"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

১০ম বর্ষ [illegible] খণ্ড

শুক্রবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭ — শুক্রবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৭

Friday, 8th May, 1970 — Friday, 31st July, 1970

অমৃত

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

অমৃত

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১ম সংখ্যা
মূল্য
২৲ টাকা

Friday, 8th May, 1970. শুক্রবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭ Rs. 2.00

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সম্পাদকীয়

নববর্ষ : রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যচিন্তা

অমৃত-র পৃষ্ঠপোষক লেখক-লেখিকা এবং অগণিত পাঠকমণ্ডলীকে নমস্কার। দশম বর্ষে পদার্পণ করল অমৃত। এই এক দশক বাংলার সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হবে। প্রতিটি দশকই নিতানতুন চিন্তার আলোড়নে উজ্জ্বলতর হতে চায়। জীবনের দ্রুতলয়ের ছন্দ, তার ব্যাপক অন্বেষণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রেরণা শিল্প ও সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। অমৃত বয়সে নবীন হলেও জীবনের এই সত্যকে ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। এই প্রয়াসে অমৃতের সহযাত্রী রয়েছেন বাংলা দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ এবং তরুণ প্রতিভাবান কবি ও কথাকারগণ। পাঠকদের সানুরাগ সাহচর্য ব্যতীত কোনো সাহিত্যপত্র সার্থক হতে পারে না। দশম বর্ষে পদার্পণ করে অমৃত সানন্দে এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে যে, তার যাত্রাপথে সকলের সাহচর্য ও আশীর্বাদই হয়েছে অমূল্য পাথেয়। আমরা আশা রাখি, আগামী দিনেও এই সহযোগিতা অমৃতকে তার সুকঠিন দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

অমৃতর নববর্ষের দিনে আমরা শ্রদ্ধা জানাই বাংলার অমেয় কবিপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর জন্মশতবর্ষেই অমৃত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ দিনে তাঁর আবির্ভাব। এই দিনটি বাঙালীর উৎসবের দিন। প্রতি বৎসরই তাঁকে আমরা নতুন করে ফিরে পাই। ফিরে পেতে চাই তাঁকে আমরা প্রতিদিনের জাগ্রত সত্তার অনুভবে। আমরা জানি পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে বাঙালী উৎসবের আলোকে উদ্দীপিত হবে। আমাদের অস্তিত্বের কতখানি জুড়ে যে তিনি আছেন তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তিনি তো শুধু একজন কবি বা সাহিত্যিকরূপেই আমাদের বরণীয় নন। তিনি তার চেয়েও বেশি। বলা চলে, তিনিই বাংলার এক শতাব্দীর মননের, চিরন্তনের এবং ধ্যানের জ্যোতির্ময় প্রতিভূ। তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলার বা বাঙালীর কোনো শুভ কর্মই সম্ভব নয়। তিনি হলেন বাকগতি, তিনি সর্বসিদ্ধিদাতা।

দুঃখে-সুখে, আনন্দে-হতাশায়, উৎসবে-শোকে সর্বক্ষণ তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমাদের আধুনিক চিন্তার তিনি উৎসস্বরূপ, আমাদের শুভচেতনার তিনি সারাৎসার। বাঙালী যে তার ভাষা নিয়ে এত গর্ব করে, সংস্কৃতি নিয়ে যে তার এত গৌরববোধ তার জন্য রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের অনলস সৌন্দর্য সাধনাই মুখ্য কৃতিত্বের অধিকারী। ইংরেজের যেমন শেকসপীয়র, জার্মানদের যেমন গ্যোটে-শিলার, রুশীদের যেমন তলস্তয় বাংলার ও বাঙালীর তেমনি রবীন্দ্রনাথ। শুধু সাহিত্যের সেবকরূপেই বাঙালী স্মরণ করে না। তিনি আমাদের সমাজচেতনা, জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকবাদেও দীক্ষিত করে গেছেন। এই দুঃখিনী দেশের বড় পুণ্যের ফলে তিনি জন্মেছিলেন আমাদের লোক হয়ে। এই দেশের কী প্রয়োজন, কী অভাব তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সকল দিকে ছিল তাঁর সযত্ন দৃষ্টি। গ্রাম সংগঠন, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি যে কাজ কবির নয়, সে-কাজও তিনি নিজের হাতে করে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন

এই দেশের প্রতি তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। তিনি যখন বিশ্বজনের কবি হিসেবে সর্বত্র নন্দিত ও পূজিত তখনও তিনি এই দেশের জনাই বেদনায় আকুল হয়েছেন, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে। এই পবিত্র ভালবাসার কোনো তুলনা নেই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে। তিনি জন্মের ঋণ দু হাত ভরে দিয়ে শোধ করে দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর উত্তরপুরুষ কীভাবে এই দেশ, এই ভাষা, এই সংস্কৃতিকে জানব, ভালবাসব, রক্ষা করব পঁচিশে বৈশাখে সেই হোক আমাদের সংকল্প। শুধু আবেগ-উচ্ছ্বাস নয়, শুধু ভাষণ নয়, শুধু সঙ্গীত নৃত্যাদিও নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার মহত্তর, গভীরতর অনুরাগের প্রত্যাশা আমাদের কাছে করে। আমরা যেন তাঁর সেই জীবনসাধনার যোগ্য উত্তরাধিকার হাতে পারি। কবিকে প্রণাম।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথই আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন মানবজীবনের অন্তর্গূঢ় ভাষ্য। তাঁকে অনুসরণ করে বাংলার লেখকগণ ছোট গল্পের জগতে অনেক চমৎকার পরীক্ষার অবতারণা করেছেন। গল্পগুচ্ছ দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের যে জয়যাত্রার সূত্রপাত তারই পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি আধুনিক ছোটগল্প লেখকদের রচনানৈপুণ্যে। আমরা তাই এবারে অমৃতর নববর্ষ সংখ্যায় বাংলা ছোট গল্পের একটি চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। গতবারও আমরা নির্বাচিত ছোট গল্প ও গল্পকারদের বিষয়ে তরুণ লেখকদের আলোচনা প্রকাশ করেছিলাম। এবারে আরও কয়েকজন তরুণ লেখকদের লেখা নির্বাচিত করা হল। অবশ্য স্থানাভাবে সকল লেখকদের রচনা সংকলিত করা গেল না। আমরা আশা রাখি ভবিষ্যতে আবার বাংলা ছোট গল্পের নিরীক্ষামূলক একটি সংকলন অমৃত প্রকাশ করতে পারবে।

বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের লেখকদের থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বিশিষ্ট ও তরুণ লেখকদের প্রতিনিধিস্থানীয় ছোট গল্প সংকলন করা হল। এতে গত তিন দশকের বাংলা ছোট গল্পের প্রকৃতি ও গতিধারা পাঠকরা বুঝতে পারবেন বলে আশা রাখি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোট গল্পের ধারাকে যে-খাতে প্রবাহিত করে গিয়েছিলেন তার কী পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছে, পাঠকরা এই সংকলন থেকে তা উপলব্ধি করতে পারলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে গণ্য করব।
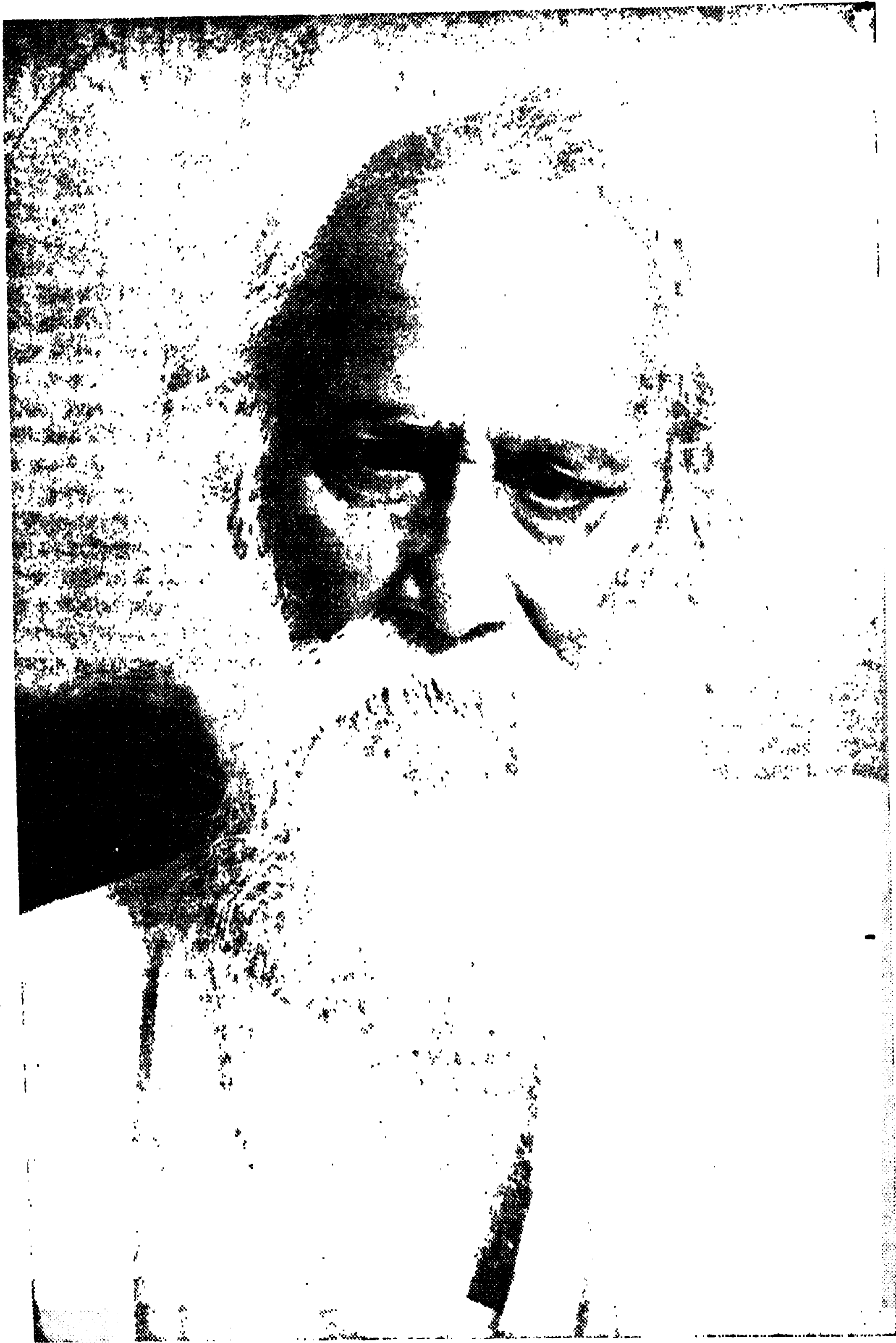
রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান প্রসঙ্গে

সুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের একটি বইয়ের নাম 'ছবি ও গান'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে কোন কবিতাগ্রন্থের এ নাম হতে পারে, এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রায় যে কোন কবিতার এবং সমগ্র কবিতাবলীর নির্দেশিকাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা-ফলের বীজ অথবা আঁটিরূপে পাই ছবি, আর গানরূপে পাই আর যা কিছু। তবে সে ছবির মাত্রাভেদ এবং প্রকারভেদ আছে। কোথাও ছবি পরিপূর্ণ, কোথাও সম্পূর্ণ, কোথাও রেখাংকিত। কোথাও বা ছবি আধখানা, কোথাও বা একটু টুকরো। এই হল ছবির মাত্রাভেদ। প্রকারভেদে রবীন্দ্র-কবিতায় পরিপূর্ণ ছবি একটি গল্প-কাহিনী বা অন্যরকম বস্তুর বিম্বন হতে পারে. কোন গল্প-কাহিনী বা অন্যবিধ বস্তুর ইঙ্গিতবহ হতে পারে অথবা কোন ভাবের বা তত্ত্বের দ্যোতক রূপক-কাহিনী অথবা তেমন কাহিনীর ইঙ্গিতবহ হতে পারে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় (ও গানে) রূপকবীজের কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রনাথের রূপকগর্ভ কবিতার কথা চিন্তা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে. এল সোনার-তরীর 'পরশ-পাথর'। এই কবিতাটি এবং ঠিক আগের দিনে লেখা 'হিং-টিং ছট' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিপুণ হস্তের প্রথম রূপক কবিতা রচনা। তবে কবিতা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর, কবির মেজাজও ভিন্ন রুচির। দুটির বস্তুই পরিপূর্ণ গল্প। হিং-টিং-ছটে গল্পটাই প্রায় সব, অর্থাৎ যেন আঁটিসার দেশি আমড়া। শাঁস যেটুকু তা পাকা আমড়ারই মতো মিষ্টির আমেজ দেওয়া টক। তার রূপকের বেজা (সাধু ভাষায় রাধাপ্রঞ্জ) হল বাঙালীর আলস্য অক্ষমতা ও সেই সঙ্গে ফাঁক আধ্যাত্মিকতা এবং প্রচণ্ড আত্মগরিমা। সুনিপুণ শ্লেষে ঝলোমলো কবিতাটিকে স্যাটিরিক্যাল প্যারাবল বললে বোধহয় বেঠিক হয় না।

এস ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ-কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

পরশ-পাথর প্যারাবলটির কাহিনী কল্পিত হয়েছে—বৃন্দাবনে গোস্বামীদের মহত্ত্বঘটিত একটি প্রাচীন কিংবদন্তী থেকে। সে কিংবদন্তী নিয়ে কবি অনেককাল পরে 'কথা'য় সংকলিত 'স্পর্শমণি' কবিতাটি লিখেছিলেন। ('নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে জপিছেন নাম')। পরশ পাথরে মূল কাহিনীর ভোল একেবারে পালটে গেছে। গল্পে খ্যাপার খ্যাপামি হয়েছে ট্রাজিক, রূপকে তা হয়েছে চরম রোমান্টিক। মানুষের জীবনে এমন কোন কোন মুহূর্ত আসে যখন তার মনে অকারণে হর্ষ সঞ্চার হয়। সেই হর্ষের উপলক্ষ্য তার কাছে অত্যন্ত ক্ষণিক ও তুচ্ছ ব্যাপার—আকাশ থেকে আলো আসার দিক, রোদের হাল্কা রং, বাতাসের ছোঁয়া, খর রোদে লতাপাতার ঝিলিমিলি চীলের ডাক দূরে কাঠকাটার শব্দ, রান্নাঘরের চালে তিনটে শালিকের ঝগড়া—এই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিতান্ত নিরর্থক ব্যাপার তার মনের কারণহীন সুখের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে মনের গহনে যেন তার মন্ত্রে আনন্দের সিম্বলে পরিণত হয়। তারপর হয়ত বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৃশ্য ও ঘটনা তার মনের উপরে ভেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সেই ক্ষণের অকারণের হর্ষের যেন ছোঁয়া

পায়। এই হল পরশ-পাথরের পরিচয়, স্পর্শমণির স্পর্শ—যে মণি আমাদের অন্তরে থাকতে পারে, কিন্তু তা আমরা জানতে পারি না। অর্থাৎ তার আবির্ভাব সজ্ঞানে অনুভব করা যায় না, দৈবাৎ কখনো সখনো অনুভব করা যায়। জানি না সেকালের ঋষিরা ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মাস্বাদ বলতে কি বুঝেছিলেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই পরশ-পাথরের পরিচয় দৃষ্টিতেই ব্রহ্মের আনন্দ এবং অমৃত রূপ অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি একটি গানে বলেছিলেন, 'তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনি না যে।' কখন যে সে মধ্যম-পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কোন সাধনায় তা পাওয়া যায় না ('নায়মাত্মা প্রবচনেন' ইত্যাদি) তাকে পাওয়া যায় দৈবাৎ ('যমেবৈষ বৃণুতে' ইত্যাদি)।

ব্রহ্ম ও বেদান্তর কথা ছেড়ে দিলেও কবিতাটির রূপকমূল্য আজকের বাজারে কিছুমাত্র কম হয় না। মানুষের ব্যক্তি-জীবনের যা কিছু নিজস্ব এবং মূল্যবান তা সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই পায়। বাইরের উপদেশ শিক্ষা তার অভিজ্ঞতার সহায়ক হতে পারে, এই পর্যন্ত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে অহেতুক অনুভব (অর্থাৎ ভালো লাগা), তাতেই স্পর্শমণির ছোঁয়া পড়ে। সেই অনুভবের প্রত্যাশাই খ্যাপার খোঁজা, জীবনের মূল্যের রস অন্বেষণ। যে সে পরশ-পাথরের স্পর্শ একবার পেয়েছে সে ধন্য হয়েছে। সে হয়ত নিজে তা খুব অবগত না থাকতে পারে, কিন্তু তার কথায় কাজে, ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে সোনার ঝলক অপরের গোচরে আসে।

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।...
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিল জগৎ মাঝে অতুল সুন্দর।

সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণ দেহ জীর্ণ চীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।...

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে,
সন্ন্যাসীঠাকুর এ কী,
কাঁকালে ও কী ও দেখি
'সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে।'
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।...

এই রূপকটিতে আরও একটু তত্ত্ব আছে, সেটুকু স্থূলে অতএব বেশি প্রয়োজনীয়। মানুষের জীবন পরিষ্কার দু-ভাগে বিভক্ত,—উঠতি বয়স, পড়তি বয়স। উঠতি বয়সে সে উদ্যম করে নূতনের স্বাদ পাবার জন্যে, পড়তি বয়সেও সে তাই চায় কিন্তু তখন তার প্রয়াসের পিছনে উদ্যম থাকে না স্বাভাবিক কারণেই। তখন সে পুরাতনেরই স্বাদ ফিরে পেতে চায়, পুরাতনকে নতুন করতে চায়। কিন্তু জীবনে কোন নূতনের তো পুনরাবৃত্তি নেই। সেই হল মানুষের ব্যক্তিগত ট্রাজেডি।

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।

জীবনের গভীরতর অনুভবের যে অসামান্যতা তাকে বিশেষ মূল্য দেয়, তা অপর গভীর-অগভীর অনুভব থেকে স্বতন্ত্র জাতের নয়। যে পরশ-পাথর ছুঁলে লোহা সোনা হয় সে পরশপাথর বাইরে থেকে দেখতে সাধারণ পাথর থেকে ভিন্ন নয়। মনে যখন কোন দিকে কোনরকম টান থাকে না, চিত্তে যখন কোনরকম রং লেগে থাকে না, বাসনা যখন কোন কিছুর জন্যে উন্মুখ থাকে না তখনই তাতে সোনা-করা জাদুর গুণ জাগে এবং তা মুহূর্তের জন্য। তাই অকারণের হর্ষ নিতান্ত চকিত স্ফুরণ, বিজ্ঞানের ভাষায় স্পার্ক। আমাদের দেশে অ-শাস্ত্রপন্থী কোন কোন অধ্যাত্ম সাধকেরা ক্ষণকালের, খণ্ডকালের অখণ্ড মূল্য জানতেন। তাই তাঁদের সাধনায় মোক্ষ নেই, নির্বাণ নেই, স্বর্গভোগ নেই। তাঁদের মতে মানুষই চরম। সুতরাং চরমতার সাধনা হল মানুষের চিরজীবন লাভ। তা সম্ভব হয় যদি খণ্ডকাল স্তব্ধ হয়ে অনন্তকালে পরিণত হয়। অর্থাৎ যখন চিত্ত হয় নিশ্চঞ্চল শ্বাস হয় নিরুদ্ধ, অতএব কায় হয় অবিকারী। বলা বাহুল্য ভাবের দিকে যতই মিল থাক না কেন, হঠযোগীদের সাধনা ও তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কোনই সম্পর্ক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ইহজীবনই বিশ্বাস করতেন, পরলোক বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। অতএব তিনি মরণও বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাবনায় অমরত্ব ইহজীবনের ওপারে নয়।—'মরার পরে চাইনে ওরে অমর হতে' তার ভাবনায় সে অমরত্ব হল পরশপাথরের স্পর্শ।

(২)

রবীন্দ্রনাথের গানে ছবি এবং রূপকের ব্যবহার কবিতার চেয়েও বেশি। তবে গানের ছবি প্রায়ই অসম্পূর্ণ অথবা ভাঙা এবং তা গানের পক্ষে সমঞ্জস। দৈবাৎ গানে কবিতার ছবির অনুসরণ এবং রূপকের প্রতিফলন ঘটেছে। একটা উদাহরণ দিই। সোনার-তরীর প্রথম কবিতাটি। চাষী ফসল ফলিয়েছে পরিপূর্ণ, সে ফসল কাটাও হয়েছে। ফসল খামারে তোলবার জন্যে সে নদীকূলে তরীর অপেক্ষা করছে। কাল শ্রাবণ প্রভাত। আকাশে মেঘের আড়ম্বর নদীকূল নির্জন। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পরে খেয়ারির আগমনী শোনা গেল—পরিচিত কণ্ঠের গান। তরী কূলে ভিড়ল, ফসল বোঝাই হল, তবে চাষীর ঠাঁই হল না সে খেয়ায়। ফসল চলে গেল, সে শূন্য নদীর কূলে পড়ে রইল।—এই হল সোনার-তরী কবিতাটির ছবি। রূপক মর্ম—মানুষের কাজেই তার জীবনের মূল্য এবং সে কাজের ফল সব কালের সকলের জন্য। যাঁরা শাস্ত্রের নজির ভালোবাসেন তাঁরা বলবেন ঠিকই তো। গীতায় বলেছে, কর্মণ্যেবাধিকারবস্তে, মা ফলেষু কদাচন।

সোনার তরী কবিতাটির (রচনাকাল ১৮৯২) অনেককাল পরে (রচনাকাল ১৯১০) রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখেছিলেন এই ছবিটিরই জের টেনে—

ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।

এবারে ফসল নয়, বোঝা তাও হয়েছে ভারি। সে বোঝা পার করা যত আবশ্যক তার চেয়ে বেশি আবশ্যক এখন বোঝার মালিকের নিজে পার হওয়া। আগে মাঝির গরজ ছিল ফসলের জন্য, এখন মাঝির কোন গরজ নেই জালজঞ্জালের বোঝার জন্য বোঝার টানে পারার্থী অনেকবার খেয়া হারিয়েছে। তাই কাতরতা

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হবে গেলি ভুলে।

ডাকরে এবার মাঝিরে ডাক,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক...

সাঁঝের তারা আর সাঁঝের বাতির প্যারাবল্-গর্ভ গানটিও একটি উজ্জ্বল পরিপূর্ণ ছবি। গানটিতে কবি মাটির ঘরের কোলে স্বর্গ নামিয়ে এনেছেন।

মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির ঘরের কোলে
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি
আলো দেখবে বলে
সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।...

মরণ সন্ধ্যাতারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি,
মনের শিখা আকুল হল
মর্তশিখায় উঠতে জবলে।

এক জীবনের পার থেকে আর জীবনের ওপারে উত্তীর্ণ হওয়ার যান; মৃত্যু এবং দুঃখের অভিজ্ঞতা জীবনের সার্থকতার অভিজ্ঞান এবং জন্মজন্মান্তরের বিত্ত,—এই তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে একটি ছবি ও গানে। সে-গান যেন একটি অপরূপ রূপকময় নাট্যচিত্র, গীতাঞ্জলিতে আছে,—'মেঘ বলেছে যাব যাব রাত বলেছে যাই'। নাট্যচিত্রের নায়ক কবিসত্ত্ব, মৌন ভূমিকা। নায়িকা প্রেম —জীবন-পরম্পরার বাসরঘরে অপেক্ষমাণ প্রেম। অপর ভূমিকা হল মেঘ, রাত, সাগর, দুঃখ, 'তিনি'—জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা, কবিসত্ত্বের ইহজীবনের 'আমি' ভুবন, গগন, মরণ। দুর্যোগময় নিশীথে কবিসত্ত্ব জীবন-তরীতে বসে কালের সাগরে পাড়ি দিয়েছে। পারে উত্তরণের কোন ভরসা নেই। (তুলনা করি যোগী-সাধকদের গানের ছত্র—'ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন'।) —এই হল পটভূমিকা। যখন আশা-ভরসা ফুরিয়েছে, তখন হঠাৎ নজর হল আকাশে মেঘ বুঝি একটু হালকা হয়েছে ('মেঘ বলেছে যাব যাব'), রাত বোধ হয় কাটল ('রাত বলেছে যাই'), আর মনে হল তীর যেন ঝাপসা দেখা যাচ্ছে ('সাগর বলে—কূল মিলেছে, আমি তো আর নাই')। এক মুহূর্তে সারারাতের বিভীষিকা মিথ্যা হয়ে গিয়ে স্মরণে লালিত হবার জন্য হৃদয়ে সোনা হয়ে সঞ্চিত রইল ('দুঃখ বলে—রইনু চুপে তাহার পায়ের চিহ্নরূপে'। এখানে বিষ্ণুর বক্ষে ভৃগুপদচিহ্নের ধ্বনি আছে।) কবি-সত্ত্বের অহং অভিমানের আর রইল না ('আমি বলে—মিলাই আমি আর কিছু না চাই')। চারদিকের জগৎ এখন কবিসত্ত্বের ভালো লাগছে ('ভুবন বলে—তোমার তরে আছে মালা'), আকাশের সূর্য গ্রহতরা উৎসবের আয়োজন করেছে ('গগন বলে—তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা')। মনে প্রসন্নতায় প্রেমের আবির্ভাব হয়েছে ('প্রেম বলে যে—যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে')। মরণ জীবনেরই ভৃত্য ('মরণ বলে—আমি তোমার জীবনতরী বাই'), সে গ্রাহ্যের মধ্যে নয়।

ছবির ছোট টুকরো দিয়ে গানে ব্যবহারের একটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। এ-গানের ছবিতে গল্প নেই। প্রথম ছত্রে শুধু আছে একটি ছেলেভুলানো গল্পের ইঙ্গিত। রাজপুত্র রাজকন্যার সন্ধানে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাক্ষসীর পুরীতে এসে আটক পড়েছে। তাকে দিনের বেলা প্রাসাদের সব ঘরে প্রবেশের স্বাধীনতা দেওয়া আছে, কেবল একটি ঘরের চাবি খোলা তার নিষিদ্ধ।—এই গল্পের ইঙ্গিত-টুকু না বুঝলে গানটির অর্থ পরিষ্কার হয় না। ছত্রটি এই—'এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার।'

গল্পে নতুন কাল

বর্তমান কালের স্বনামধন্য প্রথম শ্রেণীর একজন লেখকের প্রথম প্রকাশিত বই একটি গল্প-সংগ্রহের ভূমিকায় ছোটগল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'বিন্দুতে সিন্ধুর' উপমা দিয়েছিলাম মনে আছে।

কথাটা লাগসই হয়েছিল। কানে ধরার দরুন অনেক তরফ থেকে তারিফও পাওয়া গিয়েছিল তখন।

সে ধারণা আমার সম্পূর্ণ বদলে গেছে এমন কথা বলব না কিন্তু বেশ একটু চিড় যে খেয়েছে তা অস্বীকার করবার নয়।

চিড় খাবার কারণ প্রধানত বিন্দু আর সিন্ধু এই দুটি শব্দের বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে।

ছোটগল্পকে এক হিসেবে জীবনের বিন্দু বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু সে বিন্দুর স্বরূপ কি?

জীবনের সামান্য একটু ভগ্নাংশ হলেই তা কি গল্পের বিন্দুত্বে উত্তীর্ণ হবার যোগ্য হয়?

তার মধ্যে 'সিন্ধু' হিসাবে কি আশা করি? জীবনের গভীর বিরাট অর্থময়তা?

অর্থাৎ ছোটগল্প বিচিত্র অশেষ জীবন-লীলার কোনো এক সামান্য তরঙ্গভঙ্গের ওপর ক্ষণিকের আলোর রেখা ফেলে জীবনের বিরাট রহস্য মহিমার ইঙ্গিত দেবে?

কখনো কখনো ছোটগল্প হয়ত তা করে। সে রকম অসামান্য ছোটগল্প কোনো দেশের সাহিত্যেই একেবারে বিরল নয়, কিন্তু তাই বলে ছোটগল্প মানেই জীবনের যে কোন কণিকার মধ্যে বিশ্বরূপ দেখানো এ কথা বলতে এখন বাধে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে নতুন করে এই জিজ্ঞাসার মূলে জীবন সম্বন্ধেই আমাদের পরিবর্তমান ধারণার অনিশ্চয়তা যে অনেকখানি কাজ করছে তা অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

আদি যুগে কণ্ঠের ভাষায় সেই প্রথম জন্ম থেকেই ছোটগল্প বেশ ত কয়েকটা ফরমাস খেটে আসছিল। যারা শুনছে তাদের খুশি করো এই হল ফরমাস। শুধু যারা শুনছে তারাই বা কেন, যে বলছে তারও খুশি হওয়ার তাগিদ আছে সঙ্গে সঙ্গে।

খুশিটা নানা রকমের কিন্তু আশ মেটানোটাই তার মধ্যে বড় কথা।

সাধ মেটানোটা অবশ্য পাকা হাতে হওয়া চাই। যে শুনবে, যে পড়বে কথার যাদুতে তাকে যাকে বলে নিজের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। গল্পের মধ্যে সে নতুন করে আর এক সত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। সেই সত্তার সুখ দুঃখ আশা নিরাশা যন্ত্রণা উল্লাসের দোলায় সে থাকবে দোলানো।

আমাদের প্রত্যেকের একটা ত' মাত্র জীবন, একটা মাত্র চেতনার ধারা। তাতে তৃপ্তি নেই। আরো অনেক অনেক জীবনের আকুল পিপাসা আমাদের অস্থির করে রাখে। সেই পিপাসা মেটায় গল্প। সেই পিপাসা মেটানোর মারফৎ আমাদের ইচ্ছা-পূরণের কাজটাও সমাধা হয়ে যায়।

হাত যাদের পাকা আর তার সঙ্গে ঘাড়ও একটু বাঁকা, তেমন গল্পের ব্যাপারীরা কিন্তু নগদ বিদায়ের লোভে মামুলী ছক ধরে শুধু সাধ মেটাবার ফরমাশই খাটে নি। ইচ্ছা পূরণের ছলেই বেয়াড়া কিছু সংশয় আর জিজ্ঞাসা তারা নিজেদের সওদায় মিশিয়ে এসেছে চিরকাল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাধ মেটাবার দায় মেনেও কিছু গল্প সাহিত্য তাই জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ভিত্তিমূল ধরেই নাড়া দিয়ে যায়।

ধ্রুব বলে যা ধরে নেওয়া হত আজকের দিনে জীবনের সঙ্গে সেই ভিতটাই চোখের সামনে যদি টলে তাহলে পাঠকের সাধ মেটাবার মেজাজ ছোটগল্পের পক্ষে বজায় রাখা নিশ্চয় শক্ত।

সাধ যে মেটাবে, তাই বা কোন্ সাধ? জীবন কি ঘর-বাঁধা ঘুঁটির খেলা যে ডাইনে কি বাঁয়ে এগিয়ে কি পেছিয়ে কটা চাল বদলে দিয়ে বেশ একটা মনের মত মাৎ দিয়ে শেষ করা যায়? কি যে সাধ আর কি অসাধ তাই ঠিক মত কে বলতে পারে!

না, শুধু বিন্দুতে সিন্ধু বলে ছোট-গল্প সম্বন্ধে শেষ কথা আর বলে দেওয়া যায় না।

বিন্দুতে সিন্ধু না হোক, কোনো সস্তা ফরমাশ খাটার দায় সে না মানুক, ছোট-গল্পের একটা কিছু ধর্ম ত থাকবে। কি সে ধর্ম!

এপার ওপারের বিদ্রোহী ছোট গল্প সামান্য যা পড়ছি তাতে সে ধর্ম খুঁজে বার করা সহজ হচ্ছে না। গল্প এখন আর ঘটনা প্রবাহের কোনো একটা নক্সা মানবে না, না মানুক। চরিত্রের সঙ্গতিতে বিশ্বাস তার নেই, না থাকুক সময়ের ধারাবাহিকতা তার কাছে অলীক তাই হোক তবু কাগজের ওপর কালির আঁচড় টেনে 'শব্দ সাজাবার এ-টা কৈফিয়ৎও কি থাকবার দরকার নেই?

কৈফিয়ৎ, —নদীর স্রোতে উড়ো প… ডানার ছায়ার মত পাঠকের চেতনায় … তৎক্ষণিকের একটা মন্থন, নশ্বর অস… তাই যার সার্থকতার উপাদান।

অর্থহীন বাগাড়ম্বর যদি শোনায় ত… অপরাধটা সংস্কারের জড়ত্ব ভাঙা নব দি… সন্ধানী নতুন কালের ছোটগল্পের নয়।

নতুন ছোটগল্প এখনো সাত ন… খাস্তা হয়েই হয়ত আছে, নিজেকে চে… মত চোখই তার হয়ত ফোটেনি, উদয়… অন্ধকারে নিজের যথার্থ পথ হয়ত… হাতড়ে ফিরছে, তবু সব ভড়ং আর ভ… সর্বস্বতার পেছনে তার বিদ্রোহটা একে… ফাঁকি, এ কথা বলবার মত স্পর্ধা… কারুর না হয়।

গল্পের ঐতিহ্য আর শিল্প-সং… যাঁরা মেনে চলেছেন আর যাঁরা ভাঙ… সৎ ও সার্থক হলে দুপক্ষকেই … সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে অ… জীবনের ব্যঞ্জনার সমস্যা, শাস্ত্র আর লো… চার, নির্বিচার আনুগত্য আর … সংস্কারে শৃঙ্খলিত সাবেকী জীবন … জাগ্রত আত্ম-জিজ্ঞাসু চেতনার উন্মেষে… ধারণার সীমা যা ছাপিয়ে যাচ্ছে সেই বি… বিপুল বিক্ষুব্ধ বর্তমান জীবনপ্রব… তারই ব্যঞ্জনা।

ইচ্ছাপূরণের দায় কাঁধ থেকে নামা… সাবেকী চালের কলমে এ ব্যঞ্জনা যে… আপনা থেকে ফোটে না, তেমনি শিল্পে… সব ব্যাকরণ জলাঞ্জলি দিয়ে, প্রলাপে… কিনারায় মনকে টেনে এনে সব রাশ ছে… দিলেও নয়।

ঐতিহ্যাশ্রয়ী গল্পকারকে আজ নতু… করে বিষয় খুঁজতে হচ্ছে তার স্রষ্টা ম… জীবন রক্ষার ভিন্ন স্তরে মেলে রেখে বিষয়ের সঙ্গে প্রকাশের নতুন ব্যাকরণও।

আর সব সংস্কার-ভাঙা বিদ্রোহীকেও সন্ধান করতে হচ্ছে নিজের সেই নিগূ… শিল্পী-সত্তা, তার সৃষ্টি-কর্মের সমস্ত… আপাতঃ অসঙ্গতি আর উৎকেন্দ্রিক বিক্ষেপ যা একটি গভীর সামঞ্জস্যে গ্রথিত করে দিতে পারে।

পথ ভিন্ন হোক পৌঁছোবার ঠিকানায় তফাৎ নেই। উদ্ভাবনী প্রতিভায় আর দুঃসাহসিকতাতে কে আগে কে পেছনে তার রায় দিতে আমি কিন্তু নারাজ।

পায়ের তলার মাটিই যেখানে দুলছে সেখানে পায়ে পায়ে জড়িয়ে কথায় কথায় ডিগবাজি খাওয়ার চেয়ে সোজা হয়ে মাথা উঁচু রেখে হাঁটার বাহাদুরীই বোধ হয় বেশী।

জীবন দুর্জ্ঞেয় জটিল বিচিত্র বলে তার অপার রহস্য মহিমার ইঙ্গিত দেওয়ার সব-চেয়ে সার্থক উপায় ভাষা ও ভাবের যুক্তি-শৃঙ্খলার বালাই ঘোচানো, একথা মানতেও এখনো প্রস্তুত নই।

পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, চিরকালই চলবে। তবু সাধারণ মানুষের সস্তা সাধ মেটাবার ফরমাশ না মানলেই স্বয়ং মানুষকেই গল্পের রাজ্য থেকে বাদ দেবার হুকুমত বোধহয় মেলে না।

গল্পে নায়কের সিংহাসন উল্টে গেছে। যাবারই কথা। কিন্তু মানুষের মিছিল সেখানে থামবার নয়।

কী নিয়ে কাকে নিয়ে গল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সেদিন একজন শক্তিমান তরুণ লেখক আলোচনা-প্রসঙ্গে দুটো কথা বললেন। তাঁর প্রথম বক্তব্য ছিল, এখন আর কাকে নিয়ে গল্প লিখব—নিজেকে ছাড়া? তাঁর দ্বিতীয় কথাটি হল : কী নিয়ে গল্প লিখব আর—পৃথিবীতে গল্পের সব উপকরণই অতি-ব্যবহৃত হয়ে গেছে, কী হবে ওই সব জীর্ণতার পুনরাবৃত্তি করে?

এই তরুণ লেখক বাংলা-সাহিত্যে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁর এই ভাবনাটা একালের একটা বড়ো সংখ্যক নতুন লেখকের প্রতিধ্বনি ভাবা যেতে পারে। আমরা যারা নিজেদের বাদ দিয়েও অনেক গল্প লিখতে চেষ্টা করেছি এবং এখনো যাদের কাছে বিষয়ের অভাবটা খুব গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি, সেই আমাদেরও কথাদুটো একটু তলিয়ে দেখবার দরকার আছে।

বাংলা দেশের 'লিটল ম্যাগাজিন'গুলোতে প্রায়ই অনেক স্পর্ধিত উজ্জ্বল স্বর শুনতে পাই। সেখানেও কেউ কেউ বলেছেন, নিজের বাইরে আমরা যা কিছু লিখে থাকি, সেগুলো তো বানানো গল্প। আমি কলকাতার এক মধ্যবিত্ত সংসারের সন্তান—আমার এই পরিবেশ, এই দিনযাত্রার ভেতরে প্রতিমুহূর্তে আমার সত্তার সহাবস্থান, সংগ্রাম আর সমস্যা; সাহিত্য যদি জীবনের অকুণ্ঠিত সত্যপ্রকাশ হয়—তা হলে এর বাইরে আমি যা কিছু লিখব, তা কৃত্রিম, তা আরোপিত। মধ্যবিত্ত যন্ত্রণায় যে আমি নাগরিক অলাত-চক্রে পাক খেয়ে চলেছি, সেই আমাকেই নানা খণ্ডে—নানাভাবে আমি প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু তাই বলে আমি বাঁকুড়ার কৃষক হতে পারি না—আলুর ব্যবসায়ী গদাধর পাল হওয়াও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সত্তাকে এইভাবে ভেঙে ফেললে, আর যাই হোক, সত্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকে না।

এই চিন্তাধারার মধ্যে কোথায় যেন 'অস্তিবাদী' দর্শনের ছায়া পড়ছে মনে হয়, কিন্তু সে কথা থাক। তবে 'বিষয়ের অভাব' স্বাভাবিক ভাবেই এই চিন্তার অনুষঙ্গী হয়ে আছে। কারণ, কতক্ষণ আমার এককত্বকে আমি টুকরো টুকরো করতে পারি, কতক্ষণ পারি তাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিফলিত করতে? ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে আমার একটা সীমা আছেই, ভাবনার, অনুভূতির, বুদ্ধির, বিচারের। এইগুলোকে ভেঙে, নানাভাবে বিশ্লেষণ করে, এক-একটা বিশেষ মুহূর্তের উদ্ভাসনে, আমি দশ-পনেরো-বিশটা গল্প লিখতে পারব। বড়ো জোর। তারপর আসবে নিজেকে পুনরাবৃত্তির পালা—যার চাইতে বড়ো দুর্ভাগ্য সাহিত্যিকের আর নেই। তা থেকে নিজের কাছেই আমরা ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে উঠব, তারপর একদিন গল্প লেখাই ছেড়ে দিতে হবে।

তা হলে খুব বিপজ্জনক সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে একটা। নিজেকে নিয়ে গল্প লিখতে গেলে (দু একজন অলৌকিক শক্তিধরের কথা বলতে পারি না) অচিরাৎ বিষয়ের সমাপ্তি ঘটবে—আসবে আত্মানুবৃত্তি। তার মানে আমাদের দীপ্তিমান গল্পলেখকের দুটি কয়েক গল্প লিখেই কলমের খাপ বন্ধ করবেন? বাংলা ছোটগল্প নিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিকভাবেই গর্বিত হওয়ার অধিকার আছে—আমি অন্তত এত সহজে সে অহংকার ছাড়তে প্রস্তুত নই। আমাদের তরুণেরা অনেক—অনেক ভালো আর নতুন গল্প লিখে চলবেন, অনেক সম্ভাবনা তাঁদের সামনে।

এই নতুন গল্প বলতে ফর্মের ভাবনাটাকে আমার খুব জরুরি মনে হয় না। ভাষার ভাঙচুর করাতেই বা কী আসে যায়—যে-কোনো ভাষাই তো একটা সময়ের পরে সম্পূর্ণ বাসী হয়ে যাবে। শব্দ সংস্কার মানব না—ভালো কথা, কিন্তু তাতেও নতুন গল্প গড়া যাবে না; 'কিছুই মানব না—' এ ধরণের নৈরাজ্যবাদও এক ধরণের রোমান্স মাত্র, সমাজে জীবনে-পারস্পরিকতায় প্রতিমুহূর্তে আমরা মেনে চলি, মেনে চলতে হয়, 'মূল্যবোধে'র সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছেই। 'কনভেনশান মানব না এইটেই তাঁর কন্‌ভেনশান হয়ে দাঁড়িয়েছে—' জনৈক অতিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এবং কবি-সম্পর্কে এই উক্তিটি বিদ্যমান রয়েছে সাহিত্যে।

এগুলো বাইরের জিনিস। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল, নিজের সীমা ছাড়িয়ে যা কিছু লিখব, তা মিথ্যাচার কিনা? এইটেই একটু ভেবে দেখা যাক।

আমার নিজের কথা সবচাইতে সত্যি করে লেখা সম্ভব একমাত্র ডাইরিতে। সে ডাইরির কথা বলছি না—যেখানে প্রতিদিনের কাজকর্ম, জমা-খরচ, খুঁটিনাটি ঘটনার কথা আমরা সোজাসুজি লিখে চলি। আর এক ধরণের ডাইরি আছে—যেখানে আমরা নিজেদের মুখোমুখি বসতে চাই, আমাদের ভাবনা, উপলব্ধি, তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসাকে সাজিয়ে যাই —যে ডাইরিকে আমরা নিজেদের প্রতিবিম্ব বলতে পারি। পৃথিবীতে এইরকম অনেক আত্মলেখন প্রখ্যাত সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই আত্মমূলক লেখাগুলোতেই কি আমরা সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ হতে পারি? অথবা বলা উচিত, বস্তুনিষ্ঠ? মন্তানের 'এসে', বেকনের পাঁসে, পেপীর লেখা—সর্বত্রই মানুষের সেই বিশেষত্বটি ধরা প'ড়—যেখানে সে শুধু নিজের কথা লেখে না নিজেকে ছাড়িয়ে যায় নিজেকে সৃষ্টি করে। একটা দুর্ঘটনায় যায়, তিলের জন্যে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি—সেই মুহূর্তটি আমার সব ভাবনা স্তব্ধ অনুভূতিগুলো প্রায় অসাড়। অনেক রাতে আলো জেলে ডাইরিতে ঘটনাটা লিখতে বসছি, কিন্তু তখন আর সেই স্তব্ধতার কথা লিখছি না, আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমার যে চিন্তাগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছি—তারা তখন আলাদা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে—আমি আর বস্তুর সত্যসীমানার মধ্যে থাকছি না।

পৃথিবীর অগণিত শিল্পী সেলফ-পোর্ট্রেট এঁকেছেন। কিন্তু কোনো শিল্পীই আর নিরাসক্তভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে নেই। শিল্পী রেমব্রান্ট হোন, হোগার্থ হোন আর পিকাসোই হোন—প্রত্যেকেই নিজেকে একটা বিশেষ রূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলছেন—একটা নির্দিষ্ট মানসিকতা সঞ্চার করছেন তাতে—অর্থাৎ নিজেকেই নতুন করে সৃষ্টি ক'রে তুলতে হচ্ছে তাঁদের। যিনি লিখতে পারেন, যিনি আঁকতে পারেন—ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক—এই সৃষ্টিপ্রবণতার হাত থেকে তাঁরা পরিত্রাণ পেতে পারেন না। কিছুতেই না।

অতএব আমি যখন আমাকে নিয়ে গল্প লিখছি, প্রতিজ্ঞা করেছি সত্যসীমাকে কখনো অতিক্রম করব না—তখনো অনিবার্যভাবে নিজেকে অতিক্রম করছি, আমি যা—তার অনেক বেশি ছড়িয়ে দিচ্ছি তার ভেতরে। একমাত্র মানুষ সত্যের মধ্যে থাকতে পারে বাজারের হিসেবে, কুশলসংবাদের চিঠিপত্রে। কিন্তু লেখার জন্যে যে কলম ধরে—নিজের একান্ত বস্তুরেখাকে ছাড়িয়ে যায় বলেই এই তাগিদটা তার ভেতরে জন্ম নেয়।

সুতরাং আমাকে নিয়ে গল্প লেখাও আমাকে ছাড়িয়ে যাবে। তা যদি হয়, তা হলে নিছক আত্মাবর্তন কেন?

একটা মৌলিক সত্য স্বীকার করে নিতেই হবে যে বাঁকুড়ার কৃষক নিয়ে গল্প লিখি কিংবা আলুর ব্যবসায়ী গদাধর পালকে নিয়ে উপন্যাসই রচনা করি—তারা কেউই আমার বাইরে নয়। প্রত্যেক লেখকের প্রতিটি গল্পই কোনো না কোনো দিক থেকে তার আত্ম-আরোপ। সেখানে তার গড়া 'শয়তানে'ও সে আছে 'ঈশ্বরে'ও রয়েছে। সেই-ই তার গল্পের নায়ক-নায়িকা, তার ভিলেন তার মহামানব: তার ব্যক্তিত্বকে অসংখ্য ভাগে ছড়িয়ে দিয়ে সে চরিত্র গড়ছে, প্রতি চরিত্রের প্রত্যেক মনের ব্যাখ্যায়-বিচারে সক্রিয় হয়ে আছে তারই একান্ত ভূমিকা। তাই তলস্তয়ের চরিত্রগুলোতে তলস্তয়ই সঞ্চারিত, প্রুস্তের উপন্যাসে তাই, বঙ্কিমের লেখায় তাই, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম নেই। একটা জীবনগত বাস্তবতার ওপর চরিত্র-ঘটনাকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে—সর্বজনীনতার পটভূমিতে এনে তার মধ্যে প্রাণটুকু ছড়িয়ে দেওয়া হয়—তা লেখকেরই, তাঁরই সত্তার অংশ। তাই জগতের প্রত্যেক বড়ো লেখকের আঁকা প্রধান চরিত্রগুলোর যে নিজত্ব রয়েছে—সেটা তাঁরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছাড়া কিছুই নয়।

তাহলে বাঁকুড়ার কৃষক কিংবা চাঁপদানির চটকলের শ্রমিক অথবা কোনো সাধারণ বাঙালী করণিক—আমি যাকে নিয়েই গল্প লিখছি—তা আমার অধিকারের বাইরে দাঁড়াচ্ছে না। বরং একটা দায়িত্ব এসে দেখা দিচ্ছে। লেখক জীবনের শিল্পী, কিন্তু সেই জীবনটা কেবল আবার ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের মধ্যেই বাঁধা পড়ে নেই। আমি সমাজ, জীবন, দেশ এবং মানবতার মধ্যে বাস করি—এর মধ্য থেকে আমার নিজের দাবি-দাওয়া আমি পুরো মিটিয়ে নিতে চাই, কোথাও কম পড়লে প্রাণপণে আর্তনাদ করি। কিন্তু দেশ এবং সমাজ সকলেরই—অথচ অন্যে আমার পরিচর্যা করবে এবং আমি আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে জাল বুনে চলব—এ-দাবি অন্যায়, অপরাধ। পাড়ায় ডাকাত পড়বে—সবাই লাঠি নিয়ে তাদের রুখতে বেরুবে, আমি তখন ঘরে বসে আত্মতত্ত্ব সন্ধান করব এবং আশা করব অন্যের সমবেত প্রয়াসে আমার বাড়ীটি

থাকবে নিরাপদ—এই প্রত্যাশা থাকলে আমাকে অচিরাৎ পাড়া ছাড়তে হবে।

আমার প্রয়োজনেই আমার সমাজ, আমার দেশ। সেই কারণেই ক্ষুধিত বাঁকুড়ার কৃষক আমার যন্ত্রণার শরিক, সংগ্রামী শ্রমিক আমার আত্মজন, যে-কোনো উত্তরোল জীবনধর্মী আন্দোলনে আমারও সুনিশ্চিত ভূমিকা। আমার ভাবনা, আমার প্রত্যয়, আমার ব্যক্তিত্ব নিয়েই আমি তার অংশী-দার। 'অহং'-বস্তুর পরিচর্যা নয়—যে দেশ, যে জাতি, যে সমাজ আমার ব্যক্তিত্বের ভিত্তি, তার দিক থেকে যখন চোখ ফিরিয়ে রাখব, তখন টেরও পাব না যে নিজের পায়ের তলায় আমিই কবর খুড়ে চলেছি।

আমার গোঁকুর জর্নাল মনে পড়ছে। গোঁকুরেরা তো ফরাসী ন্যাচারালিস্ট আন্দোলনের প্রায় প্রবর্তক বলা যায়। অথচ ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সর্বজনশ্রদ্ধের ফ্লোব্যার সম্পর্কে তাঁদের জর্ণালেই লেখা হচ্ছে ঃ 'লোকটা কী নির্লজ্জ!' যখন সারা ফ্রান্স লজ্জায় দুঃখে তলিয়ে রয়েছে, তখন ফ্লোব্যার নিশ্চিন্তে বসে বসে শিল্পতত্ত্ব ভাবছে। কবি র‍্যাঁবোও তো সেদিন মৃত সৈনিকের ওপর কবিতা লিখছেন—জ্বলে উঠছে মোপাসাঁ আর দোদের কলম।

ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রের বাইরে ছড়িয়ে দিলেই অফুরন্ত জীবন। অসংখ্য গল্প। বিষয় পুরোনো হয়ে গেছে? প্রত্যেকটি মানুষই তো পুরোনো। পৃথিবীর মানব-গোষ্ঠীগুলো নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পরে নতুন কিছু কি সংযোজিত হয়েছে নারীর অ্যানাটমিতে? তবু প্রেম আসছে—নতুন হয়েই আসছে। স্পার্টাকাসের ক্রীতদাস-বিদ্রোহের পর অনেক শতাব্দীই পার হল আজো কি পৃথিবীর সব ক্রীতদাসের শেকল ভেঙেছে?

আর এই বাংলাদেশে, আমাদের ভারত-বর্ষে, এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত কঠিন সংগ্রাম; ব্যক্তিত্বের এত প্রশ্ন, এত জটিলতা —এ নিয়ে গল্প লেখা আমাদের শেষ? এতই কি গল্প, ভালো গল্প, প্রতিদিনের নতুন নতুন চেতনার গল্প, পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর সংযোজন স্পন্দিত বিদ্যুৎশোণিত গল্প—সব আমরা লিখে ফেলেছি?

আমাকে ছাড়া আর লেখবার কিছু নেই, সব শেষ হয়ে আসছে, বাংলাদেশের মাটি এতখানিই বন্ধ্যা হয়ে গেছে, এ-কথা অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই।

অন্ততঃ 'অমৃতে'র এই গল্প-সংখ্যার তরুণেরা তা প্রমাণ করবেন বলে আমার মনে হয় না।

দীনবন্ধু দত্তকে আমি ভালই চিনতাম। সে আমার সহপাঠী, আমরা এক সঙ্গে নৃতত্ত্ব পড়েছি এক সঙ্গে পাশ করেছি। সে তো আজ বছর কুড়ি আগের কথা। তারপর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। শুনেছি সে হুন্দে অল্পদিনের মধ্যে চালের ব্যবসা করে, ধনী হয়েছে। পাগলাটে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কি করে হল তার বিস্ময়ে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কোনো একটা নতুন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে এরকম উচ্ছ্বাস আমি আর কারুও মধ্যে দেখিনি। কিন্তু বিদ্যায় অভিভূত লোকটি আজ শুধুই ভূত! চমকে উঠলাম ভাবতে গিয়ে। সেই দীনবন্ধু এখন পাথরের নিচে কেন? কিংবা ভূত নয় সে। খুব সম্ভব চুরি-জোচ্চুরি করে এখন পুলিশের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন দীনবন্ধু বলে উঠল, "তুই খুব অবাক হচ্ছিস না? হবারই কথা। এটি যে আমার জন্মস্থান, এইখানেই আমি প্রথম বাস করেছি। কিন্তু তুই এখানে কেন?"

এতক্ষণে আমার ভয় কিছু দূর হয়েছে, কারণ আমার তখন মনে হল আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি। আগাগোড়া সবটাই স্বপ্ন, আমি বাড়িতেই ঘুমিয়ে আছি।

কিন্তু এ ধারণা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। চেতন মানুষের সচেতনতাই তাকে বিচার করে এবং সে বিচার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভুল হয়। অবশ্য স্বপ্নেও এমন কথা মনে হয় 'স্বপ্ন দেখছি,' কিন্তু 'স্বপ্ন দেখছি' এই মিথ্যা চেতনা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। জাগ্রত অবস্থার চেতনা কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

দীনবন্ধুর ঠান্ডা হাতের স্পর্শ লাগতেই আমি ষোল আনা চেতনাপ্রধান হয়ে উঠলাম, যদিও ভয়ে সে চেতনা ধরে রাখা খুবই শক্ত বোধ হল। ভূতের হাত বরফের মত ঠান্ডা। রাত্রির নিস্তব্ধতায় জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো বাড়ির ভিটেয় ভূতের মুখোমুখি বসে আছি। ভূত আমার একখানা হাত ধরে আছে। এমন অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার মধ্যে কোনো মনোহারিত্ব নেই, কিন্তু ভূত আমাকে ছাড়বে না। সে বলল, "কারও সঙ্গে কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি. তাছাড়া আমার অনেক কথা বলবার আছে. তুই ধৈর্য ধরে শোন। না বলতে পেরে আমি ছটফট করছি এতদিন। তুই ভয় ছাড়।"

আমার নিজের কোনো ক্ষমতা আর

দীনবন্ধু বলল, "এর পর মাত্র তিন মাস আমি সুস্থ ছিলাম। এই তিন মাস পর আবার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। যখন সুস্থ থাকি, তখন সব বুঝতে পারি। মনে হয়, আবার যদি আমার দ্বিতীয় সন্তাটি বড় হয়ে ওঠে, তাহলে হয় উন্মাদ আশ্রমে যেতে হবে না হয় ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে। একটা বিষয়ে আমি বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম এই যে, যতক্ষণ বাড়ির সীমানার মধ্যে থাকতাম ততক্ষণ সুস্থ থাকতাম। বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের স্বরূপ আমার চোখে বদলাত না, বাড়িকেও অরণ্য মনে হত না। এখানেও কিন্তু ঠিক সুস্থ লোকদের বিপরীত। কারণ বন্ধুদের কাছে শুনেছি, তারা সবাই বলে, বাড়িকেই তাদের অরণ্য মনে হয়, বাড়িতে এলে তাদের মাথা খারাপ হয়, বাইরে থাকলে মাথা ভাল থাকে।

"কিন্তু বাড়িতে কতক্ষণ থাকা যায়? অফিসে চাকরি করি। যথেষ্ট ছুটি নিয়েছি, আর নেয়া যাবে না। চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করলাম। ভাবতে ভাবতে ভাবনার আর শেষ নেই। একদিন একখানা রিকশ ভাড়া করে গঙ্গার ধারে চলে গেলাম, সমস্ত পথ চোখ বুজে ছিলাম, কি জানি যদি পথের মানুষ দেখে ক্ষেপে যাই।

"গঙ্গার ধারে বসে নানা কথা ভাবছি, কিন্তু হঠাৎ দেখি আমার অজ্ঞাতসারেই কখন আশেপাশের ভাঙ্গা ইটের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছি জলে। হঠাৎ খেয়াল হতেই চমকে উঠলাম। এও কি সেই পাথর ছোঁড়ার পূর্বাভাস। আবার কি আক্রমণ আরম্ভ হতে চলেছে?

"তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। এভাবে নিজের সঙ্গে আর লুকোচুরি খেলা যায় না বেশিদিন। মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হওয়ার আগে আরও একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। মনস্তত্ত্বের নানা বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলাম। আধুনিকতম মনোবিকলনের যত রকম বই পাওয়া গেল, তাও লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে নিলাম। আমাকে বাঁচতে হবে। স্ত্রী এবং শিশুসন্তানদের বাঁচাতে হবে। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে কাজ আরম্ভ করলাম। আত্মচিকিৎসার কাজ। মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করলাম নানাভাবে। খাতায় সমস্ত নোট করলাম। মূলে দেখা দিল দুটি জিনিস, বর্বর যুগ এবং পাথর দিয়ে পশু হত্যা। অনেক চিন্তা, অনেক বিশ্লেষণের পর থীসিস দাঁড় করলাম এই যে, আমরা আবার বর্বর যুগেই ফিরে এসেছি, শুধু বাইরের চেহারাটা তার বদল হয়েছে মাত্র। অতএব এই যুগকেই যদি বর্বর যুগ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তা হলে আর কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে না এবং তা বিশ্বাস করা কঠিন হল না। মহামন্বন্তর দেখলাম চোখের সামনে। বর্বর যুগ না হলে এমন করে অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ এভাবে পথে ধুঁকে ধুঁকে মরত কি?

"এই প্রশ্নই আমাকে আমার চিকিৎসার ইঙ্গিত দিল। যেমনি মনে হল—এরা বাকি জীবিত মানুষদের পাথর দিয়ে মারছে, চালে পাথর মিশিয়ে মুনাফার অঙ্ক বাড়াচ্ছে, তখুনি আমি পথ পেয়ে গেলাম। আমি অবিলম্বে চালের ব্যবসা আরম্ভ করলাম। প্রথমে ব্যবসায়ীদের কাছে পাথরের গুঁড়োর যোগান দিতে লাগলাম, কেননা ব্যবসার জন্য আমার মত নগণ্য লোক চাল পাবে কোথায়? তাই ঘোরা পথে ব্যবসায়ীদের বিশ্বাসভাজন হয়ে হঠাৎ একদিন চালের ব্যবসায়ী হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঠিক হয়ে গেল। পাথর দিয়ে মানুষ মারার এই পথটা যদি আমার মাথায় আগে আসত তা হলে কি আর মাসের পর মাস আমাকে ওরকম বিভীষিকার মধ্যে কাটাতে হত? এক মণ চালে পাঁচসের পাথর। অথচ আইন আমার দিকে। এক মণে দশ সের মেশালেও আইনে আটকাবে না, কিন্তু আমি অতটা নিষ্ঠুর হইনি মাথা ঠিক হবার পরে। কি অপূর্ব সুযোগ, ভেবে দেখ দেখি। চালে যত ইচ্ছে পাথর মেশাও কেউ কিছু বলবে না, বড় জোর খবরের কাগজে দু' একখানা চিঠি বেরোবে, দু' একটা গরম সম্পাদকীয় লেখা হবে।" বলতে বলতে দীনবন্ধু হাসতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ হাসি। হাসির আওয়াজ ক্রমে চড়তে লাগল। হাসতে হাসতেই বলতে লাগল, একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা না গেলে আজ আমি রাজা। ওরে, আমি রাজা হতে পারি নি, কিন্তু ছেলে হয়েছে। তাকে হাতে ধরে সব শিখিয়েছি, পাথর দিয়ে মানুষ মারার বিদ্যায় সে এখন পাকা ওস্তাদ। এখন সমস্ত বাংলাদেশের অন্তত চার কোটি হরিণ বধ করেছে সে।"

দীনবন্ধুর হাসির তীব্রতা ক্রমে বাড়তে লাগল, ক্রমে তা সকল স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে গেল। আমি স্তম্ভিত। গাছের পাখীরা ভয়ার্ত সুরে ডাকাডাকি শুরু করল। শেয়ালেরা ছুটে পালাল। আমার পাশ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে একটি শুয়োর ছুটে গেল। দূরে—বহু দূরে অসংখ্য কুকুর ডাকতে লাগল। সেই নিস্তব্ধ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেই বিকট হাসি আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করল, তারপর কি হল এখন আর তা কিছুই মনে নেই। যখন জ্ঞান হল তখন আমি আমার সেই আত্মীয় বাড়ির বিছানায় শুয়ে আমার শিয়রে আমার স্ত্রী, পাশে পুত্র, পাঁচ ছ'দিন পর আমাকে কলকাতা এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হল।

মাসখানেক লাগল সুস্থ হতে। শক পেয়েছিলাম খুবই।

এর পর আমার নিজের সামান্য একটু কাহিনী আছে। নিতান্তই সামান্য। হয়তো না বললেও চলত। কিন্তু দীনবন্ধু গৌণভাবে আমার যে উপকার করেছে তা স্বীকার করে তার প্রতি আমি এই সুযোগে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অর্থাৎ আমি নিজেই এখন চালের ব্যবসা করছি। প্রতি মণে দশ সের পাথর নির্বিবাদে চলে যাচ্ছে।

আমার দ্বিতীয় বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়ে গেছে, তৃতীয় বাড়ির প্লান আলোচনা চলছে, জমি কেনা হয়ে গেছে।

জয় দীনবন্ধু।

। না, বুঝলাম, শুনতেই হবে। তাই
কণ্ঠে বললাম, "তাহলে হাত ছাড়।"

দীনবন্ধু হাত ছাড়ল। তারপর ভাল
বসে বলতে আরম্ভ করল তার
হনী। "কল্পনাপ্রবণ ছিলাম অতি-
র—"

বললাম, "সে ত জানি।"

"না, জানিস না। তার মাত্রা কতদূর
ছিল তা কেউ জানে না, আর তা কেউ
পনাও করতে পারবে না। তুই জানিস না,
ষের আবির্ভাবের পরে প্রস্তর যুগটা
াকে আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি।
র ভাল লাগত তাদের কথা পড়তে,
পনা করতে। ঐ যুগের সঙ্গে আমি এক
ন্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম. সে এক
ন্ত মোহ। কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত যে
াবে করতে হবে তা ভাবি নি। কিন্তু
টুখানি অপেক্ষা কর, আমি একটুখানি
ড়মোড়া ভেঙে নি, সমস্ত দিন পাথরের
প থেকে হাত পায়ে খিল ধরে গেছে।
রয়ে এতক্ষণ তোর পাল্‌স ধরে বসে
াম, তোর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে
রছিলাম।"

বলতে বলতে দেখি দীনবন্ধুর দেহটা
ৎ খুব বেড়ে যেতে লাগল। বাড়তে
তে বেল গাছ ছেড়ে উপরে উঠে গেল
মাথাটা। তারপর দু' হাত দুদিকে
স্তার করে, ভেঙে, কিছু উঠ-বস করে
বার ছোট হয়ে আমার সামনে বসল।
ম আমার মাথায় একটা অদ্ভুত টান
ভব করে হাত দিয়ে দেখি, মাথার
স্ত চুল খাড়া হয়ে উঠে কাঁপছে।

সেই তারাভরা আকাশের আবছা
লায়, আমারই সামনে, আমারই পরিচিত
বন্ধুর প্রেতাত্মা, দেখতে দেখতে
তকায় হল, এবং আবার ছোট হয়ে
মার সামনে বসল, আর সেই জনহীন
া ভাঙা বাড়িতে। আগের পরিচিত বতই
, দুটি জগৎ ত আলাদা! শিশুকাল
ক ভূতের জগৎকে ভয় করতে শিখেছি,
ভয় রয়ে গেছে প্রতিটি স্নায়ুতে। তাই
বন্ধু আমাকে বার বার আশ্বস্ত করতে
াল। বলল, "তুই ভয় পাবি কেন, ভয়
চ্ছ এখন আমি। আমাকে তো একটু
রই ঢুকতে হবে ঐ পাথরের নীচে।
র চাপা হয়ে পড়ে থাকতে হবে অনন্ত-
। এই একটুক্ষণ কয়েক ঘণ্টার জন্য
বেরোতে পারি। এই সময়টার মধ্যে
টাকে একটু ছড়িয়ে দিই। হাত-পা
শ হয়ে থাকে, এতে একটুখানি আরাম
। কিন্তু যাক, আমার কাহিনীটা না
নাতে পেরে আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে
আর কি বলব! শোন সে কাহিনী,
নাতে পারলে মনটা হাল্কা হবে। সত্যি
কষ্ট পাচ্ছি, ভাই।"

এসব কথা শুনে ভয় সত্যিই অনেকটা
টে গেল। বললাম, "শোনাও কাহিনী।"

বললাম বটে, কিন্তু কাহিনী শোনার
কি হবে? তখন আমি একা ফিরব কি
করে? মনটা বড় অশান্ত হয়ে উঠল, কিন্তু
বাইরে তা প্রকাশ করলাম না।

দীনবন্ধু বলতে লাগল, "শোন্, আমার
কল্পনাপ্রবণতা কতদূর গড়িয়ে ছিল তা কেউ
জানে না, আমার স্ত্রীর কাছেও তা গোপন
রেখেছি। আমার সে কল্পনা খুবই অদ্ভুত
লাগবে। একটি যুগের সঙ্গে নিজেকে
মিলিয়ে দেখতে দেখতে একদিন আমি
নিজেই সেই যুগের মানুষ হয়ে গেলাম।
কল্পনা করতে করতে চারটি তুষার যুগের
ও তাদের মধ্যবর্তী তিনটি যুগের ছবিটা
আমার মনের মধ্যে ক্রমে বাস্তব হয়ে উঠতে
লাগল। আমি আমার মনটাকে মাঝে মাঝে
একেবারে শূন্য করে ফেলার চেষ্টা করতাম।
যেন আমি কে তা জানি না, আমার
বর্তমানের কোনো পরিচয়ে আমাকে চেনা
যায় না। আমি যেন হঠাৎ কোনো আদি
প্রাইমেট জাতীয় বংশ থেকে সদ্য মানুষের
অবয়ব নিয়ে জন্মেছি। সেই প্রথম তুষার
যুগেও মানুষ আমি, পাথর নিয়ে অস্ত্র
বানিয়েছি, পাথর ছুঁড়ে হরিণ মেরে খাচ্ছি।
সে দশ লক্ষ বছর আগের যুগ! সেই যুগের
দৃশ্য চোখের সামনে। বর্তমান যুগ সম্পূর্ণ
মিথ্যা হয়ে যেত যখন এই কল্পনায় ডুবে
যেতাম। কিরে, শুনছিস তো আমার কথা?"

"শুনছি, তুমি বলে যাও"—কোনরকমে
উচ্চারণ করলাম।

দীনবন্ধু উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল,
"কল্পনায় কি সে উল্লাস। আমি আদি
মানুষ, লম্বা চুল, দাড়ি, আমার পরনে
পশুর ছাল, হাতে পাথরের অস্ত্র। আমার
দলে আমার মতো দশ-বারোজন স্ত্রী-
পুরুষ। ভাষা আমরা তখনও পাই নি, দু-
চারটে কথা তৈরি করেছি মাত্র। এসব এমন
সত্যি মনে হত যে অনেক সময়ে এক একটি
ঘণ্টা কেটে যেত এই মোহ থেকে মুক্ত হয়ে
আপন পরিচয়ে ফিরে আসতে।"

দীনবন্ধু হঠাৎ আমার ঘাড়ে তার
ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ লাগিয়ে একটা ঝাঁকুনি
দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুই কি ঘুমিয়ে
পড়েছিস? এত নির্জীব মনে হচ্ছে কেন?"

আমি চোখ বুজে, নিবিষ্ট মনে
শুনছিলাম, এমন অবস্থায় তার হাতের
ছোঁয়া লেগে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

সে এক অদ্ভুত শব্দ বেরোল আমার
গলা দিয়ে, আর সে শব্দ শুনে পাশের
জঙ্গল থেকে কয়েকটা বন্য জন্তু শুকনো
পাতা খচমচ করতে করতে পালিয়ে গেল।
গাছের ডালে পাখী চমকে উঠল। পশুদের
তাড়াতেই সম্ভব কয়েকটি সজারু, কাঁটা
ঝমঝম করতে করতে আমার পাশ দিয়ে
ছুটে পালাল।

এবারে আত্মস্থ হতেই হল, না হলে
বাঁচবার কোন উপায় নেই। বললাম, "না
আমি ঘুমোই নি, মনোযোগ দিয়ে শুনছি,
তুমি শুধু আমার গায়ে আর হাত দিও না।
তোমার ঠাণ্ডা হাত এই শীতে ঘাড়ে
লাগাতেই চমকে উঠেছি বেশি।"

দীনবন্ধু বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আর
হাত দেব না। কি বলছিলাম? —হাঁ,
সেই কল্পনায় আদিম যুগের মানুষ
হয়ে যাওয়ার কথা। আগে নিজেকে
প্রস্তর যুগের মানুষ কল্পনা করতে কিছু
দেরি হত, শেষে কল্পনামাত্র হয়ে যেতাম।
সে কি ভীষণ অবস্থা! সেই অবস্থায়
আমার চোখে অন্য সব মানুষ হরিণ হয়ে
যেত। চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ড রাশ ছবিতে
চার্লি যেমন ক্ষুধার্তের চোখে মুরগী হয়ে
যেত, ঠিক তেমনি। আমি স্থির থাকতে
পারতাম না। জেকিল ও হাইডের মতো
আমার ব্যক্তিত্ব দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেল।
ডক্‌টর জেকিল যেমন মুহূর্তে পিশাচরূপী
হাইডে পরিণত হত, আমারও হল তাই।

ইংরেজীতে যাকে বলে 'ডিসোসিয়েশন'।
আমার দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ঘটল সেই দশা।
সে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।
মনে হত সত্যিই আমি আদিম যুগের
জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘর বাড়ি সবই
গাছপালায় রূপান্তরিত হয়ে যেত। তুমি
বিশ্বাস কর, একদিন সত্যিই একজন
মানুষের মাথা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে
মেরেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যিস তার মাথায়
লাগে নি! কিন্তু তা না লাগলেও আমার
মাথা লক্ষ্য করে পথের লোকেরা যে ঢিল
ছুঁড়েছিল তার একটা আমার মাথায় এসে
লেগেছিল ঠিকই। আমি প্রাণপণ বেগে
ছুটে না পালালে হয়ত আরও লাগত।"

একটুক্ষণ থেমে দীনবন্ধু আবার
বলতে লাগল, "ঐ একটা ঢিলেই আমাকে
সাময়িকভাবে সুস্থ করেছিল। তার মানে
আমার ভিতরের সেই দ্বিতীয় আদিম
বর্বর মানুষটি কিছুকাল মূর্চ্ছিত অবস্থায়
পড়েছিল।

দীনবন্ধু আবার একটু থামল। মনে
হল যেন এবারে সে তার কাহিনীর
দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করবে। এমন সময়
কিছু দূরে হঠাৎ একটা শেয়াল ডেকে
ওঠাতে আমি কোথায় কি অবস্থায় আছি
সে বিষয়ে আবার মনে প্রশ্ন জেগে উঠল।
এতক্ষণ ভুলে ছিলাম, কিন্তু শেয়ালের ডাকে
আবার যেন সব স্বপ্ন, সব অবাস্তব বোধ
হতে লাগল। সে কি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!
শেয়ালের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কাছে, দূরে,
যত শিয়াল ছিল সব একে একে ডেকে
উঠল। মনে হল যেন একই শব্দের
প্রতিধ্বনি সমস্ত পরিমণ্ডলে হাহাকার
করে বেড়াচ্ছে। যেন জনহীন, শব্দহীন,
বিরাট এক অন্ধকারের শূন্য পাত্রে সে
আঘাত করুণভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে
ফিরছে।

দীনবন্ধু আবার কথা বলতে আরম্ভ
করতে আমি যেন অনেকটা ভরসা পেলাম।
এমন অবস্থায় বোধ করি আমার মন কোনো
মানবিক শব্দের জন্যই ব্যাকুল হয়ে
উঠেছিল, তাই ভূতের কণ্ঠ হলেও তা আমার
কাছে তখন মধুর মনে হল। তার আরও
কারণ, ভূত হলেও সে আমার বন্ধুর ভূত
এবং গল্পের ভূতের মতো তার [illegible]
সুর ছিল না।

ছায়া-পরবাসিনী

ভবানী মুখোপাধ্যায়

টেলিফোনের ঘণ্টা আবার বেজে উঠল—তাড়াতাড়ি কল্‌টা ধরার জন্য ওঠার উদ্যোগ করতে করতে হেমাঙ্গ বলে ওঠে—"আচ্ছা, ফোন এলেই তুমি অমন লাফিয়ে ওঠো কেন? কেন এই চঞ্চলতা?"

মাধবীর দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে ফোনটা ধরল হেমাঙ্গ। মাধবী কিন্তু নীরবে নিস্পন্দ ভঙ্গীতে স্থির হয়ে বসে রইল্যা। ঠোঁট দুটি ঈষৎ খোলা, একাগ্রচিত্তে টেলিফোনের কথাসূত্র ধরার চেষ্টা করছে, অথচ জানে এইখানে বসে অপরপ্রান্ত থেকে কি কথা আসছে তা জানা অসম্ভব।

হেমাঙ্গ ফিরে এসে সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলে, "ঘড়ির দোকান থেকে ফোন করছিল। ওরা বলছে কাল শনি, পরশু রবি, তারপর দিন ঈদের ছুটি। সেই মঙ্গলবারের আগে ঘড়ি মেরামত হবে না।"

পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য হেমাঙ্গর, সাধারণ বাঙালী ঘরের পক্ষে কিঞ্চিৎ বেমানান। সামনের মাথায় চুল কম, টাক পড়তে সুরু করেছে, কিন্তু পিছন দিকের বাব্‌রী দেখবার মতন।

মাধবীর দিকে যখন তাকালো হেমাঙ্গ তখন তার চোখ দুটি যেন জ্বল্‌ছে।

মাধবী বলে—"তোমাকে কিন্তু হেস্‌টিংসে স্ট্রীটের এটর্ণী বলে মনে হয় না, দেখায় যেন মাউন্টেড পুলিস। কিংবা ওদের ঘোড়ার মতন—তেমনই তেড়ে উঠ্‌তে পারো, তবে অবশ্য হাঙ্গামা যদি বাধে।"

ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকায় হেমাঙ্গ,—কি অদ্ভুত তার ভঙ্গী, তেমনই বিচিত্র তার কথাবার্তা। সব কিছু লক্ষণ এবং ভঙ্গিমা দেখে কারো মনে হবে না যে, মাধবী পরম প্রেমে আত্মহারা হয়ে আছে। এইবার কর্কশ গলায় বলে হেমাঙ্গ—"তুমি কিন্তু আমাকে কিছুতেই বললে না টেলিফোন কেন তোমাকে চঞ্চল করছে। যেন কোনো অজানা জনের সংবাদের প্রতীক্ষায় রয়েছ, ব্যাপার কি মাধবী?"

"ছিঃ, পাগলামি কোরো না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার রুক্ষ গলায় বলে হেমাঙ্গ—"নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। আমাকে সব বলতেই হবে।"

দুই হাতে কপালটা চেপে কিছুক্ষণ বসে রইল মাধবী, তারপর মৃদু গলায় বলল—"তোমাকে আগে বলিনি—তুমি হয়ত কি ভাববে, আমাকে পাগল মনে করবে, কিন্তু স্বপ্নটা, উঃ—"

ধীর গলায় হেমাঙ্গ প্রশ্ন করে "কি জাতীয় স্বপ্ন?"

সেইভাবেই গালে হাত রেখে বসে রইল ক্ষণকাল মাধবী, তারপর যেন আত্ম-কথনের ভঙ্গীতে টেবিলের উপর দৃষ্টি রেখে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলল—"হয়ত অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম—যেন আমার ছোট ভাই নীলু আমার বিছানার ধারে এসে বসেছে, আমি বলছি কিরে নিলু, এত রাত্তিরে কোথা থেকে? নীলু বললে—'দিদিভাই আমি আর বেঁচে নেই। বারোটার সময় মারা গেছি।' কথাটা শুনে আমার ভারী মন খারাপ হয়ে গেল, হয়ত নিছক কল্পনা, স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে আমি স্পষ্ট তাকে দেখেছি, এমনি যেন আমার চোখের সামনে এসে বসেছিল সে, ওদিকে দেখছি পাশে শুয়ে তুমি অঘোরে ঘুমাচ্ছ।' কিছুক্ষণ থেমে মাধবী আবার বলতে সুরু করে—'নীলু একথাও বলল আমি আজ সকালের ভিতরই খবর পাবো যে, এ স্বপ্ন সত্যি, দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ককলে খবর আসবে যে, নীলু কাল রাতে মারা গেছে।"

সোজা ওর মুখের দিকে তাকায় হেমাঙ্গ, —সে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, মাধবী হঠাৎ এ সব বলে কি, হোল কি ওর। হেমাঙ্গ সান্ত্বনার সুরে বলে—" বেশ ত', এখন ত' প্রায় বেলা দশটা বাজে, কেউ ত' ফোন করেনি, আর ধরো যদি"— ইতস্ততঃ করে হেমাঙ্গ তারপর আবার বলে—"নীলু কিছুকাল ধরেই ত' ভুগছিল, অবশ্য তোমরা দুজনে খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তবু যা সত্য তাকে মেনে নিতে হবে, অনেক আগে থেকেই ত' এই দুঃসংবাদের জন্য তৈরী হয়ে আছো। যদি সত্যই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে—"

মাধবী যেন ঘুমের ঘোরে কথা বলছে সেইভাবেই টেবলের দিকে চোখ রেখে বলে—"তোমার কথাই সত্য, কিন্তু স্বপ্নের ভেতর নীলু আরো কিছু বলেছে, সে কি বলেছে জানো—? এইবার সোজা হেমাঙ্গর মুখের পানে তাকায় মাধবী। তারপর স্পষ্ট গলায় বলে—"আমাকে সাবধান করেছে নীলু, বলেছে আজ রাত বারোটার পর আমারও সব শেষ হবে—"

বিস্মিত হেমাঙ্গ বলে উঠে—"বলো কি, আজই রাত বারোটা? যত সব গাঁজা, তোমাকে আমি কতদিন বলেছি ঐ সব ভূত-প্রেত আর গোয়েন্দা কাহিনী পড়া ছাড়ো, তুমি কিছুতেই কথা শুনবে না।"

মাধবীর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ, সে যেন আর্তনাদ করে উঠল—"না, আমি আর বাঁচবো না। আর বড়জোর চোদ্দ-পনের ঘণ্টা। ঘড়ির দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাধবী বলল—"আর কটা ঘণ্টা মাত্র।"

এই বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মাধবী। এক মুহূর্তের জন্য হেমাঙ্গর মনে করুণা হয়েছিল, সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে মাধবীকে বুঝি স্পর্শ করার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করে পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে নাড়াচাড়া করে, তারপর কণ্ঠস্বর ঈষৎ মোলায়েম করে বলে—"দেখো, এ সব তোমার বানানো গল্প কিনা কে জানে, যদি সত্যি বলেই ধরি তাহলেও স্বপ্ন। আর যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্নকে মনে মনে রেখে বসে কোনও লাভ নেই, তাকে ভুলতে হয়, ভুলতে শেখো। তা নিয়ে বৃথা মন খারাপ করে বসে থেকে লাভ কি?"

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভঙ্গীতে বলে মাধবী—"নীলু বললে, যখন খবরটা পৌঁছবে তখন বুঝবে আমার কথা সবটুকু সত্যি। সে যে ভবিষ্যৎ বাণী করছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।"

হেমাঙ্গ বললে—"ছাই প্রমাণ পাবে, কিছুই প্রমাণ হবে না। তুমি জানতে তোমার ভায়ের কঠিন অসুখ, সে অনেক দিন ধরে ভুগছিল,—মাধবী তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে, নিশ্চয়ই জানো মাঝে মাঝে ভাই-বোনের মধ্যে এই জাতীয় সংবাদ আদান-প্রদান ঘটে থাকে। ওকে বলে টেলিপ্যাথি—কোথায় কি হচ্ছে ওরকম বোঝা যায়।"

জানলার কাছ থেকে সরে এসে প্রীতিভরে মাধবীর মাথায় হাত রেখে হেমাঙ্গ। সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বেশ মোলায়েম কণ্ঠে বলে—"শোনো মাধবী, ব্যাপারটা বেশ করে তলিয়ে ভাবো। আজ এই উনিশশো পঞ্চান্নয় তোমার এই ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে এই ধরনের ভৌতিক বাণী কি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, তার চেয়ে মাথাটা মাটির দিকে করে আর পা দুটি ওপরে করে হাঁটতে শেখা বরং সহজ। এ সব কাণ্ড কখনও ঘটে না। তা ছাড়া নীলু তোমাকে যে রকম ভালবাসে সে কখনই এইভাবে স্বপ্নে ভয় দেখাবে না। সুতরাং উঠে পড়ো,

আছে করো, খাও, দাও স্ফূর্তি
শুনেছো?"

াঙ্গ লক্ষ্য করল মাধবী কাঁপছে,
ড় এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধটা
ধরে, সাহস ও শান্তি দেওয়াটাই
দশ্য। স্বপ্নের ব্যাপারটি নেহাৎ
নগড়া ফাঁকা আওয়াজ যে নয় তা
বিশ্বাস হয়েছে হেমাঙ্গর, একটু
ভেবেছে মাধবী অভিনয় করছে,
ভ্রান্ত করাটাই হয়ত তার ফন্দী।
একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে, "আচ্ছা,
বলছ তাই হয়ত ঠিক, আমারই
ব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নটা
মার মনোবিকার।"

টু পরেই আবার টেলিফোন বেজে

ার মুখে হাত চেপে মাথা নীচু করে
বসে রইল মাধবী। অতি দ্রুতপায়ে
গেল হেমাঙ্গ টেলিফোন রিসিভ
ফিরে এলো কিন্তু অনেক পরে। ওর
দকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন
াধবী,—"কি দিল্লী থেকে খবর এলো
ু তাহলে নেই।"

নেড়ে সায় দেয় হেমাঙ্গ। সে
ঠান্ডা হয়ে গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত
ঠাট্টার বিষয় ছিল এখন তা নিষ্ঠুর
াবে প্রমাণিত হয়েছে।

যেন বলার চেষ্টা করলো হেমাঙ্গ,
ার মুখে কথা যোগায় না, বিষয়টির
সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সান্ত্বনা
ু আর একবার টেলিপ্যাথির কথা
করে হেমাঙ্গ।

কাজকর্ম ছেড়ে সারা দিনটা
সঙ্গে কাটাবে স্থির করলো হেমাঙ্গ।
কন্তু ভীষণ আপত্তি জানালো।
বললো "একা থাকলে তবু একটু
াবে, অনেক ভালো থাকবে হয়ত,
মাকে না হয় একা থাকতে দাও।"

য়ে যাওয়ার সময় হেমাঙ্গ গম্ভীর
লল—"সত্যি বলছি, তখন তোমাকে
রছি বলে এখন মনে কষ্ট হচ্ছে,
ফানের কথাটি বলা উচিত হয় নি

ী বেশ ঠান্ডা গলায় বলে উঠে—
ক, বেশ করেছ, সংসারে এমন ঘটেই

ঙ্গর গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে
মাধবী তাড়াতাড়ি গিয়ে
টা ধরে, ওপার থেকে
াসতেই কান্নায় আকুল হয়ে
াধবী। অপর পক্ষ কোমল
ন করে—"হোলো কি তোমার?
হবে সব খুলে।"

কষ্টে, মাঝে মাঝে চাপা কান্নায়
য়, ওপার থেকে শোনা কথায়
পেয়ে কোনো রকমে সমগ্র
শেষ করলো মাধবী। কিন্তু
কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এমন
ন নতুন কথা বললে যা হেমাঙ্গ

'প্রতুলদা, আমার বিছানায় নীলু যখন বসেছিল তখন আমি ওকে প্রশ্ন করলাম যা ঘটবার তা ঘটবেই, তবু আমাকে সাবধান করার হেতু কি! আমি জানতে চইলাম, কোনো উপায় আছে কি বাঁচবার? নীলু বল্‌ল—একেবারে শেষ বলে কোনো কথা নেই, পালাবার পথ নিশ্চয়ই আছে, ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা হ'ল অতিশয় সাবধানে থাকা। তা হ'লে হয়ত পরিত্রাণ পেতে পারো। কিন্তু প্রতুলদা তারপর আমার মুখের দিকে অতি বিষণ্ণ চোখ মেলে বলল—"কিন্তু মাধুদি তোমার যে রকম কাণ্ড, প্রতুলদাকে নিয়ে যেভাবে মেতে আছ তাতে যে তুমি অত সহজে নিষ্কৃতি পাবে মনে হয় না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, অপর প্রান্ত থেকে যে কথা ভেসে আসছে অতিশয় আগ্রহভরে তাই শুনছে মাধবী। তার পর অতি ক্ষীণ গলায় বলে—"প্রতুলদা, আমি বেশ বুঝতে পারছি এ যাত্রা আর নিস্তার নেই, স্বপ্নের একাংশ যখন ফলে গেছে তখন অপর দিকটাও নিশ্চয়ই ফলে যাবে। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। প্রতুলদা আমাদের......।

অপর প্রান্ত থেকে প্রতুলদা বলে ওঠে —"ননসেন্স, কি সব বাজে বকছ, একটু শক্ত হও, লক্ষীটি এই সময়ে মনটাকে অত দুর্বল করতে নেই।"

এবার জোর গলায় বলে মাধবী,—"না প্রতুলদা, ব্যাপারটা সবটুকু একেবারে নন্‌-সেন্স নয়। আজ সকালেই লক্ষ্য করেছি উনি আমাকে বেশ সন্দেহ করছেন, বেশ বাঁকা বাঁকা কথাও বলছেন, আমি সব সয়ে গেছি। এমন কি এই ইঙ্গিতও করেছেন যে কোন ভালবাসার জনের ফোন পাওয়ার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। এরপর আর কি বলবে?"

"ও বাবা, এত সব কাণ্ড ঘটেছে?"

"হাঁ, সেই জন্যেই আমি বিশ্বাস করছি যে, নীলুর ব্যাপারটা নিছক উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।"

প্রতুল বলল—"কিন্তু মাধবী আমি নাহয় ধরছি নীলুর কথাই ঠিক, তবু জিনিসটা অবিশ্বাস্য। ধরো আমাদের এই ব্যাপার হেমাঙ্গ জানলো, তা সে কি তোমাকে খুন করবে, অন্ততঃ তুমি ত' সেই কথাই বলছ?"

"জানি না কি করবে না করবে। শুধু এইটুকু বুঝেছি আমার ভয় হয়েছে, ভীষণ ভয়। আজ আর আমাদের দেখা করার দরকার নেই। অন্ততঃ বিপদটুকু না কাটা পর্যন্ত দেখা না করাই ভালো। আজ যদি দেখা না হয় আমাদের তাহলে হয়ত নীলুর কথাটা বিফল হতে পারে। নীলু বলেছিল তোমার যা অবস্থা তাতে হয়ত তুমি সামলাতে পারবে না। তা হ'লে আর যাচ্ছি না......।"

অনেক বিতর্কের পর প্রতুলের কণ্ঠস্বর রাজী হল, তার পর শান্ত গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"কিন্তু মাধবী কথা দাও তুমি এ সব কথা নিয়ে মোটে চিন্তা করবে না। এতটুকু মাথা ঘামাবে না। আমি আবার তোমাকে রাত বারোটার পর ফোন করবো।"

"আচ্ছা, তাই করো, অপ্রতুলদা, আমাকে তুমি ঠিক রাত বারোটার পর ফোন করবে,স' বারোটার ভেতর।......তা হ'লে বুঝবো বিপদ কাটলো আর তুমিও জানবে কি খবর!"

"কিন্তু—?" প্রতুল কি প্রশ্ন করতে যায়।

মাধবী তাড়াতাড়ি বলে—"কোন ভয় নেই, একবার শুলেই ওর আর জ্ঞান থাকে না, একেবারে পাথর হয়ে যায়। এমনিতেই এত ঘুম, তায় আজ আবার শনিবার, ক্লাব হয়ে ফিরবে, বুঝতেই পারছো এতটুকু জ্ঞান থাকবে না। ঠিক তা হ'লে বারোটার পর ফোন করবে। তুমিই ফোন কোরো, যদি বুঝতে পারে, বলবো রঙ নাম্বার।"

খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, হেমাঙ্গ শুতে গেছে অনেক আগে। আয়-নার দিকে তাকিয়ে ড্রেসিং টেবলে চুপ করে বসে আছে মাধবী। হেমাঙ্গকে অনেক বুঝিয়ে শুতে পাঠানো হয়েছে। কিছুতেই সে শোবে না, বলেছিল—"তুমিও বরং শুয়ে পড়ো, আজ আর সেলাই করে কাজ নেই, সারাদিন ধরে মনটা ক্লান্ত হয়ে আছে বিশ্রামের প্রয়োজন"।

মাধবী চুপ করেছিল।

তবু বার বার বলেছে হেমাঙ্গ—"ঠিক বলছ তোমার শরীর ভালো আছে?"

মাধবীর চোখের কোণে জল দেখে হেমাঙ্গ শুতে গেছে। এতক্ষণে মাধবী একটু স্বস্তি বোধ করছে, শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি, আর কতটুকুই বা বাকী এর মধ্যে কি আর ঘটতে পারে? স্বপ্নের প্রথম দিকটা মিলেছে তাই শেষটাও মিলবে এমন কথা নেই। কাল শরীর বুঝে না হয় প্লেনে চলে যাবে দিল্লী। নীলুর কথাটাও ত' মোছা যায় না মন থেকে। জানলার ধারে গিয়ে পরদাগুলি ঠিকমত টেনে দেয় মাধবী। জানলার নীচেই ছোট্ট বাগান কত বিচিত্র মরশুমি ফুল ফুটে আছে, এই ম্লান আলোয় অস্পষ্ট কার্পেটের মত মনে হয়। কত কাছে অথচ কত দূরে। জানলায় কোনো পরদা নেই, নতুন ফ্যাসান। যদি এই জানলার ফাঁকে উড়ে যাওয়া যেত সত্যি যদি পাখনা থাকত, কত মজাই না হ'ত হেমাঙ্গর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ডানা মেলে উড়ে চলে যেত মাধবী, কত দূর-দিগন্তের পারে মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিশত।

কিন্তু কি সব কথা ভাবছে মাধবী, পাগলের মত। ডানাই বা মেলবে কেন, কলহ যদি হয় সামনের দরজাও খোলা রয়েছে—তার পর প্রশস্ত রাজপথ।

এখন সে অনেক ভালো আছে, এত ভালো আছে যে এই উদ্দাম চিন্তার উদ্ভট সম্ভাবনায় সে হাসতে পারছে।

এই স্তব্ধতার মধ্যে কিসের যেন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল, অপূর্ব তার ঝঙ্কার। প্রথমটা কিছুতেই বুঝতে পারে না মাধবী শব্দটা কিসের! পরে মনে পড়ল সিঁড়ির ওপরকার ঘড়িটার ঘণ্টা বাজার আগে এমনই শব্দ হয়। তারপর ঘণ্টা বাজলো, এক, দুই, তিন—

ভাল করে কান পেতে শোনে মাধবী। বারোটাই বাজলো শেষ পর্যন্ত। তবু কিছু-ক্ষণ সেইভাবে বসে রইলো মাধবী। বারোটা যে বেজেছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে কপালে হাত রেখে বসে রইল মাধবী। সেই অশুভ মুহূর্ত পার হয়ে সে এসেছে নবীন জীবনে সংকটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, বারবার ভাবে বিপদ কাট্‌লো।

পা টিপে একবার হেমাঙ্গর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো, মুখে তার বিজয়িনীর দীপ্ত ভঙ্গিমা। তারপর পাশের ঘরে টেলিফোনটির সামনে বসে পড়লো। টেলিফোনটা বাজলেই সেটা যাতে ধরতে পারে। মনে মনে এক দুই করে সাত মিনিট, আট মিনিট পর্যন্ত সময় গুনলো। তারপর আর তার এতটুকু অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে না। চোরের মত অতি সন্তর্পণে সে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে প্রতুল লাহিড়ীর ফোন নাম্বারটা উচ্চারণ করে।

অনেক পরে ওপার থেকে প্রতুলের কণ্ঠ শোনা যায়—"হ্যালো।"

অনুযোগের সুরে মাধবী বলে—"কি হোল তোমার? কখন বারোটা বেজে গেছে, স' বারোটাও হয়ে গেল, তোমার সাড়া নেই কেন?"

"সে কি! এর মধ্যে বারোটা পনের, হ'তেই পারে না, এখন ত' পোনে বারোটা, তোমাদের ঘড়ি নিশ্চয়ই ভীষণ ফাস্ট চলছে।"

হঠাৎ পিছনে কি যেন ঘস্‌ ঘস্‌ করে উঠল। সচকিত মাধবী সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে পিছনে তাকিয়ে দেখে রবার শিলপার পায়ে হেমাঙ্গ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের চাউনিটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত।

উত্তেজিত ভঙ্গীতে মাধবী বলে—'ওঃ, তুমি বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছো'—

তারপর সহসা রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উদ্দামগতিতে মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পিছনে যেন হেমাঙ্গও দৌড়ে আসছে, তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সেই জানলার ধারে এসে পৌঁছায় মাধবী। ভীষণ আতঙ্কে তার সারা শরীর কম্পমান। তারপর হঠাৎ জানলার উপরে উঠেই শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হয়ত তখনও ডানা মেলে দেওয়ার স্বপ্নের ঘোর তার কাটে নি।

"মাধবী, মাধবী।" চীৎকার করে ওঠে হেমাঙ্গ, কিন্তু কাছে আসার অনেক আগেই মাধবীর অচেতন দেহ মরশুমি ফুলের ওপর লুটিয়ে পড়েছে।

অনেক দূরে থানার ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

মিহির আচার্য

তাহের আলি

জেল আদালতেই তার বিচার হয়ে
গেল। শান্ত্রীরা শৃঙ্খলাবন্ধ কয়েদিকে
টেনে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে দিল
অন্ধকার সেলের কুঠুরিতে।

বাইরে হয়তো এখনো এত ঘন
অন্ধকার নামেনি। ভারত মহাসাগরের
উলাস্তু পিচ্ছিল জলরাশি হয়তো এখনো
আলকাতরার মতো কালো হয়ে ওঠেনি।
এখনো ডারবান ডকে ব্যস্ত কুলি-কামিন
মাঝিমাল্লাদের বিচিত্র কর্মপ্রবাহে ভাঁটা
পড়েনি। দূর পাল্লার কোন কারগো বন্দর
ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে সংগ্রামোদ্যত
শ্বাপদের মতো শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে।
জোয়ারের জলে জেটি কাঁপছে...ছলাৎ
ছলাৎ...ভাসমান বয়াগুলোকে দেখাচ্ছে
মানুষের মাথায় মতো। আর আলোর
দীপমালায় সমস্ত ডক অঞ্চলটা যেন
আশ্চর্য রূপসী হয়ে উঠেছে।

বাইরে হয়তো এখনো এত মিশকালো
অন্ধকার নামেনি, কিন্তু পুরু দেয়ালঘেরা
সেলের ভেতরে নরকের অন্ধকার নেমে
আসছে। কোন রকমে ক্লান্ত অবসন্ন
দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঠান্ডা শক্ত
মেঝের পরে নিজেকে মেলে দিল তাহের
আলি। বিচারে জুরিরা রায় দিয়েছে।
তার ফাঁসি হবে। তার প্রথম অপরাধের
বোঝা সে জন্মকাল থেকেই বয়ে নিয়ে
চলছে। তার চামড়া কালো। আর এই
কালো চামড়া সম্বল করে কিনা সে
শ্বেতাঙ্গী মিস মার্থাকে রেপ করতে
গিয়েছিল!

একটু আগেই ওয়ার্ডার এসে একটি
তেলমাখা বাতি রেখে গিয়েছিল। সেই
ক্ষীণ আলোতে ঘরটা আলোকিত হতে
পারেনি। তবু এক টুকরো সোনারাঙা
আলো। এই আলোই না মানুষের কোন
আদিপুরুষ স্বর্গ থেকে চুরি করে এনেছিল।
এক টুকরো আলোর আশীর্বাদ। আলোর
দিকে তার শক্ত মজবুত হাতটা এগিয়ে
দিল তাহের আলি। সত্যই কি কালো—
কালো তার গায়ের চামড়া। হ্যাঁ কালো-
কুচকুচে-কালো। কালোর কোন রঙ নেই
—শুধু কালোই। কিন্তু......এই কুৎসিত
কালো চামড়ার ঢাকনাটাকে যদি একবার
খুলে নিঃশেষ করা যায়, তাহলেও কি
কোথাও ছিটেফোঁটা একটু শাদাও দেখা
যাবে না? এই কালো চামড়ার আস্তরণের
নিচে পুরু মাংসের স্তর......লাল রক্ত আর
শাদা হাড়। আচ্ছা, শাদা মানুষের রক্তও
কি শাদা? নাকি, কালো চামড়ার মতোই
তাদের রক্তের রঙ লাল? হা আল্লা! তোমার
দুনিয়ায় শাদা কালোর প্রভেদ করেছিলে
কেন? পৃথিবীতে তো এক রঙেরই
মানুষ—শুধু শাদা, গির্জের পাদরির আল-
খাল্লার মতোই শ্বেতশুভ্র। আর যদি কালোই
করলে তাহলে মানুষের রক্তের লাল রঙ
ঢেলে দিলে কেন আমার শিরা-উপশিরায়।

বিচার বসবার আগে বাচ্চাটাকে নিয়ে
লক-আপে দেখা করতে গিয়েছিল তার বউ
জাবেদা। জাবেদা তার তেরো বছরের
শাদি-করা বউ......আর তার বাচ্চা সেলিম।
আহা, কতদিন চুলে তেল দেয়নি জাবেদা,
গায়ের কামিজ যেমন ময়লা তেমনি
ছেঁড়া......এই অল্প বয়সেই কেমন সে
বুড়িয়ে গেছে......চোখের দৃষ্টি গরুর
মতো ড্যাবডেবে...গলার স্বরও গেছে
ভেঙেচুরে ফাটা বাসনের মতো। জাবেদার
মুখচ্ছবি এখনো ভাসছে। জ্বলন্ত
আগুনের শিখার মতো। জাবেদা তার
বউ—এখনো বুকের মধ্যে জেলে রেখেছে
আগুন। যে-আগুন যে-উত্তাপ জীবনের
সত্য-প্রকাশ। সে যে বেঁচে আছে, বেঁচে
থাকতে চায়—তাই তো সে বুকের মধ্যে
অনির্বাণ এক অগ্নিশিখা পুষে রেখেছে।
জাবেদা জীবনকে দেখেছে, ভালোবেসেছে,
সে গেরস্থালি পেতেছে, তার স্বপ্ন, তার
সাধ জড়িয়ে গেছে স্বামী-পুত্রের সঙ্গে।
জাবেদা তাহেরকে ভালোবেসেছে, কারণ সে
জীবনকে ভালোবেসেছে...তাহের তার কাছে
এক সংগ্রামময় জীবনের অর্থপূর্ণ প্রতীক...
তাহের ডারবান ডকের জবরদস্ত মজদুর...
তার পেশীতে ইস্পাতের কাঠিন্য, তার
শক্তিতে সমুদ্রে জোয়ার আসে। সে খাটতে
চায়, সাচ্চা মানুষের কাছে তার শ্রম ছাড়া
আর পবিত্র জিনিস কি আছে? কিন্তু সে
অন্ধ পঙ্গু নয়, তার চোখ খোলা আছে,
চোখ খোলা রেখে সে খাটুনির জোয়াল
কাঁধে নেয়। তাহেরের হাতে ডক-মজুর-
দের আত্মার চাবি। তাহেরের যোগ্যতাই
তাকে নেতৃত্বের আসনে তুলে দিয়েছে।

তাহের। ডারবান ডকের সাহসী
নেতা। জাবেদার স্বামী। তাকে না
ভালোবেসে কি পারে জাবেদা?

জাবেদার ক্লিষ্ট কঠিন মুখচ্ছবি এখনো
ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

বিড় বিড় করে বলেছিল জাবেদা :
বলো—বলো তুমি মার্থাকে বেইজ্জত
করেছিলে?

তাহেরের চোখেও আগুন জ্বলে
উঠেছিল। ক্ষুধার্ত এক সাপ ঝিলিক
দিয়ে উঠেছিল তার চোখের তারায়। মাথা
ঝাঁকিয়ে বলেছিল : না।

তবে? তবে কেন তারা তোমাকে ফাঁসি
দেবে। কেন, কেন, কেন? জাবেদা আহত
মরিয়া চিৎকার করে উঠেছিল।

এরপর এক মুহূর্তও শান্ত্রীরা
জাবেদাকে কথা বলতে দেয়নি। চুপ।
তাহেরের ঠান্ডা ভারি হাতটা সেলিমের
মাথার উপর নেমে এসেছিল। কি বলতে
চাইছিল সে, জাবেদা এগিয়ে এসেছিল,
বলেছিল : কিছু বলবে?

তাহের নিরুত্তরে চুপ করে ছিল
কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল : জাবেদা—
সেলিম আমার বাচ্চা, সেলিমও যেন শাদা
হতে চায় না কোনদিন......

বুঝতে পেরেছিল কিনা, জানি না।
ফ্যালফ্যাল করে একবার সেলিমের দিকে
চেয়ে মূক হয়ে গিয়েছিল জাবেদা।

আজ এই সেলের নির্জনে বসে তাহের
সেই কথাগুলোই ভাবছিল আবার। ভাব-
ছিল কালো হওয়ার দাম তো সে জীবন
দিয়েই শোধ করে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার
ছেলে সেলিম—সেও বড় হবে, কালো হবে,
সেও হয়তো ডারবান ডকে কুলিগিরি করতে
যাবে—তারপর......

না। তারপর নেই। তবু, কাজ নেই
শাদা হয়ে। কালো হয়েই যেন বড় হতে
পারে সেলিম, কালো রঙ দিয়েই যেন
প্রতিটি মুহূর্তকে সে ভরিয়ে রাখে। আর
যেন কোনোদিন সে না ভোলে এই কালোর
দাবিকে অমর করে রাখবার জন্যেই তার
বাপ একদিন ফাঁসিকাঠে নিজেকে ঝুলিয়ে
দিয়েছিল।

কিন্তু শুধু কি কালো? শুধু কালো
এই তার অপরাধ। এই অপমৃত্যু শুধু কি
কালোর দাবিকে দৃঢ় করবার জন্যে।

জলেডোবা মানুষের মতো সমস্ত
ঘটনাগুলো যেন এক-এক করে মনের পটে
ভেসে উঠতে লাগল। আজ তার জীবনের
শেষ রাত্রি। তাহেরের বেঁচে থাকার বিরাট
ইতিহাসটা আজ রাত্রিশেষেই নিঃশেষ
লুপ্ত হয়ে যাবে। লুপ্ত হয়ে যাবে একটা
মানুষের বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা—তার
সংগ্রাম, তার আনন্দ, তার শ্রম, তার
বেদনা,—তার চিন্তার উত্তরাধিকারী আর
কেউ থাকবে না।

থাকবে না?

থাকবে। থাকবে তার সাথীদের মধ্যে,
তার পরিবারের মধ্যে।

কিন্তু তারা যদি বিশ্বাস না করে।
নিশ্চয়ই করবে। তার বিশ্বাস দিয়েই
তো তাদের বিশ্বাসকে স্পর্শ করেছে সে।
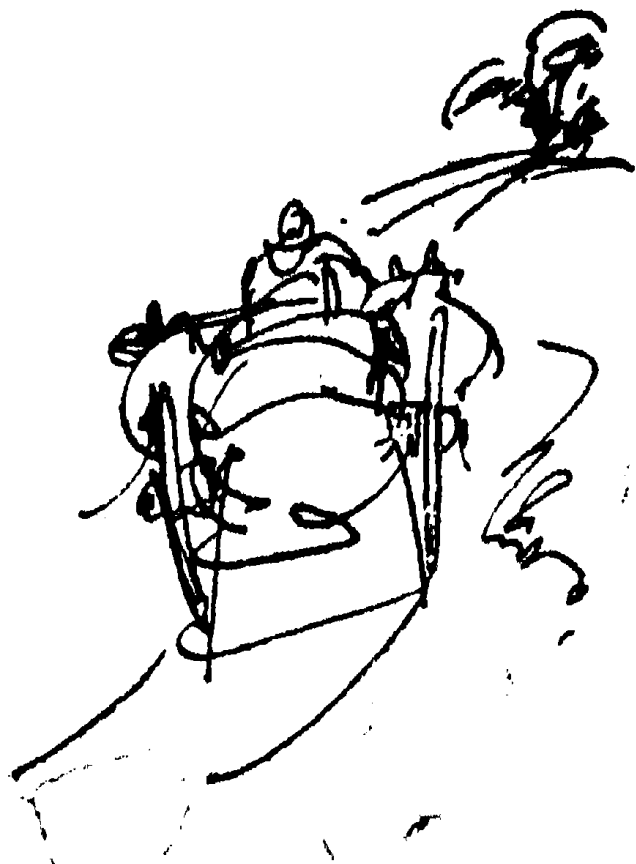
মানুষের উপর বিশ্বাস কোনো দিনই হারাবে না সে।

হঠাৎ কী দ্রুত সমস্ত পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে জ্বলেছিল মজুররা। কোম্পানী তাদের কাঁধে মাল বোঝাই আর খালাস করে লাভের পাহাড় বানিয়ে তুলল। তাদের মতো মজুর মানুষগুলির ঘামে ডকের পাটাতন ভিজে গেল। বৎসর শেষে মুনাফার বাড়তি অংশ প্রতিশ্রুতি মতো এল না তাদের ভাগ্যে। মদমত্ত মালিক রক্তচক্ষু দেখাল। তারপর ঘটল সেই দুর্ঘটনাটি। মাল খালাস করতে গিয়ে কি করে একটা বোঝাই বাক্‌স এসে পড়ল পলের ঘাড়ে। সাহায্য করতে আসবার আগেই ফাঁসা বেলুনের মতো চাপ্টা হয়ে মরে গেল পল। পল তাদের মতো ইণ্ডিয়ান নয়, সে নিগ্রো। কালো। মালিক বললে, একটা কালো নিগ্রোর খুনের জন্য কোম্পানী কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না।

তারপর শ্রমিকরা নোটিশ দিল। স্ট্রাইক শুরু হল ডক ইয়ার্ডে। কাজ হারাল মজুরেরা, কিন্তু কাজ বাড়ল তাদের। তারা বুঝল ভিখারীর মতো কয়েক টুকরো বাসি রুটির চেয়ে স্বাধীনতা বড়, বড় তাদের ইজ্জত।

তাহেরের দিনে কাজের শেষ নেই, রাত্রে ঘুম নেই। স্ট্রাইকের দিন যত বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল অভাব। দশ হাজার শ্রমিকের রুজি বন্ধ মানে আরো কুড়ি হাজার ছেলেমেয়ে বুড়োর পেট বন্ধ। অর্থের অভাবে রেশনও বন্ধ। তবু বাঁচতে হবে, দু টুকরো বাসি রুটির চেয়ে ইজ্জত বড়, স্বাধীনতা বড়।

কোম্পানী দু একবার তাহেরকে ডেকে পাঠিয়েছিল। লোভ দেখিয়েছিল, তার মাইনে বাড়িয়ে দেবে বলেছিল, তারপর শাসানি, পুলিশ আর গুণ্ডামির ভয়।

তাহের শুধু বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল : "সাহেব, দু টুকরো বাসি রুটির চেয়ে স্বাধীনতা বড়, ইজ্জত বড়।

মজুরদের মধ্যে বিভেদ আনবার সব চেষ্টাই করেছিল কোম্পানী। শাদা লোক-দের ডেকে বলেছিল : ওই বর্বর ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শাদা মজুররা তাদের ক্রিশ্চানিটির অপমান ডেকে আনছে—লর্ড জেসাস নাকি এতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হবেন।

শ্রমিকদের জরুরী মিটিঙে তাহের আলি সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল : 'দোস্ত শাদা-কালো তো চামড়ার রঙ। এই চামড়ার তলায় আমাদের রক্ত লাল...... মালিকের চাবুকের ঘায়ে আমাদের শাদা-পিঠ কালো পিঠ ছিঁড়ে গেছে...ফিনিক দিয়ে আমাদের রক্ত ছুটেছে...তার রঙ লাল। দোস্ত—একই আগুনে আমরা পুড়েছি। সে আগুন ক্ষুধা—এই আগুনের হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হলে আমাদের এক পাঞ্জা দিয়ে লড়তে হবে।

সমস্বরে জবাব দিয়েছিল মজুররা। লড়াই চলতেই থাকবে।

ডকে কাজ বন্ধ। জাহাজ এসে পড়ে আছে। দূর সমুদ্রে ঘন ঘন জাহাজ থেকে সিগন্যাল দিচ্ছে। কিন্তু জাহাজঘাটিতে জায়গা নেই। মাল খালাস হচ্ছে না। স্তূপাকারে মাল পড়ে আছে। পচছে। পচা গন্ধে ডক অঞ্চল ভরে উঠেছে।

এদিকে শ্রমিক এলাকায় আগুন জ্বলছে। ক্ষুধা। বুড়োরা মাথা নেড়ে বলেছিল এতবড় লড়াই নাকি ডারবানে এই প্রথম।

যুবকেরা মাথা নেড়ে বুঝিয়েছিল : 'ঠিক। বড় লড়াই—তাই তাকতও চাই বড়।'

রাত্রে ঘুম চোখে তাহেরের ছেলেটা টলতে টলতে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল : 'আম্মা, আমরা খেতে পাইনে কেন?'

জাবেদা বলেছিলে, 'ডকে মাল পচছে কিনা তাই।'

'পচছে। তবু আমাদের খেতে দেবে না!' সেলিম। সাত বছরের ছেলে, সেও প্রশ্ন করেছিল। ক্ষুধা তাকে দমাতে পারেনি। দমিয়েছিল মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের এই অধর্মের সংগ্রাম।

সেলিম। তাহেরের ছেলে। সে প্রশ্ন করেছিল তার রাত্রিভরা চোখে। হয়তো দিনের আলোয় ভুলে গিয়েছিল, সেই রাত্রির অন্ধকার প্রশ্নটা। তারপর আরো রাত গেছে, আরো অনেক রাতের মতো আজকের রাতটাও থমকে দাঁড়িয়েছে, তাহেরের অস্তিত্বকে স্তব্ধ করে দিয়ে। আজকের রাতেও ঘুমভাঙ্গা চোখে বাচ্চা সেলিম যদি আবার সে-প্রশ্ন করে, তাহলে ওর মা জাবেদা আজো কি সেই একই জবাব দেবে? জাবেদা। আহা, কতদিন ও চুলে তেল দেয়নি, ওর খঞ্জনি পাখির মতো জীবনভরা চঞ্চল চোখ দুটো কি নিষ্ঠুর স্থির হয়ে গেছে। তার সাতাশ বছরের তৃপ্তিহীন জীবন যৌবন নিয়ে কি সম্বল করে টিঁকে থাকবে সে। তাহের। তাহের। তাহের যখন থাকবে না—মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পূর্ণচ্ছেদ—তখন তো থাকবে ওই সাতাশ বছরের অচরিতার্থ জীবন-যৌবন—জাবেদার সামনে রইল বিরাট পৃথিবী, মহান আকাশ, উদার সমুদ্র, আর উত্তাল বায়ুতরঙ্গের মর্মর সঙ্গীত। তার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, ফুল ফুটবে, পাখিরা গান গাইবে—জাবেদার জীবন তো তাহেরের ফাঁসির রজ্জুর সঙ্গেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তার ভবিষ্যৎ আছে, সম্ভাবনা আছে, জীবন আছে, যৌবন আছে।...যদি হৃদয় থাকে জীবন্ত, আশা থাকে পুষ্পিত... তাহেরের স্মৃতির বোঝাকে ঠেলে জীবনকে পঙ্গু করবার অর্থ নেই, মৃত লোক জীবন্ত পৃথিবীতে কোনো ঋণ রেখে যায় না। তাহেরের অবর্তমানে যদি কোনো নও-জোয়ান তার জীবন-সংগ্রামে সাথী হিসেবে জাবেদাকে বাহুমূলে তুলে নেয় — তাহলে তাহেরের মতো আনন্দিত কে হবে? জীবন বিরাট—তার আয়োজন উপকরণ অজস্র—সাতাশ বছরের নির্জন যৌবনের পক্ষে এই দীর্ঘপথ একা চলা দুরূহ—যদি পথের

সঙ্গী পাওয়া যায়—কে না জানে পথচলা কত সহজ হয়, নিশ্চিন্ত হয়।

জাবেদা। জাবেদার প্রশ্নটাই ধারালো ছুরির মতো ঝিলিক দিয়ে উঠছে চোখের সামনে। 'বলো-বলো তুমি—মার্থাকে বেইজ্জত করেছিলে?'

'না। না, জাবেদা না। ঝুট। বিলকুল ঝুট!' যদি চিৎকার করে বলতে পারত তাহের। বলতে পারত সে সাচ্চা মজুর—মেহনতি মানুষ — মানুষের কাছে মেহনত করে বেঁচে থাকার মতো পবিত্র জিনিস কি আছে। বেঁচে থাকতে হলেই কাজ করতে হবে। কাজ—কাজ। আজ এই মুহূর্তে তাকে শৃংখলমুক্ত করে দিয়ে যদি তারা জিজ্ঞেস করত : 'কী, কী চাও তুমি? স্বাধীনতা?' না। তাহের বলত : 'আমি স্বাধীনতা চাই না—মরবার স্বাধীনতা! আমি কাজ চাই—কাজ—কাজের স্বাধীনতা।' কাজ-করা মানুষ শ্রমে আনন্দে বিজয়ী ক্লান্তিহীন গ্লানিহীন মানুষ—জীবন তার কাছে বিচিত্র রঙে-রসে সঞ্জীবিত। ঘোলাটে চোখে জীবনকে দেখবার নেশাটা কর্মহীন অলসদের জন্যে, যারা শাদা-মাটা জীবনকে দেখতে ভয় পায়। মদ আর মেয়ে-মানুষ—মেয়ে-মানুষ আর মদ—এই তাদের জীবনের রূপ।

মিস মার্থা। কোম্পানীর পোষা মেয়ে-মানুষ। দু জোড়া সিল্ক স্টকিং আর কয়েক বোতল কোকাকোলা। তারপর শিশি-খোলা শ্যাম্পেনের মতোই হাসবে সে উদ্দাম, অর্গেল বক-বক করে যাবে, ঢেউয়ের মতো লুটোপুটি খাবে, তারপর নরম কুকুরের মতো কখন এলিয়ে পড়বে সে আপনার কোলে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে ত্যাগ করে যখন সে ডারবানে ফ্ল্যাটভাড়া করে নতুন করে সংসার পাতল, কেউ জানত না সেদিনও পর্যন্ত তার পোশাক-আশাক-টয়লেট আর নরম বিছানার নিয়মিত দাম জোগাচ্ছে কে। কোম্পানীর সাহেবদের চর। রাত্রিতে সুরা এবং কামিনীসাহচর্যে মার্থার ফ্ল্যাট শব্দিত হয়ে উঠত।

কোম্পানির মোটা বকশিসের লোভে যখন এই নতুন অভিসারে মেতে উঠল মার্থা, কেমন রোমাঞ্চই জেগেছিল। তার দেহ স্পর্শের অধিকার যেখানে একমাত্র উপর-তলার শাদা সাহেবদের, সেখানে কিনা সে ছুটছে এক ডার্টি ইন্ডিয়ানের পেছনে।

তাহেরের পেছনে লেলিয়ে দিল কোম্পানি মার্থাকে। জয় করতে হবে লোকটাকে, তার বিবেক, তার আত্মার চাবি কেড়ে নাও।

ছায়ার মতো ঘুরতে লাগল মার্থা। কিন্তু এ কেমন ধারা মানুষ। লোভ নেই, আসক্তি নেই। যে-মেয়েটাকে ইচ্ছে করলেই নাকি সে বুকের কাছে জাপটে ধরতে পারে। কিন্তু মার্থার হিসাবেও যেন ভুল হল। আর ভুলটা যত বেশি করে ধরা পড়তে লাগল, জেদও বাড়তে লাগল তার। এ যেন মার্থাকে অপমান নয়, অপমান তার যৌবনকে। জীবনের সাতাশটি বছর যে প্রতিটি রাত্রে পুরুষকে শয্যাসঙ্গী করেছে, জেনেছে পুরুষ চরিত্র...পুরুষের কামনার অন্ধকূপে যে এক লহমায় নরকের বীভৎস আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। প্রতিটি পুরুষ তার কাছে শিশু...শিশুর মতোই বিচিত্র তাদের কামনার অলি-গলি।...কিন্তু তাহের—একটা কালা ইন্ডিয়ানের কাছে সে কি হেরে যাবে।

গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন সন্ধ্যে থেকেই। আর ঝোড়ো বাতাস। সমুদ্র থেকে আহত মুমূর্ষুর কাতরানির মতো একনাগাড়ে সাইক্লোনের শব্দ ভেসে আসছিল। যেন বন্দী প্রমিথিউসের চিৎকার। নিঃশব্দ ডক এলাকায় ভূতের ঘোলাটে চোখের মতো বাতিগুলো জ্বলছে : গলির ওধার থেকে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে অকারণে। লাইট-হাউস থেকে রেড সিগন্যাল দিচ্ছে। সন্ত্রস্ত জাহাজের নাবিকরা মাঝ-দরিয়ায় নোঙর বেঁধে উদ্বিগ্ন প্রহর গুনছে।

অনেকক্ষণ রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল তাহের।

হঠাৎ পেছনে ঘাড়ের পাশে মৃদু খস-খস শব্দ। দুনিয়ার যত রকমের নার্ভ-উত্তেজিত-করা উগ্র সুবাসিত গন্ধ। নোনা হাওয়াটা পর্যন্ত চমকে উঠল এই উগ্র গন্ধের স্পর্শে।

'হিল্লজ—'

পিছন ফিরে দাঁড়াল তাহের।

মিস মার্থা। মুখে লম্বা সিগারেট, আর চোখে অনুনয়।

'হিল্লজ—'

লাইটার জ্বালিয়ে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল তাহের। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মার্থা কৃতজ্ঞতা জানাল : 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

তাহের আবার সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিল। সমুদ্র। ঝড়। জন-ঘন সার্চ-লাইট আর লাল আলোর সঙ্কেত।

মার্থা তখনো তার পাশে দাঁড়িয়ে। আপন মনে সিগারেট টানছে আর অপাঙ্গে চাইছে তাহেরের দিকে।

ফিস-ফিস করে বললে একবার : 'রাত্রে ঝড় হবে, না?'

তাহের জবাব দিল না।

মিস মার্থা আবার বলল, 'কাছে-পিঠে কোথাও একটা পাবলিক হাউস নেই?

ওয়েদার ইজ সো ওয়াইলড—এন্ড ইউ হ্যাভ সাম ড্রিঙ্ক।'

তাহের নিরুত্তর। ঝড় উত্তাল হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাট জনমানবহীন। অন্ধকারে ভূতের চোখের মতো কেবল বাতিগুলোর মিটিমিটি হাসি। হাটতে শুরু করল তাহের। কত রাত হবে? নটা বেজে গেছে। জাহান্নামের রাত্রি।

হঠাৎ ওর সামনে পথ আটকে দাঁড়াল মার্থা। এতক্ষণকার চেষ্টাকৃত সংযত আবরণটা যেন নগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্ধকারেও হয়তো ক্ষুধিত মার্জারের মতো চোখের নীল তারা জ্বলছিল। ফুলে-ফুলে উঠছিল তার পরিপুষ্ট বক্ষদেশ। বিপদ গুনল তাহের। নির্লজ্জ মেয়েমানুষ যখন নিজেকে উন্মাটন করে দেয় তখন সে ভারত মহাসাগরের সাইক্লোনের চেয়েও ক্রুর।

তাহের কিছুক্ষণ স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থেকে বলল : 'কি চাই? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

মিস মার্থা ছেনাল গলায় বলে উঠল : 'আই—আই লাভ ইউ।'

'থ্যাঙ্কস, দ্যাট ওয়ে প্লিজ।' তাহের আঙুল দিয়ে তাকে কোম্পানির সাহেবদের বাঙলোর রাস্তা দেখাল। প্রেম! মিস মার্থার প্রেম! দু জোড়া সিল্ক স্টকিং আর কয়েক বোতল কোকাকোলা।

দ্রুত পা চালিয়ে দিল তাহের।

মিস মার্থা ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিজের মনে গালাগালি দিল বর্বর কালা আদমিটাকে।

রাত্রে ব্যারাকে ফিরে ভুলে গিয়েছিল তাহের সন্ধ্যারাত্রির ঘটনা। সারা রাত্র ওর চোখে ঘুম আসে নি অন্যদিনের মতই। সেলিমকে বুকে জড়িয়ে ওধারে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে জাবেদা। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে শীর্ণ ওর মুখখানা। আর এত করুণ! সেই রাত্রে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছিল বউটাকে। ওর রুক্ষ কর্কশ চুলগুলোর মধ্যে, ওর চোখে-মুখে একটু হাত বুলিয়ে দিতে বড় ইচ্ছে করছিল তাহেরের। কতদিন ওকে ছোঁয়নি। তাহেরের মৃদু স্পর্শে কখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল জাবেদা। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বিশীর্ণ হাসছিল সে। আরো ঘন হয়ে সরে এসেছিল তাহেরের বুকের কাছে। ওর আলতো একটা হাত জড়িয়ে ধরেছিল তাহেরের কণ্ঠদেশ। কতক্ষণ ওভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে গভীর আরামে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল জাবেদা। তাহেরের চোখে ঘুম নেই। জ্বলছিল চোখ দুটো আর দব-দব করছিল কপালের শিরটা।

ভোর রাত্রে হঠাৎ তার ঘরের বাইরে কেমন একটা চাপা গুঞ্জনে সচকিত হয়ে উঠল তাহের। জাবেদার আলিঙ্গন মুক্ত করে উঠে এল সে জানালার ধারে। বাইরে তখনো ফিকে অন্ধকার, কুয়াশায় অস্পষ্ট। তবু মনে হল কারা যেন বাইরে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ। তারাই। যাদের আসার কথা—আজ নয় কাল! সমস্ত কোয়ার্টারটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সশস্ত্র প্রহরী। আর দরজার সামনে অপেক্ষারত সার্জেন্ট।

জাবেদারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কি জিজ্ঞেস করতে চাইছিল সে। তাহের বললে, চুপ।

দরজায় ভারি বুটের লাথি।

'কে, কে ওরা?' জাবেদা ত্রস্ত চোখে জিজ্ঞেস করেছিল।

তাহের স্থির গলায় বলেছিল : 'পুলিশ।'

জামা-কাপড় পরে দরজা খুলে দিল তাহের।

সার্জেন্ট গম্ভীর গলায় জানালো : 'ইউ আর অ্যারেস্টেড।'

ঝটপট বেঁধে ফেলল তাকে। • তারপর টেনে তুলল প্রিজন ভ্যানে। ভ্যান ছুটল।

জাবেদা চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল পাথরের মতো। ওর রুক্ষ কর্কশ চুল উড়ছিল...রাত্রের সেমিজে পেটিকোটে অনাবৃত অর্ধনগ্ন দেহে স্তম্ভিত দাঁড়িয়েছিল। মজুর ব্যারাক তখনও জাগে নি। চোরের মতো এসে তাহেরকে নিয়ে ওরা চলে গেল...

অন্ধকার নির্জন সেলের পাথরের বেদীতে স্থির হয়ে বসেছিল তাহের। ভেতরের অন্ধকারটা যেন ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। পৃথিবীর বুকে আর একটি নতুন দিন ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে।

জেল আদালতে তার সাম ও কে দাঁড়িয়ে। মিস মার্থা। দু জোড়া সিল্ক স্টকিং আর কোকাকোলা। 'আই—আই লাভ ইউ।' মিস মার্থা আদালতে দাঁড়িয়ে আবেগ কম্পিত স্বরে তার নির্যাতিত নারীত্বের কাহিনী বলে যাচ্ছে : 'দিস ডার্টি ইন্ডিয়ান—তাহের আলি.....'

'বলো — বলো তুমি — মিস মার্থাকে বেইজ্জত করেছিলে?' কানের কাছে আর্তনাদ।

'না।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল তাহের : 'না না না।'

'তবে? তবে কেন তোমাকে ফাঁসি দিচ্ছে। কেন কেন কেন?'

হট যাও।

বাইরে সেলের কপাট খোলার শব্দ।

'কে? কে তোমরা কি চাও?' তাহের আলি চিৎকার করে উঠেছে। 'আমি মরব না। আমি মরতে পারি না। দোস্ত—সাথী—যদি আবার জন্মাতে হয়—যদি বারে-বারেই এই পৃথিবীতে আসতে হয়—তবে বার-বার যেন এই পথেই আসি। জাবেদা—সেলিম—দোস্ত; হুঁশিয়ার। কয়েক টুকরো বাসি রুটির চেয়ে স্বাধীনতা বড়, ইজ্জত বড়।'

রাত্রি

নবেন্দু ঘোষ

টগর সাজিতে বসিল।

ঘণ্টাখানেক পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, পূবের আর্দ্র বাতাসে একটু শীত বোধ হয়। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সময় হইয়াছে।

সময় হইয়াছে বৈকি। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ বরং একটু দেরি হইয়াছে, টগর আজ বেশীক্ষণ ঘুমাইয়াছে। পান্না আসিয়া বার দুয়েক তাহাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে উঠে নাই। হ্যাঁ, সময় হইয়াছে বৈকি।

বহুদিনের পুরাতন স্টোভের ওপর চায়ের পাত্রটা চড়াইয়া দিয়া টগর সাজিতে বসিল।

সেই পুরাতন সাজ। সাত বৎসর প্রত্যহ সে একই ধরনের সাজ করিয়াছে। জাড়ের পাড়ওয়ালা নীল শাড়ি, গিলটি করা গহনা, ললাটে একটি খয়েরের টিপ, চোখের কোণে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা, পায়ে আলতার ঘন প্রলেপ, সস্তা পাউডার আর 'দিলবাহার' এসেন্স।

সাজসজ্জা শেষ হইলে টগর দেওয়ালে বিলম্বিত বড় দর্পণটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক আছে। নিত্যকার রাত্রি জাগরণ চোখের কোণে কালো ছায়া ঘন হইয়াছে। অলক্ষ্যে সময় তাহার ললাটে দুর্বোধ্য রেখায় কি যেন লিখিয়াছে, দেহ হইয়াছে ঈষৎ মেদবহুল, বক্ষ আর কটিদেশ আগেকার মত আকর্ষণীয় নয়, তবু চলিবে। এখনও আরও কিছুদিন চলিবে।

চায়ের জল টগবগ করিতেছে।

'আমারও এক কাপ দে ভাই'—মানদা আসিয়া দাঁড়াইল। মানদা প্রৌঢ়া, স্থূলাঙ্গী, মুখে বড় বড় বসন্তের দাগ, রংটা শ্যামবর্ণ। এককালে তাহার চেহারা ভালই ছিল, আর ব্যবসাও চলিত ভাল কিন্তু আজকাল—।

'বস ভাই'—টগর বলিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে সে প্রশ্ন করিল, 'শশী কোথায় মানদা?'

মানদা ঠোঁট উল্টাইল, 'সে হারামজাদার কি আর কোন জ্ঞানগম্যি আছে—কাল রাত থেকেই তো উধাও।'

টগরকে একটু চিন্তিত বোধ হইল; আজ মুখপোড়া গেল কোথায় কে জানে।'

মানদা মুচকি হাসিয়া বলিল—'জানিস, হতভাগা তোকে ভালবাসে?'

টগর হাসিল। ভালবাসা! বহুদিন পূর্বেকার কথা—সুধীর নামক একটি সুদর্শন যুবক বিমলাকে ভালবাসিত। সেই বিমলা আজ টগর হইয়াছে—আর সুধীর?

চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া মানদা বলিল, 'যাই ভাই, আমিও তৈরী হইগে।'

মানদা চলিয়া গেল। এখন আর তাহার সেদিন নাই, একটি লোকও তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় না, আর সকলের দাসীবৃত্তি করিয়াই সে আজকাল বাঁচিয়া আছে; তবুও অন্যান্য সকলের মত সেও সাজিয়া গুজিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়ায়, পথগামী লোকদের প্রতি কটাক্ষ হানে, রসিকতা করে, অশ্লীল কথা কয়। রক্তের মধ্যে অভ্যাসটা যেন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

টগর বসিয়া রহিল। শশীর ভালবাসা! এবার আর সে হাসিল না। ধীরে ধীরে তাহার দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া উঠিল, পাউডারে অবলিপ্ত ললাটের রেখায় আবার পরিস্ফুট হইল, চোখের কোণের কাজলের রেখার উপর একবিন্দু জল টলমল করিতে লাগি...। ভালবাসা! সে কবেকার কথা—!

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। মেঘলা দিনের আলো। সেই আলো যেন হঠাৎ অন্ধকারে পরিণত হয় আর সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়াছবির মত কতকগুলি ছিন্নভিন্ন ছবি ভাসিয়া যায়, কতকগুলি পুরাতন কথা পুনর্জীবন লাভ করে।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

বিমলা লজ্জায় অধোবদন হইল।

বাহিরে সূর্য অস্ত গিয়াছে, আকাশের মেঘে মৃত সূর্যের শোণিত চিহ্ন।

সুধীর বলিল 'বিমলা, তুমি আমার'—

বিমলা বলিল, 'আর তুমি আমার।'

গলিতে ভিড় বাড়িতেছে। বিসর্পিল গলি। গলির মোড়ে কানাইয়ের মাংসের দোকান। পূর্বের ঠাণ্ডা বাতাসে মাংসের তরকারীর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

সুধীরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ বিমলা।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, চল—পালিয়ে যাই।'

বিমলা বলিল—'চল'—

তাহার পর এক নগর। সেখানে স্বপ্নভঙ্গ। পাখী উড়িল। মাতৃত্বের ভারে বিমলাকে ভারাক্রান্ত করিয়া একদিন সুধীর অদৃশ্য হইল। তারপর নূতন নূতন লোলুপ মুখ আর ক্ষুধিত দৃষ্টির মাঝে একটি শিশুর কান্না শোনা গেল। তারপর—

'কি লো গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিস, ভাই?'

চমক ভাঙিল, বুঁচী। সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিয়াছে, গলির বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মানুষের ভিড় বাড়িয়াছে। তাহাদের হাসির শব্দ আর কোলাহল শোনা যায়।

'বলি কি ভাবছিস্ লা পোড়ারমুখী?'

টগর হাসিল, 'তোর কথা রে বুঁচী।'

বুঁচী নিজের গোলমুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটাইয়া বলিল, 'ধ্যাৎ মাইরি—ইয়াকি করিস না। বল না ভাই—

কোন সে পুরুষশ্রেষ্ঠ হরিয়াছে?

চিত্ত তব দেবেন্দ্রযোগ্য?—'

বুঁচী কোন থিয়েটারে একবার এক সখীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিল। তাহার অভিনয় প্রথমবারেই শেষবারে পর্যবসিত হইয়াছিল, যেহেতু সে স্টেজে নামিয়া একটি কথাও বলিতে পারে নাই, অনেক লোক দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু স্টেজে যে কথা তাহার বলা হয় না তাহা প্রায়ই বেশ সুর করিয়া মাঝে মাঝে টগর পান্না প্রভৃতিকে কারণে অকারণে শোনায়।

টগর হাসিল। বেশ মেয়ে এই বুঁচী। বুঁচী আবার বলিল—'কি, বলি কোন মনচোরের কথা ভাবছিলে?'

মনচুরি! সে ভুল একবার হইয়াছিল। সে কবেকার কথা। তাহার পর 'পুরুষশ্রেষ্ঠ' নয়, বহু পুরুষ আসিয়াছে, নিত্য নূতন। বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়, সুস্থকায় আর ব্যাধিগ্রস্ত। এখনও আসে, নিত্য তাহার চতুর্দিকে তাহারা ভিড় করে, গুঞ্জনধ্বনি তোলে। টগরের নয়, বিমলার মন একবার চুরি গিয়াছিল বটে। কিন্তু যে হতভাগী তো আর বাঁচিয়া নাই।

'বুঁচী'—

'কি প্রাণেশ্বর?'

'আর বাজে কথা বললে চলবে না।'

'কেন হৃদয়বল্লভ?'

'সবাই চলে গেছে, বাইরের দি[illegible] তাকিয়ে দেখ।'

বুঁচীর জ্ঞান হইল, 'তাই তো! চল্ চল্'—

ফটকের সামনে গিয়া তাহারা দাঁড়াইল। ল্যাম্প পোস্টের আলোতে তাহাদের দেহ আর পোষাক আর গিল্টির গহনাগুলি ঝক্ঝক্ করিয়া উঠিল। আলোর ইন্দ্রজাল।

রাত্রি হইয়াছে। তাহাদের জীবন আরম্ভ হইল। তাহারা সকলে দাঁড়াইল—এক বাড়িতে তাহারা পাঁচজন থাকে।

ানদাও দাঁড়াইয়াছে। রক্তের মধ্যে
সটা বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে।
ান্না হাসিয়া বলিল, 'মাইরি টগর, তোর
দিন দিন খোলতাই হচ্ছে!'
গর নিরুত্তরে হাসিল। হঠাৎ তাহার
পড়িল রাধার দিকে। এক কোণে সে
রভাবে একটা সাদা শাড়ি পরিয়া
য়া আছে। টগর বিস্মিত হইল।
াধা—সে ডাকিল।
াধা তাহার মুখের দিকে চাহিল।
ুই এলি যে, আজই না তুই পথ্যি
স?'
াধা শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ'—
কন এলি তবে?'
াকা চাই, বাড়িউলি আজ আমায়
কথা শুনিয়েছে।'
র আর কি বলিবে?

া চলমান জনতার দিকে দুইটি বড় বড়
নিষ্প্রভ দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া
োগে ভোগের পর তাহার শীর্ণ
অধিকতর শীর্ণ হইয়াছে, কালো রং
ালী হইয়াছে, গাল ভাঙিয়া গিয়াছে
াথার চুল কিছু উঠিয়া গিয়াছে। রাধার
াক কি এক দুর্বোধ্য ব্যাধি
জীবনের আশা খুব কম, শ্বাস
লইতে তাহার আজকাল বড় কষ্ট
রেশ ডাক্তার তাহাকে খুব সাবধানে
বলিয়াছে।
তিনীর মত মাংসহীন লিকলিকে
বাহু দিয়া দরজার পার্শ্বদেশ আঁক-
রিয়া রাধা বাহিরের দিকে চাহিয়া
টাকা চাই।
ক বলিল—'সত্যি তুই শুয়ে থাকগে
া, এখনও আরও কয়েকদিন তোর
উচিত।'
ড়িল না, কথাও বলিল না।
বসায়েব, গোলামের সেলাম নাও।'
ট কালো ও মোটা লোক, গায়ে
ন আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে লপেটা।
া একগাল হাসিয়া আগাইয়া গেল—
সে; কত ঢংই জান, চল ভেতরে।'
টি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।
হাকে ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া

তে ভিড় ক্রমে বাড়িয়া উঠে। নানা-
াসেন্স, পাউডার আর দেহের গন্ধ।
র মুখ, পোষাক আর কথা।
র পানের পিচ আর সিগারেটের

মেয়েটা মন্দ নয়।'
টা?'
য কোমরে হাত দিয়ে—আহাহা,
ঠনটা দেখছিস।'
যুবক এদিক ওদিক একবার
তে দেখিয়া লইয়া টগরের সম্মুখে
াড়াইল।
'—সে বলিল।
! বলছেন?' টগর হাসিল।
ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'মর ছুঁড়ী—
না?'
ট হাসিয়া উঠিয়াছে। সে এ
াগত।

'কি কথা, বলুনে'—টগর নিপুণ কটাক্ষ হাসিয়া প্রশ্ন করিল।

'ভেতরে চল।'

'সেকি? দরদস্তুর!'

'সে পরে হবে।'

সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কেবল রাধা হাসিল না।

নিজের ঘরে গিয়া টগর বলিল, 'বসুন।'

যুবকটি সলজ্জভাবে বসিল। পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া সে ঘন ঘন টানিতে লাগিল

'পান খাবেন?' টগর প্রশ্ন করিল।

'না।'

একদৃষ্টে যুবকটি তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বারংবার তাহার নাসিকা স্ফীত হইতে থাকে। সুদর্শন, সুকুমার যুবক। টগর মনে মনে হাসে। নূতন পথিক।

'কতদিন এ পথে এসেছ?'

টগর শ্লেষভিক্ত কণ্ঠে বলিল 'ওসব জেনে কি করবেন—দেবদাস হবেন নাকি?'

যুবক অপ্রতিভ হইল—'না—না, মানে'—

'থাক ওসব কথা, বাতি নিভিয়ে দেব?'

সিগারেট বারান্দায় নিক্ষেপ করিয়া শয্যায় বসিয়া যুবক কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'দাও!'

'আগে দুটো টাকা দিন।'

দুইটি টাকার আওয়াজ। অন্ধকার হইল। অন্ধকারে উষ্ণ রক্তের মত্ত ইতিহাস, নিবিড় আলিঙ্গনে টগরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, দেহগ্রন্থিগুলি টনটন করে।

বারান্দায় সিগারেটটা নিভিতে চলিয়াছে। আলো জ্বলিল।

যুবকটির মাথা নত। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবিন্যস্ত চুলে একবার হাত বুলাইয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

'একটা সিগারেট দিন তো'—টগর বলিল।

যুবকটি তাহার দিকে চাহিল না, কেবল নিরুত্তরে একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া টগর বলিল, 'বসুন।'

'না'—পাপের অবসাদ তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

'আমার জীবনকাহিনী শুনবেন না?'

যুবক মাথা নাড়িল।

'কালকে আসবেন তো?'

যুবক লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

টগর হাসিল। সে জানে ঐ যুবক আবার একদিন আসিবে। এখন তাহার মাথা নীচু হইয়াছে বটে, কিন্তু দেহভ্যন্তরস্থিত নিস্তেজ শিরাগুলি যখন আবার উষ্ণ রক্তের স্রোতাবেগে উদ্দাম হইয়া উঠিবে, মন তখন আবার বদলাইবে, সে আবার আসিবে।

বাতাসে কানাইয়ের দোকানের মাংসের গন্ধ। পাশের ঘরে পান্না হাসিতেছে। ওপাশের বড় বাড়িটায় সুকেশী গান ধরিয়াছে। মহানগরীর বুকে রাত্রি গভীর হয়।

আয়নায় মুখ দেখিয়া, খোঁপা ও বেশ ঠিক করিয়া লইয়া টগর সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

এমন সময় আসিল শশী। সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠিয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে হাসিল, 'তোকেই খুঁজছিলাম টগর।'

টগর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'কেন, কি দরকার আমার খোঁজে, এখন বুঝি খিদে পেয়েছে?'

'না—তা নয়, দুটো পয়সা চাই।'

'ওপরে চল্।'

টগরের পিছনে শশী ঘরে ঢুকিল।

ঘরের আলোতে শশীর চেহারা এইবার পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। একটি সরু পাড় ময়লা শাড়ি পরনে, গায়ে একটা অর্ধ-ছিন্ন পাঞ্জাবি, মাথায় একরাশ ফাঁপিয়া ওঠা রুক্ষ চুল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহ তাহার অতিমাত্রায় দীর্ঘ, অস্বাভাবিক শীর্ণ, হাতের শিরাগুলি স্ফীত, লম্বাটে মুখের মাংসহীন দুইটি গালের উপর গরুর মত একজোড়া ড্যাবডেবে ও ক্লান্ত চক্ষু।

পয়সা দিতে গিয়া শশীর দিকে ভাল করিয়া চাহিল, হৃদয়ে একটা ব্যথা মোচড় খাইয়াও উঠিল। হতভাগা শশী। কবে কোন্ এক বেশ্যার গর্ভে এই গলির এক অন্ধকার ঘরে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার আর মনে নাই, উদ্দেশ্যহীন ছন্নছাড়া জীবনের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়া সেই কথা সে ভুলিতে চায়। কোথায় যায়, কোথায় কখন থাকে, কি খায় কিছুরই ঠিক নাই।

'বলি আজ খেয়েছিস তো?' টগর প্রশ্ন করিল।

ক্ষুদ্র শিশুর মত মাথা দুলাইয়া শশী বলিল, 'হ্যাঁ'।

'কোথায়?'

মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া টগর বলিল—'আচ্ছা শশী'—

'এ্যাঁ'—

'কেন মরতে এখানে থাকিস বলতো, অন্য কিছু করতে পারিস না?'

শশীর শান্ত ও ক্লান্ত দৃষ্টিতে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, 'এখানে যে নাড়ীর টান আছে।'

'না শশী, বাজে কথা নয়।'

শশী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তোদের মায়া ছাড়তে পারি না।'

'কেন?'

শশী তাহার উত্তর দিল না, হঠাৎ একটা কথা যেন তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে এমনি ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'আজ গণেশের ওখানে একটি ভারী অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হল টগর, বয়স বেশী নয়, কিন্তু তার জ্ঞান! সে আমায় বললে,'—সে থামিল।

'কি বললে?'

'তার আগে একটা কথার উত্তর দে তো?'

'কি?'

'এই জীবন কি তোর ভাল লাগে?'

টগরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিল, মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, 'না বাঁচতে হবে তো, অন্য আর কি উপায় আছে?'

শশী মাথা নাড়িল, 'লোকটি সেই কথাই বললে যে এমন একটা দিন আসবে যখন তোদের এ জীবনের আর দরকার হবে না, মানুষ আর সমাজ একদিন ভেঙ্গে গিয়ে নতুনভাবে তৈরী হবে।'

শশীর কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতে থাকে, কথা শেষ করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

টগর ঠিক কথাগুলি বুঝিতে পারে না, তবুও তাহা কেমন যেন ভাল লাগে। সমাজ আর মানুষ! ঠিকই তো। মুহূর্তে তাহার সারা অতীত আবার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। কিন্তু এই অতীতের স্মৃতিতে কোথায় যেন একটা পীড়াদায়ক যন্ত্রণা লুক্কায়িত আছে, টগর তাহা সহ্য করিতে পারে না। জোর করিয়া হাসিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা এবার নীচে চল্।'

শশী হঠাৎ তাহার দিকে আসিয়া চুপকণ্ঠে, উত্তেজিতভাবে বলিল 'টগর'—

'কি?'

'চল্ না কোথাও বেরিয়ে পড়ি, এই কুকুরের জীবন, এই গলির ভ্যাপসা দুর্গন্ধ আর অন্ধকার ছেড়ে চল্ না কোথাও চলে যাই। যাবি?'

টগর হাসিল, 'তা আমাকে এত দয়া কেন রে মুখপোড়া, আরও তো কত লোক রয়েছে—বুচী, মানদা, পান্না—তাদের বল্‌গে না।'

'তোকে যে ভালবাসি।'

'কি!' মানদার কথাগুলি টগরের মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ভালবাসার ছবিগুলি চোখের সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল, 'ভালবাসা! যা যা শশী দূর হ, বেশ্যাকে ভালবাসতে এসেছেন, বলি কত টাকা আছে রে তোর হারামজাদা?'

শশীর বড় বড় চোখ দুইটি যেন এবার ফাটিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম হইল, 'নাই বা থাকল টাকা, টাকাওয়ালদের মত রাতের বেলায় এসে এক ঘণ্টার জন্য তো তোকে ভালবাসি না আমি, আর বেশ্যার ছেলে আমি, বেশ্যাকে ভালবাসব না তো কাকে ভালবাসব?'

টগর বিরক্ত বোধ করে, 'পথের কুকুর মাথায় উঠেছিস্ না? প্রেমের কথা শোনাতে এসেছেন বাবু, বলি ভাত যে গিলিস, আজ কটা লোককে এনেছিস্ রে মুখপোড়া? যা যা দূর হ সুমুখ থেকে।'

মুহূর্তে শশীর মুখের রূপান্তর ঘটিল, আবার পূর্বেকার সেই নিরীহ পশুর মত ক্লান্ত ভাব ও দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, 'ঠিকই তো, বাইরে যে একটা বুড়োকে দাঁড় করিয়ে এসেছি।'

টগর একটু চুপ করিয়া বলিল, 'যা—নিয়ে আয়।'

'যাই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শশী চলিয়া গেল। কেবল যাওয়ার সময় একবার কি ভাবিয়া টগরের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল। ঘরের আলো তির্যক গতিতে সিঁড়ির উপর পড়িয়াছে, তাহাতে সিঁড়িটা সম্পূর্ণভাবে আলোকিত হয় নাই। সেই আধো আলো, আধো অন্ধকারে শশীর গরুর মত ড্যাবডেবে চোখের মধ্যে যেন কি একটা ভাষা। টগর বুঝিয়াও বোঝে না। ভারী অদ্ভুত এই শশী, একেবারে পাগল।

টগর বিছানায় গিয়া বসিল। ঘরের ভিতর বর্ষাকালের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। বাহিরে নক্ষত্রহীন অন্ধকার আকাশে মেঘরাশি আবার পুঞ্জীভূত হইতেছে। টগর ভাবে, ভালবাসা! শশীর ভালবাসা। সুধীর আর বিমলা।

সন্ধ্যাবেলায় অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিতে করিতে যেখানে ছেদ পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে সে আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল।

—এক নগর। সেখানে হঠাৎ একদিন একটি শিশুর ক্রন্দনে বিমলার নেশা ভাঙ্গিল, সে বুঝিতে পারিল যে পশ্চাতের জীবনে ফিরিবার আর কোনও উপায় নাই। এদিকে মধুলোভী মুগ্ধ ভ্রমরদের ভিড় বাড়িয়া চলিল। ইঙ্গিতে দৃষ্টিতে কদর্য পিপাসা আর প্রলোভন। ওদিকে পাপের বোঝাটি দিবারাত্র ট্যাঁ ট্যাঁ করে। বিমলা বড় মুস্কিলে পড়িল, সে কি করিবে? অবশেষে সে একদিন নিজের পাপকে ভুলিতে চাহিল। এক মত্ত মুহূর্তে সে ঐ শিশুটির কোমল গলদেশ নিপীড়ন করিয়া তাহাকে এই পৃথিবী হইতে বিদায় দিল। যন্ত্রণায় বেচারীর দেহটি কয়েকবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল মাত্র আর কিছু নয়। তারপর দূরে এক জঙ্গলে, মাটির নীচে তাহার কাঁচা দেহ চাপা পড়িল। হায়, বিমলা ভুল করিয়াছিল।

পাপ দূর করিতে গিয়া সে তাহাকে আরও কায়েমী করিয়া তুলিল, অজ্ঞাত নিয়তির আকর্ষণে সে থামিল এই গলিতে। তাহার পর এই গলির অন্ধকারে বহু মানুষের আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হইয়া বিমলা হইল টগর। সে কবেকার—

পদশব্দ।

একজন বৃদ্ধ আসিল। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। নুব্জদেহ শীর্ণকায়, মাথার চুলগুলি কাঁচাপাকা, ছোট ছোট চোখে সর্বদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, পরনে কোঁচান ধুতি, পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর।

'আসুন'—টগর বলিল।

বারান্দা হইতে শশী একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ হাসিল, 'আসুন কিগো, এসেছি।'

'বসুন।'

বৃদ্ধ বলিল, 'তোমার নাম টগর বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—

'বেশ বেশ, তা বাছা শশী মিথ্যা কথা বলেনি—তুমি দেখতে মন্দ নও।'

টগর হাসিল, 'পান খাবেন?'

'নিশ্চয়ই, অনেক পান তো খেলাম, তোমার হাতেরটাও খেয়ে দেখি। দেখ যেন গুণ কর না ভাই।'

বৃদ্ধ রসিক।

টগরও রসিকতা করে, 'গুণ করলেই বা ভয়ের কি, আমি কি বাঘ?'

'বাঘ! কে বলে তা? তোমরা বাঘের চেয়েও বড়—তোমরা হচ্ছ বাঘের মাসী।'

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ দেওয়ালে বিলম্বিত কালী পটের উপর দৃষ্টি পড়ায় তাহার হাসি থামিয়া গেল, দৃষ্টি নত হইল, ফিস্‌ফিস্ করিয়া সে বলিল, 'বাতিটা নিভিয়ে দা[illegible] তো'—

'কেন?' টগর বিস্মিত হয়, 'এত তাড়াতাড়ি, গল্প করবেন না?'

'নেভাও বলছি।'

অন্ধকার।

'ঘরে মায়ের ছবি রেখেছ কেন?' বৃ[illegible] প্রশ্ন করিল।

'আমরা কি মায়ের সন্তান নই?'

'না, তা বলছি না—কিন্তু মায়ের ছবি সামনে ভয় হয়।'

'তবে ফিরে যান।'

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধ টগর[illegible] নিকটে লইল। লোল চর্মের স্পর্শ।

'পাগল, এখানে যারা আসে, তারা কি ফিরবার জন্য আসে?'

টগর মৃদু হাসিল, 'ছবি না রাখ[illegible] কি মা এসব কাজ দেখতে পান না?'

'না—তা নয়—তবে'—

'কেন তবে এই ফাঁকি, পাপ করছে[illegible] আবার নিজেকে ভুলও বোঝাচ্ছেন!'

বৃদ্ধ নিবিড়ভাবে টগরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'ও বাবা, তুমি যে অনে[illegible] বড় বড় কথা জান মাইরি।'

সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া শশী যেন কি ভাবিতেছে। বেশ্যার ছেলে শশী।

আলো জ্বলিল।

বৃদ্ধ ম্লান হাসিয়া বলিল, '[illegible] কাটলে যেমন সব বিস্বাদ মনে হয় এ[illegible] তেমনি মনে হচ্ছে। ভাবছি কেন এ[illegible] ছিলাম?'

'কেন এসেছিলেন?'

'তা কি জানি—[illegible] সামলাতে পা[illegible] না। ঘরেতে আমার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী সবই তো আছে তবু তোমাদে[illegible] এখানে একবার না এসে পারি না কেন?'

'আমাদের ভালবাসার টানে'—টগ[illegible] হাসিয়া বলিল।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িল, 'তোমাদের ভাল[illegible] বাসা! সে তো মিথ্যা—অভিনয়।'

সে নীচে নামিয়া গেল।

মিথ্যা—অভিনয়। বিমলার ভালবা[illegible] কি মিথ্যা ছিল।

রাধা তখনও একইভাবে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। একটি লোকও তাহার দিকে ফিরি[illegible] চাহে না।

মানদাও একপাশে দাঁড়াইয়া ছি[illegible] টগরকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, 'তোদেরই ভাগ্যি মাইরি।'

'কেন?'

'একটা যাচ্ছে তো আরেকটা আসছে।'

টগর মৃদু হাসিল।

'বুচী, পান্না, কনক—এরা বুঝি ঘরে?'

'হ্যাঁ।'

মানদা সাগ্রহে রাস্তার দিকে তাকায়। [illegible] কি মুগ্ধ হইল? একদিন কিন্তু তো[illegible] দ্বারে লোকেরা হুমড়ি খাইয়া পড়িত। [illegible] যে এক মারওয়াড়ী, কি বিরাট ভুঁড়ি [illegible] তার! সে একদিন আসিয়া মানদার [illegible]

চড়াইয়া ধরিয়া কত সাধিয়াছিল তাহার সহিত যাইতে, কিন্তু সে যায় নাই। আর আজ? নিজের মুখের বসন্তের দাগগুলির ওপর মানদা হাত বুলায়।

রাধার দিকে চাহিয়া টগরের মনটা কেমন যেন করে। মোলায়েম সুরে সে ডাকিল—রাধা'।

রাধা ক্লান্তভাবে তাহার দিকে চাহিল।

'তোর টাকার দরকার তো একটা টাকা নিস আমার কাছ থেকে, তুই এখন ভেতরে যা ভাই।'

রাধা নিরুত্তরে মুখ ফিরাইয়া লইল।

রাত্রি বাড়িতেছে। রাত্রির কালো ধমনীতে তাহার কালো আত্মার স্পন্দন। গলির মধ্যে ভিড়। নানা মুখ আর নানা কথা, হাসি আর ইঙ্গিত, মদ আর পানের পিচ, অদৃশ্য শীতাংশুর হাসি আর কানাইয়ের দোকানের মাংসের গন্ধ। হ্যাঁ, রাত্রি বাড়িতেছে।

আবার শশী আসিল।

'আর একটাকে এনেছি'—সে বলিল।

তাহার পশ্চাতে একটি লোক টলিতেছিল। তাহার মাথার চুলগুলি অবিনাস্ত, অত্যাচারে গাল ভাঙিয়া গিয়াছে, রক্তাভ দৃষ্টিতে অর্থহীন চাহনি, চেহারাটা তাহার ভালই, দেখিয়া অবস্থাপন্ন ও ভদ্র বলিয়া মনে হয়।

'নিয়ে আয়'—বলিয়া টগর সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে জড়িত স্বরে লোকটি বলিল, 'অত হন্ হন্ করে যেও না ভাই, মুখখানা একবার দেখাও'—

টগর থামিল, লোকটির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'দেখুন না কত দেখবেন।'

লোকটি টলিয়া টলিয়া দেখিতে দেখিতে হাসিল, 'বেশ মুখ!'

লোকটিকে টগরও দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাহার সারা দেহের রক্ত-স্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিল, প্রতি কোষে উপকোষে হিংস্রতার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, দুই হাত বাড়াইয়া কঠিনভাবে লোকটির গলা টিপিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'শশী!'

শশীর লম্বা ছায়া সিঁড়ির ধাপে পড়িল।

'এ হারামজাদাকে বের করে দে।'

'কেন?'

'বের করে দে বলছি।'

লোকটির নেশা ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রাচীরে হেলান দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল 'তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?'

টগর অদ্ভুত হাসিয়া বলিল, 'চিনে দরকার নেই আর, এ গলিতে আর কোনদিন যেন তোমার মুখ না দেখা যায়।'

'তুমি কে?'

'আমি টগর—বেশ্যা—আবার কে।'

'না, ঠিক করে বল তুমি কে?'

টগর গর্জন করিয়া উঠিল, 'শশী—হতভাগা আমার কথা কি তোর কানে যায়নি...বের করে দে এ কুকুরটাকে।'

শশী লোকটির হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

তবুও লোকটি আকুলকণ্ঠে বলিল—তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?'

শশী আবার সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িল।

দুইটি কাবলীওয়ালাকে লইয়া রাধা উপরে চলিয়া গেল। তাহার টাকা চাই—আজই।

হঠাৎ টগর উঠিল, দ্রুতপদে দ্বারপার্শ্বে গিয়া গলির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্নদৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল। লোকটি টলিতে টলিতে গলির মোড়ে অদৃশ্য হইল। সুধীর অদৃশ্য হইল। হইবে না তো কি—টগর তো বিমলা নয়। বিমলা তাহাকে ভালবাসিত, টগরের সে শত্রু।

মানদা প্রশ্ন করিল, 'ফিরিয়ে দিলি কেন রে?'

নিরুত্তরে টগর নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িল। মুহূর্তে কি যেন হইয়া গেল। না দুঃখ, না ক্রোধ, না হতাশা, এমনি একটা অবর্ণনীয় ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সে নিঝুমের মত পড়িয়া রহিল আর

অতীতের ছবিগুলি একের পর এক ভোজ-বাজীর মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। কেবল একটি দূরে দূরান্তরে কোন এক জঙ্গলের মাটির বাধাকে ভেদ করিয়া একটি রুদ্ধশ্বাস কচি শিশুর কান্না ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বাহিরে মেঘ গর্জন শোনা গেল।

পাশের ঘরে কাবলীওয়ালা দুইটি তাহাদের দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব রসিকতা করিয়া হাসিতেছে।

রাধা।

শশী আসিল।

'খাবি না টগর?'

'তুই খেয়েছিস?'

'তুই আগে খা।'

টগর উত্তর দিল না।

বারান্দায় বসিয়া শশী বলিল, 'পুরোনো দিনের কথা ভাবিস না, এমনি হয়, অথচ কত কথাই না ভেবেছিস এই অপদার্থ লোকটার বিষয়ে!'

'ওসব কথা ছাড় দেখি।' টগর তিক্ত হইয়া উঠিল।

শশী ম্লান হাসিল, 'আচ্ছা তবে খেয়ে নে চারটি।'

টগর উঠিল। দিনের রাঁধা ভাত একটি পাত্রে কিছু দিয়া বলিল, 'নে খা।'

শশী খাইতে বসিল।

পাশের ঘরে রাধা একটু গোঙাইয়া উঠিল।

টগর খাওয়া দেখে। একগাল ভাতের চাপে শশীর দক্ষিণ গালটা ক্ষণেকের জন্য মাংসল বলিয়া মনে হয়। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় সে খাইতেছে তাই আরামে তাহার চক্ষু অর্ধনিমীলিত হইয়া আসে। টগরের মমতা বোধ হয়। শশী নাকি তাহাকে ভালবাসে! ভালবাসা!

টগর হাসিল, 'কি রে এখনও আমায় ভালবাসিস?'

খাওয়া থামাইয়া শশী তাহার দিকে চাহিল, কোনও উত্তর দিল না, কেবল তাহার গরুর মত ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। পরে একটু মৃদু হাসিয়া সে বলিল, 'খেয়ে নে তুই এবার।'

টগর নিজের থালা টানিয়া লইল।

বাহিরে বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে বাতাস।

কাবুলীওয়ালা দুইটি উত্তেজিতভাবে কি বলাবলি করিতে করিতে তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

'এক গেলাস জল দে তো শশী।'

'দিই।'

হাত ধুইয়া শশী টগরকে জল দিল।

একটি বিড়ি ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সে পরে বারান্দার উপর গড়াইয়া পড়িল।

'ও কিরে, খালি মাটিতে শুবি!'

শশী রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, শরীরটাও মাটির তা জানিস, একদিন তা মাটিতে মিশে যাবে—বাউলের গান শুনিস নি?'

মাটি!

ঝঙ্কার দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে টগর বলিল, 'বেশী কথা বলিস না হারামজাদা—ওঠ বলছি! খেয়ে নিই, একটা মাদুর আর বালিস দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

মানদার চীৎকার শোনা গেল—'ওরে তোরা শিগ্‌গির আয়—ও বুঁচী—ও টগর, শিগ্‌গির আয়—রাধা নড়ে না যে!'

'এ্যাঁ!' টগর উঠিয়া দাঁড়াইল।

'তুই খা না, আমি দেখে আসি'—শশী রাধার ঘরের দিকে গেল।

কি হইল রাধার? টগর আর খাইতে পারে না।

শশী ফিরিয়া আসে না।

বুঁচীর কান্না শোনা যায়, 'ও ভাই রাধা—রাধা'।

টগর যন্ত্রচালিতের মত গিয়া রাধার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। মলিন শয্যার উপর রাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু কাবলীওয়ালা দুইটি অকৃতজ্ঞ নয়, তাহারা একটি টাকা তাহার মাথার নিকটে রাখিয়া গিয়াছে।

ঘরের ভিতর ভিড় জমিয়া গেল। পাশের বাড়ির কমল, মতি প্রভৃতি আর বাড়িউলী আসিল। অনেক জেরা, অনেক চীৎকার, জল-ঢালা আর পাখার বাতাস। রাত্রি গভীর হইতেছে।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া গিয়া টগর ভাবে, রাধার নিস্পন্দ দেহটা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে একটা দুর্নিবার বিবমিষা পাকস্থলীতে পাক খাইয়া উঠিল। সে বমি করিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে বৃষ্টি জোরে আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রি অন্ধকার। এ গলির অন্ধকার আর তাহাদের অন্ধকার জীবনের মত।

বেশ্যার ছেলেটা মমতায় ভাঙিয়া পড়ে। টগরের মাথায় জল ঢালিয়া তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া শশী বলিল, 'এবার ঘুমো টগর—ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে? আচ্ছা—' চক্ষু মুদ্রিত করিয়া টগর আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। বিমলা। মাটি। 'টগর তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?' রাধার মাংসহীন দেহ আর রক্ত। টগর কি করিবে?

শশী মেঝেটা ধুইয়া বাতি নিভাইয়া বারান্দায় গিয়া শুইল।

রাত গভীর হইতে থাকে। বৃষ্টি থামে না, একটানা সুরে অবিরাম পড়িতে থাকে। কালির মত কালো আকাশ।

হঠাৎ টগর বিছানা হইতে উঠিল, বাতিটা আবার জ্বালাইয়া শশীর নিকট গিয়া তাহার দেহে ঠেলা দিয়া বলিল, 'শশী!'

শশী জাগে না, সারা দিনের ঘুম তাহার চোখে।

'ও শশী—শশী?'

'এ্যাঁ—কে?'

'আমি।'

'কে—টগর?'

'হ্যাঁ।'

'কি হল?'

'চল।'

'কোথায়?'

'এই না আজ সন্ধ্যাবেলা বলেছিলি কোথায় নিয়ে যাবি আমায়, এই কুকুরের জীবন থেকে আমায় না তুই মুক্ত করতে চাস?'

শশীর ঘুমভরা চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, টগরের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে কি না তাহাই সে কেবল ভাবিতে লাগিল।

'নিয়ে চল শশী—ও শশী—তুই না আমায় ভালবাসিস?' টগরের কণ্ঠে ক্ষুদ্র বালিকার মত কাতরতা, সে যেন বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্তে শশীর চেহারা বদলাইয়া যায়, গরুর মত ড্যাবডেবে ও নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটিতে মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলিয়া ওঠে।

টগরের ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া সে প্রশ্ন করিল, 'সত্যি বলছিস টগর—না মিথ্যে কথা?'

দুই হাতে টগর এবার শশীকে আঁকড়াইয়া ধরিল, ফিসফিস করিয়া বলিল—'সত্যি—সত্যি, এক্ষুণি চল শশী, দেরি করলে হয়তো হবে না।'

টগরের কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া শশী ভারী মিষ্টি হাসিয়া বলিল—'চল তবে।'

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি।

রাস্তায় নামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহারা দুইজনে চলিল।

'বড় বৃষ্টি—না?' টগর বলিল।

শশী মাথা নাড়িল, 'হ্যাঁ—তাতে কি।'

চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে অনুভব করিয়া টগর আবার বলিল, 'রাত অনেক হয়েছে—আর বড় অন্ধকার—না শশী?'

বেশ্যার ছেলেটা গভীর অনুরাগের সহিত টগরকে আরও নিবিড়তর সমীপে টানিয়া লইয়া বলিল, 'হোক না, ভয় কি, আমি তোকে আকাশের সূর্যি এনে দেব।'

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি। তবু ভয় নাই, বৃষ্টি থামিবে, লোকেরা জাগিবে, রাত্রিও শেষ হইবে বেশ্যা টগর আর বেশ্যার ছেলে শশীর জীবন নূতন দিনের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ আলো পশ্চাতে ফেলিয়া আসা গলিতে কোনও দিন ছিল না, থাকিবেও না সেখানে তো, চিরান্ধকার রাত্রির চিরন্তন বিলাস।

বিচিত্র হৃদয়

প্রতিভা বসু

আমার বাবা ছিলো না। এই অভাব-াধটা খুব ছোটো থেকেই আমাকে বারং-ার আঘাত করেছে। মাকে জিজ্ঞেস করেছি, ানি তাঁর বিষণ্ণ মুখ আরো বিষণ্ণ করে রা গলায় জবাব দিয়েছেন, তিনি স্বর্গে। র্গ কোথায়, স্বর্গ কী, কতদূরে—অনেক ন ভেবেছি, কিন্তু সে-প্রশ্নের মীমাংসা য়নি। আমার মা-র মুখশ্রী অতি সুন্দর, মস্ত মুখখানাতে তাঁর এমন একটা মধুর ষণ্ণতার আভা ছড়িয়ে থাকতো যে কোনো ানো সময় অপলকে সে মুখের দিকে াকিয়েও আমার দেখার তৃষ্ণা মিটতো । তিনি কালোপাড় শাড়ি পরতেন, হাতে রু-সরু দু-গাছা বালা ছিলো—গলায় য়-অদৃশ্য একছড়া সোনার হার চিকচিক রতো। কী যে সুন্দর দেখাতো তাঁকে—ণ শ্যামল রংয়ে একটা বর্ষার সজল ভা ছিলো—আমি ফর্শা ছিলুম, কিন্তু বু সকলে বলতো মা-র শ্রী আমি পাইনি। ান্ত শান্ত আর দৃঢ় ছিলো তাঁর ভাব। আমি তাঁর অতি অল্প বয়সের কমাত্র সন্তান।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই তাঁর জীবনের স্ত আলো নিবে গিয়েছিলো। দাদা-ায় ছিলেন সনাতনপন্থী—কাজেই বারো র বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়ে খুব টা তৃপ্তি লাভ করলেন। বিয়ের পরে ম বছর মা-র প্রায় পিত্রালয়েই কেটে-লো। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে আমার ভাবনার সূত্রপাতেই আমার বাবার মৃত্যু লা। শোকে আমার মা কতটা মুহ্যমান য়েছিলেন আমি জানি না, কিন্তু আমার ামশাই এ-আঘাত সামলাতে পারলেন না, বছরের মধ্যে তিনিও গত হলেন। ব আর দিদিমার পরিচর্যায় আমি বড়ো য়েছিলুম—কোনো পুরুষের সংস্রব াদের ছিলো না: দু-একজন আত্মীয়ই আসা-যাওয়া করতেন—আর অসুখ লে ডাক্তার। স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাজ া আমার মাকেই করতে দেখেছি। বিপদে পদে সুখে-দুঃখে সব সময়েই তিনি চলিত। দিদিমা যত না বুড়ো হয়ে-লেন তত হয়েছিলেন রুগ্ন—আর্থিক লতার অভাবও ছিলো প্রচুর, কাজেই জকর্ম সবই প্রায় মাকে করতে হতো। ালে উঠেই তিনি একেবারে কলের মতো শব্দে কাজে লেগে যেতেন—তারপর র্দিষ্ট সময়ে কলেজ এবং ফিরে এসেই ার কাজের আবর্ত। বাচ্চা একটি চলেই যথেষ্ট—তার উপর আমার মা ছিলেন আমার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী—তাঁর চোদ্দ বছরের মাতৃত্ব আমি দেখিনি, কিন্তু যে বয়সের কথা আমার মনে আছে—তখনো আমার মা খুব বুড়ো হয়ে যাননি—এখন সে-বয়েসের মেয়েদের বিয়ের কথাও কেউ চিন্তা করেন না। আমার যখন দু' বছর বয়েস মা তখন আই-এ পাশ করলেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ এক সকালে ঘুম ভেঙে আমি একজন ভদ্র-লোককে আমাদের ঘরে দেখতে পেলুম—যাঁর চেহারা আমার মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে একটি গভীর দাগ কেটে দিলো।

সুন্দর লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ যা মানুষকে টানে—অত্যন্ত নিচু স্বরে কথা বলেন আর এমনভাবে মাঝে মাঝে চোখ রাখেন মুখের উপর যে চোখে চোখ ফেলতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। দিদিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি ঘরে যেতেই আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। আমি মিশুক ছিলাম না, বিশেষত কোনো পুরুষের সংস্রব বর্জিত হয়ে মানুষ হবার দরুন পুরুষ সম্বন্ধে আমার একটা অহেতুক ভয়ও ছিলো। কিন্তু তবুও আমি ঐ ভদ্র-লোকের মৃদু আকর্ষণেই একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকালুম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুন্দর করে হাসলেন, তারপর পকেট থেকে লাল ফিতেয় বাঁধা এতো বড়ো এক বাকস চকোলেট বার করে আমার হাতে দিলেন। নেবো কি নেবো না ভাবছিলুম হয়তো, এমন সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে আমার মা ঢুকলেন ঘরে—এই প্রথম তাঁর মাথায় কাপড় দেখলুম। কেমন একটা সলজ্জ সসংকোচ ভঙ্গিতে তিনি ভদ্রলোকের হাতে চা-টা দিয়েছিলেন সেই দৃশ্যটা আমার এখনো মনে পড়ে। দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই আগুন বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি, বাবা'। তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠলো।

ভদ্রলোক মার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—একটু সময়ের জন্য বোধ হয় তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—দিদি-মার কথায় সতর্ক হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি জানতুম না আপনারা এখানে, দেশে ফিরেছি মাত্রই দশদিন—হঠাৎ পশু আপনাদের ঠিকানা পেলুম। সুমন্ত্র আমার কতখানি ছিলো তা আপনাদের বোঝানো সম্ভব নয়। আমার বিলেত যাত্রার রাস্তাটা বলতে গেলে ও-ই সুগম করে দিয়ে-ছিলো'—আমি লক্ষ্য করে দেখলুম বলতে বলতে তিনি মার মুখের দিকে তাকালেন আর মার সাগ্রহ দৃষ্টি তখুনি নত হয়ে গেলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক—'আমার একটু দরকার আছে—আজ আর বসবো না'। নত হয়ে তিনি আমার দিদিমার পায়ের ধুলো নিলেন—মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কখনো ভাবিনি আপনাকে এ অবস্থায় দেখবো। সবই ভাগ্য'। মা চুপ করে রইলেন। আমি মার কাপড়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলুম, আমার গালে মৃদু টোকা দিয়ে বিদায় নিলেন।

তাঁকে দেখার এই আমার প্রথম অভি-জ্ঞতা। তারপরে তিনি আবার এলেন, আবার এলেন—আমার জামা-কাপড়ের শ্রী বদলে গেলো, আমার মার মুখের বিষণ্ণতার পরিবর্তে ভরে থাকার একটা অদ্ভুত আভা দেখা দিলো—ক্রমে ক্রমে সংসারে যেন একটা নতুন আলো অনুভব করতে লাগলুম। শেষে আস্তে আস্তে এমন হলো যে, তিনিই এ বাড়ির অভিভাবক হয়ে উঠলেন। মাকে আর অত পরিশ্রম করতে দেখতুম না, আমার পরিচর্যার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একজন স্ত্রীলোক এলো, বাড়িতে রাঁধবার জন্য ঠাকুর এলো—বাইরের কাজ করবার জন্য চাকর রাখা হলো। প্রথমটায় দিদিমা ও মাকে প্রায়ই এ নিয়ে নানারকম ওজর-আপত্তি আর অভি-যোগ করতে শুনেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সেই জেদ তাঁরা বজায় রাখতে পারেন নি। আমার মার আত্মমর্যাদা ছিলো অসাধারণ, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বময় অসাধারণ মানুষটির হৃদয়-বৃত্তির কাছে নিশ্চয়ই তিনি হার মেনে-ছিলেন। একখানা ছোটো অস্টিন গাড়ি ছিলো ভদ্রলোকের। সকালে-বিকালে সেই গাড়িখানা নিজেই চালিয়ে তিনি আসতেন। সকালের দিকে তিনি সবশুদ্ধ পনেরো মিনিটও হয়তো থাকতেন না—কেবল একটা খোঁজখবর নেয়া—তাঁর পায়ের শব্দ পেলেই মার মুখে একটা আলো ছড়িয়ে পড়তো—হাতের কাজ শিথিল হয়ে উঠতো, অকারণে এক কাজ থেকে আরেক কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করতেন। আমি চুপি-চুপি কানের কাছে মুখ এনে বলতুম, 'সাহেব এসেছেন, মা।' প্রথম দিন তিনি স্যুট পরে এসেছিলেন আর আমার মনে গেঁথে গিয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই সাহেব। তারপরে দিদিমা কত বুঝিয়েছেন যে ইনি একজন খাঁটি বাঙালি—আমার বাবার বিশেষ বন্ধু—তারপরে কতবার উনি

ধুতি পরে এসেছেন কিন্তু আমার মনের সেই সাহেবের ছবি কিছুতেই মুছে যায়নি। কাজ করতে করতে মা ঈষৎ মুখ তুলে বলেছেন, 'আসুন। তুমি পড়তে বসো গে'। এ কথায় আমি দুঃখিত হয়ে যাই-যাই করেও দাঁড়িয়ে থাকতুম। এ ভদ্রলোকের সান্নিধ্যের কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিলো আমার কাছে। এত দেখে-দেখেও তাঁর কাছে আমি সহজ ছিলুম না। সেই বালিকা বয়সেও আমি বড়ো মেয়েদের লজ্জা অনুভব করতুম। একটু পরেই ভদ্রলোক নিজেই মার ঘরে আসতেন। 'কেমন আছেন?' রোজই এক প্রশ্ন। আমি ভেবে পেতুম না এই তো কাল রাত দশটা পর্যন্ত দেখে গেছেন—আজ এটুকু সময়ের মধ্যে আবার কী হবে যে এই প্রশ্ন। মা-ও রোজকার মতোই মাথা নিচু করে জবাব দিতেন, 'ভালোই।' একটু চুপচাপ কাটতো। তারপর মা চোখ তুলে তাকাতেন—আমি দেখতাম ভদ্রলোকও তাকিয়ে আছেন মার দিকে। তাঁদের দুজনের মিলিত দৃষ্টির এমন একটা অনুভূতি আমার অপরিণত মনের মধ্যে ক্রিয়া করতো যে দুজনকে দুজনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠতুম। মা তক্ষুনি বুঝে ফেলতেন আমার মনের কথা। সতর্ক হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসতো তাঁর মুখ দিয়ে। ভদ্রলোক বলতেন, 'কী হবে?' মা জবাব দিতেন না—আমার আঁচড়ানো মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে আরো পরিপাটি করতেন। তারপরে তাঁরা মৃদুকণ্ঠে আরো দু-একটা কথা বিনিময় করতেন।—সে সব কথার আমি মানে বুঝতে পারতুম না।

একদিন দিদিমা বললেন, 'তোমাকে বাবা আর কত কষ্ট দেবো, তুমি যা করলে—'

'ও-কথা বলছেন কেন?' ভদ্রলোক একটু আহত স্বরে বললেন, 'সুমন্ত্রর কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী ছিলুম। ঋণ তো কখনো শোধ হয় না, কিন্তু তবু যদি তার হয়ে কিছুটাও করতে পারি, সেইটাই আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ।'

'ও-কথা বোলো না—সে যদি তোমাকে কিছু করেই থাকে তার একশো গুণ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো আমাদের। যে সময়টায় তোমার দেখা পেয়েছিলুম—বলতে আর লজ্জা নেই যে সে-সময় আমাদের সম্ভ্রম রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো।'

'আমাকে আপনি পর ভাবেন কেন? আমার এই উপার্জনে যে আপনাদেরও একটা ন্যায্য দাবি আছে সেটা কেন ভাবতে পারেন না। আত্মীয় হলে কি কখনো এমন কথা বলতে পারতেন কি ভাবতে পারতেন?'

'কথাটা যে কত সত্য আমি বুঝি। আত্মীয়রা সর্বদাই শত্রু, অথচ তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতেও আমাদের লজ্জা নেই. কিন্তু—'

'এর মধ্যে কিন্তু নেই। এবার তো আমাদের আরো দরকার বাড়ছে, হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আমাদের খুকুমণিকে এবার ইস্কুলে দিতে হবে না? কী বলো, অ্যাঁ?'

আমি তখন আট বছরের হয়েছি। ঘাগরা দেয়া সুন্দর-সুন্দর ফ্রক পরি—দু'পাশে লাল রিবন দিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দি—আর সব সময় মনের মধ্যে কেমন একটা অহংকার বোধ করি। কয়েকদিন থেকে ইস্কুলে ভর্তি নিয়ে মা-র সঙ্গে কান্নাকাটি করছিলুম—এ-কথায় সুখী হয়ে লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকলুম। ভদ্রলোক বললেন, 'খুব ভালো ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবো—ইস্কুলের বাস আসবে ভোঁ করে—আর তুমি বেণী দুলিয়ে ছুটে গিয়ে উঠে বসবে। আমাদের তো তখন চিনবেই না।'

আমি একগাল হেসে লজ্জায় তাঁরই কোলের মধ্যে মুখ লুকোলাম।

'শোনো, শোনো—' আমি মুখ তুললাম না। এর পরে তিনি মা-র ঘরে গেলেন। আমি সেখানেই চুপ করে বসে রইলুম। তাঁর বুকের কাছটায় মুখ রেখেছিলুম, তাঁর গায়ের সৌগন্ধ লেগে রইলো আমার প্রাণে।

তার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ইস্কুলে ভর্তি হ'য়ে গেলুম। লেখাপড়ায় আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিলো, ইস্কুলের আবহাওয়া আমার ভালো লাগলো। তাছাড়া বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ ছিলুম, এখানে অনেক মেয়ের বন্ধুতা, অনেক দিদিমণিদের স্নেহ আমার জীবনে যেন একটা নতুন জগৎ এনে দিলো। প্রথম বছরটা আমি ইস্কুলের বাস-এ যেতাম, দ্বিতীয় বছরে আমাদের একখানা বড়ো গাড়ি এলো। আমাদের মানে ভদ্রলোকের। তাঁর ছোটো গাড়িখানাও ছিলো, সেটা তিনি নিজে ব্যবহার করতেন আর এ গাড়ি রইলো আমাদের জন্য। মা ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বললেন, মিছিমিছি অর্থ নষ্ট, কী দরকার ছিলো আবার এ-গাড়িটা কেনবার?

'শস্তায় পেলাম।'

'শস্তায় পেলেই সব যদি কিনতে হয় তা হ'লে—'

'চুপ করো তো—'

ইদানিং মা-কে তিনি তুমি বলতেন। আমার ভালো লাগতো না, কিন্তু আমার তো কোনো হাত নেই। মা বললেন, 'আমি তো চুপ করেই থাকি। কিন্তু সত্যি এ আমার ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা, তোমার ভালো না লাগে, আমি আর খুকুর ঘরে বেড়াবো। কেমন?'

মা-র পিছনে দাঁড়িয়ে পেন্সিলের কাঠ চিবোচ্ছিলাম—মৃদু হেসে মুখ নামালাম। আমাকে সম্বোধন করে উনি যখনই কোনো কথা বলেন ভিতরে ভিতরে আমি যেন কেমন এক রকমের শিহরণ অনুভব করি। আজ প্রায় তিন বছর ধ'রে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের এ-রকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—বলতে গেলে তিনিই বাড়ির কর্তা অথচ একদিনের জন্য তাঁর মুখোমুখি আমি লজ্জা কাটাতে পারিনি—আজ পর্যন্ত তাঁকে আমি কোনো সম্বোধন করি না। আমার দিদিমা বলেন, 'এ আবার কী! বাবার বন্ধু, তাছাড়া এমন মানুষ, কত ভালোবাসেন, কত যত্ন করেন, তার কাছে আবার লজ্জার কী আছে? কাকা ব'লে তো একদিন ডাকতেও শুনি না।'

মা বলেন, 'ও বুনো হ'য়ে গেছে, মা। জন্মে থেকে তো মা আর দিদিমা—অন্য মানুষ তাই ওর বরদাস্ত হয় না।'

বরদাস্ত হয় না—এ কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। সত্যিই তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন, এত যত্ন করেন, সংসারের সমস্ত সুখ আমাদের জন্যই আহরণ করেন তিনি, তথাপি আমি তাঁকে বরদাস্ত করতে পারি না। এমন নয় যে আমি তাঁকে ভালোবাসি না—তাঁকে পছন্দ করি না কিংবা তাঁর কোনো ব্যবহারই আমার মনের প্রতিকূল হয়েছে—বিশেষ ক'রে আজ জীবনের এইখানে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার উপলব্ধি করছি যে আমি তাঁকে দেখামাত্রই অতিরিক্ত ভালোবেসে ফেলেছিলুম ব'লেই তাঁর প্রতি আমার একটা অহেতুক বিদ্বেষ ভাবও ছিলো। আমার বয়সের মেয়ের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেয়া উচিত এবং যে-রকম মনোযোগ দেয়া উচিত, তিনি কেবলমাত্র সেটাই কেন দিয়েছিলেন সেটাই ছিলো আমার পরম হতাশার কারণ। আমার শিশু-মন সেটা বোঝেনি, আজকের অভিজ্ঞ মন দিয়ে সেটা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পারছি যে আমাকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্য কারো প্রতি তাঁর একতিল বেশী আসক্তিও ছিলো আমার পক্ষে দুঃসহ। মাত্র ঔচিত্যের মাপে যে মনোযোগ তিনি আমাকে দিলেন, বন্ধুপত্নীর প্রতি সে মনোযোগের প্রশ্নই উঠলো না—তাঁর জন্য তিনি সারা পৃথিবী জয় ক'রে আনতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। আমি আমার শিশু-মনের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে প্রথম দিন থেকেই সেটা উপলব্ধি ক'রে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা পেতুম। হয়তো মা-র প্রতি আমি ঈর্ষাকাতরই হয়েছিলাম।

আস্তে আস্তে বড়ো হ'তে লাগলুম। আমার সতেরো বছর বয়স হলো—সুখে সমৃদ্ধিতে সাচ্ছল্যেভরা সংসারে আমার কোনোই দুঃখ ছিলো না, তবু আমার ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ভালো-না-লাগা-বোধ অবিশ্রান্ত আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। একদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ উঠে এলাম মা-র কাছে। মা সোয়েটার বুনছিলেন। মা-র নতদৃষ্টি সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর মসৃণ রংয়ের সুগঠিত দুটি হাতের ওঠা-পড়া দেখতে-দেখতে তাঁকে আমার সমবয়সী মনে হ'তে লাগলো। হঠাৎ চোখ তুলে তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কী রে?'

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বুনছো?'

'তোমার সাহেব-কাকার জন্য একটা সোয়েটার। কিছু বলবে?'

কোনো ভূমিকা না ক'রে হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা মা, এ ভদ্রলোক তো সত্যিই আমার কাকা নন, তবু কেন আমরা তাঁরটাই ভোগ করি?' মা চকিত হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এ রকম একটা প্রশ্ন যে আমার মনে উঠতে পারে, একথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

ককে একটু সামনে নিয়ে বললেন, কো বলতে কী বোঝায় তা কি তুমি

ার বন্ধু,..এই তো? কিন্তু বাবার বাও না কাকাও না—লোকে তাঁকে বে। তাঁর গাড়ি চড়ে ইস্কুলে যাই— া দিয়ে ভালো বাড়িতে থাকি—তাঁর ভালো-ভালো পোশাক পরি—আশ্চ- লাগে আমার।'

রর সোয়েটারটা মা যেন ঝেড়ে ফেলে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় 'ভালো যিনি বাসতে জানেন তিনিই আত্মীয়—ভালোবাসাই সম্মান—ভালো- জীবন—তার চাইতে বড়ো কিছু

কে যদি বলে—'

কে কী বলে না বলে তা তোমাকে হবে না, বুলু।'

য়া হয়ে বললাম, 'কেন ভাবতে হবে ক নিয়েই তো আমাদের বেঁচে হবে।'

ু!' মা একটা মর্মভেদী গলায় সম্বোধন করে সহসা ঘর থেকে গেলেন। আমি যেন হঠাৎ একটা খেয়ে জেগে উঠলাম। এত বছরের জীবন সম্বন্ধে যে আমার মনে কেন রণ প্রশ্ন ধাক্কা দিচ্ছে, তা কি জানি? আট বছর বয়স থেকে প্রতিদিন প্রতি পলে আমার মনের স্নে লালিত হয়েছে, এতদিনে তার স্পষ্ট উপস্থিতিতে আমার সারা রে গেলো।

কলবেলা ভদ্রলোক যখন এলেন জ্জায় সংকোচে এতটুকু হ'য়ে গিয়ে রে লুকোলাম। ছ' বছর বয়স ই ষোল বছর বয়স পর্যন্ত আমি খছি, তাঁর যত্নে তাঁর ভালোবাসায়ই -মন ভ'রে আছে, আর তাঁর সম্বন্ধে মি এত বড়ো কথাটা উচ্চারণ করেছি ুখে বুক ভ'রে গেল। তিনি কি রে? তিনি কি আমাদের দয়া করেন? র্থ কি কখনো সাহায্যের পর্যায়ে আমি জানলা দিয়ে তাঁকে উঠে দেখলাম। সেই দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, উন্নত -ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা— ই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও তারুণ্যের উজ্জ্বল চামড়া। সহসা আমি আমার গুনে গুনে তাঁর সঙ্গে আমার হিসেব করলাম।

রীতি তিনি দিদিমার কাছে গিয়ে । আমি আমার ঘর থেকেই সেটা করলাম, কেন না আমার সমস্ত আমি সেদিকেই নিবিষ্ট করে াম। দিদিমার শরীরের অবস্থা ছিলো না। কিছুদিন থেকে তিনি বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে- এবং আমি লক্ষ্য করেছি সেই ার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের পরিপূর্ণ লো। কাছাকাছি ঘর—আমি তাঁদের খোনে কান দিলাম। দিদিমা বললেন,

'যদি তুমি ভালো মনে করো তা হ'লেই ভালো—আমি কী বুঝি!'

'তাহ'লে একদিন নিয়ে আসি ছেলেটিকে!'

'আনো। ওর মায়ের সঙ্গে কথা ব'লে দ্যাখো।'

'বুলুকেও জিজ্ঞেস করতে হয়।'

'বুলু!'—দিদিমা বোধ হয় একটু হাসলেন, 'ও আবার কী বোঝে?'

'না না, ওকে আপনি অবহেলা করবেন না। ওর মতো বুদ্ধিমান মেয়ে বিরল।'

'তোমরা দ্যাখো ওর বুদ্ধি। ওর মা-ই আমার কাছে শিশু, আর ও তো তার মেয়ে।' আর অল্প দু' একটা টুকরো কথা কানে ভেসে এলো, তারপরে তিনি উঠে এলেন মার কাছে।

মা-র ঘরসংলগ্ন ছোট্ট একফালি বারান্দা ছিলো। সেই বারান্দায় এসে জুতোর শব্দ থামলো—বুঝলাম, মা ব'সে আছেন সেখানে। অত্যন্ত মৃদুস্বরে ভদ্রলোক কী বললেন আমি বুঝতে পারলাম না, অত্যন্ত ক্লিষ্ট গলায় মা জবাব দিলেন, 'কিছু না।'

আমি অত্যন্ত নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দার পাশের ঘরে এসে বসলাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'বুলুর বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।'

'আমি কী বলবো, তুমি যা ভালো বোঝো তাই-ই হবে।'

মা-র তুমি সম্বোধনে আমি আঁৎকে উঠলাম। যে সন্দেহ আমাকে প্রতিদিন ক্ষয় করছিলো, মা-র সংযত আচরণ প্রতিমুহূর্তে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে এমন একটি প্রমাণও পাইনি যা থেকে সেই সন্দেহকে আমি রূপ দিতে পারি। সমস্ত শরীরে একটা বৈদ্যুতিক অনুরণন অনুভব করলাম।

'তোমার মেয়ে—'

অত্যন্ত উদাস গলায় মা বললেন, 'মেয়েই আমার—আর সবই তো তুমি করেছো—'

'তাহ'লে তোমার মত আছে কিনা, বলো।'

'আছে।'

'তোমার আজ কী হয়েছে?'

'তোমাকে একটা কথা বলবো।' মা-র গলা অত্যন্ত দৃঢ়।

'বলো।'

'এগারো বছর ধ'রে তুমি যত ঋণ দিয়েছো সব আজ আমি শোধ করে দেবো।'

'ঋণ! মণি, ঋণ? আমি তোমাকে ঋণ দিয়েছি, আর সেই ঋণ তুমি আজ শুধে দেবে?' ভদ্রলোকের গলা ধরে এলো। মা বললেন, 'কেন এত করেছ তা তো আমি জানি—প্রতি মুহূর্তে যে আবেদন তোমার চোখ দিয়ে তুমি আমাকে জানিয়েছো—সে আবেদন আমি হৃদয়ের মধ্যে অনেক আগেই গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।'

'সামাজিক অনুষ্ঠান? যা আমার প্রত্যহের স্বপ্ন—সমস্ত জীবনের বিনিময়ে একমাত্র যা আমার কাম্য—তুমি কি সত্যি সেই কথা বলতে চাইছো?'

'হ্যাঁ, আমি মনস্থির করেছি—তোমার আমার মুক্ত জীবনকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোনো যুক্তি নেই, সেটাই পাপ।'

'মণি, এ কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, এতদিন ঈশ্বর সাক্ষী ছিলেন, এখন মানুষকে সাক্ষী করে নিশ্চিত হতে চাই—'

আমি ঘরের মধ্যে সহসা দুই কানে হাত চেপে ধরলাম, তারপর একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। দিদিমার মুমূর্ষু দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি কঁকিয়ে উঠলেন। 'কী, কী, কী হয়েছে?' দুর্বল হাতে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমি কান্নার বেগে অনেকক্ষণ বলতে পারলাম না। একটু শান্ত

হয়ে বললাম, 'আমি বিয়ে করবো না, দিদিমা, বিয়ে ভেঙে দাও।' 'সে কী কথা—আশ্চর্য হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি নির্লজ্জের মতো বললাম, 'যাকে মন দিয়েছি—তাকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।'

আমার কথা শুনে দিদিমা হতবাক্ হ'লেন। আমাকে ঠেলে নিজের গায়ের উপর থেকে তুলতে চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বলছিস কী তুই? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।' আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমি বিমলেন্দুকে বিয়ে করবো।'

'বিমলেন্দু—? বিমল? তোর সাহেব-কাকা?' দিদিমা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন—আমি তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলাম, হ্যাঁ, তাঁকেই। তিনিই আমার স্বামী।'

দিদিমার মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। স্তব্ধ হ'য়ে মরা মানুষের মতো ব'সে রইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভ'রে গেলো ঘর। খানিক পরে নিঃশব্দ পায়ে মা ঘরে এসে আলো জ্বাললেন—আমাকে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকতে দেখে অবাক হ'য়ে বললেন, 'এ কী বুলু! কী হয়েছে?'

আমি জবাব দিলাম না। দিদিমা বললেন, 'মলিনা, শোনো।' মা কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বিমলের সঙ্গেই বুলুর বিয়ে ঠিক কর। বয়সে একটু বড়ো, তা আর কী! আমার শাশুড়ি আর শ্বশুরেও কুড়ি বছরের ছোটো-বড়ো ছিলেন।'

'এ কী বলছো, মা?'

'ঠিকই বলছি, এর চাইতে ভালো আর তুই কী আশা করিস?'

'ছি ছি,' মা শিহরিত হ'য়ে উঠলেন, 'ও ও'র কন্যার মতো—এমন অসংগত কথা তুমি ভাবলে কেমন ক'রে, মা?'

'কিছুই অসংগত নয় সংসারে। তুই তাকে বলবি এ-কথা।' মা-র মুখে একটি কালো ছায়া বিস্তীর্ণ হ'লো। আমার মাথায় ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বললেন, 'দিদিমা কী বলছেন শুনলে, বুলু?'

আমি নিঃশব্দে প'ড়ে রইলাম। মা আবার বললেন, 'দিদিমা কী বলছেন—বুলু—'

আমি নিঃশব্দ।

'হুঁ—' মা-র মুখ দিয়ে এ-শব্দটি এমন-একটি মূর্তি নিলো আমার কাছে যে, আমার মনে হ'লো সমস্ত ঘরে যেন আগুন লেগেছে, পুড়ে এক্ষুনি ছাই হ'য়ে যাবে।

অত্যন্ত একটা অশান্তি আর অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো সময়। বাড়িময় যেন একটা ভূতের ফিশফিশানি, কেমন-এক অদৃশ্য ভয়ে মুহুর্মুহু আমি কেঁপে উঠতে লাগলাম। রাত্রিতে মা-র সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে সময় কাটতে লাগলো—আমি অনুভব করলাম তিনি ঘুমোননি—তিনিও হয়তো অনুভব করলেন যে, আমার চোখ নির্ঘুম। অনেক রাত্রে আমার গায়ের উপর হাত রেখে মা ডাকলেন, 'বুলু, ঘুমিয়েছো?'

'না।'

'তোমার দিদিমা যা বললেন, তা-ই কি তোমার মত?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি জানো এতদিন ধ'রে এ-সংসারকে তিনি লালন-পালন করেছেন কার জন্য।'

'জানি।'

'কী জানো?'

'তোমার জন্য।'

'তাহ'লে তুমি জানো যে আমি তাঁর জীবনের প্রধান কেন্দ্র? আমাকে ঘিরেই তাঁর সুখদুঃখ।'

'জানি।'

'তবে?'

'আমি তাঁকে ভালোবাসি। তিনি তোমাকে যত ভালোবাসেন তার চাইতে অনেক, অনেক বেশী আমি তাঁকে ভালোবাসি।'

অত্যন্ত ধীর গলায় মা বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস করো না যে তাঁর অতখানি ভালোবাসা আমিও অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি? আর তা সার্থক করবার একমাত্র বাধা ছিলে তুমি? তোমার জন্যই আমি আমার সমস্ত ইচ্ছাকে এতকাল গলা টিপে রেখেছি।'

'বাবার মত আত্মাকে তুমি অসম্মান করেছো।'

'আমি ম'রে গেলে কি তোমার বাবা আমার আত্মার কথা ভাবতেন?'

'তুমি স্ত্রী, তিনি স্বামী।'

'সে তো সমাজের অনুশাসনের প্রভেদ' আত্মার তো কোনো ভেদাভেদ নেই।'

হঠাৎ আমি ভেবে পেলাম না এ-কথার কী জবাব দেবো। একটু পরে মা-ই বললেন, 'তুমি আমার সন্তান। শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে তিলে-তিলে আমি তোমাকে লালন করেছি, প্রাণের অধিক ভালোবেসে, সাধ্যের অতিরিক্ত যত্ন দিয়ে তোমাকে বড়ো হ'তে সহায়তা ক'রেছি, সত্যি বলতে, এ-ভদ্রলোকের সাহায্য তোমার কথা ভেবেই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আজকের দিনে তুমিই আমার পরম শত্রু। আজ এই অন্ধকারে শুয়ে তোমার সঙ্গে যে-কথা আমাকে বলতে হ'লো সেটা মা-মেয়ের কথা নয়, আমার পক্ষে তার চাইতে লজ্জার, তার চাইতে মর্মান্তিক আর কী থাকতে পারে? কিন্তু তবু তোমাকে বলি, অনেক দিন আগেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, আমি রাজি হইনি কিন্তু কাল আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলুম—'

'মা!'

'বুলু!'

'মা—' কান্নার বেগে আমার সমস্ত শরীর উদ্বেলিত হ'তে লাগলো। একটু পরে মা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন —একটা নিশ্বাস নিতে-নিতে বললেন, 'অদৃষ্টের এ কী বিড়ম্বনা!'

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙেও বিছানায় প'ড়ে ছিলুম। মা কখন উঠে গেছেন জানি না। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছিলো বিছানায়, বুঝলাম বেলা হয়েছে। সহসা ঐ ভদ্রলোকের গলা শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে গেলাম। দ্রুত পায়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন, আমাকে তখনো বিছানায় দেখে অবাক হ'য়ে বললেন, 'ও মা, এখনো ঘুমুচ্ছো? ওঠো, ওঠো, মা কই? শিগগির একবার বসবার ঘরে এসো।'

চোখ তুলতে পারলাম না সংকোচে। ততক্ষণে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে অদৃশ্য হলেন। দেয়ালে ঠেকানো তক্তপোশে হেলান দিয়ে ব'সে রইলাম চুপ করে। হাত-পা যেন কেমন শিথিল হ'য়ে এলো।

খানিক পরে মা এলেন ঘরে। সেই কালো-পাড় শাড়ি, মাথার আঁচল ঈষৎ তোলা —সরু হার গলায় চিকচিক করছে—সেই রকম শান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী। এতদিনের দেখা মাকে আবার দেখলুম। মাথার কাছে আধো-ভেজানো জানলা খুলে দিয়ে বললেন 'ওঠো, কত বেলা হ'লো।' একটু থেকে— 'কাল বিমলবাবু বলেছিলেন একটি ছেলেকে নিয়ে আসবেন—তিনি এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হ'লো। উঠেছিলুম, থেমে দাঁড়িয়ে বললাম, 'জানি কেন।'

ক্ষিপ্রহস্তে বিশৃঙ্খল বিছানা পাট করতে করতে মা জবাব দিলেন, 'সেই কেন আজ আর নেই—তোমার ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টাই আমি করবো। কিন্তু বাড়িতে যখন অতিথি আসেন তাঁর সঙ্গে শোভন ব্যবহার ভদ্রতা।'

আমি মেনে নিলাম। একটু পরে মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে যথারীতি ভদ্র হ'য়ে এ-ঘরে এলাম।

আমার বয়স এবং বুদ্ধির যোগ্য এ-পাত্র। বিমলবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন—অত্যন্ত লাজুক চোখে একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিলো ছেলেটি।

বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়। ঈষৎ ঢেউ-খেলানো বড়ো-বড়ো ঘন আর বিশৃঙ্খল চুল মুখ ঘিরে আছে। ভালো ক'রে তাকে দেখবার অবকাশ ঘটলো—কেননা সে নিজে নতদৃষ্টি—আর বিমলেন্দুবাবু মাকে ডাকতে গেলেন। খুব যে একটা বলবান পুরুষ তা নয়—কিন্তু স্বাস্থ্যের আভাভরা মুখ। কালো আর সন্নিবিষ্ট ভুরুর তলায় দুটি ভাসা-ভাসা চোখ। একটু কেশে একটু লাল হ'য়ে ছেলেটি মুখ তুললো এবার—নড়ে চ'ড়ে ব'সে বললো, 'আপনি তো স্কটিশেই পড়েছেন, আমিও ওই কলেজে পড়তুম।'

'ও।'

'খুব ভালো লাগতো, আমাদের একটা আলাদা দলই ছিলো—'

'আমার ভালো লাগে না—' উৎসাহের মুখে পাথর চাপা দিয়ে ব'লে উঠলুম আমি। আমার নিষ্করুণ জবাবে হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলো ছেলেটি। আমি বললুম, 'ভারি খারাপ ছেলে সব। এ-দেশে নাকি এখনো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে শিক্ষার সময় হয়ছে—আমার তো মনে হয় না।' ঈষৎ প্রতিবাদের গলায় (যদিও খুব স্তিমিত) বললো, 'তা দেখুন—সব মেয়েও তো কিছু

া হয় না—ছেলেদের মতো তাঁদের ও ব্যতিক্রম আছে।'

জানি না।'

আমার কথাবার্তা যে অত্যন্ত উদ্ধত ও ছিলো সে-বিষয়ে আমি অচেতন ম না। বিরক্তির বাষ্পে ওকে আচ্ছন্ন দিতে আমার ভালো লাগছিলো। ও যে ছে আর সে-আসা ওর পক্ষে অত্যন্ত াহসের কাজ হয়েছে সে-কথা ওকে নো ভালো। আমার জবাবের পর একটু- থেমে রইলো ওর জিহ্বা. আমি উঠে র জন্যে মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, া মুখ তুলে বললো, 'আজ কখন ন?'

'যাবো! কোথায়?'

'কেন, বিমল-দা যে বললেন—'

'কী বলেছেন বিমলবাবু?'

'আমাকে তো ধ'রে নিয়ে এলেন—'

ওর কথার মাঝখানেই মা আর বিমল- ঘরে ঢুকলেন। ও থেমে গিয়ে তাড়া- চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মৃদুহাস্যে ললেন, 'উঠছো কেন? বোসো। বুলু, ো. চা নিয়ে এসো। আমি সব ঠিক রেখে এসেছি।'

র এই আদেশ আমি মনে-মনে অপছন্দ ম। চাকর দিয়েও অনায়াসে এটা া। তবু উঠতে হলো।

ায়ের পর্বটি কিছু বিরাট ছিলো না. অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশী। হাতে ক'রেই সব নিয়ে এলাম। বাবু সাহায্য করলেন। আমাকেও হ'লো ওদের সঙ্গে চা খেতে। এত- দেখলুম ছেলটি সহজ হয়েছে. অত্যন্ত ভরে কথা বলছে মা-র সঙ্গে। অবশেষে অর্ধসমাপ্ত প্রসঙ্গ ফিরে এলো।

কখন যাবেন, বিমল-দা?'

আমি একচোখ প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম বাবুর দিকে। মা-র মুখ দেখে মনে এই যাওয়ার খবরটা মা জানেন।

বমলবাবু হাতঘড়ির দিকে এক নজর য়ে বললেন. 'বাবা! এর মধ্যেই সাড়ে ! এক কাজ করো. অসিত. তুমি আর য়েয়ো না. এখানেই যা-হয় দুটো খেয়ে আমি এদিকে বারোটার মধ্যে কজকর্ম চ'লে আসি. তারপরে—'

। ব'লে উঠলেন, 'সেটাই সবচেয়ে ।'

া. না.' অপাঙ্গে একবার আমাকে দেখে অসিত ব্যস্ত হ'য়ে বললো. 'আপনারা যাবেন বলুন. আমি ঠিক সেই সময়ে া।'

কাথায় যাবে, মা?' আমি আর কৌতূ- াখতে পারলাম না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ন. 'তোমার সাহেব-কাকা আজ নকেল গার্ডেনে যাচ্ছেন তোমাদের ' মুখ থেকে কথা শেষ না-হ'তেই াবু ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, 'তুমি বাদ?'

াহেব-কাকা ব'লেই মা আমার মেজাজ ক'রে দিয়েছিলেন। কালকের ঐ ব্যাপারের পরেও মা যে কী ক'রে তাঁকে আমার কাকা ব'লে উচ্চারণ করলেন—জানি না—উপরন্তু মা যাবেন না ব'লে বিমলবাবুর এই ব্যাকুলতা আমাকে চাবুক মারলো। দুর্বিনীতের মত উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে—আলস্য ভাঙতে ভাঙতে অবহেলার ভঙ্গীতে বললাম. তোমরাই যাও, মা— আমি যাবো না।'

'কেন?' বিমলবাবু বললেন, 'তোমার জন্যেই তো যাওয়া—তুমি না-গেলে কি হয়?'

'আমার জন্যে কিনা জানি না—তবে হ'লেও আমি যাবো না. এটা ঠিক।'

'তোমার আবার কী হ'লো?'

'এর মধ্যে একটা হওয়া-না-হওয়ার কী দেখছেন. বিমলবাবু?' আমার বিমলবাবু সম্বোধনে উনি অবাক হ'য়ে গেলেন— মা-র মুখ, রাগে কি লজ্জায় জানি না. মুহূর্তে লাল হয়ে উঠলো। আমি গ্রাহ্য না ক'রে অতিরিক্ত সহজভাবে তাকালাম সেই আগন্তুক আর অপ্রস্তুত ছেলেটির মুখে—সহাস্যে বললাম. 'আচ্ছা নমস্কার. আশা করি আবার দেখা হবে।' প্রত্যাভিবাদনের আর অপেক্ষা না ক'র তিনটি প্রাণীকে বিমূঢ় করে দিয়ে আবার সোজা চলে এলাম নিজের নির্জন ঘরে।

তারপরে সমস্ত ব্যাপারটাকে মা অবশ্যই কোনো রকমে তাঁর নিজের ভদ্রতা আর নম্রতা দিয়ে মানিয়ে নিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমার যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, মা তখন ঘরে এলেন। সোজা তিনি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'সমস্ত জীবনটা যে আমি তোমার জন্যই উৎসর্গ ক'রে রেখেছিলাম, তুমি কি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছো, বুলু?'

ভীরু চোখ চকিতে তুললাম। জবাব দিলাম না।

'বলো, জবাব দাও—আমার চোখের সামনে আমার হাতে গড়া সন্তান এত বড়ো উদ্ধত আচরণ করবে, অহেতুক অসম্মান করবে শ্রদ্ধেয়দের, আর আমি চুপ ক'রে তা দেখবো? বল, তুমি ভেবেছো কী?'

কথা বলতে-বলতে মা-র নিশ্বাসের উত্থান-পতন দ্রুত হ'লো। ছেলেবেলা থেকে মা আমাকে স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে, বন্ধুতার উত্তাপ দিয়ে বড়ো করেছেন— শাসন করেছেন তার ফাঁকে-ফাঁকে—আমি জানতে পারি নি. তাঁর সঙ্গ, তার স্পর্শ, তাঁর স্বভাবের মাধুরী আমার সারা হৃদয়ের সকল অভাব মিটিয়ে রেখেছিলো, আর আজ দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখলাম, তাঁর চাইতে বড়ো শত্রু আমার কেউ না। হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম—তীব্র কণ্ঠে মা ব'লে উঠলেন, 'আমারই অন্যায়, আমারই প্রশ্রয়ে আজ তোমার এতখানি দুঃসাহস। যিনি তোমার পিতৃতুল্য তাঁকে তুমি ভালোবাসো— যে-মুহূর্তে তুমি এ-কথা উচ্চারণ করেছিলে সে-মুহূর্তেই—'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো — মুখে-মুখে ব'লে উঠলাম, 'কেন, কিসের জন্য? কেন তুমি তাঁকে আমার কাকা ব'লে সম্বোধন করলে একটু আগে?'

'তুমি তাঁকে যা-ই ভাবো তিনি তোমার পক্ষে তাছাড়া অন্য-কিছু হ'তে পারেন না।' অসভ্যের মতো বললাম, 'স্বামীর বন্ধু হ'য়ে তিনি তোমার পক্ষে অন্য হ'তে পারলে আমার পক্ষেও হ'তে পারেন।'

'বুলু, আমি তোমার মা!' সহসা মা-র গলা কান্নার আবেগে বুজে এলো। আমি নিবৃত্ত হতে পারলাম না—অনেক দিনের অনেক ক্লেদাক্ত ঈর্ষা মনের মধ্যে লালন করেছি এতদিন ধ'রে আজ তা কথার রেখায় মূর্তি নিলো। যাঁকে বুকের মধ্যে পাবার জন্য অবিরত ইচ্ছার তীব্র আবেগে আমি মরে যাচ্ছি. যাঁকে না-পেলে সমস্ত জীবন আমার গভীর অন্ধকারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে,—তাঁকে যে-মেয়ে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, যে-মেয়ের জন্য তিনি আজ অন্যদিকে মুখ ফেরাতে পারেন না, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, মা হ'লেও না। চোখে-চোখে তাকিয়ে বললাম—'তিনিও অবিবাহিত, আমিও কারো স্ত্রী নই—তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য আমার সমস্ত জীবন আজ ব্যর্থ হ'তে বসেছে—তুমিই আমাদের জীবনকে মুক্ত করবার একমাত্র প্রতিবন্ধক।'

'কী হয়েছে?' — ঘরের মধ্যে সহসা বিমলবাবু ঢুকলেন এসে। 'বলুর আজ হ'লো কী? মেজাজ এত বিগড়েছে কেন?'

আমার কথা শুনে মা-র চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়লো, আর তাঁকে দেখে আমি চুপ করলাম।

'হ'লো কী তোমাদের?' আশ্চর্য হ'য়ে তিনি একবার মা-র দিকে, একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর আমার একান্ত কাছে এসে তাঁর সেই বলিষ্ঠ স্নেহভরা বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে বলো তো, বুলু। লক্ষ্মী মা আমার।'

ছিটকে সরে এলাম বুকের সান্নিধ্য থেকে। ক্রন্দন-বিজড়িত গলায় বললাম, 'আপনি আমাকে মা বলেন কেন?'

অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে থমকে গেলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ আমি দু' হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর বুকের উপর; দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে কেঁদে মুখ ঘষে- ঘষে বলতে লাগলাম, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি—মা-র চাইতে বেশী, অনেক, অনেক বেশী।'

আমার এই অতর্কিত আবেগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—আমার এ-রকম অসংলগ্ন কথাবার্তাও অবশ্যই তাঁকে বিরক্ত ও বিস্মিত ক'রে থাকবে—আমাকে ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'শান্ত হও, কী হয়েছে খুলে বলো।' তাঁর গলার গম্ভীর স্বরে হঠাৎ আমি ভয় পেলুম।

তাঁর স্বভাবত ধীর কণ্ঠ আরো ধীর হ'লো. পিতৃত্বের গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মুখে, মার দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তুমি যাও, অসিতকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

মা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন — ভাবে মনে হ'লো না কোনো কথাই তাঁর কানে ঢুকেছে। বিমলবাবু মুখের দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বিগ্ন হলেন। আবার বললেন, 'আমি বুলুর সঙ্গে কথা বলবো—তুমি অসিতের কাছে গিয়ে বোসো।'

মা আস্তে ব'সে পড়লেন মেঝের উপর।

'কী হোলো, মণি, কী হোলো', উদ্‌ভ্রান্ত গলায় ব'লে উঠলেন বিমলবাবু, 'বুলু, শিগগির জল নিয়ে এসো।'

চেঁচামেচিতে বাড়ির সবকটি প্রাণীই জড়ো হ'লো সেই ঘরে—দেখলুম, অসিতও এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়। কেবল অসহায় দিদিমা ও-র ঘর থেকে কাৎরাতে লাগলেন। ব্যাকুল হ'য়ে বিমলবাবু বললেন, 'এই অসিত, তুমি শিগগির ডক্টর মুখার্জিকে নিয়ে এসো —একটু দেরি না—' তারপর মা-র মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মণি, মণি—শোনো, এই শুনছো?' তাঁর গলার সুরে কী ছিলো সে-কথা আমি কেমন ক'রে বোঝাবো? হয়তো ভালোবাসার অতলস্পর্শী সম্মোহন ছিলো তাঁর কণ্ঠে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে চেয়ে।

বিশেষ-কিছু না — একটুখানি সময়ের জন্য হয়তো মা-র চৈতন্য লুপ্ত হয়েছিলো, খানিক পরেই তিনি চোখ খুললেন। ডান হাতটি একটু নেড়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'বুলু, আয়।'

মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে মা-র কপালে হাত রাখলাম—তাঁর সুন্দর মুখে দুঃখ-বেদনার লীলা। একটু আগে যে-মা আমার পরম শত্রু ছিলো, যাঁর অস্তিত্বই ছিলো আমার জীবনের চরম সুখের পক্ষে সর্বপ্রধান অন্তরায়, সেই মা-র এইটুকু অচৈতন্যের ব্যবধানই আমাকে তাঁর অনেক কাছে এনে ফেললো। মা আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুগভীর লজ্জায় দু' হাত ঢেকে নিতান্ত অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন।

অসিত ফিরে এলো ডাক্তার নিয়ে। তার মুখেও উদ্বেগের ছায়া। ফিশফিশিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছিলো?' আমি বললাম, 'এই একটু অজ্ঞান মতো—'

'এ-রকম আরো হয় নাকি?'

'না।'

আমার সংক্ষিপ্ত জবাবে আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে সে ভরসা পেলো না, বোধহয় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মা স্বাভাবিক হ'য়ে উঠলেন। বিমলবাবু নিজেও গেলেন না—অসিতকেও ধরে রাখলেন সে-বেলার জন্য। আবহাওয়াটা সহজ করবার জন্য হাসিমুখে বললেন, 'আমার এত সাধের রবিবারটাই মাটি করলে তোমরা। কোথায় ভেবেছিলাম বোটানিকেল গিয়ে গাছের ছায়ায়-ছায়ায় চমৎকার ঘুরে বেড়াবো—চারটা না বাজতেই মাঠে ব'সে চর্বচোষ্যসহযোগে চা পান—কী কাণ্ডই হ'লো বলো তো? কী আর করবে, অসিত, তোমরই ভাগ্য। বুলু, অসিতকে ভালো ক'রে বলো—ও কিছুতেই থাকতে চাইছে না। আমিই জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলাম—'

'আমি যাই, বিমল-দা, আমার আজ—'

মা বললেন, 'বোসো' তাঁর উচ্চারণের ভঙ্গিতে অপরিমিত স্নেহ ও আদেশ ছিলো। তিনি যেন মা আর অসিত তাঁর ছেলে। অসিত বাধ্য ছেলের মতো বসলে, আর কথা বললো না। আমি উঠে গেলাম সেখান থেকে। বিমলবাবু গুরুজনের মতো বললেন, 'যাও, মা-র খাবার ঠিক করো গে।'

এ-বেলা বিমলবাবু মা-কে উঠতে দিলেন না। কিন্তু বিকেলে আবার তিনি ওঠা-হাঁটা করতে লাগলেন, কাজকর্ম করলেন, আর সুস্থ মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার সেই লজ্জা আর বিরোধ ফিরে এলো আমার হৃদয়ের মধ্যে। দু'দিন আমি প্রায় নিজেকে লুকিয়েই রাখলাম তাঁর কাছ থেকে। বিমলবাবু যথারীতি এলেন, অসিতও পরের দিন খবর নিতে এলো—আমার সঙ্গে দেখা হ'লো না কারুরই। আত্মগোপন করা ছাড়া আর আমার কী উপায় ছিলো?

মুশকিল হ'তো রাত্তিরে। নিঃশব্দে মা-র পাশে গিয়ে শুতুম, কিন্তু গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়েও যে কত বড় ব্যবধান থাকতে পারে দু'জন প্রাণীর মধ্যে আমরা মা-মেয়ে তা প্রতি পলে অনুভব করতুম। বলি-বলি ক'রে মা-ও কথা বলতে পারতেন না, আমিও পারতাম না, দুর্লঙ্ঘ এক দেয়াল উঠলো দু'জনের মধ্যে।

তৃতীয় দিন ভোর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো—জেগে উঠলুম, গুনগুনিয়ে মা কাঁদছেন। মা কাঁদছেন। আমি তো তাঁকে কাঁদতে দেখিনি কোনোদিন। বুকটা ধড়াশ করে উঠলো—অন্ধকারে হাত বাড়ালাম তাঁর দিকে—ডাকলাম, 'মা!' মুহূর্তে মা-র গুনগুনানি বন্ধ হ'য়ে গেলো—একটা কাতরোক্তি ক'রে তিনি পাশ ফিরলেন। উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'একটু জল দাও।'

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। তীব্র উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বালালাম, জল দিলাম—তারপর দৌড়ে গিয়ে ভৃত্যের ঘুম ভাঙিয়ে বিমলবাবুকে ডাকতে পাঠালাম। হয়তো তখনো ট্রাম চলতে শুরু করে নি, হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তবু সেই অন্ধকারেই আমি তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে মা-র কাছে ফিরে এসে বসলাম, একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার ভারে বুক যেন বোঝাই হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে। সূর্য ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিমলবাবুকে নিয়ে ভৃত্য ফিরে এলো। লাল-দুই চোখ মেলে মা তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

কপালের উপর হাত রেখে উনি ভুরু কুঁচকোলেন। দু'বার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'তুমি কাছে থাকো, বুলু, ডাক্তার নিয়ে আসি।'

ডাক্তার এসেছিলো। তার চাইতে বড়ো ডাক্তারও এসেছিলো দু'দিন পরে—আর তারও পাঁচ দিন পরে কলকাতা শহরের সমস্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের দিকে মুখ ফিরিয়ে মা সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত হলেন। মরোন্মুখ দিদিমার বুক-ফাটা আর্তনাদে সমস্ত পৃথিবী ভ'রে গেলো। শুষ্ক চোখে ব'সে-ব'সে দেখলুম, বিমলবাবু নিজ হাতে সাজিয়ে দিচ্ছেন মা-কে। [illegible] বেনারসিতে শোভিত করলেন [illegible] মৃতদেহ, ফুলের গহনা দিয়ে মুড়ে দিলেন আপাদমস্তক—তারপর রাশি-রাশি সিঁদুরে শোভিত করলেন তাঁর ললাট আর মাথা। তাঁর এই পাগলামি দেখে কে কী ভেবেছিলো জানি না—আমি নিজেও যে কী ভেবেছিলাম তাও জানি না—বুকের মধ্যে একটা চাপা আর দম-আটকানো গুমরানি অনুভব করলাম অত্যন্ত তীব্রভাবে—আস্তে এগিয়ে গিয়ে মা-র নরম বুকের উপর মাথা রাখলাম, ধীরে-ধীরে আমার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

তবু দিন কাটলো। একটা দণ্ড যার অস্তিত্ব না-থাকলে এই ছোটো সংসার আবর্তিত হ'য়ে উঠতো—সেই মানুষের অভাবেও এ-বাড়ির সূর্যোদয় সূর্যাস্ত তাদের আলো-ছায়া ফেললো—কয়েক দিন পরে বিমলবাবুও আবার আপিসে যেতে লাগলেন—আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে মোড়া দিদিমাও মুখের ঢাকা খুললেন — আমি আবার প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়ালাম, সকল কর্তব্যই সকলে নড়ে-চ'ড়ে করতে

ম, কেবল প্রাণশক্তি চাবিকাঠিটি মা আর ফিরে এলেন না এই সংসারে। -র অসুখ থেকে শুরু করে আমাদের বর্ণনীয় দিনের দুঃসময় জীবনের অসিতও এ-ক'দিন জড়িত ছিলো। য় বিমলবাবু অত্যন্ত বেশি রকম ন্তই হয়ে পড়েছিলেন। বলতে গেলে ড়র সব ক'টি প্রাণীই আমরা এমন অবস্থায় ছিলাম যে অসিত না হয়তো কিছুতেই চলতো না। র আশীর্বাদের মতোই সকলের ভার নিয়ে সে মুখ গুঁজে পড়েছিলো । কিন্তু বিদায় নেবার সময় হলো

াস দুয়েক পরে কোনো একদিন চুপ শুয়েছিলাম ঘরে। সন্ধ্যার আবছা য় ঘর ভরে গিয়েছিলো। দরজার পায়ের শব্দ শুনে চঞ্চল হয়ে ন। বুঝলাম বিমলবাবু এসেছেন। গলায় উনি আমার নাম ধরে ডাকতেই তাঁকে আসতে বলে উঠে বসলাম। জেলে দিলাম ঘরের। চায়ের ড়ে যাচ্ছিলাম, উনি বললেন, 'এখনো ছিলে?'

এমনি।'

এ-বাড়ি আর ভালো লাগে না না?' গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল করে । আমি মুখ নিচু করলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, । আমি এখন চা খাবো না। তোমার কথা আছে।'

সে কী কথা তা আমি বুঝলাম। থেকেই উনি যেন কী বলতে চান কে। বারংবার বলবার জন্য মুখ ও থেমে যান। কিন্তু অসুখী বোধ ও প্রস্তুত হয়ে বললাম, 'বলুন।'

একটুও ভূমিকা করলেন না তিনি। ও সেদিন প্রস্তুত ছিলেন হয়তো। গম্ভীর গলায় স্বভাবোচিত নিচু স্বরে ন, 'অসিতকে কী বলবো?'

আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

তোমার মত না নিয়ে তো হতে না।'

তাঁর চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ম, 'কী হতে পারে না?'

একটু পলক নড়লো না তাঁর, কেবল একটা কঠিনতা ছড়িয়ে পড়লো সারা —বললেন, 'বিয়ে।'

বিয়ে!'

হ্যাঁ, বুলু—তোমার বিয়ের কথাই আমি। তোমার কোনো ব্যবস্থা করতে রা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি শান্তি চাই।'

কথা শুনে আহত হলাম। নিজেকে রেখে যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় ম, 'আপনাকে তো সবই বলেছি। সবই জানেন।'

জানি।'

'তবে?'

'সে তোমার ভুল বুলু, সে তোমার শিশু-মনের একটা খেলা।'

'জানি না খেলা কিনা—আমাকে অবকাশ দিন ভুল ভাঙবার।'

'শোনো—' তাঁর গলার স্বরে অদ্ভুত কান্নার শব্দ পেলাম। চকিত হয়ে চোখ তুলতেই তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, 'তুমি তো জানো তোমার মা ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার কাছে এমন কোনো মেয়ে ছিলো না, যার প্রতি ক্ষণিকের জন্যও আমার মন বিভ্রান্ত হতে পারে। ও যে আমার কী ছিলো— ও যে আমাকে কতখানি ভরে দিয়েছিলো শুধু ওর অস্তিত্ব দিয়ে, তা আমি তোমাকে কেমন করে বোঝাবো। তোমাকে এইটুকু থেকে ভালোবেসে বড়ো করেছি, আমার স্নেহে এতটুকু খাদ ছিলো না—তোমার প্রতি আমার অপরিসীম আকর্ষণ—অপরিসীম মমতা—সুমন্ত্র বেঁচে থাকলে আমার চাইতে বেশি ভালোবাসতে পারতো কিনা জানি না —সেই তুমি—'

আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে বললাম, 'জানি, জানি—'

'শান্ত হও, শোনো—তোমার মৃত মায়ের আত্মার কথা চিন্তা করো—'

কান্নাভরা গলায় বললাম, 'তিনি তো আপনাকে লিখে গেছেন, আমার সুখই তাঁর সুখ—তাঁর কোনো আলাদা সুখ নেই।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি, ব্যথিত গলায় বললেন, 'এই তোমার শেষ কথা?' 'এই শেষ—বিমলবাবু, এই শেষ।' আমি নিচু হয়ে তাঁর পায়ে মাথা রাখলাম। একটু বসে রইলেন চুপ করে—একটু হাত বুলোলেন মাথায়—তারপর নিঃশব্দে উঠে গেলেন সেখান থেকে। আমি সেই পরিত্যক্ত জায়গায় মাথা কুটে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম।

অসিত এলো ঘণ্টাখানেক পরে। ভৃত্য এসে খবর দিতেই সংযত হয়ে উঠে বসলাম। আমার মুখ-চোখ দেখে ও যেনো আঘাত পেলো। একটু তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। চোখের এ-দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়। বুকটা কেঁপে উঠলো। বললাম, 'বসুন।'

'আপনি আজ বড্ড বিচলিত রয়েছেন।'

'না।'

'কিন্তু কী করবেন—'

চুপ করে রইলাম। একটু দ্বিধা করে বললো, 'আমার তো চলে যাবার সময় হলো—ছুটির দুটো মাস কাটিয়ে দিলাম—'

'আপনি যাবেন?'

'হ্যাঁ, মা বার-বার চিঠি লিখছেন—'

'ও।'

'আমার তো যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু—'

'না, যাবেন না কেন—মা আশা করে আছেন।'

অসিত আমার কাছে থেকে যাবার উৎসাহ প্রার্থনা করে নি—কী প্রার্থনা করেছিলো তা আমি জানি। ব্যথিত হলাম, কিন্তু উপায় নেই।

একটু চুপচাপ কাটলো। তারপর মৃদু স্বরে বললো, 'আমাকে কি আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই?'

নিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'আপনার জন্য আমার কত কৃতজ্ঞতা জমা হ'য়ে আছে মনের মধ্যে'—

বাধা দিয়ে অস্থির গলায় বললো, 'কৃতজ্ঞতার কথা কেন তুলছেন—আমি তার কথা বলছি না—আপনি কি বোঝেন নি আমার কথা?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম, তারপর পরিষ্কার গলায় বললাম, 'বুঝেছি, কিন্তু সে হ'তে পারে না, অসিতবাবু—কিছুতেই না।'

'কিছুতেই না?'

'না।'

খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো ব'সে রইলো অসিত—তারপর ঠিক বিমলবাবুর মতো ক'রেই ধীরে ধীরে উঠে গেলো ঘর ছেড়ে। আবার আমার দু' চোখ ছাপিয়ে জল এলো—বুক ভেসে গেলো উদ্বেলিত অশ্রুর প্লাবনে।

পরের দিন সকালবেলা কিছু আগে পরে দু'খানা চিঠি পেলাম ভৃত্যের মারফৎ—

'বুলু,

তোমার সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখে গেলাম—আশা করি কোনো আর্থিক কষ্ট তোমাকে পেতে হবে না।

যেখানেই থাকি আমার অন্তরের সকল মঙ্গলাকাঙ্খা সততই তোমাকে ঘিরে থাকবে।

হতভাগ্য বিমলেন্দু।'

'সুচরিতাসু,

প্যাণ্ডোরার অদম্য কৌতূহলের দোষেই সমস্ত পৃথিবীতে দুঃখ ছড়িয়ে পড়েছিলো—কিন্তু আশার কৌটোটি সে খুলতে পারে নি—তাই সে আশা যতই দুরাশা হোক, মানুষ তাকে চিরকাল ধরে লালন করে আপন বুকের মধ্যে—আমিও সেই আশাটি মনের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখলাম— যদি কখনো সময় আসে আপনি নিশ্চয়ই ডাক দেবেন আমাকে।

হতভাগ্য অসিত।'

দু'খানা চিঠি হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। মনের মধ্যে ভ্রমরের একঘেয়ে গুণগুনানির মতো একটি কথাই কেবল গুঞ্জিত হ'তে লাগলো : গেলো—সব গেলো।

রিহার্সাল

প্রাণতোষ ঘটক

উত্তর কলকাতার বৃন্দাবন বসু লেনের লাহিড়ী-পরিবারের যে-কোন একজনকে দেখলেই চেনা যায় সে একই গাছের ফুল। তারতম্য শুধু বয়সের, নয়তো স্বাভাবিক ঐক্য পরস্পরের আকৃতিতে, দেখা মাত্র ধরা যায়। পরিবারের সকলের মধ্যে মৌখিক সাদৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে। লাহিড়ী ছেলেমেয়েদের যাকেই দেখা যাক, লক্ষ্য পড়বে ঐ একই একতা। ফর্সা রঙ, কটা চোখ, জোড়া ভুরু, টিকালো নাক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল।

তেমন পরিকল্পিত পরিবার নয়, তাই ওরা সংখ্যায় কিছু বেশী। আর সেই কারণেই কি না জানি না, জন্মদাতা সুখময় একটু যেন অধিক কর্মব্যস্ত। কাজ করেন কী একটা আধা-সরকারী ব্যবসায়িক সংস্থায়। মাইনে তেমন কিছু নেহাৎ কম নয়, তবুও উপরি-উপার্জনের চেষ্টায় থাকতে হয়। নয়তো সুখময়ের পক্ষে সম্ভব হয় না সকলের মুখে হাসি ফোটানো। স্ত্রী প্রীতিলতা একদা-বিত্তশালী ঘরের সুন্দরী কন্যা, সহজে মন পাওয়া তাঁর যায় না। তদুপরি সুখময়ের মেয়ের সংখ্যা চার, ছেলে মাত্র তিনটি। মাসান্তে যা হাতে আসে তার অধিকাংশই নিঃশেষিত হয়ে যায় মাসের শেষে।

লাহিড়ী-পরিবারের সর্বশেষ সংস্করণকে প্রায় সর্বদাই আপনি দেখতে পাবেন বার-দরজা আগলে বসে আছে। আদুড় গা, পরণে শুধু জাঙিয়া। গলায় রূপার চেনে তামার মাদুলী। মুখ কখনও হর্ষ, কখনও বিমর্ষ বিষণ্ণ।

রাস্তায় ফেরীওলার দেখা পেলেই সে ডাক পাড়বে।

শিশুকণ্ঠের কাকলী শুনে কেউ কেউ এসে দাঁড়ায়। যারা চেনে জানে তারা আর সাড়া দেয় না। কেন না কেউ কেউ ঠকেছে মাঝে মিশেলে। হাতে বেলুন-বাঁশী নিয়ে শিশু সেই যে অন্দরে সিঁদোয় তারপর শত ডাকেও আর তার সাড়া মেলে না। ডেকে ডেকে যখন কারও পাত্তা মেলে না তখন ফেরীওলাকে স্রেফ পথ দেখতে হয়। থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়ে শিশুর নামে তো আর নালিশ লেখানো যায় না।

উদয়াস্ত কাজে ব্যস্ত সুখময়। এবং গৃহে অনুপস্থিত।

ছেলেরা লেখাপড়া করে। দশটা বেজে গেলেই স্কুলে চলে যায়। মেয়েরা একটা বয়স পর্যন্ত স্কুলে যায়। অতঃপর আর তারা পড়ে না। কলেজে ছেলেদের সঙ্গে একত্র পড়বে মেয়েরা—মন থেকে পছন্দ করেন না সুখময়। যতই হোক, ঘি আর আগুন একস্থানে থাকলেই হুতাশনের আশঙ্কা থাকে। তার চেয়ে যোগ্য পাত্র দেখে মানে মানে মেয়েদের বিদেয় করতে পারলেই সকল দায় চুকে যায়। মেয়েদের কে আর কবে ঘরে পুষে রাখে।

মেয়েদের মধ্যে বড় সুচরিতা।

সুখময়ের রূপ-সজাগ ধনী-কন্যা স্ত্রী প্রীতিলতা বাঙলা শব্দ-ভাণ্ডার থেকে 'তা' আকারান্ত শব্দটি বেছে নিয়ে মেয়েদের নামকরণ করতে অভ্যস্ত। যতই হোক, রবি ঠাকুরের দেশের মেয়ে প্রীতিলতা।

মেজ মেয়ের নাম সুস্মিতা। তার সঙ্গেই আমার আকৈশোর অন্তরঙ্গতা। কিছু বা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মাঝে মাঝে আমরা দু'জনে মিলিত হই কোথাও। বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার মিথ্যা অজুহাতে সুস্মিতা অভিভাবিকার কাছ থেকে অলিখিত ছাড়পত্র যোগাড় করে। বলা বাহুল্য, বান্ধবীর বালাই যখন নেই আমরাই মিলিত হই দু'জনে। সিনেমায়, হোটেলে, পার্কের বেঞ্চে, চলন্ত ট্যাক্সিতে পরস্পরের ঘন সান্নিধ্য পাই।

আজ আর বলতে লজ্জা নেই, আমি সত্যিই সুস্মিতাকে ভালোবাসি।

তার রূপ প্রশংসনীয়, গুণাবলীও কম নয়। শিল্পকলায় সে দক্ষ, সংসারের কাজ-কর্মে সুপটু। সবার উপরে সুস্মিতা ধীর স্থির স্বল্পবাক বুদ্ধিমতী। চটুলা চঞ্চলাকে আমি যেন কেমন সহ্য করতে পারি না।

সেদিন শনিবারের বিকেল। পরের দিন রবিবার। তাই ছুটি ছুটি মন।

অফিসে যেতে হবে সেই সোমবার বেলা সাড়ে দশটায়।

শনিবার এলেই তাই যেন কেমন একটা শৈথিল্য এসে গ্রাস করে আমাকে। বাঁধাধরা কোন কাজে আর মন লাগে না।

কলকাতার শহরে গোধূলির চিহ্ন নেই। তবুও বলা যায় সেটা গোধূলিবেলা। কোন অবসন্ন রোদ বিলম্বিত [illegible]। আকাশের পশ্চিমে রক্তলাল [illegible] শহরের [illegible] কাক চিল চড়াই বাসার দিকে ছুটে চলেছে।

লাহিড়ী বাড়ির বার-দরজাটা বন্ধ দেখে কিছু বা হতাশা কিছু বিস্ময় আমার। তবুও সদর-দরজার কড়া ধরে বারকয়েক ঝন ঝন করি আমি। পরিবারের কারও সাড়া পেলাম না। ঠিকা ঝি কেষ্টর মা এসে একগাল হেসে বললে, মেজদিদি তো নেই। বেইরে গেছেন।

নেই?

ঈষৎ বিস্ময়ে আমি যেন কিঞ্চিৎ উন্মনা হলাম। তবে কি আর কোন প্রতিপক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে! ভালোবাসার অভিধানে যার নাম রাইভাল? অফিস লাইব্রেরী থেকে যাই হোক একখানা বই এনেছিলাম সুস্মিতার জন্যে। দিয়ে যেতে চাই আমি। বিরক্তির সুরে বলি আর কেউ আছেন?

সম্মতি জানিয়ে কেষ্টর মা বলে, আছেন। ভেতরে আসুন না।

শনিবারের বিকেল। রাস্তায় মন-এলানো গা-ভাসানো মন্থর চলমান জনতা। বৃদ্ধ থেকে শিশু—কেউ বাদ নেই। মহিলারা দল বেঁধে চলেছেন সন্ধ্যাকালীন সিনেমার শো-তে। ভেবেছিলাম ছাদে গিয়ে বসব দু'জনে। মনের কথার আদান প্রদান করব যতক্ষণ না রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

ভেতরে ঢুকতেই সেই চেনা চেনা সুগন্ধ ভেসে এল।

কি একটা স্নো না পাউডার লাহিড়ীদের সকলেই ব্যবহার করে। তারই সুবাসটুকু সদাই যেন থমকে থাকে ঘরে ঘরে। ভেতরে কারও পাত্তা নেই। কা কস্য পরিবেদনা!

মিণ্টু!

আমি খানিক অস্বস্তিতে ধরা গলায় ডাক দিলাম। সুস্মিতার এক ভাইয়ের নাম মিণ্টু। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি, এমন সময় কোথা থেকে মিণ্টুর পরিবর্তে মিষ্টি মিষ্টি মেয়েলী গলার স্বর ভাসল।

কোন্ এক ঘরের ভেতর থেকে বললে সুচরিতা, মিণ্টু তো নেই। মামার বাড়ি গেছে।

আমি বললাম, সুস্মিতা?

হয়তো বৈকালিক বেশ-পরিবর্তনে ব্যস্ত ছিল সুচরিতা। সেই অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এল ব্যাকুল ভঙ্গীতে।

আমার চোখ, যেন ঝলসে উঠল অনেক আলোর জৌলস দেখে।
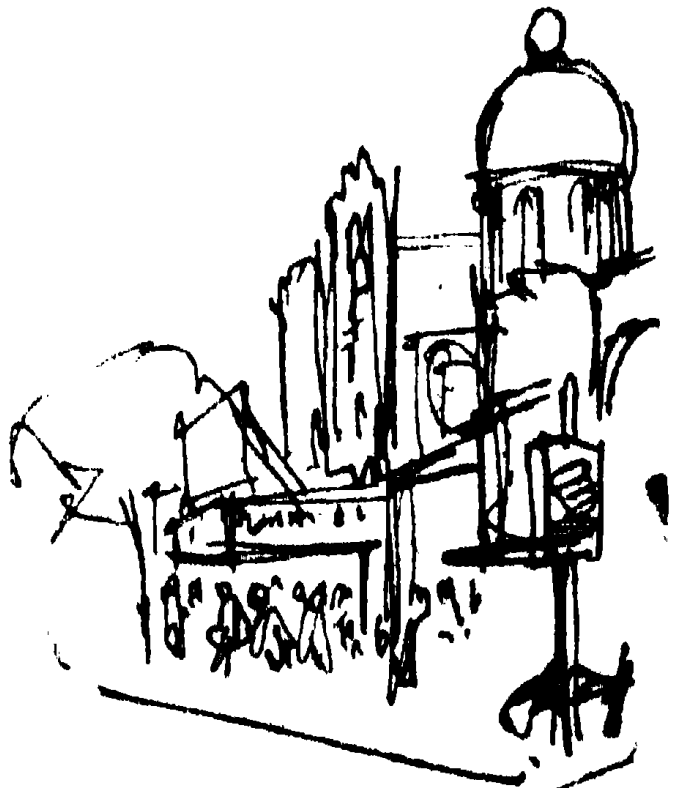
াধন-শুভ্র সুচরিতা। চোখে কাজলের রেখা। ঠোঁটে ঘন লাল প্রলেপের চিকন। বিচিত্র কবরী মাথায়, কপালে চূর্ণ অলকের গুচ্ছ। গালে টোল স্মিতমুখে বললে, সুস্মিও গেছে বাড়িতে। সকালেই গেছে। মামার ৎ আজ নেমন্তন্ন আছে। সেজমামার বিদ্যাকান্ত পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। জন্যে খাওয়া দাওয়া। আমিও াখানে।

বে আমি চলি। এই বইখানা াকে দিয়ে দেবেন।

ন-হৃদয়, তথাপি সহজ সুরেই কথা সচেষ্ট হই আমি।

পরে এস মানস। পাঁচ দশ মিনিট াও।

নীতির সুর যেন সুচরিতার কথায়। কতা দেখায় হয়তো।

ইটা হাতিয়ে দিয়ে কেটে পড়বার আমার। যার জন্য আসা সে-ই যখন স্থিত। তবুও ভদ্রতার খাতিরে ঘরে চেয়ার দখল করলাম। ড্রেসিং আয়নার চলে গেল সুচরিতা। পাউডারের বুলোতে থাকল শুভ্র নিটোল গ্রীবায়, । পাশে। বললে, আমিও যাব, তবে নয়। কেষ্টর মা চলে গেলে ঘর-চাবি দিয়ে—

ই বেশে কোনদিন দেখিনি াকে। চোখে পড়ল তার নিরাবরণ অনাবৃত বাহু। যেন মোম-পিচ্ছল। ৮টি। আমার চোখের ঘোর বাধা পেয়ে মকে থাকে। আয়নার প্রতিবিম্বিত সুচরিতা বললে, মানস, আমাকে একটু করবে?

শ্চয়ই। কী করতে হবে বলুন? ক্লিপ কিছু কিনে আনতে হবে? বললাম আমি। চেয়ার ছেড়ে উঠতে হলাম।

চরিতার দুই নিটোল হাত তখন চেষ্টায় চঞ্চল। পিঙ্ক রঙের ারের ইলাস্টিক স্ট্র্যাপ, বাঁধতে না কিছুতেই। দুই হাতের সরু আঙুল, পৃষ্ঠদেশে বৃথা নাচানাচি। অবিন্যস্ত স্যাঁতসেতে জাম রংয়ের আঁচল অধরে কামড়ে ধরে বক্ষ ঢেকে ই অতি কষ্টে। আবার একটু হাসল তা। বললে, এই স্ট্র্যাপটা আটকে পারবে? যদি কিছু মনে না কর—। চয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি। পা এগোতেই প্রসাধনের উগ্র সুগন্ধ ধরা দিল। সুচরিতার পেছন থেকে পালন করলাম সন্তর্পণে। আমার সুচরিতার দেহের পরশ ঠেকল। ঠান্ডা, পেলব, পিচ্ছিল দেহত্বক।

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে সুচরিতা া, বললে, লক্ষ্মী ছেলে। ক্ষণেক হাসির জের টেনে একটু চাপা সুরে স্ট্র্যাপ খুলতেই পারে ছেলেরা, পারে না।

রসিক ইঙ্গিতটা ধরতে পারি আমি। ম, আজ দেখলাম সুচরিতাদি, আপনি ন্দর।

হাসির জোয়ার তোলে সুচরিতা। হাসতে হাসতে বলে, ও, তাই না কি। তবু তো আমার বাবা মনের মতো পাত্র জোটাতে পারছেন না বলে মধ্যে মধ্যে ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে একজনের সঙ্গে কথা প্রায় পাকা হয়ে গেছে শুনছি। জানি না, কে একটা উজবুক জুটেছে আমার কপালে।

তাই বা কেন। পাত্র নিশ্চয়ই আপনার যোগ্য। উজবুক হবে কেন?

সহানুভূতির সুরে বললাম আমি। চেয়ারে বসে পড়লাম।

জোরালো কণ্ঠে সুচরিতা বলে, হ্যাঁ তা-ই। স্মার্ট ছেলে ক'টা দেখতে পাওয়া যায় বলতে পারো? হাজারে একটা মেলে না। স্মার্ট আর ইন্টেলিজেন্ট, ভদ্র সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিমান। যাক্ গে, কপালে যা আছে তাই হবে। কথার শেষে ঘরের আলোটা জেলে দিল সে।

আর একটা জামা তুলে নিল তেপায়া থেকে। ফিকা নীল রঙের খাটো ব্লাউজ। সুচরিতা বলে, চোখ দুটো খানিক বন্ধ কর মানস। জামাটা পরে ফেলি। শাড়িটা বদলে নিই।

আমার অবাক চোখ বন্ধ করি তৎক্ষণাৎ।

নিষিদ্ধ দৃশ্য না কি দেখতে নেই। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। লজ্জায় সংকোচে আমি যেন বিহ্বল। মনে মনে গুনতে থাকি, ঘরে ক'টা জানালা। ছোট আর বড় কতগুলি আসবাব আছে ঘরে। দেওয়ালে ক'খানা ছবি। কেমন একটা অব্যক্ত রাগে সুস্মিতার পরে বিরূপ হই আমি। আগে আমাকে জানিয়ে দিতে পারত সে, শনিবারের সন্ধ্যায় দেখা মিলবে না, তবে আর এ দুর্ভোগ পোয়াতে হত না।

এবার চোখ খুলতে পারো। ফিনিশড্। আর কোন বাধা নেই।

সুচরিতার কথা শুনে ফিরে তাকাই। দেখতে পাই সদ্য ভাঁজ খোলা শাড়ি তার পরণে। জানি না সুতী না রেশমী, নাইলন না সিফন। আজকাল চলতি ফ্যাশানের সদা-পরিবর্তনশীলতার ঠেলায় বিবিধ শাড়ির নাম রাতারাতি পালটে যায়। কালকের নামকরণ আজ পালটে যায়। আজ যা আছে কাল আর তা থাকে না।

যাই হোক শাড়িখানির রঙ নীলাভ। জমিতে কৃষ্ণরেখায় ফুল ও পাতা। দূর থেকে দেখায়, যেন একখণ্ড শারদ মেঘ গায়ে পরেছে সুচরিতা।

ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে আবার সেকথা বলল, তোমার চান্স আসতে ঢের দেরি এখনও। আগে আমি পার হই। তারপর সুস্মির পালা আসবে। তুমি কি ঠিক করলে মানস? সুস্মিকেই বিয়ে করবে তো? শুনেছি তোমার চাকরিটা পাকা হয়ে গেছে।

ভেবে দেখিনি এখনও। বললাম জড়তা কাটিয়ে। দেখা যাক কি হয়। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে।

ইচ্ছে যখন আছে তখন উপায় হবেই। ভাবনা নেই।

শাড়ির আঁচলে বিন্যাস আনে সুচরিতা, আয়নার নিজেকে দেখতে দেখতে সে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে। বললে, তাই যদি হয় তবে তো একটা দুটো রিহার্সাল দিয়ে রাখা উচিত আগে-ভাগে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা থাকলে আসল অভিনয়ের রাতে কোন অসুবিধে ভোগ করতে হয় না।

কি যে বলতে চায় সুচরিতা, ঠাওরাতে পারি না ঠিক। বললাম, তার মানে? কিসের রিহার্সাল?

ব্যঙ্গের অস্ফুট হাসি তার রক্তিম ঠোঁটে। পরিহাসের সুরে বললে, শুধু কিসের রিহার্সাল নয় সব কিছুর—

কিস।

বিদ্যুতের ঝিলিক লাগে আমার মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম শিরায়। আমি যেন বোবা মেরে যাই। নির্বাক থাকতে চেষ্টা করি। বেশ বুঝতে পারি, আমার মুখে শুষ্ক হাসি ফুটেছে। বললাম, কি যে বলেন আপনি? ইস্।

নিজের লম্বমান হাতে পাউডারের ছোঁয়া দিতে দিতে মিটি মিটি হাসতে হাসতে সুচরিতা বললে, বিয়ে গো বিয়ে। বিয়ের রিহার্সাল! আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি সব কিছু। মানে তালিম দিতে পারি। অবশ্য তুমি যদি রাজি থাক। আর, যদি কথা দাও, সুস্মি জানতে জানতে পারবে না।

সম্মতি বা অসম্মতির ধার ধারে না সে। আমার কাছে এগিয়ে আসে। হাতে সেন্টের খোলা শিশি। পম্পেই এসেন্সের বহু পরিচিত আধার।

বললে, মাখিয়ে দাও দেখি।

কথার শেষে শিশিটা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়।

অপ্রস্তুত আমি, তার ঝুলন্ত আঁচলের এক প্রান্ত তুলে ধরি দ্বিধায় সঙ্কোচে। কি কারণে কে জানে খিল খিল হাসতে থাকল সুচরিতা। তার দেহলতা যেন নেচে নেচে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, দেখছি তুমিও একটা স্রেফ আহাম্মুখ! মেয়েরা কি আঁচলে সেণ্ট মাখে?

তবে কোথায় মাখে?

নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলাম। অস্বস্তিতে আমার যেন মুহ্যমান অবস্থা।

এইখানে মাখে, বোকা কোথাকার। দেখছি তুমি স্টুপিড! ফুল! চিবুকের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল সে।

অগত্যা আমিও যন্ত্রচালিতে মতো সুচরিতার নির্দেশ পালন করতে তৎপর হলাম।

তন্মুহূর্তে আমার অপর হাতখানি ধরে আমাকে টেনে তুলে খুশি খুশি সুচরিতা মিষ্টি হাসির সংগে বললে, এস মানস আমরা পাশের ঘরে যাই। মনে কর, আমাদের সাজ-পোশাকের পালা শেষ হয়েছে। এখন আমাদের বিয়ের আসরে যেতে হবে। অর্থাৎ কী না স্টেজে নামতে হবে।

কথার শেষে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল সে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম সভয় পদক্ষেপে। কী যে তার বক্তব্য, অনুধাবন করতে পারি না। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সম্মোহিত।

বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

পাশের ঘরে যেতেই খোলা জানালা থেকে দূরে রাস্তায় আলোর বাহুল্য চোখে পড়ল। হয়তো পাশের বাড়িতে রেডিও বেজে চলেছে। সান্ধ্য-অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। গীটারের সুর ভেসে আসছে। এক বিখ্যাত গানের সুরেলা ধ্বনি শোনা যায়—বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে—

ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল সচরিতা। বিজলী পাখাটি চালিয়ে দিয়ে বলল, এস আমরা এই ছবির সামনে দু'জনে দাঁড়াই। তুমি আমার ডান পাশে এসে দাঁড়াও। স্ত্রী সব সময়ে স্বামীর বাঁদিকে থাকবে। এইটেই চিরকালের প্রথা।

দেওয়ালের কৃষ্ণ আর রাধার যুগল-মূর্তির রঙীন ছবি। সত্যিই দেখলাম, শ্রীকৃষ্ণের বামপাশে রয়েছেন শ্রীরাধা। যুগল শ্রীমুখে প্রশান্ত হাস্যরেখা। চোখে চোখে যেন বিহ্বলতা।

আমরা দু'জনে ছবির সামনে। পাশাপাশি।

অস্ফুটকণ্ঠে সুচরিতা বলে, মনে মনে প্রার্থনা জানাও, আমাদের জীবন যেন সুখের হয়, মধুর হয়। আমাদের মিলন যেন স্থায়ী হয়। আমরা যেন বিপদ-আপদ থেকে দূরে থাকতে পারি।

আমার যে কী করণীয় বুঝে উঠতে পারি না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্তে পালিয়ে যাই এখান থেকে। ভয় পাই, যদি সুস্মিতা এসে পড়ে। কিংবা যদি আসেন সুখময়! হঠাৎ, অতর্কিতে! দেখতে পান এই অভাবনীয় ঘটনা!

বললাম, ধরা গলায়, কোথা থেকে শিখেছেন বিয়ের আচার কানুন?

হাসল সুচরিতা। বললে, কোথা থেকে আবার! দেখে শিখেছি। শুনে শিখেছি। কিন্তু স্বামী কখনও স্ত্রীকে আপনি বলে না। এটা নিয়ম নয়। তুমি সম্বোধনটা কত মিষ্টি! কত আপন শুনতে লাগে!

আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে কথা বলে সে। আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। অনুভব করি, তার দেহটা কেমন নধর কোমল। বললাম, আচ্ছা, তুমিই বলব। তোমার কথাই থাকবে।

আমার মানস লক্ষ্মী ছেলে। এবার কিন্তু খাওয়ার পালা। কী খাবে তাই বল? চা না কফি? না বললে শুনছি না। একটু কিছু খেতেই হবে। অন্তত এক পেয়ালা কফি। সেই সঙ্গে দুটো মিষ্টি। সন্দেশ। অপেক্ষা কর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসব আমি। একতলার বার-দরজা খোলা আছে। হয়তো কেষ্টর মা কাজ সেরে চলে গেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুসজ্জিতা সুচরিতা। রেখে যায় মূর্ত স্মৃতির মতো, একরাশ সুগন্ধ। নিঃশব্দ পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেল স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা। যেন বাতাসে ভেসে গেল। চুড়ির রিনিঝিনি মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

ঘরের মধ্যে মোহ মোহ গন্ধ। আর ভীত ত্রস্ত আমি। নিজেকে যেন আমার কেমন নার্ভাস ঠেকে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। শঙ্কাভরা উত্তেজনা দমন করতে হবে। ধূমপান না কী প্রশমিত করে চিন্তাজ্বালা, স্তিমিত করে দেয় মনের উচাটন উদ্বেগ আতঙ্ক।

একেকবার সন্দেহ জেগে ওঠে, সুচরিতা কী তবে প্রকৃতিস্থ নয়! সে কী জানে না সে কী করছে, কী বলছে! তার মাথায় হয়তো বিকার দেখা দিয়েছে। মনের অসুখ ধরেছে। যাকে বলে মানসিক ব্যাধি। বুদ্ধি বিকৃত না হলে এমন আচরণ কেউ করে না।

সদরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবে সুচরিতা, জেনে কিছু যেন আশ্বস্ত হলাম আমি। সুস্মিতার কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়বার আর কোন আশঙ্কা থাকল না। মনে মনে স্থির করে ফেললাম, কফি আর সন্দেশ খেয়ে সরাসরি জানিয়ে দেব, এবার আমি যাই। আর নয়। ঢের শিখেছি বিয়ে-বিয়ে খেলা। জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি নেই আর।

ঘরের কোণের টেবিল থেকে তুলে নিলাম কী একটা পুরানো সাময়িক পত্রিকা। অতি-ব্যবহারে মলাট ছিঁড়ে গেছে, তাই আর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। পাতা ওলটাতেই দেখা যায় ফটোগ্রাফ। ছায়াছবির নায়িকার বিশেষ পোজের ছবি। পটলচেরা চোখে যেন কামনা ফুটে আছে। বুকের আঁচল বুকে নেই, হয়তো আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু কোথায় যেন সুচরিতার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ভাব-ভঙ্গী, সাজ-পোশাক—সকল কিছু মিলিয়ে অদ্ভুত সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

আমি তোমাকে খাইয়ে দেব। এস মানস, আমার কাছে এস।

ঘরে সিঁদিয়ে বললে সুচরিতা। এক হাতে টলটলায়মান কফির পেয়ালা। অন্য হাতে সন্দেশের রেকাবী। মুখে পরিতৃপ্তির চাপা আনন্দ। মেয়েরা না কী প্রিয়জনকে খাইয়ে স্বর্গসুখ পায়।

টেবিলে পাত্র দুটি নামিয়ে রেখে কপালের মিনমিন ঘাম মুছতে থাকে সে। ট্যাঁক থেকে বাটিকের কাজ করা চকোলেট রঙের রুমাল টেনে নিয়ে। আবার বললে হাঁফধরা স্বরে, সব নিয়মই যে মেনে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই। স্বামী আর স্ত্রীর নিজের নিজের সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে কিছু কিছু। যাকে বলে ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছে। তাও মানতে হবে বৈকি! আমার যেমন ইচ্ছে করে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াই তোমাকে। খানিক থেমে দম নিয়ে আবার বলে, মনে নেই সাবিত্রী সতীশকে, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে কত পরিপাটি করে কত পদ খাইয়েছিল? যাও সিগারেটটা ফেলে দাও।

আমার যেন কিছুই মনে পড়ছে না। যেন অতীত ভুলে গেছি। বর্তমান ঠেকছে স্বপ্নের সামিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ধারণা করতে পারি না।

কাছে যেতেই আমার কোমরে বাহু জড়ালে সুচরিতা। সাপের বেষ্টনের মতো ঠেকল যেন। মাথা রাখল আমার ঢিপঢিপ বুকে। কেমন যেন সিক্ত কণ্ঠে বললে, আগে কী খাবে—এটা না ওটা?

হাতে একটা সন্দেশ, অথচ লাল অধর উঁচিয়ে ধরল সে। দুই হাতের আলিঙ্গনে ধরে ফেললাম তাকে, নয়তো আমি হয়তো তার দেহভার সামলাতে পারতাম না। কিছু বলার অবকাশ পাই না। আমার মুখের মধ্যে নিজের অধর সিঁদিয়ে দিয়ে টানা টানা চোখ দুটি বন্ধ করল সুচরিতা। মুখে যেন নরম জেলির আস্বাদ পেলাম। বিদেশী সিনেমা দেখার অভ্যাস আছে আমার। বিশেষত 'A'—মার্কা ছবি এলে বাদ দিই না। সেই অভিজ্ঞতায় চুম্বনের রীতিনীতির থিও-

রিটিক্যাল জ্ঞান আজ যেন বিশেষভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি।

সুচরিতার তপ্ত শ্বাস আমার মুখে লাগতে থাকে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার। সাপের ফোঁসের মতো শোনায় যেন।

কয়েক মিনিট উত্তীর্ণ হয় তবুও মুখ সরায় না সে। ছাড়তে চায় না বাহুর বাঁধন। বুকে আমার যেন তীর খোঁচা লেগে থাকে। আমাকে যেন বিদ্ধ করতে চায়। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলাই আমি। প্রতিরোধের জন্য যেন একটা কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধ করি।

তারপর আমাকে মুক্তি দিয়ে একটা গোটা সন্দেশ আমার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে সুচরিতা বললে, এবার বল কোন্‌টা বেশী মিষ্টি। এটা না ওটা?

খেতে খেতে বললাম, অবশ্যই প্রথমটা।

সুচরিতা তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বলে, আমার সোনার মানস কত মিষ্টি আর লক্ষ্মী, কেউ কী জানে? আমি শুধু জানি।

স্নান আহারের পর্ব চুকতে যেন স্বস্তি পায় সে। যেন এক অবশ্য কর্তব্য দায় থেকে উদ্ধার পেয়েছে। শূন্য পাত্র ঘরের বাইরে রেখে এসে আধেক হাসি আধেক গাম্ভীর্যের ঢঙে বললে, খুবই অদ্ভুত ঠেকছে তোমার, বুঝতে পেরেছি। আমি আবার মুখ দেখে মনের কথা জানতে পারি। মানুষের মুখে ফুটে ওঠে মনের ভাষা।

বললাম, তাই তো মুখমুকুর কথাটা চালু আছে।

সুচরিতা বলে, ঠিক বলেছ। আমার মানসের দেখছি ভাষাজ্ঞান আছে। তাই তো তোমাকে আমি এত—

আমি আমতা আমতা করি। বলি, মনে হচ্ছে, আমি যেন আমাতে নেই।

কথার সূত্র ধরে সুচরিতা বলে, জানা কথা, তুমি এখন আর কারও নয়। তুমি এখন একান্ত আমার। সাত পাকে বেঁধে ফেলেছি তোমাকে।

দড়ির আবেষ্টনে আবদ্ধ আমি, সারা দেহে অস্বস্তির দহন লাগে। যেন এক ভয়াল সাপ জড়িয়ে আছে আমাকে, শরীরে তাই বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। আপন সত্তা, ব্যক্তিত্ব যেন হারাতে বসেছি। আমি আর আমি নেই। অতি কষ্টে মোহ জয় করতে চেষ্টা করি। কাষ্ঠহাসির সঙ্গে বললাম, যদিও অবশ্য এটা আসল অভিনয় নয়। মহলা চলেছে মাত্র।

সুচরিতা বসে পড়ল আমার পাশে। সোফার গদী যেন নেচে উঠল। আমার কোলে তার একখানি শুভ্র হাত বিছিয়ে দিয়ে আমার কাঁধে মাথা গলিয়ে বললে, আমার কাছে কিন্তু রিহার্সালই হল আসল। ভুল ত্রুটি শুধরে নেওয়া যায়। যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা লাভ করা যায় রিহার্সালে। শিক্ষা-নবিশী শেষ হলে তবেই যা পাকাপোক্ত অভিনেতা হওয়া যায়। পরীক্ষা না দিয়ে তুমি কী বি ই ডিগ্রী পেয়েছ মানস?

বললাম, আজ এখানেই যবনিকা পতন হোক। আমি এবার যাই। তারপর তোমাকে যেতে হবে তোমার মামার বাড়িতে। নিমন্ত্রণ রাখতে।

নিরাশার কালো ছায়া ঘনায় তার মুখে। চরম উদ্দীপনা যেন এক নিমেষে উবে যায়। বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি, স্তিমিত হতে থাকে। মিয়ানো সুরে বলে, না হয় আর না-ই গেলাম আজ। বলে দেওয়া যাবে যা হয় একটা কিছু। বলতে পারি, ভীষণ মাথা ধরেছিল। স্যারিডন খেলাম, তবুও সারল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় আমাকে।

দিনশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে বাইরে। ঘরের মুক্ত জানালা থেকে দেখতে পাই রাস্তার অপর তীরে তীরে সারি বাড়ির রেলিং থেকে ঝলানো শুকনো রঙীন শাড়িগুলি বাতাসে দুলে দুলে উঠছে। রাস্তায় ছুটন্ত দুরন্ত ট্যাক্সির হর্ন বেজে চলেছে। পাশের বাড়ির রেডিওতে দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ পড়ছে ঘোষক।

হাত-ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। লক্ষ্য করি, সুচরিতা কেমন যেন নীরব নিথর হয়ে আছে। মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ নেমেছে। জানালার বাইরে রাতের আকাশে চাহনি থমকে আছে। সোফায় এলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। যেন এক মৃতের হাত পড়ে আছে আমার জানুতে।

আবার একটা সিগারেট ধরাই। অস্থৈর্য উদ্বেগ দমন করতে চাই হয়তো।

সুচরিতা বললে, আমার খুব ভালো লাগে তাকে যে-ছেলে সিগারেট খায়।

পরোক্ষে যেন আমাকেই প্রশংসা করলে। ঈষৎ উৎসাহিত হলাম। বললাম, আজকাল বৈজ্ঞানিকরা সিগারেট খেতে খেতে রায় দেন, ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। ধূমপান করলে ক্যান্সার, থ্রমবসিস—

ক'টা বাজল মানস? সাতটা?

কী যেন মনে পড়তেই সময় জানতে চাইল সে।

সাতটা বেজে চল্লিশ হয়ে গেছে। প্রায় পোনে আটটা। আমি উঠলাম।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়তেই সুচরিতাও উঠে পড়ল। বললে, সে কী! তুমি তো আচ্ছা নিষ্ঠুর! হার্টলেস! মানস, আমি ভেবেছিলাম তুমি—

কেন? কী অপরাধ আমার?

বিয়ে হয়ে গেল। তারপর?

তারপর কী? তুমি বল, আমি তো জানি না।

জানো না? ন্যাকামি?

সত্যি বলছি। আমি মিথ্যে বলি না কখনও। মিথ্যে বলা আমার স্বভাবে নেই।

অর্থাৎ সহজে মিথ্যে না বললেও শক্ত পাল্লায় পড়লে অনায়াসে মিথ্যে বলতে পারে। পুরুষরা ভীষণ মিথ্যুক হয়। কথায় কথায় বাজে কথা বলে।

ভুরুতে কুঞ্চন ফুটিয়ে রাগের সুরে বলে সুচরিতা। কেমন যেন হিংস্র দেখায় তাকে। ক্রোধে কুটিল। মারমুখী। বলে, তোমার জন্যে আমি কী না এমন একটা নেমন্তন্ন ক্যানসেল করলাম। আর তুমি কী না মাঝদরিয়ায় নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে চাইছ? তা হতে দিচ্ছি না।

কী করতে হবে আমাকে তাই বল। কেউ যদি এসে পড়ে এখুনি!

আমি বললাম নিরুপায়ের মতো। ঘরে পায়চারী করতে করতে।

কী করতে হবে! জানো না, বিশ্বাস করতে হবে আমাকে? চল, আমরা এখন বিছানায় যাব। ফুলশয্যার পালা শুরু হবে এবার। বী রেডি মাই ডিয়ার ফুল! ননসেন্স! দশটার আগে কেউ ফিরছে না।

কথা বলতে বলতে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল সুচরিতা। বললে, আর আলোয় নয়, এখন অন্ধকারে থাকতে হবে। জানো না, নতুন বর বৌ অন্ধকার ঘরে ঢুকলে আর বেরোতে চায় না?

কথার শেষে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা এক টান মারল সুচরিতা। আমি চললাম তার সাথে সাথে। যেন বধ্যভূমিতে চলেছি।

আমাদের দুজনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের খাটখানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তোলে। আমার বুকের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে ফিস ফিস কথা বলে সুচরিতা। বলে, দুষ্টু! পাজী! বোল্লক!

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ অনুভব করলাম ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে আমার মুখে চোখে চিবুকে। তপ্ত অশ্রু যেন।

তবে কী কাঁদছে সুচরিতা। বেদনার জ্বালা ধরে আমার বুকে। সমবেদনার দংশন যেন। তবুও বললাম, সুস্মিতাকে ঠকাতে চাই না আমি। বিবেকের কাছে কী জবাবদিহি করব?

সুস্মি কিছু জানতে পারবে না। তুমি আমাকে নাও।

কান্নার সুরে বললে সুচরিতা। ফুঁপিয়ে উঠল যেন।

নিবিড়তর বন্ধনে আমি তাকে কাছে টেনে নিই। মুখের মধ্যে আবার সেই আস্বাদ পাই। যেন মিষ্টি মিষ্টি জেলী। যেন অফুরন্ত অশেষ।

খানিক বাদে মুখ সরিয়ে সুচরিতা বলে, এক মিনিট সবুর কর। লক্ষ্মীটি।

অন্ধকার। ঘন আর গভীর।

শুনতে পেলাম একটা একটা বোতাম খুলছে সে। টিপকলের বোতাম।

তারপর থেকে লাহিড়ীদের আবাসে আর যাই না আমি। সুস্মিতার সঙ্গে দেখা হয় আমার। ঘরে নয় বাইরে। জনতার অরণ্যে, পথ চলতে। হোটেলে সিনেমায়। চলন্ত ট্যাক্সিতে।

একদা এক সন্ধ্যায় সুস্মিতা জানাল, দিদির বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র খুব ভালো। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। হাইকোর্ট পাড়ায় চেম্বার। কলকাতায় বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন।

আমি শ্বাস ফেললাম একটা। দীর্ঘ-শ্বাস। স্বস্তির শ্বাস।

বিনিয়োগ

প্রভাত দেবসরকার

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে এত কথা হয় না। তাছাড়া সুধাংশুরও তাড়া ছিল। বললে, পরে দেখা করবো। তুই তো এখানেই চাকরি করিস্?

পুরনো বন্ধুকে যতক্ষণ মুখোমুখি পাওয়া যায়। দিব্যেন্দু সাগ্রহে বললে, হাঁ। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ডান দিকের প্রথম ঘরটার পর মিস্টার মুখার্জী বললে চাপরাশী দেখিয়ে দেবে,—নয় তো শিব-লিঙ্গম্-এর পি-এ বললে যে কেউ বলে দেবে, আমি অপেক্ষা করবো। আসিস্ কিন্তু!

সুধাংশু ঘাড় নাড়লে।

শুধু এই অফিসে নয়, এখানে বড় চাকরি করে দিব্যেন্দু! মিস্টার মুখার্জি! পি-এ!

আগে জানলে কাজ হ'তো। সুধাংশুর মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। দরখাস্ত করবার সময় যদি ঘুণাক্ষরে জানতো তাহলে আজ ইন্টারভিউ-এ এ ধুক-পুকুনি থাকতো না।

দিব্যেন্দুর সহযোগিতায় শিবলিঙ্গমের লোক হয়ে যেত। চাকরি ঠেকায় কে? এক আঁচড়ে ডিরেক্টর অব পার্সোনেলের চক্ষু স্থির।

এমনি না হলে মনকে বোঝান যেতো কিন্তু এখন না হলে আর বোঝান যাবে না। দিব্যেন্দু যেখানে অমন চাকরি পায় সেখানে সে এই সামান্য চাকরিটা না পেলে লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। আর জানাজানি হলে লজ্জা আরো বাড়বে।

ওপরে উঠতে উঠতে সুধাংশু মনে মনে বললে, না, আর দেখা-সাক্ষাৎ নয়—যে যেমন আছে তেমনি থাক—যেমন চুপিসারে এসেছে তেমনি চুপিসাড়ে চলে যাবে ইন্টারভিউ-এর পর। আর যদি কোন-দিন দেখা হয় দিব্যেন্দুর সঙ্গে বলবে সময় পায় নি। ফুরিয়ে যাবে!

এন্ডারসন্ হাউসের সিঁড়ি আর ফুরোয় না। সুধাংশুর পা জড়িয়ে আসে।

নিশ্চিত ক'রে তার মনে হয়, আজ ইন্টারভিউএ সে নির্ঘাৎ ফেল করবে। এখন থেকেই বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে আরম্ভ করেছে। দিব্যেন্দুটা সব মাটি ক'রে দিলে, মাঝখানে শনির দৃষ্টি দিয়ে গেল।

সে জানতে চায় নি, ওর অত কথা জানাবার দরকার ছিল কি? যত চাল!

তবু মনটাকে সুধাংশু কিছুতে স্থির করতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপে অস্থির হ'য়ে ওঠে আপসোসে: তার বাল্যবন্ধু দিব্যেন্দু এখানে বড় চাকরি করে! এত খবর নিলে, আর ওটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারলে না! চাকরিটা হাতের কাছে এসে ফসকে যাবে শেষ পর্যন্ত!

হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে সুধাংশুর। যাবে নাকি একবার দিব্যেন্দুর কাছে? বলে আসবে এখানে আসার উদ্দেশ্যটা? শেষ মুহূর্তে ইনফ্লুয়েন্স করবে? শিবলিঙ্গমের মুখের কথা বা থাবার আঁচড় একটা: ঠেক্ হিম! বাস।

না, সুধাংশুর কোথায় যেন বাঁধে। দিব্যেন্দুকে ধরে চাকরি তার মনঃপূত নয়। যেভাবে হ'চ্ছে হোক, বাল্যবন্ধু যৌবনে প্রতিদ্বন্দ্বী—আর ঠিক কি, তার কথায় অমনি সে শিবলিঙ্গকে নড়াবে! মনে মনে কৌতুক বোধ করবে নিশ্চয়। থাক্ গে। বিনা সুপারিশে যদ্দুর হয়। নিজের চেষ্টায় যতখানি সম্ভব।...

বন্ধুকে দিব্যেন্দু যথোচিত অভ্যর্থনা করে নিজের ঘরে বসালে। হাত বাড়িয়ে সিগারেট দিলে। ঠান্ডা পানীয়ের অর্ডার দিলে।

এখন মনে হচ্ছে, তখন দিব্যেন্দুকে বললে হ'তো এ্যান্ডারসন হাউসে আসার উদ্দেশ্যটা। তারপর ও যদি কিছু করতো—

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে সুধাংশু বললে, তুই কতদিন এখানে চাকরি করছিস্?

এখানে চাকরি করাটা যেন বিশেষ লজ্জার—লুকিয়ে নেশা করার মত, দিব্যেন্দু চাপা দেবার মত বললে, তা শুরু থেকে—

সুধাংশু বললে, তাহলে পাঁচ ছ' বছর বল!

দিব্যেন্দু হেসে বললে, আর বলিস্ কেন! সুধাংশু গম্ভীর হ'য়ে গেল। বন্ধুর হাসিতে যোগ দিতে পারলে না।

দিব্যেন্দু জিগ্যেস করলে, তারপর কেমন আছিস? বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই! সেই কবে কলেজে সব পড়েছিলুম মনে আছে?

মনে আছে বলেই বোধ হয় এত আশ্চর্য বোধ করছে সুধাংশু আজ। সেই দিব্যেন্দু আর এই দিব্যেন্দু ভিন্ন মানুষ। দশ-বার বছরে সম্পূর্ণ বদলে গেছে, একটা চিরকেলে পেট রোগা ছেলের হঠাৎ স্বাস্থ্য ফেরার মত—বিশ্বাসই হয় না। দৈব, টোটকা-টুটকির ফল আর কি!

সুধাংশু বললে, সেইখানেই আছিস্ তো? কালীঘাট!

দিব্যেন্দু যেন আহত হ'লো! বললে, কালীঘাট, তবে সেখানটা নয়, অন্য বাড়ি। সুধাংশুর মনে হ'ল, প্রকারান্তরে ওর খোলার বস্তির উল্লেখ করা উচিত হয় নি। অবস্থান্তরে বাসান্তর নিশ্চয়ই ঘটেছে। ধুতির বদলে প্যান্ট!

দিব্যেন্দু বললে, আয় না একদিন আমার ওখানে। গল্প হবে।

সুধাংশু অনামনস্কভাবে বললে, যাব। আগ্রহ দেখিয়ে দিব্যেন্দু বললে, সত্যি আসবি? কবে? না, ভুলে যাবি?

আশ্বাস দিয়ে সুধাংশু বললে, না ভুলবো কেন। তবে কি জানিস এখন যে যার ধান্দায় ব্যস্ত, সময় পাই না।

দিব্যেন্দু হয়তো বিশ্বাস করলে না, তাই চুপ করে রইল। পুরনো বন্ধুদের আর কাছে না-পাওয়ার কারণ বোধ হয় এ নয়।

সুধাংশু বললে, আর কারো সঙ্গে তোর দেখা হয়?

দিব্যেন্দু হতাশার সুরে বললে, হবে না কেন! কিন্তু ফিরে আর কেউ ওমুখো হয় না। দরকার ছাড়া আর কে নড়ে বেড়ায় বল! দুটো মনের কথা বলবার লোক পাই না। ভাবি, অফিস না থাকলে বাঁচতুম কি করে! সুধাংশু বন্ধুর মনোবেদনাটা বোঝে, বলে, দেখিস আমি ঠিক যাব। তখন—

দিব্যেন্দু পরখ করতে বললে, [illegible], আজই চল। আর ঘন্টাখানেক পরে এক সঙ্গে যাব। কেমন?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি বললে, আজ নয়, আর একদিন নিশ্চয়ই যাব। আজ একটু—

দিব্যেন্দু অবিশ্বাসের সুরে বললে, ঐ হ'লো! শেষ পর্যন্ত সময় আর হ'বে না। আমার জানা আছে।

সুধাংশু বন্ধুকে উৎসাহিত করতে বললে, তোর ওখানে সে আড্ডা আছে তো? গান-বাজনা?

তৃতীয় ব্যক্তির মত দিব্যেন্দু বললে, হুঁ, গান-বাজনা! আসলে দেখতে পাবি।

হেসে সুধাংশু জিগ্যেস করলে, কি দেখবো? ও-পাঠ তুলে দিয়েচিস না কি?

আর এক দফা সিগারেট ধরিয়ে হাতের মুঠোয় আগুনটা বন্ধুর মুখের কাছে আলগোছা ধরে দিব্যেন্দু বললে, রেয়াজ নেই বহুকাল। আর কাকে নিয়ে হ'বে ও-সব?

সুধাংশু বললে, কেন তোর বোন তো দিব্যি গাইতো।

দিব্যেন্দু অন্যমনস্কের মত সিগারেটটায় দীর্ঘ টান দিলে। এদিক ওদিক আগুনের ফুলকি ছুটলো।

সুধাংশু জিগ্যেস করলে, সুনীতি গান ছেড়ে দিয়েছে নাকি? তখনই তো কত মেডেল-কাপ পেয়েছিল! ক্ল্যাসিক্যালে নাম করেছিল, অল্ বেঙ্গলে প্রথম হয়েছিল যেন।

দিব্যেন্দু জবাব না দিয়ে সিগারেট পুড়িয়ে হাসতে লাগল।

রহস্য ভেদ করতে সুধাংশু আবার প্রশ্ন করলে, সুনীতির বিয়ে হ'য়ে গেছে বুঝি? তাই বল।

চাপরাশী ঘরে ঢুকে কি একটা কাগজ হাতে দিলে, দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়াল, বললে, বস্, সাহেবের ঘর থেকে আসচি।

সুধাংশু মনে মনে অপ্রস্তুত বোধ করলে একটু আগে অবান্তর প্রশ্ন করার জন্য। দশ বছর পরেও সুনীতি তেমনি অপ্রতিভ কণ্ঠে দাদার বন্ধুদের সামনে গান গাইবে—নির্লাজ সুরে চর্চা করবে—মাথা খারাপ না হ'লে কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে। পনের ষোল বছরের মেয়ের পক্ষে যা গুণ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে তা তো দোষে দাঁড়ায়!

কিন্তু বড় ভাল গান গাইতো সুনীতি। গান-বাজনায় দিব্যেন্দুদের বাড়ীর আব-হাওয়াটাও তখন বড় লোভনীয় ছিল। সুখসামাধা কত গান যে সুনীতি গাইতো, বড় মিষ্টি গলা আর দরদ ছিল সে গানের। সুধাংশুর মত যারা গানের 'গ' বোঝে না তারাও গান পাগলা হ'য়ে যেত। খোলার চালের আকাশ অনুরাগে কাঁপতো। কোন-দিনই মনে হ'তো না সুধাংশুদের বস্তির একটা এ'দোপড়া ঘরে তারা অবসর কাটাচ্ছে। দিব্যেন্দু মাথা নেড়ে নেড়ে তবলা বাজাতো, সুনীতি সামনে বসে অপ্রতিভ কণ্ঠে গান গাইতো, আর দিব্যেন্দুর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এদিক ওদিক বসে থাকতো চুপ করে। মাঝে মাঝে দিব্যেন্দুর মাকে দরজার সামনে দেখা যেত। দরিদ্রের স্বর্গ অপূর্ব মনে হতো। সুধাংশুর মত অনেকে বলতো দিব্যেন্দুকে—বোনকে কোনদিন গান ছাড়াস্ নি—খুব করে গান শেখা।

তা দিব্যেন্দু সাধ্যমত বোনকে গান শিখিয়েছিল। দশ বছর আগে অনেক মেডেল, কাপ, সার্টিফিকেট যোগাড় করেছে সুনীতি। ক বছর দিব্যেন্দুর বোনের নামও শোনা গিয়েছিল গীত-রসিকদের মুখে-মুখে—মেয়েটি ভাল গায়।

তারপর আর কোন খোঁজখবর রাখে নি সুধাংশু।

ছি ছি, বড় অসভ্যতা হ'য়ে গেল। দিব্যেন্দু নিশ্চয়ই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ফিরে এসে দিব্যেন্দু বললে, কি বলছিলি? গান!

সুধাংশু বন্ধুর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে।

অন্যমনস্কভাবে দিব্যেন্দু বললে, আসিস্ শোনাব।

সুধাংশু বিস্ময় প্রকাশ করলে, সুনীতি এখনো গান গায়! বিয়ে হয় নি?

দিব্যেন্দু ফাইল পড়তে পড়তে বললে, গায় না, বললে গায়। তোর সামনে গাইবে।

সুধাংশু সাহস ক'রে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না। দিব্যেন্দুর কথার সুরটা যেন কেমন—কেমন। বোনের সম্বন্ধে বুঝি আশানুরূপ ফল পায় নি সে।

সুধাংশুর মনে কেমন খট্‌কা লাগে। এত বয়েস পর্যন্ত সুনীতির বিয়ে হয় নি? দিব্যেন্দু তো মন্দ রোজগারপাতি করে না!

সুধাংশু জিজ্ঞেস করলে, তুই বিয়ে করেচিস?

দিব্যেন্দু জবাব দিলে, না। তুই?

সুধাংশু বললে, করে!

দিব্যেন্দু জিজ্ঞেস করলে, ছেলে-পুলে?

পাঁচটি!

শিউরে উঠে দিব্যেন্দু বললে, করেচিস কি? অ্যাঁ!

আর—র! অপ্রতিভ বোধ হয়

সুধাংশুকে। দিব্যেন্দু রহস্য ক'রে বলে, ম্যানেজ করিস কি করে রে?

যা রোজগার করি আনতে আনতেই ফুরিয়ে যায়!

সুধাংশু বললে, গরীবরা যে ক'রে ম্যানেজ করে—এখানকার মাটি ওখানে ওখানকার মাটি এখানে আর কি!

খোঁচাটা দিব্যেন্দু বুঝলে, নিজেকে সংশোধন করে নিলে, না, তা নয়। আজকাল একার চলাই দায়, তায়—সত্যি বলছিস তোর পাঁচটা ছেলে-মেয়ে? যাঃ।

সুধাংশু হাসলে। সত্যি না তো মিথ্যে, আমার ছেলেপুলের ভার তো আর পাঁচজনে নেবে না। মিথ্যে বলে লাভ?

অনেকে রগড় ক'রে বলে কি-না! দিব্যেন্দু হাসতে লাগল। তোকে দেখে কিন্তু মনেই হয় না। বরং আগের চেয়ে তোর চেহারাটা ভালই হয়েচে।

সুধাংশু সঙ্গে সঙ্গে বললে, না হ'লে পাঁচটি সন্তানের পিতা বলে মানাবে কেন? Father's personality

দিব্যেন্দু মুখে এক রকম শব্দ করলে বন্ধুর কথায় কৌতুক অনুভব ক'রে। সুধাংশু জিগ্যেস করলে, তুই বিয়ে করবি না? নাকি confirmed?

দিব্যেন্দু অনামনস্কের মত বললে, বোনটার একটা ব্যবস্থা করি আগে। সত্যি কথা বলতে কি যত দেখচি, তোদের ঐ বিয়ের ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। যত সব—

ইংরেজী গালটা দিব্যেন্দু স্পষ্ট উচ্চারণ করলে না। তবে বোনের বিয়ের ব্যাপারে সংসারটাকে সে চিনে নিয়েছে বোঝা গেল।

সুধাংশু বললে, সুনীতি তো দেখতে ভাল। এতদিনে বিয়ে হলো না, আশ্চর্য তুই ঠিকমত চেষ্টা করিস নি, না হ'লে—

দিব্যেন্দু বাধা দিলে, চেষ্টা করি নি মানে! তা বলে তো আর জেনে শুনে একটা worthless-এর হাতে বোনকে তুলে দিতে পারি না। যে নিজের দর বোঝে না, সে আমার বোনের সেন্টিমেন্ট বুঝবে কি ক'রে। বাংলা দেশে একটা ছেলেরও শিরদাঁড়া নেই, বিয়ে করবে!

দিব্যেন্দু হয়তো বলতে পারে ও কথা। শিরদাঁড়া না থাকলে তার মত কেউ নিজের চেষ্টায় এতটা উন্নতি করতে পারে না। এই অফিসের কর্তার পি-এ। তার ওপর আরো হয়তো কত কি!

সুধাংশু আমতা আমতা ক'রে জিগ্যেস করলে, বোনের বিয়েতে কত খরচা কর্তে চাস?

খোলাম কুচি গোনার মত দিব্যেন্দু বললে, পাঁচ-দশ, বিশ হাজার Anything for a right groom!

সুধাংশুর চক্ষু স্থির, বলে কি দিব্যেন্দু। মনে হ'লো ধরাটাকে সরার মত ধরে ফেলে দু'-পায়ে থেঁৎলে কুচি-কুচি করে ভেঙে দিব্যেন্দু সবাইকে ডেকে বলছে, চলে আ-ও কে কত চাও-ও!

এর পর আর কথা চলে না, বা বোনের বিয়ের জন্যে যে দিব্যেন্দুর কোন চাড় নেই একথা বলা যায় না। দশ বিশ হাজার টাকা যে খরচ করবে সে পাত্র বাজিয়ে নেবে বই-কি! হলেই বা বোন।

মনে মনে সুধাংশু ঈর্ষান্বিত হয়। তুলনায় সে আর কি করতে পেরেছে এক চাকরির পর চাকরি বদল করা ছাড়া। দিব্যেন্দু শুধু ভাল চাকরিই করে নি, বোনের বিয়ের জন্য দস্তুর মত টাকা জমিয়েছে এই ক' বছরে। দিব্যেন্দুর বাবা এই সেদিনও কালীঘাটের যাত্রী ধরতেন আর ডালার কমিশনে সংসার চালাতেন। টুইশানি করে দিব্যেন্দু নিজের পড়ার খরচ চালাতো।

সুধাংশু মুখে বললে, আমি দেখবো সুনীতির জন্যে পাত্র।

দিব্যেন্দু খুব বাধিত হলো বলে মনে হ'লো না। এমন একটা ভাব করলে যেন জুতো মেরে বোনের পাত্র যোগাড় করবার সংকল্প তার।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দিব্যেন্দু একটা নীতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলে আধুনিক বাঙালী হিন্দু সমাজের অবনতির সম্বন্ধে। মাথার টিকি থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পচ ধরেছে—ছেলের বাপ, আত্মীয়স্বজনের সব অন্তাজ, ছোট লোক, তার বোনের বিয়ে না হোক, এ সমাজের আর আশা নেই।

এত কথায় দিব্যেন্দুর রাগের ঠিক কারণটা সুধাংশু ধরতে পারে না। অপছন্দ করার মেয়ে নয় সুনীতি, তার ওপর ভাই-এর টাকা দেবার ক্ষমতা আছে, অথচ এতদিন বিয়ে হয় নি। রহস্যের মত মনে হয় সুধাংশুর।

কে জানে এর জন্যে দিব্যেন্দুর টাকার গরম দায়ী কি-না। হয়তো উৎসুক পাত্র পক্ষের সামনে অমনি গরম-গরম বক্তৃতাও করে। কুটুম্বিতা করতে পাত্র পক্ষ স্বভাবতই ভয় পায়।

এমনি একটা যোগ্য ভায়ের অভি-ভাবকত্বে পড়ে সুনীতির অবস্থাটা কি রকম হ'য়েছে ভেবে সুধাংশু বিশেষ খুশী হ'তে পারে না। চোখে না দেখলেও সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের অপ্রকাশ্য বেদনার একটা রূপ সুধাংশুর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরমুখাপেক্ষী সুখের, পুলক আনন্দের, আশা-স্বপ্নের ব্যর্থতা! হয়তো সুনীতির মুখে সে কথা লেখা হ'য়ে গেছে এতদিন।

দিব্যেন্দু বললে, সুনীতিকে আমি বলি—এই নে টাকা, চলে যা থিয়েটার, খেলার মাঠ, যেখানে খুশী তোর। ট্যাক্সি ফিটন তোর যাতে খুশী। বিয়ে না হ'লে কি জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? No....Never

যুক্তি দিয়ে হয়তো কথাটা গ্রাহ্য, সুধাংশুর মন স্বীকার করুক বা না-করুক।

সুধাংশু মুখে বললে, তা বটে। বিয়ে ছাড়া কি মেয়েদের আর কাজ নেই!

দিব্যেন্দু বোধ হয় উৎসাহিত বোধ করলে: বলি পড়া-শোনা করতে। তাতেও ডিসট্রাকসন হ'বে। কি বই চাই, যা চাইবে হাতের কাছে পাবে! বোনের জন্যে করতে কিছু বাকি রাখি নি।

সুধাংশু বিশ্বাস করে। ভাই-এর কর্তব্য দিব্যেন্দু করছে। বলবার কি থাকতে পারে ভেবে পায় না। নেহাৎ নিন্দুক না হলে কোন দোষ ধরতে পারবে না।

হঠাৎ দিব্যেন্দু এমন নীরব হ'য়ে যায় যে সুধাংশু অস্বস্তি বোধ করে। মনে করে প্রসঙ্গটা না তোলাই ভাল ছিল। ওদের সুখ দুঃখ ওদের থাকাই ভাল। ওদের জীবন ওরা যেভাবে পারুক যাপন করুক। সুধাংশুর এ কৌতূহল বোধ হয় অমার্জনীয়।

কথা ঘুরতে সুধাংশু বললে, তা হ'লে ভালই আছিস বল। চাকরিটা খুব বাগিয়েছিস!

দিব্যেন্দু হাসল: কোন মানে হয় না। আজ দু' বছর ধরে বস্ স্তোক দিচ্ছে—মিষ্টার মুখার্জি তোমার একটা ব্যবস্থা করবো! পাঁচশো টাকায় পচে মরতে হবে শেষ পর্যন্ত!

সুধাংশু বিস্ময়ে হতবাক, তার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম বাঙালী ছেলের মুখে পাঁচশো টাকায় পচে মরার খবর শুনলে।

না, নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই। জানা-শোনা কেউ এখানে আসতে চাইলে তাই বলি কেন আসবে, এ আবার একটা জায়গা!—ওর চেয়ে আমেরিকান গুডস্ ফিরি করা ঢের ভাল। বুটন্!

ভাগ্যিস সুধাংশু এতক্ষণে তার এখানে আসার হেতুটা প্রকাশ করে নি। শুনলে দিব্যেন্দু না জানি কি বলতো মুখের ওপর—ইন্টারভিউ পাওয়ার চেয়েও তা পরিতাপের হ'তো। মানে মানে চেপে গেছে ভালই করেছে সে।

ভয় ভয়ে সুধাংশু বন্ধুর কাছে বিদায় নিলে: আজ উঠি। শিগগীর একদিন যাবো তোর ওখানে। ঐ তো তেল-কলটার ওপর দোতলা বাড়ী? ঠিক আছে।

দিব্যেন্দু মাথা নেড়ে সিগারেটের টিনটা বন্ধুর সামনে এগিয়ে ধরলে...।

দিন দুয়েক পরে একদিন সন্ধেবেলায় সুধাংশু সত্যি সত্যি দিব্যেন্দুর বাড়ী এল। রাস্তা থেকে সোজা ওপরে উঠে এসে কড়া নাড়লো।

একটা কৌতুককরতায় দোরের সামনে অপেক্ষা করলে—দরজা খুলে যে কেউ দেখবে সেই অবাক হবে, এতদিন পরে সুধাংশুকে পথ ভুলে এদিকে আসতে দেখে। এ বাড়ীর সিঁড়ির ঘুলঘুলি জানালা দিয়ে নীচে খোলার চালের বস্তিটা এখনো হয়তো চেষ্টা করলে দেখা যায়। একটু ওলোট-পালট হয়েছে দৃশ্যটার—আগে ঐ খোলার চালের বস্তি থেকে চোখ তুলে এদিকে তাকাতে হতো (নতুন বাড়ীটা দক্ষিণটা হাত করে নিয়েছে), এখন তলার দিকে নজর দিলে তবে বস্তিটা দেখা যায়। গা-ছড়া গলিটা পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে, গ্যাসপোষ্টটা নেড়া-নেড়া।

সুধাংশু বার কয়েক রুমালে মুখ মুছে নিলে। ওপরে সিঁড়ি পথটা বড় নির্জন, এখন তাকে এভাবে দেখলে যে-কেউ সন্দেহ করতে পারে। নীচে তেলচিটে

শব্দটা বন্ধ হয়ে অস্বস্তিটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সুধাংশু কড়ায় ঝাঁকানি দিলে।

দিব্যেন্দুই দরজা খুললে, আরে, তুই। আয়, আয়।

ঢুকেই বসবার ঘর। দিব্যেন্দু চাল মারে নি। দেখে শুনে সুধাংশুর বিশ্বাস হয় দিব্যেন্দুর সুসময়ের কথা। আলমারী ভর্তি চকচকে নতুন বই, টেবিলে ফুলপাতা কাটা কভার, ফুলদানিতে শুকনো রজনী-গন্ধা। চিনে মাটির এ্যাশ-ট্রে!

এদিক ওদিক চেয়ে সুধাংশু বললে, কত ভাড়া দিস্?

অন্দরের দিকে পর্দাটা ফেলে দিয়ে এসে দিব্যেন্দু বললে, আশি টাকা! প্লাস পাঁচশো টাকা সেলামী!

সুধাংশু বিস্ময় প্রকাশ করলে, ইস-স্! ক'খানা ঘর?

ওনলি থ্রি! একেবারে চোর, গলাকাটা! বাড়ী-ঘর আছে নাকি তোর সন্ধানে?

সুধাংশু অক্ষমতার হাসি হাসলে নিঃশব্দে। একটা অবাস্তব কথা অসংখ্য মুখে শুনে শুনে ঘোড়ার ডিমের মত অবিশ্বাস্য।

দিব্যেন্দু বললে, একটা প্রবলেম! ক'বছর কত লোককে যে বলেছি তার ঠিক নেই! দেখিস্ যদি পাস।

সুধাংশু মাথা নাড়লে। বললে, দক্ষিণটা বেশ খোলা!

দিব্যেন্দু বললে, বস্তিটার জন্যে। ভাগ্যিস্ মাথা তোলে নি।

তোরই অসুবিধা! টাকায় কিছুটা তবু উসুল হয়। সুধাংশু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাইলে।

দিব্যেন্দু কি বুঝলো কে জানে, বললে তা যা বলেছিস্! পাথার দরকার হয় না।

সুধাংশু শ্লেষ করলে, একটা খরচ তো বেঁচেছে!

দিব্যেন্দু চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কাটে। দেখে মনে হয় না, উভয়ে উভয়েরই সান্নিধ্যে বিশেষ সুখী হয়েছে। অনভিপ্রেত না হলেও আগ্রহশীল নয় এই সাক্ষাৎকার। ডেকে এনে অপমান করার মত মনে হয় সুধাংশুর। কথা কইবার যদি কিছু নাই থাকে তা হলে বাড়িতে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিল কেন? আশ্চর্য লাগে দিব্যেন্দুর ব্যবহারটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর সুধাংশু বললে, আজ উঠি।

দিব্যেন্দু কেমন যেন এক ধরনের গম্ভীর হ'য়ে বসে আছে। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। সুধাংশু আবার বললে আজ চললুম! একদিন আমার ওখানে আসিস্!

হঠাৎ যেন দিব্যেন্দুর খেয়াল হয়েছে সুপ্তোত্থিতের মত বললে, এরি মধ্যে! চা খাবি না?

সুধাংশু বললে, না থাক, আর একদিন খাওয়া যাবে। দেখে তো গেলুম বাসা।

দিব্যেন্দু জেদ করলে, না, বস্, চা আনাচ্ছি। বলেই চট করে পর্দা ঠেলে পাশের ঘরে চলে গেল! সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপ-ডিস্ হাতে করে বেরিয়ে এসে ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গিতে বললে, এক মিনিট।

ঘর থেকে দিব্যেন্দু বেরিয়ে গেল। আগাগোড়া ব্যাপারটা সুধাংশুর রহস্যের মত মনে হ'লো। হঠাৎ কাপ-ডিস্ হাতে ক'রে দিব্যেন্দু গেল কোথায়? সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে কি নীচের দোকান থেকে বন্ধুর জন্যে চা আনাতে গেল? বাড়িতে অতিথির জন্যে চা হয় না সময়—অসময়ে? আশ্চর্য! দিব্যেন্দুর মা তো আছেন? সুনীতিও তো আছে? এক কাপ চা করে দেবার সৌজন্য বোধ করে না।

একলা-একলা বসে থেকে সুধাংশুর অদ্ভুত মনে হয় এদের অবস্থান্তর। নীচ থেকে ওপরে উঠে মানুষগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে বাসা বদলে আসবাবপত্র তছরূপ হওয়ার মত। গোটা জিনিস ভেঙে যাওয়ার মত।

সুনীতিও ভুলে গেল? আজ না হয় দেখা নেই, কিন্তু এককালে তো কত ঘনিষ্ঠতা ছিল? এক পরিবারের লোকের মত সুধাংশু কত মেলামেশা করেছে। ওদের সুখ দুঃখের স্পন্দন সাগ্রহে, সমবেদনার সঙ্গে অনুভব করেছে। এমনও দিন গেছে যখন এক সঙ্গে বসে শাকান্ন হাসি মুখে খেয়েছে। ঘরের লোকের মত সুধাংশুকে দিব্যেন্দুর পরিবারের সকলে মনে করতো।

আজ তাই এভাবে বাইরের লোকের মত বসে থাকতে সুধাংশুর অভিমান হয়। ব্যবহারটা ঠিক উপেক্ষা কি-না বুঝতে পারে না। এতদিন পরে সামনে আসতে সুনীতির যদিও লজ্জা হয়, দিব্যেন্দুর মার'ও কি সংকোচ হবে? নিশ্চয়ই এ'রা আজকাল নিজেদের ভিন্ন জগতের জীব বলে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। ছেলের পয়সায় মা'র মাথা ঘুরে গেছে।

সুধাংশুর ভাল লাগে না এভাবে চোরের মত অপেক্ষা করতে, একবার ভাবলে, চুপি চুপি সরে পড়ে। উঠলোও সুধাংশু। দোরের চৌকাঠে পা দিতেই হঠাৎ বিকট একটা শব্দ পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত অসাড় ক'রে দিলে। সুধাংশুর গা বমি বমি ক'রে উঠলো। টলতে টলতে চেয়ারে এসে বসলে। ভেতরের দিকে পর্দাটা নিঃসাড় গলায় দড়ির মত ঝুলছে। গোঁ গোঁ করে শব্দটা এখনো হচ্ছে—সুধাংশুর মনে হচ্ছে তার মাথার ওপর কে যেন তুরপুন বসিয়ে দিয়েছে। নীচের তলায় ইলেকট্রিকের ঘানিটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সরিষা নিঃসৃত খাঁটি তৈলের কল—বেরি বেরি হয় না, দি মডেল ঘানি।

তবুও সুধাংশু দু তিনটে সম্বন্ধ নিয়ে গিয়েছিল সুনীতির জন্যে। নাম ঠিকানা পরিচয় রেখে এসেছিল দিব্যেন্দুর কাছে। বয়স্থা মেয়ের উপযুক্ত ঘর বর। আশ্চর্য কোনোটাই দিব্যেন্দুর পছন্দ হয় নি। সেই এক কথা, রটন! এ সম্বন্ধের আশা নেই। ছেলের বিয়েতে বাপের দালালি অসহ্য। বিয়ে না ব্যবসা! আরো অনেক টিটকিরি দিব্যেন্দু করেছিল।

সুধাংশু ঠিক বুঝতে পারে না দিব্যেন্দুর মনোগত ভাবটা কি, বোনের বিয়ে দেবে, না, সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করবে? কি চায় ও? পাগল না উজবুক?

বিরক্ত হ'য়ে সুধাংশু হাল ছেড়ে দিলে। উপযাচক হ'য়ে বক্তৃতা শুনে লাভ কি? আর দিব্যেন্দুর যখন গা নেই তখন তারই বা এত আগ্রহ কেন! ওর বোনকে নিয়ে

ও যা খুশী করুক, কার কি! যথেষ্ট বন্ধুকৃত্য হয়েছে।

সুধাংশু আর কোন খোঁজ-খবর নেয় নি। একটা সাময়িক ঘটনা বলে যেন ব্যাপারটা ভুলে গেছে। অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মত এ-ও এক অভিজ্ঞতা! মন্দ কি! কিন্তু এ্যান্ডারসন হাউসের কথা সুধাংশু ভোলে নি। ইন্টারভিউ-এর ফলাফল এখনো জানতে পারে নি।

সেদিন বন্ধুরে মনে হয়েছিল, বোর্ড ইম্প্রেসড হয়েছিল। চাকরিটা তার হ'লেও হ'তে পারে।

দেখতে দেখতে তিন চার মাস কেটেও গেছে। একদিন সুধাংশু ব্যাপারটা 'দেখাই যাক্-না' ভাব নিয়ে আলীপুরে হাজির হ'লো। হয় হবে না-হয় নাই হ'বে।

খবর খুব আশাপ্রদ নয়, লোক একজন নেওয়া হ'য়ে গেছে। তবে নেকস্‌ট চ্যান্সে' তার হ'তে পারে। সুধাংশু মনোনীত হয়েছে।

ফেরবার সময় কি মনে ক'রে সুধাংশু দিব্যেন্দুর ঘরে উঁকি মারলে। খুব ব্যস্ত মনে হ'লো তাকে।

ঘরে ঢুকে সুধাংশু বললে, এদিকে এসেছিলুম, ভাবলুম একবার—

দিব্যেন্দু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো : সো কাইন্ড অফ্ ইউ! তারপর—

ভাল। তোর খবর কি? সুধাংশু চারদিক দেখে নিলে।

একই। সেই যে ডুব দিলি আর দেখা নেই। দিব্যেন্দু মাথা দোলাতে লাগল।

বন্ধুর কথাগুলো নির্লজ্জের মত মনে হ'লো সুধাংশুর। বোধ হয় এত বেহায়া বলেই পুরুত বামুনের ছেলে হ'য়েও উন্নতি করেছে। সুধাংশু চুপ করে রইল।

দিব্যেন্দু বললে, ভাল কথা, সুনীতির একটা পাত্র যোগাড় করে দে' না! খেতে পরতে পায়, স্বাস্থ্যটা ভাল—

নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে এ তাকেও ছাড়িয়ে যায়। ভুলে গেছে নাকি মাস কয়েক আগের ব্যাপারটা—কত ছুটো-ছুটি করেছে সুধাংশু নিঃস্বার্থভাবে?

উত্তর না দিয়ে সুধাংশুর ইচ্ছে করলো টেনে একটা চড় মারে দিব্যেন্দুর গালে, বেহায়া কোথাকার!

কিন্তু নির্লজ্জতার চরম দেখালে দিব্যেন্দু নিজের বিয়ের খবরটা দিয়ে— আমি বিয়ে করেচি—তাড়াতাড়িতে বন্ধু-বান্ধব কাউকে বলা হয় নি, একদিন আয় না!

সুধাংশু হতবাক, কি বলবে ভেবে পেলে না। গা-টা তার রি-রি করতে লাগল।

দিব্যেন্দু বলতে লাগল বড্ড ধরেছিল ওরা। বললুম, বোনের বিয়েটা হ'য়ে যাক, না, তাদের আর তর সয় না। বাধ্য হয়ে—

সত্যিকারের কোন আগ্রহ আর সুধাংশুর নেই। কোন লাভ নেই আর সুনীতির জন্যে দুঃখু করে।

বেহায়ার মত হেসে দিব্যেন্দু আবার জিগ্যেস করলে, খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে, না?

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে সুধাংশু বন্ধুর দেওয়া সিগারেট টানতে লাগলো আলগোছে। মুখের ওপর কিছু বলাটা বোধ হয় শোভন হবে না।

দিব্যেন্দুর কর্তব্য-জ্ঞান মাথা চাড়া দিয়েছে। বললে, দেখিস্ না সুবিধে মত টাকা আমি আট-দশ হাজারই খরচ করবো!

একবার সুধাংশুর ইচ্ছে করল, জিগ্যেস করে, দিব্যেন্দু কোথায় বিয়ে করেছে—মেয়ে পক্ষ কোন্ সমাজের! দেওয়া-নেওয়ার কথা তাতে ছিল কি-না!

খুব একটা আগ্রহ আজ সুধাংশু দেখালে না। শুনতে হয় তাই যেন শুনে যাচ্ছে বন্ধুর কথা। দিব্যেন্দু কিন্তু না-ছোড় বান্দা, বোনের বিয়ের জন্যে তার যেন আর ঘুম হচ্ছে না। দশ হাজারেও যদি না কুলোয় পনের হাজার সে খরচ করতে রাজী আছে। তবে হ্যাঁ, পাত্রও তেমনি হওয়া চাই—শিরদাঁড়াওলা আস্ত মানুষ। বাপের কথাও শুনবে, মামার কথাও শুনবে আবার মা'র কথাও শুনবে, এমনি নয়' জানিস তো আমার বোন বরাবর কিভাবে মানুষ হ'য়ে এসেছে। সি ইজ এ 'বিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কোনদিন তার ইচ্ছেয় আমরা কেউ হাত দিই নি!

সুধাংশু হাঁ-না কিছু বললে না।

দিব্যেন্দু বলতে লাগল, নিজে বিয়ে করে বড় মুশকিলে পড়ে গেছি, চার গুণ খরচ বেড়ে গেছে! এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে—দেখিস একটা খোঁজ খবর করে। ভাল কথা, সেই যে সেই ছেলেটি কোন অফিসের একাউনটেন্ট...হাতে আছে নাকি এখনো? সত্যি বলতে কি আমি কোন খোঁজই নিই নি তার! দেখ্ না যদি থাকে।

সুধাংশু গম্ভীর গলায় বললে, দেখবো

আজ বন্ধুর খাতিরটা এক ধাপ ওপরে উঠেছে। প্রচুর খাবার আনিয়েছে দিব্যেন্দু। চাপরাশী ঢুকতে বলল, নে খেয়ে নে!

সুধাংশু বললে, মানে? হঠাৎ? দিব্যেন্দু মিটি মিটি হাসলে, আপত্তি আছে?

হাত ধরে সুধাংশু বললে, না আপত্তির আর কি? কিন্তু ঘুষ নয় তো?

দিব্যেন্দু প্রতিবাদ করলে : ঘুষ! ঘুষ দিয়ে দিব্যেন্দু মুখুজ্জে কোন কাজ করে না।

যথা লাভ হিসেবে সুধাংশু নিঃশব্দে খাবারগুলো গলাধঃকরণ করতে লাগল। আর ঘুষ হলেই বা তার আপত্তির কি সে তো কোন লেখাপড়া করে দিচ্ছে না যে সুনীতির মনোমত পাত্র সে যোগাড় করে দেবে!

আজ দিব্যেন্দুকে সুধাংশুর অন্যরকম মনে হচ্ছে। নিজের কাজের জন্যে সে যেন কিছুটা অপ্রতিভ, দ্বিধাগ্রস্ত বন্ধুর সামনে!

আপ্যায়নের পর কিছুক্ষণ বসে, সুধাংশু উঠে দাঁড়াল, চললুম।

দিব্যেন্দু সিগারেট দিয়ে বললে, আর একদিন আয় না আমার ওখানে, তোকে সব বলবো।

হঠাৎ দিব্যেন্দুর ভাবান্তরটা সুধাংশুর বোধগম্য হয় না। কি এমন অপরাধ করেছে যে, বুঝিয়ে বলবার দরকার করবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুধাংশু মুখে বললে, আসব। সন্ধ্যেবেলায় থাকিস তো?

বন্ধুকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে দিব্যেন্দু বললে, অফিস ছাড়া সব সময়।

সিঁড়ির মাথায় এসে দিব্যেন্দু দাঁড়ালে। কি যেন এতক্ষণ সে বলতে ভুলে গিয়েছিল, হঠাৎ বললে, বড্ড খরচ বেড়েচে ভাই, আর পারি না!... এখানেও আর কোন আশা নেই, চেয়ারম্যান বদলী হয়ে যাচ্ছে!

সুধাংশুর বিশেষ আগ্রহ নেই এ খবরে। দু' ধাপ সে নেমে এল। মিছিমিছি সময় নষ্ট।

দিব্যেন্দু বন্ধুকে শুনিয়ে বললে, কত টাকা প্রভিডেন্ট ফন্ড-এ দিতে হয় জানিস?

সুধাংশুর জানবার কথা নয়। তবু জানবার জন্যে নামতে নামতে থমকে দাঁড়াল।

বড় আতান্তরে পড়েছে দিব্যেন্দু, বললে, একশ' টাকা...বিয়ে করেচি ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে তো!

সুধাংশু আর দাঁড়ালে না, তর তর করে নেমে গেল। স্বার্থপরের একশেষ!

সুধাংশুর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, বোনের ভবিষ্যতের ভাবনাটা আগে ভাব হামবাগ, কোথাকার!

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দিব্যেন্দু বললে, আসচিস তো?

কর্মব্যস্ত অফিস চত্বরে শব্দটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল—নিম্নগামী সোপান-শ্রেণীর মুখ-গোঁজ! হঠাৎ দিব্যেন্দুর পা দুটো যেন কেঁপে উঠলো থর থর করে— তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লে বোধ হয় বাঁচা যাবে না। মাঝপথেই দম আটকে যাবে।...

বন্ধুর বউ দেখতে কি, সুনীতির একটা সম্বন্ধ নিয়ে সেদিন সুধাংশু আবার দিব্যেন্দুর বাসায় এল। অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে সে খানিকক্ষণ। কড়া নাড়ার আগে ইতস্তত করলে কিছুক্ষণ। দিব্যেন্দুর বাড়ীতে এখন নতুন মানুষ এসেছে। আপনা থেকেই কিছুটা সঙ্কোচ আসে!

আস্তে আস্তে বার দুই কড়াটা নাড়লে সুধাংশু আলগোছে—কেউ যদি শুনতে পেয়ে খুলে দেয় তো ভালই, নচেৎ নিজের আগমনবার্তাটা সশব্দে বিঘোষিত করবার তার তেমন ইচ্ছে নেই। অপেক্ষা করতে পারে সে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ।

কিন্তু মিনিট পাঁচেকেও ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সিঁড়ির অন্ধকারে ভূতের মত অপেক্ষা করে লাভ নেই—সুধাংশু জোরে কড়ায় ঝাঁকানি দিলে।

দরজা খুলতে সুধাংশু সংকোচে পাশে

সরে দাঁড়াল। সামনে নারী মূর্তি, নীরব। একটা অপ্রস্তুত ভাব উভয়ের মাঝখানে থমথমে। সুধাংশু বললে, দিব্যেন্দু আছে?

সুনীতি অস্ফুটে বললে, আসুন!

আহ্বানকারিণীকে সুধাংশু হয়তো চিনতে পেরেছে, হয়তো চিনতে পারেনি। কণ্ঠস্বরের হৃদ্যতায় কেমন যেন সে থতমত খেয়ে গেছে।

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে সুনীতি সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, আসুন, ভেতরে আসুন! দাঁড়িয়ে কেন?

সুধাংশু এতক্ষণে যেন সপ্রতিভ হলো ঃ দাদা নেই?

সুনীতি মাথা নাড়লে। দিব্যেন্দু বাড়ী নেই।

সুধাংশু বললে, বলো আমি এসেছিলুম।

সুনীতি জিগ্যেস করলে, বসবেন না? হয়তো দাদা এক্ষুনি ফিরতে পারে। আসুন না!

কি মনে হলো সুধাংশুর, বললে, চল বসি।

ভেতরে ঢুকে সুধাংশু স্পষ্ট দেখলে সুনীতিকে। মুখাবয়বের জন্যেই কেবল চেনা যায়। বয়েসের স্বাভাবিক সৌন্দর্যটা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে—অনেকদিনের ফোটা ফুল বৃন্তচ্যুত না-হওয়ার মত। বিষণ্ণ কুসুমের মত।

সুধাংশু জিগ্যেস করলে, ভাল আছ? ম্লান হেসে সুনীতি বললে, হ্যাঁ। আপনি ভাল?

উত্তর দিয়ে আর কিছু হয়তো জিগ্যেস করা যাবে না. সুধাংশু চুপ করে রইল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয় তার।

সুনীতিরও কি কিছু মনে হচ্ছে দাদার বন্ধুর সামনে? সংকোচ ছাড়া নিজেকে নিয়ে কোন লজ্জা?

তবু এই নীরবতায় একটা হৃদ্যতার, আত্মীয়তার ভাব বিনিময় যেন হয় উভয়ের মধ্যে. মাঝে মাঝে চোখ তুলে সুধাংশু সুনীতির আপাদমস্তক লক্ষ্য করে। সুনীতি অপরাধীর মত প্রতীক্ষা করে।

সুধাংশু জিগ্যেস করলে, দাদা কোথায় গেছে?

সুনীতি উত্তরটার জন্যে যেন নিজের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য বোধ করলে। মুহূর্তের জন্যে হলেও সুধাংশুর দৃষ্টি এড়াল না। ভ্রূ-কুঞ্চনে কি ফুটেছে?

সুধাংশু আবার জিগ্যেস করলে, ফিরবে তো!

একটা নিষিদ্ধ কথা যেন অপরিচিত কারো সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে, সুনীতির কণ্ঠ বোধ হয় কাঁপলো ঃ দাদার শ্বশুর বাড়ী থেকে গাড়ি এসেছিল, বৌদিকে নিয়ে হয়তো কোথাও—

প্রকম্পিত কণ্ঠ অসহায় দৃষ্টিতে বড় অসহায় মনে হলো। সুধাংশু সুনীতির মুখের দিকে তাকাতে পারলে না।

সুধাংশু অন্য কথা পাড়লে. মা কোথায়?

মা মন্দিরে গেছেন। সুনীতির গলা কাঁপছে।

তুমি তা হলে একলা আছ? সুধাংশু সুনীতির সাহসের তারিফ করে যেন।

একলাই তো থাকি! হাসতে চেষ্টা করে সুনীতি বললে।

ঘরোয়া হতে সুধাংশু জিগ্যেস করলে. আজকাল গানটান গাও না?

হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল, সুনীতি বললে, শুনবে কে?

কেন, নিজে!

সব জিনিস কি নিজের জন্যে হয়?

প্রশ্নটায় যেন কিছু অভিযোগ আছে, সুধাংশু চেয়ে দেখলে সুনীতির চোখ দুটো কেমন নিষ্প্রভ।

তা হয় না, তা বলে ছাড়তে হবে? বেশ তো গাইতে!

সুনীতি নিরুত্তর। মনে হচ্ছে, দাদার বন্ধুর এই অহেতুক আগ্রহে সে কৌতুক অনুভব করছে। এসব আলাপের কোন লাভ নেই। হয়তো দুঃখ বাড়ে আরো।

পর্দাতে ছবি-আঁটার মত স্থির, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতি। সুধাংশুর কথাও ফুরিয়ে গেছে। অনেক কথা জিগ্যেস করবার ছিল, সব যেন গোলমাল হয়ে গেল, সুযোগ মত বলাও হলো না কিছু। কি জানি কেন সুধাংশুর মনে হলো দিব্যেন্দুর অবর্তমানে কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কোন প্রশ্ন করাই অশোভন। উপযাচক উপচি-কীর্ষার কোন মূল্য নেই। পক্ষান্তরে অপরাধ বাড়ায়।

সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। বললে, আজ চললুম।

সুনীতিরও বোধ হয় কিছু বলবার নেই। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে সদর দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে।

সুধাংশু পিছন ফিরলে।

আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে সুনীতি যেন নিজেকে শুনিয়ে অস্ফুটে বললে, কেন মিথ্যে আপনারা চেষ্ট করচেন—আমি ভালই আছি!

ফিরে সুধাংশু দাঁড়াল, এটা নিষেধ না উপরোধ দিব্যেন্দুর বোনের ভাল থাকার জন্যে। এ কথা বলার মানে কি!

কিন্তু সুধাংশু মুখ ফুটে কিছু জিগ্যেস করতে পারলে না। ওপারে অন্ধকার আধভেজান দরজার ফাঁকে দুটো সজল চোখ স্পষ্ট দেখা গেল মুহূর্তের জন্যে। কে জানে সুনীতি কি বলতে চাইলে, কি বোঝাতে চাইলে? তার সুদীর্ঘ কুমারী জীবনে প্রকৃত কোন দুঃখই নেই বোধ হয়। সুধাংশুর মাথা-ব্যথার কোন মানে হয় না।...

হঠাৎ একদিন ছ' মাস পরে সুধাংশুর ইণ্টারভিউ-এর জবাব এল। সুধাংশুকে চাকরি দেবার জন্যে স্মরণ করেছে! খুশী হলেও আর যেন চাকরিটার ওপর তেমন লোভ নেই সুধাংশুর। এতদিন না হয়ে যখন চলেছে, একেবারে না হলে যেন ক্ষতি ছিল না। তার ওপর দিব্যেন্দুর অফিস, এবার দু'বেলা হামবাগটার লম্বা লম্বা কথা শুনতে হবে।

চাকরিটা গ্রহণ করা সম্বন্ধে সুধাংশু অনেক ভাবলে, শেষ পর্যন্ত নেওয়াই ঠিক করলে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলাই ভাল। বলা কি যায় একদিন দিব্যেন্দুর মত সে উচ্চপদে আসীন হতে পারে। শিক্ষা-দীক্ষা তার কম কি!

নতুন অফিসের হালচাল জানবার জন্যে সুধাংশু সোজা দিব্যেন্দুর ঘরে উপস্থিত হলো। কিন্তু দরজা ঠেলেই সুধাংশু পিছিয়ে এল। দিব্যেন্দুর জায়গায় অন্য একজন।

শব্দ পেয়ে চোখ তুলে দিব্যেন্দুর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিটি বললেন, কাকে চাই?

সুধাংশু অপ্রস্তুতের মত আমতা আমতা করলে, মিস্টার মুখার্জি—

ও, বলে' ভদ্রলোক বেল টিপলেন। চাপরাশী আসতে বললেন, এঁকে ডি-পি'র ঘরে নিয়ে যাও।

মানে? সুধাংশু ইতস্তত করলে। ভদ্রলোক বললেন, যান ওর সঙ্গে মিস্টার মুখার্জির কাছে নিয়ে যাবে।

চাপরাশী বললে, আইয়ে!

বেরিয়ে সুধাংশু ঢোক গিলে চপারাশীকে জিগ্যেস করলে, ডি-পি কোন হ্যায়?

সুধাংশুর এতবড় অজ্ঞতায় চাপরাশী মুচকি হাসলে। বললে, বড় সাব আছেন, ডিরেকটার সাহেব!

এতক্ষণে দিব্যেন্দুর নতুন পদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারে—ডিরেকটার অফ পারসোনেল! দিব্যেন্দু করেছে কি! পাঁচশো থেকে একেবারে বারশো! বাহাদুর!

সুধাংশুর পা আর ওঠে না। স্পষ্ট চোখের ওপর সে দেখতে পায় দিব্যেন্দু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে, এ সমাজের কোন পদার্থ নেই—বোনের একটা যোগ্য পাত্র পেলুম না! সব রটন্!

এখানে চাকরি করার চেয়ে মানে মানে সরে পড়াই যেন ভাল। ঐ দিব্যেন্দু এ অফিসের কর্তা, নিয়োগ-বদলীর দণ্ডমুণ্ড!

বড় সাহেবের দরজার সামনে এসে সুধাংশু দাঁড়াল, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একটা সন্দেহ তার মাথায় খেলে গেল—দিব্যেন্দুর এই পদোন্নতিতে নারী-রূপ-রস-সুরের কোন পরোক্ষ হাত নেই তো? মিস্টার শিবলিঙ্গাম কি দিব্যেন্দুকে এমনি এমনি সুনজরে দেখেছিল? কিসের বিনিময়ে এ সমৃদ্ধি দিব্যেন্দুর? সেদিন সুনীতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এর যেন আভাস সুধাংশু পেয়েছিল! আপনারা মিথ্যে চেষ্টা করছেন, আমি ভালই আছি'—মানে কি? সুধাংশুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সরীসৃপ স্পর্শের অনুভূতি শিরশির করে ওঠে।

ডিরেকটার সাহেবের কামরার দরজায় একটা পাল্লা ফাঁক করে ধরে চাপরাশীটা তখনো অপেক্ষা করে।

ঠিক এই মুহূর্তে বন্ধুকে সম্বর্ধনা করা উচিত হবে কিনা ভেবে ঠিক না করতে পেরেই বোধ হয় সুধাংশু পা পা পিছিয়ে যায়। ভয়ে।

নিধিরামের বেসাতি

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

চৈতালীর আবাদ শেষ করিয়া নিধিরাম কলিকাতায় আসিত, তাহার পর বর্ষা নামিতেই দেশে ফিরিত, এই ছয়টি মাস দেখিতাম একচক্ষু নিধিরাম পাঠক মাথায় একটি ছোট লাল টিনের বাক্স চাপাইয়া হাঁকিয়া যাইতেছে "চাই—ই—চীনা—আ—সিঁদুর।" আর তাহার পশ্চাতে নগ্নকায় শিশুর দল বাদল মিত্রের গলির তন্দ্রালস মধ্যাহ্নকে সচকিত করিয়া চিৎকার করিতেছে, "চাই-ই কানা ইঁদুর।" কবে ছন্দরসিক কোন শিশু কবি সিন্দুরওয়ালা নিধিরামের এই অপূর্ব স্তববাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না, সম্ভবতঃ স্বয়ং কবিরও সেকথা মনে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বৎসর নব নব শিশুকণ্ঠ একই ভাষায় নিধিরামকে অভ্যর্থনা করিয়া আসিতেছিল। এই বিরূপ সম্বর্ধনায় নিধিরাম কোনও দিন রাগ করে নাই, প্রত্যুত্তরে মূষিকের অনুকরণে শব্দ করিয়া তাহার শিশুবন্ধুগণকে খুসী করিয়াছে, দেখিয়াছি।

বিশ বৎসর ধরিয়া এইরূপেই চলিতেছিল, সহসা একদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া নিধিরাম আশ্চর্য হইয়া গেল। গলির মধ্যে এক স্থানে গুটিকয়েক শিশু জটলা করিতেছিল, নিধিরাম সেখানে আসিয়া গলার স্বর উঁচু করিয়া হাঁকিল, "চাই-ই-চীনা-আ-সিঁদুর!" দূর হইতে দুই-একটি কণ্ঠে পরিচিত প্রতিধ্বনি শোনা গেল বটে, কিন্তু প্রত্যহের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিল না।

শিশুর দল নীরব পরম সম্ভ্রমের সহিত একজনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। নিধিরাম নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা কহিতেছিল একটি বালিকা। কোমরে নীলাম্বরী শাড়ীর অঞ্চল জড়াইয়া হাত নাড়িয়া সে প্রতিপন্ন করিতেছিল যে, কানাকে কানা এবং খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই এবং যদি কেহ বলে তবে তাহার সহিত বন্ধার জন্মের মত আড়ি এবং পুতুলের বিবাহে সে তাহাকে কদাচ নিমন্ত্রণ করিবে না। সমাজ-চ্যুতির এই নিদারুণ শাস্তির ভয়ে পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াও শিশুর দল আজ নীরব হইয়াছিল, নিধিরাম তাহা বুঝিল এবং তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যায় ফিরিবার পথে গলির মোড়ে নীলবাড়ির দরজায় দ্বিপ্রহরের শিশুসভার এই নেত্রীটির সহিত নিধিরামের সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। নিধিরামকে দেখিয়াই বিনা ভূমিকায় বালিকা কহিল, "তুমি আর জন্মে কানাকে কানা বলেছিলে, সিঁদুরওয়ালা!" বলাবাহুল্য জন্মান্তরের কথা নিধিরামের স্মরণ ছিল না, শুধু এই নবাগতার সহিত আলাপ জমাইবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী"

"মা বলেছে তাই এ-জন্মে তুমি কানা হয়েছ, না?" বলিয়াই সে এক প্রচণ্ড অভিশপ্ত-বাণী উচ্চারণ করিল, "যদু মধু ছোটকু নিমাই সবাই আর জন্মে কানা হবে। তোমায় খেপায় কিনা।"

নিধিরাম দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "এসব কথা বলতে নাই মা লক্ষ্মী।" "মা লক্ষ্মী" এইবার রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "বলব, একশোবার বলব। তারা কেন তোমাক কানা বলবে?" বলিয়াই একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি বামুন?"

নিধিরাম কহিল, "হ্যাঁ।"

প্রশ্নকর্ত্রীর চক্ষে সংশয় ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "দেখি পৈতে?"

নিধিরাম ছিন্ন মেরজাইয়ের মধ্য হইতে মলিন উপবীতগুচ্ছ বাহির করিয়া দেখাইল। বালিকা কহিল, "কাল রাধুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি মন্তর পড়াবে?"

নিধিরাম তৎক্ষণাৎ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া কহিল, "পড়াব।"

"আমরা কিন্তু গরীব মানুষ, দক্ষিণে দিতে পারব না, বুঝলে?" বলিয়া পরম গাম্ভীর্যের সহিত বালিকা কহিল, "এটি পার হলেই বাঁচি। আর দুটিকে একরকমে বিয়ে দিয়েছি। মাগো, ছেলে মানুষ করা যে কি কষ্ট!" এই বলিয়া পুতুলের ডালাখানি নিধিরামের হাতে দিয়া সে কহিল, "দেখছ, মেয়ের আমার মুখখানা রোদে শুকিয়ে গেছে। এখন আবার জল দিয়ে রাখতে হবে নৈলে পাড়ার লোকে বৌ দেখবার সময় খোঁটা দিয়ে বলবে, বৌ কুচ্ছিৎ।" এমন সময় ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "সরু!"

"মাগো মা! দেখছ? দুদণ্ড আপন ছেলেমেয়ের কথা কইবার যো নেই?" বলিয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। পুতুলের ডালা হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "তবে আসি মা লক্ষ্মী!"

"আমি লক্ষ্মী নই গো, সরস্বতী। আমাকে মা-সরস্বতী বলে ডাকবে, বুঝলে?" এই বলিয়া বালিকা ভিতরে ঢুকিল। নিধিরামের সহিত সরস্বতীর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল এই প্রকারে।

॥ ২ ॥

এই মুখরা মেয়েটিকে সহসা নিধিরামের অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কালীঘাটের পুতুল, গালার চুড়ী, দু-এক টুকরা জরির কাপড় নিধিরামের সিঁদুরের বাকসে আশ্রয় পাইয়া অবশেষে সরস্বতীর খেলাঘরে স্থানলাভ করিতে লাগিল। প্রত্যহের আনন্দহীন একঘেয়ে কেনাবেচার মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে দুদণ্ড কথা কহিয়া নিধিরাম আনন্দ পাইত, সময় সময় নীল বাড়ির জানালার রোয়াকে সিঁদুরের পেটরা কোলের উপর রাখিয়া নিধিরাম সরস্বতীর সহিত তাহার মাটির ছেলেমেয়েদের সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাইয়া দিয়াছে। ভিন্ন পল্লীতে গিয়া বেসাতি বেচিলে দশটা পয়সা রোজগার হয়, একথা মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে বটে, তথাপি তাহার প্রগল্‌ভা বান্ধবীর কথার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ সেকথাগুলি একান্তই নিরর্থক এবং কোনোদিন নিধিরামের কোনও কাজে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল না।

বর্ষা নামিলে নিধিরাম দেশে গেল।

সেবার দেশে মারাত্মক রকমের একটা ব্যাধির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার আক্রমণ হইতে নিধিরামও নিষ্কৃতি পাইল না। মাস ছয় জ্বরে ভুগিয়া একদিন মাঘের দ্বিপ্রহরে নিধিরাম তাহার সিন্দুরের বাকসটি মাথায় করিয়া সরস্বতীর বাড়ীর দরজায় আসিয়া হাঁকিল, 'চাই-চীনা-আ-সিঁদুর।" আগেকার মত আর কেহ দুড়দাড় করিয়া নামিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল না, দ্বিতীয়বার হাঁকিতে নিচের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া গেল। জানালায় সরস্বতীকে দেখিয়াই এক গাল হাসিয়া নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ো বেটার কথা মনে ছিল, সরু-মা?" সরস্বতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। নিধিরাম আশ্চর্য হইল, সরস্বতী কথা না বলিয়া থাকিবার পাত্রী নহে। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেমেয়ে ভাল আছে তো, সরু-মা?" এইবার সরস্বতী কথা কহিল, "সে সব আমি রাধুকে বিলিয়ে দিয়েছি।" ইহার
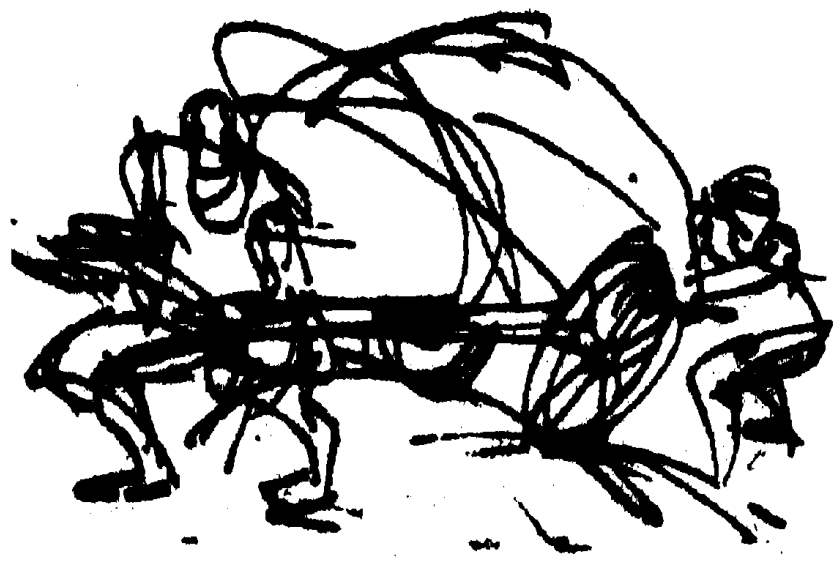
পর আর কোনও প্রশ্ন করিবার সূত্র নিধিরাম খুঁজিয়া পাইল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অনেক ভাবিয়া সে কহিল "একবার বাইরে আসবে মা?" সরু কথা কহিল না, পিছন হইতে সরস্বতীর কনিষ্ঠ ভাইটি কহিয়া উঠিল, "মা বলেছে দিদি আর বাইরে যাবে না। দিদি বড় হয়েছে কিনা।" ওঃ তাই! এইবার নিধিরামের চক্ষে সরস্বতীর পরিবর্তন ধরা পড়িল। এক বৎসর সে সরস্বতীকে দেখে নাই। কিন্তু বর্ষপূর্বে গৃহযাত্রার দিন সে যে মুখরা চঞ্চলা বালিকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত এ মেয়েটির প্রভেদ বিস্তর। ইহার সহিত কি ভাষায় কোন উপলক্ষে কথা কহিবে তাহা সহসা নিধিরাম স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ইতস্তত করিয়া বাড়ি হইতে সে পাটালী গুড় আনিয়াছিল, তাহার পুটুলিটা জানালা গলাইয়া সরস্বতীর হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "বাড়ি থেকে এনেছি সরুমা, নিয়ে যাও।" তাহার পর নিজ গৃহ সম্বন্ধে দুই-একটি অসম্বদ্ধ কথা কহিয়া নিধিরাম চলিয়া গেল, গ্রামের কারিগরের স্বারা যে বিচিত্র বর্ণের কাঠের পুতুলগুলি গড়িয়া আনিয়াছিল সেগুলি আর বাকস হইতে বাহির করিবার অবকাশ হইল না।

পরদিন নিধিরাম প্রত্যহের বেসাতি লইয়া নীলবাড়ির জানালায় দাঁড়াইল। নিচের ঘরের তক্তপোষের উপর বসিয়া সরস্বতী লেখাপড়া করিতেছিল, নিধিরাম মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কি পড়ছ সরু-মা?" সরস্বতী মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "কথামালা।"। পরক্ষণেই প্রশ্ন করিল, "মা জিজ্ঞাসা করছে গুড়ের দাম কত?" প্রশ্ন শুনিয়া নিধিরাম থমকিয়া গেল, তাহার পর শুষ্ক মুখে কহিল, "দিদিমাকে বোলো সরু-মা, আমার ঘরের তৈরী গুড়, পয়সা লাগেনি।" সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা।"

ইহার পর আর দুই তিনদিন সে-পথে নিধিরাম আসিল না। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নে যথারীতি নীলবাড়ির জানালায় দাঁড়াইয়া ডাকিল "সরু মা!" সরস্বতী শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে প্রশ্ন করিল, "দুদিন কেন আসনি?" নিধিরামের মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা হইলে সরু-মা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে। অনুপস্থিতির একটা মিথ্যা কারণ নির্দেশ করিয়া নিধিরাম অতি সতর্ক মৃদুস্বরে কহিল, "সরু-মা! একখানা বই এনেছি, পড়বে?" বলিয়া জানালা দিয়া একখানা বটতলার কৃত্তিবাসী বাঁধানো রামায়ণ চারিদিক চাহিয়া সরস্বতীর চৌকির উপর রাখিয়া দিল। সরস্বতী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি আছে?"

নিধিরাম হাসিয়া কহিল, "অনেক! রাম, রাবণ, হনুমান সবার ছবি। আমি পড়তে জানিনে সরুমা, তুমি আগে পড়ে নাও, তারপর আমাকে পড়ে শোনাবে।"

সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা। তুমি আবার কাল আসবে?" নিধিরাম একটি সমুজ্জ্বল আনন্দ-হাস্যের সহিত সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী রামায়ণ পড়িত আর নিধিরাম সিঁদুরের পেটরা কোলের উপর রাখিয়া জানালার রোয়াকে বসিয়া শুনিত। মধ্যে যে ইঁটের দেয়ালের ব্যবধান ছিল, শ্রোতা ও পাঠিকার কাহারও তাহা মনে ছিল না, সহসা একটি ব্যবধান বাড়িয়া গেল।

পাঠ যখন অযোধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন একদিন নিধিরাম আসিয়া দেখিল যে সরস্বতীর পরিবর্তে নিচের ঘরে তক্তপোষের উপর দুইটি ভদ্রলোক পরিষ্কার বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন। নিধিরাম ডাকিল, "চাই-ই-চীনা-আ-সিঁদুর।" দোতলায় একটা জানালা খুলিয়া গেল, সরস্বতী জানালায় দাঁড়াইয়া বাম হাত মুখে দিয়া ডান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে আজ পড়িবে না। নিধিরাম যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া গেল। গলির মোড়ে সরস্বতীর সখী রাধারাণী ওরফে রাধু নিধিরামকে সংবাদ জানাইল যে, সরস্বতীর বিবাহ আসন্ন এবং পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিয়াছেন। সরু-মার বিবাহ! তারপর শ্বশুরবাড়ি! সে কতদূর! নিধিরাম একবার ফিরিয়া নীলবাড়ির দোতলার রুদ্ধ বাতায়নের দিকে চাহিয়া মন্থর পদে চলিয়া গেল।

(৩)

নিত্যকার মত সেদিনও নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় নীলবাড়ির জানালা হইতে একটি শিশু ডাকিল, "দাঁড়াও সিঁদুরওয়ালা। দিদি তোমাকে ডাকছে।' নিধিরামের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ফিরিতেই সে দেখিল নিচের ঘরের জানালায় সরস্বতী দাঁড়াইয়া। নিধিরাম আনন্দ গদগদ স্বরে কহিয়া উঠিল, "কবে এলে সরু-মা। আমি তো জানিনে, তাই—"

সরস্বতী সংক্ষেপে কহিল, "আজ।" ইহার পর নিধিরাম ঘন্টাখানেক ধরিয়া নিজেই অবিশ্রান্ত কথা কহিয়া গেল। শেষে কহিল, "তোমার সিঁদুরের কৌটোটা আন তো সরু-মা, খুব ভাল উজ্জ্বল সিঁদুর আছে।"

সরস্বতীর সোনার কৌটা সিঁদুরে ভরিয়া নিধিরাম সেদিনকার মত চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বর্ণের কাঠের কৌটায় সিঁদুরের উপঢৌকন আসিতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে তরল আলতা হইতে শুরু করিয়া শাঁখের কঙ্কন পর্যন্ত এয়োতির কোন সরঞ্জাম বাদ রহিল না।

সেবার বর্ষার নিধিরাম দেশে গেল না। আশ্বিনে পূজার পূর্বে সরস্বতী সেদিন শ্বশুরগৃহে যাত্রা করিল, নিধিরামও সেইদিন দেশে গেল। বর্ষায় বাড়িতে উপস্থিত না থাকিবার জন্য অধিক ক্ষতি হইয়াছে এই বলিয়া স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পর্যন্ত নিধিরামকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু আর্থিক ক্ষতির প্রকাণ্ড অঙ্কটি তাহাকে মোটেই বিচলিত করিল না।

* * *

ফাল্গুনের বাতাসে কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে রং ধরিয়াছে। নিধিরাম কলিকাতায় ফিরিল। সরস্বতী শ্বশুর বাড়ি হইতে ফিরিয়াছে কিনা সে জানিত না। নীলবাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "চাই-ই-চীনা-সিঁদুর।" কোনো সাড়া আসিল না। নিধিরাম গলির পথে ফিরিয়া গেল কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া ডাকিল, "চাই-ই-চীনা-আ-সিঁদুর।"

অতি ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা গেল। নিধিরাম কম্পিত বক্ষে জানালার ধারে আসিয়া প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। জানালা খুলিয়া সরস্বতীর ছোট ভাইটি কহিল, "তোমাকে এ-পথে আসতে মা বারণ করে দিয়েছে, সিঁদুরওয়ালা।"

অজ্ঞাতে কোনও অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া নিধিরামের মুখ শুকাইল। আমতা আমতা করিয়া সে কহিল, "কেন?"

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল ম্লানমুখী শুভ্রবেশা নিরাভরণা সরস্বতী। নিধিরাম চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মাথার পেটরা মাটিতে নামাইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল।

নীলবাড়ির দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সম্বিত পাইয়া যখন নিধিরাম ফিরিয়া চলিল, তখন তাহার মাথার সিঁদুরের পেটরা বিশ মণ ভারি হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর আর সাতদিন সে গলিতে কেহ নিধিরামকে দেখে নাই। শেষে একদিন হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানালা খুলিলাম। নিধিরামের মূর্তি দেখা গেল। সিঁদুরের পেটরার পরিবর্তে তাহার মাথায় একটি প্রকাণ্ড ফলের ঝাঁকা। তাহার গুরুভারে অবনত হইয়া বৃদ্ধ নিধিরাম পাঠক ঘর্মাক্ত কলেবরে নীলবাড়ির সম্মুখ দিয়া গলির পথে হাঁকিয়া যাইতেছে, —"ফল চাই মা, পাকা ফল।"

দুর্জ্ঞেয়

সুমথনাথ ঘোষ
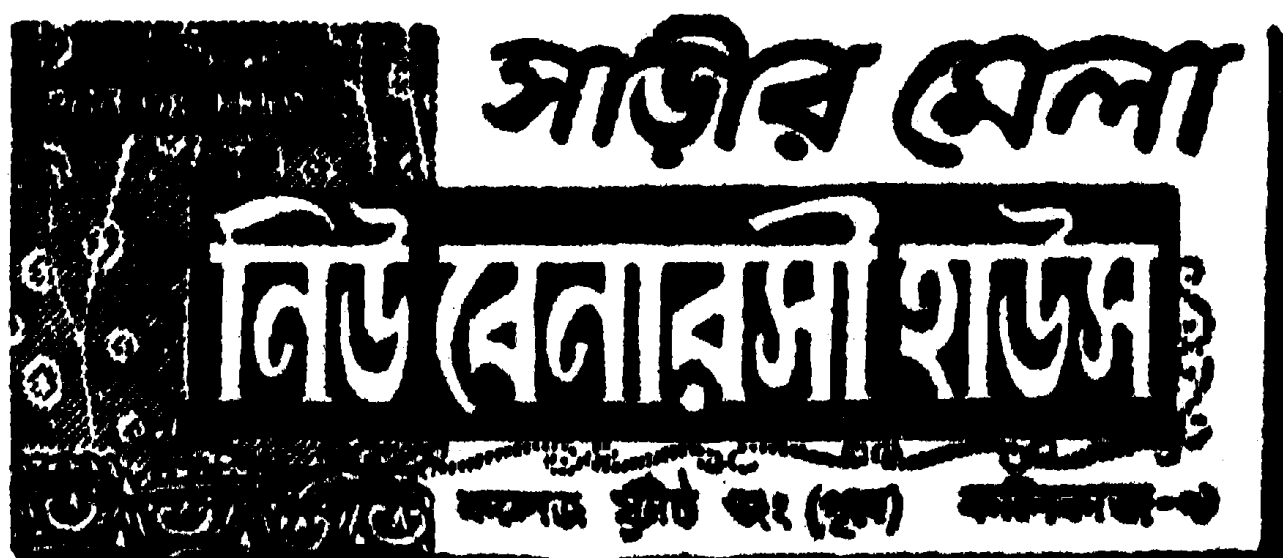
বাস্তবিক পক্ষে সতীনাথবাবু যে বৌয়ের শ্রাদ্ধে এত ধুমধাম ও ঘটা করবেন, কেউ-ই তা কল্পনা করতে পারেনি।

পাড়া-প্রতিবেশীরা ভেবেছিল, একে নিজের ছেলে নেই, তায় মণিমালার বয়সও এমন কিছু বেশী হয়নি, হয়ত খুব সংক্ষেপেই কাজটা সারবেন। সতীনাথবাবু তাঁর অন্তরের শোক আর বাইরে প্রকাশ করবেন না। বলা বাহুল্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সতীনাথবাবুর কন্যারা, এমনকি তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাও সব ঐরকম কিছু একটা অনুমান করেছিলেন। মোট কথা, কারুর-ই মনে একথা আসেনি যে, ওই সাত বছরের নাতি, দৌহিত্রকে দিয়ে তিনি ওইরকম বিরাট কাণ্ড-কারখানা করে বসবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এত জাঁকজমকের শ্রাদ্ধ ও-পাড়ায় বহুকাল হয়নি, পলাশডাঙার জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধে সেই একবার কোন্ কালে ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছিল, আর এই মণিমালার শ্রাদ্ধে। তবু পাড়া-প্রতিবেশীরা এটার ওপর বেশী জোর দেয়। বলে, তখনকার দিনে সব সস্তা-গণ্ডা ছিল, কিন্তু আজকের বাজারে যেসব উৎকৃষ্ট জিনিস খাইয়েছেন সতীনাথবাবু, তাতে তখনকার দশগুণ বেশী খরচ হয়েছে তাঁর। স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা না থাকলে, কেউ কখনো এমনভাবে পাগলের মত খরচ করতে পারে না! অথচ মণিমালা যে আদৌ দেখতে ভাল ছিল না, তাও সবাই জানে। তার ওপর চিররুগ্না। সামান্য কোন রোগ ছুঁলেই একেবারে যমে-মানুষে টানাটানি। সতীনাথবাবুর অভাব নেই, তাই পয়সার জোরে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে প্রতিবারেই ঠেকিয়ে রাখেন যমকে।

কথাটা ঠিক। তবু প্রতিবার ভাল হলে, স্বামীর বুকে মাথা রেখে মণিমালা সোহাগভরা কণ্ঠে বলে, এই ক'খানা হাড়কে বাঁচাবার জন্যে কেন তুমি মিছিমিছি, এইভাবে দু'হাতে টাকা খরচ করো, পাড়ার ডাক্তারকে দেখালে পারো? বলে একটু থেমে স্বামীর মুখের দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে মৃদু অভিযোগ করে, আর যদি মরেই যাই, তাতেই বা কি! মানুষ কি চিরদিন বাঁচে? তুমি পয়সার জোরে কি আমায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে?

স্ত্রীর শীর্ণ হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে সতীনাথবাবু জবাব দেন, পারবো কিনা জানি না, তবে যতদিন একটা পয়সা হাতে থাকবে, চেষ্টার ত্রুটি করব না স্থির জেনো।

তারপর মণিমালার মূল্যবান হীরের আংটিটা তার রোগা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে সতীনাথবাবু কণ্ঠে আরো আবেগ এনে বলেন,—মালা, আমার এত পয়সা কি হবে, যদি তুমি না বেঁচে থাকো? মেয়ে-দুটোর তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি বড়লোকের ঘরে; ছেলে নেই যে তার জন্য সঞ্চয় করতে হবে। তুমিই ত আমার একমাত্র সব। তোমার অসুখে যদি বড় বড় ডাক্তার-বদ্যি না দেখাই, তাহলে পয়সা থেকে লাভ কি! এটা কি তোমাকে আবার বুঝিয়ে দিতে হবে? তাছাড়া লোকেই বা কি বলবে আমায়?

স্বামীর বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল গোপনে মুছে মণিমালা বলে, লোকের কথায় কি এসে যায়, আমি ত জানি তুমি আমাকে কত ভালবাসো! তারপর একটু ম্লান হাসি হেসে সতীনাথবাবুর চোখের ওপর নিজের চোখদুটো রেখে বলেছিল—সত্যি গো, তোমার এই কথা শোনার পর আর আমার মরতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, রোগ নিয়ে যেন বেঁচে থাকি—অনেক, অনেক দিন।

এসব কথা একমাত্র সতীনাথবাবু ছাড়া বাইরের কেউ জানে না। জানবার কথাও নয়। বুঝি সেইজন্যেই স্ত্রীর মৃত্যুতে এত জাঁকজমক, এত অর্থব্যয় করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। অন্ততঃ লোকে বুঝুক, জানুক যে, কত গভীর প্রেম ছিল তাঁদের মধ্যে। হোক স্ত্রী রুগ্না বা রূপহীনা, তবু তাকে নিয়ে এই দীর্ঘদিন তিনি কি মনের সুখে কাটিয়েছেন, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই যে এত ঘটা ও জাঁকজমক সব যেন তারই অভিব্যক্তি। সেই বিগত-প্রেমের সাক্ষী। টাকা অনেকেরই আছে, তবে ঠিক এইভাবে দরাজ-হাতে মৃতের জন্যে আজকাল ক'টা লোক এত খরচা করতে পারে—যদি সত্যিকার প্রেমের অনুপ্রেরণা না থাকে তাঁর মধ্যে।

বাড়ীর সামনে ছেলেদের খেলার মাঠটা ঘিরে মনের মত করে প্যাণ্ডাল সাজালেন সতীনাথবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। খুঁটিতে খুঁটিতে লতাপাতা, সাদা ফুলের রকমারী গুচ্ছ, রেশমের সাদা নেট ও সাদা ঝালর। সাদা নিওন আলোর রোশনাই। সামিয়ানার ভেতরটা জুড়ে সর্বত্র পবিত্র থমথমে ভাব। সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড দাঁড়ানো মণিমালার অয়েলপেণ্টিং ফুলের মালা দিয়ে সাজানো ঠিক সভার মাঝখানে। যেন তার সেই ছবির সামনেই তাকে সাক্ষী রেখে সবকিছু করতে চান সতীনাথবাবু! বড় বড় বাইজীদের কীর্তন গান থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণভোজন, অতিথি বন্ধু-বান্ধবদের চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া, শেষ দিন দরিদ্রনারায়ণের ভোজন পর্যন্ত সব-ই হলো ওইখানে। মণিমালার সেই দাঁড়ানো প্রমাণ-সাইজের অয়েলপেণ্টিং ছবিটার সামনে।

কোথাও কোন ত্রুটি যাতে না হয়, নিজে ঘুরে ঘুরে দেখেন সতীনাথবাবু। বিরাট আয়োজন! লোকজনও খাটছে বহু, কিন্তু তবু তাঁর বিশ্রাম নেই। কারুর কোন অযত্ন না হয়, সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখার চেয়েও কে এলো বা এলো না, সেটাই যেন নিজের চোখে দেখতে চান।

তাঁর সন্ধানী চোখ ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র। বাড়ীর ভেতরে গিয়েও যেমন দেখে আসেন বাইরেও তেমনি। বিদায় নেবার সময় নমস্কার জানিয়ে সবাই সতীনাথবাবুকে, এক কথাই বলে যান, বড় ভাল আয়োজন করেছেন, ওঃ দেখালেন বটে একটা ভালবাসা!

বলা বাহুল্য, সতীনাথবাবুর সমস্ত মন যেন ওই একটি কথা সকলের মুখ থেকে শোনবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। সেই-জন্যেই বুঝি এমন নিখুঁত আয়োজন করেছেন, খরচের কথা একবারও মনে ভাবেননি!

সত্যি, শুধু ধনী বলে নয়, অমন বিনয়ী, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী ব্যক্তি আজকালকার দিনে মেলা দুষ্কর। তাই সবাই এসেছে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কেউ-ই বাদ যায়নি। যাদের সন্ধ্যায় খেতে আসার অসুবিধা ছিল, তারা পর্যন্ত দুপুরে এসে দেখা করে গিয়েছে এবং সতীনাথের পত্নীপ্রেমের সুখ্যাতি ও'র মুখের ওপর কা[illegible]লেছে, হাঁ দেখালে বটে একটা যা হোক কীর্তি!

কিন্তু এত খ্যাতিতেও বুঝি মন ভরে না সতীনাথবাবুর। একজনের অনুপস্থিতি যেন কাঁটার মত বিঁধতে থাকে তাঁর মনে। চপলা এলো না কেন? এত লোকজন হৈ-চৈ-র মধ্যে তাঁর চোখ বারবার কেবল তাকে খুঁজে মরে। সকাল থেকে কীর্তন শুরু হয়েছে—তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত একটু বেলা হলে আসবে। কিন্তু কীর্তন শেষ

হতে যখন আর বিলম্ব নেই, তখন নিজেই ওর বাবার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি প্রশ্ন করলেন, চপলাকে দেখছি না কেন? আপনার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সকলকেই ত দেখলুম।

বৃদ্ধ মাথাটা চুলকে উত্তর দিলেন, ও আসবে না, বলেই দিয়েছে।

কেন? ও ত খুব কীর্তন শুনতে ভালবাসে! কীর্তনের প্রোগ্রাম যেদিন থাকে, আমার রেডিওটার কাছ থেকে ওকে ওঠাতে পারতুম না।

হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলুম—এত সব নামকরা বড় বড় কীর্তনউলীর গান শুনতে আগেই সে ছুটে আসবে।

এরপর আর কোন কথা যেন জিজ্ঞেস করতে পারলেন না সতীনাথবাবু। গম্ভীর মুখে সরে গেলেন সেখান থেকে।

একটু পরে লোকজনের মধ্যে থেকে হঠাৎ একবার বাড়ীর ভেতর সরে গিয়ে চপলার মাকে একলা ডেকে তিনি প্রশ্ন করলেন—চপলা এলো না কেন, কীর্তন ত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই?

চপলার মা সঙ্কোচ-জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দেন, মুখপুড়ির জন্যে আমি জ্বলে-পুড়ে মলুম। দাও না বাবা, একটা যা হোক পাত্র দেখে, বাঁচি আহলে আমি, আমার হাড় জুড়োয়। এত করে সাধলুম, চল আমার সঙ্গে কিন্তু মেয়ের সেই এক গোঁ—'না'। বলে, শ্রাদ্ধের কীর্তন শুনলে নাকি ওর কান্না পায়। বলেই সঙ্গে সঙ্গে সতীনাথবাবুর গম্ভীর মুখখানার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে কথাটাকে অন্য-দিকে মোচড় দিলেন—অবশ্য ওর খুব দোষ নেই। সকল সময়-ই বৌমার কাছে কাছে থাকতো। তার শ্রাদ্ধের ব্যাপার যখন ওর মনে একটা ঘা লাগবে বৈকি! তাছাড়া বৌমাও ত ওকে একেবারে নিজের মেয়ের মত দেখতো কিনা।

সতীনাথবাবু 'হাঁ' কি 'না' মুখে একটি শব্দও আর উচ্চারণ করলেন না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলে উঠলেন, সেইজন্যেই ত ও না আসাতে আমারও মনটা ঠিক ভাল লাগছে না। বাস্তবিক পেটের মেয়েও অমন করতে পারে না, সে যা করেছে।

চপলারা সতীনাথবাবুর সবচেয়ে কম টাকার ভাড়াটে। নীচের তলায় সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে অন্ধকার যে দু'খানা ঘর, তাতে উঠে এসেছে অল্পদিন হলো। এক বছর এখনও পূর্ণ হয়নি বোধহয় ওরা এসেছে, কিন্তু এতটা হৃদ্যতা গড়ে উঠে-ছিল ওদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর যে ওরা যে পর, এটা সতীনাথবাবুই ভুলতে বসেছিলেন। বিশেষ করে মৃত্যুর আগে চপলা ওঁর রুগ্ন স্ত্রীর যেভাবে সেবা-শুশ্রূষা করেছে, সেটা জীবনে তিনি ভুলতে পারবেন না। একা রাতের পর রাত শুধু জাগেনি, চপলা সতীনাথবাবুকে জোর করে ঘুমতে পাঠিয়ে দিয়েছে ঘরে। বলেছে, সারাদিন ত ছুটো-ছুটির অন্ত নেই, তার ওপর আবার রাত জেগে শেষে কি আপনিও একটা রোগ ধরাবেন? তখন মাসীমাকে দেখবে কে শুনি?

কিন্তু তোমারও ত ওই একই কারণে রোগ হতে পারে চপলা! তখন তোমার বাপ-মাকে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব?

চপলার ঠোঁটের কোণে একপ্রকার ম্লান হাসি নিমেষে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

—ভয় নেই, কেউ তার জন্যে কৈফিয়ৎ চাইবে না আপনার কাছে, বরং মনে মনে ও'রা আশীর্বাদ করবেন, ও'দের কন্যাদায়ের হাত থেকে আপনি রক্ষা করেছেন বলে। ও'দের কাছে আমি ত যমের অরুচি। কাজেই আমার কথা না ভাবলেও চলবে আপনার।

তবু ইতস্তত করে বলেন সতীনাথ-বাবু, কিন্তু সেটা কি জেনেশুনে তোমার ওপর অন্যায় করা হবে না চপলা?

তাই যদি মনে করেন, ত পরে না-হয় একটা প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তাহলেই সাত-খুন মাপ। আমাদের শাস্ত্রেই তার বিধান আছে!

আজ সারাক্ষণ কেবল ঘুরেফিরে সেই কথাটাই মনে পড়ছে সতীনাথবাবুর—একটা প্রায়শ্চিত্ত করবেন, তাহলেই সাতখুন মাপ।

মনে মনে হাসেন সতীনাথবাবু, এর চেয়ে আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে। চপলা আসেনি আর সকলে এসেছে। এটাই যেন তাঁর মনের অবচেতনায় কাঁটা ফোটাতে থাকে। এক-একবার মনে হয়, সত্যি কি চপলা খুব আঘাত পেয়েছে, তাই আসেনি? আবার অন্য চিন্তা একই সঙ্গে জাগে। যেদিন মণিমালা মারা যায়, শেষ তাকে সাজিয়ে দিয়ে সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, এই দশদিনের মধ্যে আর তাঁর বাড়ী মাড়ায়নি চপলা, কেন? অথচ ওর মা-বাবার আসা-যাওয়ার কামাই ছিল না। যখন তখন তাঁরা আসতেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে, কখনো বা শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজে যেচে এসে সাহায্য করতেন। কিন্তু চপলা একদিনও যেমন আসেনি, তেমনি সতীনাথবাবু কি পরিমাণ ঘটা করে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করতে মনস্থ করেছেন, সে-কথাটা বাপ-মায়ের মুখ থেকে শুনে ও খুশীর বদলে কঠিন হয়ে উঠেছে। যেন কি একটা অন্যায় করতে যাচ্ছেন সতীনাথবাবু। অথচ সে এমন গম্ভীর যেন মণিমালার মৃত্যুতে শোকটা একমাত্র লেগেছে তার-ই।

ওর মা খোঁচা দিয়ে তাকে বলেন, তোর সব তাতে আদিখ্যেতা। মণিমালা মরেছে, না রোগের হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে বেঁচেছে। যে স্বামী, যার ঘর চিরদিনের মত অন্ধকার করে সে চলে গেল, তার মুখ দেখলে কেউ বুঝতে পারবে যে, এতবড় শোকটা লেগেছে তাঁর? তবে তুই অমন দিন নেই, রাত নেই, সব সময় মুখ গোমড়া করে চুপচাপ থাকিস কেন বুঝি না।

মায়ের এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে তেমনি পূর্বের মত নীরব থাকতে দেখে চপলাকে, ওর বাপ মেয়ের আড়ালে স্ত্রীকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেন, আসল ব্যাপারটা কি বল ত? হলো কি তোমার মেয়ের?

জানি না। তোমার ঐ ধিঙ্গী মেয়েকে জিজ্ঞেস করোগে। সব তাতে ওর নাটক করা চাই ত। বলে হাত-মুখ ঘুরিয়ে স্বামীর ওপর যেন মারমুখী হয়ে ওঠেন।

চপলা বরাবরই একটু পাকা কিংবা বলা যেতে পারে, বেশী রকমের স্পষ্ট বক্তা। অন্য ব্যাপার হলে বাপ-মা কিংবা প্রতিবেশী কাউকে সে কখনো ছেড়ে কথা কইতো না। কিন্তু এক্ষেত্রে কেন যে সে একেবারে মুখে চাবি বন্ধ করেছে; তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন। সতীনাথবাবু ও মণিমালার গভীর প্রেমের কথা যখন সকলের মুখে, তখনো ও তেমনি চুপচাপ।

পরের দিন ব্রাহ্মণভোজন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের দুপুর থেকেই খাওয়া-দাওয়া শুরু হলো। মোটরের পর মোটর, ট্যাক্সির ভিড় জমে উঠলো রাস্তায়। নিমন্ত্রিতদের কেউ আর বাকী রইল না আসতে।

শুধু এলো না একমাত্র চপলা।

ওর বাপ-মা যখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খেতে এলেন, তখন চপলাকে না দেখে সতীনাথবাবু প্রশ্ন করলেন, কৈ চপলা ত এলো না খেতে?

ওর মা একটা ঢোক গিলে জবাব দিলেন, ওর পেটটা আজ ভাল নেই, কিছু খাবে না, তাই আসেনি।

না না, সে কি কথা। অন্তত মিষ্টি-টিষ্টিও একটু খেতে হবে তাকে। সে না খেলে কি চলে। বলে তিনি নিজেই তিন-তলার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নীচে নেমে এলেন।

চপলারা যে-দিকটায় থাকে, সেদিকে আলো কম। অন্ধকারে পা টিপে টিপে সতীনাথবাবু পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলেন।

রাত তখন সাড়ে দশটার বেশী হবে না। চপলা ঘরের আলো নিভিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ভেতরের ছোট্ট রকটার এক কোণে। সামনের সেই উৎসব-মুখর উঁচু তিনতলা বাড়ীটার ছাদের দিকে বুঝি সে তাকিয়েছিল। যারা বড়লোকের বাড়ীতে ভালমন্দ খেতে খেতে সতীনাথবাবুর জয়-গান করছিল, তাদের কথা শুনছিল চপলা, না যাকে উপলক্ষ করে এই বিরাট আয়ো-জন, তারই কথা চিন্তা করছিল—ঈশ্বর জানেন।

সতীনাথবাবুর পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠলো চপলা, একি, আপনি?

শুধু বিস্ময় নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কেমন অবিশ্বাসও যেন ধ্বনিত হলো তার কণ্ঠে।

সতীনাথবাবুর কানে নয়, মনে গিয়ে বুঝি তা ধাক্কা মারলো। তিনি বললেন, হাঁ তোমাকে ডাকতে এলুম চপলা। সবাই খেতে বসেছেন, একটা পাতা তোমার জন্যে আমি আলাদা করে রেখে এসেছি। চলো আর দেরী করো না।

হঠাৎ চপলার কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠলো। সে বললে,—কেন, মা বলেনি যে আমি খাব না?

হাঁ, তা বলেছেন।

তাহলে আবার আপনি নিজে এসেছেন কেন?

সতীনাথবাবু চট করে বলে ফেললেন, অন্য কেউ এলে পাছে না যাও, সেইজন্যে আমি নিজেই এসেছি তোমায় ধরে নিয়ে যেতে চপলা!

আমার শরীর ভালো নয়, আমি খাবো না। আপনি দয়া করে চলে যান। বলে রক থেকে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকে আলোর সুইচটা টিপে দিলে।

সতীনাথবাবুও ওর পিছনে পিছনে ঘরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর অনুরোধ-ভরা স্বরে বললেন, অন্তত আজকের দিনে একটা সন্দেশও যদি তুমি মুখে না দাও, তাহলে মালার আত্মা তৃপ্তি পাবে না চপলা!

উদ্যতফণা সর্পিণীর মত সহসা ঘাড়টা ঘুরিয়ে চপলা বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকালো সতীনাথবাবুর মুখের দিকে। তারপর চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে— এত লোককে এত সন্দেশ খাওয়ালেন, তাতে তাঁর আত্মার তৃপ্তি যদি না হয়ে থাকে ত আমি একটা সন্দেশ খেলেই হবে কি করে জানলেন। শ্লেষ নয়, যেন তীব্র বিষ ঝরে পড়ে ওর রসনা থেকে।

ভুলে যেও না, তিনি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন চপলা।

আপনার চেয়েও? বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো চপলা। এমন অদ্ভুত, বিচিত্র ধরনের হাসি তার মুখে আর কখনো যেন শোনেননি সতীনাথবাবু। হাসি নয় যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।

সতীনাথবাবুর বুকের মধ্যেটা তার শব্দে সহসা যেন কেঁপে ওঠে। তাঁর মুখ থেকে কোন জবাব শোনার আগেই চপলা যেন অস্ত্রাঘাত হানলে সত্যি সত্যি একেবারে তাঁর মর্মস্থলে। নিঃশব্দে সতীনাথবাবুর দিকে দু'পা এগিয়ে এসে সে বললে, মাসীমা আমায় এত ভালবাসতেন বলেই যাব না। আর সেইজন্যেই একটা দানাও কোনকিছু মুখে দেব না, তাহলে আমার পাপ হবে।

পাপ! কথাটা কানে প্রবেশ করতেই পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এক-সঙ্গে শিউরে উঠলো সতীনাথবাবুর।

হাঁ। যারা আজ খেয়ে আপনার জয়গান করতে করতে চলে যাচ্ছে, তারা ত জানে না যে, এত ধুমধাম, এত ঘটার পিছনে রয়েছে এক হত্যাকারীর চক্রান্ত। জানি এত আয়োজন করেছেন আপনি কেন? শুধু সেই পাপকে ঢাকবার জন্যে। শুধু লোকের চোখ অর্থের রোশনাই দিয়ে ধাঁধিয়ে দেবার জন্যে।

কি বলছো তুমি এসব চপলা, পাগলের মত! সতীনাথবাবুর কণ্ঠস্বর যেন কেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

যা বলছি তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়। আপনার মনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করুন, বুঝতে পারবেন। চপলার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। সে বলে, কেন আপনি অন্যবারের মত এবারে বড় ডাক্তার ডেকেননি শুনি?

কাঠগড়ায় উঠে আসামী যেন বিচারকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সতীনাথবাবুর মুখের অবস্থা ঠিক তেমনি। আমতা-আমতা করে তিনি উত্তর দিলেন, কি করে জানবো বলো যে হঠাৎ এত 'সিরিয়াস' হবে!

মিথ্যে কথা। ধমক দিয়ে ওঠে চপলা। আমি সব জানি, কেন এ-কাজ করেছেন। বলে আরো একপর্দা গলা চড়িয়ে দিয়ে আবার প্রশ্ন করলে চপলা, ডাক্তার যে 'কোরামিন' পনেরো মিনিট অন্তর খাওয়াতে বলে গিয়েছিলেন, সেটাও কি তাঁকে ঠিক সময়ে খেতে দেননি মাসীমা মরে যাবেন ভাবতে পারেননি বলে? যান আমায় আর ঘাঁটাবেন না। বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো চপলা। লোককে খাইয়ে তাদের মুখে পত্নীপ্রেমের জয়ধ্বনি শুনে যত আত্মতৃপ্তি লাভ করুন আপনি তবু মনে মনে ঠিকই জানেন, এ-মৃত্যু আপনার ইচ্ছাকৃত। আপনি চেয়েছিলেন তাকে সরিয়ে দিতে এ-পৃথিবী থেকে। আমায় সেদিন মাঝ রাতে ওই জন্যে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলেন। তখন যদি জানতুম যে, আপনার মনে লুকিয়েছিল এই দুরভিসন্ধি...

কিন্তু, না না......

কোন কিন্তু নেই, এর মধ্যে। মাসীমার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেছে শুনেই আমি সবপ্রথম ছুটে গিয়েছিলুম কোরামিনের শিশিটা দেখতে। দেখলুম, একেবারে নতুন শিশি যেমন ছিল ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে। ছিপি পর্যন্ত খোলা হয়নি! যান! প্রেমের বড়াই অন্তত আমার কাছে করতে আসবেন না। আপনি আমার গুরুজন, সকলে আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে তাই কিছু বলিনি এতদিন চুপ করে ছিলুম, পাছে আপনার মাথা হেঁট হয়। শুধু আমাকে ওই হত্যার মহোৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্যে ডাকতে এসেছেন আপনি নিজে বলেই, আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

বন্দী আসামী খালাস পেলে যেমন করে ছুটে বেরিয়ে যায় তেমনি ভাবে সতীনাথবাবু নিজের ঘরে গিয়ে একেবারে দরজায় খিল লাগিয়ে যেন হাঁপাতে থাকেন। সে রাত্রে তিনি মুখে এক ফোঁটা জলও দিলেন না।

বাড়ীর লোকেরা কেউ আর সতীনাথ-বাবুকে বিরক্ত করতে এলো না। সারাদিনের পরিশ্রমে তিনি ক্লান্ত, তাছাড়া স্ত্রীর শোকে মুহ্যমান মনে করে, সবাই চুপ করে গেল।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। উৎসব মুখর বাড়ীটা সর্বত্র নীরব, নিস্তব্ধ কোথাও বুঝি একজনও জেগে নেই। ধীরে ধীরে বিছানার ওপর উঠে বসেন সতীনাথ-বাবু। তারপর হাতড়াতে হাতড়াতে দেও-য়াল-জোড়া মণিমালার বিরাট অয়েল পেণ্টিংটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আলোর সুইচটা টিপতে গিয়ে তাঁর হাতটা বার বার কেঁপে ওঠে, দু'বার হাতটা সরিয়ে নিলেন যেন কিসের আতঙ্কে। তৃতীয়বার হঠাৎ আলোটা জ্বালতেই শিউরে উঠলেন। একি, মণিমালার মুখের রেখায় এমন তীব্র ঘৃণা কেন। সে কি তবে জানতে পেরেছে তাঁর মনের অবচেতনায় লুকোনো ছিল কিসের দুরভিসন্ধি! ওই চব্বিশ বছরের আঁট-সাঁট দেহ, প্রাণ চঞ্চলা-কর্ম-নিপুণা চপলাকে বিয়ে করার গোপন বাসনা, তাঁকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাকে ভাল ডাক্তার না দেখিয়ে, ওষুধ না খাইয়ে তিনি মেরে ফেলেছেন, তবে কি সব জানতে পেরেছে মণিমালা?

তাড়াতাড়ি আলোটা তিনি নিভিয়ে দিলেন। মণিমালার দিকে তাকাতে যেন ভয় করে—ছবি নয়, ও যেন এই মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। আবার বিছানায় এসে চোখ বুজিয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। দেহে মনে যেন কিসের অব্যক্ত যন্ত্রণা। কিন্তু যে কথা তিনি কোনদিন মুখে প্রকাশ করেন নি, এমন কি চেঁচিয়ে ভাবেননি পর্যন্ত পাছে চপলা জানতে পারে এবং সব সময় আরো বেশী সতর্ক থাকতেন তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে, কি করে তা মণি-মালার পক্ষে জানা সম্ভব হলো! সত্যি কি সে জানতে পেরেছিল মৃত্যুর আগে যে চপলাকে তিনি মনে মনে ভালবেসে ফেলেছেন! তাকে কামনা করেন!

না অসম্ভব। এ তাঁর মনের ভুল। মণি-মালা কেন চপলা নিজেও বোধহয় জানতো না যে তাঁর মনের অবচেতনায় এই গোপন কথাটা লুকিয়ে ছিল। অথচ এর জন্যে দায়ী মণিমালা নিজে। সে-ই তো জোর করে চপলাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতো, জিনিস পত্র সব গোছগাছ করার জন্যে। নিজে রুগ্ন, অসমর্থ বলে তার কাজগুলো ওকে দিয়ে করিয়ে নিতো সময়ে-অসময়ে। কত-

দিন সতীনাথবাবু নিষেধ করেছেন মণি-মালাকে, পরের মেয়েকে কেন তুমি এমনি করে খাটাও, আমি পছন্দ করি না। কিন্তু তার জবাব ওঁকে না দিয়ে চপলা নিজে মণিমালাকে দিতো। বলতো, এমন কিছু ভারী কাজ নয় যে, আমি মরে যাবো, আপনি ওঁর কথা শুনবেন না। উনি আমাকে পর ভাবেন, তাই ও-কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমি ত আপনাকে নিজের মাসীমা বলেই মনে করি। কাজেই মাসীমার কাজগুলো করে দেবার অধিকার সম্পূর্ণ আছে আমার।

সতীনাথবাবু এর ওপর আর কি বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে যেতেন। কি করে মুখ ফুটে জানাবেন স্ত্রীকে যে, গোছ-গাছ করতে এসে চপলা তাঁর মনের মধ্যে সর্বকিছু, আরো বেশী যেন এলোমেলো, অ-গোছালো করে দিয়ে যায়।

তাছাড়া চপলাই বরং নিজে থেকে কতদিন রঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে তাঁর সঙ্গে মণিমালার সামনে। তখন, যদি এতটুকু সন্দেহ জাগে তার মনে, তাহলে কি আড়ালে ডেকে চপলাকে সে নিষেধ করে দিতোনা ?

মনে মনে এমনি সব পুরোনো কথা নিয়ে এখন কত কি আলোচনা করতে থাকেন সতীনাথবাবু। আর যত করেন তত যেন বুকে বল একটু একটু করে ফিরে পান। না, মণিমালার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। নইলে তাঁর সামনেই ত একদিন স্পষ্ট চপলা বলে ফেলেছিল, দেখুন আপনি মাসীমাকে একেবারে ভালবাসেন না। আপনার প্রেমটা শুধু লোক-দেখানো। নইলে এতদিন ধরে মাসীমা ভুগছেন, কেন ওঁকে ভিয়েনায় নিয়ে গিয়ে কোন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করে আনেন না? আপনি ত রাজালোক। কলকাতার শহরে পাঁচখানা ভাড়া বাড়ীর মালিক। এ কি সহজ কথা। মাসীমা ছাড়া আর আছেই বা কে খাবার লোক আপনার? আমি হলে আগেই স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি দিতুম সেদেশে। আপনাদের যে কিরকম ভালবাসা বুঝিনে বাপু!

কথাটা অবশ্য হাসতে হাসতেই বলেছিল চপলা। কিন্তু মণিমালা সেটা একেবারেই গায়ে মাখেনি। বরং খপ করে ওর সামনে তার মুখটা টিপে ধরে বলেছিল, ছি একথা শুনলে পাপ হয়। ঠাট্টা করেও বলতে নেই। সাত জন্ম তপস্যা না করলে এমন স্বামী পাওয়া যায় না; জন্ম জন্ম যেন আমি ওঁকে স্বামীরূপে পাই। ভগবানের কাছে, রোজ এই প্রার্থনাই করি।

বেশ মনে আছে, একদিন মণিমালা এসে তাঁকে বলেছিল, চপলার জন্যে একটা যেমন তেমন পাত্র দেখে দাওনা। তোমার ত এত লোকের সঙ্গে আলাপ। দোজ-বরে কিংবা একটু বেশী বয়স হয়েছে, কি কোন উদ্বাস্তু পাকিস্তানের ছেলে হলেও চলবে, মোদ্দা যা হোক দু'টো খেতে পরতে পেলেই হলো! রোজ ওর মা এসে আমার হাত ধরে কান্নাকাটি করে।

এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, সে কি! এমন মেয়ে ওইরকম একটা যার তার হাতে দেবে ওর মা-বাপ?

তা কি করবে। যাদের ঘরে একটা কানাকড়ির সম্বল নেই, তারা মেয়েকে রাজা-রাজড়ার ঘরে দেবে কোথা থেকে শুনি। এককাঁড়ি বার করতে না পারলে ত একালে মেয়ের ভাল বিয়ে হবার কোন উপায় নেই। তাছাড়া পয়সার অভাবে মেয়েটিকে লেখা-পড়াও শেখাতে পারেনি ওরা। ক্লাস নাইন-এ উঠে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল! আজকাল-কার দিনে কে ওই মুখ্যু মেয়েকে নেবে শুনি?

সতীনাথবাবু বলেছিলেন স্ত্রীকে—না, দেখো, এমন অধর্মের কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। তারপর সারা জীবন ঐ চপলা আমায় শাপ-শাপান্ত করবে, এ আমি পারবো না সহ্য করতে।

বেশ ত, এত যদি দরদ, তাহলে কোন ভাল পাত্র দেখে দু' পাঁচ হাজার খরচ করেই ওর বিয়েটা দিয়ে দাও না। তোমার ত টাকার অভাব নেই।

এটাই বরং সম্ভব। বলে হাসতে হাসতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে-ছিলেন,—বেশ, তেমন পাত্র পেলে নিশ্চয়ই বলবো!

এর তিন কি চারদিন পরে, ঠিক স্মরণ নেই সতীনাথবাবুর। একদিন দুপুরে চশমাটা চোখে লাগিয়ে 'চেরোর' একখানা হাত-দেখার বই খুলে নিজের কর-রেখার সঙ্গে কি যেন মিলিয়ে দেখছিলেন তিনি। পিছন থেকে কখন যে নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকেছিল চপলা, তা তিনি টের পাননি!

ও, আপনার আবার এসব বিদ্যেও জানা আছে নাকি! বলে তাঁর সামনে এসে নিজের হাতটা খপ্ করে বাড়িয়ে দিলে চপলা! দেখুন ত আমার ভাগ্যটা কি রকম?

সত্যি তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না। তবু বইয়ের সঙ্গে চপলার হাতের কতক-গুলো রেখার মিল খুঁজে বার করে বললেন,—আরে করছো কি? এই যে দেখছো তিনটে রেখা এক জায়গায় এসে ত্রিভুজের মত মিলছে, এ হলো যাকে বলে রাজরাণী হবার চিহ্ন।

এবার খিল খিল করে একটা হাসির তরঙ্গ যেন বইয়ে দিলে চপলা। ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে মণিমালা এসে বললেন—কি রে, এত হাসছিস কেন? কি হয়েছে?

চপলা হাসির সে বেগ দমন করতে করতে বললে, দেখুন না মাসীমা, আমি নাকি রাজরাণী হবো, উনি হাত দেখে বলছেন!

তা এতে হাসির কি আছে? মেয়ে-ছেলের ভাগ্যে কখন কি হয়, বলা যায় কি? আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন ওঁর কি ছিল? যাকে বলে রাস্তার ভ্যাগাবণ্ড। তারপর ব্যবসা করতে নেমেই না, যুদ্ধের বাজারে যা কিছু দেখছিস্, সব হয়েছে।

চপলা বললে, তাহলে আমি যে-রাজার রাজরাণী হবো, নিশ্চয়ই সে রাজ্যহীন রাজা। রাজ্য বলতে তার কিছু নেই—অর্থ নেই, লোক নেই। শেষটা বলার আগেই আবার হেসে ফেললে।

না—না—ঠাট্টা নয়। আমি যাকে যা বলেছি হুবহু মিলে গিয়েছে, জানো? বলে মুচকী হেসে চপলার মুখের দিকে সতীনাথবাবু যেমন তাকালেন অমনি সে যেন গিটকিরি দিয়ে হেসে উঠলো।

তারপর সে হাসির দমক থামাতে থামাতে বললে, তাহ'লে ত দেখছি আপনার কথাটা সত্যে পরিণত করতে হলে, আপনাকেই মালা বদল করতে হয় আমার সঙ্গে।

মুখ ফসকে কথাটা হঠাৎ বলে ফেলেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চপলা।

সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠলো সতীনাথবাবুর বুকটা। খেলার ছলে চপলা তাঁকে এমন একটা বিশেষ ইঙ্গিত দিয়ে গেল যে তা নিয়ে তিনি যত মনে চিন্তা করেন, এ চপলার রসিকতা মাত্র, এ অসম্ভব, তত যেন তাঁর দেহ-মন ভেতরে ভেতরে রোমাঞ্চিত হতে থাকে। দেহের আড়ালে মনের গভীরে আরো নীচে অন্ধকারের পঙ্ক কুণ্ডে ক্লেদাক্ত শয্যায় সুপ্ত ছিল যে অবচেতন মন, সহসা যেন বিদ্যুৎ চমকে জেগে ওঠে। হাঁ, কেনই বা সম্ভব নয়। চপলাকে ত তার বাপ-মা হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। তবে কেনই বা তাকে বিয়ে করতে পারবেন না তিনি?

ভয়ে ভয়ে একবার সে কথাটা উচ্চারণ করেই। আবার তেমনি থমকে থেমে গিয়ে-ছিলেন সতীনাথবাবু। হাঁ, বাধা আছে একটা। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সে হলো মণিমালা! তার চিররুগ্না অকর্মণ্যা স্ত্রী। বিয়ের পর থেকে দুটো বছরও যার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে, আমোদ আহ্লাদে কাটাতে পারেননি তিনি। অথচ সে তার গৃহলক্ষ্মী। তারই দৌলতে নাকি তাঁর যত কিছু সৌভাগ্য সব! এ শুধু তাঁর মত নয়। অন্য সকলেরও মনের বিশ্বাস। তাই দেবী জ্ঞানে তাকে যত্নে মাথায় করে রেখেছিলেন। এই দীর্ঘদিন ধরে এতটুকু কোথাও কর্তব্যের ত্রুটি কখনো হতে দেননি!

কিন্তু এই একটা বছর, শুধু চপলা ঘরে আসার পর থেকেই যেন মনের মধ্যে কোথায় ভেতরে ভেতরে আগুন ধরে গিয়ে-ছিল তাঁর। মনের সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করেও সতীনাথবাবু হেরে যান, পারেন না জয়ী হতে।

ধীরে ধীরে তার মন এগিয়েছিল চপলার দিকে সত্যি, কিন্তু এগুতে এগুতে শেষ সীমায় এসে প্রাচীরের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। কি করে উল্লঙ্ঘন করবেন সেই কঠিন অবরোধ, তারই চিন্তায় যখন রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী কাটছে, তখন হঠাৎ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন একটা ফাটল। সেই

সুদৃঢ় প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করবার একটা ছিদ্র পেয়ে বুঝি মেতে উঠেছিলেন ধ্বংসের নেশায়।

তারপর! তারপর আর চিন্তা করতে পারেন না সতীনাথবাবু। স্ত্রীর অসুখ বাড়লে অন্য সময় যেমন অধীর হয়ে ওঠেন, ছুটোছুটি করে বড় বড় ডাক্তার ডাকেন, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন, এবার যেন হঠাৎ তাতে কিছু শৈথিল্য দেখা দিলে! পাড়ার সুবোধ ডাক্তারকেই ডাকলেন তিনি। অবশ্য পরে যখন খুব খারাপের দিকে গেল মণিমালার রোগটা, তখন লোক-দেখানো বড় বড় ডাক্তার এনেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আড়ালে ডেকে তাঁকে বলে গেলেন, এত দেরীতে ডেকেছেন যে, আমাদের আর করার কিছু নেই। তবে যখনই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে—দশ ফোটা করে কোরামিন দিতে ভুলবেন না, পনের মিনিট অন্তর।

সত্যি কথা বলতে কি। সে কথা শুনে মুহূর্তে দুঃখের পরিবর্তে মনের ভেতর কোথায় একটা মুক্তির আনন্দ যেন ঠেলে উঠেছিল সতীনাথবাবুর।

তাইতো সেদিন রাত যখন একটা বাজলো, তখন তিনি নিজে স্ত্রীর শয্যার পাশে গিয়ে বসলেন। আর চপলাকে জোর করে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে ভেতরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর রাত্রি যখন দুটো, সতীনাথবাবু স্ত্রীর গায়ে, পায়ের তলায়, হাতের চেটোয় স্পর্শ করে দেখেন, ঠাণ্ডা কন্‌কন্‌ করছে সব। তাড়াতাড়ি উঠে কোরামিনের শিশিটা যেমন খুলতে গেলেন, কেন জানিনা সহসা তাঁর হাত থেমে গেল। কিসের একটা গোপন কম্পন যেন তাঁর আঙুলগুলোর মধ্যে সিরসির করে ওঠে। বিষাক্ত সরীসৃপের স্পর্শ লেগে যেন হঠাৎ অনড়, অসাড় হয়ে যায় তাঁর আঙুলের সব শক্তি। শিশিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সতীনাথবাবু, বুঝি মনের সঙ্গে এই তাঁর শেষ যুদ্ধ।

ফিরে এসে স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়েই তিনি আঁৎকে উঠলেন, এ্যাঁ, মালা মালা, তুমি তাহলে ফাঁকি দিয়ে সত্যি সত্যি এতদিন পরে চলে গেলে।

চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

চাকর-বাকর আত্মীয়স্বজন সবাই যে যেখানে ঘুমচ্ছিল ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে পড়ল। চপলার চোখে যেন কাল ঘুম ধরে ছিল। অনেকটা পরে সে উঠে এসেছিল, শুধু এইটুকু মনে আছে সতীনাথবাবুর।

তারপর আর কিছু তিনি জানেন না। তবে চপলা যে কেঁদেছিল খুব অনেকক্ষণ ধরে ফুলে ফুলে মণিমালার শয্যার ওপর, মনে আছে। তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, এই খাট বিছানা অলঙ্কার, যা কিছু ওর গায়ে আছে যেন ওর সঙ্গে দেওয়া হয়। আর পাগলের মত মুঠো মুঠো টাকা রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে নিজে শবযাত্রার পুরোভাগে গিয়েছিলেন। যাতে লোকের মনে এতটুকু সন্দেহ না জাগে যে তিনি তাকে মেরে ফেলেছেন। আর সেইজন্যে যে এই বিপুল খরচা করে তার শ্রাদ্ধ করেছেন এটা সত্যি হলেও চপলা কি করে জানতে পারলে তাঁর মনের খবর—এটাই বার বার সতীনাথবাবুর মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে। সেই গভীর রাত্রে যত ওই কথাটা ভাবেন তত যেন সেই সঙ্গে আরো একটা কথা জাগে তাঁর মনে, তাহ'লে এতই যখন জেনেছে চপলা তবে কি এর পিছনে যে আসল উদ্দেশ্যটা তাও সে জানে? সে কি তবে বুঝতে পেরেছে যে তাকে পাবার জন্যে এত বড় অন্যায়টা তিনি করেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত মন একসঙ্গে বলে ওঠে, হাঁ, সে জানে। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। চপলা অত্যন্ত চতুরা। সে-ই যে তাকে এই ঘৃণিত কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে, তা নিশ্চয় সে জানে। আর জানে বলেই হয়ত এত রাগ তাঁর ওপর। সেইজন্যেই ত একবারও এলো না এ শ্রাদ্ধে, কিছু মুখে দিলে না।

সতীনাথবাবুর চিন্তায় আবার ছেদ পড়ে।

তিনি ভাবেন আকাশপাতাল। এর পর কি করে মুখ দেখাবেন চপলাকে। আর কি করেই বা তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবেন! সে যদি মুখের ওপর বলে বসে, আপনি স্ত্রী হত্যা করতে পারেন, আপনার ছায়া মাড়ালে পাপ। তাহ'লে?

আর ভাবতে পারেন না। তাহ'লে কি মিছিমিছি সারাজীবন ধরে শুধু এ পাপের বোঝা বহন করবেন? কোন্ কুক্ষণে দেখা হয়েছিল চপলার সঙ্গে। অনুশোচনার আগুনে যেন ভেতরটা তাঁর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত—রোজই ভাবেন। কিন্তু ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারেন না।

এমনি করে যত দিন যায় সতীনাথবাবুর কাছে জীবনটা যেন বোঝা হয়ে ওঠে। ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সব বিষাক্ত মনে হয়।

বোধ হয় মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন চপলার বাবা এসে প্রস্তাব করলেন, আমাদের সকলের ইচ্ছে যে আপনি চপলাকে বিয়ে করে আবার সংসার পাতুন।

এই দীর্ঘদিন তিনি চপলার ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পাননি। সে তাঁর বাড়ীতে আর পদার্পণ করেনি। সতীনাথবাবু ভেবেছিলেন হয়ত আর তাঁর মুখ দেখবে না কোনদিন!

তাই চমকে উঠলেন সে প্রস্তাব শুনে। তবু প্রথমটা মুখে অনিচ্ছা দেখিয়ে এবং অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে যেন সতীনাথবাবু বললেন,—আপনি ত বলছেন, কিন্তু আপনার মেয়ে তাতে রাজী হবে কেন?

বুড়ো এবার গলাটা খাটো করে বললেন,—আরে মেয়ে নিজেই বলেছে, নইলে আমাদের সাধ্য কি যে আপনার কাছে এ প্রস্তাব করি।

আবার বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা হল, সেই একই মাঠে। একই জায়গায়। আবার তেমনি ভাবেই সাজানো হলো সেখানে সামিয়ানা ফুলে লতায় পাতায়, বৈদ্যুতিক আলোকমালায়। তবে কীর্তনের বদলে এবার কাশীর বিখ্যাত মুসলমান ওস্তাদদের সানাই বাজলো।

আবার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-পড়শি সকলে নিমন্ত্রণ খেতে এলো আগের মতই।

এবারও ভুরিভোজন করে যাবার সময় সবাই একবাক্যে বললে,—বেশ করেছো সতীনাথ, একটা পুরুষের মত কাজ করছো। বড় খুশি হয়েছি। যে যাবার সে ত চলে গেছে। তাছাড়া সে ছিল চিররুগ্না। একটা দিনের জন্যেও তুমি তাকে নিয়ে সুখী হতে পারনি। কেবল ডাক্তার আর ওষুধ। ছুটোছুটি করে তোমার দিন গেছে। আমরা সব জানি। কেউ বা বলে, এখন তুমি বুড়ো হচ্ছো, তোমার মুখে জল দেবার একটা মানুষ চাই ত! বেশ করেছো।

এ শুনে সতীনাথবাবু শুধু মনে মনে হাসেন।

কিন্তু আর একজন বোধ হয় সেই সঙ্গে সকলের অন্তরাল থেকে হেসে উঠেছিলেন—তিনি অন্তর্যামী।

হাতেখড়ি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

ভোর থেকেই নীলিমার হাঁকডাকে সারা বাড়ি ব্যতিব্যস্ত। ভৃত্য ভজুয়ার সোয়াস্তি নাই। ঘন ঘন ফরমাস ঃ এটা কর, ওটা ধর, এদিকে আয়, ও বাড়ি যা। ব্যাপার আদৌ সাধারণ নয়। এই ছোট্ট সংসারটির জীবনে আজ একটা দিনের মতো দিন। নীলিমার একমাত্র পুত্র বাবলু এই প্রথম স্কুলে যাইতেছে।

বাবলু কি আর সে বাবলু আছে! আজ মা তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলের পোষাকী নাম সুরজিৎ বলিয়াই তাকে ডাকিতে চায়। তবু মুখ হইতে কেবলি বার হয় 'বাবলু', 'খোকা' বা 'খোকন'।

বাবলুর মন দুরুদুরু করে আনন্দে আর আতঙ্কে। স্কুল আর যাই হোক, মামারবাড়ি যে নয় সে-জ্ঞান তার টনটনে। এক বছর বাবার কাছে 'ঘোড়ায় চড়িল আছাড় খাইল' করিতে গিয়া মাঝে মাঝে চড়চাপড় কম হয় নাই। গৃহশিক্ষক বনমালীবাবু তাঁর প্রতিশ্রুত প্রহার বারণ শর্ত ভঙ্গ করিতে পারেন না বলিয়াই মাঝে মাঝে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া ভিতরের রাগটা যে প্রকাশ করিয়া ফেলেন সেই অভিজ্ঞতাও বাবলুর কাছে খুব সুখকর নয়। তবু কোথায় যেন, কি সব যেন একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে সাত বছরের এক কিশোর মন।

নীলিমার রান্নার পাট আজ বহু আগেই শেষ। খোকার জামাকাপড় কোঁচাইয়া গোছাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছে বহুক্ষণ। খানিক কাজলও প্রস্তুত। ভজুয়াকে দিয়া বিল্বপত্র, আম্রপল্লব আর ধানদূর্বাও যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে।

মাঝে মাঝে নীলিমা মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়। সেই এক-রত্তি শিশু বাবা-মার সজাগ দৃষ্টির ওপর দিয়া দেখিতে দেখিতে কবে যে এতখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে সেই অতি প্রত্যক্ষ নিঃশব্দ সত্যটা যেন আজই প্রথম ধরা পড়িল। নীলিমার খোকা আর বাবলু নয়। সে এখন দস্তুরমতো শ্রীমান সুরজিৎ রায়। তার সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অস্পষ্ট পথ, আজ গৃহে সেই যাত্রারম্ভের মঙ্গলাচরণ!

"শুনেছ?"

বিশ্বজিৎ নথিপত্রের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই বলে ঃ "শুনেছি।"

"এই নিয়ে তো তিনবার শুনলে।"

"হুঁ।"

"আজ প্রথমদিন। খোকাকে তুমিই স্কুলে দিয়ে আসবে।"

"ভজুয়া দিয়ে আসবে'খন। আজ আমার মেলা কাজ।"

"ভজুয়া একবার যাবে ডাকঘরে মণি-অর্ডার করতে, আবার যাবে টিফিনের সময় খোকাকে খাবার দিয়ে আসতে, আবার বিকেলে যাবে খোকাকে নিয়ে আসতে। চাকর বলে সে তো আর মেশিন নয়।"

"পাশের বাসার পল্টু আর মণির সঙ্গে যাক্ না।"

নীলিমা এবার ফোঁস করিয়া ওঠে, "পল্টু-মণিরা যেন আজই প্রথম স্কুলে যাচ্ছে! আর, ওর সঙ্গে বুঝি তাদের তুলনা!"

অগত্যা রাজি না হইয়া উপায় নাই। তবু স্বামী বলিয়াই বিশ্বজিৎকে আরো দুকথা শুনিতে হয়। নিজের ছেলেকে এমন হেলা-ফেলা নাকি ভূভারতে কেহ কোনদিন করে নাই।

বিশ্বজিৎ হাসিয়া জবাব দেয় ঃ "ওই তোমার স্বভাব। একটুতেই উতলা হও। এই করেই ছেলে মানুষ করবে, তাহলেই হয়েছে। এই বয়েস থেকেই শিশুদের সাহস শেখাতে হয়—"

"ঢের হয়েছে, থামো।" নীলিমা বাধা দিয়া কহিল, "সব তাতেই লেকচার!— প্রথম দিনটায় অমন ভয়ভয় সবারই করে। তুমিও এক লাফেই এত্তটা বড় হয়েছ কি-না!"

যাহাকে লইয়া এত বাদানুবাদ সেই বাবলু আসিয়া হাজির। পিতা সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করে, "কিরে খোকন। তুই এক একা স্কুলে যেতে পারবি নে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বাবলু ঘাড় নাড়ে সম্মতি-সূচক।

"ওরে দস্যি ছেলে!" নীলিমা ছেলের কাছে আগাইয়া যায়। "অমন দুঃসাহস করিস্ নি কখনো।"

"আমি একাই যেতে পারব মা। সেদিন ও-বাসার কালুদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি না! থানার কাছাকাছি আমাদের ইস্কুল। তার আগেই লোন-আপিস, তার খানিক আগে ডাকঘর, তারও আগে মধু কুন্ডুর গদি, সেই গদির পাশ দিয়েই তো আমাদের পাড়ার রাস্তাটা এসেছে। আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।"

বাবলু গড়গড় করিয়া সারাটা পথ মুখস্থ বলিয়া যায়। বাবা আর মা খুশি হইয়াই শোনে। তবু নীলিমার মনে কেমন একটা শঙ্কা। ভয়টা যে কিসের তাহা নীলিমাও কি ছাই ভালো করিয়া জানে! ছোটো মফঃস্বল শহর। ট্রাম বাস নাই। মোটর গাড়ি আর লরির উৎপাত যৎসামান্য। স্বামী অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ পসার করিয়াছে। তাদের ছেলে পথ ভুলিয়া গেলেও এই শহরে হারাইয়া যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। তবু নীলিমার শঙ্কা ঘোচে না।

বাবা ছেলেকে আবার উস্কাইয়া দেয় ঃ "আজ তোকে আমিই দিয়ে আসব। কাল থেকে কিন্তু একাই স্কুলে যাবি, ভয় কী!"

নীলিমা রাগতভাবে জানায়, "ছেলেকে অমন করে আস্কারা দিয়ো না বলছি।"

"আমি সত্যি পথ চিনি মা," বাবলু আবার সগর্বে জানায়, "পল্টুদাও তো একা যায়, একা আসে।"

"যার খুশি সে যাক। তুমি যেতে পারবে না।"

ছেলে আপাতত চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কল্পটা মনে মনে রাখে। স্কুলের পথ কোন্ ছার, দুই-চার দিন বাদেই মায়ের কাছে সে প্রমাণ দিবে এক ক্রোশ দূরে রহস্যপুরের মাঠে—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পাশে গত চৈত্র সংক্রান্তিতে যে মস্ত বড় মেলা বসিয়াছিল, সেখানটায়—তার বাবলুও একা গিয়া একাই ফিরিয়া আসিতে পারে।

বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছে।

এদিকে নীলিমা ছেলেকে সাজাইতে ব্যস্ত। গেল পুজার সময় পাওয়া জরির-আঁচ-দেওয়া কাপড়খানি পরিয়া, সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া, মুখে খানিক স্নো-পাউডার মাখিয়া, কপালে ছোট্ট একটু চন্দনের ফোঁটা লইয়া খোকা এখন ঠিক বাবলুও নয় সুরজিৎও নয়—নীলিমারই মুগ্ধ মনের সকৌতুক মন্তব্য অনুযায়ী বিবাহ-বাসরের মধ্যমণি।

বাবলু এতক্ষণ কোনো আপত্তি করে নাই। কিন্তু চোখে কাজল সে কিছুতেই পারিবে না। সে যেন এখনো ছোটোই আছে।

মা-ছেলের সহাস্য হাতাহাতির মাঝখানে বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকিল।

"এ্যাঁ! একেবারে রাজপুত্তুর! ছেলে তোমার দিগ্বিজয়ে বার হচ্ছে বুঝি?"

বাবলু লজ্জায় মায়ের দেহের আড়ালে মুখ লুকায়। নীলিমা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে, "তোমায় কোনো কাজের কথা বললে তখন খোঁড়া হও আর অকাজের বেলায় পঞ্চমুখ।" বাবলুর সলজ্জ মুখখানি জোর করিয়া তুলিয়া ধরিয়া মা জানায়, "লজ্জা কিসের, মুখ তোল। বোকা কোথাকার! তুই যেন ও'র মতো এক গেঁয়ো পাঠশালায় পড়তে যাচ্ছিস। সেদিন বুঝি আর আছে! মুখ তোল্।"

মঙ্গলঘটের কাছে কপাল ঠেকাইয়া ধান-দূর্বা মাথায় লইয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া বাবলু তার বাবার সঙ্গে বার-দুয়ার পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল, নীলিমা এক-দৃষ্টে চাহিয়া আছে। এতদিনে খোকারও তবে একটা স্বতন্ত্র জীবন শুরু হইল?

নীলিমার মনে হয় সে যেন আজই প্রথম পুরোপুরি মা হইল—সাত বছর আগে নয়। শাশুড়ীর মতো তারও আজ হইতে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকার পালা। তফাৎ শুধু এই যে, একজন দূর হইতে কত দিনে আবার ছেলের দেখা পাইবেন সেই হিসাব করেন মাস গুনিয়া, আর একজন এখন হইতে পুত্র কখন স্কুল হইতে ফিরিবে সেই হিসাব করিবে ঘণ্টায় আর মিনিটে।

শাশুড়ীর ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে গ্রামের হাই স্কুলে মাস্টারি লইয়া মায়ের কাছেই থাকুক। তা হয় নাই। শাশুড়ীর সন্দেহ পুত্র-বধূই তা হইতে দেয় নাই। তিনি যখন-তখন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বলিয়া বেড়ান তাঁর ছেলে নাকি পর হইয়া গিয়াছে। অথচ তাঁর নিজের দুটি মেয়েই যার যার স্বামীর কর্ম-স্থলে বিদেশে ঘরসংসার করিতেছে নির্বিবাদে। শাশুড়ী নিশ্চিন্ত। মেয়েদের সৌভাগ্যে বেশ একটু গর্বিতও। যত অপরাধ পরের মেয়ে নীলিমার?......

নীলিমার কি দোষ! শাশুড়ীর ছেলেই যে অদ্ভুত প্রকৃতির। চিঠিপত্র দিয়া মায়ের খোঁজখবর লওয়ার ভার স্ত্রীর ওপর ফেলিয়া দিয়া খালাস। নীলিমাকে তাই প্রতি চিঠিতেই লিখিতে হয়; আপনার ছেলে রাতদিন কাজে ব্যস্ত; সময় পায় না; পৃথক পত্র দিল না; ভালোই আছে। ইত্যাকার।

ছেলে বটে! মায়ের কাছে নিজের হাতে দু ছত্র লিখিলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। প্রতি মাসে ঠিক সময়ে মাকে টাকা পাঠাইবার দায়টুকুও স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত!

"মা!"

ভজুয়ার ডাকে নীলিমার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়।

"খোকাবাবুর ইস্কুলে কখন যেতে হবে?"

"বারটায়। তুই আজ সকাল করে নেয়ে খেয়ে নে।"

দেড়টা নাগাত নীলিমা উদ্গ্রীব হইয়া আছে টিফিনের সময় খোকাকে খাবার দিয়া কখন ভজুয়া ফিরিয়া আসিবে।

মাত্র চার ঘণ্টা। বড় কম সময় নয়। খোকার একটা খবর চাই। মাকে ছাড়িয়া এতক্ষণ কোনোদিন কোনোখানেই কাটায় নাই সে। অপরিচিত সহপাঠীদের মধ্যে সে হয়তো এখন জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে একটি কোণে, হয়তো বা মার কথা, বাড়ির কথা বার-বার করিয়া তার মনে পড়িতেছে।

সেকালের মতো আজকাল আর স্কুলে বেধড়ক মারধর করে না। নীলিমা শুনিয়াছে বেতমারা এখন বে-আইনী। মাঝে মাঝে একটু আধটু কানমলা বা মৃদুমন্দ চড় চাপড় যা আছে তা-ও আজ প্রথম দিনে নিশ্চয়ই নয়। তবু মায়ের মনে কেমন একটা অস্পষ্ট অকারণ শংকা।

বার-দুয়ারে আওয়াজ পাইয়া নীলিমা ডাকে "ভজুয়া এসেছিস?"

"হ্যাঁ মা।"

"ইদিকে আয়।"

ভজুয়া আসিয়া গৃহকর্ত্রীর সামনে দাঁড়ায়।

"খোকাকে তুই নিজের হাতে খাইয়ে এসেছিস তো?"

"হুঁ"।

"দুধ সবটাই খেলে? ফেলে দেয়নি?"

"না।"

খানিক নীরব থাকিয়া নীলিমা প্রশ্ন করে,

"খোকা কিছু বললে?"

'না।'

"কিছু না?"

প্রশ্নটা ভালো বুঝিতে না পারিয়া ভজুয়া চুপ করিয়া থাকে।

"বাড়ি আসতে চাইলে না?"

"না তো।"

"তোকে আমার কথা কিছুই জিগগেস করলে না?"

"উঁহু।"

"আচ্ছা যা এবার।"

বাড়ির জন্য খোকার মন নিশ্চয় ছটফট করিয়াছে। ভজুয়াটার বুদ্ধি কম। অতশত তলাইয়া সে বুঝিবে কী করিয়া?

খানিক বাদেই আবার নীলিমা ডাকে, "ভজুয়া!"

"যাই মা।"

ভজুয়া হাজির।

"খোকাকে তুই কোথায় দেখলি? ক্লাসের মধ্যে, না বাইরে?"

"বাইরে।"

"কী করছিল তখন?"

"খেলছিল।"

"খেলা করছিল?"

"হ্যাঁ মা। ইস্কুলের লাগোয়া ছোটো মাঠটায় আর সব ছেলেদের সঙ্গে বুড়ি-ছোঁয়া খেলছিল।"

নীলিমা নির্বাক। মার কথা একটি বারও জিজ্ঞাসা করে নাই। বিচিত্র কী? বাঘের বাচ্চা আজ রক্তের স্বাদ পাইয়াছে। গৃহের সঙ্কীর্ণ পরিধির বর্ণপরিচয় সাঙ্গ করিয়া আজ সে বৃহত্তর বাইরের পরিচয় লাভের প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতে গিয়াছে।

এবার নীলিমা নিজেই ভজুয়ার ঘরের দোর-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ায়।

"ভজুয়া।"

"বলুন।"

"তোর মার জন্যে মন তোর কেমন-কেমন করে না রে?"

ভজুয়া ইতস্তত করে, "হ্যাঁ-না-তা একটু একটু করে।"

"মাকে চিঠি দিস্ তো?"

এবার ভজুয়া লজ্জায় মাথা নোয়ায়। লেখাপড়া সে জানে না।

"কেন দিস্ না? আমায় বললে তোর চিঠি বুঝি আমি লিখে দিতে পারি না? হতভাগা!"

বিকালে নীলিমা রাস্তার ধারের জানালার কাছে বসিয়া আছে। পৌনে পাঁচটা বাজে। এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়।

আরও আধ ঘণ্টা বাদে অদূরে গলির মোড়ের মাথায় ভজুয়ার আগে আগে বাবলু যেন বীরদর্পে দেশ জয় করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। নীলিমা ছুটিয়া বার-দুয়ারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। খোকার মুখ তো এতটুকুও শুকনো নয়। খুশির আবেগে যেন টলোমলো।

"দাঁড়াও, আগে আমার বই-পত্তর সব রেখে আসি," বলিয়া জননীর প্রসারিত বাহুর আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া বাবলু পড়ার ঘরে চলিয়া যায়।

"হ্যাঁরে ভজুয়া, তোদের আসতে এত দেরি হল কেন?"

"আর ব'লো না মা! খোকাবাবু বুঝি কথা শোনে আমার! খানিক পথ চলেই দাঁড়িয়ে যায়। ডাকবাংলোয় এক সাহেব এসেছে, তাকে না দেখে আসবে না। ডাক-ঘরে গিয়ে টেলি-করা আজই দেখা চাই।"

"তুই বাধা দিস্ নি কেন?"

"বাধা দিলে আমায় ধমকে ওঠে।" ভজুয়া বলিয়া যায়, "জলের কলের কাছে এসে আর আসতেই চায় না। কাল দেখাব বললাম, কানে সে কথা তোলেই না। মা! কী সাহস খোকাবাবুর! দুগগা বাড়ির পুলের উপর উঠে রেলিং ধরে ঝুলতে চায়।"

নীলিমা রুখিয়া ওঠে, "তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না বাপু! রাস্তা দ্যাখ্। একটা ছোট্ট ছেলেকে বাগ মানাতে পারিস্ না!—বসিয়ে বসিয়ে কে কোথায় খাওয়াবে যা না সেখানে।"

ভজুয়া হতবাক। ভাবিয়াছিল খোকা-বাবুর বীরত্বের ফিরিস্তি পাইয়া গৃহকর্ত্রী খুশিই হইবেন। এ যে হিতে বিপরীত। ভজুয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়ে।

পড়ার ঘর থেকে আসিয়াই বাবলু সোৎসাহে মাকে জানায়, "জানো মা, আমাদের ইস্কুলের টীম, এবার মস্তবড় একটা রূপোর কাপ পেয়েছে।"

সে-কথা জানিবার কোনো আগ্রহ মায়ের নাই। মা খাবার সামনে রাখিয়া বলেন, "আগে খেয়ে নে।"

"আমার এখনো খিদে পায়নি মা!"

"পেয়েছে। তোর কখন খিদে পায় না-পায় সে-কথা বুঝি তোর কাছ থেকে আমি শিখতে যাব?"

বাবলু খাইতে বসে। আজ মনে তার সহস্র কথা। মাঝে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে আর রোজ বিকালে ভজুয়ার সঙ্গে স্বল্প সময়ের ফাঁকে ফাঁকে যে বহির্জগতের মৃদু-মন্দ আভাস পাইয়া আসিয়াছে, তার অবারিত আস্বাদের ছাড়পত্র এতদিনে মিলিয়াছে।

মা প্রশ্ন করে, 'পড়া জিগ্গেস করেছিল?'

'প্রথম দিন বুঝি পড়া দিতে হয়। —তুমি কিছু জানো না মা।'

নীলিমা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমি না হয় জানিই না, তাই বলে অমন করে বুঝি মায়ের কথার জবাব দিতে হয়?

খাওয়া শেষ হইলে নীলিমা ছেলেকে বিছানায় কোলের কাছে টানিয়া লয়।

'খোকা! ইস্কুলে বাড়ির জন্যে তোর মন কে'দেছিল?'

'না তো।'

'নিশ্চয় কে'দেছে। টিফিনের সময় ভজুয়ার সঙ্গে বাড়ি আসবার জন্যে মনে মনে ছটফট করেছিলি, —কেমন?'

পুত্রের নিকট হইতে কোনো জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই নীলিমা বলিয়া যায়, 'ভয় কি রে বোকা! চিরকাল তোকে আমি আগলে রাখব নাকি! এখন না তুই বড় হয়েছিস!'

ছেলে চুপ করিয়া শোনে।

'খোকন!'

'কী মা?'

'এখন থেকে দিনরাত তুই তো বই নিয়েই কাটাবি। তাই না? কত বন্ধু হবে তোর।'

বাবলু নিরুত্তর।

'হ্যাঁ রে দুষ্টু ছেলে! কথা বলিস না যে!—বাড়িতে দু' বেলা কেবল বই কোলে নিয়েই পড়ে থাকবি তো?'

'না মা!' জবাব একটা না দিলে নয় তাই বাবলু কথা বলে।

'নিশ্চয় তুই বইপত্তর নিয়ে পড়ে থাকবি, তারপরে থাকবি বউ নিয়ে।'

'যাঃ!!'

'আঁ! বড় যে ভালোমানুষি দেখানো হচ্ছে! তোর পেটের কথা আমি যেন টের পাইনি কিনা!'

বাবলু অকারণ লজ্জায় মৃদু মৃদু হাসে। নীলিমা একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। সে বেশ জানে নদী কখনো সরোবর হয় না। না-ই বা হইল। তবু আজ তার সর্বাঙ্গ দিয়া নীলিমা এই উন্মেষ মুহূর্তে জননীর উপর একান্ত নির্ভরতার নাগালের মধ্যে ভবিষ্যতের এক বলিষ্ঠ দেহ যুবককে একটিবার বাঁধিয়া ধরিয়া রাখার স্বপ্ন দেখিয়া লয়!

মায়ের আকস্মিক ভাবান্তর বুঝিতে না পারিয়া ছেলে জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া আছে।

'খোকন! তুই আর যা'ই করিস, কি-হপ্তায় আমায় কিন্তু একখানা করে চিঠি দিস—নিজের হাতেই লিখবি। ভুলিস নি যেন। বউ-এর উপর বরাত দিয়ে দায় সারলে চলবে না কিন্তু।'

ব্রত

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

এতদিন হাটে-বাজারে পোস্টার পড়ছিল, এবার শুরু হল বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে।

ভদ্র এলাকা শেষ হতে মই ঘাড়ে লোক এসে এ পাড়ার মাটির দেয়ালের ওপর পোস্টার আটকাতে আরম্ভ করল। মাঝখানে ছবি, ওপরে নিচে বড় বড় লাল অক্ষরের মিছিল।

আর দিন তিনেক, তারপর ভদ্রলোক এসে পড়বেন। গাঁয়ের যাতে উন্নতি হয়, গাঁয়ের মানুষের দুঃখ কষ্ট ঘোচে সেই চেষ্টার।

উঠানে গোবর জল ছিটাতে ছিটাতে প্রথমে সোনালীর নজরে পড়ল। বালতি রেখে পোস্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পা উঁচু করে দেখল কিছুক্ষণ তারপর ঘরের দাওয়ায় উঠে গলা ছাড়ল, বংস আর আমাদের দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকবে না লো। শহর থেকে বাবু আসছেন। কোঁচার খুঁটে চোখের জল মোছাবেন।

কথা শেষ করে সোনালী মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করল।

একসময়ে জমজমাট ছিল, এখন ভাঙা হাট। কিছু মরেছে অসুখে, কিছু ছিটকে পড়েছে এদিক-ওদিক। সম্বল ছ-সাত ঘর। সাত-সকালে সোনালীর হাঁক-ডাকে সবাই বেরিয়ে এলো। কিলা সোনালী, ভোরবেলা পাড়া মাথায় তুলেছিস যে?

সোনালী বিন্দুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে দেয়ালের দিকে আঙুল দেখাল, সোনালী আবার কি করবে। ওদিকে যে নুটিশ লটকে দিয়ে গেছে।

নোটিশ! কিসের নোটিশ! সবাই গিয়ে জড় হল। বাড়িওয়ালী মাসী থেকে বিন্দু, সোহাগী, রাধারাণী, পারুল এমন কি বুড়ী দামিনী পর্যন্ত।

অনেকেই পড়তে পারে না। যারা পারে তারা অন্য সকলকে বুঝিয়ে দিল। সোহাগী ক্ষেপে অস্থির।

—ওসব চালাকি বুঝি আমরা। ভাল করতে আসছে, না ছাই। ওসব ভোটের ফন্দি। তোদের বোকা বানাতে পারে, আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

গজ গজ করতে করতে সবাই যে যার ঘরে ফিরে এলো। সোনালীর যত সৃষ্টি-ছাড়া কান্ড। হৈ-চৈ করে মানুষের কাঁচা ঘুম নষ্ট।

সবাই চলে যাবার পরেও পারুল দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এদিক-ওদিক চেয়ে ছবির আরো কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু মাংস লেগেছে গালে, বয়স একটু বেড়েছে, তাছাড়া আর কোন তফাৎ নেই। সেই রকম বড় বড় চোখ, চাপা ঠোঁটের গড়ন, এমন কি ভুরু পাশের কাটা দাগটা পর্যন্ত। স্বদেশীবাবু। দেশের দুঃখ দূর করার জন্য কোমর বেঁধেছিল, আজ বুঝি গাঁয়ের দুঃখ দূর করতে এখানে আসছে।

সারাটা দিন পারুল ছটফট করল। কেমন একটা অস্বস্তি। মানুষকে বলবার নয়, বোঝাবার নয়। নিজেই কি ছাই বুঝতে পারছে। দাঁতের গোড়ায় কাঁটা ফুটে থাকার মতন, জিভ লাগতেই খচ-খচ করে উঠল।

বছর দশেক, কি আর একটু কমই হবে। গুমট গরম। ঘামে বিছানা ভিজে একশা। দুদিন খদ্দেরের বালাই নেই। আকাল পড়েছে। গরমে পারুল ঘর আর বার করছে। ছিটেফোঁটা ঘুম নেই চোখে।

কুঁজো থেকে ঘটি ঘটি জল গড়িয়ে নিজের গলাতেই শুধু ঢালল না মুখে-চোখেও ঝাপটা দিল। কপালে, কানের দুপাশে। শেষকালে ঝাঁপ খুলে বাইরের দাওয়ায় এসে বসল।

সামনে মাতঙ্গী নদী। একেবারে দাওয়ার কোল ঘেঁষে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু হাত দূরের জিনিস নজরে ঠেকে না। বাতাস নেই। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। মাতঙ্গী পুকুরের সামিল।

আচমকা ছপছপ শব্দ হতেই পারুল চমকে মুখ তুলল। জলের আওয়াজ। একটু দূর থেকে কি একটা ভেসে ভেসে আসছে। জলে মৃদু আলোড়ন। চোখ কুঁচকে দেখল কিছুক্ষণ। বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারুলের সাহস হল না। ফিরে ঝাঁপ সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল।

একটু দাঁড়াও।

চমকে পারুল মুখ ফেরাল। জলজ্যান্ত মানুষ। গা-মাথা বেয়ে টপ-টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। ভিজে চুল কপালের ওপর। খুব ক্লান্ত গলার সুর।

চেঁচাতে গিয়েও কি ভেবে পারুল চেঁচাল না। খুব কাছাকাছি। দেখতে কোন অসুবিধা নেই। বড় বড় চোখ, অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চোর ছ্যাঁচড় পাজী বদমাইস নয়—ভদ্রলোক। আহা, কি বিপদে পড়ে হয়তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আজ রাতের মতন একটু আশ্রয় দেবে? একটা রাতের মতন?

কে আপনি? দরজায় পিঠ রেখে পারুল ঘুরে দাঁড়াল!

নাম বললে তো চিনবে না। এ গাঁয়ে আমি থাকি না। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই। পুলিশ তাড়া করেছে। এখুনি এসে পড়বে।

পুলিশ? ভদ্রলোকের ছেলে, তা পুলিশ কেন পিছনে?

জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই কিন্তু পারুল বাধা পেল।

ভিতরে এস। সব বলব। পারুলের পাশ ঘেঁষে লোকটা দরজার কাছ বরাবর দাঁড়াল।

অসহায় গলা, কাতরোক্তির সামিল। ঝাঁপ খুলে পারুল ঘরে দাঁড়াল। মুখে বলল, 'একটু দাঁড়ান, পিদিমটা জ্বালি।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে পারুল কি ভেবে প্রদীপ নয় হ্যারিকেনটাই জ্বালাল। খদ্দের না এলে হ্যারিকেন জ্বালায় না, প্রদীপেই কাজ চালায়। কেরোসিন পাওয়াই দায়। ভোর থেকে লাইন দিয়ে এক ছটাক মেলে, তাও আগুন ছোঁয়া দাম।

চোর বদমাইস নয়, স্বদেশী। পারুল সব শুনল। একেবারে কোণের দিকে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে ভদ্রলোক বলল। অল্প কথায়। তাও পারুলের পীড়াপীড়িতে।

স্বদেশী! একটু একটু করে পারুলের মনে পড়ল।

চন্ডীতলার মাঠে মেলার দিন এইসব স্বদেশীবাবুরা জড় হয়েছিল। সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সবাই। হাত জোড় করে। দয়া করে বিলিতি জিনিস কিনবেন না কেউ। বিলিতি কাপড়-চোপড়, বিলিতি খেলনা কিছু ছোঁবেন না। সন্ধ্যার দিকে শুকনো পাতা জড় করে আগুন জেলে দিয়েছিল। পারুল, সোহাগী, বিন্দু, সবাই ছুটে গিয়েছিল সেদিকে। শুধু শুকনো পাতাই নয় বিলিতি কাপড়ও ছিল তার মধ্যে। দোকান লুট করে স্বদেশীবাবুরা দেশলাই ধরিয়ে দিয়েছে তাতে। পেট্রল ছড়িয়ে।

এরকম গুন্ডামী করলে তো পুলিশ পিছনে লাগবেই।

হ্যারিকেনের ম্লান দীপ্তি, কিন্তু দেখতে কোন অসুবিধা হল না। শান্ত নিরুত্তেজ চেহারা। কতই বা বয়স। একেবারে ছেলেমানুষ, তিন কুলে কেউ নেই নাকি। এমন করে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়েছে?

পুলিশ পিছু ধাওয়া করেছিল আমাদের নৌকার। আমি ঝাঁপিয়ে জলে পড়েছি। পিছন পিছন হয়তো তাড়া করে আসতে পারে এখানে। তুমি বাঁচিও আমাকে। কোথাও না হয় লুকিয়ে রেখে দাও।

একটানা এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগল ভদ্রলোক। এক নাগাড়ে সাঁতার কেটে এতটা পথ এসে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ঠোঁট চেপে দম নিচ্ছে।

মিষ্টি হাসল পারুল।

পানের ছোপ লাগা লালচে ঠোঁট উল্টে বলল, কোন ভয় নেই। মোহিনীমাসীর আওতা থেকে ব্যাটাছেলে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এমন পুলিশ এখনও জন্মায়নি। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

কথা শেষ করে পারুল বেরিয়ে গিয়েছিল ঘরের ঝাঁপ ভেজিয়ে। চুপি চুপি পরামর্শ করেছিল বাড়িওয়ালী মাসীর সঙ্গে। খদ্দেরের জন্য মাসী সব করতে পারে। তবে বকরা দিতে হবে পারুলকে। ওসব স্বদেশীবাবুর ট্যাঁক একেবারে ফাঁকা। সে খোঁজ পারুল নিয়েছে!

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! পারুল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তেমন কাঁচা মেয়ে পাওনি মাসী। ঘরে ঢোকামাত্র পাওনা আদায় করে নিয়েছি। তুমি শুধু পুলিশ ঠেকাও। বকরা কাল ভোরে হাতে হাতে দিয়ে দেব।

মাসী খুশীতে ডগমগ। হাসি আর ধরে না মুখে। ব্যস, ব্যস, নির্বিঘ্নে ঝাঁপ বন্ধ করে দিক পারুল। মাসী রইল ঘাঁটি আগলে। যমের সাধ্য নেই, তাকে ডিঙিয়ে যাবে।

গোলমাল শুরু হল গভীর রাতে।

মাসী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। জানলার ফাঁকে ফাঁকে সার্চলাইটের জোর আলো। চোখ-ধাঁধানো।

দেয়াল ঘেঁষে ভদ্রলোক চুপচাপ বসেছিল। বিছানা পেতে দিয়েছিল পারুল। বিছানা আর কি। একটা শতছিন্ন সতরঞ্জ আর আধ ময়লা বালিশ। নিজে শুয়েছিল চৌকাঠ বরাবর। মেঝে মুছে নিয়ে তার ওপর।

আচমকা গায়ে হাত লাগতেই পারুল ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ভদ্রলোক অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে গায়ের ওপর এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঠেলছে দু হাত দিয়ে।

কি কি হল?

বাইরে আলো আর লোকের গলার শব্দ। বোধহয় পুলিশের লোকই এসে পৌঁচচ্ছে। নিভন্ত হ্যারিকেন। মানুষ চেনার উপায় নেই। কিন্তু অসহায় কাতর কণ্ঠস্বর। পারুল উঠে বাইরে গেল।

দুজন জল-পুলিশ। স্টীম লঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে হল্লা করছে। একেবারে অচেনা নয় পারুলের। রাত-বিরেতে এখান দিয়ে যেতে যেতে কাউকে দেখতে পেয়ে রসিকতার টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছে, হাল্কা পরিহাসও করেছে দু-একবার। মাঝে মাঝে উৎকট সুরে গানও গেয়েছে। কখনও-সখনও পারুলও মস্করা করেছে। শুধু পারুল কেন, সোহাগী, রাধা, সুশীলা সবাই। হেসে বলেছে, স্টীমলঞ্চে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে নাকি গো? ও পুলিশবাবুরা?

চোখ রগড়াতে রগড়াতে পারুল গিয়ে দাঁড়াল, কি ব্যাপার, মাঝরাতে এত হৈ-হল্লা কিসের?

পারুলকে দেখে একজন মুচকি হাসল, আরে এক বাবু ভাগিয়েছে। এ তরফে এসে উঠেছে নাকি? ধরতে পারলে বহুত ইনাম মিলবে। বাবু ডাকু আছে।

এসেছে রে মুখপোড়া, পারুল মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, মাঝ রাত্তিরে সাগর পেরিয়ে নাগর এসেছে। বলে দুদিন একটা মানুষের দেখা নেই। কি করে পেট চলবে ভগবান জানেন। ডাকু হোক, আর সাধু হোক, একটা বাবু পেলে বেঁচে যাই। কাজের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল হৈ-হল্লা।

পুলিশ আর দাঁড়ায়নি। এধার ওধার সার্চলাইটের আলো ফেলে ফেলে সরে গিয়েছে।

চলি বিবিজান। মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভাঙাবার জন্য কিছু মনে কর না। বাবুকে খুঁজে পাই তো ধরে এনে দিয়ে যাব তোমার ঘরে।

লঞ্চ সরে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত পারুল দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। হিসাব করল মনে মনে। এই দুদিন। একটি পয়সা রোজগারের নাম নেই, অথচ ভোর না হতেই নিজের জমানো পয়সা থেকে অন্তত নগদ দু-তিন টাকা বাড়িওয়ালী মাসীর হাতে তুলে দিতে হবে। পুলিশের তাড়া খাওয়া বাবু, ওই তো জামা-কাপড়ের ছিরি, হাতে যে কিছু দিয়ে যাবে এমন ভরসা কম।

চলে গেছে? ফিসফিসানি শুনে পারুল মুখ ফেরাল।

ঝাঁপ ফাঁক করে ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—হ্যাঁ।

উস্কোখুস্কো চুল, নিজের ভেজা ধুতি ছেড়ে পারুলের রঙীন শাড়ি জড়িয়েছে। খালি গা। চওড়া বুকের পাটা। শক্ত সবল দেহটার সঙ্গে কচি মুখের যেন মিল নেই।

হ্যাঁগো বাবু, পারুল বলতে ছাড়েনি, এমন করে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কদিন বেড়াবে? সোমত্ত পুরুষ শাড়ি জড়িয়ে বসে থাকবে ঘরের কোণে?

দু-চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভদ্রলোক পারুলের কাছে এসেছিল, মিছিমিছি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে লাভ কি বল? জেলে পুরে দেবে বিনা বিচারে। আমাদের সব কাজ পন্ড। ধরা পড়লে কিছুতেই চলবে না। ওদের নজর এড়িয়ে আমাদের বাঁচতে হবে।

তারপর পা মুড়ে বসে পারুলকে অনেক কথা বলেছে। দেশ স্বাধীন হবে। নতুন করে গড়ে উঠবে সব কিছু। পুরনো দিনের জমাট কালো অপমানের কালি দুহাতে মুছে নিয়ে নতুন করে চলার শুরু। মানুষের মতন মাথা উঁচু করে বাঁচা। দুঃখ দারিদ্র্য অশিক্ষার কুয়াশা কাটিয়েছে।

আরো অনেক কথা বাবুটি বলেছিল। সব কথা পারুলের মনেও নেই, অনেক কথা সে বুঝতেও পারেনি। শুধু দেখেছিল, এসব বলবার সময় লোকটির সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল, দু-চোখে ঘনিয়ে আসা কিসের স্বপ্ন। চেয়ে চেয়ে পারুলের আশ মেটেনি। ভাঙা কুঁড়ে ঘরে দেবদূত নেমে আসার মতন বাবুটি বুঝি অনন্ত আশ্বাসের বাণী বয়ে এনেছে।

পরের দিন পাশের ঘরের সোহাগী আর রাধা ঠাট্টা করেছিল।

কি ব্যাপার রে পারুল? নতুন কনের মত সারাটা রাত বাবুর সঙ্গে কিসের এত গুজ গুজ ফুসফুস? ভালবাসার কথা এতক্ষণ ধরে? অবাক করলি তুই।

মুখ টিপে পারুল হেসেছে, নতুনতর ভালবাসার পাঠ নিলাম নতুন নাগরের কাছে।

কতই দেখালি বুড়ো বয়সে। ওই তো একরত্তি ছোঁড়া, ও শোনাবে সোহাগের কথা, রাধা মুখ ঘুরিয়েছিল, মাসীর কাছ থেকে বোতল বেরোল না, খাবার আনার বালাই নেই। শুকনো ভালবাসার কথা, ঝাঁটা মারো অমন নাগরের মুখে।

সোহাগী অত কথা বলেনি। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, বেশ কিছু আদায় করেছিস বুঝি? এত হাসি হাসি মুখ?

পারুল উত্তর দেয়নি। শুধু আঁচলে নিজের ডান হাতটা ঢেকেছে। বাজারে হয়তো এর দাম কানাকড়িও নয়, কিন্তু ওর কাছে এর দাম অনেক। মিনে করা নিকেল-কেমিকেল সোনার আংটি। শাঁখের ওপর নীল রংয়ের অক্ষর 'ল'। বাবুটির নামের আদ্যাক্ষরই হবে বোধহয়।

যাবার সময় বাবুটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, রাত কাটালে কিছু দিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ আছে, কিন্তু আমি একেবারে নিঃসম্বল। কিছুই নেই কাছে। খুচরো সামান্য যা আছে, ছাড়তে সাহস হচ্ছে না। কোথায় কিভাবে কাটাতে হবে ঠিক নেই। তারপর কি ভেবে আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে পারুলকে দিয়েছে, এর দামও খুবই সামান্য। কিন্তু বাজারের দামে সব সময় তো সব জিনিসের যাচাই চলে না। এ আংটি আমার মার দেওয়া। তোমার উপকার আমি জীবনে ভুলব না। পুলিশ ঘর সার্চ করে আমায় পেলে তোমায়ও রেহাই দিত না। এটা তুমি রেখে দাও।

পারুল কিছু বলবার আগেই ঝাঁপ খুলে লোকটি বেরিয়ে গেল।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে পারুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। উঠান পার হয়ে মাতঙ্গী নদীর ধার দিয়ে সোজা শহরের দিকে পা চালাল। একটু দূরে যেতেই পারুল আর দেখতে পেল না।

সেই এক লোক, তাতে আর পারুলের কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ একেবারে ঘুচল আসল মানুষটাকে দেখে আসার পর।

পলাশডাঙ্গার মাঠ ভিড়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাঁশ দিয়ে পুরুষ আর মেয়েছেলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর ঝলমলে চাঁদোয়া। তলায় চেয়ারের সার। সবচেয়ে মাঝখানের চেয়ারে ভদ্রলোক গিয়ে বসল।

বাঁশের বেড়া ধরে পারুল আর সোনালী দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে একেবারে পাশ কাটিয়ে গেল ভদ্রলোক। বড়জোর হাত খানেকের তফাৎ। চোখ কুঁচকে পারুল ভাল করে দেখল। সেই বাবু, আর কোন সংশয় নেই। একটু বয়স বেড়েছে কেবল, কপালের দুপাশে চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী ইশারা। সেদিনের মতন আগুন নেই চোখে, দৃষ্টি অনেক স্তিমিত।

মিটিং শেষ হবার আগেই পারুল চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে সোনালীও, দেশোদ্ধারের বড় বড় কথা। কানে গেলেও একটি বর্ণ মানে বুঝতে পারল না। অবশ্য অত বড় একটা দেশসেবকের বক্তৃতা ওদের মতন অশিক্ষিতা নারীরা বুঝতে পারবে, এমন আশাও ওরা করেনি। পুলিশের নজর এড়িয়ে বাঁচতে চেয়েছিল বাবু। ভালভাবেই যে বেঁচেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এরচেয়ে বেশী আর কি হতে পারে।

বাঁশের আগায় তেরঙা নিশান তুলল, ফুলের মালা পরল গলায়, জেলায় হাকিমের পাশাপাশি বসে সারা গাঁয়ের হাততালি কুড়াল। এর বেশী আর কি চাইবে মানুষ!

দিন দুয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

প্রথম খবর আনল জবা। কোন গাঁ থেকে ছটকে এসে নতুন আস্তানা বেঁধেছে। শক্ত সমর্থ শরীর। চেহারার টানে খদ্দেরের আনাগোনার কমতি নেই। আগের রাতে রাজীবলোচন এসেছিল ওর ঘরে। বুড়ো উকীল তিনকড়ি সেনের পাকা মুহুরী। দুনিয়ার খবর নখের ডগায়। জানে না এমন বিষয় নেই। সে-ই বলে গেছে।

ভোর ভোর জবা পারুলের ঘরের শিকল নাড়ল। ও পারুলদি, গা তোল। কি সর্বনেশে খবর শুনলাম গো?

বার দুই তিন। তার পরই পারুল ধড়মড় করে উঠে পড়ল, কি রে জবা?

জবা বলল, পা মুড়ে পারুলের কাছাকাছি বসে। গাঁ থেকে ওদের নাকি উচ্ছেদ করা হবে। কুলোর বাতাস দিয়ে দূরে করে দেবে সবাইকে। নোংরা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। আকাশে বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে ওরা দেশের সর্বনাশ করছে।

প্রথমটা পারুল বিশ্বাস করে নি। যত আজগুবি কথা। রাজীবলোচনের যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

কিন্তু জবা পারুলের গা ছুঁয়ে বলল, একটি বর্ণ মিথ্যা নয় দিদি। সেই জন্যেই বুঝি শহর থেকে ললিত মজুমদার এসেছে। গাঁয়ের মাতব্বরদের ডেকে শলা-পরামর্শ হচ্ছে।

ললিত মজুমদার? বিস্ময়ে পারুল চোখ তুলল।

হ্যাঁগো, ওই যে? দেয়ালের ওপর লাগানো পোস্টারের দিকে জবা আঙুল তুলে দেখাল।

ওই ললিত মজুমদার। সে রাতের আশ্রয়-পাওয়া বাবু।

আর কথা বাড়াল না পারুল। জবা উঠে যেতে ঝাঁপ খুলে আংটিটা বের করল। মিনে করা আংটি। আগের সেই উজ্জ্বলতা নেই, কেমন বিবর্ণ, ফ্যাকাসে।

এই আংটি নিয়ে দেখা করলে হয় না বাবুর ডেরায়! পুরনো কথা মনে করিয়ে দেওয়া যায় না! দশ বছর আগে ঘুটঘুটে অন্ধকার এক রাতের কথা। সে রাতে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল পারুল আর আজ সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না পারুলদের। আগাছার মতন নির্মমভাবে উপড়ে ফেললেই হল বুঝি এতদিনের আস্তানা গুটিয়ে যাবেই ব[illegible] কোথায়? কোন্ জাহান্নামে?

পারুল মন ঠিক করে ফেলল, ব্যবস্থা পাকাপাকি হবার আগেই দেখা করা উচিত। রাজীবলোচন বাড়তি খবর আনল স্কুল-বাড়িতেই ললিত মজুমদা[র] আস্তানা গেড়েছে। তবে নাগাল পাওয়া মুস্কিল হরদম লোকজন যাওয়া আ[সা] করছে। চুনো-পুঁটি থেকে রাঘব বোয়াল শলা-পরামর্শ, ফন্দি-ফিকির। মতলবে[র] আর অন্ত নেই। মাটি কেটে কেটে সড়[ক] তৈরী, নদীতে বাঁধ, রাস্তার মো[ড়ে] টেপাকল, হরেক রকম ব্যাপার। তার ও[পর] গাঁ থেকে রোগ তাড়ানোর প্রশ্ন [illegible] রয়েইছে, রোগ তাড়ানো আর বদ মে[য়ে]ছেলে তাড়ানো—দুইই।

পারুলের একলা যেতে সাহস হল না[।] জবাকে সঙ্গে নিল।

উঠতি বয়স, কাঁচা পয়সা হাতে আ[ছে] কাজেই জোরও রয়েছে বুকে। আর কি[ছু] না পারুক, ভিড় ঠেলে এগোতে [illegible] পারবে। তারপর পারুলের আঁচলে বাঁ[ধা] আংটি তো রইলই।

স্কুল-বাড়ির কাছ বরাবর গি[য়ে] দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল। গোটা তি[ন] মোটর, বেশ কয়েকজন লোকও ঘোরাফে[রা] করছে এদিক ওদিক।

ও পারুলদি, দাঁড়িয়ে পড়ল জ[বা]

ফ্যাকাসে মুখের রং। পায়ের আঙুল দিয়ে আঁকি-বুকি কাটল মাটিতে।

কি হল? জোর করে পারুল নিজের গলার আওয়াজ চড়াল।

আমি দাঁড়াই এখানে, তুমিই যাও ভাই। জবা একটু এগিয়ে পেয়ারা গাছের ছায়ায় বসেই পড়ল।

আ মলো, অত ভয়টা কিসের,, বাঘ ভালুক তো আর নয়। মানুষ তো বটে। তাছাড়া, আমরা তো আর ভিক্ষে চাইতে যাচ্ছি না। স্পষ্ট কথা বলব, ভয় কিসের অত?

কিসের যে ভয় তা পারুল নিজেই জানে না। তবু কেমন ভয় ভয় করল।

পিছনে ফেলে আসা এক রাতের পরিচয়ের ওপর ভর করে দিনের আলোয় মুখোমুখি দাঁড়ান যাবে তো মানুষটার! স্বল্প মূল্যের এক আংটির জোরে বুকে জোর আনা কতখানি হাস্যকর তা বুঝেই ভিতরে পারুল একটু মিইয়ে গেল।

কিন্তু এতখানি এগিয়ে এসে অার বুঝি পিছনো যায় না। হাসি টিটকিরিতে তাহলে পারুলকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না।

জবার হাত ধরে পারুল টেনে তুলল। হেসে বলল, হায় রে, পুরুষমানুষকে এত ভয়? আমার আঁচলে বাঁধা শেকড় আছে, সাপের নাকের কাছে ধরতেই দেখবি ফণা গুটিয়ে আসবে।

দরজার মুখেই বাধা। লাঠি হাতে

পাইক পথ আটকাল। ভিতরে লোক আছে, যাবার হুকুম নেই। অপেক্ষা করতে হবে।

ঠিক আছে, অপেক্ষাই করবে। এতদূর এসে আর ফিরে যাবে না। পারুল আর জবা উঠানে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘন্টাখানেকেরও বেশী। লোক আসা যাওয়ার যেন আর কামাই নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনেই বিরক্ত হয়ে উঠল। আঁচল দিয়ে দাওয়া মুছে বসে পড়ল। আঁচলের গিঁট খুলে জবা পানের ডিবা বের করল। দোক্তার মিশেল। তবু খানিকটে প্রাণ বাঁচল।

জবা কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল। পাইকটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবু খালি হয়েছেন এইবার। দেখা করতে হয়তো গা তুলতে হবে।

চৌকাঠ বরাবর গিয়ে পারুল কাপড় দিয়ে মুখটা মুছে নিল। ঘামের ফোঁটা জমে উঠেছে কপালে। পা দুটোও বেশ কাঁপছে।

সারা ঘর জুড়ে সতরঞ্চ, মোটা মোটা কয়েকটা তাকিয়া এদিক ওদিক ছড়ানো। ঠিক মাঝখানে ভদ্রলোকটি পা মুড়ে বসে। সামনে কাগজপত্রের রাশ। পাশে গোটা দুয়েক ছোকরা কি সব আলাপ করছে ঝুঁকে পড়ে।

পায়ের আওয়াজ হতেই ভদ্রলোক মুখ তুলে চাইল।

পারুল আর জবা সামনে গিয়ে বসতে পাশের ছোকরা দুটি উঠে বাইরে চলে গেল।

কি বলুন?

জিভ দিয়ে পারুল ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। আস্তে আস্তে বলল, আমরা পুব-পাড়া থেকে আসছি।

পুবপাড়া! ভ্রূ কুঁচকে ভদ্রলোক কি ভাবলে দু-চার মিনিট, তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই যেন মাথা নাড়ল, ওঃ বলুন কি বলতে এসেছেন।

আমাদের নাকি উঠিয়ে দেবার কথা হচ্ছে? এ গাঁ থেকে সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত?

ভদ্রলোক সোজা চাইল পারুলের দিকে। সারা মুখে হিজিবিজি আঁচড়। আগের দিনের কমনীয়তার বদলে রুক্ষ কর্কশ ভাব।

হ্যাঁ কথা হচ্ছে, আর যাতে ওঠাতে পারি সেই চেষ্টাতেই আমার এখানে আসা।

কিন্তু আমরা তাহলে যাব কোথায়? কিভাবে চলবে আমাদের!

সে দেখার কথা তো আমার নয়, অসম্ভব নির্মম ঠেকল ভদ্রলোকের কণ্ঠ।

ঘৃণ্য ব্যবসা যাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টা করতে আমি দৃঢ়সংকল্প। ভদ্রলোক কথা শেষ করে তাকিয়ার হেলান দিল।

ব্যবসা বন্ধ হলে আমাদের উপায়? না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে সবাইকে।

হয়তো হবে। চোরেরাও তো ঠিক একই কথা বলতে পারে। কিন্তু তাদের ব্যবসা করতে দেওয়া নিশ্চয় উচিত নয়?

মুখের ওপর সবেগে চাবুক পড়লেও বোধহয় পারুল এতটা বিস্মিত হত না। যন্ত্রণায় এত নীল হয়ে উঠত না মুখের শিরা উপশিরা। চমৎকার উপমা। চোরের সঙ্গে তুলনা। কিন্তু সেরাতে চোরের মতন এদেরই একজনের ঘরে লুকিয়ে থাকতে বাধে নি মর্যাদায়, লজ্জা হয় নি!

কোন কথা না বলে পারুল আঁচলের গিঁট খুলল। মোক্ষম অস্ত্র। এখনি মুখ-চোখের চেহারা পাল্টে যাবে ভদ্রলোকের। পুরনো দিনের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জীর্ণ একটা কংকাল বের হবে চোখের সামনে। নিজের অতীত কীর্তিকলাপের কংকাল।

এ আংটিটা চিনতে পারছেন? পারুল আংটিটা সতরঞ্চের ওপর রেখে ভদ্রলোকের দিকে চোখ তুলে চাইল।

ললিত মজুমদার হাত দিয়ে আংটিটা তুলে ধরল। বিস্ময় ঘনিয়ে এল দুটি চোখে। ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ আপনি কোথায় পেলেন? এ আমার আংটি।

পাইনি কোথাও। আংটির মালিকই দিয়েছেন আমাকে। চোখ ফেরাল না পারুল।

আর ভয় নেই। ওষুধ লেগেছে, আংটি যখন চিনেছে, তখন মানুষও চিনবে। একটু একটু করে সেরাতের সব কথা মনে পড়বে! শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হাত শুধু নয়, বুকও কেঁপে উঠবে।

আপনাকে দিয়েছেন? ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারিত হল। মনের মধ্যে ললিত মজুমদার ডুবুরী নামিয়েছে। কি খুঁজছে, অতীতের স্মৃতিমন্থন। গরল না সুধা কি ওঠে ঠিক নেই।

কিন্তু পারুল হতাশ হল।

ললিত মজুমদার মাথা নাড়ল। কি জানি, ঠিক মনে পড়ছে না, ফেলে আসা জীবন যে কত জায়গায় কাটাতে হয়েছে তার আর হিসেব নিকেশ নেই।

ললিত মজুমদারের হিসেব নিকেশ নেই, কিন্তু পারুলের ঠিক হিসেব আছে। একটি কথাও সে ভোলে নি। থেমে থেমে সব বলল। সেরাতের কাহিনী।

ললিত মজুমদার স্থির হয়ে শুনল। একটি আঁচড় পড়ল না মুখে। একটু ভাঁজ নয়।

পারুলের কথা শেষ হতে ধীর গলায় বলল, আজীবন আমি সত্যের পূজারী। বিপদের মধ্যে পড়েও সত্যের আশ্রয় ছাড়ি নি। কাউকে মিথ্যা কথা বলতে শুনলেই অস্বস্তি লাগে।

মিথ্যা কথা! পারুল টান হয়ে বসল। আজ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতে পেরেছে বলে বুঝি সেরাতের সব কথা মিথ্যা হয়ে গেল?

উচ্ছেদ হবার ভয়ে পারুল বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছে এটাই প্রতিপন্ন করতে চায়।

পারুল গলার আওয়াজ চড়াল, এর একটি বর্ণ যদি মিথ্যা হয়, তবে আমি—

কঠিন শপথ করার মুখে পারুল থেমে গেল।

হাত তুলে ললিত মজুমদার তাকে বাধা দিল, আপনার কথা মিথ্যা তা তো আমি বলি নি। আপনার প্রত্যেকটি কথা সত্য। আমার সব মনে পড়েছে। তেঁতুল গাছি থেকে নৌকায় ফেরবার মুখে পুলিশে তাড়া করেছিল। গোকুল আর আমি দুজনে দু-দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তারপর সাঁতার কেটে কেটে আপনাদের বস্তিতে এসে ঠেকেছিলাম। সব ঠিক, কিন্তু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যা কেন বললেন আপনি? মিথ্যা বলা মহাপাপ। যে কোন কারণেই হোক।

অনেকক্ষণ পারুল কিছু বুঝতে পারল না। মানুষটা ঠিকই আছে, কিন্তু তার কথা বলার ধরনটা কেমন দুর্বোধ্য।

সেরাতে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়াই বুঝি উচিত কাজ হত! শাড়ি জড়ানো অবস্থায় বাইরে বের করে দেওয়া!

কথাগুলো মনে মনে আউড়ে পারুল বলেই ফেলল। শুকনো খটখটে কথা শেষ হবার আগেই ললিত মজুমদার ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, তাই উচিত হত। সত্যভ্রষ্ট মানুষ পশুর সামিল। ইহকাল পরকাল দুই-ই তার খতম! তখনকার শাসকদের চোখে আমি অপরাধী, আইন এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমাকে লুকিয়ে রাখা মানে আসামীকে লুকিয়ে রাখা! পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া একই [illegible]। যে অন্যায় আপনারা করছেন, তার [illegible] নেই।

হেলে দুলে ললিত মজুমদার ঠিক হয়ে বসল। তাকিয়া চেপে আরো কায়েমী আসনে। পলাশডাঙ্গার মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার সুর আনল গলায়। অবিকল সেই ভঙ্গী।

মাপ করবেন, আমার অন্য কাজ রয়েছে। আপনাদের আদর্শের বালাই নেই, কিন্তু আমাকে আদর্শচ্যুত করবেন না।

ললিত মজুমদার ওঠবার আগেই পারুল উঠে দাঁড়াল। জবাও। এক তিল এখানে বসবার ইচ্ছা পারুলের নেই। উঠে দাঁড়াবার আগে সামনে রাখা আংটিটাও হাতে তুলে নিল।

ললিত মজুমদার আংটিটার দিকে হাত প্রসারিত করতেই পারুল ভাল করে আঁচলে গিঁট দিল। অল্প হেসে বলল, সেরাতে ভুল করেছিলাম পুলিশের হাতে মানুষটাকে ধরিয়ে না দিয়ে, এ আংটি অন্য মানুষের হাতে তুলে দিয়ে আজ আবার নতুন করে ভুল করব না।

বিশ্লেষণ

দীপক চৌধুরী

আপনারা অবাক হবেন জানি। আমি যে বাঙালী তাও আপনারা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আপনারা বলবেন, হয় আমি অবাঙালী নয়তো উন্মাদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আজ ঘোষণা করছি যে, সারা জীবনে একটিও গল্পের বই আমি পড়িনি—উপন্যাস তো নয়ই। কেন পড়িনি তার কারণটা আমার জানা নেই।

অথচ আমার মা উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসতেন। দুপুরবেলা তিনি ঘুমুতেন না। প্রায় প্রত্যেকদিনই এক-একটা নতুন উপন্যাস পড়ে শেষ করে ফেলতেন তিনি। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, মায়ের পান জর্দার নেশা নেই বটে, কিন্তু উপন্যাসের নেশা বড় প্রবল। তাঁর এই দ্রুত পঠনের অভ্যাস দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে যেতাম। বাবা কিনতেন ছোটগল্পের বই। বছর দশেক পর আমাদের জনক রোডের বাড়িটা গল্প-উপন্যাসের একটা লাইব্রেরী হয়ে দাঁড়াল। বড়দার কাছে শুনেছি, আমার যখন জন্ম হয়, তখন আঁতুড়ঘর থেকে বই এর আলমারিগুলো বার করে আনবার সময় পাননি বাবা। তার ফলে গল্প-উপন্যাসের জগতেই জন্ম হল আমার।

কিন্তু সারা জীবনে একটিও গল্প-উপন্যাস আমি পড়ে উঠতে পারিনি। ব্যাপারটা খুবই বিচিত্র মনে হয়, তবুও বলছি আমার স্বীকৃতির মধ্যে মিথ্যা ভাষণের চেষ্টা একেবারেই নেই। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে কলেজে এলাম, তখনও মাসিক কিংবা সাপ্তাহিকের পাতা উল্টে দেখিনি। লেখাপড়ার আমার সুখ্যাতি ছিল খুব। প্রতিটি পরীক্ষা পাশ করেছি প্রথম হয়ে। আজ তো আমি জেলা শাসক—যার ইংরেজী নাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরি করছি তাও প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। বিয়ে করেছি দু বছর আগে। সত্যিকথা বলতে কি আগামীকাল আমাদের বিয়ের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হবে সেইজন্য আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা আমার বাংলোয় একটু আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা হয়েছে। রবীন্দ্র সংগীতের পর খেয়াল গান গাইবেন ওস্তাদ দবিরুদ্দীন খাঁ। এটা পাহাড় অঞ্চল। তিনি এখানে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছেন।

এখানে আমি বদলি হয়ে এসেছি মাসখানেক আগে। আজ সন্ধ্যেবেলা অফিস-ঘরে বসেছিলাম আমি। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেব একটু আগেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বড় মিষ্টি স্বভাবের মানুষটি। আলাপ-আলোচনায় সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। শুনলাম, তিনি বাংলা মাসিকপত্রে মাসে মাসে ছোটগল্প লেখেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর নামটা আমার কখনো চোখে পড়েছে কিনা। লজ্জায় মাথা নিচু করে রেখেছিলাম মিনিট দুই। তারপর বলেছিলাম তাঁকে, 'না, চোখে পড়েনি। এমন অপরাধের মার্জনা নেই......জানেন, আজও আমি একটিও গল্প-উপন্যাস পড়িনি!'

চেয়ারম্যান সাহেব কি ভাবলেন জানি না, চলে গেলেন তিনি। ফ্রয়েড সাহেব বেঁচে থাকলে হয়তো বা আমার অবচেতন মনের রহস্যটা কামজ বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর বিশ্লেষণটা আমার মনঃপূত হতো না। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দেখাতে হতোই।

চেয়ারম্যান সাহেব চলে যাওয়ার পর ভাবছিলাম যে, আগামীকাল থেকে গল্প পড়তে আরম্ভ করে দেব। পাঁচ দশদিন চেষ্টা করলে হয়তো গল্প পড়ার প্রতি ঝোঁক আসবে। তার পর আনন্দের উৎস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না।

রাত আটটার সময় এখানকার পুলিশ সাহেব দেবেন ধর এসে উপস্থিত হল আমার অফিস-কামরায়। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। দেবেনকে একটু উত্তেজিত মনে হল। ভাবলাম, শহরের কোথাও বুঝি দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গিয়ে থাকবে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হে খবর কি?'

আমার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিল সে। প্যাকেটের ওপরে আমার নাম লেখা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিঠি না কি?'

'আজ্ঞে না—পাণ্ডুলিপি বলে মনে হচ্ছে।'

'কোথায় পেলে এটা?'

'ধর্মশালায়। দিন সাতেক আগে একজন শিল্পী এসে উঠেছিলেন এখানে।'

'ও হ্যাঁ, আমি তাঁকে চিনি। মহীতোষ লাহিড়ী। খুব ভাল ছবি আঁকে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আগামীকাল একটা চিত্র-প্রদর্শনী খোলার কথা ছিল। ওয়ান-ম্যান শো - ' দেবেন ধর হঠাৎ থেমে গেল। ওর কথাবার্তা বলার ভাবভঙ্গী দেখে আমার সন্দেহ হল কি একটা গুরুতর কথা যেন ঘোষণা করবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু বলবার সাহস পাচ্ছে না। প্যাকেটটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আমি বললাম, 'আগামীকাল সকালে ওর চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করবার কথা ছিল আমার। আমি নিজেও দু-একখানা ছবি ওর কিনতাম। পয়সার খুব অভাব ছিল মহীতোষের। কাল সকালে আমি অবশ্যই যাব—'

দেবেন ধর ইতস্তত করতে করতে বলে ফেলল, 'মহীতোষবাবু মারা গিয়েছেন।'

'মারা গিয়েছেন?'

'মনে হয় আত্মহত্যা করেছেন।'

'বলো কি দেবেন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হল। গোটা পনেরো তৈলচিত্র পড়েছিল মেঝের ওপর। তারই মাঝখানে শিল্পীর মৃতদেহ।...... সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার তৈলচিত্রগুলো শুধু একজন ভদ্রমহিলাকে কেন্দ্র করে আঁকা। আপনি কি শবদেহটাকে একবার দেখবেন?'

'মর্গে নিয়ে যাও। কাল সকালে ধর্মশালা হয়ে মর্গে যাব আমি।'

দেবেন ধর চলে গেল। আমার তবু সন্দেহ হল আরও দু'একটা জরুরী কথা গোপন করে গেল সে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত নটা বেজে গিয়েছে। অক্টোবর মাস, ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। প্রতি ঘরেই চুল্লীতে আগুন জ্বলছে। ইজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেলাম চুল্লীর কাছে। মহীতোষের লেখা চিঠিখানা ওখানে বসে পড়ব। তার আগে দোতলায় উঠে গিয়ে দেখে এলাম প্রমীলা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে। বড্ড শীতকাতুরে। পাহাড় অঞ্চলে সে আসতে চায়নি। প্রমীলার বিশ্বাস, কলকাতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আবহাওয়া ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। কলকাতার সব কিছু ওর ভাল লাগে। এমন কি মশা-মাছির কথা উল্লেখ করলেও প্রমীলা বলে, 'আহা ওরা তো থাকবেই। মানব চরিত্র তৈরী হয়। কোন্ শহরটা ষোল আনা ভাল? কোন্ মানুষটা ষোল আনা সৎ?'

অফিস-কামরায় ফিরে এলাম আমি। বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই চলে গিয়েছে। পরিবেশের বুকে ঘন নৈঃশব্দ। শীতকালের রাত্রে নিসর্গ-চর্চার ইচ্ছা হয় না। জানালা খুলে পর্বতচূড়ার দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে। চব্বিশ ঘণ্টাই আগুনের তাপের কাছে চলাফেরা করতে হয়। ধর্মশালায় কি করে যে সাতটা দিন কাটিয়েছিল মহীতোষ ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাই। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে। আমার এখানে থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, ধর্মশালায় চিত্রপ্রদর্শনী খুললে ধনী লোকেরা কেউ
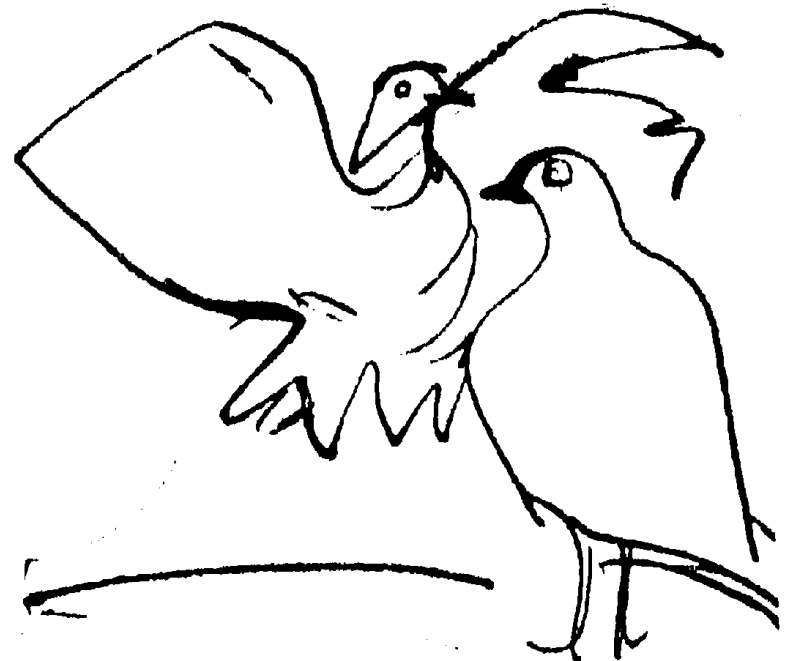
সেখানে যাবে না। আমার কোনো পরামর্শই কানে নেয়নি সে। আমার প্রস্তাব শুনে একটু শুধু হেসেছিল। দারিদ্র্যের শতচিহ্ন দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ওর হাসিটা ছিল সামাজিক প্রতিবাদের মত প্রখর। জেলা-শাসকের বাংলোর মতো ধর্মশালাটা কেন যে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর নয় তেমন প্রশ্নটা প্রচ্ছন্ন ছিল ওর হাসির তলায়। আমার বিশ্বাস, মহীতোষের মনের স্বাভাবিক অবস্থা লোপ পাওয়ার মূলে রয়েছে একটা ভয়—কমপ্লেক্স। এই ভয়টা যে কি তা আমার জানা নেই। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই আজ সে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা জন্মাল আমার।

ইজি-চেয়ারে বসে চুল্লীর দিকে পা ছড়িয়ে দিলাম। প্যাকেটটা খুলে ফেললাম আমি। উল্টে-পাল্টে দেখলাম, লম্বা সাইজের পনেরো পাতা চিঠি। বন্ধু বলে আমায় সম্বোধন করেছে মহীতোষ। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম আমরা। তারপর সে ভর্তি হল আর্ট কলেজে। আমি গেলাম আই এ পড়তে। মহীতোষ হস্টেলে থাকতো। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। আর্ট কলেজের অধ্যাপকরা বলতেন, উত্তরকালে মহীতোষ উঁচু দরের শিল্পী বলে সুখ্যাতি অর্জন করবে। পাস করার পর নিজেই একটা স্টুডিও খোলে। বৌবাজারের একটা সরু গলির মধ্যে স্টুডিওটা ভাড়া নিয়েছিল। *একটা পুরনো বাড়ির একতলার পেছন দিকে একখানা ঘর আলোবাতাস ঢোকবার প্রশ্নই ওঠে না, ওটা ছিল রান্নাঘর। মহীতোষ নিজেও তা জানতো। বাড়িওয়ালা ঘরখানার পূর্বইতিহাস গোপন করেননি।* কিন্তু উপায় ছিল না। অতো সস্তায় এর চেয়ে উজ্জ্বলতর ঘর সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। পুরনো আস্তরের ওপর বাড়িওয়ালা চুনকাম করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেয়ালের রং শাদা হলো না কিছুতেই। রাজমিস্ত্রী মহীতোষকে বলে গিয়েছিল, 'চুনের কোনো দোষ নেই বাবু, দোষ সব বাড়িটার। ইঁটের গায়ে পর্যন্ত রোগ ধরেছে, মহাব্যাধি। বাড়িটা এখন ভেঙ্গে ফেলা দরকার ইত্যাদি।' মনে হলো হেসে উঠেছিল মহীতোষ। গড়বার কাজ করবার জন্যেই ঘরভাড়া নিয়েছিল সে। ভাঙ্গবার দায়িত্ব ওর নয়, ইতিহাসের।

এই ঘরে বসে ছবি আঁকত মহীতোষ, ঘুমতও এইখানে। সৃষ্টিকর্মের প্রেরণা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে বালিগঞ্জের দিকে বেড়াতে যেত। দু একটা ঘরোয়া সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছে সে। বড়লোকের ড্রইংরুমে বসে শিল্পকলার আধুনিক ব্যাখ্যা শুনেছে সমালোচকের মুখ থেকে। সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই ধনীলোক। তাদের কাছ থেকে দু একটা তৈলচিত্রর অর্ডার পাবে আশা করেই যেত আলোচনায় যোগ দিতে কিন্তু বছর খানেক যাওয়ার পর সে বুঝতে পারল যাঁরা সমালোচক তাঁরা পয়সা দিয়ে ছবি কেনেন না।

তা সত্ত্বেও মহীতোষের শিল্পকর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ল অনেকের। সুখ্যাতিও অর্জন করতে লাগল সে। পয়সা যা রোজগার করছিল তাতে সংসারটা চলে যাচ্ছিল কোনো রকমে। মহীতোষের যে মা-বাবা বেঁচে ছিলেন তা আমি জানতাম না। তাঁরা থাকতেন মেদিনীপুর জেলার একটা গণ্ডগ্রামে। একটি বোনও ছিল। পয়সার অভাবে বোনটির বিয়ে দিতে পারেননি! প্রতি মাসে মণি অর্ডার যোগে তাদের টাকা পাঠাত মহীতোষ।

এমনিভাবে বছর পাঁচেক কেটে গেল বৌবাজারের স্টুডিওতে। এই নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্যেও শিল্পকর্মের ব্যাঘাত ঘটেনি। মনটা ওর কল্পনার পুষ্পরথে চেপে উড়ে বেড়িয়েছে পৃথিবীর দিগ্বিদিকে। জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেয়নি, কল্পনার ঐশ্বর্য বেড়েই গিয়েছে শুধু। এই সময় পরিচয় হয় একটি মেয়ের সঙ্গে। তার পিতা একজন স্বনামধন্য চিত্রসমালোচক। বিত্তশালী পরিবার। সমালোচকের ড্রইংরুমে বসে পরিচয় হয় মেয়েটির সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মহীতোষ। দ্বিতীয় দর্শনে মেয়েটির কথা শুনে পাগল হয়ে গেল সে। শিল্পজ্ঞান অসাধারণ। পিতার চেয়েও বেশী চতুর। শিল্পের জগৎটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ইউরোপের বড় বড় আর্ট গ্যালারী দেখে এসেছে ষোল বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। এখন মেয়েটির বয়স কুড়ি।

দু-পাতার মধ্যে এই ইতিহাসটুকু শেষ করেছে মহীতোষ। মেয়েটির নাম কোথাও *উল্লেখ করেনি। ভাবলাম পরে হয়তো নামটা জানতে পারবো আমি। বাকি তেরো পাতার মধ্যে সে দু-একবার অন্তত তার নামের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে আমার।*

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। মনে হচ্ছে এবার আসল গল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে আমায়। এই আমার প্রথম গল্প পড়া। মন্দ লাগছে না। পরিচিত বন্ধুর জীবনী পড়ছি বলেই হয়তো বাকি তেরো পাতার প্রতি আকর্ষণ জন্মেছে। কেউ যদি এখন আমার হাত থেকে পাতা কটা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ব আমি। রাত্রিতে ঘুমতে পারব না। উত্তেজনাটা উড়ো জাহাজের আওয়াজের মতো মাথার ভেতরে অস্বস্তির সৃষ্টি করবে।

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। হঠাৎ যদি প্রমীলার ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে আমায় সে দেখতে পাবে না। ভয় পেতে পারে। হঠাৎ ভয় থেকে অসুস্থ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কাল আমাদের বিয়ের দু বৎসর পূর্ণ হবে। খাওয়া দাওয়া এবং জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রমীলাকে সুস্থ থাকতে হবে। এই ভেবে দোতলায় উঠে গেলাম আমি। ওকে বলে আসাই ভাল যে, অফিসে বসে একটা জরুরী দরকারী ফাইল পড়তে হচ্ছে আমায়। আরও ঘন্টা দুই সময় লাগবে।

গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে প্রমীলা। কাঠের মেঝেতে পা দিয়ে আওয়াজ করলাম। দরজা খোলার সময়ও শব্দ হল জোরে। তাতেও ওর ঘুম ভাঙ্গল না। আবার ফিরে এলাম অফিস কামরায়।

চিঠিটা পড়তে গিয়ে আমার মনে প্রশ্ন উঠল একটা : মহীতোষ আমাকে কেন চিঠিখানা লিখল? মৃত্যুর আগে ওকে আমি বহুবার অর্থসাহায্য করেছি। কিন্তু মৃত্যুর পর তো আর কিছু আমার করবার নেই। মহীতোষ কি আমার ঘাড়ে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে গেছে?

বারকয়েক দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে। মহীতোষ তাকে ভালবাসল। ড্রইংরুমের বাইরে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে। পার্ক স্ট্রীটের চায়ের দোকানে বসে গল্প করে। রাত্রে ডিনার খায় বড় বড় হোটেলে। সবচেয়ে বেশী দামের সীটে বসে ছবি দেখে। প্রথম দুদিন পয়সা দিয়েছিল মহীতোষ, তারপর দিতে লাগল মেয়েটি। এ তো কাছে বসে এতো টাকা খরচ করতে কখনো দেখেনি মহীতোষ। ত্রিশ টাকার বিল দিতে শ'টাকার নোট ভাঙ্গায় মেয়েটি। মার্কেটে ঢুকে প্রায়ই শাড়ি কাপড় কেনে। শ'টাকার নোটগুলো গলে যেতে এক ঘন্টারও সময় লাগে না। এইসব দেখে-শুনে মহীতোষের মধ্যে একটা বিচিত্র মনোভাবের সৃষ্টি হলো। যেমন করেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টাই টাকার কথা চিন্তা করে। মেয়েটিকে বিয়ে করতে হলে টাকার দরকার—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা চাই। বন্ধুবান্ধবদের কাছে অভাবের কথা উল্লেখ করে টাকা ধার করতে লাগল। মেয়েটিকে জানতে দিল না কিছুতেই। ওকে সে মাঝে মাঝেই বলে, 'আজ ঢেংকানলের রাজার কাছ থেকে বড় অর্ডার *পাওয়া গেল।' এক সপ্তাহ পর আবার সে ঘোষণা করে, 'রাজপুতনা থেকে একজন ধনীলোক এসেছেন। তাঁর মায়ের একটা পোর্ট্রেট এঁকে দিতে হবে। হাজার দশেক দাম চেয়েছি।'*

ধার করবার মতো কলকাতায় আর বন্ধু রইল না। প্রত্যেকের কাছ থেকেই বার কয়েক টাকা ধার করেছে সে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস ছিল, মহীতোষ একজন উঁচু দরের প্রতিভা। ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে' সক্ষম ও কর্মঠ করে রাখতে না পারলে শিল্পজগতের ক্ষতি অন্য কাউকে [illegible]য়ে আর পূরণ করা চলবে না।

ছবি আঁকা বন্ধ করল মহীতোষ। বৌবাজারের স্টুডিওতে মন বসছে না আর। চব্বিশ ঘন্টাই টাকার কথা ভাবছে। ভাবতে ভাবতে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ল। অজ্ঞাতসারে ওর অচেতন মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসল ভয়। টাকা না থাকার ভয়, টাকা না পাওয়ার ভয়। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় পকেটে যদি অন্তত একখানা শ'টাকার নোট না থাকে তাহলে সে পথ চলতে পারে না। ট্রামে উঠতে পা ফসকে পড়ে যায়। হাতলটা ধরতে গিয়ে দেখে ট্রামটা ওর নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তাচ্ছন্নটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

মনে হল দোতলার ঘরে প্রমীলা হাঁটাহাঁটি করছে। এগারোটা বেজে গিয়েছে। প্রায় মধ্যরাত্রি। এমন সময় প্রমীলার ঘুম কখনো ভাঙ্গে না। আমাকে না দেখলে হঠাৎ হয়তো ভয় পেয়ে যেতে পারে ভেবে আবার আমি শয়ন কামরায় উঠে এলাম। ঘরের দেয়ালে খুব কম শক্তির একটা নীল

বাংয়ের বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে বিছানাটা পরিষ্কার দেখা যায়। না, প্রমীলা ওঠেনি। গভীর নিদ্রায় ডুবে রয়েছে সে। ভাল করে পরখ করবার জন্যে বিছানার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। বার দুই নাম ধরে ডাকলাম। সাড়া দিল না সে। ওকে জানিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। সরকারী ফাইল নিয়ে ব্যস্ত আছি, সেই কথাটা বলে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারত প্রমীলা। যাক ঘুম যখন ভাঙলো না তখন আর ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই। দু-হাজার ফুট উঁচুতে বসে শীতের রাত্রির কথা ভাবতেও শরীরের রক্ত বরফ হয়ে আসে। এখন শুধু রাত্রি নয়, মধ্যরাত্রি। পাহাড়ের গায়ে জমাট বাঁধা বরফ। লেপের তলায় আরাম করে ঘুমচ্ছে প্রমীলা—ঘুমক। জাগিয়ে দিলেই আরামটুকু নষ্ট হবে। আমি এবার পা টিপে টিপে নেমে এলাম নিচে।

ভয়ের জগতে বাস করছে মহীতোষ। বন্ধুদের সামনে গিয়ে হাত পাততে ভয় পাচ্ছে সে। চিঠি লিখতে লাগল তাদের কাছে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাজ করতে পারছে না। ঘরভাড়া ছ' মাসের বাকি পড়েছে। এক গেলাস জল গড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘরে একজন লোক নেই। একশো তিন ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ওকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। দোকানে গিয়ে ওষুধও কিনতে হয়। ইত্যাদি।

আমি তখন বর্ধমানের এস-ডি-ও। মহীতোষের কাছ থেকে আমিও একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠি পড়ে এত বেশী বিচলিত বোধ করলাম যে, তক্ষুনি চাপরাশীকে ডেকে বললাম, 'এই তিনশোটা টাকা টি-এম-ও করে পাঠিয়ে দিয়ে এসো। আজই কলকাতা পেঁছনো চাই। দেরী কোরো না—এখুনি চলে যাও।'

মেয়েটি টের পেল না কিছুই। ট্যাকসি ভাড়া করে মহীতোষ তাকে নিয়ে গেল ডায়মন্ডহারবার। সেখান থেকে কাকদ্বীপ। নিরিবিলিতে গাছতলায় বসে গল্প করল সারাটা দুপুর। পাশাপাশি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল ওরা। তারপর ব্যবধানটাও আর রইল না। মেয়েটির কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করলো মহীতোষ, 'আর আমি অপেক্ষা করতে চাইনে।'

'কি চাও তুমি?' জিজ্ঞাসা করলো মেয়েটি।

'বিয়ে করতে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে কাল সকালেই তোমার বাবার কাছে কথাটা তুলতে চাই।'

'দায়িত্ব নিতে পারবে কি, মহীতোষ?' প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহের সুর শুনতে পেল মহীতোষ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। মেয়েটি কি তবে বিশ্বাস করে না যে, মহীতোষের ব্যাঙ্কে টাকা আছে অনেক? টাকা না থাকলে ট্যাকসি চেপে কি করে কাকদ্বীপ এল?

মেয়েটি ওর জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না। বললে সে, 'বাবার কাছে প্রস্তাব তুলে লাভ নেই। আমাদের বিয়ে তিনি কিছুতেই অনুমোদন করবেন না। যে-চোখ দিয়ে তিনি শিল্পবিচার করেন সেই চোখ দিয়ে শিল্পীদের দেখেন না বাবা। জাগতিক ব্যাপারে তাঁর বিচারের মাপকাঠি একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা। জীবন থেকে শিল্পকে পৃথক করে দেখেন—'

'তা কখনো হয়?' মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল মহীতোষ, 'তা কখনো হয় না। আমার জীবনই হচ্ছে আমার শিল্পকর্ম।'

'কিন্তু শিল্পচর্চার দ্বারা বাবাকে বিয়ের ব্যাপারে রাজী করানো অসম্ভব হবে।'

'তাহলে কি করব আমি?' অসহায়ের মতো অনুচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মহীতোষ। কণ্ঠনালী শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। কাকদ্বীপের চতুর্দিকেই জল। মহীতোষের তবু মনে হল, সাহারার বুকে তাঁবু ফেলেছে ওরা। বালির সমুদ্রে ঝড় উঠেছে বুঝি।

একটু পরেই মেয়েটি বলল, 'বাবার অমতে বিয়ে করতে পারবে?'

'পারব।' শতছিন্ন স্নায়ুতন্ত্রকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করল মহীতোষ।

'তাহলে দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্ন উঠে পড়ছে, মহীতোষ।'

'দায়িত্ব বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'টাকা। অন্তত হাজার দশেক টাকা তোমার থাকা চাই। বাবার কাছ থেকে কানাকড়িও পাওয়ার আশা করো না।' গাছের গুঁড়িতে সুস্থিরভাবে হেলান দিয়ে বসল মেয়েটি।

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল মহীতোষ। হাসিটা মিলিয়ে যাওয়ার সময় বিকৃত একটা আওয়াজ বেরুলো। ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ পার হয়নি। কাকদ্বীপের বাতাসে আর্দ্রতার উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে না। মহীতোষের আদ্দির পাঞ্জাবীটা তবু ভিজে উঠতে সময় লাগল না। টস টস করে কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। বিকৃত হাসির ধাক্কা লেগে চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে। যেন হাড় দুটো আত্মপ্রত্যয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণসূচক ভঙ্গী করে দাঁতের ওপর দাঁত চাপলো মহীতোষ।

মেয়েটির মনে তবু নির্ভরতার জোর এল না। প্রশ্ন করল সে, 'তোমার হাতে কি হাজার দশেক টাকা নেই?'

'নেই!' গুলী-খাওয়া সাপের মতো দেহটাকে ঘাসের ওপর উল্টেপাল্টে মহীতোষ শেষপর্যন্ত কাত হয়ে বসে বলতে লাগল, "দশ হাজার নয়, বিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে রয়েছে। বোধ হয় মরচে ধরে গেল।'

'তাহলে ভয় করবার কারণ নেই।' উঠে পড়ল মেয়েটি।

'ভয় আমি পাচ্ছিনে—'

'তোমার মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না।' ট্যাকসির দিকে হাঁটতে লাগল মেয়েটি।

মহীতোষও উঠে পড়ল। ট্যাকসিতে বসে মেয়েটি বলল, 'শুধু হাজার দশেক টাকা হাতে থাকলেই ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পাব আমি।'

'বেশ তো বিয়ের আগে দশ হাজার তোমার হাতে নগদ তুলে দেব।'

'হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে তাহলে।' ট্যাকসির দূর কোণায় হেলে বসল মেয়েটি। মহীতোষের মনে হল, ওর স্পর্শ বাঁচাবার চেষ্টা করছে সে।

ডায়মন্ডহারবার রাস্তা ধরে ট্যাকসিটা ফিরে চলল কলকাতা। বেহালা পর্যন্ত আর কোনে কথা হলো না। কথা বলবার ইচ্ছে নেই মহীতোষের। হাঁপিয়ে পড়েছে সে। চলন্ত ট্যাকসির দুদিক দিয়ে হাওয়া ঢুকছে। নইলে আদ্দির পাঞ্জাবীটা ভিজে থাকতো তখনও।

গভর্নমেন্টের টাকা তৈরীর কারখানাটার সামনে পেঁছে মেয়েটি বলল, 'যা করবার তাড়াতাড়ি করো।'

'কতো তাড়াতাড়ি?' নতুন সমস্যার সন্ধান পেলো মেয়েটির কথায়।

'এই ধরো দিন পনেরো। হ্যাঁ, পনেরো দিনের চেয়ে এক ঘণ্টাও বেশী নয়। আজ চৌঠা, উনিশে ফাল্গুন রাত সাড়ে আটটার লগ্নে আমার বিয়ে।' ঘোষণাটা জজসাহেবের রায়ের মতো শোনালো। আপীল করবার দরকার বোধ করল না মহীতোষ। শুধু বলল, "ফিক্সড ডিপোজিট। ব্যাঙ্কে গিয়ে তুলতে যে ক' ঘণ্টা সময় লাগবে—" একটু থেমে মহীতোষই জিজ্ঞেস করল, "পাত্র ঠিক আছে বুঝি?"

'হ্যাঁ। আমাদের চেনা পরিবার। কথা-বার্তা সব পাকা করেছেন বাবা। ছেলেটি আমায় একবার দেখেও গিয়েছে। বড় চাকরী করে।'

'তা তো করবেই—' অসূয়চকের মত নিন্দাসূচক মন্তব্য করল মহীতোষ, "ধরবার ব্যবস্থা থাকলেই মেয়েরা ছাড়বার কথা ভাবে।" ব্যাপারটা তুলনামূলক। উনিশ তারিখের আগে যদি আরো বড় চাকুরের সন্ধান আসে তা হলে তোমার বাবা পুরো ফাল্গুনটাই অপেক্ষা করতে রাজী থাকবেন। তুমি কি করবে তখন?"

"তোমার জন্য অপেক্ষা করব। পুরো ফাল্গুনটাই যদি তোমার হাতে থাকে তাহলে টাকা জোগাড় করা সহজ হবে। আমি এখানেই নামবো মহীতোষ। এটা কোন জায়গা?"

"চৌরঙ্গী।"

ফারপো'র সামনে নেমে গেল মেয়েটি।

এক নিঃশ্বাসে গল্পটা পড়তে পারছি না। জমে উঠেছে গল্প। মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি পড়লে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। রাত মাত্র একটা। বাকি রাতটা কাটবে কি করে আমার? গল্প পড়তে পড়তে রাতটা শেষ করে দিতে চাই আমি। তারপর সোজা অফিস কামরা থেকে চলে যাব ধর্মশালায়। মহীতোষ আত্মহত্যা করেছে। সে নেই। তা হোক। সে তার শিল্পজগতটিকে হত্যা করে যায়নি। কাল সকালে গিয়ে চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করব আমি। একটা ছবি অন্ততঃ কিনব ওর।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। চমকে উঠলাম আমি। প্রমীলা তো ঘুমুচ্ছে। যদি সে জেগে গিয়ে থাকে তা হলে সে পা টিপে টিপে নিচে নামবে কেন? ওপরে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাকবে আমায়। ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে যদি নিচে নেমে এসে থাকে তা হলে এখানেই ঢুকে পড়বে প্রমীলা। মিনিট দু'তিন কেটে গেল। কেউ এল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। শয়ন কামরায় ঢুকে প্রমীলার নাম ধরে কয়েকবার ডাকলামও। বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া গেল না। আলগাভাবে কপালের ওপর হাত রাখলাম ওর। তাতেও সে নড়েচড়ে উঠল না। ঘুমের এমন গভীরতা আগে কখনো চোখে পড়েনি আমার। একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হল আমার। প্রমীলা কি তবে জেগে রয়েছে? সন্দেহাকুল মন নিয়ে আবার ফিরে এলাম অফিসঘরে। চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলাম। কিন্তু মনের একাগ্রতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। মাঝে-মাঝেই সন্দেহ হচ্ছে আমাদের শোবার ঘরে প্রমীলা হেঁটে বেড়াচ্ছে। অস্বস্তিতে সময় কাটছে ওর।

কেন যে সে জেগে থাকবে তার কারণ খুঁজে পেলাম না আমি। বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বছর পূর্ণ হবে কাল। আমার বিশ্বাস, প্রমীলাকে আমি চিনি। এমন সদা হাস্যময়ী মন-খোলা মেয়ের সঙ্গে আগে কখনো আর পরিচয় হয়নি। প্রমীলাকে আমি সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ওর দিক থেকেও কোন বিচ্যুতি ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

দশ হাজার টাকা জোগাড় করার উপায় খুঁজে বার করতে পারল না মহীতোষ। ট্যাক্সির মিটারের মতো এক একটা দিন খরচ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় না, টেলিফোনে কথা হয়। কিন্তু টাকার কথা উল্লেখ করে না কেউ। মহীতোষের মনোভাব থেকে মেয়েটি বুঝতে পারে টাকার জন্য ভাববার কোন কারণ নেই। উনিশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় না মেয়েটি। মহীতোষ টেলিফোনের তারের মারফৎ রোমান্টিক হয়ে ওঠে। বলে তোমার বাবার ধার্য করা তারিখেই বিয়ে করব আমরা। বিকেলবেলা বিয়ের চেলি পরে চলে এসো তুমি। পার্ক স্ট্রীট ফ্ল্যাট নিচ্ছি। ফারপো রেস্তোঁরার দোতলার বারান্দায় অপেক্ষা করব আমি। তুমি ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা উঠে আসবে দোতলায়।

বোধ হয় দিনটা ছিল এগারই ফাল্গুন। গোবিন্দপুরে গিয়েছিল মহীতোষ। শিল্প-সম্মেলনীর প্রধান-অতিথি হয়েছিল সে। বক্তৃতা দিতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে যায় মঞ্চের ওপর। সভার উদ্যোক্তারা ভয় পেয়ে গেল। একজন উদীয়মান শিল্পীর যদি অকাল-মৃত্যু ঘটে তা হলে দুঃখের সীমা থাকবে না। ওখানকার ডাক্তার পরীক্ষা করে রোগ কিছু ধরতে পারলেন না। মৃগী রোগের লক্ষণগুলোও স্পষ্ট নয়। তবে? তবে তার কি হল? উদ্যোক্তাদের ডেকে মহীতোষ বলল, রোগ খুব গুরুতর। চিকিৎসা করবার পয়সা নেই। আমার নামে একটা ফাণ্ড খুলতে পারো?

নিশ্চয়, নিশ্চয়—সোৎসাহে স্বীকৃতি জানালো উদ্যোক্তারা।

'কাল তাহলে তোমরা আমার বৌবাজারের স্টুডিওতে এসো। কাগজপত্র চাঁদার খাতা সব ছাপিয়ে রাখব আমি।'

"কখন যাব?"

বিকেলের দিকে। কাগজপত্র ছাপিয়ে আসতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগবে তো।

কাগজপত্র দুদিন আগেই ছাপিয়ে রেখেছিল মহীতোষ। শিল্পীর জীবনরক্ষা ফাণ্ড খুলে ফেলল ছেলেরা। উনিশ তারিখের বিকেলবেলা পর্যন্ত চাঁদা যা উঠল তার মোট অঙ্ক পাঁচ শো টাকাও হল না। উদ্যোক্তারা বলল, "এই টাকা দিয়েই এখন চিকিৎসা আরম্ভ করা হোক।"

পথ-ভুল-করা পর্যটকের মতো হতাশায় ডুবে গেল মহীতোষ।

দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিলাম আমি। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঠে পড়ে। বরফে আবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার গা গড়িয়ে পড়ে গলিত সোনা। কুয়াশার আবরু অপসারিত হয়েছে। আজও দেখলাম সনাতন সত্য পর্বতচূড়ায় রৌদ্রালোকে সমুদ্ভাসিত। কুয়াশার আবরু তাকে ঢেকে রাখতে পারেনি। গলা সোনার স্রোত গড়িয়ে পড়েছে পর্বতের চূড়া থেকে।

শেষ পাতাটা পড়তে আরম্ভ করলাম। মনে পড়ে শিল্পীর জীবনরক্ষা করতে আমিও কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম। আজ বুঝতে পারছি, সেই টাকাটা ওর কোনো কাজে লাগেনি। মহীতোষের জীবনটা রক্ষা করতে পারলে আমি নিজেও আজ গৌরবান্বিত বোধ করতাম। এমন একটি প্রতিভার অকালমৃত্যুর জন্য গোটা সমাজটাই কি দায়ী নয়? মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বার প্রবৃত্তি মেয়েদের স্বভাববিরুদ্ধ। ভাবপ্রবণতা যতই কেন গভীর হোক না, নির্দিষ্ট পথের বাইরে পা ফেলতে ভয় পায়। বৌবাজারের স্টুডিওটা শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হলেও জীবনযাপনের পরিসর তাতে নেই।

তা সত্ত্বেও উনিশ তারিখে বিকেলবেলা চেলি পরে মেয়েটা চলে এসেছিল ফারপো রেস্তোঁরার দোতলায়। অপেক্ষা করেছিল এক ঘণ্টারও ওপর। মহীতোষ আসেনি। স্টুডিয়োর অন্ধকারে চাঁদার খাতা হাতে বসে ছিল সে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, মেয়েটি হয়তো বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে এখানে এসে উপস্থিত হতে পারে। রাত সাড়ে আটটার পর লগ্ন পার হয়ে যাওয়ার পর বেড়াতে বেরিয়েছিল মহীতোষ। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল 'ফারপো' রেস্তোঁরা পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়েছিল দোতলায়। অপরিচিত ভিড়ের মধ্যে মেয়েটিকে দেখবার আশা করেনি সে। তবু তার উপস্থিতির কথা কল্পনা করে স্বস্তি পেয়েছিল মহীতোষ। তারই নির্দেশ দেওয়া জায়গায় নায়িকা এসে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করেছিল। নায়ক আসেনি। বিপ্রলব্ধার হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে মেয়েটি। এতক্ষণে বিয়ের মন্ত্র পড়াও শেষ হয়েছে তার। রক্ষা পেল মহীতোষ।

পনেরো পাতার চিঠিখানা ফেলে রাখলাম টেবিলের ওপর। আমার অচেতন মনটা চেয়েছিল চিঠিখানা খোলাই পড়ে থাক। তাতে প্রমীলার হয়তো চোখে পড়বে এটা। কেন যে প্রমীলাকে দিয়ে চিঠিখানা পড়াতে চাই আমি, তার কারণটা এখনো আমার পরিষ্কারভাবে জানা নেই। প্রমীলা ছোটগল্প পড়তে ভালবাসে। হয়তো সেইজন্যই গল্পটা ওকে দিয়ে পড়াতে চাইছি আমি।

আমার অফিস-কামরায় ঢুকে পড়ল প্রমীলা। জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার সারা রাত বসে কি পড়ছ?"

'ছোটগল্প।'

'তুমি তো গল্প কখনো পড়ো না।'

'কাল রাত থেকে পড়তে আরম্ভ করেছি। নেশা ধরে গিয়েছিল।' উঠে পড়লাম আমি। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এক্ষুনি বাইরে চললে?"

মাথা নিচু করে রাখল প্রমীলা। চোখ

দুটো আমাকে দেখতে দিচ্ছে না। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, চোখ দুটো ওর ভিজে রয়েছে। ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলাম, "কিছু বলতে চাও কি?"

"হ্যাঁ, আমিও কাল সারা রাত ঘুমুইনি"।

"ধর্মশালা থেকে ফিরে আসি। তারপরে তোমার গল্পটা শুনব।"

দেবেন ধরকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মশালায় এলাম। দরজার সামনে পুলিশ পাহারা রয়েছে। সেলাম করে তারা সরে গেল এক-ধারে। দেবেন বলল, 'আপনি ভেতরে যান, আমি বাইরে থাকি।"

ঘরের মেঝেতে ছবিগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। একটি ছবিও ফ্রেম করা নেই। পয়সার অভাবের জন্যই বাঁধাতে পারেনি মহীতোষ। প্রত্যেকটি ছবি আমি হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম। শিল্পবিচারে আমার বিন্দুমাত্র দক্ষতা ছিল না। অভিজ্ঞ-তারও অভাব ছিল খুব। তবু প্রতিটি ছবি আমার চোখে খুবই সুন্দর লাগল। দেবেন কাল রাত্রে মিছে কথা বলেনি। প্রত্যেকটি ছবি একই মেয়ের। তাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ভংগীর ছবি এঁকেছে সে। রং আর তুলির সাহায্যে ক্যানভাসের ওপর নবজীবনের স্পন্দন তুলেছে মহীতোষ। এমন সৃষ্টির তুলনা মেলা সহজ নয়। ছবিগুলো সব গুছিয়ে নিলাম আমি। প্রমীলাকে দেখাবো।

আমার বিশ্বাস, এই মেয়েটিকে প্রমীলা চেনে।

ছায়াহরিণ

সন্তোষকুমার ঘোষ

(একটি অবাস্তব গল্প)

'দেখ', কল্পনা বলল, 'তুমি রোজ রোজ এস না।'

বিছানার ধারে উঠে এসে পা ঝুলিয়ে বসেছিল কল্পনা, মাথার পিছনে হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অভব্য চুলগুলো গুটিয়ে রাখছিল, খেলা শেষ, বেদেনীর সাপ এবার ফের ঝাঁপিতে কুন্ডলী হবে, পায়ের পাতা দুটিও শাড়ির পাড়ে ঢেকে কল্পনা বলল, 'দেখ, তুমি রোজ-রোজ এস না।'

আয়নায় অরুণের চোখে চোখ রেখে কল্পনা একথা বলল। যে-অরুণ চুলে এখন চিরুনি চালাচ্ছে, তাকে নয়। তার দিকে তাকাতে পারে না কল্পনা। বুকের ভিতর থেকে অনেকখানি রক্ত ফিনকি উঠে মুখে ছড়িয়ে যায়।

আয়নায় অরুণ চিরুনিটা নামিয়ে রাখল। 'আসব না কেন?'

—'ও যদি একদিন এসে পড়ে, যদি দেখে ফেলে, যদি টের পেয়ে যায়?'

অরুণ হাসল। — 'দেখবে না। দেখার চোখই ওর নেই।'

অদ্ভুত বিশ্বাস, অসম্ভব সাহস। কল্পনা আর কিছু বলল না। চুপ করে নেমে পড়ল খাট থেকে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার এই জ্যোৎস্না রঙের আলো একটু নীল-নীল, নরম। যেন ফুঁ দিলে এই আলো উবে যাবে। কল্পনা একবার দিলও। গেল না। অথচ ব্রাকেটে যে বাল্বটা জ্বলছে, এই আলো তার নয়। ষাট-ওয়াট বাল্বটার আলোর রঙ কল্পনা চেনে। হলদে, ময়লা-ময়লা। কুট করে কবে কেটে যায় তার ঠিক নেই। তবে? পাশের কোন বাড়ি থেকে ঠিকরে আসে কি না দেখবে বলে কল্পনা জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। হতে পারে। যদিও চোখে পড়ল না। তা-ছাড়া চাঁদ-চোয়ানো আলোটাকে ওর কি রোজই জ্বলবে ঠিক একই সময়ে অরুণ যখন আসবে?

ঘরের ভিতরটা একটু ধোঁয়া-ধোঁয়া, ধোঁয়া নয় কুয়াশা। খোলা জানালা দিয়ে কতক্ষণ ধরে কে জানে ঢুকে ঘরটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আলোর রঙ তাই এমনি-কুয়াশাই হলদে রঙটাকে নীল-নীল করে দিয়েছে? হবেও বা।

কল্পনা হাত বাড়িয়ে জানালার পাল্লা টেনে দিতে যাচ্ছিল, পারল না। অবাক হয়ে দেখল, তার কবজি অরুণের হাতের মুঠিতে। অরুণ কখন খপ করে ধরে ফেলেছে।

ব্যথা নয়, অস্বস্তি থেকেই কল্পনা অস্ফুট গলায় বলল, 'ছাড়!'

অরুণ হাসছিল, সেই হাসি স্প্রে করে কল্পনার মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'থাক না, খোলা থাক।

'—হিম ঢুকবে যে। যদি আমার ঠান্ডা লাগে? যদি জ্বর হয়?'

'লাগবে না। জ্বর হবে না।' অরুণ যেন প্রেরিত পুরুষের মত প্রত্যয়ে স্থির গলায় বলল। সেই প্রত্যয় কবজি থেকে সঞ্চারিত হয়ে গেল কল্পনার শরীরে। সে আর কিছু বলল না।

তা-ছাড়া তখন সেই গন্ধটার অস্তিত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল কল্পনার সত্তায়, তাকে ছেয়ে ফেলেছিল। খুব মৃদু গন্ধ আর মিষ্টি। একটু ঝিম-ধরানো — কল্পনার অনেক দিনের চেনা। এই গন্ধটা কবে যে প্রথম টের পেয়েছিল মনে নেই। সেই য়্যালবামটার নয়ত—অনেক অনেকদিন আগে নাকের কাছে ধরতে যে গন্ধটা ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল? সেই য়্যালবামটার পাতার ভাঁজে একটা শুকনো পাপড়ি ছিল—পাপড়িটার গন্ধও হতে পারে। তার সঙ্গে ন্যাপথলিনের ঘ্রাণও মিশেছিল, হয়ত পুরু-পুরু ই বিলাতী কাগজগুলোরও, কিন্তু এত বছর ধরে কি সেই একই গন্ধ ফিরে-ফিরে আসতে পারে। যদি পারে, অরুণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী। সে এলেই কেন গন্ধটা একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ে, কল্পনা ডোবে...ডোবে, খানিকটা ভেসে-থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষে একেবারে তলিয়ে যায়?

অরুণ ওর দিকেই চেয়েছিল, তখনও সেই সুন্দর হাসিটি লেগে আছে অরুণের চোখে, কল্পনার ঘাম-ঘাম কপালটা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে মুছে দিচ্ছে।

অরুণ বলল, চলি। দরজার দিকে পা বাড়াল। ছিটকিনি খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল কল্পনা, বাধা দিল না। অরুণ ও হাতে একটু চাপ দিল, তার পরেই অরুণ আর নেই। বাইরের বারান্দা অন্ধকার। যেখানটায় অরুণ চাপ দিয়েছিল, হাতের সেই অংশ কল্পনা ঠোঁটে ছোঁয়াল। চোখ বুজল সঙ্গে সঙ্গে। এইবার ঘরের কুয়াশা কেটে যাবে, গন্ধ মিলিয়ে যাবে একটু একটু করে, নীল-নীল নরম আলোটা আবার হলদে হবে, আমি জানি আমি জানি, তার আগেই চোখ বন্ধ করে ফেলি। আমি জানি, অনেক বছর ধরে এই একই ব্যাপার দেখছি যে।

চোখ বুজেই বিছানায় ফিরে কল্পনা চাদর মুড়ি দিল।

কুলেশের নাক ডাকছিল! রোজই ডাকে, আজও ডাকছিল। রোজই কল্পনার ঘুম ভাঙে, আজও ভাঙল।

অন্ধকারে বোঝা যায় না রাত কত, সকাল ঠিক কত দূরে এসে আটকে আছে। কুলেশই বা কোন্‌খানে, পাশেই। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে কল্পনা তার হদিশ পেল! কম্বলের রোঁয়ার মত কুটকুটে লাগছে, নিশ্চয় কুলেশের বুক। প্রকান্ড বুক চিতিয়ে লোকটা পড়ে আছে। মাথার নীচে বালিশটা কল্পনা ঠিক করে দিল, কুলেশের নাক হয়ত থামবে এই আশায়। কিন্তু থামতে গিয়ে বিপদে পড়ল। দু-একবার ভোঁস-ভোঁস করেই কুলেশ পাশ ফিরল, মোটা-মোটা হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল কল্পনাকে। যদি আরও কাছে টানে, যদি পিষে মারে! কল্পনা হাঁস-ফাঁস করছিল, অনেক অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

গা ঘুলিয়ে-ওঠা ভাব তখনও গেল না। ঘুমোলে কুলেশের ঠোঁট দিয়ে কষ গড়ায়, লালায় বালিশ ভেজে। কল্পনার গালে লালা লেগে থাকবে, চিট চিট করছিল। আর ঘাম। লোকটা এত ঘামে কেন?

ঘেমেছিল কল্পনাও। দরজা-জানালা দুই-ই বন্ধ। বাইরে কিন্তু মেঘ ডাকছে, খানিক আগে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকবে। এখন গুমোট জানালাও বন্ধ করলে কে, কুলেশ নিজেই? ওই রকমই পুতপুতে। সর্দির ভয়, হাঁচির ভয়, কাশির ভয়।

জানালা খুলে দেবে বলে কল্পনা জামা-কাপড় গুছিয়ে উঠে বসেছিল, কিন্তু স্যাঁত-সেঁতে মেঝেয় পা দেবার কথা ভাবতেই গা শিরশির করল। খাটের নীচে খচখচ করছে—কী ওটা? বোধ হয় বেড়াল। মাছের কাঁটা টেনে নিয়ে এসেছে। তক্তপোষে টকা-টক আঙুল ঠুকে কল্পনা বেড়ালটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল। আঃ কখন যে মোরগ ডাকবে, সকাল হবে, কুচকুচে রাতটাকে চিবিয়ে আকাশটার দাঁতের মাড়ি টকটকে হবে।

কুলেশ কী যেন বলল, ঘুমের ঘোরে। ঘুমের ঘোরেই একটা পা তুলে দিল কল্পনার হাঁটুর ওপরে। ঝড়ে-ভাঙা খুঁটি চাপা পড়লে কলাগাছ থেঁতলে যায় নাকি? দম বন্ধ, দাঁতে-দাঁত, কল্পনা চুপ করে পড়ে রইল।

কবে আমি তোমাকে প্রথম দেখি অরুণ। আমার বিয়ে হয়েছে এই তিন বছর—তাহলে কি পাঁচ বছর আগে। লীলাদি যেবার বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এল। সকলে গেছে হুলস্থুলে কান্নাকাটিতে, দুপুরে লীলাদিকে দেখতে গেলুম। লীলাদি কাঁদছিল না। চুপ করে শুয়ে ছিল, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আমাকে দেখে ফিরে তাকাল, হাসল। কালো পাড় শাড়ি, গলায় সরু হার, হাতে একগাছি করে চুড়ি।

খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল লীলাদির। বর এখানকার সবকটা পাশ সেরে আরও কী শিখতে বিলেত গিয়েছিল। সেখানে বরফ জলের কোন হ্রদে নৌকো বাইতে গিয়ে ডুবে মরেছে। চোখের জল মুছছিল আর বলছিল লীলাদি। য়্যালবাম খুলে ফটো দেখিয়েছিল। তখনই ত সেই গন্ধটা আমি প্রথম পেলাম। নানা বয়সের ছবি ওর বরের। পাশের পোশাকের, বিয়ের সময়কার ধুতি শাদা চাদর, টোপর; বিলাতের ছিপ-ছিপে, ফর্সা, চমৎকার ছাঁটা-কাটা পোশাক অল্প-অল্প হাসি। ওলটানো চুল, একটু ফাঁপানো, ঠিক আড়াইটে ঢেউ। মরা ফুলের পাপড়িটা পাতার ভাঁজে রেখে য়্যালবামটা মুড়ে লীলাদিকে ফিরিয়ে দিলাম।

অরুণ, তোমাকে সেদিনই কি প্রথম দেখি? আর সেই গন্ধ। সাড় ফিরে গা ধুয়েছি, গন্ধ ভরে সাবানের। না-ও হতে পারে। চুলে যে বেলফুল গুঁজেছি, হয়ত তার। কড়কড়ে ভাঁজ-ভাঙা শাড়িরও একটা গন্ধ আছে। ছাদ থেকে ঝুঁকে পড়ে একটা ডাল ভাঙলুম। সবুজ পাতা চটকাতে ইচ্ছে হল। খুব আলগোছে ছুঁয়ে-যাওয়া হাওয়া দিচ্ছিল, ধুলো একটু উড়ছিল না, অরুণ তখনই তোমাকে সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলুম। মাথা তুললে একবার, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ফের মুখ নীচু করলে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম একেবারে রান্নাঘরে। চমকে উঠে মা বলল: কী রে! বললুম, কিছু না। বুক তখনও ধুকপুক করছিল। মা আর কিছু বলল না। খুন্তি দিয়ে মাছ-ভাজা উল্টে দিতে দিতে বলল, থুকু, কাল তোকে দেখতে আসবে। তারপর থেকে একরকম রোজ।

সেদিন কারা এল, কী দেখল, কী জানতে চাইল, সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না, আমার একবার মনে হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন অনেকটা তোমার মত দেখতে। এক কোণে বসেছিল, একটু লাজুক, চুরি করে চাইছিল। আমি ভাল করে তাকাতে পারি নি।

ওরা যেই গেল, আমি অমনই ছুটে উঠে গেলুম ছাদে। সেই মিষ্টি গন্ধটা তখন ছড়িয়ে পড়ছিল, বাচ্চা ছেলে ভারী বই নিয়ে যেমন করে—হাওয়া খুব হাল্কা হাতে গাছের পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছিল।

তোমাকে দেখলাম। আজও তুমি একবার দাঁড়ালে। মাথা তুলে খুব সুন্দর করে হাসলে, অরুণ কী সাহস তোমার! সাহস আমারই বা কম কী, অচেনা মানুষের হাসি জমা রাখতে নেই এই ভেবেই কি সঙ্গে-সঙ্গে হাসিটা ফিরিয়ে দিলুম?

সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ও হল, মাথা ফিরিয়ে দেখে নিলুম, মা বা আর কেউ দেখে ফেলে নি ত!

তারপর থেকে রোজ।

বিকেল হলেই গন্ধ ছড়াত, ছাদটা আমাকে ওপরে টেনে নিত। একবার থমকে দাঁড়ানো, হাসি বদলা-বদলি। কথা নয়।

কিন্তু অরুণ, সাহসের সত্যিই সীমা নেই তোমার, থাকলে দুপুরবেলা জানলায় এসে টোকা দাও?

জ্বর হয়েছিল, গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে ছিলুম। চোখ বন্ধ, মাথায় যন্ত্রণা। মা একবার এল, হাতে বার্লির বাটি, কপালে হাত দিয়ে দেখে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। অনেক কষ্টে চোখ মেললুম। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলুম ফটোটা, বালিশের নীচে লুকোনো ছিল। লীলাদির বরের, য়্যালবাম থেকে চুরি করে খুলে এনেছিলুম, খসখসে কাগজে, কিন্তু খুব চাপা একটা গন্ধ। আমাকে ওরা পছন্দ করে গেছে, যারা দেখে গিয়েছিল তারা। কী নাম আমার বরের? কুলেশ কিম্বা ওই রকমই যেন কী। দেখতে? দেখতে লাজুক-লাজুক সেই ছেলেটি ত নয়। জানি না।

টোকা শুনলুম, ধরতে পারি নি। আমার চোখ বন্ধ করলুম। চোখ বুঁজেই টের পাচ্ছিলুম, কী একটা যেন পরিবর্তন ঘটেছে ঘরটায়, জমাট ছায়া একটু করে ফিকে হয়ে আসছে। নিশ্বাসেরও শব্দ। কার?

চোখ মেলে দেখি, তুমি!

শিয়রে বসেছ, তোমার ফর্সা লম্বা আঙুল আমার হাত ছুঁয়ে। লজ্জা হল, পুট পুট করে জামার বোতাম আঁটলুম, উঠেও বসতে যাব, তুমি ইশারায় মানা করলে।

—কেউ দেখে নি? ক্লান্ত গলায় বলেই আবার বিছানায় ঢলে পড়লুম। আমার হাত তখনও তোমার হাতে ধরা।

—কেউ না।

—এলে কী করে।

—সদর খোলা ছিল। ঠেলতেই খুলল। আর সকলে বোধহয় ঘুমিয়ে। অনেক পরে বললুম, যদি দেখতে পেত? তুমি শুনে শুধু হাসলে।

আস্তে আস্তে আবার বললুম, এলেই বা কেন? তুমি ত আমাকে চেন না?

—চিনি।

আর কোন কথা হল না, অনেকক্ষণ সব চুপ। তোমার মুখের একটা দিকই দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ তোলা, অল্প অল্প সোনালীর ছিটে আছে।

—কী দেখছ?

—তোমাকে। কী সুন্দর তোমার চুল! একটু থেমে বললুম, তোমার সবই সুন্দর। সেই ঘি রংয়ের জামাটা আজ পরে এলে না কেন?

—তোমার পছন্দ?

—খুব। বলেই কনুই দিয়ে চোখ ঢাকলুম।

—বেশ, কাল সেটাই পরে আসব।

—কালও আসবে?

—রোজ। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তুমি বললে।

—অদ্ভুত লাগছে, আমি বললুম, একেবারে যেন বানানো-বানানো।—সত্যি রোজ আসবে?

মায়া-মায়া চোখ দুটি আরও বড় করে তুমি হাসলে। তোমার ঠাণ্ডা হাত কপালের ওপর রেখে বললুম, সত্যি তুমি যদি আবার আস, যদি কপালে হাত বুলিয়ে দাও আর আমি এইভাবে চোখ বুঁজে খানিক থাকতে পারি তা হলে বোধহয় আমার অসুখ দুদিনেই সেরে যায়।

কী তেল তুমি চুলে মাখ, অরুণ, সেদিন বুঝতে পারি নি। তার সুবাস কিন্তু আমার নাকে, মুখে লাগছিল, আমার গলা আমার বুকের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

সেদিন যতক্ষণ ছিলে ততক্ষণ তোমার হাতখানা আমার কপালে রেখেছিলে। এত কাছে তোমাকে এর আগে পাই নি, এত কাছ থেকে দেখি নি।

হো-হো করে হেসে উঠল কুলেশ, বলল, বটে! থিয়েটার দেখার সাধ হয়েছে?

কিন্তু দুঃখিত, কী করব বল, আজ আমাকে ইভনিং ডিউটি দিয়েছে।

কল্পনা বলল, ও।

তা-ছাড়া, আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে পাকেটটা বাইরে টেনে এনে কুলেশ বলল, তাছাড়া দেখছ ত, আমার পকেট মনে মুখে এক? কুচো চিংড়ি এনে দিয়েছি, তাই খাও আর চোঁয়া ঢেকুর তোল। থিয়েটার দেখার সাধ এ মাসের মত তোলা থাক।

—ও মাসেও তুমি এই কথাই বলেছিলে।

—আমি দু-কথা ত বলি না। কুলেশ হাসছিল, দুটো চোখের পাতা তিরতির করে নড়ছিল, টেরছা হয়ে গিয়েছিল একটা চোখের চাউনি।

তারপর কুলেশ অনেকক্ষণ ধরে তেল মাখল, কুচকুচে চুলগুলো চুপচুপে করল। চান সেরে এসেই বলল, চটপট খেতে দাও। বার তিনেক ভাত চেয়ে চেয়ে খেল।

হাফ প্যান্টের তলায় খাকির শার্টটা যখন গুঁজছিল কুলেশ, কল্পনা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এই রংটা তার দু' চোখের বিষ, হাফ-প্যান্টও বিশ্রী। পুরুষকে বেমানান-ভাবে বালক করে রাখে। কুলেশ বলে, উপায় নেই, আমার যে কাজ তার এই হল উর্দি, শর্টস পরাই সরকারী নিয়ম।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কুলেশ চুকচুক করে আফশোস উচ্চারণ করছিল—এঁহে, সব উঠে যাচ্ছে—এবার থেকে শালার চুলে কবরেজী তেল লাগাব।

—বিচ্ছিরি গন্ধ হবে কিন্তু। দাগ পড়বে বালিশে।

পড়ুক। তবু চুল ত টিঁকবে।

গামছা দিয়ে শেষবারের মত কপাল আর ঘাড় ঘষে কুলেশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। সব চুল পাট পাট, পরিপাটি। একটিও উড়ছে না।

হঠাৎ অরুণকে দেখতে পেয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল কল্পনা। অরুণ এখানেও আসবে সে ভাবতে পারে নি।

চিৎকার কারও কানে যায় নি। দরজা বন্ধ ছিল।

কিন্তু অরুণ এলোই বা কী করে। পরে অনেকদিন ধরে ভেবেও কল্পনা কূল-কিনারা পায় নি। মনে আছে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুপুরের খাওয়া সেরে পানটি মুখে পুরতেই শক্ত সুপুরির একটা ডেলা ঠেকল দাঁতে, মাথা কেমন যেন ঘুরে উঠল। এই সাড়ে বত্রিশ ভাজা বাড়িটা একবার দুলে উঠেই মিলিয়ে যেতে থাকল। সদর-রাস্তায় কুষ্ঠরোগী—টানা ঘর্ঘর ঘ'র কাঠের গাড়ি নেই, ঠন ঠন বাসনওয়ালা নেই, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে পাড়া মাত করা ঝালাইকরের দোকানটাও চুপ করে গেছে। শব্দগুলো মুছে গেল একটু একটু করে। পরে রঙও মুছল। দেয়ালে জবজব তেলের ছাপে আঁকা মোষের মাথাটা দেখা গেল না, লিচু সাইজের পানের পিচের চিহ্ন ফিকে হতে থাকল, তখনই সেই ঘুম-ঘুম গন্ধটা টের পেল কল্পনা। অনেক দিন পরে। চোখ মেলতেই দেখা গেল অরুণকে। কল্পনা চিৎকার করে উঠল।

অরুণ হাসছিল—যেভাবে হাসতে খালি অরুণই পারে। কয়েক পা এগিয়ে আসতে ওর চেহারা স্পষ্টতরও হল। দেয়ালের ভিতরে গাঁথা দেরাজটায় ডালা আলগা হয়ে কাঁপছিল। কল্পনা এক দৃষ্টে চেয়েছিল সেদিকে। অন্যমনস্ক, অবাক।

—এই! কী দেখছ?

অরুণের কথায় হঠাৎ যেন লজ্জা পেলে কল্পনা; বলল, কিছু না। অরুণের বুকে মুখ লুকিয়ে আধো-আধো গলায় বলল, শুনলে তুমি বলবে পাগলামি। আমার অদ্ভুত একটা কথা মনে হয়েছিল।

—কী।

অনেক কষ্টে সংকোচ কাটিয়ে কল্পনা বলল, ঘর অন্ধকার, দরজা ভেজানো। দেরাজের ডালা খোলা; মনে হয়েছিল তুমি যেন ওই দেরাজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে।

দুষ্টু দুষ্টু ধরনে হাসছিল অরুণ—তাই ত এলাম। কিন্তু আর কাউকে বোলো না। কুলেশবাবু শুনলে বলবেন, তোমার চোখ খারাপ, মাথা খারাপ।

—ও তো ওই রকমই বলে। কিন্তু সত্যি তুমি কী করে এলে বল না! দেরাজটা যদি বন্ধ থাকত?

—তা হলেও আসতাম। দেয়ালে ফুঁ দিতাম, ইট আলগা হয়ে যেত, আমি যে মন্ত্র জানি।

অরুণের গালে আদর করে একটা টোকা দিয়ে কল্পনা বলল, ঠাট্টা। বলেই দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল, ওদিকে মুখ ফিরিয়ে।

—এই! শুনতে পেল অরুণ বলছে এই।

—উঁ।

—এদিকে ফের।

—তোমার সঙ্গে কথা বলব না আমি।

—ফের বলছি! অরুণের নিশ্বাস পড়ছে ওর কানের গোড়ায়। কল্পনার গায়ে কাঁটা দিল। সর্বনাশ, অরুণ কি শুয়ে পড়েছে নাকি, ওর পাশেই, এই বিছানায়? বালিশ যে কুলেশের লালার দাগ এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। ঘরটা আধো অন্ধকার তাই রক্ষা—কুশ্রীতা, আস্তর খসা চেহারা—সব ঢাকা পড়ে গেছে।

—এই। তোমার বুক কাঁপছে কেন? হাত সরিয়ে দিয়ে কল্পনা বলল, কাঁপছে না তো!

—তুমি তো কাঁদছো!

—কাঁদব না? হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে কল্পনা বলল, কাঁদব না? আমার বিয়ে হয়েছে সাত মাস, এতদিনে তুমি প্রথম আসবার ফুরসৎ পেলে?

অরুণ কিছু বলছিল না। কল্পনার একটা হাত টেনে নিয়ে এক-দুই করে যেন আঙুলগুলো বারে বারে গুনছিল।

—আমার বিয়েতেও ত তুমি আস নি।

অরুণ আস্তে আস্তে বলল, এসেছিলাম। তুমি দেখতে পাও নি। তোমাকে সাজিয়ে দিয়ে ওরা ঘিরে বসেছিল, মনে নেই? আমি সেই ঘরের বাইরের জানালায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম।

চকিতে কল্পনার কী যেন মনে পড়ে গেল। অস্ফুট, যেন মনে-মনে বলল, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। একবার মনে হল বটে, ছায়ার মত কী যেন সরে গেল। সে তবে তুমি?

অরুণ বলল, আমি।

ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে কল্পনা বলল, তারপর?

—তারপর তোমাকে ওরা যখন পিঁড়িতে তুলে পাকে পাকে ঘোরাতে থাকল, তখন আমি চলে এলাম।

—তখন আমার মাথা ঘুরছিল। জান, শুভদৃষ্টির সময়ে আমি চমকে উঠি? আর একটু হলেই ফিট হত।

—ফিট হত কেন?

—ও যে একটুও তোমার মত নয়। জানো অরুণ, বিয়ের সম্বন্ধ যখন ঠিক হল, আমি তখন থেকেই রোজ ভাবতাম, বর কেমন হবে! ভাবতাম, যদি এমন হয় যে বিয়ের সময় চোখ তুলে দেখি, তুমিই টোপর পরে আমার সামনে? তাহলে খুব মজা হয়। তা সে-সব ত হল না, স্বপ্ন কি আর সত্যিই ফলে? তোমাদের কুলেশবাবু একেবারে আলাদা জাতের। যাক গে, অরুণ তুমি এতদিনে বুঝি আমার ঠিকানা পেলে?

—এতদিনে পেলাম।

হঠাৎ পাখির মত ঝটপট করে উঠল কল্পনা, পাখির মত কলকল ভাষাতে বলল, বললে বিশ্বাস করবে না অরুণ, কিন্তু আমি জানতাম আজ তুমি আসবে।

—কী করে?

—চান করে এসে ধোওয়া শাড়ি একটাও পেলাম না। সব ছিঁড়ে এসেছে। তখন, তখন বাক্স খুলে সব লাট করে ফেললাম। নেই। খুললাম সবচেয়ে নীচের সবচেয়ে ভারী তোরঙ্গটা। বিয়ের পর সেটা আর খোলা হয় নি, হাতড়াতে গিয়ে সেই ফটোটা হাতে ঠেকল যে। লীলাদির বরের সেই ছবিটা তোমাকে বলি নি?—বিলেতে গিয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে সে মারা গিয়েছিল। অরুণ, তোমার বয়সও তো ছাব্বিশ?

—তাতে কী।

—জানি না কী। আমার মন তখনই বলল, তুমি আজ আসবে।

ওর আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে অরুণ বলল, মেয়েলি বিশ্বাস!

—যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসেরই জিত হলো তো। অরুণ, তুমি সত্যিই ত আজ এলে।

বাইরের রাস্তায় তখনই কী একটা সোরগোল উঠল, চঞ্চল হয়ে অরুণ বলল, আজ আসি।

কিন্তু দু-হাতে ওর কোমর জড়িয়ে কোলে মাথা রেখে ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে কল্পনা, ধরা-ধরা গলায় বলছে, না, তুমি এখনই যাবে না। থাকো, থাকো না আর একটু।

তুমি যতক্ষণ আছ, এই ভ্যানিলা সরবতের মত মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটাও ততক্ষণ

আছে। অরুণ, তুমি থাকলে কী ভাল যে লাগে। আমাকে তুমি জড়িয়ে নাও, ছেয়ে থাক, অনেক নিয়েও অনেক তুমি ফিরিয়ে দিতে পার।

—আমি এবার চলি, কল্পনা।

ক্ষুণ্ণ একটু-বা আহত গলায় কল্পনা বলল, এস, সারাক্ষণ ধরে ত রাখতে পারব না। বেলা গেল, কলে জল এল, এক্ষুণি ঠিকে ঝি আসবে, আমিও এবার উঠব। আমাদের দশ ঘরের কলতলায় সার দিয়ে দাঁড়াতে হয়, এর পর গেলে গা ধুতে পারব না। উনুনে আঁচ দেবার আগেই হয়ত দেখব আমাদের বাবু হুট করে হাজির হয়েছেন। কাল আবার এস, কেমন? কখন আসবে বলো ত, কোন্ রাস্তায়? দরজা খুলে রাখব?

রহস্যময় ধরনে হেসে অরুণ বলল, দরকার নেই। এই মান্ধাতার বাড়িটার সব গুপ্ত পথ আমি চিনি। জানো, এটা দেড়শো বছর আগে তৈরি—এর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ আছে, ইচ্ছে হলে গঙ্গায় চলে যেতে পার।

—সেখানে কী আছে?

—ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে।
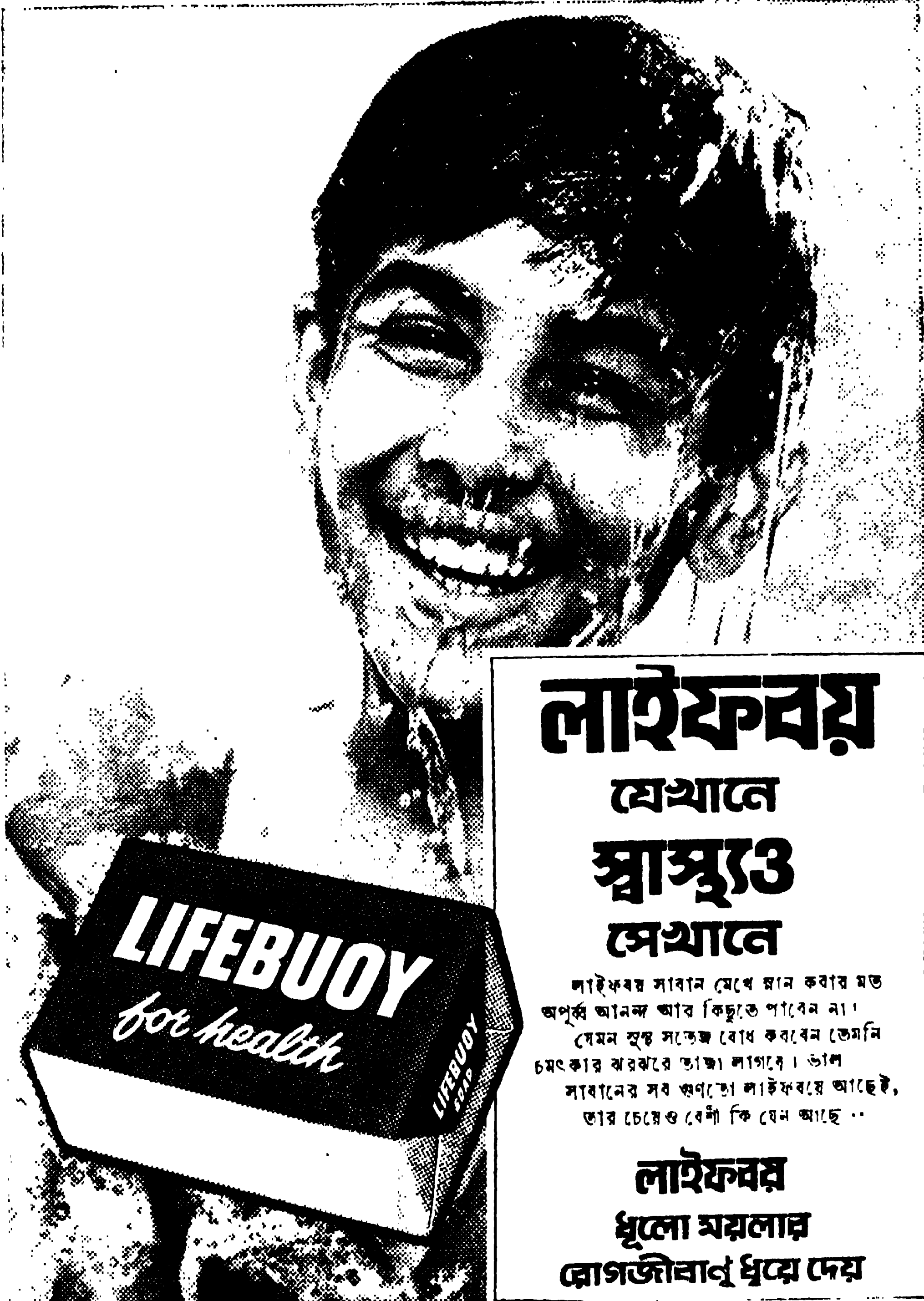
—যদি চড়ে বসি?

—মাঝিরা কাছি খুলে দেবে, পাল তুলে দেবে।

অরুণ, আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

—যাব।

তুমি একটুও অরুণের মত না, তুমি

একটুও অরুণের মত না। কলঘরে গায়ে মগ্ মগ্ জল ঢালছিল কল্পনা আর বিড়বিড় করে বলছিল। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি এই কলতলাটা। শ্যাওলাপড়া, আর একটু হলেই আমি পিছলে পড়তাম। ঝাঁঝরির মুখ বন্ধ, পচা পচা গন্ধ। ঢুকলেই গা ঘিনঘিন করে। ক্লাসটা কাজ করে না—নোংরা, নোংরা, ছিঃ! কে যেন টিনের ঝাঁপটায় টোকা দিল, বোধহয় কোণের ঘরের গিন্নী। অসভ্য, ইতর, ওর যেন আর তর সয় না। খুলব না, কিছুতে খুলব না আমি, এক ঘন্টার মধ্যে বেরোব না, দেখি ও কী করে। আমরাও ভাড়া দিয়ে থাকি। টিনের ঝাঁপটায় একটা ফুটো হয়ে আছে, সেদিন দেখেছি। ওদের কেউ ওখানে চোখ রাখেনি তো! রাখলেই বা কী, আমি তো ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে আছি।

তুমি একটুও ওর মত নও, কল্পনা বলছিল নিজের মনে, ঘরে ফিরে আসার পরেও কাপড় ছেড়ে যখন চুল বাঁধা হয়ে গেছে তখনও। রান্নাঘরে কড়াটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছিল, পুড়ুক, তোমাকে আমি পোড়া ছেঁচকি ধরে দেব।

তুমি ওর মত একটুও না, সে আমি প্রথম দিন থেকেই টের পেয়েছি। বিয়ের পরদিন সকালেই গরম নুন জলে বিকট আওয়াজ করে তুমি গার্গল করছিলে। সেটা অবিশ্যি এমনকিছু খাপছাড়া ব্যাপার নয়, তবু আমার কানে খারাপ ঠেকছিল। ঘরে ঢুকে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে তুমি বোকার মত দাঁত বার করে বললে, শ্লেষ্মার ধাত কিনা, অনেক দিনের, তাই সকালে আমার নুন-গরমজল চাই-ই চাই। পানের ছোপ লাগা দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক—চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।

ঘর করতে এলাম, ঠিক পনেরো দিন পর। ছত্রিশ ভাড়াটের এক বাড়ি, কী ঘুপচি, কী ঝুরঝুরে, কী পাথরচাপা। এই আমাদের বাসা?

লজ্জার লেশ নেই, বেহায়া, তুমি হাসতে হাসতেই বললে, আবার কী। আমার যা রোজগার তাতে এর চেয়ে ভাল বাসা মেলে না।

দাঁতে দাঁত চেপে শুনলাম। তোমার রোজগার ঠিক কত? তাও টের পেতে দেরি হল না। বিয়ের আগে শুনেছিলুম মাইনে চারশো না সাড়ে চারশো, বিয়ের পরে এই ক' মাসে একসঙ্গে দেড়শোর বেশি দেখিনি! তাও মাইনে নয়, কমিশন। কোন্ ঠিকেদারের হয়ে কুলি খাটাও, তার দালালি।

সকালে উঠি, উনুন ধরাই, চা গিলি, তোমাকে গেলাই, মাছ কুটি, ফ্যান গালি, ফোস্কা পড়ে তবু উহু-আহা করিনে, ভিড় ঠেলে কোনদিন চান করা হল তো হল, নইলে সমস্ত দুপুর চুল চিড়ে পাকিয়ে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করি, বিকেলে হাওয়া যদি দিল তো গা জুড়োল, বিষ্টি নামল তো সব ভাসল—একেবারে রসাতল, সারা রাত্তির মাদুর বালিশ ঘরের এ-কোণে—ওকোণে টানাটানি। সাপে যে কাটেনি কাঁকড়া বিছে আজও কামড়ায়নি, সে নেহাৎ পরমায়ুর জোরে।

শব্দ করে থুথু ফেলল কল্পনা, পাথার বাঁট পিঠে ঢুকিয়ে ঘামাচি মারল। তুমি আমাকে ঘামাচি দিয়েছ, তুমি আমাকে ছোট করেছ, যে ফিরিস্তি দিলুম, তা তো শুনলে। এর কোন্‌টাকে বাঁচা বলে।

কোনোটাকে না। এবাড়িতে একটা বই নেই যে পড়ি। একটা পত্রিকা নেই যে পাতা উলটে সময় কাটাই। অথচ বই পড়তে আগে কী ভালই না বাসতাম, একটা নেশার মত ছিল।

গা ধুয়ে বসে আছি, এখন তুমি আসবে না। থিয়েটারে যেতে চেয়েছিলাম, তোমার আজ সময় হল না, ইভনিং ডিউটি। সময় হলেই বা কী হত। তোমার সঙ্গে বেড়ানোর কত সুখ তা হাড়ে হাড়ে জানি।

সেবার পুজোর সময় হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে পায়ের খিল খুলিয়ে দিয়ে ছেড়ে ছিলে, পাশ দিয়ে কত বাস যাবে, আমরা উঠব না, রিক্‌সা চলবে, আমরা নেব না, তুমি খালি বলবে, আব একটু—আর একটু। চার আনা বাঁচিয়ে সেই পয়সায় একটা সস্তা চায়ের দোকানে তুমি চা খাওয়াবে। সে-সব দোকানে খুপরি থাকে না, কাটা দরজা থাকে না, কোন মজা নেই।

ঠাণ্ডা একটা দোকানে বসে আইসক্রীম খাব—আমার অনেক দিনের এই ছোট্ট শখ আজও মিটল না।

কুলেশবাবু, তুমি একটুও অরুণের মত নও। যখন ধর, তখন পিষে মার, গোগ্রাসে ভাত গেলার মত কর। যখন ছাড়, তখন সারা শরীরে ব্যথা, একটুও ভাল লাগে না। অথচ অরুণ—সে তার ছোঁয়া সমস্ত দেহে মনে ফুলের মত ছড়িয়ে দেয়!

—তুমি থাকো এইখানেই, এই চিলে কোঠায়? কই, কোনদিন তো বলনি?

—জানতুম তুমি একদিন জেনে ফেলবে, আর তাইতেই বেশি মজা।

—তিনতলার ওপর এই ছোট্ট ঘরটা ভাড়া নিয়েছ কেন?

—তোমার কাছে হবে বলে।

—ও। জান, আমি রোজই তুমি বেরিয়ে যেতে উঁকি দিয়ে দেখতে চেয়েছি তুমি কোন্ দিকে যাও। দেখতে পাইনি তুমি কি হাওয়ার মত চল, হাওয়াতে মিলিয়ে যাও?

—যা খুশি তুমি ভেবে নাও।

—জান ক'দিন থেকেই আমার খটকা লাগছিল। অনেক রাত, শুয়ে আছি, ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। সেদিন হঠাৎ একটা ছায়া দেখলুম। মনে হল, অরুণ, তোমার মত, যেন তুমি। পায়চারি করছ। আমি চেয়েই রইলুম যতক্ষণ পারি। জ্যোৎস্না সরে সরে ছাদের ওপাশে পড়ে গেল। অন্ধকার। মনে হল, তুমি যেন চিলেকোঠায় ঢুকে গেলে। ঠিক দেখিনি

—ঠিক।

—পর পর তিন দিন। তাই তো আজ দুপুরে পা টিপে টিপে উঠে এলাম। কী সুন্দর ছাদ, এতদিন কেন যে উঠিনি। জান, ওরা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। আদ্যি কালের বাড়িতে এটা—এই চিলে কোঠায় কবে নাকি কে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সেই থেকে এটা বন্ধ থাকে। কে যেন থেকে থেকে ধুপ ধুপ করে নাচে—কই এই সব। আজ আমি এলাম দরজা ঠেলে ঢুকলাম, কিছু নেই তো, তোমাকে পেয়ে গেলাম। ইঁদুর না, চামচিকে না। হাড়গোড় না, ধবধবে বিছানাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ফুলতোলা বালিশ, চাদরে ফুল ছড়ানো, তোমার ঘর তো অরুণ, এ-রকম তো হবেই। ধবধবে দেয়াল, ধূপ পুড়ছে, ধোঁয়া উড়ছে। সারা দিনই কি এ-ঘরে ধূপের গন্ধ থাকে?

—একসঙ্গে, কল্পনা, তোমার ক'টা কথার জবাব দেব?

—দিও না, শুধু শুনে যাও। আমার কী-যে মজা লাগছে, নিজেকে হালকা মনে হচ্ছে, এখন বোধহয় আমি পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারি। তোমার কাছে আসতে ওই জন্যেই তো ভাল লাগে, অরুণ, সব ভার নেমে যায়। যা হতে চাই, তাই হতে পারি, যা চাই, তাই পাই। ইচ্ছে হলে তোমার হাত ধরে ধরে তরতর করে নেমে এখনই আইসক্রীম খেয়ে আসতে পারি, আর শো-কেসের সেই আগুন রঙের শাড়িটা? আঙুল দিয়ে দেখালেই তুমি আমাকে কিনে দেবে, জানি, দেবে না?

—দেবো।

—তাই তো বলছি, আমাদের কুলেশ বাবুর মত পায়ে পায়ে পয়সার হিসেব তোমাকে করতে হয় না, আর সেইজন্যেই তো অরুণ, তুমি অরুণ। তুমি ট্যাক্সি চাপিয়ে আমাকে ময়দানের হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতে পার, কিংবা তার চেয়েও আরও দূরে পার না?

—পারি।

—তবে চুপে চুপে তোমাকে বলছি, চল না। সেই যে সুড়ঙ্গ পথের কথা বলেছিলে, তা কি সত্যি। আমরা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উঠব, নৌকো খুলে দেবে। তারপর—তারপর কী? খিলখিল হাসি, আর হাততালি। আমরা যাবই—এই ঘিনঘিনে ঘর থেকে তুমি বাইরে নিয়ে যাবেই। তুমি যেদিন বলবে সেদিনই দেখবে আমি তৈরি। এখানে আমি তিলে তিলে মরছি, মরে আছি, অরুণ, তোমার একটু মায়া হয় না!

—হয়, কল্পনা।

আঃ, তোমার হাত কী ঠাণ্ডা! আর একটু রাখ আমার কপালে, তোমার গাল আমার গালে রাখ, তোমার গা কখনও ঘামে না, গন্ধ হয় না, গেঞ্জি জবজবে হয় না, সব সময়েই ফুরফুরে সোনালী চুল ওড়ে—সত্যি কী অদ্ভুত তুমি! আর তোমার চোখের মণি—তুমি জান না অরুণ, ওই টলটলে নীল চোখ দুটো তোমাকে কতখানি মায়াবী করেছে।

কল্পনা ফুঁসছিল, আর বলছিল, মিথ্যুক, মিথ্যুক কোথাকার।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘসছিল কুলেশ আর হাসছিল—মিথ্যে কেন হবে। এই তো রয়েছে ডাক্তারের রিপোর্ট, পড়ে দেখ না।

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কল্পনা বলল, চাইনে দেখতে। জানোয়ার, ছোটলোক খাঁচায় আমাকে পুরেছ তাতেও আশ মেটেনি। এবার একেবারে শেকল পরিয়ে রাখতে চাও?

হাসতে হাসতেই বেরিয়ে গেল কুলেশ কল্পনা তখনও ফুঁসছিল। টলতে টলতে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশে মুখ

ডুবিয়ে দিল। চোখ ফেটে ফেটে নোনা জল ফেটে পড়ছে। রিপোর্টেই যা দরকার কী, সে-তো নিজেই জানে। চোখের কোণে কালির ছোপ, সব কিছুতেই অরুচি, এর মানে তার নিজেরও যে অজানা তা-তো নয়। রিপোর্ট শুধু ভয়টাকেই পাকা করেছে।

কুলেশ হাসছিল—পশু। ওর হাসি, দাঁড়াও ঘুচিয়ে দিচ্ছি। চোখ রগড়ে উঠে বসল কল্পনা। ওকে জব্দ করতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে শেকল পরাতে চাইলেই পরানো যায় না, শেকল কাটারও ফিকির আছে। ওষুধ আছে। সেই ওষুধ আনিয়ে নিতে হবে। অরুণকে বললেই—

অ-রু-ণ! হাত-পা আবার হিম হয়ে গেল কল্পনার। অরুণ আর কি আসবে? এলেও দু-হাতে মুখ ঢেকে কল্পনাকে ছুটে পালাতে হবে—এ মুখ অরুণকে সে কী করে দেখায়। বুকের তামাটে চাকতি দুটো কুচকুচে কালো হবে, কোমরটাকে দেখাবে ফাঁপানো ফানুসের মত, তখন অরুণই কি ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না! তারপর এই আঁটসাট বিছানার মত বাঁধা শরীরটা খুলে গিয়ে ঢুলো ঝুরঝুরে তোষকের চেহারা নেবে, তার আগে কি মরণ হয় না কল্পনা?

চোখ জলে টসটস করছিল, কল্পনা আবার উবুড় হয়ে পড়ে বালিশে ডুব দিল। পিঠ ফুলে ফুলে উঠছিল, পেটের নাড়ীসুদ্ধ গলায় এসে ঠেকেছে, মাথা ঘুরছে, আঃ এই সময় যদি একবার আসত অরুণ, কোলে ওর মাথা টেনে নিত, হাত বুলিয়ে দিত কপালে, সব জ্বালা নিমেষে জুড়িয়ে যেত। লজ্জা? না, লজ্জার সময় এখন নয়। অরুণের হাত দুটি চেপে ধরত কল্পনা এখনও সময় আছে, ওকে অরুণ নিয়ে যাক যেখানে খুশি, এই কাঁটার থেকে রেহাই দিক।

কিন্তু অরুণ এল না।

একবার চোখ মেলে কল্পনা দেখতে পেল কুলেশকে। ময়লা গেঞ্জিটা সে তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরল, মুখ শিটকে তবু পরল সেটাকেই, তারপর সেই হাঁটু বের করা প্যান্টটার বেল্ট কষে আঁটল। কুচকুচে চুল, রোমশ হাত—কল্পনা সেই হাতে যেন একটা সাঁড়াশি দেখতে পেল। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসবে লোকটা, ওই সাঁড়াশি দিয়ে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরবে।

কল্পনা ভয়ে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল। এস অরুণ, বোস। না-না, এখানে নয়, ওই মোড়াটা টেনে বোস। দেখছ না, এই বিছানাটা কী নোংরা, তা-ছাড়া নীলুর ঘুম ভেঙে যাবে। ওর ঘুম পাতলা, থেকে থেকে চমকে ওঠে, জেগে উঠলে আমাকে খাবে। কত বড় হাঁ দেখছ না, এটা একটা খুদে রাক্‌খোস।

তাছাড়া বিছানার অর্ধেকটায় অয়েল ক্লথ পাতা, তুমি বসবেই বা কোথায়। গন্ধ তোমার নাকে যাবে, তুমি যা শৌখীন অরুণ, রুমালে নাক ঢাকবে। নীলুর বাবার অবিশ্যি অত ঘেন্নাপিত্তি নেই, চেনো তো, ওরই ওপর উপড়ে হয়ে পড়ে চটকে চটকে বাচ্চাটাকে শেষ করে ফেলে।

অরুণ, তুমি অনেক দিন পরে এলে। শেষবার যেদিন আস, সেদিন ওই ক্যালেণ্ডারের সব কটা পাতা ছিল, এখন আছে একটা।

সেই প্রথম দিককার যন্ত্রণা আর লজ্জা তুমি জান না। নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম আর কাঁদতাম। দুপুরে যখন কেউ নেই, এই ঘরটা ছাই-ছাই রংয়ের হয়ে গেছে, তখন বার বার দেয়ালটার দিকে চেয়ে থেকেছি। সেই ম্যাজিকটা, ভাবতাম, এবার ঘটবে। দেরাজের পাল্লা কাঁপবে, তুমি বরাবর এক রকমের তুমি, বেরিয়ে আসবে।

তুমি একদিনও আসনি কেন? অরুণ? কোথায় পালিয়েছিলে? রাত্রে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, তোমাকে পায়চারি করতে দেখা যায় কিনা। যায় নি। চিলে কোঠাটা ফের ভুতুড়ে হয়ে গেছে।

ভাবতেও পারবে না অরুণ, তখন রোজ তোমাকে কত ডেকেছি। বাচ্চাটা ভেতরে নড়ে নড়ে উঠত, সেটাই অসহ্য লাগত। একটা ভয়ানক ফন্দীও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। তুমি এলে দুজনে পরামর্শ করে সেটা কাজে লাগাব ভেবেছিলাম

তুমি এলে না। তখন ভাবলাম বিষ খাব। তোমার চিলে কোঠার দরজায় টোকা দেব। কিন্তু সিঁড়ির মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এ অবস্থায় নাকি সন্ধ্যার পর ছাদে যেতে নেই। তাছাড়া আস্তে আস্তে আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, ওই চিলে কোঠাতে তুমি আর নেই। ছেড়ে গিয়েছ।

ঠিক না? ভালই হয়েছে, অরুণ তুমি আসনি। এলে সর্বনেশে কোন্ বুদ্ধিতে কী করে বসতাম, ঠিক কী!

দেখ তো অরুণ—না-না, আমাকে ছুঁতে বলছি না, শুধু চেয়ে দেখে বল—আমি খুব রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছি, কেমন? মাথার চুল—ঢের উঠে গেছে, রোজই যাচ্ছে, কী করি। তোমার চুল কিন্তু তেমনি আছে, ঢেউ খেলানো, সোনালী-সোনালী। দেখি তোমার চোখ দেখি? তেমনি নীল। অরুণ তোমার বয়স একটুও বাড়ে না।

হাসপাতাল থেকে ফিরেছি—তাও প্রায় দিন দশেক হয়ে গেল, এখনও ভাল করে চলাফেরা করতে পারি না। দুটো টনিক আছে, তা থাকলে হবে কী, সারারাত এই ডাকাতটা যে জাগিয়ে রাখে। গলা ফাটিয়ে যখন চেঁচায় পাড়াসুদ্ধ সাড়া পড়ে, কে বলবে মোটে এক মাসও পোরেনি। আগেকার মেজাজ থাকলে কী করতাম জানি না, এখন—এখন কিন্তু অতিষ্ঠ হলেও একবারও ওটাকে গলা টিপে মারতে ইচ্ছে হয় না। আসল কথা তোমাকে খোলাখুলি বলব? পেটে থাকতে যেটা ছিল কাঁটা, মাটিতে পড়তে দেখি, আরে কাঁটা তো নয়, ফুল।

তেল মাখাই, টিপে টিপে দেখি, নরম তুলতুলে। তোমার মত একটুও নয় কিন্তু সব ওর বাবার মত পেয়েছে। ওই রকমই গাঁট্টাগোট্টা হবে আর কী।

ওর বাবা, তোমাদের কুলেশবাবুকে তুমি হালে বোধহয় দেখনি, খুব রোগা হয়ে গেছে। ভাবনায় খাটুনিতে। খুব খাটছে যে। নিজে রাঁধছে হাত পুড়িয়ে। তবু আমাকে রান্নাঘরে যেতে দেয় নি। রোজই একটা না একটা ওষুধ আনবে, নয়তো আ-গুর, কিংবা অন্য কোন ফল। অথচ নিজের দিকে নজর নেই। বলে, আর কিছু দেখতে হবে না, তোমার ছেলেকে তুমি সামলাও। ছেলে হয়েছে কিনা, তাতে আবার নিজের মত দেখতে, বাবুর গর্ব খুব।

সত্যি বলতে কী অরুণ, ওকে, তোমাদের কুলেশবাবুকে, এদিক থেকে আমি কোনদিন দেখিনি। সারাদিন যে খাটে, যেখান থেকে যা পারে কুড়িয়ে সংসারে আনে, আমার জন্যে, ওর ছেলের জন্যে। কী যেন বদলে গেছে। হয়তো ও নিজেই। কিংবা যা ছিল তাই আছে, বদলে গেছে আমার দেখার ঢঙ।

একটু মাথা যখনই তুলতে পারব, অরুণ, গায়ে জোর পাব, তখনই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকব। ওকে ঘরে বাইরে খেটে খেটে শেষ হতে দেব না।

অরুণ, তুমি উঠছ? নীলুটা কেমন হাসছে, যাবার আগে একবার দেখে যাও। ঘুমের ঘোরেই ওমনি হাসে, ওরা ভগবানের সঙ্গে কথা বলে, না?

অরুণ, উঠো না, আর—একটু বোসো। বকবক করে তোমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি, জানি। খানিক পরে ও জেগে উঠে চেঁচাবে, ওকে দুধ খাওয়াতে বসব, তখন তো যেতেই হবে তোমাকে। তার আগে বরং আরও একটু বসেই গেলে।

না—না, ভয় পেও না, আমাকে নিয়ে পালাতে আর বলব না। আগে খুব পাগলামি করতাম, না? চাইলেই বা আর পালাতে দিচ্ছে কে। দেখছ বটে ছোট ছোট হাত, ওর কিন্তু জোর খুব। আঁকড়ে যখন ধরে, ছাড়ানো মুশকিল।

কী করি বল, আর উপায় নেই। বলেছি তো, একটু সেরে উঠলে আমি রান্নাঘরে ঢুকব, ময়লা বিছানার চাদর রোজ সকালে রোদ্দুরে দেব। সেই চাদর তুলে টান টান করে পাতব বিকেলে। শোব। জানি কোন কোন দিন সকালে শরীরটাকে নিংড়ে নেওয়া, ছিবড়ের মত ঠেকবে, তবু ভোরে উঠতেই হবে রান্না চাপাব, কুটনো কুটতে গিয়ে আঙুল কেটে, রক্ত বেরুতে পারে, ফ্যান গালতে গিয়ে হয়ত পায়ের পাতা দগদগে হবে, ঘেমে নেয়ে উঠব, ঘাম মুছেও ফেলব। কিন্তু পালাব না।

—কল্পনা, আমি এবার যাই। আমাকে তোমার তো আর দরকার নেই।

—নেই! কী জানি বলাও যায় না। হয়ত আছে। মাঝে মাঝেই তোমাকে ডাকতে হবে। পালাব না বটে। কিন্তু এটাও তো ঠিক, কোন কোন দিন খুব একঘেয়ে ঠেকবে, ছটফট করব। যখনই দম বন্ধ হবে, অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখনই চাইব তাকে, যার চোখ নীল, মুখে মায়াবী হাসি, সুন্দর সোনালী চুল বাতাসে ওড়ে, যে কখনো রেগে যায় না, ঘামে না, হাঁপায় না, হিসেব করে যাকে খরচ করতে হয় না। আলগা একটা ছোঁয়া দিয়ে যে ছেয়ে রাখে, যেদিনটা দুপুরটা অসহ্য হবে, সেদিনই অরুণ, জানি ওই দেরাজের ডালা কাঁপবে, হঠাৎ সুবাস ছড়িয়ে পড়বে তুমি বেরিয়ে আসবে, ওই ম্যালবাম থেকে বরাবর যেমন এসেছ, কিংবা আমিই টেনে এনেছি তোমাকে।

গাছ

অদ্রীশ বর্ধন

মনে হয়েছিল বুঝি দুঃস্বপ্ন। কিন্তু দুঃস্বপ্ন তো মিথ্যে হয় রাত ফুরোলে। কিন্তু এ দুঃস্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। সত্যি হয়েছে। ভয়ংকর সেই সত্য। নিষ্ঠুর, নির্মম সেই সত্য।

প্রথম যেদিন দেখা গিয়েছিল সেই সবুজ আলোর ধারা, তখন কি কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিল মহাশ্মশানে পরিণত হতে চলেছে এই পৃথিবী? রাতের আকাশ থেকে ঝরে-পড়া স্নিগ্ধসুন্দর সবুজ রশ্মি আর টুকটুকে লাল ফুলঝুরি দেখে বিস্ময়বিহ্বল হয়েছিল মানুষ, মুগ্ধ হয়েছিল, বিধাতার অপূর্ব লীলারেখা মনে করে পরম ভক্তিতে মাথা হেঁট করেছিল। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি কি ভয়ংকর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে পৃথিবীর বুকে। অতিবড় দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবেনি স্বর্গীয় এই সবুজ রশ্মির পেছনে গোপন রয়েছে কি ক্রূর অভিসন্ধি—লক্ষ যোজন দূরের বিচিত্র প্রাণীদের সীমাহীন নির্মমতার পৈশাচিক পরিকল্পনা।

তেরতলা বাড়ীর ওপর তলায় বসে আমি লিখছি সেই ভয়ানক দুর্যোগের কাহিনী। কিন্তু কেন লিখছি তা জানি না। লিখছি কার জন্যে? পড়বার লোক কি আর আছে? তবে কি মানুষ-শূন্য হয়ে গেছে সবুজ পৃথিবী?

না। মানুষ এখনো আছে! ভূগোলকের এখানে-সেখানে এখনও হয়ত মানুষের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন দল একতা হারিয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে এই মুহূর্তে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। এক গরস খাবারের অভাবে তারা নেমে এসেছে পশুর পর্যায়ে।

শুধু কি তাই। মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়েছে।

সেই কাহিনীই শোনাই এবার।...

সবুজরশ্মি প্রথম দেখা গিয়েছিল, আমি তখন হাসপাতালে। দুই চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আমি কিছুই দেখিনি, কেবল শুনেছি। শুনেছি যে, অজস্র সবুজ তারা শিলাবৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে পৃথিবীর দিকে। কিন্তু ভূতল স্পর্শ করার অনেক আগেই আচম্বিতে নিঃশব্দে ফেটে যাচ্ছে তারাগুলো। অবিকল তারাবাজীর মত। আর, ফুলঝুরির মত লাল আলো লক্ষ সাপের আকারে কিলবিলিয়ে ঝরে পড়ছে ধরিত্রীর বুকে।

এরকম তারা একটা নয়, দুটো নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আচম্বিতে দেখা দিয়েছে ১৯৭০ সালের ৯ মার্চের রাত্রে।

পর-পর তিনরাত এমনি সবুজ রশ্মি আর লাল ফুলঝুরির খেলা চলল পৃথিবীর সর্বত্র। পিকিং, মস্কো, মোম্বাসা, গাম্বিয়া, ফকল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ওয়াশিংটন, মেক্সিকো, টাসমানিয়া, জাপান—কোথাও বাদ গেল না। হতভম্ব হয়ে সাধারণ লোকে সারারাত দেখল সেই বিচিত্র আতসবাজীর উৎসব। স্বয়ং বিধাতা যেন আকাশ জুড়ে সাজিয়েছেন লক্ষ দেওয়ালীর কল্পনাতীত আলোকমালা।

বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকরা মাথা চুলকাতে লাগলেন—দিশেহারা হয়ে গেলেন পক্বকেশ দার্শনিকরা, মহা ফাঁপড়ে পড়লেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা, আর উল্লসিত হলেন মোল্লা, পাদরী, পুরুতের দল। ফলে, যাগ-যজ্ঞ উপাসনার ধুম পড়ে গেল মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে। সায়ান্স-ফিকশান ভক্তরা বললেন বিজ্ঞের মত, এ নিশ্চয় অন্য গ্রহ-বাসীর কীর্তি। হয় মঙ্গল, না হয় শুক্র থেকে কিছু বিটকেল বাসিন্দা এসে মস্করা করছে পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে।

কিন্তু প্রকৃত কারণটা যে কি, তা কেউই অনুমান করতে পারলেন না; জানা তো দূরের কথা।

হলিউড, টোকিও, টালিগঞ্জ থেকে অতি-উৎসাহী ক্যামেরাম্যানেরা নিশীথ রাতের সেই ঐশ্বর্য মুভি ক্যামেরায় তুলে রাখতে লাগল। টেলিভিশন কোম্পানীরাও পিছিয়ে থাকবার পাত্র নয়। তারাও তোড়-জোড় করতে লাগল ভারী ভারী ক্যামেরা নিয়ে। সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গেল বাহারি সবুজ তারা আর লাল ফুলঝুরি নিয়ে।

আমি কিন্তু কিছুই দেখলাম না। রেডিওতে, নার্সের মুখে, ডাক্তারের কাছে কেবল শুনেই গেলাম। কারণ, চোখ থেকেও আমি তখন অন্ধ। দুই চোখে আমার পুরু প্যাডের ওপর বাঁধা চওড়া ব্যান্ডেজ। ব্যান্ডেজ খোলা হলে কোনদিন দৃষ্টি ফিরে পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

দুই চোখে আতীব্র যন্ত্রণা নিয়ে অন্ধ অবস্থায় এসেছিলাম হাসপাতালে। অথচ আমি জন্মান্ধ নই। জন্মেছিলাম সুস্থ দৃষ্টি নিয়ে। উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কর্ম-জীবনেও উন্নতি করেছিলাম দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার জন্যে।

আর, তার পরেই ঘটল সেই লোমহর্ষক অঘটন। আমি অন্ধ হয়ে গেলাম।

সে আর এক কাহিনী।...

প্রথমে আগাছা বলেই মনে হয়েছিল। ঝোপেঝাড়ে যেমন অগুন্তি নাম-না-জানা গাছ-গাছড়া দেখা যায়, ভেবেছিলাম এও তাই। কিন্তু তখন যদি সাবধান হতাম, তাহলে আজ আমার এ অবস্থা হত না। পৃথিবীর সমস্ত রঙ-রূপ আজ মুছে যেত না আমার চোখের সামনে থেকে।

আমি অন্ধ হয়ে গেছি। অন্ধ হয়ে গেছি ঐ গাছটার জন্যে।

দেশ-বিদেশের গাছ-গাছড়া নিয়ে নাড়া-চাড়া করা বাবার চিরকালের সখ। ছেলে-বেলা থেকেই বাগানে ঘুরে-ঘুরে করতে করতে অমনি কত গাছের নাম আমারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত সেই গাছটি আমি চিনতে পারিনি।

গাছটা বাবাকে দেখিয়েছিলাম। বাবা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা লেবেলে তারিখ লিখে ঝুলিয়ে দিলেন শুঁড়টায়।

ওহো, গাছটার যে শুঁড় ছিল তা বলতে ভুলে গেছি। মাথার ওপর যেখানে পাতা আর ডাল থাকার কথা, সেখান থেকে একটা মাত্র সরু শুঁড় দুলছিল হাওয়ায়। সামান্য একটা শুঁড়। কিন্তু কি নির্মম। হত্যাকারী সেই শুঁড়ের মার খেয়েও প্রাণে বেঁচে গেছি আমি, কিন্তু জন্মের মত বুঝি হারাতে হল চোখ জোড়া।

কয়েক হপ্তার মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছিল গাছটা। আরো একমাস গেল। আশ্চর্য বাড় বটে। প্রায় ছ'ফুটের কাছা-কাছি পৌঁছে গেল উচ্চতা। আর, তারপরেই লক্ষ্য করলাম সেই আশ্চর্য প্রত্যঙ্গ তিনটে।

ভোরের দিকে বাগানে এসেছিলাম। অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম শুঁড়সমেত ভৌতিক চেহারার গাছটার দিকে। ভাবছিলাম, গাছ কি এত তাড়াতাড়ি বাড়ে? এ কি গাছ না, অন্য কিছু?

ঠিক এই সময়ে দুলে উঠল গাছটা। যেন রহস্যজনক উপায়ে আমার মনের কথা টের পেয়েই চনমন করে উঠল গাছটার সারা দেহ।

চমকে উঠেছিলাম আমি। তারপর ভাবছিলাম নিশ্চয় চোখের ভুল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দুলে উঠল গাছটা। এমন স্পষ্ট সেই দুলুনি যে তা চোখের ভুল হতেই পারে না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছিলাম, নড়ে নড়ে উঠছে গাছের শেকড়গুলো। আর... আর, শেকড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিন-তিনটে অদ্ভুত প্রত্যঙ্গ! শুধু প্রত্যঙ্গই বলব। প্রত্যঙ্গ ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। পা বললে হয়ত জিনিসটা পরিষ্কার হত, কিন্তু গাছের কি পা হয়? হাল-ফ্যাশানের টেবিলের পায়ার মত তিনটে শুধু ঠেকা ঠেলে নেমে এসেছে। সেই ঠেকার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে গোটা গাছটা। তারপরেই, আচমকা সামনের ঠেকা দুটো দুমড়ে বেঁকে গিয়েই সিধে হয়ে গেল। কিলবিল করে উঠল শেকড়গুলো... আর অদ্ভুতভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল গাছটা...পর মুহূর্তে যেন বিদ্যুতের মত শূন্য পথে খেলে গেল শুঁড়টা।

সমস্ত জিনিসটা এত চকিতে ঘটল যে সাবধান হওয়ার আগেই সপাং করে মুখে আছড়ে পড়ল শুঁড়টা...পড়ল ঠিক চোখ দুটোর ওপরেই। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে এলে কানে ভেসে এসেছিল বাবার কন্ঠ। কিন্তু দেখতে পাইনি কাউকে। সমস্ত ক্ষমতাই লোপ পেয়েছিল। শুঁড়ের মধ্যে ছোট ছোট থলির ভেতরে নাকি মারাত্মক বিষের সন্ধান পেয়েছেন বাবা। থলি ফেটে চোখে প্রবেশ করেছে সেই বিষ। অন্ধ হয়ে গেছি আমি।

হাসপাতালে এসে শুনেছিলাম হয়ত আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতে পারে। আবার, নাও পারে। কারণ, তিনপেয়ে ভয়াবহ দানবের মত সেই গাছটি বয়েসে নেহাতই শিশু। তাই বিষের থলিতে যে বিষ ছিল, তা হয়ত তেমন মারাত্মক নাও হতে পারে।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, তাই যেন হয়। বিশ্বের এই রঙ-রূপ যেন চোখের সামনে থেকে জন্মের মত মুছে না যায়।

তারপর কেটেছে অনেকদিন, অনেক রাত, কিন্তু আমার চোখে কোনো প্রভেদই ধরা পড়ে নি। বাবার মুখে শুনেছি সারা পৃথিবী নাকি রাতারাতি ছেয়ে গেছে এই অদ্ভুত আগাছায়। অবিশ্বাস্য গতিতে তারা বেড়ে উঠেছে, গা-শিউরানো তিনটে ঠ্যাংয়ে ভর দিয়ে দুলে দুলে হাঁটছে। প্রতিটি আগাছার শুঁড়ে মারাত্মক বিষ এবং শুঁড়ের অতর্কিতে আঘাতে বিষের ছোঁয়ায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে বহু মানুষ, মারাও যাচ্ছে অনেকে। সব চাইতে আশ্চর্য, গাছগুলোর যত আক্রোশ মানুষের চোখের ওপরেই। নির্ভুল লক্ষ্যে তারা শুঁড় চালায় চাবুকের মত, বাতাস কেটে ছপাং শব্দে ঠিক চোখ জোড়ার ওপরেই আছড়ে পড়ে বিষাক্ত শুঁড়। বিষের তীব্রতা বেশি থাকলে মানুষ মারা যাচ্ছে তৎক্ষণাৎ। যারা বেঁচে থাকছে, তারা দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে জন্মের মত।

চোখ হারিয়ে আমি দিন গুনছিলাম সেই দিনের, যেদিন অন্ধের গ্রহে পরিণত হবে সসাগরা এই ধরিত্রী। আর ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল সেই আশ্চর্য দৃশ্য! সবুজ তারা আর লাল ফুলঝুরি ঝরতে লাগল পৃথিবীর আকাশে।

পর-পর তিনরাত দেখা গেল সেই বিচিত্র দৃশ্য।

চতুর্থ দিন আমার চোখের বাঁধন খোলার দিন। চক্ষু বিশেষজ্ঞের মতে সেই-দিনই জানা যাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপ-সুধা চোখ দিয়ে পান করার শক্তি আমি জন্মের মত হারিয়েছি কিনা। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে, ফিরে পাব দৃষ্টিশক্তি, নইলে চির অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত থাকতে হবে বাকী জীবনটা।

সেদিন তাই যথাসময়ে ঘুম ভাঙতে মনটা উদ্বেগে ভরে উঠল। কিন্তু চারদিক এত নিস্তব্ধ কেন? এত নিথর কেন? তবে কি রাত এখনো ফুরোয়নি? অভ্যেস মত ভোরেই ঘুম ভাঙে প্রতিদিন। আজ কি অন্তরের উৎকন্ঠায় রাত থাকতেই ঘুম ভেঙেছে আমার? নিশ্চয়ই তাই। তাই চারিদিক এত শব্দহীন।

বালিশে আবার মাথা এলিয়ে দিলাম। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম আর এল না। কি করে আসবে? আজ আমার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ। অন্ধ আজ চক্ষুষ্মান হবে, অথবা আর কখনই হবে না। আজ কি আমি ঘুমোতে পারি।

কতক্ষণ এভাবে শুয়েছিলাম জানি না। অনেক...অনেকক্ষণ পরে ক্ষিদের জ্বালা অনুভব করলাম। নিশ্চয়ই ভোর হয়েছে। কিন্তু এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে গোটা হাসপাতাল? চারদিক এখনও নিশ্চুপ। না, না, পুরোপুরি শব্দহীন নয়। অস্পষ্ট একটা গোঙানির সম্মিলিত শব্দ যেন দূরে থেকে ভেসে আসছে কর্ণরন্ধ্রে।

কিসের শব্দ?

নার্সকে ডাকলাম। ওয়ার্ডারকে ডাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না।

গেল কোথায় সব? এরকম কাণ্ড তো কোনদিনই ঘটেনি।

টুঁটিটেপা নৈঃশব্দ্য মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে কাদের কাতর আর্তনাদে। কারা যেন নিঃসীম যন্ত্রণায় কাতরে উঠছে, ককিয়ে উঠছে। তারপরেই আচম্বিতে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেন ক্ষণে ক্ষণে আঁতকে উঠছে নির্জনপুরী।

ক্ষিদের জ্বালায় মেজাজও সপ্তমে চড়ল। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করেও যখন কারো সাড়া পেলাম না, তখন নিজেই উঠলাম শয্যা ছেড়ে। হাতড়ে হাতড়ে ঘুরলাম ঘরময়। দেখলাম, যেখানে যেটি প্রতিদিন থাকে, আজও তেমনি রয়েছে। শুধু নেই কোনো মানুষ। নেই ডাক্তার, নেই সিস্টার, নেই ওয়ার্ডার।

•

হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ হাতে ঠেকল একটা কাঁচি। ডাক্তারী কাঁচি, তুলো এবং অন্যান্য শিশিবোতলের পাশেই রয়েছে কাঁচিটা। আজ আমার ব্যাণ্ডেজ কাটার দিন বলেই বোধহয় নার্স সব সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল। ডাক্তার এলেই শুরু হত ব্যাণ্ডেজমোচন পর্ব।

কিন্তু কোথায় ডাক্তার? বেশ বুঝলাম, বেলা অনেক গড়িয়েছে। প্রচণ্ড ক্ষিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি মোচড় দিচ্ছে।

এইভাবেই ছটফট করতে করতে কাটলো আরো অনেকক্ষণ। কতক্ষণ? তা বলতে পারব না। ঘড়ি দেখার তো উপায় ছিল না। তবে কয়েক ঘন্টা তো বটেই।

তারপর আর সহ্য করতে পারলাম না। হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে পৌঁছোলাম। পাল্লা খুললাম। করিডরে পা দিলাম। কিন্তু তখনও কেউ আমায় বাধা দিল না। কথা বলল না। হুঁশিয়ার করল না।

আচম্বিতে অজানা আতংকে শিউরে উঠলাম আমি। নামহীন ভয় হিমশীতল সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল সর্ব অঙ্গ। পায়ে-পায়ে আবার আমি ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল এই বুঝি কোনো বিভীষিকা ঝাঁপিয়ে পড়বে

আমার ওপর—আমার অন্ধতার সুযোগ নিয়ে মরণ কামড় বসাবে আমার দেহে......

ঘরে ঢুকেই কাঁচিটা খুঁজে বার করলাম। এতক্ষণ যা পারিনি, নিদারুণ ভয়ে এবার তা সম্ভব হল। নিজেই কাঁচি চালালাম চোখের ব্যাণ্ডেজের ওপর। যা হয় হোক। এই অস্বাভাবিক নীরবতা আর ঐ অপার্থিব কাতরানি সহ্য হয় না।

কিছুক্ষণের চেষ্টাতে খুলেও গেল ব্যাণ্ডেজ। চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দিলাম তুলোর পুরু প্যাড। সরালাম অতি সন্তর্পণে—কাঁপা হাতে।

প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর, যেন ঘসা-কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম অদূরস্থ টেবিলটা। পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করে ফেললাম। এত আলো সহ্য হল না। দীর্ঘদিন অন্ধকারে থেকে অভ্যস্ত, তাই আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

সে সমস্যারও সুরাহা হল অচিরে। যেখানে কাঁচি ছিল, তার পাশেই পেলাম একজোড়া কালো চশমা।

চোখে চশমা এঁটে বাইরে এসে কি দেখলাম? অবর্ণনীয় সেই দৃশ্য। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

চৌকাঠের বাইরে পা দিয়ে দেখলাম খাঁ-খাঁ করছে করিডর। দুরু দুরু বুকে পা দিলাম পাশের বারান্দায়। সেখানেও কেউ নেই।

হঠাৎ চোখে পড়ল একজন ডাক্তারকে। অদ্ভুতভাবে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক। পাশের দরজা ঠেলে পা ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন—বোধ করি আমার পদশব্দ শুনেই। দারুণ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল তাঁর মুখ। তারপরেই ছুটে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দেওয়ালের ওপর।

এবার আর কোন সন্দেহই রইল না। ডাক্তার অন্ধ। হাসপাতালে অন্ধ ডাক্তার। এগিয়ে গেলাম। সন্তর্পণে হাত দিলাম তাঁর কাঁধে। তৎক্ষণাৎ শিউরে উঠে গুঙিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক—কে, কে?

—আমি, বললাম আমি। নিজের পরিচয় দিলাম।

—কিন্তু আপনি তো অন্ধ? শুধোলেন ডাক্তার।

—এখন আর নয়।

বললেন—গুড লাক। অপারেশান করে আমিই আপনার চোখ ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু হারালাম আমার চোখ।

—আপনি অন্ধ?

—হ্যাঁ।

—কি ভাবে?

—সবুজ তারা আর লাল ফুলঝুরি দেখে।

—সবুজ তারা আর লাল ফুলঝুরি দেখে। বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করেছিলাম আমি।

শুধু ডাক্তারের কাছে নয়, তারপরেও অনেকের কাছে শুনেছিলাম সেই একই কাহিনী।

হাসপাতালের প্রত্যেকেই হারিয়েছিল দৃষ্টিশক্তি। শয্যার ওপর দৃষ্টিহীন চোখ মেলে বসেছিল রুগী, খাঁ-খাঁ করছিল করিডর, সিঁড়ি, লন। নার্স, ওয়ার্ডবয় কেউ আসেনি নিজেদের কোয়ার্টার ছেড়ে। আসার উপায় ছিল না। কেননা প্রত্যেকেই হারিয়েছিল অমূল্যনিধি চক্ষুরত্ন।

হারিয়েছিল রাতারাতি। তিনরাত আলোর বাজী দেখার পর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা চোখ খুলেছে, কিন্তু আর কোন আলো দেখেনি। আলোর জগৎ চিরতরে মুছে গেছে তাদের বিনষ্ট চক্ষুপ্রত্যঙ্গের সামনে থেকে। অন্ধ হয়ে গেছে সকলে।

অন্ধ কে হয়নি? রাস্তায় বেরিয়ে দেখেছি সেই একই ভয়াবহ দৃশ্য। দেখেছি যেন যাদুমন্ত্র বলে কলকাতা নগরী অন্ধের নগরীতে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় চলমান গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই, সাইকেল নেই, রিকসা নেই, বাস নেই, ট্রাম নেই, ট্যাক্সি নেই। এখানে-সেখানে রাস্তার ধারে দু-একটা প্রাইভেট কার। তাছাড়া বড় রাস্তাগুলো অস্বাভাবিক শব্দহীন। দুচারজন অন্ধ মানুষ দেওয়াল ধরে হাঁটছে অতি কষ্টে—মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। আবার উঠছে, দুহাত সামনে প্রসারিত করে পা ঘষতে ঘষতে চলেছে অত্যন্ত অসহায়ভাবে।

সারা শহরেই কি একই কান্ড! আমি কি উন্মাদ হয়ে গেলাম? নাকি ভয়াল দুঃস্বপ্নের ঘোর এখনও কাটেনি আমার চোখের সামনে থেকে?

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দেখলাম একটা ট্যাক্সি রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে উঠে দোকানের কাঁচের শো-কেসের মধ্যে ঢুকে গেছে। প্রচন্ড সংঘর্ষে সামনের দিকটা দুমড়ে গেছে—ড্রাইভারের মৃতদেহ বিকৃত ভঙ্গিমায় আটকে রয়েছে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। ধাক্কার চোটে আটকে গেছে গাড়ীর দরজাগুলো। পেছনের সিটে ভয়ার্ত মুখে বসে একজন যুবক আর একজন যুবতী। দুজনেই অন্ধ।

যাকে দেখছি রাস্তায়, সেই অন্ধ। স্টেটসম্যান বিল্ডিংয়ে উঠেছি। মেশিন বন্ধ। মৃতপুরীর মত নিস্তব্ধ অত বড় বাড়ীটা। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। আতংকে ঢিপ ঢিপ করছিল বুক। কল্পনাই করতে পারছিলাম না এ রকম অসম্ভব কান্ড কি করে সম্ভব হল।

এমন সময়ে শুনলাম একটা নতুন শব্দ। খটা-খট, খটা-খট, খটা-খট! কে যেন এক নাগাড়ে টাইপ করে চলেছে ওপর তলায়। তবে কি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এখনও আছে শহরে?

এক-এক লাফে দুটো তিনটে সিঁড়ি টপকে পৌঁছেছিলাম তিনতলায়। শব্দের উৎস অনুসরণ করে দরজা ঠেলে ঢুকেছিলাম ছোট্ট একটা ঘরে। দেখেছিলাম জানালার সামনে একটা টেবিলের রাখা টাইপ-রাইটারে ঝড়ের মত আঙুল চালিয়ে চলেছেন এক ব্যক্তি।

হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। শুধিয়েছিলাম আকুল কণ্ঠে—আপনি......আপনি দেখতে পান?

আচমকা স্তব্ধ হয়েছিল খটাখট খটাখট যান্ত্রিক শব্দ। ভদ্রলোক কিন্তু মুখ তোলেন নি। পলকহীন চোখে জানলা পথে বাইরে তাকিয়ে বলেছিলেন অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে—না।

—তবে টাইপ করছেন কিভাবে?

—অভ্যাসের বশে। কিন্তু আপনি কে? আপনি অন্ধ হননি! কোথায় ছিলেন? কিভাবে রেহাই পেলেন?

আবেগ থরথর কণ্ঠে শুনিয়েছিলাম আমার কাহিনী। শুনে ম্লান হেসে দৃষ্টিহীন চোখ মেলে ভদ্রলোক শুনিয়েছিলেন সেই একই কাহিনী। যে কাহিনী শুনেছি হাসপাতালে, শুনেছি রাস্তায় প্রত্যেকের কাছে।

লাল ফুলঝুরি আর সবুজ তারা দেখে অন্ধ হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর মানুষ। টেলিপ্রিন্টারে সেই খবরই আসতে শুরু হয়েছিল। পৃথিবীর কোথাও কেউ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

তারপরেই একে একে স্তব্ধ হয়ে গেল সারা পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা। নীরব হল রেডিও, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার। কলকব্জা চালাবে কে? সবাই তো অন্ধ!

চাঞ্চল্যকর সেই কাহিনীই নিছক কর্তব্যের তাড়নায় অভ্যাসবশে টাইপ-রাইটারে লিখে রাখছিলেন সাংবাদিক ভদ্রলোক। চক্ষু হারিয়েও তিনি কর্তব্য ভোলেননি। যদি কারও কাজে লাগে, তাই পৃথিবীর শেষ সংবাদ ধরে রাখছিলেন কাগজের পৃষ্ঠায়।

শেষ সংবাদই বটে। মানুষ জাতির শেষ!

সাংবাদিক ভদ্রলোকের টাইপ-করা সেই শেষ রিপোর্টের একটা কপি নিয়ে পথে বেরিয়ে আমি দেখেছিলাম সেই শেষ দৃশ্য।

দেখেছিলাম, অতর্কিতে কোত্থেকে কাতারে কাতারে কিম্ভূতকিমাকার কতকগুলো জীব ঢুকে পড়েছে শহরের মধ্যে।

দূর থেকে জীবই মনে হয়েছিল। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই শিহরিত অন্তরে দেখেছিলাম তাদেরই যাদের একজনের কৃপায় চোখ হারিয়েও চোখ ফিরে পেয়েছি আমি।

চলমান গাছ! চলমান গাছেরা হেলে-দুলে ছড়িয়ে পড়ছে শহরের পথেঘাটে। আর, সামনে যে কোনো অন্ধ মানুষ পড়ছে, চাবুকের মত শুঁড়ের অব্যর্থ আঘাতে শুইয়ে দিচ্ছে তাকে জমির ওপর। ভয়াবহ আর্ত চীৎকারে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে নিস্তব্ধ নগরের বুক—কিন্তু কেউ ছুটে আসছে না তাকে উদ্ধার করতে।

চলমান গাছেরা কিন্তু বাড়ীর ওপর তলায় উঠছে না। সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্ধ মানুষেরা ক্ষিদের তাড়নায় যেমনি পা দিচ্ছে বাইরে, অমনি সাঁই শব্দে বাতাস কেটে নেমে আসছে মৃত্যু-শুঁড়—অধিকাংশ হতভাগ্য আর ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠছে না।

দারুণ ভয়ে আমি একটা প্রাইভেট কারে গিয়ে উঠেছিলাম। প্রতিটা কাঁচ ভালভাবে এঁটে দিয়ে গাড়ী চালিয়েছিলাম যেদিকে দুচোখ যায়।

গাড়ীর শব্দে অপার্থিব ভঙ্গিমায় সামনে ছুটে আসছিল চলমান গাছেরা। বিষভরা শুঁড় হেনেছিল কাঁচ লক্ষ্য করে। কিন্তু আক্রমণ তাদের ব্যর্থ হয়েছে। পিচ-

ক্রিরর মত বিষের ধারা ছিটকে পড়েছে উইন্ড-স্ক্রীনে—ওয়াইপার চালু করে তা পরিষ্কার করেছি। আর, এ'কেবে'কে ভয়াবহ দানোর মত চলমান গাছেদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েছি ব্র্যাবোর্ন রোডের দিকে।

আর, তারপরেই দেখেছি রাস্তা বন্ধ। কি এক অলৌকিক উপায়ে সেখানকার চলমান গাছেরা আগেই খবর পেয়ে গেছে আমি আসছি সেই দিকে। তাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা রাস্তা অবরোধ করেছে। একটা কুকুরেরও ক্ষমতা নেই তাদের সেই ব্যূহ ভেদ করার।

গাড়ী ধাক্কা মেরে পথ করে নেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সংঘর্ষে কাঁচ ভেঙে গেলেই আমি আর নিরাপদ নই। সবেগে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সভয়ে লক্ষ্য করছিলাম পেছনকার রাস্তাও বন্ধ। চলমান গাছেরা হেলতে-দুলতে এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। সে পথও বন্ধ।

আমি তখন একটা তেরতলা বাড়ীর সামনে। চকিতে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায় এবং চক্ষের পলকে সেঁধিয়ে গিয়েছিলাম সেই বাড়ীর ওপর তলায়।

সেখান থেকেই লিখছি এই কাহিনী। কেন লিখছি তা জানি না। কেননা, এ কাহিনী পড়বার মত মানুষ কি আর আছে? আমার সামনেই রয়েছে সাংবাদিক ভদ্রলোকের টাইপ করা বিবৃতি। শেষ বিবৃতি। কিন্তু তবুও তা শেষ নয়। কেননা, তিনি শুধু লিপিবদ্ধ করেছেন একটা মাত্র সত্য। মানুষ অনৈসর্গিক আলো দেখে অন্ধ হয়ে গেছে। এর বেশি আর কিছু তিনি জানেন না। জানবার উপায়ও ছিল না। কেননা নিজেও তিনি অন্ধ।

কিন্তু আমি তা নই। আমি স্বচক্ষে দেখছি আমাদের শেষ পরিণতি। মানুষ জাতির শেষ পরিণতি। কেননা, সুপরিকল্পিতভাবে 'এরা' হানা দিয়েছে আমাদের এই গ্রহে।

হ্যাঁ, 'এরা' বলতে আমি চলমান গাছেদেরই বোঝাচ্ছি। 'এদের' আমরা নিছক গাছ বলে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। সেই সুযোগে পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে এরা। সাপের মত বিষভরা শুঁড় হেনে অন্ধকার করেছে যাকে পেয়েছে সামনে।

এই গেল ওদের আক্রমণের প্রথম পর্ব। মানুষ তখনও বোঝেনি কি ভয়ানক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে তাদের শিরে। দেশে-দেশে যখন যন্ত্রের রেষারেষি, ভিয়েতনাম আর সুয়েজে প্রচন্ড লড়াই, পিকিংয়ে হানাহানি, ঠিক তখনি মূর্খ মানবজাতিকে চমকিত করে 'ওরা' তারাবাজী দেখাতে বসলো কালো আকাশের বুকে।

উদ্দেশ্য ছিল একটিই। সে উদ্দেশ্য মানুষকে অন্ধ করে দেওয়া। কারণ, চোখই মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ। চোখ আছে বলেই আমরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায় এত অগ্রসর হয়েছি। চোখ ছাড়া আমরা বাঁচতে জানি না, শিখিনি। তাই, এই মূল্যবান প্রত্যঙ্গটিকেই বিনষ্ট করে পৃথিবী দখলের আয়োজন করেছে 'ওরা'—ভিন্‌গ্রহের অধিবাসীরা। মানুষের অলক্ষিতে তারা বীজের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। শ্যামলা ধরিত্রীর উর্বর বক্ষ শোষণ করে মাথা চাড়া দিয়েছে, বড় হয়েছে। তারপর, মানুষের অজ্ঞাত কোনো অলৌকিক উপায়ে জানিয়ে দিয়েছে তাদের জ্ঞাতিদের যে, সময় হয়েছে। সময় হয়েছে আক্রমণের চরম পর্যায় শুরু করার—নির্বোধ পৃথিবী-গ্রহীদের চোখের সামনে থেকে অকস্মাৎ আলোর দুনিয়া নিভিয়ে দেওয়ার।

আর, তাই আচম্বিতে তারা সবুজ তারকা আর লাল ফুলঝুরির এমন মারাত্মক রশ্মির বেড়াজাল রচনা করেছে সারা পৃথিবীর আকাশ ঘিরে যে, রাতের আকাশে আশ্চর্য সুন্দর সেই দৃশ্য যে দেখেছে, তারই চোখের স্নায়ু, শিরা-উপশিরা, অসাড়, অবশ হয়ে গেছে চিরকালের মত। ফলে রাতারাতি অসহায় হয়ে গেছে মানুষ। কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সভ্যতা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

আর, তার পরেই আরম্ভ হয়েছে ক্ষুধার্ত জনতার হল্লা। নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেছে তারা এক টুকরো কি এককণা খাবারের জন্যে। দলে দলে রাস্তায় নেমে এসেছে অন্ধ মানুষ। অধিকাংশই প্রাণ হারিয়েছে চলমান গাছরূপী ভিন্‌গ্রহী হানাদারদের কবলে। যারা ভাগ্যবলে বেঁচে গেছে, তারা হাতড়ে হাতড়ে লুঠপাট চালিয়েছে দোকানে দোকানে। খাবার খেয়েছে, ছড়িয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে—

তারপর একে একে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে চলমান গাছেদের আক্রমণে।

এক হপ্তা ধরে এই কান্ডই দেখেছি আমি তেরতলায় বসে। খাবার আর পানীয় জলের অভাব নেই আমার। ট্যাঙ্ক থেকে যদিও জল আসা বন্ধ হয়ে গেছে, ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই থেকে বিদ্যুৎও আসছে না। সন্ধ্যা হলেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বিরাজ করে কলকাতা শহরে। আর, সেই নিবিড় অমানিশার মধ্যে স্বচ্ছন্দে পাহারা দেয় আর শিকার অন্বেষণ করে চলমান গাছেরা। তাদের চোখ নেই, কিন্তু আশ্চর্য অনুভূতিবলে তারা সব শুনতে পায়, দেখতে পায়। তাই, তারা চক্ষুষ্মান মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত।

আলোহীন, খাদ্যহীন, জলহীন এই শহরে দীর্ঘদিন আমি বেঁচে থাকব। কেননা আমার চোখ আছে। সুযোগমত রাস্তায় গিয়ে দোকান ভেঙে খাবার-দাবার, জল, মোমবাতি সবই নিয়ে আসছি। রাত্রে মোমবাতি জ্বালিয়ে লিখছি এই কাহিনী। মনে হচ্ছে যেন মহাশ্মশানে বসে রয়েছি। বিংশ শতাব্দীর সুসজ্জিত কলকাতা নগরীর একি ভয়াবহ রূপ! কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, সমস্ত নিথর নিস্তব্ধ। গোটা পৃথিবী-গ্রহে বোধকরি আমি শুধু দীর্ঘদিন বেঁচে থাকব চক্ষু নিয়ে—দিন গুনব সেই ভয়াবহ দিনের, যেদিন মহাশূন্য থেকে নেমে আসবে বিচিত্র আকারের গ্রহমানব। পিল পিল করে পৃথিবীর জনশূন্য শহরগুলিতে নেমে পড়বে তারাই, যারা এই সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের বহু দূরে থেকেও জয় করেছে পৃথিবীকে কোনো কিছু ধ্বংস না করেই, যারা বহু পূর্বে চলমান গাছরূপী সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছে মানব-কুলের, পর পর তিনরাত তারাবাজী দেখিয়ে হাজার হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতাকে রাতারাতি মুছে দিয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে।

তারা এসে দেখবে এক অতি প্রাচীন, অতি উন্নত সভ্যতার সদামৃত শূন্যপ্রাণ কাঠামো, দেখবে কোটি কোটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল।

ধু ধু সেই শ্মশান-পৃথিবীর মধ্যে ধুকধুক করবে শুধু একটি হৃদয়। সে আমার হৃদয়!

খাওয়ায় প্রণয়

শিবরাম চক্রবর্তী

বহুদিন পরে আবার ভাই দুটিকে দেখা গেল। আবির্ভাবের মতই দেখতে পেলাম, গোলদীঘি কফি-হাউসের কোণ ঠেসে বসে।

আমিও ওদের কোল ঘেঁষে পাশের টেবিলে গিয়ে বসেছি। আমাকে দেখে হর্ষ-বর্ধন—ঠিক হর্ষধ্বনি নয়—অর্ধপরিচিতের মতই অভ্যর্থনা করল—এই যে!

বলেই আবার ভাইয়ের সঙ্গে মশগুল হয়ে গেল গল্পে।

অনেকদিন পরে দেখা। মনে হল, হয়তো আমায় চিনতে পারেনি ঠিক। কিম্বা হয়তো হাড়ে হাড়ে চিনেই—? নইলে শুধু এই যে—এই শুষ্ক সম্ভাষণ, এত কম ভাষণ নিতান্তই হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধ, কিন্তু ও নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের কফির পেয়ালায় মন দিলাম। আর কান দিলাম ওদের কথায়...।

'বুঝলি গোবরা, এ রকমের আরেকটা কফি-হাউস আছে চৌরঙ্গীর কাছে। কিন্তু সাবধান, সেখানে যেন ভুলেও কখনো যাসনে—।'

'কেন, যাব না কেন?' কান খাড়া করা ভাই মাথা চাড়া দিয়েছে :

'কি হয় গেলে?'

'গেছিস কি মরেছিস। এ কফি-হাউস তো ভালো। এখানে তো খালি বাঙালী। বাঙালীর ছেলেমেয়েরাই আসে কেবল। নিতান্ত নিরাপদ। কিন্তু সেখানে—বাবা, যা মারাত্মক!'

বলে ভারাত্মক মুখখানা ভাইয়ের চোখের ওপর তিনি রাখেন।

'মারাত্মক কি শুনি?'

'মেমরা আসে সেখানে।' হর্ষবর্ধন বিশদ হন—'মেমরা দেখা দেয়।'

'দিলেই বা। মেম তো আর বাঘ নয় যে গিলে ফেলবে!'

'বাঘের বেশী। না গিলেই হজম করে ফেলতে পারে। তবে আর বলছি কি।... সেদিন একটা মেমের পাল্লায় পড়েছিলাম। ধরেছিল আমায়।'

'কি করেছিলে তুমি?'

'কিছু না। সবেমাত্র সেখানে ঢুকে একটা খালি জায়গা পেয়ে বসেছি। অতবড় হলটা গিসগিস করছে মানুষে। বাঙালী পাঞ্জাবী, চিনেম্যান, সাহেব মেমে ভর্তি। হলের মাঝামাঝি একটা থাম ঘেঁষে শুধু দুটি মাত্র চেয়ার খালি। একটি ছোট্ট টেবিল নিয়ে—তারই একটিতে গিয়ে আমি বসেছি। একটু পরেই একটা মেম এসে অন্য চেয়ারটায় বসল।

'ও এই ধরা' সে তোমাকে ধরবার জন্যে নয় গো দাদা, বসবার আর জায়গা ছিল না বলেই—' বলতে যায় গোবর্ধন। নিজের দাদাকে সে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না।

'শোন না আগে। সবটা শোন তো।' হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'মেমটা বসেই মা আমাকে বলল—'গুড ইভনিং মিস্টার।' আমি তার জবাব দিলুম—'গুড নাইট মিসেস!'

'তুমি গুড নাইট বলতে গেলে কেন? গুড নাইট তো বলে লোকে বিদায় নেবার সময়।'

'তখন কি আর ইভনিং ছিল রে? সন্ধ্যে উৎরে গেছে কতক্ষণ! আটটা বাজে প্রায়। আমি শুধু মেমটার ভুল শুধরে দিয়েছি। কিন্তু বলতে কি, আমি অবাক হয়েছি বেশ। মেমরাও ইংরেজিতে ভুল করে তাহলে। আশ্চর্য!'

'তারপর? তারপর?'

'তারপর মেমটা কি যেন বলল ইংরেজিতে. তার একটা কথাও যদি আমি বুঝতে পেরেছি!'

'নিশ্চয় খুব ভুল ইংরিজি?'

'ক্যা জানে। তারপরে করল কি মেয়েটা। তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বের করল আর ছোট্ট একটা পেন-সিল। কি যেন লিখল কিছুক্ষণ ধরে, তার-পরে দেখাল সেটা আমায়।'

'তুমি পড়তে পারলে?'

'পারব না কেন, ইংরিজি তো নয়! পেয়ালা।'

'পেয়ালা? পেয়ালা আবার কোন্ পেশী ভাষা দাদা?'

'এই পেয়ালারে বোকা!' হর্ষবর্ধন কফির পাত্রটা তুলে ধরেন—'এই বাংলা কাপ-ডিস। এই না এঁকে মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যাকে বলে সপ্রশ্ন নেত্রে।'

'তুমি কি করলে?'

'আমি বুঝলাম মেমটা এক পেয়ালা কফি খেতে চাইছে। আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে বেয়ারাকে কফি আনতে বললাম—দু পাত্তর। আমাদের দুজনের জন্যে।'

'মেমটা দেখতে কেমন?'

'মেম—মেম। আবার কেমন? মেমরা যেমন হয়ে থাকে। তবে বয়েস বেশি নয়, এই পঁচিশ কি ছাব্বিশ! বাঙালীর মেয়ের মত অত সুন্দর না হলেও দেখতে ভালোই বলতে হবে।'

'তাই বলো!' গোবর্ধন সমঝদারের মতন ঘাড় নাড়ে : 'প্রেম করার মত মেম? তা বলতে হয়।'

'কি যে বলিস! তোর বৌদি যদি জানতে পায়—! তারপর শোন্। আমি ভাবলাম একটা মেয়েকে কি শুধু শুধু কফি খাওয়ানো ঠিক হবে? সেটা যেন কেমন দেখায়। তাই আমি ওর খাতাটা নিয়ে একটা পাতায় টোস্টের মতন কতক-গুলো আঁকলাম। এঁকে দেখালাম ওকে, দেখে সে বলল—ইয়েসিয়েস্। থ্যাঙ্কু।'

'ইয়েসিয়েস্ মানে?' গোবরা জানতে চায়।

'মানে, তুই যা করছিস এখন। হাঁ।' দাদা জানায়—'ইয়েস মানে জানিসনে বোকা? তারি ডবোল, বুঝেচিস এখন? আর থ্যাঙ্কু মানে—'

'জানি জানি। বলতে হবে না আর। তাহলে মেমটা তোমার কথায় হাঁ হাঁ করে উঠল বলো?'

'করবে না? তারপর মেমটা করল কি, এক জোড়া ডিম এঁকে দেখাল আমায়। বুঝলুম টোস্টের সঙ্গে ডিম-সেদ্ধ চাইছে। তাও তখন আনতে বললাম বেয়ারাকে।'

'বাঃ বেশ তো!' বলে গোবরা সুরুৎ করে জিভের ঝোল টানে।

'মেমের কথা শুনে যে তোর জিভ দিয়ে জল পড়ছে দেখছি।'

'মেম নয়। মেমলেটের কথা ভেবে দাদা। মেমটা মেমলেট খেতে চাইল না?'

'ওর ডিম পাড়বার পর তারপর আমি খাতাটা নিলাম। নিয়ে এক প্লেট কাজু-বাদাম আঁকলাম। আর ও আঁকলো—কতক-গুলো চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা কি যেন। মনে হল পাঁপড়ভাজা। কিন্তু বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে 'পাঁপড়ভাজা সেখানে মেলে না। আলুভাজা হতে পারে। সে আলু-ভাজা নিয়ে এলো। আর কাজু-বাদামও। আলুভাজা পেয়ে মেয়েটাকে খুশী হতে দেখে তখন বুঝলাম যে সে আলুভাজাই চেয়েছিল।'

'আলুভাজা আর পাঁপড়ভাজার কি এক চেহারা?' গোবরা নিখুঁত চিত্র-সমা-লোচকের ন্যায় খুঁৎখুঁৎ করে। 'দুটোর আকার কি একরকম?'

'তা কি হয় রে? কিন্তু ছবি দেখে কিছু বোঝবার যো নেই। এই যে মশাই, আপনাকেই বলছি—হর্ষবর্ধন সম্বোধন করেন আমায়—আঁকার বিষয়ে আপনি কিছু জানেন? বলুন তো, আঁকতে গেলে এমনটা হয় কেন? পাঁপড়ভাজার সঙ্গে আলুভাজা এমন মিলে যায় কেন?'

আঁকের বেলায় যেমন একেক সময় মিলে যায় না? তেমনি আর কি। আবার আঁকের মতই অনেক সময় মেলেও না ফের। ভালো আঁকিয়ে হলে তবেই মেলাতে পারে। এমন ইঁদুর আঁকবে যে মনে হবে যেন হাতী। আবার উটপাখীকে মনে হবে মুরগি—ঐখেনেই আঁকার বাহাদুরি।'
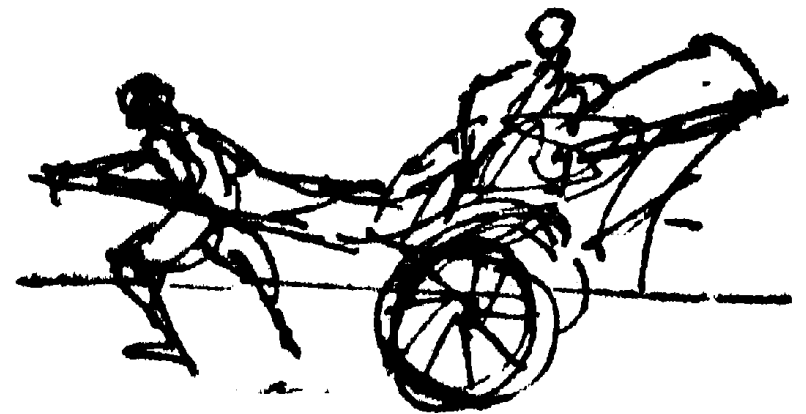
'কি করে তা হয়ে থাকে?' দুই ভাই একসঙ্গে শুধায়। দুজনের মুখে জবোল বয়েস দেখা দেয়।

'ব্লকের কেরামতি মশাই। আঁকা তো কিছুই না। আঁকিয়ে তো এক টুকরো কাগজে ছোট্ট করে একটুখানি আঁকে। যারা ব্লক করে তারাই হচ্ছে ওস্তাদ। তারাই মাথা খাটিয়ে দরকারমাফিক সেইটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে যে ছবিটি চাই তার মতন ব্লক বানিয়ে দেয়। ধরুন, আপনি লিচু এঁকেছেন। কিন্তু আপনার দরকার কাঁঠালের। ব্লকমেকার সেই লিচুকেই বড় করে বাড়িয়ে কাঁঠাল বানিয়ে তার ব্লকে আনতে পারে। একই আঁকুনি ছোট করলেই লিচু আর বড় করলেই কাঁঠাল।'

'ছোট করলেই লিচু আর বড় করলে কাঁঠাল? বারে!'—গোবরা অবাক হয়।

'তাহলে আমি যে কাজু-বাদাম এঁকেছিলাম, ব্লকওয়ালা ইচ্ছে করলে সেই ছবির থেকেই কুমড়োর ঝুড়ি বানাতে পারত?'

'পারতই তো।'

'যাগ্‌ গে', আমাদের শিল্প-তাত্ত্বিক আলোচনায় গোবর্ধন বাধা দেয়।—'তার-পর কি হল বলো না দাদা।'

'তারপর অনেক কিছুই খেলাম আমরা, একটিও কথা না বলে—শুধু কেবল ছবি চালিয়ে। প্রায় টাকা পনেরর মত খাওয়া হল। তারপর বেয়ারা বিল নিয়ে এলে আমি একটা একশ টাকার নোট দিয়েছি আর সে ভাঙিয়ে আনতে গেছে এমন সময় দেখলাম কি— মেয়েটা একমনে কি যেন আঁকছে তখনো!'

'তোমার চেহারা বুঝি?' গোবরার মুখে বেয়াড়া হাসি দেখা দেয়।

'এই চেহারা আঁকা কোন মেয়ের কম্মো না। ছোট্ট একটু খাতার পাতায়। তোর মত রোগা পাতলা হলেও হয়তো হত। আঁকা শেষ করে ছবিখানা সে আমার হাতে দিল। দিয়ে একটুখানি—যাকে বলে সলজ্জ হাসি হাসল।'

'ওর নিজের ছবি বুঝি?'

'না, দেখলাম একটা খাট এঁকেছে সে।'

'খাট? খাট কেন? খাট কি কোন খাবার জিনিস? শোবার তো জানি!' গোবরা অবাক হয়, 'ও বুঝেছি, তোমাকে আরো খাটাবার মতলব ছিল মেয়েটার।'

'আমি কি মশারি যে আমায় খাটাবে? অত সোজা নয়।' হর্ষবর্ধন আপত্তি করেন। 'কিন্তু কেন যে সে খাট আঁকলো তাই আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।'

'কি রকম খাট? দুগ্ধফেননিভ?' আমি শুধাই।

'বেশ বড় খাট। খাট যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু সেজন্যে না, আমার তাক্ লাগলো এই ভেবে যে, আমি যে খাটের জন্মদাতা, কাঠের ব্যবসা যে আমাদের, তা সেই মেয়েটা টের পেলে কি করে? এর রহস্য আমি ভাই এখনো অবধি বুঝতে পারিনি। থ হয়ে রয়েছি সেই থেকে—রহস্যের থই না পেয়ে, বুঝচেন মশাই!'

বিমলা ও কুসুমের গল্প

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দলটা হুড়মুড় করে স্টেশনে নেমে পড়ল এবং এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে স্টেশনের বাইরে লাফিয়ে পড়ল। স্টেশনের বড়বাবু হাসলেন। নিত্য এমন হচ্ছে। তিনি জানতেন এই দলটা চাল চোরাচালানের দল। ট্রেনে ট্রেনে এই দলগুলি ট্রেন থামলেই স্টেশনে নেমে যেন সকলে দেখে ফেলছে সুতরাং ছোটো ছোটো যতক্ষণ না প্লাট-ফরম পার হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ ছোটো এবং বিমলাও দেখাদেখি ছুটছিল। সে নতুন এই কাজে, সে হারুর বৌর পিছনে পিছনে ছুটছে। অভিনয়টা সে ধরতে পারে নি।

তখন বেলা দুপুর। তখন হাটে সবে দূর থেকে করলা এসেছে, ঝিঙে এসেছে, হাটে গরু মহিষ এসেছে—রাস্তায় বড় ভিড়। বড় বড় সব ট্রাক দাঁড় করান আছে রাস্তার উপর। শহরের জন্য সব্জি বোঝাই হচ্ছে—এবং বড় বড় সব ট্রাকে সব্জির নীচে মিহি চাল যাচ্ছে।

বিমলা দৌড়াচ্ছিল। হারুর বৌ ডাকল, অ বিমলা কৈ আর যাস। ইবারে ইট্টু থাম।

বিমলা বলল, পুলিশে ধরলে।

হারুর বৌ বলল, আ ল তর যে কথা। নিতাইর বাপ বাবুগ খুশী করতে গেছে।

—তবে স্টেশনে তোরা সকলে ছুটলি ক্যান?

—দ্যাখাতে হয় না ল, দ্যাখাতে হয়। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকেন। অগ করনের কিছু নাই যেন, অবলা জীবের মত ভান কইরা থাকে, যাত্রা দ্যাখছস্ বিমলা? কেস্ট যাত্রা।

বিমলা এবার দলটকে দেখল। সব একটা বড় ভাঙা বাড়ীর সামনে জড় হচ্ছে। বিমলা বলল, দেখছি।

—ঐ যাত্রার সং। আমরা সং করলাম। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকল—অবলা জীব সব ছুইট্টা যাইতেছে, আমরা কি করতে পারি। নিতাইর বাপের লগে সলাপরামর্শ কইরাই সবটা করছে।

বিমলা দেখল এই ভাঙা বাড়ীটার পাশে বড় একটা আমলকি গাছ। গাছে কোন ফল নেই। গাছটা সামান্য ছায়া দিচ্ছিল। বিমলা এই ছায়ার নীচে বসল। দলে ওকে নিয়ে আঠার জন। একমাত্র নিতাইর বাপ পুরুষ এবং সেই বাবুর ডান হাত। দলের মোড়া।

নিতাইর বাপ সকলকেই কেমন শাসনের গলায় বলল, এখানে বস। কেউ কোথাও যাবে না। একটু জিরিয়ে নাও সকলে। আজ হাটবার, তোমরা ইচ্ছা করলে কিছু কেনা-কাটা করে খেয়ে নিতে পার। আমরা রাত দশটায় ট্রেন ধরব। বড়বাবু বলেছে তখন চক্রবর্তীমশাইর দলের ডিউটি—ওরা লাল-গোলা থেকে আসবে।

নিতাইর বাপ আর কিছু বলল না। সে হাটবার বলেই হাটে ঘুরতে ফিরতে চলে গেল। বিমলা এখান থেকে স্টেশনের মাল-গুদাম দেখতে পাচ্ছে। বড় বড় খাঁচায় মুরগী। একশ হাজার মুরগী খাঁচার ভিতর। এইসব মুরগী শহরে চালান হচ্ছে। একটা মানুষ, পরনে লুঙ্গি মাথায় পাকা চুল—মানুষটা মুরগীর ঝুড়িগুলোর ভিতর খাবার ফেলে দিচ্ছে। মুরগীগুলো মাঝে মাঝে বড় বেশী চীৎকার করছিল বিমলা এখানে বসে শুনতে পাচ্ছে। ট্রেনে করে রাত জেগে আসতে হয়েছে বলে বিমলার এইসব দেখতে দখতে ঘুম পাচ্ছিল—এবং আমলকি গাছের ছায়া বড় ঠাণ্ডা—বিমলা সামান্য সময়ের জন্য চোখ বুজল।

গঞ্জের মত এই জায়গায় জেলার বড় হাট ঃ হাটের ভিতর মানুষের শব্দ গম গম করছিল। দুপুর বলে রোদের তাপ ভয়ংকর। এবং দীর্ঘদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না। শীত পড়ার আগে একবার এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে, তারপর থেকে বড় মাঠের ভিতর বৃষ্টির জন্য সব কৃষকদের হাহাকার ভেসে বেড়াচ্ছিল। সুতরাং অভাব অনটনের জন্য চাষা মানুষেরা শেষ সম্বল মুরগীর আণ্ডা পর্যন্ত বেচে দিচ্ছে। গরু বাছুর বলতে আর চাষার ঘরে কিছু নেই। অনটনের জন্য ওরা ওদের শীর্ণ গরু বাছুর নিয়ে হাটে এসেছে। গাই গরু বলদের হাট পার হলে মোষের এবং মেষের হাট—নিতায়ের বাপ হাটটা ঘুরে ফিরে দেখছিল—এবং বাজারে চালের দাম কত আর মহাজনরাই বা ওদের থেকে দাম কত নিচ্ছে—নিতায়ের বাপ হেঁটে হেঁটে সব যাচাই করে নিচ্ছিল।

বিমলা কিসের শব্দে চোখ খুলে তাকাল —দেখল একটা আমলকি ঠিক ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে। সে আমলকিটা তুলে তাড়াতাড়ি আঁচলে বেঁধে নিল। বাপ নিশীথের কথা মনে পড়ছে এবং ছাগলটার কথা মনে পড়ছিল বিমলার। ছাগলটা আজ কাল পরশু বাচ্চা দেবে। বাপ নিশীথ অলস প্রকৃতির মানুষ। সুতরাং ওর তাড়াতাড়ি চাল নিয়ে ট্রেনে ওঠে বাড়ী ফেরা দরকার। সে ডাকল, অ বৌ।

হারুর বৌ জিলিপি কিনে এনেছিল হাট থেকে। সে বাড়ীটার ভাঙা সিঁড়িতে বসে জিলিপি খাচ্ছিল। একটা জিলিপি উঠে এসে বিমলার হাতে দিল। এবং পাশে বসে বলল, ডাকলি ক্যান?

—আরে চাল কিনবি কখন?

—তর দ্যাখতে হইব না। নিতাইর বাপ সব ঠিক করব।

—আমার মনটা ভাল না বৌ।

—ক্যান সেই ভন্দর লোকের কথা মনে পড়ছে।

বিমলা থু থু ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সিংহের দুই চোখ যেন—খেলা দেখানো বাকি—চোখে নীল রংয়ের উজ্জ্বল এক আভা। তীক্ষ্ন রোদের তাপে চোখের মনি দুটো বড় বেশী হিংস্র দেখাচ্ছিল।

—অ বিমলা তুই এমন করতাছস ক্যান।

—আমার কি ইসছা হৈছিল বৌ জানস।

—কি কইরা জানমু।

—ইসছা হইছিল অর...বলে ফের থু থু ফেলল।

হারুর বৌ হাসল। এবং বলার ইচ্ছা যেন এই ভোতা দায়ের সম্বলই বা আমাদের কোথায়।

বিমলা দুঃখের সঙ্গে বলল, তোরা ধো একটা কথা কইলি না।

হারুর বৌ কুসুম বুঝতে পারল রাতের সেই বাবুর চুরি করে ইতরামো করার বাসনা বিমলাকে এখনও কষ্ট দিচ্ছে। অসম্মান ভেবে বিমলা সারা পথ আর কারো সঙ্গে কথা বলে নি। যেন ওর চোখ দেখলে মনে হয়—বিমলা হিংস্র এক প্রতিশোধের অপেক্ষায় আছে।

কুসুম বলল, গরীবের আর অসম্মান। কুসুম গম্ভীর গলায় কথাটা বলল। কুসুম গম্ভীর গলায় কথা বললে বাবুমানুষের মত কথা বলে। এবং এই কথার দ্বারা সে নিজের সম্মানের উপর নির্ভরশীল থাকতে চায়—অসম্মান সেও সহ্য করতে পারছে না —কিন্তু দুবেলা অনাহার আর [illegible] হচ্ছিল না। কুসুম গর্ভবতী কুসু[illegible] চাল চোরা-চালানের জন্য বের হয়ে পড়েছে।

কুসুম, গর্ভবতী কুসুম পা ছড়িয়ে বসল। ওর ছোট্ট ব্যাগ থেকে পান সুপারী বের করে একটু পান, চুণ এবং সাদাপাতা খুব আয়াস অথবা আরামের মত মুখে ফেলে দিতে থাকল। এইটুকু সুখ—চারিদিকে যখন

রোদ খাঁ খাঁ করছিল, চারিদিকে যখন অভাব অনটন—তখন কুসুমের এইটুকু সুখ। বিমলা জিলাপিটা আলগা করে মুখে ফেলে দিয়েছিল। সে কুসুমের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এক টুকরা সুপারী দ্যা বৌ। তারপর ওরা পরস্পর মুখ দেখে এক সময় চুপ করে গেল।

বিকেলের দিকে সেই মহাজন মানুষটি এসে সকলকে বড় আদর করে গদিতে নিয়ে গেল। নিতাইর বাপ দলটার মোল্লা। সুতরাং নিতাইর বাপ আগে আগে হাঁটছিল। মাছ এবং আনাজের হাট পার হলে সরু এক গলি। আশেপাশে গেরস্থ মানুষের সংসার। ব্যবসা আছে বলে বোঝা যায় না। বিমলা কুসুম এক এক করে চাল নিয়ে ফের সেই আমলকি গাছটার নীচে এসে বসল।

বিমলার তিনটি থলে। কাঁধের থলেটা বড়। এবং ডানহাতের থলেটা মাঝারি আর বাঁ হাতে ধরার জন্য ছোট্ট এক থলে। চাল প্রায় ত্রিশ সের হবে তিন থলে মিলে। কুসুম এত চাল বইতে পারবে না। সে কিছু কম নিয়েছে। শরীর ওর আর দিচ্ছে না। পাগুলো হাতগুলো ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে আসছে। বিমলা থলের ভিতর হাত রাখল—চালের উত্তাপ আছে—সে চালের ভিতর থেকে দুটো একটা আবর্জনা বের করে নেড়ে চেড়ে দেখল যেন এই চাল কত ভালবাসার জিনিস, এই অন্ন বড় দামী এবং সোনার মতো ভালবাসা এই অন্নের জন্য সে ভেতরে-ভেতরে পুষে রেখেছে। অন্যান্য সকলে চাল আগলে বসে আছে। এখন আর এই চাল ফেলে কেউ কোথাও যাবে না! সকলে ভাল করে বেঁধে নিচ্ছিল—যেন ওরা সকলে জেনে ফেলেছে ওদের ট্রেনে চড়ে যাবার সময় নানা প্রকারের হুজ্জুতি হবে—যেন ওদের সেই নির্দিষ্ট স্টেশনে পেঁছে দিলে গলায় সোনার হার-পরা এক বাবু পান চিবুতে-চিবুতে এসে সকলের থলে গুণে. চাল ওজন করে. কেজি-প্রতি একশ চাল মেপে দিয়ে তিনি চলে যাবেন। নিতাইয়ের বাপ পিছনে চাল চোরা-চালানের হকদার হয়ে লাঠি ঘুরাবে। সে বাবুর বরকন্দাজের মতো এই চালের পিছনে কত নাচবে-কুঁদবে।

সুতরাং নিতাইর বাপ দলটার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে কটা থলে গুণল। ওর মুখে বড় একটা আব. চোয়ালবসানো, দাড়ি-কামানো নয় বলে মুখ অমসৃণ—সে এ-দলের মোল্লা. তার কত দায়িত্ব—সে প্রায় সারাক্ষণ স্টেশন এবং এই আমলকী গাছ, পুরনো জীর্ণবাড়ীর সিঁড়িতে ছোটাছুটি করছে। লালগোলা থেকে যদি চক্রবর্তীবাবু না আসে তবে মুশকিল—যার-যার দল নিয়ে যার-যার খেলা। অপরের হাতে পড়ে গেলেই—পুলিশ. থানা এবং কিছু অবিবেচক মানুষের মত মাঠে-ঘাটে সংগ্রাম—সুতরাং নিতাইর বাপ সকলকে প্রথমে বলল. হ্যা গ মা-মাসীরা—বাড়তি পয়সা কত রাখলে।

বিমলা বলল, আমার হাতে কিছু নাই নিতাইর বাপ।

—নাইত বাবুদের পুজা দিমু কি দিয়া।

—আমারে আগে কইতে হয়। সব টাকায় চাল কিনা ফেলছি।

—ভাল করছ। নিতাইর বাপের ত একটা কপিলা গাই আছে।

—তোমার কপিলা গাই আছে আমি কইছি! বিমলা রুখে উঠল।

নিতাইর বাপ মদন বিমলার দিকে এবার ভয়ে তাকাতে পারল না। ট্রেনের সেই বিমলা পথ-ঘাট চিনে যেন সেয়ানা হয়ে গেছে। বিমলাকে বাবুযাত্রীর সঙ্গে বচসা করার সময় মদন বড় বেশী সতর্ক করে দিয়েছিল বিমলাকে। এখন সতর্ক করতে গিয়ে ফের অনর্থ কারণ বিমলার বড়-বড় চোখ—যেন সিংহের খেলা দেখানো বাকি এবারে সে ট্রেনের ভিতর অথবা অন্য কোন মাঠে সিংহের খেলা দেখাবে। বিমলা দড়ি দিয়ে থলের মুখ শক্ত করে বাঁধছিল। ওর শক্ত শরীর এবং পিঠের নীচু অংশটা দেখা যাচ্ছে। সাদা থানের ভেতরে ছিট কাপড়ের সেমিজ। বিমলার সাদা থানের ভিতর ঘাড় গলা মসৃণ রেখেছে এখনও। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল বলে আমলকির ছায়া হেলে পড়েছে। কিছু-কিছু মানুষ হাট-ফেরত গাঁয়ে ফিরছে। চাষা বৌ মুরগী বগলে ফিরছে। ঝুড়িতে আন্ডা নিয়ে ফিরছে পাইকার। বিমলা গলা তুলে এসব দেখল। তারপর উঠে গিয়ে বলল হারুর বৌকে - আমারে একটা টাকা দ্য বৌ। নিতাইর বাপের (গোলামের) কথা শুনলে গা জইলা যায়।

কুসুম কাপড়ের খুঁট থেকে টাকা খুলে দিল বিমলাকে।

তখন অন্য এক বৌ দলে বচসা করছিল। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে। আর তখন হাটের মাঠে বড়-বড় হ্যাজাক জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। বিমলার ক্ষুধায় পেট জ্বলছিল। সুতরাং মুখে গন্ধ। দুর্গন্ধের মত। সুতরাং মুখে বার-বার থুথু উঠছে। দশটার ট্রেনে উঠলে পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে। মদন আর একবার এসে সকলকে বলছিল, তোমরা মা-মাসীরা কিছু খেয়ে নাও। চিড়া-মুড়ি যা হোক কিছু। ট্রেন আসতে লেট হবে।

বিমলা কিছু ছোলার ছাতু এনেছিল সঙ্গে। সে বাটিতে জল এনে ছাতুটা ভিজিয়ে খেল। বাটিটার গায়ে নিশীথের নাম। ছাতু খাবার সময় নিশীথের মুখ মনে পড়ছিল এবং ছাগলের মুখ পাশাপাশি। বাচ্চা ছাগলটা ঘরে এনে রেখেছে কিনা, বাপ নিশীথ বড় বুড়ো মানুষ, ছাগলটা বাচ্চা হবার সময় চিৎকার করবে—বিমলা একটা ছোট্ট ছাতুর দলা কুসুমকে দেবার সময় বাপের মুখ মনে করতে পারল। অখিলের মুখ মনে আসছে। তখন সংসারে সুখের দাবী ছিল। অখিল সংসারে সুখের ছবি আঁকার জন্য দিন-রাত বর্ডারে পড়ে থাকত—অখিল বড় বেশী হাবা-গোবা অথবা বলা চলে সরল প্রকৃতির মানুষ, অখিলের কি কাজ ছিল, অখিল কি করে উপার্জন করত বিমলার জানা ছিল না। যে কোন সময়ে সে চলে আসত—বিমলাকে ভিন্ন-ভিন্ন উপহার দিত এবং ক'রাত বেজায় ফূর্তিতে কাটানর পর মানুষটা ফের রোজগারের ধান্ধায় সেই বর্ডারে চলে যেত। নিশীথকে বিমলা নিজের কাছে রেখেছিল তখন। নিশীথ এবং বিমলার দিনগুলো তখন মন্দ কাটছিল না।

মদন ছুটে-ছুটে আসছিল। সাতটা বাজে এখন। সে এসে বলল, এই তোমরা মা-মাসীরা সকলে চলে এস। চক্রবর্তী-বাবু সাতটার গাড়ীতে চলে আসছেন। বড়বাবু তাড়াতাড়ি করতে বলছে তোমাদের।

স্টেশনের বড়বাবু রেলিঙের ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখল দলটা নিয়ে মদন রেললাইনের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। কুসুম সকলের পিছনে পড়ে যাচ্ছিল। ওরা কাপড় দিয়ে কাঁথের থলেটাকে ঢেকে রেখেছে। ওরা সকলে ভয়ঙ্কর লম্বা কাপড় এবং সেমিজ পরে সকল চাল প্রায় পোশাকের ভিতর আড়াল দেবার চেষ্টা করছিল। কুসুম ছুটতে পারছিল না। সকলে প্ল্যাটফরমে উঠে গেছে। কুসুমের জন্য বিমলাও পিছনে পড়ে থাকল। এবং বিমলার শক্ত শরীর, সে ইচ্ছা করলে কুসুমকে বুকে নিয়ে স্টেশনে উঠে যেতে পারে। বিমলা নিজের বাঁ হাতের ছোট্ট থলেটা কুসুমকে দিয়ে ওর বড় থলেটা ডান কাঁধে নিয়ে ছুটতে থাকল। — তুই আয় বৌ। আস্তে-আস্তে আয়। আমি উইঠা যাই।

কুসুম একটু হাল্কা হওয়ায় প্রায় বিমলার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটতে পারছিল। হাতে-পায়ে শক্তি কমে যাচ্ছে। ওর ছুটতে গিয়ে হাত-পা কাঁপছিল। তবু কোনরকমে সে টেনে-টেনে পা দুটোকে প্ল্যাটফরমের উপরে নিয়ে তুলল। ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এই ছোটাছুটির জন্য বড় হাফ ধরছিল বুকে এবং পেটের ভিতর খিল ধরত মাঝে-মাঝে। কুসুম আর প্রায় নড়তে পারছিল না। সে বিমলার আশায়, বিমলা তাকে তুলে নেবে এই আশায় এবং ট্রেন এলে পুলিশের মহব্বতের গান গেয়ে হুইসল বাজালে—বিমলা কুসুমকে তুলে নেবে—বিমলা যথার্থই কুসুমের বোচকা-বুচকি সব তুলে দিল ভিতরে।

আর ভিতরে মানুষে-জনে ঠাসাঠাসি। ওরা একা নয়, এ-প্রায় হাজারের মত হবে। পিল-পিল করে হাটের ভেতর থেকে সব উঠে আসছে। কোন এক যাদুমন্ত্রের মত যেন—সকলে বুঝে গেছে এই ট্রেন ওদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে—কেবল এক চক্রবর্তী, রাজামানুষ, তাদের নিয়ে যাবে—হাজার লোকের কাছে তিনি দেবতার মত। বড়বাবু ছোটাছুটি করছিলেন। ট্রেনের যাত্রীরা দেখল পিল-পিল করে সব ছোট-বড় মানুষ বোচকা-বোচকি নিয়ে বাঙ্কের নীচে ঢুকে যাচ্ছে। কামরার ভেতরটা অন্ধকার। আলো জ্বালা হচ্ছে না। ভেতরটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার লাগছিল বিমলার। সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে আন্দাজে কুসুমকে ঠেলে দিল বাঙ্কের নীচে। ওর বোচকা-বুচকি কুসুমের মাথার কাছে ঠেলে দিল, তারপর বিমলা নিজে মেঝের উপর পা মুড়ে শুয়ে পড়ল। বুকের কাছে সব বোচকা-বুচকি—সন্তানের মত লেপ্টে থাকল বিমলা। যাত্রীরা হৈ-চৈ করছিল। ওদের পায়ের তলায় জলজ্যান্ত এক যুবতী মেয়ে এবং আরো সব কত বুভুক্ষ-মানুষের দল ঠাসাঠাসি করে শুয়ে-বসে আছে। দরজা পর্যন্ত দলটা এমনভাবে শুয়ে-বসে ছিল, অন্ধকারের ভিতর মানুষের এত ঠাসাঠাসি যে, যাত্রীরা দরজা পর্যন্ত এসে ভয়ে ভিতরে ঢুকতে সাহস করল না। ভিড়ের ভিতর দেখল অন্ধকারে শুধু মানুষের পিঁজরাপোল। ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে ভিতরে এবং হা-অন্নের জন্য অখাদ্য-কুখাদ্য খাচ্ছে—সুতরাং ভেতরটা মানুষের নরক যেন এবং ওরা সব অন্নের মত পরম-বস্তু অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—বিমলা দুর্গন্ধের ভিতর পড়ে থেকে নিজের চাল এবং কুসুমের চাল আগলাচ্ছিল। এ-পাশ-ও-পাশ হওয়া যাচ্ছে না, সব মেলা যাচ্ছে না, হাত মেলা যাচ্ছে না—সর্বত্র এই অপ-হরণের দৃশ্য, পা, পিঠ অথবা পাছা লাগছে। বিমলা তবু ঠেলেঠুলে কুসুমের পা মেলার জন্য একটু জায়গা করে দেবার সময় মনে হল বাঙ্কের উপর কিছু যাত্রী শুয়ে-বসে আছে। নীচে বিমলার সিংহের মত চোখ শুধু খেলা দেখানো বাকি—বিমলার চোখ জ্বলজ্বল করছিল—সে তার পাছা সাপের মত ঘুরিয়ে দিল সহসা। মনে হল বাবুটি, সেই বাবুটি বিমলার পাছার কাছে বসে এই অপহরণের দৃশ্য দেখে রসিকতা করতে চাইছে। সেই বাবুটি যে আসার পথে হারামজাদী বলে গাল দি...ছল। বাবুটি ফেরার পথে এখানে কেন, বাবুটিকে আসার পথে কোন এক স্টেশনে নেমে যেতে দেখে-ছিল যেন, ফের সেই বাবু মানুষটি ঠিক বাঙ্কের উপর পদ্মাসন করে নির্মিলিত চোখে বসে আছেন। বিমলা বুঝল কপালে আজ বড় দুঃখ আছে। বিমলার উপায় থাকল না একটু সরে বসতে, শুয়ে পড়তে, অথবা সরে অন্য কোথাও স্থান করে নিতে। একবার এই আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হলে রক্ষা নেই—তাকে একা পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং বিমলা কুসুমের পিঠে হাত রাখল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনের চাকায় এখন কারা যেন দুঃখের গান গাইছে। এই গান শুনতে-শুনতে বোধ হয় কুসুম ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। এক পুকুর জল, বড়-বড় সরপুঁটি জলের ভিতর খেলা করছে শাপলা-শালুকের জমি—বর্ষার দিনে ইলিশ মাছ, ভাজা গন্ধ এবং তালের মালপোয়া অথবা বর্ষার জন্য মানুষের এক পরিণত ভালবাসা; কুসুম ওর দেশের ছবি ট্রেনের চাকায় দেখতে পাচ্ছিল বোধ হয়। সেই ভাল-

...াসার ছবি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বিমলা অনেক চেষ্টা করেও কুসুমকে জানাতে পারল না। কুসুম ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।

বিমলা মরার মত পড়ে থাকল। কুসুমকে এবং চালের বোচকা-বুচকি নিয়ে বিমলা, বিধবা বিমলা—যার স্বামীর নাম অখিল ছিল—অখিল, সরল হাবাগোবা, অখিল বর্ডারে কি সব পাচার করত, অখিল হাবা-গোবা মানুষ সোনার বাট অখিলের পেটে-পিঠে বাঁধা থাকত—হায় সেই অখিল মরে গেল। ওকে, দলের লোকেরা ধরা পড়ার ভয়ে মেরে ফেলল। সেই সরল অখিলের জন্য ভেতরে-ভেতর বড় কষ্ট হচ্ছিল বিমলার। শুয়ে থাকলে এবং একা থাকলে ওর বিচিত্র সব ছবির কথা মনে আসে।

ট্রেন চলছিল, পাশাপাশি কেউ কোন শব্দ করছে না। মাঝে মাঝে স্টেশনে ট্রেন থামছিল। কিছু হকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর ক্রমশঃ ট্রেন এবং স্টেশন কেমন নিঝুম হয়ে আসতে থাকল। শুধু মাঝে মাঝে দলের মোল্লাদের হাঁক শোনা যাচ্ছিল—মা-মাসীরা বড় সাবধানে যাবেন—কোন হল্লা করবেন না, যাত্রীদের কোন অসুবিধা ঘটাবেন না। যাত্রীদের পায়ের নীচে পড়ে থাকবেন। ওদের সুখসুবিধা দেখবেন। এবং এই বাবুর জন্য বিমলার ভয়, সুখসুবিধা বাবুর অন্যায় রকমের। এত অন্ধকার যখন, এবং মানুষে মানুষে এই ঠেসাঠেসি যখন, কোথায় কার হাত পড়ছে, পা পড়ছে অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না যখন—তখন বাবুর পোয়াবারো, এইসব ভেবে ক্রমশঃ গুটিয়ে আসছিল। এবং ছাগলটার কথা মনে পড়ছে, ছাগলটার হয়ত চারটা বাচ্চা হবে। বাপ নিশীথ ছাগলটা বেচে দেবার মতলবে ছিল। বাপের লালসা বড় বেশী। কেননা সারাদিন খাব খাব করছে। এই বয়েস—বয়েস আর বাড়ছে না যেন নিশীথের—মেয়ের ফেরার জন্য সে নিশ্চয়ই এখন দাওয়ায় বসে তামাক টানছে।

কারণ রাত হল, রাত বাড়ছে, মেয়েটা ফিরছে না—নিশীথ হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এসে দেখল স্টেশনে পুলিশ; আরমড পুলিশ সব। এ লাইনে কিছুদিন থেকে চাল চোরাচালান বড় বেশী হচ্ছে। কেউ পুলিশকে ভয় পাচ্ছে না। ওরা ট্রেনে চাল এনে শহরে গঞ্জে বেশী দরে বিক্রি করছে। দুপুরে স্টেশন পার হলে পুলিশের সামনেই চেন টেনে সব বুভুক্ষু নরনারী চাল মাথায় করে ছোটে। ভাগে বনিবনা না হলে এমন হয়। জনতা পুলিশ সংগ্রাম। এখানে পুলিশের মাথা ভেঙে দিয়েছিল মানুষেরা। পুলিশের মহলে এবার কিন্তু খুব কড়া-কড়ি। নিশীথ শুনল আজ খবর আছে—পারের ...তে প্রচুর চাল আসছে, চোরাই চাল। পুলিশেরা রোড, ট্রেন আটকে এইসব চাল উদ্ধার করবে ওরা। নিশীথ প্রমাদ গুনল।

কামরার ভিতর বিমলাও প্রমাদ গুনল। বাবু বড় বেশী ছটফট করছেন। বড় বেশী হাই তুলছেন। এবং হাত পা এদিক ওদিক ছোড়ার বড্ড বেশী বদভ্যাস। সবই অন্য-মনস্কতার জন্য হচ্ছে এমন ভাব। ট্রেন চলছিল। ভিতরে প্রচণ্ড গরম। জানালা খোলা বলে সামান্য হাওয়া ভিতরে ঢুকতে পারছে। আর আর এই সামান্য হাওয়া বাবু মানুষটা কিংবা সামান্য যাত্রী যারা বাংকে শুয়ে বসে হাত পা ছড়িয়ে নিশিথে নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে অথবা যারা নিজের রসদ আগলাবার জন্য ঘুমুতে পারছে না—এই সামান্য হাওয়া তারাই শুষে নিচ্ছিল। ঘামে বিমলার সেমিজ এবং কাপড় ভিজে যাচ্ছে। হাত পা একটু খুলে ও-পাশ হতে পারলে শরীর সামান্য আসান পেত—কিন্তু বিমলার কোন উপায় নেই—শুধু অন্ধকার সামনে, পিছনে মাঠ দ্রুত ফেলে ট্রেন ছুটছে। রাত এখন গভীর হয়ে আসছে এবং মাঝে মাঝে সেই দ্রুত মাঠের ভিতর ট্রেনটা ভয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল যেন। আর ঠিক তখনই মনে হল ঘাড়ে কে যেন মৃদু সুড়সুড়ি দিচ্ছে বিমলার।

প্রথমে মনে হল একটি নেংটি ইঁদুর ঘাড়ের নীচ দিয়ে সেমিজের ভেতরে ঢুকে গেল। বিমলা চুপ করে অন্ধকারে ঘাড়ে হাত রেখে বুঝল, নেংটি ইঁদুরটা ভীষণ চালাক। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা রাখে। সে ঘাড় গলাতে নেংটি ইঁদুরটাকে খুঁজে পেল না। সে শুধু বলল, মরণ!

বিমলার ঠিক উপরে বাবু মানুষটা কাছে বসে আছে। একজন লম্বা মতন ক্ষীণকায় মানুষ, মনে হচ্ছে পিলের রুগী, বাঙ্কে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাশের বাঙ্কে বৃদ্ধ মতন মানুষ। এবং প্রায় বোবার সামিল। ছোট কামরা বলে যাত্রীরা আর উঠছে না। শুধু নীচে অন্ধকারে ঠাসাঠাসি করে বুভুক্ষু মানুষের নিঃশ্বাস পড়ছে। ওরা সকলে নিতাইর বাপ মদনের মত এক মানুষের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুতরাং অন্ধকারের ভিতর ইজ্জতের ব্যাপার বলে কোন বস্তু ছিল না। বিমলা গত রাতের মত চীৎকার করতে পারত, ফোঁস করতে

পারত অথবা চোখে সিংহের খেলা দেখানো বাকি—সে সিংহের মত গর্জন করে উঠতে পারত। সে কিছুই না করে দম বন্ধ করে শুয়ে থাকল। ট্রেন মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। স্টেশনে এলে একটু আলো জ্বলবে—ওর ইচ্ছা তখন খুঁজে পেতে সেই নেংটি ইঁদুরকে বের করা অথবা মানুষ বা বাবু-মানুষ,—মানুষটা রহস্যজনকভাবে ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। গত রাতে এই বাবু মানুষটাই ওকে হারামজাদী বলে গাল দিয়েছিল—আর যাত্রী সেজে খুব সাফ সুতরো যুবকের মতো চলাফেরা করেছে। বিমলা এবার সাহসের সঙ্গে অন্ধকারেই পরিহাস করল।

—কে! কি বললে? বাবুমানুষটির গলার স্বরে অভিনয় ফুটে উঠল।

—বাবু, আমি বিমলা। আমি নীচে শুয়ে আছি বাবু।

—তুমি কোন বিমলা বাছা? কাল রাতে যেতে দেখেছি ট্রেনে করে?

—হ্যাঁ বাবু, কাল রাতে যেতে দেখেছেন। আজ রাতে ফিরছি।

—সঙ্গে আর কে আছে।

—হারুর বৌ আছে, নিতাইর বাপ আছে।

—মাঠ পার হতে পারবা?

—ভয় কি বাবু।

হারুর বৌ জেগে গিয়েছিল ওদের কথায়। —আমরা কোনখানে বিমলা।

—সামনে পুরুলিয়া স্টেশন। তুই ঘুমো।

—হ্যাল তুই কার লগে কথা কস?

—বাবুর লগে।

—বাবুর চোখে ঘুম আসে না।

—বলছে, আপনার চোখে ঘুম আসে না? আপনি রাতে ঘুমোবেন না।

বাবু মানুষ বললেন, অদৃষ্ট। ঘুম আসে না রাতে। অদৃষ্ট।

বিমলা বলল, ট্রেনে ট্রেনে কি করেন বাবু।

বাবুটি এবার হাই তুলে বলল, তোমার দলে কতজন? আঠারজন বুঝি।

—বাবু সব গুনে গেঁথে রেখেছেন দেখছি।

বাবুটি এবার বিজ্ঞের মত অন্ধকারেই হাসল।

কুসুম কুঁকড়ে ছিল নীচে। ধুলোবালি কাপড়ে সেমিজে কাদার মত লেগে আছে—ঘামে নীচটা জবজব করছিল। বাবুর বিজ্ঞের মত হাসি উপরে এবং বাংকের নীচে কুসুম—ওর পিরীতের কথা মনে পড়ছিল। কুঁকড়ে থাকার জন্য এবং বিমলা লেপটে থাকার জন্য কুসুম নড়তে পারছিল না। সে কোন রকমে হাতটা ডানদিকে এনে বিমলাকে একটা চিমটি কাটল।

—বৌ ভাল হইব না।

—হ্যা গ বাবুর লগে পিরীতের কথা ক্যান।

বিমলা পায়ের নীচ পর্যন্ত বাঁ হাতে কাপড় টেনে ফিস-ফিস করে বলল, মানুষটারে ভাল মনে হইতেছে না। পুলিশের লোক। চুপ কইরা থাক।

কুসুম যথার্থই ভয় পেয়ে গেল। স্টেশনে পুলিশ অথবা হোমগার্ডের লোক আছে। সেখানে নিতাইর বাপ আছে, বড়বাবু আছেন স্টেশনের, চক্রবর্তীবাবু আছেন। কিন্তু যে মানুষটা গা ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে—তাকে বড় ভয় কুসুমের। সে এবার বলল, বাবুরে কৈয়া দ্যাখ না, বিড়ি খায় কিনা।

বিমলা বলল, তুই কৈয়া দ্যাখ।

কুসুম ব্যাংকের নীচ থেকে বলল, নিতাইর বাপরে ডাকুম নাকি?

বিমলা বলল, ডাকলে অনর্থ বাড়বে বৌ। ওরা এত ফিস-ফিস করে কথা বলছিল যে বাবুমানুষটি কানখাড়া করেও বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারছেন না। তিনি তবু বিচক্ষণ পুরুষের মত বসে থাকলেন। তিনি কাসলেন, হাত-পা নাড়লেন এবং মুখ জানালায় বের করে স্টেশনে পৌঁছতে কত দেরী দেখলেন। তাঁকে দেখে এ সময় মনে হচ্ছিল তিনি কোথাও কোন খবর পৌঁছে দিতে চান।

বাবু স্টেশনে নেমে একটা কার্ড দেখাল স্টেশনের বড়বাবুকে, আপনাদের ফোনটা দেবেন? বলে সে তার কার্ড বের করে ধরল।

—হ্যালো। কে? স্যর আছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। হিসাব করে দেখলাম প্রায় চারশতের মত লোক যাচ্ছে চাল নিয়ে।

—তাহলে বড় দল একটা আনতে হয়! আমার সঙ্গে মাত্র দশজন আছে।

—ওতে হবে না স্যর। মাঠের ভেতর দিয়ে সব তবে নেমে যাবে পিঁপড়ের মত।

—তাহলে বড় একটা এনকাউন্টার হবে বলতে চাও।

—মনে ত হচ্ছে। বলে মানুষটা ফের গা ঢাকা দিয়ে এসে বিমলার বাংকে বসে পড়ল। আসার আগে বড়বাবুকে বলে এল—খুব গোপন রাখতে হবে স্যর। তা না হলে আপনার আমার দুজনের মুশকিল।

আর মদন এবং সব মোল্লারা হেঁকে হেঁকে যাচ্ছিল তখন—মা-মাসীরা বড় দুর্যোগ। মা-মাসীরা আমরা স্টেশন পর্যন্ত যাব না। তার আগে ভাঙা পোলের কাছে—সেই বড় পুরানো বাড়ীটার কাছে চেন টেনে নেমে পড়ব। আপনারা মা-মাসীরা ভয় পাবেন না। আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য চাল নিয়ে যাচ্ছি। মা-মাসীরা কোন চুরি করছি না। জানালায় জানালায় মুখ বাড়িয়ে দলের মোল্লা হেঁকে গেল—আমরা যা করছি সন্তান-সন্ততিগণের প্রতিপালনের জন্য করছি। আমরা চুরি করছি না, চুরি করা এটাকে বলে না।

কুসুম বলল, নিতাইর বাপ কি কইল বিমলা?

—কইল, আমরা আগে নাইমা যামু। চেন টাইনা গাড়ী থামাইয়া দিব।

কুসুমকে চিন্তিত দেখাল। অন্যান্যদিন ওরা স্টেশনে নেমে কাঁচা পথ ধরে ছোটার অভিনয় করে। অভিনয় রসের। স্টেশনের মাস্টারবাবুরা তখন হাসেন। না ছুটলে বড় গালমন্দ করেন। একেবারে চোখের উপর চুরি। চুরিতে আরাম হারাম। তোরা ছুটলে অন্ততঃ আমরা থেমে থাকতে পারি। অথচ আজ গাড়ী তার আগেই থেমে যাবে। চক্রবর্তীবাবুর হাতে আর কোন কৌশল নেই কুসুম ভাবল, আর কোন কৌশল নেই যার সাহায্যে তিনি ট্রেনটাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারেন। সেই ভাঙা পোলের পাশে থাকলে...অনেকদূর তাকে এই বোচকাবুচকি টেনে নিয়ে যেতে হবে। না গেলে অনাহার। শিশুসন্তানেরা বাড়ীর হাঁসের বাচ্চার মত কেবল প্যাঁক প্যাঁক করছে। জননী ফিরলে হাঁসের বাচ্চাগুলো শান্ত হবে। কুসুমের এতটা পথ হাঁটার কথা ভেবে চোখে জল আসতে চাইল। কারণ পেটের ভিতর নতুন বাচ্চাটাও প্যাঁক প্যাঁক করে কুসুমকে মাঝে মাঝে জ্বালাতন করছে। সুতরাং সে পেটের উপর হাত রেখে বার বার বাচ্চাটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। অনাহার কুসুমের দিনমান—সুতরাং ভিতরের বাচ্চা কেবল খাই খাই করছে। কুসুম রাগে দুঃখে স্বামীকে মনে মনে গাল পাড়তে থাকল।—মানুষটা মরে না ক্যান। মরলে হাড় জুড়ায়।

বিমলা বলল, কার কথা কস।

—আর কার কথা। বলে কুসুম চুপ করে গেল। কুসুম বুঝতে পারে না মনের ভেতর কথা রাখার অভ্যাস তার কবে শেষ হয়ে গেছে।

বিমলা দেখল বাবু সামনের স্টেশনেও নেমে গেল।

—হেলো স্যর আছেন। সে ফোন তুলে অনুসন্ধানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি।

—ওরা চেন টানবে বলছে।

—চেন টানবে।

—হ্যাঁ চেন টানবে। ওরা ভাঙা পুলের কাছে চেন টানবে বলছে।

—ওখানে শালগাছের বড় বন আছে না?

সঙ্গে সঙ্গে জানালার মোল্লাদের সকলের মুখ দেখা গেল। আপনারা চেন টানার সঙ্গে সঙ্গে মা-মাসীরা বের হয়ে পড়বেন। আপনারা আর শুয়ে বসে থাকবেন না। আমাদের সামনেই নামতে হবে। বোচকাবুচকি সব কাঁধে হাতে নিয়ে রেডি থাকেন।

বাবুটি বিমলার ঘাড়ে শেষবারের মত নেংটি ইঁদুরগুলোকে অন্ধকারে ছেড়ে দিতে চাইল। বিমলা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বার বার সেই ইঁদুরটাকে বিমলা ঘাড় গলা থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষবা

[...]দ কিছুতেই পারছে না। বাবুর হাতটা [...]শ শক্ত হয়ে বিমলার শরীরের উপর থাবা [...]তে আছে। বিমলার চোখে সিংহের খেলা [...]খানো বাকি—সে শক্ত হাতে এবার ছুড়ে [...]লে দিতেই বাবুটি বলল, কোথায় নামবে [...]ছারা! ভাঙা পোলের কাছে নামবে?

কুসুম জানত না অন্ধকারে বাবু-[...]নুষটি বিমলার মত যুবতীর সঙ্গে রঙ্গ [...]মাসা করছে। বিমলা, অসহিষ্ণু বিমলা, [...]ল্লাদের ভয়ে এই যাত্রী মানুষটাকে কিছু [...]তে পারছে না, সে রাগে দুঃখে এবং [...]সম্মানের ভয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল। [...]ন্তু বুভুক্ষু মানুষের ভিতর নেমে যাবার [...]ড়া। তারা উঠে অন্ধকারেই নিজের [...]জের বোচকা ঠিক করে নিচ্ছে। এবং [...]ন্ধকারে ট্রেনটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেলে [...]বুমানুষটি বললেন, কোথায় নামবে [...]ছারা। পুলিশের বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছ [...]। বন্দুকের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে [...]সছে না।

কুসুম হাউমাউ করে কেঁদে দিল, [...]মাদের কি হবে বাবু।

বাবুটি বিজ্ঞের মত হাসলেন—যেখানে [...]ছ সেখানে থাকো। এক পা নড়বে না।

বিমলা বলল, ওদের যেতে দেন বাবু। [...]াপনি পুলিশের লোক আমাদের মা-বাপ।

বাবুটি বললেন, কেউ নামবে না [...]ছারা। বাবুটি এবার সাধারণ পোশাক [...]লে বেগের ভিতর থেকে হুইসল [...]জালেন।

তখন নিতাইর বাপ চীৎকার করে [...]নালায় জানালায় ছুটে যাচ্ছিল।

—তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না। মাঠের [...]তর নেমে যাও। অন্ধকারে যেখানে [...]চোখ যায় চলে যাও। পুলিশে ট্রেনটাকে [...]রে ফেলেছে।

বিমলা বলল, বৌ তুই নেমে যা। [...]পনারা যারা আছেন নেমে যান। বাবুটি [...]ল, না, কেউ নামবে না।

—তোমরা নেমে যাও মা-মাসীরা—[...]লে সে বাবুটির কাঁধে মাথা রাখল [...]ন্ধকারে।

পুলিশের দলটা জানালা দিয়ে দরজা [...]য়ে ঢুকে পড়ছে। অন্য দরজা দিয়ে কুসুম [...]মে গেল। অন্ধকারের ভিতর বিমলা টের [...]তে পারছে। বিমলা এবার নিজের [...]চকাবুচকি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর [...]মে যেতে চাইলে পেছন থেকে বাবুটি [...]র ফেলল।

বিমলা চাল ফেলে অন্ধকারে ছুটতে [...]লে বাবুটি দরজা বন্ধ করে দিলেন। [...]ন্তু অন্য দরজায় পুলিশ—বাবুটি ভাল [...]ষের মত দরজা খুলে বললেন, দেখ [...]নে কিছু চাল আছে। তুলে রাখ।

বিমলা বোচকাবুচকি ফেলে ছুটছে। [...]দিকে কুসুম চলে গেছে সেদিকে ছুটছে। [...]টি বিমলাকে অনুসরণ করছেন।

সামনে মস্ত শালের জঙ্গল। চাঁদের [...]লোতে এই বন এবং সামনের প্রান্তর বড় [...]সাময় লাগছিল। মানুষের সোরগোল। [...]কাটি এবং চীৎকার শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ট্রেনটা একটা বড় জন্তুর মত একা পড়ে চীৎকরা করছিল যেন। বিমলা ছুটে ছুটে কুসুমের কাছে চলে গেছে। সে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়ছিল—বিমলা দেখল এদিকটা ফাঁকা। সামনের মাঠে কিছু মানুষের সোরগোল পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে পুলিশের দলটা কিছু লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাবার জন্য সেখানেও একধরনের হায় হায় রব। পুরানো ভাঙা বাড়ী দেখা যাচ্ছে দূরে। সে যাবার পথে এক বৃদ্ধকে এই পোড়ো বাড়ীতে লুকিয়ে পড়তে দেখেছিল। বোধ হয় সেই মানুষ এখনও সেখানে আছেন। দেয়ালের ফাঁকে তার ভাঙা হ্যারিকেন জ্বলছিল—সেই আলো দেখে বিমলা কুসুমকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কুসুম চলতে চলতে বলল, পেটে কামড় দিচ্ছে।

বিমলা ওর সব চাল বোঁচকা কাঁধে হাতে নিয়ে বলল, ইবারে হাঁট বৌ।

তখন পিছন থেকে বাবুটি বললেন, কোথায় যাবে বাছা।

কুসুম হাউমাউ করে বাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

এদিকটা ফাঁকা এবং নিঃসঙ্গ। সামান্য দূরে শালের জঙ্গল। এবং প্রান্তরের ভিতর শুধু ইঞ্জিনের আলোটাকে দেখা যাচ্ছে। এই পোড়ো বাড়ীর দিকে কেউ ছুটে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু সেই বাবুটি দাঁড়িয়ে আছেন। খুব বলিষ্ঠ মনে হচ্ছিল, দেখতে সেই উঁচু লম্বা মানুষ দারোগাবাবুর পায়ে কুসুম পড়ে পড়ে কাঁদছিল।

বাবুটি ঠান্ডা গলায় বললেন, চাল নিয়ে কোথাও যেতে দেব না বাছা। আমরা পুলিশের লোক। আমরা আইন অমান্য করলে সরকারের চলবে কি করে?

বিমলা বলল, যেতে দিন বাবু! আমিও আপনার পায়ে পড়ছি।

বাবুটি হাসলেন, আইন অমান্য করলে কারো রেহাই নেই। তুমি ত বিমলা। যাবার পথে তুমি আমাকে কি বলে গালমন্দ করেছিলে ভুলে গেছ।

হায় সিংহের খেলা দেখানোর চোখ বিমলার ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। বলল, বাবু আমরা অবলা জীব, আমাদের কথা ধরতে নেই।

—অবলা জীবের মতন ত দেখতে মনে হচ্ছে না।

বিমলা কুসুমকে এবার ঠেলা দিল, এই তুই করছিস কি বৌ, হাঁটতে পারছিস না। নে—বলে চালের বোচকা কুসুমের কাঁধে দিয়ে বাবুটিকে বলল—কত বড় মাঠ দ্যাখছেন বাবু।

—দেখছি।

—আমার সঙ্গে আসেন। দেখবেন কত লোক সেখানে চাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। একটা বোচকার জন্য একশটা বোচকা চলে যাচ্ছে।

বাবুটি বললেন, কি করে জানলে?

—আপনাদের হুজুরে পুলিশের লোক ত সব রাস্তা চেনে না।

—তা ঠিক বলেছ।

বিমলা কুসুমকে বলল, এই বৌ তুই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারিস না!

—হ্যাঁ তাড়াতাড়ি হাঁট বাছা।

—কি করে হাঁটবে বলুন। আট মাসের পোয়াতি। বিমলা হাঁটতে থাকল।

—তা বটে। তুমি কোথায় চললে বিমলা।

—মাঠে চলেছি বাবু। বিমলা পথ দেখিয়ে চলল।

—আর কতদূর নিয়ে যাবে।

বিমলা বুঝল এখনও কুসুম ভাঙা পুল পার হতে পারে নি। আরও কিছু সময় বাবুটিকে ধরে রাখতে হবে। নতুবা কুসুমের চাল যাবে—কুসুম ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। ওর বাচ্চাগুলো প্যাঁক প্যাঁক করবে।

বাবুটি যেন ওর চাতুরী ধরে ফেলল, এবং বলল চালাকী করার জায়গা পাস না। দুম করে পাছার উপর লাথি মেরে দিল।

বিমলা রাগ করল না। সে ভাবল আহা ছাগলটা আমার চারটা বাচ্চা দেবে। সে বাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবং বলল, হুজুর একবার দ্যাখেন আমাকে।

বাবুটি এবার পিছন ফিরে বিমলাকে দেখল। এত বড় প্রান্তর, ঠান্ডা বাতাস নেই প্রান্তরে। দূরে শালবনের ভেতর থেকে পোড়ো বাড়ীর আলোটা শুধু এক চোখ বাঁদরের মত মনে হচ্ছে। কোথাও এতটুকু প্রাণের উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড় বড় ফাটল—দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয় নি—ধরণী ফেটে চিরে একাকার। জোৎস্না রাতের জন্য ভয়। এই মাঠে বাবুটি বিমলার নগ্ন দেহ দেখে এতটুকু নড়তে পারল না। বিমলা এই শস্যবিহীন মাঠে পাথরের মত শুয়ে থেকে শুধু বলছে, হুজুর কি দেখছেন।

সেই হবার মুখে বিমলা জীবনের সব অত্যাচারের গ্লানি দূর করার জন্য শক্ত দাঁত দিয়ে বাবুটির কণ্ঠনালী কামড়ে ধরল। এবং এ সময় দেখা গেল দূরে এক চোখ বাঁদরের মত আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। আলোটি নিভে গেল। শালের বন এবং শস্যবিহীন এই প্রান্তরে সিংহের খেলা দেখানো বাকি এমন এক চোখের বেদনা টপটপ করে অসতী হবার জন্য চোখের জল ফেলছিল। আর মনে হল দূরে সেই নিঃসঙ্গ প্রান্তর থেকে কারা যেন খালি ট্রেনটিকে ঠেলে ঠেলে স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রেন ঠেলে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য বিমলাও দলের মধ্যে ভিড়ে গেল। ওর দাঁতে মুখে রক্তের স্বাদ লেগে ছিল। ট্রেন ঠেলে নেবার সময় সেই নোনা রক্তের স্বাদ চেটে চেটে চুষে নিচ্ছিল বিমলা।

মতি নন্দী

ভোররাতে সুমিত্রার গর্ভপাত ঘটল।

পান-বসন্তে ছদিন ধরে ভুগছে। জবর উঠল একশো তিন। নিখিল শুয়েছিল মেঝেয়। সুমিত্রার চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখল বিছানায় বসে চাপা আতঙ্কে ও তখন চেঁচাচ্ছে, 'বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল।'

আলো জেবলে নিখিল দেখে সুমিত্রার দুই উরুর মাঝে কাপড়টা ফুলে রয়েছে। একটু নড়তেই দলমল করে উঠল সেই স্ফীতি। সুমিত্রা সাত মাসের পোয়াতি। ফ্যালফ্যাল করে নিখিলের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ সরিয়ে নিল নিখিল। বসন্তের ক্ষতে মুখটা খোদলান। পাশের ঘরে মা ঘুমোচ্ছে, তাকে ডেকে তুলল।

বাড়িওলার বউ উপর থেকে নেমে এসে পরামর্শ দিল ডাক্তার ডাকতে। পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে আনল নিখিল। তিনি সুমিত্রার নাড়ী কেটে পনেরোটি টাকা নিয়ে চলে গেলেন। আর সতেরোটি মাত্র টাকা সংসার খরচের জন্য রইল। নিখিল হিসেব করে দেখল আটদিন বাকি অফিসে মাইনে হতে। তবে টিউশ্যনীর টাকাটা আগাম চাইলে পাওয়া যাবে। এছাড়া ওষুধ কেনার একটা খরচও আছে। কুড়ি টাকা পর্যন্ত ধার অবশ্য অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে, ভেবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। ডাক্তার বলে গেছে ভয়ের কিছু নেই অর্থাৎ আর টাকা খরচ হবে না। বিছানার চাদর-তোষক রক্তে জবজব করছে। সুমিত্রার শায়ার রঙ বদলে গেছে, শাড়ির কিছু অংশে রক্ত। এসব ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওকে কাপড় বদলিয়ে মা সেই চাদর, শায়া ও শাড়ি ঘরের এক কোণে জড়ো করে রেখেছেন, সেই সঙ্গে সুমিত্রার পেট থেকে যে জিনিসটা বেরিয়েছে সেটাও।

বাড়িতে ধাঙড় আসতেই বাড়িওলার বৌ তাকে এই জিনিসগুলো ফেলে দিতে বলল। দেখেই সে মাথা নাড়ল। এ-কাজ তার দ্বারা হবে না, পুলিশ ধরলে ফাটকে পুরে দেবে। দশ টাকা বখশিস কবুল করেও তাকে রাজি করানো গেলো না। এখন বাড়িওলার বৌ বাড়িওলার সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বলল, 'ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনো। সেটা দেখালে পুলিশ কিছু বলবে না। উনি বললেন, এ তো আর আইবুড়ো বা রাঁড়ির পেট-খসানো মাল নয়। ভদ্দরঘরের বৌয়ের অ্যাকসিডেণ্ট, তুমি বাপু ডাক্তারের কাছেই যাও।'

তাই শুনে নিখিল ডাক্তারদের কাছে ছুটল, তখন ডাক্তার বাড়ি ছিল না। কখন আসবে তারও ঠিক নেই। বাড়ি ফিরে এসে সাত মাসের সন্তানটিকে বিছানার চাদর, শাড়ি ও শায়ার উপর রেখে নিখিল পরিপাটি করে ভাঁজ করল। শাড়ির পাড় ছিঁড়ে নিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধল যাতে জিনিসটার আকৃতি ছোট হয়। তার উপর খবরের কাগজ মুড়ল। তাতে হুবহু মনে হতে লাগল একটা কাপড়ের প্যাকেট। কিছুদিন আগেই হ্যান্ডলুম হাউস থেকে পর্দার কাপড় ও ব্লাউজের ছিট কেনা হয়েছে। দোকানের নাম-লেখা ছাপা কাগজের যে থলিতে জিনিসগুলো ভরে দেয়, সেটা রেখে দেওয়া আছে। তাইতে নিখিল প্যাকেটটা ভরে খাটের নিচে রেখে দিল। সুমিত্রা শুয়ে শুয়ে দেখছিল, কাতরস্বরে সে বলল, 'শাড়িটা তো কাচিয়ে নিয়ে পরা যায়। একটুখানি জায়গায় তো মোটে লেগেছে।'

নিখিল একথা গ্রাহ্য করল না। সুমিত্রার দিকে তাকালোও না। ওর মুখে বসন্তের ঘা-গুলো পেকে টসটস করছে। সাড়ে বারোটা নাগাদ আবার সে ডাক্তারের বাড়ি গেল। ডাক্তার খেতে বসেছে। সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দিল ছেলের হাত দিয়ে। ছেলেটি হেসে বলল, 'বাবা লিখেই রেখেছিল।'

বলার ধরণে মনে হল বলতে চায়, কি রকম বুদ্ধি দেখেছেন, বলার আগেই করে রেখেছে। কিন্তু পনেরো টাকা ফী দিয়েছি এই কথা নিখিল ভোলেনি। কৃতজ্ঞতা না জানিয়েই চলে এল। খুব ভোরে ঘুম-ভাঙা অভ্যাস নেই, তাই চোখ জবালা করছে। ভাত খেয়েই সে শুয়ে পড়ল মেঝেয় সুমিত্রার খাটের পাশে। মা পুরুত-মশায়ের বাড়ি গেছে সত্যনারায়ণের ব্যবস্থা করতে। ক্যাজুয়েল লীভের হিসেব কষতে কষতে নিখিল ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে চা খেয়ে, নিখিল থলিটা হাতে ঝুলিয়ে বেরোল। বারবার পকেটে হাত দিয়ে দেখল ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা আছে কিনা।

গলি থেকে বড় রাস্তায় পা দিয়েই নিখিল ভাবল এবার কি করার? চারদিকেই ঝকঝকে আলো, লোক, গাড়ি। থলিটা এখানেই কোথাও ফেলে রেখে গেলে কেমন হয়! এই ভেবে পায়ের কাছে সেটি রাখল। অমনি কোথা থেকে একটা লোক এসে বললো, 'পুজোর বাজার সেরে ফেললেন?' লোকটার লণ্ড্রী আছে পাড়াতেই। থলিটা হাতে তুলে নিয়ে নিখিল মাথা নেড়ে হাঁটা শুরু করল।

সুদৃশ্য থলিটা রাস্তায় ফেলে রেখে গেলে অনেকেরই চোখে পড়বে। তার মধ্য পাড়ার লোকও থাকতে পারে। তারপর কেউ হয়তো খুলবে। বস্তুটি দেখেই হাউ-মাউ করে পুলিশে খবর দেবে। সেই চেনা লোকটি তখন আগ বাড়িয়ে বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ জানি লোকটাকে, আমাদের পাড়াতেই ছাব্বিশের দুইয়ে থাকে, নাম নিখিল চাটুজ্যে, ব্যাঙ্কে কাজ করে। এখন পুলিশটা হাতে কাগজের থলিটা ঝুলিয়ে এবং তার পিছনে এক পাল লোক মজা দেখা এবং কেচ্ছা রটাবার জন্য বাড়িতে এসে হাজির হবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে নিখিলের দম বন্ধ হবার উপক্রম। সামনেই চিলড্রেন্স পার্ক, তারই একটা বেঞ্চে, কোলে থলিটা রেখে সে বসল। কিছুক্ষণ ধরে সে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল চেনা মানুষ কেউ আছে কিনা। কাউকে সে চিনল না তবে তাকে চেনে এমন অনেকেই হয়তো থাকতে পারে। চিনেবাদামওয়ালা ডেকে এক আনার কিনল। বাদাম খেতে খেতে ভাঁজতে শুরু করল, কিভাবে থলিটার হাত থেকে বিনা ঝামেলায় রেহাই পাওয়া যায়।

একটু পরেই সন্ধ্যা হবে। আধ মাইল-টাক দূরে নির্জন গলি বা মাঠ দেখে থলিটা টুক করে নামিয়ে রেখে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে। এই ভেবে নিখিল ভারী সুখ বোধ করল। চিনেবাদামওয়ালাকে ডেকে এক আনার কিনল এবং ঝগড়া করে দুটো বেশি বাদামও আদায় করল।

একা চুপচাপ বসে থাকা [illegible] না। বিশেষত তার সামনের দৃশ্য—বাচ্চাদের ছুটোছুটি, কিশোরীদের পায়চারিতে নকল গাম্ভীর্য, অফিস-ফেরৎ বাসের জানলায় সারিবাঁধা বিবর্ণ মুখশ্রী, বারান্দায় কনুই-রাখা নতদেহে নিঃসঙ্গ যুবতী, রিকসা-চালকের ঘামে-ভেজা ঘাড়—যদি খুবই পুরোনো হয়। নিখিল ভাবল লণ্ড্রী-ওয়ালাটাকে। এমন কোনোবার যায় নি যে প্যাণ্টের একটা না একটা বোতাম ভেঙেছে। শেষবার ঝগড়া করতে হয়েছে শার্টে
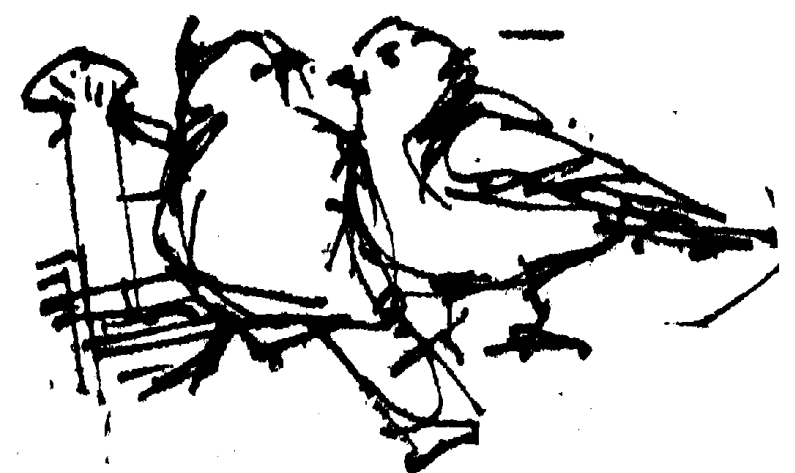
নম্বরী মার্কা দেওয়ার ব্যাপারে। লোকের চোখে পড়ে কালিটা। এই সময়ে হঠাৎ নিখিলের মনে পড়ল, খুব ছেলেবয়সে একটা ডিটেকটিভ বইয়ে সে পড়েছিল, ধোপাবাড়ির কাচা কাপড়ের নম্বরী মার্কা ধরে তদন্ত করতে করতে গোয়েন্দা শেষ-কালে খুনীকে ধরে ফেলে। এই থলের মধ্যে সুমিত্রার কাপড় এবং বিছানার চাদরে নিশ্চয়ই লন্ড্রীওয়ালাটা নম্বর দিয়েছে। সুতরাং যেখানেই ফেলা যাক না কেন, পুলিশ ঠিক বার করে ফেলবেই।

এইবার ঘামতে শুরু করল নিখিল। যদি বছরখানেকেরও বাচ্চা হতো, তাহলে সকলের চোখের সামনে দিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতা সাজিয়ে পোড়ান যেত। কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে! হৈ-চৈ করে ভিড় জমাবে। তারপর কত কথা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। শেষে পুলিশ দেবে। কি ফেললুম সেটা প্রমাণ করা সোজা কথা নয়। সার্টি-ফিকেটটা দেখালেও বিশ্বাস করবে কেন? ঠিক ওই জিনিসটাই ফেলেছি কি অন্য কাউকে খুন করে কুচি কুচি করে প্যাকেটে বেঁধে ফেলিনি তার প্রমাণ কি!

নিখিলের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। আর হতে পারে এই থলিটার রঙ-চঙ দেখে যদি কেউ এটাকে চুরি করে। চোর নিশ্চয়ই পুলিশকে খবর দেবে না। নিখিল এধার-ওধার তাকিয়ে চোর খুঁজতে শুরু করল। এবং আশ্চর্য হল একটা লোককেও তার চোর-চোর মনে হচ্ছে না। অথচ প্রতিদিনই যত লোক দেখে, তার মধ্যে
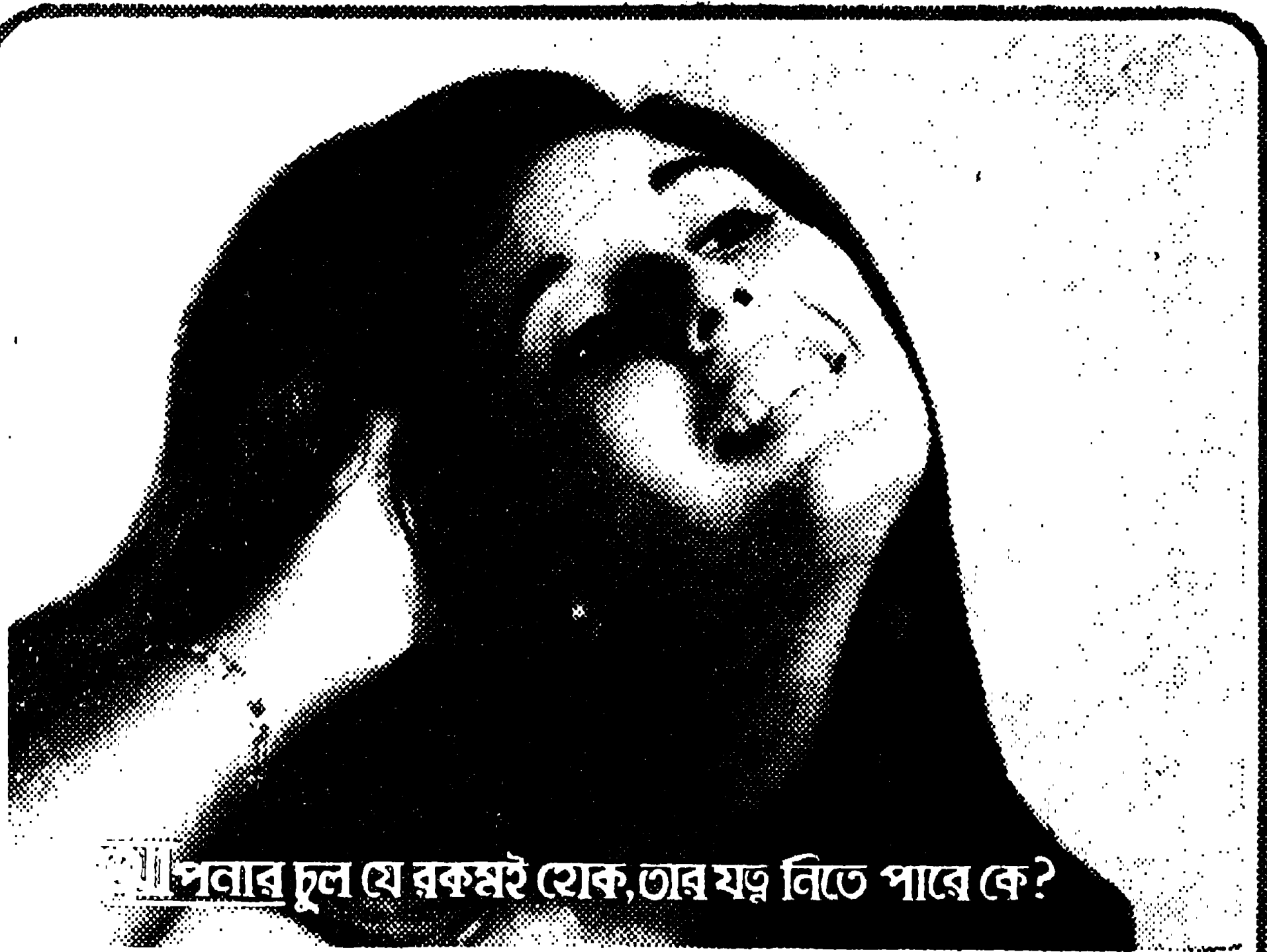
প্রায় ডজনখানেককে তার চোর বলে মনে হয়। এমনকি ঘর থেকে ঘড়িটা চুরি যাওয়ায় ঝিকে সবাই সন্দেহ করলেও তার প্রথমেই মনে পড়েছিল বাড়িওয়ালার মুখ। কিন্তু একটাও চোর সে দেখতে পাচ্ছে না।

চোর নিশ্চয়ই কলকাতায় আছে, হয়তো এখন এই জায়গাটায় একজনও নেই। নিখিল খালি হাতে উঠে পড়ল। থলিটা হাতে ঘুরে বেড়ালে নিশ্চয়ই কোন না কোনো ছিনতাই-ওলাকে আকর্ষণ করবে। তবে অন্ধকার রাস্তায় ছাড়া তাদের পাওয়া যাবে না। নিখিল আবার বসে পড়ল সন্ধ্যাটা পুরো-পুরি নামার অপেক্ষায়।

যখন জাঁকিয়ে সন্ধ্যা নামল নিখিল হাঁটতে শুরু করল। উদ্দেশ্যহীনভাবে। বহু ডাস্টবিন সে পেল যেখানে থলিটা ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু একটা ভয় ওর মনে গেঁথে আছে, বলা যায় না কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে—হয়তো অন্ধকার গলিতে কোনো যুবক পাড়ার মেয়েকে চুমু খেতে-খেতে কিংবা কোনো বুড়ি অন্ধকার বারান্দায় জপ করত করতে বা রান্নাঘর থেকে কোনো গৃহিণী। একবার চেঁচিয়ে উঠলেই হল। তাও যদি না হয়, কাপড়ের নম্বরী মার্কা যাবে কোথায়। পুলিশের গোয়েন্দা তদন্ত করে ঠিক বার করে ফেলবে। তখন সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলা যাবে, মশাই অবৈধ কোনো ব্যাপার নয়। বাড়িওয়ালাকে চোরের মত দেখতে হলেও বলেছে ঠিকই অ্যাকসিডেন্ট। স্বেচ্ছাকৃত ঘটনা নয়। যে-কোনো পরিবারেই এমন ঘটতে পারে। কিন্তু এসব বলার আগেই, পুলিশ দেখে পাড়ায় ফিসফাস শুরু হবে। গুজব রটবে। মাসকয়েক আগেই তো একটা সার্জেণ্ট এসেছিল পাড়ায়, অমনি শোনা গেল, দেবব্রতবাবু বাড়িতে জুয়া খেলত তাই ধরে নিয়ে গেল। শেষে জানা যায়, ভদ্রলোকের একটা রিক্স আছে, সেটা অ্যাকসিডেন্ট করায় থানার ডাক পড়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে নিখিল ক্লান্ত হয়ে পড়ল। থলিটা ছিনিয়ে নিতে কেউ তার সামনে ছোরা বার করল না। অথচ বস্তি দেখলেই সে ঢুকেছে। কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়নি। প্রায় নির্জন গলি দিয়েও হাঁটল, একটা কি শ্রেণীর মেয়েমানুষ শুধু তেরছা চোখে দেখল মাত্র। এছাড়া কিছুই না হওয়ায় নিখিল ভাবতে বাধ্য হল, তাহলে?

এইবার সে ভয় পেতে শুরু করল। তাহলে এই সাত মাসের মৃত সন্তানটিকে নিয়ে সে এখন করবে কি? পনেরো-ষোল ঘণ্টা হয়ে গেল। এবার পচ ধরবে, গন্ধ বেরোবে। অন্তত সুমিত্রার পেটে পুরো সময়টা কাটিয়েও যদি বেরোত! দোষটা অবশ্য কারুরই নয়। অথচ এইরকম একটা নির্দোষ ব্যাপার তাকে বিপাকে ফেলল। নিখিলের খুব রাগও হল। সেই সঙ্গে এটাও টের পেতে লাগল, আসলে সে ভয়ানক ভীতু। রীতিমত কাপুরুষ। এরকম ঘটনা নিশ্চয় এই প্রথম কলকাতায় ঘটছে না। সেসব ক্ষেত্রে কিছু একটা অবশ্যই করা হয়েছে। কিন্তু নিখিল ভাবল, তারা তো আমার মত নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতিগত হুবহু মিল থাকতেই পারে না। তারা নিশ্চয়ই সাহসী ছিল অন্তত আমার থেকে।

হঠাৎ নিখিলের মনে হল, তার থেকেও ভীতু এমন কারুর ঘাড়ে যদি দায়িত্বটা চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে রেহাই মিলবে। ভীতুরা পুলিশে যাবে না। থলিটা নিয়ে এইভাবেই ঘুরে বেড়াবে আর ভাববে কি করে রেহাই পাওয়া যায়। অবশ্য গোপনে তার ঘাড়ে চাপাতে হবে, না হলে জিনিসটা কার জানতে পারলে, বাড়ি বয়ে ফেরৎ দিয়ে আসবে।

চেনাশুনো ভীতু কে আছে, নিখিল তাই ভাববার জন্য একটা ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে পড়ল। বহুজনের নাম তার মনে এল। তারা কি পরিমাণ ভীতু তার নানান উদাহরণ মনে করতে লাগল। অবশেষে শশাঙ্ককেই তার পছন্দ হল। প্রায় চার বছর সুমিত্রার গৃহ-শিক্ষক ছিল। সুমিত্রাদের তরফ থেকেই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু শশাঙ্ক নানান অজুহাত দেখিয়ে বিয়েতে রাজি হয়নি। নিখিলের সঙ্গে সুমিত্রার আলাপ ওই করিয়ে দেয়। অবশ্য মাস-ছয়েক হল ও বিয়ে করেছে। এখন যদি শশাঙ্কের সামনে হাজির হওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয় ওর মনের মধ্যে সুমিত্রা, প্রেম, বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য অর্থাৎ যাবতীয় ধাষ্টামো এবং অন্য আর একজনকে বিবাহ, সব মিলিয়ে অপরাধবোধ তৈরী করবে। প্রাক্তন প্রেমিক-দের তুল্য ভীতু আর কে? এই থলিটা ওর হাতে কোনোরকমে গছাতে পারলে, তারপর ওর ঝামেলা। বস্তুত সুমিত্রার প্রতি ওর বিশ্বাসঘাতকতার এটা শাস্তিও হবে।

নিখিল এতসব ভেবে প্রফুল্ল বোধ করল। তবে পুরোপুরি অবস্তি ঘুচল না। শশাঙ্ক থাকে একটা গলির মধ্যে এক-তলায়। কড়া নাড়তে ঝি দরজা খুলল।

শশাঙ্ক বেরিয়ে এল পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। নিখিলকে চিনতে পেরে উচ্চকণ্ঠে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে বসাল।

'সন্ধ্যা, দেখ দেখ কে এসেছে।' এই বলে শশাঙ্ক ডাকতেই ভিতর থেকে ওর বৌ এল। দেখতে মোটামুটি। রেডিওয় গান গায়, দু-একখানা রেকর্ডও আছে। নিখিল দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করল।

'আপনার কথা ওর কাছে শুনেছি।' এতে নিখিল বিস্মিতই হল। সুমিত্রার স্বামীর প্রসঙ্গ বৌয়ের কাছে ভীতু শশাঙ্ক কি তুলবে? নাকি এটা আলাপ করার একটা কেতা!

'আমার সব বন্ধুর গল্পই করেছি। পরিচয় করিয়ে গুণপনার ব্যাখ্যার দরকার আর হবে না।'

শশাঙ্ক নতুন কেনা একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে পা নাচাতে লাগল। ঘরের সব আসবাবপত্রই যে ওদের বিয়ের পর কেনা তা রঙের ঔজ্জ্বল্যতেই বোঝা যায়।

'ওনার গুণপনার খবর অবশ্য না বললেও আমরা জানি।' নিখিল ইচ্ছে করেই 'আমরা' বলল। সন্ধ্যাও যথারীতি বিনয় জানাতে 'ভারী তো গুণপনা। আমার মত গাইয়ে গন্ডা গন্ডা আছে' ইত্যাদি কথা পরম সুখে বলে গেল। এরই মধ্যে নিখিল শশাঙ্কর হাবভাব জরীপ করে একটা প্ল্যান তৈরীতে হাত দিল।

'আমি তো এলাম, এবার আপনারাও একদিন চলুন।'

'নিশ্চয়।' শশাঙ্ক যেন প্রস্তাবটার জন্য ওৎ পেতেই ছিল। 'কবে যাব বলো, সামনের রোববার? তাহলে, ইলিশ খাওয়াতে হবে। তিলাপিয়া খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। সুমিত্রা দারুণ ইলিশ-ভাতে করতে পারে।'

নিখিলকে হাসতেই হল। সন্ধ্যা কপট উদ্বিগ্নতা দেখিয়ে বলল, 'এখন ইলিশ পাওয়া যায় না। আর তুমি ভদ্রলোককে বিব্রত করতে বায়না ধরলে ইলিশ খাব।'

'আরে ও আবার ভদ্রলোক কি। ওতো নিখিল। ওকে সব থেকে লেগপুল করতাম আমি আর সনৎ। সনৎ লিখেছে ছুটি পেলে জানুয়ারিতে কলকাতা আসবে। তোর ঠিকানাটা লিখে দিস ওকে পাঠাব।' শশাঙ্ক সবিস্তারে সনৎ-এর গল্প করে চলল আর নিখিল ভাবল, একি!

'পুজোর বাজার নাকি' হঠাৎ সন্ধ্যা প্রশ্ন করল। নিখিল লাজুক হেসে ঘাড় নাড়ল। শশাঙ্ক ছোঁ মেরে থলিটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'দেখি বৌয়ের জন্য কি শাড়ি কিনলি।' নিখিল তাড়াতাড়ি ওর হাতটা চেপে ধরল। 'আরে ধোৎ, দেখার কি আছে। মার থান, ঝিয়ের কমদামী একটা মিলের আর সুমিত্রার একটা তাঁতের ষোল টাকার শাড়ি। খুলিসনি প্লিজ। বেশ বাঁধাছাদা রয়েছে আবার কেন খাটুনি বাড়াবি।'

'সন্ধ্যা দেখেছ, বৌয়ের শাড়ি আছে কিনা, অন্যের হাতের ছোঁয়াতেও আপত্তি। কি রঙের কিনলি? স্লেট না ডীপ মেরুন? সুমিত্রা একটা রঙ একবার পরেছিল মেরুনের ওপর গ্রীন ফুটি ফুটি, পাড়টা হোয়াইট, দারুণ দেখাচ্ছিল ওকে।'

'রঙ খুব ফর্সা বুঝি।' সন্ধ্যাকে খুব কৌতূহলী দেখাল।

'না, খুব নয় আপনার মতই।'

'ওমা তাহলে তো বেশ কালো।'

'আপনি কালো হলে আমরা তো আলকাতরা।'

নিখিল হাসামুখে শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইল। শশাঙ্ক বড় করে ঘাড় নাড়ল। রঙের প্রশংসায় পুলকিত সন্ধ্যা বলল, 'দেখেছেন চা দিতেই ভুলে গেছি।'

সন্ধ্যা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই নিখিল বলল, 'শশাঙ্ক, একটা খুব অসুবিধায় পড়ে গেছি।' জিজ্ঞাসু চোখে শশাঙ্ক তাকিয়ে রইল। তখন নিখিল আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বলে টেবিলের ওপর রাখা কাগজের থলিটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওর মধ্যেই সেটা রয়েছে।'

শশাঙ্ক চড়াং করে সিধে হয়ে বসল। 'তার মানে, তুমি ওই কুৎসিত জিনিসটা আমার টেবিলের উপর রেখেছ? নামাও নামাও বলছি।' দাঁত চেপে হিস্‌হিস্‌ করে শশাঙ্ক আঙুল দিয়ে মেঝে দেখাল। নিখিল নামিয়ে রাখল।

'কি করতে এখানে এসেছ?' চাপা স্বরেই শশাঙ্ক বলল, ভিতরের দিকে চোখ রেখে।

'এটাকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।'

'ফেলে দেবে, আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'বলাটা খুবই সোজা, ফেলতে গেলেই লোকে দেখে ফেলবে। তখন চিৎকার হবে, একগাদা লোক জমবে, টানতে টানতে হাজার হাজার লোকের মধ্য দিয়ে থানায় নিয়ে যাবে। অশ্লীল কথা বলাবলি করবে।'

'তা আমায় কি করতে হবে?'

'এটার একটা বন্দোবস্ত করে দে, শশাঙ্ক প্লিজ। তোর কথাতেই বিয়ে করেছিলুম। এবার তুই আমার কথা রাখ।' নিখিল হাত বাড়াল শশাঙ্কর হাত চেপে ধরার জন্য। হাতদুটো তার আগেই শশাঙ্ক তুলে নিয়েছে। টেবলে নিখিলের দুটো হাত থলিটার পাশে পড়ে রইল।

'আমার কথাতেই শুধু বিয়ে করেছিলি? সুমিত্রাকে তোর পছন্দ হয়নি?'

'নিশ্চয়, ওকে নিশ্চয় ভালবেসেছিলুম, আজও বাসি। কিন্তু তোর সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক ছিল তাও জানি।'

'তাই এক্‌সচেঞ্জ করতে এসেছিস, এই এই জিনিসটার বদলে।' শশাঙ্ক থলিটার দিকে আঙুল তুলেছে তখন চায়ের কাপ হাতে সন্ধ্যা ঢুকল।

'কিসের এক্‌সচেঞ্জ?' হাসি মুখ করে সন্ধ্যা একটা চেয়ারে বসল।

'নিখিল বলছিল তুমি যদি গোটাকতক গান শোনাও। তাইতে বললুম বৌয়ের শাড়িটা তার বদলে দিতে হবে।'

'আহা, পছন্দ করে উনি কিনেছেন। আর গান যা গাই সে এমন কিছু নয়।'

সন্ধ্যা মেয়েটি ভাল। এর পর খুব বেশি সাধাসাধি করতে হয়নি। খালি গলায় তিনটি গান করল। শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "নিখিলকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পাঞ্জাবিটা দাও।"

ওরা দুজন চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। রাত হয়েছে। রাস্তায় লোকজন কম। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলোর পরিমাণ খুবই অল্প। নিখিলের মনে হল, এখন রাস্তার যে- কোনো জায়গায় থলিটা রেখে নির্বিবাদে চলে যাওয়া যায়।

"ওটা দে" শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কেন!"

"ওই ডাস্টবিনটায় ফেলে দি।"

"সে তো আমিও পারতুম, তা হলে তোর কাছে এলুম কেন?"

"তবে কি মতলব তোর?" হঠাৎ শশাঙ্ক গলার স্বর ও দাঁড়াবার ভঙ্গি পালটে ফেলল। নিখিল পা পা করে পিছোল। দূরে পানের দোকানটা মাত্র খোলা। এখন থলি হাতে ছুটতে শুরু করলে চোর বলে ধরা পড়তেই হবে। নিখিল দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি এখন সুমিত্রার বিয়ে-করা স্বামী।" শশাঙ্ক ওর বুকের জামা মুঠো করে ধরল, "তুমি এই জিনিসটার বৈধ অভিভাবক, তার সার্টিফিকেট পকেটে আছে। অতএব এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। আমার দায়িত্ব বহুদিন আগে শেষ হয়েছে। তবুও আমার কাছে কেন এসেছ?" নিখিলকে ঝাঁকাতে শুরু করল শশাঙ্ক।

"তুই আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিস। তুই কাওয়ার্ড, তুই ইরেসপনসিবল।" নিখিল মরীয়া হয়ে উঠল শূন্য প্রায়ান্ধকার রাজপথে। শশাঙ্কর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধাক্কা দিল। বদলে জোরে চড় মারল শশাঙ্ক। এইবার ক্রোধে দিশাহারা হয়ে মারবার জন্য নিখিল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হঠাৎ জানলা খুলে দোতলা থেকে এক পুরুষ কণ্ঠ গর্জে উঠল, "কি হচ্ছে, অ্যাঁ। গুণ্ডামী?" লোকটা চিৎকার করে উঠল। দুড়দাড় করে কিছু লোকের ছুটে আসার শব্দ এল অন্ধকারের মধ্য থেকে।

নিখিল আর চিন্তা করারও সুযোগ নিজেকে দিল না। প্রাণপণে রাস্তার নির্জন দিকে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে যখন দম ফুরিয়ে এল, থামল। তখন পায়চারি করতে করতে এক কনস্টেবল তার কাছে এসে, কেন সে এমন করে হাঁপাচ্ছে তার কারণ জানতে চাইল। নিখিল বলল, একটা গুণ্ডা তাকে তাড়া করেছিল। গুণ্ডাটা কোনদিকে কনেস্টবল জানতে চাইল। নিখিল আঙুল দিয়ে দেখাল। কনেস্টবলটি কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে 'আচ্ছা ঠিক হ্যায়' বলে পায়চারি করতে করতে চলে গেল।

নিখিল এইবার টের পেল কাগজের থলিটা তার কাছে নেই। ছোটার সময়ও হাতে ছিল না। সেটি শশাঙ্কর কাছেই রয়ে গেছে। শশাঙ্ককে লোকগুলো জিজ্ঞাসা করলে ও নিশ্চয় বলবে গুণ্ডা তাড়া করেছিল। গুণ্ডা নিশ্চয়ই সুদৃশ্য কাগজের থলিতে ভরা কাপড়ের প্যাকেট ফেলে যায়নি। লোকগুলো খুব খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, ভাগ্যিস আমরা এসে পড়লুম তাই ভদ্রলোকের এই জিনিসটা রক্ষে পেল। এই বলে তারা থলিটা শশাঙ্কের হাতে তুলে দেবে।

নিখিল বুক পকেটে হাত দিয়ে সার্টিফিকেটটা অনুভব করে ভারী আরাম পেল। তখন সে মনশ্চক্ষে দেখল, শশাঙ্ক সেই থলিটা হাতে নিয়ে হেঁটে চলেছে।

সঙ
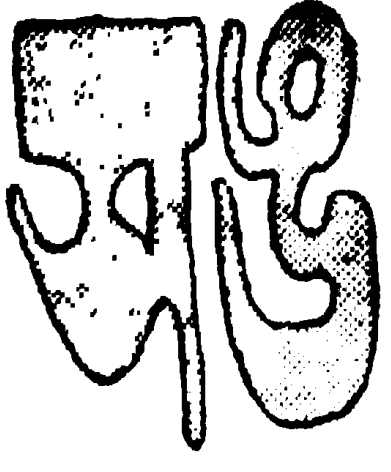
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মহাদেব ন্যাশনাল সার্কাসের ক্লাউন।

তার মুখের গড়ন ঠিক বাংলা পাঁচের মতো। চোখদুটো গোল, নাক বেশ লম্বা কিন্তু তীক্ষ্ন নয়, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো। একে দেখবার জন্যেই সহস্র দর্শকের ভিড় জমে যায়।

দু-একটা ছোটখাটো খেলা হয়ে যাবার পর নিজের বিশেষ পোশাক প'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অদ্ভুত ভংগীতে মহাদেব এসে আছাড় খেয়ে পড়ে একেবারে মাঝ-খানে। ব্যস, সেইটুকুই যথেষ্ট। প্রবল অট্টহাসিতে চারপাশ যেন ফেটে পড়ে।

তারপর রঘুনাথের বাঘের খেলা। কিন্তু প্রথম কয়েক মিনিট রঘুনাথকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—দর্শকের হাসি সহজে থামে না।

আরও নানারকম খেলার পর আসে রুক্মিণী।

প্রায় চৌষট্টিটা চেয়ার একটার পর একটা দিয়ে উঁচু করা। চেয়ারের তলা দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে রুক্মিণী একেবারে ওপরের চেয়ারে গিয়ে বসে, তারপর তেমনি ক'রে আবার নেমে আসে। কী আশ্চর্য কৌশল! নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে প্রত্যেকে যেন তাদের হৃৎস্পন্দন শোনে! একটু এদিক-ওদিক হ'লেই সর্বনাশ—বে-কায়দায় প'ড়ে গিয়ে রুক্মিণীর হাড় গুঁড়ো হ'য়ে যাবে। হাত-তালির তীব্র শব্দে তাঁবুর বাঁশগুলো যেন দুলে ওঠে।

তারপর আবার মহাদেব। নিমেষে দর্শকের হৃৎস্পন্দন শোনার আগ্রহ টুটে যায়—সমস্ত গাম্ভীর্য আর আশংকা হাওয়ায় মিশে যায়।

ঠিক রুক্মিণীর মতো সেও চেয়ারের তলায় সশব্দে মাথা ঠুকে সেই চৌষট্টিটা চেয়ারের সংগে হুড়মুড় ক'রে পড়ে। কিন্তু তার হাড় গুঁড়ো হয় না—অদ্ভুত কায়দায় আঘাত বাঁচিয়ে পা বাঁকাতে বাঁকাতে মহাদেব উঠে দাঁড়ায়।

হাসির আওয়াজ প্রবল হ'য়ে ওঠে।

বাইরে বেরিয়ে এসেই মহাদেব রুক্মিণীকে জিজ্ঞেস করে, কেমন খেলা দেখালাম আজ?

ওঃ, চমৎকার!

চমৎকার, হ্যাঁ? হে' হে', বা বা বাঃ, খেলা না দেখেই ব'লে দিলে চমৎকার?

না দেখে মানে? নিশ্চয়ই দেখেছিলাম।

কই বাবা, মাথা চুলকে মহাদেব বললো, আমি চেয়ারের তলা থেকে চোখ পিটপিট ক'রে দেখছিলাম যে, তুমি তো—

তাড়াতাড়ি রুক্মিণী বললো, কেমন ক'রে বেরিয়ে আসো তুমি? আমি হ'লে তো গুঁড়ো হ'য়ে যেতাম।

আহা হা, কী যে বলো, তুমি হ'লে সার্কাসের প্রাণ—তুমি কি পড়ে যেতে পারো?

আমি না-হয় সার্কাসের প্রাণ, আর তুমি?

আমি বাবা সার্কাসের লেজটি।

ওমা, সে আবার কী?

হুম্ বাবা, লেজটি। কিন্তু পড়ে যাবার কথা তুমি আর ব'লো না—আমার ভয় লাগবে।

আমি প'ড়ে গেলে কাঁদবে তুমি?

হুম্ বাবা, কেন কাঁদবো না? তুমি হ'লে সার্কাসের প্রাণটি...সেটি পড়লে কাঁদবো না? একেবারে ভেউ ভেউ ক'রে—

পেছন থেকে রঘুনাথ ব'লে উঠলো, তোকে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে দেখলে সকলে হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাবে। ভাগ্ এখান থেকে—

এই সব নিয়ে গড়ে উঠেছে ন্যাশনাল সার্কাস। সমস্ত পৃথিবী থেকে লোক নেয়া হ'য়েছে। আয়োজন বিরাট। তাছাড়া বাঘ-সিংহ, হাতী-ঘোড়া, বাঁদর-ভাল্লুক, নানা-রকম জন্তু-জানোয়ার মানুষের সংগে পাল্লা দিয়ে খেলা দেখায়।

আজ সার্কাস বন্ধ। মাঝে মাঝে বিশ্রাম। ফেণী মহকুমায় তাঁবু পড়েছে। বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে, কারুর শহর দেখতে বেরুবার উপায় নেই। চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে মহাদেব আর রঘুনাথ রুক্মিণীর তাঁবুতে আসর জমালো।

রুক্মিণী বললো, কিছুই খাচ্ছো না যে রঘুনাথ?

বাড়ির কথা ভাবছি!

বাড়ির কথা? গম্ভীর হ'য়ে রুক্মিণী বললো, বউ-এর কথা নাকি?

না, আমার বিয়ে হয়নি।

আমারও হয়নি, মহাদেবের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আ হা হা হা, হেসে রুক্মিণী বললো, তোমার কেন বিয়ে হয়নি মহাদেব?

কে বিয়ে করবে বাবা? যা হ্যাংগামা! যেন আলুর বস্তা ঘাড়ে নিয়ে কুঁজো হ'য়ে এমনি ক'রে চলা—উঠে দাঁড়িয়ে চলাটা দেখিয়ে দিতে দিতে মহাদেব বেরিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে রুক্মিণী বললো, ও এতো শিখলো কোথায় রঘুনাথ?

হ্যাঁ, বেটা শিখছে বটে।

ওর মুখ দেখলেই আমার হাসি পায়। মহাদেব বলে, তার মুখ নাকি আর এক-রকম ছিল, চেষ্টা ক'রে ক'রে ও এমনি মজার মুখ তৈরী করেছে।

হবেও বা, শালা সব পারে! তারপর একটু চুপ করে থেকে খুব আস্তে রঘুনাথ বললো, আচ্ছা রুক্মিণী তুমি বিয়ে করোনি?

রুক্মিণী যেন বড়ো বেশি লজ্জা পেল। মাথা নেড়ে জানালো, না।

কেন?

সে অনেক কথা রঘুনাথ!

বল না শুনি?

আর কেউ এদের কথা শুনেছে না। বৃষ্টি ঝরার একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছে। মেমসাহেবদের তাঁবু থেকে হাসির কল্লোল শোনা যাচ্ছে। বোধহয় মহাদেব গিয়ে জুটেছে সেখানে।

বলো রুক্মিণী।

আমি বিয়ে করলে সংসার চলবে না। আমার বাবা নেই, মা আর অনেক ভাই বোন। তোমার দেশ কোথায় রঘুনাথ?

দেশের সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি অনেকদিন। আমার আপনার লোক বলতে এখন কেউ নেই। আজ এখানে কাল সেখানে—এখন তো ঘর-সংসারের ঠিক নেই। তাই তো বিয়েও করি নি।

তাঁবুর হাওয়া যেন সজল গম্ভীর হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ জীবনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে দুজনের বুকে ফুলে ফুলে উঠলো দীর্ঘনিশ্বাস।

এখানকার প্রত্যেকের জীবনের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। এমনি আসরে মাঝে
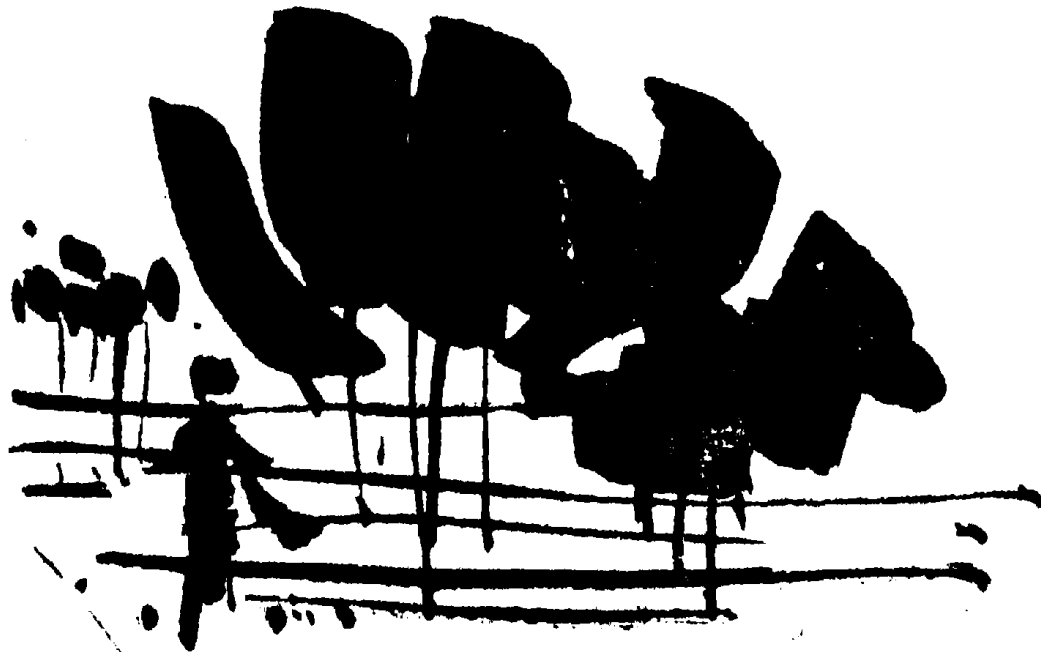
মাঝে সেই সব কথা আলোচনা করা হয়। সকলের ইতিহাস প্রত্যেকের জানা।

জানোয়ারেরা কথা বলতে পারে না। তবু কখনো কখনো খাঁচার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের চোখের ভাষা যেন পড়া যায়। গহন বনের স্বাধীন জীবনের প্রায়-বিস্মৃত ইতিহাস তাদের চোখের তারায় কাঁপে। তাদেরও দীর্ঘনিশ্বাস খাঁচার কোটরে জমা হয়ে আছে।

কিন্তু শুধু ব্যতিক্রম মহাদেব। তার চেহারা দেখলেই প্রত্যেকের হাসি পায়। তারও নিশ্চয়ই একটা কাহিনী আছে আর হয়তো তা একান্ত দুঃখেরই গম্ভীর ইতিহাস! কিন্তু সে কথা শুনবে কে? তার মুখই যে দুঃখ ভোলানো। ভাঁড়ামির প্রবল চাপে মহাদেবের অন্তরের গম্ভীর দিকটা আজ একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। মহাদেবও নিজের সব গম্ভীর কথা ভুলেছে— এই ভাঁড়ামির ভোলই তার একমাত্র চরম পরিচয়।

যদি সে একদিন অন্য সকলের মতো বেশ গম্ভীর মুখে আসরে বলতে আরম্ভ করে, শোন তোমরা, তোমাদের মতো আমিও একদিন সংসারে ছিলাম, আমারও আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, বিয়েও করবো ভেবে-ছিলাম—কিন্তু এতো কথা ওই মজার মুখ নিয়ে বলতে পারবে কি? আর বললেই বা লোকে শুনবে কেন! মহাদেবের জীবনের গভীর কাহিনী তার ভাঁড়ামির ছাপমারা মুখের চেয়ে বড়ো কি? লোকে হাসি ঠেকাবে কেমন করে!

মহাদেবের কোন কথাই কেউ জানে না।

সকালবেলা জন্তু জানোয়ারদের খেলা শেখানো হয়। রঘুনাথই শেখায় আর অনেকে নিজের খেলা অভ্যাস করে নেয়। মহাদেব এ সময়টা বড়ো ব্যস্ত থাকে। কারণ তাকে হাসাবার নতুন ভঙ্গী বের করতে হয় আর খেলারও অভ্যাস করে নিতে হয় মাঝে মাঝে।

রুক্মিণী দূরে দাঁড়িয়ে মহড়া দেখে। কখনও কখনও সে মুগ্ধ বিস্ময়ে রঘুনাথের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রঙ আর গম্ভীর মুখ রুক্মিণীর মনে যেন নেশা জাগায়। রঘুনাথ কি যাদু জানে? তাকে দেখলেই বাঘ সিংহেরা যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে। চেয়ে চেয়ে রুক্মিণীর মানসিক বিলাস বেড়ে যায়। তারপর সে হাসতে আরম্ভ করে। দূরে থেকেই হাসির শব্দ শুনে মহাদেব বুঝতে পারে রুক্মিণী তাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ মহাদেবেরও উৎসাহ বেড়ে যায়। গড়াতে গড়াতে সে চলে আসে একেবারে তার পায়ের কাছে।

কেমন রুক্মিণী?

খুব ভালো, এতো জানো তুমি!

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা নেই বার্তা নেই মহাদেব ফস্ করে গান ধরে, আমি জানি তাই মানি...

মহাদেবের হাত ধরে টানতে টানতে রুক্মিণী তাবুতে চলে এলো।

কী খাবে বলো মহাদেব?

তোমাকে খাবো—হাঁ—মহাদেব মুখটা একটু বেঁকিয়ে গোল হাঁ করলো।

বাবারে বাবা, এতো হাসাতে পারো তুমি, পেটে খিল ধরে গেল!

ছেড়ে গেলেই সেরে যাবে।

তাই নাকি?

হুম্ বাবা।

সত্যি মহাদেব, তোমাকে দেখলে শুধু হাসতে ইচ্ছে করে। কাকে বিয়ে করবে তুমি? সে বোধহয় হাসতে হাসতে মরে যাবে।

নকল কান্নাভরা গলা করে মহাদেব বললো, শুধু আমার এই চেহারাটা দেখে প্রথমেই ডুকরে কেঁদে উঠবে—হুম্ বাব্বা!

হেসে ফেলে রুক্মিণী বললো, বলো এবার কী খাবে?

বকের ডিম—

বকের ডিম? সে কোথায় পাবে?

ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিড্ডিম্—নাচতে নাচতে মহাদেব বেরিয়ে গেল।

সেদিন একেবারে প্রথমেই এক কান্ড!

ঘোড়ার পিঠের ওপর পি-কক্ হতে গিয়ে মাটিতে পড়লো মহাদেবের মাথার চাঁদি। একটা শব্দ হ'লো। মহাদেব জ্ঞান হারালো—রক্তের ধারা ব'য়ে গেল। ধরাধরি করে মহাদেবকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। তারপর ডাক্তার—ব্যান্ডেজ ইত্যাদি।

এমন ঘটনা এই সার্কাসে এই প্রথম। আজ মহাদেব দেখছিলো দূরে দাঁড়িয়ে রুক্মিণী হাসছে—তাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে সে কী যেন ভেবেছিল! ব্যস্ তারপরই এই কান্ড! কিছুক্ষণের জন্যে খেই হারিয়ে গেল। সার্কাসের লোকেরা কি করবে ভেবে পেল না।

জ্ঞান হবার পর চোখ খুলে মহাদেব বুঝতে পারলো না সে কোথায়। চোখ চেয়ে দেখলো রুক্মিণী গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

কেমন আছো মহাদেব?

আমার কী হ'য়েছে? স্বপ্নের মতো সমস্ত ঘটনাটা মহাদেবের মনে পড়লো।

মৃদুস্বরে রুক্মিণী বললো, আর কথা ব'লো না, ঘুমোও চুপ ক'রে—

আমার মাথায় বড়ো যন্ত্রণা—উঃ, বড়ো কষ্ট—

সব সেরে যাবে মহাদেব। ঘুমোও, তোমার কপালে আমি হাত বুলিয়ে দিই।

তুমি থাকবে, আমি বাঁচবো রুক্মিণী?

আঃ, কী যে বলো!

কেন আমার এমন হলো!

কিছু হয়নি তোমার। আর কথা বলো না, ব্যথা তাহলে বেড়ে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আমি ঘুমোই।

দূরে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। বোধহয় সকলের খাওয়া শেষ হলো। রাত কত কে জানে!

কয়েক দিন কাটলো।

আজ ডাক্তারবাবু আশা দিয়ে গেছেন, মহাদেবের আর কোন ভয় নেই।

রুক্মিণীর দিকে চেয়ে চেয়ে কৃতজ্ঞতায় মহাদেবের মন ভরে গেল।

বার্লিটা খাও এবার—

না, আমাকে আর বার্লি দিও না।

ছি, ছেলেমানুষী করে না, আমার কথা শোন!

আগে তুমি খাও?

ওমা, আমি কেন খেতে যাব? আমার কি হয়েছে?

তাহলে আমিও খাবো না।

বারে, এতো বেশ!

নিঃশব্দে অন্ধকার জমা হচ্ছিল। রুক্মিণী আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ল্যাম্প্ জেলে দিল। আর সেই মৃদু আলোয় তার চেহারা দেখে মহাদেবের কি যেন মন হলো—একটা তীব্র নতুন অনুভূতিতে তার শরীর কেঁপে উঠলো। বার্লি হাতে নিয়ে মহাদেবের বিছানায় আবার এলো রুক্মিণী আর আস্তে আস্তে মহাদেব তার একটা হাত চেপে ধরলো।

বার্লি খাও—

রুক্মিণী, কেন তুমি আমার জন্যে এত কর, কথাটা মৃদু গম্ভীর স্বরে বললো মহাদেব আর তার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠলো।

হঠাৎ হাসির প্রবল তরঙ্গ উঠলো রুক্মিণীর পেটে। সে অনেক চাপতে চেষ্টা করলো কিন্তু ফল হলো না কিছুই। হাসির তোড়ে কিছুটা বার্লি ছিটকে পড়লো মহাদেবের গায়ে।

এ কি, অতো হাসছো কেন রুক্মিণী?

না, কিছু না—

আবার আমার মুখ দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে না?

না না—বার্লির কাপটা রেখে হাসি থামাবার জন্যে রুক্মিণী বাইরে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে দেখলো মহাদেব বার্লি খায়নি, কাপটা দূরে ছুড়ে দিয়েছে।

রাগ হয়েছে, না?

না।

ও বাবা বড্ড রেগে গেছ দেখছি।

না, আমার আবার রাগ কি!

হাসি চেপে রুক্মিণী বললো, ছি, অত রাগ করে না, এখনো তুমি খুব দুর্বল—আবার অসুখ বেড়ে যাবে যে!

আমি মরলেই বা কার কি!

থাক, অনেক হয়েছে, যাই আবার আমার কাজ বাড়লো, বার্লি করি গে!

আমি খাবো না।

দেখা যাক, হাসতে হাসতে রুক্মিণী চলে গেল।

বার্লি তৈরী করে ফিরে এসে দেখলো মহাদেব ঘুমিয়ে পড়েছে।

রুক্মিণী তাকে আর জাগালো না। তার অদ্ভুত মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কয়েক দিন পর মহাদেবের মনে হলো তার ব্যথা অনেক কমে গেছে। বোধহয় ইচ্ছে করলে সে এখন উঠে দাঁড়াতে পারে; সে উঠতে যাবে এমন সময় রুক্মিণী এলো।

উঠো না, উঠো না বলছি।

আমি সেরে গেছি রুক্মিণী।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কে সারিয়ে তুললো তোমাকে?

তুমি। কিন্তু কেন আমাকে সারিয়ে তুললে তুমি?

কেন বল তো?

আমাকে দেখে হাসবে বলে।

না না মহাদেব।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ গো, মহাদেবের পাশে রুক্মিণী বসে পড়লো।

তার একটা হাত ধরে মহাদেব বললো, একটা কথা বলবো রুক্মিণী?

বলবে বৈকি, নিশ্চয়ই বলবে।

ভাবছি আমার অসুখ কেন সারলো? তোমাকে তো আর অতো বেশি কাছে পাবো না।

হেসে ফেলে রুক্মিণী বললো, এত কথা শিখলে কোথায়?

তুমিই তো শিখিয়ে দিলে, একটু থেমে মহাদেব আবার বললো, আচ্ছা রুক্মিণী, তোমার কী কোনদিনও বিয়ে হবে না?

কে বিয়ে করবে আমায়?

প্রচুর উৎসাহ নিয়ে মহাদেব জোরে বলে উঠলো, আমি—আমি তোমাকে বিয়ে করবো রুক্মিণী।

আরও জোরে হেসে উঠে রুক্মিণী বললো, দূর পাগলা, তোমাকে কেন বিয়ে করবো? রঘুনাথ—রঘু কী আমায় বিয়ে করবে!

বড়ো বেশি আঘাত লাগলো মহাদেবের, করুণ চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে রুক্মিণীর মুখের দিকে সে চেয়ে রইলো।

হাসতে হাসতে রুক্মিণী বললো, বিয়ে—তোমাকে বিয়ে—বাকি কথাগুলো হাসির ঝাপটায় সে আর বলতে পারলো পারলো না।

শীতের প্রবাহে তাঁবুর চারপাশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

আজ রাত্রে হবে শেষ প্রদর্শনী। বহুদিন পর আসরে আবার মহাদেবকে দেখা যাবে। হ্যান্ডবিলে একথা লেখা ছিল। সন্ধ্যে থেকেই শহরের সমস্ত লোক ভেঙে পড়লো সার্কাসের তাঁবুতে। ভেতরে প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রস্তুত—যাবার আগে সবচেয়ে ভালো খেলা তারা দেখিয়ে যাবে।

যথা সময়ে সার্কাসের সেই পরিচিত বাজনা বেজে উঠলো। রুক্মিণীকে আজ লাল পোশাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল তলোয়ারের মত। দূরে দাঁড়িয়ে মহাদেব তার খেলা দেখলো। সেই রুক্মিণী—যে তার মাথার কাছে বসে থাকতো দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত।

তারপর আরম্ভ হলো রঘুনাথের বাঘের খেলা। চাপা উত্তেজনায় গ্যালারীগুলো যেন থমথম্ করছে। চারপাশে চারটে রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে শুধু হাতে তেজস্বী নির্ভীক বীরের মতো রঘুনাথ ভয়াবহ খেলা দেখাচ্ছে। কখনও বাঘের মুখে মাথা পুরে দিচ্ছে আর কখনও অদ্ভুত কৌশলে প্রকাণ্ড বাঘকে ধরাশায়ী করছে। জনতার মুখে ফুটে উঠেছে তীব্র আগ্রহ।

দর্শকদের আড়ালে একটু দূরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মহাদেব আর রুক্মিণী খেলা দেখছে। মহাদেব এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রুক্মিণীর মুখের দিকে। কী ব্যাকুল দৃষ্টি রুক্মিণীর! তার গভীর কালো চোখ থেকে যেন আগ্রহ আর উত্তেজনার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

মহাদেব ভাবলো, তার খেলার সময় রুক্মিণীর চোখ মুখ এমনি অপরূপ হয়ে ওঠে না কেন! সে শুধু হাসে। কিন্তু সে তো তার মনে এমনি দাগ অতি সহজে কাটতে পারতো! কি খেলা দেখায় রঘুনাথ! অমন খেলা ইচ্ছে করলেই মহাদেব দেখাতে পারে। হোক না সে এ সার্কাসের ভাঁড়, কোন খেলা সে না জানে? হ্যাঁ, এই বাঘের খেলা এক সেকেন্ডে সে দেখাতে পারে। মহাদেবের মাথার ভেতর কেমন যেন হতে লাগলো। দুর্বল শরীর [illegible], সে এগিয়ে যেতে লাগলো।

হঠাৎ প্রচণ্ড হাসির শব্দে মহাদেবের চমক ভাঙলো। আরে একি সে যে একেবারে রঘুনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে আর দর্শকদের হাসির আওয়াজে বাঘগুলোও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

কোনরকমে হাসি চেপে রঘুনাথ মহাদেবের কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে বললো, এই শালা পালা এখান থেকে, বাঘ ক্ষেপে গেলে মুশকিল হবে।

পরিপূর্ণ সার্কাস মণ্ডপে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ মহাদেব যেন নিজেকে ফিরে পেল, ফ্যাল ফ্যাল করে দর্শকের দিকে চাইলো সে শুধু একবার। তারপর তার নিজস্ব ভংগী করে পা বাঁকাতে বাঁকাতে বেরিয়ে গেল। চারপাশে হাসির প্রচণ্ড আওয়াজ। দূরে রুক্মিণীও হাসছে।

গাছ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ। গাছটা সুন্দর কি অসুন্দর কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রয়োজন আছে কি নেই তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না।

যেমন মানুষ মাথার ওপর আকাশ দেখে মেঘ দেখে, পায়ের নিচে ধুলো দেখে ঘাস দেখে, তেমনি তারা চোখের সামনে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখছে। সন্ধ্যায় দেখছে দুপুরে দেখছে সকালে দেখছে। কেবল চোখ দিয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভূতি দিয়ে দেখা নয়, বোঝা নয়।

বা এমন করে একটা গাছকে বুঝতে হবে কেউ কোনদিন চিন্তাও করে না।

দিনের পর দিন যায়, ঋতুর পর ঋতু কাটে, বছরের পর বছর যায় আসে—গাছের জায়গায় গাছ দাঁড়িয়ে।

বর্ষায় পাতাগুলি বড় হয় পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং আতারক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই সবুজ-কালো গভীর রং ধূসর হয়ে ওঠে তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নিরক্ত প্রসূতির পান্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। গাছ রিক্ত হয়।

তখনও গাছ গাছ থাকে।

গাছের চেহারা তখন শুধু কাঠের চেহারা হয়।

ছোট কাঠ বড় কাঠ চিলতে কাঠ সরু কাঠ পাতলা চিকন—মানুষের আঙুলের মতো টুকরো টুকরো অজস্র কাঠ কাঠির একটা জবরজং কাঠামো হয়ে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু তা বলে কি মানুষ তখন তার ওপর রাগ করে? করে না। কারণ মেঘমেদুর আকাশের নিচে অরণ্যের চেহারা ধরে গাছ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তাকে যে চোখে দেখে শীতের শুকনো আকাশের নিচে সরু মোটা কতকগুলি কাঠ কাঠির বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও মানুষ তাকে সেই চোখে দেখে। তাই বলছিলাম ওপর ওপর দেখা। মন দিয়ে দেখা নয় বোঝা নয়। তাহলে ফাল্গুনে লালে সবুজে মেশানো নতুন পাতার সমারোহ দেখে মানুষ নাচত অথবা বৈশাখ পড়তে অজস্র মঞ্জরী মাথায় নিয়ে গাছটা আশ্চর্য গোলাপী আভায় আকাশ আলো করে তুলেছে দেখে আনন্দে চিৎকার করত। তা কেউ করে না, এ পর্যন্ত করে নি।

দু-তিনটা বাড়ির মাঝখানে এক ফালি পড়ো জমির ওপর একটা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাদের একটু সুবিধা হয়, এই শুধু তারা জানে। এ-বাড়ির মানুষ জানে ও-বাড়ির মানুষ জানে, আশেপাশের আরো গোটা দু-তিন বাড়ির মানুষগুলিও একটু-আধটু সুবিধা আদায় করতে গাছের কাছে আসে বৈ কি, যেমন সকাল হতে খবর কাগজ হাতে করে দু-চারজন প্রৌঢ় বুড়ো গাছতলায় একত্র হয়ে রাজনীতি সমাজ নীতি অর্থনীতি আলোচনা করে, যেমন দুপুরের দিকে এবাড়ির বুড়ি ও বাড়ির বুড়ি, এবাড়ির বৌ ও বাড়ির মেয়েকে গাছের নিচে সরু গালিচার মতন ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে রান্নার কথা সেলাইয়ের কথা ছেলে হওয়ার কথা ছেলে না হওয়ার কথা বলে সময় কাটায়, আর বিকেল পড়তে ছুটে আসে ছেলে ছোকরার দল। গাছটাকে ঘিরে হৈ-হল্লা ছুটোছুটি, গাছে উঠে ডাল ভাঙা পাতা ছেঁড়া, বা কোনদিন গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া।

বা শীতের দুপুরে গাছের ছায়ায় মাথা রেখে শরীরটা রোদ্রে ছড়িয়ে দিয়ে কারো কারো গল্পের বই পড়া। আবার গ্রীষ্মের রাত্রে ঠিক এই গাছের তলায় শীতল পাটি বিছিয়ে হ্যারিকেন জেলে পাড়ার পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে তাস খেলছে এই দৃশ্যও চোখে পড়ে।

যখন মানুষ থাকে না তখন গাছতলায় ছাগলটাকে গরুটাকে মাথা গুঁজে মনের আনন্দে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখা গেছে।

আর ওপরে নানাজাতের পাখির কিচির-মিচির কলরব, ডানা ঝাপটান, ঠোঁটে ঠোঁট ঘসার শব্দ। আর মাঝে মাঝে হাওয়ায় পাতা নড়ে, ডাল দুলে ওঠে।

বা এমনও এক-একটা সময় আসে যখন পাখি থাকে না, বাতাস নেই। গাছ স্থির স্তব্ধ। পড়ো জমিতে নিবিড় ছায়াটুকু ফেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যেন যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বা মনে হয় কোন দার্শনিক। নীরব থেকে অবিচল থেকে জগতটাকে দেখছে। সংসারের উত্থান-পতন লক্ষ্য করছে। পাপের জয় পুণ্যের পরাজয় দেখে বিমূঢ় বিস্মিত হয়ে আছে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয়। চিন্তাশীল মানুষ যেমন চুপ করে থাকে। সত্যি গাছটাকে সময় সময় এমন একটি মানুষ বলে কল্পনা করা যায়। তখন তার ধারে কাছে অন্য মানুষ পশুপাখি হাওয়ার চাপল্য কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

হয়তো এমন করে কেউ গাছটাকে দেখছিল গাছটাকে নিয়ে ভাবছিল। এতদিন জানা যায় নি, এতদিন বোঝা যাচ্ছিল না। কে জানে হয়তো গাছটার সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল, গাছ বুঝতে পারছিল পূর্বদিকের একটা বাড়ির সবুজ জানলায় বসে একজন তাকে গভীরভাবে দেখছে লক্ষ্য করছে। না, আগে হয়তো সে আর দশটি মানুষের মতো সাদা চোখে গাছের পাতা ঝরা দেখত নতুন পাতা গজানো দেখত। এখন আর তার চোখ সাদা নেই। কাজল পরে গভীর কালো হয়েছে। এখন আর হাল্কা বেণী ঝুলিয়ে ফ্রক উড়িয়ে সে ছটফট করছে না যে, বাড়ির সামনের পড়ো জমিতে একটা গাছ আছে কি বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে ওপর ওপর দেখে শেষ করবে! এখন সে শান্ত গম্ভীর, মাথায় দৃঢ়বন্ধ সংযত কঠিন খোঁপার মতো তার মনও বুঝি সতর্ক সুসংবদ্ধ স্থির ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। আর সেই নিবিড় মন সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ সে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছটাকে নিয়ে ভাবছে। যেন ভাবতে ভাবতে একদিন তার দৃষ্টি কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চোখের কালো পালকগুলি আর নড়ছে না, কালো মণি দুটি পাথরের মতো স্থির কঠিন হয়ে আছে। গাছ বুঝতে পারল একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে, ওই কালো পালক ঘেরা চোখ দুটোর তাকানোর

মধ্যে কেবল ভয় না বিদ্বেষও যেন মিশে আছে। গাছ ভয় পেল, দেখল, কেবল দিনের আলোয় না রাত্রির গভীর অন্ধকারেও দুটি চোখ জানালায় জেগে আছে। নিরাকার অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি হয়ে রাত্রির গাঢ় তমসায় লুকিয়ে থেকেও যেন গাছ ওই দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। আতঙ্কের সংগে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণা ছুড়ে দিচ্ছে একজন তার দিকে।

তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। বুঝি সবুজ জানালার ওই মানুষটি সকলকে জানিয়ে দিল।

এই গাছ দুষ্ট। এই গাছ শয়তান। একে এখান থেকে সরিয়ে দাও।

পড়ো জমির আশে-পাশের মানুষ-গুলি সজাগ হয়ে উঠল।

মানুষের মতো শয়তান হয়ে একটা গাছ মানুষের মধ্যে মিশে থাকতে পারে তারা এই প্রথম শুনল, জানল।

তাইতো, সকলে ভাবতে আরম্ভ করল, বুড়োর দল গাছের নিচে বসে পলিটিক্স আলোচনা করে, বুড়িরা যুবতীদের সংগে বসে ছেলে হওয়া না হওয়ার গল্প করে, ছেলে-ছোকরার দল গাছের কাছে এসে খেলা করে এখন গাছটা যদি ভাল না হয়, যদি তার মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে তবে তো—

কেটে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে দিতে হবে, মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেললে সবচেয়ে ভাল হয়। সাদা ফুলের মালা জড়ানো স্ফীত শক্ত খোঁপা নেড়ে জানালার মানুষটি বলল, তা না হলে এই গাছ কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না।

সবাই শুনল সবাই জানল।

শিশুরা খেলা করে। এই গাছের একটা বড় ডাল তাদের মাথায় ভেংগে পড়তে কতক্ষণ। বজ্রপাত হতে পারে এই গাছের মাথায়। আর তার নিচে তখন যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবে, সংগে সংগে তার অবধারিত মৃত্যু। অর্থাৎ গাছই বজ্রকে ডেকে আনবে। শয়তান কী না পারে। শুনে মানুষগুলির চোখ বড় হয়ে গেল।

কিন্তু সেই সবুজ জানালার মানুষটি চুপ করে থাকল না। গাছ সম্বন্ধে এতকাল যারা উদাসীন ছিল তারা আরো ভয়ংকর কথা শুনল।

কেবল বজ্র কেন, শয়তান মধ্যরাত্রে যে কোন একটি মানুষকে ডেকে নিজের কাছে আনতে পারে।

হুঁ, সকালে উঠে সবাই দেখবে সেই মানুষ ওই গাছের কোন না কোন একটা ডালে ঝুলছে।

গলায় দড়ি দেবার পথে গাছের ডাল যে একটি চমৎকার অবলম্বন কথাটা নতুন করে সকলের মনে পড়ে গেল।

ওই গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, সম্ভব হলে মূলসুদ্ধ।

হয়তো গাছের জানা ছিল না, পড়ো জমির পশ্চিম দিকের আর একটা বাড়ির লাল রং-এর জানালায় বসে আর একজন তাকে গভীরভাবে দেখছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে গাছ চমকে উঠল। এবং খুশি হল। লাল রঙের জানালার মানুষটির চোখ দুটি বড় সুন্দর। সেই চোখে ভয় আতঙ্ক ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই নেই। আছে স্নেহ প্রেম মমতা সহানুভূতি। দেখে গাছ বিস্মিত হল। কেননা কদিন আগেও মানুষটির দৃষ্টি অশান্ত ছিল চলায় বলায় চাপল্য ছিল। হাফ প্যান্ট পরে সময়ে অসময়ে তার কাছে ছুটে এসেছে, ঢিল ছুঁড়েছে ডাল-পাতা লক্ষ্য করে, পাতার আড়ালে পাখির বাসা খুঁজে বার করে ভেঙে দিয়েছে আর যখন-তখন দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছে। আজ সে মার্জিত ভদ্র স্নিগ্ধ সুন্দর। আদ্দির পাঞ্জাবির হাত দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে দু হাতের তেলোয় চিবুক রেখে জানালার ধারের টেবিলের কাছে বসে গাছের দিকে গাঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। গাছটাকে নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ নাকের কাছে তুলে ধরে গন্ধ শোঁকে, যেন গাছটাকে যত দেখছে যত ভাবছে তত সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে আনন্দিত হচ্ছে। যেন গাছকে নিয়ে ভাবনার সংগে গোলাপের গন্ধের একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। বুঝি গাছ তার কাছে গোলাপের মতো সুন্দর।

গাছ নিশ্চিন্ত হল আশ্বস্ত হল। লাল জানালার মানুষটার মুখে সবাই অন্য কথা শুনল।

এই গাছ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গাছের নিচে সকালে বিকালে মানুষগুলি একত্র হয়। একটি মানুষকে আর একটি মানুষের মনের কাছে টেনে আনছে গাছটা। তার অর্থ আমাদের সামাজিক হতে শেখাচ্ছে। গাছটা আছে বলে ছেলেরা খেলাধুলো করতে পারে। মায়ের মতো শিশুদের স্নেহ ও আনন্দ বিতরণ করছে মাঠের ওই বনস্পতি।

সত্যি সে সুন্দর।

তার ছায়া সুন্দর, ডাল সুন্দর। তাই না নিরীহ সুন্দর পাখিগুলি তাকে আশ্রয় করে সারাক্ষণ কূজন গুঞ্জন করছে। প্রজা-পতি ছুটে আসছে।

পাড়ার মানুষগুলি নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল।

পশ্চিমের লাল জানালার সুন্দর মানুষটি সেইখানেই চুপ করে থাকল না।

ইঁট, লোহা, সিমেন্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি মিথ্যা হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।

তবে কি লাল জানালার মানুষটি কবি? গাছ ভাবল। রাত্রে জানালার ধারে টেবিলে বসে মানুষটি কাগজ কলম নিয়ে কি যেন লেখে, যখন লেখে না চুপ ক বাইরে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মন্দ কথা শুনে মানুষ যেমন বিচলিত হয় তেমনি ভাল কথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হয় খুশি হয়।

তাই একজন গাছটাকে মন্দ বলতে মানুষগুলি যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, আবার আর একজন গাছ তাদের অনেক উপকার করছে শুনে শান্ত হল।

তাই তারা গাছ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু পুবের জানালার মানুষটি চুপ থাকল না। গাছ শুনল, দাঁতে দাঁত ঘসে সে প্রতিজ্ঞা করছে, যদি আর কেউ তাকে সাহায্য না করে তো সে নিজেই কুড়ুল চালিয়ে গাছটাকে শেষ করে দেবে। এই গাছ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। শয়তানকে চোখের সামনে থেকে যেভাবে [illegible] তাড়াবে।

গাছ শুনে দুঃখ পেল, আবার মনে মনে হাসল। যেন পূবের জানালার মানুষটিকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে হল, তোমার খোঁপায় ফুলের মালা শোভা পায়, তোমার চোখের কাজল, কপালের কুঙ্কুমটি চমৎকার, তোমার হাতের আঙুলগুলি চাঁপার কলির মতো সুন্দর। সুন্দর ও নরম, এই হাতে কুড়ুল ধরতে পারবে কি?

যেন পশ্চিমের জানালার মানুষটির কানেও কথাটা গেল। তার সুন্দর আঙুল-গুলি কঠিন হয়ে উঠল। গাছের বেশ জানা আছে ওই হাত, হাতের আঙুল দরকার হলে ইস্পাতের মতো দৃঢ় দৃপ্ত হতে জানে। আজ ওই হাত দিয়ে—সে কবিতা লিখছে বটে, গোলাপ ফুলকে আদর করছে—একদিন ঐ হাতে ঢিল ছুঁড়ে সে অনেক পাখির বাসা তছনছ করে দিয়েছে, গাছের ডাল ভেঙেছে, পাতা ছিঁড়েছে আর রুদ্রের মতো হাতের দুটো মুঠো কঠিন করে দোলনার দড়ি আঁকড়ে ধরে দানব শিশুর মতো দোল খেয়েছে। তাই বুঝি আজ বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, এই গাছকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে। যদি কেউ এই গাছ নষ্ট করতে আসে তাকে ক্ষমা করবে না। জীবন থেকে কবিতাকে নির্বাসন দেওয়া চলে না। যদি কেউ গাছের গায়ে হাত তুলতে আসে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে তাকে প্রতিহত করবে। গাছের গায়ে আঁচড়টি পড়তে দেবে না।

গাছ নতুন করে ভয় পেল! তাকে কেন্দ্র করে পূব ও পশ্চিমের জানালার দুটি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে না তো!

সেদিন দুপুর গড়িয়ে গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে একটা ছাগল নিচের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খেল। বিকেল পড়তে শিশুর দল হুটোপাটি করল। অগুনতি পাখি কিচির মিচির করে উঠে তারপর এক সময় চুপ হয়ে গেল। রাত্রি নামল। নির্মেঘ কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটল। হাওয়া ছিল। গাছের পাতার সর সর শব্দ হচ্ছিল। রোজ যেমন হয়। পড়ো মাঠের চারপাশের বাড়ি-গুলিতে নানারকম শব্দ হচ্ছিল, আলো জ্বলছিল। ক্রমে রাত যত বাড়তে লাগল এক একটি বাড়ি চুপ হয়ে যেতে লাগল, আলো নিভল। তারপর চারদিক নিঃসীম অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার আর অমেয় স্তব্ধতা। মাথার ওপর কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় হাওয়াটাও মরে গেল। গাছের একটি পাতাও আর নড়ছিল না।

এমন সময়।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে দিনের আলোর মতো গাছ সব কিছু দেখতে পায়। গাছ দেখল পূর্বদিক থেকে সে আসছে। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে বেঁধেছে। মালাটা খোঁপা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে। যেন যুদ্ধ করতে আসছে। এখন আর ফুলের মালা নয়। হাতে ধারালো কুঠার। গাছ শিউরে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে মানুষের পায়ের শব্দ হল। গাছ সেদিকে চোখ ফেরাল। এবার গাছ নিশ্চিন্ত হল। সে এসে গেছে। পশ্চিমের জানালার সেই মানুষ এসে গেছে। তার হাতে এখন কলম নেই। একটা লাঠি! গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি নেই। হাতকাটা গেঞ্জি। তার চোয়াল শক্ত। দৃষ্টি নির্মম। যেন এখনি সে বজ্রের হুঙ্কার ছাড়বে।

গাছ কান পেতে রইল।

বিষণ্ণ স্তব্ধতা। অনিশ্চিত মুহূর্ত।

গাছের মাথায় একটা পাখির ছানা কিচমিচ শব্দ করে উঠল। যেন কোন দিক থেকে একটা নাম না জানা ফুলের গন্ধ ভেসে এল। আকাশের এক প্রান্তের একটা তারার কাছে ছুটে গেল। একটু হাওয়া উঠল বৈ কি। নরম শাখাগুলি দুলতে লাগল।

—যেন ভিতরে ভিতরে গাছ এমনটা আশা করেছিল। তাই খুব একটা অবাক হল না।

শাড়ি জড়ানো মানুষটির অধরে হাসি ফুটেছে।

পশ্চিমের জানালার মানুষের শক্ত চোয়াল নরম হয়েছে। বজ্র নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে না।

একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মাঝখানের ব্যবধান এত কম যে গাঢ় অন্ধকারেও তারা পরস্পরের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। যেন একজন আর একজনের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনছিল।

'হাতে কুড়ুল কেন?'

'গাছটাকে কাটব।'

'লাভ কি?'

'গাছটা শয়তান।'

'গাছটা দেবতা।'

'শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্খ।'

'দেবতাকে যে শয়তানের মতন দেখে সে পাপী। তার মনে পাপ তার হৃদয়ে হিংসা। তাই সাদাকে কালো দেখে—আলো থাকলেও তার চোখে সব কিছু অন্ধকার।'

'তবে কি পৃথিবীতে অন্ধকার বলতে কিছু নেই? কালো বলতে কিছু নেই?"

'নেই।'

'এ কেমন করে সম্ভব।' হাত থেকে কুড়ুলটা খসে পড়ল ওর। ভাবতে লাগল। গাছ খুশি হল। গাছ দেখল একজন কুড়ুল ফেলে দিতে আর একজন হাতের লাঠি ফেলে দিল। 'এ কেমন করে হয়!' ভাবতে ভাবতে পূবের জানালার মানুষটি মুখ তুলে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তারার ঝিকিমিকি দেখতে লাগল। তারপর এক সময় বিড়বিড় করে বলল 'সব আলো সব সুন্দর—কিছু কালো নেই কোথাও অন্ধকার নেই এমন কখন হয়!'

'নিজের ভিতরে যখন আলো জাগে।'
'সেই আলো কী?'

'প্রেম'।

মেয়েটির চোখের পাতা কেঁপে উঠল। গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তার গলার স্বর করুণ হয়ে গেল।

'আমার মধ্যে কি প্রেম জাগবে না?'

'অভ্যাস করতে হবে, চর্চা করতে হবে।' ছেলেটি সুন্দর করে হাসল। 'ভালবাসতে শিখতে হবে।'

'তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারে নি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।

ননী ভৌমিক

মেডিকেল কলেজে পড়ি। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি যাই। বাড়ি মানে মফস্বল জেলায় একটা শহর। বাড়ি যাই আর আশ্চর্য লাগেই যে শহরটাতে বড় হয়ে উঠেছি, সেটা আসলে এত তুচ্ছ, মামুলী, এত পেছিয়ে পড়া ছিল নাকি কখনো?

শহরটা হয়ত যা ছিল তাই আছে, হয়ত বা একটু এগিয়েছে। কিন্তু আমাদের মন এগিয়ে চলেছে তার চেয়ে অনেক দ্রুত একটা গতিতে। তাই এক একবার ছুটিতে শহরে আসি, আর এক এক পোঁচ ম্লান হয়ে যায় শহরটা, এক এক ডিগ্রি তুচ্ছ। ছেলেবেলায় মোড়ের যে ঝুপসি গাছটা দেখে বিস্ময়ে চোখ ভরে উঠত, এক ছুটিতে এসে চোখে পড়ল তার মধ্যে এতটুকু অসাধারণ কিছু নেই। নিতান্ত মাঝারি আকারের একটা ধুলোভরা বট। মেথর পাড়ার যে বদরাগী ভয়াবহ মাতালটাকে দেখে পাড়াশুদ্ধ সকলে বার বার ভয় পেয়েছি আর মনে মনে অসুরের মূর্তি কল্পনা করেছি, এক ছুটিতে এসে মনে হল সে একটা নিতান্ত গ্রাম্য বিনীত বৃদ্ধ লক্ষ্মী-ছাড়া মাত্র। তাকে দেখে করুণা ছাড়া আর কোন ভয়াবহ অনুভূতির অবকাশই হবে না।

শহরের সবচেয়ে বলবান লোকটা, সব-চেয়ে সুপুরুষ বাবুটি, সবচেয়ে মাননীয় মাস্টারমশাই—বছরের পর বছর এঁরা সকলেই আমাদের চোখে এক এক পোঁচ ম্লান এক এক ডিগ্রি করে মামুলী হয়ে উঠতে লাগলেন। আমাদের কষ্ট হত, তবু মেনে নিয়েছিলাম এই হবে, কেননা আমরা তখন এক এক ডিগ্রি করে এগিয়ে চলেছি।

ফলে মা-মণিকে দেখে সেই ছেলে-বেলায় যা যা মনে হত, পরে যে আর তা মনে হবে না, সেটা জানা কথা। তবু ছুটিতে এলেই মা-মণির সঙ্গে একবার করে দেখা না করে যেতাম না। তাঁর রান্নাঘরের সামনে পিঁড়ি পেতে বসতাম, চা খেতাম কাঁসার গেলাসে, ওঁদের বাড়িতে চিনে-মাটির কাপ বড়ো একটা থাকত না।

আর গল্প করতাম। মা-মণি নিজে যেমন গল্প করতে ভালবাসতেন, তেমনি শোনার মত গল্প পেলেও ছাড়তেন না। বলতেন, 'তোরা তো আজকাল কলকাতার লোক। নতুন কি সিনেমা দেখলি বল না।' নতুন দেখা যা-কিছু, নতুন আইডিয়া যা-কিছু যথাসাধ্য মা-মণিকে শোনাতাম। অতি আধুনিক কোনো একটা ইংরেজি ফিল্ম কিংবা অতিখ্যাত কোন একটা ফরাসী উপ-ন্যাসের গল্প শুনিয়ে বলতাম, 'জানো মা-মণি, দুনিয়াটা ভয়ানক এগিয়ে যাচ্ছে। লোকে আর সুন্দর করে বানাতে চায় না, সত্যি করে বলতে চায়।'

'কিন্তু এ তোদের কি সত্যি হল রে বীরু? যে-গল্প বললি তার মানে তো এই যে ভালোবাসাটা আসলে ভালবাসা নয়, নিতান্ত স্বার্থপর একটা প্রবৃত্তি? এ কী রকম সত্যি? এ সত্যি জেনে লাভ কি?'

আমি ডাক্তারির ছাত্র। ডাক্তারি প্রমাণ দিয়ে জানাতাম, 'রকমটকম বুঝি না, লাভ লোকসানের কথা নয়, কিন্তু এই-ই হল বিজ্ঞানের আবিষ্কার। বিজ্ঞানকে গাল দাও কিংবা গ্রহণ করো, সেটা বিজ্ঞানই।'

মা-মণি বলতেন, 'হয়ত তোদের কথাই সত্যি। কিন্তু সব সত্যি তোরাই জেনে ফেলেছিস বলতে চাস? আর হলেই বা সত্যি। সত্যিই কি সব? আমি যদি না মানি?'

মা-মণি তর্ক করতেন কিন্তু কিছু না জেনে। সেই অনেককাল আগে যা জেনে-ছিলেন যা শিখেছিলেন সেইটুকুর জোরে। তারপর না পেরে, ওঠে যেতেন সংসারের এটা ওটা কাজে। কোলের মেয়েটাকে দুধ খাওয়ানো হয়নি। তার বড়োটা ধুলোর মধ্যে গড়াচ্ছে। বড়োছেলে ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকে বাড়িতে বিশেষ থাকে না। মাঝখানে ছেলেমেয়েগুলো পড়ার নামে এর ওর সঙ্গে খুনসুটি করে চলেছে অনবরত।

আর তখন অসহ্য মামুলী মনে হত মা-মণিকে। অসহ্য রকমের পেছিয়ে পড়া এক গ্রাম্য মাস্টারের মধ্যবয়সী স্ত্রী মাত্র। সংসারের অনটন আর একগাদা ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কোনো ভাবনা ভাবার ক্ষমতা যার নিঃশেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। অথচ এই মা-মণিকে আমরা একদিন কী চোখেই না দেখেছিলাম।

ইংরেজির নতুন মাস্টার এসেছিলেন প্রমথবাবু। যা পড়াতেন সবকিছুই অপূর্ব লাগত। স্কুলের পড়া ছাড়াও তাঁর বাড়িতে আমরা হানা দিতাম দল বেঁধে। আর কিছু-দিনের মধ্যেই দেখা গেল প্রমথবাবুর চেয়েও বড়ো আকর্ষণ আছে প্রমথবাবুর বাড়িতে : মা-মণি।

প্রমথবাবুকে আমরা ডাকতাম স্যার বলে। প্রমথবাবুর স্ত্রীকে কি বলে ডাকা যায় আমরা ভেবে পাইনি : গুরুমা? কাকীমা, মাসীমা? কোনোটাই ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। মা-মণিই বললেন, 'শোনো, গুরু-মা-টুরুমা নয় বাবা। কি বিচ্ছিরি সেকেলে ডাক। তোমরা বরং আমাকে মা-মণি বলে ডেকো, কেমন?'

ডাকার মতো এমন সুন্দর একটা নাম আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। উল্লাসে আমরা চেঁচিয়েছিলাম, 'ঠিক তো! কি সুন্দর নাম। মা-মণির মাথা ছাড়া এসব আর কারো কাছ থেকে বেরুত না।'

আমদের কাছে মা-মণি ছিলেন যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আধুনিক তারই প্রতীক। আমাদের যেতে দেখলে মা-মণি একটা-না-একটা কবিতার লাইন বলে আমাদের অভ্যর্থনা করতেন। আর সব কবিতা রবীন্দ্র-নাথের।

যাবো বলে কোনোদিন যদি যেতে দেরি হত, তো দেখতাম মা-মণি ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। আমাদের দেখে সুর করে বলে উঠতেন, 'ঘন্টা বেজে গেছে কখন অনেক হল বেলা...'

বাইরের ঘরে অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে প্রমথবাবু যখন তাঁর দরিদ্র আয়োজন নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠতেন, তখন অন্দরে মা-মণি খানিক রহস্য খানিক আক্ষেপে চা তৈরি করতে করতে হাসতেন, 'কোথায় বালা কোথায় মালা কোথায় আয়োজন...' আর তখন মা-মণির সংসারের সমস্ত দারিদ্র্যটুকুও যেন সুন্দর হয়ে উঠত।

আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম ম্যাট্রিক পাশ করে কে কি করব এই সব।

তখন মাঝে মাঝে সমস্ত আলোচনাটাকে এক আশ্চর্য বেদনার জগতে তুলে দিয়ে মা-মণি আবৃত্তি করতেন, 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরী মৃগ সম...

আমরা প্রায়ই তর্ক করতাম, কে সুন্দর দেখতে, কে কুৎসিত, কে ফরসা, কে কালো। আর তখন সমস্ত আলোচনা ভাসিয়ে দিয়ে মা-মণি হয়ত গুনগুন করে উঠতেন 'কালো সে যতোই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' আর বিস্ময়ে শেষ পেতাম না আমরা।

খুব বেশি পড়াশুনো ছিল না মা-মণির। কিন্তু এমন আশ্চর্য একটা মন ছিল, যা আমাদের বাড়ির, আমাদের চারপাশের বাড়ির কারো মধ্যে আমরা দেখিনি। পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আমরা হয়ত কোনোদিনই পড়ে দেখতাম না, সেই সব কবিতা যেন একটা জীবন্ত মানে নিয়ে মা-মণিকে গড়ে তুলেছিল। সেই সব না শোনা না চেনা কবিতা থেকে আমরা কিছুতেই মা-মণিকে আলাদা করে দেখতে পারতাম না।

অথচ মা-মণির চারপাশের যে জগতটা ছিল, তার সঙ্গে এই কবিতার জগতের এত-টুকু কোনো মিল থাকলেও না হয় হত। প্রমথবাবু পড়াতেন ভালো, কিন্তু হাজার হলেও তিনি ছিলেন মফস্বল স্কুলের এক মধ্যম মাস্টার মাত্র। অভাব-অনটনের শেষ ছিল না। আর ওই বয়সেই মা-মণির ছেলে-পিলে হয়ে গিয়েছিল একপাল। বড়ো ছেলে শ্যামলটা আমাদের চেয়ে বছর চার-পাঁচেক ছোটো। আর সবচেয়ে ছোটো ছেলে কেউ ছিল না। কেননা, একটা ছেলে কোলে থেকে নামতে না নামতেই দেখা যেত মা-মণি একদিন তাদের বারান্দার এক কোণে চট টাঙিয়ে খালিগায়ে কিছু ছেঁড়া ন্যাতা-কানি জড়িয়ে শুয়ে আছেন। আর অন্ধকার অশুচি আঁতুড়ঘরটার দোরগোড়ায় বসে ছানিপড়া চোখে বুড়ি ধাই কাঠকয়লার মালসায় হাওয়া দিয়ে আগুন করছে।

মাত্র এইরকম সময়ে মা-মণি কবিতা বলতেন না কোনো। কেবল অদ্ভুত তৃপ্তির এক কণ্ঠস্বরে আঁতুড়ের অন্ধকার থেকে লালচে এটা শিশুকে অল্প একটু তুলে বলতেন, 'তোদের আর একটি ভাই বাড়ল বীরু। এটা কিন্তু অন্যগুলোর মতো হবে না, না রে বীরু?'

আমরা অবাক হয়ে বলতাম, 'সত্যি মা-মণি, তোমার এ ছেলেটা ভারি সুন্দর হবে কিন্তু।' কিন্তু তখন যেটা তেমন চোখে পড়েনি, পরে সেইটাই দৃষ্টিকটু লাগতে লাগল আমাদের কাছে। মা-মণির ছেলে হওয়া, মা-মণির কবিতার সঙ্গে এই একের পর এক ছেলে হয়ে যাওয়ার যেন কোনো মিল নেই।

আমরা শুনতাম পাড়ার সকলে ঠাট্টা করত প্রমথবাবুকে : প্রমথবাবু আর কটি হবে আপনার?

প্রমথবাবু গম্ভীর হয়ে যেতেন।

ঠাট্টা হত মা-মণিকে নিয়েও। মুখের ওপর কেউ বলত না, কিন্তু আড়ালে মুখ টিপে বলত, গান্ধারী, মাত্র এগারোটি হয়েছে, এখনি কি। একশটি না হওয়া পর্যন্ত। থামে কি না দেখো।

আমরা তখন বড়ো হয়ে উঠেছি। কলেজে পড়ছি।

এমনসব জিনিস তখন আমাদের চোখে পড়ত, যা আগে পড়ে নি।

প্রথম অনুভব করলাম, মা-মণি দেখতে মোটেই সুন্দর নয়, অথচ আগে কি সুন্দরই না মনে হত মা-মণিকে। চোখে পড়ল মা-মণির চেহারার মধ্যে কেমন একটা ধসে থাওয়া ভাব আছে। কপালটা বড়ো, চুলগুলো শুধু পাতলা নয়, বিচ্ছিরি একটা টাক পড়েছে পাশ দিয়ে। চোখদুটো যেন কোনো একটা রুগ্নতার চাপে খোলের মধ্যে ঢোকা। চোখের কোণগুলোতে কিসের একটা কদর্য কারুণ্য। সেমিজের বাইরে কণ্ঠার হাড়টা উঁচু। ঘামাচি ভরা শিথিল চামড়ায় ঢাকা শরীরের সমস্ত কাঠামের মধ্যে শুধু মাঝখানতেই যা কিছু স্থূলতা। আর সবকিছুই কেমন শীর্ণ, শিথিল, বাঁকা, কুৎসিত। হাসলে চোখ দুটো এখনো ছলছল করে ওঠে, কিন্তু তাতে কেমন করুণাই জাগে বেশি করে।

ছুটিতে মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে এলে এখনো মা-মণি ঠিক তেমনি করেই কবিতার সুরে সম্ভাষণ করতেন, 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে। দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে?'

আমরা হাসতাম আর মনে হত, ঠিক এই লাইনটা ঠিক এমনি করেই মা-মণি আরো কতোবার যে বলেছেন। সে বলায় আর কোন বিস্ময় ছিল না তখন, শুধু এক জীর্ণ পুনরাবৃত্তি। শুধুই এক অভ্যাস। সে অভ্যাসকে শুধুই উনিশ শতকের ভাবপ্রবণতা। বললে ভুল বলা হবে। উনিশ শতকের ভাবপ্রবণতার একটা নকল অভিনয় মাত্র।

মাঝে মাঝে সম্ভাষণ করতে আসিতেন না। প্রমথবাবু থেকে সুরু করে একপাল ছেলেমেয়ের জন্যে হাজাররকমের সাংসারিক কাজ সেরে মা-মণি তখন নিজের আঁতুড় নিজেই তৈরি করে নিচ্ছেন। বারান্দার সেই অবধারিত কোণটিতে মন্থর পরিশ্রমে চট টাঙাচ্ছেন, খড় গুঁজছেন খুঁটির চারি-পাশে। বড়ো মেয়ে কমলকে হুকুম করছেন ছেঁড়া ন্যাতাকানি কোথায় কি আছে খুঁজে দেখতে।

আঁতুড় যাবার আগে এইরকম সময়টাতে মা-মণির হাড় খোঁচা চেহারার মধ্যেও কেমন একটু মায়া জেগে উঠত। শিথিল চামড়াগুলো টান টান হয়ে উঠত একটু। বুকটা অল্প একটু পুরু। চোখের চাউনি কেমন খানিক ঢলঢল। আর তখন আমরা গেলে কবিতা বলতেন না মা-মনি। কেমন একটা ভরা ভরা টস্‌টসে গলায় আস্তে করে বলতেন,'এসেছিস বীরু? বোস, তোরো তো বড়ো হয়ে গিয়েছিস এখন। বড়ো হবি, উন্নতি করবি। মাঝে মাঝে ভাবি আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে—একটাও যদি মনের মতো হতো! একটাও হল না।'

বলতাম, 'থাক, থাক আপনি নিজে এই অবস্থায় অত খাটবেন না। আমাকে বলুন কি করতে হবে।'

জানতাম, এর কয়েকদিন পরে এলে কি দেখব। দেখব অন্ধকারের কোণ থেকে ন্যাতা-কানি জড়ানো মা-মণি একটা লালচে শিশুকে অল্প একটু তুলে বলছেন, তোদের আর একটি বোন বাড়ল বীরু। এটা কিন্তু অন্যগুলোর মতো হবে না: না রে বীরু? আমার মন বলছে...' মা-মণির মন যাই বলুক, আমি ডাক্তারি পড়ি। মেজাজটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। বিশেষ করে প্রমথবাবুর ওপর। ভেবেছিলাম, মাস্টারমশাইকে খোলাখুলি বলব।

কিন্তু বলি-বলি করেও সঙ্কোচ আটকে ছিল। তারপর কোন সময় আবার কলকাতার ফিরে এসেছি। কলকাতার জীবনের মধ্যে ডুবে গেছি। বলা হয়নি।

বছর দেড়েক পরে আবার গিয়েছি ছুটিতে। মা-মণির সঙ্গে প্রত্যেকবারের মতো একবার আনুষ্ঠানিক দেখা করে আসতে হবে জানি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ মা-মণির বড়ো ছেলে শ্যামল নিজেই একদিন এসে হাজির হল সন্ধেবেলা।

শ্যামলটা বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রায় জোয়ান। কিন্তু সেই কবে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর পড়াশুনাও হয়নি ওর, কোনো কাজেও লাগতে পারেনি। ভেবেছিলাম, ও বলবে কোলকাতায় কিছু একটা সুবিধা করে দিন না, বীরুদা। বাবা আর টানতে পারছে না।

কিন্তু তার বদলে ও বললে, বীরুদা, আপনাকে এখুনি যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। মা কেমন করছে।

ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কেন, কি হল মা-মণির?'

শ্যামল একটু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট গলায় বললে, 'ছেলে হতে গিয়ে...

এত বড়ো এক জোয়ান ছেলের কাছে তারই মায়ের প্রসব-প্রসঙ্গ কেমন লাগছে কি জানি ভেবে তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিলাম, 'চল্ যাচ্ছি কি মুসকিল।'

জানতাম এই হবে। এইরকম একটা অঘটন না হওয়া পর্যন্ত ওদের এই গ্রাম্য অভ্যাসের সমাপ্তি ঘটবে না। গিয়ে দেখি সারা ঘর থমথমে, বোকার মত মুখ করে প্রমথবাবু বসে আছেন চুপ করে। মা-মণির মেয়ে, শ্যামলের ছোটো বোন গীতুটারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বছর দুই তিন আগে। বাপের বাড়ি এসেছে ছেলে কোলে নিয়ে। ছেলে কোলে করেই স্তব্ধ উদ্বিগ্ন ছোটাছুটি যা করার সেই করছে। আর সেই বারান্দার কোণে ঠিক তেমনি করেই ছেঁড়া চট আর খড় বাখারি দিয়ে অশুচি একটা অন্ধকার কোণ রচনা করা ঠিক সেই আগের মতো। শুধু আগের আগের বারের মতো সেখান থেকে মা-মণির ফিসফিসে ডাক শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে শুধু থেকে থেকে এক বিকৃত যন্ত্রণার গোঙানি।

ঘৃণায় প্রমথবাবুর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এখুনি।

জানতাম, শহরের যে সব সরকারী হাসপাতালটার নিয়ে যাবার কথা বলছি, সেখানে শহরে ভদ্রলোকেরা এখনো যেতে সাহস পায় না তবু এই অন্ধকার নরক আর বুড়ি ধাইয়ের চেয়ে সেটা শতগুণ ভালো।

দুই দিন দুই রাত্রি ঘুম ছিল না আমার। এখনো পাশ করে বেরুই নি তবু মফস্বল হাসপাতালের সরকারী ডাক্তারদের কাছে খাতির ছিল আমার। দুদিন পর একটি [illegible]পুষ্ট মরা ছেলেকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে প্রমথবাবুর কাছে এনে দিলাম, 'যান সৎকার করে আসুন গে! আরো ছেলে চাই আপনার? আশ্চর্য!' আমার গলার স্বরে ঘৃণার তিক্ততাটুকু একটুও চেপে রাখার চেষ্টা করিনি আমি। প্রমথবাবুর প্রায় বৃদ্ধ নির্বোধ মুখটা খালি বিহ্বলের মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিছু বললেন না। বললেন রাতে, মা-মণি বাঁচবে এইটে জানার পর।

'বীরু, তুই ভেবেছিস এ বুঝি আমার জন্যে? নারে, আমি চাইনি। এতগুলো ছেলে মেয়ে কোন বাপে চায়? এতগুলো পেট' একটাও কি মানুষ হচ্ছে? একটাও মানুষ করে যেতে পারব না। কিন্তু......ও যে মানে না। ও তবু চায়।......আমি কি করব যদি......'

আমি চমকে উঠেছিলাম, 'ও মানে মা-মণি? কেন?'

প্রমথবাবু বিড়বিড় করে এলোমেলো কি সব বললেন পরিষ্কার হল না। শুধু কীরকম একটা অদ্ভুত অস্বস্তি মনের মধ্যে বিঁধে রইল কেবল।

মা-মণির যখন জ্ঞান হল, রূঢ়ভাবেই বললাম, 'এইবার খুব বেঁচে গেছো মা-মণি। কিন্তু আর যদি ছেলে হয়, বাঁচবে না!'

মা-মণি আমার মুখের দিকে চেয়ে তারপর কি যেন খুঁজলেন। আমি জানতাম কি খুঁজছেন। বললাম নেই, ওটা বাঁচেনি। কিন্তু এর পরের বার তুমিও বাঁচবে না, বুঝেছো?

মা-মণি তাকিয়ে রইলেন শুধু।

কিন্তু অসহ্য একটা রূঢ়তা পেয়ে বসেছিল আমাকে। আমি বলেই চললাম, 'তুমি বুড়ি হয়ে গেছো মা-মণি, বুঝেছ? আর কেন? আর হবে না, তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে বুঝেছ?'

রূঢ়ভাবে যেটা বলেছিলাম, সেটা আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই বলেছিলাম। ছুটি শেষ হয়ে গেলে যাবার আগে মা-মণিকে আরও একটু নরম করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাপারটা। মা-মণি চুপ করে রইলেন। বললাম, 'কি ভাবছো?'

মা-মণি ম্লান হাসলেন, 'তাহলে মরে যাবো বলছিস?'

বললাম 'হাঁ!'

'তোমার দেহটা আমরা পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখেছি। দেহের একটা নিয়ম আছে তো। সে নিয়মকে মানতে হবে।'

'দেহের সব সত্যি তোরা জেনে ফেলেছিস বলতে চাস?'

'হাঁ, মা-মণি, হাঁ অন্তত এটা জেনেছি।'

মা-মণি চুপ করে রইলেন একটু।

'আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে। সবকটাকে কি ভালোই না বাসি বীরু। সবকটাকে! যেটা মরে গেলো সেটাকে দেখিনি, তবু সেটাকে ভালোবাসি কেমন। বড় থেকে ছোটটা সবাইকে তবু কি মনে হয় যেন ভারি সুন্দর একটা ছেলে হবে আমার। ছেলে হোক মেয়ে হোক, এমন সুন্দর একটা কিছু হবে, যা আর কারো মতো নয়। কেমন এক ধরনের স্বপ্নের মতো এমন কি একটার জন্যে যে আশা করে থাকি! যেগুলো হয়েছে সেগুলো ভালোবাসি ভীষণ, কিন্তু তবু আশা করি অন্য একটার...

আমি জোর করে প্রসঙ্গটা ফিরিয়ে এনেছিলাম চিকিৎসা-শাস্ত্রে।

'কিন্তু যা বলেছি মনে থাকে যেন।'

মা-মণি ছলছল চোখে সুর করে বলেছিলেন,

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না—'

তিন বছর পরে আবার ফিরেছি দেশে। মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম মা-মণি অসুস্থ। ঘরভর্তি একপাল ছেলেমেয়ে। শ্যামল আমাকে দেখে দৌড়ে এল, 'বীরুদা' দেখুন আপনি যদি পারেন বোঝান। আমরা পারলাম না। লজ্জা সরম ফেলে রেখে আমি, গীতু, গীতুর ছোটোটা সবাই মিলে রোজ মাকে বোঝাচ্ছি। কিন্তু মা কিছুতেই শুনবে না। ডাক্তার বলেছে, এখনো সময় আছে ...। কিন্তু মা.....'

'তার মানে!' আমি চমকে উঠলাম,

'আবার?'

'হাঁ'

ত্রস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম মা-মণির শিয়রে। মা-মণি না কোন অচেনা কুৎসিত এক প্রৌঢ়। ফ্যাকাশে চামড়া, খোঁচা খোঁচা হাড়, শাদায় ছিটে লাগা পাতলা চুল। অন্য অন্য বার তবু একটু অস্থায়ী মায়া নামে চোখে মুখে, একটু ভরাট হয়ে ওঠে বুক। এবার তাও নয়।

শুয়ে শুয়ে মা-মণি গীতুকে দিয়ে যা যা দরকার জোগাড় করে রাখছিলেন— 'ওরে গীতু, ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো ফেলিস না মা। রেখে দিস। শ্যামলটা যদি কিছু নতুন চট নিয়ে আসে...'

আমাকে দেখে মা-মণির ফ্যাকাশে মুখখানাতেও কেমন একটা অপার্থিব উচ্ছ্বাস দেখা দিল—'বীরু, তুই এসেছিস। আয় তুই বলেছিলি হবে না, কিন্তু দ্যাখ...'

আমি জবাব দিলাম না। আমি জানি মা-মণি যে শয্যায় পড়ে আছেন সেটা মৃত্যুশয্যা। কোন ধন্বন্তরির হাত নেই তা রোখে।

'তুই বলেছিলি, সব সত্যি তোরা জেনে ফেলেছিস, হয়তো দেহটার কলকব্জা জানিস, কিন্তু মা-কে তোরা জানবি কি করে?'

আমি চুপ করে রইলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম এক অদ্ভুত স্বপ্নাতুর ফিসফিসে আওয়াজে, 'আমি মরে যাবো বলছিস?... কিন্তু এবারকার ছেলেটা হয়ত অন্যগুলোর মতো হবে না। না রে বীরু? আমার মন বলছে.....'

সেই অনেক—অনেক কাল আগে মা-মণি যখন দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিল, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন মা-মণি ঠিক যেমন সুরে একটা লালচে কাঁচ বাচ্চাকে অল্প একটু তুলে ধরে আমাদের বলতেন, অবিকল সেই সুরে।

জানি না কখন নিজের অজ্ঞাতে আমিও বলতে শুরু করেছি, 'সত্যি মা-মণি, এটা কিন্তু সত্যিই ভারি সুন্দর হবে... ।'

আমার দুচোখ দিয়ে কখন জল পড়তে শুরু করেছিল আমি জানি না।

ইচ্ছার দাম

বুদ্ধদেব গুহ

অরা বললো, তুমি ত কিছুই খেলে না, আমার খাওয়া বেশি হয়ে গেল। এই বলে ডিভান ছেড়ে উঠে ও জানালার কাছে গেল, একটু দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ডিভানে ফিরে এসে বালিশটা টেনে নিয়ে আধশোয়া ভঙ্গীতে বসলো। বললো, রীতিমত গরম পড়ে গেল। না?

রাজা বললো, বেশ। তবে তোমাদের হাজারীবাগের গরম কিন্তু আমার ভাল লাগে---বেশ শুকনো গরম---মনের আর্দ্রতা সব শুষে নেয়।

তোমার মনে আর্দ্রতা আছে নাকি?

আমার কথা ত বলিনি। যাদের মন আছে, তাদের কথা বলছি।

তারপর ওরা দুজনে কেউই আর কোনো কথা বলল না।

অরার মা-বাবা খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমিয়েছেন। কাবুলি বিড়ালটি আদুরে আদুরে চোখ করে অরার ঘা-ঘেঁষে বসে আছে। রাজা জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। ক্যানারী পাহাড়টি রোদে আর ধুলোর ঝড়ে কেমন মেঘলা দেখাচ্ছে---শুকনো শালপাতাগুলি উঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে গরম হাওয়াটা জঙ্গলের দিক থেকে ছুটে আসছে। বাইরের গেটে বোগোনভেলিয়ার ফুলেভরা ডাল হাহাকার তোলা হাওয়ায় উথাল-পাথাল করছে। গেটের পাশের বাঁদর লাঠির গাছটির পাতা নড়ছে; পাতা ঝরছে।

এমন সব উষ্ণ হাহা-করা দুপুরে রাজার ইচ্ছা করে ও একটি শুকনো শালপাতার মতো উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে এই হতাশ হাওয়ায় ভর করে কোনো শান্ত নির্লিপ্ততে সমর্পিত হয়। তারপর কোনো ক্ষীণ খয়েরী নদীর বালিতে অথবা কোনো রুক্ষ কালো পাহাড়ের পায়ে ও পড়ে থাকে। আর চলতে হয় না, ভাবতে হয় না, আর জ্বলতে হয় না তাহলে। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে একদিন প্রস্তরীভূত হয়ে যেতে পারে।

অরা বললো, কি ভাবছ? বাইরে তাকিয়ে?

কিছু না। যদি বা ভাবতামও, ভাবনা ত কাউকে দেখানো যায় না।

দেখাতে চাও না, তাই দেখানো যায় না।

তা হলে তাই।

রাজা আর কথা বললো না। একটা সিগারেট ধরালো। কথার খেলা আর ভাল লাগে না। বহুদিন হল। যখনি ও আজকাল অরার কাছে আসে, ওর সঙ্গে কথা বলে, চোখে চায়, রাজার সমস্ত শরীর জুড়ে কি একটা জ্বালা কাঠের আগুনের মত জ্বলে---ঠোঁটটা শুকিয়ে আসে---বুকটা হায় হায় করে। রাজার মনে হয়, কোনো কোনোদিন অরারও নিশ্চয়ই ওরকম অস্বস্তি হয়। ও বড় চাপা মেয়ে। ওর মুখ দেখে কিছু বোঝা সহজ নয়। ওর বুকে ঝড় উঠলেও মুখ প্রশান্ত থাকে। তবু রাজার বহুদিন মনে হয়েছে---ওরা দুজনে একটি টাব-পেয়ারে বসে দাঁড় টানছে ইচ্ছার জলে। রাজার হাতে স্ট্রোকের দাঁড় আর অরার হাতে বো সাইডের। ওরা দুজনেই সমানে দাঁড় টেনে চলেছে, কিন্তু কোনোদিন একসঙ্গে জল কাটেনি। কক্সে কে আছে, রাজা জানে না। ভগবান টগবান গোছের কোনো শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সে কোনোদিন তাদের দুজনকে একসঙ্গে দাঁড় ফেলতে দেয়নি। সীংক্রোনাইজেশান নামক ঘটনাটি ঘটেনি ওদের দুজনের জীবনে। একজন যখন খুব একান্তভাবে অন্যজনকে চেয়েছে, তখন সে কুঁকড়ে থেকেছে। আবার সে যখন হাত বাড়িয়েছে, জোরে দাঁড় ফেলে শক্ত হাতে জল কেটেছে, অন্যজনের দাঁড় তখন জলেই নেই। কার অভিশাপে এমন হয়েছে, রাজা জানে না, অরা জানে কিনা অরাই জানে।

রাজা অরার দিকে তাকালো। একটা শাদা ছাপা ভয়েলের শাড়ি পরেছে আজ, মধ্যে হালকা নীলের চাকতি বসানো। একটা নীলরঙা ফুল গুঁজেছে বেণীতে। বালিশে ভর করে আধো শুয়ে আছে। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাজা হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল যে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। সব নেবে অথচ কিছুই দেবে না---এ বরাবর চলতে পারে না। ঘুমোবার সময় তার মুখ ভেবে ঘুমোবে, ঘুম ভেঙে প্রথম তার মুখ মনে পড়বে---পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারবে না, কারণ অনুক্ষণ সে-ই একা রাজার মন-জুড়ে চোখ ভরে আছে---অথচ অরা তাকে বরাবরই এমন সাপের খোলসের মত শীতলতায় মুড়ে রাখবে, এ হতে পারে না। রাজা ভাবলো, আজ মনে মনে অরাকে ঘেরাও করে ফেলবে। আজ তার এতদিনের দাবি মেটাতেই হবে।

রাজা বললো, বইটা এখন রাখ, আমার দিকে তাকাও।

অরা দুটি উজ্জ্বল চোখ তুলে বললো, কি? হলটা কি?

কি হল তুমি জান না?

না। অসভ্যতা করবে না। প্লিজ, তুমি এমন কিছু চেয়ো না যাতে তুমি সকলের সমান হয়ে যাও। তুমি জান না রাজা, তুমি আমার চোখে কত বড়। তোমাকে ত কতদিন বলেছি।

রাজা বললো, অসাধারণ হয়েই ত এতদিন কাটিয়ে দিলাম। তাতে লাভ হল না এককণা, নিজের মধ্যের জ্বালাটা কেবল বেড়েই চললো। তোমার কোনো ধারণা আছে, তুমি আমাকে কতখানি যন্ত্রণা দিয়েছ এতদিন, এত বছর, প্রতিটি মুহূর্ত?

অরা মুখ নিচু করে বললো, আমি ত দিতে চাই না---তোমাকে একটুও যন্ত্রণা দিতে চাই না। আসলে তুমি যন্ত্রণা পেতে ভালবাস। এ তোমার একটা বিলাস---বেদনা-বিলাস। বলে অরা ওর বিড়ালটির নরম গায়ে হাত বোলাতে লাগলো।

রাজা সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে রাখতে রাখতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কথা বলল না।

অরা বালিশটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসে বললো, কি? বাবুর রাগ হল বুঝি? তুমি আমাকে মুখে মুখেই ভালোবাসো। সত্যিই ভালোবাসলে তুমি আমার ইচ্ছার দাম দিতে।

রাজা তবুও কথা বললো না, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো।

এই ইচ্ছার দামের কথা অরা অনেকদিন রাজাকে বলেছে। একমাত্র রাজাই জানে যে, অরার ইচ্ছার দাম কতভাবে এবং কিসের বিনিময়ে ও দিয়ে এসেছে। তবু অরা ওকে

বারে বারে স্মরণ করায় তার ইচ্ছার দামের কথা। অথচ রাজার যেন কোন ইচ্ছাই নেই; থাকতে পারে না। রাজা যেন ভগবান, যেন ও রক্তমাংস শরীর হৃদয়ের কোন সাধারণ মানুষ নয়। রাজার ইচ্ছা ছিল ও এয়ার ফোর্সের পাইলট হয়, কিন্তু বাবার ইচ্ছার দাম দিতে ও সলিসিটর হয়েছে। রাজার খুব ইচ্ছা ও মালিনীকে ব্যথা না দেয়, কিন্তু মার ইচ্ছার দাম দিতে ও মালিনীকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যথা দিয়েছে। আর আজ রাজার নিরুপায় ভালবাসাকে অরা প্রতি মুহূর্তে পায়ে মাড়াচ্ছে— ওকে তার ইচ্ছার দাম দিতে বলছে, বলছে ঠাকুরঘরের ভগবান হয়ে চিরদিন ওর মনের জগতে বাস করতে! মনটাই সব, শরীরটা শুধুই ঘৃণার এমন কথা বলে বলে বলে বলে, রাজার নিজের শরীরের উপরও অরা একটা ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছে, এই পৃথিবীতে কেই বা কার ইচ্ছার দাম দেয়? কোন নির্জন দুপুরের ফিরিওলার মতো মনের ডালিতে তার সমস্ত সুগন্ধ ইচ্ছার ফুলগুলি সাজিয়ে রাজা কতদিন ফিরি করে ফিরেছে। কেউ তার ইচ্ছার কোনো দাম দেয়নি। তার সব ইচ্ছার ফুল রোদের তাপে এক এক করে শুকিয়ে গেছে। তবুও তার কাছে সকলে ইচ্ছার দাম দাবী করে এসেছে। এবং ও এমনি বোকা, এমনি হৃদয়বান যে সকলের ইচ্ছার দাম দিতে দিতে সে নিজেকে বারবার বঞ্চনা করেও দিয়ে এসেছে। 'ইচ্ছার দাম' কথাটা শুনলেই আজকাল ভীষণ রাগ হয়ে যায় রাজার। ও সাধারণ, সাধারণ হয়েই থাকতে চায় কিন্তু অরার কাছে এলেই অরা ভাল দোকানের ম্যানেজারের মতো হেসে হেসে, রাজাকে ছোট ছেলে ভেবে মহত্ত্বের মোহন মুখোশ পরিয়ে দেয়। প্রতিবার রাজা মহত্ত্বের মুখোশ পরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। এমন করে সে আর ফিরবে না। এমন করে দিন আর কাটছে না।

হঠাৎ অরা বললো, জানো? তোমাকে বলতে ভুলে গেছিলাম—সেদিন এক কাণ্ড হয়েছে। গত মাসে যখন কলকাতায় গেছিলাম, এষা, কোয়েল, মুনিয়া ওরা সকলে ধরলো, চাইনীজ খাওয়াতে হবে। পার্ক স্ট্রীটে খেতে গেলাম। খাওয়ার পর যখন বেরোলাম, তখন দেখলাম কি জানো?

কি?

অরা একটা ভাবলো, বললো তোমাকে বলছি, কিন্তু তুমি আর কাউকে বোলো না।

রাজা বললো, তুমিই যে সকলকে বলবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি বলবো না সে সম্পর্কে নির্ভয়ে থাকতে পারো।

বলছি কিন্তু তা হলে—দেখলাম রঘুদা—মানে রিণিদির বর, ডেড ড্রাঙ্ক হয়ে একটা বার থেকে বেরোলো—সঙ্গে একটি দারুণ ফিগার কিন্তু খারাপ মুখের মেয়ে—মেয়েটা হাঁটতে পর্যন্ত পারছিল না—এমন বেহুঁস। ট্যাক্সি—ট্যা—ক্সি করে দুবার ডাকলো, তারপর ট্যাক্সিতে এমনভাবে দুজনে উঠে চলে গেল যে তোমাকে বলতে পারছি না। ফুটপাতে ভীড় জমে গেল। এষারা ওদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো—আমি লজ্জায় রঘুদাকে যে চিনি এমন কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না। কী খারাপ। তাই না? ঈস্ বেচারী রিণিদি।

রাজা বললো, তুমি যদি আমায় কোনোদিন এমনভাবে দেখো, আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হবে?

অরা চোখ বড় বড় করে বললো, ধারণা মানে? তোমার সঙ্গে কোনোদিন কথাই বলবো না। বাড়ি ঢুকলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

রাজা হাসলো, বললো, এইখানেই তোমাদের সঙ্গে পার্বতীদের অমিল। দেবদাসকে দেখে পার্বতীর অন্তত দয়া হয়েছিল। তোমাদের দয়াও নেই।

না, নেই। ও রকম উপমা আজকাল চলে না। শরৎ চ্যাটার্জির সময়ের দেবদাসেরা আজকাল আর জন্মায় না। তুমি কি বলতে চাও যে রঘুদার সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে রঘুদার কোনো ইমোশনাল কানেকসান ছিল? তবে? দেবদাসের মত যদি শুধু মদ খেয়ে একজনের দুঃখ ভোলার জন্যে মরে যেত, তা হলে তার কেসটা কনসিডার করা যেত—কিন্তু এ সব ত অত্যন্ত নোংরা ব্যাপার, বাজে ব্যাপার—রঘুদা ভালোবাসার কি জানে?

রাজা আবার হাসলো, বললো, তোমার ভয় নেই। আমি চেষ্টা করেও কোনোদিন রঘুদা হতে পারবো না—কারণ তোমরা যাকে গাটস বলো আমার হয়তো সেটাই নেই, তা ছাড়া হয়তো আমি ঐ যুক্তিতে বিশ্বাস করি না। এক মুহূর্তের জন্যে যাকে তাকে পেয়ে খুশী হবার চেয়ে সারাজীবন একজন বিশেষ কাউকে চেয়ে দুঃখ পাওয়া ভাল। পাওয়াটাই ত সব নয়, কি পাব সেটাই সব। অরা, তোমাকে ভালোবেসে আমার ইহকাল পরকাল সব গেল। তুমি আমার ভালোবাসা দুহাতে ঠেলে সরালে আর আমি অন্য সকলের ভালোবাসা কাঁচের বাসনের মতো হাত থেকে ফেলে দিলাম। মজাই লাগে ভাবলে।

অরা কোনো জবাব দিল না। চুপ করে গর্বিত চোখে রাজার মুখে চেয়ে রইলো।

দুজনে আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। কথায় কথায় বিকেল গড়িয়ে গেল।

হঠাৎ রাজা বললো, এই, আমার কাছে এসো।

না। বলছি না অসভ্যতা কোরো না, বললো অরা।

কিন্তু রাজার মনে হলে, অরার মুখে সেই মুহূর্তে ও কি যেন এক অজানা আবীর দেখতে পেল যা ও আগে কোনোদিন দেখে নি—যে কোনো কারণেই হোক—এই জ্বালাধরা দুপুরে ওর কাবুলি বিড়ালের মতো অরার নিজেরও বোধহয় একটু আদর খাবার ইচ্ছা হল। কিংবা নিজেকে তাই বোঝালো রাজা। রাজা হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে অরার কাছে যেতে গেল। যাবার আগে জানালার পর্দাগুলি টেনে দিতে গেল। এই অবকাশে অরা দৌড়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালো।

রাজার সমস্ত বুকে রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগলো, কোনোদিন ওর এমন হয়নি—কোনোদিন না। ও ডাকলো, অরা। অরা উত্তর দিল না—বারান্দা থেকে বিড়ালটি মিঁয়াও করে উঠলো। আবার রাজা ডাকলো, অরা, এ ঘরে এসো। অরা উত্তর দিল, বললো, কি? কিন্তু ঘরে এলো না। রাজা আরও একবার ডাকলো। এবারে অরা এসে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো—অরা একটু সামনে ঝুঁকে রাজার আদর খেলো—তারপর ফিস-ফিসিয়ে এক নিঃশ্বাসে বললো, মা উঠে গেছেন; মা উঠে গেছেন। ছাড়ো। পরক্ষণেই ঘর ছেড়ে ও দৌড়ে পালিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ রাজা একা একা বসে থাকলো পর্দাটানা ঘরে।

তারপর অরাকে খুঁজতে খুঁজতে দেখলো অরা তার পড়ার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।—এখনো উত্তেজনায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। রাজা ডাকলো, অরা। অরা মুখ না ফিরিয়েই ধীরে ধীরে বললো, কেন এমন করলে? তুমি ভারী অসভ্য; ভীষণ অসভ্য। আজ তুমি আমার চোখে সকলের সমান হয়ে গেলে রাজা, তুমি আমার ইচ্ছার দাম দিলে না।

রাজা ভেবেছিল হয়তো অরা কাঁদবে, ভেবেছিল ওকে ঘৃণা করবে, ওকে চলে যেতে বলবে, কিন্তু অরা কিছুই করল না—কেমন এক রহস্যময় হাসিতে মুখ রাঙিয়ে আবার বললো, আজ থেকে তুমি ছোট হয়ে গেলে। ঈস্ কেন এমন করলে?

রাজা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো।

স্মিথ সাহেবের বাড়ির বাগানে কত রকম ফুল ফুটেছে—ফিকে বেগুনী রঙা ফুলের থোকা হাওয়ায় দুলছে গোলাপি আকাশের পটভূমিতে। গয়ার বাসটি গোঁ-গোঁ করে লাল ধুলো উড়িয়ে নির্জন পথ বেয়ে আচমকা চলে গেল।

রাজা কোনো জবাব দিল না।

রাজার ঠোঁটে এখনো অরার ঠোঁটের মিষ্টি আমেজ ছিল। ওর বুকের কাছে আবার ছিপছিপে শরীরের ভাপ তখনো ফুলের গন্ধের মতো ভাসছিল। অথচ সেই মুহূর্তে রাজার ভীষণ কান্না পেল। এতদিন ত সে যন্ত্রণায় আতুর হয়ে ছিলই, কিন্তু সে যন্ত্রণায় কেমন এক গভীর আনন্দও ছিল কিন্তু আজকের এই পাওয়া—এই উষ্ণতা, এই সুবাস—সবকিছুতে কেমন যেন একটা দুঃখ আছে, হীনমন্যতা আছে। এতদিন ও বরাবর অরাকে অপরাধী করে এসেছিল, আজকে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতে লাগলো। রাজার খুব ইচ্ছা করলো যে অরাকে বলে, আমার পুরোনো মহত্ত্বের ছিঁড়ে যাওয়া মুখোশটা নিজে

হাতে আবার আমাকে পরিয়ে দাও। ওর বলতে ইচ্ছা করলো, অরা, তোমার সব রঙিন ইচ্ছাগুলোকে আমি মাছরাঙা পাখির ডিমের মতো একটি একটি করে আমার প্রেমের উত্তাপে ফুটিয়ে তুলবো একদিন না একদিন। তুমি দেখো অরা, তুমি দেখো। তোমাকে যে আমি সত্যিই ভালোবেসেছি অরা, এত ভানমাত্র নয়। কিন্তু মুখর রাজা এখন মুখে কিছুই বলতে পারল না, কোনো রকমে বাধো বাধো গলায় বললো, চলি।

প্রতিদিন অরা বারান্দা অবধি এগিয়ে দিতে আসে, কী সুন্দর হাসি হাসে, বলে রাজা এসো। আজ আর এল না, কিছু বললোও না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, জানালার সামনে তেমনি উদাস চোখে দাঁড়িয়ে রইলো।

গেট পেরিয়ে নেমে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা বিছানো পথে মুখ নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে রাজা ভাবতে লাগলো। নিজেকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ও হাঁটতে লাগলো, সত্যিই কি অরার ইচ্ছার দাম ও দেয় নি? ইচ্ছার দাম। সত্যিই কি দেয় নি?

হওয়ায় বোগোনভেলিয়ার নাচ দেখতে দেখতে অরা নিজের মনে হেসে উঠলো, মনে মনে বললো, অসভ্য, রাজাটা ভীষণ অসভ্য।

তারপর হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে মাকে ডাকলো, বললো, ওমা, ওঠো না, বাইরে এসে দেখ আজকের বিকেলটা কী সুন্দর।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ-সংক্ষেপ করবার জন্য এই গলি-পথটা মাঝে মাঝে পার হতে হয় সুবিমলকে। সন্ধ্যার পরও কতদিন সে হেঁটে গেছে এই অপরিসর পথ ধরে সম্পাদক বন্ধুর বাড়িতে। কোন কিছু ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পথ চলা।

ছোট্ট গলি। গলির মুখেই ক্ষুদ্রকায় একটি পান-বিড়ি-লেমোনেডের দোকান, এক ঝলক আলো এসে পড়েছে সেখান থেকে রাস্তার ওপর। এই আলোটুকুর পরেই অন্ধকার। কিছুটা অংশ জুড়ে অবশ্য। তার পরেই আবার একটি দোকান টিনের চালার নিচে বোঞ্চ পাতা—চা-ফুলুরি প্রভৃতির দীন আয়োজন। আবার পথে এসে পিছলে-পড়া আলো। এই আলোতেই বড় রাস্তা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে হাঁটা যায়। বড় রাস্তায় সারি সারি আলোর প্রহরী, রিক্সার টুং-টাং, বাস অথবা ট্যাকসির ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে-চলা।

গলির যেটুকু অংশ অন্ধকার — সেই অংশেই আবছা আলোয় ওরা দাঁড়িয়ে থাকে সময়-সময় চিত্রার্পিতের মত মনে হয়। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় একযোগে নীরব হয়ে যায় পথ-চারী আগন্তুকের পদশব্দে, অসীম ঔৎসুক্যে তাকায় গলির মুখে বৃত্তাকারে পিছলে-পড়া আলোর দিকে—যারা আসছে, চকিতের মধ্যে সেই আলোয় দেখে নেয় তাদের চেহারা, কখনো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। মনে-মনে সূক্ষ্ম একটা প্রতিযোগিতার ভাবও অনুভব করে, এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কে কার থেকে দেখতে একটু সুন্দরী বেশী, কার প্রসাধনে পারিপাট্য জেগেছে আজ, কজ্জল-রেখায় কার চোখে ঔজ্জ্বল্য জ্বলছে বেশী? পথচারী নির্বিকার চিত্তেই ওদের পার হয়ে যখন আবার গিয়ে পড়ে আলোর বৃত্তের মধ্যে, তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সমবেদনায় মদির হয়ে ওঠে ওদের মন — এর-ওর মেকী সোনার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা মায়া জাগে ওদের অন্তরে। কিন্তু তাও ক্ষণিকের। আলোর বৃত্তে দেখা যায় নতুন আগন্তুক, আবার মন ভরে ওঠে নতুন প্রত্যাশায়। মন্থর গতিতে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসে পথিক—লক্ষ্য করে মুহূর্তের জন্য একটা শিহরণ কেঁপে যায় সারা শরীরে, ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা হয়ে ওঠে লীলায়িত, — কটাক্ষে জ্বলে বাঁকাদৃষ্টি, মনে-মনে হিসাব করে টাকার অঙ্ক। একটু ভালো খাবার — ভালো থাকবার উচ্চাশা মুহূর্তের জন্য তরঙ্গ তুলে আবার মিলিয়ে যায়।

দিনের পর দিন। সকলের অবস্থা অবশ্য সমান নয়, ওরই মধ্যে একটু অর্থ-নৈতিক তারতম্য আছে। কারুর ঘর বেশী সাজানো, কারুর কম। কারুর ঘর বড়, কারুর ঘর ছোট। কারুর বাড়িতে বৈদ্যুতিক নীল বাতি জ্বলে, কারুর বাড়িতে কালিপড়া লণ্ঠন। হয়তো একই বাড়িতে এ-ঘরে বিদ্যুৎ, ও-ঘরে লণ্ঠন। কারুর তিন-চার মাস একাদিক্রমে বিদ্যুৎ জ্বলবার পর অবশেষে কেরোসিনের বাতি। ভাড়া বাকী পড়ায় বাড়িউলার লোক বাল্ব খুলে নিয়ে গেছে সম্ভবত। তবু, এরই মধ্যে নিত্যকার প্রসাধন, নিত্যকার হেসে কথা বলা।

ভাবুক বলে বন্ধু মহলে খ্যাতি আছে সুবিমলের। একটা আত্মভোলা কবি মন। হিসাব কষা সংসারে এই বেহিসেবী লোকটাকে জীবনমূল্য দিতে হয় নি কম, তবু আজও হিসেব সে ভুল করে, আজও দুঃখ পায়।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি ঘন হয়েছে রীতি-মত। আকাশটাও কালো। পথ চলতে-চলতে মেঘের সে কালিমা আরও ঘনীভূত হল, ওর তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। বড় রাস্তা দিয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে, দু-এক ফোঁটা বর্ষণের আভাস পাওয়া গেল। তখনো থামে নি সুবিমল সংক্ষিপ্ত পথটা ধরে সম্পাদক বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে যাবার আশা পোষণ করছে সে।

তাড়াতাড়িতে গলিতে ঢুকে পড়ে বিজলী উজ্জ্বল দোকানটা পার হল সুবিমল। কিন্তু হিসাবে ভুল হল। ঝম-ঝম করে নামল বৃষ্টি। সঙ্গে বর্ষাতি নেই, কিছু নেই। ছুটে যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে হল সুবিমলকে, সেটা অন্ধকার এলাকারই মধ্যে। একটা কোঠাবাড়ির অ্যাসবেস্টাস-ছাওয়া চাল খানিকটা রাস্তার দিকে নেমে এসেছে, তারি নিচে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে ভালো করে তাকালো সুবিমল। জল লেগে ঝাপসা হয়ে-যাওয়া চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে রুমালে মুছে নিতে লাগল তার পুরু কাঁচ।

কিন্তু বৃষ্টি এল আরও জোরে। অ্যাস-বেস্টাস-ছাওয়া চালের কিনারের নিম্নদেশ থেকে কাছাকাছি অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চট করে ছুটে যাওয়া যায় কিনা, সন্ধানী চোখ মেলে দেখতে লাগল। বৃষ্টির ছাট যেন তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত এসে বিঁধে যাচ্ছে গায়ে। না কি খানিকটা এগিয়ে ভিজে-ভিজেই যাবে চায়ের দোকানটার মধ্যে? ভরসা করা যায় না, যে বৃষ্টি, আগাগোড়া ভিজে যেতে হবে একেবারে। যেমন বৃষ্টি তেমনি হাওয়া। ওখান থেকে দেখতে পেল সুবিমল, দোকানের সামনে দিয়ে আসতে গিয়ে জনৈক পথচারীর খোলা ছাতাটা হাওয়ায় গেল উল্টে, ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে ঢুকে গেলেন দোকানে। ছাতা থাকলেও দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি থেকে বাঁচত না সুবিমল। কী করবে না করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না সে, এমন সময় হঠাৎ কানে এল কেমন মৃদু একটা কণ্ঠস্বর — ভিতরে আসুন না?

রীতিমত চমকেই তাকাল সুবিমল। ডান দিককার দরজাটা খুলে কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, তাকে লক্ষ্য করে পুনরাবৃত্তি করছে তার সম্ভাষণের।

একটা অবিশ্বাস্য ভীত মুহূর্ত শিউরে উঠে মিলিয়ে গেল স্নায়ুর তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে। মেয়েটি দরজা ছেড়ে দু-এক পা এগিয়ে এল মনে হল যেন। বলল—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? বসুন না ভিতরে এসে?

বৃষ্টির ধারা তখন আরো ঘন, হাওয়ায় তখন আরো জোর। বৃষ্টি ও বাতাস মিলে সারা গলিটাকে কুয়াশার ঝাপসা করে তুলেছে। অনেকটা স্বপ্নচালিতের মতই ভিতরে প্রবেশ করল সুবিমল। এক ফালি উঠোনের মত পাশে-পাশে ব্যারাকের মত ঘর। কয়েকটি ঘরের দরজা থেকে উঁকি দিল আরও কয়েকটি মেয়ের মুখ। হয়তো তারা আশ্চর্যও হয়েছে, হয়তো-বা হয় নি। কে একটি মেয়ে বললে—তোর বাবু এল না কিরে স্বপ্না?

উঠোনে পাতা ইঁটের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে মেয়েটির ঘরে ততক্ষণে এসে গেছে সুবিমল। সঙ্গিনীর প্রশ্নে একটু হেসে উত্তর দিল মেয়েটি [illegible]।
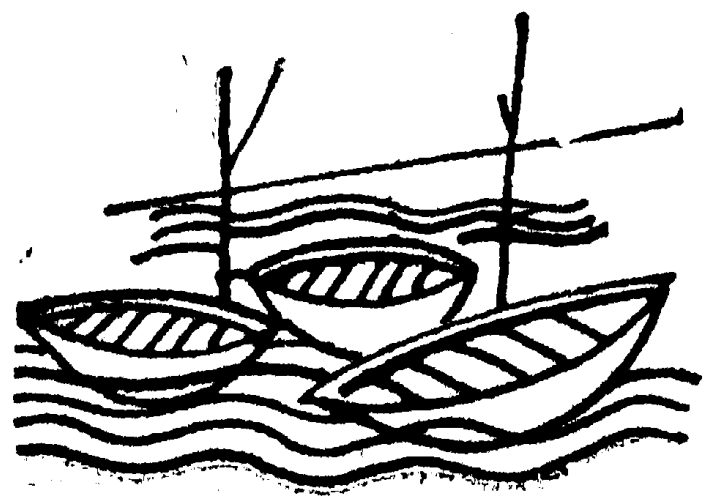
—ছুঁড়ির ভাগ্য ভাল — মন্তব্য করল আরেকজন।

সুবিমল ঘরে ঢুকে গেছে, দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে-জোরে হেসে উঠল মেয়েটি, কিন্তু কিছু বলল না। পরমুহূর্তে দরজাটা দিল টেনে বন্ধ করে। আর অনভিজ্ঞ সুবিমল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল পাথরে খোদা নিষ্প্রাণ এক মূর্তির মত। কত কী কাহিনী শুনেছে সে এদের সম্পর্কে, কত কী ভীতিকর রটনা এদের পল্লী নিয়ে। মেয়েটি দরজা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হল, কয়েকটি উদ্যত ধারালো ঝক-ঝক-করা ছুরি ছুটে আসছে তার দিকে। তার পকেট লক্ষ্য করে বহু দস্যুর সুদৃঢ় মুষ্টি। মেয়েটি কাছে আসতেই দু পকেটে হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল সুবিমল—টাকা নেই, বোধ হয় আনা ছয়েক পয়সা!

মেয়েটি একটু অবাক হল যেন, এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপর একটু হেসে মুখ নীচু করে বলল, টাকার কথা কেন? বৃষ্টি পড়ছে, একটু বসে থাকুন, বৃষ্টি ধরলেই চলে যাবেন।

পকেট ছেড়ে পাঞ্জাবির বোতামে হাত দিল সুবিমল, এগুলো সোনার নয়, মেকী।

মেয়েটি কেমন যেন হেসে উঠল, নিজের গলার হারটা ছুঁয়ে বলল, এ-ও মেকী।

নীল আলোর বদলে জোরালো আলোটা সুইচ টিপে জেলে দিল মেয়েটি, তার পরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—ভিজে গেছে কিন্তু কাঁধ আর বুকের কাছটায়।

সুবিমল গায়ের জামার ভিজে জায়গাটুকু হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিল, বলল—ভিজুক গিয়ে।

মেয়েটি বলল, মাথাটাও ভিজে। গামছা দেব?

না-না—তাড়াতাড়ি বলে উঠল সুবিমল, তারপরে মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘ চুলগুলি একটু বিন্যস্ত করে নিল।

মেয়েটি বলল—দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়ুন না খাটের উপর!

বিছানার ধবধবে নিভাঁজ শুভ্র চাদরের দিকে চেয়ে সুবিমল বলল, বসব?

বসুন না!

বসবার পর একটু যেন স্বাচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল সুবিমল, একটু সহজ।

মেয়েটি বাইরের জানলার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, টেনে বন্ধ করে দিলে ভাল করে, বলল, বৃষ্টির ছাট আসছে, আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়েছিল আর কী আজ, ভিজে সপসপে হয়ে যেতেন!

খুব মৃদুস্বরেই সুবিমল বলল—বাড়ল না কি বৃষ্টি?

বাড়ছে মানে? এগিয়ে আসতে-আসতে মেয়েটি বলল—রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে এতক্ষণে! বড় রাস্তায় দেখুন গিয়ে, হয়তো এরই মধ্যে জল জমে গেছে, ট্রামগুলি সারি-সারি দাঁড়িয়ে গেছে। জল ঠেলে-ঠেলে শুধু চলছে বাস।

সুবিমল মেয়েটির দিকে তাকাল এতক্ষণে। সাদা শাড়ি-পরা ছিপছিপে গড়নের মোটামুটি সুশ্রী একটি তরুণী। মুখখানিতে কেমন একটা ছেলেমানুষির ভাব মেশানো, চোখের কোণে কিন্তু ক্লান্তির গভীর রেখা, একটা অবসাদের ম্লানিমা নেমেছে যেন চোখ-মুখ ভঙ্গিমায়। ওর কাছে জীবনের ভার যেন দুর্বিষহ, অথচ সেটা কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াস রয়েছে অনুক্ষণ, নতুন করে জীবন সংগ্রামের প্রেরণা।

মেয়েটির মুখে রক্ত নেই, হাল্কা প্রসাধন মুখখানাতে কিছুটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে। তাকিয়ে-তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য সুবিমলের মনে হল কথাগুলি, মুহূর্তের জন্যই একটা প্রাণ-শক্তির ঝলক যেন দেখতে পেল সে মেয়েটির মধ্যে। সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

নাঃ, কিছুক্ষণ আপনাকে বসতেই হল দেখছি, বৃষ্টিটা ধরবার নাম নেই।

সুবিমল বলল, — এসে হয়তো অসুবিধাই করলাম আপনার।

অসুবিধা? মেয়েটি ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল, না। বরং সুবিধাই করেছেন।

কী রকম!

হাসতে-হাসতেই মেয়েটি বলল— আপনি না এলে ঠায় একা বসে থাকতাম তো! বসে-বসে বৃষ্টি দেখতাম।

হয়তো সেটা ভাল হত।

না, একা-একা বৃষ্টি দেখবার উপায় আছে নাকি? এখুনি ওঘরের মেয়েগুলো আসত হুটপাট করতে। গত মাস থেকে এঘরে বিজলী এসেছে কিনা, টিমটিমে হ্যারিকেন আর জ্বলে না। জোরালো আলোর নিচে এলে ওদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে।

ওদের ঘরে বিদ্যুৎ নেই বুঝি?

না। — মেয়েটি বলল — ওপরের ঘরের এক সরলা ছাড়া কারুর ঘরে নেই। আমার ঘরেই কি আসত নাকি? নেহাৎ চেহারার এতটা চটক ফুটেছে নাকি, তাই ঘরেও একটু শ্রী এল। আমি বলি, ওসব চটক-ফটক কিছু না, আসলে আমার একটু পড়তা পড়েছে।

বেশ অন্তরঙ্গ সুরেই কথাগুলি বলে যাচ্ছে মেয়েটি। মনে হচ্ছে, অনেক কথা জমেছে ওর, হাওয়া বুঝি অনুকূল, তাই ঝরে পড়ছে ওর কথাফুলগুলি।

একটু যেন সরলতা আছে মেয়েটির মধ্যে; একটু যেন ভাবালুতাও। এটাও অবশ্য সুবিমলের মনে হওয়া, সত্যিও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। সুবিমল বলল— নাম বুঝি স্বপ্না?

হেসে ফেলল মেয়েটি, বলল, কোথা থেকে শুনলেন?

ঐ মেয়েটি যে আপনাকে ডাকল তখন?

শুনেছেন বুঝি? — মেয়েটি বলল— স্বপ্নাই বটে। নিজেই রেখেছি নিজের নাম আজকালের রেওয়াজ বুঝে। কেমন, ভাল না নামটা?

ভাল।

জানেন? মেয়েটি বলল, আজকাল রঙ-টঙ মাখাও কেউ পছন্দ করে না। বড় বিশ্রী। বেশীক্ষণ রঙ মেখে থাকলে কেমন অস্বস্তি লাগে, মাথাটাও ধরে যায়।

—তাই নাকি?

ওমা, জানেন না? — প্রশ্ন করেই হেসে ফেলল মেয়েটি। জানেন, ভান করছেন।

একটু অদ্ভুতই মনে হচ্ছে মেয়েটিকে। কিম্বা হয়তো এধরনের মেয়েরা এমনিই হয়।

বলল, ধরল বৃষ্টি?

জানলাটা একটু খুলে দেখে নিয়ে ফের বন্ধ করল মেয়েটি, বলল, সে গুড়ে বালি! সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। হোক না, কত আর হবে, থামতেই হবে এক সময়!

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেয়েটি আবার বলল—রাস্তায় জল জমলে বেশ মজা না? বেশ পায়ের পাতা ভিজিয়ে-ভিজিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়।

ভাল লাগে বুঝি?

কী বৃষ্টি? ভীষণ ভালো লাগে!— বালিকার মত সারল্যে বলতে থাকে মেয়েটি—বৃষ্টি পড়লে কোন লোক আসবে না তো, বেশ মজা পাওয়া যায়।

আমি যে এলাম?

আহা! মেয়েটি বলল, এ কী আসা বলে নাকি?

বলেই হেসে উঠল, তারপর বলল, সেসব ধরনের লোক আমরা চিনি। আপনি না।

সুবিমল বলল, দেখুন, একটা কথা বলব!

বলুন না?

কিছু মনে করবেন না তো?

না।

সুবিমল বলল, এই যে আমি বসে আছি, কোন ভয়টয় নেই তো?

হেসে উঠল মেয়েটি, বলল, ওমা কেন?

লোকে কত কি বলে, টাকা চুরি, হেন-তেন, কত কী?

বুঝেছি, মেয়েটি বলল, কিন্তু তাতে কাত কার বেশী জানেন? ধরুন আপনার কাছে কুড়ি টাকা আছে, আমি বা আমার লোক সব কেড়ে নিলাম, কুড়িটা টাকা পেলাম ঠিক কিন্তু আপনি আর আসবেন কেন? কেমন কি না? ব্যবসা করতে বসে এটা ভাবতে হয় বৈকি! কোনটা হয় তাহলে লাভের শেষ পর্যন্ত?

আগ্রহের সঙ্গেই ওর কথা শুনে যায় সুবিমল। মেয়েটির কথা বলার ধরনে একটু কৌতুকও অনুভব করে। এ এক অনাবিস্কৃত জগৎ ওর কাছে!

কী? ভাবছেন কী এত? এখনো ভয় গেল না?

না, তা নয়, একটু অপ্রতিভ হয়ে সুবিমল বলে, আপনার কথাগুলি শুনতে বেশ লাগছে। বেশ কথা বলেনও আপনি!

হেসে উঠল মেয়েটি, একটা খুশীর হিল্লোল যেন বয়ে গেল সারা শরীরে, বাহু দুটি একবার দুলিয়ে খাটের বাজু ধরে রূপায়িত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল, বলে, জানেন না বুঝি কথায় আমরা ওস্তাদ।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ, কথাবার্তায় আপনাদের খুশী করতে না পারলে আমাদের চলবে কেন?

সুবিমল একটু হেসে বলল, খুব কথার মালা গাঁথতে হয় বুঝি?

কী বললেন? কথার মালা? বাঃ বেশ বললেন তো, শিখে রাখলাম।

তা শিখুন, সুবিমল বলল, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা দিলেন না তো?

কোন্ প্রশ্ন? ও, ঐ কথার মালা?— মুহূর্তে যেন বিরস হয়ে গেল মেয়েটির মুখখানি, একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল,—যারা আসে, কথা আর শুনতে চায় কই?

চায় না?

মেয়েটি একটু ম্লান হাসে, বলে অথচ আমাদের তো সাধ যায়, যাকে ভাল লাগে, তার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলতে!

সেটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু সেটা হয় না। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে কথা বলা শিখি।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

বুঝলেন না? মেয়েটি হাসল মুখ টিপে, যারা আসে তারা শুধু শুনতে চায় ভালবাসাবাসির কথা; আর কিছু তো নয়! বড়জোর নামটা, ব্যস এই পর্যন্ত!

ভঙ্গীর মধ্যে একটা অকপট কথনের সুর আছে মেয়েটির, যেটা বেশ ভাল লাগে। সুবিমল একটু হেসে বলে, ভেবে দেখতে গেলে এর বেশী জানবার আর কি আছে মানুষের সম্বন্ধে মানুষের?

চোখ বড়-বড় করে উত্তর দেয়, আপনার তাই মনে হয় বুঝি? হয়তো আপনার কথাই সত্যি! আমার কিন্তু ওতেই মন ভরে না।

চুপ করে থাকে মেয়েটি। সুবিমলও চুপ। বাইরে ঝুপ-ঝুপ করে সমানে বর্ষণ চলেছে তখনও। বন্ধ ক্ষুদ্রকায় ঘরখানার মধ্যে শুধু ওরা দুজন। খাট, আলমারী, আরো কি সব টুকিটাকি জিনিস। পাশেই বোধ হয় রান্নাঘর। শাড়ির পাড় জুড়ে-জুড়ে পর্দা তৈরী করে ঝুলিয়ে নিয়েছে দুই ঘরের মাঝখানে। রাস্তার দিককার বন্ধ জানলাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জোরে-জোরেই হেসে ওঠে মেয়েটি, বলে, দেখেছেন? জানলা টেনে বন্ধ করে দিয়েছি তবু জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। ঐ দেখুন কেমন এঁকে-বেঁকে দেওয়াল বেয়ে একটা ধারা নেমেছে। ঠিক যেন একটা সাপ, তাই না?

সুবিমল একটু হেসে চুপ করে রইল। মেয়েটি সেই একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে তার পর বলল, ভাবছেন কী অত?

একটা কথা ভাবছি।

কী?

সুবিমল মেয়েটির মুখের দিকে সোজা-সুজি তাকিয়ে বলল, শুনে আশ্চর্য হবেন না তো?

না। বলুন আপনি?

সুবিমল একটু থেমে থেকে তারপর বলল—আপনাকে নিয়ে গল্প লেখা যায় কিনা, তাই ভাবছি।

গল্প! — মেয়েটি বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, গল্প...মানে......

মেয়েটির মুখখানা যেন মুহূর্তে আলোয় ভরে ওঠে, বলে, আমায় নিয়ে!

হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে।

হঠাৎ আবার ম্লানিমায় ঢেকে যায় মেয়েটির মুখ, বলে, কী করে লিখবেন? কতটুকু জানেন আমার কথা?

যতটুকু জেনেছি, তাতে লেখা চলে।

অবাক হয়ে সুবিমলের দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি — লম্বা-লম্বা ঘন চুল, চোখ দুটি যেন স্বপ্ন দেখছে। ওর দিকে চেয়ে

হঠাৎ একটা কথা মনে জাগে মেয়েটির, সঙ্গে-সঙ্গে অধীর হয়ে ওঠে আগ্রহে আর উত্তেজনায়, বলে, বুঝেছি!

কী?

সিনেমার গল্প, না? ঐ যে টকীতে কথা বলে ছবিগুলো, তার গল্প লিখবেন! না? সে বেশ হবে!

আশ্চর্য হয়ে যায় সুবিমল ওর কথা শুনে। গল্প লেখার প্রসঙ্গে সিনেমার কথা হঠাৎ তুলল কেন মেয়েটি? আর এত উৎসাহের সঙ্গে! ঠিক ভেবে পায় না।

মেয়েটির উৎসাহ হয়ে যায় দ্বিগুণ, আতিশয্যে ওর একেবারে কাছে সরে আসে মেয়েটি, বলে এতক্ষণে আমি আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি-দেখেছি মনে হচ্ছিল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সুবিমল। মেয়েটির সে পরিচিত? বলে কী ও?

মেয়েটির বুক দ্রুত ওঠানামা করছে উত্তেজনায়, বলল, বছর তিনেক আগেকার কথা। আমার এক বাবু আমাকে বেহালার দিকে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমা দেখাতে। সিনেমা মানে টকী। কথা বলে। তাতে আপনি পার্ট করছিলেন না? সেই যে মেয়েটার স্বামী, ঐ যে শেষকালে যার সংগে বিয়ে হল মেয়েটার?

কী আবোল-তাবোল বকছে এই মেয়েটি? সিনেমায় সে আবার পার্ট করল কবে?

মেয়েটি আবিষ্টের মত বলে চলেছে—আমি কোনদিন টকী দেখিনি জানেন? ঐ সেই একবার। কী সুন্দর! দেখেছেন, আপনাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

বুঝতে পারে সুবিমল, মারাত্মক ভুল করেছে এই মেয়েটি। কোন ছবির নায়কের সংগে তার সাদৃশ্য কি করে মেয়েটি খুঁজে পেল কে জানে? কিন্তু গল্পলেখার সংগে ছবির নায়ক সাজার সম্বন্ধ কী?

চমকটা কেটে যাবার বেশ কিছু পরে সুবিমল প্রশ্ন করে—সিনেমা তো দেখেছেন। বই পড়েন? বই?

বই? মেয়েটি বললে, না, স্কুলে ভর্তি হলাম কবে? বাড়ি বসে মা যেটুকু—

না, না, সেকথা নয়। গল্পের বই-টইয়ের কথা বলছি।

ছোটবেলায় লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়তুম দু-একটা। এখন বই পাবই বা কোথায়, পড়বার সময়ই বা কই? ওপরের সরলার কাছ থেকে অনেক সেধে-টেধে একটা বই পড়েছিলুম, বিষবৃক্ষ। বুঝলেন? কিন্তু বইয়ের কথা কেন? সিনেমার কথা বলুন না একটু। বইগুলোকেই তো সিনেমা করে?

তা করে, হেসে সুবিমল বলে, কিন্তু একথা কেন? সিনেমার দিকে খুব ঝোঁক বুঝি?

একেবারে কাছে ঘন হয়ে এসে চুপি চুপি কথা বলার মতন ফিস্‌ফিস করে বলে, ওপরের সরলা। ওর এক বাবু সিনেমায় বই লিখেছিল। ওঃ একদিন কি খাওয়া-দাওয়া ওর ঘরে।

বলেই চুপ করে যায়, যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, যেন চোখের সামনে দেখতে পায় প্রতিযোগিনীর সেই সোনামোড়া দিনের ঐশ্বর্যসম্ভার।

হঠাৎ যেন চমক ভেঙে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়, বলে, চা খাবেন?

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সুবিমল, না-না।

তিরস্কারের ভঙ্গিতে মেয়েটি বলে, না-না কেন? খান না? আমার তোলা পেয়ালা-পিরিচ রয়েছে।

না-না, তার জন্য নয়।

তবে? আমার হাতে খাবার কথা ভাবছেন? কেন, রেস্টুরেন্টে খান না চা? জাত-বেজাত ভাবেন নাকি তখন?

না-না, আমি সে-কথা বলছি না।

মেয়েটি মাথা হেলিয়ে যেন শাসনের ভঙ্গিতে বলে, অনেকবার না-না বলেছেন। এবার শুনব না, আমি এক্ষুনি চা করে আনছি। বসে থাকুন।

সাজানো আলমারির পুতুলগুলির পাশ থেকে পেয়ালা-পিরীচ বার করে মেয়েটি ওর দিকে অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে পর্দা সরিয়ে চলে যায় রান্নাঘরে। আর ঘরের মধ্যে অপ্রস্তুতের মত বসে থাকে সুবিমল। কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে সে। পত্রিকায় পত্রিকায় লিখে খাওয়া দরিদ্র তরুণ লেখক। পাইস হোটেলের পয়সা জোটানোই তার কাছে কষ্টকর, তার পক্ষে এই অজ্ঞ উৎসাহী মেয়েটির সামনে অনর্থক একটা আশার আলো তুলে ধরা মারাত্মক অপরাধ। গল্পলেখার কথা তোলাই হয়েছে তার সবথেকে বড় ভুল। ধীর পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুবিমল, অতি সন্তর্পণে দরজার খিলটা খুলে বাইরের বৃষ্টির অবস্থা নিরীক্ষণ করে। হাওয়াটা কমেছে, বৃষ্টির বরুধারাও সরল হয়ে এসেছে।

কাঠের উনুনে হাওয়া দিতে দিতে পিঁড়ের উপর বসে অনেক কথাই ভাবতে থাকে মেয়েটি। ভদ্রলোককে চা খাওয়ার কথা বলে এসে রীতিমত বিপদেই বুঝি পড়ল সে। চা আছে দুধও আছে, কিন্তু চিনি নেই। রান্নাঘরের আগড়টা খুলে যাবে নাকি রমলার কাছে চিনি ধার করতে। আগেরটিরই তো শোধ হয়নি, দেবে কি এবার চাইলে? ঘরে বাবু এসেছে শুনলে দিতেও পারে। চায়ের সমস্যা না হয় মিটলো, কিন্তু রাত পোহালে কাল কি হবে, ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায়। ঘরে সর্বকিছু বাড়ন্ত, হাতে একটাও পয়সা নেই। বাড়িউলী মাসীর লোক কাল নির্ঘাৎ বাক্স খুলে নিয়ে যাবে, ভাড়া বাকী পড়ার দরুণ। তার উপরে যারা টাকা পায়, তারা? খেয়ালের বশে ভদ্রলোককে ঘরে এনে ভাল করেনি সে। ওরা জানবে, বাবু এসেছে, নিশ্চয়ই টাকা পেয়েছে ছুঁড়ি। কাল সকালে ওরা ছিঁড়ে খাবে সবাই টাকা-টাকা করে।

পোড়া বৃষ্টির জন্যই তো এত! বৃষ্টি পড়লে কেন যেন মাতাল হয়ে যায় মন। যেন মেতে ওঠে সে।

তা হোক, ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ। তার পড়তা পড়েছে হেন-তেন কত কী! লোকটা প্রথম থেকেই তাকে 'আপনি-আপনি' করতে শুরু করে দিল। তাদের মত মেয়েকে কেউ আবার আপনি বলে নাকি? হয়তো ভাল লেগেছে তাকে লোকটার। না-না, অন্যরকম ভাল লাগা, সিনেমার ভাল লাগা। সত্যই, সিনেমার লোকগুলোই ঐ রকম। সরলার মত তাকে যদি, যাকে বলে 'চান্স'—সেই 'চান্স' দেয় লোকটি, তাহলে...

তাহলে তার চেহারাই হয়ে দাঁড়াবে অন্যরকম। সরলা 'নিবেদিতা' হয়ে মোটরে মোটরে ঘুরে বেড়ায়, আর সে...না, সে স্বপ্নাই থাকবে।

ঐ যাঃ! ভদ্রলোকের নামটা তো জেনে নেওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর নাম। সেই সরলার লোকটার মতন।

ফুটতে থাকুক জলটা কেটলীতে, ও ততক্ষণ ঘুরে আসুক একটু ছেলেটির কাছ থেকে। চুপচাপ বসে বসে করছে কী ও। পর্দা সরিয়ে ঘরে এল মেয়েটি। কিন্তু কোথায় সে?

দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরে সে নেই। চলে গেছে চুপি চুপি। বৃষ্টি কমে এসেছে। প্রস্তরমূর্তিবৎ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্না।

দুদ্দাড় করে ছুটে এল রমলার দল—কী লো, বাবু চলে গেল?

হা-হা করে হঠাৎ হাসিতে যেন লুটিয়ে পড়ল মেয়েটি, বলল, —বাবু, বাবু কে?

ঐ যে লোকটা এসেছিল?

বাবু নয়।

তবে?

তেমনি হাসতে হাসতেই উত্তর দিল মেয়েটি, সিনেমার লোক রে, সিনেমার লোক। আমার সংগে 'কনটাকট' করতে এসেছিল। হয়ে গেল কনটাকট।

বলে আবার হাসতে লাগল উচ্ছ্বসিত হয়ে বিস্মিত বিহ্বল কয়েকটি সহচরীর সামনে।

বাঁয়েন

মহাশ্বেতা দেবী

ভগীরথ যখন খুব ছোট তখনি ওর মা চণ্ডীকে বাঁয়েনে ধরেছিল, বাঁয়েনে ধরবার পরে চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে দিল। বাঁয়েনকে মারতে নেই, বাঁয়েন মরলে গাঁয়ের ছেলে-পিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে, বাঁয়েনে ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

তাই চণ্ডীকে সবাই গাঁ-ছাড়া করে রেলের ধারে চালা তুলে দিল।

ভগীরথ বড় হয়েছে অন্য মা-র কাছে, অন্য মার আদরে-অনাদরে। নিজের মা কাকে বলে ভগীরথ জানে না। শুধু মাঠের ওপারে ছাতিম গাছের নিচে একটা চালাঘর দেখেছে, শুনেছে এখানে চণ্ডী বাঁয়েন একলা থাকে।

কখনো মনেও হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কারো মা হতে পারে। দূর থেকে দেখেছে ঘরের মাথায় লাল নেকড়ার ধ্বজা, মাঝে মাঝে দেখেছে উদ্‌ভ্রান্তের মত ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের চষা দুপুরে লালকাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর।

বাঁয়েন যখন যায় তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বাঁয়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা যুবা পুরুষকে দেখে তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে।

তাই বাঁয়েনকে একলা থাকতে হয়। বাঁয়েন যাচ্ছে জানলে যুবা বুড়ো সব পথ ছেড়ে সরে যায়।

একদিন শুধু একদিন ভগীরথ তার বাবা মলিন্দরকে বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল।

—চক্ষু লামা ভগীরথ ওর বাবা ধমকে বলেছিল।

বাঁয়েন পা টিপে টিপে পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভগীরথ এক পলক দেখেছিল পুকুরের জলে লাল কাপড়, তামাটে মুখ, জটাবাঁধা চুল।

দেখেছিল দুই চোখে কি ক্ষুধিত দৃষ্টি, যেন ভগীরথকে চোখ দিয়ে মেরে ফেলবে।

না, ভগীরথের মুখের দিকে চায়নি বাঁয়েন। ভগীরথ যেমন করে কালো জলে বাঁয়েনের লাল ছায়া দেখেছিল, বাঁয়েনও ঠিক তেমনি করেই ভগীরথের ছায়াটাকে দেখছিল। ভগীরথ শিউরে উঠে চোখ বুজেছিল, বাবার কাপড় চেপে ধরেছিল।

—কেন এসেছিস? ভগীরথের বাবা হিসহিসিয়ে উঠেছিল।

—মোর মাথায় তেল লাই গঙ্গাপুত্ত, ঘরে কেরাসিন নাই। একলা মোকে ডর লাগে গো!

বাঁয়েন কাঁদছিল, চণ্ডী বাঁয়েন। জলের ওপর ওর ছায়া-চোখে জল পড়ছিল।

—কেন, এ শনিবার বারের ডালা দেয় নাই?

শনিবার শনিবার ডোমপাড়ার একজন বারের ডালা নিয়ে যায়, চাল, ডাল, লবণ, তেল নিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের কাছে রেখে ছাতিম গাছকে সাক্ষী রেখে বাঁয়েনের বারের ডালা দিলামগো বলে ছুটে চলে আসে।

—কুকুর খেয়ে দিলে।

—টাকা লিবি? টাকা লে।

—আমায় কে জিনিস বিচবে?

—দেব, আমি কিনে দেব, তুই এখন যা!

—আমি একলা থাকতে পারি না।

—তবে বাঁয়েন হলি কেন? যা বলছি!

ভগীরথের বাবা পুকুর-পাড় থেকে এক-দলা কাদা তুলেছিল।

গঙ্গাপুত্ত, এ খোকাটা কি......

একটা বিশ্রী গালি দিয়ে ভগীরথের বাবা কাদার দলাটা ছুঁড়ে মেরেছিল। তখন পালিয়ে গিয়েছিল চণ্ডী বাঁয়েন।

—বাবা, তুমি বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে?

ভীষণ ভয় পেয়েছিল ভগীরথ। বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বললে তার মৃত্যু অবধারিত। ভগীরথের মনে হয়েছিল ওর বাবা মরে যাবে আর বাবা মরে যাওয়ার কথা ভাবলেই ভগীরথের মনে হত মাথায় বুঝি বাজ ভেঙ্গে পড়ল, বাপ মরলে সৎ-মা যে তাকে তাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

—এখন বাঁয়েন বটে, কিন্তু উ তোর মা।

বাবা আশ্চর্য গম্ভীর গলায় কথাটা বলেছিল। গলার কাছটায় ডেলা আটকিয়ে গিয়েছিল ভগীরথের। মা! বাঁয়েন কারো মা হয়। বাঁয়েন কি মানুষ? বাঁয়েন তো মাটি খুঁজে মরা ছেলে বের করে, আদর করে, দুধ খাওয়ায়, বাঁয়েনের দৃষ্টিতে একটা গোটা গাছ অব্দি চড়চড়িয়ে শুকিয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তো একটা জল-জীয়ন্ত ছেলে। সে কেমন করে বাঁয়েনের পেটে জন্মাল? ভগীরথ ভেবে পায়নি।

আগে মানুষ ছিল, তোর মা ছিল।

তোমার বউ?

—আমার বউ।

মলিন্দর কি ভেবে যেন নিশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল—তোরে সব বলে যাব ভগীরথ, তোর কোন ভয় লাই।

ভগীরথ অবাক হয়ে ওর বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে আল হাঁটছিল। মলিন্দর গঙ্গাপুত্রের গলায় এমন স্বরও কখনো শোনেনি। শুধু ডোম নয় ওরা, শ্মশানের ডোম, শ্মশানে এখন মিউনিসিপ্যালিটি শুধু এক-জন ডোম থাকতে দেয়। ভগীরথরা বাঁশ-বেতের কাজ করে, সরকারী মুরগী খোঁয়াড়ে কাজ করে, ময়লা ফেলে সারমাটি করে। একা মলিন্দর ছাড়া এ অঞ্চলে কোন ডোম নাম সই করতে জানে না। সেইজন্য মলিন্দর কিছুদিন আগে মহকুমার লাশঘরে কাজ পেয়েছে।

সরকারী কাজ। মলিন্দর গঙ্গাপুত্র লিখে বেয়াল্লিশ টাকা মাইনে নেবার কাজ। ভগীরথ জানে বাবা মাঝে মাঝে বেওয়ারিশ মড়া চুন আর ব্লিচিং পাউডারে পচিয়ে হাড় বের করে। হাড়, যদি গোটা মানুষের হাড়, নয়তো খুলি, নিদেনপক্ষে পাঁজরা খাঁচাটা পাওয়া যায়, তাহলে অনেক লাভ।

সরকার বাবু কলকাতার হবু [illegible]দের কাছে খুলি-হাড়-কঙ্কাল মোটা [illegible] বেচে দেয়। বাবাকে দশ-পনের যা দেয় তাতেই বাবা খুশী। এই উপরি টাকা সুদে খাটিয়ে খাটিয়ে বাবা কয়েকটা শুওর কিনেছে।

মলিন্দর গায়ে পিরান পরে, পায়ে জুতো পরে মহকুমা যায়, পাড়ায়ও সম্মানী মানুষ।

সেই মলিন্দর চোখ লাল করে অনেকক্ষণ চণ্ডী বাঁয়েনের ঘরের ওপরে গেরুয়া আকাশের কপালে এতটুকু একটা সিঁদুর-ফোঁটার মত লাল নেকড়ার নিশানটুকুর দিকে চেয়েছিল। বিড়-বিড় করে বলেছিল—আঁধারের ডর খায়, অন্ধকারে থাকতে লারত তাকেই বিধাতা বাঁয়েন করে ছাড়ল? এখন মলে বাঁয়েন শান্তি পায় কিন্তু বাঁয়েন নিজে না মরে তো কেউ ওর জান লিতে লারবে, জানু বাপু?

খুব দুঃখু না পেলে মলিন্দর এত কথা বলে না।

—কে মানুষকে বাঁয়েন করে বাবা?

—বিধাতা।

মলিন্দর ভাল করে চেয়ে দেখেছিল ভগীরথের আশ-পাশ দিয়ে দুপুরের রোদে কোন ছায়া চলেছে কিনা? বাঁয়েনরা ঠিক হাট-বাজারের ফুল, গোলাপ, মাখনবালার মত, নানা ছলা-কলা জানে। ধর কোন ছোট ছেলেকে বাঁয়েন নিতে চায়, সে যখন হেঁটে যাবে চারদিক রোদে পুড়লেও তার মুখে ঠিক ছায়া থাকবে। অদৃশ্য হয়ে বাঁয়েন আঁচলের ছায়া ধরে ছেলেকে আড়াল করে নিয়ে যাবে। ছেলেটা মরে গেলে কেউ যদি দোষ দেয় তাহলে বাঁয়েন মুচকি হেসে বলবে—তা কি জানব বল? খর রোদ দেখে এট্টু ছেঁয়া দিতে গেলাম তা তোমার ঢৌকাটা যেনু ননীর পুতুল। এট্টু তাতে মরে গেল?

ভগীরথের আশপাশে কোন ময়ল, গন্ধ-ওঠা লালচে আঁচলের ছায়া দেখতে না পেয়ে মলিন্দর যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বলেছিল—তোর কি ভয় বাপ? তোর কুনো অনিষ্ট উ করবে না।

তবু ভগীরথ ভরসা পায়নি।

শুধু ঐদিকে মন চলে গিয়েছিল ওর। ধানখেতে যাক গরু নিয়ে যাক্ কেবল মনে হত' রেললাইন ধরে ছুটে চলে যায় ওখানে। গিয়ে দেখে আসে একলা থেকে থেকে বাঁয়েন কিরকম ভয় পায়। দেখে আসে বাঁয়েন মাথায় তেল মেখে চুলের জল কেমন করে চৈত্রী বাতাসে শুকোয়।

যেতে পারত না ভগীরথ, ভয় পেত।

মনে হত যদি আর না ফিরতে পারে কোনদিন? যদি ওখানেই ভগীরথকে একটা গাছ করে, একটা পাথর করে রেখে দেয় বাঁয়েন?

কয়েকদিন ভগীরথ শুধু চেয়ে দেখত।

দেখতো ছাতিমগাছ আর চালাঘরের মাঝামাঝি আকাশটা যেন কার কপালের মতন। সেই কপালে এক ফোঁটা সিঁদুরে টিপের মত লাল নেকড়ার নিশানটা কখনো স্থির হয়ে থাকে, কখনো দোলে। মনে হত ছুটে চলে যায় একবার আর গাছে ছুটে যায় সেই ভয়ে উলটোদিকে ছুটে ভগীরথ বাড়ী চলে আসত।

আশ্চর্য বাঁয়েনের ছেলে বলে ওকে কেউ হেনস্তা করত না বরঞ্চ বেশী খাতির করত। বাঁয়েনের ছেলেকে খাতির করলে বাঁয়েন সে কথা জানতে পারে। যে ভাল খাতির দেখায় তার কাঁচকাঁচা ভাল থাকে। যে দূর ছাই করে তার ঘরে শুধু মরতেই থাকে ছেলে-পুলে।

ভগীরথের এখানকার মা-ও কিছু বলে নি। সতীনের ছেলের ওপর ওর অনুরাগ আছে, না বিরাগ, স্নেহ না ভালবাসা, তার কোনটাই ও কোনদিন প্রকাশ করেনি। তার প্রধান কারণ ওর নিজের ছেলে নেই। গৈরবী আর সৈরভী দুটো মাত্র মেয়ে। পুত্র সন্তান না থাকলে স্বামীর ওপর জোর থাকে না। তা'ছাড়া এখানকার মা-র ওপরের ঠোঁট ফাঁক, মাড়ি বেরকরা। বাড়ী থেকে বেরোতে চায় না বেশী। বলে—কুন মুখ দেখাতে যাব সি বল দেখি? মুখ মোটে বুজে না যি। হাসলেও মনে হয় মাগী হাসতেছে। দেখ গঙ্গাপুত্তু। মলে পরে মুখখানা গামছা দিয়ে ঢেকে দিও—জানলু? লইনে মানুষ বলবে দাঁতী ডোমনী চলল।

যশি শুধু কাজ করে, ঘর নিকোয়, ভাত রাঁধে, কাঠ কুড়োয়, গোবর চাপড়া দেয়, শুয়োর তাড়ায়, মেয়েদের মাথার উকুন বাছে, ভগীরথকে 'বাপ' বলে কথা বলে, খেতে এস বাপ, লাইতে যাও বাপ, যেন ওদের মধ্যে কুটুমের সম্পর্ক, বাঁয়েনের ছেলেকে যত্ন-আত্তি না করলে বাঁয়েন তার মেয়ে দুটোকে বাণ মেরে দিতে পারে। যশি জানে। আরো জানে, একদিন ভগীরথের ভাতের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে।

মাঝে মাঝে মাড়ি বের করেও সভয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, কে জানে ভর দুপুরে বাঁয়েন ওর মেয়েদুটোর কথা মনে করে মাটি দিয়ে পুতুল গড়ছে কিনা, বাণ ফুঁড়ছে কিনা। তখন যশিকে যত কুচ্ছিত তার চেয়েও কুচ্ছিত দেখায়। অনেক দুঃখে মলিন্দর ডোমপাড়ার সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটিকে সাঙা করেছে। কয়েকটা গাঁয়ের ডোমপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি বাঁয়েন হয়ে যাবার পর মলিন্দর আর রূপসী মেয়ে দেখতে পারে না।

মলিন্দর বউকে নাকি খুব ভালবাসত।

হয়তো সেই ভালবাসার কথা মনে করেই একদিন মলিন্দর ভগীরথকে চণ্ডী বাঁয়েনের কথা বলল। দুজনে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। মলিন্দরের হাতে মাংসের পোটলা, এই এক আশ্চর্য দুর্বলতা মলিন্দরের, নিজের হাতে পালা শুয়োরগুলোকে ও কাটতে পারে না। শুয়োর পোষে বড় করে, তারপর কাটবার দরকার হলে গোটা শুয়োরটা কাউকে বেচে দেয়। যে কেনে সে মলিন্দরকে একটু মাংস দেয়।

—এট্টু গাছের ছোঁয়ায় বসি?

যেন তের বছরের ছেলের অনুমতি নিল মলিন্দর, বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ভগীরথ জিজ্ঞেস করল—এখান হতে ডাকাতরা যায়, না কি বাপ?

ভগীরথ এখন বুনিয়াদী ইস্কুলে যায়। এই সরকারী ইস্কুলের দেওয়ালে ওদের মাস্টারমশাই এক সময়ে দেওয়াল পত্রিকা লিখিয়েছিলেন ছেলেদের দিয়ে। নিজে হরফ-গুলি লিখে এনেছিলেন। ভগীরথ সেগুলি কালি দিয়ে ভরেছিল। সেই লেখাটি পড়ে ভগীরথ জানতে পেরেছিল উনিশ শো পঞ্চান্ন-র অচ্ছুৎ আইনের পর থেকে ওরা কেউ আর অচ্ছুৎ নয়।

জেনেছিল ভারতীয় সংবিধান বলে একটা জিনিস আছে, তার প্রথমেই একটা মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে, তারা নাকি সবাই সমান।

দেয়াল পত্রিকাটা এখনো টাঙানো আছে। কিন্তু ভগীরথরা জানে সহপাঠিরা বা মাস্টাররা ওদের একটু দূরে বসাই পছন্দ করেন। এই ইস্কুলে অন্য জাতের ছেলেরা নেহাৎ গরীব বা অপারগ না হলে আসে না। আসবে কেন? এখন চারদিকে ইস্কুল।

যা হোক, ভগীরথ এখন একটু অন্য রকম ভাষায় কথা বলে। মলিন্দর ওর কথা শুনতে ভালবাসে ও ভগীরথের পাশে প্রায়ই ওর নিজেকে এক অযোগ্য বাপ বলে মনে হয়।

ভগীরথ ডাকাতদের কথা জিগ্যাস করল। এখন এই সোনাডাঙা, পলাশী, ধুবু-লিয়া জায়গায় জায়গায় সন্ধ্যার ট্রেনে ডকাতি খুব বেড়ে গিয়েছে। ডাকাতি সবাই করে বলতে গেলে। ভদ্রলোক-গরীব-ছাত্র-কলোনির বাসিন্দে-পাকা বাড়ীর মালিক—নানা রকম পরিচয় তারা বাইরে দেয়, কামরায় ওঠে। তারপর ঠিক সময়ে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেয় অন্ধকার মাঠে। অন্ধকার থেকে সেথোরা আসে। তারপর সবাই মিলে যা পারে নিয়ে থুয়ে মেরে ধরে চম্পট দেয়। বিশেষ করে এই বটগাছটা সন্ধ্যের পর বড় ভয়ের হয়ে উঠেছে।

তাই ভগীরথ ডাকাতের কথা জিজ্ঞেস করল মলিন্দর কিন্তু সে কথা বিশেষ গায়ে মাখল না। শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আকাশে ও মাঠে কি যেন খুঁজল, তারপর বলল।

—আমি আগে নিমায়া-নিদায় ছিলু জানলু বাপ! তোর মা ছিল তুষু তুষু ফ্যানেকে কানত। বিধেতার বিচার!

যেন ভগবানই একদিন ডোমপাড়ায় এসে পাশা উল্টে দিলেন। চণ্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন, নিঠুর নির্দয় শিশুহন্তা। আর মলিন্দর হয়ে গেল তুষুপ্রাণ। হতেই হবে।

একজন যদি অমানুষ হয়, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অলৌকিক জগতের অদৃশ্য দরজা খুলে ঢুকে যায় তাহলে আরেক-জনকে মানুষের মত মানুষ হতেই হবে।

ভগীরথ এই সময়ে বুঝতে পারল ওর বাবা ওকে কিছু বলতে চায়। ভগীরথ একটু আশ্চর্য হল। সেই একদিন বাবা বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলেছিল আর বলেনি। আজ আবার বাঁয়েনের কথা কেন?

মলিন্দর ভাগীরথের হাত চেপে ধরল। বলল—ভয় কি? সবাই জানে আর তুই তোর মায়ের বিত্তান্ত জানবি না?

ওরা গঙ্গাপুত্র। ওরা ডোম, মলিন্দর বাঁশ বইত, কাঠ কাটত আর চণ্ডীর ছিল কাঁচা ভাগাড়ের কাজ।

ওর বংশগত উত্তরাধিকার। এই গ্রামের উত্তরে বিলের ধারে বটগাছতলে কাঁচা-ভাগাড়। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মরলে এখন পোড়াতে হয়, তখন সবাই পুঁতে দিত।

ঐ ভাগাড়ে চন্ডীর বাবা খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ত, কাঁটা গাছ দিয়ে গর্ত ঢেকে রাখত, শেয়াল তাড়াত। হুই হুই হইয়া...ওর প্রমত্ত কন্ঠের ভয়ঙ্কর ডাক রাতে বিরেতে হরদম শোনা যেত।

শুধু মদ আর গাঁজা খেত চন্ডীর বাবা। আর শনিবার একটা ডালা হাতে গাঁয়ে বেরুত। বলত—আমি আপোনাদের সেবক গো, আমি গঙ্গাপুত্ত, আমার ডালাটা দিয়ে দেন গো।

সবাই ওকে ভয় পেত। ওর চোখ থেকে ছোট ছেলেমেয়েকে সরিয়ে রাখত। একটাও কথা না বলে ওকে ভিক্ষে দিয়ে চলে যেত।

একদিন একটি ফর্সা মেয়ে, কটা চোখ, লালচে চুল, এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—

—আমি চন্ডী, অমুক গঙ্গাপুত্তের বিটি, বাপ মরে গেল। বাপের ডালা এখন মোকে দেন।

—বাপের কাজ তুই করবি?

—করব।

—তোকে ভয় লাগে না?

—মোঁর ভয়ডর নাই।

এই ভয়ডরের কথাটা চন্ডী বুঝতে পারত না। ছেলে মেয়ে মরলে মা বাপ কাঁদে সে শোকের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু মরাকে কি কেউ বাড়ীতে ধরে রাখে, না রাখতে পারে? তার সৎকার করাটা তো চন্ডীর কাজ; অনাদ্য জীবিকা। এতে ভয়ের কি আছে, নিষ্ঠুরতাই বা কি? যদি থাকে সেও তো বিধাতার নিয়ম? সে নিয়ম তো গঙ্গাপুত্ররা তৈরী করেনি? তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ, কেন ভয় পায়?

এই চন্ডীকে মলিন্দর বিয়ে করেছিল। তখনো মলিন্দর সরকারবাবুর সঙ্গে হাড় বেচার কাজ করত। গো-ভাগাড়ের হাড় থেকে সার হয়, সে হাড়েরও দাম আছে। হাতে পয়সা ছিল মলিন্দরের, বুকে সাহস, রাতে মাঠ দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ও ফিরত—কিসকো নেই ডরতা, হাম আগুন খাতা! কিসিকো নেই ডরতা!

সন্ধ্যেবেলা লন্ঠনহাতে একা চন্ডীকে বটগাছতলায় ঘুরতে দেখে ও বলেছিল—এই, তু আঁধারে ডরিস না?

না। হাম আগুন খাতা জানিস? চন্ডীর হাসি দেখে মলিন্দর খুব অবাক হয়েছিল। সেই বৈশাখেই ও চন্ডীকে বিয়ে করে। আরেক বৈশাখে চন্ডীর কোলে ভগীরথ এসেছিল।

চন্ডী ভগীরথকে কোলে নিয়ে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল, বলেছিল—মোকে ওরা ঢেলা মেরেছিল গঙ্গাপুত্ত। বলল আমার নজর মন্দ।

—কে ঢেলা মারল?

—লাও! তাকে কি তুমি মারবা?

—ঢেলা মারল কেন?

মলিন্দর উঠোনে বেড়া পুঁততে পুঁততে প্রায় নাচতে শুরু করেছিল চটকা রাগে। আমার বউকে ঢেলা মারে কে? কার এত আস্পর্ধা? গালাগালি দিতে শুরু করেছিল মলিন্দর।

চন্ডী ওর দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে বসেছিল। তারপর বলেছিল—মোর মন চায় না গঙ্গাপুত্ত, খন্তা ধরতে, মন চায় না কিন্তুক বিধাতা ই কাজ মোকে দিয়ে করাবে, তা আমি কি করব বল?

চন্ডী আশ্চর্য হয়ে ঘাড় নেড়েছিল, নিজের হাত পা দেখেছিল। ওর বংশে ভাই-কাকা-দাদা থাকলে বংশের কাজ করত, কিন্তু কেউ নেই। ওরা সেই আদিম যুগের শ্মশানের দাস, যখন হরিশ্চন্দ্র চাঁড়াল হয়েছিলেন তখন চন্ডীদের পূর্বপুরুষ ওঁকে কাজ শিখিয়েছিল। আবার যখন হরিশ্চন্দ্র রাজা হলেন তখন সসাগরা পৃথিবী ওঁর, দান করতে লাগলেন ভারে ভারে।

—মোদের কি বেবস্থা?

সেই আদিম গঙ্গাপুত্র রাজসভা ফাটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। ওদের কানের ভেতরে রাবণের চিতা শোঁ শোঁ করে তাই ওরা প্রতিটি কথাই চেঁচিয়ে বলে, ধীরকণ্ঠ শুনতে পায় না।

—কিসের বেবস্থা?

—বামুন গাই-বলদ পাবে, সন্ন্যেসীর নিত্য ভিক্ষা, মোদের কি বেবস্থা? মোদের কি দিলে?

—পৃথিবীর সকল শ্মশান দিলাম।

—কি দিলে?

—সসাগরা পৃথিবীর সকল শ্মশান তোমাদের দিলাম।

—দিলে?

—দিলাম, দিলাম, দিলাম।

তখন সেই আদি গঙ্গাপুত্র দুই হাত তুলে ভীষণ নেচেছিল। উল্লাসে বলেছিল—হা, মোরা সকল শ্মশান পেয়েছি গো, সকল শ্মশান পেয়েছি! এপিথিমীর সকল শ্মশান মোদের।

সেই মানুষটির বংশের একজন হয়ে চন্ডী কেমন করে জাতকর্মে লাথি মারত? মারলে যে সে দেবরোষে পড়ত না তার ঠিক কি? অথচ, চন্ডীর ভীষণ ভয় করত ইদানীং, খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিত। গর্তে কাঁটা ঝোপ চাপা দিলেও ওর ভয় যেত না। মনে হত যে-কোন সময়ে মুখে আগুন নিয়ে একটা শেয়াল বটগাছের মত বড় বড় থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করবে।

ভগমান—ভগমান—ভগমান... ... চন্ডী গুনগুন করে কাঁদত। একছুটে চলে আসত বাড়ী। ঘরে বাতি জেলে বসে থাকত আর ভগীরথের দিকে চেয়ে ঠাকুরকে ডাকত। এই সময়ে চন্ডী সব সময়ে কামনা করত গ্রামের প্রতিটি শিশু যেন অখন্ড পরমায়ু নিয়ে বেঁচে জীয়ে থাকে কেন না আগে তার যে দুর্বলতা ছিল না এখন সেই দুর্বলতা হয়েছে।

ভগীরথের কথা মনে করে ওর প্রতিটি শিশুর জন্য কষ্ট হয়, নিদারুণ কষ্ট হয়। যদি বটতলায় বেশী সময় থাকতে হয়, ওর বুক দুধে টনটন করে। মুখ নিচু করেও গর্ত করে ও বাপকে মনে মনে দোষ দেয়। মেয়েকে কেন সে এই নিষ্ঠুর কাজে ব্রতী করে গেল?

—আপনারা অন্য মানুষ দেখে লাও, মোর মন উঠে না।

চন্ডী একথাও বলেছিল একদিন। কিন্তু ওর কথা কেউ কানে নেয় নি। মলিন্দর ওর কথা বিশেষ বুঝত না কেন না অন্য মানুষ যা দেখে ভয় পায়, ঘৃণা করে, সেই অশুচি শবদেহ, হাড়, চামড়া, নিয়েই ওর জীবিকা। চন্ডীর কথাবার্তা শুনে ও বলত—ধুস্ যত মিছা ডর!

চন্ডী বেশী কাঁদলে বলত—তো-মানীর বংশে তো কেউ লাই, কে আসবে শুনি?

এই সময়েই সেই নিদারুণ ঘটনাটা ঘটেছিল। গ্রামে বেড়াতে এসেছিল মলিন্দরের এক জ্ঞাতি বোন। তার মেয়েটা কাঁদিনেই চন্ডীর ন্যাওটা হয়েছিল। গ্রামে সেবার খুব বসন্ত হচ্ছে। চন্ডীরা কোনদিনই টিকে নেয় না, শীতলাতলায় যায়। ননদের মেয়েটিকে কোলে নিয়েছিল চন্ডী। ননদকে নিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল শীতলাতলায়। রেললাইনের ধারে বিহারী কুলীরা যখন কাজ করত ওরা একটি শীতলাথান বসিয়ে গেছে। সেখানে পাকাপাকিভাবে বিহারী পুরোহিত থাকেন একজন।

কয়েকদিন পরে সেই শিশুটিই কি আশ্চর্য, মায়ের দয়ায় মারা গেল। চন্ডীর বাড়ীতে নয়, অন্যত্র, কিন্তু মেয়ের মা-বাবা-পিসী-কাকা সবাই বলতে লাগল চন্ডীই ওকে নিয়েছে।

—আমি?

—হাঁ গো তুমি!

—আমি লয় গো আমি লয়।

চন্ডী ওদের সমাজের মেয়েপুরুষগুলির দিকে চেয়ে সকাতরে বলেছিল।

—হাঁ তুমি!

—কখনো নয়।

চন্ডী সাপের মত ফুঁসে উঠেছিল। বলেছিল—আমা হতে কারো মন্দ হবার নয়। জান আমি কার বংশ?

ভীরু, কুসংস্কারে অন্ধ মানুষগুলি ভীত চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—

—টুকুনিকে মাটি দিবার কালে তোমার বুক হতে দুধ মাটিতে পড়ল কেন?

—হারে বোকার সমাজ!

চন্ডী কিছুক্ষণ ঘৃণা ও বিস্ময়ে সকলের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—ঠিক আছে। পিত্তিপুরুষের শাপ মোকে লাগুক, ডর করি না। উ কাজ ছেড়ে দিলাম আজ হতে।

—কাজ ছেড়ে দিবি?

—দিব। যা, যেয়ে বীরপুরুষ সব, পাওরা দেগা। মোর মন ই কাজে বহুদিন লাই, গঙ্গাপুত্ত গোরমেণ্টের ঘরে সরকারী কাজ পাবে, ই কাজে আমি মরতে যাব কেন?

সমাজের সকলকে বোবা করে দিয়ে চন্ডী ঘরে চলে এসেছিল। মলিন্দরকে বলেছিল—কাজ যিখানে সিথা ঘর মেলে না? সিথা চলে যাব। উরা মোকে কি বলে তা জান?

মলিন্দর চন্ডীকে ঠাট্টা করে অবস্থাটা সহজ করে নেবার জন্য স্বভাবসিদ্ধভাবে

চেঁচিয়ে হেসে বলেছিল—কি বলো উরা। তু বাঁয়েন হছিস?

বলেই মলিন্দর আর্তনাদ চেপে নিয়েছিল। কি বলল। মলিন্দর একি ভয়ানক কথা উচ্চারণ করে?

চণ্ডী কাঁপতে শুরু করেছিল বাঁশের খুঁটি ধরে। উত্তেজনায়, দুঃখে, রাগে, চতুর্গুণ চেঁচিয়ে ও বলেছিল—ঘরে বনশধর রইতে কেউ উ বাক্য মুখে ল্যায়? আমি বাঁয়েন? আমি ঘরের ছেলে ফেলে, মরা ছেলেকে দুধ দেই, মরা ছেলে লিয়ে সোহাগ করি? আমি বাঁয়েন?

—চুবো?

মলিন্দর ওকে ধমক দিয়ে উঠেছিল কেন না তখন ভর দুপুর। এ সময়ে মানুষের কুকথা-দুঃসংবাদ বাতাসের মুখে ধায়। এসময়ে মাথায় তেল, ভাত না থাকলে মনে ভয়ংকর হিংসে-রাগ-আক্রোশ সহজে ধুঁইয়ে ওঠে। মলিন্দর ওর সমাজের লোকের স্বভাব চরিত্র জানত।

—আমি বাঁয়েন লই গো আমি বাঁয়েন লই!

চণ্ডীর কান্না চিল ছোঁ মেরে বাতাসকে পেঁছে দিয়েছিল। বাতাস নিমেষে সে কান্নার খবর ঈশান থেকে অগ্নি আকাশের সবকটা কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ঐ একবার কেঁদেই চুপ করে গিয়েছিল চণ্ডী, আর কোন কথা বলেনি, মলিন্দরকে নাকি বলেছিল—মোরা আঁধারে চলে যাই কুথা?

—কুথা যাবি?

—পালা বা?

—কুথা?

—জানি না।

চন্ডী মলিন্দরের কাছে এসে ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসেছিল, বলেছিল—কাছে গুইড়ে এসো, বুকে মাথা রাখি।

বলেছিল মোক বড় ডর লাগছে। পিতৃপুরুষের কাজ করব না বলে এলাম থিকে ডর লাগছে? এত্তদিন তো ডরি লাই? আজ অ্যামন ডর লাগছে, তুমাকে আব দেখব না, ভগীরথকে আব দেখতে দিবে না, ভগমান?

এই কথাটি বলে মলিন্দর চোখ মুছল। বলল—এখুন মনে ল্যায় বাপ, সিদিন ভগমান উর মুখ দিয়ে কথাটা বুলিয়েছিল, জানলু?

—তারপর?

তারপর চণ্ডী কয়েকদিন আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকছিল। অল্প কাজকর্ম করে আর ভগীরথকে কোলে নিয়ে বসে থাকে, গান গায়। ঘরে খুব ধুনোজনালে পিদীম জ্বালে আর মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে।

একটানা দুটো মাস খুব ভাল কেটেছিল। আর চণ্ডীকে ডাকতে আসেনি কেউ, আর দরকারও হয়নি। খুব শান্তিতে ছিল ওরা সেই কটা দিন। চন্ডীও খুব শান্ত হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—

—ই কাঁচাকাচিদের অন্য বেবস্থা হতে হয়। ই বেবস্থা খুব মন্দ।

—হবে, বেবস্থা হবে। দিকে দিকে হচ্ছে।

চণ্ডী বলত—ভাল করলাম কী মন্দ করলাম কে বুঝে দিবে? দেখ, মোক মন বুলে নিশি য্যাখন শুনলাম ত্যাখন জানি মোক বাপ হাঁকুর দেয়।

—তুই শুনলি?

—মন বুলে যেমন হই-হইহইয়া ডাক উঠে, বাপ কি শিয়াল তাড়ায় নাকি?

—চুপ যা চন্ডী!

মলিন্দর ভয় পেত। মাঝে মাঝে কি তারই মনে হত না চণ্ডী বাঁয়েন হয়ে যাচ্ছে, চণ্ডী রাতে চমকে উঠে বটতলায় কাদের কান্না শোনে? হয়তো সমাজ যা বলছে সে কথাই সত্যি। মনে হত এর চেয়ে দেশ-গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়া অনেক ভাল।

সমাজও চণ্ডীকে ভোলেনি। চণ্ডীর ওপর চোখ রাখছিল। চণ্ডী তা বুঝতে পারত না এই যা! সমাজ যখন চায় তখন লক্ষ্যে চোখ রাখে, যখন চায় না তখন অলক্ষ্যে চোখ রাখে। সমাজের অসাধ্য কাজ নেই।

তাই একদিন ঝড় বাদলের রাতে, মলিন্দর যখন মদ খেয়ে নেশায় টুপটুপে হয়ে ঘুমোচ্ছে, ওর উঠানটা মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছিল। ওকে ডেকে তুলেছিল কেতন, চণ্ডীর কিরকম মেসো। বলেছিল—তোর বউ বাঁয়েন কিনা দেখে যা!

ঘুমভাঙা চোখে মলিন্দর বোকার মত ওদের দিকে চেয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ।

—দেখে যা শালা দেখে যা, ঘরে বাঁয়েন পুষ্যে মোদের ছেলেগুলোকে সারা করাছিস ত্যাতদিন ধরে।

মলিন্দর দেখতে গিয়েছিল।

দেখছিল বটতলায় মশাল জ্বলছে, লন্ঠন, সমাজেতেরে বেটাছেলেরা ভিঁড় করে চাক বেঁধে আছে, কেউ কথা বলছে না।

—চণ্ডীরে!

মলিন্দরের আর্ত চীৎকারটা কে শুন্যেই ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছিল।

সবাই স্তব্ধ, সবাই দেখছে এরা কি করে।

চণ্ডী!

চণ্ডী দাঁড়িয়েছিল। হাতে একটা দা, পাশে লণ্ঠন, এক পাঁজা কাঁটা গাছের ডাল পাশে উঁচু করা।

—ডাল ঝোপ এনে আমি গর্ত ঢাকছিলাম গো।

—কেন, তু উঠে এলি কেন?

—শিয়ালগুলো চেঁচাতে যেয়ে য্যামন থেমে গেল ত্যামন মোক মন বুলল উরা গর্তে যেয়ে খাবলাচ্ছে মরা তুলবে।

—তু বাঁয়েন!

গ্রামের লোকেরা মন্ত্রধ্বনির মত বলল, সভয়ে।

—ক্যাও পওরা দেয় না থি।

—তু বাঁয়েন।

—মোক বংশকাজা। উরা কি জানবে?

—তু বাঁয়েন!

—আমি বাঁয়েন লই গো, মোক বুকে কাঁচছেলা, মোক বুক দুধে ফেটে যায়! বাঁয়েন আমি লই! গঙ্গাপুত্ত তুমি বুল না গো, তুমি তো সব জান?

লণ্ঠনের আলোয়, বিষ্টিতে লেপটানো বুক আঁচলটা দেখছিল মলিন্দর, মন্ত্রমুগ্ধের মত। বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছিল মলিন্দরের। কে বলছিল ও মলিন্দর সাপ দেখলে তুকাছে যাস, আগুনে যেয়ে হাত ঢুকাস, এখন যাস না তু, তুদের কত ভালবাসার বিয়ে, ভালবাসার ঘর। তু গেলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মলিন্দর কাছে গিয়েছিল, রক্ত চোখ দিয়ে চণ্ডীকে ভাল করে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠেছিল জন্তুর মত—আরি ই-ই-ইহার! তু বাঁয়েন। বটতলায় এসে কারে দুধ দিচ্ছিলে রে? আরি ই-ই-ই-ই-গো।

—গঙ্গাপুত্ত......হায় গো।

"চণ্ডীর ভীষণ ও বুকফাটা কান্না মাটির মত শিশুদের চণ্ডীর বাবার অশান্ত আত্মাকে ওর আদিমপুরুষ সেই আদিম ডোমকে অব্দি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মানুষের জগৎ থেকে অমানুষটি অতিলৌকিক লোকে নির্বাসনের সময় মানুষের আত্মা বুঝি অমনি করেই কাঁদে। অমনি আকাশ-মাটি-পাতাল কাঁপিয়ে।

কিন্তু মলিন্দর ছুটে ঘরে এসে ওর শ্বশুরের শনিপুজোর ঢোলটা নিয়ে আবার বটতলা চলে গিয়েছিল। ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—আমি, মলিন্দর গঙ্গাপুত্ত শোহরৎ দেই। আমার বউ বাঁয়েন হয়্যাছে গো বাঁয়েন হয়্যাছে।

—তারপর? ভগীরথ জানতে চাইল।

—তারপর সমাজ উকে রেলতলা লিয়ে গেল বাপ। জানলু, একেল হতে থি ত্যামন ডরাও, সি একেবারে একেল হয়ে গেল। উই ......উহু শোন্ বাঁয়েন গান গায়।

অনেক দূর থেকে টিনের কৌটোর শব্দ আর এক আশ্চর্য গানের সুর ভেসে এল। সে গানে শব্দ নেই। কথা নেই বলে মনে হয় কিন্তু কথা ধীরে ধীরে শোনা গেল।

ঘুম এস ঘুম এসরে সোনা, ঘুম এসরে যাদু......

গানটা ভগীরথ জানে, গানটা গেয়ে ওর এখানকার মা গৈরবী-সৈরভীকে ঘুম পাড়ায়।

—চল, ঘরকে যাই বাপ!

মলিন্দর অভিভূত ভগীরথকে নিয়ে ঘরে ফিরে চলল। ভগীরথ বুঝতে পারল বাঁয়েনের গানটা ওর ভেতরে ঢুকে গেল, ওর রক্তে মিলে গেল, একটা দুর্বোধ্য বেদনার মত ওর কানের ভেতর বাজতে থাকল।

তার কয়েকদিন পর ভগীরথ দুপুরবেলা একলা চলে এল মজা বিলের পাশে। অনেক দূর থেকে ও টিনের শব্দ শুনেছে শুনে ছুটে ছুটে এসেছে।

জলে বাঁয়েনের ছায়া। বাঁয়েন ওকে দেখছে না। চোখ নিচু করে জল ভরছে মাটির কলসীতে।

—তোমার আর কাপড় নাই?

বাঁয়েন চুপ; বাঁয়েন মুখ ফিরিয়ে আছে।

—তুমি ভাল কাপড় পরবে?

—গঙ্গাপুত্তের বেটা ঘরে যাক্।

—আমি, আমি এখন ইস্কুলে পড়ি। আমি ভাল ছেলে।

—মোক সংগে কথা বুলে নারে। আমি বাঁয়েন।

—আমি ছোঁয়াকে বলছি।

—মোক ছোঁয়াতে পাপ আছে ইকথা গঙ্গাপুত্তের বেটা জানে না?

—আমার ভয় নাই।

—ঘরে যাক্, এখন তাতম্পর তাত। ইকালে দুধের ছেলা বাইরে ঘুরে না।

—তুমি......তুমি একলা থাকতে ভয় পাও?

—একলা? নারে মোক কুন ভয় নাই। একলা থাকতে বাঁয়েন ডরে?

—তবে তুমি কাঁদ কেন?

—কে বুলে?

—আমি শুনেছি।

—গঙ্গাপুত্তের বেটা শুনেছে! আমি কাঁদি?

জলে লাল ছায়াটা কাঁপছে। বাঁয়েনের চোখে জল, বাঁয়েন চোখ মুছল, বলল—ঘরে থেয়ে গঙ্গাপুত্তের বেটা য্যান ফিরে কাছে বাঁয়েনের ধারে কুনদিন আসবে না লয়তো... লয়তো আমি গঙ্গাপুত্তকে বুলে দিব।

ভগীরথ দেখতে পেল আল ধরে বাঁয়েন চলে যাচ্ছে। চুলের গোছা উড়ে উড়ে পড়ছে, কাপড়ের আঁচল লাল। অনেকক্ষণ বসে রইল ভগীরথ, বিলের জল স্থির হওয়া অব্দি বসে রইল। কিন্তু আর কেউ গান গাইল না—

ঘুম এস ঘুম এস সোনা, ঘুম এসরে যাদু।।

ঘরে গিয়ে বাঁয়েনও অনেকক্ষণ বসে রইল। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। ভেবে ভেবে শেষে উঠে অনেকক্ষণ বাদে একটা ভাঙ্গা আরসি টেনে বের করল।

—চ্যাহারার কিছু লাই।

অস্ফুটে বলল বাঁয়েন। চুলগুলো একবার আঁচড়াতে চেষ্টা করল। ভীষণ জোট।

—টোকাটা কাপড়ের কথা বলল কেন? উরতো কিছু মনে থাকার কথা লয়। ফর্সা কাপড়, ভাল চ্যাহারার কথা? ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল বাঁয়েন। অনেকদিনই ও মানুষের মত গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। ভাববার কিছু নেইও ওর। শুধু গাছের পাতার শব্দ, বাতাসের ডাক, রেলের আওয়াজ নিয়ে কত কথা আর ভাবা যায়।

কিন্তু আজ ওর মনে হল টোকাটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হঠাৎ মানুষের বউয়ের মত অবিবেচক মলিন্দরের ওপর রাগ হল। টোকাটাকে সামলে রাখবা কার কাজ? বাঁয়েনের নজর থেকে আড়াল করা কার দায়িত্ব?

উঠে, লন্ঠন জেবলে ও হন হন করে রেল লাইন ধরে ধরে এগোতে লাগল। লাইন ধরে এগিয়ে গেলে ঐ দূরে গুমটি ঘর, লেভেল ক্রসিং। ওখান দিয়ে আসে মলিন্দর। এসে আলপথ ধরে ঘরে যায়। লাইন ধরে যেতে যেতে ও লোকগুলোকে দেখতে পেল। লোকগুলো লাইন থেকে কি সরাচ্ছে।

না লাইনের ওপর বাঁশ গাদা করছে এনে এনে।

আজ বুধবার রাতের ফাইভ-আপ লালগোলায় মেলব্যাগ আসবে। অনেক টাকা। অনেকদিন ধরে ওরা এই জন্যে তৈরী হচ্ছে।

—তোরা কে?

বাঁয়েন লণ্ঠন তুলল, নিজের মুখের পাশে দোলাল। লোকগুলো মুখ তুলছে। ভয়ে সাদা, চোখ বিস্ফারিত। ওর সমাজের মানুষদের এত ভয় পেতে বাঁয়েন কোনদিন দেখেনি।

—বাঁয়েন?

তুরা বাঁশ-গাড়ী দিচ্ছিস, তুরা গাড়ী মারলি? আবার পালিয়ে যাচ্ছিস, হা মোক ডরে? ই বাঁশ ফেলা আগে, সর্বনাশ হবে।

—ওরা বাঁশ নামাতে পারে না লাইন থেকে, সর্বনাশ ঠেকাতে পারে না। সমাজ চিরকাল এই করে, সমাজের এই কাজ। ওদেরি একজন একদিন ঢোল সহবৎ দিয়ে ওকে বাঁয়েন করে দিয়েছিল। বাতাসে বিষ্টির ঝাপট, চণ্ডী লন্ঠনটা হাতে নিল, অসহায়, কি অসহায় চণ্ডী। ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর পোষা আকারের দানবগুলো এসে ঐ ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে। শুধু এইটুকু। কি অসহায় চণ্ডী, চণ্ডী এখন কি করে?

লন্ঠন হাতে চণ্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগলো। একহাত তুলে মানা করতে লাগল এসো না, আর এস না-গো, এখানে পাহাড় প্রমাণ বাঁশ গাড়া।

ট্রেন দুরন্ত ছেলের মত কোন বাধা না মেনে একেবারে চণ্ডীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রাণ দিয়ে ট্রেনটাকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্যে চণ্ডীর নাম অনেক দূর পেঁছে গিয়েছিল। বুঝি বা সরকারের ঘরেও।

লাশ ঘর থেকে ওরা যখন চণ্ডীকে নিয়ে চলে গেল তখন দারোগাবাবু মলিন্দরদের গ্রামে এলেন। সঙ্গে বি ডি ও।

রেল কোম্পানী চণ্ডী গাঙ্গেনদাসীকে মেডেল দিবে মলিন্দর, তা তোদের বেত্তান্ত তো আমি জানি। বললাম ওর কেউ নেই তবু মুকাবিলা করে দেওয়া দরকার তাই ইনি এসেছেন।

সাহসের কাজ, খুব সাহসের কাজ করেছে, সবাই ভাল বলছে মহকুমায়। তোমার পরিবার?

সবাই চুপ করে। সমাজে লোকগুলি এ ওর দিকে চাইল, ঘাড় গলা [illegible]কে মাটির দিকে চেয়ে কেউ বলল তা[illegible] আমাদেরি জাতি।

ভগীরথ অবাক হ[illegible]ল। সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগলো।

চণ্ডীকে ওরা জ্ঞাতি বলল? চণ্ডীকে ওরা স্বীকার করে নিচ্ছে?

তোমাদের সকলের হাতে তো ওর মেডেল দেবে না সরকার।

আজ্ঞা আমাকে দেন।

ভগীরথ এগিয়ে এল।

—তুই কে!

—উনি আমার মা।

—বটে, তোর নাম কি—কি করিস...

বি ডি ও লিখতে লাগলেন। ভগীরথের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। একলা থেকে থেকে মরে গেল বাঁয়েন, জানতে পারল না শেষ অব্দি ও একলা ছিল না। মানুষ একলা আসে, একলা যায় বটে কিন্তু কখনো কখনো কোন কোন ভাল কাজের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যেও সমাজের সবাই এক হয়ে হাসতে কাঁদতে পারে। সেটাও কম পাওনা নয়। ভগীরথ গলা ঝেড়ে বলল—

আজ্ঞা আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র।
বাপ পুজা মলিন্দরের পুত্র। নিবাস ডোমপাড়া।
মা ঈশ্বর চণ্ডী গঙ্গাদাসী......।
ভগীরথ বংশ পরিচয় দিতে লাগলো।

ইঁদুর

সোমেন চন্দ

আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেঁকা যাচ্ছে না। ওদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর্‌তর্‌ করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোনো বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোনো বাক্‌স বা কোনো ভারী জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক্‌ করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ংকর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখে সামনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুরু হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙা কেরোসিন কাঠের বাক্‌স, কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুট্‌খুট্‌ টুংটাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকি থাকে না যে এক ঝাঁক ন্যুব্জদেহ অপদার্থ জীব ওই কেরোসিন কাঠের বাক্‌সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

যাই হোক, ওদের তাড়নায় আমি উত্যক্ত হয়েছি, আমার চোখ কপালে উঠেছে। ভাবছি ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনো কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হব না, নাও থাকতে পারে!

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি, একটা ইঁদুরের বাচ্চাও তাঁর কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছ দিয়ে গেলে তিনি তার চার হাত দূরে দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকের থাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামান্য একটা কেঁচো দেখলেই ভয়ানক শিউরে ওঠেন, আবার এমন একজনকেও জানি যাঁর একটা মাকড়সা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না। আমি নিজেও জোঁক দেখলে দারুণ ভয় পাই। ছোটোবেলায় আমি যখন গরুর মতো শান্ত এবং অবুঝ ছিলাম তখন প্রায়ই মামাবাড়ি যেতুম, বিশেষত গভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মতো বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়ে যেতে বর্ষার জলের গন্ধে আমার বুক ভরে এসেছে, ছই-এর বাইরে জলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাফ্‌লা ফুল হাতের কাছে পেলে নির্মমভাবে টেনে তুলেছি, কখনো উপুড় হয়ে হাত ডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনি আবার কেবলি মনে হয়েছে, এই বুঝি কামড়ে দিল!—আর ভয়ে-ভয়ে অমনি হাত তুলে নিয়েছি। সেখানে গিয়ে যাদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তারা আমার স্বশ্রেণীর নয় বলে আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিল না, অন্তত সে রকম আপত্তি, আশংকা বা প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগে নি।

সেই ছেলেবেলায় বন্ধুরা মাঠে গরু চরাত। তাদের মাথার চুলগুলি জলজ ঘাসের মতো দীর্ঘ এবং লালচে, গায়ের রঙ বাদামী, চোখের রঙও তাই, পাগুলি অস্বাভাবিক সরু-সরু, মাঝখান দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, পরনে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আঙুলগুলি লাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অশ্লীল ছিল যে, আমার ভিতর যে সুপ্ত যৌনবোধ ছিল, তা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠত, অথচ আমি আমার স্বশ্রেণীর সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না! তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত, আমার মুখ লাল হয়ে যেত। তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ছিল ভীম। সে একদিন খোলা মাঠের নতুন জল থেকে একটা প্রকাণ্ড জোঁক তুলে সেটা হাতে করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললে, সুকু, তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারব।

আমি ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলুম, ভয়ে আমার গা শিউরে উঠল, আস্তে-আস্তে বুদ্ধিমানের মতো দূরে সরে গিয়ে বললাম, দ্যাখ ভীম, ভালো হবে না বলছি, ভালো হবে না! ইয়ার্কি, না?

ভীম হি হি করে বোকার মতো হাসতে হাসতে বললে, এই দিলাম, দিলাম—

সেদিনের কথা আজো মনে পড়ে, ভীমের সাহসের কথা ভাবতে আজো অবাক লাগে। অনেকের অমন স্বভাব থাকে—যেমন অনেকে কেঁচো দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁচো দেখলে ভয় পাইনে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি। এসব ছোটখাট ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোনো প্রভাব আছে কিনা বলতে পারি নে।

একথা আগেই বলেছি যে আমার মা-ও ইঁদুর দেখলে দারুণ ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইঁদুরে যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশী। একবার তাঁরই একটা কাপড়ের নিচে কেমন করে জানিনে একটা ইঁদুর আটকে গিয়েছিল। সে থেকে থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিল, ছড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সেই প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দূরে সরে থেকে ভাঙা গলায় চিৎকার করে বললেন, সুকু, সুকু!

প্রথম ডাকে উত্তর না দেওয়া আমার একটা অভ্যাস। তাই উত্তর দিয়েছি এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

—সুকু? সুকু?

এবার উত্তর দিলুম, কেন?

মা তাঁর হলুদ-বাটায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা ছড়ানো কাপড়ের দিকে ধরে চোখ বড়ো করে বললেন, ওই দ্যাখ!

আমি বিরক্ত হলুম। ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কি! এত ইঁদুর কেন? পরম শত্রু কি কেবল আমরাই? আমি কাপড়টা ধরে সরাতে যাচ্ছি অমনি মা চেঁচিয়ে উঠলেন, আহা ধরিসনে, ওটা ধরিসনে।

—খেয়ে ফেলবে না তো!

—আহা, বাহাদুরি দেখানো চাই-ই!

—মা, তুমি যা ভীতু!—ইঁদুরটা

আচ্ছা মা, বাবাকে একটা কল আনতে বলতে

পার না? কোনদিন দেখবে আমাদের পর্যন্ত কাটতে শুরু করে দিয়েছে!

—আহা, মেরে কী হবে? অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না তো! আর কল আনতে পয়সাই বা পাবেন কোথায়? মা'র গলার স্বর কিছুমাত্র কাতর হল না, কোনো বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনি অকাতর থাকে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়। শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও তিনি সেখানে থাকেন না। তিনি অমনি চলে গেলেন।

একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তাহলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরনের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ-মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়। আমার পায়ের নিচে যে বালি চাপা পড়েছে, যে বালুকণা আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে, তারা ফিসফিস করে সেই ইতিহাস বলে। আমি মন দিয়ে শুনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আঠারো বছর বয়েস অবধি এগিয়ে আবোল-তাবোল ভাবনা মস্তিষ্কের হাটে কখনো বিক্রি হয় না। ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ এবং বিশ্বাস, দু-ই প্রচুর ছিল, তাই ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলে নামকরণ করে ডেকেছি, হে কৃষ্ণ, এ পৃথিবীর সবাইকে যাতে একেবারে বড়লোক করে দিতে পারি তেমন বর আমাকে দাও। রবীন্দ্রনাথের পরশমণির কবিতা পড়ে ভেবেছি, ইস, একটা পরশমণি যদি পেতুম! সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককে সত্যি জিজ্ঞেস করে বসেছি, আচ্ছা, পরশমণি পাথর আজকালও লোকে পায়? কোথায় পাওয়া যায় বলবে?

আমি যখন ছোট ছিলুম, আমাদের বৃহৎ পরিবারের লোকগুলির নির্মল দেহে তখনো অর্থহীনতার ছায়াটুকু পড়েনি। বুর্জোয়ারাজের ভাঙনের দিন তখনো ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায় নি। শুরু না হওয়ার আমি এই মানে করেছি যে তখনো অনেক জনকের প্রসারিত মনের আকাশে তার ছেলের ভবিষ্যৎ স্মরণ করে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল! অথচ সে সব আশার শাখা-প্রশাখা এখন কোথায়? আমি বলতে দ্বিধা করব না, সে সব শাখা-প্রশাখা তো ছড়ায়ই নি, বরং মাটির গর্ভে স্থান নিয়েছে। একটা সুবিধা হয়েছে এই যে পারিবারিক স্বেচ্ছাচারিতার অকটোপাশ থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে পেরেছি।

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কি আর থাকা যায়? ইঁদুররা আমায় পাগল করে তুলবে না? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কেরোসিন কাঠের বাকস বা ভাঙা টিনের ভিতর ঢুকে ওরা অনবরত টুংটাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই সেটা একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমার কেন অনেকেরই বিষম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা কুকুর যখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে থাকে, তখন সেটা কেউ সহ্য করতে পারে? আমি অন্তত করিনে। অমন হয়। যখন একটা বিশ্রী শব্দ ধীরে ধীরে একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে তখন সেটা অসহ্য না হয়ে যায় না। ইঁদুরগুলির কার্যকলাপও আমার কাছে সে রকম একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর একদিন মা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, সুকু! সুকু!

বলেছি তো প্রথম ডাকেই উত্তর দেওয়ার মতো কঠিন তৎপরতা আমার নেই।

মা আবার আর্তস্বরে ডাকলেন, সুকু?

আর তৃতীয় ডাকের অপেক্ষা না করে নিজেকে মার কাছে যথারীতি স্থাপন করে তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে যা দেখলুম তাতে যদি বিস্মিত হবার কারণ থাকে, তবুও বিস্মিত হলুম না। দেখলুম কি, আমাদের ক্বচিৎ-আনা দুধের ভাঁড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তারই পাশ দিয়ে একটি সাদা পথ তৈরি করে এক প্রকান্ড ইঁদুর দ্রুত চলে গেল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কোনো বিশেষ খবর শুনে কোনো বিশেষ উত্তেজনা বা ভাবান্তর প্রকাশ করা আমার স্বভাবে নেই বলেই বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না, একথা বলাই বাহুল্য। দেখতে পেলুম, আমার মার পাতলা কোমল মুখখানি কেমন এক গভীর শোকে পান্ডুর হয়ে গেছে, চোখ দুটি গোরুর চোখের মত করুণ, আর যেন পদ্মপত্রে কয়েক ফোঁটা জল টলটল করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন। দুধ যদি বিশেষ একটা খাদ্য হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে কখনো দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যদি অকস্মাৎ কোনো কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করবার অযোগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেললেন, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। মার ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা আমার চোখের দৃষ্টিপথকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিল, আরও গভীর করে তুলল। আমি দেখতে পেলুম আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য অগ্নি-বর্ষণ করছে, নিচে পৃথিবীর ধূলিকণা আরও বেশী অগ্নিবর্ষী। আমার হৃদয়ের ক্ষেতেও পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে গেল। একটা নীল উপত্যকাও দেখা যায় না, দূরে জলের চিহ্নমাত্র নেই, জলস্তম্ভও নেই মরীচিকা দিয়েছে ফাঁকি। ভাবলুম স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থরাজি কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী অমূল্য। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণব্রতী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (তখনো ভাবতুম না দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনো শুরু হবে)। আমার মুখগুলি চিন্তাকুল হয়ে এল, হাঁটু দুটি পেটের কাছে এনে কুকুরের মতো শুয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে নিয়েছি ভালো করে ভাবার জন্য—ভাবতে লাগলুম, এমন কোনো উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েছেন, বরং তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করলেন—যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়—বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জ্ঞান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!

দেখতে পেলুম, বাবার মুখটি যদিও শুকনো তবু প্রচুর ঘামে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, গায়ের ভারী জামাটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন একটা বিপর্যয়ের পরও তাঁর এই অবিকৃতপ্রায় ভাব দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম। এই ভেবে যে, ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা অবস্থা—যার কোনো পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোল-যোগের সূত্রপাত হবে—সেই থেকে রেহাই পাওয়া গেল, খুব শিগগির আর আমার মানসিক অবনতি ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই সুর বদলালেন : তোমরা পেলে কী? কেবল ফুর্তি আর ফুর্তি! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কি আমি পাথর দিয়ে তৈরী করেছি? আমি কি মানুষ নই? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফুর্তিতে মেতে আছ! সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও? নইলে টিঁকে থাকাই দায় হবে।

আমার কাছে বাবার এই ধরনের কথা মারাত্মক মনে হয়। তাঁর এই ধরনের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিষ্ণুতা সঞ্চিত হয়ে আছে বলে আমি মনে করি।

সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে স্বরের উত্তাপও বেড়ে যেতে লাগল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কঠিন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যে অদ্ভুত নগ্নতা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এমন অবস্থার সঙ্গে আমার একাধিকবার পরিচয় হলেও আমার গায়ের চামড়া তাতে পুরু হয়ে যায়নি, বরং আশঙ্কার কারণ আরও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় তার ব্যর্থতার মাঝ-খানে এই নগ্নতার দৃশ্য আরও একটি বেদনার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবা বললেন, আর তর্ক কোরো না বলছি! এখান থেকে যাও, আমার সমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছি!

মা বললেন, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে

নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে।

শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়ল!—তুমি যাবে? এখান থেকে যাবে কিনা বল? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগী! বাবা বিড়বিড় করে আরও কতো কী বললেন, আমি কানে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম একটি অসাড় মৃতদেহ হয়ে, আমার চোখ ফেটে জল বেরুল, বিপর্যয়ের পথে বর্ধিত হলেও আমার মনের শিশুটি আজন্ম যে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তাতে এমন কোনো কথা লেখা ছিল না। মনে হল যেন আজ এই প্রথম বিপর্যয়ের মুহূর্ত-গুলি চরম প্রহরী সেজে আমার দোর-গোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগে এমন দেখিনি বা শুনিনি। তবু আমার অনুভূতির এই শিক্ষা কোথা থেকে এল? বলতে পারি আমার এই শিক্ষা অতি চুপি-চুপি জন্মলাভ করেছে, মাটির পৃথিবী থেকে সে এমন-ভাবে শ্বাস ও রস গ্রহণ করেছে যাতে টুঁ শব্দও হয়নি। ফুলের সুবাস যেমনি নিঃশব্দে পাখা ছড়িয়ে থাকে তেমনি ওর চোখের পাখা দুটিও নিঃশব্দে এই অদ্ভুত খেলার আয়োজন করতে ছাড়েনি। আরও বলতে পারি আমার মনের শিশুর বাঁচবার বা বড়ো হবার ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষা আজ কাজ দিল কই? বরং আরও কর্মহীনতার নামান্তর হল, আমার কাঁচা শরীরের হাত দুটি কেটে ভাসিয়ে দিল জলে, দুই চোখকে বাষ্পাকুল করে কিছুক্ষণের জন্য কান্না করে দিল। আমি কি করব? আমার কিছু করবার আছে কি?

—শয়তান মাগী, যা বেরিয়ে যা!

আবার ভেসে এল অদ্ভুত কথাগুলি। এসব আমি শুনতে চাইনে তবু শুনতে হয়। বাতাসের সঙ্গে খাতির করে তা ভেসে আসবে, জোর করে কানের ভিতর ঢুকবে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে সজোরে লাথি মারবে।

—যা বলছি!

গোলমাল আরও খানিকটা বেড়ে গেল।

কিন্তু পরে মা বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাক-লেন, সুকু! সুকু!

ঠিক তখুনি উত্তর দিতে লজ্জা হল, ভয় করল, তবু আস্তে বললাম, বলো?

মা বললেন, দরজা খোল্।

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলুম, ভয় হল এই ভেবে যে এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতেও ভয় পাই ঠিক তারই সামনে এক গম্ভীর বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনাকে শূন্যে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে!

কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হল না। মা ঘরের ভিতর ঢুকতেই ঠান্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করল। কেমন অসহায় দেখাল ওঁকে। ছোটোবেলায় যাঁকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি, তাঁকে এমনভাবে দেখে এখন কত ক্ষীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে। যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কত ক্ষুদ্র, সে এখনো শৈশব অতি-ক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কত বৃহৎ, রক্তের চঞ্চলতায়, মাংস-পেশীর দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ওই হরিণের মতো ভীরু ছোট দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ আমি কত শক্তিমান! আমাকে কেউ জানে? এমনও তো হতে পারত, আজ লন্ডনের কোনো ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভা-র্সিটির করিডরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিন্তায় পায়চারি করছে, অথবা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোনো খাঁটি ইংরেজ মহিলার ধীর গভীর পদক্ষেপ ভীরুর মতো অনুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাচ্ঞা করেছে! এমন তো হতে পারত, তবে সোনালী চুল, দীর্ঘ পক্ষ্মাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ—আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা? কে এখন কই? আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার সুকুমারের মা ঐ ঠান্ডা মেঝের ওপর সামান্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে? এখান থেকে কত ছোট আর অসহায় মনে হয়। এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ত-তর করে আমি একবার মার দিকে তাকা-লুম। ডাকলুম, মা? ও-মা?

কোনো উত্তর নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোনো ভগ্ন নারীকণ্ঠ আমার কানের দরজায় এসে আঘাত করল না। ঘুমিয়ে পড়েননি তো?

পরদিনও আবহাওয়ার গম্ভীরতা কিছু-মাত্র দূর হল না। মার এমন অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমার ছোট ভাইবোনেরা প্রচুর আস্কারা পেয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তারা নগ্নগাত্র হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগল। স্কুলহীন ছোট বোনটি তার নিত্য-কার অভ্যাসমতো প্রেমকুসুমাস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড উপন্যাস নিয়ে বসেছে, অন্যদিকে চাইবারও সময় নেই। সেদিন অনেক রাতে সারা বাড়ি গভীর ধোঁয়ায় ভেসে গেল, সকলের নাক-মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল, দম বন্ধ হয়ে এল। ছোট বোনদের খালি মাটিতে পড়ে ঘুমুতে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এখনো রান্না হয়নি, মা?

চোখের জলে ভিজে উনানের ভিতর প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে মা বললেন, না। এখন চড়াচ্ছি।

—এত দেরী হল কেন?

মা চুপ করে রইলেন।

বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম এ-জিনিস এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়,—ঘুরে-ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে, কোনোরকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করি, তবে সারা-জীবন লিখেও শেষ করতে পারব না, কেউ পারবে না, তাতে কতকগুলি একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর শৌখিন পাঠকের বিরক্তি-ভাজন হবে। আমি তো জানি পাঠকশ্রেণী কে? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কান্না-কাটির ন্যাকামি চলবে না, কিংবা কিছুটা লিখলেও টাকার হিসাবটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসিমুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন—প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা রক্ষিতমশায় করেন—ঘরে অতি-শুকনো স্ত্রী আর এক-পাল ছেলেমেয়েদের অভুক্ত রেখেও পথে-ঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের প্রেস-কর্মচারী মদন—শুন্যেতার দিনটিকে

উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনো পদ্মাসন কেটে বসে নিমী চোখে দুই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এছাড়া আর উপায় কী? স্বর্গের পথ রুদ্ধ হলে মধ্যপথে এসে দাঁড়াই, জীবন আমাদের কুক্ষিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির কশাঘাতে ভাগ্যের বদনাম গাই, অথবা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একদিন সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে, তবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তের নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সেদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধোঁয়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলুম: 'এরা কে জানো? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে এরা তাই। এরা তৈরি করছে বাগান অথচ ফুলের শোভা দেখেনি। পেটের ভিতর সূঁচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নয়। পরিহাস! পরিহাস!...' ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অজ্ঞতায় নিজের মনে যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুললুম, তাতে নিজের মনে-মনে প্রচুর পরিতৃপ্ত হলুম। যে উপবাসকৃশ বিধবারা তাঁদের সক্ষম মেয়েদের দৈহিক প্রতিষ্ঠায় সংসারযাত্রার পথ বেয়ে-বেয়ে কোনোরকমে কালাতিপাত করছেন, তাঁদের জন্যে করুণা যেমন হল, মনে-মনে পুজো করতে লাগলুম আরও বেশী।

কিন্তু সেসব ক্ষণিকের ব্যাপার। শরতের মেঘের মতো যেমনি এসেছিল তেমনি মিলিয়ে গেল, মগজের মধ্যে জায়গা যদিও একটু পেয়েছিল, বেশীদিন থাকবার ঠাঁই পেল না। আজ ভাবছি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নইলে এক অসম্পূর্ণ সংকীর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে থাকত, তখন সে ভাবনা নিয়ে মনে-মনে পরিতৃপ্ত থাকতুম বটে, কিন্তু গতির বিরুদ্ধে চলতুম, এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার বিষে জর্জরিত হতুম।

এমন দিনে এক অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে আমি সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেলুম। সেই দুপুরটিকে যা ভালো লেগেছিল কেবল মুখে বললে তা যথেষ্ট বলা হবে না। সেদিন যতটুকু আকাশকে দেখতে পেলুম তার নীলকে এত গভীর মনে হল যে, চোখের ওপর কে যেন কিছু শীতল প্রলেপ দিয়ে দিলে। ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌঁছলুম সেই মধ্যাহ্নে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়। আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম, চওড়া রাস্তার পাশে সারি-সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ, সিঁড়িতে নানারকম ——— আওয়াজ, মেয়েপুরুষের মিলিত চিৎকার-ধ্বনি পৃথিবীর পথে-পথে বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়, বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফ তারের অরণ্য, ট্রাক্টর চলেছে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে—অবাধ্য জমিকে ভেঙে-চুরে দলে-মুচড়ে, সোনার ফসল আনন্দের গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষধ্বনিতে এক অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হল। একদা তা বাতাসে মাটির মানুষের প্রতি উপহাস করে বিপুল অট্টহাসি হেসেছে, সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায়-পাতায়। কেউ শুনতে পায়? যারা শোনে তাদের নমস্কার। —তাই অলস মধ্যাহ্নকে মধুরতর মনে হল। দেখলুম এক নগ্নদেহ বালক রাস্তার মাঝখানে বসে এক ইঁটের টুকরো নিয়ে গভীর মনোযোগে আঁক কষছে। কোনো বাড়ি থেকে পচা মাছের রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে বেশ, সঙ্গীত-পিপাসুর বেসুরো গলায় গান শোনা যাচ্ছে হারমোনিয়ম-সহযোগে এই অসময়ে, রৌদ্র প্রচণ্ড হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর, ও-বাড়ির এক বধূ রাস্তার কলে এইমাত্র স্নান করে নিজ বুকের তীক্ষ্ণতাকে প্রদর্শনের প্রচুর অবকাশ দিয়ে সংকুচিত দেহে বাড়ির ভিতর ঢুকল, দুটি মজুর কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লা-মলিন বেশে আবার দৌড় দিচ্ছে। এ-দৃশ্য বড় মধুর লেগেছে—অবশ্য কোনো বুর্জোয়া চিত্রকরের চিরন্তনী চিত্র বলে নয়। এ-চিত্র যেমন আরাম দেয়, তেমনি পীড়াও দেয়। আমার ভালো লেগেছে এই স্মরণীয় দিনটিতে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রাজত্বে খানিকটা পায়চারি করতে পেরেছে বলে। চমৎকার! চমৎকার!

অনেক রাত্রে ইঁদুরের উৎপাত আবার শুরু হল, ওরা টিন আর কাঠের বাক্সে দাপাদাপি শুরু করে দিল, বীরদর্পে চোখের সামনে দিয়ে ঘরের মেঝে অতিক্রম করতে লাগল, কোথাও কোনো বাক্সের ভেতর থেকে লেজ বার করে দারুণ উপহাস করতে লাগল।

রান্না শেষ করে এসে মা সকলকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, ওরে মণ্টু, ওরে ছবি, ওরে নারু, ওঠ্ বাবা ওঠ্!

মণ্টু উঠেই প্রাণপণ চিৎকার আরম্ভ করে দিল। ছবি যদিও এতক্ষণ তার উপন্যাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ছিল এখন বই-টই ফেলে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

—ওরে ছবি, খেতে আয়, খাবি আয়!

বারবার ডাকেও ছবি টুঁ শব্দটি করে না।

মা ভগ্নকণ্ঠে বললেন, আমার কী দোষ বল্? আমার ওপর রাগ করিস কেন? গরীব হয়ে জন্মালে...

মার চোখ ছলছল করে উঠল, গলা কেঁপে গেল। আমি রাগ করে বললুম, আহা, ও না খেলে না খাবে, তুমি ওদের দাও না?

মধ্যরাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর।

এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছ?

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে! ভারি চমৎকার মনে হল, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম, আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তার বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চিৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

—কনক? ও কনক?

প্রৌঢ়া কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো উত্তর দিলেন না। কোনোবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনোবার উঃ-আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটল।

ওদিকে মধ্যরাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক শাদা মসলিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মতো বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিখিরী কুকুরদের সাময়িক নিদ্রাময়তায় এক শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও বাড়ির ছাদে নিদ্রাহীন বানরদের অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। মধ্যরাত্রের প্রহরী আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে কখন?

অবশেষে প্রৌঢ়া কনকলতা নীরবতা ভাঙল; তিনি আবার অ... মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, অল্প একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে আচ্ছাদিত করলেন, তারপর এক অশিক্ষিতা নববধূর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন। অঙ্গভঙ্গির সঞ্চালনে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গীতের আয়নায় আমার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি লক্ষ্য করলুম দুই জোড়া পায়ের ভীরু অথচ স্পষ্ট আওয়াজ আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বাবা গুনগুন সুরে গান গাইতে লাগলেন। চমৎকার মিষ্টি গলা, বেহালার মতো শোনা যাচ্ছে। সেই গানের খেলায় আলোর কণাগুলি আরও শাদা হয়ে গেছে, মনে হয় এক বিশাল অট্টালিকার সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে সেই গানের রেখা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ রাত্রির বাতাস অপূর্ব স্নেহে মন্থর হয়ে এসেছে। একটা কাক রোজকার মতো ডেকে উঠেছে। বাবাকে গান গাইতে আরও শুনেছি বটে, কিন্তু আজকের মতো এমন মধুর ও

গম্ভীর আর কখনো শুনিনি। তাঁর মৃদু-গম্ভীর গানে আজ রাত্রির পৃথিবী যেন আমার কাছে নত হয়ে গেল। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিনকার প্রাণখোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলুম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ির ইঁটগুলি কাঁপছে। বাবা বললেন, পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই, উঠুন। আর কত ঘুমুবেন? সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায় কি? উঠুন?

আমি অনেক কষ্টে চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, কখন ভোর হয়ে গেছে। বাবার স্নেহময় কথায় আমি কখনো হাসিনে, কেমন বাধে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কিনা, এক কুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

মশারির দড়ি খুলতে-খুলতে বাবা বললেন, পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছো, সকলেরই ভোরে ওঠবার অভ্যাস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদারও এমনি অভ্যাস ছিল। আমরা যতো ভোরেই উঠি না কেন, উঠেই শুনতে পেতুম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। অমন অধ্যবসায়ী না হলে আর একটা জীবনে অত জমিজমা, অত টাকা-পয়সা করে যেতে পারেন! তিনি তো সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমরাই কিছু রাখতে পারলুম না। কিন্তু উঠুন পণ্ডিতমশাই, যারা ঘুম থেকে দেরী করে ওঠে, জীবনে তারা কখনো উন্নতি করতে পারে না।

অতটা মাতব্বরি সহ্য হয় না, জীবনে একদিন মাত্র সকালে উঠেই বাড়িসুদ্ধ লোক মাথায় তুলেছেন!

সমস্ত বাড়িটা খুশির বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল। ওদিকে মণ্টু সেলুনে চুল ছাঁটবার জন্য পয়সা চাইতে শুরু করেছে, ঘণ্টাখানেক পরেও পয়সা না পেলে মেঝেয় আছাড় খেয়ে তারস্বরে কাঁদবে। নারু পকর-পকর বাক্যবর্ষণ করে সকলের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টায় আছে! ছবি এইমাত্র তার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নায়িকার শয়নঘরে নায়কের অভিযান দেখে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠছে।

বাবা দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এঘর-ওঘর পায়চারি করতে লাগলেন।

এক সময় আমার কাছে এসে বললেন, তোমরা থিয়োরিটা বার করেছ ভালোই, কিন্তু কার্যকরী হবে না, আজকাল ওসব ভালোমানুষি আর চলবে না। এখন কাজ হলো লাঠির। হিটলারের লাঠি, বুঝলে পণ্ডিতমশাই?

আমি মনে-মনে হাসলুম। বাবা যা বলেন তা এমন ভাবে বলেন যে মনে-মনে বেশ আমোদ অনুভব করা যায়। তাঁর কি জানি কেন ধারণা হয়েছে, আমরা সব ভালোমানুষের দল, নিজের খেয়ে পরের চিন্তা করি, শুষ্কমুখ হয়ে শীতল জল বিতরণ করতে চাই, নিজেরা স্বর্গচ্যুত, অথচ পরের স্বর্গলাভের পথ আবিষ্কারে মত্ত!

আবার বললেন, তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুরই জন্ম দিয়েছে, অসাধু দেয়নি। কেবল মার খেয়ে মরবে। লেনিন তো মস্ত বড় সাধু ছিলেন, যেমনি টলস্টয় ছিলেন। কিন্তু ও'রা লাঠির সঙ্গে পারবেন কি? কখনো নয়!

বলতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার! এমন স্বকীয়তা, এমন নতুনত্ব আর কোথাও চোখে পড়েছে? এমন করে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটা জোর করে বলতে পারি। তিনি একবার যা বলবেন তা ভুল হলেও তা থেকে এক চুল কেউ তাঁকে সরাবে, এমন বঙ্গসন্তান ভূ-ভারতে দেখিনে। এক হিটলারি দম্ভে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু একমাত্র আশার কথা এই যে, এসব ব্যাপারে তিনি মোটেই সীরিয়স্ নন, একবার যা বলেন দ্বিতীয়বার তা বলতে অনেক দেরি করেন। নইলে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পৈত্রিক অধিকারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার অপব্যবহার করতেন সন্দেহ নেই।

ওদিকে কর্মব্যস্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন। কাঁধের ওপর দুই গাছি খড়ের মতো চুল এলিয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই ঘন-ঘন ঘোমটা টেনে দিচ্ছেন, পরনে একখানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সা পা-দুটি জলের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত শীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে-পেছনে নারু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছেড়ে বাবা এবার ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। নারুকে ডেকে বললেন, নারু, বাবা তোমার কী চাই বলো?

নারু তার ছোট-ছোট ভাঙা দাঁতগুলি বের করে অনায়াসে বলে ফেলল, একটা মোটর-বাইক। সার্জেন্টরা কেমন সুন্দর ভট্‌ভট্‌ করে ঘুরে বেড়ায় না বাবা?

কিন্তু মণ্টুর কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। সে হঠাৎ পেছন ফিরে মুখটা নিচের দিকে নিয়ে কামানের মতো হয়ে বললে, বাবা, এই দ্যাখো?

দেখতে পাওয়া গেল, তার পেছনটা ছিঁড়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, বাঃ, বেশ তো হয়েছে, মণ্টুবাবুর যা গরম, এবার থেকে দুটি জানালা হয়ে গেল, বেশ তো হল। এবার থেকে হু-হু করে কেবল বাতাস আসবে আর যাবে, চমৎকার, না?

মণ্টু সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে বুদ্ধিমানের মতো হেসে উঠল; নারু তার ভাঙা দাঁত বের করে আরও বেশি করে হাসতে লাগল, বাবাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আমাদের সামান্য বাসা এক অসামান্য হাসিতে নেচে উঠল, গুম্‌গুম্‌ করতে লাগল।

হাসলুম না কেবল আমি। শুধু মনে-মনে উপভোগ করলুম। ভাবলুম, আনন্দের, এই নির্মল মুহূর্তগুলি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে খুশির আর অন্ত থাকে না। মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে।

বাবার পরবর্তী অভিযান হল রান্নাঘরে। একখানা পিঁড়ি পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাসিমুখে বাবা বললেন, আজ কী রাঁধবে গো?

মুখ ফিরিয়ে অজস্র হেসে মা বললেন, তুমি যা বলবে!

বাবাকে এবার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। আমি যা বলব ঠিক তো? বলি, রাঁধবে মাংস, পোলাও, দই, সন্দেশ? রাঁধবে চাটনি, চচ্চড়ি, রুই মাছের মুড়ো? রাঁধবে? রাঁধবে আরও আমি যা বলব?

—ও মাগো! থাক থাক, আর আর বলতে হবে না! মা দুই হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন, খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে নারু দৌড়ে গেল, দুজনের দিকে দুইবার চেয়ে তারপর মাকে মুচকে হাসতে দেখে বললে, মাগো কী হয়েছে? অমন করে হাসছ কেন? বাবা তোমায় কাতুকুতু দিয়েছে?

—আরে, না রে না, অত পাকামি করতে হবে না। খেল গে যা—বাঁ হাত তুলে মা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবা আবার বললেন, আচ্ছা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখতে গিয়েছিলুম সেদিনের কথা মনে পড়ে?

একটুও চিন্তা না করে মা বললেন, আমার ওসব মনে-টনে নেই।

—আহা, বিলের ধারে মাঠে সেই যে গোরু চরাচ্ছিলে?

মার চোখ বড়ো হয়ে গেল। ওমা, আমি কি ভদ্দরলোক নই গো যে মেয়েমানুষ হয়েও মাঠে-মাঠে গোরু চরাব?

গরু চরানোটা কি অপরাধ? দরকার হলে এখানে-সেখানে একটু নেড়েচেড়ে দিলে দোষ হয়? আসল কথা তোমার সবই মনে আছে, ইচ্ছে করেই কেবল যা-তা বলছ।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব মনে আছে, সব মনে আছে!

মৃদু মৃদু হেসে বাবা বললেন, নৌকো থেকেই দেখতে পেলুম বিলের ধারে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার রাত্রে, একটিমাত্র দীপশিখার মতো। নৌকো থেকে নেমেও দেখলুম, সেই মেয়ে তার জায়গা থেকে এতটুকুও সরে দাঁড়াচ্ছে না বা পাখির মতো বাড়ির দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না, বরং আমাদের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে, অপরিচিত বলে এতটুকু লজ্জা নেই, কাছে গিয়ে দেখলুম ঠিক যেন দেবী-প্রতিমা, খোলা মাঠে জলের ধারে মানিয়েছে বেশ, গভীর বর্ষায় আরও মানাবে। তারপর এক ভাঙা চেয়ারে বসে ভাঙা পাখার বাতাস খেয়ে যাকে দেখলুম সে-ও একই মেয়ে, কিন্তু এবার বোবা, লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। —বাবা হা-হা করে প্রাণখুলে হাসতে লাগলেন। কতকক্ষণ পরে বললেন, তোমার কী চাই—বললে না?

—আমার জন্যে একখানা রান্নার কাপড় এনো।

—লাল রঙের?

—হ্যাঁ।

তারপর কার জন্যে কী এনেছিলেন খবর রাখিনে, কিন্তু নিজের জন্যে ছ'আনা দামের এক জোড়া চটি এনেছিলেন দেখেছি। মাত্র ছ'আনা দাম। বাবা এ নিয়ে অনেক গর্ব করেছেন, কিন্তু একেবারে কাঁচা চামড়া বলে কুকুরের আশঙ্কাও করেছেন।

কুকুরের কথা জানিনে, তবে কয়েকদিন পরেই জুতো-জোড়ার এক পাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল্র ক্লেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য।

পরদিন দুপুরবেলা রেলওয়ে ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে যেতে কার ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকালুম। দেখি শশধর ড্রাইভার হাত তুলে আমায় ডাকছে। এখানে ইউনিয়ন করতে এসে আমার একেবারে প্রথম আলাপ হয়েছিল এই শশধর ড্রাইভারের সঙ্গে। সেদিন সঙ্গে কমরেড বিশ্বনাথ ছিল। তখন গম্ভীর ভাবে শশধর বলেছিল, দেখুন বিশ্ববাবু, সায়েব সেদিন আমায় ডেকেছিল।

—কেন?

শালা বলে কি না, ড্রাইভার, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও, নইলে মুস্কিল হবে বলছি। শুনে মেজাজটা জবর খারাপ হয়ে গেল। মুখের ওপর বলে এলুম, সায়েব আমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করব। তুমি যা করতে পারো করো। এই বলে তখুনি ঠিক এইভাবে চলে এলুম। আসবার ভঙ্গিটা দেখাবার জন্যে শশধর হেঁটে অনেক দূরে পর্যন্ত গেল, তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এল। আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি আমার চমৎকার লেগেছিল। আমার সেই মধ্যাহ্নের ট্রাক্টর-স্বপ্নের ভিত পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।

আমি শশধরের কাছে গেলুম। শশধর বললে, উঠুন। সে আমাকে তার এঞ্জিনে উঠিয়ে নিল। তারপর একটা বিড়ি হাতে দিয়ে বললে, খান সুকুমারবাবু।

বিকেলের দিকে একটা গ্যাঙের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একটা মীটিং অ্যারেঞ্জ করবার ছিল। ওরা আমার দিকে কেউ তাকাল, কেউ তাকাল না। অদূরে এঞ্জিনের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। পয়েন্টসম্যান-গানারদের চিৎকার আর হুইসল শোনা যাচ্ছে।

ইয়াসিন এতদিন পরে ছুটি থেকে ফিরছে দেখলুম। আমাকে দেখে কাজ থামিয়ে বললে, ওরা কী বলছিল জানেন?

হেসে বললুম, কী?

বলছিল, আপনি একটা ব্যারিস্টার হলেন না কেন?

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল, আমিও হাসতে লাগলুম।

মট সুরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, তোমার কাছে আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, ইয়াসিন মিঞা! আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তোমার ইস্কুলে পড়াতে চাই।

এবার হাসির পালা আরও জোরে। কাজ ফেলে সবাই বসে পড়ল।

ইয়াসিন রেগে গেল, বললে, বাঃ, বাঃ, বাঃ, খালি ঠাট্টা আর ঠাট্টা, না! চারটে পয়সা দিয়েই খালাস, না? চারটে পয়সা দিলেই বিপ্লব হবে, না? বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না?—একটু শান্ত হয়ে ইয়াসিন শেষে একটা গল্প বললে। গল্পটি হচ্ছে এই: সে এবার বাড়ি গিয়ে তার গাঁয়ের চাষীদের একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। সেই বৈঠকে যে লোকটা বক্তৃতা করেছিল, সে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বললে, ভাই ইয়াসিন, তোমাদের ওখানে ইউনিয়ন নেই? ইয়াসিন বুক ঠুকে বললে, আলবত আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকপকেট থেকে একখানা রসিদ বের করে দিল। লোকটা তখন ভয়ানক খুশি হয়ে বলেছিল, তুমি যে আমাদের কমরেড, ভাই ইয়াসিন! তুমি যে আমাদেরই। ইয়াসিন তখন বিচক্ষণের মতো হেসেছিল।—দুনিয়ার সবাই এরকম একজোট হচ্ছে, আর আমরাই কেবল চুপ করে বসে থাকব, না? চারটে পয়সা দিলেই খালাস, না? বলতে বলতে ইয়াসিনের ঘর্মাক্ত মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে কাজে লেগে গেল, গভীর মনোযোগে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে কাজ করতে লাগল।

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে শেড-ঘর থেকে তেল আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে বেশ। আমি বাঁ দিকে শেড-ঘর রেখে পথ অতিক্রম করতে লাগলুম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের ওপর অনেকগুলি এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় গভীর ধ্যানে বসেছে যেন। আমার কাছে ওদের মানুষের মতো প্রাণময় মনে হল। এখন বিশ্রাম করতে বসেছে। ওদের গায়ের মধ্যে কত রকমের হাড় কত কলকব্জা, মাথার ওপর এই একটিমাত্র মুখ, কিন্তু কত উজ্জ্বল। মানুষ ওদের স্রষ্টা-কর্তা। হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মতো রাগ। এমন বিরাট কর্মী পুরুষ আর আছে! সত্য কথা বলতে কি, এত কলকব্জার মাঝে, এতগুলি এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে আমার শরীরে কেবল একটা রোমাঞ্চ হল। আমি হতভম্ব হয়ে তাদের মাংসহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে ইলুম।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফিরে রইলুম।

কয়েকদিন পরে কোনো গভীর প্রত্যুষে একটি ইঁদুর-মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নারু আর মণ্টুও তাঁর দুই আঙুল ধরে বানরের মতো লাফাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরেই আরও অনেক ছেলেপুলে এসে জুটল। একটা কুকুর দাঁড়াল এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড়-বড় ইঁট নিয়ে বসল রাস্তার ধারে।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।

নিষাদ

বিমল কর

"You begin by killing a cat and you end by killing a man."

ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ কিংবা কাল।

নাম ওর জলকু। বছর বারো বুঝি বয়েস। এখানকার দেহাতী ছেলেদের মতনই দেখতে। গাঢ় কালো রং, নরম সিমেন্ট কালি মেশান কালচে রং-এর একটি ছাঁচ যেন। এখনও কাঁচা, হাত দিলেই দাগ পড়ে যাবে। এমন-ই নরম কাদাটে কোমল ভাব সারা গায়। মুখটা গোল, ফোলা ফোলা গাল। চিবুকের ডৌলটুকু এখনও ফোটেনি, কারিগরের হাত পড়েনি বোধহয়, নাকটা মোটা, বসা, পুরু মোটা মোটা ঠোঁট। জোড়া ঘন ভুরুর তলায় বড় বড় দুটো চোখ। কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব, কালো শান্ত, কপাল আছে কি নেই বোঝা যায় না চট করে। মাথাভর্তি একরাশ চুলে কপাল ঘাড়, কানের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে থাকে। ছেলেটা একেবারে জংলী। এখানে থেকে থেকে এদের মতনই হয়ে গেছে। গায়ে জামা দেয় না, পায়ে জুতো নেই। আদুল গায়ে নোংরা একটা ইজের পরে সারাদিন ওই রেল-লাইনের কাছে।

ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ...কিংবা কাল।

এই এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে তার। আগে ছিল না।

কিছুদিন দেখতাম টিলার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে থাকত। চারপাশে তাকাত। শেষে রেল-লাইনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত, কি যেন খোঁজবার চেষ্টা করত, দেখত।

ঠিক জানি না কেন, হয়ত টিলার ওপর খুঁজে না পেয়ে কিংবা হয়ত খুঁজে পেয়েই টিলার ও-পাশটায় নেমে যেতে লাগল। ও পাশেই রেললাইন। লাইনের পর আবার টিলা। এখানটায় এই রকম দু-পাশে, প্রায় বালিয়াড়ির মতন দুই টিলা, মাঝ দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে রেললাইন।

পুব এবং পশ্চিমে বেশিদূর ছড়িয়ে পড়েনি টিলার ঢল। শ' দেড়েক গজ বড়-জোর, তারপর মাঠ আর মাঠ, অস্পষ্ট জঙ্গল। পুবে একটা ছোটোখাটো নদীর পুল। পুলের এ-পার থেকে রেললাইনটা ধনুকের মতন বেঁকে এসে টিলার কাছা-কাছি সোজা হয়ে গেছে।

জলকু টিলা থেকে নেমে রেললাইনে চলে যেতে শুরু করেছিল আজকাল। আর নতুন যে-খেলা খেলতে শুরু করেছিল, তা বাস্তবিক নতুন নয়, কিন্তু দিনে দিনে কেমন এক ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল।

ছেলেবেলায় কে না এই খেলা খেলেছে। রেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে আমরাও লাইন তাক করে পাথর ছুঁড়েছি; দেখেছি, টিপটা কি রকম; হাতের জোর কতটা, লাইনের গায়ে পাথরের চোট লেগে ফিনকি জ্বলে কিনা, শব্দটা কেমন হয়। আমাদের এ-খেলা ছিল কদাচিতের, সামান্য সময়ের। কিন্তু জলকুর কাছে খেলাটা রোজকার হয়ে উঠল। আজকাল প্রতিদিন সে এই খেলা খেলছে। প্রতিদিনই। আর এই খেলায় তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, ঘন্টার পর ঘন্টা বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ্দুরে, তাপে, লু-য়ে জলকু পাথর ছুঁড়ছে, রেল-লাইন তাক করে। আর প্রায় রোজই ওকে ধরে আনতে হয়। আমায়।

আমি ছাড়া জলকুকে ধরে আনার কেউ নেই। ওর বাবা পঙ্গু। ঘরে আছেন কি নেই বোঝা যায় না। এক-এক সময় খেপে গিয়ে যখন চেঁচাতে শুরু করেন, গালিগালাজ ছোটান—তখন বোঝা যায় আমার পাশে ও-বাড়ির কোনো ঘরে একজন পুরুষমানুষ আছে। নয়ত জলকুদের বাড়িতে শোনার মতন গলা আর নেই। জলকুর মাকে আমি কমই দেখেছি। চেহারা মুখ কিছুই ভাল করে দেখতে পাইনি, ধারণাও করতে পারি না সেই অবয়ব, অত্যন্ত ঝাপসাভাবে যে-টুকু আকার তৈরী করতে পেরেছি, তাতে মনে হয়—জলকুর মা রোগা, রুগ্ন, কালো অত্যন্ত লাজুক বা গোঁড়া,—গ্রাম্য। মুমূর্ষু পশুর মতন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। রান্নাঘর আর উনুন, মশলাবাটা, ঘরঝাঁট, কুয়াতলায় বসে বাসন মাজা—সংসারের এই শ'খানেক অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে জলকুর মা-র ভোর শুরু হয় এবং স্বামীর অসাড় দুর্গন্ধ শরীরে মালিশ মাখাতে মাখাতে সারা-রাতের বেহুঁশ ঘুমে ঢুলে পড়ে দিনটা তার ফুরিয়ে যায়।

জলকুর বাবা কি রোগে পঙ্গু হয়েছেন আমি জানি না। শুনেছি, বছর দুই ধরে ভদ্রলোকের এই অবস্থা। ডান পাশটা পড়ে গেছে একেবারে, শুকিয়ে চিমসে গেছে। অনাচারে কি ? হতে পারে। অত্যাচারে কি? অসম্ভব নয়। কোনো সাংঘাতিক আঘাতের পরিণাম যদি হয়—হবেও বা। আমি জানি না। জলকুর বাবার সঙ্গে আমার দু-একবার যা সাক্ষাৎ তাতে আমরা দু-জনেই স্বল্পভাষী হয়েছি। ভদ্র-লোকের সেই দুর্লভ গুণ আছে, দুর্ভাগ্যের কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে যারা চায় না, আমার সহানুভূতি পাবার আশা উনি করেননি, ইতিবৃত্তও শোনাননি পঙ্গুতার। শুধু মাত্র বর্তমানের অবস্থাটা দু এক কথায় বলেছিলেন।

সমবেদনা জানাবার ভদ্রতা আমার জানা ছিল। আমি বেদনা পেয়েছিলাম নিশ্চয়। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারা, মুখ, বিছানা, ঘর, ঘরের আবহাওয়া আমায় এত বেশি অস্বস্তি দিচ্ছিল যে, আমি যতটুকু সম্ভব কম কথা বলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলাম।

কাজেই আমরা কথা বলেছি অল্প, নিছক কাজের কথা ছাড়া অন্য কথায় যাইনি। কাজের কথাও অবশ্য সামান্য—ঘরের ভাগ-বাটরা, ভাড়া, ভাড়ার তারিখ—এমনি খুঁটিনাটি।

জলকুদের একতলা ছোট টালি-ছাওয়া বাড়ির পশ্চিমটা আমার, ভাড়া পাওয়া। পুবটা তাদের। আমার এলাকায় একটি মাঝারি, অন্যটি ছোট ঘর, সামনে পিছনে সামান্য বারান্ডা, খাপরা-ছাওয়া একফালি রান্নাঘর।

একই বাড়ির আধা-আধি ভাগ-বাটরার মধ্যে দেওয়াল মাটি ছাদের সংযোগ ছাড়া বাকি যেটুকু সংযোগ তা ছিল জলকুকে নিয়ে—এবং জলকুর পিসিকে যদি ধরা যায়

তবে তাকে নিয়েও। তবে সে-ত সামান্য, অতি সামান্য।

জলকুর পিসির পুরো নাম বোধহয় তরুলতা। তরু বলেই ডাকতে শুনতাম। ঢেঙা রোগাটে গড়ন। মুখের ছাঁদটি লম্বা ধরণের। গায়ের রঙ মাজা কালো। সাপের মতন লম্বা বেণীটি খোঁপা থেকে খসে পিঠের ওপর দুলত। মিলের শাড়ি, সস্তা কাপড়ের জামা, তরুর বয়েস কুড়ি ছাড়িয়েছিল অনেকদিন। বিয়ে হয়নি। একটি দুটি বসন্তের না-মেলানো দাগের সঙ্গে হতাশা এবং কাতরতা মাখানো সেই মুখ কেমন যেন রিক্ত শূন্য অবোধ দেখাত।

আমার আর তরুর মধ্যে মেলামেশা গল্পগুজব ছিল না। দেখা হলে চোখা-চোখি হত, জলকুর খোঁজ করতে এসে বড় জোর শুধোত, জলকুকে দেখেছেন নাকি? বা আমি যখন রাত্রে গ্রামোফোন বাজাতাম, —ওদের তরফের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও শুনত। পরের দিন দেখা হলে বলত, ওই গানটা আজ একবার দেবেন? বড্ড ভাল গান।...কখনও কখনও আমার ডাকে আসা বাংলা মাসিক পত্রিকা দুটো চেয়ে নিয়ে যেত, গল্প পড়তে।

গল্প করতে, গান শুনতে তরু এলে আমি বোধহয় অখুশী হতাম না।

পরে সে-কথা বুঝেছি। আর যখন কথাটা স্পষ্ট করে বুঝেছি, তখন থেকে জলকু তার সর্বনেশে নতুন খেলা শুরু করল।

জলকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত উধাও। বাড়িতে নেই, সামনের আগাছা-ভরা বাগানটায় নেই, কুয়াতলায়, মাঠে, কোথাও না।...তরু বাইরে এসে খুঁজছে, ডাকছে জলকু জলকু। বাড়ির মধ্যে বসে সে-ডাক আমি শুনতে পাই। প্রথমটায় গরজ দেখাতে ইচ্ছে করে না, ভালোও লাগে না উঠতে।

ডাক যখন বাড়তে বাড়তে ঘুরে ফিরে আমার বারান্দার কাছে এসে পৌঁছয়, উঠতে হয় আমায়। আমি জানি জলকু কোথায় আছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ছক-আঁটা। জলকুর পিসি খুঁজবে ডাকবে, আমি প্রথমে গা করব না, পরে সরু ব্যাকুল গলার ডাক অনুনয়ের মতন আমার বারান্দায় এসে থামবে, আমি উঠব, বিরক্তিতে অপ্রসন্ন মনে মাথার ওপর বৈশাখের খর রোদ, অসহ্য গরম, আগুনে-হাওয়া, আস্তে আস্তে আমি হাঁটব, বাড়ির পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে টিলার কাছে এসে দাঁড়াব, ওপরে উঠব, সতর্ক পায়ে, মুখে তপ্ত বাতাসের ঝাপটা লাগবে, কটকটে রোদের ঝাঁঝে তাকাতে পারব না ভাল করে, তবু টিলার ওপর উঠলেই দেখতে পাব, নীচেতে রেললাইনের স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে জলকু পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ছে। আদুল গা, ঢলঢলে ইজের, একরাশ চুলে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা এবং অব্যর্থ নিশানায় জলকু রেললাইনের লোহার ধারালো হিংস্র উজ্জ্বলতাকে বার-বার আঘাত করছে, ধাতব, বেসুরো একটা আওয়াজ উঠছে, ঠং-ঠং-ঠং।

'জলকু। এই জলকু।' কাছে গিয়ে জোরে এক ধমক দেব, জলকুর একটা হাত জোরে চেপে ধরে। ডান হাত। জলকু প্রথমে হাত ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। শেষে চোখ তুলে তাকাবে। সে জানে আমায় দেখতে পাবে। মুখে কোথাও তার এতটুকু বিস্ময় একটুকু ছায়া পড়বে না। আমি জানি, ঘোরভাঙা দুটি গভীর অবসন্ন লালচে চোখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাব না, তপ্ত, ঘর্মাক্ত, অথচ নরম পিচ্ছিল একটা হাত আমার মুঠোয় শক্তভাবে ধরা থাকবে।

'বাড়ি চলো।' গলাটা আমার রুক্ষ বিরক্ত কঠিন, 'তোমায় রোজ বলি এভাবে একা লাইনে এসে দাঁড়িয়ো না—সব সময় গাড়ি আসছে যাচ্ছে—কোনদিন কাটা পড়বে লাইনে।'

জলকু কথা বলে না। আরও ঘামে, মুখ মাথা আরও গোঁজ করে আমার হাতের টানে-টানে টিলার ওপর উঠতে থাকে।

মাথার ওপর আকাশ জ্বলছে, পাথর আর কাঁকরে-বালি ঝকঝক করছে, গরম হাওয়া ঝাপটা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে, দূরের পুলের কাছ থেকে রেল-লাইনের ধনুকের মতন বাঁকটা বিরাট এক তলোয়ারের মতন জ্বলছে, শানানো, ক্ষুর-দীপ্ত আভায়।

'তুমি এভাবে আর এসো না জলকু। কখনও না।' টিলার ওপরে উঠে এসে আমি বলি। হাতটা ছেড়ে দি ওর। কয়েক পা দূরেই আমাদের বাড়ির পাঁচিল।

জলকু কথা বলে না। আমি জানি, জলকু আমার নিষেধ শুনবে না। ও আবার আসবে। হয়ত আজই দুপুরে, কোনও ফাঁকে ছাড়া পেয়ে।

কি সর্বনেশে খেলায় পেয়েছে ওকে। ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ...কিংবা কাল...।

সেদিন একটা লোক জুটেছিল। আমার এলাকার বাগানটুকু নিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত খেটেছে। বাখারির ভাঙা বেড়াটা ভেঙেই ফেললাম একেবারে। আর দরকার নেই। কিছু আগাছা জমেছিল, রোদের তাতে পুড়ে পুড়ে খড় হচ্ছিল, সে-সব পরিষ্কার করা হল। বেলফুলের কেয়ারি জুঁই গাছের তলা টিপ-হলুদের ছোট ঝোপের মাটি খুঁড়তে আর বারান্দার টবের ফুল-গাছ ক'টাকে পরিচর্যা করতে করতে বেলা অনেক হল। স্নান করতে যাব, এমন সময় জলকুর পিসির গলা, 'জলকু-জলকু।'

ডাকটা পাঁচিলের শেষ পর্যন্ত চলে গেল, ওপাশে কদম গাছের তলা দিয়ে বেড় খেয়ে পেয়ারা ঝোপ, বাতাবি লেবু আম-গাছের ছায়া ঘুরে আমার বারান্দার কাছে এসে থামল।

'পালিয়েছে?' আমি বললাম, বিরক্ত গলায়।

ক-খন। আসুক আজ, হারামজাদা গায়ের ছাল তুলব। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেও নিস্তার নেই।' তরু রাগে কষ কষ করছিল।

'বেঁধে রাখাই উচিত। রোজ রোজ এভাবে রেললাইনে পালিয়ে যায়। একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ—ওইটুকু তো ছেলে।'

'মরবে; মরবে একদিন হতভাগা। মরুক, আমারও হাড় জুড়োয়।' তরু আজ অসম্ভব চটেছে। কথার ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল।

চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে আমি বললাম, 'আর কিছু না, এখান থেকে দেখাও যায় না, লোক নেই জন নেই, ফাঁকা রেললাইন...ভয় হয়।'

আমার অগুছোলো কথা, তরুর তিক্ত-বিরক্ত ভাব, সব মিলে-মিশে জলকুর একটি ভবিষ্যৎ [illegible] যেন দুজনের চোখেই লহমার জন্যে ভেসে এল। অল্প একটু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম [illegible]। তারপর আমি নেমে গেলাম বারান্দা দিয়ে।

বৈশাখের বুঝি শেষ সপ্তাহ চলছে। অসহ্য গরম। মাথার ওপর চোখ তোলা যায় না। গলা তামার মতন প্রতপ্ত আকাশ বেয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। তেঁতুল কি কাঁঠালের ঝোপ-গুলো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। একটি কাক কি চড়ুইও ডাকছে না। টিলাটা যেন পুড়ছে, পাথরগুলো রোদ আর তাতকে দ্বিগুণ করে ছুঁড়ে দিচ্ছে চোখে, গায়।

আমার চোখ জ্বালা করছিল, নিশ্বাস অসহ্য গরম, কানের পাশ দিয়ে লুয়ের হলকা বয়ে যাচ্ছে।

জলকু একটার পর একটা পাথর কুড়োচ্ছে রেললাইন থেকে আর ছুঁড়ছে ছুঁড়ে মারছে রেললাইনে। ছেলেটা যেন পাগল হয়ে গেছে আজ। কিসের এক অদম্য আক্রোশে তাকে জ্ঞানহারা করেছে। আদুল গা, ছোট একটু ইজের, উদোম পা, স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে ধারালো শক্ত

পাথর তুলে নিচ্ছে মুঠোয় আর পলকের মধ্যে হাতটা অসম্ভব কঠিন, হিংস্র, উন্মত্ত ভঙ্গিতে ওপরে তুলতে না তুলতেই পাশ কাটিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারছে। ইস্পাতের মসৃণ চকচকে একটা সাপ যেন এই অর্থহীন ছেলেখেলার আঘাত সয়ে যাচ্ছে; গ্রাহ্য নেই।

আমার হঠাৎ মনে হল আজ, জলকু অন্য কিছুকে তার ওই অন্ধ দানবীয় আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত করে মারতে চাইছে। কিন্তু কাকে?

কাকে?

কোন্ অদ্ভুত কৌতূহলে জানি না—আমি চারপাশে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত জায়গাটা নির্জন, ছায়াহীন। ঘা খাওয়া লোহার বেসুরো ভাঙা ভারী শব্দ শুধু। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বয়ে আসা লু-য়ের ঝড় বইছে, থেকে থেকে, অতি দ্রুত বাতাস কেটে এগিয়ে যাওয়ার সেই সোঁ সোঁ গর্জন, এই আছে, এই নেই। পুলের কাছে রেললাইনের পুরো বাঁকটা চোখে পড়ে না। বাঁক যেখানে শেষ হয়ে সোজা হয়ে মিশে যাচ্ছে সেটুকু চোখে পড়ে। ধারালো ফলার মতন দেখাচ্ছে অংশটা।

অতি কষ্টে একবার মাথার ওপর চোখ তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সমস্ত আকাশটাই যেন জ্বলন্ত সূর্য, আগুনের ঝলসানিতে গনগনে আঁচের মতন রঙ ধরেছে শূন্যে। টিলার পাথরে শরীরটা পুড়ছে, কাঁকরের স্তূপ ধকধক করে জ্বলছে, রেললাইনের পাথর দূর দূরান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল, অসহ্য উজ্জ্বল। আমার গাল মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল ভীষণভাবে, গলার কাছে বুকের তলায় দরদর ক'রে ঘাম ঝরছিল। আর চোখে মুখে নাকে ঠিকরে এসে লাগছিল সেই জ্বলন্ত দুঃসহ তাপ। অনুভব করতে পারছিলাম—টিলা, পাথর, লাইন, মাঠ, লোহা, স্লিপার সমস্ত জায়গাটা এক ভয়ংকর দহনের ঝলসানিতে জ্বলছে জ্বলছে। অবোধ আকারহীন এবং নির্মম কোনো হিংস্রতা তার বিরাট করতল আস্তে আস্তে মুঠো করে নিচ্ছে।

আচমকা মনে হল, জলকু এই সর্বগ্রাসী বীভৎস অবয়বহীন হিংস্রতাকে তার অতি পরিমিত অর্থহীন সামর্থ্য দিয়ে আঘাত করছে, নিষ্ফল আক্রোশে।

আমার মাথার শিরায় রক্তের প্রবাহ হঠাৎ যেন জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ভীত এক অনুভূতি হল আমার। মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস হারালাম, চোখ অন্ধকারে ঠিকরে পড়ল, অসহ্য এক ব্যথা ঘাড়ের কাছে ছুরির ফলার মতন বিঁধে গেল।

'জলকু—এই জলকু।' জ্ঞান ফিরে পেয়ে জলকুর হাত চেপে ধরলাম।

টিলার ওপর দিয়ে যখন উঠে আসছি, জলকুর হাত আমার হাতে, মনে হল, নীচের ইস্পাতের দুটি উজ্জ্বল হিংস্র অজগর যেন তার অফুরন্ত ওষ্ঠে হাসির আভা খেলিয়ে ঝকঝক করছে। বিদ্রূপে।

একটা গাড়ি আসছিল। পুলের কাছ থেকে ইঞ্জিনের সিটি বাজছে, বিরতিহীন কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনি—বাতাস থেকে বাতাসে ছড়িয়ে তরঙ্গের একটি ক্ষীণ স্পন্দন আমার কানে এসে লাগছে।

আর একটু হলেই জলকু আজ লাইনে কাটা পড়ে মরত। যা বেহুঁশ বেঘোর পাগল হয়েছিল আজ।

ছেলেটাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি বাঁচিয়েছি, আমি ভাবছিলাম, আর মনের তলায় তৃপ্তি এবং মমতার স্বাদ মাখানো এক সুখ পাচ্ছিলাম।

'জলকু, আমি না এলে আজ তুমি একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করতে আর কখনও এভাবে এসো না বুঝলে...?'

জলকু তাকাল না, কথা বলল না, মাথাও নাড়ল না।... কেন জানি না, হঠাৎ ভীষণ একটা বিরক্তি এল ছেলেটার ওপর। হাত ছেড়ে দিলাম।

ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ...কিংবা কাল।

মাঝে জলকুর অসুখের মতন হল। একদিন বিকেলে জ্বর এল। দেখতে দেখতে হু-হু করে জ্বর বাড়ল। পাঁচ পর্যন্ত উঠে থামল তখনকার মতন। ছেলেটা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, চোখ চাইতে পারছে না। সারাটা মুখ ঝলসে যাচ্ছে। এখানে কাছাকাছি কোথাও ডাক্তার-বদ্যি নেই। আমার মনে হল, তাত-জ্বর। জলপটি দিতে বললাম তরুকে, সেই সঙ্গে আমার হঠাৎ প্রয়োজনের হোমিওপ্যাথী বাক্স থেকে তখনকার মতন একটা ওষুধ।

পরের দিনও জ্বর থাকল। ডাক্তার এল না বাড়ীতে। জলকুর বাবা জলকুর মাকে গালাগাল দিচ্ছিল, শুনেছি। ডাক্তার না-ডাকার জন্যে নয়, অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক কারণে বোধ হয়। জলকুর মা যথারীতি উনুন আর বাসন আর কাপড় কাচা নিয়ে ব্যস্ত থাকল, তরুই যা বার দুই আমার কাছে এল ওষুধ চাইতে—এটা ওটা বলতে। রাত্রে যেন জলকুর মাকে কাঁদতে শুনেছিলাম। সম্ভবত বারান্দায় এসে অন্ধকারে বেচারী একটু আড়াল দিয়ে কাঁদছিল।

জলকুর জ্বর ছাড়ল পরের দিন ভোরে। একেবারে ছেড়ে গেল। গা ঠাণ্ডা।

তরু এসে খবর দিল আমায়। নিজের ওষুধের মহিমায় অভিভূত হচ্ছিলাম। গর্ববোধ হচ্ছিল। খুশী মনে তৃপ্ত মুখে তরুর দিকে চেয়ে থাকলাম।

তরু আঁচলের আগা দিয়ে আঙুলে পাক দিচ্ছিল আর খুলছিল। হঠাৎ বলল, 'জ্বরের ঘোরে বার বারই জলকু তার মানিককে খুঁজেছে। বৌদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে, জলকু তাই বুকের কাছে জাপটে ধরে......।

অসহ্য একটা রাগ মাথার মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল। তরুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বিশ্রী ইতর গলায় ধমকে উঠলাম, 'তবে আর কি—তোমার বৌদির কাছে যাও। ছেলের জ্বর তিনিই সারিয়েছেন।'

তরু চুপ। তার মুখে চোখে গলার স্বরে কি রকম এক অপরাধী ভাব ছিল, আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তরু চলে গেল ধীরে ধীরে।

যাক। মনের ঝাঁঝ তখনও আমার পুরোমাত্রায় রয়েছে। প্রায় স্বগতোক্তির মতন বললাম, 'বৌদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে—? তবে আর কি, বালিশ বুকে জড়িয়েই তোমাদের ছেলে ভাই-পো সারুক।' বিদ্রূপটা আমারই কানে মধু বর্ষণ করল।

জলকুর মানিক? সে ত জলকুর সোহাগের একটা ছাগলছানা। সেটা মরেছে। পাপ চুকেছে। বড্ড জ্বালাতন করত। আমার বহু পরিশ্রমের ফল, টবের দুটি ডালিয়াও একেবারে গোড়া পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিল। অকালের ফুল, বহু সাধ্যসাধনা করে পেয়েছিলাম।

গিয়েছিলাম সাত-সকালে সাইকেল ঠেলে, পাঁচ মাইলটাক পথ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। জ্যৈষ্ঠের রোদে আর ফেরা গেল না সকালে। ফিরলাম বিকেলে। তখনও মাথার ওপর রোদ ছিল।

খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে কুয়াতলায় স্নান করতে নামলাম। ঠাণ্ডা গা-জুড়ানো জল।

সমস্ত শরীর থেকে তাপ ধুয়ে যাচ্ছে, মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে শীতলতায়, ঘর্মাক্ত ক্লান্ত স্নিগ্ধতা জড়িয়ে ধরছে। আরাম অনুভব করতে পারছি। সাবানের ফেনায় গন্ধ উঠেছে খসের, মৃদু সুঘ্রাণ।

'জলকু—জলকু—।' তরুর গলা কানে গেল। আমি স্নান করছি, কুয়ায় গা-মাথা জুড়ানো ঠাণ্ডা মিষ্টি জল, সাবানের ফেনায় চমৎকার গন্ধ, সামনে ছায়া নেমেছে, হাল্কা ম্লান একটু রোদ, শালিক বসেছে কুয়াতলার পাড়ে।

'জলকু—জলকু।' ডাকটা বাড়ির সামনে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেড়াল। কদম গাছের তলা দিয়ে করবী ঝোপের কাছে গিয়ে থামল। ঘুরে ফিরে বাতাবি লেবুর গাছের তলায় থমকে দাঁড়ালো। আশপাশ ঘুরে কুয়াতলার কাছাকাছি কোথাও।

ছেলেটা আবার পালিয়েছে। স্নান শেষ হয়ে গেছে আমার। আমি জলকুর কথা ভাবতে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। এই সেদিন তাত-জ্বরে মরতে মরতে বেঁচেছে। এখনও ও অসুস্থ। দুর্বল, রুগ্ন। এই অবস্থায় আবার পালিয়েছে। শয়তান ছেলে একটা।

ঘরে এসে কাপড়চোপড় ছাড়লাম। কি খেয়াল হল, ধোপ ভেঙে একটা পাজামা পরলাম। প্রায় আধ-কৌটো পাউডার ছড়ালাম গায়। কে জানে কেন, অত্যন্ত আরাম লাগছিল, ভাল লাগছিল। নেটের গেঞ্জিটা গায়ে দিলাম। চুল আঁচড়াচ্ছি—আয়নায় মুখ দেখে দেখে, বারান্দার কাছে তরুর গলা শোনা গেল, ভাইপোকে ডাকছে। আসলে ভাইপোর নাম ধরে আমাকেই ডাকা, আমাকেই অনুনয় করা।

মুখ মুছে, চটিটা পায়ে গলিয়ে বাইরে এলাম।

'পালিয়েছে ?'

'হ্যাঁ, খানিকটা আগেও কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল।... আমি ভাবলাম......' তরু ব্যাকুল উদ্বিগ্ন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বিকেল শেষ হয়ে গেল...... রোগা ছেলে...।'

'দেখছি।' বারান্দা থেকে নামলাম। কদমগাছের তলায় আসতেই কেমন এক লালচে আভা দেখলাম পাঁচিলের মাথায় চুপ করে পড়ে আছে। যেন ফিসফিস করে আমায় কিছু বলতে এসেছে। পশ্চিমের আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকালাম। সূর্যাস্তের লগ্ন শুরু হয়েছে। আকাশটা সিঁদুরের রঙে ধুয়ে গেছে, সূর্যটা লাল, টকটকে...সূর্যটা ঘন লাল, টকটকে...

হঠাৎ কিসের আকুলকরা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের একটা দমকা এসে ঠিক আমার হৃৎপিণ্ডে ঝাপটা দিল। ঝাপটা নয়, ছোবল। বুক থেকে পলকে সাপের কিলবিল করা এক অনুভূতি মাথার স্নায়ুতে উঠে এল। আমার হৃৎপিণ্ড সম্ভবত জীবনের ধ্বনিটুকু সময়মত বাজাতে ভুলে গেছে। মাথা বুক হাত পা—সব অসাড়। আমি সর্বপ্রকার অনুভূতি থেকে চ্যুত হলাম কয়েক মুহূর্তের মতন।

অল্পক্ষণ। হৃৎপিণ্ড এবার ভয়ংকর জোরে শব্দ করতে শুরু করেছে। বরফের বিরাট একটা দেওয়ালে কে যেন আমার পিঠ ঘাড় ঠেসে ধরেছে। ঝিমঝিম করছিল মাথা। দৃষ্টিটা টিলার ওপর থেকে আর নড়ছে না।

জলকু মারা গেছে, লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছে আজ, অল্পক্ষণ আগেই। কানের পরদায় ইঞ্জিনের তীব্র সিটি, মালগাড়ি চলে যাবার শব্দটুকু ভেসে এল। আমি যখন স্নান করছিলাম একটা মালগাড়ি চলে গেছে। চাকার বিশ্রী, জঘন্য সেই শব্দটা এখন আবার কানের পরদায় শুনছিলাম। চাকা চলছে...চলছে, ইস্পাতের হিংস্রতা হাসছে। ছেলেটা মারা গেছে। কেন যেন আমার হঠাৎ আজ মনে হল। আকাশে টকটকে রক্তগোলা রঙ, সূর্যটা লাল, অসহ্য লাল আজ। ভয়ংকর উজ্জ্বল।

আর আমার পা বাড়াবার মতন সাহস হচ্ছিল না। কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেছে। সাড়া নেই, আগ্রহ নেই, শুধুমাত্র এক ভয়ংকর আতঙ্কের পীড়ন আমায় পিছু দিকে টেনে নিচ্ছে।

বিহ্বলতার এই উগ্রতা আমি দমন করবার চেষ্টা করলাম। কার্যকারণের স্বাভাবিক যুক্তি তৈরি করবার আপ্রাণ পরিশ্রম করছিলাম। জলকু কাটা পড়েছে, এ-কথা আমি কেন ভাবছি? কেন?...... সূর্য এইরকমই লাল থাকে, মেঘে এমনই ঘন রক্তাম্বর ছড়িয়ে পড়ে সূর্যাস্তবেলায়। হয়ত প্রত্যহই। আমি চোখ তুলে দেখি না, বা দেখলেও তেমন করে দেখি না।

আমায় যেতে হবে। জলকুকে ধরে আনতে হবে। সে মারাত্মক খেলায় মেতে আছে। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যে পা বাড়িয়েছে। জলকুর মা রুটি সেঁকছে জলকুর জন্যে। তরু কুয়াতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গামছা হাতে—অপেক্ষা করছে। জলকু ফিরে এলে হাত মুখ ধুইয়ে দেবে।

বুঝতে পারলাম আমি হাঁটছি আস্তে আস্তে, ভীত ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে। টিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশই। কাঁকরের স্তূপ, ছোট ছোট আগাছার ঝোপের ওপর থেকে শেষ আলোটুকু মুছে গিয়ে ছায়া নেমেছে, মাথার ওপর দিয়ে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে। কোথা থেকে একটু হাওয়া বইতে শুরু করেছে এতক্ষণে।

টিলায় ঠিক মতন পা দিতে পারছি না—পিছলে যাচ্ছে। আমার যেন একবিন্দু শক্তি নেই, হয় ঘুমে না হয় কতকাল অসুখে ভুগে আজ দুর্বল পায়ে পথ হাঁটতে নেমেছি।

বারবার বাধা। মন পিছু টানছে। জলকু সামনে টানছে। কে যেন কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে, যেয়ো না—। পরমুহূর্তে চোখের ঝাপসায় জলকুর মা যেন রুটির থালা হাতে এগিয়ে আসছে, তরু ডাকছে।

জানি না কখন কেমন করে টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়েছি। সূর্য সেই লহমায় কোন দূরদরাজেতে ডুব দিতে যাচ্ছে যাবার আগে শেষ নিশ্বাসের মতন [illegible] কোনও অদৃশ্য শক্তি সূর্যপিণ্ড থেকে শেষতম আলোটুকু ঢেলে দিল। এই আলো অসহ্য গাঢ়, আশ্চর্যরকম লাল। আমি জীবনে কখনও এই রঙ দেখিনি, কখনও নয়। এত ঘন, জীবন্ত, ভাষাময় হতে পারে রঙ আমি জানতাম না। এখন জানলাম। দেখলাম।

দেখলাম—টিলার তলায় অসাড় রেল-লাইন। এক ঝলক সেই আলো। হিংস্র ধারালো ইস্পাতের ওপর মুঠো মাপের জায়গাটুকুতে আলোটা ছিল। আমার চোখের সাড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাল তারপর উড়ে গেল। ছায়ার মধ্যে তালগোল পাকানো কালো জামাপরা জলকুর একটা চিহ্ন। পাথরের গায়ে গায়ে আর সব নিশ্চিহ্ন। স—ব।

কত রাত জানি না। ঘন অন্ধকার। ছোট লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়েছি কখন। অল্প টিম-টিমে আলো—তাও সইতে পারছিলাম না। যতটুকুই হোক আলো

থাকলেই মনে হচ্ছিল অন্য কিছু আছে এ ঘরে। অপলক দুটি চোখ মেলে আমায় দেখছে।... বাতি নিভিয়ে ঘরভরা অন্ধকার সামনে বসে আছি। আমায় যেন কেউ না দেখে। নিজেকেও নিজে দেখতে চাই না।

কত রাত জানি না। চারিধারে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। অন্ধকার। পাশের বাড়িতে একটি মুমূর্ষু গলার প্রায় শব্দহীন কান্নাটা শেষবারের মতন শুনেছি অনেকক্ষণ। এখন হয়ত মানুষটির গলা বুজে গেছে। আর শব্দ বেরুচ্ছে না। জলকুর পিসি হয়ত জলকুর বিছানা জাপটে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জলকুর বাবা—? জানি না।

আমি জেগে আছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার আমায় ভরে রেখেছে। মনে হচ্ছে এই লুকিয়ে থাকার খেলা আমি শুরু করেছি কতকাল আগে—আজ আর তার হিসেব পাওয়া অসম্ভব; এই খেলা কতকাল খেলব তারও কোনো সীমা পাচ্ছি না। এই অন্ধকারের মতনই সব। আদি হারিয়ে গেছে; অন্ত আছে বলে মনে হয় না।

এত অস্থির চঞ্চল কাতর বিহ্বল আগে কখনও হইনি। কেন? আজই বা আমার কি হল? জলকুর কাটা পড়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়?

বুকের মধ্যে কী যে যন্ত্রণা আর কান্না। কেমন এক মাথা-খোঁড়ার মতন হাহাকার। কিন্তু সব জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। পাথরের মতন। একটুও গলবে না, একটুও না। অন্ধকার কখন একটু ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। বাইরে হয়ত মাঝ-রাতে চাঁদ উঠল! কোন তিথি আজ...?

বাইরে থেকে আমায় নিঃশব্দে কে যেন ডাকছে। আমি জানি কে? অনেকক্ষণ থেকেই ডাকছে। সে এক ভীষণ আকর্ষণ। প্রাণপণে বাধা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু চাঁদ উঠছে বলে, আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে এসেছে। এমন কি হয়! হয়ত।

কদমগাছের পাতা সরসর করে কাঁপছে, বাতাবিলেবুর তলায় কাঠবেড়ালি ছুটছে...জলকুর দড়ির দোলনা ছিঁড়ে গেছে কবে...তার মানিকের কাঁঠালপাতা জমে জমে রোদে শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠেছে। এখন বুঝি হাওয়া ছিল একটু, শুকনো কাঁঠাল পাতা খসখস করে উড়ে গেল।

আমায় ধরে রাখতে পারল না ঘরের অন্ধকার। আমার বুক, মন, পা—প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন একবার শেষ চেষ্টা করে সেই অদ্ভুত যাদুকরী তীব্রতম আকর্ষণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চাঁদ ওঠেনি—উঠবে। পা বাড়াতে গিয়ে ফুলের টবে পা আটকাল। হাত বাড়িয়ে পথ ঠাওর করতে গিয়ে মনে হল, এটা সেই ফুল ছেঁড়া ডাল চিবোনো ডালিয়ার। জলকুর মানিকের একটা বিরাট অপরাধের স্মৃতি।

দু'পা এগিয়ে বারান্দার নিচে মাঠে নামলাম। পাশের বাড়ি অসাড়। মনে হল শূন্য। হয় সবাই মরে গেছে, না হয় ছেড়ে চলে গেছে। পোড়ো বাড়ির ভ্যাপসা গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। শ্যাওলা জমে জমে কালো দেওয়ালের অত্যন্ত আবছা একটু আভাস।

তরু কি চলে গেছে? তরু জানত আমি ফুল ভালবাসি, তরু জানত আমি গান ভালবাসি, তরু জানত আমি তাকেও ভালবাসতে শুরু করেছিলাম—সবই জানত তরু। তার অজানা ছিল না কিছু। সেই যে একদিন এক ঘন-মেঘলার আঁধার হয়ে আসা দুপুরে তরু অসাড় পায়ে আমার ঘরে এসেছিল, আমি ছিলাম...সে ছিল, ঝোড়ো ধুলোর ভয়ে জানলা বন্ধ ছিল... পাশাপাশি বসে ঘরভরা মেঘলার ঘনতা...। জলকু ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তরু চমকে উঠল, আমি চমকে উঠলাম। জলকু তার মানিককে খুঁজছে। ঝড় উঠছে কি না তাই। মানিকের সেই দ্বিতীয় অপরাধ।

চাঁদ উঠল। আমি টিলার ওপর উঠছি। চরাচর নিস্তব্ধ, বাতাস বইছে। তাল তাল এবড়ো-খেবড়ো ছায়া ছড়ানো এদিক-ওদিক। কোথাও হাল্কা, কোথাও নরম। চাঁদের অতি মিহি ঝাপসা আলো আমাকে ছায়াহীন করেছে।

জোনাকি জ্বলে না এখানে, ঝিল্লিরব হয়ত আছে...আমার কোনো হুঁশ নেই, মতিভ্রম হয়েছে হয়ত...বা কোনো কুহকের ডাকে চলে এসেছি।

টিলার উপর উঠে এসে দাঁড়ালাম, নিচে রেললাইন। কত যেন নিচু। চাঁদের মিহি, জলের মতন সাদা একটু আলো, রেল-লাইনের সাড় নেই, পাথরের কুচিগুলো চুপ।

হঠাৎ মনে হল, আমি যেন কিছু একটা ধরে রেখেছিলাম এতক্ষণ। তার ভার ছিল হাতে। আচমকা মনে হল, সে ভার আর নেই। ফেলে দিয়েছি। ছুঁড়েই দিয়েছি। টিলার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে...পড়ল। শব্দ কি শুনলাম? না, না। শব্দ নয়। তারপর চাঁদ একটু উজ্জ্বল হল, মুহূর্তের জন্যে...। এক মুঠো করুণ বিষণ্ণ আলো দুলে দুলে রেললাইনের একটু জমিতে কাঁপল। যেমন কাঁপা জলে আলো কাঁপে। জলকুর রক্ত বুঝি ওখানেই ছিল। কিংবা...মানিকের রক্ত বুঝি পাশেই ছিল, শুকিয়ে গিয়েছিল কবে। কবেই।

ক্ষীণ চাঁদ প্রকাণ্ড এক ভাসন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

কখন কদমতলার কাছে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি। জলকুদের ঘর থেকে পোড়ো বাড়ির গন্ধ ভেসে আসছে।

এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের মন এবং সত্তাকে ভাঙলাম। দু' ভাগে। এক ভাগ আমি, অন্যটি জলকু। মানুষ যখন তার নাগালের কাছে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে পায় না, অথচ তার কথা থাকে, তখন বোধহয় এইভাবে নিজেকে ভাঙে। জলকুর আদুল গা, কালো তুলতুলে চেহারাটি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আস্তে আস্তে তার মুখ স্পষ্ট হল। বড় বড় চোখ, বসা নাক, ঝুল জমে কালো হয়ে থাকার মতন চুলের গুচ্ছগুলি কপালে কানে চোখে ঝুলে ঝুলে পড়ছে।

মনে হল, জলকু পাথর ছুঁড়ছে। পরিচ্ছন্ন অথচ হৃদয়হীন এক ষড়যন্ত্র এবং অনেক সবল কঠিন নির্মমতার বিরুদ্ধে সে বোকার মতন তার ছোট পলকা হাতে শুধু পাথরই ছুঁড়ছে ব্যর্থ আক্রোশে।

কত কথা বলার ছিল, বলা হল না। বলতে পারলাম না। শুধু বললুম, 'জলকু, কে জানত গ্রামফোনের দম দেওয়া অতটুকু হ্যাণ্ডেল ছুঁড়ে মারলে তোমার মানিক মরে যাবে....একটুতেই কত কি যে মরে যায়। আশ্চর্য!'

জলকু হয়ত আমার কথা শুনতে পেল না। নিজের কথা নিজের কানেই ফিরে এসে লাগল। আমি শুনলাম। তারপর স্বপ্নের মতন দেখছিলাম, সারা দুপুর বিকেল সন্ধ্যে এবং প্রায় সারারাত পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা মানিককে আমি কেমন করে লুকিয়ে ছেঁড়া একটুকরো চটে জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি টিলার ওপর।

ছেলেটা মরেছে। লাইনে কাটা পড়েই মরেছে। আজ...।

পা

দেবেশ রায়

যেমনটি কথা ছিল, ঠিক তেমনই হলো।

প্রতিদিনের মতো সেই দিনটিও তারা রাত আটটা পর্যন্ত কাটাল। রান্নাবান্না মিটিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে থাকল, আবার উঠোনের মধ্যে একটু হাঁটা-ফেরা করল, হাঁটতে হাঁটতে বাইরে এল. বাইরে হাঁটতে হাঁটতে একটু এগুলে, তারপর দুজনেই দৌড় দিল।

বড়বৌ মরেছে এবং ছোটবৌ এক-পা-কাটা হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। দুজনেই মরতে গিয়েছিল। একজন মরল, আর একজন মরতে না-পেরে পালাতে গিয়ে পা-কাটা হলো। তা হলে কি তাদের দুজনেরই মরতে অনিচ্ছা ছিল? এতে কি তারা সারাদিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জানিয়ে দিয়েছে—আমরা কিন্তু আজ মরতে যাব আমাদের বাঁচাও। কেউ সে-কথা শোনেনি, বোঝেনি, তাই...! সবাই দূরে রেলওয়ে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে তাকায়। একটা নীল, তার উপরে একটা লাল গোল আলো। টক টক করছে না। স্থির হয়ে আছে। এর তলায়, ঠিক ওর তলায়, বড়বৌয়ের শরীরটা এখন তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। গলাটা এক টুকরো, মাঝের ধড়টুক এক টুকরো। ধড় থেকে আলাদা হয়ে শাড়ি জড়ানো দুটো প্রায়-পুরো-পা ছিটকে আছে খানিকটা দূরে। শাড়ি জড়ানো না থাকলে পা দুটো আলাদা আলাদা হয়ে ছিটকে যেত।

তা হলে আলাদা প্রায়-পুরো আর-একটা পায়ের সঙ্গে বড়বৌয়ের পা-দুটো মিশে যেত। পুলিশের সার্চ লাইটের আলোতে সেই পা-টা ধবধব করছে। উরুর যেখান থেকে কেটেছে, সমস্তটা জায়গা জুড়ে লাল, থিকথিকে লাল, কাটা পাঁঠার ঘাড়ের মতো। ছোটবৌয়ের হাঁটুর উপরে একটা কালো জট। কাটা হলদেটে ফরসা পায়ে কালো জট। ছোটবৌয়ের উরুর ভেতরে একটা হাড়ও ঠিক সমান মাপে কাটা গেছে। একটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে কোনো কলাগাছের মাঝখান থেকে কেটে দিলে তার শাদা শাদা ভেজা ভেজা একটু খসখসে উপরিভাগের মতো ছোটবৌয়ের উরুর মাংস আর চর্বিতে মেশা গোল করে কাটা জায়গাটা লাল, ভেজা ভেজা, একটু খসখসে।

ছোটবৌ এখন হাসপাতালে সাত-আটজন ডাক্তারে ঘেরা হয়ে নল দিয়ে নিঃশ্বাস টানছে। যদি ছোটবৌ বাঁচে আর পা তিনটি তাকে দেখানো যায়, নিজের পা সে পছন্দ করে নিতে পারবে?

অবশ্য ছোটবৌ বাঁচলেও আর বাঁচবে না। একবার যারা আত্মহত্যা করে মরতে যায়, তারা আত্মহত্যা করেই মরে। আরো একবার অবধারিত মরতে যাবার সত্যের কাছে বেঁচে যাওয়ার সত্যটাই যেন মিথ্যে হয়ে যায়। অবশ্য সত্যটা যে কী, সেটাই সমস্যা। হাসপাতালে ছোটবৌ অজ্ঞান হয়ে হয়তো বেশিক্ষণ থাকত না, কিন্তু তাকে রাখা হলো জ্ঞানহীন করে। দেড় দিন পর ছোটবৌ চোখ খুলল। ছোটবৌ চোখজোড়া খুলল আর বন্ধ করল। সেই সময়টুকুর মধ্যেই দেখা গেল, তার চোখের শাদা অংশটা হলদেটে, তাতে ছোট ছোট লাল শিরা। মণিটা চকচক করে উঠল। চোখের নিচের তীর দুটো শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটের মতো রুক্ষ, জলহীন। ঠোঁট দুটো ছোট-বৌয়ের একটু ফাঁক ছিল, সেটা খড়খড়ে, ফেটে গেছে যেন। ছোটবৌ প্রথমে চোখ খুলে কী দেখে, এটা সবারই জিজ্ঞাসা ছিল। ছোটবৌয়ের চাউনি দেখামাত্র যে-যার মতো বারান্দায় চলে গেল। তাদের সবারই মনে হচ্ছিল—ছোটবৌ সাধারণ নয়, স্বাভাবিক নয়। এবং অসাধারণতা ও অস্বাভাবিকতার প্রথম ধাক্কাটা ছোটবৌয়ের স্বামীকেই সামলাতে দেওয়া উচিত। ছোট-বৌ চোখ খোলার পর গত দেড়দিনের সবচেয়ে বেশি দেখা দৃশ্যটার উপর ছোট-বাবুর চোখ পড়ল। যখন ব্যান্ডেজ, ইন-জেকশন ইত্যাদি সব কিছু শেষ করে নার্স ছোটবৌয়ের গায়ের উপর একটা লাল কম্বল দিয়ে যায়, তখনি ছোটবাবু দেখলেন ছোটবৌয়ের কোমরের নিচের কম্বলের অংশটার ভাঁজ অন্যরকম। ছোটবৌয়ের ডানদিককার উঁচু থেকে সব ভাঁজ বাঁদিকের ঢালুতে গিয়ে পড়েছে। সেই তখন থেকে এ-দৃশ্যটা ছোটবাবুর চোখকে বারবার টানছে। আর নতুন করে টানল ঠিক এখন, যখন ছোটবৌ প্রথম চোখ মেলে চাইল। ◢

ছোটবৌ এমন অনেকবার চোখ খুলল, বন্ধ করল। দ্বিতীয়বার চোখ খোলার পর থেকেই ফাঁক ঠোঁট দুটো সে বুজিয়ে দিল। ঠোঁট বন্ধ করে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল। আবার চোখ খুলল। মণিটাকে চোখের চারপাশে ঘুরিয়ে আবার বন্ধ করল। যেন চোখের তীরগুলোয় শুকিয়ে-যাওয়া কাজলের কালিমা দেখা গেল। ছোটবৌয়ের কপালের দুটো পাশ, ভুরুর দুটো দিক, নাকের পাটা, চিবুক আর গলাটা দেখাচ্ছিল রুক্ষ, কর্কশ, রোদে পোড়া কচি লিচু পাতার মতো! ঠোঁট বন্ধ করার পর থেকে ধীরে ধীরে ঐসব জায়গা ঘামতে লাগল। গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম নয়, কপালটা গলাটা পুরো ভিজে উঠল। ঘামের বিন্দু নেই, কিন্তু ভিজে। নাকের পাটা আর চিবুকে জলবিন্দু আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। প্রথম চোখ খোলা ও বন্ধ করা থেকে পুরো একটা কথা বলার আগে ছোটবৌয়ের শরীরে তেমনি একটা অনুভূতি হচ্ছিল—খুব চেনা কোনো ফাঁকায় খুব দেখা কোনো গাছ কেটে দিলে আকাশটা দেখতে যেমন খালি খালি লাগে, অথচ বোঝা যায় না কেন অমন লাগছে। ছোটবৌ সেরকম একটা অনুভূতি নিয়ে ঘামছিল, আর যন্ত্রণায় দু-একটি শব্দ গলা দিয়ে বের করছিল।

ছোটবৌ প্রথম সমস্যায় পড়ল সে কোন কথা বলবে। প্রথম চোখ খোলার পর থেকেই এই সমস্যাটা ছোটবৌয়ের মনে মনে এসেছে। সারা শরীরটায় এত ক্লান্তি যে, শরীরটার অস্তিত্বই ভুলিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘসময় হতচেতন হয়ে থাকার জন্য নিজের চারপাশটাকে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। সে নিজের মনে সেই ফাঁকা ফাঁকা অনুভূতিটার ঠিক অর্থ ধরতে পেরেছিল। অর্থ ধরতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ বন্ধ করেছিল, চোখ বন্ধ করার মুহূর্তেই যেন ছোটবৌ ছুটন্ত ট্রেনটা দেখতে পেল। ছুটন্ত ট্রেন, একটা ছিটকনো মুণ্ডু, একটা শায়িত শরীর পলকের মধ্যে শূন্যে ধনুকের বাঁক এঁকে সোজা. আঘাত. হাসপাতাল। এবার ছোটবৌ ঠিক মেলাতে পারল। আবার চোখ খুলল—বর্তমানটাকে দেখবার জন্য। তার স্বামী শিয়রে বসা. পাশের বাড়ির বৌটি পাশের টুলে, বাইরে

আরো কিছু কথাবার্তা। ছোটবৌ চোখ বন্ধ করল। প্রথম চোখ খোলার পর থেকে শরীরের অসহ্য ক্লান্তি ও অনুভূতির ভারী স্থাবিরতাকে চাপা দিয়ে এ চিন্তাই সে বার-বার করছিল—তার স্বামী শিয়রে বসে। সে ছোটবাবুর স্ত্রী, মরতে গিয়েছিল। মরতে পারেনি। ছোটবাবুর রাগী আর বিরক্ত চেহারাটা কি রকম? কিন্তু রাগ বিরক্তি কিছুই যদি না থাকে—তা হলে ছোটবৌ কি করবে? কোন কথা প্রথমে বলবে। ছোটবৌ বুঝেছিল সে বাড়িতে শুয়ে নেই, তাতে তার মনে হলো—সে স্বাভাবিক ও সাধারণ নয়। পুনর্জাগরণের তন্দ্রার মধ্যে বার বারই ছোটবৌয়ের মনে হচ্ছিল—কি কথা প্রথম বলব? জ্বরতপ্ত রোগী যেমন বিকারের ঘোরে কোন কথার ধ্বনিটুকু মাত্র শোনে, কিছুতেই বুঝতে পারে না তার অর্থ কি? কী বলব, কী বলব, কী বলব, কী বলব—কুরে কুরে খেতে লাগল ছোট-বৌয়ের থমথমে মাথাটাকে। সে চোখ খুলে পারিপার্শ্বিক খতিয়ে দেখতে চাইল। জানালা দিয়ে ক্ষণিকের জন্য দেখতে পাওয়া বিকেলকে মেলাতে চাইল সেদিনের সেই রাত্রির সঙ্গে। আর কোনোবারই না পেরে চোখ খোলে, বন্ধ করে, চোখ খোলে, বন্ধ করে। তারপর উঃ আঃ শব্দ করে। চোখটা ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকায়, তাকিয়েই ঘুরিয়ে নেয়। বন্ধ করে। তারপর সেই ঘুণপোকা মাথা কাটে—কী বলব, কী বলব, কী বলব। ছোটবৌ শুনল, কে বলছে—'তোমার অসুবিধা হচ্ছে কোনো?' কথাটা শোনার পর মাথার সেই ঘুণপোকাটা থামল, থেমেই আবার মাথা কাটা শুরু করল। পা চুলকোচ্ছে খুব, পা চুলকোচ্ছে। আর বারকয়েক উঃ আঃ করে ছোটবৌ শেষে বলে ফেলল—'পা জ্বালা করছে খুব, কষ্ট হচ্ছে...চুলকোচ্ছে!' বলে ফেলার পর ছোটবৌ অনুভব করল তার মাথায় এতক্ষণ স্বামীর হাত ছিল। সেই অনুভূতির পরই আবার সেই উচ্চারিত বাক্যের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরে-ফিরে যেন একই প্রশ্নের জবাব খুঁজছে—প্রথম কথাটা স্বাভাবিক ও সহজ হল না তো! নার্স দেখে গেল। ছোটবৌ চোখ খুলল না। সে চোখ না খুলেই বাঁ হাতটা একটু সরাল। সেটা ছোটবাবুর ঠিক হাঁটুর উপর দিয়ে পড়ল। তারপরই ছোটবৌ একটু থেমে থেমে, একটু খুনিয়ে খুনিয়ে বলল—'আমায় সেই লাল চুমকি দেয়া স্যাণ্ডেলটা কিনে দেবে?' ছোটবাবু আবার ছোটবৌয়ের মাথায় হাত দিলেন। ছোটবাবু বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো হয়ে ওঠো নিশ্চয়ই কিনে দেবো।'

ছোটবৌয়ের প্রথম কথা শোনবার জন্য যারা আগ্রহী ছিল, তারা জানত অস্বাভাবিক কিছু শুনতে হবে। কিন্তু প্রস্তুত থাকলেও তাদের মনে কেমন এক ভীরুতা ছিল। তাই ছোটবৌ চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বাইরে চলে গিয়েছিল। বাইরে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল, আর কানসুদ্ধ মনটা ছিল ছোটবৌয়ের বিছানার পাশে। ঘরের ভিতরে দু-একটা শব্দ, নার্সের পায়ের খটখট, দু'একবার ঈষৎ জড়িত একটা কণ্ঠস্বর শুনেই তারা আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তখনই তারা আবার শুনল—ছোটবৌ কথা বলছে। স্বামীকে লাল চুমকি দেয়া স্যাণ্ডেল কিনে দিতে বলে এখন ঘুমুচ্ছে। ছোটবৌয়ের বিছানার পাশে টুলের উপরে বসা পাশের বাড়ির বৌটিই এসে কথাগুলো জানাল। জানিয়ে, সবার মাঝখান দিয়ে পথ ধরে বারান্দায় বেরিয়ে এল এই আশায় যে, সবাই এখন বাইরে এসে ছোটবৌয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করবে। আর তারা করলও তাই।

'যাক জ্ঞান হয়েছে তাহলে?'

'দেড় দিন তো গেল!'

'দেড় দিন যেমন গেল, একখানা পা-ও তেমনি গেছে!'

'লাল চুমকি দেয়া স্যাণ্ডেল? কী বলল?'

'চাইবেই তো, এখন বারবার পায়ের কথাই মনে হবে!'

ছোটবৌ এখন আবার খানিক আঃ উঃ করে ছোটবাবুর হাঁটুর কাছে পড়ে থাকা হাতটা কোলের উপর তুলে দিয়ে বলল—'আমি কাত হব।'

'কথা বোলো না, ঘুমিয়ে থাকো'—ছোটবাবু বললেন।

'আমি কাত হব।' অপরিষ্কার কান্নায় ছোটবৌয়ের গলার স্বর আনুনাসিক।

'তুমি ঘুমোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি'—ছোটবাবু ছোটবৌয়ের কপালের উপর থেকে হাতটা তুলে কোলের উপর রাখা হাতটায় রাখলেন।

'আমি কাত হব'—ছোটবৌয়ের জেদি কথাগুলো একেবারে বাচ্চাদের মতো শোনাল। ভঙ্গিটা বাচ্চাদের, কিন্তু স্বরটা নয়। ছোটবাবু বুঝলেন—ছোটবৌ বাচ্চা নয়, বাচ্চার মা। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে বললেন—'আপনি এখানে বসুন, আমি থাকলেই কথা বলবে।' ভদ্রমহিলা কাছে এলেন। ছোটবাবু সন্তর্পণে খাট থেকে নামলেন, ছোটবৌয়ের হাতটা নিজের হাতে ধরে। ভদ্রমহিলা ছোটবাবুর জায়গায় বসলেন। ভদ্রমহিলার কোলে ছোটবৌয়ের হাতখানা শুইয়ে ছোটবাবু বাইরে বেরিয়ে গেলেন, ছোটবৌ টের পেল, কিন্তু আবছা-ভাবে। ঘুমন্ত বাচ্চাকে অনেক রাতে জাগিয়ে খাইয়ে দিলে, পরদিন সকালে সে যেমন ভেবে পায় না গতরাত্রের খাওয়াটা স্বপ্ন, না সত্যি; তেমনি ছোটবাবুর ওঠা ও ভদ্র-মহিলা বসার পর মিনিট-দুয়েক না যেতেই ছোটবৌয়ের মনে হল—ছোটবাবুর উঠে যাওয়াটা স্বপ্ন, না সত্যি! ছোটবৌয়ের দেহ ও মনের সবটুকু নিথর নিস্তব্ধ। সেখানে গতি নেই। যেটুকু গতি না থাকলে ছোটবৌ বেঁচেই থাকত না, বেঁচে আছে বলেই সেটুকু গতি সে বুঝছে না। ফলে, বাইরের কোন গতি এসে তার সেই নীরব নিথর অস্তিত্বে ধাক্কা দিলে সেটা গভীরতায় পৌঁছচ্ছে না। হারিয়ে যাচ্ছে। তেমনি, ছোটবাবুর উপস্থিতিটা এতক্ষণ ছোটবৌ স্পর্শদ্বারা বুঝেছিল। ছোটবাবু নেমে আবার তার হাতটা পাশের বাড়ির ভদ্র-মহিলার কোলে রেখে গেছেন। ছোট-বৌয়ের নিথর হাতে দু' মিনিটের মধ্যেই সেই কোল পরিবর্তনের গতিটা হারিয়ে গেছে। গভীর নীরব রাতে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন শব্দে জেগে উঠে কয়েক মুহূর্ত পরে যেমন মনে হয় কোন শব্দই হয়নি, তেমনি ছোটবাবুর নেমে যাওয়া আর ভদ্রমহিলার বসা—এই ঘটনাটা ঘটার কয়েক মুহূর্ত পরেই ছোটবৌয়ের মনে হলো, ঘটনাটা ঘটেনি।

নাড়ানো-চাড়ানোয় ছোটবৌয়ের হাতটা উপুড় হয়ে ভদ্রমহিলার কোলের উপর পড়ল। আবার সেই ঘটেনি মনে হওয়া ঘটনাটা ঘটেছে বলে মনে হলো। হাতটা নাড়ানো-চাড়ানোয় কোনো শক্ত কর্কশ উরুর ছোঁয়া মিলল না। মেয়েদের উরু, নিশ্চয়ই কোনো মেয়ে বসে আছে শিয়রে, মেয়েদের উরু নরম, নরম ফরসা পা, একটা পাথরের বিছানায় অস্বস্তিকর শোয়া, এ-বিছানাটা পাথরের মতো শক্ত—'আমি কাত হব'—

ঘুমোও'—পাথরের বিছানায় ঘুম আসে না, ঘুম না আসার জন্যও মানুষ শোয়, লোহার বালিশে ঘাড়, ঘাড়ের নরম মাংসে লোহার ঠাণ্ডা, বালিশের উপর দিয়ে বেণী, বালিশটায় কাঁপন, লোহার বালিশটা কাঁপে, গর্জন, চোখ বন্ধ, কান খোলা, বন্ধ চোখে আলোর সূঁচ, চোখ খোলা, খণ্ড খণ্ড শরীর, ছিটকে দাঁড়ানো, দারুণ ধাক্কা, সাদা ধবধবে পায়ে কালো জুট, কী বলব, কী বলব, হাসপাতালে এক-পা কাটা, বড়দি দু'পা কাটা, মাথা কাটা; মরা, বড়দি মারা গেছে, আমি বেঁচে গেছি, আমি অস্বাভাবিক পা-কাটা, আমার পায়ে জ্বালা, আমি মরতে পারিনি, আমার গায়ে ব্যথা, আমি মরতে পারিনি।

ছোটবৌ আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

দুই বগলে দুই ক্রাচ নিয়ে রিকশা থেকে নেমে নিজের ঘরে খাটের উপর এসে বসার মধ্যেই ছোটবৌ লক্ষ্য করল, বড়দির ঘরে তার একটা ছবি বড় করে টাঙানো। বড়দির পরনে কল্কা পেড়ে শাড়ি, বড়দির মোটা গোলগাল চেহারাটা পরিষ্কার।

রিকশা থেকে তার নিজের ঘর পর্যন্ত যাওয়ার মধ্যেই বাড়ির আর সবাই দ্বিতীয়-বার আবিষ্কার করল যে, ছোটবৌর সামনের কটা দাঁত একটু উঁচু। ছোটবৌকে সে-কারণে ঠোঁট বন্ধ করে থাকতে হত। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফেরার পর, ছোট-বৌয়ের ঠোঁট দুটো বড় বেশি চাপা এবং শক্ত। ছোটবৌয়ের দাঁত যে উঁচু, বাড়ির লোক এটা বিয়ের পর প্রথম আবিষ্কার করেছিল। দ্বিতীয়বার আবিষ্কার হলো হাসপাতাল থেকে ফেরার পর। ঠোঁটদুটো মিলে থাকায়, ছোটবৌয়ের নাকের দু'পাশ থেকে দুটো রেখা বেরিয়ে উপরের ঠোঁটের কোণ দিয়ে নিচের ঠোঁটের পাশ দিয়ে থুতনিতে মিশেছে। পুরনো ভাঁজ-করা চিঠির ভাঁজ ভাঙলে যেমন অপ্রকট অথচ স্পষ্ট ভাঁজের দাগ দেখা যায়, ছোটবৌয়ের নাকের দুপাশ থেকে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে থুতনিতে এসে মেশা তেমনি দাগ, কিন্তু বাড়ির সবাই সেটি এই প্রথম দেখল। নিজের ঘরের খাটের উপর বসে ছোটবৌ টের পেল না সে হাসপাতাল থেকে একটা নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করে এনেছে। ঠোঁটের শুকনো মরা চামড়া তুলবার জন্য ছোটবৌ শুয়ে শুয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট খুটত। খাটের উপর বসে নিজের বহু পুরনো বিয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছোটবৌ তেমনি করে ঠোঁট খুটছিল। তাতে তাকে গভীর অন্যমনস্ক দেখায়। যেন সে যা দেখছে, তা ভাবছে না। আসবার সময় সে দেখে এসেছে বটঠাকুরের ঘরে বড়দির একটা ছবি টাঙানো হয়েছে। পুরনো ছবি—নতুন-করা এবং বড়-করা। বড়দি মরে গিয়েছে, তাই। ছোটবৌ মরতে পারেনি, তার ছবি নতুন হয়নি। ছোটবৌ নিজেই নতুন হয়ে ফিরে এসেছে।

বড় আর ছোটবৌয়ের বড় মেয়ে দুজন রান্নাঘরে ছিল। বাকি বাচ্চারা এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ছোটবৌকে দেখছে। ছোটবৌয়ের ক্রাচদুটো তার দুই হাতের দুপাশ। বাচ্চা-দের দৃষ্টি সেই ক্রাচের দিকে, পা না-থাকায় যে-দিকটা ফুটো বেলুনের মতো চুপসানো। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের পুরনো চামড়া তুলতে তুলতে ছোটবৌ বড়বৌয়ের সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে ডাকল—'টুনটুনি শোন্।' ন্যাঙটা টুনটুনি আঙুল চুষছিল। সে আঙুলটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে সবার পেছনে সরে গেল। ছোটবৌ বড়বৌয়ের আরেক বাচ্চাকে ডাকল—'বুলবুলি, আয়।' বুলবুলি দু-পা এগিয়ে দাঁড়াল। পেছনে বাচ্চাদের দলটা উৎসুক। 'কাছে আয়—।' বুলবুলি আরও দু-পা কাছে এল। ছোটবৌ হাত বাড়াল, বুলবুলিকে ছুঁতে পারল না। ছোঁয়া দিতে বুলবুলি আরও এক-পা এগুল। বাচ্চাদের দলটা ঔৎসুক্যে স্থির। সবচেয়ে সামনে টুনটুনি, তার মুখে আঙুল নেই। সবচেয়ে পেছনে ছোটবৌয়ের গোটা-দুয়েক বাচ্চা। বুলবুলিকে দুই হাতে ধরে, তুলে, ছোটবৌ কোলের উপর বসাল। প্রথমে বুলবুলিকে বসাল বেটপ করে। বুলবুলির খানিকটা পিছন পড়েছে ছোটবৌয়ের উরুতে, আর খানিকটা—যেখানে উরু থাকার কথা। বেটপ বুল-বুলিকে ছোটবৌ সেই একটা উরুর উপর ঠিক করে বসাল। বসিয়েই আবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট খুঁটতে লাগল। তারপর বলল—'বুলবুলি—।'

নেমে যাওয়ার জন্য শরীরের নিচের দিকটাকে পিছলিয়ে রেখে বুলবুলি বলল—'উ'

'সকালের খাবার খেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'কে দিল?'

'বামুনদি।'

'সে কে?'

'নতুন এসেছে।'

'কবে?' বলেই ছোটবৌ প্রশ্ন করল—'কি খেয়েছিস?'

'রুটি'।

'সবাই খেয়েছিস?' ছোটবৌ বাচ্চাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করল। 'হ্যাঁ'—মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সবাই। ছোটবৌ দরজাটা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাড়িতে নতুন বৌ এলে বচ্চারা তাকে ঘিরে ধরে, নতুন বৌ তাদের কোনো একজনকে কোলে নিয়ে এ জাতীয় নানা প্রশ্ন করে, আর ওরা সমস্বরে জবাব দেয়।

খোলা দরজার ওদিকে বারান্দায় ছোট-বৌয়ের বড় মেয়ে ছোটবৌয়ের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোটবৌ ডাকল—'ইরা।' মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। তাকিয়েই থাকল। বাচ্চারা পেছন ফিরে ইরার দিকে চাইল। বুলবুলি কোল থেকে পেছলে গেল। ছোটবৌ ডাকল—'শোন।' ইরা দরজায় এল, ছোটবৌয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ বাচ্চাদের বলল—'কী হচ্ছে সব, যাও, বাইরে যাও।'

সবাই দৌড়ে বাইরে গেল। তার মধ্যে ছোট-বৌয়ের গোটা দুয়েক বাচ্চা ছিল।

দরজার চৌকাটে ইরা। খাটের উপর ছোটবৌ। ছোটবৌয়ের দু'পাশে দুটো ক্রাচ। 'ইরা'—ছোটবৌ ডাকল। ইরার চোখে উত্তর ও প্রশ্ন।

'কী রাঁধছিস?'

'আমি রাঁধছি না, বামুনদি রাঁধছে।' ইরার মুখে উত্তর, চোখে প্রশ্ন।

'কী রাঁধছে?'

'ভাত নামিয়েছে, আমি আর মীরাদি আনাজ কুটে দেব, তারপর তরকারি চড়বে।'

'মীরা কোথায়?'

'বাবা আর জ্যাঠামশায়ের জন্য চা করছে।'

'তোর জ্যাঠামশায় অফিসে যাবে না?'

'ছুটি নিয়েছেন।'

'তোর বাবা?'

'যাবেন।'

'উনুনে এখন কি?'

'মীরাদি চায়ের জল চাপিয়েছে।'

'শোন, কাছে আয়।'

ইরা কাছে এল। কাছে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ইরা চৌদ্দ বছরের। আর একটু লম্বা হবে। এখন বেঁটে। ইরা দাঁড়িয়েছে লাঠির মত সোজা হয়ে। ইরার দাঁড়ানোটাই এমন যেন সে একটা উদাত্ত প্রশ্ন—আমি কেন লম্বা নই? ছোটবৌ দুহাত দিয়ে ইরাকে কাছে টেনে আনল। তারপর ইরার আঁচলটা পেছন থেকে হাতের তলা দিয়ে টেনে সামনে গুঁজে দিল- 'উনুনের পাড়ে কাজ করতে গেলে আঁচলটা ঠিক মতো গুঁজে রাখতে হয়। মীরাকে বলে দাও। আচ্ছা, চল। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। তর-কারি কুটে দেই। তোরা চা করে ঘরে নিয়ে বসগে।'

ছোটবৌ ক্রাচ সোজা করল, ধপ করে নামল এক পায়ের উপর, ক্রাচ দুটোকে দুই বগলের তলা দিয়ে মাঝামাঝি [illegible]। দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে, দুলে, অনেকখানি এগিয়ে গেল। আবার দোলা, আবার অনেকখানি। আর এক দোলায় ঘরের চৌকাঠটা ডিঙোবার আগে ছোটবৌ ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়াল, মাথা নামিয়ে বগলে ক্রাচ দুটোকে আটকে এক হাত একটু তুলে সামান্য ঘোমটা টানল, হাতটাকে নামিয়ে কাটা-পায়ের দিকের কুঁচিটা একটু তুলে কোমরে গুঁজল, মাটিতে হ্যাঁচড়াচ্ছিল পাড়টা। ছোটবৌ আর-এক দোলনে চৌকাঠ পেরিয়ে গেল। ইরা পেছন পেছন আসছিল। আসতে আসতে দেখল, সে ঘরের চৌকাঠ পেরুতে না-পেরুতে মা প্রায় রান্নাঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। মা ক্রাচে দুলে হাঁটে, ক্রাচের দোলনে একবারে দুই পায়ের সমান যাওয়া যায়। ইরা ভাবল মায়ের কাটা পায়ের চেহারা এখন কী রকম হয়েছে? একটা হাতকাটা লোককে মাঝে মাঝে পথ দিয়ে যেতে দেখেছে, সেই লোকটার হাতের উপরের টুকরোটা যেমন ছোট, কাটা জায়গাটা যেমন কোঁচকানো-মোচকানো, মায়ের উরুটাও কি দেখতে তেমনি হয়েছে?

ক্রাচে ভর দিয়ে ছোটবৌ রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়াল। ভেতরে চেয়ে দেখল রান্নাঘরের পুরনো সজ্জার মধ্যে কিছু নতুনত্ব এসেছে। একটা মেয়েছেলে তাকটার কাছে দাঁড়িয়ে কী খুঁজছে, ছোটবৌকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই কি করবে কিছু বুঝতে না-পেরে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকল। মীরা উনুনের উপর নিচু হয়ে আঁচল দিয়ে কেটলির হাতলটা ধরেছে। ততক্ষণে ইরা এসে ছোটবৌয়ের পেছনে দাঁড়িয়েছে। ছোটবৌ ডাকল—'মীরা শোন।'

মীরা চমকে চোখ তুলে চাইল। বছর পনেরর মীরা কেটলি ধরবার জন্য বাড়ানো আঁচলটা নিজের হাতের মধ্যেই চেপে ধরল। ধরে, দাঁড়িয়েই থাকল। ছোটবৌ মীরার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বামুনদির দিকে তাকাল, বামুনদির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে মীরাকে বলল—'উনুনের পাড়ে কাজকর্ম সাবধানে করতে পারিস না? আঁচলটা জড়িয়ে নে কোমরে।' বিমূঢ় মীরা আঁচলটা জড়িয়ে নিল এবং জড়িয়ে নিয়েও দাঁড়িয়ে রইল। বামুনদি, মীরা, পেছনে ইরা, মাঝখানে ছোটবৌ, উনুনের উপর কেটলির ভিতর ফুটন্ত জলের খলবল, খলবল। ছোটবৌ বলল—'আমাকে একটু চা দিস। তোমার নাম কি?'

'লবঙ্গ।'

'লবঙ্গ, বঁটি, আর তরকারির ঝুড়িটা বারান্দায় দাও, আমি কুটে দি—' পাশে একটু সরল ছোটবৌ। লবঙ্গ এতক্ষণে গতি পেল। কোত্থেকে পিঁড়ি, বঁটি, আর ঝুড়িটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দার দিকে এল। ছোটবৌ প্রথমে বাঁ-ক্রাচটাকে বগল থেকে সরিয়ে তার মাঝখানে ধরে বাঁদিকে অনেকখানি কাত হল, ক্রাচটা কাত হয়ে গেল, কাটা পা-টা প্রায় মাটি ছুঁল, ডানদিকে ক্রাচটা বাঁদিকে বেঁকে গেল, প্রায় ঘাড়ের উপর পড়ল, তারপর ক্রাচটা একটু পিছলে গেল, ছোটবৌ থপ করে পিঁড়ির উপর বসল। পিঁড়ির উপর ঠিকমতো বসা হয় নি, তাই ক্রাচ দুটোকে দেওয়ালের ভিতে শুইয়ে রেখে ছোটবৌ পিঁড়ির উপর ঠিক-ঠাক হয়ে বসল।

ঘরের ভিতর—মীরা কেটলির ঢাকনিটা আঁচল দিয়ে খুলে মুঠো থেকে চা-পাতি ঝুর-ঝুর করে কেটলির ভিতর ঢালতে ঢালতে, ইরা তাক থেকে চায়ের বাটি-ডিস-চিনির কৌটো-ছাঁকনি নামাতে নামাতে এবং বামুনদি নানা কৌটো খুলে খুলে একটা বাটির মধ্যে ধনে-জিরে রাখতে রাখতে—বারান্দায় ছোটবৌয়ের এই নতুন বসা দেখল।

ছোটবৌ তরকারি কুটছে। যে-করেই হোক, ছোটবৌ সহজ হবে স্বাভাবিক হবে। যে-করেই হোক, ছোটবৌ বাড়ির লোকদের ভুলিয়ে দেবে তার একটা পা নেই। তাই চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকার দুর্নিবার লোভ জয় করেও ছোটবৌ সকলের সঙ্গে বাড়ির কর্ত্রীর মতো ব্যবহার করছে। ছোটবৌকে আবার এ-বাড়ির ছোটবৌ-ই হতে হবে। মুখ থেকে সে যদি তার একটা পা কাটার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে পারে, তবে সবাই ভুলে যাবে ছোটবৌ মরতে গিয়েছিল, মরতে না পেরে এক-পা কেটে পালিয়ে এসেছে। ছোটবৌয়ের সেই পা-টা নেই, ফরসা ধবধবে পা, মাঝখানে একটা কালো জট।

যেটুকু অস্বাভাবিকতার খাদ থাকলে স্বাভাবিকতা খাঁটি হয়, স্বাভাবিকতার প্রাণান্তিক চেষ্টায় ছোটবৌ সেটুকু খাদ দিতে ভুলে গেছে। ছোটবৌ হাসপাতালের শাড়িটা ছাড়ে নি, কুঁচি দিয়ে পরা ছিল, তেমনিভাবেই পরা আছে, বাড়ির মতো করে বদলায় নি। কুঁচি-করে-পরা ফরসা-শাড়ি ছোটবৌকে বাড়িতে সম্পূর্ণ বিদেশিনীর চেহারা দিয়েছে। এলোমেলো খোলামেলা শাড়ির বদলে আঁটোসাঁটো শাড়ি, অভ্যস্ত অন্যমনস্ক ঘোমটার বদলে খাটো আঁচলের আত্মবিন্যস্ত অবগুন্ঠন। ছোটবৌ এ-বাড়িতে যেন কোথা থেকে বেড়াতে এসেছে, ঘুরে ফিরে কাজকর্ম করছে, আজ রাতটা থাকবে, কাল সকালে আবার চলে যাবে।

এ-কথাটা ছোটবৌয়ের নিজেরও মনে হচ্ছিল, বাড়ির আর সবাইয়েরও মনে হচ্ছিল। যে কারণে ছোটবৌ শাড়ি বদলাতে পারে নি, শাড়ি অন্যরকম করে পারতে পারে নি, ঠিক সেই কারণেই ছোটবৌ পিঁড়ির উপর বসে পড়েই তরকারি কাটা শুরু করেছে। ঝুড়ি আর বঁটি নিয়ে তরিতরকারিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ ভেবে নিতে হয়, তা সে ভুলেই গেল। একটা কিছু তুলে নিল, আঙুলে যে-ভাবে খুশি চলল। সেটা কি, কেন কাটা হলো—কিছুই দেখল না। ছোটবৌয়ের চোখ অবশ্য ওদিকে ছিল, কিন্তু ঠোঁট দুটো জোড়া লেগে গিয়েছে। ছোটবৌ দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটের চামড়া খুঁটছে। পুরনো চিঠির দুটো ভাঁজ নাকের পাশে থেকে উপরের ঠোঁটের কোণ দিয়ে নিচের ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে থুতনিতে গিয়ে মিশেছে।

ছোটবৌ অনেকক্ষণ পরে পিঠটাকে সোজা করে বসল। কোমর ব্যথা করছে, আস্ত পা-টায় ঝিঁঝিঁ ধরেছে। চোখ তুলে তাকাতেই আবার সেই পুরনো জায়গায় গিয়ে পড়ল। প্রথমে চোখ পড়ল—জানালায় মাথা দিয়ে বটঠাকুর শুয়ে আছেন, এখান থেকে তাঁর টাকটা দেখা যাচ্ছে, আর ও-পাশের দেওয়ালে বড়দির গলা পর্যন্ত। বটঠাকুর কি বড়দির ফটোটার দিকেই তাকিয়ে আছেন? খবরের কাগজ কোলে নিয়ে ছোটবাবু বারান্দার এক কোণে চেয়ারে বসে তার দিকে নির্ণিমেষে তাকিয়ে আছে। বড়দির দুটো আর তার নিজের দুটো বাচ্চা বারান্দার এক কোণে বসে জটলা করছে। চারজনের চোখই বড় বড়। বুলবুলি ক্রাচটা আর নিজের পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলছে। রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে মীরা তাকিয়ে আছে তার বাবার টাকমাথার দিকে। ইরা বসে আছে মীরার ঠিক পিছনে। স্তূপীকৃত কাটা তরকারির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রান্নাঘরের ভেতরে বামুনদি দাঁড়িয়ে আছে। সবটা একবার দেখে নিয়ে চোখ নামাল ছোটবৌ—লজ্জায়, পরাজয়ে, ক্লান্তিতে। দুটো কী আরও কুচিকুচি করল। তারপর বাড়িভরা নৈঃশব্দে সচকিত করে বলল—'লবঙ্গ, তরকারিগুলো নিয়ে যাও।' চেয়ারে বসা ছোটবাবু কোলের উপর ফেলে রাখা খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। বাচ্চাগুলো চমকাল। বটঠাকুর মাথা সরালেন না। লবঙ্গ তরকারির স্তূপের দিকে তাকিয়ে বলল—'এতো তরকারি কি হবে মা?'

দেয়াল ধরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ছোটবৌ বলল,—'রেখে দাও, বিকালে রেঁধো।'

'এ শেষ হতে যে দুদিন লাগবে!'

নিচু হয়ে ক্রাচটা তুলতে তুলতে ছোটবৌ বলল—'ফেলে দাও।'

অভিনয়-জীবনের প্রথম রজনীতে দ্বিতীয় তৃতীয় দৃশ্যে পাঠ ভুলে-যাওয়া-অভিনেত্রী যেমন সকলের সামনে চোখ নিচু করে বেরিয়ে এসে পরবর্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতে সাজঘরের চেয়ারে বসে, ছোটবৌ তেমনি করে খাটের উপর বসল। ছোটবৌ নিজেই ভুলতে পারছে না সে মরতে গিয়েছিল, মরতে না-পেরে ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে খুইয়ে এসেছে আস্ত একটা পা।

ছোটবৌ ক্রাচে ভর দিয়ে খাট ছাড়ল, দুলল, চৌকাঠ পেরুল, দুলল, আর দুলে-দুলে ছোটবাবুর চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছোটবাবু চোখ তুলে তাকালেন।

'তোমাকে আজ ক'টার সময় অফিস যেতে হবে?'

'একটা।'

'স্নানে চলো।'

'যাচ্ছি।'

ছোটবাবু কাগজটাকে ভাঁজে ভাঁজে ভাঁজ করলেন। তারপর উঠলেন। ছোটবাবুর পেছন পেছন ছোটবৌ চলল। ছোটবাবু

• চলছিলেন ধীর পায়ে, ছোটবৌ চলছিল দুলে দুলে। সেই ক্রাচহাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সেই আস্তে হাঁটা কিছুতেই মিলছিল না। সেই অমিল ছন্দে একসঙ্গে হেঁটে ছোটবৌ ছোটবাবুকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। দুই ক্রাচের উপর বগলের ভর রেখে হাত তুলল ছোটবাবুর শরীরের দিকে। স্নানের আগে ছোটবৌ ছোটবাবুর জামা, গেঞ্জি খুলে দিত। তেল এগিয়ে দিত। কখনও বা মাখিয়েও। তোয়ালেটা কাঁধে দিত। ছোটবৌ আজও তেমনি করতে গেল। ছোটবাবুর বুকের কাছে পড়ে ছোট-বৌ। গেঞ্জিটা অর্ধেক খোলার পর ছোট-বাবুর গলায় আটকে গেল। আরো খুলতে গেল। আরো খুলতে গেলে হাত আরো তুলতে হবে, ক্রাচটা মাটিতে পড়ে যাবে। অসহায়ের মতো ছোটবৌ মুহূর্ত কয় স্থির হয়ে থাকতে না থাকতেই ছোটবাবু হাত দিয়ে গেঞ্জিটা খুলে ফেললেন। ছোটবৌ মুখ ফেরাল। টেবিলের দিকে যেন কী খুঁজছে। ছোটবাবু নিজেই তেল, সাবান, তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

• রাগ-অভিমান-দুঃখ চেপে—জয় করে নয়, ভুলে গিয়ে নয়,—ছোটবৌ আবার ক্রাচে ভর দিয়ে রান্নাঘর গেল। মানুষ চললে পায়ের শব্দ হয়—সু-স-প্, সু-স-প্। ক্রাচের নিচে রবার দেওয়া। শব্দ হয় না। আওয়াজ ওঠে থুপ-থুপ।

পিঁড়ির ওপর বসে ছোটবৌ নিজের হাতে ভাত বাড়ল। গোল করে, চেপে চেপে, ছোট্ট করে। বাটিতে বাটিতে তরকারি মাছ-ডাল সাজাল। ইরাকে বলল পিঁড়ি পেতে দিতে। সেই পিঁড়িতে যখন ছোটবাবু এসে বসলেন, ছোটবৌ দুহাতে থালাটা তুলে আবিষ্কার করল, পিঁড়ির সামনে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিতে হলে দাঁড়াতে হবে, হাঁটতে হবে। হাতে থালাটা নিয়ে ছোটবৌ ছোটবাবুর দিকে সেই দৃষ্টিতে চাইল, যে-দৃষ্টিতে আধো-মফস্বলী বাঙালি বউ এককালে স্বামীর বেশ্যাবাড়ি যাওয়া দেখত। আত্মধিক্কার এবং কার্যকরণসূত্র আবিষ্কারের অক্ষমতা—এই দুটো হচ্ছে সে-দৃষ্টির ভাষা। ইরা এসে ছোটবৌয়ের হাত থেকে থালাটা তুলে নিয়ে ছোটবাবুর সামনে রাখল। ছোট মেয়েটি বিয়েবাড়িতে সারাদিন পান সেজেছে, পরিবেশনের সময় বয়স্ক কেউ তার সামনে থেকে থালাটা তুলে নিয়ে গেলে যেমন করে ছোট মেয়েটি তাকিয়ে থাকে, পেছন-ফেরা ইরার দিকে ছোটবৌ তেমনি করে তাকিয়ে থাকল। হাতে থালা নিয়ে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে ইরা চোদ্দ বছরের ইরা—তরতর করে হেঁটে, একেবারে নুয়ে, পিঁড়ির সামনে থালাটাকে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি ভঙ্গি ছোটবৌয়ের চোখে পড়ল।

প্রতিটি মুহূর্ত এক-একটা বিরাট বিরাট পাহাড় হয়ে ছোটবৌয়ের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। ছোটবৌ সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছে না। ছোটবৌয়ের আশঙ্কা হচ্ছে—আর পারবে না।

কিন্তু বার বার না পারার সামনে এসেও একটা শিশুসুলভ জেদে ছোটবৌ পারতে চাইছে। তাই; সারাটাক্ষণ ছোটবাবুকে সাধল—'এটা নাও', 'ওটা নাও', 'খাও না একটু।'

রান্নাঘরের দরজার কোণায় মীরা-ইরা-লবঙ্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে ছোটবৌয়ের কাণ্ড দেখছে। বাড়ির কোনো বয়স্ক পাগলের কাণ্ড-কারখানা যেমন অশঙ্ক নীরবতায় দেখে, ছোটবৌকে সবাই তেমনি-ভাবে দেখছে। আর ছোটবৌ নিজের সর্বাঙ্গে তাদের দৃষ্টি অনুভব করেও, ছোটবাবুকে ক্রমাগত সেধে সেধে তা অস্বীকার করতে চাইল। অবশেষে ছোটবাবু যখন জলের গ্লাসে হাত ডোবালেন, ছোটবৌ তখন হাতে-ধরা হাতাটা সশব্দে ডালের গামলায় ফেলে ছোটবাবুর ওঠার আগেই পিঁড়ি ছেড়ে উঠতে গেল। হাতাটা জোরে ফেলে ছোটবৌ নিজের দেহে যে-তীব্রগতি এনেছিল, ওঠবার সময় বাধা পেয়ে সে-গতিটা নিয়ন্ত্রিত হলো। ছোটবৌ ক্রাচটার মাঝখানে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই সে যেন ক্রাচটাকে অনেকখানি আপন করে নিয়েছে। ছোটবৌ সবার চোখের সামনে দিয়ে থুপ-থুপ করে আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল। বটঠাকুর জানলায় নেই। বড়দির ফটোর দিকে চাইল। বড়দির বিয়ের ফটো থেকে আলাদা করে বড়-করা। বড়দি সেজেছে। মুখে হাসি। ফটোটা যেন বড়দির মরার পরে তোলা। বড়বৌয়ের সাজ এবং হাসি বিয়ের। ছোটবৌয়ের মনে হলো বড়দির সাজ এবং হাসি মরার। ছোটবৌয়ের মনে হলো, বড়দির ছবিটার কাচে তার সারা শরীরের প্রতিবিম্ব পড়েছে। সে প্রতিবিম্বটা বড়দির ছবির চাইতে কম স্পষ্ট নয়। বড়দি সেজেছে এবং হাসছে। ছোটবৌ নাকের দুপাশে ভাঁজ নিয়ে ক্রাচ-বগলে দাঁড়িয়ে আছে। সেজে এবং হেসে বড়বৌ মরার পর জিতে গেছে। ছোটবৌও অমন সাজতে বা হাসতে পারত। বড়দির ছবির কাচে ছোট-বৌয়ের প্রতিবিম্বের ইচ্ছেটা যেন সে-রকমই।

দুলে দুলে ছোটবৌ আবার সেই খাটের উপর গিয়ে বসল। সেই খাটে বসে জানলা দিয়ে ছোটবাবুর অফিস-যাওয়া দেখতে দেখতে, কখন যেন ছোটবৌ রাস্তার লোক দেখতে শুরু করেছে। ইরা এসে বলল—'মা, খাবে না? নাইতে যাও।' ছোটবৌ নাইতে গেল এবং খেয়ে এল। এসে, আবার জানলার সামনে বসে রাস্তার লোক দেখা শুরু করল। সে নাওয়া-খাওয়াটা এমনভাবে সারল, যেন জানলায় এসে বসাটাই আসল কাজ।

ছোটবৌ দেখল মানুষ নানাভাবে হাঁটে। একটা হাঁটার সঙ্গে আরেকটা হাঁটার কোনো মিল নেই। হাঁটাটা যেন কেবল হাঁটা নয়, পুরো মানুষটাই। দুপুর, লোকজনের যাওয়া-আসা কম। একজন লোকের পর আরেকজন লোক আসতে খুব দেরি হয়। আর, সেই সময় ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব তীব্র মুহূর্তে সিনেমার রীল কেটে গেলে যেমন হয়, তেমনি লাগে।

একজন লোক হেঁটে গেল তরতর করে। লোকটা সরু, / সরু না হলে অমন করে হাঁটতে পারত না। খুব ছোট ছোট পা ফেলে লোকটা, চললে যেন খই ফোটে।......মাথায় ঘুঁটের ঝুড়ি নিয়ে এক ঘুঁটেআলী হাঁটে। মাথায় বোঝা। দু হাত একটু পাশে ছড়িয়ে টাল সামলাচ্ছে। সমস্ত পিঠটা দুলছে, পেছনটা সপসপ করছে এক সুমিত ছন্দ। একতালে নৌকো বাইলে নদীর জলে যেমন ছল—আৎ ছল—আৎ আওয়াজ হয়, তেমনি দেখতে লাগছে পেছনটা। ঘাড় থেকে ঢেউটা পিঠে ভেঙে, নেমে এসে, কোমরের নিচে একবার উঁচু হয়ে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আর সেই দু' ভাগ ওজন নিজের দুটো উরুতে বহন করছে, হাঁটু দুটো তাই একটু বেঁকে গেছে। ঐ বাঁকা হাঁটু থেকে আবার দুটো ঢেউ ছলবল করে উপরে উঠে গেছে। আর ঠিক কোমরের নিচে উপরে-ওঠা আর নিচে-নামা ঢেউ দুটো মিলে গিয়ে জটলা করছে। ছোটবৌ বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে, ঘুঁটেআলীর উরু দুটো এখন শক্ত হয়েছে।...আবার একটা লোক হেঁটে চলে গেল। খুব ধীরে, অথচ এক গতিতে, যেন হাঁটাটাই ওর কাজ, কেবল হাঁটা হাঁটা এবং শুধুই হাঁটাই। রোগীর সব চীৎকার, কান্না অগ্রাহ্য করে হাসপাতালের ডাক্তার যেমন ছুরি চালায়, তেমনি পথের পাশের সবকিছু অস্বীকার করে লোকটা হাঁটে, হাঁটে, কেবল হাঁটেই। ছোটবৌ অনুমান করল লোকটার পায়ের পেছনে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সাপের মতো মোটা স্পষ্ট রগ। আর, লোকটা হাঁটলে নিশ্চয়ই কটকট করে আওয়াজ হয়। ......আর-একটা লোক পান চিবুতে চিবুতে আসছে। খালি গা, জামাটা কাঁধে ফেলা। স্কুল থেকে বাড়িতে একা একা ফিরতে গেলে যেমন সারাটা পথঘাট অন্যমনস্ক করে দেয়, এ লোকটাকেও তেমনি করেছে। লোকটা বাঁ দিকে একবার তাকাল, তাকিয়ে থাকল, বাঁ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকল। এদিকে ফিরল। হাঁটা শুরু করল, চোখ ফেরাল, আবার তাকাল। /সোজাকে চলে গেল। ছোটবৌ ঠিক বুঝতে পারল, কোথাও ঘুমুতে যাচ্ছে। সে যখন যা করতে যায়, তার হাঁটা দেখলেই সেটি বোঝা যায়।

ছোটবৌয়ের হাঁটা এখন সর্বদা একরকম ক্রাচের দোলন। ছোটবৌয়ের হাঁটায় এখন লজ্জা-রাগ-অভিমান-ছলনা প্রকাশ করা যাবে না। অথচ আর সবাই পারবে।

পা, এক পা খুইয়ে এসেছে ছোটবৌ, সাদা ধবধবে একটা পা, তার মাঝখানে কালো একটা জট। বিছানায় বসে ছোটবৌ সামনে তার পা-টা মেলে দিল। তারপর শাড়িটা তুলল। একটু একটু করে, ধীরে ধীরে, নববধূর ঘোমটার মতো। সমস্ত পা-টা নিরাবরণ হয়ে এখন বিছানার উপর প্রসারিত। নিটোল উরু, মাঝে মধ্যে রোম-কূপের আভাস, বাসি দুধের মতো হলদেটে চামড়া, গোল হয়ে সরু হয়ে এসেছে হাঁটুতে। উরুর নিচু দিকে তলায় সামান্য খড়খড়ে, রংটা একটু কালচে, পুড়ে যাওয়া বাদামের

মতো। উপরের লম্বা হাড়টা দেখা যায় না, বোঝাও যায় না। নিচে নেমে গেছে। সেই হাড়টার উপর দিয়ে মাংসের নিটোল স্রোত বয়ে গেছে। স্রোতটা আঙুলগুলোর ডগায় চলে গেছে, পেছনের দিকটা নেমে গিয়ে গোড়ালি হয়েছে। গোড়ালিতে ফাটা নেই। সুন্দর ফরসা। পাশ দিকটায় একটু লাল আভা, খুব আঁকড়ি-কুঁকড়ি কাটা। পায়ের পাতায় চাপ দিলে আঁকড়ি-বাঁকড়িগুলো বদলে যায়। পায়ের তলাটা ফুলো ফুলো। বুড়ো আঙুলের পেছনটা বেশি মোটা, শক্ত, একটু খসখসে। পা-টা সুন্দর।

পা দেখে ছোটবৌ আড়চোখে একবার বাঁদিকে চাইল। এ-পায়ের শাড়িটা এতদূরে তোলা হয়েছে, তবু বাঁ পাশের শাড়ির তলায় কোনো পায়ের আভাস নেই।

একটা মরা মানুষ দেখলে বিস্ময় জাগে। মানুষ এত স্থির হতে পারে? মানুষের অস্থিরতা সবচেয়ে বড় প্রকাশ পায়ে। সেই অস্থির নৃত্যচপল পায়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ছোটবৌ ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলবেলা ঘুম থেকে ওঠা ও রাত্রিবেলা আবার ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে সন্ধ্যাবেলার একটা ঘটনা পরদিন সকালের জেগেটাকে অনিবার্যভাবে অন্যরকম করে দিল।

সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে গেছে। বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা ঘরে আলো নিয়ে পড়তে বসেছে। বড়রা সব বারান্দার এদিক-ওদিক ছিটকে একা একা বসে আছে। বারান্দায় কোনো আলো নেই। ঘরের আলো জানলা-দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে এসেছে। সেই আলোর গণ্ডীতে কেউ বসে নেই। সবাই অন্ধকারে। এক জায়গায় নয়। ইরা-মীরা পরস্পরের মতো রান্নাঘরের সাহায্যে আছে। সন্ধ্যাবেলা তারা ছোটবৌয়ের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে এল না দেখে কেউ আর তাকে ডাকতে যায়নি। ইরা-মীরা দরজার পাশে একজন আর উঠোন থেকে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির উপরে একজন। ছোটমামু একটা চেয়ার নিয়ে সকালের জায়গাটাতেই সামনের খুঁটিটার গায়ে পা তুলে দিয়ে। ঘরের সামনে মাথার উপরের জানলাটা বন্ধ করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ছোটবৌ। অন্ধকার সারাটা উঠোন আর বারান্দায়। কয়েটা মোটাসোটা বেঁটে, গোল অন্ধকার কয়োর বাঁশটা লম্বা হয়ে শূন্যের উপরে ঝুলছে। কারো কোনো ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে না, কেউ দেখছে না। শুধু ঘন কয়েক থোক অন্ধকার। অন্ধকার বারান্দায় আরো চারটে গভীর অন্ধকার। বাচ্চারা পড়ছে কখনো একসঙ্গে চারপাঁচজন চেঁচিয়ে একটু পরেই একে একে থেমে যাচ্ছে, অবশেষে থাকে কেবল একজনের ঘুমজড়িত গুনগুনে। ওদের খাওয়ার সময় হয়েছে। রান্নাঘর থেকে টগবগ ধ্বনি আসছে। সেই গুনগুনে আর টগবগ অন্ধকারের স্পর্শের মতন এ-চারজনের কানে প্রবেশ করছে। কেউ কাউকে দেখছে না। সবাই নিজেকে ভাবছে, একা একা, একেবারে একা। বাচ্চাদের গুনগুন, রান্নাঘরের টগবগ। বাচ্চাদের গুনগুন, রান্নাঘরের টগবগ। বাচ্চাদের গুনগুন রান্নাঘরের টগবগ। অন্ধকার। ছোটবৌ মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে জানলা দিয়ে বটঠাকুরের ঘরে বড়দির ছবির দিকে। বড়দি হাসছে, বড়দি সেজেছে। অন্ধকার। টগবগ আগুন। বড়দির ছবির কাঁচে কি ছোটবৌয়ের ছায়া পড়েছে? সামনে গেলে পড়বে? প্রতিবিম্বটা বড়দির ছবির চাইতে কম স্পষ্ট নয়। বড়দির মুখে হাসি। কাচবদল প্রতিবিম্বের মুখে ময়লা কাগজের ভাঁজ। অন্ধকার। ছোটবৌ অন্ধকারে বসে। প্রতিবিম্ব পড়বে না। টগবগ। গুনগুন। দূরে একটা বাঁশি শোনা গেল। তীব্র বাঁশি দূরে থেকে আসছে। তীক্ষ্ম স্বর দূরে থেকে আসছে। সেই তীক্ষ্ম বাঁশিটা, সেই তীব্র স্বরটা এক প্রবল গর্জনে রূপান্তরিত হচ্ছে। একথা যখন তারা টের পেল, তখনই দূরাগত তীব্র বাঁশির প্রতিধ্বনি করে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে ইরা চেঁচিয়ে উঠল—"মা।" বাচ্চাদের গুনগুন থেমে গেল। রান্নাঘরের টগবগ আর অন্ধকার আর সেই তীক্ষ্ম তীব্র বাঁশির সঙ্গে গর্জন। চমকে সবাই সেই

চমকিত অবস্থাতেই স্থির হয়ে রইল। ছোটবৌ অনামনস্ক হতে চাইল কুয়োপাড়ের অন্ধকারের দিকে চেয়ে। লবঙ্গ রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে বারান্দার আলোটা জেলে দিল। হাঁটুতে মুখ গোঁজা ইরা চোখ তুলল। তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশি আর গর্জনটা মিলিয়ে গেছে। রান্নাঘরের টগবগ আর শোনা যাচ্ছে না। বারান্দার আলো জ্বালানোতে ছোটবৌ দেখল ঘরে বড়দির হাসিটা ম্লান। সেই ট্রেনটা। সেই ট্রেনটা। ছোটবৌ একবার সবার দিকে চাইল। কেউ ভোলেনি, কেউ ভুলবে না। ইরার চিৎকার যেন এই অন্ধকারে সকলের চিন্তাটা জানিয়ে দিয়েছে। সবাই একই কথা ভাবছিল। ছোটবৌ মরতে না-পেরে এক-পা খুইয়ে এসেছে। ছোটবৌ মরতে গিয়েছিল, মরতে পারেনি। ছোটবৌ বাঁচতেও পারছে না। ক্রাচে দুলে ছোটবৌ ঘরে ঢুকল। বাচ্চারা থমথমে হয়ে গেল। ছোটবৌ তাদের কিছু বলল না। বিছানার উপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। বিছানার সঙ্গে হেলান দেয়া ক্রাচ-দুটো শব্দ করে পড়ে গেল। ছোটবৌ ফিরে চেয়ে দেখল না।

বাড়ির কিছুদিন ধরে শাড়ি পরতে শেখা মেয়েটি প্রেম করছে—এটা বাড়িতে প্রথম জানাজানি হবার রাত্রিতে সেই মেয়েটির সবার সঙ্গে খেতে বসা, খাওয়া এবং উঠে আসার মত ভঙ্গিতে ছোটবৌ সে-রাত্রিতে খেয়ে এল। সেই মেয়েটির মতোই ছোটবৌ শুয়ে শুয়ে সাতপাঁচ ভাবতে লাগল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেও ছোটবৌ যেন কোনো একটা ডাকে সাড়া দেবার জন্য অসহায় ইচ্ছুকের মতো প্রস্তুত। ঠোঁটদুটো বাদে তার সারা শরীরে অসহায়তা। সামান্য ফাঁক ঠোঁটেও খুব একটা জোর। সেই ময়লা কাগজের মতো ভাঁজটার উপর দিকটা স্পষ্ট, আর নিচ দিকটা অস্পষ্ট। স্পষ্ট-অস্পষ্ট, ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে ছোটবৌ ঘুমিয়ে আছে।

পরদিন খুব সকালে, রাত শেষে, ছোট-বৌ আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করল—বটঠাকুর কি উঠেছেন লবঙ্গ? তারপর নিজে উত্তর করল—বটঠাকুর সারারাত ঘুমুতে পারেন না নিশ্চয়ই। লবঙ্গও নিশ্চয় সকালে উঠেই উনুনে আঁচ দেয়। এই একই প্রশ্ন আর এই একই উত্তর ছোটবৌ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। তারপর উঠল। ছোটবাবু অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। বটঠাকুর ঘুমোন না। ছোট-বাবুকেও জেগে থাকতে হত! দুঘরে দুভাই সারারাত জেগে। নিদ্রিত ছোটবাবুর পাশ দিয়ে ছোটবৌ খাটের কানায় এল। খাটের বাজু ধরে থপ করে একটা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। খাটের বাজু ধরে ছোটদের এক্কা-দোক্কা খেলার মতো একপায়ে একটু লাফিয়ে দেয়ালে হাত দিল। ক্রাচ দুটো আনল। চৌকিতে একটু হেলান দিল। ক্রাচ দুটো বগলে নিল। দাঁড়াল। দোলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছোটবৌ একবার মুখ ঘুরিয়ে ছোটবাবুকে দেখল। ছোটবাবু জাগেনি। ছোটবাবু ঘুমুচ্ছে। জেগেছে কিনা দেখতে যতক্ষণ সময় লাগার কথা, ছোটবৌ তার চেয়ে বেশি সময়ই তাকিয়ে থাকল। তারপর তলায় রবার ক্রাচে থপ থপ আওয়াজ তুলে ছোটবৌ দরজার কাছে এল। দরজার ছিটকিনিটা খুলল। শব্দ হবে এটা জানাই ছিল। তবু সাবধান হয়নি। শব্দ হবার পর আবার মুখ ঘুরিয়ে ছোটবাবুকে দেখল। জাগেনি। জাগবে না। ছোটবৌ বেরিয়ে গেল। ছোটবৌয়ের শাড়ি বিস্রস্ত, চোখে পিচুটি, মুখের ভিতরে লালার আঠাল অনুভূতি, ঠোঁট চাপা, অতি স্পষ্ট ময়লা কাগজের ভাঁজ। ছোটবৌ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বটঠাকুরের ঘরের দরজা খোলা। তার আগে এ-বাড়ির কেউ জেগেছে, এটা যেন ছোটবৌয়ের কাছে খুব আনন্দের খবর মনে হলো। বটঠাকুর কোথায়? বাথরুমে? ছোটবৌ ক্রাচটাকে একটু ঘুরিয়ে বট-ঠাকুরের ঘরে উঁকি দিল। ঘরটা আবছা অন্ধকার। বাইরের সামান্য আলো ভিতরে গেছে। বড়দির ছবিটা মোটেই স্পষ্ট নয়। সেই কাঁচে বড়দি ছায়ার মতো অস্পষ্ট। তবু ছোটবৌ দেখল বড়দি সেজেছে এবং হাসছে। ফটোর কাঁচে ছোটবৌয়ের প্রতি-বিম্বও কম স্পষ্ট নয়। তার ঠোঁটে ভাঁজ। বড়দির এই বিয়ের হাসি আর সাজের কথা মনে করেই বটঠাকুর সারারাত জেগে থাকেন। বটঠাকুর যে সারারাত জেগে থাকেন—এটা সে ধরেই নিল। তারপর কুয়োপাড়ের দিকে ক্রাচ চালাল—যেন মুখ ধুতে যাচ্ছে। ছোটবৌ মরতে চলল। আজ রাত থেকে দুঘরে দুজন জেগে থাকবে। ছোটবাবুকে সে তো সেদিন থেকে জাগিয়ে রাখতে পারত! দুজনে শোয়া অভ্যাস, একজন শুতে হবে বলে কেন একজন জেগে থাকবে পাশের খালি বিছানাটার দিকে তাকিয়ে। ছোটবৌ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। ছোটবৌ জানে না কাল রাতে কখন ছোটবাবু এসে শুয়েছে। ছোটবাবু কেন তার গায়ে হাত দিয়ে জাগালেন না? খুব নরম কোমল করে বসাতে হাত রাখলেই ছোটবৌ জেগে যেত। (খুব নরম কোমল কোনো বস্তুকে ছুঁচ্ছে—এমনিভাবে ছোটবৌ কুয়োর কানায় হাত দিল।) ছোটবৌ ঘুম চোখে অস্পষ্ট আলোতে ছোটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ছোটবৌকে ছোট-বাবু জাগালেন না। আজ রাত থেকে নিজেকে জেগে থাকতে হবে। যে একবার মরতে গিয়ে মরতে পারে না, যে-করেই হোক নিজেকে সে মারবেই। কত কাহিনী মনে পড়ল ছোটবৌয়ের। কুয়োপাড়ের চার-দিকে চোখ বুলিয়ে ছোটবৌ দেখল শ্যাওলা, সারারাত জল পড়েনি তাই শুকনো ছাই, ঝামা, নর্দমার মুখে ভাত-ডাল, কুয়োর কানা এবড়ো-খেবড়ো। (ছোটবাবুর হাতের তেলো নিটোল।) মরতে গিয়ে মরতে না-পেরে ফিরে এলে, ছোটবৌ ভাবল, সে মরণেরও নয়, জীবনেরও নয়। কী কারণে ছোটবৌ মরতে গিয়েছিল, তা সে ভুলে গেছে। কিন্তু মরতে গিয়ে যে একটা পা খুইয়ে ফিরে এসেছে, তা সে ভুলল না। কেউ ভোলেনি। এখন মরতে না পারলে সে আর বাঁচতে পারবে না। বড়বৌয়ের মতো সে হাসতে পারবে, বিয়ের সাজের হাসি, বড়ো ফটো, মোটাসোটা, বুক পর্যন্ত, ফটোর কাঁচে ছোটবৌয়ের ছায়া, কুয়োর জলে ছোট-বৌয়ের অর্ধস্পষ্ট ছায়া। কুয়োর ভেতরে আবছা অন্ধকার। কুয়োর জল আবছা, তবু বোঝা যায়, কালো। ছোট গন্ডী। সেটুকু হাতে পাওয়া যাবে না। ছোটবৌ মনে মনে কুয়োর জলের ভেতর ডুবে গেল। মাটি ছুঁল। আঁকুপাঁকু করল। মাটি খুবলোল। ওলট-পালট খেল। কুয়োরতলের কাদার মধ্যে খিমচোতে লাগল। কুয়োর তলের টিনের পাতে আর নানা জিনিষে হাতের তেলো কেটে গেল। রক্ত বেরুল, কালো জলের মধ্যে একটুখানি লাল সুতোর মতো রক্ত। মিশে গেল। ছোটবৌয়ের মাথা নিচে হলো। একটা ঠ্যাঙ হাঁটুতে ভাঁজ হয়ে উপরে ডাং ডাং করতে লাগল। মুখচোখ নাক থুতনি কাদায় গেঁথে গেল। কাত হয়ে কুয়োর কানায় আটকে গেল। পেটটা সব-চেয়ে ভারি হয়ে উঠল। ভেসে উঠল। সমস্ত শরীর জলের তলে, কেবল [illegible] হলদেটে পেটটা জলের উপরে, শাড়ি দেখা যাচ্ছে।

লবঙ্গ উঠতে এতো দেরি করে কেন? সকালে উঠে উনুনে আঁচ দিতে পারে না? বটঠাকুর বাথরুমে এত দেরি করেন! ছোটবৌ আবার কুয়োর জলের দিকে তাকাল। প্রতিবিম্ব। বড়দির ফটোর কাঁচ প্রতিবিম্ব। ছোটবৌ ছায়াতে সেজেছে, হাসছে। কুয়োর জল কালো। ছোটবৌ বারান্দার দিকে চাইল। খালি। অনায়াসে ছোটবৌ বগলের ক্রাচ দুটো [illegible] করে ধরে শরীরের উপরের অংশটা কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দিল। ছোটবাবুর হাতের তেলো নরম, স্পর্শ কোমল। ছোটবৌ এবার আর একটু ঝুঁকে হাতের ভর ছেড়ে দেবে। বট-ঠাকুর? লবঙ্গ? ছোটবাবু? ছোটবৌ কিছু একটা ভাবতে গেল, পারল না। আঁ করে একটা কান্না শুরু হয়েই থেমে যাওয়ার ধ্বনি কানে এল। ছোটবৌ রেল লাইন থেকে উঠে পড়ার মতো দ্রুতগতিতে উঠে দাঁড়াল। দেখল বারান্দায় বুলবুলি হাঁ করে কাঁপছে।

ছোটবৌয়ের দুই ঠোঁট আর জোড়া লাগল না। ময়লা কাগজের ভাঁজটা ঠোঁট থেকে উপে গেল।

এক বছর পর ছোটবৌয়ের একটা দু-পা-অলা বাচ্চা হলো।

আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

রমাপদ চৌধুরী

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাস নি। ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরি।' বড় জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হয়, আমি বয়েসের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড় জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিল। আর যেহেতু আমি ওর ছোটো দেওরের বউ, অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো 'নতুন'। সেই বড় জা বললে, 'দেখ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এরপর তো সারাটা জীবন আমাদের মত হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি হাসি পায়।

তাই বড় জার খোলাখুলি কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জা লজ্জা করতো, কিন্তু তাই বড় জার দমবার পাত্র নয় তার দেওরটিকে বললে, 'ছোটঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিং কোথাও বেড়িয়ে এস। দিন কয়েকের জন্য। এই যে হা নমুন না—কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি।' তা শুনে এমনভাবে হাসল গৌতম, তাকালো আমার দিকে যে বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছাটা বুঝতে পেরে—না, আজকালকার মেয়েদের মত ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না। পুরোনো দিনের বউদের মতই ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে নামটা মুখের মধ্যে লোফালুফি করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড় জার সামনে তো ওর নাম বলতে পারি না। তাই বললাম, ওর' ইচ্ছে হয় যাক আমি যাবো না। বড় জা রাগ দেখিয়ে বললে 'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই। যা বলছি শোন' 'নতুন' ছুটিতে দিন কয়েক কোথায় গিয়ে—'

ঠেলেঠুলেই একরকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি, দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম, সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে জানতামই না? আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশীর ঢেউগুলো গুমরে গুমরে করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগলো, ছেলেমানুষের মত আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে, কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশী হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখজোড়ার দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভাল লাগলো, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মত নীল, সমুদ্রের মত গভীর, সমুদ্রের মত বিশাল, আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো।

ও বললে, 'কি দেখছো অমন করে?' ওর বোধ হয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না? কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে একটু দুষ্টুমিতে, পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্দুর দেখছি'।

ও কেমন অপ্রতিভ হলো, হাসলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাং, আমি ডুইব্যা মরি!'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিল খিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির উপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়েছে, সেখানে।

না, ঠিক অতদূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয় ভয় করলো। আমি তো আর আগে সমুদ্র দেখিনি, তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয় ভয় করে, তেমনি ঠিক কেমন, বলবো? ফুলসজ্জার রাতটার মত। ভালোও লাগছে, মনের মধ্যে একটা বেশ খুশীর গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কি গৌতম এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে। গা ঘেঁষে। আর আমারই মত তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

ছোট ছোট এক একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিল। মেয়ে পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। যেই ঢেউ এসে পড়েছে দু' একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা, ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সারি পড়ে আছে বালির উপর, আর বালির উপর বসে বসে বড় বড় হালগুলো মেরামত করছে ছেলেরা।

'এই, ওরা কুড়োচ্ছে কি? আমি জিগেস করলাম।

ও বললে, 'ঝিনুক।'

'ওমা, তাই নাকি-' আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানা রকমের, সাদা আর রঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়েছে বালির ওপর। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়াতে কুড়াতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম, কারণ যারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তারা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমার চোখ-দুটো টানাটানা, আমার থুড়িটা কি চমৎকার, আমার ফর্সা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বুলাতে ইচ্ছে করে, এমনি সব কথা বলে ইস্কুলের বন্ধুরাও আমাকে ক্ষ্যাপাতো, কলেজের মেয়েরাও প্রশংসা করতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম রূপ দেখছিলো

না ওরা। বয়েস হওয়া দুটি মহিলার হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিল আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অন্যরকম লাগে।

তা ছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধহয় একটু বেশী দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশী দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিলো বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিল ঝিনুক কুড়োতে, ওদের সামনে ওদের মত ঝিনুক কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। এক সময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূরে হয়ে গেছে ভয় ভেঙে গেছে তখন। হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে গৌতম পিছন-পিছন আসতে আসতে আমার ফর্সা পা—পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস। আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশী অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে। না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পরের দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগলো। সমুদ্দরে নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের উপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কি-না এই প্রথম। এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন? যাক, এসেছি যখন চোখ ভরে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই। যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালির উপর বসলাম দুজনে। স্নান করতে করতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়ের মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূরে অবধি চলে যাচ্ছে। আর তারাও ওদিকে, অনেক দূরের অথৈ জলে কালো-কালো ক্ষুদে-ক্ষুদে কয়েকটা ডিঙিতে করে মাছ ধরছে নুলিয়ারা। পাড় থেকে কেউবা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বার বার ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি, সমুদ্রে স্নান করবে না।

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম না বাবা অত শখ নেই আমার।

—'আরে দূর, ভয়ের কিছুই নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে দেখো।'

গৌতম বললে—এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিয়া, সমুদ্রের সঙ্গে চেনাশোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেবো কি না। বিয়ের পর সবাই বউয়ের কাছে অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে একথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টার সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম কি দেখছেন স্যার?

—সমুদ্র।

বললাম উঁহু আমি জানি।

—কি?

হেসে উঠে বললাম, বলবো না।

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কাপড়চোপড়—একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজ-লজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে। জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরের কিছুই চাপাঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাট-ক্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ার্কির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম—এই, কি দেখছো মশাই অমন ড্যাব-ড্যাব করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম, ওদের মত ওভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে, গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না হচ্ছিলো তা নয়। এক-একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মত নুলিয়াটাকে হাত ধরতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াটাকে হাত ধরেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে? টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এতদূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড়-জা হয়তো জিগ্যেস করবে, হ্যাঁরে নতুন, সমুদ্রে নেয়েছিস তো রোজ? তারপরও অবশ্য ইয়ার্কি-ঠাট্টা করবে তা জানি। বড়-জা বলেছিলো, আগে নাকি এসেছিল একবার রথের সময়। ননদরাও। এবার ওরা যদি সবাই আসতো, ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেতো। বড়-জা বেশ ভাল মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী।

কারো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো-হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেলো। সামনে তাকাতেই আমি হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো। প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে ফিরে এলো বালির উপর হুমড়ি খেয়ে।

আরে, এর মধ্যে এত চড়া রোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

—কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যেস করল।

আমি সায়ও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতরে ভেতরে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিলো তা নয়।

গৌতম বললে, চলো তাহলে তেল-তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা সেলাম করলে। নাহাতে যাবে না দিদি?

বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্য তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিলো ওর জন্যই। বললাম, থাক না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো গৌতম। আমার কথাটাকে কোন আমলই দিলো না। হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়ে ভীতু।

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ, আমাদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখাচোখি হতেই বউটি হেসে বললে, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা—কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও যে ঢেউয়ের কাছে যেত না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সাদাসিধে শাড়ি পরেছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে সুচ্ছন্দ বুকের উপর দিয়ে, একরাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের উপর। আমি সমুদ্রকে ভয় পাই—এ-কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ তাকিয়ে ছিলোই বা কেন? না হয় আমার চেয়ে একটু সাজ-

গোজ বেশী করে। দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দরী?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেলো। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেরুবার মুখে।

গৌতম বললে, না. না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করবার মত মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে, সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু' আনা পয়সা ছাড়া তো নয়, তার বেশী আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশী হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে—তার নব-পরিণীতা স্ত্রীর চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়ে ও বোধ হয় আমার কাছে ওর মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেলো, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিণ্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হল না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও, বললে, বেশ তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে যাবো। তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চিৎকার করে বললাম, এই! বেশী দূর যেয়ো না। কিন্তু বললেই কি আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছিলো। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি। এ-সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন্ স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না। আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিলো, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনও কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্য। ও একা একাই কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো। একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে তখন ও অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধ হয় শুনতে পেলো না।

একি! এতদূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এতদূরে চলে গেছে তখন গৌতম, সেখানে আশেপাশে আর একটিও লোকও নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বৌটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, দেখো, দেখো, উনি কতদূর গেছেন। বউটির চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে সুপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি, গৌতম যেন মুহূর্তের জন্য নেপোলিয়ানের মত বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের উপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝিবা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে তাই বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চিৎকার করে বলছে—আমাকে বাঁচাও।

অতদূর থেকে তার চিৎকার কানে এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শরীর মুহূর্তে মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠলো। আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মত আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখনও। অন্যমনস্কভাবে কি যেন দেখছে। সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আমার, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মত হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার দু' হাতের দুটো বালা খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম ওকে, বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখো ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে...ঠিক কি বলেছিলাম, কি ভেবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিলো না। কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালাদুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকালো গৌতমের দিকে। বিড় বিড় করে কি যেন বললে, তারপর সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কী উৎকণ্ঠায় একঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির উপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোটাছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি...একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আর আমার মন বলছে, পারবে না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমিষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর আমার পা-দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো. নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেলো, সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চিৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল...আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর? বীভৎস একটা আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধ হয়, বসে পড়লাম বালির উপর, কিংবা পড়ে গেলাম, কিংবা...

কি যে হয়েছিল আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম একরাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি বাবু বাঁচে গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনও ধুঁকছে, ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে, নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে

খরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম ঘুম, পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দায় দু'খানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দূরে হয়েছে, কিন্তু গৌতমের সারা দেহে তখনও ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মত শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকের মত ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিলো সারা হোটেলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিল, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিল। গৌতম কেমন আছে, আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি।

এক সময় সাজুন্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে,—কেমন আছেন?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো বলল, ভালো। তারপর মাথা নিচু করল।

আর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেলো। তাঁকে নুলিয়ার হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমি হেসেছিলাম। পাশাপাশি দুজনকে তুলনা করে গৌতমের দুঃসাহসের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম। ওরা চলে গেলো। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তখনই চোখোচোখি হলো নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকালো আমার দিকে, হাসলো, সেলাম করলো। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। ও না থাকলে আজ কি যে হতো। গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ মৃত্যুই তো বলবো তাকে। বিয়ের পর একটা মাসও যেতে না যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেতো তাহলে, তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলবো।

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাইনি। সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হতো। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে, তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ!

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূরে চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক্, এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরদিন সকালে গৌতম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। গতকালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের উপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মত কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখাচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও। ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটো যা, দু'গাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পরতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তাছাড়া কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড় জা? বলবে হয়তো, দু দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিয়েই বালা-জোড়া খুইয়ে এলি? বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড় জার খুব পছন্দ হয়েছিল। তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওর বউকে পরাতে বলবো। কিন্তু এ-জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পারলে যেন শান্তি নেই। আমরা দুজনে এই সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মত সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যারাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে আমার দিকে। আর তাদের সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে। যেমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্তির চোখে যেন এমনি এক উপহাস লুকিয়ে ছিল। সেই দুটি টানা টানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, প্রশংসায় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠেছিল দেখো দেখো, উনি কতো দূরে গেছেন! সেই চোখজোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ণ।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো কাল সকালেই চলে যাই। আমার আর ভাল লাগছে না।

গৌতম সায় দিলো, তাই চলো। কিন্তু যাওয়া হোল না। ষ্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বললে, বার্থ পাওয়া গেল না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পরদিন সকালে নিত্য দিনের মতই সাজুন্তি আর তার স্বামী নেমে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের উপর গোলাপী তোয়ালেটা বিছিয়ে। এক পিঠ এলো চুলে একটা অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়াল কিন্তু স্নান করতে যাবো কিনা সে প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ও লক্ষ্য করেছে যে ঐ দুর্ঘটনার পর সমুদ্রে স্নান করতে যাইনি। শুধু লক্ষ্য করেছে? হয়তো বলাবলি করেছেও নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও। বউটির উপরে অকারণে চটে গেলাম আমি। থামলোই যদি আমার চোখের সামনে তাহলে একটাও কথা বললো না কেন? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরেছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি। —শুনেছেন? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিল, একটা বুড়ো নুলিয়া গিয়ে বাঁচালো তাকে। কেউ ডুবে গেলে বাঁচানো কাজ ওদের নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেন্ট নাকি টাকা দেয় সেই জন্য। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো। ...আর আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিল, দেখলেন না তো।

অনর্গল কথা, অনেক বলে গেল বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই। নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেন্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে?

—কই শুনিনি তো! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ ওপরতলার বউটি যে বললে। ওই সাজুন্তি। দুপুরে শুয়ে শুয়ে ওই কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়ির প্যাটার্নটা পছন্দ করেছিলো দিদি দিদি! দিদির কথা মনে পড়লেই এত ভাল লাগে। দিদির মত বোধ হয় কেউ-ই আমাকে ভালবাসে না, গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকরেটার ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর আপ্যায়ন। —বাবা তো বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর শুধু একটা উপদেশ দিয়েছিলো, বলেছিলো, দ্যাখ নমি, দেখবার জন্যেও নয়, সাজগোজের জন্যও নয়, এগুলোই আমাদের ব্যাঙ্ক, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব অনটন হলেও না।

আচ্ছা অভাব অনটন হলেও এগুলো বিক্রি করতে নিষেধ করেছিল দিদি, অবশ্য তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তাহলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না।

দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না, কেন দেবো, শান্তদা তো যে বললে, ওরা গরমেন্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তাছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা বিক্রি করে। নেহাত গরীবও ওরা নয়। এক-একজনকে স্নান করতে দিয়ে ওরা দু আট আনা নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গোতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কি দশা হতো আমার? কোন্ মুখ নিয়ে আমি বাড়ি ফিরতাম? তাছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে—। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা, অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্ত বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে। ওটা রেখে দেবো, না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে? যদি কোনদিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাই-বাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু কি ভাববে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালবাসে আমাকে, খুব। এক এক সময় মনে হয় দিদিকেও অত ভালবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালীকে বেশী ভালবাসতে পারে? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই অমন করে ভাব করে। আমি কি বুঝি না। দিদিকে রাগাবার জন্য অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায়—আমি কিন্তু কোনদিন লক্ষ্য করিনি। গোতমই প্রথম বলেছিল। সেই যে দিদির বাড়ী গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারেনি গোতম, আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিল—তারপরই বলেছিলো ও, বলেছিলো তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওকে।

গোতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাই দুদিন পরে, যাবার দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোজগাজ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিল। কই বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ রাগ ভাব কেন? আসলে বোধ হয় ভেবেছিল আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর। প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কি, না, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল লোকটা। ভাবলে, আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কাণ্ডটাই না করলে গোতম। বড় জা বলেছিল হনিমুন করে আসতে। ভাল হনিমুনই হলো বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যে কেমন গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম করছে গোতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলেতো আংটিটা দেয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভাল থাকবে ওর, তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেয়া যাবে গোতমকে জিগ্যেস করে।

গোতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গোতম নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়া-হুড়ো হবে আমি কি ছাই জানতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপীসে, কিন্তু এলার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম ভাঙল তখন আর এক ঘন্টাও সময় নেই।

গোতম চা খেয়ে গেল হোটেলের হিসেব মিটাতে। ফিরে এসে বিছানাপত্তর গোজগাজ করতে লেগে গেলাম দুজনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম এ-ক দিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলি তো নেহাত কম ছিল না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিল। কিন্তু চিরুনি, টুথব্রাশ, পাউডার, ওর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিতে সময় লাগল। আর এ-সব করতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স বেডিং সব রিকশায় তুলে সবে রিকশাওয়ালারা পাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কি নুলিয়াটা আসছে সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে।

রিকশা চলতে শুরু করেছে তখন। আমাদের দেখতে পেয়ে এক-মুখ খুশির হাসি হাসলো নুলিয়াটা। সেলাম করলে। সেলাম করল বোধ হয় বকশিশের লোভেই।

ছি, ছি, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। এ খারাপ লাগলো আমার। রিকশা-ওয়ালাকে থামতে বললাম।

গোতমকে বললাম, এই দেখো তো তোমার ব্যাগটা। ওর বকশিশটা দেওয়া হয়নি। গোতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিল না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের উপর সুন্দর নকশা করা বটুয়াটা এখানেই কিনেছি—মন্দিরে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পাণ্ডার ছাড়দারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটেই চার পাঁচখানা খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা কি করি, ষ্টেশনে পৌঁছেই তো রিকসার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরো-গুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা টাকার নোটই বের করে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশী হয়ে সেলাম করলে। হাসলো, বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভাল লাগলো তাকে। এত ভাল।

ফিরে এসেই বড় জাকে বললাম জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ, এমন চমৎকার।

বড় জা হাসলো, বললে—দেখিস নতুন এত ভালো ভালো বলিস না ঠাকুরপোর হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ওমা—আসল কান্ডটার কথাই তো বলেনি, রীতিমত একটা কাণ্ড।

—কি কাণ্ড? চোখ কপালে তুললো বড় জা। আমি বললাম, আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই ডুবে যেত। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু'আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কের দৃশ্যটুকু চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো। বড় জা কি যেন বললে, আর আমার তন্ময়তা ভেঙে গেলো। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না। সে সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিলো? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আর আমি জানি। না, বালা-টালার কথা আমি নিশ্চয়ই বলি নি। তাছাড়া আমার বলা কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করেছিলো নাকি নুলিয়াটা? কখনো না।

আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।

অধরমাঝি

সুশীল জানা

খুদে গাঁউলি অফিসারের দল তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেল ওপারে। মোটরে উঠে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল। একজন মনের কথা আর চেপে রাখতে না পেরেই বলে উঠল, 'বাপ্‌সে, আচ্ছা এক জংলী দেশ। এই শুখা—এই বান।'

মোটরটা স্টার্ট দিল গর্জন করে—তারপর ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল মহকুমা শহর-মুখো। কয়েক মুহূর্তের কৃত্রিম শব্দতরঙ্গটা একটা অনাবশ্যক ব্যাপারের মতো বৃষ্টি ভেজা পুবালী হাওয়ার দমকায় মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। তারপর ঘোর হয়ে এল আবার এখানকার সেই আদ্যিকালের প্রকৃতি—নির্মম সত্যের মতো, অন্ধ ভাগ্যের মতো। যত দূর চোখ যায়—আকাশ মাঠ-প্রান্তর নদীনালা জুড়ে সেই প্রকৃতি—গভীর আর নিথর। আর খেয়া নৌকোর ওপরে দাঁড়িয়ে রইল একটা বলিষ্ঠ কাঠামোর বুড়ো লোক—সঙ্গীহীন, চিন্তামগ্ন, পরিত্যক্ত। সে অধর মাঝি।

'ত্তোর শালা—যা যা যা যা।' হালে একটা ঝাঁকি দিয়ে অধর মাঝি খিস্তি করে উঠল অনড় নৌকোটাকে। ফিরে চলল ওপারে। নৌকো কিছুটা উজিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে ঢল-নামা স্রোতের মুখে—নৌকোর মাথাটা শুধু একটু তেরছা করে রাখল ওপার-মুখো। জলের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলে। কি বিশ্রী থকথকে গেরুয়া রং—গা ঘিন ঘিন করে। এ যেন ধাতে সয়না পলিমাটির দেশে। এ রং মেলে না তার স্নিগ্ধ মাটির সঙ্গে, এ রং মেলে না তার শান্ত সবুজশ্রীর সঙ্গে। এ কোন পাহাড় ধোয়া ঢল নেমেছে দু কূল ছাপিয়ে। ওর সঙ্গে মেশা অধর মাঝির ঘৃণা আর শঙ্কা।

এ পারের খেয়াঘাটের কাছে এসে একটা সরু খালের মধ্যে নৌকোটা ঢুকিয়ে দিয়ে নোঙর ফেললে অধর মাঝি। তারপর নালা খানা ডিঙিয়ে, জলা ভেঙে ভেঙে ফিরে চলল সে অনেক দূরের গ্রামে।

আকাশ অন্ধকার। বৃষ্টি সমানে পড়ছেই। নদীচরের জলা জংলা দেশ। যতদূর চোখ যায়—শুধু ধানবন আর ধানবন। উঁচু গাছ-পালার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সে অনেক দূর দূরে গ্রামের কাছে দেখা যায় শুধু কয়েকটা বাবলা গাছের মাথা। অঝোর বৃষ্টির ধারায় তাও ঝাপসা হয়ে গেছে।

বিকেল হতে না হতেই যেন সন্ধ্যে। কাছের লোকই আবছা। অধর নিজের ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই রামদাসের মেয়ে বললে, 'কে!'

অধর বললে, 'আমি বৌমা।'

মেয়েটা লজ্জায় জিভ কেটে মাথায় ঘোমটা তুলে ওই জলের মধ্যে দিয়েই অধরের পাশ দিয়ে সুড়ুৎ করে ছুটে পালাল। যতই চেনাশোনা পড়শীর মেয়ে হোক, সামনে যে হবু শ্বশুর। কুসুম লজ্জায় মরে গেল।

তার পাড়ি-মরি করে ছোটা দেখে অধর সস্নেহে বললে, 'আস্তে বৌমা—আস্তে যাও। পড়ে যাবে।'

মেয়েটা ততক্ষণে এক ছুটে ঘর।

মেয়ের মুখে খবর পেয়ে খানিক বাদে তামাক খেতে খেতে তার বাপ এসে হাজির। চাষ-আবাদের কাজ শেষ রামদাসের, মাঝে ধানগাছগুলো বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। চাষীর ঘরে অনন্ত আশা আর কয়েকদিনের বিশ্রাম। সেই আশা আর বিশ্রামের আমেজ রামদাসের চোখে-মুখে। রামদাস হেসে হেসে বললে, 'বেয়াই, চলে এলে যে! বর্ষা-বাদলের দিনে বেয়ানের কথা মনে পড়ে গেল বুঝি।'

হবু সম্পর্ক ধরে ডাকাডাকি ঠাট্টা মস্করা ওদের মধ্যে চলছে বহুদিন ধরে।

কিন্তু অধর মাঝির মুখ আজ নোংরা আকাশের মতো। সেখানে ঠাট্টা মস্করা আজ আর বেরুল না। থমথমে গলায় বললে, 'না, বেয়াই, খেয়া বন্ধ। গাঙে রাঙা জল দেখা দিয়েছে। জল বাড়ছে শাঁ শাঁ করে। তার ওপরে পুবালী হাওয়ার দমকা আর শেষ বর্ষার এই অঝোর ধারা। গতিক মোর ভাল লাগছে না বেয়াই। তাই চলে এলাম।'

রামদাসের মেজাজ ভাঙার নয়—বহু পরিশ্রম, বহু কষ্টের শেষে একটা আশা ও স্বপ্ন জমাট বেঁধে আছে তার চোখে-মুখে। সে মুখ স্বপ্নাতুর চাষীর মুখ।

রামদাস বললে, 'ওসব অলক্ষুণে কথা আর ভেব না ভাই। ভালয় ভালয় কটা মাস কেটে যেতে দাও। মাঠের লক্ষ্মী ঘরে তুলে আমার ঘরের লক্ষ্মীটিকে তোমার ঘরে হাজির করে দিই এই অঘ্রাণে। তারপর আমি নিশ্চিন্ত।'

'সে কি আমিও চাইনে বেয়াই।' অধর মাঝি বললে, 'কিন্তু গাঙের গতিক ভাল নয়—এ তোমাকে আমি বলে দিলাম। আমি গাঙের মানুষ—গাঙকে চিনি বেয়াই।'

রামদাস ওর ভয়কে আমল দিলে না। বললে, 'যতো হোক না—শুখার গাঙ বেয়াই। অত বড় বাঁধ আছে—ডাকুক না কত বান ডাকবে।'

'কিন্তু গাঙ যে ঢিপি হে—চড়ায় চড়ায় বুক চিতিয়ে আছে। জল টানবে কোথা দিয়ে?' অধরের চোখে-মুখে কথায় মরা নদীর তিক্ত অভিজ্ঞতা—একটা অনাগত ভয়।

কিন্তু তবু স্বপ্ন বুকে চলে রামদাস, চাষীর স্বপ্ন।... মাঠের ধানগাছগুলি বাড়ছে,—হিল হিল—খিল খিল করছে উদ্ভিন্ন-যৌবনা একপাল্লা কিশোরীর মতো। রামদাস বললে, 'বেটি মোর পা তুলে বসে আছে তোমার ঘরে আসবার জন্য। তুমি পড়ে থাক খেয়াঘাটে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন—তুমি তো জান না, দিনের মধ্যে কতবার যে ছুটে ছুটে আসছে তোমার ঘরে।'

এমন সময়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল অধর মাঝির বড় ছেলে গগন—রামদাসের হবু জামাই। কাদা মেখে ভূত—ফিরে এল মাঠ থেকে। কোঁড়া জোয়ান ছোকরা, মাথায় বাবরি ছাঁট চুল। বাপের মতো লম্বা চওড়া চেহারা—চওড়া কপাল, চওড়া চিবুক। চেহারার মধ্যে যেন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা স্থির হয়ে আছে। গগন দাওয়ায় উঠে বসল।

রামদাস জিজ্ঞেস করলে, 'আর কত বাকি তোমার আবাদ শেষ হতে গো?'

'আজ শেষ করে এলাম।' গগন বললে।

'বাস।' হবু জামাইয়ের জন্য মস্ত বড় একটা দুর্ভাবনা যেন ঘুচে গেল রামদাসের। বললে, 'ভাল ধান হবে এবার। আজ দেখি তোমার টিকেবাড়ির পাঁচ কাঠায় ধানগাছ এরি মধ্যে হাবুসে উঠেছে। ওখানে কোন না পাবে দু'মণ। তারপর জলার মাঠ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বিশ মণ। তারপর বৌমাদের মাঠে সাত আট মণ।'

ধান ধান ধান।...

রামদাস উছলে পড়ে শত ধারে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট মণের একটা হিসেব খাড়া করে আঙুলে টুসকি দিয়ে বললে, 'বাস, আর কি চাই বেয়াই?'

'না, আর কি চাই।' অধর মাঝি কোথায় হারিয়ে গেল অনাগত সেই সোনা ধানের স্বপ্নের মধ্যে। বললে, 'ভয় সব থাক—মা লক্ষ্মী আমার ঘরে আসুক, সুখে ঘরকন্না করুক। ছেলেপুলে হোক—বংশ বাড়ুক। আর কি চাই!'

কথায় কথায় অধর মাঝি ভুলে যায় যেন নদীর সে সর্বনাশী চেহারার কথা—ভুলে যায় সে বিশ্রী রাঙা জলের কথা। গল্পগুজব করে সন্ধ্যের পরে রামদাস চলে গেল। যাওয়ার সময় তার আশা আর স্বপ্নগুলো যেন চাপিয়ে দিয়ে গেল অধর মাঝির ওপরে। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরের কোণে, কিছুটা ভাবনামুক্ত উষ্ণ আশ্রয়ে সেইগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বিছানায় রাতের অন্ধকারে তার

দুটি বলিষ্ঠ দেহের কাছে ঘন হয়ে আসে দ্বিতীয় পক্ষের বৌ সুমতি। কর্কশ হাতটায় ছোঁয়া লাগে দ্বিতীয় পক্ষের যমজ দুই সন্তান কালা আর ভোলার নরম মসৃণ গা, মনে ঘুরে ঘুরে করে প্রথম পক্ষের বড় ছেলে গগনের কথা—আর একটি লজ্জা চকিত কিশোরীর কথা। এই সামান্য লোকটার মন বলে, আর কি চাই—আর কি চাই!...

রাত করে বৃষ্টিটা যেন আরও জোরে নামল। সংগে তেমনি পুবের হাওয়া। চালা থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রান্ত ধারায় জলের কলকল শব্দ। এ ঘনঘোর বর্ষায়, আর কিছু শোনা যায় না—আর কিছু দেখা যায় না। এর মধ্যে নদীচরের ছোট্ট গ্রামটুকু ঘুমে ঘোর।

হঠাৎ সেই ঘুমন্ত অন্ধকারে চাষীদের গোয়ালে গোয়ালে গোরুর ডাক শোনা যায়—খোঁয়াড়ে ছাগল ভেড়ার আর্তনাদ। ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসল অধর মাঝি। কানে এসে লাগে অশ্রান্ত জলধারার শব্দ। বাইরে বেরিয়ে এল। উঠোন ভেসে তখন জল ছুঁই-ছুঁই করছে দাওয়ায়। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ডাক পাড়ল গগনকে।

গগন ঘুম চোখে বলল, 'কি!'

অধর মাঝি বললে, 'উঠোন জলে ভরে গেছে। আলো জেবলে দেখ দিকি—কিসের জল। বৃষ্টির জল কিনা—'

গগন আলো জ্বালল। ঝুঁকে দেখল। বললে, 'বুঝতে পারছি না।'

অধর এক আঁজলা জল তুলে নিলে চোখের সামনে। হাত কেঁপে উঠল তার। বলে উঠল, 'এ যে সেই রাক্ষসী বান্‌রা জল রে!'

'বান!'

'গোরুবাছুরগুলো ভয় পেয়ে ডাকছে, খুলে দে, খুলে দে আগে। ওরে, ডাক পাড় সবাইকে। বাঁধ ভেঙে গেছে। হেই মা গঙ্গা!—

গগন ভয় পায় হঠাৎ। উঠোনে চেঁচাতে থাকে প্রাণপণে পড়শীদের নাম ধরে।

দশ-পনেরো ঘর প্রজার একটা গাঁ—অতর্কিত একটা আর্তনাদের মাঝখানে অন্ধকারে জেগে উঠল মানুষগুলো। গোরু-ছাগলের ডাক, কাচ্চাবাচ্চার ডাক, ঘুমভাঙা কান্না—আর জোয়ান মানুষের ঘুমভাঙা ভয়-পাওয়া হাঁকডাক আদিম বৃষ্টিভেজা অন্ধকারটাকে যেন এক মুহূর্তে একটা ভয়াবহ নরক করে তোলে। তারপর আর্তনাদের মহাপিণ্ডটা কোথায় মিলিয়ে যায় দিগন্ত-বিসারী হা-হা করা জলের মধ্যে।

গগন কোমরের কাপড় কষে উঠোনে নামতে যাচ্ছিল—অধর মাঝি তার হাত চেপে ধরলে, 'কোথায় যাবি?'

'চল পালাই।'

'এই জলে? মরবি!' একজন পুরোনো অভিজ্ঞ মাঝির সতর্কতা অধরের চোখে। বললে, 'এই জল ভেঙে—এই অন্ধকারে কোথায় ছুটে পালাবি তুই? পেছনে রাক্ষসী, এর মধ্যে যে ছুটবে—সেই মরবে।'

'তবে?'

সুমতি গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে স্বামীর,—চোখে অশ্রুধারা। যমজ দুটো ছেলেকে চেপে ধরেছে বুকে। বছর তিনেক বয়স হবে বাচ্চা দুটোর—ভয়ে আঁকড়ে ধরে আছে মাকে। অধর একজনকে তুলে দিলে গগনের কাঁধে নিজে তুলে নিলে আর একজনকে। সুমতির হাত ধরে বললে, 'উঠোনে নেমে দাঁড়া সবাই চালা ধরে। ঘরের দেয়াল ধসে পড়ে চালা এখুনি বসে যাবে।'

উঠোনে নামল সবাই। জল তখন হাঁটুর ওপরে। চালা ধরে দাঁড়াল ওরা অধরের কথা মতো। চালাটা কড় কড় করছে। জল বাড়ছে একটু একটু করে হাঁটুর ওপরে। স্রোতের বেগ দ্রুত।

সেই জল ভেঙে ভেঙে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল রামদাসের বেটি।

অধর বললে, 'কে!'

মেয়েটা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, 'বাবা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলে গেল কোথায়—দেখতে পেলাম না! আমি দেখতে পেলাম না!'

'মরেছে!' অধর বলে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে, 'দাঁড়িয়ে থাক মোর পাশে, চালা ধরে থাক।'

দেখতে দেখতে মাটির দেয়াল ধসে পড়ল চারদিক থেকে—চালাটা বসে গেল জলের ওপরে।

অধর সতর্ক গলায় বললে, 'এবার উঠে পড় সবাই চালার ওপরে। একদিকে সবাই চেপে বসিসনি—ছড়িয়ে বস চারদিকে।'

কালা আর ভোলাকে বসিয়ে দিলে তার মায়ের দুপাশে। বললে, 'কপাল তোদের! শক্ত করে চেপে ধরে বসে থাক।'

সকলকে বসিয়ে দিয়ে অধর উঠল এক পাশে। উঠে বসে বললে, 'চালা এমনি বসে থাকলে রইলম এই চরে—না হলে কোথায় যেয়ে মরব জানি না। হে মা গঙ্গা!'

চারদিকের অথৈ অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না। আর্তনাদের সেই মহাপিণ্ডটা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কোথায়। অনেক দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে দু-একটা ভয়াবহ ডাক—এক আধটুকু আর্তনাদ। মৃত্যু কণ্টকিত এ অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। তারই মধ্যে রামদাসের স্বপ্ন বিছানো ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যায় উচ্ছ্বসিত রাঙা জলের সর্বনাশ।

ঘোর ঠান্ডায় আর ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে কালা আর ভোলা, কাঁপছে সুমতি আর কুসুম।

অধর মাঝি আবার হুঁশিয়ারী দিলে 'চালা খবর্দার ছাড়বি না। ভয় নাই। চেপে বসে থাক।'

গগন বলে উঠল, 'চালা যেন নড়ছে বাবা!'

অধর বুঝতে পেরেছে আগেই। বুকটা তার আগেই ধক করে কেঁপে উঠেছে। মুখে কোন কথা এল না। বোবার মতো শুধু সে চেয়ে রইল অন্ধকারে সীমাহীন—অন্তহীন জলরাশির দিকে। এ চালা এবার ভাসবে দুর্ভাগ্যের কোন দুর্জ্ঞেয় পথে কে জানে।

গগন ভয় পেয়ে আবার বলে উঠল, "চালা ভেসে উঠেছে বাবা!"

অধর মাঝি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "চল বাপ এবার কপাল নিয়ে। রইল পড়ে এ ভিটা—রইল পড়ে এ চর।"

সুমতি চালায় মাথা ঠুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"চুপ কর বৌ—চুপ কর।" অধরের গলায় সান্ত্বনা, "মাঝির বৌয়ের এখন সাহস চাই।"

ভয়ে চোখ মেলে চেয়ে আছে রামদাসের বেটি, চেয়ে আছে কালা আর ভোলা। খরবেগ স্রোতধারায় চালাটা ভেসে চলেছে কোন নিরুদ্দিষ্ট অন্ধকারে। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই, মেঘলা আকাশে চিহ্ন নেই একটি তারারও।

গগন বললে, "কোথায় কোনদিকে যাচ্ছি বল ত? বুঝতে পারছি না কিছু যে।"

অধর বললে, "দক্ষিণে—বাহার গাঙ।"

"হায় কপাল! সে যে সাগর!" গলা কেঁপে উঠল গগনের।

"কে জানে কপাল কোনদিকে নিয়ে যায় বাপ!" অধর বলল, "তবে চালা এখনো যাচ্ছে গাঙের ধারে ধারে চরের ওপর দিয়ে—গাঙের টানে এখনও পড়েনি।"

"কি করে বুঝলে?"

"এই গাঙের জল ঘেঁটে বুড়ো হয়ে গেলাম বাপ। গাঙের আসল টানায় পড়লে চালা আরও জোরে ছুটত।"

তাই বটে। চালাটা চলেছে এঁকে-বেঁকে—ঘুরে ঘুরে। চরের ওপরে উচ্ছ্বসিত জলস্রোত পাক খাচ্ছে—ঢেউ তুলছে, বাঁক নিচ্ছে। নদীর একটানা খরস্রোত নয়। তবু নদী যে কত দূরে আছে—তাই বা কে জানে! শুধু চালার ওপর থেকে এ কটি প্রাণী চেয়ে আছে অগাধ অন্ধকারে। সব কথা—সব প্রশ্ন আস্তে আস্তে থেমে এল ওদের। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্য আর দুরন্ত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে জড়ের মতো বসে রইল ওরা।

প্রথমে গেল ভোলা। চালা থেকে খসে পড়ে গেল জলে। সামান্য এক পলকের একটু আর্তনাদ। তারপর সব চুপ।

গগন চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, ভোলা পড়ে গেল যে!"

"খবরদার চালা থেকে নামবি না।" অধর ঠান্ডা গলায় হুঁসিয়ারী দিলে, "কি করবি তুই, ওর কপাল!"

সুমতি ফুঁপিয়ে উঠল।

কালা চেয়ে আছে। একটু শব্দ নেই বাচ্চাটার মুখে। শুধু বিস্ফারিত দুটো চোখ—মাছের চোখের মতো। ভেতরে ভেতরে ও যেন মরে শেষ হয়ে গেছে। কচি মুঠো দুটোতে চেপে আছে চালার খড়—সে দুটো কালিয়ে শক্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কখন আস্তে আস্তে খড় সরে এল তারও মুঠো থেকে। ঠান্ডায় শক্ত হয়ে গেছে সারা দেহ। নেমে গেল—সর সর করে সেও নেমে গেল চালা থেকে।

গগন চেঁচিয়ে উঠল আবার, "বাবা, কালা পড়ে গেল!"

"থাক। ওর কপাল বাপ!"

সুমতি মাথা ঠুকে পড়ল চালায়। সামান্য একটা ফোঁপানীর শব্দও শোনা গেল না তার।

চালাটা চলেছে।...

কচি কচি চারটে হাতে কাদা আর ভোলা আজ সন্ধ্যেবেলায় তাকে জড়িয়ে ধরে কি বলতে চেয়েছিল যেন কিসের কি কথা! নাঃ কিছু মনে পড়ছে না অধর মাঝির। সতর্ক দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে শুধু সে সামনের অন্ধকারে। একটা ঢিপি নেই—একটা বড় গাছ নেই, শুধু অঢেল অনির্দিষ্ট অন্ধকারের স্রোত। মাঝে মাঝে কখনও বা এক-আধটা কাঠির মতো বাবলা গাছ—তাও নাগালের বইরে। শুধু বোঝা যায়—এখনও চালাটা ভেসে চলেছে জলস্ফীত চরের ওপর দিয়ে।

তার মুখোমুখি সামনের চালায় তেমনি মাথা ঠুকে পড়ে আছে সুমতি। অনড়—অসাড়। অধর একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল। ডাকতে ইচ্ছে হল—ডাকল না। আহা, তার যমজ ছেলের মা! কি বলেছিল যেন গাঁয়ের সবাই? ভারী পয়মন্ত! ...হুঁ, কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অধরের।

এই তো সেদিনের কথা—আকাশে একটু মেঘের চিহ্ন নেই—চলে গেল আষাঢ় শ্রাবণ মাস। হাত গুটিয়ে বসে আছে চাষী, গোরুগুলো ছিঁড়ে খাচ্ছে তামার পাতের মতো মরা ধানগাছের পাতা। ইন্দ্রের পুজো হল, ধ্বজা উড়ানো হল। তবু জল নেই। শেষে হল ব্যাঙের বিয়ে। ডোবা থেকে দুটো ব্যাঙ ধরে এনে বিয়ে দিল সবাই। বিয়ের পর সবাই বললে, "এ ব্যাঙ জলে ছাড়বে কে?"

পয়মন্ত লোক চাই—যার হাতের ছোঁয়া লেগে মাঠ ভরে হবে ফসল। ব্যাঙ ডাকবে, মেঘ গলে জল হবে—ভরে উঠবে শুখা মাঠের জলা। কে সে এমন পয়মন্ত আছে এ চরে?

সবাই বললে, "অধর মাঝির বউ সুমতি।"

রামদাস বলেছিল, "বেয়ান ভারী পয়মন্ত—নতুন বউ এসেই দুই যমজ ব্যাটা বিইয়ে দিয়েছে গো! ওর জুড়ি কেউ নাই এ চরে।"

তারপর......

গগন চেঁচিয়ে উঠল আবার, "গেল, গেল—পড়ে গেল! বাবা!"

সুমতির সেই মাথা ঠোকা অনড় মূর্ছিত দেহটা গড়িয়ে পড়ল চালা থেকে।

অধর শুধু বললে, "যার যেমন কপাল বাপ!" তারপর বিড় বিড় করে কি বললে শোনা গেল না। অন্ধকারে বসে রইল সে একভাবে চালা চেপে। অভিজ্ঞতায়, স্বার্থে, জীবনের মায়ায় অটল একটা মূর্তির মতো।

গগনের অসহ্য লাগছে এই নীরবতা—এই নির্মম নিরুদ্দিষ্ট ভেসে চলা। সে কথা বলতে চায়। বলে উঠল, "কোথায় চলেছি?"

কেউ উত্তর দিল না। অধর বসে আছে একভাবে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে পড়ে হঠাৎ লোকটা যেন দুর্জ্ঞেয় আর স্বার্থপর হয়ে উঠেছে।

গগন অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "কুসুম, ভাল করে চালা ধরে রাখিস।"

কুসুম বললে, "ধরে আছি তো।"

"ভয় করছে?"

কি বলবে—মেয়েটা যেন ভেবে পেল না।

গগন আবার চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, চালাটা খুলে যাচ্ছে!"

অধর তার সেই সতর্ক নিথর চোখ তুলে তাকাল। জলের তীব্র স্রোতে আর কতক্ষণে টিঁকে থাকবে চাষীর কুঁড়ে ঘরের চালা। দড়িগুলো আলগা আলগা হয়ে ফেঁসে যাচ্ছে—খসে যাচ্ছে খড়, টুকরো টুকরো বাতা বাখারি। দেখতে দেখতে ওটা চার টুকরো হয়ে গেল।

গগন চেঁচিয়ে উঠল, "আলাদা হয়ে গেল। বাবা!"

"যে যার কপাল নিয়ে যাও বাপ!" অধরের সেই ঠান্ডা স্বার্থপরের কথা।

কিন্তু কোথায় যাবে!—এই অন্ধকারে—একা! কুসুম তার বিচ্ছিন্ন চালাটা থেকে আর্তনাদ করে উঠল—অধর মাঝির চালা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল জলে। ধরে ফেললে। ঝাঁকিতে খুলে গেল কয়েকটা বাঁশ বাখারি।

"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—ডুবে যাবে!" অধর পা দিয়ে ঠেলতে লাগল মেয়েটার শক্ত মুঠোকরা হাত।

"যাব—আমি যাব মাঝি। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।"

"গেল গেল! কোথায় যাবি চুলোয়। ছাড় ছাড়!" অধর তার শক্ত বলিষ্ঠ পা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইল মেয়েটার শক্ত মুঠো। এক পা—তারপর দুই পা।

কুসুম শুধু বলতে লাগল, "আমি যাব—আমি যাব, মাঝি"

দুই পায়ের চাপে ডুবে গেল মেয়েটা, ছিঁড়ে নিয়ে গেল অধরের খানিকটা চালা। বিমূঢ়ের মতো চেয়েছিল গগন—চেঁচিয়ে উঠল, "কুসুম!"

কোন সাড়া নেই:

"সে কোথায় গেল বাবা?"

"জানি না।" অধরের সেই নিষ্ঠুর গলা।

"বুড়ো শয়তান! বাঁচ, বাঁচ তুমি একলা।" গগন ঝাঁপ দিল কোনদিকে যেন। অতল অন্ধকারে বিধাতার বিদ্রোহের মতো শোনা গেল তার বলিষ্ঠ বাহুর জলক্ষেপ! দূরে—ক্রমশ দূরে। অধরের চালাটা তখনও ভেসে চলেছে তার দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের অন্ধকারে। আর তার চালা থেকে ছেঁড়া ছোট্ট অংশটুকু কোথায় ভেসে ভেসে হারিয়ে গেল কে জানে। বসে আছে সে একভাবে দয়াহীন মায়াহীন সতর্ক আরণ্যক আদিম একটা জীবের মতো। কোথায় তলিয়ে গেছে তার স্বপ্ন, কোথায় তলিয়ে গেছে আর সহস্র জীবনকথা, তার ঘর জমি চর—একটা গোটা মানুষের জীবন!

এক জায়গায় এসে চালাটা যেন ঠেকল। আর চলছে না। ভাঙা চালার তলা দিয়ে শাঁ শাঁ করে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে জল, অন্ধকারে সে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে দেখল। কিছুই দেখা যায় না। একভাবে বসে রইল কিছুক্ষণ। অত্যন্ত সাবধানে একটা পা নামালো চালা থেকে। মাত্র হাঁটু জল। পায়ে ঠেকল মাটি।

মাটি তো নয় জীবন! কোটি জন্মের সাধনার ধন—স্বপ্নের কামনা।...

এক লহমায় সমস্ত মানবসত্তা ফিরে এল যেন ওর মধ্যে। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের কাছে এতক্ষণ আত্মসমর্পণ করা জড়পিণ্ডের মতো দেহটায় ফিরে এল বাঁচবার কামনা। চালা ছেড়ে দিয়ে দু'পায়ে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এগোলো এক পা এক পা করে। জল কমছে। কমতে কমতে জল শেষ হয়ে গেল পায়ের তলা থেকে। মনে হলো—সে যেন ঢালু গা বেয়ে উঁচুতে উঠছে। একটা ঢিপির মতো। পায়ে ঠেকল দুটো কি তিনটে গাদাগাদি মানুষ।

কথা বলতে গেল, গলা দিয়ে প্রথমটা স্বর বেরুল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে হাবা একটা জানোয়ারের মতো। খানিক বাদে গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলে। কথা বলল।

"কে!"

সাড়া নেই।

"বেঁচে আছ?"

কেউ সাড়া দিলে না।

চুপ করে বসে রইল সে সেইখানে।

ক্রমশ জল নেমে যাচ্ছে ঢিপির তলা থেকে, দূরে সরে যাচ্ছে জল কল্লোলের শব্দ। বসে রইল সে ভোরের অপেক্ষায়। কোনটা কোনদিক—তাও সে বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু তার মনে আছে—সে দক্ষিণে ভেসে এসেছে। লোকটা বসে রইল পাথরের মূর্তির মত।

তারপর ভোর হলো। চারদিকে রাঙা জলের সমুদ্র।

ভোরের আলোয় তাকাল সে দুটো মৃতদেহের দিকে। একটা পুরুষ একটা মেয়ের। পুরুষটির বলিষ্ঠ একটা বাহু জড়িয়ে আছে মেয়েটার কোমর। কে জানে কোথা থেকে ভেসে আসা। মুখ থুবড়ে মরেছে আশ্রয়ের শেষ সীমায় এসে। দুজোড়া হাত খামচে ধরেছে ঢিপির মাটি—মানুষের জন্মগত অধিকারের মত। দেহ দুটো সে উল্টে চিৎ করে ফেললে। বড় বড় চোখ বের করে তাকাল বিহ্বলের মত। কুসুম না! গগন না! তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে বসল অধর মাঝি। লোকটার স্থির পশুর মতো চোখে এতক্ষণে নামল মানুষের অশ্রু। ভাঙা গলায় গুমরে গুমরে বললে:

"ওরে তোদের আমি বিয়ে দেবো বলেছিলাম—বিয়ে দেবো বলেছিলাম!"

ঋতুপর্ণ

মণীন্দ্রলাল বসু

অন্ধকার ধীরে তরল হইয়া আসিল—তাহার সম্মুখে এক বৃহৎ ধূসর পটভূমিকা, পটভূমিকার উপর আলোকের রেখাপাতে অপরূপ চিত্রের ন্যায় দিব্য দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল।

গগনচুম্বী মহান পর্বতশ্রেণী, কৃষ্ণ প্রস্তরময় পর্বতের উপরিভাগে নিবিড় অরণ্য, মধ্যে গুহার পর গুহার সারি, নিম্নে স্বচ্ছতোয়া খরস্রোতা নদী। নদীর নাম হিরন্বতী। তাহার একদিকে বিচিত্র শৃঙ্গশোভিত পর্বত, অপর দিকে তরঙ্গায়িত প্রান্তরে কয়েকটি গ্রাম।

গুহাগুলি বিচিত্র সুন্দর, কোনটি সূর্য-বাতায়নসমন্বিত, কোনটি কারু-কার্যময় প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণী-শোভিত, বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ-চৈত্য।

গুহাগুলির শেষে হিরন্বতী নদী অর্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া বাঁকিয়া গভীর খাতে প্রবেশ করিয়াছে, যেন কোষমুক্ত তরবারিকে কে নিকষপর্বতে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। খাতের উপর পর্বতশৃঙ্গ কাটিয়া সমতল করিয়া শিবমন্দির নির্মিত হইতেছে। সে এক অলৌকিক ব্যাপার। পর্বতগাত্র হইতে এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, দৈর্ঘ্যে দেড়শত গজ, প্রস্থে এক-শত গজ ও উচ্চতায় ষাট গজ হইবে। সেই প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া ক্ষোদিত করিয়া মহান শিবমন্দির গঠিত হইতেছে। অগণিত স্থপতি, ভাস্কর, শ্রমজীবী নিজ নিজ কার্যে রত। দ্বাদশশত শিল্পী তিন বৎসর ধরিয়া এ মন্দির নির্মাণে নিযুক্ত, মন্দির শেষ করিতে আরও দ্বাদশ বৎসর লাগিবে। সেই দ্বাদশশত শিল্পিগণের সঙ্গে সেও রহিয়াছে; ভারতের কোনও গৌরবময় প্রাচীন যুগে, কোন্ মহান অপূর্ব শিব-মন্দির নির্মাণে সেও ভাস্কর ছিল।

মন্দির-সম্মুখে দ্বিতল মণ্ডপ বিপুল-কায় সিংহ, হস্তী মূর্তিগুলির উপর সুরক্ষিত; অশোকমঞ্জরী উৎকীর্ণ অধি-রোহনীর উপর সে বসিয়া আছে। সকলেই কর্মে মগ্ন, সে কিন্তু স্তব্ধ বসিয়া উদাস-ভাবে কি ভাবিতেছে? মণ্ডপের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে প্রবেশ-দ্বারের পার্শ্বে হরিদ্রাভ প্রস্তরের উপর ভগীরথের গঙ্গা-বতরণ দৃশ্য ক্ষোদিত করিবার ভার তাহার উপর। দৃশ্যটি সে কিভাবে উৎকীর্ণ করিবে তাহাই পরিকল্পনা করিতেছে, পুণ্যসলিলা গঙ্গায় সে কি রূপ দিবে?

অদূরে শয্যাতি সুবিশেখ পূর্ণ দত্ত, তাহার নানা বন্ধু ভাস্করগণ শিবের জীবনের নানা দৃশ্য ক্ষোদিত করিতেছে। কেহ আঁকিতেছে মহাদেবের মদনদহনের চিত্র, নগরাজ হিমালয়ে বসন্ত সমাগমে বিচিত্র পুষ্পশোভিত পলাশ-পিয়াল-অশোক তরু-মঞ্জরীর বর্ণোচ্ছ্বাসে, ক্রৌঞ্চ-চক্রবাক-পক্ষি-কুলের কূজনে চতুর্দিকে বসন্তলক্ষ্মীর লীলা-উৎসব, তাহারি মধ্যে কৃষ্ণসার চর্ম-পরিহিত ভুজঙ্গমবেষ্টিত জটাজুটধারী মহাদেব দেবদারু তরুতলে ব্যাঘ্রচর্মের উপর ধ্যানে আসীন ছিলেন : কন্দর্পের শরাঘাতে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হইল, ক্রোধে ললাটস্থিত তৃতীয় চক্ষু জ্বলিয়া অগ্নি-শিখা বহির্গত হইতেছে, মীনকেতু বজ্রাঘাতে অশোকতরুর ন্যায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

কেহ আঁকিতেছে—কৈলাস পর্বতে হর-পার্বতী বিহার করিতেছেন; চারিদিকে কিন্নর অপ্সরাগণ, হংস দাত্যূহ শতপত্র নানা বিচিত্রাঙ্গ পক্ষী সুমধুর গান করিতেছে। বলগর্বিত রাবণ কৈলাসপর্বত তুলিতে যাইয়া তাহার নিচে চাপা পড়িয়াছে।

এ সকল মামুলী দৃশ্য ক্ষোদাই করিতে তাহার ভাল লাগে না। সে আঁকিতে চায় মানবজীবনের সুখ-দুঃখের ছবি, সে বলিতে চায় মানবঅন্তরের বেদনা, আশা, স্বপ্নের কথা। নবপরিণীতা বালিকাবধূ পিতৃগৃহ হইতে চতুর্দোলায় চড়িয়া স্বামীগৃহে চলি-য়াছে, তাহার হৃদয়ে আজন্ম-পরিচিত মাতৃ-স্নেহপূর্ণ গৃহত্যাগের বেদনা, স্বপ্নভরা স্বামিগৃহে গমনের অজানা আনন্দ, অজানা পথ-প্রান্তর-নদী পার হইয়া তাহার চতুর্দোলা চলিয়াছে; তরুণ পুত্রকে মাতা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে আশীর্বাদ করিতে-ছেন; প্রিয় বিচ্ছেদকাতরা প্রেমিকা বর্ষার সন্ধ্যায় উদাসীন, এমনি কত দৃশ্য—কমলো-চনা সুকেশিনী ঊর্মিলা পদ্মবনতীরে পুষ্পিত কদম্বতরুতলে লক্ষ্মণ বিরহ-কাতরা ক্ষীণ নিতম্বিনী; বিদর্ভরাজদুহিতা পদ্ম-নিভেক্ষণা নলবিচ্ছেদবিধুরা দময়ন্তী ব্যাঘ্রভল্লুকসংকুল গহন অরণ্যে একাকিনী পথহারা।

তাহার মন মানব-বেদনার কোন গভীর রহস্যলোকে চলিয়া গিয়াছে। সহসা সে কাহার আহ্বানে চমকিয়া চাহিল—ঋতুপর্ণ!

তাহার নাম ঋতুপর্ণ!

ঋতুপর্ণ দেখিল, সম্মুখে স্থপতি-শেখর রুদ্রদাস দাঁড়াইয়া আছেন। নৃপতি নরসিংহের এ শিবমন্দির তাঁহার পরি-কল্পনা, তাঁহার তত্ত্বাবধানে এ মন্দির নির্মিত হইতেছে। ত্রাসিত হইয়া দাঁড়াইয়া ঋতুপর্ণ স্থপতিশেখরকে প্রণাম করিল।

রুদ্রদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ঋতুপর্ণ, আজ তোমার অন্তর বড় উদাস দেখাচ্ছে!

ঋতুপর্ণ লজ্জিতভাবে উত্তর দিল, আচার্য-দেব, আমার মন সত্যই আজ চঞ্চল, গঙ্গা-বতরণের দৃশ্য কিরূপে ক্ষোদিত করব আমি ঠিক পরিকল্পনা করতে পারছি না।

স্থপতিশেখর বলিলেন, বিষয়টি কঠিন। তা ছাড়া তুমি চির প্রথামতো আঁকতে চাও না, নবদৃষ্টিতে অপূর্বভাবে গঙ্গার রূপ দেখতে চাও। খুবই প্রশংসনীয়। আমি কোনো বাধা দিতে পারি না। তবে তোমার পরিকল্পিত দৃশ্যের একটি রেখাচিত্র আগে আমায় দেখিও, তারপর পাথরে ক্ষোদিত করো। দেখ, এ স্থান পাথর কাটার শব্দে পূর্ণ, মনন করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তুমি বরঞ্চ নদীতীরে বা পাহাড়ের মাথায় কোন ঝর্ণার ধারে গিয়ে বিষয়টি চিন্তা করো। যতক্ষণ না তোমার দৃষ্টির সম্মুখে চিত্রটি পরিপূর্ণভাবে রেখা-ছন্দোবদ্ধ হয়ে উদ্ভা-সিত হয়ে উঠছে, ততক্ষণ তুমি কিছু আঁকতে বা ক্ষোদাই করতে চেষ্টা করো না। একথা জেনো, রূপ-ধ্যানে দিব্যদৃষ্টিতে সমগ্র চিত্রকে আগে দেখা দরকার, তারপর পটে বা পাথরে যা আঁকবে তা ওই দিব্য-দর্শনের ছায়ামাত্র।

ঋতুপর্ণ বিনীতভাবে বলিল, আমি সেই দিব্য নদী দেখবারই প্রয়াস করছি।

রুদ্রদাস ধীরে বলিলেন, দেবতাগণের লোচনানন্দদায়িনী সুরধুনীকে মানবনেত্রে দেখা অসম্ভব, তবে আরাধনা করলে তিনি ধ্যানে দেখা দিতে পারেন। তাঁর মূর্তি কোনো মানবশিল্পী ধারণা বা অঙ্কিত করিতে পারে না। তুমি আমাদের শাস্ত্র-বর্ণিত দৃশ্যটি কল্পনা করো—সুর-তরঙ্গিনী ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়ে জটার ভিতর দিয়ে ভূমণ্ডলে নেমে এসেছেন, মহেশ্বর নীলকণ্ঠ ভিন্ন এ গগনমণ্ডলমেখলা মন্দা-কিনীর দুর্ধারণীয় বেগ ধারণ করতে কে সমর্থ হবে? সর্বলোকপূজ্যা গঙ্গার সম্মুখে ভগীরথ করজোড়ে পথ দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে। ছবিটি কি চোখের সামনে ফুটে উঠেছে?

রুদ্রদাসের পদধূলি লইয়া ঋতুপর্ণ বলিল, আপনার আশীর্বাদে কালই একটি রেখাচিত্র দেখাতে পারব।
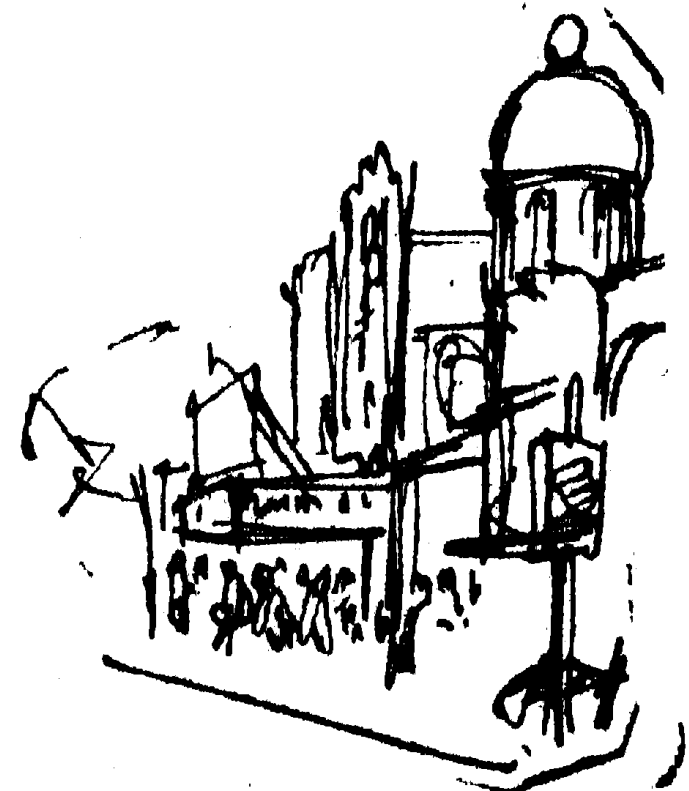
স্থপতিশেখর চলিয়া গেলেন। ঋতুপর্ণও মন্দিরের প্রাঙ্গণ পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নদীর দিকে চলিল।

চন্দনবর্ণা-হিরণ্যবতী, বর্ষার গৈরিক সলিলস্রোতে দুকূল ভরা, তীরে শুভ্র কাশ-বন, ঘন সবুজ বেণু-বন সদ্য প্রস্ফুটিত কুটজ-পুষ্পরাশিতে পাণ্ডুবর্ণ, যেন কোন সীমন্তিনী কেশে কর্ণিকার মালা জড়াইয়া, নিতম্বে কেতকীর কাঞ্চীদামে শোভিত হইয়া, হিরণ্য-অঞ্চল ঝলমল করিয়া চকিত-চরণে চলিয়াছে!

কাঠের সেতুর কানায় জল উঠিয়াছে। ঋতুপর্ণ ধীরে সেতু পার হইল। গ্রামে তাহার গৃহের দিকে গেল না। গ্রামের এক বিজন পথ দিয়া চলিল। আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লীলা, চতুর্দিকে হিল্লোলিত শারদশ্রী।

সহসা বৃষ্টি আসিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ভাদ্রের বর্ষাধারায় ভিজিয়া ভিজিয়া চলে। সম্মুখে এক বৃহৎ সল্লকী বৃক্ষ দেখিয়া তাহার নিচে দাঁড়াইল। রেশমের উত্তরীয়ে ভাল করিয়া দেহ জড়াইয়া বারি-বর্ষণ দেখিতে লাগিল।

পথের অপর দিকে এক স্থলপদ্মের গাছ, শ্বেতপদ্মগুলি রক্তাভ হইয়া আসিতেছে, তাহার পাশে পুষ্পিত সপ্তবর্ণ বৃক্ষ।

ঋতুপর্ণ চমকিত হইয়া চাহিল—স্থল-কমলকুঞ্জের পার্শ্বে এক যুবতী দাঁড়াইয়া, কোন এক গিরিপল্লীবালা হইবে, হিরণ্যবতীতে স্নান করিয়া আলিপনা আঁকা মাটির কলসী নদীর জলে ভরিয়া গৃহে চলিয়াছে। লাবণ্যময়ী মূর্তি দিব্য স্বপ্নের মতো। দীপ্তজিহ্ব ভুজঙ্গমগণের ন্যায় কৃষ্ণ কেশদাম জলসিঞ্চিত অঞ্চলে এলায়িত, হরি-চন্দনবর্ণের গাত্রবস্ত্র শুভ্রঅঙ্গে কমলনয়নে কখনও স্নেহে স্নিগ্ধ, কখনও উৎকণ্ঠায় চঞ্চল; চন্দ্রাননা চারুনিতম্বিনী, স্বর্ণবলয়-মণ্ডিত দক্ষিণহস্তে চিত্রিত জলপূর্ণ কুম্ভ ধরিয়া, পীনোন্নত-পয়োধরা, শঙ্খবলয় শোভিত বামহস্তে নবীন ধান্যমঞ্জরী; শুভ্রকুন্দের মতো বারিবিন্দু কুন্তলে কর্ণে ঝলমল করিতেছে, অলক্তক রাগরঞ্জিত চরণ রক্তকমলের মতো; জলধারা তাহাকে ঘেরিয়া মুক্তার মালার ন্যায় ঝরিতেছে।

নবোদ্গত কদম্বপুষ্পের মতো ঋতুপর্ণের চিত্ত রোমাঞ্চিত হইল।

শরতের বারিধারা থামিল। ঋতুপর্ণ সবিস্ময়ে দেখিল, নিমেষের মধ্যে সে অপরূপা যুবতীমূর্তি অন্তর্হিতা। ঋতুপর্ণ পথের চারিদিক দেখিল, স্থলকমলকুঞ্জ খুঁজিল, কোথাও সে যুবতীকে খুঁজিয়া পাইল না। একি তাহার দৃষ্টিভ্রম? অথবা কোন দেবী ছলনা করিতে আসিলেন?

দেবীমূর্তির দর্শন আর পাইল না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর এক অনাস্বাদিত গম্ভীর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। চিত্তের বিষণ্ণতা আর রহিল না। আকাশ, বাতাস, আলোক, পৃথিবী, নদীধারা, পর্বতমালা, চারিদিক আনন্দপূর্ণ মধুময়।

ঋতুপর্ণ নদীতীরে এক বনে প্রবেশ করিল। মধূক, মন্দার, দেবদারু, নানা জাতীয় বৃক্ষ চারিদিকে। কোথাও ময়ূরী নাচিতেছে, কোথাও হরিণশাবক খেলা করিতেছে। বনের মধ্যে এক হ্রদ শালবনবেষ্টিত—হংস, সারস, চকোর নানা পক্ষীর কলরবে পূর্ণ।

নির্জন এক স্থানে কালো এক পাথরের উপর ঋতুপর্ণ স্থির হইয়া বসিল। হ্রদের জলে নীলাকাশের শুভ্র মেঘের সবুজ মেঘের ছায়া। মায়াময়ী বনস্থলী। গঙ্গাবতরণ দৃশ্যটি কিরূপে ক্ষোদিত করিবে, তাহাই সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। কোন পরিকল্পনা করিতে পারিল না। সপ্তবর্ণ বৃক্ষতলে বারিধারা-বেষ্টিত লাবণ্যময়ী নারীমূর্তি বারবার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

ভাবিতে ভাবিতে সে সহসা চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

যে-গঙ্গার পরিকল্পনা করিতে এত মনন করিতেছে, তাহারি দিব্য মূর্তি তো সে স্থলপদ্মকুঞ্জের ধারে দেখিয়াছে! এই সত্যকার গঙ্গামূর্তি—কল্যাণী নারী, স্নেহময়ী মাতা, অপরূপা সুন্দরী। ব্রহ্মার কমণ্ডলু নয়, শিবের জটা নয়, দিগন্ত-মেখলা জ্যোতির্ময়ী সুরতরঙ্গিনী নয়, সুখ-দুঃখময় প্রেমময়ী নারীর রূপ, মাতৃ-রূপিণী গঙ্গা। আবার সে হতাশভাবে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। কিন্তু স্থপতিশেখর কি এ মূর্তি উৎকীর্ণ করিতে আদেশ দিবেন? এ যে মানবীর রূপ! এই তো পুণ্যসলিলা নদী, তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন জোগাইয়াছে, দেশকে শস্যশ্যামল সুন্দর সমৃদ্ধশালী করিয়াছে, তাহার এক হস্তে জলপূর্ণ কুম্ভ অপর হস্তে ধান্যমঞ্জরী।

ঋতুপর্ণ যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দেখিল গৃহাঙ্গনে বন্ধুজীব বৃক্ষের নিচে রক্তপ্রস্তর বেদিকায় চিত্রসেন তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

চিত্রসেন উজ্জয়িনীবাসী এক যুবক চিত্রকর, চিত্রবিদ্যা অপেক্ষা দর্শন পাঠে তাহার অধিক অনুরাগ। সে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য এ স্থানে এক বৌদ্ধবিহারে বাস করিতেছে। জীবনে তাহার কোথায় একটি গভীর দুঃখ আছে, সেজন্য সে সংসার ত্যাগ করিয়া আত্মার শান্তির আশায় ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়াছে। এখন সে মনস্থ করিয়াছে, সে বৌদ্ধ ভিক্ষু হইবে। কিন্তু তাহার গুরু ভিক্ষু উদয়ন তাহাকে প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিতেছেন না। তিনি বলেন, তাহার বয়স তরুণ, এখনও ভিক্ষু জীবন-যাপনের উপযুক্ত মন হয় নাই। তিনি তাহাকে গুহাবিহারের প্রস্তরগাত্রে বুদ্ধদেবের জীবন চিত্রিত করিতে বলিয়াছেন; সে চিত্রকর, ভগবান বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা অঙ্কিত করিয়াই যথার্থ ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

চিত্রসেন বলিল, ওহে ঋতুপর্ণ, তোমাকে আমি সারাদিন খুঁজেছি। মন্দিরে পেলুম না, নদীতীরে তোমার সেই প্রিয় স্থানেও পেলুম না, অপরাহ্ণ হতে তোমার গৃহে বসে আছি। তোমার মুখ বড় মলিন দেখাচ্ছে, শারীরিক কুশল তো?

—হ্যাঁ, শরীর আমার ভালই আছে, কিন্তু আজ আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত, সেজন্য কাজে মন লাগল না। তাছাড়া স্থপতি-শেখর যা খোদাই করতে বলেছেন, সে দৃশ্যটি আমার ঠিক মনোমত নয়। নীরবে একটু চিন্তা করবার জন্য রামগিরির হ্রদে গেছলাম।

—কি আশ্চর্য! আমার চিত্তও আজ বড় চঞ্চল, আমারও ছবি আঁকতে মোটেই মন লাগল না: সেজন্য তোমার সন্ধানে বেরুলুম। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে নিয়ে অপরাহ্ণে নদীতীরে একটু বেড়াব। তোমার সঙ্গে একটি বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করতে চাই।

—তুমি ভাই একটু অপেক্ষা কর, আমি হাত-মুখ ধুয়ে সন্ধ্যাপূজা শেষ করেনি।

—বেশ, আমিও সন্ধ্যার আরাধনা, ভগবান বুদ্ধের নাম করি।

সন্ধ্যার পূজা শেষ করিয়া যখন দুই বন্ধু বন্ধুকবৃক্ষতলে বসিল, শুক্ল-চতুর্দশীর চন্দ্র পূর্ণ গগনে উঠিয়াছে, মধুক-পুষ্প-গন্ধ-ভরা বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে। গৃহকোণে একটি মৃৎপ্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে।

চিত্রসেন বলিল, ওহে ঋতুপর্ণ, ঘরে খাবার কিছু আছে কি? আহারটা সমাধা করেই আমাদের আলোচনায় বসলে ভাল হয়।

—কেন, তোমার কি ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে? আমার ঘরে তো খাবার কিছু নেই, পাচকটি আবার অসুস্থ, আজ রাতে আর রান্না হচ্ছে না, তবে গুড়ের পায়েস, দধি ও মধু থাকতে পারে। আর আমি তো ভেবেছি, আজ রাত উপবাসে কাটাব, তাতে মন কিছু স্থির হবে ও চিন্তার তীক্ষ্ণতাও বাড়বে।

—সে আমি জানি, তোমার ঘরে কিছু থাকে না। চিন্তার কারণ নেই, আমিও বিশেষ ক্ষুধিত নই, তবে একেবারে উপবাসী থাকা উচিত নয়। আমি আসবার সময়ে কিছু ফল নিয়ে এসেছি, এই পর্ণ-পুটে আছে, তুমি তোমার পায়েস, দধি ও মধু বার করো।

—এ যে অনেক ফল, অসময়ে এস্থানে এসব ফল কোথা থেকে পেলে?

প্রাংশু আজ প্রভাতে উজ্জয়িনী থেকে এসেছে, সে এসব ফল নিয়ে এল, আঙুরগুলি বেশ রসাল। দেখ, তোমার পাথর খোদাই কাজে মানসিক পরিশ্রমের চেয়ে দৈহিক পরিশ্রম বড় কম হয় না, অনাহারে থাকা উচিত নয়।

আহার শেষে দুই বন্ধু বাহিরে বেদিকায় আসিয়া বসিল। চিত্রসেন বলিল, ওহে, ভুলেই গেছলুম, এই একটি মূল্যবান পুঁথি, তোমার চন্দনকাঠের পেটিকাতে সযত্নে রেখে দাও।

—কি পুঁথি?

—আমাদের কবি কালিদাস 'মেঘদূত' বলে একটি কাব্য লিখেছেন, সেই কাব্যেরই কিয়দংশ—

—কে কালিদাস?

—আমাদের উজ্জয়িনীর কালিদাসের নাম তুমি শোননি? এখন তো তাঁকেই আমরা অবন্তীর শ্রেষ্ঠ কবি বলি—

—ঠিক, মনে পড়েছে, 'শকুন্তলা' নামে তাঁর এক নাট্য দেখেছিলুম। লোকটি লেখেন ভাল, উপমাগুলি চমৎকার।

—তাঁরই এ-কাব্য, পুঁথিটা সযত্নে রেখো; আমার আবার এসব জিনিস বিহারে রাখবার জো নেই। ভিক্ষু উদয়ন একেই তো বলেন, আমার মন এখন সংসারাসক্ত, তারপর এইসব কবিদের বিরহ-কাব্য পড়তে দেখলে বলবেন, আমার হৃদয়ে রমণী-প্রেমের প্রতি কামনা, নারী-সৌন্দর্যের প্রতি লালসা রয়েছে, ভিক্ষু হবার চিন্তা করা আমার পক্ষে দুরাশা।

—তা, তোমার ও কবির কাব্যপাঠ ধর্ম-সাধনার খুব অনুকূল বলতে পারি না। আমারও মনে হয়, কালিদাসের লেখা প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত নয়, বড় আধুনিক ভাব-ঘেঁষা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই পছন্দ করেন না।

—সে আর বলতে, সভা-পণ্ডিতেরা তো কবির বিরুদ্ধে এক দল তৈরী করেছেন: তাঁরা বলেন, কালিদাসের কাব্য পড়ে উজ্জয়িনীর সকল যুবক-যুবতীর অন্তরে কাম-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে, এতে নৈতিক অবনতি হবে। বিদ্যার্থীদের আর শাস্ত্রপাঠে মন নেই।

—এ-বিষয়ে আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত।

—বল কি! আমার কিন্তু কাব্যটা পাঠ করবার ইচ্ছা হচ্ছে: এই চন্দ্রালোকিত শারদ রাত্রি অবশ্য বর্ষা-বিরহ-কাব্যপাঠের পক্ষে ঠিক সময় নয়—

—তাছাড়া, আমাদের মন এখন চঞ্চল, চিন্তাভারাক্রান্ত; অনুকূল মন না হলে কবির কাব্যপাঠ করা উচিত নয়, তাতে রস গ্রহণেরও ব্যাঘাত ঘটে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়।

—ঠিক বলেছ, আচ্ছা তুমি পুঁথিটি পেটিকাতে রেখে এস।

—আচ্ছা, তুমি যে আমার পেটিকার চারধারে ছবি এঁকে দেবে বল্লে, তার কি হলো?

—ছবিটি আমি কল্পনা করেছি। আচ্ছা, খঞ্জনপক্ষী তোমার ভাল লাগে, ধরো এক-দল নৃত্যরত খঞ্জনপক্ষী—

—কিন্তু শাস্ত্র-পুঁথি রক্ষা করবার পেটিকাতে পাখীর নৃত্যের দৃশ্য—

—দেখ, তুমি যাই বল আমি কোন দেবীর মূর্তি আর আঁকতে পারব না, ফুল-লতা-পাখী এইসব দিয়ে তোমার একটি সুন্দর চিত্র এঁকে দেব। চৈত্যের দেওয়ালে সারাক্ষণ, কেবল বুদ্ধ-বুদ্ধ-বুদ্ধ এঁকে আমি শ্রান্ত। ধ্যানী বুদ্ধ, তপস্যারত বুদ্ধ, মারের সহিত সংগ্রামকারী বুদ্ধ, ধর্মপ্রচারক বুদ্ধ, কেবল সঙ্ঘাত, সংগ্রাম, সন্ধান—বুদ্ধমূর্তি এঁকে এঁকে আমি ক্লান্ত!

—আজ তোমার মন বিক্ষিপ্ত নয় বিদ্রোহী দেখছি।

—ঠিক বলেছ, আমার অন্তরে একটা বিদ্রোহ ঘনিয়ে আসছে, সেই জন্যেই তোমার কাছে এলুম। সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার মধ্যে দেখি, পরমা শান্তি আছে, তুমি যেন জীবন-সমস্যার একটি শান্তসুন্দর সমাধান করেছ—সেজন্যেই এ-বিদ্রোহী চিত্ত নিয়ে তোমার কাছে এলুম।

—দেখ, প্রতিজনকে নিজ জীবনের সমস্যা নিজে মীমাংসা করতে হবে; এ-বিষয়ে বন্ধু সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সমাধান করতে পারে না। নিজ জীবনের বেদনা-অশ্রু দিয়ে জীবন-প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলোচনা করলে, আমি হয়তো পথ খুঁজে পাব।

ঋতুপর্ণ 'মেঘদূত' পুঁথিটি রাখিয়া আসিলে, চিত্রসেন বলিল, আমি স্থির করছি, ছবি আঁকা ছেড়ে দেব, এই চিত্র-কলার চর্চা ধর্মজীবন লাভের পরিপন্থী। তোমার কি মনে হয়?

—আমি প্রথমেই বলেছি, নিজ-জীবনের প্রশ্নের উত্তর জীবনের দুঃখসাধনা তপস্যার দ্বারা দিতে হবে। তবে তোমার সমস্যা সম্বন্ধে আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, ছবি এঁকে তুমি কি আনন্দ পাও?

—ছবি আঁকতে আমার আনন্দ, আমি বসে বসে কত চিত্র কল্পনা করি; কিন্তু বর্তমান চৈত্যে যে-ছবি আঁকছি তাতে আনন্দ নেই।

—আশ্চর্য, এই দ্বন্দ্ব আমার মনের মধ্যে জেগেছে। আর দেব-দেবীর মূর্তি করতে ভাল লাগে না, আমি চাই মানব-জীবনের হাস্যদীপ্ত অশ্রুসিক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ দৃশ্যগুলি পাথরে ফোটাতে—

—আমারও তাই ইচ্ছা করে। আমার আঁকতে ইচ্ছা করে, শৈশবের রূপকথা,—রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে চলেছে রাজকন্যার সন্ধানে, গভীর বন, অন্ধকার রাত তারায় ঝিমঝিম করছে, মহুয়া বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে; অথবা যৌবনের প্রেমস্বপ্ন—শিপ্রা নদীতে যুবক-যুবতীর স্নানলীলা, বারি-সিক্ত সূর্যালোকদীপ্ত তনুতে আনন্দের ঝলক, বেঁচে থাকার সহজ সুখ; এমনকি ছোট ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, এক ছোট মেয়ে মাথায় শাকের ঝুড়ি নিয়ে হাটে চলেছে, এক জ্ঞানবৃদ্ধ নদীর ধারে ছিপ নিয়ে বসে আছে—এমনি সব দৃশ্য আঁকতে ইচ্ছা করে।

—বেশ, তাই আঁক। বৌদ্ধ গুহামন্দিরে ছবি নাই আঁকলে, উজ্জয়িনী, দ্বারাবতী, বিদিশা, বারাণসী, যেখানেই যাবে, শ্রেষ্ঠীরা তাদের নৃত্যপ্রাসাদ সুচিত্রিত করবার জন্য বহু অর্থ দিয়ে তোমায় নিযুক্ত করবে তুমি আজ সুপরিচিত।

—কিন্তু প্রশ্ন তা নয়, চিত্রকলার বিষয়-বস্তু নিয়ে আমার সমস্যা নয়; আমি জানতে চাই, আমার এই চিত্রকলার চর্চা আমার ধর্মলাভের পক্ষে অন্তরায় নয় কি, এ-পথে কি আমি মোক্ষ পাব?

—দেখ, ভগবান বুদ্ধ মোক্ষলাভের স্ব-পথ নির্দেশ করেছেন, সে-সাধনপ্রণালী আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে-পথ আমি বুঝি না, এ-বিষয়ে কোন মত দিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে বাতুলতা হবে; তবে আমি নিজ জীবনে অনুভব করেছি, আমার ভাস্কর জীবন আমার আত্মাকে বিকশিত, উন্নত করে তুলেছে।

—কিন্তু নির্বাণলাভ এ-পথে হবে কি?

ঋতুপর্ণ বলিল, নির্বাণ কাকে বলে, আমি জানি না। সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ আমার বোধের অগম্য, আমার বুদ্ধির ধারণাতীত! আমি দেখছি, অরূপ আপনাকে প্রকাশিত করে চলেছেন নব নব ধারায়। এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের রূপমাধুরীতে আমি মুগ্ধ; ইচ্ছা করলেই এ-মোহ দূর করতে পারব কিনা, জানি না। আমার শিব আজ মেতেছেন সৃষ্টির আনন্দে, তার ললিত নৃত্যের ছন্দে প্রলয়-পয়োধি জল থেকে পৃথিবী উঠে এল; সে ছন্দে অনন্ত গগনে সূর্যচন্দ্রতারা ঘূর্ণিত হচ্ছে; সপ্তসমুদ্রে বারিরাশি আলোড়িত হচ্ছে, সাগর-মেখলা-সুন্দরী ধরণীতে তৃণে, বৃক্ষে, শত-সহস্র জীবপর্যায়ে প্রাণবিকশিত, হিল্লোলিত রূপ হতে রূপান্তরিত; চারিদিকে কি অপূর্ব প্রাণোচ্ছ্বাস, কত সুন্দর রূপ, কত বিচিত্র ভঙ্গী! চেয়ে দেখ, নীল স্ফটিকসম গগন-তলে চন্দ্রমা, অরণ্যময় পর্বতক্রোড়ে নদী-জল রেখা, তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রে সবুজের

প্রশান্তি; কিংশুক-কর্ণিকা বৃক্ষের পুষ্প-স্তবকে বর্ণোৎসব, আর এই প্রকৃতির মধ্যে কি সুন্দর নরনারীদেহ! এ রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হয়ে সৃষ্টির প্রকাশের বেদনা অনুভব করেছ কি? তা যদি না করে থাকো, তাহলে শিল্পকলা চর্চা করো না। আজ বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির লীলায় মাততে হবে। তারপর যেদিন তিনি তাণ্ডব-নৃত্যে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করবেন, সেদিন আবার তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবো।

চিত্রসেন নির্বাক হইয়া জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ঋতুপর্ণ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমার মনের অশান্তির কারণটা তোমাকে বলি। কাল মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেল। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখন পর্বতশিখরে। মনে হল, আমায় কে ডাকছে! ওই সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের নিচে এসে বহুক্ষণই দাঁড়িয়ে রইলুম, কোথাও কেউ নেই। তারপর মনে হল, হিরণ্বতী নদীতে বন্যা এসেছে, মৃদু গুরু ধ্বনি আসছে। নগ্ন পদেই গৃহ হতে বাহির হলুম। তখন অনুভব করলুম, শিব-মন্দিরের বৃহৎ শিলা আমাকে আহ্বান করছে। মন্ত্রচালিতের মতো নদী পার হয়ে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। মণ্ডপের সম্মুখে মন্ত্র-মুগ্ধের মতো দাঁড়ালুম—চারিদিক স্তব্ধ, জ্যোৎস্নালোকে রহস্যময়। মনে হল, বিরাট শিলার মধ্যে কে যেন কাঁদছে, কোন নারী কাঁদছে। চমকিত বিমূঢ়ভাবে শুনতে লাগলুম, সে নারী কাঁদছে, বলছে—আমাকে মুক্ত করো, আমাকে প্রকাশিত করো। সমস্ত প্রস্তর ভরে তার প্রকাশবেদনা আলোড়িত হয়ে উঠেছে। সে বলছে—তোমরা আপন খুশিমতো একি সব মূর্তি খোদাই করছ, আমি যে বন্দিনী রইলুম, আমাকে প্রকাশিত হতে দাও। তোমরা স্রষ্টা নও, তোমরা যন্ত্র মাত্র, বরফ গলে যেমন নদী প্রবাহিত হয়, কুঁড়ি হতে যেমন পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সমুদ্রমন্থনে যেমন লক্ষ্মী উঠে আসে, তেমনি আমি পাথর থেকে বিকশিত হয়ে উঠব, তোমরা পথরুদ্ধ করো না, আমায় সাহায্য কর।

হায়, আমি এ-নারীকে কেমন করে মুক্ত করবো? এই পাথরের মধ্যে সে ঘুমিয়ে কাঁদছে, কেমন করে তাঁকে জাগাব, অর্গল খুলে দ্বারমুক্ত করে দেবো, সে পৃথিবীতে প্রকাশিত হবে! চিত্রসেন, আমার সমস্যা বুঝতে পারছো?

গভীর রাত্রি পর্যন্ত দুই বন্ধুতে আলোচনা চলিল।

মধ্যরাত্রিতে ঋতুপর্ণ আবার গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইল। মন্দির শিলা তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, লৌহকে যেমন চুম্বক আকর্ষণ করে। ওই শিলামধ্যে কোন লাবণ্যময়ী নারী ক্রন্দন করিতেছে, তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে।

ঋতুপর্ণ দিশাহারা হইয়া চলিল। পাথর ক্ষোদিত করিবার শিল্পসরঞ্জাম দুই হস্তে। দূরে গিরি বনভূমি স্তব্ধ। ঝিল্লিরবে পাণ্ডুবর্ণ আকাশ রিমঝিম করিতেছে, জ্যোৎস্নাধৌত নদীজলরাশি দুই তীরে মত্ত আবেগে আছড়াইয়া পড়িতেছে। গুহাগুলি সুষুপ্ত।

মন্দির মণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল না। গঙ্গা-বতরণের জন্য যে প্রস্তরখণ্ড নির্দিষ্ট ছিল, সে প্রস্তর লৌহ ছেদনী দিয়া কাটিতে লাগিল। ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে নয়, শিবের জটায় নয়, হিমালয়ের তুষারস্রোতে নয়, ওই কৃষ্ণশিলার মধ্যে গঙ্গা বন্দিনী, তাহার কারাগারের অর্গলগুলি খুলিতে হইবে। উন্মত্তের মতো ঋতুপর্ণ প্রস্তর ক্ষোদিত করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে শুধু যন্ত্রী, গঙ্গামূর্তি আপনা হইতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, আজ দ্বিপ্রহরের সপ্তপর্ণ বৃক্ষতলে ধারা-বর্ষণে সে যে লাবণ্যময়ী যুবতী দেখিয়াছে, তাহার মতো মূর্তি!

কমলনয়না, পীনোন্নত-পয়োধরা, চারু-নিতম্বিনী, এক হস্তে মঙ্গলজলপূর্ণ কলস, অপর হস্তে সুবর্ণবর্ণা ধান্যমঞ্জরী। ছয় ঋতুর পুষ্পে দেহ বিভূষিতা,—কেশে হেমন্তের কুন্দ, কর্ণে নিদাঘের শিরীষ পুষ্প, কণ্ঠে বসন্তের নবকুরুবকমালা, কটিতে শীতের লোধ্রপুষ্পের কাঞ্চী, সীমান্তে বর্ষার নবকদম্ব, চরণে শরতের রক্ত শ্বেত পদ্মরাজি।

মূর্তি ক্ষোদিত করিতে ঋতুপর্ণ নিমগ্ন। কখন চন্দ্র অস্ত গেল, শুকতারা নিভিয়া গেল, সে জানিতে পারিল না। উষার রাঙা আলো যখন তাহার নবোৎকীর্ণ গঙ্গামূর্তির উপর আসিয়া পড়িল, তখন সে চরণতলে পদ্মের পর পদ্ম ফুটাইতেছে।

কাহার আহ্বানে সে যেন জাগিয়া চমকিয়া উঠিল।

—ঋতুপর্ণ!

সম্মুখে স্থপতিশেখর রুদ্রদাস একা দাঁড়াইয়া। চারিদিকে অরুণের তীব্র আলোক।

রুদ্রদাস ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, ঋতুপর্ণ তুমি কি করছ? ভোরবেলা ঘুম ভেঙে মনে হল, যেন ছেদনীর শব্দ শুনছি! একি কাণ্ড! সারাদিন অলসভাবে কাটালে, আর রাতে তস্করের মতো এসে পবিত্র মন্দির গাত্রে বিলাসিনী নারীমূর্তি—

সহসা স্থপতিশেখর স্তব্ধ হইলেন, অপূর্ব গঙ্গামূর্তির দিকে বিমুগ্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

ঋতুপর্ণ নতজানু হইয়া তখন রুদ্রদাসের পায়ের উপর পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছে, আচার্যদেব আমি উন্মাদ। রাত্রে কি অসহনীয় বেদনায় উন্মত্ত হয়ে আমি এখানে এসে মূর্তি উৎকীর্ণ করেছি—সৃষ্টির প্রকাশের বেদনা—এই শিলার মধ্যে এই নারী কাঁদছিল—আমাকে যা শাস্তি হয় দিন—আমি হয়তো উন্মাদ—

স্থপতিশেখর কিন্তু ঋতুপর্ণের কোন কথাই শুনিতেছিলেন না, আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, একি অমৃতনিষ্যন্দিনী দেবীমূর্তি! মা গঙ্গা, তোমার একি রূপ দেখলুম! ঋতুপর্ণ, এ রূপ তুমি কোথায় দেখলে, তুমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছ!

—গুরু, আমার শাস্তির বিধান করুন, তা না হলে আমি মনে শান্তি পাব না।

—আয় আমার বক্ষে আয়, তোর মতো শিষ্য পেয়ে আমি গর্বিত।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।

—ঋতুপর্ণ, এ দেবীমূর্তি গড়ে ভারতের শিল্পেতিহাসের তুমি নবযুগ আনলে। আমিও এ মূর্তি পরিকল্পনা করতে পারতুম না। দেবীকে তুমি প্রেমে স্নেহে মানবী, মানবীকে তুমি সৌন্দর্যে মহিমায় দেবী করেছ। তবে এ মূর্তি রাজপুরো-হিতের পছন্দ হবে না, আপত্তি হবে।

—আচার্যদেব! আমাকে পরিহাস করবেন না—আমার কি প্রায়শ্চিত্ত, কি শাস্তি?

—তোমাকে কঠিন শাস্তিই দেব।

—বলুন, আমি অন্তরে শান্তি পাই।

—বল্লভীপুরে যে মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা হচ্ছে, সে মন্দির নির্মাণের সমস্ত ভার তোমার উপর, তুমি হবে সে মন্দির গঠনের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ স্থপতি!

—একি পরিহাস!

—পরিহাস নয়, বৎস, সত্য। যাও বল্লভীপুরে মন্দির নির্মাণ কর, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে, আমার অন্তরে কত স্বপ্ন, কত কল্পনা জাগে, প্রকাশের কত ব্যথা, কিন্তু চারিদিকে বাধার জন্য মনের মতো করে সৃষ্টি করতে পারি না।

—সৃষ্টির প্রকাশের বেদনা—শিলার মধ্যে কোন নারী বসে কাঁদছে—আচার্যদেব আমি—

জয়ন্তের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গভীর রাত পর্যন্ত স্টুডিওতে কাজ করিতে করিতে সে ইজিচেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার নাম ঋতুপর্ণ নয়। বিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় সে ভাস্কর জয়ন্ত।

জাগিয়া ইজি-চেয়ার হইতে সে উঠিল। জানালার কাচে ভোরের পাণ্ডুর আলো। স্টুডিওর চারিদিকে মাটির তাল, প্লাস্টার অব প্যারিস, অর্ধক্ষোদিত প্রস্তরমূর্তি, নানা জিনিস ছড়ান।

তাহার মনে হইল, এখন বুঝি স্থপতি-শেখর রুদ্রদাস তাহার সম্মুখে আসিয়া বলেন, বল্লভীপুরে মন্দির নির্মাণের ভার তোমার ওপর।

হায়, এ যুগে কেহ মন্দির নির্মাণ করে না।

বিংশ শতাব্দীর জীবনকে মূর্তি দিতে হইবে। মানবের স্বপ্ন, বেদনা, সংগ্রাম, আনন্দ।

স্টুডিওর জানালা, দ্বার সে খুলিয়া দিল। প্রভাতের আলো স্টুডিওর চারিদিক দীপ্ত করিয়া তুলিল।

ঘাতক

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

ছেলেবেলায় টুকু ছিল একমাত্র নিভৃত সঙ্গিনী। জীবনে অনেক গোপন সংবাদ ওর কাছ থেকেই জেনেছি প্রথম। তার আগে অপরিচয়ের ব্যবধানে অন্ধকার ছিল সুদূর, দুস্তর, দুরধিগম্য। বাংলার পদকর্তা বলেছেন, 'আমার অধিক গুরু, বৈঠিক গুরু, গুরু অগণন।' টুকু ছিল তাই। অবশ্য তারও আগে এসেছিল পিপি। গোটা রাত একই বিছানায় কাটাতে হয়েছিল। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। নারীর হৃদয়, প্রেম যেন এক লহমায় তলিয়ে গেল কোথায়। তখন থেকে কবিতা আমার দু চক্ষের বিষ। গান আর পাগল করে না আমাকে। লোকে ভাবে, রস-কষহীন, ভয়ঙ্কর কাঠখোট্টা মানুষ। নিতান্ত মুখচোরা স্বভাব। তলিয়ে কে আর কাকে দেখে?

পিপি বলেছিল, 'এই কথা যেন পাথরে চাপা থাকে দীর্ঘকাল। যতদিন বাঁচবো কেবল আমি জানবো, আর তুই। এখন বুঝলি তো দেহটা কোন সুখের?'

বলিনি কাউকে। বলা কি যায়? বয়সের বিচারে পৃথিবীর আলো-অন্ধকার আবর্তের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার চেয়ে কিছু নিবিড়। দেহে-মনে ক্লেদ আর পঙ্ক মেখে এমনি করেই চুপি চুপি বড় হলুম। এখন কোথায় আছে পিপি, সুখে আছে কিনা তা-ও জানিনে। শুধু মনে আছে, এই দেহ সুখের কাঙাল। এখনো একলা হলে থেকে থেকে আচমকা মনে পড়ে, সেই মুখ, অন্ধকার নিপাট বিছানা আর কান্নার মত অর্থহীন, অস্পষ্ট প্রলাপ। চিবিয়ে থেঁতলে বার বার উচ্চারণ করি সেইসব কথা, আস্বাদ নেই। তিক্ত, বিস্বাদ আফিমের নেশার মত রক্তের ভেতরে ঝিম খানিক। এই আচ্ছন্নতা কাটিয়ে নতুন কিছু করা কিংবা ভাবা অন্তত সাময়িকভাবে দুঃসাধ্য মনে হয়।

'জানো, আমি তোমাকে ভালো-বেসেছিলুম।'

বিশ্বাস করিনি। কারণ, মনটা বিষিয়ে দিয়ে গেছে পিপিই। অথচ সে ছিল ছাড়া-ছাড়ির চরম মুহূর্ত। রক্তে তখন ভাবনার চেয়ে ব্যাকুলতাই বেশী।

'কাল আমরা চলে যাবো।'

সদাশাড়িপরা টুকুকে মনে হচ্ছিল নতুন উষার মত স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না, অথচ ধ্যানে অনুভব করা যায়। এমন করে পরিপূর্ণভাবে ওকে আর কখনো দেখিনি। পলকে বয়স যেন আমাকে ছেড়ে দিন-মাস-বছর পেরিয়ে অন্য দেশে চলে গেল। অন্য কোনো গ্রহে। যেখানে পাপ নেই, পুণ্য নেই, ভ্রান্তি নেই। শুধু সুখ, শুধু তৃপ্তি। শুধু দেহ, শুধু দীপ্তি।

'যাওয়া মানেই তো আসা?'

'না।' মাথা দুলিয়ে টুকু বললে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়েছে বাবা। এবার আমরা দেশে যাবো।'

জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল একবার। আমিই বাঁচিয়েছি। টুকু তা ভোলেনি। সর্বাঙ্গে আগুন মেখে কেঁদে কেঁদে নির্লজ্জের মতো আমাকেই ডেকেছে কেবল। আজ তাই চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে সব কিছু দেখে নিতে চাই, যা আমার দান, যা আমার স্মৃতি। নির্দ্বিধায় বুকের আঁচল সরিয়ে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত, উদ্ভাসিত হল টুকু। আর মুহূর্তে মন্দির হয়ে গেল শরীর।

'আর কিছু?'

'তৃষ্ণায় যদি জল না মেলে কোনোদিন তাহলে তোমার কাছেই যাবো।'

'যেখানেই থাকি আমি চিরদিন তোমার। শুধু তোমারই।'

সেই যাওয়া এখনো হলো না। টুকুকে বুঝি আর দেখা হবে না জীবনে। অথচ আশা ছিল যাবো সময় হলেই তোমার কাছেই যাবো। টুকু আজ তুমি কোথায়? অবসরের উন্মনা মুহূর্তগুলি এখনো তোমার কথা ভেবে ভারাক্রান্ত। এখনো মনের মধ্যে বেঁচে আছে গ্রাম, দেশ, বন-ভূমি। আর সেই গ্রাম্য বালিকার সরল, সহজ আত্মদানের স্মৃতি। কাছে রাখতে চেয়ে রাখা গেল না। দেখতে দেখতে যাকে আর দেখা গেল না।

টুকুর হাত ধরে ঘোরা, সে ছিল ছেলেবেলাকার সাধ।

টুকুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, সে ছিল জীবনে নিয়তি-নির্ধারিত এক অনন্য পরিণতি।

যার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউ। না টুকু, না আমি।

দুঃখ তাই অবিরল।

আছে সব। সেই বকুল, লতাপাতা, কার্পেটে নিপুণ শিল্প। ঝিনুকের ফুলদানি, মালা, রক্তের গোলাপ! ধুলো আর ধোঁয়ার আড়ালে ম্লান। ঝেড়ে নেবার সময় নেই, মুছে দেখার গরজ নেই। তবু আছে, ভোলোনি কিছুই। একদিন যত্ন ছিল, অকারণ আদর ছিল এদের। আজ শুধু সঙ্গে রয়েছে, প্রাণের মত, প্রত্যঙ্গের মত, কাছে কাছে রেখে দিয়েছে টুকু। কিন্তু একদিন বুঝতে পেরেছিলাম, আমরা যত নিকট, ততখানিই দূর। সংসারের নিয়মে লজ্জা দিয়েই সুন্দরকে ঢেকে রাখার, আড়াল করার রীতি। এই ঝিনুক, ওই মালা, রক্তের গোলাপ এরা আমার কৈশোরের বেদনা দিয়ে গাঁথা। আমি এদের চিনি। এত নিকট এত আপন আজ আর টুকু নয়। অথচ এরা আজ কত দূরের।

মনে রেখেছে সব, সকল কথাই। সেই প্রেম, প্রতিশ্রুতি, অভিমান। অদর্শনের দুঃখ তবে একা আমারই নয়। আড়াল থেকে খোঁজ নিয়েছে, দূর থেকে খবর পেয়েছে, কেমন আছি, আদৌ আছি কিনা। তবু না জানিয়ে, না শুনিয়ে আচমকা চোখের সামনে এসে হাজির হয়েছি বলেই কি এত স্থির, এমন অচঞ্চল? যেন জানার মধ্যে ফাঁকি নেই, চিনতে কোথাও বাকি নেই আর। ভেতরে-বাইরে মানুষটা আমি কেমন, কতখানি খাঁটি, চোখ বুজে টুকু তা এক্ষুনি বলে দিতে পারে।

আর আমি কি চেয়েছিলুম? এত পথ হেঁটে এ আজ কার কাছে আসা? সেই টুকুই তো! বালক বয়সে নিরুপায় ছেড়ে দিতে হয়েছে যাকে? তাই বলে যৌবনে আমাকেই ফিরিয়ে দেবে তুমি? কৃপণের
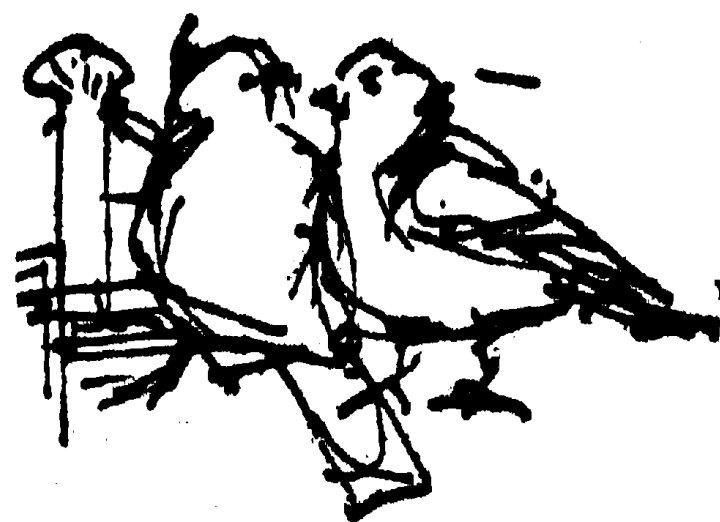
মত সরিয়ে নেবে হাত? কথা ছিল, তৃষ্ণায় কাতর হলে যাবো। তুমি চিরদিন আমার, শুধু আমারই। কিন্তু এ কেমন হল? দরজাটা খোলা নেই, তুমি নেই। তুমি, সেই তুমি। পৃথিবীর মাঠ-ঘাট এখনো ফুল-ফল-ফসলে পূর্ণ হয়ে আছে। তামাটে খুশিমাখা বসন্তের আসা-যাওয়া তেমনি অবারিত। শুধু বঞ্চনার মরুভূমি আমার ঠিকানা! ধূপ আর ধূসরতা আকীর্ণ করে রেখেছে আমার পথ।

'ভালো আছো তো টুকু?'
'হ্যাঁ, তুমি?'
'দেখতেই পাচ্ছো।'

হাসতে চেয়ে দেহমন গুলিয়ে ওঠে। যেন এক্ষুনি বমি করে ভাসিয়ে দেব ঘর। যাকে চেয়ে এত পথ হেঁটে এখানে আসা, সে আজ কোথায়? এ যে অন্য মানুষ! ত্রিশূলের মত চোয়াল। ভুরুর নিচে শূন্য বাসার মতই দুই চোখে অন্ধকার। পাকানো দড়ির মত দুই হাতে পেতলের রুলি। কাকে চেয়ে কার কাছে এলুম। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারিনে। টুকু সুখে নেই, টুকু ভালো নেই। যেন সব অপরাধ আমার। মুখ ফুটে বলতে পারিনে, তোমাকে ভয়ানক দরকার। একদিন তুমিই কথা দিয়েছিলে টুকু! তাই আসা। এবার কি নিয়ে ফিরে যাই বল তো? কোথায় যাই আমি?

'বিয়ে করেছো নাকি?'

গলায় স্পষ্ট ঝাঁজ। যেন ঝাল খেয়ে কথা বলছে। শুনে হকচকিয়ে চাই। সঠিক জবাব দিতে বিলম্ব হয়ে যায়। খতিয়ে দেখতে হয়, ভাবতে হয়। তবে কি আশা করেই বসে ছিল টুকু? পৃথ্বীরাজের মত আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে নিয়েই পালিয়ে যাবো কোথাও! নিজেকে বাস্তবিক অক্ষম অপদার্থ মনে হয়।

'করতে হয় তাই করা।' কথা বলতে বলতে হাই তুলি। মুখের সামনে তুড়ি দিই। যেন জীবনে অথবা সংসারে ওলোট-পালোট হয়নি কোথাও। আমি সেই আমিই আছি, টুকু সেই টুকু। এতটুকু নড়চড় হয়নি কিছুই। তবে কেন কান্না পায়? বুকের ভেতর টনটনিয়ে ওঠে ব্যথা?

'পথ ভুলে নাকি?'

চেহারায়, অবয়বে উদাস, নিস্পৃহ মনে হয়। কণ্ঠে বিদ্রূপ। ফিরে যাবো? বুকের ভেতরে ছুটন্ত ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ওঠে রক্ত। অত সহজে আঘাত পাইনে এখন। ভুলে গেলে? কেন আসা বুঝতে পারো না? শিশু তো নও? আমিই কি অচেনা হয়ে গেছি তবে? একদিন না চাইতেই এই দেহ, এই প্রাণের বিনিময়ে সর্বস্ব পণ করে বসেছিলে? আজ কি ভুলে গেলে টুকু? আমি কিন্তু ভুলিনি কিছুই। এখন ইচ্ছে হলে শুধু দেহ নয়, প্রাণ কেড়ে নিতে পারি। ভাবছো, কি দুর্জয় আমার সাহস! কিন্তু আমি তৃষিত, আর্ত, অসহায়। আজ তুমি ছাড়া গতি নেই। কথা রাখতে ছুটে এসেছি। দূর, দুস্তরতা ঘুচিয়ে আরো নিকট, আরো সঙ্গোপন হতে চাই।

'তোমার স্বামী কোথায়?' চারদিকে তাকাই। আতিপাতি করে খুঁজি সব।

'কাজে গেছে।' যেন সভয়ে জবাব দিচ্ছে টুকু। গলা কাঁপিয়ে কথা বলে। বেশ মজা লাগে। ভেতরে-ভেতরে একটা সুখ একটা অনির্বচনীয় কৌতুক অনুভব করি।

'একা নাকি? মা হয়নি?'

চোখের ওপর তর্জনী তুলে ধরল। মাথা দুলিয়ে ময়লা হাসি হেসে আমাকে যেন ঘায়েল করতে চাইল। দাঁতে পাওরিয়ার ক্ষত। গা ঘিনঘিন করে। আঙুলের মত কণ্ঠার হাড়। গোসাপের গায়ের মত ঘামাচি ভর্তি ঘাড়-গলা কেমন কুৎসিত, খসখসে। অথচ তুমি কত সুন্দর ছিলে। একদিন মন-ভুলানো রূপ ছিল তোমার।

'আর কেউ নেই?'

'আছে। বুড়ি শাশুড়ি।'
'কোথায়?'

'অন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সব দায় এখন আমার।'

ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, ম্লান দেখাচ্ছিল টুকুকে। যেন সরাসরি অভিযোগ করতে চাইছে। কথায় কথায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সব দোষ আমার। ইচ্ছে করলে, সেদিন আমিই বাঁচাতে পারতুম ওকে। বয়সের বিচার করবে না? অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার? বললে এক্ষুনি কান্নায় ভেঙে পড়বে। চিনি তো! এখন বয়স হয়েছে, ছেলের মা হয়েছে টুকু। হোক না পঙ্গু আর বোঝা ছেলেই তো? টুকুরই পেটে-ধরা ছেলে। বেশী বোঝাতে গেলেই বলবে, অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। অভিজ্ঞতা আমাদের বয়স আর চিন্তার ফসল। আসলে বল না কেন, তুমি ছিলে ভীরু। কাপুরুষ। হ্যাঁ তাই। কিন্তু আজ তো নই। আজ তো কথা রাখতে চলে এসেছি টুকু। দেয়াল দেখি। ফাটা ছাদ। বর্ষার জলের দাগে বিবর্ণ। ঘুণে ধরা কড়ির গায়ে বাদুড়ের মত ঝুলকালি। মেঝের একপাশে কাঁথাকানি, বিছানার স্তূপ। স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ। দড়িতে ঝোলানো জামা-কাপড়। সরে এল টুকু। চেয়ারের কাঁধ থেকে নোংরা কাঁচুলিটা তুলে নিল। চলে যাচ্ছিল। হাত ধরে কাছে টানি। বলি, 'কেউ তো নেই। একটু পাশে বসবে না আমার?'

নিপুণ লম্পটের মত হাসতে থাকি। টুকুর ভাবলেশহীন মুখে আরো এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিল কে! ও এখন ভয়ে কাঠ। হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাধা দেবার সাহস নেই। অথচ তেমন করে কাছে আসার তাগিদও নেই আর। দাঁতে দাঁত ঘষি। ইয়ার্কি!

'কথা রাখলে ক্ষতি কি টুকু?'
'ক্ষতি তোমার নেই, আমার আছে।'

'তবে যে বড় মুখ করে আসতে বলেছিলে?'

'বলেছিলুম বুঝি? তা হলে ভুলে যাও সে-কথা। এখন এই ঘরদোর সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছি। জট নামিয়ে দিয়েছি এর বাইরে একেই আরো শক্ত, সজীব করে তুলতে চেয়ে। আজ টেনে তুলতে গেলেই ছিঁড়ে যাবে। জীবনটাই নীরস হয়ে যাবে আমার। তুমি কি তা-ই চাও?'

কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা আমাকে উগ্র, উন্মাদ করে তোলে। হাত থেকে কাঁচুলিটা ছিনিয়ে নিই। কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে দূরে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিই। মেঘের মত গম্ভীর, গাঢ় স্বরে আদেশ করি, 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও টুকু।'

মুখে মদের গন্ধ নিয়ে রাত করে ঘরে ফেরে মদন। হাতে কচ্ছপের মাংস। বলে, 'চলে তো এসব?'

চোখ টিপে সায় দিই।
'আমার আবার না হলে চলে না।' ফোকলা গালে ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে থাকে মদন।

টুকু দুটো গ্লাস এনে সামনে রাখে। কিছু কাঁচা পেয়াজ, লঙ্কা, ছোলা-মটর। বেশ যত্ন নিয়ে দুটি গ্লাস পূর্ণ করে মদন। গদগদ স্বরে বলে, 'নিন। কত জন্ম তপস্যা করলে আপনাদের মত পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ পাওয়া যায় ভাবুন তো?'

তরল আগুন এক নিঃশ্বাসে গলায় ঢেলে শূন্য গ্লাসটা মদনের সামনে রাখি ফের।

'আপনি দেবতা। পায়ের ধুলো দিন। মাংসের ঝোলমাখা হাতখানাই আমার পায়ে ঠেকিয়ে কপালে বুকে বুলোতে থাকে মদন। রাগ করে বলে, 'মাগীকে আপনি কি শিখিয়েছিলেন বলুন তো? কেমন মাস্টার ছিলেন আপনি? আমাকে ভক্তি-ছেদ্দা করে

মা একদম। ঘরে ঢুকলে নাকে কাপড় দিয়ে পালিয়ে যায়। অথচ এখনো আপনাকেই মান্যি করে। কথায়-কথায় খোঁটা দেয়। আমি নাকি আপনার পায়ের যুগ্যি নই। তা একবার বলে-কয়ে শিখিয়ে দিয়ে যান না কেন?'

এবার টুকু ডাকে।

উঠে যাই।

'কত রাত হবে তোমাদের?'

'গোটা রাতই কাটিয়ে দেব ভাবছি। তুমি ঘুমোও গে যাও।'

'তাই কি হয়? তুমি থাকবে একটা মাতালের সামনে বসে, আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবো?' মোহিনীর মত হাসি হাসে টুকু। এখন অনেক সহজ, অনেক সরল মনে হচ্ছে ওকে। যেন সেই টুকু। যে একদিন হেসে কাছে এসেছিল, কেঁদে বিদায় নিয়েছিল। এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? অন্ধকার কোন অরণ্যের গভীরে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে বল তো? বেশ-বাস-প্রসাধনে এ যে অন্যমানুষ। এখন তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আদর করে কাছে টানি, বুকে হাত রাখি। টুকু নিজেই ঘনিষ্ঠ হতে চায়, আরো নিবিড়। চুলের গন্ধে নাক ডুবিয়ে বলি, 'একদিন আমার জন্যে মরতে চেয়েছিলে। আজ পারো না?'

কথা না বলে একে-একে দেখিয়ে দিলে টুকু। জঙ্ঘায়-যোনিতে-স্তনে সেই দাগ, সেই চিহ্ন। তাহলে আমি এখনো বেঁচে আছি! কলঙ্কের মত সর্বাঙ্গ জড়িয়ে রয়েছি তোমার! দেখে আশ্বস্ত হই। তৃপ্ত বোধ করি। মদনকে মনে হচ্ছে হেয়, অপদার্থ, অর্বাচীন।

ধীরে-ধীরে ফিরে এলুম।

মাংস চুষতে-চুষতে মদন বলল, 'হল?'

কথা বলিনে। চুপচাপ বসে থাকি। মাথাটা ভীষণ ভারি ঠেকছে। ফাঁকা, উদাস, শূন্য মনে হচ্ছে ঘর। দড়ির আলনায় একটিও কাপড় নেই। মেঝের ওপর বিছানাটা এলোমেলো করে পাতা। দেয়ালে বস্ত্রহরণের ছবি। কড়িকাঠে বাদুড়ের মত ঝুল। কেরোসিনের লালচে আলোয় সবকিছুই রহস্যময় ঠেকে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় বল্লমের মত সূচ। সন-তারিখের অসংখ্য ফুটো। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। মদনের বোকা ছেলেটা জানোয়ারের মত একবার চেঁচিয়ে উঠেই থেমে গেল। আমি কি মাতাল হয়ে যাচ্ছি নাকি? পাশেই মড়ার খুলির মত মাংসের বাটি, গ্লাস, বোতল। গোটা মেঝেটাই যেন কঙ্কাল করোটিময় এক বিশাল শ্মশান। ওপাশে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ধোঁয়া ছড়িয়ে জ্বলছে। কাত হল মদন। বমি করল। শেষে হাত-পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিল মেঝের। বমির ওপর গড়াতে-গড়াতে দেয়ালের কাছে চলে গেল। মদনের কাণ্ড দেখে নিজেকে ভীষণ একলা মনে হচ্ছিল। তারপর আমিও ওর দেখাদেখি বমির ওপরে নাক-মুখ ঘসতে-ঘসতে দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেলুম। দু হাতে প্রায় বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদর করে ডাকলুম, 'মদন'

ডাক শুনে এতক্ষণ পরে একটা বাচ্চা ছেলের মতই হু-হু করে কেঁদে উঠল মদন।

মদনের মা চিৎকার করছিল।

'মদন, অ-মদন!'

কিন্তু ঘুম ভেঙে পাশের ঘরে যেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। টুকু তখন জ্বলছে। দাউ-দাউ করে আগুনের শিখাগুলি হাজার আঙুলে ছাদ-বর্গা-কড়িকাঠ ছুঁতে চাইছে। বোবা ছেলেটা মরে পড়ে আছে। টুকু নিঃসাড়। ধোঁয়া আর মাংস পোড়া গন্ধে সারাটা ঘর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মদন আমার হাত ধরে টানল। বাসি হাড়-মাংস বমির ভেতরে গ্লাস আর বোতল নিয়ে আবার নতুন করে গুছিয়ে বসলুম। মদনকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। এবার আমি ধীরে-ধীরে মাতাল হয়ে যাচ্ছিলুম। ভীষণ দুঃখ হচ্ছিল আমার। অনেক কথা মনে পড়ছিল। বুকের ভেতরে পুড়ে যাচ্ছিল যেন। পাশের ঘরে আগুন ছাই হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমার আত্মার মত যোনিহীন, স্তনহীন, জঙ্ঘাহীন টুকু পবিত্র হচ্ছে ক্রমশ।

বিজনের রক্তমাংস

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

আজ ভোরবেলা বাথরুমে পেচ্ছাপ করতে গিয়ে বিজন দেখল পেচ্ছাপের বদলে আজ রক্ত বেরুচ্ছে; সে রক্ত-প্রস্রাব করছে। বাধা না দিয়ে বিজন পেচ্ছাপ করল। আরো পেচ্ছাপ পায় কিনা দেখে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সে ঘরে এল। শীত পাচ্ছিল, তাই কাঁথা মুড়ি দিয়ে দেওয়ালে দুটো বালিস রেখে তাতে ঠেস দিয়ে বসল। এখনো তার কপালে রক্ত লেগে ছিল।

এই ভোরে মেজদা ফ্যাকটরি যাবে, যাবার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিল বিজন তার শব্দ পেল। এই সময়টাকে ধরে রাখার চেষ্টায়, বিজন জানে, মেজদা এখন বৌদিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। মেজদা বেরিয়ে গেল, বৌদি হাসিমুখে জানলার গরাদে চেপে তারপর কাছে এসে বলল, 'এই, চা খাবে?' বাইরে বহুদূরে পর্যন্ত তখন বৃষ্টি চলছিল স্নানের পর মেয়েরা যেমন চুলে ঝাপটা দেয়, তেমনি করে হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঝাপ্টা মেরে যাচ্ছে। দু'একটা কাক-পায়রা ওড়াউড়ি করছিল, বৃষ্টি হঠাৎ ঝেঁপে এলে বিজন বৌদিকে বলল, 'হ্যাঁ, কারো।' তারপর বলল, 'আদা দিও, বুঝলে?' এই যে এমন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, পাখিদের এতে খুব একটা আপত্তি আছে বলে তো মনে হয় না। এ দু-এক মিনিটের ব্যাপার নয় বুঝে অনেকেই চোখ বুজেছে নিশ্চিন্তে। এদিকে, কাছেই জানালার শার্শিটা ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে বারবার। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো একটু মন্থরভাবে নেমে এসে ফেটে যাচ্ছে হঠাৎ, তারপর চৌচির জলরেখা কী তীব্রতায় ছড়িয়ে যাচ্ছে কাচময়! বিজন মনে করে দেখল, অন্য সব কিছু স্তব্ধ হলে তবে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময় যা-কিছু শব্দ শোনা যায়—রেল, মেঘ কি ট্র্যাফিকের ঘূর্ণ, জলের ছপছপ বা মানুষের স্বর, সবই প্রতিধ্বনির মত মনে হয়।..... বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে হাল্কা জামরঙের।

বিজন বসে বসে আরো ভাবতে লাগল। বিজন সবচেয়ে বেশি ভালবাসত তার আন্তরিকতাকে, সন্দেহও করত তাকেই সবচেয়ে বেশি, আজ আর কোনো সন্দেহ নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই, আজ সে খুব আন্তরিকভাবে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। বাকি ভাবনাগুলো খুব এলোমেলোভাবে এলেও, দুটো ব্যাপার তার মনে এল প্রথমেই। এক হল এই যে, তার খুব গুরুতর অসুখ হয়েছে এটা আর অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। বিশ্বাস করতে পারছে না অথচ অনস্বীকার্য, এমনি একটা অনুভব বৃষ্টিশেষের অপরাহ্নে আলোর মত সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল তার বুক জুড়ে। বিজনের মনে হল, ঠিক এরকম আলোতেই মেয়ে দেখাতে হয়, দেখালে, কালো মেয়েকেও সোনালি-ফর্শা দেখায়। দ্বিতীয় কথা তার মনে হল যে, সে কোনো মহিলার সঙ্গে প্রেম করে না। এরপর বিজন অন্য কিছু ভাবল না কয়েক মুহূর্ত। এই সময় হাওয়া উঠে এমন ফাঁপিয়ে দিয়ে গেল বৃষ্টিটা যে, কিছুক্ষণ বারিপতনের আওয়াজও আর শোনা গেল না। বিজন তখন ভাবল, আচ্ছা, ভাল যদি বাসত কেউ, তাহলে আমার এই অবস্থাটা কি অন্যরকম হত? এই যে আজ সকাল থেকে অনুভবের একটা আলো তার বুক জুড়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে ক্রমশ, যার ফলে তার বক্ষদেশ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, আলোর সামনে মেলে ধরা এক্স-রে প্লেটের মত সমস্ত অন্ধকার বুক এখন ঝল্‌ঝল্‌ করছে—তাহলে, যদি নারীর ভালবাসা থাকত, এ-রকম অবস্থা তার হত কি? বিজন বুঝতে পারল না, অপ্রেমে আছে বলেই বুক জুড়ে আজ এমন ঝলমলানি, সেখানে তাই এত কোলাহল। বিজনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গুরুতর অসুখ হবার পর তার বন্ধু হিরণ্ময় যখন ছ'মাস অনুপস্থিত রইল আড্ডায়, কই, এত সেনসিটিভ হওয়া সত্ত্বেও, হিরণ্ময় ঐ ছমাস কাল যে দুঃখ ভোগ করেছে একা, সেই দুঃখ তার তো একদিনও হয়নি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে পড়েছে বটে যে, হিরণ্ময় আমাদের মধ্যে নেই সে বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু তাকে যে ইনজেকশন নিতে হচ্ছে—যন্ত্রণাকর জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতে হচ্ছে—যন্ত্রণাকর, তার যে মনে পড়ছে, সে যে হিংসে করছে, ওই যে লোকটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাজার করতে, চাকরি করতে মোট বইতে ওরই মত কয়েকটি লোক, তাদের শুধু হাঁটাটুকু জানলার ধারে বসে সে নীরবে হিংসে করছে—এইসব দুঃখের কথা তার তো মনে হয়নি। তারপর সেরে উঠে হিরণ্ময় যখন তাদের মধ্যে ফিরে এল তা আরো দুঃখের, নয় কি? তারা যখন একটার থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিত, হিরণ্ময় কি অন্যমনস্ক হয়ে যেত না? বা, সবাই মিলে যখন মদ খেতে হেঁটে যেত এসপ্লানেড অবধি 'সাই বাড়িতে কাজ আছে.' হিরণ্ময় তো এই কথা বলেই চলে যেত। এটাই তো অধিকতর দুঃখের যে একজন যুবা যদেচ্ছ খর্চা করতে পারছে তার শরীর, তাকে সাবধানে থাকতে হচ্ছে, সন্ধে হলে তাকে ডিম ও দুধ খেয়ে শুয়ে যেত হয়। 'সমস্ত দুঃখ আমাকেও এটা ভোগ করতে হবে' বিজন এতদিনে বুঝতে পারল; বুঝতে পারছে কিন্তু কান্না পাচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে না, কারণ এই সমস্ত বুঝতে-পারাই বিজনের মনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে চলে যাচ্ছে। এরা এত শঠক যে বিজনের কোনো দুঃখবোধকেই এরা পরোয়া করে না। সমুদ্র নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিল বলে, বিজন জানে, গত ক' মাস ধরেই তার পুরীতে, সমুদ্রের ধারে, কিছুদিন কাটিয়ে আসার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এখন যদি বিজন যায়, ছোটাছুটি করতে যায় সমুদ্রের ধার অবধি, যে জ্বলন্ত জামা-কাপড় সে পরে আছে—সবই রাস্তায় ফেলে দিতে পারবে, কিন্তু সমুদ্রের সমান উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেও বীজানুগুলির হাত থেকে তবু সে কি পরিত্রাণ পাবে! কিছুতেই রেহাই সে পাবে না। অসুখ কোথায় কামড়ে পড়ে রয়েছে, সে জানে। কিন্তু সে কি পারে কিডনিটাকে খুলে সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে? সে যদি বলে, আমি কিছুই চাই না, মানুষের পরিবর্তে একটা কেঁচোর জীবন গ্রহণ করতেও আমি খুব রাজি আছি, কারণ, আমি যদিই বেঁচে উঠি, অর্ধজীবিত হয়ে বেঁচে থাকতে আমি চাই না, এর চেয়ে মেরুদণ্ডহীন হলেও কেঁচোর সম্পূর্ণ জীবন আমার কাম্য—এমন কি সে যদি লিখে দেয় যে ভবিষ্যতে নারী-সম্পর্কেও সমস্ত দাবী সে ছেড়ে দিচ্ছে, তা হলেও কি সেই অনির্বচনীয় হৃৎপিণ্ডের মালিক তার শরীর থেকে সব কটি বীজানু তুলে নিতে পারে, না!

বিজনের খেয়াল হল, বৃষ্টি থেমে গেছে, শোকের মত ফোঁটা-ফোঁটা এখন পড়ছে, ওড়াউড়ি করছে হাওয়ায়। বিষণ্ণভাবে ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে সে তা দেখল। সহসা তার কবির দুটি লাইন মনে পড়ল।

The candle on the ta[illegible] burned.
The candle burned.

কবিতাটা সে একবারও অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিল কি? সে লাইন দুটো বিড়বিড় করতে লাগল।

কোলের ছেলেটা তার বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে আছে। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে, তার হাত গলা থেকে টেনে ছাড়াতে ছাড়াতে, বৌদি, যাকে বলা হয় অর্থপূর্ণ, সেইরকম হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কীগো, কবিতা?' বিজন বলল, 'আদা দিয়েছ?'
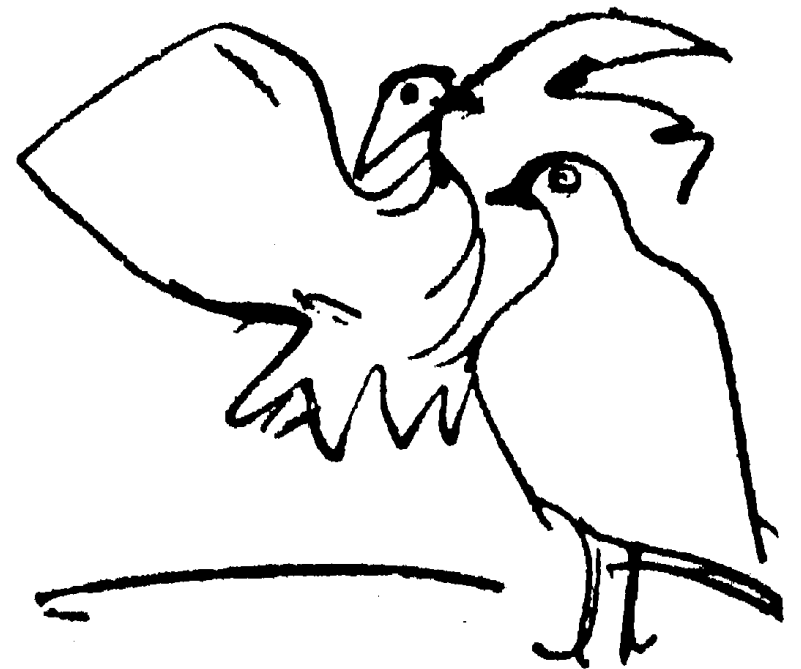
ছেলেটা মেঝের হামা দিচ্ছিল, একটা আগুনে একটা জ্যান্ত পিঁপড়ে টিপে তুলে ধরেছে মুখের কাছে, এই মুখে দিল বলে, তাকে বাধা দেবে কি—একদিন বৌদির ছেলেটাকে সে কোলে নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, এটা আগে থেকে বুঝতে পেরে কেন সে তাকে যথেষ্ট আদর করে নেয় নি, এই আপসোসে বিজনের চোখে জল এসে গেল, সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বৌদি আরো কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'কীগো......' 'আঃ' বলার মত করে বিজন বলল, 'না'; বলে হাসল। নিজের হাসিটা সে দেখতে পেল।

সমস্ত কোমর জুড়ে বিজন এবার একটা ব্যথা অনুভব করল। সেই কোন্ ভোরে বাথরুমে প্রস্রাব করার পর, সে-কথা এই প্রথম আবার তা মনে পড়ল।

বাস্‌ট থামলে বিজন রাস্তায় বেরুল। রোদ উঠেছে, শরীরের কোথাও কোনো অসুবিধে নেই। না-কোনো যন্ত্রণা, না-মাথাধরা, না-কিছু। সকালে অল্প কাশি ছিল, এখন তাও নেই। জ্বর নেই। শুধু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে তার বার বার।

কবে থেকে মনে নেই, বহুদিন বোধহয় সেই কৈশোর থেকে; ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আয়নায় মুখ দেখা বিজনের অভ্যাস। বড়দির কাছে শুনেছে, সাত-আট মাস বয়সে যখন তাকে প্রথম আয়না দেখানো হয়, সে নাকি মিনিট দুই গম্ভীর হয়ে ছিল, তারপর ফিক করে হেসে ফেলে। ছেলেবেলা থেকেই বিজন স্বপ্ন দেখত অত্যন্ত বেশি, বড় বড় ঘুমে ও স্বপ্ন দেখে দেখে ক্লান্ত নিজের ফোলা মুখটা, রাত পোহালে, আয়নায় দেখতে বরাবরই তার ভাল লাগত। বাবার কথা মনে পড়ল বিজনের। বাবা শেষ যে কদিন বেঁচে ছিলেন প্রায়ই বলতেন, 'কীরে, তোদের আজকালকার ছেলেদের হল কী। আয়নায় কী দেখছিস? এই ঘুম ভাঙল, এখন মুখ-হাত ধো, বাইরে যা। সূর্য ওঠেনি, পৃথিবীটাকে দেখার এই তো সময়।'

ছেলেবেলা থেকেই বিজনের সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুটিকে বড়দের কেউ-না-কেউ প্রায়ই বলে গেছে, 'বাঃ, ছেলেটি বেশ সুন্দর তো!' অথচ কেউ কোনোদিন বলল না তাকে কেমন দেখতে, শুধু চুপচাপ থেকে গেল। সস্তা আয়নাগুলির কথা বাদ দাও, সেগুলোর পারা খারাপ, কাচ ভাল না। কিন্তু এ বিষয়ে, দামি এবং বিলিতি ও ভাল আয়নাগুলিও তাকে কিছু জানাতে পারল কই? কলেজে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল বরুণের; বরুণ প্রথম দিনেই ওয়াই এম সি -এ-র কেবিনে বসে তার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত কেমন মৃদু হেসে জানাল আমার রূপের, বুঝলেন না, ছেলেবেলা থেকেই প্রশংসা শুনে আসছি।' ঠোঁটের কোণ দিয়ে বরুণের ধোঁয়া ছাড়া বেশ মনে পড়ে। বিজন হঠাৎ ভাবল, আচ্ছা রূপসীরা আয়নাকে কত ভালবাসে? বিজনও আয়না ভালবাসত।

আজ সকাল থেকে বিজন আয়না দেখেনি। দেখেনি, কিন্তু বর্ণনা-করা কোনো মুখের মত সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তার মুখটা ফোলাফোলা, গাল দুটো চিনচিন করছে, চোখের নিচে দুতিনটে বেশি আঁচড়, কোলে কালি। বারবার চোখদুটো টেনে তুলেছে সে ভ্রূ দিয়ে। বিজনের চোখ বরাবরই একটু বেশি কালো, আপনপ্রিয়, ভাসাভাসা। চোখদুটি আজ বসে গিয়েছে বলে সে খুবই মনোকষ্ট পেল। সে ৮ নম্বর বাস ধরল।

'কী বিজু, কী খবর!' বুকটা ধড়াস করে উঠল বিজনের। বেচুর সঙ্গে আজকাল বিজনের প্রায়ই দেখা হয়; কিন্তু সেই কবে স্কুলে সেকশন বদল হবার জন্যে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরে দু'এক বছর দূর থেকে যে-কোনো একজনের ভ্রূ-নাচানো অর্থাৎ খবর ভাল, এবং আর-একজনের ঘাড় হেলিয়ে সম্মতিসূচক হাসি, এই ছিল। ক্রমশ এটা পীড়া হয়ে উঠলে, হঠাৎ দেখা হলে কাউকে আর দেখতে পেত না। তারপর প্রায় ন বছর পরে, আজ, এই ভোরবেলা, বিজন নয়—বিজু—'কী বিজু', 'কী খবর?' 'অনেকদিন পরে দেখা হল।' প্রীতিকর হাসি স্মিত চক্ষে বেচু তাকাল। বিজন মুখের কিছু ঢাকবার চেষ্টা করল না। মুখ শুকনো হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই; শাদাটে দেখাচ্ছে, দেখাক। 'হ্যাঁ, তা সত্যি', সে বলল। গালের যেখানটা চিনচিন করছে, সেখানটা কি কাঁপছে? বিজন সেজন্যে কমপ্লেকস বোধ করল। হয়ত খুব ফোলাফোলা দেখাচ্ছে, অভিনেতা রুজ মাখলে যেমন হয়, হয়ত তেমনি লাল......'বেশ লাল দেখাচ্ছে তোকে। মোটা হয়েছিস।' মোটা? বিজন অস্বীকার করে হাসল না, স্বীকারও করল না। এমনি হাসল। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে বেচু ছেলেবেলার গল্প শুরু করল। ওরা
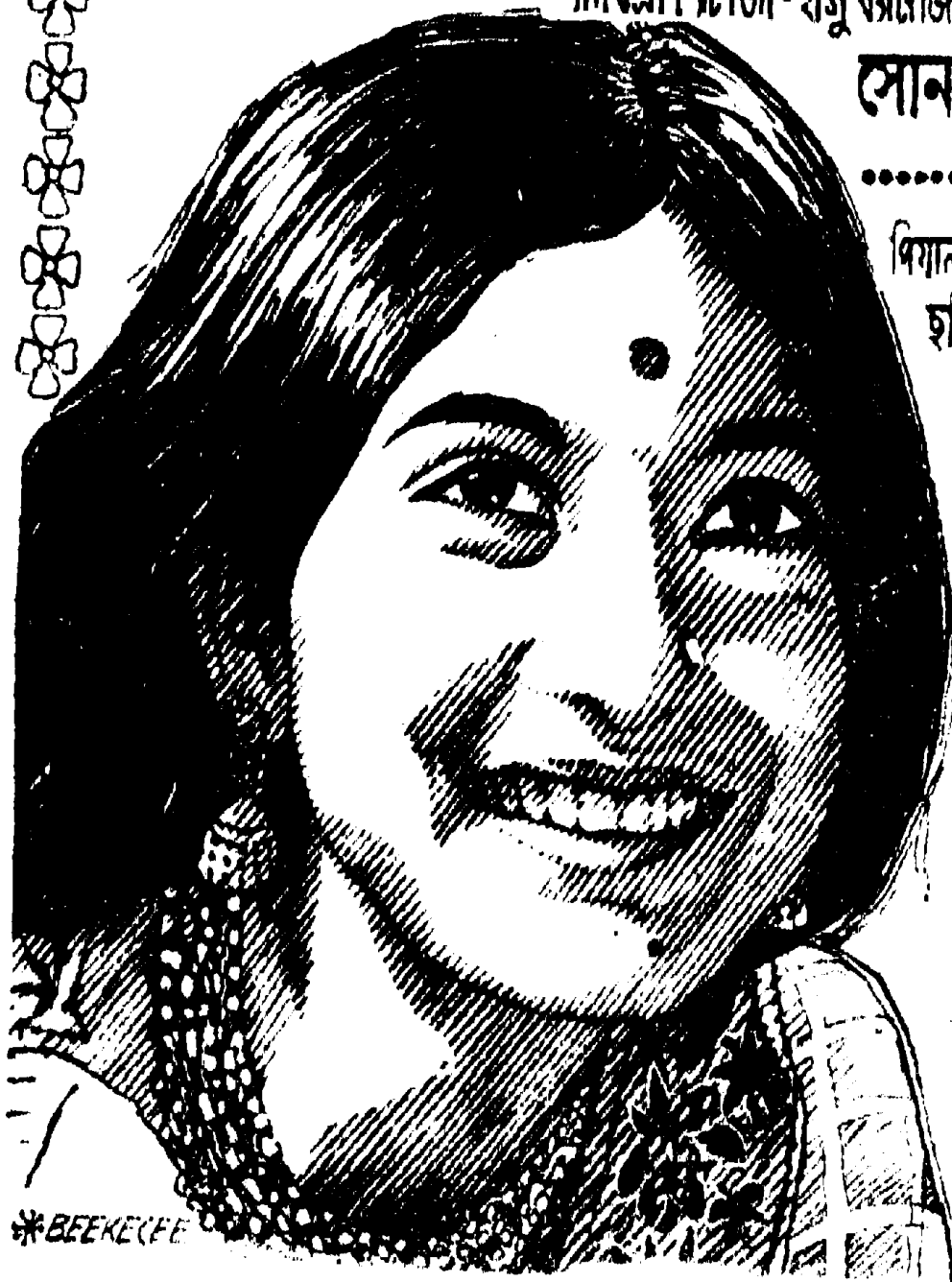
যখন মর্ণিং স্কুলে যেত, বিজন বাড়ি থেকে ডেকে নিত বেচুকে, বিজনের কি মনে পড়ে? মনে পড়ে বিজনের; মনে পড়ে ছোটবেলায় একদিন এই বেচুকে দেখে এমন কি মা পর্যন্ত বিজনের সামনেই বলেছিল, 'আহা, কী সুন্দর দেখতে রে তোর বন্ধু!' কিন্তু কেন বেচু এতদিন পরে তার সঙ্গে কথা বলছে, বলল যদি এসব বলছে কেন, বিজু বলে ডাকছে কেন—তবে কি তাহলে সকালের রক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কিছু? বেচুকে তার এত ভাল লাগছেই বা কেন, তার মধ্যে ভালবাসা হচ্ছে কেন, এমন ব্যাকুল! হঠাৎ একটা কথা মনে হল বিজনের। আরে, মর্ণিং-স্কুল তো গ্রীষ্মকালে হয়। অথচ এতক্ষণ মনে হচ্ছিল স্কুল যাবার সমস্ত পথটা শীতের কুয়াশায় ভর্তি। বস্তুত, শীতের ভোর ও কুয়াশাকে সে কিছুতেই আলাদা করতে পারছে না তার মর্ণিং স্কুলের পথ থেকে। আচ্ছা ভাল কথা, বিজুর কি মনে পড়ে যে মর্ণিং-স্কুলের পথে একটা দেবদারু গাছ ছিল, মনে পড়ে... মনে পড়ে...'মনে পড়ে কি বিজন, তোর?'

ড্রাইভারের পিছন সিট থেকে লম্বা ও বাঁকা নাকওয়ালা ওই রোগা লোকটা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে আছে, এইমাত্র তাকে দেখে ও চমকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিজন ভাবল। একটু ভাবতেই বুঝতে পারল, লোকটা দেখছিল।

লোকটা নামল কয়লাঘাট স্ট্রীটে, বিজনও নেমে পড়ল। নেমেই বলল, 'দেশলাই আছে?' লোকটার কাছে, আশ্চর্য, ছিলও। হাতের ফাঁকে পুরো কাঠিটা জ্বলে যাবার পর, নিভে যাবার আগে বিজন সিগারেটটা ধরাল ও ততক্ষণ ধরে ভ্রূদুটো নামিয়ে রেখে লোকটাকে দেখল। বিজনের গালটা চিনচিন করতে লাগল। গালের রুজ তুলতে ভুলে গিয়ে অন্যমনস্ক অভিনেতা থিয়েটার থেকে অনেক দূর চলে আসার পর যেমন বিব্রত বোধ করে, বিজন সেইরকম কমপ্লেকস বোধ করল।

লোকটা চৌরাস্তার মোড় অব্দি ক্রমশ ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল। একবারও ফিরে তাকাল না। লোকটা খোঁড়া নাকি?

বিজন ঠিক করেছিল, আজ রাত পর্যন্ত সারাদিনটা সে রেণুর বাড়িতেই কাটাবে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে অবিনাশ কবিরাজ লেনে ঢোকার মুখে তার যা-একটু লজ্জা করবে, এপাশ ওপাশ দেখে নেবে একবার। কিন্তু গলির ভিতর খানিকটা অগ্রসর হতে হতে ক্রমশ এবং ৪ নং বাড়ির চৌকাঠে পা দেবার আগে সে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ বোধ করবে। যেন, এই তৃতীয়বার সে এ বাড়িতে এল না, বহুদিন ধরে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, একতলায় কড়া নাড়াব আগে সে মনে করে নেবে ভেবেছিল যে, যেন নীপিসিমা বা সুকুমারের বাড়িতে ঢুকছে।

বিজন ভেবেছিল, রেণুকে না-জানিয়ে একেবারে বাজার করে নিয়ে ঢুকবে। রেণুর সামনে থলেটা উপুড় করে দিলে সে অবাক হয়ে বলবে, 'ওমা একী! বললেন না কেন, কত-কী আনতে বলতাম।' কত-কী কথাটার মানে তাহলে এইভাবে করে নেবে, বিজন ভেবেছিল যে, রেণু যেন, জানিয়ে গেলে, আলু-পটল কি মাংস-পেঁয়াজের সঙ্গে, বাজার থেকে, তাকে কয়েক গাছা কাচের চুড়ি কি একটা ভাল রুমাল বা দামি একটা সাবান আনতে বলত। রেণুকে, সে ভেবেছিল রাঁধতে বলবে, দুপুরে যে ঘন্টাখানেক রেণুর সঙ্গে শুয়ে থাকবে তার একটি মুহূর্তও অপব্যবহার করবে না, তারপর নিজে অল্প ঘুমিয়ে বা ঘুমন্ত রেণুকে ঘরে রেখে, তিনটে চারটে নাগাদ সে একবার অফিসে যাবে ঠিক করেছিল।

বিজন বারোটার আগেই অফিসে গেল। এর আগে তার কখনো লেট হয় নি, আজ পি-এ'র ঘরে গিয়ে সই করতে হল। হরিকান্তবাবু মোটাগোছের নন, বেশ রোগাই, কিন্তু বিশেষ নড়াচড়া করেন না। হরিকান্তবাবু চুলে কলপ মাখেন, মাথাটা পাকা তালের মত, লম্বা লম্বা মাথা-ভাঙা কানের ভেতর থেকে ঝুলে রয়েছে কয়েকগাছি চুল, যেন দুটো জামরুল গোঁজা দু'কানে—তাঁর মুখ লাবণ্যময়, চোখ ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া—আসলে, কৃতী ও তৃপ্ত মানুষগুলির মুখে যে একটা রগড় আছে, হরিকান্তবাবুকে না দেখলে তা বোঝা যায় না। চশমাটা কপালের ওপর তুলে দিয়ে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়েছিলেন। বিজন চলে আসছে, এমন সময় ফক-ফক করে বললেন, 'কী মশায়, দেরি হল?'

'এই, এমনি।' বিজন জানাল।

'কোনো বিপদ?' আবার ফক-ফক আওয়াজ শুনে বিজনের টেবিলের ওপর চোখ পড়ল। পেন-হোল্ডারে কানে সুড়সুড়ি দেবার পালক, তার পাশে একটা মোটা ফাইল রয়েছে টেবিলে; বেশ ভারি হবে, বিজনের মনে হল।

এসটাবলিশমেন্টের সুপ্রভাত কী-একটা ছুটিছাটার বিষয়ে ও একবার একটা স্ট্রিকচারের ব্যাপারে ওর পার্সোনাল-ফাইল খুব তাড়াতাড়ি মুভ করিয়ে দিয়েছিল বলে, তার জের টেনে সে বিজনের বন্ধু। বিজন তার পাশের সিটে বসে বলল, বোধ হয় তাকে ছুটি নিতে হবে, হয়ত তার কোনো গুরুতর অসুখ করেছে, বলে সে একটা গুরুতর অসুখের নাম করল।

'সে কি মশায়, তাহলে তো চাকরি যাবে।'

'কী!' বিজন ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে রইল। এত আহত সে বহুদিন বোধ করে নি। কী কথার কী উত্তর! সে নীরবে বলতে লাগল, আমার অসুখের নাম শুনে, হ্যাঁ খুব ছোঁয়াচে, ভয়ঙ্কর অসুখ, বাঁচব কি মরব ঠিক নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ কথাটা মনে হল আপনার! আমার যদি ওই অসুখই হয়ে থাকে, তাহলে চাকরি যাবে কি যাবে না......

'কী বলছেন?' বিজন জিজ্ঞাসা করল।

'না। বলছিলাম যে—' বিব্রতগলায় অথচ যেন সত্যি সত্যি বলছে, এমনভাবে সুপ্রভাত জানাল, 'মানে, ছুটি নিতে হবে তো অনেকদিন, উইদআউট-পে হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত, ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে তবে জয়েন করতে পারবেন, তারপর ধরুন না—'

বিজন অবিকল ওর দিকে একভাবে চেয়ে আছে দেখে, 'দূর মশায়, আপনার কিস্যু হয় নি, যত্তসব—হ্যাঁঃ—' 'দূর-মশায়'টা বেশ জোরের সঙ্গে এবং ভালবেসে 'কিস্যু হয় নি' উচ্চারণ করতে পেরে, পকেটে রুমাল খুঁজতে গিয়ে একটা সবুজ রঙের প্লাস্টিকের চিরুনি বের করে ফেলে, সুপ্রভাত চুল আঁচড়াতে শুরু করে দিল।

সাতের ডিভিশনে গিয়ে বিজন দেখল ঘরে কেউ নেই, তিনের ডিভিশনে চৌধুরী, প্রমোদবাবু, নিমাই ও রাসবিহারী, কেন কে জানে, আজ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। ডিভিশনাল ক্লার্ক প্রফুল্লবাবুকে ফিসফিস করে একজন বলছে, 'একটা উপায় করুন দাদা।' রাসবিহারী বলেছে, এবং বাকি সবাই সব বিষয়ে ওর সঙ্গে একমত হচ্ছে। অবশ্য, মধুসূদনের সনেট-সম্পর্কে ঈষৎ অমিল রয়েছে। কীটস এবং ফ্যানী ব্রাউনের প্রেম সম্পর্কে রাসবিহারী দু'কথা বলল, বুদ্ধদেবের অমুক কবিতা আসলে বোদলেয়ারের অনুবাদ, বলল, অপ্রত্যাশিতভাবে এলিয়ট-থেকে দু' লাইন কোট করল। ভুল, বিজনের না-পড়া থাকলেও সে বুঝতে পারল।

হঠাৎ বাইরে ইলেকট্রিক এঞ্জিনের তীব্র সিটি বেজে উঠল। রাসবিহারী বিজনের দিকে ফিরে বলল, 'এই যে! আচ্ছা, এই সিটি শুনলে আমার কী মনে হয় জানেন?'

'আপনার?'

'কী-রকম বলুন তো এই আওয়াজ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে বলতে হবে কিন্তু। ইশ, বলতে পারছেন না।' রাসবিহারী আপসোস করল, 'হোয়াট এ পিটি'

'কী?' বিজন জিজ্ঞাসা করল গলার স্বর না পাল্টে।

'ঠিক শাঁখের মত নয় কি?' রাসবিহারী তৃপ্ত হাসল, 'শুনলে মনে হয়, যন্ত্র যেন তার জয়ধ্বনি করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।'

'চলুন যাই।' একটা প্রশ্নবোধক হাসি হাসল রাসবিহারী, যেন বলছে, কেমন দিলাম। বিজন ও রাসবিহারী চা খেতে গেল।

রাসবিহারী সবসময়ই তার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলত, বিজন ভাবত নিউরোসিস শেষের দিকে সন্ধ্যাবেলার জ্বর ও ভোরবেলার বুকধড়ফড়ানির কথা বলতে গিয়ে এমন যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলত মুখে যে, বিজন ধরে নিয়েছিল, ও সত্যিই অসুস্থ। রাসবিহারী যখন এক মাস ছুটি নিল, বিজন ক্রমাগত ওর জন্যে সহানুভূতি বোধ করেছিল। আজ রাসবিহারী রেস্তরাঁয় বসেই 'সুস্থ আছি', 'নেভার ফেল্ট বেটার', 'বুঝলেন বিজনবাবু', ভোরে দুধ খান

পোরাটাক, আর সন্ধ্যেবেলা দুটো ডিম, তাহলেই দেখবেন—' বলে তারপর মেয়েদের স্তন পাছা ইত্যাদি নিয়ে নপুংসকের খিস্তি সুতরাং অশ্লীলতা করতে করতে, তারপর দুবার, 'জানেন আমি একটা সাঙ্ঘাতিক কাব্যনাট্য লিখব', জানিয়ে উত্তর না পেয়ে, "আমি কি কাব্যনাট্য লিখতে পারব না বলে মনে করেন—' জিজ্ঞাসা করায়, 'আপনি কোনদিন কিছু লেখেন নি ও ভবিষ্যতেও কিছু লিখতে পারবেন না' বিজনের এই অন্যমনস্ক ও উদাসীন উক্তিতে ধীরে ধীরে ক্ষেপে গিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে যথেষ্ট অপমান করল, অপমান করার সমস্ত সময়টা ধরে বিজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নির্বাক, শুধু এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, আমি কী ক্লীব, আমার কি আত্মসম্মান নেই এবং আমি কেন রেগে উঠছি না? অনেক আশা ছিল যে এইবার, এরপরেই সে রেগে উঠবে। একবার যদি দৈবক্রমেও রেগে যায়, তাহলে যদি কটূক্তির কথা ওঠে, বিজন জানে, তাকে চেষ্টা করতে হবে না, ভিভে নিপুণতম শব্দ তার এমনিই আসবে, ওর দুর্বলতম জায়গাতে আলপিনের পুরোটা ফুটিয়ে, চুপচাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে কুঁকড়ে বাদশার মত তারপর সে শুধু ওর কাৎরানি দেখবে।

আশ্চর্য হয়ে গেল বিজন, তার রাগ হল না। রাসবিহারী অবশ্য পরে নিজেই ক্ষমা চাইল, বুঝেছে সেসব দোষ ওর, ওর অসুস্থতার। বুঝতে পেরেছে, বলল যে, বিজন সত্যি সত্যিই তা বলতে চায় নি।

রাসবিহারী উঠে গেল বিজন রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বাইরে রাস্তায় অফিস-ফেরৎ জনতার ভিড়, এপারে শিবপুরের কাছে একটা অস্বাটে মুখের মত সূর্য ঝুলে রয়েছে।

বিজন রেস্তরায় বসে রইল। পাখাটার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মনে হল তার, আরে পাখার মুণ্ডটা যে এমন কারুকার্য-করা, এতদিন এসেছে, কই তার চোখে পড়ে নি তো। কেন সে দেখে নি এতদিন! বিজন বড্ড কষ্ট বোধ করল। কাল থেকে কতদিন আবার আসবে না, হয়ত কোনদিনই আসবে না আর, কেন সে আগে বহুদিন ধরে পাখাটা দেখে রাখে নি! ছেলেবেলা থেকে আয়নাই দেখেছে শুধু, কিছুই তার চোখে পড়ে নি, ব্যাধির কথা তার মনে পড়ে নি। নইলে কাঁসের ভুলে, কার ওপর অভিমানে, কাপের পর কাপ চা খেয়ে, সারারাত ধরে মদ খেয়ে একটা সিগারেট থেকে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে, স্বাস্থ্য খরচ করে করে—হ্যাঁ, অসুখটা তো সে নিজেই ডেকে এনেছে। অথচ তার মধ্যেও ব্যাধি রয়েছে অনিবার্য, এই বোধ সে কী করে বিস্মৃত হয়েছিল? তাহলে সে কাউকে ভালবাসে না, নিজেকেও না, পঁচিশ বছর বয়সের তার এই যন্ত্রণা কত মিথ্যা হয়ে যেত! বিজনের মনে হল, রাস্তা দিয়ে এই যে অফিস-ফেরৎ কেরানীরা যাচ্ছে হুড়মুড় করে, যারা ভুল জীবন কাটাচ্ছে, যাদের জীবনে আর কিছুই হবার নেই, যা কতকগুলি মাস পয়লা ও স্ত্রীর মেনস্ট্রুরেশনের মধ্যে খণ্ড খণ্ড একটা ব্যাপার—এই যে জীবন, এও কত গুরুত্বপূর্ণ যদি তা মৃত্যু সম্পর্কে চেতনার দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়। এইসব লোক, এরা প্রত্যেকে বীজের মত এক-একটা মৃত্যু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা প্রত্যেকটি লোক আলাদা, কারণ এদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে তার নিজস্ব এবং আলাদা আলাদা মৃত্যু, বিজনের ইচ্ছে হল সকলকে ডেকে ডেকে সে এই কথা বলে: হ্যাঁ নতুন কথা বৈকি, অনেকেই শুনলে অবাক হয়ে যাবে। কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারে, তুমি রক্তপ্রস্রাব করেছ, তুমি গুরুতর অসুস্থ, তুমি অস্বাভাবিক, তাই তুমি একথা বলছ। তাই কী? 'না', বিজনের ব্যথিত দুই চোখে তাকিয়ে বিস্ফারিত স্বরে সে বলে উঠল, 'তা নয়।' সে অতি সাধারণ মনের লোক ছিল বলেই জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে যা স্বাভাবিক, তা জানার জন্য এই অস্বাভাবিকতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যে-কোনো উপায়ে এ তার আগেই জানা উচিত ছিল। কিন্তু এখন, যখন সে জানে, তার অসুস্থতার জন্যই জানে, সে সকলকে তা জানাতে চায়। এদের সকলেরই তো অসুস্থতার আগেকার সেই অস্বাভাবিক অবস্থা, যখন সে তার প্রতিটি প্রশ্নের একটিরও উত্তর পায় নি! আজ একটির পেয়েছে। আজ সকালে বেচুকে ডেকে সে বলতে পারত, 'বেচু, তোর কি উচিত জানিস? তোর উচিত সবসময় চোখ নামিয়ে, নিচুগলায় আর হেঁটমুখে কথা বলা, যেমন, যখন তুই মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকিস। কী ডিগনিটি এই অসুস্থতার, জীবনের সঙ্গে তারই শুধু ক্ষমাহীন সম্পর্ক, মৃত্যুর কথা মনে রেখে, বেচু, তোর ঘুমঘোরে প্রতিটি কাজ করা উচিত।'

অথচ অন্যদিকে, বেঁচে থেকে পড়ন্ত আলোয় হাঁটাহাঁটি করছে এইসব নারী ও পুরুষ—এই শুধু-বেঁচে-থাকাটুকুই কত উপভোগ্যতায় কিন্তু সে যাই হোক, বিজনের চোখে তবু জল এসে গেল এই ভেবে যে, সে কেন দু-এক বছর ধরে এই রেস্তরাঁয় এই কারুকার্যকরা পাখাটার নিচে বসে রইল না, অন্তত বসে থেকে, চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে, বারবার শুধু-বেঁচে-থাকা লোকগুলোর সহসা-বিকেলবেলায় এই নীরব হাঁটাহাঁটি লক্ষ্য করে যেতে পারল না! চশমাটা খুলে ফেলে বিজন বারবার তার কাঁচ মুছতে লাগল।

রাস্তায় বেরিয়ে বিজন একটা ক্যাপস্টান কিনল। আজ সকাল থেকে সে সিগারেট খায় নি। কিনেই ভাবল, এহে, দুটো কিনলেই হত, মিছিমিছি এক নয়া-পয়সা গেল।[১] কিন্তু সিগারেটটা দাঁড়তে ঠেকাতেই এ কী হল বিজনের, রেণুর নগ্ন দেহটার জন্যে সে আপাদমস্তক কামনা বোধ করল।

একতলায় সিঁড়ির নিচে শেফালির মা শুয়েছিল। তিনতলায় উঠে যার সঙ্গে দেখা হল, কী নাম মনে পড়ার আগেই লোকটা, 'কী মোশা', কোত্তা ছিলেন এ্যাদ্দিন?' বলে ওঠায়, গলার স্বর শুনে বিজনের মনে পড়ল, ভদ্রলোকের নাম বর্মন। বর্মন বললে, 'পথ ভুলে নাকি?' বিজন বলল, 'না পথ চিনেই এলাম।'

এই ভরা সন্ধ্যেবেলায় বর্মন বাঁ-চোখ টিপে বললে, 'বেশ করেছেন। তারপর? রেণুর কাছে?'

'লোক আছে?'

'লোক? দেখুন গিয়ে!' রেলিঙে হাত রেখে বর্মন নিচে নামতে লাগল, 'কাল থেকে খিল মেরে পড়ে আছে। মাছের মত মাল খাচ্ছে মোশা', দুদিনে বোতলদশেক ওপরে গিয়েছে।' বর্মন তার নিরপরাধ মুখ ঘুরিয়ে জানাল, 'শেফালির কাছেই শুনেছিলাম।' বলতে বলতে বর্মন নিচে নেমে গেল।

বিজন ওপরে উঠতে লাগল।

ছাদের কোণে খাতুনের ঘরে আলো জ্বলছে। এদিকের ঘরটা রেণুর। দরজার, কই, খিল দেওয়া নেই তো। কলের নিচে চাকর গোপাল বাসন মাজছিল, বলল, 'মা ভেতরে আছেন।'

পর্দা তুলে ভেতরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে কোনো আলো জ্বলছিল না, একখণ্ড দেওয়ালের মত বিরাট আয়নাটার ওপাশেই, যেন রাস্তার আলোয় রেণু শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। রেণু ঘাড় ফিরিয়ে বিজনকে দেখল। ইশারা করে তাকে পাশে বসতে বলল। পাশে বসে বিজন ওর ওপর-হাতের সাপমুখো বলয়টা দেখতে লাগল। ধাবমান সাপের মত আঁকাবাঁকা ঠিকই, কিন্তু আজ কি বিজনের সবই অন্য রকম মনে হবে? বিজনের মনে হল, খুব উঁচু থেকে সে যেন একটা পাহাড়ী নদী দেখছে।

শব্দহীন ঘরে রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে তার চুল ও ঘাড় স্পর্শ করল, যেন সেখানে চুম্বন ছিল, যেন-বা জ্যোতি করছে। তখন, বিজন তার চুল ও

১। তখন দুটি ক্যাপস্টানের দাম ১৭ নয়া পয়সা ছিল।

ঘাড় স্পর্শ করতেই, হাউহাউ করে কেঁদে উঠল রেণু। উঠে বসে কোমর জড়িয়ে ধরল বিজনের। ওর বুকে মুখ ঘসড়াতে লাগল, কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। বিজন লম্বা ও প্রকাণ্ড আয়নাটায় তাদের দুজনের ছবি দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল রেণু?'

রেণু অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তারপর যখন মুখ তুলল, এলোচুলে, কান্নায় ফোলা, অশ্রু আর কফে ও মদের গন্ধে মাখামাখি —ওই মুখটাই তুলে ধরল। 'আচ্ছা, আমি কি চোর?' বলল, 'আমি কি চুরি করতে পারি?'

শায়ার দড়িটা দাঁতে চেপে দোতলার শেফালি ঘরে ঢুকে পড়েছিল। বিজনকে দেখে, 'ওমা', বলে তিড়িং করে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে, ফের শায়া পরেই ঘরে ঢুকে বলল, 'ওমা, আপনি! কার কাছে খপর পেলেন? বলুন তো একটু বুঝিয়ে, কী এমন হয়েছে বলুন না, যে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করতে হবে?' বাইরে মিনিট-খানেক ধরে রগড়ে মুখ থেকে কী তুলতে চেয়েছিল সে-ই জানে, শেফালি আয়নায় তার ছুলিধরা টকটকে মুখটা দেখতে লাগল। একবার চোখের একটা পাতা টেনে নামাল, দেখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আয়-নায় নিজের পেছনটা দেখতে দেখতে বলল, 'কী মালই খেতে পারিস বাবা!'

'আপনি তো ছিলেন সেদিন, দেখেছেন তো লোকটাকে?' জিজ্ঞেস করেই শেফালি সচকিত হয়ে উঠল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কীরে মীরা, তোর হল ভাই?'

বিজন লোকটাকে দেখেছিল বৈকি। তবে সপ্তাতিনেক আগের কথা, ভাল মনে নেই। লোকটা আসতে গোপাল বাইরে থেকে ডাকল, 'মা', ভয় ও উৎসাহে চমকে উঠে রেণু বলল, 'ওই! লোক এসেছে' দরজার কাছে উঠে গিয়ে গোপালকে বলে-ছিল, 'একটু দাঁড়াতে বল, ছাদে চেয়ারটা পেতে দে।' বিজনকে বলেছিল, 'নইলে, ফিরে যাবে। কত লোকসান খাব আপনা-দের জন্যে। খামকা বসে রইলেন, কথাবার্তা বললেন। এখন তাড়াতাড়ি নিন দেখি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিজন বলেছিল, না, আমি আজ যাই। আর একদিন আসব।' বিজনের অত্যধিক শান্ত স্বর শুনেই রেণু বলেছিল, 'কেন, নয় একটু দাঁড়াবে.' নইলে বলত না। বিজন সে-কথা শোনে নি।

দুজনের কেউই জামাকাপড় খোলে নি, রেণু নীল আলোটা নিবিয়ে নিয়ন জ্বালাল, খিল খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে. কিন্তু পর্দা তুলে বেরুতে যাবে বিজন, অপরিচিত লোকটা ওর দুকাঁধে দুহাত রেখে জড়িত স্বরে বলে উঠল. 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

বিজন দেখল একজন বুড়ো লোক। ভদ্রলোককে দেখে, কেন কে জানে, তার রাঁচির কথা মনে পড়ল। সে বলল, 'আমা-দের রাঁচিতে আলাপ হয়েছিল।'

'রাঁচিতে, রাঁচি হিলে, না? আরে, আসুন মশায়, যাচ্ছেন কোথায়, ও রেণু, এ যে আমাদের চেনা লোক হে। কদ্দিন আসছেন তোমার কাছে—'

ভদ্রলোক একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী, বিজন জানতে পারল। কিছু পরে মদ এল। শেফালিকে ডাকিয়ে আনা হলে, কষা মাংস এল। শেফালির সঙ্গে এল বর্মন। 'দুটো নইলে জমে?' হাড়ের নালি থেকে সকসক করে শাঁস টেনে নিলেন সরকারী কর্মচারী, বিজনের হয়ে সম্মতি-সূচক ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'চলে তো আপনার', শেফালি দ্বিতীয় চুমুকে মেরে দিয়ে ঠক করে গ্লাশটা ট্রে-র ওপর রেখে বলল, 'ফাঁক।' এমন সময় ঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বাজার সময় জুড়ে গম্ভীর ও সুরেলা গলায় দোর গোড়ায় ফুলওয়ালা হেঁকে উঠল, 'চাই বেলফুল উ-উ-উ-উল!'...

'অ্যা—অ্যাই! ঠিক ধরেছেন, এই লোকটাই। আপনি তো খানিক পরেই চলে গেলেন, অ্যাঁ? পরদিন মিনসে কী বলে জানেন? ওর নাকি পাঁচ-শো টাকা চুরি গেছে। ইকি কাণ্ড বলুন দেখি, অ্যাঁ?' শেফালি জানতে চাইল।

বিজনের গালটা ফের চিনচিন করতে লাগল। সেদিন রেণুর কাছ থেকে যাবার পর, বোধহয় পরদিন ভোরবেলা থেকে তার কোমরে একটা ব্যথা হয়. একটা বেল্ট থাকার জায়গা জুড়ে ব্যথাটা এখনো রয়েছে। বিজন বার-দুই কাশল, কাশির শব্দটা মন দিয়ে শুনতে গিয়ে সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কী-রকম অদ্ভুত কাশি হচ্ছে তার—কী অমানুষিক...

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে রেণু ওর গলা জড়িয়ে ধরল, 'আমি কি চোর, আপনি তো ছিলেন। আমাকে চুরি করতে আপনি দেখেছেন?'

বিজন চমকে উঠল, কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইল না কিছুতেই। এলোচুল, সিকনি আর চোখের জলে মাখামাখি চোকোগোছের একটা মুখ, চোখে লালের ছাট, চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কাজল, গা দিয়ে দিশি মদের গন্ধ ছাড়ছে ভুর-ভুর। ওর চোখের দিকে বিজন এখন তাকাবে না। না, বিজন অনুমানে বুঝল. ওর চোখে এখন প্রেতিনীর চাউনি।

'কী লো মীরা. তোর হল?' জানলা দিয়ে একতলার দিকে মুখ নামিয়ে শেফালি আবার চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বিজনের দিকে ফিরে. যেন কী গূঢ় মানে আছে কথাটার এমনভাবে হেসে বলল, 'যাই। চান করব।'

'আমাকে দুদিন হাজতে রাখল।' বিজনের বুকে মুখ রগড়াতে রগড়াতে ফোঁপাতে লাগল রেণু 'খিস্তি-খেউড় করল। বুক জ্বলে গেল, তবু মদ খেতে দিল না।'

'বড়বাবু আমাকে লাথি মারল' কোমর দেখিয়ে রেণু বলল, 'এইখানে।'

রেণু শুধু শায়া পরে ছিল। শায়াটা হাঁটুর ওপর উঠে গিয়েছে। একটা পায়ের উরু পর্যন্ত দেখা যায়। ব্লাউজের নিচের বোতামটা খোলা, রেণুর ঝোলা স্তন দেখা যাচ্ছিল, স্তনের বোঁটায় শ্বেতঅশ্রুর মত জমাট দুধ। রেণুর স্তন ও উরুর রঙ একই রকম, বিজন লক্ষ্য করে দেখল। ঘুমন্ত শশকের গায়ে যেন হাত রাখছে, বিজন ওর উরুতে হাত রাখল। সেদিন তাকে চলে যেতে হয়েছিল, আজ সুদে-আসলে উসুল করবে, এই জন্যেই তো সে এসেছে। এই নিয়ে তিন দিন এল, অথচ এখনও ওর ব্লাউজের সব কটি বোতাম সে খুলতে পারে নি। রাস্তার দড়ির আগুনে যখন সিগারেটটা ঠেকিয়েছিল, বিজন সেই মুহূর্তের মত উত্তেজিত হবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে গলাকাটা ছাগলের মুণ্ডটার মত ছটফট করছে রেণু। মাঝে মাঝে বলছে, 'ওরা নিক না। আমার আলমারি, ড্রেসিং টেবিল বিক্রী করে সব টাকা নিয়ে নিক।'

বিজনের গালটা গলাকাটা রক্ত লেগে লাল হয়ে উঠছে। সে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

'বলুন আপনি, কে চুরি করেছে?'

বিজন নিঃশব্দে ওর ব্লাউজের বোতামটা পরিয়ে দিল। গাল দুটো চিন-চিন করছে অসহ্য। জ্বর হয়েছে নাকি তার।

আচম্বিতে রেণু উঠে বসল ধড়মড়িয়ে, 'কে চুরি করল তা হলে? আপনি জানেন কে চুরি করেছে?'

প্রশ্ন দুটো যেন আঠা-লাগানো দুটো রুজের প্যাড, পটপট করে তার দু গালে সেঁটে দিল রেণু। আগুনের ঘর থেকে অন্ধ মানুষ যেমন করে প্রশ্ন করে, 'কী হল?' তেমনি ব্যাকুল হয়ে উঠে রেণু জিজ্ঞেস করল, 'কে চুরি করল?'

বিজন এবার রেণুর গালে হাত রাখল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে। দাঁতে-দাঁত চেপে বিজন বলল, 'না, তুমি চুরি করোনি।' কিন্তু তার গলা কেঁপে গেল কেন?

সেই কখন সন্ধের মুখে এসেছে বিজন, এখনো পর্যন্ত সে এই স্বরে কথা বলেনি। এই স্বর রেণুর বড় চেনা। সে টের পেল। টের পেয়েই আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নেবার চেষ্টা করল, তখুনি নড়েচড়ে শুল। হাসিও টেনে আনল ঠোঁটে। কিন্তু বিজন তা দেখতে পেল কৈ। তার চোয়াল নড়ছে, শক্ত হয়ে যাচ্ছে মুখটা, যেন রেণুর মুখটাই কাঁপছে থর-থর করে, বিজনের দু হাতের দশটা আঙুল রেণুর গালের ওপর চেপে বসে যেতে লাগল...

বিজনের ম্লান দুই চোখে সে রেণুর দিকে তাকায়।

এই মুখ, হ্যাঁ, কান্নায় ফোলা, চোখের কোল দিয়ে গলে পড়ছে রাতের নিষ্প্রভ কাজল, সিকনি আর চোখের মাখামাখি এলোচুলের ঠিক এই মুখটাই সে আগে

কথনো দেখেছে কি? বিজন অনুভব করল, সে দেখেছে, কিন্তু কোথায়! মনে করার আকুল ইচ্ছায় বিজন উন্মুখ হয়ে উঠল, দেখতে দেখতে দূরে থেকে দুলতে-দুলতে এগিয়ে-আসা একটা ঢেউয়ের মত ছুটে এল স্মৃতি, বিজনের সমস্ত অস্তিত্বকে নিয়ে কেঁপে উঠে, তারপর খুবই কাছে তা ভেঙে পড়ল। কিছুতেই মনে পড়ল না, কিন্তু বিজন বুঝতে পারল, বড় ভয়ঙ্কর সেই স্মৃতি।

অথচ, বেশি দূরে নয়, ঘরের অন্ধকার থেকে ভেসে উঠছে ঠোঁট দুটি, কাছেই কাঁপছে। এখনো গ্লাস, গন্ধের শিশি, আলমারিতে শূন্য বোতল, কাঁচি, পাপোশ, বৃষ্টি শেষের পিচের রাস্তায় ঠিকরানো গ্যাসের আলোর মত কালো আয়নার একটা অংশ, তাতে জল ভর্তি গ্লাস, তাতে ভিজে বেলফুল, পাপোশ, তাতে গন্ধের শিশি ও আলমারিতে শূন্য বোতল, নীল সাপ লতা ও পদ্ম-আঁকা একটা চীনা ফুলদানি, এইসব দেখা যাচ্ছে। একটু পরে ঠোঁট দুটিই শুধু ভাসবে, আর সব ডুবে যাবে। ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে, অন্ধকার রঙের একটা তুলি বুলিয়ে বারবার লাল করে দিচ্ছে ঠোঁট দুটি, যেন দুটো ফুলের পাপড়ি, কী ফুল, নিমজ্জমান ব্যাকুলতায় বিজন প্রাণ-পণে স্মৃতি হাতড়াতে লাগল। খুব জানা ফুল, কী নাম যেন ফুলটার, অথবা, হঠাৎ মনে হল বিজনের, এ যেন একটা লাল ফড়িং বসে রয়েছে ঠোঁটে, দু আঙুলে এখুনি চেপে ধরলে যার ধুলোমাখা পাখনা দুটি ঘন ঘন শিউরে উঠবে।

নাঃ মনে মনে বিজন চিৎকার করে উঠল, না আ! ভালবাসে না, ভালবাসা-নেই এমন দুটি ঠোঁটে সে চুমু খাবে কেমন করে। বুক খালি বিজন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আঃ! 'কী গরম', রেণু বলল।

বিজনের চোখের সামনে একে একে গন্ধের শিশি, আয়না, শূন্য বোতল, ফুল-দানি, গ্লাস, কাঁচি, পাপোশ, গ্লাসে বেল-ফুল, এইসব ভেসে উঠতে লাগল। ফুল-গুলো বাসি, বিজন দেখল। বিবর্ণ হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'সেই ফুল, সেদিনের?' বোধহয় তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয়নি ভয়ে, দুহাতে ওর বুকে মৃদু ঠেলা দিয়ে চাপা কামনা-কাতর গলায় রেণু বলল, 'একটু সবুর করলে না, আঃ!' হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিই?'

নীল আলোটা জ্বালিয়ে, বুকটা এমন টান করে চিতিয়ে দাঁড়াল সে যে, বডিজের স্ট্র্যাপে সেলাই ছেঁড়ার আওয়াজ শুনতে পেল বিজন। সমস্ত চুল খুলে ফেলে টান করে বাঁধতে লাগল রেণু, রেণু ব্লাউজের প্রথম বোতামটায় হাত রাখল।

এই প্রথম বিজন ওর আঙুলের নড়া-চড়া লক্ষ্য করল। আঙুলে মরা মাংস, বুড়ো কাকাতুয়ার মত বাঁকা, চামড়া ঢাকা গাঁট-গুলো কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, রেণুর ন্যোকড়ো বিজন দেখতে পেল-না।

না!' আততায়ী ছুরি হাতে সামনে এসে দাঁড়ালে যেমন হয়, বিজনের সেই রকম, স্বপ্নের সেই বদ্ধমূল ভয় হল। তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না, তার বুকে পাথর...

'কী হল আবার!' রেণু জিজ্ঞেস করল।

'না।' বিজন বলল।

'আপনি খুলে দেবেন?' নিতম্বটা অর্ধেক ঘুরিয়ে যেন শরীরটাকে উথলে দিয়ে দারুণ কটাক্ষ করে রেণু জিজ্ঞেস করল, 'দেবেন নাকি? খুলে?'

সহসা বিজন ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্পটা জেলে দিল। তিন সপ্তাহ আগের না-পাল্টানো উল্টে-যাওয়া ফুলদানীর জলের মত ভারি আলোয় ঘর ভরে গেল। বেশ্যা-পাটির মাঝখানে উজ্জ্বল আলোর এই ঘর, ঘরের মাঝখানে পুরু গদীর বিছানা, দেয়াল জুড়ে আয়না, দেওয়ালে ঝুলন্ত ঈশ্বরের ছবি, সব কিছুর মাঝখানে পুরুষানুক্রমে বেশ্যা রেণুকে দেখে বিজন এবার চিনতে পারল।

'না।' হাতের মুঠো শক্ত করে রেখে বিজন বলল, 'আমি যাব।'

'সে কী!' রেণু বলল, সন্দেহের হাসি হেসে।

'এই নাও টাকা।' বিজন ওর দীর্ঘ, কঙ্কালসার হাতটা রেণুর দিকে বাড়িয়ে দিল। মুঠি খুলে ধরল।

আর এক মুহূর্ত দেরি হলে কড়া নড়ে উঠত, দরজাটা দুহাট করে খুলে ফেলতেই অকস্মাৎ সর্বাঙ্গ বিদ্যুতে ঝলসে গেল বিজনের, সে আর চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াতে পারল না, দু হাতে পাল্লা দুটো দেওয়ালের সঙ্গে ঠেলে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যেন, অপ্রত্যাশিত কিছু নয় তবু। বাসের সেই খোঁড়া লোকটা। গোড়ালির কাছে দু পা মুড়ে, দেয়ালে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে, ভ্রূঅবধি নামানো ফেল্টের টুপি, লম্বাটে মুখের থুতনিটা বুকের কাছাকাছি, এখন তার গায়ে একটা ভারি ওয়াটারপ্রুফ। সপসপে ওয়াটারপ্রুফটার দিকে চেয়ে চেয়ে বিজন ক্রমশ বৃষ্টির শব্দ পেল, তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, সোঁ-সোঁ করে হাওয়া চালাচ্ছে বেশ, বিজনের বাঁ-গালে বৃষ্টির উড়ন্ত একটা ঝাপটা এসে লাগল।

লোকটা চুরোট খাচ্ছে। চুরোটের আগুনে মৃত লোকের স্ট্যাচুর মত ওর মুখের বাঁ-দিকটা বারবার প্রতিভাত হচ্ছে, বিজন ওর জীবন্ত চোখের দিকে চাইল। লোকটা চোখ ফিরিয়ে নিল না, দেখার সুযোগ দিল, ওর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। মাটিতে পোঁতা একটা পোক্ত দেবদারুর মত বিজনও দাঁড়িয়ে রইল ওর চোখে চোখ রেখে, মুখোমুখি, শুধু তার শেকড় ভয়ে সড়সড় করতে লাগল। রাস্তায় একটা কুকুর ডাকল। আর একবার ডাকল। লোকটা দুবার কাশল। কাশিটা অমানুষিক, অনেকটা ছাগলের কাশির মত, বিজন শুনেই বুঝতে পারল, ঠিক এই রকম কাশিই সে আজ সারাদিন কাশছে এবং কোনো সুস্থ লোক এভাবে কাশে না। লোকটার স্থির চাউনি বিজনের ভিতরে গিয়ে পড়লে সে ভীতভাবে হাসল।

একতলার বাথরুম থেকে শেফালির সাবান কে মেখে গেছে? ক্ষয়ে গেছে তার সাবান। 'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ.' ঘৃণায় শেফালি থুতু ছিটোচ্ছে উত্তরে, দক্ষিণে, চতুর্দিকে। 'এ কী প্রবৃত্তি!' শেফালি চাঁচাচ্ছে তারস্বরে। শেফালি থুতু ছিটোচ্ছে. 'ছিঃ ছিঃ', বিজন রাস্তা থেকেও শুনতে পেল!

সেইদিন রাত্রে বিজন একটা স্বপ্ন দেখল। ছেলেবেলায়, মা মারা যাবার পর ভোরবেলা, বাবার সঙ্গে সে পুরী বেড়াতে গেছে। সে দেখল, উত্তাল সমুদ্র থেকে ঢেউ আসছে একটার-পর-একটা, শব্দ হচ্ছে না। অধিকাংশ স্বপ্নের আকাশ যেমন থাকে, মেঘলা, সূর্যোদয়ের আগের এক ফালি ঘন লাল আলো এক জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ হয়ে; ওখানে জলতলে ঘুরন্ত বিশাল শৃঙ্খলের লোহা জেগে উঠছে মরিচার রঙ, স্বপ্নে বিজন বুঝতে পারল।...

ওদিকে দিগন্তে সূর্য উঠল লাফ দিয়ে, দূরে দেশলাই-কাঠির মত একটা নৌকো লাট খেয়ে পড়ল তার ভেতর, নৌকোসমেত এখন বনবন করে ঘুরছে, একটা ফেনময় ঢেউ কাছে এসে বিজনের পায়ে পড়ল। পায়ের পাতা ভিজিয়ে সরসর করে সরে যাচ্ছে জল, এ কী, বিজনের পা ডুবে গেছে একরাশ বেলফুলে. ভীষণ, সুড়সুড়ি লাগছে তার, বিজন ফিক করে হেসে ফেলল।......

বিজন দেখল তার গলায় একটা বেল্ট। বেল্ট তো? হ্যাঁ বেল্ট। বোধনের আগের দিন ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে সারা রাত, বিজন লাল হ্যাফ প্যান্ট ও বুক পকেটে সোডার ছাপি-আঁটা একটা সবুজ সেলুলার শার্ট পরে পূজামণ্ডপে ঢুকল। স্বপ্নে বিজনের মনে পড়ল, তার ছেলে-বেলার কোনো ফোটো নেই, বা ঐ-রকম দেখতে ছিল নাকি তাকে? স্বপ্নে যেমন হয়, বিজনের একবার মনে হল, সে কি স্বপ্ন দেখছে?

শূন্য মণ্ডপ। ভারি পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বিজন প্রতিমা দেখছে। প্রতিমা? পিছনে রাত্রির একটা সীন টাঙানো, চিত্রকর যাতে চাঁদ আঁকেনি। রাত্রির ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে প্রতিমার ডাকসাজ, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র রঙটা শরীরের এখানে-ওখানে মাংস-কাদা খোবলানো এখনো অস্ত্র দেওয়া হয়নি, দশ হাতের প্রত্যেকটি মুঠি কুষ্ঠরোগিণীর মত অসম্ভব রুড়, বিজন দেখল, একটা ভ্রূ নেই। চোখের কোল বেয়ে তারার কালো গড়িয়ে পড়ছে চুলের মধ্য দিয়ে গর্জন তেলের সঙ্গে গড়িয়ে এসে সিঁথির সিঁদুর লাল রক্তে ঢেকে ফেলছে মুখমণ্ডল। পিতলের

প্রদীপের বুক জুড়ে এখন চড়চড় করে জলতে পুড়ে যাচ্ছে। প্যান্টটা এক হাতে টেনে তুলে, অন্য হাতে বিজন তার প্রিয় সবুজ সেলুলার জামাটার গায়ে হাত বোলাল। সোডার ছিপিটা স্পর্শ করে দেখল।......

অন্ধকার; একটা সিঁড়ি. বিজন উঠছে। গলায় দুলছে বেল্ট, বিজন ছুঁয়ে দেখল, সেই ছেলেবেলার বেল্ট। স্বপ্নের মধ্যে সে অস্বস্তি বোধ করল। বিজন একটা লম্বা করিডরে পা দিল। দু দিকের উঁচু দেওয়ালে সারি-সারি ও মুখোমুখি দরজা। দরজাগুলোর সামনে এক চিলতে করে আলো। বিজন দেখল করিডোরটা অন্ধকার, তবে মাঝে-মাঝে আলোগুলিও তাকে পেরোতে হবে। বিজন দেওয়াল ধরে অগ্রসর হল। উঁচুতে একটা জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে, 'রেণুর ঘরে যাচ্ছেন?' বলেই ফটাস করে শেফালি জানালাটা বন্ধ করে দিল। এর পর বিজন যত এগিয়ে যাচ্ছে ভয়হীন, দরজায়-দরজায় মীরা, বাসন্তী, খাতুন, চামেলি, ওরা সব ভীত সরীসৃপের মত চমকানো মুখগুলি গর্তে ঢুকিয়ে নিচ্ছে লহমায়. বিজনের পিছনের আলো-গুলি একে-একে নিবে যাচ্ছে। রেণুর ঘরের সুদূরে দরজাটার সামনে পৌঁছে হাতখানেক আগে থমকে দাঁড়িয়ে বিজন পিছন ফিরে দেখল করিডোরটা এবার ডুবে গেছে ঘন ও নিরেট অন্ধকারে। অন্ধকারে—না. বিজন নিজে দপ করে নিবে গেল, করিডোরটা আর নেই। তা হলে! সে ফিরবে কী করে?

রেণুর ঘরে সরকারী কর্মচারী বিজনকে দেখে হৈ-হৈ করে উঠল। শেফালি গ্লাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে বলল, 'ফাঁক!' এমন সময় বাইরে গম্ভীর ও সুরেলা গলা শোনা গেল, 'চাই বেল-ফু-উ-উ-উল!'

ঘড়িতে আটটা বাজল। রেণু সরকারী কর্মচারীকে ফুল কিনতে বলল। যদিও দেওয়ালের ওপাশে, শেফালি ফুলেঅলার কাছে কমিশন নিচ্ছে, বিজন দেখতে পেল। শুকনো মুখ, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি. কব্জিভর্তি গোড়ের মালা, হাতে বেলকুঁড়ির মুকুট রজনীগন্ধা, কয়েকটা ব্র্যাকপ্রিন্স— আরে ঐ লোকটা ফুলঅলা! চৌরিঙ্গিতে দাঁড়িয়ে এই লোকটা মাঝে-মাঝে মাজন বিক্রী করে না? বিজন বেশ অবাক হয়ে গেল। সরকারী কর্মচারী রেণুর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ঘুরে পড়ে গেল বিছানায়। বিজন দেখল ওর ব্যাগ থেকে ঝুলে রয়েছে গোছা-গোছা নোট। বিজন বালিশের তলা থেকে ব্যাগটা বের করল। তখন, মাথার সুদীর্ঘ চুল একবার খুলে, তারপর তুলে, টান করে বাঁধতে-বাঁধতে রেণু চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান! দাঁড়াও—এই দেখ—' দু হাতে বুকে এমন চাপড় মারতে লাগল রেণু যে, বিজনের মনে হল, সে বুঝি তার বুক দু ফাঁক করে ফেড়ে ফেলে তাকে কিছু দেখাতে চায়। তার বদলে, রেণু পটপট করে ব্লাউজের সব কটা বোতাম খুলে ফেলল। আঁতকে উঠে বিজন দেখল. রেণুর বুকে কাকাতুয়ার নোখের মত কর্কশ, বাঁকা ভয়ঙ্কর কয়েকগাছি চুল!

রেণু রাক্ষসীর মত ওষ্ঠহীন হাসল।

স্বপ্নের ভয় জাগরণের চেয়ে অনেক বেশি। মানিব্যাগটা কোথায়. ডান পকেটে. বাঁ-পকেটে? দু হাতে বুক চেপে ধরে আতঙ্কের বর্ণনার মত বিজন রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল।......

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। রামাধার সেলাম করল। দু-তিনটে ফাঁকা হল পেরিয়ে বিজন ঢুকল বড়বাবুর ঘরে। বড়-বাবু নিঃশব্দে তার হাতে ভারি ও মোটা পার্সোনাল ফাইলটা তুলে দিলেন। বিজন ওল্টাতে-ওল্টাতে দেখল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ফাইলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা এবার জি এম-এর কাছে সই হবার জন্যে যাবে।

অফিসে এত দিন ধরে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে, অথচ সে তা জানতে পারে না! শুঁড়-বের-করা দুটো মুখোমুখি পিঁপড়ে যেমন করে পরস্পর কথাবার্তা বলে, পি-এ ও বিজনের মধ্যে সেই রকম কথাবার্তা হতে লাগল। বিজন বলল, 'আমাকে সাবধান করে দেন নি আপনি?'

বিজন দেখল, বাঁ-দিকে মার্জিনে লেখা, 'পি-এ টু জি-এম থ্রু প্রপার চ্যানেল' ও কয়েক পৃষ্ঠার পর ওপরে লাল কালিতে লেখা হেডিং, নিচে বিবরণ :—

পৃ.	৪১	আইটেম	নং	২০	সিসিল বারে একাকী মদ্যপান ও	তার	বিস্তৃত	বিবরণ	তাং
						"	"	"	"
পৃ.	১১০	"	"	৫২	ঐ				
পৃ.	৫৪	"	"	২৭	কোবাল্ট রুম থেকে পলায়ন : বন্ধু হিরন্ময়ের অসুখের জন্য অপারেটেড হতে আপত্তি	"	"	"	"
পৃ.	৮১	"	"	৩৮	১৯-৬-৫৮ থেকে ১৯-৬-৫৯ পর্যন্ত ১৫০০ ফাইল গ্রহণ ও ২৫০টি প্রত্যার্পণ	"	"	"	"
পৃ.	৯৮	"	"	৪৩	মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নতজানু রমণীকে টেনে তুলে উপর্যুপরি চুম্বন	"	"	"	"
পৃ.	১৮৯	"	"	৮৯	বাবা ও আরো ২০ জনের মুখ ম্লান করে দেওয়া	"	"	"	"
						"	"	"	"
পৃ.	১৪৫	"	"	৭২	বৌদির সঙ্গে অবৈধ ও গোপন প্রণয়	"	"	"	"
পৃ.	১৭৩	"	"	৮০	সিসিল বারে একাকী মদ্যপান				

এখানে পি-এ বললেন '২০০ পৃষ্ঠা দেখুন'। পাতা উল্টে বিজন দেখল, পাতা জুড়ে লাল কালির হেডিং : আইটেম নং ৯২; সোনাগাছিতে রেণুর গৃহে রাত্রি-যাপন তাং ২রা সেপ্টেম্বার...। বিজনের দম বন্ধ হয়ে এল, সে বিস্তৃত বিবরণ পড়তে লাগল।

ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর-পর তার হৃৎপিণ্ডে শব্দ হয়। ঘরে অন্য কোনো শব্দ নেই, ঘরের চারপাশে আহত কুকুরের মত রাত্রি ঘুরছে প্রভুভক্ত. গোল ঘড়িটা সময়ের এ-ঘরে ও-ঘরে হাত রাখছে ঠিক-ঠিক, মাথার ওপর দাঁড়ে-বাঁধা ব্যাঙের মত পাখাটা ঝুলছে হাত-পা ছড়িয়ে। পড়তে-পড়তে দম আটকে গেল বিজনের, বুক ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে, বিজন আইটেম নং ৯২ পড়ে শেষ করল। 'নাঃ, সেকথা নেই, সেকথা কেউ জানে না...' এই বলে, বুক খালি করে এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে, যে, ফাইলের অনেকগুলি পাতা উড়ে গেল ফরফর করে। বিজন দেখল :

* পৃ. ১ আইটেম নং ১ লাল পিঁপড়ের গর্তে খোঁচা দিয়ে, তার মধ্যে একটি জীবন্ত কেঁচো নিক্ষেপ ও তার বিস্তৃত বিবরণ তাং ১৯।৬।৩৯

বিজন মূক হয়ে গেল। বিজন এইবার টের পেল কী ভয়াবহ ও ব্যাপক এদের অনুসন্ধান! সে বলতে চাইল, 'এ তো আমার ছেলেবেলার ঘটনা। এ আপনারা জানলেন কী করে?' কিন্তু বলার আগে বিজন আবার ভয় পেল, স্বপ্নের সেই ভয়, জাগরণের চেয়ে যা অনেক বেশি। বিজন দেখল, পি-এ টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়েছেন। টেবিলে নীলসাপ লতা ও পদ্ম-আঁকা রেশমের ঘরের সেই ফুলদানিটা তাতে সুদীর্ঘ রজনীগন্ধা আর তার ঠিক পাশে, দেখে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার উপক্রম হল বিজনের, মুখ থেকে খুলে-রাখা পি-এর দু পাটি দাঁত তার লাল-লাল মাড়ি সমেত! পোড়া রবারের গন্ধ ছাড়ছে তা থেকে।...।

বিজন আবার প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। ছুটতে-ছুটতে ফের সেই সমুদ্রের ধারে এসে হাজির হল। বিজন দেখল, অদ্ভুত অবস্থা। রাস্তা পর্যন্ত জল উঠে এসেছে, সমুদ্রের ওপারের প্রবাস থেকে হাওয়া আসছে হা-হা. হোটেলের দরজা-জানালা-গুলি বন্ধ, অদূরে হাড়-পাঁজরের মত একটা নারকেল পাতা টাঙানো। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। বিজন জানতে পারল, কে যেন বলেই গেল তাকে, 'আজ সাইক্লোনের আবহাওয়া।' ফ্ল্যাগ স্টাফের কাছে একটা খুঁটি পোঁতা দেখল, তাতে লেখা :

> **বিপদ !**
> অদ্য কেহ সমুদ্রে স্নান করিবেন না।

জনহীন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা দিয়ে গোড়ালি অবধি জলস্রোত ভেঙে ছপছপ শব্দ তুলে বিজন পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল। কি বিশাল এই অন্ধকার, এরকম ছায়াবিহীন অন্ধকার বিজন আগে কখনো দেখেনি। অথচ একটা আভাও রয়েছে তার কারণ বিজন পথঘাট সবই দেখতে পাচ্ছে। একটু আগে মিউনিসিপ্যালিটির নোটিশও সে পড়তে পেরেছিল।

উড়ন্ত জলকণায় ভর্তি হাওয়া চালাচ্ছে উল্টোদিক থেকে, বিজন অন্ধকারের স্রোত ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল। এক জায়গায় যেমন মঞ্চের মাঝখানে ঘুরিয়ে ফেলা গোল আলো, সেখানে একটা জেটি। জেটির ওপর দাঁড়িয়েও, জেটি কোথা থেকে এল, বিজন বুঝতে পারল না। সমুদ্রে জেটি থাকে কি?

ভিজে বালি উঠছে চকচকিয়ে, পায়ের পাতা তখনও সরসর করছে, ফসফরাস-গুলো জ্বলছে নিবছে। জল সরে যাবার পর বিজন দেখল, পায়ের কাছে কয়েকটি লাল পাপড়ি পড়ে রয়েছে। বিজন উঁচুতে রাস্তার দিকে তাকাল। শ্মশানটা দেখা যাচ্ছে না, কোন মৃতদাহের আলো নেই, কিন্তু দেবদারু গাছটার চেহারা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট এক ঝাঁক জোনাকি চক্রের মত ঘুরছে তাকে ঘিরে, তাতে আরো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে—যেন ভীষণ-দর্শন একটা ডোম দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানে।

বিজন গলায় হাত দিল। বেল্ট, হ্যাঁ, বেল্ট-ই তো। সে হেঁট হয়ে পাপড়িকটি কুড়োতে গেল। কালো লাল হয়ে গেল যেমন, তেমনি রঙ পাপড়িগুলির। এ যে খুবই চেনা ফুলের পাপড়ি, ব্ল্যাক প্রিন্স, বিজনের মনে পড়ে গেল, খুব হত তার মায়ের হাতে, প্রায় কনুই-অব্দি সোনার চুড়ি-ভর্তি, শাঁখের মত শাদা, ভারি মিষ্টি গোলাপ ফোটাবার হাত ছিল মায়ের।

পাপড়িগুলি হাতে নিয়ে বিজন চোখ বুজল। চোখ বুজতেই এ কী হল তার! পায়ের নিচে বিপুল একটা অন্তঃস্রোতের টান অনুভব করল বিজন, অমাবস্যার ছায়াবিহীন অন্ধকার অতর্কিতে তার ছদ্মবেশ খুলে দাঁড়াল একটা গোটা সমুদ্রের চেহারা নিয়ে, ওপারে শ্মশানে দেবদারু-সমান ডোমের গলায় জোনাকির মালা দুলছে মুহুর্মুহু, চূর্ণ হবার মুহূর্তটা নিয়ে ফেঁপে উঠল যে বিশাল ঢেউ, বিজনের চাউনিসুদ্ধ সাড়হীন দেহটা তার ভিতরে চিৎ হয়ে ঢুকে যেতে যেতে দেখল [illegible] থেকে ছিটকে পড়ছে লম্বা লম্বা বেঁকে-যাওয়া ফেণা, বিদ্যুচ্চমকের শেষ চৈতন্য-টুকু দিয়ে বিজন দেখল ঢেউ-এর গায়ে ডোরাকাটা দাগ তার কষে ফেণা। সম্পূর্ণ নেবার আগে সকলকেই যেমন দেখায় সমুদ্র বিজনকেও তার সেই বিশাল থাবার লম্বা ও বেঁকে-যাওয়া ক্ষমাহীন নোখগুলি একবার দেখাল ও লুকিয়ে ফেলল।

আগে থেকে এনগেজমেণ্ট করে, পরদিন বিকেলে বিজন একজন স্পেশালিস্টের কাছে গেল। স্পেশালিস্ট প্রথমে প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে কাগজপত্র পরীক্ষা করে, তারপর সাঁড়াশির মত স্টেথিসকোপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন যে, বিজনের অতি গুরুতর অসুখ হয়েছে, এর কোনো ওষুধ নেই, এর কোনো চিকিৎসা হয় না; কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে এর ওষুধ বেরিয়ে যেতে পারে, এইজন্যে যতদিন সম্ভব বেশি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, তিনি এখুনি বিজনের চিকিৎসা শুরু করবেন। বিজনের ততদিন বেঁচে থাকা দরকার।

বাঘ

প্রফুল্ল রায়

কোথায় চান্দা জেলা, আর কোথায় রত্নগিরি।

রত্নগিরি বললে সঠিক বলা হয় না। বলা উচিত নোনপুরো।

নোনপুরো কার্পাস চাষীদের দরিদ্র একখানা গ্রাম। ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক, অনেক দূরে রত্নগিরি জেলার শেষপ্রান্তে মানুষের এই বসতিটা প্রায় আত্মগোপন করে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এখানকার বাসিন্দারা অজ্ঞাতবাস করতে ভালবাসে।

অন্য সব বছরের মত এবারও নোনপুরোয় এল ঘনুরাম। চান্দা জেলা থেকে বেরিয়ে প্রথম লাইট মারহাট্টা রেলে কিছুটা পথ এসেছে সে। তারপর শুরু হয়েছে হাঁটা; উত্তরায়ণের সূর্য মাথায় নিয়ে অবিশ্রান্ত চলা। হাঁটতে হাঁটতে কোণাকুণি পশ্চিমঘাট পাড়ি দিয়ে অবশেষে সেই নোনপুরোয় পৌঁছুনো গেছে।

মাসটা মাঘ। অর্থাৎ পঞ্চম ঋতু শীত এখন মধ্যপ্রহরে। নিয়ম অনুযায়ী সমারোহ করে হিম এবং কুয়াশা নামার কথা। উত্তুরে বাতাসের সওয়ার হয়ে একটা উদ্দাম ক্ষ্যাপামির দিগ্বিদিকে দাপাদাপি করে বেড়ানোও উচিত ছিল।

কিন্তু জগতের আর যেখানে যা খুশি চলুক, মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তে কিন্তু বিপরীত রীতি। এখানে হিম নাই, কুয়াশাও না। উত্তুরে বাতাসটাকেও কেউ বুঝি খাপে পুরে খাপটার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। আকাশময় এখনও, সেই মাঘে, টুকরো টুকরো ইতস্তত মেঘ ছড়ানো। আষাঢ়-শ্রাবণের পর কতদিন কতমাস কত প্রহরই তো পার হয়ে গেছে, তবু রত্নগিরি জেলা বর্ষাকে বুঝি প্রাণ ধরে বিদায় দিতে পারে নি; আকাশ জুড়ে আষাঢ়-শ্রাবণের স্মৃতি সে সাজিয়ে রেখেছে।

পাঁচ বছর ধরে শীতের মাঝামাঝি এই সময়টায় চান্দা থেকে নোনপুরোয় আসছে ঘনুরাম। এই সময়টায় সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয় গণপতি উৎসব। গণেশ পুজোর আয়োজন করেনি, এমন একটি বাড়িও এখন এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গণপতি পুজো মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসব। উৎসবটা চলে দিন দশেক ধরে কিন্তু সেটা ঘিরে যে মত্ততা, যে উদ্দীপনা তার মেয়াদ মাসখানেক। সেই মত্ততার ঢেউ রত্নগিরির সুদূর অভ্যন্তরে কার্পাস চাষীদের স্তিমিত নগণ্য গ্রামখানাতেও এসে লাগে। উচ্ছ্বসিত দুর্বার এক স্রোতে নোনপুরো তখন ভেসে যায়।

গণপতি-উৎসবের সময় প্রতি বছর ঘনুরাম যে নোনপুরোয় আসে সেটা অকারণে নয়। নোনপুরোয় এসে বাঘ সাজে সে। গণেশ পুজোয় বাঘ সাজা মহারাষ্ট্রের লৌকিক নীতি।

বাঘের সাজ গায়ে নিয়ে আর প্রকাণ্ড লেজ বাগিয়ে কার্পাস চাষীদের দুয়ারে দুয়ারে এ সময় ঘনুরাম নেচে বেড়ায়। সে যেখানে যায় সেখানেই সাড়া পড়ে যায়। বাঘের সং দেখবার জন্য ঘরের বার বাচ্চারা, কিশোরীরা, বয়স্ক প্রাচীনেরা, জোয়ানেরা, নবযুবতীরা — সবাই হুড়মুড় করে ছুটে আসে। মুহূর্তে তাকে ঘিরে ধরে সমস্বরে চারিদিক মুখর করে তোলে, 'ওয়াম আলো—ওয়াম আলো'—অর্থাৎ বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে।

এই পার্বণের দিনে ঘনুরাম এসে বাঘ সেজে নেচে নেচে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া নিয়ে যাবে, সে জন্য নোনপুরো গ্রামখানা সারা বছর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

ঘনুরামও তাদের নিরাশ করে না; বাঘ-নাচের সঙ্গে গানও জুড়ে দেয়:

'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া,
পুড়চ্ছি বরষি লৌকের য়্যা।'

অর্থাৎ হে সিদ্ধিদাতা গণেশ, আগামী বছর আরো তাড়াতাড়ি এসো। ইত্যাদি ইত্যাদি—নাচগানের ফলশ্রুতি খুব একটা খারাপ হয় না; বরং তা উৎসাহজনকই। নোনপুরোর মানুষ গরীব হতে পারে কিন্তু হৃদয় তাদের দরিদ্র নয়। যার যা সাধ্য, অক্লেশে হাসিমুখে তাই তারা ঘনুরামের ঝুলিতে ঢেলে দেয়। একমাস এখানে কাটিয়ে ঘনুরাম আবার যখন চান্দা জেলায় ফিরে যায়, তখন তার প্রাপ্তির তালিকা খুব একটা ছোট মাপের হয় না। খানচারেক নতুন ধুতি, নগদ দশ বারোটা টাকা, মণ দেড়েকের মত চাল, অজস্র চুট্টা (বিড়ির মত নেশার জিনিস), কিছু কার্পাস তুলো এবং আরো টুকিটাকি অনেক কিছুই তার ঝোলাটিকে ভরে তোলে।

জগতে ঘনুরাম একা। চারখানা ধুতিতে বেশ ভালোভাবেই কেটে যায়। চুট্টাও তার কিনতে হয় না। মণ দেড়েকের মত যে চাল মেলে তাতে তিনটে মাস সে নিশ্চিত, বাকি 'ন' মাসের জীবন তাহার একেবারেই অনিশ্চিত। জীবিকার জন্য ঘনুরামকে এই সময় চান্দা জেলায় নানা ভূমিকায় দেখা যায়। এ সময় কখনও সে ভূমিহীন কৃষাণ, কখনও সে মালটানা কুলী, কখনও তাকে পি ডব্লু-ডির রাস্তা বানাতে দেখা যায়। কখনও সম্পন্ন গৃহস্থের মোষ চরায় সে, কখনও বৈশাখে শুষ্ক দগ্ধ দিনে পাহাড়ী ঝরনা থেকে মহাজনদের জন্য বাঁক ভরে জল নিয়ে আসে। আবার কখন নিখাদ বেকার সে।

এত করেও কারো মন পায় না ঘনুরাম। খিস্তি, গালাগালি এবং মারও প্রায়ই ন্যায্য মার হিসাবে জোটে। এত করেও বাকি ন' মাসের জীবনে ঘনুরাম নিশ্চয়তা আনতে পারে না। কাজেই সমস্ত বছর অন্তত তিনটে মাসেরও নিরাপত্তার জন্য সে যে গণপতি-উৎসবের সময় নোনপুরোয় ছুটে আসবে, এর মধ্যে বিস্ময়ের অবকাশ নেই।

তিন মাসের খোরাকি আর সারা বছরের আচ্ছাদন—এর জন্য তো বটেই; অন্য আকর্ষণে ছুটে আসে ঘনুরাম। সেই আকর্ষণটার কেন্দ্রে বসে আছে রতি। পাঁচ বছর ধরে রতিদের বাড়িতে উঠেছে সে। গণপতি-উৎসবের একটামাস ওখানেই কাটিয়ে যায় ঘনুরাম।

সারাটা বছর রত্নগিরির এই অজ্ঞাতবাস থেকে সে যেন অবিরত হাতছানি দিতে থাকে মেয়েটা। আর হৃৎপিণ্ডের কোন অদৃশ্য শিকড়ে বুঝি টান পড়ে ঘনুরামের। এগারটা মাস কোন রকমে

কাটিয়ে বছরের শেষে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে নোনপুরায় চলে আসে সে।

এছাড়া আরো একটা কারণ আছে। নিজের দীপ্তিহীন, অর্ধাহারা, অনাহার এবং অগৌরবের জীবনে এই একটা মাসই যা কিছু মর্যাদা পায় ঘনুরাম। নোনপুরার মানুষ বাঘের সং দেখেই শুধু আনন্দ পায় না, তাকে দুর্লভ এক অগৌরবের সিংহাসনে বসিয়েছে। বাঘের সাজ গায়ে না থাকলেও সবাই, বিশেষত যুবতী মেয়েরা তার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে ফিস্ ফিস্ গুঞ্জনে মেতে উঠত। প্রাচীনেরা এক বৎসর উৎসব শেষ হতে না হতেই পরের বছর আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। যে মানুষকে জগতের কোথাও কেউ ডাকে না, খোঁজে না, চান্দা জেলার সেই ঘনুরাম নোনপুরার মানুষের কাছে পরম বিস্ময়ের মত।

যাই হোক এবার নোনপুরায় এসে যখন ঘনুরাম পৌঁছুলো সূর্য তখন আকাশের মধ্যবিন্দুতে। মাথায় একটা জীর্ণ টিনের বাক্স। সেটার ভেতর তার যাবতীয় মূলধন। মূলধন বলিতে ভুষো-কালি, পিঙ্গল আর হলুদ রঙ, লোমশ টুপি, বাঘের মত দাঁত, নখ, গোঁফ, লেজ, কিছু খড়, প্রচুর ন্যাকড়া, বাখারি, আঠা, তার এবং খানকয়েক লোহার ক্লিপ। এসব বাঘ সাজার সরঞ্জাম। তাছাড়া জামা কাপড় আছে, বিছানা আছে। একটা মাস থাকতে হবে। তাই চাল, ডাল, আটা মরিচ, মশলা ইত্যাদি আনতে হয়েছে।

মাথার উপর দুপুরের সূর্য; পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। তাছাড়া ক'টা দিন সমানে পশ্চিমঘাটের চড়াই-উতরাই ভেঙেছে। অতএব কোথাও দাঁড়াল না ঘনুরাম। শ্রান্ত শরীর নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে যে রাস্তাটা সোজা দক্ষিণ-গামিনী হয়েছে সেটা ধরে এগিয়ে চলল। আপাতত তিনটে জিনিস ভয়ানকভাবে প্রয়োজন। প্রথমে স্নান, তারপর খাদ্য, অবশেষে বিকেল পর্যন্ত টানা একখানা ঘুম।

গ্রামটা আধা-পাহাড়ী, আধা-সমতল। চারিদিকে ছড়ানো বাড়িগুলো জায়গাটার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই যেন মাথা তুলেছে। পশ্চিমঘাটের চাঁই-চাঁই পাথর কেটে সেগুলো তৈরী; মাথার ওপর অবশ্য তাদের ভাঙ্গাচোরা টিন। অথবা ইনুঘাসের ছাউনি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অর্ধপশু-গঠন আদিম মানুষদের ঘানির দুর্গবিশেষ।

নোনপুরার দক্ষিণ প্রান্তে সর্বশেষ যে টিলাটি তার মাথায় শিবল নায়েকের বাড়ি। শিবলেরই মেয়ে রতি। সরাসরি সেখানে চলে ঘনুরাম।

শিবলকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। সামনের দিকে যে বারান্দা তার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুটা ফুঁকছিল। বয়স্ক প্রাচীন একখানা পাথর দিয়ে তার বিশাল দেহটির যেন সৃষ্টি। পৃথিবীতে অনেক কাল থেকে আছে শিবল। বহু বছরের ঝড়, বৃষ্টি, দুর্যোগ তার শরীরে অসংখ্য ক্ষত ধরিয়েছে। মাথার চুল তার ধূসর; চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। শরীরময় এত যে ধ্বংস তবু মনে হয় এই লোকটির কোথায় যেন একটা অটুট কাঠিন্য আছে।

ঘনুরামকে দেখা মাত্র চুটা ফেলে শিবল ছুটে এল। রীতিমত সরবে এবং সাদরে অভ্যর্থনা জানাল সে, 'আরে এসো এসো, সংএসো'—বলে ধরাধরি করে ঘনুরামের মাথা থেকে সেই প্রকান্ড টিনের বাক্সটা বারান্দায় এনে নামাল, তারপর দুজনে মুখোমুখি বসল।

শিবল আবার বলল, 'কেমন আছ সং?'

বাঘের সং সাজে ঘনুরাম। সেহেতু এ গ্রামের সবাই তাকে 'সং' বলে ডাকে। এই 'সং' সম্ভাষণটা লঘু অথবা ব্যঙ্গার্থে নয়, রীতিমত গৌরবার্থেই।

ঘনুরাম উত্তর দিল, ভালই আছি। তোমরা কেমন আছ?

তোমরা বলতে শিবল আর রতি। শিবলের সংসারে ঐ এক মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই। না একটা ছেলে, না আর একটা মেয়ে। বউটাও দশ-বারো বছর আগে জ্বরে মারা গেছে।

শিবল বলল, 'একরকম কেটে যাচ্ছে আমাদের। তা এবার কিন্তু আসতে কিছু দেরি করে ফেলেছ সং।'

পুজোর এখনও দিনকয়েক দেরি। তবে গ্রামের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে নিজের চোখেই ঘনুরাম দেখেছে। ইতিমধ্যে উৎসবের কিছু ঘোর লেগে গেছে। শিবল তার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। শিবলের ইচ্ছা, উৎসবের মাতামাতি আরম্ভ হবার আগে ঘনুরাম নোনপুরায় আসুক এবং যত বেশী পরিমাণে পারে এখানকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে পার্বণী আদায় করে নিক। মাতামাতি যতদিন চলবে ততদিনই মানুষের মন থাকবে দরাজ আর বেহিসেবী। এক পয়সার জায়গায় তিন পয়সা ঢেলে দিতে তাদের হাত কাঁপবে না। কিন্তু উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়িলেই বিপদ। দরিদ্র কার্পাস চাষীরা তখন হাত গুটিয়ে নেবে। দুটো পয়সা গেঁজে থেকে বার করতে পাঁচবার ভাববে, দশবার করবে হিসেব। সামনের একপা এগিয়ে পিছু হটবে তিন যোজন। মোট কথা লোহা গরম থাকতে থাকতে সেটাকে পিটিয়ে কাজ গুছিয়ে নাও। শিবলের হিসেব সোজা। তার মতে সুযোগের সদ্ব্যবহার একেবারে প্রথম থেকেই করতে হবে।

ঘনুরাম বলল, 'হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল।'

শিবলের সঙ্গে কথা বলছে বটে ঘনুরাম, কিন্তু তা যেন খানিকটা দূর-মনস্কের মত। নিজের অজ্ঞাতসারে তার চোখ দুটি চারিদিকে চনমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের তকতকে উঠানে, দূরে কুয়োর পারে, পিপুল গাছের তলায় এক-চালা রান্নাঘরটায় কিংবা বারান্দার সংলগ্ন পাশাপাশি দুটো শোবার ঘরে—কোথাও, কোথাও রতিকে আবিষ্কার করা গেল না। অন্য বছর ঘনুরাম বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মেয়েটা ছুটে আসে। অপরিসীম খুশিতে তার চোখমুখ চকচক করতে থাকে যেন। অকারণ হাসিতে, অবারিত উচ্ছ্বাসে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আর অবিরত অজস্র কথা বলে ঘনুরামের চারপাশের দুরন্ত ঢল নামিয়ে দেয় সে। আর সেই ঢলে একবারে ভেসে যায় ঘনুরাম।

অতর্কিতে ঘনুরামের ভাবনার ওপর দিয়ে একটা সম্ভাবনা ছায়া ফেলল। এক বছর পর পর সে নোনপুরায় আসে। এর মধ্যে রতির বিয়ে হয়ে যায় নি তো। শিবলের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। তার আগে শিবলই বলে উঠল, 'চান করবে তো?'

ঘনুরাম বলল 'করব বৈকি। চারদিন সমানে হেঁটে আসছি! রাতে ঘুম নেই। গা-হাত-পা জ্বালা করছে। চান না করতে পারলে মারা যাব।'

শিবল আর কিছু বলল না। ঘর থেকে তেল আর গামছা বার করে ঘনুরামের সামনে রাখল।

কুয়োর জলে শরীরের দাহ এবং শ্রান্তি অনেকখানি জুড়িয়ে ঘনুরাম আবার যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল বারান্দায় সেই বাক্সটা নেই। শিবল সেটা ঘরে নিয়ে রেখেছে।

শিবলের বাড়িতে মোট দুখানি ঘর। প্রতি বছর গণপতি-উৎসবের সময়টা শিবল আর রতি এক ঘরে থাকে। দ্বিতীয় ঘরখানা ছেড়ে দেয় ঘনুরামকে।

যাই হোক ভেজা কাপড় ছেড়ে বাক্স খুলে শুকনো ধুতি পরল ঘনুরাম। আর সেই সময় শিবল বলল, 'চল, তোমাকে ভাত দিই। এতখানি পথ হেঁটে এসেছো। খেয়ে-দেয়ে ভালো করে জিরোও।'

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ঘনুরাম বলল, 'কিন্তু'— একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেই সে থামল।

'কী?'

'চাল-ডাল কিছুই দিলাম না—'

প্রতি বছর এখানে থাকেই শুধু ঘনুরাম। খোরাকি তার নিজের। অবশ্য রতি তার রান্নার দায়িত্ব নেয়। শিবল বলে উঠল, 'ওবেলা থেকে চাল-ডাল দিও। এখন এসো দিকি—'

যেতে গিয়েও ইতস্তত করল ঘনুরাম। আর সেই সময় রতির কথা আবার মনে পড়ল। আগেরবার পারেনি, এবার কিন্তু সে বলেই ফেলল, 'আচ্ছা, তোমার মেয়েকে তো দেখছি না—' 'ওর কথা আর বলো না সং। আজ পাঁচ-ছ'টা দিন ধরে ও কি আর বাড়িতে থাকে! ঘরের কাজটুকু কোন রকমে সেরে উত্তরের টিলায় ছোটে, সারাদিন তো সেখানেই পড়ে আছে। আর মেয়েটাকেই বা কি বলব, সমস্ত গ্রামটা তো ওখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে।'

একটা ব্যাপারে অন্তত আশ্বস্ত হওয়া গেল। রতি নোনপুরাতেই আছে এবং তার বিয়ে হয়নি। উৎসুক সুরে ঘনুরাম জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার; উত্তরের টিলায় সবাই ছুটেছে কেন?'

শিবল বলল, 'আরে তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। উত্তরের টিলায় একটা বাঘ এসেছে যে—'

কথাটা বুঝতে পারল না ঘনুরাম। বিমূঢ়ের মত শিবলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কোনরকমে বলতে পারল, 'বাঘ!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বাঘ, জ্যান্ত চিতাবাঘ।' শিবল বলতে লাগল শম্ভা বলে একটা ছোকরা সেই সাতারা জেলা থেকে পেল্লায় এক খাঁচায় পুরে ওটাকে নিয়ে এসেছে। দিন পাঁচ-ছয় শম্ভা আমাদের এখানে এসেছে। তার ভেতরই সারা গ্রামটাকে মাত করে ফেলেছে।'

ঘনুরাম কি বলবে, ভেবে পেল না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সমস্ত হৃৎপিন্ড ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগল যেন।

শিবল কি ভেবে আবার বলল, 'সে যাক গে, তুমি এখন খেতে এসো সং—'।

বিচিত্র এক অস্থিরতার মধ্যে শিবলের পিছু পিছু রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসল ঘনুরাম। খাওয়ার আয়োজন সামান্যই। ভাত, উচ্ছে আর বেগুন দিয়ে ভাজি খানিকটা হলদে রঙের আমতি (টকের ডাল) এবং আগুনে স্যাঁকা পাঁপড়।

ঘনুরাম লক্ষ্য করল, মাত্র একজনের মত ভাত-তরকারি বেড়ে নিয়েছে শিবল। বলল, 'এ কি, আমি একাই খাব নাকি?'

'হ্যাঁ।' শিবল মাথা নাড়ল, 'মেয়েটা নে· খেয়েই ছুটেছে। ও ফিরে আসুক; তখন খাব। ওকে ফেলে এখন খাই কি করে বল?'

হঠাৎ একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল ঘনুরাম। কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'তোমাদের দুজনের মত তো রান্না হয়েছে। আমি খেলে—'

ঘনুরামের মনোভাব যেন বুঝতে পারল শিবল। হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমরা না খেয়ে থাকব না। আজকাল দুবেলার রান্না সকাল বেলাতেই রেঁধে রাখছে রতি। তুমি খেলে কি আর হবে! ওবেলা আবার না হয় চাট্টি ফুটিয়ে নেবে।'

এরপর আর কিছু বলল না ঘনুরাম। ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে অন্যমনস্কের মত মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। একটু আগেও পেটের ভেতর গনগনে খিদে ছিল; এখন সেটা একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। শুধু উত্তরের টিলা, একটা চিতাবাঘ আর শম্ভা নামে সাতারা জেলার অজানা-অচেনা আগন্তুক তার সমস্ত অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেই সময় ছুটতে ছুটতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তরের টিলা থেকে রতি ফিরে এল। বিদ্যুৎ চমকের মত কি যেন একটা তীব্র খরস্রোতে ঘনুরামের রক্তের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল।

আগের বছর; আগের কেন গত পাঁচ বছর ধরে ঘনুরাম যেমন দেখছে হুবহু সেই রকম আছে রতি। কালো রং মেয়ে। কালো বললে সব বলা হয় না। তার গা থেকে তীক্ষ্ণ এক দ্যুতি যেমন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মনে হয় মেয়েটা সর্বাঙ্গে ঘাম-তেলা মেখে আছে। আদিবাসিনী মেয়েদের মত উদ্দাম অজস্র স্বাস্থ্য তার। নাক-মুখ বেশ টানা-টানা, তীক্ষ্ণ, হাতে রুপোর কাঙনা, নিটোল গলাটি বেষ্টন করে রুপোর বিছে হার। কালো দেহে রুপোর ছটা রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছে যেন।

মুঠোর ভেতর বেড় পাওয়া রতির কোমরখানি এমনই সরু। কোমরের নীচের দিকে বিশাল অববাহিকা; ওপর দিকে সে উদ্ধত। হলুদ রঙের ওপর কালো কালো ছাপগুলো একটা শাড়ি তার দেহটিকে সাপটে ধরে রয়েছে। মেয়েটা যেন কালো ময়ূরী। চোখের দৃষ্টিতে তার ঘোর লাগা; তার মধ্য থেকে কৌতুকের খানিকটা দীপ্তিও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ছুটতে ছুটতে এসে রান্না-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল রতি। চোখে-মুখে এই মুহূর্তে উত্তেজনা জ্বলছে। বুকটা দ্রুত তালে ওঠানামা করছে। শিবলের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল 'বাঘটা কি সুন্দর বাবা; পেংলা পেংলা রং। তার ওপর কালো কালো গোল গোল ছাপ। চোখদুটো কাঁচের মতন! ল্যাজটা—'

শিবল সস্নেহে হাসল, 'বুঝেছি, বুঝেছি। বাঘ তো নয় একবারে রাজকন্যা।'

'আরে শোনই না—' অসহিষ্ণু সুরে রতি বলতে লাগল, 'ল্যাজটা প্রকান্ড—'

বাধা দিয়ে শিবল বলল, 'শুনেছি বাপু শুনেছি। এই পাঁচ ছ'দিন ধরে কতবার তো এক কথা বললি। বাঘটার এমন চোখ, অমন নাক, তেমন ল্যাজ। শুনতে শুনতে একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছি। ঐ বাঘ, বাঘ করে তো খিদে-তেষ্টা বিসর্জন দিয়ে বসে আছ, যাও চান করে এসো—'

রতি চলে যাচ্ছিল। শিবল তাকে ডেকে থামাল 'আরে শোন্, শোন্ এই রতি! দ্যাখ কে এসেছে—'

রতি ফিরে দাঁড়াল। উত্তেজনার ঝোঁকে আগে সে লক্ষ্য করেনি। এবার দেখল রান্না-ঘরের এক কোণে বসেছে ঘনুরাম। চোখ বড় বড় করে রতি বলল, 'ওমা সং যে; কখন এসেছ?'

নির্জীব সুরে ঘনুরাম বলল, 'এই খানিকটা আগে।'

'তুমি যে এখানে বসে খাচ্ছ তা খেয়ালই করি নি।'

'খেয়াল না করবারই কথা। বাঘের গল্প নিয়ে তুমি মেতে ছিলে—'নতুন উদ্যমে রতি বলল, 'তুমিই বল, অমন চমৎকার বাঘ—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না রতি। তার আগেই শিবল তাড়া দিয়ে উঠল, 'আবার বাঘের গল্প জুড়লি! গেলি চান করতে গেলি—'

রতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পরে তোমাকে বাঘের কথা বলব সং।' বলেই ছুটে পালাল।

সর্বাঙ্গে অসীম শ্রান্তি; বিছানায় শরীর সঁপে দিলে ঘুমের আরকে ডুবে যাবার কথা। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। বুকের ভেতর একটা কাঁটা যেন বিঁধে আছে। কাঁটাটা যে কোথায়, হৃৎপিন্ডের ঠিক মাঝখানে অথবা ধমনীর পাশে কিংবা অন্য কোথাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেটা যে আছে, নিদারুণ এবং অস্বস্তির মধ্যে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছন্ন এবং অস্থির ঘনুরাম ঘুম এবং না-ঘুমের মাঝামাঝি একটা জায়গায় পড়ে রইল।

শুয়ে শুয়ে একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, কোনরকমে চান খাওয়া সেরেই আবার উত্তরের টিলায় ছুট লাগিয়েছে রতি। রতির এই পরিবর্তন ঘনুরামর প্রাণের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে বাঁকিয়েচুরিয়ে কেমন যেন ডেলা পাকিয়ে দিতে লাগল।

অথচ—অথচ অন্য সব বছরে ঘনুরাম এখানে এলে তার সঙ্গ আর ছাড়তে চায় না রতি। কি এক ঘোরে সর্বক্ষণ তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। আশ্চর্য, আজ তার সম্বন্ধে যেন বিন্দুমাত্র কৌতূহলও নেই মেয়েটার। আদৌ না ঘুমিয়ে ঘনুরাম যখন বিছানা থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে বসল তখন আকাশের কোথাও সূর্যটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ঘনুরামের ইচ্ছা ছিল, আজই ঘুম থেকে উঠে বাঘ সেজে গ্রামে বেরুবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাঘ সাজার মত সামান্য উৎসাহটুকুও নিজের প্রাণের কোন প্রান্তেই বুঝি অবশিষ্ট নেই। নিজেকে উদ্যমহীন নিরুৎসাহ এক জড়পিন্ডের মত মনে হচ্ছে। শিবল বাড়িতে নেই আর রতি ও সেই উত্তরের টিলায়। বারান্দায় বসে প্রায় শূন্যচোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ঘনুরাম।

বেশিক্ষণ অবশ্য বসে থাকতে হল না। সন্ধ্যের কিছু আগে আগেই রতি ফিরে এল। ঘনুরামকে বসে থাকতে দেখে বলল, 'আমি যখন বেরুই তখন তুমি ঘুমুচ্ছ। তা কখন উঠলে?'

'এই একটু আগে?' ঘনুরাম বলল।

'অন্য বছর যেদিন আসো সেদিনই তো বাঘ সেজে বেরিয়ে পড়, কই এবার তো বেরুলে না?'

'কালই বেরুব ভাবছি।'

'কেন শরীর খারাপ নাকি?'

না, 'তেমন কিছু নয়।'

রতি আর জিজ্ঞাসা করল না। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। লম্বা পায়ে ঘরের ভিতর চলে গেল সে, তারপর ঘরে ঘরে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে আবার ঘনুরামের কাছে এল। দু-একটা সাধারণ কথার পর আবার বাঘের প্রসঙ্গে চলে গেল সে। জ্বলজ্বলে চোখে শুরু করল, 'বাঘটা যেমন সুন্দর, তার খেলোয়াড়টাও তেমনি।'

ঘনুরাম চকিত হয়ে উঠল, 'খেলো-য়াড়টা আবার কে?'

'ঐ বাঘ যার সে। নাম শম্ভা। গায়ের রঙ টকটকে, লম্বা-চাওড়া চেহারা, পাকানো গোঁফ, বাবরি চুল। বাঘের খাঁচায় ঢুকে সে যখন খেলা দেখায় বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সত্যিকারের একটা পুরুষমানুষ। ব্যাটাছেলে এমন হলেই মানায়।' বলতে বলতে রতির গলার স্বর

আবেগে কাঁপতে লাগল। চোখের তারা দুটো কেমন যেন আকৃষ্ট।

শম্ভা নামে অপরিচিত বাঘের খেলোয়াড়টির রূপ, গুণ এবং গৌরবের স্তুতি শুনতে শুনতে আর রতির চোখমুখের চেহারা দেখতে দেখতে চোখ জ্বালা করতে লাগল ঘনুরামের। জ্বরের রুগীর মত কপালের দুপাশে দুটো রগ সমানে লাফাচ্ছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে।

রতি অবাক। বাঘ এবং শম্ভা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস থামিয়ে বলল, 'কি হল সং। উঠে পড়লে যে।'

'মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। যাই আরেকটু শুয়ে থাকি গে।'

রতিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের ঘরটিতে চলে গেল ঘনুরাম। শরীর আর মন যত নিরুদ্যম হয়েই পড়ুক তবু পরেরদিন সকালে ঘনুরামকে বেরুতে হল। তিন তিনটে মাসের নিরাপত্তা। তার ওপর সমস্ত বৎসরের আচ্ছাদনের প্রশ্নও আছে।

একেবারে বাঘ সেজে বেরুল ঘনুরাম। প্রথমেই সে গেল দক্ষিণপাড়ায়।

অন্য সব বছর সে আসা মাত্র সাড়া পড়ে যেত। ঘরসংসার ফেলে সবাই বেরিয়ে আসত বাহিরে। তার পিছু পিছু একটা জমজমাট ভিড় আর মৌচাকের মত ভনভনানি সর্বক্ষণ লেগে থাকত।

এবার কিন্তু ঘনুরামকে নিয়ে কেহ মাতল না। তাকে ঘিরে অন্য অন্যবার উদ্দীপনার যে ঢল নামে, এবছর তার ছিটেফোঁটাও নেই।

তবু দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে গলার স্বর সপ্তমে তুলে সেই গানটা গাইতে লাগত ঘনুরাম, 'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া, পুড়ছা বরষি লৌকর এ্যায়।' এত জোরে গাওয়ার উদ্দেশ্য : নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করা।

ঘনুরামকে দেখে যে দু'চারজন ঘে বেরিয়ে না এল, তা নয়। কিন্তু তাদের চোখে মুখে অভ্যর্থনা নাই, অন্তরঙ্গতার কোন উত্তাপই অনুভব করতে পারল না।

অন্য বছর এ গ্রামের বাসিন্দারা নিজে থেকেই ছুটে আসে। তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়; কৃতার্থ বোধ করে। এবার কেউ কাছে এল না দেখে উপযাচকের মত ঘনুরামই এগিয়ে এল। গান থামিয়ে মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এবারও এলাম তোমাদের গ্রামে—'

লোকগুলো বলল, 'আসবে বৈকি—' বলল বটে কিন্তু তার মধ্যে আন্তরিকতার সুর বাজল না।

দু-চার বাড়ি ঘুরে ভাওজীদের উঠানে এসে দাঁড়াতেই ভাওজীর জোয়ান ছেলেটা বলে উঠল, 'এবার আর নকল বাঘের নাচ আমরা দেখব না। আসল বাঘ এসেছে। তার খেলা দেখব।'

পাঁচ বছর ধরে নোনপুরায় আসছে ঘনুরাম। এ গ্রামের সবাইকে সে চেনে। নামও জানে। ভাওজীর ছেলের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আসলা বাঘ, নকল বাঘ —কী বলছ যশোবন্ত!'

যশোবন্ত বলল, 'তুমি হলে নকল বাঘ। ন্যাকড়া-খড়-কালি-ঝুলি দিয়ে সাজো। আর আসল বাঘ আছে উত্তরের টিলায়—'

অর্থাৎ সেই শম্ভা আর চিতাবাঘ। ঘনুরামের ধমনীতে রক্তস্রোত যেন থেমে যেতে লাগল।

যাই হোক, সূর্যকে পশ্চিম আকাশের দেউড়ি-পার করিয়ে সারাদিন পর অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে ঘনুরাম যখন ফিরে এল তখন তার ঝুলিতে মোটে পাঁচটা পয়সা আর পোয়া দেড়েকের মত চাল। পরেরদিন ঘনুরাম গেল পূব পাড়ায়, তার পরের দিন উত্তর পাড়ায়, অবশেষে পশ্চিম পাড়ায়। যেখানেই সে যায় সেখানেই এক অবস্থা। এ বছর কেউ তাকে কাছে টানার জন্য একখানা হাতও বাড়িয়ে রাখে নি। উত্তাপহীন নিস্পৃহ অভ্যর্থনা ছাড়া কোথাও কিছু জোটে না। প্রত্যাশার ঝুলিটি প্রতিদিন শূন্যই থেকে যায় ঘনুরামের।

এ গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছে, বাঘের সং দেখতে তারা উৎসাহী নয়। সত্যিকারের অরণ্যচারী জীবন্ত বাঘ যখন এসেই পড়েছে তখন তাকে দেখেই তারা পরিতৃপ্ত হবে। অনেকে আবার কিছুই বলে নি। তবে উত্তরের টিলার চিতাবাঘটার দিকেই যে তাদের প্রবল অনুরাগ সেটুকু অনায়াসেই টের পাওয়া গেছে।

ক'দিন ঘুরেই ঘনুরাম বুঝতে পারল, এবার আর সুবিধে হবে না। একটা গাঢ় গহন শঙ্কার ছায়া তার সমস্ত সত্তার ওপর অনড় হয়ে বসেছে যেন। তিনটে মাস নিরাপত্তার জন্য নোনপুরায় আসে সে। কিন্তু কার্পাস চাষীদের মুঠি তার প্রতি এত কৃপণ যে, সপ্তা খানেকের মত খোরাকিও উঠবে কিনা সন্দেহ। এবার মত্তোর সব স্রোত, সব ঢল উত্তরের টিলার দিকে।

যে মানুষ ন'টা মাস অর্ধাহারে প্রায় পশুর জীবন কাটায় তারপক্ষে বাকি তিন মাস আয়েসী না হলেও চলে। দিন একরকম না একরকম করে কেটে যাবেই। কিন্তু নোনপুরায় এসে সে যে মর্যাদা পায়, সেটা কোথায় মিলবে? ঘনুরামের মনে হল, তার ন্যায়সঙ্গত আর চিরন্তন গৌরবে শম্ভা আর তার বাঘটা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হাত বাড়িয়েছে।

উত্তরের টিলার ঐ বাঘটা শুধু তিন মাসের নিরাপত্তা আর মর্যাদাই ছিনিয়ে নেয় নি, অন্য দিক থেকেও ঘনুরামকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে।

সকাল হলেই নাকেমুখে চারটি গুঁজে বাঘ সেজে বেরিয়ে পড়ে ঘনুরাম। সমস্ত দিন নেচেগেয়ে নোনপুরা গ্রামের মনোহরণ করে সন্ধ্যের মুখে শিবল নায়েকের বাড়ি ফিরে আসে। ফিরে কোনদিন রতির দেখা মেলে। তবে বেশির ভাগ দিনই সে থাকে উত্তরের টিলায়। অবশ্য সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পর আর বাইরে থাকে না রতি। বাড়ি ফিরে আসে।

বাঘের সাজ খুলে শালিঝালি বাঁধে আসতে আসতে রাতের আয়ু একটি প্রহর পার হয়ে যায়। সেই সময় রতি খেতে ডাকে। খেতে খেতে নানা কথা হয়। তবে সব নদী সমুদ্রে মেশার মত সব কথার শেষে বাঘের প্রসঙ্গ আনবেই মেয়েটা। প্রায় রোজই সে জিজ্ঞেস করে, 'চিতাবাঘটা তুমি দেখে এসেছ সং?' খেতে খেতে ভাতের ডেলা গলায় আটকে যায়। বিস্বাদরুদ্ধ স্বরে ঘনুরাম জবাব দেয়, 'না।'

'কি আশ্চর্য, গ্রামের কোন লোকের বাঘটা দেখতে বাকি নেই। রোজ দুবার চারবার করে সবাই গিয়ে দেখে আসছে আর তুমিই শুধু যাচ্ছ না।' রতির মুখচোখ দেখে মনে হয়, উত্তরের টিলায় বাঘটা দেখতে না যাওয়া রীতিমত অপরাধ।

ঘনুরাম এবার আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে নতচোখে ভাতের থালায় আঁকিবুঁকি কেটে যায়। রতি তাড়া লাগায়, 'কালই কিন্তু যাবে সং। নিশ্চয় যাবে। অমন চমৎকার বাঘ জীবনে আর কখনও তুমি দেখনি, আর দেখতেও পাবে না। তা ছাড়া ঐ খেলোয়াড় শম্ভা—কি মজাদার লোক সে, সে, তোমায় কি বলব সং!'

অদ্ভুত ব্যাপার! অন্য বছর তাকে দেখাবার জন্য নোনপুরা গ্রামের সবাইকে টেনে টেনে বাড়িতে নিয়ে আসত রতি। সে কী খেতে ভালবাসে, কখন ঘুমোয়, কিভাবে বাঘ সাজে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রূপকথা ছড়িয়ে লোককে তাক করে দিত। সে জানে এই রতি—কালো ময়ূরীর মত শিবল নায়েকের এই মেয়েটা, একটু ইশারা পেলে একদিন তার পিছু পিছু চান্দা জেলা পর্যন্ত চলে যেতে পারত। কিন্তু প্রত্যহের অসংখ্য অপমান, অর্ধাহার আর অনিশ্চয়তার জীবনে রতিকে ডেকে নিয়ে যেতে ভরসা হয়নি ঘনুরামের। তা'ছাড়া নোনপুরার এই একটা মাস বাদ দিলে প্রাণধারণের জন্য প্রতি মুহূর্তে তার যে সংগ্রাম, সে সংগ্রাম তা ঘনুরামকে স্বভাবভীরু করে রেখেছে। রতিকে ডাক দেবার মত দুঃসাহস নিজের মধ্যে কোন দিনই সে খুঁজে পায়নি।

ঘনুরাম নিজে যেমনই হোক যতই তার ভীরুতা থাক, রতি কিন্তু এতকাল তাকে নিয়েই মেতে ছিল। তার গৌরবে সর্বক্ষণ উজ্জ্বল আর উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত সে। আশ্চর্য, সেই রতিই আজ উত্তরের টিলার চিতাবাঘ আর শম্ভাকে নিয়ে প্রমত্ত হয়ে উঠেছে।

যাই হোক রতি আবার বলে, 'আমি জানি তুমি নিজে থেকে যাবে না। আমিই তোমাকে বাঘ দেখতে কাল নিয়ে যাব।'

ঘনুরাম উত্তর দেয় না। শুধু অসহ্য অক্ষম আক্রোশে তার বুকের ভেতরটা তরঙ্গিত হতে থাকে। নাঃ, শম্ভা আর তার বাঘ সে দ্যাখেনি; দেখার বিন্দুমাত্র সাধও নাই।

দেখতে দেখতে গণেশ পুজো এসে গেল। নোনপুরা গ্রামের উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং মাতামাতি এখন শীর্ষবিন্দুতে। উদ্যমহীন

ভগ্নমন ঘনুরাম শেষবারের মত আসরে নামল। মানুষ এখন উদ্দাম, ছিসেবহীন। বেপরোয়া। এ সময়টা যদি তাদের খুশী করে কিছু আদায় করা যায়। অতএব যতখানি সম্ভব নিখুঁত করে বাঘ সাজল ঘনুরাম; শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নাচল-কুঁদল এবং মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গাইল। কিন্তু এবার নোনপুরার মানুষেরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে বসেছে তার দিকে ফিরেও তাকাবে না; কঠিন দিয়ে শুধু দূরেই সরিয়ে রাখবে।

ঘনুরামের কেমন যেন সংশয় হল, এতকাল নকল বাঘ সেজে আসল বাঘের মর্যাদা পেয়ে এসেছে সে। নোনপুরার মানুষ আসল-নকলের পার্থক্য বুঝতে না পেরেই বোধহয় সে মর্যাদা দিয়েছে। এখন সত্যিকারের বাঘটা এসে পড়ায় তফাতটা ধরা পড়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৌরবের সিংহাসন থেকে এরা তাকে একেবারে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে দিয়েছে।

আরো কটা দিন কেটে গেল। ব্যর্থ, পরাভূত, হতাশ ঘনুরাম আজকাল আর বাঘ সেজে গ্রামে বেরোয় না। কী-ই বা হবে বেরিয়ে। শুধু শিবল নায়েকের বারান্দায়, দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে উত্তরের টিলায় যে বাঘটা তার সমস্ত মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়েছে সেটা কেমন? একদিন সে পণ করেছিল, বাঘটা দেখতে কোনদিনই যাবে না। নোনপুরা গ্রামের আর সব জায়গাতেই গেছে সে। শুধু ঐ উত্তরের টিলাটাই এতখানি বাদ থেকেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রবল বিতৃষ্ণা দিয়ে গড়া শপথের ভিতটা কখন যেন শিথিল হয়ে গেছে; খেয়াল নেই। ঘনুরাম স্থির করল বাঘটা দেখতে যাবে।

বিচিত্র এক বিদ্বেষ আর উত্তেজনার মধ্যে সেদিন সারা দুপুর বসে বসে বাঘ সাজল ঘনুরাম। তারপর সূর্যটা যখন পশ্চিম আকাশের দিকে অনেকখানি নেমে গেছে সেই সময় পায়ে পায়ে উত্তরের টিলায় চলে এল।

আজ গণপতি-উৎসবের পঞ্চম দিন। ঘনুরাম এসে দেখল, উত্তরের টিলায় একেবারে মেলা বসে গেছে। এখানে ভিড় জমাতে নোনপুরা গ্রামের কেউ বুঝি আর বাকি নেই। আর ভিড়টার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই কালো ময়ূরী—রতি।

সত্যই দর্শনীয় ব্যাপার। ভিড়টা যেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই লাল শালুর একটা সামিয়ানা খাটানো। সামিয়ানাটার ঠিক নীচে বিশাল লোহার খাঁচা। তার ভেতরে একটা চিতাবাঘ শুয়ে আছে।

আর খাঁচার গায়ে হাত রেখে একটি দীর্ঘদেহ যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই বোধহয় খেলোয়াড়—সাতারা জেলার শম্ভা। রতি যা বলেছিল, মিথ্যে নয়। সত্যিই শম্ভা সুপুরুষ। শরীরময় থরে থরে সাজানো পেশী। তার হাত-পা, চওড়া কবজি, বিস্তৃত বুক—সবই বলশালীতার প্রতীক। বাবরি চুলে বাঁকা সিঁথি, নাকের নীচে সূক্ষ্ম শৌখিন গোঁফ। চোখের দৃষ্টিতে খানিকটা অবজ্ঞা মেশানো।

পরনে গোলাপী গেঞ্জি আর খাটো হাফ-প্যান্ট, হাতে লিকলিকে ছড়ি। ভিড়টার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চোখ দুইটি একবার ঘুরিয়ে নিয়ে শম্ভা আরম্ভ করল, 'এ বাঘ বড় তেজী। খোদ সাতপুরা পাহাড় থেকে পনের দিন আগে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমি একে পোষ মানিয়েছি। এ আমার কথায় ওঠে, আমার কথায় বসে, হাত জোড় করে নমস্কার করে। মন হলে গানও গায়।'

বাঘের গুণ সম্বন্ধে লম্বা একখানা ফিরিস্তি দিয়ে শম্ভা যা করল, তাতে সবার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। চকিতে খাঁচার একটা পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। তারপর বাঘটার কাছে গিয়ে ছড়ির এক খোঁচা মেরে বলল, 'ওঠ ব্যাটা, ওঠ। দুনিয়াকে একটা সেলাম ঠুকে নাচ দেখা'।

বাঘটা কিন্তু উঠল না। চোখ দুটো বার-কয়েক পিট পিট করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শম্ভা অনেক খোঁচাখুঁচি এবং টানাটানি করল। এমনকি তার মুখ খুলে একখানা হাতই পুরে দিল কিন্তু বাঘটার কোন বিকার নেই; ঘুমের আরকে সে ডুবেই রইল।

এদিকে সামনের ভিড়টা স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ। আর রতির তো কথাই নেই। দু-চোখে অপার অসীম বিস্ময় নিয়ে একেবারে সম্মোহিত হয়ে গেছে মেয়েটা।

সবার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘনুরাম। আচ্ছন্নের মত কখন যে ভিড় ঠেলে সে সামনে চলে এসেছে খেয়াল নেই।

ও-দিকে খাঁচার ভেতর থেকে বাইরে এসেছে শম্ভা। এসেই সে বলল, 'না বাবু-মশায়দের কাছ থেকে দু-চার পয়সা নজরানা না পেলে ও ব্যাটা কিছুতেই উঠবে না। সেলামও ঠুকবে না, নাচও দেখাবে না।'

বলার শুধু অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে সিকি আধুলি, এমন কি এক টাকার নোটেরও বৃষ্টি আরম্ভ হল। তাছাড়া মুখ বাঁধা ছোট ছোট চালের থলেও পড়তে লাগল।

স্তম্ভিত ঘনুরাম দেখতে লাগল। এই আগে এক মাস ঘুরে ঘুরে এ গ্রাম থেকে সে যা আদায় করতে পেরেছে, একদিনেই তার দশগুণ বেশি পেয়েছে ঐ শম্ভা আর তার বাঘ।

হঠাৎ ঘনুরামের মনে হল, জগতে যাদের কাছে যত বঞ্চনা যত অপমান যত অমর্যাদা সে পেয়েছে, খাঁচার ভেতর শায়িত ঐ বাঘটা তাদের সবার প্রতিনিধি। বাঘটা তার সমস্ত গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছে, নোনপুরা গ্রামটি তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এমনকি কালো ময়ূরীর মতন ঐ মেয়েটাকে পর্যন্ত সম্মোহিত করে ফেলেছে। অসম্মানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এই প্রথমবার নিজের শৌর্যে জ্বলে উঠতে চাইল ঘনুরাম। হঠাৎ শম্ভার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল সে, 'একটা মরা বাঘ নিয়ে এসে বাহাদুরী দেখানো হচ্ছে।'

পয়সা কুড়তে কুড়তে চকিত হল শম্ভার। তারপর বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ঘনুরামের দিকে তাকালেন। বাঘের সংটাকে দেখতে দেখতে তার ভুরু দুটো ধীরে ধীরে উত্থিত হল। চোখের দৃষ্টি স্বভাবে সেই বাঁকা বিদ্রূপে তীক্ষ্ন হতে লাগল। চিবিয়ে, চিবিয়ে অবজ্ঞার সুরে সে বলল, 'আমার বাঘটা মড়া।'

'নিশ্চয়।'

'আর তুই বুঝি জ্যান্ত বাঘ।'

শম্ভার বলার ভঙ্গিতে ভিড়টা হো-হো করে উদ্দাম হাসিতে ভেঙে পড়ল।

আর সেই হাসির আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল ঘনুরাম।

'নিশ্চয়ই আমি জ্যান্ত বাঘ।'

এক মুহূর্তে কি ভাবল শম্ভার। তারপর আগের মতই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কে জ্যান্ত আর কে মরা'। একবার পরখ করবি? লড়বি আমার বাঘটার সঙ্গে?'

ঘনুরাম লক্ষ্য করল, চারপাশের মানুষগুলো এবার আর হাসল না। দুরন্ত দ্রুতগতিতে তার সত্তার মধ্য দিয়ে একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। মনে হল, ঐ বাঘটার সঙ্গে যুদ্ধে নামলে সে তার হারানো গৌরব আবার ফিরে পাবে। ঘনুরাম বলল, 'নিশ্চয়ই লড়ব।'

'আয় তবে'। বলে বাঘের খাঁচার পাল্লা খুলতে শুরু করল শম্ভা, 'শেষে কিছু হলে আমায় দোষ দিবি না।'

'না দেব না।' অনামনস্কের মত কথা কটা বলে আরেকবার ভিড়টার দিকে তাকাল ঘনুরাম, রতিকে দেখল। অনুভব করল, সবার হৃৎপিণ্ড থমকে গেছে; নিশ্বাস আর পড়ছে না কারো। স্তব্ধ নিষ্পলক সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সবাইকে দেখে বিচিত্র ঘোরের মধ্যে খাঁচায় গিয়ে ঢুকল ঘনুরাম। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা বন্ধ করল।

শম্ভা যখন ঢুকেছিল তখন বাঘটা বার-কয়েক চোখ পিটপিট করেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘনুরাম ঢুকতেই চোখ মেলে অদ্ভুতদর্শন একটা জানোয়ারকে দেখে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে ল্যাজ ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং ঘনুরাম কিছু বুঝবার বা করবার আগেই তার ঘাড়ের কাছে প্রচণ্ড এক থাবা এসে পড়ল, পরমুহূর্তে আরেকটা। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, চেতনাটা কি এক অন্ধকারে যেন ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে।

লোকগুলো বোধহয় চারিদিকে ভয়ার্ত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু তা বুঝতে পারছে না ঘনুরাম। মনে হচ্ছে দূরাগত ক্ষীণ একটা গুঞ্জন কানে এসে লাগছে। সেটাও বেশিক্ষণ শোনা গেল না। আহত রক্তাক্ত মূর্ছিত ঘনুরাম মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল।

জীবনে চিরদিনই বাঘের সং সেজেছে ঘনুরাম। এই একবার মাত্র একেবারে বাঘ হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে।

নুড়ির দুর্গ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

কুমারনাথ যে শেষপর্যন্ত বিয়ে করবে, এমন 'আকাশে আমন ধান' কেউ কল্পনাতেও আনেনি। উদয় দত্ত আরও একটু বেশি স্বপ্নবাদী বলে সে কুমারনাথের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে হাজির থেকে দস্তুরমত হৈ-হুল্লোড় করবার পরও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সত্যিই এ-ধরনের অঘটন সম্ভবপর হয়ে গেছে। জুতোজোড়াতে দ্বিতীয় দফা পালিশ ঘষতে ঘষতে সে আপন মনে হেসে উঠল, বাঃ, বেশ মজা তো—কুমারের বিয়েটা উড়িয়ে দিচ্ছি, অথচ তার বৌভাতে যাবার জন্যে আধঘণ্টা জুতোই চকচকে করছি।... হাসির রেশ বেশিক্ষণ রইল না। উদয় আরও খানিকক্ষণ বিনামাবিলাস করে খুশী মনে উঠে দাঁড়াল—জুতোর গায়ের চামড়াটা আয়নার মত ঝকঝকে হয়েছে এবার। করে যে ওর মগজে ঢুকেছিল 'A man is judged by his shoe', তা মনে নেই, তবে এই বাণীটুকু মন থেকে মুছতে পারে না। এখন তবু নির্দিষ্ট আয় তার আছে, জুতোতে তালি না লাগিয়েও পদমর্যাদা বজায় রাখতে পারে—যখন জীবনধারণের জন্য প্রতিমুহূর্তে জোড়াতালি দিতে হত, সে-আমলেও উদয় হাফসোল-দেওয়া জুতো পরত না। উদয় দত্ত বেশ বড়মুখে বলে, 'পদমর্যাদাটা' ফালতু কথা নয়, দস্তুরমত আচার-আচরণেও প্রতিফলিত হওয়ার মত মূল্যবান কম্যান্ডমেণ্ট।

জুতো পালিশ হয়ে যাওয়ার পর ধূমপান করা চলে। হাতে পাকানো সিগারেট টানতে টানতে আবার কুমারনাথের কথাই মনে পড়ল। আড়চোখে জুতোর পালিশটা পরখ করে উদয় মাথা নাড়ল—না, অবিশ্বাস করার কোন মানে হয় না। বিয়ে না করলে হয়তো কুমার ছোকরার জীবনের সঙ্গে আদর্শের সংগতি বজায় থাকত। অথবা যে-মেয়েটিকে সে ভালবাসে বলে সবাই জানে, তাকেই যদি কুমার বিয়ে করত, তাহলে এই একটা দুঃসাহসিক কাজের নজীরেই সে আদর্শের দিক দিয়ে অনেক বড় হয়ে যেত। তা হতো বৈকি! আর সেটাই কুমারনাথের মত বেয়াড়া ছেলের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ হত। কুমারনাথকে বেয়াড়া বললে খাটো করা হয়, আবার উদয় বা নিশিকান্তের মত নিতান্ত সাধারণ ভাবলেও ভুল করা হয়। ওর সঙ্গে আর কারুর খোল আনা মিল নেই। তাই ওকে ঘিরে অনায়াসে অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা করা চলে।

যে যাই হোক, কুমারনাথের চরিত্রের সঙ্গে গৃহপালিত সুবোধ বালকোচিত বিয়ে বেহদ্দ বেমানান হলেও বাস্তবে এটা ঘটেছে। অতএব উদয়কে আজ কুমারনাথের বৌভাতে যেতে হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে উদয় দৌড়ল ডাইং ক্লীনিং-এ। পাঞ্জাবি না পরে গেলে নেমন্তন্নবাড়িতে কেমন বেখাপ্পা লাগে নিজেকে।—'ধোপদুরস্ত' দোকানটার নাম। পাড়াতে এই একটিই ধোলাই-ঘর। কথার ঠিক রাখার গরজ দোকানদারের নয়। আর্জেণ্ট কাচাতে চার-পাঁচদিনও লেগে যেতে পারে, এবং সব ব্যাপারে দোকানদার যোগেনবাবু খুব সিধে কথার মানুষ—মুখের ওপরই বলে থাকেন—'দিচ্ছেন বটে আর্জেণ্ট, দেরি হলে তো আমাকে দুষবেন মশাই। আমি বলি কি অর্ডিনারীই দেওয়া ভাল, তাতে কাপড়ের লঙ্গিবিটি বাড়ে। আমার নয় দুটো পয়সা লোকসানই হবে—তা বলে এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে—!' আজও সেই দশা হল, উদয়কে ব্যাজার মুখে খালি হাতেই ফিরতে হলো।

পথে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক এক নজর দেখে নিয়ে সে টুক করে হরিপদ মুখুজ্জের বৈঠকখানাতে ঢুকল। হরিপদ মানি প্ল্যাণ্টের গ্লাসের জল পাল্টাচ্ছিলেন, মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন—কি মনে করে হে বিজয়বাবু! হরিপদকে উদয় আদৌ পছন্দ করেন না। কতকটা রুক্ষস্বরেই বলল অন্যদিকে তাকিয়ে—বিজয় নয়, উদয়, বুঝলেন। হ্যাঁ, এই আংটিটা রেখে দশটা টাকা দিতে পারবেন?

—কই, মালটা হাতে দাও, পরখ করে দেখি। আলগা হাতে আংটির ওজন পরখ করে বললেন—তোমাদের না দিলে কি পাড়াতে বাস করতে পারব! তা দ্যাখো বাবু, সেবারের মত সুদের পয়সা হজম করে দিও না।

উদয় হাসতে হাসতে বলল—সে-টাকা তো আমি নিইনি, নিয়েছে কুমার। তা আপনি যে তেমনি পঞ্চাশ মণ সাবানের [illegible] মুফতে ফাঁকি মারলেন, সে তো কুমারের দৌলতেই।

—না, না, তা নয়। এমনি বলছিলুম হে। তা সেই—তোমার কুমারবাবু বুঝি বদলি হয়ে গেলেন। দ্যাখো দেখি ফ্যাসাদ, বলা নেই, কওয়া নেই, হুট্ করে নতুন একটা ইন্সপেক্টার হামলা করে গেল। তোমাদের আক্কেল থাকলে বদলির খবরটা দেওয়া কর্তব্য ছিল।

—আমায় জলদি দিন, তাড়া আছে। সন্ধ্যেতে একটা নেমন্তন্ন—

পরম বিজ্ঞ হাসিতে রেখাবহুল মুখখানা তুলে একবার তাকিয়ে হরিপদ বললেন—কোথায় নেমন্তন্ন—ট্যাকা-ফ্যাকা নিয়ে চললে যে সোনাগাছিতে বুঝি।

টাকাটা এখনো হস্তগত হয়নি, এ-অবস্থায় খামোখা ঝগড়া বাধিয়ে অসুবিধেতে পড়তে চায় না উদয়—নইলে সে হয়তো হরিপদর বাপ-পিতেমো তুলেই বসত। মনে মনে সে গালাগালি দিল, জানোয়ার! একটা অসহিষ্ণু নিঃশ্বাস ফেলে কোনরকমে উদ্যত উষ্মাকে সামলে নিল উদয়। টাকা হাতে নিয়ে সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হরিপদর চোখে চোখ রেখে বলল—আংটিটার পাথরখানারই দাম পঞ্চাশ টাকা, বুঝলেন!

—তা কি হয়েছে তাতে। পাঁচশ' টাকা হলেও ক্ষতি ছিল না। তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে, এখনো কথাবার্তায় ঝাঁজ মরেনি—কুটকুটে ব্যাচেলার কিনা।

হরিপদ মুখুজ্জের ঘর থেকে কেউ বেরুলেই তার দিকে পাড়ার লোক তাকায়। এমনই সহজভাবে তাকালে তো ক্ষতি ছিল না, যাকে দেখছে তার নজর বাঁচিয়ে দ্যাখে—যেন লক্ষ্যই করছে না। সবাই জানে এ-ঘরে যে ঢোকে, সে 'ফক্করে' হয়েছে ঠাট বজায়ের দায়ে পড়ে। এখানে আসে সবাই কিন্তু অন্যের নজর বাঁচিয়ে।

কুমারের বৌভাতে কি উপহার দেবে উদয়? বই, ফুলদানি, টেবিল ল্যাম্প কোনটাই মনোমত লাগছে না। দশ টাকার মধ্যে একখানা শাড়ি হবে না? শাড়ি কিংবা রুপোর সিঁদুর কৌটো ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া সংগত নয়, কেননা কুমার তার বাপ-দাদার পছন্দকরা মেয়েকে বিয়ে করেই রংচটা সামাজিক জীব প্রতিপন্ন করেছে আপনাকে। অথচ এই ঘরকন্নার ছকেবাঁধা সুবিধাবাদী জীবনের ওপর ওদের সকলেরই

প্রচণ্ড অবজ্ঞা। ওরা চোখের পর দেখছে, বিশেষ করে গৃহপালিত বিবাহিত মানুষগুলো একনাগাড়ে আপন স্বার্থচক্রে সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে তাল বজায় রেখে পাক দিয়ে কাটাচ্ছে। এদের কাছে দেশ, সমাজ, কিছুই কিছু নয়। ...উদয় মনে মনে কুমারনাথের দাম্পত্যজীবনের ছবি আঁকে। তাঁর চোখ কুঁচকে এল, ঠোঁটের ডগায় অশ্লীল তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল। বিড় বিড় করে উঠল সে—কুত্তার ডিম, শুয়োর!

স্যুটকেসটা খুলে উদয় জামা কাপড় বাছতে লাগল। পুরনো পাঞ্জাবি একটা ছিল, সেটা কোথায় যে গেল—। কোন্ নবাব দরকারের সময় নিয়ে শটকেছে আর ফেরত দেয়নি—এখন তুমি মরো। সেটা যে বেপাত্তা তা উদয়ের মনে ছিল, তবু একবার উল্টে-পাল্টে ভালো করে দেখে নিল। যেন খুঁজতে পারলেই পাঞ্জাবি গজিয়ে উঠবে। নিজেকে আহাম্মক প্রতিপন্ন করে একটু খুশী হল উদয়। আজকাল সে আগের মত আর নিজেকে মোটেই বুদ্ধিমান ভাবে না। দুনিয়ার সব মানুষকে নির্বোধ বলে জ্ঞানাটুকুর মধ্যেও পুরনো আরাম নেই—এখন নিজেকে মূঢ় ভেবে তবু কিছুটা সুখ পাওয়া যাচ্ছে। এটা মন্দ নয়।

কিন্তু দুটো শার্ট ছাড়া তৃতীয় কোন জামা নেই। শার্ট দুটোর বয়স বছরখানেক হবে। হ্যাঁ, তা হবে বে-ওজোর।

বেলারাণীর দর্জির কারবারের প্রথম আমলে এ দুটো অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়েছিল উদয়। এক বছরেও শার্ট দুটোর আয়ু অক্ষুণ্ণ থাকার কৃতিত্ব কাপড়ের মিলের নয়—দর্জির। বেলার হাতের গুণে জামার বুক পেট হাতা সবই প্রায় সমান প্রশস্ত। তারিফ করে উদয় বলেছিল—খাঁটি ডেমোক্রেসী এবং প্রথম প্রথম সগৌরবে এই শার্ট গায়ে ঘুরে বেড়াত সে। যেহেতু বেলাকে কাটা-কাপড়ের কারবারে নামানোর মূলে ছিল কুমারনাথের অসাধারণ মগজ, সেহেতু উদয়ের এই রসিকতায় কুমার হাড়ে হাড়ে চটে যেত। একদিন সে আর সামলাতে না পেরে বলেছিল—দোহাই তোকে আমি চারটে জামার খরচ দেব, ওই শার্ট দুটো তুই পুড়িয়ে ফেল...। বেলারাণীর মুখখানা মনের ভেতর ঘোরাফেরা শুরু করছে। উদয় অকারণে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

উদয় একটা শার্ট বার করে চৌকির ওপর রাখল। শার্টটাকে ঘিরে অনেক টুকরো ছবি উদয়ের মনের অলস পটে আঁকা হয়ে যাচ্ছে। বেলারাণী এখন কি করবে? প্রথম যেদিন উদয় গিয়েছিল বেলারাণীর ঘরে সেদিন এরকম কোন প্রশ্ন ওঠেনি। বরং দু-চারটে রসের কথাই বলেছিল উদয়। এমনকি, যেদিন কুমার নিশিকান্তকে টালাও হুকুম দিল—আজ থেকে তোমার বাড়ির বা পাড়ার কোন ছেলেমেয়ের বৌ-ঝির জামার অর্ডার আমি ছাড়া আর কেউ না পায়—' সেদিন ওরা সবাই অবাক হলেও ভাবতে পারেনি যে, কুমার শেষ পর্যন্ত বাজারের এক পেশাদার বেশ্যাকে সুপথে আনার জন্য সেলাই কল কিনে দিয়েছে এবং তার জন্য অর্ডার কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা ভেবেছিল কুমার নিজেই বুঝি দর্জির দোকান দিয়েছে। যখন আসল ব্যাপারটা কুমার ভেঙে বলল তখন উদয়ই প্রথম গলাবাজি করে বলেছিল—আমার ভাই দুটো শার্ট তৈরী করিয়ে দাও, মজুরী কিন্তু অন্য দর্জির চেয়ে না তোমার মত আবগারীর ঘুষ তো জোটে না কপালে!

মুখ্যতঃ কুমারের পেয়ারের মেয়েমানুষ হলেও বেলারাণী ওদের সকলের সঙ্গে দিনে দিনে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল— না, দিনে দিনে একটু একটু করে নয়, দুদিনেই ওর অন্তর অকপট দ্বিধাসঙ্কোচ শূন্যভাবে খুলে দিয়েছিল বেলারাণী, বাকী দিনগুলো কেটেছে সেই অন্তরঙ্গতার স্নিগ্ধ স্বাদটুকু উপভোগের আমেজে। অবশ্য দেহ-বিনিময়ের সম্পর্ক বেলার সঙ্গে কুমার ছাড়া ওদের দলের আর কারুর ঘটেনি। তেমন ইচ্ছে হলে তুমি অন্য ঘরে যেতে পার, এই ছিল ও-পাড়ার দস্তুর—তা দরকার পড়লে অন্যত্র গিয়েছে বৈকি বাকী সকলে।

ও-বাজারের নিয়মই এইরকম। অন্য অচেনা পুরুষকে খরিদ্দার হিসেবে মেয়েরা কারবারের রীতি প্রথা অনুযায়ী সব কিছুই করবে, খোদ খরিদ্দার ছাড়া তার সঙ্গী-সাথী-ইয়ার-বন্ধুদের খাতির যত্ন করতেও বাধা নেই, কিন্তু শেষ সীমায় দেহদ্বার বন্ধ রাখাই আদব। এটুকু যে মেয়েমানুষ না মেনে চলে সে লাঞ্ছিত হয়, পক্ষান্তরে কোন পুরুষমানুষ যদি এই সীমা ডিঙোতে চায় তবে তারও কপালে দুর্গতির অন্ত থাকে না—তাকে দেহবিলাসিনীরা চরিত্রহীন অমানুষ বলে চোখ বাঁকিয়ে ঠোঁট উল্টে থুথু ফেলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা বলে বেলার ক্ষেত্রে এজাতের প্রশ্নই ওঠেনি। বেলা হয়তো বয়সে ওদের চেয়ে দু-এক বছরের বড়ই হবে, তবু 'দাদা' বলেই সম্বোধন করে। ওর আচার-আচরণে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুর ঝরে পড়ে।

মেয়েটিকে উদয়ের ভালই লাগত—ভাল লাগত ওর গানের কণ্ঠ, ওর কথা বলার বিশেষ ধরনেও একটু অবিশেষ মাধুর্য পেয়েছে উদয়। কুমার যে ওই মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল সেজন্য কেউ ওরা এতটুকু আফশোস করে নি। বরং নিজেদের ঔদার্যহীনতার গ্লানিতে নিজেকে কুমারের কাছে খাটো বলেই মনে হয়েছে উদয়ের। সেই আক্ষেপ মেটাবার মানসে উদয় দু-একবার কুমারের অনুকরণ করতে গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। এই ব্যর্থতার জন্য সে নিজেই দায়ী—কিংবা সেরকম মনের মত মেয়ে না পাওয়াই হেতু তা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করেনি—তবে এটুকু সে বেশ বুঝেছে যে, সবাই সব কাজ পারে না। অর্থাৎ উদয় আর কুমার এক নয়।

...নাঃ আর বাজে ভেবে সময় বইয়ে লাভ নেই। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আদর্শ আর বাস্তব, কল্পনা আর ঘটনা, এক পথে হাঁটে না। কুমারকে দোষ দিয়ে কি হবে। হয়তো উদয়ও এমন ক্ষেত্রে অন্য কিছু করতে পারত না। এবার ভাবনা রেখে নিজেকে ধোপা-মুচির বিজ্ঞাপন সাজিয়ে বিয়েবাড়িতে চটপট হাজির হওয়া দরকার। পথে কুমারের বৌ-এর জন্যে একখানা শাড়ি কিনতে হবে।

চাঁপাফুল রংটার মোহ উদয় কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না। বিয়ের দিন কুমারের বৌকে একনজর দেখেছিল বটে, তবে এখন কিছুতেই মনে করতে পারছে না—মেয়েটি দেখতে কেমন, এমন কি তার গায়ের রংটাও নয়। তবে মেয়েকে কেমন মানাবে সে ভাবনা বাদ দিয়ে যদি কাপড় দেখে পছন্দ করতে হয় তাহলে এই চাঁপা রংকেই সেরা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দামও তেমনি। পকেটের সব কড়ি ধুয়ে মুছে বেরিয়ে গেল। তা যাক, তা বলে নজরকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না উদয়।

সে তো নিশিকান্ত নয় যে, সব সময় হিসাবের খাতা চোখের সামনে মেলে চলবে। আর কুমারনাথের বিয়েও বছরে দশবার হচ্ছে না। মোট কথা কুমারের বিয়েতে উদয় যে দুঃখ পেয়েছে সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত হয়ে থাকাই ভালো। সে কুমারকে ভালবাসে, কর্তব্যটুকু অন্তত করতেই হবে।

কাপড়খানা কিনে সে দোকানদারকে বলল—হ্যাঁ মশাই পছন্দ করবে তো—নাকি?

একগাল হেসে বুড়ো সেলসম্যান চোখ মটকে জবাব দিল—আপনার নজর আছে। যিনি পরবেন তিনি বেশ ফর্সা নিশ্চয়ই।

—তাহলেই ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি। লিকলিকে ঘাড়খানা যতদূর সম্ভব বাঁক করে বুড়ো বলল—চোখ বুজে নিয়ে যান আপনি। এ হল মোকামের সেরা মাল, যে গায়ে চড়বে সে গায়ের রং কিছু না হোক দু-পোঁচ খোলতাই মালুম হবে।

মামানসই প্যাকেটে গুছিয়ে শাড়িখানা বগলে নিয়ে দোকান থেকে নেমেই উদয়ের মনে হল যেন বড্ড খিদে পেয়েছে। পকেট হাতড়ে সব মিলিয়ে যা পয়সা পেল তা থেকে এক কাপ চা খাওয়া হয়, টোস্ট খেলে আর সিগারেটের পয়সা থাকে না। পথ চলতে চলতে হিসেব করল উদয়, আবার কালই গোটা পাঁচেক টাকা কারুর কাছে ধার করতে হবে।... মাসের শেষে বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া বেশ ঝকমারী।

তখন হরিপদর কাছে আরো গোটা পাঁচেক টাকা সেদিন চাইলেই হত। তাহলে আগামীকাল দিকদারিতে পড়তে হত না।

কিন্তু ষোল টাকা দিয়ে হুট্ করে শাড়ি কিনবে উদয় কি তা জানত। নাঃ কাজটা বড্ড বেমক্কা হয়ে গেল। বাজেট ছিল দশ, হাতে যা ছিল তাতে মাসটা লেংচে পার করা যেত—। দশ টাকা ধার করা কিছু যার হিসেব হয় নি, তার মেজাজ দিন দিন লক্কা পায়রার মত হয়ে উঠছে—হাতে পয়সা থাকলেই খেয়ে-খাইয়ে দিলচস্‌পি করে ফুঁকে দিতে পারলেই স্বর্গসুখ!

বিরক্ত হয়ে উদয় নিজেকে জব্দ করবার জন্য সংকল্প করল—'স্যাংশন হল না। নো চা—। সিগারেটের ধোঁয়া লাগিয়ে ক্ষিদে বাগিয়ে রাখ, একেবারে লুচি মাংসে উসুল দিও।'

পানের দোকানের ঝাপসা আয়নাতে নিজের সুরত দেখে উদয়ের হাসি পেয়ে গেল। ক'মাসে বেশ মোটা হয়েছে তো উদয়! আরো একটু ভাল করে দেখল—বাঃ বাঃ, শার্ট তো নয় বালিশের খোল পরেছে সে। এই সাজে তাকে দেখে বিয়ে-বাড়িতে সবাই কি বলবে! কুমার তো ক্ষেপে আগুন হবে। দেখে নির্ঘাত সে চিনতে পারবে, বেলারাণীর হাতের ছাঁট। শার্টের হাতা কত কুচ্ছিত বানালেও বেলার নিজের হাতের গড়ন কিন্তু ভারি সুন্দর গোল গোল।

অমন যার হাতের গড়ন—নরম কিন্তু টান-টান, সেই হাতের এই সৃষ্টি। কুমারের যেমন খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না। বেশ্যাবৃত্তি ছাড়িয়ে বেলাকে বেহুলা সতী করার আর পথ খুঁজে পেল না হতভাগা। সেইকালে উদয় বলেছিল—'ওসব বুজরুকি রেখে চিড়িয়াকে শাদি করে ফ্যাল।' কুমার দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিল—'এটা তারই ফার্স্ট স্টেজ রে। ওকেও তো একটা ওয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। আমি যদি শালা টি-বিতে ফৌত হয়ে যাই তখন কি আমার বাপ-দাদা আমার প্রস্-ওয়াইফকে পাত্তা দেবে? আরে ভ্রাদার, বিয়ে করব বলেই তো এত ঝক্কি পোয়াচ্ছি। ওরও একটা ভোকেশনাল ট্রেনিং হয়ে রইল। অবিশ্যি জানি তোরা থাকতে ওর তেমন ব্যাড লাক হবে না। তবে আই ডোন্ট লাইক ডিপেণ্ডেন্স—ওরও সেইরকম টেস্ট, বুঝলি না।'...

বিরস হাসি হেসে উদয় সিগারেট ধরাতে মুখের কাছে দড়ির আগুন তুলল—কোথায় গেল কুমারের সেই নোবল আইডিয়া।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদয় একঝলক ধোঁয়া ছাড়ল—বেচারী বেলা! বেলা এখন কি করবে? ব্যাক টু বডি বিজনেস?—তাই কি সহজে আর পারবে।

—গতবার শিবরাত্রির উপোস করল বেলা, সেই উপলক্ষে নেমন্তন্ন ছিল ওদের রাত জাগার। এতখানি এদিকে ঝুঁকে পড়বার পর ওই মেয়ে কি আবার পাব্লিকের বারোজনকে খাটে জায়গা দিতে পারবে! রুচিতে আটকাবে নির্ঘাত।

আচ্ছা বেলা কি বিয়ের খবর জানে? বোধহয় জানে না। উদয়কেই তো দিন-চারেক আগে কুমার বলেছে। তাও নিজে থেকে নয়, নিশিকান্তকে দিয়ে বলিয়েছে। কাওয়ার্ড—ব্রুট—হার্টলেস। হঠাৎ উদয়ের মাথাটা গরম হয়ে উঠল। আলবৎ কুমার একটা নিষ্ঠুর অমানুষ। হ্যাঁ আলবাৎ—। যেন এতক্ষণ নিজের কাছে এই কথাটা বলতে চেষ্টা করেও সে সাহস করেনি। যেন কুমারের এই অমানুষিক কাজটার পিছনে উদয়ের সায় ছিল বলে মিথ্যে অপরাধ-বোধ তাকে ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ অসতর্ক চিন্তার ফলেই কুমারকে সে সাংঘাতিক প্রতারক ভেবে বসল। ভাবনার মজাই হল এই—একবার ভাবতে শুরু করলে আর তার ওপর খবরদারী করতে পারে না মানুষ। এমন ভাবনার পিছু পিছু তাকে চলতেই হবে। ...উদয়ের সেই দশা। সে বেঁকে দাঁড়াল।

এরকম হীনচরিত্র স্বার্থলোভী মানুষের বিয়েতে যাওয়া মানেই তো তাকে পরোক্ষ-ভাবে সমর্থন করা। কুমার এতদিন হয়ত চরিত্রহীন ছিল কিন্তু সে হীনচরিত্র হয়ে পড়ছে। চরিত্রহীনতার মধ্যে দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু হীনচরিত্র মানুষ জঘন্য পর্যায়ের জন্তু। আর উদয় একজন খাঁটি মরালিস্ট হয়ে কিনা সেইরকম একটি ব্যক্তির বৌভাতে উৎসব করতে চলেছে।

কুমারের জীবনে যেটা বাস্তব বলে স্বীকৃত, সেটা উড়িয়ে দিতে না পারলে, প্রতিবাদ করার হক তার কেউ কেড়ে নেয়নি। প্রথম যখন বিয়ের কথা শুনে খটকা লেগে-ছিল তখন থেকেই উদয় মনে মনে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু কেবলমাত্র ভাল না লাগাটার কোন মূল্য নেই—তাকে চিহ্নিত করার মত প্রত্যক্ষ কোন কাজ খুঁজে পাওয়া চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই উপায়টুকু দেখা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকেও জোর দিয়ে বোঝাতে পারে না যে, সত্যি সত্যি ভাল লাগছে না। তখন মানুষ পাইকারী ফতোয়া দিয়েই নিজেকে থামিয়ে দেয় যেমন উদয় দিয়েছিল, এই বলে যে, সমাজকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না অথবা পারলেও সাহস করে না, বা সাহস করলেও সে বাঁচাটা সুখের হয় না—সেইজন্যেই কুমার বেলাকে ভালোবেসে শেষে এরকম একটা বিয়ে করল।... কিন্তু যে মুহূর্তে প্রতিবাদের প্রতীকচিহ্ন আবিষ্কার করল উদয়—সেই মুহূর্তে আগেকার পাইকারী ফতোয়াকে বাতিল করে যেন বাঁচল। জেল-খানা থেকে হঠাৎ বিনাসর্তে মুক্তির আনন্দে উদয় আচমকা অট্টহাসি হেসে অভিনন্দন জানাল নিজেকে।

তাহলে এবার তার যাত্রা বেলারাণীর ঘরে। দুনিয়ার লোকে যা-ই বলুক উদয় বেলারাণীকেই কুমারের "বৌভাতের শাড়ি-খানা" উপহার দেবে। এতদিন ধরে কুমার যে কথা বলে এসেছে সে কথার দাম এমনি করেই দেবে উদয়। পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ রইল যে বেলারাণীকে কুমারের স্ত্রীর মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত নয়, ভীত নয়। এ ব্যাপারে সমাজের দোহাই পেড়ে সামঞ্জস্যের গোঁজামিল দিয়ে, আদর্শের টুঁটি টিপে খতম করে, উৎসবের জাঁক-জমকে আসল সত্যকে ধামাচাপা দিতে পারবে না উদয়।

বেলারাণীর বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত উদয়ের কোন হুঁশ ছিল না। প্রচণ্ড একটা ঝড়ের বেগে তার সমগ্র সত্তা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। বিরাট পৃথিবীর তাবৎ মিথ্যাচারী মানুষগুলোর বিপক্ষে একলা লড়াই করবার উদগ্র উত্তেজনায় সে টগবগ করে ফুটছে—যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে পড়বে সে।

গলির মুখে যারা ঘোরাফেরা করছে তাদের চেনে উদয়। এ পড়ার ফ্ল্যাটবাড়ি-গুলোর সদর কখনো বন্ধ থাকে না। সরাসরি তিনতলায় উঠে দেখল বেলার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ।

কড়া নাড়ল। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হল, বেলা খুব অবাক হয়ে যাবে। আর তার গায়ের শার্টটা দেখে হয়তো মুখে 'আঁচল চাপা দিয়ে অট্টহাসিকে ভদ্র রূপ দেবার চেষ্টা করবে।

—আগে বেলা ওর সারা দেহ তরঙ্গ তুলে হাসত। হাসির ঢেউ উঠলে সহজে ও সামলাতে পারত না। সে হাসির শব্দে হাতের হাল্কা বেলোয়ারী চুড়ি-ভাঙার ঠুনকো 'ঠুং' শব্দ ধ্বনিত হত না—হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাঁসার বাসনে যে রকম শব্দ হয়, সেই শব্দের রেশ উচ্চ থেকে মৃদু, বিভিন্ন স্তরের ঢেউ খেলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চলে সে রকম ধরনের ধ্বনি ছিল ওর হাসিতে।

কিন্তু কুমার পছন্দ করত না বলে ও নিজের স্বভাবসুলভভাবে হেসে ফেললেও নিমেষে সচেতন হয়ে মুখে আঁচল চাপা দেয় আজকাল। জোরে হাসাটা ওর স্বভাব আর মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে আড়াল করা ওর এখনকার অভ্যাস। বেলার এই মেনে নেওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মাধুর্যও লক্ষ্য করেছে উদয়। আসলে মেয়েটার সূক্ষ্ম শিল্পবোধই ওকে আরও সুন্দর লোভনীয় করে তুলেছে।

একটু যেন দেরি হচ্ছে দরজা খুলতে।

আগের আমলে উদয়ের এরকম হঠাৎ চলে আসাটা হামেশাই হত এবং বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও হতো না। কুমার থাক বা না-থাক বেলা নিজেই দরজা খুলে দিত।... হয়তো বেলা আজকের বৌভাতের খবর জানে, তাই মন মুষড়ে শুয়ে আছে। কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে হয়তো ভাবছে বাজে কোন উটকো খদ্দের এসেছে। এবাড়ি থেকে বেলার উঠে যাওয়ার কথা হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া হয়নি কেননা সে রকম পছন্দসই বাসা পাওয়া যায় নি। মাঝে মাঝে বাজে লোকের উৎপাত পোহাতে হয়। এক এক সময় বেলা খুব বিরক্ত হলে কুমারকে বলত, 'তোমার মুরোদ তো ভারি। একটা ঘর জোগাড় করতে পার না—মুখেই কেবল রাজা উজীর মারতে পার।'

আবার কড়া নাড়ল উদয়। এবার একটু জোরে আর বেশিক্ষণ ধরে।

দরজার ওপারে পায়ের শব্দ। এপারে উদয়ের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড অসম্ভব দাপাদাপি করছে। তার কানের পাশের শিরাগুলোয় রক্তের বেগ দ্রুত হতে হতে শক্ত দড়ির মত ফুলে উঠল। এরপর মুহূর্তে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। তাকে দেখে বেলা চোখের তারায় কোন ভাবের কেমন ছবি আঁকবে? কতটুকুই বা সময় কাঁপায়েরই বা দূরত্ব—অথচ এই মুহূর্তটুকুকে যদি আলাদা করে রাখা সম্ভব হত তাহলে তাৎপর্যের ওজনে উদয়ের জীবনের একটি যুগের চেয়েও বেশি প্রমাণ হত। ধবক ধবক আওয়াজ বুকের ভেতরে আর বাইরে অর্থাৎ বন্ধ দরজার ওপারে পায়ের শব্দ। বেলা আসছে।

কিন্তু দরজা খুলে যখন বেলা বলল—আপনি! কী কাণ্ড—আসুন, আসুন! তখন উদয় কেমন মনমরা হয়ে পড়ল। বেলার চেহারায়, ওর মুখের কথায়, কথার ভাষাতে, ভাষার ভঙ্গিতে—কোথাও বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক কিছু নেই। কেন? ও কী জানে না যে, আজ কুমারের বৌভাত—না কী বিয়ের কথাটুকু পর্যন্ত শোনেনি।

অপ্রতিভ চোখে উদয় দেখছিল বেলার পিঠের ওপর লতিয়ে পড়া লম্বা বিনুনিটা। ঘরের মধ্যে কাটা কাপড়ের টুকরো যেন শীতের ঝরা পাতার মত এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে।

অদ্বিতীয় চেয়ারে কতকগুলো জামা পাটকরা ছিল। সেগুলো আলতো হাতে তুলে নিয়ে বেলা বলল—বসুন দাদা। তারপর কি খবর বলুন। মথুরার রাজা ভালো আছে তো!

ম্লান হাসিতে উদয়ের ওষ্ঠে কথার পূর্বাভাষ জেগে উঠল। কিন্তু তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বেলাই কলের হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে বেলা যেন নিজের মনের কথাকেই সেলাই করছে এমনি ভঙ্গীতে বলল—জানেন এ মাসে বেশ মোটা টাকার অর্ডার পেয়েছি।

সাড়া দিল না উদয়। তার যেন কী হয়েছে। কী ভাবছে সে! বেলার এই নিরুত্তাপ ভাবভঙ্গি, ওই যন্ত্রটার একঘেয়ে কিটকিট আওয়াজ, কিছুই উদয়ের মনে সায় পাচ্ছে না— বিরক্তি, বিস্ময়, অস্বস্তি। তাকে নিরুত্তর দেখেই বোধহয় বেলা কল চালানো থামিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল। তারপর উদয়ের কোল থেকে শাড়ির প্যাকেটটা টেনে নিয়ে প্রশ্ন করল—এতে কি আছে দাদা?

—শাড়ি।

—তাই নাকি? খুলে দেখব কেমন শাড়ি কিনলেন।

উদয়ের গায়ে যেন হঠাৎ খুশির এক ঝলক হাওয়া লাগল। সে একটু জোর দিয়ে বলল—শ্রীঅঙ্গে পরেও দেখতে পার, ওটা তোমারই জন্য এনেছি।

কথাগুলো বলে উদয় খানিকটা খুশি হল নিজেকে প্রকাশ করতে পারার স্বাভাবিক কারণে। আর সেই সঙ্গে হয়তো আশা করেছিল যে, বেলাই খুশি হয়েছে। কিন্তু তার উৎসুক চোখের ওপর দুটি আয়ত্ত আহত চোখ রেখে বেলা বলল—যাঃ, এসব নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা ভাল নয় দাদা।

—কী নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা, বেলা?

—এই ইয়ে নিয়ে—মানে শুধু শুধু আমাকেই বা শাড়ি দেবেন কি জন্যে?

—শুধু শুধু তো নয়, কারণ একটা আছে বইকি!

—কিন্তু আপনারা সে ধরনের ছিঁচকে মতলববাজ নন বলেই জানতাম। আপনার বন্ধু যদি শোনে তো কি মনে করবে? সে কথা ভেবে দেখেছেন।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে হাত নেড়ে উদয় জবাব দিল—আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই বেলা। সব শালা শুয়োরের বাচ্চা—

তার কণ্ঠস্বরে ঘৃণা আর আক্রোশ প্রকট।

বেলারাণী শাড়ী মোড়কটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে শ্লেষমেশানো মিষ্টি সুরে টেনে দিয়ে বলল—আপনিই বুঝি খাঁটি ভগবানের পয়দা। তাই একখানা কাপড় দিয়ে মন ভুলিয়ে আমার কাপড় খুলে ফেলতে এসেছেন। বাঃ—

চমকে উঠল উদয়। ছি-ছি, এসব কী বলছে বেলা! যে কথা সে কল্পনাতেও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়নি—অনায়াসে সেই নোংরা, বাজে একটা অপবাদ চাপিয়ে দিল? তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক ঝলক অবশ করা শিহরণ বয়ে গেল। ইচ্ছে করছে গলায় যত শক্তি আছে সমস্তটুকু প্রয়োগ করে চেঁচিয়ে বেলার কথার প্রতিবাদ জানায়—না, না, না। ভুল—তুমি ভুল করছ বেলা। আমি এসেছি তোমাকে মর্যাদা দিতে, যে মর্যাদা সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কুমার দিতে রাজী হয়নি— সেই মর্যাদা। আরও অনেক-গুলো কথার আবেগে উদয়ের মনটা সির-সির করছে। কিন্তু তার মুখ ফুটে একটি কথাও বেরুলো না।

যে ঘৃণা কুমারকে দেখানোর কথা সেই ঘৃণা কটাক্ষ মেলে উদয়ের দিকে তাকিয়ে বেলা বলল—এ শাড়ি আপনি নিয়ে যান। পরশু দিন বন্ধুর বৌভাতে প্রেজেন্ট দেবেন—তাতে খরচেরও সাশ্রয় হবে আর—

বেলার কথা শেষ হবার আগেই উদয় বলল— কি বললে, বৌভাত কবে?

—কেন পরশু, জানেন না নাকি।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মুখের কথা জিভের আড়ালে রেখে দিল উদয়। কি দরকার সাঁচা কথা বলে গোলমাল বাড়িয়ে। যদি সে বলে যে, বৌভাত পরশু নয় আজ তাহলে হয়তো তার কথা বেলা বিশ্বাসই করবে না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বেলা একটু হাসল—আমার কথায় রাগ করবেন না যেন দাদা। তবে, এরকম আর কখনো করবেন না যেন, আমি ভীষণ অপছন্দ করি। বিয়ে-থা যাই করুক, ওর সঙ্গে আমি জোচ্চুরি করতে পারব না।

স্তিমিত কণ্ঠে উদয় বলল—তাহলে বিয়ের জন্যে তোমার মনে কোন দুঃখ নেই!

—দুঃখ কষ্ট ছাড়া কি মানুষ দুনিয়াতে আছে দাদা? আপনিই বলুন। তাছাড়া আমার তেমন ইচ্ছে থাকলে ওকে জবে বিয়ে করতে পারতাম। কিন্তু দেখলাম তাতে অনেকগুলো মানুষের অভিশাপ কুড়োতে হবে। তার চেয়ে, এই তো বেশ আছি। বললাম—বিয়ে করো—বাবা-মায়ের চোখের জল ফেলিয়ো না, তাতে মঙ্গল হবে না।

কথা বলতে বলতে বেলার কণ্ঠস্বর আবেগে গম্ভীর ভারি হয়ে উঠেছে। ওর চোখের কোলে হয়তো অজস্র অশ্রু সঞ্চিত হয়ে আছে যে কোন মুহূর্তে ঝরে পড়বে।

উদয় বাধা দিয়ে বলল—কিন্তু—

তাকে থামিয়ে দিল বেলা—এতে কোন কিন্তু নেই। আমার একটা তো জীবন, সুখে-দুঃখে কেটে যাবে। এখন আর তেমন ভাবনা নেই— একটা পেটের ভাত আপনা-দের আশীর্বাদে জুটে যাবেই। তা ছাড়া শ্বশুর করেছে বলেই ও কী আর ফেলে দিতে পারবে। এই তো দেখুন না—বিয়ে-বাড়ির সব জামার অর্ডার ও আমাকে পাইয়ে দিয়েছে। কাল ডেলিভারি নিয়ে যাব, নগদ তিরিশ টাকা মজুরীও পাব। নিজে মুখে বললে খারাপ শোনাবে, কিন্তু সত্যি আজকাল আমার হাতে কাট-ছাঁট সবাই তারিফ করে। এই তো দেখুন না, এটা হল মিনতির—এটা ফুলশয্যার রাতে পরবে ও—বৌ-এর আসল নাম জানেন তো ক্ষমা—আমি কিন্তু মিনতি দিয়েছি।

বলে উৎসাহ সহকারে একটা ব্রোকেডের ব্লাউজ তুলে নিয়ে উদয়ের চোখের সামনে মেলে ধরল। উদয়ের আর একদণ্ডও এখানে বসে থাকতে ভরসা হচ্ছে না। কি জানি নিজেকে যেন ভয় করছে সে। বেলার কথা-গুলো চাবুকের চেয়েও জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে—তবু মুখ বুজে সব শুনে যাচ্ছে উদয়।

বেলার উৎসাহের যেন শেষ নেই, নতুন জামাগুলি একে-একে সব দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, কোনটি কখন পরবে মিনতি অর্থাৎ ক্ষমা। সব দেখানো হয়ে গেলে বলল, কেমন শেপ হয়েছে বলুন। আহা, মাপের জন্যে যে জামা এনেছিল তার কি ছিরি! বুক-পেট সব সমান। এই দেখুন না—

পুরনো একটা ব্লাউজ আর ব্রেশিয়ার টেনে আনল কাপড়ের গাদা থেকে, মুখের কথা কিন্তু থামেনি—আমি কিন্তু ও মাপে বানাইনি। বুকের নিচে আর পেছনে এমন ফ্যান্ট ক্লাশ প্লিট ছেড়ে দিয়েছি যে, নিচের জামা না পরলেও চলবে। বুঝলেন মশাই, আপনার বিয়ের সব অর্ডার কিন্তু আমাকে দিতে হবে, হ্যাঁ।

কথা শেষ করে বেলা এমনভাবে তাকাল উদয়ের দিকে যেন এখনই ফরমাস পাবে।

এবার, এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম উদয়ের দিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখল বেলা। দেখতে দেখতে স্বগতভাবে বলল—শার্টটা বুঝি রেডিমেড কিনেছেন, কি বিচ্ছিরি কাট—না মাপের। আমি হলে—

বেলার মুখের কথা শেষ হবার আগেই উদয় উঠে দাঁড়াল—চলি।

—ওমা, সে কি কথা! এই তো এলেন, বসুন দাদা। হিটারে জল বসিয়ে দিচ্ছি, পাঁচ মিনিটে চা হয়ে যাবে।

—থাক।

—বারে থাকবে কেন, বসুন না দাদা। একটু গল্প করুন—তারপর, বরযাত্রী গিয়েছিলেন তো, বউ দেখতে কেমন হয়েছে?

বউ-এর কথা উঠতেই উদয়ের মনে পড়ল বৌভাতের কথা মনে পড়ল কুমারের কথা। যে কুমার অর্ধ সত্যের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে বেলার কাছ থেকে। মনে মনে হাসল উদয়, সে ইচ্ছা করলেই পারে কুমারের আসল চেহারা খুলে মেলে দেখিয়ে দিতে—যদি সে বলে যে ফুলশয্যার রাতটা একদিন আগে এসে-ছিল, যদি সে বলে যে বৌভাতের নেমন্তন্নে বেরিয়ে বেলার কথা ভেবেই এখানে এসেছে উদয় তাহলে বেলার মুখের অবস্থা কি দাঁড়াবে! না, বেলার মনের শেষ সান্ত্বনার ঘোরটুকু কেড়ে নেবে না উদয়।

থাক—মিথ্যে হলেও এই সান্ত্বনাটুকু সম্বল করে যদি একটি মেয়ে সুখী হয় তাতে উদয়ের বাদ সাধার দরকার কি?

উদয় ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তার পিছু পিছু বেলাও—বোধহয় দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত মনে বিয়ে বাড়ির অর্ডার-গুলো তামিল করবে।

—দাঁড়ান।

ঘাড় ফিরিয়ে উদয় দেখল কিন্তু ততক্ষণে বেলা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরে ফিরে গেছে। ঘরে এল শাড়ির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে। কুণ্ঠিত হাতে উদয়ের দিকে সেটা এগিয়ে ধরে বলল—কিছু মনে করবেন না দাদা এটা নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।

নিজের পালিশ চকচকে জুতোর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসিতে উদয়ের মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। হাত পেতে সে শাড়ির প্যাকেটটা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল। হরিপদ মুখুজ্যের কথাটাই ঠিক! হয়তো আর একবার সে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করে বেয়াড়া খুশির বাঁকা হাসি হেসে নিয়ে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই কোন সত্যিকার বাজারে মেয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকবে এবং টাকার বদলে শাড়ি দিয়ে তার অঙ্গের বস্ত্র হরণও করবে।

অমলের শোণিত

বীরেন্দ্র দত্ত

অম...ল...। যেন অনেক দূরে থেকে খুব জোরে ডাকার মত একটা চীৎকার হল।

অমলের মনে হল, কে যেন ওর শরীরেরই মধ্যে থেকে ওর নাম ধরে ডেকে উঠল। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। তপ্ত রক্তের স্রোত, যা ওর মাথাকে ভারী ও অনড় করে তুলেছে দুপুর থেকে, দু'চোখের গভীরে অসম্ভব অস্বস্তিকর জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, মনে হ'ল, তার মধ্যেই কেউ যেন 'অমল' এই তিন অক্ষরের অতি পরিচিত এবং প্রিয়তম নামটি চীৎকার করে উচ্চারণ করল। নামটা উচ্চারিত হলেও এ যেন বদ্ধ অবস্থা থেকে আহ্বানের মত শোনাল ওর কাছে।

অমল সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল। অনুভব করল, এই জ্বরের ঘোরে ওর ঠোঁট দুটি একবারও নিজের নামের তিনটি অক্ষরের স্বরে ও শব্দে কাঁপে নি। তবে কে ডাকল? এ যে জ্বরের বিকার নয়, অচৈতন্য ভুল বকে যাওয়া নয় অমল তা নিশ্চিত জানে। তা হলে কে ডাকতে পারে! ঘরে ঢুকে এখনি কেউ কি ডাকল ওকে? পাশের ঘর থেকে সুধা অথবা রান্নাঘর থেকে মা কি?

অদ্ভুত এক আশঙ্কায় অমলের কেন যেন গা ছম্ ছম্ করে উঠল। বড় একা অসহায় মনে হ'ল ওর নিজেকে। অমলের মনে হয়, নিদ্রিত অবস্থায় ও খুব শক্ত আর সাহসী থাকে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কেমন দুর্বল হয়ে যায়। জ্বরের মধ্যে ঘুম ভাঙলে তো কথাই নেই। ওর এখনি মনে হ'ল এপাশ ফিরে ঘরটায় চোখ বুলোলে হয়ত বুঝতে পারবে, বাইরে থেকে ওকে কেউ ডেকেছে কি না। কিন্তু পাশ ফিরতে ভাল লাগছে না। তবু অনুভব করল, ঘরে এই মুহূর্তে কেউ নেই, থাকলেও নিশ্চয়ই সকলে ঘুমোচ্ছে।

তাহলে এমন নাম ধরে ওকে ডাকল কে? এক মুহূর্ত অমল তার চিন্তাস্রোতের এক অলৌকিক শূন্যের মধ্যে ভেসে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ের বিচ্ছিন্নতায় নির্মিত চিন্তার অলৌকিক শূন্যের মধ্যে একটা সরু সুতোর মত হিমেল স্রোত বয়ে গেল শরীরে। মেরুদাঁড়া ধরে ঠান্ডা স্রোতটা শুকনো পাতার শিরা-উপশিরায় চিত্রিত জালের মত শরীরটাকে কঠিনভাবে আবৃত, ভারী ও কম্পিত করল। অণুতম মুহূর্তের অনুভূতি মাত্র। অমল ভয় পেয়ে একটু নড়ে উঠল। আর তারই মধ্যে একটা ঠান্ডা হাত ওর ডান হাতের বগলের ওপর চাপ দিয়ে ধরে থাকল। অমল বুঝতে পারল, ওর মা মাথার কাছে বসে থার্মোমিটার [illegible] জ্বর দেখছে।

এক সময়ে বগল থেকে থার্মোমিটার সরিয়ে মা যখন জ্বর দেখছে খুঁটিয়ে, অমল সারা শরীর নয়, শুধু ঘাড়টাকে পিছনে বাঁকিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। ঘাড়টা এভাবে বাঁকিয়ে রাখায় একটা অল্প ব্যথার মধ্যেও আরাম পাচ্ছে ও।

মা থার্মোমিটার থেকে চোখ সরিয়ে অমলের দিকে তাকাল। 'কিছু বলবি?'

অমল একভাবে মাকে দেখতে লাগল।

মা একটুকাল তাকিয়ে অমলের দিকে ঝুঁকল। 'আমায় কি বলবি? জল খাবি একটু?'

অমল মাথা নেড়ে না বলল। 'তুমি কি একটু আগে আমাকে ডেকেছ?'

'না তো! তুই তো অঘোরে ঘুমোচ্ছিস। আমি তারই মধ্যে জ্বরটা দেখে নিচ্ছিলাম।'

অমলের আবার মুহূর্তের শূন্যতা তৈরী হল চিন্তার মধ্যে। ঘাড় ফিরিয়ে আগের মত বালিশে মুখ গুঁজে শুল। একটু পরে মায়ের নীচু গলার স্বর শুনল —'আর বরফ দিতে হবে না ষষ্ঠীচরণ। আইস ব্যাগে বরফগুলো দিস্ না এখন।' মা উঠে গেল।

মায়ের নিঃশব্দ পদক্ষেপ শুনতে শুনতে অমল বুঝল, ওর জ্বর অনেক নেমেছে। একটু আগে ঘুমোচ্ছিল, না জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারছে না। তবে এখন মনে হচ্ছে ওর জ্ঞান ছিল না তখন, এক ভয়াবহ মৃত্যুর সঙ্গে তার সাক্ষাতের সময় হয়ে আসছিল হয়ত।

অমল এক মুহূর্ত নিজেকে অসহায় ভাবল। মৃত্যুর চিন্তায় সে অসহায়। যখন বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যায়, মা পাশের বাড়ির সুধা, মালতীপিসি, ধীরাবৌদি, ছোট ভাই বকুন, দাদু, দিদিমা, ষষ্ঠীচরণ সব ঘরের মধ্যে থেকেও চুপচাপ ঘুরে বেড়ায়, তখনি অমল ভয় পায়, অসহায় হয়ে চারপাশ দেখে। একটু পরেই হয়ত তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যাবে, মাকে সুধাকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থেকে সে আকাশের রং দেখেছে, সুধার কথা ভেবেছে, অসুখ থেকে সেরে উঠে হৈ-হৈ করে ফুটবল খেলবে ঠিক করে রেখেছে। সব শেষ হয়ে যাবে, অমল তা ভাবতে পারে না। ভাবলেই ভয়ে ভিতরটা কুঁকড়ে যায়, অসহায় হয়ে ওঠে। আর এক অলৌকিক অন্ধকার পাথর শরীরের মধ্যে থেকে চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাষা, শ্রবণশক্তি, বাহুর স্পন্দন, হৃদয়ের শব্দ—সব কিছুকে অক্টোপাশের বেষ্টনীর মত টেনে রাখে। সে ভয়াবহ অবস্থা আজ হয়নি, বা হয়েছিল, অমল জ্বরের ঘোরে বুঝতে পারেনি হয়ত। সে রকম অবস্থা দেখা দিলেই এক এক সময় বাড়িতেই রক্ত দেওয়া হয়েছে তাকে। কই, ঘরের মধ্যে সে রকম কোন সরঞ্জাম নেই তো!

আর একবার ঘরের ভিতরকার পরিবেশ অনুভব করতে করতে অমলের শরীরটা কেমন হাল্‌কা মনে হ'ল। এখন একটু পাশ ফিরলে আরাম হবে। দুর্বল হলেও জ্বর নেই। অমল, জ্বর নেই—এই চিন্তা করতে করতেই চিত হয়ে শুল। দেখল পাশে কেউ নেই। ও ঘরে মা-ই বোধ হয় ফিস ফিস করে কথা বলছে কার সঙ্গে। ভাল লাগছে না অমলের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ঘরের এই শব্দহীন, উদ্বিগ্ন আশঙ্কাহীন আবহাওয়া। ও তো ভাল আছে! মা জোরে কথা বলুক, সুধা খিলখিল করে হেসে উঠুক, দিদিমা তার সঙ্গে সেই পুরনো ঠাট্টা-তামাসা করুক, বকুনটা মাথার চুল জোরে টেনে কেবল বিরক্ত করুক। তা নয়, কেবল মুখ গম্ভীর করে থাকা। আমি তো ভাল আছি।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে এপাশ ফিরে জানালার বাইরে দৃষ্টি রাখল। এই জানালা অমলের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার মধ্যে নির্মিত নিস্তব্ধ দর্পণ। তার বাইশ বছরের জীবনের সব কিছুই নিজের মত করে দেখে এই দর্পণে। এখানে একভাবে শুয়ে থেকে জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলে উঁচু-নীচু বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে একটি ঘন গাছের শীর্ষ দেখতে পায় অমল। গাছের মাথা, একরাশ লাল মদির ফুল, তাকে ঘিরে বিচিত্র বর্ণের আকাশ! এখনকার বিকেলের আকাশ ফুলগুলোর রং গায়ে মেখেছে যেন। অমলের তাই মনে হল। মাঝে মাঝে পাখির শব্দ, ঐটুকু দৃশ্যে বাতাসের বিলম্বিত খেলা করার শব্দ অমল শুনতে পায়। কিছু পাতা ও ফুল বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অমল সেই অজস্র পত্র-পুষ্পের বিচ্ছিন্ন হওয়ার এক সংখ্যাতীত শব্দের মুখরতা শুনতে পায়। শব্দগুলি ওর শরীরের লুকানো রাশি রাশি রক্তকণিকার অবিরাম সংঘর্ষের মত।

অমল একদিন সুধাকে বলেছিল, ও যখন একা বিছানায় শুয়ে থাকে, নিজের রক্তের শব্দ শুনতে পায়। বলেছিল, অসুখে পড়ার প্রথমদিকে হাসপাতালে যখন এক্স-রে করেছিল বুকের, তখন এক্স-রের আলোয় অন্ধকার রক্তকণিকাদের মুখর নৃত্যশব্দ শুনেছিল। সুধা তখন হেসে উঠেছিল। বিশ্বাসই করেনি। সুধার অকারণ হাসিতে সেদিন অমলের খুব রাগ হয়েছিল
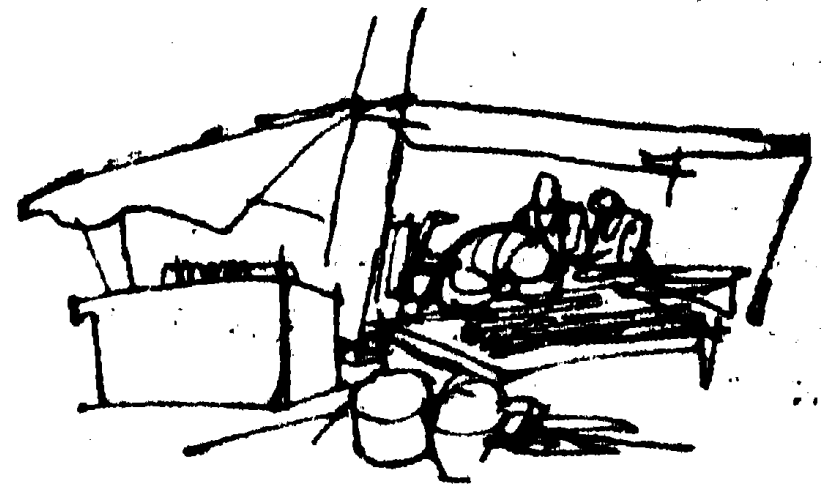
সত্যি, কিন্তু অমল তখন একটুও রাগ করে নি। সুধা হাসলে ভীষণ ভাল লাগে। দাঁতগুলো সমুদ্রজলে ধোয়া শংখের মত পবিত্র। গালের দুপাশে সুন্দর দুটি টোল পড়ে। সহজ, সরল অথচ দামাল দুটি ঢেউ-এর মত মনে হয়েছিল অমলের। হাসির সময় যতক্ষণ অমলের দিকে তাকিয়েছিল, অমলের মনে হয়েছিল সুধার দু'চোখে সমুদ্র, সারা মুখে আকাশের লাবণ্য। অমল মুগ্ধ হয়ে দেখেছিল। তখন মনে হয়েছিল, সুধার মুখমন্ডল বুকে নিয়ে অমল উজ্জ্বল, এক সমুদ্রের আস্বাদ পায়। এ সব ভাবতে ভাবতে অমল অনুভব করত, ওর শরীরে যেন একটুও মাংস, মজ্জা, অস্থি নেই, সব কিছু এক তুমুল রক্তের স্রোত হয়ে গেছে।

মাকেও একদিন বলেছিল অমল। 'জান মা, তুমি এত আস্তে হাঁটো, কেউ বুঝতে পারে না। আমি কিন্তু পারি!'

'কি করে।' মা কৌতুক করে জিজ্ঞেস করেছিল অমলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে।

'আমার রক্তকণিকাগুলোর শব্দের সংগে তোমার চলার শব্দ এক।'

মা প্রথমে বিস্মিত, তার পরে বিষণ্ণ ও শেষে ভীত হয়ে বলেছিল, 'কি সব আজেবাজে চিন্তা করিস।'

'তুমি জান না মা, এই রক্তের স্পন্দন আর শব্দ শুনতে আমার এত ভাল লাগে। যখন ঘরে কেউ থাকে না, তুমিও না, তখন আমি রক্তকণিকাদের শব্দ শুনি। দেখো, আমি ভাল হয়ে উঠলে এদের দিয়ে কি কান্ডটা না করব। এদের নিয়ে বাইরে দারুণ দৌড়ব, খেলব, গান গাইব।' বলতে বলতে উত্তেজনায় অমল হাঁপিয়ে উঠে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মা ভয় পেয়ে গিয়েছিল তখন। ডাক্তারবাবু একটু উত্তেজিত হতে বারণ করেছেন। বোধ হয় জ্বর ছিল তখন। মা কিছু না বলে বিষণ্ণ আর ভীত মুখে অমলের সারা মুখমন্ডলে, মাথায়, বুকে হাত বুলিয়ে সামলাচ্ছিল তখন।

সেদিনের মায়ের মুখ অমলের আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেদিন মায়ের দু'চোখের কোণে ভারী জলের ফোঁটা দেখা দিয়েছিল। আর মায়ের চোখে জল দেখলেই অমল ভয় পায়। রক্তের মধ্যে অবসাদ ও দুর্বলতা ঠেলে ওঠে। মা যে কেন কাঁদে অমল বোঝে না। কই, দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থাকার কষ্টে অমল তো কাঁদে না!

মাকে অমলের অবাক লাগে। মা যে বাড়িতেই আছে, তাদের ভাড়া করা জীর্ণ বাড়িটার এই দোতলার চারখানা ঘরেই ঘুরে বেড়ায়, সহজে বোঝা যায় না। খুব কম কথা বলে, যেটুকু বলে, ফিসফিস করে বলার মত। খুব কমদিনই কাঁদতে দেখেছে মাকে। বাবার বাস দুর্ঘটনায় হঠাৎ মৃত্যুর খবরে মা যে একটুও কাঁদেনি, অমলের তা মনে পড়ে। শুধু ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর মা সারাদিন কাটিয়েছিল। এখন মা মাঝে মাঝেই অমলকে বলে, 'তোকে আমার ভয় হয় অমল!' এই কথাগুলি বললেই মায়ের গলা কাঁপে, কথা ভারী হয়, চোখের সীমারেখা থেকে মণিদুটো চকচক করে। মা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। শুধু এই সময়েই অমল ভয় পায়। মা তার মৃত্যুর কথা ভেবেই কাঁদে। অমল বুঝতে পেরে ভয়ে কেমন ছোট হয়ে যায়। সেই অসহায়তা দুরারোগ্য অসুখের মত ওর বুকে, মুখ, নাক, সব চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে তোলে। অমলের তখন গা ছমছম করে। বড় অসহায় একা মনে হয় নিজেকে।

কথাগুলো মনে হতেই অমল ভয় পেল। মাকে দেখতে চাইল। জানালার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এক এক করে ঘরের সিলিং ও দেয়ালে চোখ রাখল। সেই চুন-বালি খসা দেয়ালে ব্রহ্মার ছবি-দেওয়া ক্যালেন্ডারে চোখ পড়ল। নাভিদেশ থেকে কোন দেবতা যেন জন্ম নিচ্ছে। মা যত্ন করে লক্ষ্মী, কালী আর সৃষ্টিকর্তার কিছু ছবি এই জীর্ণ দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে। আবার পায়ের বালিশ সমেত এপাশ ফিরতেই অমল দেখল, মাথার কাছে সুধা বসে রয়েছে।

'তোমার কষ্ট হচ্ছে!' সুধা জিজ্ঞেস করল।

অমল একভাবে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সুধাকে দেখতে দেখতে ওর অস্তিত্বের ঘ্রাণ নিল। বিকেলের গা-ধোয়ার পর একবার অন্তত ওদের বাড়ি আসবেই। অমলের মাকে ঠাকুরঘরে পাঠিয়ে নিজে অমলের কাছে বসে। সুধা খুব ভালবাসে অমলদের বাড়িকে। সময় পেলেই ওদের বাড়ি এসে বসে থাকে।

সুধাকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'আমার কি খুব জ্বর?'

'এখন নেই, একটু আগে ছিল।'

'ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?'

'সে-ই দুপুরে। আবার সন্ধ্যেবেলায় আসবেন।'

'আজ দু'বার আসবেন কেন?'

'এমনি। এ পাড়ায় কোথায় যেন আসবেন, দেখে যাবেন বলেছেন।'

অমল এখন তাহলে সুস্থ! সুধাকে তার খুব ভাল লাগল। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ উত্তেজিত হল। বিছানায় শুয়ে থাকতে বার বার যে কথা মনে পড়ে, আবার সেই স্মৃতি ঠেলে উঠল মনের মধ্যে। আর পুরনো স্মৃতির ছায়াপাত ঘটলেই অমল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, বিরক্ত হয়। এই অসুস্থতা যেন তার অতীত জীবনের স্মৃতিতে জর্জর হয়ে ওঠে। মৃত্যুকে সে ভয় করে, কিন্তু শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকাকে সে ঘৃণা করে। স্মৃতি আর স্বপ্ন নিয়ে সে এক জায়গায় থাকতে চায় না। হাঁপিয়ে ওঠে তাই এইভাবে একটানা শুয়ে আর ঘুমিয়ে। এখনি সে যদি সুধাকে বুকের মধ্যে বিলীন করে চুমু খেত অজস্র—তবেই বোধ হয় সব পুরনো স্মৃতিকে চুরমার করে দিত। সে যে অসুস্থ নয় বুঝিয়ে দিত।

তখন কত বয়স‌ই বা অমলের। সুধা ফ্রক পরত। মাঝে মাঝে শাড়ি পরার বয়সও হয়েছিল তখন। অমল সে সময়ে কলেজে পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে। কি দারুণ দামাল ছিল অমল—ফুটবলের মাঠে, ক্রিকেটের ব্যাট হাতে, কলেজের ক্লাশে, রাস্তায়, ফুটপাতে, মায়ের কোলে। সেই মস্ত দিনগুলির এক দুপুরে অমল সুধাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরেছিল। খুব জোরে। ওর সারা মুখময় অজস্র চুম্বনে আপ্লুত ও উদ্ভাসিত করেছিল। ঠিক তখন সুধা একটিও কথা বলেনি। অমলের শক্ত দুটি বাহুর মধ্যে সুধা ওর দুটি চোখ বুজিয়ে সন্তর্পিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কি ভীষণ কোমল, আর নিজের মধ্যেই কেমন আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল! অমলের মনে পড়ে সেই মুহূর্তে ওর শরীরের উত্তপ্ত রক্তের প্রতিবিম্ব সুধার দেহের অভ্যন্তরে প্রতিফলিত হতে দেখেছিল। সুধা ওদের বাগানের অনেক ফুল এনে হাতে করে ধরেছিল বলেই প্রস্তুতিহীন এই দুঃসাহসের কাজ করেছিল সেদিন। তারপর ভয়! ভয়টা, সুধা তার কথা সকলকে বলে দেবে ভেবে মোটেই নয়, সুধার সর্বাঙ্গের স্পর্শ অমলকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে সুধাকে দেখলে অমলের মাথা সব কিছুর যেন বিস্মরণ হত। সুধা তা বুঝেছিল বলেই বোধ হয় সহজ সরল নির্বিকারভাবে ওদের বাড়ি আসত, একা একা এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াত, ওদের গাছের ফুল ঘরময় ছড়িয়ে রাখত। মাঝে মাঝে হয়ত আপন মনে কখন অন্যমনস্ক হয়ে যেত! অমলের এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও বার বার ডেকে সাড়া পেত না। আর অমল তখন কি এক বিস্মিত ভয়ে খেলার মাঠে বেরিয়ে যেত। ফুটবলের সঙ্গে নিজেকে রক্তের সম্বন্ধে জড়িয়ে গোধূলির রক্তিম দিগন্তরেখার কাছে বলকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দৌড়ত।

এখন মনে হয়, সেটাই ভালবাসা। অমল সুধাকে বড় ভালবাসে। সুধা কি আজও সেই ভালবাসা দিতে পারে না? অমল সুধার দিকে তাকাল। কত বড় হয়ে গেছে সুধা! হোক, তবু ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে করে অমলের, জড়িয়ে ধরে ওর ভালবাসায় সুধাকে আহত করতে চায়। 'সুধা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ! ফুলের মত দেখাচ্ছে তোমায়। আমার দুহাতের মুঠোয় তুমি তোমার মুখটা একবার ঢাকবে?'

'কি বলছ? জল খাবে?' ... অমলের মুখের ওপর ঝুঁকল।

অমল স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, 'সুধা, আমি কবে ভাল হব?'

'আর কদিন। ডাক্তারবাবু বলেছেন, সামান্য কদিন পরেই একেবারে উঠে বসতে পারবে।' সমস্ত মিথ্যে জেনেও সুধা সেই পুরানো কথাগুলি বলে গেল এক নিঃশ্বাসে।

'বাইরে যেতে দেবে, খেলতে দেবে?'

'ডাক্তারবাবু তো তোমাকেই বলে গেছেন!'

'আমাকে অনেক মিথ্যে কথা বলেন, জানি। আমার অসুখটা কি, তোমাকে বলেন নি?'

সুধা মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'কেন বলবেন না? সাধারণ একটা অসুখ। ওষুধ, ভাল পথ্য খেলেই ভাল হয়ে উঠবে।'

'ভাল হয়ে গেলে আমরা দুজনে আর কোনদিন ঝগড়া করব না। কি বল?' অমল মুখে বিড় বিড় করল। গলায় ঘড় ঘড় শুব্দ হল।

সুধার হাত ধরল অমল। ভারি ভাল লাগছে সুধাকে অমলের। সুধার হাতটা কপালের ওপর থেকে সারা মুখমন্ডলে ঘষতে লাগল অমল। 'তোমার মনে পড়ে সুধা, এই হাতে ভর্তি ফুল আনতে। এখন আনো না কেন? আমি আর কদিন পরে ভাল হয়ে গেলেই আবার আসতে হবে তোমাকে।' মনে মনে উচ্চারণ করতে করতে সুধাকে দেখতে লাগল। সুধার চোখে জল কেন?

'তুমি বেশী নড়াচড়া কোরো না। বেশী কথা বলা, আর আবোল-তাবোল চিন্তা বন্ধ। শুয়ে থাকো, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।' সুধা অমলের তপ্ত কপালে হাত বুলোতে লাগল। একটু পরেই বোধ হয় আবার কপালে জলপটি দিতে হবে।

অমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। এবার মা, নিশ্চয়ই ঠাকুরঘর থেকে বেরুবে: ঠাকুর পুজোর ফুল, বেলপাতা মাথায় ছোঁয়াবে, পুজোর বাতাসা মুখে দেবে। তারপর গরম দুধের বাটি চাকর ষষ্ঠীচরণের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবে সুধার কাছে। নিজে ফলের রস করতে বসবে। সন্ধ্যে হবার আগে মায়ের এই কটি কাজ থাকে। সব শেষ হলে মা অমলের কাছে এসে বসে। মাকে কাছে পেয়ে অমলের ভালও লাগে, কষ্টও হয়। অমল ভাবতে ভাবতে অনুভব করল, ওর বুকে একটা কষ্ট হচ্ছে। কেউ যেন ওকে জোর করে ঘুম পাড়ানোর জন্য মাথার মধ্যে ভারী রক্তের স্রোত জমা করছে। অমল ঘুমোবার চেষ্টা করল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল অমলের। কে যেন ওর ঘুমের মধ্যে শরীরের ভিতরের কয়েকটা সরু মাংসপেশী ধরে নেড়ে দেগ। অমল আচমকা ঘুম ভেঙে বুঝতে পারল তা ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। যেন আর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলেই ওর ভাল ছিল। চারপাশ তাকাল। মনে হল, বাড়ির সকলেই ওর বিছানার চারপাশ ঘিরে বসে আছে। কেন? অমলের সন্দেহ হল। চারপাশ দেখতে দেখতে অমল বুঝতে পারল, ওর চোখ থেকে এখনো ঘুমটা যায় নি। একটু আগে যে স্বপ্নটা দেখছিল তারই রেশ যেন লেগে আছে। সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। অমল রাত্রির তারাভরা আকাশে দ্রুতগতিতে উড়ে চলেছে একটি পাখাওলা ঘোড়ার লেজ ধরে। আর পিছনে একটা ড্রাগনের মত কি যেন তাকে খেতে এসেও ধরতে পারছে না ওদের ওড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এ পর্যন্ত স্বপ্নটা ও বহুবার দেখেছে দারুণ জ্বরের ঘোরে। কিন্তু আজ একটু আগে মনে হচ্ছিল, ড্রাগনের মত জন্তুটা যেন ওকে কামড়ে ধরেছে। সেই জন্যেই কি ঘুম ভেঙে গেল! এতদিন ধরে দেখা স্বপ্নের শেষটা আজ প্রথম দেখল। মা কোথায়? মাকে এ গল্পটা করতে হবে। মা! মা গো! অমল পাশের দিকে তাকাল। মা সামনেই বসে আছে। অমল মাকে দেখল। দেখল, মায়ের পাশে ও পিছনে মালতীপিসি, ধীরা-বৌদি, সুধা ও ষষ্ঠীচরণ—সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে। সুধা বুকুনের হাত ধরে টানছে, কাছে আসতে দিচ্ছে না।

'তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে বাবা?'

'মা, আমি সেই স্বপ্নটা দেখছিলাম। কিন্তু ড্রাগনটা আজ আমাকে কামড়ে ধরেছিল কেন? আমার ভয় করছে মা!'

'কি বলছিস? তুই কিছু খাবি? জল? দুধ?'

মায়ের কথা শুনতে পেল অমল। 'মা, আমি কবে ভাল হবো, বলতে পার?' ভাল হয়ে একবার যদি বাইরে বেরুতে পারি, তোমার কোন অসুবিধে হবে না, কোন দুঃখ থাকবে না, দেখো। মা, আর স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে না। এবার দেখো, সত্যি আমি একদিন ঘোড়ায় উঠে এমন জোরে চালাব, তোমরা অবাক হয়ে যাবে। তুমি জান না, ভোরবেলায় গড়ের মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে কতবার বড় বড় ঘোড়াকে লাইন ধরে যেতে দেখেছি। কি কালো আর শক্ত চেহারার ঘোড়া! ওদের একটা নিয়ে এমন জোরে ছুটব, ঐ ড্রাগন কেন, কেউ আমাকে তখন ধরতে পারবে না। কিছুতেই নয়, কখখনো না।'

'কি বলছিস ভাল করে বল। জল খাবি?'

অমল তাকিয়ে থাকল মায়ের দিকে। 'মা, তুমি বল, ব্রহ্মার নাভি থেকে অনেক দেবতা জন্মেছেন। দেবতাদের গায়ে রক্ত আছে মা? আমার রক্তের মতন? যাদের রক্ত আছে মা, তারা মরে না। আমার শরীরে অনেক রক্ত। আরো কত রক্ত দিয়েছ তোমরা। দেখো, আমি এখন মরব না। মা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না?' অমল এই সামান্য কথাকটি চিন্তা করতে গিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এক রকমের বিরক্তিকর ক্লান্তি অনুভব করল। মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই ভয় পেল। ভিতরটা হিম হয়ে আসছে যেন। অমল ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে না। চোখ বুজিয়ে রক্তের শব্দ শুনতে চাইল। সে জানে না তার কি অসুখ। তবে তার রক্তে কি একটা আছে যা তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দেয়। এটা সে বোঝে। আজ বোধ হয় তা-ই বেড়েছে। রক্ত জমলে কি হয়! রং বদলে যায়! কালো রক্ত! অমল কেঁপে উঠল। অমল কালো রক্তের কথা চিন্তা করতে চায় না। সে কি খুব কাঁপছে? কারা যেন তার শরীরটা ধরেছে। মায়ের হাত আর সুধার হাত অমল চেনে। কিন্তু একি! সমস্ত স্পর্শ যে শীতল ও একাকার হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে অমলের! অমল সত্যিই ক্রমশ ভয়ে ভারী অনড় হয়ে পড়ছে যেন। চোখ বুজিয়ে চারপাশের শঙ্কিত নিস্তব্ধতা অনুভব করতে চেষ্টা করল।

কতক্ষণ পরে ঠিক বুঝতে পারছে না অমল, তবে বড়দার কণ্ঠস্বর কানে এল যেন। বড়দা এখন এখানে এলো কি করে? এমনিতে কাজের চাপে বাড়ি আসা সহজে হয়ে ওঠে না। তার ওপর কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে থাকে। কলকাতার বাইরে চাকরীতে গিয়ে বড়দা এর আগে হঠাৎ বাড়ি এসেছে কোন না কোন টেলিগ্রাম পেয়েই। এবার নিশ্চয়ই কেউ টেলিগ্রাম করেনি। বড়দা নিজের ইচ্ছেয় এসেছে।

'কোন ট্রেনে এলি?' দাদুর কণ্ঠস্বর।

'যেটা ঠিক সন্ধ্যের একটু আগে শিয়ালদায় আসে।' বড়দা থামল। ডাক্তার ডাকা হয়েছে?

'হ্যাঁ, এখুনি আসবেন।'

'রোগটা কি ধরা পড়ল?'

মা কণ্ঠস্বর অনেক নামিয়ে ধমক দেওয়ার মত চেঁচিয়ে উঠল। আস্তে কথা বল, ডাক্তারবাবু অমুর সামনে আলোচনা করতে বারণ করেছেন।'

'মা ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।' ষষ্ঠীচরণ খবর দিল।

'সিঁড়ির আলোটা জেলে দে। সন্ধ্যে হয়ে গেল। সব ঘরের আলোগুলো জেলে রাখ।' মা ফিসফিস করে বলল।

'এখন কেমন?' বড়দা অনেক এগিয়ে এসেছে অমলকে দেখার জন্যে। সঙ্গে মালতীপিসিও। আগের কথার জের টেনেই মালতীপিসি বড়দার যেন কানের কাছে বলল, 'রোগটা লিউকিমিয়া, ব্লাড ক্যান্সার!'

অমল বুকের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে চোখ খুলল হঠাৎ। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। কি যেন হচ্ছে ওর। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে বড় কষ্ট হচ্ছে। খোলা দুটি চোখের তারা ফেটে এখুনি বোধ হয় সারা জীবনের জন্যে সঞ্চিত অশ্রু নিঃশেষে গড়িয়ে পড়বে।

'আলো ফিউজ হয়ে গেল যে, কে ফিউজ করল এ সময়ে!' বাড়িতে গোলমাল উঠল। সকলেই যেন চেঁচাচ্ছে। ব্যস্ত সুধা অমলের জন্যে দুধ গরম করছিল। ডাক্তারবাবুর ভারী জুতোর পদক্ষেপ অন্ধকার সিঁড়িতে কি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল আর দাপাদাপির মত শোনাচ্ছে। ঘরের মধ্যে সবাই ব্যস্ত হল। পুরনো বাড়ির জীর্ণ ইলেকট্রিক লাইন। একবার ফিউজ হলেই যেন সারকিটে ফিউজ তার লাগে। মা জানে। মা তার বহু পুরানো আধ-ভাঙ্গা টিনের বাকসে, যেখানে অমলের ছোটবেলার লাট্টু, গুলি, ছেঁড়া টেনিস বল, কাগজের রঙিন চশমা, ট্রেনের টিকিট, কাঠের ঘোড়া, প্লাসটিকের এরোপ্লেন, ছবি আঁকার রঙের বাকস, পেন্সিল-কাটা ব্লেড ইত্যাদি থাকে, তারই মধ্যে ফিউজ তার রাখে। অন্ধকারে অমলকে ছেড়ে মা উঠে গেল ফিউজ তার সেখানে খুঁজতে।

অমল এই কলরবের অন্ধকার মুহূর্তগুলির মধ্যে তীব্র বেদনায় অনুভব করল, ওর দেহের সমস্ত রক্ত বুক আর মুখমন্ডলে জমে যাচ্ছে যেন। বুকে সুবিশাল বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার মত একটা চাপ তাকে শ্বাসরুদ্ধ করছে। শীত শীত করতেই অমল মাতৃজঠরে শায়িত শিশুর মত কুঁকড়ে গিয়ে হঠাৎ ভীষণ জোরে চীৎকার শুনল। আরো জোরে, আরো, আরো। তারপরেই কে যেন অমলের স্নায়ুর চারপাশে জমে-ওঠা রক্তের অন্ধকারে তীব্র চীৎকারে 'অম...ল...' নামে ডেকে উঠতেই সমস্ত কোলাহল হঠাৎ অনেক অনেক দূরাগত হয়ে আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল।

মুহূর্তে অমলের শরীরের রক্ত আর ঘরের অন্ধকার এক হয়ে গেল।

মোহিনী সুলতা রাজেন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পিছন দিকে জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে যা দেখার মোহিনী ঠিকই দেখে, তবু মাথা ঘোরে না, চোখে শর্ষের ফুল ফোটে না বা দম করে মরে যাবার মত লজ্জাঘেন্না আসে না তার। শুধু হাতের আঙুলগুলো আরও লিকলিকে খসখসে আর মরামাস খুস্কিওঠা দেখায়। চোখ ফিরিয়ে একবার নিজের হাত দুটোই দেখে নেয় সে। অসম্ভব খাড়ি-খাড়ি চেহারার নিজেকে মনে হয় আস্ত বাঁদর, যেন পা তুলতেই ঘুঙুর বাজবে।

ফের দুটোয় চোখ রাখে সে। খুতনিতে পিঁপড়ে সুড়-সুড় করে, এইটুকু যা উপদ্রব। তবে সহ্যশক্তি থাকলে অনেক দূর অব্দি দেখা যাবে। মোহিনীর এখন ফেরার কথা নয়। শুধু এখন কেন, আসানসোল থেকে লরী ফিরতে পুরো দুটো দিন ও একটা রাত্তির লাগার কথা। পাঁচ মাইল যেতে না যেতে হঠাৎ কোত্থেকে সামনে এক হেলেগরুর উদয়, এবং চাপা দেবার পর দেখেছে, শুধু গরু নয় সঙ্গে মানুষও ছিল—দুটি প্রাণীই থেঁৎলে একাকার হয়ে গেছে। গাড়ি পাশের নয়ানজুলিতে কাত হয়ে পড়ে আছে। কাছেই একটা চটি মত বাজার ছিল। সুতরাং মোহিনীর কপাল কেটেছে। চোয়াল টেঁসে গেছে। সারা শরীর থ্যাৎলানো তো বটেই; দারুণ জ্বরভাবও রয়েছে। আচমকা দৌড়ে পালিয়ে বেঁচেছে সে।

কিন্তু সত্যি কি পালিয়ে বাঁচা যায়। বাঁচা মানে তো জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আকাশভরা রোদে যেমন জীবনের সুখ ছড়ানো, সেই জীবনের ভিতরও আশা-আকাঙ্ক্ষা তেমনি ব্যাপক। নিতান্ত লুকোচুরির ছলে নেপথ্য থেকে মঞ্চে উঁকি মারতে গিয়ে মোহিনী দেখে জীবনটা হঠাৎ বড় বেশী ফাঁকা। অর্থাৎ আকাশে শুধু নীলই দেখছিল এযাবৎ; শূন্যতাটা লক্ষ্য করে নি।

খাটে ডাঁইকরা বালিশ। সেখানে হেলান দিয়ে বড় আরামে আছে রাজেন। বিছানাতেই চায়ের কাপ, খাবারের প্লেট জলের গ্লাসটা কেন যে পড়ে যাচ্ছে না, তাই আশ্চর্য।

পায়ের দিকে সুলতা বসেছে। কপালে দারুণ টিপ, এলানো খোঁপা; বুকের উপর দিকটায় সরু চেন চিকমিক করছে। কাপড় পরে কাল ব্লাউজে টান টান মাংসের ভাঁজ খুব বেশী প্রকট—ইচ্ছাকৃত কিংবা অলক্ষ্যে, মোহিনী জানে না আপাতত। সুলতার একটা পা মাটি ছোঁওয়া অন্যটা ঝুলছে। জানু দুটোর উপর কাপড় আরও টান-টান মনে হচ্ছে। এই সকালে ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা নরম ছায়ায় সুলতার শরীর রেডিয়ামের মত তাপ বিকীরণ করছে এবং হারামজাদা রাজেন বেশ আরামে বসে খোসগল্প জুড়েছে।

জানালার বাইরে এদিকটায় যেখানে মোহিনী দাঁড়িয়েছে এক টুকরো সব্জীক্ষেত। সব্জীগুলো যদিও এ শরতে অসম্ভব সবুজ হয়ে আছে, কথামত পরিচর্যার অভাবে বেশ জংলী দেখায়। এলোমেলো ঝাকড়মাকড় আগাছার সঙ্গে তারা একাকার। গেরস্থ কিশোরী শিমলতার সঙ্গে বুনো শিম যেন বা সরীসৃপের মত গা-জড়াজড়ি করে মিথুনলিপ্ত। ঢ্যাঁড়সের খসখসে গায়ে হাতিশুঁড়োর ঢলাঢলি। বড় সাধের চিকনকোমল লাউলতাকে পিষেছে বুনো আলুর ঢ্যামনা সাপের মত কুঞ্চিত গতর। ঝিংয়ের সঙ্গে তেলাকুচো আর বিষাক্ত ধুদুল। ঠিক সহবস্থান নয়, ধর্ষণ। মাঝেমাঝে অজস্র রং-বেরংয়ের দোপাটি ফুল গাঁদা ফুল আর জিনিয়া ফুটেছে। ভালবাসার ভান—মোহিনীর মনে হয়, এগুলো ভালোবাসার ফাঁদ। ঘাসফড়িং উড়ছে। বুলবুলি ফিঙে, শালিক দু-চারটে ঘোরাঘুরি করছে। নীচে কোথাও ফাঁকা ভিজে মাটিতে—যেখানে ঘাস গজায় নি ঘনছায়ায়, গুটিকয় ছাতারে পাখি হল্লা করছে। প্রজাপতি উড়ছে। গাংফড়িং উড়ছে। চিরোল ঘাসের পাতায় লালপোকা নীলপোকা হাঁটছে। কাছেই মাচানের ওপর একটা লাউডগা সাপকে শুয়ে থাকতে দেখে মোহিনী। আরামে শুয়ে ব্যাটা যেন দেখছে মোহিনীকে। ভারী জ্বলজ্বলে নীল চোখ। কেন মোহিনীর হঠাৎ হাসি পায়। মনে বলে, দাঁড়া, মজাটা টের পাওয়াচ্ছি। লিকলিকে আঙুল দুমড়ে কিল দেখায় সাপটার দিকে। সাপটা শুয়েই থাকে। মোহিনীর পায়ের কাছে ঝুরঝুর করে মাটি খসার শব্দ হয়। সে দেখে দেয়ালের ভিতে ইঁদুরেরা মাটি জড়ো করেছে। খুব পুরনো এই একতলা দালান। মোহিনীর ঠাকুর্দার পয়সার তৈরী। ঠাকুর্দার ছেলেটা ছিল বাউণ্ডুলে গোছের। গাঁজা খেত। জমিজমা কল্কেয় নাকি পুড়ে গেছে। মোহিনী তখন ছেলেমানুষ। আজকাল মোহিনীর মনে হয়, মদ খেয়ে মানুষ ফতুর হয়—গাঁজা খেয়ে ফতুর হবে কেন? গাঁজার সঙ্গে নিশ্চয় কিছু ছিল। মেয়েমানুষ? আলবাৎ। গাঁজা আর মেয়েমানুষ—থুড়ি, পদ্য করতে দোষ নেই, গাঁজা আর বাঁজা মেয়েমানুষ। তবে সেই এক রকম ভালো। কোন দায় ঝঞ্ঝাট থাকল না। অবশ্যি তাঁর বৌ, সাক্ষীগোপাল মেয়েমানুষ যেটা ছিল, অর্থাৎ মোহিনীর মা সে বাঁজা ছিল না—তার প্রমাণ মোহিনী। মোহিনী আকাশ থেকে পড়ে নি বা পথ থেকে কুড়োন নয়। কিন্তু এটা নিতান্ত বিশ্বাস ছাড়া কী? মোহিনীর চেহারা তার মা বা বাবা কারুর মত নয়। কেবল চোখ দুটো বরাবর লালচে—একটু ঘোলাটে। তা বলে চোখের দৃষ্টিতে কোন খুঁত ধরা পড়ে নি আজ অব্দি শুধু চোখের লালচে ভাব, ঝিমুনি ইত্যাদি মাঝে মাঝে নাকাল করে মোহিনীকে। তার ড্রাইভার হওয়া উচিত হয় নি।

ধুস্, শালা! হঠাৎ সাত-পাঁচ ভাবনা গা থেকে পোকা ঝাড়বার মত ঝেড়ে ফেলে ফের ঘুলঘুলিতে চোখ রাখে সে। দেখে সুলতার হাত ধরে টেনে [illegible] নিচ্ছে রাজেন। সুলতা, এই কী হচ্ছে বলে, শেষ অব্দি কাছেই যাচ্ছে। ডাঁইকরা বালিশে দুটিতে পাশাপাশি হচ্ছে। তারপর রাজেন তার রোদেপোড়া মুষলের মত উস্কোখুস্কো ঠ্যাঙটা সুলতার কলাগাছের গুঁড়ির মত ড্যাডসে জানুতে চাপিয়ে দিয়েছে। বিপজ্জনকভাবে কাপড় সরে যাচ্ছে সুলতার।

আর রাজেন গলার আংটিপরা মোটা আঙুলে ওর গলার খাঁজ আর ঠোঁট যেন ইঁদুরের মত কাটছে। গালে গাল ঠেকেছে দুজনের। সুলতার চোখটা অবশ্যি এ-দিকেই। ঘুলঘুলির দিকেই যেন। বড় বড় শান্ত চোখ। গভীর চাহনি। মোহিনীর চোখটিকে দেখতে পাচ্ছে সে? নাঃ, তাহলে তো এরকম ঘটতে থাকত না। আস্তে আস্তে বুকের কাপড় কোমর থেকে নেমে যাওয়া।

শ্লে শালা! ঘুলঘুলিতে ইঁদুর। চোখে তার গোলাপীঠোঁটের ধাক্‌কাও লাগে যেন। মোহিনী চোখ সরিয়ে নেয়। নির্ভীক ইঁদুরটা সুড়ঙ্গে স্থির হয়ে থাকে। নড়ে না। এ এক উপদ্রব। নীচে থেকে একটা শুকনো ডাল খুঁজে নিয়ে খুঁচিয়ে দিতে যায় মোহিনী। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে ওঠে তার। কপালের টাটকা ঘায়ে যে রক্ত জমে-ছিল এতক্ষণ জানালার রডে ঘেঁষে থেঁৎলে গেছে। তাই ফের রক্ত উপচে আসে। চোখ ঢেকে যেতে থাকে। হাত দিয়ে চেপে ধরে মোহিনী। সারা মুখে রক্ত নিয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। মনে পড়ে না, ওরা কি তাকে কোন রড দিয়ে মেরেছিল নাকি ঘুঁষি? কিলচড় অবশ্যি বেদম পড়ছিল। মাঝখানে হঠাৎ কোন সজ্জন এসে পড়ে একটুখানি বিরতি, ভীড়টাও ক্লান্ত, যার ফলে আচমকা দৌড়ে পালিয়েছিল সে। পালাতে পারত না। তবে দুটো ব্যাপার ওকে তখন সাহায্য করেছে। মৃত্যুভয়ে মরীয়া হতে পারা এবং হঠাৎ সামনে ইসমাইলের ট্রাক এসে পড়া। এক ড্রাইভার আর এক বিপন্ন ড্রাইভারকে মদদ্‌ দিয়েছে। কেবল হাটু আর রামভকতের জন্যে ভাবনা হয়। তারা কি পালাতে পেরেছে? বেচারাদের এক দঙ্গল করে পুষি।

রোদ কড়া লাগে। ছায়ার দিকে সরে এসে ঘন সবুজ ঘাসের উপর মোহিনী এবার শুয়ে পড়ে। নীচে মাটি স্যাঁতসেতে। তবে ঘাস পুরু থাকায় তার অস্বস্তি লাগে না। নিজের বাগানে চিৎ হয়ে শুয়ে মোহিনী ওপরে লতাপাতার ফোঁকর দিয়ে আকাশ দেখতে থাকে। তার সামনে পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে আগাছা আর দোপাটির ঝাড়। খুব কাছে না এলে দেখা যাবে না যে এখানে কেউ শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে প্রচন্ড অভিমান মোহিনীকে জ্বালাতন করতে থাকে। মোহিনী জীবনে কাঁদতে পারে নি। এখন মনে হয়, কাঁদতে জানা খুব সুখের ব্যাপার। অথচ কান্না আসে না। অভিমান তাকে গলাতে পারে না। বরং কুটকুট করে পোকার মত দাঁতে কুটে খায়। এ অভিমান তাকে নিস্পৃহ করে তোলে। সে চুপিচুপি শ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলে, এই তো ব্যাপার? কী হবে? নিষ্ফল মুঠো ঘাসের পরে ভেঙে পড়ে তার। আস্তে আস্তে চোখ বোজে সে। তার কানের ডগায়, গালে, জামার কলারে পিঁপড়ের সারি চলতে থাকে। মগজ লক্ষ্য করে হাঁটে। বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে সে। বুকের ওপর গিরগিটি হেঁটে যায় নির্ভয়ে দোপাটি খসে পড়ে। তারপর ক্রমশ মনে হয়, চারপাশে উপরে নীচে সব সবুজ পুড়ে যাচ্ছে। আগুন জ্বলছে। মোহিনী পুড়ে যাওয়ার সুখে চোখ খোলে না।

বড় আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল মোহিনী। চোখ খুলে প্রথমে সে অবাক হয়। তার সারা শরীর জ্বালা করে। কান সুড়-সুড় করে। আর প্রচন্ড শীতবোধে আড়ষ্ট মোহিনী বুঝতে পারে, এখন থেকে কেবল ছায়া তাকে যত্নে ঘিরে রেখেছে। আশেপাশে কিছু উজ্জ্বল রোদ। তা সত্ত্বেও সে রোদের স্পর্শ পায় নি—কারণ ছায়ারই কারচুপি। রোদ আর ছায়া তাকে নিয়ে বাজী ধরেছিল। ছায়ার কব্জির বড় জোর—শিকার ছাড়ে নি।

আস্তে আস্তে ওঠে মোহিনী। তার মনে পড়ে যায়, কখন যেন দু-চারবার ঘুমের মধ্যে হেঁটে (এই দিবালোকে) ওই ঘুল-ঘুলিতে চোখ রেখেছিল ফের। দেখেছিল সুলতা আর রাজেন জড়াজড়ি এই সব উদ্ভিদের মত শুয়ে আছে। ঘরের ভিতর বদ্ধতায় তাদের বেশ ভিজে দেখাচ্ছিল। মোহিনী জানতে পারে, নীচের এই মাটিটা —যাতে আমরা শুয়ে থাকি, তা জীব-জগতের নিজস্ব জিনিস এবং স্যাঁতসেতে সতত। জঠরের মত ভিজে। এই ভিজে ভাবটি থেকেই যা কিছু গজায়—ফুল বা ফোঁড়া। দোপাটির মত স্থির নিঃঝুম উদ্ভিদের ফুলগুলো চারপাশে ফোঁড়ার মত দেখাচ্ছে। অজস্র টাটকা ও বাসি ক্ষত-রাশির বিশুদ্ধ ও পচা রক্তে হাত বুলোতে বুলোতে মোহিনী কঁপা হাঁটে। দু-একটা পাতা ছিঁড়ে নেয়। দাঁতে কাটে। ফের হাঁটে। তার চোখের সামনে একটু করে অন্যান্য জিনিস অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যক্ত হতে থাকে—কেবল এইকব ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে স্যাঁতসেতে মাটিতে পড়ে থাকা জড়া-জড়ি শরীরগুলি সে লক্ষ্য করতে পারে। তার দুটো চোখ ক্রমশ ঘুলঘুলি হতে থাকে। দু'হাতে চোখ কচলে মোহিনী চলে। বাগানের এপাশে রাংচিতা বেড়ার সামনে এসে একবার দাঁড়ায়। শ্যাওলা-ধরা পুরনো পৈতৃক বাড়িটা পিছন ফিরে একবার দেখতে সাধ যায়। কিন্তু ঘুলঘুলি ছাড়া আর কিছু প্রবেশপথ না পেয়ে এবং রাজেন ও সুলতার আলিঙ্গন ব্যতিরেকে ভিন্ন কিছু না জেনে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হঠাৎ তার বুক কেঁপে ওঠে। তার ধারণা হয়, বুকের ভিতর দীর্ঘ সময় সে দুটো মড়াকে জায়গা দিয়েছে এবং নিজে চিতার মত জ্বলছে। চিতার আগুন উস্কে দিয়ে মড়া দুটোকে নিকেশ করার কাকুতি হয় মোহিনীর। আগুন বড় নিষ্প্রভ। বড় ঠান্ডা বাতাস বইছে। কাঠ ভিজে মাটি স্যাঁতসেতে। মোহিনী অসহায় ডোমের মত স[illegible] থাকে। লম্বা পা বাড়িয়ে বেড়া পেরোতে যায়। যাবার পথে ছোট ছোট কাঁটা দিয়ে যত্ন-রোপিত ক্যাকটাসের সারি তাকে আঁচড়ে দেয়। খাকি প্যান্টে পা দুটো ঢাকা, ক্যাম্বিসের জুতো—রক্ত ঝরার সুযোগ নেই। কিন্তু তার মনে হয়, তার পোশাক-আশাক থেকেও যথেষ্ট রক্ত ঝড়ে পড়ছে এবং পিঠের দিকে শার্ট ভীষণ ভিজে—শার্টটা মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ যাবৎ কেঁদেছে মনে হয়। লাল চোখে মোহিনী তাকায়। ঘুলঘুলি দেখে ফের। সে সেই রেজারী-

কক্ষের সেন্ট্রির মত গাড়োয়ালী ইঁদুরটা খোঁজে অনেক কষ্টের পর ইঁদুর তাকে চার্জ করে : হল্ট! হুকুমদার! এবং মোহিনী একটু হেসে বলে ওঠে : দোস্ত।

এবার হাল্কা মনে ইঁদুরটা সামনে রেখে মোহিনী পাশ কাটায়। নির্জন পীচের পথে চলতে থাকে। দুপাশে হাউসিং এস্টেটের বড় বড় নির্মীয়মান বাড়ির ছায়া পথের দিকে চলেছে। বাড়িগুলোর প্রতিকৃতি জড়িয়ে বাড়িগুলোকে অপমান করবার সাধে সে হাঁটে। বাড়িগুলো তার কাছে অসম্ভব অপ্রয়োজনীয় ঠেকে। সে তাদের কথা খুঁটিয়ে চিন্তা করে। সে জেনে ফেলে, তাদের পিছনে অজস্র ব্যাপার রয়ে গেছে। তাদের ভিত্তির মাটি কেটেছিল যারা, তাদেরও অজস্র ব্যাপার রয়েছে। ইঁটের জন্যে মাটি লেগেছিল। ইঁট পোড়ানো হয়েছিল। বয়ে আনা হয়েছিল। লোহালক্কর চুন সুরকি স্টোনচিপস্ সিমেন্ট—কন্ট্রাক্টর ওভারসীয়ার হাউসিং কমিটি রাজমিস্ত্রী মজুর... অজস্র ব্যাপার তার সামনে আসতে থাকে। এক অখণ্ড যোগসূত্রে কয়েক লক্ষ মানুষকে বাড়িগুলো বেঁধেছে। কয়েক লক্ষ মানুষের ভাবনা শ্রম সাধ উদরপূর্তি বেঁচে থাকা এবং মৈথুনের ইচ্ছা থেকে তাদের অস্তিত্ব। অথচ পলকে, চোখের একটি আকস্মিক দৃষ্টিপাতে—যদি না কেউ অন্ধ হয়, যদি না ওই গাড়োয়ালী ইঁদুরে সেন্ট্রির উপদ্রব থাকে, এত উঁচু সব নিঃশব্দ বাড়ি অর্থহীন আর অপ্রয়োজনীয় হয়ে চিৎকারে ফেটে পড়ে। মোহিনী জানতে পারে, এ পৃথিবীর সব ঘরবাড়িকে পলকে ভূমিস্যাৎ করতে একটা ঘুলঘুলিই যথেষ্ট সুলতা ও রাজেনের জড়াজড়ি শরীর কেন্দ্র করেই সব ঘরবাড়ি খাড়া হয়েছিল। মোহিনী একটু কেশে মনে মনে বলে, যদি একথায় তোমার আপত্তি থাকে, তো বলতে চাই...মিষ্টি করে শুদ্ধ করে শিশুসুলভ ভাষ্যে একে বলি প্রেম-ভালোবাসা...হ্যাঁ, পরস্পরকে ভালোবাসা মাত্র। সুলতার রাজেনকে ভাল লেগেছে, আমাকে লাগে নি। এই যথেষ্ট। তবে আইন... আইনের ব্যাপার একটা আছে (মোহিনী মাথা চুলকায়) আইনটা কিছু নয়। আইন এরকম করা যেতে পারে : দেখুন (কোন মহিলাকে) আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, আপনারও যদি তা লেগে থাকে, আসুন, আমরা ঘরবাড়িতে যাই মৈথুনে লিপ্ত হতে। আর দেখুন ম্যাডাম, ওই ঘুলঘুলিটা বন্ধ না করে জানালাই খুলে দিন বরং। দরজাও খোলা রাখতে পারেন। তবে ঘরবাড়িটা বিশেষ জরুরী। কারণ মানুষ বিছানায় শুতে অভ্যস্ত। নগ্ন মাটি হোক বা ঘাসে ঢাকাই হোক, তা সব সময় ভিজে আর স্যাঁতসেঁতে। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে শোয়াটা বেশ আরামদায়ক; কারণ হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ শুতে অভ্যস্ত। সে দাঁড়িয়ে থেকে প্রেমের নিষ্পত্তি করতে পারে না। মোহিনী খকখক করে হাসে। তার মনে পড়ে যায়, চমনলাল ট্রান্সপোর্টের রাজেশ ড্রাইভার তাকে একদিন বলেছিল, আবে শালা, স্টীয়ারিং তেরা হাতমে হ্যায়, পাকাড় লেগা কৌন? চালা, জোরসে চালা, ব্যায়াসা দিল চাহে। হ্যাঁ, স্টীয়ারিং হাতেই রয়েছে, অ্যাকসিলেটর পায়ের নীচে। স্পীডোমিটার সামনে। স্পীড লক্ষ্য কর। রাজেশ বলেছিল, উওলোগ সব রকেটবাগারা বানাতা। কহতা হ্যায়, সায়েন্স মেরা হাতমে হ্যায়! তো মেরে দোস্ত, দেখো, সায়েন্স, কাঁহা কিস্‌কা হাতমে হ্যায়! বোতামই বলো, আর স্টীয়ারিং বলো, তুমি, মোহিনী ব্যাটাই আসল লোক। তুমি শালা বোতাম টিপলে জাপানে বোমা পড়ে। তুমি শালা চুপসে বসে স্টীয়ারিংটা একটু ঘোরালেই বাস!...... সুতরাং, ইয়ার, মৌজসে রও চুপচাপ। সব ঠিক হ্যায়।

সব ঠিক হ্যায়। মোহিনী খুশি হয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে। হাঁটতে থাকে। নিজের হাত দুটোর প্রতি গর্বে বুক ফুলিয়ে সে চলতে থাকে। চমনলালের গ্যারেজে পৌঁছতেই কয়েকজন তাকে ঘিরে ধরে। মোহিনী হাত নেড়ে বলে, সব ঠিক হ্যায়। চমনলালের সামনে গেলে সে হাতের ইসারায় বসতে বলে মোহিনীকে। মোহিনী একটা চেয়ার টেনে গদীর একপাশে বসে। একটু পরে সে বলে, গাড়ি পাঁচ মাইলে পড়ে আছে।

চমনলাল বলে, খবর সব মিলা। দুসরি গাড়ি লো। অভি জানা পড়ে গা। বহত্ জরুরী।

মোহিনী শুধু একটু হাসে।

ক্যা? কৈ জখম-উখম হুয়া?

নেহী। মামুলী। হাম ঠিক হ্যায়। লেকিন, ফির কুছ অ্যাকসিডেন্ট হোনেসে? মোহিনী জোর হাসে।

ফির্ ঔর এক গাড়ি দে দেগা!

ফির অ্যাকসিডেন্ট হোনেসে?

ফির্ ঔর এক মিল জায়েগা। চমনলালও হাসে। যেতনা হোগা, হো যানে দো না ভাই। তুম শেকোসে কিয়া নেহী?

জরুর।

তব উঠো, কুছ খা লিয়া?

নেহী।

তো খা লো। এ বুধিয়া, বাবুকো কুছ খিলাও।

চিবিয়ে চিবিয়ে মাংসের হাড়শুদ্ধ খায় মোহিনী। বেড়ালের মত মুখ করে খায়। খেয়ে ঢেঁকুর তোলে। সিগ্রেট ধরায়। তারপর বলে, বাড়ি হয়ে যাবো।

চমনলাল বলে, ঠিক হ্যায়। গাড়ি লেকে যাও। লেকিন এক বাত...জাস্তি কুছ না পিও। হাতের ইশারা করে সে পানের মাপ দেখায়।...... থোড়িয়ে পিও। গেট ইউরসেলফ্ রিলাক্সড্।

পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে মোহিনী হনহন করে বাড়ি ঢোকে। সুলতা দরজা খুলে অবাক হয়। শান্ত হেসে বলে, এত শীগগীর ফিরলে যে! পরক্ষণে চমকায়।..... তোমার কপালে কী?

দরজা নিজেই বন্ধ করে সুলতার একটা হাত ধরে উঠোন পেরোতে থাকে মোহিনী। বলে, অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল। জোর বেঁচে গেছি।

গায়ের তাপ বুঝতে পেরে সুলতা বলে, একি! তোমার জ্বর। ইস্ গা পুড়ে যাচ্ছে সে।

ও কিছু না, বলে মোহিনী ওকে টেনে বিছানায় বসে পড়ে। পা দুটো ঝুলিয়ে দেয়। জুতো খোলে। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে দুহাতে।

সুলতা বলে, শোও, শুয়ে পড় চুপচাপ। তারপর ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। উঠে দাঁড়ায়।... গরম জল করে দিই। হাত মুখ ধুয়ে নাও। কপালে কী লাগিয়েছ?

কিচ্ছু না।

সে কি! দাঁড়াও, ডেটল আনি। এক, তুমি এস এখানে।

সুলতা কথা শোনে না। তক্তপোষের নীচে থেকে বেতের প্যাটরা থেকে পুরনো কাপড় ছিঁড়ে নেয়। তারপর ডেটল আর তুলোর প্যাড নিয়ে আসে—জানালার পাশে রাখা একটা কাঠের টব থেকে। কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে একটু হেসে সে বলে—ওই মদ খাওয়াই তোমার কাল হবে, বলে দিচ্ছি। ছিঃ, গাড়ি অনেকেই চালায়। সবাই কি তোমার মত মদ খায়?

মোহিনী চোখ বুঁজে বলে, খায় না।

অ্যাকসিডেন্ট হল কেমন করে?

হয়ে গেল।

লাফিয়ে পড়েছিলে?

হ্যাঁ।

কেউ চাপা পড়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

মানুষটানুষ নয়তো?

সুলতার 'মানুষটানুষ' কথাটা শুনতে কেমন লাগে মোহিনীর। সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, একটা বলদও ছিল।

বলদ?

হ্যাঁ। যা ষাঁড় নয়।

সুলতা মুখ ফিরিয়ে বলে, অসভ্য। নাও, চুপচাপ শুয়ে পড়। গায়ে জ্বর, কী খাবে?

মোহিনী একটু হেলান দিয়ে বলে, খাবো না। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি? সুলতা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। ফের গাড়ি? কোথায় যাবে?

আসানসোল।

কথাটা মোহিনী এমনভাবে উচ্চরণ করে যেন এক ইস্পাতের নলের মধ্যে শাঁই শাঁই করে বুলেট ছুটে গিয়ে কোথাও শক্ত দেয়ালে প্রতিহত হয়। শুধু প্রতিহত নয়, প্রতিধ্বনিতও হয়। তারপর নিজেই অবাক হয়ে যায়। কী বলল সে? কোথায় এ কথাটা কাকে নিয়ে যায়? কী অর্থে পৌঁছে দেয়? তার এই বাড়ি আর 'আসানসোলের' উচ্চারণ দুয়ে কোন ফারাক করতে পারে না সে। কী উদ্ভট লাগল শব্দটা। গস্তব্যটা।

আসানসোল? সে কোথা?

আছে। বলছি যখন, নিশ্চয় আছে কোথাও। মোহিনী জবাব দেয়।

এর আগে গেছ কখনও?

কী জানি! চমনভাই জানে।

জ্বরের ঘোরে বকছ। শোও। মাথা টিপে দিই।

সুলতা ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় এবার। পেটের চাপ মোহিনীর কোমরের পাশের হাড়ে লাগে। নরম কিন্তু টাইট ব্লাডার মনে হয় মোহিনী ওকে জড়ায়। বলে, স্নান করনি আজ?

সুলতা উঁচু থেকে ওকে দেখতে-দেখতে বলে, করেছি।

কী রান্না করেছিলে?

কী করব? তুমি নেই। শুধু আলু-ভাতে আর ডালসেদ্ধ। হঠাৎ গালটা মোহিনীর কপালের ব্যান্ডেজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে কোথাও রেখে সুলতা ফের বলে, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে এসো। কে আছে ওখানে?

দুজন আছে।

ওদের বলে দাও, যাওয়া হবে না।

পাগল?

তবে আমিই বলে আসছি।

যাবে, দাঁড়াও।

বলো।

আমার কাছে একবার শোবে?

সুলতা জোর হাসে।...এমন করে বললে কেন...যাও! কই, সরো, শুতে দাও।

সুলতা শুলে মোহিনী অবিকল শুনতে পায় বাইরে পথের ওপর স্টার্ট-দেওয়া গাড়ির গর-গর শব্দ। শুয়ে-শুয়েই এখান থেকে তার ঝাঁকুনি গায় টের পায় সে, এবং বলে, বেশ আরাম লাগে মাইরি। এখন শুয়ে থাকা গেলে কেমন ভালো হত...কিন্তু যাবে না। চমনভাই আর শালা তার গাড়ি, আর হারামজাদা ওই আসানসোল...সব শালা...খচ্চর মুখের সামনে থেকে খাবারের থালা কেড়ে নেওয়া। রোস। দেখাচ্ছি মজা। আমি বাবা মোহিনী ড্রাইভার। মেরা হাতমে স্টীয়ারিং। থোড়াসে ডাহিনা কী বাঁও...বাস।

তুমি ভুল বকছ। মাথায় জল ঢালবে, চলো।

রাখো ইয়ার। আভি চুপসে শো যাও। মৌজমে রও।

ছাড়ো। মাথায় জলপটি দিই।

মোহিনী এবার সুলতার কোমরের কাছে হাত দিয়ে টানতে থাকে।

সন্ধ্যার দিকে রাজেন এসে একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। সুলতাকে শুয়ে থাকতে দেখে সে বলে, কী ব্যাপার?

সুলতা প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় থেকেই জবাব দেয়। নিজেকে ঢাকে না। সে বলে, শুয়ে আছি।

ওকি! ঠোঁট ফাটল কিসে?

শুধু ঠোঁট না। সুলতা কেমন হাসে। তারপর গলার খাঁজ, বুক, নাভির কাছটা, সর্বশরীরে আঙুল ছুঁইয়ে ক্ষতচিহ্ন দেখায়।

রাজেন অবাক হয়ে বলে, কেন?

ও এসেছিল।

মেরেছে এমনি করে? রাজেন দাঁতে-দাঁত চেপে বলে। কাউন্ড্রেল!

সুলতা ওর হাত ধরে টানে। বলে, না। মারে নি। বিছানায় শুয়ে মারামারি হয় না।

রাজেন সপ্রেম অথচ ব্যঙ্গ করে বলে, তাহলে আদর করেছে?

হ্যাঁ। স্বামীরা যা করে।

সব স্বামীই অমন হারামজাদা নয়।

যেমন তুমি।

রাজেন একটু হেসে বলে, অবশ্য আমি তোমার স্বামী নই। প্রেমিক।

অন্য একজনের স্বামী তো!

এই বলে সুলতা একটু সরে যায় জায়গা দিতে। ফের বলে, আমার কাছে যারা শোয়, তারা এক রকমই। এস, শোবে নাকি? কই, এস। অভিমান হল বুঝি? সোনা, মানিক, এস!

সুলতাকে স্ত্রীলোক জেনেই রাজেন শুতে যায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

২য় সংখ্যা
মূল্য

Friday, 15th May 1970. শুক্রবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়

চিঠিপত্র

ডিপ্লোম্যাট

আমি আপনাদের বহুলে প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত অনুরাগী পাঠক। এই পত্রিকাটি আমার অতি প্রিয় এবং প্রতি সপ্তাহে এই বইটি পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। এই পত্রিকাটি আমার ভাল লাগে, কারণ বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে অমৃততে যে বিভিন্ন রচনা এবং নতুন নতুন গল্প উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়, সেটা তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমি এইমাত্র এই সপ্তাহের 'অমৃত' শেষ করলাম। এতে নিমাই ভট্টাচার্য এর লেখা উপন্যাস 'ডিপ্লোম্যাট'-এর শেষ পর্ব পড়লাম। সাধারণতঃ আমরা যে ধরনের উপন্যাস পড়তে অভ্যস্ত সেইসব গতানুগতিক উপন্যাসের থেকে এর কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এই উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ একটা গতি ও আকর্ষণ ছিল। লেখক যেভাবে তাঁর অপূর্ব লেখনীর দ্বারা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই অপূর্ব। বহুদিন পর এই রকম একটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস পড়ে খুব ভাল লাগল। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও 'অমৃত' এই ধরনের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস পাঠক সাধারণকে উপহার দিয়ে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধারা অব্যাহত রাখবে। লেখককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানালে বাধিত হব।

প্রশান্তকুমার দাস
সাহাভড়ং বাজার, মেদিনীপুর।

(২)

আমি আপনাদের বহুলে প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর একজন নিয়মিত অনুরাগী পাঠক। এই পত্রিকাটি আমার অতিপ্রিয়। এর প্রতিটি গল্প, ফিচার এবং উপন্যাস আমার অতিপ্রিয় এবং পড়তে খুব ভাল লাগে। বর্তমানে নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা ধারাবাহিক উপন্যাস 'ডিপ্লোম্যাট' আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। অনেক দিন পর আমরা সাধারণত যে ধরনের উপন্যাস পড়তে অভ্যস্ত সেই সব গতানুগতিক উপন্যাসের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি উপন্যাস উপহার দিয়ে 'অমৃত' তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা আর একবার প্রমাণ করল। লেখক যেভাবে তাঁর অপূর্ব লেখনীর দ্বারা এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসের মধ্যে বেশ কিছুটা নতুনত্ব রয়েছে যা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। লেখককে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সঙ্গে-সঙ্গে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি এই উপন্যাসের ধারাবাহিকতা যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে। আশা করব ভবিষ্যতেও এই ধরনের নতুন-নতুন চিন্তাধারার উপন্যাসের সঙ্গে 'অমৃত' আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে।

প্রশান্তকুমার দাস
সাহাভড়ং বাজার, মেদিনীপুর

বাংলা ভাষার কবি

১৩ই চৈত্র 'অমৃত'র চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবনাথ লিখেছেন 'বাংলা ভাষার প্রথম কবি সঞ্জয় এবং বাংলাদেশের আদি কবি বলে খ্যাত কৃত্তিবাস ওঝার পিতা শ্রীহট্টের সন্তান ছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝার পিতামহ পণ্ডিত নরসিংহ ১৩৬৮ খৃঃ বঙ্গের রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীহট্টের লাউড় থেকে ফুলিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।' কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও কৃত্তিবাস ওঝার আত্মবিবরণী অনুসরণ করলে উপরোক্ত তথ্যগুলি সর্বতোভাবে সমর্থন করা যায় না। কৃত্তিবাস ওঝার আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায়—

> 'পূর্বেতে আছিল বেদানুরাজ মহারাজা
> তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা
> বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির
> বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর।'

উক্ত বিবরণীতে বেদানুরাজ মহারাজা বলে উল্লেখ আছে কিন্তু কোন তারিখ নেই। সেনরাজত্বের অবসানের পরে ১৪১৪ হতে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব এবং তাঁর পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন ব্যতীত তার পরবর্তীকালেও অন্য কোন হিন্দু রাজার উপস্থিতি দেখা যায় না। তাহলে নিঃসংশয়ে বলা যায় রাজা গণেশ বেদানুরাজ মহারাজা এবং তাঁর সময়কাল ছিল ১৪১৪ হতে ১৪১৮ খৃঃ পর্যন্ত। পণ্ডিত নরসিংহ গৌড়েশ্বর গণেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে তিনি গণেশের সমসাময়িক ও পাত্র ছিলেন এবং গঙ্গাতীর ফুলিয়াতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝার আত্মবিবরণী অনুসারে পণ্ডিত নরসিংহ ছিলেন তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ। (নরসিংহ, গর্ভেশ্বর, মুরারী বনমালী কৃত্তিবাস) তাহলে প্রমাণিত হয়, কৃত্তিবাস ওঝার পিতামহ পঃ নরসিংহ ছিলেন না, এবং কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী শ্রীহট্টের সন্তান ছিলেন না, তিনি ফুলিয়াতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব শ্রীদেবনাথের পরিবেশিত তথ্যগুলির সত্যতা স্বীকার্য নয়।

বাংলাদেশের আদি কবি সম্পর্কে বলতে চাই যে, বাঙালীর সাহিত্য চর্চার কোন নিদর্শন পাল রাজত্বের আগে পাওয়া যায় না। পাল রাজত্বের শুরু থেকে সেন রাজত্বের শেষ অবধি অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীর লেখা কাব্য ও নাটক যা পাওয়া যায় তার ভাষা সবই সংস্কৃত। তার মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত অমর গীতিকাব্য 'গীত গোবিন্দ' বাংলাদেশের অপূর্ব সম্পদ ও গর্বের বিষয় যা বাংলা তথা ভারতের সীমান্ত অতিক্রমণ করে বিদগ্ধ সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। তা বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও বাংলাদেশের কাব্য বলে স্বীকৃত, কারণ জয়দেব বাংলাদেশের কেন্দুবিল্বের কবি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে জয়দেবকে বাংলাদেশের আদি কবি বলতে হয়।

বাংলা ভাষার প্রথম কবি সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তা ও ভাষাতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রথম কবি যিনি হন না কেন তাঁর কবিতা এবং রচনার সময়কাল উজ্জ্বল না হলে সর্বজন গ্রাহ্য হয় না। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্বজ্ঞাপক চর্যাগীতিগুলির মধ্যে। জানা যায়, বাইশজন সিদ্ধাচার্যের রচিত সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাপদ পাওয়া গিয়েছে, তার সুস্পষ্ট অর্থ নির্ধারণে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু সে ভাষা বাংলারূপে পূর্ণবিকশিত নয়। তারপর দু' শতক পরে বাংলা ভাষার সাহিত্যে চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ধারাকেই সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন। চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি আখ্যায়িকা ব্যতীত আর কিছুই জানতে পারা যায় না। তবে তিনি যে চৈতন্যদেবের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত, কেন না কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন যে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গানের রসাস্বাদন করতেন। তাহলে বাংলা ভাষার প্রথম কবির আখ্যা কি চণ্ডীদাসের প্রাপ্য নয়? শ্রীদেবনাথের উদ্ধৃত বাংলা ভাষার প্রথম কবিরূপে সঞ্জয়ের নাম পাওয়া যায় না। উপসংহারে কৃত্তিবাস ওঝার প্রতি বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে চাই যে, জয়দেব ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে বাংলাদেশের আদি কবি এবং বাংলা ভাষার প্রথম কবি হলেও বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে

চিঠিপত্র

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তার তুলনা হয় না।

তারানাথ সান্যাল
জামসেদপুর-৫

সাহিত্যের খবর

বিগত ৪৯শ সংখ্যা (৯ম বর্ষ। ৪র্থ খন্ড। শুক্রবার, ৩রা বৈশাখ। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই সংখ্যায় 'সাহিত্যের খবর' শিরোনামায় (পৃঃ ৮৩৭) 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' বিষয়ক আলোচনা চক্রের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদে দেখলাম আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী অধ্যাপকদের নামের তালিকা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁরা হলেনঃ অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় লোকচিত্রের প্রভাব) এবং ডঃ দুলাল চৌধুরী (লোকউৎসব ও রবীন্দ্রনাথ)।

ডি. চৌধুরী
কলকাতা-৪৫

সাহিত্যিকের চোখে

'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক 'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ' বিতর্কিত নিবন্ধটি পড়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি। এই আলোচনাটি নিঃসন্দেহে বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে ও পাঠকমহলে বেশ আলোড়ন তুলছে। এ ধরণের বিতর্কিত আলোচনা প্রায়ই আপনাদের পত্রিকায় দেখতে পাই। সেজন্য সম্পাদকের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমাদের মতন সাহিত্য-অনুরাগীরা এধরণের আলোচনামূলক নিবন্ধ পেলে আনন্দিত হন— একথা অস্বীকার করা যায় না। আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এধরণের বিতর্কিত আলোচনা আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে যেমন, তেমনি আবার পড়ে মুগ্ধও হই। আমি একটা মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা বিভাগের সম্পাদক হিসেবেও বিভিন্ন জায়গার সাংস্কৃতিক উৎসবে প্রতিযোগী হিসেবে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সেটা হলো, 'বর্তমান যুগে ছাত্রসমাজের মধ্যে পূর্বের মতো শিল্পচর্চা নেই'। কেন নেই? ছাত্রসমাজের এই পরিণতির মূলে কী আমাদের দেশের রাজনৈতিক চেতনা না দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দায়ী? আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাইনে। কিন্তু এই বিষয়ের ওপর একটা বিতর্কিত সমালোচনা কিম্বা নিবন্ধ আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ পেলে এই সমস্যার সুরাহা হবে বলে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। আমি এবার শুধু পত্রিকা নিয়েই বলছি। আমাদের দেশের ওরফে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-নিকেতনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলো দিনের পর দিন অবনতির পথে। গঠন চমৎকারিত্ব বলতে যা' বুঝি তার ত্রুটি নেই; কিন্তু ভেতরের সারবস্তুগুলো দেখতে পেলে বুঝবেন, লেখার অভ্যেস একদম নেই। মনে হবে সমস্তই কাঁচা হাতের লেখা। ম্যাগাজিন বেরুবে খবর পেয়েই বোধহয় কেউ কেউ ছাপার অক্ষরে তাঁর নামটা প্রকাশ পাবে ভেবেই লেখার প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি দেন। কিছু সৃষ্টি করবার সংকল্প নিয়ে বা শিল্পকলা চর্চার জন্য লেখেন না। কিন্তু হঠাৎ করে কি উন্নত লেখা কারও কাছ থেকে আশা করা যায়? সাত-আট বছর চর্চা করেও যে-বস্তু লাভ করা যায় না, ক্ষণিক প্রলোভনে তা' সম্ভব হয় কি?

ছাত্র-সমাজের এই নব অন্বেষার কথা ভেবে আশা করি আমার এই বক্তব্য নিয়ে 'অমৃতে' নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।

দেবীপ্রসাদ চৌধুরী
পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট
জলপাইগুড়ি

(২)

"অমৃত" ৯ম বর্ষ, ৪র্থ খন্ড, ৪৫ সংখ্যা (৬ চৈত্র ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ" ফীচারে তৃতীয় কলমে লিখেছেন, গণেশের ইঁদুর এবং অন্যান্য দেব-দেবীর বাহন সম্বন্ধে তাঁর কাছে যারা চাঁদা চাইতে এসেছিলেন তারা কেউ বলতে পারলেন না কেন ইঁদুর বা প্যাঁচা আছে। কালীর রং কেন কাল ইত্যাদি। যাইহোক এ সম্বন্ধে যদি লেখক মহাশয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করেন তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের কিছু সুবিধা হয়। কারণ ঐ রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের পড়তে হয়। বিশেষত নিজের ছেলে-মেয়ের কাছে। আমি ভুক্তভোগী। কাজেই লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করছি যেন তিনি শীঘ্রই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

সবিতা দাস, বরাহনগর, কলকাতা-৫০।

মনের কথা

মনোবিদ লিখিত 'মনের কথা' বিভাগটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। আজ বিজ্ঞান ও সমাজমানস যখন দ্রুতলয়ে অগ্রসরমান তখনও জনসাধারণের একটা বড় অংশ মনকে আধিদৈবিক শৃঙ্খলে বেঁধে বিজ্ঞান বিরোধী এক জলাচল প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। বলাই বাহুল্য মুখরোচক মনস্তাত্বিক হেঁয়ালি—সাহিত্য, শিল্প এমন কি বিজ্ঞানের ছদ্মবেশেও নানাভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আমাদের চিন্তাধারাকে বাস্তবানুগ ও বিজ্ঞানসম্মত হতে বাধা সৃষ্টি করছে। মনোবিদ প্রাঞ্জল ভাষায় যে বৈজ্ঞানিক কুশলতার সংগে পাঠককে মস্তিষ্কবিজ্ঞানের তত্ত্ব তথ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমীপবর্তী করছেন 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে এর জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এ ধরনের লেখা অমৃতে প্রকাশিত হয়ে কাগজকে নিঃসন্দেহে আরো আকর্ষণীয় করেছে।

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, হলদিয়া।

নিকটেই আছে

৬ চৈত্র ১৩৭৬ সনের নবম বর্ষ চতুর্থ খন্ড সাপ্তাহিক 'অমৃত'তে 'নিকটেই আছে' পড়তে গিয়ে রেশনিং ইনস্পেক্টরের বাস্তবিকতা জানলাম। এবারের প্রসঙ্গের তাৎপর্য একটু বিচার করলে দেখা যাবে যে রেশনিং বিভাগের কয়েকজন অসাধু রেশনিং অফিসারসহ ইনস্পেক্টরদের জন্য রেশনিং ইনস্পেক্টরদের অসাধু হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কয়েকজন অপদার্থ, সুবিধেবাদী, দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থপুষ্ট পদস্থ সরকারী কর্মচারীরাই খাদ্য দপ্তরের দুর্নামের জন্যে দায়ী। অথচ রাজ্যের দায়িত্বশীল সরকারী পদস্থ কর্মচারীরা নির্বিকার।

আমার সহকর্মীরা অনেকেই এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত বলে প্রতিবাদ করতে পারি না। আমার অশেষ দুর্ভাগ্য যে আমি রেশনিং ইনস্পেকটর হয়েছি বলেই সম্ভাব্য তথ্য দিতে পারছি না।

তবে এখন রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপাল নিশ্চয়ই খাদ্য দপ্তরের সুনাম ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবেন। নইলে এটা তাঁর কলঙ্ক, সমগ্র জাতির কলঙ্ক।

সন্ধিৎসু আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই। কারণ, আপনার সৎসাহসী উদ্দেশ্য আমার মতো সাধারণ রেশনিং ইনস্পেকটরকে সচেতন করবে সত্য বিবৃতি অনুযায়ী ভবিষ্যৎ এর জন্য।

জনৈক র‍্যাশনিং
ইনস্পেকটার,
কলকাতা।

শাদাচোখে

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের পতন হওয়ার পরও কোলকাতা পৌরসভায় ফ্রন্ট রাজত্ব অদ্যাবধি বর্তমান আছে। আদি ফ্রন্টের অশুভ ছায়া দীর্ঘায়িত হলেও পৌর-ভবনের একতাকে তা এখনও পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। তবে গ্রাস করবে না একথাও হলফ করে বলা যায় না। শুধু ভরসা এইটুকু পৌরসভার যুক্তফ্রন্ট এখনও চলছে এবং আরও কিছুদিন হয়ত চলবে।

সারা পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি ছিল ৩২ দফা কর্মসূচী। চৌদ্দটি বামপন্থীদল বা কংগ্রেস বিরোধী দল ঐ কর্মসূচীর ভিত্তিতে করায়ত্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারলে ঐ প্রোগ্রাম বাস্তবে রূপায়ণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে পৌর যুক্তফ্রন্টও কর্মসূচী রূপায়ণ ও দলীয় শক্তির ভিত্তিতে আসন বন্টন করে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস শাসনকে অপসারিত করেছিলেন। কিন্তু আদি ফ্রন্ট থেকে পৌরফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ একটু চতুর ও চালাক বলেই মনে হবে। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার সংগে সংগেই তাঁরা একটি লিখিত চুক্তিও সম্পাদন করে ফেলেন। সেই চুক্তি অনুসারে কোন দলের ক'বার মেয়র, ডেপুটি মেয়র বা কোন স্ট্যান্ডিং কমিটির কে সভাপতি হবেন বা সদস্য কোন দলের ক'জন থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ঠিক হয়ে যায়। অর্থাৎ পৌরসভার শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ছোট হোক কি বড় হোক প্রত্যেক দলকেই একটি মর্যাদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মেয়র, ডেপুটি মেয়র কিম্বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদেও পর্যায়ক্রমে বড় দলগুলি থেকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও পদ ভাগাভাগির প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দলের স্বার্থ বড় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আদি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের আসন নিয়ে এবকম কোন চুক্তি আদৌ সম্পন্ন হয়নি। বরঞ্চ 'বড় ভাইরা' পছন্দমত সমস্ত কিছু গ্রাস করবার পরই রাজনৈতিক হরিজন ছোট দলগুলির জন্য কিছু প্রসাদ বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাঁদের তা গ্রহণ করতেই হল। কারণ, বড় ভাইদের সংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে ছোটদের আর কোন ভূমিকাই রইল না। তারপর নির্বাচনের পর আসন লাভের পরিপ্রেক্ষিতে ছোট দলেরা আরও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। কাজেই এই দলগুলির প্রতি বড়রা শুধু অনুকম্পাই প্রদর্শন করলেন। আর নিজেরা মৌরসী পাট্টার মত এক-একটি দপ্তর অলংকৃত করে বসলেন। যোগ্যতার প্রশ্ন কিম্বা ৩২ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে আন্তরিকতা আছে কিনা, এই সমস্ত বিষয় যাচাই করবার কথাই উঠলো না। দলের শক্তির কথাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকে নাকি সেতুবন্ধনের জন্যে কাঠবিড়ালীর সাহায্য নিতে হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের ছত্র-ছায়াতলে (যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন) চৌদ্দটি শরিক একাত্ম হয়ে মিলিত হয়েছিল বলেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে ফ্রন্ট জনতার অকৃপণ আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু নির্বাচনের সময় কোন দলই স্বীয় শক্তির হুংকার ছাড়েনি। ফল বেরুবার পরবর্তী মুহূর্তেই গদী ভাগাভাগির প্রশ্ন যখন এল, তখনই বড় ভাইরা নিজের শক্তির উপর জোর দিয়ে মন্ত্রীদপ্তর দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। সহৃদয় পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর কার হাতে থাকবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে মাকসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দখল করবেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন কিন্তু বড় ভাইরা বিশেষ করে বাম কম্যুনিষ্টরা এই বক্তব্যই রেখেছিলেন যে, তাঁদের দলের সদস্যসংখ্যা (বিধান সভার) যেহেতু বেশী সেইজন্য তাঁদেরই দায়িত্ব সর্বাধিক। কাজেই বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদপ্তরগুলো তাঁদের হাতে না গেলে জনসাধারণের আস্থার প্রতি সুবিচার করা হবে না। তাঁদেরই সুরে সুর মিলিয়ে অন্যান্যরাও একই ধাঁচে দাবী করে বসলেন। ফলে, যুক্তফ্রন্ট নামক নৌকাটি সেদিনই ফুটো হয়ে গেল। আর বাস্তবপক্ষে সেদিনই ফ্রন্ট নৌকো বানচাল হয়ে গেল। যাত্রীরা লালদীঘির দপ্তরে আশ্রয় নিয়ে তৃপ্ত নয়নে নৌকাডুবির দৃশ্য অবলোকন করলেন। একবার কেউ সেদিন আলোচনা পর্যন্ত করলেন না যে, ফ্রন্টই যখন ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন দলীয় স্বার্থের কথা ত্যাগ করে ফ্রন্টেরই উচিত নির্ধারণ করা কে-কে মন্ত্রী হবেন এবং কে কোন্ দপ্তরের ভার নেবেন। কিন্তু কেউ তা করলেন না। যদি তা হত তবে নিশ্চয়ই সেদিন যে ঐক্যের হাওয়া বইতে শুরু করত, আজ সারা ভারতে তা নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র রচনায় অনেকখানি সাহায্য করতো। তা সম্ভব না হওয়ার কারণ হচ্ছে পরস্পরের প্রতি পূর্ণ অবিশ্বাস, আদর্শগত পার্থক্য এবং আখেরে কে কাকে খতম করে গোটা রাজ্যে দলগত শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে তার গোপন বাসনা। রাজত্ব লাভের পর আবার যখন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখনই আবার সেই বড় ভাইরা সেই ডুবন্ত নৌকার পাটাতনে বসে সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত উদ্যোগের ফসল ঘরে তুলেছেন সেই বড় ভাইয়েরা। তখন ছোট ভাইদের জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নও ওঠেনি। তবু সমস্যা দেখা দিলেই সকলকে এক সংগে নিয়ে সমাধানের কথা উঠেছে। অর্থাৎ সমস্যার জন্য সকলকেই কাঁধ দিতে হবে। মেঘলা দিন কেটে গিয়ে যখন রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুদিন আসবে তখন বড় ভাইরা আনন্দ উপভোগ করবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের কবর রচিত হয়েছিল সেইদিন যেদিন মন্ত্রীদপ্তরের উপর দলীয় শক্তির অশুভ ছায়া পড়েছিল। ফ্রন্টের একাত্ম শরিক হিসাবে মন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্ন ফ্রন্টের হাত থেকে দলীয় নেতাদের হাতে চলে গিয়েছিল।

সেদিন যদি অন্তত ঐক্য রক্ষার প্রয়াসে দপ্তরগুলি পর্যায়ক্রমে একদল থেকে অন্য দলের হাতে দেওয়ার জন্য কোন স্বীকৃতিপত্র গৃহীত হত তবে হয়ত এত তাড়াতাড়ি ফ্রন্টের সমাপ্তি ঘটত না। আরও কিছুদিন ফ্রন্ট-রাজত্ব চলতে পারত। যা-হোক আদি ফ্রন্টের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকেই পৌরসভায় অফিস ভাগাভাগির প্রশ্নটি একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সমাধা হয়েছিল। ফলে, পৌরসভায় ফ্রন্টের আয়ু দীর্ঘায়িত হচ্ছে বলেই মনে হয়।

রাজ্য সরকার পরিচালনা ও কলকাতা পৌরসভার শাসন কার্য পরিচালনায় পার্থক্য অনেক। তবু একথা বলতে হয়, পৌরসভার দৈনন্দিন কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করা যায় তবে অব্যবহিত পরেই জনতার কাছে পৌর-পিতাদের জবাবদিহি দিতে হয়। অর্থাৎ জল সরবরাহ যদি এক-ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, কিম্বা নর্দামা বন্ধ হয়ে কোন রাস্তা জলমগ্ন হয়, কিম্বা সন্ধ্যায় কোন সদর রাস্তার বিজলী বাতি মুখ গোমড়া করে বসে থাকে, বা রাস্তায় আবর্জনার পাহাড় জমে ওঠে, তখনই নাগরিকরা মুখর হয়ে ওঠেন। বর্তমানে যে ভাবে পৌর শাসন চলছে তা যে কংগ্রেস আমল থেকে কিছু ভাল হয়েছে এমন নয়। সত্যি বলতে কি সেই ট্র্যাডিশনই সমানে চলছে। তবু বলছি যে, শাসনের কাজ যেখানে গভীরভাবে স্পর্শকাতর, সেখানে যদি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির কর্তা-ব্যক্তিদের বছর বছর পালটে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারা গিয়ে থাকে, তবে আদি ফ্রন্টের বেলাতেও সেই সূত্র গ্রহণ করবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়নি কেন, সেটাই হচ্ছে জিজ্ঞাসা। রাজ্য সরকারের নীতির রূপায়ণ হলেও তার ফল ফলাতে অনেকদিন সময় লাগে। যে কোন পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার দীর্ঘ দিন পরেই তার সাফল্যের পরিমাপ করা যায়। কংগ্রেস আমলে বিশেষ করে স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে যে পরি-কল্পনাগুলি রূপায়িত হয়েছিল এখনই তার প্রভাব জন-জীবনে পড়তে সুরু করেছে। কাজেই রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতেও যদি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দলের সদস্যরা যদি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দলের সদস্যরা বস-তেন তবে প্রশাসনিক অসুবিধা তেমন কিছু হত বলে মনে হয় না। বরং যুক্তফ্রন্ট যদি পার্সোনেল বাছাই করে দিত তবে তা একেবারে নয়া ইতিহাস হয়েই থেকে যেত। তা যখন হল না তখন পৌরসভার মতো যদি আগেভাগে একটি নীতিও ঠিক করা হোত, তাহলেও ফ্রন্টের এই অকালমৃত্যু হয়ত রোধ করা যেত।

যাহোক আক্ষেপ করে লাভ নেই। যা ঘটেছে সেই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করে বলা হয় যে, যাঁরা বর্তমানে আবার চৌদ্দ শরিকের পুনরুজ্জীবন করার উপর জোর দিচ্ছেন তাঁরা কতো রাজ-নৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন বলা শক্ত। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই যুক্তফ্রন্ট বা মোর্চার উপর জোর দিয়ে আসা হচ্ছিল। এবং পশ্চিম বাংলার মানুষকে প্রত্যেক নির্বাচনের প্রাক্কালেই একথা বোঝানো হত যে একমাত্র কংগ্রেস-বিরোধী এবং বিশেষ করে বামপন্থী দল-গুলির মোর্চার মধ্যেই কংগ্রেস শাসনের অবলুপ্তির গুপ্তঅস্ত্র নিহিত আছে। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেও অনেকবার ফ্রন্ট হয়েছে, তবে এবারের মত এরকম সার্থক ঐক্য আর আগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আদর্শগত পার্থক্য নিয়ে ফ্রন্ট গড়লে যে কোন কাজই হয় না পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট তা এবার প্রমাণ করে দিয়েছে। কাজেই আবার যাঁরা সেই পাঁচমিশেলী ফ্রন্টের কথা তুলছেন তাঁরা মনকে চোখ ঠারাচ্ছেন মাত্র। তাঁরা যদি মনে করেন, এরকম কৌশল করে বাজীমাৎ করতে পারবেন তবে তাঁরা সময় নষ্ট করছেন। জেনেশুনেই যাঁরা ফ্রণ্ট ভেঙেছেন তাঁদের উচিত হচ্ছে নতুন করে গণ-আশীর্বাদ লাভ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

ফ্রণ্ট রাজত্বকালে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বজায় ছিল রাষ্ট্রপতির শাসনেও তা অব্যাহত আছে। কারণ, যে প্রশাসনিক যন্ত্র নয়া আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হবে সেই যন্ত্রচালকরা এখনও ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁরা এখনও পুরোপুরি নিরপেক্ষভাবে কাজকর্ম চালনা করতে অক্ষম। কেননা একটা অজানা আশঙ্কার তাড়নায় তাঁরা সতত বিব্রত। তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আশঙ্কা রয়ে গেছে যে ফ্রন্টের শরিকদের যে কোন জোট আবার গদীতে আসলেই তাঁরা নাজেহাল হবেন। সম্প্রতি রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক স্তম্ভ আই এ এস্‌দের সভায় সেই আশঙ্কার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে সহস্র কিম্বা ততোধিক মুদ্রার কর্মচারীরা বুর্জোয়া হিসাবে চিহ্নিত হয়ে জনতার একাংশের হাতে এমনকি মন্ত্রীদের কাছেও নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন আই এ এস বীর সেদিন সেই লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করতে সাহসী হন নি। কিন্তু রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান যখন একজন আই এ এসকে বললেন যে "আপনি অভিযুক্ত, আপনি বড়ো সাহেব নন। অতএব, আপনার কথা বলা সাজে না।" সেই উক্তি নাকি সে ভদ্রলোকের দারুণ মানহানির কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতিবাদে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহ-কর্মী ধাওয়ান সাহেবের সঙ্গে বসে চর্ব্য, চুষ্য ও লেহ্যপেয় সমন্বিত মধ্যাহ্নভোজনে বিরত ছিলেন। এমনকি এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ সম্মেলনও ডাকা হয়েছিল। সেখানে "নাভির নীচে কটিবন্ধ লাগানো আই এ এস" একজন নাকি ওজস্বিনী ভাষায় প্রতিকারের দাবী করে-ছিলেন। কিন্তু এই মানীরা প্রায় সকলেই ফ্রন্ট আমলে চরম মানহানির প্রশ্নেও চোরের মত বেমালুম "কিল" হজম করে গেছেন। এই আই এ এস বীরদের স্মরণে থাকা উচিত, জনতার অর্থপুষ্ট সরকারী তহবিল থেকেই ওঁদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়। সেই জনগণকে গুলী করে হত্যা করার জন্য দায়ী করে বক্তব্য রাখতে না রাখতেই নিজেদের নির্দোষ বলে জাহির করবার চেষ্টা ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং ধাওয়ান সাহেব সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঠিক কাজই করেছেন। বেশী টাকা বেতন পেলেই তাঁর সম্মান বেশী— এ ধারণা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে, জনতার সেবক হিসাবেই থাকতে হবে। কাজেই যেখানে জনপ্রতিনিধি কথা বলবেন, সেখানে সেবকের চুপ করে থাকাই উচিত এবং সেটাই সভ্যতার আঙ্গিক। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, ধাওয়ান সাহেব নাকি পরে ঐকথা বলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সভা আহ্বান করে মানহানির পালা গাইবার প্রয়োজন কি ছিল? যা হোক এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রশাসনের এই স্তরেও বিভেদের বীজ প্রোথিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের মালিক সম্বন্ধে অনিশ্চিত থাকার ফলে আনুগত্যের প্রশ্নে বিভ্রান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কে আবার কবে মালিক হয়ে বসবেন এই ভাবনায় তাঁদের শঙ্কাগ্রস্ত মনে দ্বিধার সৃষ্টি করছে। ফলতঃ, সমস্ত ঘটনাকেই রঙীন চোখে দেখে সমাধানের সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। আইনানুগ কাজ করতে তাঁরা অপারগ হয়ে পড়ছেন। এভাবে বিকল প্রশাসনিক যন্ত্র নিয়ে ধাওয়ান সাহেবও মুশকিলে পড়েছেন। ফলে, তাঁকেও প্রশাসনিক চৌহদ্দির বাইরে এসে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক নেতার মত আদর্শের বুলি কপচাতে হচ্ছে। আর তাই অন্যরা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন। এবং ধাওয়ানজী হঠ যাও বলে প্রস্তাবও পাশ করেছেন। এই বিভক্ত, রোগগ্রস্ত, জীর্ণ প্রশাসনিক যন্ত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতির প্রতিভূ কেন, অন্য কোন জনপ্রিয় সরকারও শাসনের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

গত কয়েক মাস ধরে প্রতিদিন কয়েক হাজার করে মানুষ পূর্ব পাকিস্থান থেকে সীমান্ত পার হয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট ও হাসনাবাদে জড় হতে থাকায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সমস্যার প্রতি আবার সারা দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

উদ্বাস্তুদের এই নূতন স্রোত আসছে প্রধানত পূর্ববঙ্গের যশোহর ও খুলনা জেলা থেকে। এই সব খেটে-খাওয়া মানুষ—চাষী অথবা জেলে—এতকাল জন্মভূমির মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন কেন, এই প্রশ্ন লোকসভার সদস্যদের আলোড়িত করেছে।

এই উদ্বাস্তুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানা গেছে তা হচ্ছে এই যে, পাকিস্থানে তাঁরা আর নিরাপদ বোধ করতে পারছিলেন না। খুলনার মুসলীম লীগ নেতা সবুর খাঁ সাহেব নাকি পাকিস্থানের আগামী নির্বাচনের আগে তাঁর জেলা থেকে হিন্দুদের উৎখাত করতে চান, কেননা, তাঁর ধারণা ঐ নির্বাচনে জেলার হিন্দুরা তাঁকে বা তাঁর দলকে সমর্থন করবেন না। সেই জন্য হিন্দুদের উপর নানা রকম চাপ আসছে। তাঁদের সম্পত্তি বিক্রী করতে দেওয়া হচ্ছে না, ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ দেওয়া হচ্ছে না, ব্যবসা বাণিজ্য করতে দেওয়া হচ্ছে না ইত্যাদি।

সীমান্ত পার হয়ে আসার সময় পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ এই উদ্বাস্তুদের কোন কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসতে দিচ্ছে না। সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় তাঁরা আসছেন। স্পেশ্যাল ট্রেনে করে প্রতিদিন তাঁদের হাজারে হাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের মানা শিবিরে, একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে। রাজ্যসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং বলেছেন যে, এই উদ্বাস্তুরা যে সম্পত্তি ফেলে এসেছেন তার জন্য খেসারত দেওয়ার কোন প্রস্তাব নেই, তবে তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করা হবে।

দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রস্তাব সম্পর্কে বিবৃতি দিতে উঠে রাজ্যসভায় শ্রীদীনেশ সিং ও লোকসভায় পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রপাল সিং বলেছেন যে, গত ২৪ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৪,৫০০ জন উদ্বাস্তু ভারতে এসেছেন। উদ্বাস্তু আগমনের এই স্রোতের কারণ হল নিরাপত্তার ব্যাপক অভাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। সরকারী বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'একথাও মনে করা হচ্ছে যে, কোন কোন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী অভিযানে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যা বলছে তাতে সংখ্যালঘুদের বিপদ বাড়ছে।'

পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের প্রতি সেখানকার কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে তোলা যায় কিনা তা নিয়েও লোকসভায় কিছু আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু উপমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রপাল সিং স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে তোলার কোন ইচ্ছাই সরকারের নেই, কেননা তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। তিনি বলেন যে, এই বিষয়টিকে একটি 'আন্তর্জাতিক প্রশ্নে' পরিণত করার অভিপ্রায় সরকারের নেই, যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্থান সরকারের মনোভাব 'দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের জঘন্য বর্ণবৈষম্য নীতির তুলনায়' ভাল কিছু নয়।

সংসদে এই আলোচনার প্রাক্কালে ভারত সরকার পাকিস্থানের কাছে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে সেখানকার সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি শত্রুপক্ষের সম্পত্তি হিসাবে দখল করে নেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন এবং এতে সেখানকার সংখ্যালঘুদের যে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তার উল্লেখ করেছেন। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে যে, পাকিস্থানের এই কাজ ১৯৫০ সালের নেহরু-নুন চুক্তির এবং তাসখন্দ ঘোষণার বিরোধী। প্রতিবাদলিপিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন লোক দেশত্যাগ করে গেলেও নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি অনুযায়ী তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকার বজায় থাকার এবং তাঁর ইচ্ছামত সেই সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকার কথা।

সংসদে সরকার পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে ও বাস্তবে তাঁরা যা করছেন, এই দুদিক থেকেই পরিষ্কার যে, এই ধরনের কূটনৈতিক প্রতিবাদ করা ছাড়া বর্তমানে ভারত সরকারের এ বিষয়ে আর কিছু করার নেই।

ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুদের স্রোত চলছে, চলবে।

●

'পুরানো' কংগ্রেসের ঘাঁটি বলে পরিচিত মহীশূরে বিধানসভার তিনটি আসনে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তিনটিতেই 'পুরানো' কংগ্রেস প্রার্থী হেরেছেন, তিনটিতেই 'নূতন' কংগ্রেসের প্রার্থী জিতেছেন। শিবাজীনগর কেন্দ্রে 'পুরানো' কংগ্রেসের প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হোসপেত কেন্দ্রে 'নয়া' কংগ্রেসের প্রার্থী তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'পুরানো' কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকে দশ হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন।

মহীশূরে ভোটের এই ফলাফল 'পুরানো' কংগ্রেসের একাংশকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে। এই বিপর্যয়ে হতাশ হয়ে দলের একজন সাধারণ সম্পাদক শ্রীবেঙ্কটসুব্বায়া পদত্যাগ করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি দলের নেতাদের অনুরোধে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, কিন্তু ভোটের বাকসে এই বিপর্যয় যে দলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 'পুরানো' কংগ্রেস দলের পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটিতে। সেখানে কয়েকজন সদস্য এই অভিযোগ আনেন যে, দলের নেতারা শুধু 'নয়া' কংগ্রেসের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকছেন, 'নয়া' কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াবার জন্য যে ধরনের কঠোর পরিশ্রম করা দরকার তার জন্য তাঁরা দলকে প্রস্তুত করছেন না। এই বলেও অভিযোগ আনা হয় যে, দল নিজের লক্ষ্য হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ছে।

সদস্যদের মধ্যে এতটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যে, তাঁদের যখন বলা হয়, আগামী ২৩ মে তারিখে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই নির্বাচনী বিপর্যয়ের বিষয় বিবেচনা করা হবে তখন তাঁরা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁরা এত দিন অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন। নয়াদিল্লীতে কার্যনির্বাহক সমিতির এই বৈঠক যখন চলছিল তখন দলের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বাঙ্গালোরে ছিলেন। তাঁকে সেখানে টেলিফোন করে অবিলম্বে এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠনের অনুরোধ জানান হোক বলে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা অভিমত প্রকাশ করেন।

*

বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের আইনসভায় ঐ দুটি রাজ্যের বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ভারতবর্ষের মোট ১৭টি রাজ্যের মধ্যে আর মাত্র চারটি রাজ্যে আইনসভার উর্ধ্বতম কক্ষ রইল। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষের সংবিধান যখন চালু হয় তখন আটটি রাজ্যে বিধান পরিষদ ছিল। এখন যে চারটি রাজ্যে বিধান পরিষদ বজায় রইল সেগুলি হল মহারাষ্ট্র, মহীশূর, জম্মু ও কাশ্মীর এবং তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ুর বিধান পরিষদের আয়ুও ফুরিয়ে এল বলে। ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি সম্প্রতি বিধানসভায় বলেছেন যে, রাজ্য সরকার বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

উত্তরপ্রদেশে এখন আবার বিধান পরিষদকে জীইয়ে তোলার একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। এ রকম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, সেখানকার বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে আইনসভার সকল সদস্য খুশী নন। এমন কি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং-এরও এই বিষয়ে কতকটা দ্বিধা ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর ভারতীয় ক্রান্তি দলের সদস্যদের এই বিষয়ে নিজের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এখন জানা যাচ্ছে যে, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার এক-

দল সদস্য বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার প্রস্তাবটি বাতিল করার উদ্দেশ্যে সদস্যদের মধ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। বিধানসভার স্পীকার শ্রীএ জি খের স্বীকার করেছেন যে, বিধানসভায় ৮০ জন সদস্য একটি গোপন পত্র পাঠিয়ে বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার প্রস্তাবটি বাতিল করতে চেয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা যাঁরা করছেন তাঁদের একটি যুক্তি হল এই যে, সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। হাজিরা খাতায় যতগুলি স্বাক্ষর আছে তা থেকে দেখা যায়, সেদিন বিধান-সভায় মোট ৩৬৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী বিধান পরিষদ বাতিলের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে সেই প্রস্তাবের পক্ষে অন্তত এই ৩৬৯টি ভোটের দুই-তৃতীয়াংশের অর্থাৎ ২৪৬ জনের সমর্থন থাকা চাই, কিন্তু উত্তর প্রদেশে ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন মাত্র ২০০ জন। এই যুক্তির উত্তরে বলা হচ্ছে, যাঁরা সারা দিনে কোন এক সময়ে বিধান-সভায় উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সকলেরই উপস্থিতি হাজিরা খাতায় নথিভুক্ত হয়েছে। বিধানসভায় ঐ ভোট গ্রহণের সময় যে কয়-জন সদস্য বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, সংবিধানের নির্দেশ পালনের দিক থেকে তাই যথেষ্ট।
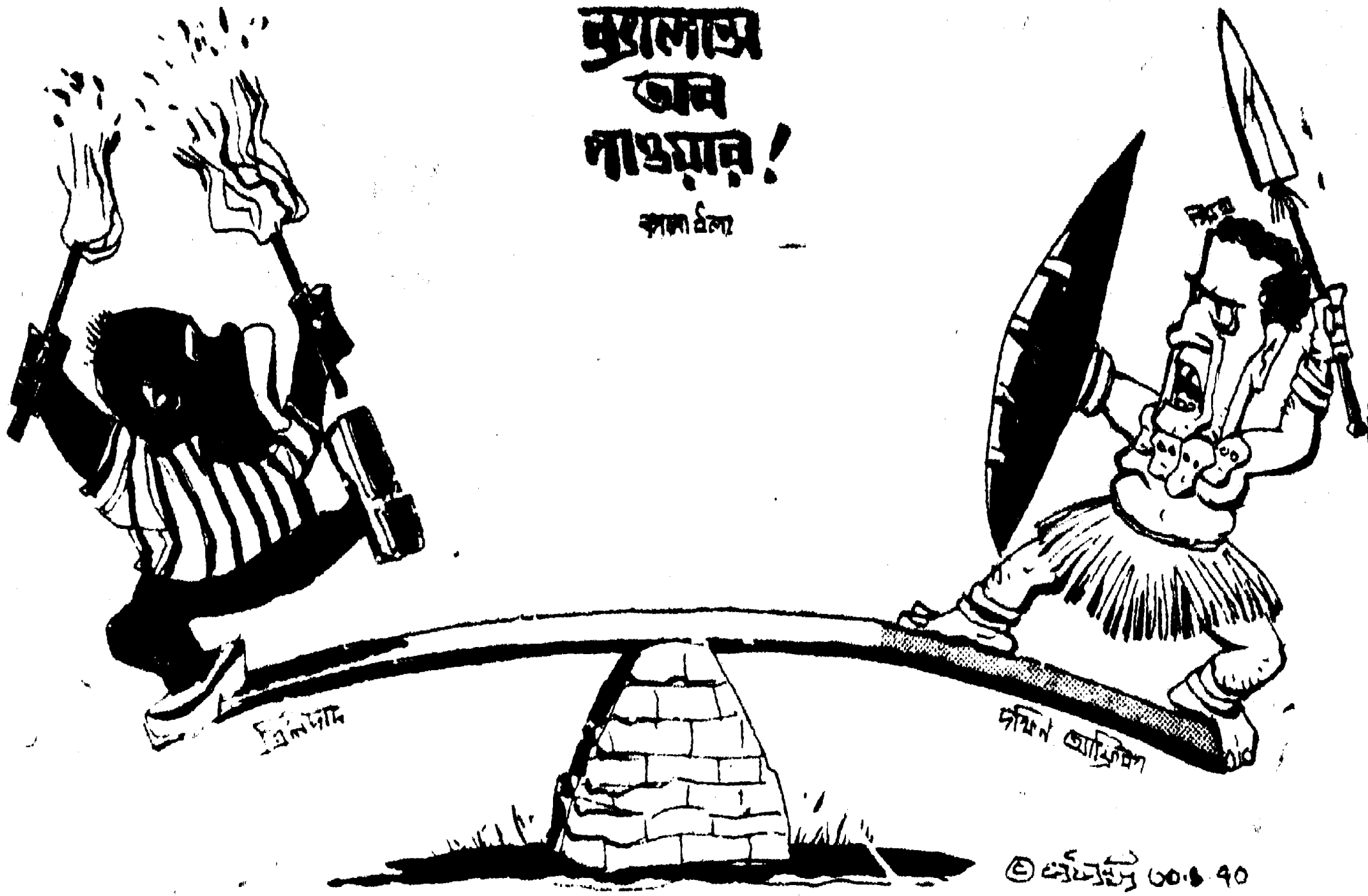
কম্বোডিয়ায় নতুন যুদ্ধ

ইন্দোচীনের যুদ্ধকে ভিয়েতনামের সীমান্ত অতিক্রম করে কাম্বোডিয়ার মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে এবং একই সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনামে আবার বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রীতিমত একটি জুয়া খেলেছেন। আমেরিকার এই জঙ্গী সিদ্ধান্ত ইন্দোচীনে যুদ্ধাবসানের আশাকে সুদূরপরাহত করেছে, প্যারিসের আলোচনাকে অর্থহীন করে তুলেছে, আমেরিকার ভিতরে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে নতুন ইন্ধন যুগিয়েছে। আমেরিকান সৈনবাহিনীর এশিয়ার মাটি থেকে সরে আসার সম্ভাব্য দিনটিকে পিছিয়ে দিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সমঝোতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনার উপর আঘাত হেনেছে এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে নতুন উত্তাপ ও উত্তেজনা এসেছে। এইভাবে বিশ্বশান্তি, দেশের ভিতর নিজের জনপ্রিয়তা এবং আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর মানমর্যাদাকে পণ রেখে প্রেসিডেন্ট নিকসন নতুন আর একটা যুদ্ধে নামলেন মাত্র এই ক্ষীণ আশায় যে, ভিয়েতনামে যে সামরিক জয় আমেরিকার করায়ত্ত হয় নি কাম্বোডিয়ায় তা হবে। কাম্বোডিয়ার যে অঞ্চলে আমেরিকান (ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী) সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করেছে সেখানে রয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধরত উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং বাহিনীর সদর ঘাঁটি ও তাদের আশ্রয়স্থল এবং এই সদরঘাঁটি ও আশ্রয়স্থল ধ্বংস করতে পারলেই শত্রুর মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাবে, এই হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিকসনের হিসাব। দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকান সৈনিকদের সরিয়ে নিয়ে আসার যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যের জন্যই কাম্বোডিয়ার ঘাঁটিগুলিতে গিয়ে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান দরকার, এই হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিকসনের যুক্তি। টেলিভিসন বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "উত্তর ভিয়েতনামীদের ঘাঁটিগুলি যখনই পরিষ্কার হয়ে যাবে, তাদের রসদ ও সাজসরঞ্জাম যখনই ধ্বংস করা হয়ে যাবে তখনই মার্কিন সৈন্যবাহিনী সরে আসবে। এটা করা না হলে ভিয়েতনামে আমেরিকান সৈন্যদের জীবন বিপন্ন হবে এবং তাদের ফিরিয়ে আনার কর্মসূচী ব্যাহত হবে।

আমেরিকার ভিতর থেকেই কথা উঠছে, ঠিক একই ধরনের যুক্তি দিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন আমেরিকাকে ভিয়েতনামের যুদ্ধের সঙ্গে ক্রমেই বেশী করে জড়িয়ে ফেলেও কোন সামরিক সমাধান তিনি করতে পারেন নি, সুতরাং আজ প্রেসিডেন্ট নিকসন যে সফল হবেন তার নিশ্চয়তা কি আছে? প্রশ্ন উঠছে, কতগুলি ঘাঁটি বা আশ্রয়স্থল নষ্ট করলেই কম্যুনিষ্টবাহিনীকে পরাভূত করা যাব, ভিয়েতনামের যুদ্ধের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরও কি সেকথা বলা বলা চলে? কাম্বোডিয়ার ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার পর আমেরিকানরা সেখান থেকে ফিরে এলে কম্যুনিষ্টরা যে আবার সেই জায়গায় নতুন ঘাঁটি তৈরী করবে না তার নিশ্চয়তা কি? কাম্বোডিয়া যেমন কম্যুনিষ্টদের আশ্রয়স্থল চীনও তেমনি কম্যুনিষ্টদের আশ্রয়স্থল। তাহলে একই যুক্তিতে আমেরিকা কি চীনের সঙ্গে লড়াইয়েরও ঝুঁকি নেবে? প্রভাবশীল সংবাদপত্রগুলিতে উত্থাপিত এই সব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, নতুন করে এভাবে যুদ্ধের আগুনে জড়িয়ে পড়াটা আমেরিকার মানুষ পছন্দ করছে না। রিপাব্লিকান দলের কোন কোন নেতা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর প্রেসিডেণ্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল এবং সিনেটের আগামী নির্বাচনে রিপাব্লিকান পার্টির সাফল্যলাভের সম্ভাবনায় গুরুতর আঘাত লাগল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের চারজন সদস্য ঘোষণা করেছেন যে, ভিয়েতনামের লড়াইয়ের সঙ্গে আমেরিকার যোগ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐ লড়াইয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। (ভিয়েতনামের লড়াইয়ে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিদিন গড়ে ৩৪ কোটি টাকার বেশী খরচ করতে হচ্ছে।) ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি জর্জ ব্রাউন জানিয়েছেন যে, কাম্বোডিয়ার যুদ্ধে আমেরিকাকে জড়িয়ে ফেলে প্রেসিডেণ্ট নিক্সন তাঁর সাংবিধানিক কর্তৃত্বর সীমানা লঙ্ঘন করেছেন কিনা সেই প্রশ্নটি তিনি বিবেচনা করে দেখছেন। সারা দেশের ৫০টি ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা আওয়াজ তুলেছেন, প্রেসিডেণ্টকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হোক্। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যুদ্ধবিরোধী ছাত্ররা বিক্ষোভপ্রদর্শন করছেন। ওহায়ো রাজ্যের কেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের এক সংঘর্ষের ফলে পুলিশের গুলীতে দুজন ছাত্রী ও দুজন ছাত্র মারা গেছেন। সারা দেশে এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং ছাত্ররা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

সীমান্তের ওপারে দুঃসংবাদ

তেইশ বছরেও এর কোনো সমাধান হল না। পূর্বপাকিস্তান থেকে আবার সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভিটে-মাটি ছেড়ে সীমান্ত পার হয়ে এপারে আসছেন। আসছেন তাঁরা দলে-দলে, এ বছরে এ পর্যন্ত যার সংখ্যা ইতিমধ্যেই চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রধানত এঁরা আসছেন পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন খুলনা জেলা থেকে। স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংখ্যালঘুদের জীবন বিপর্যস্ত করেছিল তারও সূত্রপাত হয়েছিল খুলনা থেকেই। ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবিধানের জন্য। পাকিস্তান সরকার বার-বার সেই চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে চলছে সংখ্যালঘুদের এই উৎসাদন। এবারে তারই নবতম অধ্যায়ের সূচনা। পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ মানুষ সম্প্রীতিতে বসবাস করতে চায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানকে যদি স্বদেশ বলে না জানতেন তাহলে এত দুঃখ-দুর্দৈব সহ্য করে তাঁরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকতেন না। সাধারণ চাষী, ছোট দোকানদার, সামান্য আয়ের কারবারী এবং সামান্য সংখ্যক মধ্যবিত্ত এ নিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষ সংখ্যালঘু বাস করছেন পূর্বপাকিস্তানে। এঁরা কেউই পশ্চিমবঙ্গে আসবার জন্য লালায়িত নন, আসবার সঙ্গতিও তাঁদের নেই। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে এক গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে ইয়াহিয়া খানের সরকার এই সংখ্যালঘুদের উৎখাত করার জন্য। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমত এই চাষীদের উৎখাত করে তাদের জমি দখল করা এবং দ্বিতীয় প্রাক-নির্বাচনী কালে সংখ্যালঘুদের বিদায় করে বাঙালী ভোটের সংখ্যা কমানো। পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনে এই নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান সরকার। তাঁরা চান না বাঙালী সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু মিলে-মিশে একযোগে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে ইয়াহিয়া খানের সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাক। এই উদ্দেশ্য নিয়েই পাকিস্তান সরকার চলছে এবং যখনই পাকিস্তান সরকার অস্বস্তিবোধ করেছেন তখনই দফায় দফায় চলেছে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং বিতাড়ন। লক্ষণীয় যে, সংখ্যালঘুরা যখনই আসেন তখন তাঁদের একবস্ত্রে চলে আসতে হয়। কৃষক, জেলে, খেটে-খাওয়া মানুষের দল এঁরা। এঁরা রাজনীতি নিয়ে কখনো মাথা ঘামান না। কিন্তু রাজনীতির শিকার হন এঁরা। পাকিস্তান সরকার এবং তার সহযোগীদের যখনই ইচ্ছা হয় তখুনি এই অসহায় মানুষদের বিতাড়ন করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করে।

ভারত সরকার কিন্তু এ বিষয়ে কোনোদিনই বেশী দূরে যেতে চান না। পাকিস্তান সরকারকে কড়াভাবে যদি তাঁরা জানান যে, এই বাস্তুত্যাগ বন্ধ করতেই হবে, নইলে ফল হবে মারাত্মক, তাহলে হয়তো একটা ফল হত। মানবিকতার কারণে বাস্তুত্যাগীদের স্থান আমাদের দিতে হবে। কিন্তু বাস্তুত্যাগীরাও জানেন যে, তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পশ্চিম বাংলায় কোনো স্থান নেই। তাই নতুন উদ্বাস্তুদের পাঠানো হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্যে মানা শিবিরে। এঁদের পুনর্বাসনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ট্রানজিট শিবিরেই বাস করতে হবে এঁদের। কতকগুলো কর্মঠ মানুষ ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে অবাঞ্ছিত শরণার্থীর জীবন যাপন করবেন, এ কোনো সমাজের পক্ষেই কল্যাণকর নয়।

কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবছেন তা জানি না। বিষয়টি নাকি তাসখন্দ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়াকে জানানো হয়েছে। পাকিস্তান রাশিয়ার কথায় কোনো আমল দেবে কিনা তা সেই জানে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবিধান এবং তাঁদের জীবন ও জীবিকার নিশ্চিতি দেওয়া প্রত্যেক সভ্য দেশেরই দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পাকিস্তান সরকার বার-বার অস্বীকার করে প্রমাণ করেছে যে, সংখ্যালঘুদের প্রতি তার ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদের প্রতি জঘন্য ও বর্বর কোণঠাসা নীতিরই সমতুল। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের কোনোরূপ মর্যাদা নেই। সাধারণ নাগরিকের সামান্যতম অধিকার থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। এই দুঃসহ অবস্থায় সংখ্যালঘুরা বাস করছেন। দেশ মাটি ছেড়ে কেউ স্বেচ্ছায় অজানা অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায় না। পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে এই হতভাগ্যদের দেশছাড়া করছে। এই অসহায় মানুষদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এক দুরূহ সমস্যা। ভারত সরকারকে অবিলম্বে জানিয়ে দিতে হবে যে, এইভাবে সংখ্যালঘু বিতাড়িত করে পাকিস্তান সরকার সহজে পার পাবেন না। এর পূর্ণ দায়িত্ব তাদের নিতে হবে। যাঁরা ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে। বিষয়টি ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের গোচরে এনে একে নিয়ে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। নীরবে মার খাওয়ার কোনো সার্থকতা আর নেই।

পূর্ব সীমান্তে ॥

আরতি দাস

পাতার তীক্ষ্ণতা তুলে
বল্লমের মত,
লড়াই দিয়েছে জানি
একাকী পাইন,
অরণ্যে যা কিছু বাকী
শ্যামল কোমল
বিনষ্ট করেছে শীত
ঈর্ষাতুর হাতে;

সব শেষ খবরে প্রকাশ,
গুঁড়ো হিমে যে যে ঘাস
পেয়েছিল শুভ্র এক শান্তির আশ্বাস
নিশ্চিহ্ন তারাও।

এখন পড়ে না হিম
বৃষ্টিও ঝরে না,
ঘাস, গাছ পাথরের
কে যে বেশী রণদক্ষ
এ নিয়ে বিতর্ক নেই
নিরাশায় সবাই নিশ্চুপ;

অথচ এ দুঃসময়ে
বঙ্গোপসাগর তার
প্রতিশ্রুত জঙ্গী মেঘ
যদি না পাঠায়,
তবে তো শীতের কাছে
সর্তহীন হার,
মেনে নেবে শিলঙ পাহাড়।

এই মতো জল্পনায়
মত্ত ছিল সবাই যখন,
রক্তলাল পতাকার
উঁচুমুঠি, ওরা কারা
হো হো করে ছুটে আসে—

বনভূমি লুটে আসে
জয়ী সব সৈনিক
রডোডেন্ড্রন।

আমরা মাঝে মধ্যেই ॥

দুলাল ঘোষ

আমরা মাঝে মধ্যেই সময়ের জানলা থেকে
মুখ ফিরিয়ে
নির্বোধের মতো একাকিত্ব খুঁজি
শূন্য ঘরের ঝুল বারান্দায় চোখ ঢাকি
তৃষ্ণার্ত টিকটিকির কণ্ঠনালী
অতিসন্তর্পণে এড়িয়ে যাই
বস্তুত আজন্ম প্রত্যাশার সিন্দুকে অফুরন্ত অবসাদ
ভাঙতে গিয়েই
আমরা ইচ্ছের সুতোয় অহেতুক জড়িয়ে পড়ি
অন্ধকার ডাকি স্বেচ্ছায়।

নিষ্ঠুর বাজীকরের মতো আমরা মাঝে মধ্যেই
বিষাক্ত ছোবল পছন্দ করি
সোচ্চার মিছিলে কথার খেলাপ হয়
অবসরের আবর্তে ডুব দিয়ে
অমরত্ব খুঁজি—
রূপকথা, জলপরী
নতজানু রাজকন্যা, শূন্য বিছানা......
হঠাৎ লুণ্ঠিত কিশোরীর প্রেম ভুলে
নিজেকে অহেতুক
আমরা মাঝে মধ্যেই ফাঁকি দিতে ভালোবাসি।

একটি আলপিন চাই ॥

বাণীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিনকুশটা কোথায় গেল?
একটা যে আলপিন চাই!
অনেক কাগজটুকরো গেঁথে রাখতে
একটা যে আলপিন চাই;
নতুবা, এই সব যত দামীদামী কথা,
অথবা আমার চিন্তা,
স্মৃতিলেখা নাম,
সবাই ছড়িয়ে যাবে যুগের বাতাসে।
এখানে-ওখানে—
থাকবে পড়ে অজস্র কাগজ
বহুতর স্মৃতি।
ঠিক তাই—
সবাইকে এক সাথে গেঁথে রাখতে
একটা আলপিন চাই।

মাঝখানে চর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দুটো ফ্ল্যাটের ছিমছাম ছোট বাড়ি। একতলার ফ্ল্যাটে থাকেন নবজীবনবাবু, তাঁর স্ত্রী মালতী, স্কুলে পড়া দুটো ছেলে-মেয়ে, তাঁদের বুড়ো দাদু আর বুড়ি দিদিমা, এবং তাঁদের ছোট ছেলে অর্থাৎ নবজীবন-বাবুর ছোট ভাই প্রভাতজীবন। তাঁদের বোনেরাও মাঝেসাজে এসে দু'চারদিন করে থেকে যায়। অন্য আত্মীয়-পরিজনেরাও আসে।

মাঝারি চার ঘরের ফ্ল্যাট সর্বদা লোকে গিসগিস করছে মনে হয়। একটু-আধটু হৈ-চৈ হট্টগোল লেগেই আছে। সকলেই জোরে কথা বলে, জোরে হাসে, রাগারাগির ব্যাপার কিছু ঘটলে সেও চড়া পর্দাতেই সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। ফ্ল্যাটখানা নবজীবনবাবুর নামে। মাস গেলে তিনশ টাকা ভাড়া গোনেন। বাজারের কাছে মস্ত স্টেশনারি দোকান তাঁর। ছোট ভাই এবং বুড়ো বাপের সহযোগিতায় বেশ সচ্ছল অবস্থা সেটার। মাইনে করা দুটি বিশ্বস্ত ভাগ্নেও দোকানের কাজে সুপটু হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বাড়তি লোক আছে।

ওপর তলার অর্থাৎ দোতলার চার ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসে চারশ। ওই মাশুল গোনেন চিন্ময় মজুমদার। বিলেত ফেরত উচ্চশিক্ষিত মানুষ। এক নামকরা ফার্মের গবেষণা বিভাগের কর্তা। বাড়ির অবকাশের বেশির ভাগ সময়ও বই পড়ে কাটান। এই ফ্ল্যাটে তাঁরা বেশি দিনের আগন্তুক নন। আগের মাদ্রাজী ভাড়াটে চলে যেতে, চার মাসের ভাড়া আগাম গুনে দিন মাস ছয় হল এসেছেন। ফ্ল্যাটের প্রধান বাসিন্দা তিনটি—বিদ্বান স্বামী, বিদুষী স্ত্রী এবং বিদুষী কন্যা। অপ্রধান বাসিন্দার মধ্যে একটি কমবাইনড হ্যাণ্ড এবং একটি ঝি। ড্রাইভার আছে, সে বাড়িতে থাকে না।

এম এ পাশ মার্জিতরুচি সুশ্রী স্ত্রী সন্ধ্যা মজুমদার প্রাক্-বিবাহজীবনে স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। গোড়ায় সহকর্মিণীরা কানাকানি করতেন, উঁচু মহলের কোনো প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সেই আত্মনিগ্রহ। কিন্তু সে নিগ্রহের কাল দীর্ঘ নয়। যোগাযোগ এবং কপালগুণে মনের মতো ঘরেই পড়েছেন তিনি।

মেয়ে বন্দনা অর্থশাস্ত্রের কৃতী ছাত্রী। গেল বারে এম-এ পাশ করেই কলেজে মাস্টারি নিয়েছে। সদ্য বর্তমানে তার এক-

মাত্র লক্ষ্য কোনো একটা স্কলারশিপের ছাড়পত্র-বলে আকাশপথে বিদেশ-যাত্রা। এটুকু সম্ভব হলেই জীবন মধুময়। এম এ পাশ করার পর মা একবার বিয়ের কথা তুলে-ছিলেন। বন্দনা একটি মাত্র ভ্রূকুটি এবং সামান্য মৃদু ধমকে তাঁর মুখ সেলাই করে দিয়েছে। বাবাও ছিলেন সামনে। তিনি দায়িত্ব-লাঘবের নিশ্চিন্ততায় বইয়ে মন দিয়েছেন।

এ-বাড়িতে পা দেবার সাত দিনের মধ্যে মেয়ে বলেছে, তুমি আবার বাড়ির খোঁজে লেগে যাও বাবা, নীচে সর্বদা যে-কাণ্ড চলেছে, এখানে টেকা যাবে না।

মা সায় দিলেন, কি আনন্দে যে আছে লোকগুলো। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে কি উৎসাহ, রোজ ওপর থেকে দেখছি তো, সকালে একরাশ বাজার এনে উঠোনে ফেলা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যে আছে সব ছুটে আসে বাজার দেখতে, ছোট ছেলেমেয়ে দুটো পর্যন্ত। তারপর আলোচনা শুরু হয় কি দিয়ে কি হবে, তোমার গবেষণার বিভাগও অত মাথা ঘামায় কিনা সন্দেহ।

মেয়ে মন্তব্য করল প্রিমিটিভ!

মৃদু হেসে বাপ সায় দিলেন, দেশের শতকরা আটানব্বুই জন ওইরকম বুঝলি... নইলে এই হাল হবে কেন।

নীচের তলার মানুষেরাও যে ওপরতলা সম্পর্কে সচেতন নয়, ভাবলে ভুল হবে। বরং বেশি মাত্রায় সচেতন। ওপর তলার শিক্ষিত এবং শিক্ষিতাদের তাঁরা রীতিমতো সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। ওপর তলার কর্তার সঙ্গে নীচের নবজীবনবাবুর সামনাসামনি দেখা হয়ে গেলে দু'হাত জুড়ে তিনি সশ্রদ্ধ নমস্কার করেন। মা বা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও নবজীবনবাবুর স্ত্রী একটু আড়াল নিয়ে সাগ্রহে লক্ষ্য করেন তাঁদের। দেখা কারো না কারো সঙ্গে সকাল থেকে অনেক বার হয়। সাড়ে ন'টা নাগাদ ড্রাইভার কর্তাকে প্রথম আপিসে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে। তারপর সেই গাড়িতে মেয়ে কলেজে যায়। গাড়ি ফিরে এলে দুপুরের দিকে মাঝেসাজে গিন্নিও বেরোন। বিকেলের দিকে ড্রাইভার একটু বেশি ব্যস্ত। প্রথমে মেয়ে আসে তারপর বাড়ির কর্তা। ঘন্টাখানেক বাদে বেড়ানো অথবা সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার প্রোগ্রাম। প্রায়ই তিনজনকে একসঙ্গে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে দেখা যায়। কোনদিন আবার বাবা-মেয়ে নয়তো মা-মেয়ে অথবা কর্তা-গিন্নিকে দেখা যায়। ওদের ঝিয়ের মুখে নবজীবনবাবুর স্ত্রী শুনেছেন, সকন্যা মনিব মনিবানী মাঝেমাঝে রাতের আহার বাইরের বড় হোটেল থেকে একেবারে সেরেই আসেন। এই ঝিটির সঙ্গে মালতী দেবীর বেশ খাতির হয়ে গেছে। কর্তা-গিন্নি আর মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে।

দেখে তো চোখ জুড়োয়ই শুনেও কান জুড়োয় মালতী দেবীর। নিজের মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, খুব ইচ্ছে করে ওই মেয়ে ওদের মতো হোক। পয়সার তো অভাব নেই তাঁদেরও, কেবল ব্যবস্থা আর খানিকটা রুচির অভাব।

ওপর তলার বাসিন্দাদের নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাতের নিরিবিলিতে কথা হয়। নবজীবনবাবু বলেন, ও-রকম শিক্ষা-দীক্ষার চেহারাই আলাদা, আমাদের কি আর সে রকম হবে।

মালতী দেবী বলেন, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে দেখো না, যদি সে-রকম কাউকে রেখে মেয়েটাকে একটু অন্য-রকমভাবে বড় করে তোলা যায়। ওদের ঝিয়ের মুখে শুনেছি খুব ভালো লোক, দেখেও তাই মনে হয়...তা'ছাড়া ওই মা আর মেয়ের সঙ্গে আমিও একটু আলাপ-সালাপ করে নিই, কি বলো?

নবজীবনবাবুর আপত্তির কারণ নেই, তবে কি না কি ভাববে এই সংকোচ।

প্রতি রবিবারে নীচের তলায় যেন আনন্দের হাট। ভাগ্নে দুটো তো আসেই, তাদের মা-ও আসে। অনেক বাড়তি বাজার হয়। আর হৈ-হট্টগোলের ফলে নবজীবনবাবু নিজেই ইদানীং সামাল দিতে চেষ্টা করেন, আস্তে, আস্তে! ওপরের ওরা একপাল জংলীই ভাবছে আমাদের।

সকলে না হোক, ওপরের এক মেয়ে নীচের একটা ছেলেকে যে অন্তত জংলীই ভাবতে শুরু করেছে, তাতে কোনো ভুল নেই। কারণটা অবশ্য একমাত্র বন্দনা ছাড়া সকলেরই অগোচর। এমনকি নবজীবনবাবুর ভাই বেচারা প্রভাতজীবনেরও। বন্দনার চোখে সে-ই রুচিজ্ঞানশূন্য জংলী ভূত।

তার বয়েস সাতাশ আঠাশ। সুঠাম স্বাস্থ্য। এত ভালো স্বাস্থ্য যে সাদা-সিধে মোটা ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর দিয়েও চোখে পড়ে। তার অপরাধ, খুব ভোরে, প্রায় অন্ধকার থাকতে উঠে খালি গায়ে একটা মাত্র খাটো আন্ডারঅয়্যার পরে নীচের খোলা বাঁধানো উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রায় ঘন্টা-খানেক ধরে শরীরচর্চা করে। এখানে আসার তিন চার দিনের মধ্যেই বন্দনা এই চক্ষুশূল ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে। বরাবর ভালো ছাত্রী, ভোরে ওঠার অভ্যেস তারও। এক একদিন বেশি সকালে উঠে পড়ে। সেদিন বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে নীচের তলায় ভারী লোহার কিছু একটা রাখার শব্দ কানে আসতে খোলা শার্সির ভিতর দিয়ে উঁকি দিয়েছিল। ওই দৃশ্য। কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত দরদর করে ঘামছে। বার্বেল রেখে একজোড়া পেল্লায় মুগুরের কসরৎ চলেছে। তারপর ওঠা-বসা-বুক-ডন, ইত্যাদি। সর্বাঙ্গের পেশীগুলো দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠছে।

অসভ্য কোথাকার!

সচকিত হয়েই জানলা থেকে সরে এসে-ছিল বন্দনা। নীচে থেকে দেখে ফেলবে বলে নয়। একটা মাত্র শার্সির ফাঁক দিয়ে দেখলে নীচে থেকে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। সরে এসেছে চোখে কি রকম একটা ধাক্কা লেগেছে বলে। ...একসারসাইজ করার ইচ্ছে থাকলে ঘরে করলেই তো পারে—ওই বেশে খোলা উঠোনে কেন!

দৃশ্যটা প্রায়ই চোখে পড়ে যায়, বিরক্তও হয়। জংলী ছাড়া আর কি!

অথচ, অন্য সময় একাধিক দিন দেখেছে এই লোকটাও বেশ বিনীত, ভদ্র। তাকেও সমীহ করে। নীচে সামনা-সামনি পড়লে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়। কলেজের সভ্যভব্য কোলিগরা বাড়ি এলে বন্দনা হয়তো তাদের রিসিভ করতে নীচে নেমে আসে, নয়তো এগিয়ে দিতে। তখনো লোকটার বিনীত অথচ সম্ভ্রম-ভরা দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে। দুই-একদিন এটা-সেটা কিনতে ওদের দোকানেও ঢুকেছে। যত ভিড়ই থাক, এই লোক তাড়াতাড়ি দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে এগিয়ে এসেছে, তৎপর হাতে জিনিস প্যাক করে আগে তাকে খুশি করতে পেরে যেন কৃতার্থ হয়েছে।

•

কালচারের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও ওপর তলার সঙ্গে নীচের তলার মোটামুটি সদ্ভাবই হয়ে গেল। নবজীবনবাবুর সঙ্গে চিন্ময় মজুমদারের, মালতী দেবীর সঙ্গে সন্ধ্যা মজুমদারের এবং বন্দনার। নীচের তলার অমায়িক চেষ্টা এবং আগ্রহেই অবশ্য এটুকু সম্ভব হয়েছে। মালতী দেবী দিন-কতক ওপর তলায় আসার ফলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে সন্ধ্যা মজুমদারকেও এক-আধ দিন নীচে নামতে হয়েছে। তখন মহাসমাদর তাঁর। ছুটির দিনে চিন্ময় মজুমদারকে কখনো নীচে দেখলেই নবজীবনবাবু ব্যস্ত-সমস্ত আগ্রহে তাঁকে একটু বসাতে চেষ্টা করেন, চা আর ঘরের তৈরি কিছু খাওয়ান। চা না হোক, খাবারে যেন একটু নতুন স্বাদ পান চিন্ময় মজুমদার। বলেনও সে-কথা। আর শুনে ভদ্রলোক কৃতার্থ যেন।

এরপর নীচের রান্না খাবার মাঝে মাঝে ওপরে উঠতে লাগল। কখনো একটু মাংস, কখনো একটু বিশেষ রকমের রান্না মাছ, ঝাল-ঝাল সরষে পোস্তর সজনে চচ্চড়ি, বড়ি সহযোগে মোরলা মাছের টক। শেষের দুটোর স্বাদ চিন্ময়বাবুর [illegible] তো লেগেই আছে, এমনকি বন্দনাও ।কার করেছে বেশ লাগল।

সন্ধ্যা মজুমদার বলেছেন, পারেও ওরা, নিজের চোখে দেখে এসেছি, কত রকমের যে বড়িই দেওয়া হয়েছে ঠিক নেই

অবশ্য কোনো রুচিসম্পন্ন মানুষই এ তরপা এ-সব গ্রহণ করতে পারে না ওপর তলা থেকেও বড় হোটেলের কিছু নাম-করা সামগ্রী মাঝে মধ্যে ঝিয়ে মারফত নীচের তলায় আসে। তবে তুলনা মূলকভাবে কম। তাইতেও খুশিতে ডগমগ নীচের তলার মানুষেরা। আর সে সবের স্বাদও বিচিত্র বটে। নীচের তলা কর্তা খুশির অনুযোগের সুরে ওপর তলা কর্তাকে বলেন, আমরা ছাইভস্ম পাঠা বলে আপনারা আবার কেন—আমাদের যে আর কিছু কাজ নেই, দোকান আর এই স স্থূল ব্যাপার নিয়েই আছি—আপনাদে হল গিয়ে আলাদা কথা।

আলাদা কথা যে, ওপর তলার কে মনে মনে অন্তত অস্বীকার করেন না আর এই সহজ স্বীকৃতির ফলে অখুশি হন না।

এরপর ওপর তলার কর্তার কাছে নবজীবনবাবু, এবং গৃহিণী আর মেয়ের কাছে মালতী দেবী মনের কথা ব্যক্ত ক'রে ফেললেন। ...মেয়ে বড় হচ্ছে, স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে, আর দু' বছর বাদে কলেজ যাবে, বড় ইচ্ছে মেয়েটাকে মনের মতো করে লেখাপড়াটরা শেখায়। অতএব এখন থেকেই যদি কোনো ভালো লোক মেলে, তাঁরা তো এ-ব্যাপারে কিছু জানেনও না বোঝেনও না, ও'রা যদি একটু সাহায্য করেন—টাকা যা লাগবে দেবেন, ইত্যাদি।

ওপর তলার তিনজনেরই সহৃদয়তা দেখে এ'রা মুগ্ধ। গুণীই—বটে সব। চিন্ময় মজুমদার বললেন, তার জন্যে ভাবনা কি, মেয়েকে বলব'খন, এ লাইনেই আছে, ব্যবস্থা করে দেবে। তাছাড়া মেয়ে তো সন্ধ্যের পর আমার কাছেই একটু-আধটু পড়ে যেতে পারে, বাড়িতে যেদিন থাকি, বসেই তো থাকি।

ও-দিকে মা আর মেয়ের কথা নীচের তলার গিন্নির কাছে আরো বেশি সুধা বর্ষণ করল। মেয়ে বলল, তার জন্য এক্ষুনি অন্য ব্যবস্থার দরকার কি, ছুটির দিনে সকালে বা বাড়ি থাকলে সন্ধ্যার পর আমার কাছেই পড়ে যায় যেন, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, ওকে আমিই তৈরি করে দেব। তাছাড়া মায়ের কাছে তো যখন তখন আসতে পারে।

সন্ধ্যা মজুমদার সায় দিলেন, এখনি লোকের জন্য ভাবতে হবে না, মেয়ে যেন আসে।

এরপর বইখাতা বুকে করে মেয়ের দোতলায় অভিযান শুরু হল। কর্তা বা গৃহিণী বা মেয়ে একজন না একজনকে মেলেই। সযত্নেই পড়ানো হয়। তাদের ব্যবহারে ওইটুকু মেয়েও মুগ্ধ। নীচের তলার মানুষদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁরা ভাবেন এই শিক্ষা আর কালচারের জ্যোতিই আলাদা।

নানা অছিলায় এরপর আরো কত-রকমের রান্না-করা বাটি ওপরে পৌঁছুতে লাগল ঠিক নেই। ওপরতলার মানুষদের অবাক লাগে, হাসিও পায় এক-এক সময়। ভাবে, এরা আছে ভালো।

একভাবেই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছেদ পড়ল একটু। চিন্ময় মজুমদার অসুখে পড়ে গেলেন। গ্যাসট্রিক আলসারে একেবারে শয্যাশায়ী কিছুদিন। সেরে ওঠার পরেও কাহিল অবস্থা। ডাক্তারের নির্দেশে তাঁর আহারের ফর্দ একেবারে বদলে গেল। ঘড়ি ধরে বার বার দুধ খাওয়া, সকালে বিকেলে ফল ছানা ইত্যাদি, আর দু'বেলা জল-সেদ্ধ মাছের ঝোল ভাত।

কিন্তু স্ত্রী এবং মেয়ের এত তোয়াজে থেকেও ভদ্রলোক দিনকে দিন শীর্ণ হতে লাগলেন। ফলে নামী ডাক্তারের আনাগোনা লেগেই থাকল। নীচের থেকে আহার্য আসাও কমে গেল। বাড়ির কর্তার এই হাল, কোন লজ্জায় ঘন ঘন পাঠানো যায়। ওদের ঝিয়ের মুখে মালতী দেবী শুনেছেন, এক-আধ সময় যা-ও পাঠানো হয়—কর্তার সেদিকে তাকানও নিষেধ।

নবজীবনবাবু আর মালতী দেবীর সকল আশায় একেবারে ওপর তলাই বাদ সেধে বসলেন হঠাৎ। পুরো একটা বছর না ঘুরতে চিন্ময় মজুমদার বড় রকমের প্রমোশন পেয়ে বসলেন একটা। এখন কোম্পানী থেকেই বাড়িভাড়া পাবেন মাসে ছ'শ টাকা—সেই বাড়িও পছন্দ করা হয়ে গেছে। আর দিন সাতেকের মধ্যে তাঁরা সেখানে উঠে যাচ্ছেন।

নবজীবনবাবু আর মালতী দেবী বড় বড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন একটা পরিবার এসেছিলেন যেমনটি সচরাচর বড় দেখা যায় না। ও'দের তো ভাগ্য ভালো হবেই—শুধু তাঁদেরই যে-কপাল সেই কপাল।

এই সাত দিনের ছুটি নিয়েছেন চিন্ময় মজুমদার। তার শরীর ফেরেনি একটুও। একটু বেলা হতে নিজেই নেমে এলেন নীচের তলার মেয়েকে পড়াতে। নবজীবনবাবু একবারে খেয়েদেয়ে দুপুরে দোকানে যান—তিনি বাড়িতেই ছিলেন। শশব্যস্তে ওপরতলার অতিথিকে বসালেন। আধ ঘন্টার মধ্যে মেয়ে পড়ানো হয়ে যেতে তিনি সাগ্রহে গল্প করতে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে একটু হরলিকস দিই?

—নাঃ।

এই থেকেই খাওয়ার গল্প উঠল। চিন্ময় মজুমদার বললেন, আপনারা জানেনও অনেক রকম...সেই সজনে চচ্চড়ি আর বড়ি দিয়ে মৌরলা মাছের টক এখনো যেন জিভে লেগে আছে।

নবজীবনবাবু সখেদে বললেন, আপনারা গুণী বলেই সব-কিছু ভালো লাগে......

আজও তো হয়েছে, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমাদের, একটু সামনে দেওয়াও যাবে না।

তাঁকে অবাক করে চিন্ময় মজুমদার বলে বসলেন, আচ্ছা, ইচ্ছে যখন হয়েছে, আনুন দেখি একটু-একটু।

নবজীবনবাবু উঠে দাঁড়িয়েও ফাঁপরে পড়লেন যেন। —আপনার ক্ষতি হবে না তো?

চিন্ময় মজুমদার হেসে জবাব দিলেন, স্ত্রী বা মেয়ে শুনলে অবশ্য রাগ করবেন, তবে শোনাচ্ছে কে...যে হাল হয়েছে ক্ষতি আর বেশি কি হবে...মিছিমিছি......

কথা শেষ হবার আগেই নবজীবনবাবু অন্দরের দিকে ছুটলেন।

সাত দিনের মধ্যে আরো চারদিন চিন্ময় মজুমদার মেয়ে পড়াতে নীচে নেমেছেন। এবং প্রত্যহই কিছু না কিছু তার সামনে ধরা হয়েছে।

...এই সাত দিনের প্রায় রোজই দুপুরের দিকে সন্ধ্যা মজুমদারও নীচে মালতী দেবীর কাছে এসেছেন। সময়োযোগে বিভিন্ন রকমের বড়ি দেওয়া এবং কিছু রান্নার পাঠ নিয়ে গেছেন।

আজ বেলা হলে বাড়ি বদল। এখন খুব ভোর। একটু আবছা অন্ধকার আছে এখনো। নীচের উঠোনে ব্যায়াম চলেছে। লোকটার পরনে খাটো আন্ডারঅয়্যার, ঘামে ভেজা পেশীগুলো সব দাগড়া দাগড়া দিয়ে উঠছে।

দোতলার জানলায় শার্সির ফাঁক দিয়ে বন্দনা সতৃষ্ণ চোখে দেখছে।

আজ শেষ দিন। আর দেখবে না।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

সুমথনাথ ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি, আজ সমাজের দিকে তাকালে বুকের মধ্যেটা টিপটিপ করে ওঠে। সব যেন দেখি অন্ধকার। এক এক সময় মনে হয়, বুঝি ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত কোন এক মহানগরীর মধ্যে এসে পড়েছি। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ভগ্নস্তূপের পর ভগ্নস্তূপ। এর যেখানে যাকিছু ছিল সব ভেঙে গেছে। মন্দির ভেঙেছে, বিদ্যালয় ভেঙেছে, ঘর ভেঙেছে, ধর্মাধিকরণ ভেঙেছে—ন্যায়, নীতি, বিবেক, মনুষ্যত্ববোধ, সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে!

কিন্তু কোথা দিয়ে, কেমন করে এই সর্বনাশা ভাঙন এলো, জিজ্ঞেস করলে সবাই চুপ করে যায়। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে একবার শুধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

তবে কি এর জন্যে আমরা নিজেরাই দায়ী!

জগুদা টেবিলের ওপর ঘুঁষি মেরে বলে ওঠেন, হাঁ, তাই। দেশ যখন তোমার আমার সকলের তখন তার ভালমন্দ সবকিছুর জন্যে ন্যায়ত ধর্মত দায়ী আমরা সকলেই। তবে আমার নিজস্ব মত যদি জানতে চাও, তাহলে বলবো, যত নষ্টের মূলে এই স্বাধীনতা। যেদিন থেকে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সত্যিকারের ভাঙনের শুরু সেইদিন থেকে।

চমকে উঠি। কানের পর্দায় জগুদার কথাটা যেন এক বিরাট ঘা মারে। বলে কি জগুদা, কত কালের সাধনার ধন এই স্বাধীনতা, তার জন্যে এই ভাঙন!

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমার মুখের ওপর গভীর দৃষ্টি ফেলে চেয়ে থাকেন। একেবারে যদি 'না' বলি, তাহলে যেমন তর্কের পর তর্কের ঝড় তুলে আমায় নাজেহাল করে ছাড়বেন, তেমনি 'হাঁ' বললেও রেহাই নেই। কেন তাঁকে সমর্থন করি, তারও জবাবদিহি করতে হবে।

তাই দুকূল বজায় রেখে, বার-দুই ঢোক গিলে বললুম, এ-ধরনের নতুন কথা ইতিপূর্বে কোথাও কখনো শুনিনি। সেদিক থেকে আপনার কেবল সাহস নয়, 'অরিজিন্যালিটি' আছে নিশ্চয়! হুংকার দিয়ে উঠলেন তিনি। কেন থাকবে না। আমার মত দিনরাত এ নিয়ে কি কেউ চিন্তা করে না মাথা ঘামায়! শুধু মুখে 'গেল গেল রব'। আরে কেন গেল, কোথায় তার গলদ—কারণ ছাড়া কি কার্য হয়—একবার ঠাণ্ডামস্তিষ্কে কেউ ভেবে দেখেছে? যে যার নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। যা অবশ্যম্ভাবী তাই হয়েছে। কথাগুলো বলার সময় জগুদার কণ্ঠে এমন দরদ ফুটে ওঠে, মনে হয় যেন তিনি ছাড়া এ হতভাগ্য দেশের কথা চিন্তা করার আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

গাঁয়ের লোকেরা জগুদার নাম দিয়েছে পাগলা জগাই। সকলের ধারণা, বেশী পড়ে পড়ে তাঁর মাথার স্ক্রুগুলো সব ঢিলে হয়ে গেছে। তিনি তিন বিষয়ে এম-এ—ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র ও বাংলায়; যদিচ তিনটেতেই থার্ড ক্লাশ। এখনো নাকি ইংরিজীতে একটা দেবার বাসনা আছে, দীর্ঘদিন ধরে তার প্রস্তুতি চলেছে। তাঁর ধারণা, জ্ঞানের যেমন সীমা নেই, তেমনি পরীক্ষা দেওয়ারও কোন নির্দিষ্ট বয়েস নেই। বিয়ে থা করেননি। বাপ যা বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, তাতেই চলে যায় ভালভাবে। তাই চাকরীর পিছনে কখনো ছোটেননি।

কি জানি কেন আমার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। বছরে একদিন কি দুদিনের জন্যে যখনই দেশে যাই, খবর পাওয়ামাত্র নিজেই ছুটে আসেন। তারপর সারা বছরের যতকিছু ভাবনা, চিন্তার বোঝা, আমার কাছে নামিয়ে মাথাটা যেন হাল্কা করে নেন।

তিনি বলেন, দেশে কি একটা মানুষ আছে, যার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি! কার পেটে কতটুকু বিদ্যে, আমার ত জানতে বাকী নেই। তাই সারা বছর তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি।

কথাটা হয়ত সত্যি। তবে আলোচনার কথা যা বললেন, সেটা আর যাই হোক, সত্যি নয়। কারণ একবার কিছু বলতে শুরু করলে, আর তাঁকে থামানো যায় না। তখন একলাই বক্তা বলে যান। মনে আছে, গত বছরের কথা। পুজোর ছুটিতে দেশে গেছি, হঠাৎ একদিন একবোঝা পুজা-সাহিত্য ঘাড়ে করে জগুদা ঘরে এসে হাজির। ছোট-বড়, বিখ্যাত-অখ্যাত সব মিলিয়ে পুজা-সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশখানার কম হবে না।

বললুম, কি হবে এসব?

আমার কথার জবাব না দিয়ে তিনি নিঃশব্দে শুধু একটার পর একটা পত্রিকা, টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিলেন। তারপর লাল পেন্সিলে নিজে যে অংশগুলোয় দাগ দিয়েছিলেন, আমার চোখের ওপর তুলে ধরে বললেন, তোমরা মনে করেছো কি, এইসব ইতরোমি, নোঙরামিগুলোকে সাহিত্য বলতে হবে? আর কি লেখার 'সাবজেক্ট' ছিল না। যদি মগজ দেউলে হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কলম ফেলে দিয়ে, সমাজের মানুষজনদের ঘরে গিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, সমস্যাগুলোকে নিজের চোখে দেখতে বলোগে তোমার—সাহিত্যিক বন্ধুদের। শুধু ঘরের কোণে বসে কিংবা রেস্তোরাঁ কি কফি হাউস দেখে 'সমাজ-সচেতন' সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। ছি ছি ছি, বলতে ঘেন্না করে, বোধ হয় শতখানেক গল্প পড়লুম, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলে বক্তব্য অবৈধ প্রেম। শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের মেয়ে বৌ-ঝি, সবাই নাকি চরিত্রহীনা। দু-একটি গল্পে আবার স্ত্রী স্বামীর খাদ্যে বিষ মেশাচ্ছে তার পূর্বপ্রণয়ীর সঙ্গে মিলনের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যে।

আধুনিক সাহিত্যই যথার্থ 'সমাজ-সচেতন'—'যুগযন্ত্রণা' তার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে। —বলে তোমরা যে ঢক্কানিনাদ করছো, তাহলে এর নাম সেই 'সমাজ-সচেতন' সাহিত্য? আর এই 'যুগযন্ত্রণা'র নমুনা! যুগযন্ত্রণা বলতে কি তাহলে বোঝায়—সংস্কারমুক্ত, সর্বসম্পর্কমুক্ত সকল প্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত বিশেষত পুরুষের অবাধ যৌনাচার!

বললুম, আপনি গ্রামে থাকেন। তথাকথিত সভ্য ভদ্রসমাজের ভেতরে ভেতরে যে কত ছিদ্র, কত গলদ, তার কিছুই জানেন না। শহরে যারা বাস করে, তাদের জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন।

জগুদা হুংকার ছাড়লেন। শহরে! শহরের জীবনে সমাজ কোথায়? সে ত জীবিকার্জনের ক্ষেত্র। ছত্রিশ জাতের টানাটানি, খেয়োখেয়িতে, সমাজ সেখানে টুকরো টুকরো খণ্ড, বিচ্ছিন্ন! নাগরিক জীবনে তাই সমাজ নেই, আছে শুধু কতগুলো ছন্নছাড়া, বৃত্তিজীবি দল বা গোষ্ঠী! এদেরি কোন আস্তাকুড়ের পাঁক ময়লা তুলে নিয়ে সমাজের মাথায় চাপিয়ে গায়ের জোরে 'আধুনিক সাহিত্যের' লেবেল এঁটে হয়ত হাততালি পাওয়া যায়, কিন্তু সমাজের ছাড়পত্র তাতে মেলে না।

বললুম, সাহিত্যই ত সমাজের প্রতিচ্ছবি: আপনি কি তা স্বীকার করেন না?

নিশ্চয় করি। তাই বলে যা কিছু লেখা হয়, তাকে সাহিত্য বলে স্বীকার করি না।

তা যদি হতো ভেবে দেখো আজ পর্যন্ত সাহিত্যের নামে যত কিছু ছাপা হয়েছে, সব যদি বেঁচে থাকতো তাহলে বোধ হয় সারা দেশে জায়গা কুলাতো না, তাদের রাখার। অথচ তাদের কটার নাম তুমি জানো। তোমার মনে আছে। যা সত্যিকারের সাহিত্য, তা কালজয়ী যুগজয়ী। তাদের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। বনস্পতির মত অরণ্যের মধ্যে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে যুগ থেকে যুগে। অথচ তাদেরি পায়ের নীচে কত গাছগাছালি নিত্য জন্মাচ্ছে আর মরে যাচ্ছে, কে তার খবর রাখে।

জগুদার কণ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। বলেন, যা সত্যিকারের সমাজসচেতন সাহিত্য, তার জন্যে ঢাক পেটাতে হয় না। যেখানে ধর্ম নেই, নীতি নেই, নারীর সতীত্ব বলতে কিছু নেই, আমাদের সমাজ আজ সেখানে নেমে গেছে এটা বিশ্বাস করতে বলো। আজ তাহলে গঙ্গার ঘাটে, কালী-মন্দিরে এত পেশাপিশি ভীড় কেন? মন্ত্র পড়ে শালগ্রামশিলা ছুঁয়ে কেন তবে মেয়ে-দের বধূবরণ করে ঘরে আনি। কেন তাদের গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসিয়ে ভাবী সন্তানের জননীরূপে সংসার-সুখের কল্পনা করি? এরা কারা, কোন সমাজের মানুষ? বাংলা-দেশে আজ যে প্রায় পাঁচ কোটি লোকের বাস, তার কত ভগ্নাংশ শহরে বাস করে—আর তার কত ভগ্নাংশের কথা নিয়ে এই আধুনিক সাহিত্য! হঠাৎ একটু থেমে, আমার মুখের ওপর ভ্রূকুটি করে বললেন, সমাজ একটা ছেলেখেলার বস্তু নয়, সমুদ্রের মত তা বিরাট, মহান ও সুগভীর। তোমার আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষীণ দৃষ্টি মানুষের ধ্যানধারণার তা অতীত। 'সমাজ-সচেতন' সাহিত্য তাই যাঁর অমৃতময়ী লেখনীর সৃষ্টি, তিনি কেবল স্রষ্টা নন, দ্রষ্টা! সমগ্র জাতির তিনি নমস্য।

এবার আমি তাই জগুদার ওই কথার ওপর কি বলা উচিত, ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলুম।

জগুদা বললেন, জানি কথাটা সকলের কানে খারাপ লাগে, এতকালের পরাধীনতার পর দেশে যখন স্বাধীনতা এলো, সেটাই যত দুর্ভাগ্যের মূল, একথা শুনতে কারো ভাল লাগে না। আমারও কি ভাল লাগে? কিন্তু কি করবো, রাতের পর রাত জেগে বহু গবেষণা করে তবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তুমি কি মনে করো না, এর জন্য দায়ী, স্বাধীনতা?

এই বলে আমার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে মুহূর্ত কয়েক থেমে, আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার নিজের বক্তব্যে ফিরে এলেন। দুশো বছর ধরে ইংরেজ একটা জাতকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আস্টে-পিস্ঠে বেঁধে রেখেছিল, তার অর্থ কি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। অর্থাৎ, এক নীতি, এক ভাষা, এক আইন, এক শিক্ষার ঐক্যবন্ধনে সকলকে বেঁধে তবে প্রভুত্ব করছিল, অখণ্ড প্রতাপে। এতটুকু এদিক-ওদিক হলে তার রক্ষা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি!

অবশ্য সে শাস্তির মধ্যে রকমফের ছিল। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। যেমন চোর-ডাকাত বা খুনী আসামীদের জন্যে ছিল জেল, হাজতবাস, ফাঁসি, দ্বীপান্তর তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে, স্কুলকলেজের আইন বিরুদ্ধ কোন কাজ করলে, পরীক্ষার হলে টুকতে গিয়ে ধরা পড়লে, কি কোন শিক্ষককে অপমান করলে, অপরাধের গুরুত্ব ভেঙে কখনো ছাত্রদের ফাইন হতো, কখনো বা নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো আবার গুরুতর অপরাধের জন্যে 'রাসটিকেট' করা হতো। অর্থাৎ জন্মের মত লেখাপড়া খতম্। আর কোন স্কুল-কলেজে জীবনে কখনো পড়াশুনা করতে পারবে না!

এছাড়া স্কুল-কলেজের 'ক্যারেকটর সার্টিফিকেটে'র ওপরই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বলতে যা কিছু সব তখন নির্ভর করতো। কেবল আই-সি-এস, বি-সি-এস পদ নয়, যেকোন সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কোন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদের জন্য সর্বাগ্রে এই 'ক্যারেকটর সার্টিফিকেট'কে প্রাধান্য দেওয়া হতো। ফলে ছাত্রদের অভিভাবকরা যেমন তাদের লেখাপড়া ও চরিত্রের ওপর কড়া নজর রাখতেন তেমনি ছাত্ররা নিজেও ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা চিন্তা করে, যাতে চরিত্রের কোথাও এতটুকু কলঙ্ক স্পর্শ না করে, তার জন্যে শিক্ষকদের ভয় করতো, মান্যও করতো! মোটকথা কেবল লেখাপড়া নয়, আসল যে চরিত্রগঠন, শিক্ষার সেই মূল নীতি এই স্কুল-কলেজের মাধ্যমে ছাত্ররা তখন লাভ করতে বাধ্য হতো। ইংরেজরা জানতো, এই ছেলেরাই সাবালক হয়ে এক-দিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক-একটি নাগরিক হবে। এদেরি ওপর কেবল একটা বিশেষ পরিবারের মানমর্যাদা নির্ভর করবে না, দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার যে দায়-দায়িত্ব তারও হবে অংশীদার এরাই। তাই সমাজের সর্বস্তরে, ছোটবড়, উঁচু-নীচু, যেখানে যে কাজ কেউ কখুক আগে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হতো। এতটুকু বেচাল হলেই, শাস্তি। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট হলেও ক্ষমা নেই। চাকরীর ক্ষেত্রে সব সমান। সামান্য কেরানীর মতো তাদেরও প্রমোশন আটকাতো, 'ডিমোশন' হতো। সেই জন্যে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা ফেলে ছুটতো যে-যার কর্মস্থলে। ওই বুঝি লেট হলো! সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাহলেই হাজরেখাতায় লালকালির দাগ পড়ে যাবে। অযথা কামাই, বা অনাবশ্যক ছুটি নিয়েও চাকরির রেকর্ড খারাপ করতে চাইতো না কেউই, পাছে তা প্রমোশনের প্রতিবন্ধক হয়। অথচ মজা এই। ইংরেজ যাদের হাতে এই শান্তি-শৃঙ্খলার ভার অর্পণ করেছিল তারা আমাদের এই দেশেরই লোক! তাঁদেরই কথায় লোক উঠতো বসতো, তাঁদেরি 'জী' 'হুজুর' বলে সেলাম ঠুকতো, তাঁদেরি জুজুর মতো ভয় করতো। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, বড়বাবু, ভাইস-চ্যান্সেলার, কলেজের প্রিন্সিপাল, স্কুলের হেডমাস্টার, কারখানার ম্যানেজার, ব্যব-সায়ের মালিক, যিনি যে চেয়ারেই বসুন না কেন। কেবল তাই নয়, সাহেবের আর্দালী, বড়বাবুর পিওন, আদালতের পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে চলতো। সামান্য বেতনের কোন একটা পুলিশকে পাড়ায় ঢুকতে দেখলে তখন সকলের বুক ভয়ে ঢিপ-ঢিপ করে উঠতো। সে কত টাকা মাইনে পায়, কিংবা সে দ্বারভাঙ্গা, কি গয়া জেলার লোক, একবারও তা কারো মনে হতো না। তার লালপাগড়ীটাই ছিল যথেষ্ট। সে যে একজন রাজকর্মচারী, ইংরেজ শাসকের প্রতিনিধি তাকে গালাগাল করা বা তার গায়ে হাত দেওয়া মানে ইংরেজ সরকারের অপমান করা। এটা দেশের ছোট বড় সকলেই তখন বুঝতো বলেই এতবড় দেশকে এতকাল এক শাসন রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখতে পেরেছিল তারা। রাজধর্ম বলতে দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালনকে বোঝায়। তাই ছোটবড় ও উচ্চ-নীচের প্রভেদটা তখন সবাই বুঝতো। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই তাই তার উপরিওলাকে শ্রদ্ধা করে চলতো, তার আদেশ অমান্য করার সাহস কারো ছিল না। তা ভয়েই হোক,
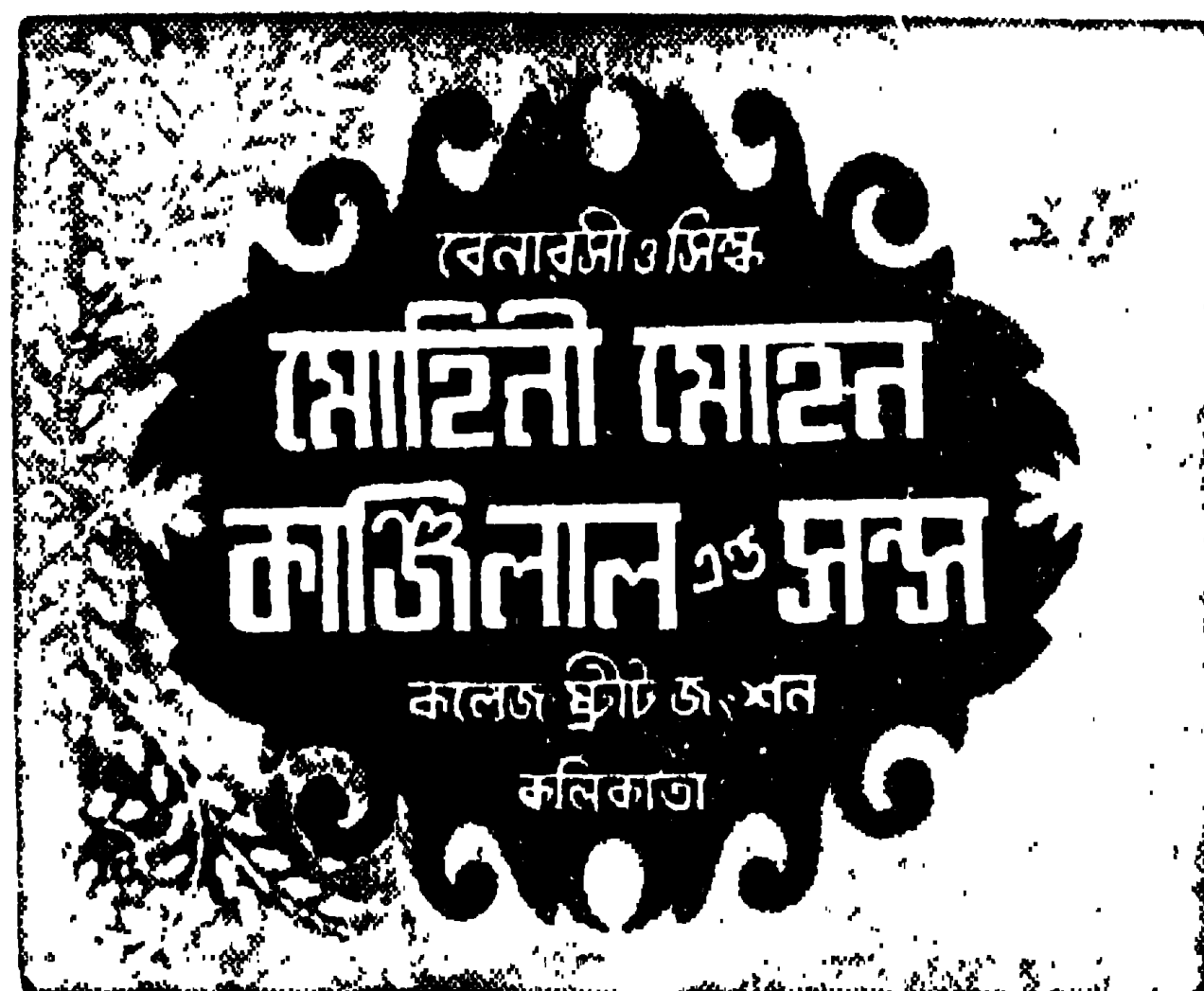
[illegible] শক্তিতে হোক। ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে লুটপাট করে যেমন অনেক কিছু নিয়ে গেছে তেমনি যা দিয়ে গিয়েছিল তার মূল্য বোধ হয় আরো বেশী, বিশেষ করে আজ তা লোক মর্মে মর্মে অনুভব করছে। এটা স্বীকার করো কিনা? বলে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমতা আমতা করে জবাব দিলাম, হাঁ, একথা শুধু আমি কেন, সবাই স্বীকার করে। 'কাম টু দি পয়েন্ট।' হঠাৎ জগুদার গলাটা আরো এক পর্দা চড়ে উঠলো। তিনি বললেন, তাহলে স্বীকার করছো যে, যেদিন এই দীর্ঘকালের পরাধীনের শৃঙ্খল ছিন্ন হলো, আমরা স্বাধীনতা লাভ করলুম, সেই দিন থেকেই দেশের ভাঙন শুরু হলো। অর্থাৎ এতকাল ইংরেজ যে একতার বন্ধনে—এক ভাষা, এক নীতি, এক আইনের রজ্জু দিয়ে আমাদের বেঁধে রেখেছিল, তা ছিঁড়ে গেল সংগে সংগে। আর তার ফলে নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা, আনুগত্য প্রভৃতি যেসব সদগুণ দাসত্বের অনুশাসনে এতদিন জাতির মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল, তাতে ধরলো ফাটল। পুরনো যা কিছু দাসত্বের প্রতীক; তাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাকে ভেঙে যথার্থ স্বাধীনতার আনন্দ পাবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠলো লোক। পরাধীনতার সব কলঙ্ক ধুয়ে মুছে ফেলতে চাইলো দেশ থেকে।

স্বাধীন দেশের মানুষ সবাই এক। সেখানে কেউ কারো দাসত্ব করে না। তাই ছোট-বড়র পার্থক্য ও মনিব কর্মচারীর সম্পর্কের মধ্যে সেদিন যে ফাটল ধরেছিল একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে আজ তা এইখানে এসে পৌঁচেছে।

জাতির জনক, মানবতার শ্রেষ্ঠ পূজারী, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তখন সবাই অনুপ্রাণিত যে সত্যাগ্রহের ফলে একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলমল করে উঠেছিল, মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত সেই পথ তারা অনুসরণ করলে। অবশ্য নিজেদের সুবিধামত সত্যাগ্রহের আদর্শ ও নীতিকে পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে নিয়ে কাজে লাগাতে লাগল।

এই বলে একটু থেমে আমার মুখের ওপর চোখ রেখে জগুদা বললেন, আমার মনে হয়, সেই সত্যাগ্রহই আজ রূপান্তরিত হয়ে 'ঘেরাও' নাম নিয়েছে।

এদিকে পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরাধীনতার গন্ধ আছে তাই স্বাধীন ভারতের জন্যে নতুন ছাঁচে তাকে ঢালতে গিয়ে সর্বপ্রথম স্কুল থেকে 'শাস্তি' তুলে দেওয়া হলো। আর সেই সঙ্গে বুড়ো বিদ্যাসাগরকে নির্বাসন দেওয়া হলো পাঠ্যতালিকা থেকে। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, বোধোদয়, কথামালা প্রভৃতি বইয়ের বদলে নানা রঙের ঝক-ঝকে চক-চকে ছবির এই তাদের পড়তে দেওয়া হলো। বিদ্যাসাগরের কথা তারা ভুলে গেল। অর্থাৎ ভুলে গেল, 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'চুরি করা বড় দোষ'। 'কখনো কাহাকেও কটু বাক্য বলিও না' 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার মানে স্বাধীন ভারতের যারা ভাবী নাগরিক, যাদের ওপর জাতির মান-মর্যাদা দায়-দায়িত্ব সব কিছু নির্ভর করছে, তাদের প্রথম দীক্ষা হলো শাস্তিহীন নির্ভয় মন্ত্রে। আর প্রথম শিক্ষা পেলে নীতিশিক্ষাবর্জিত পাঠ্যপুস্তকে। আজকের যে যুবসমাজ, তারা সেদিনের স্বাধীন ভারতের ছাত্র।

হঠাৎ যেন মনে হলো জগুদা বক্তৃতা দিচ্ছেন, কোন বিরাট জনসভায়। মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর মুখের ওপর সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। তাঁর কণ্ঠ উৎসাহে জ্বলে ওঠে, কোন কার্যই কারণ ব্যতিরেকে ঘটে না। এদিকে রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁরাও স্বাধীনতার আনন্দে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এমন কাণ্ড করে বসলেন, যা পৃথিবীর কোন দেশে কখনো হয় নি বা কেউ কোন দিন শোনে নি। দীর্ঘকালের পরাধীনতার পর কোন রাষ্ট্র স্বাধীনতা পেলে, আগে সে তার নিরাপত্তা কায়েমী করার জন্যে একদিন যারা তার সংগে শত্রুতা করেছিল বা নিমকহারামী করেছিল সেইসব দুষমনদের রাজ্য থেকে দূর করে দেয় কিন্তু আমরা তা না করে বরং দু বাহু বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছি, 'মেরেছো কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না'! শত্রুকে আমরা ভালবাসা দিয়ে জয় করতে চেয়েছি। প্রতিশোধের বদলে 'প্রীতিশোধ' বলেছি। একবারও মনে হয়নি 'রাজধর্মে' ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম নাই আছে শুধু জয়ধর্ম মহারাজ।' তাই 'ভাই ভাই' নীতি, 'শান্তিপূর্ণ সহবস্থান', পঞ্চশীল প্রভৃতি নিয়ে যখন নাচানাচি করছি, বুঝতে পারি নি সংবিধানের নামে যে খিচুড়ি তৈরী করেছি, নানা জাতি, নানা ধর্ম নানা মতবাদের সংমিশ্রণে, ভারতের মহান ঐক্যের আদর্শ দেখিয়ে বিশ্ববাসীকে হতচকিত করে দেবার জন্যে তখন কেউ জানতে পারিনি যে সেই ঐক্যের মধ্যেই ছিল ভাঙন। যে দেশে এক সংসারে তিনটে হাঁড়ি, ভায়ে ভায়ে পৃথক, মা ছেলেতে বনিয়ে থাকতে পারে না, সেখানে বহু জাতি বহু মত, বহু পথ নিয়ে একতা রক্ষা করা কি কখনো সম্ভব।

এই বলে একটু থেমে, দম নিয়ে নিলেন জগুদা। তারপর আমার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বললেন, আমার মনে হয় আজকে এই যে, আমাদের দেশে সব কিছুতে ভাঙন ধরেছে, তার জন্য দায়ী এই স্বাধীনতা। তুমি কি বলো?

আমি ত হতবাক। কি বলবো এরপর বুঝতে না পেরে নীরবে চেয়ে থাকি।

বিশ্বাস হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি করবো, এই আমার সিদ্ধান্ত। তোমরা বিশ্বাস করো বা না করো, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

এই বলে তিনি যখন চুপ করলেন, আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলুম, সব ত শুনলুম এখন এ থেকে বাঁচবার পথ কি, ভেবে দেখেছেন কিছু?

সংগে সংগে তিনি বলে উঠলেন, 'যেন মহাজন গতঃ স পন্থাঃ'। ইতিহাস তো মশা পড়ো না। সেখানেই সবকিছু লেখা আছে। সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি যখন যে রাজ্যে বিরাজ করতো তখন সেখানের শাসননীতি কি রকম ছিল, সেটা দেখলেই সহজে বুঝতে পারবে। মনে রেখো, 'হিসট্রি রিপিটস্ ইটসেলফ!'

আমি একেবারে বোবা বনে গেলুম।

রবীন্দ্রনাথ : একটি বিতর্ক

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আবার রবীন্দ্রনাথ? হ্যাঁ, একথা খুবই বলা যায়, তবু বলতে চাওয়ার আগে অন্য একটা প্রশ্নও মনে জাগতে বাধ্য, এ-মুহূর্তে জাগছেও, এবং সেটা হল এই : কী তবে হয়েছে আমাদের—হয়তো সকলের নয়, আশা করি নয়, কিন্তু অনেকেরই—রবীন্দ্রনাথের প্রতি হঠাৎ এই অনীহা কেন? অনীহাটা হঠাৎ কিনা, হলেও কত দূর হঠাৎ, সে-প্রশ্নটা হয়তো ততটা বড় নয় এবং তাতে যাওয়ার সময়ও এখন নেই। কিন্তু অনীহাটা যে আছে, হয়েছে, একটা সত্য, সেটাই বড় কথা—আর তাই এই অনীহা কেন, সে-প্রশ্নটাও বড়। অন্য দেশ হলে এ ধরনের একটা প্রশ্ন তুলতে কোনো পাঁয়তাড়া কষারই দরকার পড়ত না, কারণ সেখানে চট করে বলা এত সহজ যে ভালেরিকে আজকাল আমার আর তত ভালো লাগে না বা রিলকেকে এখন আমার অপাঠ্য বলে মনে হয় বা মাত্র দু'দিনের আগের সেই টি এস এলিঅটকেও অবশেষে তাকে তুলে রাখতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এখানে সে রকম কিছু বলা, বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই? সেটা অভাবিতব্য। এ-দেশে আমরা মানুষকে হয় অমানুষিক অবজ্ঞা ও নির্যাতনের মধ্যে রাখব, নয়তো কদাচিৎ-কদাচিৎ তাকে তুলব দেবতার আসনে, এবং একবার দেবতার আসনে তাকে তুলতে পেরেছি কি আর কথা নয়, তাকে ঘিরে নির্ভেজাল স্তোকবাক্য ও বিচিত্র ট্যাবুর বাসিফুলের মালা সাজাব। সাম্প্রতিক বাংলা সংস্কৃতির চর্চায় একটি চরমতম দুর্ভাগ্য আমাদের হল এই যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা জীইয়ে রাখতে পারি নি সজীব সমালোচনার মাধ্যমে, পরিবর্তনশীল যুগের নতুন আলোক নিয়ে আজো তাঁর দিকে তাকাতে পারি নি। এতে ক্ষতি যা হয়েছে-হচ্ছে, সেটা তাঁর এতটুকু নয়, সম্পূর্ণ আমাদেরই, কারণ অভিভূতের ভাবে না বলে তো পারব না কিছুতেই যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সারা বিশ্বের এক প্রকাণ্ডতম লেখক, এক প্রচণ্ডতম মানুষ।

বাংলা কবিতার ধারায় 'শেষ লেখা'-র স্থান কী, সে-আলোচনার সঙ্গে এ প্রশ্নগুলি যুক্ত মনে করি, তাই তুলেছি। এখন গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করা যাক, সবিনয়ে ও আমার অতি সামান্য জ্ঞান ও সাধ্যমতো। 'শেষ লেখা'র যেটি শেষতম লেখা, সেই বহুবিদিত 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটি, সেটি নিয়ে যদি বক্তব্য শুরু করি তো এ-আপত্তি হয়তো উঠবে যে কোনো ব্যক্তিত্বের শেষ সজ্ঞান স্বাক্ষর বা উচ্চারণের মধ্যে তার আদ্যন্তের সামগ্রিক মর্মার্থটি যে সব সময় ধরা পড়বেই এমন কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আপত্তিটাকে টেঁকানো মুশকিল, কারণ রবীন্দ্র-জীবনের এই শেষতম সৃষ্টিশীল উক্তির মধ্যেও হয়তো সেই জীবনের অতি চারিত্রিক ধ্বনি ও দর্শন সন্দেহাতীতভাবে বিধৃত। এমনিতেই তো আগাগোড়া এক অবিচ্ছিন্নতার সুরে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের বিপুল পরিমাণ ও বহুবিচিত্র অবদানকে একটি বিশিষ্ট ঐক্যে চিহ্নিত করেছে, তার উপর গোড়ায় ও মধ্যজীবনের লেখাগুলিতে যে-বক্তব্য ছিল অলংকারে ও অতিকথনে ভারাক্রান্ত, তা-ই শেষের পর্যায়ের রচনায় সকল অহেতুক আড়ম্বর ঘুচিয়ে ক্রমশই হয়ে উঠেছে আরো ঋজু, আরো উজ্জ্বল, আরো শাণিত—যেন অনেকটা এক্স রশ্মির ভিতর দিয়ে মাত্র সার বস্তুটিই বেরিয়ে আসার মতো। এখানে অবশ্য মানব, কেউ-কেউ সেই ঐক্যের স্থায়ী ভাবের মধ্যেও স্থানে-স্থানে দুয়েকটি সঞ্চারী-ব্যভিচারী ভাবের আবিষ্কার করেছেন, এক-আধজন তো রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের একটি-দুটি কবিতায় পাশ্চাত্ত্যসুলভ অস্তিত্ববাদ ও অতি অধুনাকালের তথাকথিত সন্দেহবাদের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে একমত আমি নই, তবু তর্কে মাততে চাই না, শুধু এটুকু বলা হয়তো সমীচীন হবে যে উল্টোপাল্টা ধ্বনি অস্ফুটভাবে যদি কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েও থাকে, সামগ্রিক সুরকে তা কোনো অংশে ব্যাহত করে নি—এবং সেই সুরটি হচ্ছে এক বিশ্বাসের, যে বিশ্বাস সর্ব দ্বিধাহীন।

নিবন্ধটি বিতর্কমূলক, এবং সম্পাদকীয় মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। তবু প্রকাশিত হল এই উদ্দেশ্যে যাতে এ নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। অ, স,

---

রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব নিয়ে ইতিমধ্যেই এত সরস-নীরস-বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে যে, আবার থোড়বড়ি-খাড়া করতে চাই না। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ঠিক কোন পর্যায়ের ছিল বা ভারতীয় সেই দর্শনে কতখানি চিহ্নিত ছিল, তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতাটিতেও সেই একটি বিশ্বাসের অঙ্গীকার এবং কবিতাটি যদিও তার সারল্যে-সংযমে-গাম্ভীর্যে অনবদ্য, এক অনস্বীকার্য মহিমায় মণ্ডিত, তা পাঠের পরে অনেক উৎসুক পাঠকই এক বিচিত্র অস্বস্তিবোধের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। এমন-কি আমি আরো দূর এগোব এবং বলব, সেই অস্বস্তিবোধের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই রেহাই পান নি, বরং এমন এক দ্বন্দ্বে হয়তো তিনি সত্যিই ভুগে[illegible] যা শুধু এই কবিতাতেই নয়, তাঁর [illegible]য়ো জীবনের ব্যাপ্তিতে অন্তত প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত। কবিতাটি আরেকবার তলিয়ে দেখা যাক তবে— বলছেন রবীন্দ্রনাথ :

> তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
> বিচিত্র ছলনাজালে,
> হে ছলনাময়ী।
>
> মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
> সরল জীবনে।
> এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত
> তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
>
> তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
> যে পথ দেখায়
> সে যে তার অন্তরের পথ,
> সে যে চিরস্বচ্ছ,
> সহজ বিশ্বাসে সে যে
> করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
>
> বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
> এই নিয়ে তাহার গৌরব।
> লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
>
> সত্যেরে সে পায়
> আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
>
> কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
> শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
> আপন ভাণ্ডারে।
>
> অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
> সে পায় তোমার হাতে
> শান্তির অক্ষয় অধিকার।

ব্যাখ্যার কমই দরকার পড়বে, বিশেষত রবীন্দ্র-কাব্যে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে। তবু খটকা লাগতে পারে একেবারে মূল বক্তব্যটা নিয়েই। প্রথমত, কোন 'ছলনাময়ী'র কোন ছলনা'র কথা এখানে বলা হচ্ছে? এ-'ছলনাময়ী' কি কবির বহু আগের এ কী কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়ী'র সেই 'কৌতুকময়ী'র সঙ্গে একাত্ম, না কি তার স্বজাতি বা দূর সম্পর্কের কুটুম্বমাত্র, কারণ এতদিনে ছলনার প্রকৃতিভেদ হয়েছে কবির অভিজ্ঞতায়, চিন্তার গভীরতায় ও পরিচ্ছন্নতায় আজ তিনি আরো অনেক বেশী বয়স্ক, বলতে পারছেন, 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' বা 'চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়'? না-হয় মেনে নিলাম শেষের অনুমানই সত্য, তবু দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন জাগবেই : সেই কঠিনের কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বলেই কি কেউ অনায়াসে ছলনা সওয়ার দরুন শান্তির অক্ষয় অধিকার পাবে? 'অক্ষয় অধিকার' কথাটা তো বড্ড বাড়াবাড়ি নিশ্চয়, তাছাড়া সেটা পাচ্ছে কে, এবং 'শান্তি'-টারই বা স্বরূপ কী? উত্তরে আমার মনে হয়, এ-শান্তি কোনো শান্তিই নয়, এ-শান্তির

[illegible]ও কখনো সম্ভব নয়, এ-শান্তি শুধু শান্তি পেলাম বলে একটি মনগড়া কল্পনা নিয়ে মিথ্যা সান্ত্বনামাত্র এবং জীবন ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে ও প্রাণপণ চেষ্টায় শান্তির এই মিথ্যা সান্ত্বনা যে পেতে চায় বা পারে, সে একমাত্র কোনো ব্যক্তি-বিশেষই, এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কারণ অনায়াসে ছলনাকে অবজ্ঞা করে শান্তির এই অক্ষয় অধিকার অর্জনের সঙ্গে মানুষের ও পৃথিবীর ইতিহাসের প্রচেষ্টার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, এমন-কি কাব্য করে বলতে গেলে ফুলের ফুটে-ওঠার অদৃশ্য দুর্ধর্ষ সংগ্রামের সঙ্গেও এর কোনো পরিচয় নেই। এ-শান্তি একান্তভাবে পলাতকের, অন্যায়ের তরঙ্গা-কুল সমুদ্রের সামনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অসহায় আত্মকেন্দ্রিকের, নিজেকে নিজের একটা স্তোক—এক কথায়, এ-শান্তি মানুষ-বিরোধী, প্রকৃতি-বিরোধী, ইতিহাস-বিরোধী।

কিন্তু এমন একটা কথা মানি কী করে? কারণ কবি রবীন্দ্রনাথের সবথেকে বড় পরিচয় তাঁর মানব-প্রেমে, অন্তত সেই বিশ্বাসেই আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। যথার্থ-ভাবে তিনি ছিলেন বিশ্ববাসী, এবং সেখানেই সগোত্র অন্যান্য বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, বিশ্বের মানুষের কথা সমানই ঐকান্তিক-ভাবে ভেবেছেন রমাঁ রলাঁ-ও, এবং বিশ্লেষণী সূক্ষ্মবুদ্ধিতে যদিও রবীন্দ্রনাথের থেকে তাঁকে আরো অনেক বেশী উজ্জ্বল মনে হওয়া স্বাভাবিক, মানুষ নিয়ে তাঁর আর্তি কখনো পৌঁছোতে পারে নি সেই রসো-ত্তীর্ণ মহিমায়, যা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথে। সেই মানব-প্রেমের অজস্র সত্যকারের প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনে, আজ যিনি 'শান্তির অক্ষয় অধিকার'-এর প্রসঙ্গ তুলছেন, তিনিই মাত্র কিছুকাল আগে অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরি-হাস', লিখেছেন, 'সভ্যতার সংকট', এমন কি, বিশ্বস্তসূত্রে শুনতে পাই ১৯৪১-এর সেই মুমূর্ষু ক্ষণগুলিতে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন গত বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু খবর নিয়ে, যেমন নাৎসী বাহিনীর আক্রমণে সোবিয়েৎ রাশিয়া পিছিয়ে পড়ছে কি না, এবং পিছিয়ে পড়ছে না জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাসও নাকি ফেলেন। অবশ্য এখানে বলা উচিত হবে, রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর খুব একটা উৎসাহ ছিল না। এক-কালে তো হিটলারের জার্মানি ও মুসো-লিনীর ইতালিকে নিয়ে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না, এবং সেই উৎসাহকে কেন্দ্র করে তাঁকে নিয়ে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের যে-প্রচণ্ড আক্ষেপের কারণ ঘটে, তার বিস্তারিত বিবরণ মিলবে রমাঁ রলাঁ-র 'ভারত ডায়েরী'তে।

তবে রাজনীতির ব্যাপারটা আলাদা, এবং সে-সম্বন্ধে পরে তিনি নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টাও করেন। কথা যেটা এখানে, সেটা হল, রবীন্দ্রনাথের অতি বড় শত্রুও তাঁকে মানব-প্রেমিকের বিপরীত কোনো আখ্যা দিতে যাবেন না। এবং সেটা যদি সত্য হয় তো পরের প্রশ্নটাও স্বাভাবিক ঠেকবেঃ তা হলে তাঁর শেষ উদাহরণে শুধু ব্যক্তিগতভাবে এক পার-মার্থিক মুক্তির কেন তিনি এত বড় বিলাসী, কেন এত আত্মকেন্দ্রিক তিনি? তবে কি মৃত্যুর মুখোমুখি বলেই ভিন্ন কিছু ভাবার সময় নেই কবির, এবং সেই কারণেই 'শেষ লেখা'র অন্যান্য কবিতাতেও ঘুরে-ফিরে একই প্রসঙ্গে বার বার আসছেন? উদাহরণ তো রয়েছেই, কোথাও বলছেন ঃ

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।।

কোথাও বা ঃ

দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,—
কে তুমি?
পেল না উত্তর।।

আবার কোথাও ঃ

এই হারজিত খেলা জীবনের
এ-মিথ্যা কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে
এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।।

তর্ক এখানে কবিতার গুণাগুণ নিয়ে নয়, কারণ ব্যক্তি-জীবনের কবিতা হিসেবে 'শেষ লেখা' মহৎ কাব্যের স্বীকৃতি পাবেই, এবং শুধু 'শেষ লেখাই' বা কেন, শেষ পর্যায়ের তাঁর প্রায় সব লেখাগুলিও, সে-স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হবে না তাঁর সারা জীবনের রচনার অন্য কিছু কিছু অংশও। প্রশ্ন বা দ্বন্দ্ব যেটা জাগবে, সেটা রবীন্দ্র-নাথের জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বও, সেটা তাঁর মানব-প্রেম ও আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে। মানব-প্রেমিক যে কখনো আত্মকেন্দ্রিক হতে পারবেন না, তা নয়, কিন্তু 'শেষ লেখা'য় ও আরো বিশেষ করে 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটিতে এমন কিছু প্রকট আভাস আছে যা শুধু মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথেরই নয়, তাঁর সারা জীবনেরও গোটা বক্তব্য ও দর্শনের একটা মোটা অংশ। এবং যেহেতু বক্তব্য বা দর্শনের সেই মোটা অংশটি সামাজিক মানুষকে নস্যাৎ করে একমাত্র ব্যক্তিস্বরূপের অধ্যাত্মভাবেই পরামর্শ খুঁজেছে, খটকা লাগে সেই কারণেই।

একদিকে 'তোমার সৃষ্টির পথ'-এর মতো কবিতা, অন্যদিকে বৃহত্তর মানুষের প্রতি উৎসর্গীকৃত কর্মময় জীবন, কী করে এই দুই নৌকায় পা রেখে রবীন্দ্রনাথ চলতে পেরেছিলেন, সেটা বুঝতে গেলে যে-সমাজের ফল তিনি, সেই সমাজকে বুঝতে হবে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে জাঁ-পল সার্ত্রের একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের কথা, এবং সার্ত্র যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক জগতের বাসিন্দা, তাঁর একটি-দুটি উক্তি এ আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ ঠেকতে পারে। সাক্ষাৎকারটিতে সার্ত্র বলেন যে, গত মহাযুদ্ধের পরেই একবার তিনি লেখেন, 'যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো পরি-স্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, প্রতারক হবে কি হবে না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা মানুষের সব সময়েই থাকবে।' আজ কিন্তু সার্ত্র ভাবতে গিয়ে আঁৎকে উঠছেন, মনে মনে বলছেন, এমন একটা সাংঘাতিক মিথ্যা কথা তিনি সেদিন লিখতে পারলেন কী করে? সেদিন ফরাসী-দের কাছে যে-দুটি প্রশ্ন ছিল, তা সাদা-কালোর মতো স্পষ্ট, হয় এটা নয় ওটা—হয় তারা জার্মান অবরোধের বিরোধে দাঁড়াবে, নয়তো জার্মানদের সঙ্গে সহ-যোগিতা দেখিয়ে প্রতারকের আখ্যা পাবে। আজকের সমাজ ভয়ংকরভাবে জটিল, তাই মানুষের প্রশ্নগুলোও জটিল, হ্যাঁ বা না নয়, 'হ্যাঁ...কিন্তু' বা 'না...কিন্তু'র সমস্যা আজ মানুষের।

খানিকটা একই যুক্তিতে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের সময়ের প্রশ্নগুলি ছিল সোজা, তখন বৈদেশিক শাসনাধীন দেশে হ্যাঁ বা না এবং ভালো বা মন্দের মূল্যবোধ ছিল অতি চিহ্নিত। তখন ঐকান্তিক মানব-প্রেম ও ব্রাহ্মসমাজোচিত বা উপনিষদসুলভ অধ্যাত্মভাব হাত-ধরাধরি করে একসঙ্গে চলতে পারত—আজ আর একেবারেই পারছে না। এমন-কি মানব-প্রেমের প্রকৃতিটাই গেছে বদলে। কারণ যে-উনবিংশ শতাব্দীর রনেসাঁস-এর পরম পরিপক্ব ফল রবীন্দ্রনাথ, এবং বহু মহৎ অবদান সত্ত্বেও যে রনেসাঁস-এর একমাত্র পরিচয় তথাকথিত মধ্যবিত্ত বাবু সংস্কৃতির অভ্যুত্থানে, সেই রনেসাঁস-এর সকল মূল্যবোধ আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত—আজ ভদ্রলোকেরা পদে-পদে-মানে 'ছোটলোক' হয়ে যাচ্ছে, অবক্ষয়ের করাল গ্রাসে অতীতের সৌন্দর্যবোধও লুপ্ত।

তাই যে-বিরাট ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর কাব্যের যে-মাহাত্ম্য, যার অতি বিশিষ্ট পরিচয় 'শেষ-লেখা'য়, তার প্রতি কটাক্ষপাত এখানে উদ্দেশ্য নয়। শুধু বাংলা কাব্যের ধারায়—যেমন বাচনভঙ্গীতে, তেমনি বক্তব্যে, তেমনি মনের দৃষ্টিতে—আজ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে কেন এত অন্য জগতের, কেন ইতিমধ্যেই এত পরি-ত্যক্ত ও এক অর্থে আকর্ষণীহীন, তার কতকগুলি কারণ এখানে দর্শাতে চেয়ে-ছিলাম। যে-দেশ বা ভূমিখণ্ড রবীন্দ্রনাথের কাব্য, 'শেষ লেখা' তার শেষতম সীমান্ত—কিন্তু আমাদের অর্ণবপোত বাত্যাবিক্ষুব্ধ কোন মহাসাগরে আজ, প্রতি মুহূর্তে যতই এগোচ্ছে, সে-ভূমিখণ্ডও শুধু দৃষ্টির অগোচরই হচ্ছে না, তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনও যেন ক্রমশই ছিন্ন হচ্ছে।

সাম্প্রতিক রবীন্দ্র সমীক্ষা

কাছের মানুষ সম্পর্কে আমরা যেমন জানি অনেক, তেমনি আবার অনেক কিছুই থাকে অজানা। রবীন্দ্রনাথও আমাদের কাছের মানুষ। তাঁর কথা লেখা হয়েছে অনেক। পণ্ডিতেরা চুলচেরা বিচারে মেপেছেন কবিকে। ক্রমে তাঁদের ক্ষমতা হয়েছে শেষ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেকটাই থেকে গেছে মাপের বাইরে। তিনি তো অনেকদিন আমাদের মধ্যে নেই। বেশ একটা কাল পেরিয়ে এলাম আমরা। পৃথিবীর অনেক কিছু বদলেছে। ন্যায় নীতি আদর্শের ব্যাখ্যা হচ্ছে নতুন করে নতুনভাবে। সমাজ-জীবনে এসেছে বিবর্তন। তবুও সেদিনের রবীন্দ্রনাথকে আমরা আজও স্মরণ করি। আজও তাঁর জন্মদিনে উৎসবের অন্ত থাকে না। নতুন নতুন বই বেরোয়, নানা আলোচনায় ভরে ওঠে পত্র-পত্রিকার পাতা। তাঁর কাছে কি আমাদের চাওয়ার শেষ হয়নি এখনও?

এবার কতকগুলি নতুন বই বেরিয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথকে যে আরও নতুন করে জানবার আকাঙ্ক্ষা যে মেটেনি তা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা :

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন সম্প্রতি। তাঁর 'রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা' প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল কয়েক বছর আগে। বাংলা দেশে তাঁর মত বিদগ্ধ সমালোচকের সংখ্যা খুবই কম। তিনি যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে আছে নতুন তথ্য। প্রথম খণ্ডে কাল সীমা ছিল সীমিত। দ্বিতীয় খণ্ডে আরও পরিব্যাপ্ত। রচনা বৈচিত্র্যকে বিস্তৃত-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ রচনা। দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে কিছুদিন আগে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় : "রবীন্দ্র প্রতিভার প্রথম সুনিশ্চিত বিকাশের যুগে উহার বৃত্তপরিধি আপেক্ষিকভাবে সুসংহত। ফলে যখন কুঁড়ি হইতে প্রথম পুষ্পপরিণতি লাভ করে বা নদী যখন পার্বত্যসংকট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমতলভূমি দিয়া প্রথম প্রবাহিত হয় তখন আঙ্গিক সুষমা বা পরিচ্ছন্ন তমবন্ধনই উহার প্রাণশক্তির সার্থক-প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়। প্রতিভার আদিম উন্মোচনপর্ব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা-গুলিকেই পূর্ণ বিকশিত করিয়া দেখায়—উহার গর্ভকোষস্থ কেশরদলই উহার সৌন্দর্যসত্তার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য নিরূপণ করে। পরবর্তী পরিণতি স্তরে নানা শাখা নদী মূল নদীর সহিত মিশিয়া উহার স্রোতোবেগ বর্ধিত করে, নানা বাহিরের প্রভাব মূল প্রেরণার সহিত যুক্ত হইয়া উহার মধ্যে জটিলতা সঞ্চার করে, ভূগোলের নানা আঁকা বাঁকা সংস্থিতি উহাকে অলক্ষ্য টানে তির্যক পথে আকর্ষণ করে। বিশেষ করিয়া সমুদ্র সংগমের আসন্নতর প্রত্যয় উহার রক্তে চাঞ্চল্য জাগায় ও উহার ঐক্যকে খণ্ডিত করিয়া বিভিন্ন সত্তার সমষ্টিরূপে উহার স্বরূপকে গহনচারীরূপে প্রতিভাত করে। কাজেই মহাকবির সৃষ্টি রহস্য—উন্মোচনে যতই অগ্রসর হওয়া যায় অনু-সন্ধানকার্য দুরূহতর হয়। আদিম ভাগীরথী-ধারা হইতে যতই পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বিভিন্ন কল্লোলিনী প্রবাহ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে ততই উহার ধারাবাহিকতা ও অন্তঃসংগতি আরও পূর্ণাঙ্গ হয় ও গভীরতর সংশ্লেষ দাবী করে। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেই আমার দ্বিতীয়ার্ধের কাজ আরও সূক্ষ্ম অভিনিবেশ ও সমী-করণের দাবী জানাইবে।"

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণগত এবং আলংকারিক বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে দেখান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধমূলক রচনা কাব্য, উপন্যাস এবং নাটক নিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবনা এবং যুক্তিপূর্ণ। 'রবীন্দ্র গদ্যের তৃতীয়-পর্বে' বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন সাহিত্য সমালোচনা ভাবুকতাময় রচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং পত্রসাহিত্য নিয়ে। নৈবেদ্য, স্মরণ, উৎসর্গ, জীবন দেবতা, স্বদেশ, মরণ, শিশু, খেয়া এগুলিকে রবীন্দ্র সাহিত্যের তৃতীয় পর্বের সৃষ্টি হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা সমালোচকের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, প্রায়শ্চিত্ত, মুকুট আলোচনায় তত্ত্বনাটক এবং অন্যান্য প্রসঙ্গের সমীক্ষা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরের আলোচনায় রবীন্দ্র উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাব ও আদর্শের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মননশীলন আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এযাবৎ। বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্র ছোটগল্পের বৈচিত্র্যে অনুসন্ধান করেছেন প্রবীণ সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের গল্পে আছে জীবনের কথা, আছে সমাজ সমালোচনা আর অতিপ্রাকৃত ঘটনা।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রবীন্দ্র সাহিত্যে অনুরাগী পাঠকের দিগদর্শনের কাজ করবে। সুদৃশ্য বৃহৎ কলেবর বইটির দাম কুড়ি টাকা।

রবীন্দ্র বিচিন্তা : অরুণকুমার বসু

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

শেষজীবনে সম্ভবত ফেলে আসা দীর্ঘ-পথের দিকে ফিরে আর অনাগত ভবিষ্যতের দিক তাকিয়ে ঐ কথা বলেছিলেন রবীন্দ্র-নাথ। অগাধ সৃষ্টির মহিমোজ্জ্বল অধ্যায় পেরিয়ে এসেছেন তিনি। সমাধিস্থ কবির চোখে পৃথিবীর বাস্তব স্বরূপ তখন স্পষ্ট। অন্যায়, অবিচার, উৎকোচ, প্রলোভন অত্যা-চারে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন কবি। ম্লান-মূক বধিরদের জন্য ছিলেন উৎকণ্ঠিত। শক্তিমানের দাম্ভিক আস্ফালনে আতংকিত।

এ হোল রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের পরিচয়। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রসাধনায় অধ্যাত্মবাদ যে প্রভাব ফেলেছিল তা স্পষ্ট। তবুও তাঁর জীবনের সামগ্রিক সাধনায় একটি ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টি গভীর এবং গম্ভীর। বিচিত্র পসরায় ভরা শিল্পীমনের অনুভূতি আর ব্যঞ্জনার স্বরূপ-নির্ণয় ধৈর্যসাপেক্ষ দীর্ঘকালের ব্যাপার। রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুভাবনা ও চিত্রগুলির পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে কবির জীবিত অবস্থা থেকেই। আজও তা চলেছে নির-বচ্ছিন্ন ভাবে। ডঃ অরুণকুমার বসুর সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্র বিচিন্তা' রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্লেষণে একটি স্মরণযোগ্য সংযোজন। বইটি বিরাট কলেবর না হলেও বহু বিষয়ে আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পে নদী, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সংগীতে রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম, নাটকের

...নে ও রাজাতত্ত্ব, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, যৌবনের শক্তি-পরীক্ষা মানসী, সৌন্দর্যের সোনার তরী, রবীন্দ্র-কাব্য-দিনান্ত আলোচনায় শ্রীবসুর অসাধারণ মননশীলতা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। গভীর বিষয়ে উঁচুদরের প্রবন্ধ লেখবার চেষ্টা নয়, স্রষ্টার জীবনসত্য আবিষ্কারে সমালোচকের নিষ্ঠা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বইটির দাম দশ টাকা।

আটপৌরে রবীন্দ্রনাথ : গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

দীর্ঘজীবী মানুষ রবীন্দ্রনাথ। চারদিকে ছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব জগৎজোড়া ছিল খ্যাতি। অসংখ্য মানুষের আনাগোনা ঘটেছে জীবনে। বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি আর বৈচিত্র্যময় তাঁর দৈনন্দিন জীবন। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনাপুঞ্জের বাইরে কেটে যেত তাঁর সময়ের অনেকটা। তবুও তাঁর নিজের একটা জগৎ ছিল। সেখানে তিনি অভিভাবক, গুরুজন, বন্ধু। সেই জগতের খবর নানা ঘটনায় মধুর, কখনও বা বিষাদময়। কবিগুরুর কাছাকাছি থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটেছিল যাঁদের, তাঁদের বিবরণে পাই অন্য একটি মানুষের পরিচয়। সেই অদেখা অজানা বহু পরিচিত নামের মানুষটির সান্নিধ্য আমাদের রোমাঞ্চিত করে। কবি রবীন্দ্রনাথের জগৎজোড়া খ্যাতির আড়ালে, মানুষ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় আটপৌরে ভাষায় আটপৌরে রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য ছবি এঁকেছেন। সাজ পোশাক আহার বৈচিত্র্য, বিশ্রাম, সাক্ষাৎকার এবং আনন্দ-রাগ অভিমানের মুহূর্ত চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, জমিদার, শোকতাপ মুহূর্তে, পরিহাস-প্রিয়তা, খেয়ালখুশির মুহূর্তে এবং আরো নানা মুহূর্তের অন্তরঙ্গ ছবি আছে বইটিতে। স্মৃতিচারণ এবং চিঠিপত্র থেকে এই ঘরোয়া পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বইটির দাম পাঁচ টাকা। কিন্তু রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুর কাছে বইটি অমূল্য।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : অর্চনা মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে কম বই লেখা হয় নি। এর মধ্যে অধিকাংশই অতি সাধারণ স্তরের আলোচনা। নতুন সত্য আবিষ্কারে সমালোচকের ক্ষুরধার চিন্তা-শক্তির মৌলিক প্রকাশ ঘটেছে স্বল্পই।

রবীন্দ্রপূর্ব কথা-সাহিত্যের অতি রোমাঞ্চধর্মীতা এবং রবীন্দ্রপূর্ব কথা-সাহিত্যের অতি বাস্তবতা বা অসম্ভব্যতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও মেনে নেন নি। মানবমনের স্থূল আর সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং মানব-জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সমাধান ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপস্থিত। মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা প্রবন্ধে, কাব্যে, নাটকে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি আছে উপন্যাসে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক তিনধারায় বিভক্ত এই চিন্তাধারা: রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদের সমন্বয় চেষ্টা স্পষ্ট। লেখিকা খুঁটিয়ে সব দেখেছেন কবির উপন্যাসে। শ্রীমতী মজুমদার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। সবথেকে বড়কথা, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বিদেশী উপন্যাসের ছায়া দেখেছেন অনেকে। কিন্তু তার বিশ্লেষণ করেন নি। লেখিকা তুলনামূলক আলোচনা করে তার সত্যতা বিচার করেছেন। বিভিন্ন উপন্যাসের পাঠান্তর, নানান সংস্করণে পরিবর্তনের কথা লেখিকা আলোচনা করেছেন। নারী-জাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব ধারণা ছিল। লেখিকা নৈপুণ্যের সঙ্গে তা উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আঙ্গিক, রচনাকৌশল, লেখন-ভঙ্গী, চরিত্র চিত্রণ ও ভাষা মহিমা নিয়ে কমই এত উন্নত স্তরের আলোচনা এর আগে চোখে পড়েছে। ওপরের চারটি সুদৃশ্য বই-এর প্রকাশক ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী।
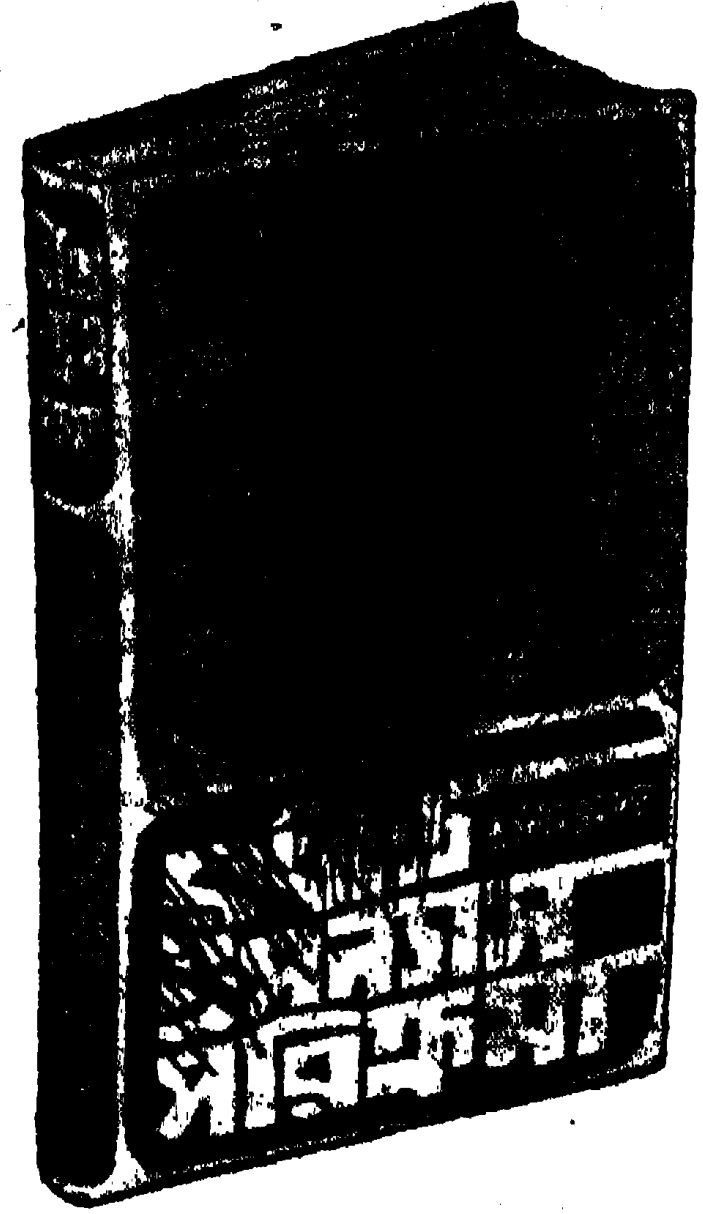
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : নেপাল মজুমদার

আগে বইটির দুটি খন্ড বেরিয়েছে। বর্তমান খন্ডে ১৯৩০—৩৫ খৃঃ ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ও গোষ্ঠীর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তার কালানুক্রমিক আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩০—৩৪ সালে চলছিল বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকট। রাজনীতির জগতেও দুর্যোগের কালো-ছায়া। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ এবং হিটলারী নাৎসীবাদের অভ্যুদয় ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা পররাজ্য গ্রাসে তৎপর হয়ে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে বিশ্বশান্তি আন্দোলন ব্যাপক ও বিস্তৃত আকার নেয়। রবীন্দ্র-নাথও জড়িত ছিলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক সংকট, বিশ্বঘটনা-প্রবাহ এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলন ভারতে বিভিন্ন নেতার ওপর কি প্রভাব ফেলে, এবং তাতে রবীন্দ্রনাথের মনেরই বা কী প্রতিক্রিয়া ঘটে, সবই আলোচনা করা হয়েছে এই খন্ডে। পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আইন অমান্য আন্দোলন চলছে তখন দেশ-ব্যাপী। পরাক্রান্ত বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কংগ্রেস আপোস মীমাংসার পথ নেয়। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক দল-গুলি দেশের প্রগতিশীল সংগ্রামকে বিপর্যস্ত করে। রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় রাজনীতি সম্পর্কে জটিলতা থাকলেও তাঁর প্রগতিশীল মনের পরিচয় স্পষ্ট। রাশিয়া ভ্রমণের পর তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। গান্ধীর ওপর আস্থা শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁর জীবনদর্শন ও অর্থনৈতিক মতবাদকে কবি মেনে নেন নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী। এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জন্মেছিল তাঁর মনে। এ সময়ে বিদেশে গিয়ে ভারতে ইংরেজের নৃশংস দমননীতির বিরুদ্ধে ভাষণ দেন। দেশের অন্ধকারময় ভবিষ্যতে তিনি চিন্তিত হয়ে ওঠেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ কবি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিতে না পারলেও গভীরভাবে সাড়া দিয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক সমস্যায় ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে শিল্প সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সংস্কারে, এবং বাস্তব জীবনের সমস্যা

সমাধানে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও মত প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান খণ্ডে রয়েছে তারই পরিচয়। বিদেশ ভ্রমণের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্পর্ক এবং তাদের বিকৃত প্রচারব্যবস্থায় কবি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীনেপাল মজুমদার দীর্ঘ গবেষণার রবীন্দ্রজীবনের এই অভিনব আলেখ্য রচনা করেছেন। ভারতের জাতীয় জীবনের ও আন্তর্জাতিক পৃথিবীর একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রমানসের বিশ্লেষণ এর আগে কখনও হয়নি। তাছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচিন্তার সঠিক মূল্যায়নও চোখে পড়েনি। রবীন্দ্রমানসের ক্রমবিকাশকে ধর্মের আবরণে যাঁরা আবৃত করে রাখতে চান, তাঁরা এই বইটি পড়বার পর রবীন্দ্রচরিত্রের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারবেন। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রমানসের এই বিষয়মুখী ব্যাখ্যা

বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইটির প্রকাশক চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড।

কবিদের চোখে ঃ

সব আছে, যথারীতি। লাবণ্য অমিত রায়
রোজ / পাহাড়ে বেড়াতে যায়।
সুচরিতা গান গায়, মিনি / সহসা
বয়সে বাড়ে। কাবুলীওয়ালার মত কত
আশা নিরাশায় দোলে। দিন যায়।
ক্যামেলিয়া ফোটে।

সব আছে যথারীতি। এবং তুমিও আছ,
তুমি।/অথচ এখানে দেখ জল নেই,
একফোটা জল / পাবে না কাথাও
খুঁজে আকাশের বুক চিরে-নেই।
কেবল পাথর আর শূন্যতার খেলা।
নদী নেই। / নেই কিছু নেই।
সোনার তরীর গানে লেখা আর
হবে না কখনো।

—লিখেছেন পূর্ব বাঙলার কবি মনজুরে মওলা। রবীন্দ্রনাথ এখনও ও'দের উদ্দীপ্ত করে। প্রাণচৈতন্যে ভরপুর করে তোলে। নতুন লক্ষে পৌঁছাবার ইশারা জানায়। শামসুর রহমানের কণ্ঠে শোনা যায়—

যেমন রৌদ্রের তাপে জ্যোৎস্নার মাদর
মায়ালোকে। হাওয়ার নির্ঝরে
অথবা শ্রাবণে
অক্লান্ত বর্ষণে বেঁচে থাকি মাঝে মাঝে
নিজেরই অজ্ঞাতে।
তেমনি তোমার
কবিতায়, গানে প্রতিধ্বনি হয়ে জাগে
আমাদের সত্তার আকাশে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাঙলার বিভক্ত বাঙলার মন তিনি। তাই ওপারের কবিরাও মুক্তকণ্ঠে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কবিকে। অনেক নিষেধ বাধার বেড়া ডিঙিয়ে আজও ও'রা রবীন্দ্রনাথকে মনে করেন নিজেরই লোক। সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রহমান, সানাউল হক, জিয়া হায়দার, মহম্মদ আলজামান, আল মাহমুদ, মনজুরে মওলা, নিয়ামত হোসেন, সুব্রত বড়ুয়া, ফজল শাহাবুদ্দীন, মাহবুবুল হক, মাশুকুর রহমান চৌধুরী, চণ্ডীপদ চক্রবর্তী, দিলওয়ার—পূর্ব বাঙলার এই সব কবিদের রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতার একটি সংকলন সম্প্রতি বেরিয়েছে এ পারের বাঙলায়। সম্পাদনা করেছেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন এবং শশধর রায়।

সংকলনটির নাম 'সূর্যাবর্ত'। প্রকাশস্থান ৩৩।৪ দীনু লেন। হাওড়া—১। দাম এক টাকা। ওপারের বাঙলার কবিরাও এ ধরনের সংকলন বের করছেন এ পারের কবিদের।

—বিব্রত ঘটক

তৃণভূমি

বীরেন্দ্র দত্ত

NITAI GHOSH
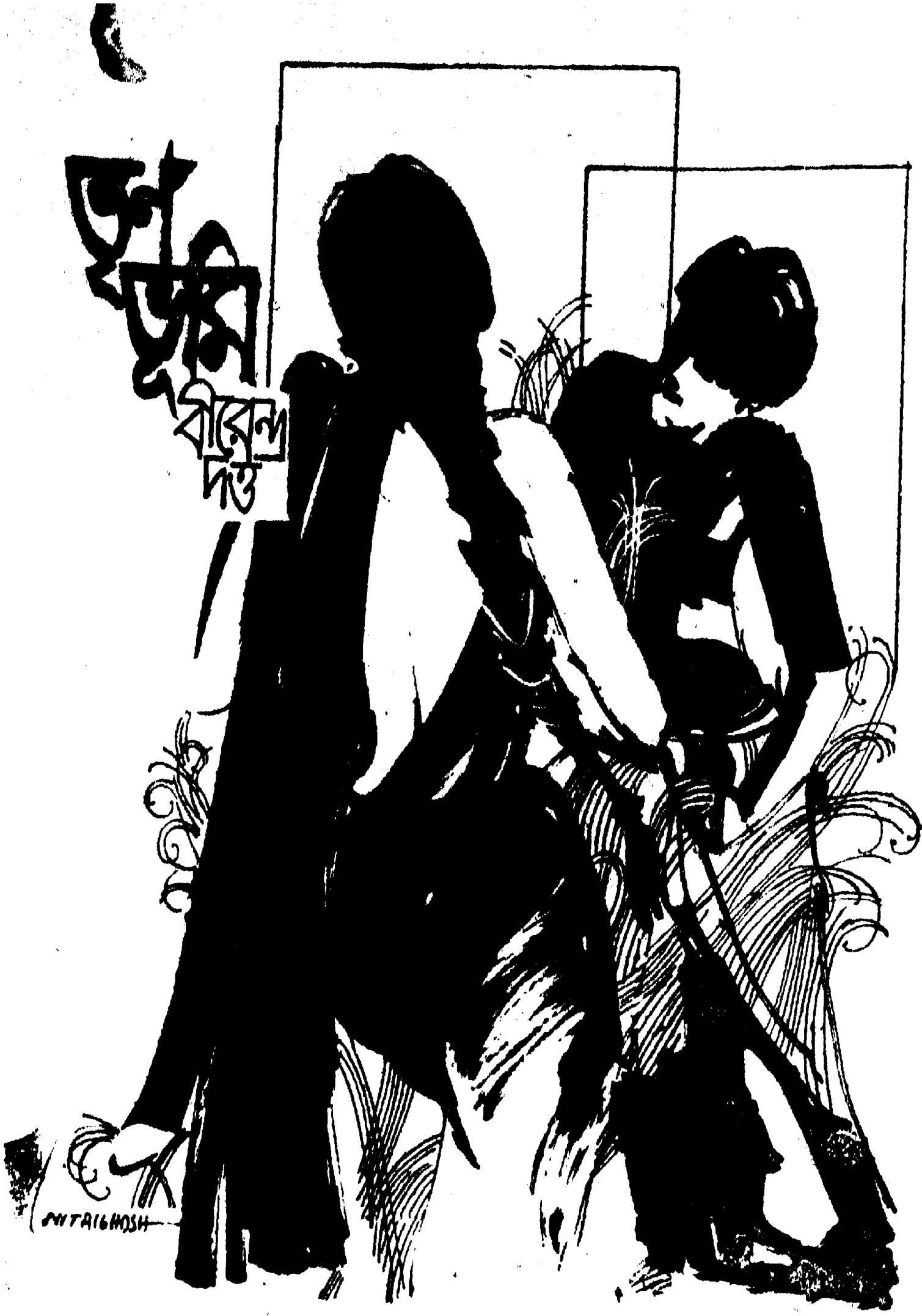
বনশ্রী তার নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে।

কাল শেষ রাতে দু'চোখের ঘুম ওকে অচেতন করার ঠিক আগে যেন কোন শূন্য নির্জন প্রান্তরে দূরাগত অস্ফুট কণ্ঠধ্বনির মত নিজের মধ্যে থেকেই কথাটা শুনেছিল মণিময়। একবার নয়, একাধিকবার। কথাটার সঙ্গে হাজার হাজার বিচিত্র পরিচিত-অপরিচিত রহস্যময় শব্দ জড়িয়ে মণিময়ের সারা শরীরের ক্লান্তিতে, বুকের নিভৃত স্পন্দনে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহে বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। বনশ্রী কাল রাতেই ওর নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। নতুন কেউ বনশ্রীর ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আন্দাজ করেছিল মণিময়। তাকে চেনে না, কোনদিন দেখেনি, দেখার ইচ্ছেও হয়নি মণিময়ের।

এতদিন ওর প্রয়োজন ছিল শুধু বনশ্রীকেই। বনশ্রীর হাসি, কণ্ঠস্বর, সহজ সরল উল্লসিত কথা, আচরণ, সঙ্গসুখ, গভীরতম অরণ্যের চপল হরিণীর মত চোখ মণিময়কে ভয়ঙ্কর এক ভালবাসার মায়ায় ধরে রেখেছিল। বনশ্রীর কাছে মণিময় এতদিন কি চেয়েছে, তা স্পষ্ট নয়; কিন্তু বনশ্রী কাছে থাকলে, নিয়মিত ওর সঙ্গে দেখা হলে মণিময় যেন এক ধরণের আশ্রয় পেতো। বন্ধুদের আড্ডা, অফিস, সিনেমা, সকালে উঠে নিয়মিত খবরের কাগজপড়া, রাজনীতি, আত্মীয়-স্বজনদের যান্ত্রিক ব্যবহার—সব কিছুর অবিশ্বাস, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা আর একঘেয়েমি মণিময়কে ক্রমশ বাঁচার ভূমি থেকে বিরক্ত বিচ্ছিন্ন করে তুলছিল। বনশ্রী যেন সে বিচ্ছিন্নতায় এক বিরাট কঠিন সেতু।

এখন বনশ্রীর বয়স কত? চব্বিশ পার হতে চলেছে। মণিময়ের সবেমাত্র চৌত্রিশ পার হল। ফ্রক-পরা তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরীকে দেখেছিল মণিময়। বন্ধু সুহাসের বোন। তখনি ভাল লাগত বনশ্রীকে। এমন পরিচ্ছন্ন প্রাণশক্তি খুব কম কিশোরীর মধ্যেই চোখে পড়েছিল মণিময়ের। সে এক যুগ আগের ভাললাগা! সেটা যে এতকাল ধরে ক্রমশ গভীর ভালবাসা হয়ে এমনভাবে মণিময়কে ঘিরে ধরবে, মণিময় তার জন্য প্রস্তুত ছিল না একটুও।

আর সেই বনশ্রী তার নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। কাল রাতে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। বনশ্রীর কলেজের পরীক্ষা শেষে কোন্ এক মফস্বল শহরের আত্মীয়ের বাড়ি উৎসব আছে। সেখানে চলে যাবে আজ সকালেই। এক সপ্তাহের ওপর সেখানে থাকবে। সেখানেই নতুন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হবে ওর। শহরের প্রান্তবর্তী সবুজ মাঠ, পাখীদের বিচিত্র শব্দ, চার পাশের ঘন পাতার গাছ-গাছালি, অফুরন্ত হাওয়া আর আকাশের নীল মাখানো রোদের মধ্যে বনশ্রী নতুন প্রেমিককে পাশে নিয়ে নতুন হয়ে ঘুরবে। কাল রাতে বনশ্রীর বাড়িতে ওর সামনে বসে ওকে দেখতে দেখতে মণিময় স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, বনশ্রী ওর নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। অন্যমনস্ক বনশ্রী। মণিময় জানত, বনশ্রীর বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞ হয়েছে এতদিনের নানারকম ভালবাসার অনুভূতিতে। তা-ও মণিময়ের সঙ্গে এতদিনের পরিচয় থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আর সেই ভালবাসার গোপনতম শিক্ষায় বনশ্রী আরও কোন প্রেমিকের আশ্রয়, প্রতিশ্রুতি, সাহস পেয়েছে।

কিন্তু এমনভাবে শূন্য শুকনো কুয়ার মত হয়ে যাবে মণিময়, তা ভাবেনি, ভাবার প্রয়োজন হয়নি। বনশ্রীকে সন্দেহ করতে গিয়ে কেমন নোংরা মনে হয়েছে নিজেকে। ভালবাসার অধিকার জোর করে জানাবার ইচ্ছে মনে জাগতেই নিজেকে বিশ্রী ধরণের করুণ অসহায় অপমানকর মনে হয়েছে। কণ্ঠস্বর ভারী করে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে অভিমান জানানোর মত কথা গুছিয়ে নিয়ে, রেস্তোঁরায় বসে বনশ্রীর হাত হাতের মুঠোয় ধরে ভালবাসা জানাবার কথা ভাবতে গিয়ে মণিময় নিজের মধ্যেই হেসে উঠেছিল নিঃশব্দে।

বয়স হয়েছে মণিময়ের। কিন্তু বনশ্রী যেন চব্বিশ বছরেও সেই কিশোরী। কোন ভারী কথা বললেই হেসে উড়িয়ে দেবে। এ এক হাস্যকর ভালবাসা! শুধু কাল রাতে নীরব অন্যমনস্ক বনশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে এক কঠিন রেখা দেখেছিল মণিময়। দুদিকের চোয়ালে সেই রেখা বুঝিবা বনশ্রীর গোপন অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। কাল রাতে এক সময়ে অন্যমনস্ক বনশ্রীকে মফস্বল শহরের নতুন প্রেমিকটির কাছে রেখেই মণিময় বেরিয়ে এসেছিল।

বনশ্রী হৃদয়ের জটিলতম কয়েকটি শব্দ অনুভব করতে করতে মণিময় সিগারেট খেতে ভুলে গিয়েছিল। শুকনো কণ্ঠনালী শিরশির করছিল। নিজেকে বড় তৃষ্ণার্ত মনে হয়েছিল। তবু, সিগারেট ধরাতে একবারও ইচ্ছে হয়নি। বাইরে বেরিয়ে মণিময় একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। ক'দিন গুমোট গরম। কাল রাতে আকাশ ছেয়ে মেঘ এসেছিল। কিন্তু বাতাস ছিল না, একটুও বৃষ্টি হয় নি। শুকনো ঘাম সারা শরীরে নিয়ে মণিময় সিগারেট টানতে টানতে একা কিছুটা হেঁটেছিল। এমন বিরাট আকাশের মত শূন্যের মধ্যে হাঁটা মণিময়ের অনেকদিন হয়নি। এক সময়ে একটানা সিগারেটের ধোঁয়ায় মণিময়ের বুক, নাক, জ্বালা করলে,

দু'চোখে আগুনের উত্তাপ নিয়ে বেরিয়ে এসে মণিময় ট্যাক্সি করেছিল। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করতেই মণিময় একটু সরে বসেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, পাশে বনশ্রী বসবে।

মুহূর্তের ভ্রান্তি মাত্র। পরমুহূর্তেই পাশে তাকিয়ে দেখল, আসন শূন্য। কখনো একা নয়, একমাত্র বনশ্রীকে নিয়েই মণিময় বহুবার ট্যাক্সি চেপেছে, সারা কলকাতা ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই কাল মুহূর্তের ভুল হয়েছিল বনশ্রীর কথা ভেবে। একটু পরে ড্রাইভারকে অনেক দূরের একটা ঠিকানা দিয়ে ভেবেছিল, চৌত্রিশ বছরের মণিময়ের এতটা সেন্টিমেন্টাল হওয়া ছেলেমানুষি, বোকামি।

গাড়ি চলতে সুরু করলে মণিময় নতুন একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে ওর কেন যেন মনে হয়েছিল, চতুর্দিকে ওর পরিচিত ঘনিষ্ঠ কেউ নেই। কেউ বুঝি ওপর থেকে একটি বিশাল শূন্য পাত্র নিক্ষেপ করেছে। সে পাত্রের মধ্যে মণিময় একা চুপ করে বসে। আর সেই পাত্র দ্রুত গড়াতে গড়াতে মণিময়কে দৃষ্টি-হীন, বাকশক্তিহীন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-হীন, রক্তচলাচলহীন একটি স্থবির মানুষের কাছে নিয়ে চলেছে। মণিময় তখন একটু কাঁদতে চেয়েছিল, পারেনি। দু'চোখের পাতার সীমা-বরাবর কেউ বুঝি আগুনের তাপ দিচ্ছিল চোখে সুর্মা টানার মত। এতটুকুও জল পড়েনি।

কাল অনেক রাতে ফিরে মণিময়ের ঘুম হয়নি। অন্যদিন এমনিতেই ঘুমের ওষুধ খেতে হয় মণিময়কে। কাল ভোর রাত পর্যন্ত পর পর কয়েকটা বড়ি খেয়েও ঘুমোতে পারেনি। আর ঘুম হয়নি বলে মণিময়ের যে খুব কষ্ট হয়েছে তা নয়। শুধু নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছে। বার বার মনে হয়েছে, বনশ্রী কাল রাতেই তার নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। এই চিন্তার পুনরাবৃত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বলে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঘুমোতে চেয়েছিল মণিময়। ঘুম আসে নি ভোর রাতেও।

তা ছাড়া কালকের গরম আরও হাজার-গুণ গুমোট মনে হয়েছিল মণিময়ের। ট্যাক্সি থেকে নেমে অনেক হাঁটতে হাঁটতে মণিময়ের মনে হয়েছিল, এই অসহ্য গরমে শহরের প্রতিটি বাড়ির ইঁট পুড়ছে, ফুটপাথ থেকে আগুন উঠছে। মণিময় তখন একটু সবুজ খুঁজছিল। মাঝে মাঝে সবুজ নিঃসঙ্গ বৃক্ষ চোখে পড়েছে, কিন্তু তাতে তৃপ্ত হয় নি। বুঝিবা কোন বিশাল তৃণভূমি মণিময়কে আকর্ষণ করছিল। অন্ধকারে ঢাকা, অথবা, শুধু ভারী নিথর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হওয়া কোন তৃণভূমির উপর মণিময় কিছুকাল বসতে চেয়েছিল, হয়ত শুয়েও পড়ত। কিন্তু সে তৃণভূমি কোথাও পায় নি। কলকাতায় কোথাও নেই। কলকাতা যেমন বহুদিন পবিত্র তৃণ-ভূমিকে গ্রাস করেছে, কাল রাতে বার বার মনে হয়েছে মণিময়ের, কলকাতা বুঝি ওকেও গ্রাস করেছে। এক সময়ে হয়ত ওকে চিবিয়ে ওর হাড়গুলোকে ট্রাম লাইন, লাইটপোস্ট, ডাল-হৌসির সেই বিশাল বাড়িটার লোহার ফ্রেমের মত করে নেবে।

মণিময় এক অনড় ভয়ে নিজের ঘরে ফিরেছিল। দরজা-জানালা বন্ধ করে, পাখা জোরে ঘুরিয়ে, আলো নিভিয়ে নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে চেয়েছিল। ঘুম হয়নি ভোর রাত পর্যন্ত। এক সময় পোড়া সিগারেটের টুকরোর স্তূপ হওয়া অ্যাসট্রে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে জানালা খুলে দিয়েছিল। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে-চোখে নিয়ে মণিময়ের কেন যেন মনে পড়েছিল ওর মাকে। এ সময়ে যদি মা থাকত! ছোটবেলায় মণিময় ভীষণ দুরন্ত ছিল। কাউকে ভয় পেতো না। চারপাশে অজস্র গোলমাল তৈরী করে ভয়কে দূরে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু কোন এক সময় হঠাৎ অকারণ ভয় পেলে মণিময় যেমন ভয়ঙ্কর এক অসহায়তায় শুধু মার কাছে এসে মায়ের কোলে গুঁড়ি মেরে বসে মাকে ভালবাসত, আদর করত, মাকেও আদর করতে বলত, এখন মা থাকলে হয়ত সেই আশ্রয়টুকু পেত। মণিময়ের নিজেকে কাল ভোর রাতে কেমন এক শিশু বলে মনে হয়েছিল। এই পৃথিবীতে সে-ই একা একটি শিশু—যে একমাত্র মায়ের আশ্রয় চায়।

বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মা মণিময়কে বলেছিলেন, 'খোকা, অযথা তুই সব চিন্তা করিস, গুম হয়ে বসে থাকিস। নিজের জন্যে কিছুই করলি না। জন্মটা যেন অভিশাপ। তাই প্রমাণ করছিস। বলে রাখি বাবা, এই বয়সের ছেলে ভালবেসে অনর্থ ঘটায়। তুই যেন তা করে বসিস না, কখখনো না।' মা মণিময়ের সমস্ত বিষয়ে নিরাসক্ত ভাব দেখে নিজের মত একটা কিছু ভেবে চাপা কান্নায় কেঁপে উঠেছিলেন। কাল ভোর রাতে সঙ্গে সঙ্গে মণিময় বালিশে দু'চোখ ঘষতে ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হওয়ার আগে মায়ের কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু কেউ তো এখনি তাকে বলছে না, 'তুই যেন তা করে বসিস না, কখখনো না'—এই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনিময় বালিশে দু'চোখ ঘষতে ঘষতে সেই যে উপুড় হয়ে শুয়েছিল, সকাল ন'টার আগে ঘুম ভাঙেনি।

এই মাত্র ঘুম ভাঙতে মণিময় টাইম-পীস দেখল। বুঝতে পারছে, অতিরিক্ত গরমে ওর মাথার বালিশ ঘামে ভেজা। দু'চোখ কয়েকবার জোরে জোরে বন্ধ করে, আবার খুলে হঠাৎ-ঘুম-ভাঙার জ্বালা অনুভব করল। ভোর রাতের বড়ি-খাওয়া-ঘুম এমন অসময়ে অকারণ আচমকা ভেঙে যাওয়ায় মণিময় মাথা থেকে পা পর্যন্ত অসম্ভব ভারে স্থির হয়ে রইল। মাথায় সত্যিই যেন এক বিরাট বোঝা চাপানো। কপালের দু'পাশের শিরা হঠাৎ-ভাঙা ঘুমের অস্বস্তিতে দপ-দপ করছে। নিঃশ্বাস চেপে দু'চোখের পাতায় ঘুম আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখতে চাইল মণিময়। চোখ একবার খুললেই ঘরের পাতলা আবছা অন্ধকার চোখে জড়িয়ে যেতে পারে। তাতে আর একটুও ঘুম হবে না, মণিময় জানে।

আর ওঠারই বা দরকার কি? এমনিতেই মণিময় বেলায় ওঠে। মা উঠলে হরিপদ ডেকে দেয়। এখন হরিপদ নেই। গত পরশুদিন ছুটি নিয়ে ওর গ্রামে গেছে। ডেকে দেবার কেউ নেই। আর ও তো কর্পোরেশনের কেরানী। একটা সময় অফিস গেলেই হল। না গেলেই বা ক্ষতি কি? ক্যাজুয়াল লিভ যাবে, যাক। মণিময় বিড়-বিড় করতে করতে পায়ের বালিশটা মুখের ওপর চেপে ধরল। দু'চোখে আরও ঘন অন্ধকার দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে মণিময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনল। প্রথমে ভাবল, পাশের ফ্ল্যাটের বা গলির সামনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে। কে এল এসময়ে? এত সকালে কে আসতে পারে? মণিময় আবার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বিরক্ত হল। হরিপদ কি গ্রাম থেকে ফিরল? বলে গিয়েছিল দু-তিন দিনের মধ্যেও ফিরতে পারে। তা বলে এসময়ে? এখন তো ওর আসার সময় নয়! এবার কড়া নাড়ার শব্দ আরও জোরে হতে এবং দরজায় দু-তিনবার ধাক্কা দেওয়ার জোর শব্দ হতেই মণিময়ের বুঝতে বাকি রইল না, হরিপদ ফিরেছে। হরিপদ জানে, এসময়ে বাবু ঘুমে অচেতন। তাই এভাবে না ডাকলে সারাদিনে হয়ত দরজা খোলাই যাবে না।

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দরজার খিল খুলল।

দেখল মণিময়, সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। পিছনে রিকসাওয়ালার হাতে ভারী বেডিং, আর ছোট একটা চামড়ার সুটকেশ। মণিময় হঠাৎ কেমন বোকা হয়ে গেল। মহিলাটির দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল। মাথা অসম্ভব ভারী বলে দু'চোখের ঘুম একটুও সরেনি।

'কি দেখছ?' মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল। 'চিনতে পারছ তো? না চিনলে বলো এখনি, অন্য পথ দেখি।'

মণিময় এবার অল্প হাসল। 'ভেতরে [illegible]না। চলে যাবে কেন?'

'[illegible], না চিনলে, না চেনার ভান করলে [illegible] আমাকে অপমান করা হয় না কি?' মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঘরে ঢ্‌কল। রিকসাওলা মালগ্‌লো দালানে রাখল। আগেই ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে বলে দাঁড়াল না, বেরিয়ে গেল।

'আমি কিন্তু সত্যি অবাক হয়ে গেছি অতসী, তুমি এমনভাবে কোন খবর না দিয়েই চলে আসবে!' দ্‌-তিনটে হাই তুলে মণিময় বলল, 'তা ছাড়া এতদিন পরে ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'ইস, কি তাড়াতাড়ি ভুলে যাও তুমি?' বেডিং আর স্‌টকেশটা দেয়াল ঘেঁষে রাখতে রাখতে বলল, 'মনে পড়ছে না! হাওড়া স্টেশনে আমি ট্রেন ধরতে চলেছি। আর তুমি ওদিক থেকে কলকাতা আসার বাসে বসেছিল ফিরবে বলে! সেই সময় দেখা। তুমি তোমার ঠিকানা বললে মনে নেই?'

অনেকদিন আগে অতসীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার কথা আবছা মনে পড়ল মণিময়ের। 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে বেশ। ওহ, সে তো বছর তিনেকে আগের কথা! ম্‌খে বলা ঠিকানা তোমার মনে ছিল! স্ট্রেঞ্জ!'

অতসী হাসল, 'মনে রেখে কি খ্‌ব অন্যায় করেছি!'

'না, তা কেন?' মণিময় হাসল। 'আমি কিন্তু একা আসতে বলিনি, অতসীর সিঁথিতে চকিত দ্‌ষ্টি ব্‌লিয়ে নিয়ে বলল,
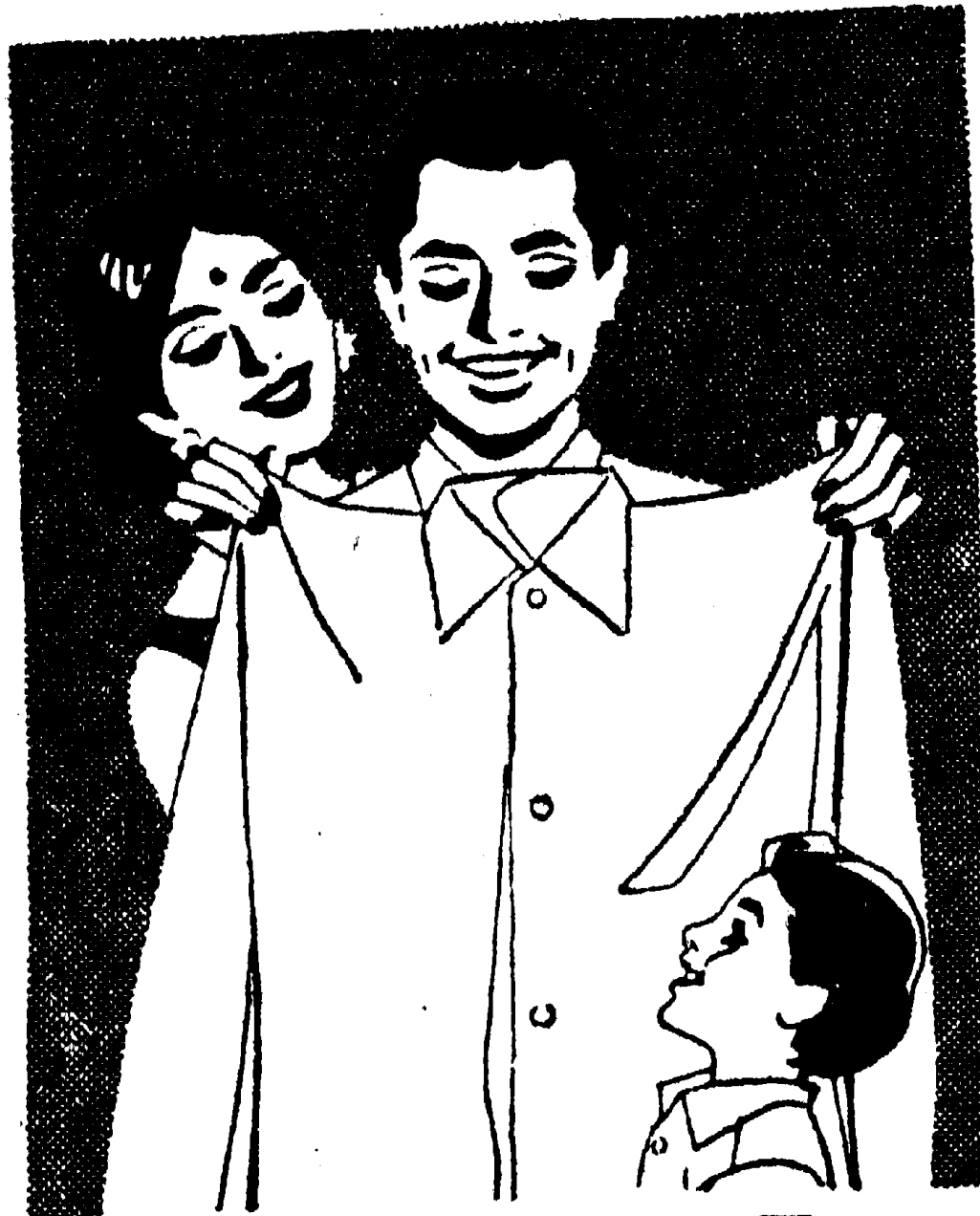
'ঘর নামক ভদ্রলোকটি কোথায়? ছেলেমেয়ে! ওদের আনোনি কেন?'

অতসী মণিময়ের থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল। 'সে সব কথা পরে হবে। তোমার পুলিশী ব্যাপার বন্ধ রাখ তো। আমাকে একটু জিরোতে দাও। সারারাত ট্রেন জার্ণি, তার ওপর ট্রেন লেট। এখানে এসে তোমার বকবকানি। ভাল্লাগে না।'

'কোত্থেকে আসছ?' মণিময় ঘরের মধ্যে ঢুকল। 'এ ঘরে এসো।'

'জামুই স্টেশন থেকে উঠেছি মিথিলা এক্সপ্রেসে সেই রাত নটায়। হাওড়ায় আসার কথা ছটা কুড়িতে। এলো এই একটু আগে। গাড়ি কি লেট, তার ওপর গরম! ইস, যা কষ্ট হয়েছে ট্রেনে!'

মণিময় অতসীকে ভাল করে দেখে নিল। 'যাও, স্নান-টান সেরে নাও তা হলে।'

'সে কি। আমি একা তোমার বাড়ির সব চিনব কি করে? তোমার মা, সেই ছোট বোন সব কোথায়। গ্রামে গেছে বুঝি? আর তুমি এখন একা হোটেলে খাচ্ছ।' অতসী একবার সারা বাড়িটায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

'দূর!' মণিময় হাসিমুখে একটা সিগারেট ধরাল। 'কেউ নেই। বোনের কবে বিয়ে হয়ে গেছে। মা গেছেন মারা, আর চাকর শ্রীমান হরিপদটি দিন পনেরোর ছুটিতে গ্রামে। এখন তুমি কি করবে ভেবে দেখ।' মণিময় একটানা কথাগুলো বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। অতসী ওর শেষ কথাটার অন্য কোন অর্থ করল কিনা, মণিময় অতসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল।

অতসী কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে ঘরের মধ্যে চোখ বুলোল। হঠাৎ বলল, 'পরে কিছু ভাবা যাবে। এখন বাথরুমে জল পাওয়া যাবে তো? সাবান গামছা সব বের করা আছে? না, আমাকে বেডিং খুলে বের করতে হবে! সেও এক ঝামেলা।'

মণিময় পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিল। বলল, 'হরিপদর দৌলতে ওসবের ত্রুটি নেই। এমন কি রান্নাঘরে চা, জলখাবার খাওয়ার মত সব কিছুই পাবে হয়ত, একটু খুঁজে নাও।'

মণিময়ের শোয়ার ভঙ্গি দেখে অতসী হেসে ফেলল। 'আর তুমি এখন কি করবে?'

'কি আবার!' হাই তুলল মণিময়। 'নতুন করে একটু ঘুমিয়ে নি। মাথার মধ্যে ভীষণ এক ভার চেপে আছে। তোমার সব হয়ে গেলে বোলো, স্নানে যাবো। অফিস আছে।' মণিময় এবার যেন নির্বিকার নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পাশ ফিরে শুলো।

অতসী সত্যি ক্লান্ত। মণিময়কে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ নেই এখনি। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মণিময়কে আরও কিছু সময় ঘুমোবার সুযোগ দিয়ে অতসী ছোট-খাটো অনেক কাজ সেরে নিল। মণিময়ের একতলার ফ্ল্যাটে দুটি ঘর। ঘরের সামনে চওড়া দালান। ওপাশে রান্নাঘর, আর এদিকটায় বাথরুম। মণিময় একটা ঘর ব্যবহার করে। আর একটা ঘর নোংরা। নানা জিনিসপত্তর ঠাসা সে ঘরে। অথচ জিনিসগুলো অন্য জায়গায় সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘরখানাকে ভাল-ভাবে ব্যবহার করা যায়। দুটি ঘরের মাঝ-খানে দরজা। মণিময় ওর ঘরের দিকে খিল এঁটে দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

অতসী স্নানে যাবার আগে সব খুঁটিয়ে দেখে রান্নাঘরে এলো। সম্ভবত হরিপদ যে অবস্থায় রেখে গ্রামে গেছে, সেই অবস্থাতেই সব জিনিসপত্তর পড়ে আছে রান্নাঘরে। মণিময় বুঝি কোনদিন নিজে চা করে খেতে গিয়েছিল। অতসী মুখ টিপে হাসল। একরাশি ভিজে চায়ের পাতা ছাঁকনিতে পড়ে আছে। প্রয়োজনের বেশী এঁটো কাপ-ডিশ ওল্টানো ছড়ানো, স্টোভের কালি-ঝুল মাখানো কেটলি মুখ খোলা অবস্থায় উপুড় করা। কিছু গুঁড়ো দুধের পাউডার আর খোলা-মুখ চিনির ডিবে ঘিরে পিঁপড়ে থিকথিক করছে। অতসী রান্নাঘরে বিশ্রী পুরনো চায়ের গন্ধ পেলো। মনে মনে একটা কৌতুক অনুভব করল। নোংরা কাপ-ডিস, চায়ের বাসন-পত্তর নিয়ে অতসী স্নানের ঘরে ঢুকল।

মণিময়কে ঠেলে তুলে বাথরুমে পাঠিয়ে অতসী নিজেই চা করতে বসেছিল। নিজে সঙ্গে কিছু নোনতা বিস্কুট এনে-ছিল অতসী, সেগুলি প্লেটে সাজিয়ে মণিময়ের ঘরে ঢুকে দেখল, মণিময় চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছে।

'আজ অফিস যাবে তো!' অতসী চায়ের কাপ সামনে ধরে বলল।

মণিময় সামনে থেকে খবরের কাগজ সরাল। অবাক হয়ে অতসীর দিকে তাকাল। 'না যাওয়ার কি কোন কারণ আছে?'

না, ভাবছি যেভাবে খবরের কাগজ পড়ছ! নাও, চা ধর।'

মণিময় হাতে চায়ের কাপ নিল। 'এসব করতে গেলে কেন? আমি ভাবছিলাম, বাইরে থেকে চা এনে খাওয়াবো।'

'থাক মশাই, সে চা আজ নয় কাল সকালে হয়ত খেতে পেতাম। যা ঠেলতে হয়েছে ঘুম ভাঙানোর জন্যে! উফ!'

মণিময় হেসে উঠল জোরে। অতসী মণিময়ের উঁচু করে বসানো তক্তপোষের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। চায়ে পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলল, 'কটায় অফিস?'

'যখন হোক গেলেই হল,' মণিময় কাপের প্রান্ত থেকে ঠোঁট সরিয়ে বলল, 'তবে একটু পরেই বেরুবে। কিন্তু আমি তো হোটেলে খেয়ে নেব, তোমার খাবারটা কি এনে দেব হোটেল থেকে?'

'কিছু দরকার নেই। তোমার শ্রীমান হরিপদ যা রান্নাঘরে রেখে গেছে, তাতেই ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিয়েছি স্টোভে। এবেলা এই খেয়ে যাও। সন্ধ্যায় না হয় ভাল করে রান্না করা যাবে।'

মণিময়ের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাপ-ডিস রেখে সত্যিই অবাক হয়ে অতসীকে দেখতে লাগল।

'কি দেখছ বোকার মত?' অতসী যেন একসঙ্গে দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরে ধমক দিয়ে উঠল।

'ভয় পাচ্ছি স্থায়ী রেশন কার্ড করতে হবে নাতো।'

'সেই আগের মতো ফাজলামি করার স্বভাবটা গেল না দেখছি!' অতসী সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তা ছাড়া, যতদূর মনে পড়ছে, তুমি তো এত কথা বলতে না! কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?'

মণিময় কোন কথা না বলে অতসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

'থাক্, তুমি তৈরী হয়ে নাও। ভাতটা চাপিয়ে এসেছি দেখি।' অতসী দরজার দিকে এগোল।

মণিময় অতসীকে দরজার আড়াল হতে দেখেই বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো অতসী, তোমার কোন কথাই শোনা হয়নি।'

অতসীর দ্রুত শদ-শব্দের সঙ্গে হাসির শব্দ কানে এল। 'বস আসছি।'

অতসী চলে গেলে মণিময় নতুন করে সিগারেট ধরাল। মণিময় তো এত কথা বলত না! শুধু বনশ্রী পাশে থাকলে মুখর হ'তে ভালবাসত। এখন কেন? মণিময় আবার এক শূন্যের মধ্যে ভাসতে লাগল। মনে হ'ল, চিন্তা থেকে সে মুক্তি পাবে! অতসী তার পুরনো বান্ধবী। 'অতসী, সত্যি, তুমি এসে আমার অনেক উপকার করলে।' মণিময় বিড়-বিড় করল।

অন্যমনস্ক হয়ে মণিময় বেশ কয়েকবার পর পর সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়ল। চোখের সামনে একটা ধোঁয়ার ভাসমান আকাশ তৈরী হয়ে গেল। বনশ্রী এখন অন্য প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। কত উল্লসিত সে এখন! তার ধারে কাছে কোথাও মণিময় নেই। মণিময়

এখানে এই ঘরে একা। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত বনশ্রী এই ঘরে সকাল, দুপুর গল্প করে কাটিয়ে গেছে। একদিন যেন ঠাট্টা করে মণিময় বলেছিল, 'কাল এসো না শ্রী, দুপুরে থাকব না।' 'কোথায় যাবে!' 'ট্রেনে করে কোথাও।' 'সেই বান্ধবীর কাছে বুঝি?' বনশ্রী গম্ভীর, অন্যমনস্ক, অসহায় হয়ে গিয়েছিল। বনশ্রী জানত, মণিময়ের এক বান্ধবী কোন্নগরে থাকে। অফিসে কাজ করে। মাঝে মাঝে মণিময়কে যেতে বলে ওর বাড়িতে, যদিও মণিময় একটি দিনও সেখানে যাওয়ার তাগিদ বোধ করেনি। মণিময়ের মজা লেগেছিল কথা'টা বলে। বনশ্রী এর পর কয়েকদিন কথা বলেনি। বনশ্রীকে এমনি করেই চিনেছিল মণিময় আপন করে।

এখন যদি বনশ্রী শোনে, অতসী ওর বাড়ি এসে উঠেছে। আজ থাকবে। অতসীর সঙ্গে মজা করে গল্প করছে, আড্ডা দিচ্ছে। বনশ্রীর কিছু মনেই হবে না। কোন দুঃখ বা ঈর্ষাও হবে না। ভালবাসায় পরাজিত মণিময় লম্পট হয়ে গেলেও বনশ্রীর দুঃখ নেই। বনশ্রী এখন স্বার্থপর। হয়ত এইভাবেই স্বার্থপর হতে হয়। মাঝে মাঝে মণিময় বনশ্রীকে স্বার্থপর বলে রাগাত, ঠাট্টা করত। ঠিক এই মুহূর্তে 'স্বার্থপর' শব্দটা মণিময়ের মুখের রেখায় কেন যেন এক কঠিনতা স্পষ্ট করে তুলল।

মণিময়ের দু'আঙুলে সিগারেটের আগুনের তাপ লাগতেই সচেতন হল। হঠাৎ মনে হ'ল এই চেয়ারের গা ঘেঁষে বনশ্রী মাঝে মাঝে দাঁড়াত। কেমন আপন হয়ে তাকাত মণিময়ের দিকে। এখনি বুঝি বনশ্রীকেই দেখল সে! মণিময় হাসল। না? দুচোখে অনিদ্রার আলস্য কাটেনি এখনো। একটু আগেই তো অতসী এসে দাঁড়িয়েছিল। বনশ্রী রোগা, ছোট-খাটো চেহারার। অতসীর থেকে ফর্সা রঙ। টানা চোখ-নাক, মুখ অতসীর থেকে অনেক ভাল। অতসী তা নয়। ওর বয়স হয়েছে। বয়স হলে বনশ্রী ঐরকমই হবে! তবু এই সময়ে যেন অতসীকেই ভাল লাগছে। অতসী অনেক পুরনো বান্ধবী। বড় একা মণিময়। অতসীর সঙ্গে তবু কিছু কথা বলে কদিন কাটানো যাবে।

আজকের অতসীর চেহারার একটা আবছা ছবি চোখের সামনে নিয়ে মণিময় বারো বছর আগের অতসীকে ভাবতে বসল। একসঙ্গে এম-এ পড়ত ওরা। অতসী পাশ কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছিল, পড়ত ইস্‌লামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার। মণিময় মডার্ণ হিস্ট্রির ছাত্র ছিল। একটা দল নিয়ে ইউনিভার্সিটির লন, করিডোর, গোলদীঘির ভিতর, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাত সর্বত্র আড্ডা জমাতো। মেয়েদের মধ্যে অতসী, রেখা, সুনন্দা, অরুণা, প্রতিমা, মুক্তি ছিল; ছিল মণিময়ের বন্ধু সুহাস, পার্থ, সলিল, অনন্ত। দলের মধ্যে অতসী তেমন মোটেই সুন্দরী ছিল না। ময়লা রঙ হলেও নাক-মুখ চোখে মোটামুটি সুশ্রী ছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সামান্য আয়োজনে সাধারণ শাড়ি, জামা গুছিয়ে পরে আসত। পাতলা ঝকঝকে চেহারা ছিল। দলের থেকে আলাদা করে প্রণয় করার মত মেয়েও ছিল না অতসী। তবে ভীষণ আড্ডাবাজ ছিল।

ফিফ্‌থ ইয়ারের শেষেই হঠাৎ অতসীর বিয়ে হয়ে যায়। বিহারে ওর এক দাদার বাড়ি থেকে বিয়ে হয়। তাই বন্ধুদের কেউই বিয়েতে যেতে পারে নি। বিয়ের পরেও খোঁজ-খবর রাখতে পারে নি। বিয়ের পরেই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের বাইরে চলে যেতে হয় ওকে। দলের আর সকলেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে। মণিময় সিক্‌স্‌থ্ ইয়ারের শেষে পরীক্ষা না দিয়ে চাকরীতে ঢুকে পড়ে।

সেই অতসীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বাদে হাওড়া স্টেশনে দেখা। দেখা হয়ে যাওয়াটা ছিল আচমকা। মণিময় তখন আগের তিনখানা বাস ছেড়ে একটা ফাঁকা বাসে জানালার ধারে বসে। অতসী সামনে রাস্তা ধরে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল।

'অতসী না? এই অতসী!' মণিময় হঠাৎ ডেকে বসল।

থমকে দাঁড়াল অতসী। একেবারে মণিময়ের জানালার সোজা, একটু দূরে। 'আরে! মণিময়?' এগিয়ে এল। 'ইস্, কতদিন পরে দেখা!'

''বাসে উঠে এস, পাশে বসার জায়গা আছে।'

'পাগল হয়েছ, আমাকে এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'চন্দননগরে মাসির বাড়ি। ওখান থেকে আজ রাতেই হাওড়া স্টেশনে আসতে হবে। ট্রেনে জসিডির দিকে পাড়ি।'

'তোমার বর কই? ছেলে-মেয়ে কটি?' কপালের সিঁদুর চোখে পড়তে মণিময় অকারণ কিছু কথায় সাংসারিক হয়ে উঠেছিল।

অতসী হাসল। 'বর কর্মক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে আপাতত দুটি।' পাল্টা প্রশ্ন অতসীর। 'তোমার খবর কি? বিয়ে করেছ?'

'নাহ্।' একটা হাল্কা রসিকতা করতে যাচ্ছিল, সামনে এক ভদ্রলোককে আসতে দেখে প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'এসো না একদিন আমার বাড়িতে।'

'ঠিকানা কি? গেলে মাসিমা আর তোমার সেই বোনটির দেখা পাব তো?'

মণিময় ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। ঠিকানা দিয়ে বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে চাকরী কর। কিসের?'

অতসী হঠাৎ হাতঘড়ি দেখল। 'ইস্, আমার দেরী হয়ে গেছে। নির্ঘাৎ ট্রেন ফেল করব। এত সব খবর এখনি দেওয়া যাবে না। চলি মণিময়, একদিন বরং কলকাতায় এসে তোমার ওখানেই উঠব।'

'সে আমার ভাগ্য! তবে একা নয় কিন্তু, চারজনে এসো! না আসলে ঢুকতেই দেবো না!'

অতসী হেসে ফেলল। 'আচ্ছা চলি।' অতসী দ্রুত হাটতে লাগল। বাঁ-হাতে ছোট একটা চামড়ার সুটকেস, ডানহাতে কিড-ব্যাগ। স্টেশনের মধ্যে ঢোকার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মণিময় অতসীর চলে-যাওয়া লক্ষ্য করেছিল। মণিময়ের মনে হয়েছিল, অতসী আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছে। সারা মুখে, চেহারায় বয়সের ঈষৎ ভার লেগেছে। তবু পোশাকে, চলায়, কথা বলায় কোথাও দশ বছরের বিবাহিতা দুটি সন্তানের জননীর ভারী স্বভাব স্পষ্ট নয়। কিন্তু মণিময়ের যেন মনে হয়েছিল, অতসীর দৃষ্টি, চোখের কোল, মুখের রেখা আর কণ্ঠস্বরে যেন চাপা বিষণ্ণতা মাখানো রয়েছে। সেই সপ্রতিভ হাসি, আর চঞ্চল দৃষ্টি, আড্‌ডাবাজ স্বভাব কেউ বুঝি ওর মধ্যে থেকে মুছে দিয়েছে। বিয়ে হলে, সন্তান হলে বা বয়স হলে মেয়ে-পুরুষ—সবাই বুঝি এরকম হয়? নাকি, অতসী জীবনের যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, বা হেরে যাওয়ার অসহায়তায় এমন করুণ হয়ে গেছে?

মানুষের অভিজ্ঞতা মানুষকে শরীরে-মনে বুঝি কঠিন করে তোলে। অতসীও কি কোন অভিজ্ঞতায় এমন রুক্ষ হয়ে গেছে? মণিময়ও কি বনশ্রীর প্রেমের অভিজ্ঞতায় নিজের মধ্যে এমন কঠিন হয়ে উঠেছে? চাপা শ্বাসকণ্ঠে মণিময় সোজা হয়ে বসল। নিভে যাওয়া সিগারেট ধরালো। অতসীর চিন্তার মধ্যে বনশ্রীকে মনে হতেই মণিময়ের মাথাভার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চোখ বুজে সিগারেট টানতে লাগল। মণিময় পাখার নীচেও ঘেমে গেছে।

'কার কথা এমন বিভোর হয়ে ভাবছ?'

'তোমার।'

'সত্যি! তাহলে তো ভয়ের কথা!'

'আপত্তি থাকলে ভাবব না।'

'নতুন করে প্রেমে পড়তে চাইছ নাকি?'

'বয়সটা যেভাবে লুকিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বলা যায় না, এক সময়ে দুম্ করে ভালবেসে ফেলতেও পারি।' মণিময় শব্দ করে হেসে উঠল।

অতসী সামনের মোড়াটায় বসে পড়ল। 'দেখ, মেয়েদের বয়সের প্রসঙ্গের ধারে-কাছে যেও না কখনো, ঠকবে।'

'মানে?' মণিময় হঠাৎ কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে ভুরু কোঁচকালো।

'আমার বয়স কত বলতো?'

'আমার চৌত্রিশ। তোমার তা হলে একত্রিশ কি বত্রিশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

'বত্রিশ। বলো, এই বয়সে নতুন করে কি প্রেম হয়?'

'ভাল জমে।' বলেই মণিময় হো-হো করে হেসে উঠল।

অতসী মণিময়কে দেখাল। গোলদীঘির মধ্যে ঘাসের ওপর দল নিয়ে গোল হয়ে বসে আড্‌ডা দেবার সময় মণিময়কে কোন দিন এটরকম শব্দ করে হাসতে দেখে নি। অথচ কত পালটে গেছে! 'মনে পড়ে মণিময় গোলদীঘির আড্‌ডার কথা!'

মণিময় নতুন একটা সিগারেট ধরালো। 'খুব মনে পড়ে। আমরা কতদিন হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে এর-ওর সঙ্গে গোপন

প্রেমের মিথ্যে কাহিনী বলতাম, আর দলের কেউ তাই কারোর সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারত না। তাই শুধু আড্ডার দল হিসেবে ছিল ইউনিক, তাই না?'

'তা ঠিক। তবে আমার মনে হয়, শেষ দিকে কেউ কেউ গোপনে প্রেম করতে সুরু করেছিল। তাই নয়?'

'হয়ত। ঠাট্টাচ্ছলেও তো সব কথা বলে ফেলা যায়।'

'একটু আগে তুমি সেই ভেবে ভাল-বাসার কথা বলে ফেলেছ নাকি? সত্যি করে বলতো?' অতসী চোখ বড় বড় করে তাকাল।

'এখনো সেই পুরনো আড্ডাবাজ মেয়েটা তোমার মধ্যে আছে দেখে ভীষণ ভাল লাগছে অতসী।'

'অথচ দেখ, ইচ্ছে করলেই কিন্তু ঠিক সেই আড্ডা তুমি আর দিতে পারবে না। বয়স হয়েছে না?'

'আমার কিন্তু তোমাকে পেয়ে ভীষণ ভাল লাগছে। আমি ক'দিন যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলুম কারোর সঙ্গে কথা বলতে না পেরে।'

অতসী সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে মণিময়ের দিকে তাকাল। 'উঁহু, সন্দেহ হচ্ছে। কোথাও কোন ধাক্কা খাওনি তো মণিময়? তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি কোন গোল-মালে পড়েছ।' অতসী গলা নামাল। অভিজ্ঞের মত বলল, 'প্রেমে ব্যর্থ নাকি?'

মণিময়ের এতক্ষণ পরে আবার বনশ্রীর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। এক ধরনের চাপা বিরক্তি শূন্যের মধ্যে পাক খেতে লাগল। অতসীকে বুঝতে দিল না। ওর কথাটাকে চতুরভাবে এড়িয়ে গেল মণিময়। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'আসল কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি অতসী! হঠাৎ কলকাতায় কেন?'

মণিময়ের আগের প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার কৌশলটা অতসী আদৌ ধরতে পারল না। সহজভাবে বলল, 'একটা নার্সিং-এর ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। কাল দুপুরে ইন্টারভিউ।'

'একা চলে এসেছ, সঙ্গে কাউকে আনোনি।'

'সোমনাথ তো শিলিগুড়িতে থাকে বড় ছেলেকে নিয়ে। আমি ছোট মেয়েটাকে নিয়ে নার্সের কোয়ার্টারে থাকি। মেয়েকে পাশের এক নার্সের জিম্মায় রেখে দু-তিন দিনের জন্যে এসেছি। কে আর আসবে বল?'

'সঙ্গে না আসার জন্যে দুঃখ হচ্ছে তোমার? আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি!'

অতসী মুখ টিপে হাসল। 'কাকে? আমাকে?'

'তোমাকে! ইস্! বরং আমাকেই তুমি ভয় করবে। আমি একজন অবিবাহিত পুরুষ। তাই—'

অতসীর মুখ ঈষৎ লাল হল। চিবুক একটু কাঁপল চাপা লজ্জায়। 'তোমার সেই আগের মত যা তা বলে ফেলার স্বভাবটা গেল না দেখছি। পাশের বাড়ির যদি কেউ শোনে! তার ওপর চাকর-বাকর কেউ এখন নেই। সারা বাড়িতে আমরা দুজনে একা!'

'তা ঠিক। চাকরটা থাকলে এত সব কথা বলাই যেত না। ও নিশ্চয়ই কিছু ভেবে বসত।'

'কি?'

'কি আবার! তোমাকে ভাবত আগের প্রেমিকা!'

'ওকে এসব ভাবতে ট্রেণিং দিয়েছ নাকি? তাই যে কেউ আসুক, ঐ একটি ভেবে বসবে?'

'বয়ে গেছে।'

'না, না, ভাবগতিক তো ভাল নয়। সময় বুঝে হোটেলই দেখতে হবে দেখছি। তাও না পেলে ফুটপাত। তবু কিছুটা সেফ!'

অতসীর চোখমুখের আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে মণিময় আগের মত শব্দ করে হেসে উঠল। অতসীও চাপা হাসি সাম-লাতে পারল না।

দুজনের হাসি থামলে অতসী বলল, 'এই, অফিস যাবে না?'

'তোমার রান্না হয়ে গেছে নাকি?'

'কখন! শুধু ভাতে-ভাত তো!'

মণিময় বাইরে দালানের দিকে একবার তাকাল। 'এই উঠছি। ব্যাপার কি জানো, অনেক দিন পরে আগেকার দিনগুলোর মত একটা দিন পেয়েছি। নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু যা গরম। তার ওপর যত বেলা বাড়ছে, পাখার তলাতেও আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না।' বলেই অতসী একটু নড়ে বসে শারীরিক অস্বস্তি বোঝালো।

'ইস্, যদি বৃষ্টি নামত এখনি!' মণি-ময় ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হল।

'তোমার তো আবার সবুজ ঘাসের ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভাল লাগে খুব, তাই না? বিজ-বিজ শব্দ। আমার ওখানে এসো। কোয়ার্টারের সামনে বিরাট ফাঁকা ঘাসে ঢাকা জায়গা আছে। বৃষ্টি নামলে যা ভাল লাগে, থাকলে বুঝবে।'

মণিময় অবাক হয়ে অতসীকে দেখল। 'তুমি সব মনে রেখেছ তো?'

অতসী হাসল।

'তোমার কথাও মনে পড়ে অতসী। কফি হাউসে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে তুমি অনামনস্ক হয়ে হাত বাড়িয়ে জানালা থেকে বৃষ্টির গুঁড়ো হাতে নিতে! তাই না?'

'তখনি খুব পেকে গিয়েছিলে দেখছি। মেয়েদের সব লক্ষ্য করতে তো!'

'অথচ দেখ, তবু তোমাকে ভালবাসায় ধরতে পারি নি!'

'ইস্, আমিই বা এগোতাম নাকি? তোমাকে আমার ভালই লাগত না!'

'কেন?' মণিময় অতসীর চোখে চোখ রাখল। 'তোমার সাহস তো কম নয়? আমারই বাড়িতে বসে আমাকে একথা বলছ?'

অতসী হেসে ফেলল। 'তুমি আর কি জানবে? এভারেজ মেয়েরা সব সময়েই হিন্দী সিনেমার নায়কের মত ছেলেদের মধ্যে হালকা হুল্লোড় দেখতে ভালবাসে। তাদের প্রেমিকের মধ্যে সে রকম না পেলে এগোতে চায় না। তুমি তখন থেকেই এত কম কথা বলতে, আর গম্ভীর, দার্শনিক ছিলে!'

'আমারও তো তাই কোন মেয়েকে ভাল লাগে নি।' বলেই বনশ্রীর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। বনশ্রী বুঝি সেই রকম এক এভারেজ মেয়ে—যে কেবল হিন্দী সিনেমা দেখে তার নায়কদের মত প্রেমিকদের আদর্শ কল্পনা করেছে এতদিন? তা-ই কি চেয়েছিল মণি-ময়ের মধ্যে? হঠাৎ বিস্বাদ হয়ে গেল ভিতরটা।

অতসী সোজা তাকাল মণিময়ের দিকে। 'অবশ্য এটা হয় কম বয়সে। বেশী বয়সে এসব থিতিয়ে আসে।'

'নিজের কথা ভেবে শুধরে নিচ্ছ?' মণিময় একটু বেশী হাসল। 'আগে তুমি ঠিকই বলেছ, মেয়েরা চল্লিশ বছরেও খুকি থাকে।'

'বাজে বোকো না তো। একজন বিবা-হিত ভদ্রমহিলার সামনে এসব কথা বলে না।' যেন ধমক দিল অতসী।

'শাসন করছ?'

অতসী উঠে দাঁড়াল। 'নাও, স্নান করো তাড়াতাড়ি। একসঙ্গে খেয়েনি।'

'ওঃ, ভুলেই গেছি। তুমি সারারাত ট্রেন জার্ণি করে ক্লান্ত, তাই না?' উঠে দাঁড়াল মণিময়। 'আমি অফিস বেরিয়ে গেলে তুমি বরং লম্বা একটা ঘুম দাও।'

'ভাত খেলে তবে ঘুম আসবে। তার আগে দু'চোখে একটুও ঘুম নেই। শুধু ক্লান্তিটুকু জড়িয়ে আছে সারা শরীরে।' বলতে বলতে অতসী পিঠ-বুক ঈষৎ দুমড়ে-মুচড়ে চাপা ক্লান্তি সরাতে চাইল।

মণিময় ঘর থেকে বাইরে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল। ঘুমোবার কথা মনে হতেই কি একটা প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেছে। অতসীর দিকে তাকাল। 'তাই তো! কথাটা বলাই হয় নি। তোমার শোবার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

অতসী মণিময়ের চোখে চোখ রাখল। মণিময় হঠাৎ নিজের মধ্যে আড়ষ্টতা বোধ করল। চিন্তায় এক জটিলতা পাক খেয়ে গেল। অতসী নীরব। মণিময় অতসীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে এক কাজ কর। তুমি আমার বিছানায় শোও, রাত্রে আমি দালানে শোব এখন।'

বিষয়টা এমনি জটিল, অস্বস্তিকর, অতসী চাইছিল না মণিময়ের সঙ্গে এ নিয়ে কোন আলোচনা হোক। সারা বাড়িতে মণিময় আর অতসী থাকবে, আর কেউ নেই। এরকম কোন ভাবনা কোন সময়েই যেন দুজনের মধ্যে না আসে। অতসী তা-ই চাইছিল। মনে পড়লে আর কিছু নয়, মণিময় আর অতসী দুজনেই অস্বস্তিকর লজ্জায় পড়ে যাবে, কিছু বলতে পারবে না। দুজনের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন সব রকম ঠাট্টার সম্পর্ক বটে, তবু একটা জায়গায় অতসীর চুপ করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা ছাড়া, মণিময়ের মা বা

.বোন, কেউ না কেউ থাক.ই—এটা ভেবেই এসেছিল। এখন নেই বলে অতসীর দিক থেকে শোয়া নিয়ে কথা বলা বা হোটেলে চলে যাওয়া কোনটাই সম্মানের হবে না মণিময়ের কাছে।

কয়েকটি কথা মুহূর্তে ভেবে নিয়ে অতসী বলল, 'সে সব তোমার ভাবতে হবে না, পরে ভাবা যাবে। শুধু মনে রেখ, দুপুরে আমি একটু ঘুমিয়ে বেরুব। ফিরে রাঁধব দুজনের। তুমি যেন বাইরে খেয়ে এসো না। কখন ফিরবে?'

'তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে যখন পারো ফিরবে, তবে রান্না-বান্নার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মণিময় হাসল। কোন কথা না বলে কলঘরের দিকে এগোল।

বিকেলে মণিময়ের ফেরার আগে অতসী একা অনেক কাজ করেছে। দুপুরে ঘণ্টা-দুয়েক ঘুমিয়ে একটা কাজ সারবে বলে বেরিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে বাড়ি ফেরার পথে কিছু আনাজ, মাছ কিনে নিয়ে এসেছে। মণিময়ের শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটার জিনিস-পত্তর সরিয়ে দালানের এক কোণে জড়ো করে রেখে ঘরটা পরিষ্কার করে ধুয়েছে, মুছেছে একাই। একটা তক্ত-পোষ ছিল, সেটাকে পরিষ্কার করে তার ওপর অতসী নিজের হোল্ডঅলে আনা বিছানাটা পেতেছে যত্ন করে। ঘরের কোণে কাপড়ের ঢাকা-পরানো একটা টেবিল ফ্যান ধুলোমাখা অবস্থায় পড়েছিল। পাখাটা খারাপ নয়। অতসী সেটাকে একটা টুলের ওপর বসিয়ে প্লাগ পয়েন্ট ঠিক করে রেখেছে। মণিময়ের শোবার ঘর সুন্দর করে গুছিয়েছে। রান্নাঘরের সামনে দালানে একটা পুরনো টেবিল আর দুটো চেয়ার রেখে খাবার টেবিল বানিয়ে দিয়েছে। সব ডাঁই হয়ে ছিল ছোট ঘরটায়।

যেন একটা নেশার ঘোরে অতসী এত কাজ করেছে গড়িয়ে আসা দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। এরই মধ্যে রান্না সেরেছে। ভাল করে সন্ধ্যায় স্নান করার জন্যে বাথরুমে এল অতসী। ওখানে হাসপাতাল থেকে ফিরে সন্ধ্যায় স্নান করার অভ্যেস। তার ওপর কলকাতায় আজ যা গরম। মনে হয় রাত দশটার পরেও একবার স্নান করতে হবে।

কলঘরে স্নান করতে করতে অতসী নিজের মত করে নানা কথা ভাবছিল। কিন্তু বাইরে এসে দেখল, চাপা গুমোট গরম বেশ সরতে শুরু করেছে। আকাশ ছেয়ে ঘনমেঘ। হু হু করে মাতাল হাওয়া বইছে। মনে হয়, একটু পরেই ভীষণ ঝড় উঠবে। সকালে মণিময়ের কাছে শুনেছিল, কলকাতায় আজ প্রায় সাত-আট দিন এরকম অসম্ভব গুমোট গরম চলেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। দূরে গুম গুম করে মেঘ ডেকে উঠল। অতসী দালানের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখল। মণিময়ের এখন ফিরে আসা উচিত। বৃষ্টি নেমে এলে আসতে পারবে তো? একটু বৃষ্টিতেই তো কল-কাতার ট্রাম-বাস অচল হয়ে পড়ে। একবার মেয়ের কথা মনে পড়ল। এ রকম ঝড় এলেও ওখানে ভয় নেই। কি ভেবে অতসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

একটু পরে মণিময় যখন ফিরল, অতসীর প্রসাধন শেষ হয়ে গেছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অতসীর নিজেকে বড় একা, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। বুকচাপা কষ্ট ওকে অস্থির করছিল বারবার।

মণিময় ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বলল, 'এসব কি করেছ অতসী?'

'কি আবার?' অতসী সহজ ঠাণ্ডাগলায় বলল।

'তোমাকে এসব কে করতে বলল। তুমি একাই বা এসব করতে গেলে কেন?'

'ক্ষতি কিসের? আমাকেই তো থাকতে হবে?'

'মানে!' মণিময় চাপা কৌতুকে ফুলে উঠল। 'স্থায়ী একটা রেশন কার্ড তাহলে সত্যিই করাতে বলছ!'

'যাও, আবার সেই কথা! সব বিষয়ে ঠাট্টা।' একটু থেমে বলল, 'কোথায় এত কষ্ট করে সব পরিষ্কার করলাম, একটু প্রশংসা করবে, তা না!' দু'চোখ পাকাল অতসী।

মণিময় এবার অতসীকে স্থির দৃষ্টিতে দেখল। সকালের সেই ক্লান্তি অতসীর শরীরের কোথাও নেই। দুটি সন্তান হয়ে গেছে অতসীর, কেউ এই মুহূর্তে ওকে দেখলে তা ভাববেই না। ভারী খোঁপা করেছে ভিজে চুল জড়িয়ে। এতক্ষণ পরে মণিময়ের লক্ষ্য পড়ল অতসীর শরীর। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঈষৎ ভারী মনে হয়, কিন্তু নাক, মুখ, চোখ, গ্রীবা, বুক, পিঠ এমন পরিমিত স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল অতসীর, মণিময় এই প্রথম যেন তা নিঃশব্দে অনুভব করল। বত্রিশ বছরের বিবাহিতার বুঝিবা আলাদা যৌবন আছে। বনশ্রীর বয়স চব্বিশ, দেখলে মনে হবে উনিশ-কুড়ি। কিন্তু এমন স্থির দীপ্তি, চোখে-মুখে যৌবনের আলোয় এমন শান্ত শীতলতা কোন দিন ওর শরীরে দেখে নি মণিময়। তিরিশের ওপরে মেয়েদের বয়স হলে মেয়েরা বুঝি সদ্য-সবুজ-হওয়া গাছের মত সুন্দর হয়? মণিময় নিজের পছন্দ মত একটা উপমা তৈরি করে অতসীর পরিচ্ছন্ন শরীর দেখল।

'কি ভাবছ? প্রেমিকার কথা?'

চমকে উঠল মণিময়। হাসল। 'সত্যি অতসী, তুমি আমাকে রীতিমত অবাক করে দিয়েছ!'

'আমাকে দেখে তাই ভাবছ? তাহলে চলো, আরও অবাক হবে।' বলেই অতসী মণিময়ের হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। 'দেখ তো, অতিথির শোবার মত হয়েছে কিনা।'

মণিময় এবার হতবাক। অতসী যে এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে, ভাবেই নি। একবার ঘর, আর একবার অতসীকে দেখল মণিময়। সত্যি, সোমনাথবাবুকে এবার ঈর্ষা হচ্ছে।'

'থাক, সব কথা স্পষ্ট করে বলতে নেই মশাই।' মুখে-চোখে, হাতের ভঙ্গিতে চটুল ভাব করল অতসী।

হেসে উঠল মণিময়। অতসীও।

'রান্না শেষ করে ফেলেছ?'

'কখন!'

'কিন্তু এখনি তো খেতে বলা যায় না।'

'কে বলেছে খেতে। বরং চা করি একটু।'

'এমন ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, এ সময়ে চা-পান তো উত্তম প্রস্তাব!' এ ঘরে এলো মণিময়। 'কিন্তু আর একটা প্রস্তাব আছে অতসী।'

'কি?'

'তুমি ওঘরে শুতে পাবে না। এ ঘরে আমার বিছানায় শোও, আমি বরং ও-ঘরে শুচ্ছি।'

'কেন!'

'ও ঘরটায় ইঁদুর আরশুলা আছে, তার ওপর অনেক দিন ব্যবহার করা হয় নি। তুমি গেস্ট, তার ওপর ভদ্রমহিলা। তোমাকে তো ও ঘরে শুতে দিতে পারি না।'

চিবুক তুলে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে ছিল অতসী। মণিময়ের বলার ভঙ্গি দেখে অতসী হেসে উঠল। 'তুমি যখন এ বাড়ির মালিক, তখন আর না করি কি করে? তবে ও ঘরে আমার অসুবিধে হত না।'

'থাক, মেয়েরা সব সময় নিজের সুবিধে-অসুবিধে বুঝতে পারে না। তাই এক এক সময় ভীষণ ঠকে যায়।'

'খুব যে!' অতসী চোখ পাকাল। 'আসছি, আগে চা-টা নিয়ে আসি। তার পর দেখা যাবে।' অতসী রান্নাঘরের দিকে এগোল।

'সেই ভাল। আমিও মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নি। মণিময় জামা-কাপড় বদলাতে ব্যস্ত হল। 'ইউনিভার্সিটিতে আড্ডা দেবার সময় মাঝে মাঝে যেমন

পিঠে আচমকা কিল বসাতে, ছেলেদের কলার ধরে টানতে, তা করবে না 'তুমি?' অতসীকে শুনিয়ে বলল মণিময়।

রান্নাঘর থেকে অতসীর হাসির শব্দ এল।

দালানে মাদুর পেতে সামান্য দূরত্বে দুজনে দেয়াল ঘেঁষে বসল। মণিময়ই যুক্তি দিল, এমন হু-হু হাওয়ায় ঘরের মধ্যে বসতে ভাল লাগছে না। আজ আবার পূর্ণিমা। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও জ্যোৎস্নার হাল্কা আস্তরণ বাইরেটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। গুমোট গরমের পর চার পাশের ঠান্ডা পরিবেশ বড় ভাল লাগছে।

সামনে কিছু মুড়ি, ভাজা আর চায়ের কাপ নিয়ে বসল মণিময় অতসী।

মণিময় বলল, 'দালানের আলোটা বরং নিভিয়ে দাও। হাল্কা অন্ধকারটা খারাপ লাগবে না। তাছাড়া ঘরের আলোও জানলার গরাদ দিয়ে মাদুরের ওপর পড়লে আমরা দুজনেই দুজনকে দেখতে পাবো।'

অতসী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে দালানের আলো নেবালো। বসতে বসতে বলল, 'হঠাৎ এমন হাল্কা রোমান্টিক হচ্ছ কেন? ছেলেমানুষি করতে ভাল লাগছে বুঝি?'

দালান অন্ধকার হতেই ওদের দুজনের মাঝখানে ঘরের উজ্জ্বল আলো জানালার গরাদ ডিঙিয়ে মাদুরের ওপর পড়ল। স্পষ্ট করে দুজনে দুজনের মুখ-চোখ দেখতে পাচ্ছে এবার।

মণিময় আর অতসী দুজনেই হঠাৎ চুপ করে গেল। কি যেন ভাবতে ভাবতে দুজনে মুঠো করে মুড়ি খেয়ে চলল নিঃশব্দে। চা ঠান্ডা হয়ে যাবে বলে দুজনেই চা খেয়ে নিয়েছে নিঃশেষ করে। খালি কাপ সামনে পড়ে আছে।

অতসী বলল, 'কি হল? কথা বল. এমন চুপ করে বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।' বলা শেষ করে বাতাসে উড়ে পড়া কয়েকটা চুল চোখের ওপর থেকে সরালো।

মণিময় অতসীর দিকে সোজা তাকাল। 'তাস খেলবে?'

'তাসের খেলা জানি না।'

'তাসের কোন খেলাই না?'

'একদম না।'

মণিময় চুপ করল। ইউনিভার্সিটিতে পড়া বন্ধু-বান্ধবীদের সব খবর দিয়েছে অতসীকে। অতসীর নার্সের চাকরী নেওয়ার কাহিনীও শোনা হয়ে গেছে সকালে খাবার টেবিলে বসে খাবার সময়। আর কি কথা বলার আছে? আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে মুড়ি খাওয়া শেষ করল। অতসীর খাওয়া আগেই শেষ হয়ে গেছে। বাইরে প্রবলবেগে বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দূরে মেঘের গম্ভীর শব্দ। অতসী-মণিময়ের ভাল লাগছে ঠান্ডা ভাবটা।

'আমরা কি এরকম চুপ করে বসে থাকব?' অতসী হাসবার চেষ্টা করে গায়ের আঁচলটা আলতো করে জড়িয়ে নিল পিঠে।

'তাছাড়া আর কি? আর কিছু কথা তো বলার নেই।'

'সত্যি নেই?' অতসী নিজের মধ্যে অকারণ চমকাল। 'তোমার অনেক কথা আমি জানি না, আমার কথাও তুমি জান না। অথচ এত বছর পরে আমাদের দেখা মণিময়। এখন কি কোন কথা বলার নেই?'

মণিময় একটু অবাক হয়ে তাকাল অতসীর দিকে। 'কি জানতে চাইছ বল?'

'তুমি কেমন আছ, কেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছ?' অতসী থামল। 'আমিও বা কেমন আছি, কেমন ভাবে দিন চলছে! এটাও তোমার জানতে ইচ্ছে করে না!'

অতসীর কণ্ঠস্বরে কি যেন এক বিষণ্ণতা মেশানো আছে—মনে হল মণিময়ের। মণিময় অতসীকে সম্পূর্ণ করে দেখল। বসার ভঙ্গিতে অতসীর শরীর ভাঙা। মাথা নীচু করে বসে। মণিময় অতসীর সারা শরীরে যেন বয়সের ক্লান্তির সঙ্গে শীতল বিষণ্ণতা মেশানো অনুভব করল। মণিময়ের হঠাৎ কিসের ভয় হল। সারাবাড়ি নিঃশব্দ। হৃদয়ের মধ্যে যেন শব্দের অতিরিক্ত কয়েকটা শব্দ হল। অতসীকে মনে হল বড় আপন, বড় অন্তরঙ্গ। সচকিত হল।

'আমি তো বেশ ভালই আছি। দেখে বুঝতে পারছ না?' মণিময় শুকনো পাতার মত হালকা হওয়ার চেষ্টা করল মনের গভীরে।

অতসী আবছা অন্ধকারে মণিময়ের মুখের দিকে তাকাল। মণিময় অন্যাদিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানছে। অতসী গলায় ছোট শব্দ করে হাসল। 'আমার মনে হয় তুমি একটুও ভাল নেই।'

'কেন?' মণিময় হাসবার চেষ্টা করল। কয়েক মুহূর্ত বনশ্রীর মুখ, স্বভাব ছবির মত স্থির করে ভাবতে চাইছিল। অতসীর দিকে চোখ রেখে বলল, 'তোমার মতন বিয়ে করিনি বলে?'

'না তা নয়, কাউকে ভালবাসতে চাইছ বলে!'

'কাকে, তোমাকে?' মণিময় নড়ে বসল। বেশী হেসে অতসীর দিকে কৌতুককর দৃষ্টিতে তাকাল। 'আপত্তি এখনো নেই।' মণিময়ের মনে পড়ল, ঠিক এইভাবে ইউনিভার্সিটিতে আড্ডা দেবার সময় মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের কথা বলে ঠাট্টা করত।

অতসীর গলা ঠান্ডা, ঈষৎ গম্ভীর। 'এড়িয়ে যেতে চাইছ?'

অতসীর বলার ভঙ্গিতে মণিময় অবাক হল। অজানা ভয় যেন চারপাশের শীতল অন্ধকার জড়িয়ে মণিময়কে ঘিরে ধরছে। মণিময় সারা মুখে লঘুতা বজায় রেখে বলল, 'আচ্ছা, কি বলতে চাইছ, বল তো? খুব চালাক তুমি। এইবার গোপন কথাটি বলে দি আর কি?'

'বনশ্রী কে মণিময়!' অতসী চকিতে মণিময়ের দিকে তাকাল। ওর চোখে কিছু ধরতে চাইছে।

মণিময় ভিতরে চমকে উঠল। ভয়-মেশানো অন্ধকার যেন শীতলতর হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের গভীরে কেউ যেন মরা মাছের চোখের মত তাকিয়ে আছে একভাবে। 'কেউ না।' ফিসফিস করে বলল। মণিময়ের দৃষ্টি মাটির দিকে, অন্যমনস্ক। নিঃশ্বাস মন্থর। একটা চাপা বিরক্তি মণিময়কে বিব্রত করছে।

অতসী সময়ের কিছু বেশী সময় চুপ করে রইল। 'আমি জানি মণিময়, সে তোমার সমস্ত কিছু। আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কি করে!' যেন অনেক দূরে থেকে মণিময় জিজ্ঞেস করে উত্তর শুনতে চাইল।

'তুমি কোনদিন এত চুপচাপ ছিলে না, এত কথা, হালকা ঠাট্টা করতে না—আমরা যখন একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। তাই না? তোমাকে দেখেও তাই মনে হয়। অথচ আজ সকাল থেকে দেখছি, তুমি ভীষণ কথা বলছ, যা বলার নয় তাই বলে ফেলছ। তখনি সন্দেহ করেছি।'

'আর কিছু!' মণিময় সহজ হবার চেষ্টা করল।

'আজ বিকেলে ঘর গুছোতে গিয়ে বনশ্রীর ফটো দেখেছি। ফটোর পিছনে ওর নাম সই করা। কয়েকটা চিঠিও চোখে পড়েছে। তবে ভয় নেই, একটিও পড়িনি। শুধু ওপরে ঠিকানায় হাতের লেখা দেখে বুঝেছি।'

মণিময় এখন পাথরের মত স্থির। কি বলবে বুঝতে পারছে না। অতসী কি বুঝতে পেরেছে, বনশ্রী এখন অন্য প্রেমিকের কাছে! ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা অতসীর চোখের মণির একেবারে ভিতরে তাকাল মণিময়। নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'সে এখন আমার কাছে নেই অতসী, আর কোনদিন সে আসবে না।' মাদুরের ওপর আঙুল ঘষতে ঘষতে মণিময় বলল। একটা কালো দাগের চারপাশে বৃত্তাকার রেখায় আঙুল রেখে খেলতে লাগল।

'বুঝতে পারি মণিময়।' অতসীর চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। মণিময় সে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়নি। অতসী একসময়ে বলল, 'আমি এ কথা বলে তোমায় কষ্ট দিলাম মণিময়?'

'না।' মণিময় কথাটা বলতে বলতে ঘাড় নাড়ল। 'জেনে ভালই করেছ। অন্তরঙ্গ কাউকে বলার মত একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম। তা না হলে—' মণিময় আর কিছু বলতে পারল না।

অতসী মণিময়ের অবনত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরে হাওয়ার বেগ কমে এসেছে। আকাশের কালো মেঘ আরও ঘন। চারপাশ যেন থমথমে হয়ে আসছে। জ্যোৎস্নার অতি সূক্ষ্ম আস্তরণে যেন কালি মাখানো। ঝিরঝির করে বয়ে যাওয়া শীতল হাওয়ার ঢেউ ওদের দুজনকে ঢেকে দিল।

মণিময় অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ সচেতন হয়ে অতসীর দিকে তাকাল। অতসীর ডান হাঁটু মোড়া। বাঁদিকের হাঁটু মুড়ে মাদুরের ওপর ফেলে রেখেছে। ডানদিকের হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মাদুরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছে। পিঠের ওপর বিকেলের সাধারণ জড়ানো ভিজে খোঁপা

আধখোলা। বুক থেকে কাপড় সরে গেছে। মণিময় বত্রিশ বছরের বিবাহিত অতসীর গ্রীবা, পিঠ, বুক, হাতের ডৌল, ভারী নিতম্ব এক পলক দেখল। বয়স তিরিশের ওপর গেলে, বা বিয়ে হয়ে গেলে বুঝিবা মেয়েদের আলাদা সৌন্দর্যে ভয়ঙ্কর এক আকর্ষণ শক্তি আসে। মণিময়ের হৃদয়ে বুঝিবা ভয় গভীর হ'ল।

'কি ভবছ?' মণিময়ের কণ্ঠস্বর লঘু।

অতসী ভিতরে চমকে উঠল। মণিময়ের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কিছু না।' কথাটা চাপা কণ্ঠস্বরে ফ্যাসফ্যাসে শোনাল।

মণিময় হাসবার চেষ্টা করল। 'ও সব ভাবনা ছেড়ে দাও অতসী। জীবনে সুখী হওয়া ব্যাপারটাই একটু জটিল। এই যে তুমি ছেলেমেয়ে-স্বামী নিয়ে এত সুখী, অন্য সব সময়ে যে তা-ই পাবে, কেউ কি গ্যারাণ্টি দিতে পারে?' মণিময় অতসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

অতসী 'এত সুখী' কথাটা শুনেই মণিময়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। মণিময় কথা বন্ধ করতেই বলল, 'আমি এত সুখী তোমায় কে বলল!'

'না হওয়ার তো কোন কারণ দেখি না!'

'ওঃ, তোমার ধারণা! তাই বল।' অতসী চুপ করল। একটু পরে হঠাৎ ঈষৎ হালকা কণ্ঠেই বলল, 'তুমি আগে হাত দেখতে না, মণিময়?'

'কবে!' মণিময় অবাক হবার ভাণ করল। 'আমাকে আবার ঠাট্টা করতে চাইছ?'

'বাঃ, আমরা যখন একসঙ্গে আড্ডা দিতাম, তুমি সকলের হাত দেখতে না?'

মণিময় জোরে হেসে উঠল। 'আরে, সে তো তোমাদের মত মেয়েদের সুন্দর সুন্দর হাতগুলো ধরার জন্যে! বল তুমি, এই সুযোগে একটা মেয়েকে কত তাড়াতাড়ি কাছে আনা যায়!'

'বাজে বোকো না মণিময়।' যেন ধমক দিল অতসী। 'তুমি বলেছিলে না, মানুষের ভাগ্য জানার ব্যাপারটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং! একবার হাসপাতালে কি এক অসুখে এক মাসের ওপর ছিলে। তখনি এসব বিষয়ে পড়াশুনা করেছ, বলনি? আর আমি তো দেখেছি, তুমি অনেককে অনেক কথা ঠিক বলে দিতে!' একটু থেমে বলল, 'প্রতিমাকে বলেছিলে, তিন মাসের মধ্যে ওর মায়ের মৃত্যু হবে। আমায় বলেছিলে, তোমার বিয়ে হবে বাইরে হঠাৎ, আর তা-ও তিন মাসের মধ্যে। দুটোই কিন্তু একেবারে ঠিক ঠিক ফলেছিল। কি, মনে পড়ছে?'

মণিময় হেসে উঠল। 'এমনি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। আন্দাজে ঢিল মারা। ইস্, তোমরা কি বোকা দেখ, সামান্য কথাকেই এত বিশ্বাস করে বসে আছ!'

'বাজে বোকো না।' অতসী মণিময়ের চোখে চোখ রাখল। 'বিয়ের পর আমার কি হবে, তা বলনি তখন।'

মণিময় বুঝল, অতসী ওর ভাগ্য সম্পর্কে সত্যি কিছু শুনতে চাইছে। একটু গম্ভীর গলায় কৌতুক করতে চাইল। 'দেখছ না অতসী, তিন মাসের কথা বলে ঐ 'তিন' শব্দটা দুজনের বেলাতেই বলতে চেয়েছিলাম। আসলে মানুষের জীবনে ঐ তিন-ই সত্য। আর তা-ও হল জয়েন্ট তিন তাসের মত। যেমন দুর্বোধ্য, রহস্যময়, তেমনি এক অদ্ভুত অ্যাক্সিডেন্ট। ঐ তিনকে না ধরা পর্যন্ত কেউ কিছু বলতে পারে না।' মণিময় এই মুহূর্তে বনশ্রীর নামের তিন অক্ষর ভাবছিল। আর আশ্চর্যভাবে অতসীর নামের তিন অক্ষর বার বার স্পষ্ট হতে লাগল। মণিময় অতসীকে স্পষ্ট করে দেখল।

'ভাল কথা বলতে পার, এ তো আমি তোমাকে আগেই বলতাম। এখন বাজে কথা ছাড়। আমার হাতটা একটু দেখ।' বলেই অতসী জানলার গরাদের ছায়া দিয়ে কাটা আলোর মধ্যে হাত মেলে ধরল। 'আমার জীবনে সুখ আছে কিনা!'

মণিময় অবাক হল। অতসীর কণ্ঠস্বর একটু কঠিন শোনাল। 'সুখ' শব্দটা যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে ছড়িয়ে গেল। 'তুমি সত্যি কিছু শুনতে চাইছ?'

'সত্যি।' মাথা হেঁট করে নিজের করতলের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিল অতসী।

মণিময় ওর সামনে ঝুঁকে-পড়া অতসীকে দেখল। গলার সরু হারের সঙ্গে লকেটটা বুকের খাঁজে আটকে আছে। সামনের কাপড় শিথিল হয়ে একপাশে সরে গেল। অতসীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ভারী বুক উঠছে-নামছে। মণিময় সামনে আলোয় মেলে-ধরা হাতের দিকে তাকাল। নরম, কোমল হাত। আলোর আস্তরণে করতলের ত্বক বিশুদ্ধ মাখনের মত মসৃণ। মণিময় ওর হাতের মুঠি ডান হাতে নিল। করেরেখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি, কিছু মনে নেই আমার।'

'যা মনে আছে।'

অতসীর হাত ঠাণ্ডা, করতল অনেক উষ্ণ, করেরেখা অনেক স্পষ্ট। অতসীর হাতের ভরে মণিময়ের মনে হল, অতসীর হাত মণিময়ের হাতের মধ্যে নির্ভরতা চাইছে। হাতের মুঠি তুলে ধরল আরও সামনে। ঠাট্টা করেই বলল, 'ভীষণ সুখী তুমি অতসী। স্বামী, ছেলে, মেয়ে নিয়ে অফুরন্ত সুখ তোমার। এ সুখের শেষ নেই। আর সোমনাথবাবুও কদিনের মধ্যে তোমার কাছে আসবেন। হাতের রেখায় তা স্পষ্ট।'

চাপা গলায় অনেকটা পাগলের মত খিলখিল করে হেসে উঠল অতসী। এক ঝটকায় মণিময়ের হাতের মধ্যে থেকে হাত সরিয়ে নিল। 'সত্যি, তুমি সব ভুলে গেছ মণিময়!' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ?'

'মিথ্যে!' মণিময় সত্যি অবাক হল। একটু বা ভয় পেল।

অতসী চুপ করে গেল। হাতটা কোলের ওপর মৃত কোন জীবের মত ফেলে রেখে বাইরে তাকাল। পেনসিলের সীসের মত রঙ, বাইরে ডোরা-কাটা সিমেন্টের উঠোনের ছায়া-ছায়া অন্ধকারের আবরণ ঠাণ্ডা বাতাস পাক খাচ্ছে। যেন গরমটা আবার চারপাশে নেমে আসছে।

'সোমনাথ কোনদিন আমার কাছে আসবে না মণিময়। প্রায় বছর তিনেক সে আসে নি। ছেলে নিয়ে বাইরেই আছে।'

'আর তুমি!' অস্ফুটে বলল মণিময়।

'আমি মেয়ে নিয়ে বড় একা।' থামল অতসী। 'একজন মেয়ের পক্ষে একা থাকার যে সুখ, সত্যি তাতে আমি সুখী মণিময়।'

কিন্তু কেন? মণিময় বলতে চেয়েছিল। অতসীর মুখের রেখায় চোখ বুলিয়ে তা আর বলতে পারল না।

অতসী ফিস-ফিস করে বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, আমি বলতে পারব না।' অতসী দু হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে নিঝুম হয়ে গেল।

মণিময় কিছু সময় অতসীর চোয়ালের এক পাশের রেখা, চিবুক দেখল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না, অতসীও না। এখন একটুও বাতাস বইছে না।

বেশ কিছু সময় পরে মণিময় স্বগতোক্তির মত বলল, 'বৃষ্টি বোধ হয় হবে না আর। ইস, গরম একটুও ভাল লাগছে না।'

'আমার ওখানে চলে এস মণিময়। এসময়ে বৃষ্টি প্রায়ই আসে। ভীষণ ভাল লাগবে তোমার।' অতসী যেন সম্পূর্ণ অন্য একটি মেয়ের মত কথা বলল।

'তুমি তো সকালে বলছিলে, তোমার কোয়ার্টারের সামনে তৃণভূমি আছে!'

'এসো না, সত্যি কিনা দেখবে!' বৃষ্টি নামলে সে জায়গাটার শব্দ, গন্ধ, রঙ কত ভাল লাগে! তুমি গেলে অনেক রাত পর্যন্ত ওখানে বসে গল্প করব।' থামল অতসী। 'আমি তো গভীর রাত পর্যন্ত ঘাসের ওপর একা শুয়ে থাকি। জীবনে ঐটুকুই যা আরাম পাই। জানো, চারপাশে অনেক দূরে-দূরে পাহাড় আছে!'

মণিময়ের ভাল লাগছে অতসীকে। 'সত্যি যেতে বলছ? একবার গিয়ে যদি ভাল লেগে যায়, আর ফিরে না-ও আসতে পারি।'

'আপত্তির কি? পুরনো বন্ধুত্ব নতুন করে সাজিয়ে নেব।'

মণিময় অতসীর কথা শুনল কি শুনল না, বুকের মধ্যে হৃদয়ের শব্দের বেশী কিছু শব্দ ধরে সময়ের কিছু বেশী সময় বনশ্রীকে ভেবে নিল। 'আমার কলকাতা ভাল লাগে না, একটুও না অতসী। সবুজ ঘাসের ওপর হাঁটতে বড় লোভ।'

অতসী মণিময়ের দিকে তাকাল। গলার যেন ফিস-ফিস শব্দ হল। 'সত্যি এসো তাহলে।'

মণিময় অতসীর কণ্ঠস্বরে শিহরিত হল। সারা শরীরে চকিতে যেন ঠাণ্ডা স্রোত বইল। স্থির হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

আচমকা মেঘ গর্জন কানে আসতেই সম্বিৎ ফিরে এল দুজনের।

অতসী বলল, 'বৃষ্টি নামবেই। চল, খেয়ে নি। বড় ঘুম পাচ্ছে।'

'চল।' মণিময় উঠে দাঁড়াল। 'আমারও যেন ঘুম পাচ্ছে।'

দুজনে অল্প কয়েকটি কথাবার্তার মধ্যে খাওয়া শেষ করে যখন শুতে এল, তখন গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। হঠাৎ ঝড়ের মত আসা এলোমেলো বাতাসে বৃষ্টির ফোঁটা বিক্ষিপ্ত। বিদ্যুৎ চমক আর মেঘ গর্জন একসঙ্গে চারপাশ কাঁপিয়ে তুলছে মাঝে-মাঝে।

কখন শুয়েছে অতসী, দু চোখের পাতা একবারও এক করতে পারে নি। বৃষ্টির ঝাপটার জন্যে জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইরে তুমুল বাতাস। অন্ধকার ঘরে জোরে পাখা ঘুরলেও এক ধরনের অস্বস্তিকর গরম অনুভব করল অতসী। বিছানার ওপর উঠে বসে অতসী গায়ের জামা, ব্রা খুলে ফেলল। চুলের গোছাকে খোঁপা করে বাঁধল। দু চোখ জ্বালা করছে। অতসী জল খেতে চাইল। মণিময় শোবার আগে ঘরের কোণে কুঁজোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। অতসী অন্ধকারে ঠাহর করতে পারে না, তাই উঠল না। অথচ আলো জ্বাললে জল খাওয়ার অসুবিধে ছিল না। তবু অতসী সংকোচ বোধ করল। এখন রাত কতটা কে জানে। মণিময় যদি বুঝতে পারে, অতসী এখনো ঘুমোয় নি! অতসী কিছু সময় বসে থেকে শুয়ে পড়ল। মণিময়ের বিছানা। মণিময়ের বালিশ মাথার নীচে। অতসী অদ্ভুত একটা গন্ধ পেল। হঠাৎ মনে হল, মণিময় কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি তার মতো এখনো নিদ্রা-হীন! অতসীর কয়েকটা হাই উঠল। কোয়ার্টারে থাকার সময় বিছানায় মেয়েকে পাশে নিয়েও কেমন এক-এক সময় ওর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হত। এই মুহূর্তে অতসী সে রকম এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশ মনে হচ্ছে, মণিময় যেন ওর শরীরের সঙ্গে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। না, মণিময় না। আমি ঘুমোই। অতসী বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রেখে অনেকক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে যখন চাপা নিঃশ্বাস ছেড়েছে, অতসীর খেয়াল নেই।

...কে ওপাশের শিকল নাড়ল? মণিময়? না মণিময়, আজ না, এখন না। কোনদিন না। আমাকে ডাকছ মণিময়? অতসী উঠে বসল। বিছানা ছেড়ে মেঝেয় দাঁড়াল। কাঁধ, পিঠ থেকে সমস্ত কাপড় সরে গেছে। বুকের ওপর আঁচল ধরে অতসী দু চোখে অজস্র ঘুম নিয়েই কপাটের দিকে গেল। দেখল, দরজায় সেই যে খিল দিয়ে শুয়েছে, তা একভাবে আঁটা। অতসী দরজায় কান রাখল। ওপাশ থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা, ভীত অতসীর তা শোনার বড় লোভ হল। বাইরের দামাল বাতাসের হিস-হিস শব্দ কানে আসছে। কেউ যেন দরজার শিকলটা ওপাশে বার-বার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোলাচ্ছে। অতসী খোলা বুক দরজায় চেপে ধরল। রঙ-করা দরজার শীতলতা অতসীকে বড় আরাম দিচ্ছে। আহ্, মণিময়! এখনি দরজা খুলতে বলো না। না, না, কিছুতেই না মণিময়। তুমি বৃষ্টির শব্দ শুনছ? আমার ওখানে চল, ফাঁকা মাঠের কাঁচা ঘাসে সেই ঝিঁঝিঁর শব্দ শুনবে, ঘাসের মধ্যে ধুলোর গুঁড়োর মত হাল্কা পোকার লাফালাফি দেখবে। এসব তুমি তো ভালবাস! তাই না? আর কাউকে সেখানে তুমি দেখতে পাবে না, কোনদিন না। একটুও ভয় নেই তোমার। দরজার ওপর বুক চেপে অতসী বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

মণিময় যেন ধড়ফড় করে উঠে বসল। কত রাত হয়েছে কে জানে! কখন ঘুমিয়েছে? কিছুতেই ঘুম তাড়াতাড়ি না আসায় আজ সবচেয়ে বেশী ঘুমের বড়ি খেয়েছে মণিময়। খাওয়ার সময় সময় আলো জ্বালে নি, পাছে অতসী বুঝতে পারে। আবার কেন ঘুম ভাঙল? কেউ কি ডেকেছে? মণিময় উৎকর্ণ হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ যেন দরজায় মাথা ঠুকছে। কেউ যেন কাঁদছে। দরজার ফাঁকে কান্নার শব্দ! কে? অতসী? তুমি আমায় ডাকছ? না অতসী, আমি যাব না। তুমি ভয় পেয়েছ? আমি তো সবই ঠাট্টা করে বলেছি। মণিময়ের বুক দুরদুর করে উঠল। এখনি ঘুমনো দরকার। বালিশের নীচে ঘুমের বড়ি নেই। থাকবে কি করে? এটা যে অতসীর বিছানা! মনে পড়তেই মণিময় লাফিয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। এপাশ-ওপাশ ইঁদুরের দ্রুত সরে যাওয়ার শব্দ কানে এল। মণিময়ের অপরিচিত ঘর। এঘরে বনশ্রী একবারও আসে নি। মণিময় অবাক হল, বিছানাটা যেন অতিপরিচিতের মত আকর্ষণ করছে। অতসী কি কোন গন্ধ তেল মেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল? নরম বালিশে এত গন্ধ কিসের?

উহ্! মণিময় ভীষণ এক অস্বস্তি অনুভব করল সারা শরীরে। তন্দ্রার মধ্যেই কখন যেন গেঞ্জী খুলে ফেলেছে মণিময়। পুরনো টেবিল ফ্যান বন্ধ হয়ে গেছে কখন। অতসীর শীতল হাতের স্পর্শ মনে পড়ল। না, অতসী, ওভাবে ডেকো না। মণিময়ের এখনি আর একটা ঘুমের বড়ি দরকার। অথচ আলো জ্বালার সাহস নেই। কাল সকালে এ নিয়ে অতসী ঠাট্টা করতে পারে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াতেই মণিময় যেন জানালার স্পর্শ পেল। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হওয়ার শব্দ কানে এল। মণিময় জানালার একটা কপাট খুলে দিল। ঘরে এতটুকু আলো এলো না। ঘরের মধ্যেকার কঠিন পাথরের মত জমাট অন্ধকার শুধু ঠাণ্ডায় নরম হয়ে গেল। মণিময় বুঝল, সে ভীষণ ঘেমে গেছে।

মণিময় ঘুমের বড়ির জন্যে ওপাশে একটু এগোতেই দরজায় হাত লাগল। আরও ঘন হয়ে এলো দরজার কাছে। অতসী কি ঘুমিয়ে পড়েছে? অতসী, তুমি কি ঘুমোচ্ছ? মণিময় বিড়বিড় করল। বাইরের বৃষ্টির শব্দ, ঠাণ্ডা হাওয়া মণিময়কে যেন এক পাহাড়-ঘেরা তৃণভূমির মধ্যে নিয়ে চলেছে। সবুজ ঘাসে-ঢাকা তৃণভূমি শান্ত, মসৃণ। অবিরাম ঝিঁঝিঁর শব্দ উঠছে তার মধ্য থেকে। ছোট ছোট জলের স্রোত ঘাসের গোড়া বেয়ে-বেয়ে চলেছে নিঃশব্দে। মণিময় যেন সেই শব্দও কানে গেল। আহ্, কি আরাম! মণিময় এবার ঘুমোতে পারবে। আচমকা শিকলে হাত লাগল। মণিময় শক্ত মুঠিতে শিকল চেপে ধরল। মণিময় শোবার সময় শিকল তুলে বন্ধ করে নি একভাবে ঝুলে রয়েছে। থর-থর করে কাঁপছে মণিময়। বুকের প্রতিটি শব্দে নতুন ভয় আর উত্তেজনা। মণিময়ের মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছে।

এক সময়ে হঠাৎ শিকল থেকে সজোরে হাত সরাল। শিকলটা দ্রুত কয়েকবার এপাশ-ওপাশ দুলতে-দুলতে মন্থর-গতি হল। খোলা জানালা দিয়ে প্রবল বাতাস ঈষৎ ভারী লোহার শিকলকে ক্রমাগত স্থির-ভাবে দুলিয়ে চলেছে। মণিময় কাছে থেকে শিকলের নিয়মিত শব্দ শুনল। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একভাবে টিক-টিক শব্দ উঠছে কপাটের স্পর্শ লেগে। মণিময় বুকের মধ্যে হৃদয়ে শব্দের বেশী কয়েকটা শব্দ নিয়ে, অনেকটা সময় ধরে ওঘরের বড় ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দের মত শিকলের শব্দে সময়কে ধরতে চাইল। কপাটের ওপর মণিময়ের মাথা, উন্মুক্ত শরীরের ত্বক দরজার রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। মণিময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জন্ম জন্মান্তর

"বন্ধুরা সকলেই তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করে। তাঁর উপস্থিতিতে সরস ও সজীব হয়ে ওঠে যে কোন শ্রেণীর বৈঠক। মিশতে পারেন তিনি শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পীর মত। আবার রাম-শ্যামের সঙ্গে রাম-শ্যামের মত। তাঁর মুখে হাসির বুলি ও হাসির গল্প জমে ওঠে অপূর্বভাবে। এমন গল্পিয়া মানুষ আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে আমি আর দেখিনি। অতিসাধারণ কথা তাঁর ভাবণ-ভঙ্গীতে হয়ে ওঠে অসাধারণ।"

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রসঙ্গে উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছিলেন তাঁর আবাল্য সুহৃদ হেমেন্দ্রকুমার রায় 'এখন যাদের দেখছি' নামক গ্রন্থে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই দুই লেখককেই কাছ থেকে দেখার সুযোগ মিলেছে। উভয়েই তখন প্রবীণ, কিন্তু কি প্রচণ্ড প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে যখন পরিচয় হল তখন তিনি জরাক্রান্ত খুব বেশী ঘোরাফেরা করতে পারেন না, তবু কি মনের জোর। জীবন সম্পর্কে চির-উদাসীন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তখন শেষ খেয়ায় পাড়ি জমানোর কথা ভাবছেন। তথাপি সরস রসিকতা কিংবা শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে কোনো রকম আলোচনায় তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। আমরা তাঁর নিজের মুখে তাঁর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু কাহিনীও শুনেছি।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর রচনাবলীর সংখ্যা পরিমিত। যে কয়খানি উপন্যাস বা যেসব ছোটগল্প লিখেছেন তার মধ্যে আছে বিচিত্র-লোকের সংবাদ, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিত জগতের ছবি। সবাই তাঁকে 'বুড়োদা' বলে ডাক্‌তো, কারণ তাঁর বাড়ির ডাকনাম ছিল বুড়ো, মানুষটি কিন্তু সজীবত্বে অনেক ছোকরাকেও হার মানিয়ে দিতেন। তবে মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন পরমপ্রাজ্ঞ তাই হয়ত তাঁর স্মৃতিচারণমূলক এপিক উপন্যাসটির নাম করেছিলেন 'মহাস্থবির জাতক'। প্রেমাঙ্কুরের প্রিয় কবি লিখেছেন—"এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর"—প্রেমাঙ্কুরের জীবনে অনেকবার জন্মান্তর ঘটেছে তাই তিনি পরিণত বয়সে যখন এই উপন্যাসটি রচনা সুরু করলেন তখন তার নামকরণ করলেন 'মহাস্থবির জাতক'। প্রেমাঙ্কুরের জীবনে সাফল্য আসেনি; কিন্তু 'মহাস্থবির জাতক' তাঁকে খ্যাতির সর্বোচ্চ-শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বাংলা ভাষায় রচিত একশখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'মহাস্থবির জাতক' যে অন্যতম সেই স্বীকৃতি তাঁর জীবদ্দশাতেই মিলেছে। তাঁর বন্ধু প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"মহা-স্থবির জাতক' লিখে রাতারাতি প্রেমাঙ্কুর দিগ্বিজয় করে নিল বলা যায়।"

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রসঙ্গে অতি-চমৎকার ভঙ্গীতে লিখেছেন পরিমল গোস্বামী তাঁর 'আমি যাদের দেখেছি' গ্রন্থে। প্রেমাঙ্কুর চরিত্রের এমন যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আর চোখে পড়েনি। পরিমল গোস্বামী প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে-ছিলেন। তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—"প্রেমাঙ্কুরের মতো এত বেশী স্তরের সঙ্গে সহজে কোনো বাঙালীর পরিচয় ঘটেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের সঙ্গে হয়তো অনেকটা মিলবে। কিন্তু তবু মনে হয় প্রেমাঙ্কুরের অভিজ্ঞতা যেন তাঁকেও হার মানিয়েছে।"

আর প্রেমাঙ্কুরের 'মহাস্থবির জাতকে'র সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের আরেকটি গ্রন্থ তুলনীয় তা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'। প্রেমাঙ্কুর যেন শরৎচন্দ্রকেও অতিক্রম করেছেন। শরৎ-চন্দ্রের 'শ্রীকান্তের' মর্মবাণী ব্যাখ্যা করেছেন মোহিতলাল, প্রেমাঙ্কুরের 'মহাস্থবিরে'র ব্যাখ্যা করার মত লেখকের আজ অভাব ঘটেছে। শরৎচন্দ্রই নাকি একদিন প্রেমাঙ্কুরকে "তীব্র ভাষায় যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন সিনেমায় মেতে উঠে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্য।" (দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়—মরমী কথাশিল্পী)—শরৎ-চন্দ্রের এই স্নেহের তাড়নায় হয়ত প্রেমাঙ্কুর তাঁর মরিচাধরা কলমটি আবার হাতে নিয়ে-ছিলেন। 'মহাস্থবির জাতক' যখন শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হতে লাগল তখন সবাই চমৎকৃত হলেন, অল্পকালের মধ্যেই ছদ্মনামী লোককে সবাই খুঁজে বার করলেন। জাতকের তিনটি পর্ব শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়; এখন চতুর্থ পর্ব সংযোজিত চারখণ্ডে সম্পূর্ণ 'মহাস্থবির জাতক' প্রকাশিত হল। কবি উমা দেবী লেখকের খাতা থেকে প্রেস কপি করে দিয়েছেন এবং পরে তিনি সুস্থ অবস্থায় মুখে মুখে যেমনটি বলেছেন উমা দেবী তাই লিখে নিয়েছেন।

মহাস্থবির জাতকের প্রথম পর্বে এই শতকের প্রথম দিককার কলকাতার পরিচয়

পাওয়া যাবে। ঘোড়ায় টানা ট্রামের কলকাতা, কলকাতার লোকজন আর সেই কালের নব-জাগ্রত ব্রাহ্মসমাজ। প্রেমাঙ্কুরের পিতৃদেব মহেশচন্দ্র আতর্থী ছিলেন আদর্শবাদী ব্রাহ্ম কিন্তু পুত্রদের মানুষ করার জন্য তিনি অযথা উৎপীড়ন করতেন। মানুষটি যে খারাপ ছিলেন তা বলা যায় না, তাঁর পরোপকার স্পৃহা, তাঁর জেদ অর্থাৎ বিলের পিছনে অপহৃত মাছের জন্য ছোটা, পাগলদের প্রতিপালন, চা-বাগানে বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে মৃতকল্প হওয়া প্রভৃতি মহেশচন্দ্রের উদ্ভট প্রকৃতির পরিচায়ক। এর ফলে বড় ছেলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনি পরে বিদেশে বড় ডাক্তার হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় প্রেমাঙ্কুর বালক অবস্থা থেকেই ঘরের বাইরে বিরাট বিশ্ব যেখানে বাহু মেলে রয়, সেই বাহুর আলিঙ্গনে ধরা দিলেন আর কনিষ্ঠ জ্ঞানাঙ্কুর। তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেমাঙ্কুরের কাছেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্নেহ পরায়ণা উদ্বেগাকুল জননীর কথাও প্রেমাঙ্কুর লিখেছেন অতি সূক্ষ্ম রেখায়। কিন্তু এই রেখাচিত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে, ইংরাজীতে যাকে বলে 'হান্ট' প্রেমাঙ্কুরের মহাস্থবিরের অনেক-গুলি আমাকে রীতিমত 'হান্ট' করেছে। সহ-পাঠিনী লতার সঙ্গে বিচিত্র অবস্থায় তার স্বামীর মৃত্যুর মুহূর্তে সাক্ষাৎকার। তিন পয়সা চুরির অপবাদ দিয়েছিল যে সুবর্ণ তার পাগল হয়ে যাওয়া। স্কুল-জীবনে টমরী সাহেব এবং শ্যাম ও সুরেশ্বর পর্ব প্রভৃতি এক একটি চিত্র। তারপর পাগলা সন্ন্যাসীর কাছে ইংরাজী কাব্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ। তিরাত্তর বছরের এই বৃদ্ধ ছিলেন পণ্ডিত, মদ্যপ এবং গাঁজাখোর। মদ খাওয়াটা শিখেছিলেন নিজের ছেলের কাছ থেকে। তিনি একদিন প্রেমাঙ্কুরদের দুই ভাইকে মদ্যপানের দীক্ষা দান করলেন। তখন প্রেমাঙ্কুরের বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। পাগলা সন্ন্যাসীর কবিতা পাঠ প্রসঙ্গে প্রেমাঙ্কুর প্রথম পর্বে লিখেছেন—

"কবিতার ভাষা বোঝবার মতো বিদ্যা আমাদের ছিল না। শুধু ধ্বনি ও সুর মনের মধ্যে একটার পর একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম অ্যালাস্টারের কবি চলেছে দূরে, সুদূরে—তার অন্তরে যে চেতনা জেগেছে তারই সন্ধানে। চলেছে—চলেছে—কত দেশ, কত মেরে এল তার জীবনে, তবু সে চলেছে বিরামবিহীন।"

এই পথচলায় পেয়েছিল প্রেমাঙ্কুরকে অন্তহীন পথ পরিক্রমা। এই পাগলা সন্ন্যাসীর পুত্রবধূ গোষ্ঠদিদিও এক বিচিত্র চরিত্র। এই কালেই লতুকে ভালোবাসতে শিখেছেন লেখক, সেও ভালোবাসত লেখককে। আর এই প্রথম প্রেমের স্পর্শ সারা জীবনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। মাল্যবদল করে গান্ধর্ব মতে বিবাহ হয়েছিল হয়ত, আনুষ্ঠানিক বিবাহ হল অন্যজনের সঙ্গে।

পনের বছর বয়সে রাজ্ঞমুহূর্তে প্রথম গৃহত্যাগ করলেন লেখক আর এখানেই প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথমে কাশীতে গুরুমার সঙ্গে পরিচয়। তাঁর দ্বারা প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়া। গুরুমার আদর। আড়ালে এই গুরুমা রাজকুমারী হয়ে উঠতেন আর সেই রাজকুমারীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে পড়ে থাকা। এবং রাজকুমারী আদর করে বলতেন গোপাল। এই রাজকুমারী পর্বের বিবরণ অন্য কোনো লেখকের হাতে পড়লে কি আকৃতি নিতে পারত তাই ভাবি।

যাই হোক রাজকুমারীর ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কাশী ছাড়তে হল।

তারপর ছোট সাহেবের সঙ্গে পরিচয়। কি বিচিত্র মানুষ এই ছোট সাহেব। ব্যাধি-জর্জর দেহে কত বড় মন। আর তেমনই মহিয়সী মহিলা তার ভগ্নী, লেখকের হাতে 'দিদিমণি'র যে ছবি আঁকা হয়েছে তা তুলনা-রহিত। তারপর বৃন্দাবনে দিদিমণির সঙ্গে যে অবস্থায় আবার দেখা হল তা নাটকীয়। এক অতিশয় সমৃদ্ধ অবস্থা থেকে একেবারে পথের ভিখারিণী। দিদিমণিকে যখন প্রশ্ন করা হল তোমার কি অর্থকষ্ট আছে তখন দিদিমণি বললেন—'গোবিন্দের ইচ্ছায় আমার কোনো অভাব নেই।'

এইখানেই দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি। এই পর্বের আর দুটি চরিত্র পেয়ারা সাহেব আর তাঁর সন্তজনোচিত দাদামশাই নবাব সাহেব। এমন মানুষ কি একদা সত্যিই ধরাধামে বিচরণ করেছেন—এই প্রশ্ন মনে জাগে।

তৃতীয় পর্বের এক জায়গায় প্রেমাঙ্কুর লিখেছেন—"মানুষের মধ্যে যতপ্রকার শ্রেণী আছে—অর্থাৎ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিবেচক, অবিবেচক, ধূর্ত, নির্বোধ, সুবোধ, দুর্বোধ—এদের কারুকেই স্রেফ দেখেই বোঝা যায় না সে কোন শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যারা পরশমণির ছোঁয়া পেয়েছে — তাদের দেখলেই চেনা যায়। অন্তত এই শ্রেণীর মত লোকের সাহচর্যে আমি এসেছি তাদের দেখেই চিনতে পেরেছি।"

সুরাটের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গয়ারাম সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—"জীবনযাত্রার প্রাক্কালে আমরা যে মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেছিলুম, আজ জীবনসন্ধ্যায় বিশেষ করে তাঁকে স্মরণ ক'রে বলি—হে মহাত্মন্‌! আজ হতে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে দুটি দীন ও তুচ্ছ বাঙালী বালক কম্পিত হৃদয়ে সাহায্যের জন্যে আপনাদের দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দুঃখে সুখে তাদের দিন কেটে গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বিদায় নিয়েছে, আর একজন পথের শেষে এসে অতিক্রান্ত অতীতের দিকে চেয়ে আপনাকে স্মরণ করছে।'"

সেই অন্ধকার দিনে ম্যাজিস্ট্রেট গয়ারাম এবং তাঁর বন্ধু পণ্ডিতজী লেখকের রচনা-কৌশলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন। পণ্ডিতজী, শঙ্কর ও দেবী যেন মর্তের মানুষ নয়। দেবীর মৃত্যুতে সব শেষ হল। লেখক বলেছেন—"পণ্ডিতজী ও শঙ্করের খবর পাইনি তবে দেবী আমাকে ভোলে নি। মাঝে মাঝে স্মৃতির সরণী বেয়ে এসে সে আমাকে চমকে দিয়ে চলে যায়।"

চতুর্থ পর্বে আছে বোম্বাই শহরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ। সেখানে দৈনিক ছ পয়সার মজুরিতে খেতে কাজ করেছেন। ছাগলদুধ বিক্রি করে যাদের চলে তাদের কাছে পেয়েছেন অযাচিত স্নেহ, অথচ তারা নাকি ডাকাত। অনেক অলৌকিক কাহিনীও ছড়ানো আছে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে।

পূর্বেই লিখেছি যে, 'মহাস্থবির জাতক' বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে যে পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তা সম্ভব নয়।

এই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

—অভয়ঙ্কর

মহাস্থবির জাতক— (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ পর্ব একত্রে)—মহাস্থবির (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী)। প্রকাশক—মেসার্স ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—৭। দাম—বাইশ টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা পাঠ : বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি উজ্জ্বল নাম। ত্রিশের দশকে যে কবি সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের মধ্যে বোধ করি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ব্যাপ্তিই সর্বাধিক। গত ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের দপ্তরে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। দীর্ঘদিন পর এমন একটি ঘনিষ্ঠ পরিবেশে কবির স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠ শোনার সুযোগ পেয়ে আনন্দ পেয়েছি। এ ছাড়াও উপস্থিত কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবীণ ও তরুণ কবিও তাঁর কবিতা পাঠ করে উপস্থিত শ্রোতাদের শোনান। কবিতা পাঠের পর প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

আলোচনার উদ্বোধন করে আলোক সরকার বলেন, প্রথম যখন কবিতা পড়তে আরম্ভ করি, তখনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা আমাকে সম্মোহিত করে এবং সে প্রভাব এখনও সমান। তাঁর কবিতার মূল সুর মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং এই মানবিকতা তাঁর কবিতাকে একটি বিশেষ অন্বিষ্টে পৌঁছে দিয়েছে।

মণীন্দ্র রায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন, কারণ তাঁর কবিতা নানাভাবে আমাকে সম্পৃক্ত করে

আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় তাঁর একান্ত নিজস্ব। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এই কবিতা উজ্জ্বল। এই বৈশিষ্ট্য কোন বিদেশী কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। ইতিহাস, বিজ্ঞান চেতনা এবং একটা অনন্ত ব্যাপ্তি তাঁর কবিতাকে করেছে উজ্জ্বল। কিন্তু সমস্ত কিছুর মূলেই আছে মানুষ। অনুন্নত কবিদের তিনি প্রভাবিত করেছেন।'

পূর্ণেন্দু বসু তাঁর কবিতায় থিসিস, এ্যান্টিথিসিস এবং সিন্থেসিসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,—'একালে কোন কোন সমালোচক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় দ্বন্দ্বের সংশয় ইত্যাদি নেই বলে, তাকে আধুনিক কবিতার ইতিহাসে, অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ সময় চেতনা এবং মানব চেতনা সমন্বয়ে সংশয় তার মধ্যে যেভাবে ধরা পড়েছে, তা অনেকের মধ্যেই নেই। এই অভিমতের প্রতিবাদ প্রয়োজন।' আশিষ সান্যাল তাঁর কবিতার প্রকরণ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,—'অনেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাকে আভরণ-হীন বলেছেন। কিন্তু কবিতার বিচারে একথা মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর কবিতায় ছন্দ বা চিত্রকল্প ব্যবহারের পদ্ধতি আলাদা। কবিতাকে অকারণ অলংকার পরিয়ে তিনি সুন্দর করতে চাননি কবিতার অন্তর্গত সৌন্দর্যকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় যে ব্যাপ্তি আছে, তাও অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে।'

গৌরাঙ্গ ভৌমিক উল্লেখ করেন যে, ছোটবেলা থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের তাঁর রোমান্টিক ধর্ম তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

সতীকান্ত গুহ আলোচনার উপসংহারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন,—'অনেকেই কবিতা লেখেন, কিন্তু সবাই সম্পূর্ণ হতে পারেন না। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পূর্ণ কবি। তিনি একজন মহৎ কবি।'

আলোচনার শেষে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—'আমার কবিতায় এমন অলঙ্কার ব্যবহার করতে চেয়েছি, যা অলংকার বলে অনেক সময় চেনা যায় না। সহজ হবার সাধনা করেছি সারা জীবন।' অনুষ্ঠানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য জানা যায়।

একটি মনোজ্ঞ মুশায়ারা : কবিতা এবং মুশায়ারা শোনার জন্য যে এত লোক কলকাতাতেও উদগ্রীব হয়ে থাকেন, তা জানা ছিল না। সেদিন তা দেখে তাজ্জব বনে গেছি। উর্দুভাষী এত সাহিত্যপ্রেমিককেও এর আগে কখনও দেখিনি।

গত ২ মে সন্ধ্যায় 'কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে এই মুশায়ারা বসেছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন বেংগল সার্ভিস সোসাইটি। তাঁদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ ধরনের দ্বিতীয় মুশায়ারা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীএস এস ধাওয়ান। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে [illegible] কবিদের [illegible] অমৃতলোকের বার্তা এনে দিতে পারে। প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমার [illegible] একজন কবির কবিতা [illegible] মানুষের মনে আনন্দ [illegible] সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত উর্দু কবি জো আনসারি। তিনি গালিবের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। সকলকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন শ্রীমতী লক্ষ্মী [illegible]। সম্পাদক শ্যাম নিগম সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এরপর মুশায়ারা আরম্ভ হয়। সারা ভারতের বিখ্যাত উর্দু কবিদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মুশায়ারা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পণ্ডিত আনন্দ-নারায়ণ মোল্লা। যে সব কবিরা এতে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফিরাক গোরখপুরী, জো আনসারি, পণ্ডিত আনন্দ-নারায়ণ মোল্লা, বস্কার মেহেদী, শায়ার ফতেপুরী, শচ্চীদানন্দ সিংহ, জীবন [illegible], রাজা মেহ্দারি, ইব্রাহিম হোস, খালিক লাকনউ, ইজাজ আফজল, আলকামা শিবলী, হাসান আসার, কামাল আখতার, রাজা আজিম, তবিস আজিমাবাদী প্রমুখ।

নতুন বই

এখনো সেই মুখ (দিব্যজীবন কথা)—সঞ্জীব সরকার বিরচিত। প্রকাশক—সাহিত্য-সদন — কলিকাতা — ৯ ।। দাম—তিন টাকা মাত্র।

ঈশ্বরের পুত্র একদিন এই ধরণীতে নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম থেকে তিরোধানের কাল পর্যন্ত যে সব বিচিত্র লীলা ঘটেছে তার কাহিনী অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। সঞ্জীব সরকার কাব্য-ধর্মী সুললিত ভংগীতে যীশুর পুণ্য-জীবনের কথা 'এখনো সেই মুখের' কাহিনী-গুলিতে নতুন রীতিতে পরিবেশনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক সেই মহাজীবনের আবির্ভাব বার্তা প্রসঙ্গে লিখছেন—

'তিনি আসবেন। বিশ্ববিধাতার বিধান তিনি আসবেন। সত্যিই তিনি এলেন। ঐ ছোট বেৎলেহেম সহরেই হলেন ভূমিষ্ঠ।'

সকলের অগোচরে এই আবির্ভাব তখন আমরা মন্দিরের কপাট বন্ধ করে মন্ত্র আওড়াচ্ছিলাম। তাই আমরা শুনিনি সেই পুণ্য পদক্ষেপ। এই সঙ্গে আবার 'বড়দিনের কয়েকটি চিত্র' প্রথম আঘাত মৃত্যু হল পরাজিত, ধনী ও দরিদ্র, সেই পুরাতন কাহিনী, 'এখনো সেই মুখ প্রভৃতি রচনাগুলি সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কালের ঢেউ (গল্প)—শিপ্রা দত্ত। প্রকাশক : গ্রন্থপীঠ, ২০৯-বি বিধান সরণী, কলকাতা ৬, দাম—তিন টাকা।

কাঁচের সংসার (উপন্যাস)—শিপ্রা দত্ত। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা ৬, দাম—সাত টাকা।

বাংলা ছোটগল্প যখন এগিয়ে চলেছে, যখন এ-নিয়ে চলেছে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তখন এই গল্প-সংকলনটি হাতে এলো। এতে সার্থক গল্প একটিও নেই। যা কিছু আছে, তাদের সব কটিই হয় মামুলী, আর না-হয় অবাস্তব ও অসম্ভব ঘটনার ভিড়ে অতি-নাটকীয়।

প্রথম গল্প 'রহস্যময়ী'তে রহস্য জমে ওঠবার আগেই উচ্ছ্বাস ও অবাস্তব ঘটনার জোয়ারে হকচকিয়ে যেতে হয়। নায়িকা সুস্মিতা ওরফে পাপিয়া, ওরফে পিয়ার আত্মহত্যা ও দীর্ঘ চিঠি যে কোনো কান্ড-জ্ঞানসম্পন্ন পাঠকের কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। 'অপরাজিতা' গল্পটি সার্থক হতে পারত। কিন্তু নায়িকা দেবযানীর চিঠি পেয়ে নায়ক দেবাশীষ-এর (না দেবাশিস? 'ভাঙা মনে ক্ষণিক পুলক সঞ্চার' সে সম্ভাবনাকে অংকুরেই বিনষ্ট করেছে। অতি-নাটকীয়তা 'মা' গল্পেরও প্রধান ত্রুটি। ট্রেনে রজত ও মনোবীণা দেবীর আলাপ, শিলিগুড়ির উৎসবে ওদের আবার দেখা এবং পরিশেষে মনোবীণা দেবীর বাড়িতে ওদের পুনর্মিলন—সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত, অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঠেকে। 'সহযাত্রী', 'ভাঙা ঢেউ' ইত্যাদি গল্প সম্পর্কেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য।

পাতার পর পাতা শুধুমাত্র মনগড়া কিছু অদ্ভুত কাহিনী লিখে গেলেই যদি উপন্যাস হয় তো 'কাঁচের সংসার' নিশ্চয়ই একটি উপন্যাস। কিন্তু যদি তা না হয়, অর্থাৎ, যদি কোনো সৃষ্টিকে উপন্যাস-পদবাচ্য হতে গেলে এর চেয়েও বেশি কিছু হতে হয় তো একে ঠিক কোন্ পর্যায়ে ফেলা যায়, তা জানা নেই।

এ-কাহিনীতে গোড়া থেকেই সংসার ভেঙে বসে আছে। লণ্ডন-প্রবাসী বড় ছেলে কমল মেম বিয়ে করে উগ্র আধুনিক। ছোট ছেলে অমল লণ্ডন থেকে ফিরে এসে আধুনিকতাকে আরেকভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

মা-বাবাকে চরম কষ্টের মধ্যে ফেলেছে ওরা, তিলে তিলে একটা পরিবারকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু অবাক লাগে ভাবতে, লেখিকার মুনশীয়ানার অভাবে এই চিত্র পাঠকদের মনে কোনো রেখাপাত করে না। বরং 'কাঁচের সংসার'-এর মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সব ঘটনার ভিড় পাঠকদের যেন দিশেহারা করে। উদ্ভট সংলাপ, অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু এবং উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি ইন্ধন যোগায় এতে। পড়ে বার-বার মনে হয়, সংসারে ভালো বলতে কিছুই নেই, যা আছে সবই খারাপ। কিন্তু সত্যি কি তাই? সংসারে সত্যি কি শুধুমাত্র ভাঙা কাঁচের ওপর দিয়েই হাঁটি আমরা? কেবলই কাঁচের টুকরো পায়ে ফোটাই?

দীর্ঘতম সেতুতে আমি একা

[কাব্যগ্রন্থ]

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত। বাণী মঞ্জিল, এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম : তিন টাকা।

ইদানীং বাংলা কবিতায় 'একা' শব্দের আধিক্য একটি গোপন যন্ত্রণার বিষয়। অবশ্য রোম্যাণ্টিক বিষাদ অনেক সময় এরকম নিঃসঙ্গতার অলক্ষ্য কারণ হিসেবে কাজ করে।

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত এই কাব্যগ্রন্থে তরুণ বয়সের প্রেমভাবনাকে সার্থক শব্দ-ব্যবহার ও রোম্যাণ্টিক চিত্রনির্মাণে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। 'নিজেকে চিনেছ কি' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

বলেছে সে এসে, নিজেকে চিনেছ কি?
চেনো তাকে আগে, চেনো সেই গুপ্তধন
নির্জন আঁধারের আলোয় আলোয়।

কখনো কখনো তাকে সন্ন্যাসিনীর মতো উদাসীন মনে হয়। কবিতা পাঠকের কাছে বইটি সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদ ও ছাপা ভালো।

নীল স্বপ্ন লাল ফুল (কবিতা-পুস্তিকা)—আরাধনা গুপ্ত।। প্রকাশক : শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৩ বারুইপাড়া লেন, কলকাতা ৩৫।। দাম এক টাকা।।

বাংলা কবিতায় আরাধনা গুপ্ত একেবারে নবাগতা। এই পুস্তিকাটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যসংকলন। ফলে, কবিতার নির্মাণে ও শব্দচয়নে দুর্বলতা রয়ে গেছে যথেষ্ট। ভাবসংযমের অভাব মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক। ভূমিকায় একালের একজন বয়স্ক কবি লিখেছেন : "তাঁর কবিতাগুলি পড়লে অনুভূতিময় আবেগের উচ্চশিখর থেকে সংবেদনশীলতার অগাধ গভীরতায় অবতরণ অনায়াসসাধ্য হয়। এইখানেই কবির হাতে জয়পতাকা।" এ সংকলনের কয়েকটি কবিতা ভালো। আমরা তাঁর পরিণত রচনার জন্য অপেক্ষা করবো।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অণু (নববর্ষ সংখ্যা)—সম্পাদক উৎপল সেনগুপ্ত ও সুভাষ উকিল। ৭২।১ শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা—৬। দাম : কুড়ি পয়সা।

সম্পাদক লিখেছেন : "সুদূর ইওরোপ আমেরিকার মিনি-তরঙ্গ আজ বাংলাদেশের সাহিত্য আবহাওয়াতে মিশ্রণ ঘটেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় এখানে দেখা দিল 'মিনি' 'মিনি' রব।" এ সম্পর্কে বেশী কিছু মন্তব্য করতে আমরাও আর চাই না। পত্রিকাটির এ সংখ্যায় লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিরণ-শঙ্কর সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বীরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায় এবং আরো অনেকে।

তন্দ্রা (জানুয়ারী-এপ্রিল)—সম্পাদক মধু-সূদন চৌধুরী ও সুধাংশু ঘোষ। সন্তোষপুর গভর্নমেণ্ট কলোনী, মহেশতলা, ২৪ পরগণা। দাম : পঁচিশ পয়সা।

মনে হয়, পত্রিকাটি আগে বড় আকারে বেরোত। এখন অবস্থাদৃষ্টে আকার খর্বতা ঘটেছে। এটি অষ্টম বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। এ সংখ্যায় লিখেছেন শঙ্কর পাল, সুধাংশু ঘোষ, আয়েষা সেন, ভূপেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং আরো কয়েকজন।

ঝিনুক (দোল সংখ্যা)—সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাস ও স্বপন চক্রবর্তী। হাকিম-পাড়া মেন রোড, শিলিগুড়ি। দাম : ২০ পয়সা।

এটি ঝিনুকের প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক দাবী করেছেন : "দার্জিলিং জেলার প্রথম মিনি পত্রিকা।" লিখেছেন অশ্রুকুমার সিকদার, চোসংলামা, মার্কোপোলো, ষষ্ঠী বাগচী, রূপক চৌধুরী, বিপ্লব তালুকদার এবং আরো কয়েকজন।

সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিক 'রূপসী বাংলা'র প্রথম সংখ্যায় সময় বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সাহিত্যে অবক্ষয়, বাদল ঘোষের বিশ শতক, এবসার্ড নাটক ও বাদল সরকার, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরুণ পরিচালকগণ এবং রামেন্দ্র দেশমুখ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কবির কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। নির্মলেন্দু গৌতমের 'নীলাম' গল্পটিতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতিশ্রুতিও আকর্ষণীয়। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৭, চণ্ডীতলা লেন রোড, আর্যপল্লী, কলিকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

কালি ও কলম (চৈত্র ১৩৭৬)—সম্পাদক বিমল মিত্র ।। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২ ।। দাম : ৭৫ পয়সা ।।

আগেকার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কালি ও কলমের নতুন সংখ্যাটি বেরিয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন, বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, অরুণকুমার ভট্টাচার্য, আশিস মজুমদার, শিশির ভট্টাচার্য, অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন।

মাইক্রো (দ্বিভাষী মিনি-পত্রিকা)—সম্পাদক শিবাজীশঙ্কর সান্যাল ।। ১৩৮, কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯ ।। দাম : ১৫ পয়সা ।।

বর্জাইস হরফে ছাপা সুমুদ্রিত কাগজ। বাংলায় লিখেছেন, নজরুল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বিমল মিত্র, সুনীল গাঙ্গুলী, হরিনারায়ণ চট্টো-পাধ্যায়, কবিতা সিংহ, কাজী সব্যসাচী এবং শিবরাম চক্রবর্তী। ইংরেজীতে কয়েকজন কয়েকটি লেখা লিখেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন আর মিনি পত্রিকা? সাহিত্যের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি?

বিন্দু (এপ্রিল ১৯৭০)—সম্পাদক তপন রায় ও অঞ্জলি মজুমদার ।। ১০বি, জনক রোড, কলকাতা ২৯ ।। দাম : ২০ পয়সা ।।

মিনি গল্পের পত্রিকা। লিখেছেন সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ এবং বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।

এই সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছে **'মোহিনী আড়ালের অজস্র প্রতিম কবিকে।'** কয়েকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে প্রথম ও শেষদিকে। লিখেছেন উত্তর বসু, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ দাশগুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

ক্রমে কিছু সময় কেটে গেল। কিছু বছর কেটে গেল।

মাঠের শেষ শস্যকণা ঘরে উঠে গেছে। এখন চৈত্রের মাঝামাঝি।

মাঠ এখন ধু-ধু করছে। শুকনো জমিতে হাল বসছে না। সর্বত্র চাষবাসের একটা বন্ধ্যা সময়। যতদূর চোখে পড়ছে সামনে, শাদা ধোঁয়াটে ভাব। শুকনো কঠিন জমি পাথরের মত উঁচু হয়ে আছে। পাখপাখালি যেন সব অদৃশ্য অথবা সব জ্বলে পুড়ে গেছে। মনেই হয় না এই সব জমিতে সোনার ফসল ফলে। মনেই হয় না এখানে কোন দিন বর্ষায় প্লাবন আসে। ঝোপ জঙ্গল ফাঁকা ফাঁকা। গরীব দুঃখীরা ঝরা পাতা সংগ্রহ করছে। মুসলমান চাষী-বোরা এইসব ঝরাপাতা সংগ্রহের সময় আকাশ দেখছিল।

জোটনও আকাশ দেখছিল কারণ তার এখন দুর্দিন। ফকিরসাব সেই যে নাস্তা করে পাঁচ বছর আগে সিন্নির নাম করে গেছে আর ফিরে আসেনি। আবেদালিও আকাশ দেখছিল কারণ চাষবাসের কাজ একেবারেই বন্ধ। নৌকার কাজ বন্ধ। গয়না নৌকার কাজ শীতের মরশুমেই বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে নতুন শাকপাতা মাটি থেকে বের হবে, সেজন্য জোটন আকাশ দেখছিল। বৃষ্টি হলে চাষবাসের কাজ আরম্ভ হবে, সেজন্য আবেদালি আকাশ দেখছিল। এই অঞ্চলে আকাশ দেখা এখন সকলের অভ্যাস। কচি কাঁচা ঘাস, নতুন নতুন পাতা এবং ভিজে ভিজে গন্ধ বৃষ্টির—আহা মজাদার গাঙে নাইয়র যাওয়নের লাখান। জোটন বলল, বর্ষা আইলে আবেদালি, তুই আমারে নাইয়র লৈয়া যাবি।

আবেদালি বলল, তর নাইয়র যাওনের জায়গাটা কোনখানে?

—ক্যান্ আমার পোলারা বাইচ্যা নাই।

—আছে, তর সবই আছে। কিন্তু কেও তরে খোঁজ-খবর করে না।

জোটন আবেদালির এই দুঃখজনক কথার কোন উত্তর দিল না। গতকাল আবেদালির কোন কাজ ছিল না। আজ সারাদিন হিন্দু-পাড়া ঘুরে ঘুরে একটা কাজ সংগ্রহ করতে পারেনি। এখন যুদ্ধ হচ্ছে কোথায়। সব কিছুতে টান পড়েছে। মাঝে মাঝে আকাশে কত সব উড়োজাহাজ উড়ে যায়। কোথায় যায় কে জানে। কাজ নেই ত খৈ ভাজ। আবেদালি, গৌর সরকারের ছনের চালে নতুন ছন লাগিয়ে দিয়েছে। যা মিলবে—সামান্য যা কিছু। সে পয়সার কথা বলেনি। আবেদালি সারাটা দিন কাজ করেছে—যেহেতু কামলার সংখ্যা প্রচুর এবং মুসলমান পাড়াতে রুজি-রোজগার বন্ধ, যার গরু আছে সে দুধ বেচে একবেলা ভাত, অন্য বেলা মিষ্টি আলু সেদ্ধ খাচ্ছে। আবেদালির গরু নেই, জমি নেই, শুধু গতর আছে। গতর বেচে পর্যন্ত পয়সা হচ্ছে না। সারাদিন খাটুনির পর গৌর সরকারের সঙ্গে পয়সা নিয়ে বচসা হয়ে গেল। কুৎসিত গাল দিয়ে চলে এসেছে আবেদালি।

আবেদালির বিবি জালালি তখনও পেট মেঝেতে রেখে পড়ে আছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি। জব্বর আসমানদির চ'রে গান শুনতে গেছে।

জালালি পেট মাটিতে রেখেই বলল, পাইলানি!

আবেদালি কোন উত্তর করল না। সে তার পাশ থেকে ছোট পুঁটলিটা ঢিল মেরে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল। সামনে জোটনের ঘর। ঘরের ঝাঁপ বন্ধ। জালালি পুঁটলিটা দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি উঠে বসল। এবং দাঁড়িয়ে খোলা কাপড়ের গিট ফের পেটে শক্ত করে বাঁধল। আবেদালি অন্যমনস্ক হবার জন্য হুঁকা নিয়ে বসল। আর জালালি ঝরাপাতা উঠোনে ঠেলে ঘোলা জলে পাতিল হাঁড়ি থল-থল করে ধুতে গেল।

আবেদালি কতক্ষণ হুঁকা খাচ্ছিল টের পায়নি। সে দেখল উনানের ওপাশে বসে জালালি হাঁড়িতে চাল দিচ্ছে। ওর খাটো কাপড়। দু হাঁটুর ভিতর দিয়ে পেটের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। শালি মাগির, বড় পেট ভাসাইয়া রাখনের অভ্যাস। শরীর দেয় না আর। তবু এই ভাসানো পেট আবেদালিকে কেমন লোভী করে তুলছে। আবেদালি বেশীক্ষণ বিবিকে এভাবে বসে থাকতে দেখলে কখনও কখনও কলাইর জমি অথবা একটা ফাঁকা মাঠ দেখতে পায়। সে ফের নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, জব্বইরা গ্যাল কোনখানে? কাইল থাইকা দ্যাখতাছি না।

জালালি আবেদালির দুষ্ট বুদ্ধি ধরতে পারছে যেন। সে বলল—জব্বইরা গুনাই বিবির গান শুনতে গ্যাছে। কাঠের হাতা দিয়ে ভাতের চালটা নেড়ে দেবার সময় জালালি বলল—গুনাই বিবির গান শুনতে আমার-ও ইসছা হয়।

এত অভাবের ভিতরও আবেদালির হাসি পাচ্ছে। এত দুঃখের ভিতরও আবেদালি বলল—পানিতে নদী নালা ভাইসা যাউক, তখন তরে লইয়া পানিতে ভাইসা যামু।

জালালির এইসব কথাই যেন আবেদালির ছাড়পত্র। মাঠে নামার অথবা চাষ করার ছাড়পত্র।

আবেদালির দিদি জোটন এতক্ষণ দাওয়ায় বসে সব শুনছিল। এত সুখের কথা সে সহ্য করতে পারছিল না। সে সন্তর্পণে ঝাঁপটা আরও টেনে চুপচাপ বসে থাকল। কোন কর্ম নেই—শুধু আলস্য শরীরে। আর চুলের গোড়া থেকে চিমটি কেটে কেটে উকুন খুঁজছিল। তার জালালির এত সুখের কথা শুনেই যেন চুলের গোড়া থেকে একটা উকুনকে ধরে ফেলতে পারল। জোটনের মুখে এখন প্রতিশোধের স্পৃহা—মান্দার গাছের নিচে

মনজুরের মুখ ভেসে উঠল। উকুনটাকে দু নখের ভিতর রেখে ঝাঁপের ফাঁকে উঁকি দিতেই দেখল, উঠোনের অন্য পাশে আবেদালি। জালালিকে সে সাপ্টে যেন বাঘ ঘাড় কামড়ে অথবা থাবার ভিতর শিকার নিয়ে পালাচ্ছে। জালালি লতার মত দু পায়ের ফাঁকে ঝুলে আছে। এখন চৈত্র মাস। কথায় কথায় ঘূর্ণি ঝড়। ধুলো উড়ে এসে ঝাপটা মারল—উঠোন অন্ধকার হয়ে ওঠায় ঘরের ভিতর আবেদালি কি করছে শিকার নিয়ে দেখতে পেল না। সে রাগে দুঃখে এবার মাঠের ভিতর নেমে ধুলোর ঝড়ে ডুবে গেল।

চৈত্র মাস। সুতরাং রোদে খাঁ-খাঁ করছে মাঠ। পুকুরগুলোতে জল নেই। একমাত্র সোনালি বালির নদীর চরে পাতলা চাদরের মত তখনও জল নেমে যাচ্ছে। মসজিদের কুয়োতে জল নেই। গ্রামের দুঃখী মানুষেরা অনেকদূর হেঁটে গিয়ে জল আনছে। সোনালি বালির নদীতে ঘড়া ডুবছে না। নমসুদ্রপাড়ার মেয়ে-বৌরা সার বেঁধে জল আনতে যাচ্ছে। ওরা খোড়া দিয়ে জল তুলচে কলসিতে। টাবার পুকুরে, সরকারদের পুকুরে ঘোলা জল। গরু নেমে নেমে জল একেবারে সবুজ রঙ হয়ে গেছে। বড় দুঃসময় এখন। সে বের হবার মুখে কলসি নিয়ে বের হল। সোনালি বালির নদী থেকে এক ঘড়া জল এনে হাজি সাহেবের বাড়িতে উঠে যাবে। বুড়ো হাজি সাহেবের জন্য এত দুঃখ করে জল বয়ে আনলে কিছু তেলকড়ি মিলতে পারে—পয়সা না হোক, এক কাড়ি ধান। সে নেমেই দেখল মাঠে কারা যেন ছুটে ছুটে যাচ্ছে। একদল লোক খাঁ-খাঁ রোদের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। ওদের মাথায় বোধহয় ওলাওঠার দেবী। বিশ্বাসপাড়াতে ওলাওঠা লেগেছে। সে এতদূর থেকে মানুষগুলোকে স্পষ্ট চিনতে পারছে না।

মাঠে পরেই জোটনের মনে হল—জালালি এখন উদোম গায়ে ঘরের ভিতর। উননে ভাত সেদ্ধ হচ্ছে। পাতা, খেড় অথবা লতাপাতায় আগুন ধরে গেলে আগুন লাগতে কতক্ষণ! নদীর দিকে হেঁটে যাবার সময় জোটনের এমন সব দৃশ্য মনে পড়ছিল। চৈত্র মাসে আগুন যেন চালে বাঁশে লেগেই থাকে। জোটনের মন ভাল ছিল না সে সেজন্য দ্রুত হাটছে। সকলেই জল নিয়ে ঘরে ফিরছে, তাকেও তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। গ্রামে গ্রামে ওলাওঠা মহামারীর মত। যেসব লোকরা রোদের ভিতর পালাচ্ছিল তারা ক্রমশ জোটনের নিকটবর্তী হচ্ছে। একেবারে সামনা-সামনি। জোটন তাড়াতাড়ি পাশে কলসি রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গাধার পিঠে ওলাওঠা দেবী যাচ্ছেন। মাথায় করে মানুষেরা ঢাকের বাদ্যি বাজাতে বাজাতে নিয়ে যাচ্ছে। জোটন ওদের পিছন পিছন বেশিদূর গেল না। সড়কের ধারে সব মান্দার গাছ। মান্দার গাছে লীগের ইস্তাহার ঝুলেছে। জোটন সেই মান্দার গাছের ছায়ায় গ্রামের দিকে উঠে গেল।

পথে ফেলু শেখের সঙ্গে দেখা, ফেলু বলল—জুটি পানি আনলি কার লাইগ্যা!

জোটন থুথু ফেলল মাটিতে। মানুষটার সঙ্গে কথা বললে গুনাহ্। মানুষটা এক কোপে আন্নুর মরদকে কেটে এখন আন্নুকে নিয়ে ঘর করছে। একদিন বসে বসে আবেদালিকে এইসব গল্প শুনিয়েছে—মানুষটার বুকের কি পাটা! ভয় ডর নাই। সামসুদ্দিনের সঙ্গে এখন লীগের পান্ডাগিরি করছে। জোটন কিছুতেই কথা বলছে না। আলের পাশে দাঁড়িয়ে ওর যাবার পথ খালি করে দিচ্ছে।

কিন্তু ফেলুর লক্ষণ ভাল না। সে দাঁড়িয়ে থাকল সামনে। কেমন মুচকি হাসছে। ওর একটা চোখ বসন্তে গেছে। মুখ কি ভয়ঙ্কর কুৎসিত! দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ ঢেকে থাকে এখন। হাডুডু খেলার রস মরে গেছে। গতরে তেমন শক্তি নেই বুঝি। তবু চোখটা ভয়ঙ্করভাবে কেবল জ্বলছে। ফেলু মুচকি হেসে বলল, জুটি তর ফকির সাব তবে আর আইল না।

—কি করতে কন তবে! জোটন ফের থুথু ফেলল।

ফেলু এবার অন্য কথা বলল। কারণ জোটনের মুখ দেখে ধরতে পারছে এইসব ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকাটা সে পছন্দ করছে না। সে এবার খুব ভাল মানুষের মত বলল, মানুষগুলাইন মাথায় কৈরা কি লইয়া যাইতেছেন!

—ওলাওঠা দেবীরে লইয়া যাইতাছে।

—মাথাটা ভাইঙা দিলে ক্যামন হয়?

জোটন এবারেও দাঁত শক্ত করে বলতে চাইল যেন, তর মাথাটা ভাঙমু নিবংশা। অথচ মুখে কোন শব্দ করল না। লোকটার জন্য সকলের ভয় ডর। কার মাথা কখন নেবে, হাসতে হাসতে হ্যাং করে মাথা কাটতে ফেলুর মত ওস্তাদ আর নেই। মানুষটাকে কেউ ঘাঁটায় না। যেন ঘাটালেই সে রাতের অন্ধকারে বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে কোরবানির খাসির মত গলা ছিঁড়ে দেবে। কোরবানির দিনে মানুষটা আরও ভয়ংকর। সুতরাং জোটন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঝোপ জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে চাইল।

ফেলু দেখল চৈত্রের শেষ রোদ বাঁশগাছের মাথায়। সামসুদ্দিন তার দলবল নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এখন সামনের মাঠ ফাঁকা। লতানে ঝোপ আর শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল, আর জঙ্গলের ফাঁকে ওরা দুজন। একটু ফষ্টিনষ্টি করার মত মুখ করে সামনে ঝুঁকল, তারপর ফিস-ফিস করে বলল, দিমু নাকি একটা গুঁতা।

জোটন এবার মরিয়া হয়ে বলল, তর ওলাওঠা হইবরে নির্বংশা। পথ ছাড়, না হইলে চিৎকার দিমু। বলা নেই কওয়া নেই, এমন একটা হঠাৎ ঘটনার জন্য জোটন প্রস্তুত ছিল না। ফেলু হাসতে হাসতে বলল, রাগ করস ক্যান! তর লগে ইটু মসকরা করলাম। তারপর চারিদিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, শীতলা ঠাইরেনের ডর আমারে দেখাইস না জোটন। কসত আইজ রাইতে মাথাটা লইয়া আইতে পারি।

সামসুদ্দিন দলবল নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছে। লীগের সভা হবে। শহর থেকে মৌলভি সাব আসবেন। সুতরাং ফেলুকে নেতা গোছের মানুষের মত লাগছে। পরনে খোপকাটা লুঙ্গি। গায়ে হাত কাটা কালো গেঞ্জি। আর গলাতে গামছা মাফলারের মত বাঁধা। সে জোটনকে পথ ছেড়ে দিল। ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ওদের ধরতে হবে। সে আল ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। মাঠ থেকে ওলাওঠা দেবীও গ্রামের ভিতর অদৃশ্য। তখন ধোঁয়ার মত এক কুন্ডলী গ্রাম মাঠ পার হয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে যা ভাবছিল তাই। জল নেই নদী নালাতে। মাঠ শুকনো, পাতা শুকনো। আর সারাদিন রোদে পাতার ছাউনি তেতে থাকে, পাট কাঠির বেড়া তেতে থাকে। জোটন কাঁখের কলসি নিয়ে দ্রুত ছুটছে। সে দেখল পাশের গ্রাম থেকেও মানুষেরা ছুটে আসছে। যারা সোনালি বালির নদীতে খাবার জল আনতে গিয়েছিল তারা পর্যন্ত দুঃসময়ে আগুনের উপর সব জল ঢেলে দিল।

কিন্তু এই আগুন, আগুনের 'মত' আগুন বাতাসের সঙ্গে মিলে-মিশে অশিক্ষিত এবং অপটু হাতের গড়া সব গৃহবাস ছাই করে দিতে থাকল। জোটনের ঘরটা পুড়ে যাচ্ছে। আবেদালির ঘরটা সকলের আগে পুড়েছে। আবেদালি জালালির অগোছালো শরীরটা সেই আগের মত সাপ্টে ধরে রেখেছে। নতুবা ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। ওর কাঁথা, বালিশ মাদুর কলাইকরা থালা, সানকি সব গেল। পুড়ে যাচ্ছে। ঠাসঠাস করে বাঁশ ফাটছে, হাঁড়ি-পাতিলের শব্দ হচ্ছে। আগুন গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং কাঁচা বাঁশ অথবা কলাগাছ এবং কাদা জল সবই প্রয়োজনীয়। চারিদিকে বীভৎস সব দৃশ্য। যাদের কাঁথা বালিশ আছে তারা কাঁথা বালিশ মাঠে এনে ফেলল। জালালি তখন আমগাছের নিচে বসে কপাল থাপড়াচ্ছে। পুবের বাড়ির নরেন দাস একটা দা নিয়ে এসেছে। যে সব ঘরে আগুন লাগেনি, এবার লেগে যাবে— হল্কা বের হয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, চাল থেকে চালে আগুন লাফিয়ে পড়ছে, সেই সব চাল কেটে দিচ্ছে। ঘর আলগা করে দিচ্ছে। যেন আগুন আর ছড়াতে না পারে। মানুষেরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আগুন নেভানোর জন্য। কুয়োর জল ফুরিয়ে গেছে। হাজি সাহেবের পুকুরে যে তলানিটুকু ছিল তাও নিঃশেষ। মনজুরদের পুকুরে শুধু কাদা মাটি। এখন লোকে কোদাল মেরে কাদা-মাটি চালে ছুঁড়ছে। তখন দূরে ওলাওঠা দেবীর সামনে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল। বিশ্বাসপাড়াতে হরিপদ বিশ্বাস হিক্কা তুলে মারা গেল। সাইকেল চালিয়ে গোপাল ডাক্তার ছুটছে বাড়ি বাড়ি টাকার জন্য, রুগী দেখার জন্য। সে যেতে যেতে আগুন দেখে এইসব অশিক্ষিত লোকদের গাল দিল। ফি বছর হামেশাই কোন না কোন দুঃখী গ্রামে এমন হচ্ছে। হাতুড়ে বদ্যি গোপাল ডাক্তারের এখন পোয়াবারো। রুগী কামিয়ে অর্থ, গরীব
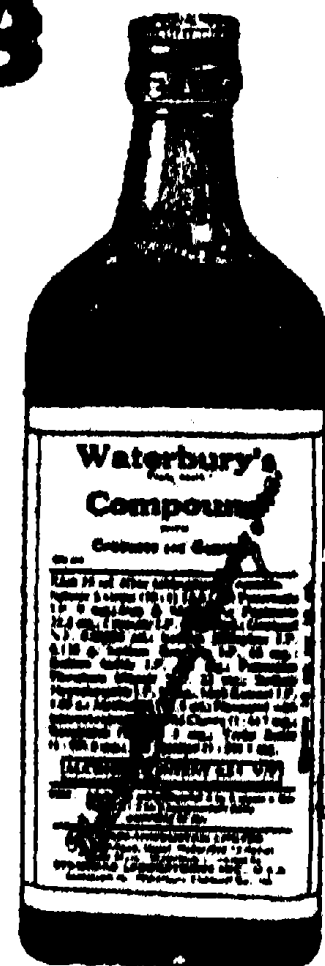
জোকদের দুঃসময়ে অর্থ দিয়ে সুদ। আলের উপর গোপাল ডাক্তার এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রিং-ক্রিং বেল বাজাচ্ছে। যেন বলছে, কে আছ এস, টাকা নিয়ে যাও, অষুধ নিয়ে যাও। অর্থ দিয়ে সুদ দেবে, শোধ করবে। !

খড়ম পায়ে শচীন্দ্রনাথও ছুটে এসেছিল। জোটন, আবেদালি এবং গ্রামের অন্য সকল সান্ত্বনার জন্য ওকে ঘিরে দাঁড়াল। শচীন্দ্রনাথ সকলের মুখ দেখলেন। সকলে এখন আবেদালি এবং জালালিকে দোষারোপ করছে শচীন্দ্রনাথ বললেন, কপাল।

সামসুদ্দিনের দলটা অনেক রাতে সভা শেষ করে ফিরে এল। ওরাও ঘুরে ঘুরে সকলকে সান্ত্বনা দিতে থাকল। আগুন নেভানোর চেষ্টায় বড় বড় বাঁশের লাঠি অথবা কাদামাটি নিক্ষেপ করে যখন বুঝল—কোন উপায় নেই, সব জবলে যাবে—তখন ওরা মসজিদের দিকে চলে গেল। মসজিদটা এখন দাউ দাউ করে জবলছে।

চোখের উপর গোটা গ্রামটা পুড়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসপাড়াতে এখনও ওলাওঠা দেবীর অর্চনা হচ্ছে। মাঠে সব চাষের জমিতে পোড়া কাঁথা পেতে যে যার ভস্ম থেকে তুলে আনা ধন-সম্পত্তি আগলাচ্ছে। আগুনে ওদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

যখন আগুন পড়ে এল এবং এক ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব—জোটন শোকে আকুল হতে থাকল। ঘন অন্ধকার চারিদিকে। থেকে থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে অন্ধকারের ভিতর পোড়া ভস্ম ধন-সম্পত্তির আশায় চুপি চুপি হাজিসাহেবের গোলাবাড়িতে উঠে এল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। সে ঘুরেও গেল কতকটা পথ। পোড়া পোড়া গন্ধ। আশেপাশে সব দুঃখী মানুষদের হা-হুতাশের শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকারে জোটন পরিচিত কণ্ঠ পেয়ে বলল, ফুফা আমার ঘরটা গ্যাল। ভালই হইছে। যামু গিয়া যেদিকে চোখ যায়। ঘরটার লাইগা বড় মায়া হইত। ফকির সাব আর বুঝি আইল না। এও বলার ইচ্ছা। যখন এল না তখন আর কার আশায় সে এখানে বসে থাকবে। পরিচিত মানুষটা অন্ধকারে বসে টের পেল জোটন অনেক কষ্টে এমন কথা বলছে।

পরিচিত মানুষটি বলল, আবেদালির আফুর দুফুর নাই!

জোটন এবার ফিরে দাঁড়াল। বলল, কারে কি কমু কন। পুরুষ মানুষ। দিন নাই রাইত নাই খাটু খামু করে, কিন্তু তুই মাইয়ামানুষ হইয়া আফুর দুফুর দ্যাখলি না। উদাম কইরা গায়ে গতরে পানি ঢাললি।

জোটন আর দাঁড়াল না। সে বকতে বকতে অন্ধকারে হাজিসাহেবের গোলাবাড়িতে ঢুকে গেল। বড় বড় গোলা সব ভস্ম হয়ে গেছে। ধান পোড়া মুসুরি পোড়া গন্ধ উঠছে। কোথাও থেকে এই দুঃসময়ে একটা ব্যাঙ কুপ কুপ করে উঠল।

জোটন আগুনের ভিতর খোঁচা মারল একটা। না কিছু বের হচ্ছে না। অন্ধকারের ভিতর কিছু ছাইচাপা আগুন শুধু কতকটা ঝলসে উঠে ফের নিভে গেল। সেই আগুনে জোটনের মুখ পোয়াতির মুখের মত—লোভি এবং পেট সর্বস্ব চেহারা। সেই আগুনে জোটন অন্ধকারে পথ চিনে নিল। তখন ঢাকের বাজনা, ঢোলের বাজনা ওলাওঠা দেবীর সামনে। তখন হাজিসাহেব তার তিন বিবির কোলে ঠ্যাং রেখে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর হাজিসাহেবের তিন বেটার তিন বিবি, মাঠের মধ্যে চষা জমির উপর বিছানা পেতে ওত পাতার মত অপেক্ষা করছে। যেন এটা ভালই হল। দিয়ে থুয়ে গড়াগড়ি খাবে।

জোটনের মনে হল এই অন্ধকারে সে একা নয়। অন্য অনেকে যেন হাতে কাঠি নিয়ে পা টিপে টিপে আগুনের ভিতর ঢুকে খোঁচা মারছে। দূর থেকে মনে হল ওর হাজি সাহেবের একটা ঘর তখনও জবলেনি। অথবা আর জবলবে না। সে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোল। সে ঘরের ভিতর গতকাল অনেকগুলো পাট দেখেছিল। জোটনের পরান এখন ভাদ্রমাসের পানির মত টল-টল করছে। আর তখন জোটনের পায়ের শব্দে অন্ধকার থেকে কে যেন বলল, কেডা?

—আমি...আমি... ...

জোটনের মনে হল অন্ধকারে আর একটা মানুষ যেন তন্ন-তন্ন করে কি খুঁজছে।

জোটন বলল, তুমি কেডা?

জোটনের মনে হল ফেলু শেখ। সে অন্ধকারে সম্পত্তি চুরি করতে এসেছে। অথবা মাইজলা বিবির সনে পীরিত তার। হাজি সাহেবের মাইজলা বিবিও এই রাতের অন্ধকারে যখন কেউ কোথাও জেগে নেই, সকলে মাঠে নেমে গেছে, কিছু ফেলে গেছে এই নাম করে ফিরে এলে ফেলু শেখ চুপি-চুপি চিনে ফেলবে। কার টের পাবার কথা! ফেলু সেই এক জবালা নিবারণের জন্য, কি যে এক জবালা, উজানে যেতে. হাজি সাহেব ভোলা অঞ্চলের পাশে কোন এক সাগরের কুল থেকে এই মাইজলা বিবিরে তুলে এনেছিল। তখন সঙ্গে ছিল ফেলু। ফেলু ফুসলে-ফাসলে টাকার লোভ দেখিয়ে হাজি সাহেবের নৌকায় এনে তুলেছিল মাইজলা বিবিকে। তখন হাজি সাহেব হাজি নন, তখন ফেলুর যৌবন কত বড়, ফেলুর কত নামডাক—জোয়ান মরদ ফেলু পীরিত করার অছিলা খুঁজছিল মাইজলা বিবির সনে। বোধ হয় এখনও সংগোপনে গানটা গায় মাইজলা বিবি। যখন কলিমুদ্দি সাহেব হজ করতে গেলেন এবং যখন হাজি হয়ে ফিরে এলেন তখন মাইজলা বিবির সেই গান গলার। একা আতাবেড়ার পাশে বসে-বসে গাইত। ঘাটে ফেলু বসে থাকত। সে ওদের তখন বড় নৌকার মাঝি—কার কারবারে তাকে হাটে-বাজারে যেতে হয়, সওদা করে আনতে হয়। তার মাইজলা বিবির মনে পীরিত, রঙ্গরস করার উছিলাতে ঘাটের মাঝি হয়ে সে বসে থাকত। কিন্তু কলিমুদ্দি হজ করে এসে সবই টের পেয়ে গেল। সে বলল, মিঞা তোমার এই আছিল মনে। তারপর হাজি সাহেব ঘাট থেকে তাড়িয়ে দিল ফেলুকে। সে কবেকার কথা! সেই থেকে ফেলু আর হাজি সাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। মাঝে মাঝে মাইজলা বিবির মুখ ওর পরানে দরিয়ার বান ডেকে আনে। তখন সে একা একা প্রায় পাগল ঠাকুরের সামিল। সে গোপাটে অথবা অন্ধকার রাতে চুপি-চুপি অশ্বত্থের নিচে নেমে আসে। ঝোপ-জঙ্গলে উবু হয়ে বসে থাকে। আতাবেড়ার পাশে কখন উঁকি দেবে মুখটা। বিবি আন্নু আজকাল হাজি সাহেবের বাড়িতে আসে-যায়। ছোট বিবির সঙ্গে আন্নুর খুব ভাব। সেই বিবি ওকে লুকিয়ে-চুরিয়ে তেল দ্যায়, ডাল দ্যায়, মাস কলাইর বড়ি দ্যায়। আন্নু বলে ছোট বিবি দ্যায় — কিন্তু জোটনের মন বলে সব মাইজলা বিবির কাজ। মাইজলা বিবির সনে পীরিত বড় ফেলুর।

জোটন বোঝে সব। আন্নু দেখায় ছোট বিবির সঙ্গে তার বড় ভাব — সখী সখী গলায় দড়ি ওলো সখী ভাব।

আর ফেলুর যখনই ভাবের কথা মনে হয় তখন আর এক মুহূর্ত দেরী করতে পারে না। সে এই অন্ধকারে আগুনের ভিতর মাইজলা বিবির মুখ মন শরীর দেখার বাসনাতে বসে আছে। চারিদিকে হল্লা—কে কোথায় ছুটছে—কে কোথায় আছে কে জানে। এই ত সময়। সুতরাং সে এখানে বসে বিবির উঠে আসার অপেক্ষায়—কি যাদু বিবির চোখে আর কি যাদু আছে এই মনের ভিতরে। এই মন কি যেন চায় সব সময়। ফেলু কি যেন চায় সব সময়। তার ঘরে যুবতী বিবি আন্নু, ফেলুর বয়স দুই কুড়ির উপরে হয়ে গেছে—তব [illegible]টা কি যেন চায় এত অভাব-অনটনে [illegible]তরও ভিতরটাতে কি পেতে কেবল ইচ্ছা ইচ্ছা করে। কিসে যে সুখ—এই আন্নুর জন্য সে কি কান্ডটা না করেছে! আলতাফ সাহেবের গলাটা সে হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলেছে। পাট খেতের ভিতর আলতাফ সাহেব বাছ-পাট কেমন কাটা হয়েছে দেখতে এসেছিল। বুড়ো আলতাফ সাহেবের শেষ পক্ষের বিবিকে সে ঈদের পার্বণে পীরের দরগায় দেখে প্রায় পাগলের মত—কি করে, কি করে! কি করবে ফেলু ভেবে উঠতে পারল না। তখন ফেলুর যৌবনকাল যায়-যায়। সে তল্লাটের ফেলু। সুতরাং সে ঈদের আর এক পার্বণে মেমান সেজে চলে গেল আলতাফ সাহেবের বাড়ি। ওকে সে পাটের ব্যবসা করতে বলল— ঢ্যান ফেলু কত বড় মহাজন। সে দাড়িতে আতর মাখত তখন, ভাল তফন কিনে আনত বাবুর হাট থেকে। মন খুশ থাকলেই ম্যাডেল ঝোলাত গলায়।

বুড়ো আলতাফ খেলার বড় উৎসাহদাতা ছিল। ফেলুর সঙ্গে কত জান পহচান, কত বড় খেলুড়ে ফেলু তার বাড়ি মেমান হয়ে

এসেছে—বিবি দেখতে দেখুক। বেলোয়ারত ফেলুকে সে অন্দর মহলে একদিন ঢুকিয়ে দিল। ফেলুর পীরিতের ছলাকলা সব যেন জানা। ফাঁক বুঝে কুলের কুঁড়ির মত আলতাফের ছোট বিবিকে কাছিমের মত বুকের ছাতি দেখাল একদিন। আন্নু দেখল সেই বুকের ছাতিতে মেডেলগুলি ঝক-ঝক করছে। আর আন্নুর তখন মনে পড়ছিল তার ছোট বয়সের কথা। বালিকা আন্নু খেলা দেখতে গেছে—হা-ডু-ডু খেলা। ফেলু এসেছে খেলতে পন্নাপরদির হাটে। সেদিন হাটবার ছিল না, তবু কি লোক কি লোক! দু-দশ মাইলের ভিতর কোনো যুবা পুরুষ আর সেদিন ঘরে ছিল না। মেলার মত প্রাণপণে-প্রাণপণে নিশান উড়ছিল — ব্যান ঈদ-মুবারক। ফেলু সেই মেলার প্রাণ ছিল। খেলা শেষ হলে ফেলুর জয়-জয়কার। আন্নু, বালিকা আন্নু সেদিনই কেমন ফেলুর ভালবাসায় পড়ে গেল। সেই ফেলু এসেছে মেমান সেজে—অলতাফ সাহেবের বিবি নিজেকেই যেন শুধাল, এই আছিল তর মনে। তারপর সময় বুঝে হ্যাঁৎ করে গলাটা কেটে ফেলল ফেলু। পাটক্ষেতের ভিতর হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলল গলার নালিটা। যেমন সে কোরবানের দিন দশটা-পাঁচটা কোর-বানিতে চাকু চালায়, বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে, তেমনি সে বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে হ্যাঁৎ করে নালিটা আলতাফ সাহেবের কেটে ফেলল। যেদিন সে বিবিকে বোরখা পরিয়ে নিয়ে আসে, সেদিন সে, হ্যাঁৎ করে গলা কেটে ফেলেছে কথাটা প্রথম জানাল বিবিকে। আন্নু শুনে বলল, এই আছিল তর মনে! বলে সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর হা-হা করে হেসে উঠেছিল। আন্নুকে দেখলে মনেই হবে না ফেলুর জন্য সে এত বড় হত্যাকাণ্ড হজম করে গেছে।

অন্ধকারে ফেলু ও-পাশের একটা ছায়া-মূর্তি দেখছিল আর ভাবছিল। বুঝি চুপি-চুপি মাইজলা বিবি এসে গেছে। কিন্তু এখন এ কি—কার গলা, জোটন মনে হয়। সে ধরা পড়ে যাবে, চুরি করতে এসেছে এই আগুনের ভস্ম ধন-সম্পত্তি থেকে — তার ভয় ধরে গেল।

জোটন তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, নাম কৈতে পার না মিঞা। আমি, কেডা!

—আমি মতিউর। ফেলু যেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলল।

—তোমাগ আর মানুষগুলান কৈ?

—আগুনে দেইখ্যা পালাইছে।

—তুমি এখানে কি করতাছ?

—সানকিডা খুঁজতাছি।

—হাজি সাহেব জানে না যে, বৈঠক-খানা ঘরডা পুইড়া যায় নাই!

—আগুনে বড় ডর হাজি সাহেবের' লোকটা দূরে থেকেই কথা বলছে। অন্ধ-কারকে এখন ওদের সকলেরই ডর। গলাটা স্পষ্ট নয়। গলাটা কখনও ফকির সাহেবের মত, কখনও মনে হচ্ছে ফেলুই মতিউরের গলায় কথা বলছে। তারপর মনে হল অন্ধকারে লোকটা কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে। এবং পেয়েই এক দৌড়।

জোটন বলতে চাইল—ধর-ধর। কিন্তু বলতে পারল না। সে নিজেও একটা সানকি খুঁজতে এসেছে অথবা কিছু চাল, পোড়া ধান হলে মন্দ হয় না, পোড়া কাঁথা হলে মন্দ হয় না—সে এখন যা পেল তাই নিয়ে আম গাছের নিচে জড় করল। জালালি সব জোটনের হয়ে সংরক্ষণ করছে। সে অন্ধকার থেকে খুঁজে-পেতে আনছে আর জালালিকে দিয়ে আবার অন্ধকারে খুঁজতে চলে যাচ্ছে।

তখন কান্না ভেসে আসছিল বিশ্বাস-পাড়া থেকে। তখন ওলাওঠা দেবীর সামনে আরতি হচ্ছিল। ওলাওঠাতে আবার হয়ত কেউ মারা গেল। জোটন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সানকি, ভাঙা পাতিল অথবা পেতলের বদনা খুঁজতে-খুঁজতে সেই কান্না শুনছে, রাত তখন অনেক। মাঠের ভিতর দিয়ে কারা যেন নদীর পারের দিকে ছুটছে আর গাছের নিচে ইতস্তত যে সব লম্ফ জ্বল-ছিল—বাতাসে সব এক-দুই করে নিভে যাচ্ছে। মাঠে একটা মাত্র হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনটা হাজি সাহেবের। মহামারী লাগলে যেমন এক অশরীরী বাতাসে ভেসে বেড়ায় তেমনি এই ধ্বংসের অন্ধকারে জোটন ভেসে বেড়াতে লাগল। জোটন অন্ধকারে পা টিপে-টিপে হাঁটছে। হাজি সাহেব মাঠে এখন কেবল সোভান আল্লা, সোভান আল্লা বলে চেঁচামেচি করছে। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। মাঠের ভিতর তিনি তাঁর ছোট বিবিকে নিয়ে আছেন কে কখন কি করে যাবে—ভয়ে ঘুম আসছিল না। যাদের ভাঙা ঘর শুধু গেছে ছেঁড়া হোগলা বিছিয়ে ঘুম যাচ্ছে তারা। সকাল হলেই হিন্দু পাড়াতে রুজি-রোজগারের জন্য উঠে যেতে হবে এবং হিন্দু পাড়াতেই সব বাঁশ কাঠ। সব শনের জমি ওদের। ওদের থেকে চেয়ে আনলে ঘর এবং ঘর বানাতে-বানাতে ঘোর বর্ষা এসে যাবে। জোটন এ-সময় নিজের ঘরের কথা ভাবল, বর্ষার কথা ভাবল, ফেলু সময়-অসময় গুতো দিতে চায়, মনজুরের মত চোখ-মুখ গরম ছিল না, চান্দের লাখান গড়বন্দি আছিল না—দিমু তরে একদিন একটা গুতো—এইসব ভেবে জোটন নিজের দুঃখকে জোড়াতালি দিয়ে পোড়া ভাঙা ঘরের ভিতর থেকে আর একটা বদনা টেনে বের করতেই এক দৌড়। সে জালালির পাশে এসে বসল, দ্যাখ কি আনছি।

জালালি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বদনাটি দেখল। কুপির আলোতে এত বড় একটা আস্ত পেতলের বদনা—সে কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবেদালি ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আছে। সে হাত দিয়ে প্রায় যেন ছুঁয়ে দেখল। — এক বদনা পানি, পানি আন ঢক-ঢক কইরা খাই। বদনা দেখেই ওর কেমন জল তেষ্টা পেয়ে গেল।

জোটন জল আনতে গেছে।

জালালি বলল, আমি যাই। বদি কিছু মিল্যা যায়!

জোটন জল আনতে গেছে। আশে-পাশে কেউ নেই। আবেদালি তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। তারপর এক থাপ্পড় দিয়ে দিল গালের কাছে। বলল, তর এত সাহস! তুই যাইবি চুরি করতে। পরে সে গামছা দিয়ে মুখ মুছল। ঘামে গরমে মুখ চুলকাচ্ছে। সে আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসতেই দেখল জোটন জলের জন্য উঠে যাচ্ছে। জলের বড় অভাব। সে অন্ধকারে এখন জল চুরি করতে যাচ্ছে।

জালালি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর কচ্ছপের মত গলা লম্বা করে দিল। তারপর চিৎকার করে বলল, তর লাইগাইত নির্বংশা আগুনে লাগলরে!

আবেদালি চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল।—আমার লাইগ্যা বুঝি।

এবার জালালি খল-খল করে উঠল, আমি সকলরে না কইছি ত কইলাম কি!

—কি কইবি?

—কমু, তাইন আমারে ঘরে জোর কইরা ধইরা নিছে।

—ঘরে নিছি, ভাল করছি। তুই নাড়া দিয়া রানতে-রানতে প্যাট ভাসাইলি ক্যান?

—তার লাইগ্যা বুঝি সময়-অসময় নাই।

গোটা ঘটনাটাই আগুনের মত। আবেদালি এবার আরও ঘন হয়ে বসল। আমার বুঝি ইসহা হয় না ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করি।

* * *

ফকিরসাব নিমগাছটার নিচে বসলেন। গাছটাতে একটা কাক উড়ছে না। সুতরাং ফকিরসাব এ-গাঁয়ের ঘরগুলো দেখলেন। বৈশাখ মাস শেষ হচ্ছে। এখন গাছে-গাছে আমের ভালো ফলন। তিনি তাঁর মালা-তাবিজের ভিতর থেকে একটা বড় পুঁটলি বের করলেন। আর গোস্তের ওজন দেখবার সময় মনে হল এবার গ্রামে কোরবানির সংখ্যা কমে গেছে। তিনি হাত গুনে বলতে পারছেন যেন সংখ্যায় কত তারা, বকরি ঈদে এত কম কোরবানি এই প্রথম আর এই জন্যই কাকগুলি গোস্ত খুঁজে-খুঁজে হন্যে হচ্ছিল। কাকগুলি উড়ে-উড়ে হয়রান হয়ে গেছে অথচ কিছুই মিলছে না। ওরা উড়ে-উড়ে এদিক-ওদিক চলে গেল। সুতরাং তিনি কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। কোথাও পুঁটলির ভিতর পান-সুপারি আছে অথবা চুনের কৌটা থেকে চুন নিয়ে ঠোঁটে লাগাবার সময়ই সুখী পায়রার মত অনেক দিন আগের কসমের কথা মনে পড়ে গেল।

সামনে সড়ক। দূরে কোথাও আজ হিন্দুদের মেলা আছে। ফকিরসাব মনে করতে পারলেন হয়ত এদিনেই নয়াপাড়া পার হলে ঘোড়দৌড়ের মাঠে মরশুমের শেষ ঘোড়দৌড় হবে। একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেলে হয়। কিন্তু অনেক দিন পর এদিকে আসায় কসমের কথা মনে পড়ে গেল। সড়কের পথে গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোড়া

যাচ্ছে। বিশ্বাসপাড়ার কালু বিশ্বাসের ঘোড়া—খ্যান নয়নের মণি। ঘোড়াটার রঙ কালো কুচকুচে। কপালে সাদা আর সোনালি কড়ির মালা ঝুলছে ঘোড়ার গলাতে। ঘোড়াটা সড়ক ধরে দূরে চলে গেল। গ্রীষ্মের শেষ জল-ঝড়ে এ-অঞ্চলের কিছু বাড়ি-ঘর ভেঙে দিয়েছে। মাঠে ছোট ছোট পাটের চারা বাতাসে দুলছে। ইতস্তত মাঠের ভিতর মাথলা মাথায় চাষীরা পাটের জমিতে নিড়ান দিচ্ছিল আর আল্লা ম্যাঘ দা, প্যানি দ্যা—এই গান গাইছিল। চৈত্রের খরা রোদ এবং শুকনো ভাবটা কেটে গেছে। এখন শুধু সবুজ প্রান্তর এবং মানুষের মুখে সুখের ইচ্ছা অথবা যেন বছর শেষ, দুঃখ শেষ—এখন অভাব কম, গরীব মানুষেরা অন্তত শাকপাতা খেয়ে বাঁচবে। বিশেষ করে এই সব গ্রীষ্মের দিনে কচি পাট পাতার শাক অথবা শুক্তোনি এক সানকি ভাতের সঙ্গে মন্দ নয় এবং যখন কোরবানির গোস্ত মুশকিলাসানের পাত্রটার নিচে যত্ন করে রাখা আছে, যখন মনে হচ্ছিল শেষ বয়সের সম্বল জোটন বিবিকে ধরে নিলে গোস্তের মতই সস্তা হবে তখন সড়ক ধরে সামনের গ্রামটার দিকে হাঁটা যাক।

মুশকিলাসানের আধারে তেল নেই। দরগায় ছইয়ের নিচে রসুন গোটা ভিজান আছে। তার তেল বড় উজ্জ্বল আলো দেয়। আর এ-অঞ্চলে তিনি রাতে মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। দরগায় গিয়ে লম্ফে আবার তেল ভরতে হবে। ফকির সাহেবের ইচ্ছা ছিল রসুন গোটার তেলে মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বালাবেন এবং ছোটদের চোখে সুর্মা টেনে আস্তানা সাহেবের দরগাতে রসুলের কাছে দোয়া, জোটনের জন্য দোয়া ভিখ মেগে নিবেন। কিছুই হল না।

মসজিদের কুয়া থেকে প্রথম জল তুলে পা ধুলেন ফকিরসাব। তারপর শতছিন্ন এক জোড়া কাপড়ের জুতো, যার ফাঁকে কচ্ছপের গলার মতো বুড়ো আঙুলটা বের হয়ে আসে এবং জুতোর ভিতর পা গলাবার সময় একটা ইস্টিকুটুম পাখি ডেকে উঠলে ফকিরসাব ভাবলেন, দিনটা ভালই যাবে। শেষে আবেদালির বাড়িতে ওঠার মুখেই ডাকতে থাকলেন, মুশকিলাসান সব আসান করেন এবং এইসব বলতে-বলতে উঠোনে উঠেই তিনি বুঝতে পারলেন পরবের দিনে জোটন বাড়ি নাই। তিনি যেন এই উঠোন এবং ঝোপ-জঙ্গলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাইসাবে ডাইকা দিলে ভাল হয়। অনেক দূর থাইকা আইছি, আবার কবে আমু ঠিক নাই। তাই ভাবছি আরে নিয়া যামু। তারপর কারো উপর ভরসা না করে নিজেই ছেঁড়া লুঙ্গি ঘাসের উপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। খুব সন্তর্পণে মালা-তাবিজ খুলে পোঁটলা-পুঁটলি পাশে রাখলেন। অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছেন না। যেন সব ঠিকই করা আছে, উকিল বলা আছে, মৌলভি সাবকে বলা আছে আর দু-চারটে দোয়া। ফকির-

সাব এবার গলা খেকারি দিয়ে চোখ তুলতেই দেখলেন, জালালি ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে জোটনকে খবর দিতে হাজি সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটছে।

ফকির সাব ছেঁড়া তফনের উপর বসে আমরুল গাছের ফাঁকে সেই অস্পষ্ট মুখ দেখতে পেলেন। জোটন আসছে। আগের শক্তি সামর্থ্য যেন পায়ে নেই। জোটন নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ফকিরসাব জোটনকে আর দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি নানারকম শব্দে ধরতে পারছেন জোটন এখন আর্শিতে নিজের মুখ দেখছে। ভিজা শনের মত চুল—কত কষ্টে খোঁপা বাঁধা। আর তিনি মুখ না তুলেও যেন ধরতে পারছিলেন জোটন বেড়ার ফাঁকে ফকিরসাবের মুখ হাত-পা অথবা সব অবয়ব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ফকিরসাব গাছ-গাছালিকে উদ্দেশ্য করে যেন বললেন, তাড়াতাড়ি করতে হয়।

ঘরের ভিতর জোটন সরমে মরে যাচ্ছিল। ঘরের ভিতর ফিস-ফিস শব্দ, আবেদালিরে আইতে দ্যান।

ফকিরসাব উঠোন থেকে বললেন, উকিল দ্যাখতে হয়।

জোটন এবার যেন গলায় শক্তি পাচ্ছে। ভাইবেন না। আবেদালি যাইয়া সব ঠিক কইরা দিব।

ফকিরসাব সঞ্চিত কোরবানি গোস্তের উপর হাত রেখে বললেন, ব্যালায় ব্যালায় রওনা হইতে হয়। না হইলে গোস্ত পইচা যাইব। বলে ফকিরসাব গোস্তের পুঁটলিটা নাকের কাছে এনে শুঁকে বললেন, গোস্তে মশলা নুন দিতে আপনের হাত কেমন?

এবার জোটন ঘরের ভিতর খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল, ঘরে নেওয়ার আগে একবার পরখ কইরা দ্যাখতে সাধ যায় বুঝি।

—দ্যাখতে ইচ্ছা যায়, কিন্তু ব্যালা যে পইরা আইতাছে।

জোটন দাঁত খুঁটছিল। মুখ কুলকুচা করে হাঁড়ির ভিতর থেকে পান সুপারি বের করে মুখে পুরল। তারপর ঝোপের ফাঁকে যখন দেখল জালালি আসছে, যখন দেখল গোপাটের অশ্বত্থ গাছের মাথা থেকে রোদ নেমে যাচ্ছে এবং যখন কামলা ফিরছে মাঠ থেকে, মাথায় চারা পাট গাছের আঁটি, ঘাসের বোঝা আর আবেদালি পরবের দিনেও ঠাকুর বাড়ির কাজে গেছে—ফেরার সময় এখন, হয়ত সে ফিরছে, তখন জোটন ঠোঁট রাঙা করে বাবুর হাটের ডুরে শাড়ি পরে দেখল বুকের মাংস একেবারে শুকিয়ে গেছে। সে একটু ঠোঁট থেকে থুতু এনে বুকে মেখে দিল। পাতলা থুতু দিয়ে শরীরের শুকনো ভাবটা কমনীয় করতে চাইছে অথবা মনে হল, ফকিরসাবের বুড়ো হাড় অঘ্রাণী ধানের মতো—আদরে দেবে,

নিকা করবে এবং ফাঁকা মাঠের মতো উদোম গায়ে রংগরস করবে। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা—আল্লার মাশুল তুলতে এই বয়সেও গতর কম কৌশল করবে না।

বেলায় বেলায় আবেদালি এল। বেলায় বেলায় করণীয় কাজটুকু আবেদালি করে ফেলল। দু-চারজন গাঁয়ের লোক জমা হয়েছে উঠোনে। আবেদালি সকলকে পান তামুক খাওয়াল। হাজিসাহেবের ছোট বিবি একটা ছেঁড়া খোরমা দিল জোটনকে। আগুনের জন্ম থেকে যে পেতলের বদনাটা তুলে এনেছিল, ফকিরসাবের পাশে সেটা রেখে দিল জোটন।

দুটো মেটে কলসী এনেছিল জোটন লাঙলবন্দের বাজার থেকে—যাবার সময় জোটন জালালিকে ডেকে কলসী এবং ঘরের সামান্য জিনিসপত্র অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিনে সংগ্রহ করা ঝরা পাতা, পাট কাঠি এবং দুটো সরা—সব দিয়ে দিল। আর ছেঁড়া তফনে জোটন তার ভাঙা আর্শি, ঠাকুর বাড়ির বৌদের পরিত্যক্ত ভাঙা কাঠের চিরুনী, একটা সানকি আর সম্বলের মধ্যে কিছু ভাতের শেউই বাঁধা পুঁটলি হাতে তুলে নেবার সময়ই অন্যান্যবারের মত আবেদালির হাত ধরে কেঁদে ফেলল। এবার নিয়ে চারবার নিকা, এবং এবার নিয়ে চারবার জোটন এই উঠোন ছেড়ে বাপের ভিটা ছেড়ে মিঞা মানুষের সঙ্গে খোদার মাশুল তুলতে চলে গেছে। ফকিরসাব পুটলা পুঁটলি যত্ন নিয়ে বাঁধছে। পিতলের বদনাটা হাতে নিয়ে দুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বদনা থেকে পানি চুষে খেলেন। তারপর বাকি পানিটুকু ফেলে দিয়ে—বাঁ-হাতে পেতলের বদনা, কাঁধে ঝোলাঝুলি এবং ডান হাতে মুশকিলাশান, মুখে আল্লার নাম অথবা রসুলের নাম নিতে নিতে গোপাটে নেমে যাচ্ছেন। জোটন এক হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে আবেদালির ঘরে ঢুকে বোরখাটা মাথার উপর তুলে দিল। আবেদালিকে উদ্দেশ্য করে বলল, জালালিরে মাইর-অ ধরই-অ না ভাই। জালালিকে উদ্দেশ্য করে বলল, সময় মত দুইটা রাইন্দা দ্যাইস।

এসব কথা বলার সময়ই জোটনের চোখ থেকে জল পড়ছিল। কত দীর্ঘদিন পরে ফের এই নিকা এবং এদিনে সে তার মোট তেরটি সন্তানের কথা মনে করতে পারল। যেন তাদের জন্যই চোখের জল। কোথাও তার দীর্ঘদিন ঠাঁই হয় না। জোটন চতুর্থবার স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে এবং আল্লার মাশুলের জন্য এই যাত্রা। যদি কোন কারণে আল্লার দরবার শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে সে ফের ফিরে আসবে এবং সোনালি বালির নদীতে অথবা বিলে শালুক তুলে, বাড়ি বাড়ি চিঁড়া কুটে, পরবে পরবে গেরস্থ মানুষের কাজ করে দুঃখে সুখে তার দিন কেটে যাবে।

(ক্রমশঃ)

চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ

শচীন দত্ত

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত চন্দ্রনাথ পাহাড় ও মন্দিরাদি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার চাঞ্চল্যকর দুঃসংবাদ সরকারী মহলে স্বীকৃত হয়েছে। এই নিবন্ধে চন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্যাদি প্রকাশিত হল।

চন্দ্রনাথধাম বা সীতাকুণ্ড প্রধানতঃ শিবতীর্থ। চন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় তীর্থস্থান রূপে সুপরিচিত। অবিভক্ত ভারতে এবং দেশবিভাগের পরেও পাকিস্তানী রেলওয়ের সীতাকুণ্ড নামক অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্টেশনের অদূরে পূর্বদিকে অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্য সমন্বিত উচ্চ শৈলশ্রেণী। তারই সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম চন্দ্রশেখর, উচ্চতায় প্রায় ১২০০ ফিট। এখানেই চন্দ্রনাথ শিবমন্দির বিরাজমান। সীতাকুণ্ড স্টেশন কলকাতা থেকে ২৫০ মাইল, চাঁদপুর থেকে লাকসাম জংশনের কিছু দূরে এবং অপরদিকে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে পাথরের গায়ে এবং স্বচ্ছ ঝরণার ধারা বা পুণ্যতোয়া একাধিক কুণ্ড বা জলাশয়ের কাছে বহু তীর্থ রয়েছে ঃ সীতাকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, গয়াকুণ্ড, বিরূপাক্ষ ও স্বয়ম্ভুনাথ শিব-মন্দির, ঊনকোটী শিববাড়ী, পাতালপুরী, সহস্রধারা, মন্দাকিনী, জগন্নাথ মন্দির, ভৈরব মন্দির, বাড়বানল, সরস্বতী শিলা, চন্দ্রনাথ, হরগৌরী, জ্বালামুখী প্রভৃতি। এই তীর্থগুলি সীতাকুণ্ড (বা চন্দ্রনাথধাম) নামে জনপ্রসিদ্ধি লাভ করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। সারা বর্ষব্যাপী প্রকৃতির এই পুণ্যাঙ্গনে শতসহস্র হিন্দু তীর্থযাত্রী নরনারীর সমাবেশ হত। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম "শিবরাত্রি মেলা" উপলক্ষে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের চারদিক থেকে লক্ষাধিক যাত্রী ও দর্শকের সমাগম হয়ে থাকে। চন্দ্রনাথ শিবমন্দির অত্যুচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বলে শিবরাত্রি পূজা, ব্রতাদি সম্পন্ন হয় অপেক্ষাকৃত পাহাড়ে অবস্থিত স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে ক্রমদীশ্বর শিবলিঙ্গের সম্মুখে।

এই ঐতিহ্যময় এবং অপূর্ব অধ্যাত্ম মহিমামণ্ডিত তীর্থকেন্দ্র সম্পর্কে নানা কাহিনী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় সুদূর ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী সহ এই পুণ্য পার্বত্য স্থান পরিক্রমায় এসেছিলেন। দেবী পুরাণ অনুসারে মহামুনি ভার্গব তাঁর ঐশ্বরিক শক্তিবলে পর্বতগাত্রে বাড়বাগ্নি মিশ্রিত এক কুণ্ড বা জলাশয় সৃষ্টি করেন। সতী শিরোমণি সীতাদেবী এই কুণ্ডে অবগাহন করেছিলেন, কালক্রমে উক্ত অঞ্চল সীতাকুণ্ড নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে এই সীতাকুণ্ডের বিলোপ-সাধন হয়ে যায় এবং লুপ্ত কুণ্ডের পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কিছু কাহিনী স্বর্গীয় উমাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চন্দ্রশেখর মহাত্ম্য" গ্রন্থে (আনুমানিক ১৮০০ শকাব্দ) এবং স্বর্গত অধরলাল সেনের অধুনা "The Shrines of Sitakund" দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের সম-সাময়িককালের পুঁথি ইত্যাদিতেও এ সকল বৃত্তান্তের খোঁজ রয়েছে বলে জেনেছি। "Chittagong Distriel Records" সরকারী গ্রন্থেও চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ শাসক আগমন কাহিনী Camp at Sitta Coon" অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

সীতাকুণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বয়ম্ভুনাথ শিবমন্দির সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস "রাজমালা" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে জনৈক নরসুন্দর এক সুপবিত্র শিবশিলা আবিষ্কার করেন। তা থেকেই এক মনোরম শিবলিঙ্গ গড়ে ওঠে, কোনও মনুষ্য হস্তের কারুকর্ম তাতে ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ ত্রিপুরা রাজ শ্রীশ্রীধন মাণিক্য ছিলেন একান্ত শিবভক্ত। প্রথমে ইনি এই শিবমূর্তি আগরতলা রাজধানীতে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ বিফল হয়। অতঃপর তাঁরই নেতৃত্বে সীতাকুণ্ডে স্বয়ম্ভুনাথ শিবমন্দির নির্মিত হয় ১৪২৩ শকাব্দে (ইং সন ১৫০১)। সেই থেকে শত শত বৎসর ধরে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীশিবচতুর্দশী ব্রত ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথধামের ঐতিহ্যময় মন্দিরাদি নির্মাণে ও যাত্রীসাধারণের সুখ-সুবিধা ব্যবস্থায় স্বাধীন ত্রিপুরা রাজগণের ঐকান্তিকতা এবং অবদান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের অর্থ-সাহায্যে উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে চন্দ্রনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সনে বিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবাত্যায় ঐ মন্দির ভগ্ন হয়ে যায়। অতঃপর প্রখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ী রামসুন্দর এর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ২৪ পরগণা জেলার খড়দহ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামহরি বিশ্বাস তাঁর পুণ্যবতী বৃদ্ধা মাতৃদেবীর বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথ দর্শনের সুবিধার জন্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ১৮২টি পাথরের সিঁড়ি প্রস্তুত করে শিবযাত্রা পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। অতঃপর ২৪ পরগণার অপর এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি টাকীর ধর্মপ্রাণ জমিদার সূর্যকান্ত রায়চৌধুরী উপরোক্ত প্রস্তর সোপানাদি বহু অর্থ ব্যয় করে সংস্কার করিয়েছিলেন।

সীতাকুণ্ড যাত্রীরা এই তীর্থ পরিক্রমায় এসে সাধারণত প্রথমে ব্যাসকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ কার্য সমাধা করে পার্শ্বস্থ ভৈরব দর্শন করেন এবং অক্ষয় বটবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে অন্যান্য তীর্থ মন্দির বিগ্রহাদির দিকে যান। অদূরে ছোট এক পাহাড়ের চূড়ায় ব্যাসাশ্রমে শংকর মঠ অবস্থিত। এই মঠে সাধু সন্ন্যাসীর ধ্যানধারণার উপযুক্ত একাধিক গুহা প্রস্তুত করা হয়েছে পর্বত-গাত্র খোদিত করে। মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে যখন বর্তমান লেখক সীতাকুণ্ড ভ্রমণে যান, তখন উক্ত মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ নীলানন্দ সরস্বতী যুব-অতিথিবৃন্দকে তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ পরমস্নেহে আপ্যায়িত করেছিলেন। এই পর্বতে অবস্থান করে চন্দ্রনাথধামের চতুর্দিকের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমরা দিনের পর দিন মুগ্ধ হয়েছিলাম!

সীতাকুণ্ড তথা চন্দ্রনাথধামের তীর্থ সংস্কার এবং মন্দির পথাদির বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পে উপরোক্ত ধর্মনিষ্ঠ ধনী জমিদারগণ ছাড়া চট্টগ্রামের জেলা শাসক, সীতাকুণ্ডের জননেতা হরকিশোর অধিকারী, ঢাকা ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য রাজা শ্রীনাথ রায় এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ রাজা জানকীনাথ রায়, রায়বাহাদুর সীতানাথ রায় প্রমুখ অনেক পরিশ্রম ও অর্থসাহায্য করে গিয়েছেন। শেষোক্ত মহাপ্রাণদ্বয়ের বদান্যতায় সীতাকুণ্ডে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে সীতাকুণ্ড মন্দিরাদি উন্নয়ন কমিটি সংগঠিত হয়েছিল তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লী সাহেবের J H Lea, I.C.S উদ্যোগে। ১৯৩৬ সালে সীতাকুণ্ড মেলা কমিটির উদ্যোগে এবং চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোরে সর্বাধ্যক্ষ কে কে সেন মহাশয়ের বহুল প্রচেষ্টায় সীতাকুণ্ড মেলা প্রাঙ্গন থেকে স্বয়ম্ভুনাথ, ভৈরব ও কালীমন্দির পর্যন্ত রাস্তাঘাটে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হ্যান্ডস (A. S. Hands, I.C.S) তার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেছিলেন। চট্টগ্রামের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এস এন রায় তখন মেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন।

রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়। — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেলগাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

ফেভ আর্টিস্ট

শুরুতেই নিরাবয়ব শূন্যতা। বৈশাখী গ্রীষ্মের নির্মেঘ নির্মল চিলচরানো আকাশ থেকে ক্যামেরা টিলট ডাউন করে এই অতি-পরিচিত পুরোনো শহরটার ট্রাম, টেলিগ্রাফের তার বেয়ে সদ্য কিশোরীর ব্রণভরা মুখের মত ক্ষত-বিক্ষত রাস্তায় এসে সামান্য সময় স্থির হল। ক্যামেরার মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকগ্রাউণ্ডে চড়া পর্দায় বেজে ওঠে—না, তানপুরা, সেতার, বা স্বরোদ নয়—মোটর কারখানার ঝালাইয়ের সুই সাঁই, দোতালা বাসের চোঁয়া ঢেকুর, ট্রামের একঘেয়ে ট্যাং ট্যাং, ঝ্যাকোর-ঝ্যাকোর, ঠেলা, ট্যাক্সি, টেম্পোর গতিময় উল্লাস, পানের দোকানে দোকানী-ক্রেতার সরব ঝগড়া ও আধুনিক সঙ্গীতের বিচিত্র চোলাই। 'বিবিধ ভারতী'। কলকাতার যে কোন একটা মোড় হতে পারে— উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম। মোড় ছেড়ে গলিতে ঢুকতে হবে। ক্যামেরা প্যান করে সরু ফালি গলিটার রোগা, মোটা, বেঁটে, ধেড়ে, বিবর্ণ, কঙ্কাল দুপাশের বাড়ীর সারিগুলো স্পষ্ট করে তোলে। ক্লোজ, সেমি ক্লোজ ছেড়ে একবার লংশটে ব্যাক-গ্রাউণ্ডে ধরা পড়ে রাস্তার ধারেই করপোরেশনের জলের ফোয়ারা। অস্পষ্ট কতকগুলো রেখা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। এবার অনাবশ্যক ফিল্ম ফুটেজ ব্যয় রোধের জন্য একটি 'জুম' চার্জ প্রয়োজন।

এক লাফে গলির মাঝখানে আমরা চলে এসেছি। ফোয়ারাটা একটা 'টিউকল'। রেখাগুলো আকৃতি পেয়ে জেগে উঠেছে। হাঁড়ি, কলসী, জগ, বালতি, সাজিয়ে উবু হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে নানা বয়সী কতগুলো মেয়ে-মদ্দ ঝগড়া জুড়েছে। পাশেই একটা দুধের ডিপো। ডিপোটা একতলায়; ধার ঘেঁষে উঠে গেছে একটা সরু অন্ধকার ভাঙা-চোরা সিঁড়ি। ক্যামেরা এই সিঁড়ির মুখেই মানুষটিকে ধরল।

শীর্ণ দুটি পা (ক্লোজ শট)। আস্তে আস্তে ক্যামেরা টিলট আপ করতে ধরা পড়ে—একটা পুরোনো ছেঁড়া ধুতি লুঙ্গির মত কোমরে জড়ানো। খালি গা। হাড় পাঁজরা সব বেরিয়ে এসেছে। গলার নলি-দুটো যেন অনেক কষ্টে বুক আর মাথা একসঙ্গে ধরে রেখেছে। খাড়া নাকের পাশে কোটরবসা দুটি চোখ—বয়সের ছ্যাতলা জমে কালো হয়ে আছে। মানুষটি এক পলক ঐ টিউবওয়েলের সামনে জমে ওঠা জটলাটার দিকে তাকিয়ে হতাশ ভাবে হাতের বালতিটা মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। কাঁধের গামছাটা একবার কেশবিরল মাথায় বুলিয়ে নিলেন। তারপর আবার বালতিটা তুলে নিয়ে দোতালায় উঠতে লাগলেন সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে।

কাট করে একবারে দোতালার বারান্দায়। লম্বা টানা বারান্দা। বাঁ-ধারে পর পর অনেকগুলো ঘর। উল্টোদিকে দুটি ঘর পিছু রান্নাঘর, বাথরুম। মানুষটি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এক কোণে পুরোনো খবরের কাগজ, শিশি-বোতল, একজোড়া লেডিজ স্যাণ্ডেল ও তাপ্পিমারা বিদ্যাসাগরী চটির পাশে নামিয়ে রাখলেন বালতিটা। নামানোর আওয়াজ পেয়েই যেন পাশাপাশি ঘর-দুটির কোন একটি থেকে অসুস্থ বয়স্কা এক মহিলার গলা ভেসে এল : কি আজো স্নান করতে পারলে না?

দড়িতে শুকনো গামছাটা মেলে দিতে দিতে জবাব দিলেন মানুষটি সংক্ষেপে—না, বাণী। তারপর প্রথম ঘরটি ছেড়ে দ্বিতীয় ঘরটির ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বললেন—যা ভিড়। মাছি গলতে পারে কিনা সন্দেহ। আমি কি করে পারব?

সাধারণ যে কোন মধ্যবিত্ত মানুষের শোওয়ার ঘর। ক্যামেরা প্যান করে আস্তে আস্তে ঘরটির পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে—এক ধারে তেলচিটে রংওঠা একটা কাঠের আলমারী। আলমারীর মাথায় কাগজপত্রের ডাঁই উঁচু হয়ে আছে। পাশে খানকয়েক ইটের ওপর দুটো স্টিলের ট্রাঙ্ক। লোহার পোঁয়ুর ঢেকে বলেছে বিগত যৌবন ঢাকনায় ঝালর। পাশেই একটা ড্রেসিং টেবিল। বহুদিনের অযত্নের ধুলো জমে আছে আয়নাটায়। একটা চিরুণী, গোটা কয়েক কাঁটা আর একটা চুল বাঁধার ফিতে পড়ে আছে টেবিলে। কালো চিরুণীটার গায়ে কয়েকটা কাঁচা-পাকা চুলের জট। ঐ চুলের জট থেকে মিক্স করে খুব ক্লোজে পর্দা জুড়ে ভেসে ওঠে একরাশ আলুথালু চুলের বোঝা। ক্যামেরা টিলট ডাউন করে—একটা ছাপরখাটের বাজুতে দেহের ভার এলিয়ে দিয়ে একটি শীর্ণ করুণ হতাশ মুখ তাকিয়ে রয়েছে দরজার দিকে।

: ভিড় বলে রোজই যদি এই গরমে স্নান না কর তাহলে যে শরীর গরম হয়ে শেষ পর্যন্ত খারাপ একটা ব্যামো বাধিয়ে বসবে। তোমার এমনিতেই পিত্তের ধাত। রোজ রোজ...।

কথা কটা শেষ হওয়ার আগেই দরজা ছেড়ে মানুষটি ভেতরে এসে দাঁড়ান। খাটের স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো পাঞ্জাবীটা টেনে নিতে নিতে বলে ওঠেন—না না, দেখো কাল আর জলের অসুবিধে থাকবে না। পাঁচুবাবু বলেছেন কলটা আজই সারিয়ে দেবেন।

কল আর কি হবে না। খাটে বসা মানুষটির প্রতিটি কথাই যেন হতাশায় গড়া—কি করে ঠিক হবে। এক বছরের বাড়ী ভাড়া বাকী। নিত্যি যে লোক দুবেলা শাসাচ্ছে এক মাসের মধ্যে বাড়ী ভাড়া দিতে না পারলে ঘাড় ধরে তুলে দেবে, সে ঠিক করে দেবে কল? তুমি আমায় কি ভাব বলো তো। অসুখে পড়ে আছি বলে তো আর অন্ধ বা কালা হয়ে যাইনি। সবই শুনতে পাই, টের পাই। কাল সন্ধ্যেবেলা তোমায় বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাঁচুবাবুর ছেলে সমীর কি বলেছে সব আমি জানি।

তুমি আবার এসব নিয়ে কেন মিছি-মিছি ভেবে মরছ বলো তো বাণী। বলতে বলতে মানুষটি খাটে এসে স্ত্রীর পাশে বসেন। তারপর সান্ত্বনা দেওয়ার সুরেই বলে চলেন—বাড়ীওয়ালারা চিরকালই ওসব কথা ভাড়াটেকে শুনিয়ে থাকে। কেন

তোমার মনে নেই সেবার বালীগঞ্জ প্লেসে কি হয়েছিল?

আমার সব মনে আছে। সে তো প্রায় তিন যুগ আগের কথা। সুনয় তখনো হয়নি। বাড়ীর সকলের অমতে বিয়ে করলে বলে বাবা দাদা সবাই তোমাকে দূর করে দিলেন আমায় নিয়ে গিয়ে উঠলে নীরেনবাবুর বাড়ীতে। বলতে বলতে বাণীর তোলায়টে চোখদুটি স্বপ্নে ভরে ওঠে। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিময় অতীত যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মন্তাজ ফ্লাশব্যাকে বড় দ্রুত কয়েকটি ছবি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় —যুদ্ধ, দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতা। দিশেহারা মানুষ একটু আশ্রয় খুঁজে ফিরছে। তারই মাঝে এরা দুজনে সংসার পাতার আয়োজনে মত্ত। বন্ধুর বাড়ীতে দুদিনও টিঁকতে পারেনি। রাসভারী গৃহকর্তা ছেলের সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ওদের তাড়িয়ে দেয়। ধার-ধোর করে এক কামরার একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ওরা উঠে আসে। যুবকটি স্টুডিও পাড়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটার হিসেবে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে গল্প লেখে। স্ত্রীকে শোনায়। শোনায় বন্ধুদের। ডিরেকটর, প্রোডিউসার, ডিসট্রিবিউটরদের দরজায় দরজায় ফাইল হাতে ঘুরে বেড়ায়। যদি কেউ শোনে, যদি কারুর পছন্দ হয় এই আশায়। একদিন সেই স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে। শাদা কাগজের বুক থেকে পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠে ওর বিশ্বাসের অভিজ্ঞতার দলিলখানি। সেই সংগে সিনেমার হল জুড়ে কানফাটা হাততালি সিটি; দশ আনার লক্ষ্মীদের হৃদয়জোড়া ভালোলাগা বয়ে আনে প্রতিষ্ঠা, অর্থ, যশ। ততদিনে ঘর আলো করে বাণীর কোল জুড়ে এসেছে একরত্তি সুনয়। কসবার বাড়ী ছেড়ে ওরা উঠে আসে বালীগঞ্জ প্লেসে।

হঠাৎ রাস্তার জটলা থেকে একটা তীব্র চীৎকার হাউইয়ের মত উঠে এসে ওদের অতীত ধুয়ে মুছে দিয়ে জ্যান্ত বাস্তবের মুখোমুখি করে দিল! মানুষটিও যেন ততক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে ছিলেন। এবার কি একটা জরুরী কথা মনে পড়তেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করেন—তুমি ট্যাবলেটটা খেয়েছ?

ক্লান্ত হাসিতে শীর্ণ পাতলা মুখটি বড়ে উঠল—হ্যাঁ, খেয়েছি। কিন্তু ওষুধ খেতে আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে যদি আবার সেই বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারতাম; দেখতে আমার সব অসুখ সেরে যেত। এই বুকচাপা ঘরে যে কোন সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে যাবে।

শান্ত অনুত্তেজিত গলায় অসুস্থ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মানুষটি বলেন—যেতে তো চাই, কিন্তু যাই কি করে বলো? আর সেই কোনো। কি করে ঐ বাড়ী রাখব? যোলটা বছর যে বাড়ীতে কাটালাম, মাত্র তিন মাসের ভাড়া দিতে না পারার জন্য এক নোটিশেই উঠিয়ে দিল। কেন তাতো তুমি জান। রাতদিন পরিশ্রম করে এক-একটা ছবির সিনারিও লিখে দিয়েছি আর পেমেণ্টের বেলায় প্রাপ্যের সিকির সিকিও পাইনি। কত লোকে কত টাকা দেবে বলে দেয়নি, মেরে দিয়েছে। তবু আগে বয়স ছিল। মনে জোর ছিল। লোকে বলত আমি কলম ছোঁয়ালেই না-কি ছবি হিট করে। গণ্ডা গণ্ডা সুপার হিট ছবির সিনারিও আমি লিখেছি। কিন্তু বয়স বাড়ার সংগে সংগে টেরও পেলাম না কেমন করে কখন বাতিলের দলে আমিও পড়ে গেছি। আগে বাড়ীর সামনে ভোর না হতেই প্রোডিউসারের গাড়ীর ভিড় জমে যেত। এখন আমিই তাদের অফিসে বাড়ীতে উমেদারী করে বেড়াই। যে যা দেবে বলে তাতেই রাজী হই। তবু কাজ জোটে না। কাজ জুটলেও টাকা মেলে না। আমার তো কোন দাম নেই আজ। তাই কনট্রাকটের কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না। পারি না বলেই কাজ হয়ে গেলে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে প্রোডিউসার পালায়। আর আমি, আমি...। শেষের দিকে ইষৎ উত্তেজনায় গলা ভারী হয়ে আসে মানুষটির। প্রবঞ্চনার বেদনায় চোখের পাতা তির তির করে কাঁপে (ক্লোজ)। চোখ বেয়ে সরু একটা জলের ধারা গালে গড়িয়ে আসে। কথা শেষ হয় না।

ক্যামেরা আর একটি সরু জলের ধারা অনুসরণ করে সামান্য ওপরে উঠতেই পর্দায় ধরা পড়ে বাণীর মুখ। আস্তে আস্তে স্বামীর মুখ থেকে উল্টোদিকের দেয়ালে এসে ওর চোখদুটি স্থির হয়। ড্রেসিং-টেবিলের ঠিক মাথার ওপরেই কিশোর সুনয় দেয়ালজুড়ে হাসছে। হাসিটুকুর বয়স বাড়ে না। চিরদিনের জন্যই সুনয় ওদের চোখে ছবি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ছবি থেকে চোখ সরিয়ে এনে আঁচলে জলের দাগ মুছতে মুছতে প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বাণী—তুমি খাবে না?

ঃ এখন থাক। এখুনি বিজনবাবু এসে পড়বেন। উনি চলে গেলে দুজনে একসংগে খাবো'খন।

উদ্বেগে ছটফট করে বাণী—সে তো অনেক বেলা হয়ে যাবে। তুমি বরং এখুনি যা হোক দু' মুঠো খেয়ে নাও। বলতে গিয়েই হঠাৎ যেন বাণীর মনে পড়ে গেল —আজই বিজনবাবুর টাকা দেওয়ার কথা না?

শুকনো গলায় জবাব আসে—হ্যাঁ।

ঃ কত দেবে গো? তোমার আর কত পাওনা বিজনবাবুর কাছে?

ঃ দেয়নি তো কিছুই। ছ' হাজারের মধ্যে এক হাজার দিয়েছেন। বাকী আরো পাঁচ হাজার। বলেছেন আজ দেবেন হাজারদুয়েক। আর স্যুটিং শুরু হলে বাকীটা মিটিয়ে দেবেন।

মাত্র দু' হাজার—হতাশায় ভেঙে পড়ে বাণী। কি হবে তাতে? এক বছরের বাড়ী ভাড়া দিতেই তো পনেরোশ' চলে যাবে। তিন মাসের মুদি বাকী। গয়লা, কাগজ সব বাকী। পাশের বাড়ীর মিজামা পাবে দুশ'। হাতে তো কিছুই থাকবে না।

পাঞ্জাবীর ঝুল পকেটে হাত গলিয়ে একটা ফাউনটেন পেন বার করলেন মানুষটি। তারপর আলমারীর মাথায় ডাঁইকরা ফাইলের স্তূপ থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—কি করব বল? জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই। গল্প, চিত্রনাট্য ধরে ছ' হাজার দেবেন বলেছিলেন। কথা ছিল মাসে মাসে পাঁচশ' করে দিয়ে যাবেন। চার মাস দুবেলা ওর বাড়ী আর অফিসে হাঁটাহাটি করে মাত্র এক হাজার আদায় করতে পেরেছি। কিছু বলতে গেলেই বলেন, মধুদা এখনো যোগাড় হয়নি; আপনি আমার দাদার মত। একটু হেল্‌প করুন। হাত জড়িয়ে ধরে এমন করে অনুনয় করেন যে, কিছু বলতেও পারি না।

কিন্তু না বললে চলবে কেন—গলার স্বরেই টের পাওয়া যায় বাণী কতখানি উত্তেজিত। বিজনবাবু লাখ লাখ টাকার মালিক। তোমার মত একটা বুড়ো মানুষকে দিন নেই রাত নেই খাটিয়ে মারছেন। এক-বারের জায়গায় দশবার লিখিয়ে নিচ্ছেন একই সিন। এত খাটুনীর কি কোন দামই নেই? না না, তা হয় না। তুমি বলবে পাওনাদাররা আমাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে, টাকাক'টা দিয়ে দিন।

জবাবে কি একটা কথা মধুসূদন বলতে যাচ্ছিলেন ঠিক এমনি সময় তলায় গাড়ী থামার আওয়াজ শোনা গেল। সজোরে গাড়ীর একটা দরজা বন্ধ হল। মধুসূদন রাস্তার ধারের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—বিজনবাবু এসে গেছেন। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি। তুমি শুয়ে একটু বিশ্রাম নাও বাণী। কিছু দরকার হলে ডেকো। বলতে বলতে পেন, ফাইল হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান মধুসূদন। ততক্ষণে সিঁড়ি থেকে আওয়াজ ভেসে আসে...মধুদা, মধুদা। শোওয়ার ঘরের পাল্লার ওপর সশব্দে ডাকটা এসে আছড়ে পড়ে। (ফেড আউট)।

পরের দৃশ্য। ফেড ইন। ফোরগ্রাউণ্ডে মধুসূদন, ব্যাক টু ক্যামেরা। ব্যাকগ্রাউণ্ডে খাকী রংয়ের টেরিলিন স্যুট-পরা ঝকঝকে চেহারার বছর-চল্লিশেকের একটি মানুষ। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ভদ্রলোক যখন উঠে আসছিলেন, তখনই শোনা যাচ্ছিল—কতদিন মধুদা আপনাকে বলেছি এ-বাসাটা এবার পাল্টান। দিনেদুপুরে যদি অমাবস্যা হয়ে থাকে, তাহলে মানুষজন উঠবে কি করে? বলতে বলতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পোখরাজ আর চুনীর আংটি-পরা ফর্সা গোটা গোটা আঙুলের ফাঁকে আলতো করে বসানো ফিলটার-টিপড সিগারেটের ডগায় একটা কলকে টান জুড়ে খুব আন্তরিক গলায় বললেন—এ-বাড়ী আপনি ছেড়ে দিন। একবার ছোট ভাইকে অনুমতি দিন, এখুনি একটা ভাল বাসা ঠিক করে দিচ্ছি। আপনার মত লোকের এরকম জায়গায় পড়ে থাকা ভাল দেখায় না। কি বলুন দেখব নাকি?

উত্তরে কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু ম্লান হাসলেন মধুসূদন। বসার ঘরের শিকল খুলে পাল্লাদুটো হাট করে দিয়ে বললেন—আসুন, ভেতরে আসুন বিজনবাবু।

মিক্স করে ঘরের ভেতরে চলে আসে ক্যামেরা। হাড় বার করা সোফা, কানাভাঙা কাঁচের টেবিল, দোমড়ানো জৌনপুরী পেতলের আসল্লে, ঝুলেভর্তি মোরাদাবাদী ফুলদানী—সবই এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটানো। বিজনবাবুর হা-হা করে প্রাণ-খোলা হাসি, চেঁচিয়ে কথা বলায় সারাটা ঘর যেন চুন, বালি, সিমেন্টের খসে-পড়া পলেস্তারার ভার নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপে—হয়ে গেল দাদা। সইটই সারা। কুমার-সাহেব সত্তর চেয়েছিলেন, পঞ্চাশেই রাজী করিয়েছি। এসব ফুটো মাস্তানের কাপ্তানী দেখলে গা রি-রি করে। তবু ডিসট্রি-বিউশনের জন্য সব সহ্য করতে হয়। ওদের আবার নামী স্টার না হলে চলে না। আমি বলি, আরে বাপু গল্পই যদি না থাকে, সিনারিও যদি অচল হয়, তাহলে হাজার গণ্ডা কুমারসাহেব বা মিসেস বোসকে নাও না কেন বই চলবে না। তা গরীবের কথা কে শোনে বলুন উল্টে তাড়া লাগায়। যাকগে সেসব কথা, আমি এখন টপ-গীয়ারে, আপনি গ্রীন সিগন্যাল দিলেই—।

আমি তো গ্রীন সিগন্যাল দিয়েই রেখেছি বিজনবাবু—ছেঁড়া সোফাটার হাড়-পাঁজরায় চেপে বসে ঈষৎ বিরক্তভাবেই জবাব দেন মধুসূদন।

: হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো আপনি দিয়েছেনই দাদা। তবে কিনা, হিরোর রিকোয়েস্টে ঐ শেষের অংশটুকু।

: তাও রেডি। এই নিন। যা আপনা-দের হিরো চেয়েছেন তাই করে দিয়েছি। এই নিয়ে লাস্ট সিকোয়েন্সটা সাতবার পালটে দিলাম। ফাইল খুলে কতগুলো ক্লিপে গাঁথা আলগা কাগজ এগিয়ে দেন মধুসূদন।

কাগজের গোছাটা টেনে নিয়ে চটপট পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিজন বলেন : ঝামেলা কি একটা। হিরোর যদি এই চাই, তো হিরোইনের চাই ঠিক তার উল্টোটা। মাঝখান থেকে খেটে খেটে হাল্লাক হই আমরা। ওদের রিকোয়েস্ট না রাখলে ওরা চটে, আর রাখলে চটেন আপনারা।

বোবা ফেসে বিজনের কথাগুলো শোনে মধুসূদন। ক্যামেরা সেমি-ক্লোজ। একটা নতুন সিগারেট ধরাতে ধরাতে গলায় মধু ঢেলে দেন বিজন : কিসসু বোঝে না দাদা, কিসসু না। পাবলিকে অজ্ঞান। সেই রোমান্সেই বলে কিনা এ-সিন চলবে না, এখানে একটু লপচালপাঁচ চালাও এসব হ্যানা-ত্যানা নানা কথা। সেসব আপনাকে বলতেও লজ্জা হয়।

এই শেষ ডায়ালগেই মধুসূদন নাড়া খেয়ে যান। হিরোর বকলমে প্রোডিউসার আবার কোন নতুন ফরমায়েস করে বসেন বুঝি। অমায়িক ভদ্রতার মুখোসের আড়ালে নিত্যনতুন প্যাঁচ-পয়জার চলে এই লাইনে। তাই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে আসল কথাটাই খুব ইতস্তত করে পাড়েন মধুসূদন—আজ কিছু টাকার বড় দরকার বিজনবাবু। আপনি বলেছিলেন দু' হাজার দেবেন।

আস্ত একখানা থান ইঁট যেন কেউ ছুঁড়ে মেরেছে মাথায়। ঠোঁটের ডগায় সিগারেটটা ঝুলে পড়ে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তার মধ্যেই নিজেকে সামলে নেন প্রোডিউসার—টাকা ছাড়া কি জগৎ চলে দাদা। কুটোটা পর্যন্ত কেউ নাড়তে চায় না। এই দেখুন না, ডিসট্রিবিউশনের

ঝামেলা এড়ানোর জন্য ফিনান্স করপোরেশনে অ্যাপ্লাই করলাম। ছ'-ছ'টা মাস শুধু-মুধু ঘুরিয়ে মারল। টাকার কোন পাত্তাই নেই। শেষপর্যন্ত কুমারসাহেব হিরো হতে রাজী হয়েছেন শুনে টমটমওয়ালাজী একটু হেসে কথা বলছেন। বলতে বলতে একটু থামলেন প্রোডিউসার। তারপর একমর বোঝে ঠেলে দিয়ে দাবার চাল আটকালেন—এসব কথা থাক। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। যদ্দিন এই বিজন হালদার আছে, তদ্দিন মধুসূদন রায়ের সব ভাবনা তার।

আড়চোখে মধুসূদনের মুখটা পড়বার চেষ্টা করলেন বিজন। মনে হল কথাগুলো যুৎসই হয়নি। তাই আকণ্ঠ উদ্বেগে হেসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা বৌদির শরীর কেমন?

ভাল নেই বিজনবাবু। মধুসূদন যখন ভাল না থাকার কারণগুলো বলে চলেছেন ঠিক তার ওপরেই কাট করে বারান্দায় চলে আসে ক্যামেরা। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাণী। কান পেতে শুনছে সেই করুণ আর্তনাদ—আজ তিন-দিন ধরে হার্টের যন্ত্রণায় ছটফট করছে আপনার বৌদি। ডাক্তার ডাকতে পারিনি। পুরোনো প্রেসক্রিপসন দেখিয়ে দোকান থেকে ধারে গোটাকয়েক ট্যাবলেট এনেছি। জানি না ওর পক্ষে তা ওষুধ না বিষ। আজ আপনি আমায় কিছু অন্তত দিন বিজনবাবু।

শরীরের সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করেও যে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় উঠে এসেছিল, স্বামীর ভিখারীর দশা দেখে সে যেন আচ্ছন্নের মত সমস্ত চেতনা হারাতে থাকে। আঁচল খসে পড়ে মেঝেয়। চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল চিবুক ছুঁয়ে বুকে নেমে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় বারান্দায় বাণীকে রেখে কাট করে ক্যামেরা চলে আসে ঘরের ভেতর।

ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স জুড়ে হতাশ-বিহ্বল লেখকের মুখ শুধু। পর্দার ওপর ভেসে আসে বিজনের গলা—মধুদা আজই দশ হাজার অ্যাডভান্স দিয়েছি কুমার-সাহেবকে। মাইরি বলছি কাছে আর কিসসু নেই, গাড়ীর এই চাবিটা ছাড়া।

মধুসূদনের মুখের ওপর আস্তে আস্তে একটা হাত এগিয়ে আসে। বিরাট একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত চাবিটা ঠিক পর্দার আড়-বরাবর ঝুলতে থাকে।

ক্যামেরা ট্রাকস ব্যাক। মিড-শটে পাশা-পাশি বসে লেখক ও প্রোডিউসার। তড়বড় করে বিজনের মুখে খৈ ফোটে—আমি বরং কাল, না না, পরশু প্রোডাকশন ম্যানেজার বলাইবাবুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। হ্যাঁ, পুরোপুরি দু' হাজার। আপনি কিসসু ভাববেন না। আজ চলি দাদা, এখুনি এক-বার টমটমওয়ালাজীর ওখানে যেতে হবে। বৌদিকে বলবেন আজ দেখা হল না।... এরপর একদিন এসে চুটিয়ে...।
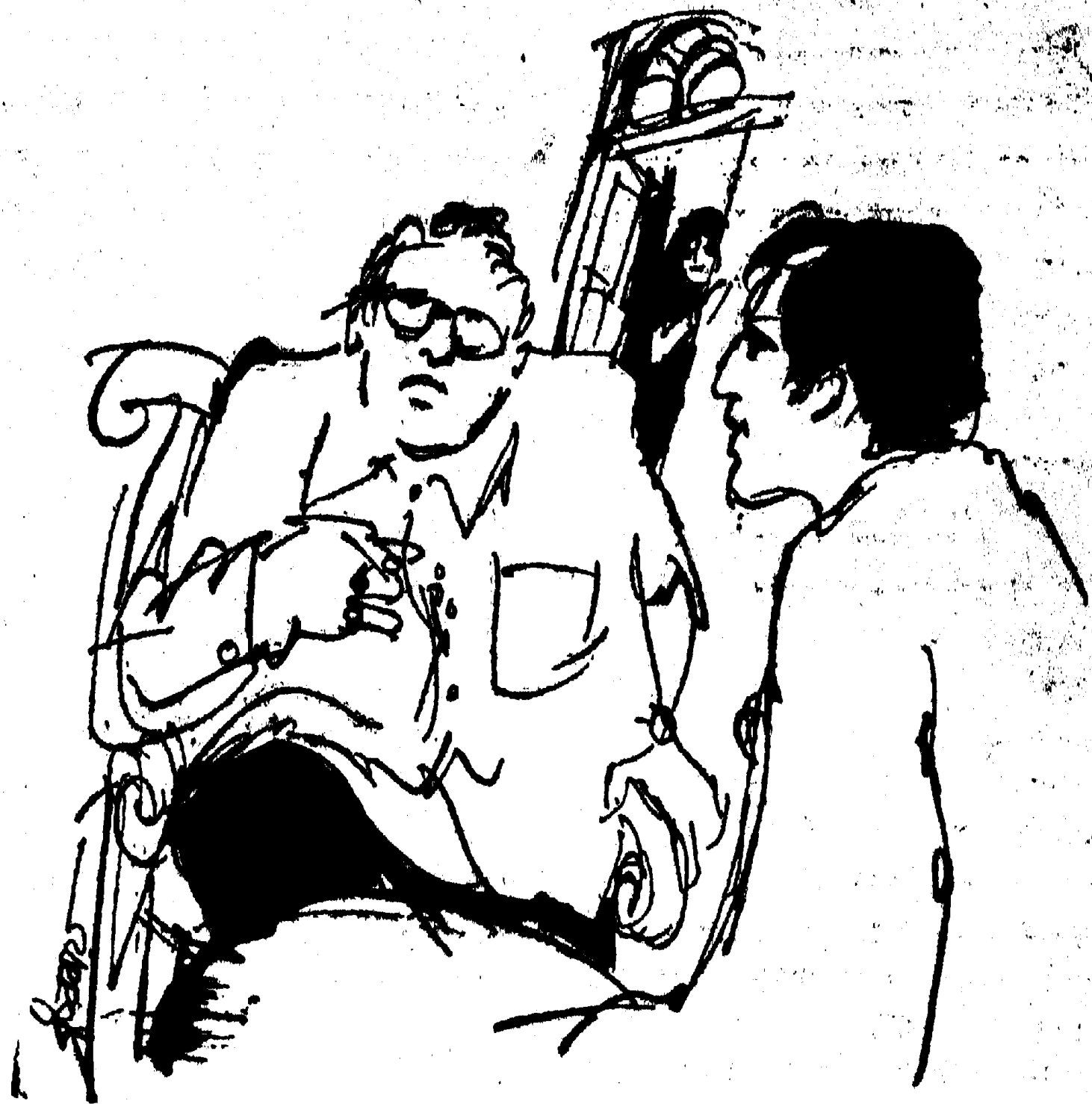
মধুসূদন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণে চিড়িয়া উধাও।

পর্দা জুড়ে একটা বিস্মিত ক্লান্ত ভীত মুখ স্থির হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার ওপর আর একটি আচ্ছন্ন মুখের ছবি ভেসে আসে। বাইরে স্টার্টারের আওয়াজ শোনা যায়। তারপর সব স্থির শান্ত। শোনা যায় শুধু কমেন্টারী—এই-ভাবেই বারবার চলচ্চিত্রের চিত্রকররা প্রতারিত হন। কাজ করিয়ে নেয়ার বেলায় প্রশংসার স্তুতিতে এইসব অভিমানী মানুষগুলিকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে মাতাল করে তোলেন বিজনবাবুর দল। তারপর দিন, রাত, সপ্তাহ, মাসের হাড়ভাঙা পরি-শ্রমের ফসলটুকু অক্লেশে গোলাজাত করে হাসতে হাসতে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যান—আমি বরং কাল, না না, পরশু বলাইবাবুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। হ্যাঁ পুরো দু হাজার। সেই কাল বা পরশু আসে না কোনদিনই। আর না এলেও এদের কিছু করার নেই। কারণ, কোন কনট্রাক্ট থাকে না। থাকলেও কিছু করার নেই। বাংলাদেশে ফিল্মের আজ বড় আকাল। মার্কেট রুপালি জোট হয়ে গেছে। কিন্তু যে মানুষগুলো সমস্ত যৌবনের বিনিময়ে তিল তিল করে স্বর্ণ-প্রতিমাখানি গড়ে তুলেছেন, তাঁরা আজ যাবেন কোথায়? মধুসূদনের আশ্রয় কোথায়? ফিল্মের ঘোলা জলে বাস করে প্রোডিউসার-কুমীরকে তো আর চটানো চলে না। তাই অভাবে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায়, অপমানে ক্লান্ত রিক্ত মধুসূদন চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। তবু মুখ ফুটে বলতে পারেন না কিছুই। যে গলিতে তাঁর বাস, সেখানকার মুদি, গয়লা, ডাক্তার, হকার, বাড়ীওয়ালা, দোকানীর দল তাঁকে ছিঁড়ে খায়। তাদের আর দোষ কি, তারা তো ফিল্মের লোক বলেই গোড়ায় কত খাতির করে ধার বাকী রেখেছিল। তখন তো আর জানত না প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার সবচেয়ে বেশী ঘন।

আস্তে আস্তে গোটা পর্দা জুড়ে ভেসে থাকা দুটি বোবা মুখ ফেড আউট হয়ে যায় এক অপরিসীম শূন্যতায়। যেন বৈশাখের নির্মম দুপুর সারা আকাশ গ্রাস করে ফেলে।

—[illegible]

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখে আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

বিনোদ-কাহিনীর সমাপ্তি
ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি

(তের)

বিনোদের রোগ-ইতিহাস থেকে তার স্নায়ুতন্ত্রের বিশিষ্টতা খানিকটা জানা গেছে, তার ভয়ের ইতিবৃত্ত অনেকটা বোঝা গেছে। পাভলভ-ল্যাবরেটরীর পরীক্ষামূলক আবেশ সৃষ্টির ইতিহাস থেকে আবেশের শারীর-বৃত্তিক ব্যাখ্যাও মিলল। এবার বিনোদের রোগের নিদান ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করা চলতে পারে।

আগের এক সংখ্যায় (৪৮শ) লিখেছি যে বিনোদের মস্তিষ্কে উত্তেজনার প্রাবল্য ও নিস্তেজনার অভাব আছে; আর তার ইন্দ্রিয়ভিত্তিকতন্ত্র (প্রথম সাংকেতিক) বাক্-ভিত্তিক (দ্বিতীয় সাংকেতিক) তন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। শৈশব থেকে সে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে আসছে। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, বিশ্বাস, ভালবাসা নেই। মায়ের প্রতি মমত্ববোধ আছে, কিন্তু শ্রদ্ধার অভাব। পরিবারের দারিদ্র্য ও বাবা-মায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের অভাব বিনোদের চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। বাবার অসুখের খবর গুছিয়ে ফেনিয়ে বলার ফলে পিতৃবন্ধুদের সহানুভূতি উদ্রেক করতে পেরেছে; তাই পরবর্তীকালে নিজের অসুস্থতা জাহির করার মধ্যে অন্যের সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা। সামন্ত-যুগীয় পিতৃবশ্যতা ও গুরুজন-নির্ভরতা পিতার ব্যবহারের ফলে খানিকটা ক্ষুন্ন হলেও, এখনও বিনোদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। গুরুদ্রোহিতা তার কাছে নৈতিক অপরাধ। তাই ইউনিয়নের প্রতিবাদ মিছিল বা ধর্মঘটে সে যোগ দিতে পারে না। আবার এ-যুগের বিদ্রোহ বিবাদ-বিসংবাদের প্রভাব থেকেও পুরোপুরি মুক্ত হতেও পারছে না। অবাধ প্রতিযোগিতার এই সভ্যতায় শুধু যোগ্যতমেরই আছে বাঁচার অধিকার,—আর দশজনের মত বিনোদকেও এই অতি-প্রচলিত ধারনা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ওর সামন্তযুগের ধ্যানধারণাপুষ্ট মনে বুর্জোয়া-মানুষের নিভীক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা বদ্ধমূল হতে পারে নি। সামন্তযুগের নির্ভরতা-প্রবণতার সঙ্গে বুর্জোয়া-যুগের নিঃসঙ্গতাবোধ ওকে আরো দুর্বল ও অসহায় করে তুলেছে। আত্মবিশ্বাস ওর মধ্যে কোনোদিন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। একক প্রচেষ্টায় অসাধ্যসাধন করার অভিলাস মাঝে মাঝে ওকে দুঃসাহসী উদ্যমে চঞ্চল করে তোলে; আবার পিতৃতুল্য অফিস-বস্ বা ঐ ধরণের কোনো গুরুজনের তির্যক দৃষ্টিপাতে, উৎসাহবাক্যের অভাবে ওর সমস্ত উদ্যম, সমস্ত কর্মক্ষমতা লোপ পায়। নিজের গৃহে বিনোদ পুরোপুরি সামন্ত-তন্ত্রীয় পিতা। স্ত্রী এবং পরিবারের সকলের উপর একাধিপত্য চায়; সামান্যতম বাধা বা প্রতিবাদে ক্রোধ-উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ে। অসুস্থতা ইদানীংকালে পরিবারের উপর আধিপত্য বিস্তারের একটা অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই হল বিনোদের চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য। এখন রোগের প্রধান উপসর্গ-গুলোর উৎস অনুসন্ধান করা যাক।

দুই রকমের ভয়ে বিনোদ অস্থির। বদ্ধজায়গার ভয় প্রথম দিকে বেশি ছিল; শেষের দিকে রক্তচাপবৃদ্ধি ও মৃত্যুভয় ওকে পেয়ে বসেছে। ওর শৈশবের এমন কোনো বিস্মৃত ঘটনা ওর মনে এল না যা দিয়ে ক্লস্ট্রোফোবিয়ার হদিশ পাওয়া যায়। রক্তচাপ-বৃদ্ধির অবসেশন দুই ডাক্তারের যন্ত্রের গরমিল থেকে এসেছে। কয়েকবার এই গরমিল ঘটেছে। (৪৮শ সংখ্যা ৭৬০ তৃতীয় কলম) বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যা ওর প্রক্ষোভ-প্রভাবিত মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি। ভয় ধীরে ধীরে জমছিল। সেক্রেটারীর স্নেহ-বঞ্চিত হয়ে বিনোদ অস্বস্তি বোধ করছিল। ইউনিয়নের সহকর্মীদের উদ্দেশ্য ও ঠিকমত বুঝতে পারে নি। গ্রুপ-এ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে ওর কোনোরকম ধারণাই ছিল না। নিজের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক, নিজের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ও অজ্ঞ ছিল বলা চলে। প্রতিযোগিতার দিকটাই ওর চোখে পড়েছে, সহযোগিতার দিকটা নজরে আসে নি। দ্বন্দ্ব-বিরোধের সমাজের আন্ত-মানসিক সম্পর্কের বৈপরীত্য ধরতে পারে নি। অন্য মানুষ ওর কাছে হয় বন্ধু, না হয় শত্রু, হয় ওর উপকার করবে, না হয় ওর অপকার করবে। অফিসে সকলেই ব্যক্তি-স্বার্থকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে, কাজেই সুযোগ পেলেই অন্যরা ওর ক্ষতি করবে। এই ভয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বোঝা নিয়ে বিনোদ পথ চলছিল। এমনি সময় ঘটল ডেপুটীর আবির্ভাব। সেক্রেটারীর নিরাপদ স্নেহছায়া থেকে সরে আসতে হল। ফলে, নিরাপত্তার অভাব এবং ভয় আরো বাড়ল। নির্ভর করার মত কোনো কিছু আর রইল না। এই সময় বাড়ীতেও নানা-রকমের অশান্তি ঘটছিল। ভায়েরা কিছুদিন থেকে স্ব-স্ব-প্রধান হয়ে উঠছিল। বিনোদের মাতব্বরী মেনে নিতে চাইছিল না। পদে পদে বিনোদ অপমানিত বোধ করছিল। কয়েক বছর আগেও যারা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ভয় পেত, তারা এখন সমানে কথার উত্তর দিচ্ছে, চোখ লাল করে তাকাচ্ছে, অনেক সময় মারমুখী হয়ে এগিয়ে আসছে। মেয়েদের রান্নাঘর-কেন্দ্রিক তুচ্ছ ঝগড়া এক-একদিন ভায়েদের মধ্যে তুমুল কলহে পরিণত হচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিক মানসতায় যৌথ-পরিবার নিরাপত্তার দুর্গ, অথচ সেই যৌথ-পরিবার টিঁকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এই সূত্রে বিনোদের মনে অস্বস্তি ও ভীতি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ওকে অস্থির করে তুলেছিল। যেদিন প্রথম ভয় পেয়ে অফিস থেকে পালিয়ে আসে তার আগের দিন পারিবারিক কলহ চরমে উঠেছিল; স্ত্রীর সঙ্গেও এই ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক কথা কাটাকাটি ঘটেছিল। বিনোদের স্ত্রী 'আলটি-মেটাম' দিয়েছিল : 'হয় আমাকে বাপের বাড়ী রেখে এসে ভাইদের নিয়ে যৌথ-পরিবারের কাঠাম বজায় রাখ, না হয় নতুন বাসা করে এক মাসের মধ্যে এই ঝগড়ার পরিবেশ থেকে আমায় উদ্ধার কর।' যখন স্টোররুমের আবছা অন্ধকারে বিনোদ কাজ করছিল, তখন তার মন পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে বিশেষভাবে বিচলিত। আবার এদিকে, ইউ-নিয়নের নির্দেশ অমান্য করে ডেপুটীর খেয়াল মেটাতে গিয়ে আরো বেশি বিচলিত বোধ করল। সহকর্মীদের সমবেত কণ্ঠের স্লোগান, মনে হল, যেন ওর বিরুদ্ধেই

ধ্বনিত হচ্ছে। ভয় বাড়ল। যৌথ-পরিবারের নিরাপত্তার দুর্গ ভেঙে পড়ছে, সেই পর্বে ইউনিয়ন কর্মীদের ক্রুদ্ধ গর্জন বিনোদকে তাড়া করে আসছে—এই রকমই ওর মনে হয়েছিল। সেক্রেটারী তাকে পরিত্যাগ করেছেন, ইউনিয়নকে সে আপন মনে করতে পারছে না, পারিবারিক নির্ভরতার অভাব ঘটেছে। স্টোররুমের আধা-অন্ধকার আলো-বাতাসহীন ঘরে নিজেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 'কনডেমড্' সেলে নির্বাসিত আসামী মনে হল। মৃত্যুভয় অক্টোপাসের মত আটটা শুঁড় বের করে ওকে আঁকড়ে ধরতে এগিয়ে এল। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার দরুণ শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ওকে আরো ভয়ার্ত করে তুলল। এই সব সামাজিক ভয় সম্পর্কে ওর মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। কাজেই রক্তচাপবৃদ্ধির ফলে আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে—এই চিন্তাই ভয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে বিচার আলোচনার ফলে ওর মৃত্যুভয় ও বন্ধজায়গার ভয়;—এই দুই ভয়েরই উৎস আবিষ্কৃত হল। আতঙ্ক অবসেশনে দাঁড়াবার একটি কারণের উল্লেখ আগেই করেছি। 'যান্ত্রিক বিভ্রাট' সত্যিই ওকে বিভ্রান্ত এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসার উপর অবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। বিশেষজ্ঞের কৈফিয়তে সায় দিলেও মেনে নিতে পারেনি। কয়েকবার ঘন ঘন একই ধরণের অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতা কমিয়ে দিল। পারিবারিক ও অফিস-সমস্যার কোনো সমাধান না ঘটার ফলে আতঙ্ক ক্রমশ অবসেশনে পরিণত হল। মস্তিষ্কের কয়েকটি কেন্দ্র উত্তেজিত অবস্থানে নিষ্ক্রিয় অনড় হয়ে থাকল।

আগেই বলেছি, আবেশকালীন অবস্থায় ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি বিশেষ কাজে আসে না। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই এই মত পোষণ করেন। সব রোগীর বেলায় বা সকল ক্ষেত্রে এই মত অভ্রান্ত, একথা বলা চলে না। সাধারণত দেখা যায় যে চিকিৎসক ভয় দূর করবার জন্য কেবলমাত্র আশ্বাস দিয়ে চলেছেন, রোগী আশ্বস্ত হচ্ছে না। কি ধরণের আশ্বাস? আপনার প্রেসার স্বাভাবিক মাত্রাতেই রয়েছে, প্রস্রাবে এ্যালবিউমিন নেই, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামে কোনো দোষ পাওয়া যায় নি। মিছিমিছি কেন ভয় পাচ্ছেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বশালী চিকিৎসকের এই ধরনের আশ্বাসে একেবারে কাজ হয় না, এ ধারণা ঠিক নয়। সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য অন্তত ভয়ের নিরসন ঘটে। কিন্তু স্থায়ী কোনো ফল আশ্বাস থেকে পাওয়া যায় না। অতি সামান্য কারণে বা অনেক সময় বিনাকারণেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রোগী চিকিৎসকের কাছে ফিরে আসে। তখন হয়ত তাকে পাঠানো হয় বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনি 'ট্রাংকুইলাইজার'-এর ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে আগের চিকিৎসকের কথাগুলোই হয়ত আরো একটু গুছিয়ে বলেন। এ রকম হলে ফল পাওয়া যাবে না। মনে রাখা দরকার, আশ্বাস আর ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি এক জিনিস নয়। 'হার্ট ঠিক আছে, প্রেসার ঠিক আছে'— এই আশ্বাস শুধু তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন ভয়ের উৎস হার্ট বা প্রেসার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভয় হার্ট বা প্রেসারের উপর প্রক্ষিপ্ত, আসল উৎস অন্যত্র। সেই সব ক্ষেত্রে আশ্বাসে ফল হবে না, এটাই স্বাভাবিক। প্রেসারের ভয় ওষুধ এবং সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের ফলে হয়ত দূর হল; কিন্তু তার বদলে অন্য এক ভয়ের আবির্ভাব ঘটল এমন হামেশাই দেখা যায়। বিনোদের বেলায় ভয়ের কারণ আমরা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছি, তাকে ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি বলা চলে। বিনোদকে শুধু আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে না, তাকে ভয়ের উৎসমুখের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাখ্যা যদি রোগীর মনঃপূত হয়, সে যদি ভয়ের কারণ সঠিকভাবে বুঝতে পারে, তাহলে কি রোগ-নিরাময়ের পথ প্রশস্ত হবে? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া চলে না। সন্দেহ নেই যে, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের দিক থেকে ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি খানিকটা সাহায্য করে। সমাজের শ্রেণীসংস্থান, শ্রেণীসংগ্রাম সামাজিক সংসর্গে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান রোগীকে অনেকখানি শক্তিশালী করে। কিন্তু রোগী যদি নতুন জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে বদলাবার সুযোগ না পায়, তাহলে ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি পুরোপুরি ফলপ্রসূ হতে পারে না। সমাজ ও সমাজস্থিত অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রায় নতুন করে জীবন আরম্ভের মত কঠিন কাজ। মনোবিদের নির্দেশ আর ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা আজন্ম পোষিত ব্যবহার ও ধ্যানধারণাকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বদলে দেবে, এই ধরনের আশা কোনো চিকিৎসকই পোষণ করেন না। পরিবর্তনের ইচ্ছা মনে জাগলেও, পারিপার্শ্বিক অসুবিধার জন্যে হয়ত পরিবর্তনের সুযোগ পাওয়া গেল না। রোগীর কর্মস্থানে যে-সব অসুবিধা ও ভয়ের উৎস রয়েছে, সেগুলো চিকিৎসকের ইচ্ছায় বা রোগীর অভিলাসে রাতারাতি মিলিয়ে যাবে না। পুরনো ভয়ের উদ্দীপক মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে আবার অবিশ্বাস, সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে। তা ছাড়া, মনে রাখা দরকার, মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হওয়ার ফলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সহজে তৈরী হতে চায় না। সব থেকে বড় কথা, আবেশের কেন্দ্র যাকে আমরা "ইনার্ট একসাইটেবল' বলে বর্ণনা করেছি, সহজে স্বাভাবিক নিস্তেজনাধর্ম লাভ করে না।

এই সব কারণে বলা হয়ে থাকে যে ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপী আজকের আবেশ দূর করতে পারে না। কিন্তু আবার এও ঠিক যে একমাত্র এই ব্যাখ্যামূলক চিকিৎসাই আরোগ্যের পথ খুলে দিতে পারে, এবং পথকে সুগম করতে পারে। যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষের শক্তি-সামর্থের সঠিক সংবাদ মিথ্যা ভয়কে অনেক পরিমাণে দূর করে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে অনেকখানি সহজ করে তোলে; ব্যাখ্যামূলক চিকিৎসাও তেমনি ভয়ের এবং উদ্বেগের পরিমাণ অনেক কমিয়ে রোগীকে পরিবেশের বিশেষ করে পরিবেশের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সজাগ ও সংগ্রামী করে তুলতে পারে। আর সৌভাগ্যক্রমে রোগীর পরিবেশে যদি চিকিৎসার সময় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে একমাত্র ব্যাখ্যামূলক চিকিৎসাতেই রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে।

বিনোদের বেলায় কি ঘটল? বিনোদ বুদ্ধিমান ও অনুগামী ব্যক্তি। আমার ব্যাখ্যার তাৎপর্য ও যুক্তি সে মেনে নিল। বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই মেনে নিল। সেক্রেটারীর প্রতি মনোভাব কিন্তু সহজে পরিবর্তিত হল না। অফিসের সহকর্মীদের দুচারজন (যারা প্রত্যক্ষভাবে প্রোমোশন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত) বাদে অন্যের প্রতি ওর মনোভাব অনেকখানি বদলাল। সন্দেহ, ভয়ের মাত্রা কমল। চিকিৎসার প্রথম দিকে কিছু কিছু 'গ্রুপ এ্যাকটিভিটিতে' তার আগ্রহ দেখা গেল। পারিবারিক অশান্তিও 'পৃথক হাঁড়ি' হবার ফলে কিছুটা কমল। কয়েকটি ডাক্তারী আলোচনাসভায় অংশগ্রহণের ফলে প্রেসারের ভয় আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা কম মনে হল। এই সময় সম্মোহিত অবস্থায় কয়েকদিন মাত্র অভিভাবন চিকিৎসাও চলছিল। একলা ট্রামে করে অফিসে যাতায়াত করতে লাগল। আমার কাছে নিয়মিত চিকিৎসার জন্যে আসা বন্ধ হল। তবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল না। পারিবারিক কলহ অথবা অফিসের কোনো অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই বিনোদের দেখা পাওয়া যেত। একলা নয় সংগী নিয়ে আসত। ক্লস্ট্রোফোবিয়া ও আনুসঙ্গিক উপসর্গ মাঝে মাঝেই দেখা দিত। দু-একদিন অফিস কামাই হত; আমার সংগে দু'একদিন ঘণ্টাখানেক ধরে নিজের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত দু'চারদিন বাদে আবার সহজ স্বাভাবিকভাবে চলা ফেরা, অফিস যাওয়া সুরু করত। আগের মতন উপসর্গগুলো দীর্ঘস্থায়ী হত না; আতংকের তীব্রতাও আগের তুলনায় কম। চিকিৎসায়, ব্যাখ্যামূলক চিকিৎসায় আংশিক ফল পাওয়া গেছে। সম্মোহন চিকিৎসার কথা হিসেবের মধ্যে আনছি না; কেননা মাত্র কয়েকটি অভিভাবন তাকে

দেওয়া হয়েছিল। সম্মোহন-ঘুম কোনো-দিনই আনা যায়নি। তবে হিস্টিরিয়ার উপসর্গগুলো মোটামুটি দূরে হবার ফলে স্ত্রী-পুত্রের সংগে অনেকটা সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হল। সামন্তযুগীয় পিতার বা স্বামীর ভূমিকা এ যুগে অভিনয় করা চলে না, এই কথাটা সে ভালভাবে বুঝেছিল।

ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপির কোনো বাঁধা সড়ক নেই, কোনো ফর্মুলা বা নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। ফ্রয়েডিয়ানদের অবাধ-অনুষঙ্গ ইয়ংপন্থীদের শব্দ-অনুষঙ্গ বা স্বপ্নবিশ্লেষণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধাধরা পথে চলে। সেই রকম কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ছকের মধ্যে এই চিকিৎসাকে ফেলা যায় না। ব্যক্তিকে 'ইনডিভিডুয়াল' মনে করেও ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপিতে ব্যক্তিকে পুরোপুরি সামাজিক মনে করা হয়। এই জায়গায় তার সংগে সমাজের আরো অনেকের মিল। এই মিল বা সাধারণ সামাজিক-মানসিকতা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে কিন্তু পিষ্ট করে না। রোগীর শ্রেণী-আনুগত্য, সামাজিক অবস্থান, সমাজ ও দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা, চিকিৎসকের পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য। তার মস্তিষ্কের টাইপ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা না থাকলে ওষুধ নির্বাচনে বিশৃংখলা ঘটতে পারে অন্তত ওষুধের মাত্রা নির্ণয়ের দিক থেকে উত্তেজনা-নিস্তেজনার পরিমাপ বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিনোদের কাহিনী পড়ে পাঠকরা যেন না মনে করেন যে, এই প্রতিযোগিতামূলক ধ্বংসাত্মক সমাজে সকলেই বুঝি নিউরোটিক হতে বাধ্য। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক এই ধরনের মতবাদ প্রচার করে থাকেন। সমাজই রুগ্ন, কাজেই মানুষও রুগ্ন হতে বাধ্য। এ ধারণা ভ্রান্ত এবং আপত্তিজনক। খুবই অস্বাস্থ্যকর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, তলস্তয়, লেনিন, রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেছে। আজকের রুগ্ন সমাজেও বহু সুস্থ সংগ্রামী মানুষ রয়েছেন যাঁরা সামাজিক মঙ্গল ও মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়াই-এ নেমেছেন। সমাজের মধ্যে বিরোধ দ্বন্দ্ব, সুস্থতা অসুস্থতা, ভাল-মন্দ দুই দিকই রয়েছে। যার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে তার পক্ষে নানারকম ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব। সাইকোথেরাপির প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করা। দৃষ্টিভংগীকে বৈজ্ঞানিক করা। বিশ্লেষণী শক্তিকে তীক্ষ্ণ করে বিচারবুদ্ধি যুক্তিকে জাগিয়ে তোলা। বুদ্ধি বা বিচার ক্ষমতা থাকলে নিউরোসিসের সম্ভাবনা নেই, এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরাও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। "গ্রুপ এ্যাকটিভিটিজ"র পক্ষে আমার পক্ষপাতিত্ব দেখে কেউ যেন এ ধারণা পোষণ না করেন যে যারা দলবেঁধে কাজকর্ম করে, তারা বোধ হয় কোনোদিনই অসুস্থ হয় না। সর্বক্ষণের রাজনীতিক কর্মীদের মধ্যেও বহুরকমের মানসিক রোগ দেখা যায়। উপরতলার নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, নেতৃত্ব বজায় রাখা, ইত্যাদি কারণের জন্য সাইকোসোমাটিক বিশৃংখলার খুবই প্রাদুর্ভাব। রক্তচাপের ভয় নয়, সত্যিকারের 'হাই ব্লাডপ্রেসার', কোলাইটিস, পেপ্‌টিক আলসার ইত্যাদি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তাদের রোগ নেতাদের মধ্যে বিরল নয়। সাইকোথেরাপিতে চিকিৎসক নিরপেক্ষ থাকেন না। অবাধ অনুষঙ্গপদ্ধতির চিকিৎসকদের মত তাঁরা নিরপেক্ষ থাকা প্রয়োজনও মনে করেন না। কিন্তু তা বলে প্রত্যেক রোগীকে কোনো মতবাদে দীক্ষিত করতে তাঁরা চান না। উপসর্গের পার্থক্য, রোগীর শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যানধারণা, ব্যাখ্যাগ্রহণ ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপিকে ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী করে তোলা হয়। সব রোগীর পক্ষে আবার ব্যাখ্যামূলক চিকিৎসা উপযুক্ত নয়।

সব রকম মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেই চিকিৎসক এবং রোগীর পারস্পরিক সম্পর্ক চিকিৎসার ফলাফলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগে না। ফ্রয়েডিয়ানরা এই সম্পর্কের উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক হলে চিকিৎসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকে বেশি। বিনোদ, আগেই বলেছি বিনয়ী নম্র এবং বুদ্ধিমান, কিন্তু রোগী হিসেবে মোটেই সুবিধার নয়। চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিনোদের কোনো অভিযোগ থাকে না, চিকিৎসকের সব ব্যাখ্যাই তারা নির্বিচারে মেনে নিয়ে থাকে, কিন্তু চিকিৎসকের নির্দেশ তারা পুরোপুরি মেনে চলে না। চিকিৎসককে শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি বিনোদ। উপসর্গের তীব্রতা হ্রাস পেলেই ডাক্তারকে এড়িয়ে চলেছে সে। কিছুদিন পরে নিজের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী নিজেকে চিকিৎসা করেছে। 'ড্রাগ্‌-এ্যাডিক্‌ট' বনে যাবার প্রবণতা তার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার অনুভূতি আধিক্য ও কল্পনাপ্রবণতা তাকে রক্ষা করে এসেছে। ওষুধের দরুণ যে কোনো সামান্যতম শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনকে সে ভয়ের চোখে দেখেছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই একটি ওষুধ ছেড়ে অন্য ওষুধের প্রতি আসক্তি দেখিয়েছে। এইভাবে এতদিন রক্ষা পেয়েছে। তবে ভবিষ্যতে কি ঘটবে বলা যায় না।

—মনোবিদ

।। নয় ।।

অধ্যাপকদম্পতির ওপর রাগে ফেটে পড়ছিল চীনা। কর্নেল চলে যাবার আধ-ঘণ্টা পরেই হঠাৎ যেন ধ্যান ভাঙে সুদেষ্ণার। ...সর্বনাশ! আমার গুরুদেবের ছবি! তাড়াহুড়ো বেরিয়ে আসবার সময় একেবারে ভুলে গেছি। ওগো, ওঠ, ওঠ। শিগগির চলো!......বলে অধ্যাপককে চাবির গোছা এগিয়ে দিয়ে ওরা চলে যায়। চীনা উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। স্বাতী মুখ তুলে ব্যাপারটা দেখেছে মাত্র। কোন মন্তব্য করেনি।

ঘড়ি দেখল চীনা। এগারোটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি আছে। এখনও দিব্যেন্দুরা ফিরল না। সে বলল, নীচে গিয়ে একবার ঝাকরাগঞ্জ ফাঁড়িতে ফোন করলে হত। এত দেরি হচ্ছে কেন ওদের?

স্বাতী কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে ততক্ষণে। সে বলল, আপনি যান না নীচে। আমি থাকতে পারব।

চীনা দাতে ঠোঁট কামড়াল। একটুখানি ভাবল যেন। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, থাক গে।

কেন?

চীনা হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমার ভয় করছে।

সেই সময় বাইরে কোথায় গাড়ির গর্জন শোনা গেল। দুজনে পরস্পর তাকাতাকি করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর স্বাতী বলল, পুলিশ এল হয়ত। চলুন চীনাদি, আমরা নীচে যাই। বোধ হয় দিব্যেন্দুরাও এসে গেছে ওদের সঙ্গে।

দুজনে উঠে এসে দরজা খুলতেই জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। দুজন কনস্টেবল এগিয়ে আসছিল। চীনাকে দেখে তাদের একজন বলল, আপনারা বেরোবেন না। ঘরে থাকুন।

চীনা বলল, আমাদের লোকেরা কোথায়?

কনস্টেবলটি মাথা দোলাল। বলতে পারছিনে। আমরা থানা থেকে আসছি। ওনারা হয়ত এখনও ফাঁড়িতে আছেন।

ওরা দুজনে থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সিগ্রেট বের করে জ্বালল। চীনা আর স্বাতী দরজা বন্ধ করে দিল ফের। স্বাতী একবার বলল, আপনার দরজায় তালা দিয়েছিলেন তো?

চীনা একটু হেসে বলল, দিয়েছি মনে পড়ছে। ডাইনিং হলে যাবার সময়......হ্যাঁ, দিয়েছি।

দুজনে বিছানায় বসল। স্বাতী বলল, ঘুম পেলে শুয়ে পড়ুন বরং। ওই বিছানাটাতেও শুতে পারেন।

কেয়া পাড়ে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
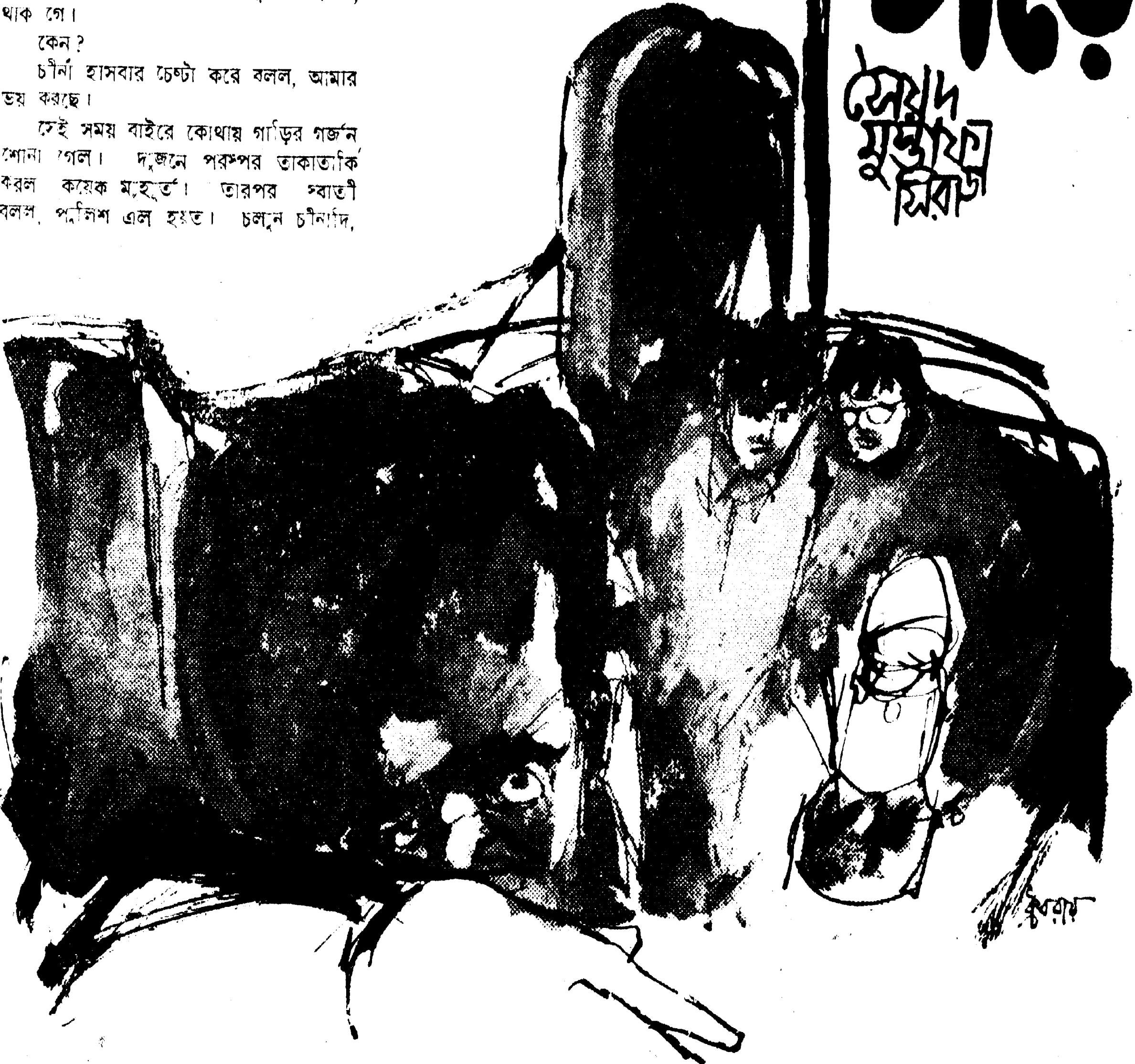
চীনার চোখদুটো লাল। হাই উঠছিল বারবার। সে কল্পনার বিছানায় চলে গেল। বলল, আপনিও ঘুমোন। ওরা এসে ডাকবে।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর স্বাতী উঠে টেবললাম্পটা জেবলে দিল এবং হাত বাড়িয়ে সিলিঙের উজ্জ্বল আলোটা নিবিয়ে দিল। হাল্কা নীলধূসর আবছায়ায় ঘরটা রহস্যময় হয়ে উঠল সংগে সংগে।

কতক্ষণ পরে চীনা ডাকল, ঘুমোলেন?

স্বাতী ঘুমোয়নি। জবাব দিল, না।

একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লাগছে কিন্তু।

কী?

জাকরাগঞ্জের আঁধারমহলে ঢুকেছিলেন শুভ নীরেন আর বিভাসবাবু। তারপর নীরেন আর ওই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, শুভ থেকে গেল। ও'রা ভাবলেন, শুভ আগে বেরিয়ে চলে গেছে। এদিকে শুভকে পরে দেখা গেল মার্ডার হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার অদ্ভুত লাগছে ঘটনাটা। সারা বিকেল গেল, সন্ধ্যা গেল, শুভ ফিরল না—অথচ নীরেনবাবুরা......

স্বাতী সক্রোধে বলে উঠল, নীরেন চেপে যাচ্ছে আসলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চীনাদি, ও ছাড়া কেউ শুভকে খুন করেনি। ও গোঁয়ার যত, তত ধুরন্ধর। ওকে আমি চিনি।

চীনা বলল, কী চেনেন?

স্বাতী চাপা গলায় বলল, এক সময় নীরেনকে পুলিশ খুজত। কোথায় কী করেছিল নাকি। ওর এক বন্ধুর কাছে শুনেছি, নীরেন রাজনীতি করে-টরে। আই মিন, সে রাজনীতি নয়—রীতিমত বোমা ছোড়া স্ট্যাবিং গুন্ডাবাজি।

চীনা একটু চুপ করে থেকে বলল, হতে পারে। কিন্তু শুভকে সে কেন খুন করবে? সেইটেই অদ্ভুত লাগছে।

স্বাতী দৃঢ়কন্ঠে বলল, করবে। কল্পনার জন্যে।

কল্পনার জন্যে মানে?

একটু ইতস্তত করে স্বাতী বলল, কল্পনা এত বয়ে গেছে জানতাম না। এখানে আসার পর হঠাৎ যেন পাগলের মত যাচ্ছেতাই কান্ড শুরু করল। দিব্যেন্দুর সংগে মাখামাখি দেখে ওকে বকছিলাম। অথচ দিব্যেন্দু বলল, নীরেনের সংগেও নাকি খুব গলাগলি করেছে কখন। তারপর শেষে শুভর সংগে শুরু করেছে। কাল রাত্রে শুভ আর কল্পনা হোটেল ছেড়ে বাইরে কোথায় ছিল। ফিরল রাত আড়াইটে তখন। এবার বুঝতে পারছেন?

চীনা বলল, হয়ত তাই। কিন্তু কল্পনা......

স্বাতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কল্পনাকেও খুন করেছে।

ফের কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর চীনা বলল, কী কুক্ষণে যে ছবিটা আঁকতে গেলাম। আমার বুক কাঁপছে।

ছবির সংগে এর কী সম্পর্ক? কল্পনা প্রশ্ন করল।

চীনা বলল, প্রথমে ধরুন, মোতিঝিল মসজিদের দেয়ালে সেই দুলাইন কবিতা। মধ্যরাতে বনের মাথায় উঠলে চাঁদ / ডোবার ধারে পাতব হরিণ ধরার ফাঁদ /...তারিখ লেখা ছিল নীচে ৮-২-৭০ তার মানে গত কালকের তারিখ। শুভই কবিতাটা দেখেছিল। তারপর ওইদিন রাত্রে সে হোটেলের বাইরে ছিল অনেকটা সময়। কল্পনাও ছিল না। আমার মনে হচ্ছে কি জানেন?

স্বাতী কনুই ভর করে মাথাটা তুলল। ...কী?

কিছু একটা আবিষ্কার করেছিল শুভ। হয়ত কল্পনাকেও বলেছিল সেটা। কিংবা হয়ত কল্পনাও কিছু টের পেয়েছিল। তারপর ওরা কাল রাত্রে ডোবার ধারেই গিয়েছিল—না, আপনি যা ভেবেছেন তা নয়, সম্ভবত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল ওদের যাওয়ার পিছনে।

তাহলে আমাদের বলল না কেন? বলাই স্বাভাবিক ছিল।

বলেনি—হয়ত নিছক তামাসার ব্যাপার ভেবেছিল। হয়ত......

স্বাতী ফোঁস করে উঠল।...আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, ইওর 'হয়ত'।

চীনা ফিসফিস করে বলল, আই সাসপেক্ট বিভাসবাবু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই খুন করেছে শুভকে। তাছাড়া কল্পনাকেও...গড হেলপ আস্...বলে সে থেমে গেল হঠাৎ।

স্বাতী উঠে বসল বিছানায়। বিভাসবাবুর সংগে কিসের শত্রুতা ছিল শুভর?

চীনা চুপ করে রইল।

বলুন?

চীনা তবু চুপ।

চীনাদি?

উঁ?

বিভাসবাবু কেন শুভকে খুন করবেন?

চীনা দুহাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ পাশ ফিরল। স্বাতী দৌড়ে এল তার কাছে। সে রীতিমত অবাক। পিঠ ধরে ডাকতে থাকল, চীনাদি, এই চীনাদি! আরে, কী হল বলবেন তো?

চীনা ঘুরল এবার। নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বলল, কথাটা কাকেও বলবেন না তো?

না, না। বিলিভ মি। আপনার গা ছুঁয়ে বলছি।

বিভাসবাবু নীরেনের চেয়েও সাংঘাতিক লোক। আমি ওকে চিনি। ও একটা জুয়াড়ি। মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া জীবনে আর কিছু বোঝে না।

সে কি! আপনি চেনেন নাকি ওকে?

হ্যাঁ, চিনি।

বলেন নি তো এতদিন! স্বাতী ফুঁসে উঠল। অ্যাদ্দিন আমরা অমন একটা স্কাউন্ড্রেলের সংগে মিশেছি—তার কিছু না জেনে! আশ্চর্য! আপনার সাবধান করা উচিত ছিল!

চীনা একটু ইতস্তত করে বলল, বলিনি। তার কারণ, তাতে আপনারা আমায় ভুল বুঝতেন।

কেন? ভুল বোঝবার কী আছে?

আছে। বলে হঠাৎ চীনা মিত্র হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁপতে থাকল। জানেন? এক-সময় ওর সংগে আমার বিয়ে হয়েছিল। বছর দুই আগে আমাদের ডিভোর্স চুকে গেছে। আমি একটুও ভাবিনি যে এখানে আমার এত কাছে ও এসে বসে রয়েছে। উঃ, আই...আই কুড নট হেলপ ইট...আনএকসপেক্টেড!

স্বাতী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বলল, বুঝেলাম। তাই আপনারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলতেন দেখেছি। কিন্তু চীনাদি, উনি কেন শুভকে খুন করবেন?

সেইটেই বুঝতে পারছি না। কিন্তু... চীনা বিড়বিড় করে বলল....কিন্তু আমার ক্রমাগত সন্দেহ হচ্ছে, আঁধারমহলে ও শুভদের সংগে ছিল। ওর মত লোকের অসাধ্য কিছু নেই। শুধু বুঝতে পারছি না, মোটিভটা কী!...আচ্ছা স্বাতী, শুভর অনেক খবর তো আপনি জানেন। শুভর কি জুয়াখেলায় নেশা ছিল জানেন?

স্বাতী মাথা দোলাল।...কই, শুনিনি তো!

চীনা কী বলতে যাচ্ছিল, দরজায় করাঘাতের শব্দ হল।...ওই ওরা এল বুঝি! বলে সে সশব্যস্তে গিয়ে দরজা খুলে দিল। তার পিছনে স্বাতীও ছুটে গেছে।

দরজা খুলতেই দিব্যেন্দুকে দেখা গেল। তার পিছনে একজন পুলিশ অফিসার। দিব্যেন্দুকে গাছের গুঁড়ির মত খসখসে আর পাংশু দেখাচ্ছিল। সে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে স্বাতীর বিছানায় গিয়ে ধুপ করে বসল। পুলিশ অফিসার ঘরের ভিতরটা উঁকি মেরে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর মৃদু হেসে বললেন, ঠিক আছে। আপনারা রাতের মত নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। সকাল আটটা-নটার মধ্যে আপনাদের একটু বিরক্ত করব। আর দেখুন, এই সময়ের মধ্যে প্লীজ হোটেল ছেড়ে কেউ বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না।

স্বাতী কতকটা ককিয়ে উঠল, কল্পনার খোঁজ পেয়েছেন আপনারা?

না। তবে আমরা চেষ্টা করছি। থ্যাংকু, চলি!...

পুলিশ অফিসার চলে গেলে স্বাতী দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর কপাটে পিঠ রেখে সোজা দাঁড়াল। শান্ত অথচ ভিজে গলায় প্রশ্ন করল, শুভকে দেখলে?

দিব্যেন্দু মাথা দোলাল। খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে তাকে। যেন কথা বলবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে।

চীনা বলল, কিসে খুন হয়েছে? ওর ডেডবডিটা এখন কোথায়? আর নীরেনবাবুরা?

দিব্যেন্দু হাতের ইশারায় জলের গ্লাস দেখাল। চীনা পাশের টেবিলে রাখা জলের কুঁজো থেকে গ্লাসে জল ঢেলে আনল। চকচক করে জলটা খেয়ে গ্লাস চীনার হাতে দিল সে। চীনা গ্লাসটা হাতে রেখেই ফের প্রশ্ন করল, বলুন—কী সব দেখলেন?

বলছি।... দিব্যেন্দু স্বাতীকে হাত ইশারায় কাছে আসতে বলল। স্বাতী এল না। দিব্যেন্দু মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে থাকল, আমরা প্রথমে গেলাম ফাঁড়িতে। সেখান থেকে পুলিশ

আমাদের সেই আঁধারমহলে নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। টর্চলাইটের আলোয় আমরা এগোচ্ছিলাম। সে সাংঘাতিক অন্ধকার কল্পনা করতে পারবেন না। ওপরে মস্তো উঠোন। আর শেষপ্রান্তে মসজিদ আছে, নীচে তিন সারিতে মোট পনেরটা ঘুপচি ঘর। একটু লম্বা হলে ছাদে মাথা ঠেকে যেত। প্রতিটি ঘরে একটা করে কবর। যাক্ গে, এঁকেবেঁকে এদরজা ওদরজা পেরিয়ে একটা ঘরে পোঁছলাম। আলোর ছটা আসছিল একটু আগে থেকে। গিয়ে দেখি, একটা হ্যাসাগ জ্বলছে মেঝের। আর কবরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে শুভ।

দিব্যেন্দু হঠাৎ চুপ করলে চীনা বলল, তারপর?

লাশটা প্রথমে দেখতে পায় আঁধার-মহলের দারোয়ান— ঠিক দারোয়ান নয়, যাকে বলে সেবায়েত। তার কাজ হল, সন্ধ্যার প্রতিটি ঘরে একটা করে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া। বড়ো আঙুলের সাইজ মোমবাতি। ...দিব্যেন্দু সাইজটা আঙুলের সাহায্যে দেখাল। ফের বলতে থাকল, কাজেই আলো খুব স্পষ্ট ছিল না। সেবায়েত লোকটি কবরের ওপর শুভকে দেখে চমকে ওঠে। প্রথমে ভেবেছিল, কোন ট্যুরিস্টবাবু মাতাল হয়ে এখানে পড়ে রয়েছে। এমন ঘটনা আকছার ঘটে নাকি এখানে। যাই হোক, সে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার সন্দেহ হয়।

আঙুল ভালভাবে পরীক্ষা করার পর সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে কাছের ফাঁড়িতে খবর দেয়। সকাল দশটায় যে তিনটি ট্যুরিস্টবাবু ভিতরে ঢুকেছিল, এ তাদেরই একজন। লোকটা ঠিক চিনতে পেরেছিল। তারপর পুলিশ আসে। পুলিশের ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন, খোঁজখবর নিতে-নিতেই রাত নটা বেজে গিয়েছিল। সদর থানা থেকে অফিসার আসবার পর প্যালেস হোটেলে ওরা ফোন করে।

চীনা বলল, কীভাবে খুন হয়েছে দেখলেন?

দিব্যেন্দু বলল, সকালে আরেকদফা সরেজমিন তদন্ত করবে—তারপর মর্গে পাঠাবে। তখন জানা যাবে। তবে আপাতত যা মনে হল, গলা টিপে মারা হয়েছে ওকে। ওঁরাও তাই বলছেন। কারণ শুভর চোখ-দুটো আর জিভ বেরিয়ে খুব ভয়ঙ্কর লাগছে। টর্চের আলোয় ওর গলায় আঙুলের দাগ অনুমান করা যাচ্ছিল।...ওঃ, অমানুষিক। আমার বমি আসছিল দেখে।

চীনা বলল, মীরেনবাবুরা কোথায়?

দিব্যেন্দু মুখ নামাল।...ওদের দুজনকে সদর থানায় নিয়ে গেছে। জিগ্যেসপত্তর করবে।

এতক্ষণে স্বাতী এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, তোমায় কিছু জিগ্যেস করেনি?

করেছিল।...দিব্যেন্দু একবার স্বাতীর দিকে তাকিয়েই ফের মুখ নামাল।...আমি এখানে আসার পর যা সব ঘটেছে যা জেনেছি সবই বলেছি পুলিশকে। সম্ভবত সেইজন্যে ওর হোটেলের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। সবাইকে জিগ্যেসাটিগ্যেস করবে নিশ্চয়। আমার সঙ্গে আসামাত্র ওরা শুভর বিছানা জিনিসপত্র পরীক্ষা করেছে। দরজায় তালা এঁটে দিয়েছে। আমি বলেছি, পাশের ঘরে শোব। আমার এক আত্মীয়া ওঘরে আছেন।

চীনা পাংশুমুখে বলল, তাহলে তো যা ভেবেছিলাম, তাই হল!

স্বাতী তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল তার দিকে... কী ভেবেছিলেন চীনাদি?

চীনা মাথাটা সামান্য দোলাল।...তেমন কিছু না। এই—মানে—স্ক্যান্ডালগুলো ছড়িয়ে পড়বে। আমরা সবাই সাসপেক্ট হয়ে যাব। এবং...

স্বাতী একটু ঝুঁকল। এবং?

পুলিশের ব্যাপার।... চীনা বিমর্ষকণ্ঠে বলল। খুব শিগ্‌গির এখান থেকে নড়তে দেবে না ওরা। এদিকে খুব বেশি ফান্ডও আমার নেই। খরচ জোগাবে কে?

স্বাতী নির্ভীক স্বরে বলল, সে দেখা যাবে। ভাববেন না। আর—পুলিশ যদি আমাদের আটকে রাখে, সে খরচ ওরা জোগাবে। আমার যত দায় শুধু কল্পনার জন্যে। ওর পাত্তা পেলেই আমি নিশ্চিন্ত জ্যান্ত হোক বা মড়া হোক, আই ওয়ান্ট হার।

দিব্যেন্দু আর চীনা দুজনেই বিস্মিত-দৃষ্টে তার দিকে তাকাল।...

পোড়ো আমবাগান থেকে কর্ণেল যখন ফিরে আসছেন, তখন কেল্লাবাড়ির প্রধান ফটকে দুবার ঘন্টা বাজল। দূরে থেকে প্যালেসহোটেলের একটা ঘরে আলো দেখা যাচ্ছিল। তার উত্তরের জানালাটা খোলা। আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছিলেন তিনি। মনে মনে হাসছিলেন, একটু আগের ঘটনাটি ভারী কৌতুককর। ওই অদ্ভুত লোকটি যে-মুহূর্তে টের পেয়েছিল যে ইনি তিনি নন, সঙ্গে সঙ্গে আচমকা ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত পা-ঝাড়া দিয়ে বনবাদাড় ভেঙে দৌড়ল। হরিবল! এ দৃশ্যের কোন তুলনা নেই।

কিন্তু ওখানে কোথাও তো কল্পনাকে আবিষ্কার করা গেল না। হোটেলের পেছন দিকে এসে এবার সতর্ক হলেন কর্ণেল। সম্ভবত দিব্যেন্দুরা পুলিশকে আগাগোড়া সব বলেছে। এবং পুলিশও যথারীতি এই বাগান আর হোটেলের চৌহদ্দী ঘিরে ফেলেছে। যা বোঝা গেল, রাত্রিবেলা ওরা তদন্তে নামছে না। সকাল হলেই খোঁজা-খুঁজি শুরু করবে। কাঁটায় ছিঁড়ে যাবার দাখিল প্যান্টকোট, টুপিটা ঝোপের মাথায় আটকে যেতে চায়—তা সত্ত্বেও টর্চ না জ্বেলে অতিকষ্টে কর্ণেল এগোচ্ছিলেন। পিছনের খিড়কিতে ঘুরন্ত সরু সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময় তাঁর মনে হল, ওপরে বারান্দায় পুলিশ পাহারা দিচ্ছে না তো?

এ একটা সমস্যা। তবে ওরা বারান্দায় থাকলে সোজাসুজি খিড়কি দরজাটা নজরে পড়বে না ওদের। বরং সিঁড়ি থেকে পা বাড়িয়ে কার্ণিশে উঠতে চীনা মিত্রর জানালায় পৌঁছনো যাবে। বিদেশি কায়দার গরাদবিহীন জানালা। খড়খড়ি আছে। সামান্য ফাঁক করে হাত গলালেই ছিটকিনি খোলা যাবে। অবশ্য আরেকপ্রস্থ কাচের বাধা থাকলে সমস্যা আছে। কাচের পাল্লা ছিল কি? আজ সকালে চীনা মিত্রর ঘরে অনেক সময় ধরে আড্ডা দিয়েছেন। তখন ঘরটার সবকিছু লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু কাচের পাল্লা?—কিছু মনে পড়ছে না তো!

তার ওপর এই প্রচণ্ড শীত। বয়সও হয়েছে। সে জোর আর গায়ে নেই। তবে কর্ণেল তাঁর জীবনে বহু দুঃসাহসিক কাণ্ড করেছেন। নার্ভ একটুও বেঠিক হবার কথা নয়। আস্তে আস্তে খুবই সন্তর্পণে তিনি পা বাড়ালেন বাঁদিকে। কার্ণিশ স্পর্শ করতেই সিঁড়ির রেলিং ধরে প্রায় শূন্যে ভেসে উঠলেন।

খড়খড়িওয়ালা কাঠের জানালাটা খুলে গেল। কী সর্বনাশ! কাচের পাল্লা যে!—নাঃ, ভাগ্য ভাল। পাল্লাটা ভাঙা। বাইরে থেকে কবে কেউ ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছে খানিকটা। হাত গলিয়ে ছিটকিনি খুললেন কর্ণেল। তারপর প্রায় নিঃশব্দে ঘরে ভেতর গলিয়ে গেলেন। মাত্র চার ফুট নীচে মেঝে। কোন আঘাতই লাগল না।

ভিতরে জিনিষপত্র বেশি কিছু নেই মনে হচ্ছে। সাবধানে টর্চ জ্বালতেই অগোছাল ছবি, ছবির কাগজ, ইজেল, অজস্র তুলি, রঙের টিউব, কতকিছু নজরে পড়ল। বিছানার ওপর আগাগোড়া কম্বল ঢাকা দিয়ে কে শুয়ে আছে দেখেই কর্ণেল চমকে উঠলেন। সে-কি! তাহলে চীনা স্বাতীকে ফেলে চলে এসেছে কখন?

আসবারই কথা। বার্ধক্যে বুদ্ধিভ্রম ছাড়া কী! পুরো দুটো ঘন্টা কর্ণেল বাইরে ছিলেন। এর মধ্যে দিব্যেন্দুরা থানা থেকে ফিরে আসতে পারে। কাজেই চীনাও নিজের ঘরে এসে ঘুমোতে পারে। ইস, কী বোকামিই না হয়ে গেল! চীনা সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। বেচারার শিল্পী নার্ভে কতখানি সইবে? জেগে থাকলে এক্ষুণি বিদঘুটে কাণ্ড শুরু হত। কর্ণেল এক অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যেতেন।

এবং এখনও যে কোন মুহূর্তে চীনা জেগে উঠলে তেমনি সম্ভাবনা রয়েছে। থাক্, ওকে জাগিয়ে কাজ নেই। দরজা নিঃশব্দে খুলে বেরোলে যদি পুলিশের সামনে পড়েন, একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন হবে না। তিনি যে হোটেলের ভিতরে ছিলেন, এটা তো প্রমাণ করা যাবে।

দরজার কাছে আসতেই দ্বিতীয়বার চমকালেন কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার: দরজা যে বাইরে থেকে বন্ধ!

মুহূর্তে বুকের ভিতর একঝলক রক্ত নেচে উঠল। হৃদপিণ্ড একবার কেঁপে উঠল। তারপর দ্রুত বিছানার দিকে এগিয়ে কম্বলটা একটানে তুলে ফেললেন।

কল্পনা শুয়ে রয়েছে। মুখটা পাশে ঘোরানো। নাকে ঠোঁটের পাশে জমাট কিছু রক্ত। হিম শরীর। আর তার বুকের ওপর সম্ভবত চীনা মিত্রর সেই হারানো ছবিটা

কর্ণেল কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত—তারপর জানালার দিকে এগোলেন। পালাতে হবে এক্ষুনি। তা না হলে...

কিন্তু সে সুযোগ নেবার আগেই আচমকা দরজা খুলে গেল। সুইচ টেপার শব্দ ও আলো জ্বলল। চীনা মিত্র দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়েই কাঠ। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল সে, কর্ণেল!...পরক্ষণে বিছানার দিকে তাকিয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, কল্পনা!

কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার ঠোঁটে আঙুল রেখে তার দিকে এগোলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

৯ থেকে ১৬ এপ্রিল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তরুণ শিল্পী বরেন বসুর ১৬ খানি ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল।

বরেন বসুর ছবিতে কালো রেখায় ফিগারের একটু স্টাইলাইজড রূপ খোঁজার চেষ্টা রয়েছে। রঙ অনেক সময় মোজাইকের মত করে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন ছবিতে বালির জমি প্রায় রিলিফের চেহারা নিয়েছে। রঙ অনেক জায়গায় সংযত, ধূসরের কোল ঘেঁসে গিয়েছে। কিছু ভারতীয় প্রতীক ও দেবদেবীর মূর্তির ব্যবহার দেখা গেল—তার মধ্যে গণপতি ও দুর্গামূর্তি উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য অনেকখানি তবে চিত্রার্পিত রূপ কতখানি সাফল্য লাভ করেছে তা চিন্তার কথা, যেমন তিনটি লাল বাজীকরের মত চেহারাকে "কার্নিভাল অব লাইফ" বলা চলে কিনা বা নীল চাঁদের মত আকারে মধ্যে শাদা নৌকার মত নকশা, তিনটি হস্তপদবিক্ষেপকারী মানবাকার মূর্তি একটি দংশনে দ্যত সর্প ও একটি চতুষ্পদ প্রাণীকে "লাইফ—অ্যান আর্টিস্টস ইম্প্রেশন" বলে সকলে গ্রহণ করবেন কিনা তা নিঃসন্দেহে বলা যাবে না। ছবিগুলির গ্রাফিক গুণ মন্দ নয়।

*

৫৪বি মহানির্বাণ রোডের উত্তরঙ্গ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট ইনস্টিটিউটের ঘরে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপকথা নিয়ে আঁকা ছবির একটি সিরিজ ৬ থেকে ১১ এপ্রিল প্রদর্শিত হল।

কালো রেখা এবং অল্প কয়েকটি মৌল বর্ণে কয়েকখানি ছবি ভালই উৎরেছে।

*

বন্দনা রায় এবং বাণী মিত্রের যৌথ প্রদর্শনীতে (অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ১৫—২১ মার্চ) বাণী মিত্রের ফিগারেটিভ ও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ঘেঁষা রঙীন ছোট গ্রাফিকসগুলির মধ্যে বেশ মুন্সিয়ানার ছাপ পাওয়া গেল। ধূসর রঙের ব্যবহার বেশ ভালভাবেই করা হয়েছে।

বন্দনা রায়ের তেলরঙের কাজগুলি সব সমান স্ট্যান্ডার্ডের নয়। রিপ্রেজেন্টেশনাল ল্যান্ডস্কেপের জন্যে আরো একটু ড্রয়িং ও কম্পোজিশনের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

চৈতন্য কলাবিজ্ঞান কেন্দ্রের ছ'জন শিল্পী ৮ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত অ্যাকাডেমিতে যৌথ প্রদর্শনী করেন। বাণীনাথ ঘোষ দেব-দেবীর ছবি এঁকেছেন। দিলীপ মুখার্জি ছোট মাপের কয়েকটি মৌলিক রঙের জ্যামিতিক ঘেঁষা ডিজাইন উপস্থিত করেন। মুকুন্দলাল ভাদুড়ীর 'বুল' ছবিটি কালো জমিতে হাল্কা লালচে রঙে আঁকা ইন্টারেস্টিং কাজ। শচীন্দ্রকুমার ব্যানার্জি ডেট ক্যালেণ্ডারের ওপর কিছু বিভ্রান্তিকর রেখা ছড়িয়ে কাশীপুরের হত্যাকান্ড আঁকতে চেয়েছেন। শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের রেখাধর্মী 'পুষ্পিত'টি মন্দ নয়।

লেনিন শতবার্ষিকীর যুব উৎসবে রণজি স্টেডিয়ামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭ থেকে ১৫ মার্চ একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এতে লেনিনের কয়েকটি ফটোগ্রাফ ছাড়াও সোভিয়েত শিল্পীদের আঁকা লেনিনের জীবনের কয়েকটি ঘটনার ছবির প্রতিলিপিও ছিল। আর ছিল ভিয়েতনাম সংগ্রামের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ। তাছাড়া কলকাতার শিল্পীরা তাঁদের আঁকা অনেকগুলি ছবির প্রদর্শনী করেন। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের বিভিন্ন মুহূর্তে লেনিন কিভাবে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তার একসারি পরিচ্ছন্ন প্রাচীরপত্র ছিল। সত্যেন ঘোষাল, হরেন দাস, গোপাল ঘোষ, অশেষ মিত্র প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি লেনিনের প্রতিকৃতি এবং লালমোহন মিস্ত্রীর করা একটি ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য।

*

সাদার্ণ অ্যাভিনিউ-এর বিড়লা আকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচারে সোসাইটি অব ওয়ার্কিং আর্টিস্টস ওয়েস্ট বেঙ্গল একটি বড় যৌথ চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। ২২ থেকে ২৮ এপ্রিল অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে দশজন শিল্পী আটাত্রিশখানি শিল্পবস্তু প্রদর্শন করেন। এঁরা হলেন তারাদাস চ্যাটার্জি, সুবল সাহা, অরুণ মুখার্জি, সুচিত্রা দত্তরায়, অনিমেষ সেনগুপ্ত, সুরেন দে ও সমরেশ চৌধুরী।

শিল্পীরা ফিগারেটিভ ও নন-ফিগারেটিভ উভয় রীতিরই চর্চা করেছেন। স্টাইলের বৈচিত্র্যও এঁদের এক একজনের কাজে দেখা গিয়েছে, রঙের ব্যবহারও মোটামুটি মন্দ নয়, কিন্তু খুব একটা পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ চোখে পড়ল না যদিও অনেক কাজকেই বেশ কম্পিটেন্ট বলা চলে।

তারাদাস চ্যাটার্জির চারখানি পেন্টিং-এ গ্রোটেস্ক-এর দিকেই ঝোঁক বেশী। দুখানি ছবিতে তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

সুবল সাহার ভাস্কর্য দুটি পূর্বে প্রদর্শিত। ক্যাকটাস নামে একটি গ্রুপ এবং লোহার রডের সাহায্যে করা কম্পোজিশনটি মন্দ নয়।

অরুণ মুখার্জির পাঁচখানি গ্রাফিকের দুটি ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে করা—মায়াদেবীর স্বপ্ন। অনেকখানি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ঘেঁষা কাজ 'মেডিটেশন' সিরিজের কাজগুলিও তাই। কোথাও ভারতীয় ভাস্কর্য ঘেঁষা ফর্মও দেখা গেল। নিম্নগ্রামের রঙ চড়ানো ছোট ছোট প্রিন্ট।

সুচিত্রা দত্তরায়ের 'বার্ড সেলারের' একটি ছেলে হাস্যরসের অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত। অন্য ছবিগুলির মেজাজ কখনো রোমান্টিক কখনো বা জার্মাণ একসপ্রেসনিজম ঘেঁষা। 'সলিচুড' ছবির স্থাপত্য-নির্ভর ফর্ম তিনজন 'জোকার'-এর মূর্তিতে একসপ্রেশনিজমের ছাপ সুস্পষ্ট। রঙের ব্যবহার প্রশংসনীয়।

অনিমেষ সেনগুপ্ত কিছু ছবিতে ফ্যান্টাসীর অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন। যেমন 'আই অন হার বেড' বা 'ইনসাইড অব মাই হার্ট' ছবিতে। 'হার ড্রেসিং' কতকটা লোকশিল্প ঘেঁষা কিন্তু বিশেষ জমেনি। 'রেড লায়ন' কতকটা জাপানী ঘেঁষা কাজ মন্দ নয়। বাউলের ছবিটি চলনসই কাজ।

সুরেন দের একটি প্রতিকৃতি (ভাস্কর্য) মন্দ হয়নি। 'স্পীড' ও 'কম্পোজিশন' মাঝারি ধরনের কাজ।

সমরেশ চৌধুরীর 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ডের' মূর্তিটি তারের ওপর সিমেন্ট জমিয়ে ইন্টারেস্টিং কাজ। অতিমাত্রায় সরলীকৃত। তারের আরেকটি কম্পোজিশন কতকটা ক্লে'র ড্রয়িং-এর মত হাল্কা চালের কাজে।

*

২৬ জানুয়ারী নর্দার্ন পার্কে এই 'সিট অ্যান্ড ড্র' প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়েছিল শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। কলকাতার প্রায় একশতের কাছাকাছি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ গ্রহণ করে। সিনিয়র, জুনিয়র এবং টাইনি এই তিন বিভাগে ১৬ থেকে ৫ বছরের ছেলেমেয়েদের তিনটি বিষয় আঁকতে দেওয়া হয়। একটি শীতের দৃশ্য, একটি বাজারের দৃশ্য এবং খেলা। তথ্যকেন্দ্রে এদের আঁকা একশো বত্রিশটি ছবি ৪ মে পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়। তিনটি বিভাগে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় যথাক্রমে সুমিলা সেন, লহন সরকার এবং রুচিরা সেনগুপ্তকে। ছোট ছেলেমেয়েদের ছবির বিচার করাও দুরূহ কাজ। কারণ পুরস্কার না পাওয়া ছবিও কোন অংশে কম আকর্ষণীয় নয়। খেলা নিয়ে যে কত-রকমের ছবি কতরকম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আঁকা হয়েছে। ছোট বিভাগের শিল্পীরা প্রধানত প্যাস্টেল ও ক্রেয়নে কাজ করেছে অন্য বিভাগে জলরঙে। এদের সহজাত রঙ আর কম্পোজিশনের চাতুর্য আর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা এক নজরেই চোখে পড়ে। প্রদর্শনীর আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

—চিত্ররসিক

সুখের মেলা

যাঁরা আমাদের কাছের মানুষ অথচ চির অচেনা, গ্রাম-বাংলার সেই অগণিত সাধারণ মানুষের অাঁতের খবর জানাচ্ছে তাঁদেরই আত্মার আত্মীয় বাংলার তরুণতম নতুন লেখক আব্দুল জব্বার এই সুখের মেলায়

জীনের গোলাম

দমকা ভূতুড়ে হাওয়ায় আড়মোড়া ভাঙে বাঁশবনটা।

অক্টোপাসের মতন ডালপালা ছড়ানো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। বুনো বিড়ালের মতো কটা নীলচে চোখদুটো চকচক করে উঠল মস্তানের—তার দোসরা বিবি তহুরা খাতুনের হাই তোলা আলস্য ভঙ্গিতে এলো উদোম বুকখানাতে কাপড়-না-দিয়ে বেহিসাবিভাবে শোয়া দেখে অথবা রাত এগারোটার পর হোজরায় কাদের যেন ডাকাডাকি শুনে। মস্তান জোরে জোরে কোরআন থেকে মুখস্ত-করা সুরা পড়তে লাগল সুর করে—দুলে দুলে—মোমবাতির আলোতে তার পীরহান আর টুপিপরা দাড়ি-ভরা চেহারার ছায়াটা দেওয়ালে দুলতে লাগল। দরজার ফুটো দিয়ে লোকদু'জন ভিতরে তাকিয়েই স্তম্ভিত। একটা মড়ার মাথা, বাটিতে জাফরান গোলা, তাতে পালকের কলম ডোবানো, সামনে আরবী অক্ষরে দোয়া-তাবিজ লেখা কাগজপত্র আর অলস নিদ্রায় যৌবন-জাগা একটি রমণী—প্রায় বিবস্ত্রা...

'মস্তান সাহেব আছ নাকি গো—আপনি একবার বাইরে এস তো...আমরা হাউড়ী গাঁয়ের লোক'...

দীর্ঘ ছ' ফুট লম্বা কালো পীরহান-পরা গলায় হরেক রঙের কাচের মালা মস্তান সৈয়দ আজহার আলী দস্তগীর খান জাহান আল্ বজবজিয়া খড়ম পায়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল আলো নিয়ে। তীব্র আতরের গন্ধ ছড়ালো চারদিকে।

মস্তান বললে, 'তোমরা আসবে আল্লার ফজলে আমি জানতাম! তোমাদের গেরামে 'ওবা' ঢুকেছে। গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। এগারজন মরেছে বোধ হয়?'

'হুজুরের কিছুই অজানা নেই, দেখছি।'...

এবড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁতে ফ্যারফেরে দাড়ি চুলকে খল-খল করে হেসে উঠল মস্তান। ভয় পেল বোধ হয় লোক দুজন। মস্তান হঠাৎ জোরে শব্দ করে উঠল, 'ইল্!...ইল্...ইল...হক্, লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মোহম্মদর রসুলাল্লা!'...

মস্তান ওদের দুজনের হাত ধরে টেনে আনল হোজরার ভিতরে। লোকদু'জন প্রায় উলঙ্গ মেয়েটির দিকে লোলুপ চোখে তাকাতে লাগল। মস্তান একখানা লাল চাদরে মেয়েটির আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে বললে, 'বসো তোমরা। তোমাদের গায়ে কলেরার বিষ আছে। আজ না এলে কাল ভোরেই তোমরা মারা যেতে।'

লোকদু'জন মস্তানের কথায় ভয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল। কুল-আঁটির মতন হয়ে গেল ঠোঁটদুটো। মস্তান বললে, 'ভয় নেই, আল্লাকে ডাকো। আমি তোমাদের গ্রাম থেকে 'ওবা' তাড়াবো। 'ওবা' হল কলেরার দূত—এক মেয়েমানুষ! ঐ যে! আমার ঘরে এসে শুয়ে আছে। শুনবে ওর মুখ দিয়ে সব ঘটনা বার করব?'

মস্তান হড়হড় করে চল্লিশ গজ কাপড় বার করার মতন তার পেটের ভিতর থেকে মুখস্ত আরবী সুরা টেনে আনতে আনতে লোক দু'জনের চারদিকে ঘুরতে লাগল। লোক দু'জন সম্মোহিত হয়ে গেল যখন মড়ার মাথাটা তাদের মুখের কাছে নেড়ে নিয়ে মেয়েটির বুকের মাঝখানে চাপিয়ে দিলে। মেয়েটি নড়ল একবার। তারপর গোঁ-গোঁ করে জজ করতে লাগল।

মস্তান শুধোলে, 'বল্ বেটি 'ওবা'—কে মন্দ কাজ করেছিল হাউড়ী গাঁয়ে—কখন কাকে তুই দেখা দিলি?'

মেয়েটি 'হি-হি' করে কাঁদতে লাগল আবার।—তারপর বললে, 'বাউড়ী গ্রামে, সবেদ আলীর বউ—আবেসন বিবি লুকিয়ে ব্যভিচারে করত—আমি এগার দিন আগে সন্ধ্যার পর তার সামনে দেখা করে তার মূর্তি ধরে আর অনেক মানুষ আ মেয়েদের কাছে যাই। জানো 'আমাকে মরবার জন্যে এলে আমি খিলখিল করে হাসতে হাসতে মাঠের দিকে ছুটে যাই। সেও পিছন পিছন ছুটতে থাকে। তারপর আমাকে দেখতে না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ঘরে ফিরে এসে খোঁজ নিয়ে দেখে সবেদ আলীর বউ তখন দাওয়ায় বসে বসে কাঁটাল খাচ্ছে। ব্যাপার কি! সে টলতে টলতে এসে বিছানায় পড়ল। তার বউকে সব বললে। বউ বললে, ওমা! লোক! তারপর কায়েদ আলী মরল। বাদু, হাশেম, করিম, রহমান, মকু, এবাদ, আম্বিয়া, আনজুমন, আখলিমা, আবু মরেছে। তোমরা ফিরে যেয়ে দেখবে আর একজন মরেছে—তাকে আমি 'ভর' করে আছি—সে হল 'আবেসন বিবি'।

লোকদুজন স্তম্ভিত। বললে, 'সব ঠিক!'

'এদের নাম কি?'

'একজনের নাম পিয়ার আর একজন ওহাব।'

কাঁদতে লাগল তখন লোক দুজন। মস্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরলে। 'মস্তান বাবা আপনি আমাদের রক্ষে করো। আমাদের বাল-বাচ্চাদের বাঁচাও।'

মস্তান বললে, 'জিতা রহ বেটা। ডরো মৎ।' মড়ার মাথাটা মেয়েটির বুকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে এসে ঝোলাতে পুরলে। দুজনকে খানিকটা করে সৈন্ধব লবণগুঁড়ো খাওয়ালে। ঠান্ডা জল দিয়ে 'শঙ্করারিষ্ট' খাওয়ালে এক ঢোক করে। তারপর পিঠ চাপড়ে দিলে। বললে, 'গ্রাম বন্ধ করতে যাব আমি, আড়াইশো টাকা দিতে হবে আমাকে। আর 'খাজে খতম' করতে হবে। এইমাত্র 'চিলে' গ্রাম বন্ধ করে এলুম—সেখানে বিয়াল্লিশজন মরেছে। একটা মড়া 'খ্যান' পেয়ে দেখি 'মালসা' গিলেছিল!'

হঠাৎ মেয়েটি খিক করে হেসে উঠল। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে হাসতে লাগল। দমকে দমকে। মস্তান রাগে তার দিকে একবার তাকাল। মেয়েটি বললে, 'মালসা কত বড় আর গাল কত বড়? হি হি হি।'...

মস্তান বললে, ' বোঝ! মালসা কত বড় আর গাল কত বড়! শয়তান যখন হাঁ করে, তখন দুনিয়া গিলে নেয়"

মেয়েটি এবার হাসতে হাসতে উঠে পড়ে দৌড় মারলে। তার বাইরে যাবার দরকার হয়েছিল, থাকতে পারেনি আর।

মস্তান বললে, 'শালা হারামি, মেয়ে-মানুষ হল ঘোড়ার বিষ্ঠা।...ছুঃ! ওরাই তো দুনিয়াকে পোড়ায়। বাবা আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড়।...ছি, সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করতে পারবে? ডাক্তারকে তো অনেক টাকা ঢেলেছ!'

লোক দুজন বললে, চলো হুজুর বাবা, আমাদের রক্ষে করো। টাকা আমরা [illegible] করে পারি দোব।'

মস্তান তখন লাল কালিতে লেখা একটা বিরাট ফর্দ তাদের হাতে গুঁজে দিলে। বললে, 'এগুলো কাল জোগাড় করে রেখ—'খাজে খতম' হবে কাল রাত্রে। গ্রাম বন্ধ করে দিয়ে আসব। টাকাকড়ি এনেছ কিছু?'

'হাঁ বাবা—এই পঞ্চাশ টাকা আছে, এখন লও।'

ছোঁ মেরে টাকাক'টা নিয়ে বললে মস্তান, 'এখন যাও। মেয়ে-মানুষটার তাড়া-তাড়ি কবর দাও যেয়ে। দেরি করো না যেন। ঐ মেয়েটা 'আবেসন বিবি' না কি যেন নাম বললে? আমার একটা 'জীন' পালা আছে, 'এসম্ আজম' করে ডাকলেই ঐ মেয়েমানুষটার ওপরে 'ভর' করে—আর সব বলে দেয় সেই। অবাক হবার কিছু নেই—আমি কিছু জানি না—ইলু—ইলু'...

লোক দুজন বাইরে বেরিয়ে এল যখন, হোজরা থেকে ঝড় উঠেছে তখন প্রচন্ড বেগে। চারদিকে অন্ধকার। কাটালী চাঁপার গাছের পাশে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আস্ত সেই মেয়েমানুষটা! এলো চুল, গোল গোল বড় বড় দুটো স্তন—খোলা বুকের কাপড় উড়ছে—বিদ্যুতের আলোয় তাকে মোহিনীর মতো দেখাচ্ছে। মেয়েটি হাসছে। ওরা ভয় পেয়ে সালাম করতে করতে পালিয়ে গেল। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। মস্তান এসে বললে, 'ছিনাল মাগী, জ্যান্ত কবর দোব তোকে। লোকের সামনে ইয়ার্কি'! টাকা না পেলে পেট চলবে কি দিয়ে?'

মেয়েটি ঝড় আর বিদ্যুৎ আর আকাশে দেখতে দেখতে বললে, 'বুজরুকি!'

বাড়িতে ফিরে এসে বললে, 'তুমি একটা 'জীন', একটা শয়তান, আল্লার নামে মিথ্যে ভেলকি দেখাও, বুজরুকি করো। এত যদি জানো তবে একটা ছেলে হয় না কেন? মুরোদ আছে, বুড়ো হাবড়া!'

মস্তান [illegible] [illegible] আরাম করে কোলে বসায়। চুমু খায়। [illegible], [illegible] হবে, এই [illegible] বুঝেছ...

মেয়েটি [illegible] হাত সরিয়ে দেয়। আবার [illegible] পড়ে। হঠাৎ খিলখিল [illegible]। [illegible]! বাব্বা! [illegible] একটা [illegible] জীবন্ত [illegible] দিয়েছে। ঐ মড়ার মাথাটা তুমি যদি ঘর থেকে দূরে না করো আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবো দেখো। ঐ মাথাটা দেখলেই আমার কেমন যেন [illegible] করে। তুমি কি সব আজেবাজে যেন আমাকে বলিয়ে নাও।'

মস্তান একটা শিশি থেকে হঠাৎ একটু তুলোতে কি যেন ঢালতেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠে বসে। মস্তান ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে পেড়ে ফেলে তার নাকে ঘষে দেয়। মেয়েটি হাত-পা নাড়ে কিছুক্ষণ। তারপর নীরব।

মস্তান হাসে। তারপর ফ্ল্যাশ লাইট, মড়ার মাথা, এক বাক্স গুঁড়ো জাফরান, ছুরি, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদি তার ঝুলি ঝাপ্পার মধ্যে ভরে নিয়ে দোরে চাবি এঁটে দিয়ে বেরিয়ে যায় অন্ধকারে।

গহিন রাত। ঝড় বইছে। খরগোস, খ্যাকশিয়াল, খটাশ ছুটে যেতে দেখা যায় পথের পাশে মাঠের ওপর দিয়ে। আষাঢ় মাসের অর্ধেক হয়ে গেল, আকাশে বৃষ্টি নেই, রোজ মেঘ হয়, হুড়ুম দুড়ুম শব্দ করে, ঝড় উঠে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ডোবার জল শুকিয়েছে। পুকুরের তলায় ঠেকেছে নীল শ্যাওলা জমা পচা দূষিত জল। গ্রামে সেই বিষাক্ত জলে স্নান, রান্না, থালা-মাজা, গরুর গা-ধোয়ানো, কাঁথা কানি কাচা—কলেরা লাগবেই তো! মস্তান জানে, ভারি বর্ষণ না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই।

একেবারে ভোর রাত্রে যখন ক্লান্ত অবসাদে মানুষ একটু ঠান্ডা পেয়ে ঘুমের কোলে ঢলে প'ড়ছে মস্তান এলো বাউড়ী গ্রামের কবরস্থানে। পাশাপাশি অনেক নতুন কবর। ফ্ল্যাশ লাইট ফেললে। কয়েকটা শিয়াল—কবর খুঁড়ে মানুষের মাংস খাবার জন্য মাটিধুলো মেখে ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়া পেয়ে তারা সরে গেল।

অদূরের পল্লীটার মধ্যে বার কতক কুকুর ডাকল।

আবেসন বিবির নতুন কবরটা দেখলে মস্তান। জামা-কাপড় খুলে বকুল গাছে টাঙিয়ে রাখলে। তাড়াতাড়ি মাটি সরিয়ে তলপাতা, এড়ো আর পাটাতনের লম্বা বাঁশ টেনে তুলে নেমে পড়ল কবরের মধ্যে। মড়ার কাফন খুলে ফেললে দেহ থেকে সবটা। যুবতী মেয়ে। পেটটা পিঠের সঙ্গে চেপটে গেছে। দাঁত বেরিয়ে আছে। ভয়ংকর মূর্তি! উঠে এল মস্তান। একটা প্লাসটিক গামলায় টাটকা রক্তের মতো জাফরান গোলা নিয়ে আবার কবরের মধ্যে নামল। সমস্ত কাফনটা সেই রঙে ভিজিয়ে ফেললে। তারপর মড়াটার গালের মধ্যে খানিকটা কাফন ঢুকিয়ে একটা বড় চামচ দিয়ে ঠেসে ঠেসে ঢোকাতে লাগল। খালি পেটে ঢুকে চলল কাফনটা! মস্তান ঘেমে ভিজে নেয়ে গেল। ভয় করছে নাকি তার? কিসের শব্দ! শিয়াল ডাকছে! তাড়াতাড়ি উঠে এল সে। সব তুলে এনেছে তো? গামলা, চামচ, লাইট—হাঁ সব। এবার কবরটা যেমন ছিল চাপা দিয়ে দিলে। ব্যাস সব ঠিক হ্যায়!

একটা ডোবাতে গা-হাতের মাটি বং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে জামা-কাপড় পরে বাউড়ী গ্রাম থেকে সে যখন অন্য গ্রামে এসেছে তখন সকাল হল। একটা দোকানে চা খেলে। বললে, 'গিয়েছিলুম ভাই বহু দূরে—ফলতায়—কলেরা ছাড়াতে। রাস্তায় 'ওবা'র কি কান্না।"

'বাউড়ীতেও তো বারোজন মরল।'

'হে' হে'—একটা মেয়ে তেরো হাত কাফন গিলে বসে আছে ওদের গাঁয়ের কবরে। কাল রাত্তিরে গিয়ে তুলব। তোমরা রাত একটার সময় যেও সব, দেখবে।'...

মস্তান বাড়িতে এসে দোর খুলে দেখলে তার স্ত্রী তেমনি পড়ে আছে। ঝোলা নামিয়ে রেখে একটা ইঞ্জেকশন দিলে মেয়েটির চিতোড়ে। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটির জ্ঞান ফিরল। গালাগালি করতে লাগল। মস্তান বুঝতে পারে ওর মাথায় একটু পাগলা ছিট এসে গেছে। আগেরটার মতন এও বোধহয় বদ্ধ পাগল হয়েই যাবে। অজ্ঞান করে রেখে না গেলে যৌবনের তৃপ্তি খুঁজতে হন্যে হয়ে পালাবে মেয়েটি। দুর্ভাগা মস্তানের যে সে অক্ষম।

দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে নিয়ে বিকেলে এল মস্তান তার বাহারে বাঁকা লতার লাঠি, সত্তর তালি মারা ঝোলা, গলায় রঙিন কাঁচের মালা, মাথায় জালি টুপি, কালো লম্বা পীরহান গায়ে দিয়ে। সবই ভক্তিতে গদগদ। 'কদমবুসী' করতে লগল সবাই।

এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের নামে ছোলা পড়িয়ে ফল-পাকড়, সন্দেশ মিষ্টি দিয়ে 'খাজে খতম' শেষ করতে রাত দশটা বাজল।

দু-হাজারের উপর লোক জুটেছে মস্তানের কীর্তি দেখতে।

'খাজ খতমে'র ফলমেওয়া বিলি করা হল। পাঁচখানা গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সবাই খেলে। বোতল শিশি ঘটিতে করে বহু লোক জল এনে মস্তানের পাশে বসিয়ে রেখেছে। মস্তান একবার বিড় বিড় করে সমস্তগুলোয় ফু দিয়ে দিলে। তাবিজ কবজ বিক্রি করলে শতখানেক টাকার। তারপর একা বেরুল অন্ধকারে। দৌড়ে গেল কবরখানার দিকে। হঠাৎ গ্রামের শেষ প্রান্তে তার আজান শোনা গেল। আবার দক্ষিণে—তারপর উত্তরে। মস্তান ফিরে এল কিছুক্ষণ পরেই। বললে, 'চল সবাই কবরখানায়, কোদাল লও, নতুন কাফন চাই আর দশ বালতি পানি।'

সমস্ত কবর পরীক্ষা করে দেখলে মস্তান হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কবরে কান দিয়ে দিয়ে। নতুন কবরের কাছে এল শেষ বেলা। বললে, 'খুলে ফেল এই কবর!'

মস্তান নিজে কোদাল ধরে মাটি টেনে দিলে প্রথমে তারপর দু-চারজন মিলে কবর খুঁড়ে ফেলে পাটাতনের বাঁশ তুলে দিতে মস্তান নেমে গেল কবরে। উলঙ্গ মড়াটাকে তুলে দিলে উপরে। মড়া সমস্ত কাফন গিলেছে! হায় বাবা!

কি ব্যাপার! তাজ্জব কাণ্ড!

মড়াটাকে সরিয়ে আনলে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। মস্তান একটা গামছা চাপা দিয়ে দিলে তার কোমরে। তারপর তার বুকে পা দিয়ে গালের মধ্যে থেকে হড় হড় করে রক্ত-রাঙন কাপড় টেনে টেনে বার করে আনলে। লোকের তো চক্ষুস্থির!

মস্তান জোরে জোরে 'লা ইলাহা' পড়তে লাগল।

বালতির জল ঢেলে স্নান করানো হল মেয়েটিকে। আবার কাফন পরানো হল। 'জানাজা' পড়ানো হল। গোর দেওয়া হল নতুন করে।

ভোর রাতে গাঁয়ের চার কোণে লাল নিশান উড়িয়ে দিয়ে গ্রাম বন্ধ করে টাকা নিয়ে মস্তান বাড়ি ফিরবার পথে প্রচণ্ড ধারায় বর্ষণ নামল।

বাড়িতে ফিরে দেখলে স্ত্রীর আপনা-আপনি জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে জানালায় বসে ঝড়ে তোলপাড় করা বর্ষণমুখর প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছে উদাস মনে। তালা খুলে ভিতরে এসে মস্তান তার ঝুলি-ঝাপ্পা নামিয়ে রেখে ডাকলে, 'তহুরা—আমার 'সরাবন তহুরা'—এদিকে এসো। দেখো কত টাকা এনেছি।'

তহুরা বললে, 'রেখে দাও। মরলে পাকা কবর হবে। অনেক ভক্ত আসবে। টাকা পড়বে।'

'লও, এসো, গোসা করো না বিবি। মর্দ মানুষ হল বাজপাখি, সে কোথা থেকে কি ছোঁ মেরে শিকার করে আনে তা মেয়েমানুষ-দের অতো বিচার করে দেখার দরকার নেই। চুরি-বাটপাড়ি করার চেয়ে তো ভাল। বোকা মূর্খ সমাজকে সবাই ঠকায়। আমার সাহসকে তুমি তারিফ করবে না?'

'করি! কিন্তু আমার ভয় করে। সাপুড়ের যে সাপের হাতে মরণ হয়! তোমার যদি কলেরা হয়?'

হা-হা করে হেসে ওঠে মস্তান। বলে, 'আল্লা বাঁচানেওয়ালা!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তহুরা। বলে, 'আল্লা তোমাকে বাঁচাচ্ছে বললে আল্লার নামে কলঙ্ক দেওয়া হবে। তুমি তো জানো তুমি কতবড় শয়তানী করছ। আমাকে তিলে-তিলে মেরে ফেলছ—শুধু টাকার জন্যে—নামের জন্যে—কী চাও তুমি? আমাকে কেন তুমি বিশ্বাস করো না? কেন বন্দী করে, অজ্ঞান করে রেখে যাও? আমি যদি ঘরে আগুন দিই তুমি যখন ঘুমোও...'

মস্তান হঠাৎ উঠে পড়ে তলোয়ারটা পেড়ে নিয়ে শূন্যে তুলে কোপ বসাবার ভঙ্গি করে বলে, 'এক কোপে এখনি দু-টুকরো করে ফেলে দেব—চোপ!'

ঝড় ছুটে চলেছে গাছপালা চুরমার করে।

হঠাৎ বাজ পড়ল একটা, প্রচণ্ড জোরে।

মস্তান টাকা গুনতে গুনতে বললে, 'কলকাতায় যাব ওষুধপত্র কিনতে, রান্না করো।'

জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল তহুরা। হঠাৎ একটা মেয়ে ভিজতে ভিজতে ছুটে এসে, 'বাবা মস্তান বাবা, আমার কোলের বাচ্চাটাকে সাপে কামড়েছে—এসো বাবা—তোমার দুটো পায়ে ধরি...'

মস্তান তখনি ছাতা মাথায় দিয়ে চলে গেল মেয়েটার সঙ্গে। যাবার সময় বলে গেল, 'তহুরা আজ থেকে তুমি মুক্ত—তুমি যা খুশি করতে পার।'

ফিরে এল মস্তান রাত দশটার পরে। এসে কাঁদতে লাগল—মস্তানের চোখে জল! বললে, 'ছেলেটা বাঁচল না!'

ছেলের জন্যে তাহলে মস্তানের প্রাণে মায়ামমতা আছে? তহুরা অবাক। সে স্বামীর কাছে এসে বসল। লণ্ঠনের আলোতে লোকটাকে নতুন করে দেখতে লাগল। মস্তান তহুরার রকম দেখে বললে, 'তহুরা, আমিও মানুষ, বুজরুকি না করলে চলবে কি করে!'

বিজ্ঞানের কথা

ধোঁয়া ধুলো ও বাতাস

দূষিত বাতাস স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, এটা জানা কথা। কিন্তু দূষিত বাতাস আবহাওয়াও বদলে দিতে পারে, শুধু দিতে পারে নয়, দিয়েছে এবং দিচ্ছে. গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে পারে যে, স্থানীয়ভাবে কোনো একটি শহরের বা অঞ্চলের নয়, গোটা মহাদেশের বা এমনকি গোটা বিশ্বের আবহাওয়া বদলে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কলকাতার লোকের মুখে প্রায়ই মন্তব্য শোনা যায় যে, কলকাতার আবহাওয়া নাকি বদলে যাচ্ছে। কলকাতার স্টেটবাসগুলো যে-পরিমাণ ধোঁয়া ছাড়ে, কলকাতার আশেপাশে কল-কারখানার চিমনি থেকে যে-পরিমাণ ধোঁয়া ওঠে তা একটি শহরের আবহাওয়া বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখবেন। যতোদূর জানি, কলকাতার বাস্তুসমস্যা, পরিবহণ সমস্যা ইত্যাদি অনেক সমস্যা নিয়ে কিছুটা ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে, কিন্তু ধোঁয়ার সমস্যা নিয়ে কদাচ নয়. এমন কি ধোঁয়ার সমস্যাটি এখনো পর্যন্ত সমস্যারূপেই গণ্য নয়। চাষের সময়ে বৃষ্টি না হলে খবরের কাগজে ফাটা জমির ছবি বেরিয়ে থাকে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, বাতাস দূষিত হয়ে যাওয়াটা এই অনাবৃষ্টির একটা কারণ কিনা— একথা উঠেছে বলে কখনো শুনি নি।

সমস্যাটা হালকা করে দেখার নয়। আবহাওয়ার ওপরে দূষিত বাতাসের প্রভাব নিয়ে গত কয়েক বছর যেসব বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন তাঁদের ধারণা, এই আপাতদৃষ্টিতে সামান্য কারণে বিশ্বের আবহাওয়াতেও বড়ো রকমের অদল-বদল ঘটে যেতে পারে।

একক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা প্রধান আসামী করেছেন যে পদার্থটিকে তার নাম কার্বন-ডাই-অকসাইড। যে কোনো কার্বনগোত্রীয় জ্বালানী পুড়লেই এই পদার্থটি তৈরি হয়ে থাকে। আশঙ্কার কথা, বাতাসে কার্বন-ডাই-অকসাইডের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গত শতকে ছিল প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ২৯০ ভাগ, এই শতকে বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৩৩০ ভাগ। এই বেড়ে-যাওয়ার ফল কী হয়েছে, বা হতে পারে?

পৃথিবী তার তেজের ভাণ্ডারটি পূর্ণ করে প্রধানত সৌর বিকীরণ থেকে। আবার পৃথিবী তার উত্তাপের মাত্রায় একটা সমতা বজায় রাখে এই সংগৃহীত তেজের কিছুটা অংশ পুনরায় মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে। কথাটা সহজভাবে বলতে হলে এভাবে বলা যায় : পৃথিবী তাপ পাচ্ছে সূর্য থেকে কিন্তু পুরো তাপ ধরে রাখছে না, খানিকটা ছেড়ে দিচ্ছে, এই যোগবিয়োগের ফলে যেটুকু থেকে গেল তারই ওপরে নির্ভর করে পৃথিবীর তাপমাত্রা। এখন বাতাসে যদি কার্বন-ডাই-অকসাইড জমতে থাকে তাহলে কি এই যোগে বা বিয়োগে কোনো হেরফের ঘটা সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব, তবে দুদিকে নয়, একদিকে। সূর্যের তাপ পৃথিবীতে পৌঁছবার সময়ে কার্বন-ডাই-অকসাইডের বাধা যৎসামান্য, কোনোক্রমেই গ্রাহ্য নয়। অর্থাৎ যোগ হয়ে চলে পুরোমাত্রায়। কিন্তু রীতিমতো বাধা সৃষ্টি হয় বিয়োগের বেলায়। বাতাসে কার্বন-ডাই-অকসাইড থাকলে পৃথিবী থেকে ছেড়ে দেওয়া তাপের বেশ খানিকটা অংশ আত্মসাৎ করে নেয় এই কার্বন-ডাই-অকসাইড, ফলে পৃথিবী থেকে যতোখানি তাপ বিমুক্ত হবার কথা তা হতে পারে না। খুব ছোট আকারে এ ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে কাচের ঘেরাটোপ দেওয়া বাগান তৈরির হটহাউস। কাচ থাকার জন্যে যতোখানি তাপ ছড়িয়ে পড়ার কথা তার চেয়ে কম ছড়ায়, তার ফলে ঘেরাটোপের মধ্যে তাপমাত্রার আধিক্য ঘটে।

বাতাসে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার দরুন বিশ্বের তাপমাত্রা কতখানি বাড়তে পারে, অনেক বিজ্ঞানী তার একটা হিসেব করার চেষ্টা করেছেন। হিসেবটা জটিল, কেননা মেঘসঞ্চার বাতাস-সঞ্চালন ও আর্দ্রতা ইত্যাদি কারণেও পৃথিবীর উত্তাপের পুঁজিতে লক্ষণীয় রকমের হেরফের ঘটার সম্ভাবনা। এই কারণগুলোকে হিসেবের মধ্যে রেখে এবং তা থেকে পৃথক করে কার্বন-ডাই-অকসাইডের হিসেবটি করা চাই। এই হিসেব মতো, পৃথিবীর বাতাসে কার্বন-ডাই-অকসাইডের পরিমাণ যদি হয় প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ৬০০ ভাগ, তাহলে পৃথিবীর তাপ বেড়ে যাওয়ার মাত্রা হবে ১·৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এমনিতে মনে হতে পারে ১·৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরিমাণ তাপমাত্রা কমা-বাড়াটা এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। যাঁরা ব্যাপারটাকে এই বলে উড়িয়ে দিতে চান—বিজ্ঞানীরা তাঁদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে গত হিমযুগটির সৃষ্টি তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি থেকে ৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমে যাবার ফলে।

বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যেমন তুচ্ছ করার মতো নয়, তেমনি নয় ধুলোর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও। বাতাসে যে ধুলোর পরিমাণ বাড়ছে, বেড়েই চলেছে, এবং যে-হারে বাড়ছে তার পরিণতি যে বিপর্যয়কর হতে পারে, এ বিষয়ে কিছু সুনিশ্চিত তথ্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে সম্প্রতি জানা গিয়েছে।

গত কয়েক বছরে ওয়াশিংটনে ধুলোর পরিমাণ বেড়েছে ৩৭ শতাংশ, সুইজারল্যান্ডে ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে দেড় গুণেরও বেশি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ। গত পাঁচ বছরের মধ্যে নিউইয়র্কের বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বেড়েছে দশগুণ। আর শুধু এইসব বড়ো বড়ো শহরে নয়; এমন কি হাওয়াই এলাকাতেও —যেসব স্থানীয় কারণে বাতাস দূষিত হয়ে থাকে তার কোনো অস্তিত্ব যেখানে নেই— সেখানেও এই লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

স্পষ্টই বোঝা যায়, শিল্প যতো বাড়ছে, মানুষের সংখ্যা যতো বাড়ছে, শহর-এলাকা যতো বাড়ছে, বাতাস ততো দূষিত হয়ে উঠেছে। কারখানা-এলাকায় গেলে খালি-চোখেই দেখা যায় আকাশে-বাতাসে ধুলোর একটা মেঘ ভারী হয়ে ঝুলে আছে যেন।

বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফল কি হতে পারে? সবচেয়ে মারাত্মক ফল সূর্যের তাপ পৃথিবীতে পৌঁছতে বাধা পায়। বাতাসের ধুলো একটা ছাতার মতো আড়াল তুলে ধরে।

তখন কী হবে? সূর্য থেকে পৃথিবীর যতোখানি তাপ পাবার কথা তা যদি পৃথিবী না পায় তাহলে পৃথিবীর তাপ অবশ্যই কমবে। গত দশ বছরের মধ্যে কমেওছে। আর পৃথিবীর তাপমাত্রায় হেরফের হলে অনেক কিছুই ঘটে যাবার সম্ভাবনা। হালে লক্ষ করা যাচ্ছে, বাণিজ্য-বায়ুর আর তেমন তেজ নেই। সমুদ্রের স্রোতের গতি একটু যেন এলোমেলো, এসব ব্যাপার পৃথিবীর বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া সরাসরি ফল কিনা তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হবার প্রয়োজন আছে।

বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্যে মেঘ তৈরি হয়ে যাবার মত একটি অবস্থা দাঁড়াতে পারে। ব্যাপারটি ঘটে, ধুলোর কণাকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প জমতে জমতে। শেষ পর্যন্ত তৈরি হয় মেঘ বা কুয়াশা।

ধুলোর পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় তাহলে বৃষ্টিপাতও হয়ে যেতে পারে। বড়ো বড়ো কারখানা-এলাকার আশেপাশে এ ব্যাপারটি লক্ষণীয়। বার্নপুর-কুলটির আশেপাশের এলাকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়ে তদন্ত চালালে, হয়তো এই উক্তির সমর্থন আবিষ্কার করা যেতে পারে। ইন্ডিয়ানার লা পোর্ট নামে একটি জায়গায় কিন্তু তদন্ত চালানো হয়েছে ও উক্তিটি সমর্থিত হয়েছে। এই জায়গাটি গ্যারি-র ইস্পাত কারখানা থেকে বায়ুর গতির দিকে ৩০ মাইল দূরে। চোদ্দ বছরের মধ্যে—গ্যারির কারখানায় ইস্পাত উৎপাদনের হার যতো বেড়েছে তারই সঙ্গে তাল রেখে—এই জায়গায় বৃষ্টিপাত বেড়েছে ৩১ শতাংশ, বজ্রসহ বৃষ্টিপাত ৩৮ শতাংশ, শিলাবৃষ্টি ২৪৫ শতাংশ। গোটা এলাকা জুড়ে নয়, শুধু এই জায়গাটিতে।

আবার উল্টো ব্যাপারটিও ঘটতে পারে বৃষ্টি একেবারে না হওয়া। বাতাসে যদি ধুলোর পরিমাণ বেশি হয় অথচ আর্দ্রতা কম হয়, তাহলে ধুলোর এক-একটি কণাকে আশ্রয় করে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প জমতে পারে তা বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ার মতো যথেষ্ট বড়ো হতে পারে না। ফলে ধুলোর পরিমাণ কম হলে যা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে পারত, ধুলোর পরিমাণ বেশি হওয়ার দরুন তা মেঘের আকারে আকাশেই থেকে যায়। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে চিনি কলের এলাকায় এ ব্যাপারটি ঘটতে দেখা গিয়েছে। আখ কাটার আগে এখানে আখের পাতা-গুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিরাট এলাকা জুড়ে আগুন জ্বলতে শুরু করে ও প্রচুর ধোঁয়া ওঠে। এই ধোঁয়া বাতাসে ভেসে যে সব জায়গায় পেঁছিয় সেখানে আশেপাশের জায়গায় তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক কম।

কলকাতা শহরে স্টেটবাসের নিঃসরণ-নল থেকে যে পরিমাণ কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসে, সব মিলিয়ে ধরলে তার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। এটা চোখে দেখার ব্যাপার। কিন্তু তার ফলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়ে থাকে তা শুধু চোখে দেখে বোঝা যায় না। সেজন্যে চাই বৈজ্ঞানিক তদন্ত। কিন্তু আমাদের দেশে ধোঁয়া আর ধুলো এখনো পর্যন্ত সমস্যা হিসেবেই গণ্য নয়। তবে বিজ্ঞানীরা বেখানে বলছেন ধোঁয়া আর ধুলো এখন আর আঞ্চলিক সমস্যা নয়, গোটা পৃথিবীর সমস্যা সেখানে আমরা কিছু করি না করি এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার ও কাজ করার লোকের অভাব হবে না এবং তার ফল আমরাও ভোগ করব।

[illegible]

ভেষজ ও মহাকাশ গবেষণার জন্যে বানর, শিম্পাঞ্জী ও আরও কয়েক জাতের প্রাইমেটস-এর সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ ইউনিয়ন। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৬৭ সালে প্রাইমেটস আমদানী করা হয়েছে ১,২৪,০০০ আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ।

পঞ্চাশের দশকে পোলিও রোগের টীকা নিয়ে গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ লক্ষ বানর লেগেছিল। এর বেশির ভাগটাই ছিল বাচ্চা বানর, বড়ো হয়ে বংশ বৃদ্ধি করলে যাদের সংখ্যা দাঁড়াত ৭০ লক্ষ। অধিকাংশ বানরই গিয়েছে ভারতের উত্তরপ্রদেশ থেকে। ১৯৬০ সালের একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের শতকরা ৬৩টি গ্রামে ও মন্দিরে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বানর একেবারে লোপাট। লোকালয়ে থাকে না এমন বানরও গবেষণার জন্যে দরকার হয়। ফলে জঙ্গলের বানরবংশও রেহাই পাচ্ছে না।

কেনিয়া থেকে বছরে বানর রপ্তানী হয় ১৮,০০০। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৬ সালে শিম্পাঞ্জী আমদানী করা হয়েছিল ৩০০, পরের বছরে ৪০০। একটি শিম্পাঞ্জী জীবন্ত অবস্থায় ধরার জন্যে ৪ থেকে ৯টি শিম্পাঞ্জী মারা পড়ে। ফলে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করার জন্যে বছরে শিম্পাঞ্জী মারা পড়ছে ১৫০০ থেকে ২৭০০। পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের জন্যেও সম্ভবত সম-সংখ্যক। এই হার বাড়ার দিকে, কেননা মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জীর শরীরগত মিলের জন্যে গবেষণার কাজে শিম্পাঞ্জীর চাহিদাই সবচেয়ে বেশি।

ভারতে নতুন রেডিও টেলিস্কোপ

দক্ষিণ ভারতের উটকামণ্ডে টাটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় যে নতুন রেডিও টেলিস্কোপটি নির্মিত হয়েছে তার প্রথম চোদ্দ দিনের পর্যবেক্ষণের ফলাফল খুবই আশাপ্রদ। তেজস্ক্রিয়তার পাঁচটি নতুন উৎস ধরা পড়েছে এই টেলিস্কোপে।

টেলিস্কোপটি নলাকৃতি বিশিষ্ট, সমান দূরত্বে স্থাপিত ২৪টি লম্বা ইস্পাতের স্তম্ভের ওপরে নির্মিত। রেডিও প্রতি-ফলনের তলটি তৈরি হয়েছে ৫৩০ মিটার লম্বা হাজারেরও বেশি স্টেনলেস স্টিলের তারের সাহায্যে। সমগ্র তলটি ১৪০ ডিগ্রী পর্যন্ত ঘোরানো যেতে পারে। জডরেল ব্যাঙ্কের ২৫০ ফুট ব্যাসের বাটি-সদৃশ রেডিও টেলিস্কোপের চেয়েও এই রেডিও টেলিস্কোপটির ধরার ক্ষমতা প্রায় চারগুণ বেশি।

পরলোকে ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় 'জ্ঞানয়ে'র অন্যতম ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় গত ৯ এপ্রিল কলকাতায় ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের ছাত্র ও কর্মজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এস-সি পরীক্ষায় বিশুদ্ধ রসায়নে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। স্যার আশুতোষের আহ্বানে তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯২৩ সালে ঘোষ ভ্রমণবৃত্তি লাভ করে তিনি ইংল্যেণ্ডে গিয়ে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে গবেষণা করেন। তিনি ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে রসায়নে পি এইচ ডি ও ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৬ সালে স্যার রবিনসনের সঙ্গে একযোগে একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন, যা যোজ্যতার আধুনিক ইলেকট্রনিক তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ।

ডঃ রায় ভারতে উপক্ষার সংশ্লেষণ গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ এবং এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে 'বারবেরিন' উপক্ষারের সংশ্লেষণ। ১৯২৮ সালে তিনি ভারতে ফিরে এসে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। এখানে তিনি একটি উদীয়মান গবেষক-গোষ্ঠী গড়ে তোলেন এবং তাঁর এখানকার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ হর-গোবিন্দ খোরানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকারের আমন্ত্রণে জ্ঞানেন্দ্রনাথ 'ড্রাগস ও ড্রেসিং' দপ্তরের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধশেষে শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের সহ-অধিকর্তা হন। ১৯৫১ সালে সরকারী কাজ থেকে অবসরগ্রহণ করে তিনি বোম্বাই ও কলকাতায় একাধিক রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপদেষ্টারূপে যুক্ত ছিলেন। সরকারী কাজ থেকে অবসরগ্রহণের পরও তিনি ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-উপদেষ্টা ছিলেন।

ডঃ রায় ১৯৩৭ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪৮—৫০ সালে ভারতীয় রসায়ন সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো এবং রয়েল ইনস্টিটিউট অব কেমিস্ট্রির ভারতীয় শাখার সভাপতিও ছিলেন। ভারত, বৃটেন, আমেরিকা এবং জার্মানীর বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর ১৮০টির অধিক গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রশাসন, পরিকল্পনা, সমাজ ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। চিন্তাশীল লেখক এবং বক্তা হিসাবে তিনি বিশ[illegible] মহলে সুপরিচিত ছিলেন।

—[illegible]

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনেই এলাম চক্রপাণি মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে। সঙ্গে গোপালও আছে।

মন্দিরে এসেছি। চক্রপাণির মন্দির। সন্ধ্যারতি তখনো আরম্ভ হয়নি।

দক্ষিণ ভারতের আরো মন্দির থেকে এ মন্দিরটি একটু স্বতন্ত্র ধাঁচের। এ মন্দিরের যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তা মন্দিরটির সাধারণত্বে। আকারে ছোট হলেও সুন্দর। তবে মন্দিরের আচ্ছাদন-গাত্রে দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে রাশিচক্র অঙ্কিত রয়েছে, সত্যই তা দেখবার মতো।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। মন্দিরের অভ্যন্তরের অপূর্ব কারুকার্য দেখে বিস্ময় অভিভূত হয়ে যাই।

মন্দিরের আরতি শেষ হতে ফিরে এসেছি। এবারে আর সেই ছাপাখানায় নয়, হোটেলে।

এখনো সম্পূর্ণ হয়নি হোটেল-বাড়িটি। কাজ চলছে। এতোদিন এটা কেবল রেস্তোরাই ছিল, এখন আয়োজন চলছে এটিকে আবাসিক হোটেলে রূপান্তরিত করার।

হোটেলের হলঘরটিতে, যেটি তখনো সম্পূর্ণ নয়, কাজ চলছে সেইখানেই আমাদের জন্যে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।

সময়ের সঙ্গে সবই মেনে নিতে হয়। যেমনই হোক, হোটেলের হলঘরের মধ্যে একটি তক্তপোষকেও আজ মনের মতো মনে হলো।

আমার তবুও বিশ্রামের অবসর আছে: কিন্তু সুধীরার অবসর কই। তাকে যে এখন রান্নার আয়োজন করতে হবে। ঘরের কোণেই স্টোভ জ্বালাতে বসলো সুধীরা। কিন্তু বাধা দিলে গোপাল। জানালে, নিচে ভালো চুল্লি আছে, মিছে কেন এসব ঝামেলা করা।

একটু বাদেই সে ওপরে চলে এলো। রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করতে মাথা নাড়লো। ওর ওই এক স্বভাব। সব কথাতেই মাথা নাড়বে।

সুধীরা একটু বিরক্ত মনেই ওপরে ওঠে এলো। জানালে, নিচে সে রান্না করবে না। ভয় করছে তার।

—কেন কী হলো?

—কি জানি, পাঁচ ছ'জন ষণ্ডাগোছের কালো কালো লোক নিচে জটলা করছে। কী যে বলছে তারা, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাছাড়া অতো বড়ো বড়ো উনুনে—গনগন করে জ্বলছে আগুন। আর ওই সব ভয়ানক লোকজন, ওর মধ্যে আমি একজন মেয়েমানুষ—কি করে থাকবো! আমি পারবো না নিচে রান্না করতে।

—ভয় কি? বললাম, গোপাল না হয় সঙ্গে থাকছে। এবারে সুধীরা কিছুটা আশ্বস্ত হলো। গোপালের সঙ্গে নিচে চলে গেল।

ওরা চলে যেতে চুপচাপ বসে রইলাম একা।

রান্নার পালা চুকতে সুধীরা ওপরে এলো গোপালকে নিয়ে। সুধীরা খাবার পরিবেশন করতে আরম্ভ করলো। গোপাল দাঁড়িয়েছিল একান্তে। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি খাবে তো?

—না, আমি খেয়ে এসেছি।

—সে কী!

গোপাল কথা না বলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো। এবারে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পালা। শুধু আজকের রাতটুকু। কাল ভোরেই তো চলে যেতে হবে। কদিন থেকে এই তো চলছে। আজ এখানে, কাল সেখানে। কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই, শুধু যাযাবর মানুষের মতো পথ চলা।

গোপাল তখনো দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথায় থাকবে গোপাল?

গোপাল এদিক-ওদিক ফিরে তাকালো। বললো, বারান্দায় আপনাদের দরজার বাইরে।

—অসুবিধে হবে না তো?

—না। অনুচ্চ কণ্ঠে গোপাল বললে, তারপর সে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেল।

রাত। ঘুম আসেনি তখনো। ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় জীবনের হিসেব করছি। হিসেব এমন কিছু নয়—কদিনের এই ছুটে চলার হিসেবটা মিলিয়ে নিচ্ছি মনে মনে। এরই মধ্যে এক সময় কখন যেন ঘুমের মধ্যে আজকের সব চিন্তা শেষ হয়ে গেল।

ঘুম ভাঙালো রাত ভোরে। গোপালের ডাকে। সকাল সাতটায় ট্রেন ধরতে হবে, সে খেয়াল তার ঠিকই আছে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের ডাক দিয়েছে।

সকাল সাতটায় ট্রেন। হাতে আর সময় নেই। এখনই সম্পূর্ণ করতে হবে যাবার আয়োজন।

সব কিছু গোছগাছ হয়ে যেতে গোপাল গাড়ী ডাকতে গেল।

ঘোড়ায় টানা গাড়ী। ধ্রুপদী ছন্দে চলে।

হোটেল থেকে স্টেশন। এমন কিছু দূরের পথ নয়। হোটেল থেকে বেরোবার মুহূর্তে একবার ফিরে চাই হোটেল-বাড়িটার দিকে। ভাবি, জীবনের চলার পথে আমরা একটা রাত কাটিয়েছিলাম ওখানে।

স্টেশনে পৌঁছেছি। ট্রেনের কামরায় স্থানও করে নিয়েছি। কিন্তু কী জানি কেন, গোপাল তখনো দাঁড়িয়ে আছে, মুখ-চোখ দেখে মনে হয়, কিছু বলতে চায় সে। এক সময় কাগজ-কলম এগিয়ে দিলে। একটু কুণ্ঠা জড়ানো সুরে বললে, একটা সার্টি-ফিকেট স্যার।

—সার্টিফিকেট! কী হবে।

—আপনার একটা সার্টিফিকেট পেলে আমার অনেক কাজে লাগবে।

গোপালের মুখের দিকে ফিরে চাই। ভাবি, আমি দু'কথা লিখে দিলে ওর যদি কোন কাজ হয়, ভালোই তো!

সার্টিফিকেট লিখে গোপালের হাতে দিলাম। গোপাল একবার আমার মুখের দিকে তাকালো। দেখলাম, ওর দুটি চোখ কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

স্টেশনের ঘণ্টা বাজলো। এনজিনের বাঁশী উঠলো বেজে। বাঁশীর সংকেত দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলো।

গোপাল তখনো দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাট-ফর্মে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিলাম। হয়তো গোপালকে দেখার জন্যে।

এক সময় গোপাল আমার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল অপসৃয়মান ছায়ার মতো।

জীবনে চলার পথে এমনি কতো মানুষ আসে যায়। হয়তো অজ্ঞাতসারে তারা মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়। জীবনের চলতি পথের ছন্দ তো এরই মধ্যে।

শীতার্ত আবহাওয়ায় যাত্রা শুরু করেছিলাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমেজটুকু হারিয়ে গেল। নির্মেঘ আকাশ, কুয়াশার জালটুকু সরে গেছে। সূর্যের আলো ঝরে পড়েছে প্রকৃতির পটভূমিকায়।

চলতি ট্রেনের জানালার ধারে বসেছিলাম। দৃষ্টি ছিল বাইরে। যেখানে উদার আকাশ—দিগন্তের পারে মাটি স্পর্শ করেছে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। দেখি দু'চোখের তারায় চলমান ছবি।

মুহূর্তের জন্যে কতো ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে হারিয়ে যায়। জীবনের হারানো মুহূর্তের সঙ্গে তারাও যেন হারিয়ে যায়।

শুধু আমি নই—সুধীরার দৃষ্টিও তখন বাইরে চলমান দৃশ্যের মধ্যে সমানে ছুটে চলেছে। সে-ও দেখছে চলতি পায়ের ছবি।

পথ চলাতে এই আনন্দ। ক্ষণিকের দেখা, ক্ষণিকের উপলব্ধি—তারই মধ্যে জীবনকে মিশিয়ে দেওয়া।

বেলা এগারোটা।

চিদাম্বরমে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। ট্রেন থেকে নেমেছি। এসেছি প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে কোথায় যাবো প্রথমে —এই কথাটা ভেবে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী করেছি। ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা। আমাদেরকে সওয়ারী করে ছুটে চললো নটরাজের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। গাড়ির ভাড়া ঠিক করতে হলো না। মিউনিসিপ্যালিটির রেটে বাঁধা আছে।

চিদাম্বরমে শহরের রাজপথ ধরে চলেছে আমাদের টাঙ্গা। এখানেও দেখার বিরাম নেই। চলতি পথে যেটুকু দেখার দু'চোখ ভরে দেখে নিই।

নটরাজের মন্দির। যার কথা এতোদিন করেছি, যে মন্দির দেখার বাসনা এতোদিন মনের মধ্যে রেখেছি, সেই মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। গাড়ি থেকে নেমে চেয়ে থাকি মন্দিরের দিকে। তারপর গাড়িতে জিনিসপত্তর রেখে গাড়ির লাইসেন্স নাম্বারটি সঙ্গে রেখে নগ্নপদে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি।

দক্ষিণ ভারতের আরো মন্দিরের মতো এ মন্দিরের স্থাপত্যকলা একই ধরনের। যেটুকু পার্থক্য তার গঠনশৈলীতে এবং বৈচিত্র্যে।

মন্দিরের চারদিকে যা কিছু দর্শনীয়, দেখা শেষ করে নটরাজের মূল মন্দিরে প্রবেশের পালা। লক্ষ্য করলাম—আরো দর্শনার্থী যারা, তারা সবাই নটরাজ দর্শনে চলেছে খালি গায়ে এবং খালি পায়ে। গায়ে শুধু একটি করে চাদর।

অগত্যা আমিও গায়ের জামা খুলে স্ত্রীর হাতে দিলাম। বললাম, তুমি অপেক্ষা করো। আমার দেখা হয়ে গেলে, তুমি যাবে।

সুধীরা আমার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে বললে, পুজো দেবে কেমন?

সুধীরা দাঁড়িয়ে রইলো। আমি আরো দর্শনার্থীর সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে চললাম, নটরাজের মূর্তি দর্শন করতে।

বাইরে বারান্দা , থেকে দেখলাম উচ্চ বেদীর ওপর নটরাজের মূর্তি। ছোট হলেও সুন্দর। দুষ্প্রাপ্য এ্যাম্বার পাথরে তৈরি। যার পিছনে একটি দীপ-শলাকা জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটি যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ভাবি, কী বিচিত্র এই রূপকল্পনা। নৃত্যরত মহাকাল। সৃষ্টি, স্থিতি, কালের ঈশ্বর।

দাঁড়িয়ে থাকি অচঞ্চল। প্রণাম করি। তারপর যাই দেবগৃহ দেখার বাসনা নিয়ে।

এবারে বিস্মিত না হয়ে পারি না। কোন মূর্তি নেই—শুধু পটে আঁকা আকাশ। মনে হয়,—সেই অরূপ অব্যয়—সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ ওই আকাশে।

জানি না আমার ব্যাখ্যা ঠিক কিনা—জানতে চাইনে কারো কাছে—ভাবলাম, ঈশ্বরতত্ত্বের মূল কথাই এই। তিনি অরূপ —তিনি অব্যয়, তিনি অসীম অনন্তে বিরাজিত।

চিত্রিত আকাশপটের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ মনে এলো, সুধীরার কথা। সে আমার অপেক্ষায় আছে।

ফিরে এলাম মন্দিরঅঙ্গনে। যেখানে সুধীরা দাঁড়িয়ে ছিল আমার অপেক্ষায়।

এবারে সুধীরা গেল মন্দিরে। আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তার অপেক্ষায়।

শুনেছি, চিদাম্বরমে আরো একটি দর্শনীয় স্থান আছে, যেখানে ভরতনাট্যমের ১০৮টি মুদ্রা পাথরে ক্ষোদিত রয়েছে। আমি নাটক ভালোবাসি, নাটকের মধ্যেই নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছি, তাইতো ভরতনাট্যমের মুদ্রা দেখতে এতো আগ্রহ।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আমি দূরদেশী পথিক, যা দেখতে আমার অদম্য আগ্রহ, সেই দর্শনীয় স্থানটির নিশানা জানাতে পারলো না কেউ। শেষটা মুস্কিল আসান করলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম পথের হদিশ।

মনের মধ্যে যে কৌতূহল জমা ছিল, অবশেষে সে কৌতূহলের অবসান হলো। ভরতনাট্যমের স্মারক আমার চোখের সামনে।

পর পর ১০৮টি ফলকে ভরতনাট্যমের মুদ্রা। পুরুষ আর প্রকৃতি—লীলায়িত দেহতনু। কতো বিচিত্র তার প্রকাশ। কতো বিচিত্র তার ছন্দ।

দু'চোখ ভরে দেখি, ভাবি যদি শিল্পী হতাম রঙ-তুলি দিয়ে এঁকে রাখতাম ভরতনাট্যমের এই ধ্রুপদী ছন্দকে। যদি ক্যামেরায় ছবি তুলতে দিত, তাহলেও হয়তো ছবি তুলতাম। কিন্তু এখানে ছবি তোলা নিষেধ।

কিন্তু অঙ্কনশিল্পী আমি নই। অথচ মনের ক্যানভাসে চিরদিনের জন্যে আঁকা হয়ে গেল সব কিছু।

এবারে চললাম আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে। বাইরে থেকে যতটুকু দেখা—নয়তো আর কিছু নয়। দেখে মনে হলো, আজ যে সম্ভাবনা দেখলাম, একদিন হয়তো তা পূর্ণ হবে নানা নতুন সম্ভাবনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের বাসগৃহটিও দেখা হলো। সুন্দর।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে অনেক সময় গেল। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে আরো সময় যেতো। কিন্তু এই বেলায় আর তা সম্ভব নয়। সেই সকাল থেকে একটানা ঘুরছি, দেখছি—এবারে একটু বিশ্রাম চাইছে দেহ। সুধীরাকে ক্লান্ত মনে হলো। তারও মনে একটু বিশ্রাম-চিন্তা।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘোড়ার গাড়িতে সোজা স্টেশনে চলে এলাম। ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব। ভালোমন্দ বিচারের অবসর নেই। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে খাবার পাওয়া যায়। প্ল্যাটফর্মের একান্তে বসে মাদ্রাজীখানা গ্রহণ করলাম।

আজই প্রথম মাদ্রাজীখানার স্বাদ গ্রহণ করলাম। ভাত আর ইডলিধোসা। অপূর্ব সুস্বাদু মনে হলো। হয়তো সেই প্রচণ্ড ক্ষুধার মুখে বলেই।

প্ল্যাটফর্মে আরো মানুষের ভিড়। সবাই অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্যে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। বেলা চারটেয় ট্রেন এসে দাঁড়ালো। ভিল্লুপুরমগামী ট্রেন। ভিল্লুপুরম থেকে আবার মাদ্রাজগামী ট্রেন ধরতে হবে।

বেলা তখন চারটে। শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

খোলা জানালার ধারে বসেছিলাম। দৃষ্টি ছিল বাইরে।

গ্রাম-জনপদ-প্রান্তর পেরিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। এরই মধ্যে চোখের পরদায় প্রতিফলিত হয় চলমান জীবনের ছবি।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
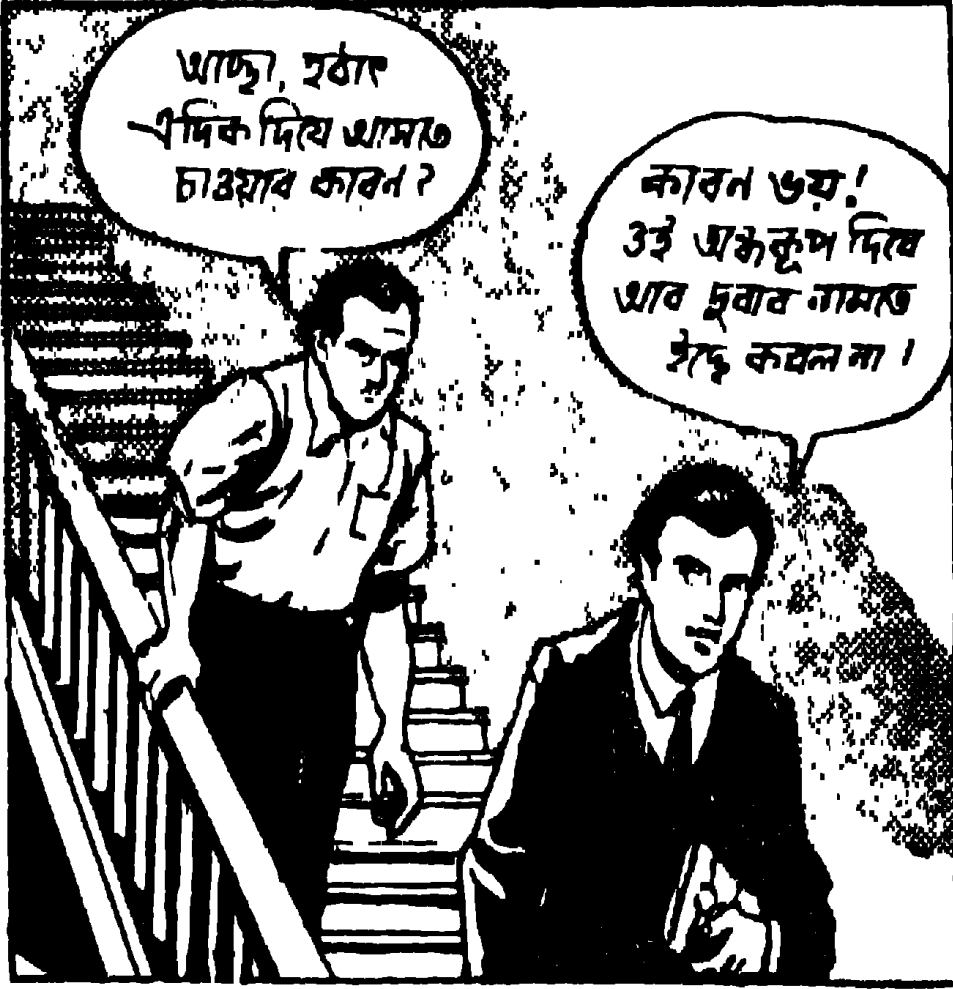
ছিমছাম থাকুন

অঙ্গনা

কলেজ জীবনে একদিনের ঘটনা।

সেদিন বাস-ট্রামের জ্যামে পড়েছিলেন স্বয়ং অধ্যাপক। ঘণ্টা পড়ার বেশ কিছুক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লাসে ঢুকলেন। রোল কল করলেন। কয়েক মুহূর্তে চুপচাপ। তারপর তিনি শুরু করলেন বাস-ট্রামের রোজকার দুর্বিসহ জীবন। একজন বলে বসলো, আমি কিন্তু স্যার, কাজার ভিড়েও ঠিক নিজের জায়গা করেনি। অধ্যাপক একটু হেসে বললেন, বিকস ইউ ডু নট টেক মাচ স্পেস। তারপর আমাদের একজনের দিকে ইংগিত করে বললেন, কিন্তু ওর কথাটা একবার ভেবে দেখ। বন্ধুটি নিজের বাহাদুরি জাহির করতে করতে গিয়ে চুপসে গেল। ওর সঙ্গে আরেক বন্ধু জড়িয়ে নিজের দেহাকৃতিতে লজ্জায় লাল হলো। আর সবাই হো হো হাসিতে মজার ভেঙে পড়লো।

সত্যি, ভাববার মতো। একজনের দারুণ ক্লিনক্লিনে চেহারা। কি করে শরীরে একটু মাংস করা যায় সে নিয়ে ওর ভাবনার অন্ত নেই। আর একজনের ঠিক তার বিপরীত। মেদবাহুল্যে সে ভুগছে। কি উপায়ে মেদ কমিয়ে দেহ স্বাভাবিক করা যায় সে নিয়ে ওর ভাবনার অন্ত নেই। ওর কাছেই শুনেছি, মেদ কমানোর জন্য

মডেল : চিত্রাভিনেত্রী বাসবী নন্দী
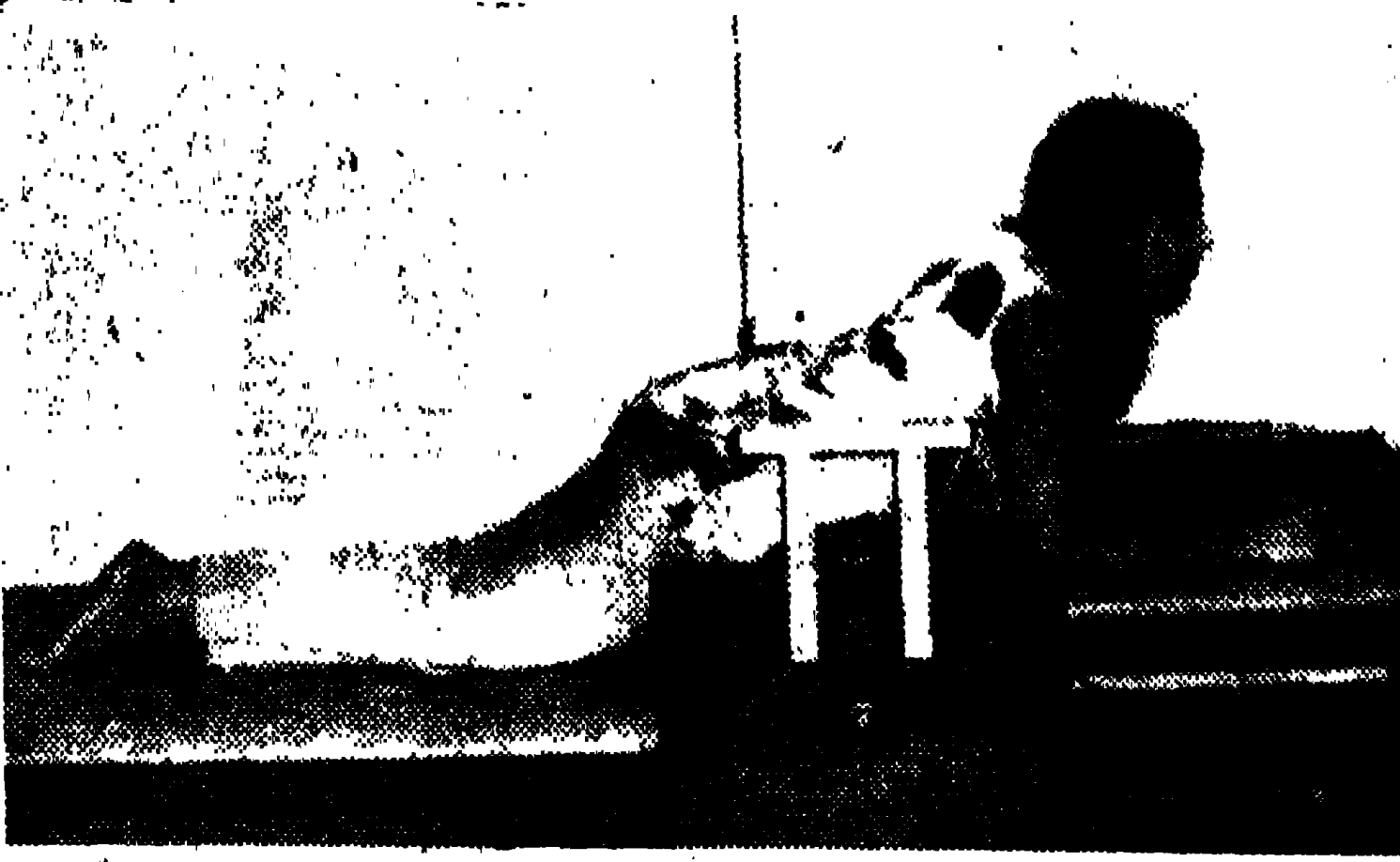
নাকি মাঝে মাঝে উপোস করে। এছাড়া আর কিছু ওর জানা নেই। আমাদেরও জানা ছিল না। তাই সঠিক কিছু বাতলাতে না পেরে চুপ করে থাকতাম।

মাঝে মাঝে বেশ মজা হতো। ওরা দু'জন পরস্পরের দুঃখে দুঃখী। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, তোরা নিজেদের মধ্যে মেদের আদান-প্রদান কর। ওরাও সে ঠাট্টায় যোগ দিত। তারপর একজন হয়তো বলতো, দাঁড়া, তোদের মতো যখন হবো না, তখন এই রসিকতার শোধ তুলবো। আমরা সমবেত হাসিতে ফেটে পড়তাম। জানতাম, কোনদিন সম্ভব হবে না।

বিজ্ঞান আজ অনেক অবিশ্বাস্য সত্য আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে। মহাকাশ থেকে চাঁদ মানুষের গতি ক্রমেই সহজ হয়ে আসছে। মেদবাহুল্য আর এ-যুগে কোন সমস্যাই নয়। সহজ প্রক্রিয়ায় এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। লিটল রাসেল স্ট্রীটে শ্রীমতী প্রভা খৈতানের ফিগারেট থেকে ঘুরে আসার পর এ-কথা নিশ্চিত-ভাবেই বলা যায়।

শ্রীমতী খৈতান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। তারপরই তাঁর সামনে এসে যায় বিদেশ-ভ্রমণের সুযোগ। তিনি পাড়ি জমান হলিউডে। নিছক বেড়ানোই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর একটা জিনিস তাঁর মনে ধরে। তিনি লক্ষ্য করেন, মার্কিন মুলুক তথা পশ্চিমী দেশের সব মহিলারাই অত্যন্ত সৌন্দর্য-সচেতন। দেহের সৌন্দর্যকে স্বাভাবিক রাখতে তাঁদের চেষ্টার অন্ত নেই। সে-তুলনায় আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে। তারা সাজতে-গুজতে চায় কিন্তু সর্বদা দেহ-সৌন্দর্য বজায় রাখায় তেমন সচেতন এবং যত্নবান নন। তাই ত্রিশের পরই ভারতীয় রমণীর দেহ-সৌন্দর্য ফিকে হয়ে আসে। অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য রমণীর সৌন্দর্য বজায় থাকে প্রায় পঞ্চাশ পর্যন্ত। শ্রীমতী খৈতানের মনে তোলপাড়।

তিনি ভর্তি হয়ে গেলেন ট্রেনিং নেবার উদ্দেশ্যে। দেহ-সৌন্দর্য সঠিক রাখার কায়দাকানুন দেখে গিয়ে দেশে যদি কোন কাজে লাগেন। হলিউডের লেক উড বিউটি স্কুলে ভর্তি হলেন শ্রীমতী খৈতান। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এলেন দেশে। এসেই আর দ্বিধা করলেন না। ছোট-খাটো পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করলেন। ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। ক্রমে নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে খুললেন ফিগারেট। এখন সারাদিন লোকজনের যাতায়াত। শরীরের বাড়তি মেদ কমিয়ে সবাই সহজ স্বাভাবিক হয়ে বাঁচতে চায়।

কথায় কথায় শ্রীমতী খৈতান জানালেন, আমাদের ধারণা, ওজন কমাতে পারলেই বাড়তি মেদের প্রকোপ থেকে বেঁচে যাবো। কিন্তু এটা নেহাতই আমাদের অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে মেদবহুল অনেকে খাওয়া-দাওয়া কমান, উপোস করেন। এ-কথা ঠিক, মেদ কমাতে হলে খাওয়া-দাওয়ায় নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত। তবে সেটা নিজের ইচ্ছে মাফিক নয়। দেহের ওজন যেমন কমাতে হবে, তেমনি দেহসৌষ্ঠবও ফিরিয়ে আনতে হবে। মুখের কুঁচকে-যাওয়া চামড়াটা টানটান করে মুখকে আকর্ষণীয় করা একটা বিরাট দায়িত্ব। ফিগারেটের সমস্ত কাজকে শ্রীমতী খৈতান বিবৃত করলেন, স্লেণ্ডার বডি, ক্লিক স্টেপ, স্টেডি নার্ভস অ্যাণ্ড দি ক্লিয়ার স্কিন অ্যাণ্ড স্পারকলিং আইজ। এই হলো সঠিক নারী দেহ, যার কথা আমরা ভাবি আর স্বপ্ন দেখি। সেই দেহ-ই সবাইকে উপহার দিতে চান শ্রীমতী খৈতান এবং তার ফিগারেট।

শ্রীমতী খৈতান সব ঘুরিয়ে দেখালেন। আর এটাই স্পষ্ট হলো, শুধু ওজন কমানোর জন্য উপোস করলেই মেদ কমে না। এজন্য প্রয়োজন অনেককিছু। তবু মেদ কমানোর কাজ দিয়েই শুরু করা হয়। এজন্য রোলার রয়েছে। রোলারের নাম শুনে আঁৎকে ওঠার কোন কারণ নেই। এটা কোন দৈহিক নির্যাতন নয়। বরং ভারমুক্তি। এক্‌সারসাইজ সাইকেল, ওয়ার্কিং আর রোয়িং মেশিন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় শরীরের সর্বাঙ্গের চালনা এর লক্ষ্য। মেদ কমুক কিন্তু সেই সঙ্গে দেহ হোক সুঠাম। তাই রয়েছে মাসল সংকোচন-পদ্ধতি। মুখের কোঁচকানো চামড়াকে স্বাভাবিক করার ব্যবস্থাও রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও ফিরে আসে। রক্ত-চলাচলের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য ব্লাড সারকুলেটরও আছে।

ফিরে এলাম শ্রীমতী খৈতানের চেম্বারে। মেদবহুল অনেক মহিলাকে দেখলাম খুশিমনে চলে যেতে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসি, বাড়তি মেদ-এর কারণ কি। ছোট্ট হেসে তিনি জানালেন, জমা এবং খরচে হেরফের হলেই বাড়তি ফ্যাট শরীরে জমা পড়ে। তুলনায় এনার্জি কম খরচ হলেই এই অঘটন ঘটে। কেউ যদি রোজ এক-কাপ অতিরিক্ত চা খান তাহলে দু-চামচ চিনির ক্যালোরির তাঁর শরীরে জমা পড়লো এইভাবে অতিরিক্ত ক্যালোরি জমা হয়ে ফ্যাট-এর আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

চিকিৎসা এবং ডায়েট দুটোই এক সঙ্গে চলে। চিকিৎসার অর্থে কোন ওষুধপত্র নয়,—পূর্বোক্ত মেসিনের ব্যবহার। তবে চিকিৎসার সময়ে এবং পরেও ডায়েট মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। ডায়েট মেনে না চললে শুধু চিকিৎসায় ফল ফলবে না। হঠাৎ একটা চার্ট চাপ দিয়ে আমার সামনে মেলে ধরলেন। তারপর বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন, এখানে আসার পর ওজন কমতে শুরু করে। দেহের বিভিন্ন অংশও সুষম হওয়ার পথে। কিন্তু মাঝপথে বিদ্রোহ ঘটে। ওজন বাড়ে, দেহের বিভিন্ন অংশও।

কেন এরকম হলো?

নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর দিলেন, ইতি-মধ্যে ডায়েটে অনিয়ম ঘটেছে। এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই এবং থাকতেও পারে না। রোগী অবশ্য স্বীকার করে না। তবে আমরা বসে না থেকে খোঁজখবর নেই এবং জানতে পারি মূল ত্রুটি এখানেই।

আবার দেখুন, এই চার্টটা। ঠিকমতো শুধু ওজনই কমছে না, দেহ সামঞ্জস্যও রক্ষিত হচ্ছে। এখানে কোন অনিয়ম ঘটেনি। সবাই তো সমান নয়।

কথাটা ষোল আনা খাঁটি। মেদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার লোভ বাড়ে। আর সে লোভ দমন করা হয়ে পড়ে খুবই কঠিন। চিকিৎসা করতে এসে এর সঙ্গে শুরু হয়ে যায় জোর লড়াই। কেউ জেতে, কেউ হারে। যে জেতে সে সহজে সেরে ওঠে। আর যে হারে তাকেও জিততে সারতে হয়। সময় কত লাগবে কেউ জানে না।

এমনিতে মোটে তেরটা সিটিং-এর দরকার। চার্জও খুব মডারেট। একদিন ছাড়া একদিন সিটিং। এতে ওজন কমে আট থেকে দশ পাউণ্ডের মতো, শরীরের আয়তন হ্রাস পায়। তবে কারো কারো একটু বেশি সময় লাগে। তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কোর্স আছে। শ্রীমতী খৈতান এবার তার কর্মকেন্দ্র বিস্তৃত করবেন আসামে। বিহার ও ওড়িশায় সম্ভাবনা আছে।

—প্রমীলা

প্রেক্ষাগৃহ

বেংগল ফিল্ম জার্ণালিস্টস্ এসোসিয়েশন-এর ৩৩তম বার্ষিক প্রশংসাপত্র বিতরণী উৎসব

৮ মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদন অভিমুখে চলেছিল সবাই—চলচ্চিত্র জগতের প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সঙ্গীত পরিচালক, বিভিন্ন কলাকুশলী, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, বিশিষ্ট লেখক, নাট্যকার, সাংবাদিক, রাজ্য সরকারের পদস্থ কর্মচারী এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু মাননীয় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। রবীন্দ্র সদনের প্রেক্ষাগৃহ জনপূর্ণ, চত্বর-প্রাঙ্গণে অসংখ্য মোটর গাড়ী। একটি শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ শোভন পরিবেশে শুরু হল বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর) ৩৩তম বার্ষিক শংসাপত্র বিতরণী উৎসব। মঞ্চের উপর সভাপতির আসনে সঙ্ঘ-সভাপতি অশোককুমার সরকার, প্রধান অতিথির আসনে তুষারকান্তি ঘোষ, উদ্বোধকের ভূমিকায় প্রবীণ নট, রবীন্দ্র ভারতীর ভূতপূর্ব ডীন, নটসূর্য ডঃ অহীন্দ্র চৌধুরী, বিশেষ অতিথিরূপে

তুষারকান্তি ঘোষ
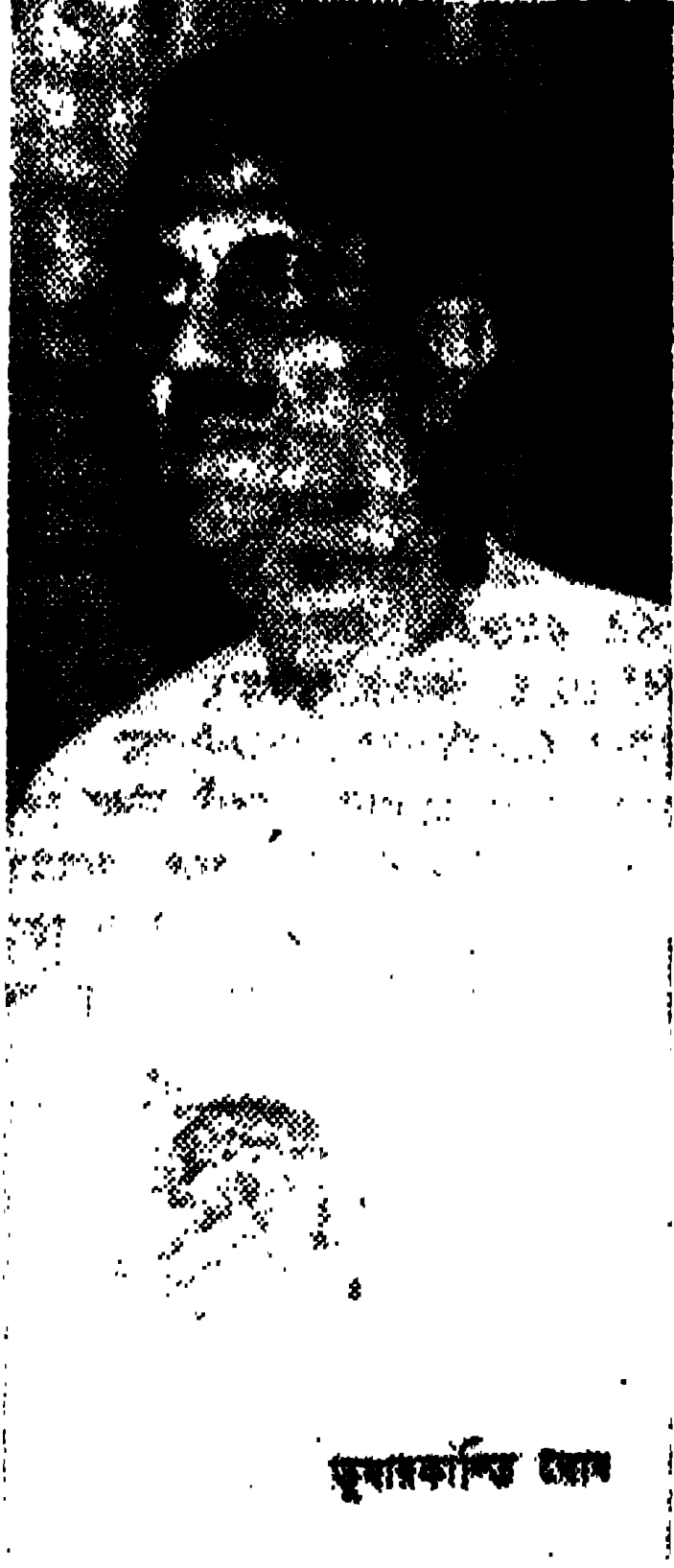
বর্তমানে নেপালের ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর এবং শংসাপত্র-দাত্রী বাঙলার সবাক ছবির প্রথম যুগের স্বনামধন্যা উমাশশী দেবী। সংস্থার সহ-সভাপতি কালীশ মুখোপাধ্যায় দ্বারা সকলে মাল্যভূষিত হবার পরে সভাপতি উপস্থিত সকলকে সাদর অভ্যর্থনা দ্বারা আপ্যায়িত করেন। এর পর নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বাংলার চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে কিছুটা স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন, চলচ্চিত্র সমালোচকরা হচ্ছেন শিল্পীদের বন্ধু, দার্শনিক বিচারক ও পথপ্রদর্শক (ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড)। চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নতিকল্পে বি-এফ-জে-এর প্রচেষ্টা অধিকতর সার্থকতা লাভ করুক, এই আশা প্রকাশ করে তিনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথিরূপে তুষারকান্তি ঘোষ চলচ্চিত্র সমালোচনার প্রথম যুগ থেকে বর্তমান অবস্থার একটি তুলনামূলক মনোজ্ঞ বিবরণ দানের পরে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বি-এফ-জে-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সবশেষে শ্রীরাজবাহাদুর ভারতের জাতীয় জীবনে বাংলার মনীষীদের সার্থক অবদানের কথা
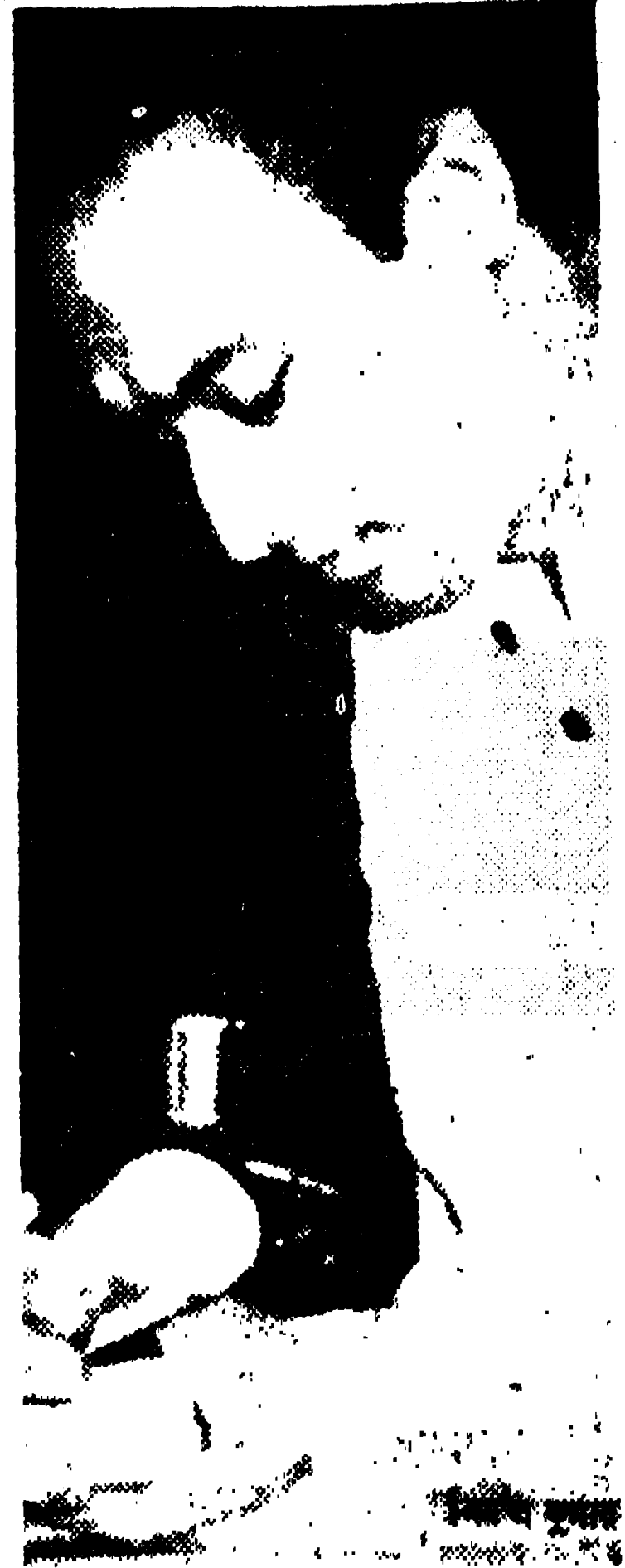
আবেগ ভরে ওজস্বিনী ভাষায় উল্লেখ করবার পরে বলেন : চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও বাঙলাই আন্তর্জাতিক খ্যাতিভূষিত; তাই তিনি এখানকার চলচ্চিত্রকারদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান, দেশকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চলচ্চিত্রের শক্তি অপরিসীম; বিদেশের সঙ্গে ভারতের ঐক্যবন্ধন প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্র রাষ্ট্রদূতদের থেকেও ঢের বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বক্তৃতামালা শেষ হওয়ার পরে বি-এফ-জে-এর বিচারানুযায়ী শংসাপ্রাপকদের মধ্যে শংসাপত্র উপহার দেন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী উমাশশী দেবী। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার জন্যে বোম্বাই থেকে অধিকাংশ প্রাপকই আসতে অসম্মতি প্রকাশ করলেও অজয় সাহানী (হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা), কে কে মহাজন (হিন্দী ছবির সাদা-কালো চিত্রগ্রহণে শ্রেষ্ঠ), মুকেশ (হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক) প্রভৃতি যে-ক'জন আসবেন বলে জানিয়েছিলেন, তাঁরাও ঐ ৮ মেতে বোম্বাই থেকে দিনের উড়োজাহাজ শেষ মুহূর্তে না ছাড়ার জন্যে এসে পৌঁছুতে পারেন নি। হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুহাসিনী মুলে শিক্ষাব্যপদেশে সুদূর কানাডায় রয়েছেন বলে তাঁর মা শ্রীমতী বিজয়া মুলে (যিনি একদা এই কলকাতায় চলচ্চিত্র সেন্সার অফিসাররূপে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করবার সময়ে চলচ্চিত্র জগতের বহুজনকেই আপন অমায়িকতার গুণে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ রেখেছেন) শংসাপত্র গ্রহণ করবার জন্যে তাঁর বর্তমান কর্মস্থল দিল্লী থেকে এসেছিলেন। শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী শশিকলার শংসাপত্র গ্রহণ করে তাঁর কন্যা আশা জয়েদকা। শংসাপত্র বিতরণের পরে চা-পানের বিরতি শেষে বি-এফ-জে-এর শ্রেষ্ঠ কর্মী-সদস্য হিসেবে সহ-সম্পাদক অশোক মজুমদারকে সংস্থা স্তম্ভস্বরূপ বাগীশ্বর ঝা প্রদত্ত রৌপ্য পদকটি প্রদান করেন শ্রীমতী উমাশশী দেবী। হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় গীত সঙ্গীতের পরে সভার কার্যসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত করেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্টুডিও থেকে

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত বাংলা ছবি "কলঙ্কিত নায়ক" আগামী ১৫ই মে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহ সমূহে মুক্তিলাভ করবে। বেবী জন প্রোডাকসন নিবেদিত ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন সলিল দত্ত। সুরারোপে আছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে সেন্সরের ছাড়পত্র প্রাপ্ত ছবিটির প্রধান কয়েকটি চরিত্র রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, উৎপল দত্ত, এন বিশ্বনাথন, বেবী বুচন, মিহির ভট্টাচার্য এবং নৃত্যে মধুমতী (বোম্বে)।

নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, নির্মলা মিশ্র ও বাসবী নন্দী।

বলাই নন্দী নিবেদিত নব গঠিত রামায়ণ চিত্রমের প্রথম চিত্রার্ঘ "মহাকবি কৃত্তিবাস" বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। বাংলার ঘরে ঘরে আদৃত রামায়ণ। সেই রামায়ণ রচয়িতার জীবনকাহিনীই এ ছবির বিষয়বস্তু। রামায়ণ আমাদের ধর্মগ্রন্থ তাই রামায়ণ আমাদের পূজ্য। কিন্তু কৃত্তিবাস আজ বিস্মৃতপ্রায়। সেই কৃত্তিবাসকে বাংলার জনগণের মনে জাগরূক রাখার সঙ্কল্পে এগিয়ে এসেছেন এ ছবির স্রষ্টারা। "ধ্রুব-কৃষ্ণ" খ্যাত চিত্র পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। ছবিটি

সুরসৃষ্টি করেছেন শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদার। ছবির প্রধান সম্পাদক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জী, চন্দ্রানী মুখার্জী, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, মাধবী ব্রহ্ম ইত্যাদি।

এ ছবির ভূমিকাগুলি চিত্রিত করেছেন অসীমকুমার, লিলি চক্রবর্তী, সুমন মুখার্জী, পদ্মা দেবী, গোপীকৃষ্ণ, তরুণ রায়, কল্যাণী মণ্ডল, গীতা প্রধান, রবীন ব্যানার্জী, সুমিত্রা মিত্র, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, ভোলানাথ ব্যানার্জী, পশুপতি কুণ্ডু, তারক ভট্টাচার্য, অশোক সেন, চিত্রালী মুখার্জী, বুলা মুখার্জী, বেচু সিংহ, সুচিত্রা, গজানন ব্যানার্জী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

মঞ্চাভিনয়

মসিজীবী : ৮ মে 'কাল্পনিক' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা মিনার্ভায় ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'মসিজীবী' নাটকটি পরিবেশন করেন। শিশির চক্রবর্তী ছিলেন নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্বে। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন অশোক রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু দাস, শংকর দাস, চঞ্চল ভট্টাচার্য, অজয় চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মান্না, স্বপন রুদ্র, জয়দেব বসাক, মণি বিশ্বাস, হীরক, মানসী ব্যানার্জি, রুমা গুহ, মালা দাস ও শিশির চক্রবর্তী।

সংগম : বোম্বাইর সুপরিচিত সংস্থা 'সংগম' সম্প্রতি বালগন্ধর্ব নাট্যমন্দিরে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা'। নাট্য-পরিচালনা করেন চিত্র-পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য। জ্যোতির্ময় মুখার্জির 'মিঃ হালদার', অপূর্ব। মানিক দত্তর 'সঞ্জীব' ভোলবার নয়। সুকৃতি রায়চৌধুরীর 'মনোহর' অনবদ্য এক চরিত্রসৃষ্টি। চমৎকার অভিনয়নৈপুণ্য দেখান তরুণ ঘোষ (ভূপতি), অনুরাধা চ্যাটার্জি (স্বপ্না), সমর গুপ্ত (মিঃ চৌধুরী) ও ইন্দ্রাণী মুখার্জি (ছন্দা)। অন্যান্য ভূমিকায় অশোক চ্যাটার্জি, ষষ্ঠী চৌধুরী ও অমল সেন সুঅভিনয়ের সাক্ষ্য রাখেন। আলোক-সম্পাত ও সঙ্গীত যথাযথ।

ডক্টরস ক্লাবের আলমগীর : ২৯ এপ্রিল রঙমহল মঞ্চে এই হাসপাতালের চিকিৎসকদের সংস্থা ডক্টরস ক্লাব চতুর্দশ বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষে 'আলমগীর' অভিনয় করেন। আলমগীর চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তনশীল কূটনৈতিক ব্যঞ্জনা প্রকাশে যে সাবলীল অভিনয় দক্ষতার পরিচয় ডাঃ বিমল খাসনবীশ দিয়েছেন তা তাঁকে দীর্ঘকাল দর্শকের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। দিলীর খাঁ চরিত্রাঙ্কনে ডাঃ নারায়ণ চন্দ্রের কৃতিত্ব ঐ চরিত্রের যোগ্য ব্যক্তিত্ব আরোপে যথেষ্ট উজ্জ্বল। রাজসিংহ চরিত্রাভিনেতা পরিচালক, ডাক্তার বাণী সেনগুপ্ত মেবাররাজ অধিপতির যে দৃঢ়তা ও উদারতার ছবি এঁকেছেন তা অনুরূপে প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে সর্ব-ডাক্তার সুরজিৎ ঘোষ, মিলন মজুমদার, নারায়ণ সেন, শঙ্কর সেন, সৌরেন বন্দ্যো, অনিল ভট্টাচার্য, নীহার রায়-চৌধুরী, সাগর ঘোষ, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল দত্ত, ধীরেন পাল, সুকেশ চক্রবর্তী, পবিত্র ঘোষ, অতুলানন্দ দাশগুপ্ত যথেষ্ট সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। শেষের দুই শিল্পী কৌতুকরস সৃষ্টিতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রী-চরিত্রে শ্রীমতী গীতা দে, কাজল মুখোপাধ্যায়, বীথি গাঙ্গুলী ও অনুরাধা রায়চৌধুরী চরিত্রগত অভিনয়ে উল্লেখনীয়।

৩ মে জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা হৈ-চৈ-এর আসর (কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ) নিখিল দের নির্দেশনায় পঞ্চদশ নিবেদন শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ-কাল' স্থানীয় শ্রীভবন রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সর্বশ্রী রবীন্দ্র-

নাথ রায়, নিখিল দে, অসীম মুখার্জি, শৈলেন কর্মকার, কানাইলাল রায়, নিখিল-রঞ্জন চৌধুরী, সমর মজুমদার, বাসু চক্রবর্তী, সরকার, সবিতা রায় ও দীপ্তি চ্যাটার্জি অংশ গ্রহণ করেন।

অভিনয় দিক দিয়ে বিচারে নাটকের প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। তাহলেও অবিনাশ, সুবিনয়, অমল, বাবলু চরিত্রে যথাক্রমে নিখিল দে, রথীন্দ্রনাথ রায়, অসীম মুখার্জি, স্বাধীন পাণ্ডের অভিনয় ও অভিব্যক্তি মনে রাখার মত। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয়ের দাবী রাখেন রঘু—নিখিলরঞ্জন চৌধুরী, অশোক — শৈলেন কর্মকার, মধুময়—কানাইলাল রায়। নারী-চরিত্রে রমার ভূমিকায় সবিতা রায়, লতার চরিত্রে দীপ্তি চ্যাটার্জির অভিনয় বিশেষ সুশৃঙ্খলার দাবী রাখেন।

এই সংস্থার নাট্যাভিনয়ের প্রধান সম্পদ ছিল গতিবেগ এবং করুণ নাটকীয় রসের কিছু খণ্ডমুহূর্ত। টিম-ওয়ার্ক এক কথায় অপূর্ব। এদের মঞ্চসজ্জা সুন্দর রুচিসম্মত। আলোকসম্পাত সন্তোষজনক। আবহসঙ্গীত প্রশংসার দাবী রাখে।

বিলাসপুর : আগামী ১৭ মে '৭০ সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে মঞ্চে বেঙ্গলী ক্লাবের সৌজন্যে আর্ট থিয়েটার (কাঁচড়া-পাড়া) তুলসী লাহিড়ী বিরচিত নাটক 'গণনায়ক' অভিনয় হইবে।

যাত্রার আসরে নতুন নাটক : উত্তর কলকাতার সুপ্রাচীন সৌখীন নাট্যসংস্থা সান্ধ্য নাট্যসঙ্ঘের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দুদিনব্যাপী যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল বাগবাজারের নব-বৃন্দাবন নাটমন্দিরে। ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় অভিনীত হল সঙ্ঘের নাট্যশিক্ষক শ্রীবিপিন মুখোপাধ্যায় রচিত 'ভূমিলক্ষ্মী'। ভূমি বন্টন আইন আর তার প্রয়োগ নিয়ে শাসক শক্তির প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বন্দ্ব ও ভূমিহীনের ক্ষোভের পটভূমিকায় রচিত নাটকটি সুপ্রযোজিত ও সুঅভিনীত হয়ে অগণিত শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে। অভিনয়ে সঙ্ঘ তার পূর্বের টিম-ওয়ার্ক রেখেছেন এবং নারীচরিত্রে পুরুষ দ্বারা অভিনয় ও বিবেক চরিত্র বজায় রেখে সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর প্রতি-ফলিত করেছেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমন্মথ রায় ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅখিল নিয়োগী। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আসরস্থ হল 'সংসার' নাটকটি। এই দিনও দর্শক মুগ্ধ-বিস্ময়ে সঙ্ঘকে অভিনন্দিত করেন।

বঙ্গের বাইরে বাংলা নাটক : সম্প্রতি হিন্দু মিলন মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় ২৬ এপ্রিল স্থানীয় 'প্রয়াসী' নাট্যসংস্থা রমানাথ লাহিড়ী দুর্গাবাড়ীতে দিলীপকুমার রায়ের কাহিনী ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাট্যরূপ 'অঘটন আজও ঘটে' নামক নাটক মঞ্চস্থ করে নাট্যরসিক মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ভিন্ন স্বাদের নাটকটির সাফল্যের মূলে রয়েছে দলগত অভিনয়নৈপুণ্য, আঙ্গিকের অভিনবত্ব ও বিষয়বস্তুর প্রকাশের ভঙ্গী তার জন্য কৃতিত্বের দাবী রাখেন প্রয়োগ-প্রধান শ্রীঅমিয়কান্তি ভট্টাচার্য। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে যুক্তিবাদী 'অসিতে'র ভূমিকায় শ্রীঅমিয়কান্তি ভট্টাচার্য সংযত, সংবেদন-শীল, ব্যক্তিত্বময় ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। 'সতী'র ভূমিকায় কুমারী দীপালি দত্ত এককথায় অপূর্ব। অমল, অরুণ, আনন্দ গিরি, গুরু, রহমৎ, নন্দা, কমলা ও শ্যাম ঠাকুরের ভূমিকা যথাক্রমে সর্বশ্রী দিলীপ দত্ত, সরোজ কুণ্ডু, রবীন মুখোপাধ্যায়, নলিনী চট্টোপাধ্যায়, অজয় চট্টোপাধ্যায়, অনিলকান্তি ভট্টাচার্য, অনাদি দাস, শ্রীমতী শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লতা বোস ও শ্রীঅশোককুমার বসু সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া মিহির দাস, উদয়ন মুখোপাধ্যায়, কুমারী সীমা বোস, শম্ভু মুখোপাধ্যায় ও শান্তি বন্দ্যো-পাধ্যায় সুঅভিনয় করেন। স্মারক, মঞ্চ-সজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতের জন্য সর্বশ্রী শ্রীতোষ চক্রবর্তী, অনিলরঞ্জন দত্ত, মধুসূদন সেন, রবীন্দ্রনাথ দে, নূর মহম্মদ ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসা লাভ করেন।

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম সমাবর্তন উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ নাটক, সঙ্গীত ও চারুকলা আকাদামী গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্মানপত্র ও নগদ দু' হাজার টাকা প্রদান করা হয় চিত্রকলা শিল্পী যামিনী রায়কে, নৃত্যকলা শিল্পী উদয়শংকরকে এবং নাট্যকলা শিল্পী অহীন্দ্র চৌধুরীকে। উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রথম বছর পশ্চিমবঙ্গ নাটক, সঙ্গীত ও চারু-কলা আকাদামী এইভাবে গুণিজনদের সম্মানিত করবার ব্যবস্থা করেছেন।

রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ এবারেও ২৫ বৈশাখ (৯ মে) থেকে ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) পর্যন্ত এগারো দিনে তেরোটি অনুষ্ঠানের (প্রতি রবিবার দু'টি) মাধ্যমে রবীন্দ্র নাটক, নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীতের আসর প্রবর্তন করে ১০৯তম রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছেন।

২৫ বৈশাখে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সদনের গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, রবীন্দ্র সদন কেবল নৃত্য-গীত-অভিনয় অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত হয় নি — রবীন্দ্রসাহিত্যে

অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় বৃত্তির অনুশীলনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে—সঙ্গীতের রেকর্ড সংগ্রহ। এই সংগ্রহে কেবল রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রেকর্ড নয়—পুরানো দিনের বহু দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য প্রায় ২০০ খানা রেকর্ড দান করেছেন শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায়। পুরনো ও নূতন রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র সদন পরিচালক সমিতির সহ-সভাপতি শিক্ষাসচিব জে সি সেনগুপ্ত বলেন যে, পঞ্চাশ বছর আগে কিভাবে বিভিন্ন সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হত—বর্তমানের সঙ্গীত গবেষকরা এই গ্রন্থাগার থেকে তার কিছু তথ্য পাবেন। রবীন্দ্র সদন উৎসব সমিতির সভাপতি মন্মথ রায় বলেন যে, বর্তমানে প্রায় ১২০০ বই সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা, রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কিত রচনা এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য রচনা রয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের পক্ষে এগুলি চিত্তাকর্ষক হবে। আপাতত রবীন্দ্র সদনের দোতলায় একটি ঘরে বই এবং অপর ঘরে রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার ও গ্রামোফোন যন্ত্র রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা আছে যে, ছোট ছোট ঘর করে এক সঙ্গে যাতে একাধিক ব্যক্তি রেকর্ড শুনতে পারে তার ব্যবস্থা করা। গ্রন্থাগারের এই রেকর্ড বিভাগটি কলকাতার সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও গবেষকদের পক্ষে নিঃসন্দেহে নূতন জিনিস হবে।

গীতালি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা : গীতালি সঙ্গীত শিক্ষায়ন আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয় : কণ্ঠসঙ্গীত, গীটার, বেহালা, সেতার, তবলা ও নৃত্য। মূল পুরস্কার ব্যতীত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের মধ্যে কণ্ঠ-সঙ্গীতে একটি তানপুরা, গীটারে একটি গীটার এবং নৃত্যে পাঁচশত জয়পুরী নূপুর দেওয়া হইবে। এছাড়া শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষায়তন ও শিক্ষককে পুরস্কৃত করা হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ২০ মে'র ভিতর যোগাযোগ করুন : পংকজ সাহা, অধ্যক্ষ গীতালি—৩বি, ললিত মিত্র লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা—৪।

বাগবাজারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ **শিল্পীদল** সম্প্রতি অনুষ্ঠিত করে তাদের প্রথম বর্ষ-পূর্তি উৎসব। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সবশ্রী অনিল দত্ত, গোরাচাঁদ মুখার্জি, বাঁশরী মিত্র (বাঁশী), দীপক মিত্র, গোবিন্দলাল বোস (কাওয়াল), গোপাল মুখার্জি, অসিত গাঙ্গুলী, লোকেশ লাহা, ছন্দা ধর, শিখা দত্ত, আলপনা দত্ত, রূপক চ্যাটার্জি, তরুণ বোস,

সালকিয়া তরুণ পরিষদে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নির্মলেন্দু চৌধুরী

মিনতি দাস, কেদার সাউ ও রত্না চ্যাটার্জি, প্রতিমা দাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরেশ চ্যাটার্জি।

গত ৬এপ্রিল সালকিয়া তরুণ পরিষদ-এর উদ্যোগে একটি মনোগ্রাহী বিচিত্রা-নুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলা দেশের বিখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যন্ত্রশিল্পী নিমাই দাস।

ভারত চিত্রের প্রযোজনায় অশোক বাগচী ও অলোক এন বাগচীর পরিচালনায় দুইখানি তথ্যচিত্র 'শান্তিপুর ও তাঁত শিল্প' এবং 'বাংলার উৎসব ও পূজাপার্বণ' প্রস্তুত হচ্ছে।
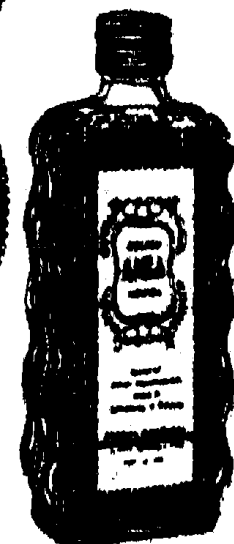
বেতার স্মৃতি

গতবারে গানের অডিশন বোর্ড গঠনের গোড়ার কথা লেখা হয়েছে—কীভাবে আগে বেতারে গানের শিল্পীদের মনোনীত করা হ'ত, তারপর এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে কীভাবে অডিশন বোর্ড গঠন করা হ'ল এবং এখন আবার এই অডিশন বোর্ডের বিরুদ্ধে কী দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেই কথাও।

অডিশন বোর্ডের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে সঙ্গত কারণেই একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে : আগে যখন অডিশন বোর্ড ছিল না, প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্টরা শিল্পী মনোনীত করতেন তখনকার গানের স্ট্যাণ্ডার্ডের চেয়ে এখন যখন বাইরের সঙ্গীতজ্ঞদের নিয়ে গঠিত অডিশন বোর্ড শিল্পী নির্বাচন করছেন তখন গানের স্ট্যাণ্ডার্ড কি উন্নত হয়েছে? এর কোনো সহজ উত্তর আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবে বেতারে গাইবার অনুপযুক্ত অনেক শিল্পী যে বেতারে এসে গেছেন সে বিষয়ে তাঁরা অনবহিত নন। ১৯৫৮ সালে আকাশবাণীর ডিরেকটর-জেনারেল 'সি' ক্লাসের সমস্ত শিল্পীর প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে আদেশ জারি করেছিলেন। এ বিষয়ে লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে তদানীন্তন বেতারমন্ত্রী ডঃ বি ভি কেশকর বলে-ছিলেন, অডিশনে পাস করলেই কোনো শিল্পী প্রোগ্রাম করার অধিকার অর্জন করেন না, এবং প্রোগ্র্যামের মানের উন্নতির জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৬১ সালে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন 'বি' ক্লাসের শিল্পীদেরও সাধারণত 'সোলো' প্রোগ্র্যাম করতে দেওয়া হবে না। এবং তারও উদ্দেশ্য ছিল প্রোগ্র্যামের মানের উন্নতি করা।

কিন্তু যে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতাদের মনে এসে পড়ে : প্রোগ্র্যামের সামগ্রিক মান কি সত্যিই উন্নত হয়েছে? শ্রোতারা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন : না।

কারণ, অডিশন বোর্ড সব সময় নিরপেক্ষভাবে শিল্পী নির্বাচন করেন না। অডিশন বোর্ডের সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু তাঁদের স্বার্থ যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। এবং এই আভাসটিই গতবারের আলোচনায় দেওয়া হয়েছিল।

অডিশন বোর্ডের প্রায় সকল সদস্যেরই ছাত্রছাত্রী আছেন, এবং এই ছাত্রছাত্রীরা সকলে নিছক গান শেখার জন্যই তাঁদের 'স্কুলে' ভর্তি হন না, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অডিশনের বৈতরণী পার হওয়া। রেডিওর প্রতি সকলেরই একটা মোহ আছে, সবে যিনি গান শিখতে আরম্ভ করেছেন তাঁরও লক্ষ্য রেডিওয় গাওয়া। এবং তাঁরা জানেন, রেডিওয় গাইতে হলে অডিশন বোর্ডে যাঁরা আছেন তাঁদের ধরতে হয়, এবং ধরাটা সহজ হয় যদি তাঁদেরই কাছে গান শেখা যায়। আর অডিশন বোর্ডের সদস্যরা অনেকেই যে এই সুযোগ নিয়ে থাকেন সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অডিশনের বোর্ডের সদস্যদের অনেকেই প্রায় দুশ্যমান সঙ্গীতজগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁরা অনেকটা টিকে থাকার জন্যই 'স্কুল' খুলে বসেছেন, এবং সেই 'স্কুলে' ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি হতে পারে যদি তাঁরা অডিশনে পাস করিয়ে রেডিওর প্রোগ্র্যামের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এবং যাঁরা যত ছাত্রছাত্রী পাস করাতে পারবেন তাঁদের তত নাম-ডাক হবে, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়বে, স্কুলের বাড়বাড়ন্ত হবে—অর্থ আসবে। তাই দে[...] যায়, অডিশনের বোর্ডের সদস্যদের কারও না কারও 'স্কুলে' ভ[...] হতে না পারলে অডিশনের বৈতরণী পার হওয়া দুঃসাধ্য—এ[...] ভর্তি হলে অনেক পঙ্গুও অনায়াসে গিরি লঙ্ঘন করে যে[...] পারেন।

কিন্তু পঙ্গুদেরই তো গিরি লঙ্ঘনের সাধ বেশি, ত[...] তাঁরা রেডিওয় ভিড় করে আছেন।

অডিশন বের্ডে এই যে দুর্নীতি চলছে, স্থানীয় বেতার কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে বেশ সচেতনই আছেন। তাঁরা বেশ ভালো করেই জানেন, কোথায় দুর্নীতি কিসের দুর্নীতি। কিন্তু মৌচাকে ঘা দেবার সাহস তাঁদের নেই। তাঁরা চোখ বুজে থাকার চেষ্টা করেন, কেউ তাঁদের কাছে অভিযোগ করলে এড়িয়ে যাবার পথ খোঁজেন—এমন কি, বেতার কেন্দ্রের লোকেরা অভিযোগ করলেও। আমি জানি, এই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এমন একজন সৎ, বলিষ্ঠ অফিসার ছিলেন যিনি এই দুর্নীতির উচ্ছেদ চেয়েছিলেন, এবং একের পর এক অনেক স্টেশন ডিরেকটরের কাছে অভিযোগ পেশ করে মৌচাকে ঘা মেরে এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্টেশন ডিরেকটররা কেউ-ই সাহসী হন নি। তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, 'আমি আর ক'দিন আছি। আমার পরে যিনি আসবেন তাঁর কাছে ব্যাপারটা তুলবেন।' তাঁরা জানতেন, অডিশন বোর্ডের সদস্যদের অনেকেরই দিল্লীতে শক্ত খুঁটি আছে, সে খুঁটি সহজে নাড়ানো যাবে না—নাড়াতে গেলে হয়তো তাঁদের নিজেদেরই নড়ে যেতে হবে।

কিন্তু দিল্লী কেন এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বোঝা দুষ্কর। রেডিও জাতীয় সম্পত্তি এবং কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত কিছু এখানে চলা উচিত নয়। রেডিওর প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রোগ্র্যামের মানের উন্নতি-বিধান—এবং তার জন্য সমস্তরকম দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ।

দিল্লীর উচিত বর্তমান অডিশন বোর্ড ভেঙে দিয়ে এমন সব সদস্যদের নিয়ে নতুন অডিশন বোর্ড করা যাঁদের 'স্কুল' নেই, ছাত্রছাত্রী নেই, —সঙ্গীতই যাঁদের কাছে প্রধান বিবেচ্য। তাঁদের যে গায়ক হতেই হবে কিম্বা গানের শিক্ষক অথবা সিনেমার সঙ্গীত-পরিচালক হতে হবে তার কোনো মানে নেই।

আর তা যদি না করা যায় তাহলে আগেরই মতো প্রোগ্র্যাম এগ্‌জিকিউটিভদের উপর শিল্পী নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেওয়া হোক, যে প্রোগ্র্যাম এগ্‌জিকিউটিভরা সঙ্গীত বোঝেন তাঁদের উপর। তাতে বিউরোক্র্যাসি হয়তো আসবে কিছুটা, কিন্তু দুর্নীতি কমবে অনেকটা। কারণ, প্রোগ্র্যাম এগ্‌জিকিউটিভদের গানের 'স্কুল' থাকে না, ছাত্রছাত্রী থাকে না—ছাত্রছাত্রীদের অডিশনে পাস করিয়ে টিকে থাকার দায়ও তাঁদের নেই। তাঁরা হয়তো অন্যায়ভাবে দু-চারজন জানা-শোনা লোক কিম্বা বন্ধুবান্ধবের পুত্র-কন্যা আর স্ত্রীকে পাস করাবেন, কিন্তু সেই সংখ্যা এখনকার অডিশন বোর্ডের সদস্যদের অন্যায়ভাবে পাস করানো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার চেয়ে অনেক কম হবে।

খেলার কথা

ক্রিকেট আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র

ক্রিকেটের আকাশে এখন সবচেয়ে ...জ্বলে তারা হচ্ছেন গারফিল্ড সোবার্স। ...চম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এই ক্রিকেট ...লোয়াড়টি সম্ভবত সর্বকালের অন্যতম ... ব্যাটসম্যান ডন ব্র্যাডম্যানের খ্যাতিকেও ...ড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই উত্তুঙ্গ জন-... তার প্রধান কারণ ক্রিকেটের সর্ব বিভাগে অসাধারণ দক্ষতা; কি ব্যাটিং, কি ...লিং, কি ফিল্ডিং কোনটিতেই তাঁকে াধা-...ন্তরে ধরে রাখা যায় না। ব্যাট ধরলে ...গুন ছোটে, বল হাতে নিলে প্রতিপক্ষের ...টসম্যানরা চোখে ধুতরো ফুল দেখেন, ...র উইকেটের কাছে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং নিলে ...য কোন দূরত্বে ক্যাচ অনায়াসে ধরা পড়ে, ...র দুর্দ্ধর্ষ ব্যাটসম্যানদের ফেরৎ যেতে ...। এমনি একটি খেলোয়াড একাই তিন-...ন খেলোয়াড়ের মহড়া নিয়ে কাজ করে ...লেন। তাঁর অধিনায়কত্ব ও কুশলী দল ...রিচালনা প্রতিপক্ষ অধিনায়কের দুঃস্বপনের ...রণ হয়ে ওঠে।

চৌত্রিশ বছর বয়সের এই অমিতবিক্রম ...খেলোয়াড়টির দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে ...শ্বের ক্রীড়ারত সমস্ত দেশেই, সর্বপ্রকার ...বহাওয়াতেই তাঁর দক্ষতা অনতিক্রম্য। ...য়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্থান, ...স্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড বা ইংলন্ড কোন ...শেই তাঁর নৈপুণ্যের ঘাটতি দেখা যায়নি। ...কথা আজ মুক্ত কন্ঠেই বলা যায় যে ...কেটের সকল বিভাগে এমন সাবলীল ...ক্ষতা আর কোন খেলোয়াড়ই দেখাতে ...রেন নি।

কৃতিত্বের খতিয়ান নিলে সোবার্সের ...ভিন্ন কৃতিত্বের তালিকা যে কোন সেরা ...কেট খেলোয়াড়ের তালিকাকে ছাড়িয়ে ...বে। টেস্ট ম্যাচে ব্যাটিং ও বোলিং দু-...ভাগের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ...র এক অসাধারণ রেকর্ড—একদিকে সাড়ে ...ট হাজার রাণ ও অন্যদিকে দেড়শো ...ইকেট। কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় ...উথ অস্ট্রেলিয়ান টিমের পক্ষে খেলে তিনি ...ক মরশুমে হাজার রাণ ও অর্ধশত ...ইকেট জয়ের রেকর্ড করেন পর পর দু ...র। ১৯৬৬ সালেই টেস্ট ক্রিকেটে পর ...র একটানা যোগদানের গৌরবে তিনি এক ...জীর রেখেছেন—নিউজিল্যান্ডের খ্যাতনামা ...লোয়াড় রীড ৫৮টি টেস্টে পর পর ...লার যে রেকর্ড করেছিলেন তা অতিক্রম ...রেছেন সোবার্স। একই টেস্ট ম্যাচে ...ঞ্চুরী ও পাঁচ বা ততোধিক উইকেট ...বার কৃতিত্বেও তিনি বিশ্বের নজ্জন খেলোয়াড়ের অন্যতম— এই গৌরব পেয়েছেন—জে এইচ সিনক্লেয়ার, জি এ ফকনার, সি ই কোলওয়ে, জে এম গ্রেগারী, ভিনু মানকড়, কে আর মিলার, পলি উমরিগড়, আর এ টেলার ও গারফিল্ড সোবার্স।

সোবার্স ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা চৌকস খেলোয়াড় কিনা এ নিয়ে তথ্যাভিজ্ঞ মহল হিসেব-নিকেশ করে কি সিদ্ধান্তে আসবেন জানা শক্ত হলেও সাধারণ একটা প্রবল জনমত তাঁর পক্ষেই যাবে। অনেকে হেঁকে ডেকে একথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তুলনামূলক হিসেবে সোবার্সের অনন্যসাধারণ রেকর্ড সে মতই প্রতিষ্ঠিত করবে সন্দেহ নেই। এককালে ডবলিউ জি গ্রেস তাঁর অসাধারণত্বে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। ক্রিকেট জীবনে তিনি মোট ৫৪,৮৯৬ রাণ ও ২৮৭৬টি উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন। সে যুগে তিনি ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি-ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

শংকর বিজয় মিত্র

দক্ষিণ আফ্রিকার অব্রে ফকনার ছিলেন গুগলি বোলার। টেস্ট ক্রিকেটে তিনি ৭৫৪ রাণ ও ৮২টি উইকেট নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে জর্জ হার্স্ট যখন প্রথম দু হাজারের বেশি রাণ (২৩৮৫) ও দুশোর বেশি উইকেট (২০৮) নিয়েছিলেন তখন হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। কেউ তাঁর এ রেকর্ড ভাঙ্গতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'যেই করুক না কেন তাকে ক্লান্ত হতে হবে।' কিন্তু হার্স্টের এই রেকর্ড এখন সোবার্সের রেকর্ডের কাছে নবীন। এরপর ধরা যাবে উইল্‌ফ্রেড রোড্‌সের কথা। তিনি তাঁর জীবনে সঞ্চয় করেছিলেন ৩৯, ৮০২ রাণ (গড় ৩০-৮৩) এবং ৪১৮৭টি উইকেট (গড় ১৬-৭১) ফ্র্যাংক উলির কৃতিত্বও অবিস্মরণীয়।

একথা ঠিক যে এক যুগের খেলোয়াড়ের শক্তি সামর্থ্য বা দক্ষতা অপর আর এক যুগের খেলোয়াড়ের ঐ সব গুণাবলীর সঙ্গে তুলনা করা সমীচীন নয়। কারণ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, যুগের অবস্থা ও অন্যান্য বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের উপর খেলোয়াড়ের প্রতিভা নির্ভরশীল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থা হলেও কতক-গুলি খেলোয়াড় সর্বযুগেই মাথা উঁচু করে থাকেন। এর কারণ এঁদের প্রতিভা খেলাটিকে সহজ, সাবলীল ও অনায়াস সাধ্য করে লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে থাকে। সোবার্স সেই ধরনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুখের কথা এই যে অতীতের নজীর হিসেবে গবেষণার বস্তু না হয়েই সোবার্স তাঁর নিজের যুগেই সকলের স্বীকৃতি পেয়েছেন। সোবার্সের বৈশিষ্ট্য এই যে ব্যাট করলে মনে হয় স্বাভাবিকভাবেই যে কোন মারই তাঁর ব্যাটের ডগায় ফুলের মত ফুটে উঠছে। কোন খেলায় যে সোবার্সকে শ্রম করতে হচ্ছে এমনটা কোন সময়েই মনে হয় না। সোবার্স একটা খুব ফাস্ট বল দেলেন, কিন্তু দেখে মনে হল একটু বেঁখাক। নিলেই বলটা আরও ফাস্ট হত। তাছাড়া ব্যাটে, বলে বা ফিল্ডিংয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখানোর পরও মনে হয় সোবার্স যেন পুরো গা ঘামায়নি। এখনও প্রচুর শক্তি ওর মধ্যে রয়েছে। অনেক সময় ঘটেছে তাই। বিপদাপন্ন দলকে একাই কাঁধে করে তুলে নিয়ে এসেছেন সাফল্যের শীর্ষদেশে।

১৯৬৬ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে সোবার্স করেন ৭২২ রাণ (গড় ১০৩-১৪), পতন ঘটান বিপক্ষের কুড়িটি উইকেটের। তার গড় হল ২৭-২৫ রান এবং ক্যাচ ধরে বিপক্ষের দশজনকে আউট করে দেন। ম্যানচেস্টারের প্রথম টেস্ট ম্যাচে ১৬১ ও ১০৩ রান করলেন এবং উইকেট নিলেন তিনটি। লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে ৪৬ রান ও ১৬৩ নট আউট আর ৯৭ রাণে এক উইকেট। নটিংহামে তৃতীয় টেস্টে ৩ ও ৯৪ রাণ এবং ১৬১ রানে পাঁচ উইকেট। লীডসে চতুর্থ টেস্টে ১৭৪ ও ৮০ রাণে আট উইকেট। ওভালে পঞ্চম টেস্টে ৮১ ও শূন্য রান এবং ১০৪ রানে ৩ উইকেট। টেস্ট ম্যাচের পরের খেলায় দৃঢ়তা নিয়ে সোবার্স সেবার যে খেলা দেখিয়েছেন ইংলন্ডের ক্রিকেট রসিক মহল তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান সোবার্সের খেলা দেখে বলেছেন, তিনি যে সকল খেলোয়াড়কে জানেন তাদের কেউই এত তীব্র বেগে বলকে মাঠের বাইরে পাঠাতে পারেন না— তাঁর মারের মধ্যে থাকে প্রচন্ড শক্তি। ফ্র্যাংক উলির পর এমন শক্তিধর ন্যাটা ব্যাটসম্যান দেখা যায় নি। তাঁর খেলাকে ক্লাসিক্যাল স্টাইলের বলা চলে না। তবে একটা অনবদ্য অনায়াস ছন্দের স্বাক্ষর তাঁর খেলায় প্রতিভাত হয়। সোবার্সের ড্রাইভ দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বলটা যেন মন্থর গতিতে আছে কিন্তু ঐ বল যখন

গারফিল্ড সোবার্স

কোন ফিল্ডার আটকান, তাঁর হাত অক্ষত থাকে না কিংবা বাউণ্ডারীর বেড়ায় গিয়ে লাগলে তার প্রচণ্ড ভর ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পুস ও পুলগুলিও দেখবার মত। হুক মারবার সময় তিনি যেন দেহের সমস্ত ভারসাম্য হারিয়ে বলের মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করেন।

সোবার্স ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দৈহিক সামর্থ্যে ও মুক্ত জল হাওয়ার পরিবেশে গড়া একটি স্বাভাবিক প্রতিভা। এমন যুগে তাঁর আবির্ভাব যে যুগে তিন ডবলিউ নামাঙ্কিত , ক্রিকেট ত্রয়ী বিশ্বের ক্রিকেট মহলে চমকের সৃষ্টি করেছে। এ'রা হলেন ওরেল, উইকস ও ওয়ালকট। আবার সেই সঙ্গে বোলিং-এ এসেছেন সনি রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইন। এই সমস্ত দিকপাল খেলোয়াড়দের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী আরত্ত করার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। মাত্র দশ বছর বয়সে সোবার্স বা হাতে স্লো বল দিয়ে শুরু করেন—অবশ্য তখন কোন নিয়মিত ট্রেণিং তিনি পান নি। বয়স যখন ষোল তখন একটা জাহাজী কোম্পানীতে কেরাণীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্পিন বোলিং করতে শিখেন এবং তখনই সেখানে ভ্রমণরত এক ভারতীয় · দলের বিরুদ্ধে বার্বাডোজ দলে স্থান পান। এই খেলাতে তিনি ১৪২ রানে ৭টি উইকেট পান।

১৯৫৩-৫৪ সালে সোবার্স তখন সতের বছরের তরুণ—কিংসটনের সেবিনা পার্কে তিনি টেস্টম্যাচে স্থান পেলেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। অসুস্থতার জন্য ভ্যালেন্টাইন খেলতে পারলেন না বলে পঞ্চম টেস্টে তাঁর জায়গায় স্থান হ সোবার্সের। ব্যাটিং পর্যায়ে তাঁর স নবম। তবে তিনি ২৮ ওভার বল কর এবং ৪টি উইকেট নিলেন ৭৩ রা ইংলণ্ড ৪১৪ রাণ তোলে এবং একা হাটনই করলেন ২১৫ রান। দু ইনি ব্যাট করে তিনি করেছিলেন যথাক্রমে (অপরাজিত) ও ২৬ রাণ। এরপর থে ক্রিকেট জীবনের মহত্তর সম্ভাবনার তাঁর খুলে যায়। তাঁর স্বভাবজ ক্রীড়ানুরাগ ও প্রকৃতিদত্ত সামর্থ্য নৈপুণ্যের সহায়তায় তিনি ক্রিকেটের অবিসম্বাদী নেতারূপে স্বীকৃতি করেন। ঐ সময় থেকে ব্যাটিং-এর দি জোর নজর দিলেন এবং তাতে এ সাফল্য অর্জন করলেন যে ১৯৫৫ সা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হ চতুর্থ টেস্টে জে কে হান্টের সঙ্গে গোড় পত্তনকারী ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলবা সুযোগ পেয়ে গেলেন। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে যখন ৬৬৮ রান করেছে তখ তিনি মারমুখী হয়ে এমন খেলতে লাগলে যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলিং জু লিণ্ডওয়াল ও মিলারের বলে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ৪৩ রান সংগ্রহ করলেন।

ইংলণ্ডে সোবার্স প্রথম তাঁর দেশের হয়ে খেলেন ১৯৫৭ সালে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সেবার ৩-০ খেলায় রাবার খুইয়ে আসে। সোবার্স এই সিরিজের প্রথম ইনিংসে ৩২০ রান করেন এবং গড়ে ৭০ রান দিয়ে পাঁচটি উইকেট পান। এরপর সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে যোগ দেন এবং বোলিংয়ের স্পীড ও সুইং-এর দিকে মন দেন।

১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলভুক্ত হয়ে তিনি ভারত সফরে আসেন। এখানে তাঁর খেলা ক্রমোন্নতির পথে এগোতে থাকে। ভারতের মাটিতে তিনি বাঁহাতে গুগলি বোলিং করতে থাকেন. এতে তাঁর ব্যাটসম্যানশিপের কোন হানি হয় নি। ভারতের বিরুদ্ধে তিনি মোট ৫৫৭ রান করায় তাঁর ব্যাটিং-এর গড় দাঁড়ায় ৯২-৯৩ এবং ২৯২ রানে দশটি উইকেট দখল করেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্থান সফরে গিয়ে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ৩৬৫ নট আউট রান করে বিশ্বের ক্রিকেট মহলকে চমৎকৃত করেন।

১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় তিনি সাফল্যের শীর্ষে ওঠেন এবং খাস অস্ট্রেলিয়াতেই ব্যাডম্যানের খ্যাতিকেও যেন ম্লান করে দেন।

সোবার্স যে দেশেই খেলতে গিয়েছেন তিনি যে দেশেই ক্রিকেট খেলতে গিয়েছেন একক ব্যক্তিত্বে তিনি প্রতিপক্ষকে দমিত করে রেখেছেন। সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব যেন তাঁর মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মানেই সোবার্স, সোবার্স মানেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ।

কলকাতার সাউথ ক্লাব কোর্টে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের প্রদর্শনী টেনিস খেলায় যোগদানকারী এলান স্টোন, রে রাফেলস, জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল। সিঙ্গলসের খেলায় রাফেলসের বিপক্ষে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলালের বিপক্ষে এলান স্টোন জয়ী হন। ডাবলসের খেলায় ভারতীয় জুটি জয়দীপ এবং প্রেমজিৎলাল অস্ট্রেলিয়ার স্টোন এবং রাফেলসকে পরাজিত করেন। ভারতবর্ষ ২-১ খেলায় জয়ী হয়।

খেলাধুলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল

সাবাস জয়দীপ! সাবাস প্রেমজিৎলাল!

বাঙ্গালোরে আয়োজিত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষকে ৩-১ খেলায় জয়যুক্ত করেছেন প্রেমজিৎলাল এবং জয়দীপ মুখার্জি। এই জয়লাভের ফলে ভারতবর্ষ মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ভারতবর্ষের এই জয়লাভের মূলে নন-প্লেয়িং ক্যাপটেন রমানাথন কৃষ্ণানের অবদানও যথেষ্ট ছিল।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের কাছে অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয় আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। ইতিপূর্বে ডেভিস কাপের খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া দুবার খেলে দুবারই ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল—১৯৫৯ সালের ইন্টার-জোন ফাইনালে ৪-১ খেলায় এবং ১৯৬৬ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ৪-১ খেলায়। ভারতবর্ষের তুলনায় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্য এবং সাফল্য বহুগুণ বেশী। যেখানে ভারতবর্ষ ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মাত্র একবার খেলে রাণার্স-আপ হয়েছে সেখানে অস্ট্রেলিয়া ৩৭ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ২২-বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাস সর্বাধিকবার কাপ জয়ের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ারই। একমাত্র আমেরিকা তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। আমেরিকা ডেভিস কাপ পেয়েছে ২১ বার। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত—যেখানে ৩২-বার ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা, সেখানে ডেভিস কাপের আসর বসেছে ২৬-বার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) ডেভিস কাপের খেলা হয়নি। এই ২৬ বছরের খেলায় (১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৪৬-৬৯) অস্ট্রেলিয়া একটানা ২৫-বার (১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৪৬-৬৮) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলে ১৬-বার ডেভিস কাপ জিতেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে ডেভিস কাপের ২৫ বছরের খেলায় (১৯৪৬-৭০) অস্ট্রেলিয়া একটানা ২৩-বছর চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ১৫-বার ডেভিস কাপ পেয়েছে। সুতরাং এ হেন অস্ট্রেলিয়ার উপর্যুপরি দু'বছর (১৯৬৯-৭০) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা থেকে বাদ পড়া রীতিমত অঘটন। প্রকৃতপক্ষে গত দু বছর অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দল তৈরী করতে পারেনি। তাদের প্রখ্যাত খেলোয়াড় এমার্সন, স্টোলে, নিউকম্ব এবং রোচে পেশাদার খেলোয়াড় দলে যোগদান করায় অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ দল খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। নতুন খেলোয়াড় দিয়ে অস্ট্রেলিয়া তাঁদের অভাব পূরণ করতে পারেনি। যেহেতু ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদান নিষিদ্ধ এবং পেশাদার টেনিস মহলে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের বাজারদর বেশী সেই কারণে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় অন্য দেশের থেকে পেশাদারী টেনিস অস্ট্রেলিয়ার বেশী ক্ষতি করেছে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার নবাগত খেলোয়াড়রা বিপক্ষের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কাছে বেশ কিছুদিন এইভাবে হার স্বীকার করবে। '১৯৬৯ সালে নর্থ আমেরিকান জোনের ফাইনালে মেকসিকোর কাছে ২-৩ খেলায় এবং ১৯৭০ সালে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষের কাছে ১-৩ খেলায় হেরে যাওয়ার ফলে অস্ট্রেলিয়া উপর্যুপরি দু বছর চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলতে পেল না। এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার যোগদান এই প্রথম। অন্য জোনের থেকে পূর্বাঞ্চলের খেলায় চ্যাম্পিয়ান হওয়া তারা খুব সহজ ভেবেছিল।

খেলার ফলাফল

প্রেমজিৎলাল ৬-২, ৬-৮, ৬-৩, ৩-৬ ও ১৪-১২ গেমে রে রাফেলসকে পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জি ৩-৬, ৬-৮, ৬-৪, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে ডিক ক্রিয়েলিকে পরাজিত করেন।

১৯৭০ সালের আন্তঃ কলেজ হকি লীগ এবং নকআউট চ্যাম্পিয়ান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ।

এলান স্টোন এবং জন আলেকজান্ডার ১৫-১৩, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে প্রেমজিৎলাল এবং জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

প্রেমজিৎলাল ৮-৬, ৬-২ ও ৬-১ গেমে ডিক ক্রিয়েলিকে পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জি বনাম রে রাফেলসের শেষ সিঙ্গলস খেলাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। মুখার্জি প্রথম দুটি সেটে জয়ী হন। অপরদিকে রাফেলস জয়ী হন তৃতীয় এবং চতুর্থ সেটে। শেষ পঞ্চম সেটে যখন খেলার ফলাফল সমান (৬-৬) ছিল তখন আলোর অভাবের কারণে খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

ইণ্টার-জোন ফাইনাল

ডেভিস কাপের ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার পরই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। ভারতবর্ষ এপর্যন্ত ৬-বার ইণ্টার-জোন ফাইনাল এবং একবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে যে খেলেছে তার ফলাফল নীচে দেওয়া হল। ভরতবর্ষের এই সাফল্যের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন রমানাথন কৃষ্ণান। তাঁর পরই নরেশকুমার, জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলালের নাম উল্লেখযোগ্য। নরেশকুমার ১৯৫২ সালে, রমানাথন কৃষ্ণান ১৯৫৩ সালে, প্রেমজিৎলাল ১৯৫৯ সালে এবং জয়দীপ মুখার্জি ১৯৬০ সালে ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে প্রথম নির্বাচিত হন।

১৯৫৯ : অস্ট্রেলিয়া ৪ : ভারতবর্ষ ১
১৯৬২ : মেক্সিকো ৫ : ভারতবর্ষ ০
১৯৬৩ : আমেরিকা ৫ : ভারতবর্ষ ০
১৯৬৫ : স্পেন ৩ : ভারতবর্ষ ২
১৯৬৬ : ভারতবর্ষ ৩ : ব্রেজিল ২
১৯৬৮ : আমেরিকা ৪ : ভারতবর্ষ ১

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড

১৯৬৬ : অস্ট্রেলিয়া ৪ : ভারতবর্ষ ১

এফ এ কাপ ফাইনাল

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে আয়োজিত ১৯৭০ সালের ইংলিস ফুটবল কাপের দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে চেলসী ২-১ গোলে লিডস ইউনাইটেড দলকে পরাজিত করেছে। চেলসী দলের পক্ষে এই নিয়ে তৃতীয়বার ফাইনাল খেলা এবং প্রথম এফ এ কাপ জয়। অপরদিকে লিডস ইউনাইটেড ইতিপূর্বে মাত্র একবার ফাইনাল খেলে রাণার্স-আপ হয়েছিল।

উইম্বলি স্টেডিয়ামে আয়োজিত আলোচ্য বছরের প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ২-২ গোলে ড্র ছিল। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলাও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ড্র ছিল। ফলে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। এখানে উল্লেখ্য, এফ এ কাপ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৯৯ বছরের ইতিহাসে ইতিপূর্বে মাত্র একবার দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় অতিরিক্ত সময় খেলবার প্রয়োজন হয়েছিল।

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

ম্যানিলায় আয়োজিত ৭ম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ৩-০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে 'টুংকু আবদুল ট্রফি' জয়ী হয়েছে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় ১৬টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। সেমি-ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ২-০ গোলে জাপানকে এবং ইন্দোনেশিয়া ১-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। দক্ষিণ কোরিয়া ৫-০ গোলে জাপানকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

কলকাতায় প্রধানত হকি, ফুটবল এবং ক্রিকেটে আগে থেকেই আপোষে নাকি অনেক খেলার ফলাফল ঠিক হয়ে থাকে—এরকম অভিযোগ সাধারণ লোক কেন খোদ কর্ম-কর্তাদের মুখ থেকেও শোনা যায়। এ ব্যাপারে কর্মকর্তারা এমনই ভাব দেখান যেন তাঁদের কিছু করার নেই, হাত-পা একেবারেই বাঁধা। কর্মকর্তার আসনই যাঁদের কাছে রুজি-রোজগার, সামাজিক প্রতিপত্তি বা বিলাসের একমাত্র অবলম্বন, তাঁরা এই নিয়ে কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করতে চান না। কারণ ভোটের ওপরই যে তাঁদের অস্তিত্ব। ভোট অন্য দেশেও আছে, কিন্তু সেখানের কর্মকর্তারা আমাদের দেশের মত এতখানি ক্লীব নন। এখানে হালফিলের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ইংল্যাণ্ডের লিডস ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের যথেষ্ট নামডাক আছে। তারা ১৯৬৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯৭০ সালের এফ এ কাপের রাণার্স-আপ। সদ্য সমাপ্ত ১৯৭০ সালের ফুটবল লীগের কোন একটি খেলায় দুর্বল দল গঠনের কারণে ইংলিশ ফুটবল লীগ খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা লিডস ইউনাইটেড দলকে ৫,০০০ পাউণ্ড (৯০,০০০ টাকা) জরিমানা করেছেন। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতে বাধ্য হয়েছিল বলে লিডস ইউনাইটেড দল যে কৈফিয়ত দিয়েছিল তা গ্রাহ্য হয়নি। লীগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ হল, লীগের সমস্ত খেলাতেই দলের সামর্থ্য মত শক্তিশালী দল গঠন করতেই হবে, এর ব্যতিক্রম হলেই জরিমানা অনিবার্য।

স্ট্যাফোর্ড কাপ ফুটবল

বাঙ্গালোরে স্ট্যাফোর্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২—১ গোলে গত বছরের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী গোর্খা ব্রিগেড দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে সেণ্টার ফরওয়ার্ড পাপাইয়া দুটি গোলই দেন।

গোল্ড কাপ হকি ফাইনাল

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (জলন্ধর) ০-০ ও ৩-১ গোলে কলকাতার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান (১৯৭০) মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার গোল্ড কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে—১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে সরাসরি জয় এবং ১৯৬৯ সালে টাটা স্পোর্টস দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

৩য় সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 22nd May 1970. শুক্রবার ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ 40 Paise

সুচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়

চিঠিপত্র

রামের বনবাস : বারো না চৌদ্দ ?

গত ২৭শে চৈত্র সংখ্যার 'অমৃত'এ চিঠি-পত্র বিভাগে ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' তথা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে তথ্যগত একটা সংশয় নিয়ে আলোচনার উদ্বোধন করেছেন।

বস্তুতঃ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নিজেই যেন একটি কাব্য। পড়তে পড়তে মনে হয় পাঠককে কাব্যলোকে টেনে নিয়ে চলেছেন কবি। রাজা দশরথের সুবিশাল রাজ-অন্তঃপুরে। ঐশ্বর্যের ঝলক যেন সহসা ম্লান হয়ে গেছে। কোলাহলমুখর অন্তঃপুর নীরব নিথর! ক্কচিৎ রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যার বেদনাতুর আর্তনাদ ভেসে আসছে। স্তব্ধতার মধ্যে শুধু তারই প্রতিধ্বনি। এ সবের দিকে কবির খেয়াল নাই। তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঊর্মিলাকে। রাজহর্মের কোন নিভৃত কক্ষে ভূলুণ্ঠিতা ঊর্মিলা অব্যক্ত বেদনায় ছটফট করছে? বুঝি চোখে পড়লো উপাধানে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্বামী-সঙ্গ-সুখ-বঞ্চিতা উদ্ভিন্নযৌবনা এক বরনারী! এমনি অবস্থায় দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে। একটি দুটি নয়; কবি বলেন, এমনি করে বারটি বছর অতিবাহিত হবে।

...খটকা লাগ্‌লো পণ্ডিতমণ্ডলীর জনৈক সভ্যের মনে। ঊর্মিলাকে এমনিভাবে কাটাতে হবে বার বছর তো নয়, চৌদ্দ বছর! আদি কবির কাব্যে তো চৌদ্দ বছরের কথাই উল্লেখ আছে; তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি আমি,—বিকল্প কিছু নেই।

ডক্টর ঘোষাল আমার পরিচিত বন্ধু! স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তিনি সাহিত্যের (বাংলা) অধ্যাপনা করে চলেছেন সুদীর্ঘকাল। তাঁর প্রশ্নটি বিশেষজ্ঞদের মতামতের অপেক্ষা রাখবে তাতে বিতর্কের অবকাশ নাই। বিদ্বজ্জন সমীপে আমারও প্রশ্নটির যথাযথ জবাবের আবেদন রইলো। ডক্টর ঘোষালের মনে খটকা জেগেছে, রামের চৌদ্দ বছর বনবাসের সঙ্গে পাণ্ডবদের বার বছরের অজ্ঞাতবাস গুলিয়ে গেছে কিনা। রামায়ণ ত্রেতাযুগের আখ্যায়িকা, আর মহাভারত দ্বাপরের। মনে হয় কবিগুরু এমন সামঞ্জস্যহীন ভুল বোধহয় করেন নি। এ দুয়ের মধ্যে ঘটনাগত মিল নাই। তবে কবিগুরু 'চিত্রাঙ্গদা' রচনার পরই যদি 'কাব্যের উপেক্ষিতা' লিখে থাকেন তাহ'লে 'বার' সংখ্যা অজ্ঞাতসারে লেখনিতে এসে যেতে পারে।

পিতৃ-সত্য রক্ষার জন্য রাম অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনে গেলেন এ কাহিনী কে না জানে! যাত্রাকালে বনবাসের ব্যাপ্তি স্বীকৃত হয়েছিল চৌদ্দ বছর এতে দ্বিমত নাই। তবে রামচন্দ্র যে ঠিক চৌদ্দ বছর পরেই ফিরে এসেছিলেন এমন 'চুলচেরা' প্রমাণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সাপেক্ষ—একমাত্র পণ্ডিতগণই দিতে পারেন। রাম বনবাস স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। বনবাসকালে সীতাহরণ আকস্মিক ঘটনা। রাম রাবণের যুদ্ধ এই আকস্মিকতার পরবর্তী অধ্যায়—অনির্দিষ্টকাল তার ব্যাপ্তি। যুদ্ধে যবনিকা পড়লো রামের হাতে রাবণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। যুদ্ধ হয় এবং সীতা উদ্ধারের সংবাদ পেয়ে অযোধ্যাবাসী রাম-সীতাকে ফিরিয়ে আনতে ছুট্‌লো। এই সকল ঘটনাবহুল পরিবেশে দিন, মাস, বছর হিসাব করে চৌদ্দ বছর গণনা করা কি সম্ভব হয়েছিল? কবিগুরুর মতে যাওয়া ও ফিরে আসার সময়ের ব্যাপ্তি 'বার' বছরও তো হতে পারে!—

ডক্টর ঘোষাল দীর্ঘকাল 'শান্তিনিকেতন'এ কাটিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সেক্রেটারীদের কারও কাছে এ প্রশ্ন তুল্‌লে হয়তো সঠিক বা অনুমেয় একটা সিদ্ধান্ত ডক্টর ঘোষাল পেতে পারতেন। এখন যদি 'বার' সংখ্যা উল্লেখ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভুলই হয়েছে সাব্যস্ত হয় তবু তো ভ্রম সংশোধনের উপায় নাই। সুতরাং কাব্যের দোহাইয়ে 'সংখ্যাটিকে' যদি 'আর্যপ্রয়োগ' বলে গণ্য করা হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?

ত্রিদিব ঘোষ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়
রাঁচি—১

নিকটেই আছে

অমৃত-এর 'নিকটেই আছে' এই বিভাগটিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাজ-বিরোধী মানুষের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করে শ্রীসন্দীপবসু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সম্প্রতি ৪৬শ সংখ্যা অমৃতের এই বিভাগে প্রকাশিত 'পঞ্চাশ টাকা ছাড়ুন' শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে মন যুগপৎ ব্যথা ও বিরক্তিতে ভরে উঠলো।

শ্রীসুব্রত মজুমদার প্রমুখ যেসব তরুণরা আজকালকার তথাকথিত 'রকবাজী' ও 'মস্তানির' পথ গ্রহণ না করে জীবন-যুদ্ধে নেমেছে, পিতামাতা ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্যে ন্যূনতম একটি চাকুরী যাদের একমাত্র দাবী, তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ইতিহাস তো রোজই চোখের উপর দেখছি ও শুনছি। সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যে সর্বাঙ্গীন অবহেলা ও অভদ্র ব্যবহারের উদাহরণও বহু পুরাতন।

তবুও আন্তরিক ক্ষোভের সঙ্গে বারে বারেই মনে হচ্ছে যে চাকুরী নয়, তার কোন প্রতিশ্রুতিও নয়, সামান্য একটি সরকারী ট্রেণিং, তারই ইন্টারভিউটুকুর সুযোগ থেকেও এরা বঞ্চিত হচ্ছে শুধু মানুষের লোভ ও গাফিলতির জন্যে। দিনের পর দিন তারা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যালয়ে হাঁটা-হাটি করেছে এবং কর্মচারীদের বর্বরোচিত আচরণ সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। পরিণামে ঘরে তুলেছে এই প্রবঞ্চনার ফসল।

এ অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিকার করার কোন শক্তি আমার নেই, তবু বাংলাদেশের সব বোনেদের পক্ষ থেকে সুব্রত মজুমদার তথা এইরকম প্রব[illegible] সব ভাইয়েদের উদ্দেশে আমার আন্ত[illegible] সমবেদনা ও শুভেচ্ছা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না।

মহুয়া গাঙ্গুলি
কলকাতা-১৬।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির আমি গ্রাহক এবং প্রতিটি সংখ্যা আমি নিয়মিতভাবে পড়ে আসছি। সেই সূত্রে আপনার অমৃতের ১৩ চৈত্র শুক্রবার ৪৬ সংখ্যার 'অঙ্গনা' বিভাগে লেখিকা প্রমীলা কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'-এর মনোজ্ঞ আলোচনাটুকু পড়লাম। এই বিভাগে প্রতিটি সংখ্যায় নারী সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করে যাচ্ছেন। যার ফলে আমরা বর্তমান জগতে নারী সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতির দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। পুরুষদের তুলনায় আজ নারীরাও পিছিয়ে নেই। ভবিষ্যতেও হয়তো তাদের আরও কৃতিত্ব আমরা দেখতে পাবো। যাক এই

চিঠিপত্র

আলোচনায় একটি ভুল আমার চোখে পড়লো। এই ভুলটুকুর দিকে আমি লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন 'প্যারাট্রুপার শ্রীমতী দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ ধরে এগিয়ে আসছেন একাধিক জীবন—ভয় তুচ্ছ করা মহিলা।' যতদূর জানি শ্রীমতী দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারাট্রুপার নন। তিনি প্রথম বাঙালী মহিলা পাইলট। বর্তমানে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসে কলকাতা শাখায় কর্মরতা। প্যারাট্রুপার হলেন শ্রীমতী গীতা চন্দ। অবশ্য বিমান চালনা করতে গেলে প্রথমে প্যারাট্রুপারের যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হতে হয় কিনা সেটা আমার জানা নেই। এবং শ্রীমতী দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিষয়ে সাফল্যলাভ করেছেন কিনা তাও বলতে পারবো না। তাই এ বিষয়ে লেখিকার কাছ থেকে কিছু জানার প্রতীক্ষায় রইলাম।

তা ছাড়া আপনাদের 'নিকটেই আছে' নতুন বিভাগটি আর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। এই বিভাগের ৪৫ সংখ্যার 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' লেখাটি একটি অতি বাস্তব ঘটনা। হিসেব একেবারে প্রাঞ্জল। এরকম ঘটনা শহর-মফস্বলে অসংখ্য ঘটছে। যা সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। আপনারা পত্রিকা মারফত সে চিত্র জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছেন এবং সবার কাছে তা ধরা পড়ছে। এজন্য আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ।

ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত
প্রধান শিক্ষক, মানিক ভান্ডার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। কমলপুর, ত্রিপুরা

নববর্ষ সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রথমেই অশেষ ধন্যবাদ জানাই 'অমৃতে'র নববর্ষ সংখ্যাটির জন্য। বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প আমাদের একান্ত গর্বের বিষয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই ছোট গল্প সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উদাসীন, কারণ বর্তমানের বিশিষ্ট লেখকদের ছোটগল্পের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত নন। আপনারা গত বছর থেকে বিশিষ্ট লেখকদের প্রতিনিধিত্বমূলক ছোট গল্পের সংকলন বার করে একটা বিরাট দায়িত্ব পালন করলেন এবং বাংলা-সাহিত্যের শুভানুধ্যায়ী লেখক ও পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হলেন। তবে সবচেয়ে আনন্দিত হয়েছি শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "কী নিয়ে কাকে নিয়ে গল্প" রচনাটি পড়ে। আজকের অনেক তরুণ লেখক ও যাঁরা ভবিষ্যতে লেখক হবেন তাঁদের কাছে এটা একটা বিরাট সমস্যার মতো দেখাচ্ছে, কী নিয়ে ও কাকে নিয়ে গল্প লেখা যায়। একটা অদ্ভুত চিন্তা দেখা দিয়েছে, গল্পের বিষয়বস্তু আর নেই বা শিগগিরই শেষ হয়ে আসছে। যেন এর পরে আছে নিঃসীম শূন্যতা। গল্পের ভান্ডার যেন খুব তাড়াতাড়ি Saturation point-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। পাঠকরাও হয়ত তাই আতঙ্কিত বা হতাশাগ্রস্ত যে তাঁরা আগামী দিনের সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আর নূতন কিছু পাবেন না ও সাহিত্যের আসরে আর নূতন শক্তিমান লেখক দেখা দেবেন না। কিন্তু শ্রদ্ধেয় নারায়ণবাবু তাঁর এই লেখায় এই নৈরাশ্য কাটিয়ে দিয়ে একটি আশার আলো দেখিয়েছেন। তিনি বিষয়বস্তু ফুরিয়ে গেছে বা যাচ্ছে, একথা মানতে রাজি নন। তিনি বলছেন, আমাদের বিচিত্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে এত জটিলতা রয়েছে মানুষের জীবনে, এত যন্ত্রণা এত বিচিত্রতা রয়েছে জীবনে, এবং প্রতিদিন নূতন করে এগুলি জন্মাচ্ছে যে তা নিয়ে এখন প্রচুর ভাল গল্প লেখা যায়। এবং তাই ঘটবে। প্রতিদিনই আমরা এক একটা নূতন উপলব্ধিতে পৌছাই। এই নতুন উপলব্ধ চেতনাই কথা-সাহিত্যিকদের লেখার বিষয়বস্তু হবে। সুতরাং লেখার আর বিষয় নেই বা থাকবে না এটা একটা মিথ্যা আতঙ্ক মাত্র। বাংলা-সাহিত্যের এক খ্যাতিমান লেখকের কাছ থেকে এই আশ্বাসবাণী পেয়ে নৈরাজ্য থেকে আশার রাজ্যে উত্তীর্ণ হওয়া গেল। আমিও বিশ্বাস করি, যতদিন মানুষ থাকবে, মানুষের মন থাকবে, ততদিন বিষয়বস্তুর অভাব হবে না। সাহিত্যের মাটি বন্ধ্যা নয়, সে এর ভিতর থেকেই নতুনের জন্ম দেবেই, এবং সাহিত্যের রথ কালের সঙ্গেই এগিয়ে যাবে।

তপন দাশগুপ্ত
কলিকাতা—৩২।

সাহিত্যিকের চোখে

'সাহিত্যিকদের চোখে আজকের সমাজ' বিভাগটি প্রবর্তন করে অমৃত একটি সময়োপযোগী কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হয়েছে। পাঠকদের কাছে এজন্য পত্রিকা অকুন্ঠ ধন্যবাদ পাবে।

'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ' ঘটনা বা পরিস্থিতি তাঁরা শুধু আমাদের মত বাইরে থেকে দেখেন না, তার ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে তার মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেন, কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাই আজকের এই দিশেহারা দিনে অমৃত যখন সাহিত্যিকদের বিচার-বিশ্লেষণ পাঠকদের কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করলেন, তখন অনেক আশা নিয়ে উদগ্রীব হয়েছিলুম।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে অমৃত তার কর্তব্যে এগিয়ে এলেও সাহিত্যিকরা সে ডাকে সাড়া দিলেন না। যে অকপট মূল্যায়ন তাঁদের কাছে আমরা আশা করেছিলুম তাঁরা সে জিনিস উপহার দিলেন না। অধিকাংশজনই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে কিছু বক্তব্যহীন সাহিত্যিক-সুলভ বাক্যজালের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখলেন। মনে হ'ল মনোভাব প্রকাশে অনেকেই যেন দ্বিধাগ্রস্ত। গজেন মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ যে তাঁদের এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অক্ষমতা অথবা বক্তব্য প্রকাশের অনীহা অকপট ভাষায় স্বীকার করেছেন।

সবথেকে বেদনাদায়ক ব্যাপারটি হ'ল, আজকের সাহিত্যিকদের যেন কোনো প্রত্যয় নেই বলে মনে হ'ল। যিনি নিজে কোনো প্রত্যয়ে দৃঢ় নন তিনি আমাদের পথের হদিশ দেবেন কি ক'রে? প্রত্যয়হীন ভাসমান সাহিত্যিক সমাজ দেশের মনোজগতের কোন দুর্লক্ষণের ইংগিত দিচ্ছে কে জানে।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়। তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে সহমত না হতে পারি, কিন্তু তিনি যে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছেন সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। সকল সাহিত্যিক যদি তাঁদের বিশ্বাস ও বিচার-শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসে অকপট ভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে অমৃতর এই সময়োপযোগী উদ্যমটি সার্থক হয়ে উঠত।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—১৯।

●

গত সপ্তাহে একই বিষয়ে একই পত্রলেখকের আগে-পরে লেখা দুটি চিঠি একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে, এজন্যে দুঃখিত। অ, স।

শাদাচোখে

সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু আলোচিত ভূমিসমস্যার সুরাহার উদ্দেশ্যে একটি "গুরুত্বপূর্ণ" সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মনে হয় এই সিদ্ধান্ত সত্যিই একটা মহৎ প্রচেষ্টা। রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিবারপিছু জমির পরিমাণ ৪৫ থেকে ৬০ বিঘার মধ্যে ধার্য করা হবে, এবং বর্গাদার কৃষকরা যদি হাল, গরু দিয়ে চাষ করেন তবে উৎপন্ন ফসলের তিন-চতুর্থাংশ পাবেন। আর শুধু শ্রমদান করলে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বর্গাদার গোলাজাত করতে পারবে। আরও একটি বক্তব্য এই সুপারিশগুলির মধ্যে আছে। সেটি হচ্ছে বাস্তুজমি যেসব লোকের নেই অবিলম্বে তাঁদের পাঁচ কাঠা করে জমি দেওয়ার বন্দোবস্ত সরকার করবেন।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলেই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের সহকারী শাসকরা জেলায় জেলায় জেলাধীশদের নিকট তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আদেশ—অবিলম্বে বেনামী-জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে (অবশ্য স্থানীয়) বন্টন করা হোক, এবং যাঁরা ফ্রন্ট-আমলে বেআইনীভাবে আইন-স্বীকৃত জমির অংশ কেড়ে নিয়েছেন তা পুনরুদ্ধার করা হোক। আবার স্বল্প-মালিকানা যাঁদের আছে সেই সমস্ত কৃষককে কৃষিঋণ দেওয়ার জন্যও নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এক কথায় এই সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ খাদ্যসমস্যার সুরাহা ও গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ সুদৃঢ় করা।

সাংবাদিকরা রাজ্যপালের ভূমি-বিষয়ক উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি এই সমস্ত "প্রগতিমূলক" সংস্কারের সুপারিশ করেছেন। যুক্তফ্রন্টের প্রভাবের ফলেই তাঁরা এই সব ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হতে প্রয়াস পেয়েছেন কিনা? উত্তরে শুধু এই কথাই বলা হয়েছে, ফ্রন্টের প্রভাবের কোন প্রতিক্রিয়ার বশবর্তী হয় এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। নিছক সমাজব্যবস্থাকে প্রগতিমুখী করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা-সমূহ অবলম্বন করা হচ্ছে।

যাহোক প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাথাপিছু জমির পরিমাণকে কমিয়ে পরিবারপিছু ৪৫ থেকে ৬০ বিঘা করার কথা সুপারিশ করেছেন। ফ্রন্ট-আমলে মাথাপিছু ৭৫ বিঘা জমির পরিমাণকে কমিয়ে পরিবারপিছু ঐ জমির বরাদ্দ করার আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা চলছিল। অবশ্য দীর্ঘ তেরমাস দাপাদাপি করার পরও কোন ব্যবস্থাই ফ্রন্ট সরকার করেন নি। শুধু একটি বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের হুমকি দিয়েই তাঁরা সারা রাজ্যটাকে গাতিয়ে রেখেছিলেন। নীরবে গুণগত ও আকৃতিগত পরিবর্তন আনার জন্য বিধানসভায় আইন উত্থাপন ত্বরান্বিত করতে পারেন নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পরিবারপিছু জমির বরাদ্দ কথাটার সঠিক অর্থ কি? পরিবার বলতে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? কিছুদিন ধরে পরিবার বলতে পাঁচজনের ইউনিট ধরে একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। এই সংজ্ঞার মধ্যে পিতা ও পুত্রের একান্নবর্তী পরিবারের কথাই উল্লেখ করা হচ্ছিল, ফ্রন্ট-আমলেও পরিবারের কি সংজ্ঞা হবে সেই প্রশ্ন এসেছিল। জমির বর্তমান মালিকানা থেকেই শুরু হবে পরিবারের ভূমিকা, এবং নির্দিষ্ট জমি যতই পুরুষান্তর হোক না কেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ জমি ভাগ হতে শুরু করলেই এদের মধ্যেই তা ভাগ হবে। জমির ভাগ চালু থাকবে। বর্তমানে যে ফ্র্যাগমেন্টেশন আছে তাও চালু থাকবে। জমি সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতে ফ্র্যাগমেন্টেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য জমির মধ্যে যে সীমারেখা বর্তমান আছে সারা ভারতের হিসাব ধরলে সেই সীমারেখার জমির পরিমাণ নাকি এক কোটি একর দাঁড়ায়। অর্থাৎ "আল" দেওয়ার জন্য এক কোটি একর উর্বর জমিতে ফসল ফলানো যায় না। এই হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশানের প্রত্যক্ষ ফল। কোন বৈজ্ঞানিক পন্থায় চাষের কথা না বলেও সাধারণ হিসাব মতই মামুলী প্রথায় চাষ করলেও এই এক কোটি একর জমিতে কত ফসল ফলতে পারত! ভেবে দেখুন ব্যাপারটা।

ফ্রন্ট-আমলেও পরিবারের কথা বলা হয়েছিল, এখন রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতি শাসনেও এই পরিবারপিছু জমির পরিমাণ আরও কমিয়ে ফ্রন্ট থেকেও একটু বেশী প্রগতিশীল সাজবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, ৪৫ থেকে ৬০ বিঘা করলেও পরিবার কাকে বলবেন তার সংজ্ঞা সম্পর্কে এখনও কোন তথ্য জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় নি। তদুপরি যে সমস্ত জমিতে সেচের পুরোপুরি ব্যবস্থা আছে সেখানেই বা এই পরিবারপিছু জমির পরিমাণ কত হবে, কিম্বা পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার কাঁকর মাটির জমিতে কত পরিমাণ জমি এক-একটি পরিবার রাখতে পারবেন সেই সব ব্যাপারে কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। আবার এই জমির মধ্যে কতটুকু বাস্তু বা বাগান আর কতটাই বা ধানি জমি হবে সে সম্পর্কেও কোন হদিস অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। কৃষক পরিবার না হলে অর্থাৎ যাঁরা নিজহাতে জমি চাষ করবেন না তাঁরা আদৌ জমি রাখতে পারবেন কিনা, এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কেও জনতা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আবার চাষের জমিও আছে, অথচ কোলকাতার সওদাগরী অফিসে বেতন বাড়ানোর আন্দোলন করে তলবটা বৃদ্ধি করিয়ে নিয়ে যে নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে তাঁদের সেই অবাঞ্ছিত সুযোগ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে (বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বা অবাঞ্ছিত) তারও কোনো নিরাকরণ হয় নি। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে কোনো একটি জীবিকাই গ্রহণ করা যেতে পারে। নতুবা দারিদ্র্য ও বেকারীর সমাধান করা আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অদ্যাবধি কত জমি কত পরিবারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বন্টন করলে তাদের কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে সংসার চালানো সম্ভব হয় সেইদিকে কেউ নজর দেওয়ার চেষ্টা করছেন না। সারা ভারতব্যাপী জমির পুনর্বন্টনের প্রশ্ন নিয়ে শুধু তোলপাড়ই করা হচ্ছে। কিন্তু সঠিক মূল্যায়ন করে জমি বন্টনের কোন সুস্থ ব্যবস্থা অদ্যাবধি গ্রহণ করেন নি কোনো রাজ্য সরকার। কেউ কেউ জমির সীমানা নিরূপণের প্রশ্নে বার বার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বা পুনর্বিবেচনা করছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যেভাবে ভূমি-সীমা নির্ধারণের কথা ঘোষণা করেছেন সেই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বলতে পারবেন না যে কত পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে কিম্বা জাতীয় খাদ্য সংগ্রহের প্রশ্নে এই নয়া নীতি কতটুকু সাহায্য করবে। সমস্ত কিছুই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত। সকলেই বলছেন জমির সর্বোচ্চ সীমা কমিয়ে দেওয়ার জন্য, অতএব তাই করা হোক। কোন সুচিন্তিত কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেউ সত্যিকারের আগ্রহী কিনা তা বোঝা কঠিন। আশা করি কেউ মনে করে বসবেন না 'সমদর্শী' জমির সীমানা কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে দুঃখিত। মোটেই তা নয়। বক্তব্য হচ্ছে, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করে কৃষিক্ষেত্রে কত সংখ্যক মানুষ বা পরিবারকে নিয়োজিত রাখতে পারা যাবে বা তাদের দ্বারা খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত এ হেন কোন প্রচেষ্টাই অদ্যাবধি দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভূমিহীনদের কিছু জমি বা কিছু ঋণের টাকা দিলেই যেন সমস্ত সমস্যা অক্লেশে সমাধা হয়ে যাবে এমনি একটি ধারণার বশবর্তী হয়েই সমস্ত দলীয় নেতারা কাজ করতে শুরু

করেছেন। এই নীতি অবলম্বিত হলে আজ থেকে ১০।২০ বছর পরে গ্রামীণ অর্থ-নীতির কি চেহারা দাঁড়াবে বা কৃষক পরিবারের জীবনে কি অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে সেই সম্পর্কে কোন সম্ভাব্য চিত্র পর্যন্ত রচিত হয় নি। শুধু আজকে একটা আওয়াজ উঠেছে বলেই তড়িঘড়ি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা হলে অঘটন ঘটবে। প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন ভারতবর্ষে জমির উপর চাপ অত্যন্ত বেশী, বিশেষ করে বাংলায় ত জনসংখ্যা ও আশ্রয়প্রার্থীর চাপ সর্বাধিক। কাজেই জমিবন্টনের ব্যাপারে খুব সতর্কতার সংগে এগোনো দরকার। অদ্যাবধি ইকনমিক্ হোল্ডিং বলতে সত্যিকারের কত একর জমি বুঝায় তা পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি। কাজেই সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে ভূমিসমস্যার মত কঠিন সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা করলে ফল খারাপ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

যাঁরা কৃষিজীবী তাঁদের মধ্যে ঋণগ্রস্ততা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী তহবিল থেকে ঋণদানের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক নাভিশ্বাস রোধ করা প্রায় অসম্ভব। কেননা দীর্ঘসূত্রতাই এই ব্যাপারে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছে। অন্যদিকে জাতীয়করণ করার পরও ব্যাংকগুলি থেকে ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ গ্রামান্তর ত দূরের কথা সদর মহকুমার শহরগুলিতে পর্যন্ত ব্যাংকসমূহের শাখা-প্রশাখা এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নি। তদুপরি ঋণ গ্রহণের শর্তাবলীর দুস্তর প্রাচীর ত রয়েছেই। এসব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জরুরী নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। বিনয়ের সংগে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এহেন নির্দেশ ফি-বছরই পাঠানো হয়। সেই অফিসাররাই এখনও বহাল আছেন যাঁরা বছরের পর বছর গড়িমসি ও গাফিলতি করে সমস্যাকে আরও জটিলতর করে তুলেছেন। রাজ্য সরকার যখন তাঁদের নয়ানীতি অর্থাৎ পরিবারপিছু ৪৫।৬০ বিঘার জমি নির্ধারণ করবেন তখন আবার কিছু জমি বেনামী হয়ে যাবে। আদালতে কিছু মামলা বাড়বে আর ভাগ্যবানদের কিছুটা অর্থ-প্রাপ্তি ঘটবে। ৭৫ বিঘার দখল এখনও সামলানো যায় নি এবং প্রায় দেড় দশক পরেও বেনামী জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। আর প্রত্যেকবারই যথারীতি নির্দেশাবলী পাঠানো হচ্ছে। এবারও হয়েছে, অবিলম্বে বেনামী জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বেঁটে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কাজের কাজ কি হবে তা অনুমানের বাইরে নয়। সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাওয়া অবশ্য একটা বড় ব্যাপার। এতদিন রাজনৈতিক নেতারা সেই সুবিধা নিরংকুশভাবে উপভোগ করছিলেন, এবার প্রশাসনের কর্তারাও এবিষয়ে এগিয়ে এসেছেন।

'সমদর্শী'কে যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে তার উত্তর হচ্ছে, যদি এইভাবেই জমি বন্টন করতে চান তবে একটি করে জেলা বা সদর মহকুমার সমস্ত জমির মালিকানা প্রথমে সরকারের হাতে নিয়ে নিন। তারপর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সত্যিকারের চাষীর মধ্যে বন্টন করে দিন। অনেকেই তখনই প্রশ্ন তুলবেন, সংবিধানে যে মানুষের সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ-প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে তার কি হবে? যাঁরা এই প্রশ্ন তুলবেন তাঁদের কাছে বক্তব্য হচ্ছে, সংবিধান মানুষের জন্য। সংবিধানের জন্য মানুষ নন। যদি সমস্ত জমি সরকারী মালিকানায় না এনে অর্থাৎ জমির উপর মরেটোরিয়াম না করে বন্টনের চেষ্টা হয় তবে আগের মতোই সেই বেনামী করার প্রচেষ্টা চলবে। ফলে খুব কম চাষীই জমি পাবেন। শুধু কিছু আমলার ব্যাংক ব্যালান্স বাড়বে। সমস্যা কিন্তু আরও জটিলতর হয়ে দেখা দেবে। তাছাড়া এই নয়ানীতি কার্যকর করতে জনতার সাহায্য ও আন্দোলনও দরকার। শুধু আমলা দিয়ে এ কাজ সমাধা করা দুরূহ। পঞ্চায়েৎ কিষাণ সমিতি ইত্যাদির সদস্য নিয়ে এই ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে, দলীয় স্বার্থ ভীষণভাবে তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। অথচ এ সমস্ত সংস্থাকে বাদ দিয়েও এ হেন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা দুরূহ। এ এক জটিল সমস্যা।

যাই হোক, রাজ্য সরকারের সুপারিশসমূহ কিম্বা আরও কিছু প্রগতিমূলক ভূমিব্যবস্থা আশু অবলম্বনের উপর জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারেই পরোক্ষরূপ। কাজেই আন্ত-রিকতাবশতই হোক বা রাজনীতির মার-প্যাঁচের জনাই হোক, এই ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ফলাফল কি দাঁড়ায় সেটাই সাগ্রহে লক্ষ্য করবার বিষয়।

—সমদর্শী

পুরুলিয়া জেলায় খরার অবস্থা ভয়াবহ। শুকনো নদীর মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে লোকদের জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

দেশে বিদেশে

সোমবার ১২ মে। নয়াদিল্লীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের তিন নম্বর কামরা। এজলাসে বসবার ও দাঁড়াবার মত যতটা জায়গা ছিল সব ভরে গেছে, কামরার বাইরে আরও ডজনখানেক মানুষ কিউ-এ দাঁড়িয়েছেন।

বিচারপতি সিকরির মুখ থেকেই শোনা গেল সেই ঐতিহাসিক রায়। পাঁচজন বিচারপতির সর্বসম্মত অভিমত— ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতিরূপে শ্রীবরাহ-গিরি বেঙ্কট গিরির নির্বাচন বৈধভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে এবং ঐ নির্বাচনের বিরুদ্ধে যে-সব আবেদন করা হয়েছে সেগুলি অগ্রাহ্য করা হল।

গত ১২ জানুয়ারীতে শুরু হয়ে মোট প্রায় ৫০ দিন যে মামলার শুনানী হয়েছে, রাষ্ট্রপতি, কয়েকজন মন্ত্রী, পার্লামেন্ট সদস্য ইত্যাদি সহ মোট ১১৬ জন যে মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে মামলার সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে ১৫০০ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে তার উপর এইভাবেই যবনিকাপাত হল মিনিট পাঁচেকেরও কম সময়ের মধ্যে।

যবনিকাপাত হল বললে অবশ্য হয়ত ভুল হয়। কেননা, বিচারপতিরা সংক্ষেপে শুধু তাঁদের সিদ্ধান্তই জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তিগুলি তাঁরা দেন নি। সুপ্রীম কোর্ট গ্রীষ্মের ছুটিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আগামী ২০ জুলাই ছুটি শেষ হলে আবার কোর্ট বসবে। সেই সময় আদালতের সম্পূর্ণ রায় প্রকাশিত হবে। আবেদনকারীদের আবেদন কি কারণে নাকচ হয়ে গেল সেটা সে সময়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিরুদ্ধে চারটি আবেদন পেশ করা হয়েছিল। শ্রীআব্দুল গনি এম-পি, শ্রীরাম রেড্ডি এম-পি, শ্রীশিবকৃপাল সিং ও ডাঃ ফুল সিং প্রত্যেকে একটি করে আবেদন পেশ করেছিলেন। এইসব আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, শ্রীগিরির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে একটি কুৎসামূলক প্রচার-পুস্তিকা বিলি করে শ্রীগিরির সমর্থকরা তাঁর সমর্থনে এই নির্বাচনকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং কয়েকটি মনোনয়নপত্র অবৈধভাবে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। মামলার শুনানীর শেষ দিকে সওয়াল করতে উঠে শ্রীগিরির পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীসি কে দপ্তরী বলেছিলেন যে, এই আবেদনগুলি হচ্ছে "রাজনৈতিক তামাসা" এবং এগুলির দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে ও দেশের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হেয় করার চেষ্টা হয়েছে।

মামলায় যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে সেটুকু হল এই যে, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে ঐ নোংরা পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোন কোন মহলে প্রচারিতও হয়েছিল। কিন্তু আবেদনকারীরা বিচারপতিদের সামনে একথা প্রমাণ করতে পারেন নি যে, এই পুস্তিকা প্রকাশ বা প্রচারের পিছনে শ্রীগিরি বা তাঁর কোন প্রতিনিধির হাত ছিল অথবা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ঐ পুস্তিকা বিলি করেছিলেন। স্পষ্টতই তাঁরা একথাও প্রমাণ করতে পারেন নি যে, ঐ পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচারের ফলে নির্বাচন কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায় যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতিকে সম্ভাব্য অপবাদ থেকে মুক্তি দিল তেমনি কতকটা পরোক্ষভাবে তাঁদের প্রতিপক্ষকে মিথ্যা মামলার দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানকে হেয় করার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। সেই অর্থে এটা শুধু আবেদনকারীদের মামলায় হার নয়, শ্রীগিরির বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলির রাজনৈতিক পরাজয়ও বটে।

ঐ রায় সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে তাতে এই সুরই ফুটে উঠেছে।

সুপ্রীম কোর্টের এই রায় যখন ঘোষণা করা হয় তখন রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি দক্ষিণ ভারতে সফর করছিলেন। দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মাঙ্গালোরে টেলিফোন করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। শ্রীগিরিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। 'নয়া' কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন, 'সত্যেরই জয় হল।' রাজ্যসভায় কম্যুনিস্ট দলের নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত বলেছেন, এই রায় 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া'র পরাজয় সূচিত করছে। তাঁর মতে, 'এটা শুধু রাজ্যসভার নয়, সারা দেশেরই, প্রগতিশীল শক্তির রাজনৈতিক ও নৈতিক জয়।'

* * *

বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে ভিওয়ান্ডি নামে একটি জনপদ, প্রধানত তাঁতীদের বসতি। বিজলীচালিত তাঁতের অনেক কারখানা রয়েছে সেখানে। শিবাজী জয়ন্তী উপলক্ষে সেখানে একটি মিছিল বেরিয়েছিল। সেই মিছিল উপলক্ষ করে লাগল দাঙ্গা। দেখতে দেখতে সেই দাঙ্গার আগুন ছড়াল দুই শতাধিক মাইল দূরবর্তী জলগাঁও শহরে, তারপর ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলে। এক সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ১৩৬।

এই দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীডি পি মদনকে নিয়ে বিচার-বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই দাঙ্গা সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

বারবার এভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে থাকায় ভারত সরকার বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁরা একটা আশ্চর্য যোগাযোগ লক্ষ্য করছেন। সেটা হল এই যে, জামসেদপুর, রাঁচী, রাউরকেলা, আমেদাবাদ প্রভৃতি যে-সব শহরে সম্প্রতি বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে সেগুলি সবই শিল্পপ্রধান শহর। ভিওয়ান্ডিও একটি শিল্পপ্রধান অঞ্চল। শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াবার কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তা সরকারী কর্তারা বুঝে উঠতে পারছেন না।

এই দাঙ্গায় শিবসেনার ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। শিবাজী জয়ন্তীর যে মিছিল বেরিয়েছিল তার উদ্যোক্তা ছিল এই শিব-সেনাবাহিনী। ভিওয়ান্ডির স্থানীয় নেতারা যে অভিযোগ করেছেন তা যদি সত্য হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই মিছিল থেকে কুৎসিত শ্লোগান দেওয়া হচ্ছিল এবং তার ফলেই মিছিলের উপর ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া হয় আর তাতেই দাঙ্গা বেঁধে যায়। লোকসভায় জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভিওয়ান্ডির মুসলমানরা নাকি মিছিলের সঙ্গে গেরুয়া পতাকা নেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন।

পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। প্রকাশ যে, শিবাজী জয়ন্তীর ঐ মিছিলের উপর নজর রাখার জন্য সেদিন সাতশ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এত বড় পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতেও কি করে দাঙ্গা বাধল সেটা আশ্চর্যের বিষয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চল থেকে ফিরে এসে রাজ্যসভায় বলেছেন যে, ভিওয়ান্ডিতে যাঁরা মার খেয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই মুসলমান আর জলগাঁওতে ক্ষতিগ্রস্তরা সকলেই মুসলমান।

জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী কিন্তু এই দাঙ্গা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, দাঙ্গায় মুসলমানরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলেও, তাঁর মতে বার বার যে-সব দাঙ্গা হচ্ছে সেগুলির জন্য দায়ী কিছু মুসলমান যাঁরা ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে যেতে দিচ্ছেন না। তাঁর মতে, মুসলমানরা ক্রমেই বেশী সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছেন বলে হিন্দুরা ক্রমেই বেশী জঙ্গী হয়ে উঠছেন। তিনি বলেন, হিন্দুরা সাত-আটশ বছর ধরে মার খেয়েছেন, এখন আর তাঁরা এই দেশে মার খেতে রাজী নন।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কাছে যুদ্ধ-বিরোধীদের যে বিরাট সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয় তাতে একজন নিগ্রো ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।
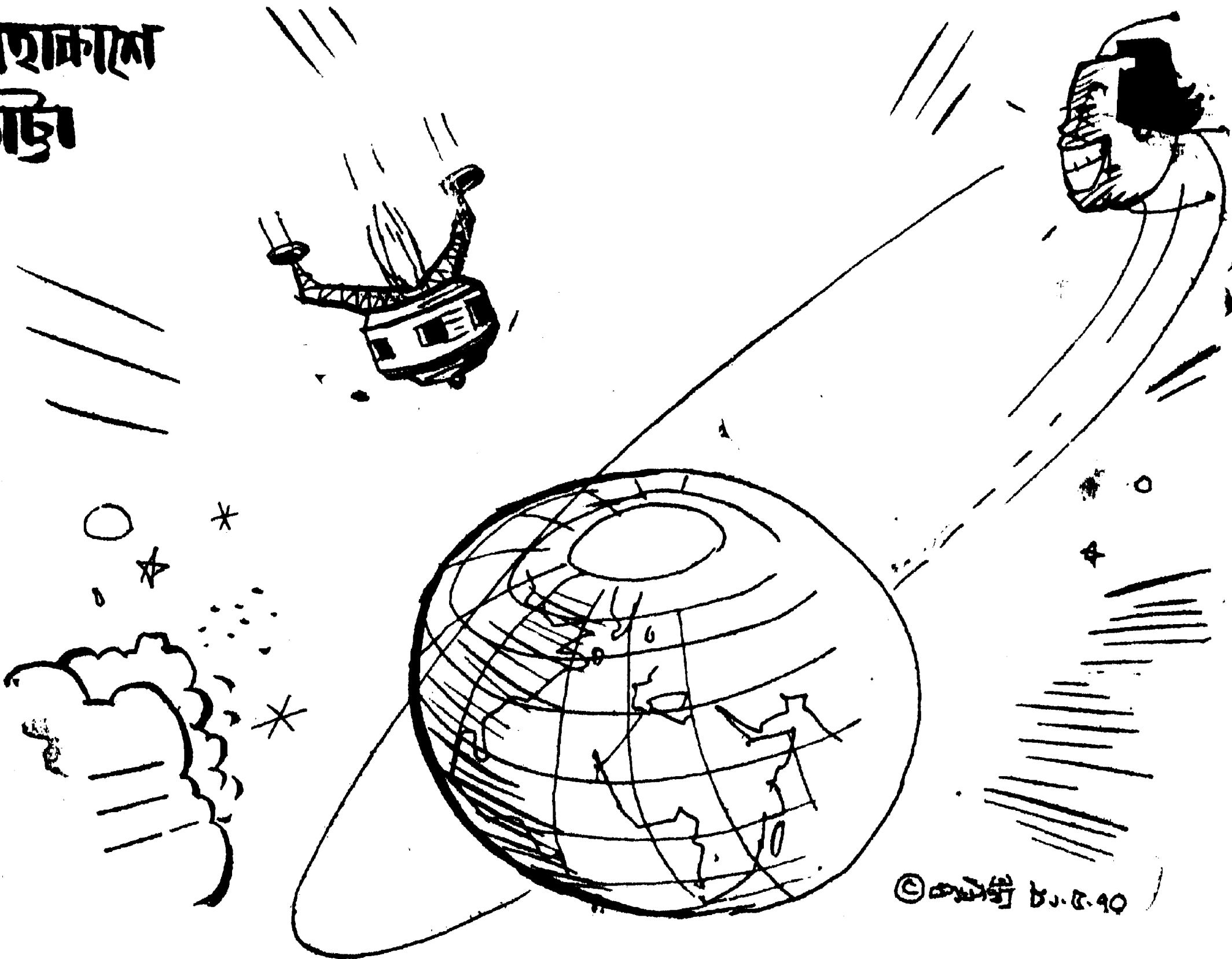
...আর আগে ভারতবর্ষে আর কোন দাঙ্গা সম্পর্কে পার্লামেন্টে এমন খোলাখুলি মুসলিম-বিরোধী, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আগুনে ভরা বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। এর আগে আর কোন বক্তৃতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এতখানি ক্রোধ প্রকাশ করেছেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। শ্রীবাজপেয়ীর বক্তৃতাকে তিনি "উলঙ্গ ফ্যাসিবাদ" বলে অভিহিত করে বলেছেন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আগুনে ইন্ধন যোগাবার উদ্দেশ্যে পার্লা-মেন্টকে ব্যবহার করে শ্রীবাজপেয়ী দেশের নিদারুণ ক্ষতি করছেন। তিনি আরও বলেন যে, কোথায় কোন বালক একটা ঢিল মারল অথবা কোথায় কাকে খুন করা হল তা থেকে দাঙ্গা বাধে না, শ্রীবাজপেয়ী যে ধরনের বক্তৃতা করেছেন তাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ তৈরী হয়।

কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গে বলেছেন যে, শ্রীবাজপেয়ীর বক্তৃতাটা যেন একটা গৃহ-যুদ্ধের ইস্তাহার।

●

দিল্লীর 'হিন্দুস্তান টাইমস্' পত্রিকায় ঐ সংবাদের শিরোনামায় লেখা হয়েছিল, 'উই ক্যান বাট উই ক্যাননট'—'আমরা পারি, কিন্তু পারি না।' প্রশ্নটা ছিল, 'ভারতবর্ষ কি পরমাণু বোমা বানাতে পারে?' জবাবটা ছিল পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বি ডি নাগচৌধুরীর।

দিল্লীতে একটি আলোচনাসভায় ডাঃ নাগচৌধুরী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর মোদ্দা বক্তব্য হল এই যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার মত যথেষ্ট সম্বল ও কারিগরী জ্ঞান পারমাণবিক শক্তি বিভাগের আয়ত্তের মধ্যে আছে; কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে তার জন্য ঐ বিভাগকে নূতন করে সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

চীন সম্প্রতি মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়ে রকেটবিজ্ঞানে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে এই উদ্বেগাকুল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—আমরা কি পারমাণবিক বোমা বানাব? পারমাণবিক বোমা বানাবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে রাখা সমীচীন হবে?

চীন হাইড্রোজেন বোমা আগেই ফাটিয়েছে। এখন চীনা উপগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, হাজার যোজন দূরে মহা-দেশের ব্যবধান অতিক্রম করে পারমাণবিক অস্ত্র পাঠাবার বিদ্যা ও সম্বলও তার আয়ত্তে।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিয়রে এই শমন নিয়ে ভারতবর্ষ কি পারমাণবিক অস্ত্র থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে?

ডঃ নাগচৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে দেখান যে, ভারতবর্ষ যদি শান্তির কাজে পারমাণবিক শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করে, এমনকি বাঁধ নির্মাণ অথবা খাল খননের কাজে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করতে চায়, তাহলে তার কাঁচা মাল, সম্পদ ও কারিগরী জ্ঞানের বর্তমান সীমার মধ্যে সেটা সম্ভব। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি একই সঙ্গে পার-মাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও যুদ্ধের কাজে সেই শক্তির ব্যবহার করতে চায়, তাহলে প্রশ্ন দেখা দেবে, এটা করার মত যথেষ্ট কারিগরী জ্ঞান এখন ভারত-বর্ষের আয়ত্তের মধ্যে আছে কিনা।

ডাঃ নাগচৌধুরীর ও অন্যান্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত শোনার পর নয়াদিল্লীর এই আলোচনাসভায় সমবেত বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, দেশরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, ভারতবর্ষের এখন পার-মাণবিক অস্ত্র তৈরী করা ছাড়া পথ নেই। তাঁদের হিসাবে ভারতবর্ষ যদি আগামী দশ বছরে ৩২৫০ কোটি টাকা খরচ করে, তাহলে শুধু যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী ও রকেট ছোঁড়ার বিদ্যায় সে দক্ষ হয়ে উঠবে তাই নয়, দেশের অর্থনীতিও সর্বদিক থেকে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

'নয়া' কংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রীজগ-জীবন রাম ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীর প্রেস ক্লাবে তাঁর 'ব্যক্তিগত অভিমত' প্রকাশ করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করা উচিত। ০৮-৭-৭৩

সম্পাদকীয়

দুরপনেয় কলংক

গত সপ্তাহে মহারাষ্ট্রের নানা জায়গায় যে মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে গেল তা এই দেশের এবং জাতির মুখে দুরপনেয় কলংকের ছাপ দিয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এই দেশে নতুন নয়। গত বৎসর মহাত্মা গান্ধীর জন্মভূমি আমেদাবাদে ভয়াবহ দাঙ্গায় বহু মানুষ প্রাণ হারায়। অতি সম্প্রতি চাইবাসাতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগে প্রাণহানি ঘটেছে অনেকের। তার রক্তের দাগ মেলাতে না মেলাতেই মহরাষ্ট্রে এই সাংঘাতিক হাঙ্গামা ঘটল। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং ভয়াবহতায় সরকার প্রথমে হতচকিত হয়ে যায়। পরে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সেনাবাহিনী তলব করে কঠোর হাতে এই হাঙ্গামা দমনের জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনা ভীওয়ান্দি থেকে জলগাঁও এবং জলগাঁও থেকে থানা জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। নিহতের সংখ্যা শতাধিক। আহত হয়েছেন অনেক এবং সম্পত্তি নষ্টের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা।

ভারতবর্ষে সব সময়েই যে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ওপর আক্রমণে উদ্যত তা মোটেই নয়। বরং তার বিপরীতটাই সত্য। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান পারস্পরিক সহযোগিতায় ও নির্ভরতায় সম্প্রীতির পরিবেশে বাস করে। কৃষিক্ষেত্রে, কলে-কারখানায়, সরকারী পদে এমনকি উচ্চতম পদেও হিন্দু ও মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাবে ও সহযোগিতায় কাজ করছেন। ভারতের অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে সকল সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট ও অর্থপূর্ণ ভূমিকা আছে। সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাও এদেশে যথেষ্ট উন্নত। বহু আন্দোলনে এদেশে হিন্দু ও মুসলমান সমান অংশীদার। বহু রাজনৈতিক দলে মুসলিমরা রয়েছেন নেতৃপদে। দেশের জন্য তাঁদের দুঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকার তাঁদের হিন্দু সহযোগীদের মতোই তুলনাহীন। অথচ আকস্মিকভাবে দেশের এক-একটি জায়গায় অতি সামান্য কারণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও মত্ততার আগুন জ্বলে ওঠে। তখন এই আগুন থামাবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। সরকারকে তখন এগিয়ে এসে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে এই মত্ততা থামাতে হয়। কিন্তু এ তো সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সরকারী নীতিনির্ভর হতে পারে না। জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এবং পারস্পরিক নির্ভরতা ছাড়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনো সম্ভব হতে পারে না। জনগণের মধ্যে যদি বিষ ঢোকে তাকে সারাবার দায়িত্ব কে নেবে? সরকারের পক্ষে একা তা করা সম্ভব নয়।

এই ঘটনাগুলো ভারতবর্ষে হামেশাই ঘটছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বলে থাকেন যে, পাকিস্তানের হাত আছে এইসব কান্ড ঘটানোতে। তাঁরা বলে থাকেন, মুসলমানরাই নাকি এই দাঙ্গার উস্কানি প্রথমে দিয়ে থাকে। জনসংঘী নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী এক অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, মুসলমানরা জানে যে, এদেশে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। তাই লড়াই করে ওরা মরতে চায়। ফ্যাসিস্ট হিটলারও ইহুদী নিধনের সময়ে এ ধরনের নানা যুক্তি দিত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে হিন্দুধর্ম উদারতা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়, যত মত তত পথের নির্দেশ যে-ধর্মের, তার ধ্বজাধারী কিছু লোক হিন্দুদের রক্ষার নাম করে এ ধরনের নৃশংসতাকে সমর্থন করছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দ্ব্যর্থহীনভাষার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সর্বশক্তি দিয়ে এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের মোকাবিলা করবেন। জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং অধুনা মহারাষ্ট্রের শিবসেনা অতি নির্লজ্জভাবে এই হাঙ্গামার উস্কানিদাতা। তাদের মতে মুসলমান মাত্রেই পাকিস্তানের চর, হিন্দুবিদ্বেষী এবং পরমত অসহিষ্ণু। খারাপ লোক সব সম্প্রদায়েই আছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় সংখ্যালঘুরাই শুধু নিপীড়িত হয় না, ভারতবর্ষের ক্ষতি হয় বিপুল। তার সুনাম ভূলুণ্ঠিত করছে তারাই যারা ভারতমাতার নামে জয়ধ্বনি দেয়, হরিজনদের পুড়িয়ে মারে, সংখ্যালঘুদের উৎপীড়ন করে এবং মেকী দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়।

এ সমস্তই দেশভাগের বিষময় ফল যার প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই অবিভক্ত ভারতের চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের এই পাপের জন্য প্রভূত প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। এখনও দলে দলে পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুরা বিতাড়িত হয়ে আসছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে। পাকিস্তান সরকারের উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতিও ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই পাপকর্মে উস্কানি দেয়। কিন্ত তা হলেও ভারতের ঘটনার জন্য আমরা ভারতীয়রাই দায়ী। পাক-ভারত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হলে হয়তো এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না। যতদিন তা না হয় আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই অমানুষিক ঘটনার প্রতিবাদ করতে হবে এবং তার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য গ্রহণ করতে হবে কঠোরতম সরকারী ব্যবস্থা। নতুবা এ কলংক যাবে না।

কলকাতা—৬৯ ॥

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

সকলেই বুড়ো হল, শুধু
বয়স বাড়লো না
কলকাতার।

আটচল্লিশ অথবা পঞ্চাশ সালে
যে সব ছোকরা
কফি হাউস অথবা ভার্সিটি লনে
টেবিল চাপড়ে কথা বলত
আজ তাদের দাড়ি পেকেছে,
আজ তারা সকালে অথবা সন্ধ্যায়
শেয়ালদ আর শ্যামবাজারে
সজনে ডাঁটা কেনে।

বয়স সবারই বেড়েছে, শুধু
কলকাতাই আজো
বুড়ো হল না।

যে ট্রাম একদা ঝকঝকে ছিল
তার শব্দে
আজ কানে তালা লাগে।
সেদিনের উজ্জ্বল নীল স্টেট বাসগুলি
রোদে পুড়ে. বৃষ্টিতে ভিজে
আজ ধূসর, ম্লান।

সকলেই বুড়ো হল
অথচ
কলকাতা আজো তেমনি
বেপরোয়া বেহিসেবী।
আজো তেমনি
বিকেলবেলার চুল উড়িয়ে
মিছিলে যায়।
নীল লাল আলোয়
সাঁতার কাটে
গোলদীঘির উজ্জ্বল জলে.
ময়দানে বা গঙ্গার ধারে প্রেম করে
কিংবা
মরা ছেলে কোলে নিয়ে
আজো রাস্তা জুড়ে কাঁদতে বসে
সূর্যাস্তের রক্তরাঙা আলোয়।

বয়স সবারই বাড়ল, অথচ
কলকাতা আজো
যুবতী।।

এখন ॥

আশিষ সান্যাল

এখন সমস্ত ভয় ভেঙে দিতে হবে।
স্তূপীকৃত কঠিন কুয়াশা
দুহাতে সরিয়ে যেতে হবে।
মন থেকে
ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত সমস্ত হতাশা
নির্ভয়ে সরাতে হবে দুর্জয় বিশ্বাসে।

এখন সময় দীপ্ত
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি নিবিড় উজ্জ্বল।
রাশীকৃত পথের প্রস্তর
আঘাতে ভাঙতে হবে।
নাহলে হৃদয়
ক্রমশ বিনষ্ট হবে বাঁচবার নীরব সঞ্চয়।

হে আকাশ!
গঙ্গার মেঘনার বুকে বহমান ধ্বনিত প্রবাহ,
হে ত্রিকালদর্শী দুর্জয় মহিমা!
এবার আঘাত হানো
বুকের পাথরে।
ভাঙো সব সীমারেখা।
ভীরুতার নির্মম কুয়াশা
দু'হাতে সরিয়ে আজ শ্যামল উচ্ছ্বাসে.
জাগাও আনন্দধারা বুকের আঁধারে।

দামাল ছায়া ॥

প্রদোষ দত্ত

প্রতিদিন আমার ছায়ার কাছে লজ্জায় ছোট হ'য়ে যাচ্ছি আমি
প্রতিদিন আমার ছায়া হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে আমাকে মাড়িয়ে।
ওকে সামলানো দায়
কারুর দু'চোখের দালান পেলেই দামাল শিশুর মতো
লাফিয়ে পড়বে ও
তারপর অশালীন অসভ্যতা করবে কিছুক্ষণ
এদিক ওদিক হামাগুড়ি দিয়েই
বন্ধ দরজার কড়া নাড়বে নির্লজ্জের মতো।

প্রতিদিন আমার ছায়ার কাছে লজ্জায় ছোট হ'য়ে যাচ্ছি আমি
প্রতিদিন আমার ছায়া চরিত্রহীন হ'য়ে যাচ্ছে আমাকে ছাড়িয়ে
ঘরে ফিরেও স্বস্তি নেই
সারারাত খেলা করবে নিরালোকে আমাকেই ঘিরে
নিরুচ্চার লাফালাফি 'দ্বার খোলো দ্বার খোলো' ব'লে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আমি লিখি। লিখতে ভালো লাগে বলেই লিখি — কেবলমাত্র এইটুকু বলেই খালাস পেতে চাইলে সমাজ তা মেনে নেবে কেন? বরং জীবনের কাছে প্রতিনিয়ত যত ঋণ জমা হচ্ছে তার সামান্যতম অংশমাত্র শোধ করতে চাইছি এই লেখা দিয়ে। তার অর্থ এই নয় যে যা-খুশি খামখেয়ালিপনা চরিতার্থ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি লিখতে পারি, লেখাটা আয়ত্ত করেছি দীর্ঘদিনের শ্রম আর অধ্যবসায়ের বিনিময়ে। এখন সেই লিখন ক্ষমতাটাই যাতে সমাজের হিতার্থে না হলেও প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়, লক্ষ রাখবো সেই দিকে। যোগ্যতার অপচয় যেন না ঘটে। যে কারণ জীবনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে চলা বা বলা আমাকে সাজে না। তাই আমি যখন কিছু করি তখন এই চলতি সময়ের ঘটনার আবর্তে প্রখর দৃষ্টি রেখেই করি। ফলে আমি ক্ষুব্ধ বা পুলকিত যা-ই হই না কেন (কারণ একজন লেখকের প্রথম এবং শেষ পরিচয় মানুষ। সংসারে অসংখ্য কাজ। তার মধ্যে লেখাটাও একটি। এবং বিশেষ একজনের কাছে বিশেষ একটি কাজ যা তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক ছাড়া কিছু না।) পরিণামে দেশ-কাল-সমাজ অর্থে চিন্তিত হওয়া ছাড়া আমার আর গতি নেই।

আমার কাছে আমার কালের শুরু তো আজ নয়। বরং অন্ধকার সেই দুর্দিনে যখন যুদ্ধের দৌলতে বাজার থেকে চাল-নুন-কেরোসিন, এমন কি কাপড় অবধি উধাও হয়ে শহর-গ্রাম শ্মশান হতে চলেছে। ক্ষুধা-মৃত্যু-হাহাকারের ভেতরেই আমার জ্ঞানোদয়। সেই যেন প্রথম চোখ মেলে নগ্ন এক পৃথিবীকে দেখা।

জ্ঞান-বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলটি কে যে প্রথম খাইয়েছিল বলা ভার। হতে পারেন তিনি আমার বাবা অথবা মা। অথবা বাবা-মা দুজনেই। অথবা দেশ-কাল-সমাজের তাৎকালিক অবস্থা কিম্বা পরিবেশ। হয়তো তা-ই। জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে হাত পেতে আছি। যে-যার আপন রুচি ও প্রয়োজনের তাগিদে ঋণ দান ও গ্রহণের পালা পূর্ণ করে চলেছি। পূর্ণতার মাপ কাঠিটাও নিজের মন-মেজাজ-মর্জির আয়ত্তাধীন। নইলে কত চাইবো, কত দেবো! নাক বোঁচা সেবীদের মত কেবল চাইবো? দেবো না কিছুই?

সংসারে ভালো-মন্দের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ক'রে ফল যা দাঁড়াচ্ছে আসলে তার নাম জীবন। আর এই জীবন কখনো এক-রঙা নয়। হতে পারে না। হলে সেটা ফ্যাকাশে হতেও বেশীক্ষণ লাগে না। বৈচিত্র্য ছাড়া সে যে চলতে চায় না, চলতে পারে না। পারলে তাকে মৃত বলবো। নয়তো সে পাগলের জীবন। কিন্তু সংসারটাকে পাগলা গারদ বলি কোন সাহসে? লোকে যে আমাকেই দুয়ো দেবে। আমি তাই তেমন করে পিছিয়ে পড়তে নারাজ। বরং আপনি যদি এক পা এগোন, আমি যাবো দু'পা। কারণ আমি লেখক। সমাজে পথিকৃতের আগাম দাবীদার। আসল গোলমালটা কোথায় চলেছে জানেন? আমাদের মগজে। সত্যিকারের চিন্তা-ভাবনার ভাঁড়ারে কুলুপ এঁটে আমরা মান্ধাতার আমলের ঝুল-কালি মাখা হৃদয়াবেগের ঝর-ঝরে পাল্লা দুটো টান মেরে খুলে দিয়ে প্রায় মত্ত অবস্থায় বসে আছি। বাহাদুর বনে যেতে চেয়ে উঠে পড়ে লাগতে গিয়েই একজন অন্যজনের কাঁধে একেবারে শেকড় সুদ্ধু হুড়মুড় করে পড়তে চাওয়ার আনন্দেই মশগুল। মনের এমন হাল নয় যে আমি আপনার কথা শুনি, কিম্বা আপনাকে আমার কথা শোনাই। 'ধৈর্য' 'তিতিক্ষা' শব্দগুলি যেন সংস্কৃত ভাষার লুপ্ত অ-কারের মত। থাকলে আছে। না থাকলেও ক্ষতি নেই।

• • •

বিদেশে রবিশঙ্করের ভক্ত হচ্ছে দলে-দলে। বাইরে আজ আলি আকবরের শ্রোতা আর ছাত্রের সংখ্যা অগুন্তি। বাঙলায় ভাটিয়ালি, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্তার-

তাঁরাও কান পেতে শোনে। জানা না বুঝুক সুর শুনেই মুগ্ধ হচ্ছে এবং হবে-ও হয়তো। অথবা তা-ও যদি না হয়, নিছক কৌতুহল মেটাবার ছলেই যদি কেউ আমাদের নাচ-গান-বাজনা নিয়ে মেতে ওঠে তাতেই বা অস্বস্তিবোধ করার কী আছে? অনেকের ধারণা সর্বনাশের মূলে সিনেমা। এবং বলা বাহুল্য তা বোম্বাই-মার্কা হিন্দি বা ঐ জাতীয় বাঙলা সিনেমা যাকে আসলে হলিউডের উচ্ছিষ্ট বলেই ধরা হয়। এটা কেমন ধারা বিচার? আমাদেরটা কেউ নিচ্ছে শুনতে পেলে আনন্দে ডগমগ হব আর অন্যেরটা আমাদের ঘরে আসছে জানতে পেলেই ক্ষেপে উঠবো? তাছাড়া কিসে ভালো আর কিসে মন্দ হবে তার বিচার কি আজ এই মুহূর্তেই করতে হবে? আখেরে ঠকতে হবে না তো? নাকি জোর করলেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবো সবাইকে? আমি বলি, এভাবে কেঁদে-কেটে লাভ নেই। বরং সময়ের গোলায় আজকের যাবতীয় ফসল তুলে দিয়ে খানিক জিরিয়ে নেয়া ভালো। দেখাই যাক না কী হয়। এই তো সেদিন রক্ষিতবাবু বললেন, বাড়িতে রেডিওটা যখন প্রথম আসে তখন আমি শুনতাম কীর্তন। মাঝে-মধ্যে সময় পেলে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতও মন দিয়ে শুনেছি। দাদা কেবল খবর শোনার আগ্রহে রেডিও খুলতেন। বৌঠান চাইতেন রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি। কালে-ভদ্রে দু-একখানা অতুল-প্রসাদীতে-ও অরুচি ছিল না তাঁর। আর ছেলে-মেয়েগুলো? ওদের কথা কী বলবো মশাই। আধুনিক গানের যাকে বলে পোকা। শুধু কি তাই। ফাঁক পেলে সিলোন সেন্টার খুলে বসতো। শুরুতে লক্ষ রাখতো এমন ব্যাপারটা আমাদের কান অবধি যাতে না গড়ায়। আর এখন কি হয়েছে জানেন? ওরা ভয় পায় না। আমরাও আর বাধা দেবার কথা তেমন করে ভাবিনে। বরং যে-যার ইচ্ছেমত রেডিও খোলে আবার বন্ধও করে দেয়। আমি কিন্তু এক আশ্চর্য সিম্ফনি লক্ষ করছি এর ভেতরে। অথচ প্রথম-প্রথম যা ভেবে বিরক্ত হয়েছি এখন দেখছি সেটা অমূলক। গান শুনে ছেলে-মেয়েগুলো বখে যায় নি সত্যি। চাল-চলনে এতটুকু বেসামাল মনে হয় না কাউকে। বরং বাধা পেলেই হয়তো ক্ষেপে যেতো। মানিয়ে রাখা কি চাট্টিখানি কথা মশাই। সংসারে এই নিয়ে একটা যাচ্ছে-তাই কাণ্ড শুরু হতে পারতো। ছেলে-পিলেকে বাগ

তাছাড়া সবটাই কি হুজুগ? তাহলে এ্যাদ্দিন ধরে চলছে কিসের জোরে, কাদের ভরসায়?'

রক্ষিতবাবুর সংগে আমি একমত। অবশ্য গড্ডালিকা প্রবাহে দেশসুদ্ধ সবাই ভেসে চলুক তা-ও বলছিনে। কিন্তু যা অবধারিত তাকে রুখবার সাধ্য কি আপনার-আমার সত্যিই আছে? কারো ছিল কোনো দিন?

তাছাড়া কোনটা দেশী আর কোনটা যে বিদেশী বলা দুষ্কর। আমাদের মেয়েরা আজ বিদেশী মেয়েদের পোশাক গায়ে চড়াচ্ছেন। বিদেশিনীরা পছন্দ করছেন আমাদের মেয়েদের বেশ-বাস-অলঙ্কার। এটাকে খারাপ বলবো কেন? কোট-প্যান্ট পরাটাকে আজ আর কেউ বিদেশী বলে বর্জন করার কথা ভাবে না। বরং গায়ে কোট-প্যান্ট মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে যদি কেউ দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তৎপর হন আমার চোখে তাঁকেই মনে হবে নিতান্ত ভাঁড়। নইলে শিল্প বিপ্লব যত দ্রুত আর ব্যাপক হবে দেশ-বিদেশের সীমা-রেখাটাও ততখানিই হবে ফিকে। একদিন তা পায়ে-পায়ে নিশ্চিহ্ন হবে। আমরা এক হ'ব, একাত্ম হ'ব তখন। সুখী হ'ব কিনা তার জবাব দেবে কাল, মহাকাল। এমন দিন আসবে কিনা জানিনে, যেদিন কোনো দেশ তার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতির গায়ে অন্যের পোশাক বা অলঙ্কার দেখে বিস্ময়ে, বেদনায়, হাহাকারে পাড়ার মানুষ ক্ষেপিয়ে তুলবেন। হয়তো না। কারণ সেদিন পৃথিবীটা আমাদের কাছে আরো ছোট মনে হবে। কিন্তু পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের বোধ হবে বিশাল, বিপুল, মনোরম।

• • •

আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। স্বয়ম্ভু বলে কিছু আছে বা হয় তা মানিনে। এজন্যে বন্ধুরা যদি মনে করেন, আমি ব্যাক-ডেটেড তাহলে বলার কিছু নেই। জীবনে মহত্তর সত্যের সন্ধান পেতে আমি অবশ্য ধর্মের কাছে ছুটে যাবো না। জীবন আমার কাছে জীবন হয়েই আছে। থাকবেও। মহত্তর সত্যের সন্ধানে আমি দৈনন্দিন জীবনের কাছেই হাত পেতে আছি। সমস্ত ক্রোধ-অভিমান-উষ্মা, প্রেম-প্রীতি-স্নেহের বিনিময়ে আমি সেই পরম সত্যকেই পাবো বলে আশা রাখি। আমার কাছে তাই কিছুই তুচ্ছ নয়। এবং একথাটাও মানি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। হয়তো যা দেখছি, যা শুনছি তা-ই শেষ নয়, একমাত্র নয়। এর পরেও আছে। নিশ্চয়ই আছে। আর তার নামও জীবন।

দু'চোখ ভ'রে দেখেছি, সেই চলমান জীবনের বিচিত্র জটিল রূপ। দু'শো বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটে নি, অন্তত এমন করে ঘটে নি আদৌ—এত আক্ষেপ, আলোড়ন, আবর্তনের কথা ভাবেনি দেশ। অথচ কি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সব! একের-পর-এক ঢেউয়ের আঘাতে সমাজ-সংসার-জীবনের পুরনো তটরেখা ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে আবার নতুন করে গড়ে উঠছে। এই পরিবর্তনের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে হয়তো সাময়িক বিপত্তি দেখা দেবে, অঘটন ঘটাও স্বাভাবিক। তাই বলে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকেই দ্রুত বিনষ্টির হাত থেকে টিকিয়ে রাখতে চেয়ে কেউ যদি মরিয়া হয়ে ওঠেন, অনুকম্পা ছাড়া তাঁকে দেবার মত আর কিছুই নেই।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা—বড় অল্প সময়ে এতগুলি ঘটনা ঘটে গেল! যেকারণ দেশের, সমাজের মর্মমূলে আজ বিধ্বস্ত, করুণ! এ আঘাত এখুনি সামলে ওঠা যাবে কিনা বলা ভার। এই আঘাতের স্মৃতি সহজে মুছে ফেলা সম্ভব হবে কিনা তা-ও জানিনে। কিন্তু একথা ঠিক এ আঘাত সহ্য হয়ে যাবে একদিন। আজ কিম্বা কাল। কিন্তু এই আঘাত সহ্য করার মূলে তো সেই চিরন্তন বিশ্বাসই কাজ করে চলেছে। এবং আশা আছে, একদিন এ পথেই সূর্যোদয় দেখে যাবো!

প্রতিশ্রুতি

দীপক চৌধুরী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কুমারেশ মজুমদার একজন ঠিকাদার ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ। তারপর কলকাতার দক্ষিণে গড়িয়া অঞ্চলে একটা কারখানা খুললেন। ছোট কারখানা। সেখানে যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। কারখানার ভবিষ্যৎটা যে খুব উজ্জ্বল সেই ধরনের কথা অনেকেই তাঁকে যখন-তখন এসে জানিয়ে যায়। যারা আশেপাশে থাকে তারা গত দশ বছর থেকে কারখানাটাকে ঠিক এই রকমই দেখছে। এর মধ্যে বড় হয় নি, ছোটও হয় নি। মজুর-মিস্ত্রীদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশজন। আজো তাই আছে। রামনাথ আগরওয়ালা নামে একজন লোহার ব্যবসায়ী প্রায়ই কুমারেশবাবুকে বলতেন, 'একি ছেলে-খেলা করছেন মজুমদারবাবু? এখন রামরাজত্ব চলছে। টাকা বানাবার এই সময়, এই মওকা। এক কোটি টাকা মাটির তলায় পুঁতে রাখলে গভর্ণমেন্টের লোক খুঁজতে যাবে ব্যাঙ্কের খাতায়। সেখানে পাবে কি? লাল কালি দিয়ে লেখা বড় বড় অঙ্ক—আসুন হাত মেলাই। কারখানাটাকে বড় করুন—পাঁচ লাখ আমি দিচ্ছি। রামরাজত্ব চিরকাল থাকবে না।'

কুমারেশবাবু রাজী হন নি। দশ বছর আগে যা ছিল আজো তাই আছে। টাকার প্রতি লোভ নেই তাঁর। বছরে দু-তিন লাখ টাকার ব্যবসা হয়। যোধপুর পার্কে দুতলা বাড়ি করেছেন। বিঘে দেড়েক জমির ওপর বাড়ি। সামনের দিকে মস্তবড় বাগান। গ্যারেজে গাড়ি আছে দুখানা। কিন্তু সংসারটা ফাঁকা। এক বছর আগে স্ত্রী মারা গিয়েছেন। সেই কারণে একটা গাড়ি পড়ে থাকে গ্যারেজে। সন্তানের মধ্যে মাত্র একটি ছেলে। বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে দু-চারদিনের মধ্যে ফিরে আসবে দেবেশ। তারপর সে এসে রামরাজত্বের সুযোগ নেবে কিনা কুমারেশবাবু তা জানেন না

এদেশেও যে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে কুমারেশ মজুমদার তার খবর রাখেন। কারখানা ছোট হলেও সেটা কারখানা। বছরে দু-তিন লাখ টাকার

ব্যবসাও হয়। বোধপুর পার্কের বাড়ি আর জমির মূল্যও আজকালকার বাজারে পাঁচ-ছ লাখ টাকার কম নয়। তার ওপরে একটা কারখানা তো রয়েছেই। সরকারী মহলে এক সময়ে খুবই আনাগোনা করতেন। শিল্পবিপ্লবের উত্তাপ উভয় পক্ষেরই গায়ে লাগত। তারপর পরিচয়ের নিবিড়ত্ব যখন নিরাপদ হয়ে গেল তখন সরকারী মুরুব্বিরা তাঁর মহলেই আনাগোনা আরম্ভ করে দিলেন। বিরাটভাবে যখন পরিকল্পনা চলছিল তখন তিনি সহসা হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলেন ঘরে। এমন কি কারখানাটার সম্প্রসারণও করলেন না। কেউ বুঝতে পারল না যে, তাঁর স্বাস্থ্য-শিবিরের দু-একটা খুঁটি আলগা হয়ে গিয়েছে। সকলেই ভাবল, লোকটি অল্পেতেই সুখী।

সুখী হয় নি শুধু ভবতোষ। অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলে। খুবই একটা ছোট কাজ নিয়ে ঢুকে পড়েছিল এখানে। তারপর লেদ মেশিন চালাতে চালাতে এখন সে একজন ওস্তাদ মিস্ত্রী হয়ে উঠেছে। ওভারটাইম নিয়ে ভবতোষ যা রোজগার করে তা প্রায় দুজন কেরানীর মাইনের সমান। ছেলেটিকে খুবই ভালবাসেন কুমারেশবাবু।

তিনি বলেন, 'তোর ভাত আর কেউ মারতে পারবে না, ভবতোষ। বড় কারখানায় গেলে আরো বেশি মাইনে পাবি।'

'আমার তো ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার ইচ্ছে ছিল, সার।'

'কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলি?'

'ক্লাস নাইন। আমায় নাবালক রেখে গাড়ির তলায় চাপা পড়ে বাবা মারা গিয়েছিলেন। আপনার কারখানায় ঘর ঝাড়পোঁছ করবার কাজ নিয়ে ঢুকে পড়তে হল। তখন মাইনে দিতেন পঁয়তাল্লিশ টাকা।'

'দশ বছর আগের কথা। তখন পঁয়তাল্লিশ টাকার দাম ছিল ডবল। এখন কত পাচ্ছিস?'

'ওভারটাইম নিয়ে শ-দুই হয়, সার। আপনি যদি কারখানাটাকে বড় করতে পারতেন আমি তা হলে ম্যানেজার হয়ে বসে পড়তাম।'

সিগারেটে গোটা কয়েক টান মেরে কুমারেশবাবু বললেন, 'এ তো আমেরিকার ফোর্ড সাহেবের মতো কথা হল রে! বাঙালীদের মুখে ঠিক মানায় না।'

'মানায় সার। আমি বড় হতে চাই—খুব বড়।'

'অতো বড় হয়ে কি করবি, ভবতোষ? খুব বড় হওয়ার মানেই তো অনেক টাকার মালিক হওয়া। সত্যি কথা বলতে কি, সুখে আর সুস্থভাবে জীবনযাপন করবার জন্য অনেক টাকার দরকার হয় না।' একটু থেমে অতীত স্মৃতির মধ্যে মুহূর্তের জন্য ডুবে গিয়ে কুমারেশবাবুই বললেন, 'তোর মতো বয়সে আমিও লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।'

'হয়েছেন তো, সার। প্রকাণ্ড বড় দোতলা বাড়ি, গ্যারেজে দুখানা গাড়ি, ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার জন্য ছেলে গিয়েছে বিলেতে। তার ওপর এই কারখানাটা তো আছেই। শুনেছি আপনি ব্ল্যাক করেন না। করলে আরো লাখ লাখ টাকা আয় করতে পারতেন।'

ভবতোষকে নিজের ছেলের মতোই ভালবাসেন কুমারেশবাবু। যখন কাজ করতে এসেছিল তখন ওর বয়স ছিল পনরো। এখন পঁচিশ। দু-চারজন বড়লোক আত্মীয়-স্বজন যে ছিলেন না তা নয়। কিন্তু কেউ তো একটি মানুষ গড়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন নি। অতএব ওকে রোজগার করতে হল।

কারখানার সংলগ্ন দোতালার দক্ষিণ কোণায় তাঁর অফিস। ডানদিকে বড় একটা হল-ঘরে কেরাণীবাবুরা বসেন। কুমারেশ-বাবুর অফিসটা আসলে একটা দু-কামরার ফ্ল্যাট। সঙ্গে শুধু স্নানঘর নয়, আলাদা একটা রান্নাঘরও আছে। আলাদা একজন বাবুর্চিও আছে এখানকার জন্য। এটার সঙ্গে বোধপুর পার্কের সংসারের কোনো সম্পর্কই নেই। স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন তখনো এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। বোধপুর পার্কের বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিলেও তাঁর কোনো অসুবিধে হতো না।

কারখানাটার সম্প্রসারণের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই তাঁর। বিকেলবেলা থেকে দেহটা যেন কেমন অসাড় হয়ে আসে। স্নায়ুতন্ত্রের ওপর নিজের কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। মনে হয় দেহটা অবশ হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে থাকলে পড়ে যেতে চান। বসে থাকলে এলিয়ে পড়েন চেয়ারের গায়ে। বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা কম্পন অনুভব করেন। রামগড় জঙ্গলের ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথটা সহসা ভেসে ওঠে চোখের ওপরে। তারপর দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতটা নিমেষের মধ্যে একটা অসত্য অনুভূতির মায়াজাল সৃষ্টি করে। কোনো কিছুই আর সত্য বলে মনে হয় না। সংগ্রাম করতে করতে বিছানায় শুয়ে পড়েন কুমারেশবাবু। পাপের বেতন মৃত্যু। তবু ওষুধ খান, ইনজেকশনের খোঁচা লাগে গায়ে। মধ্যরাত্রি পার হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

এটা তাঁর পুরনো ব্যাধি। টের পাননি, কিন্তু বোধ হয় রামগড়ের জঙ্গল থেকেই বীজাণুটা তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। যখন টের পেলেন তখন প্রায় পনরো বছর পার হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কেউ তাঁকে আরোগ্য করতে পারেন নি। বিকেলের দিক থেকে স্নায়ুতন্ত্রের অসাড়তা অনুভব করতে থাকেন। একটা নিয়মিত বাঁধা সময়ের মধ্যেই অসাড়তার সৃষ্টি হয়। বিদেশের কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক তাঁকে কেন্দ্র করে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন বটে, কিন্তু ব্যাধির মূলটাকে কেউ খুঁজে বার করতে পারেন নি। [illegible] হয়তো তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

আজো নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দুপুরের মধ্যেই অফিসের জরুরী চিঠিপত্রগুলো সই করে দেন। বছর-খানিক হল একটি মেয়ে স্টেনোগ্রাফার রেখেছেন তিনি। মিস নীতা বসু। বোধ হয় বছর পঁচিশ বয়স হবে। তার কাজ-কর্ম দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন কুমারেশবাবু। তাঁকে কিছুই করতে হয় না। সবই করে নীতা বসু। মেয়েটির সৌন্দর্য আর দেহ-লাবণ্যের কথা ভাবলেই তিনি অবাক না হয়ে পারেন না। মনে হয় নীতার প্রতি অবিচার করছেন তিনি। এমন একটি মেয়েকে গড়িয়া অঞ্চলে ধরে রাখা উচিত নয়। ডালহাউসি স্কোয়ারের আশেপাশে কোনো একটা সুবৃহৎ বণিক অফিসে ডবল মাইনেতে চাকরি পেয়ে যেতে পারে নীতা। একথা আজ কদিন থেকে তিনি ওকে বার বার করে বলছেন। কথাটাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়। দেবেশের আসবার সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই যেন কুমারেশবাবু নীতার জন্য বড় একটা চাকরির জোগাড় করে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছেন।

পেয়েও গেলেন একটা। কক্স অ্যাণ্ড কিঙ কোম্পানীর বড়সাহেব একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি চান। মাইনে ভাল, বাড়িভাড়া পুরো না পেলেও আংশিক পাবে, অফিসে যাওয়া এবং অফিস থেকে ফেরার জন্য কোম্পানি ওকে গাড়ি দেবে। ভগবান দয়া করেছেন। মেয়েটার ভাগ্য কী ভাল! নেচে নেচে কথা বলছিলেন তিনি। তার ওপর বছরে এক মাসের ছুটি। নীতা চাকরিটা নেয় নি। এমন কি সাহেবটির সঙ্গে গিয়ে দেখা করতেও রাজী হয় নি।

কুমারেশবাবু বলেছিলেন, 'এইটুকু একটা ছোট্ট কারখানায় চাকরি করে পরকাল নষ্ট করছ মা।'

'একদিন বড় হতে পারে—'

'আমার জীবনে নয়।'

'আপনার ছেলে তো ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরছেন। তিনি হয়তো কারখানাটাকে প্রকাণ্ড বড় একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন—'

'তুমি কেন ততোদিন অপেক্ষা করে বসে থাকবে?' সন্দেহের দৃষ্টিতে নীতাকে একবার দেখে নিয়ে কুমারেশবাবুই জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'তুমি কি দেবেশকে চেনো?'

'না।'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। তুমি এখানে কাজ করছ মাত্র এক বছর হল। দেবেশ বিলেত গিয়েছে—'মনে মনে হিসেব করে কুমারেশবাবু বললেন, 'চার বছর তিন মাস হল।'

চিঠিগুলো সই করে দিয়েছিলেন তিনি। নীতা দরজাটা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কুমারেশবাবু ডেকে উঠলেন, 'মিস বসু, নীতা—'

'ইয়েস সার—' ফিরে এল নীতা।

'একটু বসো। তুমি কি ভবতোষকে চেনো?'

'চিনি সার।'

'একটি জিনিয়াস—রত্ন। ভাবছি ওকে আমি বিলেত পাঠিয়ে দেব। হাতের কাজে ভবতোষ অদ্বিতীয়—'

'ছেলেবেলা লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায় নি। বাবা মারা গিয়েছিলেন একটা মোটর গাড়ির তলায় চাপা পড়ে। আদালতে প্রমাণ হয়ে গেল, ভবতোষের বাবা আত্ম-হত্যা করেছিলেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওর মা একটি পয়সাও পেলেন না। আইন-আদালত ও সমাজ-ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। গাড়ির মালিক একজন ধনীলোক। ঘুষের জোরে তিনি শাস্তি পেলেন না। কিন্তু ভবতোষকে পনরো বছর বয়সে চাকরি নিতে হল। নইলে মা আর একটি ছোট বোন না খেতে পেয়ে মারা যেতেন। অবিশ্যি ভবতোষ জিনিয়াস কি না জানি না।'

'অবশ্যই জিনিয়াস—' একটু নড়েচড়ে বসে কুমারেশবাবুই বললেন, 'বিলেত থেকে এবার সে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে [illegible]ফিরবে। ছেলেটাকে যে তুমি পছন্দ করো সেটা শুনে আমি খুশী হলাম। আচ্ছা নীতা, তুমিও কেন ওর সঙ্গে বিলেত চলে যাও না?'

'একটা বেজে গিয়েছে আমি এবার চলি সার।'

'হ্যাঁ, একটু পরেই আমার স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে আসবে। সারা দেহে দৌর্বল্য অনুভব করব—বাই দি ওয়ে, তুমি বোধ হয়
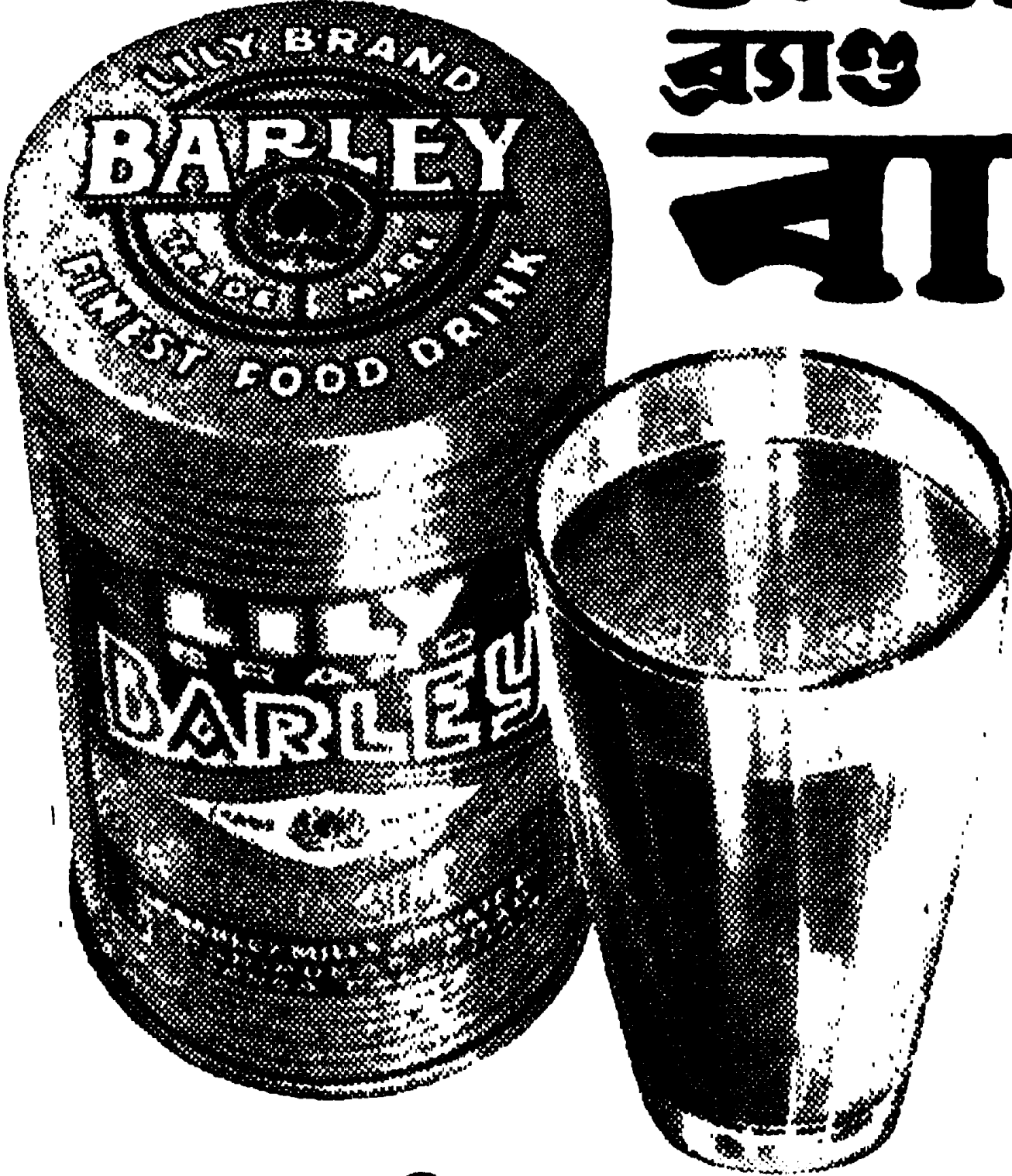
জানো দু-চার দিনের মধ্যে দেবেশ ফিরে আসছে—একটু দাঁড়াও নীতা, কথাটা কি সত্যি?'

'কোন কথাটা সার?'

'তোমার টেবিলে ফাইলের তলায় দেবেশের একটা ফোটো লুকনো ছিল—আই মীন, টেবিল সাফ করতে গিয়ে ছবিখানা হাতে ঠেকে গিয়েছিল চাপরাশির।'

'কথাটা মিথ্যে নয়। অফিস ঘরের দেয়াল থেকে সেদিন ছবিখানা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কালবৈশাখী শুরু হয়েছিল কিনা। আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, সার। আমার মাও খেতে পেতেন না। বিধবা মা কত কষ্ট করে আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছেন। আমি কি করে আপনার ছেলেকে ভালবাসার কল্পনা করতে পারি?'

'দেবেশকে আমি অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই। এটা আমার বহুদিনের আশা। দেবেশও সেকথা জানে।' মুহূর্ত কয়েক চুপ করে বসে রইলেন কুমারেশবাবু। অতীত চিন্তার গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন, 'গত পঁচিশ বছর ধরেই মেয়েটির কথা আমি ভেবেছি। আমার এক বন্ধুর মেয়ে। বন্ধুটি নেই। একটা জীপ গাড়িতে করে আমরা দুই বন্ধুতে মিলে রামগড়ের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাঁচীর দিকে আসছিলাম। যাত্রা শুরু করেছিলাম দুপুরের ঠিক পরেই—'

হঠাৎ কথা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন কুমারেশবাবু। ভয় পেয়ে গেল নীতা। কুমারেশবাবুর দেহটা যেন থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি অসুস্থ মানুষ নীতা তা জানে। কিন্তু ব্যাধির লক্ষণগুলোর সঙ্গে পরিচয় ছিল না ওর। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কুমারেশবাবুর কাছে। তিনি ওর ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, 'আমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো। নীতা, কাল সকালে একবার আমার যোধপুর পার্কের বাড়িতে এসো। অফিসে আসতে হবে না কাল—' ওর ঘাড়ে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামতে নামতে তিনিই বললেন, 'আমার দেবেশকে তুমি ছিনিয়ে নিয়ো না মা। আমি জানি, তোমাকে দেখলে সে তোমার প্রেমে পড়তে চাইবে—তুমি সত্যিই একটি লোভনীয় বস্তু—নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবে সে।'

'প্রতিশ্রুতি?' সিঁড়ির শেষ ধাপটাতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নীতা।

'হ্যাঁ। সে কথা দিয়েছে যতদিন না আমি সেই বন্ধুটির মেয়েটিকে খুঁজে না বার করতে পারি ততদিন দেবেশ অপেক্ষা করবে। আমার ঠিকেদারি ব্যবসার অংশীদার ছিল অমল—নীতা, তাকে ঠকাবার জন্য—অনুভব করছ কি দেহটা আমার কাঁপছে?'

'করছি, সার।'

'তখন হাতে অনেক টাকা এসে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে ইউরোপ-আমেরিকার লক্ষ লক্ষ লোক পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—ছাই উড়ছে আকাশে। আমরা ছাই বিক্রি করেও টাকা রোজগার করেছি। রামগড়ের জঙ্গলে যদি একটা লোক খুন হয়ে যায় তাতে পৃথিবীর আর কতটুকু লোকসান হবে? অমলকে আমি জীপ গাড়ি থেকে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিলাম, তারপর তারপর—গাড়িতে আমায় তুলে দিয়ে এসো মা।'

গাড়িতে তুলে দিয়ে এল নীতা। প্রকাণ্ড বড় আমেরিকান গাড়ি। গদির ওপর এলিয়ে পড়লেন তিনি।

নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব?'

'তুমি কোথায় থাকো জানি না। যদি অসুবিধা না হয় তা হলে এসো। টাকা পেয়েছি, কিন্তু টাকার খোঁচা সহ্য করতে পারছি না। স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়ে গেছে—কোলের শিশুটাকে নিয়ে অমলের বউ যে কোথায় আত্মগোপন করে গেলেন খুঁজে পেলাম না। কত লোক লাগিয়েছি তাকে খুঁজে বার করবার জন্য—'

'অসুখটা তাহলে আপনার মনের?' গাড়িটা গড়িয়ার সীমানাটা পার হয়ে যাদবপুর পেঁছে গিয়েছিল।

'হ্যাঁ মা, প্রথমে মনের অসুখই ছিল। তারপর ধীরে ধীরে স্নায়ুগুলো আক্রান্ত হল। শুধু দিনেরবেলা নয় রাত্রে ঘুমের মধ্যেও অমলের কথা ভেবেছি। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আর আগ্রহ রইল না। কারখানাটা কেন বড় করছি না সেই প্রশ্নটা প্রায়ই ভবতোষ আমায় করে। মনের কথাটা কাউকে খুলে বলতে পারি না। তোমায় আজ বললাম নীতা।'

'কেন বললেন, সার?'

'আমার শুধু মনে হচ্ছে দেবেশ তোমার প্রেমে পড়বে। তুমি ছিনিয়ে নেবে ওকে। অমলের জন্য তা হলে কিছুই আমার করা হবে না। অমলের স্ত্রী আর মেয়েকে আমি খুঁজে বার করবই। মা নীতা, অমলের মেয়ের সঙ্গে যদি দেবেশের বিয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো আমার অমার্জনীয় পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। কে জানে হয়তো আমার স্নায়ুতন্ত্রের শিথিলতাও হ্রাস পেয়ে যাবে।' নীতার দিকে ঝুঁকে বললেন তিনি।

'আমায় কি করতে বলেন আপনি?'

'দেবেশ আসবার আগে ভবতোষকে বিয়ে করে ফ্যালো। আমি তোমাদের দুজনকেই বিলেত পাঠাব। খরচা সব আমার। নয়তো—

'চুপ করে গেলেন কেন?'

'নয়তো এখানকার চাকরি ছেড়ে দাও। সেই চাকরিটা এখনো নিতে পারো। বড়সাহেব অপেক্ষা করছেন। সাড়ে সাতশো টাকা মাইনে পাবে। এখানে তোমার ভবিষ্যৎ সীমাবদ্ধ।'

গাড়িটা যোধপুর পার্কে ঢুকে পড়েছে। একটা সুনির্দিষ্ট উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কুমারেশবাবু।

নীতা বলল, 'আপনার প্রথম প্রস্তাবটা গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব—'

'দ্বিতীয়টা?'

'হ্যাঁ, এখানকার চাকরি আমি ছেড়ে দেব। কাল আপনি বড়সাহেবকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিতে পারেন।'

'কবে গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারো?'

'আসছে মাসের পয়লা তারিখ থেকে।'

'এখনো তিন সপ্তাহ বাকী। পুরো মাইনেতে তোমায় আমি কাল থেকেই ছেড়ে দিতে চাই। দেবেশ ঠিক কোন তারিখে এসে পৌঁছবে আমায় লেখে নি। আমার মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে।'

গাড়িটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। কলকাতার বুকের ওপর শুধু মাড়োয়ারীরাই এতো বড় বাগান তৈরি করে শৌখিনতা করতে পারে। বাঙালীরা টুকরো-টুকরো করে উদ্বৃত্ত জমিটা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে দিত। তারপর মাটির টবে কয়েকটা ফুলগাছ পুঁতে দিয়ে বাগানের শখ মেটাত তারা।

গাড়ি থেকে নামবার আগে নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'অমলবাবুর স্ত্রী আর মেয়ের খবর কি পেয়েছেন?'

'না, এখনো পাই নি। তবে পেয়ে যাব। বিলেত থেকে দেবেশও প্রতি চিঠিতে এই খবরটা জানতে চাইত। শেষের দিকে খুবই ব্যস্ততা প্রকাশ করত। মনে হতো এই খবরটার জন্যই যেন সে বসে আছে বিলেতে।'

'এতো ব্যস্ততার কারণ কি, সার?'

'বোধ হয়—বোধ হয়—' চুপ করে গেলেন কুমারেশবাবু। নীতা নিজেও জবাবটা জানত। অমলবাবুর স্ত্রী আর মেয়েকে খুঁজে না পেলেই খুশী হয় দেবেশ। সে হয়তো আসবার সময় একটি ইংরেজ বউ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চায়। সঙ্গে না এলেও হয়তো পরে এসে মেয়েটি উপস্থিত হবে এখানে। পিতার কাছে দেবেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা ঠিক। কিন্তু এ যুগের শ্রীরামচন্দ্রই কি চার বছরের বেশি প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা করতে পারতেন?

একটা ট্যাক্সি এসে ভেতরে ঢুকলো। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল দেবেশ। স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়ে পড়া সত্ত্বেও কুমারেশবাবু নেমে পড়বার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। নীতা দরজাটা খুলে দিয়ে কুমারেশবাবুকে বলল, 'আমার ঘাড়ে ভর দিয়ে সাবধানে নামুন।'

কুমারেশবাবু তাই করলেন। নীতার ঘাড়ের ওপর এমনভাবে ভর দিলেন যে, দেবেশের মনে হল, এই মেয়েটির ঘাড়ের ওপরেই বাবার অস্তিত্বটা ষোলআনা নির্ভরশীল। বিলেত যাওয়ার আগে কোনো ওষুধ কিংবা ইনজেকশনের ওপর এতো বেশি নির্ভরতা সে লক্ষ্য করে যায় নি।

পায়ের ধুলো নিয়ে দেবেশ বলল, 'তোমাকে খবর দিয়ে আসতে পারি নি, বাবা। পৃথিবীর কয়েকটা বাজার আমায় ঘুরে আসতে হল। এখন আসছি সিঙ্গাপুর থেকে।'

দেবেশ কথাগুলো বলছিল আর চেয়ে চেয়ে নীতাকে দেখছিল। তবে কি অমলবাবুর মেয়েটির সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন

বাবা? এমন একটি মেয়ের জন্য চার বছরের বেশিও অপেক্ষা করা যায়। মেয়েটির মধ্যে শুধু সৌন্দর্য নেই, নির্ভরতাও রয়েছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুমারেশবাবু বললেন, 'এর নাম নীতা বসু। আমার স্টেনো—মানে এখন আর নেই। আসছে মাসের পয়লা তারিখ থেকে সাড়ে সাতশো টাকা মাইনেতে অন্য কোম্পানিতে চলে যাচ্ছে। কোম্পানিটা প্রকাণ্ড বড়। আমি খুব খুশী হয়েছি, দেবেশ। আফটার অল গড়িয়ায় ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

'আমাদের কোম্পানিতে কত পেতেন উনি?' জিজ্ঞাসা করল দেবেশ।

'নাথিং—মানে মাত্র সাড়ে তিনশো।'

'দু-এক বছর অপেক্ষা করলে আমরাও সাড়ে সাতশো দিতে পারব। বাবা, আমাদের কোম্পানিও মস্তবড় হবে। পৃথিবীর বড় বড় বাজারগুলো দেখে এসেছি। মহাজনদের সঙ্গে পাকা কথা বলে এসেছি। দু-এক-দিনের মধ্যে আমি দিল্লী যাচ্ছি। শিল্প-বাণিজ্য দফতরের মুরুব্বিরা শুনলে খুশী হবেন। বাবা, আমরা যদি ঠিক মতো কাজ করতে পারি তা হলে বাজারের কোনো অভাব হবে না। ভারতবর্ষের রপ্তানি-বাণিজ্য বেড়ে যাবে অনেক। দেশের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল—' নীতার দিকে চেয়ে দেবেশ বলল, 'মিস বোস, পরশুদিন আমি দিল্লী যাব। দয়া করে একটা টিকিট কাটিয়ে রাখবেন—'

বাধা দিয়ে কুমারেশবাবু বললেন, 'মিস বোস আমার স্টেনো। টিকিট কাটবে অন্য একজন কর্মচারী। তাছাড়া আসছে মাস থেকে নীতা কাজ করবে অন্য কোম্পানিতে—বাই দি ওয়ে, কাল থেকে নীতা অফিসে আর আসবে না। এ মাসের পুরো মাইনেটাই দিয়ে দেব।'

ঘাড় থেকে কুমারেশবাবুর হাতটা সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল নীতা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন কুমারেশ মজুমদার। ব্যাপারটা যেন নীতার অজ্ঞাতসারে ঘটে যাচ্ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে। দেবেশ এসে বাবাকে ধরে ফেলবার আগে নীতাই আবার কুমারেশবাবুকে সামলে নিল। বলল সে, 'চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার ওপর এতো বেশি নির্ভর করলে পরে আমাকে আর ছাড়তে পারবেন না। আফটার অল আমি আপনার স্টেনো বই তো আর কিছু নই।' তারপর বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে নীতাই বলল, 'পুরো মাসের মাইনে যখন নিচ্ছি তখন বাকী তিন সপ্তাহ কাজ আমি করব। দেবেশবাবুর টিকিট আমি কেটে দেব। কাজ করতে আমার ভাল লাগে।'

আবার বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন কুমারেশবাবু। পাশ থেকে দেবেশ এসে বাবার বাঁ-হাতটা তুলে নিল নিজের ঘাড়ে। দুদিকে ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে এগিয়ে চললেন কুমারেশবাবু।

তারপর কয়েকটা মাস পার হয়ে গিয়েছে। অসহায় দৃষ্টিতে কুমারেশবাবু চেয়ে চেয়ে দেখছেন যে, কারখানাটা রাতা-রাতি বড় হয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্তও বসে নেই দেবেশ। ভবতোষ ওর দক্ষিণহস্ত। অনেকগুলো নতুন নতুন লেদ মেসিন এসেছে। আরো নানারকম মেসিনের অর্ডার হয়ে গিয়েছে। কারখানার আয়তন বাড়ছে। শ্রমিকদের সংখ্যাও বাড়ছে। সেই সঙ্গে কয়েকজন কেরাণীকেও চাকরি দেওয়া হল। সবশুদ্ধ গোটা তিন টেলিফোন। এতদিন এগুলো প্রায় নীরব হয়েই থাকত। এখন দিন-রাত বেজে চলেছে টেলিফোন। পুরো অফিসটার দায়িত্ব নিয়েছে নীতা।

ডালহাউসি স্কোয়ারের বড় অফিসে সে চাকরি করতে যায় নি। সেই একই মাইনেতে সে তিনগুণ কাজ করে চলেছে। সকাল আটটায় কাজ করতে আসে। কোনো কোনো দিন রাত আটটায় বাড়ি ফেরে। ফেরার মুখে গড়িয়ার সিনেমা হাউসের সামনে দেবেশই ওকে নামিয়ে দিয়ে যায়। বাড়ি পর্যন্ত নীতা ওকে নিয়ে যায় না। বলে, পাঁচ মিনিটের পথ। চলে যেতে পারব। তা ছাড়া আগেকার দিনের পুরনো একটা সরু গলি। আপনার এই প্রকাণ্ড বড় আমেরিকান গাড়িটা ওখানে ঢুকবে না। আমাদের দেশের রাস্তার অবস্থা বিবেচনা করে ওরা গাড়ি তৈরি করে নি। নমস্কার সার।'

'সারাদিন তো সার সার করো, আবার এখানেও সার কেন?'

'কি বলব?'

'দেবেশ বলবে।'

'আপনার বাবা রাগ করবেন।' গাড়ির দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নীতাই বলল, 'প্রতিশ্রুতির কথাটা ভুলে যাবেন না।'

'ভুলি নি। বাবাকে আর ছ' মাসের সময় দিয়েছি। তার মধ্যে যদি অমলবাবুর স্ত্রী আর মেয়েকে খুঁজে বার করতে না পারে তা হলে আমি আমার ইচ্ছানুসারে—' থেমে গেল দেবেশ।

'কি করবেন? বিলেতের মেমসাহেবকে বিয়ে করে ফেলবেন বুঝি?'

'বিলেতের মেমসাহেবকে বিয়ে করব!' অবাক হল দেবেশ।

'সেখানে কেউ অপেক্ষা করে বসে নেই?'

'না।'

'তা হলে চলুন, আজ রাত্রে কোনো চীনা হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি। গল্প শোনাব।'

দেবেশের পাশে বসে পড়ল নীতা।

দিনরাত গোটা কয়েক দালাল আসছে কুমারেশবাবুর কাছে। অমলের পরিবারের খোঁজ করে এরা। খোঁজ আনতে পারে না, শুধু টাকা খেয়ে চলেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য বসে থাকেন কুমারেশ মজুমদার। তাঁর বিশ্বাস, প্রায়শ্চিত্ত না করতে পারলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন না। অমলের মেয়ে দেবেশের স্ত্রী হয়ে আসুক, এই সংসারের ভার নিক। বিষয়-সম্পত্তির তদারক করুক সে। বিষয়-সম্পত্তির অর্ধেক-টাই তিনি তার নামে লিখে দিয়ে যেতে চান।

সেদিন সকালের দিকেই হঠাৎ দেবেশ এসে তাঁর অফিস ঘরে ঢুকে পড়ল। এসেই সে বলল, 'বাবা, আমার ত্রিশ বছর বয়স হল। ছ' মাসের মেয়াদটাও পার হয়ে গিয়েছে। এবার আমি বিয়ে করতে চাই।'

'কাকে বিয়ে করতে চাও?'

'নীতাকে।'

'সেই জন্যই ওকে এই কোম্পানি থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ছি ছি—কোন্ এক হাঘরের মেয়ে—'

এই সময় কয়েকটা টাইপ করা চিঠি হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল নীতা। বলল, 'এগুলো খুব জরুরী। এক্ষুনি সই করে দিতে হবে সার।'

'দিচ্ছি। মিস বসু, তোমার বাবা কি করেন?'

'বলেছি তো সার, তিনি মৃত।'

'কি নাম ছিল তাঁর?'

'শ্রীঅমলকুমার বসু।'

'কোন্ অমল?' সোজা হয়ে উঠে বস-লেন কুমারেশবাবু।

'যিনি রামগড় জঙ্গলে মারা গিয়ে-ছিলেন।'

কুমারেশবাবুর দেহে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই। নীতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। ওর মুখের ওপরে অমলের মুখের কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি? কোনো বৈশিষ্ট্যই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। হয়তো মায়ের মতো হয়েছে। এতদিন পর মায়ের চেহারাটাও তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। তবু স্নায়ুতন্ত্র ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। দেবেশকেও আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধ বহন করতে হবে না।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল নীতা। দেবেশের দিকেও চোখ তুলে চাইতে পার-ছিল না। টাইপ করা চিঠিগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

কুমারেশবাবু বললেন, 'দেবেশ, আমার অনুমতি তুমি পেয়েছ। শুভলগ্নে নীতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাক তোমার। একটু দাঁড়াও দেবেশ—শোনো, মেয়েটা ধাপ্পা মেরে গেল না তো?'

'তার মানে?' স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দেবেশ।

'রামগড় জঙ্গলের গল্পটা সে আমার কাছেই শুনেছিল। হয়তো তারই সুযোগ নিয়ে তোমার মতো একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চায়।'

'ডাকো ওকে—' সেই মুহূর্তে সারা দেহে প্রবল কম্পন অনুভব করতে লাগলেন কুমারেশবাবু। তিনি নিজেই চললেন নীতাকে ডাকতে। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে। পারলেন না। দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। মজুর-মিস্ত্রীরা ছুটে এল অফিসে: কারখানা বন্ধ হয়ে গেল।

রামগড় জঙ্গলে সন্ধ্যা হতে তখনো অনেক দেরি। বেলা মাত্র বারোটা।

সুখের মেলা

যারা আমাদের কাছের মানুষ অথচ চির অচেনা, গ্রাম-বাংলার সেই অগণিত সাধারণ মানুষের আঁতের খবর জানাচ্ছে তাঁদেরই আত্মার আত্মীয় বাংলার তরুণতম নতুন লেখক আব্দুল জব্বার এই সুখের মেলায়

পীরিনী বুড়ীর বিচার

এক মানুষ উঁচু দলিজের ওপর বসে মোড়ল বুড়ী ঢ্যারা ঘুরিয়ে পাট কাটছিল আর সামনের তাল পুকুরের ডান হাতি বাঁ হাতি দুটি পাড়ে দাঁড়িয়ে কোঁদল ভাঙছিল দুটি মাঝ বয়েসী মুসলমান বাড়ির বউ। সম্পর্কে দুজনে জা। তাদের গালের ধাঁধুনি, ভাষার চাতুরী, খরিশ কেউটের মতন অঙ্গের দুলুনি— সবই লক্ষ্য করছিল মোড়ল বুড়ী।

পশ্চিম পাড়ের বউ লায়েলা বিবি বলছিল : 'কড়-কড় করে 'আগাশ' ফেটে বাজ পড়বে তার মাথায় যে মিছে কথা বলবে।'

পুব পাড়ের হালিমা বিবি বলছিল : 'মালসা-মালসা, সরা-সরা লউ (রক্ত) ভেঙে মরবে সে আঁটকুড়ির বেটি যে সতীকে আঁচল চাপা দিয়ে লুকোবে।'

দু পক্ষেই বিশ-পঁচিশজন করে মেয়ে জুটে জটলা করছে। কেউ নীরব শ্রোতা। কেউ-বা কথা যুগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছিল— উৎসাহিত করছিল উভয় পক্ষকেই।

লায়েলা বলে : তুই যদি সতী হবি হাঁ লা মাগী, তবে তোর নিজের সব কটা মেয়েছেলে হয় নে কেন লা? তোর মুরগিই খালি সব 'পিলে'-মুরগি-বাচ্চা তোলে, আর মোর মুরগির সব মোরগ-বাচ্চা হয়? ঠিক আছে লো বেহুলা সতী, তোর মুরগি যদি আমার মোরগের কাছে আসে তো 'গইলে' (গোয়ালে) ফেলে তোর পাছায় কাস্তে পুড়িয়ে দাগ দোব। তোর সতীগিরি থাকবে, তোর মুরগির সতীগিরি থাকবে নে কেন লো বড়লাট-ভাতারী?'

হালিমা বলে, 'তোর বেটার মাথায় হাত দিয়ে বল। তোর মাথায় কোরআন শরীফ তুলে দোব, তোকে 'মজিদে'র (মসজিদের) ভেতর ঢুকে হলপ করে বলতে হবে, তোর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের ভেতরে ক'টা ঠিক খাঁটি লোককে বাপ বলে ডাকে। কটা 'বাওয়া' আণ্ডা! তোর পাছার বাহার, তোর চলন দেখে কোন যোয়ান ছোঁড়া না গাড়োলের মতন চেয়ে থাকে। তুই নামাজ পড়িস লা, তুই তিরিশটা রোজা করিস লা? তোর ভাতার মোর দেওর, তাকে দেখে মোর লজ্জা কি লা? মোর ভাতার তোর ভাশুর, তাকে দেখে মাথায় ঘোমটা দিস? এঘাটে থাকলে ওঘাটে তুই নেবে যেয়ে উদোম হয়ে গা ধুস? তোর বিপদ নেই লা—আপদ নেই লা? তোর ছেলে হবার সময় ডাকতে আসিস নি লা? তরকারী চাইতে আসিস নি লা বাটি হাতে নিয়ে?'

ছোট জা লায়েলা : 'তোতোর মুখে 'কুট' (কুষ্ঠ) হোক।'

'তোর মুখে 'ফুল' (শ্বেতী) পড়ুক।'

'তোর বাপ মরুক।'

'তোর বেটা মরুক।'

'তোকে ওলাউঠো হোক, হাঁফ কাশি হোক, ধুকড়ে বসন্ত হোক, মাটি বসন্ত হোক, কাল বসন্ত হোক, তোর মাথায় টাক পড়ুক, তুই বাঁ পায়ের গোল্লায় যা, তোর ভাতার থালভরা রক্ত দুপুরে হাসপাতালে যাক— কলকাতার বিলেত পাশ ডাক্তার 'এসে' দিক—তুই কোমড়ে ফেটে মর—তোর প্যাটে বক'র ছানা হোক, তোর মদ্দমানুষ রাঁড়ের বাড়ি যাক'—

'আল্লা হে আল্লা তুই 'সেইজন' কান করে সব শুনে রাখ। বেটির নিজের পাপ যেন নিজে মাথা পেতে নেয়।'

দুপুর হয়ে গেছে। হাল লাঙল করে ক্ষেত থেকে দুজনের মন্দ মানুষ ঘরে ফিরে আসছে জানতে পারলে দুজনেই আপাতত ক্ষ্যান্তি দেয়।

হালিমা বলে, 'রইল লো বেটাখাকী, খোড়া চাপা রইল, মন্দ মানুষ চলে যাক, বিকেলে আবার খোড়া তুলব।'

'মোরও এই থামা চাপা রইল—আসিস বিকেলে। সাক্ষী রইলে গো পীরিনী মা। তুমি বিচার করো।'

ছোট ছোট কম বয়েসী মেয়েরা গাল দিতে হয় কেমন করে, কাঁদতে হয় কেমন করে তা শিখে নেয়। খেলাঘরে তারা তার অনুকরণও করে।

পথ দিয়ে বুকভরা দাড়িওয়ালা বুড়ো নগেন মান্না যাচ্ছিল। মোড়ল বুড়ী বললে, 'জনলি বাপ নগেন, আমাদের এপাড়ায় আবার এবছর বসন্ত কলেরা হবে। এই রকম গলমন্দ যারা বাইরে বার করে ভেতটা তাদের কী! বজবজ থানার বিদিরা, রামচন্দ্রপুরে গাঁয়ে ভয়ঙ্করভাবে বসন্তর মহামারি দেখা দিয়েছে। পঞ্চাশজন মারা গেছে। পাশাপাশি সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারীবাবুরা এসে ভাল লোককে টিকে দিচ্ছে, সেও তিন দিন পরে খতম। সাতটা শীতলা ঠাকুর তুলে পুজো দিলে তবু রেহাই নেই। অভি-সম্পাৎ!'

নগেন মান্না বলে, 'কেন আর বলো পীরিনী মা, সব গাঁয়েই ঐরকম। চাষী-বাসী মুসলমানপাড়া, বাগদিপাড়ায় যা একটু বেশি।'

বিকালে আবার গালাগালি শুরু হল দুটি বউয়ের স্বামী দুজন মাঠের কাজে বেরিয়ে যেতে।

খোড়া তুলে লায়লা বললে, 'কইলো জোড়াবেটার মাথাখাকী, আয় না আজ রাতে মোর ঘরে মোর বিছানায় শুবি—মোটা করে বিছনা পেতে দোবখন।'

থামা তুলে হালিমা বললে, 'তোর বাপ গরু চুরি করে জেল খেটেছিল মনে নেই না?'

'ওলো তোর ঘরে আগুন লাগুক লো, ওলো তোর ধানের কাঁড়িতে আগুন লাগুক, তোর গোলার ধান পুতি পোকা হয়ে উড়ে যাক, তোর ছেলে গরুজোড়াকে মুড়িতে বিষ খাওয়াক, তোর পুকুরের পাঁচ সের দশ সের করে রাখা রুই-কাতলা মরে ভেসে উঠুক।'...

'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক, পুলিশ ঢুকুক, তোর ঘরে কাবুলি ঢুকুক। তিন সন্ধ্যে না পেরুতে তোর হাতের চুড়ি ভাঙুক।'

'ওলো বেটাখাকী, বাপখাকী, ভাই-খাকী, মাখাকী, ফুফুখাকী, খালুখাকী, ভাতারখাকী, শুয়োরখাকী—'

'তুই পা-পোঁছনায় যা, যমু-পাতালে যা, রসাতলে যা, জাহান্নামে যা, কবরে যা, কালীঘাটে যা, বাবুরবাড়ি চাকরিতে যা, তোকে যন্ত্রনা করুক, তুষ্ ক্লেশ করুক, হরে করুক, নরে করুক! পাঁচ ছাবালের মা হয়েও তুই 'টাইট বডি' 'পিসে' 'মুরে' 'সেনো পাওটার' মেখে টকি 'সাইসকোপ'-এ যাস—লজ্জা করে নে? তুই ছেলেদের মা—না বাজারের নটি? ওইরকম পোষাক করলে তোর ভেতরে কি আছে মানুষ কি আর টের পায় নে? দু' বস্তা ধান বেচে তুই যে 'নাইলনে'র 'ওলন্দা-বাহার' শাড়ি কিনেছিস কিসের জন্যে না? শহুরে বিবি হয়ে নগরে নাগর নাচাতে যা না।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত গাল থামল। স্বামী দুজন মোড়ল গিন্নীর কাছ থেকে সব শুনে এসে দুজনেই বেশ করে শুনো দড়ির চাবুকের বাড়ি কষালে। জ্বলন্ত উনুনে কুপিয়ে দিলে। হাঁড়ির ভাত ফেলে দিলে গরুর গামলায়।

পরদিন সন্ধ্যায় দুটি বউ এল মোড়ল গিন্নীর কাছে বিচার করতে। পাড়ার সব মেয়ে-পুরুষ এসে বসল। অনেকগুলি হ্যারিকেন জ্বলছে চারদিকে। মোড়ল গিন্নীর উপরে নাকি সত্যপীরের ভর হয়। সাচ্চা বিচার করে দেয়। সত্তর বছরের বুড়ী।
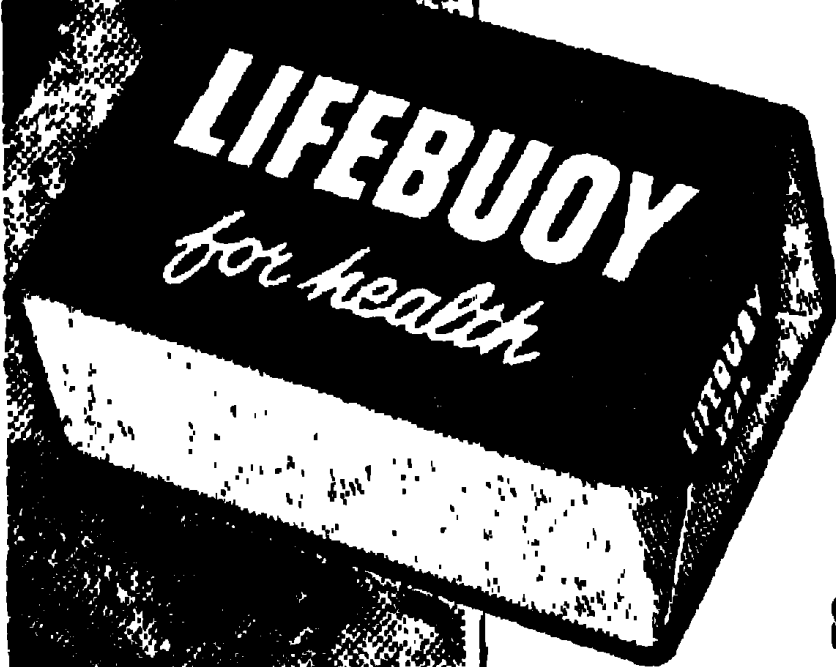
তীক্ষ্ণ নাক। পটল-চেরা চোখ। টুকটুকে ফরসা। গায়ের মাংস এখনো লোল হয়নি। চোখের দৃষ্টি এত ভাল যে ছুঁচে সুতো লাগাতেও পারে। বুড়ী প্রতি সন্ধ্যায় পাড়ার ছোকরা আয়নাল গাজির সুললিত সাপ-খেলানো সুরের পুঁথি পড়া শোনে। রামায়ণ মহাভারত পড়া শোনে। কাসাসল আম্বিয়া (নবীগণের জীবনী) তার সব জানা হয়ে গেছে। হজরত ইউসুফের করুণ কাহিনী শুনে তার দু' চোখের জল ঝরে। জল ঝরে সীতার দুঃখের কাহিনীতেও।

বুড়ীর বিচার তাই ঠেলে ফেলে দেবার শক্তি নেই কারো। বিচারে বসলে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়।

দুটি বউ তার পাশে বসলে সে চোখ বুজে দুজনের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। কে মিথ্যাবাদী বা দোষী এতেই সে ধরে নেয়।

মোড়ল বুড়ী ওজু করে এসে প্রথমে দু' রাকাত নামাজ পড়ে নিয়েছে। তার ছেলেরা একটু দূরে বসে আছে। বুড়ী কথা বলে :

'ছোট বউ লায়লা কথা বলবে।—কি নিয়ে ঝগড়া তোমাদের?'

লায়লা বলে, 'মুরগির বাচ্চা নিয়ে। আমার মুরগির সাতটা আন্ডা বড় জায়ের মুরগির তায়ে দিয়েছিনু মুই। আমার মুরগির আন্ডা সব খেয়ে খেয়ে ফুরিয়ে গেছিল। বলি সাতটা আন্ডা নিয়ে আর তায়ে বসাব? জাকে বলতে তার তায়ে দিতে রাজি হল। আমি আমার আন্ডায় হাঁড়ির কালির ঢ্যারা দাগ দিয়ে এসেছিনু। যদি 'ঘোলা' পড়ে তাহলে বাদ যাবে—বাচ্চা মোর পাওনা হবে নে। তা পাঁচটা নাকি ফুটছে। দুটো ঘোলা পড়েছে। আমাকে বাচ্চা দেবার সময় দেখি সব মোরগ ছানা দিয়েছে। জা বলে, তোর সব মোরগছানা হয়েছে। আর ওর দশটা আন্ডার নাকি সবক'টাই মুরগি-ছানা হয়েছে। এই কথা কাটাকাটি নিয়ে শেষ অবধি ঝগড়া।'

'হালিমা বল এবার।'

হালিমা বলে, 'ওর সাতটা আন্ডার যে পাঁচটার বাচ্চা ফুটেছিল সবক'টা মোরগ-ছানা আমি দেখেছিনু পরখ করে করে। তাই দিইচি।'

জেরা : 'যখন ডিম ফোটে তুমি কি রাত জেগে বসে থেকে থেকে দেখেছিলে?'

'সকালে দেখেছিনু খোলার ভেতর থেকে নড়েচড়ে বেরুচ্ছে।'

'একদিনের বাচ্চাকে কি চেনা যায়?'

'মাসখানেক বাদে দিয়েছেন, একটু টনকো হতে।'

'যখন ধাড়ির সঙ্গে ঘুরে বেড়াত সব চিনে রেখেছিলে?'

'হাঁ, তিনটে লাল, দুটো সাদা।'

'তোমার।'

'সব কালো।'

'ধাড়ির রঙ?'

'কালো।'

'মোরগের রঙ?'

'লাল।'

'লায়লার মোরগ-মুরগি কি রঙের?'

'মুরগি কালো, মোরগ সাদা।'

'ডিমের খোসাগুলো আছে?'

'হাঁ। ঝাঁটাকাঠি দিয়ে গেঁথে রেখেছি। চালের বাতায় খোসা আছে। আন ত মা এলাচি।'

ডিমের খোসাগুলো আনা হলে বুড়ী আলোর সামনে সেগুলো পরখ করে করে দেখলে। ভাঙা আধাআধি খোসা। কালি-লাগানো পাঁচটা ডিম। ঘোলা পড়া বাকি দুটোর খোসাও নাকি আছে লায়লার ধাড়িতে। মুখ ফুটিয়ে ভেতরের পচানি বার করে ফেলে দিয়ে রেখেছিল। তার বড় মেয়ে ফুলজান ডিমের খোসায় নানা রঙ দিয়ে 'সিকা' টাঙায় বলে খোসা জমিয়ে রাখে। সে দুটোও আনা হল।

বুড়ী সব দেখে বললে, 'লায়লার কালি মারা এই সাতটা ডিমের খোল এক জাতের—এক মুরগির নয়। কেন না এক মুরগির আন্ডার আকার এক রকমেরই হবার কথা। এই ঘোলা-পড়া দুটো এক জাতের। যার সঙ্গে মিল হালিমার আন্ডার। তলার দিকে বেশি ভারী মোটা মাথার দিকে সরু ছুঁচলো। যেমন বড়লোকদের মুখের ডোল হয়। কপালের দিকটা ছোট—গালের দিকটা ভারী। আর গরিব লোকের মুখের ডোল তেকোনানে। কপালের উপর দু'কোণের দিক, নিচে এক কোণ। তা লায়লার আন্ডা সেই রকম অবশ্য উল্টে নিলে। যাই হোক, পচা ঘোলা-পড়া দুটো বড় জা হালিমার—অন্য দুটোর কালি তুলে দিয়ে নিজের যে দুটোয় বাচ্চা হয়নি তাতে কালি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই ডিমগুলো থেকে মুরগি ছানা হয়েছে—যার মুখ অল্প জায়গা নিয়ে কেটেছে। তাহলে দশটা বাচ্চা, মুরগি। পাঁচটা মোরগ। না না—ভুল হচ্ছে, সাতটা মোরগ। এখনো দুটো মোরগ-ছানা হালিমার বাচ্চার মধ্যে আছে যাদের ও বেটি চিনতে পারেনি। আর একটু বড় হলে ধরা পড়বে। এখন বিচার হল সাতটা বাচ্চা দিতে হবে ছোট বউকে। বড় বউ পাবে সাতটা। একটা থাকবে মসজিদের জন্যে মানসিক। সেই মোরগ বড় হলে জবাই [illegible] বড় বউয়ের অন্যায়ের জন্যে গরিব [illegible] ভাত খাওয়াবে। যাও সব মুরগি বাচ্চা নিয়ে এস।'

মুরগি বাচ্চা আনলে দুটি বউ কোঁচড়ের মধ্যে করে। দুটি চুবড়ির মধ্যে তাদের ধরা হলে মোড়ল বুড়ী—ইনসান মোড়লের স্ত্রী—খালেদা বিবি পরখ করে দেখে দেখে হালিমার মুরগি বাচ্চার মধ্যে থেকে ঠোঁটের উপর ফুলমতো যে দুটোর সে দুটো নিয়ে হাতের তালুতে বসিয়ে সবাইকে দেখালে। বললে, 'এই দুটো মোরগ। লায়লা পাবে চারটে মুরগি, তিনটে মোরগ। হালিমা পাবে তিনটে মোরগ আর চারটে মুরগি। একটা মানসিকের মোরগ—পালবে বড় বউ—হাজুতের চালও তাকে দিতে হবে। এখন বড় বউ বল, তুমি কার-সাজি করেছিলে কিনা? তোমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে হবে।'

বড় বউ অপরাধ স্বীকার করলে।

জায়ে জায়ে মিল করে দিলে মোড়ল বুড়ী। সবাই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলে ওজু করে এসে বুড়ী ইশার নামাজ পড়তে বসল। ঘণ্টা-দুই পরে তাকে খাবার জন্যে বড় ছেলে খালেক ডাকতে এসে দেখলে মা আলো নিভিয়ে দিয়ে পড়ে মৃগিরোগীর মতন অজ্ঞান হয়ে কেবলই শরীর ঝাঁকাচ্ছে। এই অবস্থাকে সকলে বলে পীরিণী বুড়ির ভর হয়েছে। বাবা সত্যপীর ভর করেছে। এরকম অবস্থা হয় প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে। কোনো সপ্তাহে দুবারও হয় নাকি। খুব উত্তেজিত হলেও হয়। মোড়ল বুড়ীকে তার বড় ছেলে পাঁজাকোলা করে ধরে থাকে। বউরা আলো, জল নিয়ে আসে। দাঁতকপাটি ছাড়িয়ে দেয় কানে-নাকে পালকের সুড়সুড়ি দিয়ে। তারপর যথা-রীতি প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বকতে থাকে পারিণী বুড়ী।

মানুষের ভিতরে আছে কংকাল
হাড়ের খিলেন।
বুকের মধ্যে আছে প্রাণ
পদ্মপাতার পানি।
চোখের মধ্যে মণি,
ডিমের মধ্যে কুসুম,
ফুলে থাকে মধু আর গন্ধ,
পাথর ফেটে চৌচির হয়ে ঝরণা নাবে
আকাশ ফেটে নাবে বাজ
তবু আমাকে অন্ধকারে খুঁজে বেড়াও
নিজের পায়ে নিজেই গড় করো!
মানুষ বেইমান
আলো, সত্য, সুন্দরকে ভুলে
ভালবাসছে কালোকে—
সে আহাম্মক
সে জানে না তার রঙ নিয়ে খেলা
শুধু ছেলে খেলা।
কিন্তু ক্ষেত খামার পড়ে রইল
আবাদ করবে কে?
আকাশে লাঙল জুড়েছ
মাথার ঘি বিক্রি করে গাঁজা খাচ্ছ?
স্মরণ রেখো আসছে কিয়ামত
পাহাড় পর্বত উড়বে তুলোর মতন
আগুন উড়বে [illegible]

মার ইতিহাস তোমাকে পড়তে
দেওয়া হবে।
খের পানিতে তখন দেখবে সব কালো।
জকে পণ্ডিত ভাবতে
কে জ্ঞানী ভাবতে
তে তুমি পীর
তে নিজেকে নেতা বলে
া বাদশা
র হয়ে ঘুরে বেড়াত তোমার বাপ
র হাড়ের মজ্জা
রক্তের বীর্য
র গর্ভ খনিতে
তোমাকে হাড়ে চামড়ায় জড়ালে?
রের পোষাক তো তোমার কাপড়
াতেই তা পড়ে থাকবে!
ছলে কুত্তা
। সব খাবার কুড়িয়ে খেতে
চলেছ পথে
মার কংকালটা চলেছে সঙ্গে
টা তোমার নয়
পের
াদমের
আল্লার।
াল্লা হল মনুষ্যত্ব
াকে বাদ দিচ্ছ কিসের বদলে
ধের বদলে তাড়ি?
বে তোমরা মরো—
তোমরা নষ্ট জিনিস
আঁধার আনব আবার
তারপর আলো।...

এই রকম লাচাড়ি চলে হাজার লাইন। গ্রামের লোক কেউ তার অর্থ বোঝে না। এসব নাকি ভর-কথন। সিদ্ধ-বাক্য। বুড়ীর জ্ঞান হলে নাকি কিছুই মনে থাকে না। তাকে পীরিণী বললে নাকি পায়ের খড়ম তুলে দেখায়। মহাভারত পড়াশোনার সময় দুলতে থাকে। খুশী হলে হাততালি দেয়। রাগ হলে থুথু করে।

পীরিণী বুড়ীর ভর হয়, ভর হলে কি সব বলে শোনার আগ্রহে একদিন যেতেই বুড়ী আদর করে কাছে বসালে। বুড়ী আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া হয়। চাচাত মামার দিদিশাশুড়ী। বুড়ী তার ছেলেদের ডাকাডাকি আরম্ভ করলে : 'ওরে খালেক, মালেক তোরা এসে দেখ কে এসেছে! ডাব পেড়ে দে। মাছ ধর।'

একটা গোলাপ ফুল হাতে ছিল তার হাতে দিতে বুড়ী সেটা শুঁকে আবার আমার হাতে ফেরৎ দিলে।

বললাম, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আমাকে 'তুমি' বল। আমি মা।'

'পীরিণী মা বলব?'

'না, শুধু মা।'

'মা!'

'বল্‌ বেটা।'

'আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে?'

'তুই হলি গোবর গাদায় পদ্মফুল! কল-মরুয়ের লেখন। দেখি তোর ডান হাত দে।'

পীরিণী মা আমার হাতটা তার মুখের ওপর চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করে রইল। পরে বললে, 'তোকে এখন সব কথা বলা ঠিক নয়। সামলাতে পারবি না।'

'ঠিক পারব। আমাকে রাজা-বাদশা করে দিলেও ঠিক চালিয়ে যাব। শুনি না একটু।'

মা হাসল। বললে গোপনে, কানে কানে।

আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

ভয় পেলাম।

আমার শরীর যেন কাঁপতে লাগল। চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু গড়াতে লাগল। মা পটল-চেরা চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, 'আজ আমার ভর হবে, বাঁ চোখ আর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল নাচছে। যখন ভর হবে আর আমার মুখ থেকে কথা বেরুবে, তুই লিখিস তো—জ্ঞান হলে শুনব।'

সেদিন সত্যই ভর হল রাত নটার পর। আশ্চর্য সেসব বাণী। কোথা থেকে আসছে—কেমন করে আসছে? কেন আসছে? কাদের জন্যেই বা আসছে? সবটা লেখা অসম্ভব।

পরদিন সকালে লেখাটা ফ্রেশ করে তার সামনে ধরতে চেয়ে রইল। বললে, 'পড়।'

বললাম, 'না।'

'কেন?'

'আমার বাঁচবার উপায় বল।'

মা হাসলে। বললে, 'শিবের মতন পাথর হবি। রাগকে মেরে ফেলবি। দুনিয়ার সব লোক তোর আপন দেহ, মুচি মেথর পণ্ডিত জ্ঞানী সবাই যেন তুই নিজে, এমনি ভাববি। কাউকে ঘেন্না করবি না। কাউকে আঘাত দিবি না। তওবা কর। আল্লা নেই একথা ভাবিস না। আল্লা হল মনুষ্যত্ব। সে তোকে আড়াল থেকে সাহায্য করছে। সে যাকে রক্ষা করে কেউ তাকে মারতে পারে না। হজরত ইউসুফকে তার অত্যাচারী ভাইরা মেরে পাতকুয়োর মধ্যে ফেলে দিলে। তাকে তুলে নিয়ে গেল মনিরু সওদাগর, বেচে দিলে মিশরের রাজার কাছে। রানী তাকে ভালবাসতে চাইলে নোংরাভাবে। ক্ষেপে গিয়ে উল্টে বদনাম দিলে। তার জেল হল। সেখানে তার অন্তরে এল আল্লার দূত জিব্রিলের ভর। সে স্বপ্নের মানে বলে দিলে। পরে সাধক ইউসুফ হল দেশের উজির। তারপর রাজা। দুর্ভিক্ষের সময় তার ভাইরা এলে সে চিনল। তাদের একজনকে চোর দায়ে ফেলে আটকে রেখে বিচারের সময় পরিচয় দিলে। তবে কি তোমরা মনে কর ইউসুফ মরে গেছে? তারা বললে, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বললে, আল্লা যাকে বাঁচায় সে মরে না। তার রাজপোষাক খুলে দিতে পুত্রশোকে অন্ধ বাবার কাছে তা আনলে। সেই পোষাক আনতেই বাবা বলে উঠল, আমার ইউসুফের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি কোথা থেকে!'

পীরিণী মা বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে ফেললে। বললে, 'তোর অন্ধ বাপ মারা গেছে, সে এখন জগতের সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে—তাদের পথে অনেক কাঁটা—রক্ত ঝরছে। দুর্ভিক্ষ বেধেছে। তোর কাছে সবাই আসবে—তাদের ফিরিয়ে দিস না। তাদের পেছনেই বাপ আছে অন্ধ হয়ে বসে—আশীর্বাদের ডালা হাতে নিয়ে।'

মাকে তার বাণী পড়ে শোনালাম। মা অবিশ্বাস করে আমার গালে আলতোভাবে, আদর করে একটা চড় মারলে। বললে, 'এসব কি আমি বলতে পারি! তুই বানিয়ে বানিয়ে লিখিচিস"

বললাম, 'আল্লার কিরে মা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি না।'

মা তখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলে। আমি বিদায় নিলাম।

পথে আসতে আসতে মনে মনে হাসতে লাগলাম :

পীরিণী না ঘোড়ার ডিম!

মা—শুধু মা! মায়ের বুকের ভেতরের একটা চিত্র শুধু মূর্তি ধরে বাইরে প্রকাশ পেয়েছে।

আটকুড়ির বেটি মরলেই তার কবরের পাশে লোকে মালসা, সরা উপুড় করে দেবে। মাটির ঘোড়া বসিয়ে দেবে সারি সারি।

কিন্তু তার পটল-চেরা চোখদুটো যে মায়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে? কি সর্বনাশ!

আবদুল জব্বার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার বন্ধু নজরুল

কথাটা সবাই জানে।

একই দেশে আমাদের বাড়ী।

কয়লাকুঠির দেশ।

চারিদিকে কাঁকর-পাথরের শুকনো ডাঙ্গা, যেখানে সেখানে ছোট ছোট কয়লার কুঠি। গাছপালায় ঢাকা আর ধানের মাঠ। মাথার ওপর অজয় নদী। গ্রীষ্মকালে অজয়ের শুকনো বালি মরুভূমির মত ধু ধু করে।

সেদিক দিকে তাকালেই কোনও এক রুদ্রাণী ভৈরবীর ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। গৈরিকবসনা ভৈরবীর উগ্রচণ্ডা মূর্তি। রক্তবর্ণ তেজোদ্দীপ্ত চক্ষু আর পিঙ্গল জটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল।

বর্ষায় কিন্তু অন্য রূপ! ছোটনাগপুরের পার্বত্য এলাকা থেকে গিরিমাটি ধোয়া জলের ঢল নামে অজয় নদীতে। তৃষ্ণার্ত মৃত্তিকা শীতল হয়। শ্যামসুন্দর সে এক অপরূপ রূপে প্রকৃতি যেন অকস্মাৎ তার বেশ পরিবর্তন করে। অজয়ের জল দুকুল ভাসিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটতে থাকে। বড় বড় লাল-লাল পলাশের ফুলগুলো তখনও সব ঝরে পড়েনি। ঝাঁকে ঝাঁকে নানারকমের আগন্তুক পাখীর দল কোন্ দূর দেশ থেকে—উড়ে এসে জুড়ে বসে। অদূরে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি শিবের মন্দির—পাণ্ডবেশ্বর। তার ওপারেই কবি জয়দেবের কেন্দুবিল্ব। এখনও মনে হয় যেন সেইদিক থেকে গীতগোবিন্দর সুর ভেসে আসে—

...দেহিপদপল্লব মুদারম্!

অজয়ের তীরে চুরুলিয়া গ্রামে কবি নজরুলের জন্ম।

হ্যাঁ, সে কবি হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল।

সব সময়েই তার সেই প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখখানি আজও আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে। হাসি-হাসি মুখ।

হাসি যেন তার মুখে লেগেই থাকতো।

সেই বড় বড় দুটি চোখ, চওড়া বুকের ছাতি, তার স্বাস্থ্যসুন্দর সেই সুদর্শন দেহের দিকে একবার যার নজর পড়েছে—সারা জীবনেও সে স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়নি—সেকথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

যেমন সুন্দর চেহারা তার তেমনি সুন্দর মন। সে রকম উদার হৃদয়বান আপনভোলা মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি।

অভিজাত এক মুসলমান পরিবারের সন্তান সে।

অভিজাত কিন্তু বড়ই দরিদ্র।

বাড়ীর সুমুখে পীরপুকুর নামে একটি পুকুর আর সেই পুকুরের পূর্বদিকে ছিল পীরসাহেবের সমাধিক্ষেত্র আর পশ্চিমদিকে ছিল একটি ছোট মসজিদ।

অবস্থার দুর্বিপাকে নজরুলের পিতাকে আজীবন সেই মাজার শরীফ আর মসজিদের সেবা করে জীবিকানির্বাহ করতে হয়েছিল।

সেই পিতা যখন লোকান্তরিত হলেন, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিলেন না—যিনি তাঁদের সংসারের হাল ধরতে পারেন।

সংসারে অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই। নজরুলের বয়স তখন আট কি নয়।

সেই অপরিসীম দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে।

তবু কোনোদিন তার মুখের হাসি ম্লান হয়নি।

তার বয়স যখন দশ, তখন দেখলাম—গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সেই মক্তবেই শিক্ষকতা করছে। আর করছে পিতার পরিত্যক্ত সেই 'মাজার সরীফে' মসজিদের সেবা। অবসর সময়ে সুর করে রামায়ণ পড়ছে মহাভারত পড়ছে। 'লেটো'র দলে ছোট ছোট পালা লিখছে আর গানের সঙ্গে ঢোলক বাজাচ্ছে।

পদ্যে নাটক রচনা করে নাচ দিয়ে গান দিয়ে 'লেটো'র অভিনয় করাতে গিয়েই হলো তার কবিপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ।

এই সময় রামায়ণ, মহাভারত পড়া তার খুব কাজে লাগলো। কারণ—'লেটো' কথাটার উৎপত্তি বোধ হয় নাট্য থেকে। কবি গানের মত এর পালাগানে—বিপক্ষ দলের পালটা প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তরে 'চাপান' থাকতো 'কাটান' থাকতো। মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে সুর দিয়ে নেচেগেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যে যত তাড়াতাড়ি জবাব দিতে পারতো তার বাহাদুরী তত বেশি।

সেদিক দিয়ে নজরুলের দক্ষতা অসাধারণ। তেরো চোদ্দ বছরের ছেলের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা

বছর চারেক কাটলো এমনি করে।

তারপর সোজা চলে গেল মাথরুণ স্কুলে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক সেখানকার হেড মাস্টার। লেখাপড়া শে ইচ্ছা তার ছিল, কিন্তু কোনও সু ছিল না। সেখানে মাত্র একটি ব কাটিয়ে আবার সেই চুরুলিয়া। বাড় তখন নিদারুণ অন্নাভাব। মন আর না কিছুতেই। আবার 'লেটো'। বি 'লেটো'র জন্য কেউ সে বছর একটি প... খরচ করতে পারে না। বৃষ্টির অভাবে দেশে দারুণ অজন্মা। টাকা-পয়সা খরচ করে লেটোর আসর বসাবার সাধ্য কারও নেই।

নজরুল হট্ হট্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নজরে পড়লো এক ক্রিশ্চান গার্ড-সাহেবের।

—বাবুর্চির কাজ করবে?

রান্না জানে না। তাই তাই সই।

চুরুলিয়া, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ—তারপর আসানসোলের এক রুটির দোকান।

আসানসোল থেকে কোথায় গেল কি হলো কিছুই আমার জানবার কথা নয়। আমি তখন রাণীগঞ্জ ইস্কুলের ছাত্র। রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোল অবশ্য বেশি দূরে নয়। একদিন গেলাম আসানসোলে। গিয়ে শুনলাম—সেখানকার এক রুটির দোকানে কিছুদিন কাজ করবার পর কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে কেউ কিছু বলতে পারলে না।

তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হলো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে।

সেও আমাদের সেই ঘাট-বাঁধানো পুকুরে স্নান করতে এসেছে।

অনেক দিন পরে দেখা। কেমন যেন রোগা হয়ে গেছে মনে হলো।

মুখের হাসি অবশ্য ঠিক তেমনিই আছে।

সবই সে আমাকে বললে।

আসনশোলের এক পুলিশ-ইন্সপেক্টরের সুনজরে পড়ে গিয়েছিল। তিনিই তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বহু দূরে বেল—

ময়মনসিংহে। সেখানে কাজীর-সিমলা নামে একটি গ্রাম আছে—সেই গ্রামে।

একটা ইস্কুলে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। স্কুলটা ছিল গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে। জল কাদা ভেঙে সেই ইস্কুলে তাকে যেতে হতো।

সে কি সহজ কথা! নজরুল বললে, আমার পোষালো না। পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

এসে আবার সে ভর্তি হয়েছে শিয়াড়-সোল রাজার ইস্কুলে। ফ্রি স্টুডেন্ট।

এবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

আমাদের সেই পুকুরটার কাছে ছোট্ট একটি মাটির ঘর। সেইটিই ইস্কুলের মহমেডেন বোর্ডিং। মাত্র পাঁচজন ছাত্র থাকে। তার ভেতর নজরুল একজন। নজরুলকে পয়সাকড়ি দিতে হয় না। তার উপর রাজবাড়ী থেকে প্রতি মাসে সাতটি করে টাকা পায়।

দুজন দুটো আলাদা ইস্কুলে পড়ি। একজন শিয়ারশোলে একজন রাণীগঞ্জে। খুব কাছাকাছি। বোর্ডিং তো আরও কাছে।

এইখানেই সুরু হলো আমাদের সাহিত্যের চর্চা। লেখা লেখা খেলাও বলতে পারেন।

নজরুল লেখে গান, কবিতা, আমি লিখি কবিতা।

তারপর যখন আমরা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র, হাফইয়ারলি পরীক্ষা চলছে। ওদিকে তখন নানারকমের পোস্টারে বিজ্ঞাপনে শহর একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। —কে বলে বাঙালী নিবীর্য, কে বলে বাঙালী শক্তিহীন? আসুন বাঙালী পলটনে যোগ দিন। যুদ্ধবিদ্যা শেখবার সুবর্ণ সুযোগ।

আমরা সে সুযোগ পরিত্যাগ করলাম না।

দুজনেই নাম লেখালাম যুদ্ধের খাতায়। কাউকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে গেলাম আসনশোল। সেখান থেকে কলকাতা রিক্রুটিং আপিস।

কিন্তু কেমন করে না জানি সব জানাজানি হয়ে গেল। এবং তার ফলে আমার বুকের মাপ হলো আধ ইঞ্চি কম। আমার যাওয়া হলো না। নজরুল চলে গেল করাচী।

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে আবার সেই স্কুল!

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আমি যখন কলকাতায় পড়ছি, নজরুল ফিরে এলো করাচী থেকে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। নজরুলের ছুটি।

আমরা আমাদের সাহিত্যের প্রোগ্রাম বদলে নিলাম।

নজরুল এক 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়েই দিগ্বিখ্যাত হয়ে পড়লো।

নজরুল হলো কবি। আমি হলাম গল্প-লেখক।

এবার যা হলো সে সব কথা সবাই জানে। নজরুলের কর্মজীবনের পরিধি মাত্র ২৫ বৎসর। (১৯২৮-১৯৪৮) এই কয়েকটি বৎসরের ভেতর নজরুল তার আরব্ধ কর্ম শেষ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কবি নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পী নজরুল যখন তার খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে, তখন তার স্ত্রীর হলো দুরারোগ্য ব্যাধি। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেলেন তিনি।

তার চিকিৎসার জন্য নজরুল সর্ব-স্বান্ত হয়ে গেল।

তার পরেই সে নিজে হলো অসুস্থ।

প্রিয়তমা পত্নীর রোগমুক্তির জন্য সে যা করেছিল—না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথী, কবি-রাজী—সব চিকিৎসাই যখন ব্যর্থ হলো তখন চললো ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা, পূজো অর্চনা—আধিদৈবিক, আধি-ভৌতিক আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম—কিছুই বাদ গেল না।

নজরুলের মনের অবস্থা তখন এমনি যে কিছুই লিখতে পারছে না।

অর্থাভাবে বিপন্ন নজরুলের যা কিছু ছিল সব গেল। মোটরগাড়ীটা বিক্রি করে ফেললে। বালিগঞ্জে একটুখানি জায়গা কিনেছিল সেটি বিক্রি হলো, লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের পলিসিগুলো 'সারেন্ডার' করলে, গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের রয়েলটি বন্ধক রাখলে, বই-এর কপিরাইট্ বিক্রি হয়ে গেল।

এককথায় বলতে গেলে নজরুলের তখন আর কিছু নেই।

অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করবার পর গ্রামোফোন কোম্পানীর কল্যাণে তখন যদি-বা সে একটুখানি সুখের মুখ দেখেছিল, এইবার তাও গেল।

সর্বহারা হয়ে তখন সে একরকম পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও রিক্সায় চড়ে পথ চলছে। কোথায় শুনেছে নাকি কোন্ দেবস্থানে দৈব ওষুধ পাওয়া যায়, ছুটলো সেই অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে। তিনদিন উপবাস করে ধর্ণা দিয়ে ওষুধ নিয়ে এলো। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে ওষুধ খাওয়ালে স্ত্রীকে।

কিছুই হলো না।

যে-মুখে হাসি লেগেই থাকতো সে মুখ হলো ম্লান। নিতান্ত নিরুপায় অসহায়ের মত চুপটি করে বসে থাকে স্ত্রীর শিয়রে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারে না।

এমনদিনে খবর পেলে ডায়মণ্ড হারবার থেকে মাইলতিনেক দূরের একটি গ্রামে এক প্রেতসিদ্ধ সাধু থাকেন, তিনি নাকি মন্ত্র পড়ে এবং আরও কি-সব ক্রিয়াকাণ্ড করে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে দিতে পারেন।

হাতে টাকা নেই অথচ খবর নিয়ে জানলে সাধুর ঠিকে চুক্তি পাঁচশ' টাকা।

প্রথমে বায়না দিতে হবে পঁচিশ টাকা, তারপর সাত দিনের ভেতর রুগী যখন উঠে হেঁটে বেড়াবে তখন দিতে হবে পাঁচশ' টাকা।

অনেক বড়লোক অনুরাগী স্তাবক ছিল নজরুলের। সুখের দিনে দিবারাত্রি যারা তাকে ঘিরে থাকতো, তখন আর তারা কেউ পাশ মাড়ায় না।

কাবুলিওলার কাছে টাকা ধার করে নজরুল ছুটলো সেই ভূতসিদ্ধ সাধুর কাছে।

রোগ সারলো না। ভূতসিদ্ধ লোকটা বললে, সময় লাগবে।

তার বুজরুকি তখন ধরা পড়ে গেছে। পাঁচশ' টাকা আর দিতে হলো না। পঁচিশ ত্রিশ টাকার ওপর দিয়েই গেল।

কিন্তু পাঁচশ' টাকা তখন সংসারে খরচ হয়ে গেছে। দুই ছেলে সব্যসাচী আর অনিরুদ্ধ তখন কলেজের ছাত্র। স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য মাইনে করা দুটি মেয়ে আছে, অভ্যাগত অতিথি এবং পোষ্যের সংখ্যা কম নয়।

রোজগার করতে হবে নজরুলকে।

রোজগার তখনও সে করছিল। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে নজরুল তখন দেশী-বিদেশী নানান্ রাগ-রাগিনীর সংমিশ্রণের দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল। বেতারের সঙ্গীত-বিভাগে সে অনন্যসাধারণ এবং যুগান্তকারী বৈচিত্র্যের তুলনা হয় না। 'হারামণি' 'হরগৌরী', 'নবরাগ মালিক' তার পরিচয়।

অথচ ঠিক সেই সময়ে একদিন বেতারের প্রোগ্রাম করতে করতে নজরুলের হঠাৎ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। তার ছিল হাই ব্লাড প্রেসার। মানসিক দুশ্চিন্তা তখন তার সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করে গেছে।

যে সর্বনাশা ব্যাধি নজরুলের মত একজন স্বভাবকবি এবং দুর্লভ সুরশিল্পীকে আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের মত দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, সেই ব্যাধির এইখানেই হলো বুঝি প্রথম সূত্রপাত।

দেশের এত বড় দুর্ভাগ্য আর কল্পনা করা যায় না।

ধীরে ধীরে সে রোগ তার বেড়েই যেতে লাগলো।

চিকিৎসার ত্রুটি হলো না। এমনকি বিলেতে পাঠানো হলো, জেনেভায় পাঠানো হলো। কিন্তু অর্থাভাবে সবই হলো এত দেরিতে যে, প্রত্যেকটি দেশের বিখ্যাত চিকিৎসকেরা সকলেই আফশোষ করে বলতে লাগলেন, বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। আর কিছুদিন আগে এলে বোধকরি বা কবিকে আমরা সুস্থ করে দিতে পারতাম। এখন আর উপায় নেই।

কবির প্রতি দেশবাসীর এ ঔদাসীন্যের কথা আজ আর ভেবে কোনও লাভ নেই।

ঔদাসীন্যের কথা যদি ভাবতেই হয় তো ভাবছি শুধু তাঁদের কথা—যাঁরা তাঁদের ভাগ্যের জোরে নামের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে বসে আছেন। কবি-সাহিত্যিকদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—সরকারী এবং বেসরকারী পুরস্কার বিতরণের সময় বিচারকের ভার পড়ে তাঁদেরই ওপর।

তাঁদের বিচারে নজরুল অপাঙক্তেয়।

সে-সব কথা বলতে হলে অনেক কথাই বলতে হয়।

কাজেই সেকথা আজ বলবার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমি শুধু বলবো সেই সব কথা—যেগুলি বলার আজ একান্ত প্রয়োজন।

আমাকে কতলোক চিঠি লিখে টেলিফোন করে জানতে চেয়েছে, নজরুল কতবার বিয়ে করেছে? যাঁরা জানে তাঁর পাঁচটি স্ত্রী। প্রতিবাদ করেছি। বলেছি তাঁরা ভুল শুনেছেন। বিয়ে তার মাত্র একটি। এবং সেই একটি স্ত্রী নিয়েই সে তার জীবন কাটিয়েছে। সে স্ত্রী এখন আর বেঁচে নেই। তাঁরই দুই ছেলে—সব্যসাচী আর অনিরুদ্ধ।

আর একটি নামে মাত্র বিয়ে তার হয়েছিল, কিন্তু সে বিয়েটাকে বিয়ে বলা চলে না। মজাফ্‌ফর আহমদ-সাহেবের 'নজরুল ইসলাম' বইখানি পড়লেই সেকথা আপনারা বুঝতে পারবেন। তাতে বিস্তারিতভাবে সব কথাই লেখা আছে।

তারপর আর একটা কথা।

অনেকবার অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছে—কবি নজরুলের আপনি অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি বলুন আমরা যা শুনেছি তা সত্যি কিনা!"

—কী শুনেছেন?

—কবি নজরুল ইসলাম রোজ ক' বোতল মদ্যপান করতেন? এখনও নাকি তিনি মদ না পেলে চীৎকার করেন?

বলেছিলাম, যা শুনেছেন সব মিথ্যা কথা। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তো এইটুকুমাত্র জেনে যান—নজরুল জীবনে কোনদিন মদ্য স্পর্শ করেনি।

তারা বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করেছিল। যাবার সময় বলে গেল—তাহ'লে যা শুনেছি তা মিথ্যা গুজব!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মিথ্যা গুজব। নজরুল কোনোদিন মদ খায়নি আর ধূমপান করেনি।

সেদিন একটি পত্রিকায় দেখলাম—ছাপা হয়েছে—নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সিঁড়ির ওপর চীৎকার করতে করতে উঠছে—গুরুজি! গুরুজি!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতেই প্রথম কথা!—আমার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আমার নাম বোধ হয় আপনি শুনেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সেই প্রথম দেখা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, শুনেছি শুধু নয়, তোমার 'বিদ্রোহী' কবিতা আমি পড়েছি।

নজরুল ইসলাম বললে, আমি আপনাকে হত্যা করবো।

রবীন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। বললেন, তোমার হাতে আমি নিহত হতে যাব কোন্ দুঃখে?

নজরুল বললে, কারণ আমার 'বিদ্রোহীর' মত কবিতা আপনি লিখতে পারেননি।

দু'জনেই তখন উচ্চ হাস্য করে উঠলেন।

যিনি লিখেছেন এই কথাগুলি তিনি নাকি শুনেছেন পবিত্র গাঙ্গুলীর মুখে।

অথচ আশ্চর্য। পবিত্র কখনও এ-সব কথা বলতে পারে না। কারণ এর এক বর্ণও সত্য নয়।

পবিত্রই নজরুলকে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তারা যেদিন যায়, আমি ছিলাম তাদের সঙ্গে। কাজেই আমি সব জানি।

নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সবে লিখেছে। তার খ্যাতি তখন ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। নজরুলের লেখা গান তারই দেওয়া এক অভিনব সুরে অনেকে তখন গাইতে সুরু করেছে।

নজরুলের খুব ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার।

এ-সব ব্যাপারে পবিত্রই আমাদের সেতুর কাজ করে।

হঠাৎ পবিত্র একদিন এসে বললে, চল্ আজকেই নিয়ে যাব।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অগ্রিম সে কোনও 'এপয়েন্টমেন্ট' করেছিল কিনা তখন বুঝতে পারিনি। আমি নজরুলের কাছে বসেছিলাম। পবিত্র বললে, তুইও চল্।

আমারও যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন আমি মাত্র কয়েকটি কয়লাকুঠির সাঁওতালী গল্প লিখেছি। আমার কোনও পরিচয় নেই। আমি মাত্র নজরুলের সহপাঠী বন্ধু। সেই পরিচয় নিয়েই আমিও গেলাম তাদের সঙ্গে।

কাজেই আমি জানি নজরুল রবীন্দ্রনাথকে গুরুজি বলে কখনও ডাকেনি। 'আমি আপনাকে হত্যা করবো' তো বলেইনি। নজরুলের প্রাণপ্রাচুর্য ছিল প্রচুর কিন্তু কোনও প্রকার ঔদ্ধত্য ছিল না।

এমনি সব মিথ্যা অপপ্রচার তার নামে যে কত হয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই।

নজরুল সেদিন তার 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। চার পাঁচটি গান গেয়েছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথকে সে অনুরোধ করেছিল গান গাইবার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ দুটি গান গেয়েছিলেন। আবৃত্তি করেছিলেন।

নজরুলকে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। বলেছিলেন, তুমি চারণ কবি। চল তুমি আমার শান্তিনিকেতনে। সেখানে তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করে দেবো আমি। খাবে-দাবে মনের আনন্দে গান গাইবে, গান গাইবে, কবিতা লিখবে। আর মনে খুশী ঘুরে বেড়াবে।

নজরুল চিরকাল স্বাধীনতাপ্রিয়। জবাবে বললে, আমি ভেবে বলবো।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—নিশ্চয় ভাববে। তার যদি ইচ্ছে না হয় তো যাবে না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ আমি করতে বলবো না।

নজরুলের তখন থাকা-খাওয়ার কষ্টের অন্ত ছিল না। থাকতো মুজাফফর আহমদের সঙ্গে। তালতলা লেনে। দুজনেরই অবস্থা সমান। শীতকাল। গায়ে দেবার কম্বল নেই। মেঝেতে পাতবার বিছানা নেই।

কি রকম ভাবে, কি অবস্থায় এই বাড়ীতে ছেঁড়া কম্বলের ওপর শুয়ে-শুয়ে সে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেছে আমি জানি। সাদা ফুলস্কেপ কাগজের ওপর কাঠের পেন্সিল দিয়ে লেখা। লিখবার জন্যে না-আছে কালি, না-আছে কলম। কাঠের পেন্সিলটি লিখে-লিখে ছোট হয়ে গেছে। তার জন্যে কোনও দুঃখ নেই, অসন্তোষ নেই।

সেই দিল-দরিয়া মেজাজ আর মুখের হাসি তার লেগেই আছে।

আমি কিন্তু চেয়েছিলাম সে শান্তিনিকেতনে যাক।

কিন্তু সে গেল না কিছুতেই।

দু'চার দিন পরেই সবকিছু ভুলে গেল।

এই তার চরিত্র।

কিন্তু নানান পত্র-পত্রিকায়, লোকের মুখে মুখে নজরুল সম্বন্ধে যে-সব মিথ্যা কথা প্রচারিত হচ্ছে, ভয় হয় ভবিষ্যতে আমরা যখন কেউ থাকবো না, তখন এইগুলিই না সত্য হয়ে দাঁড়ায়!

বড় হওয়ার বিড়ম্বনা কম নয়। নিজের প্রতিভার জোরে যারা বড় হয়—যারা খুব কম সময়ের ভেতর জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে—সমাজে (বিশেষ করে আমাদের এই বাঙালী সমাজে) এক শ্রেণীর পরশ্রীকাতর মানুষ আছে যারা তা সহ্য করতে পারে না। তার নামে নানারকম কুৎসা রটনা করে আনন্দ পায়। প্রতিবাদ করবার মত কেউ যদি না থাকে তো সোনায় সোহাগা! তার নামের সঙ্গে নিজের নামটিকে জুড়ে নিজে বড় হবার চেষ্টা করে।

যে নজরুলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ত ক্ষণিকের, সেই নজরুল সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে অপরিচিত লোকজনের সামনে বলে বসলো -- অনেক দিন পরে সেদিন কাজীর সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম সকাল বেলা মদ খেয়ে হৈ-হৈ করতে-করতে পথ চলছে। আর একটু হলেই গাড়ী চাপা পড়তো, আমি দু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম। বললাম, মদ খেয়ে-খেয়েই তুই নিজের সব্বনাশ করবি দেখছি। যখন-তখন ওগুলো আর ওরকম করে গিলিসনে। এই বলে যথেষ্ট তিরস্কার করলাম তাকে। হি-হি করে হাসতে লাগলো। লজ্জা-শরম কিছু নেই। তা যদি থাকতো তো রবি ঠাকুরের চেয়ে বড় কবি হতে পারতো সে।

বললাম, রবীন্দ্রনাথও খান। আমি নিজে দেখেছি। রোজ সন্ধ্যেবেলা—খুব ভাল বিলিতি মদ — দুটি পেগের বেশি নয়। এই রকম সংযম দরকার।

এখন থেকে বছর-পাঁচেক আগে রহড়ার কাছে কোন্ এক পল্লীগ্রামের একটি ইস্কুলের কয়েকজন ছেলে নজরুল জন্মোৎসব পালন করবে বলে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলো।

কিছুতেই না বলতে পারলাম না। রাজী হয়ে গেলাম।

সন্ধ্যে সাতটায় সভা। বললাম, ঠিক ছ'টায় গাড়ী নিয়ে এসো। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। আকাশে মেঘ ছিল। বিকেল থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

সতটা পর্যন্ত যখন গাড়ী এলো না, ভাবলাম বুঝি তারা আসতে পারলে না। ভালই হলো। বৃষ্টি-বাদলার দিনে যেতে হলো না।

নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা।

খুব আওয়াজ করে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো আমার বাড়ীর দরজায়।

জানলার পথে তাকিয়ে দেখি—অনেককালের পুরনো মডেলের ছোট একটি ফোর্ড গাড়ী থেকে সেই ছেলে দুটি নামছে।

বললাম, এখন আর গিয়ে কি হবে? এইখানেই তো আটটা বাজলো!

ছেলে দুটি ছাড়লে না কিছুতেই। একেবারে কাঁদো-কাঁদো ভাব। —'আপনি

গেলে মিটিং আমাদের আরম্ভ হবে না ...র। কবি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই ...নি না। আপনি তাঁর বন্ধু। আপনার ...ছ থেকে শুনবো বলে অনেক কষ্টে ...দু চাঁদা তুলে আমরা এই সভার ...য়োজন করেছি।

ফিরতে অনেক রাত্রি হবে বুঝতে ...ছি। তবু তাদের অনুরোধ এড়াতে না ...র গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

কিছু দূর গিয়েই গাড়ী গেল বন্ধ

...টিপ-টিপ 'করে বৃষ্টি পড়ছে। কাপড়ের ...-দেওয়া পুরনো গাড়ী। তার ওপর ...রি গেছে ডাউন হয়ে। ছেলে দুটি ...া, ড্রাইভার নামলো গাড়ী থেকে।

আমিও নামতে যাচ্ছিলাম, ড্রাইভার ...কে সান্ত্বনা দিলে। — আপনাকে ...তে হবে না স্যার। এক্ষুনি ঠিক করে ...লেছি।

এই বলে তিনজনে ঠেলতে আরম্ভ করলে। ঠেলতে-ঠেলতে অনেক অভদ্র মন্তব্য করতে লাগলো গাড়ীর মালিকের উদ্দেশে। — হারামজাদা কৃপণ-কঞ্জুসের ...কশেষ। জানে আমাদের মিটিং, তবু বেছে ...বেছে চারখানা গাড়ীর ভেতর সব চেয়ে ...যেটা খারাপ সেই গাড়ীটাই দিয়েছে।

একটি ছেলে বললে, দয়া করে দিয়েছে এই যথেষ্ট। লে ঠেলা।

হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে কিছু দূর ঠেলতেই গাড়ী স্টার্ট হয়ে গেল।

তারপর আবার আর একবার।—'তেল ফুরিয়ে গেছে।'

পেট্রোল-পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে তেল নেওয়া হলো।

এমনি করে থামতে-থামতে গিয়ে যখন পেঁছোলাম, দেখলাম — গ্রামের রাস্তার পাশে ছোট্ট একটি ইস্কুল-বাড়ী। চারিদিক লোকে-লোকারণ্য। দরজাগুলো পর্যন্ত লোকে ঠাসা। ভেতরে যাবার রাস্তা পর্যন্ত নেই।

মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। মাইকের সামনে 'ডায়াসে' দাঁড়িয়ে কে একজন বক্তৃতা করছেন। বক্তাকে দেখা যাচ্ছে না, তাঁর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

সামনের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বললে, আপনি একটু বসুন স্যার, আমরা লোকজন সরিয়ে রাস্তাটা ঠিক করি।

আর একটি ছেলে বললে, ততক্ষণ একটু চা খান।

বলেই সে বোধহয় চা আনতে গেল।

চা-খাবার প্রবৃত্তি তখন আমার নেই। বক্তার কথাগুলো আমার কানে এসে ধবক-ধবক করে বাজছে।

এ কীরকম মিথ্যা কথা বানিয়ে-বানিয়ে বলছেন তিনি?

বলছেন—কবি মোহিতলাল মজুমদার 'মানসী মর্মবাণী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম—'আমি'।

কবি নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে আমরা যখন খুব হৈ-চৈ

নজরুলের হস্তাক্ষর

স্বদেশী

কালের শঙ্খে বাজিছে আজও
তোমারই মহিমা ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায় বিশ্বভুবন
শিখিছে আজিও তব আদর্শ॥
নিখিল মানবের প্রথম ধাত্রী
শিক্ষা সভ্যতা দীক্ষা দাত্রী।
~~আজি~~ আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি ঋষি
লভিতে তোমারি চরণ স্পর্শ॥

শিল্প সঙ্গীত বেদ বিজ্ঞান
সাংখ্য দর্শন পুণ্য প্রেম জ্ঞান।

যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহীয়ান
বিশ্ব সাক্ষী মাগো সকলি তোমারই দান।
জগত-সভামাঝে তাহারি সন্তান
আজি মলিন মুখ — আজি বিমর্ষ॥

করছি, সারা দেশে সাড়া পড়ে গেছে, সবাই বলছে অদ্ভুত কবিতা, ঠিক সেই সময় কবি মোহিতলাল আর শনিবারের চিঠির সজনী-কান্ত দাস—দুজন এক সঙ্গে প্রচার করলে—নজরুল ইসলামকে নিয়ে তোমরা এত হৈ-চৈ কোরো না। আসলে সে একটি পাকা চোর। তার বিদ্রোহী কবিতাটি আসলে মোহিতলালের 'আমি' প্রবন্ধের হুবহু নকল। অর্থাৎ চুরি। অথচ নজরুল তা স্বীকার করে নি।

শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত লিখলে —নজরুল আসলে কবিই নয়। গ্রাম্য অশিক্ষিত এবং মূর্খ। তার গানগুলি সব রবীন্দ্রনাথের নকল, কবিতাও তাই। আমরা তা প্রমাণ করে দিতে প্রস্তুত।

শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি 'প্যারোডি' ছাপিয়েছেন—

আমি ব্যাং!
আমার লম্বা লম্বা ঠ্যাং!...

অনেকখানি কবিতা তিনি মুখস্থ বলেছিলেন।

আজ আর আমার তা মনে নেই। মনে থাকা সম্ভবও নয়।

তার পরেই বলেছিলেন, একদিন সন্ধ্যেবেলা ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর নজরুল আর মোহিতলালকে তিনি নাকি অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে আর ছাতি নিয়ে মারামারি করতে দেখেছিলেন। ছাতিটা ছিল মোহিতলালের হাতে। তাই দিয়ে নজরুলকে তিনি এমন মার মেরেছিলেন যে নজরুল ফুটপাতের ওপর শুয়ে পড়ে বলে-ছিল—'আর আমি কখনও এমন কাজ করবো না।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে যাবার জন্যে লোকজনকে ঠেলে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মাইকের সামনে কে যেন বলে দিলে—

'আমাদের সভার সভাপতি এসে গেছেন। এক্ষুনি তাঁকে আমি এইখানে নিয়ে আসছি।'

বলবামাত্র বক্তার বক্তৃতা বন্ধ হয়ে গেল। আমি সেই ভিড়ের পেছন থেকে

চিৎকার করে উঠেছিলাম — ওঁকে যেতে দেবেন না। আমি যাচ্ছি।'

ভেতরে কিসের যেন গোলমাল উঠলো। লোকজনের পেছন থেকে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। অনেক কষ্টে ডায়াসে যখন গিয়ে পেঁাছোলাম তখন শুনলাম— যিনি এতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন, আমার নাম শুনেই তিনি পালিয়েছেন। কোথাকার কোন একটি ইস্কুলের টিচার তিনি। ছেলেরা তাঁকে টেনে ধরে রাখতে পারে নি।

পালাবেন জানি। পালানো ছাড়া তাঁর কোনও উপায় ছিল না।

আমি সভার মাঝখানে সবাইকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হলাম—তিনি যে-সব কথা আপনাদের শুনিয়ে গেলেন তার এক বর্ণ সত্য নয়। মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের মনোমালিন্য হয়েছিল সত্য, কিন্তু রাস্তার ওপর ছাতি নিয়ে মারামারি তাঁরা কখনও করেন নি।

শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার 'প্যারোডি' একটি লিখেছিলেন বটে, কিন্তু নজরুল কারও লেখা কোনোদিন নকল করেছে কিম্বা কারও লেখা কোনোদিন অনুকরণ করেছে — সজনীকান্ত সেকথা কখনও লেখেন নি। লেখা দূরে থাক, মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করেন নি।

মোহিতলাল এবং সজনীকান্ত দুজনেই আর ইহজগতে নেই। নজরুল বেঁচে আছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনও অপবাদের প্রতিবাদ সে করবে না জেনেই এই সব পণ্ডিতম্মন্য ইতর এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তিরা নানা রকমের মুখরোচক গল্প তৈরি করে তাঁদের গায়ে অযথা কাদা ছিটোতে আরম্ভ করেছেন।

সজনীকান্ত নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার 'প্যারোডি' (আমি ব্যাং আমার লম্বা লম্বা ঠ্যাং) যখন লিখেছিল, তখন তাঁর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় পর্যন্ত ছিল না—কেউ কাউকে চিনতো না। শনিবারের চিঠির তখন প্রথম জন্ম। চিঠির আকারে ছোট্ট একটি কাগজে ছাপা হতো। তারই একটি কপি কিনে নিয়ে আমি নজরুলের হাতে দিয়েছিলাম।

নজরুলের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। বার-কতক সেই 'প্যারোডি'টি পড়েই সেটি সে আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেললে।

তার কাছে লোকজনের আসা-যাওয়ার অন্ত ছিল না। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে হাসতে-হাসতে সজনীকান্তর লেখা সেই ব্যঙ্গ কবিতাটি নজরুল গড়-গড় করে মুখস্থ বলে যেতে লাগলো।

তারপর প্রথম যেদিন তাঁদের দুজনের দেখা হলো, নজরুল হাসতে-হাসতে দু হাত বাড়িয়ে সজনীকান্তকে জড়িয়ে ধরে তাঁরই বিরুদ্ধে লেখা কবিতাটি আগাগোড়া আবৃত্তি করে হো-হো করে তার সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হাসি হেসে সজনীকান্তর মন থেকে বিদ্বেষের বাষ্পটুকু পর্যন্ত উড়িয়ে দিলে।

সেদিন থেকে তাদের দুজনের সে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব যে না দেখেছে সে বিশ্বাস করবে না।

নজরুলের মন চিরকালই এমনি উদার। কারও বিরুদ্ধে এতটুকু বিদ্বেষ সে কোনো দিন পোষণ করে নি।

সেকথা যাক।

যে-নজরুল কোনো দিন কারও বিরুদ্ধে এতটুকু বিদ্বেষ পোষণ করে নি, যার হৃদয়ের উদারতা তুলনাহীন, তার সম্বন্ধে যে-সব বর্বর এবং অমানুষ নিন্দুকেরা নানা প্রকার মিথ্যা গল্প তৈরি করে প্রচার করছে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।

নজরুলের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন—

'অরুণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্নতার অনবদ্য ভাবমূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার কোনও ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করে নি। জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করে নি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে। তাই আবির্ভাব মাত্রই অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি।'

জনাব আজহারউদ্দিন খান লিখেছেন—

'কবির জীবন সম্পর্কে নানারূপ ভুয়ো গুজব আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেই গুজবকে বিশ্বাস করে আজও অনেক মহলে কবির বিরুদ্ধে বিকৃত প্রচার চলে।'

খুব সত্য কথা।

কারণ তার প্রমাণ এখনও মাঝে-মাঝে পাচ্ছি।

নজরুলের অনেকগুলি পূর্ণা জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তারই জ কিনা জানি না—এখন সেই সব আজগ গল্পের হিড়িক অনেকটা কমে গেছে।

এখন আর-একটি ক্ষেত্রে শঙ্কিত হ উঠেছি।

সেটি নজরুলের অনবদ্য সৃষ্টি সঙ্গীত আর তার সুরমাধুর্য। নজরু কবি-প্রতিভার মহত্তম এবং মধু বিকাশ তার গানে। বাংলা গানের ইতি তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজকাল রবীন্দ্র সঙ্গীতের প নজরুলের গান গাওয়া হচ্ছে সর্বত্র। আ গানের বিশেষজ্ঞ নই, তবু মনে হয় কয়েকজন গায়ক এবং গায়িকা নজরু সুরের বিকৃতি এনে দিচ্ছেন।

সেদিক দিয়ে আমরা যদি এ অবহিত না হই তাহলে আমার ভয় হ বাংলার সঙ্গীত জগতে নজরুলের চি স্থায়ী আসন যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখা নজরুলের গান হয়ত গাওয়া হবে বি সুরের যে ইন্দ্রজাল নজরুল রচনা করে যেখানে তার অভিনবত্ব সেখানে আ সত্যিকারের নজরুলকে খুঁজে পাব না

একে তো আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দুর্লভ নজরুলকে আমি চিরদিনের জ হারিয়েছি, তার জন্য আমার দুঃ দুর্ভাগ্যের আর সীমা-পরিসীমা নে তার ওপর তার গানের সুরে যখন বিকৃ ছাপ পড়ে, আমার কানে তখন মনে যেন আগুন ঢেলে দিচ্ছে।

তাই নজরুলের সুর-জগতের সা যাঁরা সুপরিচিত সেই সব সঙ্গীতজ্ঞ স শিল্পীদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অ রোধ—তাঁরা যেন এর প্রতিবাদ করেন।

বিস্ময়কর এবং অত্যাশ্চর্য কবি-কল্পনার অনায়াস লীলায়, সুললিত ছন্দের লেখায়, বিচিত্র সুন্দর সুরমাধুর্যে নজরুল তার কবিকর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সত্য, তার জীবনীকারেরা বিস্তারিতভাবে সেকথা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু নজরুল চিরজীবী হয়ে থাকবে—আমার বিশ্বাস—নজরুল-সঙ্গীতের সুরের সুরধুনী বইয়ে দেবেন যাঁরা — সেই সব সুরশিল্পীদের কণ্ঠে।

এই প্রসঙ্গে নজরুলের 'সিন্ধু' কবিতার কয়েকটি লাইন—যে কবিতাগুলি সে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে আমারই হাতে তুলে দিয়েছিল—আমি এইখানে তুলে দিলাম।

—চেনার বন্ধু পেলাম নাকো
জানার অবসর
গানের পাখী বসেছিলাম
দুদিন শাখার 'পর
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাকবে নাকো—
থাকবে পাখীর স্বর।
উড়বো আমি, কাঁদবে তুমি
ব্যথার বালুচর।

নজরুল চরিত্রের অন্যদিক

আবদুল আজীজ আল আমান

(১)

দে গরুর গা ধুইয়ে!

আড্ডায় জমায়েৎ-হওয়া সবকটি মানুষ এক সঙ্গে উৎকর্ণ হলেন। এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। এবং আগন্তুককে অভ্যর্থনার জন্যে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

আশ্চর্য! মানুষটা আসার সঙ্গে সঙ্গে আসরের গুমোট আবহাওয়ায় লাগল বসন্তের মিঠেল স্পর্শ। আর তুহীন কাতরতা নয়—ফাগুনের নবীন আনন্দ। সেই আনন্দে সবাই হাসতে চায়।

এক অদ্ভুত মজলিসী মানুষ নজরুল।

হাসি তখনো থামে নি, আবার সেই দরাজ কণ্ঠ শোনা গেল, দে গরুর গা ধুইয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গলায় আশ্চর্য ভাঙা-ভাঙা হাসি।

এই-ই নজরুল। নজরুল-মানসের এই আসল পরিচয়। বাধা-বন্ধনহীন। উদার এবং মুক্ত।

এই সঙ্গে হাস্যরসিক নজরুলের সঙ্গেও আমরা কিছুটা পরিচিত হই। আড্ডাবাজ এবং মজলিসী। এ তাঁর জীবনের একটি বিশেষ দিক। তাঁর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। প্রতিমুহূর্তে কত বাধা, কত যন্ত্রণা! দৈন্য এবং জীর্ণতা! তাও মানুষটির মুখ থেকে কেউ কোনদিন হাসিটি মুছে যেতে দেখে নি। শত দুঃখের মাঝে থেকেও তিনি নিজে হেসেছেন এবং অপরকে হাসিয়েছেন। নিজে মেতে অপরকে মাতিয়েছেন। কি মজলিসে, কি আড্ডায়, কি বৈঠকে।

অথচ নজরুল-জীবনের এদিকটি নিয়ে আজ পর্যন্ত কোথাও কোন আলোচনা হ'ল না। আমাদের বিশ্বাস, নজরুল জীবনের এদিকটি নিয়ে আলোচনা না হলে মানুষ নজরুলের পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হবে না। পূর্ণ মানুষটাকে জানার জন্যে হাস্যরসিক নজরুলের পরিচয় অনিবার্য। কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে আমরা মানুষ নজরুলের এই দিকটির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হবার চেষ্টা করব।

(২)

একদিন বিভূতিবাবু কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে পরিমল গোস্বামী। যেতে-যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কী ব্যাপার? ছুটে চলা একটা মটরের দিকে তাকিয়ে বুকে হাত দিলেন। তারপর বুক চাপড়ে বললেন, 'মেরে দিয়ে গেল'। অর্থাৎ ঐ মটরে একটা সুন্দরী তরুণী ছিল—তাঁর চোখ ঝলসে দিয়ে সে চকিতে মিলিয়ে গেল। কী সাংঘাতিক ঘটনা।

ঘটনাটি স্থূল কিন্তু দিলখোলা বিভূতিভূষণকে চিনতে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না।

আড্ডা জমজমাট। সমানে চলছে হাসি-হৈ-হুল্লোড়। হঠাৎ নজরুল উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর হলেন। তারপর পথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বন্ধু-বান্ধবও উঠে দাঁড়ালেন। কী ব্যাপার। সবাই দেখলেন পথের ওপর দিয়ে আলত পা ফেলে শান্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন এক ভদ্রমহিলা। সবাই হেসে অস্থির। নজরুল শান্ত কন্ঠে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন, গুরুদেবের কবিতা।

নতুন করে হাসির হল্লা পড়ে গেল। হাসি তখনো থামে নি, দেখা গেল পথের উপর দিয়ে এক ছিপছিপে তরুণী টগবগিয়ে দ্রুত চঞ্চল পদে এগিয়ে চলেছে।

নজরুল সোল্লাসে বলে উঠলেন, সত্যেন দত্তের লাইন।

বুঝুন ব্যাপারটা। শান্ত পদবিক্ষেপে চলা গুরুদেবের কবিতা নয়, টগবগিয়ে ছুটে-চলা সত্যেন দত্তের লাইন! সত্যিই তো, ছন্দ-যাদুকর সত্যেন দত্তের কবিতায় এমন চটুল পংক্তির অভাব নেই। আশ্চর্য রসবোধ ছিল নজরুলের!

(৩)

রবিবারের সকাল।

কয়েকজন প্রবীণ জ্ঞানী মানুষ বসে আছেন গম্ভীর হয়ে। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই বসে অপেক্ষা করছেন শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রবীণ ব্যাখ্যাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। মহানির্বাণ রোডের এই বাড়ীটি অদ্ভুত এক গাম্ভীর্যে নীরব হ'য়ে রয়েছে। বড় অস্বস্তিকর গাম্ভীর্য। কয়েকজন জ্ঞান-বৃদ্ধ মানুষ—তবুও একে অপরের সঙ্গে নীরবে গাম্ভীর্যের প্রতিযোগিতা করে চলেছেন। সবাই নিশ্চুপ। কথা বললেই যেন একে অপরের থেকে ছোট হয়ে যাবেন।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে হাজির। গায়ে মুগা রঙের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি। দীর্ঘ কেশ। অটুট স্বাস্থ্য। শিশুর মত সরল চাউনি ভরা দুটি বড় চোখ। হন্তদন্ত হয়ে এসেই বললেন, 'নরেনদাকে একটু সংবাদ দিন তো যে তাঁর মুখুজ্যেমশাই এসেছে।'

সেখানে বসেছিলেন বিভূপদ কীর্তি মশাই। তিনি বললেন, 'নরেনদা বাড়ী নেই—প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরলেন বলে।'

ওঃ।

তক্তপোষে পা তুলে বসলেন আগন্তুক। তারপর কথাবার্তার মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ বিভূপদবাবুকে তিনি তুমি বলেই সম্বোধন করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রম সংশোধন করতে চাইলেন। বললেন, 'তুমিই বললাম—কিছু মনে করো না।'

প্রবীণেরা তখন নড়ে-চড়ে বসছেন। কঠিন গাম্ভীর্য আস্তে-আস্তে তরল হচ্ছে। মনে-মনে বলছেন, বাঃ বেশ লোক তো—

বিগলিত বিভূপদ উত্তর দিলেন, 'আপনি বয়সে বড়। তাছাড়া ব্রাহ্মণ। সুতরাং কী মনে করব।'

আগন্তুক হো-হো করে হেসে উঠলেন—দিলখোলা প্রাণঢালা হাসি। সে হাসির নির্মল স্রোতে সব মালিন্য ভেসে যেতে চায়।

বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ! নরেনদা তাই বলেন। অবশ্য রসিকতা করে। [illegible]

মশাই' বলে তিনি বোঝাতে চান 'মুখ্যু যে মশাই'।

বলেই আবার সেই প্রাণখোলা হাসি। গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে প্রবীণেরাও সে হাসিতে তৎক্ষণে যোগ দিয়েছেন। চমৎকার মানুষ তো!

বিভূপদ জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে আপনি...

আমার নাম নজরুল ইসলাম।

মুহূর্তে সমগ্র পরিবেশটা পাল্টে গেল। কোথায় সেই গাম্ভীর্য! কোথায় সেই প্রবীণতার খোলস! এক আশ্চর্য প্রাণ-বন্যায় সব ভেসে গেছে।

প্রাণ থাকলে গান জাগে। নজরুলের আগমনে সকল মজলিসে সেই গানেরই জলসা বসেছে!

(৪)

সিরাজগঞ্জের নাট-ভবনে অনুষ্ঠিত হল 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন'। উনিশ শো বত্রিশ সাল। মোট সম্মেলন দু দিনের—পাঁচই ও ছয়ই নভেম্বর। মূল সভাপতি কাজী নজরুল ইসলাম।

বিশাল সমাবেশ। তরুণদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ। দারুণ প্রাণ-চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার মধ্যে সম্মেলন শেষ হল।

সম্মেলন শেষে কবি এবং বিশিষ্ট সম্মানীয় অতিথিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হল। পাশেই প্রবহমান যমুনা। তীরে সুন্দর বাংলো। এই বাংলোতেই খেতে বসেছেন কবি। যমুনার উচ্ছ্বলতা বুঝি কবির মনে দোলা জাগিয়েছে। তাঁকে অত্যন্ত খুশী-খুশী দেখাচ্ছে।

খাওয়া চলছে। পরিবেশন করছেন শিরাজী ও গিয়াসউদ্দীন সাহেব।

পূর্ব বাংলা। আবার সিরাজগঞ্জ। ইলিশের জন্যে চিরবিখ্যাত। সুতরাং খাদ্য-তালিকায় ইলিশের প্রাধান্য থাকবেই। প্রথমেই দেওয়া হল ইলিশ মাছ ভাজা।

কবি একটি ভাজা মাছ শেষ করলেন।

তাঁকে আর একটি দেওয়া হল।

তিনি সেটিও শেষ করলেন।

তাঁকে যেই আর একটি দিতে গেলেন তিনি সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশককে থামালেন। থামিয়ে বললেন, আরে করছ কী, করছ কী—শেষকালে আমাকে বিড়ালে কামড়াবে যে!

খাওয়া ফেলে সকলেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। মুহূর্তে পরিবেশের মধ্যে একটি পবিত্র মাধুর্য নেমে এল।

প্রকৃতপক্ষে এই-ই নজরুল। এই সুন্দর রসজ্ঞান কবিকে যথার্থ মজলিসী করে তুলেছে।

খাওয়া শেষ। এবার দই দেওয়া হবে। শিরাজী সাহেব সকলের পাতে দই দি[illegible] চলেছেন। কবির পাতেও দেওয়া হ[illegible] সকলে দই মুখে দিয়ে একটু যেন 'কিন্তু কিন্তু' করছিলেন। কী যেন বলতে চা[illegible] ছিলেন। কবি দই মুখে দিয়ে সকলে[illegible] মনের সেই গোপন কথাকে সুন্দরভা[illegible] ব্যক্ত করলেন। শিরাজীকে উদ্দেশ্য ক[illegible] বললেন, 'কি হে—তুমি কী এ দই তে[illegible] গাছ থেকে পেড়ে আনলে?'

আবার সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ভোজন-পর্ব সমাপ্ত হয়েছে।

কবি সদলে বসে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় আলাপ করতে এলেন এক ভদ্রলোক। কবির সামনে এসে তিনি মুসলিম রীতিতে সালাম জানিয়ে বললেন, আস্সালামো আলায় কুম।

কবি তাকালেন। তাকিয়েই বললেন,—দুর্গাদাসবাবু যে। তা দুর্গাদাসবাবুর মুখে আস্সালামো আলায়কুম! ব্যাপার কী?

আগন্তুক ভদ্রলোকের ছিল সুন্দর নায়কোচিত চেহারা। তাঁকে দেখতে কিছুটা দুর্গাদাসবাবুর মতই। বাংলা নাট্যমঞ্চের বিখ্যাত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপস্থিত সকলেই ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন। ভদ্রলোক কিন্তু লজ্জায় লাল। তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললেন, আমি দাস নই—সৈয়দ। নিকটেই আমার বাড়ী।

ঐ যাঃ—আমি ভাবলুম [illegible] দুর্গাদাসবাবু এখানেও ধাওয়া করেছে!

পরিবেশটা এমনই সুন্দর হয়ে উঠেছিল যে, কবির এই চটুল রসিকতায় সকলে হেসে গড়াগড়ি।

কবির দৃষ্টিভঙ্গী এবং রুচিবোধ চিরকালই উন্নত ছিল। উন্নত এবং অনন্য।

(৫)

বর্তমান কালে, কেবল বর্তমান কালে কেন চিরকালেই, এমন কিছু লেখক থাকেন—যাঁরা ভাল লিখতে পারেন কিন্তু জনতার সঙ্গে মিশতে পারেন না। কোন মজলিসে বা আড্ডায় গিয়ে স্থাণু হয়ে পড়েন। ভীড় থেকে মুক্তি পেতেই তাঁরা ব্যস্ত। নিতান্ত পরিচিত জন ছাড়া তাঁরা মুখ খুলতে পারেন না। কিন্তু নজরুল এঁদের বিপরীত। সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজে মেতে অপরকে মাতানোর এক দুর্লভ ক্ষমতা ছিল নজরুলের। বলা চলে ঐশ্বরিক ক্ষমতা। অপরিচিত জনের সঙ্গে মিশতে তাঁর কতক্ষণ! একবার যিনি কবির

এসেছেন—আর কোন দিন কী তিনি সরে যেতে পেরেছেন।

বৈঠকী জলসায় তিনি এমন সব বার্তা বলতেন, এমন সুন্দর হাস্য-কতার অবতারণা করতেন যাতে ...টি সম্পর্কে সবাই নতুন করে ভাবতে হতেন। শুনেছি শরৎচন্দ্রের মধ্যে ...র দুর্লভ গুণ ছিল। তিনি বৈঠকী ...র ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু সভা-...তে বড় অস্বস্তি অনুভব করতেন।

...ক সেকথা।

...কবার অনেক কজন প্রগতিশীল ... একটি ছোট্ট জলসার আয়োজন করে ...শ দাওয়াৎ করেছিলেন। উদ্যোক্তা ... বেগম শামসুন্নাহার। বৈঠক বসে-...বানীপুর পুলিশ হাসপাতালের ...তলার একটি ঘরে। শ্রোতারা অধি-...ই নারী। আসর জমজমাট। কবিকে ... খুশী-খুশী মনে হচ্ছিল। এই ...সোজ্জ্বল মুহূর্তের পিছনে ছিল তাঁর ...স্বপ্নের সফলতা। নজরুল সারা জীবন ...নারী জাগরণের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। ...মুসলিম নারীরাও পর্দার বাঁধন ছিন্ন করে ...রে আসতে শুরু করেছে। সেদিন ...লসার সকল আলোচনার মূলেই ছিল ...নারী-জাগরণের কথা। সমবেত মহিলারা কবিকে নারী-জাগরণ সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ জানালেন। আর কী আশ্চর্য সকলকে অবাক করে, কবি আকবর এলাহাবাদীর 'দেওয়ান-ই-আকবর' থেকে একটি সুন্দর কবিতা সুর করে আবৃত্তি করলেন।

আবৃত্তির পর সবাই কবিকে তার অর্থ বলে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কবি বললেন, এ কবিতায় স্বামী তার বেগমকে জিজ্ঞেস করছে, 'কী বেগম—তুমি যে নেকাব (ঘোমটা) খুলে ফেলেছ?'

বেগমের উত্তর শোনার জন্যে সমবেত মহিলারা অস্থির। তাঁরা কবিকে জিজ্ঞেস করেন, বেগম কী বলল?

কবি মৃদু হেসে বললেন, তিনি তো তোমাদের মত বাংলা দেশের ভয়কাতুরে বেগম নন—দীপ্ত তেজে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ঘোমটা খুলেছি এবং সে ঘোমটা পড়েছে পুরুষের আক্কেলের উপর।

উত্তর শুনে কবির সঙ্গে সমবেত মহিলারা সকলেই হেসে কুটি-কুটি।

(৬)

রুচিবান নজরুলের বৈঠকী হাস্য-রসিকতার আরো কিছু পরিচয় নীচের আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে।

কবির গানের শিষ্যা পুষ্পলতা দে। তাঁর জন্মদিনে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন কবি, কবি-পত্নী, তাঁর শ্বাশুড়ী গিরিবালা দেবী, জাহানারা বেগম ও তাঁর মা, জসিমউদ্দীন এবং আরো অনেকে।

জন্মদিনের আসরটি সত্যিকারের একটি বৈঠকী জলসার রূপ নিয়েছে। পুরো জাগে আছেন কবি নজরুল। ছোট্ট-ছোট্ট কথায়, চটুল হাস্যরসিকতায় তিনি সারা আসর-টাকে মাতিয়ে রেখেছেন।

খেতে দেওয়া হয়েছে সবাইকে। সবার পাতে প্রথমে লুচি দিয়ে যাওয়া হল। পাতে লুচি দেখে গম্ভীর কণ্ঠে কবি বললেন, এ কী করলে?

পাশে বসেছিলেন পল্লী-কবি জসিম-উদ্দীন। কবি তাঁকেও বললেন, জসিম—তুমি লুচি খেও না।

সবাই উৎকণ্ঠিত। জসিমউদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, কেন কবিদা?

ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম এসেছিল আরব দেশ থেকে—বেলুচিস্তান পার হয়ে। সেদিকে ইঙ্গিত করে সকৌতুকে কবি বললেন, যেহেতু বে-লুচি স্থান (বেলুচি-স্থান) থেকে এসেছি—সুতরাং আমাদের লুচি খাওয়া নিষেধ।

ছোট-ছোট মাটির পাত্রে বিবিধ খাদ্য-সামগ্রী নিমন্ত্রিতদের সামনে রাখা হয়ে-ছিল। কবি এক-একটি পাত্র দেখিয়ে বলেন, এটি খুড়ি-মা, এটি মাসী-মা, এটি পিসী-মা ইত্যাদি। জসিমউদ্দীন রীতিমত কৌতুক অনুভব করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা হলে আমাদের ভাবী সাহেবা কোনটি?

কবি সঙ্গে-সঙ্গে পানীয় জলপাত্রটি ধরে উত্তর দেন, এইটি। যেহেতু আমি তাঁর পানি গ্রহণ করেছি।

খাওয়া-দাওয়া ফেলে রেখে সবাই দম-ফাটা হাসিতে ভেঙে পড়ল।

আর একটি সকরুণ রসিকতা।

কবির স্ত্রী তখন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। নিম্নের অর্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ।

কবি তখন গ্রামোফোনে কাজ করেন। একদিন বিকেলে অফিস থেকে যথারীতি বাসায় ফিরে এলেন। এসে দেখেন বিভূপদ বসে আছেন।

কবি ঘরে এসে প্রথমেই কবি-পত্নীর শিয়রে বসলেন। প্রতিদিনের মত কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বিভূপদ-বাবুর দিকে তাকিয়ে সকরুণ কণ্ঠে বললেন, 'জান বিভূপদ—তোমাদের বৌ-দি সত্যিকারের অর্ধাঙ্গিনী।'

সেদিন কবির কণ্ঠ থেকে যে কী অপরিসীম অনুরাগ আর বেদনা ঝরে পড়েছিল!

আমরা এই মানুষটির মুখ থেকে আর কোন দিন হাস্যরসিকতা শুনতে পাব না। চিরদিনের মত তিনি স্তব্ধ হয়ে গেছেন। বেঁচে থেকেও তিনি অনেক দূরের মানুষ। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!!

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

রক্তিম ঝড়

বৈশাখ যদি মৌনী তাপস তাহলে জ্যৈষ্ঠকে কি বলা যায়; সে উদ্দাম, ভয়ঙ্কর, অথচ ভয়ঙ্করের বেশে এক পরম সুন্দর। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আর জ্যৈষ্ঠ মাস কবি নজরুলের জন্মমাস। প্রাণোজ্জ্বল এক পুরুষের আবির্ভাবে বাংলাদেশ ধন্য হয়েছে। নজরুলের জীবনী রচনা করেছেন তাঁর কল্লোলের বন্ধু অচিন্ত্যকুমার, এ গ্রন্থের নাম 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়।' এ ঝড় মনোহর, ছন্দোময়।

অচিন্ত্যকুমার নজরুল প্রসঙ্গে বলেছেন—"সে প্রসন্ন প্রাণের পরিপূর্ণ প্রতীক। নজরুলের দুর্বার প্রাণশক্তি, তার সমস্ত সৃষ্টিকে প্রণোদিত করেছে। ভাষায় এনেছে তীক্ষ্ণতা, ছন্দে এনেছে জীবন-স্পন্দন, ভাবে এনেছে বল-বীর্য ওজঃ তেজের উদ্দীপ্তি।"

নজরুল যা কিছু জীর্ণ তাকে সংহার করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক, তাঁর কাছে আত্মপর নেই, ছোট বড়ো নেই। একই আসরে বসে নজরুল গাইছেন, 'এই শিকল-পরা ছল' তারপরই লালন ফকিরের গান—অধীন লালন বলে, "আমার মুখ সর্বস্ব মন-বিরাগী' কিংবা 'মুর্শিদ বিনে কি ধন আছে সংসারে'—একটার পর আরেকটা—ক্লান্তি নেই, বিরাগ নেই; তারপর হঠাৎ গেয়ে উঠলেন স্বরচিত গান—'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। এই নজরুল। কল্লোলের আসরে তিনিই ছিলেন একেশ্বর। নজরুলের আবির্ভাবে 'কল্লোল' কার্যালয়ের 'প্রাণঠাসা একমুঠো ঘর' যেন অকস্মাৎ এক নতুন প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠত।

নজরুলের প্রথমতম সম্বর্ধনার এক বিবরণ লেখক দিয়েছেন। কল্লোলের বন্ধুদের আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বক্তৃতা দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র; তিনি বলেছিলেন—অনেক শুনেছি জাতীয় গান কিন্তু নজরুলের দুর্গম গিরি কান্তার-মরুর মত প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনিনি।

এ হোল নজরুল যখন বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন সেদিনের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ জ্বালানোর আগে আছে সকাল বেলার সলতে পাকানোর প্রস্তুতি। নজরুলকে তাই মাজার মসজিদে খিদমত করতে হয়েছে। গার্ডসাহেব তাকে চাকরী দিয়েছেন। কি কাজ করতে হবে— না শুধু গান শোনাবে। সেই গার্ডসাহেবই বলেছিলেন, গান কখনো ছেড়ো না।

এরপর সেই আসানসোলের রুটির দোকানের কাজ নজরুলের। পাঁচ টাকা মাইনে। কিন্তু নজরুলের গানই তাঁকে নতুন পথে নিয়ে যায়। সাইকেল চড়ে দারোগা সাহেব এসে বললেন—চলো লেখাপড়া শিখতে হবে, লেখাপড়া না শিখলে বড় কবি হবে কি করে?

দারোগা রফিজুল্লা সাহেব নজরুলকে নিয়ে গেলেন তাঁর দেশে ময়মনসিংহে, সেখানে দরিরাম স্কুলের সপ্তমশ্রেণীতে ভর্তি হলেন নজরুল। তারপর নজরুল একদিন রফিজুল্লার আশ্রয় ছেড়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন। রাণীগঞ্জে ফিরে এসে শিয়ারশোল রাজ স্কুলে থার্ড ক্লাসে ফার্স্ট ছেলের মত ভর্তি হলেন। সে ভালো ছাত্র, মাইনে দিতে হয় না, শুধু তাই নয়, শিয়ারশোলের রাজা সাত টাকা বৃত্তিও দেবার ব্যবস্থা করলেন। সেই বৃত্তির টাকা ঘরে এসে ম্লানমুখ ছোটভাইকে দেখে তার হাতে দিয়ে দিলেন নজরুল। দশম শ্রেণীতে উঠলেন, আর একটু, গেলেই ম্যাট্রিক, এমন সময় লাগল প্রথম মহাযুদ্ধ। শৈলজানন্দ ছিলেন নজরুলের সহপাঠী দুজনে পরামর্শ করে যুদ্ধে যোগদানের ব্যবস্থা করলেন। শৈলজানন্দ আনফিট হলেন তাঁর আত্মীয়ের কারসাজিতে, নজরুল চলে গেলেন একা। এইখানে ফার্সীটা দুরস্ত করে নিলেন এক মৌলভীর কাছে।" তিনি রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ অনুবাদ করেছে সেই নজরুল ফিরে এলেন কলকা ইতিমধ্যে তাঁর 'সবুজপত্রে' পাঠানো কবি প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসীতে। নজরু রিকশা চড়ে একেবারে শৈলজানন্দের মেসে এসে উঠলেন। ইতিমধ্যেই মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল সেই-খানেই গেলেন দুই বন্ধুতে।

যুদ্ধের ফেরৎ বলে নজরুল একটা সাব রেজিস্ট্রারের চাকরীও পেয়েছিলেন, কিন্তু সব ছেড়ে মুজফফর আহমেদ প্রভৃতির পরামর্শে পুরোপুরি সাহিত্যে মন দিলেন। বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের মুসলমান সাহিত্য সমাজের অফিসে অনেক পুরাতন বন্ধু আসতেন, আসতেন গোপীনাথ, বিউগিল মাস্টার। তিনিই বার বার আক্ষেপ করতেন, এমন গান, গ্রামোফোনের রেকর্ড হয় না? গোপীর আশা পূর্ণ হয়েছিল, নজরুলের নিজের কণ্ঠে এবং পরের কণ্ঠে নজরুলের কত গানই ত রেকর্ড হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরে আর কোনো বাঙালী কবির এত গানের রেকর্ড হয়নি।

এই নজরুল কলকাতায় সাহিত্যিক সমাজকে জয় করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বললেন—শাতিল-আরব আমার ভালো লেগেছে কি, স্বয়ং গুরুদেবের ভালো লেগেছে—রবীন্দ্রনাথও নতুন কবিকে বরণ করলেন।

কিন্তু নজরুল, এক জায়গায় একভাবে বসে থাকার মানুষ নন। অসহযোগ আন্দোলনের মুখে তিনি কুমিল্লায় হরতালের আবেদনে গান রচনা করলেন, পথে পথে গান করলেন।

মুজফফর আহমেদ বললেন—কি করবেন? স্রেফ সাহিত্য না রাজনীতি??

সেদিন নজরুল বলেছিলেন—'আমি সৈনিক-সাহিত্যিক। আমি রাজনীতিকে সাহিত্যায়িত করব—'

এরপর ফজলুল হক সাহেবের সহযোগিতায় দুজনে মিলে খবরের কাগজ বার করলেন 'নবযুগ'। হক সাহেবের বাসনা ছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে লেখাবার, কিন্তু মুজফফর বলেন—নজরুল লিখবে। একরকম জোর করেই সাংবাদিকতায় টানলেন মজফফর আহমেদ সাহেব নজরুলকে। এই 'নবযুগে' নজরুলের সম্পাদকীয় এক নতুন ইতিহাস রচনা করল। ফলে নবযুগের জমানত বাজেয়াপ্ত হল।

এরপর আলি আকবর আর তাঁর ভাগ্নী নারগিসের পর্ব। আলি আকবরের বাসনা ছিল নারগিসের সঙ্গে নজরুলের বিবাহ দেবেন। কিন্তু বিবাহটা পাকাপাকি হল না। নজরুলকে সেদিন অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ফকিরের আশীর্বাদে জন্মেছেন, নজরুল জন্মেছেন তারাপীঠের আশীর্বাদে, তাই তাঁর নাম তারাক্ষেপা। দুজনে আত্মীয়। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদকে যখন পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পড়ে শুনিয়েছিলেন নজরুল তখন বৃদ্ধ ক্ষীরোদপ্রসাদ আশীর্বাদ করেছিলেন—'তুমিই হিন্দু-মুসলমানকে বোঝাতে পারবে। তুমি এই অসাধ্য সাধন করবার জন্য জন্মেছ এই বাংলা দেশে।'

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা নজরুলের মুখে শুনে বললেন—'তুমি আমাকে নিশ্চয় অতিক্রম করে যাবে। তোমার কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। আশীর্বাদ করি তোমার কবি-প্রতিভায় বিশ্বজগত আলোকিত হোক।' নজরুল প্রণাম করলেন গুরুদেবকে।

এরপর লিখেছেন বাসন্তী দেবীর আহ্বানে 'বাংলার কথায়—' 'কারার ঐ লৌহ কপাট—'।

এরপর প্রকাশিত হল 'ধূমকেতু'। হাফিজ মাসুদ আহম্মদ নামক এক বন্ধু আড়াই শো টাকা সংগ্রহ করে পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকাকে আশীর্বাদ করলেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বারীন ঘোষ আর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'জাগিয়ে দেরে চমক মেরে, আছে যারা অর্ধচেতন।' ১৯২২-এর বারই আগস্ট তারিখে 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশ। রুশ বিপ্লবের সংবাদ তখন এদেশে এসেছে। এদেশের তরুণ সমাজের মুখপত্র ধূমকেতু। নজরুল ইসলাম সেদিন লিখে গেছেন—

'সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কারণ ও কথাটার মানে এক একজন মহারথী এক একরকম করে থাকেন...'

নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল কুমিল্লায়। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নজরুল বললেন—আমার ভয় নেই, দুঃখ নেই, কারণ ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন।

সে যাত্রা এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল নজরুলের। নজরুলকে হুগলী জেলে পাঠানো হল, তিনি অনশন করলেন। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করলেন—'অনশন ত্যাগ করো, তোমায় সাহিত্য তোমাকে দাবী করে—'

সে টেলিগ্রাম পেলেন না নজরুল, শাসকের কারসাজিতে।

এই আমাদের নজরুল ইসলাম। 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' নামক গ্রন্থটিতে অচিন্ত্যকুমার প্রাণ ঢেলে তাঁর বন্ধুর কথা বলেছেন। কোনো তথ্য বাদ নেই, অথচ সব কথাই বলা হয়েছে কাহিনীর আঙ্গিকে। এক মহাকবির জীবন ও কর্মের বিস্ময়কর ইতিহাস। যেন একটি পরমাশ্চর্য বিয়োগান্ত নাটক। নজরুল আজও আছেন, কিন্তু নেই। আজ তিনি সমাধিমগ্ন। নজরুলের কঠোর তপশ্চর্যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থশেষে লেখক নজরুলকে নিবেদিত এক সুদীর্ঘ কবিতায় বলেছেন—

'তুমি জাগ্রত, তুমি উত্থিত, তুমি
স্বাদে-বোধে পরিপূর্ণ
তুমি দেখেছ সর্বময় সত্যবস্তুকে
বলো, ঘোষণা করো—
আমরা, অকিঞ্চনের দল, আমরা
সবাই সত্যবস্তু।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' বাংলা জীবনী-সাহিত্যে এক সার্থক সংযোজন।

—অভয়ঙ্কর

জ্যৈষ্ঠের ঝড় (সচিত্র নজরুল জীবনী)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা মাত্র।।

সাহিত্যের খবর

একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা।। 'সম্প্রদায়' গোষ্ঠীর পরিচালনায় একটি সারা বাংলা সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয়—(ক) কবিতা—যে কোন বিষয়ে; (খ) ছোট গল্প—যে কোন বিষয়ে; (গ) প্রবন্ধ—বর্তমান গ্রাম বাংলার দুরবস্থা এবং তার প্রতিকারের বাস্তব উপায়; (ঘ) আবৃত্তি—জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোন মূল্য লাগবে না। যোগাযোগের ঠিকানা—'স্বরূপ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা' (৩য় বর্ষ), গুসকরা, বর্ধমান।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস জন্মশতবর্ষ প্রকাশন কমিটি : আগামী ৫ নভেম্বর চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হবে। সেই উপলক্ষে একটি প্রকাশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি শ্রীবসন্তকুমার দাস এবং সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার প্রামাণিক। শতবর্ষ প্রকাশক কমিটি দেশবন্ধুর জীবনী, তাঁর ভাষণ এবং রচনাবলী এবং সমকালীন ব্যক্তিদের অভিমত সহ তিনটি বই প্রকাশ করবেন।

একটি সম্বর্ধনা সভা ।। শিশু সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য এবার সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। তিনি সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের সভাপতি। গত ৭ মে সন্ধ্যায় কলকাতায় কলামন্দিরে উক্ত সম্মেলনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ওড়িশার বিশিষ্ট কবি শ্রীশচী রাউতরায়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন—'মৌচাক সমিতিকে ধন্যবাদ যে আবার তাঁরা সতীকান্ত গুহকে প্রকাশ্যভাবে সাহিত্যের আসরে হাজির করেছেন। এক সময়ে রংমশাল পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি।'

প্রধান অতিথি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'সতীকান্ত গুহের লেখা আগে যেমন ভাল লাগত, এখনও তেমনি ভাল লাগে। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে, তা পড়ার সময় আমার শৈশব মনে পড়ে যায়। ৭২ বৎসর বয়সেও আমি আমার শৈশবে ফিরে আসি।'

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বলেন—'সতীকান্ত গুহকে আমার ভাবুক মানুষ বলে মনে হয়েছে। আমরা আশা করবো, যে কাজ তিনি আরম্ভ করেছেন, তা আরো ভালভাবে করবেন।' শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন যে, শিশুদের তিনি ভালবাসেন। তাদের জন্যই তিনি সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সম্মেলনের পক্ষ থেকে মানপত্রটি তাঁকে প্রদান করেন। তিনি বলেন—'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের কথা

আমরাল্যান্ড-ই ভাবতে পারিনি। তিনি সভাপতি হিসেবে তা সম্পন্ন করেছেন। এটা তাঁর পরিচয়ের একটা দিক। তিনি শিশু সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা—এটা তাঁর চরিত্রের দ্বিতীয় দিক।'

শ্রীগুহের বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে সর্বশ্রী শিবরাম চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, আশিস সান্যাল, শ্যাম সিংহ, সামসুজ্জমান প্রমুখও ভাষণ দেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীশচী রাউতরায় বলেন—"তাঁর ইংরেজি কবিতা আমি আগেই পড়েছি। বাংলায় পড়েছি কয়েকটি বই। 'খেয়ার মাঝি লক্ষ্মীনাথ' আমাকে মুগ্ধ করেছে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমতী মুন্না গুহঠাকুরতার পরিচালনায় 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার'র কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। পরে শ্রীগুহের দুটি কবিতা ইংরেজি ও বাংলায় আবৃত্তি করেন যথাক্রমে শ্রীমতী ঈপ্সিতা চক্রবর্তী ও শ্রীঅশোক মিত্র। এ ছাড়াও শ্রীগুহের লেখা 'নতুন দিনের রূপকথা' নাটকটি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

নতুন বই

নজরুল পরিক্রমা—আবদুল আজীজ আল আমান। হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২। দাম পনের টাকা।

কবি নজরুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাব রয়েছে আজো। তাছাড়া নজরুলের সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। নজরুল দীর্ঘদিন এক জায়গায় কাটাননি কখনও। বিক্ষিপ্ত জীবনের ঘটনার স্মৃতিও ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। জীবনীকারের কঠোর পরিশ্রমেই সেই উপাদান সংগ্রহ সম্ভব। কবির নিকট সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন যাঁরা—তাঁদের কারো কারো স্মৃতিকথা বেরিয়েছে। এখনও যাঁরা আমাদের মধ্যে বর্তমান অবিলম্বে তাঁদের দেখা কাছের মানুষ নজরুলের পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'নজরুল পরিক্রমার' প্রথম খণ্ডটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে নজরুল জীবনী এবং তৃতীয় খণ্ডে নজরুল সাহিত্য। বর্তমান খণ্ডের দুটি অংশ নজরুল যুগ এবং নজরুল রচনার উৎস। কবিজীবনের বহু অজনা তথ্যে সমৃদ্ধ খণ্ডটিতে 'বেতারে নজরুল', 'সংগীতকার নজরুল', 'মোহিত-লাল, সজনীকান্ত নজরুল বিরোধ', 'নির্বাচন প্রার্থী নজরুলের' পরিচয় স্পষ্ট করে তুলেছে। নজরুলের সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির রূপরেখাটি এসেছে স্বাভাবিকভাবে। রবীন্দ্রনাথ, শনিবারের চিঠি, আব্বাসউদ্দীন, সুরেশ চক্রবর্তী, মন্মথ রায়, জসীমউদ্দীন, মুজাফফর আহম্মদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আরো অনেকের সান্নিধ্যে নজরুল চরিত্রের এবং সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার।

গ্রন্থকার কবির জীবন ও সাহিত্যকৃতির যে বিস্তৃত গবেষণা করছেন, তার জন্য সকল বাঙালীই তাঁকে সাধুবাদ জানাবেন।

পদক্ষেপের ছন্দ (কাব্যগ্রন্থ)—শ্যামসুন্দর দে। নবজাতক প্রকাশন। ৬ এ্যান্টনীবাগান লেন, কলি-৯। দাম—তিন টাকা।

সৎ কবি কখনো সামাজিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করতে পারেন না। বিশেষত এখন এমন একটা সময় যখন জীবনের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মানুষের জীবন-সত্তায় নাড়া লেগেছে।

কবি শ্যামসুন্দর দে'র পদক্ষেপের ছন্দ মানুষের পথ চলার গান। ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'আমাদের সারাটা জীবনই পথ চলা। আমার পদক্ষেপের ছন্দ সেই পথ পরিক্রমারই সঞ্চয়।'

আজ চারদিকে দুনিয়া বদলের যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে এ পথ সেই পথ। যে পথে পৃথিবীর ইতিহাস লিখেছে জীবন, সেই জীবনের চারদিকে অন্যায় শোষণ—শোষিত মানুষের পুঞ্জীভূত ক্রোধ। কবি এই শোষণ নিপীড়নের মধ্যে দেখেছেন দিন বদলের পূর্বাভাষ। তাই আর্তকামনা—'ফিরে পেতে চাই পৃথিবীতে ফুলের সকাল।' সাম্প্রতিক নানা বিষয় তাঁর কবিতার উপকরণ। প্রতিটি কবিতায় 'সূর্য তোরণ-দ্বার' খুলবার আকুলতা—তার জন্যে সংগ্রামে আহ্বান। আশা রাখি কবি ভবিষ্যতে জীবনের ভেতরে দাঁড়িয়ে আরো গভীর কথা আমাদের শোনাতে পারবেন।

গোয়েন্দা পানু (কিশোর উপন্যাস)—সুমন্ত সোম। আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ৪০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯। দাম ১-৭৫।

গোয়েন্দা পানু কিশোরদের উপযোগী একটি রহস্য কাহিনী। তবে সচরাচর চোখে পড়া কোন রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুলিশ গোয়েন্দা নিয়ে এর কাহিনী আবর্তিত নয়। পানু নামে একটি পনেরো-ষোল বছরের ছেলে এই কাহিনীর নায়ক। সে আর তার মাসতুতো ভাই পিন্টু কিভাবে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে থেকে চলের চোরাকারবারের ঘাঁটি আবিষ্কার করেছিল এবং কিভাবে সমাজদ্রোহীরা এই দুই কিশোরের সহায়তায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী এই 'গোয়েন্দা পানু'। কাহিনী গ্রন্থখানি নানা ত্রুটি আছে, তা সত্ত্বেও যাদের জন্যে লেখা তারা বইটি পড়ে আনন্দ পাবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

নিম সাহিত্য (৪র্থ সংকলন)—সম্পাদক সুধাংশু সেন ও বিমান চট্টোপাধ্যায়। ৩এ।৪৯ রামকৃষ্ণ এভিনিউ (এক্সটেনশন), দুর্গাপুর ৪। দাম ২০ পয়সা।

পত্রিকাটি গত চার পক্ষ ধরে বেরিয়ে আসছে নিয়মিত। অদ্ভুত ধরনের চটকদার লেখায় আকর্ষণীয়। এ সংখ্যায় লিখেছেন সুকৃতি বকসী, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, মৃগাঙ্ক বণিক, অজয় নন্দী-মজুমদার, সুধাংশু সেন, ক্ষিতীশ দেব-সিকদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ আইন।

কল্পবাণী (পৌষ-চৈত্র ১৩৭৬)—সম্পাদিকা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২, ভেলি-পাড়া লেন, কলকাতা-৪। দাম এক টাকা।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গশোভনতায় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেও পত্রিকাটির সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গী এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য লেখা 'তিন সঙ্গীর ল্যাবরেটরী' প্রসঙ্গে লিখেছেন গৌতম গুপ্ত। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরা মিত্র, বাঁধন সেনগুপ্ত, বাণীকুমার ও আরো কয়েকজন।

দুই বাংলার কবিতা (বিশেষ সংকলন)—সম্পাদক অঞ্জন সেন। পি-২৩৯ লেক রোড, কলকাতা-২৯। দামঃ পঞ্চাশ পয়সা।

'আমরা' পত্রিকার বিশেষ কবিতা সংকলনটি বেরিয়েছে 'দুই বাংলার কবিতা' নামে। এ সংখ্যার লিখেছেন অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সামসুর রহমান, আল মাহমুদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আবদুল হাসান, আবদুল্লা আবু সায়ীদ, নাসিমুন আরা মিনু, কাইয়ুম চৌধুরী, রত্নেশ্বর হাজরা, দেবারতি মিত্র, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে পূর্ববাংলার কবি-কণ্ঠের সম্মিলিত উচ্চারণে পত্রিকাটি পাঠকের ভাবাবেগকে স্পর্শ করে।

নববর্ষের সাহিত্য সভা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নববর্ষের সাহিত্যসভায় ভাষণ দিচ্ছেন তুষারকান্তি ঘোষ।

ফটো : অমৃত

আজকের এই আনন্দ অনুষ্ঠানে সর্বাগ্রে প্রণতি জানাই কবিগুরুকে। গতকাল গেছে ২৫ বৈশাখ। আজও সারা মহানগরী এবং সারা অখণ্ড বঙ্গদেশ অর্থাৎ রাজনৈতিক বিপর্যয়ে দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গের উভয়বঙ্গ মহাকবির স্মরণোৎসবে ও পূজোয় নিমগ্ন রয়েছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে তারই অঙ্গ বলে মনে করাই উচিত। মহাকবির জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে বর্তমান কালের স্মরণীয় ও বরণীয় সাহিত্য-স্রষ্টা যাঁরা তাঁদের আমরা অভিনন্দিত করে থাকি। এক্ষেত্রে এই প্রশংসনীয় কর্মের সকল প্রশংসা এবং কবিপূজোর সকল পুণ্য বাংলার সংবাদপত্রগুলিরই একান্তভাবে প্রাপ্য। বাংলা সাহিত্য বাংলার সংবাদপত্র জগতের পরিচালক ও সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে যে সেবা পেয়ে এসেছেন তা ইতিমধ্যেই অবিস্মরণীয় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলির পুজো-সংখ্যাগুলির প্রেরণা বা তাগিদেই ইদানীং কালের বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্য তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। তারপর তাঁরা উদ্যোগী হয়ে যখন এই সকল স্মরণীয় লেখকদের অভিনন্দিত করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মত সাহিত্য-সেবীদের কণ্ঠে স্বতঃই উচ্চারিত হয়—আপনাদের জয় হোক।

এইখানে আমি স্মরণ করছি এই অনুষ্ঠান ও এই ব্যবস্থার প্রধান প্রবর্তক ও প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়কে, আমাদের আনন্দময় অকম্পিত ধীর স্থির পুরুষ সুধীরদাকে।

বৈশাখে একটি নববর্ষের আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন সুধীরদা। সেই অনুষ্ঠানে এক বৎসর শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়মহাশয় বাংলা সংবাদ-পত্রের কর্তৃপক্ষকে আহবান জানান—বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচিত করে তাঁদের মাল্যচন্দনে ও তার সঙ্গে কিছু সম্মানী দাক্ষিণা দিয়ে তাঁদের অভি-নন্দিত করার জন্য। তখন সবে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং আকাদেমী পুরস্কার সরকার প্রবর্তিত করেছেন। কিন্তু তাতে সুবিচার ঠিক হচ্ছে না। বাংলাদেশে সভা-সমিতিতে মাল্যদানের প্রথা পুরাতন কিন্তু মাল্যগুলি সে কালের সেই রাজকণ্ঠের মাল্যও নয়। এবং তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার মত কোন উপাদান ছিল না। নানান অসন্তোষও সেকালে সৃষ্টি হয়েছিল সরকারী পুরস্কার নির্বাচন প্রথা নিয়ে। সুতরাং শ্রদ্ধেয় রায়মহাশয়ের এই প্রস্তাব শুধু সময়োপযোগীই, নয়, বাংলা সাহিত্যিকদের দুঃখ-দারিদ্র্য বরণের যে একটি মহৎ ইতিহাস রয়েছে—যা' মহা-কবি মাইকেল মধুসূদনের অভাব, হাস-পাতালে শেষশয্যা পাতা থেকে কবি হেমচন্দ্রের শেষজীবনের দুঃখ থেকে, সেদিনের সেই সদ্য স্বাধীন দেশে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারমহাশয়ের অভাবের মধ্যে পরলোকগমনের কথা পর্যন্ত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন সঙ্গে সঙ্গেই অমৃতবাজার, আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ চারটি পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। তার সঙ্গে 'উল্টোরথ'—যা শুধু গল্পের এবং সিনেমার সংবাদের বাহক, তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন—কবিতার জন্য পুরস্কার। শ্রদ্ধেয় সুধীরদা মৌচাকের তরফ থেকে বৎসরের সেরা শিশুসাহিত্যিককে অভি-নন্দন দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন। সারা বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা এবং সাহিত্যরসিকেরা সকলেই আনন্দিত হয়ে-ছিলেন এবং যদি এ কল্পনাও করি যে—জননী বঙ্গ-সাহিত্য-সরস্বতীর মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ চকিত দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে-ছিল—তা হলে তা নিতান্ত মিথ্যা বলা হবে না। তার আগে অবশ্য সর্বপ্রথম সাহিত্যিক-সম্মান এবং শ্রেষ্ঠ-সম্মান বাংলায় পুরুষ-সিংহ স্যার আশুতোষ প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর মায়ের নামে জগত্তারিণীপদক। জগত্তারিণী পদক প্রথম পুরস্কার এবং তার প্রাপক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। [illegible]

প্রবর্তিত হয়েছিল শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করেন এটি। কিন্তু এই পুরস্কার ঘোষণা নবতর উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল সেদিন।

তারপর থেকেই নিয়মিতভাবে এই বৈশাখ মাসে এমনি একটি প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই সাহিত্যিক সমাদর উৎসব চলে আসছে। এ বৎসব যাঁরা প্রাপক, যাঁদের কন্ঠে ও ললাটে মাল্য-চন্দন তিলকসহ সমাদরের কথঞ্চিৎ নিদর্শন অর্পণ করছি—তাঁদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ এবং নবীন উভয় প্রান্তেরই কীর্তিমান জন রয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ, পরিমল গোস্বামী নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবক এবং স্মরণীয় কীর্তির কীর্তিমান সাহিত্যসেবক। তাঁরা আমাপেক্ষাও বয়সে প্রবীণ, তাঁদের প্রণাম জানাই।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনও কীর্তিমান জন। বিদগ্ধজনের আসরেও তিনি উজ্জ্বল ব্যক্তি। আমার প্রীতি ও নমস্কার নিবেদন করি। শ্রীমান গৌরকিশোর আমার অনুজ-তুল্য প্রিয়জন। সাহিত্যক্ষেত্রে তার বৃদ্ধি ও প্রসার গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছি। আশীর্বাদ করি গৌরের কলম যেন সোনার দোত-কলমের কলম না হয়ে শক্ত এবং নির্ভীক কলম হয়।

শ্রীযুক্ত তরুণ সান্যাল পরিচয়ের সম্পাদক, ইতিমধ্যেই কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠার সোপানে আরোহণ করছেন ক্রমান্বয়ে। তাঁকে নমস্কার ও অগ্রজের অধিকারে প্রীতিপূর্ণ স্নেহ-সম্ভাষণ জানাই।

মৌচাক পুরস্কার প্রাপক সতীকান্ত গুহ মহাশয়কে প্রীতি অভিনন্দন জানাই। তাঁর শিশুপাঠ্য রচনার মধ্যে আমার শৈশবকে আমি ফিরে পাই। তাঁর কবিযশের কথাও আমরা সকলেই জানি। তাঁকে নমস্কার জানাই।

সর্বশেষে এই প্রাপক-জনদের দীর্ঘ আয়ু এবং আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করি, আপনাদের কৃতিত্বে এবং সেবায় আরও দীর্ঘকাল বঙ্গসরস্বতী পরিতৃপ্ত হোন। এবং আমরা গৌড়জন আনন্দে আপনাদের সৃষ্ট পুষ্পের মধুপানে পরিতৃপ্ত হই।

আরও কয়েকটি কথা আছে, নিবেদন করব দেশবাসীর কাছে। প্রথম সরকারের কাছে, দ্বিতীয়ত প্রকাশকদের কাছে। বঙ্গ-ভাষার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকে সম্মানিত করবার জন্য সরকার যা করে এসেছেন, তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলেই আমার মনে হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের নামে তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। একটি সাহিত্যে একটি বিজ্ঞানে প্রতিটির মূল্য ৫০০০ এবং বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থের জন্য, তৃতীয়টি ইংরাজী ভাষায়
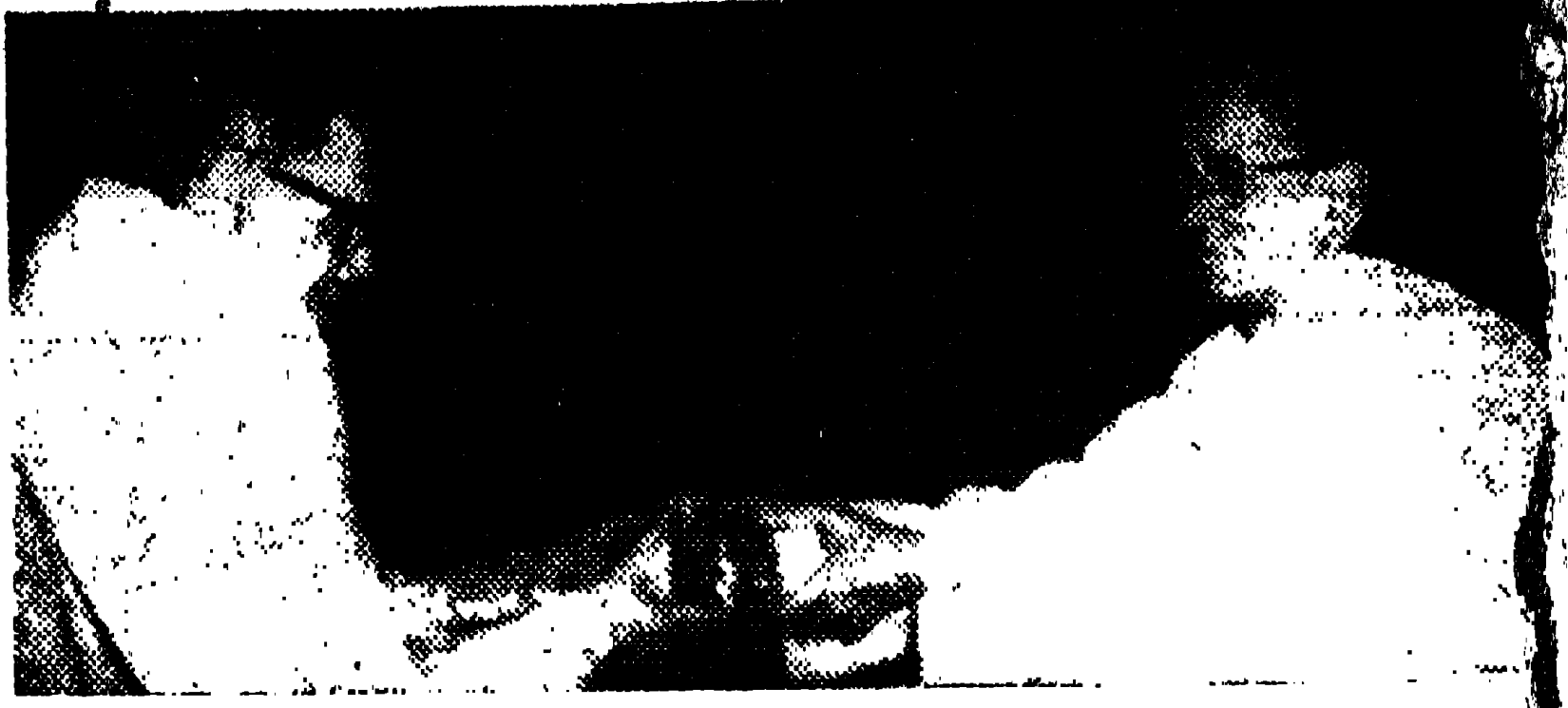
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন পরিমল গোস্বামী, সতীকান্ত গুহ, তরুণ সান্যাল এবং গৌরকিশোর ঘোষ। ফটো : অমৃত

লিখিত পুস্তকের জন্য। তারপর ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমী বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থের জন্য আর একটি পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। তারপর এই ছটি পুরস্কার। কিন্তু আমরা অনুভব করি আরও পুরস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে।

বাংলার প্রাদেশিক সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেব তিনটি অবিস্মরণীয় বরেণ্য নাম।

প্রথম নাম—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
দ্বিতীয় নাম—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
তৃতীয় নাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অর্থ হোক পদক হোক এ'দের পুণ্য-স্মরণীয় নামকে আশ্রয় করে বাংলা সরকারের কিছু করার প্রয়োজন—যেন পিতৃ-মাতৃ নামকে স্মরণীয় করার মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

তারপর বাংলার পুস্তক-প্রকাশকদের প্রত্যেক জনের কাছে এবং সমবেত প্রকাশক-মন্ডলীর কাছে, বাংলার সাহিত্য-রথী—যাঁরা বিগত হয়েছেন এবং যাঁরা রয়েছেন, যাঁরা আসছেন, আসবেন তাঁদের জন্য নিবেদন জানিয়ে বলব,—আপনারাও কিছু করুন।

বাংলার নাট্যজগতের কাছে শেষ নিবেদন।

মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশচন্দ্র ঘোষ—এই নাম তিনটি আজও দানপুণ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। বাংলার নাট্যসাহিত্যও আজও অনাদৃত। কেন্দ্রের

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রবোধচন্দ্র সেন

সঙ্গীত নাটক আকাদেমি এক্ষেত্রে যা করে থাকেন অর্থাৎ বাংলার নাট্য-সাহিত্যকে যেভাবে পাশ কাটিয়ে যান তাতে বাঙালী মাত্রেই দুঃখিত হন বলে মনে করি। এমন ক্ষেত্রে বৎসর বৎসর প্রত্যেকটি থিয়েটার যদি এক-একটি সম্মিলিত অভিনয় করে তারই অর্থে বাংলার নাট্যকারকে—ওই তিনজনের নামে সম্মানিত করেন তা হলে বাংলার রঙ্গমঞ্চ তার সেই ঐতিহ্য রক্ষা করবে যে ঐতিহ্যের ধারায় বাংলার নাট্যশালা বহু চ্যারিটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে অনেক মহৎ কর্ম করেছেন।

আমার সাল সন তারিখ মনে নেই, কিন্তু মনে রয়েছে সেকালের কলকাতার দেওয়ালে পোস্টার পড়েছে—বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সেবার জন্য সাহায্য-রজনী। দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চ অনেক করেছেন। নাট্যকার ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্মান-রজনীর কথাও মনে আছে অনেকের। কিন্তু নিয়মিতভাবে এক-একজন নাট্যকারকে সম্মানিত করার কথা হয়তো তাঁদের মনে হয় নি; সেই কারণেই আমি কথাটা মনে পড়াবার জন্যই উত্থাপন করলাম আজ।

ভিক্ষা প্রার্থনা করেই আমি বক্তব্য শেষ করছি না—আপনাদের সকলকে প্রীতি-নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি। শেষ বাক্য উচ্চারণ করি—বাংলা সাহিত্যের জয় হোক।

সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে ঃ পরিমল গোস্বামী, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন ও সতীকান্ত গুহ। পিছনে দাঁড়িয়ে অন্নদা শঙ্কর (বামে) ও গৌরকিশোর ঘোষ।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

বোরখা গায়ে জোটন চলে যাচ্ছিল। এই অঞ্চলের সকলে দেখল, আবেদালির দিদি জোটন ফের চলে যাচ্ছে। কবে আবার সন্তান-সন্ততি প্রসব করে ফিরে আসবে, কবে আবেদালি ফের ওর দখিনদুয়ারি ঘরটা তুলে দিতে দিতে বচসা করবে জোটনের সঙ্গে, তা যেন সকলের জানা। হিন্দুপাড়ায় মেয়েরা এই ঘটনায় খিল-খিল করে হেসে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। দীনবন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ খবর পেয়ে ড্যাফল গাছটার নিচে ছুটে এসেছে। মালতি ঝোপের ভিতর বেথুনে ফল খুঁজছিল, সে জোটনকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, বৌদি দেইখা যান কান্ড। জুটি একটা ফকিরের লগে কই যাইতাছে গিয়া। ঠাকুরবাড়ির বৌরা পর্যন্ত পুকুর পারে এসে দাঁড়াল। হাতে মুশকিলাশান, বগলে কোরবানির গোস্ত এবং গলায় মালা তাবিজ—ফকিরসাব উপরের দিকে চেয়ে চেয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। গায়ে শতছিন্ন আলখেল্লা এবং কাঁথায় সেলাইর মত সেলাই সেখানে। যেখানে যে কাপড়টুকু পাওয়া গেছে তাই জুড়ে দিয়েছেন ফকিরসাব। ঠিক এই আল্লার দুনিয়ার মতো—যেখানে যা পাওয়া গেছে এই দুনিয়ার জন্য তিনি হাজির করেছেন। এই মাঠ, গাছপালা পাখি এবং নদীর তীর, তরমুজ খেত সবই যেন এক শতছিন্ন সেলাই করা জোব্বা। বিচিত্র দোস মাটি এবং জলের রং-এ দুনিয়া রাঙিয়ে রেখেছেন। তিনি এবার চোখ তুলে দেখতে পেলেন পিছনে জোটন বিবি—বোরখা পরে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার তবু এই চেনা পথটুকু বোরখা পরে না হলে সম্মান থাকে না। তিনি তাকে জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে বললেন।

জোটন বোরখার ভিতর পেতলের বদনা রেখে জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করছে। এই গ্রাম মাঠ ফেলে সে চলে যাচ্ছে, নরেন দাসের বিধবা বোন মালতিকে এখন কিছু বলার ইচ্ছা। মালতির হাঁসগুলি প্যাঁক প্যাঁক করছিল মাঠে। পুরুষ হাঁসটার জন্য মালতির বড় কষ্ট। মালতির শরীর আর আল্লার মাশুল তুলবে না ভেবে জোটনেরও ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল।

মাঠ ভেঙে কখনও নদী-নালা অতিক্রম করে অথবা বাঁশের সাঁকোতে ওঠার সময় ফকির সাব জোটনের হাত ধরে পার করে দিচ্ছিল। তিনি সওদা করে ফিরছেন। হাতে পানি ফলের মত মুশকিলাশানের লম্ফ, তিনদিকে তিনমুখ, কাজল জমানো গর্তে ছোট একটা কাঠি। চার ক্রোশের মতো পথ। জ্যৈষ্ঠ মাস বলে নদীতে জল বাড়তে সুরু করেছে। ফকিরসাব জোটনকে একটা পলাশ গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে সামনের হাটে সওদা করতে গেলেন। নতুন মেমান,, ঘর আলো করে রাখবে। দূরবর্তী কোন দরগার পাশে ফকিরসাবের ছই দেয়া ছোট মাচানের ঘর। সাজ লাগলে দরগার কবরে কত মোমবাতির আলো, আলোতে খানিক সময় ঝোপ-জঙ্গল শাদা হয়ে থাকে। তখন তিনি কালো রঙের আলখেল্লা পরে মুশকিলাশানের লম্ফ জেবলে অন্ধকার মাঠ ভেঙে গেরস্থ বাড়ির উঠোনে উঠে যান। মোটা গলায় হেঁকে ওঠেন মাঠ থেকে। গভীর রাতে মানুষেরা ভয় পায়—মুশকিলাশান আসান করে বলতে বলতে উঠে আসেন। জবা ফুলের মতো চোখ লাল। রসুন গোটার তেল চোখে মেখে চোখ জবা ফুলের মত করে না রাখলে—মানুষ রাতে ভয় পায় না, পয়সা দেয় না। তখন ফকিরসাবের মাচানে ফেরার স্পৃহা আর থাকে না। অন্ধকারের ভিতর, বিচিত্র সব ঘাসের ভিতর অথবা জমির আলে আলে এক ভয়ংকর রহস্য জেগে থাকে। মনে হয় তাঁর এইসব অলৌকিক রহস্যের ভিতর আল্লা কোথাও না কোথাও অদৃশ্য হয়ে আছেন।

বাজার করে ফিরতে বেশিক্ষণ সময় নিলেন না ফকিরসাব। হাট পার হলে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। পলাশগাছের নিচে এসে শুধোলেন, যাইবেন নাকি একবার বাবা লোকনাথের কাছে।

জোটন বোরখার ভিতর থেকে বলল, তবে চাইর পয়সার মিসরি কিনা লন।

কিন্তু ফকিরসাব যেন সহসা মনে করার মত বললেন, কোরবানির গোস্ত নিয়া যামু কি কইরা বাবার কাছে। তার চাইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে বাবার উৎসবে আমুনে আপনেরে নিয়া। সুতরাং আর দেরি করা ভাল নয়। বেলাবেলিতে পৌঁছাতে পারলে হয়। আরও ক্রোশখানিক পথ। ওরা জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করল।

ফকিরসাব বললেন, ক'দিন ভাবছি একবার আপনের কাছে চইলা যাই। কিন্তু ভরসা আছিল না।

—ক্যান এই কথা কন!

—আমার ছৈ ছোট। মেলা বন-জঙ্গল, কবরখানা। বড় বড় শিরিশ গাছ। রাতে ডর লাগতে পারে।

আপনে আমার নয়নের মণি। বলার ইচ্ছা ছিল জোটনের কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এখন ভালবাসাবাসির কথা বলতে পারল না।

এসময় বেলা পড়ে আসছিল। সূর্য মেঘনার অন্য পারে অস্ত যাচ্ছে। মাঠের পুকুরে অজু সেরে নামাজ পড়তে বসে গেলেন। জোটনও পাশাপাশি বসে—যখন কেউ নেই আশেপাশে—কেবল ফাঁকা মাঠ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে ত যাচ্ছেই, জোটন পা ভাঁজ করে ফকিরসাবের পাশে বসে পড়লে মনে হল তার সামনের গ্রামটাই বুঝি তার সেই প্রিয় সুলেমানপুর। তার প্রথম সাদি সমন্দের কথা মনে হল। গ্রামের সে বড় বিশ্বাসের ছোট বিবি ছিল। সেদিন সে যেন বেগম। তার সন্তানেরাই হয়ত দূরের মাঠে অবেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোটন নিজের প্রথম সাদি সমন্দের কথা ভেবে আকুল হতে থাকল।

আস্তানা সাবের দরগাতে পৌঁছাতে ওদের রাত হয়ে গেল। চারিদিকে কবরস্থান। চারিদিকে ঘন বন এবং মাঝে মাঝে [illegible] বাঁধানো কবর, কেউ কেউ মোমবাতি জেবলে দিয়ে গেছে। আজ কি বার, বুঝি কেউ কবর দিতে এসে সব কবরে মোমবাতি জেবলে দিয়ে গেছে। অন্ধকার রাতে লাঠি ঠুকে ঠুকে নিজের আস্তানার ভিতর ঢুকে বললেন, ডর নাইগ বিবি। আপনে বোরখা খুইলা ইবারে হাওয়া খান। কবরের আলো থাইকা আশানের লম্ফটা জবালাইয়া আনতাছি।

ফকিরসাব লম্ফ জবালতে গেলে জোটন বোরখাটা খুলে রাখল, অন্ধকারে সে কিছুই টের করতে পারছে না। এমন ঘন অন্ধকার জোটন যেন জীবনেও দেখেনি। একটা কুকুর ডাকছে না, একটা মোরগ ডাকছে না। সে দূরবর্তী কোন গ্রামে আলো পর্যন্ত দেখল না। যেন সে যোজন দূরে চলে এসেছে। ওর ভয়ে আতঙ্কে কান্না পাচ্ছিল। জঙ্গলের ভিতর শুকনো পাতার শুধু খচ-খচ শব্দ। মৃত মানুষেরা ইতিমধ্যেই যেন যুদ্ধের মহড়া দেবার জন্য যোজন দূরে থেকে জিন-পরি হয়ে নেমে এসেছে।

তখন দূরে মুসকিলাশানের আলো এবং শেয়ালের চিৎকার। ঝোপ অথবা গাছ-

গাছালির ফাঁক থেকে ফকিরসাবকে কোন রসুলের মতো মনে হচ্ছে যেন। সামনে অনেকগুলি অর্জুন গাছ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। তার নিচে নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে। জোটন নতুন কফিনের গন্ধ পাচ্ছিল। অথবা কারা যেন বলাবলি করছে, সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের ছোট বিবির পহেলা সন্তানের ইন্তেকাল হচ্ছে।

যারা কবরে কফিন নামাচ্ছিল জোটন তাদের দেখতে পাচ্ছে না। ফকিরসাব দরগার চার পাশটা কেবল কি খুঁজে মরছেন লম্ফের আলোতে। কবর দিতে যারা এসেছে তারা সব এখন ফিরে যাচ্ছে। জোটন এই প্রথম এখানে মানুষের সাড়া পেল। ওদের হাতে হ্যারিকেন। ওরা নিচের পথ ধরে মাঠে নেমে যাচ্ছে। বড় বিশ্বাসের পেয়ারের ধন সকলের মুখে ছাই দিয়ে গেল। আল্লার বড় বিশ্বাসভাজন ছিলেন তিনি। বড় বিশ্বাসের নাম শুনতেই ছই-এর নিচে জোটনের মুখ শুকিয়ে গেল। সে ফকিরসাবের অপেক্ষায় বসে আছে, এলে খবরটা নেবে, কারণ লোকগুলি পথে যেতে যেতে সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের কথা বলছিল। বাকি কথা অস্পষ্ট। বাকি কথা কানে আসেনি। মানুষগুলোকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হ্যারিকেনটা মাঠে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে।

ওখানে কার ইন্তেকাল হল, জিজ্ঞেস করতেই ফকিরসাব আশানের আলোটা জোটনের মুখে তুলে ধরল। কিছুক্ষণ মুখে কি দেখল। তারপর খুব ঘন হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনের মুখে এই কথা শোভা পায় না বিবি। আপনে ফকির-সাবের শেষ বিবি। বলে আরও কাছে মুখটা এনে তদগদ চিত্তে দেখতে থাকলেন. তারপর একসময় আবেগে বলে ফেললেন, কথা দ্যান আমারে ছাইড়া যাইবেন না।

—যামু না।

—ইবারে গোস্ত রাইন্দা ফ্যালান।

মাচানের নিচে নানা রকমের হাঁড়ি-পাতিল। ভাঙা এবং ভাল—সব রকমের। মাঠে জলাশয়। পিছনে নোনা-ধরা ইটের প্রাচীন মসজিদ। ফকিরসাব লম্ফটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে দিলেন। সব জামা-কাপড়, মালা-তাবিজ খুলে শুধু একটি নেংটি পরলেন। তারপর জলাশয় থেকে জল এনে দিলেন। ওরা রান্না হলে গোস্ত ভাত খেয়ে তাড়াতাড়ি ছইয়ের ঢুকে মুখোমুখি বসে অন্ধকারে গল্প আরম্ভ করলেন।

আর যখন অন্ধকার এই শয়তানের রাজত্ব গিলে খাচ্ছে, যখন মনে হচ্ছিল এই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর পরি অথবা জীনেরা হেঁটে বেড়াচ্ছে তখন একদল ধূর্ত শেয়াল নতুন কবরের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে।‌ নেমে আসার সময় ওরা পরস্পর মাংসের লোভে খ্যাঁক খ্যাঁক করছিল। জোটন বলল, আমার ক্যান জানি ডর লাগতাছে।

ফকিরসাব জানেন, সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের ছোট বিবির বড় ছেলে কলেরায় মারা গেছে, জানেন শেয়ালেরা খাবার লোভে কবরে পা বাড়িয়ে গর্ত খুঁড়ছে। সুতরাং তিনি সান্ত্বনা দেবার মতো আদর করে বললেন, শিয়ালেরে এত ডরান! ডর নাই। অরা ক্ষুধায় এমন করতাছে। মনে আছে আপনের—পাঁচ বছর আগে আমার একবার ক্ষুধা পাইছিল। আপনে শুঁটকিমাছ দিয়া প্যাট ভ-ই-রা খাওয়াইছিলেন। প্যাট ভরলে অরা হুক্কাহুয়া করব না।

জোটনের স্মৃতিতে সব ভেসে উঠছে। সেদিন ফকিরসাব পরিপাটি করে ছেঁড়া মাদুরে খেতে বসেছিলেন। তিনি খেতে বসে দুবার আল্লার নাম উচ্চারণ করে আকাশ দেখছিলেন। আকাশ পরিষ্কার। বড় তক-তকে সেই উঠোনে ঝকঝকে আকাশের নিচে বসে গব গব করে খেতে পারছিলেন না। যেমন পরিপাটি করে বসেছিলেন, তেমনি ধীরে-সুস্থে এক সানকি মোটা ভাত শুটকির বর্তা দিয়ে কিঞ্চিত মেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছিলেন। ঠিক যেন এই মাচানের মতো। কোন জবরদস্তি নাই। নিচে একটা দুটো ভাত পড়েছিল, তিনি আঙুলের ডগায় তুলে সন্তর্পণে মুখে পুরে...যেন এই মোটা ভাত ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না...আল্লার বড় অমূল্য ধন। জোটনের এখন মনে হচ্ছে ফকিরসাবের খুঁটে খুঁটে খাওয়ার স্বভাব চিরদিনের। এখন এই মাচানে বসে অন্ধকারে শরীর খুঁটে খুঁটে খাওয়ার সখ। শরীরে শক্তি নেই। তবু ফোকলা দাঁতে মাংস খাওয়ার মতো হাতটা যত্রতত্র নাড়ছেন। এভাবে ধীরে ধীরে জোটন বিবি নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। এখন আর শেয়ালের চিৎকার কানে আসছে না। সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের কথা মনে পড়ছে না। তেরটি সন্তানের জননী জোটন—এই অন্ধকারে চুপি দিলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না। তার বড় বেটা কাফনের ভিতর হাত-পা শক্ত করে শুয়ে আছে, অথচ জোটনের জননী হবার সখ মরছে না। সে ফকিরসাবের কোলে মাথা রেখে বলল, রাইতের ব্যাল্লা চান্দের লাখান মুখখান একবার দ্যাখমু ফকিরসাব।

ধীর সুস্থির ফকিরসাব এই মুহূর্তে খুঁটে খুঁটে খেতে এত ব্যস্ত যে, চান্দের লাখান মুখখান, আপনে আমার নয়নের মণি অথবা পানীর মতো গড়-বন্দী কইরা রাখতে ইচ্ছা যায়—এ ধরনের কোন কথা গলা থেকে উঠে আসছে না। জননী জোটন সে কথার উত্তর পেতে জবরদস্তি করল না খুঁটে খুঁটে ভাত খেতে সেও বসে গেল।

ছোটকাকা লালটু পলটুকে পড়ার ঘ ধমকাচ্ছেন। সোনার পড়া হয়ে গেছে, এ এখন ছুটি। সুতরাং ওর একা-একা বাইরে ঘরে ভাল লাগছিল না। সে পাগ জ্যাঠামশাইকে মনে মনে খুঁজতে থাকল মা এখন রান্নাঘরে, তিনি আতপ চাউলে ভাত রান্না করছেন। আতপের ভাত আ কৈ মাছ ভাজা আর সুগন্ধ ঘি সোনা ক্ষুধার্ত ভাবল নিজেকে। সে জ ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ে নিল একটা। ও পড়া শেষ হলে একসঙ্গে মা খেতে দে সে এখন বাড়ির চারিদিকে জ্যাঠামশা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে হেঁটে যাচ্ছে। বাগা দোপাটি ফুল ফুটে আছে। বেলফুলে গন্ধ আসছে। ঝুমকোলতা গাছে গা দুলছিল। নানারকমের ফুল এই বাগানে শ্বেত জবা, রক্ত জবা, চন্দনি জবা। ক রকমের জবাফুল। ভোরে সে বড় জেঠিম সঙ্গে ফুল তোলার সময় সব ফুলের না মুখস্ত করে ফেলেছে। সে যেতে যে দেখল, দোপাটি ফুলগাছের নিচে যেসব সবুজ ঘাস রয়েছে, সেখানে জ্যাঠামশাই শুয়ে আছে। সে চুপি চুপি ফুলের রাজ্যে ঢুকে জ্যাঠামশাইর পাশে বসল। জ্যাঠামশাই মাথার নিচে হাত রেখে সন্তর্পণে অন্য হাতটা প্রায় আয়নার মতো চোখের সামনে এনে ধরে রেখেছেন। যেন সেই হাতের ভিতর তাঁর বিশ্বদর্শনের ইচ্ছা। সোনা এবার চুপি চুপি জ্যাঠামশাইর পেটের উপর চেপে বসল। তারপর উঁকি দিল পাতার ফাঁক দিয়ে। সে দেখল কত সব বিচিত্র রঙের প্রজাপতি ফুলের মৃত ডালে বসে আছে। সোনা বুঝল, জ্যাঠামশাই হাত দেখছেন না, গাছের সব প্রজাপতি দেখছেন। সোনা তখন পেটের উপর বসে ডাকল জ্যাঠামশয়।

মণীন্দ্রনাথ উত্তর করলেন না। শুধু হাসলেন।

সোনা বলল, তামুক খাইবেন? তামুক আইনা দিমু।

মণীন্দ্রনাথ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। সোনা বলল, আপনের ক্ষুধা লাগে না জ্যাঠামশয়?

মণীন্দ্রনাথ বলল, গ্যাৎচোরেৎশালা।

সোনা এবার রেগে গিয়ে বলল, আমি-অ আপনেরে তবে গ্যাৎচোরেৎশালা কমু।

মণীন্দ্রনাথ এবারেও হাসলেন। তারপর হাত তুলে মৃত সেই ডালে বিচিত্র রঙের সব প্রজাপতিদের দেখিয়ে নিজে দু-তিনটে ঘাস মুখে পুরে দিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে মুখটা হাঁ করে রাখলেন—যেন বলতে চাইছেন, আমার মুখ দ্যাখো, গহ্বর দ্যাখো, আমার আলাজিভটা কত বড় দ্যাখো। তখন সামসুদ্দিন কি কাজে

এপাড়ার নৌকা নিয়ে উঠে আসছে। এখন বর্ষাকাল। ঈশম এই সকালে নাও নিয়ে আউশ ধান কাটতে চলে গেছে। এটা ভাদ্র মাস।

মণীন্দ্রনাথ, দোপাটি ফুলের সব বড় বড় গাছ, গাছের ভিতর নিজেকে কেমন আড়াল করে রেখেছেন। কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সেই গাছের ঝোপে ঢুকে গেলে সোনাকেও আর দেখা গেল না। কেবল মনে হয় সেখানে সব ফুলের গাছ আছে আর অজস্র দোপাটি ফুল, লাল নীল হলুদ অথবা লাল রঙের ফুল ফুটছে আর ঝরে পড়ছে। আর ঘাট পার হলে গোপাটের জল, জলে নৌকা যাচ্ছে। বাবুর হাটের এড়ি যাচ্ছে নৌকায়, বাদাম তুলে সোনালি বালির নদীতে এখন গিয়ে এইসব নৌকা পড়বে। সামু ফতিমার হাত ধরে ছোট-কর্তার কাছে যাচ্ছে।

সামু ছোটকর্তাকে দেখেই বলল, কর্তা আপনের ডে-লাইটটা নিতে আইলাম।

ছোটকর্তা বললেন, ডে-লাইট দিয়া কি হৈব?

—ফুলনের সাঁদ দিতাছি।

—কোন্‌খানে দিবি?

—আসমানদির চর।

—বৈঠকখানায় গিয়া ব। আমি দ্যাখতাছি লাইটের অবস্থাটা কি।

সামু ফুলের বাগান অতিক্রম করার সময় দেখল বড়কর্তা দোপাটি গাছের ভিতর শুয়ে আছে। মাথার নিচে হাত এবং সোনা, বড়কর্তাকে জড়িয়ে দুর্বাঘাসের উপর শুয়ে আছে। সন্তর্পণে ওরা উভয়ে গাছের ভিতর কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ফতিমা সামুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সোনাবাবুকে দেখতে পেল। বলল, আমি যাই বাজী।

—কৈ যাবি?

—বড় ঠাকুরের কাছে।

—যাও, কিন্তু বড়কর্তারে ছুঁইয় না। সোনাবাবুরে ছুঁইয় না।

এইসব ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ এবং লেবুর ঝোপ পার হলে গ্রামের পথ। ফতিমা ঘুরে গিয়ে সেই পথের উপর বসল। ডাকল—অ সোনাবাবু!

সোনা পিট-পিট করে তাকাচ্ছে ঝোপের ভিতর থেকে। সে বলল, তুই!

—বাজীর লগে আইছি। ফিক করে হেসে দিল ফতিমা।

ফতিমার কোমরে একটা বাবুরহাটের ছোট শাড়ি জড়ানো। নাকে নথ, ছোট চোখ এবং সুর্মা-টানা চোখ। পায়ে মল। ফতিমা নড়লে অথবা হাঁটলে পায়ে ঝুম ঝুম শব্দ হয়। গায়ের রঙ সবুজ এবং ঘন পাতার রঙ মুখে। সোনা বলল, ভিতরে আইবি?

—কি কইরা যামু?

—ক্যান দোপাটি গাছগুলির ভিতর দিয়া আয়।

ফতিমা ফুলের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিল। সে লেবুর ঝোপে ঢুকে সোনার পাশে একটা পোষা পাখির মত মুখ করে ফুলের মত ডালে সেইসব প্রজাপতি দেখল। আর অবাক ফতিমা—সে লক্ষ্যই করেনি, ঠিক পায়ের কাছে, একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ, গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে, নিচে সেই আশ্বিনের কুকুর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ছে। ফতিমাকে সামান্য অপরিচিত মনে হচ্ছিল। কুকুরটা মুখ হাঁ করে ঘেউ ঘেউ করবে ভাবছিল—কিন্তু যা ভাব সোনাবাবুর সঙ্গে, কুকুরটা আর কোন কথা বলল না। মণীন্দ্রনাথ তেমনি শুয়ে আছেন। ডালপালা অতিক্রম করলে অফুরন্ত আকাশ, সেখানে মেঘের ভিতর অনেকদিন আগের সোনালি বালির চরে নৌকার পালের মতো একখানা মুখ আকাশে ভাসতে দেখলেন। আর সেই অভ্যাসমতো একই কবিতার পাখিরা সারা মুখের উপর উড়তে থাকল, তিনি যেন বলছেন, আই হ্যাভ একজামিনড্ অ্যান্ড ড্ ফাইন্ড অফ অল দ্যাট ফেভার মি, দেয়ার'স নান আই গ্রীভ টু লিভ বিহাইন্ড, বাট ওনলি, ওনলি দি।

ফতিমা নথ পরে পোষা পাখির মত ঝোপের ভিতর বসেছিল। সে পাগল ঠাকুরের কথা শুনে হাসছিল। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। কিছু বুঝতে না পারলে ফতিমা হাসে। সোনা বলল জ্যাঠামশাই ইংরাজি কৈতাছে। আমি যখন জ্যাঠামশাইর মত বড় হমু, ইংরাজিতে কথা কমু। আমি এ বি সি ডি পড়তে পারি।

ফতিমা পাল্টা গাইল—বাজী কৈছে আমারে-অ ইস্কুলে ভর্তি কইরা দিব। আমি-অ পড়মু।

সোনা বলল, ভোরে কলাপাতায় খাগের কলমে এ বি সি ডি লেখলাম। তারপর সে বলতে পারত, নির্মল চরণে, মস্তে বিভূষিত কুন্ডল করণে বললাম। কারণ পড়া শেষ হলে প্রতিদিনের মতো সোনা ঘাটে দাঁড়িয়ে খাজাপাতাগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে। তারপর বর্ষার জলে ভাসিয়ে দেবার সময় সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করতে করতে বলেছে, আইছেন সরস্বতী যাইবেন কই—হাতে-পায়ে ধরিয়া বিদ্যাখানি লই। কিন্তু সোনা কিছুই বলল না। কারণ, জ্যাঠামশায় বড় বড় চোখে তাকাচ্ছে। কোনোদিকে চলে যাবার আগে তিনি এমন করেন। সোনা এবং ফতিমার কথা শুনে যেন তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। ফতিমা এক কথা বললে, সোনা দু'কথা বলছে।

—বাজী কইছে দান্দরহাটে যাইয়া বই আইনা দিব। মসজিদের বারান্দায় বইসা আমি পড়মু।

পাগল ঠাকুর তখন বললেন, গ্যাৎ চোরেত শালা।

সোনা বলল, আপনে গ্যাৎচোরেত শালা।

এবার পাগল ঠাকুর সোনাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সেই ঝোপ থেকে উঠে বাইরে এসে সোনাকে একটা প্রজাপতি ধরে দিতে সাহায্য করার সময় ফতিমা পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। সোনা সেই প্রজাপতি নিয়ে কৌটার ভিতর করে রাখবার সময় বলল, এই প্রজাপতি লাগব তর?

—দ্যান।

—নিবি কি কইরা?

ফতিমার গলাতে পাথরের মালা। ফতিমা কোমরের কাপড়টার প্যাঁচ খুলে ফেলল। একটা কচুর পাতা তুলে আনল। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে দুজনে প্রজাপতিটা কচুরপাতায় রেখে মুখটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফতিমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে আবার জ্যাঠামশাইর পিছনে ছুটতে থাকল। মণীন্দ্রনাথ ওদের নিয়ে অর্জুন গাছটা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। এখন বর্ষাকাল—সুতরাং নাও, নদী, মানুষ এই শুধু দৃশ্যমান জগৎ। এখন কত তালের নৌকা, আনারসের নৌকা, কবলার নৌকা নদী ধরে নেমে যাচ্ছে। এই নদী আর নাও দেখলেই মনে হয় কোথাও না কোথাও পলিন শুয়ে আছে। পলিনের স্মৃতি, পলিনের চোখ গুণ-দেয়া নৌকার মত শুধু টানছে আর টানছে।

দক্ষিণের ঘরে লালটু পলটু এখনও পড়ছে। ওদের ছুটি হয়নি। ওরা সোনাকে পুকুর পারে ঘুরতে দেখে চটে গেল। পুকুরের অন্য-পারে সোনা, পাগল জ্যাঠামশাই এবং টোডারবাগের সেই টরটরি মেয়েটা। যেন এক হরিণশিশু লাফায় আর নাচে, সোনাকে পেলে ত কথাই নেই—শুকনো দিন হলে মাঠে ছুটে গিয়ে বব গম খেতে হারিয়ে যেত। ওদের ছুটি হয়নি। সোনার ছুটি হয়ে গেছে। ওদের রাগ বাড়ছিল। সোনা মেয়েটার আঁচলে কি যেন বেঁধে দিচ্ছে। ওরা ক্ষেপে গেল। পলটু বলল, দ্যাখল, সোনা ফতিমারে ছুঁইয়া দিল।

তখন অর্জুন গাছের নরম ত্বকের উপর পিঠ রাখল মণীন্দ্রনাথ। সামনে বিস্তৃন জমি, জমিতে জল থৈ থৈ করছে, দূরে কোথাও ধান খেতের ভিতর কোড়া পাখি ডাকছিল। নদীতে নৌকা, গ্রামোফোনে গান—নদী আমারে ভাসাইয়া লইয়া যাও। আর বর্ষার অবয়বে শুধু এই যেন প্রার্থনা—আমারে ভাসাইয়া লইয়া যাও। সুতরাং এখন এই দুই বালক-বালিকার সঙ্গে এই জলে ভেসে যেতে ইচ্ছা হল মণীন্দ্রনাথের।

ফতিমা ডাকল, সোনাবাবু।

সোনা বলল, কি!

—আমারে একটা লাল শাপলা ফুল দিবেন?

—দিমুনে। তখন সামু ফিরছে। হাতে তার ডে-লাইট। সে কিছুতেই নরেন দাসের বাড়ির দিকে গেল না। সে সোজা পুকুর পারে নেমে এল। এবং দূরে একবার চোখ তুলে গাছগাছালির ফাঁকে মালতিকে দেখার সময় মনে হল বাড়িটা বড় খালি খালি লাগছে। মালতি কি এখানে নেই! সে কি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। ওর কেন জানি একবার বেহায়ার মত মালতিদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা হল। অথচ পারছে না। কোথায় যেন ক্রমে সংশয় ওকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। সে তখন অনামনস্ক হবার জন্য ডাকল, ফতিমা কৈ গ্যালি?

ফতিমা সোনাবাবুকে বলল, আমি যাই। সে ছুটে চলে গেল। সামসুদ্দিন নৌকায় উঠে লগি বাইতে থাকল। কি ভেবে ফতিমা বলল, বাজী সোনাবাবু কইছে আমারে একটা লাল শাপলা ফুল দিব। সামু উত্তর না করে মেয়ের মুখ দেখল—মেয়ে তার বড় চঞ্চল। চোখ দুটোতে সব সময় দুষ্টুমির হাসি। মেয়ে এখনও অর্জুন গাছটার নিচে কি খুঁজছে। সামু দেখল, গাছটার নিচে কেউ নেই। ফতিমাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

তখন সোনা ক্ষুধার জন্য এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে ধনবৌকে জড়িয়ে ধরল। বলল, মা ভাত খাইতে দ্যাও। ক্ষুধা লাগছে।

ধনবৌ সোনার জন্য পিতলের মালসা থেকে সরু আতপ চালের ভাত বাড়ছিল। বলল, পিঁড়ি পাইতা বস।

লালটু খাচ্ছিল। সে পিট পিট করে তাকাচ্ছিল। সোনার জন্য মার এমন সোহাগ ভাল লাগছিল না। মা ওকে বড় কৈ মাছ ভাজা দিয়েছেন। সে কিছুতেই আর ক্ষোভ সামলাতে পারল না। বলল, মা, সোনা ফতিমার কাপড়ে কি বাইন্দা দিছে।

সোনা তাড়াতাড়ি ভয়ে মার গলা ছেড়ে বলল, নাগ মা।

লালটু চিৎকার করে বলল, মিছা কথা কইস না। সে পলটুকে সাক্ষী রাখল।

পলটু বলল, তুই ফতিমারে প্রজাপতি ধইরা দিছস।

শশীবালা বাইরে বড় শিঙ মাছের গলা কাটছিলেন। তিনি এমন কথা শুনে হৈ হৈ করে ছুটে এলেন। ধনবৌ ভীত হয়ে পড়ছে। কারণ, এখন এই ভোরে শাশুড়িঠাকুরুণ জাতমান নিয়ে অনর্থ বাধাবেন। বাছবিচারের কথা বলবেন। কি অশুচির কথা, অমঙ্গল ডেকে আনছে—আরও কত রকমের কথা হবে কে জানে। সুতরাং ধনবৌ ভাতের থালা রেখে বলল, সোনা বাইরে যাও। তুমি স্নান কর আগে।

সোনা বলল, না আমি স্নান করমু না। আমার ক্ষুধা লাগছে। আমারে খাইতে দ্যাও।

ধনবৌর মাথা কেমন গরম হয়ে উঠছে। এই নিয়ে সারাদিন শশীবালা গজ গজ করবে। সে দৃঢ় গলায় বলল, সোনা, ঘরের বাইরে যাও কইতাছি।

সোনা বলল, আমার খুধা পাইছে খামু। খাইতে দ্যাও আমারে। লালটু বলল, না খাইতে পাইবি না, স্নান না করলে খাইতে পাইবি না। ধনবৌ ধমক দিল লালটুকে। পেতলের মালসাতে অবশিষ্ট যে ভাত ছিল—সবই ধনবৌ বাইরে বের করে দিল। মাছ ভাজা, ভাত সব আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিল। সোনার দুঃখ বাড়ছে তখন। জিদ বাড়ছে। মা তার খাবার আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মা তাকে স্নান করতে বলছে। সোনা পিঁড়িতে বসে থাকল। সে উঠল না। সে রাগে, অভিমানে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকল।

ধনবৌ বলল, ভাল হইব না সোনা। তোমার পিঠে পড়ব কইতাছি। ভাল চাওত উইঠা যাও।

বাইরে শাশুড়িঠাকুরুণের গজ গজ করা ক্রমে বাড়ছে। সোনা কিছুতেই উঠছে না। এই সব হেনস্থার জন্য একমাত্র সোনাকে দায়ী ভেবে, সোনার পিঠে ধনবৌ অমানুষিকভাবে আঘাত করতে থাকল। সোনার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সোনা কিছুতেই পিঁড়ি ছেড়ে উঠছে না। একান্নবর্তী পরিবার এবং সংসারের ভিন্ন ভিন্ন জ্বালা ধনবৌকে এই মুহূর্তে চরম কুৎসিত করে তুলল। সোনার চুল ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এল। —খাড়ও চুপ কইরা। মুখে যান রা থাকে না। বলে ধনবৌ নিজে চান করে এক এবং এক কলসী জল ঢেলে দিল সোনার মাথায়।

আর কাফিলা গাছের নিচে তখন সেই আশ্বিনের কুকুর। পাশে মণীন্দ্রনাথ। মণীন্দ্রনাথ সোনার কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। দুঃখে নিজের হাত কামড়ে ধরেছেন। হাত থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল।

ঘাটে ফতিমা, নৌকা বাঁধলে বলছিল, বাজী সোনাবাবু আমারে প্রজাপতি ধইরা দিছে।

সে কেমন অনামনস্কভাবে বলল, জীবেরে কষ্ট দিতে নাই। ছাইড়া দ্যাও।

ফতিমা প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দেবার জন্য আঁচল খুলে দেখল, প্রজাপতিটা উড়ছে না, নড়ছে না। প্রজাপতিটা মরে গেছে।

(ক্রমশঃ)
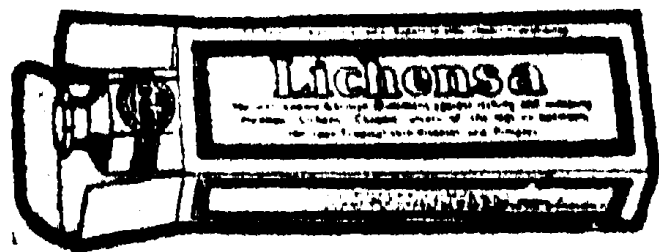
রেলগাড়ীর সেই বিজ্ঞপ্তিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়। — চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে। হ্যাঁ আছে, শুধু রেল-গাড়ীতে নয়, পথেঘাটে সব জায়গাতেই। আমাদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি। নিকটেই আছে — অতএব সাবধান।

নিকটেই আছে

ফেড "ধ্বস নামছে"

—গোড়ায় ভেবেছিলাম বোর্ডের সভাপতি বা সেক্রেটারীকে একটা চিঠি লিখব। পরে খেয়াল হল, ব্যাপারটা সঙ্গে তো শুধু বোর্ডই নয়, খোদ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিও জড়িত। লিখতে হলে, চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলারকেও লিখতে হয়। কিন্তু তাঁরা কি আমার চিঠির কোন গুরুত্ব দেবেন, না কি আদৌ পি-এ, সি-এ-দের হাত ঘুরে সেই চিঠি তাঁদের হাতে পৌঁছবে? এরকম সাত-পাঁচ ভেবেই আর লেখা হয়ে ওঠে নি। এমন সময় আমার ভাসুর-পো অজয় বললে ও না কি আপনাকে চেনেও। আপনি তো এসব বিষয়ে লিখছেন। দেখুন না এটা নিয়ে কিছু করতে পারেন কিনা?

হাত বাড়িয়ে অজয়ের কাকীমা চিঠিটা এগিয়ে দিলেন। এই চিঠিটার কথাই তাহলে অজয় দিন-কয়েক আগে বলেছিল। আদারওয়াইজ খুব লাজুক মুখচোরা ছেলে, কলম পিষেই দিন কাটায়। সাতে-পাঁচে থাকে না। দশটায় আসে, পাঁচটায় ফিরে যায়। গোটা অফিসে এক আমার সঙ্গেই যা দুটো কথা বলে। তাও অফিসে নয়। ফিরতি পথে হাঁটতে-হাঁটতে ধর্মতলা বা কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে বাদাম চিবুতে-চিবুতে।

বাড়ীর খবর বলতে চায় না সহজে। টিপে-টিপে আদায় করতে হয়। অজয়ের বাবা-কাকারা পাঁচ ভাই। রীতিমত বড় সংসার। অনেকগুলো খুড়তুতো ভাই-বোন। ঠাকুর্দার চেহারাটা ভুলেই গেছে প্রায়। ঠাকুমা গত আশ্বিনে গত হয়েছেন। সেই সঙ্গে জয়েন্ট ফ্যামিলীর নাট-বল্টু-গুলো সব আলগা হয়ে খসে গেছে। কাকারা সবাই বেশ ভালভাবে এসটাব-লিশড। কেউ সরকারী বড় পেয়াদা, কেউ-বা সাংবাদিক, কেউ অধ্যাপক ও ছোটজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। এক অজয়ের বাবাই একটু বা আয়েলায় আছেন। থার্টি নাইনে এম-এ পাশ করে খুলনার একটা স্কুলে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। যুদ্ধের মাঝামাঝি হাফপ্যান্ট ও কেডস পরে মাথায় সোলার হ্যাট চাপিয়ে পুরোদস্তুর কানুন-গো হয়ে গেলেন। তারপর সাতাশ-আটাশ বছর ধরে এঘাট সেঘাটের জল খেয়ে পড়ন্ত বেলায় আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি খান-কয়েক দ্বীপের বি-ডি-ও হয়ে হাড় কখানা জুড়োচ্ছেন; অবশ্য পৌনে তিনশ টু সাড়ে ছ'শ স্কেলে যতখানি সম্ভব ততখানি।

মা থাকতে অজয়ের বাবা সুখেন্দু-বিকাশ অনেক নিশ্চিন্ত ছিলেন। জানতেন ভাইরা সবাই মিলে-মিশে থাকবে। তাই একমাত্র ছেলে অজয় বি-এ পাশ করে মেজ-কাকার দৌলতে ড্যালহৌসী পাড়ার একটা ফার্মে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলের বিয়ে দিলেন। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত ছোটখাট মিষ্টি বৌ ঘরে এনে দেখেন লক্ষ্মী আগেই বিদায় নিয়েছে। শ্রাবণে অজয়ের বিয়ে হল, আশ্বিনে মা মারা গেলেন। এক শীতেই সব কটা কাকের বাচ্চা কোকিলের আস্তানা ছেড়ে উড়ে গেল। তারা সবাই ভুলে গেল যে এই বড়দাই একদিন প্রোমোশনের সব আশা ত্যাগ করে দু হাতে খুব নিয়ে এতগুলো ভাইকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছিলেন। অসময়ে যে কেউ কারো বন্ধু নয়, সুখেন্দুবিকাশ রিটায়ারমেন্টের মাত্র পাঁচ বছর বাকী থাকতে তা বুঝেছেন: বুঝলেও করার কিছু নেই। তাই প্রাণ্ব-শান্তি চুকে যেতে বিশ বছরের ছোট ভাই অমলেন্দুর হাত ধরে অনুরোধ করে গেলেন—আগামী এপ্রিলে অজয়ের বৌ স্কুল-ফাইন্যাল দেবে। আমার ওখান থেকে তো আর সম্ভব নয়। তুই যদি দয়া করে ওদের একটু থাকতে দিস। মুখে মোলায়েম ছোট কাকা আর না বলতে পারেন নি।

ছোট কাকীমা খুব সুবিধের লোক নন। কলকাতার পুরোনো বাসাটা এখন তাঁরই দখলে। কারণ ভাড়ার টাকাটা এখন এজমালী সংসার থেকে আসে না; ছোট কাকাই দেন। আড়ালে কাকীমা ভ্রু নাচিয়ে কাকাকে বলেছিলেন—তোমার দাদা-বৌদির কোন আক্কেল নেই। আজকের দিনে একটা মানুষের খাই-খরচাই যেখানে প্রায় দুশো টাকা লাগে সেখানে ছেলে-বৌয়ের দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়লেন।

কাকা সামান্য প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন—তা কেন? ব্যাপারটা তো মাত্র সাত মাসের। পরীক্ষা হলেই ওরা চলে যাবে।

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন কাকীমা — চলে যাবে। কোথায় যাবে শুনি? অজয়ের চাকরী কলকাতায়। আর তোমার দাদা থাকেন সেই কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে। চাকরী না ছাড়লে তো আর যোগাযোগ সম্ভব না।

কাকীমাকে চটাতে চান না কাকা। মন রেখে সায় জানানোর সুরেই বলেন—সেটা বড়দার ব্যাপার। আমি দাদাকে সাফ বলে দিয়েছি, পরীক্ষার পর একদিনও না। তবে খাইখরচের জন্য অজয় মাস-মাস সোয়া দুশ করে দেবে বলেছে।

এর পর কাকা-কাকীমার ভেতর আর কি কথা হয়েছিল বা আজো নিত্য হয়, তা শোনার ধৈর্য অজয়ের ছিল না। বিশেষ করে সদ্য-বিয়ে-করা ছেলেমানুষ বৌ ভাদিনকে এভাবে আড়ি পেতে প্রায় সাত-আট বছরের বড় কাকা-কাকীমার জটিল মন-স্তত্ত্বের সুলুকসন্ধান নেওয়া আদৌ ভাল লাগে নি অজয়ের। বিরক্ত হয়েই বলেছে—শুধু কান ভরসা করে থেকো না। চোখ মেলে দেখো তোমার-আমার জন্য কাকা-কাকীমা কি করেন। বরং দরকার হলে কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করো। ছোট কাকী বি-এ বি-টি। উনিও তোমার মতই বিয়ের পর এ বাড়ীতে এসে পড়াশোনা করেছেন।

উপদেশের বকলমে তানিকে ধমকালেও, ভেতরের চাপা অভিমান ঢেকে রাখতে পারে নি অজয়। ধর্মতলার ফুটপাথ ধরে

হাঁটতে-হাঁটতে অনেক কথা ও আমায় বলেছে—জানেন দাদা কাকীমা যেবার বি-এ পরীক্ষা দিলেন সেবার কাকা পুরোনো কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে একেবারে পুরো বেকার। হাতে এক পয়সাও ছিল না। বাবাই কাকীমার টিউটোরিয়ালের মাইনে থেকে পরীক্ষার ফীজ সব জুগিয়েছিলেন। অথচ মাত্র কটা টাকার জন্য তানিকে এক সেট কোশ্চেন আনিয়ে দিতে পারছি না। সব জেনেও কাকা স্পিক টি নট। অথচ টি-এ ডি-এ হল্টেজ মিলিয়ে কম করেও নশ টাকার ওপর কাকার ইনকাম। আমার আয় তো আপনি জানেনই। সবশুদ্ধ মাত্র তিনশ পনেরো টাকা। এ থেকে কাকাকে দিই সোয়া দুশো। যাতায়াত ভাড়া আর দু-একটা ছোটখাট প্রয়োজন মিটিয়ে হাতে কিছুই থাকে না। বাবাকে জানাতে লজ্জা করে। ভাববেন ছেলেটা অপদার্থ। চাকরী-বাকরী করছে, বিয়ে-থা করেছে, এখনো বাপের সাহায্য না হলে চলে না। সত্যি আমি অপদার্থ। মেজো কাকার ছেলে রঞ্জু এবার ডাক্তার হয়ে বেরুবে। আর আমি কিছুই হতে পারলাম না।

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের হৃদপিণ্ডের দপদপানিটুকু স্পষ্ট কানে শুনতে পাই। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস, প্রায়-অদৃশ্য জলের রেখা, ক্ষোভ, হতাশা কিছুই বাদ যায় নি। অনুজ্জ্বল কাকা ও উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ খুড়তুতো ভাইপোদের পাশে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। গোপন ইচ্ছার সামান্য যেটুকু ঝিলিক দিয়ে যায় তাতে মনে হল ও চায় আলাদা করে সংসার পাততে, কিন্তু ক্ষমতা নেই। পাছে কোন লুকোনো বেদনা মাড়িয়ে ফেলি, তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞাসা করি—কি একসেট কোশ্চেনের কথা বলছিলে অজয়? ব্যাপারটা কি?

প্রশ্নের জবাব রাস্তায় মেলে নি। নানা কথায়, ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। শুনলাম দিনকয়েক বাদে অফিসে। বলল অজয় নিজেই। অফিসের পিওন বনমালীর কাছ থেকে ধার নিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যেই কোশ্চেন এসে যাবে। ওরা একসপ্রেস ডাকে পাঠাবে।

এর পর মাসখানেকও যায় নি, হঠাৎ একদিন রাস্তায় বলল—আমরা এ মাসের শেষেই চলে যাচ্ছি দাদা।

চমকে উঠলাম—কোথায়? কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

ম্লান মুখে জবাব দিল ক্লান্ত ছেলেটা—ভাবছি তানিকে ওর দাদার কাছে রেখে আসব। নিজে একটা মেস-টেস দেখে উঠে যাব।

ঠোঁটের ডগায় যে প্রশ্নটা ঝুলছিল, জিভ দিয়ে সেটা টাকরায় ঠেলে দিলাম, এসব পারিবারিক ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে কি লাভ? তারচেয়ে খুব সহজ সরল নির্ঝঞ্ঝাট প্রশ্নটা করলাম — তানির পরীক্ষা কেমন হল অজয়?

সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর কথার ফাঁকে-ফাঁকে বলল—কয়েক দিন ধরেই আপনাকে ব্যাপারটা বলব-বলব ভাবছিলাম। লজ্জায় পারি নি।

কৌতূহল চাগিয়ে উঠল ভেতরে—কি ব্যাপার?

না রাস্তায় বলব না। চলুন না আজ কাকার বাসায়। রোজই তো কলেজপাড়ায় যান। ওখানে থেকে তো খান-কয়েক স্টপ মোটে। কাকীমার মুখেই সব শুনবেন।

সেই ব্যাপারটাই আজ অজয়ের কাকীমা ভেঙে বললেন। ভদ্রমহিলা কথা বলেন বেশ গুছিয়ে। কিন্তু বড় কাটা-কাটা। তানি সম্পর্কে ও'র পুত্রবধূ। ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে আমার মত এক অপরিচিত বয়স্ক লোকের সামনে দাঁড় করিয়ে ওর অসাফল্যের ইতিবৃত্ত না শোনালেই হয়তো ভালো করতেন। নিজে যে অক্লেশে বি-এ, বি-টি পাশ করেছেন, বছর বছর ফেল করেন নি সে কথাও শোনাতে ছাড়লেন না। আর তানি? দু দু'বার স্কুল ফাইন্যাল ফেল করার যন্ত্রণায় এমনিতেই মলিন। কাকীমার হুল ফোটানোয় যেন আরো কুঁকড়ে গেল। প্রথম বার পরীক্ষার এক মাস আগে টাইফয়েড থেকে উঠেছিল। দ্বিতীয় বার বিয়ের প্রস্তুতি, হৈ-চৈ সব মিলিয়ে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। তারপর বাপ মা নেই, ছোটবেলা থেকে দাদাদের দয়ার মানুষ। অবহেলা অযত্নের সেই বিশ্রী দিকটার সঙ্গে কথা বলা যায় না। তাই মুখে যে জবাব দিতে পারে নি, তারই যোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবার। সেই চেষ্টার সূত্রপাত কিন্তু এক অস্বাভাবিক যোগাযোগের ফল।

মার্চের মাঝামাঝি হঠাৎ ডাক-পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। পোস্ট কার্ড সাইজের চিঠিটার এক পিঠে লেখা আছে তানির পুরো নাম, ঠিকানা। উল্টো পিঠে এক কোণে ইংরেজীতে টাইপ করা—

"অ্যাকাডেমিক ব্যুরো (কোশ্চেন ডিপার্টমেন্ট),

৭৯..............স্ট্রীট।

কলকাতা।"

বাকী চিঠিটা হাতে লেখা, বাংলা সাইক্লোস্টাইল করা। বক্তব্য মোটামুটি এ রকম—

"মহাশয়—মহাশয়া,

১৯৭০-এর বি-টি, স্পে-অনার্স ১।২, বি-কম, ১।২, বি-এস-সি ১।২, বি-এ ১।২, প্রি-ইউ, হাঃ সেঃ, ও স্কুঃ ফাঃ পরীক্ষার 'লাস্ট মিনিট সাজেসান্স' এইমাত্র বেরিয়েছে। প্রতি পেপারে মাত্র দশটা প্রশ্ন। গত পরীক্ষায় ৯৫ শতাংশ প্রশ্ন এসেছিল। এবারও প্রচুর কমন আসবে।

প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য (সমস্ত বিষয়) : ১৫্ (ডাক মাশুল ১্ স্বতন্ত্র)। চিঠি পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে নিলে কনসেশনে দশ টাকায় 'সাজেসান্স' পাওয়া যায় (১১টা—৭টা)। অন্য কোন ব্রাঞ্চে পাওয়া যাবে না। ডাকে পাবার জন্য পরীক্ষা, বিষয়, নাম, ঠিকানা এবং নম্বর উল্লেখ করে এগারো টাকার মণি অর্ডার উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠালে তৎক্ষণাৎ এক্সপ্রেস ডাকে পাঠানো হয়। ইতি—

সেক্রেটারী।"

চিঠির তলায় কোন সই নেই। ফলে জানার উপায় নেই যে কে সেক্রেটারী। তবে ঠাসবুনোন ঐ চিঠির শেষে একটা রেকট্যাঙ্গুলার বক্সের মধ্যে জরুরী ফুটনোটে বলা হয়েছে, "সত্বর রেজাল্ট জানার জন্য 'সাজেসান্সের' সঙ্গে পাঠানো 'ফর্ম' পরীক্ষার পর তাড়াতাড়ি পাঠান।"

ঐ পুনশ্চটুকুই যত গোল বাঁধিয়েছে। বনমালীর কাছ থেকে ধার নিয়ে অজয় বৌকে সাজেসান্স আনিয়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গে সাইক্লোস্টাইলড ফর্মও এসে উপস্থিত। ফর্মের ওপরেই তিনটি লাইনে যে বক্তব্যটুকু লেখা ছিল, তার প্যারাফ্রেজিং করলে মানে দাঁড়ায় : পেপার পিছু কুড়ি টাকা। একসঙ্গে সব কটা পেপারের মার্কস জানতে হলে কনসেশনাল রেটে একশ টাকা মাত্র। তার পরে মোটা করেক কিল আপ দি ব্যাক্স ও সব শেষে আন্ডার লাইন করা একটা জরুরী বার্তা—অন্য প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার বাঞ্ছনীয়।

আবার এক দফা ধার করে ফর্ম জমা দিয়েই আ...নি অজয়, স্টাইল দিয়ে

দেখাও করেছে, অবশ্য 'অন্য প্রয়োজনের' তাগিদেই। আর কোন পেপারে বিশেষ ভয় নেই। যত ভয় তানির অঙ্ক আর ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে। যদি তাম্বির তদারকে ভয়ের কারণটা কোনরকমে দূর করা যায়। এবার ফেল করলে আত্মীয়-সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। বিশেষ করে কাকীমাকেই অজয়ের ভয় বেশী।

স্বাক্ষরহীন সেক্রেটারীর সাক্ষাৎ মিলল কলেজ পাড়ায়। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের মাঝবরাবর যে গলিটা কাঁচা সব্জী আর ডাইকরা ডাবের পাঁচিলের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে পূব দিকে, সেটাই ....স্ট্রীট। রোগা-প্যাটকা, ঢাউস-কুমড়ো প্যাটার্ণলেস বাড়ীগুলোর মাঝে একটা টার্নের মুখেই উনসত্তর নম্বর বাড়ী। একতলায় সিঁড়ির মুখেই একটা মিষ্টির দোকান। সিঁড়ির গায়ে ঝুলছে ডজন-খানেক কোম্পানী, ইউনিয়ন আর কো-অপারেটিভের সাইনবোর্ড। ঐ ভিড়ের মাঝেই অ্যাকাডেমিক ব্যুরোকে খুঁজে বার করল অজয়—দোতলা বারান্দার পশ্চিম ধারের শেষ ঘর।

খুব বেশী হলে আট ফিট বাই ছ ফিট বড় জোর। তার মাঝেই খানকয়েক টিনের চেয়ার, চলটা ওঠা কাঠের টেবিল, একটা পুরোনো রেমিংটন, দেয়াল-জোড়া কাঠের র‍্যাকে টাল দেওয়া ফাইলের গাদা। ঘর ফাঁকা দেখে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল অজয়। হঠাৎ চাপা কাশির খুক-খুকানি শুনে পেছন ফিরে দেখে দম নিতে নিতে সিগারেটের জব্বর টান সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এক ভদ্রলোক। গোলগাল যেন গুড়ের কোলো। সরু পাড় পাতলা ধুতির ওপর ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পরনে। ডান হাতে চারটে আংটি ও একটা সিগারেট মুঠিয়ে ধরে আবার একটা কলকে টান লাগালেন। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যে কথা কটা বললেন, অজয়ের মনে হয় তার অর্থ—কাকে চাই?

কাকে চাই, কেন চাই, কি প্রয়োজন সব বলল অজয়। শুনেটুনে সংক্ষিপ্ত একটা টান সিগারেটের গোড়ায় লাগিয়ে চোখের ইশারায় অজয়কে ভেতরে ঢুকতে বললেন ভদ্রলোক। নিজেও টেবিল ঘুরে দরজার দিকে মুখকরা চেয়ারটা টেনে বসলেন। সযত্নে ধুতির কোঁচাটা গিলেকরা পাঞ্জাবীর ঝুলপকেট থেকে বার করে কোলের ওপর বিছোতে বিছোতে উদ্বেগ-হীন গলায় জানতে চাইলেন—নম্বরটা কত?

আজ্ঞে? —যেন প্রশ্নটা ঠিক মাথায় ঢোকে নি অজয়ের। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই বলল—সেটা জানতেই তো এসেছি। বলেই বুঝতে পারল ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কড়া ধাঁচের একটা গাট্টা প্রশ্ন হয়ে অজয়ের ব্রহ্মতালুটাকে নাড়া দিয়ে গেল—মাথা খারাপ নাকি? এই তো দু'দিনও পরীক্ষা শেষ হয় নি, সবে আটাশ তারিখ। খাতাই যায় নি পরীক্ষকের কাছে তো নম্বর জানবেন কি? যাক ফর্ম তো জমা দিয়েছেন, তাতে রোল নাম্বার লেখেন নি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভুলটা শুধরে নেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি তানির রোল নম্বরটা উগরে দেয় অজয়—নর্থ পি-সি...।

ভদ্রলোক মন দিয়ে বারকয়েক সিগারেট টানলেন। তারপর টুকরোটা একটা চায়ের ভাঁড়ে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফাইল র‍্যাকের সামনে ঝুঁকে পড়ে নানা রংয়ের ফাইলের বস্তায় যেন কি খুঁজতে লাগলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা ফিকে নীল ফাইল টেনে বার করে ফিতে খুলতে খুলতে খুকখুক করে জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম?

আমি স্যার ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী—নতুন কোন ভুল করে ফেলার ভয়ে কেমন থতমত খেয়ে যায় অজয়।

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, নর্থ পি-সি...আপন মনেই গুনগুন করে নামতা পড়তে পড়তে ব্যাঙ্কের নোট গোনার মত ফর্মের তাড়া উল্টোতে উল্টোতে আবার চেয়ারটায় এসে বসলেন ভদ্রলোক। দেখুন তো এটাই কিনা?— ক্লিপ আলগা করে একটা ফর্ম খসিয়ে নিয়ে অজয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন। নিজের হাতের লেখা চিনতে কোন কষ্ট হয় নি অজয়ের। ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ এটাই।

অঙ্ক আর ইংরেজীর নম্বর জানতে চেয়েছেন তো? ঠিক আছে জুনের ফার্স্ট উইক নাগাদ খবর পেয়ে যাবেন।— বলেই ফর্মটা ক্লিপে গেঁথে ফাইলটা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রলোক। যেন চ্যাপটারটা ওখানেই ক্লোজড হয়ে গেল।

কিন্তু শুধু নম্বর জানলেই তো চলবে না। তানির যে পাশ করা চাই। এবারও যদি ফেল করে তো কাকীমার মুখ নাড়ায় জান বেরিয়ে যাবে। অথচ ভয় রয়েছে পুরোদস্তুর। সব কিছু ভেবেই অজয় এসেছে। তাই বলতে লজ্জা করলেও অনেক কষ্টে জিভের জলটা সাফ করে নিল—আপনাদের ফর্মের তলায় লেখা ছিল 'অন্য প্রয়োজনে'...।

সেনটেনস্‌টা শেষ হল না। আর একটা সিগারেটের চুলোয় আগুন ধরাতে ধরাতে ভদ্রলোক বললেন—দুটো পেপারের জন্য কম করে দুশো টাকা লাগবে। তাও এখন না। সেই জুনের গোড়ায়। তখন আসবেন। দেখব কি করতে পারি। তবে হ্যাঁ অ্যাডভান্স ছাড়া কাজ করি না আমরা। পুরো পেমেন্ট আগেই আপনাকে করতে হবে। বোঝেনই তো, অনেককে দিতেথুতে হয়—ছোট ছোট কাশি, এক রাশ ধোঁয়ার আড়ালে গোলগাল মেদল মুখখানা স্বল্প হাসিতে থিকথিক করে কাঁপতে লাগল।

তানির অঙ্কের জের মেটানোর অঙ্ক শুনেই মাথা ঘুরে গেছে অজয়ের। কোথায়

পাবে এত টাকা? অলরেডি বনমালীর কাছে দু দফায় এক গাদা ধার হয়ে গেছে। বাবার কাছেও চাওয়া যায় না। কোথ্ থেকে দেবেন? মানসাঙ্কের গোলকধাঁধার পাক খেতে খেতে কখন যে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে টেরও পায় নি।

বাড়ীতে অফিসে শুধু ঐ একই চিন্তা। টাকা পাবে কোথায়? এ মাসের শেষেই ওদের চলে যাওয়ার কথা। তানিকে বাবার কাছে রেখে নিজে মেসে উঠলেও দুশো টাকা বাঁচানো অসম্ভব। বড় জোর টেনে টুনে চললে শ'খানেক বাঁচাতে পারবে। ভেবেছিল তাই করবে, প্রয়োজনে না হয় বনমালীরই শরণাপন্ন হবে আর একবার।

কিন্তু বাবার একটা চিঠিই সব প্ল্যান আপসেট করে দিল। সুখেন্দুবিকাশ দু' মাসের মধ্যেই আলীপুরে বদলী হয়ে আসছেন। লিখেছেন "দুই মাসের জন্য তানিকে এখানে না পাঠাইয়া তোমরা অমলেন্দুর ওখানেই থাকিও। আমি তোমার কাকাকেও চিঠি দিতেছি।" দাদার চিঠি পেয়ে ছোট ভাই যে রকম মুখ বেঁকালেন তার অর্থ একটাই—আপদ দেখছি কিছুতেই ঘাড় থেকে নামে না। ফলে অজয় পড়েছে ফাঁপড়ে। যে মাসটা এখানে থাকলে ছোটকা'কে সোয়া দুশো দিতে হবে। তাহলে তানির পাশের কি হবে? সব দিক ভেবেচিন্তে কাকীমাকে গোপন করেই কাকাকে রিকোয়েস্ট করেছিল অজয়—যে মাসের কনট্রিবিউশনটা যেন ছেড়ে দেন। পরে যে করেই হোক অজয় গ্যাপটা ফিল আপ করে দেবে।

কাকা খুব সংগোপনেই কাকীমার কানে কথা কটা তুলে দিয়ে কোম্পানীর কাজে ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন। কাকীমা এমনিতেই সুখেন্দুবিকাশের চিঠি পেয়ে ফুঁসছিলেন। সেই সঙ্গে অজয়ের অনুরোধ শুনে চটে লাল। তানিকে চাপ দিয়ে আসল কথাটা জেনে নেওয়া ইস্তক চেঁচাচ্ছেন—এ-সব নোংরামিকে প্রশ্রয় দেওয়াও পাপ। টাকা দিয়ে পাশ করবে, এ যে বাপের জন্মেও শুনি নি। সেই সঙ্গে নানারকম কটু-কাটব্য, ইঙ্গিত। কাকীমা তো ঠিকই করেছিলেন চিঠি লিখবেন বোর্ডের অফিসে। পরে অজয় বোঝানোতে কাজ হয়েছে। আমিও তাই বললাম—লিখে ফল হবে না কিছু। তখন যেন অনেকটা নিরুপায় হয়েই চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন না এটা নিয়ে কিছু করতে পারেন কি-না?

ফেরার পথে আমায় বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল অজয়। কোন কথা বলে নি, চুপ করে ছিল। মায়া হল ছেলেটার জন্য। বললাম—এরা চিটিংবাজ। তুমি কেন এর মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছ?

যেন জবাব রেডি ছিল, শুনে কেসে বলল—এরা চিটিংবাজ ঠিকই। তবে আপনাকে আমাকে ঠকাবে না। মার্কস ঠিকই জেনে দেবে, নম্বরও বাড়াতে পারে। জানি খুব নোংরা ব্যাপার। তবু তানি যাতে পাশ করে তাই আমায় দেখতে হবে।

কোথায় যেন কথার সুরে একটা মরীয়া ভাব লুকিয়েছিল অজয়ের, তাই জানতে চাইলাম—এভাবে পাশ করাতে চাও কেন?

দূরে দোতলা বাস তখন ঝড়ের মত এগিয়ে আসছে। সেই দিকে তাকিয়ে অজয় বলল—আপনি কাকীমাকে বলবেন না, অফিসেও কাউকে না। আমার একার আয়ে চলা সম্ভব নয়। বাবা, কাকা কারুর অনুগ্রহই আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পাড়ার কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট আমায় কথা দিয়েছেন, তানি পাশ করলে নার্সারীতে পড়াবার একটা চান্স দেবেন। তাই ঠিক করেছি দু মাসের জন্য কাকার বাসায় আর না থেকে তানিকে ওর দাদার কাছে রেখে আসব। নিজে যে কোন একটা মেসে গিয়ে উঠব। খরচ কমিয়ে যা বাঁচবে তার সঙ্গে বনমালীর ক্লেশ লোন যোগ দিলে তানি পাশ করে যাবে।

(এ লেখা ছেপে বেরোনোর অনেক অনেক পরে স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরুবে। তানি পাশ করবে নিশ্চয়। চাকরীও হয়তো একটা জুটে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয়ে বনমালীর ধার শোধ হয়ে আর একটি নতুন সংসার পাতার আয়োজন হয়তো সম্পন্ন হবে। আর সুযোগসন্ধানী অ্যাকাডেমিক ঘুঘুরা এ রকম হাজার হাজার অজয়-তানির ঘাড় মটকে বিশ্বাস, , বিবেক, রক্ত শুষে নিয়ে আরো স্ফীতকায় হবে। এদের বাধা দেবার কেউ নেই আজ এদেশে?)

—[illegible]

শরীরের অসুখ হলে আমরা ভাবনায় পড়ি। কিন্তু মন? মনের অসুখ আমরা আমল দিতে চাইনে, বলি ওসব আজগুবি বিলাসিতা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'মনের কথা' বিভাগে পাবেন তার জবাব।

মনের কথা

নিবারণবাবুর কাহিনী
যৌথ-পরিবার ও নিরাপত্তা

(১৪)

বিনোদের চিকিৎসার ব্যাপারে তার অশৈশব জীবনকাহিনী জানার প্রয়োজন হয়েছিল; সব কেসে এত বিশদভাবে ছোট-বেলার ইতিহাস জানার দরকার হয় না। বিনোদ দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার জন্যে আমার কাছে যাতায়াত করেও পুরোপুরি সুস্থ হতে পারে নি। সুস্থ না হবার আনুমানিক কারণগুলো পাঠকরা জেনে-ছেন। এ থেকে তাঁরা যেন এই সিদ্ধান্তে না আসেন যে রক্তচাপবৃদ্ধি বা হার্টের অসুখের ভয় বুঝি পুরোপুরি ভাল হয় না। মনে রাখা দরকার রোগ নিরাময় অনেক কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল এবং মানসিক রোগের ক্ষেত্রে একই ধরনের উপসর্গ হলেই চিকিৎসার ফলাফল একই রকমের হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। নিউরোসিস-চিকিৎসায়, বিশেষ করে অবসেশনের বেলায় ট্রাংকুইলাইজর বা অন্যান্য ওষুধের ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। ব্যাখ্যা, আলোচনা, ভাবভাবন, সংবেশন ইত্যাদি মানসিক চিকিৎসার নানা ধরনের পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করে থাকি। রোগীর মস্তিষ্কের টাইপ, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ ধরনের পদ্ধতির শরণ নিতে হয়। বিনোদের অবসেশন পুরোপুরি দূর হল না বলে ঐ ধরনের অবসেশন মাত্রেই দুরারোগ্য, এ আমরা মনে করি না। দৃষ্টান্ত হিসেবে একই ধরনের আর দুটো কাহিনী বিবৃত করছি। এঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিলেন এবং এখনও সুস্থ আছেন। এঁদের খবর আমি এখনও পেয়ে থাকি। চিকিৎসা করেছিলাম প্রায় ১৪।১৫ বছর আগে।

প্রথমে বলছি নিবারণবাবুর কথা। আমার কাছে পাঠালেন এক ডাক্তার বন্ধু। বয়স ৪৫। রোগা পাতলা চেহারা। ভুগছেন প্রায় কুড়ি বছর। একলা চলাফেরা করতে পারেন না; একলা এক ঘরে থাকতেও পারেন না। এক বিলাতি কোম্পানীর এ্যাকাউন্ট্যান্ট। চেম্বারে একলা বসতে পারেন না, খাস বেয়ারা টুল নিয়ে ভেতরেই থাকে। দরোজা খোলা রেখে বাথরুমে যেতে হয়। স্ত্রী বা অন্য কেউ বাথরুমের দরোজা আগলে বসে থাকে। নিবারণবাবুর ভয়, যে কোনো মুহূর্তে তাঁর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ডাক্তার ও আনুষঙ্গিক সাহায্যের প্রয়োজন যে কোনো সময়ে দরকার হতে পারে বলেই সব সময়ে তিনি সাহায্যকারী নিয়ে ঘোরাফেরা করেন; অফিস-চেম্বার ও বাথরুমেও একলা থাকতে পারেন না। হার্ট ফেল করার ভয় থেকে একলা থাকার ভয় জন্মেছে, কিন্তু গুরুত্বে দুই ভয়েরই সমান। পাঁচ মিনিট একলা থাকতে হলেই দেহ-মনে ভয়ের উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং হৃদ্-যন্ত্র অচল, বিকল হয়ে এল মনে হয়। এর ওপর আছে পেটের গোলমাল। কোনো কিছুই হজম (?) হয় না। সব সময়ে পেটে বায়ু; ঘন ঘন ঢেকুর উঠছে, তবু বায়ুর চাপ কমে না। কয়েক-দিন কোষ্ঠবদ্ধতা চলে, তারপর সুরু হয় পাতলা পায়খানা, মিউকাসে ভরতি। বারে বেশি নয়, তবে পরিমাণে বেশি। কোলাইটিস্-এর চিকিৎসা চলছে। কোনো চিকিৎসাতেই কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। হজমের ওষুধ দু' বেলা খেয়ে যাচ্ছেন, প্রতিদিন 'ডুস' নিচ্ছেন, তবুও কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হচ্ছে না। পেটে বায়ুর চাপ বাড়লে ভদ্রলোকের ভয় আরো বাড়ে, মনে হয় হৃদপিণ্ড এখুনি কাজ বন্ধ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। বুকের বাঁ-দিকে তীব্র বেদনা বোধ করেন এবং তখুনি ডাক্তার ডাকতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার কোনো অনিয়ম তিনি করেন না; আজে-বাজে কোনো জিনিষ খান না, তা সত্ত্বেও বায়ুর উপদ্রব যাচ্ছে না। সকালে আধ ছটাক চালের ভাত ও মশলা না দেওয়া মাছের ঝোল, অফিসে দুটো মাত্র বাড়ীর তৈরী সন্দেশ, আর রাত্রে খান চারেক গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি;—এই তাঁর সারা দিনের খাদ্য।

অনেক ক্ষেত্রেই এই তথাকথিত 'কোলাইটিস' আর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আকস্মিক মৃত্যু হবার ভয়—একই রোগীর মধ্যে দেখা যায়। 'কোলাইটিস'কে বাংলা ভাষায় 'বৃহৎ-অন্ত্র-প্রদাহ' নাম দেওয়া যেতে পারে। পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা আমাদের দেশে খুবই ব্যাপক। অ্যামিবা ও জিয়ার্ডিয়াকে সাধারণত এই বিশৃঙ্খলার জন্যে দায়ী করা হয়। কিন্তু অ্যামিবা এবং জিয়ার্ডিয়ার প্রচলিত চিকিৎসাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণ আরোগ্য হবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। প্যাথলজিস্টরা এর কারণও অনেক নির্দেশ করে থাকেন। 'এ্যামিবিয়াসিস', 'জিয়ার্ডিয়া-সিস'-এর নতুন অব্যর্থ মহৌষধ প্রতি বছরই দুটি একটি করে আবিষ্কৃত হয়; কিন্তু হিসেব-নিকেশ করে দেখা যায় যে আরোগ্যের হার বাড়ে নি। অনেক সময় বারবার পরীক্ষা করেও হয়ত 'এ্যামিবা', 'জিয়ার্ডিয়া' পাওয়া গেল না; তা সত্ত্বেও ডাক্তাররা হজম বা পাকযন্ত্রের গোলমালের জন্য কোনো না কোনো রোগ-জীবাণুকে দায়ী করে থাকে। এবং সেই মত চিকিৎসাও চলতে থাকে। 'কোলাইটিস'-এর বেলাতেও মানসিক কারণ (পাঠ্য-পুস্তকে বলা হয়,—নার্ভাস এ্যান্ড ইমোশনাল ফ্যাক্টর) স্বীকার করে নিয়েও প্রচুর পরিমাণে হজমের ওষুধ, বিরেচক, ডুস, এনিমা ইত্যাদির ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ডুস, এনিমা এক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক। অন্ত্র-প্রদাহকে চিরস্থায়ী করে তোলে। আজকাল অবশ্য এ-সব ক্ষেত্রে তরুণ ডাক্তাররা অনেক সময় 'ট্রাংকুই-লাইজার' ব্যবহার করছেন, কিন্তু এইসব 'অবসেশন'-এর রোগীদের এতে বিশেষ কোনো উপকার হয় না। পুরনো অ্যামিবিয়াসিস্, 'জিয়ার্ডিয়াসিস' অনেক সময়ই 'কোলাইটিসের' মতই নার্ভাস এ্যান্ড ইমোশনাল ফ্যাক্টর'-এর সঙ্গে জড়িত। নিউরোসিসের শরীরগত উপসর্গ। আবার কোনো কোনো সময় এইসব আন্তর-যন্ত্রের প্রদাহ মস্তিষ্ক-কোষকে উত্তেজিত করে মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ ও ভয় সৃষ্টি করে থাকে। এ-আলোচনা আমরা অন্য

এক সংখ্যায় বিশদভাবেই করেছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পাচনক্রিয়ার বিশৃঙ্খলার দরুন পাকাশয়ের এবং বৃহদন্ত্রের নিঃসৃত রস গেঁজে ওঠে (ফারমেন্টেশন)। পেট ফুলে ওঠে, তল পেটেও গ্যাস হয়। পাকাশয় ও হৃৎপিন্ডের মাঝখানে যে পাতলা পরদাটি আছে সেটা ঠেলে ওপর দিকে ওঠে এবং হৃৎপিন্ডের উপর চাপ বাড়ে। রোগীর মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নিবারণবাবু ডাক্তার ডাকতে পাঠান। 'কোলাইটিস', 'এ্যামিবিয়াসিস', এইভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের উপসর্গ তৈরী করে মৃত্যুভয়ের সৃষ্টি করতে পারে। এ-ছাড়া 'রিফ্লেক্স-জনিত বুক ধড়পড়ানি এই সময় ভয়কে আরো বাড়িয়ে তুলে জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে।

নিবারণবাবুর ক্ষেত্রে 'কোলাইটিস' থেকে অন্য উপসর্গের উদ্ভব। হার্ট সম্পর্কে সব ডাক্তারই একমত—কোনো গোলমাল নেই। তা সত্ত্বেও নিবারণবাবুর ধারণা যে কোনো সময়ে হার্ট-ফেল করে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।

আমার কাছে এলেন তিনটি ফ্ল্যাট-ফাইল ভরতি রিপোর্ট প্রেসক্রিপশনস ইত্যাদি নিয়ে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৫—এই কুড়ি বছরের মধ্যে কোলকাতার অন্তত কুড়িজন সর্বোচ্চতলার বিশেষজ্ঞকে দিয়ে নিবারণবাবু বার-বার পরীক্ষিত হয়েছেন। বছরে তিন চারটে করে ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাফ নেওয়া হয়েছে, কোনো অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ে নি। রক্ত, থুতু, মল, মূত্র পরীক্ষার রিপোর্ট অসংখ্য জমেছে ফাইলে। এ-ছাড়া মহারথী চিকিৎসকদের অভিমত ও ব্যবস্থাপত্র মিলে সে এক বিরাট ব্যাপার। দাদা ডাক্তার আর নিজেরও পয়সার অভাব নেই। কাজেই তিন মাস অন্তর চেক-আপ ও চিকিৎসক পরিবর্তন চলেছে। ডাঃ সরকার, ব্রহ্মচারী, ভট্টাচার্য, রায়, রায়-চৌধুরী থেকে সুরু করে যুদ্ধ-পূর্ব ও যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের সকল চিকিৎসকই এক বাক্যে বলেছেন—"না হে, তোমার হার্টের কোনো ট্রাবল্ নেই। তবে হ্যাঁ, পেটটা সারিয়ে ফেল। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া কর। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ঘুরে এস। সব ঠিক হয়ে যাবে।" নিবারণবাবুর প্রতিক্রিয়া তাঁর কথাতেই শুনুন। "ডাঃ বোস-এর ধর্মতলার চেম্বার থেকে খুব খোশ মেজাজে বের হলাম। ডাঃ ব্রহ্মচারীও ত' সেদিন এই কথা বললেন। হার্টের কোনো দুর্বলতা বা অসুখ নেই। মিছিমিছি ভয় পাওয়ার কোনো মানেই হয় না। আজ থেকে বাথরুমের দরোজা খোলা রাখব না। বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে কোনো সিনেমা দেখতে যাব। অনেকদিন সিনেমা দেখা হয় নি। মনের মধ্যে বেশ স্বস্তির ভাব। ড্রাইভারকে গাড়ী জোরে চালাতে বললাম। সে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। সাধারণত জোরে চালাবার জন্যে আমার কাছে ধমক খেয়ে থাকে। কিন্তু শোভাবাজারের মোড়ে আসতে না আসতেই মেজাজ বিগড়োতে সুরু হল। ডাঃ বোস ত দাদার বন্ধু, আমাকে অনেক দিন ধরে চেনেন, খুবই স্নেহ করেন। আমি ভয়কাতুরে, তাও জানেন। আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে আসল অবস্থাটা গোপন করেছেন বোধ হয়। হ্যাঁ,......সেইটেই ত স্বাভাবিক। গ্রাফ্‌টা অন্য কাউকে দেখাতে হবে। পুরনো চেনাশোনা ডাক্তারদের কাছে আর যাব না। ওরা সবাই মনে করে আমি বাতিকগ্রস্ত। দাদারও তাই ধারণা। একেবারে অচেনা, নতুন, টাটকা বিলেত থেকে এসেছে এমনি কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল, পেট বায়ুতে ভরতি হয়ে গেল, নিঃশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল, প্যাল্‌পিটেশন সুরু হয়ে গেল। বাড়ী পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে—'পুনর্মূষিকোভব'। যা ছিলাম তাই হয়ে গেলাম।"

আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চেক-আপ, আর একটা কার্ডিওগ্রাফ, আর একবার চিকিৎসক-বদল। আর একবার আশা-নিরাশার মধ্যে দোল খাওয়া। কিছুতেই হৃদরোগের ভয় থেকে পরিত্রাণ মিলছে না। বড় বড় ডাক্তারদের 'মাভৈ' বাণী সত্ত্বেও নিবারণবাবু ভয় পাচ্ছেন। কেন?

আগেই জানিয়েছি নিবারণবাবু পাশ করা এ্যাকাউন্ট্যান্ট। দক্ষ হিসাব-নবীশ। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও খুব হিসেবী। সুশৃঙ্খল ও নিয়মনিষ্ঠ। যৌথ পরিবারের মধ্যে মানুষ। বাবা-কাকারা আড়তদারী ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। নিবারণবাবুরা তিন ভাই। বড়-ভাই ডাক্তার, ছোটভাই ইঞ্জিনীয়ার। বড়-ভাই সরকারী চাকরী করেন, বদলির চাকরী। ছোটভাই উত্তরপ্রদেশের এক শহরে চাকরী করেন। বড় ছোট দুজনেরই পৈত্রিক ব্যবসায় ও পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা করে নিজেদের অংশ বেচে দেবার ইচ্ছে অনেক দিন ধরে। কিন্তু কিছুতেই ব্যাপারটা ঘটে উঠছে না। ছুটি নিয়ে কলকাতায় দু মাস একনাগাড়ে থাকতে না পারলে হাঙ্গামা মিটবে না। দিনক্ষণ ঠিক করে তিন ভাই যখন ভাগ-বাটোয়ারার জন্য একত্র হচ্ছেন, তখনই আবার নিবারণবাবুর অসুস্থতা এত বেড়ে যাচ্ছে যে তাঁকে নিয়ে দু'ভাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

তিনজনের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসল কাজ এগুচ্ছে না। আমার কাছে বার বার নিবারণবাবু এই কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে বললেন। 'পার্টিশান' এ বছরের মধ্যে না হলে তিন ভাই-এর প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দুই ভাই-ই এখন কোলকাতায়। দু' মাস থাকবেন। "কিন্তু মজা দেখুন, আমি আবার ঠিক এই সময়টাই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমি ছাড়া খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে, এটর্ণি উকিলের সঙ্গে কথা বলার দ্বিতীয় লোক নেই। ভাইরা হিসাবপত্তর বোঝে না।"

প্রথম রোগের সূত্রপাত কখন হয়েছিল? তখনও কি পারিবারিক ব্যাপারে এই রকম কোনো বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল?

একটু চিন্তা করে নিবারণবাবু বললেন, সেই সময় বাবা-কাকাদের মধ্যে মামলা মোকর্দমার সূত্রপাত হয় এবং আট দশ বছর মামলা চলার পর তাঁরা আলাদা হয়ে যান। ইতিহাস থেকে বোঝা গেল নিবারণবাবুর রোগের সূত্রপাত ও হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে যৌথ পরিবারের ভাঙাগড়ার সম্পর্ক রয়েছে।

যৌথ-পরিবারের মধ্যে মানুষ হবার ফলে নিবারণবাবুর মানসিকতা সামন্ত-তান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। শৈশব থেকে একান্নবর্তী যৌথ-পরিবারের একতার মধ্যে নিজের নিরাপত্তা-বোধ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর বাবাও তারই মত ছিলেন। ছোট-বড় দুই ভাই-ই বিদেশ থেকে শিক্ষালাভ করে অনড় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা সচল পরিবর্তনশীলতার মধ্যে নিজে-দের নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছে। নতুন যুগের সঙ্গে, মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে; নিবারণবাবু পারছেন না। যুক্তির দিক থেকে পার্টি-শানের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই বলবার নেই। তাঁদের পরিবারকে আর কোনোক্রমে যৌথ বলা চলে না, একান্নবর্তী ত' নয়ই। তিন ভাই তিন জায়গায় থাকেন, কালে-ভদ্রে দেখা হয়! অবশ্য ডাক্তার ভাই-এর চাকরী বাংলা দেশের মধ্যেই; প্রয়োজন-মতই তাঁকে পাওয়া যায়। ভায়ের জন্য মাসে একবার তিনি নিয়ম করে কোলকাতায় আসেন; এছাড়া টেলিফোন-কল পেয়ে কখনও-কখনও আরো ঘন-ঘন আসতে হয়। নিবারণবাবুর নিরাপত্তাবোধ ডাক্তার দাদাকে ঘিরে। তাঁর ওপর নিবারণবাবুর বিশেষ নির্ভরতা। শিশুসুলভ দুর্বলতার পর্যায়ে পড়ে এই নির্ভরতা। পার্টিশন হলে, নিবারণবাবু মনে করছেন, দাদা আর নির্ভরযোগ্য থাকবেন না। তাছাড়া পৈত্রিক বাড়ী বেচে দেওয়া হবে। খদ্দের ঠিক হয়ে গেছে। পুরনো বাড়ী ভেঙে সেখানে নতুন ইমারত গড়ে উঠবে। মা-বাবার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই বিরাট বাড়ীর কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ পার্টিশন তাঁদের তিন ভায়ের দিক থেকে শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্য। ভাগ-বাটোয়ারার নির্ধারিত সময়ের কাছাকাছি এসে নিবারণবাবুর অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণের মূলে পার্টিশন সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব। পার্টিশন না হলে আর্থিক ক্ষতি ঘটবে পার্টিশন হলে নিরাপত্তার অভাব বাড়বে। গত দশ বছর ধরে এই মানসিক টানা-পোড়েনের মধ্যে রয়েছেন ভদ্রলোক।

আর্থিক দিক থেকে নিবারণবাবু পুরোপুরি আত্মনির্ভর। তাঁর নিরাপত্তা-বোধ, যা এখন একমাত্র ডাক্তার-দাদার সঙ্গে জড়িত, সম্পূর্ণভাবে মানসিক স্তরের ব্যাপার। সেখানে বৈষয়িক বা অন্য কোনো স্বার্থ দেখা যাচ্ছে না। নিবারণবাবু অবশ্য মনে করছেন যে, তাঁর হার্ট-এর অসুখের জন্যই সবকিছু গোলমাল। হার্টের অসুখ সেরে গেলে দাদার প্রতি এই আকর্ষণ, এই আনুগত্য আর থাকবে না।

নিবারণবাবুর সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্য ও নির্ভরশীলতা নিয়ে কয়েক দিন আলোচনার পর নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণ তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন। যৌথ-পরিবারের উপর এ যুগে নির্ভর করা চলে না। যৌথ-পরিবারই এযুগে অচল। ভেঙে পড়তে বাধ্য, ভেঙে পড়বেই। তবে এই নির্ভরতার সঙ্গে তাঁর রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক বুঝতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগল। নিবারণবাবু স্বীকার করলেন, দাদার উপর তাঁর নির্ভরতা রয়েছে। সেটা অসুস্থতার দরুন। আমি বললাম, ঠিক উল্টো। নির্ভরতার দরুন অসুস্থতা, অসুস্থতার দরুন নির্ভরতা নয়। নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই অসুস্থতা সারবে।

'কিন্তু ভয়, মৃত্যুভয় মনের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বাসা বাঁধল কি করে? আমার চেনা এক ভদ্রলোকের তিন-বার স্ট্রোক হয়েছে; তা সত্ত্বেও সে ত' দিব্যি তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি ডাক্তারদের পেছনে দৌড়চ্ছি, আর ডাক্তাররা তার পেছনে দৌড়ে তাকে ধরতে পারে না। আমার ডাক্তাররা বার-বার বলছে, আমার হার্টের অসুখ নেই; তবু আমি তাদের কথা মেনে নিতে পারছি না কেন? যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝছি, মনকে সেটা বোঝাতে পারছি না কেন?'

অবসেশনের মনস্তাত্ত্বিক ও শারীর-বৃত্তিক ব্যাখ্যা সহজ করে নিবারণবাবুকে বুঝিয়ে দিলাম।

নিবারণবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। পর দিনই এসে আমাকে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'হার্টের অসুখের সূত্রপাতের কারণটা এবার আমি ধরতে পেরেছি। বাবা-কাকাদের বিরোধে আপসের চেষ্টা বিফল হবার পরদিনই ঠাকুর-দাদা মারা যান। বয়স হয়েছিল; কিন্তু কোনো রোগ ছিল না। সুস্থ মানুষ দুপুরে সেদিন রোজকার মত ঘুমিয়ে-ছিলেন; সে ঘুম আর ভাঙে নি। ডাক্তার-কাকা বলেছিলেন, — ভায়ে-ভায়ে লড়ায়ের চোট গিয়ে বাপের ওপরেই পড়ল। বাবা বলেছিলেন,—মন খারাপের জন্যই হার্ট-ফেল হয়েছে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। ঠাকুরদাকে আমি খুবই ভালবাসতাম, আমার হার্ট-এর অসুখের সূত্রপাত ঐ সময় থেকেই।...

...আশ্চর্য। কোনোদিন এভাবে ব্যাপার-টাকে বোঝবার চেষ্টা করি নি। এইবার অনেক কিছু বুঝতে পারছি।'

হার্ট সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা এই সময় থেকে কমতে শুরু হল। এই সময় থেকে সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন দিতে থাকি। বিনোদের নার্ভতন্ত্রে প্রথম সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য ছিল, তবু তাকে সম্মোহিত করা যায় নি। নিবারণ-বাবুকে সম্মোহিত করতে বেগ পেতে হয় নি, যদিও তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রভাব বেশি। হজমের শারীরবৃত্ত, ও গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে পাচন-ক্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে একদিন আলোচনা করলাম। রুশবিজ্ঞানী বিকফ-এর 'কর্টিকো-ভিসে-রাল রিফ্লেক্স, মানে, গুরুমস্তিষ্ক-আন্তরযন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বললাম। বিনোদবাবুর উদ্বেগ ও ভয় আরো কমল। ডাক্তার ডানবার, ডাক্তার আলেকজাণ্ডার প্রমুখ আমেরিকান লেখকদের দু-একটা রোগী-কাহিনী পড়ে শোনালাম। তত্ত্ব ও চিকিৎসার দিক থেকে পাভলভিয়ান বিকফ এবং ফ্রয়েডিয়ান ডানবার আলেকজাণ্ডার ইত্যাদির মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক; তবুও একথা স্বীকার করছি যে, রোগীদের কাছে সাইকো-সোমাটিক মেডিসিনের প্রবক্তাদের 'কেস হিস্ট্রি'গুলো ভয় দূর করতে অনেকখানি সাহায্য করে থাকে।

চার মাসের মধ্যে নিবারণবাবু সুস্থ হয়ে উঠলেন। যে ডাক্তার বন্ধুটি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর পাশে বসে, দশ বছর বাদে প্রথম নেমন্তন্ন বাড়ীর রান্না খেলেন। মৃত্যুভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে একলা থাকার ভয় ও বায়ুর চাপের ভয়, দূর হয়েছে। পৈত্রিক বাড়ী ছেড়ে এক বছরের মধ্যেই দক্ষিণ কোলকাতায় নিজস্ব গৃহে উঠে গেলেন। তার আগেই অবশ্য আপসে পার্টিশান হয়ে গেছে। এর পর একবার মাত্র ভদ্রলোক কয়েক দিনের জন্য আমার কাছে যাতায়াত করেছিলেন। সেসময় নিদ্রাহীনতায় ভুগ-ছিলেন। নিবারণবাবুর চিকিৎসায় খুব স্বল্পমাত্রায় 'কৌফিন-ব্রোমাইড' ব্যবস্থা করেছিলাম। সেও খুব অল্প কয়েক দিনের জন্য। আধুনিক ট্রাংকুইলাইজার জাতীয় ওষুধ তখন বাজারে বিশেষ কিছু ছিল না।

রোগ সারানোর ব্যাপারে যদিও চিকিৎসাপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তবুও ডাক্তার এবং রোগীর ভূমিকাও উপেক্ষা করার মত নয়। কোনো চিকিৎসক সব রোগীর বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন না; সব রোগীকে ভাল করতে পারেন না। রোগীও ডাক্তারবিশেষেত্তর সংস্পর্শে এসে রোগ-মুক্তি সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে ওঠে এবং রোগ সারাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে; অনেক কিতাব লেখা হয়েছে; কিন্তু এ সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় কম নজরে পড়েছে। ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক নিয়ে, বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল। আমাদের দেশে পুরনো সামাজিক ঐতিহ্যের পরি-বর্তনের সঙ্গে ডাক্তার-রোগী সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটছে। স্যার নীলরতন বা ডাক্তার বিধান রায়ের সামন্ততান্ত্রিক পিতৃ-প্রধান সমাজে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা ও যে অবদান ছিল; আজকের সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই ভূমিকা গ্রহণ করার চিকিৎসক নেই; সেই ভূমিকার সাফল্যের আশাও সুদূরপরাহত। সমাজ বদলাচ্ছে, ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর সম্পর্ক বদলাচ্ছে; ডাক্তারের ভূমিকাও পাল্টাচ্ছে।

—মনোবিদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। দশ ।।

ফের সূর্য উঠেছে নিজামতকেল্লার শীর্ষদেশে। গাছগাছালির পাতায় কুয়াশার মলিনতা দূর করছে বিচ্ছুরিত রৌদ্ররশ্মি—তাকে নিঃসন্দেহে, বিশেষত এই অমল সকালে অলৌকিক সমার্জনী বলে ভ্রম হতে পারে। সারাটি রাতের আবর্জনা জড়ো করে যেন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই প্রতিটি সকালকে মনে হয়েছে এতদিন, একেকটি শুচিতার আয়োজন।

আজ অনুভূতি অন্য রকম। সূর্য উঠেছে। তবু যেন অশুচিতা থেকে গেল আজ। আলোর সকাল এল। তবু যেন অনেকখানি অন্ধকার থেকে গেল।

শুধু থেকে যাওয়া নয়, স্পষ্টতার পরিবর্তে আরো অস্পষ্টতা, আরো কিছু অন্ধকার, কিছু অশুচিতা জেগে উঠল। প্যালেসহোটেলের প্রতিটি মুখে তার ছাপ পড়েছে। কোন মুখে হাসি নেই। চপলতা নেই। প্রতিটি মুখে সন্দেহ অবিশ্বাস ও সতর্কতা। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে। কারো একা থাকতে ইচ্ছে করে না। অথচ সন্দেহ অবিশ্বাস ত্রাস—সুতরাং এসবের ফলাফল-স্বরূপ ঘৃণা ওদের একত্র থাকতে দিচ্ছে না।

এক্ষণে সারা হোটেল ঘিরে পুলিশের বেড়াজাল। ওখানে জাফরাগঞ্জের আঁধার-মহলেও কড়া পাহারা। হোটেলের উত্তরে জঙ্গুলে বাগানের ভিতর ভাঙা মসজিদ আর ডোবাটাও ঘিরে রেখেছে ওরা। ঘিরে রেখেছে মোতিঝিলের পাশের জঙ্গলে সেই গম্বুজঘরটাও।

সবাই টের পেয়েছে, এত তৎপরতার মূলে আছেন কর্ণেল এন সরকার। পুলিশ সুপার বর্মণের নাকি পিতৃবন্ধু উনি। বহরমপুরে ট্রাংককল করেছিলেন শোনা যাচ্ছে। স্পেশাল তদন্ত স্কোয়াড আর দুঁদে ডিটেকটিভ অফিসারেরা এসে গেছেন এক ঘণ্টার মধ্যে। আরও গুজব, কলকাতা থেকেও বিকেলের গাড়িতে বিশেষজ্ঞরা আসছেন। শহরের সবখানে ফিসফিস, কানাকানি গুজব আর সতর্কতা। সদর-গেটের বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র লোক। এ শহরে এমন ঘটনার নজীর নেই। বৈচিত্র্যহীন শহরবাসীদের জীবনে এ একটা আশ্চর্য থ্রিল।

নীচের তলায় ডাইনিং হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে রয়েছে সবাই। এটা পুলিশেরই আদেশ। দিব্যেন্দু আর স্বাতী, দীপেন বোস আর ইরা, অধ্যাপক আর সুদেষ্ণা জোড়া-জোড়া আলাদা টেবিলে বসেছে। চীনা একা একটা টেবিলে। কিছুক্ষণ আগে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে বিভাস আর নীরেনকে আনা হয়েছে। তারা একত্র পৃথক টেবিলে বসেছে। সবাই চুপচাপ। চিন্তিত। উদ্বিগ্ন। মনের দিক থেকে সবাই আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা বোধ করছে।

সুরঞ্জনের ঘরের পাশে যে-ঘরটায় দারোয়ান থাকে, সেটা আসলে অতিথিদের ওয়েটিং রুম। তেমনি সাজানোগোছানো। কিন্তু কাজে লাগে না বলে একটা খাটিয়া পেতে বাহাদুর সেখানে রাত্রিযাপন করে। আজ খাটিয়াটা বের করতে হয়েছে তাকে। ওঘরে পুলিশ অফিসাররা বসেছেন। কর্ণেলও আছেন তাঁদের সঙ্গে। ওখানে

বসেই সবাইকে একে একে ডাকা হবে। জিগ্যেসপত্তর করা হবে।

সুরঞ্জন উদ্বিগ্ন মুখে রিসেপসনে বসে রয়েছে। বাবুর্চিখানায় তোরাপ হোসেন বাবুর্চি, গঙ্গারাম ঠাকুর (অর্থাৎ সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অপূর্ব দৃষ্টান্ত!) রতন শম্ভু আর মানদা গম্ভীরমুখে বসে আছে। ব্রেকফাস্ট পরিবেশন শেষ। নিত্য বরাদ্দ থাকে চারটে মাটন কিংবা ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ, জোড়া ডিমের মামলেট, আর একপট চা কিংবা কফি। আজ চা-কফি ছাড়া কেউ ছোঁয়নি কিছু। না—কেবল নীরেনই বরাদ্দটা বর্জন করেনি। সে ম্লান হেসে অস্ফুটকণ্ঠে বিভাসকে বলেছে, ভীষণ খিদে পেয়েছে—ডোণ্ট মাইন্ড। বিভাস মাথা দুলিয়েছে মাত্র। ওদিকে সুদেষ্ণার তো এ ম্লেচ্ছতা অসহনীয়—প্রত্যূষকালীন অভ্যাসমত কিছু গঙ্গাজল পান করেই ক্ষান্ত রয়েছে। এখন তার মূর্তিটি ধ্যান-স্তব্ধ। কিন্তু নাকের ডগা কুঞ্চিত। চোখ দুটি বোজা।

ওয়েটিং রুমের টেবিলে দুটো ম্যাপ। ডিটেকটিভ অফিসার সত্যজিৎ গুপ্ত, স্থানীয় পুলিশ অফিসার অপরেশ ভদ্র আর কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার তিনদিক থেকে ঝুঁকে রয়েছেন ম্যাপের ওপর। মিঃ গুপ্ত বলছিলেন, প্রথমে এই ম্যাপটা দেখুন। জাফরাগঞ্জের আঁধার মহলের ম্যাপ।..

ডাইনের দরজায়। আর শুভও ঢোকে বাঁদিকেরটায়। নীরেন বা বিভাস কেউ একজ্যাক্ট টাইম বলতে পারেনি—বলেছে আধ ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি হতে পারে, তারা ভিতরে ঘুরেছে। অন্ধকারে ঘুপচি ঘর আর কবরে-কবরে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য কী? তার জবাবও আমরা পেয়েছি। ওরা নাকি বেরোনর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। সেটা অবশ্য খুব অস্বাভাবিক নয়। খাদিম অর্থাৎ সেবায়েত মহবুব খাঁ বলেছে, বাবুরা ঠিক সকাল দশটায় ভিতরে ঢোকেন। তারপর সে রাস্তার ওপারের একটা দোকানে মোমবাতি কিনতে যায়। সেখানে কয়েক মিনিট দেরী হয়েছিল। তারপর সে যায় আবগারীতে—দোকান থেকে জাস্ট পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে সে গাঁজা কেনে। তারপর যায় মখদুম-পীরের আস্তানায়—ধরে নিচ্ছি দু মিনিটের পথ আবগারী থেকে। আস্তানার দরবেশের কাছে বসে অভ্যাসমত গাঁজা খাওয়া আর আড্ডা দেওয়ার সময়টাই সে সঠিক বলতে পারছে না। আমরা ধরে নিচ্ছি, পনের মিনিট—কিংবা কুড়ি মিনিট—তার বেশি কখনো নয়। কারণ, অতক্ষণ বাইরে থাকলে তার প্রতিপদে চাকরী হারানোর ভয় রয়েছে। সব সময় ট্যুরিস্ট আসছে—বিশেষত শীতের সময় এটা। কাজেই সম্ভবত আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ

তলায় উঠেছিল যে সিঁড়ি বেয়ে—সেটা রয়েছে শেষ প্রান্তে। সেই ঘরেই শুভর লাশ পাওয়া গেছে। অথচ নীরেন নাকি কিস্যু দেখেনি। এটা হতে পারে না। মহবুব খাঁ বলেছে, দুজনের চেহারা বেশ পেরেসান (ক্লান্ত) দেখাচ্ছিল। মহবুবের মতে, এটা স্বাভাবিক। ভিতরে গেলে অতিবড় সাহসী আদমীও দুবলা হয়ে ওঠে—সে বহুবার দেখেছে। যাই হোক, মিনিট পাঁচেক নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা শুভর অপেক্ষা করে। সিগ্রেট খায়। দুটো সিগ্রেটের টুকরোও আমরা পেয়েছি। দুটোই কিন্তু আধ-পোড়া অবস্থায়—থামে ঘষে নিভানো। থামের গায়েও তার চিহ্ন রয়েছে। তারপর দুজনে পাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যায়। শুভর নাম ধরে জোরে ডাকে। সাড়া পায় না। নেমে আসে দুজনে। সেই সময় কিন্তু দুজনে ভীষণ হাসাহাসি করছিল। মহবুব দেখেছে। ওরা হাসতে হাসতে খাদিমকে বখশিস দিয়ে চলে যায়। সে-হাসির কারণ আমরা ওদের মুখে শুনেছি। ওরা ভেবেছিল, শুভ কৌশলে কেটে পড়েছে। সোজা কল্পনার কাছে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। হোটেলে ফিরে আসে ওরা জাস্ট একটায়। সেখানে কল্পনা বা শুভ সেই দেখে ওরা নাকি সন্দেহটা খাঁটি ধরে নেয়। এদিকে মহবুব আর শুভর সম্পর্কে মাথাব্যথা

।।।। দরজা
△ কবর
● স্তম্ভ
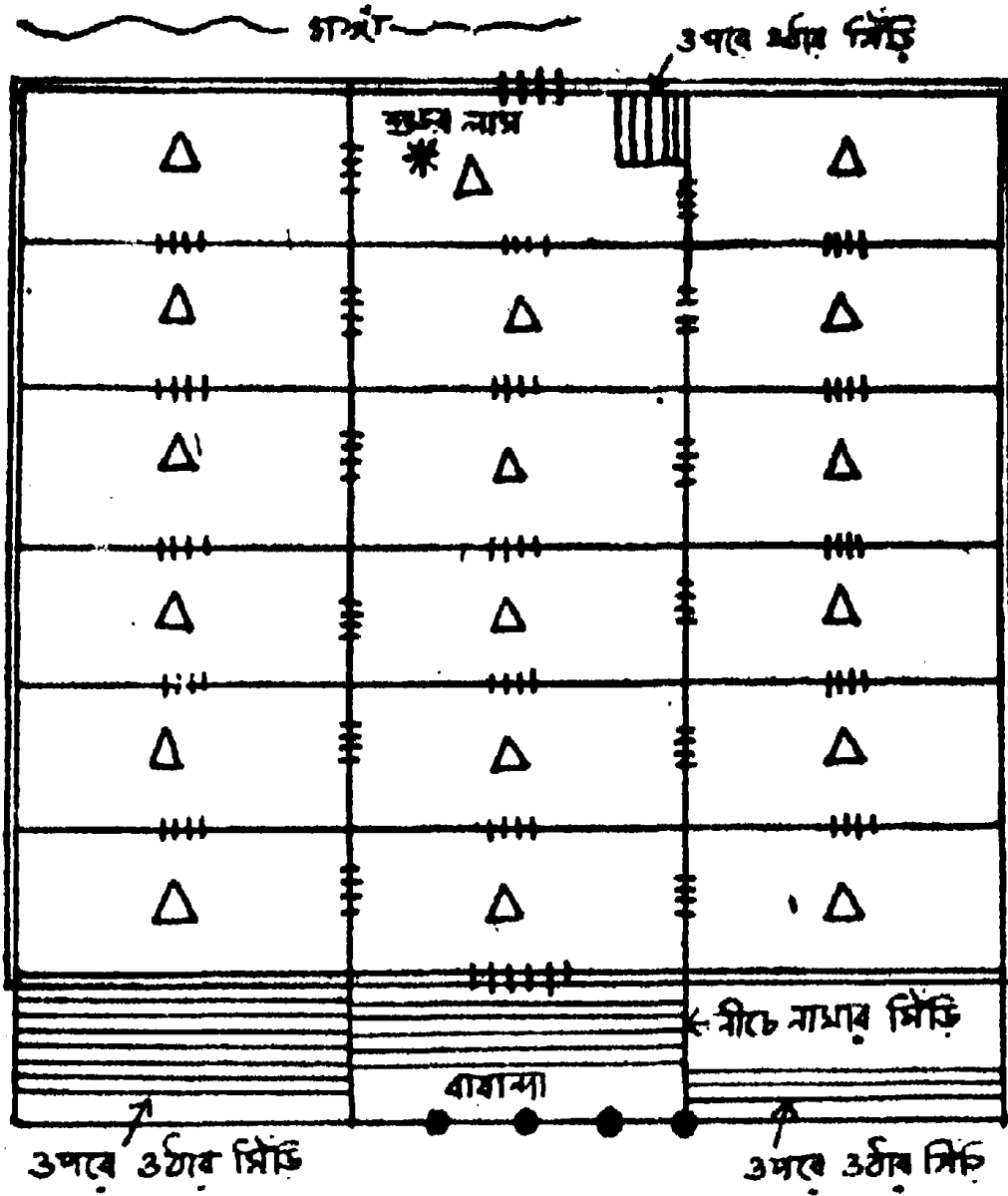
চিত্র ১ - আঁধার মহলের নীচের তলা
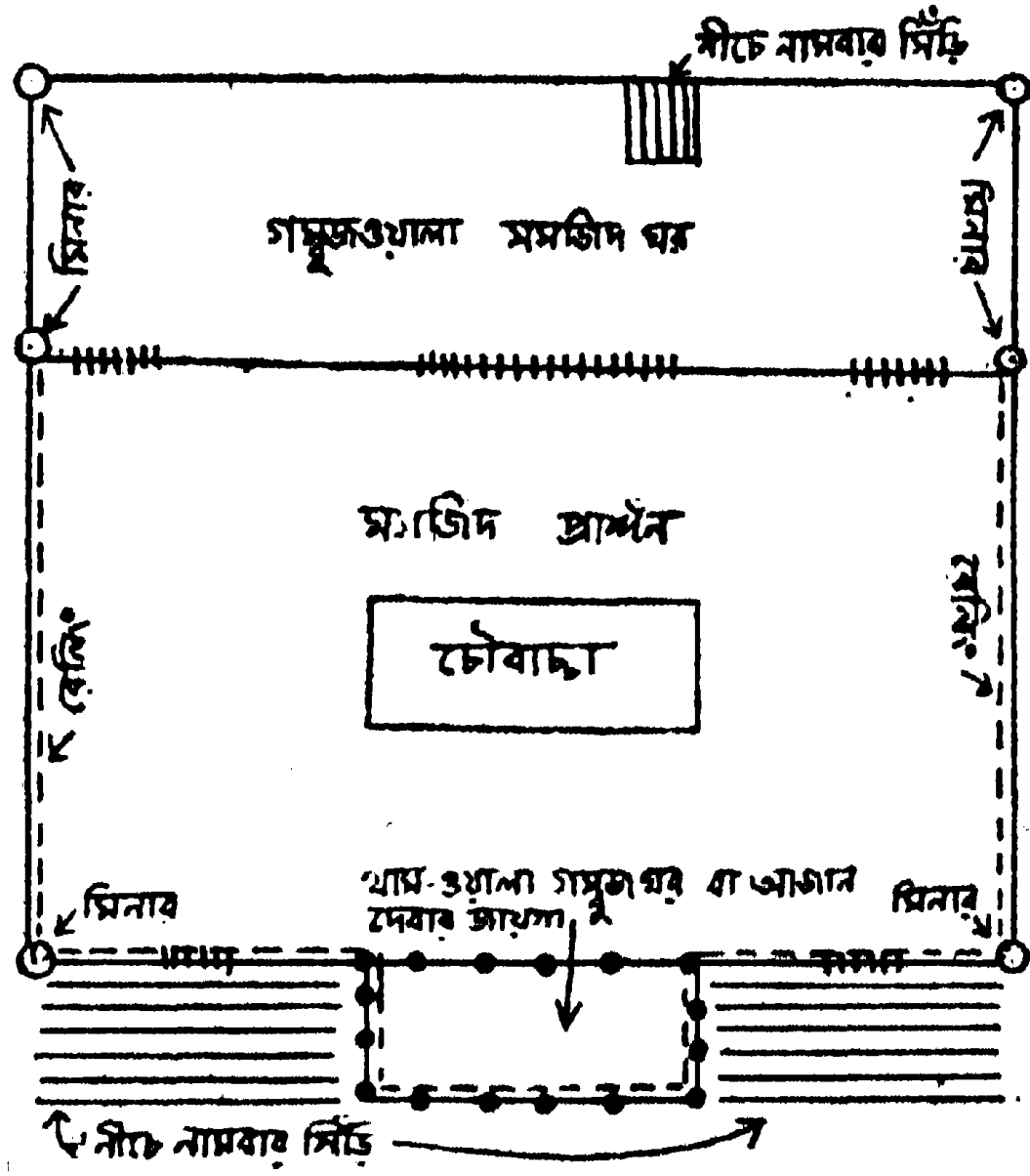
চিত্র ২ - আঁধার মহলের ওপরতলার মসজিদ

...স্বভাবত আমাদের যা মনে হবে বা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য যা পাচ্ছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে বিভাস কিংবা নীরেন ছাড়া এ কাজ অন্য কারো হতে পারে না। সিঁড়ির নীচেই অর্থাৎ সামনের ঘরে প্রথমে ওরা তিনজন ঢুকেছিল। তারপর নীরেন ঢোকে বাঁদিকের দরজা দিয়ে, বিভাস মিনিটের মধ্যে মহবুব খাঁ ফিরে আসে। তখন কবরের ওপরতলায়—তার মানে মসজিদের প্রাঙ্গণে দেখতে পায় বেঁটেবাবু অর্থাৎ নীরেনকে। নীরেন সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে নেমে আসে তার কাছে। অন্যবাবু-দের কথা জিগ্যেস করে। তার আন্দাজ এক মিনিট পরেই নীচে বাঁদিকের দরজা থেকে বিভাস বেরোয়। এখানে লক্ষ্য করুন ম্যাপটা। নীরেন নীচের তলা থেকে ওপর-করেনি। কারণ ম্যাপটা লক্ষ্য করুন। নীচের তলার শেষ প্রান্তে মাঝের ঘরটার একটা দরজা আছে—সেটা প্রায় ভাঙা। ওখান দিয়ে বেরোলে গঙ্গার ধার। তাছাড়া মহবুব খাঁ অতক্ষণ ওখানে ছিল না। শুভ চলে গেলেও সে দেখতে পায়নি। আর সব-চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, তখন সে রীতিমত গাঁজার নেশায় টইটুম্বুর।

আরামকেদারায় ঢুলে বসে অভ্যাসমত ঝিমোতে শুরু করেছে।

সবাই হেসে উঠল। কর্ণেল একটা চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, বলুন।

মিঃ গুপ্তও সিগ্রেট জ্বাললেন। এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে ধোঁয়ার কয়েকটা রিঙ তৈরী করার পর বললেন, ...তাহলে আমরা দেখছি, সাধারণ বিচারে বা পারি-পার্শ্বিক সাক্ষ্যে ওয়ান অফ দেম ইজ দি মার্ডারার। দুজনেরই অ্যালিবাই অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। তা হোক। খুনের মডুস অপারেণ্ডি, কিন্তু আমাদের ধারণার বিপক্ষে যায় না। দুর্বল রোগা একটি যুবককে নীরেন বা বিভাসের মত শক্তসমর্থ যুবক অতি সহজেই গলা টিপে মারতে পারে। বাট মোটিভ? যে কোন হোমিসাইডাল ইনসিডেণ্টের পিছনেই যে নিশ্চিত মোটিভ থাকতে হবে, আমি অবশ্য তা বলছি না। ধরুন, মা ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে চড় মারলেন, ছেলে বেঘোরে মরে গেল। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমাতিশয্যে এমন ঠেসে ধরল যে শ্বাসরোধ হয়ে প্রেমিকা মারা পড়ল। এমন সব ক্ষেত্রে আমরা একে নিতান্ত অ্যাক্সিডেণ্ট বলতে পারি। অবশ্য চতুর খুনীরা এমন সুযোগ না নেয়, এমন নয়। যাক্ গে। আমাদের প্রথমে দেখতে হবে, কোন হোমিসাইডাল ইনসিডেণ্ট আসলে ডেলিবারেট মার্ডার বা খুনের উদ্দেশ্যেই খুন কিনা! ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারার কথাই বলছি আমি। শুভর মৃত্যু যে ডেলিবারেট মার্ডার, সেটা নিশ্চিত। বরং তা আরও নিশ্চিত হয়েছে আরেকটি মার্ডারের ঘটনায়—দ্যাট ইজ, দা পুওর গার্ল কল্পনা! ফের এবার মোটিভের প্রশ্নে আসছি। এ সব মার্ডারে মোটিভ একটা থাকতেই হবে। রাইট?

কর্ণেল অনুচ্চস্বরে বললেন, হুম্। মিঃ ভদ্র শুধু মাথা দোলালেন।

...এক্ষেত্রে শুভর সম্ভাব্য খুনী যদি বিভাস কিংবা নীরেন হয়, অথবা তারা দুজনই একাজ করে থাকে, কল্পনাকেও তাদের একজন অথবা দুজনে একসঙ্গে খুন করেছে। কিন্তু কেন? অস্পষ্ট হলেও একটা মোটিভ আমরা টের পাচ্ছি। এখানে ওরা আসবার পর আগের দুদিন ও দুরাত্রির ঘটনা খুঁটিনাটি আমরা দিব্যেন্দুর কাছে শুনেছি—নীরেন-বিভাসও তা বলেছে। ওদের তিনজনের বর্ণনায় কোন অসঙ্গতি নেই। এর একটা প্রসঙ্গ ধরুন। শুভ আর কল্পনা আগের রাত্রে হোটেলের বাইরে বেশ কিছুকাল সবার অজানতে কাটিয়েছিল। বিভাস বলেছে, ওরা পোড়ো বাগানে গিয়েছিল। বিভাস নেমে গিয়ে আর শুভকে দেখতে পায়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে টর্চ জ্বলে-ছিল কোথায় এবং কল্পনা আচমকা অন্ধকারে তার গায়ে এসে পড়েছিল। তারপর দুজনে হাসতে হাসতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে হোটেলে ফেরে। কল্পনা নাকি বলেছিল, সে শুভকে হোটেলের জানালা দিয়ে দেখতে পেয়েছিল। তখন সে ভীতু শুভকে ভয় পাইয়ে দিতে নীচে নেমে যায়। বিভাস পরে সকালবেলা শুভকে ঘরে ডেকে কথাটা বলে। শুভ হেসে বলে, কল্পনাটা দারুণ সাহসী। কিন্তু শুভ কী করছিল ওখানে? শুভ বলে, একটা কবিতা লিখতে চেয়েছিল সে—অন্ধকার তার বিষয়। তাই সরেজমিনে গিয়ে নাকি অন্ধকারের রূপ দেখছিল। হরিবল্! যাক গে। এসব অজুহাত কারো বিশ্বাস্য নয়। ওদের প্রতি সবার সন্দেহ পড়ার কথা। এখন দেখা যাক, এতে কার ঈর্ষা হবে বেশি? পূর্বাপর যা শুনেছি, তাতে বোঝা যায়, এখানে আসবার পর কল্পনা বেশ বোহিমেবী মেলামেশা সুরু করেছিল। রীতিমত ফ্লার্টিং! বিভাস মোতিঝিলের বটতলায় দিব্যেন্দু আর কল্পনাকে চুমু খেতে দেখেছে। স্বাতী তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিল। বিভাস এবং নীরেনের মতে স্বাতী দিব্যেন্দুকে ভালবাসে। কাজেই কল্পনা শুভর সঙ্গে রাত্রিবেলা অভিসারে বেরোলে প্রথমে রাগ হবে দিব্যেন্দুর। কিন্তু দিব্যেন্দু আঁধারমহলে ছিল না। তাকে সর্বদিক বিবেচনা করেই বাদ দিচ্ছি। দ্বিতীয়জন খুঁজে দেখা যাক। কল্পনার নাকি দূর সম্পর্কের দিদি স্বাতী এবং স্বভাবত সে কল্পনার গারজেন। ব্যাকগ্রাউণ্ড না জানলেও আমরা বেশ বুঝতে পারি, স্বাতীরও রাগ হতে পারে—যদিও এতে তার খুশি হবার কথা: কারণ তার প্রেমিককে ছেড়ে অন্যত্র ঝুঁকেছে কল্পনা। কিন্তু স্বাতীর পায়ে ব্যথা—সে আঁধারমহলেও যায়নি। এবার আসে নীরেনের প্রসঙ্গ। বিভাস বলেছে, প্রথমদিকে নীরেনের সঙ্গেও কল্পনা ঢলা-ঢলি করেছে। ম্যানেজার সুরঞ্জন আমাদের কাল রাত্রে বলেছে, গতকাল ভোরবেলা সুইমিং পুলের ওদিকে শুভ আর কল্পনা পরস্পরকে টানাটানি করছিল এবং নীরেন ওপরে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তা দেখ-ছিল। আই সাসপেক্ট নীরেন।...

বলে গম্ভীর মুখে থেমে গেলেন মিঃ গুপ্ত।

কর্ণেল নিঃশব্দে চুরুট টানছেন। মিঃ ভদ্র শুধু বললেন, এ্যাণ্ড বিভাস?

সে কথায় কান না দিয়ে মিঃ গুপ্ত বললেন, এ্যাণ্ড নাও দি মার্ডার অফ কল্পনা। সকালে স্বাতীর ঘরে দরজা বন্ধ করে নাকি স্বাতী কল্পনা আর দিব্যেন্দু ঝগড়া করছিল। বিভাস-নীরেন দুজনেই বলেছে সে কথা। তারপর বিভাস-নীরেন আর শুভ এক সঙ্গে ডাইনিং হলে চা খেয়ে বেরোয়। আঁধারমহলে যায়। বাট হোয়াই আঁধারমহল? কে প্রথমে ওখানে যাবার কথা তোলে? বিভাস বলেছে, নীরেনই তুলেছিল কথাটা। নীরেন সম্ভবত প্রশ্নের গুরুত্ব না বুঝেই আমাদের বলেছে, হ্যাঁ, আমিই বলে-ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল। ...তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে। সে ডেলিবারেটলি ওখানে গিয়ে ডেলিবারেটলি শুভকে খুন করেছে। আর দুজনেই বলেছে, এমন কি মহবুব খাঁও বলেছে, নীরেনই নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভিতরে ঢুকে যায়।

মিঃ ভদ্র বললেন, কিন্তু কল্পনাকে খুন করবে সে কীভাবে? টাইমফ্যাক্টর তো আছেই—আছে প্লেসফ্যাক্টর।

মিঃ গুপ্ত বললেন, নাথিং! হোটেল থেকে আঁধারমহলের দূরত্ব হাফ কিলো-মিটার। অবস্থান হল নর্থে। এখন উত্তর থেকে দক্ষিণে বাতাস বইছে। মাত্র দুটো মিনিট সাইকেলরিকসোর পক্ষে যথেষ্ট। এখান থেকে ফের ওখানে ফেরার সময় সাইকেলরিকসোর পক্ষে ধরুন চারগুণ, কী পাঁচগুণ সময় লাগুক। দ্যাট ইজ ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস। সময় আরও কম লাগবে, যদি সে হোটেলের লাগোয়া এই জঙ্গুলে বাগানের শেষ অর্থাৎ উত্তর সীমায় নামে। বুঝতে পারছি [illegible] নেমে-ছিল সে। তা না হলে হো[illegible] কেউ না কেউ তাকে দেখতে পেত! এবার একটা সঙ্গত প্রশ্ন ওঠে। তার এখানে আসার উদ্দেশ্য কী ছিল? কল্পনাকে একা না পেলে তো খুন করা যায় না। তা ছাড়া পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠলেও কারো চোখে পড়া সম্ভব। তা পড়েনি যখন, তখন ধরে নিচ্ছি, হোটেল অব্দি সে আসে নি। ওই বাগানের ভিতরেই কাজ শেষ করেছিল।

লাফিয়ে উঠলেন মিঃ ভদ্র।...কল্পনাকে ওখানে সে পেল কেমন করে? আর লাসটা চীনা মিত্র ঘরের বিছানায় এল কীভাবে?

মিঃ গুপ্ত একটু হাসলেন।... কল্পনাকে ওখানে পাওয়া নিছক কো-ইনসি-ডেণ্ট হতে পারত। তা হয়নি। কল্পনা তখন ওখানে কোথাও ছিল। এমন জায়গায় ছিল, যা নীরেনের জানা। এবার মনে করুন, সেই কবিতাটার কথা। মধ্যরাতে গাছের মাথায় উঠলে চাঁদ/ডোবার ধারে পাতব হরিণ ধরার ফাঁদ।...ডোবা ইজ দি ভাইটাল পয়েণ্ট অফ দি কেস।

কর্ণেল এসময় তীক্ষ্ণদৃষ্টে মিঃ গুপ্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়েস!

সোৎসাহে গুপ্ত বললেন, নীরেন চেপে যাচ্ছে। কল্পনাকে সে কোন ছলে ওই ডাবার ধারে উপস্থিত থাকতে বলে-ছিল। ওই কবিতাটার রহস্য আর কিছু নয়। এখনও হাতের লেখা সনাক্ত করা হয় নি। হলে আমরা অবশ্যই জানব—ও লেখা নীরেনেরই। আমার ধারণা, নীরেনের প্রথম লক্ষ্য ছিল কল্পনা। কারণ, সেও দিব্যেন্দুর সঙ্গে তার ফ্লার্টিং—এমন কি চুমু-খাওয়ার ব্যাপারটা দেখেছিল। সে স্বীকার করছে একথা। আমার অনুমান, কল্পনার মত কৌতূহলী বোকা মেয়েকে নির্জনে ডাকবার ওই একটা ছল নীরেনের। গতকাল সকালে নীরেন কোন এক সুযোগে কল্পনাকে ওখানে যেতে বলেছিল—ধরুন, কোন মজার জিনিস দেখানোর অজুহাতে। দিব্যেন্দুর কাছে জেনেছি, কল্পনার মধ্যে হীনমন্যতা ছিল প্রচুর। ইনফ্যান্টাইল ব্যাপারও ছিল বিস্তর। ফোটো তুলতে চাইত না। তাছাড়া আরও অনেক প্রবণতার কথা আমরা শুনেছি তার মুখে! কাজেই কল্পনা ডোবার ধারে কথামত গিয়েছিল এবং নীরেনের পাল্লায় পড়েছিল।

মিঃ ভদ্র বললেন, এটা নিতান্ত অনুমান।

নো। নেভার। মিঃ গুপ্ত ঝুঁকে এলেন ফের।...সুরঞ্জনের বয় শম্ভু বলেছে, সে কাল সকালে তিন বাবু বেরিয়ে যাওয়ার

পর কল্পনাকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছে। তারপর সে জঙ্গলের ভিতর তাকে যেতেও দেখেছে।

কর্ণেল সোজা হলেন। বললেন, দ্যাটস রাইট।

হ্যাঁ। মিঃ গুপ্ত বললেন।...তারপর যা ঘটেছে, তা স্পষ্ট। কাজ শেষ করে নীরেন আঁধারমহলে ফিরে যায়।

মিঃ ভদ্র কাঁচু-মাচু মুখে বললেন, কিন্তু স্যার—লাসটা চীনা মিত্রর ঘরে এল কীভাবে?

মিঃ গুপ্ত একটু হেসে একটা ম্যাপ ধরলেন সামনে।...এটা হোটেলের ম্যাপ। লেট আস চেক।

কর্ণেল বললেন, কিন্তু চীনা মিত্রর ঘরে কেন?

যেন একটু দমে গেলেন মিঃ গুপ্ত। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, সম্ভবত চীনা মিত্রর আঁকা ছবিটাই তাকে একাজে প্রলুব্ধ করে। এমন রোমান্টিক টাইপের খুনীর কথা আমরা অনেক জানি। রোমান্টিক—কিন্তু বড্ড নির্বিকার এরা। ঠান্ডা মাথায় যেমন খুন করতে এরা পটু, তেমনি রসিকতা করবার লোভও ছাড়ে না। আবার এমনও হতে পারে, নীরেন চীনা মিত্রর কাঁধে দায় চাপাতে চেয়েছিল। বোঝাতে চেয়েছিল—নিছক মডেলের জন্যই চীনা মিত্র একাজ করেছে।

অবশ্যই। এবার শুধু প্রমাণগুলো গোছাতে হবে।

কর্ণেল একটু হাসলেন।...ফোরেনসিক এক্সপার্টরা যদি শুভ বা কল্পনার গলায় নীরেনের আঙুলের ছাপ না পায়?

পাবেই।

সে তো পাবে। কর্ণেল বললেন।...ছাপটা যদি অন্য কারো হয়?

একটু চমকে উঠলেন গুপ্ত।...আর কার হবে?

কর্ণেল নিভন্ত চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, চীনা মিত্রর হতে পারে।

চিত্র ৩- হোটেলের নীচের তলা

চিত্র ৪- হোটেলের উপরতলা

...কল্পনার লাস ডোবার ধারে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, তার প্রমাণও নিশ্চয় পাব আমরা। ভাঙা মসজিদের সিঁড়ির নীচে সুড়ঙ্গমত রয়েছে। ভিতরে আগাছা গজিয়েছে। সেখানেই রাখা সম্ভব। তারপর সন্ধ্যার দিকে চীনা মিত্র ঘর ছেড়ে বেরোয়। ঘরে ফেরে একেবারে রাত দুটোর কিছু পরে। নীরেন ফাঁড়িতে যাওয়ার আগেই সবার অলক্ষ্যে পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। লাসটা এনে চীনা মিত্রের ঘরে রাখে।...হাসতে-হাসতে কর্ণেলের দিকে কটাক্ষ করলেন মিঃ গুপ্ত।...আমাদের কর্ণেল সায়েব যে পদ্ধতিতে ওঘরে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেভাবেই ওকাজটা সম্ভব। বিশেষ করে নীরেনের গায়ে জোর আছে প্রচুর। ওর পারশোনাল ব্যাক-গ্রাউন্ড শিগগির আমরা কলকাতা থেকে পেয়ে যাবো। আমার ধারণা কখনও মিথ্যে হয় না, মিঃ ভদ্র।

মিঃ ভদ্র নড়ে উঠলেন।...কোয়াইট অ্যাবসার্ড!

মিঃ গুপ্ত বললেন, সার্টেনলি নট। আমি একটা কেসের কথা জানি। এক আর্টিস্ট হত্যার দৃশ্য আঁকবার জন্যে আস্ত মানুষ খুন করাত তার সহকারীকে দিয়ে। হত্যাকালীন মার্ডারার আর তার হতভাগ্য শিকারের মুখে-চোখে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠত—দ্রুত তুলি চালিয়ে সে তা এঁকে নিত।

মিঃ ভদ্র বললেন, বীভৎস!

বীভৎস। বাট দিস ইজ দি হিউম্যান লাইফ। —মিঃ গুপ্ত বললেন।...এসব খুনীরা বড় রহস্যময় বিচিত্র জীব মিঃ ভদ্র।

কর্ণেল সরকার মুখ তুলে বললেন, তাহলে ইউ আর কনভিন্সড যে নীরেন খুনী?

বিভাসের হতে পারে। স্বাতীর হতে পারে। অ্যান্ড ইভন দ্যাট প্রফেসর অর হিজ ওয়াইফ...

একটা কনস্টেবল হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে বলল, স্যার, ডাইনিং হলের জানালা দিয়ে এই চাদরটা এক্ষুনি পড়েছে। রক্ত লেগে আছে স্যার। জানালার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের সমাদ্দার। তার গায়ে পড়েছিল। লোকটাকেও সে দেখেছে।

তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, কে, কে সে?

কনস্টেবলটি বলল, ওই যে বুড়ো মত ভদ্রলোক—কলেজের মাস্টার না কী যেন।

কর্ণেল হো-হো করে হেসে উঠলেন। সত্যজিত গুপ্ত হতভম্ব একেবারে।

(ক্রমশঃ)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেখতে পাই, প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে নানা প্রতীক মূর্তি। ভাবি, দেবতা যেন এদেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। মানুষ আর দেবতা যেন এখানে এক হয়ে গেছে।

আরো দেখি, ক্ষেতে-খামারে কাজ করছে নর-নারী। দেখি নারী এখানে পুরুষের কর্মসঙ্গিনী। জীবনের কর্মকাণ্ডকে তারা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। আরো দেখতে পাই, নারী এখানে অবগুণ্ঠনের আড়ালে হারিয়ে যায়নি। তারাও আলো-বাতাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারে।

দেখতে দেখতে দিনের আলো হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল বাইরের ছবি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম ট্রেনের কামরার ভিতরে। দেখলাম, সুধীরা তখনো বসে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। হয়তো দৃষ্টি তার আকাশের কোণে কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে।

ভিল্লুপুরম জংশনে পৌঁছলাম সন্ধে সাড়ে সাতটায়। রাত দেড়টার আগে মাদ্রাজগামী ট্রেন নেই। সুতরাং এই সময়ের জন্যে যাত্রা বিরতি এখানেই।

কিন্তু রিটায়ারিং রুমে জায়গা নেই। নাই-বা থাক। এইটুকু তো সময়। কেটে যাবে ওয়েটিং-রুমে। তা ছাড়া এমন প্ল্যাটফর্ম তো রয়েছে।

সারাদিনের ক্লান্তি। দেহ-মন যেন একটু বিশ্রাম চাইছে। তাছাড়া শুধু তো একদিনের ক্লান্তি নয়, কদিন তো এই চলছে।

রিফ্রেসমেণ্ট রুমে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে নিই আমরা। তারপর একটু বিশ্রামের আশায় এসে বসি ওয়েটিং রুমে।

ওয়েটিং রুমের চেয়ারে বসে থাকাতে একটু তন্দ্রাও এসেছিল। তন্দ্রা টুটে গেল স্টেশনের ঘণ্টা বাজতে। ট্রেন আসছে।

ট্রেন আসার পূর্বক্ষণে যাত্রীরা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ চাঞ্চল্য আমাদের মনেও।

ট্রেনের কামরায় উঠেছি। বসেছি অলস ভঙ্গিতে। বাকি রাতটুকু কেটে যাবে চলন্তি ট্রেনে।

বাঁশীর সংকেত দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলো। চলন্তি ট্রেনের একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। রাতে যেন এই ছন্দটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দেখলাম, ট্রেনের দুলুনিতে সুধীরা ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। আমারও দু'চোখে তন্দ্রার আবেশ।

তখনো ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। ট্রেন এসে দাঁড়ালো এগমোর স্টেশনে। ঘড়িতে সময় দেখলাম। পাঁচটা।

স্টেশনে নেমেই মুখে-চোখে জল দিয়ে চায়ের তৃষ্ণা মেটাই। তারপর দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটতে সকাল সাতটা নাগাদ ফোন করলাম জীতেনকে। জানালাম, আমি এসেছি।

জীতেন জানালো, সে এখুনি আসছে আমার কাছে।

সাড়ে আটটায় জীতেন এলো। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা এখানে উঠেছেন কেন? না—না এখানে থাকা চলবে না। আসুন, আমি ভালো হোটেল ঠিক করে দিচ্ছি।

বললাম, না, হোটেল নয় জীতেন। আমরা এখানেই থাকবো। এই তো বেশ আছি।

জীতেন তবুও বলে, না—সে হয় না।

বললাম, কেন হয় না। এখানে অসুবিধে কিছু নেই, বরং অনেক দিক থেকে সুবিধে। পা বাড়ালেই রাস্তা, কাছেই ট্যাক্সি। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ারও সুবিধে। হোটেলের মতো আমির জেনুরনের থাকা নেই। হোটেলে থাকলে তো তিনবেলা ট্যাক্সিতে তোমার বাড়ি থেকে খাবার আনতে হবে। কী দরকার এমন ঝামেলা? তার চেয়ে এই তো ভালো।

সুধীরাও সেই একই কথা বললে।

জীতেন জিজ্ঞাসা করলে, এখন আর কি করবেন বলুন।

—করার আর কি আছে। আজ তো ভাবছি, শহরটা একবার ঘুরে দেখবো। বাজারটাজার করবো। জানো তো আমাদের কিছু কেনাকাটার বাতিক আছে। তাছাড়া মায়লাপুরের মন্দিরটা আজই ঘুরে আসতে চাই। আজ পাঁচ তারিখ। হাতে তো দু'দিন সময়। এর মধ্যে পক্ষীতীর্থম আর মহাবলীপুরম দেখার ব্যবস্থাটা করে দিও। মাদ্রাজে এসে ওই দুটো জায়গা না দেখে তো যেতে পারি না। আট তারিখে কলকাতা যাওয়ার জন্যে ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ করে রেখো।

জীতেন বললে, নিশ্চয়ই। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জীতেন তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে ফোন করলে। কী বললে জানি না। তবে যা বুঝলাম, তাতে মনে হলো—আমার প্রসঙ্গেই ওর কথা।

এরপর চা-পানের পর জীতেন গাড়ি নিয়ে এলো। উদ্দেশ্য বাজারে যাওয়া—কিছু কেনাকাটা করা। সেই সঙ্গে শহরটাও একটু খুঁটিয়ে দেখা হবে।

ঘুরে ঘুরে নানারকমের জিনিস কিনলাম। সুধীরার ঝোঁক ঠাকুরপুজোর তৈজস কিনবার। পুজোর নানারকমের জিনিস-পত্তর কিনলাম। দেখবার মতো। ধুতি চাদর থেকে আরম্ভ করে আরো কিছু কেনাকাটা করি। তারপর আছে আমার মেয়ের জন্যে পছন্দসই কিছু কেনা। তার জন্যে কিছু না নিলে নয়। ভারতবর্ষের এতো জায়গায় এতো জিনিস কিনেছি, কিন্তু এমন জিনিস চোখে পড়েনি।

কিন্তু বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে হলো আর এক মুস্কিল। দাম দিতে যাই দোকানীকে, কিন্তু জীতেন বাধা দেয়। জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বলে, ওসব পরে দিলে হবে। বুঝলাম না ওর মতলবটা কি।

বাজারের পথেই রামসেশানের অফিসে এলাম। এসেই শুনলাম, আসছে কাল থেকে আমাকে ও এনাক্ষী রামা রাওকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। সম্বর্ধনার কথা শুনে খুশি হইনি এমন নয়, তবু মনে হলো—এসেছি বেড়াতে, এখানে আবার এসব ঝামেলা কেন? তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। ভাবলাম, ওরা আমাকে ভালোবাসে বলেই তো সম্বর্ধনা দিতে চায়। ভালবাসার দান মাথায় তুলে নিতে হবে।

বললাম, সম্বর্ধনা তো হবে—আমাকে কিছু বলতে হবে না তো?

—বলতে হবে বৈকি। রামসেশান বললে, নিশ্চয়ই। এখানকার সবাই আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়।

রামসেশানের অফিস থেকে এসেছি মায়লাপুরম মন্দিরে। শহরের মধ্যেই মন্দির। অজস্র মানুষের ভিড়। এতো ভিড় ভালো লাগে না। নিভৃতেই যেন দেবতার স্থান। তবু মন্দির দেখলাম। মনে তেমন দাগ কাটলো না। মন্দির থেকে বেরিয়ে আর কোথাও নয়, সোজা চলে এলাম স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। আজকের মতো এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়লো।

পরদিন। তারিখটা ৬ই ডিসেম্বর। সকাল থেকেই চিন্তা আজকের সম্বর্ধনার ব্যাপারে। চিন্তা বলতে, একটা কিছু ভাষণ দিতে হবে তো? কী বলবো। বসে বসে ইংরেজীতে তার খসড়াও করে ফেললাম। মোটামুটি একটা কিছু দাঁড়ালো।

যাইহোক যথারীতি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আলাপ হলো এনাক্ষী রামা রাও-এর সঙ্গে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সত্যমূর্তি। সত্যমূর্তির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো।

অনুষ্ঠান আমাদের দেশের মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন শহরের বিশিষ্ট নাগরিক। দেশ থেকে এতো দূরে এসেও আজ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে মনে হলো আমি এদের কতো কাছের মানুষ।

সম্বর্ধনার উত্তরে আমাকে কিছু ভাষণ দিতে হলো। ইংরেজীতেই আমার ভাষণ পাঠ করলাম।

তারপর যথারীতি জলযোগের পালা। এখানে অতিথিদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ পেলাম।

অনুষ্ঠানশেষে আমাকে ফিরতে হবে। জীতেন আর কেণ্টবাবু আমাদের সঙ্গেই এলো। কেণ্টবাবু বললেন, আসছে কাল ভোরেই আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন। পক্ষীতীর্থম যাবো।

বললাম, ঠিক আছে তুমি যতো সকালে এসো না, দেখবে আমরা তৈরি হয়ে আছি তোমার অপেক্ষায়।

এর পর খানিক গল্পগুজব করে কেণ্ট-বাবু আর জীতেন বিদায় নিলে।

যাবার আগে কেণ্টবাবু আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিলে আসছে কাল সকালের কথা।

সে রাতটা কাটলো নিশ্চিন্ত আরামে। রাতভোরে সূর্য ওঠার আগে সুধীরাই আমাকে ডাকলো। বললে, ওঠো—এখনো ঘুমোচ্ছো, পক্ষীতীর্থ যেতে হবে যে!

শয্যাত্যাগ করেছি। তৈরি হয়েছি অল্প সময়ের মধ্যে। জীতেন, কেণ্টবাবু এখনো এসে পৌঁছয় নি। তবে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। জীতেন আর কেণ্টবাবু এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মুসাফির চলো। যাওয়ার নামে সুধীরা তো পা বাড়িয়েই আছে।

সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। শহর—শহরতলী পেরিয়ে পল্লীর পথ। পথের দুধারে মনোরম দৃশ্যপট। এই মুহূর্তে যা স্পষ্ট হয়ে ফোটে পরমমুহূর্তে তা হারিয়ে যায়। মাঝপথে চিংলিপুট জংশনে যাত্রাবিরতি। এখানে প্রাতরাশ সারতে হবে।

চিংলিপুট রেলস্টেশনটি বেশ বড়ো। এখান থেকেই চলে গেছে কাঞ্জিভরম, এবং ত্রিচিনাপল্লীর রেলপথ। স্টেশনের রিফ্রেস-মেণ্ট রুমটিও সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

প্রাতরাশের পালা চুকিয়ে নিয়েছি। অর্ডার দিয়েছি দুপুরের আহারের জন্য। পক্ষীতীর্থম আর মহাবলীপুরম থেকে ফেরার পথে এখানেই মধ্যাহ্নভোজন করবো। ফিরতে হয়তো দুটো আড়াইটে হবে। তা হোক।

চিংলিপুট থেকে রওনা হয়ে একেবারে পক্ষীতীর্থম। পক্ষীতীর্থমে পৌঁছেই এক-নজরে চারদিকের পরিবেশে দৃষ্টিপাত করি। প্রথম দর্শনেই ভালো লাগলো জায়গাটিকে। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়—সবুজ অরণ্যে ঢাকা।

প্রথমেই দেখলাম একটি সুন্দর জলাধার। শুনলাম, যুগান্তে অর্থাৎ বারো বৎসর ধরে এই জলাধারে একটি বিরাট শঙ্খ আসে। যে শঙ্খটিকে এখানকার দেবী মন্দিরে সযত্নে রাখা হয়। তাছাড়া এই জলের নাকি নানা গুণ। এখানে স্নান করলে নানা জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

জলাধার থেকে পাহাড়ের পাদদেশের মন্দিরটিতে এসেছি। সুবৃহৎ মন্দির। নানা কারুকার্যের ঐশ্বর্য। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, ভাবি—কোন সুদূরে অতীতের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দির। মানুষ তার আরাধ্য দেবতাকে এই মন্দিরে অভিষিক্ত করেছিল। তারপর কতোদিন গেছে, কালের কতো আবর্তন, বিবর্তন—যুগ-যুগান্তর ধরে কতো মানুষ এসেছে, গেছে—মন্দিরের পাথরে পাথরে হয়তো তা গাথা হয়ে আছে। মন্দির আর দেবতা—পুরাতন ইতিহাসের নীরব সাক্ষী।

এবারে পাহাড়ে ওঠার পালা। পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়িপথ উঠে গেছে ওপরের দিকে। এমন কিছু উঁচু নয়, হয়তো পাঁচশ ফুট কিংবা আরো কিছু বেশি হবে।

পাহাড়ের সিঁড়িপথ ধরে উঠছি। সবুজ ছায়া জড়ানো পথ। মনে হয় যেন এক [illegible] পথ ধরে [illegible]। মাঝে মাঝে নিবিড় ছায়ার মধ্যে থেকে চিকন রোদ এসে পড়েছে। বেশ লাগছে আলোছায়ার মিতালি।

পাহাড়ের ওপরে উঠেছি। ছোট মন্দির। মন্দিরের চত্বরে মদ্রদেশীয় পুরোহিত কয়েকজন। পুরোহিতরা পক্ষীদেবতার ভোগের আয়োজনে ব্যস্ত। আরো কিছু যাত্রীকেও দেখলাম।

পক্ষী-দেবতার উদ্দেশে আমরাও পুজো নিবেদন করেছি। পুরোহিত একটু দূরে গিয়ে পক্ষীদেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিতে লাগলো। দেখলাম, ডাক শুনে দুটি সুন্দর পাখি উড়ে এলো। পাখিগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। গায়ের রঙ শাদা, ঠোঁট আর পা দুটি হলদে। দেখতে অনেকটা শঙ্খচিলের মতো।

পাখিরা উড়ে এলো, আহার্য গ্রহণ করে আবার উড়ে গেল পাহাড়ের সবুজ গাছ-পালার আড়ালে।

পুরাণে বর্ণিত আছে এরা নাকি অভিশপ্ত দেবতা। ত্রিকালজ্ঞ। যুগ-যুগান্তর ধরে এরা নাকি পক্ষীরূপে এখানে অবস্থান করছে।

সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রবৃত্তি নেই। কিংবদন্তী এই, তবে এদেশে এই জাতীয় আরো অনেক পক্ষী দেখেছি।

পক্ষীতীর্থম থেকে মহাবলীপুরম।

দক্ষিণ ভারতের অজস্র দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মহাবলীপুরমের স্বকীয়তা আছে। শুনেছি, এখানে সাতটি প্যাগোডা আছে। যার সঙ্গে মহাভারতের নায়ক-নায়িকাদের স্মৃতি জড়ানো। অক্ষত অবস্থায় পাঁচটি প্যাগোডা দেখলাম। ষষ্ঠটি সমুদ্রের ধারে। যার অনেকখানি অংশ আজ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আর সপ্তমটির সন্ধান পেলাম না। হয়তো কালের গতির সঙ্গে কোন একদিন তা হারিয়ে গেছে সমুদ্র-সংঘাতে।

অখণ্ড পাথর কেটে তৈরি হয়েছে এই প্যাগোডা।

সমুদ্রের ধারে আলোকস্তম্ভ দেখলাম। যে আলোকস্তম্ভটি নিষেধের বাণী উচ্চারণ করছে : এখানে এসো না। তোমার জন্যে বিপদ অপেক্ষা করছে। সমুদ্রে রয়েছে গোপন পাহাড়ের অস্তিত্ব।

কিংবদন্তী আরো [illegible], সুদূর অতীতে এখানে নাকি দানবরাজের রাজধানী ছিল। মহাপরাক্রমশালী ছিলেন দানবরাজ। তাঁরই আমলে নির্মিত হয়েছিল মহাবলীপুরম। কিন্তু আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু এই কয়েকটি প্যাগোডা ছাড়া।

হয়তো একদিন এই মহাব[illegible]পুরম ছিল নানা ঐশ্বর্যে ভরা। ইতিহা[illegible]র নির্মম পরিহাসে সেই ঐশ্বর্য হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে দানবরাজের রাজধানীর [illegible]। [illegible]

ফিরে চাই চারদিকের পরিবেশে। কোথাও কোন জনবসতির চিহ্নমাত্র নেই। দূরে দৃষ্টি যায় শূন্যপ্রান্তর ধূ-ধূ করছে। তারই মাঝে সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে আছে এই কটি প্যাগোডা।

প্যাগোডাগুলি দেখে আরো মনে হয়, হয়তো এগুলো অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। নয়তো এমন অবস্থায় থাকবে কেন। হয়তো কিংবদন্তীর সেই দানবরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির কাজও পরিত্যক্ত হয়েছিল।

আজ সেই দানবরাজ নেই। নেই তাঁর মহাবলীপুরমের গৌরব। অবশিষ্ট আছে শুধু নাম। হয়তো একদিন এই সমুদ্রসৈকতে মাটি আর পাথরের নীচে থেকে আবিষ্কৃত হবে ইতিহাসের কোন হারানো স্মৃতি।

বসেছিলাম সমুদ্র-সৈকতে একটি পাথরের ওপর। শুনছিলাম হারানো ইতিহাসের কান্না। হঠাৎ চমক ভাঙে সঙ্গীদের ডাকে।—কী ভাবছো!

—কিছু না। বলে উঠে দাঁড়াই।

দৃষ্টিপাত করি দূরে, যেখানে বিরাট পাথরে খোদিত সিংহ, হাতী এবং ষণ্ড মূর্তি দাঁড়িয়ে বলছে, আমরা এখানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছি।

এবারে ফিরে চলার পালা। সমুদ্রের জল মাথায় তুলে নিলাম যাবার আগে।

পাথরের সিংহমূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম চারদিকে।

শূন্য মনে হলো সব কিছু। শুধু কানে এলো সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের শব্দ। দানব-রাজের দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো।

মহাবলীপুরম থেকে আবার চিংলিপুট। চিংলিপুটে স্টেশনের রিফ্রেসমেন্ট রুমে মধ্যাহ্নের আহার্য গ্রহণ করলাম।

তারপর আবার বাইরের দিকে ছুটে চলা।

স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে ফিরে আসার কিছুক্ষণ বাদেই জীতেন আর রামসেশান এলো। রামসেশান জানালে, আসছে কাল আমাদের জন্যে বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত।

আজ আর বেশি কথা নয়, গল্প নয়। সকাল থেকে এই সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা চলেছি—এবারে দেহ-মন যেন বিশ্রাম চাইছে।

জীতেন, কেষ্টবাবু আর রামসেশান বিদায় নিলে আমরাও রাতের আহার গ্রহণ করে শয্যা গ্রহণ করি।

এবারে মতো প্রবাসে এই শেষ রাত।

৮ ডিসেম্বর। সকাল থেকেই বসে আছি রিফ্রেসমেন্ট রুমের বারান্দায়। কোন কাজে মন নেই, বসে থেকে কী করবো, তাই ডায়েরীর পৃষ্ঠাটা কালির আঁচড়ে ভরে রাখছি। কদিন কি করেছি, কি দেখেছি সবটুকু ডায়েরীর পৃষ্ঠায় ধরে রাখার চেষ্টা। সুধীরা আমার পাশেই বসে আছে। মাঝে মাঝে এটা-ওটা কথা দিয়ে সময়ের গতি চিহ্ন দেওয়া।

বেলা দশটা নাগাদ অরোরার গাড়ী নিয়ে এলো জীতেন। সেখানেই দেখা হলো কেষ্টবাবু আর রামসেশানের সঙ্গে। কথার মধ্যে একসময় জীতেনকে বললাম, এবারে তোমার পাওনা কি বলো?

—কিসের পাওনা?

—সেদিন যে অতো কেনা-কাটা করলাম, তার দাম তো দিই নি।

—ওসব কথা থাক। জীতেন বললে, আপনার কাছ থেকে জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। ওটুকুর দাম নিতে বলে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগটুকু হারাতে দেবেন না।

কেষ্টবাবুকেও আড়ালে ডেকে বললাম, জীতেনকে তুমি বুঝিয়ে বলো।

কেষ্টবাবুও জীতেনের সঙ্গে কি আলোচনা করে এসে বললে, ও দাম নিতে চায় না। বলে, একসময়ে আপনার কাছ থেকে ও অনেক উপকার পেয়েছে। শুধু সেই কথা মনে করেই ও আপনাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাবার অবকাশ পেয়েছে।

শেষটা এ নিয়ে আর কোন কথা বললাম না।

এই প্রসঙ্গে পুরোনো কথা মনে পড়লো। দেবুবাবুর সঙ্গে ও ক্যামেরার কাজ করতো। কিন্তু দেবুবাবু ওকে ক্যামেরায় হাত দিতে দিতেন না। একবার ছবি তোলা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। জীতেনকে একবার দেবীবাবু পাঠান মৃতের ছবি তুলতে কিন্তু ছবি শেষ পর্যন্ত হোজি হয়ে যায়। দেবু যখন ওকে জিজ্ঞাসা করে, এটা কি হলো জীতেন। জীতেন বলে, কী করবো ওটা নড়ে গেছে।

—ওটা নড়ে গেছে মানে। ও তো মরা।

আসলে নড়ে ছিল জীতেনের ক্যামেরা। তার জন্যেই ছবিটা ঠিকমতো হয়নি। যাই হোক, জীতেনের এই কথা নিয়ে অরোরা স্টুডিও-য় রীতিমতো হাসাহাসি হতো। ওকে দেখলেই সবাই বলতো, মড়া নড়ে উঠেছে—পাগলা জীতেন।

পুরোনো কথা মনে হতেই হেসে উঠি।

বেলা একটার পরে ফ্রিলান্সের সাংবাদিক এলেন আমার ইন্টারভিউ নিতে। নানা কৌতূহলী প্রশ্ন। উত্তরও দিলাম। তারপর সাংবাদিক বিদায় নিয়ে গেলেন।

সারাটা দুপুর অলসভাবেই কাটলো। বিকেল হতেই যাবার কথাটা মনে এলো। আজই যেতে হবে। সন্ধ্যের পরই সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ক্যালকাটা মেল ছাড়বে। সুতরাং হাতের সময়টুকু গোছগাছ করতেই কেটে যাবে।

দিনের বাকি সময়টুকু কেটে গেল দেখতে দেখতে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। নির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে উঠলাম। জীতেন, কেষ্টবাবু, রামসেশান—ওরা এসেছে আমাদেরকে বিদায় জানাতে। জীতেন তো টিফিন কেরিয়ারে করে আমাদের রাতের খাবারটুকু আনতে ভোলেনি।

এই বিদায়ের মুহূর্তটি বড়ো বেদনা-দায়ক। জীবনের চলতি পথে এই যে কদিনের জন্যে এখানে আসা, কদিনের জন্যে নানাজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা—বিদায়ের মুহূর্তে স্মৃতির পর্দায় সবকিছু যেন একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়।

ট্রেন ছাড়লো। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে আরম্ভ করলো কেষ্টবাবু, রামসেশান। আর জীতেন তো একেবারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে দেখেছি তার দুটি চোখ সজল হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের বাইরে এলো। এই মুহূর্তে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো কদিনের স্মৃতি। স্মৃতি নয় যেন চলচ্চিত্র।

কতো জনপদ দেখেছি, দেখেছি কতো শহর। দেখেছি মন্দির, দেখেছি দেবালয়। কদিন কতো মানুষের সংস্পর্শে এসে এসেছে পরিচিতির মতো, আবার চলে গে অপরিচয়ের আড়ালে।

কদিন যে কথা ভাবি নি, আজ সে কথাই ভাবছি। মনের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে চাইছি, পরিচিত দৃশ্যপট পরিচিত মানুষের মুখ।

মনে আসছে। কিন্তু কেমন যেন অ হয়ে গেছে। হয়তো এমনি হয়। স্মৃতি কালের গতির সঙ্গে হারিয়ে যায় বিস্মৃ আড়ালে। তারপর ভবিষ্যতের কোন হয়তো মন চাইবে বিস্মৃতির দুয়ার অতীতের স্মৃতি ছবিকে আবিষ্কার ক

চমক ভাঙলো সুধীরার কণ্ঠস্ব কী ভাবছো!

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললাম—কিছু না।

সেই মুহূর্তে ট্রেনের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলার শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ক্যালকাটা মেল ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারের বুক চিরে।

রাজমাহেন্দ্রীতে পৌঁছতে পুরোনো দিনের কথা মনে এলো। উনিশ'শ বিশ সালে আরো একবার এ পথে এসেছিলাম সেবারে রাজমাহেন্দ্রীতে নেমেছিলাম রাতে আহারের জন্যে। কিন্তু আহার তখনো শেষ হয়নি এমন সময় ট্রেন ছাড়ার সময়সংকেত শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম খাবারের টেবিল ছেড়ে। কিন্তু শুনলাম, আমার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন অপেক্ষা করবে। উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে নাকি এইরকমই নিয়ম। যাই হোক, আমার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন অপেক্ষা করেছিল। এবারেও স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নেমে এলাম। কিন্তু পুরোনো দিনের কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। তখন ছিল টানা পাখা, এখন সেখানে বৈদ্যুতিক পাখা। তাছাড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্ম রিফ্রেসমেণ্ট রুম সবকিছুর আমূল পরিবর্তন চোখে পড়লো। সেদিনের রাজমহেন্দ্রী স্টেশনের সঙ্গে আজকের স্টেশনের কোথাও কোন মিল নেই। শুধু নামটার যা পরিবর্তন হয়নি।

রাজমাহেন্দ্রীতে ক্ষণবিরতির পালা ফুরোলো। আবার গোদাবরীর ব্রীজ সেই ট্রেনের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলা।

ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। সুধীরার চোখেও তন্দ্রা ঘোর। তবুও দুচোখে দেখার নেশা। চেয়ে থাকি বাইরের দিকে। মাঝে মাঝে রাতজাগা স্টেশন। নামগুলো পড়তে চেষ্টা করি কিন্তু নামটা স্পষ্ট করে দেখার মুহূর্তেই হারিয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

মেঘ ও ময়ূর

সুভাষ ঘোষাল

NITAI GHOSH

সবাই বলে বাউণ্ডুলে। ছন্নছাড়া।

আসলে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় কই। আর সে মনও নেই। তাই জন্মদিনের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জন্মেছি এটা ভেবে একদিন সত্যিই কেমন গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু কখন যে এই গর্ব মুছে গেছে টের পাই নি। আজ জন্মের কথা ভাবলেই কেমন যেন যন্ত্রণা পাই। আমি এ পর্যন্ত কতোটুকু দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি—জন্মদিনে এসব কথাই মনে পড়ে। সোনামাসীকে বেশ মনে আছে। সোনা-মাসীর জন্মদিনে ছোটবেলায় আমরা তাঁর আন্দুলের বাড়িতে যেতাম। তিনি আমাদের নিয়ে মন্দিরে যেতেন। পুজো দিয়ে প্রসাদ নিতেন। তারপর সেই প্রসাদ সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হতো। এটাই যেন তাঁর একমাত্র দায়িত্ব ছিলো। সত্যি আমার খেয়াল ছিলো না যে আজ ষোলোই জুলাই। অন্যদিন হলে এসময় আমার বাড়ি থাকারও কথা নয়। কিন্তু দিনটা স্যাঁতসেঁতে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর ভালো লাগছিলো না। এর থেকে একটানা বেশ কিছুটা বৃষ্টি হয়ে একেবারে থেমে যাওয়া ঢের ভালো। বিষণ্নতার বৃত্তে যেন আমি বন্দী আছি একা, দীর্ঘবেলা। কতক্ষণ যে নিজেকে হারিয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। চমক ভাঙলো কার আঙুলের আলতো টোকায়। তাকালাম পিছন ফিরে। দেখলাম, জবা। হাসছে সে। কুয়াশার ভেতরে সূর্য-দেবের হাল্কা হলুদের উপস্থিতি। বেঁচে গেলাম আমি। ওকে পেয়ে বেঁচে গেলাম।

ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো মার্বেল রক দেখতে গিয়ে। জব্বলপুরের সেই বিখ্যাত মার্বেল রক। আজ বহু দিন পরে যাদবপুরে আমাদের বাড়িতে বসে এই কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কেমন আশ্চর্য লাগছিলো। আমরা দুজনে মুখোমুখি হলে এলোমেলো কথা বলায় আমাদের জুড়ি মেলা ভার। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ জবা হাতব্যাগ থেকে একটা বই বের করলো। প্রচ্ছদ দেখেই চিনে ফেললাম আমার প্রিয় কবির কাব্যগ্রন্থ। পাতা ওল্টাতেই জবার গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা মনে করিয়ে দিলো আজ আমার জন্মদিন। দেখে কেমন আনন্দ হলো। যাক পৃথিবীতে অন্তত একজনের কাছেও এদিনটার অর্থ আছে যাকে দু বছর আগে নর্মদার শীর্ণ ধারায় চোখ-মুখ ভেজাতে দেখেছি। এর-

পর যে সব কথাবার্তা হলো তা এতোই ব্যক্তিগত যে উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখি না। বরং এর পরের টুকু বলি। জবা গুন-গুন করছিলো। এক সময় ওর গলায় ভালো সুর খেলতো। এখন চর্চা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ আমার পড়ার টেবিল থেকে পুরনো ডায়রীটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলো। একটা পৃষ্ঠায় আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করলো—মনে হচ্ছে, গল্প? কবে লিখেছো?

বললাম—ঠিক মনে নেই। জবা কিছু বললো না। অনুচ্চ গলায় লেখাটা পড়তে শুরু করলো।—

'এ অঞ্চলে তালগাছ খুব বেশী। নারকেল গাছও আছে। তবে তালগাছের মতো নয়। মাঝে-মধ্যে দু-একটা বাড়ি না থাকলে জায়গাটাকে অনায়াসে তালবন বলা চলতো। খুব নির্জন বলেই এখানে কখন যে সকাল সরে গিয়ে দুপুর আসে টের পাওয়া যায় না। কাছে কোন তালগাছের মাথায় কাক ডাকছিলো। হয়তো এখনও বাচ্চা। দলছাড়া হয়ে ভয় পেয়েছে। শহরের শেষে—বিশেষত দুপুরে—এই একটানা ডাক চারদিক কেমন অসাড় করে তোলে। পুকুর পানায় ঢেকে গেলে যেমন নিস্তেজ হয়ে যায় অনেকটা সেই রকম। দুপুর ঢলে পড়লে টেলিগ্রাম এসেছে। বয়ে এনেছে একই লোক। অর্থাৎ তিরিশ-পঁয়ত্রিশের রোদে-পোড়া অক্লান্ত সেই মানুষটি। সেই পুরনো সাইকেলের ঘন্টি, গম-গমে গলার স্বর—টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম। তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। কাকটা ক্লান্ত হয়ে কখন যেন থেমেছে। মাঝে-মাঝে পাখির ঝাঁক অনেক দূরে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন গলার হার। চিত্রা কোথায়! দোতলার বারান্দার কোণে শূন্য পেরাম্বুলেটর। তার ভেতরে এক হাত সপ্রতিভ রোদ। হয়তো চিত্রা সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছে মৃত্যুকে একমাত্র মৃত্যুই অনুসরণ করে। যে ছেলে বাঁচলো না, পৃথিবীর আলো একবারের জন্যও দেখলো না, তার ছায়া সরতে না সরতেই চিত্রা এ কী শুনলো! শুভ এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবে ও যে কল্পনা করতেও পারে নি। অথচ সে সব দিন তো খুব একটা দূরের নয়। শিমুল তুলোর মতো আনন্দে উত্তেজনায় ভেসে-ভেসে বেড়াতো দিনগুলো। শুভ যখন বাড়ি ফিরতো আকাশের রঙ কমলালেবুর মতো হয়ে উঠতো। পোশাক ছাড়ার তর সইতো না। চিত্রার শরীরের প্রতিটি ডালপালার যেন শুভ-র স্পর্শে ঘুম ভাঙতো। শুভ স্বগতোক্তি করতো—মানুষ দুটো জিনিস পারে। এক—ভালোবাসতে; দুই—বিশ্বাস করতে। আমাদের জীবনে যে আসবে ভালোবাসা আর বিশ্বাস এই দুটোই আমরা তাকে দিয়ে যাবো।

একদিন উদ্যোগী হয়ে শুভ পেরাম্বুলেটর কিনে এনেছিলো। চিত্রা ওর কাণ্ড দেখে শুধু অবাকই হয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের রঙ থাকার কারণ কি? তখন তো চিত্রার আকাশেও নতুন জীবনের পদধ্বনি।

যখন বাড়িটা একেবারে ফাঁকা থাকতো, তখন এক অদ্ভুত উত্তেজনা গোপন অসুখের মতো ক্রমশ চিত্রাকে ভীষণ ক্লান্ত করে তুলতো। ক্লান্ত হতে-হতে ঘুমিয়ে পড়তো সেও এক সময়।

এর কিছুদিন বাদে একদিন গভীর রাতে চিত্রা যাকে পেলো তার প্রাণ নেই। প্রায় ভোর হয়ে এলে সেজ পিসিমার দেওর আর শুভ-র কয়েকজন বন্ধু তাকে রেখে এসেছিলো মাটির কিছুটা নীচে। শুভ তখন অফিসের জরুরী কাজে বাইরে। ওর কাছে খবর পোঁছলো দেরীতে। শুভ যে চিঠি লিখেছিলো তার কয়েক ছত্র চিত্রার মনে আছে—পৃথিবীতে পরিসরের বোধ মানুষের হয়তো কোনদিনও হবে না। যেমন ধরো বিরাট পাহাড় আছে, অগাধ সমুদ্র আছে, আবার তার পাশাপাশি আছে নানা জাতের পোকামাকড়। কেউ যদি এই সব দেখে ভাবে এখানে অনায়াসেই আরো এক জাতকের জায়গা হয়ে যাবে, তবে সে যে কতো বড়ো ভুল করবে আর ব্যথা তা তো আমরা বুঝতেই পারছি। ওইটুকু শরীরের মাটির ওপর জায়গা হলো না, মাটির নীচে যেতে হলো। তাই বলছিলাম মানুষ কোনদিনই হয়তো পরিসরের বোধ পেয়ে উঠবে না।

ঐ চিঠি পাবার পর থেকেই চিত্রা দিন-পঞ্জী লিখতে শুরু করে। বৈশাখের শেষে সে লেখে—আজ কি অদ্ভুত প্রশ্নের সামনেই না পড়েছিলাম। সমুকে ফুলদির কাছ থেকে সকালে আমার কাছে নিয়ে আসি। ও কখন ঠাকুর-ঘরে ঢুকে পড়েছে খেয়াল করি নি। লক্ষ্মীর ঘটের ওপর যে কলা ছিলো সেটা তুলে নিয়ে আমার কাছে ছুটে এলো। তারপরেই আমাকে সেই অদ্ভুত প্রশ্ন—মাসিমণি, তুমি ঠাকুরকে ঐ ঘরে রেখেছো ঠাকুরের একলা থাকতে ভয় করে না বুঝি? আমি এর কী উত্তর দেবো! আমার ভেতরটা থর-থর করে কেঁপে উঠেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ঈশ্বর কী চূড়ান্ত নিঃসঙ্গ।

শীতের শুরুতে চিত্রা লেখে—ফাদারের সঙ্গে আজও কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় দেখা হয়েছিলো। ইদানীং লক্ষ্য করছি ওঁর মুখে ভাঁজ পড়ছে। বেশী কথা বললে হাঁপিয়ে ওঠেন। আজও তাঁর হাতে সরু পেন্সিল আর কাগজ দেখে কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। চারদিকে ছোট-বড়ো-মাঝারি—নানা আকারের সমাধি। নিস্তরঙ্গ সময়। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা আপনাকে যখন দেখি আপনার হাতে খাতা-পেন্সিল কেন থাকে? ফাদারের চোখ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার দিকে অপলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বললেন—তুমি আমাকে এখানে দিনের পর দিন দেখেছো। শুধু এখানেই নয় হাটে-বাজারে মাঠে-ঘাটে বেড়াচ্ছি। কিন্তু মানুষের মুখ কিছুতেই আঁকতে পারছি না। কতোবার মনে হয়েছে এই বুঝি ধরতে পারলাম। কিন্তু আঁকতে গিয়ে হতাশ হয়েছি। তবু হাল ছাড়ি নি। বাকী দিনগুলোতে আমি চেষ্টা করবো, প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

চিত্রা আগে স্বীকার করতো না। কলেজ জীবনে ইংরেজীর অধ্যাপক একবার শেকসপীয়র পড়াতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—জীবনের প্রতি বাঁকে-বাঁকে নাটক।

ও এটাকে তখন মেনে নিতে পারে নি। প্রতিবাদ করেছিলো, তর্ক করেছিলো। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতা দিয়ে সে সব স্বীকার করে। বুঝতে পারে জীবনে কোন চরিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একে অন্যের সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে জড়িয়ে আছে। তা না হলে তার আর শুভ-র জীবনে সদানন্দ কাকার অস্তিত্ব (তা সে যতো অল্পই হোক) কেন ভুলে থাকা যায় না।

একবার ওদের বাড়িতে শকুন পড়ে। তখন অনেক রাত। উঠোন জুড়ে শকুনের দাপাদাপিতে সবাই জেগে যায়। তারপর সে কি প্রাণান্তকর চেষ্টা তাকে উড়িয়ে দেবার জন্য। অনেক বুদ্ধি খেলানোর পর শকুন অবশ্য উড়লো। তবে সারা উঠোনে রেখে গেলো অস্তিত্ব। ছেঁড়া পালকের টুকরো। মা বেশ কয়েক দিন ধরে বিষন্ন হয়ে ছিলেন। সব সময়েই কোন অমঙ্গল-

চিন্তা তাঁকে ঘিরে থাকতো। শেষে ঠাকুর-মশাইকে ডেকে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করানো লো। নেমন্তন্ন করা হলো কয়েকজন ণকে। সদানন্দ ছিলেন নিমন্ত্রিতদের জন। ওদের বাড়ির উঠোনো সেদিন তকে রোদ। উঠোনের একেবারে গের দিকে ফুলগাছটার নীচে ঘুমিয়ে ড়েছিলো কানুর মা। হয়তো এতোক্ষণ লো-মন্দ দুটো খাবার অপেক্ষায় থেকে। কানুর মার কানুকে পাড়ার কেউ কোন-দিন দেখে নি। অসাড়ের মতো ঘুমোচ্ছিলো বলে বুঝতে পারে নি কখন বুকের কাপড় সরে গেছে। হঠাৎ চিত্রা কী একটা কাজে কাছাকাছি এসে পড়ে। কয়েক হাত রেই দেখতে পেল সে সদানন্দ কাকাকে। চত্রা বিস্মিত। সে পা টিপে-টিপে সরে য়।

এই সদানন্দ কাকার অন্য দিকও চিত্রা দেখেছে। কী অপরিসীম পরিশ্রমে তিনি তিল-তিল করে বাগান গড়ে তুলেছিলেন। নতুন কারো সঙ্গে আলাপ হলেই তার কাছে নতুন চারাগাছ আছে কিনা জেনে নিতেন। ভোরের বাগানে খুরপি হাতে কোন চারা গাছকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে তাঁকে অনেকেই দেখেছে।

হঠাৎ সদানন্দ তাঁর ভীষণ পরিচিত জন্মভূমি ছেড়ে মধ্যপ্রদেশে চাকরী নিয়ে চলে যান। হয়তো জন্মভূমি, তার মানুষ, তার বুকের বাগান সদানন্দকে তেমন কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি—তিনি হয়তো ক্রমশ ই সব বুঝতে পেরেছিলেন কোন বেদের রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে, মানস সরোবর থেকে আসা পাখিদের অস্পষ্ট সংলাপে। যাবার আগে পৈতৃক বাড়ি এমন কারো কাছে বিক্রী করতে চেয়েছিলেন যে তাঁর প্রিয় বাগানকে নষ্ট করবে না, ভালোবাসবে। সদানন্দ যাবার আগে বন্ধুপুত্র শুভর কাছে সবকিছু বেচে দিয়ে যান। শুভ তখন চিত্রাদের পাড়ায় চলে আসে। তারপর পরিচয় থেকে পরিণয়।

সন্তান হারানোর পর চিত্রা শুভ-র মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখতে পায়। শুভ যেন হঠাৎ কেমন পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। সেই প্রাণচঞ্চল, আত্মবিশ্বাসী শুভকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। চিত্রা ছোটবেলায় হ্যারিওয়েট বীচার স্টোয়ের 'আংকল টমস কেবিন'-এর বাংলা অনুবাদ পড়েছিলো। সেই মেয়েটির নাম আজ আর তার মনে নেই। শুধু মনে আছে সে যখন বুঝতে পেরেছিলো তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, সে তার ঘন চুলের গোছা স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে টুকরো-টুকরো করে বিলিয়ে দিয়েছিলো তার প্রিয়জনদের কাছে। শুভ যেন সেই মেয়েটির মতো নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলো। তার যেন আর নতুন করে পাওয়ার কিছু ছিলো না। চিত্রা নিজেও জানতো যে সে তার ভালো-বাসা দিয়ে শুভকে ফিরিয়ে দিতে পারে শুভর নিজস্ব জগতে। কিন্তু ভালোবাসার সেই অসীম ক্ষমতা সব মানুষের থাকে না। তাকে বোধ হয় ক্রমশ অর্জন করে নিতে হয়। চিত্রা স্বীকার করে সে এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে।

মনে আছে ওরা দুজনে একদিন বাড়ি ফিরছিলো। বিকেলের আলো কমে এসেছে। সমানে ছোট মাঠ। সেখানে আলতো ভিড় দেখে ওরা এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করলো দাঁড়ে একটা পাখি। চওড়া আর লম্বা ঠোঁট। তাকে দেখিয়ে লোকটি বোঝাতে চাইছে যে অনেকেই ধনেশ পাখির নাম শুনেছে, যদিও অনেকেই তাকে দেখে নি। এই সেই ধনেশ পাখি। এর হাড়ের টুকরো হাতে বেঁধে রাখলে শরীরের যে কোন ব্যথা, বিশেষ করে বাত, সেরে যাবে। লোকটির হাতে ছোট একটা হাড়ের কুচি। আর পাখিটা দাঁড়ে কেমন অবসন্ন হয়ে আছে। চিত্রার দৃষ্টি এড়ায় নি শুভ কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। আরো খানিকটা এগিয়েই ওরা দেখতে পেলো তিনজন ড্যাং-গুলি খেলছে। তাদের কুষ্ঠরোগী মনে হয়। ফেরার পথ-টুকুতে ওদের মধ্যে কোন কথা হয় নি।

অনেক রাতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লে শুভ যখন চিত্রার অসম্ভব কাছে সরে এসেছে, চিত্রার মনে হলো এই মুহূর্তে দুটো শরীরের নিয়মিত যোগ-সাজস শোবার ঘরের জমাট অন্ধকারে একটুও ঢেউ তুলতে পারবে না। প্রত্যেকেই নিজের জন্য বেঁচে থাকতে গিয়ে আবহমান অন্ধকারকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

জবা একটু থেমে বললো—এর পরের অংশ লাল কালি দিয়ে দাগানো কেন?

বললাম—কোন্ অংশটা? পড়ো তা।

ও পড়লো—'চিত্রা প্রায়ই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের বিষয় মোটামুটি এক। তবে আঙ্গিকের রকমফের হয়। জেগে উঠেও সে বেশ কিছুক্ষণ ভুলতে পারে না যে সামনে-পেছনে নিবিড় দিগন্ত। দিগন্তে সময়ের অলৌকিক শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত স্বামী আর বিনষ্ট সন্তানের মুখ সে আর পৃথক করতে পারে না। সেই সম্মিলিত মুখাবয়ব বিবর্ণ পেরাম্বুলেটরে বসিয়ে সে হেঁটে যায় যে কোন দিগন্তের দিকে। আকাশ তার অগণিত পূর্ব-পুরুষের চোখের মণির মতো। তার মাথার ওপর চক্রাকারে ঘোরে সেই ধনেশ পাখি। তার মনে পড়ে মেঘের টুকরো উড়তে-উড়তে একদিন ঘরের কাছে আসে। আর তাই দেখে নেচে ওঠে ভিতর-বাড়ির ময়ূর। অথচ মানুষের জীবনে যোগা-যোগের এই আনন্দ কেন নেই। মানুষ কেন ক্রমশই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'

আচ্ছা এবার মনে পড়েছে। ওটুকু গল্পটা থেকে শেষে বাদ দিয়েছিলাম।—চিত্রাকে জানালাম।

কিন্তু ওটুকু থাকলে ক্ষতি কী? আমার তো বেশ ভালো লাগছে।—জবা প্রতিবাদ করলো।

বললাম—ছোট গল্প তো জানি কোন বিশেষ জায়গায় শেষ হয়। আর তাছাড়া ওই অংশটা কেমন বক্তব্য প্রধান হয়ে পড়েছে।

জবা কোন উত্তর দিলো না। শুধু আমার দুটো হাত তার কোলে টেনে নিলো।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

"বন্দুকের গুলির কথাটা হয়ত পরাশরের ঠাট্টা কিন্তু মস্ত বড় একটা বিপদের ফাঁড়া সেদিন তাদের সত্যিই ছিল ......

দরোয়ান অর্জুনসিং-এর মুখে যাবার সময়ও একই ভ্রূকুটি!

ট্যাক্সিওয়ালা সত্যিই তার কথা রেখেছে দেখা গেল।

খুব বেশী দেরী হয়নিত?

রাত ভর দেরী হলেও থাকতাম স্যার! কথা যখন দিয়েছি!

ওই ত একজন ভাড়া নিতে এসেছিল। জরুরী নাকি দরকার। মিটারের ডবল দেবে। রাজী হইনি স্যার!

ভাড়া নিতে এসেছিল এখানে? এখানে হঠাৎ ট্যাক্সির খদ্দের এল কোত্থেকে!

কে জানে স্যার! একটা সাইকেলে এসেছিল। যাবনা শুনে চলে গেল।

আচ্ছা, ড্রাইভারজি! তুমি ত ওস্তাদ চালিয়ে! সব আলো নিভিয়ে এই অবস্থায় গাড়ি চালাতে পারো?

এ আবার কি আজগুবী খেয়াল!

ড্রাইভার কিন্তু সানন্দে রাজী।

কেন পারবনা স্যার! এই দেখুন না!

সব আলো নেভানো চলন্ত গাড়িটার তখন কেমন ভুতুড়ে চেহারা।

পরাশর এই অন্ধকারে গাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে কি দেখছিল কে জানে!

তত্ত্বকথা
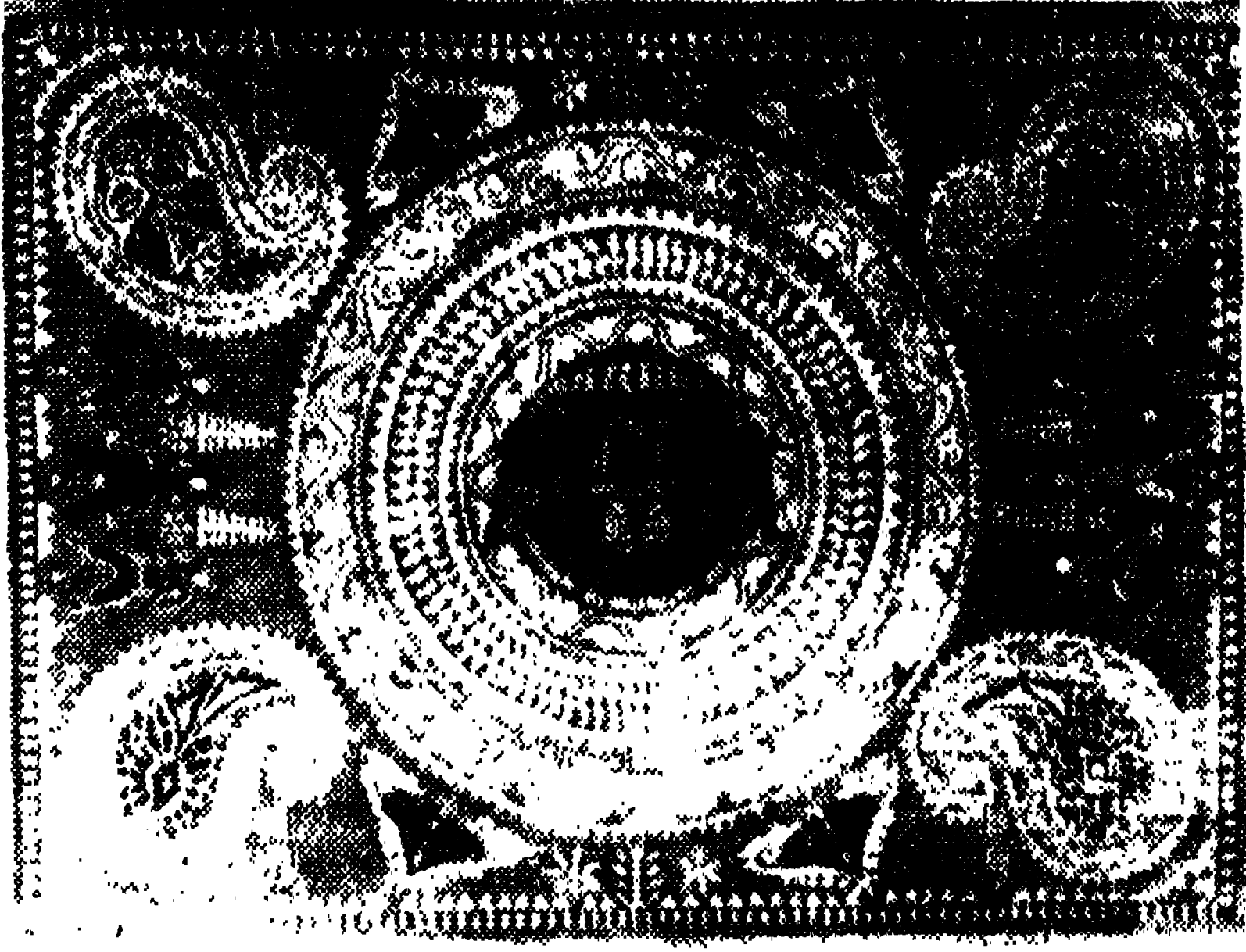
পিঁড়ির আলপনা

প্রজাপতি ঘুরঘুর। হাসির রোল পড়ে যায়। কিছুটা আনন্দেরও। আরো, যদি সে বাড়িতে বিবাহযোগ্য কেউ থাকে। তাহলে তো রীতিমতো জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসে। ঘুরে ঘুরে। সবাই সেদিকে তাকিয়ে খুশি-খুশি কথা বলে। আলাপ-আলোচনা চলে। বাড়ি-শুদ্ধ সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

প্রজাপতির আগমন-নির্গমনে সব মুখর মুখ নীরব হতে না হতেই বাড়িতে বিয়ের আসর জমে ওঠে। এতদিন যা ছিল জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা, এবার তাই সত্যি। বিয়ের কনে বার বার লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। এদিকে বাড়ির সবার ব্যস্ততার সীমা নেই। কেনাকাটা, গয়নাগাটি, খাট-আলমারি। তারপরও আর একটা ভাবনা আছে। তত্ত্বের ভাবনা। সবই এই পর্যায়ে পড়লেও মেয়ে বা নাতনির বিয়েতে হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শের উত্তাপে এই অনুষ্ঠানকে সঞ্জীবিত করা চাই। ভাবনায় ওঁদের চোখের ঘুম বিদায় নেওয়ার উপক্রম।

ওঁরা সব ভাবতে বসে যান। কিভাবে এই অনুষ্ঠানে আর একটু নতুনত্বের ছোঁয়া আনা যায়। এর আগে ছিল নাতির বিয়ে। তাই রকমফের বড়ি বানিয়েই ঠাকুরমা দায়িত্ব সেরেছিলেন। কিন্তু এবার আর তা হবার জো নেই। নাত-জামাই যে তাহলে ঠাকুমাকে খোঁটায় অস্থির করে দেবে। নাতনিও কি ছাড়বে? এখন না হয় চুপচাপ, মুখ বুজে আছে। পরে ঠিক শুনিয়ে বসবে। তাই ঠাকুমা কাজে হাত লাগান। বড়ির গয়না বানান তিনি দিনের পর দিন বসে। কতরকম গয়না। হার থেকে বাজু এবং বাজুবন্ধ সবই আছে। আর কত যে বড়ির বাহারে বড়ি তার ঠিক নেই। ঠাকুমা তো জানেন, ভোজনরসিক নাতজামাইকে আগেই কাবু করা দরকার।

ওদিকে দিদিমারও চিন্তার অন্ত নেই। নাতনিকে কিভাবে সাজানো যায় সেকথা তিনিও ভাবছেন। চোখে ভাল ঠাহর হয় না। নিজে হাতে সূঁচে সুতো পরাতেও পারেন না। তবু তার মন মানে না। তিনি বসে গেছেন কাঁথা নিয়ে। ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়েই তিনি শুরু করেছেন। কি সুন্দর তার নকসা! চোখ জুড়িয়ে যায়। দিনের পর দিন বসে তিনি নকসা তোলেন। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তবু তিনি দমছেন না। হাতের এক-একটি ফোঁড়ে সৃষ্টি হচ্ছে অপূর্ব সৌন্দর্য।

শুধু ঠাকুমা-দিদিমা নয়। এমনি অনেক কিছু দেবার আছে অনেকের। তাঁরা চুপচাপ বসে নেই। সারা বাড়ি জুড়ে ব্যস্ততা। সবকিছুর ফাঁকে তত্ত্ব সাজানোর ব্যস্ততায় অনেকেই নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছেন। সবাই চাইছেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ জিনিসটুকু উপহার দিতে। আবার যেন আগের সঙ্গে না মেলে সে বিষয়েও তাঁরা সচেতন।

এসবই সেদিনের ভাবনা। সেদিন ঠাকুমা-দিদিমা থেকে শুরু করে সবাই যেরকম ভাবতেন আজ অবশ্য ভাবনা সেদিকে বয় না। দিনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও অন্য খাতে বইছে। তাই কুসুমিকার বাঙালী বিয়ের উপকরণ-প্রদর্শনীর আমন্ত্রণ পেয়ে আজকের কথাই মনে হচ্ছিল বেশি। পুরনো কথা ভাববার সুযোগ খুব একটা পাইনি।

কিন্তু প্রদর্শনীর আসরে হাজির হতেই মনটা ঘুরে গেল। সানাইয়ে আলাপ হচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে শুনলাম। তখনো জানি না, ভেতরে কি বিরাট আসর বসেছে। সানাই শুনতে শুনতে ঢুকে পড়লাম একেবারে প্রদর্শনীর ঘরে। আর তারপরই বিস্ময়ের পর বিস্ময় এক রাশ বিস্ময় একসঙ্গে।

রীতিমতো বিয়ে বাড়ি। তত্ত্বের বহরে আসর ভরে গেছে। বর-কনের বিয়ের পিঁড়ি মায় যজ্ঞকুণ্ড পর্যন্ত প্রস্তুত। আমন্ত্রিতেরা সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন। আর সবকিছুর তত্ত্বাবধান করছেন কুসুমিকার পরিচালিকা শ্রীমতী উমা বসু।

বড়ির গয়না কত রকমের। ঠিক আগেকার দিনের ঠাকুমা-দিদিমা যেরকম ভাবতেন। এছাড়া বড়িও আছে থরে-থরে। নাতজামাইয়ের রসনাকে তৃপ্ত করার জন্য

আধুনিক কালের বেয়াইন

ওদের আন্তরিকতার অন্ত নেই। শুধু বুড়ি ঠাকুমা-দিদিমা নয়। হাত লাগিয়েছে সবাই। তাই মশলার ট্রে-তে ধরা পড়েছে বিচিত্র শিল্পকার্য। লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি দিয়ে কত নকসা করা হয়েছে। গৃহস্থ বাড়ির সমস্ত সম্পদকে সেখানে হাজির করা হয়েছে। নতুন জামাইকে পরিচয় দেওয়া হয়েছে শ্বশুরবাড়ির।

কুলো আর পিঁড়ির আলপনায় অনেক দূরের হারিয়ে যাওয়া বিয়ে বাড়ির আমেজ পাচ্ছিলাম। বর-কনের জন্য সাজানো পিঁড়ি ছাড়াও কত সুন্দর শিল্পকাজে শোভিত পিঁড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য।

রুমাল আর রিবনের সাজও বিয়ের তত্ত্বের একটি অনবদ্য দিক। বাপ-মার যদি পয়সা থাকে তাহলে তো কথাই নেই। তাহলেও সবকিছুর সংগে যাবে এই-সব শিল্পকাজ। ভিন্ন ভিন্ন সাধনায় অভিন্ন হৃদয়কে ও'রা কাছে রাখতে চায়। আবার পয়সা না থাকলেও তত্ত্বের ত্রুটি পূর্ণ হয়ে যাবে এইসব উপকরণে।

এসব যাঁরা করতে পারেননি তাঁদের ভূমিকা আছে বিয়েতে। চন্দনের কাজ আর কনের চুল বাঁধা। চন্দনের কাজ বিয়ের অবশ্য-অঙ্গ। একে আজো বর্জন করা চলেনি। মনের মতো সাজানো হবে চন্দনের বাহারী কাজে। চুল বাঁধা অবশ্য এরও আগের পর্ব। প্রায় শুরুর কাজ বলা চলে। কনের বিভিন্ন খোপার কয়েকটি মডেল প্রদর্শনীকে পূর্ণতা দিয়েছে। বিশেষ চন্দনের সাজে যে সৌন্দর্য প্রাণবন্ত হয়েছে তা সহজে ভোলা যায় না। এই কাজ প্রদর্শনীতে উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী জীজাবাই ভট্টাচার্য।

কিন্তু এখানেই তো তত্ত্বের শেষ হতে পারে না। বর-কনের প্রয়োজনীয় জিনিষ চাই। তাই কসমেটিকস আর জামা-কাপড়ের প্রাচুর্যও আছে। থরে থরে সাজানো। অবশ্য কসমেটিকের কথা আজ আর নতুন করে বলার দরকার নেই। প্রায় বিয়েতেই এর বাহুল্য কারো নজর এড়ায় না। আর সেদিনের তুলনায় এখন প্রসাধনদ্রব্যের উন্নতিও ঘটেছে এবং বৈচিত্র্যও বেড়েছে।

একটি জরির ব্লাউজ ঘিরে সকলের কৌতূহল। এত সুন্দর ব্লাউজ আগাগোড়া হাতে তৈরি। সে এমন অবাক হবার কিছু নয়। এর চেয়েও বড়ো কথা, এটি তৈরি করেছেন একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধা। নাতনিকে জীবনের এই মহালগ্নে সাজানোর কাজে তিনি দূরে সরে থাকেননি। বিয়ের খবর পাওয়ার সংগে সংগে দিনের পর দিন বসে বানিয়েছেন এই ব্লাউজ।

প্রদর্শনীতে আরেকটি জিনিষ স্থান পেয়েছে যা অসংখ্যের মধ্যে সহজেই নিজেকে চিনিয়ে দিতে পারে। পুরনো নোট আর চেক দিয়ে সাজানো একটি পিঁড়ি। এর একটু ইতিহাস আছে। ১৯০৬ সালে এই পিঁড়িটি সাজানো হয়। লেডি মিন্টো পিঁড়ির সাজ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ। তিনি শুধু সেটিকে পুরস্কৃত করেই ক্ষান্ত হলেন না, পাঠিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে রসিকজনের প্রশংসা কুড়িয়ে পিঁড়িটি ফিরে আসে আবার দেশে। এই দ্রষ্টব্য জিনিষটা নিঃসন্দেহে প্রদর্শনীর মর্যাদা বাড়িয়েছে।

ফুলের আর ফলের ডালিতে তত্ত্ব সাজানো হয়েছে নিখুঁতভাবে। যেন কোথাও কোন ত্রুটি না থাকে। ফুলের ডালিতে কয়েকটি চাঁপা ফুল পুরোপুরি বানানো হয়েছে পেঁপে আর শশা চিঁড়ে। কিন্তু কোথাও এতটুকু ধরার উপায় নেই। সত্যিই সেই, ফুলের গন্ধ নিতে গিয়ে বর-কনে খুব ঠকবে। দেবীপ্রসাদ সরকারের মুখোস খুব ঠকানো এই চাঁপা ফুল খুবই প্রশংসনীয়। বড়ির গয়নায়ও তিনি বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

উনসত্তর বছরের শ্রীমতী উমাশশী বসু-মল্লিক বড়ির গয়নায় যথার্থ মনটিকে ধরে রাখতে পেরেছেন। সেই মন যা আজ লুপ্ত হতে চলেছে। বড়ি আর বড়ির গয়না নিয়ে মাথা ঘামাতে আজ আর কেউ খুব একটা রাজী নন। অথচ একদিন এটুকু না হলে তত্ত্ব হতো অপূর্ণ। শুধু ভোজ্যদ্রব্য নয় এর শিল্পসুষমার জন্যও।

কৃষ্ণা মিত্রের মশলার ট্রে থেকে পুরো গেরস্থ বাড়ির একটি রূপকল্প পাওয়া যায়। আর পিঁড়ির আলপনায় দীপা রায় শিল্পী মনের সুন্দর পরিচয় রেখেছেন। এমনি কৃতিত্ব রুমাল সাজানোয় চন্দ্রিমা রায়ের। এছাড়াও কোন কিছুই ফেলনার নয়।

প্রদর্শনী দেখতে দেখতে হাতের কাছে শ্রীমতী উমা বসুকে পেয়ে যাই। একফাঁকে জিগ্যেস করি, এতসব পেলেন কোথা থেকে?

সেই হাসি হাসি অতিথি আপ্যায়ন করা মুখেই তিনি বললেন, এজন্য তত্ত্বসজ্জা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি আমরা। প্রতিযোগিতায় ছিল ছয়টি বিষয়। যার সব-কিছুই এখানে হাজির করা হয়েছে রুমাল ও রিবন সাজানো, মশলার ট্রে বড়ির গয়না, কুলো ও পিঁড়ি আলপনা। অনেক প্রতি-যোগী যোগদান করেছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়া এরকম প্রদর্শনী করা খুব একটা সহজ নয়। তাছাড়া অশিক্ষিত-পটুত্ব নিয়েই আমাদের মা-দিদিমা এবং প্রতিবেশী বিয়ের তত্ত্ব, সাজাতেন। সেই ধারাটি ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁদেরই বংশধর আমরা আজ তত্ত্বের ব্যাপারে বহুলাংশে পরমুখাপেক্ষী। সেই লুপ্ত ঐতিহ্যকে যেমন তুলে ধরতে চেয়েছি তেমনি আরেকটি উদ্দেশ্যও আছে।

কি সেই উদ্দেশ্য প্রশ্নহীন জিজ্ঞাসায় তাকালাম শ্রীমতী বসুর দিকে।

এরপর যদি কেউ উৎসাহিত হয়ে এভাবে তত্ত্ব সাজান। আর বিভিন্ন মহিলাকে দিয়ে এই কাজগুলি করিয়ে নেন। তবেই আমার এই প্রদর্শনী সার্থক।

শ্রীমতী উমা বসু এখন আর হাসছেন না। চিন্তা করছেন।

—প্রমীলা

বেতার শ্রুতি

খবর দেখেছেন? ২৬ এপ্রিল তারিখের কাগজে খবর বেরিয়েছিল (নয়াদিল্লী থেকে খবরটি দিয়েছিলেন প্রেস ট্রাস্ট অভ ইণ্ডিয়া), আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার আসর প্রচারিত হবে, কলকাতা কেন্দ্র থেকে যেমন নিয়মিত হিন্দী শিক্ষার আসর প্রচারিত হয়। খবরে বলা হয়েছিল, সংস্কৃত শিক্ষার আসর প্রচারিত হবে ২৬ এপ্রিল থেকে সপ্তাহে দুদিন—রবিবার আর সোমবার; আর বাংলা শিক্ষার আসর প্রচারিত হবে ২৮ এপ্রিল থেকে সপ্তাহে পাঁচ দিন—মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার। শিক্ষা দেওয়া হবে হিন্দীতে, আর সংস্কৃত-বাংলা দুটি আসরই হবে পনের মিনিট করে।

খবরটি দেখে বাংলাভাষীরা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন এবং আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বাংলাভাষাকে কোণঠাসা করার জন্য যখন প্রকাশ্যে ও গোপনে শত চেষ্টা হচ্ছে তখন অবাঙালীদের বাংলা শেখানোর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাংলাভাষার উপর পূর্ব পাকিস্তানে অনেক অত্যাচার হয়েছিল, সেখানেও বাংলাভাষাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী তরুণেরা রক্ত দিয়ে সেই অত্যাচার প্রতিরোধ করেছেন, বাংলাভাষাকে কোণঠাসা করার সেই চেষ্টা তাঁরা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তাঁরা প্রাণ দিয়ে বাংলাভাষাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এখানে আমরা তা পারিনি। এখানে বাংলাভাষা কেন্দ্রীয় সরকার ও হিন্দীওয়ালাদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে, বাংলাভাষাকে কোণঠাসা করার নির্লজ্জ চেষ্টা হচ্ছে এখানে। এবং এই বাংলাদেশের বুকেই হচ্ছে। বাংলাদেশের রেল-স্টেশনগুলোতে প্রথমেই বড়ো বড়ো হরফে হিন্দীতে স্টেশনের নাম লেখা, তারপর ছোটো হরফে ইংরেজীতে আর বাংলাতে। বাংলাত সকলের শেষে। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলোতে যত সাইনবোর্ড তার সবই হিন্দীতে লেখা, বাংলার স্থান নেই সেখানে। এমনকি, যে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বাংলাভাষী শ্রোতাদের জন্য বাংলাভাষাতেই অধিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেই কেন্দ্রেও বাইরে একবার মাত্র আকাশী নীল হরফে 'আকাশবাণী ভবন' লেখা ছাড়া সারা বাড়িটার ভিতরে-বাইরে আর কোথাও কোনো সাইনবোর্ডে একবর্ণও বাংলা নেই, আছে হিন্দী আর ইংরেজী। হিন্দীর দাপট শুধু সাইনবোর্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অনুষ্ঠানের উপরেও পড়েছে। কলকাতা কেন্দ্র থেকে দিনে-রাত্রে কতগুলো করে হিন্দী নিউজ বুলেটিন পুনঃপ্রচারিত হয়, কতগুলো করে হিন্দী গান শোনানো হয়, ক'টা করে হিন্দী কথিকা আর আলোচনা প্রচার করা হয়, কী পরিমাণ হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হয়—তার মোটামুটি একটা হিসাব ইতিপূর্বে বেতারশ্রুতি বিভাগে দেওয়া হয়েছে। কোন্ কোন্ বাংলা অনুষ্ঠানে কীভাবে কৌশলে হিন্দী অনুপ্রবেশ করানো [illegible] এই বিভাগে লেখা হয়েছে। এখন [illegible] হিন্দী [illegible] কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বাংলা শব্দও হিন্দীর অনুকরণে উচ্চারণ করা হচ্ছে। বাংলাকে হিন্দীর ধাঁচে ঢেলে আনার একটা প্রবল প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে আকাশবাণীতে। অথবা বাংলাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করার।

ঠিক এই রকম সময়ে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ দিল্লী কেন্দ্র থেকে নিয়মিত বাংলা শিক্ষার আসর প্রচারের ব্যবস্থা করায় কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য খুঁজছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য—তবু আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের অনেক অনুরোধ-উপরোধ আমল না দিলেও এই যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজধানীর বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত বাংলা শিক্ষার আসর প্রচারের আয়োজন করেছেন তাতে তাঁদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না।

বাংলা শুধু ভারতেরই একটি সুললিত উন্নত ভাষা নয়, পৃথিবীরও। পৃথিবীর বহু দেশে এখন বাংলা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। বহু দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

কয়েকটি বড়ো বড়ো দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারের সময় ও মিটার অনেকেরই জানা আছে, কিন্তু অনেক ছোটো ছোটো দেশের বেতারকেন্দ্র থেকেও যে নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সে-কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। বিদেশের বেতারকেন্দ্র থেকে কী রকম বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সে-বিষয়ে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক, এবং আছেও অনেকের। সেই কারণে ছোটো-বড়ো কতকগুলি দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানের সময় ও মিটার পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান বহু শ্রোতা শুনে থাকেন, সুতরাং তার সময় ও মিটার জানাবার বোধ হয় দরকার করে না।

রেডিও জাপান থেকে আগে সপ্তাহে তিন দিন—সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার রাত ৯টা ১৫ মিনিট থেকে ৯টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত ২৫ মিটার ব্যাণ্ডে (১১৭০৫ কিলো সাইক্লে) ও ৩১ মিটার ব্যাণ্ডে (৯৬৭০ কিলো সাইক্লে) বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ত। গত ৬ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ঐ মিটার ব্যাণ্ডগুলিতেই নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

রেডিও কায়রো থেকে প্রতিদিন বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট থেকে ৬টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ১৬·৭৪ মিটারে (১৭৯২০ কিলো-সাইক্লে) বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। প্রতি বুধবার বাংলা গানের অনুরোধের আসরও হয়।

বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন লণ্ডন থেকে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৭টা ১৫ মিনিট (রবিবার ৭টা ৩০ মিনিট) পর্যন্ত ২৫, ৩১, ৪১ ও ৪৯ মিটার ব্যাণ্ডে এবং শনিবার ও রবিবার ছাড়া প্রতিদিন রাত ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে ৮টা পর্যন্ত ১১, ১৩, ১৬, ১৯ ও ২৫ মিটার ব্যাণ্ডে (২৫·০৯ মিটারে অর্থাৎ ১১.৯৫৫ কিলো সাইক্লে) 'প্রবাহ' এবং প্রতি বুধবার ১১, ১৩ ও ১৬ মিটার ব্যাণ্ডে বেলা ৩টে থেকে ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত 'বাতায়ন'

অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। 'বাতায়ন' অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হয় ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে ১০টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ২৫·০৯ মিটারে অর্থাৎ ১১,৯৫৫ কিলো সাইক্লে।

ভয়েস অভ অ্যামেরিকা প্রত্যহ রাত ৯টা ৩০ থেকে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১ মিটার ব্যাণ্ডে এবং মিডিয়ম ওয়েভে ১৯০ মিটারে অর্থাৎ ১,৫৮০ কিলো সাইক্লে নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করেন।

ফার ইস্ট ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৭টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ১৯·৪৯ মিটারে অর্থাৎ ১৫,৩৯৫ কিলো সাইক্লে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন।

রেডিও মস্কো বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট থেকে ৫টা পর্যন্ত এবং রাত ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ৮টা পর্যন্ত, আবার ৮টা ৩০ মিনিট থেকে ৯টা পর্যন্ত ১৩, ১৬, ১৯ ও ২৫ মিটার ব্যাণ্ডে এবং মিডিয়ম ওয়েভে ২১৭ মিটারে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

ভয়েস অভ জার্মানী (পশ্চিম জার্মানী) প্রতি একান্তর বৃহস্পতিবারে রাত ৯টা ২০ মিনিট থেকে ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ২৫ মিটার ব্যাণ্ডে (১১,৭৯৫ কিলো সাইক্লে) ও ১৯ মিটার ব্যাণ্ডে (১৫,২৭৫ কিলো সাইক্লে) বাংলা অনুষ্ঠান নয়, সংস্কৃত অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন।

অনুষ্ঠান-পর্যালোচনা

---

২৪ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষে 'বিচিত্রা'। প্রযোজক প্রথমে সরল ভাষায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তারপর আমাদের নিয়ে গেছেন দমদম বিমানবন্দরের আবহাওয়া অফিসে। সেখানকার আবহবিদদের সঙ্গে আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর কথাবার্তা শুনিয়েছেন। তারপর আবহাওয়া নির্ণয়ের বিভিন্ন যন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই পরিচয় কতখানি সার্থক হয়েছে অর্থাৎ যন্ত্রগুলি ও তার কার্যকলাপ কতখানি বোঝা গেছে, সে ভিন্ন প্রশ্ন—কিন্তু এই কলকাতারই বুকে আলিপুরে আরও একটি অতি পুরাতন আবহাওয়া অফিস যে আছে, সেটা তিনি ভুলে ছিলেন কেমন করে?

২৫ এপ্রিল সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ শেষ হবার পর যথানিয়মে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু হ'ল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান শেষ হ'ল ৮টায়, এবং জনৈক ঘোষিকা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে তারপর ঘোষণা করলেন, "আকাশবাণী কলকাতা, এখন দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।" ঘোষণাটা শুনে দারুণ চমক লাগল : পৌনে ৮টায় "দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানোর" পর আবার ৮টায় "দিল্লী থেকে বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে"! কোনো বিশেষ সংবাদ নাকি? কিন্তু কই, ঘোষণায় সে রকম কিছু তো বলা হ'ল না? আগেও তো কোনো নোটিশ পাওয়া যায় নি। তাহলে?...

ভাবনা শেষ হতে না হতেই ঐ ঘোষিকারই কণ্ঠে আবার ঘোষিত হ'ল, "আকাশবাণী কলকাতা এখন লোকগীতি (লো-ক-গী-তি নয়)। শোনাচ্ছেন নির্মলেন্দু গুপ্ত।" ব্যাপার কী, দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে বলে যে ঘোষণা করা হ'ল সেই সংবাদের রিলে কই? শুরু হয়ে গেল লোকগীতি, এবং পনের মিনিট পরে তা শেষও হ'ল। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী ঘটে গেল তা জানানো হ'ল না, ঘোষিকা ভুল ঘোষণা করেছিলেন এমন কিছুও বলা হ'ল না। আলেকজাণ্ডার হলে বলতেন, "সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই কলকাতা কেন্দ্র!"

আমার এক প্রবীণ সহকর্মী বললেন, "শুনেছ ব্যাপারটা?" বললাম, "শুনেছি।" তারপর তিনি বললেন, "আমি বাজারে গিয়েছিলাম। হন্তদন্ত ফিরলাম, ৮টার সময় এক জায়গায় যেতে হবে। ঘরে ঢুকতেই কানে গেল, দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে। শুনে খুব আশ্বস্ত হলাম। যাক, এখনও তাহলে আধঘণ্টা সময় আছে। কিন্তু ও হরি, একটু পরেই যে লোকগীতি শোনাতে আরম্ভ করল!"

২৬ এপ্রিল বেলা ১টায় রূপ ও রঙ্গের আসরে প্রচারিত হ'ল শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত কৌতুক নকশা "সেলামী"। বেশ রসাল হয়েছিল নকশাটি, উপভোগ্য। বাড়িওয়ালার আপাত নির্দয়তার মধ্যে যে দয়ালুতা লুকিয়ে ছিল তা আজকের দিনে সত্যিই দুর্লভ, কিন্তু খুবই কাম্য। সুন্দর লেগেছে চরিত্রটি। চরিত্রটি ফুটিয়েছেন সুন্দর শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়।

সামগ্রিক অভিনয় ও প্রযোজনাও প্রশংসনীয়।

এইদিন রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রীনির্মল সেনগুপ্তর সমীক্ষাটি উল্লেখযোগ্য। এই সমীক্ষায় তিনি গান্ধীর মত ও পথের সঙ্গে লেনিনের মত ও পথের তুলনা করেছেন। কোনোটিকে তিনি ছোটো করেন নি। তিনি বলেছেন হিংসা ভয় পাচ্ছে অহিংসাকে। গান্ধীজী মৃত্যুবরণ করেছিলেন চরম দক্ষিণপন্থী হিংসার হাতে, এখন তিনি আক্রান্ত হচ্ছেন চরম বামপন্থী হিংসার হাতে। খুব সত্যি কথা।

শ্রীসেনগুপ্তের ভাষার বাঁধুনি আছে, বক্তব্য ব্যালান্স করার ক্ষমতা আছে।

৩০ এপ্রিল রাত ৮টায় অতুলপ্রসাদের গান শোনালেন শ্রীমতী প্রতিভা মজুমদার। ...যে অপূর্ব ভাবের জন্য অতুলপ্রসাদের গানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সেই ভাবের অভাব দেখা গেল শ্রীমতী মজুমদারের গানে, একটু মিষ্টতারও। এই দুটি দিকে আর একটু নজর দিলে তাঁর অনুষ্ঠান উপভোগ্যই হ'ত। রাত সাড়ে ৮টায় শ্রীমতী বনশ্রী সেনগুপ্তর রবীন্দ্রসঙ্গীত মন্দ লাগল না।

৩ মে সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিশুসঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ পরিবেশিত "শিশু রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক আলেখ্যটি বেশ তথ্যমূলক। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা ও গান অবলম্বনে এটি রচনা করেছেন ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য। গ্রন্থনাও তাঁর।

শিশুদের গানের অংশের চেয়ে কথার অংশই বেশি মনোরম হয়েছিল। গানের অংশ যেন কিছুটা অবহেলিত ছিল। তবু শিশুদের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া গেছে,—উজ্জ্বলতা, আনন্দ, উচ্ছলতা খুশি। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, গ্রন্থনায় মন ভরে নি। গ্রন্থনা নীরস, গদ্যময়।

৪ মে রাত সাড়ে ১০টায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী সুমিত্রা সেন। সুন্দর লাগল। বেশ দরদ দিয়ে গেয়েছেন শ্রীমতী সেন।

৬ মে বেলা ২টো ৪৫ মিনিটে শ্রীগোপালচন্দ্র পাত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীতও প্রশংসনীয়। এই নবীন শিল্পী দুটি গান গাইলেন এই আসরে—"মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের..." ও "আমি কান পেতে রই"। প্রথম গানটির চেয়ে দ্বিতীয় গানটিতেই ভাব-রস পাওয়া গেল বেশি।

...—শ্রবণক

সরস্বতীর্থের নৃত্যানুষ্ঠানে মধুশ্রী দাস

জলসা

মহিলা সংস্কৃতির সার্থক অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রসদনে কানন দেবী পরিচালিত নবগঠিত সংস্থা উইমেন্স কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বিচিত্রানুষ্ঠানের আশাতীত সাফল্যলাভের কারণ কলারসিকদের শিল্পের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, কর্মীদের অনলস পরিশ্রম এবং সংঘনেত্রীর গঠনক্ষমতা। খুব সম্ভব এ-সবেরই মিলিত যোগফল সেদিনের সার্থক সন্ধ্যা। বহুদিন বাদে প্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ দেখে খুশীতে মন ভরে না উঠে পারে না। কানন দেবীর উদ্বোধনী ভাষণে জানা গেল — শিল্পকলার বহুধাবিস্তৃত ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও—অর্থ অথবা সামর্থ্যের অভাবে অনেক সত্যিকারের প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটে ওঠে না। উইমেন্স কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য—এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্বারা অর্জিত অর্থে এঁদের সাধ্যমত সাহায্য করা। সভার পৌরোহিত্যকালে ডঃ রমা চৌধুরী এই নতুন প্রতিষ্ঠানকে আশীর্বাদ জানানোর প্রসঙ্গে কানন দেবীর সংগঠন-শক্তি ও সকলপ্রকার কল্যাণমূলক কাজে প্রাণঢালা আত্মসমর্পণের উল্লেখ করেন এবং তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে লক্ষ্যে পৌঁছতে এঁদের দেরী হবে না—এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বলে জানান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় দুটি নৃত্য দিয়ে। একটি লোকনৃত্য—'এই বর্ষায়', দ্বিতীয়টি 'কাজ নেই'। অসিত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত নৃত্যদ্বয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে প্রথমটি উপভোগ্য। দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু হোল বেকার যুবকের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালে ফুটে-ওঠা একগুচ্ছ ফুল ফোটা দেখে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা। উদয়শঙ্করী রীতি অনুসৃত নৃত্যাংশ স্থানবিশেষে মন্দ নয়। কিন্তু গান দিয়ে অতি কাঁচা অপরিণত শিল্পকর্মেরই পরিচয়। নৃত্যাংশে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত বসু চলনসই।

এরপরই মঞ্চস্থ হয় 'বারো ভূত' প্রযোজিত 'এবং ইন্দ্রজিত'। প্রতিষ্ঠান নতুন, শিল্পীরা নতুন এবং তরুণ পরিচালক আলোক ও সঙ্গীতশিল্পী অর্জুন মুখোপাধ্যায়ও নতুন। এতগুলি আনকোরা নতুন তরুণ সম্প্রদায়ের 'এবং ইন্দ্রজিত'-এর মত কঠিন এবং রূপকধর্মী নাট্যকে রূপ দেবার প্রয়াস অবশ্যই দুঃসাহসের পরিচয়। কিন্তু এই দুঃসাহস যে নিছক ব্যর্থতায় পরিণত হয়নি—সারা প্রেক্ষাগৃহের তুমুল হর্ষধ্বনিই তার প্রমাণ। অভিনয় ও উপস্থাপনায় হয়ত কিছু ত্রুটি ছিল। প্রথম প্রয়াস হিসাবে তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

ইন্দ্রজিৎ আরো প্রাণবন্ত হতে পারত। কবির সংলাপবর্ণন আরো চিত্তগ্রাহী হওয়া উচিত ছিল। এ-ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে ভবিষ্যতে এঁরা স্ব স্ব প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে পারবেন এই আশাই আমরা করব।

গ্রামোফোন কোম্পানীর রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব। কবিগুরুর আবির্ভাব-লগ্নকে প্রতি বছর গ্রামোফোন কোম্পানী প্রণতি জানান জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে কবির গানের নৈবেদ্য সাজিয়ে। এই গানগুলির ডিস্কই অসংখ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের প্রতি তা রবীন্দ্রজয়ন্তীর উপহার। গত সপ্ত রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এক উৎ রেকর্ডের গানগুলিই স্ব স্ব কণ্ঠে শিল্প গেয়ে শোনান সেদিনের সঙ্গীতা নিমন্ত্রিত অতিথিদের। পুষ্পস্তবক ও সজ্জিত সারা মঞ্চ যেন মন্দির হয়ে উঠে আর শিল্পীরা সেই পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে আরাধনার ভাবেই কবির গ অর্ঘ্য ২৫শে বৈশাখের উদ্দেশে নি করেছিলেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রতিশ্রুতি তরুণ শিল্পী বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিয়ে। তরুণতর গোষ্ঠীর মধ্যে অনু তালিকায় ছিলেন স্বপন গুপ্ত, ঘোষাল, সুশীল মল্লিক, অর্ঘ্য সেন, প্র

মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। পরিণততর শিল্পীদের মধ্যে সুমিত্রা সেন সাগর সেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের উজ্জ্বল তারকাদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায় আধুনিক গানের জনপ্রিয় শিল্পী হয়েও রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন।

সকল শিল্পীই আপনাপন যোগ্যতা অনুযায়ী উৎসব-সন্ধ্যাকে সুন্দর করে তুলেছেন। তবে কানন দেবী গীত 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'-র রেশ সেদিনে উপস্থিত বহু শ্রোতার স্মৃতিতে আজও অনুরণিত বলেই বোধহয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ঐ গান তাঁদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

এবারের উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদ হোল 'ই পি রেকর্ডে কানন দেবীর বিভিন্ন ছবিতে গাওয়া চারখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই সেদিনে বিশেষ অতিথিরূপে কানন দেবী আহূত হয়ে শিল্পীমহল ও শ্রোতাদের আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছিলেন।

সুরতীর্থের নৃত্যোৎসব। গত সপ্তাহে সুরতীর্থের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায় এক পরিচ্ছন্ন সুন্দর নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেন রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। এই নৃত্যসভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

একাধারে লোকনৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং নৃত্যনাট্য 'জটায়ু বধ' এই ব্যপক নৃত্যানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মিলিত অনুষ্ঠানের এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবেশনা সচরাচর চোখে পড়ে না। কথাকলি, ভারতনাট্যম মণিপুরীর বীর্য ও আরাধনার ভাব এবং লোকনৃত্যের সহজ, সরল আনন্দ দর্শকচিত্তে পরিব্যাপ্ত হয়েছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার গুণে। তবে প্রতিটি অনুষ্ঠান এমন দীর্ঘ-বিলম্বিত না হলে রসোপভোগ আরো নিবিড় হয়ে উঠতে পারত। বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল বালকৃষ্ণ মেননের পরিচালনায় 'জটায়ু বধ'। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমেনন স্বয়ং। নৃত্যের ভাববস্তুর প্রয়োজনে কখনও কথাকলি কখনও অন্যান্য নৃত্যের ছোঁয়া লেগে চরিত্র ও বিষয়বস্তু জীবন্ত হয়ে ওঠে। মহাকাব্যের মূল রসটিও সযত্ন রক্ষিত। নৃত্য ছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলগীতির অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও অনুশীলনের মনোগ্রাহী নমুনা পেশ করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

গ্রামোফোন কোম্পানীর রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে বাণী ঠাকুর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ, কানন দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সুশীল মল্লিক এবং সুমিত্রা সেন

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত জার্মান ব্যালের একটি বিশেষ মুহূর্তে শিল্পীদ্বয় [illegible] এবং [illegible]

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

মুক্তিস্নান / ললিতা চট্টোপাধ্যায়

নায়কোত্তম উত্তমকুমার

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা আর কি! একটা পুরোনো লোহা বেচা-কেনার দোকান—কোনোরকমে নড়বড় করে চলছে। তাইতে বসে বসে ইন্দ্রজিৎ মুখুজ্যে স্বপ্ন দেখে ধনী শিল্পপতি হবার। ছোট ভাই দেবজিৎ দাদাকে সাহায্য করবার কথা চিন্তাই করে না, সে ব্যবসার ধার দিয়েও যায় না। ইন্দ্রজিতের কিন্তু সুযোগ মিলে যায়। মদ্যপ অমর সেনের কাছ থেকে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে সে পেয়ে যায় একরাশ সোনার গহনা; যে দেয় এই গহনাগুলি, সে হচ্ছে অমর স্বারা প্রতারিতা ও নিগৃহীতা রমা। রমার আশা ছিল অমর ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে, বিশেষ যখন তারা কালীঘাটে মালাবদল করেছে। কিন্তু সে-আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়ে সে ইন্দ্রের হাতে গহনার বাক্স তুলে দিয়ে নিজে যায় আত্মহত্যা করতে। ইন্দ্র তাকে বাধা দেয় এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। বিধবা রক্ষণশীল মা তাকে ভুল বোঝেন ও পরদিন তার ঘুম ভাঙার আগেই ঐ সন্দেভাজনা, অপরিচিতা মেয়েটিকে বাড়ীছাড়া করেন। শুধু তাই নয়, আগে থাকতে ঠিক করে রাখা মেয়ে ধীরার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বিবাহও দেন। ইন্দ্রজিৎ এর মধ্যে পুরোনো দোকান বেচে দিয়েছে এবং গহনা বন্ধকের টাকায় গড়ে তুলেছে লোহার কারখানা। তার স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যার অনুগ্রহে, সেই নারীটি কোথায়? বড়ো অর্ডার পাবার লোভে সে দিল্লী গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করল, সেই দয়াময়ী নারী আর রমা নামে পরিচিতা নয়, এখন সে বহুজনকাম্য, নৈশ ক্লাবের মধ্যমণি, লাস্যময়ী রোজি। ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠল। রমার রোজিতে পরিণত হওয়ার মূলে পরোক্ষভাবে তার দায়িত্ব রয়েছে ভেবে মনে মনে ব্যথিত হল। বিশেষ রোজি যখন বলল, তার এ-জীবন ভালো লাগে না। রোজি ইন্দ্রজিৎকে শুধু যে অর্ডারটাই পাইয়ে দিল, তাই নয়, সেই বিরাট অর্ডার যোগান দেওয়ার জন্যে টাকাও যোগাড় করে দিল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে ইন্দ্রজিৎ দেখল, তার কারখানা টলমল; স্ত্রীর বড় ভাই অবিনাশের খলতায় সে রিক্তপ্রায়। দিল্লী থেকে পাওয়া এক চিঠিকে ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে অবিনাশ প্রমাণ করতে চাইল, ইন্দ্রজিৎ লম্পট, সে দিল্লীর এক বিলাসিনীর পাল্লায় পড়ে অধঃপাতের পথে পা বাড়িয়েছে। চাক্ষুষ প্রমাণেরও সুযোগ মিলে গেল। অতএব স্ত্রী, ভাই, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি আপনার বলতে যে যেখানে ছিল, সবাই বিরুদ্ধবাদী হয়ে দাঁড়াল। ছোট ভাই সম্পত্তি সম্পর্কে প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করল। সেই মামলার কৌঁসুলী মিঃ চাকলাদার ইন্দ্রজিতের জীবনকে কলঙ্কময় বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন অকাট্য সব প্রমাণ উপস্থিত করে। ইন্দ্রজিতের পক্ষের কৌঁসুলী হালে পানি পাচ্ছেন না। এহেন অবস্থায় ইন্দ্রজিতের পক্ষে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল—রোজি। এবং এর পরে কি হল, এটুকু অনুমান করে নিতে আশা করি কারুরই কষ্ট হবে না।

—খুব সোজাসুজি একমুখী কাহিনী। এবং বেশ দুর্বলও বটে। কারণ, যে-অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে ইন্দ্রজিতের স্ত্রী, ছোট ভাই প্রভৃতি তার বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠল, সেই কারখানার আর্থিক সঙ্কট ঘটেছে দিল্লী যাবার প্রাক্কালে ইন্দ্রজিতের অনেকগুলি ব্ল্যাঙ্ক (কোনো কিছু না-লেখা) চেক সই করে যাওয়ার ফলে। যতই সংবুদ্ধি-পরায়ণ ও সরল অন্তঃকরণ লোক হোক না কেন, কোনো ব্যবসায়ীই এমন নির্বোধের মতো কাজ করে না। তাছাড়া অবিনাশের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সেই অনায়াসে আইনের আশ্রয় নিতে পারত। একটি কোম্পানী প্রদত্ত চেকের টাকা আত্মসাৎ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। অথচ এই আত্মসাৎ করার ওপরেই ছবির প্রায় পুরো দ্বিতীয়ার্ধটি নির্ভর করছে। এই অবিসংবাদী দুর্বলতা জন্যে চিত্রকাহিনীটি বুদ্ধিগ্রাহ্য ও মননশীল হয়ে উঠতে পারেনি।

অথচ এই চিত্রকাহিনীর ওপরই নির্ভরশীল বেবী জুম প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন '**কলঙ্কিত নায়ক**' যে একটি পরম উপভোগ্য

ম্যাগি স্মিথ—প্রাইম অফ মিস জীন রোডি

ছবি হয়ে উঠেছে, তার জন্যে অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, চিত্রনাট্যকার-পরিচালক সলিল দত্ত এবং অবিসংবাদীভাবে নায়কোত্তম উত্তমকুমার। সুকৌশলে লিখিত, বুদ্ধিদীপ্ত চিত্রনাট্যের সহায়তায় শ্রীদত্ত ছবিটিকে এমন একটা গতি দিতে প্রয়াস পেয়েছেন যা কাহিনীগত দুর্বলতাকে যতদূর সম্ভব ঢাকবার চেষ্টা করেছে এবং এ-ব্যাপারে তিনি আংশিক সাফল্যও লাভ করেছেন বলা যায়।

কিন্তু যিনি **'কলঙ্কিত নায়ক'** ছবিটিকে চলচ্চিত্রামোদীর পক্ষে অবশ্য দর্শনীয় করে তুলেছেন, তিনি হচ্ছেন নায়কোত্তম উত্তমকুমার। কোনোরকম বাকাস্ফুরণ না করেও মাত্র চোখের ভাষা দিয়ে অভিনয়কে কতদূর পর্যন্ত প্রাণবন্ত করতে পারা যায়, তার এক নবতম নিদর্শন তিনি রাখলেন এই ছবিটিতে। এমন অন্তরস্পর্শী নীরব অভিনয় আমরা শুধু ভারতীয়ই নয়, পৃথিবীর চলচ্চিত্রজগতে অতি অল্পই দেখেছি। কথা যেখানে তিনি বলেছেন, সেখানে তো কথাই নেই, কিন্তু যেখানে মাত্র নীরব অভিব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করেছেন, সেখানেও তিনি যে কতখানি অসামান্য, তা চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। অবশ্য তাঁর এই অভিব্যক্তি পরিস্ফুটনে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আলোকচিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ শিল্পসম্মত আলোছায়া সৃষ্টি করে। 'অপরিচিতা'র নায়িকারূপে বি এফ জে এ অ্যাওয়ার্ড-পাওয়া শিল্পী অপর্ণা সেন যে অতি-আধুনিক 'তথাকথিত' সোসাইটি গার্লের ভূমিকা করতে অত্যন্ত পারদর্শিনী, তার আর একটি প্রমাণ রেখেছেন এই ছবির 'রোজি'র ভূমিকায়। দিল্লীর নাইট ক্লাবের ছলনাময়ী নায়িকা রোজিকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন অত্যন্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। সৎ, সরল ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে রোজির আন্তরিকতাকেও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং যেখানে তিনি রমা, —প্রতারিতা, নিগৃহীতা রমা, সেখানেও তাঁর অভিনয়ের আন্তরিকতা আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে। তবু বলব, রমা বা রোজির ভূমিকাতে এমন কোনো বিশেষ মুহূর্ত বা পরিস্থিতি নেই, যেখানে চলচ্চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা শিল্পী অপর্ণা সেন তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের অসামান্যতাকে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সু-অভিনীত ধীরা চরিত্রটিকেও যথেষ্ট নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন করার সুযোগ করে দিতে পারতেন অনায়াসেই কাহিনীকার তাকে রোজির সামনে হাজির করে ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে অভিযোগ তুলিয়ে। ধীরা ও রোজির মধ্যে সংঘাত ঘটিয়ে ইন্দ্রজিৎ ও রোজির সম্পর্ক সম্বন্ধে দর্শকচিত্তে একটি কুহেলীর সৃষ্টি করতে পারলে চিত্রকাহিনীটি ঢের বেশী সার্থক হয়ে উঠতে পারত। অপরাপর ভূমিকায় তরুণকুমার (অমর সেন), বিকাশ রায় (অবিনাশ), অনুপকুমার (দেবজিৎ), উৎপল দত্ত (মিঃ চাকলাদার), এন বিশ্বনাথন (ইন্দ্রজিতের পক্ষের ব্যারিস্টার), জ্যোৎস্না বিশ্বাস (কবিতা), মিহির ভট্টাচার্য (পরিতোষবাবু), পঞ্চানন ভট্টাচার্য (ভৃত্য মহাদেব), ছায়া দেবী (ইন্দ্রজিতের মা) প্রভৃতি সু-অভিনয়ই করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। ছবির প্রায় সর্বত্রই আলো-ছায়া সৃষ্টিতে বিজয় বসু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কেবল দিল্লীর নাইট ক্লাবে মধুমতীর নৃত্য-দৃশ্যটিকে ঝলমলে আলো-কোজ্জ্বল না করে ছায়াঘন বিমর্ষভাবাপন্নরূপে উপস্থাপিত করাকে আমরা সমর্থন

করতে পারছি না। ছবির শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় যথাক্রমে সত্যেন রায়চৌধুরী এবং অমিয় মুখোপাধ্যায় সার্থকতা লাভ করেছেন। ছবির তিনটি গানের মধ্যে প্রণব রায় রচিত ও মান্না দে গীত 'বিদায় দিতে না চায়' গানখানি সুপ্রযুক্ত, সুগীত ও সু-সুরসমৃদ্ধ।

নায়কোত্তম উত্তমকুমার অভিনয়দীপ্ত 'কলঙ্কিত নায়ক' চলচ্চিত্র-রসিকদের পক্ষে একটি অবশ্য দর্শনীয় চিত্র, এ-কথা আমরা আবার করে বলছি।

বিগত যুগের বিরহ-মিলন কথা

আজ পশ্চিমবঙ্গ থেকে জমিদারী প্রথা লুপ্ত। কিন্তু যখন জমিদারী প্রথা চালু ছিল, তখন সব জমিদারেরই বাঈজী পোষা রীতি ছিল কিনা, তা জানা না থাকলেও রাধারানী পিকচার্স-এর চতুর্থ নিবেদন 'মুক্তিস্নান' ছবির কাহিনীভুক্ত চৌধুরী বংশের যে ছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই দেখি, ফুলশয্যার রাত্রেই জমিদারপুত্র উদয়নারায়ণ চৌধুরী যথারীতি তাদের বাগানবাড়ীতে অধিষ্ঠিতা হীরাবাঈ-এর কাছে চলে গেছে বেহালায় সুর তোলবার অছিলায়। কিন্তু হীরাবাঈ-এরই কথায় সে ফিরে আসে দুঃখে ম্রিয়মাণা নবপরিণীতা বধূ সুমিতার কাছে। গরীবের ঘরের মেয়ে সুমিতার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে জমিদার বসন্তনারায়ণ নাকি তাকে ছেলের বৌ করে ঘরে তুলেছেন তাঁর উদ্দাম ছেলেটির রাশ টেনে ধরবার জন্যে। তাই সুমিতা অনেক সাধ্যসাধনা করে উদয়কে বাগানবাড়ীমুখো না হতে; কিন্তু বেহালা শিক্ষার জন্যেই হোক বা হীরাবাঈ-এর ব্যক্তিগত আকর্ষণেই হোক, উদয় স্ত্রীর কাকুতি-মিনতিতে কর্ণপাত না করেই বাগানবাড়ীতে যেতে থাকে। এরই মধ্যে হীরাবাঈ তার প্রাপ্য অর্থ চেয়ে বসে খরচ চালাবার জন্যে। উদয় বাঈজীকে ভুল বোঝে এবং তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়। আচম্বিতে তার সমস্যার সমাধান করে সুমিতা নিজের গহনাগুলি তার হাতে তুলে দিয়ে। কিন্তু গহনা দিতে গিয়ে উদয় হীরা-বাঈয়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না— সে হীরাবাঈয়ের কাছেই থেকে যায়। এদিকে বসন্তনারায়ণ নিলামের দায় থেকে বসত-বাড়ীকে বাঁচাবার জন্যে পুত্রবধূর কাছ থেকে তার গহনা ভিক্ষা করে বসলেন। অনন্যোপা সুমিতা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে হীরাবাঈয়ে কাছ থেকে গহনাগুলি ফিরিয়ে এ শ্বশুরের হাতে সমর্পণ করল। কিন্তু তা বারংবার প্রশ্ন সত্ত্বেও সে জানাতে পারল এত রাত্রে কোথা থেকে সে গহনাগু নিয়ে এল। ফলে বসন্তনারায়ণ সুমিতা তাঁদের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে কড়া হু দিলেন। বেদনাসিক্ত মন নিয়ে হুকুম তাি করবার পূর্বে সে পিসশাশুড়ীকে জানি গেল—সে সন্তানসম্ভবা। যে-কোনো উপা সে তার সন্তানকে মানুষ করে চৌধ পরিবারের বংশধরকে ফিরিয়ে দিয়ে যা এর পর বহু ঘটনার ভিতর দিয়ে সু ডাক্তার ঋষি বসুর সেবাশ্রমে সেবি (নার্সের) কাজ করতে থাকে শান্তনুকে মানুষ করে তোলবার জ অপরদিকে উদয় সুমিতার খোঁজে যাত্রাদলে বেহালা-বাজিয়ের কাজ শেষপর্যন্ত কেমনভাবে আবার চৌ পরিবারের ছেলে-বৌয়ে মিলন হয়ে ব নারায়ণের শেষজীবনে সুখশান্তি এল, তাই নিয়েই ছবির শেষ পর্ব রচিত।

ঘটনাপ্রধান এই কাহিনীটির বিন্দু হল সুমিতা চরিত্রটি। আদর্শ স্ত্রী ও মায়ের রূপে সুমিতা চ আকর্ষণ আমাদের দর্শকসমাজে আধুনিকতা সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য। চিত্রকাহিনী বিন্যাসে অনেক পরি অবিশ্বাস্য এবং অযৌক্তিক বিবেচিত বসন্তনারায়ণ ও উদয়নারায়ণের বহু কলাপ ও সংলাপ সম্পর্কে হাজার মনে উদিত হলেও এই একটি চরিত্রই কাহিনীটিকে সমগ্রভাবে গ্রহণযোগ তুলেছে। তার ওপর এই ধরনের চরি যিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই চট্টোপাধ্যায় ভূমিকাটিকে এমন ভাবে মূর্ত করে তুলেছেন, যে চ আকর্ষণ শতগুণে বর্ধিত হয়েছে। জ পুত্র উদয়নারায়ণ বেশে অনিল চট্টে অনুতপ্ত স্বামীর মূর্তিটিকে জীবন তুলেছেন। জমিদার বসন্তনারায়ণের কমল মিত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-করেছেন। ডাক্তার ঋষি বসুর সহৃদয় অন্যায়বিরোধিতা—দুই-ই পরিস্ফুট

গাঁওয়ার / নিশি, রাজেন্দ্রকুমার এবং তরুণ বোস

পাহাড়ী সান্যালের সংবেদনশীল অভিনয়ের মাধ্যমে। নায়েব গোবিন্দ ও তার সহকারীর ভূমিকায় যথাক্রমে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃণাল মুখোপাধ্যায় দু'টি জীবন্ত টাইপ সৃষ্টি করেছিলেন। ললিতা চট্টোপাধ্যায়ের হীরাবাঈ বেশ কিছুটা আড়ষ্ট। অপরাপর ভূমিকায় শ্যামল ঘোষাল (ডাঃ চ্যাটার্জি), অজয় গাঙ্গুলী (ললিত), সমরকুমার (প্রফুল্ল), শোভা সেন (সুমিতার মা), গঙ্গাপদ বসু (দীনু মিত্তির), গীতা প্রধান (দীনুর স্ত্রী), হরিধন মুখোপাধ্যায় (যাত্রাদলের অধিকারী), গীতা দে (চৌধুরীবাড়ীর ঝি), কামু মুখোপাধ্যায় (মতিলাল) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। চিত্রগ্রহণে বিজয় দে ছবির আগাগোড়া একটি সমতা (ইউনিফর্মিটি) রক্ষার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। ছবিতে একটি নিরবচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহ রক্ষায় সম্পাদক অমিয় মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতা অনস্বীকার্য। শিল্পনির্দেশনায় সুনীল সরকার তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছবির চারখানি গানের মধ্যে যাত্রাগান 'বিহগী উলু দিল—ধেনু দিল শঙ্খধ্বনি' মান্না দে-র দ্বারা সুগীত। হীরাবাঈয়ের মুখে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গীত 'দরদিয়া, যে তোমায় এত জানায়' গানখানির ধরতা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু তারপরে গানটি গতানুগতিকতার পথে এগিয়ে গিয়ে আমাদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ হতে দেয়নি। অপর দুখানি গান যথাযথ।

রাধারানী পিকচার্স-এর 'মুক্তিস্নান' সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়-চিত্রিত সুমিতা চরিত্রটির জন্যে দর্শকসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

শিক্ষয়িত্রীর সংকট

মাত্র গেল ৮ এপ্রিল আমেরিকার অ্যাকাদেমী অব মোশান পিকচার আর্টস্ অ্যান্ড সায়েন্সেজ্ ম্যাগি স্মিথকে যে ছবিতে অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর প্রাপ্য অস্কার দ্বারা সম্মানিত করেছেন, সেই "প্রাইম অব মিস জীন ব্রোডি" ছবিখানি গেল ১৫ মে তারিখে স্থানীয় গ্লোব থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছে। কলকাতার চলচ্চিত্রামোদীদের কাছে এহেন সৌভাগ্য রীতিমত দুর্লভ।

ছবির কাহিনীটি গড়ে উঠেছে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় একটি গোঁড়া রক্ষণশীল স্কুলে ১৯৩২ সালে সংঘটিত একটি কাল্পনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রক্ষণশীল বালিকা বিদ্যালয়টিতে পড়াতে আসেন একজন শিক্ষিকা; নাম তাঁর জীন ব্রোডি। কুমারী জীন ব্রোডি 'সত্য, শিব, সুন্দর'-এর পূজারী। তাঁর কথাবার্তা, চালচলনে যৌবনের উচ্ছলতা। তিনি বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা আইন-কানুন মেনে চলেন না। তিনি ক্লাশ রুমে টাঙানো "সেফটি ফার্স্ট"—ছবির উপরে র‍্যাফেলের আঁকা ম্যাডোনা ছবিটি লটকে দিয়ে বলেন, : জীবনে নিরাপত্তাই প্রথম নয়; প্রথম হচ্ছে সত্য, সৌন্দর্য। তিনি বয়স্থা মেয়েদের বন্ধুরূপে ব্যবহার করেন; তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন ফল-ফুলুরি খেতে খেতে। ছাত্রীদের ওপরই যে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন, তা নয়; সহ-শিক্ষক - শিক্ষিকাদেরও দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেছেন স্বাভাবিকভাবেই। তাঁর শিল্পিসুলভ চালচলনে বিমুগ্ধ হয়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষক টেডি লয়েড বিবাহিত ও ছেলেমেয়ের বাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রণয়কামী। আর গান-বাজনার শিক্ষক অবিবাহিত গর্ডন লোথার চান তাঁকে
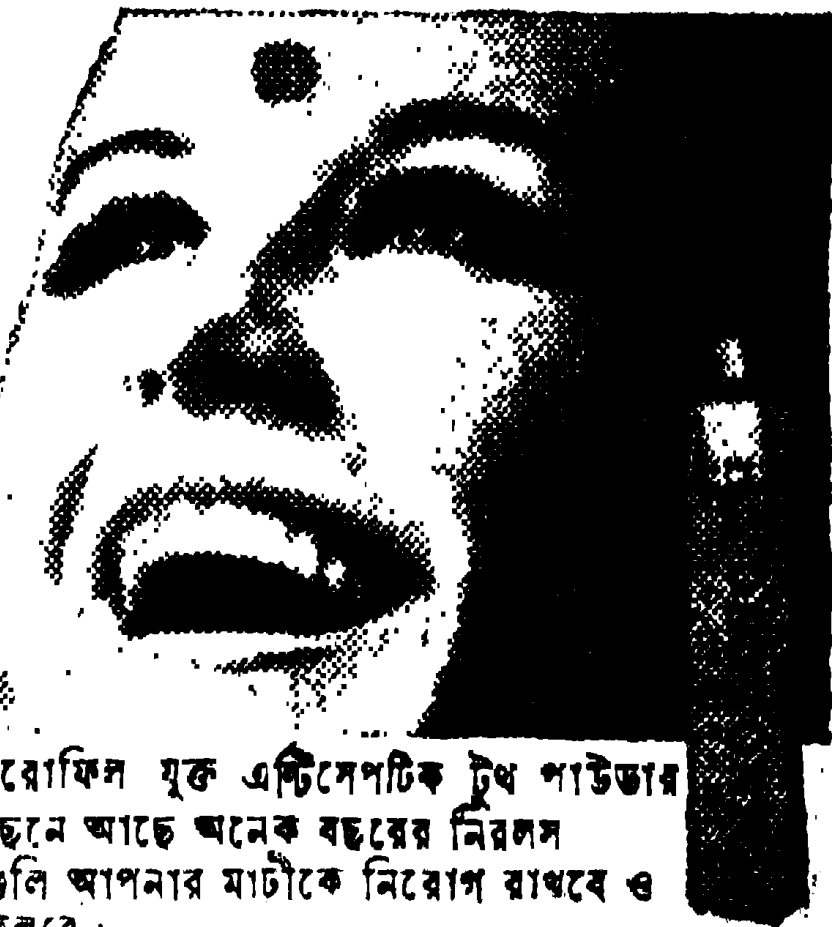
শিক্ষার আদর্শে। কিন্তু কুমারী ব্রোডি এদের দুজনের কারুরই প্রস্তাবে যথার্থ সায় দিতে নারাজ; কারণ, তিনি মনেপ্রাণে শিক্ষিকা—শিক্ষকতার যে আত্মোৎসর্গ করতে চায়, তার কি বিবাহ করা সাজে? কিন্তু দুজনেই নাছোড়বান্দা। মিঃ লয়েড তো একদিন তাঁকে জোর করে ধরে চুমুই খেয়ে ফেললেন। এবং দুর্ভাগ্য ব্যাপারটি হঠাৎ দেখে ফেলল কুমারী ব্রোডির তোতলা ছাত্রী ম্যাকগ্রেগার। পীড়াপীড়িতে বেচারাকে ঘটনাটা প্রকাশ করতেই হল অন্য তিন বন্ধু—স্যান্ডি, জেনী ও মোনিকার কাছে। এবং পরে ব্যাপারটি একটি চিঠির আকারে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ ম্যাকের গোচরে এল। সমস্ত দেখে শুনে মিস্ ম্যাকে মিস্ ব্রোডিকে পদত্যাগ করতে বললেন। ব্রোডি গেলেন রীতিমত ক্ষেপে: প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলেন কি? জানত এমন

[illegible] চিত্রে জীতেন্দ্র এবং মমতাজ

কোনো অপরাধ তো তিনি করেন নি, যাতে তাঁকে আর শিক্ষিকারূপে রাখা যায় না! তার ওপর শিক্ষাদানকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন—তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা? না, তিনি কিছুতেই পদত্যাগ করবেন না; তাঁকে যদি প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বরখাস্ত করতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি আইনের সাহায্য নেবেন। ব্যাপারটা তখনকার মতো ধামাচাপা রইল বটে, কিন্তু পরে ঘটনা আরও খারাপের দিকে চলে গেল। মিস্ ব্রোডির কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে তাঁর ছাত্রী মেরী ম্যাকগ্রেগর চলে গেল স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর দলে যোগ দেবার জন্যে; সেখানে সে কিছুদিন বাদে মৃত্যুবরণ করল। ব্রোডি মেয়েদের কাছে তার এই বীরের মতো মৃত্যুবরণের প্রশংসা করলেন। জেনী ও স্যান্ডি অঙ্কন শিক্ষকের কাছে মডেল হতে গিয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করল। স্যান্ডি তার এই পরিণতি সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করল তাদের অকালপক্কতার জন্যে মিস্ ব্রোডিই দায়ী। এবার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ ম্যাকে ব্রোডিকে জানালেন, স্কুল পরিচালক সমিতি তাঁর পদত্যাগ চান। যখন ব্রোডি অসম্মতি জানিয়ে বললেন, ছাত্রীরা তাঁকে চায়, তখন মিস্ ম্যাকে তাঁকে উল্টে প্রশ্ন করলেন, ছাত্রীরা কি সত্যিই তাঁকে চায়? তিনি কি এ-বিষয়ে নিশ্চয় করে জানেন?—মিস্ ব্রোডি থমকে দাঁড়ালেন, হঠাৎ যেন তাঁকে কে ছুরিকাবিদ্ধ করল! —ছাত্রীরা তাঁকে চায় না? —না, তারা তাঁকে চায় না; তাঁর শিক্ষায় তাদের নৈতিক অবনতি ঘটছে—একথা তাঁকে তাঁর মুখের ওপর জানাল তাঁরই প্রিয় ছাত্রী স্যান্ডি। তাঁর কল্পনার জগৎ তাঁর চোখের সামনে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে গেল; এ-রকম অকৃতজ্ঞতার ছুরিকা দ্বারা তাঁকে যে বিদ্ধ হতে হবে, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

—এই আশ্চর্য চরিত্রটিকে আশ্চর্যতর ভাবে চিত্রিত করেছেন ম্যাগি স্মিথ। মিস ব্রোডি শত আন্তরিকতা সত্ত্বেও শিক্ষিকারূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য, এ সিদ্ধান্তে যাতে উপনীত হওয়া যা এমন ধরনের চালচলন মিস্ স্মিথ গো থেকেই প্রদর্শন করেছেন। চরিত্রটি জীব রূপে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। এ-রব স্বতঃস্ফূর্ত, অনুপ্রেরণা অভি কাচৎ দেখা যায়। অস্কার পুরস্কার ল করবারই মতো তাঁর নাটনৈপুণ্য। তরু স্যান্ডির ভূমিকায় প্যামেলা ফ্র্যাঙ্কলিন অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিলেন, রীতিমত বিস্ময়কর। টেডি লয়েড, গ লোথার ও মিস্ ম্যাকের ভূমিকায় যথা রবার্ট স্টিফেন্স, গর্ডন জ্যাকসন ও সি জনসনও আশ্চর্য সাবলীল ও জী অভিনয় করেছেন। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদন শিল্প নির্দেশনায় যথাক্রমে টেড নর্মান স্যাভেজ ও ব্রিয়ান হার্বার্ট দক্ষতা ছবিটিকে হৃদয়সংবেদনশীল তোলায় ছবির পরিচালক রো নীয়েমকে পরিপূর্ণ সাহায্য করে চিত্রামোদী মাত্রেরই এই আশ্চর্য ছবি দর্শনীয়।

খেলাধুলোর কথা

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন

[illegible]তিক খেলাধুলোর আসরে ব্যাড-[illegible] স্থান প্রথম সারিতে। আগের তুলনায় ব্যাডমিন্টন খেলার পদমর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এক সময়ে ব্যাডমিন্টনের নামে লোকে নাক তুলতেন—ভাবটা এই যে, এ খেলা ছোট ছেলে-মেয়েদেরই সাজে। লোকের আগের ধারণা বদলেছে। খেলায় সূক্ষ্ম কারুকার্য ছাড়াও খেলোয়াড়দের যে যথেষ্ট দৈহিক শক্তি এবং অফুরন্ত দম দরকার তা যে-কোন উঁচু-দরের খেলা দেখলেই বোঝা যায়। দুই পক্ষ সমান শক্তিশালী হলে খেলোয়াড়দের কালো-ঘাম ছুটে যায়। বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যাড-মিন্টন সারা বছর ধরেই চলতে পারে—আর পাঁচটা খেলার মত এ খেলার নির্দিষ্ট কোন মরসুম নেই। ব্যাডমিন্টন একটি আদর্শ খেলা। ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত এই খেলার মাধ্যমে আনন্দ এবং দৈহিক পটুতা বজায় রাখতে পারেন।

ব্যাডমিন্টন খেলার সঙ্গে ভারতবর্ষের যে রক্তের সম্পর্ক আছে তা অনেকেরই অজানা। ভারতবর্ষই ব্যাডমিন্টন খেলার জন্মভূমি। অতীতে ভারতবর্ষে পুণা খেলার বহুল প্রচলন ছিল। এই পুণা খেলারই নাম বদলে হয়েছে ব্যাডমিন্টন। নামের এই পরিবর্তন ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। ঘটনাটা এই রকম : জনৈক ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার তাঁর লম্বা ছুটিতে যখন ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফিরে যান সেই সময় তিনি পুণা খেলার সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলেননি। তিনি ভারতীয় পুণা খেলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। একদিন চায়ের আসরে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে তিনি পুণা খেলার কলাকৌশল হাতে-কলমে ব্যাখ্য করেন। এই খেলা দেখে উপস্থিত সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করেন এবং তাঁদেরই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইংল্যান্ডের খেলাধুলোর আসরে ভারতীয় পুণা খেলা ব্যাডমিন্টন নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্লস্টারসায়ার কাউন্টির ব্যাডমিন্টন গ্রামে পুণা খেলা প্রথম হয়েছিল বলেই খেলার নাম দেওয়া হয় ব্যাডমিন্টন। সারা পৃথিবীতে ব্যাডমিন্টন নামটাই প্রচলিত। এমন কি ভারতবাসীর কাছেও পুণা নামটা আজ অজ্ঞাত। ১৮৭৭ সালে কর্ণেল সালবী ব্যাডমিন্টন খেলার আইন তৈরী করেন এবং ১৮৯৩ সালে ইংল্যান্ডে ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অনেক পরে ১৯৩৪ সালে পুণা খেলার জন্মভূমি ভারতবর্ষে 'অল ইন্ডিয়া ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হল।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলার আসরে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতা হল এই তিনটি—অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন, টমাস কাপ এবং উবের কাপ প্রতিযোগিতা। প্রথমটি ব্যক্তি-গত অনুষ্ঠান, টমাস কাপ পুরুষদের দল-গত এবং উবের কাপ মহিলাদের দলগত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। সরকারী-ভাবে ব্যক্তিগত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতি-যোগিতার কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি। অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় কোন খেতাব জয় বেসরকারীভাবে ব্যক্তিগত বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য গণ্য করা হয়। বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা খেলো-য়াড়রা প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং আন্ত-র্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলার আসরে অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক বেশী। তিনটি বিভাগ (পুরুষ ও মহিলাদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস) নিয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৮৯৯ সালে। ১৯০০ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেলা প্রথম যোগ করা হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে
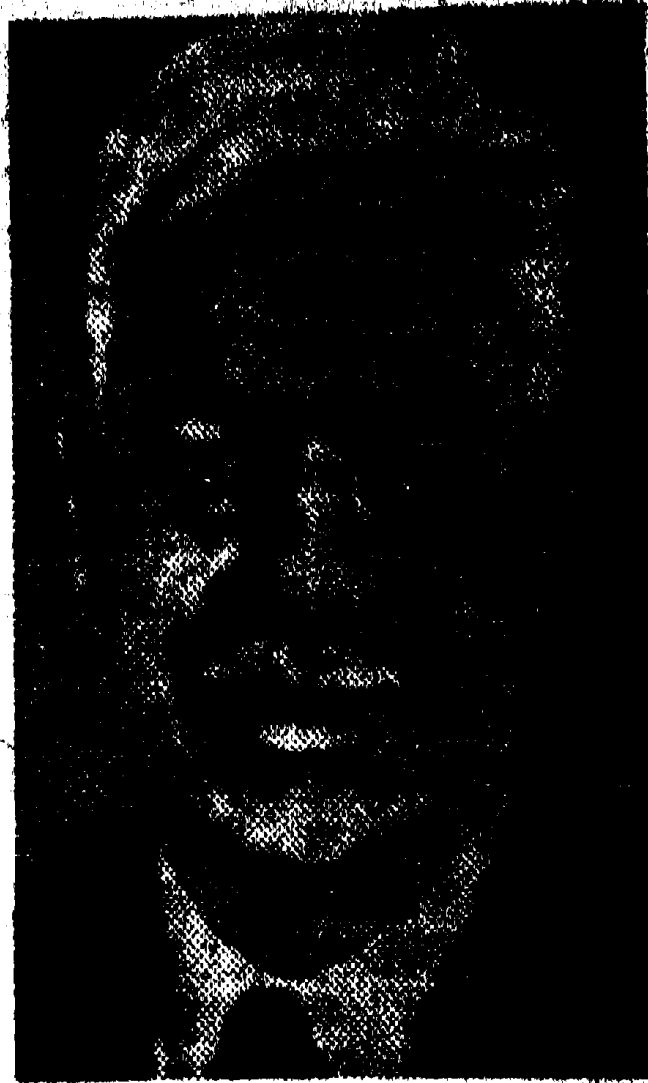
ক্ষেত্রনাথ রায়

[illegible]

সুসান পিরার্ড (আমেরিকা)

জুডি হাসম্যান (আমেরিকা)
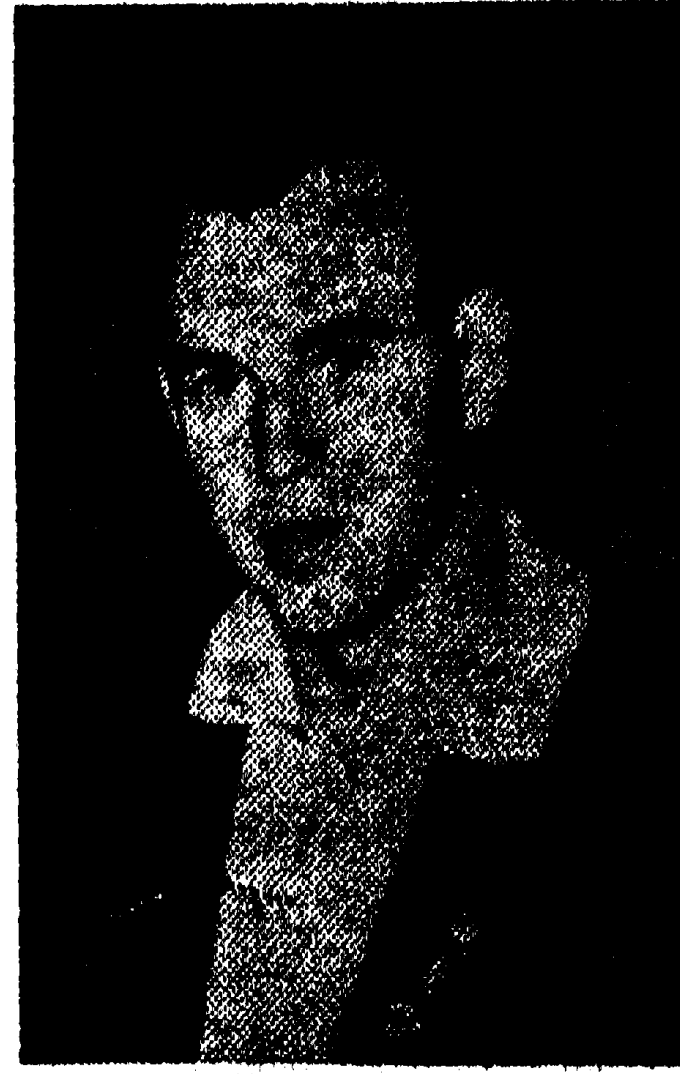
আরল্যান্ড কপ্স (ডেনমার্ক)

১২ বছর (১৯১৫—১৯ ও ১৯৪০—৪৬) এই প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। ফলে ১৮৯৯ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোট ৬০ বার প্রতিযোগিতার আসর বসেছে।

এই অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের স্যার জর্জ টমাস, বার্ট হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। এই প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ২১টি খেতাব জয়ের রেকর্ড তাঁরই, যা আজও কোন খেলোয়াড় স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি। ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে তিনি এই ২১টি খেতাব জয়ী হন—সিঙ্গলস ৪টি, ডাবলস ৯টি এবং মিক্সড ডাবলস ৮টি। প্রথম খেতাব পান ১৯০৩ সালে (মিক্সড ডাবলস) এবং শেষ ১৯২৮ সালে (পুরুষদের ডাবলস)। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পান উপর্যুপরি ৪ বছর (১৯২০—২৩)। একই বছরের আসরে তিনটি খেতাব পান ১৯২১ সালে। আন্তর্জাতিক আসরে তিনি ইংল্যান্ডকে ২৯ বার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৯ সালে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে স্যার জর্জ টমাস, বার্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের হাতে একটি সুদৃশ্য কাপ উপহার দেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ফলে ১৯৪৮ সালের আগে পুরুষদের দলগত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন সম্ভব হয়নি। তাঁর দেওয়া এই কাপটি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার। তাঁর সম্মানে কাপের নামকরণ হয়েছে 'টমাস কাপ' এবং সেই থেকে পুরুষদের দলগত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা 'টমাস কাপ' প্রতিযোগিতা নামে সুপরিচিত।

সাফল্যের দিক থেকে এরপর আয়ার-ল্যান্ডের ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেভলিন অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি খেতাব জয় করেন—সিঙ্গলস ৬টি, ডাবলস ৭টি এবং মিক্সড ডাবলস ৫টি। তিনি প্রথম খেতাব পান ১৯২২ সালে (পুরুষদের ডাবলস) এবং শেষ খেতাব ১৯৩১ সালে (সিঙ্গলস ও ডাবলস)। ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন এবং জি এস বি ম্যাক জুটি ৬ বার পুরুষদের ডাবলস খেতাব পান। একই বছরের আসরে ডেভলিন তিনটি করে খেতাব পান তিন বছর (১৯২৬—২৭ ও ১৯২৯)। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তাঁর এই রেকর্ড আজও অম্লান আছে। তাঁর দুই কন্যা জুডি ডেভলিন এবং সুসান ডেভলিন আমেরিকার হয়ে অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় সর্বাধিক খেতাব (৭ বার) জয়ের গৌরব লাভ করেছেন ডেনমার্কের আরল্যান্ড কপস।

মহিলা বিভাগে বিশেষ সাফল্যের সূত্রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চির-স্মরণীয়া হয়ে আছেন কুমারী এম লুকাশ (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী কিং এডামস)। কুমারী লুকাশ মোট ১৭টি খেতাব পান—সিঙ্গলস ৬টি, ডাবলস ১০টি এবং মিক্সড ডাবলস ১টি। একই বছরের আসরে তিনটি খেতাব পান ১৯০৮ সালে। তিনি প্রথম খেতাব পান ১৮৯৯ সালে (ডাবলস)—প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে এবং শেষ খেতাব ১৯১০ সালে (সিঙ্গলস এবং ডাবলস)। তাঁর পরই আমেরিকার কুমারী জুডি ডেভলিনের নাম উল্লেখযোগ্য। কুমারী জুডি ডেভলিন (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী জি সি কে হাসম্যান) মোট ১৭টি খেতাব পান—সিঙ্গলস ১০টি এবং ডাবলস ৬টি। তিনি তাঁর আপন বোন সুসান ডেভলিনের (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী ফ্র্যাঙ্ক পিয়ার্ড) জুটিতে ডাবলস খেতা[illegible] পান ৬ বার। মহিলাদের সর্বাধিক (১[illegible] বার) সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড শ্রীমতী জুডি হাসম্যানেরই। মহিলা বিভাগে শ্রীমতী এইচ এস উবেরের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রীমতী উবের মোট ১৩টি খেতাব পান—সিঙ্গলস ১টি, ডাবলস ৪টি এবং মিক্সড ডাবলস ৮টি। তিনি একনাগাড়ে মিক্সড ডাবলস খেতাব পা[illegible] ৭ বার (১৯৩০—৩৬)। প্রথম খেতা[illegible] পান ১৯৩০ সালে (মিক্সড ডাবলস) এ[illegible] শেষ খেতাব ১৯৪৯ সালে (ডাবলস)। মহিলাদের দলগত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতি-যোগিতার সঙ্গে শ্রীমতী উবের চি[illegible] স্মরণীয়া হয়ে থাকবেন। এই প্রতি-যোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসা[illegible] তিনি যে কাপটি উপহার দেন তা তাঁর নামে অভিহিত এবং প্রতিযোগিতা[illegible] উবের কাপ প্রতিযোগিতা না[illegible] সুপরিচিত।

গত ২৪ বছরের খেলা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ১৯[illegible] সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত [illegible] ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা [illegible] ছিল। পুনরায় ১৯৪৭ সাল থেকে সুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত—এই ২৪ বছরের প্রতিযোগিতা[illegible] পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে ডেনমার্ক ১০ বার, মালয়েশিয়া ৯ বার ইন্দোনেশিয়া ৪ বার এবং আমেরিক[illegible]

এডি চুং (মালয়েশিয়া)

ওই টিক হক (মালয়েশিয়া)

এডি চুং (মালয়েশিয়া)

ফিন কোবেরো (ডেনমার্ক)

১ বার। উপর্যুপরি পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়—মালয়েশিয়ার ৮ বার (১৯৫০—৫৭), ডেনমার্কের ৬ বার (১৯৬০—৬৫) এবং ইন্দোনেশিয়ার ৩ বার (১৯৬৮—৭০)। এই ২৪ বছর সময়ে আরল্যান্ড কপস (ডেনমার্ক) ৭ বার, ওয়াং পেং সুন (মালয়েশিয়া) ৪ বার, এডি চুং (মালয়েশিয়া) ৪ বার এবং রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ৩ বার পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে বিশেষ ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আরল্যান্ড কপস যে ৭ বার সিংগলস খেতাব পান তার মধ্যে উপর্যুপরি জয় ৪ বার (১৯৬০—৬৩)। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে পুরুষদের সিংগলস খেতাব প্রথম জয় করেন মালয়েশিয়ার ওয়াং পেং সুন, ১৯৫০ সালে। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে প্রথম রানার-আপ হয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রকাশ নাথ। ১৯৪৭ সালের সিংগলস ফাইনালে প্রকাশ নাথ ডেনমার্কের কনি জেপসেনের কাছে হেরে যান।

গত ২৪ বছরে (১৯৪৭—৭০) মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয়ী হয়েছে আমেরিকা ১২ বার, ডেনমার্ক ৭ বার, ইংল্যান্ড ২ বার, জাপান ২ বার এবং সুইডেন ১ বার। ডেনমার্কের উপর্যুপরি ৭ বার (১৯৪৭—৫৩) সিংগলস খেতাব জয়ের পর ১৯৫৪ সাল থেকে আমেরিকার প্রাধান্য সুরু হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত—এই ১৪ বছরে আমেরিকা ১২ বার মহিলাদের সিংগলস খেতাব পায়। আমেরিকার এই একটানা খেতাব জয়ের পথে দু'বার (১৯৫৯ ও

রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া)

১৯৬৫) বাধা দিয়েছিল ইংল্যান্ড। গত ২৪ বছরে (১৯৪৭—৭০) আমেরিকার জুডি ডেভলিন (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী জুডি হাসম্যান) মোট ১০ বার মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার সিংগলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছেন। তিনি উপর্যুপরি ১১ বার (১৯৫৪—৬৪) ফাইনালে খেলে মোট ৮ বার খেতাব জয়ী হন—এর মধ্যে উপর্যুপরি জয় ৫ বার (১৯৬০—৬৪)। ১৯৬৭ সালে মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে পরাজিত হন জাপানের কুমারী নোরিকা তাকাগি—এশিয়া মহাদেশের পক্ষে তিনিই মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে প্রথম খেলেন। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয়ের প্রথম গৌরব লাভ করেন কুমারী ইরো জুকি (জাপান), ১৯৬৯ সালে।

১৯৬৯ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব পান ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্টোনো এবং মহিলাদের সিংগলস খেতাব পান জাপানের ইরো জুকি। ফলে প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬০ বছরের ইতিহাসে এশিয়া মহাদেশের পক্ষে একই বছরে পুরুষ ও মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয়ের প্রথম নজির সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় নজির ১৯৭০ সালে।

১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় পূর্ব-জাভার ১৮ বছরের স্কুল-ছাত্র রুডি হার্টোনো পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে এক অসাধারণ রেকর্ড সৃষ্টি করেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ সিংগলস খেতাব বিজয়ী পুরুষ খেলোয়াড়। আরও উল্লেখ্য, তিনি তাঁর প্রথম যোগদানের বছরেই এই খেতাব জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৮-৭০) পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন।

পুরুষদের ডাবলসের খেলায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ডেনমার্কের

জে হ্যামারগার্ড হ্যানসেন (ডেনমার্ক)

ফিন কোবেরো। তিনি মোট ৭ বার ডাবলস খেতাব পেয়েছেন—এর মধ্যে জে হ্যামারগার্ড হ্যান্সেনের জুটিতে ৬ বার—উপর্যুপরি জয় ৪ বার (১৯৬১—৬৪)। ডেনমার্কের আরল্যান্ড কপস ডাবলস খেতাব পেয়েছেন মোট ৪ বার—এর মধ্যে এইচ বোর্চের জুটিতে ৩ বার (১৯৬৭—৬৯)। মালয়েশিয়ার ই. এল চুং এবং ই বি চুং জুটির উপর্যুপরি ৩ বারের (১৯৫১—৫৩) ডাবলস খেতাব জয়ও উল্লেখযোগ্য।

মহিলাদের ডাবলস খেলায় আমেরিকার জুডী ডেভলিন ও সুসান ডেভলিন এবং ডেনমার্কের শ্রীমতী টনি আহম ও কুমারী কিরস্টেন থর্নডাল জুটির সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জুডি ডেভলিন মোট ৭ বার ডাবলস খেতাব পান—এর মধ্যে সুসান ডেভলিনের জুটিতে ৬ বার। অপরদিকে শ্রীমতী টনি আহম এবং থর্নডাল জুটি ৪ বার ডাবলস খেতাব পান।

মিক্সড ডাবলস খেলায় ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পল হম এবং শ্রীমতী টনি আহম জুটি ৪ বার এবং ফিন কোবেরো এবং কুমারী কিরস্টেন থর্নডাল জুটিও ৪ বার মিক্সড ডাবলস খেতাব পেয়েছেন।

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার গত ২৪ বছরের খেলায় (১৯৪৭—৭০) ডেনমার্ক, মালয়েশিয়া, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপানের খেলোয়াড়রা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সিংগলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেলায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের (উত্তরসহরতলী জেলা কেন্দ্র) পরিচালনায় অষ্টা-দশ বার্ষিক অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটি-ক্যাল ইনস্টিটিউটের আম্রকুঞ্জে শিশুদের চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার দৃশ্য।

খেলাধুলা

দর্শক

বেটন কাপ

বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার প্ল্যাটিনাম জুবিলী বছরের (১৯৭০) ফাইনালে বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ণ রেল দল ১-০ গোলে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার বেটন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। রেলদল ১৯৫৪ সালের ফাইনালে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের কাছে হেরে গিয়ে ১৯৫৫ সালের ফাইনালে উত্তরপ্রদেশ দলের সংগে যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। অপরদিকে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব ইতিপূর্বে চারবার বেটন কাপ জয়ী হয়েছে—১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৪ (যুগ্ম-বিজয়ী মোহনবাগানের সঙ্গে) এবং ১৯৬৭ সালে।

এ বছরের প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে বি এন রেল দলকে, ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ২-০ গোলে সেকেন্দ্রাবাদের এ ও সি (সেন্ট্রাল) দলকে এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে এ্যাথলেটিক এসো-সিয়েশন ৩-০ গোলে মহীশূর দলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইন্যালে উঠেছিল। ইস্টবেঙ্গল বনাম গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী কোর অব সিগন্যালস দলের খেলাটি তিন দিন ১-১ গোলে ড্র ছিল। শেষ পর্যন্ত টসে জয়ী হয়ে ইস্টবেঙ্গল দল সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। সেমি-ফাইনালে ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ২-১ গোলে মোহনবাগানকে এবং ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

ফাইনালে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে ওয়েস্টার্ণ রেলদলের অধিনায়ক গুরবক্স সিং পেনাল্টি পুস থেকে জয়সূচক গোলটি দেন। যে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে দর্শকরা ফাইনাল খেলা দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন তা পূর্ণ হয়নি প্রথমার্ধের খেলা তবু কিছুটা উপভোগ্য হয়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের মামুলি খেলায় দর্শকরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন। ওয়েস্টার্ণ রেলদলের জয়লাভের মূলধন ছিল খেলোয়াড়দের সংহতি এবং সেমি-ফাইনালে গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী এবং এ বছরের প্রথমবিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানকে পরাজিত করার দলের দৃঢ় মনোবল।

বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা ভারতীয় খেলাধুলার ইতিহাসে একটি প্রাচীনত[illegible] নক-আউট প্রতিযোগিতা, উদ্বোধন ১৮[illegible] সালে। ক্যালকাটা কাস্টমস ১২ বার [illegible] কাপ জয়ী হয়ে সর্বাধিকবার কাপ জয়ের রেকর্ড করে তা আজও অক্ষুন্ন আ[illegible] তারা উপর্যুপরি তিনবার করে কাপ জ[illegible] হয়েছে—১৯০৮-১০ সা[illegible] এবং ১৯[illegible] ৩২ সালে।

মেহারা কাপ

বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন [illegible] চালিত ১৯৬৯-৭০ সালের সিনিয়র [illegible] আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাই[illegible] গত বছরের বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব [illegible] ইনিংসের রানে বি-এন আর দলকে পর[illegible] করে ১২ বার মেহেরা কাপ জয়ের [illegible] লাভ করেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মোহনবাগান : ২৫৭ রান ([illegible] পোদ্দার ১০১ এবং হাসান ৪৭ [illegible] পি বসু ৪৬ রানে ৪ উইকেট)।

বি এন আর : ১৬৩ রান (শান্তি [illegible] নট আউট ৪৪ রান। রমেশ [illegible] ৪৮ রানে ৫ এবং স্বপন দে ২[illegible] ৩ উইকেট)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 29th May 1970 শুক্রবার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : পাঁচুগোপাল দে

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ : একটি বিতর্ক

আমি আপনাদের বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার একজন অনুরাগী পাঠক। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ সালের ১০ম বর্ষ ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যাতে প্রকাশিত বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ : একটি বিতর্ক' আলোচনাটি পাঠে প্রভূত আনন্দ ও অপরিমিত বিস্ময় বোধ করছি।

রবীন্দ্রপ্রতিভা, রবীন্দ্রমানস, ও ব্যক্তিত্ব অতল সাগরের গভীরতা ও হিমালয়ের উচ্চতার সংগেই একমাত্র তুলনীয়। তাই রবীন্দ্রমানসের অনেক কিছুই আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। সেই বিচিত্র জটিল অজানা মানসিকতার একটি নতুন দিক প্রবন্ধটিতে যেভাবে যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভংগীতে উন্মোচিত হয়েছে তার জন্য লেখকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ যে 'চিরবিস্ময়' তা আর একবার নতুনভাবে আমরা উপলব্ধি করছি।

উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়,
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

(২)

গত পয়লা জ্যৈষ্ঠের অমৃতে শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথ : একটি বিতর্ক' শীর্ষক নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের অপব্যাখ্যাজনিত কুৎসাপ্রচারের প্রাচীন প্রবণতার একটি সাম্প্রতিক নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হল। নতুন মূল্যায়ন অবশ্যই কাংক্ষিত, কিন্তু যে মূল্যায়ন পল্লবগ্রাহী চিন্তা ও অপযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যুক্তি তথ্য অসমর্থিত হয়েও—ঔদ্ধত্যের আস্ফালনে মত্ত, তা বেদনার কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের সে বেদনা আত্মগত ক্ষোভেই সমাপ্তি লাভ করে। অমৃতের সম্পাদক বর্তমান ক্ষেত্রে সে বেদনার মুক্তিদানের ব্যবস্থাগ্রহণে আগ্রহী দেখে ভালো লাগলো। এবং সম্পাদক মহোদয়ের আলোচনার আহ্বানে সাড়া দিতেই 'বিতর্কের উত্তর' নিবন্ধটির সৃষ্টি। (জানিনে সম্পাদক মহাশয়—পত্রাকারে মতামত স্থাপনের আহ্বান করেছিলেন কিনা, কিন্তু কোনো সিরিয়াস আলোচনা পত্রাকারে হয় না ব'লেই এবং যথাসম্ভব ভাষা-সংযমের চেষ্টা করেও—বর্তমান লেখা ১০ পৃষ্ঠার নিবন্ধের রূপ নিল, ছাপলে অমৃতের ৫ পৃষ্ঠা নিতে পারে বোধ হয়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে দু'সংখ্যাতেও ছাপানো যেতে পারে। এবং বর্তমান লেখাটিতে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। প্রথমার্ধে (৫ম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত)—লোকনাথবাবুর নিবন্ধটির ক্রমানুসরণ করে তাঁর বক্তব্য ও প্রাসংগিক উক্তি ও যুক্তিগুলির অনুধাবন এবং সেসব বিষয়ে আমাদের মতামত জ্ঞাপন। বাকী অর্ধে—লোকনাথবাবুর মূল্য প্রতিপাদ্য যে যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, রবীন্দ্র-দর্শনের তত্ত্বভ্রষ্ট মহিমা প্রমাণের প্রসংগে, সেই যুক্তির অসারতার সুনিশ্চিত প্রতিপাদন)।

আমার প্রেরিত নিবন্ধটি ছাপা হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকের ব্যক্তিগত মর্জি, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র বক্তব্য নেই, থাকতেও পারে না: তবে লেখক হিসেবে সম্পাদকের প্রতি দুটি অনুরোধ অবশ্যই রাখবো :—এক, তিনি প্রবন্ধটি অনুগ্রহ করে পূর্বাপর পড়বেন (দেখবেন মৌলিকতা কিছু আছে কিনা) এবং দুই অমনোনীত হলে— দয়া করে অকারণ বিলম্বের বিড়ম্বনা বাঁচিয়ে লেখকের ঠিকানায় ফেরৎ পাঠাবেন।

সুকুমার দাস,
অধ্যাপক, আলিপুরদুয়ার কলেজ,
জলপাইগুড়ি।

[লেখাটি আগামী সপ্তাহের অমৃতে ছাপা হবে। অঃ সঃ]

বহির্বংগে বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

বহিবংগ ও বহিভারতের অনেক শহরেই যেখানে বাঙালীদের আস্তানা রয়েছে এবং যেখানে নিয়মিত-অনিয়মিত ভাবে সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র স্থানীয় বাঙালী অধিবাসীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠছে এমন সব প্রতিষ্ঠান ও তাদের সভাদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার একান্ত ইচ্ছা আমাদের আছে। অভিপ্রেত গোষ্ঠী থেকে সময়ান্তরে কোন মুখপত্র প্রকাশিত হয় কিনা সেটাও জানা গেলে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে।

অমৃতের পাঠক-পাঠিকারা এবং অপরা সংস্কৃতিপ্রিয় ভিনদশী বন্ধুরা এ ব্যাপারে আমাদের সংগে সরাসরি নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

সুনির্মল চট্টোপধ্যায়
সম্পাদক, 'তরুণ অভিযান' গোষ্ঠী,
১৭, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড,
কলকাতা-২০।

নববর্ষের সাহিত্য সভা

এ বছরের নববর্ষ সাহিত্য সভায় সভাপতি হিসেবে শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটি অমৃত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রথমেই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ যাঁরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি তাঁদের কাছে এই মূল্যবান ভাষণটির অনেকটাই অজ্ঞাত থেকে যেত। সাহিত্য-দরদী মাত্রেই ভাষণটি পাঠ করলে বুঝতে পারবেন, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এটি বি[illegible] ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আর একটি কথা এই ভাষণটি প্রকাশের মাধ্যমে অমৃত পত্রিকা[illegible] সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্ববোধও ফু[illegible] উঠেছে। অন্য কোন সাপ্তাহিকে এর কোন[illegible] উল্লেখ না দেখে দুঃখিত হয়েছি।

পুরস্কারের দ্বারা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত না হলেও ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ না পেলে বিশ্ব[illegible] সাহিত্য সভায় বাংলা সাহিত্যের সুনাম [illegible] এতটা বৃদ্ধি পেত? বাংলায় পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের কৃতিত্বের জন[illegible] জগত্তারিণী পুরস্কার প্রবর্তন করেন এব[illegible] প্রথম এই পুরস্কার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'এই পুরস্কার ঘোষণা নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল সেদিন।' শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য ঐতিহাসিক অর্থেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ না রাখাই ভাল।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হল—যেখ[illegible] তিনি বাংলা সরকার এবং প্রকাশক[illegible] কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বাংলা সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যা করেছেন তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার সরকার দুটি পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের নামে প্রবর্তন করেন। এ বছর থেকে আর একটি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে—বাংলা ভাষার উপর লেখা কোন বিদেশীর মৌলিক গবেষণা গ্রন্থের জন্য। ব্যাস, এ পর্যন্তই অথচ অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার এ ব্যাপারে অনেক কিছু করেছেন। তামিল, গুজরাটি, তেলুগু, হিন্দি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষা[illegible] প্রাদেশিক সরকার অনেক পুরস্কার দি[illegible] থাকেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের [illegible] ব্যাপারে খুব একটা সচেতনতা নেই। সাহিত্য পত্রিকা ও সংস্কৃতিমূলক কা[illegible] সাহায্যের জন্য যত টাকার অপচয় হ[illegible] তার কিছুটা রক্ষা করলেই এরকম কয়েক পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। তাছা[illegible] কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা বাজেট আ[illegible] প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নয়নের জন[illegible] প্রত্যেক রাজ্যই চাপ দিয়ে তাদের প্রা[illegible] টাকা নিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এব[illegible]

চিঠিপত্র

সক্ষেপ্ট হলে সাহিত্যসেবীদের কিছুটা উপকার হত।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রাদেশিক সরকারকে যথার্থ কারণেই তিনটি নাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নাম তিনটি হল—মধুসূদন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। তারাশঙ্করবাবুর কন্ঠের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি—অর্থ হোক, পদক হোক, এঁদের পুণ্য-স্মরণীয় নামকে আশ্রয় করে বাংলা সরকারের কিছু করার প্রয়োজন আছে। প্রকাশকসমাজ এবং পত্রিকাগোষ্ঠীও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন। বিশেষ করে যে সমস্ত প্রকাশক উপরের তিনজনের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ তাঁদের বই বিক্রীর মুনাফা থেকে এক শতাংশ যদি এ কাজে ব্যয় করেন, তবে বাংলাদেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাঁদের দান স্মরণ করবে। নাট্যকারদের সম্পর্কেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আর একটি প্রস্তাব যোগ করার আছে: বাংলা সাহিত্যকে অবাঙ্গালীদের মধ্যে প্রচার করতে হলে দক্ষ অনুবাদকের প্রয়োজনীয়তা আছে। সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বহু অনুবাদক নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ করে যাচ্ছেন। এখন বহু বিদেশী বন্ধুও নিছক বাংলা সাহিত্যকে ভালবেসে বাংলা থেকে অনুবাদ করছেন। অনেকে অর্থাভাবে ভাল অনুবাদ করতে পারছেন না। তাঁদের জন্যও সরকার বা প্রকাশকমণ্ডলীকে একটি বা কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার দিকে তাকিয়ে দেখবার অনুরোধ করি—তারা কি করছেন। কোন বিদেশী সেই ভাষায় আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁকে স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে আসছেন সে ভাষা থেকে অনুবাদের জন্য। হিন্দির কবিতার একটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশের জন্য একজন বিশিষ্ট ইংরেজ কবিকে দিল্লীতে রাখা হয়েছে বহুদিন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিশেষে আবার ধন্যবাদ জানাই, তাঁর এই সময়োচিত ভাষণের জন্য। এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসে দাবী করবার জন্য সাহিত্য-দরদীদের কাছে আবেদন জানাই।

আশিস সান্যাল,
সম্পাদক, সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন,
কলকাতা : ৩২

মহামতি লেনিন

অমৃত পত্রিকার ৯ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪১শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহামতি লেনিন' প্রবন্ধটির নিম্নোক্ত অংশটির (৮২০ পৃঃ) প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

"১৯২২ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন যে পাঁচজন ভারতীয়কে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁরা হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, নলিনী গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও চিত্তরঞ্জন দাস (দেশবন্ধুর পুত্র)

সুভাষচন্দ্রকে লেনিন যে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এই দুর্লভ সংবাদ প্রথম জানা গেল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কতকগুলি প্রশ্ন জাগে। প্রথমত—লেনিনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল কি? থাকলে, তা কোন পর্যায়ের ছিল? দ্বিতীয়ত—লেনিনের সঙ্গে, তাহলে লেনিন কোন কারণে সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? তৃতীয়ত—মার্কসবাদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের কিরূপ মনোভাব ছিল? চতুর্থত—১৯২২ সালে সুভাষচন্দ্রের বয়স খুবই অল্প ছিল। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের কোন রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেনিনের মত নেতা তাঁকে বিশেষভাবে 'আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? পঞ্চমত—সুভাষচন্দ্র আলোচ্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন কি? যদি করে থাকেন, তাহলে তার বিশদ বিবরণ প্রয়োজন। ষষ্ঠত—যদি সুভাষচন্দ্র উক্ত কংগ্রেসে যোগদান না করে থাকেন, তাহলে তার কারণ কি সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতা, না, বৃটিশ সরকারের পাসপোর্ট নামঞ্জুর করা, না, উক্ত সভায় যোগদানে তাঁর ব্যক্তিগত অনিচ্ছা?

এ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণ্য পুস্তকের অস্তিত্ব জানা না থাকায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনারা পত্রিকা মারফৎ এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ জানাতে অনুরোধ করছি।

অমিতাভ রায়।
কলকাতা-৪।

মুখের মেলা

ক্রমশঃ ধ্বসে পড়া গ্রামীণ-সমাজ সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে 'মুখের মেলায়'। অমৃতের সদ্যজাত এই বিভাগ নিঃসন্দেহে অপূর্ব সংযোজন। 'বাংলার তরুণতম নতুন লেখক আবদুল জব্বার' সাহেব গ্রাম-বাংলার আঁতের খবরা-খবর জানাতে যে অভূতপূর্ব পারদর্শী তা তাঁর এ সংখ্যায় প্রথম লেখা 'মোমিন কুঁজোর সংসার' প্রমাণ করিয়ে দেয়।

বাপ-বেটার চটকলের চাকরি চলে যাওয়াতে 'মোমিন কুঁজোর সংসারের' যে শোচনীয় পরিণতি হল তা নগরসভ্যতার ছা-পোষা মানুষের কাছে চির-অচেনা হলেও আমরা যারা গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা, আমাদের কাছে এ সমস্ত অচেনা নয়। তবে এই সকল মানুষের মুখচ্ছবি সাহিত্যের পৃষ্ঠায় কদাচিৎ দেখেছি। সেই দিক থেকে অবশ্য এরা অচেনা এবং চির-অচেনা। 'যারা আমাদের কাছের মানুষ অথচ চির-অচেনা, গ্রাম-বাংলার সেই অগণিত সাধারণ মানুষদের' চিনিয়ে দেবার যে কঠিন দায়িত্ব নিয়েছেন আবদুল জব্বার সাহেব, তার জন্যে তাঁকে 'মুবারকবাদ' জানাই। এবং চিরন্তন সাহিত্যে তাঁর প্রতিভার অগ্রগতি কামনা করি।

লায়লার জন্যে মনটা কেমন-কেমন করছে। অন্য ভাষাভাষী এক মুসলমান কশাইয়ের সঙ্গে তার বিবাহে বাধা অনুভব করছি। দরিদ্র-সমাজে নারীর সতীত্ব যে নেহাৎ 'মাটির পুতুল' তা আলোচ্য বিভাগে প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হ'য়েছে।

জব্বার সাহেবের 'মুখের মেলায়' আরো নতুন মুখ দেখবার জন্যে আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

সাজেদুল হক
২৪ পরগণা

(২)

প্রথম বারই রং-এর তুরুপ। মুখের মেলায় (অমৃত ১৭ই বৈশাখ ১৩৭৭) মোমিন কুঁজোর সংসারের যে বাস্তব চিত্র জব্বার সাহেব এঁকেছেন, সত্যই তা হৃদয়-স্পর্শী। গ্রাম বাংলার চাষী, মজুর, মেহনতী মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর কলম চালিয়েছেন। আর কয়েকটি মাত্র আঁচড়েই ফুটিয়ে তুলেছেন একটি নিখুঁত স্কেচ। ভাষায় রং-এর চমক আর চাকচিক্য না থাক, নিতান্ত সহজ, সরল কথায় আঁকা ছবিটি মনে করিয়ে দেয় 'হানশব্যাক অব নটর-ড্যামের' এ যেন একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আশা রাখছি আব্দুল জাব্বার সাহেব এ'রকমের আরো অনেক ছবিই অমৃতের পাঠকদের উপহার দেবেন। আর এজন্য অমৃতের কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ।

—চিত্তরঞ্জন কর্মকার
কলিকাতা—৩৬

শাদা চোখে

প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এই রাজ্যে খরা ও বন্যা পালাক্রমে উপস্থিত হয়। ফলে, বিধাতার রুদ্ররোষে একশ্রেণীর মানুষের কষ্টের অবধি থাকে না। সরকারী প্রচেষ্টায় সারা বছর ধরে খরার ও বন্যার জন্য রিলিফের কাজ চলে। বন্যাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা রচিত হয়। ঢিমে তেতালায় কাজও কিছু কিছু হয়। আর একটা প্রবল বন্যা না আসা পর্যন্ত বন্যা-নিরোধ প্রকল্পের কাজ আদৌ কিছু হল কিনা তা বোঝা সম্ভবপর হয় না। খরার বেলায়ও তাই। অবশ্য বন্যার কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। তার সর্বগ্রাসী রূপ দেখে ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু খরার বেলায় সেটা পুরোপুরি নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়।

খরার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে কিনা জানি না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ অগ্নিবাণে যখন সমস্ত জলাশয় শুকিয়ে উঠে আর সঙ্গে সঙ্গে কাল-বৈশাখীর আকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ বিলম্বিত হয় তখনই সকলে ভীষণ খরা হয়েছে বলে চীৎকার করে ওঠে। সমদর্শীর বক্তব্য হচ্ছে খরা তখনই বলা উচিত যখন সমস্ত জায়গায় মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়ে বৃষ্টি নামে অথচ একআধটা পকেটে মার্তণ্ডদেবের পূর্ণদৃষ্টি বিরাজমান। বর্তমানে যে খরার কথা বলা হচ্ছে তাকে তাপপ্রবাহের ফল বলা যেতে পারে। কাজেই বলছিলাম পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বর্তমানে যে তাপপ্রবাহ চলছে তাকে মনে হয় "ড্রাউট" বলা ঠিক নয়।

কেউ হয়ত মনে করতে পারেন "ড্রাউট" না বললেই বোধহয় সেই তাপদগ্ধ অঞ্চলের চির-বুভুক্ষু মানুষগুলো রিলিফের সাহায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সমদর্শী তার তথাকথিত টেস্ট রিলিফ, গ্রেটুইশাস রিলিফ ইত্যাদির ব্যবস্থা অবিলম্বে তুলে দিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক যাতে সেই অভিশপ্ত মানুষগুলোকে চিরকাল ধরে রিলিফের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে জীবনধারণ না করতে হয়। রিলিফ ব্যবস্থা মর্মান্তিক অতীব বেদনাদায়ক ও আত্মসম্মান হানিকর। অনেকেই হয়ত জানেন না টি আর বা জি আর কি? টি আর সাহায্য পাওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে ১০০ ঘনফুট মাটি কাটতে হবে। অর্থাৎ রাস্তার কাজ কিম্বা অন্য কোন পুকুর ইত্যাদি সংস্করণের কাজ করলে ও ঐ পরিমাণ মাটি কাটবার পর ঐ দুই ব্যক্তি ১-১৫ পয়সা করে মজুরি ও প্রত্যেকে ১১৫০ গ্রাম করে গম পাবেন। পুরুলিয়ায় ও বাঁকুড়ায় এই ব্যবস্থা চলছে। আর "জি আর" হচ্ছে একটি পরিবারের প্রধান পনেরো দিনে একবার চার কেজি করে গম ফ্রি পাবেন। পরিবার বলতে পাঁচজনের ইউনিট বোঝায়। আরও উল্লেখ করা দরকার, "টি আর" এর যে গম দেওয়া হয় তা সরকারের নয়। আমেরিকার "কেয়ার" নামক সংস্থার।

পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার পাথর মাটির ১০০ ঘনফুট মাটি খরার দিনে কাটা নিশ্চয় মামুলী ব্যাপার নয়। শুধু শক্ত মাটি নয়, তদুপরি অনাহারক্লিষ্ট অশক্ত মানুষ। শাবলের ঘা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাথুরে মাটি থেকে ঝিলিক দিয়ে আগুন বেরোয়। আর এই অসহ্য গরমে এই সুদুঃসহ পরিশ্রম করে কোন সুস্থ সবল মানুষকে পর্যন্ত অধিক মজুরীর লোভ দেখিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। অথচ এখন সেখানকার সংবিধান-স্বীকৃত মর্যাদাপূর্ণ নাগরিকদের পেটের জ্বালায় এই অগ্নিস্রাবী দিনে (মানুষ যেখানে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিবানিদ্রায় মশগুল) মাঠে-ময়দানে 'টি-আর'-এর বাবুদের কাছে ধর্না দিতে হচ্ছে। কারণ তাদের বাঁচতে হবে। কে জানে তা নিজেদের জন্যই কিনা! হয়তো নেতাদের ভোট দিয়ে বিধানসভার সদস্য কিম্বা মন্ত্রী হওয়ার জন্যই বাঁচতে হবে এদের। মনে করবেন না "টি আর"-এর যে নগদ টাকা ও গম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেটাও ঠিকমত কাজ করতে পারলেও ঠিক ঠিক মেলে। সমদর্শী বলতে চায় না, সরকারী কর্মচারীরা কারসাজি করে এই দুঃস্থ জনতাকে ঠকায়। তবু কি যে হয়ে যায়, কি করে যেন হিসাব মেলে না। যাঁর যা পাবার কথা তা পায় না। খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে গেলেই শোনা যায় সে অভিযোগ। সে কথা যাক। একটা অসমর্থ পরিবারকে ১৫ দিনে ৪ কেজি গম দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেবার নৈতিক বা আইনগত অধিকার সরকারের আছে কিনা— এই প্রশ্নটি আজকে পশ্চিমবাংলার বিদগ্ধ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চাই। শুধু তাই নয়, সমস্ত রাজনৈতিক দল— কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী—সকলেরই কাছে নিবেদন করছি এই প্রশ্ন। দেখা যাচ্ছে গত বাইশ বছরে কংগ্রেস কি যুক্তফ্রণ্ট সবরকমের সরকারই পশ্চিমবাংলায় কম বেশি সময় রাজত্ব করে গেল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে যে রিলিফ ম্যানুয়াল তৈয়ার হয়েছে তার পরিবর্তনের জন্য কোন প্রচেষ্টা অদ্যাবধি হয় নি। শুধু বক্তৃতার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং একে অপরের কাঁধে দোষ চাপিয়ে নিজেকে "দেবদূত" বলে জাহির করার চেষ্টা হয়েছে। চার কিলো গম পাওয়ার পর বাঁকুড়ার বা পুরুলিয়ার অখ্যাত গাঁ থেকে কোথায় এবং কাকে দিয়ে যে সেই গম ভাঙানো হবে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই, আবার সেই চার কেজি গম থেকেই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে যাঁরা শহরে প্রতিনিয়ত দাবীদাওয়ার সনদ দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা একবার এই হতভাগা ভারতের সংবিধানের মর্যাদায় পুষ্ট নাগরিকদের কথা ভাবেন ত?

হালফিল অনেকেই লক্ষ্য করেছেন কিম্বা সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখেছেন, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে লোকেরা অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু আসলে কি তাই। এই দেখুন না পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার খরা-পীড়িত অঞ্চলে চালের দাম ১·৩০ থেকে ১·৪০ এর মধ্যে। এই চালের দাম যদি কোলকাতায় বজায় থাকত তবে কি কোলকাতার নাগরিকরা উর্ধবাহু হয়ে নৃত্য করতেন না? ঐ সমস্ত খরাগ্রস্ত অঞ্চলে জিনিসের অভাব আছে এমন নয়, যার সবচেয়ে বেশী অভাব সেটা হচ্ছে রজত মুদ্রার। অর্থাৎ লোকে বেকার। টাকার মুখ কেউ দেখতে পায় না এবং সেইজন্যে চলছে অভাব। আর সেইজন্যেই খরার প্রচণ্ডতার মাত্রা প্রতিমুহূর্তে লোক উপলব্ধি করছে। কেননা খরা না হলে চাষ-বাসের কাজেও গরীব লোকেরা কিছু টাকা রোজগারের পথ পেত।

দেখা যাচ্ছে, প্রতি তিন বৎসর অন্তর খরা আসছে। এমন কি কোথাও কোথাও
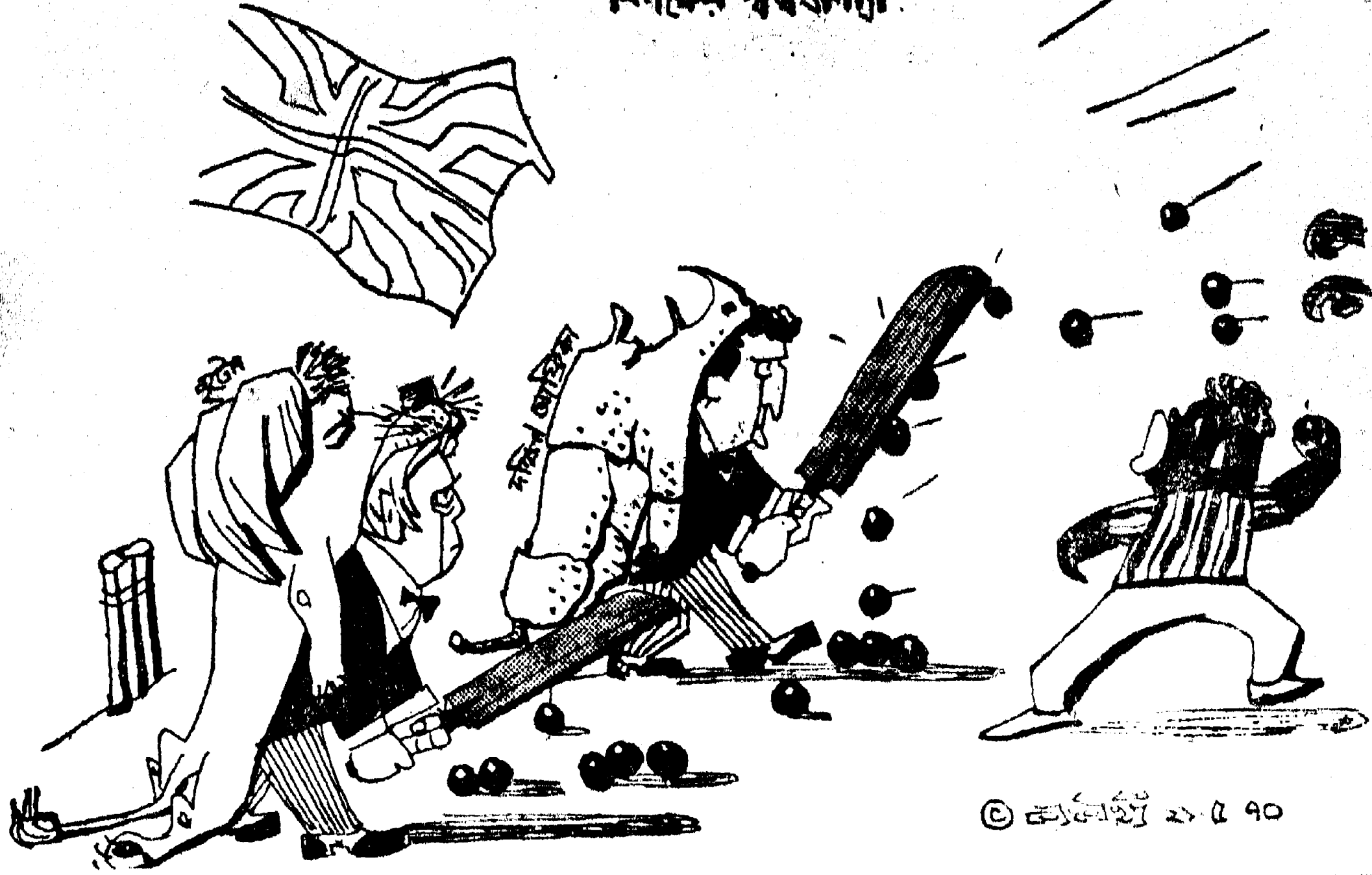
ফি বছরও আসছে। অনুরূপভাবে আসছে বন্যা। আর এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন ঘটে তখন সরকার আর রাজনৈতিক দলের পোয়া বারো। কেউ বা জনসেবার খাতিরে আর্ত চীৎকার করে চালটা-টাকাটা পাইয়ে দিয়ে ভোটের সংখ্যা বাড়াবার নেপথ্যে প্রচেষ্ট চালায়। আর সরকারী কর্মচারীদের ত কথাই নেই। গোমস্তা যেমন জমিদারবাড়ীর বার মাসের তের পার্বন লাগিয়ে রেখে নিজের আনন্দ বর্ধন করে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসলে কর্মচারীরা কাজ করবার মত বা জাতীয় সেবা করার বিশেষ সুযোগ পান ও নিজেদের আনন্দ বর্ধন করেন। অথচ কি রাজনৈতিক, কি সরকারী কোনো স্তরেই যাকে বলে 'সিরিয়াস' এমন কোন প্রকল্প রচনা করার চেষ্টা হয় না। ফলে ঐ সমস্ত অভিশপ্ত এলাকার মানুষের একটা কিছু স্থায়ী উপকারও হয় না। অর্থাৎ খরা আসুক আর বন্যা আসুক, নিজের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সেই ক্লিষ্ট মানুষ অদম্য উৎসাহে বাঁচবার লড়াই চালিয়ে যেতে পারে না। পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৫৭ সালে অর্থাৎ এক যুগের চেয়ে এক বছর আগে। আর প্রতিবারেই এই জেলার খরা-ক্লিষ্ট অঞ্চলকে সাহায্য মারফৎ নগদে ও জিনিসে সাহায্য দেওয়া হয়। জানা যায় অদ্যাবধি অর্থাৎ বর্তমান খরার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুই কোটিরও অধিক টাকা খয়রাতির নাম করে বন্টন করা হয়েছে। এবারও ইতিমধ্যেই নাকি ১৫ লক্ষ টাকা বণ্টিত হয়ে গেছে। কিন্তু খরাকে যুঝবার জন্য যে দৃঢ় গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ তৈরী করা দরকার সেদিকে কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না। নয়া শিল্প খোলা বা সেচের ব্যবস্থা করে জমির উর্বরা শক্তি বাড়িয়ে উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়ার কোন চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। আলোচনা করুন, দেখবেন লেকচার দিয়ে আপনার মাথা ঘুরিয়ে দেবে। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকর করতে বলুন, অমনি উত্তর আসবে টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। এই রিলিফের জন্য ফি বছর এত টাকা কোথা থেকে আসছে? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে। অনু-সন্ধান করে দেখুন প্রায় এক জায়গাতেই বছরান্তর খরা হচ্ছে। আর অনুরূপভাবে কিছু জায়গাতে বন্যাও হচ্ছে। সাইক্লিক অর্ডারেই সব ঘটনা ঘটছে। কোন ব্যতিক্রম নেই, যদি রাজনৈতিক দলগুলি 'সিরিয়াস' হত তবে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা করে এই খরার মোকাবিলার জন্য সার্থক প্রচেষ্টা চালানো যেত। কিন্তু তা হয়নি। বামপন্থী হউন আর দক্ষিণপন্থী হউন সকলেরই সমাধানের ধরন ছিল একই রকমের। দৃষ্টিভঙ্গির কোন তফাৎ অন্ততঃ রিলিফের প্রশ্নে অদ্যাবধি দেখা যায়নি। সকলেই আমেরিকান 'কেয়ার'এর ফ্রি গম দিয়ে ভোটসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন মাত্র।

সংবাদপত্রে প্রায়শ দেখতে পাবেন টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে অমুক জায়গায় এত দীর্ঘ রাস্তা তৈরী হয়েছে। পুকুর ও কুয়ো খনন করা হয়েছে। পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার বর্তমান খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে অদ্যাবধি প্রতিবার খরার সময় যত পুকুর বা কুয়া খনন করা হয়েছে তার লিস্ট যদি কেউ জোগাড় করতে পারেন তবে দেখবেন ঐ খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে এত খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে যে তার ফলে নিদেনপক্ষে ২২টি সুয়েজ ক্যানেল হয়ে গেছে। কিন্তু গিয়ে দেখুন তার চিহ্ন পর্যন্ত পাবেন না। অর্থাৎ প্রতিবারই সব কিছু হয়, কিন্তু নিতান্তই দায়সারা গোছের হিসাবে কাজগুলি সম্পন্ন করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য যাতে কাজে না লাগে এই প্রকল্পগুলিকে সেইভাবেই রূপায়ণ করা হয়। আর মহাকরণ থেকে টাকার অঙ্কে হিসাব বের হয় যে খরাক্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য মহানুভব সরকার অদ্যাবধি এত কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। জনতাও ওদিকে বাহবা, বাহবা নন্দলাল বলে উঠে। (বন্যার বেলাতে সেই বাঁধ, সেই খাল খনন ইত্যাদির ব্যাপারে কত টাকা খরচা হল তার ফিরিস্তি পাওয়া যায়। কোন ব্যতিক্রম হয় না।)

মোদ্দা কথায় বলতে গেলে একে বলে খরা বা বন্যার রাজনীতি। এবং এ রাজ-নীতি চলবে। সমস্যার চিরতরে সমাধান করবার চেষ্টা কোনদিন আদৌ হবে কিনা সন্দেহ। তা হলে জনতা নেতাদের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যেতে পারে তো।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডি, জলগাঁও ও অন্যান্য অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারার পর এখন এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পিছনে প্রস্তুতি ও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, যথেষ্ট হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও এই দাঙ্গা নিবারণ করতে ও দমন করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন এবং জাতীয় সংহতি পরিষদের মাধ্যমে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য এযাবৎ যেসব চেষ্টা হয়েছে সেগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশোবন্ত রাও চাবন লোকসভায় স্বীকার করেছেন যে, জাতীয় সংহতি পরিষদ সাম্প্রদায়িক হানাহানি দমন করার জন্য যেসব প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন সেগুলিতে কাজ হয় নি, এখন সমগ্র জাতিকে সংখ্যালঘুদের রক্ষায় নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

লোকসভার এই বিতর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথাও বলেছেন যে, ভিওয়ান্ডিতে যে ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিল জলগাঁওতে তাও ছিল না, তবুও যে জলগাঁওতে দাঙ্গা হয়েছে তাতে সেখানকার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সমর্থনে তাঁর 'কিছুই বলার নেই।'

এই দাঙ্গায় অন্যান্য যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেগুলির মধ্যে আছেঃ—

'নয়া' কংগ্রেস দলের পার্লামেন্ট সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এর আগে যখন আমেদাবাদে দাঙ্গা হয়েছিল তখন সেখানকার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার দায়িত্ব 'নয়া' কংগ্রেস দলের উপর আসেনি; কেননা, গুজরাটের সরকার 'পুরনো' কংগ্রেস দলের হাতে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের সরকার পরিচালনা করছে 'নয়া' কংগ্রেস দল, সুতরাং সেখানকার দাঙ্গার আগুনের আঁচ কিছু না কিছু এই দলকে স্পর্শ করবেই। দলের এম-পি-রা এবিষয়ে অবহিত। বিশেষ করে, তাঁরা জানেন যে, বোম্বাই কর্পোরেশনে তাঁদের দলের সঙ্গে শিবসেনার মাখামাখি অতঃপর দলের রাজনৈতিক মর্যাদায় আঘাত করবে, কেননা, মহারাষ্ট্রে এই দাঙ্গা বাধাবার মুখ্য দায়িত্ব শিবসেনা দলের উপরই এসে পড়ছে। (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন লোকসভায় স্পষ্ট করেই এই দাঙ্গার জন্য অন্যান্যদের মধ্যে শিবসেনাকে দায়ী করেছেন, যদিও তিনি সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মুসলিম সংস্থার দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, শ্রীচাবন শিবসেনা দলের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, এই দল মহারাষ্ট্রের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে এবং মানবিক মূল্যবোধ বলতে যা কিছু বোঝায় তার বিরোধী এই দল। ভারত সরকারের কোন মুখপাত্র এর আগে আর কখনও সম্ভবত শিবসেনা দলের বিরুদ্ধে এরকম কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন নি।)

'নয়া' কংগ্রেস দলের কয়েকজন এম-পি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের উদ্বেগ জানিয়ে এসেছেন। প্রকাশ, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কারণ দূর করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হোক। এইসব সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় সংহতি পরিষদ তাঁদের বিগত অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব করেছিলেন সেগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলির তরফ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই সব সংসদ সদস্য মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রাজ্য সরকারগুলির হাতে ছেড়ে না রেখে এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

নয়া কংগ্রেস দলের পার্লামেন্টারি পার্টির সভায়ও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে সদস্যরা বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্য দিয়ে যেভাবে তরুণদের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার উল্লেখ করেন। একজন সদস্য সাম্প্রদায়িক দলগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবী জানান।

'পুরনো' কংগ্রেস দলের চারজন প্রতিনিধি দাঙ্গাদুর্গত অঞ্চলগুলিতে ঘুরে এসে একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, যদিও এখন ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ ভালভাবেই এগোচ্ছে তাহলেও মহারাষ্ট্র সরকার যে হাঙ্গামার ঘটনাস্থলগুলিতে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছেন সে বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ। 'পুরনো' কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবেঙ্কটসুব্বায়া বলেছেন যে, সাম্প্রদায়িকতা মহারাষ্ট্রেই দেখা দিক অথবা অন্য কোন জায়গায় দেখা দিক, সেটা একটা জাতীয় সমস্যা এবং এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা থেকে কোন পার্টিরই সুবিধা নেওয়া উচিত নয়।

মজলিস-ই-মুশাওয়ারতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারতের মুসলিম সংস্থাগুলির এক সভায় দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা এবং ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার একটি সুচিন্তিত পূর্ব পরিকল্পনার অংশ। 'আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হচ্ছি যে, পাইকারী মুসলমান-নিধনের একটা পরিকল্পনা আছে', এই কথা বলে প্রস্তাবে ভারত সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হিসাবে গণহত্যা নিবারণ করার জন্য তাঁদের যে দায়িত্ব আছে সেটা যেন তাঁরা পালন করেন।

মহারাষ্ট্রের এই দাঙ্গার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই গণহত্যার অভিযোগ এসেছে। অভিযোগকারী পাকিস্থান। প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার এই সুযোগ নিতে আদৌ কার্পণ্য করে নি। দাঙ্গার খবর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লীতে পাকিস্থানী হাই-কমিশনার দাবী করেন, তাঁদের প্রতিনিধিকে দাঙ্গা-দুর্গত অঞ্চলে সফর করার অনুমতি দিতে হবে। ভারত সরকার সেই দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইতিমধ্যে, পাকিস্থান বেতারে মহারাষ্ট্রের দাঙ্গার কথা ফলাও করে বলা হয়েছে। পাকিস্থানের সরকার সমর্থক যেসব দক্ষিণপন্থী দল ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির সহযোগিতায় যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলছে তাদের সংবাদ এই বেতার মারফৎ বিস্তারিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। পাকিস্থান বেতারের খবরেই প্রকাশ যে, মারকের-এ-জমহ-এ-উলেম-এ-ইসলাম নামক করাচীর একটি প্রতিষ্ঠান বলেছেন, দাঙ্গাদুর্গত অঞ্চলে মুসলমানদের দুর্দশা দেখার জন্য জেড্ডা সম্মেলনের উচিত ভারতে একদল প্রতিনিধি পাঠান। পশ্চিম পাকিস্থানের মুসলিম লীগ কাউন্সিল পাকিস্থান সরকারকে ভারতের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনার পরামর্শ দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে, সেখানকার অবস্থা এখন শান্ত। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিক পর্যন্ত অবশ্য থানা, কোলাবা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে গৃহদাহ, লুঠপাট, মারামারি ও খুনের

জোহানেসবার্গের উইটওয়াটারস্র্যান্ড য়ুনিভার্সিটিতে সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভের দৃশ্য।

খবর আসছিল। সর্বশেষ যে হিসাব পাওয়া গেছে যে, এই দাঙ্গায় মোট ১৫৭ জন মারা গেছেন।

ভিওয়াণ্ডির দাঙ্গার যেসব বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে এখন জানা যাচ্ছে যে. গত ৭ মে তারিখে শিবাজীর জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে যে মিছিল বেরিয়েছিল সেই মিছিলে কিছু লোক অননুমোদিত ও আপত্তিকর ধ্বনি দিয়েই এই দাঙ্গার অব্যবহিত কারণটি ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

ভিওয়াণ্ডি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী মিউনিসিপ্যাল শহর। বোম্বাই শহর থেকে ৩০ মাইল দূরে বোম্বাই-আগ্রা সড়কের উপর অবস্থিত এক লাখ ৪০ হাজার মানুষের এই শহরের পৌর-সভার বার্ষিক বাজেট ৮০ লাখ টাকা ভিওয়াণ্ডির এই সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে সেখানকার তাঁত শিল্প। সারা মহারাষ্ট্রে যত তাঁত রয়েছে তার অর্ধেকই দেখতে পাওয়া যাবে এই ভিওয়াণ্ডি শহরে। উত্তরপ্রদেশের মোমিন মুসলমান তাঁতী ও অন্ধ্রের তেলেগু হিন্দু তাঁতীরাই প্রধানত এই সব তাঁত-শালায় কাজ করেন। শহরে মুসলমানদের যে প্রাধান্য রয়েছে তার প্রমাণ, মিউনিসি-প্যালিটির ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জনই মুসলমান। এই প্রমাণও আছে যে. তামির-ই-মিল্লাত নামক একটি সংস্থা শহরের মুসলমানদের মধ্যে কিছুকাল যাবং বিশেষ সক্রিয় রয়েছে। অন্যদিকে, শহরের হিন্দুদের মধ্যে শিবসেনার প্রভাব বাড়ছে। এসব সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে একথা সত্য যে, উভয় সম্প্রদায়ের স্থিরবুদ্ধি লোকরা এযাবৎ শহরে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেসব পালা-পার্বন উপলক্ষে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে সেগুলি যাতে নির্বিঘ্নে উদ্যাপিত হতে পারে তার ব্যবস্থাপনা করার উদ্দেশ্যে কিছুকাল যাবৎ ভিওয়াণ্ডিতে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিবাজী জন্ম-দিবস উদ্যাপনের ব্যবস্থা করা এই কমিটির একটি বিশেষ দায়িত্ব। কেননা, শিবাজী সম্পর্কে মুসলমানদের অনেকের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরূপতা আছে এবং অন্যদিকে জঙ্গী হিন্দুরা শিবাজীর মধ্যে তাঁদের ঐতিহাসিক নায়ককে দেখতে পান। এই বছরও শিবাজী জয়ন্তীর দিন ঐ কমিটি কতকগুলি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। কারা মিছিলের নেতৃত্ব করবেন (উভয় সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতারা মাইক্রো-ফোন নিয়ে মিছিলের সামনে যাচ্ছিলেন), মিছিলে কি ধ্বনি দেওয়া হবে ('ছত্রপতি শিবাজী কী জয়', মারাঠীতে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যচা বিজয় আসো' এবং উর্দুতে 'হিন্দু-মুসলিম ইত্তেহাদ জিন্দাবাদ', মারাঠীতে 'স্বতন্ত্র ভারতচা বিজয় আসো' এবং উর্দুতে 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ', 'হিন্দভী পাদপাদশাহী সংস্থাপক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কী জয়' প্রভৃতি), মিছিলে কি পতাকা থাকবে (শুধু পতাকা, এমন কি শিবাজীর গৈরিক পতাকাও নয়) সেসব কমিটি আগে থেকে স্থির করে রেখেছিলেন। কিন্তু মিছিলের শুরুতেই বিভ্রাট বাধল যখন ঐ মিছিলের পিছন দিক থেকে কিছু অননুমোদিত ও মুসলমানদের পক্ষে অবমাননকের ধ্বনি দেওয়া হল। মিছিলের

নেতারা সতর্ক করে দেওয়ায় তখনকার মত এইসব ধর্বনি বন্ধ হল বটে; কিন্তু মাইল-খানেক যাওয়ার পর আবার সেসব শেলাগান শোনা যেতে লাগল। কিছু কিছু শেলাগান নাকি এমন কুৎসিত যে সেগুলি ছাপানই যায় না। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভদ্র শেলাগান হল 'হিন্দু ধর্মচা বিজয় আসো' অর্থাৎ 'হিন্দু ধর্মের জয় হোক।' (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন বলেছেন, 'মুসলমানরা চোর' এই শেলাগানও দেওয়া হয়েছে)।

এই শেলাগানই হল উত্তেজনার আশু কারণ। ঘটনার যেসব বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে প্রকাশ যে, প্রথম আক্রমণটা এসেছিল মুসলমানদের তরফ থেকে, পরে তাঁরা নিজেরা আক্রান্ত হয়েছেন এবং যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যেসব সাংবাদিক ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন তাঁরা বলছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যে এই দাঙ্গার জন্য কতকটা প্রস্তুত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। একটি অনুমান এই যে, শহরের ২৫ হাজার বাড়ীর মধ্যে শতকরা ২৫ থেকে ৪০টিতে আক্রমণ অথবা আত্ম-রক্ষার মাল-মশলা মজুদ ছিল। দাঙ্গা বাধবার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মিছিলের উপর অ্যাসিড বালব, বোমা ইত্যাদি এসে পড়তে আরম্ভ করে তাতেই এই পূর্বপ্রস্তুতির কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।

ভিওয়ণ্ডির দাঙ্গা সম্পর্কে আর একটি খবর এই যে, ঐ শিবাজী জয়ন্তী মিছিলের উপর নজর রাখার জন্য যে ৬০০ পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের কারোর হাতে লাঠি ভিন্ন অন্য অন্য কোন অস্ত্র ছিল না এবং দাঙ্গার সময় তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করে নি। (শ্রীচ্যবন বলেছেন যে, ভিওয়াণ্ডি শহরের সরু সরু গলির মধ্যে যখন দাঙ্গা চলছিল এখন সশস্ত্র পুলিশও কিছু করতে পারত না)।

●

উড়িষ্যায় শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও তাঁর অনুগামীরা একটি নতুন দল গঠন করেছেন। এই দল কোন সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। শ্রীপট্টনায়ক বলেছেন, যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এখন আর বাস্তবিকপক্ষে সর্বভারতীয় দল বলতে কিছু নেই। তাঁর মতে, ডি-এম কের মত রাজ্যভিত্তিক দলের পক্ষেই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আপাতত তাঁর দলের নাম উৎকল প্রদেশ কংগ্রেসই থাকল, কিন্তু পরে দলের নতুন নাম দেওয়া হতে পারে।

উড়িষ্যায় শ্রীপট্টনায়কের এই নতুন দল পত্তন করার আগে 'নয়া' কংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম শ্রীপট্টনায়ককে, উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীনীলমণি রাউৎরায়কে ও কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপি সি মোহান্তিকে দলের সদস্যপদ থেকে সাসপেণ্ড করেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল করে দেন। অন্যদিকে, 'নয়া' কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করে উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

রাজ্যসভায় গত নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীপট্টনায়ক ও তাঁর অনুগামীরা 'নয়া' কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তার জের গড়াতে গড়াতেই এত দূর গড়াল। উৎকলে এই বিদ্রোহের ফলেই সেখান থেকে দলের মনোনীত প্রার্থী রাজ্যসভার নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন এবং 'পুরনো' কংগ্রেস দলের প্রার্থী সেই আসনটি লাভ করেছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারি বোর্ডের নির্দেশ ছিল, উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বিষয়টি নিজেরা বিবেচনা না করে যেন তাঁদের উপর ছেড়ে দেন। উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যখন তাঁদের এই নির্দেশ লংঘন করার সিদ্ধান্ত করলেন তখনই দেখা দিল চূড়ান্ত বিপদ।

২৩-৫-৭০
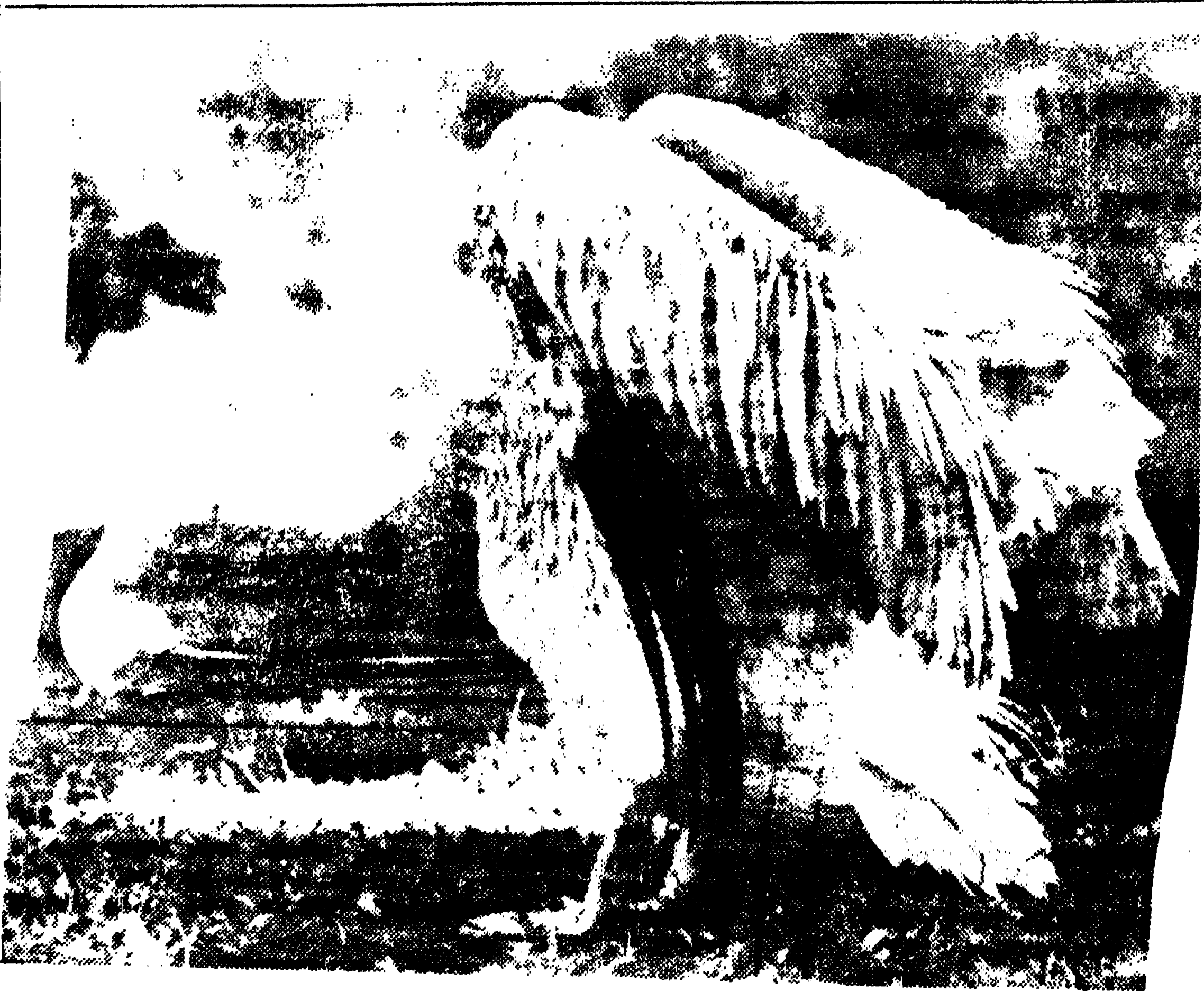
প্রথম বর্ষণ নামার পর আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি পেলিক্যান।

সম্পাদকীয়

আট বনাম ছয়

যুক্তফ্রন্ট বিলুপ্ত হবার পর প্রাক্তন চৌদ্দ শরিক ক্রমশই সমধর্মী দলগুলোকে নিয়ে জোট বাঁধার চেষ্টা করছেন। যতই দিন যাচ্ছে একটা বিষয় ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, এই দলগুলোর মধ্যে সত্যিকারের মিল খুব বেশি নেই। আদর্শের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের অনেক দলই হয় মার্কসবাদ নয়তো গান্ধীবাদ অথবা সমাজবাদের অনুগামী। মার্কসবাদের নামে শপথ নিলেও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। দক্ষিণপন্থীরা বরং গান্ধীবাদী বাংলা কংগ্রেস কিংবা এক ধাপ ঝাঁঝালো মার্কসবাদী সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার অথবা সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগে এক পাতে বসে খেতে রাজি। কিন্তু তাঁদেরই দল থেকে উদ্ভূত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সংগে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখতে রাজি নন।

অন্যদিকে মার্কসবাদীরা লেনিনবাদের নামে প্রতিজ্ঞা নিলেও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, ও যাঁদের সংগে একদিন ছিল নাড়ীর যোগ, তাঁদের মুখদর্শন প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ সকলেরই লক্ষ্য আবার সরকার গঠন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হওয়া। কমিউনিস্ট পার্টির সংগে অপর সাতটি পার্টি মিলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী আট পার্টির একটি জোট বাঁধবার চেষ্টা করছেন। বাংলা কংগ্রেসকে তাঁদের মধ্যে নেওয়া হবে কি হবে না তা নিয়ে এই মহলে সম্প্রতি জোর তর্ক শুরু হয়েছে। পি এস পি'র যে-অংশ যুক্তফ্রন্টে আছেন তাঁরা এবং এস এস পি'র একটা অংশ বাংলা কংগ্রেসকে আট পার্টি জোটের আওতায় রাখতে চান। এ নিয়ে আট পার্টির অন্যান্য শরিকদের মধ্যে এখনও কোনো বোঝাপড়া হয় নি। বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় গ্রামে-গ্রামে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন। অন্যান্য দলের কর্মপন্থা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আসলে তাঁরা আবার একটা বিকল্প ফ্রন্ট গঠন করে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন অথবা নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করবেন এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে না আসাতেই নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অজয়বাবু বলছেন মার্কসবাদীরাই সব নষ্টের গোড়া। ও'দের সংগে তিনি আর কোনো ফ্রন্ট করবেন না। কংগ্রেসীদের তিনি বাংলাদেশে জব্দ করেছেন। মার্কসবাদীদেরও তিনিই জব্দ করবেন বলে অজয়বাবু মনে করেন। আট পার্টির অন্যান্য দল অবশ্য এত স্পষ্ট করে এই কথাগুলো বলতে পারছেন না। মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের সাহায্য নিতে হয়। এই ঝুঁকি এ'রা কেউ নিতে চাইছেন না।

মার্কসবাদীরা অবশ্য চুপ করে নেই। কিন্তু এ'রাও স্পষ্ট কোনো কর্মপন্থা দেখাতে পারছেন না। ও'রা যেহেতু বৃহত্তম দল এবং যুক্তফ্রন্টের আমলে এ'দের ক্ষমতাও খুব বেড়ে গিয়েছিল তাই এ'রা আশা করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবে। কিন্তু কার্যত তা হল না। একদিন হরতাল বা জনসভা করলেই গণ-আন্দোলন হয় না। এ ধরনের আন্দোলনের ধারও কমে গেছে। কেরলেও ও'রা আশা করেছিলেন যে অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভাকে গণ-আন্দোলনের চাপে পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তা হয় নি। কেরলের পরিস্থিতি থেকে মার্কসবাদীরা কিছু শিক্ষা নিয়েছেন কিনা জানি না। তাঁরা সমধর্মী আরও পাঁচটি দল নিয়ে একটি জোট বেঁধেছেন। এ'দের সংগে রয়েছেন প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাঁচটি দল—ওয়ার্কার্স পার্টি আর সি পি আই-এর একটি অংশ, বলশেভিক পার্টি এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। এ'রা যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন চান না। অবিলম্বে নির্বাচনের জন্য সি পি এমের নেতৃত্বে এ'রা গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আট পার্টির শরিকরাও বিকল্প ফ্রন্টের কোনো আশা নেই দেখে নির্বাচনের দাবীতেই আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছেন। উদ্দেশ্য যখন এক তখন এ'দের মধ্যে কোনো সংহতি না হওয়ার কারণ হল পারস্পরিক বিরোধ এবং অবিশ্বাস। তাতে আশঙ্কা হয় যে, যুক্তফ্রন্টের আমলে যে বিরোধ বাংলার রাজনীতিকে কলুষিত করেছিল আট ও ছয়ের জোট আবার সেই মারাত্মক রেষারেষির মধ্যেই রাজনীতিকে টেনে নামাবে। রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘকাল থাকুক এটা কেউ চান না। কিন্তু নতুন নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে না তুললে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের আশাও হবে সুদূরপরাহত।

মন্দির ॥

নিশিকান্ত

তোমার মন্দির মাঝে, হে সুন্দর, অর্ঘরূপে ধরা
এ-সত্তার সব কিছু—তিলে তিলে সমর্পণ করা ঃ
প্রতি পল, প্রতি কণা, প্রতি অণু, প্রতি পরমাণু,
মনের ভাবনা যত, জীবনের প্রত্যেক জীবাণু,
পরম সার্থক তারা; হোক তারা যত অকিঞ্চন,
হোক ম্লান, হোক ধূলি, তবু তারা লভে উদ্ভাসন
অপার-দীপ্তির মাঝে।

জ্যোতির্ময়! মন্দির তোমার
পরশমানিক দিয়ে গড়া সে যে, পরশে তাহার
রূপান্তরিত হয় যাহা রয় তার বক্ষ পরে;
কালের অঙ্গুলি তারে পলকেও স্পর্শ নাহি করে,
যায় তার সব শঙ্কা; সে পরশে ভালো মন্দ আর
আঁধার আলোর দ্বন্দ্ব প্রজ্জ্বলিয়া হয় একাকার;
সেথায় জীবন লভে মরণের মলিন বাতাস,
সে যে চির-সুন্দরের অন্তহীন জ্যোতির আবাস।
প্রিয়তম!

যত দিই, যত আমি করি সমর্পণ,
ততই নির্মল হয় ঘোর ম্লান মর্তের জীবন ঃ
শুভ্রতার তারা সম, কলুষের কালোবিন্দুগুলি
ফুটে ওঠে পলে পলে; মানসের ধূসর-ভাবনা
প্রভাতের মেঘসম হয় চির-লাবণ্যের সোনা;
প্রত্যেক মুহূর্ত মোর মূর্ত হয় আশ্চর্য-বিকাশে ঃ
উদ্ভাসে অচিন্ত্য ঊষা, অভিনব সন্ধ্যালোক আসে,
সত্যের সৌন্দর্য লভি জাগে মোর দিবস-শর্বরী,
মোর ধমনীর প্রতি রক্তকণা ওঠে রূপান্তরি'।
হে সুন্দর প্রিয়তম!

হে ভাস্বর, তুমি যে পাবক!
পরশে প্রোজ্জ্বল করো যা তোমায় অর্ঘ দেওয়া হোক;
তাই আমি যাহা দিই হিরন্ময় বহ্নি সম জাগে—
উদয় অস্তের পারে আরতির দীপ জ্বালি রাখে
তোমার মন্দির মাঝে চিরন্তন-শিখার লীলায়;
তাই মোর প্রতি কথা আনন্দের উৎসবে মিলায়,
শাশ্বত জ্যোতির মন্ত্রে ঝঙ্কারিয়া ওঠে মোর বাণী।
জানি আমি জানি, প্রিয়!

আমি মর্তধূলির আধার,
তবু যে আমার মাঝে মূর্তিয়াছে মন্দির তোমার ঃ
আত্মার লাবণ্যলোক, প্রকাশের প্রেম-পরায়ণ;
সেথা অধিষ্ঠিত তুমি।

অর্ঘে তাই ধরি অনুক্ষণ
তারি পানে মোর গতি, জীবনের রূপান্তর চাই,
[illegible] অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালাই।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমস্যা

প্রফুল্ল রায়

সাম্প্রতিক যে কোন একটি দিনের সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চেহারাটা দেখা যাক।

সকাল—

ঘুম থেকে উঠতেই চোখে পড়ল, হিন্দুস্থানী হকার খবর কাগজ দিয়ে গেছে। প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে প্রথম খবর : দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে তিনজন নিহত, সতেরজন আহত। তার ঠিক তলাতেই রয়েছে, চব্বিশ পরগণার অমুক গ্রামে পাঁচ শ' একর বেনামী জমি উদ্ধার। তার পাশে : আটতলা বাড়ির মাথা থেকে ঝাঁপ দিয়ে বেকার যুবকের আত্মহত্যা এবং উত্তর কলকাতায় রিভলবার দেখিয়ে দশ হাজার টাকা ছিনতাই।

প্রথম পাতাখানা উল্টে যেতেই ভেতর থেকে আরো অসংখ্য খবর বেরিয়ে আসতে লাগল। যথা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার দলে-দলে উদ্বাস্তু আগমন। চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় মহারাষ্ট্রের জন্য যেখানে বরাদ্দ আট শ উনষাট কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম বাঙলার ভাগে মাত্র তিন শ' বাইশ কোটি টাকা। কলকাতা উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও যোজনা কমিশনের কাছে নতুন করে ধর্না। চক্ররেলের বদলে আবার পাতাল রেলের জল্পনা-কল্পনা : সমীক্ষার জন্য সময় চাই : কলকাতাবাসীকে ধৈর্য-ধারণের উপদেশ। ইঞ্জিনীয়ার স্নাতকদের সমাবর্তন বর্জন। তাঁদের দাবী : ডিগ্রি চাই না, কাজ চাই। কলকাতা কর্পোরেশনের কয়েক কোটি টাকা ঘাটতি বজেট পেশ। বেকারিত্বে পশ্চিম বাঙলার শীর্ষস্থান অধিকার। চাঁপদানির চটকলে ক্লোজার ঘোষণা, রিষড়ার কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে লক-আউট, কলকাতা থেকে অমুক কোম্পানীর হেডঅফিস স্থানান্তরের চেষ্টা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবর কাগজে আজকাল আর কোন রহস্য নেই। সারা গায়ে প্রায় একই ছবি এঁকে রোজ সকালে তারা হাজিরা দিচ্ছে।

খবর কাগজ শেষ করে এনেছি, মেয়ে এসে জানাল, বাজারে যেতে হবে। তক্ষুনি উঠে পড়লাম।

আমাদের গলি থেকে বেরুলেই সারি সারি বাড়ির দেওয়ালগুলো আর অক্ষত নেই ; বিভিন্ন পার্টির শ্লোগানে ছেয়ে আছে। শ্লোগানগুলো রোজই একরকম থাকে না ; দু-চারদিন পরপর পুরনোগুলো মুছে নতুন শ্লোগান লেখা হয়।

প্রতিদিনই ওগুলো পড়তে পড়তে বাজারে যাই ; আজও যাচ্ছি। যাদুকরের আয়নার মতন এই শ্লোগানগুলো বাঙলা-দেশের ইদানীংকালের নানারকম রাজনৈতিক আন্দোলনের ছায়া ধরে রেখেছে।

রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে মোড়ের মাথায় কাটাচায়ের দোকান। অন্য-দিনের মতন আজও সেখানে গুলতানি চলছে। দু'চারজন বয়স্ক লোক বাদ দিলে কুড়ি-বাইশ বছরের একদল যুবক ভিড় করে আছে। সকাল থেকে মাঝরাত্ত পর্যন্ত চায়ের দোকানগুলো ওদেরই দখলে।

ওদের পরণে ড্রেন-পাইপ প্যান্ট, চক্কর-চক্কর টী-শার্ট, কোমরের তলার দিকে বেল্ট। বৈশিষ্ট্যের ভেতর গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্প্যানিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের মতন মোটা জুলপি।

আমাদের পাড়ারই ছেলে। সবার নাম জানি না ; মুখ চিনি। স্বরূপও কিছু কিছু জানি। স্কুল-কলেজে এক-আধজনের নাম হয়তো লেখানো আছে ; তবে যায় না। বাদবাকি যারা, সেখানকার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। চাকরি-বাকরিও করে না। করবে কি, আমাদের এই অঞ্চলে নতুন কোন কল-কারখানা হচ্ছে না। যেগুলো আছে, তার বেশির ভাগ বন্ধ। যেগুলো খোলা, সেখানে ছাঁটাই, লে-অফ এবং বহুরকমের অশান্তি। অতএব ছেলেরা চায়ের দোকান আশ্রয় করেছে।

প্রায়ই এদের মধ্যে দু-দলে ভাগাভাগি হয়ে কিংবা অন্য পাড়ার সঙ্গে ওরা মারা-মারি লাগায়। তখন যথেচ্ছ রড, ডাণ্ডা, সোডার বোতল এবং বোমার ব্যবহার চলে। মিউনিসিপ্যাল কি জেনারেল ইলেকশনের সময় দেখা যায়, ওরা বিভিন্ন প্রার্থীর হয়ে খাটছে। এদেরই কেউ কেউ, এবং এ পাড়ার আরো অনেকে যারা এখানে বসে না, তাদের দেখি মাঝে মাঝে মিছিল করে ময়দানের দিকে চলেছে। সেই সময়টা চায়ের দোকানে ওদের দেখা যায় না, নির্বাচনের পর আবার ওরা ফিরে আসে। সমাজতত্ত্ববিদেরা যাদের সম্বন্ধে বলেছিলেন 'লস্ট জেনারেশন'? এরাই কি?

সন্তর্পণে জায়গাটা পার হয়ে যাচ্ছিলাম ; একটা ছেলে সামনে এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল।

মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'স্যার, দুপুরবেলা আপনার বাড়ি যাব।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'তখন বলব।'

আর কিছু না বলে বাজারে চলে গেলাম। খিঁচ লাগার মতন বুকের ভেতর একটুখানি শঙ্কা আটকে রইল। আমার কাছে ওদের আবার কী দরকার?

দুপুর—

প্রায় সারাদিনই আমি বাড়িতে থাকি। হয় লিখি নয় পড়ি ; কিংবা আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। লেখাই আমার জীবিকা।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সবে লিখতে বসেছি, দরজায় টোকা পড়ল। খুলতেই দেখি, ডাক-পিওন। একটা খাম দিয়ে সে চলে গেল। চিঠিটা আমার না, ছোট ভাইয়ের—একটা নামকরা প্রাইভেট ফার্ম থেকে এসেছে। মাসখানেক আগে ছোট ভাই এই কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। তবে কি চাকরিটা হয়ে গেছে? আশায় এবং উত্তেজনায় খামের মুখটা ছিঁড়ে পড়তে লাগলাম। 'ডিয়ার স্যার, উই রিগ্রেট টু...' অর্থাৎ 'অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনাকে এ চাকরিটা দেওয়া গেল না।...'

এই নিয়ে গত চার বছরে ছোট ভাইয়ের নামে বাইশবার এইরকম চিঠি এল। তবু এরা ভদ্রতা করে চাকরি না দেবার খবরটা জানিয়েছে। কিন্তু আরো দু'শ' বাইশ জায়গায় ছোট ভাই যে ইন্টারভিউ দিয়েছে তার কোন খবরই নেই।

ছোট ভাইটা বি, এস-সি পাশ করে চার বছর বসে আছে। এই মুহূর্তে সে বাড়ি নেই। সকালবেলা উঠেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। শুনেছি, আজ বিকেলে নাকি চাকরির দাবীতে এরা মিছিল করে মহা-করণের দিকে যাবে।

চিঠিটা রেখে দিয়ে আবার লিখতে বসলাম। আধঘণ্টার মতন পার হয়েছে ; দরজায় টোকা পড়ল। বিরক্ত হলেও খুলতে হল। এবার চায়ের দোকানের সেই ছেলেটি তার পেছনে দশ-বারোটি সঙ্গী।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। ছেলেটি গলার ভেতরে জিভ কাত করে অদ্ভুত উচ্চারণে তাদের নিজস্ব 'ইডিয়মে' যা বলে গেল, সংক্ষেপে এইরকম। তিনরাত্রি ব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বম্বে থেকে বড় বড় আর্টিস্ট আসবে, অর্কেস্ট্রা আসবে, হাস্য-কৌতুকের বন্দোবস্তও আছে। আর হবে যাত্রা-উৎসব। ইদানীং ছেলেরা

সংস্কৃতির এই সুপ্রাচীন বাহনটি আধা-থিয়েট্রিক্যাল কিম্ভূত চেহারা নিয়ে নাকি জাতে উঠেছে। যাই হোক, এইসব মহৎ কারণে আমাকে সামান্য কিছু ডোনেশন দিতে হবে—মাত্র পঁচিশটি টাকা।

দিনকয়েক পর-পরই ওরা চাঁদার জন্য হানা দেয়। উপলক্ষ নানারকম। কোনবার রবীন্দ্র-জয়ন্তী, কোনবার সরস্বতী-পুজো, কোনবার শিবরাত্রি।

এ-জাতীয় যুব-শক্তিকে চটানো কাজের কথা নয়। অনেক কাকুতি-মিনতির পর পনের টাকায় রফা হল।

ডোনেশন নিয়ে ছেলেরা চলে গেল।

বিকেল—

সারা দুপুর লিখে বিকেলে বেরুলাম। রোজই বিকেলবেলা বেরুই। কোনদিন এসপ্ল্যানেডে এসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিই। কোনদিন যাই কলেজ স্ট্রীটে, বই-পাড়ায়। কোনদিন বা পত্র-পত্রিকার অফিসে।

আজ এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত আসতে কম করে পনের ষোলটা মিছিল দেখলাম। অজস্র পতাকা তুলে অসংখ্য মানুষ সারিবন্ধভাবে শুধু হাঁটছেই, হাঁটছেই। মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলে শ্লোগান দিচ্ছে।

মিছিলগুলোর কোনটা ডক-শ্রমিকদের, কোনটা ছাত্রদের, কোনটা ব্যাংক কর্মচারীদের কোনটাতে বা সুদূর বাঁকুড়া কি বীরভূম জেলার কৃষাণ, গ্রাম থেকে এসেছে। সবারই কোন না কোন দাবী আছে।

জল-কল্লোলের মতন শোনা যাচ্ছে, 'আমাদের দাবী—'

'মানতে হবে, মানতে হবে।'

'ইনকিলাব—'

'জিন্দাবাদ।'

রোজই বিকেলবেলা এসপ্ল্যানেডের দিকে যেতে যেতে কত মিছিল যে দেখি। এ শহরে মিছিল ছাড়া একটা দিনও যায় না।

মনে পড়ছে, কে যেন বলেছিলেন, 'এ শহর মিছিলের শহর, দুঃস্বপ্নের শহর।' তাঁর নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এসপ্ল্যানেডে আসতেই চোখে পড়ল, মনুমেন্টের তলায় মিটিং চলছে। উত্তেজিত বক্তার কণ্ঠস্বর অসংখ্য লাউড-স্পীকারে হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রায় প্রতিদিনই এখানে মিটিং হয়। কোনদিন দূর গ্রামাঞ্চলের কৃষাণদের নিয়ে, কোনদিন ভিয়েৎনামের ব্যাপারে, কোনদিন বা মার্কেন্টাইল ফেডারেশনের ডাকে।

মাঝে মধ্যে সময় হাতে থাকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনে যাই। আজ আর দাঁড়ালাম না; কলেজ স্ট্রীটে কাজ ছিল, চলে গেলাম।

রাত্রি—

আটটা নাগাদ আমার এক প্রকাশক বন্ধু তাঁর গাড়িতে এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। এখান থেকে আবার ট্রাম ধরতে হবে।

স্টপেজে এসে শুনলাম, ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। যাত্রীদের সঙ্গে কন্ডাক্টরদের কি একটা গোলমাল হয়েছিল; ট্রাম বন্ধ তারই পরিণতি। শুধু এই রুটেই নয়, যে কোন রুটেই যে কোন সময় যে কোন কারণে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এর কোন প্রতিকার নেই। দিনের পর দিন এতেই আমরা অভ্যস্ত।

অগত্যা বাস-স্ট্যান্ডে চলে এলাম। আমার মতন কয়েক শ'লোক ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেট বাস কদাচিৎ এক-আধটা চোখে পড়ে। সেগুলোর অবস্থা অবর্ণনীয়; তার ভেতর ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই। গাড়িগুলো দাঁড়াচ্ছেও না; সাঁই-সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রাইভেট বাসগুলোর অবস্থা আরো ভয়াবহ। সামনে-পেছনে এবং পা-দানিতে মানুষ চলছে। এমনকি মাথায়ও কিছু চড়েছে। স্টেটবাসের মতন এই বাসগুলো হুস করে চলে যাচ্ছে না; স্ট্যান্ডে দাঁড়াচ্ছে। আমার চারধারের লোকগুলো গাড়ি আসামাত্র মশার মতন ছেঁকে ধরছে। এক-আধজন ওর মধ্যেই জায়গা করে নিচ্ছে; বাদবাকি বাইরে পড়ে থাকছে। ঐ বিপুল ব্যূহ ভেদ করে বাসে ওঠার মতন বাহুবল, মন্ত্র, বা কৌশল আমার জানা নেই। আমি দাঁড়িয়েই আছি।

লক্ষ্য করেছি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চেহারা এবং পোশাক-টোশাক দেখে মনে হয়, ভালই চাকরি করেন। যে বাসটি আসছে তাতেই তিনি উঠবার চেষ্টা করছেন। দু-তিনটে বাস চলে যাবার পর যে বাসটা এল তাতেও যখন উঠতে পারলেন না, তখন ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল, গুচ্ছের তেতো গিলেছেন। বিকৃত মুখে তিনি বললেন, 'শালা—'

এর পরেই যে বাসটা এল তাতেও উঠতে পারলেন না ভদ্রলোক। হিংস্র মুখে উচ্চারণ করলেন,, 'শুয়ারের বাচ্চা—'

তার পরের বাসটায় পা ঢোকাতে গিয়ে একটি লাথি খেলেন ভদ্রলোক। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে আসতে আসতে এবার অকথ্য একটা খিস্তি দিলেন তিনি। দিয়েই হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থতিয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে আমার উদ্দেশে বললেন, 'সারাদিন অফিস করবার পর যদি ট্রাম-বাস না পাওয়া যায় কেমন লাগে বলুন তো? ইচ্ছা করে সব জ্বালিয়ে দি। কলকাতা শহরটা একেবারে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। কোন মানুষ এখানে থাকতে পারে না।'

অনেক রাত্রে খানিক হেঁটে, খানিক টেম্পো ভাড়া করে বাড়ি ফিরলাম।

এই একটি দিনের মধ্যে আজকের কলকাতা এবং ব্যাপক অর্থে গোটা পশ্চিম-বাঙলার মোটামুটি একটা ছবি মুদ্রিত আছে।

খবর কাগজের সেই সংবাদগুলো থেকে শুরু করে বাসস্ট্যান্ডে-দেখা সেই ভদ্রলোকটি পর্যন্ত সমস্ত কিছুর ভেতর শুধু বিক্ষোভ, অসন্তোষ, আর হতাশা।

এই একটা দিন শুধু চব্বিশ ঘন্টাতেই শেষ নয়। পুনরাবর্তনের মতন ঘুরে ফিরে একই চেহারা নিয়ে, ঠিক একরকম নয়, আরো জটিল, আরো উত্তেজক হয়ে প্রতিদিন হাজিরা দিচ্ছে।

(দুই)

পশ্চিম বাঙলার আজকের এই চেহারার দিকে তাকাবার আগে কয়েক বছর পিছিয়ে যাওয়া যাক।

আমার জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে; পূর্ব বাঙলায়। তার নিসর্গ, তার ধান-কাউনের ক্ষেত, তার পদ্মা-মেঘনা - ধলেশ্বরী - ইলশা - বুড়ীগঙ্গা - শীতলক্ষা, তার রুপো-দিয়ে-গড়া অফুরন্ত মাছ, সারি-জারির ভাটিয়ালি রয়ানি, তার মহত্ব, তার সরলতা, হৃদয়-ধর্ম, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি-বন্ধন, তার মাধুর্য মিলিয়ে পূর্ব-বঙ্গ সেদিন এক স্বর্গ। সেই স্বর্গের ছবি আমি আমার উপন্যাস 'কেয়া পাতার নৌকো'য় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি।

একদিন সেই স্নিগ্ধ সুশ্যামা বসুন্ধরায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া পড়ল বাঙলাদেশের পক্ষে সেই বোধহয় প্রথম বৃহৎ আঘাত। মনুষ্যত্বের সংকট সেদিন থেকেই বুঝি শুরু। কয়েকটা বছরের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সরল নিষ্পাপ মানুষগুলো রাতারাতি চোর, অসৎ এবং কুটিল হয়ে উঠল। কালোবাজারিতে দেশ ছেয়ে গেল।

যুদ্ধের হাত ধরে একে একে এল দুর্ভিক্ষ, মহামারী। এই সুজলা, সুফলা, শস্যে-স্বর্ণে পরিপূর্ণ দেশে হাজার হাজার মানুষ মাছির মতন মরল। তার কিছুদিন পর এল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সারা দেশ রক্তের নদী হয়ে দুলতে লাগল। তারপর দেশ-জোড়া রক্তাক্ত সূতিকাগারে জন্ম হল একটি বিশেষ দিনের যার নাম পনেরই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ। খণ্ডিত দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

দেশ ভাগ করে ভাবা গিয়েছিল, অতঃপর একটি সর্বরোগহর বটিকা পাওয়া গেছে। কিন্তু কিছুই হল না; সমস্যা নামে সেই বরফের বলটি, যত দিন যেতে লাগল গড়াতে গড়াতে, ক্রমশ আরো আরো বড় হতে লাগল। একদিন লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্ত এপারে চলে এলাম। দেশভাগের বাইশ

তেইশ বছর পরও উম্বাস্তু আসা বন্ধ হল কই? আজও তারা আসছেই, আসছেই। হয়তো অনন্তকাল ধরে আসতেই থাকবে। আজকের পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপদে থাকবার মতন রক্ষাকবচ তাদের কেউ দিতে পারেনি। অথচ তাদেরই জীবনের দানে দেশের স্বাধীনতা এসেছে। তাদের কথা মনে রাখার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। কিন্তু দেশভাগের সময় কী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, নেতারা হয়তো ভুলে গেছেন; বিস্মৃতির অনেক সুবিধে।

পশ্চিম বাঙলায় জমি আর কতটুকু? তেত্রিশ হাজার বর্গমাইলের এই ভূখণ্ডে এ বঙ্গের অধিবাসীরা তো আগে থেকেই ছিল; তার ওপর কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর ভার পড়ল। তাছাড়া অন্যান্য প্রদেশের কয়েক লক্ষ মানুষ তো আছেই। বিহার, উত্তর-প্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশের গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে রোজ কয়েক শ করে লোক আসছে।

পশ্চিম বাঙলায় জমি আর জন-সংখ্যার মাঝখানে দুস্তর ফারাক। তার ওপর রয়েছে ভূমি-সমস্যা। 'জমিদারি বিলোপ বিল' কবেই পাশ হয়ে গেছে। কাগজে-কলমে জমিদারি নেই, কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে লক্ষ লক্ষ একর জমি বেনামী করে রাখা হয়েছে। মান্ধাতার আমলের কৃষি-ব্যবস্থা, ভূমি বন্টনের মধ্যে ত্রুটি—সব মিলিয়ে এ রাজ্যের ভাঁড়ার চিরদিনই বাড়ন্ত। তার একমাত্র বাঁচবার উপায় ছিল শিল্পের দৌলতে। কিন্তু সে পথেও অসংখ্য কাঁটা।

ভারতবর্ষের সবক'টি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হয় বোম্বাই নতুবা দিল্লীতে। কল-কারখানায় যারা লগ্নি করে তেমন একটি সংস্থাও কলকাতায় নেই। কলকাতায় কেন, পূর্ব ভারতেই নেই। ফলে পশ্চিম ভারতের দাক্ষিণাত্যে এবং আর্যাবর্তে মূলধন উজাড় করে দেবার পর পশ্চিম বাঙলার বরাতে যে ছিটেফোঁটা জোটে সমস্যার তুলনায় তা কিছুই নয়।

তা ছাড়া আছে কেন্দ্রের লাইসেন্সিং নীতি। চাইবার আগেই মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানা কি পাঞ্জাব যেখানে ঢালাও লাইসেন্স পেয়ে যায়, সেখানে হাজার আবেদন-নিবেদনেও পশ্চিমবঙ্গ পাষাণসম কঠিন হৃদয় গলাতে পারে না। মহারাষ্ট্রের থানা অঞ্চল এই ক' বছরে শত-শত নতুন কল-কারখানায় ভরে গেছে। কিন্তু দুর্গাপুরের মতন এমন সম্ভাবনাপূর্ণ জায়গায় অসংখ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লটে এখন আগাছা জন্মাচ্ছে। তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের কোন কোন কার্যকলাপ এ-রাজ্যে শিল্পের বিকাশে কিছু বাধা সৃষ্টি করছে।

স্বাধীনতার আগে এবং কিছু পরেও পশ্চিম বাঙলা ছিল শিল্প-সমৃদ্ধ ধনী রাজ্য। দেশের শতকরা পঁচিশ ভাগ শিল্পজাত সামগ্রী এখানে উৎপন্ন হত। এখন সেই স্থানটি দখল করেছে মহারাষ্ট্র। পশ্চিম-বঙ্গের উৎপাদন এখন শতকরা চৌদ্দ ভাগ। তিন-তিনটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে; চতুর্থটি শুরু হতে চলেছে। পশ্চিম বাঙলা শুধু নীচের দিকে নামছেই, নামছেই। এভাবে নামতে থাকলে একদিন আমরা নিঃসংশয়ে সবার পেছনে চলে যাব।

শুনতে পাই, পশ্চিম বাঙলার পাট আর চা থেকে সব চাইতে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আসে। এ-রাজ্য আয়কর এবং বিক্রয়কর হিসেবেও কোটি কোটি টাকা দিয়ে আসছে। কিন্তু সেই টাকার কতটুকু অংশ এ-রাজ্যের কল্যাণে খরচ করা হচ্ছে? পশ্চিম বাঙলার টাকায় দিল্লীর রাজপথ আরো মসৃণ হচ্ছে, বোম্বাইয়ের জলুষ আরো বাড়ছে। আর এই প্রদেশ? চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

প্রতি বছর হাজার হাজার যুবক ইউনিভার্সিটি থেকে, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে অসংখ্য টেকনিক্যাল আর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে আসছে। সেই তুলনায় কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা কতটুকু? জের টানার মতন পুরনো বেকারদের হিসেবের সঙ্গে নতুন বেকারের সংখ্যা বছরের পর বছর যুক্ত হয়েই চলেছে।

এ তো গেল শিক্ষিত বেকারদের কথা। এরপর আছে অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার। তাদের সংখ্যা কত, কে বলবে?

এ-রাজ্যের কোন্ সমস্যাটা মিটেছে? আজও হাজার হাজার উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পশুর জীবনযাপন করে চলেছে। আজও দিন-মজুর সেই দিনমজুরই থেকে গেছে। এই সেদিনও সাড়ে চার টাকা করে কিলো চাল কিনতে হয়েছে লোককে। বন্ধ-হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকের আত্মহত্যার খবর তো প্রায়ই শোনা যায়। দিনের পর দিন কলকাতার রাস্তায় হকার, ভিখিরি আর গণিকা বেড়েই চলেছে। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ দ্রুত এখানে কমে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর এই বাইশ-তেইশ বছরে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ভাবা যায় না। নিদারুণ এই দুঃসময়ে মানুষের মনে শুধু হতাশা, বিক্ষোভ আর চূড়ান্ত ফ্রাস্ট্রেশন। প্রথমেই যে দিনটির ছবি এঁকেছি, সেই দিনটা আরো কতকাল যে আসতে থাকবে, কে জানে। মানুষের ক্রোধ, বিক্ষোভ এবং হতাশা ধীরে ধীরে বিস্ফোরণে পরিণত হচ্ছে কি? আমার মনে হয়, সারা পশ্চিম বাঙলা জুড়ে মশাল হাতে কেউ যেন ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটাবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে।

পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য আর বিক্ষোভের এই ঊষর মরু থেকে পশ্চিম বাংলাকে কে আশাবাদের শ্যামল তীরে পৌঁছে দেবে? কার হাতে সেই সঞ্জীবনী? জানি না, জানি না।

।। তিন ।।

আমার এক লেখক বন্ধু সেদিন বলছিলেন, 'এইরকম একটা এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত সময় নিয়ে লেখা যায় না। আমি বাপু, দরজা-জানালা বন্ধ করে নিজেকে নিয়েই লিখে যাচ্ছি। তুমিও তাই কর।'

কথাটা ভেবে দেখা দরকার। দরজা-জানলা বন্ধ করলেই কি বাইরের ঝড় থেকে রক্ষা পাব? চারদিকে যদি আগুন লাগে নিজেকে বাঁচাবার মতন 'সেফটি ভল্ট' আমার কোথায়?

বেঁচে থাকার জন্য এই সমাজ থেকে প্রতিদিন মাশুল গুনে নিচ্ছি অথচ তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে থাকব? আমি যখন এ সমাজেই আছি, আমৃত্যু থাকতেও হবে, তখন তার কথা না লিখে আমার মুক্তি নেই। তার কথা না লিখলে নিজেকেই তো অস্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয় পৃথিবী

শান্তি পাল
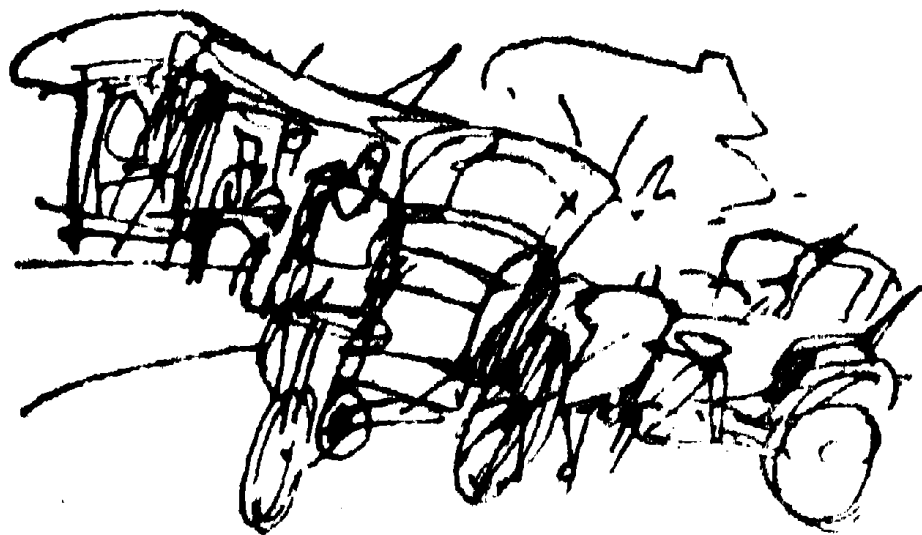
বড় রাস্তা থেকে প্রথম বাঁক ঘুরেই গলিটা যেখানে হঠাৎ সরু হয়ে এসেছে, ঠিক সেই মুখে রমেনের সদর। রমেনের সদরের দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে পরিমল হতাশ হল। দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝোলান। যেন ঠোঁটে-আঙুল-চুপ-এর নির্দেশ। অতঃপর সব উৎসাহের এখানেই শেষ হয়ে পরিমলের চলার ভঙ্গি শিথিল হল। সম্ভবত ওরা আজ দেশে গেছে। দেশ বলতে অবশ্য নখের মত এক-ফালি জমি আর ভাঙা ভিটে। তাই জুড়ে পাহারা দিচ্ছে ওদের বুড়ো পিশে আর পিশি। কি আর পায় জমি থেকে, গোটা-কত আম জামরুল আর কলা বৎসরান্তে। যাই হোক, আজ আর মোটকথা কনকের সঙ্গে দেখা হল না। অথচ কালও কথা হয়েছে কনকের সঙ্গে। ও একবারো বলেনি আজ ওরা থাকছে না। আসলে এসব ওর খেলা। কথা নিয়ে আচরণ নিয়ে। কনক খেলতে ভালবাসে। খেলাতেও।

যাক গে। পরিমল অপেক্ষাকৃত দ্রুত-পথ শেষ করার চেষ্টা করল। ক্রমশ গলিটা এত অপ্রশস্ত হয়ে এসেছে যে একজন মানুষও চলতে গেলে দু-পাশের নোংরা দেয়ালে কাঁধ প্রায় ঠেকে যায়। জামা-কাপড় বাঁচিয়ে পা ফেলতে ফেলতে দূরে রকে বসা অনন্তকে দেখল পরিমল। অনিঃশেষিত সিগারেটটা অনিচ্ছায় ছুঁড়ে ফেলে বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল। পৃথিবীর তাবৎ নোংরা বস্তুর প্রতি অস্ফুটে কটূক্তি করল। এরকম ভাগাড়েও মানুষ থাকে, খায় দায় বাঁচে। এমনি ধোঁয়া আর জঞ্জালের মধ্যে থেকেও। সিনেমা থিয়েটার দেখে। ভাবতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে পানের রঙের মত আলতো হাসি এল। কার কথা ভাবছে, সে নিজেও তো এহেন গলিরই বাসিন্দা। একেবারে মাঝ বরাবর। এপাশ বা ও পাশের কোন বড় রাস্তারই নাগাল পাওয়া যায় না তার সুস্থ নিশ্বাস নেওয়ার জন্য। এরি মধ্যে সেও দিনের পর দিন যায়, আনন্দ বেদনা ব্যর্থতায় মিশ্রিত দিনগুলিকে ক্রমাগত বহন করে নিয়ে যায়।

এসব কথা যে পরিমল ঠিক সংবদ্ধ-ভাবে ভাবতে পারছিল তা নয়। কেবল এই ধরনের মানসিক অবস্থার একটা উপলব্ধি তার চেতনায় [illegible] খেলা করছিল। বস্তুত মাথার ওপর মধ্যাহ্নের রোদ এবং শূন্যপ্রায় জঠর নিয়ে কোন চিন্তাই তার মনে স্থির হতে পারছিল না। এসময় অনন্ত স্যাকরা দূর থেকে ওর আবছা হাসির সম্যক অর্থ না বুঝে নিজেও পরিচিতির হাসি মুখে ফোটাল।

দুপুরের মাঝখান থেকে শরতের হালকা হাওয়াতেও উষ্ণতা ভেসে বেড়ায়। দুপাশের ঘরবাড়ির ছাদ কার্ণিশ দেয়াল পাঁচিলে হলুদ রোদের পর্দা বিছানো। প্রয়োজনীয় বাতাস না খেলার জন্য গলির আবহাওয়া গুমোট হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ইতস্তত স্তূপাকৃতি জমানো ময়লা থেকে ভ্যাপসা গন্ধ ছড়ায়। স্কুলে-না-যাওয়া কটি ছেলে হৈচৈ করে আনাচ-কানাচে লুকোচুরি খেলছে। দু-একটি উদাস কাকের ডাক মধ্যাহ্নের বার্তা বয়ে আনে। এখন মানুষজন এড়িয়ে যেতেই চাইছিল পরিমল। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত শরীরে

খুব দ্রুতই বাসায় ফিরতে চাইছিল। কিন্তু অনন্তকে একেবারে চোখের ওপর দেখে একটুক্ষণ না দাঁড়িয়ে পারল না। ময়লা গেঞ্জী আর চেককাটা লুঙ্গি পরে রাস্তার ধারের খুপরি ঘরটার রোয়াকে বসেছিল অনন্ত স্যাকরা। নামেই স্যাকরা। আসলে কাজ ঘুচে গেছে কবে। তখনো গরীব ছিল অনন্ত এখনো তাই, তবে নিজের ব্যবসা উঠে গেলেও কি করে আজো ঠিক সংসারটাকে টিঁকিয়ে রেখেছে ভাবলে খুব রহস্য মনে হয়। রুজি বন্ধ হতে ঘার ভিখিরি হবার কথা সে একদিনো কারো কাছে হাত পাতল না। অথচ এই ক'র কত লোকের সংসার ভেসে গেল, আত্ম-হত্যা করে মরল। যাকগে। এসব এখন। পরিমল অনন্তর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অল্প হাসল সৌজন্যের মত করে।

—ইস্কুলের ছুটি হল? বিড়িতে সুখ টান দিয়ে অনন্ত জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। শনিবার বলে আজ দুপুরেই ছুটি। খেয়েদেয়ে জিরোচ্ছ বুঝি অনন্তদা?

—হ্যাঁ, জিরোতে কি দেয়। হাত উল্টে ভঙ্গি করল অনন্ত। রাতদিন শালার সংসারের কচকচিতে কানফান ঝালাপালা হয়ে গেল। বেঁচে থাকাটাই যেন অসহ্য হয়েছে আমার।

নির্ঘাৎ আজ ঘরে কলহ হয়েছে অনন্তর। ঘরভরা ছেলেপুলে, প্রচণ্ডা স্ত্রী, অনন্ত শান্তি পাবে কোত্থেকে। রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে দূরের দিকে চেয়ে রইল পরিমল অন্য-মনস্কভাবে।

—তোমরা ভাই বেশ আছ, অনন্ত দুঃখে করার মতন বলে উঠল, বে-থা করলে না। রোজগার করলে, দুটো মুখে দিলে, বাস, ফুরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনন্তর বক্‌নি শুনতে ভাল লাগছিল না পরিমলের, ভরা পেটে বসে অনেক পাঁচালী পড়তে পারবে এখন অনন্ত, কিন্তু পরিমলের আপাতত দেহ শুষ্ক ক্ষুধাতুর। পরিমল তাড়াতাড়ি বলল,

—আছে বইকি, অনন্তদা এই তো বাড়ি ফিরে দুটো মুখে দিয়েই আবার এতখানি পথ ভেঙে ছুটতে হবে সেই টিউশনিতে। যে যেমনই হোক, কষ্ট করেই সবাইকে বাঁচতে হয়। বুঝেছ তো। চলি এবার, কেমন।

—আর হ্যাঁ হ্যাঁ, রহস্যের মত করে চোখ কুঁচকে বলে উঠল অনন্ত, তোমার সেই গাঙ্গুলীবাড়ির কি খবর হে।

—ওই একরকম। পরিমল কোনরকমে পরিত্রাণ পেতে চাইল, এক এক সময় তেমন মেজাজ থাকলে গাঙ্গুলীবাড়ির কথা নিয়ে বেশ জমিয়ে পাড়ার খাতিরের লোকদের সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু এখন তা' সময় নয়, নিজের ওপরই এখন বিরক্তি ধরছিল তার।

—চললুম অনন্তদা। কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল সে।

গলির এ জায়গাটায় কিছু টিনের চাল দেওয়া বস্তি। কিছু পাকা বাড়ি, একতলা কি দোতলা। বাড়িগুলির মধ্যে একটির একতলায় পরিমলদের বাসা। দুখানি ছোট ঘর। চাতালে চট আড়াল দিয়ে রান্না, খুপসি অন্ধকার কলতলা। শ্যাওলা সমাচ্ছন্ন উঠোন। ঘর এমন স্যাঁত-সেঁতে যে তাকের ওপর বই রাখলে ধীরে ধীরে ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে যায়। এই বাসার জন্যই মাসে পঞ্চাশ টাকা করে গুনে দিতে হয়। এহেন মূল্যবান বাস-স্থানেই অতএব যথাযোগ্য সমারোহের সঙ্গে চলে পরিমলের সংসার। সংসার পরিমলের নয়। তার দাদা বৌদির। পরিমল তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ছিল ভাগ্যিস। নাহলে এই সাময়িক কর্মক্লান্ত দ্বিপ্রহরে আহার বিশ্রামের জন্য কার দোরে ছুটত এখন।

নীচু জীর্ণ সদর দিয়ে ঢুকলেই একটা ঠাণ্ডাভাব পাওয়া যায়। জামা-গেঞ্জী খুলে পরিমল উঠোনের ওপর ফালি রোয়াকে বসল। গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘাম শুকোবার চেষ্টা করল। বড় ভাইঝি মিতুকে কলতলা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে পরিমল বলে উঠল।

—আজ কি গরম দেখেছিস। আশ্বিনের অর্ধেক দিন হল, তবুও গুমোট।

—হ্যাঁ, মিতু সায় দিল, তুমি তাড়া-তাড়ি চান করে নাও। চৌবাচ্চায় বেশী জল নেই।

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গামছায় মাথা মুছছিল মিতু। মিতুর চুলটা অনেক লম্বা হয়েছে, ছোটবেলায় থোপা থোপা হয়ে ঘাড়ের কাছে দুলত। এখন মিতুর বয়স ও শরীরের সঙ্গে মানানসই ধরনের দীর্ঘ সুঠাম চুল ওকে আলাদা একটা কমনীয়তা দিয়েছে। বস্তুত মিতু এবং মিতর চুল কতটা বড় হয়েছে আজই প্রথম যেন তা লক্ষ করল পরিমল। দাদার এই মেয়েটিকে সে সবচেয়ে ভালবাসে নম্র সভ্য স্বভাবের জন্য। অন্যান্য ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে তেমন হৃদ্যতা নেই পরিমলের। আসলে ওদের মায়ের শিক্ষা ও শাসনের অভাবে ওরা অবাধ্য হয়ে উঠছে বলে।

অনেক উঁচুতে মাঝবেলার রোদ সোনা-রঙ হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, বাতাসে ঈষৎ উষ্ণতার ঝাঁঝ। দূরাগত চিলের তীক্ষ্ম ডাকে দুপুর নিঝুম লাগে। পরিষ্কার আকাশে বিচ্ছিন্ন সাদা মেঘেদের শূন্যে দুলন্ত মনে হয়। হাতপা টানটান করে শরীরের আলস্য ছাড়াল পরিমল। চৌবাচ্চার নীচে থিতিয়ে থাকা জলে সংক্ষিপ্ত স্নান সেরে নিল। তারপর কলতলা থেকে বেরিয়ে এসে বলল,

—বৌদির আজ সাড়াশব্দ নেই যে, কি ব্যাপার।

—গলার জোর কমে আসছে যে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সরযূ বাইরে এল। সংসারের চাপে হাঁপ ছাড়তে পারছি না।

—আমি কিন্তু খেয়েই বেরোব খুকু। ওদের আজ বিকেলে কি প্রোগ্রাম আছে, সিনেমাটিনেমা যাবে বোধহয় সব, দুপুর-বেলাই পড়িয়ে আসতে বলেছে। পরিমল খুব তাড়াতাড়ি মাথা মুছে গেঞ্জী পরছিল।

—বেশ আছে, কিন্তু গাঙ্গুলীরা। সরযূ চোখ আচ্ছন্ন করে ঈষৎ বিস্তৃত ঠোঁটের ফাঁকে কথাগুলি উচ্চারণ করল। কেমন রাজার হালে খাচ্ছেটাচ্ছে—স্ফূর্তি আমোদ করছে, ওসব লোক তপস্যা করে আসে, জানো।

মিতু এতক্ষণে মাথা আঁচড়ে বাইরে এসেছিল। হেসে ফেলে বলল,

—কাকাকে খেতে দেবে, না দাঁড়িয়ে বকবক করবে?

—দিই। সরযূ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, একমিনিট কি বিশ্রাম আছে, এক-গ্লাস জল পর্যন্ত খেতে সময় নেই। সরযূর গলায় আক্ষেপ কাঁপছিল।

আসলে সরযূর কাজকর্ম কথা সব-কিছুতেই একটু ঢিমে তাল। নিজের মন্থরতার জন্য সরযূ কাজ নিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। আজকাল মিতু বড় হওয়ায় মাকে তাড়া দিয়ে থাকে।

পরিমল খেতে বসে কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল। শনিবার দুপুরের ভাতটা সে স্কুল ছুটির পর বাড়িতে এসেই খায়। তার জন্য বেলাও হয় বেশ খানিকটা। পুরনো হাত-ঘড়িটায় সওয়া দুটো বাজতে দেখে পরিমল খুব তাড়াতাড়ি করছিল। খেয়ে উঠে এতটা পথ এখুনি হনহন করে ছুটতে হবে ভেবে মনে মনে খুব বিরক্তি বোধ করছিল। মিসেস গাঙ্গুলীর এত বয়সেও হৈচৈ করার সময় গেল না। এদিকে আবার একদিন মাস্টার কামাই করলে ছেলে স্কুলের পড়া তৈরী করবে না। সন্ধেবেলার বন্ধুবান্ধব ছেলেমেয়ের হুল্লোড় পার্টিতে মন খুঁতখুঁত করবে মিসেস গাঙ্গুলীর। কি করে যে একজন সংসারের কর্ত্রী প্রায়শই এরকম আমোদ-আহ্লাদে গা ঢেলে দিয়ে থাকে কে জানে। থাকবে না-ই-বা কেন, মনকে বোঝাল পরিমল। অভাব কি আছে আর কাজই বা কি। ভারী পর্দাটানা ঘরের ভেতর গানবাজনা খাওয়া-দাওয়া অথবা হুহু করে ছুটে চলা মোটরে পথ পরিক্রমা অথবা ছবিঘরের নিশ্ছিদ্র শীতল আরাম। এছাড়া গাঙ্গুলীগিন্নির জীবনে তার কিছু নেই। সমস্ত পরিমণ্ডলটা শূন্য ফাঁকা। ছেলেমেয়ে স্বামী কারোর ওপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ চলে না, যে যার নিজের পথে। পারিবারিক বন্ধনটা এখন কেবল সম্পর্ক আর সৌজন্যের সুতোয় ঝুলছে। মনের কাছে আঁকড়ে ধরায় মত আর কি আছে মিসেস গাঙ্গুলীর?

—এবার রেশনের দাম আরো বেড়ে গেল, বুঝলে? পরিমলের পাতে হাতায় করে ঝোল তুলে দিতে দিতে সরযূ বলল।

—হু, জানতুম বাড়বে। পরিমল আনমনা উত্তর দিল।

—সমস্ত জিনিসের দামই তো আগুনে হয়ে যাচ্ছে।

—পয়সার দাম কমে গেলে এরকম হয়।

—দিন দিন এমনি হলে কি করা যায় বলত। পরিমলের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল সরযূ, বেশ রীতিমত একটা আলোচনা শুরু করার ভঙ্গিতে। পরিমলের আগ্রহশূন্য মুখের দিকে তাকাল।

পরিমলের দেরী হয়ে যাচ্ছে, গোগ্রাসে থালার ভাতকটি শেষ করতে করতে বলল,

—তুমি আর কি করবে। মানুষের দুর্দশা ক্রমশ বাড়বে, এতো জানা কথা।

—তোমরা তো বলেই খালাস। সরযূর গলা হঠাৎ একটু উষ্ণ হয়ে উঠল। যেমন তুমি হয়েছ তেমনি তোমার দাদা। হাত-পা ছেড়ে বসে আছ সব।

পরিমল এতক্ষণে মনোযোগ দিয়ে ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে তাকাল। সরযূর সঙ্গে কথাবার্তার সুর থেকেই আজ কিসের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। সরযূ ঈষৎ বেগের সঙ্গে একপাশে মুখ ঘুরিয়ে গিয়ে বলল,—

থাকো সব রাস্তায় রাস্তায়, সংসারে কি দিয়ে কি হয় তা তো কেউ চেয়ে দ্যাখো না। এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা ধাড়ি সবার খোরাক জোগাতে হয় আমাকে, সে বিষয়ে তো কারোর ত্রুটি সইবে না; কে জানে, এবার আমাকেই হয়ত রোজকার করতে পথে বেরোতে হবে।

একনিশ্বাসে জলের গ্লাসটা শেষ করে ফেলল পরিমল। কমুহূর্ত ঝিম মেরে রইল। অর্থাৎ সরযূর কথায় কি উত্তর দেবে কিছুই ভেবে পেল না। আসলে এসব কথা শুধু নিরুপায়তায় আঘাত করা ছাড়া আর কিছুই না। সরযূ কি বলতে চাইছে সেটা এখন পরিষ্কার আলোর মতই তার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হচ্ছিল। এবং সেই আলোর প্রখরতা কিছুটা ঝলসাচ্ছিলও তাকে ভেতরে ভেতরে। সম্ভবত সদ্য পেটভরা শরীরে এসব দগ্ধানিগুলো একটু বেশী করেই লাগে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও সরযূর যুক্তিতে জোর থাকায় পরিমলের মুখে এখন কোনরকম প্রতিবাদ বা কলহের কথা এল না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটাকে দ্বিতীয়বার আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের মুখখানা দেখল পরিমল। পান খেয়ে দাঁতগুলোয় কেমন বিশ্রী ছোপ ধরেছে। আগে খেত না। ইদানীং মুখের মধ্যে সবসময় পান থাকলে ভাল লাগে। সিগারেটও জমে ভাল। আসলে বয়স হতে থাকলে একটা একটা করে অবলম্বন মানুষ আঁকড়ে ধরে। অবলম্বন। পরিমলের জীবনে কোন অবলম্বন নেই। বয়স বাড়তে বাড়তে ক্রমশ বুড়ো হয়ে যাবে পরিমল, ভেতর বাইরে কাঠের মত শক্ত হতে থাকবে। একফোঁটা জল সিঞ্চনে সরস করার কেউ থাকবে না। ভাইপো ভাইঝি? যতই করো না, সব ডানা গজালেই মুখে পাখার ঝাপটানি মেরে উড়ে যাবে। মিতু খাচ্ছিল তখনও বসে, পরিমলের দিকে চেয়ে বলল।—কাকু তোমার কানের কাছে কতগুলো পাকাচুল দেখেছ?

দেখেছে পরিমল। শুধু পাকা নয়, চুলের সামনের দিকের প্রশস্ততা কপালের কুঞ্চন, শুকিয়ে আসা গাল, সবই দেখেছে। বয়স কত হল, সাঁইত্রিশ? সাঁইত্রিশ এমন কিছু না, তবু গাড়ির স্টিয়ারিং-এর মত শক্তহাতে জীবনটাকে কেবলই মুচড়ে মুচড়ে একমুখী নির্বিকার চালাতে থাকলে এরকমই হয়। জীবনকে শুধু আঁকড়ে রাখার প্রচেষ্টায় কালাতিপাত করতে করতে পরিমল হৃদপিণ্ডের সমস্ত রক্তকে শীতল করে ফেলেছে, এছাড়া উপায় নেই, কিছু করার নেই। মনের ভাব ঝেড়ে ফেলে একটু লঘু করে হাসল সে।

—পাকবে না। জামাই আসার সময় হল যে।

—ধুৎ, তোমার খালি বাজে কথা।

অন্যদিন হলে সরযূও এসব কথায় যোগ দিত, হয়ত নানারকম প্রস্তাবের সূত্রপাত করত। কিন্তু আজ সে নীরবে রইল। একপাশে কাত হয়ে ছোট আয়নার মধ্য দিয়ে সরযূকে দেখল পরিমল। অন্যমনস্ক হবার ভান করছে সরযূ। পরিমলও আর ঘাঁটাল না ওকে। সরযূর খোলামেলা মুখকে একটু ভয়ই করে সে। জামাটা গায় দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল পরিমল। যেতে যেতে ভাবল, বেরোবার মুখেও আর কনকের সঙ্গে দেখা হবে না। দুটো উজ্জ্বল কালো চোখের আলতো কোমল ছোঁয়া মুখে মেখে নিয়ে কাজে যাওয়া হবে না আজ।

পরিমলকে ঢুকতে দেখেই মিসেস গাঙ্গুলী বারান্দা থেকে নেমে এলেন যেন ওরই জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। পরিমল একটু বিস্মিত হল। বাড়ির সামনেটা একটু কাবো জমি, ছোটখাট কটি গাছ লাগান। মাঝখানে ছোট পথ গেট পর্যন্ত। একপাশে গ্যারাজ। গাড়িখান এমন কিছু নয়, সাধারন এ্যামবাসাডর তবু এরই জন্য গাঙ্গুলীপরিবার অংশত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কর্তার অফিস, মেয়ের কলেজ, ছেলের টুকিটাকি ব্যবসা আর গিন্নীর আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি, সবকিছুই এই মোটরের চাকায় মসৃণভাবে চলে যায়।

শেষ বেলার তামাটে রোদের আভা হাওয়ার সঙ্গে মিশে মিসেস গাঙ্গুলীর সজ্জিত মুখ ও শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল। একবার চোখ তুলে দেখে মাথা নামাল পরিমল ও'র সামনাসামনি।

আমার সঙ্গে যাবে একটু, বিনা ভূমিকায় উনি বললেন, সামান্য অনুরোধের সুরে, আমার ড্রাইভার আসেনি আজ। ট্যাক্সিতে একা যেতে সাহস হয় না।

—চলুন, কোথায় যাবেন। পরিমল মাথা নীচু করেই উত্তর দিল।

—বিশেষ দরকার পড়ে গেল, এখনই না গেলে নয়, মিসেস গাঙ্গুলী অপ্রয়োজনেই বললেন। চাকরকে পাঠিয়েছি ট্যাক্সির জন্য।

মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে যেতে একটু অস্বস্তি বোধ করলেও সেটাকে আমল দিল না পরিমল। অনেকদিন পড়াতে পড়াতে ওদের সঙ্গে খানিকটা আপনার মতন হয়ে গেছে পরিমল। কখনো প্রয়োজনে ওদের সাংসারিক কাজেও সামিল হতে হয়, তেমনি আবার উৎসবে-উপলক্ষে।

এ সময় রাস্তায় ভীড় কম থাকে। সামনের উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে কোণাকুণি প্রতিফলিত মিসেস গাঙ্গুলীর মুখ দেখতে পাচ্ছিল পরিমল। খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল তাঁকে। এমনি ফিটফাট মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাকে দেখতে বেশ সুন্দরী মনে হয়। অভিজাত পরিবারের মেয়ে, পড়াশোনা জানেন। সাদার ওপর বুটিতোলা শাড়িতে, দামী ফ্রেমের চশমায়, রঙের ওপর উড়ন্ত খুচরো চুলে আপাতত ও'কে এত বড় বড় ছেলেমেয়ের মা বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। মেজাজ ভাল থাকলে লোকের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেন। অন্তত পরিমল ও'র বেশ স্নেহের পাত্র।

—পরিমল। কি যেন ভাবতে ভাবতে মৃদু গলায় ডাকলেন।

—বলুন। পরিমল নম্র সুরে উত্তর দিল।

—তুমি খোকার সঙ্গে মাঝে মাঝে বেরোও, না? একটু ইতস্তত করে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন। পরিমল একটু সতর্ক হয়ে ক' সেকেন্ড থেমে থেমে বলল, মাঝে মাঝে তো না। অনেকদিন আগে দু-একবার ও'র এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন চাকরীর জন্য।

চুপ করে গেলেন মিসেস গাঙ্গুলী। উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে দূরমনস্ক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন পরিমলের মত মানুষ, সামান্য এক গৃহশিক্ষকেরও মনে মায়া আসে ও'র জন্যে। সংসারে উনিই সব, দায়িত্ব সবই ও'র, অথচ সর্বদা কেমন অপাংক্তেয় হয়ে থাকেন। স্বামীকে নাগালে পাওয়া যায় না, নিজের উচ্চতর চাকরী এবং নিজের চেয়ে উচ্চতম স্তরের মানুষদের নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। ছেলেমেয়েদের মনের হদিশ জানা নেই। বড় ছেলেটি সম্বন্ধে নানারকম গুজব কানে আসে; কিছু করার নেই। খোঁজ নিতে গেলে পাত্তা দেবে না। অগত্যা পরিমলের কাছেই উদ্বিগ্ন মায়ের মন ধর্ণা দিতে এসেছিল। কিন্তু পরিমলও বেতনভুক শিক্ষক মাত্র। নিজের দিকটা সেও বজায় রাখবে। একজনের মন রাখতে গিয়ে অপরের কথা ফাঁস করে দেওয়ার অর্থই তার বিরাগভাজন হওয়া, অর্থাৎ চাকরী নিয়ে টানাটানি। ওসবে নেই পরিমল। পরিমল কারো ঝামেলায় থাকবে না।
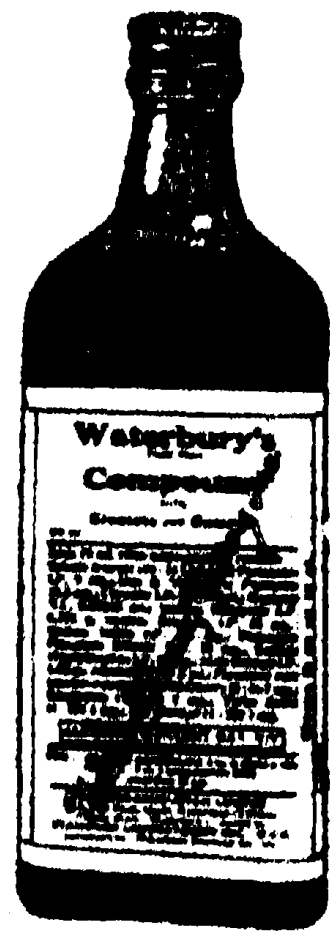
—ব্যাধো, কিছুক্ষণ চিন্তা করতে করতে মিসেস গাঙ্গুলী বলে উঠলেন, আজ সোমারও কলেজ থেকে ফিরতে খুব অসুবিধে হবে, তাই না?

তাই নাকি, কেন আপনার মেয়ে কি এতটুকু খুকু, যে পথঘাট কিছু চিনবে না, মনে মনে বলল পরিমল, একদিন গাড়ি না থাকলে ট্রামবাসে আসতে কি গায়ে ফোস্কা পড়ে। মুখে কোন সাড়া দিল না পরিমল, চোখ নীচু করে নিজের সিগারেটের ছোপধরা আঙ্গুলে লুকোল।

—আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি এই ট্যাক্সিটা নিয়েই একবার যাবে?

—আমি, মানে ও'র কলেজে? চকিত বিস্ময়ে বলল পরিমল, কথাটা শুনেই যেন ওর অপ্রস্তুত মনে হচ্ছিল।

—হ্যাঁ, ও তো জানবে না, হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে, বাসট্রামে একা আসতে অসুবিধে হবে শেষে। তুমি শুধু ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে যেও।

মিসেস গাঙ্গুলীর কথাগুলি অনুরোধের মত শোনাল। ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করলেও কিছু বলতে পারল না পরিমল। সামান্য সময় ও'র দৃষ্টিটা নিজের নত মুখের ওপর অনুভব করল। মিসেস গাঙ্গুলী হাতের ব্যাগ খুলেছিলেন, বললেন,

—ট্যাক্সির ভাড়াটা তোমার কাছে রেখে দাও কেমন?

ট্রাফিকের লাল আলোর সামনে গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে মিসেস গাঙ্গুলী উসখুস করে উঠলেন,

—সাড়ে তিনটের আগেই তুমি ওর কলেজের কাছে পৌঁছতে পারবে, তাই না?

পরিমল ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল। সামনের আয়নার দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে ও'র মুখের ভাব অনুধাবন করতে চাইল। রাস্তায় এত লোক দোকান ফেরিওলা যানবাহন, কিছুতেই ও'র মন যেন সম্পৃক্ত হতে পারছিল না। এক ধরনের মানসিক অস্থৈর্যে উনি কাতর হচ্ছেন বোঝা গেল। যাকগে, পরিমল ভাবল, ও'দের হতাশা চিন্তা সমস্যা সবকিছু নিয়ে গবেষণা অন্তত তার নিজের পক্ষে অবশ্যকরণীয় না।

সোমা কলেজের গেট থেকে বেরিয়েই অতিরিক্ত চমকাল। ট্যাক্সির মধ্যে অনড় একটা অস্তিত্বের মত পরিমলকে বসে থাকতে দেখে। ভ্রূতে সামান্য কুঞ্চন তুলে বলে উঠব,

—একি, আপনি এখানে যে?

অনেকদিন ওদের বাড়িতে টিউশনি করায় পরিমলের সঙ্গে সোমার কিছুটা মুখের আলাপ ছিল, তাও প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে কথার মাধ্যমে। এভাবে পরিচিত গন্ডীর বাইরে একলা সোমার মুখোমুখি পড়ে পরিমল কিছুটা নার্ভাস বোধ করছিল। ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এসে চোখ দূরে রেখে পরিমল বলল,

—আজ আপনাদের ড্রাইভার আসে নি—

—সে তো আমি জানতাম, আসার সময় তো আমি নিজেই চলে এসেছি।

সোমার কথাগুলি কি কারণে যেন ঈষৎ কঠিন ও রূঢ় শোনাচ্ছিল। নিজেকেই যেন অপ্রস্তুত বোধ করছিল পরিমল। মিসেস গাঙ্গুলীর উৎকণ্ঠা তার মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল,

—আপনার মা আমাকে পাঠালেন বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য।

—ওঃ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সম্ভবত ক্রোধ দমন করল সোমা।

পরিমল খুব নিরীহ অনাসক্ত মুখ করে রেখেছিল। দু-একটি কৌতূহলী মেয়ে ওদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল। ক' মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিয়ে এবার বেশ সহজ ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠল সোমা।

পরিমল এবার স্বস্তি বোধ করল। কাউকে চটিয়ে রাখলে সে শান্তি পায় না। বিশেষত যেখানে চাকরির ক্ষেত্র।

পড়ন্ত বেলার রোদ ক্রমশ জ্যোতিহীন হওয়ায় ইতস্তত হলুদ রঙ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে বসে ঝিরঝিরে হাওয়াটা ভাল লাগছিল পরিমলের। চাপাকল থেকে ছড়িয়ে দেওয়া জলে পথ ভিজে থাকার জন্য বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। পিছনের আসনে নিশ্চুপে বসে থাকা সোমার দিক থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনমনে ধাবমান গাড়িতে বসে এসময় পরিমলের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। প্রথমে মিন্টুর বিষয়, তারপর বৌদির সেই চিত্তদাহী ইঙ্গিতগুলি। ভাবতে ভাবতে ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছিল পরিমলের মাথাটা। কিছুটা রাগে, কিছু বা উপায়হীনতায় একটা দুর্বোধ্য গ্লানি ওর শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সরযূর যুক্তি অকাট্য কিনা অথবা সরযূ সংসারের দৈনন্দিনতায় অতিরিক্ত কাতর কিনা এসব পরিমল যেন ইচ্ছে করেই ভাবতে চাইছিল না। আসলে ভেবে লাভও নেই। অর্থাভাবে সরযূর সংসার ভেসে গেলেও পরিমলের পক্ষে আর কিছু করার নেই। সে ভালভাবেই জানে তো, তার দেওয়া খরচ তার একার পক্ষেই মাত্র কোনমতে সংকুলান হওয়া সম্ভব। অথচ পরিমলের তো আর সামর্থ্যও নেই। যদিও সম্ভবত সরযূ একথা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করানোর চেষ্টাও সচেতনভাবে করা যায় না, অতএব প্রায় মাঝে-মাঝেই সরযূর এ ধরনের ইঙ্গিতবহ উক্তি শুনে হজম করতে হবে। সহ্য না করলেও চলে না। হাজার হোক, নিজের লোক। অসুখ-বিসুখ দায়বিপদেও তো ওদেরই দরকার হয়। চারমিনারের ধোঁয়ায় ভাবনাচিন্তা জমাট মাথাটাকে খোলসা করার চেষ্টা করছিল পরিমল, এসময় পেছন থেকে আস্তে করে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে ডাকল সোমা—শুনছেন?

—হ্যাঁ, বলুন, চমক ভেঙে সাড়া দিল পরিমল। একটুক্ষণ কি চিন্তা করে ছাড়া ছাড়া ভাবে সোমা বলল,—আপনাকে একটা কথা বলব।

পরিমল উৎকর্ণ হল। সমস্ত সত্ত্ব সজাগ করে দাঁতে দাঁত চেপে মুখখান কঠিন নির্বিকার করে রইল।

—মা তো আজ বেরিয়েছে, না?

—হ্যাঁ, আমি সঙ্গে এসেছিলাম ও'র। সোমার অপ্রস্তুত গলার স্বরে পরিমল যুগপৎ কৌতুক এবং কৌতূহল বোধ করছিল।

—দেখুন, আজ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এক জায়গায় দেখা করার কথা আছে। সোমার কথার ভঙ্গি এবা খানিকটা হাসি-হাসি ও অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছিল।

—তাই নাকি। পরিমলের মুখের রেখা সামান্য কাঁপল, মিসেস গাঙ্গুলীর উদ্বেগ ও ছটফটানির কথা এবার স্পষ্ট তার মনে পড়ল।

—আপনার কি খানিকটা অপেক্ষা করার সময় হবে? মানে, যদি খু অসুবিধা না থাকে, স্পষ্টতই এবার সোমার সুরে মিনতি ঝরছিল।

উদগ্র হাসি চেপে পরিমল পুরনো ঘড়িশুদ্ধ কব্জিটা তুলল সামনে,

—মিনিট পনেরো সময় হতে পারে।

নিজেকে ক' মুহূর্তের জন্য এই মেয়েটির সময়ের নিয়ামক ভেবে গর্বিত হচ্ছিল পরিমল। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে সম্ভবত ভিতরের ক্ষোভকে দমন করল সোমা, তারপর একটু আত্মগত স্বরে টেনেটেনে বলল,—আচ্ছা, তাই।

সোমা মাথা নীচু করে চিন্তান্বিত থাকায় পরিমল অলক্ষ্যে পেছন দিকে তাকাল একবার। সোমা কিছুটা ক্ষীণাঙ্গী, বেশ একটা ঢলঢলে কমনীয় ভাব আছে। ফাঁপিয়ে বাঁধা রুক্ষ চুলে, হালকা রং ও ডিজাইনের শাড়িতে যথেষ্ট আধুনিকা লাগে সোমাকে। রাস্তাঘাটে সর্বত্রই মেয়েদের দেখে মনে মনে বিচার ব্যাখ্যার দ্বারা ওদের চলতি, সেকেলে আধুনিক বা অত্যাধুনিক রকমফেরজাত একটা বিভাগীয় ধারণা সে করে [illegible]তে পেরেছে। এখন, এই পড়ন্ত বেলার হলুদ আভায় রাঙানো সোমাকে পরিমলের খুবই ভাল লাগছিল। একটা বর্ণালী প্রজাপতির মতন। বুকের স্নায়ুশিরার মধ্যে, প্রায় সমস্ত সত্তার মধ্যেই কেমন একটা ভাললাগার রস চুঁইয়ে নামছিল। পরিমল যে স্তরেরই থাক সে কিছু স্থবির নয়, স্টিয়ারিং-এর চাকার মত ঘুরিয়ে যৌবনকে নিংড়ে না ফেললে— পরিমল প্রায় হাঁপিয়ে পড়ছিল, এই ধরনের সব বোধ তাকে কিরকম পীড়িত করছিল, ভাল লাগছিল না পরিমলের। বারবার সোমার দিকে তাকাবার জন্য চোখ অস্থির হচ্ছিল।

এসব পাপ, পরিমল ভাবল, আমার মনের পাপ। সহজ হবার জন্যে স্পষ্ট করে ফিরে সোমার দিকে তাকাল পরিমল, যেন জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল।

—কোথায় নামবেন আপনি?

(ক্রমশঃ)

নবান্নর পঁচিশ বছর ও নাট্য আন্দোলন

"তিনি তাঁর দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে যে জিবীবিষা আর মৃত্যুভয়ের উত্তপ্ত সত্য তাই যেন হাতুড়ি-নেহাইতে পিটিয়ে গঠন দিলেন নাটকের দৃশ্যপরম্পরায়, অভিনয়ের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বিস্তারের বিবরণ থেকে থেকে উপস্থিত করে—মস্কোতে ঠিক যেমনভাবে থেকে থেকে খবর আসছিল পার্টিসান্ দলের গৌরবান্বিত কীর্তিকলাপের, চাপায়েভ ও তাঁর সেনাবাহিনীর। আবেগের এমন তীব্রতা তড়িৎচালিত হল থিয়েটারের নাটকর্মের মধ্যে দিয়ে যে নাটকটি হয়ে উঠল একটি জীবময় বস্তু, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা লড়াই, যেন নাট্যগৃহে যে দর্শকেরা বসে সেই মানুষদেরই জীবন-মৃত্যু। তাদের কাছে নাট্যাভিনয়ই হয়ে উঠল আশু কাজের উদ্দীপিত ডাক, বক্তৃতারই মতো, হাতে হাতে পুস্তিকা বিলির মতো বা খবরের কাগজের জরুরি সংবাদের মতো......"

কিন্তু ঐ কথাগুলি প্রযুক্ত মস্কোতে মায়ারহোল্ডের থিয়েটার প্রসঙ্গে—বিপ্লবের পরে।

যদি—হ্যাঁ, আমরা বলাবলি করতুম, যদি শুধু অবস্থা ব্যবস্থাটা পাল্টে যেত, নাট্যান্দোলনের অবস্থাও এবং সামাজিক জলবায়ুও! এই মনে হওয়াটাই এক বছর বয়সের ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘের পক্ষে প্রশস্তিলাভ যে আমাদের মনে এই রকম চিন্তা এল, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ে ব'সে ব'সে, নোংরা ছোট একটা হলের মধ্যে, শোচনীয় একটা মঞ্চের সামনে, তাও অনেক খাতির জমিয়ে গলাকাটা দরে এক সন্ধ্যার জন্যে ভাড়া নিয়ে, চতুর্দিকে আমাদের কলকাতার ব্রিটিশ সামাজিক দীন হীন গ্লানির মধ্যে। পরে নয়, বিপ্লবের অনেক আগেই।

দর্শকদের ভিড়, তাঁদের আবেগোৎসারিত গভীর উদ্দীপনা, পেশাদার থিয়েটারের বৈরিতা, পুনরভিনয়ের জন্যে নানা লোকের নানা জায়গা থেকে তাগাদা—এ সবই প্রমাণ করে বাংলা নাট্যজগতে আমাদের নাট্যসংঘের প্রায়বৈপ্লবিক কৃতিত্ব, বিশেষত সঙ্ঘের এই তৃতীয় নাটক নবান্ন-য়। আমরা আগে কখনও থিয়েটারের শহর কলকাতাতেও দেখি নি শম্ভু মিত্রের মতো এমন স্বাবলম্বী ডিরেকটর ও অভিনেতা-অভিনেত্রী দল, তাঁর মতো অন্তর্দৃষ্টির নিশ্চয়তা, সামগ্রিকতার উপরে এই কর্তৃত্ব, সমস্ত নাট্যপ্রযোজনাটিকে নানা অভাব ও বিপত্তির মধ্যেও এমন সংহতভাবে দেখার ক্ষমতা অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ ছোটখাটো সব কিছুই, এমন কি অভাবত্রুটিকেও নাট্যেরই কাজে লাগাবার প্রতিভা। দেখি নি বিজন ভট্টাচার্যের মতো একাধারে নাটকরচয়িতা

বিষ্ণু দে

তথা-প্রযোজক এবং প্রচণ্ড অভিনেতা। এবং মুখ্যগৌণ অভিনেতা-অভিনেত্রীর কুশীলবও ছিল বিস্তৃত, সবাই স্বেচ্ছাকর্মী কিন্তু আশ্চর্য তাঁদের স্বভাবোৎসারিত সাযুজ্যের যৌথ মেজাজ, যা ব্যবসায়ী থিয়েটারে পাওয়ায় প্রশ্নই ওঠে না।

পুস্তকাকারে নবান্ন-কে বলতে হয় একটি নাটকীয় ইতিবৃত্ত, বাংলার একটা ভয়াবহ নাটকীয়তায় মর্মভেদী সময়ের—১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলন থেকে তেতাল্লিশের শেষ অবধি, অত্যাচার ও তার প্রতিবাদ, এবং তার শাস্তিতে আরো অত্যাচার, জবাবে মাটিতে ফসলে আগুন-লাগালো, খাদ্যাভাব, বন্যা, রোগ, গৃহহীনতা—একটার পরে একটা। এদিকে তখন অনেক স্বাধীন ভূখণ্ডে চলেছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বিরাট সোভিয়েত যুদ্ধ। নাট্যমঞ্চে তাই বইটি হয়ে ওঠে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ একটি গাঢ়বন্ধ একাগ্র প্রতীক—এমনই মাহাত্ম্য আন্তরিক নাট্যপ্রযোজনার, যেখানে শারীরিকতার সংবেদন হয়ে ওঠে দৃশ্য ও শ্রাব্য এক একাধারে মর্মবিদারক ও হৃদয়-তাপসঞ্চারী শিল্পবিন্যাস, বৈপ্লবিক এক শিল্পরূপায়ণ যা আবস্ট্রাক্ট-মন্য মায়ারহোল্ডের প্রশংসা পেত,—আবার অভিনয়ের বাস্তবতার জন্যে পেত স্তানিসলাভস্কিরও তারিফ।

শম্ভু মিত্র সমস্ত রচনাটির মূল সুর বেঁধে দিলেন খুব সরল উপায়ে, সামান্য সাজসরঞ্জামের সাহায্যে এবং বিবিক্ত ইতিবৃত্তটি পেয়ে গেল শিল্পকর্মের সমগ্রতা। একেবারে প্রথম দৃশ্যের চমকপ্রদ বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল মাত্র এবং প্রবল উদ্দীপ্তির মাত্রা দর্শকদের মনের তার চড়া পর্দায় বেঁধে দেয় এবং তখনই মন প্রস্তুত হয়ে যায় সমস্ত নাটকটির বিন্যাসের জন্যে। তারপরে উচ্চগ্রাম ভেঙে পড়ে ঘোর দুর্যোগে আহত এক গাঁয়ের সংসারে। বিজনবাবুর চূড়ান্ত অভিনয়ে আমরা দেখি গর্বিত আবেগে উদ্বেলিত বৃদ্ধ কর্তাকে, দেখি দুটি ভাইপোকে, তাদের তরুণী বৌদের, ক্ষুধার্ত শিশুকে, দেখি আত্মস্থ শান্তমতি গ্রামের মোড়লকে, অভিনয়ার্থে কঠিন চরিত্র কিন্তু শম্ভুবাবুর শক্তিমত্তায় উত্তীর্ণ। সকলেরই মুখের সামনে অনাহার ও গৃহহীনতা, আর চতুর্দিকে মৃত্যু, অপঘাত, অনাচার। থেকে থেকে নেপথ্যে শবযাত্রার চীৎকার প্রযোজনার তীব্রতা ও রূপাঙ্গিক সচেতন চারিত্র্য আরো চড়া করে তোলে। খুবই সঙ্গতভাবে, কারণ নাটকের গঠন একটা জটিলতা, এমন কি উদ্ভ্রান্তিকরতা সমেত বাস্তবজীবনের টাইপ-সত্যের খুঁটিনাটিতে ভর্তি এবং ভাষা ও বাচন প্রাণবন্ত দেশজরীতিতে বিন্যস্ত, রূপায়ণে তীক্ষ্ণ্যায়িত, মাত্রায় উচ্চকিত এবং তা মোটেই ক্যারিকেচারের অতিশয়োক্তিতে নয়, আবেগের প্রাবল্যে আপাতশিথিল কাঠামোর সঙ্গে এক সুরে অঙ্গীভূত। তাই প্রথাসিদ্ধ বা টিপিকল সুদখোর উপস্থিত যে কোনো টাটকা জমির দিকে শকুনচক্ষু হেনে—চাষ করতে নয়, মালিকানার লোভে, কেনাবেচা করতে। তার সঙ্গে হাত মেলায় জনগণের আরেক শত্রু, শহরের চোরা-আড়তদার, যার গুপ্তকারবার শুধু ধান-চালের পাহাড় বানিয়ে নয়, যে আবার গ্রামছাড়া অসহায় মেয়েদের নিয়েও কারবার করে।

গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে গ্রাম। মধ্যযুগের মৃত্যু থেকে আধুনিক অপঘাত। নিছক খাদ্যের প্রশ্ন, সভ্যতার কটি মৌলিক মূল্যবোধ, ক্ষুধার মধ্যেও ও নিবারণব্যবস্থার মধ্যেও মানবিক ভব্যতা, জীবন ও মৃত্যু—

দর্শকদের যতই সাময়িকভাবে হোক তড়িৎ-স্পর্শেই রূপান্তরিত করে তোলে এবং দর্শকেরা হয়ে ওঠে সেই সব মানুষ যারা শুধু ব্যাখ্যা করে না, যাদের মনে হয় যে তারাও বাস্তবের চেহারা পাল্টে দিতে পারে।

জর্জী মায়ারহোল্ড বলতেন যে, নাট্যশালায় বাস্তব সত্য জেগে ওঠে মঞ্চে নয় শ্রোতাদের দর্শকদের মনেও। তাই শম্ভুবাবুর সাফল্য অর্জিত হল রিক্ত চটের পশ্চাৎপটে এবং মঞ্চে সরাসরি উপস্থিত করে কলকাতার যে মানুষকে অপমানকর তখনকার সব লঙ্গরখানা, সরঞ্জামহীন দুস্থ-সেবার হাসপাতাল, অমানুষিক আড়ি-পাতা ক্যামেরা-হাতে সংবাদসেবী, বিট বা দালাল, কালোবাজারি, বিয়েবাড়ির সেই ভোজ, ওদিকে বাইরে রাস্তার মোড়ে আস্তাকুঁড়ে বাস্তুহারা ভিক্ষুকদের। এই সব কিছুই আমাদের চোখকানকে ধাক্কা দিয়ে যায় আর আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে ধাওয়া করে, মনে গেঁথে বসে। আর এটা কাউন্টারপয়েন্টেড বা প্রতিস্পর্ধিত হয় খাঁটি দেশজ ভাষায় যখন মনে করায় যে এইসব ভিক্ষুকাবস্থ মানুষেরা শুধুমাত্র হতভাগ্য গ্রামের লোক, যারা ঘরদোর ছেড়ে এসেছে নিছক খাদ্যের সন্ধানে, যারা মোটেই শহরের ভিক্ষুক-ব্যবসায়ের হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কারণ এদের মাটিতে কাজ এদের স্বভাবের ছাঁচ গড়েছে। পরিণামে এরাও সবাই জমিতে ফিরে যায় এবং সম্মিলিত হয় মরিয়া আনন্দে বাংলাদেশের

সাবেক কিন্তু বাস্তবে দুর্লভ সেই মিলিত চাষে, ও ফসল কাটায় গাতায়। নাটকটি শেষ হয় এক চিত্র রচনায়, সকালের প্রথম আলোর লাঠিহাতে গ্রামবাসীদের নৃত্যে এবং উন্মাদ বৃদ্ধ প্রবীণ জোড় বাঁধেন সেই স্থিতধী গ্রাম-বৃদ্ধাটিরই সঙ্গে—সমস্ত দৃশ্যটি প্রতি-পূরক হয় প্রথম দৃশ্যের সেই অগ্নিময় রাত্রির সঙ্গে।

বলাই বাহুল্য, যথারীতি শোনা গেছে বিরূপ মন্তব্য, বিরুদ্ধ সমালোচনাও, প্রায়ই মূল বিবেচ্যটির দিকে মন না দিয়ে—এমনকি পরিচয়-পত্রেও। বস্তুত, নাটকটির প্রবল সার্থকতা সম্ভব হয় নাট্যকার-প্রযোজক-অভিনেতারা সকলের অসামান্য একাত্মতায় এবং সেটা ভারতীয় নাট্যশালায় এক অগ্রণী কৃতিত্ব, যার কথাটা সোভিয়েত দেশের গুণীজনেরা বলেন : একটা বিশেষ আবেদন জাগাতে হলে, প্রযোজককে জানতেই হবে শুধু তাঁর নাট্যদলকে নয়, তাঁর দর্শক-শ্রোতাদেরও, জানতে হবে এবং সৃজনশীলভাবে সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রয়োগ করতে হবে। শম্ভুবাবুরা বিজনবাবুরা তাঁদের শ্রোতৃপক্ষকে জানতেন—আমাদের বন্দী ও বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে যতটা গভীরভাবে জানা সম্ভব। সোভিয়েত অভিজ্ঞতার পাঠ থেকে এটাও তাঁরা জানতেন যে, নাট্যাভিনয় শুধু পরিচিত চালু অনুষঙ্গে নির্ভর করে না, নব নব দৈবপ-লব্ধিতে মননের শক্তিও তাতে সৃষ্ট হয়, মানুষের আত্মসচেতনতাকে নাট্য নব-জীবন দেয়, মানুষের অনুষঙ্গ ও সংলগ্নতার ক্ষমতা জাগিয়ে তোলে।

ঐরকম সব ভাবনা মাথায় এসেছিল বছর-পঁচিশ আগে। 'নবান্ন'—নাটকের প্রযোজনা মনে এমনই ধাক্কা দিয়েছিল, আবেগের প্রবল শক্তিমত্তায়, যে আজও সেই অভিজ্ঞতার রৌদ্রে বন্যায় আমাদের মন স্বতঃই ফিরে যায়, শিল্পের অভিজ্ঞতার এমনই ক্ষমতা। নান্দনিক অভিজ্ঞতা এই-রকমই প্রবল হয় যখন আর্ট নন্দনশিল্প এবং যথার্থ জীবনের আবেগময় উপলব্ধি, আমাদেরই, এই মানব-জীবনেরই উপলব্ধি, তার ভয়াবহতায়, তার কারুণ্যে এবং আশ্চর্য তার মহিমাগৌরবে একাকার হয়ে যায়। যেমন বাস্তব জীবনে ও ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয় মুহূর্তবিশেষে সংগোরথিত হয় নীলকণ্ঠ-বিষ ও অমৃত—যথা ৪৭-এর ১৪ই।১৫ই আগস্ট মনে করুন, তেমনি শিল্পকর্মেও সমুত্থিত হয় এইরকম মুহূর্ত। 'নবান্ন' আমাদের ইতিহাসের কয়েকটি মুহূর্তকে আধৃত করেছিল নাটকের ভাষায়, নাট্যরূপে, আমাদের ৪২।৪৩-এর সেই বেদনাক্লিষ্ট জীবনায়নের

সঙ্গে একাত্ম অভিনয়ের কর্তৃত্বে ও আবেগে।

সব সময়ে হয়তো নাটকের রচনা বা প্রযোজনা আর অভিনয় যতই দক্ষ হোক, এরকম প্রবল শক্তিমত্তা ও একতার বোধ জাগাতে পারে না। সম্ভবত শিল্পাতিরিক্ত কিছু বিবেচ্য তথা বাস্তব ঐতিহাসিক বা সামাজিক পরিস্থিতির মানবিক নাট্য ও সৎ শিল্পস্রষ্টার আন্তরিক কর্মকে প্রভাবিত করে। তার অর্থ এ নয় যে নবান্ন-র দীর্ঘস্থায়ী মর্মস্পর্শী নন্দনে চিত্তশুদ্ধিতে কিছু আপতিক ব্যাপার ছিল। আমাদের চোখ ও কান আমাদের বঞ্চনা করেনি।

রবীন্দ্রনাথের শতবিধ কিন্তু একক প্রতিভার ও কীর্তির পরে বোধহয় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক-শিল্পীদের এবং গণনাট্যের প্রগতি আন্দোলনই নানারকম কর্মক্ষেত্রে অনেক কিছু সাফল্য অর্জন করে সেই সাত-আট বছর ধরে এবং পরে বৃহত্তর প্রভাব রেখে যায়। গল্পে কবিতায় চিত্রশিল্পে তার ছাপ পাওয়া যায় এবং নৃত্যোগানেও। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নব জীবনের গান, ঝঞ্ঝার গান প্রভৃতি সংগীত সৃষ্টি আজও আলোড়ন তোলে এবং নাটকে ও নাট্যমঞ্চে আজ এক দিশারী জয়স্তম্ভ। আর নাট্যরচনাতেই তো লেখক সেরা সেতু-বন্ধন করতে পারেন জনসাধারণের মনের সঙ্গে।

কিন্তু নাট্যপ্রযোজনার প্রাণবন্ত আন্দোলন ছাড়া নাটক লেখকের হাত-পা অনেক-টাই বাঁধা থেকে যায়। বাস্তবিকপক্ষে প্রাণবন্ত নাট্যসাহিত্যে নাট্যশালাই হয়ে ওঠে নাটকের প্রাণ, তাই নাট্যমঞ্চের আন্দোলনে সাহায্য পান নাটক লেখকেরা কি গদ্যে কি পদ্যে। এইরকম একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বাংলায় আমাদের শতভাঙনধরা সামাজিক জাতীয়-জীবন সত্ত্বেও। শুধু কলকাতাতেই তো কোন্ না ১০।১৫টি নাট্যদল আছে, যাঁদের নাট্য-প্রয়াস প্রায়ই চমকপ্রদ এবং মাঝে মাঝে গভীরভাবে তৃপ্তিকরও বটে। বহুরূপী ও শম্ভু মিত্র যে প্রযোজনার মান অর্জন করেছেন, তা কলকাতার গর্বের বিষয়। তেমনি আছেন নান্দীকার ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত ও তাঁর রূপকার গোষ্ঠী, বিজন ভট্টাচার্য ও অসাধারণ বীরত্বে পূর্ণ তাঁর নানা রচনা প্রযোজনা। এখন বোধহয় আশা করাটা পাগলামি হবে না যে, ব্যবসায়ী থিয়েটার ও বুদ্ধিমান থিয়েটারের শিল্পকৃতিত্বের ও আর্থিক নিশ্চিতির অভাবের তফাৎটা কমে আসবে। মিলিত নাট্যসংস্থার চেষ্টা তো সেই আশার দিকেই তাকিয়ে।
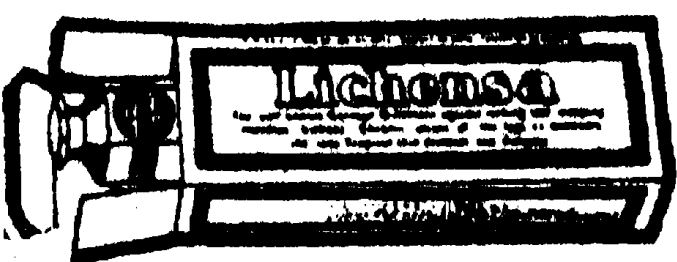
সুখের মেলা

সুরমী বিবি যেরকম

'বুবু'র বাড়ি 'বুদতে' এসেছিল সুরমী বিবি! বুবু কুলসুমের একটা মেয়ে হবার পরে 'সোঁত' রোগে 'বিছেন'ধরা 'আবস্থা' হলে সুরমী—ছোট বোন এল অচল সংসার সামলাতে। তার ডালিম-ভরা বুকে বোনাইয়ের পাপ-চোখ যেন বিঁধে গেল। 'শতেক কথায় সতী ভোলে!' সুরমীর আর দোষ কি! বোনাই জমির মল্লিক 'হাসখোল' মানুষ। সদাই হাসি-ইয়ারকী। সদাই তার পিছনে ভ্যানভ্যান করে। থালাবাটি মাজতে গেলে ঘাটে গিয়ে হাজির। গোয়ালে গোবর তুলতে গেলে, গরুকে খড়-খোল-ভুষি দিতে গেলে সেখানে হাজির, তালগাছ কাটতে গেলে ভাঁড় নিয়ে চল সঙ্গে, মাঠে গরু বাঁধতে গেলে কুয়াশার মধ্যে সেখানেও তাকে ধরবে আর রাত্রে দিদির পাশে ঘুমোলে মিনসেটা উঠে এসে চুপিচুপি হাতে-গায়ে-পায়ে হাত দিয়ে দিয়ে যেন জলের মধ্যে আন্দাজে 'নয়না' মাছ খুঁজে বেড়াবে!

একটা ভয়ানক আতঙ্কে যেন সারারাত চোখে-পাতায় করতে পারে না সুরমী। অন্ধকার ঘর। তক্তাপোষটা মচ্‌মচ্‌ করে। ভগ্নিপতি বোধহয় নামল। মেঝেয় তাদের বিছানা। মট্‌ করে হাঁটুর শব্দ হল। বসল বোধহয় মশারীর পাশে। তারপর পায়ে হাত পড়ল। হাতটা কাঁপছে।

সুরমী পা ছোঁড়ে। ডাকে যেন ঘুমভাঙা জড়ানো গলায় : 'বুবু! ও বুবু!...কি মরণের নিদ বাবা।'

আবার চুপচাপ।

মোটা দুর্গন্ধ কেরোসিনের কুপীটা জ্বালায় জমির মল্লিক। বিঁড় ধরায়। ছারপোকা মারে। সুরমী বলে, 'মিনসে যেন ঢং!'

'আরে ধের শালী, ছারপোকাতে খেয়ে ফেলছে তোদের!'

'তাই মোর পায়ে হাত 'দিচ্ছলে?'

'চুপ শালী!'

'বুবুকে বলে দোব। ওরকম জ্বালাতন করলে কাল আমি চলে যাব।'

জমির বলে, 'তোমার পরাণে দয়া নেই!'

আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গিয়ে অন্ধকারে তারার জ্বলজ্বল করা আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে জমির। ধানের গোলার পাশে ইঁদুর-ছুঁচো দৌড়য়। সুরমীও ঘুমোতে পারে না বোধহয়। গরমে ঘাম হচ্ছে। বাইরে এসে গায়ের আঁচল খুলে হাওয়া দেয় তালপাতার পাখা দুলিয়ে। তারপর একটা ঝ্যাংলা পেতে দাওয়ায় শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে বোধহয়। নাকি ভান!

জমির এসে বসে তার পাশে। গায়ে হাত দেয়। কোনো সাড়া করে না সুরমী। কিন্তু ঘুমন্ত মানুষের যেরকম আচরণে জাগা উচিত তার বোধহয় সীমা পার হয়ে যায়! তাই সাড়া দিতে বাধ্য হয় সে। ধড়ফড় করে উঠে বসে। জমিরের হাত চেপে ধরে চোর ধরার মতন করে। 'কে তুই র‍্যা!'

চুপ! চুপ মুই তোর বোনাই!'

ডাকব বুবুকে!'

'তোমার পায়ে ধরি।'

সুরমী আর যেন পারে না। লোকটার কাকুতি-মিনতি দেখে ভেঙে পড়ে। যেন একটা ঢেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বানের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আর সে যুঝতে পারবে না। ডুবে যাবে। তলিয়ে যাবে।...দিদি দুঃখ পাবে।...

তবু সেখানেই আবার শুয়ে পড়ে সুরমী। কাঁদতে থাকে ফোঁস ফোঁস করে বালিশে মুখ চেপে। জামির অনুনয় করে মাথায় মুখে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'তুমি কেঁদো না সুরমী, ধান বেচে, খড় বেচে তোমাকে সোনার হার গড়িয়ে দোব। পাছাপেড়ে শাড়ি কিনে দোব। রুপোর মল, তাবিজ, গোট গড়িয়ে দোব।'

সুরমী বলে, 'তোমার বউকে দাও। তাকে কি ভাল লাগে না? একই তো জিনিস! এক তরকারী, দুটো বাটিতে করে দিলে কি দু'রকম স্বাদ লাগে?'

জামির বলে, 'ও বুড়ী হয়ে গেছে! রোগী। তুমি থাকো। তোমাকে বিয়ে করব।'

'বুনে বুনে সতিন হয় বুঝিন? বউ মরে গেলে তার বুনকে বে' করতে আছে। শালীকে নষ্ট করলে বউ তালাক হয়ে যায় জানো?'

'হয় হবে। তোমাকে আমার চাই। কুলসম মরুক।'

'লোকে কি বলবে?'

'বলুক। সংসার ছারেখারে যাক, তোমার রূপ, তোমার 'যৈবন' আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তোমাকে চাই-ই।'

সুরমী বোধহয় ভয় পেলে। উঠে দিদির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দিদিকে জাগালে। জল খাওয়ালে। বাচ্চার কাঁথা পালটে দিলে।

কুলসম আর ঘুমোবে না! তাই সুরমী সুযোগ বুঝে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

সকালে জামিরের মেজাজ কড়ুয়া হয়ে গেল। খালি-খামখা ছেলে গরুটাকে পিটতে লাগল। সুরমী ঝাঁটপাট সেরে ভগ্নীপতিকে জামবাটি ভরে পান্তা খেতে দিলে, কিন্তু সে এল না। কুলসম বাইরে থেকে আসার সময় সামনে পড়তে জামির বললে: 'মরিস নি? ওলাউঠো ধরেছে, কবে নিয়ে যাবে তোকে?'

কুলসম বলে, 'আমি মরলেই তো তোমার হাড়ে বাতাস লাগে। 'জনজাহান' ঠাণ্ডা হয়। আল্লারও কি চোখ আছে, সে যে অন্ধ! মরণ কি মোর দেবে?'

সুরমী হঠাৎ একটু খেলাতে চাইলে ভগ্নীপতিকে। দিদিকে শুনিয়ে বললে, বুবু মুই ঘর যাই। তোদের সংসার তোরা দ্যাখ।' সে কাপড় পরতে গেল।

কিন্তু জামির কিছু বললে না। খড় এনে বসে বসে পাকিয়ে কলাই রাখা 'পুড়ো' বানাবার জন্যে বিড়িয়ে বিনুনীর মতন ছোটা তৈরি করতে লাগল উঠোনে বসে।

কুলসম কোনো কথা বললে না। শুয়ে পড়ল গিয়ে। বাচ্ছাটা ককিয়ে চলেছে।

সুরমী শাড়ি পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল খিড়কি দিয়ে।

জামির চেয়ে দেখলে শুধু একবার।

তারপর সামনের মাঠের মাঝখানে যখন চলে গেছে সে, জামির দৌড়ুল। ধরলে তাকে এসে।

'এই শালী, চলে যাচ্ছিস, রাঁধবে কে? তোর বুনকে দেখবে কে?'

'কেন, আমি কি তোমাদের দাসী? লোক রাখতে পার না? ছাড়ো, হাত ছাড়ো।'

'আয়, চলে আয়।' হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে যেন দৌড়য় জামির। দেড় মণে ধানের বস্তা একাই যে মন্দ-মানুষ মাথায় তুলে নিতে পারে তার হাত ছাড়ানো শক্ত! মাঠে মেয়েরা বিরি কলাই তুলছিল, হিন্দু মেয়েরা হাসতে লাগল দৃশ্য দেখে। কিন্তু একটি মুসলমান বুড়ী বললে, 'সোমত্ত শালীর সঙ্গে মুসলমান-ঘরে অবাধ মেলামেশা-ঢলাঢলি করা নিষেধ। দ্যাখ—মজা দ্যাখ!

জামির তাদের শুনিয়ে হেঁকে হেঁকে বলে, 'বউ পালাচ্ছিল গো মা-মাসিরা। ধরে আনছি। যাবে কোথা শালী, পুলিশ তুলে ধরে আনব।'

সুরমী হাসে, কাঁদে, গাল দেয়। কিন্তু ছুটতেও হয় ভগ্নীপতির সঙ্গে। গোঁয়ার ষাঁড়ের মতন সে টেনে নিয়ে চলেছে। শেষে কামড়ে দেয় তার হাত। রক্ত বার করে দেয়। স্মরসী ক্ষেপে গেছে। কেননা হাল-বাড়ির ঢেলামাটিতে তার পায়ে চোট লেগে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, তবুও হাত ছাড়ে না জামির। হাত বদলে নেয়। অন্য হাতটা মাথায় ঘষতে থাকে। ফুঁ দিতে থাকে দাঁতে-কাটা জায়গাটাতে।

নিজের বাগানের উপর টেনে তুলে আনলে হঠাৎ সুরমী বলে, 'এই মিনসে ছাড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, এই আমি ন্যাংটো হয়ে গেছি...দোহাই আল্লার...তুমি যা চাও দোব...ছাড়ো'...

ছেড়ে দিতে কাপড় পরে নিলে সুরমী। কিন্তু হঠাৎ আবার পালাতে গেলে তাকে দৌড়ে ধরে এনে শূন্যে চাগিয়ে তুলে ধরে একেবারে বাড়ির মধ্যে আনলে।

কুলসম ছেড়েমেড়ে উঠে বসল ঘরের মধ্যে। দৃশ্যটা দেখে কপালে হাত চাপড়ে আবার শুয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ডুকরে ডুকরে। বাচ্চাটা ককাচ্ছে দেখে একবার ভাবলে ওর গলাটা টিপে দেবে নাকি। বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে এসে দোলায় বসে থামায় তাকে থামায় সুরমী। দিদি কাঁদছে কেন? সে চলে যাচ্ছিল বলে? তাই ভাবে অবশ্য সুরমী।

সেই রাত্রেই সুরমী আর বাধা দিলে না জামিরকে। ভয়ানক এক আনন্দের বন্যায় যেন সে ভেসে গেল। বাঘিনী যেন মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে পাগল হয়ে গেল।

সে আর ঘরে ফিরে যাবার নামও করে না। প্রকাশ্যেই দিদিকে একদিন বললে, 'তোর মন্দ-মানুষ আমাকে নষ্ট করেছে।'

'চুপ, কাউকে বলিসনি। ঘরে চলে যা। আমি তো এবার একটু সেরে উঠেছি—যেমন করে হোক কাজ-কাম করব। হালীর মাকে বলিচি, কাজ করে দিয়ে যাবে।'

কিন্তু সুরমীর চোখে কেমন যেন এক চাতুরী-ভরা হাসি। সে আর যেতে চায় না। দিদির বুকের ওপরে যেন চেপে বসেছে সে। ভগ্নীপতির সঙ্গে তার প্রণয় আর লুকোনো রইল না পাড়ার কারো চোখে।

এক রাত্রে ওদের ধরলে কুলসম। বোনকে ঝাঁটার বাড়ি ঘা-দুই দিলে। 'বেরো, দূর হ, হারামী।'

জামির কুলসমের টুঁটি টিপে ধরে জিব বার করে ফেললে, বললে, 'তুই দূর হয়ে যা মাগী। তোকে তালাক দিচ্ছি।'

সকালে মেয়েকে কোলে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল কুলসম। মা শুনে ছুটে এল। সুরমীর চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে পেড়ে ফেললে, 'হারামী, তোর এই ব্যাভার!'

জামির বললে, 'ওর দোষ নেই মা, আমি ওকে 'নষ্ট' করেছি। ওকে নিয়ে আমি ঘর করব। তোমার বড় মেয়ের তালাক হয়ে গেছে।'

শাশুড়ি বলে, 'তুমি একটা মানুষের বাচ্ছা, তাই তোমার মুখে ও কথা বেরুতে লজ্জা হল না।'

কিন্তু সুরমীর হাত ধরে টানাটানি করলেও সে আদৌ ভগ্নিপতির ঘর ছেড়ে এখন আর যেতে রাজি নয়। অগত্যা তার পিঠে লাগি মেরে জামিরের শাশুড়ি পাড়ার মোল্লা, রেইস, কোলেমান সবাইকে ডাকতে গেল বিচারের জন্যে।

সন্ধ্যার সময় বিচার বসল।

মোল্লা শুধোলেন, 'জামির তুমি কি তোমার শাশুড়ির কাছে বলেছ যে তোমার বউকে তুমি তালাক দিয়ে শালীকে নিয়ে ঘর করবে?'

'হাঁ, মোল্লাজী।'

'সুরমী বিবি কি রাজি?'

সুরমী বলে, 'বুবুকে তালাক না দিলেও সে তালাক হয়ে গেছে এমন কাজ আমার সঙ্গে আমার ভগ্নিপতি করে ফেলেছে।'

'রেইস' মানে প্রধান বলে উঠল 'দুজনের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে কলকাতা শহরে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ওসব কাজ করলে কেউ কিছু বলবে না।'

'জানো জামির, এর কি দণ্ড?'

'হুজুর যা বলো।' হাত কচলাতে লাগল জামির মল্লিক। চ্যাপটা মুখে

কুতকুতে চোখ দুটো তার পিঠ্‌পিঠ করতে লাগল। ভাবটা যেন সুরমীর যৌবনের খেলার বিনিময়ে সে যে কোনো শক্ত সাজা নিতেও এখন প্রস্তুত।

'কুলসমের দেন মোহরের টাকা দিতে হবে, আর একশো টাকা জরিমানা, অথবা শালীর সংগে তোমার সাদী পড়াবার দিনেই গ্রামের সমস্ত লোককে খানা খাওয়াতে হবে।'

রায় হে'কে দিলেন সাদা দাড়িঅলা বৃদ্ধ মোল্লা সাহেব।

জামির রাজি।

সবাই অবাক। একজন বললে, 'যার সাথে যার মজে মন কিবা ইয়ে কিবা কী? এখন কি আর পাতলা রস আছে, জ'মে মিছরির কুঁদো হয়ে গেছে!' শুধু শাশুড়ি কপালে করাঘাত হেনে কাঁদতে লাগল। সংগে সংগে একশো প'চিশ টাকা দেন মোহর বাবদ নগদ বার করে এনে দিলে জামির মোল্লার পায়ের কাছে।

প্রকাশ্যে বড় বিবিকে তিন তালাক দেওয়ানো হল। সবাই চলে যাবে কিন্তু হঠাৎ পাশের বাড়ির বাবুজান দর্জি বুড়ো লোকটা বলে ফেললে, 'মোল্লা সাহেব যাবেন না, ওরা যে ক'রাত এক সংগে থাকবে ততই পাপ বাড়বে, গ্রামে কলেরা হবে, তার চাইতে আজই—এখ'নি সাদী পড়িয়ে দিয়ে যান। জামির ইচ্ছে করলে কালই সবাইকে খানা খাওয়াতে পারে।'

প্রস্তাবটা সবাই মেনে নিলে। সুরমীর সংগে সাদী পড়ানো হয়ে গেল জামির মল্লিকের।

জামির অন্ধকারে একান্তে টেনে এনে বাবুজান দর্জির দাড়িভরা মুখে চুমো খেয়ে বললে, 'চাচা, তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইনু মুই। আমার বাপের মতন কাজ করেছ তুমি।'

বাবুজান দর্জি বললে, 'তুই শালার বেটা এমন কাজ করলি, এখন কি করি বল্‌!

পরদিনই জবাই করে, খাসী মুরগি কেটে মণখানেক চালের ভাত রে'ধে, ডাল মাছের মাথা দিয়ে আলু ঘণ্ট, মাছ ভাজা তিন রকম মাংস রান্না করে জামির মল্লিক খাইয়ে দিলে পাড়ার সমস্ত লোকজনকে।

শালী বউ হয়ে গেল, বউ পর হয়ে গেল তার কোলের দুধের বাচ্ছাটা নিয়ে!

ভাজা কোটা করে খেতে খেতে মা'টাও একদিন মারা গেল। কিন্তু কুলসম আর নিকে সে'ধল না। পুরুষ মানুষের ওপরে তার ঘৃণা ধরে গেছে। বাটা নগরের পাশে নুঙ্গির বিখ্যাত ধনী এবং পরহেজগার মানুষ তারিক মোল্লা সাহেবের বাড়িতে সে দাসীর কাজ করতে চলে গেল। চোখে জল মুছতে মুছতে সে ধান সিদ্ধ করতে, কাপড় কাচতে, রান্না করতে লাগল।

বছর পার হয়ে চলল হু-হু করে।

কুলসমের মাথার চুল পাকলো। তার মেয়ে হল যুবতী। মেয়েটা মাঝে মাঝে আসত জামির মল্লিকের কাছে। কুলসম এলেও জামিরের বাড়ির সদরে মাথা গলাত না। দর্জিদের বাড়ি থাকত। বোনে বোনে দেখা নেই।

সুরমী ডেকে পাঠালে কুলসম বলে 'ছেনালের মুখে মারি ঝাঁটা!'

সুরমীর কোলে তখন দুটো মেয়ে।

বড় মেয়ের সাদীর জন্যে টাকার দাবি করতে এসেছিল কুলসম। বাবুজান দর্জি অনেক বোঝাতে, মোল্লার নির্দেশে জামির টাকা দিলে। বড় মেয়ের সাদি হয়ে গেল নুঙ্গিতেই। তারিক সাহেবরাও সাহায্য করলেন।

সুরমীর কিন্তু মেজাজটা তিরিক্ষি হতে থাকল দিন দিন। জামিরকে সে তোয়াক্কাই করে না। বলে 'বাঁশ-কাঠ বেচা টাকা, তালপাতা, গুড় কলাই বেচা টাকা, আমড়া, শাঁকালু, কলা, আতা পে'পে বেচা টাকা, ঘু'টে কঞ্চি বেচা টাকা, আমার সুদের টাকা—বার করো সব মিনসে। না হলে তোমাকে ব'টি দিয়ে 'কুইচে' ফেলব। বড় মেয়ের বিয়েতে ক'শো টাকা দিয়েছ? কার টাকা? আমি মেয়েমানুষ হয়ে কোথা জন ডেকে এনে ধান রুয়ি—হাল করাই, নিজে ডাঙা কোপাই কাছা সে'টে, চোর পড়বার ভয়ে বালাম ছোরা নিয়ে রাত জাগি—ভু'ড়ো মিনসে শুধু তাড়ি গিলে ঢোল হয়ে পড়ে থাকবে। জমিদারের প্যায়দা এসে খাজনার জন্যে বাকুলে ঢুকে 'কুরশী বিবি—সুরমী বিবি' বলে তম্বি—গুহোর বেটাকে কাটারী নিয়ে তাড়া করতে মারলে [illegible] দৌড়! সুরমী বিবি বড্ড জালিয়াদ! খালি তার টাকাটাই মিষ্টি!

জামির বলে, 'মাগী, তোর বড্ড ফড়ফড়ানি! সুনো দড়ির চাবুকের বাড়ি মেরে তোর 'কাবলা' ফাটালে তবে রাগ যায়! বড় মেয়েটা কি বাওয়া আন্ডা? আমার মেয়ে নয়? রামনগরে মেয়েমানুষের 'ভাইরে' নাচ দেখতে যেতে তুই ছেনাল ঘরে সি'দ কাটবার নাম করে মোর যত টাকাকড়ি ছিল বার করে লুকুলি। জানি নি মুই?'

সুরমী হঠাৎ জামিরের সামনে হাঁটুর ওপরে কাপড় চাগিয়ে তুলে ধরে নাচতে থাকে ঘুরপাক মেরে। বলে, 'মরি মরি! কি আবদারের কথা! মুই নাকি মন্দমানুষের টাকা চুরি করিচি! তোমাকেও তো চুরি করিচি! কি আদরের কথা! বড় মেয়েটা ওর! আমার গুনো বানে ভাসা। তবে বড় গিন্নিকে ফের পায়ে ধরে আনো না!'

জামির বলে, 'তার পায়ে যা আছে তোর কপালেও নেই। বুন হয়ে বুনের সংসার যে ভাঙে তার ইহকালেও সুখ নেই—পরকালেও সুখ নেই। তোর টাকা কোথা থেকে এল শুনি? বাপের বাড়ি থেকে এনেছিস? কুলসম তো কক্ষনো একটা পয়সা 'লিত্তুন'। আর তুই সব টাকা দখল করেছিস।'

'আরে বুড়ো 'ঢোসকা' তুমি তো কবে এবার পটল তুলবে, তখন কি আমি আর
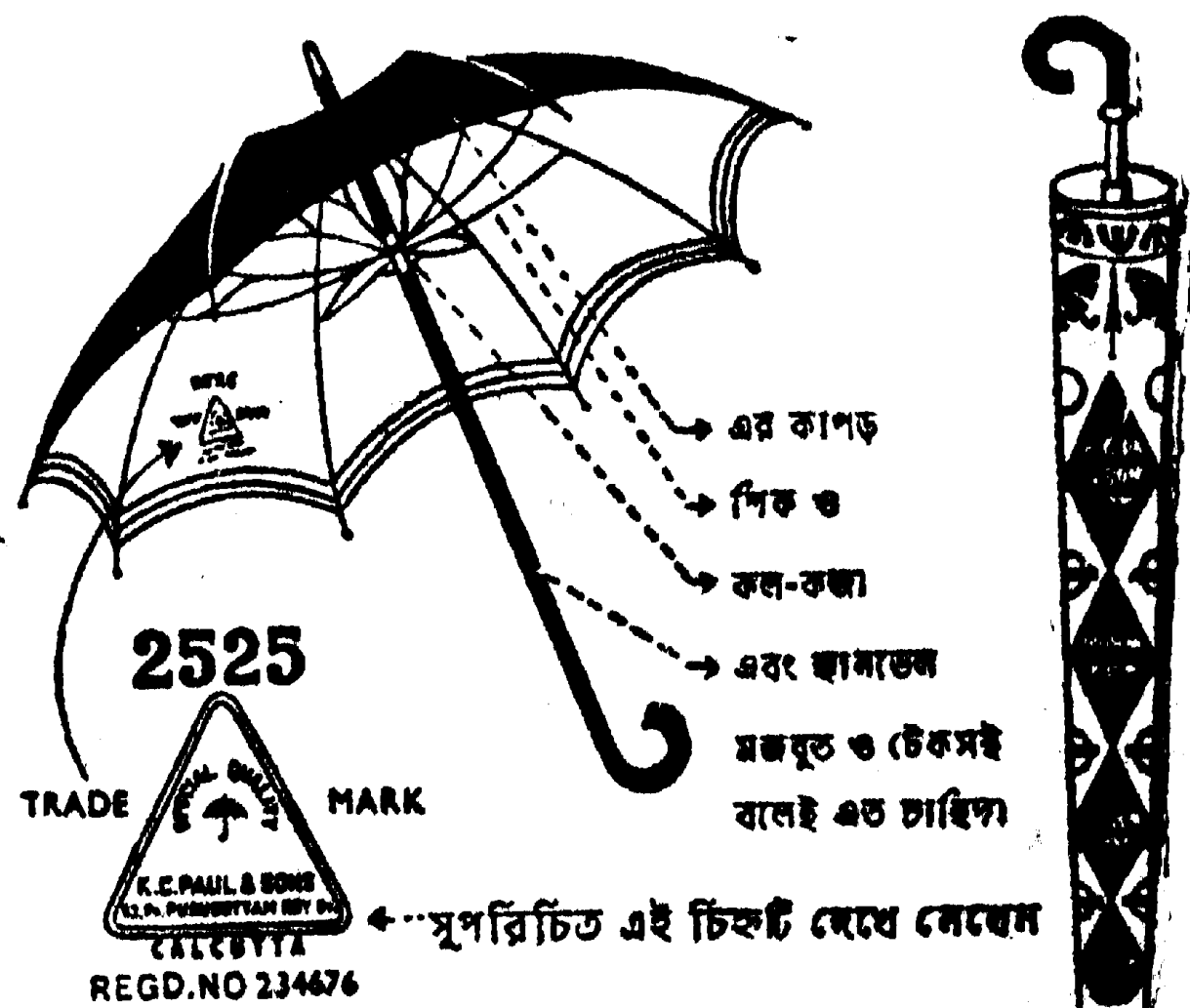
একটা 'লিকে' সেঁধব? গতরে রেখেছ কিছু?' নিজের শরীরটা দেখায় সুরমী।

সুরমীর পেটের দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে অল্পদিন পরেই জামির পেটের যন্ত্রণায় আছাড় কাছাড় করে 'বিনি তিকিজ্জেয়' মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলতে কুরশী বললে, 'টাকা কোথা? মিনসে কি আমাকে টাকা দিত?'

ছোট জামাইটা বাড়িতে পাহারা দেবার জন্যে রইল। ক্ষেতে খামারে কাজ করতে লাগল। সে তাল গাছ খেজুর গাছ কেটে রস নামায়, গুড় জ্বাল দেয়, ডাঙা কোপায়, বনজঙ্গল কাটে আর মেয়ের পেটে প্রতি বছরে একটা করে বাচ্চা পয়দা করিয়ে যখন কুঁড়ে গরুর মতন 'আলো' মেরে গেল তাকে সুরমী ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলে।

মেয়ে ঝগড়া করলে তাকে আলাদা করে দিলে। জন খাটতে বেরুল সে।

সুরমী একাই আলাদা থায়। একটা হাফপ্যান্ট (বোধহয় তার ছোট জামাইয়ের) পরে এলো গায়ে হুমহুম করে নিজের ডাঙার মধ্যে কোদাল পাড়ে, জল বয়, গাছ লাগায়, পাট কাটে। পাড়ার লোকজন আসে জ্বালানী কাঠপাতা কিনতে। এক মুঠো নারকেল পাতা চার পয়সা দাম, এক ঝোড়া ঘুঁটে চার আনা, গেছো পান এক গোছ চার আনা। কাঁচা বুনো আমড়া, মোচা, সবেদা, আম, কলা, বাতাবীলেবু কাঁঠাল, তাল, নারকেল, নোনা, আতা, খামালু—যখনকার যা—সব মাথায় করে বয়ে নিয়ে বিক্রি করতে হাটে যায় সুরমী। রাত্রে মেয়ের খোকাটাকে কাছে নিয়ে শোয়। প্রায় কুড়িটা কাঁথা পেতে মোটা করে বিছানা পেতে রেখেছে তক্তা-পোষের ওপরে। তার ভাঁজে ভাঁজে টাকা আছে। টাকা আছে তক্তাপোষের বাক্সর মধ্যে। ঘরে সিঁদ কাটার ভয়ে কাঁটা-পালা ঘিরে দিয়েছে বনেদের পিছনে।

ছোট মেয়ে হাসেন বানুর দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। কুলসম শেষ জীবনটা জামাইবাড়ি থেকে সুখেই মারা গেল। মেজ মেয়ের বর বাটানগরের কারখানার শ্রমিক। ভাল পয়সা পায়। সে এলে সুরমী বিবি মুরগি জবাই করে খাওয়ায়। হাসেন বানুর দুটি মেয়ের বিয়ের খরচ অবশ্য সুরমীই দিয়েছিল। হাসেন বানুর ছেলেটার গোঁফ গজিয়েছে, ভাল জনমজুর হয়েছে। কুরশীর জবরদস্তি, এখনো তাকে বুড়ীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে শুতে হবে! আর বুড়ী তাকে সারারাত ঘুমোতে দেবে না।

সুরমী বিবির কাছে কত টাকা আছে?

লোকে বলে, অনেক।

তবে চোর পড়ে না কেন? চোরেরা সুরমীকে ভয় করে। সে একটু কুকুর ডাকলেই বল্লম নিয়ে তেড়ে হেঁকে বেরিয়ে আসে। 'কুন গোলাম র‍্যা...'

সুরমী বিবির কাছে লোক আসে সুদে টাকা নেবার জন্যে। তার ভাগ্নে বড়লোক মন্তাজ মোল্লার মতন লোক, পাঁচ হাজার টাকা চায়! জমি কিনবে। অভাব পড়ে গেছে টাকার। মাস ছয়েক পরেই দিয়ে দেবে।

কত সুদ দিবি?

'টাকায় দু' পয়সা।'

'অত টাকা মোর কাছে আছে হাঁ লা হাসেনবানু?' মেয়ে টাকা গুনতে জানে। বললে, 'হবে। কাল সকালে এস দাদা।'

রাত্রে সবাই ঘুমোলে মেঝের মাটি খুলে একটা মাটির কলসী বার করে সুরমী বিবি আর তার মেয়ে। জয়নালকে সেদিন আর ঘরে শুতে দেয় না।

এক কুড়ি এক কুঁড়ি করে প্রথমে পাঁচ কুঁড়িতে একশো টাকার থাক দেয় হাসেন বানু। দশশো হলে এক হাজার। এইরকম পাঁচটা সারি!

সুরমী বলে, 'মনে রাখিস মা এই টাকার জন্যে বিনি তিকিজ্জেয় তোর বাপ মরেছে তবু টাকা ছাড়ি নি...অনেক কষ্টের টাকা... সুদটা হিসেব করে লিবি।'

সেকালের অনেক কাঁচা টাকা রয়েছে। মেয়ের হাতের দিকে সদাই লক্ষ্য রাখে সুরমী বিবি। দশটা টাকা পেট কাপড়ের মধ্যে 'লুইকে' ফেললেই হল।

মন্তাজ মোল্লা টাকা নিয়ে গেল সকালে এসে। কোনো সাক্ষী বা লেখাপড়া নেই। কিন্তু সুরমীর পায়ের কামাই নেই। যাকে পাঁচটা টাকা ধার দিয়েছে প্রতিদিন একবার করে তার বাড়ি যাওয়া চাই। কথা শোনানো চাই। শেষে তার বউ কি রান্না করেছে দিতে বলে। সাতসকালেই একটা ভাঁড় হাতে নিয়ে পাড়ার বাড়ি বাড়ি যাবে মুরগির কুঁড়ো গুলবার জন্যে ফেন চাইতে। কেউ যদি সুদসমেত টাকা মিটিয়ে দিয়েও থাকে তবু তার রেহাই নেই। সুরমী বলবে, 'বিপদের সময় টাকা চাস, এই যে ছেঁড়া কাপড় পিঁধে আছি, কই দাদিকে তো একটা ছ' হেতে 'ঠেঁটি' কিনে দেবার মুরোদ হয় নে।'

বি-এ পাশ বিণ্টুবাবু, সম্ভ্রান্ত লোক, দেখা হলেই সুরমী বলবে, হাঁ-র‍্যা বিণ্টু, তুই 'পেসিডেণ্ড'বাবু ছিলি, মোকে 'রিলিফে'র মাল দিসনি কেন? মোর কি আছে?'

ছোট জামাই 'ডুবে' সামনে পড়লে বুড়ী বলে, গোলামের বেটা যেন সং! মাগ নেই, ছেলে নেই, আঠারোটা 'টোকা'র জন্যে ডাক্তার দিয়ে ফি করিয়ে বলদ হয়ে এ'ল! এখন পাড়ার ছুঁড়িদের খারাপ করে বেড়াবার মতলব।' ডুবে কিন্তু কিছু টুঁ শব্দ করে না—বুড়ীকে সে ভয় করে। কিছু বললেই এক্ষুনি পটাস্ করে গালে চড় মেরে দেবে! সোজা মাথা হেঁট করে চলে যায়।

সুরমীর সঙ্গে দেখা হলেই সবাই ভাবে অযাত্রা। মুখ খারাপ করতে, ঝগড়া করতে তার জুড়ি নেই ভূ-ভারতে।

তবু পেটে ব্যথা উঠলে যত রাতই হোক মেয়েরা লম্ফ জেলে নিয়ে ডাকতে যাবে সুরমী বিবিকে। পোয়াতি খালাস করানোর ব্যাপারে সে নাকি ওস্তাদ। যে মোল্লাজী তার সাদী পড়িয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ছেলেরা প্রায় ভেসে যায়। কিন্তু বিধাতার কি বিধান, মোল্লাজীর বড় ছেলেটা অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে নাকি কবি-সাহিত্যিক হয়ে গেল। বুড়ী তাকে বড় ভালবাসত। তাদের ঘর বাঁধবার জন্যে টালিখোলা কিনতে বিনা সুদে দেড়শো টাকা ধার দিলে! টাকা শোধ দিলেও একটা কাপড় দেয়নি বলে বুড়ী তারও ভূত ভাগিয়ে দিতে কসুর করে না। আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ওপরে তার দরদ অপরিসীম। তাদের কাউকে মারতে দেখলে সে ক্ষেপে যাবে। তার বাড়িতে কারো ছেলেমেয়ে গেলে সে কাকে-খাওয়া পেঁপে, বাদুড়ে-খাওয়া আম, শিয়াল-খাওয়া কাঁঠাল —এইসব হাতে দেবে। গুড় বা আমসত্ত্ব দেবে। আর বিয়ে বাড়িতে কন্যার গায়ে হলুদ দেবার সময় সারারাত নাচ গান করবার জন্যে ডাকো কুরশী বিবিকে। সুরমী লজ্জা শরম উড়িয়ে দিয়ে নাচবে গাইবে :

আঁধার ঘরে চাঁদের বাসর
নেটের মুশারী
তার ভেতরে শুয়ে এ কোন
নবীন কিশোরী?
চাঁদ সদাগর গায়ে দিল হাত
কন্যে যেন ঘুমে মরে কাত
ওমা মিনসে করে কি!
ছি ছি ছি!
মুখের ওপর মুখ রেখে সে
কাটিয়ে দিলে রাত!'...

বিয়ের কনে লজ্জায় বুড়ীকে চিমটি কাটে। মেয়েরা খিলখিল করে হাসে। তারপর আদিরসের হাঁড়ি যেন হাটে ভেঙে দেয় সুরমী বিবি।

বিয়ের পর যুবতী শালী থাকলে বরকে দেখায় কুরশী বিবি : 'ওটা এখন, পরে এইটা হে মিনসে!'

শালী হয়তো বলে, 'হাঁ তোমার মতন সবাই!'

'সবাই লো সবাই। লাজে কই না। বোনাই কক্ষনো ভদ্দরলোক হয় না লো!'...

তার কথার মাত্রা সীমা ছাড়াতে চাইলেই কেউ হয়তো পট্টি মারে : 'ও সুরমী দাদি, তোমার বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, চোর পড়েছে বোধহয়'...

অমনি একটা লাঠি কিম্বা কাটারি খুঁজে নিয়েই মালকোঁচা মেরে অন্ধকারেই দৌড় মারে সুরমী বিবি, 'কুন গোলামের বাটা র‍্যা—জামির মল্লিকের ভিটেয় পা দেয়—হারামীর ছাওয়ালের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দোব ভড়াত করে এক শড়কি মেরে!'

আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

একটি ঐতিহাসিক রহস্য

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতিহাস আর সেক্সপীয়র বলেছেন যে, নরদেহে পিশাচ তৃতীয় রিচার্ড টাওয়ার অব লন্ডনে রাজকুমারদের হত্যা করেছেন। এই লোকটি নাকি শয়তানিতে শয়তানকেও পরাজিত করতে পারতেন এবং একমাত্র নরক ভিন্ন অন্য কোনো স্থানের তিনি অযোগ্য। কোথাও তাঁর ঠাঁই নেই।

কিন্তু সত্য কি তাই? ইতিহাসের এ এক সুগভীর রহস্য। একদিকে আছেন স্যার টমাস মোর, পঞ্চম এডওয়ার্ড এবং তৃতীয় রিচার্ডের রাজত্বকালের কাহিনী তিনি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন। আর উইলিয়াম সেক্সপীয়র তৃতীয় রিচার্ডকে শয়তান, ক্রূর, কুচক্রী এবং টাওয়ার অব লন্ডনে প্রিন্সদের হত্যাকারী বলে এঁকেছেন, আর এই ধারণাটাই সাধারণ মানুষের মনে গাঁথা রয়ে গেছে। কিন্তু হত্যাকারী কে?

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে যার ফলে রিচার্ড কলংকমুক্ত হতে পারেন, ব্যাটল অব বসওয়ার্থে যে হেনরী টিউডর তাঁকে পরাজিত করে সপ্তম হেনরী নাম গ্রহণ করে ইংলন্ডের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই নাকি আসল হত্যাকারী।

'দি ম্যারেজ মেড ইন ব্লাড' নামক গ্রন্থে হিউ রস উইলিয়ামসন বলছেন যে, সপ্তম হেনরী তাঁর পুত্রের অভিশপ্ত বিবাহের প্রাক্কালে সিংহাসনের প্লান্টাজেনেট উত্তরাধিকারী ডিউক অব ক্ল্যারেন্সের পুত্র এডওয়ার্ডকে হত্যা করেন, ইনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের ছোট ভাই। সপ্তম হেনরীর পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস আর্থারের বিবাহ স্থির হয়েছিল স্পেনের নৃপতি ফার্ডি-নান্ডের দুহিতা ক্যাথরিন আরগনের সংগে।

এই বিতর্ক কিঞ্চিৎ বিচিত্র ধরনের। সপ্তম হেনরী যদি আর্ল অব ওয়ারউইক এডওয়ার্ডকে হত্যা করতে পারেন তাহলে কি তিনি এডওয়ার্ডের দুই পুত্রকেও ধরা-ধাম থেকে সরিয়ে দিতেন না?

চতুর্থ এডওয়ার্ডের যখন মৃত্যু হয় ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তখন তাঁর তেরো বছর বয়সের পুত্র পঞ্চম এডওয়ার্ড সিংহাসন পেলেন, তাঁর পিতৃব্য রিচার্ড অব গ্লস্টার করোনেশন না হওয়া পর্যন্ত লর্ড প্রোটেকটার হিসাবে কাজ চালিয়ে গেলেন। এই গ্লস্টার কিশোর সম্রাটকে টাওয়ার অব লন্ডনে পাঠালেন, সেখানে কিছু পরেই পাঠানো হল তাঁর ছোট ভাই রিচার্ডকে এই ছেলেটি তার জননী এলিজাবেথের সঙ্গে ওয়েস্ট মিনিস্টারে ছিল।

১৪৮৩ খৃস্টাব্দের ২২শে জুন, রবিবার, করোনেশনের দিন ধার্য হল। কিন্তু সেইদিনে অভিষেক হল না। তার পরিবর্তে বক্তৃতাবিশারদ সন্ন্যাসী শ সেন্টপলস ক্রসে উপদেশ দান করলেন, ইনি লন্ডনের লর্ড মেয়রের ভাই, আর লর্ড মেয়র ছিলেন গ্লস্টারের দলভুক্ত। তিনি 'বুক অব উইসডম' থেকে—

"Bastard slips shall not take deep root"

এই বাণী নিয়ে উপদেশ দান করলেন। আর উপস্থিত সম্ভ্রান্তদের কাছে কি কারণে যে অভিষেক সম্পন্ন করা গেল না তা ব্যক্ত করলেন। সংবাদ শুনে ত' সকলের চক্ষুস্থির। চতুর্থ এডওয়ার্ডের সঙ্গে কিশোর সম্রাটের জননী এলিজাবেথ উডভিলের বিবাহ অসিদ্ধ, কারণ এরা ব্যাভিচারী এমন অভিযোগ বর্তমান। সুতরাং চতুর্থ এডওয়ার্ডের সন্তানরা অবৈধ সন্তান আর সেই কারণে রাজ-মুকুটের অধিকারী হলেন রিচার্ড অব গ্লস্টার। এমন কি চতুর্থ এডওয়ার্ডের জন্মের বৈধতা সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এডওয়ার্ড যে তাঁর পিতা ডিউক অব ইয়র্কেরই পুত্র এ বিষয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করলেন। অনেকের মনেই এই সন্দেহ জেগেছিল আগে থেকেই, এই কথায় তা দৃঢ়তর হল। কিন্তু এই তথ্যই যদি সত্য হয়, তাহলেও তাঁর প্রথম সন্তানের সিংহাসনের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ চতুর্থ এডওয়ার্ড উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনলাভ করেন নি, তিনি শেষতম ল্যাংকাস্টারীয় সম্রাট ষষ্ঠ হেনরীকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করেন।

তিনদিন পরে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে পার্লামেন্টের অধি-বেশন বসল, তাঁরা ঘোষণা করলেন চতুর্থ এডওয়ার্ড আর এলিজাবেথের বিবাহ অসিদ্ধ, তাঁদের সন্তানাদি অবৈধ এবং সেই কারণে একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন লর্ড প্রোটেকটার, তাঁকেই রাজমুকুট ধারণের জন্য অনুরোধ জানানো হল, তিনি প্রথম-দিকে একটু কপট অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে অবশেষে এই অনুরোধ মেনে নিলেন। তাঁকে তখন তৃতীয় রিচার্ডরূপে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল, কিন্তু করোনেশন উৎসব এবং তৎসংক্রান্ত মিছিলাদি অনুষ্ঠিত হল দশদিন পরে ৬ই জুলাই তারিখে।

এর অল্পকাল পরেই টাওয়ার অব লন্ডনে প্রিন্সদের অবস্থা এক বিশ্রী আকার ধারণ করল। তারা যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। কি হল তাদের? তাদের কি টাওয়ার অব লন্ডন থেকে সেরিফ হ্যাটনের আবাসে স্থানান্তরিত করা হল? কারণ এমন আশংকা ছিল যে, তাদের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে অপর কেউ সিংহাসন নিয়ে টানাটানি করতে পারেন। অন্ততঃ কোনো-রূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ না করে লেখক হিউ রস এই সম্ভাবনায় ইঙ্গিত করেছেন। কিংবা প্রিন্সদের টাওয়ারে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটেছিল? অথবা তাদের হত্যা করে টাওয়ারেই কবরস্থ করা হয়? তাই যদি হয়, তাহলে এই ঘৃণিত অপরাধের জন্য দায়ী কে? তৃতীয় রিচার্ড

না হেনরী টিউডর যিনি তাঁকে পরাজিত করে সিংহাসনে বসলেন? এ'রা দুজনেই এই কান্ড করতে পারেন। দুজনেরই অভিসন্ধি পরিষ্কার।

রিচার্ড জানতেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে একদিন তাঁর বিরুদ্ধে একটা বিরোধী শক্তি গড়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রথমতম সন্দেহভাজন তিনি। যখন প্রিন্সদের টাওয়ার অব লন্ডনে আর খেলা করতে দেখা গেল না তখন বিশপ অব এলি এবং জন মর্টন প্রচার করলেন যে, প্রিন্সদের হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের খুল্লতাত রিচার্ড-ই এই কাজ করেছেন। জন মর্টন ছিলেন ল্যাঙ্কাস্টার-পন্থী।

হেনরীর অভিসন্ধিটা তেমন স্পষ্ট নয়। প্রিন্সভগ্নি চতুর্থ এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি, কিন্তু চতুর্থ এডওয়ার্ড এবং এলিজাবেথ উডভিলের প্রতি প্রযুক্ত এ্যাক্ট অব ব্যাসটার্ডি তুলে না নিলে এ বিবাহ সম্ভব নয়। তাই এই আইনটির নাম তালিকা থেকে কাটা হল এবং প্রকাশ্যে এই এ্যাক্টের বহ্ন্যুৎসব করা হল। তখনও যদি রাজকুমারদ্বয় জীবিত থাকেন তাহলে হেনরীর পক্ষে বিষম সংকট, কারণ ব্যাসটার্ড এ্যাকট বাতিল হওয়ায় ওরা বৈধ সন্তানের মর্যাদালাভ করেছে। এলিজাবেথের সঙ্গে তার ভাই দুটিও বৈধ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পঞ্চম এডওয়ার্ড এখন অনাগত সম্রাট হিসাবে গৃহীত হতে পারেন। তাই হেনরীর পক্ষে পথ পরিষ্কারের জন্য দুই ভাইকে অবলুপ্ত করা সম্ভব। পথ পরিষ্কার রাখার জন্যই এই হত্যার প্রয়োজন হয়েছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে, ঘটনার প্রায় দুই শতাব্দী পরে, এই হত্যারহস্য প্রায় সমাধানের পথে পৌঁছেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিতর্কের আর এক ধারালো সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে হোয়াইট টাওয়ারে যাওয়ার সিঁড়িটা যখন মেরামত করা হচ্ছিল তখন আবিষ্কৃত হল দুটি কিশোরের কঙ্কাল, সিঁড়ির নীচে পাথর চাপানো অবস্থায় পড়েছিল। রয়্যাল সার্জান অর্থাৎ রাজবৈদ্য স্বয়ং পরীক্ষা করে অভিমত দিলেন যে এই কঙ্কাল দুটি হতভাগ্য এডওয়ার্ড এবং তার ভাই রিচার্ড অব ইয়র্কেরই বটে। কঙ্কাল দুটির অস্বাভাবিক অবস্থান এই সন্দেহ সুদৃঢ়ীভূত করল যে, রাজকুমারদের মৃত্যুর পিছনে ঘৃণিত চক্রান্ত আছে। দ্বিতীয় চার্লস এই অভিমত মেনে নিলেন। রাজবৈদ্য যা বলেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য।

তারপর কঙ্কাল দুটি নতুন করে সমাধিস্থ করা হল ওয়েস্ট মিনিস্টারে হেনরী দি এইটথ চ্যাপেলের প্রাঙ্গণে। এই অপরাধের জন্য দায়ী করা হল তৃতীয় রিচার্ডকে। লাতিন ভাষায় সমাধি ফলকে লেখা হল—"এই ঘৃণিত কর্মের জন্য জঘন্য চরিত্রের খুড়ো-মশাই রিচার্ড সম্পূর্ণ দায়ী, তিনি জোর করে সিংহাসনে বসার লোভে এই হত্যা করেছিলেন।"

সুতরাং তৃতীয় রিচার্ড বিরোধী এই টিউডর সূত্রের তথ্যই স্বীকৃত হল। কিভাবে এই ধারণা সৃষ্টি হল এবং ক্রমবিকাশ সম্ভব হল এই প্রশ্ন উঠতে পারে।

'দি ম্যারেজ মেড ইন ব্লাড' গ্রন্থের লেখক হিউ রস উইলিয়ামসন এই চিত্ত-চমকপ্রদ রহস্যের সুপ্রাচীন জট ছাড়াবার চেষ্টা করেছেন। ইংলন্ডের ইতিহাসে এই কাহিনী এক পরমাশ্চর্য কাহিনী। লোভ এবং ক্ষমতা অধিকারের নেশা মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যায় এই কাহিনী তারই এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক তাই আগামী বারে শেষাংশটুকু আলোচিত হবে। ঐতিহাসিক এবং উপন্যাসকার দুইপক্ষই এই কাহিনীতে অনেক রঙ চড়িয়েছেন। হিউ রস উইলিয়ামসনের তথ্যভিত্তিক আলোচনা এই রহস্যকাহিনীর আকর্ষণকে দৃঢ় করে তুলেছে।

—অভয়ঙ্কর

MARRIAGE MADE IN BLOOD: By HUGH ROSS WILLIAMSON: Published by Michael Joseph: Price: 35 Shillings.

সাহিত্যের খবর

পরলোকে কাজী আবদুল ওদুদ।। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কাজী আবদুল ওদুদ আর নেই। গত ১৯ মে সন্ধ্যা সাতটায় তিনি পরলোকগমন করেছেন। চোখের সামনে ফুটে উঠলো কয়েকটি বিগত মুহূর্ত। প্রথম যেদিন তাঁকে দেখেছিলাম—বোধ হয়, আজ থেকে আট-দশ বছর আগের একটা দিন। গিয়েছিলুম তাঁকে একটা আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাতে। আশংকা ছিল মনে অনেক—দেখা হবে কি না অথবা দেখা হলে কি বলবেন। কিন্তু যখন দেখা হল, তখন এক মুহূর্তে সমস্ত ভয়-ভাবনা কোথায় যেন উবে গেল। কি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর মানুষটি। কোথাও এতটুকু অভিমানের চিহ্ন নেই। কাজীসাহেব ছিলেন সকলেরই প্রিয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। বিছানা ছেড়ে প্রায় উঠতেই পারতেন না। হাত-পা সব সময় কাঁপতো। এবছর 'শিশিরকুমার পুরস্কার' পেয়েছেন তিনি। মাত্র কয়েক দিন আগে যখন এই পুরস্কার প্রদান করা হয়, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী কোহিনুর বেগম। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর অসুস্থতার কথা জানান। কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি ইহলোকের মায়া ছিন্ন করে চলে যাবেন, তা ভাবতে পারিনি।

আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর আগে কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম। কর্মজীবনের সূত্রপাত অধ্যাপনার মাধ্যমে। প্রথমে ছিলেন ঢাকায়, পরে চলে আসেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকেই চলে তাঁর সাহিত্য সাধনা। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'তরুণ' 'আজাদী' 'নদীবক্ষে' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক গবেষণা গ্রন্থ রচনার জন্য। 'বাংলার জাগরণ', 'শাশ্বত বঙ্গ', 'শরৎচন্দ্র ও তারপর', 'হজরত মহম্মদ ও ইসলাম', কবিগুরু গ্যয়টে (২ খণ্ডে) প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব 'কোরাণ শরীফে'র বাংলায় অনুবাদ। ইংরাজীতেও তাঁর অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদের আর একটি পরিচয় না উল্লেখ করলে বোধ করি, তাঁর সম্পর্কে অনেকটাই অজানা থেকে যাবে। তিনি ছিলেন আজন্ম সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী। অথচ ধার্মিক। তখন তিনি শরৎচন্দ্র ও তারপর গ্রন্থটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ফিরেছেন সবে ঢাকা থেকে। জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কেমন দেখলেন সেখানে?' কেমন যেন একটা হতাশার সুর শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে। উত্তর এড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন—"একই ভাষায় কথা বলি, অথচ দেখুন, আমরা আজ দুই দেশের নাগরিক। ধর্ম মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবে—এ আমি সইতে পারি না। ধর্ম

নয়—আসলে কি জানেন, ধর্মের নামে রাজনীতিই আমাদের এত দূরে ঠেলে দিয়েছে।" কাজী ওদুদের অন্তরতম প্রদেশের মর্মবেদনা আজো ইতিহাসে কান পাতলে স্পষ্ট শোনা যায়।

ভাষা ব্যবহারের বহুবিধ সমস্যা ।। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। সাহিত্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ভাষা। প্রতি লেখকই তাই সাহিত্যে ভাষা ব্যবহার নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। সম্প্রতি মস্কোতে রুশ লেখকদের তৃতীয় কংগ্রেস হয়ে গেল। এতে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হল সাহিত্যে ভাষা ব্যবহার নিয়ে।

প্রখ্যাত রুশ লেখক লিওনিদ সোবোলভ ভাষাকে একই সঙ্গে লেখকের বন্ধু এবং উৎপীড়ক আখ্যা দেন। তিনি বলেন—নিজের লেখা সম্বন্ধে খুঁতখুঁতে লেখকমাত্রেই জানেন, একটি বিশেষ শব্দ, বিশেষ সেই শব্দটি যা চিন্তা, আবেগ বা চিত্রকল্পের সূক্ষ্মতা সব থেকে সফলভাবে প্রতিফলিত করতে সমর্থ, কেমন করে তা কেবলই তাঁকে এড়িয়ে চলে। কি সাংঘাতিক এই শব্দ। কেবলই পালিয়ে বেড়ায়, কেবলই লুকিয়ে থাকে তা অপ্রয়োজনীয়, প্রচলিত, ব্যঞ্জনাহীন শব্দের আড়ালে।'

মিখাইল আলেকসিয়েভ ভাষাকে শিল্পীর রঙ-মেশানোর পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন—'সাহিত্যশিল্পী এই নানা রঙের পাত্র থেকে বহুবিধ রঙের আলোছায়া নিয়ে এঁকে তোলেন তাঁর চিত্রকল্প।" সোভিয়েত কবিতার বিকাশের উপায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন—"ভাষাকে আমরা কাব্যের বিকাশের সহায়ক ও বাহন বলেই গণ্য করি। ...তবে ভাষার কাজ শুধু এটুকু নয়, আরো বেশি। বৃক্ষ বা কয়লা যেমন সৌরতেজ প্রতিফলিত করে, তেমনি প্রতিটি শব্দ জাতির আত্মিক শক্তির ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। এই আত্মিক শক্তির নিষ্কাশনই কবির কাজ।" ভাষা যে সাহিত্যের উচ্চ শিল্পগুণসমন্বিত সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ, একথা উল্লেখ করলেন সুখ্যাত কাল্মিক কবি দাভিদ কুগুলতিনভ। সাহিত্য এবং কবিতার ভাষা এবং শব্দ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাঁদের পক্ষে বিষয়টি অনুধাবন প্রয়োজনীয়। শব্দ শিশুর হাতের খেলনা নয়—শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশ ও জাতির যুগযুগান্তরের ইতিহাস।

আজকের আমেরিকান কবিতা সম্পর্কে ।। আজকের আমেরিকান কবিতা কোন পথে—সে সম্পর্কে একজন তরুণ অস্ট্রেলিয়ান কবি-সমালোচক কয়েকটি উল্লেখ্য মন্তব্য করেছেন। 'পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়ার' বর্তমান সংখ্যায় 'অস্ট্রেলিয়ান-আমেরিকান কানেকসান' নামের এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি করেছেন জেমস টিউলিপ। তিনি লিখেছেন—'১৯৪৫ এর পর থেকে আমেরিকান কবিতার যে গতিপ্রবাহ চলেছে, সে সম্বন্ধে আমার সাধারণ ধারণা হল, তা সূক্ষ্ম কৌতুকবোধের পুনরাবিষ্কার। দশ-পনের বছর আগে যখন লাওয়েল নিজেকে নিয়েই কবিতায় বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন, তখন কু-ম্যানের মত এলিয়ট প্রভৃতি, যা সাংকেতিকতার আভিধানিক অর্থ কবিতা থেকে অন্তর্হিত হল। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে আমেরিকার কবিতা হয়ে উঠেছে লিটারেল। অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক কবিতা এদিক দিয়ে স্বতন্ত্র।" প্রবন্ধটিতে সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতা সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য আছে। যা সাহিত্যরসিককে ভাবিয়ে তুলবে।

কম্বোডিয়ায় মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে ।। কম্বোডিয়ায় মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী হয়েছেন দিল্লি এবং কলকাতার লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা শুধু সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, প্রতিবাদ সভাও আহ্বান করেছেন। দিল্লির সভায় ভাষণ দেন নাগার্জুন, অমৃত প্রীতম প্রমুখ।

কলকাতায় গত ১৫ মে স্টুডেন্টস হলে এই ব্যাপারে একটি সভা হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। সর্বশ্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বেদুইন চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক মুখার্জি, ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ মার্কিন আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য রাখেন। শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

নতুন বই

সাহিত্য-বাতায়ন—(প্রবন্ধ সংকলন) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ক্লাসিক প্রেস। কলিকাতা—১২। দাম বারো টাকা মাত্র।

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতি-কবিতা প্রভৃতি প্রশংসিত গ্রন্থাবলীর লেখক ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত সাহিত্য-বাতায়ন গ্রন্থটিতে বাংলা সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় ধারাবাহিকত্ব অনুসরণ করা হয় নি, ফলে প্রতিটি রচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ। 'ঈশ্বর গুপ্ত, আধুনিকতার সূচনা' নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্য সমাবেশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশজ ঐতিহ্য প্রীতির মূল্যায়ন করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনা এই বক্তব্য লেখক সপ্রমাণ করেছেন। এরপর বীরাঙ্গনা কাব্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল, এই বীরাঙ্গনা কাব্যকে শ্রীঅরবিন্দ ভার্জিলের রচনার সমগোত্রীয় বলেছেন। শিল্পসঙ্গত এই লিরিকধর্মী কাব্যের শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ্য। এরপর বাংলা সাহিত্যের গোড়ার যুগের প্রাণ-পুরুষ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের : মনন ও শিল্প এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মনন ও শিল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধ দুটি সুলিখিত। এই দুই মনীষীর আলোচনার প্রয়োজন ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক, কাব্যাদর্শের বিরোধ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধ দুটিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া এই গ্রন্থে বিভূতিভূষণ, বাংলাদেশে শেক্সপীয়র চর্চা, বাংলা শিশুসাহিত্য, প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। শেষ প্রবন্ধ 'অশ্লীলতা ও সাহিত্য'-এ অজস্র তথ্য সমাবেশে লেখক নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যপাঠক এবং ছাত্র-সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

দিল্লী নব নব রূপে—রাজেন্দ্রলাল হাণ্ডা প্রণীত। অনুবাদক—অজিত দত্ত। প্রকাশক : দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং (প্রা) লিমিটেড, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৬ টাকা মাত্র।

১৯৪০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে বিশ্বজগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, দিল্লীর রঙ্গমঞ্চেও অনেক অদল-বদল ঘটেছে, কুশীলব পালটেছে। এই পরিবর্তনশীল

নাটকে দ্বিতীয় ভূমিকা প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ আপিকে নব দ্বিতীয় নবযুগের পরিচয় দিয়েছেন রাজেন্দ্রলাল হাল্দার। গ্রন্থটির মূল সংস্করণের যে জনপ্রিয়তা আছে তার প্রমাণ একাধিক সংস্করণ। বাংলায় সুন্দর ভাষায় প্রায় মৌলিকের মত অনুবাদ করেছেন অজিত দত্ত। মূল হিন্দির সুরটি অক্ষুন্ন রেখে তিনি অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য এবং তথ্যসমৃদ্ধ। মুদ্রণ এবং প্রচ্ছদ মনোরম; সেই অনুপাতে দাম অনেক কম।

বাঙালী মনীষীর শিক্ষা চিন্তা ও সাধনা—অধ্যাপক সুখময় সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—স্ট্যাণ্ডার্ড বুক এজেন্সী (প্রা) লিঃ। কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যে সব বঙ্গীয় মনীষীর অবদান অবিস্মরণীয় তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা কদাচিৎ হয়। অথচ মনীষীদের শিক্ষা চিন্তা বিষয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যথেষ্ট আলোচনা হয়ে থাকে। সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুখময় সেনগুপ্ত এক হিসাবে এই পথে প্রথমতম। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ, শ্রীঅরবিন্দ ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রভৃতি বিষয়ে ঠিক এই ধরনের আলোচনা আগে হয়েছে কিনা জানা নেই। এতগুলি মনীষীর শিক্ষা চিন্তা ও সাধনার ধারা একত্রে পরিবেশনের ফলে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতগুলি মনীষীর শিক্ষা চিন্তা প্রসঙ্গ একই গ্রন্থে থাকায় গ্রন্থটি 'রেফারেন্স বুক' হিসাবে হাতের কাছে রাখা প্রয়োজন হবে। ইংরাজ এদেশে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছেন কিন্তু তার পূর্বে কিছুই যে ছিল না তা নয়, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানুরাগ এদেশে ছিল। ১৭৭৪ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণকাল সেই কালের কথা অজস্র প্রামাণিক তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ করে লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই কারণে তিনি অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটি সমুদ্রিত এবং দাম অপেক্ষাকৃত কম।

বিজয়ামৃত — (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনালেখ্য) প্রথম খণ্ড। শ্রীরাইমোহন সামন্ত, এম-এ, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপ্যারীমোহন সামন্ত। ২৪।১ ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬। দাম—আট টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবনালেখ্য লিখেছেন তাঁরই একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত রাইমোহন সামন্ত। এই খণ্ডে স্বামী বিজয়কৃষ্ণের জন্মকাল ১৮৪১ থেকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক পদ ত্যাগ অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সবিস্তারে লেখা হয়েছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্যের বংশে, এই বংশে তিনি অদ্বৈতাচার্য থেকে দশম পুরুষ। বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় প্রথম বাণী দান করেন "পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস না হইলে প্রীতির উদয় হয় না। প্রীতি না হইলে প্রিয় কার্য সাধন করা যায় না। ঈশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার হৃদয় পাষাণময়, তাহা কর্তৃক কোনো পাপই অকৃত থাকে না"—

বহুচিত্র ও তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থটি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রভুর অনুরাগী মহলে উপযুক্ত সমাদর লাভ করবে এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

তিনি আসছেন—(বিচিত্র কাহিনী)—বামদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক — শিল্পশ্রী প্রকাশনী। ১৬এ, সুইনহো স্ট্রীট, কলি-৪২। দাম আড়াই টাকা।

"ব্যাণ্ডেল গীর্জায় যাওয়া আমার কাছে তীর্থযাত্রা" এই কথা বলেছেন ভূমিকা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের লেখক। এরপর তিনি ব্যাণ্ডেল চার্চের ঐতিহাসিক পটভূমি বিধৃত করে বলেছেন—"একটি মুহূর্তকাল থেকে খসে পড়া বিচ্ছিন্ন ঝরা পাতার মত কয়েকটি ঘণ্টা আমি কুড়িয়ে এনেছি যীশুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য লেখক হিন্দু কিন্তু মহৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেই কারণে গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ভক্তিরসাপ্লুত এই কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে এবং আঙ্গিকে নতুনত্ব আছে। কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি, বরং পাঠককে শেষ পর্যন্ত টানে। 'তিনি আসছেন'—এক নতুন স্বাদের পুরাতন কাহিনী।

ডিরোজিওর—কবিতা অনুবাদ ও সম্পাদনা পল্লব সেনগুপ্ত, শুকসারী প্রকাশক, ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কল-১৪। দাম—তিন টাকা।

দীর্ঘদিন পর হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিওর এক গুচ্ছ কবিতা এবং তার অনুবাদ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এ দেশে ডিরোজিওর কাব্যানুবাদ করেছেন ইতিপূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্ভবত পল্লব সেনগুপ্তই তৃতীয় অনুবাদক। মূলের অজানুগত্য এবং ছন্দোরীতি যথাসাধ্য বজায় রাখবার চেষ্টা হয়েছে। 'হে ভারত, স্বদেশ আমার' বিখ্যাত কবিতাটির সঙ্গে আরো অনেকগুলি কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। ডিরোজিওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমস' ১৮২৭ সালে প্রকাশিত হয় যখন তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করছেন। ১৮৩১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বহু লেখা সাময়িক পত্রিকায় বেশ কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে। সে সব কবিতার কিছু এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এদেশে দেশপ্রেমের বাণী যাঁরা প্রথমে শুনিয়েছেন, ডিরোজিও তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম কবিতায় ধ্বনিত। ডিরোজিওর কবিপ্রতিভার যথার্থ বিচার এখনো হয়নি। এ গ্রন্থটি গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হবে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

শিলালিপি—বৈশাখ ১৩৭৭। অন্তরঙ্গ। ২২।২এ বাগবাজার স্ট্রীট। কলকাতা—তিন। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতাপ্রধান পত্রিকা 'শিলালিপি'র পঞ্চম সংকলন বেরিয়েছে এই বৈশাখে। সাম্প্রতিক মননশীলতায় কাগজটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। লেখকদের মধ্যে আছেন বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। পত্রিকাটির সম্পাদক অমল মুখোপাধ্যায়, কণাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রণব চক্রবর্তী।

পঁচিশে বৈশাখ (মিনি সংকলন)—সপ্তদ্বীপা প্রচেষ্টা। এ।১২৪ কংকরবাগ কলোনী। পাটনা-১। দাম পঁচিশ পয়সা।

বিহার থেকে প্রকাশিত এই প্রথম মিনি সংকলনটি লেনিন ও রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সবই আছে এবং লিখেছেন, জিয়া হায়দার, [illegible] দত্ত, অসীম ভৌমিক, জীবনময় দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, শ্যামলী সরকার প্রভৃতি। এই পত্রিকাটি পরিচ্ছন্ন এবং প্রতিশ্রুতিময়। রচনাগুলির মধ্যে মুন্সিয়ানা আছে। ছাপা সুন্দর।

সপ্তদ্বীপা—(সম্পাদক রবীন দত্ত ও জীবনময় দত্ত)—২য় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৭০। এ।১২৩, কংকরবাগ কলোনী, পাটনা—১। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

বিহার থেকে প্রকাশিত এই প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি ক্রমশঃই বেশ বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে। পূর্ব পাকিস্থানে নিষিদ্ধ রচনা বলে মুদ্রিত 'বাঙালী মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' এই সংখ্যার সম্পদ। এ ছাড়া সুশীলকুমার বিশ্বাস, শ্যামলী সরকার, জীবনানন্দ মুন্সী, দিলীপকুমার মিত্র, সুস্মিতা রায়, রমা ঘোষ প্রভৃতির রচনাবলী সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। পত্রিকাটির অধিকতর উন্নতি কামনা করি।

বৈকুণ্ঠের খাতা

প্রায় বিয়াল্লিশ বছর ধরে নিয়মিত গল্প উপন্যাস লিখে আসছেন শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনো বিশ্রাম নেননি। তিনি সৃজনশীলতায় ক্লান্তিহীন। দ্রষ্টার মতো অতীত-ভবিষ্যতের দিকে চোখ রাখতে রাখতে এগিয়ে এসেছেন বর্তমান কাল অবধি। স্বভাবতই জীবনের অভিজ্ঞতা ও সময়ের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর উপন্যাসের স্তরে স্তরে।

এখন তাঁর বয়স বাহাত্তর বছর।

মনে পড়ে, প্রায় এক যুগ আগে জনৈক তরুণ সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, তারাশঙ্কর বিশেষ ঋতুর ওষধি নন, বাংলা-সাহিত্যের বনস্পতি।

এই মন্তব্যে তীক্ষ্ণ আলোড়িত হয়েছিলাম সেদিন। বুঝেছিলাম, বনস্পতির মতোই বাংলাদেশের মাটির গভীরে তাঁর শিকড় প্রসারিত। বহু দূরের হাওয়ার স্পর্শ যেমন বনস্পতি অনেক আগে পায়, তেমনি তারাশঙ্কর এদেশের ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন-সংবাদ উপলব্ধি করেছিলেন সকলের আগেই।

পরে ভাবতে চেষ্টা করেছি, তাঁর জীবনের বিকাশ ও বৃদ্ধির কালটা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটের দিনে তারাশঙ্কর ছিলেন তরুণ। সারা পৃথিবী, বিশেষ করে সমগ্র য়ুরোপ তখন জীবন-জিজ্ঞাসায় জটিল। তার ছোঁয়া লেগেছিল বাংলাদেশের সাহিত্যেও। কিন্তু য়ুরোপীয় গুরুমশাইদের কাছে দীক্ষা নিতে রাজী হননি তারাশঙ্কর। জীবনরসের সাধনায় মগ্ন ছিলেন তিনি। বিশ্লেষণের মনোভূমিতে প্রবেশ না করে গোটা মানুষের সান্নিধ্য কামনা করছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে। হয়তো সাহিত্যের উত্তেজনাকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্যই তাঁর চিন্তা ও চেতনায় উৎসে সৃষ্টি হয়নি জটিলতা। কিন্তু সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতার বিশেষ সংবাদ সাড়া জাগিয়েছিল তাঁর শিল্পীপ্রাণে। জাগ্রত হয়েছিলেন তিনি 'গণদেবতা'র অভ্যর্থনায়।

এই প্রবল জীবনবোধ ও সময়চেতনার জন্যই বাংলাদেশের সচেতন পাঠক ও সমালোচকরা প্রথম দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন তাঁর দিকে। সকলেই দেখেছেন তাঁর উপন্যাসে সমাজের সার্থক চিত্ররূপ। এজন্যেই ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহচর্য ছিল অনেকের কাছে মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষিত।

অনেকে তাঁর উপন্যাসের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও মানবচরিত্রের নিজস্ব ভঙ্গির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান। সন্দেহ নেই, রাঢ় অঞ্চলের মানুষ, তাদের দুর্ধর্ষ পৌরুষ ও আদিমতা, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি—সবই তাঁর লেখায় সজীব হয়ে উঠেছে। 'ধাত্রী-দেবতা' উপন্যাসের সূত্রপাত করেছেন তিনি রাঢ়ের মাটির একক বৈশিষ্ট্যের চিত্র দিয়ে। তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> "বাংলাদেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজ-রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিক বর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বনফুল আর খৈরি-কাঁটার গুল্ম, বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তাল গাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মতো ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত।"

এই স্থানচেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তারাশঙ্করের কালচেতনা, মাটি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। রাঢ় অঞ্চলের নানাশ্রেণীর মানুষ, তাদের ভাষা ও বাচনভঙ্গি, মনোজগতের প্রবণতা, ওখানকার লাল মাটির রুক্ষতা, শালবনের দীর্ঘ প্রসারিত ব্যাপ্তি, মাঠ-ঘাট-মন্দির, কাহার-বাগদী, কুলি-কামিন, চাষী-জমিদার, বোষ্টম-বাউল, বেদে-বাউরি-সাপুড়ে, রাজনীতি ও অর্থনীতি তাঁর বাস্তবতার কেন্দ্রীয় পরিমণ্ডল তৈরী করেছে। এসব নিয়েই তারাশঙ্করের বিকাশ ও বিবর্তন।

স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালচেতনার একটি বিশিষ্ট দিক প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "আমাদের সামাজিক ইতিহাস-লেখক ও ঔপন্যাসিকগণ একটা কথা বিশেষ স্মরণ রাখেন না যে, মধ্যযুগ

হইতে আরম্ভ করিয়া গত দুই-তিন শতাব্দী জমিদারবংশই প্রদেশের প্রাণ-শক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যত স্বাধীন, অপ্রতিহত প্রভাব ভূস্বামিকুলের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিত-বাৎসল্য, সৌন্দর্যরুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছে। গত দুই-তিনশত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে—তাহদেরই কেন্দ্র-বিকীরিত শক্তি দেশের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জনসাধারণের বিশেষ কোন আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ধারণশক্তি ছিল না—জমিদারদের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত। দেশের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ, নিয়মশৃঙ্খলার পরিপন্থী বিদ্রোহশক্তি ছড়ান ছিল, তাহা জমিদারদের অত্যাচারের দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া ঐক্য ও সংহতি লাভ করিত। জমিদারদের দানশীলতা নদী-প্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্ত পৌরুষ জাতির শক্তিকে উদ্বোধিত ও সংঘবদ্ধ করিত, তাহার ক্রমপ্রসারিত দাবিদাওয়া জনসাধারণের বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্বভাবসিদ্ধ চতুরতাকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিত। সুতরাং জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসাবে এই অভিজাতবর্গের সাহিত্যে ও ইতিহাসে স্থান আছে।"

তাই বলে তারাশঙ্কর কখনো জমিদারদের সম্পদ ও শক্তির চিত্রই শুধু আঁকেননি, বরং তাঁদের ধ্বংসের ছবিই এঁকেছেন। যান্ত্রিক সভ্যতা ও পুঁজিবাদের কাছে সামন্ততন্ত্রের পরাজয়চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে 'কালিন্দী, 'জবানবন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে। যে আলোয় তিনি সামন্তবাদের পতনচিত্র এঁকেছেন, সে আলো প্রদীপের নয়, শেষ-প্রজ্জ্বলিত চিতার। হয়তো তার মধ্যে কিছুটা হাহাকার আছে। কান পাতলেই শোনা যাবে ধ্বংসের ও প্রাসাদ বিদীর্ণ হবার শব্দ। তারাশঙ্কর এই শব্দ শুনতে পেয়েছেন ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে।

একদিন তারাশঙ্করকে প্রশ্ন করেছিলাম ঃ প্রাচীন জমিদারী ব্যবস্থায় পতনে কি আপনি দুঃখবোধ করেন? এই দুঃখ কি আপনার ব্যক্তিচিত্তের, না শিল্পী-সত্তারও?

গভীর মমতার সঙ্গে তারাশঙ্কর বলেন, জানি, যা অনিবার্য তাকে ঠেকানো যাবে না, তার পতন হবেই। তবু তার প্রতি আমার শিল্পীপ্রাণের সহানুভূতি আছে। তাকে আঁকড়ে থাকতে চাইনি আমি, আসন্ন কালকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি।

তারপর একটু থেমে বললেন, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের মল্লিকদের বাড়ী গেছেন কখনো? যাকে মার্বেল প্যালেস বলে লোকে জানে। এখন সেই বাড়ীটা শূন্য, খাঁ-খাঁ করছে। অথচ একদিন লোকজনে ভর্তি ছিল অন্দর-বাহির। বড়-কর্তার ঘুম ভাঙলে, তার খড়মের শব্দে সারা বাড়ীটা চঞ্চল হয়ে উঠত।

একটা উপমা দিয়ে বললেন, ঐ বড়কর্তা ছিলেন বাঘের মতো। অরণ্যের নিস্তব্ধতায় তার বাস। তবু তার প্রতি আমার একটা মোহ ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে তাঁর কয়েকটি গল্পের নাম—'যাদুকরী' 'বেদেনী' 'নারী ও নাগিনী' 'তারিণী মাঝি' 'ডাইনী' প্রভৃতি। সমস্ত রকম নীতিজ্ঞানকে বিসর্জন দিয়ে এইসব গল্পের প্রতিটি চরিত্র যেন আদিম বর্বরতায় জেগে ওঠে। মনে পড়ে 'বেদেনী' গল্পের কয়েকটি লাইন। তারাশঙ্কর অবিস্মরণীয় শিল্পসার্থকতায় এঁকেছেন উক্ত গল্পের নায়িকা রাধার একটি বিশেষ মুহূর্তের ভাষাচিত্র ঃ

> "কালো সাপিনীর ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা।... সে যেন মদির সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল। মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাস ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনি চোখে ধরাইয়া দেয় একটি নেশা।"

কিংবা গ্রামীণ কুসংস্কারের অনন্য চিত্র 'ডাইনী' গল্পের কয়েকটি পংক্তি ঃ "একটা ভাঙা ডালের সুচালো ডগায়...তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাইনী। আকাশপথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পক্ষপুচ্ছ পাখীর মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে।"

এভাবেই জীবনের, সমাজের, সময়ের—সন্ধ্যা ও আরণ্যক—ক্রুদ্ধ ও শান্ত—আগত ও বিগত—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, স্বদেশী আন্দোলন—সমস্ত দিকের আয়ত ও লোকায়ত ছবি এঁকেছেন তারাশঙ্কর।

কালরাত্রি

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর নতুন উপন্যাস 'কালরাত্রি'। গ্রামীণ কিংবা বিগতজমানের কাহিনী নয় এ উপন্যাস। অতি-সাম্প্রতিক বর্তমান ও একালের নগরজীবন তার পট-ভূমি। আজকের অস্থিরতা, উদ্দামতা, অসহায়তা, বিপর্যয় ও মূল্যহীনতার কারণ-অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারাশঙ্কর যেন অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান দিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বলেন, 'আমার এ উপন্যাসে যে কালরাত্রির কথা বলা হয়েছে, তার সূত্র-পাত ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। আজও একটানা অন্ধকারের মধ্য দিয়েই আমাদের দিন চলে যাচ্ছে। হয়তো এ কালরাত্রির প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আরো অনেক আগে। এখনো তার উদয়কাল আসে নি।'

আমি তাঁর বলার ভঙ্গি লক্ষ্য কর-ছিলাম। একালের অনির্দেশ্যতা যেন ভাষা পাচ্ছিল তাঁর কণ্ঠস্বরে। তিনি বললেন, 'কল্লোল আমলে আমরা বিবাহের চেয়ে বড় জীবনকে কামনা করেছিলাম সাহিত্যে। অনেকে চেয়েছিল 'প্রাচীর ও প্রান্তর'কে সমান করে দিতে। কিন্তু প্রান্তরে বাস করা যায় না, প্রাচীর দিয়ে অন্দর তৈরী করে নিতে হয়।'

এ উপন্যাসের নায়ক অংশুমান তার ডায়েরীতে লিখছে ঃ 'আজ সীতা চলে গেল। কালরাত্রে সে এখানে ছিল। আমি তাকে জোর করে আটকে রেখেছিলাম।'

তারাশঙ্কর লিখেছেন ঃ 'সাহিত্যে আমরা এ সত্যের সহজ প্রকাশ গ্রহণ করতে পারি নি, কিন্তু আজ সমাজে তা বলে তো সত্য—সে মুখ লুকিয়ে অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করে থাকবে না। মানুষের দেহ কোষে কোষে এই প্রবৃত্তি রিপু হয়ে উঠতে চাচ্ছে ও উঠছে আশ্চর্য—১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ দেশ—যেন আর একরকম ছিল। তার আগে এ প্রবৃত্তি ছিল, ছিল না কে বলবে?'

অংশুমানেরও পতন ঘটেছে ঐ একই সময়ে ঃ স্বাধীনতালাভের ঘণ্টাখানেক আগে সে নিজে ভ্রষ্ট হয়েছিল। সেই রাত্রে তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল—অভিশপ্ত হয়েছে সে। ওই পাপে। ভাবতে ভাবতে সে যেন ভেঙে পড়েছিল। যে-সত্যকে সে সত্য বলে মেনেছে তারও উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি।...

কেন এমন হল। একা তো সেই শুধু নয়—সারা দেশেরই এই একই অবস্থা। নিজের জীবন দেশের মানুষের জীবন বিচিত্রভাবে একটা আশ্চর্য উগ্র চেহারা নিয়েছে। প্রাচীন সবকিছুই যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। বুকে যেন অকস্মাৎ কোন প্রসুপ্ত আগ্নেয়গিরি জীবন্ত হয়ে উঠে অগ্ন্যুদ্গার করছে।...

শুধু এ দেশই বা কেন? সারা বিশ্বের সকল দেশের অবস্থাই তো তাই। জ্বলছে;

মানুষেরা যেন জ্বলছে। দেহের ক্ষুধায় মনের ক্ষুধায়—জ্বলছে।

এ হয়তো এই কালেরই আগুন। এই যে কাল—১৯০১ সাল থেকে এই ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এইকালে যেন কালেরই বুকখানাকে বিদীর্ণ করে ভিতরে সঞ্চিত বহু বহু কালের আগুন ফেটে বেরিয়ে—এত কালের সবকিছু জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরই মধ্যে সে এবং সীতা।'

২

সবচাইতে আশ্চর্য লেগেছে আমার 'সীতা' চরিত্রটি। সে একালের শহুরে মেয়ে। অংশুমান যখন তাকে সারা রাত আটকে রেখেছিল, তখন তার কাছে সাত নীরবেই আত্মসমর্পণ করেছিল। এবং সে আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন কুণ্ঠা বা কোন কার্পণ্য ছিল না। শুধু নীরব হয়ে ছিল। সে নীরবতার অর্থ সে বুঝেছিল। কিন্তু বুঝেও জীবনাবেগকে সে সংহত করতে পারেনি। সীতাও এ যুগের মেয়ে। সে তার থেকেও অবিশ্বাসী এবং তার থেকেও উগ্র বিদ্রোহাত্মক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ। এক সময় সীতার দুটো আঙুলে সিগারেট খাওয়ার জন্য গাঢ় নিকোটিনের ছোপ ধরেছিল।'

তার অতীত সম্পর্কে খোঁজ করে নি অংশুমান। প্রথম পরিচয়ের সূত্রে জেগেছিল সীতা হিন্দু নয়, বাঙালি ক্রীশ্চান। বব-ছাঁট চুলওয়ালা এই মেয়েটি অংশুমানকে ভালো বেসেছিল। অংশুমানও যে বাসে নি তা নয়। কিন্তু ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখে নি কখনো। সে ত্যাগ থেকে ভোগকে বেশী ভালোবাসে।

তারাশঙ্কর বললেন, একটি যুবকের কাছে একটি যুবতী ক্রমশ বান্ধবী থেকে প্রিয়-বান্ধবীতে পরিণত হবে—এটাই তো পূর্বনির্ধারিত। পরস্পরের ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত দৈহিক বন্ধনে ধরা দিতে চায়। আগেকার দিনে বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজ তাকে স্বীকৃতি দিতো। এখন বিবাহবন্ধন অসহ্য হলে বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে যায়।

তবু অংশুমানের সঙ্গে রাত কাটিয়ে সীতা যেন হঠাৎ অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। সে সিঁথিতে সিঁদুর পরে আত্মরক্ষার কথাই প্রথম ভেবেছিল। অংশুমানের কাছে চেয়েছিল বৈধভাবে একটি শিশুর মা হবার অধিকার। কিন্তু সে সিঁদুর নয়, একটু লালকালিও সিঁথিতে পরিয়ে দিতে সম্মত হয় নি। সীতা নিজেই খানিকটা লালকালি সিঁথিতে দিয়ে চিরকালের মতো বেরিয়ে গিয়েছিল।

কথায় কথায় তারাশঙ্করবাবু বললেন, এখন প্রতিনিয়ত জীবনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হচ্ছে।

সীতা উগ্র আধুনিকা হলেও তার মধ্যে একটা নিরন্তন নারীপ্রকৃতি ছিল। বাস্তবকে অস্বীকার করার সাধ্য ছিল না তার। মুক্তি, স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রতি আনুগত্য নিয়েও সে আন্তরিকভাবেই গৃহমুখী। না হলে ১৯৬২ সালের পর কলকাতা শহরের কোনো আধুনিকার পক্ষে রানাঘাটে মাস্টারী নিয়ে পালানো সম্ভব হত না।

অন্যদিকে অংশুমান এই বিপর্যস্তকালের ও স্ব-বিরোধী ভাবনায় দোদুল্যমান। পারিবারিক ঐতিহ্যের দিক দিয়ে তার গোঁড়া হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। হয়তো চিরকালই মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা অনেক বেশী বেপরোয়া ও বহির্মুখী হবার শক্তি রাখে। অংশুমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সদাঅতীত ও আসন্ন ভবিষ্যতের ছায়া পড়েছে পুরোপুরি।

তারাশঙ্করবাবু বললেন, 'এ কালের ছেলেদের আমি নিন্দা করতে পারি না। তাদের দোষ নেই। তারা পথ পাচ্ছে না। এমন কি তাদের সামনে কোন আদর্শ পর্যন্ত নেই।'

জিজ্ঞেস করলাম, একে কি সমাজের পতন বলা যায়?

বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, না, পতন নয়—পরিবর্তন। এখন দেশ পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে। এই তো সেদিন কাগজে দেখলাম, কয়েকটি ব্রাহ্মণ মেয়ে কয়েকটি শূদ্র যুবককে বিয়ে করেছে। তার মধ্যে আমি কোনো দোষ দেখি না।

আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বাহাত্তর বছর বয়স্ক স্রষ্টা ও শিল্পীর মুখে এ কোন্ নির্মম সত্যের প্রকাশ? সমাজ বিবর্তনের কঠিনতম সংকটের মুহূর্তেও তিনি যেন স্থির, ভয়ঙ্কর উদাসীন, অথচ প্রাক্তনের প্রতি আসক্তি ও বর্তমানের প্রতি সহানুভূতি তাঁর এতটুকু কম নয়।

৩

তারাশঙ্করবাবু আমার হাত থেকে উপন্যাসটি চেয়ে নিয়ে খানিকটা অংশ পড়ে শোনালেন। আমি চুপ করে শুনছিলাম :

'১৯৬২ সালে অজয় নদের দক্ষিণ তটের উপর দেবগ্রাম গ্রামখানির, (গ্রামখানির নাম দেবগ্রাম) প্রধান জন ছিল চৌধুরীরা। উপাধি চৌধুরী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, গোত্রে কাশ্যপ অর্থাৎ চাটুজ্জে। বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজের মধ্যে নিঃস্ব খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে সম্পদশালী ভূসম্পত্তিশালী ঘর পর্যন্ত অনেক শ্রেণী, অনেক ধাপ বা সিঁড়ি। দিন আনে দিন খায়, না আনলে উপোস যায় থেকে দিয়ে খায় খেয়ে ছড়ায়, ছড়ানো ভাত কাকে খায়, কুকুরে খায় যে ঘরে সে ঘর পর্যন্ত মুটে মজুর কৃষাণ চাকর চাষীভূষি জোতদার পর্যন্ত বহু ধাপ—জোতদার-মহাজন—জমিদার। এর সঙ্গে আবার জাতের শ্রেণীবিন্যাস জড়িয়ে আছে, ছুৎ-অচ্ছুৎ—ব্রাত্য থেকে নবশাক পর্যন্ত অনেক শ্রেণী, উপরের তিনটে শ্রেণী সচরাচর কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।'

লক্ষ্য করছিলাম, তারাশঙ্করের ইতিহাসচেতনা সমাজবিকাশের ধারা বেয়ে প্রায়শ উৎসমুখী। কেননা, তাঁর জীবন ও মানসিকতা ধ্রুপদী চিন্তনে বিশিষ্ট। কোনো ঘটনাকেই বিচ্ছিন্নভাবে ভাবতে পারেন না তিনি। যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে সমগ্র মানব সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সে দৃষ্টির আলোকেই দেখেছেন সমস্যাকে। কেবল পটভূমি আলাদা, বদল হয়েছে বহির্দৃশ্যের। এজন্যেই অংশুমানের মতো শহুরে যুবকের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন নবগ্রামের সামাজিক পরিবেশে। হয়তো অংশুমানের সত্তার গভীরে সেই সমাজের ক্ষীণস্রোত রক্তের কল্লোলে প্রতিধ্বনি তোলে। আর ঐ একই কারণে তাঁকে দিতে হয়েছে তার মা শোভা চক্রবর্তীর (পরে চৌধুরী) পূর্ব পরিচয়।

পড়া থামিয়ে তারাশঙ্করবাবু বললেন, উপন্যাসটির ৯৩।৯৪।৯৫ পৃষ্ঠা ভালো করে পড়ে দেখবেন। পড়ে দেখলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের তথ্য দেওয়া হয়েছে পংক্তিতে পংক্তিতে। তিনি লিখেছেন :

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই দুনিয়ার সমাজের যাত্রার বা থিয়েটারের সাজানো আসর ভেঙে গেছে। অতীতকালের পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকের আমল চিরদিনের মতো শেষ। গ্রীনরুম থেকে রঙ মুছে সবাই বেরিয়ে এসে খোলা মাঠে ময়দানে নেমেছে। পয়সা বদলে নয়া পয়সা হয়েছে। মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে। পারমাণবিক বোমার আঘাতে নাগাসাকি হিরোসিমায় মানুষই শুধু মরে নি, সেখানকার সমস্ত প্যাগোডাগুলো এবং ভিতরের দেবতাগুলো ভেঙে গেছে। পৃথিবীতে কালোবাজার নামে নতুন একটা বিরাট বা বিশাল বাজার আপনাআপনি পথের ধারের হাটের মত বসে গেছে। ...চোরা-

বাজারের আশেপাশে রাত্রির প্রথম প্রহর দ্বিতীয় প্রহরে কালো টাকায় মেয়েরা দেহ বেচেছে।... আবার দেহ কেনাবেচার নেশাটাও বড় একটা কম নেশা নয়। কারণ যুদ্ধ মিটবার পরও যে এই কারবার ফলাও হয়ে চলেছে। সে এই নেশার ঘোরেই বেশী চলেছে।'

'অংশুমান বলে—যার চোখ আছে, মন আছে, অনুভূতি আছে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারে যে গোটা পৃথিবীটাই একটা বিরাট কবরে পরিণত হয়েছে, সে কবরে গোর দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের কবর। ঈশ্বরের মৃতদেহকে সেখানে যুদ্ধের মড়ার স্তূপে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে—হতভাগ্য অজ্ঞাতপরিচয় ধিকৃতদের সমাধি।'

তারাশঙ্কর বুঝতে পারেন, একথা বলার সাহস আছে অংশুমানের। অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। অথচ ঈশ্বরের কবরে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। পুরোহিত, পূজক, পাদ্রী থেকে সব মানুষই অস্বস্তি বোধ করছেন। কেননা, তার বাবার নাটুকে দলের সস্তা শিবকিংকরের কাছে প্রথম শিখেছিল মদ খেতে। সে-ই তাকে অতসীর মুখে তুলে দিয়েছিল। পনের বছর বয়সে নারীদেহের প্রথম আস্বাদ পেয়েছিল সে অতসীর কাছে। তারিখটা ছিল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল।

৪

আমাদের আলোচনার মাঝখানে এলেন এক ভদ্রলোক। তারাশঙ্করবাবু বললেন, ওকে জিজ্ঞেস করুন, অনেকটা বলতে পারবে। আমার এ উপন্যাসের প্রুফ দেখেছে মনোযোগ দিয়ে।

বললাম, বলুন, কালরাত্রি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

তিনি সংক্ষেপে বললেন, আমার মনে হয় এ উপন্যাসের প্রতিটি মানুষই কীটদষ্ট। কেউ স্যাক্রিফাইস করে নি, কিন্তু কমপ্রোমাইস করেছে সকলেই।

তারাশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, অংশুমানের মধ্য দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

—বিবাহবর্জিত প্রেমের আন্দোলনটা কতখানি বাস্তব, তাই আমি অংশুমানের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছি। এখন বিচার্য হতে পারে, ছেলেটি কতখানি কালোপযোগী কিংবা মেয়েটি কালোপযোগী হয়েছে কিনা।

আপনার কি মনে হয়, এ কালের যুবকদের কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ আছে?

—তারা দিগন্তহীনতাকেই একটা আদর্শ করে নিতে চাইছে।

আপনি সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে সমস্যাটার কথা বলতে চেয়েছেন, অন্য কোনো উপন্যাসে কি তার কোনো ইঙ্গিত আছে?

—'ফরিয়াদ' উপন্যাসে আমি এ সমস্যাটাকে ধরতে চেয়েছি মায়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অবশ্য একটু ভিন্নরূপে। 'কালরাত্রি'তে আমি তিন ধরনের মেয়ের কথা লিখেছি। এক ধরনের মেয়ে অতসী—সে সহজে কারো সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চায় না। দ্বিতীয় ধরনের মেয়ে হলো, ভাঙা ঘরের কর্তার নাতনী। তৃতীয় ধরনের মেয়ে দাদার শালী, যে ফরেন অফিসারকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছে। সীতা এদের কারোর মত নয়। তাকে অন্যভাবে আঁকবার ইচ্ছা ছিল আমার।

তারাশঙ্করবাবু বললেন, এ বই লিখে আমি অনেক গাল খেয়েছি—বিশেষ করে মেয়েদের কাছ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম, আজকের সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার জন্য কি আপনি কোনোরকম অস্বস্তি বোধ করছেন?

—না, কোনোরকম অস্বস্তি বোধ করছি না। আমার সব লেখার বিষয়বস্তু সময়কেন্দ্রিক। আজকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের কথাটাই কালরাত্রির প্রধান অবলম্বন।

৫

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তারাশঙ্করের উপন্যাসের ধারায় 'কালরাত্রি'র স্থান কি? তাহলে অনেকক্ষণ ভাবতে হবে, কিন্তু সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রথমত, এ উপন্যাসের আঙ্গিক কিছুটা আলাদা রকমের—বঙ্কিমী ধরনের পিরামিডিক্যাল কাহিনীবৃত্তকে অনুসরণ না করে, অনেকটা রৈখিক পদ্ধতির অনুগামী। দ্বিতীয়ত, একটা মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য এর অন্তঃস্রোত হিসেবে কাজ করলেও একালের নগর-জীবনই তার প্রধান অবলম্বন। সংলাপে বর্ণনায় কোথাও জটিলতা নেই।

তারাশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কালরাত্রি'র সঙ্গে অন্য কোনো উপন্যাসের কি সাদৃশ্য আছে?

তিনি বলেন, 'আমার উপন্যাস যে ধারায় চলেছে, এ উপন্যাস সে ধারায় নয়। তবে কিছুটা মিল আছে 'মন্বন্তর' 'বিচারক' 'সপ্তপদী' 'উত্তরায়ণ'-এর সঙ্গে। 'মন্বন্তরে' যে সমস্যার সূত্রপাত 'কালরাত্রিতে' তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের গীতা নামে একটি যে মেয়েটি অর্থের লোভে অন্য মেয়ে সাপ্লাই করতো, 'কালরাত্রি'তে তারই পরিণতি দেখিয়েছি।'

অনেক দিন আগে আমি তাঁর উপন্যাসকে ভাগ করেছিলাম তিনটি স্থূল পর্বে। সেই হিসেবে 'কালরাত্রি' তৃতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত। সময়ের হিসেবে বলা যায়, ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'পাষাণপুরী' 'নীলকণ্ঠ' 'রাইকমল' 'আগুন' প্রভৃতি উপন্যাস প্রথম পর্বের রচনা। এই পর্বে তাঁর বিশিষ্ট মানসলক্ষণের প্রকাশ ঘটেছে রাঢ় বাংলার গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, ও সাহিত্যে অবহেলিত বিশিষ্ট শ্রেণীর সামগ্রিক জীবনচিত্র প্রকাশের প্রয়াসে। দ্বিতীয় পর্বে তিনি ধরতে চেয়েছেন আদিমতম প্রবৃত্তির শক্তি, দম্ভ, লালসা ও লেলিহান ক্রোধের স্বরূপ। কোনো খণ্ড চিত্রে নয়, এক-একটি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ছবি, ঐতিহ্য ও সংস্কার, ভৌগোলিক অবস্থানে। আকারে, আয়তনে, বর্ণনায়, বিস্তারে বিপুল সমুন্নতি পেয়েছে তাঁর উপন্যাস। দেশ-কাল-গোষ্ঠীর সমগ্রতা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন কোনো একটি কিংবা দুটো চরিত্রের নির্ধারিত প্রাধান্যে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে লেখা 'ধাত্রী দেবতা' 'কবি' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' 'সন্দীপণ পাঠশালা' 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা' 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর এ পর্বের স্বর্ণশস্য ফসল। প্রধান চরিত্রের চারপাশে ভীড় করেছে অসংখ্য মুখ, অজস্র তরঙ্গ বিক্ষেপ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও দেশবিস্তৃত প্রেক্ষাপট।

১৯৫০-এর পর সম্পূর্ণ নতুন ভাব-কল্পনায় জাগ্রত হয়েছেন তারাশঙ্কর। প্রথম পর্বের মতো আঙ্গিকপ্রধান ছোট উপন্যাস লেখেন নি আর। দ্বিতীয় পর্বের সময় থেকেও সরে এসেছেন অনিবার্যভাবে। সামান্য দু-একটি উপন্যাস ছাড়া রাজনীতি-বর্জিত লেখার দিকেই তাঁর প্রধান ঝোঁক পড়ে। 'আরোগ্য নিকেতন' 'রাধা' 'বিচারক' 'সপ্তপদী' 'মহাশ্বেতা' 'উত্তরায়ণ' 'জনান্দবন্দী' প্রভৃতিকে হাজির করা যায় এই ধারণার নিদর্শন হিসেবে। অবশ্য মাঝে মাঝে এসেছে দাঙ্গা, যুদ্ধ, রাজনীতির প্রসঙ্গ। গ্রাম-পটভূমিকে ছাড়িয়ে তারাশঙ্কর চোখ ফিরিয়েছেন নগর-জীবনের দিকে। এমনো হতে পারে, নায়কচরিত্রের সন্ধানেই যুগযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে একালের প্রতিটি মানুষ। 'কালরাত্রি'র পাত্রপাত্রীরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে একালের অংশীদার।

—গ্রন্থদর্শী

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

শীতকাল এলেই মানুষটা কিছুদিন যেন ভালো থাকে। ঠাণ্ডার জন্য মণীন্দ্রনাথ গায়ে র‍্যাপার জড়িয়েছেন। আগের মত খালি গায়ে থাকছেন না। এমন করে ভালো হতে হতে একদিন হয়ত যথার্থই ভালো হয়ে যাবেন। তখন কোথাও দুজনে চলে যাবে এক সঙ্গে—কোন তীর্থে অথবা বড় সহরে। অথবা সেই যে বলে না এক মাঠ আছে, মাঠের পাশে বড় দিঘি আছে, দিঘিতে বড় বড় পদ্মফুল ফুটে থাকে, বড়বৌ গ্রীক পুরানের এই নায়ককে নিয়ে একদিন যথার্থই সেখানে চলে যাবে। মানুষটা ভাল হলেই জলদামের নিমিত্ত কোন জলছত্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন হয়ত কোথাও দূরে গীর্জায় ঘণ্টা বাজবে, পুরোহিতেরা মন্ত্র উচ্চারণ করবে—পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ কোন হ্যামলক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সোনার হরিণের স্বপ্ন দেখবেন।

বড়বৌ মানুষটাকে এমন স্বাভাবিক দেখে এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এল। সঙ্গে নতুন গুড়, মর্তমান কলা। কিছু গরম মুড়ি। বড় আসন পেতে সে মানুষটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

সেই আশ্বিনের কুকুরটা মণীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছিল। সোনা দক্ষিণের বারান্দায় পড়ছে। কুকুরটা মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করছিল। লালজবা গাছটার নিচে দুটো শীতের ব্যাং ক্রুপ ক্রুপ করছে। মণীন্দ্রনাথ গরম দুধ, মর্তমান কলা, নতুন গুড় মেখে খেলেন। কিছু তাঁর প্রিয় কুকুরকে দিলেন। তারপর উঠে আসার সময় মনে হল সোনা চুপি চুপি পড়া ফেলে এদিকে আসছে। বড়কর্তা খুব খুশী—তিনি, কুকুর এবং সোনাকে নিয়ে শীতের ভোরে মাঠে নেমে গেলেন।

ওরা সোনালি বালির নদীতে এসে নামল। এখন জলে তেমন স্রোত নেই। জল কমে গেছে। যেন ইচ্ছা করলে হেঁটে পার হওয়া যায়। পারের পরিচিত মানুষেরা সোনা এবং মণীন্দ্রনাথকে আদাব দিল। আসে পাশে সব মুসলমান গ্রাম। ওদের দেখেই মাঝি এ-পারে চলে এল। নৌকায় কুকুরটা সকলের আগে লাফিয়ে উঠছে। সোনার অনেকদিনের ইচ্ছা— কোন ভোরে, পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে গ্রাম মাঠ দেখতে বের হবে। প্রতিদিন ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে দুপুরে অথবা সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাই ক্লান্ত সৈনিকের মত বাড়ির উঠোনে উঠে আসেন, পায়ে পায়ে বিচিত্র নদী নালার চিহ্ন থাকে, গরমে তরমুজ এবং শীতের শেষে আখের আঁটি সঙ্গে আসেন। সোনার কাছে মানুষটা বনবাসী রাজপুত্রের মতো। কত রকমের গল্প শোনার ইচ্ছা এই মানুষের কাছে—পাগল বলে অদ্ভূত অদ্ভূত গল্প শোনাতেন। নির্জন নিঃসঙ্গ মাঠ পেলেই, বলতে থাকেন। পাগল বলে গল্পের আরম্ভও নেই শেষও নেই।

জ্যাঠামশাই বলতেন, পদ্মপুকুরে যাবি?

জ্যাঠামশাই বলতেন, ইলিশমাছের ঘর দেখবি?

তারপর কোন উত্তর না পেলে বলতেন, রূপচাঁদ পক্ষী দেখবি?

সোনা কোন উত্তর করত না। উত্তর করলেই বলবেন, গ্যাৎ চোরেত শালা। তবু একবার সে খুব সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল, আমি পঙ্খীরাজ ঘোড়া দ্যাখমু। দ্যাখাইবেন।

মণীন্দ্রনাথের যেন বলার ইচ্ছা, তোমার পদ্মপুকুর দেখতে ইচ্ছা হয় না! ইলিশমাছের ঘর দেখতে ইচ্ছা হয় না! রূপচাঁদ পক্ষী দ্যাখো না! দ্যাখো কেবল পঙ্খীরাজ ঘোড়া। পঙ্খীরাজ ঘোড়া একটা আমারও লাগে। পাই কোথা! বলে সোনার দিকে একটা প্রশ্নবোধক মন নিয়ে তাকিয়েছিলেন।

আর আজ সোনার কিছুতেই পঙ্খীরাজ ঘোড়ার কথা মনে হল না। সে আজ পড়া ফেলে চলে এসেছে। মা, ছোট কাকা খুঁজছেন। সোনা কই গ্যাল, দ্যাখেন পোলাটা কই গ্যাল—সকলে খুঁজবে। সোনার ভারি মজা লাগল ব্যাপারটা। মা ওকে ফতিমাকে ছুঁয়ে দেবার জন্য মেরেছে। ঠাকুমা বলেছে ওর জাত ধর্ম গেল। ওকে সকলে অযথা হেনস্থা করেছে কতদিন। লালটু পলটু ওকে, একটু কিছু করলেই কান ধরে ওঠ বোস করিয়েছে—আজ ওরা সকলে ভাবুক। সে, জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বাড়ি থেকে চুপি চুপি বের হয়ে পড়ল। পাগল বলে তিনি শুধু হেসেছিলেন। পাগল বলে তিনি তাকে এই যাত্রার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। যেন বলেছিলেন, কোথাও না কোথাও পঙ্খীরাজ ঘোড়া আকাশে উড়ে বেড়ায়, কোথাও না কোথাও শঙ্খের ভিতর শঙ্খকুমার পালিয়ে থাকে আর কোথাও না কোথাও ঝিনুকের ভিতর চম্পকনগরের রাজকন্যা সাপের বিষে ঢলে আছে। তুমি আমি সেখানে চলে যাব সোনা। সকলের জন্য বড় মাঠ থেকে সোনালি ধানের ছড়া নিয়ে আসব।

আহা ওরা কত গ্রাম মাঠ ফেলে চলে যাচ্ছে। যত ওরা এগুচ্ছিল তত আকাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সোনা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পড়ছে। সে আকাশ ছুঁতে পারছে না কিছুতে। ওর কতদিনের ইচ্ছা জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বের হয়ে সে, যে আকাশটা নদীর ওপারে নেমে গেছে—সেটা ছুঁয়ে আসবে। কিন্তু কি করে যাদু বলে আকাশটা কেবল সরে যাচ্ছে।

কিছু পরিচিত লোক এই নাবালক শিশুকে পাগল মানুষের সঙ্গে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠল, সোনাবাবু আপনে!

জ্যাঠামশয়ের লগে কোনখানে যাইতাছেন। হাঁটিতে কষ্ট হয় না!

সোনা খুব বড় মানুষের মত ঘাড় নাড়িয়ে বলল, না।

কিন্তু মণীন্দ্রনাথ এক সময় বুঝতে পারলেন সোনা আর যথার্থই হাঁটতে পারছে না। তিনি ওকে কাঁধে তুলে নিলেন। এখন সূর্যের উত্তাপ প্রখর। ঘাসের মাথায় আর শিশির পড়ে নেই। সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে। এ-সময় ওরা, কোথাও যেন ঘণ্টা বাজছে এমন শুনতে পেল।

সোনার মনে হল বুঝি সেই পঙ্খী-রাজ ঘোড়া। সে হাততালি দিতে দিতে বলল, জ্যাঠামশয় পঙ্খীরাজ ঘোড়া!

আশ্বিনের কুকুরটা সহসা চলতে চলতে থেমে পড়ল। সে কান খাড়া করে শব্দটা শুনল। শব্দটা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে।

মণীন্দ্রনাথের এখন বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ছে। সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনেই বুঝি বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ে গেল। ডান-দিকে এক দীর্ঘ বন। বনের ভিতর দিয়ে হাঁটলে ফের সেই সোনালি বালির নদী পাওয়া যাবে, নদীর পারে তরমুজ খেত। এখন হয়ত তরমুজের লতা এক দুই করে বিছিয়ে যাচ্ছে ঈশম। আর তখন বনের ভিতর কত রকমের গাছ। সেই ঘণ্টার শব্দ ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে। বনের ভিতর কত রকমের ফলের গাছ-- সব চেনা নয়। তবু গন্ধ গোলাপ জামের, লটকন ফলের। সব ফল এখন প্রায় নিঃশেষ। সোনা গাছে গাছে কি ফল আছে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। তারপর ফাঁকা মাঠে নামতেই দেখল, এক আজব জীব। অতিকায় জীব। ওর গলায় ঘণ্টা বাজছে। সোনা চিৎকার করে উঠল, ঐ দ্যাখেন জ্যাঠামশয়।

কুকুরটা ছুটতে চাইল, এবং ঘেউ ঘেউ করে উঠল। জ্যাঠামশাই কুকুরটাকে ধরে রাখলেন। সোনাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে পাশাপাশি যেন তারা তিন মহাপ্রাণ সেই আজব জীবের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কাছে এলেই ছুটতে থাকবে তারা, অন্য পথে চলে গেলে কোন ভয় থাকবে না।

সোনা বিস্ময়ে কথা বলতে পারছে না। আসলে এত বড় মাঠ এবং এক বিরাট জীব--এ-হাতির গল্প সে মেজ-জ্যাঠামশাইর কাছে শুনেছে। জমিদার বাড়ির হাতি। হাতিটা দুলে দুলে ওদের দিকে নেমে আসছে। কাছে এলে ওর মত বয়সের এক বালক হাতির মাথায় বসে অঙ্কুশ চালাচ্ছে দেখতে পেল। যে ভয়টুকু ছিল প্রাণে তা একেবারে উবে গেল। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, জ্যাঠামশয়!

জ্যাঠামশাই কতদিন পর যেন কথা বললেন। --ওটা হাতি।

সোনা বলল, হাতি!

জ্যাঠামশাই বললেন, ওটা মুড়াপাড়ার হাতি।

কিন্তু এ-কি! হাতিটা যে ওদের দিকেই ধেয়ে আসছে। বড় বড় পা ফেলে উঠে আসছে। এত বড় একটা জীব দেখে আর এমনভাবে এগিয়ে আসছে দেখে সোনা ভয়ে গুটিয়ে গেল। একেবারে ওদের সামনে এসে পড়ছে। জ্যাঠামশাই নড়ছেন না। কুকুরটা ছুটাছুটি করছে। সোনা ভাবছিল পালাবে কি না, ছুটবে কি না। অথচ এত বড় বিস্তৃত মাঠ পিছনে--সামনে ঝোপ-- সে কোন দিকে ছুটে যাবে স্থির করতে পারল না। ভয়ে সে শুধু জ্যাঠামশাইকে জড়িয়ে ধরল। বলল, জ্যাঠামশয় আমি বাড়ি যামু।

জ্যাঠামশাই কোন উত্তর করলেন না। তিনি এখন শুধু অপলক হাতিটাকে দেখছেন। যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত তিনি কেমন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছেন।

সোনা, জ্যাঠামশাইকে এবার হাত কামড়ে দিতে চাইল। মানুষটা ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, আমি মার কাছে যামু। বলে কাঁদতে থাকল।

কিন্তু কি আশ্চর্য হাতিটা ওদের সামনে এসে চার পা মুড়ে বশংবদের মত বসে পড়ল। মাহুত, জ্যাঠামশাইকে সেলাম দিল। তারপর হাতিটাকে বলল, সেলাম দিতে। হাতিটা শুঁড় তুলে সোনাকে সেলাম দিল।

জসীমের ছেলে ওসমান সামনে বসে। জসীম পিছনে। সে বলল, আসেন কর্তা, হাতির পিঠে চড়েন। আপনেগ বাড়ি দিয়া আসি।

ওরা এতদূর এসে গেছে যে জসীম পর্যন্ত বুঝতে পারছিল বেলাবেলিতে পাগল মানুষ এই নাবালককে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে না। সে তাদের হাতির পিঠে তুলে নিল। সোনা হাতির পিঠে বসে মেজ-জ্যাঠামশাইর কথা মনে করতে পারছে। তিনি মুড়াপাড়া থেকে বাড়িতে এলেই এই হাতির বিচিত্র গল্প করতেন-- হাতিতে চড়ে একবার ওঁরা শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে কালীগঞ্জে যেতে এক ভয়ংকর ঝড় এবং ঝড়ে একটা গাছ উপড়ে এলে এই হাতি গাছ রুখে মেজ-জ্যাঠামশাইকে মৃত্যু থেকে রেহাই দিয়েছিল। সোনার এমন একটা বিরাট জীবের জন্য মায়া হতে থাকল। এখন মনে হচ্ছে তার, হাতির পিঠে চড়ে সামনের আকাশ অতিক্রম করে চলে যেতে পারবে। হাতিটা হাঁটছে। গলায় ঘণ্টা বাজছে। পিছনে আশ্বিনের কুকুর। সে পিছনে ছুটে ছুটে আসছে। কত গ্রাম, কত মাঠ ভেঙে, ঝোপ জঙ্গল ভেঙে ওরা হাতির পিঠে--যেন কোন এক সওদাগর বাণিজ্য করতে যাচ্ছে--সপ্ত ডিঙায়, সাত শ মাঝির বহর...সোনা যুদ্ধ জয়ের মত ঘরে ফিরছে।

জসীম সোনাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কখন আপনেরা বাইরে হৈছিলেন।

সোনা বলল, সেই ভোরবেলা।

--মুখত আপনের শুকাইয়া গ্যাছে।

--খুধা লাগছে, কিছু খাই নাই।

খাইবেন? বলে জসীম পাকা পাকা প্রায় দুধের মতো সাদা গোলাপজাম কোঁচড় থেকে তুলে দিল।

মিষ্ট এবং সুস্বাদু গোলাপজাম। সোনা প্রায় খাচ্ছিল কি গিলে ফেলছিল বোঝা দায়।

তখন হাতিটাকে দেখে কিছু গাঁয়ের নেড়ীকুকুর চিৎকার করছিল। কিছু আবাদী মানুষ বাবুদের হাতি দেখছিল-- মুড়াপাড়ার হাতি, হাতিটাকে নিয়ে জসীমউদ্দিন প্রতি বছর এ-অঞ্চলে ঠিক হেমন্তের শেষে, শীতের প্রথম দিকে চলে আসে। বাড়িবাড়ি হাতি নিয়ে জসীম খেলা দেখায়।

জসীম সোনাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কর্তা, পাগল জ্যাঠামশয়ের লগে যে বাইর হইলেন--যদি আপনেরে ফালাইয়া তাইন অন্য কোনখানে চইলা যাইত?

--যায় না। জ্যাঠামশয় আমারে খুব ভালবাসে।

জসীম বলল, পাগল মাইনসের লগে বাইর হইতে ডর লাগে না?

সোনা বলল, না। লাগে না। জ্যাঠামশয় আমারে লইয়া কতখানে চইলা যায়। একবার হাসান পীরের দরগায় আমারে রাইখা আইছিল, না জ্যাঠামশয়! সোনা পাগল জ্যাঠামশাইকে সাক্ষী মানতে চাইল।

মণীন্দ্রনাথ ঘাড় ফিরিয়ে সোনাকে দেখলেন। যেন এখন কত অপরিচিত এই বালক। বালকের সঙ্গে কথা বলা অসম্মান-জনক। তিনি তার চেয়ে বরং সামনের আকাশ দেখবেন। আকাশ অতিক্রম করে আরও দ্রুত চলে যাওয়া যায় কি না অথবা যদি তিনি আকাশ অতিক্রম করে চলে যেতে পারেন---সামনে এক বিরাট দুর্গ পাবেন, দুর্গের ভিতর পলিন--তিনি এইসব ভেবে হামাগুড়ি দিতে চাইলেন হাতির পিঠে এবং ক্ষুদ্র সেই বালক ওসমানকে তুলে অঙ্কুশ কেড়ে হাতিকে নিজের খুশিমত চালিয়ে নিতে চাইলেন-- হাতি আমাকে নিয়ে তুমি দ্রুত হেঁটে পলিনের দেশে চল--সেই কোমল মুখ আমি আর কোথাও দেখছি না।

জসীম চিৎকার করে উঠল, কর্তা আপনে কি করতাছেন, কর্তা! ওসমান পাগল মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। সে তার অঙ্কুশ কেড়ে নিতে আসছে। সোনা পিছন থেকে একটা পা চেপে ধরল। জ্যাঠামশয় আপনে পইড়া যাইবেন। মণীন্দ্রনাথ আর নড়তে পারলেন না। তিনি করুণ এক মুখ নিয়ে সোনার দিকে তাকালেন। তিনি আর নড়তে পারছেন না। কারণ সোনার চোখে এমন এক যাদু আছে যা তিনি কিছুতেই ঠেলে ফেলতে পারেন না। মাঠ পার হলে শুধু তিনি দেখলেন, পুবের বাড়ির নরেন দাস মাথায় কাপড়ের গাঁট নিয়ে বাবুর হাটে যাচ্ছে। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছিল বলে গ্রামের সব বালক বালিকা ছুটে এসেছে। আর নরেন দাসের বিধবা বোন মালতি সেই শ্যাওড়া গাছটার পাশে দেখল বড় বড় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়েছে। মিঞারা, মৌলভিরা এসে জড় হচ্ছে। আর এই গ্রামের সর্বত্র, অন্য গ্রামের গাছে গাছে, মাঠে মাঠে

ইস্তাহার ঝুলিয়ে চলে গেছে সামসুদ্দিনের লোকেরা অথবা তার ডান হাত যাকে বলা যায়—সেই ফেলু শেখ। তাতে কিছু শব্দ লেখা ছিল। লেখা ছিল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ। লেখা ছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আর লেখা ছিল নারায়ে তকদির। মালতি নারায়ে তকদির এই শব্দের অর্থ জানত না। একদিন সে ভেবেছিল, চুপি চুপি সামসুদ্দিনকে অর্থটা জিজ্ঞাসা করবে।

মালতি এবার নিজের দিকে তাকাল। শরীরের লাবণ্য ক্রমে বাড়ছে। স্বামীর মৃত্যুর পর ফের ঢাকায় গত মাসে দাংগা হয়ে গেছে। ওর শ্বশুর এসে বলে গেছে, ঢাকায় শাঁখারীরা, কুট্টিরা বড় বদলা নিচ্ছে। সেদিন থেকে মালতি খুশী। সামুরে তুই গাছে গাছে ইস্তাহার ঝুলাইয়া কি করবি! সামুকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে গাল দিল মালতি।

সামিয়ানার নিচে মুসলমান গ্রামের লোকেরা জড় হচ্ছে। সিন্নির জন্য বড় বড় উনুন ধরানো হচ্ছে। বড় বড় তামার ডেকচিতে দুধে জলে চালের গুঁড়ো সেদ্ধ হচ্ছে, গোপাট ধরে হাতির পিঠে রাজার মতো তখন পাগল মানুষ ঘরে ফিরে আসছেন।

মালতি দেখল হাতির পিঠে পাগল ঠাকুর বাড়িতে উঠে আসছে। ঘণ্টার আওয়াজে যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছে। এই ঘণ্টার শব্দ কোন শুভ বার্তার মতো এই অঞ্চলের সকল মানুষের কানে বাজছে। ওরা মনে করতে পারল, সেই পয়মন্ত হাতি লক্ষ্মীর মতো রূপ নিয়ে, শুভ বার্তা নিয়ে তাদের দেশে চলে এসেছে। এই হাতির জন্য যারা গেরস্থ বৌ, যারা কোনকালে একা একা ঘরের বার হয়নি তারা পর্যন্ত বাড়ির সব ছোট বালকের পিছু পিছু ঠাকুর বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল।

অথবা হাতিটা যখন পরদিন উঠানের উপর এসে মা মা বলে ডাকবে তখন সব গেরস্থ বৌদের প্রাণে 'এই হাতি আপনার ধন' অথবা 'এই হাতি মা লক্ষ্মীর মতো' এই হাতি বাড়ির উঠানে উঠে এলে জমিতে সোনা ফলবে এবং ভিন্ন রকমের উচ্ছ্বাস ওদের। ওরা হাতির জন্য, মাথায় কপালে লেপে দেবার জন্য সিঁদুর গুলতে বসে গেল। হাতিটার কপালে সিঁদুর দিতে হবে, ধান দুর্বা সংগ্রহ করে রাখল সকলে। আর মালতি দেখল, হাতির পিঠে পাগল মানুষ হাততালি দিচ্ছে। হাতির পিঠে সোনা, ফতিমা সোনাবাবুকে নিচ থেকে কিছু বলছে যেন, আমারে পিঠে তুইলা নেন সোনাবাবু। ফতিমা হাতিটার পাশে পাশে হাতির পিঠে ওঠার জন্য ছুটছিল। আর তখন ফতিমার বাজী সামসুদ্দিন শামিয়ানার নিচে বড় বড় অক্ষরে ইস্তাহার লিখছিল, ইসলাম বিপন্ন। বড় বড় অক্ষরে লিখছিল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

মালতি এই সব দেখতে দেখতে গাছতলার নিচে বসে কেমন আবেগে কেঁদে ফেলল। সে চিৎকার করে বলতে চাইল, সামুরে তুই দ্যাশটার কপালে দুঃখ ডাইকা আনিস না।

হাতিটা পুকুর পার ধরে উঠে যাবার সময় আমের ডাল, অর্জুনের ডাল এবং জামগাছের ডাল অর্থাৎ নিচে যা পেল সব মট মট করে ডালপালা ভেঙ্গে শুঁড় দিয়ে মুখে পুরে দিতে থাকল। আর সেই স্থল-পদ্ম গাছটা, যে গাছের নিচে বসে পাগল মানুষটা স্বচ্ছ আকাশ দেখতে ভালো-বাসতেন—সেই গাছটা পর্যন্ত মট মট করে ভেঙে হাতিটা মুখে ফেলে কট করে শব্দ, প্রায় কাটা নারকেল খেলে মানুষের মুখে যেমন শব্দ হয়, হাতির মুখে স্থলপদ্ম গাছের ডালপালা কাণ্ড তেমন শব্দ তুলছে। জসীম বার বার অঙ্কুশ চালিয়েও হাতিটাকে দমিয়ে দিতে পারল না। হাতিটা গাছটাকে চেটে পুটে ফেলল। রাগে দুঃখে পাগল জ্যাঠামশাই হাত কচলাতে থাকলেন। তার এই স্থলপদ্ম গাছ, তার সখের এবং নীরব আত্মীয়ের মত এই স্থলপদ্ম গাছের মৃত্যুতে তিনি বললেন, গ্যাৎ চোতে শালা।

মাঠের ভিতর শামিয়ানা টানানো। মোল্লা মৌলভিরা আসতে শুরু করেছে। ধানকাটা হয়ে গেছে বলে নেড়া নেড়া সব মাঠ। শস্য বলতে কিছু কলাই গাছ, মশুরি গাছ। ফেলু শেখ সব জুড়িদারদের নিয়ে বড় বড় গর্ত করছে। হাজি সাহেবের চাকর দুধ ফোটাচ্ছে। বড় বড় তামার ডেকচিতে দুধ এবং জল, জলে চালের গুঁড়ো, মিষ্টি, তেজপাতা, আখরুট, এলাচ, দারুচিনি, জাফরান, লবঙ্গ। পুরনো তক্ত-পোষের উপর ছিন্ন চাদর পাতা। আর হাজি সাহেবের তিন ছেলে উজান গিয়েছিল ধান কাটতে, তখন একটা খ্যাস এনেছিল উজান থেকে। সেই খ্যাস পেতে প্রধান মৌলভি সাবের জন্য একটা আসন করা হয়েছে। সব মুসলমান চাষাভূষা লোক ক্রমে শামিয়ানার নিচে জড় হচ্ছিল।

শচীন্দ্রনাথ জানত, এমন একটা ঘটনা ঘটবে। সামসুদ্দিন ভোটে এবারেও হেরে গেছে। লীগের নাম করে এবারেও সে মুসলমান চাষাভূষো লোকের সব ভোট নিতে পারেনি, শচীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে এবারেও ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়ে গেল। সুতরাং সে এমন একটা ঘটনা ঘটবে জানত। সামসুদ্দিন ঢাকা গেছিল। সাহাবুদ্দিন সাবের আসার কথা। এত বড় একটা মানুষ আসবে এদেশে, একবার ওরও ইচ্ছা ছিল সামিয়ানার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ধর্মীয় করে রেখেছে। বোধ হয় নিমন্ত্রণ করলেও সে যেতে পারত না।

সে হাতিকে পুকুর পার ধরে উঠে আসার সময় এ-সব ভাবছিল। জসীম হাতিটাকে এখন উঠানে তুলে আনছে। হাতিটা কাছে এলে সে বলল, জসীম ভাল আছ ?

—আছি কর্তা! জসীম হাতিটাকে সেলাম দিতে বলল।

—মাইজা দা ভাল আছেন ?

জসীম একটু নুয়ে বলল, হুজুর ভাল আছেন।

—অনেক দিন পর ইদিকে আইলা।

—আইলাম। আপনেগ দ্যাখতে ইচ্ছা হইল, চইলা আইলাম।

—বাবুরা বুঝি এখন বাড়ি নাই ?

—না। বাবুরা ঢাকা গ্যাছে।

সোনাকে এবার ছোটকাকা বললেন, হারে সোনা তর ক্ষুধা পায় না? অরে নামাইয়া দে জসীম। অর মায় ত গালে হাত দিয়া ভাবতেছে, পোলাটা গ্যাল কৈ ?

হাতিটা পা মুড়ে বসে পড়ল। সোনা নেমে গেল। গ্রামে এখন এই হাতির জন্য উৎসবের মতো আনন্দ। জসীমের ছেলে ওসমান নেমে গেল। সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। জসীম পাগল মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলল, কর্তা নামেন।

পাগল মানুষ তিনি, তিনি এই কথায় শুধু হাসলেন। তিনি নেমে যাওয়ার এতটুকু চেষ্টা করলেন না। এই হাতি তাঁর প্রিয় স্থলপদ্ম গাছ খেয়ে ফেলেছে। যেন স্থলপদ্ম গাছটা কত দিনের কতকালের পলিনের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই গাছের নিচে বসলেই তিনি জাহাজের সেই অলৌকিক শব্দ শুনতে পেতেন। কাপ্তান মাস্তুলে উঠে নিশান ওড়াচ্ছে। জাহাজটা পলিনকে নিয়ে জলে ভেসে গেল। আর হাতিটা সেই স্মৃতিসহ সব চেটে পুটে খেয়ে এখন চোখ বুজে আছে।

শচীন্দ্রনাথও অনুরোধ করল হাতির পিঠ থেকে নামতে; কিন্তু পাগল মানুষ তিনি—হাতির পিঠে সন্ন্যাসীর মত পদ্মাসন করে বসে থাকলেন। এতটুকু নড়লেন না। জোর করতে গেলে তিনি সকলের হাত কামড়ে দেবেন, অথবা হত্যা করবেন সকলকে এমন এক ভঙ্গি নিয়ে স্থলপদ্ম গাছের শেষ চিহ্নটুকু দেখতে থাকলেন।

জসীম দেখল হাতির পিঠে বড় কর্তা বসে কেবল বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছেন। তিনি কারও অনুরোধ রাখছেন না। শচীন্দ্রনাথ বার বার বলছে, দু চার জন মাতব্বর মানুষ হাতিটা ঠাকুর বাড়ি উঠে আসতে দেখে জড় হয়েছিল—তারাও বলছে, বড় কর্তা নামেন। হাতিটা অনেকটা পথ হাইটা আইছে, অরে বিশ্রাম দ্যান। বড় কর্তা ভ্রূক্ষেপ করলেন না, তিনি বরং হাতিটার কানের নিচে পা রেখে যেন বলতে চাইলেন, হেট্ হেট্।

তখন হাতিটা ইঙ্গিত পেয়ে উঠে দাঁড়াল। পাগল মানুষ বড় কর্তা হাতিটা নিয়ে বের হয়ে পড়ল। জসীম ডাকল, কর্তা এইটা আপনে কি করেন! কর্তা অঃ কর্তা।

বাড়ির প্রায় সকলেই বিপদ বুঝতে পেরে পিছনে ছুটল। ততক্ষণে হাতিটা পুকুর পার ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে। পুবের বাড়ির মালতি দেখল, পাগল ঠাকুর মুড়া-পাড়ার হাতিটা নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। মাঠে নরেন দাসের জমি পার হলেই সেই গ্যাওড়া গাছ, গাছে ইস্তাহার ঝুলছে, গাছে গাছে সামসুদ্দিন ইস্তাহার ঝুলিয়ে গেছে

এক বাক্য বলছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। লড়কে লেংগে পাকিস্তান। অথবা নাম্নারে তকদির এবং এমন সব অনেক কথা লেখা আছে—যা মালতির দুচোখের বিষ। মালতির চিৎকার করে বলার ইচ্ছা, সামুরে তর ওলাওঠা হয় না ক্যান!

তখন হাতিটা নরেন দাসের জমি পার হয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। পিছনে ছোট ঠাকুর, জসীম, জসীমের পুত্র ওসমান ছুটছে। গ্রামের কিছু ছেলে বুড়ো ছুটছে। ওরা সকলে হৈ হৈ করছিল—কারণ একজন পাগল মানুষ এক অবলা হাতি নিয়ে মাঠে ঘোড়দৌড়ের বাজী জেতার মতো ছুটছে। কিছুদূর গেলে সামসুদ্দিনের শামিয়ানা টানানো মণ্ডপ। মণ্ডপের বাইরে খোলা আকাশের নিচে বড় বড় ডেকচি—ফেলু শিন্নি চাঁড়য়েছে। মৌলভি সাব আজান দিয়ে এইমাত্র মঞ্চে উঠে নামাজ পড়ছেন। যারা দূর গাঁ থেকে সভায় 'ইসলাম বিপন্ন' ভেবে সিন্নির স্বাদ নিতে এসেছে অথবা ইসলাম এক হও এবং এই যে কাফের জাতীয় মানুষ, যাদের পায়ের তলায় থেকে সংসারের হাল ধরে আছি—কি না দুঃখ বল, এই জাতি তোমাদের কি দিয়েছে, জমি তাদের, জমিদারী তাদের—উকিল বল ডাক্তার বল সব তারা—কি আছে তোমাদের, নামাজ পরার পর এই ধরনের কিছু কিছু উক্তি—যা রক্তে উত্তেজনার জন্ম নেয়—মানুষগুলো কান খাড়া করে মৌলভিসাবের, বড় মিঞার এবং পরাপরদীর বড় বিশ্বাসের ধর্মীয় বক্তৃতা শোনার সময় পেছনে ফেলু শেখের চিৎকারে একে অন্যের উপর ছিটকে পড়ল! সেই ঠাকুরবাড়ীর পাগল ঠাকুর এক মস্ত হাতি নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে। সকলে হৈ হৈ করতে থাকল। তিনি পাগল মানুষ, হাতি অবলা জীব—সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাতিটা বুঝি ক্ষেপে গেছে। হাতিটা পাগলা হাতির মত শুঁড় উঁচু করে চিৎকার করতে করতে সেই শামিয়ানার ভিতর ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

ফেলু শেখ তামার বড় ডেকচীগুলির পাশে লুকিয়েছিল। ভিতরে দুধে জলে চালের গুঁড়োতে টগবগ ফুটছে। সেই মস্ত হাতি ভিতরে ঢুকে গেলে সকলে নানাভাবে মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। সকলে দৌড়ে দৌড়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করছে। সামসুদ্দিন আতংকে ভাঙা তক্তপোষের নিচে লুকিয়ে পড়ল। ফেলু পালাচ্ছিল, পালাতে গিয়ে হাতিটার একেবারে সামনে পড়ে গেল। হাতিটা সহসা ওকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরল এবং ধরার জন্য একটা হাত ভেঙে গেল। সকলে চিৎকার করছে দূরে, কেউ কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না, হায় হায় করছে, একটা মানুষ হাতির পায়ের নিচে বুঝি চলে গেল। মণীন্দ্রনাথ হাতির পিঠে বসে গালে হাত দিয়ে হাতি কর্তাকে কি করতে পারে যেন এমন কিছু দেখ-ছিলেন। যেন তিনি [illegible]। হাতির পিঠে চড়ে [illegible] যেন এমনি হওয়া উচিত ফেলুর। পাগল ঠাকুর এখানে যেন হাতির কানের নিচে পা দিয়ে খোঁচা মারতেই একান্ত বশংবদের মত ফেলুকে মাটির উপর পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতিটাকে এই স্থান কাল পাত্র পরিত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। আর হাতিটাও স্থান কাল পাত্র পরিত্যাগ করে মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে থাকল।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তখন সোনালি বালির নদীর চড়ে স্টেশনে তরমুজের লতা নিড়েন দিয়ে সাফ করে দিচ্ছিল। হেমন্তকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে। সূর্য পশ্চিমে নামতে থাকলেই ঘাসে ঘাসে শিশির পড়তে থাকে। জসীম চিৎকার করছিল, আর হাতিটার পিছনে ছুটছিল। বাবুদের হাতি—সে এই অঞ্চলে হাতি নিয়ে ঘুরতে এসে কি এক বিপদে পড়ে গেল—সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর থেকে পাগল মানুষ বড় কর্তাকে হাতির পিঠে তুলে না নিলেই এখন মনে হচ্ছে ভালো হত। সেই যে তিনি হাতির পিঠে চড়ে বসলেন আর নামতে চাইলেন না। এখন কি হবে! হাতিটা ক্রমশঃ মাঠ ভেঙে গ্রামে, গ্রাম ভেঙে মাঠে পড়ছে। উপরে মণীন্দ্রনাথ বসে বসে হাতে তালি বাজাচ্ছেন। গ্রামের ছোট বড় সকলে পিছনে ছুটে ছুটে যখন হাতিটার আর নাগাল পেল না, যখন হাতিটা নদীর চড় পার হয়ে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল—তখন মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে থেকে বুঝলেন—আর ভয় নেই। হাতিটাকে কৌশলে তিনি যেন বলে দিলেন, অবলা জীব হাতি, তুমি এবার ধীরে ধীরে হাঁটো। তোমাকে আমাকে এখন আর কেউ খুঁজে পাবে না।

রাত হয়ে গেছে। এটা কোন মাঠ হবে, বোধহয় দামোদরদীর মাঠ হবে। আর একটু গেলেই মেঘনা। নদীর পারে বড় মঠ। অন্ধকারে এখন মঠ দেখা যাচ্ছে না। শুধু ত্রিশূলের মাথায় একটা আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

শচীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীর ভিতরে, আরো সব মানুষজন এসেছে। জসীম উঠানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এত বড় হাতি নিয়ে পাগল ঠাকুর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সে মাহুত হাতির—বাবুদের হাতি, লক্ষ্মীর মতো পয়মন্ত হাতি—এখন কি হবে, সে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিল না। উঠোনের উপর গ্রামের লোকেরা কি করা যায় পরামর্শ করছে। গ্রামে গ্রামে এখন খবরটা পৌঁছে গেছে। ঈশম লণ্ঠন হাতে আবার বের হয়ে পড়েছে এবং প্রায় একদল মানুষ লণ্ঠন হাতে সোনালি বালির নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। তারা জোরে জোরে ডাকছিল। জসীমও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেনি। সে ওসমানকে রেখে একা একা সেই দলটার সঙ্গে মেশার জন্য কাঁধে গামছা ফেলে দৌড়াতে থাকল।

সামসুদ্দিন লণ্ঠন হাতে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ফেলু খুব বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। ওকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটা তছনছ ভাব এবং পাগল ঠাকুর ইচ্ছা করে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন যেন, যেন তিনি জানতেন সামসুদ্দিনের এই যে ইস্তাহার ঝুলিয়ে স্বার্থপর মানুষের মতো একই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বাসনা—এই বাসনা ভাল নয়, পাগল মানুষ তিনি, এইটুকু ভেবে গোটা উৎসবের মতো এক ছবিকে তছনছ করে চলে গেছেন। সামসুদ্দিনের আপ্রাণ চেষ্টার দরুন এই মাঠে এত বড় একটা জলসা হতে পারছে। এত বড় জলসাতে শহর থেকে মোল্লা মৌলভিরা এসেছিল। ও'রা এখন হাজিসাহেবের বাড়ীতে উঠে, তোবা তোবা, কি এক বেমাফিক কাজ হয়ে গেল—সামসুদ্দিনের ইচ্ছা হল এখন সে নিজের হাত নিজে কামড়ায়। আর মনে হল গোটা ব্যাপারটাই এক ষড়যন্ত্র। যেন ছোট ঠাকুর আবার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হতে চায়। আবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছোট ঠাকুর দাঁড়াবে এবং কবিরসাবকে ধরে এনে কংগ্রেসের পক্ষে বড় এক বক্তৃতা। সে ভাবছিল এমন একটা হাতি পাওয়া যাবে না সেদিন। হাতির পিঠে ফেলু বসে থাকবে, অথবা ফেলুকে দিয়ে মণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিলে যেন সব আক্রোশের শোধ নেওয়া যাবে। লণ্ঠন হাতে সামসুদ্দিন জব্বরকে দিয়ে সব তৈজসপত্র, ভাঙা টুল টেবিল, ছেঁড়া শামিয়ানা এবং বড় সতরঞ্চ একসঙ্গে করে মাঠ থেকে বাড়ীতে তুলে আনার সময় এসব ভাবল।

তখন বাড়ীর বৃদ্ধ মানুষটি প্রশ্ন করেছিলেন—তিনি অতিশয় বৃদ্ধ বলেই ঘরের ভিতর বসে প্রদীপের মৃদু আলোতে সামান্য কাসছিলেন, এখন আর তিনি তেমন বেশী ঘর বার হন না। অধিকাংশ সময় ঘরের ভিতর খাটে একটা বড় তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকেন। অতিশয় গৌরবর্ণ চেহারার এই মানুষ উঠানে গোলযোগ শুনে বড়বৌকে প্রশ্ন করলেন, কি হইছে বড়বৌ? উঠানে এত গণ্ডগোল ক্যান?

বড়বৌ প্রদীপের আলো একটু উসকে দিল। টিন কাঠের ঘর। জানালা দিয়ে শেষ হেমন্তের ঠাণ্ডা ভেসে আসছে। লণ্ঠনের আলো সংসারের এই বুড়ো মানুষটি একেবারেই সহ্য করতে পারে না। সুতরাং ঘরে মৃদু প্রদীপের আলো থাকে। বড়বৌ এই সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের দেখাশুনা করার সময় প্রায়ই জানালায় দূরের সব মাঠ দেখতে পায় এবং সেই মাঠে সংসারের এক পাগল মানুষ ক্রমান্বয়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন কেবল চলে যেতে চাইছে। উঠোনের সেই গণ্ডগোল, মানুষটার এভাবে হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এ-সব বড়বৌকে বড় বিষণ্ণ করছে। মানুষটা আবার ক্ষেপে গেল। ভোরেও বড়বৌ এই মানুষকে খেতে দিয়েছে—ভালোমানুষের মত খেয়ে প্রতিদিনের মতো নিরুদ্দেশে চলে গেছিল এবং সংসারের ছোট এক বালক সোনা সঙ্গ দিয়েছে মাঠে মাঠে এবং গ্রামে গ্রামে।

তারপর কোন এক দূরে গ্রাম থেকে মাঠ ভেঙে সোনার হাত ধরে এই পাগল মানুষ গ্রামের উদ্দেশ্যে ফিরছিল তখন জসীম আসছে হাতিতে চড়ে। জসীমের ছেলে ওসমান হাতির পিছনে—ওরা দেখল সেই বড় মাঠে ঠাকুর বাড়ীর পাগল ঠাকুর ছোট এক বালকের হাত ধরে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। এই মানুষটার জন্য তল্লাটের সকলের কষ্ট—কারণ এমন মানুষ হয় না, কথিত আছে তিনি দরগায় পীরের মতো এক মহৎ পুরুষ। জসীম পাগল ঠাকুরকে হাতির পিঠে তুলে বলেছিল, চলেন বাড়ি দিয়া আসি কর্তা। জসীম, সোনা এবং পাগল মানুষকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এই কান্ড। বড়বৌ খুব দুঃখের সঙ্গে বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসে সব বলল। বৃদ্ধ পুত্রের হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনে পাশ ফিরলেন শুধু। বৃদ্ধের মুখে এক অসামান্য কষ্ট ফুটে উঠছে। বড়বৌর কাছে ধরা পড়ে যাবেন ভাবতেই মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে শুধু অন্ধকার দেখতে থাকলেন। এই শেষ সময়ে এক তাঁর পাগল ছেলে মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সব দুঃখের মূলে তিনি—তাঁর জিদ, এ-সব ভেবে তাঁর দুঃখের যেন অন্ত ছিল না। তিনি বললেন, বৌমা জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও। আমার বড় শীত করতাছে।

—একটা কম্বল গায়ে দ্যান বাবা।

—না। জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও।

বড়বৌ জানালা বন্ধ করার সময়ই দেখল কামরাঙা গাছের ওপারে যে বড় মাঠ, ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—সেখানে অনেক লন্ঠন, বড়বৌ বুঝল, এইসব মানুষ যাচ্ছে অন্ধকারের ভিতর পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে খুঁজতে।

আর জসীম অন্ধকারে ডাকছিল হাতিটার নাম ধরে—লক্ষ্মী অ লক্ষ্মী! সে সকলের আগে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। যেন তার ঘরের বিবির মতো এক রমণী অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়েছে অথবা সেরা মানুষ পাগল ঠাকুর—দশাসই চেহারা, গৌরবর্ণ—ঠিক পীরের মতো এক মানুষের সঙ্গে তার পোষা হাতি, তার ভালবাসার লক্ষ্মী চলে গেছে। সে প্রাণপণ ডাকছিল, লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী! আমি তর লাইগা চিড়ামুড়ি তুইলা রাখছি, লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী, তুই একবার অন্ধকারে ডাক দিহি, মাঠের কোন আনধাইরে তুই বইসা আছস একবার ডাইকা ক দিহি। আমি পাগল ঠাকুরের মত তরে লইয়া ঘরে ফিরমু।

ঈশম বলছিল, আরে মিঞা এত উতালা হইলে চলব ক্যান। বড়কর্তা বড় মানুষ। হাতি অবলা জীব, ভালবাসার জীব। তিনি হাতির মত পোষা জীব লইয়া পলিনরে খুঁজতে বাইর হইছেন।

জসীম বলল, পলিন, কোন পলিনের কথা কন!

—আরে আছে মিঞা!

জসীম বলল, হাঁটিতে বড় কষ্ট। কিবসা কইলে বেশী হাঁটিতে পারি।

ঈশম বলল, বড় মানুষের কথা অধমের মুখে ভাল শুনাইব না। অথবা যেন ঈশমের বলার ইচ্ছা—মিঞা তল্লাটের লোক কেনা জানে এ-কথা। তুমি এডা কি কও। তুমি জান না কর্তা ফাঁক পাইলে নৌকায়, না হয় হাঁটিতে হাঁটিতে নিরুদ্দেশে যান। তারপর ঈশম এক বর্ষার কথা বলল। এক বর্ষাকালে পাগল ঠাকুর নৌকা নিয়ে তিনদিন নিরুদ্দেশে ছিল তার গল্প করল। সোনালি বালির নদীর জলে তখন স্রোত ছিল। তিনি একা স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে বসেছিলেন। যেন এই নাও তাকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অথবা গঙ্গার জেটির পাশে বড় এক জাহাজ, জাহাজে পলিনের স্মৃতি—পাগল মানুষ বলে তিনি মনে মনে বিলের ভিতর বড় এক কলকাতা শহর বানিয়ে বসেছিলেন এবং সারাদিন সারা মাস ধরে যেন তিনি সেই বিলের জলে পলিনকে খুঁজেছিলেন। বিলের জলে এক স্বপ্ন ভাসে, স্বপ্নে সেই বড় কলকাতা শহর—গাড়ী ঘোড়া হাতির মিছিল, আর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, দুর্গের পাশে মেমোরিয়েল হল—কার্জন পার্ক। গড়ের মাঠে সাহেবরা উর্দি পরে কুচকাওয়াজ করছে। পাগল ঠাকুর হে হে করে হাসতে হাসতে শুধু বলছিলেন, গ্যাৎ চোত্তে শালা। কারণ তাঁর প্রতিবিম্ব জলে দেখা যাচ্ছিল, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শহরটা নিমেষে কেমন জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর প্রতিবিম্ব এখন শুধু পরিহাস করছে, হায় বেহুলা জলে ভাইস্যা যায়রে, জলে ভাইস্যা যায়।

সবই যেন জলে ভেসে যাচ্ছিল। এত বড় বিল, এই অন্ধকার চারিদিকে, জোনাকিরা জ্বলছে। উড়ে উড়ে জোনাকিরা পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথকে এবং হাতিটাকে ঘিরে ধরলে। মণীন্দ্রনাথ হাতির পিঠে চড়ে বিলের পারে পারে ছুটে বেড়াচ্ছিল। বিলের জলে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার। হেমন্তকাল বলে ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। পাকা ধানের গন্ধ মাঠে মাঠে। এই অন্ধকারে হাতির পিঠে বসে পাকা ধানের গন্ধ পাচ্ছিলেন। আর আকাশে কত হাজার নক্ষত্র, পাগল মানুষ প্রতিদিনের মতো হাতির পিঠে বসে সেইসব নক্ষত্র দেখতে দেখতে, যেন সেইসব নক্ষত্রের কোন একটি তার প্রিয় পলিনের মুখ—তিনি হাতিতে চড়ে অথবা নৌকায় উঠে কিছুতেই আর সেই প্রিয় পলিনের কাছে অথবা হেমলক গাছের নিচে পৌঁছাতে পারলেন না। তিনি হাতিটাকে সম্বোধন করে বললেন, হ্যাঁ লক্ষ্মী তুমি আমাকে নিয়ে পলিনের কাছে যেতে পার না! সেই সুন্দর মুখ—ঝরনার জলের উৎসে তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে পার না!

সহসা এই পাগল মানুষের ভিতর পূর্বের স্মৃতি তোলপাড় করলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না, মনে হয় আর কিছুদূর গেলেই সে তার প্রিয় হেমলক গাছটি খুঁজে পাবে এবং সেই হেমলক গাছের নিচে সোনার হরিণটি বাঁধা আছে। এইভাবে কতদিন কতভাবে একা একা মাঠ থেকে মাঠে গ্রাম থেকে গ্রামে এবং এমন তল্লাট নেই এ-অঞ্চলে তিনি যেখানে একা-একা চলে যান না, তরপর এক সময় কেন মনে হয় সেখানে আর তিনি এ-জীবনে পৌঁছাতে পারবেন না। সুতরাং সেই এক বড়বৌর মুখ এবং তার দুঃখের ছবি পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন। তখন মনে হয় হাতিতে অথবা নৌকায় কখনও সেই হেমলক গাছের নিচে পৌঁছানো যাবে না। সোনার হরিণেরা বড় বেশী দ্রুত দৌড়ায়।

জসীম, ঈশম এবং নরেন দাসের দলটা সারারাত লন্ঠন হাতে খুঁজে হাতিটা এবং মানুষটাকে বার করতে পারল না। ওরা সকলে ভোর রাতের দিকে ফিরে এসেছিল। আরও দুটো দলকে শচীন্দ্রনাথ পূবে এবং পশ্চিমে পাঠিয়ে দিলেন। খবর এল, যারা উত্তরে দেখেছে, তারা আবার দক্ষিণেও দেখেছে। নানা মানুষ নানা রকমের খবর দিল। কেউ বলল, অশ্বত্থ গাছের নিচে গত রাতে পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে দেখেছে, কেউ বলল, বারদীর মাঠের উত্তরে একদিন দেখা গেছে মানুষটাকে। উত্তর থেকে খবর এল, পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ হাতিটাকে দিয়ে সব আখের খেত খাইয়ে দিচ্ছে। কেউ কিন্তু হাতিটার নাগাল পাচ্ছে না। সপ্তাহের শেষ দিকে আর কোন খবর এল না। সকলেই তখন বলল, না আমরা পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে দেখিনি।

বাড়ীতে প্রায় সকলের মুখে একটা শোকের ছবি। কেউ জোরে কথা বলছে না। লালটু, পলটু, সোনা সারাদিন বাড়ীতেই থাকছে। পুকুর পাড়ের অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ওরা প্রতিদিনই হাতিতে চড়ে মানুষটা ফিরছে কিনা দেখত। বিকালের দিকে জ্যাঠামশাই মাঠের ওপর থেকে উঠে আসবে প্রতীক্ষায় অর্জুন গাছটার নিচে বসে থাকত। সঙ্গে থাকত সেই আশ্বিনের কুকুর। ওরা প্রিয় মানুষটির জন্য গাছের নিচে বসে সারা বিকেল, যতক্ষণ সন্ধ্যা না হত, যতক্ষণ গোপাট অতিক্রম করে মাঠের বড় অশ্বত্থ গাছটায় অন্ধকার না নামত, ততক্ষণ অপেক্ষা করত। আর এ-ভাবেই একদিন কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল—কুকুরটা কেবল চিৎকার করছে—সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। তখন ওরা দেখল কুকুরটা দৌড়ে দৌড়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। আবার সোনার কাছে উঠে আসছে। ওরা দেখল পূবের মাঠে আকাশের নিচে কালো একটা বিন্দুর মতো কি কাঁপছে। ক্রমে বিন্দুটা বড় হচ্ছে। হতে হতে ওরা দেখল এক বড় হাতি আসছে। সোনা চিৎকার করে বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল, হাতিতে চইড়া জ্যাঠামশয় আইতাছে।

গ্রামের সকলে দেখল পাগল মানুষ, ক্লান্ত। বিষণ্ণ। চোখে মুখে অনাহারের ছাপ। তিনি হাতির পিঠে প্রায় মিশে গেছেন।

হাতিটা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল উঠোনে। যেন এই হাতি আর কোথাও যাবে না। এখানেই বসে থাকবে। অসীম বলল, কর্তা নামেন। লক্ষ্মীরে আর কত কষ্ট দিবেন।

গ্রামের সকলে অনুরোধ করল নামতে। কিন্তু তিনি নামলেন না।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, তোমরা সকলে বাড়ী যাও বাছারা। আমি দেখি। বলে, সে হাতিটার কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে বলল, বড়দা, বড়বৌদি কয়দিন ধইরা কিছুই খায় নাই। বৌদিরে কত আর কষ্ট দিবেন।

কিন্তু কোন লক্ষণ নেই নামার। শচীন্দ্রনাথ বলল, সোনা তর বড় জ্যাঠি-মারে ডাক।

বড়বৌ ঘোমটা টেনে স্থলপদ্ম গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। শচীন্দ্রনাথ বলল, আপনে একবার চেষ্টা কইরা দ্যাখেন।

বড়বৌ কিছু বলল না। সেই সজল উদ্বিগ্ন এক চোখ নিয়ে হাতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ হাতি থেকে নেমে বড়বৌকে অনুসরণ করলেন—তিনি এখন এক সরল বালক যেন। তাঁর এখন বড়বৌর দুই বড় চোখ ব্যাতিরেকে কিছুই মনে আসছে না। ঘরে ঢুকে দেখলেন, তাঁর প্রিয় জানালাটি খোলা। তিনি সেখানে দাঁড়ালেই তার প্রিয় মাঠ দেখতে পান। এবং তখন মনে হয় মাঠে বড় এক হেমলক গাছ আছে, নিচে পলিন দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন অকারণ তিনি নদী বন মাঠের ওপারে পলিনকে খুঁজেছেন। (ক্রমশঃ)

নিশ্চয়ই আছে

কালীপাড়ার মার্ক টোয়েন

মাছ কিনতে গিয়েছিলাম দূরে বন্দরে। বন্ধুর বিয়ে। সস্তায় ভাল মাছ চাই। রাত জেগে নীলামে দর হেঁকে চুবড়িবোঝাই পোনা, কাতলা আর ছোট এক টুকরি বাগদা নিয়ে ফার্স্ট ট্রেনে ফিরছি কলকাতায়। জানালার ধারে বসে তুখোড় বৈশাখের ভৈরবী বাতাসের তার-সানাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলাম। একের পর এক স্টেশন সাইনবোর্ডের মত চোখের পর্দায় ধাক্কা খেয়ে সরে সরে যাচ্ছে আর বড় জোর পঞ্চাশ মিনিট। গাড়ী ইন করল শ্রীকৃষ্ণপুর স্টেশনে।

ঃ কে ঝুনু না?

যে নামে গত তিন বছরে বাড়ীর বাইরে কেউ ডাকে নি, নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম যে পোষাকী ভারিক্কী নামের আড়ালে আত সংক্ষিপ্ত দু অক্ষরের একটি ডাকনামেই গোটা ছেলেবেলাটা দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছি, সেই নামে এই অজ ইস্টিশানে কেউ আমায় ডাকতে পারে, এ ভাবতেও পারি নি। হালকা ঘুমের চটকা গেল কেটে। বাইরে তাকিয়ে দেখি গোটা জানলাটা জুড়ে কালীপাড়ার প্রসিদ্ধ বেকার কালুদা ভাঁটার মত গোল গোল দুটি চোখ জিজ্ঞাসা চিহ্নের পুটলি করে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

ঃ কি ব্যাপার তুই ইদিকে?

ঃ বন্ধুর বিয়ে। মাছ কিনতে গিয়েছিলাম পোর্টে। এই ফিরছি—আলসেমিটুকু চোখের পাতা থেকে মুছে গেল। তা তুমি এখানে?

ঃ সে কি রে! তুই কিসসু জানিস না?

ঘাড় নাড়লাম—না, কিচ্ছু না।

ঃ আয় নেবে আয়।

ঃ না দাদা, এখুনি ট্রেন ছাড়বে। সারা রাত যা ধকল গেছে। এখন এই মাছটাছ পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরে ঘুমবো। তুমি বরং ঠিকানাটা দাও, পরে যদি কোনদিন আসি নিশ্চয়ই দেখা করব তোমার সঙ্গে

ধুর, ট্রেন এখন ছাড়বে নাকি? এক ফার্লং পথের তার লোপাট। এই তো সবে খবর গেছে হেড অফিসে। মিনিমাম তিন চার ঘন্টার ধাক্কা। তার ওপর আজ লেট হলে, আর হবেই, অফিস-বাবুরা নিশ্চয়ই বড় রকমের একটা হামলা করবেন স্টেশন মাস্টারের ওপর। ব্যস তাহলেই হয়ে গেল। সারাদিনে আর গাড়ী চলবে না। আমার কত জরুরী কাজ ছিল কলকাতায়। স্টেশন ওয়াগানটা খারাপ হওয়ায় ভেবেছিলাম ট্রেনে যাব। এক সপ্তাহ ধরে সাতশো বস্তা গম গো-ডাউনে পড়ে আছে, ওয়াগনের অভাবে চালান আসছে না। এদিকে আমার কাজ কারবার সব বন্ধ। কত লোকের পেমেন্ট আটকে আছে। তার চেয়ে তো তোর ব্যাপারটা সিরিয়াস না।

এরপর ট্রেনে বসে থাকাটা নিরর্থক। কালুদা যে বাজে কথা বলেন নি, তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। গোটা ট্রেনটার যাত্রীরা সব প্ল্যাটফর্মে নেমে এসেছে। দুহাতে অন্তর মাছওয়ালা, তরকারিওয়ালা, তাড়িওয়ালাদের জটলা জমতে শুরু করেছে। এই ট্রেনের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্যাসেঞ্জারই ব্যাপারী। সবাই যাচ্ছে কলকাতায়। সঙ্গে ছিল বন্ধুর ছোট ভাই। ওকে মাছের চুবড়ির ওপর চোখ রাখতে বলে নেমে এলাম।

গিলেকরা পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী ফুঁড়ে ভাল খাওয়াপরার ফাইন চর্বির চেকনাই পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। এই সেই কালুদা। ট্রাম রাস্তার ধারে, সিনেমা হলের গা-ঘেঁষা গলিটার নাম করপোরেশন যাই দিক না কেন, সবাই বলত কালীপাড়া। সেই পাড়ার স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরাদের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন কালুদা। সারাটা দিন মোড়ের চায়ের দোকানে বসে পাড়াটা কনট্রোল করতেন। ফোর টেন হাইটে ক্যান্তমণি মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ডে টীম নামানো থেকে কালীপুজোর ভাসানে চীৎপুর থেকে ব্যান্ডপার্টি ভাড়া করে আনা সবই ছিল দাদার এক্তিয়ারে।

রোগা, ঢ্যাঙা, ব্রণলাঞ্ছিত মাকুন্দমুখো কালুদাকে কেউ কোনদিনও চাকরী করতে দেখে নি। চাকরীর কথা উঠলে এড়ানোর জন্য স্রেফ কেটে পড়তেন। অথচ লোকটা কোয়ালিফায়েড। পাসকোর্সের আর্টস গ্রাজুয়েট। শুনেছি কালুদার বাবা নাকি কালুদাকে আর্মিতে ঢোকাতে চেয়েছিলেন। ফোরটি নাইনে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর সব ঠিকঠাক। দেরাদুন থেকে ফর্ম আনিয়ে ফিল আপ করে পাঠানো সারা। ইংরেজী আর অঙ্কে স্পেশ্যাল কোচিংয়ের জন্য দু দুজন টিউটর রাখা হল, দু মাসের জন্য। হঠাৎ একদিন পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে গেল। কি ব্যাপার? ক্যালকাটা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বিজন দফাদারের ছেলে কল্লোল খাবার পকেট সাফ করে ক্লিন উধাও।

দু মাস বাদে অ্যাডমিশন টেস্ট শেষ হতে কালুদা ফিরে এলেন। শুনলাম মাদ্রাজ মেলে উইদাউট টিকিটে ট্র্যাভেল করার অপরাধে দু রাত সরকারী অতিথিশালায় ছিলেন। তারপর ছাড়া পেয়ে ব্যাঙ্গালোরে এক উকিলের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। দু মাস ধরে কয়লা ভেঙে, বাসন মেজে, জুতো সাফ করে হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। নাড়ীর জ্ঞান টনটনে। ক্যালেণ্ডারের অ্যাকাউন্টস মিলতেই অরিজিন্যাল পদ্ধতিতে ঘরে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন উকিল মনিবের দু একটা মেমেন্টো একটা দামী পার্কার আর রঙচটা ময়লা পার্স। খালি পার্সটা কালুদা ভোম্বলাকে দান করে দেন। পার্কারটা রাখেন নিজের জন্য। বলতেন আমি হচ্ছি বাঙালী মার্ক টোয়েন—নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ফসলে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে যাব।

স্বদেশী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার তাগিদে কালুদা বাংলা অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে গেলেন। পুত্রের গর্ভধারিণীর মুখে খবর পেয়ে দারোগা দফাদারমশাই নিজের ঘরের প্রবেশপথে একটি বড় সাইনবোর্ড লটকালেন—কল্লোলের প্রবেশ নিষেধ।

অফুরন্ত প্রাণশক্তি কালুদার। ছোট ছোট ভাই-বোনগুলো সব চোখের সামনে দিয়ে টপাটপ পাশ করে, চাকরী-বাকরী জুটিয়ে বা বিয়ে-থা করে সেটলড হয়ে গেল, তবু একটুও ঘাবড়ান নি। বছর চারেকের চেষ্টায় প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হিসেবে ঠেসে পুরিয়া টুকে পাশ করে, পার্মানেন্টলি মোড়ের চায়ের দোকানে বসে পাড়ার দারোগাগিরি শুরু করে দিলেন। লোক খুব খাঁটি। যখনই যার আপদ-বিপদ হত চেলা-চামুন্ডাদের নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতেন। মড়ার খাট বওয়া থেকে পরীক্ষার হলে মাল পাঠানো সব দায়িত্ব একাই বইতেন। ফিফটি থ্রি টু সিকসটি সিকস, তেরো বছরে কোন পরিবর্তন দেখিনি কালুদার।

শ্রীকৃষ্ণপুরের প্ল্যাটফর্মে সেই কালুদাকে দেখেই রীতিমত চমকে গেলাম। চক-

চকে শেলস কিডের পাম্পশুর খাপে বোয়াম ওপচানো ঘিয়ের মত চর্বির দলা ঠেলে উঠেছে। সরু পাড় ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে। বাঁ হাতে সিগারেটের টিন আর লাইটার। ডান হাতটা বাড়িয়ে আমায় [illegible] কাছে টেনে নিলেন কালুদা—তারপর [illegible] বাদে তোর সঙ্গে দেখা?

প্লাটফর্মের শেষে সাইকেলরিকসার লাইনের ধারে খোলার চালের চায়ের দোকান। কালুদাকে ঢুকতে দেখে কয়েকজন খদ্দের তাড়াতাড়ি বেঞ্চিটা ছেড়ে উঠে গেল। উনুনের ধার ছেড়ে দোকানী এক লাফে সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁধের গামছা দিয়ে রগড়ে বেঞ্চির ময়লা যতটা পারে সাফ করে একগাল কৃতার্থের হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করল কি দেব বাবু?

ঃ দাও, দুটো চা দাও।

ঃ আর কিছু না বাবু?

ঃ না তোমার দোকানে আর আছে কি? পার যদি মাতৃ-ভাণ্ডারে লোক পাঠিয়ে কিছু ভাল মিষ্টি আনাও।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলেন কালুদা। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদার খাতির-পসার দেখছিলাম। মিষ্টির কথা শুনে বললাম—

ঃ দাদা কিছু খাব না। শুধু চা-ই নাও।

হামলে উঠলেন কালুদা, পাড়ার চায়ের দোকানে বসে যেভাবে ধমকাতেন ঠিক সেই ভাবেই—চুপ কর। ট্রেন কখন ছাড়বে তার নেই ঠিক। বেলা বাড়লে দোকানের মিষ্টি-ফিষ্টি ব্যাপারীরা সব সাফ করে দেবে। আমার বাড়ী এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল। তোকে নিয়ে বাড়ীতে গেলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তোর পক্ষে যাওয়াও মুস্কিল। সঙ্গে মাছ আছে। তার চেয়ে মিষ্টিই আজ খা। ঠিকানাটা দিয়ে দেব, আসিস অন্য কোনদিন। যা চাস তাই খাওয়াব। তোদের ঐ কলকাতার বরফঠাসা মাছ না রে, টাটকা পুকুরের পোনা। কচি পাঁঠার মাংস। আর তোর বৌদি বাড়ীর দুধের ছানা কেটে সন্দেশ বানিয়ে দেবে। বিকেলে পুকুরের ধারে বসে পায়রার মাংস দিয়ে গাছকাটা তাড়ি চাখবি, দেখবি কি ফাইন লাগে। ওসব বিলিতি-ফিলিতি কিসসু না ওর পাশে। অবিশ্যি তোর যদি সহ্য না হয় তাহলে সে ব্যবস্থাও আমার আছে—ওল্ড টাভার্ণ, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের বোতল সর্বদাই রেডি রাখতে হয়। কখন সাহেব-সুবোরা এসে পড়ে বলে যায় না তো।

আড়চোখে তাকালাম কালুদার দিকে। ট্রামের ভাড়া জুটত না বলে কতদিন গালমন্দ খেয়েও পাড়ার নির্মলদার মান্থলিটা চেয়েচিন্তে এসপ্ল্যানেডে ইংরেজী ছবির আগাম টিকিট কিনতে যেত।। সেই লোক মাত্র তিন বছরে জমি, বাড়ী, পুকুর, মদ, বৌ ও সেই সঙ্গে কিলো দশেক চর্বি জুটিয়ে ফেলেছে। নিত্যি দুবেলা চায়ের বরাদ্দ জোটাতে যে হিমসিম খেয়ে যেত, সে এখন কত ক্যাজুয়ালি দিশি বিলিতি মালের নাম আওড়াচ্ছে। চাকরি করে এসব হয় না। হলেও তিন বছরে নিশ্চয়ই না। কম করেও মোটা মাইনের ঘুষের চাকরীতে এত সব জোটাতে তিরিশ বছর লেগে [illegible] কালুদা কত কম সময়েই সব [illegible]লেছেন।

[illegible]টা যাচ্ছি দেখলাম। পুরোনো দিনের মতই, প্লেটে ঢেলে গরম চায়ের তেজ মেরে একটু একটু করে চাখতে চাখতে কালুদা জানতে চাইলেন, কি করছি? বললাম। ব্যাঙ্কের কেরানী শুনে নাকটা একটু কুঁচকোলেন। বিয়ে করেছি জেনে খুব খুশী হলেন। তারপর পুরোনো পাড়ার হাল জানতে চাইলেন। বললাম তোমরা উঠে যাওয়ার পর পরই আমরাও পাড়া ছেড়ে ইন্টালীতে চলে গেছি। তবে এখনো মাঝে-সাঝে সময় পেলে যাই। পুরোনো পাড়া আর নেই। অনেক বদলে গেছে। সরু গলি চওড়া হয়েছে খানিকটা। পাড়ার তোতলা এডভোকেট এখন কাউন্সিলার। সেই রাস্তা বাড়িয়েছে, টিউবওয়েল বসিয়েছে, আলোর ব্যবস্থা করেছে। নীতুরা পাড়া থেকে উঠে গেছে। গোপালবাবুর ছেলেগুলো, একটাও মানুষ হয় নি। দিনরাত মদ গিলে মস্তানি করছে।

ঃ আর বুলু, সুকুমার, যীশু, ওরা কি করছে রে আজকাল?

ঃ যীশু একটা কমার্সিয়াল ফার্মের অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। বুলু গেঞ্জির দোকান দিয়েছে কালীঘাটে। আর সুকুমার রেলের অফিসার।

ঃ সুকুমার রেলে আছে?—মনে হল, খবরটা পেয়ে যেন কালুদা উলসে উঠলেন—কোন রেল? কোথায় বসে?

ঃ গার্ডেনরীচে।

ঃ গার্ডেনরীচে! ওর পুরো নামটা কি বলত।

ঃ সুকুমারবিকাশ দাস।

ঃ ও হরি! আমাদের সেই সুকুমারই তাহলে এস বি দাস। রিসেন্টলি বদলি হয়ে এসেছে। ওর কাছেই তো আমার দরকার।

সুকুমারের কাছে দরকার কালুদার? সুকুমারের অফিস গার্ডেনরীচে। আর কালুদার আস্তানা এই শ্রীকৃষ্ণপুরে। দুয়ের মাঝে যোগসূত্রটা কোথায় বুঝতে না পেরে জটিল ধাঁধার সমাধানের আশায় তাকালাম দাদার দিকে।

ঃ বুঝতে পারলি না? পাহাড়পুরে এফ সি আইয়ের গো-ডাউনে আমার সাত শো বস্তা গম পড়ে আছে। আর ইদিকে গমের অভাবে আমার সব কাজ-কারবার বন্ধ হওয়ার জোগাড়। লোক পাঠিয়েছিলাম। শুনলাম ওয়াগান নেই। আগে যিনি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে খুব খাতির ছিল. প্রয়োজনে সরকারী কাজ বন্ধ রেখে আমার ওয়াগন অ্যালট করতেন। নয়া অফিসার এস বি দাস খুব জবরদস্ত লোক, হাতে মাথা কাটে। তাই আজ নিজেই যাচ্ছি গার্ডেনরীচে। ভালই হোল তোর সঙ্গে দেখা হয়ে।

চা-মিষ্টি শেষ হয়ে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, আর কি খাবি?

ঃ আর কিছু না কালুদা। চল একটু বাইরে গিয়ে হাওয়া খাই। ভেতরটা বড় গুমোট।

ঃ তা যা বলেছিস। এ তল্লাটে ইলেকট্রিসিটি এলেও দোকানীরা অনেকেই লাইন নেয় নি। ফলে ফ্যান-ট্যান নেই। আমাদের সাইডে এখনো তার যায় নি। আমি কিন্তু ডায়নামো বসিয়ে নিয়েছি।—নিজের কৃতিত্বে বেশ উৎফুল্ল দেখালো কালুদাকে।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের বিচিত্র কায়দায় ঢাকনি খুলে ঝাঁকিয়ে টিনটা বাড়িয়ে ধরলেন কালুদা ঃ নে, খা। আমেরিকান জিনিস। আমার আবার শস্তা সিগারেট পোষায় না।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। জুতোর চামড়া থেকে সিগারেট টিন, সর্বাঙ্গ জুড়ে মেড ইন ইউ কে ছাপ। কিন্তু এই ছাপটা এল কোত্থেকে? লাইটারের শিখায় সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি কি গমের ব্যবসা করছ কালুদা?

ঃ না রে না। তোর কালুদা ব্যবসা করে না। ওসব চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-ট্যাবসা আমার সহ্য হয় না। করি সোস্যাল ওয়ার্ক।

ঃ সোস্যাল ওয়ার্ক?

আমার প্রশ্নের ধাঁধাই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল—সোস্যাল ওয়ার্ক করে কি কেউ জমি, বাড়ী, গাড়ি, পুকুর, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করতে পারে। টুসকি দিয়ে সিগারেটের মুখের ছাইটুকু ঝেড়ে, জুলপিছোঁয়া হাসিতে মুখটা কাঁপিয়ে কালুদা বললেন—

ঃ হ্যাঁরে সোশ্যাল ওয়ার্ক। ব্যাপারটা তোকে বলা দরকার, শোন। সিক্সটি সিক্সে বাবা মারা গেল। তোরা জানতিস কি খরচে লোক ছিলেন বাবা। এক পয়সাও রেখে যেতে পারেন নি। অবিশ্যি রেখে গেলেও আমি পেতাম না। যাক গে সে কথা। ছোট ভাইগুলো সব আলাদা হয়ে গেল। বাণী আর বীণার বিয়ে বাবাই দিয়ে গিয়েছিলেন। মা গেলেন মেজভাই বাবলুর কাছে বোকারোতে। আমি তো কিছুই করতাম না। অর্ডিনারী গ্র্যাজুয়েট। চাকরীর পরোয়া করিনি কোনদিনও। বাবা মারা যাওয়ার পর একটা কিছু করা বড় জরুরী হয়ে উঠল। নিজের পেটটাতো চালাতে হবে। ভাইদের কাছে হাত পাততে লজ্জা হল। কিন্তু করি কি? বয়স হয়ে গেছে। এমনিতে বাজার যা টাইট, তাতে আমার মত বিশ্ব-বেকারকে চাকরি দেবে কে? মাঝে মাঝে প্রুফ-টুফ দেখে, ট্যুইশনি করে যা দু পয়সা রোজগার হত তাতে আর কুলোচ্ছিল না। আড্ডা-ফাড্ডা মেরে সময় পেলে কলেজ পাড়ায় পাবলিশারের ঘরে ঘরে প্রুফের কাজ খুঁজে বেড়াতাম। সেখানেই দেখা হয়ে গেল অনিলের সঙ্গে। অনিলকে তোর মনে আছে?

ঠিক মনে করতে পারলাম না। ঘাড় নেড়ে জানালাম—না, মনে পড়ছে না।

: আরে আমাদের পাড়ার পেছনে, বাদাম-তলায় পুজো-মণ্ডপের উল্টোদিকের বাড়ী-টারে। কুঞ্জদা, মানে কুঞ্জ সেন, আমাদের পুজো কমিটির পার্মানেন্ট ভাইস প্রেসি-ডেন্ট ওরই সেজ ছেলে অনিল। একটা পাঞ্জাবী পাবলিশিং কনসার্নের সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। অবরে সবরে কলেজ পাড়ার বই বিক্রির ধান্ধায় ঘুরে বেড়াত। ওখানেই আমার সঙ্গে দেখা। দু-চার বার দেখা হওয়ার পর নিজে থেকেই আমায় বলল দাদা একটা কাজ করবে?

: কি কাজ?—জানিস তো ফুনু কাজের নামে আমার গায়ে কেমন অ্যালার্জি বেরোত। তাই ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, পাছে কোন গাড্ডায় পড়ি।

বলল—সোশ্যাল ওয়ার্ক। তুমি তো দাদা চিরকালই পাড়ায় সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছ, তোমার অভিজ্ঞতা আছে, তুমি পারবে। তারপর আমায় কথা বলার কোন স্কোপ না দিয়েই একদিন জোর করে ধরে নিয়ে এল এই শ্রীকৃষ্ণপুরে। এখান থেকে দেড় মাইল উত্তরে চক গোবিন্দপুর। বেশ বড় গাঁ। প্রায় পাঁচ ছশো পরিবারের বাস। এতবড় গ্রাম অথচ গাঁয়ে কোন টিউবওয়েল নেই যে লোকে জল খাবে। বর্ষায় মাঠ-ঘাট ভেসে যায়, অথচ জলনিকাশী কোন নালা নেই। নোনা জলে ধান পচে নষ্ট হয়। অথচ খরার সময় সামান্য জলের অভাবে মাঠগুলো সব খালি পড়ে থাকে, চাষ হয় না। বাঁধানো রাস্তা নেই। বর্ষায় সে যে কি কষ্ট বলে বোঝাতে পারব না। একটা প্রাই-মারী স্কুল পর্যন্ত নেই। নেই ডাক্তার বা ডিসপেনসারী। বিশ্বাস হবে না যে আজকের দিনেও, যে গাঁয়ের মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণে ইলেকট্রিক রেল চলে, সে গাঁয়ের এই অবস্থা। এই অবস্থা শুধু ঐ গাঁয়েরই না, আশপাশের বিশটা গাঁয়ের একই হাল।

অনিলদের আদি বাড়ী এই চক গোবিন্দপুরে। কুঞ্জদার ঠাকুর্দা ছিলেন জমিদার। মস্ত অবস্থা। কিন্তু পরের জেনারেশন দু হাতে মজা লুটতে গিয়ে সব খুইয়েছে। ফলে কুঞ্জদা চাকরীর খোঁজে কলকাতায় আসেন। এখন ওর সব কটি ছেলেই ওয়েল এসট্যাবলিশড।

অনিল গোড়ায় ছিল কোম্পানীর হেড-অফিসে, দিল্লীতে। ওখানে এক বিদেশী ওয়েলফেয়ার মিশনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয়। তাঁরা পাঞ্জাবে, ইউ পিতে সেলফ-হেলপ স্কীমে গম সাহায্য দিয়ে গাঁয়ের চেহারা বদলাতে ব্যস্ত। তখনই অনিলের মাথায় এল নিজের গাঁয়ের কথা। কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল ভাল একটা সোশ্যাল সার্ভিস প্ল্যান দিতে পারলে মিশনের সাহায্য পাবে। কোম্পানীর বড়কর্তাকে বলে করে রাজী করিয়ে কলকাতার রিজি-ওন্যাল অফিসে বদলি হয়ে এল। কিন্তু নিজের কাজ ছেড়ে একটানা বেশীদিন গাঁয়ে পড়ে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমায় নিয়ে এল।

: কিন্তু তোমাদের প্ল্যানটা কি?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

: দাঁড়া, দাঁড়া। সব বলব। অত ব্যস্ত হোস না।—জম্পেস করে দামী সিগারেটের গোড়ায় টান লাগালো কালুদা। গলগল করে ধোঁয়া উগরাতে লাগল মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে। আস্তে আস্তে আবার সুতো ছাড়তে সুরু করলেন : সিকসটি সিক্সের নভেম্বরে আমি এখানে এলাম। নিশ্চয়ই তোর মনে আছে সারা দেশে ফুডের তখন কি ক্রাইসিস। শহরেই রেশন মেলে না তো গাঁয়ের লোক খাবে কি? এক পালি চালের দর ন'টাকা, সাড়ে ন'টাকা। পালি মানে বুঝিস তো? আড়াই সেরে এক পালি। অধিকাংশই ভাগ-চাষী। খরায় মাঠের ধান গেছে জ্বলে, ভাগে পায়নি কিছুই। কোন কাজ নেই। ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ। ওয়েলফেয়ার মিশনের সাহেবদের নিয়ে এল অনিল। তারা সব দেখে-শুনে অনিলের প্ল্যানে সায় দিয়ে গেল। রাস্তা বানাও, টিউবকল বসাও, মজা পুকুর সংস্কার কর, খাল কাটাও, স্কুল বিল্ডিং গড়। পোলট্রি করা শেখাও, স্যানিটরী পায়খানার উপকারিতা বোঝাও। সব বুঝিয়েসুঝিয়ে যাদের জিনিস তাদের দিয়েই কাজ করাও। সব দরিদ্র বেকার চাষীকে টেনে আন কাজে : গাঁয়ের চেহারা পাল্টেই ফেল।

তখন এসব জায়গায় দিন-মজুরীর রেট ছিল আড়াই টাকা, আর এক বান্ডিল বিড়ি। ক্যাশ টাকার বদলে সবাইকে গম দেওয়া হবে, মাথাপিছু তিন কিলো।—বলতে বলতে একটু থামলেন কালুদা। নিজ ধরিয়ে, আমায় একটা সিগারেট দিলেন। ততক্ষণে প্ল্যাটফর্ম দেখি লোকে গিজগিজ করছে। বৈশাখের উঠতি বেলায় রোদের ঝাঁঝে তাড়ির হাঁড়ি উপচে সাদা গাঁজলা বেরিয়ে এসেছে। লোকেরা রাস্তার ধারের পানা-পুকুর থেকে আঁজলা ভরে জল এনে হাঁড়ির ভেতরের তেজ মারবার চেষ্টা করছে। মাছওয়ালারা রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। লগন-শার মার্কেটটা বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। অফিস-যাত্রীরা দাপা-দাপি করছে। তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ীর পেছনে সাতটা বারো আর আটটা আঠারোর ট্রেনদুটো লাইন লাগিয়েছে। রেলের কর্মচারীরা পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। সবাই অশান্ত, ব্যস্ত অধৈর্য, এক কালুদা ছাড়া। মাটিতে লুটোনো কোঁচার খুঁটে পাম্পশুর ডগা জড়িয়ে যাচ্ছে, ময়লা লাগছে, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই : ঠান্ডা গলায় বলে চলেন—আমি হলুম গ্যাংম্যান। দেড়শো টাকা মাইনের কুলির সর্দার। টাকাটা দিত মিশন। অনিলের প্ল্যান অনুযায়ী সারাদিন এ-গাঁয়ে, ও-গাঁয়ে রাস্তা বানাই, খাল কাটাই পুকুর পরিষ্কার করি, টিউবওয়েল বসাই। সন্ধ্যাবেলা অনিলদের কাছারিবাড়ীর দালানে বসে টাল দেওয়া গমের বস্তা খুলে মেপে মেপে তিন কিলো মজুরী দি। সে-কি লাইন, তুই কল্পনাও করতে পারবি না : এক একদিনে বাট সত্তর কুইন্টাল শিল হয়ে গেছে, বস্তা শেষ, তবুও খাঁই মেটাতে পারি না।

: কিন্তু তুমি তো দাদা শুধু অপরের বোঝা বয়েই বেড়াতে, নিজের দিকটা সামলালে কি করে?

: ওরই ফাঁকে। সোশ্যাল ওয়ার্কের সে কি মধু, গোড়ায় তো টের পাইনি। ভূতের মত খেটে মরেছি। মিশনের ওদাগাম থেকেই হয়ে শ্রীকৃষ্ণপুরে এসেছে, লরীতে চাপিয়ে নিয়ে গেছি চক-গোবিন্দপুরে। তারপর বিশটা গাঁয়ের হাজার হাজার বেকার চাষীকে "নিজের কাজ নিজে কর" স্কীমে খাটিয়ে সেই গম বেশী দিয়েছি তাদের মাথায়। তখন খেয়ালই ছিল না [illegible] নিজের বেলায় অষ্টরম্ভা। আর নিজের বেলায় অষ্ট। আর্থিক [illegible]

খুলতে দেরী হয়নি বেশী। খুলে দিল গোবিন্দপুরের মডিফায়েড রেশন শপের মালিক। বলল—দাদা সবার জন্যই তো করছেন, এবার নিজের জন্য কিছু করুন।

ছ' মাসে ভোল পাল্টে গেল রে। গমে গাঁয়ের চাষীর অভাব কতটা মিটে [illegible] মুস্কিল, তবে আমার আজ আর কোন অভাব নেই।

ঃ কেন এত যে রাস্তাঘাট বানালে,, কল বসালে তার কোন সুফল নেই— জিজ্ঞাসা করি আমি।

ঃ ধুর। ক্যাশ নেই, শুধু গমে কি কিছু হয়। রাস্তা যা বানাই বর্ষায় সব ধুয়ে যায়। টিউকল যে গাঁয়ে অন্তত পাঁচটা দরকার, সেখানে একটা হলে কদিন টেঁকে বল। প্রাইমারী স্কুলের বাড়ী বানানোর জন্য হাতে পাই শুধু কাদামাটি, আর চাষীদের নিজেদের হাতে বানানো ইঁট। সেই ইঁট পোড়ানোর কয়লা পাব কোথায়। এক-একটা ঝড়ে এক-একটা বাড়ী কলাগাছের মত নেতিয়ে যায়।। গোড়ায় সামপ্ল্যাস গম বেচে একটা ডিসপেনসারী করেছিলাম, তা কম্পাউণ্ডার পাইনি। ডাক্তার আসতে চায় না। বলে ভিজিট কে? কে দেবে বল— ঐ তো সব চাষীদের অবস্থা। তাই এখন সার সত্য বুঝেছি, নিজেরটা নিজেই কর।

ঃ তার মানে?

ঃ মানে তোকে একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি, তুই নিজেই হিসেব করে দেখ। ডিসেম্বর টু মে, শীতের আর খরার সময় ফি মাসে মিশন সাতশো বস্তা গম পাঠায়। বুলগার পাঠায় না আজকাল, কারণ চাষীরা খেয়ে হজম করতে পারে না। এক বস্তা মানে এক কুইন্টাল। এখন এখানে গমের দর কে-জি পিছু পঁচাশী পয়সা। সাতশো বস্তা থেকে যদি একশো বস্তা সরিয়েও রাখি কেউ টের পাবে না। টের পেলেও বলবে না কিছু। বলবে কি? খেতেই তো পেতো না, তবু তো কিছু পাচ্ছে। পাচ্ছে বলেই টিঁকে আছে। চালের যা দর—এক পালি সোয়া চার সাড়ে চার টাকা।

এখন এদের রেট বেড়েছে। এক বেলার মজুরী তিন টাকা বাবা পয়সা আর এক বান্ডিল বিড়ি। ক্যাশ তো দিই না দিই চার কেজি গম। আমিই গম দেওয়ার মালিক। চটালে কিসস্যু পাবে না। তাই কেউ ঘাটাতে সাহস পায় না। লোক ঠিক করা আছে। আশপাশের গাঁয়ের মডিফাইড রেশন শপ, মুদির দোকান। রাতদুপুরে মাল পাচার করে দি। তবে বাবা ক্যাশ আগাম জমা না পড়লে মাল ছাড়ি না। বলে দি টাকা আর থলে নিয়ে আসবে তবে গম পাবে।

ঃ থলে কেন দাদা?

ঃ মিশনের ব্যাগে যে ছাপ মারা আছে।—গম্ভীর গলায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন কালুদা—ঐ ছাপ দেখিয়ে যদি কেউ

ঃ বুঝেছি। তা মাস গেলে কত থাকে

ঃ তা হাজার সাড়ে চার, পাঁচ তো হবেই। সত্তর পয়সা কেজি দরে একশ বস্তার দাম হিসাব করে দেখ। ওর থেকে দু আড়াই হাজার লোক্যাল লীডার আর [illegible] কাকাদের পার্বনী মেটাতে বেরিয়ে যায়।

ঃ এখানে আবার তোমার কাকা-জ্যাঠারা কবে এলেন? —এবার সত্যিই আমার অবাক হওয়ার পালা।

ঃ ধুর বোকা বুদ্ধু। লোক্যাল থানার দারোগারা প্রফেশনালি আমার বাবার ভাই না?—বলেই হো হো করে হেসে ওঠেন কালুদা। তেনাদের সন্তুষ্ট না করলে যে হাতে দড়ি পড়বে।

কালুদা হাসলেও, আমি পারি না। কোথায় জানি একটা ভয়ের দামা থেকে থেকে লাফিয়ে ওঠেঃ ধর দাদা মিশন যদি টের পায়। অনিলবাবু যদি জানতে পারেন?

হাসি থামিয়ে, সিল্কের ফুলকাটা রুমালের গদানের খাঁজে খাঁজে জমে ওঠা ঘাম মুছতে মুছতে বলেন ঃ সে পথ মেরে রেখেছি না। গাঁয়ের মাথাদের মুখ বন্ধ। তার অনিলকে তো এর জন্য প্রতি মাসে হাজার টাকা দি। ওর কি আর মুখ খোলার জো আছে। আমি যা নি, সে তো আমার প্রাপ্য। দেড়শো টাকা মাইনেয় কি আর এত কাজ হয় রে। যতই বলি না কেন কিছু হয় নি, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দেখ কিছু কাজের নিশানা পাবি। তিন বছরে কম করেও পঁচাত্তরটা মজা পুকুর কাটিয়ে দিয়েছি, খাল কাটিয়েছি প্রায় দু মাইল। প্রত্যেক গাঁয়ে ফি বছর খরার সময় দুটো তিনটি করে টিউকল বসাই। প্রাইমারী স্কুল বিল্ডিং করে দিয়েছি সাত আটটা। যে সব গাঁয়ে লোকে রাস্তা বলতে আলপথ বুঝত সেখানে দেখ গিয়ে কেমন ইঁটের রাস্তা বানিয়ে দিয়েছি। এর জন্য কি কম মেহনৎ করতে-হয়েছে আমায়। দিন রাত মাটি কেটে ইঁট তৈরী হয়েছে; পাঁজায় আগুন ধরিয়ে ইঁট পোড়ানো হয়েছে। তবে সেই ইঁট বসেছে রাস্তায়। কে করেছে এ সব? এই, এই তোদের কালুদা, কল্লোল দফাদার—উত্তেজনায় ফোলা ফোলা মাকুন্দ গাল দুটো থরথর করে কাঁপে। বুকের মাঝখানে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে, স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন কালুদা—তার বিনিময়ে যদি নিজের জন্য কিছু নিই, তবে কার কি বলার আছে বল? আর কোন্ শালা দিচ্ছে না। সাহেবদের নজর পড়েছে এদিকটাতে। অন্তত বিশটা সেন্টারে এখন এই কাজ চলছে। সব সেন্টারেই খোঁজ নিয়ে দেখ একজন করে কালুদা বসে আছেন। সবাই ফেঁপে ফুলে ঢোল। কেমন করে? এখাই প্রসেস।

আমাকে আর প্রশ্ন করতে হয় না। নিজেই প্রশ্ন করে, জবাব দিয়ে চলেন কালুদা—খাতায় দেখাই দেড়শো নাম। আসলে কাজ করে একশ জন। বাকীটা পেটোয়া লোক দিয়ে টিপসই [illegible]। এর জন্য [illegible] হয়। কিন্তু [illegible] ভাবিষ্যতটাও তো দেখতে হবে। [illegible] খুব? —বলে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন কালুদা। তারপর ঝপ করে গলার সুরটা পালটে ফেললেন—সুকুমারের সঙ্গে তোর দোস্তি এখন কেমন?

ঃ মোটামুটি।

ঃ দ্যাখ এ-সব ওয়াগন-টোয়াগান জোগাড় করা বড় ঝক্কির ব্যাপার। সবাই নেয় কিছু কিছু। না দিলে গম গো-ডাউনে পড়ে পচে। ওদিকে কাজ কারবার সব ওঠে শিকেয়। সাহেবরা জানতে পারলে খয়রাতি বন্ধ করে দেবে। তাই নিজের গাঁট-গচ্চা দিয়ে রেলবাবুদের তুষ্ট করে মাল আনাই। ভালই হল, সুকুমার যখন আছে তখন আর কোন চিন্তা নেই, কি বলিস? তোর তো খুব বন্ধু ছিল। আমি তো দাদা হয়ে আর ঘুষ-টুষের কথা বলতে পারি না। তুই যদি একটু বলে দিস। বেশী না দুটো ওয়াগানেই আমার মাল পেঁ।ছে যাবে। ওর আগে যে ছিল, তাকে যা দিতাম, তাই দেব। ফি মাসে পাঁচশো। তুইও বাদ যাবি না। ঐ নেগোশিয়েশনের জন্য—বলতে বলতে জোকারণ্য প্ল্যাটফর্মেই পকেট থেকে মণিব্যাগটা বার করলেন কালুদা।

হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠি— হচ্ছে কি? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার।

চার পাশের চর্বির ভাঁজ [illegible] উত্তেজনায় বেরিয়ে আসা গোল গো[illegible] চোখ দুটো কেমন মিইয়ে গেল। দু হাতে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে অনুনয়ে ভেঙে পড়েন কালুদা—বড় উপকার হয় মাইরি। তোরা যদি একটু হেলপ করিস।

মাস গেলে যার পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম, গাঁয়ের লোকের কাছে যিনি দেবতা, তিনি এই অজ্ঞাত অখ্যাত স্টেশনের প্ল্যাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে সামান্য পৌনে চারশো টাকা মাইনের এক কেরানীর হাত জড়িয়ে ধরে অনুনয় করছে—একটু হেলপ কর মাইরি কানে আসছে উত্তেজিত জনতার ক্রুদ্ধ গর্জন, গাড়ি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো আভি ছোড়ো। গাড়ি কখন ছাড়বে তা ঠিক নেই। হাসতে হাসতে বললাম—ও-স ছাড়। চল গাড়ীতে গিয়ে বসি।

তারপর ফার্স্ট ক্লাসের মাস্থলিধারী থার্ড ক্লাশের কামরায় নিজের পাশে বসি বললাম—আগে কলকাতায় পেঁ।ছোই। সে সেখানে গিয়ে কি করতে পারি।

—সন্দীপ

মনের কথা

জলাতংকের অবসেশন

মুরারির কথা

মুরারি কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস-কর্মী। দৈহিক স্বাস্থ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে মুরারি। লম্বা চওড়ায় মানানসই চেহারা। মুখে সব সময় মিষ্টি হাসি। দেখে মনেই হবে না যে এর মনে কোনো উদ্বেগ বা অশান্তি আছে। চাকরীসূত্রে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। ঠিক চেয়ার-টেবিলের চাকরী নয়। নানা জায়গায় ঘোরাফেরা ও নানালোকের সংগে মেলা-মেশা মুরারিকে চাকরীসূত্রে রোজই করতে হয়। অগুনতি বন্ধু-বান্ধব; হৈচৈ আড্ডা দিয়ে দিন কেটে যায়। সব চেয়ে বড় কথা। অনেকের সংগে মিলেমিশে কাজ করতেও ভালবাসে। বাকপটু এবং কর্মপটু দুইই। সব রকম কাজ জানে—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কোলকাতায় নিজেদের বাড়ী। দেশের জমি-জমা থেকে ভাল আয় হয়। একান্নবর্তী পরিবার। তিন ভাই-এর মধ্যে মুরারি কনিষ্ঠ। বড় ভাই আর মুরারি বিবাহিত। মেজদা বিয়ে করেননি, করবেনও না। বড় ভাইয়ের একটি সন্তান, মুরারি নিঃসন্তান। একান্নবর্তী পরিবারে ঝগড়া-ঝাটি নেই এ বড় দেখা যায় না। মুরারি-দের পরিবারকে এদিক দিয়ে সত্যিই আদর্শ পরিবার বলা চলে।

এ হেন মুরারি পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এল। প্রথম দিন বন্ধুর মুখে রোগ ইতিহাস শুনলাম। বছর দুয়েক ধরে ভুগছে। অনেক চিকিৎসা হয়েছে৺ তবে ঠিক মনোচিকিৎসক যাকে বলে, সে রকম কোনো ডাক্তার এপর্যন্ত দেখানো হয়নি। অফিসডাক্তার শহরের বৈদ্য-বিশারদদের কাছে পাঠিয়েছেন; তাঁরা রোগবৃত্তান্ত শুনে ভুরু কুঁচকে বলেছেন—'ফানি' কিম্বা 'সিলি'। মল-মূত্র রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার পর তাঁরা ট্রাংকুইলাইজার দিয়ে-ছেন এবং কেউ কেউ মুরারিকে মনের ডাক্তারের কাছে যেতে উপদেশও দিয়েছেন। অফিস-ডাক্তারের সংগে বোধ হয় কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের আলাপ-পরিচয় ছিল না; তাই তিনি ও দিকটা একবারও চেষ্টা করে দেখেননি। বন্ধুটি অনেকটা জোরজবরদস্তি করেই আমার কাছে নিয়ে এসেছেন।

নিজের রোগ-উপসর্গের কথা বলতে গিয়ে মুরারির লজ্জা হচ্ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মত মুরারি বলল—সত্যিই 'ফানী'। অফিসের এক সহকর্মীকে কুকুরে কামড়ায়, নিয়মমাফিক জলাতঙ্ক-প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, কুকুরটির ওপর নজরও রাখা হয়। কুকুরটির কোনো রোগ ধরা পড়ল না, সে দিব্যি সুস্থ শরীরে বহালতবিয়তে হাঁকডাক করে আগের মতই ঘোরাফেরা করছে। অফিসের সহকর্মীটি খোশমেজাজে আড্ডা জমায়, কিন্তু মুরারি তার সংগে মিশতে পারে না, তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, তাসের আড্ডায় বসে না পাছে সহকর্মীর ছোঁয়া তাস ওঁকে ছুঁতে হয়। যার মুখ থেকে সিগারেট টেনে নিয়ে ঘন ঘন টান দিয়েছে, যার কামড় দেওয়া সিঙাড়া নিয়ে টুপ করে গলায় ফেলে দিয়েছে, তাকে এখন কুষ্ঠরোগীর মত ভয় পায়। ভয় জলাতংকের। ওর ছোঁয়া লাগলে মুরারির জলাতংক হবে—এই ভয়।

বন্ধুরা প্রথমদিকে হাসিঠাট্টা করে ওর ভয়টাকে আমল দিতে চায়নি। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই তারা বিস্মিত ও হতবাক হয়ে মুরারিকে নিয়ে ডাক্তারী পরামর্শের জন্য নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি সুরু করেছে। অফিস-ডাক্তার, আত্মীয় ডাক্তার, বন্ধু ডাক্তার সকলে নানাভাবে বুঝিয়েছে, মুরারিও বুঝেছে; ওদের কথামত জলাতংকের ইতিবৃত্ত ডাক্তারী কেতাব থেকে বারবার পড়েছে, পাস্তুরের জীবনী পর্যন্ত মুখস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আতংক কাটল না, যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেছে। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তিহীন ভয়কে দূর করা যায়নি। বরং ক্রমশ ভয়ের পরিধি বেড়েই চলেছে। রাতের ঘুম, মনের শান্তি নষ্ট হতে বসেছে। অফিসে যেতে ইচ্ছা করে না। গেলেও ঘুরে বেড়ায়, চেয়ারে বসে না। কে জানে? হয়ত ঐটেতেই একটু আগেই সহকর্মীটি এসে বসেছিল। সহকর্মীর সংগে চোখাচোখি হয়ে গেলে লজ্জা পায়। তার কুশল প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এত সাবধান সতর্ক থেকেও জলাতংকের ভয় তাকে ছাড়ে না। বাড়ী গিয়ে অফিসের সব কাপড়জামা বাইরের ঘরে রেখে, জীবাণুনাশক সাবান মেখে ঘণ্টাখানেক ধরে স্নান করে, তবে বাড়ীর জিনিষপত্রে হাত ঠেকায়। ভাইঝিকে খুব ভালবাসে। অফিস থেকে ফিরলেই তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করত, তার মুখে পকেট থেকে বিস্কুট কিম্বা অন্য কিছু নিয়ে গুঁজে দিত। এখন বাইরে থেকে কোনো কিছু বাড়ীতে নিয়ে যায় না; জলাতংকের জীবাণু কখন খাবার জিনিষের সংগে বাড়ীতে ঢুকে বসে—এই ভয়ে ও অস্থির। নিজের অসুখ ভাইঝি অথবা স্ত্রীর দেহে সংক্রামিত হবে,—এই ভয়ে তাদের মন খুলে আদর করতেও পারছে না। জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। হাসিখুসি জোয়ান মানুষটা আমার কাছে রোগের কথা বলতে বলতে ভয়ার্ত, বিমর্ষ হয়ে উঠল। তার মুখচোখের চেহারা পাল্টে গেল। এখন বাড়ীর লোকদের নিয়েই ওর যতকিছু দুশ্চিন্তা। ওর জন্যে খুকু (ভাইঝি) আর বিনীতা (স্ত্রী) পীড়িত হয়ে না পড়ে।

আগের দুটি রোগীর এই 'সংক্রমণ-সম্ভাবনা-ভীতি' ছিল না। এই ভয়টা মুরারির বিশিষ্টতা। আগের দুজন নিজের রোগ-ভয় নিয়েই অস্থির ছিল। মুরারির বর্তমান ভয় অন্যকে রোগগ্রস্ত করার; বিশেষ করে খুকু আর বিনীতাকে।

আমার কাছে যখন এসেছে, তখন নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খাচ্ছে, তবুও ভাল ঘুম হচ্ছে না। অফিসে যাচ্ছে তবে কাজ করতে পারছে না। নিজের অফিসে (যে সহকর্মীটিকে কুকুরে কামড়েছিল, তার আর মুরারির কাজ একই কামরায়) চেয়ারে বসতে পারে না, টেলিফোনে হাত দিতে পারে না। কয়েক মিনিট অন্তর রুমালে হাত মুছতে হয়। জীবাণু কোনো পথে অনুপ্রবিষ্ট হল কিনা, এই চিন্তাতেই অস্থির। সকালে বাড়ীর বাজার করা ছেড়ে দিয়েছে। বাজারে এক দোকানদারের শ্বেতী আছে, (লিউকোডারমা) বলে বাজারে যেতে চায় না। শ্বেতী সংক্রামক নয় মুরারি বোঝে, তবুও ভয় কাটাতে পারে না। সে কি জানে না যে জলাতংক রোগ কিভাবে সংক্রামিত হয়? জানে, তবুও ভয় পায়।

'জলাতংকগ্রস্ত রোগীর লালা যদি কারুর রক্তের সংগে সরাসরি মেশে, তবেই তার জলাতংক হতে পারে,—এত আমি

জানি। তবু কেন ভয় পাই? সহকর্মীকে কুকুরে কামড়ে ছিল দুই বছর আগে; এখন আর তার রোগ হবার সুদূরতম সম্ভাবনাও নেই জানি। তবু ভয় তাড়াতে পারছি না কেন? বাড়ী ফিরে চশমা, মনিব্যাগ, রুমাল ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি কেন? রোগের ভাইরাস চশমায়, মনিব্যাগে, রুমালে ছড়িয়ে রয়েছে, এ ধরনের আজগুবী চিন্তা মন থেকে তাড়াতে পারছি না কেন?' সব অবসেশন রোগী এই ধরনের চিন্তা করে। ডাক্তারকে এই রকম প্রশ্ন করে। রোগের কারণ, উপসর্গের ব্যাখ্যা না জানা পর্যন্ত তাদের অস্থিরতা কমে না। ট্রাংকুলাইজার দিয়েও অস্থিরতা কমানো যায় না। কাজেই অন্যদের মত মুরারিকেও অবসেশনের শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা ও সম্ভাব্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ জানাতে হল। আলোচনার পর মুরারি বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হল।

অন্যকে রোগগ্রস্ত করে দেবার ভয়, এবং তার বিরুদ্ধে নানারকমের লড়াই মুরারিকে অস্থির করে তুলেছিল। মনের মধ্যে কি কোনো অপরাধের ভাব পোষণ করছে মুরারি? সরাসরি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম; এমন কোনো কাজ করেছ কি, যার জন্যে তুমি অস্বস্তি বোধ করছ? নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে? না, খুব পুরনো দিনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কয়েক দশকের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে, সেই সব মনে করবার চেষ্টা কর। এই মর্মে সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনও দিলাম একদিন। মুরারি সহজেই সম্মোহিত হল। অবশ্য অভিভাবনের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। ঘটনাটা মুরারির স্মৃতিতে বেশ উজ্জ্বল হয়েই জেগেছিল। বলবার ইচ্ছেও হচ্ছিল, লজ্জায় বলতে পারছিল না। আমার দিক থেকে উৎসাহ দেখাতে খোলাখুলি ঘটনাটা বিবৃত করল। বলবার সময় বরাবর ও লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল। খুব আস্তে, অনুচ্চ স্বরে জানাল সেই অধঃপতনের কাহিনী। কোলকাতার বাইরে এক মাঝারি শ্রেণীর হোটেলে মাত্র এক-রাত্রির কথা। সে রাতে ওর মাথায়, মুরারি বলল, হুইস্কির বোতল থেকে ছিপি খোলা পেয়ে, সর্বনেশে সেই দৈত্যটা ঢুকে পড়েছিল। কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাইরের ঝড়ের সংগে পাল্লা দিয়ে, ওর মাথার মধ্যে, ওর মনের মধ্যে, ওর দেহের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় প্রকোপ সেই ঝড়ের। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার সত্তা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই প্রথম, এবং এই শেষ; এরকম ঘটনা আমার জীবনে আর ঘটেনি না। ওই হোটেলের ছায়া আর মাড়াইনি, মাড়াবোও না।

বিশেষ নাটকীয়ভাবে ঘটনাটা বিবৃত করল মুরারি। মেয়েটি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল যে, অনেক দিন ধরে মেয়েটিকে ও চেনে। ওর বন্ধুস্থানীয় হোটেল-মালিকের স্ত্রী। সেই রাতের আগে কোনোদিন ও ভাবেনি যে [illegible] সঙ্গে এক রাতের জন্যেও ওর এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। বন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ও কী করে এই ধরনের ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হতে পারল? সেই থেকে ভয়, লজ্জা, গ্লানি ও ঘৃণায় মুরারি অস্থির হয়ে পড়েছে। এই সব স্বগতোক্তির পর সেদিন বেশ উত্তেজিত-ভাবে ও আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘটনাটার সঠিক তারিখ বলতে পারল না। এমনকি, জলাতংক ভীতি আগে না এই ঘটনাটা আগে; তাও মনে করতে পারল না।

দিন তিনেক পরে মুরারি এসে কয়েকটি নতুন তথ্য সরবরাহ করল। জলাতংকের ভয় সবে মনে ঢুকেছে, এমনি সময় হোটেলের ঘটনাটি ঘটে। তার অবসেশনের মৌল কারণ হিসেবে এই ব্যাপারটিকে গ্রহণ করা চলে না। তবে জলাতংকের ভয় এর কয়েক সপ্তাহ পরে থেকে খুব বেড়েছে, এ কথা বলা চলে।

পরের দিনই ও হোটেল থেকে, একরকম পালিয়েই কলকাতায় চলে আসে। এই ব্যাপারের পরে যৌন ব্যাধির তাড়নায় জলাতংক-ভীতি অনেকটা নিস্তেজ হয়ে গেল। পারিবারিক চিকিৎসককে কোনো কিছু জানাবার সাহস হল না। হাসপাতালের আউটডোরে এবং দু চারজন অপরিচিত ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইল। কয়েক সপ্তাহ ধরে যৌনব্যাধির ভয় ভূতের মত ওকে ভর করে রইল। নানাভাবে রক্ত পরীক্ষা করা হল, অন্যান্য পরীক্ষাও বেশ ঘটা করেই চলতে থাকল। সব পরীক্ষার ফল নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিল যে মুরারির দেহে যৌনব্যাধির জীবাণু,—স্পাইরোকিট, কক্কাস,—কিছুই অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। সপ্তা তিন চার পরে ধীরে ধীরে এই ভয়টা কমতে থাকল। কিন্তু অন্য ভয়টি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জলাতংকের ভয় এবার তীব্রভাবে দেখা দিল।

তখনও পর্যন্ত মুরারির দুটি অভিব্যক্তির অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার মাধ্যমে অন্যের দেহে রোগ-সংক্রমিত হবে,—এই ভয় কেন? আর একটি ব্যাপারও একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছিল; নৈতিক অধঃপতনের' উপর অতি গুরুত্ব স্থাপনেরই বা কারণ কি? আজকালকার যুবকদের মধ্যে যৌন ব্যাপারে নীতিবোধের বাড়াবাড়ি খুবই কম। রক্ত-বেরংগের সাইক্লোস্টাইল পত্র-পত্রিকার এবং যৌন বিকারগ্রস্ত নায়ক-নায়িকা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসের চাহিদা থেকেও এটা বোঝা যায়। অনেক রোগী নিজে থেকেই যৌন-জীবনের ইতিহাস বলতে থাকে, তাদের মধ্যে অনেক সময় নাটকীয় ভাব, বাহাদুরির ভাবও দেখতে পাই; কিন্তু তাদের বেশির ভাগই পর-নারীতে উপগত হওয়া ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছে মনে হয়। ডাক্তারের কাছে বেশ রসিয়ে যৌনজীবন খুলে ধরবার চেষ্টা করে। নিউরোসিসের সঙ্গে যৌন-জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে—এই চলতি অথচ ভ্রান্ত ধারণা থেকে তারা যৌন-ইতিহাসের বিবরণ দিতে আগ্রহী ও উৎসুক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মনোবিকারের সঙ্গে এই সব ইতিহাসের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। পরোক্ষ প্রভাব বিস্তর অবশ্য অনেক সময় করতে পারে। তবে তাদের মনোবিকার যতটা তাদের যৌনবিকারের জন্য দায়ী, যৌনবিকার মনোবিকারের জন্য ততটা দায়ী নয়। এ-আলোচনা বারান্তরে করবার ইচ্ছে রইল। যাক, বর্তমান প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক।

অন্যকে সংক্রামিত করতে পারি, এ ভয় অপরাধ বোধেরই অভিব্যক্তি। হোটেলের ঘটনাটি কি এই অপরাধবোধের জন্য দায়ী? না, আরো কোনো কারণ রয়েছে এই অপরাধবোধের মূলে? হোটেলের ঘটনাটিকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কি মুরারি? তার কারণ কি? অপরাধমনস্কতা নয় তো?

হোটেলের সেই রাত্রির দুর্বলতা প্রকাশের জন্যে নিজেকে এত বেশি অপরাধী মনে করছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মুরারি বলল যে বন্ধুপত্নীর তরফ থেকে নিমন্ত্রণ আসে নি, ইশারা ইঙ্গিতেও নয়। সেই পুরোপুরি দায়ী। সে যে বন্ধুপত্নীর দেহশ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হবার ফলেই এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারটা ঘটেছে, তা নয়। অন্য একটা তাগিদও ছিল। সে জানতে বা বুঝতে চেয়েছিল তার যৌবন নিঃশেষিত কি না? স্ত্রীর কাছ থেকে সে সঠিক খবর জানতে পারে নি, কেননা স্ত্রী লাজুক এবং অতিমাত্রায় তাপহীন, শীতল। সন্দেহ এল কেন? ডাক্তারদের কথা থেকে। অনেকদিন বিয়ে হয়েছে অথচ সন্তান হচ্ছে না; —এই উদ্বেগ অনেকদিন ধরে পীড়িত করছিল। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে চলল। তাই ঠিক করল, এর কারণ নিয়ে এবার ভালরকম অনুসন্ধান চালাবে। স্ত্রীকে নানা-ভাবে পরীক্ষা করে ডাক্তাররা রায় দিলেন যে ওর সন্তানধারণের ক্ষমতা পুরোপুরিই আছে। বন্ধ্যাত্বের কোনো লক্ষণ তাঁরা ওর মধ্যে পেলেন না। তারপর চলল অনুসন্ধান পর্ব ওকে নিয়ে। মুরারির সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা আছে কিনা, তার বীর্যে যথেষ্টসংখ্যক শুক্রাণু আছে কিনা, অণু-গুলি যথেষ্ট মাত্রায় সচল সক্রিয় কিনা?—এই নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বীর্য পরীক্ষা হল। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হল না। যে-ডাক্তারের পরামর্শে এইসব পরীক্ষা-অনুসন্ধান চলছিল, তিনি রিপোর্টটা দেখে ভুরু কোঁচকালেন। ওর জন্যে কিছু বীর্য-বর্ধক ওষুধ লিখে দিলেন। ওষুধ কেন? তবে কি—? না, তেমন কিছু নয়, —ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিলেন। মোটিলিটি ঠিক আছে তবে সংখ্যায় যেন শুক্রাণু সামান্য কিছু কম মনে হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর এই কথায় মুরারি চোখে অন্ধকার দেখল। কিন্তু ল্যাবরেটরির ডাক্তার বলল যেন যে সব ঠিক আছে। এই ব্যাপারে তার জ্ঞান ও চিকিৎসক ডাক্তারবাবুর থেকে বেশি। এইসব চিন্তা করেও হতাশার ভাব ও দুশ্চিন্তাকে দূর করা গেল না। পরের দিন পরিবারের পরিচিত ডাক্তারের কাছে গিয়ে

সব কথা খুলে বলল। তিনি রিপোর্টটা দেখলেন, টেলিফোনে ল্যাবরেটরীর পরীক্ষক-ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেন। মুরারিকে রীতিমত কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করলেন। কেন সে সব ব্যাপার ওঁর কাছে থেকে গোপন রেখেছে? ল্যাবরেটরিতে ফোন করে জেনেছেন যে তাঁর ধারণা ও পরীক্ষকের ধারণা হুবহু এক। মুরারির কোনো 'ডিফেক্ট' নেই। চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে 'কনফারমেশনের' জন্যে আর একটি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাতে বললেন। সেই ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় প্রায় একই রকম রিপোর্ট পাওয়া গেল। সংখ্যার দিক থেকে সামান্য কিছু কম, কিন্তু এর জন্যে সন্তান উৎপাদন আটকাতে পারে না। ভদ্রলোক অন্য দিক দিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। প্রশ্নগুলো যৌনশক্তি (পোটেন্সি) সংক্রান্ত। যদিও মুরারির 'পোটেন্সি'র এবং আকাঙ্ক্ষার কমতি ছিল না, কিন্তু ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তার মনে হল, যে সে নিবীর্য না হলেও নিঃসন্দেহে অক্ষম, শক্তিহীন। ল্যাবরেটরির রিপোর্ট থেকে মনে যে উদ্বেগ ঢুকেছিল, এবার সেই উদ্বেগ আতংক হয়ে তাকে আবিষ্ট করল। ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল মুরারি।

তার অক্ষমতার জন্যেই সন্তান হচ্ছে না। এই সন্দেহ তাকে পেয়ে বসল। নিশ্চয়ই, পারিবারিক চিকিৎসক তাকে স্তোকবাক্যে ভোলাতে চেয়েছেন, ল্যাবরেটরীর পরীক্ষকরা একটু রেখে ঢেকে কথা বলেছেন। তারই দোষ। তারই জন্যে স্ত্রী সন্তানের মা হতে পারছে না। মা না হতে পারা নিশ্চয়ই স্ত্রীর পক্ষে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। স্ত্রীর মনোকষ্টের জন্য সেই দায়ী। স্ত্রী অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল। মুরারি প্রথম দিকে কিছুই বুঝল না। সত্যিই হয়ত অফিসে চাকরী করা মেয়েরা সন্তান ধারণ ও পালনের হাঙ্গামা পোয়াতে চায় না। প্রথমদিকে স্ত্রীর অনুরোধ ও নির্দেশে তারা নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। স্ত্রীর শীতলতার কারণই হয়ত এই সন্তান ধারণের ভয়। নিজেকে নানাভাবে আশ্বাস দিল মুরারি। উদ্বেগ-আতংক অনেকটা যেন কমে এল। ঠিক এমনি সময়ে সহকর্মীকে কুকুরে কামড়াল। জলাতংক রোগের উপসর্গ নিয়ে অফিসে বন্ধুদের আলোচনা থেকে ওর ভয়ের সূত্রপাত ঘটল। তার আসল উদ্বেগ ও ভয়কে জলাতংকের ভয়ের উপর প্রক্ষেপ করল। অক্ষমতার লজ্জা ও দৈন্য-বোধের হাত থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পেল।

ওর জীবনের এই কাহিনী শোনার পর বুঝতে পারলাম তার অপরাধমনস্কতার কারণ। পনেরো বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে স্ত্রীকে সন্তানের মা করতে না পারায় মুরারি নিজেকে অপরাধী মনে করে আসছিল। নিজের অক্ষমতার চিন্তা জলাতংকের চিন্তায় মিশে যাবার পর অপরাধবোধ অন্য পথে আত্মপ্রকাশ করল। স্ত্রীকে হয়ত বন্ধ্যাত্ব রোগে সংক্রামিত করেছি, এই চিন্তা পরবর্তীকালে স্ত্রীকে হয়ত জলাতংক রোগে সংক্রমিত করছি, এই চিন্তায় রূপান্তরিত হল।

বন্ধুপত্নীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের মূলে ছিল অক্ষমতার দরুন হীনমন্যতা নিরসনের প্রচেষ্টা। সে জানতে বা বুঝতে চেয়েছিল যে তার যৌবন নিঃশেষিত কিনা? সে যে নিবীর্য বা যৌনশক্তিহীন,—এটা যেমন সে বিশ্বাস করেছিল, তেমনি আবার এই অপযশ, এই কলঙ্ক দূর করবার চেষ্টাও চলছিল মানসিক স্তরে। বন্ধুপত্নী সেই রাত্রে যতটা তার হীনম্মন্যতার শিকার হয়েছিল, লালসার ততটা নয়।

বন্ধুপত্নীতে উপগত হবার পর যৌন-ব্যাধির ভয়ে সে অভিভূত হল কেন? বন্ধুপত্নীকে সে অনেকদিন ধরে জানে, বন্ধুকেও ভালভাবে চেনে। দুজনেরই নৈতিক চরিত্র উচ্চস্তরের, তাদের যৌনব্যাধি থাকার কথা নয়। এটা কি জলাতংক ভয়কে আর একটা ভয় দিয়ে জয় করবার চেষ্টা? একে কি সেকেণ্ডারী প্রজেকশন বলা চলে? নিবীর্যতা বা যৌনশক্তিহীনতার ভয় থেকে জলাতংকের ভয়,—প্রাইমারি প্রজেক্শন। জলাতংকের ভয় থেকে যৌন-ব্যাধির ভয় সেকেণ্ডারী প্রজেকশন অথবা একে অবসেশনের পরিধির বিস্তার ও রূপান্তর বলে ধরব? শেষোক্ত ধারণাটাই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা আরো কিছুদিন পরে লিউ-কোডার্মার এবং কুষ্ঠরোগের ভয় ওকে আবিষ্ট করেছিল। এরকম আতংকের রূপান্তরণ অন্য রোগীর বেলাতেও দেখা গেছে।

প্রাথমিক ভয় সন্তান উৎপাদনের অক্ষমতার দরুন ভয়ের পিছনে ছিল পুং নামক নরক থেকে ত্রাণ না পাবার ভয়। মনু পরাশরের দেশে এ ভয় এখনও বিদ্যমান।

ব্যাখ্যামূলক সাইকোথেরাপি এবং সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে মুরারি খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। মুরারির স্ত্রী এই সময় অন্তঃসত্ত্বা হয়। এই ঘটনার পর মুরারির জলাতংকের ভয় ও অন্যান্য রোগের ভয় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একেবারে দূর হয়ে যায়। রোগ-নিরাময়ে, আমার মনে হয়, এই ক্ষেত্রে প্রকৃতি আসল চিকিৎসকের কাজ করেছিল। স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা না হলে মুরারি সম্পূর্ণ আরোগ্য হত কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

—মনোবিদ্

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

(এগারো)

হাসি মুখ নিয়েই ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। জিগেসপত্তরের সময় তাঁর উপস্থিতি পুলিশের বাঞ্ছনীয় না হতেও পারে।

এবং সেটা টেরও পেলেন যেন। তাঁকে বেরিয়ে আসতে দেখে ও'রা কেউ কোন ভ্রূক্ষেপও তো করলেন না।...ওয়েল। পুলিশ মোজ দেয়ার জব।—মনে মনে একথা ভাবলেন কর্ণেল। আরও ভাবলেন, গুপ্ত যেভাবে ঘটনাটা সাজিয়েছে, তার বাহাদুরী আছে বলতে হয়। উড়িয়ে দেবার মত তথ্য তো কিছু নেই। অবশ্য পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আর ফোরেনসিক এক্সপার্টদের রিপোর্ট এখনও হাতে নেই। পেলেই বা কী হবে! পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী নবীনেন্দ্র খুনী প্রতিপন্ন হয়েছে—কোর্টেও হবে। ওর বাঁচোয়া নেই। তবে হঠাৎ ওই অধ্যাপকের রক্তমাখা চাদরটা এসে গুপ্তকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে। এ আক্রমণ অভাবিত ছিল। শেষ অব্দি সত্যজিৎ গুপ্ত এটা বুঝে নিয়ে বলছিল, চাদরের রক্ত যে কল্পনার, সেটা আইনত প্রমাণ করার মত জোর কোন ডাক্তারের নেই। অধ্যাপক যদি এটার সংগত ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তাহলেই আইন খুসি। বিছানার চাদরে রক্ত। তা নিজেদেরই রক্ত হতে পারে। অবশ্য রক্তের গ্রুপ রয়েছে। কিন্তু তা দিয়েও আইনত কোন ডাইরেকট প্রমাণ হয় না। যে খুন হয়েছে তার রক্ত যদি বি গ্রুপের হয়, যাকে খুনী বলে সন্দেহ করে তার কাপড়ে যে রক্ত পাওয়া গেছে তাও যদি বি গ্রুপের হয়—

বড়জোর সেটা হবে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের অন্তর্গত মাত্র। চিকিৎসা-বিদ্যা এক্ষেত্রে নাচার। খুনী অ্যালিবাই দিতে পারে নানা-রকম। এবং অজস্র মানুষের গায়েও বি গ্রুপের রক্ত রয়েছে। তাছাড়া...গুপ্ত আরও বলছিল, সম্প্রতি অ্যামেরিকান ফোর-সেনিক এক্সপার্টরা আরও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। মানুষের সমজাতীয় প্রাণী অর্থাৎ গরিলা, বানর ইত্যাদির রক্তের সঙ্গে মানুষের রক্তের পার্থক্য টের পাওয়া কঠিন আছে। খুবই নিপুণ বিশ্লেষণের ফলে পুরুষ-নারীর রক্তের পার্থক্য নির্ণয় করাও কিছুটা সম্ভব—কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। নানা বিষয় বা অবস্থার ওপর নিশ্চিত সিদ্ধান্তটা নির্ভর করছে। কাজেই আইনে এগুলো কোনটাই ডাইরেকট এভিডেন্স নয়। প্রফেসর-ফ্যাক্টর ইজ নাথিং।

তা ঠিক। গুপ্তের মাথা আছে। অভিজ্ঞতা আছে। কর্নেল ভাবলেন।...কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ধাঁধা থেকে যাচ্ছে তাঁর নিজের মনে। তার একটা হচ্ছে, গত রাত্রে

ডোবার ধারে সেই অদ্ভুত লোকটির আবির্ভাব এবং পলায়ন। তার হাতে একটা পাউডারজাত জিনিস দেখেছেন। কী ছিল ওতে। দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে : সেই কবিতাটা। ডোবা, ইয়েস...শুভ ঠিক বলেছেন, ডোবা ইজ দি ভাইটাল পয়েন্ট অব দি কেস। তৃতীয় ব্যাপার : হোটেলে কতকগুলো অদ্ভুত চুরির ঘটনা। স্বাতীর একপাটি জুতো গেল বিভাসের বাথটবে। কল্পনার টুথব্রাস হারাল। চীনা তাকে সন্দেহ করেছে। টুথব্রাশটা কে স্বাতীর ব্যাগে রেখে দিয়েছিল। পরে ছবি চুরির রাত্রে জানলার নীচে সেটা ফের খোওয়া গেছে। তারপর হল মিসেস ব্যানার্জির গুরুদেবের ছবি চুরি। সে ছবিটা পাওয়া গেল তাঁর স্বামীরই ব্যাগে। বিচিত্র সব ব্যাপার।

হঠাৎ কর্নেল চমকে উঠলেন।...মাই গুডনেস! সিঁড়ির মাথায় নাকি একটা কলার খোসা পড়েছিল—সাত তারিখ রাত্রে। স্বাতীর ধারণা, তার পিছন থেকে কেউ অন্ধকারে ওটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। তার ফলে তার পা স্লিপ করে গড়াতে গড়াতে সিঁড়িতে প'ড় যায়। কী উদ্দেশ্য ছিল এর পেছনে? স্বাতীকে ওই আশ্চর্য কৌশলে কি কেউ খুন করতে চেয়েছিল? খুন বৈকি। স্বাতী খুব শক্তসমর্থ খেলোয়াড় মেয়ে—তা না হলে অত উঁচু থেকে গড়িয়ে নীচে পড়লে নির্ঘাৎ তার লাঙস বা হার্টে গুরুতর আঘাত লাগত। এই সেকেলে নবাবী বাড়িগুলোর প্রতিটি তলা দারুণ উঁচু—ইটালিয়ান স্থাপত্যের ধাঁচে তৈরী। দোতালা থেকে একতলায় পড়লে কারো হাড়গোড় আস্ত থাকবে না।

কী উদ্দেশ্য এর? প্রণয়ঘটিত ঈর্ষা? কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে ডোবা প্রসঙ্গ অন্যান্তর হয়ে পড়ে।

নাঃ, ডোবা ইজ দি ওনলি ক্লু। ওখানেই সব ধাঁধার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে।.........

বারান্দার দু-প্রান্তে দুজন করে চারজন সেপাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্নেল নিজের ঘরে গেলেন না। সোজা ডাইনিং হলে ঢুকলেন। দেখলেন অস্বাভাবিক থমথমে পরিবেশ সেখানে। অধ্যাপক মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে নিবিষ্ট মনে ধুতির পাড় খুঁটছেন। জানালার পাশেই তাঁর চেয়ার। ভদ্রলোক এখনও হয়ত টের পাননি—তাঁর কীর্তি পুলিশের করায়ত্ব। বেচারা!

থামের পাশে চীনা মিত্র একা। কর্নেল তার কাছেই গেলেন। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন হ্যাল্লো গার্ল। ডোন্ট মাইন্ড। বসছি।

না, না। বসুন। চীনার উদ্বিগ্ন মুখটা বদলে গেল। প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠল আবার।...কফি বলছি। এক মিনিট।

চীনা উঠে গেল কিচেনের কাউন্টারে। কর্নেল চারপাশটা লক্ষ্য করছিলেন। বিভাস চাপা গলায় নীরেনকে কী বোঝানোর চেষ্টা করছে। নীরেনের মুখটা কুৎসিত দেখাচ্ছে। চোখদুটো লাল। মাথার চুল বিশৃংখল। ওর চিবুকের সামান্য দাড়ি যেন রাতারাতি কাঁটার মত খাড়া হয়ে গেছে। ওপাশে বোস-দম্পতিও বেজায় গম্ভীর। ইরা দীপেনের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। মুখ নীচু করে কী বলছে অনুচ্চকণ্ঠে। দীপেনের দৃষ্টি জানালার বাইরে। স্বাতী আর দিব্যেন্দুও চাপা গলায় কী বলাবলি করছে।

কী দুর্ভাগ্য বেচারাদের। প্রমোদভ্রমণে এসে বিপদে পড়ে গেছে। কর্নেল ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, আরে, আরে! তুমি নিজে নিয়ে এলে যে! ওরা সব কোথায়?

চীনার হাতে ট্রে। কফির পট। কাপ! মৃদু হাসল সে।...

সামনাসামনি বসে দুজনে কফি খেতে থাকল। কর্নেল বললেন, এবার ওদের ডাক সুরু হবে। দেখা যাক, কার ঝুলি থেকে কী বেরোয়।

চীনা বলল আপনাকে বলা দরকার—একটু আগে লক্ষ্য করলাম প্রফেসর কী একটা...

কর্নেল হাত তুলে বাধা দিলেন।...জানি। একটা রক্তমাখা চাদর ফেলেছেন। সেটা পুলিশের হাতে চলে গেছে।

চীনা চমকে উঠল।...আশ্চর্য! প্রফেসর ব্যানার্জি...সে নির্বাক হয়ে গেল হঠাৎ।

কর্নেল আরো চাপা গলায় বললেন, কাল রাত্রে ডোবার ধারে যে লোকটি এসেছিল তোমাকে তার কথা আগেই বলেছি। তুমি বলছিলে যে সে প্রফেসরের জন্যেই ওখানে এসেছিল। কেন একথা তোমার মাথায় এসেছিল?

চীনা তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল। একটু ঝুঁকে বলল, ও'র মাথায় পুরাতত্ত্বের বাতিক আছে। সম্ভবত উনি মুর্শিদাবাদের নবাবী মহাফেজখানার কোন বিশেষ দলিল হাতাতে চান।

কর্নেল মাথা নেড়ে বললেন, রাইট, রাইট।

দুজনেই অবশ্য খুব চাপা গলায় কথা বলছে। কাছের লোকদের পক্ষে তা শোনা বা বোঝা বেশ কঠিন। চীনা বলতে থাকল, আগের রাত্রে কে নীচে মেইন সুইচ অফ করে রেখেছিল। তারপর নাকি বাহাদুর দ্যাখে যে প্রফেসর ব্যানার্জি সুরঞ্জনবাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বাহাদুরকে জিগ্যেস করেছি সব। বাহাদুরের ধারণা, প্রফেসর বাইরে থেকে এসেছিলেন যেন—তার মানে ওপারের সিঁড়ি বেয়ে নামেননি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সেদিন তারিখ ছিল কিন্তু আট ফেব্রুয়ারি। সেই কবিতার নীচে লেখা তারিখ।

ইয়েস, ইয়েস।

যে কোন কারণেই হোক, সে রাত্রে কার্যসিদ্ধি হয়নি। কাজেই পরের রাত্রে প্রফেসরের ওখানে পৌঁছনোর কথা ছিল। তার মানে গত রাত্রে।

হ্যাঁ, গতরাত্রে তাঁর বদলে আমি গিয়ে হাজির হলাম। কর্নেল একটু হাসলেন।... এদিকে শুভ খুন হবার সংবাদে প্রফেসর আর সাহস পেলেন না বেরোনর।

চীনা ফুসফুসে ফিসফিস করে বলল, উঁহু। আমার ধারণা, উনি বেরিয়েছিলেন। স্বাতীর ঘর থেকে শ্রীমিত্তিরা তো বেরিয়ে গেলেন। তারপর উনি কোথায় ছিলেন, আমরা জানি না। নিজের ঘরে ছিলেন কি না—ও'র স্ত্রী কক্ষনো বলবেন না। স্বামীকে ফাঁসাতে চাইবেন কেন? যাই হোক বেরিয়ে ডোবার ধারে পৌঁছনর পর কথামত লোকটির দেখা পেলেন না। তখন...

কর্নেল প্রশ্ন করলেন, কল্পনার লাশ এল কোত্থেকে? কে আনল?

বলছি। রক্তমাখা চাদরের সূত্রটা আমার সব ধাঁধার সমাধান করেছে এতক্ষণে। কল্পনা কাল কোন সময় ওর ঘরে গিয়ে থাকবে কোন উদ্দেশ্যে। দেবতোষ টের পেয়েছিলেন, শুভ আর কল্পনা কোনভাবে তাঁর দলিল হাতানোর ষড়যন্ত্রটা জানতে পেরেছে। ওই কবিতাটা শুভর ছাড়া কারো লেখা নয়। অধ্যাপককে নিয়ে এমন তামাশা শুভর মত সরল বোকা ছেলের পক্ষে খুবই সম্ভব। শুভ যেন এই কবিতাটা রটিয়ে বলতে চেয়েছিল, অধ্যাপক মশাই, সব জানি আমরা! ব্যস, অধ্যাপক ভয় পেয়ে গেলেন। এবার পরপর সাজিয়ে যাচ্ছি ঘটনাটা।

দেবতোষ শভুদের প্রায় পিছন-পিছনই বেরিয়ে যান গতকাল। পরে বলছিলেন, রামরাজাপুর গিয়েছিলাম। ওটা মিথ্যে। চতুর দেবতোষ ওদের ফলো করছিলেন। আঁধারমহল আমি দেখে এসেছি একদিন। প্রচুর জঙ্গল আছে চার পাশে। যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে কে ঢুকছে-বেরোচ্ছে লক্ষ্য করা যায়। দেবতোষ ওখানে যেভাবে হোক ঢুকে কাজ শেষ করে এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ফিরে আসেন। খিড়কির সিঁড়ি হচ্ছে বেস্ট পথ। এক মিনিট—স্মরণ করে নিই, তখন কে কোথায় ছিলাম...হ্যাঁ, আপনি ছিলেন আমার ঘরে। আমরা ছবি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। দরজায় পর্দা আছে বাইরের কিছু দেখা যায় না। ম্যানেজারের নীচে থাকবার কথা। দিব্যেন্দু স্বাতীর ঘরে। বোসবাবুরাও নিজের ঘরে। বারান্দা ফাঁকা। কল্পনা...কল্পনাকে নিজের ঘরেই পেয়েছিলেন—কারণ বারান্দায় খুন করা সম্ভব নয়। কেউ টের পেয়ে যাবে। শভুদের ঘরে তালা দেওয়া ছিল নিশ্চয়—কারণ, ওরা বেরিয়ে গেছে। এদিকে অদ্ভুত চুরির ব্যাপার চলছে—যার ফলে ওরা সতর্ক হবেই। দিব্যেন্দুর কাছে আলাদা চাবি রয়েছে।... চীনা কফিতে চুমুক দিয়ে ফের বলতে থাকল।...বলবেন, স্ত্রীর সামনে খুন করা কি সম্ভব হল? আমরা জানি, মিসেস ব্যানার্জির ফিটের অসুখ রয়েছে। গুরু-দেবের ছবি চুরির ফলে ভয়ংকর শক খেয়েছেন ভদ্রমহিলা। এ ধরণের ধর্ম-বাতিক যাদের আছে, তাদের স্বভাব আমরা জানি। যাই হোক, কল্পনাকে খুন করে দেবতোষ ওই চাদরে জড়িয়ে—ধরুন, খাটের নীচে ঢুকিয়ে রাখলেন।...জাস্ট এ মিনিট। বলে চীনা কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ফের বলল, আমার ধারণা কল্পনাকে তাঁর ঘরে আসতে বলেছিলেন দেবতোষই। তার আগে স্ত্রীর কাছে ব্যাপারটা গোপন করবার জন্যেই গুরুদেবের ছবি চুরি করেছিলেন নিজে। তিনি জানতেন, এ-কাজ করলে মিসেস ব্যানার্জির ফিটের অসুখ বেড়ে যাবে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবেন।...

কর্নেল মৃদু মৃদু হাসছিলেন। এতক্ষণে বললেন, তোমার ছবি চুরি কে করল? কল্পনার টুথব্রাশ? স্বাতীর জুতো? কলার খোসা কে ছুঁড়েছিল স্বাতীর পায়ের সামনে? আর ওই মিসেস বোসের চুলই বা কে কাটল?

চীনা নির্দ্বিধায় জবাব দিল, সব—সবই প্রফেসরের কীর্তি।

বাট হোয়াই?......কর্নেল ঈষৎ ঝুঁকলেন টেবিলে। ফের বললেন, কেন?

চীনার সোজা জবাব।...আমাদের ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আইদার আমরা হোটেল ছেড়ে যাব চটপট, অর শোকি হয়ে পড়ব—সন্ধ্যার পরই যে-যার ঘরে ঢুকে খিল কপাট এঁটে বসে থাকব। চুল কাটার ব্যাপারেই মতলবটা স্পষ্ট হয়েছে। ভূত-প্রেতে নাকি এমনি কান্ড করে থাকে। মহিলাদের এমনি করে চুল কাটার ঘটনার সঙ্গে ভূত-প্রেতের কিংবদন্তী ওতপ্রোত জড়ানো। কাজেই নবাবী প্রাসাদের ভূতের ভয়ে আমরা পালাব—এই ছিল ওঁর ধারণা। জায়গাটাও তো বিশেষ করে ঐতিহাসিক—আই সে, ক্ষুধিত পাষাণ!

চীনা হাসল। কর্নেল চোখ বুজে শুন-ছিলেন। এবার বললেন, কিন্তু আমি কাল সকালে যখন তোমার ঘরে ছিলাম, কল্পনাকে খিড়কির সিঁড়িতে নামতে দেখেছিলাম। তোমাকে বলেছিও সেকথা।

চীনা সঙ্গে সঙ্গে হ্যাবাচ্যাকা খেল।... তাইতো! ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা।

কর্নেল বললেন, তোমার কল্পনার বাহাদুরি দিচ্ছি চীনা। অযৌক্তিক বলছি না, কিন্তু প্রমাণ-সাপেক্ষ।

চীনা চিন্তিত মুখে বলল, ধরুন, কল্পনা কোন কারণে নীচের বাগানে গিয়েছিল তারপর ফিরে এসেছিল। এবং প্রফেসরের কথামত তাঁর ঘরে গিয়েছিল।

দ্যাট ডিপেন্ডস। নো এভিডেন্স। কর্নেল মাথা দোলালেন।...প্রমাণ কী?

চীনা মিত্রর মুখে অসহায়তার ছাপ। সে বলল, কিন্তু অধ্যাপককে সন্দেহ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে কি না! তাঁর মোডুস অপারেন্ডি আমরা জানি না বা ধরতে পারছি না, কিন্তু ওদের দুজনকে খুন করার পিছনে একমাত্র তাঁরই যথেষ্ট মোটিভ রয়েছে। খুব সংগত মোটিভ।

তা আছে। কিন্তু মোটিভ তো নীরেনেরও বেশ সঙ্গত।

কী সেটা?

প্রতিহিংসা। চারতাখ'।

চীনা বলল, আমিও ভেবেছিলাম সেটা। স্বাতীর মুখে শুনেছি, ও হচ্ছে দারুণ রুস্তাম টাইপ ছেলে। জাস্ট অ্যান ইন-টেলেকচুয়াল মস্তান। পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। না করেছে, এমন জঘন্য কাজ নেই।

সর্বনাশ! কর্নেল আতঙ্কে উঠলেন। ...তাহলে তো পুলিশের সিদ্ধান্ত আরও শক্ত হল। যে গড শেভ্ দা পুওর বয়!

কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে খুন করেনি। ওই ডোবাটাই হচ্ছে আসল রহস্যের উৎস।

কর্নেল তীক্ষ্নদৃষ্টে ওর দিকে তাকালেন।......আমারও তাই মত।

কাল রাত্রে ডোবার ধারে আপনার ওই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পরও আপনি নীরেনকে এর সঙ্গে জড়াতে চাইছেন?

না, না। আমি চাইছি না। পুলিশ। আমার ধারণা......

কথা শেষ করার আগেই চীনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বিভাস?

কর্নেলের চোখের কোণে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলল।......গতরাত্রেই তোমাকে বলেছি, আই লাইক ইওর ডিভোর্সড হাজ-ব্যান্ড—বেচারা বিভাস। সেও তোমার মত গুণী শিল্পী। আমি জানি, দুই শিল্পীর একঘরে জায়গা হয় না। এক্সকিউজ মি... বলে হেসে ফেললেন কর্নেল। উঠে দাঁড়ালেন এতক্ষণে।......ওরা সব কী ভাবছে হয়ত। আমরা এতক্ষণ ফিসফিস করছি।

চারপাশে তাকিয়ে নিলেন কর্নেল। এখনও ঘরে কারো ডাক পড়েনি। সম্ভবত হোটেল স্টাফ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন [illegible]।

না, ডাক এল। একজন কন[illegible]ল এসে ডাকল, দিব্যেন্দুবাবু, কে—আ[illegible]ন।

দিব্যেন্দুর মুখটা হঠাৎ কেমন সাদা দেখাল। কর্নেল লক্ষ্য করলেন। দিব্যেন্দু স্বাতীর দিকে কটাক্ষ করে বেরিয়ে গেল। কর্নেল স্বাতীর টেবিলে গেলেন।......এক্স-কিউজ মি, আপনার সঙ্গে তো ভালো আলাপ হয়নি। দে সে—দুর্দিনেই বন্ধু চেনা যায়। আমিও একজন বন্ধু আপনাদের—বাট ভেরি..ভেরি ওল্ড ফর মেকিং ফ্রেন্ডশিপ উইথ দা ইয়াং গার্লস!

হাসতে হাসতে বসে পড়লেন কর্নেল। স্বাতী সসঙ্কোচে নড়ে উঠল।......না, না। বসুন কর্নেল। আপনার সঙ্গে আলাপের এত ইচ্ছে করছিল। কিন্তু একে হাঁটুর ব্যথা, তারপর এইসব ভয়ংকর কান্ড।...... স্বাতীর চোখ ছলছল করে উঠল।...... চীনাদির কাছে আপনার কত প্রশংসা শুনেছিলাম।

কর্নেল চুরুট বের করে ধরালেন। তারপর বললেন, হতভাগ্য মেয়েটির জন্যে

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে—যদিও পরিচয় নি। জীবনের স্বাদ পাবার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

স্বাতী মুখ নামাল। স্পষ্টত, কে কান্না চাপছে।

কর্নেল বললেন, কিন্তু দিস ইজ ক্, মাই গার্ল। শক্ত হয়ে দাঁড়াও। ভেঙে লে তো চলবে না মা।

কর্নেলের সম্বোধন শুনে স্বাতী মুখ ল। আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বলল, আমাকে নাম তুমি বলবেন।

রাইট। কর্নেল বললেন।......আচ্ছা, না তো তোমার বোন ছিল? কেমন

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বাতী জবাব দিল, সম্পর্ক আমি জানি মেন মা জানেন। কারও ও ছিল পেটের মেয়ের চেয়েও। কল্পনাকে একমুহূর্তও চোখের ল করতে চাইতেন না। আজই সকালে ন্দু ট্রাংক কল করে খবর দিয়েছে মা শয্যাশায়িনী একরকম—তবু খবর আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন ক। এসে পড়বেন খুব সম্ভব। ভয়ে মি তো ফোন ধরিনি। আমায় ধরতে ছিলেন—দিব্যেন্দু বলল। মায়ের মুখোমুখি আর দাঁড়ানোর সাহস আমার নেই। ন পড়লে কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। কৈফিয়ৎ দেব তাঁকে? তাঁর নিষেধ ম শুনিনি। কল্পনাকে সঙ্গে নিয়ে সেছিলাম।......স্বাতী কেঁদে ফেলল।

কর্নেল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, টেক ইট ইজি মাই গার্ল। তুমি কি করবে? তোমার তো হাত ছিল না এতে।

স্বাতী কম্পিতস্বরে বলল, কিন্তু এমন যে একটা মারাত্মক কিছু ঘটবে, আমি সন্দেহ করেছিলাম। কল্পনা যে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনেছে—আমার ইনটুইসন তা বলছিল।

বল কী? কর্নেল উৎকর্ণ হলেন।

হ্যাঁ। স্বাতী অনুচ্চকণ্ঠে বলতে থাকল।......কল্পনা ছিল ভীষণ মুখচোরা মেয়ে। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, ও এত ভীতু আর বোকা ছিল। স্কুলকলেজে রেজাল্টও খুব ভালো ছিল না। শেষঅব্দি মা বললেন, থাক, আর পড়াশুনোয় কাজ নেই। ডিগ্রিকোর্সের ফাইনাল ইয়ারেই ওকে কলেজ ছাড়ালেন। মা বললেন, কল্পনা তো আর চাকরী করতে যাচ্ছে না।...ওর নামে উনি যা দিয়ে গেছেন, তাই যথেষ্ট।

কর্নেল বাধা দিলেন।......এক মিনিট। কল্পনার নামে সম্পত্তি রয়েছে!

হ্যাঁ।

বেশ। বলে যাও।

কল্পনার মধ্যে অনেক ধরনের কম্প্লেক্স ছিল। হীনমন্যতা তো দারুণ ছিল। অথচ সেটা থাকবার কথা আমারই। ওর ওপর আমার যা হিংসে ছিল, বলার নয়। মায়ের যত আদর, যত লক্ষ্য তো ওর ওপর। ফলে, আমার ভীষণ দুঃখ হত। মায়ের চোখের আড়ালে ওকে আমি কত নির্যাতন করেছি।......রুমালে চোখ মুছে স্বাতী বলতে থাকল।......ও যেন ছিল আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটা নিজেই মুছে দিলাম মন থেকে। ওকে মুখ বুজে ভাবতে শিখলাম। শুধু তাই নয়—কতটা গায়েজোরগিরিও করাতে বাধ্য হলাম। ওকে পুরো মডার্ন গার্ল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলাম। ওর বয়ফ্রেন্ড থাক, এই ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসেছিল। শুভর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। নীরেনের সঙ্গেও দিলাম। অবশ্য সবই মায়ের অজান্তে ঘটছিল। কিন্তু দেখলাম, কল্পনা যেন কিস্যু বোঝে না—কিংবা ইচ্ছে করেই ওসব এড়িয়ে থাকছে। এখানে আসবার পর হঠাৎ দেখি, ও কেমন বদলে গেছে। কী যে ঘটল কে জানে, কল্পনা রীতিমত ফ্লার্টিং আরম্ভ করল সবার সঙ্গে। শেষ অব্দি দিব্যেন্দুকেও ছাড়ল না।......

কর্নেল বললেন, বুঝেছি। দি ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ ক্লিয়ার। এখন, একটা কথার জবাব দাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। দেবে তো?

বললুম। দেব না কেন?

খুনী বলে কাকে সন্দেহ কর তুমি?

স্বাতী ঝটপট জবাব দিল।......নীরেনকে।

কেন?

ও সব পারে। কল্পনার দিকে ওর বিচ্ছিরি টান ছিল লক্ষ্য করেছি।

রাইট। বলে কর্নেল উঠলেন।

কনস্টেবল ডাকছিল, দীপেন ঘোস কে? চলে আসুন।

দীপেন বোস স্ত্রীর দিকে কটাক্ষ করে উঠল। বেরিয়ে গেল। দিব্যেন্দুকে দেখা গেল না ফিরতে। সম্ভব সবার জেরা শেষ না হলে কাকেও ফিরতে দেবে না। মিঃ গুপ্তর তদন্ত পদ্ধতি বেশ অদ্ভুত। ব্রিলিয়ান্ট! ভাবুক, ভাবুতে, কর্নেল, গেলেন ইরা ঘোসের সামনে।

ইরা অসহিষ্ণু বলল, আসুন কর্নেল। বসুন। কী কাণ্ড হল দেখুন তো! আমার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। অথচ ওরা যেতে দেবে না!

কর্নেলের চুরুটটা হাত থেকে পড়ে গেল।......বাই জোভ! বলে তিনি হেঁট হয়ে টেবিলের নীচে হাত বাড়ালেন।

ইরা বলল, আচ্ছা কর্নেল সায়েব, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই করি।

ইরা ভীতু গলায় বলল, আমার চুল কেটেছিল শুনেছেন?

শুনেছি।

মনে মনে অতি কষ্টে হাসি চাপছিলেন কর্নেল। কারণ, চীনার কথাটা মনে পড়ে গেছে। ইরার মাথায় ওই সুদৃশ্য চুলের ঝাঁপিটি পুরো নকল। ওর মাথাজোড়া টাক।

কিন্তু এইমাত্র চুরুট কুড়োবার ছলে দীপেন ঘোসের চেয়ারের নীচে থেকে যে জিনিষটি হাতগত করলেন, তা পরক্ষণে তাঁর কৌতুককে বিলুপ্ত করল। একটিন একবার নিজের ঘরে যাওয়া দরকার। জিনিষটা তাঁকে উত্তেজিত করছিল পলকে পলকে। আশ্চর্য, দীপেন ঘোস......

(ক্রমশঃ)

কেমন ক'রে ভরসা রাখি ॥

অজয় ভৌমিক

বদলে যাচ্ছো কেবল তুমি
অনবরত বদলে যাচ্ছো
বল পাথর কেমন ক'রে তোমার উপর
ভরসা রাখি।

আকাশ থেকে সূর্য ঝরছে প্রতিদিনের
রোদের তাপমাত্রা বাড়ছে
পাহাড়ের বুক কেটে নদী নামছে সমুদ্রে।
নিত্য আশীর্বাদের অহংকারে আলুথালু হ'লে
বল পাথর কেমন ক'রে তোমার উপর
ভরসা রাখি।

উষ্ণ এবং হিমের আন্দোলনে দিনের সূর্য
রাতের পরবাসী.
সকালবেলার অপর্যাপ্ত গৌরবে রঙ বদলায়
অববাহিকার নরম মাটি জমতে জমতে পথ আটকায়
স্রোতের শিথিল
উপত্যকার হিমবাহ
জল হয়ে যায়।
বল পাথর কেমন ক'রে তোমার উপর
ভরসা রাখি?

লাল অন্ধকার ॥

মৃগাঙ্ক রায়

আর্তনাদ করে উঠলাম, 'থামাও, থামাও।'
থামল না,
রুক্ষ রুদ্র সূর্যকে ঢেকে ধুলো উড়ল।
মানুষ জন্তু ঘর বাড়ি শহর গ্রাম
বিকট চিৎকার করে
ধ্বসে পড়ল,
তারপর ভীষণ বিবর্ণ তাপের ছোঁয়ায়
গ'লে দলা পাকিয়ে গেল।
আবার আর্তনাদ করে উঠলাম, 'থামাও, থামাও।'
কোন উত্তর দিল না।
গতি তীব্রতর হল।
মেঘে মেঘে গম্ভীর ঘর্ষণের আওয়াজ হল,
আছড়ে পড়ে সমুদ্রের ঢেউ ভীষণ শব্দে ফেটে গেল,
মাটি ফাটল, পাহাড়ে পাহাড়ে আগুনের চূড়া
দাউ দাউ করে উঠল।
জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'
কেউ সাড়া দিল না।
যূথবন্ধ জানোয়ারের মতো ফুঁসে উঠে ছুটে এলো হাওয়া।
কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বললাম, 'থামাও, থামাও,
একবার, শুধু এক মুহূর্ত থামাও।'
থামল না। দিন গেল।
আঁচলে আগুন লাগিয়ে অন্ধকার লাল হয়ে উঠল।।

দেখাশোনা ॥

বিজয়কুমার দত্ত

যখন যেভাবে দেখি, সেই দেখা নয়—
যখন যেমন শব্দ কথার বাহার
কান পেতে শুনি,
সেই শব্দ কথামুখ, যেন তাও নয়,
একেকটি মুহূর্তে দেখা, কিংবা শুধু শোনা
মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে, আকাশের নীলবীথি দেখা
হাজার কথার মধ্যে তোমার চোখের দিকে
তাকিয়ে হঠাৎ—
ইথার তরঙ্গ স্রোতে ভাসমান সুপারসোনিক
শব্দের অনন্ত যাদু শুনাতে শুনতে স্থির হ'য়ে যাওয়া—
সেইসব দেখাশোনা চাই।
সময়ের কালপরিমাণ
এইসব দ্বিতীয়দলের মাপ, হিসেবনিকেশ
ঠিকঠাক ধরে রাখতে পারে!
কোথায় তেমন যন্ত্র, টেপ-রেকর্ডার?

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আজকের দিনে সাহিত্যে, শিল্পে এবং জীবনে একটা অনিশ্চয়তা এবং অশান্তির ছায়া দেখা দিয়েছে। জীবনের পুরনো মূল্যবোধগুলো আমাদের কাছ থেকে দিনে দিনে মুছে যাচ্ছে। সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে একটা চরম অসহিষ্ণুতা এবং হতাশা কেন?

নিশ্চয়ই এর কারণ আছে। আমরা যে সময়টার মধ্য দিয়ে চলছি সেটাকে সন্ধিক্ষণ বলা যায়। একটা যুগ শেষ হচ্ছে, আর একটা আসছে—এর মাঝ-খানে এ ধরনের অস্থিরতার ভাব আসাই স্বাভাবিক। পুরোনো বিশ্বাস আমা-দের মধ্যে আর তেমন করে সাড়া দেয় না। আবার নতুন যুগ সম্পর্কে ধারণাও আমাদের মনের অবচেতনে দানা বেঁধে আছে। তাই এ যুগ-সন্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং অসহিষ্ণুতা।

সাহিত্য জীবনেরই প্রতিরূপ, তাই সাহিত্যেও সেই যুগ-যন্ত্রণার অগ্নিমন্থন চলেছে। কোনো নিশ্চিত প্রত্যয়, কোনো সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা আমাদের সামনে কোনো শুভ-সংকেতের দ্যোতনা আনছে না। আমরা যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে প্রতিনিয়ত উদ্দিষ্টকে খুঁজে ফিরছি—যেমন করে 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর'। তাই সাহিত্যে কোন মহৎ সৃষ্টিও দেখা যাচ্ছে না। নতুন দিনে যাঁরা লিখছেন তাঁদের মধ্যেও কোন বিরাট ও বিচিত্রের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে না—এমন কথা আমরা সব সময়েই শুনছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা আমাদের মনের ভেতরে অনেকখানি হতাশা এনে দিয়েছে। কোন বিরাট শক্তিমান নেতৃত্ব আমাদের পথ-প্রদর্শক হিসেবে এগিয়ে আসছেন না। যাঁরা শাসক হিসেবে গদি-য়ান, তাঁরা নিজেদের মধ্যেই ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে জটিলতা বাড়িয়ে তুলছেন; ফলে সমাজ-জীবনের আকাশে আসন্ন দুর্যোগের ঘনঘটার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। আমাদের পায়ের তলার শক্ত মাটি যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, সেখানে ভাঙনের সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিচ্ছে। কাজেই জীবনে যে অনি-শ্চয়তা আর অশান্তি, সাহিত্যে, তারই কালো ছায়া পড়েছে। একে এড়ানো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। আজকাল সকালে খব-রের কাগজ খুললেই হয় খুন নয় ডাকাতী; হয় সংঘর্ষ নয় গুন্ডাবাজীর খবর। সুস্থ সাহিত্য এবং মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা যদি জীবনাভিত্তিক বাস্তবমুখিন সাহিত্যই হয়ে থাকে, তবে এমন বিপর্যস্ত অবস্থা কোন মহান শিল্পের উদ্দীপনা জোগাবে? জীবনের ওপরেই সাহিত্যের ভিত্তি। যদি সে ভিত্তি প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তার আতঙ্কে কাঁপতে থাকে তবে সে স্থিতি-শীল সাহিত্য জোগাবে কোথা থেকে?

আশা দেবী

কিন্তু এ তো অন্ধকারের দিকটা। এই অন্ধকার তো জীবনবাদী মানুষের শেষ কথা হতে পারে না। সুতরাং আমি জানি, এ দুর্যোগ থাকবে না। এ অনিশ্চয়তার কুয়াশা কেটে গিয়ে পরিপূর্ণ প্রত্যাশায় শুভ সূচনা দেখা দেবে। দেবে নিশ্চয়ই। মানুষ কখনও অনিশ্চয়তা নিয়ে বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারে না। কোনো কুশ্রীতাই মানু-ষের সুস্থচিন্তাকে বেশী দিন কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। আপনা থেকেই মানু-ষের জাগ্রত শুভবুদ্ধি জঞ্জালের মত অসুন্দরকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে।

যা রুচিহীন, তাকে এক আধবার হয়তো কৌতূহলী মন প্রশ্রয় দিতে পারে; কিন্তু তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। যা শোভন-সুন্দর, তাই টিঁকে থাকে তার স্বভাবসুলভ জীবনীশক্তির জোরে। যা সুন্দর তাকে দামামা পিটিয়ে আত্ম-ঘোষণা করতে হয় না।

যা হঠাৎ আমদানী, রুচিহীন স্থূলে-তার পোষাক, তা একেবারেই সাময়িক উত্তে-জনা মাত্র। স্বাভাবিক নিয়মেই তা আব-র্জনায় আশ্রয় পাবে। কাউন্ট লিও টলস্টয়, ভিকটর হুগো, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র,—এঁদের অশ্লীলতার চার্জ দিয়ে সাহিত্যের আসর মাত করতে হয়নি। নিজের সত্য দিয়েই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

অবশ্য আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, সাহিত্যে অশ্লীলতা বলতে আপনি কি বোঝেন? যে কোনো বিষয়েই যদি রসো-ত্তীর্ণ হয় তা সাহিত্য। তবে সব সৃষ্টিরই দৃষ্টিভঙ্গি স্রষ্টার শক্তির উপর নির্ভরশীল। নির্বাচিত বিষয় কিভাবে পরিবেশন কর-বেন সমস্ত রসিক ব্যক্তি তারই দিকে চেয়ে থাকবে। কি বলছেন তার চেয়ে কেমন করে বলছেন এইটে সাহিত্যের রসসৃষ্টির প্রতীক।

আমি জানি বিকৃতিই জীবন নয়। যে ক্ষীণজীবী সাহিত্যের আমরা অনিশ্চয়তা দেখছি আজ—কালই হয়তো নতুন শক্তিমান সাহিত্যিকের বলিষ্ঠ পদসঞ্চারে তা কেটে যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফরাসী অব-ক্ষয়ের যে চিত্র ফরাসী সাহিত্যে ফুটে উঠেছে সেটাই তো আর সত্য নয়: পরবর্তী কালে পরিপূর্ণ প্রত্যাশার আলোয় তাঁদের সাহিত্য ও জীবন পূর্ণতার শুভ চেতনায় নবরূপে রূপায়িত হয়েছে। রুশ জীবনে যুদ্ধের পর যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা তাদের সাহিত্যে এবং জীবনে ছায়া ফেলে নি—তাঁদের প্রাণ-শক্তিকে পঙ্গু করে দিতে পারে নি। নতুন জীবন-প্রবাহের প্লাবন তাঁদের জীবন ও সাহিত্যকে পরবর্তীকালে পরিপূর্ণতার দিকে টেনে নিয়েছে। আমা-দের এই যুগ-সন্ধিক্ষণের অনিশ্চয়তার লগ্ন কেটে গিয়ে মেঘমুক্ত আলো সাহিত্যকে উজ্জ্বল করতে নতুনকালের পদসঞ্চার ধ্বনি বয়ে নিয়ে আসবেন নব-যুগের অভি-যাত্রী সৈনিক দল। এঁরা আসবেনই—কোন ডাকের বা আবাহনের অপেক্ষায় তাঁরা বসে থাকবেন না।

দাদা কেমন আছেন?

হিমানীশ গোস্বামী

'এই যে দাদা, কেমন আছেন? বিশ্ববন্ধুবাবু জিজ্ঞেস করলেন ভীড়ের মধ্যে, কলেজ স্ট্রীটে। আমি তাঁর দিকে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকালাম, জবাব দিলাম না। বিশ্ববন্ধুবাবু আমার দিকে দু এক পা এগিয়ে এলেন, তারপর একটু বেশ জোরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মশাই, কালা হয়ে গিয়েছেন নাকি?' আমি যেন কথাটিকে শুনতেই পাইনি এমনি ভাব করেই রইলাম। তিনি এবারে আমার অতি নিকটে এসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বেশ উচ্চগ্রামে গলা থেকে বাজখাই আওয়াজ বার করলেন : 'কে-ম-ন আ-ছে-ন?' আমি তবুও চুপ। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, হঠাৎ যেন ব্যথাও বোধ হল, কিন্তু আমি নীরব। কেবল দু হাত দিয়ে এমন ভঙ্গী করলাম যে তিনি বুঝলেন আমি তাঁর একটি কথাও শুনতে পাইনি। এবারে অবশ্য তাঁর মুখোভাবের পরিবর্তন হল। যে মুখে কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং ক্রোধ-কাদম্বিনীর জমায়েত হচ্ছিল একটু আগে, সে মুখ একটু কমনীয় হল। কপালের দু চারটে ভাঁজ এবং দুই চোখের মাঝখানকার জায়গার ভাঁজে কিছু ঘাটতি দেখা গেল। বুঝলাম তিনি খুসি হলেন। তাতে আমিও খুসি হলাম। তিনি আর কোনো কথা বলবার চেষ্টা না করে আমাকে পরিত্যাগ করলেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, কেননা, আজকাল আমি কেমন আছি সে কথাটা বলতে ভয় পাই। কেবল আমি কেমন আছি নয়, কোনো কথাই আমার আর বলতে ইচ্ছে করে না। কবিতা গল্প উপন্যাস রাজা উজীর ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আগে যেমন উৎসাহের সঙ্গে পাড়ার এবং বেপাড়ার চায়ের দোকানে চিৎকার করে গলা ফাটাতাম এখন আর তা করি না। ফলে চায়ের দোকানেই যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি একেবারে, সেদিনকার ঘটনার পর। আসলে, সেদিনকার ঘটনাটি ঘটবার আগের দিন পর্যন্ত কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন আছ হেমেন?' তাহলে আমি বেশ হাসিমুখেই জবাব দিতাম, 'আর বলো কেন, একেবারে সময় পাচ্ছি না। একটা বই পড়তে পারছি না, এক পাতা লিখতে পারছি না।' কিন্তু আর নয়। সেদিনের ঘটনার পর থেকে কেবল আমি কেমন আছি নয়, অন্য কোনো বিষয়েই আমি আর টু শব্দটি করছি না। তা সেজন্য কেউ যদি আমাকে কালা, বধকালা, ঠসা বা অন্য যে কোনো বিশেষণে ভূষিত করেন, তাতে আমার যেটুকু এসে যাবে তাতে আমার খুব আপত্তি নেই। আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার নামে এই বিশেষণগুলি এরই মধ্যে বাজারে চলছে। তা চলুক, কিন্তু আমি তবু শান্তিতে আছি।

এইবার সেদিনকার ঘটনাটা বলা প্রয়োজন মনে করি। সেটুকু বলবার আগে আপনারা একটা কথা নিশ্চয় জানেন আজকাল এই বাংলাদেশে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রাজনীতি করছেন। প্রত্যেকে না হলেও অনেকেই। সেদিনকার ঘটনা বুঝতে এটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ঘটনাটা ঘটেছিল চায়ের দোকানে—ঠিক আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি ন সেটিতে বুধুবাবু যতদিন ছিলেন ভাল চা এবং টোস্ট পাওয়া যেত। ধা দিতেন তিনি আমাদের। চার পাঁচ টা হয়ে গেলে একবার খুব আস্তে করে ম করিয়ে দিতেন—ওহে হেমেন তোম হিসেবে স'চার টাকা দাঁড়িয়েছে, কিংবা বীরেন, সোমবারের মধ্যে গোটা চা টাকা দিও বুঝলে? ধরনের ব্যবহার। কিন্তু যেমি তিনি অসুস্থ হ দেশে চলে গেলেন, তাঁর জায়গায় ভাগ্নে বিশুকে বসিয়ে, তখনি পরিবর্তি আবহাওয়া সুরু হল। চায়ের দাম পো পয়সার জায়গায় আঠারো পয়সা হ টোস্টের দাম হল কুড়ির জায়গায় পঁচি চায়ের কাপও আকৃতিতে রাতারাতি হয়ে গেল, আর ধার একেবারেই বন্ধ দিল। তাই আমরা পাড়ার দোকানে যে যাওয়া বন্ধ করলাম। একটু দূরে রাস্তা—সেখানে অনেক দোকান, তা একটিতে গিয়ে বসে চায়ের অর্ডার দিল আর বেশ মৌজ করে একটা সিগা ধরালাম। আমার আশেপাশে দেখ কয়েকটা টেবিলে কয়েক গুচ্ছ ছেলে প্র ভাবে কত কি কথা বলছে। আর ঠিক সময় রাস্তা দিয়ে দেখলাম নির্মলব যাচ্ছেন, আর আমি বললাম, 'ও নির্মলব কোথায় যান?' নির্মলবাবু আমার অ কাজ করেন—অনেক দূরে থাকেন হা স্টেশান দিয়ে যেতে হয় হুগলীর গ্রামে। নির্মলবাবুও আমাকে বললেন, 'আমি এক ভদ্রলোকের স
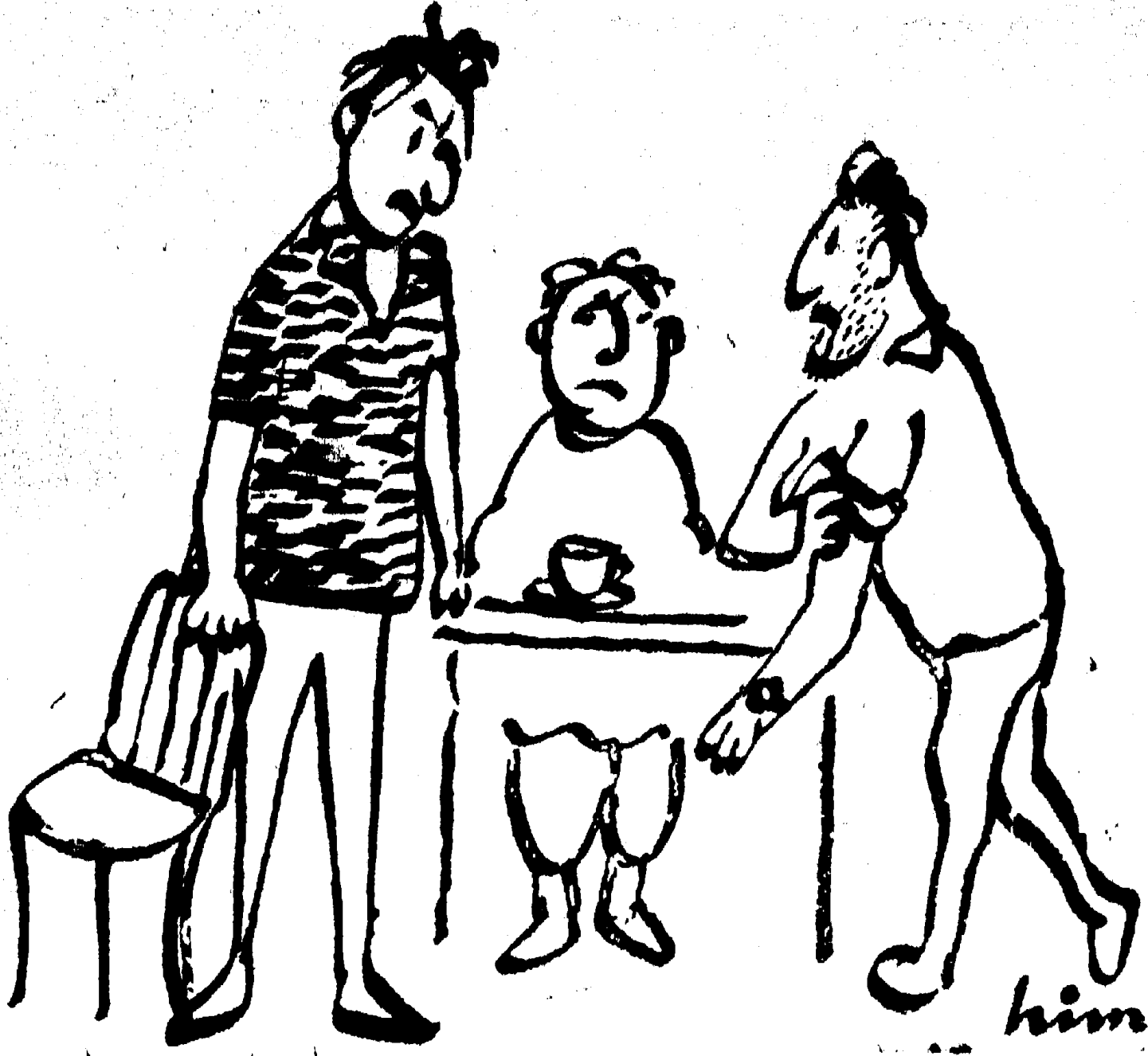
দেখা করতে যাচ্ছি, আপনি কেমন আছেন?' বললাম, 'ভাল।' নির্মলবাবুর খুব তাড়াতাড়ি ছিল। তিনি হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, 'পরে দেখা হবে অফিসে, কেমন?' বলে তিনি বেশ জোরে পা চালিয়ে দিলেন। আমিও দরজা থেকে ফিরে এসে চায়ের কাপ দেখতে পেয়ে সেটার হ্যাণ্ডেল ধরলাম। এক চুমুক খেতে যাব, এমন সময় পাশের টেবিল থেকে একটি ছোকরা বলল, 'দাদা, কথাটার মানে কি দাঁড়াল?' আমি তো অবাক। অন্য একটি ছোকরা আস্তিন গুটিয়ে আমার কাছাকাছি এসে গেল। আমি এবারে স্তম্ভিত। আস্তিন গোটানো এমনিতে খুব খারাপ বা ভীতিজনক কোনো ব্যাপার নয়। আমি নিজেও বহুবার আস্তিন গুটিয়েছি। কিন্তু এক একটা পরিবেশে সেটার অন্য রকম অর্থ এবং রূপ নেয়। আমার তখন মনে হল অন্য রকম রূপ নিচ্ছে। আমি বললাম, 'কোন্ কথাটার কি মানে দাঁড়াল?' আরো একটি ছেলে উঠে এল আমার কাছে। তার আস্তিন ছিল না তেমন বড়। একটা বুশ শার্ট পরে ছিল কেবল। এসে বলল, 'কথাবার্তাগুলো একটু সাবধানে বলতে হয়!' আমি বললাম, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' কে যেন বলল, 'ন্যাকো। বুঝতে পারছেন না?' আমি বললাম, 'না—তাছাড়া আপনাদের এরকম অভদ্র কথা-বার্তার অর্থ কি?' শুনে তারা হৈ হৈ করে উঠল, বলল, 'লোকটা একে রি-অ্যাকশনারি, তার উপরে প্রতিক্রীয়াশীল!' আমি বললাম, 'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?' একটি ছেলে. খুব সম্ভবত আমার প্রতি কৃপা করেই আমার সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল। সে হাতের ইসারায় তার বন্ধুদের দূরে যেতে বলল। বুঝলাম এই হল এদের সর্দার। এর চেহারা বেশ ভালই, কেবল একটু একটু খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে, আর হাতে বড় একটা চুরুট। আমি এর আগে অত কম বয়সের কাউকে অত বড় চুরুট টানতে দেখিনি। সে আমাকে বলল, 'আমরা একটু আগে শুনলাম আপনি আপনার চেনা কাকে বললেন ভাল আছেন?' আমি বললাম, 'তা...তা...তাতে কি অন্যায় হয়েছে—আমার চেনা লোককে যদি আমি বলেই থাকি?' ছেলেটি খুব আস্তে আস্তে বলল, 'এর একটিই অর্থ হতে পারে।' আমি বললাম, 'কি অর্থ?' ছেলেটি বলল, 'আপনি রাষ্ট্রপতির শাসনে ভাল আছেন, এর অর্থ হচ্ছে আপনি হচ্ছেন অ-গণতান্ত্রিক কেউটে সাপ!'

'কেউটে সাপ?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আপনি কেউটে সাপ, আপনার বংশ সমেত সবাই কেউটে সাপ। অর্থাৎ কি-না আপনি এমন একটা শ্রেণী থেকে এসেছেন যে শ্রেণী হল জোতদার-শাসক-পুঁজিপতির সমর্থক। এবার কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ুন।' আমি বললাম, 'আমার চা...।' ছেলেটি বলল, 'চা আর খেতে হবে না!' আমি চায়ের জন্যই দোকানে এসেছি। অতএব আমি আমার সুর বদলালাম, অর্থাৎ বদলাতে বাধ্য হলাম। বললাম, 'দেখুন দাদা, একটা কথা বলি—আমি সত্যি সত্যি খুব খারাপ অবস্থায় আছি। বাড়িওলার সঙ্গে গোলমাল চলছে, মাঝে মাঝে জল বন্ধ করে দেয়। বাড়িওলার দুটি দুর্দান্ত ছেলে আছে—আমার নামে কোন চিঠি এলে লেটার বক্স থেকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। তাদের কুকুর আমাকে মাঝে মাঝে শোঁকে। ইন ফ্যাক্ট, আমি দারুণ খারাপ অবস্থায় আছি!'

কথাটা একটু জোরেই বলেছিলাম। চায়ের দোকানের অন্য প্রান্তেও তার আওয়াজ পৌঁছেছিল। সেদিকে যে একগুচ্ছ যুবক বসেছিল, হঠাৎ তাদের একজন বলল, 'অর্থাৎ লোকটা বিধানসভা ভাঙতে চায়। ধর ওকে, মেরে হালুয়া করে দে!' আমি কখনো বিধানসভা ভাঙতে চাইনি—একটা বিধানসভা ভাঙা কি সোজা কথা, কত কুলি-মজুর যন্ত্রপাতি লাগে। ওরকম কথা আমার মনেও কখনো স্থান পায়নি, কেননা বিধানসভাটির ডিজাইন বেশ ভালই। তাছাড়া বেশ মজবুতই রয়েছে। কিন্তু সে কথা আর বলতে পারলাম কই? দুই টেবিলের দুই দলের মধ্যে এই নিয়ে নানা কথা কাটাকাটি বচসা টেবিল ভাঙা-ভাঙি চলতে লাগল। আমিও এক চুমুকে চা-টা খেয়ে দাম না দিয়েই (দাম নেবার লোক কাউকেই সেখানে দেখতে পেলাম না এমনকি বেয়ারাগুলোও উধাও হয়ে গিয়ে-ছিল!) সেখান থেকে চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা মন্ত্র জপ করতে করতে বাড়ির দিকে দৌড়ুলাম।

এই হচ্ছে সেদিনকার ঘটনা। এতই সাধারণ ঘটনা যে খবরের কাগজেও পরদিন সেটা বেরয়নি। যদিও পরে দেখেছিলাম দোকানটি একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, আশে-পাশের দু পাঁচটা মোটর গাড়িকে ভাঙা হয়েছে, এবং শুনেছিলাম এগারোজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এই ঘটনার পর থেকে আমি রাস্তায় ঘাটে সাবধানে থাকি। তাতে লোকে আমাকে কালা মনে করে করুক, বোবা মনে করে তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু আমি ভাল আছি কি নেই, সে কথাটা কাউকে বলি না।
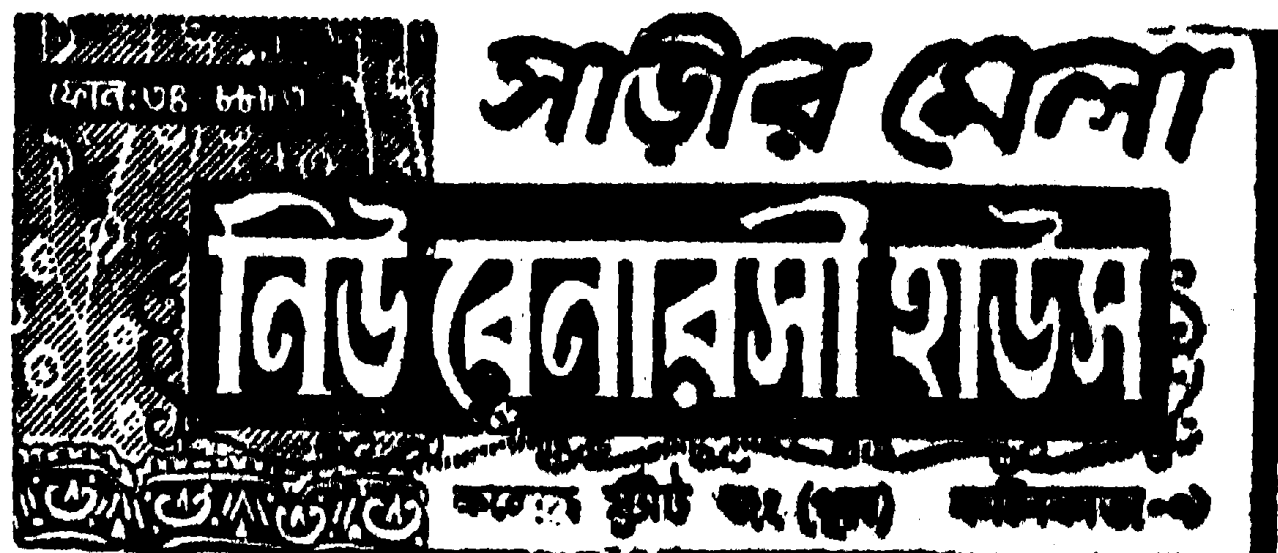
সুখের মেলা

হোগলা বন : জলভাঁটি
জলে ভাসা জীবন

লক্ষ লক্ষ তলোয়ার মাটি ফেড়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে লক-লক করছে, আলো পিছলে দিয়ে ঝলমল করে উঠছে, ঢেউ খেলিয়ে দোল খাচ্ছে সাগরের জলের মতন।

লখাইয়ের মা বলে, 'তওয়াল-বন।'

আসলে হোগলা বন। বাদা অঞ্চলের ভাষায় 'হোঁকোল বন'।

সুন্দর বন অঞ্চলের সেই এক হোগলা বনের মধ্যে এক দংগল বাগদি তিয়োর ডাহুক পানকৌড়ির মতন ঝোড়া কাঁখে নিয়ে 'জল-ভাঁটি', 'দুর্গা বড়ি', 'দুপাটি মাছ' খুঁজে বেড়ায়। ভীষণ কালো মজবুত তাদের চেহারা। লখাইয়ের পাঁচ ছওয়ালের মা অথচ সাত দিন পরে-পরে একবার সিঁথিতে একটু 'খেলোল' কাঠি দিয়ে সিঁদুর না ঠেকালে তার নিটোল আর ডাগড়াই বুক দেখলে কার বাপে বুঝতে পারে ও মেয়ে পাঁচবার পাঁচ কলসী খুন ভেঙেছে! বালি হাঁসের মতো একবার ডুব মেরে উঠলেই একেবারে চকচকে! বয়েসের পায়ের ছাপ পড়ে নি তার গতরের আচোট মাটিতে।

হোগলা বনের মধ্যে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে মেয়ে-পুরুষগুলো কলবল করে কথা বলছিল। হাত চালিয়ে 'জল-ভাঁটি' অর্থাৎ শামুক সংগ্রহ করছিল সবাই। কলাপো কাঁটায় উরু ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তলার জলে মাঝে-মাঝে জল-ডুমুর, ফুল-দফুলভরা কাঠ-শোলার গাছ। জলসংলগ্ন সেই গাছের গায়ে শামুক বসে থাকে। জলে একটু নাড়া পেলেই শামুকগুলো মুখ ছেড়ে দিয়ে তলায় তলিয়ে যায়। মাঝে-মাঝে নরম পানকৌটি গাছ সুঁতি শাপলা, রক্ত শাপলার গাছ। পদ্মবন। শালুকে অর্থাৎ শাপলার মূল ভেউট বা ভেঁট তোলে মেয়েরা। 'দুর্গাবড়ি' হল গেঁড়ি, 'দুপাটি মাছ' হল ঝিনুক।

হঠাৎ লখাইয়ের মা চিল্লে ওঠে, 'ওমাগো! পায়ে মোর কি চিপটে ধরেছে! দেখ না লো মাগীরা! উঃ! বড্ড কামডাচ্ছে।'

মাগীরা সবাই খিল-খিল করে হাসতে থাকে। মাছের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো পাঁচকালা চৌকি হাতে ছিদাম এগিয়ে এসে লখাইয়ের মায়ের কোমর থেকে ডোবা পায়ের তলায় হাত ডুবিয়ে কতকক্ষণ হাতড়াতে লাগল। মেয়েদের মধ্যে হাসি-মস্কারা ঢলাঢলি শুরু হল।

লখাইয়ের মা একবার বলে উঠল, 'দেখ, মিনসে আবার কোথায় হাত দেয়!'

ছিদাম বললে, 'শালা, চেংড়া মাছ!' বলে সে ইয়াবাগাতোক গায়ে-শ্যাওলা-জমা পুরোনো একটা গলদা চিংড়ি দু' হাতে জলের মধ্যে থেকে তুলে আনলে। বড-বড় দাড়া মেলে মাছটা ছিদামের হাতে চিপটে ধরতে লাগল। লখাইয়ের মা এক ঝাপটা মেরে মাছটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঝোড়ার শামুকের তলায় লুকিয়ে রাখল। শামুখের ধারালো মুখ লেগে হাত কেটে গেল। সেখানটা চুষতে লাগল লখাইয়ের মা।

ছিদাম বললে, 'দেখলে কান্ড!'

ময়না বললে, 'তবকারী দিস মাসি।'

লখাইয়ের মা মাছটার উদ্দেশে থু-থু ছিটিয়ে দিয়ে বললে, 'নজর লাগবে বাবা, থু-থু! থুড়ি!'...

দূরে ঝপ-ঝপ করে কি যেন শব্দ হচ্ছে না?

সবাই চুপ। কান পেতে থাকল।

ছিদাম বললে, 'বাঘ!'

সবাই তাড়াতাড়ি এক জায়গায় সরে এল। ঝোড়ার তলা থেকে দা বার করলে। রূপোর মত ধারালো হেঁসো বার করলে লখাইয়ের মা।

ছিদাম, পীরু, দুলাল, গোবিন্দ—সবাই চৌকি সড়কি হাতে নিয়ে দাঁড়াল। গোবিন্দর কাঁধে হাত দিলে অবিবাহিতা সোমত্ত মেয়ে ডালিম।

হঠাৎ সবাই দেখলে একাই একটা ডান্ডা হাতে নিয়ে লখাইয়ের বাপ আসছে জল ভেঙে ঝপ-ঝপ করে শব্দ তুলে হোগলা বনের মধ্যে দিয়ে।

পীরু হেঁকে বললে, 'দুস শালা! তুই এসচিস, সাড়া দিবি তো, মোরা মনে করি বাঘ। সড়কি ছুঁড়লেই শালা টের পেতিস! জেলখানা থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলি বউয়ের খোঁজে?'

লখাইয়ের বাপ কাছে এল। সবাইকে এক চোখ দেখলে। বড়-বড় গোঁফ রেখেছে সে। মাথায় কোঁচকানো বিরাট এক স্তবক চুল। ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করে দিলে সকলকে। তাড়ি খেয়ে নেশায় চুর হয়ে এসেছে। চোখ দুটো কুঁচের পানা লাল। লখাইয়ের মাকে বললে, 'চল শালী, ঘরে চল!'

'তুই যা মিনসে, মুই ইক্ষুনি যাই বলে! আধ ঝোড়া জলভাঁটি হয়েছে 'সব্বেলে'। তিনটি ছাওয়ালের 'রাজকাঁড়ে' দিতি কুলোবে নি!'

'তুই চ' তো! ট্যাকা লেইচি। চাল কিনিস। কাটার 'মংস' লেইচি, গামছায় বাঁধা আছে, দাবার খুঁটিতে বেঁধে টাঙিয়ে রেখে এইচি, কুন শালা না লিয়ে পালায়। চল্ তুই'—

লখাইয়ের মায়ের হাত ধরে টান দেয় তার জেল-ফেরৎ ইয়া তাগড়াই চেহারা মন্দ মানুষ—হরিপদ।

ভীরুর মা বুড়ী বললে, 'যা না লা বউ, কদ্দিন পরে মানুষডা এল। যা, ঘর যা।'

লখাইয়ের মা পদ্ম তার ঝোড়ার মধ্যে থেকে গলদা চিংড়িটা বার করে ছিদাম ঠাকুর-পোকে বললে, 'লিয়ে লে তোর মাছ, মোদের নাকি 'মাংস' এনেছে মিনসে।'

হরিপদ হঠাৎ মাছটা কেড়ে নিলে। চোখ রাঙালে।

ছিদাম হাসলে। বললে, 'না বৌদি, তুই লে। তোর পা থেকে মুই ছাইড়িছি বটে, তোরই পাওনা!'

খেঁকিয়ে উঠল হরিপদ, 'তবে? মাগীর আসনাই!'

পদ্ম বললে, 'ঢ্যামোন মিনসের কথা শোন্!'

হরিপদ পদ্মর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে হোগলা বনের আড়ালে চলে এল। জল পার হয়ে ডাঙায় উঠতে আধ ঘন্টা সময় লাগবে। তার আগেই হরিপদ জড়িয়ে ধরে পদ্মকে। শামুকের ঝোড়া নিয়ে বেসামাল পদ্ম। গালাগালি করে।

'মাতাল মিনসের আর তর সয়নে। খালভরাটা যেন বুনো ভাল্লুক। ওলাউঠো, হি-হি-হি, আরে এই তুই ঘর চ' এগুগে—বলি এ্যাদ্দিন ছ্যালে কি করে?'

'তুই?'

'মুই!' হাসলে পদ্ম। তার ছাঁচে-গড়া সুন্দর কালো মুখে, শাদা-শাদা দাঁতে আর চোখ দুটোতে যেন বিদ্যুৎ চমকালো। তারপর ঝোড়া মাথায় তুলে নিয়ে হঠাৎ ছুট মারলে পদ্ম। হরিপদও ছুটল তার পিছনে। নেশায় সে টলছিল। হোগলা বনে জড়িয়ে গিয়ে বার-দুই পড়ে গেল। হোগলা গাছের তলোয়ার-ধার লেগে কেটে গেল খানিকটা। সে পড়ে গেলেই পদ্ম খিলখিল করে হাসতে লাগল। হরিপদর ইচ্ছে করতে লাগল ওর নাড়ী-ভুঁড়িটা বার করে দেয় ডান্ডার এক হুড়ো মেরে। যেমন বার করে দিয়েছিল বদমাস গোকুল গায়েনের। শালাকে মেরে ফেলে দু' বছর জেল খেটে এল। পাঁচ বছরের সাজা ছিল। জেলখানার এক বিখ্যাত ডাকাত বুদ্ধি দিলে আপীল কর। আপীলে তার বেকসুর খালাস হয়ে গেল।

পদ্ম আর হরিপদ জল ছেড়ে দুজনে ডাঙ্গায় উঠল।

হরিপদর পায়ে বেড় দিয়ে হেঁতো জোঁক ধরেছে দেখে পদ্ম শিউরে উঠল। বিরাট লোম-অলা কালা মোটা চামড়ার হেঁতো জোঁক। ছাড়াবে কি করে! হাত দিয়ে টানলে হড়কে যায়।

হরিপদ বলে, দাঁত দিয়ে ধর শালী! 'অক্ত' খেয়ে মোটা হয়েছে। শালা এক পো' অক্ত খেয়েছে বোধহয়। ধানপাতা থাকলে তাই দিয়ে ধরা যেত। দাঁত দিয়ে ধর—টেনে তোল!'

'ওয়াক্ থুঃ। ছি! মোর ঘেন্না করে!'

'তবে হেঁসো দে, কেটে দিই।'

কেটে দিতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হতে লাগল। যত বেগে জোঁকটা রক্ত টানছিল সেই রকম বেগে রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল।

এখন উপায়! হরিপদ চেষ্টা করতে লাগল আঙ্গুল দিয়ে খিমচে জোঁকটাকে দু' খন্ড মুখকে টেনে তুলতে। কিন্তু রক্ত লেগে আরও হড়হড়ে হয়ে গেছে তোলা গেল না।

অগত্যা বাধ্য হয়েই পদ্ম দাঁত দিয়ে কামড়ে জোঁক টেনে তুলে ফেলে দিলে। গালে তার নোনা রক্ত ভরে গেল। থুথু করে থুথু ফেলতে-ফেলতে মুখে জল দিয়ে এল ভিজে কাপড় চটপটিয়ে।

রক্ত তখনো গড়-গড় করে বার হচ্ছে। জোঁক যতটা রক্ত খেয়েছিল ততটা আরো বার হবে। এক মাসেও আর ঘা ভাল হবে না। কেবল চুলকোতে থাকবে।

ওরা দুজনে মাঠ পার হয়ে চলেছে।

জল শুকোনো ধু-ধু ক্ষেত। ধান কেটে ঘাস জন্মাছে ছত্রাকার হয়ে মাঝে মাঝে। মাটিতে নুন ফুটে গেছে। সব লাল-লাল বাচ্চা কাঁকড়াদের গর্ত। মাঝে মধ্যে হরকোচ আর বনঝামা, সোনাকাটি ঝোপ। গুলঞ্চ লতা জড়ানো গায়ে বাবলা গেঁয়ো, কল্ক ফুলের গাছের জংগল। বা দূরে বাগদিপাড়া। ছোট-ছোট ছিটে বেড়া খড়বাড়ি। তালপাতার ছাউনী। বর্ষাকা যখন চারদিক ডুবে যায় তখন যাতায়াতে একমাত্র বাহন হল তালগাছ থেকে তৈ করা ডিঙ্গি।

ওরা দুজনে ঘর ফিরে এল। লখাই মায়ের পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্র দুটো কলেরায় মারা গেছে। বাকী তি

কচ্ছপের মাংস নিয়ে উলঙ্গ ধুলোমাখা চেহারায় মাটির দেওয়াল হেলান দিয়ে বসে আছে। বাপকে দেখে তারা ভয় পেলে। হরিপদ ছেলে-মেয়েদের ধরতে যেতেই তারা ভয়ে কেঁদে উঠল। পদ্ম একটা গামছা পরে কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'তোদের বাপরে, বাবা হয়, ভয় কি!'

ছেলে-মেয়ে তিনটে মাকে জড়িয়ে ধরলে। বড়টাকে পদ্ম বললে, 'খোড়ার জলভাটিগুলো ম্যাচলার জলে রাখ। মরে যাবে। আজ 'মাংস-ভাত 'আঁধা' হবে।'

'ভাত 'আঁধা' হবে মা!' বড়টা শুধোলে।

'হাঁ।'

'কতদিন ভাত খাইনি মা?'

'কি জানি বাবা, মোর কি মনে আছে? চার-পাঁচ চাঁদ হবে। শুধু শামুক গেঁড়ি, ঝিনুক, তাল, কচু শাকপাতা খেয়ে আছি মোরা। পয়সা কোথা পাব যে চাল গম কিনব? চাল-গম ভদ্দর 'নোকে'রা খায়—বড়নোকরা খায়।'

হরিপদ ট্যাঁক থেকে ভিজে-যাওয়া নোটগুলো বার করলে। পঞ্চাশ টাকা। জেলখানায় থাকতে কাজ করত। দিনে ছ' আনা করে রোজ পেত। সেই জমানো টাকা। গাড়িভাড়া আর তাড়ি খেতে দু-তিন টাকা বেরিয়ে গেছে। আর মাংস কিনতে দু' টাকা। চারবার করে গুণে দেখে দু কুড়ি পাঁচ টাকা আছে।

টাকাগুলো রোদে শুকোতে দেয় হরিপদ। কচ্ছপের মাংস কুচোতে বসে পদ্ম। তার আর একটাও শাড়ি নেই যে ছেঁড়া ভিজেটা আজড়ে পরবে। খাটো গামছায় তার বড়সড় চেহারা ধরে না। বুক বেরিয়ে থাকে, সুডোল সুগোল, যুবতীদের মতন। হরিপদ তাকিয়ে থাকে। পায়ের জোঁক-ধরা ক্ষত মুখটাতে চুন লাগিয়ে দিয়ে ন্যাকড়া জড়ায়। ছেলে-মেয়েদের খুচরো দু-চারটে করে পয়সা দিয়ে বললে, 'যা তোরা, দোকান থেকে কিছু কিনে খা যেয়ে।'

মাঠ পার হয়ে দোকান অনেক দূর। ছেলেরা যেতে পারবে না। তাই হরিপদ টাকা নিয়ে চাল আর বাজার-হাট করতে চলে গেল।

ফিরে এল ঘণ্টা দুই পরে। একটা মোটা শাড়ি কিনে এনেছে ছ' টাকা দিয়ে। পদ্ম খুশী। রান্না করে। তারা ঠিক জানে না আজ আবার কতদিন পরে পেট পুরে ভাত খেলে। খেয়ে উঠেই তারা শুয়ে পড়ল খেজুর পাতার চাটাইয়ে। এত খেয়েছে যে কেউ নড়তে পারছে না। আড়াই কে জি চালের ভাত আর এক কে জি মাংস খেয়ে ফেলেছে পাঁচজনে। তিনটে বাচ্চা আর দু মেয়ে-মদ্দতে।

ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে হরিপদ পদ্মকে কাছে টানে।

পদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামীকে সোহাগে আঁকড়ে ধরে।

কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা আর কতদিন চলতে পারে মোটা 'গাম-দানা' (রেড়ির বিচির মতন) চাল, শামুকের তরকারী খেয়েও মাস-দুই পরে হরিপদর হাত খালি হয়ে যায়।

আবার শুধু শামুক খাওয়া শুরু হয়। দূরে আবাদ অঞ্চলে চাষের ক্ষেতে জনমজুরি করবার জন্যে যাবে হরিপদ, ছিদাম, পীরু যুক্তি করে রোজই তাল ঝোপের মধ্যে বসে। কিম্বা দশ মাইল উত্তরে ভদ্রপল্লীতে ডাকাতি করতে যাবে কিনা সে কথাও তোলে হরিপদ। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

পদ্মর কাছে আসে ডালিম। গোবিন্দ ওর মনের মানুষ। পদ্ম মাসি যদি ডালিমের সঙ্গে দু কুড়ি টাকার মধ্যে বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারে তাহলে একটা শাড়ি বখশিশ দেবে গোবিন্দ। ডালিমের দিকে চোখ পড়ে হরিপদর। কিন্তু কাকা বলে মেয়েটা। পদ্ম আর ডালিম উঠোনে বসে ইঁটের ওপরে শামুক রেখে কাটারি দিয়ে ঘা মেরে-মেরে ভেঙে পোঁটাটুকু হাঁস ছানাদের দিয়ে মাটি-টুকু কেটে নিয়ে চুবড়িতে রাখছিল। সেই-গুলো শিলে রোগড়ে ঘষে নিয়ে হলুদ মাখিয়ে ধুয়ে এনে নুন দিয়ে জল দিয়ে ভটভট করে উনোনে চড়ানো মাটির হাঁড়িতে ফোটাতে থাকে ঘন্টা খানেক ধরে। তারপর সিদ্ধ হলে পিঁয়াজ লংকা দিয়ে কষে নিয়ে আর একটু ফুটিয়েই নামিয়ে নেয়। আঁশটে গন্ধে চারদিকটা ভরে যায়। তারপর মাটির শানকিতে অথবা টিনের খোরায় ঢেলে নিয়ে খেয়ে নেয়। পুরুষরা ঝাঁপা-ভরা তাড়ি খায় তার সঙ্গে।

ছিদাম এক ভাঁড় গাঁজা ফোঁটা কড়া তালের তাড়ি এনেছিল। শামুক রান্না হলে তাকেও খেতে দিয়েছে পদ্ম। খেতে-খেতে গল্প করে হরিপদ আর ছিদাম।

ছিদাম বলে, 'কলকাতা কি রকম র‍্যা হরি-দা?'

'সে এক রকম! খালি পাকা ঘর-বাড়ি আর গাড়ি-ঘোড়া। মেম সাহেব বাবু বিবিরা ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জামা কাপড় দেখলে বোঝা যাবে তাদের কারুর টাকা কড়ির অভাব নেই। সবাই বাবু! মেয়েদের কি পরীর মতন চেহারা মাইরি! বগল কাটা জামা। নাই বার করা ফাঁকা পেট!'

'কলকাতা কুনু দিকটাতে হবে?'

'ঐ 'ওত্তর'-পুবে। 'আগাশ' সাদা হয়ে আছে যিদিকে।'

'মোকে একদিন লি-যাবি?'

'যাবি? তাহলে সেই পাথরপিতিমের দিকে যেয়ে ভদ্দরলোক বা জোতদারদের ক্ষেতে ক্ষেত মজুরি করে সুযোগ বুঝে তাদের ঘরে ডাকাতি করে যেদিন ধরা পড়ি তাহলে কপালে জেল লেখা থাকলে কলকাতা দেখা মিলতে পারে।'

তবে চল, কালই দল বেঁধে পাথর-পিতিমেয় কাজে যাই।'

সত্যই পরদিন সব কজন পুরুষই দূরে পাথর-প্রতিমার দিকে চলে গেল বড় বড় চাষী জোতদারদের চাষের জন-মজুরি খাটবার জন্যে। গোবিন্দ শুধু যায় নি। তার বাপ কোথা থেকে তাইচুং ধান চুরি করে আনতে তাই চাষ করেছে। নাবাল-ডাঙা জমিতেই চায়েন হয়ে ধান ফলেছে। কাঠায় আড়াই মণ ধান হবে। ধান যেন বিছিয়ে দিয়েছে। দশ কাঠা জায়গাতে যা ধান হবে তাতেই ওদের সম্বৎসরের খোরাকী হয়ে যাবে। হরদম জল বইছে গোবিন্দ। ডালিমও তার সঙ্গে জল বইছে কলসী কাঁখে নিয়ে। সৌদামিনী আর তাব মা বাবার কাছে যাবে না—ঝাঁটার বাড়ি হরদম মার খেয়েও।

গোবিন্দর বাপ অথলে বুড়ো হাসে। ঠিক আছে, থাক। এক বছর বাদে-বাদে বামুন ঠাকুর আসে। সামনের মাসেই আসবে। তখন বিয়ে হবে।

পদ্ম শামুকের মাটি চিবোতে চিবোতে অন্ধকারে আঁচল ঝাপটা মেরে জ্বরতপ্ত তিনটে ছেলের গায়ের মশা তাড়াতে তাড়াতে উদাস মনে দেওয়াল হেলান দিয়ে ভাবতে থাকে কবে মিনসে আবার ফিরবে। পেটে যে তার আবার একটা বাচ্চা এল! লোকটা যদি না ফেরে শহর ভারী হলে এই অবোলাদের নিয়ে সে কি উপায় করবে? হোগলা বনের মধ্যে যদি তাকে কেউটে সাপে কাটে, বাঘে নিয়ে যায় ...দের কি হবে? এই জ্বর গায়ে বাচ্চা ...ড়ে আছে, এক ফোঁটা বার্লি নেই—চিকিৎসা নেই।...

হঠাৎ একদিন ছিদাম এল।

পদ্মকে জড়িয়ে ধরে বললে, বৌদি তুই কাঁদিবিনি বল—হরিদা আর পীরু জোতদারের বন্দুকের গুলি খেয়ে মারা গেছে! তল্লাটের চাষী লোকরা জোতদারের বাড়ি ঘেরাও করলে। খুব কাটাকাটি মারা-মারি হল। হরি-দা আর পীরুর লাস 'পুলিস' নিয়ে গেছে।'

মাথা কুটে কুটে পদ্ম কাঁদতে লাগল। ছেলেদের জ্বর। লোকটা আর কক্ষনো ফিরবে না। তার হাত ধরে হোগলা-বন থেকে টেনে ঘরে আনবে না।

ছিদাম জ্বরতপ্ত ছেলেগুলোর কপালে হাত দিয়ে দেখলে একবার। তারও হাত জখম হয়েছে। দুটো টাকা নিয়ে পদ্মর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বাড়িতে চলে গেল ছিদাম।

পদ্ম বুক ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল সারা রাত। তার পেটে আর একটা বাচ্চা এসেছে। চিরকাল এবার তাকে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শামুক খেয়েই থাকতে হবে। জলভাটির মতন চিরকালই তারা হোগলা-বনের জলে ভাসতে থাকবে।

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

হিপি প্রসঙ্গ···

অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড়, মাথার চুলে তেলের অভাব, ঢুলু ঢুলু নেত্র। গায়ে-মাথায় ধুলো, পোষাক-পরিচ্ছদ কিম্ভুত, পুরুষের মুখে অযত্নবর্ধিত দাড়ি, মেয়েদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পায়ে চপ্পল, গায়ে কম্বল আর কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ—এরা কারা? এই প্রশ্নের জবাব একালের বালকেরাও দিতে পারে—এ'রা যে হিপি তা সবাই জানে। এ'দের যত্র-তত্র শয়ন ও হট্টমন্দিরে ভোজন, মরণটা গোমতী তীর হবে কিনা বলা কঠিন এবং এরপরই বা কি ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না। এ'রাই হিপি। এ'দের আচার আচরণ দেখে মনে হয়েছে হিপিরা এমন কিছু নতুন কান্ডকারখানা করেনি, আমাদের ব্যাঘচর্ম পরিহিত, গাঁজা-ভাঙসেবী, শ্মশান-মশানবিহারী ছাইমাখা ভোলানাথ পৃথিবীর আদি-হিপি। তাঁর নানাবিধ আচরণ ত' হিপিদেরই মত। মাদকদ্রব্যপ্রীতিতে হিপিরা তাঁকেই অনুসরণ করছেন।

হঠাৎ সবাই দলে দলে হিপি হয়ে গাঁজা ভাঙ খেয়ে তুরীয়ানন্দে মাতল কেন? এর পিছনে একটা সামাজিক কারণ বর্তমান এবং সেই কারণটি অনুসন্ধান করেছেন বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ডাঃ ইয়াবলোনসকী তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'হিপি-ট্রিপ' বা হিপি যাত্রায়।

তিনি বলেছেন, 'মার্কিন রঙ্গভূমিতে এক বিচিত্র রঙদার ও মনোহর নাটক সুরু হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত ঘাত-প্রতিঘাত বা নাটকীয় এ্যাকসনের পিছনে আছে 'প্রেম', 'অবাধ-যৌন বিহার' (তার আচরণটুকু আধ্যাত্মিক), আর ধর্মীয় আচার-আচরণের অঙ্গ হিসাবে গাঁজা-ভাঙ সেবন। এর ফলে মার্কিন সমাজের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার এবং সামাজিক নীতির একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে।'

ডাঃ ইয়াবলোনসকীর এই বিশ্লেষণের একটি বিশেষ মূল্য আছে, হিপিদের নিয়ে অনেকরকম লেখা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এই জাতীয় যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন আর চোখে পড়েনি। রোগনির্ণয় করার পূর্বে রোগলক্ষণ বিচার করাই বিধি। লেখক রোগলক্ষণগুলি বিচার করেছেন, গভীরতার দিক থেকে এই গ্রন্থটি অনন্য। একটা সামাজিক আলোড়নের হেতু নির্ণয়ে তিনি যথেষ্ট মনীষার পরিচয় দিয়েছেন।

লেখক ভূমিকায় বলেছেন—

"I donot pretend to be completely 'objective'. In fact I am a Social Scientist who considers it almost impossible to be totally objective in the study of human behaviour. There are simply too-many personal and situational variables in the human condition for a Student of Society to become fully detached".

নিরাসক্ত ভঙ্গীতে সমগ্র বিষয়টির বিচার কঠিন। লেখক বলেছেন, যে-সময় তিনি হিপি যাত্রায় ব্রতী হলেন তখন যৌন-একগামীত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গী আরও পাঁচজন মার্কিন নাগরিকের মতই ছিল, মার্কিন সরকারের সামগ্রিক মূল্যায়নেও সেই দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে। মাদকদ্রব্য সেবনের ব্যাপারে সরকারী বিধি-নিষেধও তিনি সমর্থন করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, হিপি যাত্রা সুরু করার পূর্বে তিনি কখনও অত্যধিক মদ্যপান করেননি বা কোনো প্রকার নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যাদিও সেবন করেননি।

সমগ্র গ্রন্থটির বিচারে এই ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ পাঠ করা কর্তব্য। অনেককাল আগে আমরা 'লিং দেম ব্যাক এলাইভ' নামক একটা এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীমূলক ফিল্ম দেখেছিলাম, এই গ্রন্থে সেই ফিল্মের মত কিছু কিছু চমক স্থানে স্থানে আছে, তবে, তার জন্য লেখককে ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ সেই সব অংশ সত্যই বিস্ময়কর। মারিজুয়ানা সিগারেট সেবনে ভয়, আতঙ্ক এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বর্ণনায় লেখক কোনো প্রকার ব্যক্তিগত লজ্জা প্রকাশ করেননি। স্পষ্ট করেই সব লিখেছেন। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে 'এল এস ডি' যাত্রার বিবরণও দিয়েছেন কিছু গোপন না রেখে।

স্পষ্টতা এবং সারল্য-ই ডাঃ ইয়াবলোনসকীর রচনার সর্বোত্তম গুণ। এর ফলে অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি ঢাকা পড়ে গেছে। এই আন্দোলনের গতিস্[illegible] এবং অঙ্গ বিনিশ্চয়তা প্রকাশে লে[illegible] শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি যেখানে দুর্বল সেইখানে তিনিও দুর্বল। এই আন্দোলনের পিছনের পটভূমি বিচারসূত্রে ইতিহাসকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল তা সর্বত্র যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি। লেখকের যুক্তির সমর্থনে জে এল মরেনো বা রবার্ট মেরটনের উধৃতি দেওয়া হয়েছে অজস্র। কিন্তু রুশো, রবার্ট ওয়েন, গীবন, ইমারসন, থোরো, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতির কোনো উল্লেখ নেই। এবং শুধু তাই নয়, প্রাচীন রোম থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সংঘটিত বিপ্লবের ইতিহাসকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

এর ফলে হিপি আন্দোলনকে তার নিজস্ব রূপেই গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ করতে পাঠকের বাধবে না, তবে ইতিহাস হিসাবে স্বীকার করতে আপত্তি উঠবে।

হিপি আন্দোলন মোটেই ঐক্যবদ্ধ নয়, কতকগুলি আদর্শের কথা অবশ্য সাক্ষাৎকার সূত্রে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃতির বুকে ফিরে যাওয়া বা 'ব্যাক টু নেচার' প্রভৃতি বাদ দিয়ে যদি একটা মোটামুটি

সিদ্ধান্তে পেঁছাতে হয়, তাহলে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়। 'টিচার' এবং 'হাই প্রিস্ট' শিক্ষক এবং পুরোহিত সম্পর্কে অনেক কথা আছে। আর আছে শিশুকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে এই আন্দোলনের একটা সাধারণ আবেদন।

'ছোট্ট শিশুরা নেতৃত্ব ভার নেবে' এই অনাপেক্ষিক পাশ্চাত্যনীতি যদি এর পিছনে থাকে, তাহলে শিশুদের জেহাদ বা শিশুদের খেলাধুলার মধ্যে যে অবাস্তব দিক আছে, তাকেও গ্রহণ করতে হয়। নঞর্থক দিক থেকে হিপি জীবন অনেকক্ষেত্রে পীড়াদায়ক, নোঙরা এবং বীভৎস মনে হয়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যে সব ভদ্র এবং ভব্য বিবরণ হিপি প্রসঙ্গে প্রকাশিত সেইটাই কিন্তু সব নয়। উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে কোন একটি সাপ্তাহিক পত্রে যে রোমাণ্টিক বিবরণ দেওয়া হয় তা লুইস গোলডিং লিখিত 'লর্ড অব দি ফ্লাইজে'র দুঃস্বপ্নময় বর্ণনা মনে পড়ে।

বেদনাময় ব্যক্তিগত সন্ধান, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো, আত্ম-বিধ্বংসী মাদক সেবন, চেতনময়ত্বের অবসান, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত করে আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকা, দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে জীবন যাপন মোটেই সুস্থতার পরিচায়ক নয়। অনেক সময় শিশুদের প্রতি অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায়, তখন মনে হয় হিপি বাউন্ডুলেপনার তাৎপর্য আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি।

ডাঃ ইয়াবলোনসকীকে ধন্যবাদ যে, তিনি সর্বক্ষেত্রে ফাঁদে পা দিয়ে বসেননি। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি মানবিক এবং সংবেদনশীল। তিনি তাঁর বিশ্লেষণকার্য সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণেই সম্পন্ন করেছেন। তিনি হিপি আন্দোলনের প্রবক্তা নন আবার তার প্রচারকও নন। তিনি অযথা নিন্দার ভারে তাঁর বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করেননি। ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি বার বার ঠিক সুরটি ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই সব মানুষের মনে যে কি উদগ্র আগ্রহ, আবার সুরু থেকে অগ্নি আবিষ্কার দিয়ে যেন তাঁরা নতুন জগৎ গড়তে চান। অথচ মার্কিন সমাজে ত' সবই আছে। সবই-ত আবিষ্কৃত হয়ে আছে, এ আবার নতুন করে কিসের উদ্যোগ!

কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন—

"I was imprsssed with the eloquence of some of the 'love-seekers' and frankly dismayed with the chaos, poverty and violence that dominated much of the scene."

হিপি আন্দোলন আজ শুধু মার্কিন সমাজ নয়, তার সংক্রামকত্ব অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ায় সারা পৃথিবীকে ভাবিয়ে তুলেছে। লেখক অনেক নতুনদিকের সন্ধান এই গ্রন্থে দিয়েছেন। ছবিগুলিও বিস্ময়কর।

—অভয়ঙ্কর

THE HIPPIE TRIP : By Lewis. Yablonsky. Published by Peagasus: : Price 6.95 dollars.

সাহিত্যের খবর

পরভেজ শাহিদীর নামে ।। আর একজন কবির নামে কলকাতার একটি পথ চিহ্নিত হল। এবারের এই নামকরণে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। যাঁর নামে রাস্তার নতুন নামকরণ হয়েছে, তিনি একজন অবাঙালী কবি—উর্দু ভাষার বিশিষ্ট কবি পরভেজ শাহিদী। কলকাতাই ছিল শাহিদীর কর্মক্ষেত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সুদীর্ঘদিন উর্দুর প্রধান অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। কলকাতার সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল তাঁর আত্মিক বন্ধন। তিনি যখন প্রায় শয্যাশায়ী, তখনও তাঁকে কলকাতা এবং বাংলা সাহিত্যের নামে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি। তাই তাঁর নামে রাস্তার এই নামকরণ করে কলকাতা তার কর্তব্য পালন করেছে।

সম্প্রতি পরভেজ শাহিদীর দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভার আয়োজন হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন 'পরভেজ কমিটি।' এই অনুষ্ঠানেই কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব কলকাতার সার্কাস রেনজ-এর নতুন নামকরণ করলেন 'পরভেজ শাহিদী রেনজ'।

প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল রেজ্জাক খান কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—'তিনি ছিলেন উর্দু ও বাংলা সাহিত্যের সেতুস্বরূপ।' মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর কবির সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেন। সভায় ডঃ এ এম ও গণি এম-এল-এ, কবির একটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ডঃ গণি কবির একাধিক কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরভেজের কবিতার একটি বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন শ্রী শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী। সভার প্রারম্ভে সকলকে স্বাগত জানান মহম্মদ ওয়াসিম।

বাংলায় পরভেজ শাহিদীর অনেক কবিতাই অনূদিত হয়েছে। সেই সব কবিতা সংকলিত করে এবং কিছু কবিতা নতুন অনুবাদ করে যদি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন 'পরভেজ মেমোরিয়াল কমিটি' তাহলে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে তাঁরা অসংখ্য ধন্যবাদ পাবেন এবং কবির প্রতিও যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

আমেরিকান পত্রিকায় অমৃতা প্রিতম ।। মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'মহফিল' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে প্রখ্যাত পাঞ্জাবী কবি শ্রীমতী অমৃত প্রিতমের উপর। ভারতীয় সাহিত্যরসিক মাত্রেই এ সংবাদ শুনে আনন্দিত হবেন। শ্রীমতী অমৃত প্রিতম পাঞ্জাবী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখিকা। এ পর্যন্ত তাঁর ৪১টি গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। 'অমৃত' পত্রিকায় তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীমতী প্রিতমের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয় অতি অল্প বয়সেই। এ সম্বন্ধে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেনঃ--আমার বাবা ছিলেন একজন লেখক এবং আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র সন্তান। আমার যখন বয়স এগার বৎসর, তখন মা মারা যান। খুব একাকী তখন আমার দিন কাটত। সেই একাকীত্ব ঘুচোবার জন্যেই আমি তখন লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু সেই সময়ের রচনা ছিল তাঁর খুব অপরিণত। 'পাথর গীতি নামক কবিতার বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আর 'লম্বিয়া ভাটান' বইটি প্রকাশের দ্বারা তিনি নিজের কাব্য জগতে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বইটির মধ্যে ভারত বিভাগের বেদনা ফুটে উঠেছে। বইটির প্রথম কবিতা 'ওয়ারিশ শাহ'। এমন কোন পাঞ্জাবী নেই, যে এই কবিতাটি পড়েনি বা শোনেনি। প্রসঙ্গতঃ কবিতাটির অংশত অনুবাদ তুলে ধরছি।

'একদিন এক পাঞ্জাব তনয়া কেঁদেছিল নিদারুণ,
সেই কান্নার কাহিনী নিয়েই লিখেছিলে তুমি কাব্য;
আজ দেখ চেয়ে লক্ষ তনয়া কাঁদিছে চতুর্দিকে,
ওয়ারিশ শাহ! তোমাকেই তারা ডাকছে বারংবার।

হে অশ্রুজলের বন্ধু!
পাঞ্জাবের দিকে চেয়ে দেখ আজ।
প্রতিটি গ্রামের সীমানা এখন মৃতদেহে পরিপূর্ণ,
নদীজলধারা রক্তপ্লাবিত আজ।

ভারতবিভাগের প্রেক্ষাপটে তাঁরা কয়েকটি উপন্যাসও রচিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'ডঃ দেব' উপন্যাসটি উক্ত পত্রিকাটিতে আরো কয়েকজন ভারতীয় লেখকের উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকা করবেন বলে জানা গেছে।

পরলোকে জন গান্থার ।। প্রখ্যা আমেরিকান সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক

গান্থার গত ২৯ মে কলাম্বিয়া প্রেসবিটেরিয়ান হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন।

তাঁর জন্ম আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৯০১ সালের ৩০ আগস্ট। ১৯২২ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে যান। ফিরে এসে 'চিকাগো ডেইলি নিউজে' যোগদান করেন। উক্ত সংস্থা তাঁকে ইউরোপ যাবার অনুমতি না দেওয়ায় তিনি ১৯৩৭ সালে এর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে লন্ডন যান। এরপর তিনি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশে সাংবাদিক হিসেবে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁর চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তিনি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ভ্রমণ করেছেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তাই তাঁর খ্যাতির প্রধান কারণ। তিনি যেসব রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড লয়েড জর্জ, লিয়ন ট্রটস্কি, ডি ভেলেরা, চিয়াং কাইশেক, সম্রাট হিরোহিতো, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীজবাহরলাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সালে তাঁর 'ইনসাইড ইউরোপ' প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ইউরোপে সংকটের যে ঘনছায়া নেমে এসেছিল, গান্থার তাঁর গ্রন্থে তার বিস্তৃত এবং বাস্তব বর্ণনা দেন। 'ইনসাইড এশিয়া' এবং 'ইনসাইড ল্যাটিন আমেরিকা' গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৩৯ এবং ১৯৪১ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মাল্টায় জেনারেল আইসেনহাওয়ারের জেনারেল স্টাফের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর অন্যতম প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ইনসাইড রাশিয়া' প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত 'ডেথ বি নট বি প্রাউড' গ্রন্থে আছে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে ব্রেণ কেনসারে মৃত তাঁর পুত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর পরলোকগমনে বিশেষ করে সাংবাদিক জগতের যে বিরাট ক্ষতি হল তাতে সন্দেহ নেই।

এশিয়ার সাহিত্য ।। আমাদের নিকট প্রতিবেশী এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। ইরাক বা ইরাণের ভাষা কি? লেখকেরা কোন ভাষায় লেখেন? ফিলিপাইনের সাহিত্য কোন পথে? আমরা এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনা। আর এ কারণেই বোধ হয়, এশিয়া ভূখণ্ডে আমরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি।

কথাগুলো মনে পড়লো কাইরো থেকে প্রকাশিত 'অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটিংস' নামে পত্রিকার একটি কপি দেখে। এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যের বিভিন্ন অনুবাদ এবং সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে অনেক তথ্য চোখে পড়ল।

ফিলিপাইনের প্রখ্যাত তরুণ লেখিকা লিজেন কুইরিনোর একটি নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। নাম 'লাইক দি উইন্ড আই গো'। ওমর খৈয়মের সেই বিখ্যাত লাইন দিয়েই উপন্যাসের নাম। কাহিনীও এই উপন্যাসের অনুরূপ। এক রোমান্টিক কাহিনী। ১৯৪১ সালে জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হবার সময় থেকে কাহিনীর সূত্রপাত। আর শেষ হয়েছে ১৯৬০ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে এসে। সমকালীন ফিলিপাইনের সমাজজীবন উপন্যাসটির মধ্যে উদ্ভাসিত।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে প্রচলিত ভাষারীতিতে পার্থক্য স্পষ্ট। পূর্ব, পাকিস্তান বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চল। সাহিত্যের ভাষাও সাধারণত বাংলা। উর্দুরও প্রচলন আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুরই ব্যাপক প্রসার। সাহিত্যের ভাষা কোথাও পুশতো, কোথাও পাঞ্জাবী, কোথাও সিন্ধী এবং কোথাও বালোচী। আটক নদী থেকে দক্ষিণে করাচী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় আজকাল পাঞ্জাবী ও সিন্ধী উত্তর অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তথ্যবিদরা এই অঞ্চলকে উর্দুর জন্মভূমি বলে মনে করেন। মুসলমান আগমনের পর সর্বপ্রথম ঐ এলাকায় উর্দুর প্রচলন হয়। আরবী ফারসী এবং স্থানীয় ভাষাগুলির সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার উৎপত্তি। সিন্ধী, পাঞ্জাবী এবং উর্দুর বুনিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করলে বোঝা যায় এই ভাষাগুলি প্রকৃতপক্ষে এক এবং তা একই বুনিয়াদ থেকে সম্প্রসারিত। তবে পরবর্তীকালে তার পরিবর্ধন বিভিন্ন পরিবেশে হওয়ার এবং তার মধ্যকার কোন-কোনটা নানা অভাবনীয় অবস্থায় পড়ার ফলে ভাষায় গঠনপদ্ধতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে, এবং শাখা-প্রশাখাগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়। পুশতোর গঠনপদ্ধতি সিন্ধী ও পাঞ্জাবীর নিকটবর্তী — উর্দুর ততটা নয়। কিন্তু এ সম্পর্কে এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত, সিন্ধী এবং পাঞ্জাবীর মতো পুশতোও উর্দুর বর্ণমালাতেই লেখা হয়ে থাকে।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য এবং উর্দু সাহিত্য মূলত একই সংস্কৃতি এবং একই সমাজ-মানসের প্রতিচ্ছবি। গত এক হাজার বছর ধরে মুসলমানরা এই উপ-মহাদেশে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তাকে উন্নত ও বিস্তৃত করেছে এবং তাদের প্রচেষ্টায় এই দেশে যে সুষ্ঠু মানসিকতা গড়ে উঠেছে, তার প্রকাশ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় উর্দু সাহিত্যের বদওলতে এবং অনেকাংশে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাগুলিতে। মূল বিষয়ে ঐক্য থাকায়, চিন্তার ক্ষেত্রে অনেকাংশে রয়েছে সমতা। শাহ আবদুল লতিফ ভীটের 'রিসালা', খোশহাল খান খটক এবং আবদুর রহমান বাবার 'কালাম', বুল্লহে শাহর কাব্য এবং ওয়ারিশ শাহর 'হীররানঝা' স্থানীয় বৈশিষ্ট্যময় এবং পুশতো পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় লেখা হলেও তা সার্বিকভাবে একই সভ্যতার প্রতিচ্ছবি। পশ্চিম পাকিস্তানী সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্থানীয় পরিবেশের প্রতিফলন। যেমন, পুশতো সাহিত্যে সীমান্ত প্রদেশ এবং সেখানকার উপজাতীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায়। তাছাড়া, কঠিন পর্বতমালা ও পাথর-কুচিপূর্ণ পথ-ঘাট, উপত্যকা এবং রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চল স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুশতো সাহিত্যের চিত্রকল্পে। এই রকম পাঞ্জাবী সাহিত্যও সে অঞ্চলের প্রতিচ্ছবি। তার উপমা ও দৃষ্টান্ত সবই দৈনন্দিন কথাবার্তা এবং সেখানে যে 'হুসন' ও 'ইশক'-এর দাস্তান বর্ণনা রয়েছে, তা গ্রামজীবনেরই কথা। রানঝা অথবা মীরযার মর্মবেদনা এবং তাদের প্রেম-কাহিনী ওয়ারিশ শাহ এবং পিলু শাহ যেভাবে শব্দের তুলিতে এঁকেছেন তা প্রত্যেক পাঞ্জাবী নওজোয়ান-এরই মর্ম-কাহিনী।

পুশতো ও পাঞ্জাবীর মতো সিন্ধী এবং বালোচী সাহিত্যেও রয়েছে স্থানীয় রূপ ও পারিপার্শ্বিকের জীবন্ত ছবি। বিস্তৃত বালুকাময় মাঠ, তরঙ্গ-সংকুল সিন্ধু নদ, পশুপাল, জমাট মেঘপুঞ্জ, বারিবর্ষণ, ক্ষেত-খামারের সজীবতা—তা ছাড়া সাধারণ লোকেদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা-প্রবাহ প্রভৃতি শাহ আবদুল লতিফ একান্ত সহজ ভাষায় ও স্বাভাবিকভাবে আপন রচনায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন। শাহ আবদুল লতিফ ছাড়া অন্যান্য সিন্ধী কবিরাও লোক-গাথা ও লোক-কাহিনীর মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাবনা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন এবং সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখ করে তাকে চিত্তাকর্ষক করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য আরো অনেক এগিয়েছে। যুগের ছাপ পড়েছে তার ওপর ক্ষমতাশালী সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশে পাকিস্তানের এই অঞ্চলের সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ।

অনন্ত সেন

নতুন বই

কেশবসুত (জীবনী)—প্রভাকর মাচয়ে ।। অনুবাদ ঃ ক্ষিতীশ রায় ।। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। দাম ২-৫০ টাকা ।।

প্রেমচন্দ (জীবনী)—প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত ।। অনুবাদ ঃ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ।। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী ।। দাম ২-৫০ টাকা ।।

স্বীকার করতে বাধা নেই, একজন শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে য়ুরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় যতটা ঘনিষ্ঠ, প্রতিবেশীদের নৈকট্য সত্ত্বেও তামিল-তেলেগু-হিন্দী-উর্দু-উড়িয়া-অসমীয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের সংযোগসম্পর্ক ততটা ঘনিষ্ঠ নয়। সাহিত্য অকাদেমী 'ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন ও তাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগ' বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছেন 'ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা'।

এই সিরিজের দ্বিতীয় বই প্রভাকর মাচয়ের 'কেশবসুত' এবং সপ্তম গ্রন্থ প্রকাশচন্দ্র গুপ্তের 'প্রেমচন্দ'। মূল বই দুটো ইংরেজীতে লেখা। সম্প্রতি বাংলায় অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে ক্ষিতীশ রায় ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। পাঠক হিসেবে আমাদের প্রথম বিস্ময়, বইগুলির মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা। দুটো বইয়েরই অন্তঃপ্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তৈরী একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি। দ্বিতীয় বিস্ময়, কেশবসুত সম্পর্কে। ১৯৬৬ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালি পাঠকের সঙ্গে তাঁর কবিতার অপরিচয়কে উপেক্ষা করা যায় না কোনোক্রমেই।

'কেশবসুত'-এর ভূমিকায় প্রভাকর মাচয়ে লিখেছেন 'উর্দু ভাষীর কাছে হালী যেমন, বাঙালীর কাছে যেমন মধুসূদন দত্ত, তামিল ভাষীর কাছে যেমন সুব্রহ্মণ্য ভারতী বা গুজরাটীর কাছে নর্মদ, তেমনি হলেন কেশবসুত মারাঠীদের কাছে।' লেখক গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন কেশবসুতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধ, যথাক্রমে (১) জীবনী, (২) কেশবসুতের প্রেমের কবিতা, (৩) কেশবসুতের প্রকৃতি প্রেম, (৪) কেশবসুত ও সমাজসমস্যা, (৫) অনুবাদ, (৬) অভিনবত্ব ও (৭) সমালোচকের দৃষ্টিতে কেশবসুত। শেষের দিকে ছাপা হয়েছে 'নির্বাচিত কবিতা'র কিছু অনুবাদ ও গ্রন্থপঞ্জী।

প্রেমচন্দের রচনা অবশ্য বাঙালি পাঠকের নিকট আদৌ অপরিচিত নয়, কিন্তু তাঁর জীবন অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোদান' বাংলায় অনূদিত হয়েছিল প্রায় দুই যুগ আগে। হিন্দী সাহিত্যের গোর্কি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। প্রেমচাদ নিজের জীবনকে তুলনা করেছেন 'সমতল ভূমি'র সঙ্গে। 'উত্তর ভারতের যে-অঞ্চলে তিনি জন্মেছিলেন এবং যেখানে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন, সেখানকার প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে' তিনি লিখে গেছেন প্রায় তিন শো ছোটগল্প ও বারোটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

এই গ্রন্থের লেখক প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত প্রথাগত পদ্ধতিতে তাঁর জীবন কিংবা সাহিত্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন নি। দেশকাল ও জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের সংযুক্তির বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন স্তরে স্তরে। সাধারণত জীবনী-জাতীয় গ্রন্থে জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়টা থাকে উহ্য। এ গ্রন্থ তার ব্যতিক্রম। বরং বহির্ঘটনার অন্তঃস্রোত হিসেবে সর্বদাই প্রবহমান থেকেছে ইনার-লাইফ।

আমরা সাহিত্য অকাদেমীকে অভিনন্দন জানাই, বই দুটো প্রকাশের জন্য। কেননা, আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় যেমন মানুষ সাহিত্যিক সম্পর্কে আগ্রহী হয়, তেমনি লেখকের জীবনী পাঠে উৎসাহিত হন লেখা সম্পর্কে।

বই দুটোর অনুবাদ স্বাচ্ছন্দ ও সাবলীল। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা সত্যজিৎ রায়ের।

অভিশপ্ত প্রেম (উপন্যাস)—নিখিলরঞ্জন মাইতি। কুমকুম প্রকাশনী। ১০৩।বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

নিখিলবাবুর এটি 'সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাসটি কাহিনীনির্ভর। প্রফেসর মিলন চৌধুরীকে ভালবেসেছিল সুজাতা মুখার্জি। নিজেই গায়ে পড়ে আত্মীয়তা করেছিল সুজাতা। সুজাতা তার ভালবাসাকে মানবিক চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত না করে প্রশান্ত রায়কে বিয়ে করেছিল শাস্ত্রীয়ভাবে। তাই বিবাহিত জীবনে তার না এল সুখ, না শান্তি। পূর্বস্মৃতির ভাবনা-চিন্তার মারপ্যাঁচে জীবন কাটল তার। কিন্তু যখন ভুল ভাঙল, তখন তার হৃদয়াকাশে নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। সে এক অভিশপ্ত প্রেমের নায়িকা, স্মৃতির সূর্য চিরদিনের মত অস্ত যেতে বসেছে। 'অভিশপ্ত প্রেমে'র এই মূল আখ্যানকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে এবং কৌশলী লেখন-ভঙ্গিমার মাধ্যমে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনার আকর্ষণ পুরো মাত্রা তিনি বজায় রেখেছেন। অযথা চটকদারি কিংবা যৌন-উত্তেজনা নেই। পরিণতি বলিষ্ঠ না হলেও কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দ শৈলী সরল এবং ভাষা প্রাঞ্জল—সাধার পাঠকের পক্ষে যা উপেক্ষণীয় নয়। ছাপ প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই সুন্দর।

ওরা ক্যাকটাসের ফুল (উপন্যাস)—সবি বসু। বিচিত্রা প্রকাশনী। ৭, নব কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য টাকা।

আজকাল গল্প-উপন্যাসে গল্প বালাই বিশেষ থাকে না। নানাবিধ আ ও মতবাদের গোলকধাঁধায় বিষয়বস্তু অসহায়ের মতই ঘুরপাক খেয়েই মরে। সাধারণ পাঠক চমৎকৃত যদি বা হন, নি একটি গল্পের রসাস্বাদন করতে না যে প্রচন্ড অতৃপ্তি ভোগ করেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আ উপন্যাসটি এদিক দিয়ে এক ব্যতি উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নতুন ধরনের। ও অন্যান্য নেশার বস্তু নিয়ে যে খেল জাল বিস্তার করা হয়েছে, উপন ঘটনার মধ্যে তা অতি মুন্সীয়ানার সাজান হয়েছে। বাস্তব জগতের ঘা সাহিত্যবস্তুতে রূপান্তরিত করবার, দেখা পাত্র-পাত্রীকে কথাশিল্পের চরিত্র তোলবার দৃষ্টি লেখিকার রয়েছে, এ কথা নয়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রজত স্মাগলার এবং নোংরা ঘৃণিত সংগে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দুর্নীতিপরায়ণতা স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে। দুর্নীতিপরায়ণ হলেও সে বাৎসল্য হারায়নি, যে কারণে তার সুন্দরী কন্যা হেমলতাকে কুপথ সরিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা ক রজতের প্রতি শিরিনের ভালবাসা বিষাক্ত সৌরভের মতই। লেখিকার প্রকাশভঙ্গি ও সংলাপ ভাল প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই সুন্দর।

বইকুণ্ঠের খাতা

চিঠিপত্রে মোহিতলাল

ভলতেয়ারের সেই মোক্ষম উক্তিটি জানা আছে সকলেরই—মানুষ ভাষা পেয়েছে মনের কথা গোপন করার জন্যে।

কথাটা যদিও বিদ্রূপ করে বলা তবু সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত স্বীকার করতেই হবে পাঠকের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট আড়াল থাকে সাহিত্যিকের। তাঁকে সংযত হয়ে কথা বলতে হয় অনেকের সঙ্গে, বহুর উদ্দেশ্যে। বিশেষকে পৌঁছে দিতে হয় নির্বিশেষের সীমানায় ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিকতার স্তরে।

কিন্তু চিঠিপত্রে সকলেই নিরাবরণ, অপ্রচ্ছন্ন এবং আন্তরিক। কেননা, চিঠি হলো, এক ধরনের ঘরোয়া আলাপ, পত্রদাতা ও পত্রপ্রাপকের মধ্যে সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যম। স্থানগত ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে থাকে না তৃতীয় পুরুষের উপস্থিতি।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে, প্রথমা স্ত্রীর কাছে লেখা নজরুলের একমাত্র চিঠিটির কথা। অন্য কোনো পাঠক-পাঠিকা জুটবে জানা থাকলে হয়তো সে চিঠি তিনি আদৌ লিখতেন না, কিংবা লিখলেও তাঁর ভাষা হতো অন্যরকম।

ঐ একই কারণে আমাদের আবিষ্ট করে কীটসের ব্যক্তিগত চিঠিগুলি, রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে লেখা চিঠি আমাদের এত আগ্রহ সঞ্চার করে। টি এস এলিঅটকে বোঝার জন্যে আমরা পড়ি এজরা পাউণ্ডের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলি।

মোহিতলালের একটি চিঠির অংশ

Kailas Chandra Ghose Road
Barisa P.O. (24 Pergs)
21.5.47.

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ

অবশ্য চিঠিপত্র যে সবসময় মন্ময় উপলব্ধি ধারক হবে, তার কোনো মানে নেই। লেখকের মানসিকতাও চিঠির বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রিত করে অনেকখানি। মোহিতলাল মজুমদারের পত্রাবলীকে হ্যাক্তর করা যায় তন্ময় অভিব্যক্তির উদাহরণ হিসেবে। তিনি আত্মমবিবেক কিংবা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব নন, যুক্তিবাদী সমালোচক, আত্মসচেতন কবি, ধ্রুপদী চিন্তনের অনুগামী। তাঁর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে মাইকেলের। সেই প্রবল পৌরুষ, সেই নিয়তি-তাড়িত জীবন।

তবু দুইজনের ব্যক্তিত্ব দুরকম : 'মোহিতলাল অধীর, অসহিষ্ণু, বিচারশীল, স্পষ্টবাদী, আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন। মধুসূদন অধীর, অসহিষ্ণু, চিন্তাহীন, সরল।'

মাস কয়েক আগে বেরিয়েছে আজহার-উদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্তের সম্পাদনায় 'মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ।' চিঠিগুলি সংগ্রহ করেছেন আজহারউদ্দীন খান।

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত লিখেছেন : 'তাঁর পত্র একান্ত ব্যক্তিগত নিভৃত-চারণ নয়, আবার বস্তুগৌরবহীন অলস কল্পনার শিল্পরচনাও নয়।... মোহিতলালের পত্রে বক্তব্যই বড়, এবং সে বক্তব্য এমন যে তার অভিধা শুধু লেখক বা উদ্দিষ্টের মধ্যে বদ্ধ থাকে না। এইজন্যেই মোহিতলালের পত্রের নৈর্ব্যক্তিকতার গুণ আছে, সাহিত্যমাত্রেরই যা উৎকর্ষের কারণ।'

ব্যক্তিগতভাবে মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয়লাভের সুযোগ হয়নি আমার। দূর থেকে যেটুকু জেনেছি, তাতেই শ্রদ্ধামেশানো এক ধরনের ভয় ছিল তাঁর সম্পর্কে। কেন জানি না, মনে হতো, মুখোমুখি বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে না বেশিক্ষণ।

প্রসঙ্গক্রমে ভবতোষবাবু লিখেছেন : 'পত্ররচনাতেও মোহিতলালের পৌরুষ আমাদের মতো দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়বিচলিত দুর্বলচেতা আদর্শদ্বিন্দেদ ক্ষত-বিক্ষত বাঙালী পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর লেখায় কোনো দ্বিধা নেই, অনিশ্চয় ধারণা নেই। যা বিশ্বাস করেছেন, সে বিশ্বাসের পর্বতকে কোনো ইষ্টদেবতার বজ্রপাতই টলাতে পারেনি, হোন না তিনি গান্ধী, হোন না তিনি রবীন্দ্রনাথ।'

এই সংগ্রহের চিঠিগুলি পড়তে পড়তে কেবলই কানে বাজে এক ব্যর্থ পৌরুষের জ্বালা, প্রবল আদর্শবাদী একটি মানুষের হাহাকার, তীক্ষ্ম যুক্তিবাদী সমালোচকের কঠিন ভর্ৎসনা ও দীর্ঘশ্বাস। কখনো তাঁকে মনে হয় রুদ্ধ, কখনো ব্যথিত, কখনো অহংকারী। কিন্তু কোথাও নেই অনুতাপের

ছিটেফোঁটা। চিঠিগুলির ভাষাও তেমনি রুক্ষ। ভবতোষবাবুর মতেঃ 'তাঁর ভাষা সালঙ্কারা নটী নয়, রুদ্রাক্ষশোভিতা কঠোরা ভৈরবী।'

বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দত্ত লিখেছেনঃ 'কখনও কখনও তাঁকে গোঁড়া অন্ধবিশ্বাসী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হয়, তাঁর মন যেন একটা জায়গায় গিয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ হয়েছে। জগতের প্রবাহ নিয়তির বিধানে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে এগিয়ে চলে এসেছে, তিনি কিছুতেই তাকে স্বীকার করে নিতে পারছেন না।'

হয়তো এটাই তাঁর ব্যর্থতার প্রধান কারণ, স্ববিরোধিতার উৎসভূমি।

তবু কখনো তিনি আত্মমগ্ন নন, সরাসরাই পাঠকসচেতন এবং নিজস্ব বিশ্বাসের কাছে দায়িত্বশীল। জীবনকে তিনি শাসন করেছেন, অন্যের কাছে নতিস্বীকার করেননি। প্রবল আত্মমর্যাদাবোধে সর্বদাই স্বশাসিত। স্বভাবতই চিঠিপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সেই অপরাজেয় মনোভাবের খর দীপ্তি।

আজহারউদ্দীন খানের 'নিবেদন'

'নিবেদন'-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত আজহারউদ্দীন লিখেছেনঃ 'প্রকৃতপক্ষে লেখকের পত্রাবলীই তাঁর জীবন ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য ও যথোপযুক্ত প্রতিচ্ছবি।'

সেজন্যে তিনি বছর দশেকের চেষ্টায় সংগ্রহ করেন মোহিতলালের শতিনেক চিঠি। কেবল সন্দেহ ছিলঃ 'যে-দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কাটতি নেই, সে-দেশে মোহিতলালের পত্রগুচ্ছের প্রকাশক পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। তদুপরি মোহিতলাল মতান্তরকে মনান্তরে নিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনদন্ড হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সবাইকে শত্রু করে তুলেছিলেন।'

প্রায় এক দশক আগে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল' গ্রন্থ লেখার সময় আজহারউদ্দীন সাহেব তাঁর অনেকগুলি মূল্যবান চিঠির সন্ধান পান। বলা যায়, ঐ চিঠিগুলিই তাঁর এই সংকলন প্রকাশের প্রধান প্রেরণা।

তবু কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে অনেক। 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল'-এর ভূমিকায় দুঃখ করে লিখেছিলেন : 'মফস্বলে বসে এ জাতীয় বই রচনা করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। হৃদ্যতা ও অনুদারতা, আগ্রহ ও বিমুখতা দুই-ই পেয়েছি। নাম করতে চাইনে, কবির কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রার্থনা করেও অন্তত সৌজন্যের খাতিরেও তাঁরা আমার কৌতূহলে কিংবা চিঠির জবাব দেননি।'

দশ বছর পরে, পত্রগুচ্ছের নিবেদনেও তিনি সেই ক্ষোভই ভাষান্তরে প্রকাশ করেছেনঃ "আপাতদৃষ্টিতে আপনারা যাঁদের নাম করবেন, তাঁদের নাম আমি জানি, তাঁদের কাছে মোহিতলালের অনেক মূল্যবান চিঠি আছে। কেন জানি না, যোগাযোগ করলেও চিঠি দিতে তাঁরা কুন্ঠিত। যাঁদের কাছে চিঠি পাবার প্রত্যাশা ছিল বেশী, তাঁরাই বিমুখ করেছেন সবচেয়ে বেশী।'

তাঁর এই অনতি-উষ্ণ মন্তব্যের মধ্যে আমি অনুভব করি, জাতীয় সংকটের আরেকটা দিক। বাঙালী পাঠক ও বুদ্ধিজীবীদের নির্মম ঔদাসীন্যও অনেক সময় কি রকম আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে, এও বুঝি তার অন্যতম নিদর্শন: তা হলে, এতদিনে বেরুনো উচিত ছিল, শুধু মোহিতলাল নয়, আরো অনেকেরই পত্রগুচ্ছ। ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে সাহিত্য ও সমাজের প্রাচীন দলিলগুলি। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বা কি করছেন? বাঙালী গবেষকরা কি এখন পি এইচ ডি, ডি-লিট পাওয়ার ব্যাপারেই ব্যস্ত? লাইব্রেরীগুলি কি কেবল গল্প উপন্যাসেই ঠাসা হবে?

তবু আজহারউদ্দীন সাহেব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, অধ্যাপক তারাচরণ বসুর আগ্রহ ও সহযোগিতার কথা। মোহিতলালের আজীবন সুহৃদ জীবনকালী রায় ও 'কালি-কলম'-এর সম্পাদক মুরলীধর বসু ছিলেন পত্রগুচ্ছ প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। তাঁরা কেউ-ই বইটি দেখে যেতে পারেননি।

কেননা, পত্রগুচ্ছ ছাপা হতে সময় লেগেছে প্রায় এক যুগ। বাংলা বই ছাপার ইতিহাসে বোধহয় একেও একটি স্মরণীয় ঘটনা বলা যায়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর প্রথম সংস্করণ ছাপতেও নাকি প্রায় এক দশক সময় লেগেছিল।

পত্রগুচ্ছের স্বাতন্ত্র্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে ১৯৩টি চিঠি। সংকলকের অনুমানঃ 'সারা জীবনে তিনি যত চিঠি লিখেছিলেন, তার অর্ধেকও এগুলি নয়।' সেজন্যে তিনি আবেদন জানিয়েছেন, 'মোহিতলালের চিঠি যদি কারো কাছে থাকে, তিনি যেন অনুগ্রহ করে' তার প্রতিলিপি প্রকাশকের ঠিকানায়, তাঁর নামে পাঠান। 'সংখ্যায় বেশী হলে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা হবে।' বইটি প্রকাশ করেছেন জিজ্ঞাসা। ১ কলেজ রো কলকাতাঃ ৯।

এই গ্রন্থের চিঠিগুলিকে ভাগ করা হয়েছে পাঁচটি ভাগে। প্রতিটি ভাগের শিরোনাম আলাদা। যথাক্রমেঃ

১। সাহিত্যচিন্তা : ৪৩টি চিঠি
২। দেশ ও সমাজ: ১৮টি চিঠি
৩। শিল্প-দর্শনঃ ৬টি চিঠি
৪। ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবনঃ ৫৫টি চিঠি
৫। বিবিধঃ ৭১টি চিঠি

পত্রপ্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দিলীপকুমার রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, মুরলীধর বসু, পরিমল গোস্বামী, জীবনকালী রায়, নিত্যেন্দ্রলাল নাথ, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মানিকচন্দ্র দাস, তারাচরণ বসু এবং আরো অনেকে।

সংকলকের বিশেষ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বিষয়-সজ্জায় ও তথ্যপঞ্জী প্রণয়নে। প্রতিটি চিঠির আনুষঙ্গিক পরিচয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে পরিশিষ্টে। এজন্যে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছিল, তা অনুমান করাও কঠিন। আমাদের দেশে, একক প্রয়াসে, খুব কম লেখকই অনুরূপ কাজে সফল হয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য 'মোসলেম ভারত'। সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের চিঠিটি। তার সূত্র ধরে আজহারউদ্দীন রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল বিরোধের মতো নজরুল-মোহিতলাল কিম্বদন্তীর আবরণ উন্মোচন করেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন, নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের ঝগড়াঝাটি যাই হোক, ভালোবাসাটা ছিল আজীবন।

'কল্লোল যুগ' পড়ে মোহিতলাল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখেছিলেনঃ 'আমার সহিত নজরুলের পরিচয় ও তাহার সহিত যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একটা মোটামুটি সত্য বিবরণ আপনিই বোধহয় সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহার একাধিক কারণ আছে। আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বা 'শক'—তাহার পরিমাণ বা গভীরতা অ[illegible] বুঝিবে না।'

তবু স্বীকার করতে হবে, আজহা[illegible] উদ্দীন সাহেব অসংকোচে মোহিতলালে[illegible] সব চিঠিকে এ সংকলনে জায়গা দি[illegible] পারেননি। কারণ হিসেবে তি[illegible] বলেছেনঃ 'সমকাল এবং সমকালীন সম[illegible] সম্পর্কে মোহিতলালের খোলাখু[illegible] ধারালো তীক্ষ্ন মন্তব্য-প্রকাশে অ[illegible] অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হ[illegible] পারে—এই আশঙ্কায় কাউকে বিব্রত [illegible] কিংবা প্রকাশককে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত ক[illegible] আন্তরিক ইচ্ছা না থাকায় কিছু [illegible] সম্পূর্ণ বাদ দিতে হয়েছে; কয়েকটি চি[illegible] অংশবিশেষ বর্জন, কোন কোন স্থানে [illegible] ধাম-পরিচয় গোপন রেখে প্রকাশ ক[illegible] হয়েছে। তাই কোন কোন পত্রে [illegible] অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাবে।'

এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, আমার [illegible] হয়, 'মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ' [illegible] সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। যে [illegible] পৌরুষ ও অনমনীয়তা নিয়ে মোহিতক[illegible] আবির্ভাব, যার জন্যে তিনি ক্রমাগত [illegible] বন্ধু-বান্ধবহীন ও নিঃসঙ্গ হয়ে[illegible] ছিলেন, সেই একরোখা ব্যক্তিত্বের জন্য [illegible] উত্তাপ অনুভব করা যায় কয়েকটি চি[illegible] এখনো অনেক কাহিনী অপ্রকা[illegible]

—শ্রী

[ভেরা নোভিকোভা লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষা। এ বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর বাঙলায় লেখা এই সাম্প্রতিক নিবন্ধটি 'অমৃতে' প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন।]

সোভিয়েত ইউনিয়নে বাঙলা সাহিত্য চর্চা

ভে রা নো ভি কো ভা

রুশ দেশে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। রুশ পর্যটক ও সঙ্গীতকার গেরাসিম লেবেদেফের নামের সঙ্গে তা যুক্ত। আঠার শতকের শেষভাগে বেশ কয়েক বছর তিনি বাঙলাদেশে বসবাস করেছেন। এক সময় তিনি ভারতচন্দ্র রায়ের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রুশ ভাষায় তরজমা করার প্রয়াসও করেছিলেন। উনিশ শতকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যেতর পেত্রোভ ও পরে সেন্ট পিতার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইভান মিনায়েভ রুশিয়ায় বাঙলা সাহিত্য চর্চা আরও একধাপ এগিয়ে নেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে রুশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে নানা রুশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হতে থাকে এবং পরে একাধিক কাব্যসংকলনে তা গ্রথিত হয়।

১৯১৭ সালের অকটোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পরই অবশ্য নিয়মিত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা সম্ভব হয়। ১৯১৮ সালে ভি, আই, লেনিনের স্বাক্ষরিত একটি ডিক্রি বলে কিয়েভ (যুক্রাইন) ও তাশখন্দে (উজবেকিস্তান) প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। পরে প্রাচ্যদেশের আধুনিক ভাষা, সাহিত্য, অর্থনীতি ও ইতিহাস চর্চার জন্য মস্কো (১৯২০) ও পেত্রোগ্রাদেও (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ) অনুরূপ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। লেনিনগ্রাদে প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটে প্রথম বাঙলা শিক্ষক ছিলেন দাউদ আলি দত্ত (প্রমথনাথ দত্ত)। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বাঙলা প্রবর্তন করেন আকাদেমিশিয়ান ফিয়োদোর সেরবাৎস্কোয়। ১৯২৬-২৭র শিক্ষাবর্ষে তিনি মিখাইল তুবিয়ানস্কিকে বাঙলা পাঠক্রমের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিশের যুগে তুবিয়ানস্কিই প্রথম বাঙালী লেখকদের রচনা সরাসরি রুশ ভাষায় তরজমা করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম ও রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'জীবন-স্মৃতির' অংশবিশেষের তরজমা প্রকাশ করেছিলেন। তুবিয়ানস্কি রবীন্দ্রনাথের গোরা, নৌকাডুবি, তাঁর নাটক, ছোটগল্প ও প্রবন্ধাদির রুশ তরজমার সম্পাদনা করেন, ভূমিকা লেখেন ও টীকা রচনা করেন। বিশের যুগে অনেক অনুবাদক, বিজ্ঞানী ও লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আনাতোলি লুনাচারস্কি, সের্গেই ওলদেনবার্গ ও অধ্যাপক ভি তান-বোগোরাজ এইসব রচনার মধ্যে লেখার উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুরসংযোজন [illegible]রেন এম, ইপ্পোলিতোভ-ইভানো[illegible] এস, ভাসিলেংকো ও এ, দুজেগেলেনোক প্রমুখ প্রখ্যাত সুরকার।

গত ২০।২৫ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাঙলা চর্চায় নতুন জোয়ার এসেছে। এখন মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও রিগায় (লাতভিয়া) বাঙলা পড়ান হয়। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ান হচ্ছে। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের বাঙলার ছাত্ররা রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি আটখণ্ডের (১৯৫৬-৫৭) ও পরে একটি বারোখণ্ডের সংস্করণ (১৯৬০-৬৫) প্রকাশ করে। ঐ সময়ে তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক আলাদা গ্রন্থ হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আজারবাইজানি, আর্মেনিয়, বাশ্কির, বিয়েলোরুশীয়, লাতভিয়, লিথুয়ানিয় কাজাখ, মোলদাভিয়, তাজিক, তাতার, উজবেক, তুর্কমেনিয়, যুক্রাইনিয় ও এস্তোনিয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশিত হয়। লাতভিয় প্রজাতন্ত্রের সংস্কৃতি কর্মী কার্ল ইগলে রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক রচনার তরজমা করেছেন।

পঞ্চাশের যুগের শেষ দিকে এবং ষাটের যুগের প্রথম দিকে সোভিয়েতে যেসব বাংলা গ্রন্থের তরজমা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলীর একটি দুখণ্ডে সমাপ্ত সংস্করণ। তাতে ছিল—বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রজনী ও কমলাকান্ত। তাছাড়া ছিল ঊনিশ শতক ও সমকালীন কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ আরও অনেকের কবিতা; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ও উপন্যাস, নজরুল ইসলামের কবিতা। পূর্ব পাকিস্তানের সমসাময়িক সাহিত্যেরও চর্চা হয়ে থাকে এদেশে। জসিমউদ্দীন ও বেগম সুফিয়া কামালের কবিতাও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সুফিয়া কামাল 'মহান লেনিন' নামে একটি কবিতা সম্প্রতি লিখেছেন, তাও আমরা জানি।

সোভিয়েত দেশে বাঙলা ভাষা চর্চার সর্বদিক এই প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই এখানে আলোচনা শুধু লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিভাগ ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, বিশেষ করে যোগাযোগ রক্ষা করছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ কবি জসিমউদ্দীন, ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক*, আবদুল মান্নান ও আবদুল হাই*। তাঁরা যে বই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা' আমাদের পাঠান তা থেকে আমরা জানতে পারি পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের চর্চা কতটা এগোচ্ছে।

এখানে আমি আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগের কথা নতুন করে বলব না, উভয় দেশের স্বার্থেই দীর্ঘকাল ধরে সে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে তা সুবিদিত।

বাঙলা সাহিত্যের যেসব দিক নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগ কাজ করছে তা যেমনই বিচিত্র, তেমনই সংখ্যায়ও অনেক। বাঙলা ধ্রুপদী সাহিত্য ও সমসাময়িক লেখকদের রচনা উভয়ই এর মধ্যে পড়ে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বর্তমান লেখিকা নিম্নোক্ত রচনাসমূহ প্রকাশ করেছেন: 'ঊনিশ শতকের বাঙলা গদ্যের সংকলন", "দশম থেকে অষ্টাদশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে নিবন্ধ", "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: জীবন ও রচনাবলী" এবং আরও কিছু প্রবন্ধ (বাঙলা দেশে গোর্কির রচনার অনুবাদ, ভারত ও পাকিস্তানের বাংলা লোককথা, ঊনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস)।

লেনিনগ্রাদে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লেখা বইটি প্রচ্ছদ। এবছর বইটি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে।

В. А. НОВИКОВА

БОНКИМЧОНДРО ЧОТТОПАДДХАЙ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলেনা ব্রসালিনা এখন শান্তিনিকেতনে বাঙলা আলিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর অধ্যয়নের বিষয় হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী। ভিকতর ইভব্‌য়েলিন তাঁর স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে শান্তি ভট্টাচার্য 'গোর্কি ও ভারত" বিষয়ে থিসিস রচনা করেন। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম শেষ করে তিনি স্বদেশে ফিরে গেছেন। গত বছর আমাদের বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্ররা 'পলাতক' নামে সমসাময়িক বাঙালী লেখকদের একটি ছোট গল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন।

আমাদের ছাত্ররা তাদের বার্ষিক পরীক্ষা পত্রে ও স্নাতকের থিসিসে নানা বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা করে থাকেন। এই বসন্ত কালে ডিপ্লোমার জন্যে তাঁরা যেসব থিসিস পেশ করবেন তার মধ্যে আছে: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, ন ... গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'লাল ... রবীন্দ্রনাথের বলাকা, বাঙালীর লো... (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ... তোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত)।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ... ভাষাতত্ত্ব শাখার উদ্যোগে ভি আই লে... জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বর্তমান লেখিকা 'ভি লেনিন ও বাঙলা সাহিত্য' বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে অ... করা হয় সেইসব বর্ষীয়ান লে... বিষয়ে (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ... নাথ রায়, গোপাল হালদার, মানিক ... পাধ্যায় প্রমুখ) লেনিনবাদী ... প্রসারে যাঁদের প্রভাব অপরিসীম। ... ছাত্ররা লেনিন সম্পর্কে সুকান্ত ... বিমলচন্দ্র ঘোষ, গোলাম কুদ্দুস ... কবিতা আবৃত্তি করেন।

এদেশে বাঙলা-সাহিত্য সম্পর্কে ... আগ্রহ আছে—তাই সোভিয়েত ... ছাত্ররা এবিষয়ে মনোযোগ দিয়ে ...

*এঁরা দুজন মারা গেছেন ... আগে।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০)

মালতীর দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। রঞ্জিত আসার পর পরই মালতীর মনে হল ওর কি যেন হারিয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে. কি যেন নেই, সংসারে কি না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় এমন এক জিনিস রঞ্জিত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মালতির জীবনে ফিরে এসেছে।

শীতকাল বলে বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। শীতকাল বলে জলে বাঁশ পচা গন্ধটা তেমন তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে না। আর শীতকাল বলেই গ্রামের সকলে সকাল সকাল জল নিতে চলে আসে কুয়োতে।

চাষের কুয়ো, লম্বা। গলা পর্যন্ত দাঁড়ালে দেখা যায়। কুয়োতলা পার হলে বাঁশঝাড়। ঈশম শক্ত বাঁশ খুঁজছে। রঞ্জিত একটা করে বাঁশ কোপ মেরে আলগা করে দিচ্ছে. আর ঈশম সেই বাঁশ টেনে বের করে কঞ্চিগুলি ছেঁটে দিচ্ছিল। যারা জল নিতে এসেছিল ওরা বেশীক্ষণ কুয়োতলায় অপেক্ষা করল না। বড়বৌর সেই নিরুদ্দিষ্ট ভাইটি ফিরে এসেছে। সরু গোঁফ, লম্বা চোখ আর বিদেশ বিভুঁয়ে থাকে বলেই হয়ত শরীরে এক ধরনের শ্যামল লাবণ্য। মালকোচা মেরে ধুতি পরেছে, চুল কোঁকড়ানো, মাথার মাঝখানে সিঁথি—লম্বা মানুষ রঞ্জিতকে এখন আর দেখলে চেনাই যায় না, বাপ মা মরা সেই বালক এত বড় হয়ে এখন মশাই হয়ে গেছে।

যারাই জল নিতে এসেছিল তারা সকলেই প্রায় বালতি ফেলছে কুয়োর ভিতর এবং জল তুলে আনার সময় রঞ্জিতকে দেখছে। সুদর্শন এই যুবকটিকে সকলেই একনজরে চিনতে পেরেছিল, কতদিন আগের কথা যেন. কেউ কেউ ডেকে ওর সঙ্গে কথা বলল. যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, সে যাদের দিদি বলে ডাকত, পাড়া-পড়শী, যারা এক সময় ওকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়েছিল, মা মরা ছেলে বলে যারা ওকে সামান্য ভালমন্দ হলে ডেকে খাওয়াতো তারা জল তুলে নিচে নেমে গেল এবং ওর সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরে গেল।

মালতী এল সকলের শেষে। ওর কাঁখে কলসী, পরনে তাঁতের শাড়ী। মালতী যে বিধবা, এ-শাড়ী পরলে মনে হয় না। মনে হয় কুমারী মালতী সখ করে এখন জল তুলতে এসেছে। মনে হয় মালতী এই মানুষের সামনে সাদা থান পরতে লজ্জা পায়। সে এসেই সোজা কুয়োতলায় কলসী রেখে যেখানে রঞ্জিত বাঁশ কাটছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।—কি এত বাঁশ! এত বাঁশ দিয়া কি হইব!

রঞ্জিত বলল, জলে ভিজিয়ে রাখব। লাঠি হবে, পাকা বাঁশের লাঠি।

সোনা আশেপাশে ছোটাছুটি করছে। সে এই নতুন মানুষটিকে কখনই ছাড়ছে না। মানুষটি তাকে কত দেশ-বিদেশের সব অদ্ভুত গল্প বলছে। অদ্ভুত সব ম্যাজিকের কথা বলছে।

সোনা বলল, পিসি রঞ্জিত মামা রাইতের ব্যালা ম্যাজিক দ্যাখায়।

মালতী আর একটু নেমে গেল। যেখানে ঈশম বাঁশের গুঁড়িতে দা রেখে কাটা বাঁশ ঝাড় থেকে টেনে নামাচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, তর মামার কথা আর কইস না!

রঞ্জিত মালতীর দিকে তাকাল না। সে বাঁশের কঞ্চি কেটে সাফ করছে। সে খা তাকিয়েই হাসল। কারণ মালতীর কোন রহস্যজনক কথা শুনলেই শুধু সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে। সেদিন মালতী রাগে অথবা ক্ষোভে কিংবা হয়ত উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চোখ মুখ লাল, চোখ ভিজা ভিজা, যেন মালতীর সব সতীত্ব রঞ্জিত কেড়ে নিয়েছে। প্রায় মালতী কেঁদে ফেলেছিল। রঞ্জিতের সেই কথা মনে হয় আর মনে হয়—মালতী তোমার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে না! মালতী তুমি দিদিকে আর কিছু বলনি ত। রঞ্জিত এবার মালতীর দিকে সহজ ভাবেই তাকাল। বলল, মামার কথা বলতে নেই কেন!

রঞ্জিত এমনভাবে তাকাল, যেন মালতীরও সেই দৃশ্যটা মনে পড়ুক এমন এক ইচ্ছা। সুতরাং মালতী আর দেরী করল না। সে জল ভরে চলে গেল। চলে গেলেই সব শেষ হয়ে যায় না। যেতে যেতে বড়বৌদির সঙ্গে গল্প করল। বড়বৌ এবং ধনবৌ ঢেঁকিতে ঠাকুর-ভোগের জন্য ধান ভানছে। ভানা ধান ঢেঁকির মাথার কাছে বসে শশীবালা ঝাড়ছিল। পাগল ঠাকুর আজ কোনদিকে বের হয়ে যায়নি। তিনি উঠোনে আপন মনে পায়চারী করছেন। মালতী উঠোনে এসেও বাঁশের কোপ শুনতে পেল। এই বাঁশ দিয়ে কি হবে, বাঁশ দিয়ে লাঠি হবে! তার তোড়জোড় হচ্ছে। মানুষটার শরীর হাত পা মুখ, সারাক্ষণ কেন জানি বুকের ভিতর নড়ে-চড়ে বেড়ায়। এখন মানুষটাকে দেখার জন্য ছলছুতো করে কেবল এ-বাড়ীতে চলে আসা। কি আর কাজ মালতীর, নরেন দাস এখন আর বাড়ীতে নেই। অমূল্য মাথায় ডুরে শাড়ী নিয়ে বাবুর হাটে গেছে নরেন দাসের সঙ্গে। এখন বাড়ীতে শুধু শোভা, আবু আর মালতী। আভারাণী আছে, কিন্তু এত নিরীহ যে মনেই হয় না একটা মানুষ বাড়ীতে আছে। আভারাণীকে রঞ্জিত বৌদি বলে ডাকে। রাতের বেলায়, যখন শীত বলে সকলে শুয়ে পড়ে, যখন বৈঠকখানায় শচীন্দ্রনাথ লালটু পলটুকে পড়াতে বসেন তখন রঞ্জিত নিজের ঘরে বসে সামান্য হ্যারিকেনের আলোতে কি সব বড় বড় বই পড়ে। কত পড়ে মানুষটা! মানুষটা এখন কম কথা বলে, বেশী কথা বললে মালতীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, যেন অজ্ঞ লোকের কথা শুনে হাসছে। তখন অভিমানে মুখটা লাল হয়ে ওঠে মালতীর। মানুষটা তখন অপরাধীর মতো চোখ করে তাকায়। তাকালেই কিছু দৃশ্য, ভয়ে মানুষটা নিরুদ্দেশে চলে গেল।

মালতী একদিন বলেছিল, এত ডর পুরুষ মাইনসের ভাল না।

—আমার আবার ডর কিসের?

—ডর না! মুখে কইলেই কি সব কওয়ন যায়।

—আমার কিন্তু মনে হয়েছিল তুমি দিদিকে সত্যি বলে দেবে।

—আর কিছু মনে হয় নাই ত!

—আবার কি মনে হবে?

ক্যান মালতীর নামে কত কথা মনে হইতে পারে।

—আমার আর কিছু মনে হয়নি মালতী। আমি তারপর অনেকদূর চলে গেছিলাম। আসামে চলে যাই। সেখান থেকে ফিরে আসি দু বছর পর। কলকাতায় লাহিড়ীমশাইর সঙ্গে দেখা। তিনিই আমাকে প্রায় টেনে তুলেছেন। বলতে বলতে থেমে যেত রঞ্জিত। স্বপ্ন দেখতে শিখে গেলাম। এ-সব এখন খুব

তুচ্ছ মনে হয়। বোধ হয় বেশী বলা হয়ে গেল। তার গোপন জীবনের কথা বুঝি ফাঁস হয়ে গেল। সে সহসা থেমে তারপর আর কিছু বলতে চাইত না। নিজের কথা ভুলে গিয়ে বলত, বলো তুমি কেমন আছ। তোমার সব খবরই আমি রাখতাম। তুমি যে এখানে চলে এসেছ তাও। কিন্তু তারপর?

—তারপর আবার কি। যেন বলার ইচ্ছা, তারপর যা আছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। এই নিয়ে আছি।

—সামুকে আর দেখি না কেন?

—সামু ঢাকা গ্যাছে। লীগ লীগ কইরা দ্যাশটারে জ্বালাইয়া দিল।

—সামু তবে পার্টি করে!

—পার্টি না ছাই! মালতীকে খুব হিংস্র দেখাচ্ছিল। মালতী বলল, লাঠি ত বানাইতেছ মেলা। কিন্তু লাঠিতে মাথা ভাঙতে পার করটা?

—লাঠি তো মালতী মাথা ভাঙার জন্য নয়, মাথা রক্ষা করার জন্য। আমি ভেবেছি, এখানেই মূল আখড়া করব। তারপর আরও তিনটে ছোট ছোট আখড়া খুলব। একটা রাম্মন্দীতে, একটা সম্মান্দীতে আর একটা বারদীতে। তারপর সেখান থেকে যারা শিখে ফেলবে তারা আবার তিনটে করে নতুন আখড়া খুলবে। গ্রামে গ্রামে আখড়া খুলে আমাদের প্রত্যেককে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা সব শিখে নিতে হবে। নিজের মাথা নিজে রক্ষা করার জন্য এসব করছি। অন্যের মাথা ভাঙার জন্য নয়।
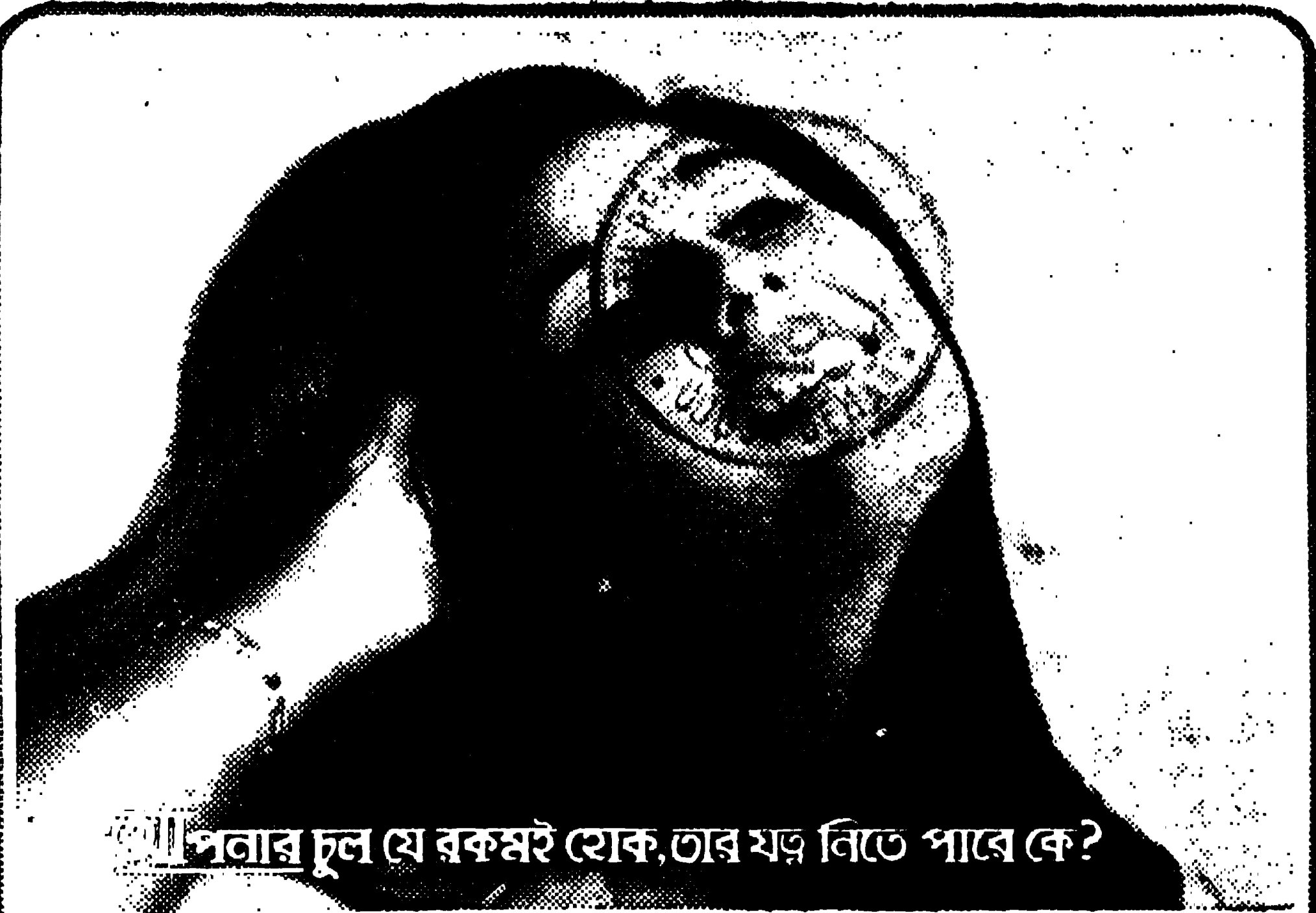
মালতী কেমন লজ্জা পেল বলে। তারপর বলল, তুমি আমারে দুই চারটা কৌশল শিখাইয়া দ্যাও। আমারে লাঠি খেলা শিখাইলে তোমার আবার জাত যাইব না ত?

—জাত যাবে কেন।

—আমি মেয়েমানুষ। অবলা জীব।

—অবলা জীবদেরই বেশী শিখতে হবে। আরম্ভ হোক, সব গোছগাছ করে নি। খেলা জমে উঠুক।

—খেলা শিখাইবে কে?

—আমি।

—তুমি আবার এইসব শিখলা কবে?

—এক ফাঁকে শিখে ফেলেছি।

—তুমি কত না কিছু জান! কত না কিছু করতে পার!

—আমি কিছুই করতে পারিনি মালতী। কত কিছু করার আছে আমাদের। তুমি সব জানলে অবাক হয়ে যাবে।

—আমারে দলে লও না।

—দল পেলে কোনখানে?

—এই যে তুমি লাঠি খেলার দল করতাছ।

দল কথাটা বলতেই রঞ্জিত কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দল বলা উচিত নয়। কারণ সে এখানে গোপনে কিছুদিন বসবাস করতে এসেছে। সে বলল, না কোন দল করছি না মালতী। আমার দল করার কি আছে।

—ক্যান বৌদি যে কইল তুমি দ্যাশের কাজ কইরা বেড়াও।

—তা হলে দিদি তোমাকে সব বলেছে। বলে সামান্য সময় চুপ করে থাকল রঞ্জিত। সকালবেলার রোদ ওদের পিঠে পড়ছিল। ওরা দীনবন্ধুর বড় ঘরটার পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। লালটু, পলটু সোনা সকলেই ওকে ঘিরে আছে। ওরা মালতী পিসি'কে দেখছে। মামা, মালতী পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, মালতী পিসি মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।

মালতী কিছু বলতে যাচ্ছিল। সে দেখল এইসব ছোট ছোট ছেলেদের সামনে বলা ঠিক না। মালতী আর কথা না বলে চলে গেল।

খুব গোপনে কাজ করছিল রঞ্জিত। সে লাঠি খেলা ভিতর বাড়ীর উঠোনে, জ্যোৎস্নার আলোয় অথবা মৃদু হ্যারিকেনের আলোতে শেখাবার চেষ্টা করছে। যেন কেউ না জানে। কেবল বড়বৌ, ধনবৌ, পাগল ঠাকুর সাক্ষী থাকত। সোনা লালটু, পলটু ঘুমিয়ে পড়লে উঠোনে লাঠি খেলা আরম্ভ হত। কিন্তু একদিন রাতে সোনা খুঁজতে গিয়ে দেখল পাশে মা নেই। মা কোথায়! সে ঘুম থেকে উঠে বসল। দরজা খোলা। উঠোনে লাঠির ঠক ঠক শব্দ পাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত। আবছা আলোতে সে বুঝতে পারল মা এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছেন। সে মেঝে দরজা পার হয়ে মায়ের কাছে চলে গেল। আট দশজন গ্রামের যোয়ান লোক রঞ্জিত মামার কাছে লাঠি খেলা শিখছে। অন্য পাশে কারা যেন—বুঝি মালতী পিসি, বুঝি কিরণী দিদি এবং মনী, শোভা, আবু। ওরা কাঠের ছোরা দিয়ে খেলছিল, খেলা শিখছিল। মা এবং বড় জ্যাঠিমা পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল আর বোধ হয় পাহারা দিচ্ছিল, এদিকে কেউ আসছে কিনা লক্ষ্য রাখছে। লাঠির ঠকাঠক শব্দ উঠছে, শির, মহেরা, কটি এমন সব শব্দ। ছোট মামা কেমন মন্ত্রের মতো তালে তালে বলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ছোট মামা লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে এত বেগে এদিকে ধেয়ে আসছেন যে টের পাওয়া যাচ্ছে না ছোট মামার হাতে লাঠি আছে। কেবল বন বন শব্দ, তিনি ঘুরে ঘুরে, কখনও ডান পা তুলে, কখনও বাঁ পা তুলে, যেন মানুষটা এই লাঠির ভিতর বেঁচে থাকার রহস্য খুঁজে পেয়েছে, মানুষটা লাঠিটাকে নিজের ডান হাত বাঁ হাত করে ফেলেছে, যেমন খুশী লাঠি চালাচ্ছে। সোনা, মাঝে মাঝে লাঠির ভিতর ছোট মামার মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেল।

সোনাও খুব উত্তেজনা বোধ করছিল ভিতরে ভিতরে। সামান্য কাক জ্যোৎস্না। কামরাঙা গাছের ওপারে তেমনি বিস্তৃত মাঠ নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্নায় শুয়ে আছে। পাগল জ্যাঠামশাই দাওয়ায় বসে হাত কচলাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে সেই এক উচ্চারণ। সংসারে যেন এক আপদ লেগেই আছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ছোট মামা মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছিলেন মালতী পিসির দিকে। মালতী পিসি কাঠের ছোরা নামাতে গিয়ে কোথায় ভুল করেছে শুধরে দিচ্ছেন। দাওয়ার পাশে সব বড় বড় লাঠি দাঁড় করানো। তেল মাখানো বলে লাঠিগুলি এই সামান্য জ্যোৎস্নায়ও চকচক করছে। কেউ লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে পরিশ্রান্ত হলে, লাঠিটা দাওয়ার পাশে রেখে উঠোনের উপর দু পা ছড়িয়ে বসে যাচ্ছে। ছোট মামা হাতকাটা গ্যাঞ্জী গায়ে অনবরত দৃষ্টি রাখছেন সকলের উপর। সোনা আর কাফিলা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না: সে ছুটে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ধনবৌ বলল, তুমি সোনা!

—আমার ভয় করতাছে।

ঘরের অন্ধকারে সোনা একা শুয়ে থাকতে ভয় পাচ্ছিল। সে ফের বলল, মা এইটা কি হইতাছে!

—লাঠি খেলা।

রঞ্জিত দেখতে পেল সোনা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সে সোনাকে কাছে নিয়ে বলল, তুই খেলা শিখবি?

—শিখমু। খুব আগ্রহের সঙ্গে কথাটা বলল সোনা।

—কিন্তু অনেক সাধনা করতে হয়।

সোনা সাধনা কথাটার অর্থ জানে না। সে মাকে বলল, মা সাধনা মানে কি মা?

রঞ্জিত বলল, ধনদি কি বলবে। আমার কাছে আয়। সাধনার মানে হচ্ছে তুমি যা করবে, একাগ্রচিত্তে করবে। কেউ তোমার এই ইচ্ছার কথা জানবে না।

—আমি কাউরে কমু না।

—হ্যাঁ বলতে নেই। যদি না বল, তবে তোমাকে শেখাতে পারি।

—দ্যাখবেন আমি কাউরে কমুনা।

রঞ্জিত জানত এইসব কথার কোন অর্থ হয় না। এইসব বালকদের রঞ্জিত দলে নিয়ে নিল। বলে দিতে পারে, নাও পারে, তবু ওদের একাগ্রচিত্ত করার জন্য মাঝে মাঝে রঞ্জিত নানাভাবে বক্তৃতা করত। সুতরাং সোনা, পলটু, লালটু এই দলে এসে ক্রমে ভিড়ে গেল। ওরা খেলার চেয়ে ফাইফরমাস খাটায় বেশী উৎসাহ বোধ করত। রাত ঘন হলে কোনদিন সোনা ঘুমিয়ে পড়ত। ওর খেলার কথা মনে থাকত না। ভোর হলে মামাকে বলত, আমি তোমার লগে কথা কমু না।

—কেন কি হল?

—তুমি কাইল আমারে খেলাতে লও নাই।

—তুমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সোনা মাঝে মাঝে মামার মতো অথবা বড় জ্যাঠিমার মতো কথা বলতে চেষ্টা করত। মামা কেমন সুচতুর মানুষের মতো স্পষ্ট এবং ধীর গলায় কথা বলে। মালতীর ইচ্ছা হত রঞ্জিতের মতো কথা বলতে। বড়বৌদি এবং এই রঞ্জিতের কথা এত মিষ্টি যে মনের ভিতর কেবল গুন গুন করে বাজে। ওদের কথা একটুকু কর্কশ নয়। মালতীর মনে হত ওর কথা বড় কর্কশ। সে সেজন্য যতটা পারে রঞ্জিতের সঙ্গে কম কথা বলে। রঞ্জিতও আজকাল কাজের কথা ব্যতিরেকে অন্য কথা বলতেই চায় না। সে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার সময় বলত, তোমার খুব একাগ্রতার অভাব মালতী। তুমি খুব যেন অন্যমনস্ক। খেলার সময় অন্যমনস্ক হলে মাথায় মুখে কোনদিন লেগে যাবে।

মালতী তখন কোন উত্তর [illegible] না। কি উত্তর করবে। এই খেলা যেন নিত্য তার সঙ্গলাভের জন্য। যেন এই মানুষ এসে গেছে তার, এখন আর ভয় কিসের। রঞ্জিতের সব কথা সেজন্য সে চুপচাপ শুনে যেত কেবল। কোন কোনদিন মালতীকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সে এই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করত। তখন আরও গা জ্বলে যেতো মালতীর। এইসব গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষা যেমন কর্কশ তেমন শ্রীহীন। রঞ্জিত এমন ভাষায় কথা বললে, তার কাছে আর কিছু চাইবার থাকে না। মালতী বিরক্ত হয়ে বলত, তোমার আর ঢং করতে হবে না রঞ্জিত। ইচ্ছা করলে আমিও তোমার মতো কথা বলতে পারি। তুমি যা ভালো করে বলতে পার না, তা বলো না। বড় খারাপ লাগে। তোমার সঙ্গে আমি ছেলেবয়স থেকে বড় হয়েছি।

রঞ্জিত কেমন অবাক হল ওর কথা শুনে।—তোমাকে মালতী আর গ্রাম্য বলে ধরাই যায় না।

মালতী বলল, তবু যার যা, তার তা।। আমার মুখে তোমার ভাষা মানাইব ক্যান। তুমিও যা ভাল কইরা কইতে পার না, তা কইতে যাইয় না। বড় খারাপ লাগে শুনতে।

সোনা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি ডাকলা না ক্যান।

—ঠিক আছে, আজ রাতে তোমাকে ডেকে তুলব। কিন্তু শর্ত আছে।

—শর্ত! শর্ত কথাটাই শোনেনি সোনা। সে বলল, ছোটমামা শর্ত কি!

—তুমি সোনা শুধু মাঠ দেখেছ।

—মাঠ দেখেছি।

—ফুল দেখেছ।

—ফুল দেখেছি। সোনা মামার মতো কথা বলতে চেষ্টা করল।

—আর সোনালি বালির নদীর চর দেখেছ।

—চর দেখেছি। তরমুজ খেত দেখেছি।

—কিন্তু শর্ত দ্যাখোনি।

—না।

—শর্ত বড় এক দৈত্য। এই দৈত্য কাঁধে চাপলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। আবার অমানুষ মানুষ হয়ে যায়।

—তোমার দৈত্যটা কি কয় ছোটমামা?

—আমার দৈত্যটা অমানুষকে মানুষ হতে কয়।

—দৈত্যটা আমারে আইনা দ্যাও না।

—বড় হও। বড় হলে এনে দেব। রঞ্জিত এই বলে সোনাকে কাঁধে তুলে ঘোরাতে থাকল। বড় উঠোনে লাঠি খেলা হয়, ছোরা খেলা হয়। চারধারে বড় বড় টিন কাঠের ঘর। পালবাড়ীর উঠোন থেকে কিছু দেখা যায় না ভিতরে। রাত হলেই উঠোনটা মানুষে মানুষে ভরে যাবে।

আতা বেড়ার ওপাশ থেকে একটা চোখ অপলকে দেখছে রঞ্জিতকে। রঞ্জিতের শক্তিবহুল শরীর দেখে চোখটা কেমন নিস্তব্ধ বনে যাচ্ছে। রঞ্জিতের খালি ... । রঞ্জিত সোনাকে কাঁধে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। এখনও সোনাকে দুহাত ধরে ঘোরাচ্ছে। সোনা খুব আনন্দ পাচ্ছিল। ওর মাথা ঘুরছিল। কিছুক্ষণ ঘুরিয়েই সে সোনাকে মাটির উপর ছেড়ে দিচ্ছে। সোনা টলছিল, দু হাত বাড়িয়ে আদর আবদার করছিল। শচীন্দ্রনাথ উঠোন পার হয়ে যাবার সময় দেখল, রঞ্জিত সোনাকে নিয়ে উঠোনে খেলা করছে। শচীন্দ্রনাথ কিছু বলল না। সকালবেলা পড়ার সময়। কিন্তু সোনার পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে পরীক্ষায় খুব ভালো করেছে। সোনার স্মৃতিশক্তি প্রবল। এই সকালে উঠোনের উপর মামা ভাগ্নেকে নিয়ে এমন মত্ত দেখে মনে মনে খুসি হল। শীতকালে ওদের মামাবাড়ী যাবার কথা। ধনবৌ ওদের পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাপের বাড়ী যায়। শীতের সময় খুব কুয়াশা হয় মাঠে। কলাই গাছে কলাইর শুটি। আর মাঠে মাঠে শর্ষের ফুল হলুদ গোলা রঙের মতো।

শীতের দিনেই যত খাবার রকমারী খাবার। পিঠা পায়েস তখন বাড়ী বাড়ী। তখন বড় বড় গেরস্থবাড়ীতে বাস্তু পূজা। ভেড়া বলি, তিলা কদমা আর তিলের অম্বল। নানা রকমের খাবার। তখন বাজারে গেলেই বড় পাবদা মাছ—কি সোনালি রং, আর কি বড়ো বড়ো। কালি-বাউশ, বড় বাগদা চিংড়ি আর দুধ। শীত এলেই অঞ্চলের গাভীরা তাদের সঞ্চিত দুধ সব ঢেলে দেয়। তখন অভাবটাও পল্লীতে পল্লীতে জাঁকিয়ে বসে থাকে না। তখন সংসারে সংসারে আনন্দ উৎসব। দুঃখী মানুষেরা তখন কাজ পায় গেরস্থবাড়ীতে জিনিষপত্রের দাম সস্তা হয়ে যায় বড়। আর তখনই লালটু পলটু গ্রামের সব ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে গিয়ে গোল্লাছুট খেলে। শুধু মাঠ, ধান কেটে নেওয়া হয়েছে বলে নরম মাটির উপর শুকনো নাড়া, পা পড়লেই খড় খড় শব্দ। তখন যত পার ছোটো। ছুটে ছুটে পড়ে যাও মাটিতে—কিন্তু শরীরের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগবে না।

শচীন্দ্রনাথ আতা বেড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল, মালতী দাঁড়িয়ে আছে। কাফিলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। শচীন্দ্রনাথ বলল, তুই এখানে?

—আঁঠা নিমু। বলে কাফিলা গাছ থেকে আঁঠা তুলে নেবার মতো অভিনয় করল। বস্তুত মালতী এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একজন মানুষকে ওপাশে বেড়ার ফাঁকে চুপি চুপি দেখছিল। কেউ এলেই খুটে খুটে যেন গাছ থেকে আঁঠা নিচ্ছে এমন ভাব চোখে মুখে। সে এই করে প্রাণভরে রঞ্জিতকে দেখছিল। ভোরে উঠেই মালতীর হাতে যা কাজ ছিল, যেমন উঠোন ঝাড় দেওয়া আর বাসন ঘাটে নিয়ে যাওয়া তারপর হাঁসগুলো ছেড়ে দেওয়া—এইসব কাজ করে দেখল আর কিছু করণীয় নেই। আভারাণী রান্নাঘরে চিড়ার ধান ভিজিয়ে রাখছে। চুপি চুপি সে ঠাকুরবাড়ী চলে এল। মালতী আতা বেড়ার পাশে একটু সময় অপেক্ষা করল। প্রথম উঁকি দিতে সাহস পায়নি। একটা কিছু অছিলা দরকার। বেড়ার সঙ্গে কাফিলা গাছ। গাছ থেকে একটু একটু আঠা ঝড়ছে। সে একটা পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ দেখতে পেলে বুঝবে মালতী আঠা নিচ্ছে গাছ থেকে। সে আতা বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিল। মরিয়া হয়ে সে উঁকি দিয়ে রঞ্জিতকে দেখতে থাকল। অপমানকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে এই নিয়ে, কলংক পর্যন্ত রটে যেতে পারে এই নিয়ে, সে তাও ভুলে গেল। নরেন দাস বাড়ীতে নেই অমূল্য বাবুর হাটে শাড়ী বিক্রী করতে গেছে, তাঁত এখন কদিনের জন্য বন্ধ সুতরাং মালতীর প্রায় ছুটির দিন এগুলি। সে এইসব দিনে খেলে, বেড়িয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, তেঁতুলের আচার মুখে স্বাদ নিতে নিতে বেশ কাটিয়ে দিতে পারে। তার পরই পরীপূজার মেলা। সে এবার রঞ্জিতকে নিয়ে পরীপূজার মেলায় চলে যাবে। তারপর সেই মেলার প্রাঙ্গণে সারকাস হাতি, সিংহ, বাঘ মাঠে মাঠে ঘোড়দৌড় এবং মন্দিরের এক পাশে ডোমদের শুয়োর বলি এসব দেখে, জিলিপি রসগোল্লা মুখে পুরে সারামাঠ ছুটে বেরিয়ে—কি যে এক আনন্দ, কি যে এক সুখ বসত করে মনের ভিতর—বুঝি সুখের জন্য এই মানুষ রঞ্জিত এখন তার জীবনের সব কিছু। সে মরিয়া হয়ে বেড়ার ফাঁকে একটা চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল।

বিকালের দিকে যখন বেলা একেবারেই পড়ে এল, যখন বৈঠকখানার উঠোনে আলো মরে গেছে, সোনা, লালটু, পলটু যখন একটা একটা করে বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে পূজোর ঘরে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছিল—তখনই গলা পাওয়া গেল। পুকুর পাড় থেকে ডেকে ডেকে উঠে আসছে কে!

বৈঠকখানার উঠোনে এসে ডাকল, রঞ্জিত নাকি আইছে?

শচীন্দ্রনাথ সামুকে দেখে সামান্য বিস্মিত হল। কিছুদিন আগে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে শচীন্দ্রনাথ সামুকে গালমন্দ করেছিল। কথা কাটাকাটি হয়েছে। সেই সামু ফের এ বাড়ীতে উঠে এসেছে বলেই বোধহয় সংকোচিত না হয়ে পারছিল না। সে স্বাভাবিক হবার জন্য অন্য কথা টেনে আনল। বলল, তর মায় নাকি বিছানা থাইকা আর উঠতেই পারে না।

—পারে না কর্তা।

—তারিণী কবিরাজের কাছে একবার যা।

—গিয়া কি হইব কর্তা। বোধহয় শীতটা পার করতে পারমু না।

—তবু একবার গিয়া দ্যাখ। যদি তাইন একবার তার মায়রে দেইখা যান। আমার চিঠি নিয়া যা।

সামু বলল, দ্যান চিঠি। পাঠাই। দ্যাখি কি হয়।

—দ্যাখি কি হয় না! তুমি পাঠাইবা। পিসিরে অচিকিৎসায় মারবা সে হইতে দিমু না।

সামুর মুখে সামান্য প্রসন্ন হাসির রেখা ভেসে উঠল। ওর ছাটা গোঁফ এবং অতি সামান্য নূর—খুব লক্ষ্য করলে বোঝা যায় থুতনির নিচে সেই নূরটাকে যেন সামু গোপনে লালন করছে। এক সময় সামুর মুখে বড় বড় দাড়ি দেখে শচীন্দ্রনাথ বলেছিল—তরে দেখলে সামু পিসার কথা মনে হয়। শচীন্দ্রনাথ সামুর বাবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সামুকে মহান করে তুলছিল যেন। তারপর কতদিন গেছে, মালতীকে ইচ্ছা করেই বড় দাড়ি দেখিয়ে যেন প্রতিশোধ তুলতে চেয়েছিল। তারপর একসময় মনে হয়েছে, প্রতিশোধ কোথাও কারো জন্য অপেক্ষা করে থাকে না, সময় এলে সব জলের মতো মনে হয়, হাস্যকর মনে হয়। নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভেবে লজ্জায় মুখ ঢেকে দিতে ইচ্ছা যায়। সুতরাং এখন সামু আবার ভদ্রগোছের যেন। বিশেষ করে শিক্ষিত, মার্জিত রুচির পুরুষ যেন এখন সামু। ওর তফন, ডোরাকাটা, ধানগাছের মতো রং তফনের। আর গায়ে হাল্কা গ্যাঞ্জি, পুরহাতা সার্ট। সে এবার শচীন্দ্রনাথের দিকে না তাকিয়েই বলল, শোনলাম রঞ্জিত ফিরা আইছে?

—হ্যাঁ আইছে। এতদিন কলকাতায় আছিল, আবার ফিরা আইছে।

সামু আর শচীন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করল না। ডাকল, কৈ ঠাকুর কৈ গ্যালা। একবার এদিকে বাইর হও। দেখি চেহারাটা। তুমি আমারে চিনতে পার কিনা দেখি।

রঞ্জিত বৈঠকখানার উঠোনে এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।—তুই সামু না?

—তাইলে দেখছি ভুইলা যাও নাই।

—ভুলব কেন!

—কি জানি বাবা, তুমি কোনখানে চইলা গেলা। কোন চিঠিপত্র নাই। বড় বৌ-ঠাইরেনের লগে দ্যাখা হইলে কইছি, রঞ্জিতের চিঠি পাইলেন নি! এক্কেবারে নিরুদ্দেশে গ্যালা। কোন চিঠিপত্র নাই।

রঞ্জিত বলল, ভিতরে এসে বোস।

—সাঁজ বেলাতে ঘর বইসা থাকবা? চল না মাঠের দিকে যাই।

এটা মন্দ কথা নয়। মাঠের দিক বলতে —সেই সোনালি বালির নদীর চর। সেই নদী, এক আবহমান কালের নদী। কথায় কথায় রঞ্জিত সামুকে অনেক কথাই বলল, অনেক দিনের অনেক কথা। এক ফাঁকে মালতীর কথাও।

জ্যোৎস্না উঠে গেছে, পরিচ্ছন্ন আকাশ। ওরা আলের উপর দিয়ে হাঁটছিল। এই সব যব গম খেত পার হলেই নদীর চর। সাপের মত বিস্তৃতি নিয়ে এই চর মাঠ এবং নদীর মাঝে শুয়ে আছে। তরমুজের লতা খুব ছোট বলে এবং বাতাস দিচ্ছিল বলে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দূর থেকে একপাল খরগোসের মতো মনে হচ্ছে। ওরা যেন নিরন্তর সেই বালির চরে ছুটে বেড়াচ্ছিল। নদীর জল নেমে গেছে। কি আর জল— সেই এক রকমের, মনে হয় 'পার হয় গরু পার হয় গাড়ী'। ওরা নদীর জলে কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলে নেমে গেল। স্ফটিক জল। নিচে নুড়ি পাথর, মাথার উপর আকাশ। সাদা জ্যোৎস্না, নদী পার হলে গ্রাম, কিছু ঘন বন এবং আরও পুবে হেঁটে গেলে এক বাঁশের সাঁকো পাওয়া যায়। সেই সাঁকোর উপর মালতীকে নিয়ে একদিন সামু এবং রঞ্জিত চলে গিয়েছিল। নদীর জল ভেঙ্গে মাঠ ভেঙে চুকৈর ফল, টক টক মিষ্টি মিষ্টি ফল, আনতে ওরা চলে গিয়েছিল। তারপর ওরা ফেরার পথে বড় মাঠ পার হতে গিয়ে পথ হারিয়ে সারাক্ষণ মাঠ ময়, গ্রাম ময় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরলে নরেন দাস ধমক দিয়েছিল। ওদের দুজনকে নরেন দাস লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। ওরা বাড়ীতে ঢুকলেই মালতীকে কান্ দিয়ে তাঁতঘরে পাঠিয়ে দিত।

তখন সামু বলেছিল, ঠাকুর একটা বুদ্ধি দ্যাও।

রঞ্জিত বলেছিল, নরেন দাস মাছ খেতে ভালবাসে।

—কি মাছ?

—ইচা মাছ।

সেবার ভাদ্র কি আশ্বিন মাস ছিল। ঠিক এখন মনে পড়ছে না ওদের। বর্ষার জল নেমে যেতে আরম্ভ করেছে। জলের নিচে সব জলজ ঘাস পচতে শুরু করেছে। দুর্গন্ধ জলে। জলের স্রোত বড় ক্ষীণ, নদী অথবা সমুদ্রে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। খাল ধরে মাছগুলি নেমে যাবে। ঠিক জায়গা মতো জলের নিচে চাই পেতে রাখতে পারলে মাছে চাই ভরে যাবে। চিংড়ি মাছে ভরে যাবে। বড় বড় গলদা চিংড়ি। কিন্তু বড় কষ্ট। বিশেষ করে সাপ খোপের ভয়, জোঁক এবং জলজ কীট পতঙ্গের ভয়। ওরা সব তুচ্ছ করে গায়ে রসুন গোটার তেল মেখে মাছ ধরার জন্য সাঁতরাতে থাকল। পচা জল সাঁতরে খালের বড় বটগাছটার নিচে চাই পেতে সেই বটগাছের ডালে ওরা সারারাত পাহারা দিয়ে পরদিন প্রায় দুই ঝুড়ি গলদা চিংড়ি নরেন দাসের উঠোনে এনে ফেলতেই চকিতে যেন বলে উঠেছিল, আরে তরা করছসটা কি! সেই যে উজ্জ্বল চকিত চোখ দেখেছিল নরেন দাসের, সেই যে লোভে নরেন দাস, বিষয়ী মানুষ নরেন দাস, লোভে আকুপাকু করেছিল—আর কোন দিন কখনও ছোট মেয়ে মালতীকে ধরে রাখেনি। মালতী প্রায় সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে এই অঞ্চলের সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছে।

এই মালতীর জন্য ওরা নানারকমের দুঃসাহসিক কাজ করে বেড়াত। সেই মালতী এখন কত বড় হয়েছে। রঞ্জিত হাঁটছিল আর ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে এক সময় বলে ফেলল, মালতী বড় সুন্দর হয়েছে, কতদিন পর দেখা। মালতী এখন কি লম্বা হয়েছে।

সামু এবার মুখ তুলে তাকাল। বলল, অরে নিয়া বড় ডর আমার। একদিন রাইতে দেখি অমূল্যরে নিয়া আনধাইরে হাঁস খুঁজতে মাঠে বাইর হইছে।

রঞ্জিত বোধ হয় কিছুই শুনছিল না। মালতীকে সে প্রথম দিন দেখে চমকে গিয়েছিল। ওর মুখ থেকে যেন ফসকে বের হয়ে গেছিল—কি সুন্দর তুমি! কিন্তু বলতে পারেনি। কোথায় যেন ওর মনে এক অহঙ্কার আছে, আত্মত্যাগের অহঙ্কার। তবু মনের ভিতরে ভাল লাগার আবেগ সময়ে অসময়ে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। সামুর সঙ্গে দেখা হতেই মনে হল, এই মানুষ, একমাত্র মানুষ যাকে তার ভাল লাগার কথাটুকু বললে কোন ক্ষতির কারণ হবে না। সে জলের কিনারে হেঁটে যাবার সময় মালতীর কথা বলছিল। নির্মল জলের মতো মালতী পবিত্র হয়ে আছে এমন সব বলার ইচ্ছা। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। জলের শব্দে ছোট ছোট মাছেরা ছুটে আসছে পায়ের কাছে। দাঁড়িয়ে গেলে সেই সব কুচো মাছ পায়ে ঠোকর মারছিল। দুজনই প্রায় সময় সময় একেবারে চুপ মেরে যাচ্ছে আবার কথা উঠলে নানারকমের কথা, কথায় কথায় রঞ্জিত বলল, তুই নাকি লীগের পাণ্ডা হয়েছিস!

সামু এ-কথার কোন জবাব দিল না। কারণ কথাটার ভিতর স্বাধ হয় রঞ্জিতের অবজ্ঞা আছে। সে যেন ঠিক এখন শচীন্দ্রনাথের মতো কথা বলছে। শচীন্দ্রনাথ অথবা অন্যান্য হিন্দু মাতব্বর ব্যক্তিরা ওর দল সম্পর্কে যেমন উদাসীনতা রক্ষা করে থাকে ঠিক তেমনি যেন রঞ্জিত ওর পার্টি সম্পর্কে অবজ্ঞা দেখাতে চাইল। সুতরাং সামু অন্য কথায় চলে আসার জন্য বলল, চল উপরে উইঠা যাই। চরে বইসা হাওয়া খাই।

রঞ্জিত চরে উঠে এগিয়ে গেল। তারপর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে বলল, কিরে জবাব পেলাম না যে!

—ও-কথা বাদ দ্যাও ঠাকুর।

—কেন বাদ দেব। আরও কি বলতে যাচ্ছিল। সহসা যেন সামু বলে ফেলল, ওটা আমার ধর্মের কথা। বলেই হাত ধরে রঞ্জিতকে টেনে বসাল। ছুঁইয়া দিলাম। সান করতে হইব না ত! রঞ্জিত এমন কথায় হা হা করে হেসে উঠল। কিন্তু হাসতে হাসতেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল রঞ্জিত। তারপর উদ্বিগ্ন চোখে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখল কিছুক্ষণ। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সামু এবার ধীরে ধীরে বলল, কতদিন আছ ঠাকুর? বলে দূরে নদীর জল দেখতে থাকল।

—ঠিক নেই। যতদিন পারি থাকব। বলার ইচ্ছা যেন আত্মগোপন করে আছি। যদি ধরিয়ে না দিস তবে বোধ হয় এবার এখানে অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যেতে পারব।

সামু এবার ওর দিকে মুখ ফেরাল। এখন সে আর এই বালিয়াড়ি দেখছে না। নদী দেখছে না। এবং এত যে রহস্যময় গ্রাম মাঠ ফসল পড়ে আছে, তাও দেখছে না। সে শুধু রঞ্জিতের মুখ দেখছে। সে রঞ্জিতের মুখে সেই ছায়া দেখছে—বোধ হয় আত্মত্যাগের অহঙ্কার এই মানুষের মুখে, অন্য মানুষের ধর্মে কর্মে একে[illegible] বিশ্বাস নেই। সে মুখের কাছে মু[illegible] বলল, আমার মাইয়াটারে তোমারে [illegible] দ্যাখামু ঠাকুর। মাইয়াটা এখ[illegible] ঠিক মালতীর ছোট বয়সের মত হইছে। কেবল ছুটে ছুটে বেড়ায় গোপাটে। মাইয়াটারে দ্যাখলে, আমার, তোমার ক[illegible] মনে হয়। তুমি আমারে ঠাকুর অবিশ্বাস কইর না, অবহেলা কইর না। বলে কেমন দুঃখের সঙ্গে হাসল সামু।

—মালতী বলল, তুই ঢাকায় থাকিস, সেখানে পার্টি করছিস!

—মালতী বড় অবজ্ঞা করে ঠাকুর। মালতী আমার লগে আর প্রাণ খুলে কথা কয় না।

—বুঝি অবিশ্বাস করছে।

—জানি না ঠাকুর। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা জানি না।

ঠিক তখনই জ্যোৎস্নার ভিতর মনে হচ্ছিল এক মানুষ, পাগল মানুষ হেঁটে নদী পার হচ্ছে। ওপারে গ্রামের ভিতর লণ্ঠন জ্বলছিল, জলে সেই লণ্ঠনের আলো ভাসছে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ নদী পার হচ্ছিল বলে জলে সামান্য ঢেউ উঠছে। আলোর রেখাগুলি ছত্রখান হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

নির্ঘণ্টেই আছে

সব ঝুট হ্যায়

রণদা মুখুজ্যে পাগলা ডাক্তার। পাগল ছাড়া আর কি নইলে সকালে হাসপাতালে যে রুগীকে দেখেটেখে রায় দিলেন, এখনো ম্যাচিওর করেনি, দু মাস বাদে আসবেন তখন কাটিয়ে দেব, সেই যখন বিকেলে চেম্বারে এসে স্লিপ পাঠায় তখন কোন জ্ঞানগম্যিওয়ালা লোক ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাতে পারে? রুগীর মুখের ওপর কুঁচি কুঁচি করে স্লিপ ছিঁড়তে ছিঁড়তে পাগলা ডাক্তার নৈনিতাল আলু চোখদুটো আলতা-গোলা করে গর্জায়—এখানে এসেছেন কেন? সকালে না বললাম, দু মাস বাদে হাসপাতালে আসবেন। ভেবেছেন হাসপাতালে ডাক্তার-বাবু ফিজ নেননি বলে আপনাকে ভালো করে এগজামিন করেননি। চেম্বারে এসে ষোল টাকা ফিজ দিলেই ভালো করে দেখব? ঘুষ দিতে এসেছেন? যান, বেরিয়ে যান, বেরোন এক্ষুণি। প্রায় ধাক্কা দিয়েই বার করেন আর কি। নেহাৎ জুনিয়র মাঝে পড়ে বাধা দেয়, স্যার আপনি বসুন। আমি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাই সে যাত্রা রুগী কোন রকমে পালিয়ে বাঁচে।

রুগী তো পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু দাদার সততার ঠেলায় বৌদির বাঁচা দায় হয়ে উঠেছে। কতদিন দাদার অবর্তমানে আমাদের কাছে প্রায় কাঁদতে কাঁদতেই রুণ-বৌদি বলেছেন, আপনারা ভাই ওঁকে একটু বলুন। এ ভাবে যদি রুগীদের গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেন, তাহলে প্র্যাকটিস জমবে কি করে? তাহলে আর কলকাতার হাসপাতালে অ্যাটাচড থেকেই বা কি লাভ? ন বচ্ছর হল কলকাতায় এসেছেন, বলতে পারব না কোন দিন একসঙ্গে নব্বুইটা টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরেছেন। অথচ নিত্যি চেম্বারে যাওয়া চাই। ফি সন্ধ্যেয় কম করে দশ বারোজন রুগী দেখেন, অথচ টাকার বেলায় কোনদিন বত্রিশ, কোনদিন বড়জোর আট-চল্লিশ। ব্যস। এর বেশী এক পয়সাও না। এদিকে বললে বলবেন, সবার তো দেওয়ার সামর্থ্য থাকে না। কলেজের মাইনে তো মোটে তেরোশ। তার থেকে ট্যাক্স, প্রভিডেন্ড ফান্ড বাবদ কাটা যায় শ-দেড়েক টাকা। কি করে এই টাকায় এতবড় সংসার চলে বলুন তো?

কোথায় লাগে কম্পিউটার। মানসাঙ্কের যা দৌড় তাতে মুহূর্তে অঙ্কটা কষে ফেলি। মাইনে ধরা যাক সাড়ে এগারো শ। চেম্বার থেকে গড়ে যদি বত্রিশ টাকাও রোজ আসে তাহলে ত্রিশ দিনে কত হয়? ন'শ ষাট। আচ্ছা না হয় চারটে রবিবার কি দু একটা দিন বাদই দিলাম। তাহলেও আটশ সাড়ে আটশ তো নিশ্চয়ই আসে। তাহলে হল গিয়ে সবশুদ্ধ দু হাজার। উরি ব্বাস! অতগুলো টাকা একসঙ্গে কখনো চোখেও দেখিনি। আমার মাইনের পাঁচ গুণেরও বেশী। তবু বলে কি বৌদি সংসার নাকি চলে না।

দাদাও তাই বলেন। বলেন মানে আমাদের কাছেই মাঝে মাঝে প্রাণের কথা দু একটা বলেন। আমরা তিনজন দাদার কাছেই কলেজে পড়েছি। কলেজ হস্টেলের একই ঘরে তিনটে খাটে পাশাপাশি শুয়ে কতদিন রাম, বিজু আর আমি স্বপ্ন দেখেছি বড় ডাক্তার হব। রাম এখন শ্রীরাম-পুরে বাবার সাজানো পুকুরে নিজের প্র্যাকটিশের চারা ফেলছে। কখনো সখনো শেয়ালদায় বা দাদার এই ফ্ল্যাট বাড়ীর ড্রইং রুমে দেখা হয়। বলে পুঁটি, খলসে এখন টপাটপ উঠছে, পোনা মৃগেলও উঠবে কয়েক বছরের মধ্যে। বিজু এদেশের ব্যাপারস্যাপার দেখে, লিটারেলি ভয় পেয়েই বিলেত চলে গেছে। যাওয়ার সময় বলেছিল, এফ আর সি এস পড়তে যাচ্ছে। রণদা বললেন, তোর মুণ্ডু। ও গেছে চাকরী করতে। ফিরবে না আর। তা ছাড়া ওর যা ক্যালিবার তাতে এফ আর সি এস হতে হলে কম করে গুনে গুনে ছেষট্টিবার পরীক্ষা দিতে হবে। যার এম বি বি এস পাশ করতে গিয়েই দুটো দাঁত সমেত মাথার চাঁদির ফরটি পার্সেণ্ট চুল খসে গেল তাকে আর রয়েল কলেজ অব সার্জারীর ফেলো হতে হবে না। আর আমি পৈতৃক টাকাকড়ির টানাটানিতে পড়ে থার্ড ইয়ারে উঠে পড়া ছেড়ে সেই যে ধর্মতলায় এক সওদাগরী ফার্মের অধস্মের হিসব নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছিলাম, আজো তাই চালিয়ে যাচ্ছি। কাজকর্মের ফাঁক নিয়ম পেলে মাঝে মধ্যে প... মাস্টার-মশাই 'কাম' বন্ধ 'কাল' দাদার লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে যাই। হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে বৌদি জোড়েন কান্না, আর দাদার হাত খালি থাকলে ডাক্তারী দুনিয়ার ভেতরের খবর সবই পাই। রাম আসে মাঝে মাঝে। প্র্যাকটিশ চালু করার তাগিদেই নাকি সম্পর্কটা বজায় রেখেছে। সেখানেই দাদার দুঃখ। বৌদি কিন্তু রামের এক্জাম্পলটা তুলে ধরেই বলেন, দেখ তোমার ছাত্র হয়ে একটা মফস্বল শহরে বসে সে যা রোজগার করছে, তার সিকির সিকিও তুমি রোজগার কর না কলকাতায় থেকে। কৈ রুগীর মন ভোলাতে রাম তোমার দুর্বলতাটুকু তো কাজে লাগাতে ছাড়ে না। জানে তুমি মাস্টার, রুগী পাঠালে অনুরোধ ঠেলতে পারবে না। এই সুযোগে ও ওর আখের গুছিয়ে নিচ্ছে আর তোমার কি ফয়দা হচ্ছে শুনতে পারি?

বৌদিকে শোনাতে গেলে যে যুক্তির ধারালো দিকটা ভোঁতা হয়ে যায় কান্নার, ফোঁপানিতে আর চাপা আক্রোশে দাদা তো জানেন, তাই আমি গেলে যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বলেন, অমল তুই আমার প্রবলেমটা বুঝবি। তাই তোকে বলেই মনটা হালকা করি।

কখনোসখনো বৌদির কান্নায় বেসামাল হয়ে গিয়ে দাদাকে ঝাঁঝাই, আপনি কেন মিছিমিছি অনেস্টির বোঝা বয়ে মরছেন। কৈ আর কেউ তো এসব করে না। এদিকে আপনার সংসার চলে না। আড়ালে আপনাকে সবাই কি বলে জানেন।

প্রাণখোলা হাসিতে ঘরের গুমোট এক দমকায় কাটিয়ে দিয়ে বলেন, জানি। বলে পাগলা ডাক্তার। বলে অধ্যাপক রণদা মুখুজ্যে এক নম্বরের পাগল। বলুক। আমি কারোর তোয়াক্কা করি না। শুধু ভয় পাই কোনদিন না আবার তোর বৌদির কান্নার গুতোয় নোংরা পথে পা দিয়ে ফেলি। সত্যি অমল, সংসার চালানো যে কি দায়।

সংসার চালানোর দায়টা অন্তত একস মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে শেখার আমার কোন দরকার নেই। ছ বছর কলম ঘষড়াতে ঘষড়াতে তিনশো বিরাশী টাকা বাহান্ন পয়সায় পৌঁছে জেনেছি সংসার কি বস্তু। বয়স্থা অবিবাহিত দু দুটি বোন যার ঘাড়ে, বেকার বি-এ পাশ উঠতি যুবক যার ভাই,

যার মা হার্টের অসুখে প্রায় পঙ্গু, বাবা বিগত তার আর জানার কি বাকী থাকে? তবু দাদার ফিরিস্তি শুনতে হয়,—

ঃ বেহালায় যে মেণ্টাল হসপিট্যালটা করেছি অমল, বুঝলি, গত তিন বছর ধরে হাজার লেখালেখি করেও তার জন্য এক পয়সাও সরকারী গ্র্যাণ্ট বার করতে পারলাম না। গ্র্যাণ্ট না পেলেও হাসপাতাল তো চালাতে হবে। নিজের মাইনের প্রায় টোয়েণ্টি টু টোয়েণ্টি ফাইভ পার্সেণ্ট যায় হাসপাতালের পেছনে। অবিশ্যি অন্যান্যরা সবাই সাহায্য করে বলেই কোনরকমে হাসপাতালটা টিঁকিয়ে রেখেছি। তা ছাড়া তুই তো জানিস আমার খুড়তুতো ভাইদের অবস্থা। ওরা মনে করে, আমি বড় ডাক্তার। টাকার অভাব নেই। তাই যখন খুশী হাত পাততে পারবে। গড়ে কম করেও একশ দেড়শ ওদের দিতে হয়। এ ছাড়া জুনিয়ারের মাইনে, চেম্বারের ঘরভাড়া, লাইটের বিল, ফোনটোন হ্যানাত্যানা নানা ঝঞ্ঝাট। এটা জানবি, ডাক্তারের ঠাটবাট মেনটেন করতেই তার আয়ের ফরটি পার্সেণ্ট বেরিয়ে যায়। ফলে বুঝতেই পারছিস কেন তোর বৌদি কাঁদে।

ঃ তাতো বুঝতে পারছি দাদা। তবে কেন আপনি এত চেষ্টাচরিত্র করে মফস্বল হাসপাতালের দারোগাগিরি ছেড়ে কলকাতায় এলেন, সেটাই যে বুঝতে পারছি না।

চট করে জবাব না দিয়ে, আস্তে আস্তে যেন চিন্তা করেই বলেন ডাক্তারদা, একটু-খানি পড়ানোর আর নিজের পড়াশোনার লোভে। তুই বেঁচে গেছিস অমল যে তোকে ডাক্তার হতে হয়নি। এটা যে আজকাল কি পাপের লাইন হয়েছে তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। মজাটা কি জানিস চোর কিন্তু মাত্র কয়েকজন, অথচ দোষটা পড়ে সবার ঘাড়ে। বদনাম হচ্ছে প্রফেশনের। আজকাল তুই ফুটপাথের ভিখিরী থেকে পার্ক স্ট্রীটের ম্যানস্যানওয়ালা, যে কাউকে জিজ্ঞেস কর দেখবি সবাই বলবে, বাঘে ছুঁলে আঠারো, পুলিশে ধরলে ছত্রিশ, উকিল পারলে চুয়ান্ন, আর ডাক্তার একবার বাগে পেলে রুগীর সর্বাঙ্গে বাহাত্তর ঘা বার করে ছাড়বে। অথচ এই যেন্নাতেই আমি সি এম ও'র চাকরী ছেড়ে কলকাতায় ছুটে এলাম। কিন্তু কি লাভ হলো বল তো? যে ভয়ে পালিয়ে এলাম, সে ভয়টা তো আজো গেল না। ভূতের মত তাড়া করে ফিরছে।

ঃ কিন্তু ভয়টা কিসের তাতো বললেন না, আমি প্রশ্ন করি।

ঃ ভয়টা পাপের, অধর্মের। ছাত্রজীবন থেকে দেখেশুনে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কোনদিন, বিশ্বাস কর, বড় ডাক্তার হতে চাইনি। হব কি? বড় হওয়া মানে যদি রুগী ঠকানো হয় তো, সে বড় হওয়া আমার পোষাবে না। আমার বাপ খুড়ো সবাই অধ্যাপনা করেছেন। আমরা তিন পুরুষে শিক্ষক। কিন্তু কলেজ-জীবনে কয়েকজন দামী ডাক্তার-শিক্ষকের জমাটি পসারের গোপন খবর পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম। কেন শুনবি?

দাদা হাসলেন। আমি ভাহা মধ্যবিত্ত। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তাই বড় মানুষের আসল রহস্য জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই বুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে যে প্রফেশনে পা বাড়িয়েও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছি, তার বড় বড় চাঁইদের কেচ্ছা শোনার সুযোগ পেলেই কানটা বাড়িয়ে দি। দাদা বোঝেন কিনা জানি না, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বেদনার বোঝা হাল্কা করেই বোধহয় তৃপ্তি পেতে চান,—

তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। তুই বোধহয় সবে অ আ ক খ শিখছিস। বিখ্যাত সার্জেন, নামটা শুনেছিস নিশ্চয়, অচ্যুত মুখার্জি আমাদের পড়াতেন। রেজাল্ট খারাপ না করলেও দেখেছি স্যার আমায় একদম পছন্দ করতেন না। কারণ কি বুঝতে পারতাম না। পরে বুঝলাম। আমাদের কলেজে অনেক অবাঙালী ছেলে পড়ত। তাদের প্রচুর পয়সা। তাদের দেখতাম প্রায়ই স্যারের বাসায় বা চেম্বারে যেতে। শুধু হাতে না। না না পয়সাকড়ির ব্যাপার না। যেত রুগী নিয়ে। দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় অপারেশন করাতে এলেই তারা তাদের নিয়ে স্যারের দরজায় হাজির হত। স্যারের কনসালটেশন কি ছিল চৌষট্টি টাকা। তিন চারবার ভিজিট দিলেই স্যার খুশী হয়ে যেতেন।

স্যারকে খুশ করবার জন্যই একবার আমার এক ক্লাস মেট, কলেজের হায় হয়েও কলেজ-হাসপাতালে সামান্য একটা অপারেশন না করিয়ে গেল স্যারের নিজস্ব নার্সিং হোমে। কত দিল জানিস?

জিজ্ঞাসা করি, কত?

ঃ অপারেশন বাবদ চারশো। একদিন নার্সিং হোমে থাকার জন্য একশ। সব মিলিয়ে ওর প্রায় পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো ব্যয় হল। যে জন্য হল, সেটা কলেজ-হাসপাতালে করালে ওর এক পয়সাও লাগত না। আর ঐ অপারেশন তো যে কোন হাউস সার্জনই আকছার করে থাকে।

আমি চমকে উঠি, এর জন্য সাড়ে পাঁচশো?

ম্লান হাসিতে গম্ভীর মানুষটার মুখ করুণ দেখায়। বলেন, হ্যাঁ, এর জন্য সাড়ে পাঁচশো। আর ঐতেই কেল্লা ফতে। তুই ডাক্তার না হলেও, একদিন ডাক্তারী পড়েছিলি। জানিস ডাক্তারীতে প্রাকটিক্যাল আর থিয়োরিটিক্যালের পাল্লা প্রায় সমান সমান। স্যার নিজে এগজামিনার। ঐ ছেলেটি যখন ভাইভা ভোসিতে অ্যাপীয়র হবে, তখন কি আর স্যারের কোন উপায় থাকবে পাস না করিয়ে? প্রশ্নের জবাব দিতে পারুক বা নাই পারুক, নম্বরের ঘরে ঢ্যাঁড়া না পড়ে পাস মার্কস জমা পড়বেই। এবং পড়েও ছিল। সে এখন বদদুরে জানি গুজরাটে চুটিয়ে ব্যবসা করছে।

নিজের ছাত্রজীবনে এ ঘটনা কত ঘটতে দেখেছি। আজ দেখি এটাই প্রায় প্রথায় দাঁড়িয়েছে। তার মানে এই নয় যে সবাই এই ভাবে ব্যাকডোর বিজনেস চালায়। তবে অনেক বড় বড় চাঁইকেই চালাতে দেখছি। আর চালাচ্ছেন তার কারণ গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালে অ্যাটাচড বড় বড় ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ অ্যালাউড করে। হাসপাতালে কনসাল্‌টেণ্ট হিসাবে বড় জোর পঁচাত্তর, একশ' টাকা অ্যালাওয়েন্স বাবদ পান। ওতে ওঁদের পানের খরচাও ওঠে না। কিন্তু ঐ পথেই রুগী আসে প্রাইভেট চেম্বারে। এক-একজনের আণ্ডারে বিশ-ত্রিশটা বেড থাকে। রুগীরা তা জানে। জানে বলেই যখন হাসপাতালে হত্যা দিয়ে পড়ে থেকেও ভর্তি হতে পারে না তখুনি ছুটে যায় চেম্বারে। তিন-চারবার যোল বত্রিশ বা চৌষট্টি টাকা গছাতে পারলে একটা বেডও আদায় হয়।

জানিস ডাক্তার ঘোষ, রায় বা চৌধুরীদের মান্থলি ইনকাম কত? কম করেও চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা। তুই, আমি যেমন পুজোর সময় পুরোনো জামা-কাপড় বদলাই, সেইভাবে গাড়ী বা বাড়ি বদলান। আর ঐ বদলানোর দৃষ্টান্ত সত্য

সর্বদা জুনিয়র ডাক্তার, হাউস-সার্জেন আর পড়ুয়া ছাত্রদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। বড়র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ছোটরাও। ডেমনেস্‌ট্রেশন এফেক্ট আর কি। কচুগাছ কাটতে কাটতে ওরাও একদিন ডাকাত হয়ে উঠবে। উঠবে নাই বা কেন?

নিজের চোখে যা দেখেছি তার আর কটা ঘটনা তোকে বলছি শোন। বর্ণনা শুরু করার আগেই ভেতর থেকে একপ্লেট গরম সিঙ্গাড়া আর চা এসে গেল। ফুরিয়ে তারিয়ে সিঙ্গাড়া চিবুতে চিবুতে মথাড়া করলাম। দাদা বলে চলেছেন—

সেবারই পাশ করে বেরিয়েছি। হাউস-জেন। আমার বস্ তখন বিখ্যাত ছিলেন তারকদাস ভট্টাচার্যের ছেলে …তুলাল ভট্টাচার্য। বাপের মত অত নাম-যশ না থাকলেও ডক্‌টর ভট্টাচার্য টামুটি পশার জমিয়েছিলেন। তাঁকেই খছি, চেম্বারের রুগীকে হাসপাতালে পারেট করে চার-পাঁচশো টাকা পেসেণ্টের থেকে আদায় করতে। ভাবতে পারিস র কথা? সরকারী হাসপাতাল। হাস-তালের যা পাওনা তা তো পেসেণ্ট রেছেই, তাছাড়াও তাড়াতাড়ি ভর্তি রার সুযোগ আর ডক্‌টর ভট্টাচার্যের নামী ডাক্তারের হাতে কাটানোর আশায় দুশো টাকা তাকে খেসারত দিতে হল।

মজার ব্যাপার, এমন অনেক ডাক্তাদের জানি, যাঁদের নাম আছে। কিন্তু নিজস্ব নার্সিং হোম নেই। নার্সিং হোম হতে দামী ইনস্ট্রুমেণ্ট আসবে কোথা থেকে। অন্যের নার্সিং হোমে কাজ করতে ভাগে কম পড়ে যাবে, তাই তাঁরা হাসপাতালে বসেই কাজকর্ম সারেন, আর ঘরে বসে সেই কাজের মাশুল আদায় করেন। অথচ নর্মাল কোর্সেই ঐসব রুগীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত। ভর্তি হলে ঐসব নামী ডাক্তাররাই তার অপারেশন করবে। শুধু অনিশ্চয়তা আর অনর্থক হয়রানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য রুগীদের এতগুলো টাকা দিতে হয়। এর পরেও কি তুই বলবি যে রুগী সেরে গেলেও ডাক্তার ভট্টাচার্য আমাদের এই প্রফেশন সম্বন্ধে কোন ধারণা নিয়ে ফিরবে? আমাদের তো কোন বিজ্ঞাপন নেই। রুগীরাই আমাদের জীবন্ত বিজ্ঞাপন। মুখে মুখে তারা প্রচার করে বেড়ায় অমুকের কাছে যাও। না না, হাসপাতালে না, চেম্বারে। টাকয়েক ফিজ দাও। ব্যস তাহলেই স্বর্গের দরজায় পৌঁছে যাবে।

কলকাতার কথা ছেড়ে দে। এখানে এখনো তবু কিছু আড়াল-আবডাল আছে। মফস্বলে সে-সবের বালাই নেই। তুই তো জানিস এই কলেজে আসার আগে আমি ছিলাম রঙ্গপুর ডিস্ট্রিক্‌ট হস্‌পিট্যালের চীফ মেডিক্যাল অফিসার। সি এম ও হিসেবে খুব কাছ থেকেই ওখানকার অনেক নামী ডাক্তারদের কাজকর্ম দেখেছি। দেখেছি বলেই পালানোর জন্য অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

রঙ্গপুর তো বেশী দূরে নয়। থার্ড ক্লাসে কলকাতা থেকে ভাড়া বড় জোর চার টাকা পঞ্চাশ কি পঁয়ষট্টি হবে। নিজেই একদিন দেখে আয়। বাসেও যেতে পারিস। ভোর সাতটা নাগাদ এসপ্ল্যানেড থেকে চাপবি, দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবি। স্টেশনের গায়েই বাসগুমটি। ট্রেন থেকেই নাম, কি বাস থেকেই নাম, দেখবি সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌সাওয়ালারা তোকে ছেঁকে ধরবে। আর যদি একবার জানতে পারে যে তুই অসুস্থ, যাচ্ছিস হাসপাতালে চিকিচ্ছে করাতে, তাহলে দেখবি তোকে নিয়ে কেমন শেয়াল-কুকুরের লড়াই বেঁধে যাবে।

দূর দূর গাঁ থেকে দরিদ্র চাষী-মজুরের দল আসে চিকিৎসার আশায়। ডিস্ট্রিক্‌ট হাসপাতাল। এখানে না এসেও উপায় নেই। গোটা জেলাতেই আর কোন ভাল হাসপাতাল নেই। তাছাড়া জনা-বিশেক কনসালটেন্ট আর ত্রিশ-চল্লিশজন জুনিয়র ডাক্তার রয়েছে হাসপাতালে।

গঙ্গার পাড় ঘেঁষে পুরোনো বাড়ী ভেঙে নতুন পেল্লায় বিল্ডিং উঠেছে হাস-পাতালের। স্টেশন থেকে রিক্‌সায় লাগে বড়জোর চার আনা।

ভুলেও ভাবিস না রিক্‌সাওয়ালারা রুগীদের নিয়ে সোজা হাসপাতালে আসতে চায়। তার আগেই হাসপাতাল আর কোর্টের মাঝ-বরাবর প্যারালাল টু গঙ্গা আর একটা রাস্তা চলে গেছে বেনেপাড়ার দিকে। ডিস্ট্রিক্‌ট হসপিট্যালের তাবড় তাবড় নামী কনসালটেন্টদের অনেকের চেম্বারই এই বেনেপাড়ায়।

রিক্‌সাওয়ালারা রুগীর প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু পথেই সেরে নেয়। পেটের না বুকের, মাথার না চোখের, কোথায় ব্যামো শুনে, কদ্দিন ভুগছে জেনে বলে

জেনে ঘোষ না বোস, মিত্তির না গাঙ্গুলী, কোন্ ডাক্তারের কাছে গেলে ঠিক হবে। সেই সঙ্গে ফিসফিস করে শুনিয়ে দেবে—হাসপাতালে গিয়া কি অইব। অইখানে গিয়া দ্যাখাইলে জীবনেও রোগ সারব না। তার চেয়ে চলেন স্যান ডাক্তারের চেম্বারে লইয়া যাই। দুই-তিনবার চ্যাম্বারে দ্যাখাইলে, ভর্তির ব্যবস্থা ডাক্তারবাবু নিজেই কইর‍্যা দিবেন। কিসসু ভাবতে অইব না। হুধু হাসপাতালে গিয়া একখান সিলিপ করাইবেন। দ্যাখবেন পঞ্চাশখান সিলিপের মধ্যে আপনারটা হ্যাপে পড়লেও কেমন সুরুৎ কইর‍্যা ব্যবস্থাপাতি বেবাক হইয়া যায়। বল তো অমল, পেসেণ্টের জন্য রিক্‌সাওয়ালার এত মাথাব্যথা কিসের?

বললাম, বুঝতে পারছি, কোন কমিশন-টমিশনের ব্যবস্থা আছে। তাই না দাদা?

একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। টাকায় চার আনা। ডাক্তারের ফিজ যদি পাঁচ টাকা হয়, তাহলে একটা রুগী পৌঁছে দিলেই রিক্‌সাওয়ালার কমিশন পাঁচ সিকি। রিক্‌সার ভাড়া নিয়ে তাই রিক্‌সাওয়ালারা বিশেষ কামড়া-কামড়ি করে না। জানেই তো কমিশন বাঁধা। ওদের যত ঝগড়াঝাড়ি পেসেণ্টকে নিয়ে। আগে ভাগে পেসেণ্ট-সওয়ারী পাকড়াতে পারে!

কম্পিটিশন শুধু রিক্‌সাওয়ালাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ডাক্তাররাও কোন কমতি যান না। ডাক্তার বোস যদি দেন টাকায় পঁচিশ পয়সা, ডাক্তার চৌধুরী ঝট করে রিক্‌সাওয়ালাকে রেট বাড়িয়ে দিলেন তিরিশে। নাও এখন ঠ্যালা সামলাও। তুমি যত বড় ডাক্তারই হও না কেন রুগী যাবে যে বেশী কমিশন দেবে তার চেম্বারে। ওখানে ডাক্তারদের এফিসিয়েন্সির ব্যারো মিটার তো রিক্‌সাওয়ালারা।

বলতে বলতে একটু থামলেন ডাক্তারদা। তারপর আবার শুরু করলেন, এমন অনেক ডাক্তার ওখানে আছেন, যাঁদের কম করেও মাস গেলে আয় পাঁচ-ছ' হাজার টাকা। মনে রাখিস ওটা কলকাতা না। বড়লোক বিশেষ কেউ থাকে না। থাকে তোর আমার মত মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ আর গাঁয়ের খেটে-খাওয়া চাষী-মজুরের দল, যাদের মাথাপিছু রোজগার বছরে চার-পাঁচশো টাকা হবে কিনা সন্দেহ। তারাই ঘটিবাটি, ভদ্রাসন বেচে, বন্ধক রেখে ডাক্তারবাবুদের খাঁই মেটাচ্ছে। না মিটিয়েও উপায় নেই। কারণ সহজ পথে ওখানে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া বড় মুস্কিল।

আর বড় ডাক্তাররা? গাড়ী, বাড়ী, ধানজমিতে তাঁদের একেবারে টইটুম্বুর অবস্থা। তাঁরা কেয়ারও করেন না, যে তাঁদের নিয়ে রেল-স্টেশনের গায়ে, চায়ের দোকানে বা ভাটিখানায় রিক্‌সাওয়ালারা কাজিয়া করে, চেঁচায় কোন্ বাবুর কমিশনের রেট কত। তাঁদের মাথা ঘামাতে গেলে চলে না। কিন্তু আমার মত, যারা বড় হতে চায় না, শুধু ডাক্তার হতে চায়, তাদের যে না ঘামিয়ে উপায় নেই। মান-মর্যাদা বাঁচাতে, ঐ বীভৎস ব্যবস্থা থেকে মুক্ত পাওয়ার আশায়, সুস্থ পরিবেশে পড়া ও পড়ানোর লোভে পালিয়ে এসেছিলাম কলকাতার এই কলেজে। কিন্তু আমি পালালে কি হবে, লোভের ভূত তো আমায় ছাড়ে না। ছাত্র, হাউস-সার্জেনদের অনেকেই ভাবে স্যার বোধহয় খুশী হবেন রুগী-টুগী চেম্বারে পাঠালে। আবার রুগীরাও বিশ্বাস করে না যে, হাসপাতালে গেলে সত্যিই ডাক্তারবাবু ভাল করে দেখবেন। তাই সকালে যে রুগীকে হাসপাতালে ভাল করে দেখেটেখে অ্যাডভাইজ দিলাম, সন্ধ্যায় দেখি সেই এসে উপস্থিত চেম্বারে। তখন তুই বল, মেজাজ কি ঠিক থাকে? আমি কি প্র্যাকটিশ শুরু করার আগে শপথ নিইনি যে, অসৎ পথ থেকে দূরে থাকব? আমার কি সামান্যতম নীতিবোধও থাকতে নেই? এরা ভাবে কি বলত? মাঝে মাঝে তাই ক্ষেপেটেপে গিয়ে গালাগাল টালাগাল দিয়ে ফেলি। শুনে কলিগরা, ছাত্ররা, পেসেণ্টরা এমনকি তোর বৌদি পর্যন্ত আমায় বলে—পাগল।

ফিরতি পথে ঐ পাগলের কথাই ভাবছিলাম। বৌদির বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। ব্যারিস্টারের মেয়ে। বাপ বিয়ে দিয়েছিলেন জামাইয়ের অবস্থা দেখে নয়, পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে। আশা করেছিলেন তার জামাইও একদিন বিশ-হাজারী মনসবদার হয়ে উঠবে। কিন্তু নির্লোভ এই মানুষটির বোকামি দেখে বৌদি, এমনকি ছেলেমেয়েরাও আজকাল অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। একুশ বছর প্র্যাকটিশ করে, কলকাতার নামী কলেজের শিক্ষক হয়েও যে লোক বাড়ী বানাতে বা গাড়ী কিনতে না পারে, সে তো বোকা, বুদ্ধু, পাগল। চোখের সামনে অন্যরা যখন ঐ সুযোগেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমিয়ে, ফ্রীজ, রেডিওগ্রাম, ডজ, বুইক বা ইম্পালা কিনে, মালটিস্টোরিড বিল্ডিং হাঁকিয়ে 'রইস' হয়ে উঠেছেন, তখনো কিনা রণদা মুখুজ্যে, এম-বি, বি-এস, এফ-আর-সি-এস, শুচিবাইগ্রস্ত বিধবার মত চীৎকার করছেন—তফাৎ যাও তফাৎ যাও। কিন্তু আজ যদি রণদা মুখুজ্যেরাও না থাকে, তাহলে কাল কোন্ ভরসায় আমাদের মত গরীবগুর্বো মানুষগুলো হাসপাতালে যাবে?

—অনিরুদ্ধ

মনের কথা
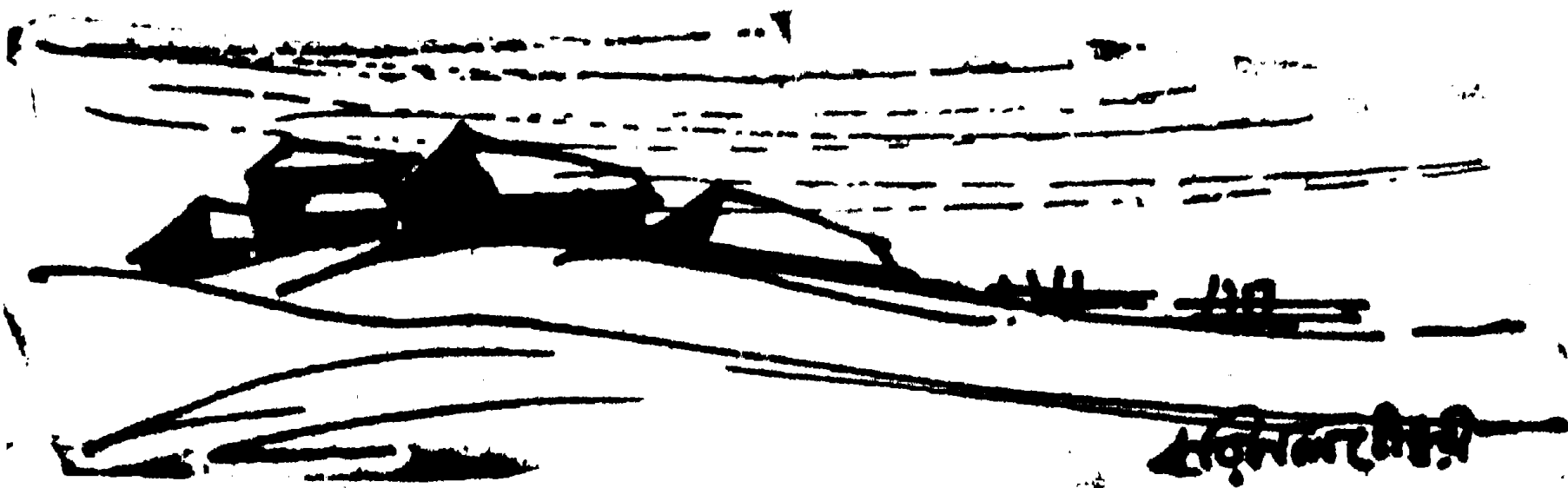
প্রসেনজিতের অবসেশন

নাট্যকার ও নায়ক

(১৭)

ডাক্তারের অন্তরলোকে অন্তরঙ্গ হয়ে বেশ করতে চান অনেক রোগী। ণ্ডিত্যের প্রদর্শনী অন্তরঙ্গতা বাড়ানোর পায়; ডাক্তারের অন্তরজগতে প্রবিষ্ট হবার াশপোর্ট। এ'দের পাণ্ডিত্য আরোগ্য-ভের পথে বাধা সৃষ্টি করে না, বরং নেক সময় সাহায্যই করে। আবার কিছু ছু এমন লোক আছেন, যাঁরা চিকিৎসিত ার জন্য (হয়ত সব কিছুর জন্য) কারুর ারস্থ হওয়াটাকেই দৈন্যপ্রকাশ অপমান-নক বলে মনে করেন। এ'রা পাণ্ডিত্য াহির করে ডাক্তারকে অপদস্থ করতে চান। াক্তারের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখেন, টা প্রমাণ করে নিজের কাছে নিজেকে বড় রতে চান। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই চিকিৎসায় ানো ফল পাওয়া যায় না। চিকিৎসার াঝ পথেই এ'রা অনেকে তিক্ততার সৃষ্টি রে, চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে থাকেন, থবা কোনো কিছু না বলে, তিক্ততা ৃষ্টি না করেই যাতায়াত বন্ধ করেন। 'দের একজনের কথা বলছি।

নজরে পড়বার মত চেহারা। দূর থেকে খতে ভাল লাগবে, কিন্তু কাছে গিয়ে ালাপ করতে ইচ্ছা হবে না। চেহারার মধ্যে ন্ধত্যের এরকম নির্লজ্জ প্রকাশ খুব কম খা যায়। চল্লিশের কাছাকাছি হয়েছেন, লে পাক ধরেছে, কিন্তু চোখে দৃপ্ত াবনের তীক্ষ্ম উজ্জ্বল চাহনি। গৌরবর্ণ, ীর্ঘকায়, উন্নতনাসা ভদ্রলোক যেন অন্যের পর নেতৃত্ব করার সহজাত অধিকার নিয়েই ন্মেছেন; অন্তত তাঁর এই রকমই ধারণা। দ্রলোকের নাম জানতাম। নানা সূত্রে ওঁর ম্বন্ধে নানারকমের কথা শুনেছি। তাঁকে দখবার একটা ঔৎসুক্য ছিল মনে মনে, —অস্বীকার করতে পারব না। তিনি এলেন; আগে থেকে সময় ঠিক করে। সঙ্গে জনতিনেক ভক্ত সহকারী। একখানা নাটক লিখেছেন, নাটকটি মনস্তত্ত্বমূলক; আমার সঙ্গে একটা দৃশ্যের ঘটনা নিয়ে আলাপ করতে চান। তাঁর এক বন্ধু নাকি বলেছে দৃশ্যটা অতিনাটকীয় হয়েছে। ঐ সামান্য কারণে নায়কের পক্ষে ঐ রকম মারমুখী হয়ে নায়িকাকে খুন করতে যাওয়া মোটেই মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। ভদ্রলোকের ভক্তদের মধ্যে একজন আমাকে অনেকদিন ধরে চেনে। তার আত্মীয়-পরিচিতদের মধ্যে আমার কয়েকজন 'প্রাক্তন-রোগী' বিদ্যমান। সেই নাট্যকার-পরিচালককে মনস্তত্ত্বের বিচারে আমার সাহায্য নিতে পরামর্শ দিয়েছে। এরকম 'অনরারী অ্যাডভাইসরের' কাজ এর আগেও করতে হয়েছে, কাজেই 'অ্যাপয়েণ্টমেন্টটা'কে রুটিনমাফিক বলে ধরে নিয়েছিলাম। নাট্যকারের নায়কের সমস্যা যে নাট্যকারের নিজস্ব সমস্যা ঘুনাক্ষরেও তার আভাস পাইনি। কাজেই সহজভাবেই নাট্যকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে গেলাম।

আলোচনাটা চলল নরহত্যা, আত্মহত্যা, জিঘাংসা, রিরংসা ইত্যাদি নানা ধরনের অস্বাভাবিক ব্যাপার নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, বোধহয় নাট্যকার প্রসেনজিৎ মর্ষণকাম-চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে নাটকটি লিখেছেন। প্রগতিপন্থী বলে খ্যাত ভদ্রলোকের মনে এই ধরনের চিন্তা বাসা বেঁধেছে বুঝতে পেরে একটু বিস্মিত বোধ করলাম। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে নাট্যকার খানিকটা ফ্রয়েডের, খানিকটা কিয়েকের্গার্ডের ধারণাদ্বারা প্রভাবিত। সেইদিন এবং পরে আর একদিন মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চলল। প্রসেনজিতের ধারণা ও মতামত আমি মেনে নিতে পারলাম না, উনিও আমার 'তথাকথিত প্রগতিবাদী' ও 'জড়বাদী' ধারণাকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়লেন না। নাট্যকার প্রসেনজিতের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি।

"মানুষ মানুষের প্রতি সর্বদাই বিদ্বেষভাবাপন্ন। মানুষের হিংসাপ্রবৃত্তি শাশ্বত ও সনাতন। জন্মের সঙ্গে জড়িত এই জিঘাংসাবৃত্তি এবং সমাজসভ্যতা জিঘাংসাকে অবদমিত করার চেষ্টা করে সফল হয়নি। অনর্থক এর ফলে নিউরোসিসের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে; অবদমিত জৈব-প্রবৃত্তি নানাধরনের 'কমপ্লেক্স' সৃষ্টি করেছে। বিনা কারণে বা সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে প্রেমাস্পদকে আঘাত করা বা নিজেকে হত্যা করা আপনাদের মত লোকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এইটেই স্বাভাবিক. আমার নায়ক জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি; তার ব্যর্থতার কারণ সে বুঝতে পারছে না, তার অন্তর্দাহ অ্যালকহল ট্রাংকুইলিজারে কমছে না। এ ক্ষেত্রে তার জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগবেই, জাগতে বাধ্য। তার ভেতরকার নেকড়ে (যে নেকড়ে আপনার আমার অবচেতনায় এখন হয়ত জৃম্ভন কাটছে) বেরিয়ে এল এক ঝড়ের সন্ধ্যায়। এমনি এক সন্ধ্যায় বছর পাঁচেক আগে তাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। পাঁচ বছর ধরে আমার নায়ক রাজনীতির সংস্রব ছেড়ে, নায়িকাকে বিবাহ করে সংসারী হবার জন্যে, অর্থ রোজগারের নানা চেষ্টা করেছে। সফল হয়নি। নায়িকার সমাজে প্রবিষ্ট হবার জন্য আর্থিক সাফল্য, নিজস্ব বাড়ী, গাড়ী, একান্ত প্রয়োজন। সে সাফল্য সে লাভ করতে পারেনি। নায়িকার সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি। এদিকে তার পুরনো

সমাজ, তার পুরনো বন্ধুরা, পার্টির সহকর্মীরা তাকে পরিত্যাগ করেছে; কেননা, সে, তাদের মতে, সুবিধাবাদী ব্যক্তিস্বার্থসন্ধানী। এক সময় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে, বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেবে কল্পনা করেছে। পাঁচ বছর আগেকার সেই সন্ধ্যায় একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে তার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে, তার জীবনও ব্যর্থ হতে চলেছে। অর্থ-প্রতিপত্তি লাভ না করে, নায়িকার সমাজে মাথা উঁচু করে চলবার মত শক্তি অর্জন না করে সে নায়িকাকে গ্রহণ করতে পারে না। আবার পুরনো জীবনেও ফিরে যাওয়া চলে না। এই তীব্র দ্বন্দ্বের সমাধান দুভাবে হতে পারে। সুইসাইড কিম্বা হোমিসাইড। সুইসাইড-টাই অল্প-শক্তি নাট্যকারদের প্রথমে মনে আসবে। আমি পন্থা হিসেবে 'হোমিসাইড' সমীচীন মনে করেছি।"

একেবারে মামুলি ফ্রয়েডীয় ধারণায় ভদ্রলোক ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আমার কাছে মতামত নিতে এসে তাঁর মতামত জোর করে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে, আমার কথায় কর্ণপাত না করে, নিজের পক্ষ উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করে, ডজনখানেক সিগারেট ও কাপ চারেক চা শেষ করে নাট্যকার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে নাটকীয়-ভাবে প্রস্থান করলেন।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় নাট্যকার উচ্চতর মার্গে অবস্থিত ছিলেন। এদিনে তিনি তুললেন অনন্ত দেশকালের কথা।

"অনন্ত দেশকালের প্রেক্ষিতে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জীবন, আমাদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার লড়াই, অভীষ্টসিদ্ধির প্রচেষ্টা; —এ সবের উদ্দেশ্য কি? আপনি ত' মনের মাস্টার, কোনো মনকে ঠিকমত চালাতে পেরেছেন কি? কোনো মানুষের সঠিক লক্ষ্যের সন্ধান জানেন কি? অস্তিত্বের মৌলিক বিচ্ছিন্নতা আপনার মত 'সুপারফিসিয়াল' জড়বাদীকে ভাবিয়ে তোলে না আমি জানি; কিন্তু আমি এ চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না, যেতে চাইও না। যুক্তিবাদী, বাস্তুবাদী বলে খুব গুমোর আপনাদের, আসলে আপনারাই অবাস্তব, যুক্তিহীন। অস্তিত্বের সমস্যাই মানুষের আসল সমস্যা। হিন্দুদর্শন এই সমস্যা নিয়ে অনেক ভেবেছে, অনেক কিছু বলেছে। আপনারা আধুনিকতার নাম করে সেসব অগ্রাহ্য করতে চান। আধুনিক চিন্তাবিদরাও অনেক কিছু লিখেছেন, তাঁরাও আপনাদের মতে 'রি-অ্যাকশনারী'। কিয়েরকেগার্ডকে না মানতে চান, না মানুন, কিন্তু কামু, সার্ত্রের বক্তব্যকে খণ্ডন করার কোনো যুক্তি আপনার থলিতে আছে কি? আমি জানি, নেই। মুহূর্তবাদী আপনারা। মানুষকে দিয়ে অর্থহীন জীবনের রথ টানাবার জন্যে তাকে তত্ত্বের মদে মত্ত করে, শ্লোগানের চাবুক মেরে স্পিরিচুয়াল চিন্তা থেকে সরিয়ে রেখেছেন।"...

ঘণ্টাদেড়েক ধরে পরমার্থিক আধ্যাত্মিক নানাধরনের উচ্চমার্গের জ্ঞান বিতরণ করে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। এ-দিন নাটক নিয়ে কোনো কথা তুললেন না। তবে 'ক নাটকের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ছাড়া, তাঁর নিজের আলাদা কোনো সমস্যা আছে; একবার বোধহয় এইরকম মনে হয়েছিল।

দিন সাতেক পরে ভদ্রলোক একলা এলেন। এবার সরাসরি নিজের বক্তব্য পেশ করলেনঃ—দেখুন, আমার নিজের একটা অসুবিধা হচ্ছে। জীবনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। জানতে এলাম আপনার চিকিৎসায় সে অসুবিধা দূর হতে পারে কিনা?

—অসুবিধা কি না জানলে কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক বিশদভাবে তাঁর অসুবিধার কাহিনী বিবৃত করলেন।

ঘুম হচ্ছে না। আলো নিভিয়ে ঘুমোনো অভ্যেস। কিন্তু বছর তিনেক ধরে আলো নিভুতে সাহস হচ্ছে না। অন্ধকার হলেই ভয় পাই। না, এখনও বিয়ে করিনি। একলা থাকি। চাকর পাশের বারান্দায় শুয়ে থাকে। আলো জ্বালিয়ে অনেক রাত অবধি লেখাপড়া করি। কিন্তু সারারাত ত না ঘুমিয়ে থাকা যায় না। দিনের বেলায় চেষ্টা করে দেখেছি। ঘুমুতে পারি না। চোখ বুজলেই বিপদ; —সেই ভয়। চোখ মেলে ঘুমুবার প্রাকটিস করে দেখেছি। ঘুম আসে নি। আপনি ডাক্তার তবু মনে হচ্ছে আপনি হয়ত আজগুবি মনে করবেন। তাই ভয়ের কথাটা বলতে পারছি না। যেটুকু শুনলেন, তা থেকে আপনার কি ধারণা হল, বলুন! পারবেন আমার চিকিৎসার ভার নিতে?

—যেটুকু শুনলাম, তা থেকে কিছুই বলা চলে না। আপনি মশায় এত জানেন, আর এটুকু জানেন না যে রেখেঢেকে বললে ডাক্তারের পক্ষে চিকিৎসা সম্ভব নয়।

—কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করি কি করে? আপনি যে আমাকে নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করবেন না আপনি যে আমাকে হেয় করবার জন্য আমার চেনাজানা মহলে সব কিছু রটিয়ে দেবেন না, তার গ্যারাণ্টি কোথায়?

—তা হলে অন্য ডাক্তারের কাছে যান। যাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাকে দিয়ে চিকিৎসা করালে কোনো ফল হবে না। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। মুখ নীচু করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বেশ একটু রুক্ষকণ্ঠেই বললেন,—শুনুন তা হলে বলছি। জানি কোনো ফয়দা হবে না, তবুও না বলে পারছি না।

এবার ভদ্রলোক মোলায়েম হাসি টেনে নিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

—দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি,—ভয়টা এত আজগুবি আর অবাস্তব যে দিনের বেলায় ভাবতে গেলে হাসি পায়। যে শুনবে সেও হাসবে। মজাটা হচ্ছে এই যে আমি জানি অবাস্তব, জানি আজগুবি; তবু এ ভয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছি না। অন্ধকার হলেই, কিম্বা চোখ বুজলেই মনে হয় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। কোনো সময় মনে হয় একজন, কোনো সময় মনে হয় অনেকে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। তাদের চোখমুখ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তবুও মনে হয় তাদের চোখে সবুজ আলো, তাদের মুখের মধ্যে চকচক করছে ধারালো চারটি 'ক্যানাইন'; (কুকুরে দাঁত, যা দিয়ে আমরা খাবার সময় খাদ্যদ্রব্য ছিন্ন করি) তাদের নখগুলো বাঁকানো। আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, ভয়ে হাত পা অবশ হয়ে যায়, চীৎকার করে পাশের বারান্দার চাকরকে ডাকবার ক্ষম[illegible] থাকে না সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই মূর্তি মিলিয়ে যায় আমার ভয়ও দূর হয়। অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছি। বর্তমানে এমন দাঁড়িয়েছে যে দিনের বেলাতেও কোনো নির্জন গলির মধ্যে ঢুকতে ভয় পাই। ঢুকলেই মনে হয় কে যেন পিছু নিয়েছে। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে, আমার উপর নজর রেখে, আমার পেছন পেছন আসছে। আমি থামলে, সেও থামছে। কয়েক মাস আগে একটা গলির মধ্যে ঢুকে, আমাকে শেষ পর্যন্ত ভয়ে ছুটতে হয়েছিল। দৌড়ে বড় রাস্তায় পড়ে তবে বাঁচলাম। সেই থেকে বড় রাস্তা, ভিড়ের রাস্তা ছাড়া আর চলি না। কিন্তু গলি না হয় এড়িয়ে চললাম কিন্তু রাত্রিকে, অন্ধকারকে ত' এড়িয়ে চলা যায় না।

ভদ্রলোকের মুখের হাসি চলে গি[illegible] কিরকম একটা বিষণ্ণতার ভাব ফুটে উঠেছে পূর্বপরিচিত, বাকাশ্লেষদক্ষ নাট্যকা[illegible]

প্রসেনজিতকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। তিনি বলে চললেন;—

—আমি হিস্ট্রিটা লিখে এনেছি পড়ে দেখবেন। কিন্তু মনে হয় না আপনি কিছু উপকার করতে পারবেন।

—কেন? আগে থেকেই আমার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা কেন?

—কারণ, আপনাদেরই 'ফাণ্ডামেণ্টাল কনসেপ্টে'-গলোই ভুল। কারা ওরা? আপনার [illegible] দিয়ে ওদের আপনি [illegible] পারবেন না। ভুল 'ডায়াগনোসিস [illegible] নিশ্চয়ই। সেই মামুলি বুলি [illegible]। তার আপনার সমাজ-বাস্তবে, [illegible] আপনার পরিবেশে। আপনার রোগ [illegible] যদি ভুল হয়, রোগ সারাতে ভুল [illegible]।

[illegible], আপনাকে আবার বলছি [illegible] জন্য ডাক্তারের কাছে যান।

—আমরা আপনার থেকে বেশি পণ্ডিত [illegible] তাই বা জানলেন কি ক'রে? [illegible] কাছে চেষ্টা না করে আপনার [illegible] এসেছি, ভাবলেন কি করে? সত্যি [illegible] কি জানেন, আমাদের দেশে মনের চিকিৎসা হয় না। মনের ডাক্তারদের [illegible] 'প্রাইমারি' জ্ঞান থাকা দরকার, তা [illegible] কারুরই নেই। 'ট্রানকুইলিজার [illegible] অ্যান্টিডিপ্রেসাণ্ট'—এই ত' আপনাদের [illegible] সহস্রদল পদ্মকে আপনারা [illegible] মনে করে বসে আছেন।

—আমার ঘরে বসে, আমাকে এবং আমার [illegible] যথেষ্ট অপমান আপনি করেছেন। এবার আপনি দয়া করে আপনার [illegible] দেশের ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক এবারও চুপ করে রইলেন। [illegible], কোনো তাড়া আছে বলে মনে হল না। কিন্তু আমার তাড়া ছিল। সেদিন আর কোনো কথা হল না।

এর পর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে ভদ্রলোক বার ছয়েক আমার কাছে এলেন। আমাকে আক্রমণ করে কোনো মন্তব্য আর জানালেন না। মনে হল বুঝি তাঁর চিকিৎসক-বিরূপতা দূর হল। হয়ত চিকিৎসায় ফল হবে।

এই ভয়ের উৎপত্তি তিন নয়, প্রায় বছর পাঁচেক আগে। তবে বছর দুয়েক এর তীব্রতা কম ছিল। ঘুমের ওষুধে কাজ হত। তাতেই তত বেশি বিব্রত বোধ করেন নি। চিকিৎসার কথাও মনে হয়নি। ভয়ের প্রথম সূত্রপাত হাজারিবাগে। সুরমার আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে এই ভয় ঢুকেছে প্রসেনজিতের মনে। সুরমা ছিল তাঁর [illegible] নায়িকা। সুরমার সঙ্গে নাট্যকার অভিনেতা প্রসেনজিতের ঘনিষ্ঠতা দলের অনেকেই জানত। সুরমার স্বামীকে অনেকে আকারে ইংগিতে জানাতে চেষ্টা করেছে এই ঘনিষ্ঠতার কথা। তিনি বিশ্বাস করেন নি। সরকারী ঠিকাদার এই লোকটি প্রসেনজিতের বিশেষ ভক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিঃসন্তান সুরমা অভিনয় নিয়ে নিজেকে ভুলে থাকুক স্বামী এই চাইতেন। বিয়ের দু বছর পর প্রথম সন্তান প্রসবের সময় সুরমার জীবন সংশয় হয়েছিল। ডাক্তারেরা অপারেশনের সময় স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে, সুরমার সন্তানধারণার সম্ভাবনা বন্ধ করে দেন। এর পর বছর দুয়েক সুরমা 'মেলানকলিয়াতে' (বিষাদ রোগ) ভোগে। ডাক্তারদের নির্দেশে স্বামী সুরমাকে চলা ফেরার অবাধ স্বাধীনতা দান করলেন। বন্ধু প্রসেনজিতকে ধরে ওকে অভিনয়ে ব্রতী করালেন। প্রথমটায় সুরমার আপত্তি ছিল। পরে অভিনয় তার নেশা হয়ে দাঁড়াল। ক্রমশ প্রসেনজিতের দলের সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। স্বামীর মত প্রসেনজিতের ভক্ত হয়ে উঠল। স্বামী ঠিকাদারির কাজে আজ এখানে, কাল সেখানে থাকেন; আর স্ত্রী থিয়েটারের দলের সঙ্গে মাঝে মাঝে দিল্লী বম্বে রাঁচী হাজারীবাগ ঘুরে বেড়ান কিম্বা রাত এগারোটা পর্যন্ত রিহার্সালে ব্যস্ত থাকেন। স্বামীর অগাধ বিশ্বাস ও অপার ভালবাসার মূল্য সুরমা বুঝত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রসেনজিতের ব্যক্তিত্ব, অভিনয়দক্ষতা, অগাধ পাণ্ডিত্য ওকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করতে লাগল। প্রসেনজিত অনেক নিজের মনোভাব গোপন করতে পেরেছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে নিজেকে সংযত রাখা আর সম্ভব হল না। প্রকাশ্যে সুরমাকে প্রেম জানালেন সুরমা সাড়া দিল না। কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করতে পারল না। তারা দুজনে রিহার্সালের শেষে লেকের ধারে বসে থাকত, গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে বেড়াত। দলের লোকেরা এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে অনেক কিছু জল্পনাকল্পনা করছিল। তার বেশির ভাগই অবিশ্যি মিথ্যে। কেননা ওদের প্রেম সুরমার চেষ্টাতে কামনা-কলুষিত হতে পারেনি। প্রসেনজিতও বন্ধুপত্নীকে সম্ভোগের সামগ্রী করবার চেষ্টা করেন নি কোনো দিনই। সুরমার স্বামী সবটা না হলেও অনেকটা বুঝতে পেরেছিলেন। দুজনের ওপরই ছিল তার অটুট বিশ্বাস। ওদের অবাধ মেলামেশায় তিনি কোনো বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন না। কিন্তু সেদিন হাজারিবাগে এসে 'ক [illegible] হল প্রসেনজিতের; তিনি নিজেই জানেন না। ওদের মোটরগাড়ীটা কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছে, দলের অন্যেরা ট্রেনে আসছে। প্রসেনজিত, সুরমা আর দুটি ছেলে গাড়ীতে এসেছে। ছেলে দুটো এসেই শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাম্পের পাশে, প্রসেনজিত আর সুরমা। করিডোরে বসে আগামী তিন দিনের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে চাইল। কিন্তু সুরমার দিক থেকে সাড়া নেই। সে ক'দিন ধরেই আনমনা ও বিমর্ষ। টিকিট বিক্রী মন্দ হয়নি, অর্গানাইজাররা জানিয়েছে। একটা হ্যাণ্ড-বিলের খসড়া তৈরী করছিলেন প্রসেনজিত। হঠাৎ সমস্ত আলো নিভে গেল। চাকর এসে জানাল, সাপ্লাই স্টেশনে গড়বড়। এরকম মাঝে মাঝেই হয়। তবে আধঘণ্টা, তিন-কোয়ার্টারের বেশি অন্ধকারে থাকতে হবে না। সেই অন্ধকারে হঠাৎ প্রসেনজিতের মনে হল তার ভেতর থেকে পশুটা বেরিয়ে আসছে। এ পশুটা তার পরিচিত। আজ পাঁচ, ছয় বছর ধরে লড়াই করছে এটার সঙ্গে। অনেক কষ্টে তাকে এতদিন দমিয়ে রেখেছিল। আজ বোধ হয় আর পারবে না। বলে বসলেন ফিসফিস করে, 'তুমি পালিয়ে যাও সুরমা। আজই, এখনই এই রাতের ট্রেনেই কোলকাতায় পালিয়ে যাও।'...আর কিছু তাঁর মনে পড়ে না। কতক্ষণ পরে আলো জ্বলল মনে নেই। পাশের চেয়ার খালি। কোথায় গেল সুরমা? সত্যিই কোলকাতায় ফিরে গেল নাকি? না কোলকাতায় যায় নি। তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরেই তাকে পাওয়া গেল। ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ওষুধ সে খেতই। আজ একটু বেশি করেই খেয়েছে। সে ঘুম আর ভাঙে নি।

প্রসেনজিতের, পণ্ডিত প্রসেনজিতের ধারণা তার ভেতরের পশুটা বোধ হয় বেরিয়ে এসেছিল। তিনিই সুরমাকে হত্যা করেছেন। কেন হত্যা করলেন? আত্মরক্ষার তাগিদে। মানুষ আসলে নেকড়ে, হায়েনা ও শুকর। মৃত্যুর রহস্য জানবার জন্যে বোধ হয় হত্যা করেছেন আমার মত বর্বর জড়বাদী হয়ত বলবে প্রসেনজিত মনের রোগে ভুগছে। মনের রোগ নয়, আত্মায় ক্ষত হয়েছে। সে ক্ষত সারানোর ক্ষমতা জড়বাদী ডাক্তারদের নেই। সুরমার স্বামী, আমার বন্ধুর ধারণা সুরমা আত্মহত্যা করেছে। মাস-খানেক ধরে তার পুরনো 'মেলানকলিয়া' আবার দেখা দিয়েছিল। প্রসেন বুঝতে পারে নি সুরমার স্বামী পেরেছিল। প্রসেনজিতের শেষ দিনের কথা-গুলো এখনও মনে আছে :

—সেই থেকে ভয়। অন্ধকারের ভয়। মৃত্যুভয়। কিন্তু ওরা কারা? সুরমার প্রেতাত্মা না আমার নিজের ভেতরকার সেই পশুটা? মাঝে-মাঝে ওরা অনেকে মিলে আসে কেন? ক্ষুধিত আত্মাগুলো প্রেত-লোকে গিয়ে দল বাঁধে বোধ হয়। আপনার মত ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা হবে না।

সেই শেষ। প্রসেনজিত আর আসে নি। কেসটা নিউরোটিক অবসেশন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হয়ত চিকিৎসা করলেও সারত না। পণ্ডিত রোগীর কথা বলতে গিয়ে প্রসেনজিতের কথা মনে পড়ে গেল, তাই অবসেশন প্রসঙ্গেই কাহিনীটা বিবৃত করলাম।

ওনার নায়ককে উনি নিজের [illegible] আঁকতে চেয়েছিলেন। —মনোবিদ

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ফুটবল কাপ ঃ ৩নং গ্রুপে ইংল্যান্ড বনাম রুমানিয়ার খেলায় একটি দৃশ্য—ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কস বলে ঘুষি মেরে দলের বিপদ দূর করেছেন। খেলায় ইংল্যান্ড ১-০ গোলে জয়ী হয়।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ৩১শে মে মেক্সিকোতে ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এখানে শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় ১৬টি দেশ সমান ভাগ হয়ে চারটি গ্রুপে খেলছে। প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশই শুধু কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। এই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নকআউট প্রথায় খেলা হবে। ৭ই জুন পর্যন্ত যে লীগ খেলাগুলি হয়েছে তার ফলাফল ধরে বর্তমানে বিভিন্ন গ্রুপে এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঃ

১নং গ্রুপ ঃ রাশিয়া এবং মেক্সিকো লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে আছে। দুটি করে ম্যাচ খেলে উভয়েরই ৩ পয়েন্ট করে সংগৃহীত হয়েছে।

২নং গ্রুপ ঃ লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে আছে উরুগুয়ে এবং ইতালী। দুটি করে ম্যাচ খেলে তারা ৩ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছে।

৩নং গ্রুপ ঃ লীগ তালিকার শীর্ষস্থান নিয়েছে ব্রেজিল, দুটি খেলায় ৪ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইংল্যান্ড এবং রুমানিয়া—দুটি করে ম্যাচ খেলে প্রত্যেকের ২ পয়েন্ট করে সংগৃহীত হয়েছে। গতবারের বিজয়ী ইংল্যান্ড ০—১ গোলে ব্রেজিলের কাছে হার স্বীকার করেছে।

৪নং গ্রুপ ঃ লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে পেরু এবং পশ্চিম জার্মানী—দুটি করে ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছে।

এ পর্যন্ত তিনটি দেশ—ব্রেজিল (৩নং গ্রুপ) পেরু এবং পশ্চিম জার্মানী (৪নং গ্রুপ) খেলায় কোন পয়েন্ট নষ্ট করেনি।

টমাস কাপ

কোয়ালালামপুরে আয়োজিত পুরুষদের দলগত ৮ম বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৭—২ খেলায় গতবারের (১৯৬৭) বিজয়ী মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে এবং মোট চারবার 'টমাস কাপ' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৩—৪ খেলায় মালয়েশিয়ার কাছে হেরেছিল। দর্শকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে জাকার্তায় আয়োজিত ১৯৬৭ সালের ফাইনাল খেলা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় মালয়েশিয়া ৪—৩ খেলায় এগিয়েছিল। জাকার্তায় দর্শকদের এই বিক্ষোভ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন ১৯৬৭ সালের অসমাপ্ত ফাইনাল খেলার আসর যে স্থানান্তরিত করেন তার প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়া প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে মালয়েশিয়াকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

পুরুষদের এই দলগত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৪৮-৪৯ সালে। এ পর্যন্ত মাত্র এই দুটি দেশ 'টমাস কাপ' জয়ী হয়েছে ঃ মালয়েশিয়া ৪ বার এবং ইন্দোনেশিয়া ৪ বার। এ বছর থেকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা উঠে গেল। আগে টমাস কাপ বিজয়ী দেশ পরবর্তী প্রতিযোগিতায় মাত্র একটি আসরে (যা চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড নামে অভিহিত ছিল) খেলতো।

আলোচ্য বছরের ফাইনালের প্রথম দিনেই ইন্দোনেশিয়া ৩—১ খেলায় এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় উপর্যুপরি তিনবারের (১৯৬৮-৭০) অল ইংল্যাণ্ড সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী রুডি হার্টোনো জয়ী হয়ে ইন্দোনেশিয়াকে ৪—১ খেলায় অগ্রগামী করেন এবং দ্বিতীয় সিঙ্গলসে মুলজাদি জয়ী হয়ে স্বদেশকে ৫—১ খেলায় জয়যুক্ত করেন। ফলে বাকি ৩টি খেলার গুরুত্ব লোপ পেয়ে যায়।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

প্রথম দিনের খেলা

সিঙ্গলস ঃ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান মুলজাদি (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-৯ ও ১৫-৫ পয়েন্টে মালয়েশিয়ান চ্যাম্পিয়ান পি গুণালনকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস ঃ উপর্যুপরি ৩ বারের অল-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ান রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১২ ও ১৫—২ পয়েন্টে আবদুল রহমনকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ঃ রুডি হার্টোনো এবং ইন্দ্রগুণাবন (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—৯ ও ১৫—১১ পয়েন্টে তান আইক হুয়াং এবং নগ তাই ওয়াইকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ঃ নগ বুন বী এবং পি গুণালন (মালয়েশিয়া) ১৫—৭, ১৩—১৫ ও ১৫—১০ পয়েন্টে ইন্দরয়ো এবং মিন্তারজাকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

সিঙ্গলস ঃ রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৭—১৬, ১২—১৫ ও ১৫—৩ পয়েন্টে গুণালনকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস ঃ মুলজাদি (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—৫ ও ১৫—৫ পয়েন্টে আবদুল রহমানকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ঃ হার্টোনো এবং গুণায়ান (ইন্দোনেশিয়া) ৯—১৫, ১৭—১৬ ও ১৫—৬ পয়েন্টে নগ বুন বী এবং গুণালনকে পরাজিত করেন।

সেমি-ফাইনাল

মালয়েশিয়া বনাম ডেনমার্কের সেমি-ফাইনাল খেলাটি খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলায় মালয়েশিয়া ৩—১ খেলায় অগ্রগামী হয়। সকলেই ভেবেছিলেন, চারবারের টমাস কাপ বিজয়ী মালয়েশিয়া সহজেই ডেনমার্ককে পরাজিত করবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের প্রথম দুটি সিংগলস খেলায় জয়ী হয়ে ডেনমার্ক খেলার ফলাফল সমান (৩—৩) করে। মালয়েশিয়া তৃতীয় সিংগলসে জয়ী হয়ে ৪—৩ খেলায় অগ্রগামী হয়। ডেনমার্ক দ্বিতীয় দিনের প্রথম ডাবলসে জয়ী হলে পুনরায় খেলার ফলাফল সমান (৪—৪) দাঁড়ায়। শেষ ডাবলস খেলায় মালয়েশিয়ার অধিনায়ক বুন বী এবং গুণালন ১৬ মিনিট ১৯৭০ সালের অল-ইংল্যান্ড ডাবলস চ্যাম্পিয়ান টম বার্চার ও পল পিটারসেনকে পরাজিত করে স্বদেশকে ৫—৪ খেলায় জয়যুক্ত করেন।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৯—০ খেলায় আমেরিকান-জোন বিজয়ী কানাডাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ইংল্যান্ড বনাম বিশ্বএকাদশ দল

দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ১৯৭০ সালের ইংল্যাণ্ড সফর বাতিল হওয়ার ফলে স্থির হয়েছে যে, পূর্বঘোষিত পাঁচটি টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তে বিশ্ব একাদশ দলের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড দল খেলবে। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন কাউণ্টি ক্রিকেট দলে বিভিন্ন দেশের যেসব খ্যাতনামা খেলোয়াড় বর্তমান মরসুমে খেলছেন, তাঁদের থেকেই বিশ্ব একাদশ দল তৈরী করা হবে। ক্রিকেট খেলার কর্মকর্তারা আশা করেন, ভারতবর্ষ, ওয়েস্টইণ্ডিজ এবং পাকিস্তানের অশ্বেতকায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শ্বেতকায় খেলোয়াড়দের এই পাঁচটি টেস্ট খেলা বর্তমান আন্দোলনকে অনেকটা ঠাণ্ডা করবে।

ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন কাউণ্টি দলে বিদেশের যেসব খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় বর্তমান মরসুমে খেলছেন, তাঁদের নাম এখানে দেওয়া হল :

ভারতবর্ষ : ফারুক ইঞ্জিনীয়ার।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : গ্যারী সোবার্স, ল্যান্স গিবস, ক্লাইভ লয়েড, বাসান বুচার, রয় মার্শাল, জন হোল্ডার এবং রোহন কানহাই।

পাকিস্তান : মজিদ খাঁ, মুস্তাক মহম্মদ, ইউনিস আমেদ, আসিফ ইকবাল এবং ইন্তিখাব আলম।

সিংহল : ক্লাইভ ইনম্যান।

অস্ট্রেলিয়া : এ্যালান কনোলী এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী।

নিউজিল্যান্ড : গ্লেন টার্নার।

দক্ষিণ আফ্রিকা : মাইক প্রোক্টার, বেরী রিচার্ডস এবং হিলটন অ্যাকারম্যান।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং নটিংহামসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্ব একাদশ ক্রিকেট দল গঠনের উদ্দেশ্যে গ্যারী সোবার্স (অধিনায়ক), ফ্রেডী ব্রাউন (ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক) এবং লেসলী এমস (ইংল্যাণ্ড দলের প্রাক্তন উইকেট-কিপার)—এই তিনজনকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী হয়েছে।

আগামী ১৭ই জুন লর্ডস মাঠে আয়োজিত প্রথম টেস্ট খেলায় বিশ্ব একাদশ দলে এই ১১ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন : গ্যারী সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও নটিংহামসায়ার) অধিনায়ক, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (ভারতবর্ষ ও ল্যাংকাসায়ার), ল্যান্স গিবস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ওয়ারউইকসায়ার), ক্লাইভ লয়েড (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ল্যাংকাসায়ার), ইন্তিখাব আলাম (পাকিস্তান ও সারে), রোহন কানহাই (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ওয়ারউইক-সায়ার), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি (অস্ট্রেলিয়া ও লিস্টারসায়ার), মাইক প্রোক্টর (দঃ আফ্রিকা ও গ্লস্টারসায়ার), বেরী রিচার্ডস (দঃ আফ্রিকা ও হাম্পসায়ার), এডি বার্লো (দঃ আফ্রিকা), আর জি পোলক (দঃ আফ্রিকা)।

গারফিল্ড সোবার্স

টেস্ট খেলার তারিখ

১ম টেস্ট (লর্ডস) : জুন ১৭—২৩
২য় টেস্ট (ট্রেন্টব্রীজ) : জুলাই ২—৭
৩য় টেস্ট (এজবাস্টন) : জুলাই ১৬—২১
৪র্থ টেস্ট (হেডিংলে) : জুলাই ৩০—আগস্ট ৪
৫ম টেস্ট (ওভাল) : আগস্ট ১৩—১৮

ফেডারেশন কাপ

পশ্চিম জার্মানীতে আয়োজিত মহিলা-দের দলগত ৮ম বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৩ - ০ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে চতুর্থবার ফেডারেশন কাপ জয়ী হয়েছে। ইতিপূর্বে তারা এই কাপ জয়ী হয়েছে ১৯৬৪ - ৬৫ এবং ১৯৬৮ সালে। এপর্যন্ত এ ফেডারেশন কাপ জয়ী হয়েছে মাত্র এই দুটি দেশ—আমেরিকা ৪বার (১৯৬৩, ১৯৬৬, ৬৭ ও ১৯৬৯) এবং অস্ট্রেলিয়া ৪বার। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার একদিকে সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ২-১ খেলায় গত চারবারের কাপ বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করে। অপরদিকে সেমি-ফাইনালে বৃটেনের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়। ফেডারেশন কাপের উদ্বোধন ১৯৬৩ সালে।

বিশ্ব-বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

যুগোশ্লাভিয়াতে আয়োজিত বিশ্ব অপেশাদার বাস্কেটবল প্রতিযোগি... যুগোশ্লাভিয়া স্বর্ণ, ব্রেজিল রৌপ্য, রাশিয়া ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়ে... এখানে উল্লেখ্য, রাশিয়া গতবার এই প্র...যোগিতায় স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিল। আমেরিকা অলিম্পিক গেমসে বাস্কে... প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে (১৯৩৬) ৭ বার (১৯৩৬-৬৮) স্বর্ণপদক জয়ী... অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার জেমস এ নেইস্মিথ এই বাস্কেটবল প্রবর্তন করেন এবং প্রথম খেলা হয় ১... খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

কলকাতায় প্রথম বিভাগের ... লীগ প্রতিযোগিতার তালিকায় ব... বি এন আর ৬টি খেলায় ১০ পয়েণ্ট করার সূত্রে শীর্ষস্থান অধিকার আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে রেলওয়ে—৬টি খেলায় ৯ পয়েণ্ট। ... বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং শীল্ড ... মোহনবাগান ২টি খেলায় ৪ পয়েণ্ট ... করেছে। অপরদিকে গত বছরের ... আপ ইস্টবেংগল দলের উঠেছে ৩টি ... ৫ পয়েণ্ট। তারা উয়াড়ীর সংগে গো... অবস্থায় খেলা ড্র করে একটা পয়ে... করেছে। মহমেডান স্পোর্টিং তিনটে ... ৬ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে। মোট ... দলের মধ্যে লীগের খেলায় অপরাজিত আছে এই চারটি দল—রেলওয়ে, মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্ট... এবং মোহনবাগান। লীগ ... একেবারে নীচের দিকে আছে টেলিগ্রাফ—৬টি খেলায় ২ পয়েণ্ট।

(৭ই জুন প...

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৭ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 19th June 1970. শুক্রবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়

চিঠিপত্র

মুখের মেলা

(১)

আপনাদের জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবার আবদুল জব্বার মহাশয়ের মুখের মেলার বিষয়ে কিছু লিখছি। অমৃতের বেশ কয়েক সংখ্যা থেকে আবদুল জব্বার মহাশয়ের লেখা মুখের মেলার প্রতিটি রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে ভেসে উঠছে অসংখ্য মুখ। তাদের কেউ আজকের সমাজে কাঙাল, আবার কেউ ধনকুবের। এদের মনের আকাঙ্ক্ষা একেক ধরনের। কেউ চায় কলঙ্কহীনভাবে বাঁচতে, আর কেউ চায় কলঙ্কের সাগরে ডুবে বাঁচতে। আর এদেরই জীবনের ইতিহাস হাজির করেছেন অমৃতের পাঠকের দরবারে শ্রীজব্বার সাহেব। একটি বিষয়ে আমি অবগত হতে পারছি না যে জব্বার সাহেব মুসলমান সমাজের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। শুধু কি মুসলমান সমাজেই এরূপ অবস্থা? আর কোথা কি এরূপ নেই?

পরিতোষ নাগ
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি।

(২)

কোন কোন রচনা শুরুতেই সার্থকতার পরিচয় বহন করে। আবদুল জব্বারের 'মুখের মেলা' তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। যে সব মুখের সঙ্গে পরিচয় হোল তারা আমাদের চেনার মাঝে চির অচেনা। সেই অচেনা মানুষদের বাস্তব ছবি আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে তাদের চেনবার যে সুযোগ লেখক দিলেন তারজন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। আমাদের নগর-সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যে এমন ধ্বসেপড়া গ্রামীণ সমাজ আছে এ যেন আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এদের তুলে ধরে তিনি এক নূতনত্বের সূচনা করলেন।

সহজ সরল ভাষায় এমন রচনা প্রকাশের জন্য লেখক ও অমৃতের কর্তৃপক্ষ উভয়েই প্রশংসার যোগ্য।

গীতা রায়চৌধুরী
কলিকাতা—২০

(৩)

অনেকদিন আগে জন গান্থারের লেখা ইনসাইড আমেরিকা পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। ঠিক সেই ধরণের অনুভূতি আমি অনুভব করি আবদুল জব্বারের লেখা 'মুখের মেলা' পড়ে। গান্থারের লেখায় আমেরিকার পোর্ট্রেট করা ছবি দেখে অনেক আমেরিকাবাসী আহত হলেন, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে এর থেকে বাস্তব ছবি একমাত্র আপটন সিনক্লেয়ার ছাড়া আর কেউ আঁকতে পারেননি।

কবিতার বইতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আঁকা গ্রামের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবং তা আমার মনের স্মৃতিপটে কেবল 'সুন্দর ছবি' হয়েই বিরাজ করেছিল। কিন্তু জব্বারের লেখা পড়ে এই প্রথম চির অবহেলিত গ্রামবাংলাকে ভালবাসতে শিখেছি। এই ভালবাসার রঙে শুধু আমি নয় অনেক সাধারণ পাঠকের মনই রঞ্জিত হয়েছে—এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব। পরিশেষে সম্পাদক মহাশয়কে আমার অসংখ্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই অমৃতর মত এমন একটি সুন্দর সাপ্তাহিক উপহার দেবার জন্য।

শুভ্রত সেনগুপ্ত
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা-১৬।

(৪)

আমি আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বর্তমানে বাংলা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের জনজীবনে আমার পাশের উপেক্ষিত মেহনতী মানুষের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস এবং জীবনযাপনের যে চিত্র জব্বার সাহেব 'মুখের মেলা'য় দিচ্ছেন তা প্রশংসনীয়। আজকের দিনে যখন সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে শহরঘেঁষা হয়ে চলেছে, তখন গ্রামবাংলার মাটির মানুষ যারা, অতি নিকট অথচ উপেক্ষিত হয়ে আছে যারা, তাদের যে সুনিপুণ আলেখ্য 'মুখের মেলা'য় পেলাম তা বাংলা সাহিত্যে গৌরবের দাবী রাখে। 'মুখের মেলা'য় মোমিন কুঁজোর সংসার' আমায় বেশ আলোড়িত করেছে। এরপর মোমিন কুঁজো এবং এরপানের মত মানুষদের প্রতি আমাদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। অবক্ষয় জর্জরিত সমাজের আসল চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। লেখক মোমিন কুঁজোর সংসারের এক জায়গায় লিখেছেন "এমন কপাল তার যে ভারতের মতন এমন একটি পুরাতন সভ্যদেশে প্রায় ছাপ্পানো বছর বেঁচে থেকেও জীবনে নাকি কক্ষনো একটা ডালিম কিংবা একটা বেদনা কি জিনিস খেয়ে দেখে যেতে পারে নি।" একটি বিরাট অর্থ প্রকাশ পেয়েছে উক্তিটির মাধ্যমে। লেখক উৎকৃষ্ট এবং সুস্থ সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন 'মুখের মেলায়'।

মুখের মেলায় জীবনচিত্র যেন গূঢ় রহস্য নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। লেখক নিভৃত গ্রামবাংলার হৃদস্পন্দন কান পেতে শুনে যে-ভাবে সাহিত্যের উপজীব করে তুলেছেন তার জন্য লেখক আবদুল জব্বারকে পল্লীগ্রাম থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। জব্বার সাহেবের সঙ্গে যে গ্রামবাংলার আত্মিক যোগ আছে ত নিঃসন্দেহ। আর পরিশেষে এই উৎকৃষ্ট ধারাবাহিক সংযোজনের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিয়া, হুগলী

(৫)

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় (১০ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) প্রকাশিত সর্বশ্রী খাজিম উদ্দিন আহমেদ ও কুমারেশ চক্রবর্তী চিঠিটি পড়লাম। শ্রীআ[illegible]ল জব্বারে 'মুখর মেলা'র ওপর [illegible] সুচিন্তিত আলোচনাটি নিঃসন্দেহে [illegible]য়গ্রাহী। সত্যি সত্যিই আজকের সাহি[illegible] শহুরে সাহিত্য-তাতে আকাশ-বাতাস নেই, কাদামাটির স্থা নেই, নেই কোন বেদনারসে নেয়ে ওঠা গ্রামা জীবনের প্রতিচ্ছবি। আছে শুধু নগর জীবনের 'লোহার পাঁজরে ইঁটের খাঁচা দারুণ মর্মব্যথার যক্ষ্মাকাশে ক্লিষ্ট জীবন চিত্র। তাইতো শরৎচন্দ্রের 'গফুরমিঞ হারিয়ে যাচ্ছে, বিভূতিভূষণের 'দুপোকাক হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে ওদের আনন্দ-বেদনার শরিক আরো কত নাম-না জানা মানুষ। ওরা আজ আমাদের মনে কোণের বাইরে। সাহিত্য-পরকলায় এইস হারিয়েযাওয়া মানুষগুলোর জীবনছবি আ কোনদিনই কি প্রতিবিম্বিত হবে না?

থেমে যাওয়ার আগে এইসব অবহেলিত, প্রপীড়িত ও সমাজের বৃহদাংশে অংশীদারদের মসীলিপ্ত জীবনকাহিনী রূপকার শ্রীআবদুল জাব্বার যেভা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সাত সমুদ্দু তের নদী পাড়ি দিয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যা জীয়নকাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তোলার কাে সচেষ্ট হয়েছেন, সেজন্যে তাঁকে আমর অকুণ্ঠ প্রশংসা পাঠাচ্ছি।

তুষারকান্তি দাস
মেচেদা, মেদিনীপুর।

চিঠিপত্র

"সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ"

'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ' পর্যায়টি চালু করে 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ পাঠকদের কাছে বিশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষ করে উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই নিয়ে আলোচনার অবকাশ ও প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। কেননা আজকের বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ উপন্যাস ও ছোটগল্প পড়ে অনেক পাঠকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অধিকাংশ লেখকই যেন লেখার উপাদান আর খুঁজে পাচ্ছেন না। আমরা যেন এখনো সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেষ্টনিতেই আটকে আছি। ফলে আজকের লেখাগুলো হয়ে চলেছে গতানুগতিক, বলিষ্ঠতা-বর্জিত, ছায়াচ্ছন্ন এবং সমাজের সঙ্গে সংগতিবিহীন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে আজকের সমাজ সার্থক সাহিত্যের উপাদান যোগান দিতে পারছে না (?) অথবা লেখকদেরই সমাজ-প্রজ্ঞার অভাবে তাঁরা সমাজ থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারছেন না (?)। প্রথমটি নিশ্চয়ই স্বীকার্য নয়। কারণ সমাজে ভাটার টান যত প্রবলই হোক না কেন সাহিত্যের উপাদান সেখানে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোই তার প্রমাণ। দ্বিতীয়টি সত্য হলে একথাই বুঝতে হবে, সাহিত্যিকরা (সবাই নন) নিজেদেরকে সমাজ থেকে খানিকটা তফাতে রেখে চলেছেন। বর্তমান সমাজের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা যেন খানিকটা কুণ্ঠিত। কিন্তু ভেবে পাই না, কেন এই কুণ্ঠা? সত্যিই কি বর্তমান সমাজে সাহিত্যের উপাদানের অঘটন চলছে। অথবা যা পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা করা যায় না ভেবেই সাহিত্যিকরা এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত? আমার এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো লেখকরাই যথার্থভাবে দিতে পারবেন।

'অমৃত'-র আলোচ্য পর্যায়ে যেসব সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রফুল্ল রায়কে বাদ দিলে আর কেউই যেন এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি নন। তাঁদের মতামতও কেমন যেন অস্পষ্ট। জানি না এ তাঁদের ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু প্রফুল্ল রায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ সংখ্যার 'অমৃতে' প্রফুল্ল রায়ের রচনাটি বলিষ্ঠতা ও স্পষ্টবাদিতায় সমুজ্জ্বল। রচনাটি পড়বার মতন এবং পড়ে ভাববার মতন। আজকের সমাজবিমুখ সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রীরায়ের এ এক বলিষ্ঠ প্রশ্ন। শ্রীরায় সমাজের প্রতি লেখকের কর্তব্য সম্পর্কে এক মূল্যবান জিজ্ঞাসা রেখেছেন রচনাটির শেষাংশে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্য আর বিক্ষোভের মাঝে আজকের লেখকরাও যেন বিব্রত। ঠিক স্থিতিশীল হতে পারছেন না। তাই তো শ্রীরায়ের লেখক-বন্ধুর বক্তব্য : "এইরকম একটা এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত সময় নিয়ে লেখা যায় না। আমি বাপু দরজা-জানালা বন্ধ করে নিজেকে নিয়েই লিখে যাচ্ছি।" কিন্তু এই কি সত্যিকারের সাহিত্যিকের পথ? ঘরের কোণে নিজেকে আবদ্ধ করে এভাবে আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যরচনায় মগ্ন থাকলে কি লেখকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দেওয়া হয়? কেননা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমাজ থাকবেই। সমাজকে এগিয়ে চলার পথ দেখানোতে লেখকের দায়িত্ব অনেকখানি। তাই তো শ্রীরায়ের প্রশ্ন : "দরজা জানলা বন্ধ করলেই কি বাইরের ঝড় থেকে রক্ষা পাব? চারদিকে যদি আগুন লাগে নিজেকে বাঁচাবার মতন 'সেফ্‌টি ভল্ট' আমার কোথা? বেঁচে থাকার জন্যে এই সমাজ থেকে প্রতিদিন মাশুল গুনে নিচ্ছি, অথচ তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে থাকব? আমি যখন এ সমাজেই আছি, আমৃত্যু থাকতেও হবে, তখন তার কথা না লিখে আমার মুক্তি নেই। তার কথা না লিখলে নিজেকেই তো অস্বীকার করা হবে।" ধন্যবাদ প্রফুল্ল রায়কে তাঁর এই মূল্যবান অঙ্গুলিসংকেতের জন্যে। আধুনিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র যদি 'মানবমুক্তির বাণী'ই হয় তবে আমাদের আশা বাঙালী আত্ম-কেন্দ্রিক সাহিত্যিকরাও শ্রীরায়ের প্রশ্ন-গুলিকে সামনে রেখে সাহিত্যে তাদের সমাধানের চেষ্টা করবেন। তাহলে বাংলা-সাহিত্যও উপকৃত হয়ে মানবমুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী,
কলকাতা—৫০।

বেতারশ্রুতি

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠের অমৃতে বেতার-শ্রুতি বিভাগে শ্রীশ্রবণকের লেখা পড়লাম। লেখার শুরুটা বেশ ভাল লেগেছে। শেষের কয়েকটি লাইনের কথা বাদ দিলে বলা যা[য়] যে, লেখক যথেষ্ট যুক্তির সাহায্যে তাঁ[র] বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকেও শ্রীশ্রবণকে[র] লেখা নিঃসন্দেহে উৎকর্ষের পরিচয় বহ[ন] করে। কিন্তু রচনার শেষে, হয়ত বা অসা[ব]ধানতাবশতই লেখক অতি অবান্তর একা[ধিক] বাক্য-সংযোজন করে সমস্ত রচনাটি[র] উৎকর্ষ অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। শেষে[র] লাইন ক'টি তিনি নিজেই লিখেছেন, 'একা[ন্ত] অপ্রাসঙ্গিক...'। 'কথাটা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক' 'একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও লিখছি' ইত্যা[দি] শব্দচয়ন করে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথ[া] অনেক রচনায় ঢুকিয়ে দেয়া যায়, এ[বং] শুধুমাত্র ঐ সব শব্দগুচ্ছের উপস্থিতি[র] গুণেই কথাগুলো বেশ প্রাসঙ্গিক হ[য়ে] ওঠে।

ডঃ অমুকচন্দ্র অমুক, এম-এ, পি-এ[ইচ] ডি, লেখকের মতে, এরকম লেখা ভুল। 'এ ক্ষেত্রে ডঃ বাহুল্য মাত্র এবং বর্জন কর[া] উচিত'। ভুল আর বাহুল্য—এ দুটোকে সমার্থজ্ঞাপক ধরে নিলে লেখ[ক] কি ভুল করবেন না? বাহুল্য হলেই কি বর্জন করতে হবে? বাহুল্য বর্জন হ[য়ত] বা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বাহুল্যটা ভুল হ[বে] কেন? সব বাহুল্য যদি বর্জনীয় হয়, ত[বে] বোধকরি শ্রীশ্রবণক তাঁর নিবন্ধের [শে]ষ লাইনটি বর্জন করতে পারতেন, যেখ[ানে] তিনি লিখেছেন, 'বলা বাহুল্য, ত[িনি] ইংরাজীর অধ্যাপক নয়'। বলা যেখ[ানে] বাহুল্য সেখানেও শ্রীশ্রবণক বলার লো[ভ] সামলাতে পারেন নি কেন? নামের অ[ন্তে] পি-এইচ ডি, ডি-ফিল বা ডি, এস[-সি] থাকলে নামের আগে ডঃ যোগ করা বাহু[ল্য] বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা প্রবীণ অধ্যাপ[ক]রাও এরূপ অনাবশ্যক ডঃ ব্যবহার ক[রে] থাকেন, লেখক তা দেখেছেন। সেখ[ানে] অস্বাভাবিক নয়, কারণ সত্যই এর ভুল (?) অনেকেই করেন। কলিক[াতা] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকখ[ানি] পুস্তকে নামের পিছনে 'পি-এইচ ডি' ও নামের আগে ডঃ—এ দুয়ের যুগপৎ প্রয়ো[গ] দেখেছি। কিন্তু লেখক দাবি করেছেন ইংরাজীর অধ্যাপকগণ এ ভুল কর[েন] করেন না। এ উক্তি থেকে ইংরাজ[ীর] অধ্যাপকদের প্রতি এক ধরনের পক্ষপা[তিত্ব] প্রকাশ পাচ্ছে।

অজয়কুমার চক্রবর্ত[ী]
ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভ[াগ]
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল[য়]

শাদা চোখে

ঝাড়মাঝগ্রামের নৃশংস হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে আবার নতুনভাবে ভূমি-সমস্যার প্রশ্নটা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। যদিও বা সংশ্লিষ্ট দলগুলি এই অকল্পনীয় অমানুষিকতাকে একটি স্থানীয় ঘটনা বলে উল্লেখ করে ঘটনার গুরুত্ব লাঘব করতে প্রয়াস পাচ্ছেন. তবুও একথা বলতে হয় যে এটা মোটেই মামুলী ব্যাপার নয়। এর মূল অনেক গভীরে। পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে জমির ক্ষুধাকে মূলধন করে—সে জোতদারের হোক বা ভূমিহীনেরই হোক—দলীয় আধিপত্য বিস্তার বা অক্ষুণ্ণ রাখার এ একটি জবরদস্ত লড়াই।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যাঁদের সমর্থকরা নিহত হয়েছেন তাঁরা কিন্তু প্রথমে এই নারকীয় ঘটনাকে একটি স্থানীয় ব্যাপার বলে মোটেই লঘুভাবে দেখেন নি। বরঞ্চ, একটি পরিকল্পিত রাজনীতির প্রোজেকশান বলেই চিহ্নিত করেছেন। দুই দলের দুই শীর্ষনেতার বৈঠকের পরই মূল্যায়নে হেরফের ঘটছে।

ঘটনার পটভূমিকাটা কি সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। 'সমদর্শী' যদি নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে আদ্যোপান্ত বিবরণটা নিবেদন করে তবে নেতারা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার জন্য সাক্ষী-সাবুদ তলব করবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করবেন না। কাজেই সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতারা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন সেইগুলি হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে। বিবৃতিগুলি পাঠ করেই সহৃদয় পাঠকরা বুঝতে পারবেন সত্য ঘটনা কি। এবং বুর্জোয়া সংবাদপত্র যে আদৌ কাউকে হেনস্তা করবার চেষ্টা করেনি সেটাও বুঝতে কেউ অপারগ হবেন বলে মনে হয় না।

ঝাড়মাসগ্রাম ঘটনার অংশীদার দুই দল। পূর্বতন যুক্তফ্রন্টের দুই শরিক। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। অন্যান্য দলগুলি যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছেন তা অংশীদার হিসাবে নয়। ঘটনার নৃশংসতাকে নিন্দা করে তাঁদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে যে দলকে দোষী বলে মনে হয়েছে তাদের আক্রমণ করে বক্তব্য রেখেছেন। সে যা হোক, দুই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতারা কি বলেছেন সেই বক্তব্যই এই ঘটনার প্রধান উপজীব্য। যেদিন এই নৃশংস হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয় সেদিন আর এস পি'র তিন নেতা যথাক্রমে সর্বশ্রী ননী ভট্টাচার্য এম-এল-এ, নিখিল দাস এম-এল-এ, ও সৌরীন ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। আর শ্রীমাখন পাল কলকাতায় ছিলেন। ঘটনার দুদিন পরে প্রথম আর-এস-পি'র তরফ থেকে নিন্দা করে শ্রীমাখন পাল এক বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে শ্রীপাল বলেছেন যে এই জঘন্য হত্যাকান্ডের নিন্দা করবার মত "শক্ত ভাষা" তাঁর জানা নেই। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা (অবশ্য স্থানীয়) শরণার্থীদের জমি থেকে উৎখাত করবার জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার উস্কানি দিতেও কসুর করেন নি বলে শ্রীপাল অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেছিলেন, কতকগুলি নিঃস্ব শরণার্থী যাঁরা দু' দুবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে—একবার পাকিস্তান থেকে আর অন্যবার সর্বনাশা তিস্তার বন্যায়—হত্যা করা কি শ্রেণী-সংগ্রাম? শ্রীপাল আরও বলেছিলেন যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের ভেবে দেখা উচিত তাঁরা কোন পথে চলেছেন। অবশ্য শ্রীপাল সরকারী গাফিলতির কথা উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। শ্রীপালের বক্তব্য সংবাদপত্র অফিসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দলের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীননী ভট্টাচার্য, শ্রীসৌরীন ভট্টাচার্য মারফৎ উত্তর বঙ্গ থেকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে আর একটি বিবৃতি পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য, পূর্বদিন শ্রীননী ভট্টাচার্য শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের কাছে ঘটনা সম্পর্কে কোন বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন। কারণ, তিনি তখনও অকুস্থল পরিদর্শন করে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। কাজেই পরে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরেই ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তিনিও মার্কসবাদীরা সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার উস্কানি দিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করে ঐ জঘন্য হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছেন বলে অভিযোগ করেন। তাঁর তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, ঐ এলাকার বাস্তুহারাদের একটি বড় অংশ আর এস পি'র শিলিগুড়ি জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে মার্কসবাদীরা এই বর্বর অভিযান চালায়। শ্রীপাল ও শ্রীভট্টাচার্য উভয়েই বলেছেন যে সাম্প্রদায়িক ঘটনার সময় যে অমানুষিক বর্বরতা সংঘটিত হয়েছিল, ঝাড়মাঝগ্রামের ঘটনা তাকেও হার মানায়। দুই নেতার বিবৃতিই ছিল ঘৃণায় পরিপূর্ণ। আরও তথ্য প্রকাশ পায় যখন শ্রীনিখিল দাস অকুস্থল পরিদর্শন করে এসে কলকাতায় শ্রীমাখন পালের মাধ্যমে তাড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলনে আর একটি বিবৃতি পেশ করেন। শ্রীদাসের বক্তব্য উল্লেখ করে শ্রীমাখন পাল সাংবাদিকদের যা বলেছেন, তা অনুরূপ: ঝাড়মাঝগ্রামে যে জমিতে বাস্তুহারা পরিবারগুলি নতুনভাবে বাস্তু নির্মাণ করেছে সেই জমি সরকারের খাস জমি। ঐ জমি খাস হওয়ার আগে স্থানীয় এক মুসলমান জোতদার ঐ জমি "ওয়াকফ্ স্টেটের' অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করে নিজের দখলে রেখেছিলেন। পরে প্রমাণিত হয় যে ঐ জমি "ওয়াকফ্ সম্পত্তি" নয়। ফলে, সরকারের খাস জমিতে

পরিগণিত হয়। ঐ জমির পরিমাণ ১২২ একর। পরে ঐ মুসলমান জোতদার ১৯জন লোককে বর্গাদার সাজিয়ে কৌশল করে বেনামীতে ঐ জমি নিজের ভোগ-দখলে রাখে। ইতিমধ্যে তিস্তার বন্যায় তিস্তার চরে যে সমস্ত উদ্বাস্তু নতুন করে নীড় বেঁধেছিলেন, তাঁরা আবার দ্বিতীয়বার বাস্তুহারা হন। সরকারের তরফ থেকে পুনরায় বসতি স্থাপনে সাহায্য করার জন্য ঝুমাঝগ্রামের ঐ সরকারী জমিতে দু একর করে জমি দেওয়া হয়, এবং তখন থেকেই স্থানীয় লোকের সঙ্গে ঝগড়ার সূত্রপাত। শ্রীদাস ঐ স্থানীয় লোক কারা তার উপরও আলোকপাত করেন। ঐ স্থানীয় লোকের বেশীর ভাগই নাকি মাইগ্রেটেড্ মুসলমান। তবে কিছু নাকি স্থানীয় অধিবাসীও আছেন। সেই মুসলমান জোতদার তখন থেকেই উদ্বাস্তুদের বাস্তুচ্যুত করবার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। তার পরে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির শরণাপন্ন হয়। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে আরও কয়েকবার এই জমির অধিকার নিয়ে এই জোতদার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে বাস্তুহারাদের ছোটখাট লড়াই হয়েছে, এবং শান্তির প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য সভা-সমিতিও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুফল ফলেনি। অবশেষে এই নরমেধ যজ্ঞ। শ্রীদাসের বিবৃতি থেকে আরও জানা যায় যে আক্রমণকারীরা বাস্তুহারাদের প্রায় ৪০টি কুটির জ্বালিয়ে দিয়েছে, আর সেই আগুনে তার দিয়ে হাত-পা শক্ত করে বেঁধে কিছু লোককে পুড়িয়ে মেরেছে। নারী ও শিশুরা পর্যন্ত অব্যাহতি পায়নি। শ্রীদাসের মতে প্রায় ১৭।১৮জন নিহত হয়েছেন এবং শতাধিক আহত হয়েছেন। এই আহতদের মধ্যে গর্ভবতী নারীও রয়েছেন। আর এস পি'র প্রত্যেক নেতাই ব'লছেন এটা একটি পূর্ব-পরিকল্পিত আক্রমণ। সংঘর্ষ নয়। ফলে, শুধু বাস্তু-হারারাই নিহত ও আহত হয়েছেন।

শ্রীপাল শ্রীদাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন যদি ১৯জন বর্গাদারকেও দু একর করে জমি দেওয়া হত ৪০ ঘর বাস্তু-হারার বসতি স্থাপনের পরও উদ্বৃত্ত খাস জমি থাকত। অনেকবার এই প্রস্তাব দেওয়ার পরও এই সমস্যার সমাধান করা যায়নি। বরঞ্চ ঐ জোতদার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আর এস পি নেতারা হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের তাঁদের সমর্থক বলেই দাবী করেছেন। দলের দরদী কর্মী বলে দাবী জানাননি।

আর এস পি'র বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরই অন্যান্য বামপন্থী দল এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন। এবং তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আর এস পি যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন তার উপর নির্ভর করেই আমরা ঘটনার মূল্যায়ন করেছেন, এবং দোষী-নির্দেশ সাব্যস্ত করেছেন।

প্রায় সকল বামপন্থী দলের বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের লিখিত বক্তব্য কাগজে প্রকাশের জন্য পেশ করেন। সেই বিবৃতিতে তাঁরা কি বলেছেন তাই নিম্নে পরিবেশন করা হল। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটি অতীব দুঃখিত যে ঝুমাঝগ্রামের খাস জমির দখল নিয়ে স্থানীয় লোক ও কিছু বাস্তুহারাদের মধ্যে এক দুর্ভাগ্যজনক সংঘর্ষের ফলে ১১জন লোক নিহত হয়েছেন ও কিছু সংখ্যক লোক আহত হয়েছেন। কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয় যে কিছু সংবাদপত্র ও রাজ-নৈতিক নেতা দলনীতি এই ঘটনাকে মূল-ধন করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা আর এস পি সমর্থকদের আক্রমণ করেছে বলে সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক প্রচার অভিযান শুরু করেছে। এটা একটি জঘন্য মিথ্যা তথ্য তাই প্রমাণ করবে।

সেই খাস জমি স্থানীয় দরিদ্র কৃষকদের অধিকারে ছিল। তারা ভাগচাষী পূর্বতন মধ্যস্বত্বভোগীর। জমি খাস হওয়ার পর তাঁরা যথানিয়ম চাষ করে যাচ্ছেন। কিন্তু গত বৎসর ক্রান্তির হাটের এক দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কিছু বাস্তুহারা ঐ জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে কুঁড়েঘর তৈরী করে। দরিদ্র ভাগচাষীরা তখন জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদন জানায়। পরে ডেপুটি কমিশনার তাদের বলেন যে, মাত্র দশ একর খাস জমি বাস্তুহারাদের দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট জমি তাদেরই থাকবে। এই মীমাংসা সি-পি-আই ও সি পি এম নেতাদের সামনেই হয়। কিন্তু কিছু লোক বাস্তুহারাদের সমস্ত জমিই দখল করার প্ররোচনা দেয়। ফলে, কিছু সংঘর্ষ হয়। গত ২০শে এপ্রিল জবরদখলকারীরা আরও কিছু বেশী সংখ্যক কুঁড়ে নির্মাণ করে এবং ভাগচাষীদের মার-ধর করে।

পুলিশ আক্রমণকারীদের নিরস্ত না করে দু'জন ভাগচাষীকে গ্রেপ্তার করে। ২৩শে এপ্রিল প্রায় এক সহস্র চাষী মিছিল করে জলপাইগুড়ি যায় ও সহকারী ডেপুটি কমিশনারকে তাঁদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার আবেদন জানায়। তিনি অবশ্য জমিটির সীমানা চিহ্নিত করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এপ্রিলের শেষ থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কয়েকবার চাষীরা ডেপুটি কমিশনার ও তাঁর সহকারীর কাছে প্রতিনিধি মারফৎ আবেদন করেছে, টেলিফোন করেছে জমির সীমানা নির্ধারণ করার জন্য এবং তাদের রক্ষা করার জন্য। কিন্তু জবরদখলকারীরা মাল থানার ভার-প্রাপ্ত অফিসারের সক্রিয় সহায়তায় আরও জমি দখল করতে থাকে। চাষীদের আকুল আবেদনে জেলা কর্তৃপক্ষ সাড়া দেন নি। ঘটনা গড়াতে থাকে। ৬ই জুন সকাল ৯টায় যখন চাষীরা চাষ করছিল তাদের নিজেদের জমিতে, জবরদখলকারীরা তাদের আক্রমণ করে: শ্রীবারা রায়কে হত্যা করে ও তার লাস সরিয়ে ফেলে। এই ঘটনা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। দুই পক্ষে লোক জমায়েৎ হয়, এবং সংঘর্ষ হয়। ফলে কিছু লো[illegible] প্রাণহানি ঘটে।

যদি কাউকে দোষী বলে ধরা হয় ত[illegible] সে হচ্ছে জেলা কর্তৃপক্ষ। তাঁরা সমস্যা[illegible] জীইয়ে রেখেছেন। আর প্রতিশ্রুতি [illegible] কাজ করেন নি। এখন দুষ্কর্ম চাপা দেও[illegible] জন্য নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পু[illegible] আমদানি করছেন। রাজ্যের জনসা[illegible] নিশ্চয় বুঝতে পারবেন, কি ঘটনাকে [illegible] করে সংবাদপত্র ও কিছু নেতা সি-[illegible] এমকে দোষারোপ করছে। এই ঘটনা ঘ[illegible] না যদি না সরকারী কর্তৃপক্ষ ঢি[illegible] তেতালা তালে কাজ করতেন, এবং অব[illegible] অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

পশ্চিম বাংলার বামপন্থীদের ম[illegible] স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, কোন অছিলায় ভ[illegible] চাষীদের খাস জমি থেকে জবরদস্তি উ[illegible] করা যাবে না। এক্ষেত্রে বিশেষভ[illegible] উল্লেখযোগ্য যে ভাগচাষীরা এখানে [illegible] সমস্ত জমি বাস্তুহারা জবরদখল করেছি[illegible] তাঁদের সঙ্গে একটি সমঝোতা করার [illegible] সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। আর এস [illegible] নেতৃত্ব সময়মত সহযোগিতা করতে পা[illegible] নি, কিন্তু এখন মার্কসবাদী কম্যু[illegible] সমর্থকদের আক্রমণকারী বলে, এবং জো[illegible] দারদের সাহায্য করছে বলে, ভি[illegible] অভিযোগ করছেন। এটা দুঃখের বিষয় [illegible] যখনি ভাগচাষীরা খাস জমি রক্ষার [illegible] করছে তখনি তাঁদের জোতদারের লোক[illegible] অভিহিত করা হচ্ছে। অন্য কয়েকটি দ[illegible] এই সূত্র ধরে অভিযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির [illegible] কমিটি পরিষ্কারভাবে জানাতে চায়, ত[illegible] সমর্থকরা আক্রমণ করে নি, কিম্বা [illegible] একটা শরিকী সংঘর্ষও নয়। তাঁদের আগের মতই এই সমস্যা সমাধানের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

দুই দলের বিবৃতির বয়ান তুলে হল। বয়ান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সত্যকে গে[illegible] করেছেন। অবশ্য অনেক সময় সত্যকে করবার জন্য মিথ্যা বলতে হয়। এম[illegible] সত্যদ্রষ্টা যুধিষ্ঠির পর্যন্ত ধর্মকে করার জন্য অসত্য বলছিলেন।

যা হোক, এই দুই বিবৃতি প্রক[illegible] হওয়ার পর শ্রীমাখন পাল ও শ্রীপ্র[illegible] দাশগুপ্ত মিলিত হয়ে বলেছেন যে, ঘা[illegible] একটি স্থানীয় ব্যাপার। অথচ দুই [illegible] বক্তব্যের মধ্যে একটি বিরাট নীতি[illegible] সমস্যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। [illegible] দু-দলেই সাংবাদিক ছাড়াও পুলি[illegible] শাসনকর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। [illegible] ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তখন যখ[illegible] শরিকই সুবে-বাংলার গদীতে জবরদস্ত আসীন ছিলেন। তখন তাঁরা কিছু [illegible] পারেন নি। 'সমদর্শী'ও বলবে প[illegible] নিশ্চয় দোষী। কারণ মারপিট যে হবে [illegible] পুলিশের আগেই জানা উচিত ছিল।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

বিপদ বুঝলে মন্ত্রিসভার আয়তন বাড়াও দলবদলের রাজনীতির মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভার সংকট নিরসনের দাওয়াই হিসাবে এটা একটা নিয়মিত ফরমুলায় পরিণত হয়েছে। এক সপ্তাহে দুজন মুখ্যমন্ত্রী এই দাওয়াই প্রয়োগ করেছেন।

দুজনের মধ্যে পাঞ্জাবের শ্রীপ্রকাশ সিং বাদল এই দাওয়াই প্রয়োগে এমন বাড়াবাড়ি করেছেন যে, সেটা একটা কেলেংকারির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ২৭ মার্চ যখন বাদল মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এখন এই মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন মাত্র তিনজন। তারপর গত দশ সপ্তাহে পাঁচবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করে এখন এই তিনজনের দলটিকে সর্বশুদ্ধ ২৯ জনের একটি বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে।

বাদল মন্ত্রিসভা হচ্ছে অকালী দল ও জনসংঘের কোয়ালিশন। অকালী দলের সদস্যসংখ্যা ৫২, জনসংঘের ৭। পাঞ্জাব বিধানসভার মোট ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে এই ৫৯ জন হচ্ছেন সরকারের পক্ষে। আর এই ৫৯ জনের মধ্যে ২৯ জন হয় মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী অথবা পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি। অর্থাৎ প্রতি দুজনের একজন হচ্ছেন মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য।

বিধানসভার কংগ্রেস সদস্য শ্রীউমরাও সিং ঠাট্টা করে বলেছেন যে, পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের মর্যাদা এখন তহশিলদারদের সামিল। রাজ্যে যতজন তহশিলদার প্রায় ততজনই মন্ত্রী।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বাদল তাঁর মন্ত্রিসভাকে এভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়েও তাঁর নিজের দলকে সন্তুষ্ট রাখতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। অকালী হরিজন এম-এল-এ শ্রীদিলীপ সিং পান্ধি বলেছেন যে, মন্ত্রিসভায় হরিজনদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তিনি দলের মধ্যে একটি পৃথক গোষ্ঠী গঠন করবেন বলে জানিয়েছেন। শ্রীরবীন্দর সিংকে রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দিয়ে অপমান করতে চাওয়া হয়েছিল বলে তিনি শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান থেকে উঠে চলে এসেছেন। জনসংঘের সাতজন সদস্যের মধ্যে চারজনকেই মন্ত্রিমণ্ডলীতে নেওয়া হয়েছে বলে দলের একাংশ ক্ষুব্ধ।

মন্ত্রিসভার আয়তন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও দপ্তর পছন্দ না হওয়ায় একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন।

সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে যে, অকালী দলের সম্পাদক শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি সন্ত চমন সিংহের 'ডিক্‌টেটরি'-র প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যেভাবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করা হয়েছে ও যেভাবে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে, সেটা গভীর লজ্জার বিষয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বাদল বলেছেন, 'এখন আর নূতন কোন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে না।' সাংবাদিকরা তাঁর এই বিবৃতির যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা হল, আপাতত আরও কিছু পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নেওয়ার এবং অদূরভবিষ্যতে আরও কয়েকজন মন্ত্রী নেওয়ার রাস্তা মুখ্যমন্ত্রী খোলা রাখছেন।

মন্ত্রিত্বের পদাকাঙ্ক্ষী সকলকে স[illegible] করে নিজের গদী রক্ষা করা দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীটির পক্ষে ক্রমেই কঠিন [illegible] উঠছে তিনি হলেন বিহারের শ্রীদারো[illegible] প্রসাদ রায়। তাঁর সঙ্গে রয়েছে [illegible] কংগ্রেস' ছাড়া আরও ছয়টি দল। এই দলের মধ্যে আবার কম্যুনিস্ট পার্টি, এস পি ও ভারতীয় ক্রান্তি দল মন্ত্রিস[illegible] বাইরে থেকে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন [illegible] যাচ্ছে। বাকী যেসব দলের উপর মুখ্যম[illegible] শ্রীরায়কে নির্ভর করতে হচ্ছে সেগু[illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। তাদের মধ্যে অনে[illegible] মন্ত্রিত্বের পদের জন্য লালায়িত। [illegible] না পেলে তারা কখন কি করে বসেন [illegible] নেই।

একদিকে এই বিপদ, অন্যদি[illegible] 'পুরানো' কংগ্রেস, এস এস পি, স্বত[illegible] জনতা পার্টি ও জনসংঘ দল শ্রীরা[illegible] মন্ত্রিসভাকে উল্টে ফেলে দিতে সচে[illegible] এই দলগুলি মিলে নূতন 'সংযুক্ত বিধা[illegible] দল' গঠন করেছে। এস এস পি-র শ্রীরা[illegible] নন্দ তেওয়ারি এই 'সংযুক্ত বিধায়ক দলে[illegible] নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি যদিও চায় যে, সংযুক্ত বিধায়ক দলের এই নয়া জো[illegible] দারোগাপ্রসাদ মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে দি[illegible] তাহলেও তারা শ্রীদারোগাপ্রসাদ রা[illegible] সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুব সন্তু[illegible] নয়। তারা কোয়ালিশন সরকারের 'সমন[illegible] কমিটি'র সভায় যোগ দিচ্ছে না।

সুতরাং, শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায় নিশ্চি[illegible] হতে পারছেন না। নিজের শক্তিবৃদ্ধি[illegible] তাগিদে তিনি শ্রী এল পি শাহীকে মন্ত্রি[illegible] সভায় নিয়েছেন। শ্রীশাহী নিজেকে লো[illegible]

তান্ত্রিক কংগ্রেস দলের সদস্য বলে পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু এই দলের নেতা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, দল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, দারোগাপ্রসাদের সরকারকে সমর্থন করা হবে কিনা সেই প্রশ্নে লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এই মতভেদের মীমাংসা করতে না পেরেই দল ভেঙে দেওয়ার সিন্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন মুখ্যমন্ত্রী আশা করছেন যে, শ্রীশাহীকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে ভাঙা লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলকে তাঁর সংগে রাখতে পারবেন।

●

মধ্যপ্রদেশের উপনির্বাচনগুলিতে 'নয়া কংগ্রেস' দল চমকপ্রদ সাফল্যলাভ করেছে। বিধানসভার যে-ছয়টি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে, সেগুলির মধ্যে পাঁচটিতেই 'নয়া' কংগ্রেস জয়ী হয়েছে।

ঐ পাঁচটি আসনের মধ্যে গারোথ, নিমচ ও নরসিংগড়-এর আসনগুলিতে 'নয়া' কংগ্রেসের সাফল্য বিশেষ কৃতিত্বের বিষয়। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের এলাকাভুক্ত মধ্য-ভারত অঞ্চলের এই তিনটি কেন্দ্রই জনসংঘ ও গোয়ালিয়রের রাজমাতার শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে এই তিনটি আসন জনসংঘের দখলে ছিল।

বিধানসভার কাটাঙ্গি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে তাঁর নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার পর যে উপনির্বাচন হয় তাতে দ্বারকাপ্রসাদের ভাই "নয়া" কংগ্রেস দলের প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি দাদার মত বৃহৎ ব্যবধানে জিততে পারেন নি বটে; কিন্তু কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে দলের সাফল্য এনে দিয়েছেন।

মুরওয়ারা কেন্দ্রে "নয়া" কংগ্রেস দলের সংগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী এই কেন্দ্রের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে ভোটের ব্যবধান বহুগুণে বাড়াতে সমর্থ হয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশে শুধু বিধানসভার আসনেই নয়, লোকসভার আসনেও "নয়া" কংগ্রেস দল সাফল্য দেখিয়েছে। দুর্গের আসনে "নয়া" কংগ্রেস প্রার্থী "পুরানো" কংগ্রেসকে বহু ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের এই সাফল্য সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামাচরণ শুক্লের হাত শক্ত করেছে।

●

বিপরীত দিকে, হরিয়ানায় "নয়া" কংগ্রেস দলের হার সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলালের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়েছে। সেখানকার তিনটি আসনে উপনির্বাচনে দুটিতে "নয়া" কংগ্রেস দল-"পুরানো" কংগ্রেস দলের কাছে হেরেছে, একটিতে জিতেছে। যে দুটিতে "নয়া" কংগ্রেস হেরেছে সে দুটি ঐ দলের হাতে ছিল।

"পুরানো" কংগ্রেসের যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শ্রীহরদ্বারী লাল। মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল বলেছিলেন, শ্রীহরদ্বারী লালের জয়কে "পুরানো" কংগ্রেস দলের জয় বলে গণ্য করার কারণ নেই। কেননা, মানুষ যেমন করে পোশাক বদল করে তেমনি করে শ্রীহরদ্বারী লাল দলবদল করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ইচ্ছা করলে শ্রীহরদ্বারী লালকে "নয়া" কংগ্রেস দলেও নেওয়া যেত; কিন্তু না নিয়ে ভালই হয়েছে। কেননা, তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পর একটি মন্ত্রিসভা আট দিনে আর একটি দুই মাসের মধ্যে ভেঙে গিয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর এইসব মন্তব্যের জবাবে শ্রীহরদ্বারী লাল তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, তিনি বংশীলাল মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর মরিসাস সফর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মরিশাস সফর করে আসায় এই ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মাত্র আট লক্ষ অধিবাসীর বাসভূমি, ১২৫০ বর্গমাইল পরিমিত এই রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার দুটি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। প্রথমত মরিশাসের অধিবাসীদের প্রায় অর্ধেক হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সেদেশে শাড়ীর মেলা, মন্দিরের ছড়াছড়ি আর ভারতীয় ভোজ্যদ্রব্যের বহুল প্রচলনের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। আজ যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা নিয়ে ভারতবর্ষ বিব্রত হচ্ছে তখন ঘরের পাশে একটি দেশে ভারতীয় পিতৃপুরুষের সন্তানরা নিজেদের অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত আছেন, এটি দেখার জন্য ভারতবর্ষের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে পারমাণবিক বোমার অধিকার থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে ভারত ও মরিশাস সমান আগ্রহী।

মরিশাসের পক্ষে ব্যাপারটি খুবই জরুরী। কেননা, যদিও মরিশাস ভারতের মতই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাহলেও তার বুকের উপর একটি বৃটিশ নৌঘাঁটি রয়েছে এবং তার পার্শ্ববর্তী একটি দ্বীপ বৃটিশের দখলে আছে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে যে চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন মরিশাসকে স্বাধীনতা দেন তার একটি সর্ত হিসাবেই বৃটিশ সরকার ঐ নৌঘাঁটির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন এবং পার্শ্ববর্তী একটি দ্বীপকে মরিশাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের অধিকারে রেখেছেন। মরিশাসের আশঙ্কা এই যে, সুয়েজের পূর্বাঞ্চল থেকে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসার পর ঐ দ্বীপে পারমাণবিক ঘাঁটি তৈরী করাই হচ্ছে বৃটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গেই লক্ষণীয় যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পাঁচদিনব্যাপী মরিশাস সফরের পর তাঁর এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী শিউসাগর রামগোলামের যুক্ত স্বাক্ষরে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভারত মহাসাগরকে পরমাণু বোমা থেকে মুক্ত রাখার দাবীর উল্লে· ·রা হয়েছে।

এই সফরের ফলে অন্যদিকে যেসব অগ্রগতি হয়েছে সেগুলি হচ্ছে, মরিশাসের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনায় ভারতের পরিকল্পনা কমিশন সাহায্য করবেন এবং দুই দেশের ব্যবসায়ীরা যৌথ উদ্যোগে কলকারখানা গড়ে তোলার সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখবেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক দিক থেকে ভারত-মরিশাস সম্পর্কের এই উন্নয়নে সাহায্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সঞ্জয়। তিনি এই সফরে মায়ের সহযাত্রী ছিলেন। প্রকাশ, তাঁকে মরিশাসের মেয়েদের দারুণ পছন্দ হয়েছে এবং তাঁরও সে দেশের মেয়েদের ভাল লেগেছে। মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহু ছবি স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই ঠিক "স্নেহের পাত্র" বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১২-৬-৭০

সম্পাদকীয়

উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ৫৪তম অধিবেশনে পশ্চিমের স্বচ্ছল দেশগু প্রতিনিধিদের সামনে এশিয়া-আফ্রিকা ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার একটি বাস্তব দিক অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছেন। সেই সমস্যা, বলা বাহুল্য, ক্রমবর্ধমান বেকার জনসংখ্যার কর্মসংস্থান। শ্রীগিরি আজীবন শ্রমিক আন্দোলনে সঙ্গে যুক্ত। রাষ্ট্রপতির উচ্চপদে নির্বাচনের পরেও তিনি শ্রমজীবী মানুষের কথা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হননি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই শ্রী গিরি এর সঙ্গে জড়িত। ১৯২৭ সালে তিনি প্রথম এই সম্মেলনে ভারতে শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে প্রথম বক্তৃতা দেন।

এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর চেহারা অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কয়েক শতা এই দেশগুলোর ওপর যে-আধিপত্য বিস্তার করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একে একে বিভিন্ন দেশ থেকে সেই প্রভুত্বে অবসান ঘটে। আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ আজ স্বাধীন। জনজাগরণের ফলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীন দেশগুলোতে হয়েছে শিক্ষার প্রসার। অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে এই দেশগু আজ দীর্ঘ শতাব্দীর বঞ্চনা ও অনগ্রসরতার প্রতিকারে বদ্ধপরিকর। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষ সকল কর্মক্ষম মানুষের চাহিদা, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিতি প্রদান এই দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

আজকের যুগে তাই প্রয়োজন হল জাতিতে জাতিতে এবং জাতির ভেতরে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করা। রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সমবেত প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চলে দারিদ্র্য অন্য অঞ্চলে সমৃদ্ধির পক্ষে বিপদস্বরূপ। আজকের যুগে কোনো একটি জাতি শুধু নিজের সমস্যা ও চাহিদা মিটিয়ে নিশ্চি বাস করতে পারে না। তাকে এক অখণ্ড দুনিয়ার অংশীদার হিসেবে বাস করতে হবে। এশিয়ার সমস্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, জনসংখ্যা বাড়ছে এ-কথা সত্য। কিন্তু তার জন্য অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। উন্নত ধ কর্মসংস্থান নীতি অনুসরণ করে এই জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল কার্মে নিযুক্ত করতে পারলে যে-কোনো দেশের অর্থনৈ উন্নয়নে তারা সহায়কশক্তিরূপে পরিগণিত হবে। আজকের যুগে দেশে দেশে যে ছাত্রদ্রোহ এবং তারুণ্যের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য এবং কর্মসংস্থানের অভাব। একে উপেক্ষা করলে চরম ভুল করা হবে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষ করে অনগ্রসর দেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষ সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি সম্ আজ বিক্ষুব্ধ। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে এই বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সকলকে তৎপর হতে হবে।

এশিয়াতে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ত্রিশ কোটি। আগামী এক দশকে আরও ২২ কোটি লোক বেকারের দলে যুক্ত হয়ে সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলবে। রাষ্ট্রপতি তাই গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের ওপর জোর দিয়েছেন। উন্নত ও শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে যেভাবে মূল ধনতন্ত্রপ্রধান শিল্প প্রসার হচ্ছে অনুন্নত দেশে তা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হতে পারে না। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প এবং কৃষি-শিল্প কর্মসূচীর ভিত্তিতে অনুন্নত দেশগুলোর বৈষয়িক উন্নতির পথ প্র করতে হবে। প্রাচ্যদেশে জাপান এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পশ্চিমী দেশগুলোর সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতিতে পাল্লা দিতে সক্ষ হয়েছে। বৃহৎ শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ না করে গ্রামে কৃষিকর্মের পাশাপাশি ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলে সমস্যা সহজতর হবে এবং কৃষিপ্রধান দেশের উন্নয়নও হবে ত্বরান্বিত।

রাষ্ট্রপতি একজন প্রবীণ শ্রমনেতারূপে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তা ভারত পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গোড়ার দিকে বৃহৎ শিল্পের ওপর নজর দিয়ে ক্ষুদ্র শি ও কৃষিকর্মকে অবহেলা করা হয়েছিল। তাই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক বৃহৎ বেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিনিধিরা নিশ্চয়ই গুরুত্বসহকারে বিবে করবেন। আমাদের দেশের সরকারও যেন রাষ্ট্রপতির বক্তব্য থেকে তাঁদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ইঙ্গিত গ্রহণ ক

শেষ চড়ুইভাতি ॥ জগন্নাথ চক্রবর্তী

তুমি আমায় নাম ধরে ডাকলে, যেন প্রথম,
এবং তখনই আমার হাতের পাঁচটা আঙুল
ঝনঝন করে উঠলো,
তোমাকে গুলি করলাম।

তুমি এখন পালক-ছাড়ানো মোরগ, নিঃস্বর,
বালির উপর তোবড়ানো মুখ
এবং আমি, বাষ্পহীন চোখ, মুখোমুখি,
নিশপিশ-আঙুলে সদ্য বারুদের ধোঁয়া।
তোমার ছুটি
আর আমার মনে আপাদমস্তক ভয়।

তাহলে
এই আমাদের শেষ চড়ুইভাতি।
বারুদের সমুদ্রে তোমার ভেলা ভাসিয়ে দিলাম।
তুমি জানতে ভালবাসা একদিন তোমাকে
ভূমিশয্যায় নিয়ে যাবে,
এবং আমাকেও।
কিন্তু পিকনিকের বিকেলে তুমি একেবারে অবুঝ
তোমার রক্তে বসন্তকাল এবং
হাতঘড়িতে ছোট কাঁটার উপর বড়ো কাঁটা;
তোমার অবুঝ পেশীর মধ্যে আমি খরগোশের
চেয়েও নরম;
তুমি আমাকে হত্যায় বাধ্য করলে।
তুমি এখন স্থির। আমি অস্থির।

আমার জন্য ভেবো না,
আমায় শেষবারের মতো ভাবতে দাও।

বিশ্বাস করো, আমি খুব ভালো নেই,
মাথার উপর কোনো ছাদ আর নিরাপদ নয়,
এখন আমার সব গন্তব্যই পিছনে।
তুমি শান্ত, হয়তো সুখী;
আর আমার মনে আপাদমস্তক ভয়।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে যদি পালাতে পারতে
কী হত?
তাহলেও আবার তুমি, আবার আমি।
কাল, পরশু, বা কোনো পিকনিকের বিকেলে
যখন তোমার হাতে প্রতিহিংসু নিরিখ,
এবং আমি পাপীয়সী, মুখোশের মধ্যে আমার মন,
এবং মনের মধ্যে ছদ্মবেশ,
তুমি না পেয়ে না পেয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে
অবশেষে গুলি করতেই।
আমি তোমায় সে-সুযোগ থেকে রেহাই দিলাম।

তুমি এখন নেই, জানি না হয়তো আছো,
কিন্তু আমার মনে আপাদমস্তক অশরীরী ভয়—
পাছে ভালবাসার কাছে ঘৃণা হার মানে,
পাছে তোমায় নাম ধরে ডেকে বসি!

নির্মাণ ॥ দীপেন রায়

দুখের সেতুতে মুখ মূর্তি যার গড়ি সেই প্রেম
আমার বাঙলার জল-মাটি টেনে মাখানো রোদ্দুর,
একদিকে খরস্রোতা অন্য নদী মরা জলধারা
দুয়ের আকণ্ঠ টান থাড়া-বৃষ্টি জলের ভিতরে।

টান খাচ্ছে হৃদপিণ্ড মুক্ত রক্তে নীল ভালোবাসা,
দুহাত বাড়িয়ে ধরি মাটি ভিন্ন কিছু না কিছু না
পড়ি যাতে ধরে উঠি এই দেশ স্বদেশ আমার—
চালচিত্রহীন মুক্তি হাঁটু জলে ডুবে তা মরার।

অনন্ত প্রেমের উক্তি হৃদয়ের সংবেদনে রেখে
কার কাছে যাই বলো! ভেঙে দেশ গড়ি পুনর্বার।

হে প্রিয় আমার দুঃখ ॥ সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

কে তুমি আমার দুঃখ,
গাঢ় নীল চোখ তুলে
চিরদিন বুকের কাছেই শুয়ে থাকো?
অনুভবে পরাভব,
বড় অসময় দেখো বড় অন্ধকার।
সামান্য আনন্দ দাও,
জ্যোৎস্নাংশের মতো কোনো সুখ
এনে দাও প্রিয়তম, হে দুঃখ আমার!
তুমি এক তৃষিত জোয়ার।
কোন দূর অরণ্যের
অন্তরাল থেকে তুমি ডাকো?
হে প্রিয় আমার দুঃখ
গাঢ় নীল চোখ তুলে
চিরদিন বুকের কাছেই শুয়ে থাকো।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

"সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ"— এই শিরোনামার তলায় পরিপাটি আসন পেতে বসা তো গেল, কিন্তু একটা খটকা কাটছে না। প্রথমত, সাহিত্যিকের চোখ, সে কি সমাজ-বহির্ভূত আলাদা কিছু নাকি। সুন্দর-অসুন্দর, কুৎকুতে বা আয়ত, নীল, ধূসর অথবা পিঙ্গল—বাইরের ব্যাপারটা আর দশ-বিশটা মানুষের যা, সাহিত্যিকেরও তাই। দ্যাখে যে, সে সাধারণ, সকলের মতোই এক লোক; সেই দেখাটাকে যে লিখে রাখে, তার সেই ভাগটুকুর নাম 'সাহিত্যিক'।

এই পর্যন্ত লিখে নিজেকে বলছি 'তিষ্ঠ ক্ষণকাল'। নিছক দেখাটাই সে যদি লিখত, তবে সাহিত্যিক হত খালি কলম-নবিশ বা মুনশি। দেখাটার সঙ্গে ভাবা, চোখের সঙ্গে মনও সে মেলায় আর মেশায় কিনা, ওইখানেই চমৎকারিত্ব তার মুনশি-য়ানার। তাছাড়া, পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রথমটির কাজ যদিও তাকানো, তবু তাকানোরও রকমফের কত: ভ্রূকুটি কিংবা কটাক্ষ, কখনও আঁখি দুটি উৎসুক পাখি, কখনও নম্র-নত, কখনও-বা সরসীর মত; অথবা পূর্ণিমার মতো স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিস্তারিত। এইসব।

আবার, দেখা মানে তো তুলে আনা? সেই অনুভূতি স্নায়ুপথে পরিবাহিত হতে হতে কী ঘটে কে জানে! প্রায়শ দেখি যা পৌঁছল বা অবশেষে বেরিয়ে এল, তা বিলক্ষণ পরিবর্তিত। নতুবা দূরের নীল অরণ্য কদাচ একদঙ্গল বন্য হস্তী হত কি, সূর্যাস্ত কি দিনের চিতা হয়ে যেতে পারত?

একটু দূরে সরে যাচ্ছি: এই প্রসঙ্গে আমার সওয়াল এখনও শেষ হয়নি কিন্তু। সাহিত্যিকের চোখে সমাজ? বেশ। কিন্তু কোন্ বয়সের সাহিত্যিক, এবং কোন্ সমাজ? 'আজকের' বলে সমাজকে না হয় একটা খুঁটিতে বাঁধা গেল, তবু সমাজেরও যে অশেষ স্তর। কোন্ স্তরের দিকে তাকা'বেন সাহিত্যিক তাকাবেন কোথায় বসে, তাঁর নিজের কোনও নীচ বাংলোর জানালায়, নাকি একেবারে গগনচুম্বী মিনার-টিনারের চূড়ায়? অথবা তিনি কি নেমে আসবেন রাস্তায়, যেখানে ঘেঁষাঘেঁষি-মাখা-মাখি সব একাকার? এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন, অনেক কালের তর্ক।

প্রথমে সাহিত্যিকদের গোত্রকুল বিচার করা যাক। বাংলায় অসুবিধা কম, কারণ লেখকদের বেশিরভাগই এসেছেন সেই শ্রেণী থেকে, যে শ্রেণীকে বলা হয়ে থাকে মধ্যবিত্ত। কুলপতি রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ব্যতিক্রম, কিন্তু কথায় বলে ব্যতিক্রমই না বস্তুর প্রমাণ।

ফলে মধ্যবিত্ত মানসিকতা বঙ্গ-সাহিত্যের মর্মে মর্মে। এই মধ্যবিত্তরাও আবার প্রধানত শহুরে, অন্তত বসবাসের সুবাদে বেশির ভাগই যাকে বলে 'কল-কাত্তাইয়া'; সেকালে যাদের বাবু বলা হত, একালেও যাঁদের 'ভদ্রলোক' বলি, যদিও এঁদের অনেকেই মূলত গ্রামীণ, তবু দীর্ঘ-কাল শহরবাসের বশে প্রায় সকলেই অর্জন করেছেন দ্বিতীয় একটি সংস্কার, দৃষ্টি-ভঙ্গী বা অভ্যাস—সেই 'দুরাশা' গল্পের নায়ক কেশরলালের মতো। বদলে-যাওয়া চোখ নিয়েও অবশ্য পিছন ফিরে তাকানো চলে, কেউ কেউ তাকানও। স্মৃতি-রোমন্থন করেন। তারও একটা আলাদা স্বাদ-আমেজ

ধরাই পড়ে না। ঐতিহাসিক ছাপ-মারা উপ-
ন্যাসেও না। এবং সেই ঐতিহাসিক উপ-
ন্যাসও ইদানীং রচিত হয় কদাচিৎ।

আসলে, মাঝে মাঝে ভেবে দেখে
আমরা শিক্ষিতমন্য এক শহুরে সম্প্রদা
কোটি কোটি মানুষের মধ্যে যারা নিতান্ত
সংখ্যালঘিষ্ঠ—আমাদেরই ভাব-ভাবনা রু
সংস্কৃতির পরকলা পরে আর সবাইকে
কিছুকে দেখছি না তো! আমাদের র
ধরন-ধারন অন্যের উপর চাপাচ্ছি। যেম
একদা পৌরাণিক কাহিনীতে দেবতা
উপর মানবিকতা চাপানো হত। য
লোকের, অন্য স্তরের জীবন নিয়েও য
যখন লিখি, তখন তাদের বেশভূষা
মুখের ভাষা মলাতে একটু মালিন্য
সারল্য দিই বটে, কিন্তু ভিতরটাকে আমা
নিজের মত করে সাজাই।

যাদের কথা তারা সেখানে বসে লি
এ-রকম হত না, গ্রামের প্রাণ কলমের ম
ফুটে বের হত। আমাদের সাহি
দুর্ভাগ্য, এই প্রত্যাশা প্রায় পূর্ণই হয়
ফলে দুধের বদলে পিটুলি; ফলে ব
মণ্ডুকের জীবন-দর্শন। কূপের মং
যেমন কূপকে, আমরাও—কলকাতার মা
পরিখাপ্রয়ী কয়েকটি প্রাণী—তেমনই
চৌহদ্দিটাকেই বিশ্ব বলে ঠাউরেছি।

(২)

কাজেই কথাটা উঠছে, কোন্
দেখবে কোন্ সামাজিক স্তরকে। ে

সন্তোষকুমার ঘোষ

আছে, ভিন্‌টেজ-মদ্যের মতন, কিন্তু তা টাটকা-সবুজ সব্জি হয় কদাচিৎ; একটু পীত, একটু নীরক্ত সেই সৌরভ, প্রাণের ঝলক তাতে থাকে না। শহর থেকে 'ড্যাণ্ডি' বাবুরা যেমন গ্রামে যান কখন-সখন, শহর-বাসী লেখকেরাও তেমন গ্রাম্য পটভূমি নিয়ে লেখেন কখনও-কখনও—ওটা চেঞ্জ, লেখার রুচি আর স্বাস্থ্য ফেরাবার কৌশল। যখন গ্রামের কথা লেখেন, তখন এঁদের এক-একজন যেন পূর্বজন্ম-কথক এক-এক জাতিস্মর।

খনি-খেত-মজুরের কথাও মাঝে মাঝে আসে, রাষ্ট্রিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় 'সীমান্ত লঙ্ঘন'। তবে এই লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত স্বীকার করি, কম। সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা আমাদের কথাসাহিত্যের অচলায়তন। সেটাই স্বাভাবিক। যার মধ্যে আছি, যা প্রত্যক্ষ করছি তাকে মুখ্য-উপকরণ করবই বা না কেন। তবে কিনা এর ফলে সাহিত্যের মণ্ডপটি গণ্ডী-ঘেরা ছোট্ট গোহালটি হয়ে যায়। যে-ভারত এত শত বছরের এত আঘাতের পরও স্বস্থানে স্থিত, তার রূপটি

কাল কোন্ কালকে? ভাবীকালকে কি
হবে একালের পরকলা এঁটে? ব
প্রসঙ্গও অনিবার্য উঠে পড়ছে। অন্যত্র ব
করেছি, পরের বয়সকে এই বয়সের ঠ
বসে যেন ভাল করে ঠাহর করতে পারি
বাইরের কিছুটা ভাল ঠেকে, অনেকটা
কিন্তু ভিতরটাতে চোখ যাবে কী ব
দিব্য কোনও রঞ্জনরশ্মি তো নেই। ন
রক্তে মিশে নতুনকে যদি পরখ :
পারতুম! হায়, তাহলে তো এই খোল
বদলে ফিরে আসতে হবে।

এই ঝাপসা চোখে অনেক কিছুই
করতে পারিনে। এ-যুগের রাজ
এ-যুগের প্রণয়, এ-যুগের মন। প্রেম
কালেও কৃত হত, এ-কালেও, অনুমান
হয়। কিন্তু কোনও বান্ধবী 'ক
খাওয়াতেই হবে' বলে কোনও যে
কালেজের করিডরে ধাওয়া করছে,
ছেলেটি 'পয়সা নেই' বলে ত্রাহি-ত্রাহি র
এমন গদ্য-দৃশ্য আমাদের কালে ভাবাই
না। তখন পকেট ফাঁক থাকলে ব

থাকত "চোরের মা-র কান্না, তখন মেয়ে দেখলে বুকের শিরে শিরে ইমন বইত। আর আলাপে তুই-তোকারি? ছিলই না।

তাই বলে বেশি-বয়সীরা কম-বয়সীদের নিয়ে লিখবেন না, তা-ও কি কখনও হয়! লিখবেন, তবে সেই লেখা ঘন ঘন শ্বাস, বা রক্তে মথিত হবে না, তার তাৎপর্য নিহিত থাকবে অন্যত্র। তেমনই মাথায় জজের পরচুলো, পরে রায় দিতে বসাও সাজবে না। তার চেয়ে কম-বয়সীরা কম-বয়সের কথা লিখুক, যে-যার ক্ষমতা আর অনুভব-মত। আমরা বরং আমাদের এই বয়সের কথা লিখি, বিচার করি এই বয়সের যত বাসনা, বিশ্বাস আর আখেরী যত লাভ করা যায়।

"Know then thyself; presume not (others) to scan."

—এই আমার মটো।

আতিশয্য, বিকৃতি, ঘটেই থাকে, যখন জোয়ার আসে। ভাঁটায় আবার সব নেমে যায়, শুধু পলিস্তর পড়ে থাকে। বারে বারে এই হয়—সমাজে, এবং সমাজেরই প্রতিফলিত সাহিত্যে। তবে মিছে স্রোতের তোড়ে ভেসে-আসা আবর্জনা নিয়ে ভেবে ভেবে মাথা ধরিয়ে ফেলা কেন? মনে করি, উনিশ শতকের গোড়াতেও, প্রাচীনেরা ইয়ং-বেঙ্গলদের বাড়াবাড়ি দেখে এইরকমই ভাবিত হতেন, ভাবতেন জাতি-ধর্ম সব গেল, কিন্তু দেখুন ফেনা নিজে থেকেই কবে থিতিয়ে গিয়েছে, কিছু তো রসাতলে

যায় নি। এখানেও সনাতন মূল্যবোধ-টোধ গেল গেল বলে হাহাকার অকারণ। যাকে মূল্যবোধ বলছি, তার সত্যিই যদি কিছু মূল্য, কিছু সারবস্তু থাকে, তবে তা টিকবেই, অন্তত ফিরে আসবে। না থাকলে, চিরতরে যাবে। একদিন তো রূপোর টাকা পকেটে পুরে বাজাতাম, ওটাই ছিল স্ট্যানডার্ড কয়েন। আজ কাগজের নোট দিয়েও তো দিব্যি চলছে। কপালে থাকলে খাপার মাঠেও ফুলকপি ফলাবে।

আসলে বয়স্কদের যেটা বাজে সেটা হল মানসিক নির্বাসন। সময়ের নিষ্ঠুর বিধানে এ'রা কবে স্বীপান্তরে চলে যান। স্বদেশ কালক্রমে বিদেশ হয়ে যায়। বিদেশে গিয়ে কি কেউ স্বদেশের মতো জল-হাওয়া নেই বলে নালিশ করেন? উদাসীন পর-সময়ে, পরিজনদের দ্বারা নামে-সম্মানিত, কিন্তু কাজে-পরিত্যক্ত বয়সে একটা ম্যাডজাস্টমেন্টের অভাব ঘটে, অজীর্ণ রোগে যেমন খাদ্য, ছানি-পড়া চোখে তেমনই সাময়িক আচার ব্যবহারও সয় না। সব তিক্ত লাগে। পরিবেশের কাছ থেকে যা মেলে তা করুণায় পেনসন; পেন্সামের 'ডোল' অপমানের মত ঠেকে। প্রত্যাঘাতের স্পৃহার রূপ নেয় অভিমান। কিন্তু বুদ্ধিমান জন সরে আসেন, নিজেকে গুটিয়ে নেন, দেখেও দেখেন না, শুনেও না শোনেন। নিজের শান্তি, সকলের শান্তির জন্য এই ব্যবহারিক বাণপ্রস্থই তো ভাল! আগামীকালে যারা বেঁচে থাকবে, আগামীকালের ভাবনা তাদের। তিনকাল খোয়ানোরা তো আগামী কালে থাকবেন না।

বদলে যাচ্ছে পরিবারের আকার-প্রকার। সেকালের যৌথ পরিবার একালে আর "সুখী পরিবার" না। এখানকার সুখী পরিবারের ছাঁচটা বড়ই ছোট, তার রঙ যেমন টকটকে, তার প্রতীক তেমনই চোখা, কোণাকাটা। অনেক ছেলেমেয়ে দাদা-দিদি ভাই-বোন কাকে বলে তা জানে না, জানবেই না—নিরোধের কল্যাণে কত সম্পর্কের সম্ভাবনা নিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র মতো কিছু আর কোনও দিন কি লিখিত হবে? হলে, ছেলেমেয়েরা তার মানে বুঝবে? ঠাকুরমা যে কী জিনিস, কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানো আর কানের কাছে ছড়া—তারা তার ঘনিষ্ঠ স্বাদ পাবে কী করে; ছোট্ট যে-ফ্ল্যাটটিতে তারা বড় হচ্ছে, সেখানে বড় জোর বাবা আর মা, কখনও বেড়াতে আসেন মাসী-পিসী বা কাকারা। ঠাকুমা তো সেখানে থাকেন না! নাতনিকে শালী বলে ডেকে কোনও দাদু আজ যদি পার পেয়ে যান তো তাঁর ভাগ্যকে ঈর্ষা করি। বিয়ে যেখানে প্রেমজ, বর-কনে একই শহরে এ-পাড়া ও-পাড়ায়, সেখানে তাদের ছেলে-মেয়েরা মামার বাড়ি গিয়ে মাসখানেক কাটানোর মজাটা জানেই না। ওই আর একটা পাট উঠে গেল; যাচ্ছে।

ভাঙন আরও নানা রকমের ঘটছে—ধরা যাক বিবাহ-বিচ্ছেদ। সব শিশু কি তার বাবা আর মা দুজনকেই পায়, অথবা চেনে? সে-ও একটা অভাববোধ। তা-ছাড়া তাদের তৈরী হওয়ার বয়সে কত ঘটনা, কত দৃশ্য তারা তো চোখের সামনেই ঘটতে দ্যাখে, ঘা খায়, কাদা শুকিয়ে ক্রমশ কঠিন হয়।

অন্য সম্পর্ক থাক—দাম্পত্য জীবনই ধরা যাক। স্বামী-স্ত্রীর দুজনেই যেখানে চাকুরে, একজনের ডিউটি দিনে একজনের রাত্রে, সেখানে ও'রা পরস্পরকে পান তো? পেলে কতখানি, কতক্ষণ? একজন যদি হন শিল্পী, অন্যজন সামান্য? দুইজন দুই রাজনৈতিক দলের? অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারি, জটিলতা ক্রমেই বাড়ছে। বহু গৃহিণীর দিনমানের একটা বড় ভাগ কাটে গৃহের বাইরে—অনেক প্রভাব, অনেক সংস্পর্শ, পরিচয়, অনেক ছাপ ভুল ঠিকানা চিঠির পিঠে ডাকঘরের ছাপের মতো পড়ে। বিশেষ এক সামাজিক স্তরে নিত্য পার্টি, পার্টির পর পার্টি, সেই জীবনই রপ্ত হয়ে যায়, তারই মধ্যে দাম্পত্য বাঁচে হয়ত শুধুই কেতাগত ভাবে, জৈব অর্থে। হয়ত শেষ পর্যন্ত কিছুই বাঁচে না।

স্থূল-সূক্ষ্ম নানা সুতোর তৈরী মাকড়শার জালে এ-কালের জীবন আটকা। তবু তো শুধু নাগরিক জীবন থেকেই টাটকা কয়েক নমুনা দিলাম, গ্রামবাংলা বা মফস্বলের মুখশ্রীও যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে, অর্থনীতি, গ্রামনীতি, জোত-জমি নিয়ে যত সংকটের উদ্ভব হচ্ছে, তার উল্লেখ করলাম না। দূরভিসারী এক-একটা হাইওয়ে খুলে দিচ্ছে দিকের পর দিক—মন্দবহ দৈনন্দিন জীবনের উপরে তারও প্রবল অভিঘাত। এই সব নিয়েই এখনকার জীবন, সমাজ—সব। সেই জীবন নিয়েই সাহিত্য, অখণ্ড অথবা খণ্ডাকার। যে-সাহিত্য জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত ও সৎ, জনচিত্ত তাই অধিকার করে। প্রকৃত সাহিত্য সম্ভাষ-শতক বা সদুক্তি-কর্ণামৃত নয়, ছিলও না কখনও। বিষয়বস্তু কিংবা পরিণামের নীতি বাক্যটি মহৎ বলেই সে-সাহিত্য যে মহৎ হবে, এমন কোনও কথা নেই। অমহৎ, এমনকি আপাত-দৃষ্টিতে অসৎ কথাবস্তু নিয়ে লেখা সাহিত্যও মহৎ হয়, হয়ে থাকে। মূল শর্ত হল জীবন। তবে সে-জীবন শুধু বহিরঙ্গ জীবন কেনই বা হবে। নিরালায় বসে মরমী এবং বয়সী লেখকের যে ভাবনা যাপন, সেই অন্তর্লীন মনোময়তাও আর এক জীবন; সৎ-সাহিত্যের তা-ও উপাদান হতে পারে।

অতিকথা

ছবি বসু

স্টেশনের বিরাট চত্বরটায় ঢোকবার মুখে পানের দোকানটার আরশিতে নিজের মুখ দেখে সে একটু থমকে দাঁড়াল। কপালটা দেখে ত চোখ ট্যারা হবার জোগাড়। রক্ত জমে কালশিটে পড়েছে ঠিক যেন কাজলের টিপের মত।

তার এই ধন্দ ভাবটা পেছনের লোক কেনই বা বরদাস্ত করবে। মন্মথর খেঁকুরে গলাটা শুনিয়ে দিল—কিগো মুর্চ্ছা গেলে নাকি রূপ দেখে?

কথা দেখ বাক্যি শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়, ইচ্ছে হ'ল ছ্যার ছ্যার করে কথা শুনিয়ে দেয়—দেখবনা তোমার গুণধর হাতখানার কীর্তি।

কিন্তু না সে কথা সে বলবে না। বিশেষ করে আজই যখন সব চুকেবুকে যাচ্ছে। এতদিনই যখন সইতে পেরেছে তখন আর একটু ক্ষণের জন্য......

মাথার কাপড়টা গায়ে হেলিয়ে দিয়ে বলে —গাড়ী ফেল হবে বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা ঝিমিয়ে যায়। ঐ একটা কথাতেই বাস। কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে মন্মথ বলে—জল খাও এস।

—তা খাও পেট বোঝাই করে জল খাওয়া যত পার। পেটের হাওড়টা ভরবার মত যত জল ধরে নিয়ে নাও। স্বামীর দিকে আড়-চোখে চেয়ে সে দেখে। খোঁচা খোঁচা আধ-কাঁচা আধপাকা দাড়িগোঁফ। চড়ান চোয়াল আর ঝুলে পড়া ঠোঁটে কেমন একটা বেয়াড়া ভবঘুরে ভাব—এবার যে যার পথ দেখি কি বল।

শুনে দমক মেরে বৌ ঘুরে দাঁড়ায়। মাথার ঘোমটা খসে পড়ে দুটো আরক্ত চোখে আগুন ছোটে।

—যাবে যাও তা আবার অত ঘটা করে পেছন নিয়েছ কেন।

—দূরে পাগল, নিজের জ্বালায় মরি, কে বাঁচল কে মরল কারও কথা ভাবতে বয়েই গেল।

তারপর স্টেশনেই ভিড়ের মাঝে মন্মথ কোথায় যে হারিয়ে গেল তার দিশা পেল না বৌটা। তখন চোখের আগুন নিভে তপ্ত জলের ধারায় বুক গলা ভেসে যায়। আবার এই হাজার মানুষের সামনে চটপট চোখমুছে শান্ত হতে হয়। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা পরিবার ফেলে কতজন নিরুদ্দেশ হয়েছে, কেউবা অভাবে গলায় দড়ি দিয়েছে। তার কপালেও এমনি একটা কিছু হল, তা এমন ঘটা করে ইস্টিশানে এসে বিদায় নেওয়া কেন। যেন ওরা দশ বছরের সংসার করা স্বামী-স্ত্রী নয় যেন নেহাতই পথেঘাটে পরি-চয়। দূরপাল্লার গাড়ী চেপে যে যার জায়গায় চলে যাবে। মনের ফাটল মনেই মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু ধূমকেতুর মত মানুষটা আবার উদয় হল ঠিক তার গা ঘেঁষে—অমন কাপড়ের পুঁটলি পারা হয়ে থেক না।

—সে আমি বুঝব'খন, আর দরদ দেখাতে হবে না। থতমত খেয়ে মন্মথ তার কর্কশ গলাটা সাধ্যমত নরম করে—এতবড় জায়গায় হঠাৎ একটা কিছু জুটে যেতে পারে।

শুনে গলা ফাটিয়ে হাসতে সাধ হয়। যেমন সে একদিন হাসত। আর কি বিপদ হাসলে ওর চোখে জল আসে। আশেপাশের ঘরের বয়সী গিন্নীরা এ হাসি বরদাস্ত করত না। বলত—মেয়েমানুষ আবার অত হাসুনি কেন? ঘরের লক্ষ্মী পালায় এ হাসিতে। হেই মা লক্ষ্মীঠাকরুন, হাসি কেড়ে নিয়েছ

ভালই হয়েছে তবে দুঃখ কিসের কেন হল সে কি আমার হাসির অপরাধে।

স্বামী বলেছে, এতবড় জায়গায় ওর খবর হয়ত মিলবে কিন্তু কেমন করে তাত বলেনি। তবে অতবড় এই কলকাতা শহরে আবর্জনার মত ঘরসংসার থেকে তারা বিদায় হল কেন সে কথা ত তাকে কেউ বলেনি। আবার দশ বছরের বিয়ে করা পরিবারকে আজ নিজের পথ নিজে দেখতে হবে এ কেমনধারা তার স্বামী। ভাবনায় চাপে ভিড়ের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে সে ঘড়িটার নিচে এসে ঠেকল। আপিস ছুটি হয়েছে। একটার পর একটা লোকাল ট্রেন ছাড়ছে। টিকিট ঘরের সামনেই আগন্ডা মেয়েপুরুষের ভিড়। এর মধ্যে অনায়াসে লাইনে দাঁড়িয়ে একটা টিকিট সেও কাটতে পারে।

কিন্তু কোথাকার টিকিট? মনে পড়ছে রাণাঘাট, পালচৌধুরী পাড়া। দশ বছর আগে সেখান থেকে তার মামা বিয়ে দিয়েছিল। তারপর মামা মরেছে। মামী বেঁচে আছে কিনা তাও সে জানে না। ওরা দয়া করে তার বিয়ে দিয়ে জন্মের মত বাপের বাড়ির সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে।

কাজেই ওখানকার টিকিটও কাটা চলে না। আচ্ছা মন্মথও ত কোন ট্রেনে উঠে বসতে পারে। তবে যাবে কোথায়। চা-বাগানে, কয়লাখনিতে শুনেছে হাজার লোক খাটে। শহরের কারখানার ছাঁটাই লোককে তারা কাজ দেবে? দিলে বড় ভাল হয় যে মন্মথ তাকে ছেঁটে ফেলে দিলেও।

মন্মথর নামে পাথরচাপা মনটা আবার টসকালো, হুশ করে কল টেপার মত জল উছলোল, আবার সে চোখ মোছে। একটা মিশকালো পাজামাপরা মানুষ তার চোখের জল দেখে পায়ের কাছে সরে এসেছে।

কটমটিয়ে চেয়ে মাথার কাপড় সে টানল। তারপর উত্তরদিকে এগিয়ে এল যেখানে অনেক মানুষ, অনেক ভিড় দম আটকানো বাতাসের চাপ। আর যাদের মুখ চোখে পড়ে সেসব মুখেই বুঝি মন্মথর ছাপ। ফ্যাকাসে মিয়োন মুখগুলো ঠিক রঙচটা পুতুলের মত। মন্মথর বউয়ের কান্না দেখে তারা থমকে দাঁড়াবে না, কি বলবে? কিছুই বলবে না। দূর দূর কৌতূহল না আর কিছু। এমনতরো আকছার দেখছে শুনছে। বলবে--বানানো গল্পকথা, সরে পড় ভালয় ভালয়। স্বামী পালিয়েছে? আহা কি ভাগ্যিমান পুরুষ, তার চেয়ে নিজের কাঁদুনি পেটে চেপে থাকাই ভাল, কিন্তু মানুষটা বলেছিল হয়ত ভাগ্য ফিরে যাবে, একটা কিছু সুরাহা হবে। সুরাহা মানেটা বটে কি? হাতবদল? এ পুরুষ থেকে ও পুরুষের হাতে। মুখে ঝাড়ু মার অমন ভাগ্যের। আশেপাশের পুরুষগুলোও মন্মথরই গোত্রের। তাদের প্রতিপক্ষ খাড়া করে আক্রোশে বউটা ফুঁসলতে থাকে। সব কিল মারবার গোঁসাই। ইচ্ছে করে ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়কে ছেঁটে বিদায় করতে। উত্তেজনায় বুকটা ধড়ফড় করছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল দুচারজন পুলিশ চোর ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। ওরা যদি মন্মথকে ধরে নেয়, হয়ত নাম দেবে পকেটমার, কিংবা অসামাজিক মানুষ বলে তখন কি তার বউটা শুধু প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখবে। তার কি করবার কিছুই থাকবে না।

মাথার ওপর গাঁক গাঁক করে কথা বিষ্টি হচ্ছে। অমুক প্ল্যাটফর্ম অমুক ট্রেন অমুক সময় ছাড়ছে, আসছে, কথাসাগরে খিজির হাঁড়ি যেন ফুটছে। একটা গমগমে আওয়াজে কানে তালা ধরে যাবার জোগাড়। কোলাপসিবল গেটের ওপিঠে গাড়ীটা এল ফুঁসতে ফুঁসতে। কোথাকার গাড়ী কে জানে? তবে পেট বটে একখানা। কোথায় ছিল এই বাছাধনরা। এ জগতে এত মানুষও থাকতে পারে বটে।

হুমদো হুমদো পা ফেলে কাঁধে বাঁখ বয়ে নেকড়ের মত সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে জনাদশেক মানুষ। ঝুঁকে পড়ে দেখল--তাইত জলছানাই বটে। কি হবে মিষ্টিমাষ্টা গন্ডা গন্ডা বিয়েবাড়িতে যারা হেলাফেলা।

বছর পাঁচেক আগে মন্মথ তার কারখানার হেডবাবুর বাড়ীতে একটা বিয়ের নেমন্তন্নে বউকে নিয়ে গিয়েছিল, কি পেল্লায় সাইজের মিষ্টি, আহা মনে করেও সুখ। সেদিন কেন আরও বেশি খায়নি ভেবে আজকের খালি পেটটা তার গুলিয়ে ওঠে।

মেজেতে ঢালাও মানুষ শুয়ে বসে রয়েছে। তাদের মাঝখানে এক-একটি সংসার --হাঁড়ি-কুঁড়ি, ঘর গেরস্ত। বাড়িওয়ালা না-হয় তাদের বাড়ি থেকে দূর দূর করে খেদিয়েছে, কিন্তু থালা-বাটি, বিছানা মাদুরে কি দোষটা করল? সে সব বেবাক তার নিজের সম্পত্তি।

মন্মথকে বলেছিল—চলনাগো এসব বেঁধেছেদে না-হয় রাস্তাঘাটে ফুটপাথেই দু-চারদিন কাটাব। তোমার চেনা জানা ইয়ার বন্ধু দেখলে ত বয়েই গেল।

তারা ত' সব কিল মারবার গোঁসাই।

শুনে ত বাবুর কি রাগ। দুম-দাম ভাতের মেটো-হাঁড়িটাকে লাথি মারল। দু-চার মুঠো ভাত যা ছিল মেজেতে ছড়িয়ে পড়ল। ভাত ত নয়, অন্ন। স্বয়ং মা অন্নপূর্ণার গায়ে লাথি, তা কখনও সয়?

—তুমি নির্বংশ হবে। বারবার সে দিব্যি দিয়েছে। শুনে মন্মথ ফুক-ফুক করে বিড়ি টেনেছে। যেন বংশ বজায় থাকুক বা না থাকুক তার কিছুই যায় আসে না।

গোটা বেলাটা দুজনে দু-মুখো হয়ে বসে থেকেছে পার্কের দক্ষিণ কোণায়।

শেষ বিড়িটা জুৎ করে টেনে স্বামী বলল—এ-জগতে কে কার, যে যেমন পারি চরে খাব। ভাত-কাপড়ের আশায় আমার গায়ে এঁটুলি পোকার মত আর লেগে থেক না,

আর বউ?

যতক্ষণ ঘরে ছিল ততক্ষণ তার তেজ ছিল। ঘর ছেড়ে পথে নেমে কেঁচো পানা হয়ে গেছে। ঘেন্না-পিত্তিতে বুকটা জ্বলে জ্বলে খাক হয়েছে। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত স্বামীর সঙ্গে চোখ ধাঁধান ইস্টিশানে শুধু এসে জুটেছে।

কিন্তু সুরাহা কথাটার অর্থ কী? এখানে কি জুটবে বল দিকি? মেয়ে-চোরের হাতে পড়বে? দূর-দূর সে কি খুকী? ওর পাকা পাকা চোখ কান দেখে কে না জানবে যে সে দশ বছরের সংসার করা ঝানু গিন্নী। সাধ্য কি কে তাকে ফুসলাবে? পুলিশ মানবে কেন তার কথা? হাকিম কেনই বা পাঠাবে কোন আশ্রয় শিবিরে। মন্মথ যাই বলুক সে জানে ও-পথ তার বন্ধ।

মানুষজনের পাশ কাটিয়ে সে এল তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-ঘরের দিকে, এবার বোঝে, আর ত চলতে পারছে না। মনে পড়ল গতকাল ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গার পর থেকে কুটোটি অবধি খায়নি। মন্মথর পকেট হাতড়ালে কি আর কিছু পাওয়া যেত না হয়ত যেত। আসল কথা, মনের ঘেন্না।

বেঞ্চের ওপর ছেলেকে শুইয়েছিল বৌটি. ওকে দেখে তাকে কোলে তুলে নিয়ে জায়গা করে দিল—

—বসনা ভাই। এই ত জায়গা রয়েছে।

তখন বসল আরাম করে। ইচ্ছে হচ্ছিল পা-দুটো তুলে বসে, কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি ঠেকল।

—তুমি কতদূর যাবে গো?

—যাব ফরাক্কায়, বউটি হাসল। একটু টোল খেল গালে। আসমানি রঙের রোলেক্স ভুরে শাড়ী, মাথায় সিঁদুর আর কপালে এই ধ্যাবড়া এক সিঁদুরের ফোঁটা?

—ফরাক্কা আবার কোন দেশ?

ওর অজ্ঞতায় বৌটি মুচকি হাসল।

—আমিও জানতাম নাকি। উনি বাঁধের আপিসে কাজ করেন তাই ত' জানলাম।

—কোলে ত' দেখছি কাঁচ ছেলে। তা যাচ্ছ কার সঙ্গে? দিনকাল ভাল নয়, একা একা যাওয়া ঠিক না।

বিজ্ঞের মত সে মন্তব্য করল।

—না-গো সঙ্গে দেওর আছে। বাপের বাড়ি এসেছিলাম তা মাস সাতেক হবে। ছেলের ছ' মাসের হ'ল। যাব-যাচ্ছি করে বাপের বাড়ী হতে শ্বশুর বাড়ি ঘুরে ঘুরে ফেরা হচ্ছে।

--ঘরের মানুষটিকে ছেড়ে এতদিন! ও ফস করে বলে বসল। তারপর রসিকতায় দুজনেই হেসে উঠল; যেন দুজনে দুজনকে কতদিন চেনে। সমবয়সীর মনের কথা জানাজানি হয়ে যাবে এই মুহূর্তে। বউটির হঠাৎ মনে হয় তাই ত' তারও ত কিছু জানা দরকার তাই বলে—

—তুমিও নিশ্চয়ই তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছ না?

—মোটেই না। যাচ্ছি দুজনে ননদের বাড়ি শ্যামনগরে। শুধু হাতে কুটুমবাড়ি কি যাওয়া সাজে। তাই দশটা টাকার সন্দেশ আনতে গেছেন।

—তা বটে।

বউটি ছেলেকে চাপড়ে ঘুম পাড়ায়।

সামনে দিয়ে নতুন বিয়ে হওয়া বর-বৌ যাচ্ছে, লাল শাড়ী পরা গয়না মোড়া বউ তার পায়ে আলতা, রুপোর মল। বরের পেছন পেছন আড়ষ্ট পায়ে বৌ চলেছে। বরের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায়

জোনার টোপর আর তাদের সঙ্গে কুলির মাথায় নতুন ট্রাঙ্ক, বিছানা থেকে একটা নতুন মিঠে গন্ধ ওদের সামনে হাওয়ায় সূক্ষ্ম জালের মত মিশে রয়েছে।

তাইত রাগ করে কাপড়-জামা ফেলে এক বস্ত্রে চলে এল। বাক্সে তারও বিয়ের চেলিটা ছিল।

খোকার মা এই বউটি বল্লে—বরের বাপু বয়েস হয়েছে। মাথায় হাঁ-হাঁ করছে টাক। বউটা বড় কচি।

—না অমন কি আর বয়স? পুরুষ-মানুষ ওদের চেহারাই অমনি কড়া।

এমন সময় বউটির দেওর এল হন্তদন্ত হয়ে। চোঙ্গা প্যাণ্ট পরনে ছেলেটির। এক মাথা রুখু চুল আর গাল বয়ে জুলফি।

এক ঘটি জল আর দু-খিলি পান দিয়ে বল্লে—বউদি খোকনকে নিয়ে এবার ওঠ। আমি কুলি ডাকি ট্রেন এসে গেছে।

বউটি একটি পান ওর হাতে দেয়—

—ওদিকে এলে আমাদের কাছে এস কেমন? হেডবাবু মুখুজ্যের নাম করলেই সবাই চিনবে। একা-একা থাকি, সব কুলি-কামিন। ভদ্দর লোকের বসতি তেমন একটা হয়নি। কথা বলতে না পেরে প্রাণ আই-ঢাই করে।

পানটা মুখে দিয়ে ও যেন নিংড়ে রস যার করে তার ছিবড়ে গিলে ফেল্ল। কত-কালের চেনা-জানা যেন বউটি। তার হাতটা ধরে বলে—

—কাজ খালি আছে নাকি ভাই তোমাদের ঐ ফরাক্কায়।

পানের রসে রাঙা ঠোঁট উলটে বৌটি বলে—কাজের খবর কাজের লোক জানে। আচ্ছা ভাই জিজ্ঞেস করব'খন। তবে কার জন্যে বলত?

বৌটি থমকে ওর চোখে চোখ রাখল।

ওর গলা কাঁপল, চোখের পলক নেমে আসল—আমার এক আত্মীয়ের জন্য বলছি। আজ ছ'মাস বেকার বসে আছে। দেখ না সেই পাট-কলে কাজ করত, মোটা হপ্তা ঘরে আনত। এককাঁড়ি লোক দুম করে ছাঁটাই হয়ে গেল।

—বলব'খন ও'কে। কত লোক ত তাঁকে জিজ্ঞেস করে। আচ্ছা চলি ভাই।

—ছেলে কোলে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে বউটি দেওরের পিছু পিছু চলে গেল।

সেও এগোল এই গমগমে শব্দের মধ্যে। এখন আর পায়ে ব্যথা নেই। পানটা খেয়ে প্রাণ বেঁচেছে।

— আপনি কোন প্ল্যাটফর্মে যাবেন দিদি?

—এই যাব আর কি...

—সঙ্গের লোককে বুঝি খুঁজে পাচ্ছেন না?

—কে বল্লে? বউটি কটমটিয়ে চায়।

—তবে ভুল করেছি। ছেলেমানুষ ছেলেটি ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

ও হয়ত সত্যি তাকে সাহায্য করতে এসেছিল। নিশ্চয়ই কোন পড়ুয়া ছেলে হবে। দিদি বলে ডাকল আর সে দুম করে মানুষটাকে অবিশ্বাস করে বসল। সবাই সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায়। ছেঁটেকেটে ফেলতে চায় ক'জনা?

বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা মনে হচ্ছে। শীত করছে। থামের গা ঘেঁষে আঁট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর এগিয়ে এল কোলাপসিবল গেটের দিকে। কি ভেবে পিছোল। টিকিটবাবুরা সব নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। হয়ত তাকে বেরিয়ে যেতে বলবে মাথার ওপর ছাতওয়ালা এই আশ্রয়টুকু থেকে।

ইতিমধ্যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়েছে কত। লোকাল ট্রেন, সব একে একে ছেড়ে গেছে। ভিড়ের সেই আড়ষ্ট ভাবখানা ক্রমশ কেটে একটু ফিকে পানা বোধ হচ্ছে। সবাই যাচ্ছে আসছে, কেউ দাঁড়াচ্ছে না, শুধু পড়ে আছে সে আর গুটিকয় বাস্তুহারা পরিবার। ওদেরও হাবভাবে চাঞ্চল্য নেই। হয়তো তার মত ওদেরও সংসার কাটি হারিয়ে গেছে।

কুয়াশা আর ধোঁয়ায় ব্রিজের ওদিকটা অস্পষ্ট ঠেকছে। মানুষজন, বাস, গাড়ী চলছে আবার বুঝি চলছে না। সাদা-কালো আঁকা-বুঁকো ওরা ঠিক বায়স্কোপের ছবির মত। এর মধ্যে মন্মথ নামে যে মানুষটার বুকের গোড়ায় শুয়ে সে দশ বছর কাটিয়েছে, সেও একটা ফুটকি হয়ে মিলিয়ে গেল।

কি সুন্দর বাস মাগো, আস্তে আস্তে সে শ্বাস টানল। ফুলের দোকানটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মোটামোটা গোড়ে মালা। গুচ্ছ গুচ্ছ টকটকে তাজা গোলাপ।

কম বয়সী আইবুড়ো মেয়েটি এই এত গোলাপ কিনল। সঙ্গের ছেলেটি বলে—আমার হাতে দাও, কাঁটা লাগবে।

—ইস, কাঁটার ভয় করলে চলে বুঝি? এমনিতে বুঝি কম লাগছে!...

মেয়েটির চোখে ঝকঝকে হাসি। গায়ের ওপর তার চুলের লম্বা বিনুনি। ছেলেটি একটি গোলাপ তার চুলে গুঁজে দিল।

—এই এখানে অসভ্য কোথাকার।

ওদের কথা আর হাসিতে কেমন চাপা-রহস্যের বুনুনি। এমন টুকরো টুকরো কথার অর্থ কি হতে পারে সে ভাবতে লাগল।

হবে হয়ত ওরা নিকটবন্ধু নয়ত ভালবাসাবাসির লোক। ঠিক বায়স্কোপে যেমন দেখা যায় তেমনটি।

মেয়েটি বল্লে—চলনা একটু কফি খেয়ে নিই। নেমন্তন্ন খাওয়ার পর কফিটা যা জমবে...বলতে বলতে মেয়েটি থমকে যায়। চোখে পড়ে আধময়লা শাড়ী জড়ান শহর ও গাঁয়ের মেশামেশি এক বউ তাদের কথা গিলছে।

ওদের স্বপ্নের জগৎটা বুঝি খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ে, ছেলেটির কনুই ধরে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় মেয়েটি রেস্টুরেন্টের দিকে। ওদের পেছন পেছন ও এগিয়ে যায়। ভেতরে ধপধপে চাদর মোড়া টেবিল আর চেয়ার, জালের দরজা ফাঁক হয়ে আবার জুড়ে গেল। তার মধ্যে মিলিয়ে গেল বুঝি একজোড়া সাদা লক্কা পায়রা।

যাত্রী আসছে রাশি রাশি। অজস্র মানুষ কাঁধে পিঠে বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ঠেলাঠেলি করছে। দেহাতী মেয়ে-পুরুষ যাবে গঙ্গাসাগরে, কপিল মুনির আশ্রম দর্শনে। এদের মাঝে হারিয়ে গেলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

বৌটা এটা-সেটা ভাবতে ভাবতে কোলাপসিবল গেটের লোহায় মাথা দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। সেই মেয়েটি কি এখনও ফুলগুলো বুকের কাছে চেপে ধরে গলগল করে কথা বলছে? বাপস্‌ এত কী কথা যেন খই ফুটছে।

আর দেখ দিকি ফরাক্কার সেই বউটির সঙ্গে কথার পর আজ এই এতক্ষণ সে বোবাটি হয়ে রয়েছে, অথচ কত কথা যে তার জমে রয়েছে। ফরাক্কার সেই বউটির মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পান খাওয়া টুকটুকে রাঙা ঠোঁট, আর কপালে এই ধ্যাবড়া সিঁদুর ফোঁটা। সিঁদুর গড়িয়ে নাকে পড়েছে। পড়বে না বাস্তবিকই স্বামী সোহাগিনী বউটা। সে ওর চোখের চাউনিতে, মুখের তৃপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু ওমা ঐ দেখ, ওর কপালেও কালসিটে। কোথায় সেই সিঁদুর ফোঁটা, সারা কপালে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রয়েছে জমাট বাঁধা একটা রক্তের ডেলা।

তারপর কী ভেল্কি দেখছে সে এ-বউ ও আর কেউ নয়, নিজের মুখ নিজে চেনে না কী লজ্জার কথা! জলের ঘটি আর তবক মোড়া পানের খিলি এনে মন্মথ বলছে—ওগো শুনছ, ও পদ্ম-বৌ। খোকাকে কোলে নিয়ে চটপট এস। ট্রেন এসে গেছে। ওদিক কুলিরা মাল তুলতে লেগেছে।

নতুন ট্রাঙ্ক, নতুন সজ্জা, খোকার দোলনা আর সব ছাপিয়ে বেল ফুলের ম'ম করা গন্ধ।...

হঠাৎ মাঘের কনকনে হাওয়ায় ঘুমের চটকটা ভেঙে যায়। দেখে নেহাতই মেঝেতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাশে বসে ডাকছিল তাকে দশ বছরের সংসার করা সেই চেনা মানুষটা।

কপালে হাত দিয়ে দেখল ফুলোটা এখনও তেমনি রয়েছে। সবই যদি তেমনি থাকবে, তবে এতক্ষণ সে কি করছিল?

—ওগো চল এবার ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না। না-হোক ক্ষতি নেই। স্বামীর হাত ধরে আধ-ঘুমো পদ্ম-বৌ স্টেশনের ঐ বিরাট চত্বরটা পেরিয়ে রাস্তায় নামল।

সুখের মেলা

গন্ধ-ভেদালী

গেঁদালী বা গন্ধ-ভেদালী পাতা আনতে বলেছে মা। রোগা ভাইটা পথ্য পাবে আজ। শিঙিমাছ, কাঁচকলা আর গেঁদালী পাতার ঝোল নাকি খুব উপকারী। শিরীন গাছটাকে ভাল করে চেনে না। মা বলেছে, 'কবরস্থানের জঙ্গলে, আমাদের আনারস-বাড়ির কাছে দেখিস, লতানে গাছ, কালচে সবুজ একটু লম্বাটে পাতা 'মলচে' দেখলেই যেন এক দুর্গন্ধ পাবি, যা আন গে।'

কবরস্থানের নির্জন জঙ্গল। শত শত সুদীর্ঘ সরল দেবদারু গাছ আকাশ-ছাওয়া-সবুজ-পত্র-সম্ভারে সমাচ্ছন্ন। আম, জাম, করোমচা, খিরিশ, বাঁশ, কলাগাছের নিবিড় জড়াজড়ি। দেবদারু বনের নিচে কবরস্থান। কবরের গর্ত বা জোল পড়ে আছে চারদিকে। চারদিকে লতা-গুল্ম ঘাস-আগাছা। মাঝে মাঝে সরু সিঁথির মতন পায়ে-চলা অস্পষ্ট পথ। আম কুড়োতে, নারকোল বা পাতা কুড়োতে আসে ছেলেমেয়েরা। দক্ষিণ দিকে আমির আলী মণ্ডলের পুকুর, ফলের বাগান। বড় বড় পেয়ারা পেকে আছে। গাছভরা পাতিলেবু। আনারস পেকে আছে অনেকগুলি। ডালিম, সবেদা, বেল, পেঁপে, কলা পেকে আছে গাছে গাছে। কেউ একটাতেও হাত দেয় না। মোড়ল ভীষণ পাজি লোক। চুরি করার সময় ধরতে পারলে সাবাড় করে ফেলবে। মোড়লের জমিতে সদ্য রোয়া ধান বাড়ির মধ্যে দিয়ে একটা লোক অন্য ক্ষেত থেকে কাজ সেরে আসছিল একবার—তাকে ধরে এনে কাস্তে দিয়ে একটা কান কেটে নিলে আমির আলী মোড়ল। অনেক টাকা ঢালা সত্ত্বেও মোড়লের তিন মাসের জেল হয়ে গেল! সেই সময় পাড়ার ছেলেরা যা একটু সুখ করে মোড়লের বাগানের নারকোল, কলা, আনারস, পেয়ারা, লেবু, কাঁটাল ধ্বংশ করতে পেরেছিল। মোড়ল এখন চৌকি দিতে আসে—চুপচাপ বনের মধ্যে বসে থাকে। ধরতে পারলেই মুশকিল!

শিরীন দেখলে কবরের গর্ত থেকে দুটো শিয়াল ঝুপ-ঝুপ করে ওদিকে বাঁশবনের মধ্যে চলে যাচ্ছে পিছন ফিরে মাঝে মাঝে তাকে দেখতে দেখতে। শিয়ালগুলো এই নির্জন সুশীতল ছায়াঘন জঙ্গলের মধ্যে আরামসে সারাদিন শুয়ে ঘুমোয় আর রাত নামলে ঘুরে বেড়ায় খাদ্যের সন্ধানে। মরে গেলে মানুষকে এখানে কবর দিয়ে গেলে ওরা কবর খুঁড়ে খেয়ে নেয়। তাই জমপেশ করে বাঁশ আর কাঁটা দিয়ে কবর দিতে হয়। আশ্চর্য, যে কারো কারো কবর ওরা আবার আদৌ ছোঁয় না! দিনের বেলা পাড়া থেকে মুরগী নিযে পালিয়ে এসে এই নির্জনে বসে বসে খেয়েছে, কত সব শাদা কালো আর রাঙা রাঙা পালক পড়ে আছে।

শিরীনের ভয়ে গা ছমছম করছিল। প্যাঁচা ডেকে উঠল কাঁটাল গাছের ওপরে। বিড়ালের মতন গোল গোল কটা চোখ, ঠোঁটটা যেন নাক—চ্যাপটো মুখ—মাথা নাচিয়ে শিরীনের দিকে ভেংচি কাটে! তারপর একবার ছোঁ মেরে যায়। খিরিশ গাছের কোটরে বোধহয় ওদের বাচ্চা আছে। বাচ্চা পেড়ে নেবার ভয়ে ওরা ঐরকম চিৎকার করে। একবার শিরীন দেখেছে, বিরাট একটা কেউটে সাপ গাছ বেয়ে জড়িয়ে উঠে নারকোল গাছের কোটরের

মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পাখির বাচ্চা খাচ্ছে আর এক ঝাঁক শালিক এসে চিৎকার জুড়েছে। ছোঁ মেরে খোপর দিয়ে অস্থির করে তুলছে সাপটাকে। সাপটা মাঝে মাঝে মুখ বার করে ছোবল হানতে চেষ্টা করছে।

মা বলেছে, 'খুব সাবধানে পা ফেলবি মা। চন্দ্রবোড়া শুয়ে থাকে ঘাস জঙ্গলের মধ্যে।'

শিরীন দেখলে তাদের আনারসগুলো গাছ থেকে ভেঙে এনে কারা বাঁশতলাটার নিচে বসে ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে আরাম করে খেয়ে গেছে।

কতকগুলো পাতার গন্ধ শুঁকলে সে। এটা তো বন-তুলসী, এই হল ভেঁট, কাল-কাসুন্দে, কালমেঘ, বিশল্যকরনী! গেঁদালী গাছ তো লতা গাছ! গাছটা সে ঠিক চিনতে পারছে না। খালি হাতে গেলেই মা গালাগালি করবে'খন। বলবে'খন, 'বে' দিলে ছেলের মা হয়ে যেতিস, তোর জুড়ি মেয়ের ছেলে হয়ে গেল, ষোল বচ্ছরী হয়েও তুমি এখনো খোলায় খুদ খাও, মালায় দুধ খাও!...'

মোড়লের বেড়াটার ধারে দাঁড়িয়ে সে পাকা ফলগুলো দেখছিল। কত পাকা লেবু পড়ে আছে গাছতলায় বিছিয়ে। হঠাৎ দেখলে আমির মোড়ল—ডাঙার মধ্যে রয়েছে! কলাবনের মধ্যে বসে বসে, হেঁট হয়ে পড়ে কি যেন করছিল। তাকে দেখে এগিয়ে এল। শুধোলে, 'কে লো বুন, শিরীন না? জঙ্গলে কি মনে করে ভাই?' মিষ্টি করে কথা বললে মোড়ল।

শিরীন বললে, 'গেঁদালী পাতার জন্যে এসেছি মোড়লদা। খুঁজে পাচ্ছি না। আমি গাছটা ঠিক মতন চিনি না।'

'গেঁদালী গাছ?' গন্ধ-ভেদালী? এইতো আমার বাগানের মধ্যে কত হয়ে রয়েছে। ক'গাড়ি চাই তোর? আয় নিয়ে যা।'

'কি করে যাব? বেড়া যে! তুমি দাও!'

'ঐ তো, ঐ ফাঁকটা গলে আয়। আর চাট্টি ফল দিচ্ছি। পেয়ারা নিবি? ডালিম নিবি? পাকা আনারস দুটো নিয়ে যা।'

শিরীন একটু দ্বিধা করলে, ইতস্তত করলে। মোড়লের চোখ-মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করলে। এই নির্জনতা। সোমত্ত ডাগর মেয়েছেলে। যৌবন শিউরে উঠছে দেহে। ইস্কুলের মাস্টার দুলাল দাদামশায় ঠাট্টা করে বলে, 'তোর খুব সুন্দর বর হবে রে শিঁরি! তোর চোখ দুটো ভাল। চেহারার গড়নটাও ভাল। আমাকে মনে ধরে তো বল, ঘর-সংসার, মান-ইজ্জৎ সব ফেলে রেখে তোকে নিয়ে দেশান্তরী হই!' শিরীন বলেছে, 'মুখে ছাই তোমার বুড়ো!' আমির আলী মোড়ল পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে! কপালে দাগ হয়ে গেছে! রোগা ভাইয়ের জন্যে গেঁদালী পাতার ঝোল চাই। ফলগুলো দিলে সে খেতে পাবে। ভারী টাইফয়েড গেল। ডাক্তার ফল খেতে দিতে বলেছিল।... পয়সার অভাবে গরিব বাপ তার আনতে পারেনি। বেড়া গলে ভেতরে গেল শিরীন। মোড়ল হাসতে লাগল। দুটো ডালিম পেড়ে তার বুকের ডালিমের ওপরে হাত ছুঁইয়ে কাপড়ের মধ্যে রাখতে দিলে! চারটে বড় বড় পেয়ারা পেড়ে দিলে ছোট মতন গাছের ডালে উঠে। পেয়ারা দেবার পর দুটো আনারস ভেঙে দিলে। লেবু দিলে আট দশটা। আঁচল ভরে গেল! গন্ধ-ভেদালী পাতাটা দিলেই এবার চলে যাবে সে। কিন্তু মোড়ল তার চিবুক ধরে শুধোল, 'কি, খুশী তো! ভারী সুন্দর তোমার মুখটা তো!' বলেই সে তাকে ধরে চুমো খেতে গেল!

শিরীন ভয়ে যেন একেবারে কেমন হয়ে গেল! 'মা'—বলে একবার চিৎকার করে উঠল। মোড়ল হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কলাবনটার ভেতরে।

'আহা, ছাড়ো না মোড়ল-দা, ছিছি, কেউ দেখতে পাবে যে! মাকে বলে দেব।'

'বলে দিলে আমি বলব আমার বাগানের ফল চুরি করেছে!'

'আমি চুরি করেছি? তুমি তো ডেকে দিলে!' ফলগুলো ছড়িয়ে পড়ে গেল আঁচল থেকে। মোড়লের তাজা দীর্ঘ শরীরের রক্ত তখন মরুভূমির মতন গরম হয়ে গেছে। সে জোর করে শিরীনকে মাটিতে ফেলে দিল। শিরীন চিৎকার করতে গেলে তার মুখটা চেপে ধরে রইল। শিরীন কাঁদতে লাগল। হাতের চুড়ি ভেঙে হাত কেটে রক্ত বার হতে লাগল। মোড়লের দাড়িগুলো শিরীনের মুখে বুকে ফুটতে লাগল। তবু সে হঠাৎ জোরে এক লাথি মারলে মোড়লের বুকের ঠিক মাঝখানটাতে। মোড়ল পড়ে গেল উল্টে।

শিরীন উঠে পড়ে শাড়ি জড়াতে জড়াতে কেউটে সাপের মতন ফুঁসতে লাগল: 'হারামীর বাচ্চা, তোর মা বুন নেই! তোর সোমত্ত মেয়ে আছে না?' একটা আনারস কুড়িয়ে নিয়ে জোরে ছুঁড়ে মোড়লের মুখে মারলে সে। মোড়ল তীক্ষ্ণ চোখে এখন পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করলে। বললে, 'তোর পায়ে ধরি শিরীন, কাউকে বলিস না। তোকে একশো টাকা দোব, শাড়ি দোব, গয়না দোব। তোকে সাদি করব! তোর দেহ এত সুন্দর! এত নরম!...'

'চুপ কর শয়তান! আমি এক্ষুনি পাড়ার সব লোককে বলছি। বিচার ডেকে তোর মাথায় ঘোল ঢালব। পাঁচ খুরে করে তোকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সাত গেরাম ঘোরাব!'...

তখন ক্রুদ্ধ এবং হতাশ মোড়ল হঠাৎ ছুটে এসে আবার ধরলে শিরীনকে আর চিৎকার করে ছেলের নাম ধরে ডাকতে লাগল, 'আসগার আলী রে! —দৌড়ে আয় —চোর ধরেছি'—

শিরীন দেখলে, উল্টো বিপদ!

মোড়লের ছেলেরা তার বাপের দরাজ গলার চিৎকার শুনতে পেয়েছে। লাঠি নিয়ে তারা ছুটে আসছে।

শিরীন হাত মোচড়াতে থাকে। বলে, 'ছেড়ে দাও মোড়ল-দা, তোমার পায়ে ধরছি।'

'আর ছাড়া যায় না! এখনো বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে নষ্ট করেছি এটা যদি বলো তোমার জীবন 'বরবাদ' হয়ে যাবে! কেউ তোমাকে আর ঘরে তুলবে না!'

মোড়লের ছেলেরা এসে পড়ল হই হই করে।

মোড়লের বড় ছেলে আসগার দেখলে ভারী মজা! শিরীনকে প্রেমে ফেলবার জন্যে সে কত কায়দাকানুন করেছে, শেষে পাড়া জুলপি পর্যন্ত রেখেছে, তবু মেয়েটা পটে না! ভারী দেমাক দেখাত টিউকলে জলের জন্যে যাবার সময় ঠোঁটে বঙ দিয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে! কিন্তু এখন? তার হাত ধরলে আসগার। ফলগুলো দেখিয়ে বললে, 'এসব কি?'

'তোর বাপ দিয়েছে!'

'মোর বাপ দিয়েছে?' মোড়ল তখন চলে যাচ্ছে। আসগার চুমু খাবার ভঙ্গী করে বললে, 'সোনামণি!'

সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে।

ঠাস করে গালে চড় মারলে শিরীন। হাতে কামড়ে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেড়া গলে সে পালিয়ে গেল!

ছেলেরা তাড়া করলে, 'ধর শালীকে! ধর শালীকে! থানায় নিয়ে চল!'

চেঁচামেচি শুনে শিরীনের মা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। মেয়ের ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, ঝাঁকড়া চুল, রক্ত-মাখা হাত-মুখ দেখে আঁতকে উঠে বললে, 'কি হয়েছে শিরীন!'

শিরীন মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু একবার 'মা' বলে উঠল! তারপর নীরব। সে অজ্ঞান হয়ে গেল!...

মোল্লাদের বাড়ির যত মেয়েছেলে লোকজন সবাই জুটল। মাথায় জল-ঢালা

হতে লাগল শিরীনের। মেয়েদের আন্দাজে মোড়লপাড়ার সবকটা ছোঁড়া শিরীনকে একা জঙ্গলের মধ্যে পেয়ে ধর্ষণ করেছে।

শিরীনের মা আকলিমা বিবি হাত-পা ছড়িয়ে সুর করে কাঁদতে বসল : 'হায় আমার কপাল রে আল্লা, তোকে একলা কেন বনজঙ্গলে পাঠানু মাগো, হায় বাবা গেঁদালী পাতা, তোর মনে এই ছ্যালো! মোর মন্দমানুষ এখন ঘরে ফিরে মোকে কি বলবে! কাঁচা মেয়েটার মাথা আমি খেনু গো!...'

পুরুষরা লাঠিসোটা ছোরা বল্লম বার করতে লাগল। কিন্তু শিরীনের মুখ থেকে আসল কথাটা শোনা দরকার। সে সুস্থ হোক। কাছের চটকল থেকে শিরীনের বাপ দুপুরে খেতে ফিরুক।

দুপুরে দু' পাড়ার মধ্যে 'দুপুরে-মাতম' শুরু হয়ে গেল। প্রথমে মেয়েরা গাল পাড়তে লাগল মোল্লাপাড়া থেকে। তারপর বেরুল মোড়লপাড়ার মেয়েরা। দু'পাড়ার দু' দল মেয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে যেন লড়াইয়ে নেমেছে। একবার সামনে আসছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। পরে বেরুল পুরুষরা। লাঠি সড়কি বল্লম হাতে। শিরীনের বাপ আনসার আলী মোল্লা বল্লম নিয়ে বার বার ছুটে যেতে গেলে তাকে শিরীনের মা কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে রাখতে লাগল। শেষে যখন মোড়ল আমির আলী তার দলের লোকদের পিছনে সরে যেতে বলে একাই খালি হাতে সাহস-ভরে এগিয়ে এসে বলতে লাগল, 'মাথা গরম করিস নি আনসার, তোর মেয়ে বাগানের ফল তুলেছিল কিনা হলপ করে বলতে বল—আর আমিও বলছি—তোর মেয়ের গায়ে কেউ হাত দেয়নে বাপ—! তোরা কি ঐ মেয়েছেলেটার কথা শুনে আমাকে মারবি? একটু বিচার করবিনি? তখন আনসার হঠাৎ তার স্ত্রীকে এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিয়ে বল্লম নিয়ে ছুটে গিয়ে মোড়লের পেটে বুকে ঘ্যাচাঘ্যাচ খুঁচতে লাগল! মোড়ল চিৎকার করতে লাগল! রক্ত! রক্ত! আসগারের ছেলেরা ছুটে আসছে দেখে মোল্লারাও খোলা তলোয়ার তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল সামনের দিকে। হেঁকে বললে, 'খামোস! এগুলেই বাপের সঙ্গের-সাথী হবে! একটার জায়গায় দশটা পড়বে!'

মোড়লের লাস পড়ে গেল!

আনসার চলে এল বাড়িতে। মোড়ল-পাড়ায় কান্না-গোল পড়েছে। মোড়লকে মেরে ফেলেছে শুনে ভয়েই আবার অজ্ঞান হয়ে গেল শিরীন।

পুলিশ এল সন্ধ্যার পর।

আনসার আলীপুর কোর্টে হাজিরা দিতে চলে গেছে। বড়দারোগা রিপোর্ট লিখতে লাগল। লাসটা ঝাংলার মধ্যে মুড়ে বাঁধা হল। ভ্যান গাড়িতে তোলা হল।

বিচারে আনসারের ছ-মাস জেল হল। ধর্ষণের চাইতে মানুষ খুন অনেক বড় অপরাধ—(যুদ্ধ বাধিতে রাজা বা রাষ্ট্র-প্রধান লক্ষ লক্ষ মানুষ মারলে তার বিচার নেই) শিরীনের ওপর ব্যভিচারের প্রমাণের জন্যে বেশি সাজা হল না।

ফল হল, শিরীনের আর বর জুটল না। আনসার জেল থেকে ফিরে বাধ্য হয়েই মোড়ল আমির আলীর গোঁয়ারগোবিন্দ মূর্খ ছেলে আসগারের সঙ্গে শিরীনের বিয়ে দিয়ে দিলে!

আসগার মহা খুশী হয়ে ঢোল বাজাতে লাগল : ছুঁড়ি তোর 'মুখ দেখি তোর, 'মুখ' দেখি তোর, 'মুখ' দেখি তোর, কনের মায়ের 'ধড়' ধামসা! তুই কি 'ইয়ের' ঘাড় ভেঙেছিস!'... [ঢোলের বুলি, ইলেকের জায়গায় অশ্লীল শব্দ] শিরীন তার বরের 'ছেরন' (ছিরি—শ্রী) দেখে না হেসে পারলে না!... এর নাম হল জীবন:!

—আবদুল জব্বার

রবীন্দ্রনাথ : বিতর্কের উত্তরে

"রবীন্দ্রনাথ : একটি বিতর্ক" শীর্ষক আলোচনায় শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য মূলত যা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তা হল রবীন্দ্রনাথ সেকেলে কবি। তাঁর মূল্যবোধ ও কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্তমানকালের সঙ্গে সম্বন্ধহীন; তাই তিনি এখন প্রাক্তনের দলে নাম লিখিয়েছেন। আধুনিক মননের চর্চায় তিনি অপ্রাসঙ্গিক ও অকিঞ্চিৎকর। বর্তমান যুগ পরিবেশে আমরা এক বৈপ্লবিক হিল্লোলের মধ্যে বাস করছি—তাই বেখাপ্পা ও বেমানান যা কিছু তাকেই আমরা বৈপ্লবিক শিরোপায় সম্মান করে থাকি; সেহেতু লোকনাথবাবুর আলোচনাটিও বৈপ্লবিক বলব না কেন?

আলোচনার আরম্ভে শ্রীভট্টাচার্য বলছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের অনীহা সত্ত্বেও বর্তমানে আমরা আমাদের সেন্টিমেন্টাল দুর্বলতার জন্য অকপটে তা প্রকাশ করতে পারি না; অথচ ওদেশের পাঠক এখন অনায়াসে পেরেছেন টি এস এলিয়টকে "তাকে তুলে রাখতে"। টি এস এলিয়ট কখন বিলেতী কাব্যবোদ্ধার তাকে উঠেছেন তা সঠিক না জেনেও বলতে পারি এই টাটকা ঊনিশশো সত্তরেও ইংরেজী কবিতার চর্চায় এলিয়ট একটি চলন্ত ও জীবন্ত শক্তি। তবে 'পোয়েটিক ট্রেন্ড'-এর মাহাত্ম্যবশে যে কোনও কবিরই কাব্যখ্যাতি যে জনে জনে ও কালে কালে পরিবর্তমান সে কথা এখন বহু জীর্ণ এক ক্লিশেতে পরিণত হয়েছে। যে উইস্টান হিউগ অডেন একদিন অধ্যাপক নেভিল কগহিলের কাছে গিয়ে তাঁর নতুন কবিতায় এলিয়ট ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, সেই অডেনই আবার এলিয়ট-পরবর্তী ইংরেজী কবিতায় নতুন স্বাদ ও সুমিতির জন্মদাতা হিসেবে চিহ্নিত। তাতে কি হয়েছে? তাতেই কি সূচিত হয় অডেনের এলিয়ট অনীহা? শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর 'মডার্ন ফিকশন" প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে সাহিত্যে 'সার্কুলার টেনডেনসি' চির সচল। এক যুগকান্তির ক্ষণে একটি সাহিত্যধারার প্রভাব বিগত হলেও তা সম্পূর্ণ বিলীন হয় না। কালাতিগ সত্যের গুণে যে সাহিত্য সমৃদ্ধ তা পুনরায় উদ্বোধিত হতে বাধ্য। এমন কি রিচার্ডসন—ফিল্ডিং-এর প্রভাব যে সুদূর অর্থে ডরোথি-রিচার্ডসন—ভার্জিনিয়া উলফের ওপরই বর্তেছে এমন প্রমাণও দেওয়া যায়। ষাট বা সত্তরের দশকের কবিরা নতুন কালের মঞ্চে যে রঙমশালই জ্বালান না কেন রবীন্দ্রনাথের দীপ্তি তাতে ম্রিয়মাণ হয় না। সমালোচনার ধারাকে ত্রিধা বিভাজন করে-

সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড : পার্সোনাল এস্টিমেট, হিস্টরিকাল এস্টিমেট ও রিয়েল এস্টিমেট। আর্নল্ডীয় রীতিকে অনুসরণ করে যখন আমরা রবীন্দ্রকাব্যের রিয়েল এস্টিমেটে প্রবৃত্ত হই তখন রবীন্দ্রনাথ সকল অনীহা ও অমনোযোগের সীমানা ছাড়িয়ে এক অক্ষয় ও অব্যয় আলোকবিন্দুতে অবস্থান করেন প্রোজ্জ্বল প্রশান্তিতে।

"শেষ লেখা"র "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি" কবিতার শেষ লাইনে "শান্তির অক্ষয় অধিকার"কে নিয়ে বিতর্ক তুলেছেন প্রবন্ধকার। তিনি বলছেন : "অক্ষয় অধিকার কথাটা তো বড় বাড়াবাড়ি নিশ্চয়, তাছাড়া সেটা পাচ্ছে কে এবং শান্তিটাই বা স্বরূপে কী?" তিনি রবীন্দ্রনাথের এই শান্তি অনুভবকে এক মনগড়া কল্পনা ও জীবন ও প্রকৃতি বিরোধী এক মিথ্যা সান্ত্বনারূপে নির্দেশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন : "এ শান্তি একান্ত পলাতকের।" রোমান্টিক কবিরা পলাতক স্নাতক পর্যায়ের ছাত্ররা এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান। লোকনাথবাবু তেমন এক আদুরে প্রশ্ন তুললেন কেন আমার প্রশ্ন সেখানেই। রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনে "শেষ লেখা" যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' লাভের বাণীটি উজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেমনই প্রত্যাশিত, তেমনই সময়োচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কবিজীবনে অনেক কথা, সংগ্রামের কথা, আঁধারের সঙ্গে আলোকের মুখোমুখি সংঘর্ষের কথা বলে এসেছেন। 'বলাকা'র একটি কবিতায় কবি বলছেন :

> "তুফানের মাঝখানে
> নূতন সমুদ্রতীর পানে
> দিতে হবে পাড়ি।"

ঐ কবিতায় একটু বাদে আবার বলছেন :

> "নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার
> খুলিতে বিলম্ব কত আর।"

রবীন্দ্রচিন্তায় যে ভাবনাটি স্বতঃই মূর্ত তা হল শান্তি, স্থিতি ও সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে দুঃখের অভিঘাতের মধ্য দিয়ে, কঠিন সংগ্রামের অবসানে, রাত্রির তপস্যার পরপারে। তাই কোনো সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে অথবা পাশ কাটিয়ে নয়, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাকে জয় করেই রবীন্দ্রনাথ শান্তি ও সুন্দরের অভ্যুদয় কল্পনা করেন। "শেষ লেখা" যখন লিখেছেন তখন তিনি জীবনের লেনদেন প্রায় চুকিয়ে দিয়েছেন; কঠোর জীবন সংগ্রামের উত্তরণে সত্য ও সুন্দরকে করেছেন আবিষ্কার এবং এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই লাভ করেছেন পরম শান্তি। সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনা-জালে আকীর্ণ, জীবনে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ চারিদিকে বিছানো। বাইরের বস্তু-জগতের মিথ্যা ছলনা ও অমঙ্গলের কুহককে অতিক্রম করে, আপন অন্তর্লোকে স্থিত জ্যোতিষ্কের আলোকে আত্মাবিষ্কার করে মানুষ যখন পরম সত্যের সন্ধান পায় তখনই লাভ করে "শান্তির অক্ষয় অধিকার"। এ বাণী কবির গভীর উপলব্ধি সঞ্জাত; এ কখনই নিছক মনগড়া ও দায়-সারা আপোষের কথা নয়। সেই কবে "গীতাঞ্জলি"র কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "যাবার বেলা এই কথাটি

> বলে যেন যাই
> যা দেখেছি যা পেয়েছি
> তুলনা তার নাই।"

"গীতাঞ্জলি"র তন্ময়তার আবেগ "শেষ লেখা"য় পৌঁছে হয়েছে আরও ঘন নিবিড় ও দ্যুতিশালিত।

তর্কের শেষে শ্রীভট্টাচার্য যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তা হল রবীন্দ্রনাথের জীবনে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে মানবপ্রেমের দ্বন্দ্ব। নিজের ভাবের আত্মমগ্নতা যে অপরিহার্য সে বিষয়ে লোকনাথবাবু নিঃসন্দেহ নাকি? রবীন্দ্র-

নাথের মত কবি যিনি তাঁর বাণীর সুরে মেরুকালের দ্বন্দ্ব স্বীকার করেছেন সংহত তাঁর মানবপ্রেমও ("যে মানুষ আছে মাটির কাছাকাছি/তারি লাগি কান পেতে আছি") স্বতোৎসারিত ও চারদিকে প্রসারিত। সার্থক কবিকল্পনা কদাচ আংশিক ও খণ্ডিত নয়, সে আপন জীবন-বৃত্তে কেন্দ্রস্থ বটে, কিন্তু স্বীয় সত্তার উৎস থেকে ক্রমশই বহু শাখায়িত ও বহু বলয়িত এক পূর্ণাবয়ব সত্তার উত্তীর্ণ প্রত্যাশী। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ 'আমি'র গণ্ডী ছাড়িয়ে নির্বিশেষ নিখিলের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করেছেন।

'পথে ও পথের প্রান্তে'র এক জায়গায় কবি নিজেই বলেছেন : "আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে সাধনা হচ্ছে আবরণ-মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।......আমির বড়োটাকে আমার থেকে সরানোই জীবনের সব থেকে বড় সাধনা, তাহলেই আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় অপমানটাই লুপ্ত হয়। অস্তিত্বের অপমানটা হচ্ছে, ছোট খাঁচায় থাকা, সেটা পশু পাখিকেই শোভা পায়।"

বৈপরীত্যের বিবাহবন্ধনই ('রিকনসিলেশ্যান অব অপোজিটস্') সার্বভৌম কবি-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অধিকার, সে অধিকার রবীন্দ্রনাথের আছে, যার বলে তিনি "পৃথিবীর" প্রতিমার দুই মেরুর মিলন দেখতে পান ("অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা/অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী")। আত্মপ্রেমে রবীন্দ্রনাথের যে সাধনার উন্মোধন, মানবপ্রেমে তার উত্তরণ ও পূর্ণতা। একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তারা প্রকৃত অর্থে পরস্পরের পরিপূরক। সমগ্র রবীন্দ্রজীবন পর্যালোচনা করলে যে সত্যটি প্রকটিত হয় তা হল কবির আত্মজিজ্ঞাসা ক্রম প্রসারিত হয়েছে বিশ্বজিজ্ঞাসায়। ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের টানা-পোড়েনের লীলা চলেছে কবির সমগ্র জীবনব্যাপী। প্রসঙ্গ, পরিপ্রেক্ষিত ও পরিণতির ধারা থেকে বিযুক্ত করে কোনো একটি উক্তি বা পংক্তি বা একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতাকে আমরা সঠিক অনুধাবন করতে পারি না। কবিজীবনের কোন্ পর্যায়ে কোন্ কথাটি কথিত হোল সেটাই বিচার্য। কবি টেনিসন তাঁর 'ইন মেমোরিয়াম'এ বলেছেন এ ব্যাখ্যাখ্যা কেবলমাত্র 'প্রাইভেট সরোজ ব্যারেন লঙ' নয় তেমনি "তোমার সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করি" কবিতা, তথা সমগ্র "শেষ লেখা" কাব্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের শুধুই শেষ ইস্তাহার নয়। এটি যে কোনো এক প্রাজ্ঞ, প্রদীপ্ত ও প্রশান্ত জীবনপ্রেমিকের শেষ জবানবন্দী। মহৎ সাহিত্যিক যে কথা আপনার হয়ে বলেন সে কথাই যে সকলের করে বলা হয়।

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে ও উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের ফলশ্রুতিরূপে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ নাকি তার অতি সহজ 'হ্যাঁ' ও 'না' উত্তর দিয়েছিলেন এমন অভিযোগ এনেছেন শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য। তিনি একথাও বলেছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় লালিত রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মভাব সহজ সমীকরণ লাভ করেছিল। শ্রীভট্টাচার্যের এমন সিদ্ধান্তে ক'জন সায় দিবেন জানি না।। কবির 'মুড্' ও কবির কাজের 'ইন্টেলেকচুয়াল মিলিয়্যু' কাব্যরচনায় প্রাধান্য পেতে বাধ্য, তবে তাই সব নয়। মহৎ কবি স্থান ও সময়ের সীমাকে ছাড়িয়ে ওঠেন আপন ঐতিহ্যচারিতার গুণে ও স্বীয় কালোত্তীর্ণ প্রতিভার বৈশিষ্টে। রবীন্দ্র-সাহিত্য শুধুমাত্র উনিশশতকীয় রেনেসাঁস বাহিত কতকগুলি ভাবনায় সমাকীর্ণ অথবা সে যুগের কতকগুলি সরল সিদ্ধান্তের সহাবস্থিতিতে পূর্ণ এমন ধারণা পোষণ করলে আমরা আমাদের সাহিত্যবুদ্ধিরই অবমাননা করব। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম, কারণ তিনি যথার্থ অর্থে ঐতিহ্যানুসারী ও ইতিহাসবোধে উদ্দীপ্ত। ইতিহাসবোধ প্রসংগে টি এস এলিয়টের সংজ্ঞা সত্যই প্রণিধানযোগ্য :

> ......the historical sense incolves a perception, not only of the pastness of the past, but of its preserb"........"The historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and the temporal together, is what makes a writer traditional.
> "(Tradition and Individual Talent)".

কে বললে আধুনিক পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ পরিত্যক্ত ও আকর্ষণহীন? জীবনযন্ত্রণার উৎকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ করলেই অথবা পাপচিন্তায় উৎপীড়িত হলেই কবিতায় আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটানো যায় এমন ধারণা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়। বোদ্লেয়ার, ভ্যালেরী, হোল্ডারলিনের নেতি চিন্তায় অথবা এক্সিসটেন-সিয়াল আর্তির মধ্যেই আধুনিকতা বেঁচে থাকে না। এখন "অবক্ষয়ের করালগ্রাসে অতীতের সৌন্দর্যবোধ লুপ্ত" এমন কথা কি নির্দ্বিধায় বলা যায়?

নিখিল শান্তির রূপকল্পে যে বৈনাশিক জীবনদৃষ্টি প্রতিবিম্বিত তাই প্রকৃত আধুনিকতা নয়। সমকালীনতার সঙ্গে আধুনিকতার প্রভেদ দুস্তর। সমকালীন সাহিত্য একটি কালের তথ্যকে করে পরিবেশন, আর যে সাহিত্য কালাতীত তথ্যকে ভিত্তি করে কালান্তরী সত্যকে করে স্বপ্রকাশ তা চিরায়ত, এবং যেহেতু সে চিরায়ত তাই সে আধুনিকও বটে। রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যকারের আধুনিক, কারণ সকল নাস্তিকতার উপরে যে আস্তিক্যবোধ চিরবিরাজমান, রবীন্দ্রনাথ সেই আস্তিক্যবোধের করেন জয়গান। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ 'ক্রিটিকাল' কিন্তু কখনো 'সিনিকাল' নয়। নান্দনিক বিচারে রবীন্দ্রনাথ কবিশ্রেষ্ঠ, তিনি কোনোকালেই 'মিউজিয়াম পিস' হন না। নিবারণ চক্রবর্তীরা চিরকাল নিবারণ চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই রবীন্দ্রনাথ থাকবেন।

ছায়া পড়ে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। চৌদ্দ ।।

এ রাত আগের রাতের মতই ঠান্ডা, তেমনি অন্ধকার আর রহস্যময়। কিন্তু কিছু তফাৎ ছিল। অন্তত প্যালেসহোটেলের পরিবেশে এই ঠান্ডা অন্ধকার রাতটাকে মনে হচ্ছিল ভারমুক্ত অথচ ক্লান্ত, নিরুদ্বেগ অথচ নিস্পন্দ। আজ সবার চোখে ঘুমের বড় আদুরে ছোঁওয়া। শোক-দুঃখ বিপর্যয়ের ঝড় শেষ হলে তবেই এমন নৈঃশব্দ আর পবিত্র শান্তি নামে মানুষের মনে। শুধু মানুষের মনেই বা কেন, তার দুশ্ছেদ্য পটভূমি ওই নিসর্গও যেন শান্ত আর শুদ্ধ হয়ে ওঠে। হয়ত একেই বলে ট্রাজেডির দিব্য মহিমা।...

কর্ণেল সরকার তাঁর ঘরে আরামকেদারায় ঝিমোচ্ছিলেন। দূরে সদর গেটের ঘণ্টা-ঘড়ি বেজেছে দশবার। শীতের রাতে এ মফস্বল শহরে রাত দশটা মানেই ঘোর নিশুতি। আজ নটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া শেষ। বাবুর্চি-ঠাকুর সবাই দরজায় খিল এঁটেছে। কর্ণেলের পাশের ঘরে তারা থাকে। তার ওপাশে ডাইনিং হল। সেখানে তালাচাবি পড়ে গেছে। তার মুখোমুখি সুরঞ্জনের ঘর। বাবুর্চিঘরের সামনাসামনি ওয়েটিং রুমে বাহাদুর থাকে। সে আজ ঘরে ঢুকে পড়েছে। বেচারার গত দুতিন রাত ঘুম নেই। ঘুমোক। বারান্দার আলো জ্বলছে। পূর্বপ্রান্তের সারভ্যান্টস রুমও নিস্পন্দ।

ওপরতলাটাও মনে মনে দেখছিলেন কর্ণেল। একই নৈঃশব্দ আর নির্জনতা হয়ত। স্বাতীর ঘরে দিব্যেন্দু আর স্বাতীর মা শুয়েছেন। দিব্যেন্দুদের ঘরটা আজ শূন্য। বিভাসও হয়ত ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। যা দুর্ভোগ না গেল বেচারার! অধ্যাপক-দম্পতি, বোসদম্পতি সবাই আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমোনর আয়োজন করছে। আর চীনা? চীনা কী করছে? ওর ঘরে কল্পনার লাস পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্যেকে ওকে নিষেধ করল ওঘরে শুতে। সুরঞ্জন ওকে বোসদম্পতির পাশের খালি ঘরটা দিতে চেয়েছিল, চীনা জেদ ধরল। বেচারার একপ্রস্থ বিছানা গেছে! ডোম এসে নিয়ে গেছে। তাই আরেকপ্রস্থ বিছানা জোগাড় করে দিতে হয়েছে সুরঞ্জনকে। কিন্তু কর্ণেলের উদ্বেগ যে ওঘরে ওই বিছানাতেই চীনা শোবে কেমন করে? কী দুঃসাহসী দুঁদে মেয়ে রে বাবা।......

এবার একটু বিস্মিত হলেন কর্ণেল। চীনার এ অস্বাভাবিক জেদের কি কোন গূঢ় কারণ আছে? আগামীকাল সকালে সবাই এ হোটেল ছেড়ে যে-যার জায়গায় চলে যাবে। পুলিশ অনুমতি দিয়েছে। সাক্ষীদের নামে কোর্টের সমন যাবে সুযোগমত। সে যাই হোক, এ অভিশপ্ত জায়গায় আর কারো একদণ্ড কাটানোর ইচ্ছে নেই। কলকাতা থেকে শুভর একমাত্র গারজেন—তার দাদা এসেছিল স্বাতীর মায়ের সঙ্গে। সে কিন্তু একবারও এদিকে আসেনি। শ্মশানঘাট থেকেই ফিরে গেছে। হ্যাঁ, সবাই বড্ড ভয় পেয়েছে এ পুরনো শহরটাকে। সুরঞ্জন দুঃখ করছিল, মরশুমের জমাটিতেই এমন ভাঙন ধরে গেল? হয়ত হোটেলটা উঠে যাবে। কাল থেকে জনশূন্য হোটেলে কেমন করে দিন কাটাবে সে? কর্ণেল আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, না, না। দেখবে, ঠিকই কারা না কারা এসে যাবে। আজকাল খুনজখম সবার গা-সওয়া। তাছাড়া সুরঞ্জন, আমি তো রইলাম!...ফের একটু চঞ্চল হলেন কর্ণেল। কেন চীনারা এত জেদ ওঘরে রাত কাটাতে? দিনের দিকে বেচারা ঘরে ঢোকার সুযোগ পায়নি। পুলিশ পাহারা ছিল। বিশেষজ্ঞরা খুঁটি-নাটি পরীক্ষা করেছেন বিকেল অব্দি। কারণ মর্গের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কল্পনার মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ নয়—কোন ভোঁতা নিরেট জিনিস দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করা হয়েছিল। অবশ্য শুভরটা নিছক শ্বাসরোধ। কিন্তু আশ্চর্য, তার গলায় যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তা নীরেনের নয়। অন্য কারো। গুপ্তকে ফোন করেছিলেন কর্ণেল। গুপ্ত বলেছেন, কল্পনার মৃত্যু ওঘরে হয়নি। অন্য কোথাও হয়েছিল। তারপর চাদরে জড়িয়ে ওকে ওখানে নিয়ে গেছে খুনী। এবং দোষটা ঘাড়ে চাপানোর জন্যে চাদরটা অধ্যাপকের ঘরে ফেলেছে। গুপ্তর ধারণা—যদিও এখনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি, খুন হয়েছে বাইরের ওই পোড়োবাগানে। আর 'রাইগর মরটিস' এবং অন্যান্য দিক থেকে ডাক্তারের ধারণা, খুনটা প্রায় সামান্য আগে-পরে হয়েছে—বড়জোর একঘন্টার ব্যবধানে। খুনের সময় সকাল দশটা থেকে বারটার মধ্যে রাখা যেতে পারে।... ঘড়ির কথাটা আপাতত চেপে রেখেছেন কর্ণেল। এটা অবশ্য বেআইনী। কিন্তু আর একটু জানবার বাকি আছে। তাহলেই ঘড়িটা পুলিশকে পৌঁছে দেবেন।...কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন। একবার চীনার ঘরে যাওয়া জরুরী মনে হচ্ছে। কী করছে সে? যদি কোন মতলব ছিল, লুকোল কেন তার কাছে?

কর্ণেল সাবধানে দরজা খুলে বেরোলেন। বারান্দায় নির্জনতা থমথম করছে। জুতোর রবারসোল কোন শব্দ হতে দিচ্ছিল না। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, তিনি চীনা মিত্র ও বিভাসের ঘরের সংগমে অর্থাৎ খিড়কি দরজার কপাট-দুটো সদ্য বন্ধ হতে দেখলেন।

রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে গেলেন কর্ণেল। দরজায় কান পাতলেন। নীচের দুরন্ত সরু সিঁড়ি বেয়ে কে যেন নেমে যাচ্ছে। দরজার খিলও খোলা। কে গেল পোড়ো বাগানে এত রাত্রে? কী উদ্দেশ্য তার?

পরক্ষণেই ডানদিকে চীনা মিত্রের দরজাটা খুলে গেল। চীনা ভাঙা গলায় বলছে, না, না না— তুমি যাও, তুমি যাও...এবং বিভাস প্রায় ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এল এবং সশব্দে কপাট বন্ধ হল। কর্নেল সকৌতুকে বলে উঠলেন, হ্যাল্লো, মাই বয়। গুডনাইট।

বিভাস অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কোন রকমে 'গুডনাইট' বলে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত নিজের ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

কর্ণেল একটু ইতস্তত করে চীনার দরজায় টোকা দিলেন। একবার, দুবার, বারবার। মুখে চাপা হাসি। কর্নেল ধৈর্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ যেন। ক্রমাগত টেলিগ্রামের শব্দ তুলছিলেন। অবশেষে দড়াম করে দরজা খুলে গেল। এবং পর্দার ভিতরই চীনার কণ্ঠস্বর বাজল, আঃ কেন বারবার বিরক্ত করছ? এত জ্বালিয়েও তোমার আশা মেটেনি? ফের এসেছ এখানে...

পর্দা তুলে কর্ণেল বলেন, গুডনাইট মাই গার্ল!

চীনা ভূত দেখল। কয়েক মুহূর্ত তার মুখটা জ্বলে রইল। তারপরই আচমকা দৌড়ে গিয়ে বিছানায় ঝুঁকে পড়ল। তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছিল। নিঃশব্দে কাঁদছিল চীনা মিত্র।

কর্ণেল দরজাটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে তার কাছে গেলেন। পাশে বসে পিঠে হাত রেখে বললেন, চীনা, শোন! জাস্ট এ মিনিট মাই গার্ল!...ও ইয়েস, ইয়েস। আই ফিল ফর ইউ। বাট চীনা... একটা ব্যাপার হয়েছে শোন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

চীনা মুখ তুলল।...কী?

কর্ণেল বললেন, এইমাত্র কেউ খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে নামল।

কথাটা শোনামাত্র চমকে উঠল চীনা।

...তাই নাকি? ...তাহলে দাঁতে ঠোঁট কামড়াল সে।

তাহলে কী?

চীনা উঠে দাঁড়াল। চোখ মুছে নিয়ে বলল, ওকে একটু ডাকবেন?

বিভাসকে?

হ্যাঁ।

কেন?

ও আমায় একটা কথা বলছিল এইমাত্র। কান দিইনি তখন। ... চীনা সলজ্জ হাসবার চেষ্টা করল। ওর কতকগুলো পিকিউলিয়ার অভ্যেস আছে। একসময় আমি রাগ করলে ওইরকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাত। আমায় বড্ড ছেলেমানুষ ভাবে কি না!

তুমি সত্যি বড্ড ছেলেমানুষ।

চীনা এবার সত্যি হেসে ফেলল। হয়ত তাই। ও সুর ধরে শুভর কবিতাটা আবৃত্তি করছিল। তারপর বলছিল, চলো ওই জানালার কাছে দাঁড়াই। এক অপূর্ব রহস্য দেখাব। সব রহস্যের অবসান হবে।

স্ট্রেঞ্জ! বলে কর্ণেল হন্তদন্ত উঠলেন।

আধঘন্টা পরে।

পোড়ো বাগানের ভিতর খুব সন্তর্পণে অপেক্ষা করছিলেন কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার, বিভাস সিংহ আর সুরঞ্জন বসাক। ভাঙ্গা

মসজিদের পাঁচিলের এ পাশে ওঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদটা উঠতে দেরী আছে। ডোবাটা গাছপালার ভিতর অন্ধকারে অদৃশ্য। তবু অন্ধকারের একটা বিচিত্র স্বচ্ছতা আছে। জল থিতিয়ে পড়ার পর গভীর স্বচ্ছতার মত। মসজিদের চত্বরটা ঝকমক করছে। ওখানে যে একজন মানুষই বসে রয়েছে, তাতে কোন ভুল নেই।

আশেপাশে কোথাও সত্যজিৎ গুপ্তরা রয়েছেন। হোটেল এবং জঙ্গলে বাগানের প্রায় সারা বাউণ্ডারি ঘিরে পুলিশ তৈরী। কেবল পূর্ব প্রান্তের প্রাইভেট রোড—যা কেল্লা-নিজামতের সমান্তরাল, সেখানে কোন পুলিশ নেই। যেখানে-যেখানে আছে, তারাও গাছপালার আড়ালে ঝোপেঝাড়ে ওৎ পেতে সতর্ক। ভীষণ হিম। কিন্তু উত্তেজনায় সবাই যেন উষ্ণতা অনুভব করছে।

আট তারিখের মধ্যরাতে ডোবার ধারে যা ঘটবার কথা ছিল, তা আজ দশ তারিখে ঘটছে। বিভাস টের পেয়েছিল। সেই টুকরো কাগজটা এখন কর্ণেলের পকেটে। ইংরেজী হরফে লেখা : ডোণ্ট ফেল টুডে এ্যাট টেন-থারটি পি-এম। বিসাইড দ্যাট মস্‌ক— সেইম প্লেস। কাগজটা লনের ওদিকে জড়ানো পড়েছিল। একটা ঘরের জানালা দিয়ে না পড়তে দেখলে বিভাসের কৌতূহল হত না।

প্রথম আলোর সংকেত দেবেন কর্ণেল। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। সেকেণ্ড গোনার পালা শুধু। এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ ... সারা পৃথিবী ঘোরতর প্রতীক্ষায় স্তব্ধ।

হঠাৎ পিছনে একপাল শেয়াল ডেকে উঠল। কয়েকটা পেঁচা কাছে ও দূরে ডাকল। যেন কয়েক মিনিট ধরে স্তব্ধ নিঃঝুম হিমরাত্রির বনভূমি তোলপাড় হল। সবাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কণেক লক্ষ্য করলেন, মূর্তি একটা নয়, দুটো। চাপাস্বরে কথা বলছে।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বাললেন কর্ণেল। দুটো মূর্তি চকিতে স্থির। তারপরই চারদিক থেকে অজস্র টর্চের আলো। গম্ভীর গর্জন : খবরদার! যে-যেখানে আছেন, দাঁড়িয়ে থাকুন। নড়বার চেষ্টা করলেই আমরা গুলি ছুঁড়ব।

একটা সুটকেসপ্রমাণ প্যাকেট হাতে নিয়ে দীপেন বোস নিশ্চল পাষাণ। পাশের লোকটি বয়সে প্রৌঢ়। পরনে ধুতি, গায়ে চাদরজড়ানো আষ্টেপৃষ্টে। মিঃ গুপ্ত লাফ দিয়ে চত্বরে উঠতেই সে হাউমাউ করে পায়ে জড়িয়ে ধরল। আমার কোন দোষ নাই স্যার। মলয়বাবু আমাকে এই প্যাকেটটা পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। পাঁচটা টাকা মজুরী স্যার...বাবা গো! বুটের লাথি খেয়ে সে চুপ করল।

উত্তরপ্রান্ত ঘরে সবাই এল প্যালেস-হোটেলে।

ডাইনিং হলের দরজা খোলা হল। বাবুর্চি-ঠাকুররা সবাইকে জাগাতে হল। হিটার জেলে চা-কফির আয়োজন। উত্তেজনা এসে বেচারাদের বিরক্তি দূর করেছে।

ওপরে সবার ঘুম ভেঙেছে বিহঙ্গকুলের মধ্যে। প্রতিটি ঘরের দরজা গেছে খুলে। সবগুলো আলো জ্বলছে প্যালেসহোটেলে। সামনাসামনি গঙ্গার ওপারে যে গ্রাম—সেখানে গ্রামবাসীরা জেগে থাকলে তাদের চোখে বড় বিচিত্র দৃশ্য ভাসত।

প্রথমে দৌড়ে এল ইরা বোস। স্বামীর দিকে দৌড়ে যেতেই একজন সেপাই বাধা দিল। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। থামে হেলান দিল। চীনা তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। এসেছে দিব্যেন্দু, স্বাতী, স্বাতীর মা এবং অধ্যাপকদম্পতিও। দেবতোষের মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। সুদেষ্ণা হাঁ করে তাকিয়ে আছেন দীপেন বোসের দিকে। তার দুপাশে মিঃ গুপ্ত আর ভদ্র। পিছনে আরও কয়েকজন অফিসার। সামান্য দূরে বসেছেন কর্ণেল আর বিভাস। সুরঞ্জন কিচেনে বাস্ততা তুলেছে।

দীপেনের টেবিলে সেই প্যাকেটটা খোলা হয়েছে। অবিশ্বাস্য! একরাশ সোনার বাঁট। বিদেশী ছাপ মারা। স্মাগলড্ গোল্ড। পূর্বসীমান্ত থেকে প্যাকেটটা বয়ে এনেছিল দীপশ্রী স্টোর্সের মালিক। বরাবর এই কারবার চলে আসছে। সোনার বদলে এখান থেকে যায় ঘড়ির পার্টস কেমিক্যাল দ্রব্যাদি, নারকোটিকস—কত কী!

সত্যজিৎ গুপ্ত একটু কেসে বললেন, কেসের এই দিকটা আমি অবশ্য ভাবিনি— যদিও মনে হয়েছিল, ডোবা ইজ দি ওন্‌'স ভাইটাল পয়েন্ট! বেচারা নীরেনের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু অবস্থা বা প্রমাণের কাছে আমি তো অসহায়। কী করতে পারি! কেসের মস্তুস অপারেশন্ড আমায় এখন পুরো নতুন করে সাজাতে হচ্ছে। যেসব পয়েণ্ট পরিষ্কার হচ্ছিল না, এখন তা পরিষ্কার। আর কোন অসুবিধে নেই। গোড়া থেকেই একটা ব্যাপার আমায় ভাবাচ্ছিল। নীরেন একজন সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু অত বোকার মত কাজ করল কেন? সে পয়েন্টটা এখন ক্লিয়ার। অঁাধারমহলে একজন চতুর্থ ব্যক্তি থাকা যুক্তির দিক থেকে বাঞ্ছনীয়। সেই হচ্ছে খুনী।

কর্ণেল একটু হেসে বললেন, কে সেই চতুর্থ ব্যক্তি, আশা করি এতক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে।

সারটেনলি। মিঃ গুপ্ত টেবিলে থাপ্পড় মারলেন।...গোড়া থেকে ব্যাপারটা সাজানো যাক। একদল ছেলেমেয়ে এখানে বেড়াতে এল। হোটেলে উঠল। সেই হোটেলে কিছু অদ্ভুত চুরি ঘটতে থাকল—যা ভৌতিক উপদ্রব মনে হতে পারে। বিশেষ করে শেষ অবদি চুলকাটার ঘটনা। এর অর্থ ছিল একটাই। বোর্ডারদের ভয় দেখানো অর্থাৎ যেন হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, দীপেন এসেছে সাত তারিখ সন্ধ্যায়। তারপর এসব ঘটতে সুরু হয়েছে।

ইরা ফোঁস করে উঠল। আমরা আসবার অনেক আগে কল্পনার টুথব্রাস হারিয়েছিল। আমরা আসার পর ম্যানেজার বলল, একটু সাবধানে রাখবেন জিনিসপত্র। ম্যানেজার, ম্যানেজারবাবু! ইরা সাক্ষী মানতে সুরঞ্জনকে ডাকছিল।

মিঃ গুপ্ত মুচকি হেসে বললেন, ওয়েট ওয়েট। টুথ ব্রাসটা ছোট্ট জিনিস। ইঁদুর বেড়ালে নিয়ে যেতে পারে।

চীনা কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করল, কিন্তু কর্ণেলের চোখের দিকে তাকিয়ে নিরস্ত হল।

গুপ্ত বললেন, যাই হোক। ধরে নিচ্ছি ওই টুথব্রাস হারানোর খবরই দীপেন বোসের মাথায় একটা আইডিয়া এনে দিল। ইজ ইট ইল্‌লজিকাল কর্ণেল?

কর্ণেল মাথা দোলালেন।

সে কাজ সুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। তার স্ত্রীও যে স্বামীকে সাহায্য করেনি, এটা অসম্ভব। চুল কাটার ঘটনা লক্ষ্য করুন অন্যের চুল কাটার রিস্ক আছে—যদিও অন্যের অলক্ষ্যে জিনিসপত্র চুরি করা সহজ। তার আগে আট তারিখের সকাল থেকে রাত্রি অবদি ঘটনাগুলো বিচার করা যাক। মোতি-ঝিলের মসজিদের দেয়ালে লেখা কবিতাটা আশা করি আপনাদের মনে আছে। আমাদের এক্সপার্ট প্রমাণ করেছেন, ও হস্তাক্ষর শুভরই।

ইরা হুড়মুড় করে বলে ফেলল, শুভ আমার সঙ্গে গিয়ে আমার সামনেই ওটা লিখেছিল। বলেছিল, কাকেও বলবেন না। বেশ জমিয়ে তুলব এবার।

মিঃ গুপ্ত বললেন, আর আপনি আপনার স্বামীর কানে কথাটা তুলে দিলেন। ব্যস, অমনি সে সতর্ক হল। তাহলে কি ওরা আমার প্ল্যান টের পেয়ে গেছে? এমন কি ওই তারিখ রাত্রিবেলা দীপেন বোস জঙ্গলে ডোবার কাছে কোথাও শুভ আর কল্পনার সামনে পড়ে যায়। ফলে তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়েছিল।

ইরা বাধা দিল।...আমি কিছু বলিনি। খোজাকবরখানার গেটে দাঁড়িয়ে শুভ নিজেই সব বলছিল। জিগ্যেস করুন না চীনাদিকে।

এনিওয়ে! গুপ্ত হাত তুললেন।...সে সতর্ক হয়েছিল। কিন্তু কথামত ডোবায় যাবার সময় বাধা পেয়ে ক্ষেপে গেল দুজনের ওপর। ওরা যখন জেনেছে, আরও রটে গেলে সর্বনাশ হবে। কাজেই দুটিকেই সাবাড় করতে হবে। সে সুযোগ খুঁজতে থাকল। নয় তারিখ সকালে দিব্যেন্দু-স্বাতী-কল্পনার ঝগড়াঝাঁটির খবর হোটেলেই সবাই জেনেছিল। কল্পনা-শুভর রাত্রে উধাও হওয়া নিয়ে কানাকানি চলছিল। আমার ধারণা, নীরেন যে কল্পনার ব্যাপারে বেশি তৎপর, সে জেনে থাকবে। ন তারিখ ভোরে নীরেনকে থামের আড়ালে দাঁড়াতে দেখেছিল সে। তখন সুইমিং পুলের ওখানে কল্পনা-শুভ বেড়াচ্ছিল। তারপর সে সুযোগ খুঁজতে থাকল। নীরেন-শুভ-বিভাস বেরিয়ে যেতেই সে হয়ত খিড়কির দরজা দিয়ে নেমেছিল নীচে।

দীপেন গজগজ করল। কোন প্রমাণ নেই।

কান করলেন না মিঃ গুপ্ত।...বাগানে ঢুকেই লাকিলি সে পেয়ে যায় কল্পনাকে। অভাবিত সুযোগ। প্রশ্ন উঠবে, কল্পনা ওখানে কী করছিল?...কল্পনা যে ওপথে নীচে নেমেছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি কর্ণেলের কাছে—বর শম্ভুর কাছে। তাঁরা ওকে দেখেছিলেন। কিন্তু কল্পনার উদ্দেশ্যটা আপাতত জানা যাচ্ছে না।

কর্ণেল পকেট থেকে আচমকা একটা লেডিজ হাতঘড়ি বের করে টেবিলে এগিয়ে দিলেন। ...কল্পনা সম্ভবত এই ঘড়িটা খুঁজতে গিয়েছিল। ঘড়িটা রাত্রে দৌড়নর সময় আছাড় খেয়ে হাত থেকে খুলে গিয়ে থাকবে। টাইম ইনডিকেশান ইজ জাস্ট টেন থার্টিফাইভ। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, এটা সকাল দশটা পঁয়ত্রিশ—কল্পনার খুন হবার সময়। কিন্তু তা নয়, সেটা পরে বুঝলাম।

বাঘের মত থাবা বাড়িয়ে ঘড়িটা নিলেন মিঃ গুপ্ত। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, এ ঘড়ি আপনি কোথায় পেলেন?

আজ সকালে এই ঘরে। দীপেনবাবুর পায়ের কাছে পড়েছিল।

আই সী! বলে মিঃ গুপ্ত দীপেনের মুখটা একবার দেখে নিলেন।

দীপেন প্রতিবাদ করল, ও ঘড়ি আমি দেখিনি।

মিঃ গুপ্ত বললেন,...তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বাঘের সামনে শিকার নিজে থেকেই এসে গিয়েছিল। কল্পনাকে খুন করে সে ঝোপে কোথাও লুকিয়ে রাখে। তারপর চলে যায় শুভদের উদ্দেশ্যে। আঁধারমহলে গিয়ে কীভাবে শুভকে খুন করল সবার অলক্ষ্যে—এটাই আপাতত ধাঁধা।

কর্ণেল বললেন, সেও ধাঁধা নয়। আরমানি গীর্জার গাইড আমায় আজ বলেছে, কে একজন সেই সময় ওখানে গিয়েছিল। তাকে পাঁচটাকা বখশিস দিয়ে তার ওখানে থাকার কথা কাকেও বলতে নিষেধ করেছিল। তারপর...

মিঃ গুপ্ত ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, প্লীজ কর্ণেল। পরে শুনব।

কর্ণেল হেসে উঠলেন।......লোকটার চোখে ভিউ ফাইণ্ডার ছিল।

দীপেন বোস বলল, আমার কোন ভিউ ফাইণ্ডার নেই।

দেবতোষও সশব্যস্তে বলে উঠলেন, আমারও নেই কিন্তু।

দিব্যেন্দু একটু কেসে বলল, আমার একটা ছিল। সেটা আজ সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। সকালে জেরার সময় মিঃ গুপ্তকে সেকথা বলেছি।

ইয়েস। মিঃ গুপ্ত সায় দিলেন।

কর্ণেল বললেন, শুভকে খুন করার সময় ধস্তাধস্তিতে সেটা ভেঙে যায়। প্রায় সবগুলো টুকরো খুনী কুড়িয়ে বাইরে কোথাও ফেলেছিল। শুধু ফাটলে কিছু রয়ে যায়। এই দেখুন।

পকেট থেকে মোড়ক বের করতেই গুপ্ত সেটা হাতিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, খুনী দীপেন বোস চলে এল কাজ সেরে। এখন দোষ চাপাতে হবে কারো কাঁধে। সে এমন লোক খুঁজল, যার স্পষ্ট মোটিভ রয়েছে। এমন লোক রয়েছে মাত্র দুজন। নীরেন পালিত আর দিব্যেন্দু চৌধুরী। দিব্যেন্দু বলিষ্ঠ, খেলোয়াড় ছেলে। কিন্তু তার এ্যালিবাই প্রত্যক্ষ—সে প্রায় সারাক্ষণ স্বাতীর কাছে রয়েছে। এদিকে নীরেনের ব্যাকগ্রাউণ্ডও তার জানা—আমরাও সেটা আজ জেনেছি—সে খুনে মাস্তানটাইপ যুবক। সবচেয়ে মস্ত পয়েন্ট, সে শুভর সঙ্গে বেড়াতে গেছে। ব্যস! দীপেন বোস সন্ধ্যার পর আরো সুযোগ পেল। সবাই শুভ-কল্পনার উধাও হওয়া নিয়ে মশগুল। নীচে ডাইনিং হলে রয়েছে। সে তিনটে কাজ করল পর-পর। একটা হল, ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে নীরেনের ঘর খুলে চাদর চুরি। পরেরটা হল সেই চাদর নিয়ে খিড়কি-পথে বাগানে গিয়ে কল্পনার লাসটা তাতে জড়িয়ে চীনার ঘরে পৌঁছে দেওয়া। তিন নম্বর হচ্ছে, রক্ত মাখিয়ে চাদরটা অধ্যাপকের ঘরে পাচার!...

সুদেষ্ণা কী বলতে যাচ্ছিল, কর্ণেল হাতের ইসারায় তাকে থামিয়ে বললেন, মিসেস ব্যানার্জি তখন একা ছিলেন ঘরে। উনি কাকে ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেনও। সকালে চাদরটা পাওয়া গেল খাটের নীচে। এঁর বোকার মত সেটা ওই জানালা গলিয়ে ফেলতে গেলেন।

সুদেষ্ণা সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু...

কর্ণেল তাকে থামালেন ফের।...মিঃ গুপ্ত, তারপর কী হল বলুন?

আড়ামোড়া দিয়ে সত্যজিৎ গুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন, আর কী! তামাম শোধ। দি এণ্ড! দীপেন বোস নীরেনকে ফাঁদে ফেলে নেকস্ট প্ল্যান করেছিল আজ রাত্রে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য!

কর্ণেল মিটিমিটি হাসছিলেন। তাহলে নীরেনকে ছেড়ে দিচ্ছেন?

সারটেনলি।

দীপেন বোসের বিরুদ্ধে চার্জ আনছেন?

হোয়াই নট?

কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার উঠে দাঁড়ালেন। একটা কথা মিঃ গুপ্ত। আপনারাও শুনুন। দীপেন বোস গোল্ড স্মাগলার—এটা প্রত্যক্ষ। সে হাতেনাতে ধরাও পড়েছে। এবং এটা খুবই সত্য যে ওই ডোবাপ্রসঙ্গই ছিল এ কেসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। একজন স্মাগলার তার নিরাপত্তার জন্য খুন করতে পিছপা হয় না—তাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা জানি, যা প্রতীয়মান তাই বাস্তব নয়। দুটো ঘটনার মধ্যে যতই যোগসূত্র থাক, কারণ যে একটাই থাকবে, তার মানে নেই। প্রখ্যাত 'কাকতালীয়' যোগের কথা আমরা জানি।...

হলশুদ্ধ লোক রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে কর্ণেলের দিকে। দূরে ঘণ্টাঘড়ি বাজল এগারবার। কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার ফের বলতে থাকলেন। ...লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টলমেন!...

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচয়

হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার প্রাধান্য দানের ফলে সারা ভারতে একটা আঞ্চলিক সংকীর্ণতা মাথা তুলেছে। হিন্দি এবং তামিলের বাচনিক লড়াই সহজে বিস্মৃত হওয়ার নয়, এবং খানিকটা সেই একটিমাত্র কারণেই ইদানীং তামিলনাড়ের আঞ্চলিক রাজনীতি সর্বভারতীয় মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত নয়। একটা কথা কিন্তু এইসব আত্মকলহের স্রোতে হারিয়ে গেছে, কয়েকটি পূর্ণ স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র সেকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মকলহে এবং আত্মবিধ্বংসী সংগ্রামে লিপ্ত থাকলেও দু হাজার বছর আগেও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র ছিল। আঞ্চলিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজনে তার রূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হলেও মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে নানাবিধ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এই অবস্থা দক্ষিণ ভারত সম্পর্কেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে তামিল বণিক এবং শাসকগণ সংস্কৃতকে 'লিংক ল্যাংগুয়েজ' হিসাবে ব্যবহার করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাংস্কৃতিক বিজয় অভিযানে বেরিয়েছেন। কিছুকাল আগে মাদ্রাজে ওয়ার্লড তামিল কনফারেন্সে অনেক দেশের পণ্ডিতজন উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে অধ্যাপক জাঁ ফিলিওজাট এই ধারণার সমর্থনে অজস্র প্রমাণ প্রয়োগ করেছেন। এই কালের অনেক পূর্বে তামিল শাসন-ব্যবস্থা এবং সামাজিক আকৃতির সঙ্গে উত্তর ভারতের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল অতি সামান্য।

প্রাচীনকালের তামিল পণ্ডিতগণ এই ধারণা সমর্থন করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পণ্ডিতগণ ইদানীং ভারতের সামগ্রিক সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা না করে মন দিয়েছেন যে যার আঞ্চলিক প্রাধান্য প্রমাণের প্রয়োজনে ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশে। এর ফলে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাব দেখা দিয়েছে।

ডাঃ নইনার সুব্রহ্মনীয়ান অশেষ পরিশ্রমসহকারে লিখেছেন 'সঙ্গম পোলিটি', এবং এই গ্রন্থটি ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় প্রকাশে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দান করেছে। এই কাজ করতে বসে তাঁকে অজস্র প্রাচীন তামিল গ্রন্থের মূল থেকে পাঠোদ্ধার করতে হয়েছে। তিনি অনুবাদের ওপর নির্ভর না করে প্রায় দু' হাজার বছর আগে দক্ষিণ ভারতে কি জাতীয় সংস্কৃতির প্রচলন ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তামিল এবং বিদেশী গবেষকদের তথ্যের প্রতি নির্ভরশীল। গত বিশ বছরকাল ধরে দক্ষিণ ভারতে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার-অভিযান চলেছে, তার ফলে অনেক নতুন তথ্যও সুলভ হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক আকৃতির পরিচয়ও আজ আর দুর্লভ নয়।

দক্ষিণ ভারত এবং তামিলনাড়ের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে সকলের সমধিক আগ্রহ। এইসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সঙ্গম সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে। এই সঙ্গম সাহিত্য প্রায় পাঁচ থেকে সাত শতাব্দী কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

ডাঃ সুব্রহ্মনীয়ানের মতে সঙ্গম কথাটি সংস্কৃত ও বৌদ্ধ 'সঙ্ঘ' থেকেই সম্ভবত উদ্ভূত। তবে দক্ষিণ ভারতে যে কিভাবে ও ঠিক কি অর্থে এই কথাটি প্রচলিত হল তা লেখকের জানা নেই। 'সঙ্গম' অর্থে 'ক পণ্ডিতজন সঙ্গম, এই প্রশ্ন তাঁর মনে এসেছে! বৌদ্ধ সঙ্ঘ শুধু সাধুদের আস্তানা নয়, সেই সঙ্ঘ ছিল বিদগ্ধজনের সমাবেশ।

প্রাচীন পাণ্ডিয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেগাই নদীর তীরে মাদুরাই অঞ্চলে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। আজকাল যার নাম 'আকাদেমি'। সঙ্গমের কবি এবং পণ্ডিতজনের প্রচেষ্টায় অজস্র সাহিত্যসম্ভার প্রকাশিত হয়েছে। এইসব গ্রন্থের সামগ্রিক বক্তব্য ধর্মনিরপেক্ষ। ডাঃ নইনার সুব্রহ্মনীয়ানের এই গ্রন্থে প্রাচীন তামিলনাদের সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদে—সঙ্গমের উৎপত্তি এবং সঙ্গম যুগে প্রকাশিত গ্রন্থাদির কথা আলোচিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে প্রকাশিত 'আপপার' রচিত 'তেভারাম' গ্রন্থে সঙ্গমের উল্লেখ আছে। তামিল সাহিত্যে সঙ্গমের প্রতিশব্দ হিসাবে 'অভাই', 'কুড়াল', 'তোগাই' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব শব্দগুলির অর্থ সভা, সমাবেশ, সম্মেলন। আর একটি নাম 'পুনরকল্প' এর অর্থও প্রায় একই প্রকার, সকলের একত্র সমাবেশ।

নবম শতাব্দীর এক ভাষ্যে আছে সব, বিভিন্ন সময়ে প্রায় তিনটি সঙ্গম বর্তমান ছিল। বজ্রনন্দী যে দ্রাবিড় সঙ্গম প্রতিষ্ঠা

করেন সেটি জৈন মতবাদ প্রচারের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি তামিল সঙ্গম নয়।

সঙ্গম সাহিত্যের আদি পর্ব সপ্তম শতাব্দী। এই কালের দশটি কবিতা, আটটি কাব্য সংগ্রহ এবং আরো আঠারোটি ছোটখাটো গ্রন্থ, দুটি মহাকাব্য ইল্লানগো আদিগলের 'সিলাপড়িকরম' ও 'মণি-মেখলাই' খৃস্টান যুগের কিছু আগের এবং একেবারে প্রথম দিকের।

দ্বিতীয় খণ্ডের পরবর্তী ছয়টি পরিচ্ছেদ রাষ্ট্রনীতি, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, যুদ্ধ, সামরিক সংগঠন, বিচারব্যবস্থা ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ঘটিত। রাজা ছিলেন শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। একটি সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকত্ব রক্ষায় প্রথম সন্তানের উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল। পরবর্তীকালে ছেরা (বর্তমান কেরল) অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কখনও বা শূন্যসিংহাসন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে অধিকার করতে দেওয়া হত, এ'দের নির্বাচন হত হাতির সাহায্যে, হাতি অনুগ্রহ করে যাঁর গলায় মালা দিত তিনিই অভিষিক্ত হতেন। বিজয়ী শাসক অভিষিক্ত হতেন রণক্ষেত্রে। যুদ্ধে পরাজিত হলে রাজা তখন জাপানী কায়দায় স্বয়ং আত্ম-বলিদান করতেন। রাজা সিংহাসন ত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁকে কেউ সিংহাসনচ্যুত করতে পারত না। 'তুলাভার', 'জন্মবার্ষিকী', 'অভিষেক' প্রভৃতি রাজকীয় পার্বন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। রাজপুত্রগণ রাজকর্মে নানারকম দায়িত্ব পালনের ভার পেতেন। রাজার শৈশবকালে কোনোরকম অভিভাবক সরকার গঠনের বিধি ছিল না।

রাজসভা (অভাই) বসত প্রতিদিন প্রাতঃকালে। পট্টমহারাণী উপস্থিত থাকতেন সভায়। রাজাকে রাজকর্মে সাহায্য করতেন দুটি পরিষদ, তার সদস্য ছিলেন পাঁচজন, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, দূত এবং গুপ্তচর, অপর পরিষদের সদস্য সংখ্যা আটজন। তাঁরা হলেন হিসাবরক্ষক, করণিক, অর্থভাণ্ডারের প্রধান, নগরমন্ত্রার (সমাজকল্যাণ বিধায়ক নাগরিক), পদাতিক প্রধান, হস্তিবাহিনীর প্রধান ও অশ্ব-বাহিনীর প্রধান। এই দুটি বিভিন্ন পরিষদের কর্মধারার সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্রাটকে সাহায্য করতেন মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য রাজকর্মচারিবৃন্দ। চেরাচোলের রাজা ও পাণ্ড্যে রাজের নিজস্ব প্রতীক-চিহ্ন ছিল। অশোকের ধর্মচক্র জাতীয়। এইসব প্রতীক তরবারি, লাঙল, ছত্র, অশ্ব, দামামা, হস্তি ও রথ প্রভৃতি, আরো কিছু পরে যুক্ত হয়, তবে এই আট রকম প্রতীকই ছিল মুখ্য। অভিষেকের পর সম্রাট রাজত্ব করতেন তার নাম 'মণ্ডিমাননার' বা 'মণ্ডলাম'। সম্ভবত এই কথাটি থেকেই মণ্ডল মাণ্ডলিক প্রভৃতি পর্যায়ের উৎপত্তি।

যাতায়াতের অসুবিধার জন্য রাজা দূরের অঞ্চলে স্বয়ং যেতে পারতেন না। সেই সব অঞ্চলে তাই তাঁর প্রতিনিধি গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকতেন। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সেই সূত্রপাত। গ্রামের প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শাসন-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করতেন। পাটলিপুত্রের মত পৌরশাসনব্যবস্থা ছিল না, তবে প্রতিদিন রাজপথে ঝাড়ু দেওয়া হত, নতুন করে বালি ছাপান হত। সাধারণের ব্যবহারের জন্য রাজপথ, কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং পান্থশালা নির্মিত হত। জন-সংখ্যার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, তবে দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত তথ্যকার প্লিনির মতে 'পালসমুন্দম' নামক (তাম্র-পর্ণীর একটি শহর) অঞ্চলে প্রায় দু' লক্ষ লোকের বসবাস ছিল। গাছের তলায় স্থানীয় জনপরিষদ বা আভাই-এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত।

চারণগণ শৌর্য ও বীর্যের প্রশংসা করে গান করতেন। যুদ্ধে মৃত্যু হলে নিশ্চিত স্বর্গলাভ (তুরক্রম), তাই তাদের নামে স্মারক মর্মরফলক স্থাপিত হত। রাজার জন্য টোটেম বৃক্ষ বা 'কাবলমরা' স্থাপিত হত (বৃষকাষ্ঠের মত). এইসব বৃক্ষ অপসারণ করলে গভীর পাপের কারণ হত। নৌ-বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল, তারা তামিল এবং অ-তামিল সমাজ থেকে সংগৃহীত হত। সকল শ্রেণীর মানুষ সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারত। রাজা স্বয়ং ন্যায়াধীশ হয়ে বিচার করতেন। তৃতীয় পর্বে আছে সমাজব্যবস্থা এবং সমাজবিধি বিষয়ক বিবরণ।

লেখক বলেছেন, চেরা, চোল এবং পাণ্ড্যিয় এই তিন অঞ্চলের সাধারণ ভাষা তামিল হলেও তাঁরা নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন—এই কথা বলার অর্থ এই যে, শুধু ভাষার সূত্র দিয়ে গাঁথলেই ঐক্য অক্ষুন্ন থাকে না।

সাংস্কৃতিক ঐক্যের যা যা উপকরণ এবং উপাদান তা সবই ছিল এদেশের মানুষের তবু অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্ত-র্বিভেদের অন্ত ছিল না।

গ্রন্থটি বিরাট তাই আংশিক পরিচয় মাত্র দেওয়া গেল। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-নীতি বিষয়ে গ্রন্থটি অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান দান করেছে।

—অভয়ঙ্কর

SANGAM POLITY: By N. SUBRAHMANIAN Published by: ASIA PUBLISHING HOUSE—BOMBAY, PRICE Rs. 35/- only.

সাহিত্যের খবর

পরলোকে উনগারেত্তি ।। বর্তমান ইতালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জুসেপ্পে উনগারেত্তি ইতালীর মিলানে পরলোকগমন করেছেন। ইতালীয় সাহিত্যে আধুনিক কাব্য আন্দোলনে তিনি অন্যতম দিকপাল বলে বিবেচিত। 'শুদ্ধ কবিতা' আন্দোলনের তিনিই ছিলেন প্রধান প্রবক্তা। তাঁকে অনুসরণ করে এগিয়ে এসেছিলেন সেকালের তরুণ কবিরা। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কোয়াসিমোদো ছিলেন এই তরুণ কবি-গোষ্ঠীর অন্যতম। দুঃখের বিষয়, উন-গারেত্তি কোন আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাননি। তাঁর কবিতার বিদেশী অনুবাদ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে কয়েক বছর আগে। গত মার্চ মাসে তিনি 'বুকস অ্যাবরড' পুরস্কার পান।

উনগারেত্তির জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ আলেক-জান্দ্রিয়ায়। ১৯১২ খৃঃ প্যারিসে যান উচ্চতর শিক্ষার জন্য। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি ইতালী ও ফ্রান্সে ছিলেন। সেই সময়েই তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ খৃঃ ব্রাজিলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতালীয় সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ খৃঃ চলে আসেন রোমে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতালীয় পড়াবার দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপর। তিনি ইউরোপীয় লেখক সমিতিরও দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন।

বাংলায় কিন্তু উনগারেত্তির অনেক কবিতা অনূদিত হয়েছে। 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' গ্রন্থে তাঁর কবিতার একাধিক সুন্দর অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। তাঁর উপর কয়েকটি প্রবন্ধও বেরিয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

বাংলার প্রাচীনতম ব্যাকরণ ।। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ কোনটি? সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে একটি নতুন তথ্য পরিবেশন করে-ছেন। লণ্ডনে বাংলা ব্যাকরণের এক অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এর লেখক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে লেখকের নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে, গ্রন্থটি ১৮০৭ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে রচিত। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউসে' পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে। গত শনিবার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক অনুষ্ঠানে ডঃ মুখোপাধ্যায় মূল পাণ্ডুলিপির ফটো স্টাট কপি উপস্থিত সকলকে দেখান। মুদ্রিত বইটির একটি কপি তিনি জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উপহার দেন।

ফস্টার আর নেই ।। ইংলন্ডের এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিকদের অন্যতম ই এম ফস্টার গত রবিবার, ৭ জুন ৯১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয় কেন্টের টেনব্রিজে। এরপর চলে আসেন কেমব্রিজের কিংস কলেজে। এখান তাঁর যে বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল হয়ে ওঠেন।

কেমব্রিজে পড়াশোনা শেষ করে তিনি প্রথমে যান ইতালীতে এবং পরে গ্রীসে। সেখানে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯০৫ সালে প্রথম উপন্যাস 'হোয়ার এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'লংগেস্ট জার্নি' প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে এবং তৃতীয় উপন্যাস 'এ রুম উইথ এ ভিউ' ১৯০৮ সালে। এই উপন্যাস তিনটি ইংরেজি সাহিত্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিছুকাল পর তিনি ভারতে আসেন এবং মহারাষ্ট্রের তুকোজি রাও দেওয়াস (৩য়)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি মিশরে তিন বছর কাটান এবং সেই সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে এক বছরেই বইটির সপ্তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীরা সাধারণতঃ যে ধরণের বই লিখে থাকেন, এই বইটি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের দুঃখ ও বেদনা এবং ভারতের মহত্ত্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯২৭ সালে 'আসপেকটস অব দি নোভেল'-এর উপর ক্লার্ক বক্তৃতা করেন। ১৯৫৩ সালে 'দি হিল অব দেবী' নামেও তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি বহু জীবনী গ্রন্থ, সমালোচনা এবং পুস্তক আলোচনা গ্রন্থ লেখেন। তাঁর একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। শান্তারাম রাওয়ের সহযোগিতায় তাঁর 'এ প্যাসেজ টু আমেরিকা' বইটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে খুবই জনপ্রিয় হয় এবং লণ্ডনের লোক সিনেমায় প্রায় এক বছর প্রদর্শিত হয়।

ভারতবর্ষের সাহিত্যের প্রতিও ফস্টারের সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। ১৯৬২ সালে তিনি উর্দু ভাষার উন্নতির জন্য হায়দরাবাদের আঞ্জুমান-এ-তারক্কী-হিন্দ সংস্থাকে এক হাজার পাউণ্ড দান করেন। বিভিন্ন সংস্থা তাঁর সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁকে সম্মানিত করে।

নতুন বই

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড)—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। প্রকাশক : ভারতী লাইব্রেরী। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম — আঠারো টাকা।

সদ্য পরলোকগত মনীষী কাজী আবদুল ওদুদের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালের প্রথম দিকে। সেই সময় লেখক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এর পরের বছরই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। আরো অনেক প্রবন্ধ গ্রন্থের অদৃষ্টে যেমনটি ঘটে থাকে, এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রকাশকের উৎসাহের অভাবে গ্রন্থটির ২য় খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। বর্তমান প্রকাশককে ধন্যবাদ, তিনি অগ্রসর হয়ে না এলে এই গ্রন্থ অমুদ্রিত থেকে যেত। কাজী আবদুল ওদুদ একজন বিদগ্ধ সমালোচক ছিলেন এবং রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম ভাষ্যকার হিসাবে তিনি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত যাবতীয় রচনা, এমনকি 'কবির আঁকা ছবি' নিয়েও আলোচনা করেছেন। সমগ্র পর্বকে তিনি দুই অংশে ভাগ করেছেন 'চিরকুমার সভা' থেকে 'গীতিমাল্য', এবং নোবেল প্রাইজ লাভ পর্বটির নামকরণ করেছেন 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' (পৃ ১-৩৫৮); এবং 'গীতালি' থেকে 'শেষ লেখা' ও উপসংহার (পৃ ৩৫৮-৬৬৮)-এই পর্বের নামকরণ করেছেন 'পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে—'। অবশ্য এইভাবে দুই পর্বে বিভাগ করবার কোনো কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি। তবে মনে হয় যে, কবির এই দুটি পর্বের মধ্যে যে মূল সুর লেখক লক্ষ্য করেছেন সেইভাবেই ভাগ করেছেন। প্রথমোক্ত পর্বে আছে কবির নানাবিধ প্রবন্ধাবলী, নষ্টনীড়, চোখের বালি, গোরা প্রভৃতি উপন্যাস; চিরকুমার সভা, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর প্রভৃতি নাটক• স্মরণ, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের মত কাব্যগ্রন্থ এবং আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'। প্রায় সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠায় এইসব গ্রন্থের পরিচয়, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। এবং বলা বাহুল্য সুললিত ভঙ্গীতে এইসব বিশিষ্ট গ্রন্থের পরিচয় তিনি যেভাবে দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বাজার-চলতি রবীন্দ্রচর্চায় বিরল। ১৩১১ থেকে ১৩১৬-১৭-১৮ সাল পর্যন্ত কবির জীবনের এক বৈচিত্র্যময় কাল, সেটি এই পর্বের সঙ্গে জড়িত। কাজী সাহেব শুধু গবেষক বা সমালোচনার দৃষ্টিতে নয় রসিক পাঠকের দৃষ্টিতে সমগ্র পর্বটির পরিচয় দান করেছেন এবং আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করেছেন।

এর পরবর্তী পর্যায় ১৩২১ থেকে ১৩৪৮, অর্থাৎ কবির তিরোধানের কাল পর্যন্ত রচিত সমগ্র রচনাবলী আলোচিত হয়েছে। এই পর্বের মধ্যে আছে বলাকা, পলাতকা, লিপিকা, শিশু ভোলানাথ, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পুনশ্চ, বিচিত্রিতা, পত্রপুট, শ্যামলী, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থাদি; ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, নটীর পূজা, তপতী, চণ্ডালিকা ও শ্যামা প্রভৃতি নাটক; চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, চার অধ্যায়, সবুজ পত্র যুগের ছোটগল্প, এবং শেষজীবনের লেখা 'তিন সঙ্গী', আর সেই সঙ্গে আছে মানুষের ধর্ম, রাশিয়ার চিঠি, কালান্তর, সভ্যতার সংকট প্রভৃতি যুগান্তকারী রচনাবলী। কাজী সাহেব এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে সামগ্রিক রচনার বিচার করেছেন এবং সেই সঙ্গে স্যার উপাধি ত্যাগ, কবির আঁকা ছবি, শব্দতত্ত্ব, বাংলাভাষা পরিচয়, ছন্দ প্রভৃতি সবকিছুর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ এমন সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা গ্রন্থ কদাচিৎ চোখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে কাজী সাহেবের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' ১ম খণ্ড থেকে ২য় খণ্ডটি যেন অধিকতর সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সাহিত্য-সাধনার পরিচয় এইভাবে পরিবেশন করা যে কি অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল তাই ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

ভোরের গোলাপ (কাব্যগ্রন্থ) — গিরিধারী কুণ্ডু রচিত। প্রকাশক : অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। ৫৯, বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা-১৪। দাম — তিন টাকা মাত্র।

লেখক বর্তমান সমাজের মানুষ, তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থে সমকালীন সমাজের ছবি ফোটানোর চেষ্টা স্বাভাবিক। 'অস্থির প্রতি মুহূর্তে ক্ষত দেহ নিয়ে' তিনি অশান্ত হয়ে ঘুরছেন ধ্বংসের সান্নিধ্যে। দুঃখবাদ সমস্ত কবিতাবলীকে আচ্ছন্ন রেখেছে, তবু 'দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে, আরেকটা জীবনযুদ্ধের পথ চেয়ে'—এই চপলতা হয়ত কাটবে। অস্থির যুগের প্রতিকৃতি এই ভোরের গোলাপ। কবিতাগুলির মধ্যে কিছুটা শক্তিমত্তার ছাপ আছে।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১)

ফেলু দাওয়ায় বসে গজরাচ্ছিল। বাঁ হাতে এখন আর একেবারেই শক্তি পাচ্ছে না। হাতটার দিকে তাকালেই ভয়ঙ্কর এক আক্রোশ বুক বেয়ে উপরে উঠতে থাকে—তুমি ঠাকুর, পাগল ঠাকুর, তোমার পাগলামি ভাইঙ্গা দিমু।

হাতটা ওর বাঁ হাত। কব্জিতে জোর নেই। কালো পোড়া বিশীর্ণ রগু ধরে আছে কব্জির চামড়াতে। দু পাশের মাংস ফুলে ফেঁপে আছে। যেন কব্জির দু পাশে মাংস বেড়ে একটা মোটা গিঁট হয়ে যাচ্ছে। কালো তার বাঁধা। কালো তারে মন্ত্র পড়া সাদা এক কড়ি ঝুলছে। কড়ির গলায় ফুটো করে হাতে বাঁধা সুতো নিয়ে ফেলু কেবল গজরাচ্ছিল। কিছু কাক উড়ছিল উঠোনে, কিছু শালিখ পড়ছিল মাচানে আর বিবি গেছে পশ্চিমপাড়াতে এক শিশি তেল ধার করতে। ফেলু আছে মাছ পাহারায়।

উঠোনের উপর শীতের রোদ পিটকিলা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে নিচে এসে নামছে। এই সামান্য রোদেই ফেলু মাচানে মাছ ছড়িয়ে বসে আছে। তারপর আরও সামনে খানা-ডোবা এবং জমি, জমিতে কোন ফসল হয় না। ছোট্ট একখণ্ড জমি ফেলুর। বাড়ীর উত্তরে এই জমি, বাঁশ গাছের ছায়া জমিটাকে বড় অনুর্বর করে রেখেছে।

ওর গলায় কালো তার বাঁধা। গলায় চৌকো রুপোর চাকতি। সব সময় পালোয়ানের মতো চেহারা করে রাখার সখ ফেলুর। ফেলুর যৌবন নেই, কিন্তু এখনও শক্ত ঘাড় গলা দেখলে, ঘাড় গলা হাত দেখলে, তাজ্জব বনে যেতে হয়। মানুষটার মুখ ফসলহীন মাঠের মত। রুক্ষ, দাবদাহে যেন সময় পুড়ে যাচ্ছে। এক চোখে তাকালে বুকটা কেঁপে উঠে। চোখের ভিতর মণি আছে, মণির ভিতর সব সময় নৃশংস এক ভাব। সুখী পায়রা আকাশে উড়তে দেখলেই ধরে ফেলার সখ, দুই পাখা ছিঁড়ে দেবার সখ। এবং ঠ্যাং খোঁড়া করে দিতে পারলে গাজীর গীদের বায়ানদারের মতো চান্দের লাখান মুখখান এমন সব বলতে থাকে।

ফেলু বড় হা-ডু-ডু খেলোয়াড় ছিল। তখন তার দুই হাতের উপর শত্রু পক্ষের কি আক্রোশ! ঐ হাত যেভাবে পারো ভেঙে দাও। থাবা মারলে ফেলু, সকলে বাঘের ভয় পায়।

চত্বরে খেলা হচ্ছে। গোপালদি বাবু-দের দল খেলছে—দশ টাকা আগাম, আরও দশ ফেলুর ঐ বাঘের মতো থাবা মচকে দিতে পারলে। কিন্তু হায়, কে কার থাবা মচকায়। ফেলু ছুটছে। একবার এ-মাথায় আবার ও-মাথায়। সে খুব দ্রুত ছুটতে ভালবাসে। দাগের উপর পড়েই সে লাফ দেয়, যেন সে লাফ দিয়ে আসমান ছুঁতে চায়। ঐ ওর কায়দা। শক্ত হাত-পা পেশীতে সূর্যের আলো ঝলমল করত। কালো খাটো প্যান্ট, কালো গেঞ্জি আর রুপোর তাবা গলায়, যেমন লম্বা ফেলু তেমন কুৎসিত মুখ শরীর—মনে হয় তখন ফেলু জয় মা বলে অথবা আল্লা আল্লা বলে—হা মা ঈশ্বরী বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুই পায়ে কাইচি চালাও—ফেলু যে ফেলু সে পর্বত পাহাড়ের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে। তখন ফেলুর কোমরে বসে উল্টোভাবে এমন এক মোচড় দিতে হবে যেন বাঘের থাবা বেড়ালের হয়ে যায়। বাবুদের বায়নার মুখে ছাই দিয়ে যে ফেলু সেই ফেলু। খেলায় শেষে টেরটি পাওয়া যায় না, ফেলুর কোথাও শরীর জখম হয়েছে।

সেই ফেলু বসে বসে এখন হাত দেখছে। কাক তাড়াচ্ছিল এবং ভাঙা হাতের দিকে তাকিয়ে বড়ঠাকুরকে উদ্দেশ করে গাল পাড়ছিল—পাগলামির আর জায়গা পাওনা ঠাকুর, তোমার পীরাগরি ভাইঙ্গা দিমু। তারপর সে হুস করল। একটা কাক ফের এসে ঘরের চালে বসেছে। কাকটা সেই থেকে জ্বালাতন করছে। কাক একটা নয়, অনেক। ধরে ফেলেছে সে ব্যারামী নাচারী মানুষ। সে ক্রমে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। গিঁটে গিঁটে ব্যাদনা। হাতির শুঁড় ওর সব শক্তি নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু ফেলুর জ্বলন্ত দুই চোখ, বিশেষ করে পোকায়-খাওয়া চোখটা এখন বড় বেশী ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। কাকটা বোধ হয় সেই চোখটা দেখতে পায়নি। সে চোখটা দেখাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কাকটা উড়ে এসে উঠোনে বসল। চোখটা দেখতে পায়নি। সে এবার তেড়ে গেল—তুমি আমারে পাগল ঠাকুর পাইছ! বলেই সে ডান হাত উঁচু করতে গিয়ে দেখল, হাতটা পুরোপুরি নিরাময় হয়নি। বাঁ হাতটা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটা নিরাময় হচ্ছে না। বিবি গেছে এক শিশি তেল ধার করতে আর সে ঘরের মাগের মতো বসে আছে মাছ পাহারায়।

বিবির উপর রাগটা বাড়ছিল। একটা পাটকাঠি দিয়ে পঙ্গু হাতে কত আর কাক-শালিখ তাড়ানো যায়! কাক-শালিখ, মাছের লোভে বাজপাখি পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে। বাজপাখির কথা মনে আসতেই গোর সরকারের কথা মনে এসে গেল। হাজি সাহেবের পাঁচনের খোঁচা, সময়ে অসময়ে সেই সন্দেহের পাখি কুরে কুরে খেলে, হাজি সাহেব পাঁচনের খোঁচা মারেন মাইজলা বিবিরে আর প্রতাপ চন্দের নাভিতে তেল মাখানোর অভ্যাস, অভ্যাসটার কথা মনে আসতেই ফেলু ভাবল—ওরা কাক চিল নয়, ওরা বাজপাখি নয়, ওরা লাল নদীর ঈগল। বড় মাছ বাদে ওরা খায় না।

সব জমি জিরাত ওদের। সুদিনে দুর্দিনে কামলা খাটলে পয়সা। ফেলুকে গোর সরকার বড় ভয় পায়। সে ফেলুকে

ভয় পায় গতর দেখে নয়, এমন গতরের কামলা ওর ঘরে কত বাঁধা আছে। ভয়, ফেলু নাকি যৌবনে অথবা সেদিনও রাতে বিরাতে কোথায় চলে যেত। দরকার পড়লে সে দশটা টাকার বিনিময়ে দশটা মাথা এনে দিতে পারে—সেই ফেলু কি তাজ্জব, একটা কাক তাড়াতে পারছে না! ফেলু রাগে হতাশায় লুঙিটা ডান হাতে ঝাড়তে থাকল বার বার।

রোদে মাছ শুকানো হচ্ছে। ছোট একটা উঠোন ঘিরে ফেলুর ঘর। একটা পেয়ারা গাছ। নতুন বিবি ঘরে এসেছে। চার-পাঁচ সাল হল সে বিবিকে, বয়স আর কত বিবির, এক কুড়ি হবে, কি দু-এক বছর বেশি হতে পারে। কাঁচা যৌবনের ঢল বিবির বড় বেশি ছিল। পাড়াময় রসিকতা কত—বিবিটা আলতাফ সাহেবের। কি করে, কে কখন আলতাফ সাহেবের লাস পাট খেতে আবিষ্কার করেছিল কেউ জানে না। তারপর বছর পার হয়নি ফেলু আলতাফ সাহেবের খুবসুরত বিবিকে ঘরে এনে তুলেছে। কেউ রা-টি করেনি। ফেলু বড় দাঙ্গাবাজ মানুষ। ভয়ে বিস্ময়ে কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। সেই ফেলু এখন এক কাক, সামান্য কাকের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

মাছ রোদে শুকাচ্ছে। এক ফাঁকে একটা কাক এসে মাছ নিয়ে উড়াল দিল। দুঃখে হতাশায় ফেলু কাকটাকে তেড়ে গেল। কোমর থেকে লুঙিটা খুলে গেছে, সে প্রায় উলঙ্গ হয়ে কাকটার পিছনে ছুটতে গিয়ে দেখল, প্রায় সব কাকগুলি ওর মাছের মাচানে বসে মাছ খাচ্ছে। রাগে দুঃখে সে ছেঁড়া তফনটা তুলে আর হাঁটতে পারল না। প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতো হেঁটে গিয়ে দেখল, কাক যে সামান্য কাক, সেও বুঝে ফেলেছে ফেলুর আর শক্তি সামর্থ্য নেই। সে মরা মাছগুলোর চোখের দিকে নিজের পোকায় খাওয়া চোখটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। সে নড়তে পারছে না। নড়লে বাকি কয়টা মাছও আর থাকবে না। ওর ডান হাত সম্বল, বিবির উপর সংসার। মাছের এ-অবস্থা দেখলে বিবি তাকে কুঁপিয়ে কাটবে। সে মাচানের পাশে বসে মাছগুলোকে ফের ছড়িয়ে রাখল। পুঁটি মাছ, চেলা মাছ। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রাখলে বিবি এসে ধরতে পারবে না। কাকে এসে মাছ নিয়ে গেছে। সামু ফের ঢাকা গেছে, ফিরছে না। সামুর মার কাছ থেকে এক কাঠা ধান এনেছে ধার করে, সেও কি দিয়ে শোধ হবে, কবে, কিভাবে কাজ করতে পারলে শোধ হবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। একমাত্র যুবতী বিবি আন্নু সব দেখেশুনে করছে।

আন্নুর উপর এ-সময় তার কেমন মায়া হতে থাকল। সে লুঙিটা তুলে এবার পরল। আন্নু বেগম, বড় মনোরম নাম। কিন্তু আন্নুটার শরীরে এত বেশী তেজ—প্রায় যেন সরকারদের তেজী ঘোড়া—লম্বা মাঠ পেলেই কেবল দৌড়াতে চায়। বড় মাঠে ফেলু এখন আর ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে পারে না। কোমরে টান ধরে। সমানে ছুটতে গেলে বড় অবশ অবশ লাগে শরীরটা। আন্নু ক্ষেপে গিয়ে বলে, মরদ আমার! ঠেলে ফেলে দেয় পিঠ থেকে, মাটিতে থুবড়ে মুখ হাঁ করে রাখে ফেলু। তখনই একটা সন্দেহের কোড়া পাখি ফেলুকে কুরে কুরে খায়। সে অতি কষ্টে যেন নদীর চর পার হতে হতে ডাকছে, আন্নু, আন্নুরে পাগল ঠাকুর আমারে কানা কইরা দিছে।

ছোট্ট গ্রাম। কয়েক ঘর মুসলমান পরিবার। হাজি সাহেবের বাড়ীতে চারটা চার-দুয়ারী নতুন টিনের ঘর উঠেছে। কিছু গাই গরু আছে, বড় দুটো মেলার গরু আছে। তারপর সামুদের কিছু জমি, নয়াপাড়ার মাঠে ওদের কিছু জমি আছে। সমবৎসর সামুদের ঐ ফসলে চলে যায়।
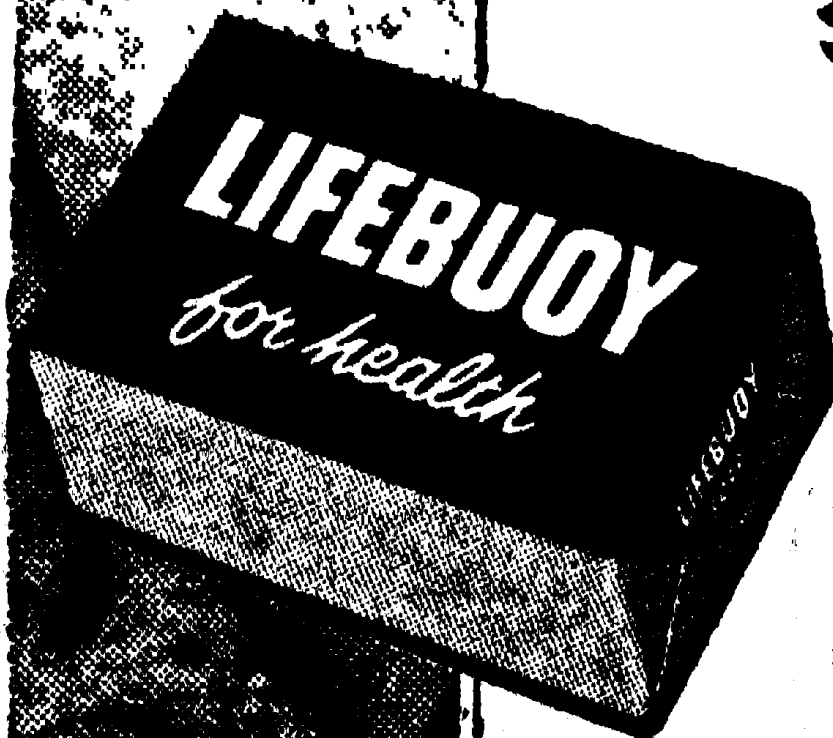
আল্লা রে, কবে পাটের জমি থাকলে আর কি চাইরে! আমরা মিঞাজানেরা বড় বেকুব। সুতরাং অভাবে অনটনে ধান, খৈ, মুড়ি সবই চলে আসে। তারপর আর যারা আছে প্রায় সবাই আল্লার বান্দা। গতরের উপর নির্ভর। আবেদালির জমি নেই। মানুষের অধিকাংশ জমি ভাগচাষ করে। উপর ও শালা! বলে ফেলু একটা খিস্তি করল। পশু বিবি উপমের। মানুষের আত্তাবেড়া পার হলে হাজী সাহেবের গোলাবাড়ী এবং পরে একটা বেতঝোপ, আর আতাফলের একটা বড় গাছ, গাছের নিচে ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর—কোন আদ্যিকাল থেকে বিবিটা সেখানে পড়ে গোঙাচ্ছে। কি যেন এক ব্যাধি! বিবিটাকে সে কোনদিন ভালবাসতে পারেনি। ওর একমাত্র সম্বল এক তরমুজ ক্ষেত। সেই ক্ষেতে বসে থাকে মানুষটা। এখন শীতের দিন, এইসব দিন পার হলে গ্রীষ্মের দিন আসবে। তখন যেন ঈশম সওদাগরের মতো। ঠাকুরবাড়ীর বান্দা ঈশম তরমুজ বিক্রি করবে, আর সব টাকা তুলে দেবে ছোট ঠাকুরের হাতে। ওর গর্ব সে জমি থেকে ছোট ঠাকুরের হাতে কত টাকা তুলে দিতে পারল।

গ্রামের পর গ্রাম অথবা বিস্তীর্ণ মাঠ। মুসলমান গ্রামগুলিতে হাহাকার যেন। কোনো কোনো গ্রামে হাজি সাহেবের মতো ধনী আছেন, তাদের সুখ অন্য ধরনের। ওরা, ওদের ছেলেরা উজানে যায়, পাটের ব্যবসা করে কেউ। মসজিদে ইন্দারা দিয়ে ওরা সিমি চড়ায়। এইসব দেখে অন্ত ফেলুর মত ইসছা একবার বড় একটা নাও বানায়। সেই নাও নিয়ে পাটের ব্যবসা করার সখ। পাটের দালাল অথবা ফড়ে হতে পারলে বড় সুখের। যা করে হাজি সাহেব হজ করে আসলেন পর্যন্ত।

আর হিন্দু-গ্রামগুলির দিকে তাকাও—পুবের বাড়ীর নরেন দাস—তার জমি আছে, তাঁতের ব্যবসা আছে। দীনবন্ধুর দুই তাঁত, দুই বউ। সুখে আছে লোকটা। আর ঠাকুর বাড়ীর মানুষেরা শোনা যায় তল্লাটের বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ। বড় ঠাকুর পাগল মানুষ। মেজ ঠাকুর, সেজ ঠাকুর দু দশ ক্রোশ হেঁটে গেলে মুড়াপাড়ার জমিদারদের কাছারি বাড়ির নায়েব গোমস্তা। জমিদারদের বড় বিশ্বাসভাজন লোক। ওদের স্বচ্ছল সংসার। তারপর পাল বাড়ী—জমি আছে ওদের, বিলের কাজ আছে। তারপর মাঝিরা—ওদের বড় বড় গরু। ইচ্ছা করলে ওরা প্রায় মেলায় জিতে আসতে পারে। শুধু দু একবার নয়াপাড়ার মিঞাজানেরা বাজিতে জিতে গেলে—সে যেন মাঝিদেরই অপমান। যার যার কাপ মেডেল নিলে মাইনসে কয় কি। ওরা মেলায় গরু মাঠে নিয়ে যায় কি বলে মিঞা-জানেরা দৌড়ে বাজি জিতে গেল।

শেষে পড়বে কবিরাজ বাড়ি। প্রতাপ মাঝি ধনী লোক, বিশ্বাসপাড়ার মাঠে ফাউসার মাঠে এবং সুলতানসাদির মাঠের সব সেরা জমিগুলি ওর। শেষে আর দ্যাখো গৌর সরকার—শালীর সনে পীরিত যার, যে ছন হাইতে গেলে জলপান করতে দেয় না, যে মানুষ সুদে এবং লালসায় বড় হচ্ছে—অপরের সুখ দুঃখের বোধ যার কম— কেবল টাকা টাকা, টাকা পেলে সে তার নিজের কলিজা পর্যন্ত বিক্রি করতে পারে। ফেলু ভাবতে ভাবতে দাঁত দাঁত ঘষে ফেলল—তোমা-গ মশাইরা জবাই করতে পারলে শান্তি। সে চিৎকার করে উঠল, ঠাকুর পাগল তুমি! তোমার পাগলামি— সে আর বলতে পারল না, কাকগুলি ওকে অন্যমনস্ক দেখে ফের উঠোনে নেমে এসেছে। সে হুস হুস করতে থাকল। কিন্তু দুঃখে দুর্দশায়...বিবিটা এখনও বিছানায় গোঙাচ্ছে। হাঁ, কি করছে এতক্ষণ! হাজি সাহেবের ছোট ছেলে কি আমারে পেটে হাঁটু রাখতে চায়। সে চিৎকার করে উঠল, হালার কাওয়া আমারে ডরায়। হালার বিবি আমারে ডরায় না! সে বিবিকে খুন করবে ভেবে পাগলের মতো হেসে উঠল। সে হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, পোড়া হাত কি ভাল হইব না আল্লা! সে বাঁ-হাতটা কোনো রকমে ডান হাতে চোখের সামনে তুলে আনল। দেখল কব্জির চামড়া কুঁচকে গেছে। ফোলা কব্জি, কব্জিতে কানাকড়ি বাঁধা কালো তার ঝুলছে। মনে হয় এই ফেলু ঈশমের বিবির মতো পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সে উঠোন থেকেই পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, আমারে, আমা!

তখন আবেদালির বিবি জালালি যাচ্ছে বাড়ির নিচ দিয়ে। বাঁশ ঝাড়ের নিচে শীর্ণ জালালিকে দেখে মনে হল বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। এখন গরীব-গরবাদের শালুক তুলবার সময়। আশ্বিন-কার্তিকে সামনের সব মাঠে আর অঘ্রাণ-পৌষে বিলের জমিতে ফাট ধরে ঘাসের ডগা শুকিয়ে মুখে ফেটে কোচড় ভরা যায়। এখন মাঠে কিছু নেই। ফাঁকা মাঠ। সব শস্যের ফলন হয়নি। এখন শুধু বিলে নেমে যাওয়া মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র শালুক তুলতে বিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সে জালালিকে দেখে বলল, ভাবি, আমারে দ্যাখছেন নি?

জালালি গায়ছাটা বগলে রেখেছে। মাথায় ওর একটা পাতিল ছিল। পাতিলটার জন্য মুখ দেখা যাচ্ছে না। পাতিলটা মাথায় ছিল বলেই হয়ত ফেলুর কথা ওর কানে যায়নি। অথবা শোনেও শুনল না। সুতরাং জালালি পাতিলটা মুখ থেকে নামিয়ে এনে বলল, কি কও মিঞা। আমারে কিছু কও নাকি!

—আর কি কমু! বলে ফেলু যে ফেলু সে পর্যন্ত গাই গরুর মতো মুখ নির্বোধের হাসি দিয়ে তাকাল।

—কিছু কইতে চাও?

—আমু গেছে এক শিশি তেল আনতে। আইতাছে না।

জালালি বলল, আইবনে। বলে, জালালি দাঁড়াল না। সে ফের পাতিলটা মাথায় দিয়ে মাঠে নেমে গেল। বড় মাঠ সামনে। বাঁ পাশে সোনালি বালির নদী, নদীর চর। চর পার হয়ে সোজা উত্তরমুখো হাঁটলে সেই বিল। ফাওসার বিল। বিলে একবার ঈশমকে কানা ওলায় ধরেছিল— এত বড় বিল এ-পরগণাতে কেন, এ-জেলাতে বুঝি আর নেই। একবার বিলের জলে কুমীর ভেসে এসেছিল, বড় এক অজগর সাপ ভেসে উঠেছিল। তারপর এই বিলের নানা রকমের কাছিমের গল্প, গজাড় মাছের গল্প এবং রাতে সপ্তডিঙ্গা মধুকরের গল্প কিংবদন্তির মতো এ-অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সেই বিলে জালালি যাচ্ছে শালুক তুলতে। শুধু জালালি নয়, অনেক এমন প্রায় হাজার হবে। ওরা শালুক তুলে আনবে। ওরা ভোরে ভোরে বের হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। দুঃখী মানুষেরা শীতের ভোরে শালুক তুলতে বের হয়ে যাচ্ছে। ফেলু উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

আবেদালি এ-সময়ে দেশে চলে আসবে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্তে সে [illegible] নৌকার মাঝি, শীত, গ্রীষ্ম আর [illegible] হিন্দু-পাড়ায় কামলা খাটবে। এই তো গ্রাম—গ্রামে মাত্র সামু মাতব্বর মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারছে। যত সামু মাতব্বর মানুষ হয়ে যাচ্ছে, যত হিন্দু যুবকেরা সামুকে সম্মান দিয়ে কথা বলছে, তত ফেলু সামুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সে যেন ফেলুর বান্দা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

যেন এক মানুষ মিলে গেছে সমাজে, আর এক মানুষ যে এইসব ভদ্র হিন্দু পরিবারের মানুষদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না। সামু ঢাকা থেকে এলেই ফেলুর ঘর ঘর করা বেড়ে যায়। সে ওর ভাঙা হাত সম্পর্কে নালিশ দেবার সময়

ফেলুর দেখে। সে মাথার উপরে ডান হাতে পাঁচকাটিটা ঘোরাতে থাকল।

আর তখনই বাছুরটা হাম্বা করে ডাকল। হাড় বের করা বাছুরটার মুখ দিয়ে ঠাণ্ডায় লালা পড়ছে। বাছুরটার ঠাণ্ডা লেগেছে, শীতে বাছুরটা ফুলে ঢাক হয়ে আছে। রোদে নিয়ে গেলে ফুলে থাকা ভাবটা গরমে কমে যাবে। তাছাড়া হাতে একটা কাজ পাওয়া গেল। এত বেলায়ও যখন আমু ফিরে এল না, বাছুরটা ক্ষুধায় হাম্বা করছে—ওকে নিয়ে তবে মাঠে নেমে যেতে হয়। খোঁটাতে বেঁধে দিলে কিছু ঘাসপাতা খেতে পাবে। ঘাসপাতা খেলে শক্ত হবে বাছুরটা।

আমু আসছে না! কি করা যায়? সে তাড়াতাড়ি ডান হাতে মাছগুলি তুলে ফেলল। ঘরের ভিতর মাছ রেখে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। সে বাছুর নিয়ে গোপাটে নেমে গেল। খোঁটা পুঁতে দিলে দেখল কাতারে কাতারে লোক বিলে শালুক তুলতে যাচ্ছে। সব মুসলমান বিবি, বেওয়া। ওরা এ-অঞ্চলের সব মুসলমান গ্রাম থেকে নেমে যাচ্ছে। আর এই তো সামনে বিশাল বিলেন মাঠ। হাইজাদির সরকাররা পুকুর পাড়ে বাস্তুপুজা করছে। ভেড়া বলি হচ্ছে। ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে।

বাস্তুপুজার জন্য ঠাকুরবাড়ীর ছোট ঠাকুর বের হয়ে পড়েছে। সে হিন্দু গ্রামে উঠে সব হিন্দু গেরস্থ বাড়ীতে বাস্তু-পুজার তিল-তুলসী দেবে। বাস্তুপুজায় ঢাক বাজছে—পুজা-পার্বণে ঘুরে বেড়াবে, মন্ত্র পড়বে। ঈশম আজ যাবে না। সে কাল যাবে। চাল কলা এবং অন্য তৈজসপত্র সব বেঁধে আনবে।

সরকারদের বাস্তুপুজায় কত লোক এসেছে নতুন শাড়ী পরে—কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে সোনার গহনা, পরনে গরদের শাড়ী আর ওদের কেমন মিষ্টি চেহারা—কি সুন্দর মুখ! একেবারে যান হেমন্তে সোনালি বালির নদীর চর। পুজা হচ্ছে, পার্বণ হচ্ছে। কুটুমের মতো ঠাকুরবাড়ীর বড়বৌ, ধনবৌ পুকুর পাড়ে নেমে এল। জমির বুকে ছোট এক কলাগাছ, নিচে ছোট ঘট, ঘটের উপর নারকেল আর চারধারে সব নৈবেদ্য—যেন ভোজ্য দ্রব্যের অভাব নেই। তিলা কদমা শীতের যত খাদ্য-দ্রব্য সব ওদের আয়ত্তে।

আর কি জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না জলে, জালালি জলের দিকে নেমে যাবার জন্য মাঠের ও-পাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর কি জ্বালা, বাছুরটা কতকাল আর ঘাসে মুখ দিচ্ছে না। শীতের ঘাস—শিশিরে ভিজে আছে ঘাস। যতক্ষণ রোদ ভালভাবে না উঠবে, যতক্ষণ হিম ঘাস থেকে ভালভাবে না মরে যাবে ততক্ষণ বাছুরটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ঘাসে মুখ দেবে না। সে রাগে দুঃখে বাছুরটা ঘাস খাচ্ছে না বলে পেটে লাথি বসিয়ে দিল। বাছুরটা দু-হাঁটু মুড়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কারণ ওর মনে হচ্ছিল কেবল তাড়াতাড়ি ঘাসকটা না খেয়ে ফেললে, এক ফাঁকে হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়টা অথবা গৌর সরকারের দামড়া গরুটা এসে চেটে-পুটে এই তাজা ঘাস খেয়ে ফেলবে। এই ঘাস সে যেন মাঠে নেমে আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বাছুরটা ঘাস খেয়ে ফেললে আর কেউ এসে ভাগ বসাতে পারবে না। কিন্তু বলিহারি যাই হালার মাগী আমু, ভাগে এক বাছুর এনেছে! এমন এক মরা বাছুর যার কপালে সুখ নাই, গায়ে বল নাই, আছে কেবল ছড়ানো ছিটানো অথবা থ্যাবড়ানো ঘরময়, পাড়াময়—আমুর কথা মনে হতেই সে সব ফেলে গাঁয়ের দিকে উঠে যাবে ভাবল। এক শিশি তেল ধার করতে এত দেরী!

দূরে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। ওর কানে বড় বেতপ লাগছে শব্দটা। জালালিকে দেখা যাচ্ছে। অনাহারে জালালি কাতর। এখন ফাওসার বিলে নেমে যাবার জন্য প্রতাপ চন্দের ঘাট পার হচ্ছে। সে, সামনে যেসব জমি আছে, শ্যাওড়া গাছের বন আছে তা অতিক্রম করে বেনেদের পুকুর-পাড় ধরে হাঁটছে। সেই এক বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের সব জমি প্রতাপ চন্দের। সেইসব জমি পার হলে ফাওসার খাল। খালের পারে পারে যত জমি পড়বে—পাটের, আখের, এমনকি করলার জমি, জমি সব গৌর সরকারের। তারপর যত জমি, সব জমি হাজি সাহেবের। হাজি সাহেবের তিন বিবি, ছোট বিবির বয়স আর কত—এই এক কুড়ি চার-পাঁচ হবে। হাজি সাহেব ঈদের দিনে তিন বিবি মসজিদে নিয়ে যাবার সময় চারিদিকে নজর রাখেন। সতর্ক নজর। কেউ কিছু নজর দিয়ে গিলে ফেলল কিনা দেখেন। অন্তরালে কিছু দেখা যায় কিনা, হেই হেডা কি হইছে। নজরে লালসা ক্যান, বলে হয়ত একটা পাঁচনের খোঁচা মারেন মাইজলা বিবিরে। খোঁচা দিয়া কন, বিবিরে, অঃ সোনার বিবি, পথ দেইখা হাঁটি। তখন কেবল কেন জানি মনে হয় ফেলুরে, পাঁচনটা কেড়ে নিয়ে একবাড়ি হালার হালা হাজির মাথায়। ভাবতে ভাবতে এসব, ফেলুর মাথায় খুন চড়ে যায়, ফেলু স্থির থাকতে পারে না—কেবল কি খুব মনে হয়। ফেলু, যে ফেলু কোন মাতব্বর মানুষ নয়, জলে জঙ্গলে যে ফেলু মানুষ হয়েছে, যে ফেলুকে উজান থেকে হাজি সাহেব ধরে এনেছিল—উজানি নৌকাতে ধান কাটা সারা হলে, ফেলু, হাজি সাহেবের পেটে পিঠে পায়ে রসুন গোটার তেল গরম করে মেখে দিত, সেই ফেলুর কেন জানি বড় শখ মাঝে মাঝে হাজি সাহেবের মাইজলা বিবিরে একবার ঘোরখার অন্তরালে উঁকি দিয়া দ্যাখে।

সে গোপাটে দাঁড়িয়েছিল। বড় সেই অশ্বথ গাছটার নিচে বিচিত্র সব মটাকলা গাছের ঝোপ, পাতাবাহারের জঙ্গল। শীত-কাল বলে জঙ্গলের ভিতরটা শুকনো খট-খটে। ভিতরে ঢুকে গোসাপের মতো ঝোপের ভিতর সন্তর্পণে পড়ে থাকলে হয়ত মাইজলা বিবিরে দেখা যাবে—কারণ, ও-পাশটায় হাজি সাহেবের অন্দরে পুকুর। ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি দেবার আগে চারপাশটা সে দেখে নিল। বাঁদিকে আবেদালির ঘর, কেউ এখন ঘরে নেই। আম-গাছটার নিচে ভাঙা ঘর এখন খালি। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরে সেই কবে জোটন বাস করত, এখন জোটন নেই বলে বর্ষার বৃষ্টিতে ঝড়ে ঘরটা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিছু ঝোপ জঙ্গল, বেত-গাছ আবেদালির বাড়িটাকে সব সময় অন্ধকার করে রাখে। কোন রকমেই শীতের সূর্য আবেদালির উঠোনে নামতে চায় না।

আর এইসব ঘর উঠোন এবং ঝোপ-জঙ্গল পার হলেই—হাজি সাহেবের আতা-বেড়ার ও-পাশে তিন বিবির গলা কাচের চুরির মতো জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলছে। কি হাসে! হাসতে হাসতে মনে হয় হালার দুনিয়া গিলা ফ্যালবে। সিঁথিতে বড় লম্বা টান ধানক্ষেতের সাদা আলের মতো। আর ডুরে শাড়ি হাঁটুর নিচে বেশীদূর নামতে চায় না। ঝোপের ভিতর থেকে ফেলু মরিয়া হয়ে একবার উঁকি দিল। হাত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতটা কোনোরকমে কাজে লাগছে এখনও, কবে এই হাত পর্যন্ত পঙ্গু হয়ে যাবে—সে প্রায় একটা মরা সাপের মতো ঝোপের ভিতর পড়ে থাকল। ঝোপের পাশ দিয়ে ঘাটের পথ। হাজি সাহেবের অন্দরের পুকুরের পানি কি কালো। পানি দেখলেই বিবি বৌদের পেটে জ্বালা ধরে। তলপেটটা শির শির করতে থাকে। কালো পানির টানে চুপি চুপি সময়ে-অসময়ে মাইজলা বিবি ঘাটে নেমে আসে। এলেই খপ করে হাত ধরে ফেলবে, ধরে ঝোপের ভিতর টেনে—ফেলু আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে কচ্ছপের মতো এবার গলাটা তুলে ধরল। সে মরা সাপের মতো বেশী সময় শিকারের আশায় ঝোপের ভিতর পড়ে থাকতে পারছে না।

(ক্রমশঃ)

নিবিষ্টেই আছে

আট ডজন স্যুট ও শালপাতা

একটা বাজতে না বাজতেই বেয়ারা এসে লাইট-ফ্যানগুলো পটাপট নিভিয়ে দিয়ে গেল। খোলা ফাইলের ওপর পেপার ওয়েট চাপিয়ে শশা কিনতে বেরোল রথীন। ঝালনুনমেশানো বিশ পয়সা জোড়ার শশাতে টিফিনটা বেশ জবর হয়।

সাত মিনিটেই টিফিন শেষ করে মোড় থেকে ফিরে এল। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ দেখে সড়াৎ করে নুন-ঝাল-মেশানো শশার জলটুকু শালপাতার প্লেট থেকে টেনে নিল। প্লেটটা বার-দুয়েক শূন্যে পাক খেয়ে লিফট আর সিঁড়ির মাঝে করিডোরে ভূমিশয্যা নিল। রথীন ফিরে এল সেকশনে।

এবার ঝাড়া পঞ্চাশ মিনিট ধরে চলবে টু নো ট্রাম্পস, থ্রি স্পেডস, ফোর হার্টস, হাঁকাহাঁকি, যতক্ষণ না বেয়ারা এসে আবার লাইট জ্বালিয়ে, ফ্যান চালিয়ে ঘোষণা করে খেল খতম, কাজ শুরু। কিন্তু গীতেশদার টেবিলের কাছে এসে রথীন বুঝতে পারল আজ গোড়াতেই খেল খতম হয়ে আছে। অ্যাকাউন্টসের মিত্তির এসে গীতেশদাকে উস্কে দিয়েছে। তিন পুরুষে বনেদী কেরানী গীতেশচন্দ্র পাল তখন তেড়েফুড়ে গল্প ফাঁদতে বসেছে। নাহ, লোকটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। নেহাৎ তাসটা খেলে ভাল তাই বাদ দেওয়ারও জো নেই। গল্পের বাই প্রচণ্ড। একবার সুযোগ পেলেই হল। একই গল্প সাতাশবার রিপিট করে কানের পোকা বার করে দেবে। তবে মানুষটা খাঁটি। সাতে পাঁচে নেই। না থাকার কারণটা, রথীন শুনেছে, ঈষৎ গূঢ়। সরকারী আন্ডারটেকিংয়ের কলকাতার এই সেলস ডিভিশনে বদলী হয়ে আসার আগে দাদা ছিল সুলতানপুরে কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে। একটা বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে বড়সাহেবের পা জড়িয়ে, কেঁদে নাকমুলে কানমুলে বৌদির সিরিয়াস অসুখের সার্টিফিকেট দাখিল করে পালিয়ে এসেছে। এসেই জমিয়ে তুলেছে তাসের আড্ডা, আর সেই সঙ্গে গল্পের মজলিশ। অভিজ্ঞতার অম্বলে পেটটা সর্বদাই আইঢাই করে। একটা টুসকি দিলেই তাসফাস ভুলে গিয়ে ঝোলা ঝাড়তে বসে যায় গীতেশদা। কবে কোথায় কোন সাহেব কত লাখ টাকা ঘুষ খেয়ে কোম্পানীকে একেবারে লাটে তুলে দিয়েছিল সেই সব ঝাল-মশলাদার গল্প। টেবিলের চারপাশে কাগজের ভিড় ঠেলে কানটা বাড়িয়ে দিল রথীন।

শুনতে পেল গীতেশদা বলে চলেছে, তারপর বুঝলি মিত্তির, পারচেজের সুপারিনটেনডেন্ট আশ্রফ সাহেব ফাইলটা পাঠিয়ে দিল পি ও থ্রি বকসী সাহেবের কাছে। কি হল, ভুরু কোঁচকালি কেন?

আমতা আমতা করে ভ্রূ কোঁচকানোর কারণটা মিত্তির খোলসা করে, পি ও থ্রিটা কি দাদা?

মিত্তির যেন দারুণ একটা হাসির কথা বলেছে, হো-হো করে হাসতে গিয়ে কেশে-টেসে একেবারে একাকার কাণ্ড। কাশির বেগটা একটু কমতেই, রুমালে মুখটা মুছতে মুছতে দাদা গম্ভীরভাবে বলে, খেয়াল ছিল না যে এটা একটা পুঁচকে সেলস ডিভিশন। স্রেফ বিক্রীবাটার ব্যাপার। তা কেনাকাটার কিছু না থাকলে তোরা জানবি কি করে যে পি ও থ্রি কাকে বলে। সে ছিল আমাদের সুলতানপুরে। এলাহি সব কাণ্ড কারখানা। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। বছরে সাত আট কোটি টাকার মাল কেনা হয় সেখানে। কোম্পানীর পারচেজ ডিপার্টমেন্টটাই তোদের এই সেলস ডিভিশনের ডবল। একজন স্টোরস অ্যান্ড পারচেজ কনট্রোলারের আন্ডারে দু-দুটো সুপারিনটেনডেন্ট। একজন স্টোরস, অন্যজন পারচেজ। আবার পারচেজ সুপারিনটেনডেন্টের আন্ডারে রয়েছে চারগণ্ডা সিনিয়র জুনিয়র পারচেজ অফিসের। তিনজন সিনিয়র ক্লাস ওয়ান, সাতটা জুনিয়র। এ-ছাড়া ক্লাস টু ছজন। একশ বারোজন ক্লার্ক, স্টেনো-টাইপিস্ট, বেয়ারাটেয়ারা সব মিলিয়ে।

বলতে বলতে একটু থামল গীতেশদা, কাশিটা বেড়েছে! পাঁচ ফুট সোয়া দুই ইঞ্চি শরীর যেন খসখসে কালো রংয়ের সিলিন্ডারটা। তার টু-থার্ড ঢাকা পড়ে গেছে চেয়ার টেবিলে। বাকীটা ঢেকে রয়েছে একটা ফুল স্লীভ সার্ট, হাফ হাতা সোয়েটার আর মাফলার। দাদার আবার অ্যালার্জিক ব্রংকাইটিস। শীতকালে কাশেন কম। বর্ষা পড়তে না পড়তেই হেঁপো রুগীর মত দম আটকানো খকখক আওয়াজে গোটা অফিসটাকে জানিয়ে দেন যে তিনি আছেন। টেবিলের ওপর সিরাপের শিশি, ট্যাবলেটের পাতা এখনও পুজো অবধি থাকবে।

কাশির তোড়টা একটু কমতেই গীতেশদার গলা শুনতে পেল রথীন, এক একজন অফিসার এক একটা আইটেমের ইনচার্জ। যেমন ধর মেনন সাহেবের হাতে ছিল সবরকম ইলেকট্রিক্যাল গুডসের কেনাকাটার ভার। কেমিক্যাল দেখতেন টি ভি পাকড়ে। আর আমার কর্তা সি এল বকসীর হাতে ছিল মেকানিক্যালের সমস্ত পারচেজ। গণ্ডা গণ্ডা অফিসার, কে কোনটার ইনচার্জ তাই বোঝার সুবিধের জন্য আইটেম ওয়াইজ অফিসারের নম্বর। মেকানিক্যাল তিন নম্বর, তাই বকসী সাহেবও পি ও থ্রি। আর আমি তখন তার আন্ডারেই কাজ করি। সিকসটি সিকসের শেষদিকের ঘটনা এটা।

খুব নীচু গলা হলেও, রথীন স্পষ্ট শুনতে পেল ক্যাশের ছোকরা ক্লার্ক বারীনের টিপ্পুনিটা—তারপরেই গীতেশদা বুঝি কলকাতায় চলে এলেন।

অবিশ্যি এসব ছোটখাট কথা গায়ে মাখেন না গীতেশদা। জানে এটা ছোকরার বদ-অভ্যাস। বয়স হলে কেটে যাবে। তাই উচ্চাঙ্গের একটা হাসিতে বারীনকে নির্বাক করে দিয়ে ফের শুরু করে, ট্রান্স-ফর্মার ডিপার্টমেন্ট থেকে একেবারে ড্রইং সমেত রিকুইজিশন পাঠিয়েছে। সুপারিন-টেনডেনট আশ্রফ সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে বকসী সাহেব বললেন, পাল, দেখো তো ট্রান্সফর্মারের অ্যাসিসট্যান্ট সুপারিন-ডেনটকে লাইনে পাও কি-না?

ট্রানসফর্মারের মেজ কর্তাকে লাইনে দিতে না দিতেই, বক্সী সাহেব বললেন

কলকাতার সুরেশ অ্যানড কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভকে একবার খবর পাঠাও তো। বুঝলাম, নিশ্চয়ই আবার কোন বড় মাছ উঠেছে জালে। নইলে স্টোর ডিপার্টমেন্টের মেজ-কর্তা, সাপ্লায়ারের রিপ্রেজেনটেটিভের খোঁজ পাড়ে কেন? চুপ-চাপ সব দেখে যেতে লাগলাম। জানি ফাইল শেষ পর্যন্ত তো আমার কাছেই আসবে। বাইরে চিঠি, চা-পাটি যা যাবে সবই এই শর্মার হাত দিয়েই ইস্যু হবে, তখনই বোঝা যাবে ব্যাপারটা কি?

আন্দাজ যা করেছি, ঠিক তাই। ট্রান্সফর্মারের মেজকর্তা লাইন ছাড়তে না ছাড়তেই সুরেশ অ্যানড কোং-এর খোদ মালিক এসে হাজির।

তবে যে দাদা এক্ষুনি বললেন, কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভকে ডেকে পাঠিয়েছেন আপনার সাহেব, তা মালিক এল কোথ্ থেকে?—চিড়বিড়িয়ে উঠল বারীন। ছোকরার ভারী সন্দেহ বাতিক।

বার বার বাধা পেয়ে দাদার ভ্রুদুটো একবার শুধু কুঁচকে উঠল। একটা কাশির বড়ি গালে ফেলে চুষতে চুষতে ঝাঁঝর-গলায় দাবড়ি দিল গীতেশদা, থাম দিকি। অত তড়বড় করিস না। তোর তো সবতাতেই সন্দ: আগে শোনই না।

মিত্তিরও মওকা পেয়ে বারীনকে এক-হাত নিল, এত সন্দেহ কিসের রে? দাদা কি গল্প ঝাড়ছে? এ-তো সব লাইফের এক্সপিরিয়েন্স। তোর দুধের দাঁতই এখনো পড়ল না, বুঝবি কি করে কোথায় মালিক নিজেই হয় রিপ্রেজেনটেটিভ।

যা বলেছিস মিত্তির, ছেঁড়া সুতোয় গিঁট বাঁধতে বসেন দাদা, কোম্পানী না ছাই। মালিকের নামেই কোম্পানী। সুরেশ আগরওয়ালা ধুরন্ধর বিজনেসম্যান। একাই চারটে কোম্পানী চালায়। নিত্য নতুন অর্ডার ধরার মতলবে প্যাড ছাপিয়ে কোম্পানীর সাইনবোর্ড পাল্টে ফেলে। অফিসিয়ালি কোম্পানীগুলোর হেড-কোয়ার্টার কলকাতা। আসলে মালিক যেখানে কোম্পানীও সেখানে। আগরওয়ালা নিজেই কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ। ওর বিজনেসই ছিল আমাদের মেকানিক্যাল পার্টস ইত্যাদি সাপ্লাই করা। আর সেজন্যই সারা বছর সুলতানপুরে পড়ে থাকত।

আমার কর্তা বক্সী খান্ অফিসার। এমনিতে খুবই কোয়ালিফায়েড। আই আই টি-র মেকানিক্যাল গ্র্যাজুয়েট। গভর্ণ-মেন্টের টাকায় জার্মানী ঘুরে এসেছে একবার। তেত্রিশ বছরেই সিনিয়র ক্লাস ওয়ান। কাজটা বুঝত ভাল। অন্যান্য অফিসাররা যে মাল আনতে বছর ঘুরিয়ে দিত, বক্সী তাই আনাত দু মাসের মধ্যে। ফলে আস্রফ সাহেবও খুব পছন্দ করতেন। মেকানিক্যাল আইটেমের ফাইল এলেই চোখ-কান বুজে সৈতাকনা বক্সীর কাছে। তবে বক্সীর তালজ্ঞান ছিল দারুণ। এত বছর একসঙ্গে কাজ করেছি, কখনো দেখিনি অডিট ওর কোন পারচেজে অবজেক-শন দিয়েছে।

রথীন নিজে ইন্টারন্যাল অডিটের লোক। সব তাতেই খুঁতখুঁত বাই। তাই শেষ কথাগুলো শুনেই ওর কান খাড়া হয়ে উঠল। বলল, দাদা একটু ঝেড়ে কাশুন তো। আপনার বক্সী সাহেব কি ভাবে অডিট এড়াতেন?

হাসতে হাসতে জবাব দিল দাদা—সে কথাই তো বলছি। এখন শুধু শুনে যা, পরে প্রশ্ন করিস। তারপর বুঝলি, আগরওয়ালা তো এল। কিউবিকেলের ভেতরে বসে ওদের কি কথা হল বুঝলাম না, তবে দিন দুয়েক বাদেই সাহেবের নোট দেওয়া ফাইলটা পেলাম—এই এই কোম্পানীগুলোকে ইমিডিয়েটলি চিঠি পাঠাও। সাড়ে সাত হাজার অয়েল সীল চাই, অ্যাকরডিং টু স্পেসিফিক ড্রইং। ওদের কোটেশন পাঠাতে বল।

এবার মিত্তিরই বাধা দিল, অয়েল সীলটা কি দাদা?

অয়েল সীল হোল, দাদা বুঝিয়ে দিল, এক ধরনের রবার বা চামড়ার গোল চাকতি। মাঝখানে বড় একটা ফুটো, সাইডে পেরেক বা স্ক্রু ঢোকার মত গোটা কয়েক ছোট ছোট ছ্যাদা। জেনারেলি দুটো মেটাল পার্ট জয়েন করার সময় মাঝে বসিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তেল লিক না করে। এক একটার দাম বড়জোর চার আনা। না থেমেই বলে চলে গীতেশদা চাই সাড়ে সাত হাজার পীস। কোম্পানীর নামগুলো দেখেই বুঝলাম কর্তার চালাকিটা কোথায়? গোটা সাতেক কোম্পানীর নাম দেওয়া আছে। তার দুটো খুবই বড়। ওরা অয়েল সীল ম্যানুফ্যাকচারারদের মধ্যে রাঘব বোয়াল। তবে স্ট্যান্ডার্ড সাইজের মাল চালান দিয়েই কুলোতে পারে না তো স্পেশ্যাল ডিজাইন অনুযায়ী বানাবে কি। তাছাড়া এসব খুচরো অর্ডার ধরলে ওদের পোষায় না। ওদের চাই লাখ বে-লাখের অর্ডার।

বাকী পাঁচটার মধ্যে একটাকে বক্সী সাহেব লাস্ট ডেটে চিঠি পাঠাতে মুখে বলে দিলেন, যাতে আর কোটেশন পাঠাতে না পারে। ফলে পড়ে রইল আর চারটে কোম্পানী যার মালিক ঐ সুরেশ আগরওয়ালা। সাহেব আদেশ করেছেন, আর আমি তো হুকুমের গোলাম। পাঠিয়ে দিলাম চিঠি।

একুশ দিন সময় দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত কোটেশন এল মাত্র ঐ চারটে কোম্পানী থেকে। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই! বড় দুটো বা যেটাকে লাস্ট ডেটে চিঠি পাঠিয়ে ছিলাম, একটারও কোন জবাব আসে নি। তখন আমি যে চারটে কোম্পানী কোটেশন পাঠিয়েছে তাদের নাম, ধাম, দামের লিস্ট তৈরী করে বক্সীর কাছে ফাইল প্লেস করলাম। আগরওয়ালা একই জিনিষের চার রকম দাম পাঠিয়েছে চারটে কোম্পনীর নামে। একটা কোম্পানী লিখছে তারা এক টাকা সাইত্রিশের কমে মাল সাপ্লাই দিতে পারবে না। দু-নম্বর কোম্পানীর রেট এক টাকা পঁচিশ। তিন নম্বর চার পিস পিছু একটাকা বারো। আর চার নম্বর এক টাকাতেই রাজী।

ব্যস। অর্ডার পেল চার নম্বর কোম্পানী। তারাই লোয়েস্ট প্রাইস কোট করেছে। নাও এখন কি করবে কর। অডিটের বাবার সাধ্যি কি যে বক্সীর টিকি ছোঁয়। কাগজেকলমে সব ঠিকঠাক। দেখে মনে হবে সত্যিই বুঝি জিনিষটার দাম এক টাকা থেকে এক টাকা ছ আনার মধ্যে ভ্যারী করছে। চার-চারটে কোম্পানীর কোটেশন। মালটার দাম যে মোটামুটি এই হতে পারে, সবাই তাই বুঝবে। তাছাড়া লোয়েস্ট প্রাইস কোট করেছে যে কোম্পানী তাঁকেই অর্ডার দিয়েছে সুলতানপুর সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যালস। কারুর বলার কিছু নেই। আর এই সুযোগে আগরওয়ালা চার আনার মাল এক টাকায় বেচে, নর্মাল প্রফিটের ওপরে আরো বারো আনা এক্সট্রা প্রফিট পিস-পিছু লুটে নিল। তবে ঐ বারো আনার মধ্যে আমার কর্তার শেয়ার ছিল ছ আনা।

বারীনটাকে দাবিয়ে রাখা মুস্কিল। সুযোগ পেয়েই ফস করে উলসে উঠল, গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিংয়ে মাল কিনতে গেলে টেন্ডারকল করতে হয় না বুঝি?

ধীরে বারীন ধীরে। টেন্ডার? কল করতে হয় তবে দশ-বিশ হাজার টাকার জন্য নয়। একি তোদের এই পুঁচকে [illegible] ডিভিশন পেইছিস যে সারা বছরে কালি, কলম, দোয়াত, কাগজ আর গোটা কয়েক লাল-নীল পেন্সিল কিনবে। এখানে ছটা ফ্যান কিনতে গেলে তোদের ঐ পারচেজের সুকুমার চোদ্দবার ছোটে ম্যানেজারের ঘরে। আর সুলতানপুরের ফ্যাক্টরীতে একজন ক্লাস টু অফিসার দেখেছি ছ হাজার টাকার মাল ওপরওয়ালার পারমিশন ছাড়াই কিনতে পারত। আর এটা তো বুঝিস ফ্যাক্টরীতে এত ফাইল চালাচালি, টেন্ডার ডাকাডাকি করতে গেলে প্রোডাক-শন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই অফিসারদের ঐটুকু ক্ষমতা ওখানে থাকেই। যেমন আমার কর্তার দেখেছি দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বসের কনকারেন্স লাগত না। আর সেই সুযোগেই বক্সী সাহেব টাকায় চার, ছ আনা কমিশন মারতেন। কমিশনই যদি না পাবে তো বেছে বেছে ঐ আগর-ওয়ালাকেই বা অর্ডার দেবে কেন। তাহলে তো আরো অনেকগুলো ছোটখাট এনলি-স্টেড জেনুইন কোম্পানী ছিল যারা ঘুষ না দিয়ে চার ছ আনাতেই মালটা সাপ্লাই

দিতে পারত। সে থেকেই এক আধ আনা নর্মাল প্রফিটও কোম্পানীর থাকে। কিন্তু বক্সীর তাতে কি লাভ? সাতশো সাড়ে বারোশ স্কেলের মাইনেয় তো আর লুধিয়ানায় বাড়ী বানানো যায় না। স্ত্রীর নামে গাড়িও কেনা চলে না। বক্সীর ফ্ল্যাটে দেখেছি ফ্রীজ রেডিওগ্রামে ঘর-ঠাসা। এক একটা মদের গ্লাস দেখলেই চমকে যাবি। কি গড়ন আর কি পাতলা। কম করেও সত্তর পঁচাত্তর টাকা ডজন। বক্সীর বউ চোখের পাতায় কি সব মাখত। শুনেছি ও জিনিষ এদেশে হয় না, ব্ল্যাকে দেড়শো পৌনে দুশ পর্যন্ত এক একটা টিউবের দাম। কম করেও সাত আট ডজন স্যুট ছিল সাহেবের। রোজই নতুন নতুন টাই হাঁকিয়ে অফিসে আসতেন। এত সব খরচ কি গভর্ণমেন্ট দেখে না ঐ মাইনের হয়? ফলে ব্যাকডোরেই খরচটা পুষিয়ে নিত সাহেব। আর ব্যাকডোরের গ্যাঁড়াকলে বক্সী শুধু ক্লাস ওয়ানই না, একেবারে পয়লা নম্বরী।

দাদা একটু থামল, তারপর গ্যাঁড়াকলের খুঁটিনাটি বোধহয় মনে মনে ঝালিয়ে নিয়ে ফের শুরু করল, রিপিট অর্ডার কাকে বলে জানিস? রিপিট অর্ডার হচ্ছে একই মাল ইচ্ছে হলে তিন মাসের মধ্যে পারচেজ অফিসার জরুরী প্রয়োজনে একই কোম্পানীর কাছ থেকে কিনতে পারে। তার জন্য ওপরওয়ালার পারমিশন লাগে না। এই ধরনা অয়েল সীলের কেসটা। আসলে ট্রান্সফর্মার ডিপার্টমেন্টের চাহিদা ছিল পনেরো হাজার অয়েল সীলের। এখন এক টাকা করে দাম হলে পনেরো হাজার পীসের দাম পড়বে পনেরো হাজার টাকা। আর দশ হাজারের বেশী হলেই পারচেজ সুপারিনটেনডেনটের সুপারিশ চাই। বক্সী ঘোড়েল লোক। সে ঐ লাইনেই গেল না। আগরওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ফোনে ট্রান্সফর্মারের অ্যাসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেনটকে বলল—রিকুইজিশনে লিখেছেন এখুনি সাপ্লাই চাই। যদি খুব আর্জেন্সি থাকে তাহলে অর্ডারটা দু-ভাগে ভাগ করে দিন। এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি। নইলে একসঙ্গে আনাতে গেলে দাম যা পড়বে দেখছি তাতে বড়সাহেবের কনফারেন্স লাগবে। মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে।

ট্রান্সফর্মারের মেজকর্তা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলেন না। তিনিও ইঙ্গিতটা বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো রিকুইজিশনটা ফেরৎ নিয়ে নতুন রিকুইজিশন পাঠালেন দু খেপে, সাড়ে সাত হাজার করে। সেজন্য চার্জ করলেন ফাইভ পারসেন্ট কমিশন অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকার মালে তিনি পেলেন সাড়ে সাতশো টাকা। বক্সী পেল সাড়ে পাঁচ হাজার। আর সব দিয়েথুয়েও আগরওয়ালার বাড়তি নাফা হল নিট পাঁচটি হাজার টাকা। একটা ছোট পারচেজেই এত মধু তাহলে বোঝ লাখ বেলাখে কত থাকে।

কথার তোড় থামিয়ে গীতেশদা একবার শ্রোতাদের মুখের ওপর চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল কার কি রি-অ্যাকশন। তারপর মাফলারের প্যাঁচটা জম্পেস করে গলায় আঁটতে আঁটতে বলল, এবার বুঝলি তো মিত্তির, কেন সরকারী আণ্ডারটেকিংগুলো বছর বছর এত লোকসান দেয়। যদি চার আনার র-মেটিরিয়ালে গভর্ণমেন্টকে বারো আনা গচ্চা দিতে হয় তাহলে ফিনিশড প্রোডাকটের দাম কত পড়বে হিসেব করে দ্যাখ। এখন বুঝতে পারছিস তো কেন তাদের এই সেলস ডিভিশন খদ্দেরের অভাবে খাঁ খাঁ করে। কারণ কাস্টোমার তো আর বোকা বুদ্ধু নয় যে জেনেশুনে এক আনার মাল চার আনায় কিনবে। সেম প্রোডাকট প্রাইভেট কোম্পানীগুলো সিকির সিকি দামে বেচে বছর বছর ব্যালান্স সীটে লাখ লাখ টাকা প্রফিট দেখাচ্ছে, শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ট দিচ্ছে। আর ওদিকে সুলতানপুরের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যালসের তো ঢাকের দায়ে মনসা বিকোনোর অবস্থা।

তাতো বুঝলাম দাদা। তবে আপনি কেন ঐ সোনার খনি ছেড়ে এই ছাইগাদায় এসে পড়ে রয়েছেন?—ফিচলেমিতে রথীন ওস্তাদ। ফাঁক পেয়েই ফুট কাটতে শুরু করেছে—শুধু কি কলকাতায় থাকার লোভেই না কি কোথাও ফেঁসে গিয়ে—।

বারীনের সেনটেনসটা আর কমপ্লিট হোল না। তার আগেই মিত্তিরের বাজখাঁই গলার এক থাপ্পড় চড়াৎ করে বেজে উঠল, আহ্ কি হচ্ছে বারীন। বৌদির চিকিচ্ছে করানোর জন্যই তো দাদা নিজে থেকেই ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে। তাই না গীতেশদা?

যা বলেছিস, কোনরকমে সংক্ষেপে মিত্তিরকে জবাব দিয়ে ঘড়াং ঘড়াং করে রমাগত কেশে চলে গীতেশদা। বেয়ারা জগদীশ কোন ফাঁকে এসে যে লাইট জ্বালিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে গেছে শ্রোতারা কেউ টের পায় নি। ম্যানেজারের ঘরে 'বাজার' টেপার আওয়াজ হতেই যে-যার টেবিলে ফিরে গেল।

রথীন পেপার ওয়েট সরিয়ে আবার ফেলে রাখা ফাইলটার পাতা ওল্টাতে শুরু করল। থেকে থেকে একটা আক্ষেপের মাছি সেদিন পুরো বিকেলটা রথীনকে জ্বালাল, কাজে মন বসতেই দিল না—এর চেয়ে যদি সুলতানপুরের ফ্যাক্টরীতে বক্সী সাহেবের আন্ডারে কোন কাজ জুটত, তাহলে আর শালপাতা চেটে দুপুরের খিদে মেটাতে হোত না। বদলি কি হওয়া যায় না?

—সন্ধিৎসু
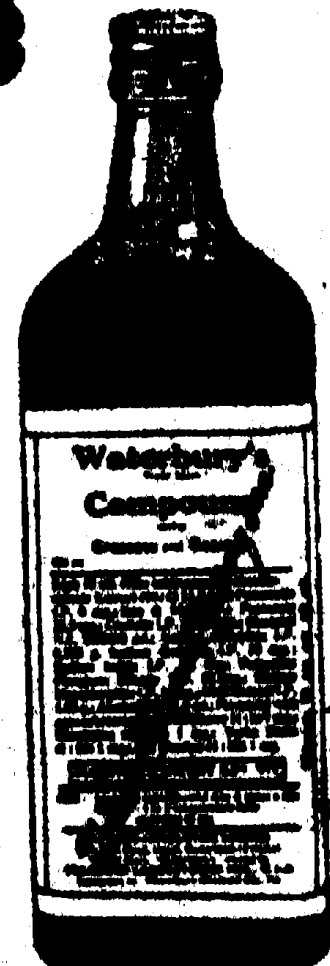
মনের কথা

প্রেমের অবসেশন
অনাদির সংকট

(১৮)

এবার অনাদির কথা।

অনাদি প্রেমের অবসেশনে ভুগছে। নীলিমা তাকে ভালবাসে না জেনেও সে নীলিমার চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। স্বপনে জাগরণে নীলিমা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কোনো কাজে মন দিতে পারছে না, অফিসের কাজকর্মে ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঘুম নেই, খিদে হয় না। নীলিমার জন্যে আর্থিক ক্ষতিও কম হচ্ছে না। মাঝে মাঝে 'ইনস্পেকশন ট্যুরে' বেরুলে টি-এ, ডি-এ বাবদ বেশ কিছু বৈধ-রোজগারের সম্ভাবনা থাকে। শরীর খারাপের অজুহাতে 'ট্যুর প্রোগ্রাম' সে কোনোমতে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিকে খুব বেশি আমল দিচ্ছে না অনাদি। তার আসল সমস্যা নীলিমার চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সে আমার শরণাপন্ন। নীলিমার চিন্তা তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই চিন্তা না ছাড়তে পারলে তার শান্তি নেই। আর একটা অনুরোধ আছে। সে নীলিমার মনের খবর জানতে চায়। মাঝে মাঝে কেন তার মনে হয় নীলিমা হয়ত তাকে ভালবাসে? নীলিমার হাব-ভাব আচার-ব্যবহার রহস্যে ভরা। সেই রহস্য ভেদে সে আমার সাহায্য চায়। নিজের মনেরও সঠিক সংবাদ জানবার আগ্রহে সে আমার কাছে ছুটে এসেছে।

দীর্ঘ তিনপৃষ্ঠার এক আত্মবিবরণী আমার হাতে দিয়ে অনাদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। লম্বা রোগা বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা, বয়স মনে হল তিরিশের কাছাকাছি। মুখে দু-একটা বসন্তের দাগ। তিনপৃষ্ঠার সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েক লাইনের মধ্যে বলবার চেষ্টা করেছি। শেষের লাইনে লিখেছে যদি আমি তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য না করি, তবে আত্মহত্যা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকবে না।

আত্মহনন হতাশ-প্রেমিকদের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব নয়। কাজেই বিরক্তি গোপন করে মোলায়েম কণ্ঠে বলতে হল,—তোমার মনের খবর না হয় তোমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে খানিকটা জানতে পারলাম; কিন্তু মেয়েটির মনের সংবাদ জানতে হলে তোমাকে রাজ-জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হতে হবে। যাকে দেখলাম না, জানলাম না, তার মনে কি আছে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কিন্তু জ্যোতিষীদের ওপর আমার আস্থা নেই। কবচ-মাদুলিতে আমার বিশ্বাস নেই। আপনি আমাকে ত্যাগ করলে আমার, ঐ যা বললাম, আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না।

বেশ কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু তখনকার দিনেও অনাদির মত কেস খুব কমই চিকিৎসার জন্যে আসত। অনাদি-জাতীয় যুবক এখন আরো কমে গেছে মনে হয়। এখন সমাজ বা পরিবার থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে বাধা দেওয়া হয় না। বাধা দিলেও তরুণ-তরুণীরা সে-বাধা অগ্রাহ্য করে। এখনকার অভিভাবকরা প্রেমকে ব্যাধি বা অপরাধ মনে করেন না। আমি অবশ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক-তার সঙ্গে বেশি পরিচিত। অনাদের খবর বেশি রাখি না। আর এ-সম্বন্ধে কোনো সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে কিনা জানি না। আমার মন্তব্য পুরোপুরি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক।

সামাজিক বা পারিবারিক প্রতিবন্ধক-তার দরুন প্রেমিক-প্রেমিকার ঈপ্সিত মিলনে বাধা সৃষ্টি হলে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা নিয়ে নাটক-নভেল অনেক লেখা হয়েছে। এখনও হচ্ছে না, এমন নয়। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে রোমিও-জুলিয়েট, দেবদাস-পার্বতী শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে যেভাবে প্রভাবিত করত, আজ আর তা করে না। সে সামাজিক পরিবেশ নেই, সে মান-সিকতাও বদলেছে। এসব কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা অবশ্য অনাদির মত অবসেশনে ভোগেননি। তাঁরা সামাজিক বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুযোগ পাননি, অথবা সংগ্রাম করে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এঁদের কোনোক্রমে রুগ্ন বলা চলে না। মহৎ শিল্পীরা এইসব কাহিনী নিয়ে রসসমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনাদির মত অবসেশনের রোগীরা ডাক্তার ছাড়া আর কারুর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে কিনা সন্দেহ। এদের নিয়ে বোধহয় উচ্চশ্রেণীর কাব্য-কাহিনী রচিত হতে পারে না। একজনের মস্তিষ্ক প্রক্ষোভ-আপ্লুত; অন্যজনের মস্তিষ্ক আবেশগ্রস্ত। প্রেমের প্রক্ষোভ সদর্থক প্রক্ষোভ। আমি যাকে ভালবাসি, সে-ও আমাকে ভালবাসে;—এই বিশ্বাস, এই অনুভূতি, মানুষকে মহিমান্বিত করে। প্রেমের প্রক্ষোভ চিত্তলোক আলোড়িত করে প্রেমিক-প্রেমিকাকে জীবনানুগ করে, আরো বেশি মানবিক করে। তাই কাব্যে এঁদের আত্মহনন মহান আত্মত্যাগরূপে চিত্রিত হয়। এই আত্মত্যাগ সামাজিক সংস্কার ভেঙে ফেলে মানুষে মানুষে মিলনের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু প্রেমের অবসেশন খুব কম ক্ষেত্রেই মহত্তর প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে, বরং অবসেশনের ফলে সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংসা ইত্যাদি ইতর মনোবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়। অনাদির উচিত খোলাখুলি নীলিমার সঙ্গে আলোচনা করে নীলিমার মনের কথা জানা।

অনাদির পুরো ইতিহাস শোনার আগেই তাকে এই ধরনের অনেক কথা বললাম। কথাগুলো রূঢ় না হয়, সেদিকে আমার নজর ছিল। ওকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা, নীলিমার কাছে ও প্রেমনিবেদন করুক। নীলিমা ওকে প্রত্যাখ্যান করলে ওর অবসেশন কেটে যেতে পারে।

—আপনি আমাকে হিপ্নটাইজ করে নীলিমার চিন্তা আমার মন থেকে দূর করে দিন। ওর কাছে আমি প্রেম জানাতে পারব না। ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমি লজ্জায় আর ওর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

—কিন্তু যতক্ষণ না তুমি স্পষ্ট জানতে পারছ যে নীলিমা তোমাকে ভালবাসে না, ততক্ষণ নীলিমার চিন্তা তোমাকে আবিষ্ট রাখবেই।

—হিপ্নটিজম করে, আমি শুনেছি, সবকিছু করা যায়।

—তুমি ভুল শুনেছ। নীলিমার প্রতি আকর্ষণকে তুমি জীইয়ে রাখতে চাও বলেই ওকে সরাসরি প্রেম জানাতে ভয় পাচ্ছ। এ-অবস্থায় হিপনটিজমে কাজ হবে না। তুমি ওকে ভুলতে চাও না?

—না, না, আমি ওকে ভুলতে চাই। কিন্তু উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি সবটা শুনলে বুঝতে পারবেন কেন আমি ওকে স্পষ্টভাবে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। দয়া করে আমার কেসটা পুরোপুরি শুনুন।

প্রেমের কাহিনী অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি। অনাদির কাহিনীতে কি আর নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য থাকবে? অনেকটা নিস্পৃহ উদাসীনতা নিয়ে শুনতে শুরু করলাম। অনাদি অনুত্তেজিত একঘেয়ে সুরে বলে চলল।

—শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়েছি। তাঁদের চেহারাও মনে নেই। এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মানুষ হয়েছি। তাঁরা, বিশেষ করে, জ্যাঠাইমা আমাকে নিজের ছেলের মতন দেখতেন। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল ছিলাম। স্কুল পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত পাশ করতে কোথাও আটকায়নি। স্কলারশিপের টাকা আর টিউশনির রোজগার থেকে নিজের পড়ার খরচা চালিয়ে শেষদিকে জ্যাঠাইমাকে কিছু কিছু সাহায্যও করতে পারতাম। জ্যাঠামশায় মারা যাবার পর জ্যাঠাইমা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে সংসারটাকে কোনোমতে চালিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। বছর-দশেক আগে নীলিমা এই পরিবারের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসে ক্রমে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। নীলিমা এসেছিল শিয়ালদার শরণার্থীদের আস্তানা থেকে। ওর মা-বাবা প্রায় একসঙ্গেই কলেরায় মারা যাবার পর, এক টিকিটবাবু ওকে আশ্রয় দিলেন। আমাদের বাড়ীর পাশেই তাঁর বাসা। কয়েক মাস সেখানে থাকার পর এক রাত্রে টিকিটবাবুর বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে জ্যাঠাইমার কাছে ও আশ্রয় চায়। জ্যাঠাইমা আশ্রয় দিলেন। কি হয়েছিল জ্যাঠাইমাই জানলেন। আমি কিছু জানলাম না, জানতে চাইলামও না। টিকিটবাবু কেন জানি না, কোনোরকম গোলযোগ করলেন না। নীলিমার বয়স তখন পনেরো-ষোলো। আমি সেবার এম-এ আর ল'এর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। পাশ করেই একজন সিনিয়রের সাকরেদী স্বীকার করে নিয়ে কোর্টে যাতায়াত আরম্ভ করলাম। জ্যাঠাইমা নীলিমাকে নিয়ে তাঁর বড় ছেলের কর্মস্থল বোম্বাই চলে গেলেন। বছর-দুয়েক হল ওঁর ছেলে ওখানে চাকরী করছিল। আমি মেসে গিয়ে বাসা বাঁধলাম। বছর-আড়েক আগে বর্তমান চাকরীতে বহাল হই। জ্যাঠাইমার সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমশ শিথিল হয়ে এল। ন'মাসে ছ'মাসে চিঠি পেতাম উত্তর দিতুম তার একটা চিঠিতে জেনেছিলাম অসীমের (জ্যাঠাইমার বড় ছেলের) সঙ্গে নীলিমার বিয়ে হবে। নীলিমা কলেজে পড়ছে। এর পর বছর-দুয়েক কোনো খোঁজখবর রাখিনি। ওদের স্মৃতি প্রায় ঝাপসা। এমনি সময় হঠাৎ এক টেলিগ্রাম। নীলিমা জানিয়েছে, হাওড়া স্টেশনে বোম্বে মেল এ্যাটেণ্ড করতে। গাড়ী এসে যাওয়ার পর প্ল্যাটফর্মের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছি, এমনি সময়ে একটি মেয়ে জানতে চাইল, আমার নাম অনাদি কিনা। মেয়েটি প্রণাম করে জানাল যে সে নীলিমা। জ্যাঠাইমার খোঁজ করতে জানলাম জ্যাঠাইমা মাস-তিনেক আগে গত হয়েছেন। অসীমের সম্বন্ধে কোনো খবরই বলল না। আমি বিব্রত বোধ করলাম। অনাদি থামল।

ধৈর্য রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসব অবসেশনের রোগীদের ভালভাবেই জানি। বাধা দিলে এরা থামবে না। কোনো জায়গায় আটকে দিলে, আবার গোড়া থেকে তার ক্লান্তিকর গল্প শুরু করবে। বাধা না দিয়ে শুনে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তবুও একবার বললাম, —এত মহাভারতের কোনো দরকার আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। আমি বর্তমানের ঘটনা জানতে চাই। এসব অতীতের সঙ্গে তোমার অবসেশনের কি সম্বন্ধ ধরতে পারছি না,—

—আর বেশি নেই। গত দু'বছর ধরে আমার অতীত আমি রোজ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছি। নীলিমার প্রতি আমার আকর্ষণের কোনো নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায় কিনা, আমাকে জানতে হবে। আপনাকেও বুঝতে হবে আমার ভালবাসার মূল কোথায়?

বাধা দেওয়া বৃথা! ওর কথা ও বলেই চলল।

—নীলিমাকে কোথায় নিয়ে তুলব, সেদিন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। নীলিমা বুঝতে পারল আমার মনের কথা। একটা কার্ড আমার হাতে দিয়ে বলল, সেই ঠিকানায় তাকে রেখে আসতে। কোলকাতার কোনো জায়গা সে চেনে না, তাই আমার সাহায্য দরকার। একটা ট্যাক্সি করে নীলিমাকে নিউ আলিপুরের সেই ঠিকানায় নিয়ে গেলাম। কলিংবেল টিপতে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এল। নীলিমা কার্ডখানা তার হাতে দিতে সে অভ্যর্থনা জানালো। বলল, মিঃ পাকড়াশী, অর্থাৎ কাকাবাবু টেলিগ্রাম করে নীলিমার খবর জানিয়েছেন। সে অনায়াসে মালপত্র নিয়ে উপরে উঠে আসতে পারে। আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি। নীলিমা বলল, আমার দাদা; আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছেন। আমাকেও ভিতরে যাবার জন্য দুজনে পীড়াপীড়ি করল, আমি রাজি হলাম না। একটু বোধ হয় রূঢ়ভাবেই তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, সেই ট্যাক্সিতেই মেসে ফিরে এলাম। পাকড়াশীকে আমি চিনি। আমাদের বম্বে অফিসের ম্যানেজার। যেমন আমি না, মেসে ফিরে এসে অবসাদে দেহমন ভেঙে পড়ল। কিছু না খেয়েই শয্যা নিলাম। সারারাত ঘুম হল না।

সেই থেকে,—অনাদি মন্ত্রপাঠের মত আবৃত্তি করে চলল,—সেই থেকে বেশির ভাগ রাত্রেই ঘুমুতে পারি না। অবসাদে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন থাকে মন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দুদিন পরে অফিসে এসে শুনি বম্বে অফিস থেকে একটি বাঙালী মেয়ে আমাদের অফিসে বদলি হয়ে এসেছে। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে। দেখা হয়ে গেল সেইদিনই। লাঞ্চের সময় সোজা আমার টেবিলে চলে এল। আমি নিউ আলিপুরে ওর খোঁজ নিতে যাইনি বলে কোনো অনুযোগ করল না। শুধু ওকে কাছাকাছি কোনো সস্তা লাঞ্চের জায়গা দেখিয়ে দিতে বলল। এইদিন থেকে, না সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে, ঠিক বলতে পারব না, আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলাম। সুশ্রী সুঠাম তনু সাঙলাদেশের পথেঘাটে খুব বিরল নয়। কি ওর বিশিষ্টতা যার জোরে আমাকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করছিল? আমি খুব মিশুক নই, মেয়েদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা আমার স্বভাব। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়া অভ্যাস নেই। তবে চাকরী উপলক্ষে অনেক অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে দু' একজনকে বেশ সুন্দরী বলেই মনে হয়েছে। তাদের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করিনি। তবে ও কেন, কি ভাবে আমার মনকে এইভাবে প্রভাবিত করল ওর মত স্মার্ট, চালাকচতুর মেয়ে, আমাদের অফিসেই ত আরো দু' একটি রয়েছে। তাদের দিকে ত কোনোদিন ফিরেও তাকাইনি, অথচ ওকে দেখবার জন্য এত আকুলি-বিকুলি কেন? বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, ওদের ডিপার্টমেন্টটা রোজ অন্তত একবার ঘুরে আসি। হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি। প্রথম দিন লাঞ্চ খেতে বসে, হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একখানা মস্ত শিলমোহর করা লেফাপা বের করে ও আমার হাতে দিয়েছিল। জ্যাঠাইমার শেষ চিঠি। ও বলেছিল,—লাস্ট টেস্টামেণ্ট। মেসে সারা রাত জেগে চিঠিটা পড়েছিলাম। অনেকবার। জ্যাঠাইমার চিঠিতে জানলাম নীলিকে অসীম অপমানিত করেছে।... অবাধ মেলামেশা আর মেয়েটার সারল্যের সুযোগ নিয়েছে। ওর দেহ অপবিত্র করে, ওকে বিয়ে করতে চায়নি। উপরন্তু ওর কিশোরবয়সের ঘটনার উল্লেখ করে, ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। টিকিটবাবুর রক্ষিতা বলে ওকে বিদ্রূপ করেছে। মৃত্যুশয্যায় বসে জ্যাঠাইমা চিঠি লিখেছেন। চিঠির বিবরণস্তুর কিন্তু-

বিসর্গ নীজিকে বলেননি। শেষের দিকে আমাকে (যদি সংস্কার না থাকে) ওকে বিয়ে করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন যে বিয়ে করা বোধ হয় নীলির পক্ষে সম্ভব নয়। পুরুষজাতির প্রতি ওর ঘৃণা ওকে বিপথে চালিত না করে শুধু এইটুকু দেখতে বলেছেন। পাকড়াশীকে বলেকয়ে ওকে কোলকাতায় বদলি করার বন্দোবস্ত জ্যাঠাইমাই করেছিলেন। বম্বেতে থাকা নীলিমার চলবে না। অনাদির জীবনকাহিনী এতক্ষণে আমার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বললাম,—

চিঠির কোনো কিছুই নীলিমা জানে না? তবে লাস্ট টেস্টামেন্ট বলল কেন?

জ্যাঠাইমার তিন বিঘে ধেনো জমি আর বসিরহাটের এক বিঘের বাস্তু আমার নামে লিখে দিয়েছেন, তাই বোধ হয়।

তোমার আকর্ষণ ত' বলছ, চিঠি পড়ার আগে থেকেই। ভাল করে ভেবে বলছ কি? আমার ত মনে হয় ঐ চিঠিই তোমার মনে আলোড়ন তুলেছে। এ চিঠির কথা তুমি ওকে জানাচ্ছ না কেন? তুমি কেন ধরে নিয়েছ যে নীলিমা তোমাকে ভালবাসে না। নীলিমা কি অন্য কারুর প্রতি অনুরক্ত বলে তোমার মনে হয়?

বড়সাহেবের গাড়ীতে আমি তাকে দু' একদিন সন্ধ্যার পর দেখেছি। অফিসের আরো দু' একজনও দেখেছে। বড়সাহেবের 'লেডি কিলার' হিসেবে সুনাম আছে। তাঁর স্ত্রী চিররুগ্না। অসীম অযাচিতভাবে চিঠি লিখে নীলিমার অনেক কীর্তির কথা আমাকে জানিয়েছে। তার কথা অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না। আর অফিসের ঈর্ষাকাতর গুজবেও আমি কর্ণপাত করতে চাই না। নিজের চোখে দেখেছি বললাম বটে, কিন্তু তা দিয়ে কি প্রমাণ হয়? মেয়ে আর ছেলে গাড়ীতে করে বেড়ালেই তাদের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক আছে—এ আমি মনে করি না। তাছাড়া পাবলিসিটি অফিসার বা ডিপার্ট-মেন্টের কাউকে নিয়ে আমাদের বড়সাহেবের ঘুরে বেড়ানোটা ব্যবসায়িক কারণে যে নয়, তাই বা কে বলতে পারে? আজকাল আর আমরা একসঙ্গে লাঞ্চে যাই না। তবে ছুটির দিনে সকালে মাঝে মাঝে ওর টালিগঞ্জের বাসায় গেলে আমাকে খুবই আদর আপ্যায়ন করে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিজের হাতে আমার জন্যে ওমলেট ভাজতে লেগে যায়। আর কে থাকে সেই বাড়ীতে? এক মাঝ-বয়সী মহিলা, পূর্ববঙ্গের লোক, ওদের গ্রামেই বাড়ী ছিল। নীলিমা ভালই মাইনে পায়। ওই এখন আশ্রয় দিয়েছে। একদিন ওর আশ্রয়ের দরকার ছিল। মহিলাটির খুবই ইচ্ছে নীলিমা বিয়ে করে, আমাকে এ-নিয়ে দু' একদিন বলেছেন। কিন্তু বিয়ের কথা কিছুতেই ওর কাছে আমি তুলতে পারি না। নিজের কথা নয়, অন্যের কথাও নয়। অফিসের এক ছোকরা আমাকে ওর অভিভাবক ঠাউরে আমাকে মুরুব্বি পাকড়াও করেছিল। আমি তাকে খিজিত কায়দায় প্রোপোজ করতে বলেছিলাম। কোনো ফল হয়নি। তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে সিনেমায় যেত, সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেটি চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আমি দিনে একবার করে ওর চেহারা না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ি। মনে হয়, দিনটা বৃথা গেল। বেশ চলছিল এই রকম আশা-নিরাশার দোলার মধ্য দিয়ে দিনগুলো। অফিসের ছোকরাকে ও প্রত্যাখ্যান করতে সত্যিই আমি খুশি হয়েছিলাম। মনে আশা হয়েছিল। একদিন হয়ত নিজে থেকেই আমাকে সিনেমা যাবার নিমন্ত্রণ জানাবে। হয়ত অসীমের অত্যাচারের কাহিনী একান্তে বসে আমাকে বলবে। অশ্রুবিগলিত ওর মুখখানা আমি আদর করে মুছিয়ে দেব। স্বপ্ন দেখে বেশ চলছিল। কিন্তু আর পারছি না। তাই আপনার কাছে এসেছি। ওর চিন্তা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ওকে ঘৃণা করতে শিখিয়ে দিন। না হলে আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব।

এতক্ষণে অনাদির কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস পেলাম। খুব চেষ্টা করেও উত্তেজনা দমন করতে পারছে না।

—এমন কি ঘটেছে যে আত্মহত্যার কথা মনে হবে? ও তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে বলেই ত' মনে হয়। খোলাখুলি ওর মতামত জিজ্ঞাসা না করে আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করছ কেন? তোমার উদারতার জন্যে ও নিশ্চয়ই তোমাকে শ্রদ্ধা করবে।

উল্টোও ত হতে পারে। ওর জীবন-বৃত্তান্ত এক জানে অসীম, আর জানি আমি। অসীমের কাছ থেকে ও আঘাত পেয়েছে, সেইজন্যে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্য বন্ধুদের যতটুকু আমল দিচ্ছে, আমাকে সেটুকুও দিচ্ছে না। তা ছাড়া বিয়ে হলে, ও ভাবতে পারে, আমার কাছে ওকে চিরকাল ছোট হয়ে থাকতে হবে!

—তোমার কথার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু সমস্যা মীমাংসার আর কোনো পথ নেই। ওর কাছ থেকে নির্মম প্রত্যাখ্যানই শুধু তোমাকে মোহমুক্ত করতে পারে। প্রত্যাখ্যান না করে যদি জ্যাঠাইমার ইচ্ছে পূর্ণ করে, তা হলে ত' কথাই নেই। তুমিও বাঁচলে, নীলিমাও বাঁচল। হ্যাণ্ড কারেজ ইয়ংম্যান।

—না ডাক্তারবাবু ওর প্রত্যাখ্যান আমার মোহমুক্তি হবে না। আপনার সাহায্য ছাড়া আমার বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। আমার কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে; প্রমাণ মাত্র তিনদিন হল আমার হাতে এসেছে,—যে নীলিমা বড়সাহেবকে ভালবাসে। ভালবাসা চুম্বনে আলিঙ্গনে অভিব্যক্ত হয়েছে। স্বেচ্ছায় বড়সাহেবের লালসা মিটিয়েছে। বড়সাহেবের বয়স ওর থেকে অন্তত পঁচিশ বছর বেশি। আই ডেফিনিটলি নো দ্যাট সি ইজ মরবিড। তবু আমি ওকে ঘৃণা করতে পারছি না। তাই বলছিলাম ওর প্রত্যাখ্যানে আমার মোহ ভাঙবে না, আমার অবসেশন কাটবে না। আপনি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে সাজেসশন দিয়ে ওর আকর্ষণ থেকে আমাকে বাঁচান।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। না-দেখা মেয়েটির প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করলাম। অন্যদিকে জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার প্রমাণ অভ্রান্ত, তুমি ঠিক জানো?

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বড়সাহেবকে নিজের হাতের লেখা নীলিমার ডজনখানেক চিঠি আমার হাতে এসেছে। বড়সাহেব মাঝখানে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে ভিয়েনায় গিয়ে মাসখানেক ছিলেন। চিঠিগুলো সেই সময়কার। সুদীর্ঘ প্রেমপত্রের লাইনে লাইনে প্রেমিকার আকুলতা ফুটে উঠেছে। অদর্শনে দিন মাস মনে হচ্ছে, মাস বছর মনে হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু, একটা কথা চিঠিতে আছে যেটার অর্থ আমি ঠিক ধরতে পারছি না। বড়সাহেব বোধহয় বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। হয়ত তিনি লিখেছিলেন, স্ত্রী আর বেশিদিন বাঁচবেন না, অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিবাহ চলতে পারে,—এই রকম কিছু ছিল তাঁর চিঠিতে। উত্তরে নীলিমা কাকুতিমিনতি জানিয়ে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কেন?

—তোমার কি মনে হয়?

এমনও ত' হতে পারে বড়সাহেবকেও সত্যিকারের ভালবাসে না; সাময়িক আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করবার সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছে তাকে। কিম্বা চুম্বন আলিঙ্গনেই পর্যবসিত রয়েছে ওদের ভালবাসা। নীলিমা আর বেশিদূর এগুতে চায় না। তাই বিবাহে ওর অসম্মতি।

—বিবাহের প্রস্তাবটা ফাঁকি, আজগুবি। নীলিমার মত মেয়ে সেটা বোঝে। তোমার জ্যাঠাইমা ঠিকই ধরেছিলেন। বিবাহের প্রস্তাব খাঁটি হলেও নীলিমা বিয়ে করবে বলে মনে হয় না। পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ওকে বিপথে নিয়ে গেছে। তুমি ঠেকাতে পারোনি। ও মেয়ে তোমাকে কেন কাউকেও ভালবাসবে না। ওকে সরাসরি প্রেম জানাওনি ভালই করেছ। হ্যাঁ, তোমাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। আশা করছি তোমার প্রেমের অবসেশন কেটে যাবে। নীলিমার করুণ জীবন ইতিহাস, এবং জ্যাঠাইমার চিঠি থেকেই তোমার মনে নীলিমার প্রতি ভালবাসা জন্মেছে। এ ভালবাসা সহানুভূতির ভালবাসা। এ ভালবাসা ছোট নয়।

—অনোবিন্দ

মনের কথা : আলোচনা

আমি আপনার 'অমৃতে'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং মনোবিদ লিখিত 'মনের কথা'র ধারাবাহিক প্রকাশ অনুসরণ করে আসছিলাম। এসম্পর্কে শ্রী আর প ব্যানার্জি'র আলোচনাটিও পড়েছি। এ-বিষয়ে দু-একটি কথা অমৃতের পাঠক-পাঠিকাদের সামনে রাখা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমেই বলে নেয়া ভালো, আমি মনোবিজ্ঞানী নই বা মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ নই। তবে সম্মোহিত হওয়া বা সম্মোহিত করা দু ব্যাপারেই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, শ্রীব্যানার্জি'র আলোচনাটি পড়ে তাঁর সঠিক প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি এবং তাঁর চিন্তা-প্রক্রিয়া কোন ধরনের যুক্তি-বিধৃত তা পরিষ্কারভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। তবে মনে হল, তিনি বেশ একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন এবং সম্মোহন যে কোনমতেই ঘুম নয়, তাও বলতে চাইছেন। সম্ভবত এই অসহিষ্ণুতার জন্যই তাঁর সমগ্র লেখাটি এমন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে।

কোন প্রবন্ধের মধ্যে যদি 'তত্ত্ব, তথ্য ও বিজ্ঞানগতভাবে ত্রুটি' থাকে, তবে তা উন্মোচিত করার স্বাধীনতা যে-কোন পাঠক-পাঠিকার রয়েছে। কিন্তু তাঁর আলোচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে তিনি বলছেন : 'মনোবিদ মহাশয়কে সবিনয়ে নিবেদন যে, তিনি সম্মোহক ও সংবেশিতের সম্পর্ক সম্বন্ধে ও সম্মোহন বিজ্ঞান সম্পর্কে যেসব তথ্য বর্ণনা করেছেন, তা বহু যুগ পূর্বের।' অবশ্যই বহু যুগ পূর্বের, কারণ মনোবিদ সম্মোহন সম্পর্কিত ধ্যানধারণার বিবর্তনের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে শুরু করেছেন—ব্রেইড ইত্যাদি থেকে এখন পর্যন্ত ফ্রয়েড, ইয়ুং ইত্যাদি পর্যন্ত। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের মতবাদ উল্লেখিত হবে এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এরূপ অবস্থায় এই আকস্মিক 'সবিনয়ে নিবেদন'-এর অর্থ কি? 'তারপর গত ৩৫।৪০ বছরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা হয়েছে এবং অনেক নতুন আবিষ্কারও বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। সে সকল সংবাদ তাঁর জানা নেই দেখে বিস্মিত।' বিস্মিত আমিও, এই অপ্রয়োজনীয় রূঢ় ভাষণ ও ব্যক্তিগত আক্রমণে। মনোবিদ একটি ছদ্মনাম। এর অন্তরালে যিনি লিখছেন, তিনি কতটুকু জানেন আর কতটুকু জানেন না তা শ্রীব্যানার্জি কি করে জানলেন? আমি অবশ্য মনোবিদের অসংখ্য প্রবন্ধ ও বই-এর সঙ্গে পরিচিত, তা সত্ত্বেও এখানে তাঁকে কোন অভিজ্ঞানপত্র দেবার প্রয়োজন দেখি না। শুধু মনে হয়, কোন লেখকের বক্তব্যকে খণ্ডন করার পরিবর্তে, তিনি অনেক কিছু জানেন না যা আমি জানি—এই স্বতঃসিদ্ধ সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত করে সত্যই কি কোন লাভ হয়?

শ্রীব্যানার্জি ইলেকট্রো এনসেফেলোগ্রাফ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এগুলোর নাম পত্রপত্রিকার কল্যাণে আজ সবাই জানে। তিনি শুধু নাম উল্লেখই করেছেন, কিন্তু কিভাবে এগুলো আলোচ্য বিষয়টিকে প্রভাবিত করেছে তা দেখাননি, যেমন তিনি নানা পত্রপত্রিকার নাম তুলে দিয়েছেন, কিন্তু কোন মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞের অভিমত তুলে ধরেননি।

শ্রীব্যানার্জি'র প্রধান আপত্তি সম্মোহিত অবস্থাকে ঘুম বলায়। সম্মোহিত অবস্থা ঘুম তো নিশ্চয়ই, যদিও সাধারণ ঘুমের সঙ্গে এর কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। একে বলা যায় partial sleep, induced sleep, suggested sleep এবং এই তিনটি শব্দই মস্তিষ্কের সম্মোহিত অবস্থা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আমি আরো একটু এগিয়ে যেতে চাই : তথাকথিত জাগ্রত অবস্থায়ও মস্তিষ্কের অংশবিশেষ নিদ্রিত বা সম্মোহিত থাকে, ঠিক যেমন সাধারণ নিদ্রিত বা সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কের অংশবিশেষ সম্পূর্ণ সজাগ থাকে।

ঘুম এবং সম্মোহন হল মস্তিষ্কক্রিয়া এবং বিষয়টি শারীরবৃত্তবিদের উপজীব্য বিষয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এই উচ্চতর অংশের প্রক্রিয়ারাজির অনুশীলন কোনদিনই বাধামুক্ত ছিল না, আজও নেই। যেহেতু বিষয়টি এখানে নিজ প্রজাতিরই মস্তিষ্ক (যার মনের আশ্রয়ভূমি) সেহেতু এক্ষেত্রে গবেষণাকালীন অনেক সময়ই গবেষক মস্তিষ্কক্রিয়ার বস্তুগত মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার আরোপ করে বসেন। এটি স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলেই অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে সজাগ থাকা প্রয়োজন। এই ভূমিকাটুকুর জন্য ক্ষমা চাইছি, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস এই দুঃখেরই ইতিহাস।

মস্তিষ্ককোষের দুটি বিপরীতধর্মী গুণ রয়েছে : exitation and inhibition; বাংলায়, উত্তেজনা ও নিস্তেজনা। এবং এই গুণদুটির সাধারণ প্রবণতা হল মস্তিষ্কের কোন বিন্দুতে উৎপন্ন হলে তা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া। অনেক বছর আগে Strumpel নামে এক চিকিৎসক এমন এক রোগীর সাক্ষাৎ পান যার অধিকাংশ ইন্দ্রিয় বিকল। প্রকৃত প্রস্তাবে বহির্বাস্তবের সঙ্গে সে মাত্র দুটি অটুট ইন্দ্রিয় মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করতে পারত। একটি চোখ ও একটি কান। চিকিৎসক এদুটিকে ঢেকে দিলে রোগীটি ঘুমিয়ে পড়ত। পরবর্তীকালে অধ্যাপক গ্যালকিন গবেষণাগারে অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করাতে সক্ষম হন। কুকুরের ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গুলোকে বিকল করে দেয়া হল অর্থাৎ তার fili olfactori, n. optici ও cochleae দুটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়া হল। দেখা গেল যে, কুকুরটি দিনে ২৩½ ঘণ্টা নিদ্রিত হয়ে রইল, শুধুমাত্র মৌলিক জৈবিক প্রয়োজনজাত উদ্দীপক প্রভাবে সে জাগরিত হত, যেমন মলমূত্র ত্যাগ, ক্ষুধা। এ হল অক্রিয় ঘুম। সাধারণ ঘুমকে বলা যায় সক্রিয় ঘুম, যা নিস্তেজনামূলক প্রক্রিয়ার পরিণতি। এই নিস্তেজনামূলক প্রক্রিয়া মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশে উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে নিম্নতর অংশে বিস্তার লাভ করে এবং প্রাণী ঘুমিয়ে পড়ে। একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়া যাক।

> "I shall now submit to you one **of the numerous cases investigated** by us in the course of thirty five years. Let us take a dog which is falling into a state of **drowsiness, sleep or hypnosis ....** A certain period of time passes. and you give the dog food. You see that its tongue functions very **slowly and awkardly, ...But as** time goes on, you observe in the course of the experiment that although the dog turns towards **you, it brings its head to the food** with great difficulty. Consequently, **the inhibition or sleep has already seized other points of the skeletal movement —— And finally**

you observe the onset of a general passivity of the skeletal masculature: the dog hangs limply in the loops, it is in a sta e of sleep. Thus, inhibition gradually develops before your eyes in a very obvious and concrete manner; at first it affects the tongue, then it spreads to the cervical muscles, from there to general skeletal masculature until, finally, sleep sets in. When you observe this development you can hardly doubt that inhibition and sleep are one and the same thing". (I. P. Pavlov, Selected Works, 1955)

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গভীর নিদ্রার ক্ষেত্রেও সমস্ত মস্তিষ্ক ঘুমায় না, কোন কোন বিন্দু জাগ্রত থাকে। দেখা গেছে যে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মা পাশের শিশুসন্তানের অস্ফুট কাকলীতে জেগে ওঠেন, অথচ শ্রুতিগোচরযোগ্য অন্য উচ্চতর শব্দ হলেও তার ঘুম ভাঙে না। অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিদ্রারও সম্মোহনের বিশেষ গুণ বা লক্ষণ বর্তমান। মায়ের মস্তিষ্কের ঐ সজাগ কেন্দ্র হল point on duty; সম্মোহিত অবস্থার যেমন rapport zone যার মাধ্যমে অভিভাবন ক্রিয়াশীল হয়।

সম্মোহনও সেই একই নিস্তেজনা-ক্রিয়ার পরিণতি।

"Hypnosis, for example, is sleep which develops very slowly, i.e. it is first confined to a very small and restricted area and then begins to spread further and further until it finally descends from cerebral hemispheres to the subcortex, leaving untouched only the centres of respiration, of the heart-beat etc., though somewhat weakening hese too. (Pavlov — Selected Works, 1955)

সম্মোহিত অবস্থা শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যেতর উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু অভিভাবন বা কথার সাহায্যে শুধু মানুষকেই সম্মোহিত করা যায়, কারণ কথারূপ সংকেত গ্রহণক্ষম দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র (second signalling system) কেবলমাত্র মানুষের মস্তিষ্কেই বিবর্তিত হয়েছে। এই ধরনের সম্মোহনকেই suggested sleep বলা হয় এবং মানসিক ও নানাপ্রকার মানস-দৈহিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এর প্রচলন। এ-ধরনের চিকিৎসাকে Sleep Therapy ও বলা হয়। সম্মোহিত অবস্থা মস্তিষ্কের অধিকতর অংশে ছড়িয়ে পড়লে অর্থাৎ নিস্তেজনার অধিকতর পরিব্যাপ্তি ঘটলে rapport নষ্ট হয়ে যায় এবং সম্মোহিত অবস্থা সাধারণ নিদ্রায় পরিণত হয়। গুণগতভাবে নিদ্রা ও সম্মোহিত অবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও এদের পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে।

"... the suggested sleep of man is a private case of his hypnotic sleep, the hypnotic sleep is a private case of conditioned reflex sleep, while the condition reflex sleep is one of the varities of natural sleep'. (K. Platonov—The Word As A Physiological And Therapeutic Factor, 1959)

শ্রীব্যানার্জি ঠিকই বলেছেন যে, সম্মোহনের তিনটি স্তরভেদ রয়েছে। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে আরো নানা উপবিভাগ সম্ভব। তৃতীয় স্তরের সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ তার পারিপার্শ্বিক সম্পর্কিত বোধ হারিয়ে ফেলে এবং জাগ্রত হবার পর কোন অভিভাবনই মনে করতে পারে না—যদি না, মনে রাখার জন্য বিশেষভাবে অভিভাবন দেয়া হয়। কাজেই মনোবিদ যে বলেছেন, ঘুম থেকে উঠবার পর সংবেশিত সব ভুলে যায়—একথা তৃতীয় স্তর সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সত্য। শ্রীব্যানার্জি বলেছেন যে, সম্মোহিত অবস্থা হল 'গভীরতম একাগ্রতাপূর্ণ অবস্থা (super-concentrated state)" এই বিশেষণটি বিষয়ীগত (subjective) ভাবসঞ্জাত; মস্তিষ্কের তৎকালীন শারীরবৃত্তিক অবস্থা সম্পর্কে এরূপ কোন বিশেষণ প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। আন্তর্বাস্তব ও বহির্বাস্তব থেকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য উদ্দীপক মস্তিষ্কে বাহিত হচ্ছে। Reticular substance & cortex অনেকটা অভিভাবকের মত কাজ করে : অপ্রয়োজনীয় উদ্দীপককে অগ্রাহ্য করে এবং প্রয়োজনীয়গুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবতন্ত্রকে সঠিক নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ এভাবে মস্তিষ্কে একটা heightened tonus" বর্তমান থাকে। নিদ্রিত বা সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কের এই চিত্রটির পরিবর্তন ঘটে। স্বল্পপরিসরে বিশদভাবে বলা সম্ভব নয়। কোন মানুষের গুরু মস্তিষ্কটি যদি অস্ত্রোপচার করে অপসারিত করা হয়, তবে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? সে প্রায় সব সময় ঘুমিয়ে থাকবে। নিদ্রিত ও সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কের এক বিশাল অংশের কোষরাজি ঘুমিয়ে রয়েছে, সজাগ রয়েছে কয়েকটি অঞ্চল। কাজেই জাগ্রত অবস্থার মত অসংখ্য internal external stimulation সেখানে পৌঁছাতে পারছে না। এককথায় বেশীর ভাগ মস্তিষ্ক তখন শান্ত, অচঞ্চল; জাগ্রত শুধু rapport Zone বা points on duty গুলো। ঐ বিন্দুগুলো'র মাধ্যমে প্রদত্ত অভিভাবন বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে নানা কারণে। প্রকৃতপক্ষে সম্মোহিত অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল, cortex এর এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে তখন কেন্দ্রীভূত উত্তেজনা (exicitation) গড়ে ওঠে এবং তখন অপরাপর অংশের tonus থাকে দুর্বল, যার ফলে সৃষ্ট নঞর্থক আবেশ (negative induction) আন্তর্বাস্তব ও বহির্বাস্তব থেকে আগত উদ্দীপকগুলোকে সক্রিয় হতে দেয় না।

সে যাই হোক, সম্মোহন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এখনো অনাবিষ্কৃত। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সত্য, কিন্তু নিজ মস্তিষ্কের অধিকাংশই অজানা এবং ফলস্বরূপ এই পৃথিবীতে যে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ মানসিক রোগে অপরিসীম কষ্ট পাচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই। এই সেদিনও মনোবিদ্যা দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। সকল পূর্বসূরীদের প্রণাম করেও এ-কথা বলতেই হবে যে, ঈভান পেত্রোভিচ পাভলভই হলেন প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেন। তাঁর মনোবিজ্ঞান মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিষয়ীগত ধ্যানধারণা সেখানে অচল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বস্তুগত ভিত্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রথমদিকে ইংলণ্ডের চর্চ পাভলভীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেছিলেন। আজ অবশ্য অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। পাভলভীয় মতবাদকে আশ্রয় করে সোভিয়েত শারীরবৃত্ত, মনোবিজ্ঞান ও সম্পৃক্ত অন্যান্য বিজ্ঞান অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে। মনোবিদ স্পষ্টতই পাভলভীয় মতবাদকে অনুসরণ করে লিখছেন। শ্রীব্যানার্জি তাতে এত অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন কেন বোঝা দুষ্কর। ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিপ্রমাণসহযোগে খণ্ডনের চেষ্টা করুন না—আমরা অমৃতের পাঠক-পাঠিকারা তাতে আনন্দিত হব। অসহিষ্ণুতা তো আজ জীবনের সর্বস্তরে। অন্তত চিন্তাবিদরা যদি তা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা না করেন, তবে তা বড়ই ভয়ের কথা।

শ্রীব্যানার্জির সর্বশেষ অনুচ্ছেদ সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই। গঙ্গায় চলমান এক নৌকার মাঝি তার পুত্রকে চপেটাঘাত করলে, শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। এ হল complete identification -এর নিদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর সকল বস্তু ও তিনি অভিন্ন, কাজেই আঘাত তাঁর লাগবেই। বর্তমান পত্রলেখক ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু তা বলে মস্তিষ্ক মনন-ক্রিয়ার জনক ও জীবতন্ত্রের সর্বোচ্চ নিয়ামক এই পাভলভীয় তত্ত্বকে অস্বীকার করি কি করে? আর বিজ্ঞান ও ঈশ্বরকে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করানোর বা কি প্রয়োজন? অধ্যাত্মচিন্তা ও বিজ্ঞান দুটি ভিন্ন জিনিস। প্রথমটিকে বিজ্ঞান আখ্যা দিলে অধ্যাত্মচিন্তার মর্যাদার হানি বা বৃদ্ধি কিছুই ঘটে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এরূপ ইচ্ছাকে অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করি।

পরিতোষ গুপ্ত,

অসভ্য সব ধাড়ী-ধাড়ী ছেলেদের সামলান, তাই ভাবি। তার ওপর আবার টিউশনি। ঝণ্টুর মত মোটা মাথার ছেলেকে সামলানো। আচ্ছা, ঝণ্টুকে পড়াতে ভাল লাগে আপনার?

—কেন লাগবে না। ও বেশ শান্ত।

—ছাই। এক নম্বরের ভাল। এরকম ছাত্রের জন্য আপনার মত ধৈর্যশীল লোকই দরকার। আসলে সেই বুঝেই বোধহয় প্রকৃতিটাকে এরকম তৈরী করে নিয়েছেন, তাই না?

সোমাকে বোধহয় আজ গল্পে পেয়েছে। আসলে ওর এই মুহূর্তে কোন সঙ্গী প্রয়োজন ছিল। এই কিছুটা সময় কোনমতে কাটাবার জন্য। কেন সোমা এত উচ্ছল এরকম ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে, তার কারণ খুঁজল পরিমল মনে মনে। আস্তে করে বলল, — আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—বইয়ের দোকানে।

—এত দূরে এলেন তাহলে? পরিমল বিস্ময় চাপতে পারল না।

—এমনি। ঐ নভেল বাড়িতে ভাল লাগে না। মুখ টিপে একটুখানি রহস্যের হাসি হাসল সোমা। পরিমল ওর মোটিভ কিছুটা আন্দাজ করলেও মুখে কিছু বলল না।

—মিতুর কি খবর। সোমা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করল।

—ভাল। প্রায় নির্দ্বিধায় উত্তর দিল পরিমল। চকিত দৃষ্টি ফিরিয়ে সোমার দিকে দেখল। রাজপথে ঘন হয়ে আসা বিকেল। পথচারীদের আনা-গোনা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ, শিথিল। আবহাওয়ায় হাল্কা খোলা-মেলা বেড়ানোর ভাব। সোমার মেজাজেও। অপরাহ্নের মোলায়েম আলো সোমার সর্বাঙ্গে পড়ে কেমন একটা আলাদা দ্যুতি বিচ্ছুরিত করছিল। সোমার চোখ-মুখ কোন চাপা উত্তেজনার দীপ্তিতে ঝকঝক করছিল। সামনের আসনে গাড়ি চালাতে থাকা ড্রাইভারের নিস্পৃহ ভঙ্গি পেশীবহুল শরীরের শক্ত ঘাড়, কাঁধ ও হাতের চওড়া কব্জী দেখল পরিমল। এরকম উদাস বিকেলবেলা ট্যাক্সিতে একটি ছেলে ও মেয়েকে দেখলে লোক কি ভাববে? না।

—মিতু বেশ ইন্টেলিজেন্ট। ওকে এই বয়সে লেখাপড়া ছাড়িয়ে দিয়েছেন কেন? সোমা আলাপের সূত্র ছাড়ল না।

পরিমলের মাথা রহস্যজনকভাবে হাল্কা হয়ে আসছিল। মাথা ঘুরতে পারে কিনা, ভাবল একবার। সোমার কথায় হাসল।

—আমাদের মত ঘরের মেয়েদের ঐ বয়সেই লেখা-পড়া ছাড়তে হয়। হাসতে চেষ্টা করলেও মুখের ভেতর তেতো বোধ করল পরিমল।

—ও কি? আপনার কি মাথা ধরেছে? মাথায় লঘু উদভ্রান্ত ভাবটাকে দমন করার জন্য দু-আঙুলে রগ টিপে ধরেছিল পরিমল। ঘাড় নেড়ে বলল, না। কিছু নয়।

—না আবার কি। প্রায় ধমকে উঠল সোমা। আপনার মুখ লাল, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, নিশ্চয় শরীর খারাপ লাগছে আপনার।

পরিমল উত্তর দিল না, দু-হাতের তেলোয় কপালে ঘসল।

—ইস, আগে জানলে আপনাকে আসতে বলতাম না। সোমা আক্ষেপ করল।

—কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন তাতো বলছেন না। কেবল চলেছেন।

মুখ টিপে একটু রহস্যময় হাসল সোমা, তারপর বলল, আপাতত আমার এইখানে নামার ইচ্ছে। ড্রাইভার রাখো।

পরিমল চারিদিকে চেয়ে দেখল ভাল করে। গোধূলির কিছু রঙ মাঠের প্রান্তে সিঁদুরের হোলির মত ছড়িয়ে আছে। ইতস্তত পাখীর ডানায় চঞ্চলতা। চৌরঙ্গীর আলোগুলি জ্বলতে শুরু করেছে। লাল নীল সবুজ হলুদ বিজ্ঞাপনের আলো মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলে আবার নেভে। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঘূর্ণ মাঠের ধুলোর ঝড় তুলে দূরে দূরে মিলিয়ে যায়। মাঠের ধারে নেমে গাড়িটা ছেড়ে দিল সোমা। ওর ভাবভঙ্গি হঠাৎ কেমন গম্ভীর গুরুত্বপূর্ণপ্রায় একটা সিদ্ধান্ত নেবার মত মনে হচ্ছিল। পরিমলের আগে আগে চলে সোমা কিছুটা দূরে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

—এখানেই বসি একটু, কেমন। চলন্ত গাড়িতে আপনার বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাই না. সোমার গলার আত্মীয়তার সুর খেলা করছিল। মনে মনে খুব নরমবোধ করছিল পরিমল। এরকম সমবেদনায় আর্দ্রকণ্ঠ শোনার জন্য যে আরো কিছু অসুস্থ হতে রাজী ছিল। সোমা ঘাসের ওপর বসতে সেও ওর মুখোমুখি বসল, বেশ কিছু দূরত্ব রেখে।
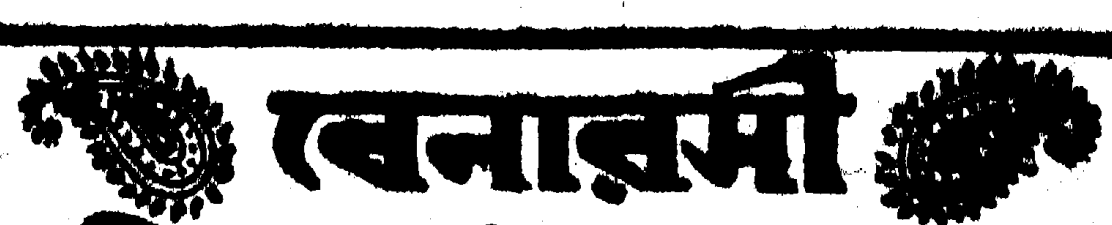
—আপনার শরীর ভীষণ দুর্বল, এর একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত পরিমলবাবু।

এত স্পষ্ট করে নাম ধরে এই প্রথম ডাকল সোমা। ঘনিয়ে আসা ছায়ার পরিবেশে সোমার সামনে বসে বুকের ভিতরটা কেমন শিউরে উঠল পরিমলের। এই বিশাল মাঠের পটভূমিকায় নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নিয়ে, যাবতীয় গাছপালা, অন্যমনে বেড়াতে থাকা মানুষ, লক্ষ প্রতিলক্ষ, ধূসর বিরাট আকাশ এবং চারিদিকে আচ্ছন্ন করে আসা অবছায়া ইত্যাদি দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে পরিমল নিজের জীবনব্যাপী নিঃসঙ্গতাকে আবার নতুন করে উপলব্ধি করতে লাগল। আপন প্রাণের যন্ত্রণায় এই বোধ তার নিজেরই পাঁজরের মধ্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত করতে লাগল। চতুর্দিক খুব বিস্তৃত বলে খানিকটা দূরে দূরে স্বচ্ছ ঘোরাটে কুয়াশা স্তর আস্তে আস্তে বৃত্তরেখার মত জমে উঠতে দেখা গেল। দূরের আলোগুলি যেন চমৎকার সূক্ষ্ম মসলিনের ঘোমটার-ঢাকা ঈষৎ অনুজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছিল। বাতাসে অত্যন্ত সামান্য শীতলতার আভাস।

—সবে জ্বর থেকে উঠেছেন, এরকম কুয়াশায় বসে থাকা ঠিক না। বেশ অভিজ্ঞ সাবধানী গলায় বলল সোমা। সোমা উঠে দাঁড়াতে পরিমলও উঠল নীরবে।

—বিশ্রাম করে খানিকটা সুস্থ বোধ করছেন তাই না? ওর গলা মমতাপরায়ণ লাগছিল, চলুন একটুখানি হেঁটে যাই তারপর গাড়ীতে উঠব। আপনার কষ্ট হবে না তো?

—না, ক্ষীণ উত্তর দিল পরিমল। মনে মনে কিরকম দুর্বোধ্য কারণে অথবা অকারণেই ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। সোমা আজ তার সব গতি যেন নিয়ন্ত্রণ করছে। আপন খেয়ালে কলের পুতুলের মত চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এরকম ঠিক না, ভাবল পরিমল। কালই তো সোমা তার মত অকিঞ্চনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আবার এক নতুন খেলায় মাতবে। ভাবল বটে কিন্তু কোনরকম বিদ্রোহী হল না মন। কে জানে হয়ত

সোমা এসব কিছু আচরণই খুব স্বাভাবিকতা নিয়ে করছে। হয়ত নয়, নিশ্চয়ই। শুধু জানতে পারছে না কোথায় কোন আগুনে কে পুড়ে যেতে পারে। খানিকটা হাঁটতে হাঁটতে সোমা প্রস্তাব করল, —আমরা একটু কফি খেয়ে নিয়ে ফ্রেশ হতে পারি কিন্তু।

—না না, বাধা দিতে গেল পরিমল। ও কোন মহিলার সঙ্গে কোনদিন কফি হাউসে যায়নি, কনকের সঙ্গেও না। আদৌ কফি হাউসেই কম যাওয়া গেছে।

ভেতরে ঢুকে অন্যমনস্ক চোখে একবার চারদিক দেখল সোমা। তারপর অপেক্ষাকৃত বিরলভীড় কোণের টেবিল খুঁজে গিয়ে বসল। পরিমলও বসল। ঠিক মুখোমুখি নয়, একটু তেরছাভাবে রাখা চেয়ারে।

—একটু কফি খেলে আপনার ঝরঝরে লাগবে। হাতের সুদৃশ্য ব্যাগ টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল সোমা, যেন পরিমলকে ঝরঝরে রাখাই আপাতত তার মুখ্য উদ্দেশ্য। দাঁতের ফাঁকে সূক্ষ্ম হাসি চাপতে না পেরে মুখ নামিয়ে নিল পরিমল।

—হাসছেন! কটাক্ষে ভ্রূভংগে সরব হয়ে উঠল সোমা। পরিমলের নিঃশব্দে হাসির ভঙ্গিটা দেখে। একটু সন্দেহাতুর মনে হল ওর গলা।

—কই হাসছি না তো। পরিমল তাকাল, আপনাকে একটা কথা বলব?

—অনেকগুলোও বলতে পারেন। দাঁড়ান আগে কফিটা অর্ডার দিই।

কফি আর স্যাণ্ডউইচ অর্ডার দিল সোমা। কপালে ভাঁজ ফেলে তাকাল।

—কই, কি বলবেন বলছিলেন।

পরিমল ক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর আস্তে করে বলল,—আপনার বেরোনোর উদ্দেশ্য এখনো জানতে পারলাম না, পুরনো কব্জিঘড়ি চোখের কাছে আনল পরিমল, প্রায় দেড় ঘণ্টা হতে চলল।

সোমা একটু থমকালো। নিজের উদ্দেশ্যটা নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল সম্ভবত। তারপর বলল, —উদ্দেশ্য আগে একটা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু পরে সেটা আর রইল না। নিজের কথাগুলো হেঁয়ালী মত লাগতে চুপ করে গেল সোমা।

—আমি অন্যকিছু ভেবেছিলাম। আমাকে নিয়ে আসার কারণ হিসেবে।

—কথাটা অন্যরকমই ছিল। আপনার ধারণায় ভুল নেই।

—কোথায় দেখা করার কথা ছিল। পরিমল নিরীহ ঘরোয়াভাবে প্রশ্ন করল।

—এখানেই। এই কফি হাউসে।

—এখানে? পরিমল ত্রস্তে চারিদিক তাকাল, আসেনি?

—অত ভয় পাবার কি আছে। হি-হি করে হেসে উঠল সোমা, দেখা হলে কি আর আপনাকে সামনে নিয়ে বসে কফি খেতাম?

পরিমল সামান্য গম্ভীর হল। একটা উচ্ছৃংখল মেয়ের খেয়ালের বলি হতে হচ্ছে তাকে। ক্ষোভে মনে মনে ছটফটিয়ে উঠল। আমি বাড়ীর টিউটর, আমার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। আর এই মেয়েটা আমাকে কু-প্রয়োজনে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নাকে দড়ি দিয়ে কলের পুতুলের মত অথবা বানরের মত ঘোরাচ্ছে। ভাবতেই ঘেমা এল পরিমলের। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইল লোকজনের আনাগোনা দেখল, চাপা হৈ-চৈ শুনল তারপর কফি আসতে দুজনেই নীরবে খেতে থাকল। এক সময় সোমা ফিসফিসানি স্বরে বলল,

—সেদিনকার ঘটনায় আমার সব ব্যাপার নিশ্চয় অনুমানে বুঝেছেন। আমার ভয় হয়েছিল, পাছে বাড়ীতে বলে দেন।

পরিমল সামান্য শব্দ করে শান্ত হাসি হাসল। সোমা বলল আবার,—এখন বুঝেছি আপনি নির্ভরযোগ্য। তাই আর ভয় হয় না। লজ্জাও করে না।

পরিমল চেয়ে চেয়ে দেখল শিশুর মত অবলীলায় কথা বলছে ও।

—আজকে ছটার সময় ওর এখানে থাকার কথা ছিল। আমার তো কলেজ ছুটি। বাড়ী থেকে বেরোবার সুযোগ কম। তাই একটা বই কেনার ভীষণ দরকার এরকম ভান করলুম। সামনে পরীক্ষা কিনা। সেজন্যেই আপনাকে টেনে আনলুম। না হলে—ভ্রূতে কুঞ্চন তুলে সামনে দেয়ালের দিকে দূরমনস্ক দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে রইল সোমা।

—একা একা ট্র্যামে বাসে মা ঘুরতে দেয় না। পরিবারের প্রেস্টিজ আছে। আর একা ট্যাক্সিতে উঠতে আমার নিজেরই ভয় করে।

পরিমল কোন কথা বলছিল না। সমস্ত ঘরের গুঞ্জন ছাপিয়ে তার কানের কাছে সোমার কথাগুলি যেন অর্থহীন অথচ সুন্দর প্রলাপের মত বাজছিল। টেবিলের ওপর আঁকিবুকি কাটতে থাকা সোমার আঙুল দেখল সে।

—মা আপনাকে বিশ্বাস করে। কেন জানি না, মনে মনে বেশ নির্ভরতা রাখে।

নম্র ও সূক্ষ্ম করে হাসল পরিমল। আত্মপ্রশংসা শোনার লজ্জা দমন করতে। তারপর কিছু মনে পড়ার মত চকিত ভঙ্গিতে বলল,

—কিন্তু তিনি, মানে আপনার সঙ্গে যাঁর দেখা হবার কথা, আসেননি?

বিদ্যুৎঝিলিকের মত ঈষৎ উজ্জ্বল হাসল সোমা, তারপর বলল,—কে জানে। হয়ত এসেছিল। হয়ত কেন, নিশ্চয় এসেছিল। আজ পর্যন্ত কখনো ফেল করেনি। আমিই ত এলাম না।

—এলেন না? পরিমলের চোখ সোমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল, কেন এলেন না?

—বারে, আপনি কি? আজকে ছটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত মাঠে রইলাম না আমরা। ভুলে গেলেন?

—ও। পরিমল ঘটনাটা মনে মনে সাজাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেন করলেন তা?

—কি জানি। সোমার দৃষ্টি দূরবিস্তারী হল। মনে হল আমার একটা তুচ্ছ সখের খেয়াল মেটাতে অনিচ্ছুক আপনাকে টেনে আনলাম। এই দুর্বল অসুস্থ শরীরে হয় আমাদের থেকে দূরের টেবিলে অথবা অন্য কোথাও আপনাকে অপেক্ষা করতে হতো, ভদ্রতার জন্য আপনি ডিসটার্ব করতে আসতেন না। দেখা হলেও কতক্ষণ ডিটেন করাত কে জানে। এই সব ভেবেই আমার খুব খারাপ লাগল। তাছাড়া ঘটনা অন্যরকম ঘটলেও আজকের সন্ধেটাও তো মন্দ কাটল না, কি বলেন; কেমন শান্ত নিরুদ্বেগ।

—অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এবার তো ফেরা উচিত।

পরিমলের চারিদিক আবার কেমন নির্জন হয়ে আসছিল। বুনো নিঃসঙ্গতার ভার আবার তাকে ঘিরে ধরছিল সেই নিঃসঙ্গতার পর্দার স্বচ্ছ আড়াল থেকে ক্রমশ একটা মুখ, সোমার মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জানি না, একি খেলা কাতর হয়ে ভাবল পরিমল। কতক্ষণ এর স্থায়িত্ব। পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি ছিল না। অথবা হয়ত পুতুল তৈরী করার পক্ষে পরিমলের মনের মাটিই সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয়। মনের মধ্যে মুখটা ক্রমশ ব্যাপ্ত বিস্তৃত হয়ে ছেয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি কফির কাপ শেষ করে পরিমল কেমন বিব্রতের মত বলে উঠল, অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এবার তো ফেরা উচিত।

ছেলেবেলায় মফস্বলের স্কুল টীমের ছেলেরা ভাল ফুটবল খেলত। পরিমল কোনদিন ওসব দিকে দক্ষ ছিল না। যে সব ছেলেরা খেলোয়াড় ছিল তাদের খুব খাতির ছিল স্কুলে। পরিমল লেখাপড়ায় ভাল হয়েও কোনদিন তাদের নাগাল ধরতে পারেনি। জীবনের কোন খেলাতেই সাক্ষাৎ মাঠে নেমে পড়তে পারল না পরিমল চারিদিকে থমথমে উত্তেজনা, দর্শকদে

আনন্দোল্লাস, হারজিতের অনিশ্চিত নাগর-দোলা, এসব জীবনে কখনো আর উপভোগ করা হল না। সকলের জন্যে সব কিছু নয়। ভাবলে ক্ষীণ হাসি আসে ঠোঁটে। তারচেয়ে পরিমল নিভৃতে সবার সঙ্গ এড়িয়ে মাঠের সরু প্যায়ে চলা পথ দিয়ে আপনমনে অনির্দিষ্টভাবে হেঁটে গেছে, লিচুগাছের নরম কচি পাতার কাছে প্রজাপতির অস্থির পাখায় ঝাপটে নির্ণিমেষ চেয়ে দেখেছে। ধূসর হয়ে আসা শেষ বিকেলে পুকুরের শীতল স্বচ্ছ জলের ধারে বসে কাটিয়ে দিয়েছে কতক্ষণ। আত্মচিন্তা নির্বিরোধ। এসব গোলমালহীন কাজেই বরাবর পরিমল আত্মনিয়োগ করে এসেছে। আজও যেমন। সাধারণ একটা স্কুলমাস্টারি জোগাড় করে নিতে পেরেছিল কপালজোরে। এখনও গ্রীষ্মদুপুরে ক্লান্ত গাভীর রোমন্থনের মত নিস্তরঙ্গ কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন।

আপনার কি হয়েছে বলুন তো, আজকাল কেমন অন্যমনস্ক থাকেন? সহকর্মী শিক্ষক অজিত সামন্ত স্টাফরুমে বসে মন্তব্য করল। দোকানের সরু চায়ের গেলাসটা একেবারে মুঠোর ভেতর ধরে রাখা যায়। হাতের চেটোর মধ্যে উত্তাপটা পরখ করতে করতে পরিমল প্রায় ভাষাহীন চোখ তুলে তাকাল। দাঁতের ফাঁকে সামান্য নরম হাসল। —কেন, আপনার সেরকম মনে হয়।

—মনে হয় কি, চোখের সামনে দেখছি আপনি দিন দিন কেমন বুড়োটে হয়ে যাচ্ছেন। কি এমন বয়স আপনার, আক্ষেপ করে উঠলেন অজিত সামন্ত, আমরা তাই বলাবলি করি। আমরা স্টাফেরা।

বলাবলি করে। পরিমলের আড়ালে কেউ তাহলে তার বিষয় আলোচনা করে। পরিমল তেমন নগণ্য নয় তাহলে। মুঠোয় ধরা গেলাসে চুমুক দিল পরিমল। জানলার বাইরে স্কুলের একচিলতে মাঠ দেখা যায়। মাঠের সবুজ ঘাসের বুকে মধ্যাহ্নের রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছে। চারিদিক আলোয় আর হাওয়ায় ভরা। পুজোর ছুটির পর এই দু একদিন মোটে স্কুল খুলেছে। বাতাসে এখনো শরৎকালের শিউলির গন্ধ পায় পরিমল। মন ভেসে ভেসে যায় অনেক দিনের ফেলে আসা স্মৃতির কাছে, উন্মন ছেলেবেলায়।

—চাকরীর ক্ষেত্রে এরকম হলে চলে না। আমি বন্ধুভাবেই বলছি। সামন্ত ঘেঁসে ঘেঁসে পরিমলের অনেকখানি কাছে সরে এল। অন্তত চটপটে ভাবটা রাখতে হবে। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিটা থাকা দরকার, আসল কাজ কিছু হোক বা না হোক। চোখ টিপে ইঙ্গিত করল সামন্ত, না হলেই ত কর্তাদের সব মুখ হাঁড়ি।

—কি ব্যাপার বলুন তো? কিছু খবর আছে নাকি?

—খবর রাখতে হয় দাদা। শুনেছি আজকালের মধ্যেই আপনাকে ওপরঅলা থেকে ওয়ার্নিং দেওয়া হবে। অমনোযোগের জন্য। আপনার ক্লাশ নেওয়া ইরেগুলার হচ্ছে, পড়ানোর নেগলিজেন্স, ছাত্ররা ক্লাশে অসম্ভব হৈচৈ করার সুযোগ পায়। পেছন থেকে কারো হ্যাঁচড়ামি আর কি, বুঝলেন না? সবই পলিটিকসের ব্যাপার।

বোঝার আর চেষ্টা করল না পরিমল। দিন দিন নিজের ভেতরের শিথিল ভাবটা যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তা তো আর নিজের কাছে অজানা নয়। জীবনের সব দিকেই ফিটনেসএর প্রশ্নটা এখন তার কাছে এক সমস্যা। শরীরটাও। আসলে শরীরটাই যেন বাদ সাধে। কে জানে। দিন দিন পাঁজরের ভেতর কেমন যেন জোর কমে যাচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপ স্খলিত হয়ে যেতে চায়।

—একটা বিয়েটিয়ে করুন না। রসিকতার হাসিতে পানরঙা ঠোঁট উজিয়ে বলল সামন্ত। শরীরে বল পাবেন। মনেও। সারাজীবন এমন হমছাড়ার মত পরের ঘরে থাকলে চলে?

—আপনি বিয়ে করে শান্তি পেয়েছেন? কিরকম অর্থহীন দৃষ্টিতে সামন্তর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করে ফেলল পরিমল।

সামান্য থতিয়ে গেল সামন্ত। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তা যদি বলেন, অস্বীকার করব না। মুখে যতই আক্ষেপ করি, হয়ত এই বাজারে ছেলেপুলেগুলো ঠিকমত মানুষ হচ্ছে না, অভাবের জন্য পরিবারও মাঝে মধ্যে খোঁচা দেয়, তবু বলব ঘরে অন্তত নিশ্চিন্ততাটুকু খুঁজে পেয়েছি। জীবনে পয়সা ছাড়া আর কোন প্রবলেম ত নেই। আর প্রকৃত শান্তি কারই বা আছে বলুন, স্বয়ং রাজারও না।

অবসরের সময়টুকু শেষ হল। ঘণ্টা পড়ে গেছে। এবার ক্লাসে যেতে হবে। উঠতে গিয়ে অবসাদ বোধ করল পরিমল। খুব সূক্ষ্মভাবে মাথাটা ঘুরল ক মুহূর্ত। দুহাত ছড়িয়ে পরিমল আলস্য ছাড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে কি ভেবে থমকে দাঁড়াল সামন্ত তারপর বন্ধুর মত কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল,

—নিদেন একটা প্রেমট্রেমও তো করতে পারেন।

হেসে চলে গেল সামন্ত। পরিমলও হাসল। সামন্তর বলার ভঙ্গিতে। ক্লাশে গিয়ে চেষ্টা করল মনোযোগী হবার। কিন্তু ক্ষুদে ছেলেগুলো পরিমল সম্বন্ধে কেমন যেন নিঃসংশয় হয়ে গেছে। যেন অনায়াসে যে কোনরকম উচ্ছৃংখলতা ওরা করতে পারে তার পিরিয়ডে। পরিমল অসহায় চেয়ে থাকে বেঞ্চিভরা টুকরো শয়তানগুলোর দিকে। একরকম ইউনিফর্ম পরা প্রায় একটা ব্যাটালিয়ন। অথচ এরাই অন্য টিচারদের ক্লাশে কেমন আতঙ্কিত নিঃশব্দ হয়ে থাকে।

—একটা গল্প বলছি শোন। পরিমল চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করল। কিন্তু সাড়া পেল না। প্রাণপণে গম্ভীর মুখে পড়া বোঝাবার চেষ্টা করল, নিজের কাছেই হাস্যকর ঠেকল সেটা। অতঃপর, ঘণ্টা বাজলে বেরিয়ে এসে মুক্তির শ্বাস নিল পরিমল। হেডমাস্টার ওয়ার্নিং দেবে। একেবারে ছাড়িয়ে তো দেবে না। এইভাবে কোনমতে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

ছুটির পর রাস্তায় এসে হালকা মনে করল। এতদিন নিজের বিষয়ে কিছু ক্ষীণ আস্থা তবুও ছিল। সন্দেহ, সংশয়ের দোলা ইত্যাদিও ছিল। এখন তার সবটুকু মুছে গিয়ে একটা ভারহীন বিশ্বাসের অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়াল। পরিমলের শরীর মনে সত্যি আর কোন শক্ত গ্রন্থি নেই। সব কিছু স্খলিত শিথিল। তার কোন আশা নেই তার কাছ থেকে কারো কিছু পাওয়ার নেই। চোখের দিগন্ত থেকে যাবতীয় রঙিন বস্তুপুঞ্জ মুছে আজ পরিমল শুধুমাত্র বেঁচে থাকার একটা শূন্য অনুভূতির নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে এসে দাঁড়াল। দূরে ট্রাম আসছিল। পরিমলের একটা অদ্ভুত ধারণা হল যে হয়ত সে হাত দেখালে ট্রাম থামবে না। কারণ পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। হাস্যকর এবং হাস্যকরভাবে করুণ।

তখনো অফিস ছুটির সময় নয় বলে ট্রামে বসার জায়গা পেল পরিমল। তার মাথার মধ্যেটা কিরকম জমাট লাগছিল। এ সময় একটুখানি কোন পার্কে বসলে কাজ দিত, অথবা ময়দানে। কার্জন পার্কে। কার্জন পার্কের কথা ভাবতেই মেয়ের কথা মনে হল। ঝিপঝিপ করে সাদা কুয়াশায় বিলীন অপরাহ্নে বিশাল মাঠের দিগন্তে বড় বড় গাছের গায়ে জড়িয়ে আসা আবছায়া, মাটির নীচে ঘাসের অদৃশ্য

শিরুড়ে কিছু চঞ্চল শিরশিরানি, একেবারে বুকের মধ্যে রক্তস্রোতে যেন তা অনুভূত হয়। আর সামনে সেই ধূসর হয়ে আসা পরিমণ্ডলের মাঝখানে স্থবির মত সোমার অস্তিত্ব।

বাইরে রাজপথে লোকজন ক্রমশ পিছলে পিছলে পেছনে সরে যাচ্ছে, ট্রামের জানলা দিয়ে লক্ষ্য করল পরিমল। বিকেলের আলো নরম হয়ে আলতো ছড়িয়ে আছে সব চলন্ত যানবাহন বাড়ীঘর, পণ্যসম্ভারের ওপর। যেন পার্থিব সর্বাকিছু হঠাৎ দীপ্তি হারিয়ে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাচ্ছে। গাড়ীর ভেতরটা শান্ত। কিছু বর্ণসমৃদ্ধ পোশাকের মেয়েকে বিকেলের রঙে আশ্চর্য মানিয়েছে।

—কি রে, চিনতেই পারছিস না যে। পিঠে হাত পড়তে চমকালো পরিমল।

—কে? ও, সিতু। কখন উঠলি? বন্ধুকে দেখে পরিমল হাসি আনল মুখে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে ঈষৎ উত্যক্ত বোধ করল।

—টিকিট কাটিসনি তো? সিতু জিজ্ঞেস করল।

—না। পরিমলের এতক্ষণ একবারো এ বিষয় মনে পড়েনি।

—আমি কেটে নিয়েছি, সিতু দুটো টিকিট দেখাল, অনেকক্ষণ উঠেছি তো।

অতএব পরিমলকে এখন বন্ধুত্ব বজায় রাখতে সারা পথ বকবক করতে হবে অবান্তর। অথচ বহুদিন যাবৎ সিতুর সঙ্গ আর ভাল লাগে না পরিমলের। ওর অনর্থক হামবড়াই ভাব আর মেয়েদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করে বলে। পারতপক্ষে পরিমল ওকে এড়িয়ে চলতেই ভালবাসে।

পরিমল জানলার ধারে। তার ও সিতুর মাঝখানে একটি লোক। সিতু রড ধরে দাঁড়িয়ে। পরিমল ঘাড় উঁচু করে কথা বলছিল।

—তুই এখনো সেই স্কুলেই আছিস?

—হুঁ। পরিমল ছোট করে উত্তর দিল। তোর কি খবর।

—আমার তো, জানিসই। হৈহল্লায় বেশ কাটছে। শার্টের কলার অনাবশ্যক নাড়াচাড়া করল সিতু। সযত্নচর্চিত রুক্ষ চুলে আঙুল ছোঁয়াল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ভাল সোর্স ছিল সিতুর, চাকরি পেয়ে অনেক চনমনে আর অহংকারী হয়েছে। সিতুকে মেয়েঘেঁষা বললে ভাট দেখিয়ে বলে—অক্ষমেরাই ওকথা বলে থাকে। কাঁধে একটা মানানসই ঝাঁকুনি দিয়ে চারিদিক তাকিয়ে সিতু বলে উঠল, তুই দিন দিন এমন ঝিমিয়ে যাচ্ছিল কেন বল ত? ব্যাপার কি তোর।

বিরক্তিতে গা রিরি করে উঠল পরিমলের। নিজের শ্রীবিলীন চেহারা, নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন পরিচ্ছদ এবং ক্লান্তির কালিমাখা মুখ যেন সবাই চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে এরকম মনে হল তার। কানের পাশে গরম ঝাঁঝের মত লাগল এক ঝলক। ইচ্ছে হল ঘাড় শক্ত করে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু ছেলেমানুষী হবে ভেবে পারল না।

—কি রে জবাব দিচ্ছিস না, কি হয়েছে তোর? একেবারে পাঁজরের মধ্যে পর্যন্ত যেন খুঁচিয়ে দিচ্ছিল সিতু। ওর গলাটা কেমন কঠোর মমতাহীন তাচ্ছিল্যের মত কানে বাজছিল।

—কি আবার হবে। কৈফিয়ৎ দেবার মত বলল পরিমল, কদিন আগে খুব অসুখ গেল। খুব অসুখের কথাটা জোর দিয়ে বলল।

—না কি? দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

পরিমল আশ্বস্ত হল। অসুস্থ হওয়া ও তার জন্য ঝিমিয়ে যাওয়া নিশ্চয় লোকচক্ষে হেয় নয়।

—তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হল। ঠোঁটে আঙুল চাপল সিতু, একটা কথা তোকে বলার ছিল, মানে তোরই ভালর জন্যে।

খানিক আগ্রহ নিয়ে তাকাল পরিমল। চেনাজানা একটা ফার্মে সিতু চাকরি করে দিতে পারে, এরকম একবার শুনেছিল সে। মনের মধ্যে কিছুটা আশ্বাস সংশয়ের দোলা নিয়ে তাকাল।

—এখন বাড়ী যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—ধ্যুৎ। তাচ্ছিল্য করল সিতু। এই বিকেলবেলা ঘরের কোণে মুখ গুঁজতে যাবি। তার চেয়ে চল নেমে পড়ি।

শরীরের অবসাদ মনের ক্লান্তির পাহাড়ের কথা ভাঙতে পারল না পরিমল। অনিচ্ছা গোপন করে ঘাড় নাড়ল ওর প্রস্তাবে।

কলকাতার রাস্তা বিকেলে জমজমাট থাকে। বস্তুত সারাদিন ধরে বিছানো রোদের ছটাগুলি শহরের পিঠ থেকে আস্তে আস্তে তুলে নেওয়া হলেই পথচলতি মানুষের গায়ে পায়ে এক ধরনের চঞ্চলতা খেলা করে। ট্রাম থেকে নেমে পরিমল কমুহূর্ত নিশ্চুপে এইসব দেখে। এই শীতলপাটির মত বিছিয়ে আসা ক্ষণস্থায়ী বিকেলের বাস ট্রাম উন্মুখ ফেরিওলা সন্ধানী ভিখারী।

—থ মেরে কি দেখছিস? সিতু ওকে ঠেলা দিল।

—কই কিছু না তো।

—তুই মাইরী সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছিস। এদিকে সব ভাল জিনিস না দেখে কোথায় দূরের দিকে চেয়ে আছিস।

—কি বলছি বলছিলি।

—চল আগে কোথাও বসে চা খাই। সিতু চলতে চলতে বলল, তুই তোর দাদার ওখানেই আছিস তো?

—হ্যাঁ, সে তো বরাবরই।

—বৌদি সেভাবেই আছে? সেইরকম আয়েসী আর বিরক্ত?

মাঝে মাঝে দুঃখের ক্ষোভের সময় বন্ধুদের কাছে ঘরের কথা বলে ফেলেছে পরিমল, অথচ ভাল মনে থাকলে ভাল কথাটা আর বলা হয়ে ওঠেনি। মনে পড়েনি। তার বৌদির সম্বন্ধে ওদের ধারণা খারাপ করে রেখেছে বলে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল পরিমলের। এবিষয়ে তার আর কথা বলতে ইচ্ছে ছিল না।

—না, হ্যাঁ, ঐ একরকম আছে। যেমন থাকা যায়।

—বাসায় থাকিস তো অনেকক্ষণ। ঘরের খবর রাখিস না কিছু?

এমনভাবে চোখ কুঁচকে হাসল সিতু যে পরিমলের শরীর জ্বলে উঠল। পরিমল মাঝে মাঝে সংসারের ওপর বিতৃষ্ণ হয় বটে কিন্তু আসলে তো সে বাড়ীকে বাড়ীর মানুষগুলিকে ভালবাসে।

—তোর বড় ভাইঝিটা তো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে রে।

চমকে সিতুর দিকে তাকাল পরিমল। কান ঝাঁঝাঁ করছিল ওর। সিতুর মুখটা ইতরের মত লাগছিল ওর। ওই মুখে মিতুর নাম উচ্চারিত হওয়াটা সে পছন্দ করছিল না।

—বড় হয়েছে মানে ... উড়তেও শিখেছে।

—সিতু! নিজের গলায় যে এত চাপা গর্জন থাকতে পারে পরিমল নিজেও জানত না। কিন্তু সিতু অন্যমনস্ক থাকায় গ্রাহ্য করল না।

—প্রায়ই ত এখানে ওখানে ঘুরতে দেখি ওকে, একটা লক্কাপায়রামার্কা ছোকরার সঙ্গে। সেকি ঢঙ তার, বুঝলি...ওকি, পরিমল?

পরিমল ততক্ষণে শক্ত করে ওর শার্টের কলারটা চেপে ধরেছে। মুখে উত্তেজনার গনগনে আগুন। কৌশলে মুখ সরিয়ে ওর বেমক্কা ঘুষিটা সামলে নিল সিতু। তারপর আস্তে আস্তে জামা থেকে ওর হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে আশ্চর্য শান্ত করে হাসল।

—জোরে তুই আমার সঙ্গে পারতিস না পরিমল। আমি কিছু মনে করিনি। সত্যি কথা শুনলে সবারই এরকম হয়। যা বাড়ী যা। তোর মন ভাল নেই একদম।

(আগামীবারে সমাপ্য)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাণ্ডুঘাট থেকে কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কর্পোরেশনের গাড়িতে শিলং-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সকাল সাড়ে সাতটায়।

আমাদের পথ আসাম ট্রাঙ্ক রোড। জোড়হাট হয়ে নানপো এসে পৌঁছে ক্ষণিকের যাত্রাবিরতি। রোড ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

বেলা দশটা। রোড ক্লিয়ারেন্স পেয়ে আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করলো পার্বত্য পথ ধরে। সর্পিল গতিতে চলে গেছে পার্বত্য পথ। হিমালয়ের অন্যত্র যেমন, এখানে ঠিক তেমন নয়। পথের ধারে খাদ এখানে সর্বত্র সুগভীর নয়, মাঝে মাঝে অধিত্যকার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

আঁকাবাঁকা পথ। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে চলে গেছে। মনে হয় এ-পথ গেছে নির্দিষ্ট ঠিকানায়, কোন নিসর্গ-সৌন্দর্যের দেশে।

শিলং-এ স্ট্যান্ডে পৌঁছেও শেষ নয়, আমাকে যেতে হবে লাইটুংখ্রা অব্দি। বাড়তি একটি টাকা দিতে ওই গাড়িই আমাকে পৌঁছে দিলে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে ঘড়িতে সময় দেখলাম। বেলা একটা বেজে পনেরো মিনিট।

ক'দিন পর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। যাই হোক, খানিক কথাবার্তার পর স্নানাহারের পালা চুকিয়ে ভাবলাম, একটু ঘুমিয়ে নিই। কিন্তু শয্যাগ্রহণ করতেই হলো এক ঝামেলা। নিশ্চিন্তে শোবার জো কি! দারুণ মাছির উৎপাত। ওই দিনের বেলাতেই মশারী টাঙাতে হলো।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি যখন এসে পৌঁছেচি, তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হলো।

সুতরাং আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকা নয়, বেরিয়ে পড়লাম ট্যাক্সি নিয়ে। সঙ্গে বাড়ির সবাই আছে। বিডন ফলস, বিশপ ফলস, শিলং লেক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এ্যাসেম্বলি ভবন দেখে যখন ডাঃ এল কে চক্রবর্তীর বাড়ী এলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্তী বেশ মজলিশি মানুষ। প্রবাসে আমাদের জন্যে উনি যথেষ্ট করেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তীকে বললাম, আসছে কাল চেরাপুঞ্জি যাবার জন্যে একটা গাড়ি ঠিক করার কথা।

ডাঃ চক্রবর্তী কথা দিলেন।

পরদিন। তেইশে এপ্রিল। সকালে বাড়িতে এক কাশ্মীরি ফেরিওলা এলো। তার কাছে নানা জাতের পাথরের মালা ছাড়া আরো কিছু জিনিসপত্তর। একটি এ্যাম্বারের মালা কিনলাম তিরিশ টাকা দিয়ে, আর ফাইবারে তৈরি একটা মণিপুরী মাফলার।

একটু বাদেই ডাঃ চক্রবর্তী ট্যাক্সি নিয়ে এলেন। আমাদের রওনা হতে পৌনে এগারোটা বাজলো।

চেরাপুঞ্জীর পথ চলে গেছে আপার শিলং-এর ওপর দিয়ে। কিছু পথ অতিক্রম করে ট্যাক্সি দাঁড়ালো, এ্যালিফ্যান্ট জলপ্রপাতের কাছে।

এলিফ্যান্ট জলপ্রপাত দর্শন করলাম। ভালো লাগলো। আমরা সমতলভূমির মানুষ—পাহাড়ের যা-কিছু সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, মনকে করে অভিভূত।

এবারের পথ পরম রমণীয়। সর্পিল গতিতে পথ চলে গেছে। দৃষ্টিপথেই পড়লো সবুজ পাইনের নিবিড় বন—পাহাড়ের গায়ে পাইনের ছায়ায় পাতা সবুজ ঘাসের কার্পেট। চলতি পথে অবাক চোখে চেয়ে থাকি, সবুজ-সৌন্দর্যের দিকে।

এই পথে যেতেই দেখলাম, কয়লা সংগ্রহের কাজ চলছে। পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কেটে কয়লা বার করে আনা হচ্ছে। আরো দেখলাম, চুনের কারখানা, পাথর পুড়িয়ে এখানে চুন তৈরি করা হয়। যে 'সিলেট চুন' কলকাতার বাজারে আমরা পাই।

দেখতে দেখতে পথ ফুরিয়ে এলো। চেরাপুঞ্জীতে পৌঁছে চারদিকের পরিবেশে দৃষ্টিপাত করি। চেরাপুঞ্জীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ফিট। চিরকালের বৃষ্টিঝরার দেশ চেরাপুঞ্জী—চারদিকে নিবিড় সবুজ বনভূমি, সবুজ পাহাড়—শুধু আকাশের নীলরঙ ঢাকা থাকে ঘন কালো মেঘে।

চেরাপুঞ্জীতে একটি গুহা দেখলাম, যেটি সত্যিই বিস্ময়কর। গুহার ভিতরে বটের ঝুরির মতো কী যেন ওপর থেকে নেমেছে। ওগুলো কিন্তু পাথরের। সত্যি—দেখবার মতো। ভারতে যে এমন গুহা আছে একথা আমি আগে কখনো শুনিনি।

এরপর এলাম মসওরাম্বি ফলস দেখতে। বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই দেখলাম। কাছে যাওয়ার পথ নেই। তবে যাওয়া যায় না এমন নয়। যাই হোক, দূর থেকে দেখলাম, সুউচ্চ পাহাড় থেকে জলধারা নেমে আসছে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে। শুনলাম, জলপ্রপাতের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের সুর। পাহাড়ের ওপর থেকে জলধারা পড়ছে ১৮০০ ফুট নিচে।

এখান থেকে দেখা যায় শ্রীহট্টের সমতলভূমি। বিহ্বলদৃষ্টিতে ছবির মতো মনে হয়। দাঁড়িয়ে দেখলাম। কয়েকটি ছবিও তোলা হলো এখান থেকে।

ফিরতি পথে চেনামুখের দেখা মিললো। কলকাতার বড়তলার ও-সি যতীনবাবুর দেখা পেলাম অপ্রত্যাশিতভাবে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি বেড়াতে এসেছেন?

হ্যাঁ, না—কিছুই বলেন না যতীনবাবু। ভাবলাম, পুলিশের লোক—ও'রা কোন কথাই বলতে চান না। হয়তো কোন কাজ নিয়ে এসেছেন।

এরপর শিলংশিখরে ওঠার পালা। এলামও। সাগর পৃষ্ঠ থেকে ছ' হাজার ফুট ওপরে শিলংশিখর। এখান থেকে শিলং শহরের দৃশ্যটি বড়ো সুন্দর।

শিলংশিখর থেকে ব্যাণ্ড স্ট্যান্ড। তারপর হ্যাপী ভ্যালী হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি।

বাড়িতে চায়ের আসর বসলো। আসরে ডাঃ চক্রবর্তীও ছিলেন। ওখানেই কথা উঠলো, 'পাইন উসলা' দেখার। কিন্তু সেদিন যাবো কি যাবো না—সেটা ঠিক হলো না।

চা-পানের পর সেদিনের মতো ডাঃ চক্রবর্তী বিদায় নিলেন।

আমিও ক্লান্ত। এবারে একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের অবসর খোঁজা।

পরদিন চব্বিশে এপ্রিল, বাড়িওয়ালা ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য এলেন। সকালে তাঁর সঙ্গে খানিক গল্পগুজবও হলো।

সকাল থেকে বাড়িতেই ছিলাম। বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে নানা এলোমেলো চিন্তার জাল বুনছিলাম। এর মধ্যে মাঝে মাঝে সুধীরা এসেছে, বসেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছি, গল্প করেছি। ছেলেমেয়েরা এসেছে কাছে। তাদের সঙ্গেও হাসাহাসি করেছি।

এমনি করে সকালটা কেটে গেল।

দুপুরে দেড়টা নাগাদ ডাঃ চক্রবর্তী গাড়ি নিয়ে এলেন। বললেন, চলুন—পাইন-উসলা যাবো, আমার গাড়িতেই। এক্ষুনি তৈরী হয়ে নিন।

মিনিট-পনেরোর মধ্যে তৈরী হয়ে নিলাম। বেলা তখন দেড়টা।

বেলা সাড়ে তিনটেয় পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যস্থানে। পাইন-উসলায়। পাহাড়ের রমণীয় পরিবেশে চমৎকার জায়গা। চারদিকে জড়িয়ে আছে প্রকৃতির গভীর প্রশান্তি।

এখানকার ডাকবাংলোটি বড়ো সুন্দর। ছবির মতো। রিফ্রেসমেণ্ট রুমটি ডাকবাংলোর সংলগ্ন। সবাই মিলে চা-পান করলাম। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে দেখার পালা।

সাগর-পৃষ্ঠ থেকে ছ' হাজার সাতশ ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে দেখছি চারদিকের পরিবেশ। সিলেট রোড দেখতে পাচ্ছি, যেন পাহাড়ের গায়ে একটু সরু ফিতে ছড়িয়ে আছে।

ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালে শ্রীহট্টের সমতলভূমি নজরে পড়ে। দূর থেকে ভারি সুন্দর লাগে দেখতে।

পাইন-উসলা দেখা শেষ হলো। ফিরে এলাম শিলং-এর নির্দিষ্ট ঠিকানায়। ডাঃ চক্রবর্তী বিদায় নিলেন আমাদের পৌঁছে দিয়ে।

ডাঃ চক্রবর্তীর শ্বশুর মিঃ এ কে ভট্টাচার্যের বাড়িতে গেলাম। আলাপকুশলী মানুষ। সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেন। মিঃ ভট্টাচার্যের বিরাট ব্যবসা আছে। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-তে ও'দের ব্যবসায়ের শাখা অফিস রয়েছে। ধনী হলেও ভট্টাচার্যের মধ্যে একটি সুন্দর মানুষ লুকিয়ে আছে।

এখানেই কথা উঠলো দেবীতীর্থ কামাখ্যা যাওয়ার। একটা গাড়ির কথাও জানিয়ে রাখলাম। আসছে কালই যাবো।

এখানে মিসেস চক্রবর্তী ও মিসেস ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা হলো। মিসেস ভট্টাচার্য আর তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা হলো।

পরদিন পঁচিশে এপ্রিল। সকালে ডাঃ চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামাখ্যা যাত্রা করলাম সপরিবারে। বাসায় রইলো গোকুল। ভৃত্য হয়েও যে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে।

গোহাটির পথে ড্রাইভার জানালো, বশিষ্ঠ আশ্রমের কথা। গোহাটি থেকে ছ' মাইল দূরে বশিষ্ঠর আশ্রম।

যাচ্ছি যখন এই পথে—কেনই বা বাকি থাকে বশিষ্ঠ আশ্রম যাওয়া।

ড্রাইভার আমাদের নিয়ে চললো বশিষ্ঠ আশ্রমের পথে।

সত্যি বশিষ্ঠ আশ্রমটি দেখবার মতো। খরস্রোতা পার্বত্য নদী তিনদিক থেকে আশ্রমকে বেষ্টন করে রেখেছে। দুরন্ত জলধারা ছুটে চলেছে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে।

ওপরে মন্দির দেখলাম। মন্দির-চুড়োটি উপুড়-করা ধামার মতো। কামরূপ অঞ্চলের প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী একই ধাঁচের।

মন্দির দেখলাম। কোন বিগ্রহ নেই। বিগ্রহ না থাক—তবু তো দেবতার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে এই মন্দির।

এবারে নীচে এলাম। মাটির নীচে ঘর। দেখলাম, এখানেও কোন বিগ্রহ নেই। শুধু একটি পাথর বসানো। শুনলাম—এটি একটি আসন। হয়তো বশিষ্ঠ এখানে এই আসনে বসে তপস্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে হয়তো আরো অনেক মহাপুরুষ এই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

কামরূপ—তন্ত্রসাধনার পীঠভূমি। তন্ত্রসাধনা—শক্তিসাধনার এক রূপ।

বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শনান্তে, গোহাটি ফিরে এলাম। গোহাটিতে প্রথমে এলাম পানবাজারে, সতী সিনেমার সামনে, এন কে ভট্টাচার্য এ্যাণ্ড সন্সের অফিসে। ডাঃ চক্রবর্তী এই অফিসের মোহিনীবাবুকে দেওয়ার জন্যে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন আমার হাতে। সেটি মোহিনীবাবুকে দিয়ে এলাম।

তাড়া রয়েছে কামাখ্যা যাওয়ার। সুতরাং এখানে আর অপেক্ষা নয়, চললাম কামাখ্যার পথে। পথের দু'ধারের দৃশ্যপট মনোরম। সামান্য পথ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। গাড়ী এসে দাঁড়ালো কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে। দেখলাম, সামনেই পাহাড়ের ওঠার সিঁড়ি পথ।

এসেই পাণ্ডার খোঁজ করলাম।

সামনের এক দোকানদার জানালো, আমাদের পাণ্ডা এতোক্ষণ অপেক্ষা করে একটু আগে ওপরের দিকে উঠেছেন।

অগত্যা নিজেরাই চলতে আরম্ভ করলাম পাহাড়ের সিঁড়ি পথে।

সিঁড়ি-পথ উঠে গেছে ওপরের দিকে। মাঝে মাঝে খাড়াই সিঁড়ি। তবে যাত্রীদের সুবিধার জন্যে লোহার রেলিং আর রড দেওয়া আছে। সুতরাং উঠতে কোন অসুবিধে নেই। তবে হাত আর পায়ের জোর থাকা চাই।

এইসব তীর্থের পথে মানুষ এক ধরনের শক্তি পায়। কতো অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও দেখেছি, ওই পাহাড়ের সিঁড়ি-পথ ধরে উঠে চলেছে। আমরা কেন পারবো না।

ওঠার পথে আমি যদিও এক আধবার থমকে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু সুধীরা একবারের জন্যেও দাঁড়ায় নি। ভানু, মীরা—ওরাও কতো স্বচ্ছন্দে উঠে চলেছে।

দেড় ঘণ্টা লাগলো পাহাড়ের ওপরে উঠতে। উঠেই এক নজরে দেখলাম, দেবীর মন্দির।

মন্দিরের চত্বরের কাছেই একটি কুণ্ড। জলের রঙ গাঢ় সবুজ। শুনলাম এই পবিত্র কুণ্ডে স্নান করে মন্দিরে যাওয়া বিধি। কিন্তু আমরা স্নান করলাম না। কুণ্ডের জল মাথায় দিয়ে মন্দিরে এলাম।

ওপরের মন্দিরে কামাখ্যা দেবীর সুবর্ণমূর্তি। নীচে গর্ভমন্দিরে যোনী-পীঠ। বাহান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে কোন মূর্তি নেই। ফুলচন্দনেসাজানো একটি পাথর খণ্ড। এখানেই পড়েছিল বিষ্ণু চক্রে খণ্ডিত সতীর দেহাংশ।

পুজো দিলাম। প্রণাম জানালাম দেবীর উদ্দেশ্যে।

পুজোন্তে বাইরে এলাম। পাণ্ডা নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। এখানেই পাণ্ডার বাড়িতে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করলাম। একে অনেক বেলা হয়েছে তারপর শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল যায় নি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলাম, ভোগপ্রসাদ। পাণ্ডাঠাকুর বললেন, এবারে আমাদের যাত্রীনিবাসে বিশ্রাম করুন।

মন্দিরের কাছেই যাত্রী নিবাস। সুন্দর পরিচ্ছন্ন। যাত্রী নিবাসে এলাম বিশ্রামের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু বিশ্রাম নিতে মন চাইলো না। পাহাড়ের শিখরে উঠবার আগ্রহ।

যেমন ইচ্ছে, তেমন কাজ। সবাই মিলে পাহাড়ের শিখরদেশে উঠতে আরম্ভ করলাম।

পাহাড়ের ওপরে দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দির। শূন্য মন্দির। এখানেও কোন মূর্তি নেই।

পাহাড়ের শিখরদেশ থেকে চারদিকের দৃশ্যাবলী অত্যন্ত সুন্দর। বিশেষ করে উচ্ছল ব্রহ্মপুত্রকে দেখবার মতো। চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখতে পাই, ব্রহ্মপুত্রের ছোট দ্বীপটি যেখানে উমানন্দ ভৈরবের মন্দির।

দেবী কামাখ্যা এখানে ভৈরবী, ভৈরব উমানন্দ।

দাঁড়িয়ে রইলাম পাহাড়ের শিখরদেশে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখি চারদিকের অনুপম দৃশ্যাবলী।

কিন্তু দু' দন্ড দাঁড়িয়ে দেখার অবসর কই। আমাকে যে আজই ফিরতে হবে।

নীচে মন্দিরের কাছে নেমে এসেছি। এবারে আমার চলার পালা।

আজ আমি একাই যাবো, নয়তো আর সবাই এখানে থাকবে। সুধীরাকে বললাম, পুণ্যের অংশটা তোমাদের ভাগ্যেই বেশি পড়বে—তীর্থস্থানে রাত্রিবাস, এ-তো ভাগ্যের কথা। ঠিক আছে—তোমরা থাকো।

সুধীরা কী যেন বলতে যাচ্ছিল।

বললাম, কোন চিন্তা নেই—এখানে নির্ভয়ে থাকতে পারো। তাছাড়া গাড়ি তো আছে, কাল যাবার পথে গোহাটি শহরটা ভালো করে দেখে যেও।

ওরা সবাই রইলো। আমি একা ফিরে চললাম।

পান্ডুতে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললাম, তুমি ওদের ঠিকমতো পৌঁছে দিও। দেখো কোন অসুবিধা যেন না হয়।

ড্রাইভার বললে, কোন চিন্তা নেই, আপনি মনের মধ্যে কোন চিন্তা রাখবেন না।

পান্ডু থেকে আমিনগাঁও।

ফেরি স্টীমারে উঠেছি আরো যাত্রীর সঙ্গে।

পথশ্রমে ক্লান্ত আমি। তারপর একনাগাড়ে চলাফেরার দরুন ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব। স্টীমারের দোতলায় ক্যান্টিনে খেতে বসেছি।

আমার কাছ থেকে একটু তফাতে, আর একটি টেবিলে দেখলাম, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে। দেখেই মনে হলো মিলিটারীর কোন জাঁদরেল ব্যক্তি। তিনি একা নন, তাঁর আশপাশে আরো কয়েকজন সৈনিকপুরুষ।

শ্বেতাঙ্গ মিলিটারী অফিসারটি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করছেন। টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটি বোতল সাজানো। মদ্যপানে হয়তো কিছুটা উন্মাদনাও এসেছে। সঙ্গীদের সঙ্গে ভারি-গলায় কি যেন বলছেন। আর কথার মাঝে মাঝে খানিকটা করে তরল পদার্থ গলার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছেন।

অন্যান্য সৈনিকপুরুষরা, তাঁদের অফিসারটির অবস্থা বুঝতে পেরেছে। তারা দূরে ছিল, চোখ ইশারায় তাদের ডাকছে। ইশারায় বলতে চাইছে, ওরে সুরার পাত্র এখানে আছে—যতো খুশি পান করো।

সুতরাং আর কি!

পানের আসর আরো জমে উঠলো।

এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করলো। কথা শুনে এবং অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হলো, কোন নির্মীয়মাণ পথের শ্রমিকদের নিয়ে ওরা কথা বলছে। যেসব কথা কানে এলো, তাতে বুঝলাম, ওরা শ্রমিকদের কাজ দেখে বিরক্ত হয়েছে এবং শ্রমিকরা যে কুঁড়ে, ঠিক মতো কোদাল-বেলচা চালাতে চায় না, এইটাই ওদের কথার বিষয়।

পান্ডু থেকে আমিনগাঁও।

স্টীমার ঘাট থেকে স্টেশনে এসেছি।

গাড়ির নির্দিষ্ট কামরায় উঠতে যাবার সময় একজন অপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনাদের ট্রেনে একজন জেনারেল যাচ্ছেন।

বললাম, জানি—কিন্তু আমি তাঁদের চিনি না। বলে নির্দিষ্ট কামরায় উঠেছি।

ছুটন্ত ট্রেনের শব্দের মধ্যে একটা ছন্দ আছে। সুর আছে। সেই ছন্দ আর সুরের ভাষা শুনতে শুনতে এক সময় আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

বেলা দেড়টায় এসে পৌঁছলাম শিয়ালদা স্টেশনে। স্টেশন থেকে ট্যাকসি নিয়ে সরাসরি বাড়ি।

বাড়িতে পৌঁছে স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম। তারপর আবার সেই পুরোনো পৃথিবী—রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।

এলাম নাট্যভারতীতে। সেদিন পি ডবলু ডি-র ১১২তম রজনী।

অভিনয়-শেষে দুর্গাদাস বললে, রঙমহলের ষষ্ঠীবাবু আমাকে তাঁদের ওখানে ডাকছেন। কী করি বলো তো? এখানকার তো এই হাল! 'রিহার্সাল' নাটক কি হবে বুঝতে পারছি না।

বললাম, আমি কি বলতে পারি বলো। তুমি যা ভালো বুঝবে করবে।

ঐ সময় শনি-রবি চলছে পি ডবলু ডি। অন্যান্য দিন অন্য নাটক। ধীরেন মুখুজ্যের জয়ন্তী নাটক ঐদিন উদ্বোধন হলো মিনার্ভায়। তারিখটা হলো ঊনত্রিশে এপ্রিল।

ঐদিনেই যথাসময়ে নাট্যনিকেতনে গিয়েছি, 'রিজিয়া' রিহার্সাল দিতে। গিয়ে দেখলাম, মঞ্চের ওপর প্রবোধ গুহকে ঘিরে কয়েকজন বসে। কী যেন হচ্ছে।

ইতস্ততঃ করছি, ভিতরে যাবো কিনা, এমন সময় প্রবোধবাবু ডাকলেন, এসো—নতুন নাটক পড়া হচ্ছে।

নতুন নাটকের নাম কালিন্দী। নাট্যকারের নাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরচিত উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনিই দিয়েছেন।

প্রবোধবাবুর কাছে শুনলাম, তারাশঙ্কর সিউড়ীর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় এবং ভালো লেখেন।

সেইদিনই প্রথম দেখলাম, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যে তারাশংকর পরবর্তী কালে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা যুগ সৃষ্টি করেছেন।

যাই হোক, ওঁদের নাটক শোনা চলতে থাকলো।

আমি এলাম ভিতরে, যেখানে 'রিজিয়া' রিহার্সালের আসর বসেছে। রিজিয়ার উদ্বোধন রজনী আসন্ন। আসছে পয়লা মে।

পয়লা মে সকালেই স্টুডিও যাবার তাগিদ ছিল। স্টুডিও পৌঁছলাম সাড়ে দশটায়। মেক-আপ নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছি। অন্যান্য শিল্পীরাও তৈরি। কিন্তু ফ্লোরে যাবার ডাক আসছে না।

শুনলাম, ছবির ক্যামেরাম্যান কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে, তাই এ বিভ্রাট। তক্ষুনি অন্য ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আসা হলো। কাজও শুরু হল দুটো পঞ্চান্ন মিনিটে। কিন্তু আবার নতুন বিভ্রাট। একটা সট নিতেই দেখা গেল, পিকচার নেগেটিভ নেই। আবার গাড়ি ছুটলো ফিল্ম আনতে। নতুন করে শ্যুটিং আরম্ভ হলো ৪টা ৫০ মিনিটে। ৫টা ৫৫-তে কাজ শেষ করলাম। থিয়েটারে যাবার তাড়া রয়েছে। আজই নাট্যনিকেতনে 'রিজিয়া' আরম্ভ হবে।

সাড়ে সাতটায় 'রিজিয়া'র উদ্বোধন হলো নাট্যনিকেতনে। সেদিনে বক্তিয়ারের ভূমিকায় ছিলাম আমি, শৈলেন চৌধুরী নেমেছিলেন বীরেন্দ্রসিংহের ভূমিকায়; পান্নালাল আর ঘাটকের ভূমিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র এবং ভূমেন রায়। সমরেন্দ্রের ভূমিকা ছিল উৎপল সেনের। নাম-ভূমিকায় ছিলেন প্রভা, আর যশোর থেকে যে-মেয়েটি নতুন এসেছে, চলচ্চিত্রে এবং মঞ্চে অভিনয় করে ইতিমধ্যে কিছুটা পরিচিতিও পেয়েছে, সে ছিল ইন্দিরার চরিত্রে। মেয়েটির নাম ছায়া।

অভিনয় সেদিন আরো ভালো হতো, যদি সবাই 'পার্ট' মুখস্থ করতো। কিন্তু কেউ-ই তেমন পার্ট মুখস্থ করেনি। সবাইকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রম্পটারের ওপর।

আমি ঠিকমতো তৈরি হয়ে নেমেছিলাম। ওটা আমার চিরদিনের অভ্যাস। মঞ্চে নেমে প্রম্পটারের ওপর কান রাখবো, এটা আমি ভাবতেই পারি না। তবে কখনো কখনো এমনধারা ঘটেনি এমন নয়। যাই হোক, রিজিয়া অভিনয় দর্শকরা মোটামুটি নিয়েছিল। বক্তিয়ার বারকয়েক হাততালিও পেয়েছিল সেদিন।

জোড়াসাঁকো রাজবাড়িতে বিবাহের উৎসব উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। অভিনয় হয়েছিল কর্ণার্জুন। রাত এগারোটায় অভিনয় শুরু হয়ে শেষ হয় রাত তিনটেয়। সেদিন তারিখ ছিল ২ মে।

পরদিন ৩ মে, ছুটির দিন। নাট্যভারতীতে পি ডব্লু ডি-র দুটি প্রদর্শনী ছিল।

এরই মধ্যে নাট্যভারতীতে 'সরলা'র নতুন করে অভিনয়ের তোড়জোড় চলছিল। ৭ মে 'সরলা' নতুন করে উদ্বোধন হলো। সরলা সে-যুগে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সেদিন ভূমিকালিপি ছিল আকর্ষণীয়। গদাধর—আমি, বিধুভূষণ—দুর্গাদাস, শশিভূষণ—সন্তোষ দাস, নীলকমল—কুমার মিত্র, সরলা—সাবিত্রী, প্রমদা—সুহাসিনী। সে-রাতে অভিনয় শুরু হয়েছিল ৭-৩০টায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, সে-রাতে গদাধরের চরিত্রে আমার অভিনয় দর্শক-মনকে খুশি করেছিল। কিন্তু এই হালকা রসের চরিত্রটি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। এই চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় আমি দেখেছি—সে-অভিনয়ের তুলনা হয় না। এছাড়া আমি শুনেছি, এই গদাধর চরিত্রটিতে বেলবাবুর (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) অভিনয় ছিল নাকি আরো সুন্দর এবং প্রাণবন্ত। উনিশ শতকের শেষে সম্ভবত ১৮৮৮ খৃঃ সরলা প্রথম অভিনীত হয়েছিল, আর সে-রাতে বেলবাবু নেমেছিলেন গদাধরের ভূমিকায়।

মে মাসের দিনগুলো এইরকমভাবে চলছিল। এর মধ্যে ২৫ মে তারিখটি কিছুটা স্বতন্ত্র। ঐদিন ছিল পি ডব্লু ডি-র ১২৫তম রজনী। কিন্তু ঐদিন মঞ্চে গিয়ে শুনলাম, দুর্গাদাস আসেনি, তার জায়গায় অভিনয় করবে 'হটু'।

দুর্গাদাসের জায়গায় হটু!

শুনে অবাক হলাম। হটু একজন প্রম্পটার।

দুর্গাদাসের জায়গায় সে অভিনয় করবে কেমন করে। শুনলাম, এর আগেও নাকি হটু দুর্গাদাসের বদলি হিসাবে অভিনয় করেছে।

যাইহোক অভিনয় হলো। বলা বাহুল্য, দুর্গাদাস আসেনি বলে, কিছু টিকিটের মূল্য ফেরত দিতে হয়েছিল।

বলতে দ্বিধা নেই, ঐ দিনেই মনে হয়েছিল, পি ডব্লু ডির আয়ু আর বেশি-দিন নয়।

ছাব্বিশে-সাতাশে মে, দুদিনই সারা রাত ধরে রিহার্সাল চলেছিল নতুন নাটকের। নাটকের নামও 'রিহার্সাল'। নাট্যকার অয়স্কান্ত বকসী। তবে এটা মৌলিক নাটক নয়, বিদেশী নাটক, He who gates slaped' এর ছায়া নিয়ে লেখা।

২৮ 'রিহার্সালে'র উদ্বোধন রজনী। উৎসাহী নাট্যরসিকদের ভিড়ও হয়েছিল সেদিন। নাটকের প্রথম দিকটা ভালোই জমেছিল, কিন্তু শেষটা তেমন হয়ে ওঠেনি।

মে মাসটা ফুরিয়ে গেল। দিনগুলো কতো তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়।

২ জুন শিলং থেকে আমার পরিবার-বর্গ ফিরে এলো। কথা ছিল, আমি ওদের আনতে যাবো। কিন্তু কাজের চাপে আমি যেতে পারবো না—কথাটা ওদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আমার অপেক্ষায় না থেকে নিজেরাই চলে এসেছে।

৪ জুন ছিল রিহার্সালের তৃতীয় অভিনয় রজনী। ঐদিন দুর্গাদাস অনুপস্থিত। শুনলাম, দুর্গাদাস নতুন কন্ট্রাক্টের কথা তুলেছে। নতুন কনট্রাক্ট না হলে সে অভিনয় করবে না। রাধানাথবাবু তাকে বলেছেন, এ সম্পর্কে তিনি ভাবছেন, কিন্তু দুর্গা যেন অভিনয় বন্ধ না করে। কিন্তু দুর্গাদাস তার কথা কানে নেয়নি।

পি ডব্লু ডিতে দুর্গা অভিনয় করতো মিঃ সেন চরিত্রে। ঐদিন অনুরোধ এলো, আমি যেন ঐ ভূমিকাটি অভিনয় করি।

আপত্তি জানালাম। দুর্গাদাসের জন্যে ওই চরিত্র—ওটা আমার পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব নয়।

শেষটা অনুরোধ এলো নানাদিক থেকে। মঞ্চের সাধারণ কর্মী থেকে আরম্ভ করে সবাই অনুরোধ করলো। শেষটা না করতে পারলাম না।

শচীন সেনগুপ্তের ভারতবর্ষ নাটকটি বেতারে অভিনয় হলো ৬ জুন। নাটকে আমি ছাড়া দুর্গাদাস, সুনীল, সরযূ, উষা—এরাও ছিল।

৬ জুন তারিখের আরো একটি সংবাদ যে সংবাদটি নাটক বা চলচ্চিত্রের নয়। সংবাদটি নিতান্ত ঘরোয়া—ঐ তারিখেই ভানুর ম্যাট্রিক পরীক্ষার খবর বেরোলো। চারটি সাবজেক্টে লেটার পেয়ে ভানু ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। ভানুর খবর পেয়েই যারপরনাই আনন্দ পেয়েছিলাম। সেদিনে বাড়িতে তো রীতিমতো উৎসবের সমারোহ। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার এক উকিল বন্ধু, যে নাকি আগে-ভাগে পরীক্ষার ফল জানতে পারতো, তাকে ভানুর রোল নম্বর দিয়েছিলাম। প্রথমটা আজ না কাল করে শেষটা খবর জানিয়েছিল। বলেছিল, ভানু সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে। এই খবরটা আমি শিলং পাঠিয়েছিলাম। ফল হয়েছিল, ভানু খবর পেয়ে মন মরা হয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে সে নাকি ভালো করে কথা বলতো না, বেড়াতো না—দিনরাত বসে থাকতো।

ফল প্রকাশিত হতে বুঝলাম, কেন সে মনমরা হয়ে থাকতো।

যাইহোক, খবরটা কর্তব্য হিসাবে উকিলবাবুটিকেও জানিয়ে দিয়েছিলাম।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৭ জুন। পি ডব্লু ডির ১৩০তম অভিনয় রজনী। ঐদিন আমি মিঃ সেনের ভূমিকায় অভিনয় করলাম। কেমন হয়েছিল জানি না, তবে আমার অভিনয় দর্শকদের মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল। দুর্গাদাসের অভিনয় আমি দেখেছি, আমি নিজস্ব রীতিতে চরিত্রটিকে রূপ দিয়েছিলাম।

এরপর আবার সেই একই দিনের পুনরাবৃত্তি। কখনো, পি ডব্লু ডি, কখনো রিহার্সালের অভিনয়। নতুন কিছু নেই।

১৯ জুন তারিখে একটা চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হলো, অভিনেতা জ্যোতিপ্রকাশ বিয়ে করেছে শীলা হালদারকে। জ্যোতিপ্রকাশ অল্পদিনেই যথেষ্ট নাম করেছিল। নিউ থিয়েটার্সের ডাক্তার ছবিতে তার অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো। ঐ ছবিতে আমি তার দাদুর ভূমিকায় ছিলাম। এ ছাড়া রাজনর্তকীতেও জ্যোতিপ্রকাশ সুন্দর অভিনয় করেছিল। তার মতো অভিনেতা যে শীলা হালদারকে বিয়ে করবে, এটা ধারণার বাইরে। শীলা ছিল নর্তকী। কখনো কখনো অভিনয় যে করতো না তা নয়।

অপ্রত্যাশিত হলেও সেদিনের খবর ছিল তাই।

কলকাতা শহরে তখনো ব্ল্যাক আউট চলছে। সন্ধ্যের পর থেকে মহানগরী এক-রকম অন্ধকারে ঢাকা থাকে। অনেকদিন থেকে এই অবস্থা চলছিল, কিন্তু এবার কলকাতার থিয়েটারগুলোর প্রদর্শনীর সময় পরিবর্তন করা হলো। বেলা একটায় ম্যাটিনী শো, আর শেষ প্রদর্শনীর শুরু হবে বেলা পাঁচটায়।

এতো যে নাটক অভিনয় হচ্ছে, তার মধ্যে শাজাহান কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। যখন শাজাহান অভিনীত হচ্ছে, তখনই দর্শকরা সেই আগের মতো আকর্ষণেই ছুটে আসছে।

এরই মধ্যে দুটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করলো। বড়ুয়া-সরযূ অভিনীত 'মায়ের প্রাণ' মুক্তিলাভ করলো উত্তরায়। ছবির পরিচালক ছিলেন বড়ুয়া সাহেব। আর সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'প্রতিশোধ' মুক্তি পেল রূপবাণী চিত্রগৃহে।

(ক্রমশঃ)

হেমন্তের শস্যভূমি

অশোক কুমার সেনগুপ্ত

এখন বন-পায়রারা হাতের তালির শব্দকে ভয় করে না। মুখে হা-হা রে-রে শব্দকে পর্যন্ত না। মাটির বিছানায় দেহ লুটিয়ে দেওয়া ধানের আঁটির উপর বসে ঘুঘুর ডানা গুটিয়ে অবিরত ঠোঁট ঠুকে চলে। শরীরটা নড়ে। মুখে কোন শব্দ না। শালিখ কিংবা চড়ুই দোয়েল ফিঙে টুন-টুনি কিংবা হলুদ, সবুজ নীল, লাল ক্ষুদে পাখির পাল কিন্তু শব্দ করে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে, একবার এখানে একবার সেখানে। যেন হেমন্তের এই অবাধ শস্য-ভাণ্ডারের মালিকানা নিয়ে তারা বড় বেশী ব্যস্ত, উজ্জ্বল। আশেপাশের মহুয়ার ডালে টিয়া ট্যাঁ-ট্যাঁ করে এবং জলাভূমির উদ্দেশে ডানা ভাসান শুভ্র বক সাড়া দিয়ে যায়। দূরে দূরে গরুর পাল নতুন ঘর এবং ধানের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়। এবং মানুষের অলক্ষ্যে ইঁদুরেরা ঘর বাঁধে আলে, সঞ্চয় করে। পিঁপড়েরা শস্যকণা নিয়ে সারি দেয়। গরুর গাড়ী আল ভেঙে ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ক'রে ধানের রাশি নিয়ে চলে। আর হেমন্তের শস্যভূমি আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন উদাস উদার হয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেলে। এবং চতুর্দিকে সমগ্র প্রাণীকুলের এই উন্মত্ত আহরণের পালার গান দিবস-রজনী জুড়ে নীরবে কান পেতে শুনে যায়।

কাস্তেখানা পাশে রেখে আলের উপর বসে হুঁকো টানতে টানতে বুড়ো প্রাচীন দেহখানা নাড়িয়ে বলে, খাক খাক কেনে গো। ই বাবা পাখে আর কত খাবেক। আঁ যতুই খাক্ না কেনে আউর ঠিক হবেক।

আহা চাষ তো ইবার লেগে লয়গো। উ সব অবলা জীবেরও যে বটেক।

সোনা হেঁট হয়ে ধান কাটতে কাটতে থমকায়। সোজা হয়। কোমরটা সোজা করায় কেমন যেন স্বস্তি। হাতটাও রেহাই পায়। দেহখানা টান-টান করে আড়মোড়া ভাঙ্গার মত তৃপ্তি। গায়ে আঁটসাঁট করে বাঁধা নীল পাড় কাপড়খানা। নতুন। রঙ এখনও টকটকে। বলে, বলি অ ভালমানুষ, বলে ত দিলে কথাটি কিন্তুক একটুস ভেবেছ ম্যাঘ-বাদলার কথা। ছপ-ছপ জল, দড়ে সাপ-খুপ, কাদা পায়ে হাতে, খানিকটা মুখে ঢোকে। তখন—তখন কুথা থাকে গো তুমার উরা?

বুড়ো ভুড়ুক-ভুড়ুক হুঁকো টানে। চোপসান কালো কাঁচাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়িভর্তি মুখখানায় ফিকে হাসি ঠোকরায়। অল্পক্ষণ চুপ করে থাকে। মুখ থেকে হুঁকো সরায়। হাসিখানা তখন গাল থেকে কালো ঠোঁট, ছোপপড়া দাঁত, মোটা জিভ বেয়ে গড়ায়। বলে, লা, সিউড়ীতে থেকে তুর জ্ঞানগম্যি ঢেক ঢেক হুন-ছেক খুনা। কথাটতু মিছে বলিস নাই। কিন্তুক ইটিই তো লিরম্বরে। রাজ্যময় ই লিয়ম চলছেক।

সোনা ততক্ষণে হেঁট হয়ে আবার ধান কাটায় মন দিয়েছে। বুড়োর কথা পর্যন্ত কান বরাবর তার পৌঁছয় না যেন। অথবা সোনা স্পষ্টতঃই বোঝে রাজ্যময় ওই নিয়মের কথা। হেমন্তের শস্যভূমি উজাড় করে নেবার মত অগণন প্রাণী আছে, কিন্তু অসময়ে ঘোর বর্ষায়, কাদা ছপছপ, সাপখোপ, রোদ, ঝড়ে পাশে কেউ নেই, কেউ থাকে না। কিংবা কে জানে সোনা বোধকরি ওসব ভাবে না। কথার পিঠে কথা বলাতেই তার স্বস্তি। আসলে সোনার সহ্যের সীমাটা যেন বড় ছোট হয়ে গিয়েছে। হাত বাড়ান যায় না, পা বাড়ান যায় না, সেই সীমায় শরীরটার আড়মোড়া ভাঙ্গা পর্যন্ত না। ঠিক দেওয়ালে ধাক্কা লাগে। আর ধাক্কা লাগলেই জ্বালা। একটু ঘষা খেলেই তিরতিরিয়ে মস্তিষ্কের কোষে কোষে বাসা বাঁধে। তখন মুখ ফসফস। কথার যোগ্য উত্তর ঠোঁটের ডগায়। সন্দেহ নেই সিউড়ী থেকে ফেরার পরই এমন হয়েছে তার। যেন দুটি বছর সিউড়ী নামের মফস্বল শহরটা, যেখানে গোনাগুনতি বাস, ট্যাক্সি একটা সিনেমা হল এবং দালান-কোঠা, ছোটবাজার নিয়ে এ অঞ্চলটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সে যেন সোনার মনের ভেতর একরাশ বিদ্যেবুদ্ধির খড়খড়ে কথাকে উজাড় করে দিয়েছে। বোকা ভীরু মেয়েটার খোলস ছাড়িয়ে আলাদা একটা খোলস পরিয়ে বলেছে, সোনা, যা এবার তোর গাঁয়ে যা। হেমিপিসী পানখাওয়া লাল মুখের ঠোঁটখানা বেঁকিয়ে বলেছে, বলি মরণ আমার, তা এলি কেনে লো ইখানে আবার। আঁ সুখের লেগে? ছাই। ছাই। কুছু পাবি না হেথা। তু সিউড়ীতে থাক গা যা। তা হ্যাঁলো টকি ছিনেমা লো, ছিনেমা ক'দিন গেইছিলি? বাজা সোন্দর বটেক কিন্তুক। মানিকমেসো বলেছে, বলি আসাট হল কথুন? আমরা ভাবলম তু সুখ ছেড়ে আর আসবি নাই। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে এককালের প্রাণের বন্ধু মেনী বলেছে, বলি হ্যাটে এলি কেনে আবার গাঁয়ে। আমি কিন্তুক একবার গেলে আর আসব নাই ইখানে। সোনা স্পষ্টতঃই টের পেয়েছে শহর ছেড়ে আবার গাঁয়ে ফিরে আসায় সকলেই বিস্মিত। যেন এক ঐশ্বর্যময় সুখশান্তির জগতকে হেলায় হারিয়ে সে এখানে এসেছে। কিন্তু সোনা তো জানে—সোনা তো পাক্কা দুটো বছর সিউড়ী রায়বাবুদের ঘরে থেকে টের পেয়েছে আসলে সবই সমান। প্রথমে রায়-বাবুদের ডাক তার কাছেও সুখের শিহরণ এনে দিয়েছিল সত্যি কথা। স্বামী হারিয়ে বাপ-মা হারিয়ে নিঃসঙ্গ একক জীবনে কাকার ঘরে বসবাসের সেই সময়টা তো তার কাছে আদপেই সুখের ছিল না। সুতরাং বাইরের একবার হাতছানিতেই সে পা বাড়িয়েছিল। আসলে চেনাজানা জায়গা থেকে সোনা এক অপরিচিত জগতে যেতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, নিজেকে বাঁচাতেই। অন্ততঃ সোনার তখন নিজেকে বাঁচানই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খাওয়াপরার অভাব ছিল না। গায়ে শক্তিসামর্থ্য থাকতে খাওয়াপরার অভাব কি! গতর খাটালেই ভাত। কাকার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হত না। কিন্তু শুধু তো খাওয়াপরা নয়, সোনার ভাবনা ছিল অন্যদিকে। তার নিজেকে নিয়ে। নিজের যৌবন শরীর নিয়ে। যে শরীরে বর্ষার কূলউপচান নদীর জলের মত অথৈ যৌবন। কালো দীঘল দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরুষহরিণ আকর্ষণের দুর্নিবার অস্ত্র। কমনীয় মুখে, ঠোঁটে, চিবুকে, বাহুতে আশ্চর্য মাদকতা। যাকে ঘিরে তখন অসংখ্য পতঙ্গ। তখনও বুকের ভিতর স্বামী-সোহাগের চিহ্ন আঁক, রাতে বিছানায় সেই পুরুষের কন্ঠস্বর। মাত্র একটা বছর, একটা বছর বিয়ে, দুরন্ত সেই পুরুষের সঙ্গে এক বছরের ঘর। তারপর এক ভয়ঙ্কর অসুখ মানুষটাকে ছিনিয়ে নিল তার কাছ থেকে। চতুর্দিক শূন্য করে অন্ধকার আর হাহাকারে ভরিয়ে তুলল। মাস ছয়েকের ভিতর একসঙ্গে বাবা আর মা। সোনাকে এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে একলা রেখে যেন স্বামী পিতামাতা সরে গেল, শাস্তি দিতে। হ্যাঁ, সোনা তখন জানত শাস্তি। শাস্তি। জানত এ তারই পাপ। কিন্তু কেমন পাপ? কি পাপ? হ্যাঁ, সোনা তাও জানত। জানত অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ তার খাতায় সোনা নামের পাশে ঠিক লিখে রেখে দিয়েছিল সোনা তার গাঁয়ের পুরুষ রাম বাগদীর পিরিতে মজেছে। বিয়ের পরও বাঁশবাগানের ধারে এক অন্ধকার সন্ধ্যায় সে রাম বাগদীর বুকের উপর......। এবং জানত বলেই সোনা ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিল। বিধাতার আর কোন শাস্তি তার মাথার উপর নামবে? কোন শাস্তি? সোনা কি সহ্য করতে পারবে? না, না, রাতে কাকার ঘরে বিছানায় তার ঘুম আসত না। ছোট্ট জানালার সামনে সে দাঁড়াত। শেয়ালের হাঁক শোনা যেত তখন। আকাশে নক্ষত্র ফুটত। কখনও রাত-চোরা পাখির ডাক। গাঁয়ের পথের কুকুরও সাড়া দিত। চারিদিক গভীর ঘুমে ডুবে। সোনা তখন কাঁদত। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে বাঁচানর চেষ্টা করতে করতে সে থরথর করে কাঁপত, হেই ঠাকুর, হেই ভগমান, যখুন আমার পাপ বটেক তখুন আমাকে কেনে লিলে না ঠাকুর? কেনে লিলে না? অন্ধকার তারাজ্বলা রাত সাড়া দিত না।

ঈশ্বর কিংবা অন্ধকার তারাজ্বলা রাত সাড়া না দিলেও সাড়া দিয়েছিল রাম। রাম বাগদী। পাটাল বুক। কালো লম্বাচওড়া চেহারা, বুকে চুল, লাঙ্গলের বোঁটা ধরে সারাদিন চষে ক্লান্ত হয় না শরীর। পনের বিঘে জমি চাষ করে। বুক টানটান করে বলেছিল, কুনু ডর নাই তুর সুনা, আমি তুকে বিয়া করব। সাঙ্গা হবেক আমাদের। সোনা শোনেনি। দু'কানে আঙ্গুল চাপা দিয়েছিল। লোভ। যৌবনের লোভ। যৌবন বড় ভয়ংকর। বড় তার জ্বালা। পাপ বড় ভয়ঙ্কর। বড় কঠিন তার শাস্তি। নইলে ছট-ফট করে অমন জোয়ান মানুষটা শেষ হয়ে যায়। যার হাতে ধরা পড়ে ফাঁদে পাখির মত অবস্থা হত তার শরীরের তার যৌবনের সেই মানুষ অমন করে বিছানায় ফ্যাকাশে শক্তিহীন অসহায় হয়ে যায়। এবং তখন সোনা স্পষ্টতঃই অনুভব করেছিল তার লোভ তার যৌবনের লোভ। অনুভব করেছিল রামের বড় বড় দু'টো চোখের মধ্যেকার গোল তারায় যে উল্লাস ছটফট করছে তা ভালবাসা নয় তার অসময়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে শান্তি নয় সান্ত্বনা নয়, লোভ—তার যৌবনদেহের উপর মানুষটার নিদারুণ লোভ আঁকা হয়ে আছে। কেমন যেন কুঁকড়ে গিয়েছিল তার দেহ। নিজের ভেতর নিজেকে ঢেকে রাখার শামুকের মত আপ্রাণ প্রয়াসে সে ঘেমে উঠেছিল।

শুধু রাম নয় আরও অনেকগুলো আগ্রহী হাত তার দিকে এগিয়ে আসছিল। এ গাঁয়ের নয় ভিনগাঁয়ের। হরেন, গুরুচরণ,

ঘুমেয়ে কেন্দে আরও কে কে যেন। কাকাও তাই ফেরেনিক। সোনা বলেছিল, মা কাকা গাঙ্গা আমি কয়ব নাই। আমার লেগে ভাবতে হবেক নাই। কাকা নয় তখন সকলেই চিন্তিত হয়েছিল। সোনার অবশ্য ওদের বিস্ময়কে আমল দেবার অবসর ছিল না। তার চোখে তখন পাপ—পাপের শাস্তি। তার চোখে তখন যৌবন—যৌবন ঢাকার আপ্রাণ ব্যর্থ প্রয়াস। তার চোখে তখন কোন অপরিচিত জায়গায় নিজেকে ফেলার আকুল বাসনা। এবং তখনই রায়বাবুদের ছোটগিন্নী বলেছিল, ও সুনো চল বাবু আমার সংগে সিউড়ী চল। বাসনকোসন ধুবি, ফাই-ফরমাস খাটবি।

সিউড়ী তাকে সুখ না দিলেও স্বস্তি দিয়েছিল। প্রথম প্রথম অচেনা জায়গা অচেনা মানুষ বাঁধান রাস্তা, ঘেঁষাঘেঁষি ঘরবাড়ী, বৈদ্যুতিক আলো, দোকানপাট, সাইকেল রিকসার ভোঁ ভোঁ, বাস মোটরগাড়ীর শব্দ এবং মেলার মত মানুষের ভিড় তাকে শিশুর খেলনা পাওয়ার মত সব ভুলিয়ে রেখেছিল। তারপরও সেসব গাসওয়া হয়ে যেতেও কোন দুঃখ বোধ মনে আসেনি। এল যখন সে বিছানায় পড়ল অসুস্থ হয়ে। গা পুড়ে যেতে থাকল। ডাক্তারবাবু এলেন। ওষুধের শিশি এল। এবং তখন তার চোখে পৃথিবী আবার এক নতুন রূপে ধরা দিল। চতুর্দিক কি ভীষণ শূন্য। একটা সান্ত্বনার হাত নেই। কপালের উপর কোন উদ্বিগ্ন শ্বাস পড়ে না। অসুখ বাড়ল। কিন্তু ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার শরীর থেকে অনেককিছু। যাকে নিয়ে বড় ভয় ছিল তার সেই ঐশ্বর্য। যেন অসুখ এসে তাকে সবকিছু থেকে মুক্তি দিল। নিজের ভেতরে নিজেরই গড়া যে ভয়ংকর বন্ধন সে বন্ধন আলগা করে দিল। কিন্তু তাতে কি পরিতৃপ্তির শ্বাস পড়ল সোনার? তাতে কি বুকের ভিতর সুখের হিল্লোল বইল? তাতে কি ভয়ভাবনাহীন এক নতুন জীবনের স্বাদে মন তার ভরে উঠল? না, বরঞ্চ হল একেবারে বিপরীত। পাপ নয় ভয় নয় শাস্তির চিন্তা নয় সোনা এক আশ্চর্য শূন্যজগতে সাঁতারজানা নেই এমন মানুষের জলে পড়ার মত হাত ছুঁড়ে পা ছুঁড়ে কি যেন আঁকড়ে ধরতে চাইল। এক-দিন বলল, মা আমি আর ইখানে থাকব নাই। গাঁয়ে ঘুরে যাব।

এখন মরা বিষণ্ণতার ভরা হেমন্তের শেষ বিকেল। দুপুর কখন যেন নিঃসাড়ে তার আঁচল গুটিয়ে নিয়েছে। ডিমের কুসুমের মত ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত রোদ। পশ্চিমের দিগন্তরেখা বরাবর বিশাল লাল সূর্য। মাথার উপরে তার মেঘে বিচিত্র বর্ণের ছড়াছড়ি। এসময় হাজারো পাখির ঝাঁক শস্যক্ষেত্র ছেড়ে নীড়ে ফেরার উদ্যোগী। তাদের কোলাহলে চতুর্দিকে পূর্ণ। দিনান্তে খালের জলে ঠোঁট ডুবিয়ে পাল পাল কাক।

গরুর গাড়ীতে শস্যভূমি শূন্য করে ঘরের পথে মানুষজনও। বাতাস শীতের বার্তা ফিসফিস করে শোনাতে থাকে তারি মধ্যেই। এবং এ সময় সোনা বুকের হাতে কাস্তে-খানা নিয়ে চৌধুরীপুকুরের পাড়ের নীচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ পথেই সোনা জানে রাম হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে মদের দোকানের দিকে যাবে।

—শুনছ গো!

রামকে দেখে সোনার গলা দিয়ে কেমন শব্দ বের হয়। ইতিমধ্যে দিগন্তরেখায় একাকার বিশাল সূর্য। পাখিদের কলরবে অবশ্যই চতুর্দিক আপ্লুত। গান গাইতে গাইতে কার যেন পথ হাঁটার শব্দ ও বাতাস শীতের সংগে মাখামাখি করে দুকানে ভরে দেয়। আর সোনা ক্লান্ত নির্জীব। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পায়ের পাতা ভারী। শীত লাগে শরীরে। একটু উষ্ণতার স্বাদের জন্যে প্রাণ আকুল হয়। অবশ্য রামকে দেখার পর সে টের পায় ভেতরটা তার হিম হয়ে যায়নি। টের পায় কি যেন পাওয়ার বাসনা মুঠো মুঠো আগুন তার চতুর্দিকে ছড়াচ্ছে। রক্তের মধ্যেও গভীর প্রত্যাশার সুর রিনরিন করে বাজতে থাকে।

—অয় তুমি! রাম থমকায়। চোখ বড়বড় হয়। তারপর বলে, তা তুমি এলেছ সিটি শুউনছিগো আমি। তুমার নাকি খুবি অসুখ হুনছিল!

বুকের ভেতর একটা ব্যথার ঢেউ, হয়ত বা অভিমান ছলাৎ করে ওঠে। সোনা ঘাড় নাড়ে খুব আস্তে। বলার সাধ হয় তিনদিন আসাহুম গেল আমার, কিন্তুক তুমার কি একটুস্‌ সময় হল না আমার লেগে! কিন্তু বলল না সে কথা সোনা। চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। কত কি যেন ভেবেছিল, কত কি যেন বলবে সে, কিন্তু কিছুই মুখ দিয়ে বের হয় না। চারপাশ নির্জন। অন্ধকার নামছে। রক্ত শুধু তার এক গভীর প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে।

—কুথা চললে? মানুষটাকে চুপ করে থাকতে দেখে সোনা জিজ্ঞাসা করে।

—মদদোকান।

—অ।

আর কোন কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা তার অন্ধকার আঁচল বিছিয়ে দিচ্ছে চতুর্দিক জুড়ে। চৌধুরীপুকুরের পাশে এ পাশটায় অগণন শস্যক্ষেত। কিন্তু এখন সব শূন্য। ধান কেটে খামারে তুলেছে মানুষ। খাঁ খাঁ করছে সব এই সন্ধ্যায়। আর শব্দও যেন ফুরিয়ে আসছে। সারাদিন বাতাস মুখর করে থাকা অজস্র শব্দ এখন যেন ঘুমের রাজ্যে চলে যেতে চায়।

দেহের প্রতিটি রেখায় সমর্পণের ভঙ্গীমায় সোনা দাঁড়িয়ে থাকে? মুখে কোন কথা জোগায় না তার। অথবা সে মুখে আর এখন কোন কথা আনতে চায় না। আনাতেই দরকার কি। মানুষটা তার

খোঁজখবর নিতে পারেনি ব্যস্ততার জন্যে, সত্যি কথা, হ্যাঁ তাই সোনা তো নিজে এসেছে। আর এখন কোন কথাও নয়। সোনা এখন আশ্রয় চায়। ওই পাটাতন বুকের মধ্যে ওই পুরুষশরীরের ভীষণতম শক্তির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে চায়। সেদিনও তো হারিয়ে দিয়েছিল। কোন কথা নয়। বাঁশঝাড়ে সন্ধ্যায় পাখিরা ডানায় শব্দ তুলছিল। ঝটপট ঝটপট, মুখে খিস্তি খই ফোটার আওয়াজ তাদের। আর তখন মানুষটা তাকে দু হাতে বুকের মধ্যে...। আঃ সোনা যেন দাঁড়াতে পারে না। প্রতীক্ষায় রক্ত যেন ভয়ঙ্কর চঞ্চল হয়ে ওঠে। হিম সন্ধ্যায় বাতাস দেহের কোষে কোষে শীত ঢালে, তবু রক্ত কি ভীষণ উষ্ণ। যেন ফুটছে। শরীরের ভিতর প্রত্যাশার কি নিদারুণ আলোড়ন।

রাম একবার কাশে। তারপর বলে, তা দেহিট তুমার বাড়া খারাপ হুন-গেইছে।

—হুঁ। মুখে শব্দ করে সোনা।

—তুমাকে পেথমে আমি চিনতে লেরেছি। লাকপুখোরের ঘাটে সিদিন ছিলে, আমি তখুন পেরিয়ে যেছিলাম। বিশ্বেস হছিল না তুমি বটে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাম। তারপর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সোনা কথা বলে না।

একটু চুপ করে থেকে রাম বলে, তা তুমি ভালই করেছ গো, গাঁয়ে এসেছ। উ সব সিউড়ী-মিউড়ী আমাদের পুষাবেক কেনে। আমরা গাঁয়ের মানুষ।

সোনা কি রামের কথার মধ্যে থেকে কিছু অনুভব করতে পারে? সেই দিন সেই রাম সেই সোনা সব কি এখনও অটুট? রাম কি তখন এই গলায় কথা বলত? রাম কি তখন গাঁয়ের আর পাঁচটা মানুষের মত ছিল? সোনা—সোনা তো ওই কথার ভিড়ে একটুকরো সম্পদও কুড়িয়ে পাচ্ছে না। যাকে নিয়ে সে আরও উষ্ণ হয়। যাকে সে ফুটন্ত প্রত্যাশার রক্তের ভিতর ফেলে দিতে পারে। বড় জ্বালা তার। সাঁতার না-জানা মানুষের জলে পড়ার মত এক ভয়ঙ্করতম রাজ্যে সে হাত ছুঁড়ছে পা ছুঁড়ছে। দেহখানাকে অতলে তলিয়ে যেতে না দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় অবিরত সংগ্রাম করে চলেছে। পাপ নয় অতীতের চিন্তা নয় আগামীকালের শাস্তির ভয় নয়, সে এখন বাঁচতে চায়। সারা দেহ জুড়ে তার সমর্পণের আকুল মিনতি। রাম—রাম এখনও কেন স্থির। এখনও কেন এগিয়ে আসছে না তার দিকে। তারপর দুটি বলিষ্ঠ বাহুর গভীর বন্ধনে বেঁধে ফেলছে না তাকে। সোনা জানে তাতে তার শ্বাস বন্ধ

[illegible] যাবে। আর [illegible] কল্পনায় তার দেহ [illegible] থাকে। [illegible]...।

রাম [illegible] সোনার সাক্ষিমতায় কি [illegible]। [illegible], তা শাঁখারিপাড়ার [illegible]?

—[illegible] সোনা খিলখিল করে ওঠে।

—[illegible]। রামের গলা [illegible] বের হয়। সে কতকাল [illegible]। [illegible] চেষ্টা করে। মুখ দেখা যায় না, [illegible] না, একটা শরীরের আদল শুধু। এ সময় মাথার উপর চমক দিয়ে কি [illegible] শব্দ শোনা যায়।

—হাঁ। সোনা এক-পা সামনে এগিয়ে আসে।

—কেমনে?

—[illegible] শোভাবাজির মুখোমুখি [illegible] তার মাথায় আসেনি। তাই দাঁড়িয়ে পড়ে। এবং মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বের হয়ে যায়, কেমনে? কেমনে?

রাম অন্ধকারে গলায় বলে, হাঁ।

আমি আর পারছি নাই গো। [illegible] করতে পারছি নাই। তখন বাড়া ভুল করে ফেলেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি গো। তুমি আমারে ক্ষমা করে দাও। সোনা [illegible] দিতে থাকে।

তুমার কথা বুঝতে পারছি। রাম খুব [illegible] গলায় বলে।

—বুঝতে পারছ।

—হাঁ।

—সুজা কথাটি বুঝতে লারছ। সোনা বুকের ভিতর রক্তের ধমনীতে ভয়ঙ্কর উত্তাপের আন্দোলন নয়, টের পায় এক অসহ হিম-প্রবাহ কুলকুল করে বইতে শুরু করেছে।

—না। রাম আবার বলে।

—কিন্তুক সুজা কথাই ত বললম গো। বলছি ত আমার ভুল হুন গেইছে। তখুন তুমার কথা শুনি নাই আমি। আমারে ক্ষমা করে দাও গো। সোনা থরথর করে কাঁপে। বলে, আমি আর পারছি না। আমি ই গাঁয়ে আসি নাই গো, তুমার কাছে এসেছি।

রাম অন্ধকারে আবার দেখতে চেষ্টা করে রমণীশরীর। অন্ধকারে বড় অস্পষ্ট। একটা আকার মাত্র। মুখে কোন কথা জোগায় না তার। চুপ করে থাকে। চারি-দিকে অন্ধকার আরও ঘন হয়। দূরে মদের দোকানের চাতালে মাতালদের কলরব শোনা যায়। অদূরে গাঁয়ের কুকুর ডাক পাড়ে। রাম ভাঙাগলায় বলে, কিন্তুক পিতি আর হবার লয় গো। এতেককাল ভেবে-ছিলম—বিয়া করব নাই। এখন কিন্তুক মন ঠিক করি। পিতিকে সাংগা করব আমি।

—পিতি!

বুক ফেটে যেন সোনার শব্দ বের হয়। পিতি, বিধবা পিতি তার অচেনা নয়। শরীরে আঁটসাঁট যৌবন, শ্যামোজ্জ্বল গায়ের রঙ, কথায় কথায় মুখে হাসির ফোয়ারা বয়, দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরুষ আকর্ষণের রেখা-গুলো হাতছানি দেয়। পরাজিতা, সেখানে পরাজিতা সোনা। তার পাশে দাঁড়িয়ে সে রামের চোখের তারায় আঁকা লোভের দিকে একমুঠো হাসি ছুঁড়ে বলতে পারে না, দেখ দেখ গো, আমার পানে। অসুখ তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। শূন্য করে দিয়েছে তাকে। আর কেউ না, কেউ ভালবাসে না। কিন্তু বড় আশা ছিল রাম আবার নেবে। যে রাম পাটাল বুক টানটান করে কানের পাশে ফুলের গন্ধের মত একদিন, শূন্য বুকে নিয়ে ঘর বাঁধব আমি শুন্য, বলে তাকে জড়িয়ে তুলত। না সোনা স্পষ্টতই টের পায় তার সম্পদ তার ঐশ্বর্য সব উধাও এখন শূন্য এ তুমি।

সোনা বিড়বিড় করে, তুমি যাও গো। মদনকাল চলে যাও।

রাম স্তব্ধ দাঁড়ায়।

—যাও গো। সোনা যেন কেঁদে ফেলেছে।

রাম পায়ে পায়ে হাঁটে।

হেমন্তের শূন্য শস্যক্ষেত্রে সোনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার উপর নক্ষত্রেরা। নীচে অন্ধকার। অন্ধকারে জোনাকির ভিড়। চারিদিকে আশ্চর্য নির্জনতা। চারিদিকে অন্তহীন শূন্যতা। চারিদিকে সব ফুরানোর দীর্ঘশ্বাস। কেমন যেন শীত নামে। হেমন্ত ফুরানোর খবর বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে শোনায়। বুক কাঁপায়। স্পষ্টতই অন্ধকারেও যেন দেখা যায় শস্যক্ষেত্র এখন প্রাণশূন্য হয়ে আকাশের দিকে হাঁ মুখ করে আছে।

সোনা হিমকুয়াশায় হিমের শরীর হয়ে হেমন্তের শূন্য শস্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে। বালসার পাখি শস্যক্ষেত্রে শস্যকণা আহরণের জন্যে ঠোঁট ঠুকিয়ে মাটি শুধু মাটি টের পেয়ে, এখন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কোথায় যেন ডানায় কোন শব্দ না তুলে উড়ে যায়।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

কফি খেতে খেতেই পরাশর রতনলালের [illegible] কথা শোনে —
রতনলাল যখন এসেছিল তখন কোম্পানীর আর ওঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে!

কিসের মামলা? সেই ওষুধের ভেজালের? সে মামলাও টেকেনি। শিউপ্রসাদজিই মীমাংসা করলেন।

হ্যাঁ, কিন্তু রতনলাল তখনই বলেছিলেন মামলাটা শিউপ্রসাদজির সাজানো। লছমী দেবীকে সঙ্গে করে ...

রতনলাল হঠাৎ একদিন এসেছিলেন ...
আপনি যা যা চান তাই দেব, মিঃ বর্মা! শুধু শিউপ্রসাদজির ওপর কিছুদিন আপনাকে নজর রাখতে হবে!

মাপ করবেন রতনলালজি, এ কাজ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? কবে একবার শিউপ্রসাদজির একটা কাজ করে দিয়েছিলেন বলে? কিন্তু সেত চুকে বুকে গেছে। এখন আমি আপনাকে নতুন করে কাজ দিচ্ছি —

কাজ ত একজন অন্ধের ওপর গোয়েন্দাগিরি! কাজটাতেই আমার আপত্তি!

অন্ধ বলেই আপনার আপত্তি? কিন্তু চোখে যার আলো নেই দিলও তার নরকের মত অন্ধকার হতে পারে তা জানেন? জানেন, শুধু আমার সর্বনাশ করার জন্য এ জাল ওষুধের মামলা উনি নিজে গোপনে মিথ্যে করে সাজিয়েছেন!

তা সাজিয়ে ওঁর লাভ কী? মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে উনি নিজে আপনাকে কোম্পানীর ভার দিলেন!

হ্যাঁ, তা দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন পোষা ঘর জামাই হয়ে আমি ওঁর গোলামী করব এই আশায়। হইনি বলেই এ আক্রোশ। আর মেয়ে? লছমী কি রকম মেয়ে ওকেই জিজ্ঞাসা করুন!

অঙ্গনা

কামিনের জীবন

সারি সারি ধাওড়া। টালি-ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট ঘর। ওদের বাসস্থান। স্বামী-পুত্র এবং [illegible] সংসার নিয়ে ওরা এখানেই বাস করে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো কঠিন। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। বসা-শোয়া চলে কিন্তু দাঁড়ানো অসম্ভব।

এটাই রেওয়াজ। এভাবেই পুরুষ-পরম্পরায় ওরা কাজ করছে। কেউ এখান থেকে সরে যেতে পারছে না। সবাই থেকে যাচ্ছে। এমনি মোহ এই কাজের। অজগরের চোখ যেমন মানুষকে সম্মোহিত করে, তেমনি এখানকার অফুরন্ত কাজের আহ্বান। সহজ জীবিকার এমন দুরন্ত হাতছানিকে উপেক্ষা করা খুবই অসহজ। ওরা ভুলে এসে জড়িয়ে পড়ে। আর ছাড়াতে পারে না।

সেই কোন ভোরে কলের ভোঁ বাজতেই ওরা বেরিয়ে পড়ে। রাতে তৈরি করা বাসি রুটি আর চা দিয়ে নাস্তা করে। আবার কেউ কেউ আরো ভোরে অর্থাৎ অন্ধকার ফিকে না হতেই ওঠে উনুনে হাঁড়ি বসিয়ে দেয়। ফুটিয়ে নেয় ভাত-ডাল। ভাত-ডাল হতে হতে খাওয়ার অবসর আর বেশি থাকে না। কোনক্রমে নাকেমুখে দুটো গুঁজে বেরিয়ে পড়ে। হাজিরায় লেট হলে দিনের কাজ বরবাদ। ওদের তো কাজের উপরই পয়সা।

ওরা কোলিয়ারি-কামিন। এভাবেই কাটে ওদের জীবন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বারো মাস। জীবন ওদের কাছে যন্ত্রের সামিল। স্বাভাবিক জীবনবোধ ওরা অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছে। কোলিয়ারি কামিনের খাতায় নাম ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

খাদে যাওয়া ওদের আইনে আটকায়। খাদের নিরেট অন্ধকারে জীবনের আদিমতা কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে। তাই এই নিষেধাজ্ঞা। খাদে কাজ করে ওদেরই পুরুষরা। তারা কয়লা কাটে। ট্রলি ভর্তি করে ওপরে চালান পাঠায়। তারপর শুরু হয় কামিনদের কাজ। পাথুরে কয়লা রূপান্তরিত হয়। ওরা সেই কয়লা ঝুড়ি বোঝাই করে তুলে দেয় অপেক্ষামান ওয়াগনে অথবা লরিতে।

প্রচণ্ড শীতে ওরা হু-হু করে কাঁপে। শীত নিবারণের উপকরণও কোনমতেই যথেষ্ট নয়। আর এই কাজ তো গায়ে প্রচুর জামাকাপড় চাপিয়ে করা সম্ভব নয়। কয়লা পোড়ানোর আঁচে ওরা নিজেদের উত্তপ্ত করে নেয়। আর আছে কাজের তাড়া। শীতের কথা ওরা ভাববার অবসর পায় না। সর্দার তাড়া লাগায়। ওরা দলবেঁধে কাজ করে। এতেই ওরা শীতকে ভুলে যায়।

যেমন শীত তেমনি গরম। দুই-ই একেবারে চরম। শীতে তবু সামলানো যায়। কাজের চাপ থাকে। আর আছে কয়লা পোড়ানোর আঁচ। কিন্তু গ্রীষ্মে তাই হয়ে ওঠে অভিশাপ। প্রচণ্ড লু চলে। গায়ে জ্বালা ধরে। মুখ ঝলসে যায়। চামড়া পুড়ে যায়। ওদের রুটিনওয়ার্কে তা বলে কিন্তু কোন ফাঁক নেই। তেমনি নেই ফাঁকিরও কোন সুযোগ। এরই মধ্যে কাজ করতে হয়। পেটের তাড়া যে সবচেয়ে বড়ো তাড়া। কাজে ফাঁক দিলে পেট উপোসী থাকবে।

তাই শীত যেমন ওরা উপেক্ষা করে তেমনি গ্রীষ্মকে ওরা বেপাত্তা করে ছাড়ে। তেতেপুড়ে কাজ করে ওরা। ওয়াগন ভর্তি করে আর লরি বোঝাই করে। লু লাগে। চিকিৎসার বন্দোবস্ত অবশ্য আছে। কিন্তু বেঘোরে প্রাণ হারানোর নজীরও কম নেই।

তারপর আসে বর্ষা। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়। কোলিয়ারি আইনে কোন কোন কোলিয়ারি এসময় বন্ধ থাকে। বর্ষার জল সে সময় খাদে প্লাবন আনে। শ্রমিকের জীবন বিপন্ন। খাদে কাজ বন্ধ। ওদেরও রুজি-রোজগার নেই। নামমাত্র হয়তো কোম্পানীর কাছ থেকে কিছু পায়। সে সময় ওরা অন্য কাজের চেষ্টা দেখে। আর যেসব খাদে কয়লা কাটা চলে সেখানে ওরা বৃষ্টির ভিজতে ভিজতেই কাজ করে। অসুখ-বিসুখের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে। জীবনকে হাতে নিয়ে ওরা জুয়া খেলে যায়। হারজিতের প্রশ্ন ওঠে না। পেট ভরানো আর জীবনধারণই সেখানে বড়ো হয়ে ওঠে।

খাদে যারা কাজ করে সেই ওদের পুরুষদের তবু কাজের সুবিধা অনেক। শীত-গ্রীষ্ম ওদের ততখানি কাবু করতে পারে না। কারণ, ওরা থাকে খাদে। সেখানকার তাপমাত্রায় শীত-গ্রীষ্মের কোন হেরফের বিশেষ হয় না। বরং খাদ থেকে বেরিয়ে এলেই ওদের অসুবিধা। তখনই শীত ওদের জাপটে ধরে, গ্রীষ্ম উষ্ণশ্বাসে ওদের কাবু করার চেষ্টা করে।

অবশ্য জীবনের ভয় ওদের অনেকখানি। নানারকম গ্যাসের হাত থেকে ওরা নিস্তার পায় না অনেক সময়। তারপর কতরকম দুর্ঘটনা তো আছেই। সে তুলনায় কামিনদের জীবনে দুর্ঘটনা কম। তবু ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কারণ খাদে কাজ করছে ওদেরই পুরুষরা। তাদের জীবন যদি সংশয় হয়, তবে ওদের জীবনেও নেমে আসে হাহাকার। প্রচণ্ড [illegible] বেদনায় ওরা গুমরে ওঠে।

ইদানীং তবু কাজকর্মের সুবিধা হয়েছে। ঠিক ঠিক কাজ অনুযায়ী পয়সা পাওয়া যায়। গোলমাল যে কিছু না হয় এমন নয়। আগে এই সুবিধা ছিল না। আর ওদের বিবেচনায় এটাই হলো সবচেয়ে বড়ো সুযোগ। সত্যিই তাই, কাজ করতে এসে যদি কাজের মজুরি না পাওয়া যায়, তবে দুঃখের অবধি থাকে না। কামিনরা আশ্বস্ত, এখন আর সে অন্যায় হয় না। সরকারী আইনকানুন আর শ্রমিক সংগঠন ওদের অনেকখানি নিশ্চিন্ত করেছে।

এবেলা-ওবেলা কাজ ওদের নয়। সারাদিন কাজ চলে। এরই মধ্যে একটু জিরিয়ে নেয়। সকলে একসঙ্গে বসে। দুদণ্ড কথা বলে। হাসি-গল্পের ফোয়ারা ছোটে। গল্প করে ওরা বুড়ো সর্দারকে নিয়ে। আবার কোন ছোকরা বাবু কাকে বেশি অনুগ্রহ করে, সে নিয়েও ওদের হাসি-ঠাট্টার অন্ত থাকে না। কোলিয়ারি কামিনের জীবনে এও একটা দিক। সেখানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আজও বাসা বেঁধে আছে।

এরই মধ্যে কত সুখ-দুঃখের কথা হয়। ওরা নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে কেমন আনমনা হয়ে পড়ে। মনে পড়ে, বাড়ীতে রেখে আসা সেই ছোট্ট ছেলেটার কথা। ভোঁ বাজতেই যে মাকে জড়িয়ে ধরে। কিছুতেই আজকে সে তার মাকে কাছছাড়া করবে না। এমনি বায়না তার নিত্য তিরিশ দিন। মায়ের উপায় নেই। তারও মাঝে মাঝে মনে হয় কাজকম্মো ছেড়ে ছেলে নিয়ে ঘরে বসে থাকতে। কিন্তু উপায় নেই। সবাই যখন একে একে বেরিয়ে পড়ে। তখন সে আর থাকতে পারে না। ছেলেকে জোর করে কোল থেকে নামিয়ে ছুট দেয়। পিছনে ভাসে ছেলের কান্নাবিকৃত কণ্ঠস্বর। এমনি আলাপ-আলোচনার মুহূর্তে তার অন্তরের সেই বেদনার একতারাটা রিনরিনিয়ে ওঠে। সে হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে যায়।

তাই ওরা চায় ছেলেকে রাখবার জন্য বেবী ক্রেশ হোক। কামিনরা তাহলে ছেলের সম্বন্ধে শংকাহীন হয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে দেখেও আসতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ অনেক কোলিয়ারিতেই নেই। অথচ এই সুবিধের দাবী জানিয়ে আসছে ওরা দীর্ঘদিন। যাদের বাড়িতে বুড়ি আছে

তাদের তবু আশংকার কিছু থাকে না। কিন্তু যাদের এই সুযোগ-সুবিধা নেই। তারা অপরের ভরসায় নিজের ছেলে গচ্ছিত রেখে আসে। ছেলের জন্য মনটা তাই সব সময়ই কেমন করে।

এই ভাবনা আজ সকলের। শহুরে আফিসের কর্মী মায়েদের যেমনি ওদেরও তেমনি। অথচ কারো সমস্যারই কোন সুরাহা হচ্ছে না। সকলেই পেটের ধাঁধায় অস্থির। কাজটাই যা তফাৎ। এই কাজের তফাতেই ওরা কামিন আর আমরা কেরানী। কিন্তু স্বামী-পুত্রের ভাবনায় আমরা অভিন্ন।

সপ্তাহে একদিন ওদের ছুটি। বাদ-বাকি দিন একটানা কাজ। সপ্তাহের কাজের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে পাওনাগণ্ডার মিট-মাট হয় সপ্তাহান্তে। টাকা হাতে এলেই দেনাশোধের পালা। আর যেটুকু বাকি থাকে পরদিনের দোলতে সেটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায় সপ্তাহে একদিন মৌজ করার আনন্দে। তারপর আবার ঋণ। চড়া সুদে রোজগারের টাকা শেষ। এমনিভাবে পুরুষপরম্পরায় ওরা বয়ে চলে এক অভিশপ্ত জীবন।

কামিন বলে, আমার মেয়ে হবে কামিন ছেলে খাদে কাজ করবে। এথেকে আমাদের উদ্ধার নেই।

হঠাৎ ভাবনা এসে জড়ো হয়, এ জীবন থেকে উদ্ধার কত দূরে?

—প্রমীলা

বেতারশ্রুত

ইন্সপেক্টর আসবেন স্কুল পরিদর্শন করতে। হেডমাস্টারমশাই আগেই সব ক্লাসে নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। নিজে প্রত্যেক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে সকলকে তৈরি হয়ে আসতে বলেছেন। ক্লাস-টিচাররাও ছাত্রদের জনে জনে বলেছেন : কাল ফর্সা জামাপ্যান্ট পরে আসবে, খালি পায়ে আসবে না, পড়া ভালো মুখস্থ করে আসবে...ইত্যাদি ইত্যাদি গৎ বাঁধা একগাদা কথা।

ইন্সপেক্টর এসেছেন। ছাত্ররাও মাস্টারমশাইদের নির্দেশমতো আর নিজেদের সাধ্যমতো সাজগোজ করে, পড়া মুখস্থ করে, তৈরি হয়েই এসেছে। বাইরে থেকে সাধ্য আর সামর্থ্যের মধ্যে ফাঁক রাখেনি কোথাও। মাস্টারমশাইরা মনে মনে খুশি। হেডমাস্টারমশাই আরও খুশি। মনের মধ্যেও, মনের বাইরেও। কিন্তু...

ইন্সপেক্টর আগে স্কুলবাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। মালী-চাপরাশীর দৌলতে ময়লা-আবর্জনা ছিল না কোথাও। সব পরিষ্কার। ইন্সপেক্টর খুশি প্রকাশ করলেন।

তারপর ক্লাস দেখতে গেলেন। উঁচু দিকের একটি ক্লাসে প্রবেশ করতেই ছাত্ররা সসম্ভ্রমে সশব্দে উঠে দাঁড়াল। ইন্সপেক্টর বসতে বললেন। তারা বসল। নিঃশব্দ কয়েক মুহূর্ত।

নৈঃশব্দ ভঙ্গ করলেন ইন্সপেক্টর। জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা ইংরেজী বই এনেছ?

একটি ছেলে শশব্যস্তে একখানা বই এগিয়ে দিল। ইন্সপেক্টর বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন। এক জায়গায় এসে থামলেন। যে-ছেলেটি বই এগিয়ে দিয়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : শেলী কে জানো?

ছেলেটি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে নিশ্চল। কাঠ।...ইন্সপেক্টর দেখলেন সকলেই নিস্পন্দ, চোখে তাদের ভীতিবিহ্বল ছায়া। শুধু একটি ছেলে হাত তুলেছে। তিনি তার দিকে তাকালেন। বললেন : বলো।

ছেলেটি ক্ষিপ্রবেগে বলে উঠল : আমার মামাতো বোন স্যার, কলকাতায় থাকে।

এবার ইন্সপেক্টর নিস্পন্দ। কাঠ। খানিকক্ষণ।...তারপর তিনি মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকালেন। মাস্টারমশাই বিব্রত, বিমূঢ়। জোর করে বিমূঢ়তা অনেকখানি কাটিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বললেন : কবিতাটা এখনও পড়ানো হয়নি স্যার্‌।

ইন্সপেক্টার বইটা ফিরিয়ে দিলেন। আর একটি ছেলের কাছ থেকে বাংলা বইটা চেয়ে নিলেন। পাতা ওলটাতে ওলটাতে বইটা যে দিয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : দেশবন্ধু কে ছিলেন?

ছেলেটির ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু শব্দ বেরুচ্ছে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে আওড়াচ্ছে : দেশবন্ধু...দেশবন্ধু...

ইন্সপেক্টর তাকে সাহায্য করলেন : চিত্তরঞ্জনের নাম শুনেছ?

আবার ছেলেটির ঠোঁট নড়তে লাগল, কিন্তু শব্দ বেরুল না। স্পষ্ট বোঝা গেল, সে হাতড়াচ্ছে : চিত্তরঞ্জন...চিত্তরঞ্জন...

ইন্সপেক্টর সারা ক্লাসটার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। সকলেরই ঠোঁট নড়ছে, শব্দ বেরুচ্ছে না। শুধু একটি ছেলে অনেকটা সপ্রতিভ হয়ে হাত তুলে বসে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : জানো?

ছেলেটি তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল : হ্যাঁ, স্যার। মিহিজামের কাছে চিত্তরঞ্জন। সেখানে রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা আছে। আমার কাকা সেই কারখানায় কাজ করেন।

ছেলেটি একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্সপেক্টরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। দৃষ্টি তাঁর স্থির। স্থির দৃষ্টিতে তিনি মাস্টারমশাইয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মাস্টারমশাই সেই দৃষ্টিতে পুড়ে যেতে লাগলেন। ইন্সপেক্টর কিছু বললেন না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাঠক, এইবার আপনি ইন্সপেক্টর সেজে আসুন আকাশবাণীর স্কুলের কলকাতা ব্রাঞ্চের ঘরে ঘরে। জিজ্ঞাসা করুন অফিসাররূপী ছাত্রদের (কিন্তু তাঁদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করবেন না যেন, তাহলে মানহানির দায়ে পড়বেন) : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস জানেন?

তাঁরা বিব্রত মুখে, ইতস্ততঃ করে জবাব দেবেন : ইতিহাস? হ্যাঁ, পড়েছি স্কুলে থাকতে—অশোক, কণিষ্ক, শাহ্‌জাহান, লর্ড বেণ্টিঙ্ক...

জবাব শুনে কিছুক্ষণ আপনার মুখে কথা সরবে না। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগবে। তারপর আপনি বলবেন : আমি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

তাঁরা আমতা আমতা করে বলবেন : স্বাধীনতা... স্বাধীনতা...

আপনি বলবেন : হ্যাঁ।

উত্তর পাবেন : কেন, আমরা তো স্বাধীন হয়েছি।

আপনি জিজ্ঞাসা করবেন : কী করে এই স্বাধীনতা এল?

উত্তর আসবে : কেন, আন্দোলন করে। মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

আপনি জিজ্ঞাসা করবেন : আর কেউ আন্দোলন করেননি?

উত্তর শুনবেন : হ্যাঁ, করেছেন—জহরলাল...জহরলাল...জহর...

আপনি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করবেন : সুভাষ বোস?

সঙ্গে সঙ্গে চটপট উত্তর আসবে : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুভাষ বোস... সুভাষ বোস...নেতাজী ২৩শে জানুয়ারী...

আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন, জিজ্ঞাসা করবেন : রাসবিহারীর নাম শুনেছেন?

সপ্রতিভ, সহাস্য উত্তর শুনবেন : রাসবিহারী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দক্ষিণ কলকাতায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বলে একটা বিরাট, চওড়া রাস্তা আছে। রোজই তো যাই সেই রাস্তা দিয়ে।

আপনি এবার কী বলবেন, খুঁজে পাবেন না। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হবে, আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে হবে, প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হবে। কিন্তু সে-ইচ্ছে আপনি পূরণ করবেন না। দারুণ ঘৃণায়, একটি কথাও উচ্চারণ না করে আপনি দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। আর কোনোদিন ও-মুখো হবেন না।

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না। জিজ্ঞাসা করেই দেখুন না আকাশবাণীর, না দিল্লী কেন্দ্রের কথা বলছি না, কলকাতা কেন্দ্রেরই কর্তারা ক'জন রাসবিহারী বসুর নাম জানেন। জানলে কি আর তাঁর জন্মদিনটা এমনি অনাদরে অবহেলায় অতিবাহিত হত।

২৫শে মে বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর জন্মদিন। বেতারজগতের অনুষ্ঠানসূচীটা খুলে দেখুন তো কোথাও একটি বারের জন্যও তাঁর নাম দেখতে পান কিনা।...পাবেন না—কোথাও না, একবারও না। অথচ ঐদিন নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠান চোখে পড়বে, এমনকি নজরুলের স্ব-কণ্ঠেও।

জওহরলালের জন্মদিনের আর মৃত্যুদিনের কয়েকদিন আগে থেকেই সমস্ত বিভাগীয় অনুষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়—চলে পরেও কয়েকদিন ধরে। কিন্তু হতভাগ্য রাসবিহারীর জন্মদিনের কথা কর্তাদের মনে থাকে না। একটা অনুষ্ঠানও তাঁর নামে বরাদ্দ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

২৫শে মে রাত সওয়া ৮টায় পূর্বনির্ধারিত আধুনিক গানের একটি অনুষ্ঠান বাতিল করে সেই জায়গায় রাসবিহারী সম্পর্কে একটি কথিকা প্রচারিত হয়েছে। কথিকাটি হয়তো শেষ মুহূর্তে স্থির হয়েছিল। বেতারজগতে তাই তার উল্লেখ ছিল না। সংবাদপত্রে বিশেষ ঘোষণাও দেওয়া হয়নি।

এত বড়ো একটা বেতার কেন্দ্রে এতগুলো অনুষ্ঠানের মধ্যে রাসবিহারীর মতো একজন মানুষের জন্য আর একটু জায়গা কি হত না? বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্মদিনটা স্মরণ রেখে তাঁর নামে কয়েকটি সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান কি করতে পারতেন না? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে কার কাছে? এই লজ্জা, এই কলঙ্ক ঢাকবার জায়গা পাওয়া যাবে কোথায়?

অনুষ্ঠান-পর্যালোচনা

২৩ মে সন্ধ্যা ৬টায় গীটার বাজালেন শ্রীমতী (ঘোষণায় অবশ্য শ্রীমতী বলা হয়নি) প্রগতি সেনগুপ্ত। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজালেন। বেশ মিষ্টি, সুরেলা হাত।

এইদিন রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে সমীক্ষায় কলকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে বললেন শ্রীবিভূতি দাস। কলেরার কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেন তিনি। কিন্তু তার মধ্যে কতগুলো জনসাধারণের গ্রহণীয়? জলের অভাব জনসাধারণ মেটাবেন কেমন করে? কর্পোরেশনের জলে তাঁরা ক্লোরিনই বা মেশাবেন কীভাবে? শহরের আবর্জনা পরিষ্কার, সে-ও কি জনসাধারণকে কোমরে গামছা বেঁধে, হাতে ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে করতে হবে? তাহলে ঘটা করে একটা কর্পোরেশন রাখার কী দরকার? সরকারেরই বা ভূমিকা কী? জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া ভালো, কিন্তু সেই উপদেশ পালন করা তাঁদের পক্ষে কতখানি সম্ভব, একবার বিচার করে নিয়ে তারপর উপদেশ দিলে ভালো হয় না? সেই সঙ্গে কর্পোরেশন ও সরকারও যাতে তাঁদের দায়িত্বগুলি পালন করেন, তা-ও দেখে নিলে ঠিক হয় না?

সমীক্ষার পরে স্থানীয় সংবাদে শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার বন্দরে 'বার্জম্যান'-দের ধর্মঘটের খবর দিলেন। 'বার্জম্যান'-য়ের বাংলা কিছু নেই? বাংলা বললেই তো আমাদের মতো লোকেদের বুঝতে একটু সুবিধা হয়।

২৪ মে সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে নেহরুর শিশুপ্রীতি সম্পর্কে 'আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু' নামে একট অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। এতে শিশুদের সম্পর্কে নেহরু যেখানে যা বলেছেন, শিশুরা তা মুখস্থ বলার মতো বলে গেল। মনে হল, তারা অনেক কষ্ট স্বীকার করে খবরের কাগজ আর অন্যান্য পত্রপত্রিকা আর তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতিগুলি সংগ্রহ করেছে। এটা কি তাদের পক্ষে সম্ভব? অনুষ্ঠান রচনায় আর একটু প্র্যাকটিক্যাল হলে ভালো হয় না? অনুষ্ঠানটি এমনিতে কিন্তু মন্দ লাগেনি।

এই আসরে পরে গান শোনাল দেবী বর্মণ। বেশ লাগল।

আসরের পরিচালিকা নজরুল সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক সময় বললেন, 'কবি অসুস্থ, অনেকদিন ধরে অসুস্থ।' কতদিন ধরে, সেটা বললে বোধহয় ভালো হত। বলার দরকারও ছিল।

এইদিন রাত ৭টা ৫০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদে শ্রীপীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পপুলার গভর্নমেন্টের' বাংলা করলেন 'জনপ্রিয় সরকার'। 'পপুলার'-এর অর্থ কি সব সময়েই জনপ্রিয়? অভিধানটা একবার দে[খে] নিলে হয় না? আর কতকাল এমনি ক[রে] শ্রোতাদের ভুল জিনিস দেওয়া হবে?

২৬ মে সকাল সাড়ে ৯টায় প্রচারি[ত] হল 'বিচিত্রা'—অলকেন্দু বোধ নিকেত[ন] সম্পর্কে। প্রযোজনা গ্রন্থনায় ছিলে[ন] শ্রীশিবপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী। অনুষ্ঠান[টি] যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি সুন্দর। শিশু[রা] কেন জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মায়, কেমন ক[রে] শিশুদের জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মানো রো[ধ] করা যায়, জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মানো শিশু[]দের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন[্য] কীভাবে চেষ্টা হচ্ছে এই অলকেন্দু বো[ধ] নিকেতনে সেসব বিষয়ে বেশ সুন্দর কা[রে] বোঝানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। কিছু ডিমোন্সট্রেশনও দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি তথ্যমূলক, জ্ঞাতব্য। এতে সমাজের অনেক উপকার হবে এবং অনেকে জীবনে ভরসা পাবেন বলেই বিশ্বাস।

২৯ মে রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে সমীক্ষায় ডঃ অ্যালবার্ট ক্রু-র একটি মাত্র পরমাণুকে আলাদা করে নিয়ে ছবি তোলার বিষয়ে বললেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী। বলাটা বেশ স্বচ্ছ, সহজবোধ্য। বেশ ধীরে ধীরে, সহজভঙ্গিতে এমনভাবে বললেন তিনি যে, অল্প অল্প বিজ্ঞান-জানারাও বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করা যেতে পারে।
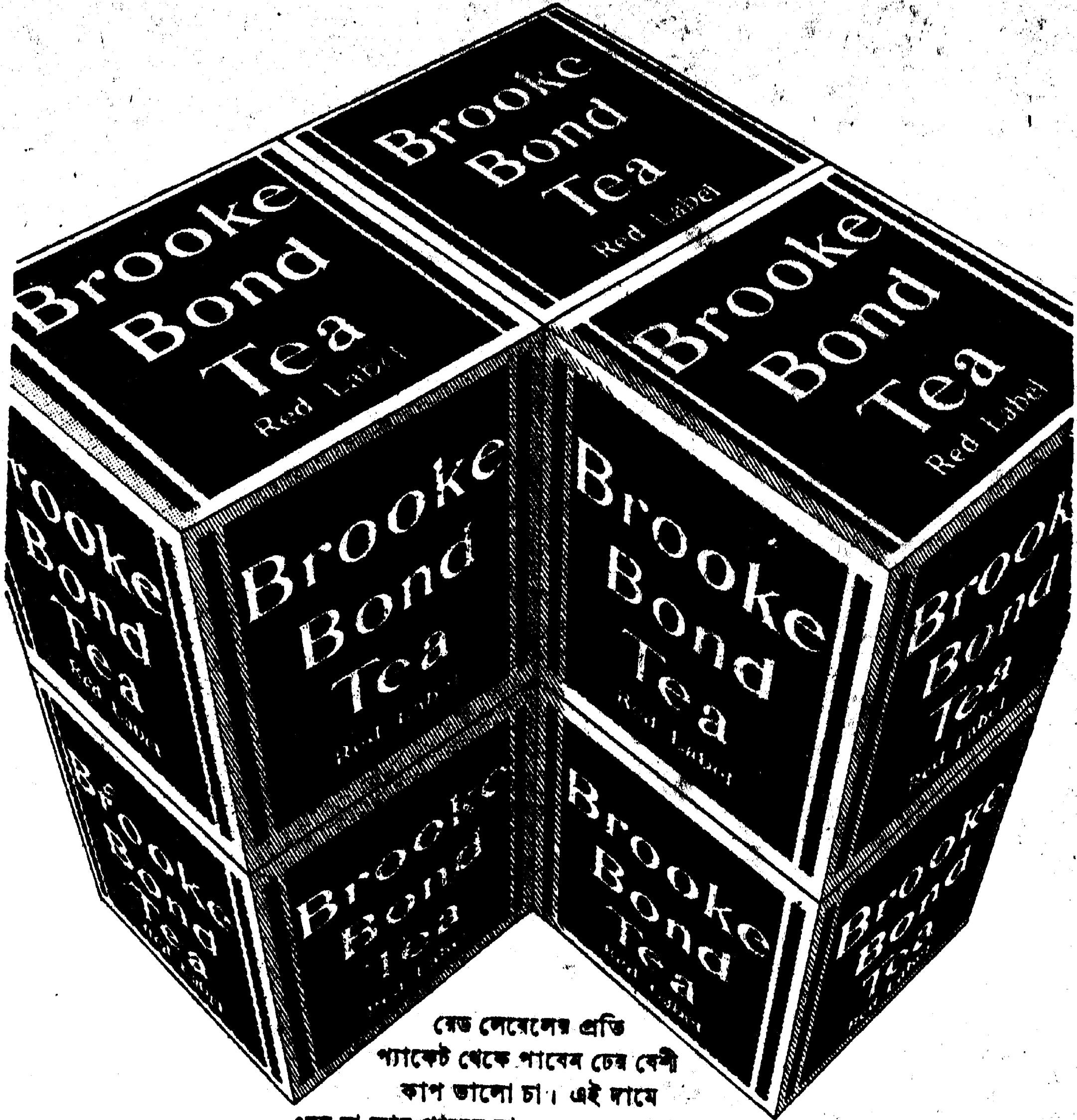
—শ্রবণক

নাটমঞ্চের মঞ্চোৎসব

বহুরূপীর চার অধ্যায়

দিলীপ মৌলিক

বিশ শতকের এই দশকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আজ বাংলা থিয়েটারে শিল্পচিন্তার এক আশ্চর্য ব্যাপ্তি ঘটেছে, যার মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধতর হয়েছে দেশের জীবননিষ্ঠ সংস্কৃতি। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে সব নাট্যগোষ্ঠী অবিরত নাট্যানুশীলনে রত। তারাই তাদের আন্তরিকতার অঞ্জলিতে ভরে এনেছে যা কিছু গৌরবের মালা। এর ফলে দেশের শিল্পসংস্কৃতির মান হয়েছে উন্নত। কিন্তু যাঁরা অনলস পরিশ্রম করে নাট্যসংস্কৃতির একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন এবং যাঁদের উদ্যম প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতেও থেমে যায়নি. তাঁদের চোখে এক অনিশ্চয়তার মেঘ জমতে শুরু করেছে। মনে জেগেছে এক প্রশ্ন—সামগ্রিকভাবে শিল্পচর্চার একটি সুসংহত কেন্দ্র কোথায় যেখানে শিল্পীরা স্বকীয় চিন্তার আলোয় নতুনতর অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকতে পারেন? কোথায় এমন একটি জাতীয় মঞ্চ যেখানে খুশীমতো প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন ধরনের নাট্যনিরীক্ষা করতে পারেন? প্রশ্ন প্রশ্নই থেকেছে, সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই ক্ষোভ জমতে শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরে. কিন্তু বার বার চরমতম ঔদাসীন্যের কাছে তা হয়েছে মর্মান্তিকভাবে প্রতিহত। সরকারী কর্তৃপক্ষ নাট্যগোষ্ঠীগুলির অসাধারণ কর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সচেতনভাবে পরিচিত থেকেও নির্বিকার থেকেছেন। এটা সত্যি খুবই এক আশ্চর্য ব্যাপার। গৌরব যারা বয়ে আনলেন, গৌরবান্বিত বোধ করবার সুযোগ তাঁরা পেলেন না। তাহোলে কি বাংলা থিয়েটারের অর্জিত এই সম্পদকে চিরন্তনত্বের আলোয় ধরে রাখা যাবে না? পঁচিশ বছরের অকৃত্রিম নাট্যসাধনা কি অবহেলায়, উপেক্ষায় শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবে? এই প্রশ্নগুলো গভীরভাবে আন্দোলিত করলো বিশেষ করে 'বহুরূপী', 'নান্দীকার' ও 'রূপকারে'র ও 'অনামিকা'র শিল্পীদের। বাংলা দেশের প্রখ্যাত এই নাট্যগোষ্ঠী চারটির নেতৃত্বে তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হোল 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'। উদ্দেশ্য, যে-ভাবে হোক বাংলার পরিব্যাপ্ত শিল্পচর্চার জন্য একটি স্থায়ী মঞ্চ গড়ে তোলা। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এ যৌথ প্রচেষ্টা এক বলিষ্ঠতম পদক্ষেপ।

আমাদের দেশে যাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে নানা ধরনের শিল্পচর্চা করে চলেছেন, তাঁদের একটি জায়গায় মেলাতে পারলে প্রত্যেকের মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতির সেতুবন্ধন হয় এবং তাতেই দেশের শিল্পসংস্কৃতির সামগ্রিক একটি চেহারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাংলা নাটমঞ্চ সমিতির লক্ষ্য হোল, কিভাবে এই মিলনের একটি কেন্দ্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা চলেছে অবিরত। গত বছর নাট্যোৎসব ও বিভিন্ন লোকের দান থেকে সংগৃহীত হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। এবারেও কয়েকদিন আগে 'কলামন্দিরে' অনুষ্ঠিত হোল পাঁচদিনব্যাপী এক শৈল্পিক সুষমায় মন্ডিত নাট্যোৎসব। এবারে সমিতির ভান্ডারে অর্থ এসেছে প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো। জনসাধারণ যে একটি জাতীয় মঞ্চ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন হয়েছে, এ থেকে তা নিশ্চিত বোঝা যায়। পাঁচদিনের এই নাট্যোৎসবের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের নাট্যপিপাসা যে গভীরতা লাভ করেছে, তার নজীর ধরা পড়ে। প্রতিদিনের সন্ধ্যা ও রাতের আকাশ থেকেছে ঝড় আর বৃষ্টির মেঘে ভরা। কিন্তু বাইরে অশান্ত বর্ষণ সত্ত্বেও নাটক চলেছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে।

এবারের নাট্যোৎসবের শুরু হয় 'রূপকারে'র নতুন নাটক 'লালন ফকির' দিয়ে। বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত লালন ফকিরের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিবর্তন ও সমাজের রুক্ষ বিধান থেকে পাওয়া চরমতম বিপর্যয়কে কেন্দ্র করেই প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় 'লালন ফকির' নাটকটি গড়ে তুলেছেন। এ নাটকে যেমন অধ্যাত্মচিন্তার কথা

অনামিকার আধে আধুরে

আছে, তেমনই আছে তখনকার সমাজ-জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ চেহারা। সংলাপের ভাবগম্ভীরতায় ও কয়েকটি অসাধারণ মুহূর্ত সৃষ্টিতে নাটকটি শ্রীরায়ের পরিণত নাট্যচিন্তার একটি সম্পদ হোতে পেরেছে। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন সবিতাব্রত দত্ত; নির্দেশনায় তাঁর আন্তরিকতার অভাব কোথাও চোখে পড়েনি। কিন্তু শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয়ে দু'এক জায়গায় শৈথিল্য চোখে পড়েছে। প্রয়োজনমত অনুশীলনের অভাব বোধ হয় এর মূলে। সংলাপের প্রাণোচ্ছলতায় ও সঙ্গীতের সুরে 'লালনে'র চরিত্রটিকে সহজ ও সরল করে তুলেছেন সবিতাব্রত দত্ত। অন্যান্য প্রযোজনায় তাঁর কন্ঠে সুরের যে দ্যুতি তা এখানে ততোটা স্পষ্টতা না পেলেও 'লালন'কে বুঝে নিতে আমাদের এতটুকু অসুবিধে হয়নি। এই নাটকের একটি আশ্চর্য আকর্ষণ হোল শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের 'মতি' চরিত্রচিত্রণ। বাচন-ভংগি ও বিভিন্ন মুহূর্তের ভাবপ্রকাশে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ এক নতুনভাবে প্রকাশ করেছেন। চরিত্রের অতলে মিশে না গেলে বোধ হয় এমন নিবিড়তা আনা যায় না। 'সিরাজ সাঁই' চরিত্রে স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন রসরাজ চক্রবর্তী। মধু দত্ত'র 'নিবারণ', গীতা দত্ত'র 'তুলসী' মোটামুটি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হোল 'নান্দীকারে'র 'তিন পয়সার পালা'। ব্রেখটের 'দি থ্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে এ নাটকের প্রযোজনা ইতিমধ্যে বাংলার নাট্যজগতে আলোড়ন এনেছে, প্রশংসাও পেয়েছে যথেষ্ট। ১৮৭৬ এর ক'লকাতা মহানগরীতে বাস করতো মহীন্দ্র নামে এক দস্যু, তারই দৌরাত্ম্যের কাহিনী নিয়ে এ নাটক। অদ্ভুত সব ঘটনার সঙ্গে মহীন্দ্রের যোগ এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটকটি মঞ্চে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। মহীন্দ্রের অনেক মন্তব্যে গভীরতর সামাজিক ব্যঞ্জনা আমাদের একই সঙ্গে হাসায় এবং ভাবায়। নাটকটির রূপান্তর ও নির্দেশনায় অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রসাল সংলাপে ও নাচে-গানে তিনঘণ্টা যেন মনটা ভরে থাকে। প্রতিটি শিল্পীই নিখুঁতভাবে চরিত্রকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, এবং তাই টিমওয়ার্কে কোথাও এতটুকু শৈথিল্য স্পষ্ট হোতে পারেনি। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহীন্দ্র' একটি স্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ। অবাক করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'যতীন্দ্রনাথে'র ভূমিকায় অভিনয় করে। সত্যি এতো স্বাভাবিক ভংগিমায় অভিনয় সচরাচর চোখে পড়ে না। লতিকা বসুর 'মালতী-মালা'ও চমৎকার। 'পারুলবালা' চরিত্রে কেয়া চক্রবর্তী প্রত্যাশিত অনুভূতি দিতে পেরেছেন, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'বটকৃষ্ণ', চরিত্রোপযোগী। এমন একটি প্রয়োগসফল ভালো নাটক কমই দেখা গেছে বাংলা মঞ্চে।

হিন্দী নাটকও যে বাংলা নাটকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে তৃতীয় দিনে 'অনামিকা' প্রযোজিত "আধে আধুরে" নাটকে। মোহন রাকেশ রচিত এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিসত্তা যেখানে দ্বিধা বিভক্ত। প্রত্যেকেই সেখানে নিজের নিজের অসম্পূর্ণতার নিদারুণ যন্ত্রণায় গুমরে কেঁদে উঠছে। এই অসাধারণ বাস্তব জীবননিষ্ঠ নাটকটিকে মঞ্চে প্রাণবন্ত করে তোলার ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক শ্যামানন্দ জালানের শিল্পবোধ নিঃসংশয়ে প্রশংসার দাবী রাখে। শিল্পীতালিকায় ছিলেন কৃষ্ণ-কুমার (স্বামী), প্রতিভা অগ্রবাল (স্ত্রী), ইয়ামা অগ্রবাল (বড় মেয়ে), আভা জালান (ছোট মেয়ে), কল্যাণ চ্যাটার্জী (ছেলে)।

পরের দিন। মঞ্চে আধো আলো অন্ধকার। এলার তৃষ্ণার্ত দুটি চোখের দিকে চোখ রেখে অতীন আবৃত্তি করছে—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

সে এক অপূর্ব মুগ্ধ শিহরণ, অনুভূতি-লোকে এক আশ্চর্য স্পন্দন। নাটকের নাম 'চার অধ্যায়'। প্রীতি আর স্মৃতির দোলনে বারো বছর পরে আবার 'বহুরূপী' এই নাটকটি মঞ্চস্থ করলো। সংলাপের সেতু-বন্ধনে শম্ভু মিত্রের 'অতীন', আর তৃপ্তি মিত্রের 'এলা' মঞ্চে এমন একটা মায়া সৃষ্টি করে যা থেকে মনটাকে চেষ্টা করেও সরিয়ে নেওয়া যায় না। আঙ্গিকের কোন বাহার নেই, কলা-কৌশলের কোন চমক নেই, শুধু দুটি হৃদয়ের বিভিন্ন মুহূর্তের অনুভূতির আদানপ্রদান। এরই মধ্যে নাটক, এরই মধ্যে আনন্দ বিপদের সীমারেখা ধরে 'অতীন' আর 'এলা'র প্রাণময়তার সঙ্গে মিশে যাওয়া। এই সূত্রেই নাটকের প্রাণ-বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। 'দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণকে বাঁচিয়ে তোলা যায়'...এই ভয়ংকর মিথ্যার বিরুদ্ধে 'চার অধ্যায়' হোল প্রবল প্রতিবাদ। মৌল সত্যকে অবিকৃত রেখে 'অতীন', 'এলা' বলেছে প্রাণের কথা, যার মধ্যে আমরা

নাম্দীকারের [illegible]

সিদ্রদের অনুভব করেছি প্রতিমুহূর্তে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ডিত ভাষা যে আশ্চর্য-রকম নাটকের প্রাণ হোতে পারে 'বহুরূপী' 'চার অধ্যায়ে' একথা প্রমাণ করেছে।

'চার অধ্যায়ে'র আবেদন আজও ফুরিয়ে যায় নি। নাটকের শেষে শম্ভু মিত্রের শোকাবহ ঘোষণা 'চার অধ্যায়ে'র অভিনয় সম্ভবত এখানেই শেষ' আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। আমরা বলবো আরো বহুরজনী অভিনীত হোক এ নাটক।

শেষের দিনের নাটক হোল 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' প্রযোজিত 'মুদ্রা-রাক্ষস'। প্রথমেই বলি এ নাটকের প্রযোজনা হয়েছে অসাধারণ; দুরূহ জটিল এই নাটকটিকে কি সহজ স্বাভাবিকভাবে মঞ্চে পরিবেশন করা হয়েছে তা ভাবলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রেক্ষাগৃহের সব আলো নিভে গেলে শোনা গেলো কাঁসর ঘণ্টা, আর ঢাক-ঢোলের আওয়াজ। প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন দিক থেকে কেউ ঢুকছে ঢাক, ঘণ্টা নিয়ে, আর কেউ মঙ্গল-ঘট নিয়ে। ওদিকে মঞ্চের পর্দা সরে গেছে। সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছেন শিল্পীরা। 'জর্জর পুজো' শুরু হোল, দণ্ডটিকে স্থাপন করা হোল। তারপর সূত্রধরের ভাষ্যে যাত্রা শুরু হোল নাটকের।

প্রস্তাবনা থেকেই নাটকের প্রতি আকর্ষণ শুরু হয়েছিল এবং সে আকর্ষণ ছিল শেষ পর্যন্ত অটুট। এর জন্য দৃশ্য পরিকল্পনা, সংগীত, অভিনয় সব কিছুই অপূর্ব ছন্দে মেলবন্ধন করেছে। এ ব্যাপারে নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প-চিন্তা অভিনন্দনযোগ্য। বহু চরিত্রের এই প্রাচীন নাটকটির প্রযোজনায় সেকালের পূর্ণাঙ্গ চেহারা ও বিশেষ মেজাজটুকু ফুটে উঠেছে।

বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'এর নাট্য-কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি রাজনৈতিক পটভূমিকাকে নিয়ে। কূটনীতিবিশারদ চাণক্যের নির্দেশে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশ ধ্বংস করে নিজেই বসেছেন মগধের সিংহাসনে। মগধের সবাই চাণক্যের বশে, কিন্তু তবু তাঁর মনে খুশি নেই, স্বস্তি নেই। ভূতপূর্ব নন্দের মন্ত্রী সুনীতিজ্ঞ বিদ্বান ব্রাহ্মণ রাক্ষস এখনো আসেনি চন্দ্রগুপ্তের দিকে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকে নিষ্কণ্টক করার জন্য চাণক্য রাক্ষসকে স্বপক্ষে আনবার জন্য চেষ্টা চালান। কেমন করে চাণক্য রাক্ষসের মুদ্রা (বা শীলমোহর) সংগ্রহ করে এই প্রচেষ্টায় সফল হোলেন সেই কাহিনীই রয়েছে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে।

এই কাহিনীটিকেই স্বাভাবিকতার সঙ্গে মঞ্চে মূর্ত করে তোলেন 'নাটমঞ্চ সমিতি'র শিল্পীরা। অভিনয়ের ব্যাপারে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হোলেন 'চাণক্যে'র রূপদাতা শ্রীশম্ভু মিত্র। তাঁর অভিনয়ে এতটুকু আতিশয্য তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নি। শান্ত, কূট-কৌশলী, স্থিতধী ব্রাহ্মণ চরিত্রের ভাবসংগতি বজায় রেখে অত্যন্ত সহজ সরল বাচন-ভংগিতে অভিনয় করেছেন বলে তাঁর 'চাণক্য' বার বার দর্শকদের আপ্লুত করেছে। এ চরিত্রের অভিনয় শম্ভু মিত্রের শিল্পী-জীবনের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে থাকবে, আর ভাবীকাল তাঁর এই চরিত্রচিত্রণ নিয়ে গর্ব করবে। নাটকের আর একটি মুখ্য চরিত্র রাক্ষসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কুমার রায়। নির্লোভ, বন্ধুবৎসল, প্রভুভক্ত, তপস্বীর রূপটি ভালোভাবেই পরিস্ফুট করেছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রগুপ্তে'র মধ্যে দেখাবার কিছুই ছিল না। তবুও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ চরিত্রে ভাবগাম্ভীর্য ফোটাতে পেরেছেন। অন্য কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন সন্তোষ দত্ত (জীবসিদ্ধি), কালী-প্রসাদ ঘোষ (মলয়কেতু), দেবতোষ ঘোষ (ভাগুরায়ণ), হিমাংশু চ্যাটার্জী (সিদ্ধার্থক), রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (বিরোধ গুপ্ত), পশুপতি বোস (চন্দন দাস), কেয়া চক্রবর্তী (প্রিয়দর্শিকা)। সূত্রধার ছিলেন গঙ্গাপদ বসু।

'আতঙ্কবেদী' শম্ভু ভট্টাচার্যের সংগীতও মনকে আকৃষ্ট করেছে। নাটকটির দৃশ্য পরিকল্পনার জন্য খালেদ চৌধুরী প্রশংসার দাবী রাখে।

নাট্যোৎসব তো শেষ হোল। কিন্তু আসল কাজের এখনই হোল শুরু। নাটমঞ্চ সমিতির ভাণ্ডারে যে অর্থ এখন পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে তা দিয়ে কিছু কাজ আরম্ভ করা যায় ঠিকই, কিন্তু আরো অনেক অর্থের দরকার। এ ব্যাপারে সরকারের আনুকূল্য যাতে আসে সেদিকে চেষ্টা করা উচিত এবং জনসাধারণ যাঁরা নাটক ভালোবাসেন তাঁদেরই এ কাজে অগ্রণী হোতে হবে। পৃথিবীর প্রতি দেশে সরকারই প্রতিষ্ঠা করেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। আমাদের দেশেই বা তা হবে না কেন?

কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে সবরকম শিল্পীর সমাবেশ ঘটিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতির চেহারা পরিস্ফুট করাটার দায় আমাদের সবারই। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ন্যাশনাল থিয়ে-টারের স্বপ্নকে সফল করে পরিপূর্ণভাবে ভারতবর্ষীয় থিয়েটারের একটি প্রাণময় রূপকে তুলে না ধরতে পারলে ভাবীকালের কাছে আমাদের দেখার আর কিছু থাকবে না। এটাকে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে মেনে করে আজ সবাইকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে যে 'এ নেশান ইজ নোন বাই ইটস স্টেজ' মন্ত্রকের গভীরতর সত্যকে আমাদের দেশের মাটিতে ভাস্বর করে তুলবো।

প্রেক্ষাগৃহ

পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র চিত্রে বিন্দুর ভূমিকায় নবাগতা রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী।

আধুনিক আমেরিকান নাটক ও ডক্টর হেনরী পপ্‌কিন

আধুনিক মার্কিনী নাট্যজগতে ডক্‌টর হেনরী পপ্‌কিন একটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত নাম। শুধু মার্কিন মুলুকেই নয়, ইংলণ্ডেও গেল কুড়ি বছর ধরে লণ্ডন টাইমস পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ নাট্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি অজস্র। আমেরিকার মিনিয়াপোলিসের সুপ্রসিদ্ধ টাইরন গুথ্‌রি থিয়েটারের ইনি হচ্ছেন সাহিত্য পরিচালক; গুথ্‌রি থিয়েটার যে-নাটক অভিনয় করবে, তা ইনিই নির্বাচন করে দেন। নাট্যসমালোচক হিসেবে ইনি নিউইয়র্ক টাইমস, লাইফ, থিয়েটার আর্টস, ওয়ার্ল্ড থিয়েটার প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। এঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'নিউ ব্রিটিশ ড্রামা' ও 'কন্‌সাইজ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব মডার্ন ড্রামা' বই দু'খানির কৃতিত্বপূর্ণ সম্পাদনা। ডঃ পপ্‌কিন আগে শিক্ষকতা করেছেন রাটগার্জ বিশ্ববিদ্যালয়, কুইন্স কলেজ, ব্র্যাণ্ডিস্‌ বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ইনি নিউইয়র্কের বাফেলোতে অবস্থিত স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কে ইংরাজীর অধ্যাপক। ১৯৫৯-৬০ সালে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে ইনি ফ্রান্সের লিয়োঁ ও ক্লারমোঁত-ফেরাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক সংক্রান্ত বক্তৃতা দেন। ঐ সময়ে তিনি ইংলণ্ড, ইটালী, হল্যাণ্ড ও যুগোস্লাভিয়াতেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। গেল ১৯৬৮ সালেও তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গেই চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও যুগোস্লাভিয়া পরিভ্রমণ করেন। সম্প্রতি ডঃ পপ্‌কিন ভারতে এসেছেন এখানকার নাট্যজগৎ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার তথা পৃথিবীর বর্তমান নাট্যজগৎ বিষয়ে আমাদের কিছু শোনাতে। তাঁর মুখ থেকেই শোনা গেল, ভারতে আসবার আগে তিনি দূর প্রাচ্যের জাপান, ফিলিপিন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের নাট্যাভিনয়াদি সম্পর্কে যতটা সম্ভব পরিচয় লাভ করে এসেছেন। কলকাতায় ৬ ও ৭ জুন, মাত্র এই দু'দিন অবস্থানের মধ্যেই তিনি বিশ্বরূপা থিয়েটারের "বেগম মেরী বিশ্বাস" ও কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবের অন্যতম "মুদ্রারাক্ষস" অভিনয় দেখে গেছেন।

নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক ও পরিচালক, নাট্যসমালোচক, নাট্যবিষয়ক অধ্যাপক প্রভৃতির এক নির্বাচিত সমাবেশে ডঃ পপ্‌কিন গেল ৬ ও ৭ জুন তারিখে যথাক্রমে "আমেরিকান থিয়েটারের বর্তমান গতিপ্রকৃতি" ও "বর্তমানের বিশ্বরঙ্গমঞ্চ—প্রতিকৃতি, বৈশিষ্ট্য, নবপ্রবর্তনা" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন এবং প্রতিদিন বক্তৃতা শেষে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরে যোগ দেন। বর্তমানের মার্কিন নাট্যজগৎ সম্পর্কে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানের নাট্যাভিনয় মাস-অ্যাপীলের (বৃহৎ জনতার প্রতি আবেদনের) কোনো ধার ধারে না, তার দৃষ্টি আজ সীমিত দর্শকের প্রতি, যাদের কাছে সে কোনো বিশেষ আদর্শ বা বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চায়। আজকে আমেরিকান থিয়েটার বলতে মাত্র ব্রডওয়েকেই বোঝায় না; আজ তার পরিধি বিস্তৃত হয়ে 'অফ্‌-ব্রডওয়ে', 'অফ্‌- অফ্‌-ব্রডওয়ে' পার হয়ে রিজিওন্যাল থিয়েটারে গিয়ে পৌঁছেছে। অথচ 'অফ্‌-ব্রডওয়ে'র সৃষ্টি হয়েছে মাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। এবং প্রথম প্রথম 'অফ্‌-ব্রডওয়ে'র কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষে তার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করবার মতো উপার্জন করাও দুরূহ ছিল। পঞ্চাশ দশকেও এরা প্রধানত শেক্সপীয়র, ইবসেন, শেকভ, স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি ধ্রুপদী নাট্যকারদের রচনা অভিনয় করত। পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে ও ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এই ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নাট্যকারদের রচনা মঞ্চস্থ করা শুরু হয়। এই সময়েই অ্যাল্‌বির "জু স্টোরি" এখানে অভিনীত হয়; যদিও বইটি প্রথম অভিনয় করার গৌরব হচ্ছে পশ্চিম বার্লিনের (১৯৫৯ সালে)। ১৯৬০-এর দশকে দেখা গেল, বছরের সেরা দশটি নাটকের মধ্যে একটি 'অফ-ব্রডওয়ে'র নাটক স্থান পেল; 'অফ্‌-ব্রডওয়ে'তে অভিনীত নিগ্রো নাট্যকারের রচনা বিখ্যাত 'পুলিটজার' পুরস্কার লাভ করল এবং আর একখানি 'অফ্‌-ব্রডওয়ে'র নাটককে দেওয়া হল নাট্য-সমালোচকের (ড্রামাক্রিটিক্‌স্‌) পুরস্কার। 'অফ্‌-ব্রডওয়ে' আজ বিশেষত্ব অর্জন করেছে : (১) রক-মিউজিক্যাল এবং (২) নিগ্রোজীবন সম্পর্কিত নাটকাভিনয়ে। এখন শ্রেষ্ঠ নিগ্রো নাট্যকার হচ্ছেন লে জনসন। আজকের নাটক সর্বত্র মনস্তত্ত্ব-মূলক; মানুষের মনের বিচ্ছিন্নতাবোধ,
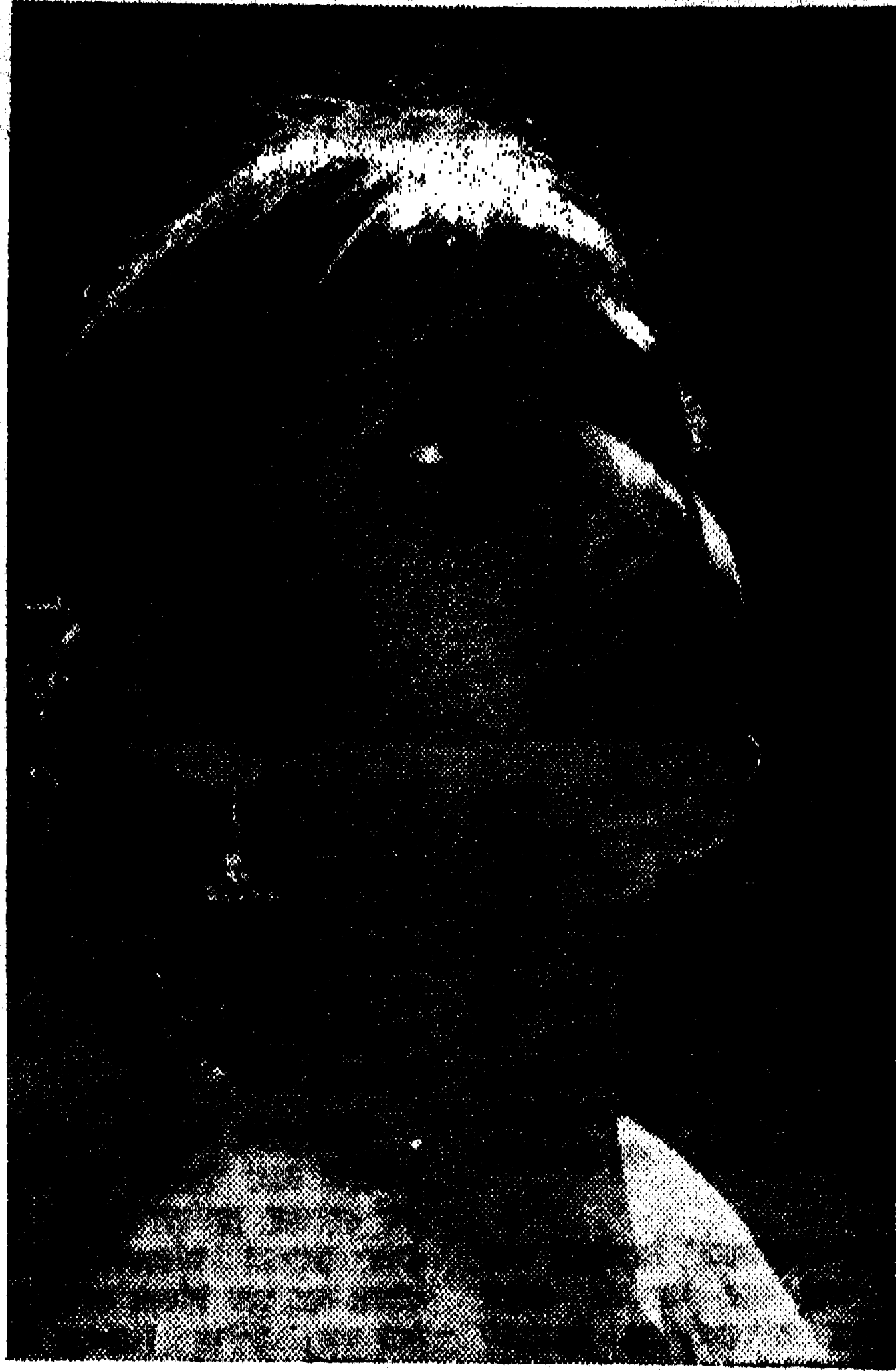
বোস, চ্যাটার্জি পরিচালিত সারা আকাশ নন্দিতা ঠাকুর এবং রাকেশ।
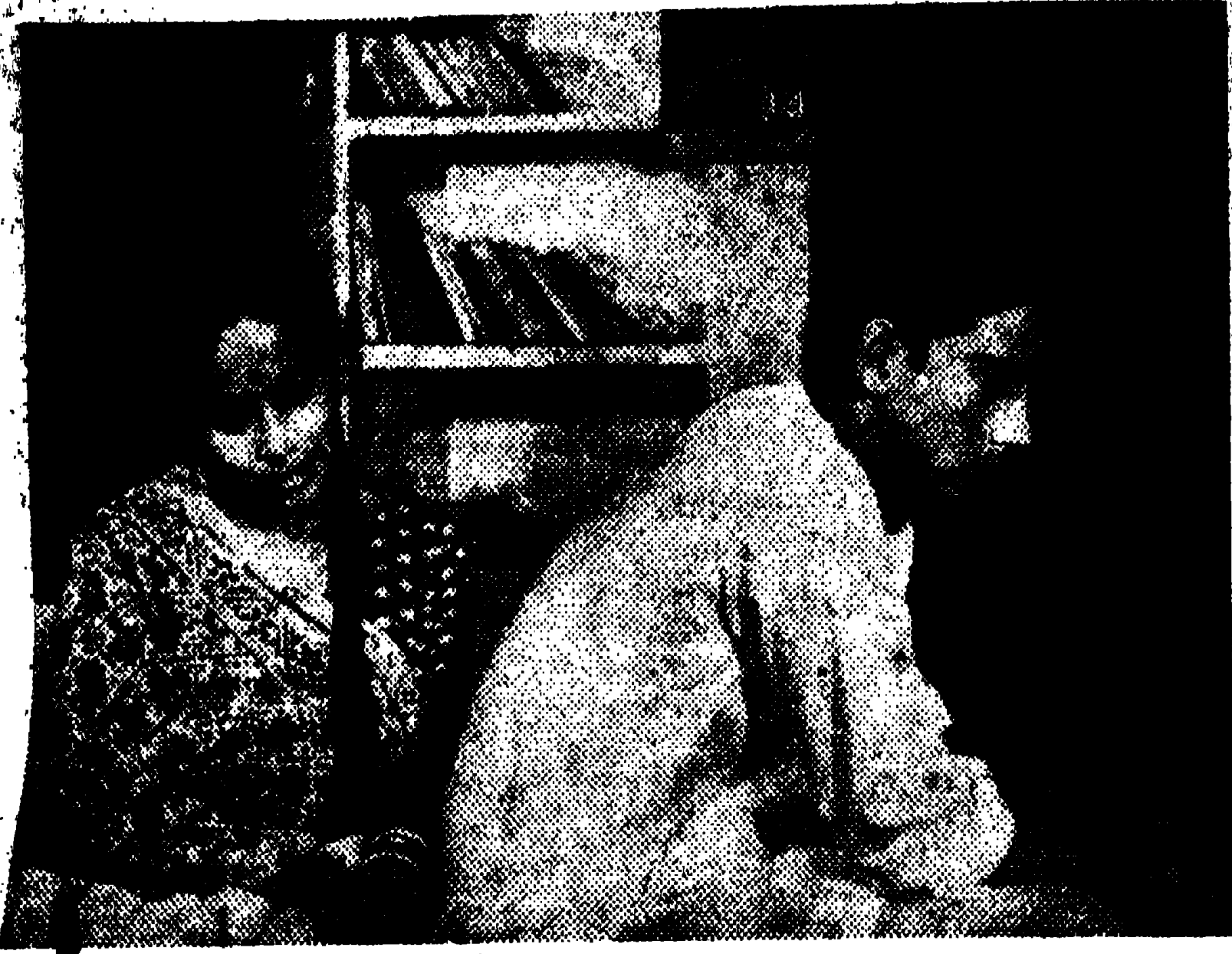
বিচ্ছিন্নতাবোধ নাটকের উপজীব্য। মানুষ মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে উগ্রতা বা হিংসা-পরায়ণতারও আশ্রয় নিচ্ছে। "হু'জ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উল্ফ?" নাটকে তারই পরিচয় মেলে। মাদকসেবীদের নিয়ে রচিত জ্যাক গেলবারের বিখ্যাত নাটক "দি কনেকসান" এবং বিখ্যাত রক-মিউজিক্যাল-দ্বয় "হেয়ার" ও "ইয়োর ওন থিং" (টুয়েল্‌ফথ্‌ নাইট অবলম্বনে) অফ-ব্রডওয়ে'রই দান।

"অফ্-অফ্-ব্রডওয়ে" থিয়েটারের জন্ম হয়েছে মাত্র বছর আটেক। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ও দুঃসাহসী নাট্যপ্রেমীদের ভীড়। এখানকার বেশীর ভাগ নাটকই পরীক্ষানিরীক্ষামূলক, যাদের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে। মিস এলেন স্টুয়ার্ট, যিনি নাকি মেয়েদের খেলাধুলোর উপযোগী পরিচ্ছদ প্রস্তুতের কাজে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁরই পরিচালিত "কাফে-লা-মামা" এদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। জাঁ-ক্লদ-ভ্যান-ইতালী রচিত "আমেরিকা হুররে" এই অফ্-অফ্-ব্রডওয়ে'রই নাটক।

"রিজিওন্যাল থিয়েটার" গড়ে উঠেছে নিউইয়র্ক থেকে দূরবর্তী সানফ্রান্সিস্কো, লস্ এঞ্জেলস্, ফ্লোরিডা প্রভৃতি শহরে। এসব জায়গার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একমাত্র কাম্য হচ্ছে অভিনয় করবার সুযোগ লাভ করা; জীবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্যে তারা আদৌ লালায়িত নয়। আগে নিউইয়র্কের বাইরের থিয়েটারগুলি ব্রডওয়ে থেকে আগত ভ্রাম্যমাণ দলগুলির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত; কিন্তু এখন তারা নিজেরাই নতুন বইয়ের প্রয়োজনা করতে ব্যস্ত। অ্যান্টনী পারকিন্স ছিলেন একজন নামকরা অভিনেতা; তিনি এখন এক রিজিওন্যাল থিয়েটারের পরিচালক। এর পর আছে এরিণা থিয়েটার, থিয়েটার ইন দি রাউণ্ড প্রভৃতি। ওয়াশিংটন শহরের সাফল্যমণ্ডিত নাটক "গ্রেট ওয়াইল্ড হোপ" আমেরিকান নাট্যকারের কাম্য তিনটি পুরস্কারই—পুলিটজার, ক্রিটিকস্ এবং আইরিশ পুরস্কার লাভ করেছে।

সবশেষে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, ওয়াশিংটনের কেনেডি সেণ্টারে ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 'জনসন' পরিচালিত সরকার দ্বারা রিজিওন্যাল থিয়েটারগুলির পরিচালনার জন্য 'ন্যাশানাল ফাউণ্ডেশন ইন আর্টস্' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া সরকার একটি ব্রডওয়ে থিয়েটারের পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন বিদেশী থিয়েটার সম্প্রদায়ের অভিনয় ব্যবস্থার জন্যে।

আমরা ডঃ পদ্‌কিন-এর প্রত্যো নাট্য-বোধ্যার ভারতে আগমনে যথার্থই উপকৃত বোধ করি।

নির্বাক যুগের আমেরিকান ছবি সম্পর্কে

সম্প্রতি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টার-এর উদ্যোগে "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রেতিহাস" সম্পর্কে তিনদিনব্যাপী যে আলোচনাচক্র বসেছিল, তারই অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচী হিসেবে একেবারে ১৯০৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তোলা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি চিত্রামোদীদের দেখানো হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল : এডউইন, এস, পোর্টার-এর **দি লাইফ অব অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান** (১৯০৩), **দি গ্রেট রবারি** (১৯০৩), ডি, ডাবলু, গ্রিফিথ-এর **দি লোনলি ভিলা** (১৯০৯), **দি লোনডেল অপারেটার** (১৯১১), চার্লি চ্যাপলিন-এর **দি ট্র্যাম্প** (১৯১৫), ম্যাক সেনেট-এর **এ ক্লেয়ার্স জাম** (১৯১৭) এবং উইলিয়াম এস, হার্ট-এর **দি টোলগেট** (১৯২০) ও হেনরী কিং-এর **টলেবল্ ডেভিড** (১৯২১)-এর নির্বাচিত অংশ। এ-ছাড়া চলচ্চিত্র-রসিকদের ডি, ডবলু, গ্রিফিথ-এর **"ইনটলারেন্স"** (১৯১৬) এবং ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস-এর **"দি থ্রী মাস্কেটিয়ার্স"** (১৯২১) ছবি দুখানিও সম্পূর্ণ দেখানো হয়। এই আলোচনাচক্রে আমেরিকার নির্বাক ছবি সম্বন্ধে একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় এবং বিশেষ করে কমেডি চিত্র সম্পর্কে বলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। এর ওপর বিভিন্ন দিনে টীকা-টিপ্পনী দেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন : শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতলকুমার গুপ্ত, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, লিপটন কোম্পানীর প্রচার বিভাগের বিশ্বনাথন, অতনু বসু, নির্মাল্য বসু, এবং অরুণ প্রামাণিক। প্রথমে যা মাত্র চলন্ত ছবিরূপে সাধারণ দর্শকের কাছে বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠেছিল, সেই জিনিসই অচিরে কাহিনী রূপায়ণের কাজে কেমনভাবে ব্যবহৃত হল এবং আরও পরে ডি, ডাবলু, গ্রিফিথ-এর সৃষ্টিধর্মিতার স্পর্শে একটি জীবন্ত শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হল, তা চাক্ষুষ দেখার সুযোগ দিয়ে এ-ইউ-সি চলচ্চিত্র-রসিকদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। বিশেষ করে আমরা ধন্যবাদ দেব এ-ইউ-সির পরিচালক মিঃ রল, ডি, ক্লিফটনকে এমন একটি সার্থক আলোচনা সভার আয়োজন করার জন্যে। অবশ্য নির্বাক চলচ্চিত্র দেখাবার আয়োজন সুসিদ্ধ হয় তখনই, যখন চলচ্চিত্রগুলিকে নির্বাক যুগের গতিবিশিষ্ট করে দেখানো সম্ভব হয়। ঐ সময়ে ছবির গতি ছিল প্রতি মিনিটে ষাট ফুট। এখন হচ্ছে প্রতি মিনিটে নব্বই ফুট। এই দেড়াগতিতে নির্বাক ছবিকে অযথা হাস্যকর বলে মনে হয়; যেটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

[illegible]-এর সেটে মাধবী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক সুশীল বিশ্বাস।
ফটো : অমৃত
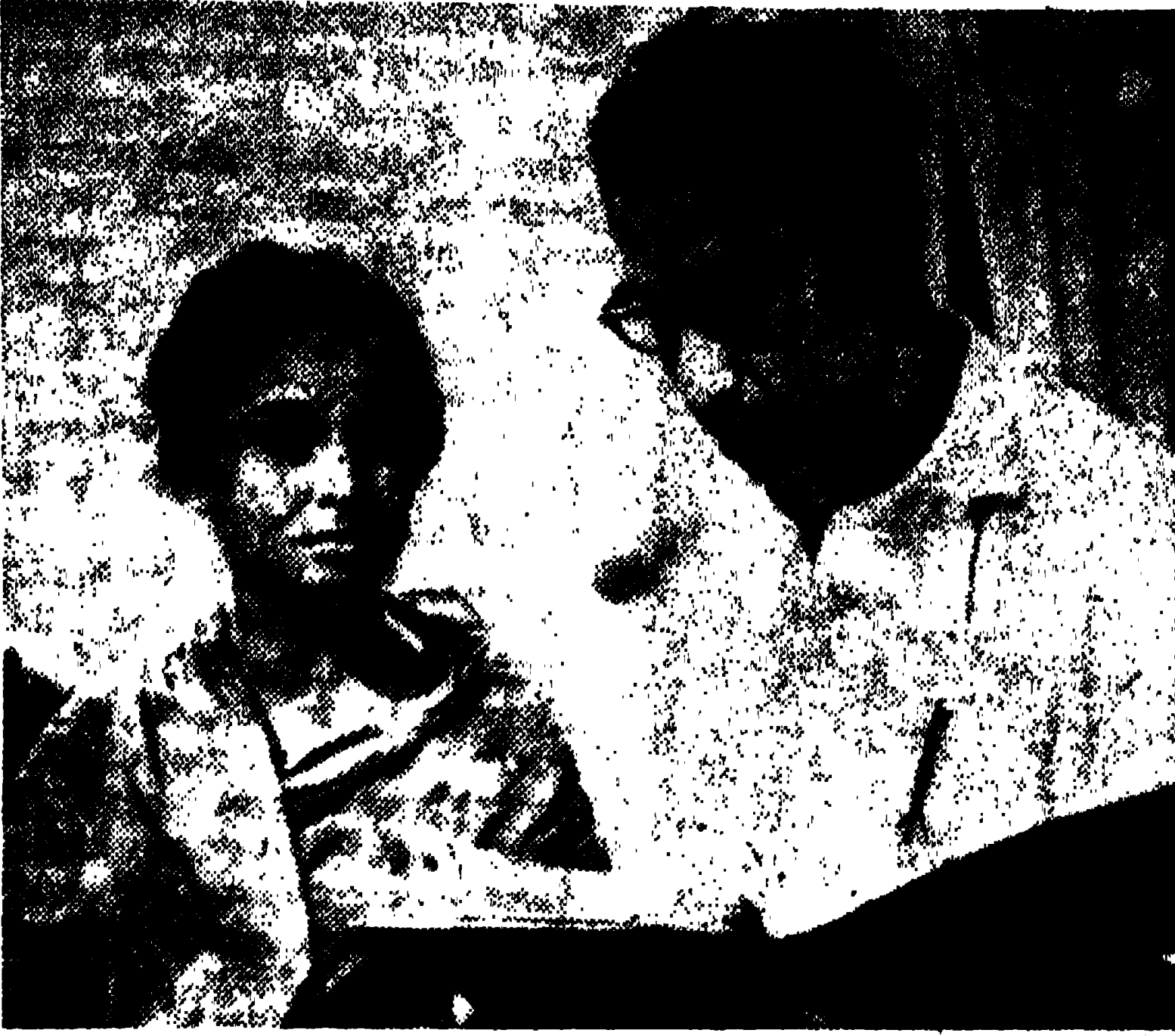
স্টুডিও থেকে

চৈতালী শেষ হওয়ার ফলে বিশ্বজিতের হাতে কোলকাতার আর কোনো ছবি রইল না। (তপেশ্বর প্রসাদের 'প্রতিবাদ'এর কাজ শেষ হয়নি বটে, তবে বাকিও নেই বেশী) একমাত্র বম্বেতে বিশ্বজিৎ নিজে যে ছবিটা করবেন সেটি ছাড়া।

সে ছবির নাম নিশ্চয়ই জানা আছে সবার। তবুও বলি ছবির নাম 'রক্ততিলক।' বিশ্বজিৎ ও'র বিপরীতে নায়িকা হিসাবে কনট্রাক্ট করেছেন সুন্দরী হেমা মালিনীকে। এবং এ-ও শুনলাম নায়িকাকে বাংলা শেখানোর জন্য বিশ্বজিৎ একজন মাস্টারও রেখেছেন নিজের খরচায়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা জানাই, হয়ত আপনারা অনেকেই জানেন না হেমা মালিনীর মা বাঙ্গালী। অবশ্য হেমা ছোটবেলা থেকে অন্য পরিবেশে মানুষ হওয়ার দরুন বাংলা ভাষাটা তেমন করে আয়ত্ত করতে পারেনি, তাই সহৃদয় প্রযোজক বিশ্বজিতের এই ব্যবস্থা গ্রহণ।

'রক্ততিলক' পরিচালনা করবেন বিশ্বজিতেরই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অজয় বিশ্বাস আর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাজ বম্বেতেই হবে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। দানধ্যান সম্পর্কে বিশ্বজিতের যথেষ্ট সুনাম আছে। বাংলাদেশের দর্শক তাঁকে বাংলা ছবিতে আগের মত আর না পেলেও এখানকার চিত্রজগতের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক দুর্বলতার কথা তিনি জানেন। বাংলা চিত্রজগত বিশ্বজিতের কাছ থেকে শুধুমাত্র বৎসরে কয়েকবার কিছু দান নেবার আশাই করে কি? তিনি ছবি প্রযোজনা করছেন সংবাদ জেনে বম্বের দর্শক ও চিত্রজগত তাঁকে কতটা সম্মান দিচ্ছে তার খোঁজ এখানকার দর্শক রাখে না, কিন্তু কোলকাতার বিশ্বজিৎ ছবি করছেন—এ সংবাদ এখানকার সাধারণ দর্শক ও চিত্রমহলে সাড়া জাগিয়েছে অনেকখানি। এবং তার কিছু সাড়া বিশ্বজিৎ নিজের মনেও বুঝতে পারছেন আশা করি।

কাজেই তিনি কি পারতেন না 'রক্ততিলকে'র কাজ কোলকাতাতেই কোনো ভাড়া স্টুডিওয় করতে? হয়ত খরচ কিছু বেশী হবে, কিন্তু মৃত্যু পথ যাত্রী বাংলার চিত্রজগতের কথা তাঁর অন্তত একবার ভাবা উচিত। জানি কোলকাতায় রাজনীতি আছে, নোংরামি আছে, তবুও এখান থেকেই উনি বম্বে গেছেন, তাঁর জনপ্রিয়তার মূলতো এখানেই। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে বাংলা দেশ বৎসরান্তে দু-একটা দানের আশাই শুধু করে না, রুজি-রোজগারের এক-আধটা কানাগলিও অন্তত খুঁজে পেতে চায়।

●

গ্রাম বাঙলার চিরন্তন সুখদুঃখ-সংঘাত আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে "সতীশ ডাক্তার" একটি মূর্ত জেহাদ। পল্লীগ্রামের সবুজসুন্দরের আড়ালে যে বেদনা আর কান্না রয়েছে, এই ছবির কাহিনী তার মূল বিষয়বস্তু। দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ● সুকুমার বসু প্রযোজিত চিত্রারণ প্রোডাকসন্স-এর প্রথম অর্ঘ্য "সতীশ ডাক্তার" ছবির কয়েকটি গান শৈলেস রায়ের সুরে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে ইতিমধ্যে বাণীবন্ধ হয়েছে। চিত্র ও মঞ্চের জনপ্রিয় সাংবাদিক দিলীপ দত্ত এই ছবির কাহিনী

কুহেলীর সেটে সুমিতা সান্যাল এবং ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়।

ফটো : অমৃত

রচনা ও পরিচালনা করছেন। চিত্রনাট্য-সম্পাদনা-চিত্রগ্রহণে আছেন যথাক্রমে পরিতোষ চক্রবর্তী, রবীন দাস ও শংকর গুহ। বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত শিল্পী-সমন্বয়ে গঠিত এই ছবিতে কয়েকটি নতুন মুখ দেখা যাবে। বর্তমান ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কাহিনীকার-পরিচালক দিলীপ দত্ত তাঁর ইউনিটসহ, বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য বীরভূম যাত্রা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

●

বহুদিন বাদে কলকাতার সব স্টুডিও-গুলোয় কাজ চলছে দেখতে পেয়ে ভালো লাগল। অনেকদিন এমনটি চোখে পড়েনি। কনক মুখার্জীর 'দাবী', বিজয় বসুর 'নবরাগ', বিভূতি লাহার 'মঞ্জরী অপেরা', সলিল সেনের 'রাজকুমারী', সুনীল বসু-মল্লিকের 'জয়-জয়ন্তী' ইত্যাদি নিয়ে পাঁচটা স্টুডিওই জম-জমাট।

হয়তো আবার আসছে সপ্তাহে মন্দা যাবে স্টুডিও পাড়া। তাতো হয়ই! জোয়ার ভাঁটাইতো নিয়ম। তবে এখন যে সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর হাওয়া বয়ে চলেছে সারা সিনেমা রাজ্য ঘিরে চিরদিন এমনটি চলুক এটাই কাম্য।

—নির্মল ধর

মঞ্চাভিনয়

চলন্তিকা'র 'সাঁওতাল বিদ্রোহ': পরাধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে মুক্তির দাবীর কথা যেদিন আকাশ বাতাস ধ্বনিত করেছিল সে সময়টা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। বাংলার যে সব নাটক এই অধ্যায়ের ঘটনাকে সংঘাতের দুর্বারতায় মুখর করে তুলেছে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাসি, মহুয়ার আবেশে নীড় বেঁধে যেসব সহজ, সরল সাঁওতালেরা বাস করতো, যাদের দিন বয়ে যেতো মাদলের তালে তালে, তাদের ওপরও এসে পরলো নীলকুঠি সাহেবদের অত্যাচারের নির্মম নগ্নতা। [illegible]-শাসিত মাথা, সাঁওতালদের জীবনটা দ্বন্দ্বে কেঁপে উঠলো। কিন্তু সংগে সংগে অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সংঘবদ্ধ হোল সাঁওতালেরা। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' একেই নাটকীয় সংঘাতের আবর্তে ভাষা দিয়েছে। মধ্যমগ্রাম বঙ্কিম-পল্লীর প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'চলন্তিকা'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি এ নাটকের সফল প্রযোজনা করে স্থানীয় নাট্যানুরাগী-দের অকুণ্ঠ অভিনন্দন অর্জন করেছেন। এই নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে মফঃস্বল নাট্য-গোষ্ঠী হিসাবে 'চলন্তিকা'র স্বাতন্ত্র্য দ্বিধা-হীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হোল।

নাটকের প্রতিটি শিল্পী আন্তরিকভাবে চরিত্রের অতলে ডুব যেতে পেরেছিলেন বলে নাট্যাভিনয়ে প্রাণের ছোঁয়া ছিল সব সময়েই। সাঁওতালদের দুর্বোধ্য ভাষা কি অনায়াসে শিল্পীরা আয়ত্ত করেছিলেন। এই সব ব্যাপারেই নির্দেশক সুবোধ রায়চৌধুরীর নিঃসীম নিষ্ঠাই স্পষ্টতা পেয়েছে। অভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখান যাঁরা তাঁরা হোলেন প্রভাত ঘোষ (কিত্তা), সুভাষ মিত্র (সিধু), সুবোধ রায়চৌধুরী (কানু), মনতোষ বসু (মংরী), রমেশ রায়চৌধুরী (মহেশ), সমীর কর (রিচার্ডসন), দীপ্ত চক্রবর্তী (তুফানি)।

অসাধারণ অভিনয় করেন অলিনা মিত্র 'সুখিয়া' চরিত্রে। চরিত্রটির সাথে তিনি নিজেকে একেবারে বিলীন করে দিতে পেরেছিলেন। শ্রীমতী মিত্রের চরিত্র-চিত্রণ নিঃসন্দেহে সমগ্র নাট্যপ্রযোজনার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন অমর ঘোষ, অজিত মুখার্জী, মাখন ঘোষ, সাধু কর, রতন ঘোষ।

নাটকটির মঞ্চসজ্জা স্বাভাবিকতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

সমাজ-দর্পণ: সম্প্রতি চন্দননগর থিয়েটার সেন্টারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সংস্থার তরুণ নাট্যকার দিলীপ দে রচিত 'সমাজ-দর্পণ'নাটকটি স্থানীয় নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দিরে সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ হয়ে গেল। নির্দেশনা এবং সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও বাসুদেব গোস্বামী। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার নানা সমস্যা ও সমাধানের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে এ নাটকে। অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন বাসন্তী চ্যাটার্জী, প্রেমাংশু বসু ও দিলীপ দে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মৃণাল দত্ত, শৈলেন মুখার্জী, পান্নালাল চ্যাটার্জী, উদয় রায়, আশা দেবী, লতা দেশী, নিতাই দত্ত, লক্ষ্মীরঞ্জন ব্যানার্জী ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং সাংবাদিক রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

চণ্ডালিকা: বর্ধমান গত ৬ জুন রাত্রে ফেডারেশন অফ মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভস এসোসিয়েশনস অফ ইণ্ডিয়ার ৭ম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বর্ধমান রেলওয়ে
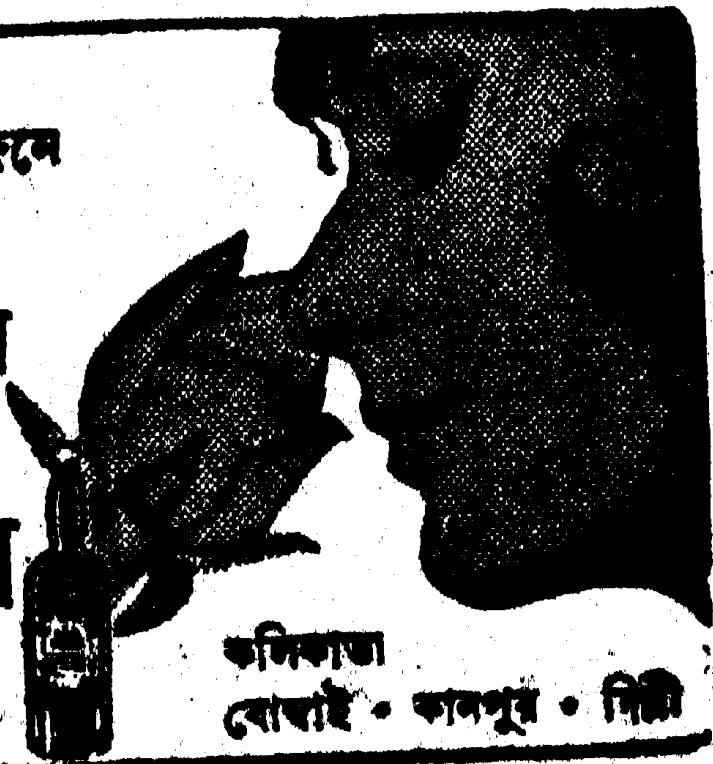
[illegible]ভবনে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির ভূমিকায় কৃষ্ণা রায়, মায়ের ভূমিকায় স্বপ্না সেনগুপ্তা ও অন্যান্য ভূমিকায় মানসী ঘোষ, রত্নাবলী ঘোষ, রিঙ্কু ভাদুড়ী, অরুণা দে, কৃষ্ণা হালদার, পূর্ণিমা হালদার, মিতা পাল ও মনানী চৌধুরী সুঅভিনয় করেন। সংগীতাংশে সংগীত পরিচালক নির্মলেন্দু বিশ্বাস, মীরা চৌধুরী ও কাজল বোস দর্শকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা অর্জন করেন। কাজল রায় মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভস এসোসিয়েশনের-এর পক্ষ থেকে শিল্পীদের অভিনন্দন জানান। সংস্থার সম্পাদক অসিত চক্রবর্তী উদ্যোক্তাদের ও উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীদের ধন্যবাদ জানান।

এখানে পিঞ্জর-এর সেটে পরিচালক অভিনেতা দিলীপ মুখার্জি অপর্ণা সেনকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি: গত ২২ মে মহাজাতি সদনে 'রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি' প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উদযাপন করলেন তাদের ৬৩তম বার্ষিক উৎসব। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটি সুসজ্জিত করেন এ'রা। বেদ পাঠ, স্বস্তিবাচন ইত্যাদিতে সূচনা হয় শুভ উৎসবানুষ্ঠানের। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শার্মিষ্ঠা ঘোষ। স্বাগত সম্ভাষণ জানান সমিতির সভাপতি জননেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসু। তৎপরে অনুষ্ঠিত হয় যোগব্যায়াম প্রদর্শন, আবৃত্তি, নৃত্য, গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠান। সভাপতি ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণের পর সাংস্কৃতিক শাখার সভ্যরা অভিনয় করলেন 'ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর পৌরাণিক নাটক 'বামনাবতার'। শিশু-শিল্পীগণের নাচ গান অভিনয় দর্শকদের বিমোহিত করে রাখে। নাটকটির পরিচালনা করেন শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ। সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা শ্রীনলিনীকান্ত করণ। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুনীতি দাস, কার্তিকচন্দ্র দাস, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, কৃষ্ণা দাস, ঝুমা ঘোষাল, প্রভাত ঘোষ, দীপালী দাস, দুলাল ঘোষ, বীরেন্দ্র ঘোষ, শিবরঞ্জন ভট্টাচার্য, শিবসুন্দর সিংহ, কানাই ঘোষ, রাধিকা-মোহন মুখার্জি, রবীন্দ্র দে, রবি ঘোষ, সাধনা দত্ত, সুষমা দাঁ, শিপ্রা, মালা, বুলা, মন্দিরা, জয়া, রীণা, কল্পনা ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীহেমন্তকুমার বসু। প্রখ্যাত নট হরিপদ দাসের আকস্মিক পরলোকগমনে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীগোকুল মুখার্জী। পল্লীর 'বাঁশতী কবি-রাজ শ্রীহেরম্বনাথ শাস্ত্রীপ্রাণাচার্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়ায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে ধন্যবাদ জানান সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিপুরানন্দ মহারাজ।

তরুণ অপেরার হিটলার: ২০ জুন মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরার হিটলার অভিনীত হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়।

'আমরা সবাই': সম্প্রতি চেতলার আমরা সবাই এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠান করেন তাঁদের নিজস্ব প্রাঙ্গণ পিয়ারীমোহন রোডে। এই সংস্থার শিশু বিভাগ, শ্রীঅমিত ব্রহ্মের নির্দেশনায় 'ডাক-ঘর' মঞ্চস্থ করে। শিশু শিল্পীদের মধ্যে অমল, পিসেমশাই ও সুধার অনবদ্য অভিনয় দর্শক মন জয় করে। এই অনুষ্ঠানে অকুণ্ঠ প্রশংসা পায় 'ঋতুরঙ্গ'। শ্রীমতী কুমকুম দত্তের নৃত্য পরিচালনায় কুমারী মুনমুন দত্ত ও কম্প্র সর্বাধিকারী বিশেষ দক্ষতা দেখান। কণ্ঠসংগীতে শ্রীমতী অনুরাধা ঘোষ ও বুলাই ব্রহ্ম বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। সর্বোপরি যন্ত্রসংগীতে শ্রীরামমোহন ভট্টাচার্য সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী: লণ্ডনে 'সাগর পারে পত্রিকার তরফ থেকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন করা হয় ৩১ মে। সভায় প্রধান অতিথি হন ডেম সিবিল থর্নডাইক। লা কন্টিনেন্টাল সিনেমায় শান্ত পরিবেশে শ্রীমতী থর্নডাইক রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মালা পরিয়ে দেন। তারপর বলেন, যুবক রবীন্দ্রনাথের কথা। কবিগুরু লণ্ডনে এলেই তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। নিজের কবিতা পড়তেন। গান শোনাতেন। তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু ভারতের জন্য নয় সর্ব দেশের সর্বকালের জন্যে।

ডেম সিবিল থর্নডাইকের বয়েস ৮৮। লাঠিতে ভর করে অতি কষ্টে দাঁড়াচ্ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। হাত তুলে নাচের ভংগীতে বলে যান। তার সুললিত কণ্ঠে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে থাকে। তারপর রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান হয়। অংশ গ্রহণ করেন তৃপ্তি দাস, সুগত দাস, পম্পা ধর,

তরুণ অপেরার 'হিটলার' পালায় নাম-ভূমিকায় শান্তিগোপাল

ছবি বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ঝিঁঝি পোকার কান্না নাটকের একটি দৃশ্য।

মঞ্জুলা বিশ্বাস ও মঞ্জুশ্রী সরকার। তবলা বাজান প্রসূন রায় ও প্রসূন চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে 'সাগর পারে' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার প্রচ্ছদপট সৈয়দ মুজতবা আলীর আঁকা। বাংলা দেশের ছবি। সব লেখা উচ্চ মানের।
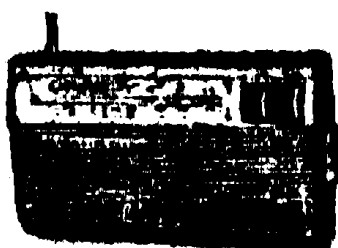
সাগর পারের সম্পাদক বিজয়ের কৃতার্থ মনেন, পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলা থেকে তাঁদের পত্র প্রকাশের এই পত্রিকা। বিদেশের বাঙালীদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রক্ষার আশা এর উদ্দেশ্য। অতঃপর দেশের অতীত মতীয় সংস্কৃতি প্রসারে জানান। সভার বহু বিশিষ্ট ভারতীয়, পাকিস্তানী ও ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী ঃ গত ৩ ও ৪ জুন আসানসোল রবীন্দ্রজন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে সুকান্ত ইনস্টিটিউটে কবিগুরুর শততমতম জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও সম্প্রদায়ের গাওয়া নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত। দ্বিতীয় দিন সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'সুরমন্দির'-এর শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। বিশেষত সারিকা প্রকৃতির গানে শ্রীমতী পাপিয়া বাগচী (অপর্ণা) অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

এবারে বার্লিন মেলায়

আর মাত্র কয়দিন বাকি। তিরিশে জুন সন্ধ্যায় বার্লিনের জুপালাস্ট প্রেক্ষাগৃহ শহরের মেয়র আর আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত অতিথিদের নিয়ে মুখরিত হয়ে উঠবে। সব আয়োজন প্রায় শেষ। উৎসবের প্রধান শ্রীআলফ্রেড বাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কুড়ি বছরের তরুণ এই চিত্রোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে। আয়োজনের মহড়া দেখে মনে হয় কাঁ বা ভেনিসের তুলনায় বার্লিন আর এতটুকুও পিছিয়ে নেই। বিশেষভাবে গুণগত বিচারে।

এ পর্যন্ত আঠাশটি দেশ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছে। কেউবা এক আবার কেউবা একাধিক ছবি নিয়ে উৎসবে যোগ দিচ্ছেন এবার। 'লা ইম্মরতাল' ও 'ট্রান্স ইয়োরোপী-য়ান এক্সপ্রেস' খ্যাত ফরাসী চিত্র পরিচালক অ্যালা রোব গ্রিলেৎ এর 'লা ইডেন এবং অ্যাপ্রে' ফরাসী প্রতিযোগী হিসাবে নামছে আসরে। গ্রিলেৎ-এর ছবি বার্লিনে এই প্রথম নয়, এর আগে দুবার তার ছবির প্রদর্শনী হয়েছে সেখানে। য়ুনিভার্সিটির একদল ছাত্র-ছাত্রী তাদের বোহেমিয়ান জীবন, প্রেম-ভালবাসা, মৃত্যু, রাজনীতি নিয়ে ছবির গল্প। আমেরিকা পাঠাচ্ছে এবার দুটো ছবি—'ডায়ানোসিস ইন ৬৯' ও 'আউট অফ ইট।' প্রথম ছবির পরিচালক ব্রায়ান দা পালমা গত বছর 'গ্রিটিং স' ছবির জন্য রৌপ্য ভল্লুক পেয়েছিলেন। সত্যজিৎ-বাবুর কাছে শুনেছিলাম 'মিড নাইট কাউবয়' ছবির নায়ক জন ভয়েট নাকি অসম্ভব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন—অনেকের আশা ছিল সেরা অভিনেতার পুরস্কার বুঝি ভয়েটের হাতেই যাবে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক তা হয়নি। এবারে আমেরিকা থেকে জন ভয়েটের ছবি আসছে 'আউট অফ ইট।' দেখা যাক এবার কি ঘটে? শোনা যাচ্ছে 'মিডনাইট কাউবয়ে'র চাইতেও ভালো অভিনয় করেছেন নাকি এ ছবিতে।

ইতালী এবারও পাঠাচ্ছে দুটো ছবি। বার্নার্ডো বেরতোলুচির 'দি কনফরমিস্ট' (আলবার্তো মোরাভিয়ার কাহিনী) আর তিন্তো ব্রাসের 'লা উর্লো।' আজকের ইতালীর চিত্রজগতে আন্তোনিওনি বা ফেল্লিনির চাইতেও কোনো কোনো মহলে বেশ জোর গলায় নাম দুটি বলা হচ্ছে তা হল এক—বেরতোলুচি অপরটি বেলোশিওর। 'দি কনফরমিস্ট' মোরাভিয়ার জনপ্রিয় উপন্যাস। বেরতোলুচি যথাসম্ভব সাহিত্য-রস বজায় রেখেই চিত্রায়িত করেছেন কাহিনীটিকে। তিন্তো ব্রাসের ছবি কিছুটা সুররিয়ালিস্টিক ধাঁচের অ্যাডভেঞ্চার।

গতবারে সুইডেনের 'মেড ইন সুইডেন' পুরস্কৃত হয়েছিল। এবারে সেখান থেকে আসছে 'কালে'ক হিস্টোরিয়া।' পরিচালক—রয় এন্ডারসন। ইনি ইতিপূর্বে বো ওয়াই-ডারবার্জের 'অ্যাডলেন-৩১' ছবির সহকারী প্রযোজক ছিলেন। এটাই তাঁর প্রথম ছবি। যদিও প্রথম ছবি, তবে গতবারের সম্মান যাতে এবার অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই ছবিটা নির্বাচিত হয়েছে আশা করা যায়।

অন্যান্য যে কটি দেশ ছবি পাঠাচ্ছে তারা হোল বেলজিয়াম (গ্রাণ্ড গুইগনল—প্যাট্রিক লিদু), ইস্রায়েল (এ [illegible]স্টমার ইন দি ডেড সীজন—মোশে [illegible]রাহি), স্পেন (এল জার্ডিন দা লস দি[illegible]য়াস—কার্লোস সাউরা, আর্জেন্টিনা (লস হেরিডে রোম—ডেভিড স্টিভেল), ব্রেজিল (ও প্রফেতা দা ফোম—মা[illegible]স [illegible]পোভিল্লা), আর আছে ভারতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি।' কানাডা যুগোশ্লাভিয়া, বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড, অস্ট্রে-লিয়া ছবি পাঠিয়েছে—এখনও প্রাক উৎসব প্রদর্শনী হয়নি সে সব ছবির। তবে প্রতি-যোগিতায় এসব দেশও থাকছে নিশ্চিত।

সপ্তাহব্যাপী ইয়ং ফিল্ম বিভাগে এবার দেখানো হবে ল্যাতিন আমেরিকার যে কটি দেশের ছবি সেগুলি হলো বলিভিয়া, মেক্সিকো, উরুগুয়ে, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা ও ভেনিজুয়েলা আর রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগে দেখানো হবে ফ্রেড অ্যাস্টায়ার ও জিঞ্জার রজার্সের 'টপ হ্যাট', 'সুইং টাইম', 'কেয়ার ফ্রি' 'স্যাল উই ডান্স', 'দি গে ডির্ভোস', 'বর্বাতা' ও অন্যান্য ছবি।

সব মিলিয়ে এবারের আসন্ন বার্লিন মেলা নতুন চমক নিয়ে নতুনভাবে হাজির হবে। প্রস্তুতি জোর চলছে। ত্রুটি নেই এতটুকু।

—চিত্রলেখক

জলসা

তানসেন পান্ডের স্মৃতিতর্পণ ঃ তানসেন পান্ডে স্মৃতি পরিষদ ও যদু ভট্ট সংগীত-সমাজের পক্ষ থেকে কয়েকদিন আগে উত্তর কলকাতায় বিজয় ভট্টাচার্যের গৃহসভায় জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে স্বর্গত পণ্ডিত তানসেন পান্ডের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বর্তমান যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট ধ্রুপদীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভারম্ভে সংগীত-সমাজের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য মঙ্গলাচরণ এবং রমা ভট্টাচার্য ও পাপিয়া সরকারের জাতীয় সংগীতের পর ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ধ্রুপদীদের মাল্যদান করেন। সম্বর্ধিত ধ্রুপদীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপুরের বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সেনী ঘরানার মহম্মদ দবীর খাঁ, হরেকুটীরের উদয় ভট্টাচার্য, কলকাতার জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও জনাব ফহীমুদ্দিন ডাগর। এরপর উক্ত ধ্রুপদী সাধকদের ধ্রুপদ সংগীত এবং বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ধ্রুপদাঙ্গের সুরশৃঙ্গার বাদনে এক মর্যাদাগম্ভীর পরিবেশ গড়ে ওঠে। এঁদের সঙ্গে সুযোগ্য পাখোয়াজ সংগত করেন শ্রীরাজীবলোচন দে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান এ-উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা বিজয় ভট্টাচার্য ও জনাব ফহীমুদ্দিন ডাগরের যৌথ আলাপ ও ধ্রুপদ গানে মুগ্ধকারী অনুষ্ঠান মনে রাখবার মত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভাষণে সংগীতের প্রাচীন ঐতিহ্যরক্ষার সঙ্গে নব সৃষ্টির প্রয়াসের দ্বারা তার জীবনীশক্তি বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। প্রধান অতিথি হীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ধ্রুপদ সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে ডাগর ঘরানার বিখ্যাত গুণীদের এবং পান্ডেজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিন খাঁর আশ্চর্য সংগীতের প্রসারে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন।

পরিশেষে সভায় উপস্থিত গুণীবৃন্দ ও অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

'সৌরভ'-এ সোভিয়েত শিল্পী ঃ সম্প্রতি সাংস্কৃতিক সফরে ভারত সরকারের অতিথিরূপে ভারতে আসেন দুই সোভিয়েত শিল্পী—অটার গর্ডেলিক ও মির্জা জাদেহিম। কোলকাতায় থাকাকালীন একমাত্র 'সৌরভ' সংগীত-প্রতিষ্ঠান আয়োজিত 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' অনুষ্ঠানে এঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন। উভয় শিল্পীই ভারতের প্রাচীন শিল্প ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, গত বছর সুলতান গাজী বেকভ্ কোলকাতায় এসে এখানে সংগৃহীত ভারতীয় সংগীতের উপাদান অবলম্বনে রচিত তাঁর সংগীতের একটি ডিস্ক সৌরভ-এর সম্পাদিকা নমিতা মুখোপাধ্যায়কে উপহার দেন।

'সৌরভ'-এর ছাত্রছাত্রীরা গীটারে ও সেতারে রবীন্দ্রসংগীত এবং কয়েকটি কণ্ঠসংগীতে রবীন্দ্রগীতি পরিবেশনের পর 'প্রেম ও পূজা' শীর্ষক একটি গীতিনাট্য আলেখ্য মঞ্চস্থ হয়। সংগীতাংশে বাণী ঠাকুর, কল্যাণ মুখার্জি, রুচিরা মুখার্জি, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা ঘোষ এবং অন্যান্য সবাই এবং নৃত্যে ছিলেন দীপালি রক্ষিত, অসীমা ঘোষ ও মণিকা দে।

বীণাপাণি সংগীত সমাজ ঃ দক্ষিণ শহরতলীর বেহালার শৌখিন নাট্যসংস্থা 'বীণাপাণি সংগীত সমাজে'র সভাগণ গত ৩০ ও ৩১ মে যথাক্রমে প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল চক্রবর্তীর পরিচালনায় শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটকদুখানি স্থানীয় এ পি রায় ইনস্টিট্যুটে সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করেন। গোলাম হোসেন ও শংকরের ভূমিকাদুটিতে প্রাণবন্ত অভিনয় করে যথেষ্ট নাট্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন সুনীল ভট্টাচার্য। সত্যপ্রসন্ন, অলক, উৎপল, সিরাজ ও ওয়াটসের ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনয়ের পরিচয় দেন প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর দাস, অমূল্য চক্রবর্তী ও নবদ্বীপ রায় ও অন্যান্য ভূমিকায় সুশীল ভট্টাচার্য, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ পাল, সুরেশ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ গোস্বামী, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, অর্চনা গঙ্গোপাধ্যায় ও সেবা দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। আবহসংগীতে বারীন চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায় ও দুদিন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলন ঃ সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের দশদিনব্যাপী একাদশ বার্ষিক নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা বালিগঞ্জস্থিত তীর্থপতি ইনস্টিটিউশানে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগী এ-বছর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। যে সকল সংগীতবিদ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন চৌধুরী, বিভূতি দত্ত, রথীন চৌধুরী, প্রদ্যোৎ নারায়ণ, ভূপেশ মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, কালীপদ দাস, হিমাদ্রি রায়চৌধুরী, নীহারবিন্দু চৌধুরী, সুনীলরঞ্জন বসু, স্বপন মুখোপাধ্যায়, কান্তি মৈত্র, গৌর বসাক ও আরও অনেকে। যে সকল প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল ঃ

খেয়াল ঃ কৈকেয়ী রায়, কল্যাণী আচার্য, তোড়া সরকার, সবিতা সিংহ। ভজন ঃ সোনালী রায়, স্বপ্না মুখার্জি, স্বস্তিকা চক্রবর্তী, বীণা মণ্ডল অধিকারী, তপন ঘোষ। রাগপ্রধান ঃ কৈকেয়ী রায়,

[illegible] দত্ত, অজন্তা পাল, উমা কর, তপন ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত : বর্ণালী গুপ্ত, [illegible] গুপ্ত, সুতপা ঘোষ, সুস্মিতা [illegible]চৌধুরী, প্রশান্ত সরকার। আধুনিক : [illegible], মল্লিকা ব্যানার্জি, স্বস্তিকা চক্রবর্তী, উমা কর, তপন ঘোষ। অতুল-প্রসাদ : অনুরাধা চ্যাটার্জি, শাশ্বতী গুপ্ত, জোড়া সরকার, বীণা মণ্ডল অধিকারী, সুকুমার [illegible]। ভাওয়াসংগীত : অনুরাধা দত্তগুপ্ত, স্বপ্না মুখার্জি, স্বস্তিকা চক্রবর্তী, বীণা মণ্ডল অধিকারী, তপন ঘোষ। পল্লীগীতি : মানসী দাশ, সুস্মিতা দাশ, আরতি দত্ত, বীণা মণ্ডল অধিকারী, চন্দ্রকান্ত দাস। হিমাংশুগীতি : কৈকেয়ী রায়, লক্ষ্মী গুপ্ত , আরতি দত্ত, উমা কর, গৌতম বসু। গীটার : ছন্দা দত্ত, অরুণ দাস, শুভতোষ মজুমদার।

একটি স্মরণীয় সংগীতাসর : বোধহয় মাস-দুই আগে 'কৌশিকী' নিবেদিত অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি একক সংগীতের আসরে উপস্থিত হবার ও শিল্পীর নিজস্ব রসলোককে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটেছিলো এবং তাঁর আবেগ ও প্রকাশব্যক্তিত্বের বিশেষ ধারাটির সঙ্গে পরিচয়ে আনন্দ দিয়েছিলো। এবার শিল্পী-রূপে তাঁকে দেখলাম বিস্তৃততর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসদনের একক আসরে। অনুষ্ঠানটির পরিবেশক কালীঘাট তরুণ সংঘ।

আগেরবারেরই এক সংস্করণ হলেও, শিল্পীর গায়নশিল্পী এবার যুগপৎ আনন্দিত এবং শঙ্কিত করেছে।

আনন্দিত এই কারণে যে, কবিগুরুর দিগন্তে ভাবলোককে ক্রম-উন্মোচনের যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ থাকলে প্রতিটি গানের মর্মবাণী শ্রোতার অন্তরে সঞ্চারিত হতে পারে নিষ্ঠা অনুশীলন ও যথাযথ অধ্যয়ন দ্বারা সেই শিল্পবোধের অধিকার এই তরুণ শিল্পী অর্জন করেছেন। আশংকা এই কারণে যে সম্ভাবনার উজ্জ্বল আশ্বাস পাওয়া গেল, মাঝপথে তা হারিয়ে যাবে না তো?

এই ধরনের রবীন্দ্রসংগীতের আসরের অবতারণা বোধহয় অশোকতরুই প্রথম করলেন এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস ও শিল্প-কৃতি উল্লেখযোগ্য সার্থকতায় তাঁকে অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছে। নৈলে রবীন্দ্রসদনের মত বিরাট প্রেক্ষাগৃহ দীর্ঘ দু'ঘণ্টাব্যাপী পরি-পূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলী নিয়ে অমন নিঃশব্দচারী হয়ে থাকত না।

অনুষ্ঠান শুরু হোল ব্রহ্মসংগীত নিয়ে। তারপর কবির অপরিণত বয়সের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসের গান (যাই, যাই ছেড়ে দাও) ভাবগম্ভীরতা (ডেকো না আমারে)। অনুভব-বৈচিত্র্যে (যেতে যেতে একলা পথে) কৌতুক-গীতি, রামপ্রসাদীর বিচিত্র অনু-ভবের পথ বেয়ে পৌঁছল 'খেলার সাথী বিদায়দ্বার খোলো'-তে।

প্রায় প্রতিটি গানই আপনাপন ভাবে যেন কয়েকটি সরস মুহূর্ত রচনা করেছে।

শিল্পী পূর্বে মাত্রায় রাবীন্দ্রিক। উপযুক্ত শিক্ষার ভিত্তি এই ধারাকে পরিপুষ্ট করবার সহায়ক হয়েছে। সুরেলা কণ্ঠ বলিষ্ঠতারও অভাব নেই, সুরের শুদ্ধতাও লক্ষ্য করবার মত। কিন্তু নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অতি-ব্যাকুলতা, রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক শ্রোতা ও এখনকার শ্রোতাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টির আশঙ্কা আছে।

কারণ, রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বেরই সম্পূর্ণ প্রকাশ। এখানে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ খুবই কম। রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধিই এখানে প্রধান। শিল্পীর আত্মোপলব্ধির প্রকাশ-মাধ্যম এ সংগীত নয়। কিন্তু সেদিন অশোকতরুর গান শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছিলো নিজেকে প্রকাশের তাগিদে তিনি রাবীন্দ্রিক সীমাকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন না ত? রবীন্দ্রনাথ নিজের গান সম্বন্ধে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর ছিলেন বলে শুনেছি। তা যদি হয়, তবে গোঁড়া রবীন্দ্রসংগীতপন্থীরা এ প্রগতিশীলতা কতটা পছন্দ করবেন জানি না অথচ শিল্পীর সৃজন-প্রয়াসকেও তুচ্ছ করা যায় না।

আর একটা কথা। নিবিড় রসে শ্রোতাদের মনকে অবগাহিত করার চরম মুহূর্তে অকস্মাৎ কৌতুক-গীতির অবতারণা একটু রসহানি ঘটায়নি কি? যদিও পরমুহূর্তেই শিল্পী এ ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছেন 'এসেছিলে তবু আস নাই' ও 'পিনাকেতে লাগে টংকার' দিয়ে। ভাব থেকে ভাবান্তরে যাবার অনায়াসদক্ষতা অভিনন্দনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু অশোকতরুবাবুর ওপর আমাদের আশা অনেক, তাই তাঁর অনুরাগী শ্রোতা হিসেবে অনুরোধ জানাব—ভবিষ্যতে ভার-সাম্যের দিকে আর একটু নজর রাখতে।

সঙ্গত-সঙ্গীতে কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ (বাঁশী), দীনেশ চন্দ (সেতার), রমেশচন্দ্র ও জহর দে (তবলা) বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন এইজন্যে যে, অর্কেস্ট্রেশনের প্রলোভন সংযত করে এঁরা প্রতি গানের ভাবানুসারী হয়ে উঠেছেন যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু বাজানোর মধ্যেই নিজেদের সীমিত রেখে।

*

গত ১৬ ও ১৭ মে কৃষ্টিতীর্থের দ্বি-বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম দিনটি রবীন্দ্র-দিবস হিসাবে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশচীন সেনগুপ্ত। গত দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে কবিগুরুর নৃত্যনাট্য শ্যামা ও শাপমোচন অভিনীত হয় সংস্থার সভ্য ও সভ্যাগণ কর্তৃক। যদিও বহু-অভিনীত এই নৃত্য-নাট্যদ্বয় সম্বন্ধে সকলেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ তবুও এই সংস্থা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

শ্যামা ও বজ্রসেনের ভূমিকায় শ্রীমতী অশোকা ব্যানার্জি ও দেবকান্তি রায়ের নৃত্য অপূর্ব হয়েছে। কোটালের চরিত্রে শ্রীমতী অনীমা সে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। সংগীতে শ্যামা—শ্রীমতী অন্ন-পূর্ণা দত্ত, বজ্রসেন—শ্রীনবগোপাল চক্রবর্তী, উত্তীয়—শ্রীদীপেন দত্ত ও কোটাল—শ্রীসমরীশ মুন্সী দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিতে পেরেছেন। শ্রীমতী বিজলী দাশ-গুপ্তের 'জীবন পরমলগ্ন' গানটি যেন দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে নৃত্যে শ্রীমতী দেবযানী গুহ, বাবলী রায়চৌধুরী গার্গী ভট্টাচার্য, গোপা নিয়োগী, প্রতিভা ভট্টাচার্য ও সংগীতে প্রতিমা ভট্টাচার্য, শোভনা ভট্টাচার্য, শম্পা নিয়োগী ও সুমিত্রা চ্যাটার্জি। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পীদের দিয়ে 'স্বপন-পুরী' রূপকথার রূপায়ণ সত্যই একটি অপূর্ব সৃষ্টি। শিল্পীরা স্বভাবতঃ সব সমালোচনারই ঊর্ধ্বে, কারণ এরা এত ছোট যে, এদের ব্রতী হওয়াই একটা সাফল্য বলে গণ্য হবে। এতে অংশগ্রহণ করেছে—কুমারী মালা গোস্বামী, মৈত্রেয়ী দত্ত, গার্গী দত্ত, পলাশী বোস, ঝুমা মুখার্জি, রাতুলা চক্রবর্তী, শিলা পাল, শিখা পাল, মুক্তা মুখার্জি, শ্রাবণী পালচৌধুরী, মিঞ্জি মুখার্জি, চন্দ্রা সেনগুপ্ত, শম্পা ঘোষ, নূপুর পালচৌধুরী, লীলা রায়চৌধুরী, ছন্দা সেনগুপ্ত, চন্দনা ব্যানার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানের নৃত্যপরিচালনা করেছেন শ্রীগৌরীপদ মজুমদার।

*

গত ২৬ বৈশাখ, [illegible]বার, সুভাষ সরোবরে 'পলিগ্লট' ভা[illegible]শিক্ষা নিকেতনে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন [illegible] হয়। সভার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় ছিল জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, ইতালীয়ান, ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি দেশী ও বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন। অনুবাদ ও পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বহুভাষাবিদ শ্রীব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত জনমণ্ডলী বিদেশে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের বিষয়ে আলোচনা ও উৎসাহ দান করেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতাটি রাশিয়ান ভাষায় আবৃত্তি করা হয়।

সুরবিতানে নজরুল জয়ন্তী: গত ২৫ মে নজরুল জয়ন্তী দিবস উপলক্ষে খিদির-পুরে সুরবিতান সংস্থা এক নিষ্ঠাপূর্ণ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে কবির উদ্দেশে প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শ্রীপ্রভাতভূষণের পরি-চালনায় সংস্থার শিল্পীরা কয়েকখানি সুনির্বাচিত নজরুল গীতি পরিবেশন করেন। প্রতিষ্ঠানাধ্যক্ষ শ্রীরাখাল বসু অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং এক ভাষণে নজরুলের বহুমুখী প্রতিভার কথা এবং তাঁর মানবপ্রীতির কথা বলেন।

খেলার কথা

টমাস কাপ

মনোজ গুহ (ভারতবর্ষ)

দীপু ঘোষ (ভারতবর্ষ)

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন

ক্ষেত্রনাথ রায়

এশিয়া মহাদেশ বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে খেলাধুলার এই তিনটি আন্তর্জাতিক আসরে—বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা, পুরুষদের দলগত আন্তর্জাতিক টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা এবং সম্প্রতি মহিলাদের দলগত আন্তর্জাতিক উবের কাপ প্রতিযোগিতা। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান, টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এবং উবের কাপ প্রতিযোগিতায় জাপান তাদের বিরাট সাফল্যের সূত্রে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার মানচিত্রে এশিয়ার নাম উৎকীর্ণ করেছে। ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেবল টেনিস প্রভৃতি খেলা নিয়ে যেমন সরকারীভাবে বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসে ব্যাডমিণ্টন খেলায় সে রকম ব্যবস্থা আজও হয়নি। তবে এ নিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় বা খেলার অনুরাগীদের কোন খেদ নেই। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় টমাস কাপ এবং উবের কাপ জয় বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পুরুষদের দলগত টমাস কাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৪৮ সালের ২রা নভেম্বর (ডেনমার্ক বনাম আয়ারল্যাণ্ড)। মহিলাদের দলগত উবের কাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনেক পরে, ১৯৫৬ সালের ৩০শে আগস্ট (মালয় বনাম হংকং)।

বিশ্ববিশ্রুত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় স্যার জর্জ টমাস, বার্ট (আয়ারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড) পুরুষদের দলগত বিভাগের খেলায় বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে যে সুদৃশ্য কাপটি উপহার দেন তা তাঁরই নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। মহিলাদের দলগত বিভাগের খেলায় বিজয়ী দলের কাপটি দান করেছেন শ্রীমতী এইচ এস উবের, আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুতা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। এই দুই প্রতিযোগিতারই আসর বসে দু বছর অন্তর। এই দুই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা যথাক্রমে টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা এবং উবের কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা নামে সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পুরুষদের দলগত আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এ পর্যন্ত একমাত্র এশিয়া মহাদেশের মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া 'টমাস কাপ' জয়ী হয়েছে—মালয়েশিয়া ৪ বার এবং ইন্দোনেশিয়া ৪ বার। গত আটবারের টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছে—ডেনমার্ক ৩ বার, মালয়েশিয়া ২ বার, থাইল্যাণ্ড ১ বার, ইন্দোনেশিয়া ১ বার এবং আমেরিকা ১ বার।

পুরুষদের দলগত আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে মালয়েশিয়া উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৪৯, ১৯৫২ ও ১৯৫৫) টমাস কাপ জয়ী হয়। এই তিনবারের প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া যে ৩৬টি ম্যাচ খেলে তার ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ২৯ এবং পরাজয় ৭। যেসব খেলোয়াড় মালয়েশিয়াকে উপর্যুপরি তিনবার টমাস কাপ জয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ওয়াং পেং সুন, ওই তিক হক, ল তিক হক, ওং লিম, চ্যাং লিয়ং, এডি চুং, টেক চেই, টি এস খুন এবং ও পি লিম—প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইন্দোনেশিয়াও উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৮, ১৯৬১ ও ১৯৬৪) টমাস কাপ জয়ী হয়ে মালয়েশিয়ার রেকর্ডের সমান ভাগীদার হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার এই উপর্যুপরি তিনবার টমাস কাপ জয়ের প্রধান অবলম্বন ছিলেন—তান জো হক, ফেরী সোনেভিলে, এডি ইসুফ এবং তান কিং গোয়ান।

উপর্যুপরি ৩বার টমাস কাপ জয় এবং ১৯৫৮ সালে রানার্স-আপ হওয়ার পর মালয়েশিয়া পরবর্তী দুটি প্রতিযোগিতায় খুবই শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৯৬০-৬১ সালের প্রতিযোগিতায় এশিয়ান জোনের ২য় রাউণ্ডে মালয়েশিয়া ২—৭ খেলায় থাইল্যাণ্ডের কাছে পরাজিত হয় এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের

ত্রিলোকনাথ শেঠ (ভারতবর্ষ)

প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে তারা ২—৭ খেলায় ডেনমার্কের কাছে হেরে যায়।

পুরুষদের দলগত টমাস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ উপর্যুপরি দুবার (১৯৫২ ও ১৯৫৫) ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এই ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার পরই চ্যালেঞ্জ রাউন্ড বা প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। ১৯৫১-৫২ সালের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ৬—৩ খেলায় ১৯৪৯ সালের রানার্স-আপ ডেনমার্ককে পরাজিত করে পরবর্তী ইন্টারজোন ফাইনালে আমেরিকার কাছে অল্পের জন্যে ৪—৫ খেলায় যে হেরেছিল তা খুব অগৌরবের হয়নি। ১৯৫৪—৫৫ সালের ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে আমেরিকাকে ৬—৩ খেলায় হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়, কিন্তু ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩—৬ খেলায় ডেনমার্কের কাছে হেরে যায়। টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এ পর্যন্ত এই তিনজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলেছেন—মনোজ গুহ এবং দুই ভাই—দীপু ঘোষ ও রমেন ঘোষ। ১৯৬৬-৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় দীপু ঘোষ ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। গত পাঁচটি প্রতিযোগিতায় (১৯৫৮-৭০) ভারতবর্ষ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে—চারটি প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় এবং একটির দ্বিতীয় খেলায় ভারতবর্ষ হেরে গিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। যে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ উপর্যুপরি দুবার (১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে) জয়ী হয়েছিল তাদের কাছেই কিন্তু উপর্যুপরি দুবার (১৯৫৮ ও ১৯৬১) হেরেছে প্রথম রাউন্ডের খেলায়।

টমাস কাপ ফাইনাল

বছর	বিজয়ী	বিজিত	খেলা
১৯৪৯	মালয়েশিয়া	ডেনমার্ক	৮—১
১৯৫২	মালয়েশিয়া	আমেরিকা	৭—২
১৯৫৫	মালয়েশিয়া	ডেনমার্ক	৮—১
১৯৫৮	ইন্দোনেশিয়া	মালয়েশিয়া	৬—৩
১৯৬১	ইন্দোনেশিয়া	থাইল্যান্ড	৬—৩
১৯৬৪	ইন্দোনেশিয়া	ডেনমার্ক	৫—৪
১৯৬৭	মালয়েশিয়া	ইন্দোনেশিয়া	৪—৩
১৯৭০	ইন্দোনেশিয়া	মালয়েশিয়া	৬—২

দ্রষ্টব্য : মালয়েশিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়ার ১৯৬৭ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলাটি দর্শকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে পরিত্যক্ত হয়। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন এই খেলার আসর জাকার্তা থেকে নিউজিল্যান্ডে স্থানান্তরিত করায় ইন্দোনেশিয়া প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার সময় মালয়েশিয়া ৪—৩ খেলায় অগ্রগামী থাকায় তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

মহিলাদের দলগত আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে আমেরিকা উপর্যুপরি ৩বার (১৯৫৭, ১৯৬০ ও ১৯৬৩) উবের কাপ জয়ী হয়ে যে বিরাট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তা সহজে নষ্ট হবে না বলেই পণ্ডিত মহলের বদ্ধ ধারণা ছিল। আমেরিকার বিপক্ষে ফাইনালে খেলে ডেনমার্ক ২বার (১৯৫৭ ও ১৯৬০) এবং ইংল্যান্ড ১বার (১৯৬৩) রানার্স-আপ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৬ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে জাপান ৫—২ খেলায় উপর্যুপরি তিনবারের উবের কাপ বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করে সারা পৃথিবীর ক্রীড়ামহলকে হতবাক করে দেয়। উবের কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদানের বছরেই জাপান যে এরকম অভাবনীয় কাণ্ড করবে তা কেউ কল্পনা করেননি। এই সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন আসরে জাপানের কোন নামগন্ধ ছিল না। অপর দিকে আমেরিকা ছিল উপর্যুপরি তিনবারের উবের কাপ বিজয়ী এবং আমেরিকার অধিনায়ক শ্রীমতী জুডি হাসম্যান ৮বার অল-ইংল্যান্ড সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে বিশ্ববিশ্রুতা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। জাপানের অধিনায়ক কুমারী নোরিকো তাকাগি ছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন আসরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত খেলোয়াড়। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় তাকাগি ১২—৯ ও ১১—৭ পয়েন্টে শ্রীমতী জুডি হাসম্যানকে হারিয়ে দিয়ে রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে জাপান ৬—১ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার উবের কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। উবের কাপ প্রতিযোগিতায় এখন এশিয়া মহাদেশের জয়-জয়কার।

উবের কাপ ফাইনাল

বছর	বিজয়ী	বিজিত	খেলা
১৯৫৭	আমেরিকা	ডেনমার্ক	৬—১
১৯৬০	আমেরিকা	ডেনমার্ক	৫—২
১৯৬৩	আমেরিকা	ইংল্যান্ড	৪—৩
১৯৬৬	জাপান	আমেরিকা	৫—২
১৯৬৯	জাপান	ইন্দোনেশিয়া	৬—১

টমাস কাপে ভারতবর্ষ

খেলার ফলাফল

১৯৪৮-৪৯ : পরাজয়—১ম রাউন্ডে কানাডার কাছে ২—৭ খেলায়

১৯৫১-৫২ : জয়—থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ৯—০ খেলায়

জয়—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯—০ খেলায়

জয়—ডেনমার্কের বিপক্ষে ৬—৩ খেলায়

পরাজয়—আমেরিকার বিপক্ষে ইন্টার-জোন ফাইনালে ৪—৫ খেলায়।
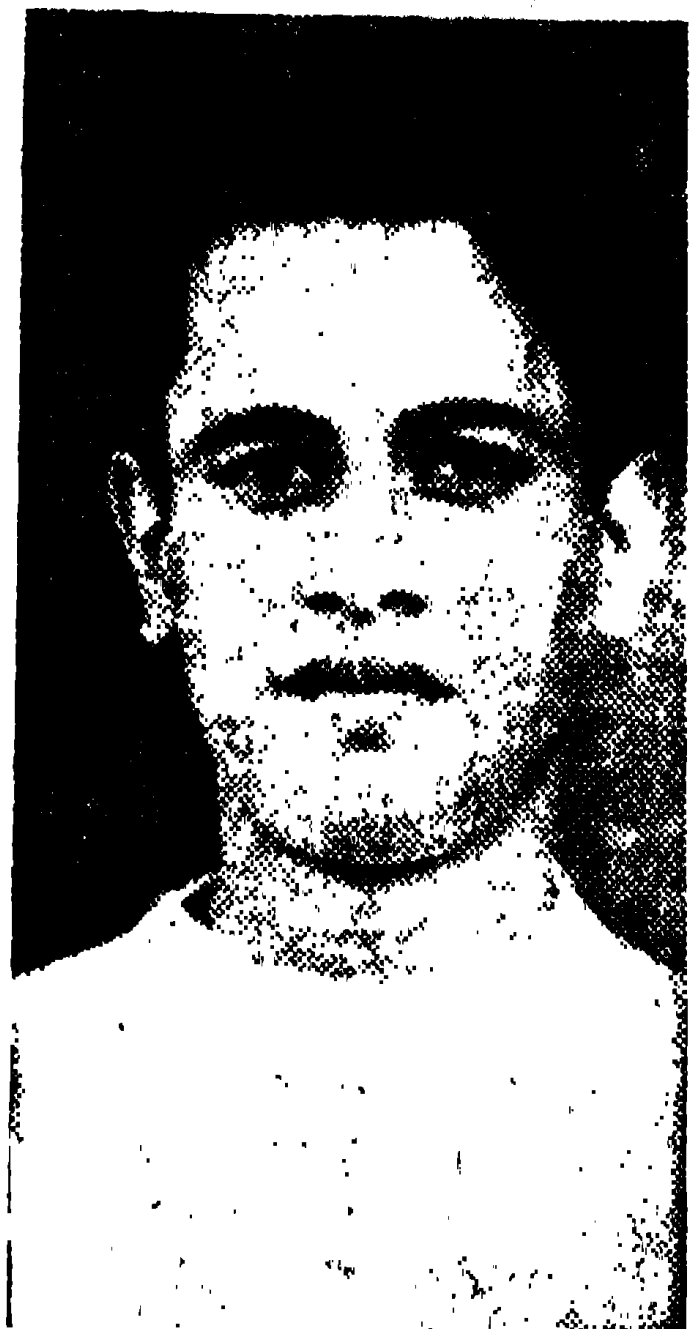
নান্দু নাটেকার (ভারতবর্ষ)

১৯৫৪-৫৫ ঃ

জয়—থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ৬—৩ খেলায়

জয়—পাকিস্তানের বিপক্ষে ১—০ খেলায়

জয়—হংকংয়ের বিপক্ষে ১—০ খেলায়

জয়—আমেরিকার বিপক্ষে ৬—৩ খেলায়

পরাজয়—ইন্টার-জোন ফাইনালে ডেনমার্কের কাছে ৩—৬ খেলায়

১৯৫৭-৫৮ ঃ

পরাজয়—থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ১—৮ খেলায়

১৯৬০-৬১ ঃ

পরাজয়—থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ৩—৬ খেলায়

১৯৬৩-৬৪ ঃ

জয়—দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭—২ খেলায়

পরাজয়—মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ১—৮ খেলায়

১৯৬৬-৬৭ ঃ

পরাজয়—মালয়েশিয়ার কাছে ১—৮ খেলায়

১৯৬৯-৭০ ঃ

পরাজয়—ইন্দোনেশিয়ার কাছে ২—৭ খেলায়

দ্রষ্টব্য ঃ ভারতবর্ষ ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালের প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান পেয়েছিল এবং ১৯৫৫ সালের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের মনোজ গুহ এবং গজানন হেমাড়ী ডাবলস জুটিদের মধ্যে ৪র্থ স্থান পেয়েছিলেন।

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

মেকসিকোতে আয়োজিত ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৬টি দেশের শেষ লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হয়েছে। চ্যাম্পিয়ান এবং রাণার্স-আপ হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে ঃ ১নং গ্রুপ থেকে রাশিয়া ও মেকসিকো, ২নং গ্রুপ থেকে ইতালী ও উরুগুয়ে, ৩নং গ্রুপ থেকে ব্রেজিল ও ইংল্যান্ড এবং ৪নং গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মানী ও পেরু। এই যে ৮টি দেশ কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে এদের মধ্যে ৩নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিল এবং ৪নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী লীগের খেলায় পুরো ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ছল। এই ৮টি দেশের মধ্যে ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত হল এই চারটি দেশ—ইংল্যান্ড, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী এবং ইতালী; বাকি এই চারটি দেশ— ব্রেজিল, মেকসিকো, উরুগুয়ে এবং পেরু লাতিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং লড়াইটা দাঁড়ায় ইউরোপ বনাম লাতিন আমেরিকা। চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার মধ্যে দুটি খেলায় একই মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশের খেলা পড়ে, যেমন ব্রেজিল বনাম পেরু এবং পঃ জার্মানী বনাম ইংল্যান্ড।

১নং গ্রুপ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
রাশিয়া	৩	২	১	০	৬	১	৫
মেকসিকো	৩	২	১	০	৫	০	৫
বেলজিয়াম	৩	১	০	২	৪	৫	২
সালভেডোর	৩	০	০	৩	০	৯	০

উবের কাপ
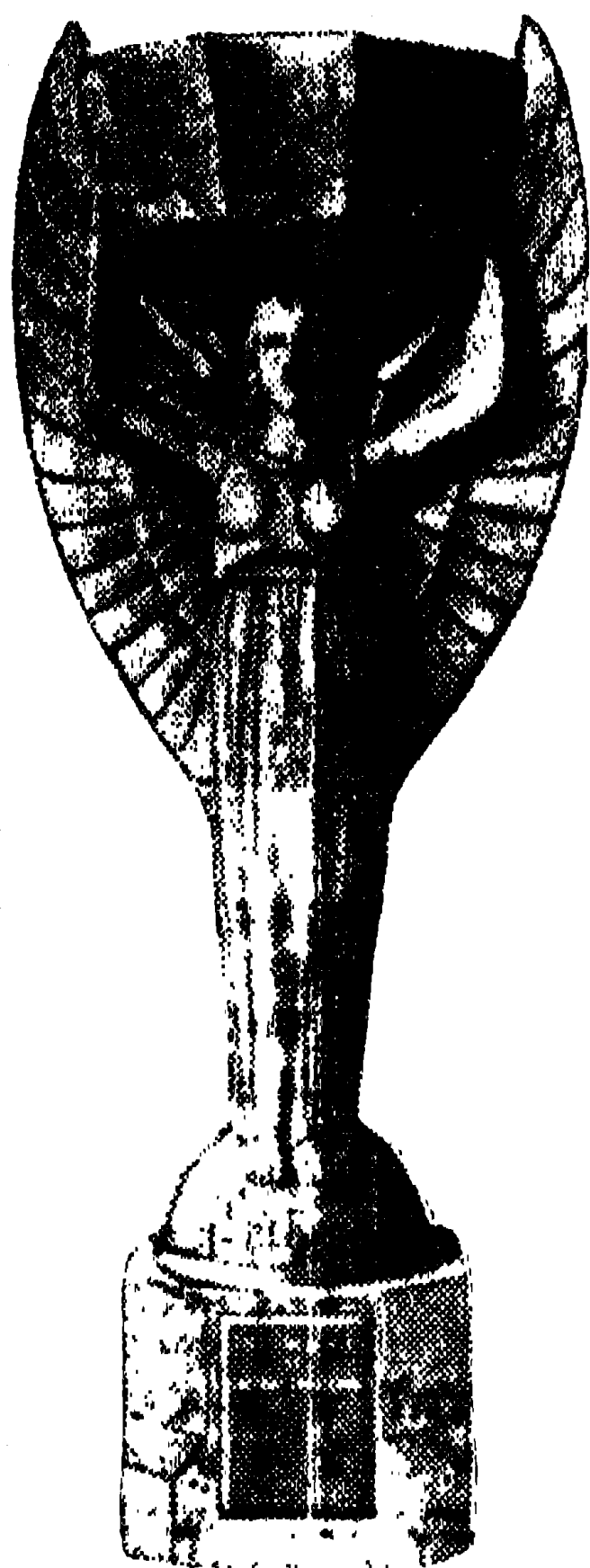
খেলার ফলাফল

রাশিয়া	০	ঃ	মেকসিকো	০
বেলজিয়াম	৩	ঃ	সালভেডোর	০
রাশিয়া	৪	ঃ	বেলজিয়াম	১
মেকসিকো	৪	ঃ	সালভেডোর	০
রাশিয়া	২	ঃ	সালভেডোর	০
মেকসিকো	১	ঃ	বেলজিয়াম	০

২নং গ্রুপ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইতালী	৩	১	২	০	১...	০	৪
উরুগুয়ে	৩	১	১	১	২	১	৩
সুইডেন	৩	১	১	১	২	২	৩
ইস্রায়েল	৩	০	২	১	১	৩	২

খেলার ফলাফল

ইতালী	১	ঃ	সুইডেন	০
উরুগুয়ে	২	ঃ	ইস্রায়েল	০
ইতালী	০	ঃ	ইস্রায়েল	০
ইতালী	০	ঃ	উরুগুয়ে	০
ইস্রায়েল	১	ঃ	সুইডেন	১
সুইডেন	১	ঃ	উরুগুয়ে	০
ইতালী	০	ঃ	ইস্রায়েল	০

৩নং গ্রুপ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ব্রেজিল	৩	৩	০	০	৮	৩	৬
ইংল্যান্ড	৩	২	০	১	২	১	৪
রুমানিয়া	৩	১	০	২	৪	৫	২
চেকো	৩	০	০	৩	২	৭	০

খেলার ফলাফল

ব্রেজিল	৪	ঃ	চেকোঃ	১
ইংল্যান্ড	১	ঃ	রুমানিয়া	০
রুমানিয়া	২	ঃ	চেকোঃ	১
ব্রেজিল	১	ঃ	ইংল্যান্ড	০
ব্রেজিল	৩	ঃ	রুমানিয়া	২
ইংল্যান্ড	১	ঃ	চেকোঃ	০

৪নং গ্রুপ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পঃ জার্মানী	৩	৩	০	০	১০	৪	৬
পেরু	৩	২	০	১	৭	৫	৪
বুলগেরিয়া	৩	০	১	২	৫	৯	১
মরক্কো	৩	০	১	২	২	৬	১

খেলার ফলাফল

পঃ জার্মানী	২	ঃ	মরক্কো	১
পেরু	৩	ঃ	বুলগেরিয়া	২
পেরু	৩	ঃ	মরক্কো	০
পঃ জার্মানী	৫	ঃ	বুলগেরিয়া	২
পঃ জার্মানী	৩	ঃ	পেরু	১
মরক্কো	১	ঃ	বুলগেরিয়া	১

একটি খেলায় এক দলের ৪টি গোল

৫টি গোল — পঃ জার্মানী (বিপক্ষে বুলগেরিয়া)

ব্রেজিল বনাম ইংল্যান্ড ঃ ব্রেজিলের জাইরজিনহো (৭নং) তাঁর দেওয়া দলের জয়সূচক গোলটি দেখছেন। ইংল্যান্ডের গোল-কিপার গর্ডন ব্যাঙ্কস মাটিতে পড়ে আছেন। ব্রেজিল ১—০ গোলে জয়ী হয়।

৪টি গোল — রাশিয়া (বিপক্ষে বেলজিয়াম)
৪টি গোল—মেক্সিকো (বিপক্ষে সালভেডোর)
৪টি গোল — ব্রেজিল (বিপক্ষে চেকোঃ)

একটি খেলায় সর্বাধিক গোল

৭টি—পঃ জার্মানী ৫ ঃ বুলগেরিয়া ২

গোলের খতিয়ান

(প্রতি গ্রুপে প্রতিটি দল তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে এবং প্রতি গ্রুপে মোট খেলার সংখ্যা ৬টি)।

১নং গ্রুপ	ঃ	১৫ গোল
২নং গ্রুপ	ঃ	৬ গোল
৩নং গ্রুপ	ঃ	১৬ গোল
৪নং গ্রুপ	ঃ	২৪ গোল

ব্যক্তিগত সর্বাধিক গোল

৭টি — গারহার্ড মুলার (পঃ জার্মানী)

হ্যাটট্রিক

২টি — গারহার্ড মুলার (পঃ জার্মানী) —বিপক্ষে বুলগেরিয়া এবং পেরু।

সর্বাধিক গোল

পক্ষে ঃ ১০টি—পঃ জার্মানী (৪নং গ্রুপ)
বিপক্ষে ঃ ৯টি—এল সালভেডোর (১নং গ্রুপ)
৯টি—বুলগেরিয়া (৪নং গ্রুপ)

বিপক্ষে গোল শূন্য

১নং গ্রুপে মেক্সিকো এবং ২নং গ্রুপে ইতালীকে কোন দল গোল দিতে পারে নি।

খেলা ড্র

চারটি গ্রুপের মধ্যে একমাত্র ৩নং গ্রুপের কোন খেলাই ড্র হয় নি।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রেজিল	৪	ঃ	পেরু	২
ইতালি	৪	ঃ	মেকসিকো	১
পঃ জার্মানী	৩	ঃ	ইংল্যান্ড	২
উরুগুয়ে	১	ঃ	রাশিয়া	০

সেমি-ফাইনাল

ব্রেজিল বনাম উরুগুয়ে

পঃ জার্মাণী বনাম ইতালী

শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় যে চারটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল তাদের মধ্যে রাশিয়া বাদে বাকি তিনটি দেশ সেমি-ফাইনালে উঠেছে। ২নং গ্রুপের রানার্স-আপ উরুগুয়ে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ১—০ গোলে ১নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান রাশিয়াকে পরাজিত করে সেমি-ফাই
খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।
গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইতালী
রানার্স-আপ উরুগুয়ে সেমি-ফাই
খেলবে। অপর কোন গ্রুপের চ্যাম্প
এবং রানার্স-আপ দেশ এইভাবে সে
ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ ক
পারেনি। ইতালি যেখানে লীগের তি
খেলায় মাত্র একটি গোল দিয়ে
চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সেখানে মেকসি
বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ৪
গোলে জয়ী হয়েছে। তাজ্জব ব্যাপ
পশ্চিম জার্মানী ১৯৬৬ সালের জুল
কাপ বিজয়ী ইংল্যান্ডকে অতিরিক্ত স
খেলায় ৩—২ গোলে পরাজিত করে
পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। ১৯
সালের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ২
গোলে ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরেছিল। এব
কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথমার্ধের শে
ইংল্যান্ড ১—০ গোলে এবং খেলা ভা
২০ মিনিট আগে পর্যন্ত ২—০ গোলে
গামী ছিল। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের শে
উভয়পক্ষই দুটি করে গোল দিয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

৮ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 26th June, 1970 শুক্রবার, ১১ই আষাঢ়, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅনাব বড়ুয়া

চিঠিপত্র

মহামতি লেনিন ও ভারতবর্ষ

"অমৃত" পত্রিকার গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ সংখ্যার চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅমিতাভ রায়ের চিঠি ও তারপরে শ্রীগোতম চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরটিও পড়লাম। কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীরায় যা জানতে চেয়েছিলেন তার সঠিক উত্তর গ্রন্থের মুজাফর আহম্মদের "আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি" বইখানিতে কিছুটা পাওয়া যায়। সম্ভবত মানবেন্দ্র রায় নলিনী গুপ্ত মারফৎ চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। যাই হোক, ওই বই থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। 'সুভাষ বসুর নামীর পত্রখানি (এম, এন রায়ের লেখা চিঠি) প্রথমে আমার নিকটে এসেছিল। আমি তা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে দেখাই।...উৎসাহভরে তিনি বললেন, 'সুভাষের পত্রখানা আমিই তাকে পৌঁছিয়ে দেব।' কিন্তু ফিরে এসে তিনি আমায় জানালেন যে, 'সুভাষ পত্রখানি নিল না।' আমি পড়লাম মুস্কিলে। এই পত্র নিয়ে সুভাষ বসুর সঙ্গে আমায় দেখা করতে বলা হ'য়েছিল।...আমার সঙ্গে আগে তাঁর কোন পরিচয়ও ছিল না। তবুও আমি একদিন সুভাষের নিকটে গেলাম। তিনি বল্লেন, যাঁরা তাঁকে পত্র লিখতে চান তাঁরা যেন সোজাসুজি লেখেন।' (৩২৩-২৪ পৃঃ) কিন্তু পরে সরাসরি তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল কিনা তা এই বইয়ে উল্লেখ নেই।

তবে '১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আহমেদাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ৩৬-বারের অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জী স্বাক্ষরিত যে-ইস্তাহার বিতরিত হয়েছিল তা ছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশিত ইস্তাহার।'

'১৯২২ সালের বার্লিন যুগে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির একটি বিশিষ্ট কাজ হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের বিবেচনার জন্য একটি প্রোগ্রাম পাঠান। এই সময়ে রায় অনেককে পত্র লিখেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখেছিলেন, তাঁর পত্র চিররঞ্জনকে লিখেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুকেও লিখেছিলেন।' (৩২২ পৃঃ)

'ইতিহাসের দিক হতে মনে রাখতে হবে যে গয়ায় পাঠান প্রোগ্রামটিই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম প্রোগ্রাম।' 'অমৃতবাজার পত্রিকা সহ বহু কাগজে তা ছাপাও হয়েছিল...কংগ্রেস কিন্তু তার কোন উল্লেখ কোথাও করেছেন বলে মনে পড়ে না।'

অবশ্য হাল আমলে জাতীয় মহাফিজখানার (National Archieves) দলিলগুলি সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হওয়ায় তদানীন্তন এই সম্পর্কীয় বহু তথ্য জানা যায়। উপরের উল্লিখিত অংশগুলো অনেকের কৌতূহল মেটাতে পারে ভেবে তুলে দিলাম।

সত্য বসু
কলকাতা-২।

খেলার কথা

আমি আপনাদের সর্বাধিক প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত ও অনুরাগী পাঠক। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ সালের ১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যাতে প্রকাশিত শঙ্করবিজয় মিত্রের 'খেলার কথা : ক্রিকেট আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র' পড়লাম। পড়ে যেমন আনন্দিত হলাম তেমনি নিরাশ হলাম। কারণ লেখক কয়েকটি জায়গায় কতকগুলি তথ্য অসম্পূর্ণ রেখেছেন। সেগুলি আমি আপনাকে জানাচ্ছি এবং শঙ্করবিজয় মিত্র মহাশয়কে পত্রিকা মারফৎ সেগুলির রেকর্ড জানাবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

(১) আজ পর্যন্ত সোবার্স একাদিক্রমে কতকগুলি টেস্ট খেলেছেন?

(২) ১৯০৬ সালে জর্জ হার্স্ট ২৩৮৫ রান ও ২০৮টি উইকেট নিয়ে যে রেকর্ড করেছিলেন, লেখক জানাচ্ছেন সোবার্স সে রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত সোবার্সের রেকর্ড কি?

(৩) ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় সোবার্সের সাফল্যের নজীর কি?

গোপালপদ দে,
মনিয়াখালী, হুগলী।

দুই লেখকের এক বই

সাম্প্রতিক আমাদের দুজনের হাতে দুখানা বই এসেছে। একটির নাম 'সন্ধ্যা গোলাপ' লেখিকা প্রভাবতী দেবী। অপরটার নাম 'প্রথম বসন্ত' লেখক সুদর্শন চৌধুরী। দুই বই-এর শুধু কাহিনীগত মিলই নেই আদ্যন্ত আক্ষরিক মিল রয়েছে। কাহিনীদ্বয়ের পাত্র-পাত্রীর নাম এক, ভাষা এক অথচ লেখক দুজন। সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এই যে দুটি বই-এরই প্রকাশক একজন অধীর প্রশান্ত তালুকদার। একই বই-এর লেখক কি করে দুজন হয়, তা যদি প্রকাশক অনুগ্রহ করে অমৃত মারফৎ জানান তো আমাদের মতো অনেক পাঠক-পাঠিকার সংশয়ের নিরসন হতে পারে।

বাণী সাহা ও মৃত্যু তালুকদার
নৈহাটি,
২৪ পরগণা।

'আমার বন্ধু নজরুল'

গত ২২ মে 'অমৃত' পত্রিকায় (১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বন্ধু নজরুল' পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। প্রকৃতপক্ষে শৈলজানন্দবাবু নজরুলের ঘনিষ্ঠতম বাল্যবন্ধু। সেই হিসাবে তিনি তাঁর (নজরুল) বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান অবস্থার কথা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাই তাঁর প্রশংসা করবেন।

তবুও একটি প্রশ্ন আমাকে খুবই বিচলিত করে তুলেছে। তা হচ্ছে—নজরুল কি সত্যিই বেতারে প্রোগ্রাম করতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়েছিলেন?

জানি না, শৈলজানন্দবাবু এর উত্তর কি দেবেন। তবে আমার যতদূর মনে হয়—যখন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছিলেন, তখনই কোন ব্যক্তি ছলে-বলে-কৌশলে তাঁকে কোন জিনিস খাইয়েছিলেন এবং তার ফলেই তিনি হয়েছেন বাকরুদ্ধ। যখন কোন লোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে তখন সে খুব জোর পাগল হতে পারে, কিন্তু তা বলে বাকরুদ্ধ হবে কেন?

যাই হোক, শৈলজানন্দবাবুর কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তিনি যদি এই বিষয়ে কিছু জানেন (প্রকৃত সত্যঘটনা) তাহলে কোনরকম দ্বিধা না করে তিনি

চিঠিপত্র

যেন অবিলম্বে 'অমৃত' পত্রিকার মারফৎ জানান। কেননা, নজরুলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অনেকেই ছিলেন, কিন্তু তাঁরা এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ।

পরিশেষে, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে নমস্কার জানিয়ে আমার চিঠির বক্তব্য শেষ করলাম।

করুণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৩০।

অঙ্গনা

গত ৪ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত 'অমৃত'এ অঙ্গনা বিভাগটির মধ্যে কুলমিকার বাঙালী বিয়ের উপকরণ প্রদর্শনীর সম্বন্ধে লেখিকা প্রমীলা অনেক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা আমার খুবই ভাল লেগেছে। আমি বর্তমান যুগের মেয়ে। তাই বিগত দিনের অনেক সুন্দর জিনিস সম্বন্ধে বাঙালী হয়েও আমি অজ্ঞ, তাই অঙ্গনার পরিচালিকা প্রমীলাকে আমি অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করছি, যদি তিনি ঐ বিভাগটির মাধ্যমে রুমাল ও রিবন সাজানো, মশলার ট্রে, বড়ির গয়না, কুলো ও পিঁড়ি আলপনা সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রণালী আমাকে জানাতেন তবে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হতাম। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমি খুবই উৎসাহী এবং আমি মনে করি আমার মত আরও অনেক উৎসাহী বোন আছেন যাঁরা ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে জানতে চান। আমি আশা করি অমৃতে অঙ্গনার মাধ্যমে আমি ঐ সমস্ত বিষয়ের উপকরণ ও সজ্জা প্রণালী জানতে পারবো।

লক্ষ্মী চক্রবর্তী
কলকাতা-৩২।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

আপনার বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকায় (বৈশাখের ১৭ তাং-এ প্রকাশিত সংখ্যায়) শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবীর চোখে আজকের সমাজের যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ পড়ে খুবই ভাল লাগল। বর্তমানে সাহিত্যিকদের স্বধর্মচ্যুতির অকপট উন্মোচন ও তজ্জন্য ক্ষোভের নির্ভীক প্রকাশ আমাকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছে।

'আজকের পৃথিবীতে মানুষ আর যা থেকে হোক, সাহিত্য থেকে প্রেরণা নিয়ে সৎ ও মহান হতে যাবে না' কেন—এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সে কারণগুলো নির্দেশ করেছেন, সেগুলো হচ্ছে, (১) সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক তাৎক্ষণিকতায় মেতে ওঠা অর্থাৎ স্বধর্মচ্যুতি এবং (২) নিজেকে (লেখকসত্তাকে) একটা জানাশুনা ছাঁচের মধ্যে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া।

লেখিকার মতে এরই ফলে সাহিত্যিকরা দলে দলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কামরায় কামরায় ভাগ হয়ে যাচ্ছেন। পরিণতি স্বরূপ তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে 'পূর্ণ সমাজের কথা' আর পাওয়া যাচ্ছে না। সমাজকে শুধরে বাধা করার মত কণ্ঠ তাঁদের হারিয়ে গেছে।

শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। আমিও মনে করি, বর্তমান সাহিত্যিকরা কেবল শক্তিচর্চা করে এর চেয়ে বেশি কিছু লাভ করতে পারেন না। হতে-থাকার সাধনাকে তাঁরা বাহুল্য মনে করছেন বলেই সৃষ্টিও তাঁদের মহত্ত্বচ্যুত হচ্ছে। যাঁর সাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা নেই, সেই সংস্থার আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন, তা সে ভাবগত বা চিন্তাগত বা রাজনীতিক যে কোন প্রকারের সংস্থাই হোক। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সংস্থা সত্তার পরিপূরক হলেও বদলের কাজ করে না কখনো। সত্তার বিবর্তন অন্তর্নিহিত আবেগজন্য, সংস্থার পরিবর্তন পরিপার্শ্বের চাপের পরিণাম। তাছাড়া 'বিদ্যুৎ গতিতে' পরিবর্তমান সাংস্থানিক জীবনে কোন কিছুই থিতিয়ে উঠতে পারে না, ধরবার মত কোন কিছুই এখানে টিঁকে থাকে না বলেই কনভেনশান-এর ঔরসজাত যে সমস্ত মূল্য সত্তার মধ্যে থাকে, তাদের পরিগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। মূল্যের আসল উৎস সমাজ নয়, তা সত্তা। কিন্তু কথা হচ্ছে, সত্তাকে সেখানে স্বীকারই করা হয় না, হতে থাকার সাধনা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে বরণযোগ্য 'সুপাত্র' পাওয়া ভার, সেখানে তাই মূল্যের ধর্ষণ অনিবার্য হয়ে উঠে।

আমার মনে হয়, সাহিত্য-সংসারের এই অবস্থাটাকে যদি একবার পাঠকের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবীর চিন্তার পরিপূরক আরো এমন কিছু পাওয়া যাবে যাতে সব কিছু মিলিয়ে আমরা দেখতে পাব, সাহিত্যিক এই অসামর্থ্যের দায়িত্ব কেবল সাহিত্যিকদেরই নয়।

ধরা যাক, এখানে সুস্থ পাঠক যদি সাহিত্যের দরবারে জীবনের প্রতি উন্মুখ হওয়ার প্রার্থনা নিয়ে এসে দাঁড়ায়, তাহলে সে সেখানে কতখানি সুবিচার আশা করতে পারে? প্রথম দৃষ্টিতেই সাহিত্যের ভূগোল দর্শনে সে বুঝতে বাধ্য হবে, স্বেচ্ছায় সে একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। দেখতে পাবে সাহিত্যের দেশ শতধাবিভক্ত আর বিশুষ্ক রসের প্রবাহ ক্ষীণস্রোতা। একে সাহিত্যের বৈচিত্র্য বললে ভুল হবে। কারণ এই বিভাজনের পেছনে রয়েছে উদ্দেশ্যের বিরোধ। একদিকে যৌনআবেদনমূলক রচনার নির্লজ্জ হাতছানি, তারই পাশে মারবীর গোয়েন্দা উপন্যাসের জমজমাট প্রদর্শনী। অন্যদিকে উন্নাসিক গবেষণাধর্মী সাহিত্যের অনাকর্ষণীয় তদগত গাম্ভীর্য, তারই পাশে ছাঁচে-ফেলা গোষ্ঠী সাহিত্যিকের তাত্ত্বিক আলাপন। এ অবস্থা দেখে পাঠক কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে বাধ্য। সে ক্ষীণস্রোতা সাহিত্যরসপ্রবাহে অবগাহন করতে যায়, তাহলে দেখতে পাবে সন্তরণ করার মত বিস্তৃতি ও গভীরতা এতে নেই। এ অবস্থার জন্য দায়ী কেবল লেখকরাই নয়, পাঠকরাও। কারণ সাহিত্য-গঙ্গায় অবগাহন করে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মত অখণ্ড পাঠকসমাজও যে আজ আর নেই। এখানেও ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া সক্রিয়, এখানেও দল, গোষ্ঠী আর বিচ্ছিন্নতা। কিছুদিন আগেও যে সাহিত্য নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করতে পারত' তার কারণ তখন অখণ্ড পাঠকসমাজ বলতে একটা কিছু ছিল। রাজনীতিতে যেমন জনসাধারণ কথাটা আজ লোক-শ্রুতিতে পরিণত হয়েছে, এর স্থলে এসেছে দল ও গোষ্ঠী, তেমনি অখণ্ড পাঠকসমাজও আজ স্মৃতিমাত্র। তাই চিড়-খাওয়া ব্যক্তিত্ব যেমন কোন কিছুতেই সাড়া দিতে পারে না, আত্মবিরোধের মধ্যে ও দ্বিধার মধ্যে স্থবির হয়ে থাকে, তেমনি বিখণ্ডিত পাঠক-সমাজ আর সাহিত্যিক আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে না।

বিনয় রায়,
ত্রিপুরা।

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গে আবার মন্ত্রিসভা গঠনের জল্পনা-কল্পনাকে ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। অতীব সন্তর্পণে নয়া-জোট সৃষ্টি করে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে হাজাফিল বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে মন নেওয়া-দেওয়া চলছে। অবশ্য, প্রকাশ্যে একথা কেউ স্বীকার করবেন না। আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীর উপর জোর দিয়ে একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করার উদ্যোগ পর্বের পেছনেই রয়েছে আর একটি সরকার গঠনের পরিকল্পনা। চিন্তার বিভিন্নতা, পারিপার্শ্বিকের মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও এ ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁরা এখনও দমে নি। অন্যান্যবার কর্মসূচীর ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা গেছে। এবার কিন্তু অদ্যাবধি কর্মসূচী বাধা সৃষ্টি করছে বলে মনে হয় না। সরকার গঠিত হওয়ার পর যদি কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যর্থ হয়, বা প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক সরকার রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পরে, তবে পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এক ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে—এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হওয়ার ফলেই প্রচেষ্টা শম্বুক গতিতে চলছে বলে অনুমিত হয়। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা সেই বিষয়েও গবেষণা চলছে। কারণ, যাঁরা এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা একথা বিলক্ষণ জানেন যে লালদীঘির দপ্তর তাঁদের কাছে আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। সরকার গঠন করার অব্যবহিত পরেই আসবে হিংসাত্মক আন্দোলনের প্লাবন। কর্মসূচী রূপায়ণের পথে আসবে দুস্তর বাধা। সবল হাতে এ সমস্ত দমন করে এগিয়ে যাওয়ার মত মানসিকতা ও নেতৃত্ব সম্ভাব্য সরকারের থাকবে কিনা তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বর্তমানে চলছে।

রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরও কেন বার বার সরকার গঠনের চিন্তা আসছে এ প্রশ্ন অনেকের মনে নাড়া দিতে পারে। কারণটা অতীব স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত, কেরালার ঘটনা উল্লেখ করলে উত্তরটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কয়েক সপ্তাহ আগেই কেরালার বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদলের কার্যকর সমিতি এবং ঐ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। পাঠকরা জানেন, কেরালা আর এস পি সেখানে বর্তমান ফ্রন্ট সরকারের শরিক হলেও মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নি। তাঁরা বলেছেন, যে মুহূর্তেই বোঝা যাবে সেখানকার সরকার ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল তখনই সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। অধিকন্তু, কেরালার সরকারী দলগুলির মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হওয়ার ফলে সরকার বেশ সংকটের মধ্য দিয়েই চলেছে। একথা অবশ্য ঠিক, আইনানুগ পন্থায় কেরালার বর্তমান সরকার কতকগুলি বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় ইতিমধ্যেই হাত দিয়েছেন এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে ধীরে ধীরে এগিয়েও যাচ্ছেন। কিন্তু তবুও আর এস পির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেননের কাছে নাকি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে তিনি যদি অবস্থার গুরুতর অবনতি উপলব্ধি করেন তবে যেন রাজ্যপালের কাছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী জানিয়ে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল, রাজ্যপাল অচ্যুত মেনন সরকারের প্রস্তাব মেনে নিলে তাঁকেই কেয়ার-টেকার সরকার চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেবেন। ফলে সেই সরকারের ব্যবস্থাপনায় নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সি পি এমের সংখ্যাধিক্যতা কমতে বাধ্য। ফলে নতুন করে বর্তমান মোর্চার সরকার গঠিত হলে প্রতিনিয়ত সংকটের সম্মুখীন হতে হবে না। বর্তমান মোর্চার শরিকরা নির্বাচনে ভাল ফল করতে পারবে বলেই আর এস পির ধারণা। কেননা বর্তমানে যেভাবে তাঁরা জনকল্যাণমূলক কাজ করছেন তার একটি শুভ প্রভাব কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর পড়তে বাধ্য। এ তথ্য এখনও আলোকপ্রাপ্ত না হলেও এ ফরমুলার কার্যকরিতা বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

পাঠকরা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, কেরালার অবস্থার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মিল কোথায়? মিল অবশ্য এখন নেই। কিন্তু সেই অঙ্ক মেলানোর জন্যেই বর্তমানে এই রাজ্যে চেষ্টা চলছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাম কম্যুনিস্টদের সাংগঠনিক শক্তি ও সংগঠন কেরালার চেয়ে পশ্চিম বাংলায় বেশী। বিগত ফ্রন্ট সরকারের সময় তাঁদের শক্তিই শুধু তাঁরা এই রাজ্যে বাড়াতে সমর্থ হননি সুসংহত করেছেন অনেকখানি। কাজেই রাজ্যপালের শাসনকালে অবিলম্বে যদি মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, বাম কম্যুনিস্টদের ধারণা তাঁরা এককভাবে লড়াই করলেও তাঁদের বর্তমান বিধানসভায় শক্তি হয়ত বজায় রাখতে পারবেন। নির্বাচন যতই দেরীতে অনুষ্ঠিত হবে, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, বাম কম্যুনিস্টদের হাতে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলি ক্রমেই দুর্বল ও অবশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে। আর বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দাবীকে যদি কার্যকর করা যায় তবে অন্য কেউ মন্ত্রিসভা গঠন করে ফেলবে এমন একটি দুশ্চিন্তার হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া জনসাধারণের অর্থ অপব্যয়ের কথা তুলে বিধানসভা ভেঙে দেবার আন্দোলন করলে আম জনতার কাছ থেকে একটি নৈতিক সমর্থন পাওয়ার আশাও প্রবল। এ প্রসঙ্গে অন্য দলের কথাও মনে রাখা দরকার। রাজনৈতিক মহল মনে করেন, জনতার পকেট কাটা যাচ্ছে বলে দয়ায় বিগলিত হয়ে কোনো দল আন্দোলনের জন্য ডাক দেবেন, তা নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে বিধানসভা ভেঙে না দিলে যে কোন মুহূর্তে বিকল্প সরকার কায়েম হলে বিরোধী দলের সংগঠনের মূলে আঘাত পড়বার আশঙ্কা প্রবল। আপাতত এই ভাবনা নাকি মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের সমধিক বিচলিত করেছে। কারণ, যে প্রস্তাবিত সরকার গঠনের নেপথ্য প্রচেষ্টা চলছে সেটা কংগ্রেস সরকার ত হবে না, মূলত বামপন্থীদেরই মন্ত্রিসভা হবে। আর যাঁরা মন্ত্রিসভায় আসতে পারেন তাঁদের অনেকেই সংগঠন গঠন ও নস্যাৎ করবার কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাঁদের অনেকেই মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষায় সুশিক্ষিত, এবং সমস্ত বামপন্থী কৌশলের সঙ্গে তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক থেকে খুবই পরিচিত। কথাই আছে, যেমন শত্রু তেমনি সৈনিক নিযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের হাতে এ রাজ্য তুলে দিয়ে অন্যান্য পূর্বতন শরিকরা ত আর তাঁবু গুটিয়ে ফেলাতে পারেন না। কাজেই বিকল্প সরকার গঠনের এই প্রচেষ্টা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,—এ সরকার গঠন কি প্রকারে সম্ভব? এবং গঠন করলেও কারা এই সরকারের দায়িত্ব নিতে পারেন। কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের দলের পক্ষে সরকার গঠন অসম্ভব। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের কোন গোষ্ঠীই এই চিন্তা মনে

স্থান দিতে পারেন না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের তরফ থেকে শ্রীজ্যোতি বসু যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের অব্যবহিত পরেই এই চেষ্টা করেছিলেন। তবে তা দুটিজ্কা-গুহেই পঞ্চত্বলাভ করেছে। একমাত্র বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও বর্তমানের অষ্টবাম এই প্রচেষ্টা করেন নি। অন্যদিকে অষ্টবামের মধ্যে দুটি প্রশ্ন নিয়ে টানা-পোড়েন চলছিল। প্রথমত, চৌদ্দ দলের পূর্বতন যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করা। দ্বিতীয়ত এই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব না হলে মধ্যবর্তী নির্বাচন। অবশ্য নির্বাচন কবে হবে বা হওয়া উচিত, অষ্টবামের কোন শরিকই অদ্যাবধি তা সুনির্দিষ্টভাবে বলেন নি। কিন্তু একটি বিষয়ে এই জোটের সকল শরিকই একবাক্যে ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেসের কোন জোটেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে তাঁরা সরকার গঠন করবেন না। এখন তাঁদের এই তিনটি বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা যাক। চৌদ্দ শরিকের ফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের কথার উপর বার বার জোর দেওয়ার ফলে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, একথা অষ্টবামের শরিকরা বর্তমানে উপলব্ধি করতে পারছেন বলে মনে হয়। তাঁদের এই শ্লোগানের ফলে কর্মচারীদের সকল স্তরেই একটি ভয়ের ভাব দেখা দিয়েছে। কারণ প্রতি পদক্ষেপেই কর্মচারীরা তাঁদের কাজ ভবিষ্যৎ প্রভুদের মনোরঞ্জনের সহায়ক হবে কিনা সেই কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখবার ফলে সব কিছুই বিলম্বিত হচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে পরিত্যক্তও হয়ে যাচ্ছে। এবং ফ্রন্ট পুনরুজ্জীবিত হলে বাম কম্যুনিস্টরাই আবার প্রশাসনের মধ্যমণি হয়ে উঠবে একথাও কর্মচারীরা আন্দাজ করে নিয়ে এক পা এগিয়ে যাওয়ার ভান করে দশ পা পিছিয়ে যাচ্ছেন। আর এই শ্লথ কর্মপন্থা প্রচারের অফুরন্ত মাল মশলা যুগিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসনের বিরুদ্ধে। অষ্টবামের এই অবস্থা থেকে প্রচারের সুবিধা হতে পারে বটে, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহকে অনুকূলে আনার পারিপার্শ্বিক গড়ে উঠছে না। যা কিছু লাভালাভ তা বাম কম্যুনিস্টদের তহবিলেই জমা পড়ছে বলে অনেকের ধারণা। আর মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্যে সময় নির্ঘণ্ট নির্ধারণের প্রশ্নেও অষ্টবাম বিলম্বিত লয়ে চলছেন। কারণ—আর একটি নির্বাচনে লড়বার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য এই মোর্চার মধ্যে সাতটি দলের নেই বলে অনেকের ধারণা। তদুপরি জোট বাঁধার পক্ষে অবস্থা এখনও পুরোপুরি অনুকূল হয়ে ওঠেনি। বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জী—অবশ্য একটি সার্বিক গণতান্ত্রিক মোর্চার কথা ইতিমধ্যেই তুলেছেন। তিনি কংগ্রেস ও বামকম্যুনিস্ট দুই দলের থেকে তফাৎ থাকবার জন্যে আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রীমুখার্জি অষ্টবামের প্রতিই ঝুঁকেছেন। কিন্তু তা হলেও পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ রাজনীতির চিত্র কি হবে একথা অনেককেই ভাবিত করেছে। অতীতে কেরালায় যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির হবার আশঙ্কা থেকে এই রাজ্যকে মুক্ত রাখবার প্রয়াসেই বিকল্প সরকার গঠনের এই পুনঃপ্রচেষ্টা। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কেরালায় এ পর্যন্ত কয়েক দফায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক অবস্থায় যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উন্নয়নমূলক কাজ বারে বারে ব্যাহত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এখনই অন্যান্য রাজ্য থেকে সর্বক্ষেত্রেই অনেক পিছিয়ে আছে। আবার রাষ্ট্রপতি শাসনের টানা-পোড়েনের খেলা শুরু হলে এই রাজ্যের অধিবাসীদের কপালে যে চরম দুঃখ আছে তা রাজনৈতিক নেতারা বিলক্ষণ উপলব্ধি করছেন। একমত হন বা না হন, একথা সত্য, যে স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বের অবসান ঘটার পর থেকে পশ্চিমবাংলায় কোন পরিকল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। কংগ্রেসের শেষ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলেও নয়। বস্তুতপক্ষে তখন থেকেই পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে অনিশ্চিত অবস্থার শিলান্যাস হয়েছে।

অষ্টবাম যখন দুই কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য নেবে না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ, তখন কি সূত্র অবলম্বন করে আর একটি বিকল্প সরকার সম্ভব? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন যে অষ্টবামের নেতারা যদি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সহমত হন তবে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবার জন্য দুই কংগ্রেস থেকেই অনেকে বেরিয়ে এসে একটি প্রগতিশীল ব্লক গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তখন কংগ্রেসের সমর্থন নেওয়ার যে প্রশ্ন তা আর থাকবে না। নয়া ফ্রন্ট পশ্চিমবাংলার শাসনভার হাতে নিতে পারবে। অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রন্টের ৩২-দফা কর্মসূচীকে ভিত্তি করে কয়েকটি দফায় যদি কিছু পরিবর্তন করে সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারের প্রশ্নকে মেনে নিলে আর এস পিও এই জোটে আসতে গররাজী হবে বলে মনে হয় না। আর লোকসেবক সংঘ না এলেও এই জোটের বিরোধিতা করবে না বলেই ধারণা। তবে এই জোট গড়ে তুলবার জন্য ইতিমধ্যে একটি সর্বভারতীয় প্রচেষ্টাও নাকি হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন এস এস পি যদি বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আঁতাত বর্জন করে কেরালায় অচ্যুত মেনন সরকারের সহযোগী হতে রাজী হয় তবে আর এস পি পশ্চিমবঙ্গে অষ্টবামের সঙ্গে সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেবে।

এদিকে আবার খবর শোনা যাচ্ছে যে বাম কম্যুনিস্টদের মধ্যে গৃহবিবাদ নাকি প্রবল হয়ে উঠেছে। নিদেনপক্ষে ত্রিশজন আইনসভার সদস্য নাকি বর্তমান দলীয় নীতির সঙ্গে সহমত হতে পারছেন না। বাম কম্যুনিস্টরা বর্তমানে যে 'মিলিট্যাণ্ট' লাইন নেওয়ার জন্যে প্রতি শ্রেণী সংগঠনেই উঠে পড়ে লেগেছেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁদের ঘোষিত কর্মনীতির সঙ্গে বা আদর্শগত ঘোষণার সঙ্গে অনেক জায়গায় তার মিল নেই। সংগঠনকে মজবুত রাখবার উদ্দেশ্যে তাঁরা যে জঙ্গী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছেন আখেরে তা কতটুকু ডিভিডেণ্ড দেবে সে সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

যা হোক, অষ্টবামের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস, আর এস পি ইত্যাদি দল যোগ দিয়েও যদি কোন সরকার গঠিত হয় তাও বেশীদিন চলবে বলে রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা মনে করেন না। বিগত ফ্রন্ট আমলে দলীয় সংগঠন বাড়াবার অল্পবিস্তর কায়দা এঁদের অনেকেই শিখেছেন। আবার সেই নেশায় যদি পেয়ে বসে তাবে ত কথাই নেই, একেবারে সোনায় সোহাগা। কিছু কিছু কাজ-কর্ম তাহলে প্রথমদিকে করতে পারলেও পরে আর বিশেষ এগুতে পারা যাবে না বলেই অনেকের ধারণা। কারণ নয়া জোটেরও কোন গুণগত পরিবর্তন হবে না বা আদর্শগত মিল থাকবে না। শুধু এইটুকু লাভ হতে পারে যে কেয়ার-টেকার সরকারের দায়িত্ব নিয়ে সম্ভাব্য সরকার নির্বাচনে কিছু ভাল ফল লাভ করতে পারে। সেও পুনঃ পদত্যাগের পারিপার্শ্বিকতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে।

এ খবর যখন কলকাতার বাজারে অল্পবিস্তর শোনা যাচ্ছে তখন শহরবাসীর জন্যে আরও একটি সন্দেশ পরিবেশিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে সুপরিচিত শ্রীআশু ঘোষও নাকি পুনরায় আসরে নেমেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা নাকি চলছে বাম কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেসের কিছু সদস্যকে নিয়ে একটি নতুন জোট সৃষ্টি করা। স্রষ্টার প্রয়াস কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হবে জানি না, তবুও বলতে হয়—
'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা।'

—সমদর্শী

[illegible] সার্কিট হাউসের সামনে একটি খোলা জীপের বোনেটে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা দিচ্ছেন। চিত্রের ডানদিকে পঃ বঃ কংগ্রেস (শ) কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এম-এল-এ'কে দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

'বোম্বাই থেকে দিল্লী", 'সমাজতান্ত্রিক সত্তর' প্রভৃতি শ্লোগানের মধ্য দিয়ে নয়াদিল্লীর মবলংকার হলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (নয়া) যে অধিবেশন হয়ে গেল সেটা সারা সপ্তাহ ধরে সংবাদপত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেখেছে।

এবারকার এই অধিবেশনের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, একদিকে 'নয়া' কংগ্রেস যখন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী সমস্ত দলের সহযোগিতা আহবান করেছে এবং শ্রীসুব্রহ্মণ্যম প্রমুখ নেতারা যখন দক্ষিণপন্থী সংহতির বিরুদ্ধে বামপন্থী সংহতি গড়ে তোলার কথা বলেছেন, তখন 'নয়া' কংগ্রেস দলের ভিতরে কিন্তু মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তর পার্থক্য দেখা গেছে।

সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা গেছে নকশালপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হবে সেটা স্থির করার ব্যাপারে। আর এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ক্ষোভ নিয়ে ফিরে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা। তাঁদের অভিযোগ এই যে, অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদের উপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, সেই তুলনায় নকশালপন্থীর বিপদটাকে আমলে আনা হয়নি।

একজন পর্যবেক্ষকের মতে, এ-আই-সি-সিতে এবার পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা যতটা প্রাধান্য পেয়েছেন নিকট অতীতে আর কখনও ততটা প্রাধান্য তাঁরা পাননি। পশ্চিমবঙ্গের এই সব সদস্য মবলংকার হলের অধিবেশনক্ষেত্রে বক্তৃতা করতে উঠেছিলেন প্রধানত বিভিন্ন বিষয়ে দলের নেতাদের বামঘেঁষা মধ্যপন্থার বিরোধিতা করার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, সি-পি-এম ও নকশালপন্থীদের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য করা ঠিক নয়। আব্দুল আন্সার বলেন, দুই দলের তফাৎ শুধু নামে। শ্রীফণী ঘোষ বলেন [illegible] নকশালপন্থার আড়ালে মার্কসবাদী ১৯৪৯ সালের রণদিবে লাইন চালাচ্ছে[illegible] শ্রীঘোষ পশ্চিমবঙ্গের [illegible]পাল শ্রীশা[illegible] স্বরূপ ধাওয়ানকে [illegible]য়ে নিয়ে যাও[illegible] দাবী তুলে বলেন যে, রাজ্যপাল [illegible] মস্তিষ্ক ও বিবেক শ্রীজ্যোতি বসুর কা[illegible] বাঁধা দিয়েছেন। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ [illegible] বলে আক্ষেপ করেন যে, নকশালপন্থী কা[illegible] কলাপকে শুধুমাত্র 'বামপন্থী হঠকারিত[illegible] বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর নিজে[illegible] মতে এই কার্যকলাপ দেশদ্রোহিতা ছা[illegible] কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গের আরও দুজ[illegible] সদস্য শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ও শ্রী শ[illegible] কুমার খান্না এই বলে হুঁশিয়ার করে দে[illegible] যে, নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ[illegible] অবলম্বনের ব্যাপারে দ্বিধা করা হলে সা[illegible] পশ্চিমবঙ্গই হাতছাড়া হয়ে যাবে।' ড[illegible] নলিনাক্ষ সান্যাল প্রস্তাব করেন যে, যে স[illegible] গ্রামে নকশালপন্থীদের উৎপাত দে[illegible] দিয়েছে, সে সব গ্রামে উপযুক্ত তালি[illegible] দেওয়া ও উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিরো[illegible] বাহিনী গঠন করা হোক।

পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা শুধু তাঁ[illegible] বক্তৃতায় এসব কথা বলেই ক্ষান্ত থাকে[illegible]

এ-আই-সি-সির সদস্যদের মধ্যে একটি 'নোট' বিলি করে তাতেও তাঁরা একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

নোটে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় নেতারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও জনসঙ্ঘের সমালোচনা করে বক্তৃতা দিয়েছেন, অথচ সি পি এম-এর লোকরা ও নকশালপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকর্মীদের হত্যা করা সত্ত্বেও তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে কিছু বলা হয়নি। সি পি এম-এর লোক ও নকশালপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য যতটা দৃশ্যত ততটা বাস্তব নয়। তফাৎটা শুধু পদ্ধতি ও সময়ের ব্যাপারে, উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নয়। যুক্তফ্রন্টের আমলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর মার্কসবাদীদের হাতে থাকাতেও নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে, ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে মাওবাদী সাহিত্য বিলি করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে ও কেনাবেচা করতে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তুত এই নোট-এ রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবীও রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর শিবির থেকে চাপ দেওয়ার শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের নেতারা নোট থেকে ঐ অংশটি বাদ দেন। প্রধানমন্ত্রীর শিবির থেকে পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের একথা বিশেষভাবে বোঝান হয় যে, রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে কাজ করছেন। তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার দাবী তোলার মানে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলা অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 'নয়া' কংগ্রেস নেতাদের একথাও মনে রাখতে বলা হয় যে, এর আগেরবার যখন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শক্ত হাতে শাসন চালান হয়েছিল, তখন সেই কাজের ফল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের পক্ষে ভাল হয়নি।

নকশালপন্থীদের সম্পর্কে কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা যে দাবী তোলেন সেটা মবলংকার হলে একমাত্র কেরলের কিছু সদস্য ছাড়া আর কারও সমর্থন লাভ করেনি। পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা যেসব সংশোধন প্রস্তাব এনেছিলেন, সেগুলি সবই অগ্রাহ্য হয়েছে। শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে যেসব অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, সেগুলির দরুন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি এই সভার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সেই কারণেই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা বলেছি যে, আইন ও শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।'

নেতারা অতি-বাম বিপদের স্বরূপ উপলব্ধি না করায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন আর দলের বামঘেঁষা সদস্যারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সরকারী কার্যকলাপের মধ্যে মৌলিক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা বা আন্তরিকতা দেখা যাচ্ছে না বলে।

নয়া কংগ্রেসের অন্যতম 'তরুণ তুর্কী' শ্রীমোহন ধারিয়া তীব্র আক্রমণ করে বলেন যে, বোম্বাই এ-আই-সি-সি-র গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণে সরকার অহেতুক দেরী করছেন। এই দেরীর কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন যে, রাজন্যদের ভাতা বিলোপের ব্যাপারে যদি অসুবিধা দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে কংগ্রেসের উচিত ঐ প্রশ্নে সরকার থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হওয়া। শ্রীকালী মুখার্জি প্রশ্ন তোলেন, বড় বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কংগ্রেস কি করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে? শ্রীমতী সাবিত্রী নিগম ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'এই সব বাঁধাধরা বুলি ও প্রস্তাব আমরা গত ২০ বছর ধরে শুনে আসছি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলি কাগমানুষে চিন্তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। গোয়ার একজন সদস্য বলেন যে, বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেটা 'সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর'। তিনি প্রশ্ন করেন, 'এই রিপোর্ট দিয়ে আমাদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কেন?' তিনি দেখান যে, রপ্তানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গোয়ার আকরিক লোহার অর্ধেক অর্থাৎ ৮০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশী রপ্তানী করার অনুমতি সামন্ত রাজপরিবারের লোকদের দেওয়া হয়েছে।

কয়েক দিন আগে যে, 'খুদে এ-আই-সি সি-র' অধিবেশন হয়ে গেল সেখানও 'নয়া'

তুরুপের জয়!

© [illegible] ১৮.৬.৭০

কংগ্রেস সরকারের নেতাদের এই ধরনের সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। সেই সমালোচনা শুনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর সরকারের কার্যকলাপ পছন্দ না হলে তাঁকে পার্লামেণ্টারি পার্টির নেত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সমালোচকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

এবার অসহিষ্ণু সমালোচকদের জবাব দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীওয়াই বি চ্যবন। তিনি বিশেষ করে শ্রীমোহন ধাড়িয়ার মন্তব্যগুলির উল্লেখ করে বলেন, 'বোম্বাই কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আন্তরিকতায় যদি সমালোচকরা অবিশ্বাস করেন, তাহলে আমি তাঁদের বলব, তাঁরা পার্টির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা নূতন করে বিবেচনা করুন।'

নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হওয়ার জন্য শ্রীধাড়িয়া যে দাবী তুলেছেন, তার উল্লেখ করে শ্রীচাবন বলেন যে, 'এটা কোন বিচক্ষণ সেনানায়কের যুদ্ধ পরিকল্পনা নয়। আমরা কি পরাজয়ের জন্য পরিকল্পনা করব? অথবা জয়ের জন্য? কোন সেনানায়ক পরাজয়ের জন্য পরিকল্পনা করলে কোন বুদ্ধিমান সৈনিকই তাঁর অধীনে থাকতে চাইবেন না। কখন নির্বাচন করতে হবে, সেই সময়টা নেতাদেরই বেছে নিতে হবে। শ্রীমোহন ধাড়িয়ার আন্তরিকতা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতা আমি স্বীকার করছি না।

অসহিষ্ণু সমালোচকদের সমালোচনার উত্তরে শ্রীচ্যবন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সরকারী নীতির অন্যান্য সমর্থকরা যা বলেন তার মূল কথা হল, গণতন্ত্রে এই সব ব্যাপারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 'বোম্বাই কার্যসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে সরকার যা করেছেন বা যা করেননি তার কোন কিছুর জনাই তাঁদের দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ণ করতে গিয়ে আমাদের এটাও দেখতে হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের কার্যকারিতা ও বজায় রাখতে পারি।'

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি সি শেঠী বলেন যে, শহরাঞ্চলে সম্পত্তির উচ্চসীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে একটি মডেল বিল তৈরী করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অন্য অন্তর্বর্তী বোর্ড সত্বর ঘোষণা করা হবে এবং সেগুলিতে স্থায়ী বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হবে। একটি একচেটিয়া ব্যবসায় কমিশন শীঘ্র গঠন করা হবে বলেও তিনি জানান। সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যে সরকার ও যে নেতৃত্ব ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন, তাঁরা সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। 'আমরা হাতীর সঙ্গে মোকাবেলা করেছি। এখন আমরা কি একটা পিঁপড়ের সামনে কুঁকড়ে যাব অথবা [illegible] করব?'

[illegible] [illegible] [illegible] পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের সদস্যরা যে দাবী তুলেছেন এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের বিষয়ে কিছু কিছু সদস্য যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন, তা বাদে আরও দুটি বিষয় এবার এ-আই-সি-সি অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমটি হল, আধা-সামরিক সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও জামাত-এ-ইসলামি-র নাম করে তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি সরকারকে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ভিয়েতনাম সংঘাতের অবসান ঘটাবার পথ যাতে সুগম হয়, সেজন্য ইন্দোচীন থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে এ আই সি সি-র সামনে যে 'সরকারী' প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংগঠন নিষিদ্ধ করার অথবা ইন্দোচীন থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ ছিল না। অধিবেশনের মধ্যে উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে এই দুটি প্রসঙ্গ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, জামাত-ই-ইসলামি প্রভৃতি ধরনের সংগঠনকে আইনত নিষিদ্ধ করার প্রশ্নটিতে যে জটিলতা আছে, সেকথা উপলব্ধি করেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারীর দাবী না তুলে এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার অবকাশ রাখা হয়েছে।

—[illegible]
১৯-৬-৭০

সম্পাদকীয়

ভারত সরকার নীরব কেন

গত তিন চার মাস ধরে পূর্বপাকিস্তান থেকে ক্রমাগত বন্যার স্রোতের মতো হিন্দু উদ্বাস্তুরা আসছে। প্রথমে মনে হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই দুঃস্থ লোকেরা যেমন সব সময়েই পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়, এও তেমনি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার থেকে দেড় হাজার উদ্বাস্তু আসছে বনগাঁ, বেনাপোল দিয়ে। ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ হাজার উদ্বাস্তুকে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসন শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরও ত্রিশ হাজার উদ্বাস্তু বসিরহাট ও হাসনাবাদে অপেক্ষা করছে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, আগে যেমন রাজনৈতিক দলগুলো উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং পাকিস্তানে তাদের নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন করত, এবার এ বিষয়ে তাদের উৎসাহ কম। এমন কি আগে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠান যেমন উদ্বাস্তুদের সাহায্যে এগিয়ে আসত, এবারে তাদের সংখ্যাও কম। তার ফলে উদ্বাস্তুরা কেন আসছে এবং কীসের আশায় আসছে এবং এসে পড়লে তাদের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশে কারো যেন মাথাব্যথা নেই। বহুদিনের পুরনো ক্ষত তা যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক যেমন গা-সহা হয়ে যায়, বাংলাদেশে উদ্বাস্তু সমস্যাও যেন তেমনি হয়েছে। এরা হতভাগ্য। পাকিস্তান সরকার এদের বিতাড়িত করছে। ওখানেও তাদের জন্য বলবার নেই কেউ। বাড়িতে অবাঞ্ছিত আত্মীয় এলে তাকে একবেলা খাইয়ে গাড়িভাড়া দিয়ে বিদেয় করার মতো অবস্থা হয়েছে এই উদ্বাস্তুদের। বাংলাদেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এদের কোথায় কোন মুলুকে পাঠানো হবে তার জন্য দিল্লীর সঙ্গে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়। অন্যত্র এরা কীভাবে থাকবে তা দেখার দায়িত্বও পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিচ্ছেন না।

দেশবিভাগের পরিণতি যে এরূপ শোচনীয় হবে তা ১৯৪৭ সালে যে কজন দূরদর্শী ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধীজী তাঁদের অন্যতম। দেশ-ভাগ তিনি রোধ করতে পারেন নি। নেতারা তাড়াতাড়ি ক্ষমতা পাবার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিলেন। এ-সব সত্ত্বেও একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, পাকিস্তানের এক অংশ থেকে যখন সমস্ত সংখ্যালঘুকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন অন্য অংশে সংখ্যালঘুরা থাকতে পারবে এই ধারণা নেতাদের কী করে হয়েছিল? এই অদূরদর্শিতার খেসারত এখন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যহত সংখ্যালঘুদের দিতে হচ্ছে।

এই উদ্বাস্তুরা অধিকাংশই হল কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এরা কালেভদ্রে নিজেদের গ্রামের বাইরে পা দেয়। রাজনীতির ধারেকাছেও এরা যায় না। অর্থের সম্বল এদের নেই বললেই চলে। দেশ-ভাগ হয়েছে, দফায় দফায় সংখ্যালঘুদের মেরে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান থেকে। এরা কিন্তু ভিটেমাটি আঁকড়ে বাপপিতামহর পেশা সম্বল করে পাকিস্তানেই পড়েছিল। নিজের জন্মভূমি কি মানুষ সহজে ছাড়ে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার তবু এদের থাকতে দিল না। এবং শুধু এরাই নয়, এদের পিছু পিছু আরও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সীমান্তের এপারে চলে আসবার আশংকা। ভারত সরকার এ বিষয়ে কী চিন্তা করছেন তা আমাদের জিজ্ঞাস্য।

নবাগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সরকারের করণীয় দুটি। প্রথমত, এদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান সরকারের কাছে এ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা। পাকিস্তানের নাগরিকদের সরকার তাড়িয়ে দিচ্ছে, এর দায়িত্ব পাকিস্তানকেই নিতে হবে। ভারত সরকার এখুনি বিবরটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের নজরে আনতে পারেন এবং এই উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কথা বলে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। পাকিস্তানে আমাদের যে হাইকমিশনার মহোদয় আছেন তিনিই বা কী করছেন? তিনি কি এ সম্পর্কে তদন্ত করে উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের আসল কারণ, তাদের ওপর অত্যাচার ও নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাঠাতে পারেন না? ভারত সরকারের এই নীরবতা উদ্বাস্তুদের দুঃখই শুধু বাড়াবে না, তার পরিণামে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলদেরও নষ্টামির সুযোগ দেওয়া হবে। কোনো দেশেই সংখ্যালঘুরা লাঞ্ছিত হোক তা আমরা চাই না। পাকিস্তান সরকার যে চক্রান্ত করছে তাকে বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে ভারত সরকার অগ্রণী হয়ে পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় সহায়তা করুন। নতুবা পাকিস্তানের অবশিষ্ট সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

যদি যেতে হয় ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

যদি যেতে হয় তবে যাবো ওই মানুষের কাছে
বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াবো না
বৃক্ষ কী রক্তাক্ত হলে চুম্বনে নিচু করে মাথা?
আমি ওই সমুদ্রে যাবো না
সমুদ্র আপন দম্ভে চুর হয়ে থাকে ক্ষমাহীন?
মেটাতে পারে না তৃষ্ণা যে রকম মানুষ মেটায়,
আমি ওই উদাসীন দেবতার দুয়ারে প্রার্থনা
জানাবো না, ওইখানে উপেক্ষিত মানুষের মহৎ হৃদয়

যদি যেতে হয় তবে যাবো ওই মানুষেরই কাছে
বৃক্ষ যা পারে না তা যে দিতে পারে
সমুদ্র যা দেয় কিম্বা দেবতারা অনায়াসে
তা সে

দিতে পারে, দিতে চায়
বুক পেতে বজ্র নিতে পারে
আমাকে আশ্রয় দেবে ভেবে নিজে হয়েছে দধীচি

এখন রক্তাক্ত হলে বৃক্ষ নয়
মানুষেরই ছায়ায় দাঁড়াবো

সে গেছে ॥

রঞ্জিত রায় চৌধুরী

আজকের বাংলাদেশে যেন সেই নিতাপলাতক
নিরুদ্দেশ কলামে যার মেলে নি ঠিকানা—
শোকের বিবিধ দৃশ্যে ব্যবহৃত সংগীতের মতো,
অস্থির পায়ের নিচে—ছিল যার স্থির আত্মাবহ
অনুগামী আমাদের কৈশোরের স্মৃতি।

সে গেছে বৃষ্টির মতো চারপাশে নিজেকে ছড়িয়ে,
প্রচলিত এইসব মূর্খ-জনশ্রুতি।

এখন সময় হোলো ॥

সত্য গুহ

তুমি যে দুন্দার করে ডাকো, সময় দেখবে তো
ডাকলেই তো অপ্রস্তুত সময়ে হয় না আর কুমারসম্ভব
তখন কুয়াশা ছিলো, শরীরেও ছিল না উত্তাপ
পাতা ঝরে ঝরে পথে অলিখিত নিঃস্বতার করুণ প্রস্তাব
সর্বজনীন ছিলো এবং আমিও
পরিপূর্ণা অপর্ণা, শুনেছি
তোমার পিনাক, একটু দাঁড়াও না, আমার
সাজপোষাক করা নেই, সর্বাঙ্গের গেরুয়াই দ্রৌপদীর শাড়ীর
মতন

আমি যাবো, তোমার জন্যেই যাবো, অস্তিত্বে আমার
তোমার তপস্যা জন্মে জন্মে
হয়ে গেছি আমিই তুমি যে! দেখো, রিক্ত হয়ে আছি
শীতের কুয়াশা আর শিশিরের জলে
ধুয়ে গেছে প্রগলভ সব ছেলেমানুষী, আম
এখন সন্তান চাই, সুঠাম বলিষ্ঠ আর দানব বিনাশী
সন্তান, গেরস্ত হবো আমি
ঘুলঘুলি ভরা থাকবে পায়রা পুরোনো তাল দরজার শিকোয়
এবং কোল জুড়ে যদি থাকেও সন্তান
চুমু দিয়ে দিয়ে ডাকবো বাবুন্তা...আ...আ...।...আমার বৈভব

সারা শরীরে কী ওঠে শিহরণ, বাজে তোমার পিনাক
বসন্ত ঝাউ গাছে পড়ে হেসে কুটিকুটি
তুমুলে পলাশ গুনছে সেইটুকু দুপুর যখন
আর্ত কোকিলের স্বর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে
নীরব
শরীর জাগে না মন, শোন না [illegible] [illegible]
থেমে থাকো—থামেই থাকো না
অনন্ত [illegible] নামে [illegible] আজো জেনে আর
সামর্থ্য না নিয়ে বাইরে [illegible] না করে পারে পুরুষকে [illegible]
আগুন

এখন সময় হোলো, শূন্য হৃদয়; প্রিয়, ভরে দাও
তোমার যৌবনে।।

সাহিত্যিকের চোখে

আজকের সমাজ

আজকের সমাজ যে খুবই উৎকেন্দ্রিক তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কেন এই অস্থিরতা তাই নিয়েই নানা মুনির নানা মত।

আসলে কোনো পরিস্থিতিই তো একদিনে ঘটে না। আমরা সচেতন থাকি বা না থাকি, অনেক দিন আগে থেকেই চলে তার আয়োজন। বহু ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর টানাপোড়েনে সমাজের মধ্যে অদলবদল ঘটে, ঘটতে থাকে। এইটেই চিরকালের নিয়ম। কিন্তু মাঝে মাঝে ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সময়ে তার গতিটা হয় দ্রুততর, এলোমেলো, পরস্পরবিরোধী। তখনই আমরা চমকে উঠি, হোঁচট খাই। প্রশ্ন করি, কেন এই অস্থিরতা?

বলা বাহুল্য আকস্মিক মনে হলেও এই আপাত দুর্জ্ঞেয় বিশৃঙ্খলারও কারণ থাকে। আর সে কারণের শিকড় ছড়িয়ে থাকে অতীতে। তাই আজকের সমাজ উৎকেন্দ্রিক এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে দেখতে হয়, আমরা অর্থাৎ যাদের বয়স চল্লিশের ওপর তাদের দায়িত্ব কতোখানি। কেননা, যাদের নিয়ে আজকের ভাবনা, সেই অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের দল, তারা তো আকাশ থেকে পড়েনি, তারা আমাদের ঘরেই জন্মেছে, আমাদেরই আদর্শে মানুষ হয়েছে। ত্রুটি যদি কিছু আজ ঘটে থাকে, সে গলতির বীজাণু কি আমাদের রক্তের মধ্যেই ছিল না? আমাদের জীবনযাত্রা ও আচরণের মধ্যে যতো গোঁজামিল ও আত্ম-প্রতারণা ছিল সবকিছুরই তো এরা আজন্ম সাক্ষী। তাই কথা ও কাজের সেই দুস্তর ফারাক যদি এদের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে ক্রমাগত দুর্ঘটনা ঘটিয়ে এক বিপজ্জনক প্রান্তে নিয়ে এসে থাকে, দোষ দেব কাকে?

অধিকন্তু আমরাও যে দেশাত্মার কপটতার আশ্রয় নিয়ে আমাদের পুত্র-কন্যাদের অঘাটায় নামিয়ে দিয়েছি তা মোটেই নয়। আমরা মনে হীন, কাপুরুষ, মতলববাজই হই—এ-হৃদয়হীনতা আমাদেরও অসাধ্য। আসলে আমরাও তো কোণঠাসা হয়েই আত্মপ্রতারণার জীবন কাটিয়েছি। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিকে চাপা দিয়ে রাখলেও পরিণামে যা ঘটার তাই ঘটে। অতএব—!

এ-পরিস্থিতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আছে, সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও অনেকেরই বোধগম্য জানা। অর্থাৎ কী করে ইংরেজের উপনিবেশে এই দেশে মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটল, এবং একই সঙ্গে জমিদারী-প্রথা আর কলকারখানার প্রসার ঘটতে লাগল। কিন্তু যেহেতু দেশটা পরাধীন, তাই সবকিছুর সামনেই লক্ষ্মণের গণ্ডি। জমিদারী ব্যবস্থা তাই ধুঁকতে ধুঁকতেও জগদ্দল পাথরের মতো টিকে থাকে দেশের [illegible]। কল-কারখানার মালিকানা তাই প্রধানত বিদেশী প্রভুর এবং এদেশী বণিকদের ছিটেফোঁটা যা সুযোগ মেলে তা-ও বেশিদূর এগোতে পারে না। অগত্যা বেশির ভাগই হন বেনিয়ান, জায়গীরদার, সুদখোর মহাজন এবং সাধারণ শিক্ষিতেরা হন লক্ষ লক্ষ কেরানি। তবু প্রথম দিকে বিদেশী আর স্বদেশী প্রভুদের তুলনা করে সমাজে একটা নতুন ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। কেরানিগিরি করেও তাঁরা ছেলেদের লেখা-পড়া শেখালেন, এবং সেই ছেলেরাই হলেন আবার কেরানি, আর সেই সঙ্গে কেউ কেউ শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী এবং হ্যাঁ, কেউ কেউ শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকও। বুদ্ধিজীবী এই মধ্যবিত্তেরা বাংলাদেশে তো বটেই, বাংলার বাইরেও পেলেন জীবিকার উদার সুযোগ। বেশ একটা আত্মতুষ্ট স্বচ্ছলতার আমেজ এল জীবনে। তারই প্রতিফলনে ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও এল একটা নতুন উদ্দীপনা। কিন্তু যেহেতু এদেশের শতকরা সত্তরভাগ মানুষ চাষী বা চাষের সঙ্গে যুক্ত, এবং যেহেতু কৃষি-ব্যবস্থায় চেপে রইল মধ্যযুগীয় জমিদারী ও জোতদারী প্রথা, যেহেতু কলকারখানা স্থাপনের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ, টাটার লোহা-কারখানা ছাড়া মূলে শিল্প প্রায় একটিও ছিল না, এবং যেহেতু ব্যবসা মানেই ছিল দালালী বা কাঁচামাল চালানের ঠিকেদারী; যেহেতু ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও লেখাপড়ার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মানুষ এবং তাদের চাপে সঙ্কুচিত হতে হল প্রবাসী বাঙালীদের—কাজেই মধ্যবিত্তের সেই স্বর্ণ-যুগ সূর্যাস্তের সোনালি আভার মতোই ক্ষণস্থায়ী দীপ্তির পর সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকল। আমরা অর্থাৎ একালের চল্লিশোত্তর বয়স্করা সেই আলোর বিপর্যয়েরই কালসন্ধির মানুষ। কাজেই আমাদের সন্ততিদের জন্যে আমরা কী উত্তরাধিকার রেখেছি তা সহজেই অনুমেয়। এ নিয়ে আমাদের মতো বাতিল-হয়ে-যেতে-থাকা মানুষদের চলতে পারে, কিন্তু যারা আমাদের পরবর্তী—যারা নতুন করে বাঁচতে এসেছে, তাদের চলবে কেন? এই কেন-র প্রশ্নই ক্রমাগত ফেটে পড়ছে আজ চারদিক থেকে।

অধিকন্তু এ-সমস্যার একটা অন্য দিক আছে, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। বাংলা-দেশ এবং ভারতের একটা বিশেষ সমস্যা আছে সেটা ঠিকই। কিন্তু আজকের দিনে গোটা পৃথিবীর মধ্যে যে জানাজানির জোয়ার ও বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গেও আমাদের যোগ আছে বইকি! বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মতোই ভাবাদর্শও কোনো বিশেষ জায়গা থেকে জন্ম নিলেও তা শুধু সেই দেশের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে না, সারা মানবজাতিরই সম্পদ হয়ে যায়। কাজেই আজকের যুগের যা প্রধান ভাবধারা তা আমাদের দেশেও আলোড়ন তুলছে।

সকলেই জানেন, বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিদ্যার অভূতপূর্ব দিগন্তবিস্তারের ফলে আমাদের চিন্তা ও মূল্যবোধের জগতে তুলকালাম ওলটপালট ঘটে যাচ্ছে। তাছাড়া পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, গত মহাযুদ্ধের পর থেকে জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিরও যুগান্তকারী রদবদল ঘটে গেছে। ভারত, চীন ও গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তো বটেই, অন্ধকার আফ্রিকাও সাম্রাজ্যবাদী শিকল ভেঙে স্বাধীন মহিমায় শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়েছে। এদিকে পৃথিবীর আধাআধি অংশে আজ সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, এবং ভারতসহ অন্য বহু উন্নয়নশীল দেশেও সমাজতন্ত্র আজ মূল লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত। আবার এরই সঙ্গে প্রায় একযুগ ধরে ঘটছে ভিয়েতনামের রক্তাক্ত সংগ্রাম, অতি-সম্প্রতি যার প্রসার ঘটেছে কাম্বোডিয়ার মাটিতেও। ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও অগ্নিগর্ভ। অথচ রাষ্ট্রসংঘ আছে, তার জাতীয় নিরাপত্তার সনদ আছে, এবং দেশনেতাদের মহিমা কীর্তনে গদগদ ভাষায় কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনও আছে। চাপা দেবার ও ধোঁকা দেবার এই ক্ষীণ পলেস্তারা ভেদ করে আজকের পৃথিবীর এই অন্তঃসারশূন্যতা অনেকের চোখেই ধরা পড়ছে। বিশেষ করে যুবকদের কাছে, যারা এই পৃথিবীটাতে নতুন করে বাস করতে এসেছে তাদের কাছে। কেন তারা এই অক্ষম নির্বোধ দায়িত্বহীন খোলসটাকে জীইয়ে রাখবে? কেন?

তাই তো তারা দাবি করে, তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কী তাদের শেখানো হবে তার পাঠক্রম স্থির করার সময়ে তাদের কথাও শুনতে হবে; কেননা তরুণরা নতুন দিনের চাহিদার বিষয়ে সচেতন মন; এবং সে-দাবি তারা আদায় করে। আর ভেবে দেখুন, যখনি আমরা তাদের সে-দাবি মেনে নিয়ে সিলেবাস কমিটিতে তাদের ডাকি, তখনি আমরা এ-ও মেনে নিই যে, আগামী দিনের চিন্তার ক্ষেত্র থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি এবং আমরা বাতিল হয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ দেখা দিয়েছে একটা 'জেনারেশান গ্যাপ'—আমাদের ও আমাদের পরবর্তী পুরুষের মধ্যে একটা শূন্যতা। এবং সকলেই জানেন, শূন্যতা কেবল বায়ুমণ্ডলেই নয়, মানব-সমাজেও স্থিতাবস্থার ভিত ধরে নাড়া দেয়।

আজ সারা পৃথিবীই পার হচ্ছে সেই অস্থির যুগসন্ধির ভেতর দিয়ে। আমাদের বাংলা ও ভারত পিছিয়ে-পড়া দেশ বলে তার সমস্যা আরো জটিল, আরো ভয়াবহ।

কিন্তু রাত্রি যতো গাঢ়ই হোক, সূর্যোদয়ের পথ আমরা খুঁজে পাবই—নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত আজকের যুবকদের ওপর আমার সে আস্থা আছে।

তেরোই আষাঢ়

বঙ্কিম স্মরণে

'বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে', রবীন্দ্রনাথের গানের এই কলিটি প্রায় প্রত্যেক বৎসর আষাঢ় মাসে 'বঙ্কিমচন্দ্রকে' স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে যায়। বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে। যে কালে 'বন্দেমাতরম' এই মহান ধ্বনিটি মানুষের মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে এবং তার জায়গায় বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক বা ইনকিলাব জিন্দাবাদ শ্লোগান লেখা হয়েছে এবং কায়েমও হয়েছে-সেই কালের আজকালকার দিনে। তবু মনে পড়ে তার কারণ আষাঢ় মাস বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম মাস। আজ থেকে ১৩২ বৎসর আগে ১২৪৫ সালে ১৩ই আষাঢ় ইংরিজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় তাঁর পৈত্রিক বাড়ীতেই (সম্ভবতঃ) তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ী আজও বিদ্যমান। এই বাসভবনেরই একাংশ (ঠিক একাংশ নয় একটি পৃথক অংশ, সম্ভবতঃ এটি তাঁদের অথবা একক তাঁর বাইরের বসবার ঘর বা বৈঠকখানা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল) এই একাংশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতার উত্তরকালে কিনে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নামাঙ্কিত ক'রে তাঁর ব্যবহার্য জিনিষের ও গ্রন্থাবলীর একটি সংগ্রহশালা খুলেছেন। এটি ছাড়াও নৈহাটিতে ঋষি বঙ্কিম কলেজ নামে একটি কলেজও হয়েছে। তথাপি বিগত দশ-বারো বা চৌদ্দ বৎসর আমরা যেন তাঁকে ঠিক স্মরণ করি না বা করতে চাই না।

আমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়েছি এমন ধারণা আমি করতেই বোধ হয় পারি না। বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীর ছেলে বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্মৃত হবে কি? বঙ্কিমচন্দ্র অবিস্মরণীয়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, ঋষি বঙ্কিম এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী কি বিস্মৃত হ'তে পারে? সে মনে আমি করি না। তবুও অভিযোগ আছে বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে। বাংলা সরকার, বাংলা ভাষাকে সরকারী দপ্তরে তাঁর প্রাপ্য মহিমান্বিত মাতৃ মর্যাদাটি দেবার প্রস্তাব করেছেন কয়েক বারই কিন্তু বিচিত্র বিস্ময়ের কথা এই যে, আজও তা কার্যে পরিণত করেন নি। গণ-অভিযান আমরা করি নি; ভাষাও দীনদুর্বল নয়। সরকারী কর্মচারী ও গণ-প্রতিনিধিগণের এই ভাষায় অপারঙ্গমতার জন্য তাঁরা বাঙলা ভাষার আসনে আজও ইংরিজীকে বসিয়ে রেখেছেন। এ অভিযোগও করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে। বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাসভবন সরকার কিনেছেন—কিন্তু আজও সেখানে এই বিরাট পুরুষের যোগ্য সম্মান সমৃদ্ধ কোন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণশালা করতে পারেন নি। সেও হ'তে পারে বা হবে কিছু কালের মধ্যে। নিশ্চয়ই হবে। গণতন্ত্রের আমলে যেখানে একটা বাড়ী কেনা হয়েছে সেখানে ওই বাড়ীতে সাহিত্যের ছাপ মেরে কিছু ক'রে গণ-তোষণ করতে কেউ ভুল করবেন না। কেবল দৃষ্টিগোচর করার অপেক্ষা। ওদিক দিয়ে অবস্থা যাই বা যেমনই হোক—বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলেছে একথা প্রমাণিত করে না। আমার মনে হচ্ছে, যে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভোলা যায় না তাকেই আমরা ছদ্ম অবহেলায় ভুলতে চেষ্টা করছি। ভুলতে চাচ্ছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাল ১৮৩৮ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত—তাঁর সাহিত্য জীবন দুর্গেশ নন্দিনীর রচনাকাল ও প্রকাশ কাল ১৮৬৪—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত। তাঁর জীবনকালের পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তার মধ্যে তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিমাণ ২৫ বৎসর। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়া মাত্র বাঙলা সাহিত্যের অদৃশ্যলোকে ধ্বজা পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, যদি বলি তার সঙ্গে শঙ্খ ঘন্টাধ্বনি সহযোগে একটি মঙ্গলারতির থালা জ্বালিয়ে ভাগ্যবিধাতা বঙ্গ-সরস্বতীর আরতি নিষ্পন্ন ক'রে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—বিশ্ব-সারস্বত মণ্ডপে তোমার আসন নির্দিষ্ট হল—তুমি আজ থেকে এখানে ব'স—তা হ'লে বাড়িয়ে বলা হবে না। সমস্ত ঘটনাটি খতিয়ে দেখে উপলব্ধি করতে বিস্ময় বোধ হয়। অনেক পিছনের কথা থাক; নবযুগ থেকে গণনা করা যাক। নবযুগ যাকে বলি—সেই রামমোহনের কাল থেকে বঙ্কিমের কাল পর্যন্ত কাল খুব পরিসর বা দীর্ঘ নয়। রাম[illegible]হনের পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে[illegible] [illegible]কটা পর্ব আছে—তারপরই বিদ্যাসা[illegible] এলেন, বর্ণপরিচয় থেকে সীতার বনবাস পর্যন্ত একটা প্রাথমিক কৃষিকর্ম অথবা একটি বসতি পত্তনের প্রাথমিক কর্মগুলি করলেন। তার সঙ্গে সঙ্গেই এলেন মাইকেল তাঁর আশ্চর্য মেঘনাদ বধ কাব্য নিয়ে। তারপরই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে বাংলা কবিতা ও কাব্যে একটা সাহিত্যের ভাষা ছিল।

তার প্রমাণ প্রবাদ বাক্যে আছে, ছড়ায় আছে, ধাঁধায় আছে—এমন কি শুভঙ্করের কাঠাকালী বিঘাকালীতেও আছে। বাংলা গদ্যের যে নমুনা উইলিয়াম কেরী প্রমুখ পাদরীদের সংগ্রহের মধ্যে পাই তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার দূরত্ব অন্ততঃপক্ষে কয়েকটা শতাব্দী। (আলাল প্রভৃতি এবং ভূদেব রচনার কথা এখানে বিচার্য বিষয় নিশ্চয় কিন্তু তাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের বিস্ময়কে কোনক্রমে লঘু করা যায় না।)

শুধু ভাষা নয়—উপন্যাস নামক নূতন যে সাহিত্যকর্ম এল তার আঙ্গিক ব্যাকরণ ভাবাবেগের আশ্চর্য মধুর সুষমাপ্রকাশ—গোলেবকাওলীর ক্ষেত্রে জন্মাল কেমন ক'রে সে প্রশ্ন নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি গবেষণা আমরা করি নি—ভোলোই করেছি বলে

মনে হয়) আমরা তাঁকে মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি এই বলে যে মধ্যে মধ্যে এমন হয়। এমন ঘটে। আমাদের মতই ঘটেছে।

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী সম্পর্কে বলেছেন— "দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আমার ধারণা এ উচ্ছ্বাসকে তিনি ইচ্ছা করেই সংযত করতে চান নি—তাঁর সাজিতে ফুল ছিল অন্তরে উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা ছিল—সেই উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা বশেই দুই হাতে তাঁর যত ফুল ধরে তত ফুলই বঙ্কিমের উদ্দেশ্যে ঢেলে দিয়ে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃত না করলে আমার বক্তব্য ঠিক পরিস্ফুট হবে না। এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করতে ব'সে তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে গ্রহণ না করলে বঙ্কিম স্বরূপ রেখার মতেই হোক আর খড় মাটি কি মর্মর খন্ড থেকেই হোক কোন ক্রমেই গড়া যাবে না। তিনি বলছেন—"পূর্বে কি ছিল (অর্থাৎ বঙ্কিমের পূর্বে) এবং পরে (বঙ্কিমের পরে) কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার সেই একাকার সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয় বসন্ত' সেই 'গোলেবকাওলি' সেই বালক ভুলানো কথা, কোথা হইতে আসিল এত আলোক এত আশা এত সঙ্গীত এত বৈচিত্র্য। বঙ্গ দর্শন যেন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষায় মতো—সমাগতো রাজবদুন্নতে ধ্বনিঃ। এবং মুষল ধারে ভাব বর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

* * * *

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবন প্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেই দিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সে দিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে কোন দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।"

এইখানে আর একজনের উক্তি উদ্ধৃত করব। সে উক্তি অপূর্ব পাণ্ডিত্যের অধিকারী—আই সি এস রমেশচন্দ্র দত্ত মশাই। তাঁর মতে—বঙ্কিমচন্দ্র— "the greatest man of the 19th Century"

আজ আমার কথা ঠিক তাই।

বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। সমস্ত বাঙালী জাতির যারা রাজনীতিতে মেতেছে তারা তাই নিয়ে মেতে থাক, যারা কৃষিবিপ্লব ঘটাচ্ছেন তারা তাই ঘটান—যাঁরা ঘরবাড়ী গড়ছেন—টাকার হিসেব করছেন-প্ল্যান করছেন, অনুগ্রহ আপনাপন কর্মে তাঁরা রত থাকুন। এমন কি ভাষা যাঁরা শিক্ষা দেন—যাঁরা শিক্ষক তাঁদেরও যদি আপন কর্মের মধ্যে অবকাশ না-পান নাই পেলেন। কিন্তু যাঁরা কর্মে সাহিত্যিক, যাঁদের সাহিত্যপত্র আছে, যাদের সাহিত্য চর্চার বা সাহিত্য রসভোগের জন্য প্রতিষ্ঠান আছে তারা যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করেন। আমি জানি সুনিশ্চিত যে বঙ্কিমচন্দ্র অবিস্মরণীয়, তাঁকে বিস্মৃত আমরা হইনি হ'তে পারিনে। শুধু শীতপ্রবাহ বা তাপ-প্রবাহের মত সাময়িক একটা বিক্ষোভের প্রবাহে আজ আমরা বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে বিস্মৃতির থেকেও বড় অপরাধ করতে বসেছি, তাঁকে অস্বীকার করতে চাচ্ছি চেষ্টা করছি।

বিস্মৃতি হলে জাতীয় চরিত্রে স্মৃতির দুর্বলতার উপর অপরাধ আরোপিত করতে পারতাম। কিন্তু এ তা নয়। এ আমাদের নূতন কালের সাহিত্যকারদের অপরাধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা অপরাধের কথা শুনি, শুনি—শুনি তিনি প্রতিক্রিয়াশীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন,—তাঁর গোঁড়ামি ধর্মান্ধতা জীবনের সুস্থ গতির পক্ষে অনুকূল নয়,—কিছু কিছু লোক তাঁর উপর সাম্প্রদায়িকতার দায়-দায়িত্ব চাপাতে চান। সে ক্ষেত্রে বলার কথা এই যে, তার জন্য দায়ী ক'রেও তাঁকে আমরা মহান শিল্পীরূপে স্মরণ করতে পারি। বস্তুত তার সেই আলোচনার মধ্যেই তাঁর স্মৃতি আমাদের সম্মুখে জাগ্রত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তাঁর একটি মূর্তি রবীন্দ্রনাথ আমাদের মন লোচনের সম্মুখে তুলে ধরেছেন; তার ছবি আমরা দেখেছি কিন্তু সে ছবিই। রবীন্দ্রনাথের শব্দচিত্রের মধ্যে তিনি জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

এমারেল্ড বাওয়ারে একটি সভায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছিলেন—এবং সেই স্মৃতি থেকেই লিখেছিলেন—"বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্ল মুখ—গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ—চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। * * *। মনে

আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুন্দর স্বাতন্ত্র্য ভাব আমার মনে অংকিত হইয়া গিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে আপন রূপ ও গুণের যে ছাপ তিনি অংকিত করে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে যেন অভিভূত। তথাচ এইটিই তাঁর বিচার। এবং এই বিচারই নিঃসংশয়ে সত্যের বিচার। চক্ষু কর্ণ মন সব কিছু দিয়ে বিচার হয়ে গেছে এখানে। কোন কালে কোন ভাবান্দোলন চালিত বিরূপতায় যদি এই মূর্তিকে আমরা মসী লেপন করে কালো করে দিই বা অবহেলায় ইচ্ছা করে বিস্তৃত হতে চাই— তবে তাই কি সত্য হবে? বা মানব জীবন কি তাই মেনে নিতে পারে?

এই অসাধারণ মানুষটি সম্পর্কে আর একটি দুর্লভ সত্য আছে। সে সত্যটি হ'ল এই:—যিনি বড় স্রষ্টা তিনি সর্ব সময়ে বড় দ্রষ্টা নন। যিনি অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভাশালী শিল্পী তিনি সকল সময়ে সূক্ষ্ম শিল্প সমালোচক নন। শিল্পবোধ এবং শিল্প সমালোচনা এক কথা নয়। বিধাতা, যিনি সব কিছুরই স্রষ্টা তিনি সৃষ্টিশালায় ব'সে সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরকেও গড়ে বসেন। সে গড়েন শিল্পেরই প্রয়োজনে—ইচ্ছে করে, অসুন্দরকে গ'ড়ে তুলে সুন্দরকে তুলে ধরেন। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়, মানুষ স্রষ্টাদের অধিকাংশেরাই নিজের শিল্পের সমালোচক হ'তে পারে না। সেখানে বোধ বা এই সমালোচনা বুদ্ধিটি খেই হারায়। এবং এই ধরনের বিভ্রান্তির দায়ে দায়ী হয়ে সমালোচনার আদালতে স্রষ্টারা কাঠগড়ায় দাঁড়ান বাধ্য হয়ে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুজন স্রষ্টা—বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তাঁরা চাঁদের মত এক পৃষ্ঠে থেকে যাকে বলে ভুবন ভাসিয়ে আলোর প্লাবন বইয়ে দিয়ে অন্যপৃষ্ঠে অন্ধকারকে বহন করেন নি। সূর্যের মত তাঁরা সর্বদিক থেকে আলোকময়। শুধু আলো নয় জীবন্ময় উত্তাপও আছে তাদের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের এই দুজনের প্রথমজন—বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় জন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের স্রষ্টাই নন—ধর্ম ও দর্শন সাহিত্যের বনিয়াদ পত্তন করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি; বাংলার সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম পত্তনকারও তিনি। ব্যঙ্গ-রঙ্গ সমালোচনা এমনকি আজকের যুগের যে সমাজদর্শন বা তত্ত্ব বিশ্বসমাজতত্ত্ব হতে চলেছে সেই সাম্য সম্বন্ধেও তিনি প্রবন্ধ রচনা করে বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ-দিগন্ত থেকে ও-দিগন্ত পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সর্বদিকে ও দিগন্তেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন এবং যা দেখেছেন সকল কিছুকে তাঁর চৈতন্য ও বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ-পূর্বক গ্রহণ করে বাংলা ভাষাভাষী জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে গেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় মহাজন।

এককালে এই বিরাট পুরুষকে নিয়ে অনেক বাক্‌বুদ্ধ হয়ে গেছে। অভিযোগ বলতে গেলে যা বলেছি তাই। এবং এর উত্তরও দিয়ে গেছেন সে কালের পন্ডিত-জন, রসিকজন, সমালোচকগণ, সর্বোপরি মনীষী জনেরাও। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য সমালোচক মনীষী এবং কবি মোহিতলাল মজুমদার, আচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি; ঔপন্যাসিক সমালোচক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীও এ ধরনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আজ এই ১৩৭৭ সালের আষাঢ় মাসে অকস্মাৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল সেই অবিস্মরণীয় চিত্রকল্পকে মনে ক'রে।

"মা যা হইয়াছেন।"

সেই রূপটি আজ সারা দেশে যেন মাটিতে পা রেখে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। রূপ হয়তো নানা-জনে অন্যরূপে কল্পনা করতে পারেন কিন্তু এমনভাবে উপস্থিত করে এমনই ওই "মা যা হইয়াছেন" এই কয়টি কথায় ব্যক্ত করতে পারতেন না।

থাক। ওই কথাগুলি নিয়ে নিবন্ধকে দীর্ঘ করব না। হৃতসর্বস্ব-মন্দ-রুদ্ধ রক্ত তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত দেশের কথা ভাবতে গিয়ে ওই ছবি মনে পড়ল—ওই কথা ক'টি মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি কথা মনে হল। এর সঙ্গে মনে পড়ছে ৩২ বছর আগের কথা। ১৩৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিম শত-বার্ষিকীর কথা।

বঙ্কিম শত-বার্ষিকীতে যে উৎসব ও সমারোহ বাঙালী করেছিল—তা আজও বহুজনের মনে রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সে সময় উদ্যোগী হয়ে বঙ্কিম রচনাবলীর শত-বার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশ ক'রেছিল। সমগ্র দেশ কৃতজ্ঞ হয়েছিল এই মহৎ কর্মটির জন্য। এই শত-বার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার। বিজ্ঞপ্তি হিসাবে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন—দার্শনিক মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়। তখন তিনি সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। তাঁর এই নিবন্ধের প্রথম অংশটুকু উদ্ধৃত করছি। এর থেকে ৩২ বৎসর পূর্বে বাঙালীর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে চিন্তা ও মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তিটির সেই অংশ—এই:—
"১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় মঙ্গলবার (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ ২৬শে জুন) রাত্রি ৯টায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন —ঐদিন আকাশে কিন্নর গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল — দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল— স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম শত-বার্ষিকী। এই শত-বার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নানা উদ্‌যোগ আয়োজন করিতেছেন— দেশের প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলাদেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা-স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।"

বত্রিশ বৎসর পর আজ আষাঢ় মাসে সারাদেশ বঙ্কিমচন্দ্র ও ১৩ই আষাঢ় সম্পর্কে-নীরব উদাসীন।

আকাশে চলমান মেঘপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি কল্পনাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠল। তার—সঙ্গে ক'টি কথা—।

"মা-যা হইয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে হল। মনে হ'ল ১৩ই আষাঢ় তাঁর জন্মদিন।

"বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে"—গানটির কলিটির মতই মনে হ'ল তাঁর কথা। তাঁকে প্রণাম জানাই। তিনি অবিনশ্বর এবং অবিস্মরণীয়।
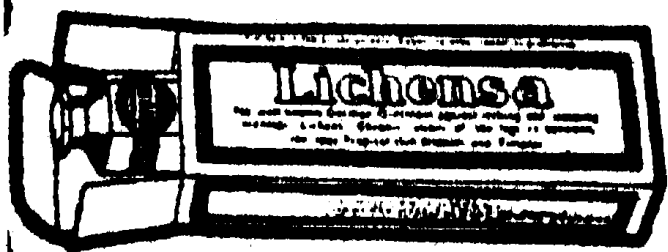
বাড়ি আমার গ্রামে হলেও শহরে মানুষ ছোটবেলা থেকেই। গ্রামের বাড়িতে গেছি অনেক বেশী বয়সে। বাবা মারা যাবার পর—যখন জমিজমা দেখাশুনো করার দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়েছিল। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে।

হয়তো সে জন্য গ্রামে যাবার দরকার হলে মনে হয়, কোনো বাধ্য বাধকতা আমাকে গুঁতোধাক্কা দিয়ে গ্রামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া কলকাতা আমার কর্মক্ষেত্র হলেও মাঝে মাঝে আমাকে ছুটে গিয়ে আমার গ্রামের কাছে বিপদে হাত পাততে হয়েছে...অবশ্য আমার গ্রাম আমার বিপদোদ্ধার করেছে...দুঃসময় কাটিয়েছে, অর্থ-সাহায্য করেছে।

প্রায় সব বারেই গ্রামের বাড়ি যাবার পেছনে একটি-না-একটি তিক্ত কারণ কাজ করেছে...

জীয়ন রস

অজিত মুখোপাধ্যায়

হয় তো সে জন্যই গ্রামকে আমি ভালো-বাসতে পারি নি। কিম্বা নগরে বাস করার যে সহজ আরাম সে আরাম গ্রামে মেলে না... মেলে না মনোমত সংগ, মেলে না ছোটখাট-ও লাইব্রেরী এবং আরও অনেক কিছু, যা কলকাতায় সহজে অথবা অনেক কষ্টেও মেলে।

দু-চার দিন কাটানোর পক্ষে গ্রাম মন্দ নয়। বিভিন্ন ঋতুতে তার বিভিন্ন সৌন্দর্য... কিন্তু এক সৌন্দর্য এক দিন কি দুদিন দেখলেই একঘেয়েমি আসে। কী বসন্তের শালবন, কী গেরুয়া ডাঙার পরপারে সূর্যোদয়, কী মাঠভর্তি সবুজ ধান...বড় জোর দু-চার দিন মুগ্ধ চোখে দেখা যায়... রাত্রির স্বচ্ছ নীল আকাশে সুস্পষ্ট নক্ষত্র-রাজী দেখে অনেক দার্শনিক তত্ত্ব মনে আসে...কিন্তু সেও বড় ক্ষণস্থায়ী।

গ্রাম আমার কখনোই দীর্ঘকাল ভালো লাগে না। দীর্ঘকাল গ্রামে বাস করতে হবে ভাবলে মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব। এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে আমাকে মাঝে মাঝে রেহাই দিয়েছে যে কয়জন, তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় হাবু পাত্রর নাম। হাবু পাত্রর কাছে গিয়ে আমি মন হালকা করতে পেরেছি...সে জন্যে গ্রামে যে ক'দিন কাটিয়েছি, হাবু পাত্র আমার দীর্ঘ সময় জুড়ে থেকেছে।

আমি যখন বিপদে আত্মহারা তখন এই লোকটির সাহচর্য আমাকে অনেক ভরসা জুগিয়েছে...কারণ বুঝি নি। আমি সভ্য-জগতের মানুষ, শিক্ষার আলোকে আলো-

...আর হাবু পাত্র অশিক্ষিত ,অজ্ঞ এবং ... চাষী...তাকেই আমার ভরসা ...উচিত, কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে উলটো।

উপদেশ বা জ্ঞান বিতরণ করে হাবু পাত্র আমাকে ভরসা জোগায় নি—সে-রকম দুঃসাহস সে কখনো দেখায় নি...আমি শুধু তাকে দেখে, তার কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, ওর কাছ থেকে ওর অগোচরেই সাহস সংগ্রহ করে নিয়েছি...

সারা সকাল ও সারা দুপুর ট্রেনে ও বাসে কাটিয়ে খাঁ খাঁ রোদ ভেঙে সেবার কলকাতা থেকে যখন বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় বিকেল। মাঠ শূন্য...রোদে পুড়ে যাচ্ছে দিগন্ত। মনে হচ্ছে খড়ের চালগুলো থেকে এই বুঝি আগুনের শিখা নেচে উঠবে ...বিকেল হতে চলেছে, তবু যতদূর চোখ গেল ততদূরে জনপ্রাণী বা পশুপাখি দেখতে পেলাম না।

বাড়ি পৌঁছে হাত পা ও মুখ ভালো করে ঠান্ডা কুয়ার জলে ধুয়েও সারা শরীর ও মাথার উত্তাপ যেন এতটুকু কমল না। আজকাল সকালে ঠান্ডার ভয়ে চান করতে পারি না...কলকাতা থেকে চান না করেই বেরিয়েছি, রাস্তায় কোথাও চান করার অবসর জোটে নি...ট্রেন থেকে নেমেই সঙ্গে সঙ্গে বাস ধরতে হয়েছে...কেবল মাঝখানে দুটি ভাত নাকে মুখে গোঁজার ফাঁক পেয়েছিলাম...বিকেলেও সর্দি লাগার ভয়ে চান করতে পারলাম না... মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল...

তার মধ্যেই চা খেতে খেতে গ্রামের দুরবস্থার পাঁচালী শুনলাম, মায়ের অনটনের ফিরিস্তির ফাঁকে ফাঁকে। অনেক দিন পরে বাড়ি আসছি, কেমন ধান-ধুন হয়েছে খবর রাখতাম না। বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমাদের অভাব অনটনের কথা শুনে আসছি, তার সঙ্গে নতুন খবর পেলাম, এ বছর মাঠকে-মাঠ ধান পোকায় সাবাড় করে দিয়েছে...যে জমি মায়ের আয়ের প্রধান উৎস সে জমি এবার বিরূপ...ঘরে সম্বৎসরের খোরাক নেই...কী করে বছর চলবে, ঘাড়ে এক পঙ্গু মেয়ে, এক ছেলে কলেজে পড়ছে...তার পিছে কাঁড়ি-কাঁড়ি খরচ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখলাম, সত্যি সত্যি আকস্মিকভাবে মায়ের গাল দুটো বসে গেছে, মাথার প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে, চোখেমুখে প্রগাঢ় দুশ্চিন্তার ছাপ।

মাথায় আমার রক্তস্রোত নাচানাচি করতে লাগল।

আমি নিজের বিপদেই দিশেহারা, পরন্তু মায়ের অভিযোগ।

আর অভিযোগের লক্ষ্যস্থল যে ছেলে, সেটা মা মুখ ফুটে না বললেও বুঝতে পারছিলাম...কারণ তখন আমার অবস্থা টলোমলো।

হাবুদার কাছে যাবার ইচ্ছে হল হঠাৎই...

ভাবলাম, সেখানেও যদি হাহাকারের মর্মবিদারক চিৎকার শুনি?

তবু মায়ের ২০।২৫ বিঘে জমি আছে ...হাবু পাত্রর তো তা-ও নেই। হাবু পাত্রর জমি আছে বড়জোর বিঘে আষ্ট, তার ... ছ' বিঘে ডাঙা। ভাগ-চাষ করে নিয়ে থাকে। মোট কুড়ি বিঘের চাষ বর্তমানে...আগে আরও বেশি চাষ করত; বাপ-বেটার ইদানীং ঝগড়া-ঝাঁটি চলছে বলে চাষও কমিয়ে দিয়েছে হাবুদা...

যে চাষী মাত্র কুড়ি বিঘে মোট চাষ করে তার অবস্থা এ বছর নিশ্চয় মায়ের চাইতে অনেক বেশি শোচনীয়।

তাহলে যাই কোথায়...

আছে আত্মীয়দের বাড়ি...

আত্মীয়রা কাছের মানুষ কিন্তু মনের মানুষ নয়। ছোটবেলায় আত্মীয়স্বজনদের যত ভালো লাগত, বয়স বাড়ার সঙ্গে তারা তত দূরে সরে যাচ্ছে...হয়তো আত্মীয়দের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতটা অনাত্মীয়দের তুলনায় অনেক বেশি।

কৌতূহল আমাকে টেনে নিয়ে গেল হাবু পাত্রর বাড়ি।

লোকটাকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছি ......দেখেছি তার অদম্য উৎসাহ জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় ...বড় কৌতূহল জাগল এই প্রচন্ড দুর্বৎসরের বিপাকে লোকটাকে কেমন দেখব।

কয়েক মিনিটের পথ খালি পায়ে আল ভেঙে হাবুদার বাড়ির সামনে গিয়ে ডাক দিলাম।

মাটির দেয়াল খড়ের চাল, ঠিক রাস্তার উপরে যেখানে হওয়া উচিত বৈঠকখানা সেখানেই গোয়ালঘর। রাস্তায় দুটি মরখুটে কাড়া ও দুটি রুগ্ন গাই বাঁধা, একটি কাঁড়ার কাঁধে ঘা—ঘায়ের উপর কয়েকটি ডাঁশ উড়ছে। বাড়ির পাশে শূন্য খামার এক ফালি, তার ওপাশেই একটি ছোট পচা ডোবা, কয়েকটি হাঁস চরছে। বাড়ির একদিকে মাথা ঢাকা দেওয়া চাল—কাঠের কারখানা করেছে সেখনে...দরজা জানলা চেয়ার বেঞ্চ থেকে সুরু করে লাঙল ও গরুর গাড়ি পর্যন্ত তৈরি করে হাবুদা এই কারখানায়। এখানে সেখানে নানান আকারের কাঠের টুকরো, ও গুঁড়ো ছড়ানো।

একটা গামছা পরে হাবু পাত্র ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। মুখ-ভর্তি বয়স ও অভিজ্ঞতার গভীর দাগ, ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ নাক। বড় বড় চোখ দুটি জ্বলছে। বেঁটে-খাট ছোটো মানুষটি...দেখে মোটেই সরল প্রকৃতির মনে হবে না। মেদহীন দেহ... তবু পেটের চামড়ায় অজস্র কুঞ্চন।

সারা জীবন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়াই করার জন্যে শরীরটা একটা চাবুকের মত দৃপ্ত।

আমাকে দেখে হাবুদা সাবলীল হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিল, এস, এস। কখন এলে—

বলতে বলতে ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে একটি সুন্দর চেয়ার নিয়ে এসে গামছার খুঁট দিয়ে মুছে দিল। একটা তালপাতার পাখাও এগিয়ে দিল...

বসে আমি চেয়ার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম...

কোন গাঁয়ে এই মহুয়া গাছের গুঁড়ি কে আগ্রহ করে ফেলে রেখেছিল—কত সস্তায় হাবুদা সেই মেহগনি কাঠ কিনে...তখন এই চেয়ারটি এবং আরও কী কী আসবাব নিজের হাতে তৈরি করেছে...সে সব খুঁটিনাটি বিবরণ বলে গেল হাবুদা...

এ বিবরণই হাবুদা বলবে, সে ত্রিশ পঁচিশ কি ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথাই হোক...একেবারে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম কণামাত্র বাদ দেবে না।

এত বিস্তৃত ও এত তুচ্ছ প্রসঙ্গ কী করে হাবুদা মনে রাখে, ভেবে আমি চিরকাল আশ্চর্য হয়েছি...

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাবুদা যখন বুঝল আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, তখন সে প্রশ্ন করল, তারপর খবর কী। ছেলে-মেয়েরা বৌমা...ওরা সব ভালো তো?

হ্যাঁ ওরা ভালো। আমার খবর খুব খারাপ...ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেছে...

কলকাতা ছাড়ো... কলকাতা ছাড়ো... ওখান থেকে চলে এস—এস দু' ভাইয়ে কিছু করি।

এখানে কিছু হবে? আমার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর...তুমি কিছু করতে পারছ? কেমন ধান পেলে এবার...

হাবুদার মুখে মুহূর্তের কালো ছায়া খেলে গেল......

সবাইকে জিজ্ঞাসা করো, আমার কথা ওরা শুনেছে কিনা...শুনে নাই...সোনাকরার কাঁদিতে পরথম পোকা দেখা গেল, তখুনি সব্বাইকে বলেছি, ওষুধ লিয়ে স...ওষুধ... নিজের নিজের কাঁদিতে ছড়াতে থাক...কেউ আমার কথা কানে লিল না...

তুমি ছড়িয়েছিলে? আতার কথায় কড়া সুর।

নিশ্চয়...ঠোঁট বিকৃত করে হাবুদা জবাব দিল।... শুধু একা কি বাঁচা যায় ভাই? শুধু একা বাঁচা যায় না...শুধু একা বাঁচা গেলে সংসারে কেউ থাকত না ...আজ আমার কাঁদিতে ওষুধ ছড়ালাম...পোক নাশ করলাম ...কালই পাশের কাঁদি থেকে আবার আমার কাঁদিতে পোকা চলে আ...ন...কত ওষুধ ছড়াবে রোজ রোজ?...বাদ দাও...তোমাকে আমি চাষ কত্তে বলি নাই...তোমার স্বারা চাষ যে সম্ভব লয়, সে কি আমি বুঝি না?

বুঝতে পারলাম, হাবুদা আমাকে কোন নতুন প্ল্যানে জড়াতে চায়।

আমাকে দেখলেই হাবুদার উদ্ভাবনী শক্তি বেড়ে যায়। অথবা তার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনীশক্তির প্রাচুর্যের জন্য সর্বদাই হাবুদার মাথায় *নতুন নতুন প্ল্যান নতুন নতুন পরিকল্পনা গজগজ করে।*

বছর পনের আগে যখন আমি একটানা বছরখানেক সময় গ্রামের বাড়িতে ছিলাম, তখন আমার কর্মক্ষমতা দেখে হাবুদা উদ্দীপিত হয়ে, আমাকে দিয়ে মুদির দোকান করতে মেতে উঠেছিল। আমাকে কিছু করতে হবে না, দাঁড়িপাল্লা ধরতে হবে না, বসে থাকা...হাবুদা নিজে অথবা তার ছেলে সবকিছু করবে। আর আমাকে বিষ্ণুপুরের মারওয়াড়ীদের কাছে একবার নিয়ে গেলেই হল...এক হাজার টাকার মূলধনে তিন হাজার টাকার মাল নিয়ে আসতে

পারবে হাবুদা মারওয়াড়ীদের কাছ থেকে... ইত্যাদি ইত্যাদি...

কাজ পাওয়া গেলেও হাবুদার সে চিন্তা করার অবসর নেই। আমি যে কোনো-কালে মুদির দোকান করতে পারি না... আমার মানসিকতার সঙ্গে এই ব্যবসা মেলে না...এত চিন্তা করার বিবেচনাশক্তি হাবুদার নেই।

তাছাড়া এ তল্লাটের লোকজন বড় গরীব...তাদের ক্রয়ক্ষমতা বড় নগণ্য এবং নগদে সওদা করার খদ্দেরও খুব বিরল...এ সব বিপদের কথা হাবুদার মাথায় আসত না।

দিনরাত আমার কানের কাছে হাবুদা গুনগুন করত...কর না, করেই দ্যাখ না... অমুক দোকানী কত কম সময়ে কত উন্নতি করেছে...কত জমি করেছে...পাকাবাড়ি তুলেছে ...আর আমরা পারব না?

বলা বাহুল্য আমি হাবুদার প্রস্তাবে সায় দিতে পারি নি...কলকাতা পালিয়ে গিয়েছিলাম...

যতবারই আমি বাড়ি এসেছি ততবারই শুনেছি হাবুদা নতুন কিছু করছে আর আমাকে সেই নতুন-কিছুর সংগে জড়াতে হাবুদার উৎসাহ অপরিসীম।

আবার কী করতে চাও? আমি হাসতে হাসতে বললাম...

পাম্প নিয়ে এস, ভাড়া খাটাব ..হাবুদার প্রস্তাব।

পাম্প এখানে অনেকেই ভাড়া নেবে। এদিকে সেচের বড় অভাব। গ্রামের পাশেই একটি জীবন্ত খাল বয়ে চলেছে, তাতে সারা বছর জল থাকে এবং খালটি খরস্রোতা... দশ মাইল দূরে মাটির তলা থেকে উত্থিত শীর্ণ ঝর্ণা এই চাঁপা খালের উৎস...এই খাল থেকে জল সেচ করতে পারলে দুপাশের জমিতে সোনা ফলবে সন্দেহ নেই...

আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে এখানে আসতে পারব না। দেখাশুনা কে করবে শুনি?

কেন, আমি। হাবুদা বলল।

তুমি কোনটা করবে হাবুদা? চাষ, না কাঠ মিস্ত্রীর কাজ, না দশজনের ধান্দায় ঘুরবে, না পাম্প দেখবে?

অনেক জটিল কাজ একসঙ্গে হাবুদার মাথায় ঘোরে চিরকাল।

চাষের ব্যাপারে, শ্রাদ্ধশান্তি বিয়ে ইত্যাদি উৎসবের ব্যাপারে এমন কি কায় গরু মোষ কিনে দিতে হবে পছন্দ করে—তারও ব্যাপারে হাবুদাকে সবাই চায়। আর ওর সঙ্গে কেউ কোনো কাজ করার আগে পরামর্শ না করলে—হাবুদা ভীষণ অপমানিত বোধ করে। সে যেন গ্রামের ধর্মপিতা...

দশজনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজে-কর্মে হাবুদা নিজেকে জড়িয়ে বহু সময় অপব্যয় করে, তাতে তার বউ ছেলেরা খুবই অসন্তুষ্ট...অভাবী সংসার...যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত সদ্ব্যবহার করতে পারলে, কোনো রকমে সংসার চালানোই প্রায় অসম্ভব, সেখানে বহু সময়ের বহু অপচয় বউ বা ছেলেরা কেউ সহ্য করতে পারে না।

এই নিয়ে চিরদিন হাবুদাকে আর অশান্তি...কতবার এই তোমার সঙ্গে... আর বুদ্ধির কখনও জন্য কোনোদিন আমেলা হাবুদাকে বাজে থাকে না তখন অশান্তি...

যেখানে জলের প্রশ্ন আছে সেখানে হাবুদা সবসময় যাচ্ছি রাখতে প্রস্তুত...অথবা অন্যকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করতে...

......নিজে এক মামলা লড়তে গিয়ে পৈতৃক দু' বিঘে জমি ঘুচিয়েছে...কিন্তু জিতেছে তো ...

সেই মামলা জেতার পর থেকে হাবুদার মুখে একটা কথা যখন-তখন শুনতে পাওয়া যায়...ফেলিওর আমি হই নাই ভাই...

সেই একই সুরে হাবুদা আমাকে বললে, সে আর কী কঠিন ব্যাপার! সব দেখব...তুমি আমাকে এখনো চিনতে পারলে না...

এই আফশোস হাবুদার চিরকাল...ও মরে গেলে সবাই চিনতে পারবে...কী লোক ছিল এই গ্রামে...দশটা গ্রামের লোক তখন হাড়ে-হাড়ে হাবুদার উপযোগিতা উপলব্ধি করবে।

আমি একটু রেগে গেলাম,...আরে বাবা, সব কিছুরই একটা সম্ভব-অসম্ভব আছে তো...

তুমি কিনে দিবে কি না বল!

ধমক লাগালাম...তুমি নিজের সংসার নিয়েই অস্থির...তার উপর আবার পাম্প!

কিনে দিয়েই দ্যাখ, আমি সামালাতে পারি কি না...

হাসতে হাসতে বাড়ির ভিতর চলে গেল হাবুদা...কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল দু-হাতে দু-কাপ ধুমায়িত চা নিয়ে...চা দিয়ে ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করল...

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে আমি নাক সিঁটকালাম...

হাবুদা প্রশ্ন করছে তখন মুচকি হেসে, কেমন চা হইছে? বখশচারা দিইছি।

জানলাম, সুন্দর, বেশ সুন্দর হয়েছে।

এ তল্লাটে যখন কেউ চা খেত না শুধু বামুনেরা ছাড়া, তখন হাবু পাত্রর ঘরে চা পাওয়া যেত। এ অঞ্চলে যখন কেউ পাম্পের সাহায্যে ক্ষেতে জলসিঞ্চনের চিন্তা করত না, তখন হাবুদার মুখে পাম্প ব্যবহার করার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে। দূর-দূরান্তের হাট ছুটে যায় হাবুদা ছেলে-কাচ্চা কিনতে; তার কাছে বহু দূরের খদ্দের আসে গরুর গাড়ি কিনতে, মামলা-মোকদ্দমার কাজে হাবুদা অনেকবার জেলার সদরে গেছে...বহু লোকের সঙ্গে মিশেছে হাবুদা, তাদের কাছ থেকে বহু নতুন পরিকল্পনা সংগ্রহ করেছে, শুধু সংগ্রহই করেনি, কাজে লাগাবার চেষ্টাও করেছে। নতুন কিছু অভিনব কিছু হাবুদা বরাবরই চট করে গ্রহণ করতে পারে।

চা শেষ করে বিড়ি ধরিয়ে বললাম, ব্যাপার কী জানো, এখানে কিছু হবে না।

কলকাতায় কী হল?

তাও ঠিক...কলকাতায় কুড়ি বছর কাটিয়েও তো আমার কিছু হল না। আসলে গরীবদের কোথাও কিছু হবে না...সবাই তো সম্পদের পেছনে ছুটছে, সময় নষ্ট করছে, ব্যর্থ হচ্ছে...সম্পদ পাচ্ছে না... জানে সবাই বড়লোক হতে পারে না, তবু আফশোস করতে করতেও সম্পদের পিছু বৃথা ছুটে ছুটে হয়রান হবে, ক্লান্ত হবে, অসুখে পড়বে এবং একজন সামান্য গরীবের মতই মারা যাবে...

ওখানে কিছু হবে না...আমি বললাম।

এখানে এস, দ্যাখ কিছু হয় কি না?... হাবুদার নিশ্চিন্ত জবাব।

হঠাৎ হিংস্রতা আমার মনে লাফিয়ে উঠল, খোঁচা দেব—ওর হাহাকারটা আমার মায়ের মত চোখের সামনে তুলে ধরব, গ্রামে বাস করার আনন্দটা কী, হাবুদা একবার নতুন করে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করুক।

কেমন ধান পেলে এ বছর, বললে না তো?

সহজ সুরেই হাবুদা উত্তর দিল, সে আশা রয়েছে নাকি!

আমি জানতাম। এখুনই গ্রামের চাষীরা জলের দরে শেষ পৈতৃক জমিটুকু বেচে দেবার জন্যে খদ্দের খুঁজছে...ঘটি-বাটি তো অনেকেরই ঘর ছেড়ে চলে গেছে... সামনে যে ভয়ংকর দিনগুলো ঘনিয়ে আসছে, তাদের সঙ্গে চাষীরা পূর্ব পরিচিত। এটাই তো আর প্রথম দুর্বৎসর নয়। অনেক খরা অনেক পোকা অনেক অতি বৃষ্টির অত্যাচার সয়েছে চাষীরা। ভিটে-মাটি বেচে কেউ কেউ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে পুবের দিকে চলে গেছে কত জনমজুর খাটতে, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়েছে কতজন...বহুবার ভাগ্যের মার খেয়ে চাষীরা আজ সবাই ভাগ্যবাদী।

হাবু পাত্র একটু ভিন্ন ধরনের। পুরো-পুরি ভাগ্যবাদী সে নয়।

অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে ওর বিশ্বাস অটুট, কিন্তু সে বরাবরই আশা করে, যুতমত একটা কিছু করতে পারলে মা-লক্ষ্মী তার ঘর জুড়ে একদিন বসবেনই বসবেন।

ব্যবসা করেছে, রেলে কার্পেন্টারের চাকরি করেছে...চাষ তো তাদের বহু পুরুষের জীবিকা...অনেক কিছু করেছে হাবুদা...প্রচণ্ড ব্যর্থ হয়েছে বহুবার... দেনার দায়ে ওর বাড়ির সকলের চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে...তবুও হাবুদা নতুন কিছু ভাবছে—এই অভাব-অনটন অসহায়তা এবং অপমানের হাত থেকে সে একদিন-না-একদিন পরিত্রাণ পাবে।

ওর সর্বাঙ্গে আজ প্রাচীন বটগাছের মত সহস্র অভিজ্ঞতার ভাঁজ...ব্লাডপ্রেশারে প্রায়ই শয্যাশায়ী...মাথা ঘোরে, পা টলে, রাতে একেবারে ঘুমোতে পারে না...মাঝে মাঝে মনে হয় মস্তিষ্ক আর কিছু চিন্তা করতে পারছে না...

তবু একটা নতুন প্ল্যান হাবুদার মাথায় ঠিক মাত্রামাতি করছে— হাবুদা সারা শরীর ও সারা মন দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছে, এইটা লাগাতে পারলে আর তার ভাবনা নেই, বাকি জীবন সে নিশ্চিন্ত।

আমি ওকে বরাবর অবাক হয়ে দেখে গেছি।

আর নিজের বিপদ কাটিয়ে ওঠার সাহস পেয়েছি মনে মনে।

নীলকুঠির ধারে হাবুদা সেদিন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। দেখিয়েছিল, সবাই যখন দুর্বৎসরের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মুহ্যমান তখন সে বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা বের করতে পেরেছে।

নীলকুঠির পাশে দু বিঘে জমিতে চালি ধান বুনেছে হাবুদা। আঙুলে চার উঁচু ধানের চারাগুলি ঘন সবুজ...জমিটা আকারে একটা ডিঙি নৌকোর মত...এই ধান উঠবে ভাদ্র মাসে...যখন রাজার ভাণ্ডার খালি তখন হাবুদা এই চালি ধানের পালুই বাঁধবে খামারে...

এই প্রচণ্ড খরানে বাঁচবে গাছগুলো? আমি প্রশ্ন করলাম।

এই যে কুয়া...কুয়া কেটেছি...

গেরুয়া ডাঙায় দোআঁশ বেলেমাটি... এইখানে নীলকুঠির পাশেই হাবুদা হাড়ার রায়বাবুদের কাছ থেকে ছ বিঘে ডাঙা নামমাত্র মূল্যে খরিদ করেছে, একটা ছোট পুকুর কেটেছে...এই কুয়া কেটেছে...পয়সার অভাবে কুয়াতে পাট বসাতে পারে নি... বাঁধাতে পারে নি...এইখানে ছোটখাট এগ্রি-কালচারাল ফার্ম করবে হাবুদা।

ওই ছোট পুকুরটাতে বানের ঢল নামে। নতুন গেরুয়া জলে মাছ ডিম ছাড়বে, এ বছর বর্ষায় হাবুদা মাছ পাউস করাবে এই পুকুরে। মণ দুয়েক মাছ পাউস করাতে পারলে ডিম বেচে মুঠো মুঠো টাকা...

আর এই নীলকুঠি...

ছাতগুলো কবে পড়ে গেছে, টিঁকে আছে কোমর অব্দি দু হাত চওড়া দেয়াল... এখনো আট-দশটা কুঠুরির চিহ্ন রয়েছে... যদিও নানান গাছে আর পরগাছায় ঢেকে আছে সেগুলো...আর নিশ্চয় বড় বড় বিষ-ধর সাপের আড্ডা...তবু এসব সাফ করতে ক'দিন!

এইখানটা সাফ করে বাড়ি করবে...গ্রাম থেকে হেঁটে আসতে মিনিট পাঁচ সময় লাগে...গ্রাম থেকে কিছু দূরে তো বাস করা যাবে। আর হাবুদা লোকালয়ে বাস করতে পারছে না...ভীষণ ছোট হয়ে গেছে মানুষের মন...ইদানীং কারুর মতের সঙ্গে তার মিলছে না...

নিজেই ইঁট পোড়াবে...সে আর কী কঠিন ব্যাপার, কী জানে না হাবুদা! বাড়ি তৈরি করার সমস্ত রীতিনীতি ওর জানা আছে...

একেবারে মনের মত বাড়ি করবে, পৈতৃক পুরনো বাড়িটা তার কোনোদিনই পছন্দ নয়!

চোখের সুমুখে এক ছকে ছ বিঘে জমি...সেচের জল দেবে কুয়া কিংবা ছোট পুকুর অথবা সাড়ে তিন বিঘের কুঠির পুকুরটা...কুঠির পুকুরের তলায় রয়েছে অমর ঝর্ণা...দরকার কেবল একটি পাম্পের... নিজের কাজ চলাবে...ভাড়াও খাটাবে... নিজে যখন পাম্পটা ব্যবহার করবে, তার দাম অবশ্যই দিয়ে দেবে হাবুদা...

চির সবুজ করে রাখবে হাবুদা তার এগ্রিকালচারাল ফার্ম...চাষের কাজে কোন মরদ পাল্লা দেবে তার সঙ্গে!

ঠিক কুড়ি বছরের যুবকের মত নাচতে নাচতে হাবুদা আমাকে তার পরিকল্পনার চমৎকারিত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল। তখন তার বয়স ঠিক ষাট বছর।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে দেখ-ছিলাম...ভাবছিলাম...যতক্ষণ মানুষ একটা কিছু করতে চাইছে ততক্ষণ সে যুবকের মত সতেজ।

চোখ ফেরালাম। সিঁড়ির ধাপের মত উঁচু-নিচু আদিগন্ত জমি খাঁ-খাঁ করছে... ঝলসে যাচ্ছে মাটি...বাষ্প উঠছে...গরম হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে...যতদূরে চোখ যায় পড়ে আছে রুক্ষ নীরস মাঠের পর মাঠ...দূরে চাষীদের খোড়ো চালগুলি মনে হচ্ছে খেলাঘর...

আসন্ন দুর্বৎসরের তুলনায় বিঘে দুই জমির সামান্য চালি ধান যে কী নগণ্য রসদ, আর সেই রসদের উপর নির্ভর করে হাবুদার এগ্রিকালচারাল ফার্মের কী করুণ পরিকল্পনা...উপরন্তু চালি ধান উঠবে সেই ভাদ্র মাসে...এই পাঁচ-ছ মাস যে-সমুদ্রের মত অভাব চোখের সামনে ভেসে উঠছে... সে-সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য ডিঙি নৌকোর মত চালি ধানের জমির উপর কী করে ভরসা করছে হাবুদা...

এই সব ভেবে চোখে জল আসার কথা...কিন্তু জল এল না, বরং বড় হাসি পেল আমার।

হেসে ফেললাম।

হাবুদা আমার হাসি অগ্রাহ্য করে কঠিন মুখে বলে উঠল, ভাই আমি কোনোদিন ফেলিওর হই নাই...যে-কাজেই হাত দিয়েছি, সে-কাজেই সাকসেসফুল হইচি।

হাবুদার কাছ থেকে আবার নতুন কিছু করার উদ্দীপনা সংগ্রহ করে কলকাতায় ফিরে এসে অনেক নতুন কিছু করলাম...বিশেষ সাফল্য অর্জন করলাম কিনা জানি না, অদম্য সাহস আমাকে ব্যর্থতা হজম করার ক্ষমতা জোগাল।

দু বছর বাদে এই সেদিন আবার বাড়ি গেলাম।

মায়ের মুখে শুনলাম, বারবার ডেকেও আজকাল হাবুদার পাত্তা পাওয়া যায় না। যাকে যখন-তখন দেখা যেত তাকে অতি বিপদেও ডেকে পাঠালে একবারও আসে না।

অথচ হাবুদা নাকি সুস্থই আছে।

গেলাম হাবুদার কাছে...সূর্য তখন হেলে পড়েছে...শালবন থেকে গরু-মোষের পাল নিয়ে ফিরছে রাখালেরা...মাঠে মাঠে জাল্গু দেওয়া ধানের আঁটি...দাঁড়িয়ে দূরে

নিয়ে যাচ্ছে ধান...কেউ কেউ মাথা বোঝাই করে বয়ে নিয়ে আসছে।

হাবুদা খামারের এক পাশে ক্যাম্বিসের খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে, বুকের উপর বাজছে ট্রানজিস্টর রেডিও...বড় ছেলে রেলের অফিসে পিওন—সে দিয়েছে রেডিওটা বাবার জন্যে। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে হাবুদা...পাশেই তার দু বছরের নাতি আপন মনে খেলা করছে নগ্ন গায়ে...

বাড়িতেই শুনেছি...আমি চলে যাবার পর হাবুদা মাছ পাউস করাতে গিয়ে বেশ লোকসান দিয়েছে...গত বছর তার ছেলে বাপের বুদ্ধির সঙ্গে নিজের বুদ্ধি মেশাল দিয়ে মাছ পাউস করিয়ে লাভ করেছে। যে বছর হাবুদা মাছ-পাউসে লোকসান দেয় সেই বছরই আরেকটা ধাক্কা খেয়েছে ওরা। চাঁপা খালের পাশে দেড় বিঘে জমির মাটি কাটাতে গিয়ে অনেক টাকা খরচা করে দিয়েছে হাবুদা...অবশ্য জমিটা এখন তিন ফসলা হয়েছে...

কিন্তু হাবুদা সেই থেকে বাড়ির বাইরে বেরোয় না বড় একটা।

একেই পুরনো দেনা...তার উপর মাছ-পাউস ও মাটি-কাটার দেনার দায়ে হাবুদা নাকি কিছুদিন মাথা তুলে চলতে পারেনি।

কিন্তু ওর মেজ ছেলে বাবার প্ল্যান নিজের মতে ভেঙেচুরে কাজে লাগিয়ে এক বছরের মধ্যেই অনেক দেনা শোধ করে দিয়েছে।

সুতরাং হাবুদাকে আমি প্রফুল্লই দেখব আশা করেছিলাম।

কিন্তু যে আমাকে দেখলে শিশুর মত নাচানাচি করত সেই হাবুদা কোনো রকমে উঠে খাটিয়া ছেড়ে দিয়ে শুকনো মুখে আপ্যায়িত করল...রেডিওটা বন্ধ করল না...ওটা বেজেই চলল।

প্রশ্ন করলাম উৎকণ্ঠার সঙ্গে...কেমন আছ হাবুদা!

ভারি মুখে জবাব দিল...যেমন দেখছ...

তবে যে বিকেলবেলা শুয়ে? শরীর ভালো তো?

দিনেরবেলা কখনো হাবুদাকে স্থির হয়ে দু দণ্ড বসে থাকতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

শরীর আমার খুবই ভালো...এখন তো আর কুনো অনিয়ম নাই, কুনোখানেও তো বেরোই না!...মন খুব খারাপ...

কেন...শুনলাম, তোমার ছেলে উন্নতি করছে চড়-চড় করে...

ওদের কথা আমার কাছে বোলো না...হাবুদার মুখ রাগে থমথম করতে লাগল...ভারি আমার বাহাদুর হইচে...মাতব্বর হইচে...

ভালোই তো...এবার ওদের ওপর ছেড়ে দাও...

প্রায় চিৎকার করে উঠল হাবুদা, ছেড়ে দুব কি? কাড়িয়ে লিয়েচে। আমাকে কিছু করতে দিবেক নাই। আমি নাকি সব লোকসান করে দুব। আরে ভাই...তিনটা ছেলেকে মানুষ করল কে...কে বড় ছেলের রেলে চাকরি করে দিইচে...কে আমার মেয়ের বিয়ে দিইচে? আমি কিছু করি নাই...এমনে একটা লোক আছে, যার আমি কিছু করি নাই?

হাবুদা উত্তেজনায় তোতলাতে লাগল...হাঁপাতে লাগল...

বললাম...ভালোই তো...এবার তুমি বিশ্রাম নাও...সারা জীবন তো খেটে মরেছ, এবার খাও দাও ঘুমোও বেড়াও...রাগ করছ কেন, অত চিৎকার করছ কেন...আবার যে ব্লাডপ্রেশার হবে...

আমি খুবই সুস্থ রইচি...৬২ বছর বয়স হল মাত্তর...সত্তর বছরের আগে আমার বাপ-পিতাম' মরে নাই...বস একটু চা করতে বলি...

সুস্থ লোকের মতই হাবুদা সহজ পদক্ষেপে হেঁটে গেল।

ফিরে আসার পর বললাম, আমার তো তোমার কথা শুনে তোমার ছেলেদের উপর মোটেই রাগ হচ্ছে না হাবুদা...

হাবুদা শূন্য দৃষ্টিতে আমার কথা শুনতে লাগল।

আমার তো ভীষণ হিংসে হচ্ছে হাবুদা...ঝুঁকি নেই, বিপদ নেই, মার খাবার ভয় নেই...কেমন নিশ্চিন্ত জীবন...রোগ নেই, সুস্থ আছ...ঘরে মা-লক্ষ্মী আসছেন—এর চেয়ে আর বেশি কী কামনা করতে পারে মানুষ!

আমার মুখের দিকে হাবুদা সুতীব্র বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল, যেন সে অন্তত আমার কাছ থেকে এমন কথা শুনবে, একেবারেই আশা করতে পারে নি...আমি ওর কর্মের অংশীদার না হতে পারলেও, কোনোদিন ওকে নিরুৎসাহ করি নি...।

ওর সাফল্য তারিফ করার লোক একমাত্র আমিই ছিলাম।

মলিন মুখে হাবুদা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুমিও বলচ! আমি কিছু করব নাই! আমার কিছু করার নাই!

চা খেয়ে উঠে আসার সময় পর্যন্ত হাবুদা আর মুখ খুলল না। 'আবার এস' বলতে ভুলে গেল...

আমি ওর মন হাল্কা করার জন্য লঘু সুরে বললাম, বিশ্রাম কর...সেই তো সাত বছর বয়সে বামুনদের রাখালি থেকে জীবন সুরু করেছিলে...কত বড় ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছ...আর কী! এখন বিশ্রাম কর...ধর্ম-কর্ম কর...পরলোকের কাজ হবে—দেখবে একশো বছর সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকবে...

হাবুদার কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলাম না...অন্ধকারে হাবুদার মুখ দেখা যাচ্ছিল না—হাবুদা ঘর থেকে আলো আনতেও ভুলে গিয়েছিল...বাড়ি ফিরে আসার সময় হাবুদার কথাই ভাবছিলাম...আজ যা মানব জগতের কাম্য, মানব জগতের কাম্য হোক আর নাই হোক...অন্তত আমার কাম্য...আমি এক ডুবন্ত মানুষ, খড়কুটো ধরে বাঁচছি...একটা খড়কুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে, আরেকটা খড়কুটো আঁকড়ে করছি...আর সর্বদাই উৎকণ্ঠা...কখন বর্তমান খড়কুটো হাত থেকে ছিঁড়ে যায়...তখন হাবুদা নিশ্চিন্তির কঠিন মাটি পেয়েছে...ওই রকম সময় আমার যদি আজই আসে, তাহলে বেশ হয়...বাকি জীবনটা নিরুদ্বেগে কাটিয়ে দিই...

হাবুদাকে সত্যি সত্যি হিংসে হল।

কলকাতায় এসেও কাজে মন দিতে পারলাম না...কী দীর্ঘ কী প্রচণ্ড কী নিরবচ্ছিন্ন লড়াই...মুহূর্ত অবসর নেই...মাঝে মাঝে ভাবি...মস্তিষ্কে কতগুলি কোষ আছে? এত জটিল এত বিচিত্র চিন্তা কী করে একটা মস্তিষ্ক বয়ে চলেছে...

হয় তো কিছু বিশ্রাম পেলে আরও কত বিপুল চিন্তা নিয়ে খেলা করতে পারত আমার মস্তিষ্ক।

বাড়ি থেকে কলকাতা আসার দিন সাতেক পরে মায়ের চিঠি পেলাম...জানলাম, হাবুদা মারা গেছে...শেষ সময়ে হাবুদা খুবই নাকি আমার নাম করেছে,...আর বড় আশ্চর্যের কথা মারা যাবার দিন পর্যন্ত সে সুস্থ সবল ও সক্ষম ছিল। যেদিন বিকেলে মারা যায় সেদিন সকালে ছ-সাতটা গরু-মোষের জাব কেটেছে...সে জাব তিন দিন চলবে। এতটুকু হাঁপায়নি, এতটুকু ক্লান্তি বোধ করেনি হাবুদা।

মন বিষিয়ে উঠল...ইশ যদি সেদিন হাবুদাকে বিশ্রাম করতে পরামর্শ না-দিতাম, তাহলে বোধহয় লোকটা এত তাড়াতাড়ি মারা যেত না...শেষ পর্যন্ত বিনা কারণে অযথা একটা খুনের দায়ে পড়ে গেলাম!

মুখের মেলা

তালপাতার পাখার ছবি

'তালতমালবনরাজিনীলা!...'

হাঁসিনাচা, মায়াপুর, বাগানবেড়িয়া, মোথালী, জামালপুর, চণ্ডীপুর, কাশীপুর কয়েকখানা গ্রাম জুড়ে শুধু তালবন। কালো কালো দীর্ঘ রেখা, মাথায় ছাতার মতো পাতা—অপূর্ব দৃশ্য! আমনধান চাষের উন্মুক্ত মাঠে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যাবে চারদিকের আকাশপটে শুধু তালগাছ আর তালগাছ! মাঝে মধ্যে নারকোল, সুপুরি, আম, কাঁটাল, জাম, জামরুলের বাগান। বাঁশুনী, ভেলকো আর তলতা বাঁশের জঙ্গল। মাঠের মাঝে ভেড়িতেও তালগাছের সারি। খেজুর গাছ, বাবলা গাছ। মাঝে মাঝে ডোবা। শুকনো ডোবার মাঝখানে বাঁশ-জুটলাই অথবা কঞ্চির বোঝা দাঁড় করানো। কাছেই হুগলী নদী। বর্ষায় রাজ্যের 'ভেকটি' (ভেকুট), বোয়াল, ভাঙন, পারশে মাছের 'ম্যাতা' যা ডিম আসে খালের নোনা জলে। ভাদ্র আশ্বিনেই ভেকটি মাছের ঝাঁক ভাসে ডোবাগুলোয়। তখন বঁড়শিতে জ্যান্ত পুঁটি মাছ অথবা চিংড়িমাছ গেঁথে ডোবা থেকে ছিপ ফেলে মাছ ধরে উজাড় করে ফেলে লোকজন—চুরি করে। তাই ডোবার মাঝখানে ডাল-পালা বাঁশকাণ্ড পোঁতা আছে—ছিপে ভেকটি মাছ লাগলেই চোঁ করে টেনে নিয়ে গিয়ে জড়াবে ঐসব ডালপালায়। তখন আর মাছ তোলা যাবে না। তবু সাপের ভয় উপেক্ষা করে বর্ষায় এইসব ডোবা থেকে মাছ চুরি করে কতলোকের সংসার চলে।

হাঁসিনাচার মাঠে দাঁড়ালে দেখা যাবে গ্রামের বড় মসজিদের মিনার—বিরলাপুর জুট মিলের গলগল করে কালো-ধোঁয়া-উদ্গীরণ-করা বিরাট চিমনী, ক্যালসিয়াম কারবাইড ফ্যাকটরী আর মোড়লপাড়া মোল্লাপাড়ার খোলার ছাওয়া, টিনের ছাওয়া মাটির ঘর। এক আধটা পাকাবাড়ি।

হাঁসিনাচা আর মায়াপুর গ্রামের মাঝ দিয়ে চলে গেছে চওড়া কংক্রীটের বিরলা বাহাদুর রাজপথ। পথের ধারে ধারে হিন্দুস্থানী, চুলিয়া, ওড়িয়াদের বাসাবাড়ি। বিরাট মোটা মোটা রুপোর মল পায়ে হিন্দুস্থানী মেয়ে—লাল কাপড় পরা—গায়ে হাতে উল্কির নকসা—ফেন গড়াচ্ছে পথের ধারে। মাদ্রাসা আর হাইস্কুলের ধারের টিউবওয়েলে ভীড় জমে আছে মেয়েদের। পথের পাশে পাশে রাজ্যের চা দোকান। বাইশকুটরীর বেশ্যালয়। কৃষ্ণচূড়ার রক্তরাঙন ফুলে ফুলে পথের দু-পাশ লাল। তাইচুঙ ধান ফলেছে বিস্ময়করভাবে কোথাও কোথাও, যেখানে জল আছে কাছেপিঠেয়। বিরলা ডেয়ারী ফার্মের গরু-মোষের জন্যে খড় কিনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হিন্দুস্থানীরা মুসলমানপাড়াটা থেকে মাথায় করে। রজকেরা কাপড় শুকোতে দিয়েছে মাঠে। চা দোকান-গুলোতে তাস পিটছে রিকসাঅলারা। গাঁজা টানছে অন্য কেউ কেউ বা। হুরপরীর মতন সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে কোম্পানীর শাদা অ্যামবাসাডর মোটরটা সাঁ করে বেরিয়ে যায়। চুস্তপ্যান্ট পরা চ্যাংড়া চাষীর বাড়ির বখাটে ছোঁড়ারা সুন্দরী মেয়েভরা মোটর আসতে দেখলেই টুইস্ট নাচ জোড়ে—শিস মারতে মারতে। এরা সব হিন্দি সিনেমার পরিণাম ফল—নয়া ফলশ্রুতি!

কিন্তু এত হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ তালগাছ কেন এইসব গ্রামগুলোয়। শীতের সময় তালপাতা কেটে নেওয়া হয়েছে সব

গাছের। শিরোমূলে শুধু তীক্ষ্মধার একটি করে পাতা আছে। বাকি সব পাতা গেল কোথায়?

মোল্লাপাড়ার মধ্যে এলেই দেখতে পাওয়া যাবে তালপাতার পাখা তৈরি করছে মেলা মেয়েপুরুষ হেঁসো, কাটারী, কাঁচি চালিয়ে। বাড়ি বাড়ি তালপাতার পাখার কারবার। গরমে যখন মানুষের প্রাণ 'আই-ঢাই' করে, হাতে চাই একটা তালপাতার পাখা! সেই তালপাতার পাখার কারবার হাঁসনাচা, মায়াপুর, মৌখালি গ্রাম জুড়ে। কুমারী, বিধবা গরিব-বেওয়া বউমানুষরা তালপাতার পাখা নিয়ে গিয়ে বাড়ি থেকে 'কুসি' লাগিয়ে এনে আবার দিয়ে যাচ্ছে মাঠ পার হয়ে। সেইসব তৈরি পাখায় আবার রঙের তুলি টেনে ছবি আঁকছে কেউ কেউ। বাঁখারী চেঁছে কাঠি তৈরি করছে লোকজন। বড় মিস্ত্রি চকচকে ধারালো হেঁসো মেরে ভেজানো 'মুটি' কেটে সাইজ করে দিচ্ছে। সবায়েরই 'ফুরোন' কাজ। হাজার-করা দাম।

পৌষ-মাঘ মাসে যখন ক্ষেত থেকে ধান উঠে যায় কিছু লোক পাড়ায় পাড়ায় তালপাতা কিনতে আসে। পঞ্চাশ টাকা হাজার দরে তারা পাতা কেনে। পাতা মানে এখানে 'মুটি'। একখানা পাতা থেকে দুটো করে 'মুটি' বাঁধা যায়। গোটা পাতাকে মাঝামাঝি চিরে ফেলা হয়। তারপর মাথা-তলা ছেঁটে ফেলে কাঁচা পাতা দিয়ে জড়ো করে বেঁধে নিলেই 'মুটি' তৈরি হয়ে গেল। সকালে কাটার পর বিকালে 'মুটি' বাঁধার সময়েই পাতার সবুজ-প্রাণ-অংশ শুকিয়ে যায়। বেশি পাতা হলে জ্যোৎস্না রাতে সেই কনকনে শীতে গামছা গায়ে দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে খোলা মাঠে বসেই কাজ করে লোকগুলো। অনেকেরই মুখে বসন্তর দাগ, গলায় তক্তি বা মাদুলী, পেটে পিলে-লিভার পোড়ানো চাকা চাকা দাগ, পরনে লুঙ্গি, ঝাঁপি মতন চুল, ঘষা কাঁচের পানা চোখ। দেখলেই বোঝা যায় ওরা মুসলমান। বিশেষ এক ধরনের ভাষা। একই গ্রামে, একই পাড়ায় বাস অথচ হিন্দু মুসলমানের ভাষার শব্দ ব্যবহার আলাদা। 'লুক্কে' (লুকিয়ে), 'পেলিয়ে' (পালিয়ে), 'কত্তেচে' (করতেছে), কাঁনতেছ্যালো (কাঁদতে ছিল), 'আসাম' (ফেন), 'ভা' দে' (ভাত দে), 'ওসরা' (দাওয়া), 'এগুনে' (আঙিনা, আঙনে, এগনে, উঠোন), 'লউ' (রক্ত), 'যেতি' (যদি), 'লিয়ে' (লইয়া, নিয়ে), 'পানি-ঢালা' (জল গড়ানো), 'ভাত খসানো' (ভাত বাড়া), 'গোন' (পথ), 'ঠেঁটি' (আটপৌরে কাপড়), 'কুর্তা' (ব্লাউজ) ইত্যাদি। গ্রাম্য মূর্খ মুসলমানদের ক্রিয়াপদ ব্যবহার বিকৃত-ভাবে অন্যরকম।

আতাহার মোল্লার দলিজে মেয়েমর্দ যারা পাখার কাজ করছে সবাই মুসলমান। ওদের প্রকৃত ভাষা-যা তা অনেকেরই পক্ষে দুর্বোধ্য। যেমন বড় কাঁচি চালিয়ে আরশাদ মণ্ডল কাজ করতে করতে বলছে, 'মাংস বললেই তো হবে না যাদু, তার ভিতরে বহুৎ কিসমের নাম আছে। সিনা, টক্কর, রমপোট, চেকনা, রেওয়াজ, রিপ, খিরি, দীল, কোলজে, ফ্যাপসা, উজাড়, মগজ, রান, গুরদো, গর্দান—কত কি! হিন্দুরা মোদের কথা শুনে হাসে—ওদের হরিজনদের কথা শুনবি? 'আণ্ডা' 'গড়ু' মানে 'রাঙা গরু, 'আম্মাঘড়' হল রান্নাঘর। ওজনকে বলে 'রোজন'। মোরা বলি পানের 'বোরোজ' 'ওরা' বলে 'বরোজ'। মোরা বলি, 'পেলিয়ে' আর চাচা 'লুক্কে' পড়, 'হাঙা'র ভিতরে 'সেঁইধে' যা! সিদনে লবুর খালা বলতে ছ্যালো 'অসুমায়ে' 'ছেরাবন' মাসে মোর ঝিকে লিয়ে যেতে এল মা মোর জামাইটা। কি 'সালুন' রাঁধি কি 'সালুন' রাঁধি ভেবে মুই 'হাঙা'য় (মাচায়) উঠে দুটো 'আন্ডা' 'পানুন' (পাড়লুম)!'

আরশাদের কথা শুনে মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। আরশাদ খুব কাজের লোক। কথা বলছে বটে কিন্তু কাঁচি চলেছে তার অত্যন্ত দ্রুতছন্দে। পাঁচ টাকা হাজারে সে মুটির মাথা গোল করে পেঁচিয়ে দেয়। কতকগুলো মেয়ে পা মেলে বসে পা দিয়ে সেই পাতাকে মেলে চেপে ধরে ঝাঁটা কাঠি বা বাঁশের সলা দিয়ে ছুঁচ ফুঁড়ে সেলাই করে দেয়। পয়লা এককাঠি তারপর দু'কাঠি সেলাই ফোঁড়াই দিতে হয়। পাড়ার মেয়েরা বারো আনা শ' হিসেবে যেসব তৈরি পাখায় তালপাতার কুঁচিকুঁচি নক্সা দিয়ে ফেরত দিয়ে যায় সেইগুলোয় বিচিত্র ছবি আঁকে আতাহার মোল্লার ছেলে বরজাহান। বরজাহানকে দেখতে খুবই সুন্দর। শাজাহান বাদশার যুবককালের ছবি যেন সে। বরজাহান যখন গান করে, পুঁথি পড়ে, বাঁশি বাজায় সবাই যেন মোহিত হয়ে শোনে। সে ছবিও আঁকতে পারে চমৎকার এবং বিচিত্রতর। কতলোকের দোকানের এমনি-এমনি সাইনবোর্ড লিখে দেয়! তার চোখ দুটো দীঘল, বিকশিত, দীর্ঘ পল্লব আর নীলাভ। নাকটা খাড়া, পাতলা, মসৃণ তীক্ষ্ম্যাগ্র। চুল ঢেউখেলানো, কালো, সতেজ। গায়ের রঙ পাকা গমের মতন। কণ্ঠস্বর খুব নম্র, স্পষ্ট, মার্জিত। সে মসগুল হয়ে একমনে তুলি টেনে নানান ফুল এঁকে যায় পাখায়। একটায় আঁকার সময় অন্যটায় কি আঁকবে ভেবে নেয়। গোলাপ, পদ্ম, জবা, মুকুল, ধানশিষ, খেজুর ছড়ি, লতাপাতা, মসজিদ-মীনার, ময়ূর কত কি! বাপের ধান জমি, ডাঙা জমি, বাগান-বাগিচা আছে, টাকা-পয়সা বা খোরাকীর অভাব নেই, তাই প্রথমটা অসৎসঙ্গে ঘোরাফেরা করে ভাল করে আর পড়াশোনা করতে পারলে না বরজাহান। এখন অনুশোচনা হয়। ক্লাশ এইটের ফাইনাল পরীক্ষায় সে ফেল মারলে অংকে। গোপনে গোপনে সে নাকি আবার কবিতা লেখে! মা মারা যাবার পর অন্য মা এল সংসারে। তার মেজাজ গেল বিগড়ে। পাখার কারবারটার দেখাশোনার ভার চাপালে বাপ তার ঘাড়ে। ক্ষেতখামার বাগবাগিচা দেখা-শোনা করে তার বাপ আতাহার মোল্লা। নতুন মা এসেছে তারই বয়েসী। তাকে মা বলে না বরজাহান। মেয়েটা তার বুড়ো বাপকে পছন্দ করে না।

ডাগর মেয়ে ফুলজান কাজ করতে করতে খিলখিল করে হাসে—গরিব চাচা মতেহার মোল্লার মেয়ে সে। চাচা মামলা করে করে সর্বউড়িয়ে দিয়ে আজ দুর্দশায় পড়েছে। সোমত্ত মেয়েটার সাদি পর্যন্ত দিতে পারছে না। ফুলজান সুরেলা জেহেনে কোরআন শরীফ পড়তে পারে। ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়েছে মাদ্রাসা-স্কুলে। অভাবের সংসার, তাই মায়ের সঙ্গে চাচাদের কাজ করে। বাপ নানান সমাজ-কল্যাণ করে বেড়ায়। বিরলা কোম্পানীকে সে মিল অঞ্চলের পাশের সমস্ত ধানজমি তার বেচে দিয়েছে, কোম্পানীর অফিসে গেলে নাকি খাতির করে মূর্খ মানুষ হলেও চেয়ার দিত আগে। এখন আবার চাচার রঙ বদলেছে। ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে তার দহরমমহরম। জমি বেচে চাচা নাকি প্রায় এক লাখ টাকা পেয়েছিল কিন্তু খরচা হয়েছে নাকি তার লাখেরও উপরে। এখন যুক্তি আঁটছে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা লড়বে কম টাকায় জমি কিনেছে বলে! তাকে নিয়ে একটা কবিতার বই লিখেছে বরজাহান। ঐ পুঁথির মতন পয়ার ছন্দে। মাঝে মাঝে ফুলজান যখন কাজ ভুলে বরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর বরজাহান তাকালেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজে মন দেয় তখন বরজাহান তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে :

'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল'।
জমি নাহি বেচ চাচা সকলে বলিল।।
চাচা না শুনিল তারে আলীপুর টানে।
জমি বেচে টাকা ঢালে,
দারোগাকে আনে।।
পোনামাছ ধরে দেয়, কিনে দেয় আন্ডা।
তবু নাহি দারোগার মাথা হয় ঠান্ডা।।
চাচার ডাগর মেয়ে ফুলজান নাম।
মোর মুখ পানে চেয়ে ভুলে যায় কাম'।

'হোৎ!' বলে ফুলজান তার হাতের পাখা দিয়ে বরজাহানকে ঝাপটা মারে। চাচী হাসে। বলে, 'বেশ তো বাবা, চাচার জন্যে যেতি অত দুঃখ তবে ফুলজানকেই তুই বে' কর না।'

বরজাহান হাসে। বলে, 'আমার বাপ আমার বিয়েতে বিশ হাজার টাকার যৌতুক দাবি করে কত মেয়ের বাপকে ভাগালে আর তুমি কি বলছ চাচী? বাপ শুনলে তোমাদের কাজ বন্ধ করে দেবে! ফুলজান দেখতে ভাল, ঝিনুকের মতন চোখ, তিল ফুলের মত নাক, দুধে-আলতাগোলা রঙ'...

'গাল দেব দাদা!'
'কি গাল দিবি?'
'জানি না, যাও!'

'মুসলমানের মেয়ে গাল দিতে শেখ নি তুমি এখনো? তাহলেই তুমি পরের ঘর করেছ! শোনো, খালভরা, গোলাম, হারামী, —ওই আরশাদ দাদুর ভাইপো জামাই 'অমৃত' পত্রিকায় 'পাঁচিনী বুড়ীর বিচার' লেখাটাতে মুসলমান মেয়েদের গালাগালির বহর যা দিয়েছেন!'

ফুলজান বলে, 'সেই আড়ুলগাছার জামাই? আসিলার বর?'

'হ্যাঁ।'

দুপুর হয়ে গেছে দেখে সবাইকে ছুটি দেয় বরজাহান। সবাই খেতে চলে যায়।

ফুলজান শুধু একা বসে বসে ছবি আঁকে। তাদের রান্না হয়নি আজো। তার মা বরজাহানের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে দোকানে আটা কিনতে পাঠিয়েছে ছোটভাইকে।

বরজাহান স্নান করে খেয়ে এসে দেখে ফুলজান একাই দলিজে বসে বসে লাল নীল সবুজ রঙ দিয়ে ফুল পাতা আঁকছে।

কাছে এল বরজাহান। বসল তার কাছে।

ফুলজান তুলি টানা বন্ধ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে ম্লান একটু।

'খেতে যাবে না?'

'কি খাবো?'

মুখটা ম্লান, শুকিয়ে গেছে কুল আঁটির মতো হয়ে গেছে ফুলজানের ঠোঁট দুটো। বললে, 'এস, আমাদের বাড়ি দুটি ভাত খাবে।'

'না।'

'কেন?'

'চাচী নিন্দে করে। বলে, আমি নাকি'...

'কি?'

'তোমার সঙ্গে আছি!'

'আচ্ছা। এসো। থাকাথাকি পরে হবে। আরে, এসো না।' হাত ধরে টানাটানি করলেও ফুলজান খেতে যায় না। শেষে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালায় সে নিজেদের বাড়িতে।

সন্ধ্যার পর আতাহার মোল্লা এসে বসে দলিজে। দীর্ঘাকার জালিদার টুপী মাথায়। লম্বা মোচাকের মতন ঝোলা দাড়ি। গায়ে পীরহান। এসে বসে রোজকার মতন সে 'কাসাসল আম্বিয়া' পুঁথিখানা খুলে সুর করে পড়তে থাকে। সবাই মন দিয়ে শোনে। এক সময় বিচিত্র ফুল-আঁকা গেলাসে করে গরম দুধ কিম্বা চা দিয়ে যায়, বরজাহানের সৎমা। বরজাহানকেও দেয়। জনেদের দেয় এক খুরি করে গরম চা।

রাত দশটা পর্যন্ত কাজ চলার পর সবাই চলে যায়। গা হাত ধুয়ে খেয়ে নিয়ে এসে বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে বরজাহান। সে যেন বন্দী! কোনো সুখ নেই, শান্তি নেই তার মনে। পাখার পাইকের আসছে প্রতিদিন, টাকাগুলো নিয়ে নিচ্ছে তার বাবাজী। সৎমা'র সোনার গয়না গড়াচ্ছে। পাকা ঘর গাঁথা হচ্ছে তাদের। ফুলজানের আজ আর সারাদিন বোধ হয় খাওয়া হল না।

চাচার গলা শোনা যায়, 'গরিবরা যেভাবে একজোট হয়েছে বড়লোকদের অর তারা রাখবে না। জমিজমা আর এক কাঠাও কেউ রাখতে পারবে না চাষীরা।'

চাচী বলে, এখন 'লেকচার' থামাও হুজুর! জমি তোমার নেই, অতো ভাবনা কিসের?'

তারপর চুপচাপ।

ঘন্টাখানেক কেটে যাবার পর মনে হল কে যেন কাঁদছে এসে বরজাহানের দোর-গোড়ায়! শুধু ফোঁস-ফোঁস করে নাকের শব্দ!

দোর খুললে বরজাহান।

আশ্চর্য!

'ফুল! তুমি? এখন?'

'দাদা! — আমি আর খিদে সইতে পারছি না!' কেঁদে বুকে যেন ঢলে পড়ল ফুলজান বরজাহানের।

বরজাহানেরও চোখে জল এসে গেল। মাথায় তার হাত বুলোতে লাগল। মুখটা ধরে চুমু খেলে। ফুলজানের নোনা চোখের জলের ফোঁটা মুখে এল তার।

গাঢ়স্বরে বললে, 'এসো। আমার ঘরে মুড়ি, কলা আছে খাও।'

ঘরের মধ্যে গেল ফুলজান।

টর্চ জেবলে মুড়ি বার করে দিলে তাকে বরজাহান। কলা দিলে এক ছড়া। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় সে যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

বললে, 'ভাইটার জন্যে কিছু নিয়ে যাব।'

'সে নিয়ে যেও। তুমি এখন পেট ভরে খাও।'

'দু দিন আমি কিছু খাই নি।' বলে সলজ্জ হাসলে ফুলজান।

'দুপুরে খেতে গেলে না কেন?'

'কি করে যাই, মা ভাই শুকিয়ে থাকবে!'

'তারা তো আটা কিনে এনে রুটি করে খেয়েছিল?'

'মা, ভাইকে দুখানা রুটি দিয়ে গা ধুতে যেতেই বুড়ো বাপ সব রুটি ক'খানা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছিল যে!'

'চাচীও তাহলে সারাদিন না খেয়েই আছে?'

'হাঁ।'

'তবে মুড়ি নিয়ে যাও। কিন্তু কাল মুড়ি নেই বললেই সৎমা বলবে, দান করা হচ্ছে গোপনে—'নেকি' হচ্ছে!'

'তবে থাক, চলে যাই।'

'আরে খাও।'

'না, কেউ দেখতে পাবে।'

'আচ্ছা ফুল, তোমাকে যদি আমি বিয়ে করি?

ফুলজান কিছুই বলতে পারে না। শুধু তার অপরূপ রূপকুমার চাচাতো দাদার বুকে মুখ ঘষে!

তারপর এক সময় মায়ের আর ভাইয়ের জন্যে মুড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় সে—নিজেকে এক রকম জোর করেই ছাড়িয়ে নিয়ে। তারপর আর বরজাহান ঘুমোয় না। আড়বাঁশি বাজায় ফাল্গুনের মিঠেল হাওয়া-ভাসা মাঠের মাঝখানে বসে। ফুলজান তার বাঁশি শুনে আর ঘরে থাকতে পারে না। মা ঘুমোলেই আবার সে পালিয়ে আসে বরজাহানের কাছে!...

কিন্তু বাস্তবের স্বরূপ আলাদা।—

তারপর আড়ুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মতেহার আল্লা চটকদার কাজকারবার বুজরুক-খ্যাত মসজিদের ইমাম। বুড়া এক ওড়িয়া মৌলভীর কাছ থেকে মাত্র শ'-খানেক টাকা নিয়ে এসে কন্যাদায়ের মহা-আপদটা সেরে ফেললে চটাং চট করে। শুভকাজে দেরি না করে মোল্লাজী মাত্র পাঁচটা টাকা নিয়ে সাদির পবিত্র কলেমা পাঠ করিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ফুলজান কেঁদে-কেটে মাথা কুটে পাগল হয়ে গেলেও তাকে ধরে-বেঁধে ফুল-চড়ানো শাড়ি-ঘেরা রিকসার মধ্যে পুরে সাধের 'খসমালয়ে' পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শুয়োর গরু-চরা হিন্দুস্থানী খোট্টা ডেউকি-ভরা বাসাবাড়ির মধ্যে বুড়ো ওড়িয়া মৌলভীর ঘর করে দিন তিনেক পরে আবার ফিরেও এল ফুলজান।

বরজাহান চুপচাপ। কেবলই মনে হয়েছে তার চাচাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দেবে একদিন। অথবা বাপের বন্দুকটা নিয়ে গুলি করে সাবাড় করে দেবে! কিন্তু ফুলজান যখন হঠাৎ ঘাটে দেখা হতেই তার মুখের দিকে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'দাদা, একি হল! আমি মরে যাবো! আমি গলায় দড়ি দোব!' — তখন সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হয়ে গেল বরজাহানের চোখে।...

তালপাতার পাখায় ফুল আঁকতে-আঁকতে কেবলই সে ভাবতে লাগল, কেন এমন হয়! এই গরমিল! জীবনটা ভর দুঃখ পেতে হবে ফুলজানকে! মতেহার চাচাকে একশো টাকা দিলে সে কি আর ওড়িয়া মৌলভী জামাইকে তা ফেরৎ দিয়ে ফুলজানকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে? যে সাদি একবার পড়ানো হয়ে গেছে, তাকে আর নস্যাৎ করার সাধ্য আছে কার?

কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে আবার ফুলজানকে নিয়ে গেল তার পাকা মাথা বুড়ো সোয়ামী। আর ক'দিন পরেই সে তার মিলের 'প্র ফা স' (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তুলে নিয়ে ফুলজানকে নিয়ে চলে গেল কোন সুদূর বালেশ্বরে!...পাখি উড়ে চলে গেল!...

বাপ একটা কুৎসিত কালো মেয়ে যোগাড় করে অনেক টাকার লোভে বিয়ে দিতে চাইলে বরজাহানের। বরজাহান বেঁকে বসল। বাপ তেরিয়া হেঁকে বললে, 'ত্যাজ্য-পুত্র করে বাড়ি থেকে তেড়ে দোব আমার কথা না শুনলে। যে ছেলে তার বাপমায়ের কথা শোনে না তার মরণ ভাল।'

বরজাহানের ঝিনুকের মতন সুন্দর দুটো চোখ থেকে জল পড়তে লাগল টপ-টপ করে তার আঁকা তালপাতার পাখার ছবির ওপরে! ফুলের ছবিটা ছিটকে বিকৃত হয়ে একটা বুড়ো মুসলমান-চাচা অথবা বাবা কিম্বা সেই ওড়িয়া মৌলভীর মুখের মতন হয়ে গেল। হাত দিয়ে ছিঁড়ে দুমড়ে বরজাহান দূরে করে পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে আরশাদ মোড়লের মুখের ওপরে।

—আবদুল জব্বার

রবীন্দ্রনাথ : বিতর্কের উত্তরে

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা —ওহে ইস্কাবনের গোলাম।
গোলাম—কী রাজা সাহেব?
রাজা —তুমি ত সম্পাদক।
গোলাম—আমি তাসদ্বীপ প্রদীপের সম্পাদক, আমি তাসদ্বীপ কৃষ্টির রক্ষক।
রাজা —কৃষ্টি! এটা কি জিনিষ? মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো?
গোলাম—না, মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নূতন—নবতম অবদান—এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন
সকলে—কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথের তাসের চিঁড়েতন, হরতন, ইস্কাবনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও কি বলবো রবীন্দ্রকৃষ্টি বিপন্ন? তাঁর প্রতি অনীহা আমাদের বেড়ে চলেছে।

ওরে ও লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ !

একদিন কবি গেয়েছিলেন

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে
চুকিয়ে দেবো বেচাকেনা,
মিটিয়ে দেব লেনাদেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই ঘাটে
তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাকলে

একথা আমরা মানিনি, শুনিনি। কবিকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার, বিস্ময়ের সীমা নেই, আলাপ-আলোচনার ক্লান্তি নেই। প্রায় নব্বই বছর ধরে কবিকৃতির সমালোচনা চলছে নিরবধি। বঙ্কিম, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতিতে যার শুরু, কাব্যবিশারদ, সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল, মোহিত মজুমদার, অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতিতে যার বিকাশ, আজও স্বদেশীবিদেশী বহু মনীষীর লেখায়, আলোচনায় বিশ্লেষণে সেই ধারা সচল। তাই আজও তাঁর সম্বন্ধে বিতর্ক উঠবে এটা শুধু স্বাভাবিক নয়, সুষ্ঠু। বিতর্কটি তুলেছেন শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য 'অমৃতে' (দশম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা)—আবার রবীন্দ্রনাথ? সকলের না হয় অনেকের রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনীহা বেড়ে চলেছে। এ অনুমান হয়তো সত্য, হয়তো সত্য নয় কিন্তু কোন তথ্য বা তত্ত্বের উপর এর মূল ভিত্তি তা লেখক জানান নি। এই ভ্যালু জাজমেন্ট-এর পেছনে অবজেকটিভ ড্যাটাগুলি কি তার কোন উল্লেখ তিনি করেন নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে এটা তাঁর সাবজেকটিভ অ্যাসেসমেন্ট, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে অনুমান, কতকগুলি মহলের বাত্যাবিক্ষুব্ধ পরিমণ্ডলের বায়ুচাপের হিসাব। মূল প্রশ্নটিকে একটু গভীরভাবে দেখলে, কতকগুলি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন এসে পড়ে। যেমন (১) রবীন্দ্ররচনাবলীর বিক্রয় কি কমে যাচ্ছে? বিশ্বভারতীর তহবিল ইতিহাসলক্ষ্মীর কি সাক্ষ্য? (২) মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে, সভায়-সমিতিতে, আসরেবাসরে তাঁর সম্বন্ধে অনীহার প্রকাশ কি কঠোর ও কটু সমালোচনায়, না নীরবতায়, না ইচ্ছাকৃত অবহেলায়, না তরুণদের ঔদাসীন্যে, (৩) তাঁর নাচগান গল্প কবিতা, ভাবভাষা ভঙ্গী আঙ্গিকের প্রতি উত্তরপুরুষেরা বা হাংরি ও অ্যাংরি ইয়ংমেন ও ওমেনেরা উদাসীন ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন? আজি হতে শতবর্ষ পরে কোন কবির গান গাওয়া হবে? কালের নিয়মে, আহ্নিক গতিতে বছরের পর বছর যায়, এক-একটি পঁচিশে বৈশাখ আসে, জেনারেশন গ্যাপ বাড়ে নতুন ধ্যানধারণা দৃষ্টিভঙ্গী আদর্শ কর্মকৌশল মানবমনকে সমাচ্ছন্ন করে, নতুন করে পুরাতনের মূল্যায়ন হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সত্যিকারের কবি বা সাহিত্যিক দৃষ্টিপথের বাইরে মিলিয়ে যান না। তাঁরা বর্তমান কালকে পেরিয়ে কালাতীত না বলি কালাতিরিক্ত যুগে পৌঁছে যান। যেমন গেছেন সেকালের ব্যাস-বাল্মীকি হোমার ভার্জিল, প্লেটো এরিস্টটল, কালিদাস চণ্ডীদাস থেকে আজকের বঙ্কিম গ্যয়টে বা মধ্যযুগের ডান্টে শেকসপীয়র। অর্থাৎ তাঁরা হয়ে গেছেন ক্ল্যাসিক্যাল—বর্তমান কালের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত না হলেও রস জোগান, প্রেরণা দেন। সে হিসাবে তাঁরা চিরকালের ও সমকালীন। জানি ইটারন্যাল, ইউনিভার্সাল, ভেরিটিস এসব কথাগুলি আপেক্ষিক বা রিলেটিভ, তবু আমার ঠাকুর্দার যুগে দাশু রায়ের পাঁচালীর সমসাময়িক যা মূল্য ছিল তা কমে গেলেও সাহিত্যের ইতিহাসে সেটা একটি স্মারকলিপি। কারুর জীবন স্বল্পস্থায়ী, কারুর দীর্ঘ, তা নিয়ে যেমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না, তেমনি নির্মম হবারও কোন আয়োজনের দরকার নেই। (৪) পঁচিশে বৈশাখের জন্মজয়ন্তী উৎসবের উন্মাদনা, জলুষ, জমক বাহ্বাস্ফোট হয়তো কমে যাচ্ছে, হয়তো কোথাও সাময়িক উত্তেজনার বশে কবির প্রতিকৃতি ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। কিন্তু কবি তো শুধু ছবি নন শুধু পটে লিখা নন, যে তাতেই আমরা ধরে নেবো যে তাঁর প্রতি আমাদের অনীহা বিবর্ধমান। একথা ঠিক যে, কবিকে বুঝি না, চিনি না, পড়ি না। সে আগ্রহ নেই, সংগ্রহ নেই, চিন্তার উদার আতিথ্য নেই, বিচারের নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। শুধু কোমর বেঁধে লেগে যাই চাঁদা তুলতে, জন্মোৎসবের মহড়া দিতে। না হয় বিজ্ঞজনোচিত ভাবভঙ্গীতে বলি কাফকার মত সমতুল্য তিনি নন, র‍্যাঁবোর রিল্কের মত অতলস্পর্শী গভীরতা তাঁর নেই। শেষজীবনে তিনি ব্যর্থ লিওনার্ডো বা পুশকিনের মত। তাঁর লেখায় শ্রেণীবর্জিত সমাজগঠনের ইঙ্গিত নেই, নীচতলার লোকদের স্বীকৃতি নেই, আছে শুধু একটা রোমান্টিক অ্যাওয়ারনেস—অ্যাকসেপটেন্স বা আইডেন্টিফিকেশন নয়, শুধু একটা সরল বিশ্বাসের ছবি। তখন তাঁকে আজকের সঙ্গে মিলিয়ে নেব কি করে? —একবার ফিরাও মোরে, বললেও তাঁকে ফেরানো যাবে না। তাঁর জীবনদেবতা তখন ছলনাময়ী, কাব্যে তার প্রকাশ 'সারল্যে সংযমে-গাম্ভীর্যে অনবদ্য ও অনস্বীকার্য মহিমায় মণ্ডিত' হলেও। এই ধরনের সমালোচনা একটু স্ববিরোধী নয় কি? কাব্য কি শুধু ধ্বনির আলোক, রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি, না মিল্টন যাকে বলেন সিম্পল, সেনসুয়াস প্যাশনেট, রসাস্বাদন করবার ও করানোর ও পরমার্থ বস্তু প্রকাশন সমর্থ রীতি, না আমেরিকান কবি এডুইন মার্কহ্যাম যা বলেন—

> "Something more than vital is to be released, something organically rhythmical that has not need of embelleshment or conventional device to make its poetic nature explicit

এ কথাও বলি যে তাঁর হিউম্যানিজম জীবনরসে জারিত বোধ নয়। তামসপ্রবেগের খর ধারা নেই এখানে, ওয়ালপারজিসস নাইট নেই। তাঁর মানবকেন্দ্রিক চিন্তা 'ম্যান এ্যান্ড ইটসেল্ফ' নয়। একটা ভাসাভাসা ডিভাইনিটি অফ হিউম্যানিটি, হিউম্যানিটি অফ ডিভাইনিটির খেয়াতরীতে বাওয়া, উপনিষদের চিন্তায়, মরমীদের বার্তায় পুষ্ট জীবনবাদ যেখানে সমাজচেতনা বা ব্যক্তিচেতনার ভ্যালু বা নর্ম সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কাব্য-কুহেলিকায় সব ঘুলিয়ে গেছে, জীবনের গণচেতনা ভাষা ও ভাষ্যের মধ্যে ডুবে গেছে। (৫) এই প্রসঙ্গেরই আর একটি প্রশ্ন ওঠে যে কোন্ রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের অনীহা বেড়ে চলেছে। খ্যাত অখ্যাত ব্যর্থ চরিতার্থতার জটিল সংমিশ্রণে 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা' আমরা গেঁথে তুলেছি। সেখানে বসে আছেন শুধু পোয়েট, প্রেস্ট্রিয়ট প্রফেট নন, নাট্যকার, সুরকার পথচারী, আলাপচারী, শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক ওয়াইজম্যান অফ দি ইস্ট, ভাষার ইন্দ্রজালে যিনি বক্তব্যের প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন, যিনি বলেছেন

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ

যিনি ●

বিদ্রোহী নবীন বীর
স্থবিরের শাসন নাশন
বারে বারে দেখা দিবে
আমি রচি তারি সিংহাসন
তারি সম্ভাষণ

যিনি একরাত্যের উপাসক, ঝড়ঝঞ্ঝার মাঝখানে রুদ্র ঈশানকে ডাকেন না নটরাজকে। সেই কবি, না যিনি পেলবতার কোমলতার আবাহন আনেন চাঞ্চল্যের দোলে, রক্তিম হিল্লোলে, কামিনীতে রমণীতে ধরণীর ধমনীতে বসন্তের মধুরাত্রের কল্পনায়। ইনিই কি শিলাইদহ নিবাসী পদ্মাবাসী জমিদারনন্দন ফিউডাল ব্যারন? আবার তিনিই কি ভুবনডাঙার ভুবনজয়ী বংশীধারী যার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, রোদেনস্টাইন, এণ্ড্রুজ, ইয়েটস, স্টার্জ মুর. মে সিনক্লেয়ার, স্টপফোর্ড ব্রুক, নেভিনসন, এজরা, পাউণ্ড, ভ্যানমুডী প্রভৃতি। 'গীতাঞ্জলি' এককালে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। একজন লিখছেন যে, ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের বুক মান্থলিতে দেখা গেলো যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিই একমাত্র কবিতাগুচ্ছ যা ছিল ১৯১৩ সালে ওয়ান অফ দি বেস্ট বুকস যদিও নোবেল প্রাইজ তাঁকে দেওয়া হয় নভেম্বর মাসের শেষে। তারপর শুধু গীতাঞ্জলি নয়, দি গার্ডেনার, দি ক্রেসেণ্ট মুন, দি পোস্ট অফিস, চিত্রা, দি কিং অফ দি ডার্ক চেম্বার, সাধনা, পার্সোন্যালিটি, সাইক্লং অফ স্প্রিং প্রভৃতি
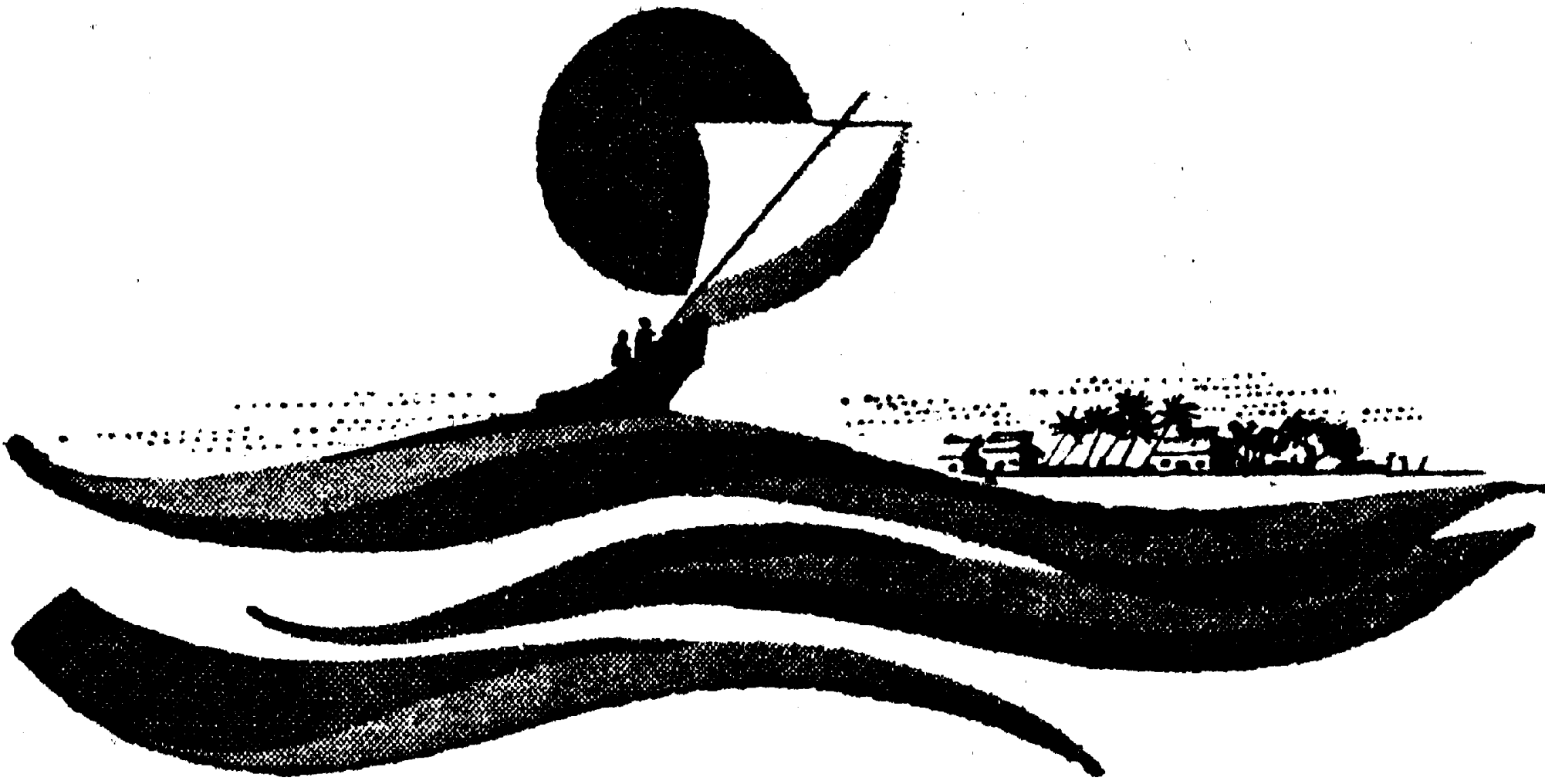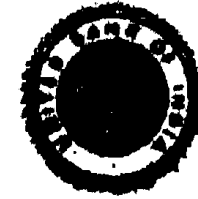
নানা বই শুধু ইংরাজীতে নয়, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সুইডিশ, ডাচ, রাশিয়ান, ইতালিয়ান, হিব্রু, হাঙ্গারিয়ান, চেক, যুগোশ্লাভ প্রভৃতি কতো ভাষায় অনূদিত হয়। ফরাসী আঁদ্রে জিদের মন্তব্যসহ অফরাল্লে লিরিক, কেপটাউনে এন্ড্রুজের রবীন্দ্র-দর্শনের ব্যাখ্যা, জার্মান ভাষায় উইনটারনিজের ও আলবার্ট সোয়াইত-জারের রবীন্দ্রকথা, ডাচ ভাষায় নোটো সেক্রোটোর বায়োগ্রাফিক্যাল শিটস, আমেরিকান বুলেটিন অফ বিবলিয়োগ্রাফি বা কাউন্ট হাবম্যান কেই সারলিং-এর দি ট্রাভেল ডায়রি অফ এ ফিলসফার বা ক্রিয়েটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা ইতালীয়ান লা পোয়েজি ডি রবীন্দ্রনাথ টেগোর বা স্পেন্ডারের চেঞ্জিং ইস্ট পুস্তকে রবীন্দ্র-চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা রবীন্দ্রনাথকে সমধিক আলোকমণ্ডিত করেছিল। আবার সেই যুগেই এক দেশে তাঁর পুস্তকগুলি নিষিদ্ধও হয়েছিল অ্যান্টি-সোস্যাল বলে শেকসপিয়রের সঙ্গে। সেইজন্য প্রশ্ন হচ্ছে, আমরাই কি তাঁকে শুধু দেবতার আসনে তুলেছি এবং তাঁকে ঘিরে নির্ভেজাল স্তোকবাক্য ও বিচিত্র ট্যাবুর বাসিফুলের মালা দিয়ে সাজিয়েছি? জানি ইয়েটস, এজরা পাউন্ড রোলাঁ প্রভৃতি যাঁরা তাঁকে আকাশে তুলেছিলেন বিশ্বের একটা প্রচণ্ডতম লেখক ও প্রচণ্ডতম মানুষ বলে, তাঁরাই তো তাঁকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন 'গতগৌরব হৃত মহিমা' করে। আর আমরা সেই পুরনো স্তবস্তুতির কচকচানি চালিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথকে ডিবাঙ্কড করবার চেষ্টা হয়েছিল, আজও হচ্ছে। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে, প্রেরণার মধ্যে যে সত্য আছে তার মূল্য দিতেই হবে। স্বীকার করি যে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা হৈ-হুল্লোড় জয়ন্তী বার্ষিকী আলাপ-আলোচনা হয়েছে, প্রশস্তির ঝড় বয়েছে ততটা 'গ্রহণ' হয়নি। এই ধরনের বাহ্য উচ্ছ্বাসের উপর প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য, যদি না অবজেকটিভ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই সৃষ্টিশীল মননশীল সত্তার হার্ড কোরটি খুঁজে তাকে যুগোপযোগী করে নিতে না পারি। সে দোষ আমাদের, রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁর রুচি, তাঁর ধ্যান, তাঁর অনুভূতি, তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা, স্বাজাত্যবোধ, বিশ্বপ্রেম, তাঁর মানবিকতার মূল্যবোধ, তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তাঁর দৃপ্তভঙ্গী, তাঁর অনমীয় ব্যক্তিত্বের কাছে কতটুকু পাঠ নিয়ে জাতীয় মানসকে প্রজ্ঞাবান করতে পেরেছি আমরা? একথা সত্যি যে, তাঁর জীবনবোধ বিচিত্রপথে গেলেও সর্বত্রগামী হয় নি। কিন্তু তাঁর মনে ঐকতান বেজেছে

নিজে যা পারিনি দিতে
নিত্য আমি থাকি তাঁর খোঁজে
সেটা সত্য হোক্

বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানি, একথা তাঁরই। শতশত সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ পরে যারা কাজ করে, যারা বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, হাল ধরে থাকে তাদের কথা বিস্তৃতভাবে বলেন নি কবি একথা ঠিক। কিন্তু মহাকাল সিংহাসনসমাসীন বিচারকের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী। বহুতরের সুর সেখানে মিলেছে। জীবনের নানা উত্থানপতনের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়াই জীবনের ধর্ম। সেখানে অপরাধবোধ (দি কোশ্চেন অফ গিল্ট), বা মানসিক যন্ত্রণা, সংশয় সন্দেহ (যার কথা বলেছেন সোরেন, কিথের্কেগার্ড, মার্টিন হুইডেগোর, জ্যাপল সার্ত্রে, বা আলবেয়ারে কামু) সেইগুলিই সব নয়। রবীন্দ্রনাথের মনেও দ্বন্দ্ব এসেছে, কিন্তু শুধু ভয়ের বিচিত্র চলচ্চিত্র ছবি হয়ে নয়, আঘাতে আঘাতে বেদনায়, জিজ্ঞাসা হিসাবে।

> The solitary enjoyment of the Infinite in meditation no longer satisfied me and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it. I am sure I vaguely felt that my need was spiritual self realization in the life of man through some disinterested service (Religion of Man-Hibbert Lectures)

রবীন্দ্র-জীবনে ও সাহিত্যে বারে বারে ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে, শেষ লেখায় (আমি শেষের যুগের লেখার কথা বলছি) তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতাটি শুধু বিশ্বাসের অঙ্গীকার বা অস্বস্তিবোধের অস্তিবাদ না এই কবিতাটিই তাঁর জীবনবোধের 'লাস্ট টেস্টামেন্ট'? নানা মন্তব্য সঙ্গত। একটু আগিয়ে গিয়ে শেষ সপ্তকের এই কবিতাটা পড়ুন

কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবেয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তের প্রতীক্ষায়।

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর একটি সত্য (হয়তো মৃত্যুভীতির জন্য, বাস্তু থেকে অবক্তে চলে যাবার এই যে উত্তেজনা মানুষকে পীড়িত করে বারে বারে, যার জন্য সে চায় অন্তরে সান্ত্বনা), নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল, ধ্বনিত হয়েছে যে প্রাণ অবিনশ্বর আজ যা যায় কাল তা নূতন করে আবির্ভূত হয়—নাথিং এন্ডস, অল বাট বিগান। কিন্তু এই যে বিবর্তন এতো সম্পূর্ণ নয়—

প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড
বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
(রোগশয্যায়)

রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ অপেক্ষা করে আছে নূতন জীবনের প্রত্যাশায়। দূর জন্মের আদি পরিচয় তিনি পেয়েছেন।

বৈরাগ্যব্রত সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে
শুধু জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া তার

এই ধারা বেয়েই তিনি সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রীকে আহবান করেছেন ছলনাময়ী রূপে, যে নানা ছলনায় সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করে রেখেছে। কিন্তু ছলনাময়ী (একে কি প্রকৃতি বলবো) যুগ যুগান্তরের আবর্তনের প্রাণধারার মধ্যেই উৎসারিত, সব সৃষ্টির অন্তরালে তার প্রাণের স্পন্দন আছে। সারা পৃথিবীব্যাপী সভ্যতার সংকর্ষের দিনে অবিচার অত্যাচার অনাচারে ক্ষুব্ধ কবি শান্তির যে অক্ষয় অধিকারের কথা বলেছেন সেইটেই তো তাঁর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার স্বরূপ, যে মানুষের উপর তিনি বিশ্বাস হারান নি—

মানব তপস্বী বেশে চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
স্থান লভে নিরাসক্ত মনে ধ্যানের আসনে

এটা শুধু আত্মকেন্দ্রিক স্তোকবাক্য নয়। মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ আত্মকেন্দ্রিক এর অর্থ কি? কন্ট্রাডিকশন আসে কোথা থেকে। শান্তির অক্ষয় অধিকার আর শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস কি একই কনটেকস্ট-এ লেখা—একটিতে অন্তরের শান্তির মথা উদ্দিষ্ট হয়েছে আর একটিতে বহিরঙ্গের শান্তি। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে পড়া যায় না। একথা ঠিক তিনি রোমান্টিক কবি। তবু এই যুগের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য তিনি যুগবাস্তবের নৈকট্যে আসিয়াছেন, তুচ্ছতা ও কুশ্রীতার মধ্যে অর্থ পেয়েছেন, নামহীন খ্যাতিহীন জনগণের শরিক না হলেও তাদের কথা ভেবেছেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন এক প্রাণরহস্যকে—হয়তো সেটা intutive এখানে মানুষের চিন্তা—

> not so much the ideal of social-justice but to rediscover the essence of his nature.

সমালোচক বলছেন, তখন দেশ ছিল বৈদেশিক শাসনাধীন, দেশে হাঁ, না ভালোমন্দর মূল্যবোধ ছিল অতি চিহ্নিত। তখন ঐকান্তিক মানবপ্রেম ও উপনিষদসুলভ বা ব্রাহ্ম-সমাজোচিত অধ্যাত্মভাব হাত ধরাধরি করে চলতে পারতো। আজ পারে না। এমন কি মানবপ্রেমের প্রকৃতিটাই গেছে বদলে। কারণ যে রেনেসাঁস-এর পরিপক্ব ফল রবীন্দ্রনাথ তার পরিচয় তথাকথিত মধ্যবিত্ত বাবুসংস্কৃতির অভ্যুত্থান, সেখানে আজ অবক্ষয়ের করালগ্রাস। মধ্যবিত্ত মুহ্যমান। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিবৃত সমস্যা ও সমাধান আজকের যুগের মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না, শান্তির অধিকার দিতে পারবে না, তাকে প্রবঞ্চিত হতেই হবে। সেইজন্য এই যুগের সঙ্গে ও আগামী 'যুগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা আরো ছিন্ন হবে।' কথাগুলি নিছক উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিন্তু কোন রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিচার করতে বসেছি? কোন নিরিখে কোন মানদণ্ডে? তাঁর সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি, ডায়েলেকটিসের উদ্গাতা বা সোসিওলজির ব্যাখ্যাতা নন। তাঁর সবচেয়ে বড় কামনা, যে কবির অন্তর দিয়ে তিনি সমস্ত জীবের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে একটা সেন্স অফ আইডেনটিফিকেশন পাবেন, যেটা ক্লাস স্ট্রাগলের উর্ধ্বে

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়
এই মোর শেষ পরিচয়

এই ধরনের সমীকরণ, চিন্তাধারাই বোধহয় ভারতবর্ষের সমাজচেতনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
পথের দু'ধারে যে আমার দেবালয়

সেইখানেই নত হতে চেয়েছিল তাঁর মন—একটা বৃহত্তের, মহতের কাছে,—যে শক্তি স্বর্গের হাইকোর্টে বসা কোন পরম মাহেশ্বর প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দেবরাজ নন। রাষ্ট্র গণ গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে এক শক্তি। সে শক্তি অন্তরের, তাকে বলা হোত ধর্ম, যা ধরে রাখে—ওয়ে অফ লাইফ। জানি, এখনি বলা হবে যে, এই ধরনের রোমান্টিকধর্মী চিন্তাপ্রণালী হচ্ছে কনফিউশন অফ ভ্যালুজ অ্যান্ড আইডিওলজিস বা প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ আজ সমাজ সুস্থ নয়, চেতনা আনন্দিত নয়, দেহ ও মন বিকৃতভঙ্গুর ও উপবাসী। হয়তো প্রতিটি ধূলিকণায় স্তব্ধ হয়ে আছে ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস। কবির সাইকোগ্রাফিক মনে তার ছাপ পড়তে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথে যে চেতনা রোমান্টিক ভগবৎব্যাপ্তিতে লুকিয়েছিল তার প্রথম আধার প্রকৃতি, তারপর এলো পুরুষ (অর্থাৎ যিনি প্রকৃতির অধীশ্বর) তারপর নেমে এলো মানুষে—মানুষে-মানুষে মিলিয়ে মহাদেবতায়—দি হুইল কেমন ফুল সার্কেল—এটা শুধু সেন্টিমেন্টাল ল্যাঙ্গার নয়, কেল্টিক মিসটিসজম বা মেটারলিংক সিম্বলিজম নয়। রবীন্দ্রকাব্যের শেষের যুগে আশমানী শাড়ীর সঙ্গে কাটাজের ছুরি, পচা আমানি মাছের আঁশ, মরা বিড়ালের দেহ আছে, লেখার মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, কিন্তু তার আদি ধ্যানমূর্তিকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি। এই যুগ তাঁর অনুভূতির দুই কোটি—একদিকে কালের অশান্ত ও অশ্রান্ত প্রবাহের মধ্যে ঈশ্বরনিরপেক্ষ অনুভূতি আর একদিকে বৈদান্তিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সোহম অনুভূতি। ব্যক্তিগত বিশ্বভুবনেশ্বরের স্থান নেই বললেই চলে। বরং তার কনটেন্ট, ক্যারেকটার, কনটেকসট এবং কনটুর বদলেছে। শুধু জীবই শিব নন, শিবের সেবাই পূজা। একদিকে পীড়নের যন্ত্রশালে চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে বিশ্বের ভৈরবীচক্রে অণু-পরমাণুর প্রচণ্ড মত্ততা, আর একদিকে মানবের দুর্জয় চেতনা, দেহ-দুঃখ হোমানলে প্রচণ্ড আহুতি, অপরাজিত বীর্য নির্ভীক সহিষ্ণুতা—দুই মিলিয়েই রবীন্দ্রনাথের শেষ অভিজ্ঞতা।

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।
সেকথা কখনো করে না বঞ্চনা
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন

তাইতো তিনি নিজেই বলে গেছেন যে তিনি কোন মোহ নিয়ে আসেন নি আমাদের সম্মুখে

এতদিন যে দিনরাত্রির মালা
গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্য অমরতার দাবী করব না
তোমার দ্বারে
তোমার অযুত-নিযুত বৎসরের
সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত
নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো
একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি
তবে দিয়ো তোমার মাটির
ফোটার একটি তিলক
আমার কপালে
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের
মধ্যে যায় মিলিয়ে
হে উদাসীন পৃথিবী—
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি

বেশ কয়েক বছর পূর্বে একটি মন্তব্য বেরিয়েছিল, যতদূর মনে পড়ে ব্লিৎস-এ ১৯৬১ সালে—

> Are they trying to brainwash the bard of Santi-niketan—

তাতে বলা হয়েছিল—

> Like the six blindmen of Hindusthan describing an elephant—one blind man who touched the ears imagined the elephant to be shaped like a fan, the other who felt one of the mighty legs thought it was like a pillar, while the third who managed to catch hold of the tail described it something like a wriggling snake. They were all **equally right** and all were equally wrong.

মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা।—কিছুকাল ভক্তেরা দেবে মালাচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তারপর আসবে তাকে বলি দেবার পুণ্যদিন—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভলগ্ন। পুজো জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্রত অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না....ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। 'শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষেরে ভিক্ষালব্ধ বুভুক্ষেরে' যারা প্রশ্রয় দেন সেই রবিঠাকুরের দলকে চুপ করতেই হবে। ফজলি আম ফুরোলে আতাই আনতে হবে।

উর্বশীর শবচ্ছেদ করে একদিন এক সমালোচক দেখিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় ভিনাসের ভারতীয় নটীর ছদ্মবেশেই তিনি প্রতিভাত। একদিন তাঁর 'ইউরোপিয়ানা'ই ছিল দোষের, এবং বিদায়ের আনন্দনাড়ুও খাওয়ানো হয়েছিল

আমি নিশ্চয়ই কোন রূপে
স্বর্গ থেকে টসকে
জন্মেছি এ বঙ্গদেশে
বিধাতার হাত ফসকে

আবার শুনেছি রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট আধুনিক নন। তিনি বেদ-বেদান্ত উপনিষদ আওড়ান শান্তিনিকেতনের বেদীতে বসে ভক্তমাস প্রচার করেন। আসলে 'যারা লোকোত্তর পুরুষ তাদের চেতনা বহুতর পুরুষের চেতনার সমষ্টি। বিভিন্ন এমন কি বিরোধী ধারা মিলে কি অপরূপ অভিনব ঐকতান সৃষ্টি করতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা।' তাঁকে নিয়ে দেশে-বিদেশে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস যে প্রকাশ হয় নি তা নয়, যেমন ডার্মস্টাটে ১৯২১ কালে কাউন্ট কেইসারলিং কর্তৃক স্কুল অফ উইজডম স্থাপন এবং হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র অনুকরণে জার্মান ভাষায় সংবাদ পরিবেশন। যিনি এলেন তিনি পূর্বগগনের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সত্যসনাতনের একটি দীপ্ত প্রতীক। আবার এ ধরনের কথাও কিছুদিন থেকে শুনছি যে রোলাঁ-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বেশ একটি চিড় খেয়েছিল এবং তাঁর আদি দিনপঞ্জীতে তা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা শুধু ভুলে যাই যে রোলাঁর প্রশস্তির উপর যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধি নির্ভর করে না, তেমনি রোলাঁর সাহিত্যিক ও মানবিক আভিজাত্যও স্বতঃস্ফূর্ত। এমন কি একথাও বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর সম্বন্ধেও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন (শুধু মতের অনৈক্য নয়—কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে প্রেজুডাইসড অ্যান্ড ম্যালেসাস বা তাঁর র‍্যাংকর ছিল (ফরাসী ভাষায় র‍্যাংকার কথাটির অর্থ বিটারনেস) এ ধরনের তর্কবিতর্কের শেষ নেই। একথা হয়তো সত্য যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি সজীব সমালোচনার মাধ্যমে। কিন্তু তার অর্থ নয় যে পরিবর্তনশীলের যুগের আলোকে তাঁকে প্রতি যুগেই নতুন করে মূল্যায়ন করতেই হবে। অর্থাৎ আমার যুগের ধ্যান-ধারণা যুক্তিবাদ প্রতিবাদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য যেটুকু মিলবে সেই মডিফায়েড রবীন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করব। আমরা ভুলে যাই যে, কবিকে বুঝতে গেলে শুধু কবিমানস নিয়েই গবেষণা করলে চলে না। বুঝতে হয় যুগের ইতিহাসকে, জাতির ঐতিহ্যকে পারিবারিক পারিপার্শ্বিককে জীবনযাত্রার পারম্পর্যকে—কবি শুধু স্রষ্টা নন—দ্রষ্টা। সেখানে তার ব্যক্তি শুধু অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নয়। তাই বারে বারে যুগে যুগে এই প্রশ্নই ওঠে—হে গুণী কোন অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্য সৃষ্টি করলে। সরস্বতীর শ্বেত শতদল সব দল বেদলের মাদলের ঊর্ধ্বে—এই প্রতীতি আজ হারিয়ে যাচ্ছে। তবু সেই শাশ্বত মানববেদীতেই প্রকৃত সাহিত্যিককে বসিয়ে আমরা বলবো—জয় হোক মানুষের ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।

এই বিশ্বাস হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষভাবে বা একবিংশ শতাব্দীতে হারিয়ে যাবে, হবে মূল্যহারা। কিন্তু কে জানে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে ত্রয়োবিংশ শতাব্দীতে আবার পুনরুজ্জীবিত হবে না? কাল যাঁরা কথা বলবেন, তাঁরাই কি শেষ কথা বলবেন? তার পরের, পরেররা আসবেন না? এ চিন্তা হয়তো রোমান্টিক একসট্রাভাগাঞ্জা, হয়তো তাই, হয়তো তাই নয়। মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ, যেদিন হবে না, সেদিন আসুক না ক্ষতি কি?
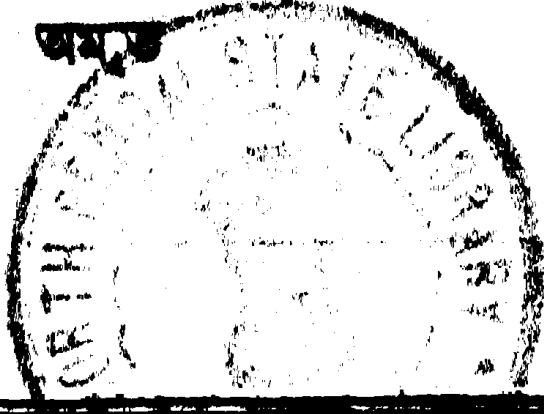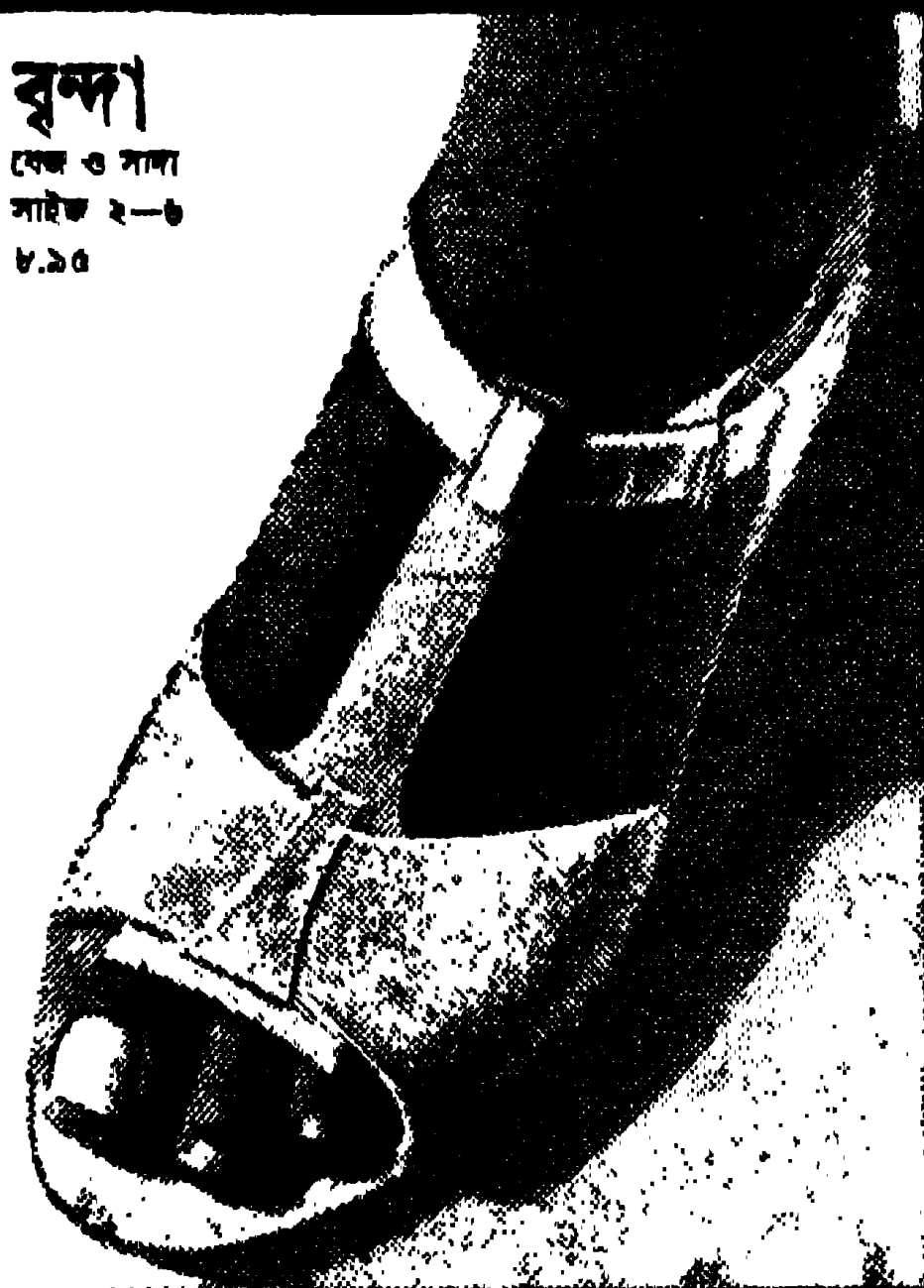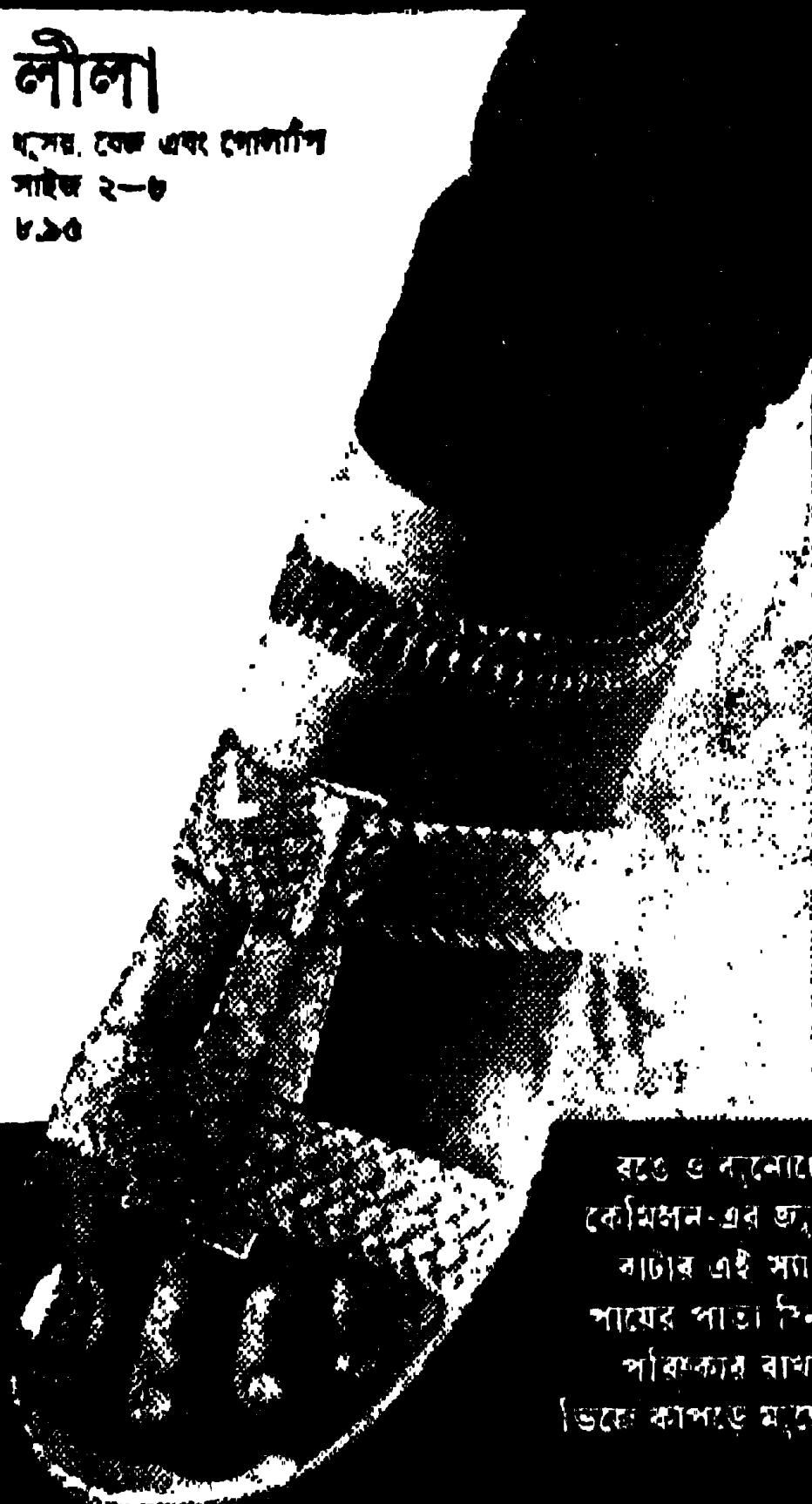
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মুখোশের অন্তরালে

প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয় গ্রাহাম গ্রীনের প্রথম উপন্যাস 'দি ম্যান উইদিন'। তারপর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নাটক, গল্পসংগ্রহ, প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং আট-নখানি উপন্যাস। সাহিত্যকর্ম হিসাবে এই হিসাব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, আরো উল্লেখ্য যে, তিনি আজো লিখছেন এবং আশ্চর্য লিখছেন।

গ্রাহাম গ্রীনের—'দি কমেডিয়ানস' একটি সাম্প্রতিক উপন্যাস এবং উপন্যাসটির বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

অনেককাল আগে 'দি হোরাইজন' নামক পত্রিকায় বিখ্যাত লেখক আর্থার কলডার মার্শেল গ্রাহাম গ্রীনের সাহিত্যকর্মের আলোচনা করেন এবং এই আলোচনাটির শিরোনাম ছিল 'গ্রাহাম ইন গ্রীনল্যান্ড'। গ্রীনল্যান্ডের গ্রীন শব্দটি বানান গ্রাহাম গ্রীনের উপাধি অনুযায়ী।

গ্রীনল্যান্ড নামক কল্পলোকের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিমন্ডল প্রভৃতি সমন্বয়ে তিনি এক অপরূপ মানচিত্র এঁকেছিলেন। তারপর কিছুসংখ্যক দায়িত্বহীন সমালোচক কোনোরকম ঋণ স্বীকার না করেই কথাটি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, ফলে 'গ্রীনল্যান্ড' কথাটি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা সুপ্রযুক্ত হলেও এখন সময় এসেছে কথাটি সযত্নে পরিহার করার। এর কারণ গ্রাহামের জগৎ, তাঁর চিন্তাধারা, রচনাশৈলী ও আঙ্গিক যদিচ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে অথচ তাঁর জগতের পরিধি পরিবর্তিত হয়ে সীমানা হয়ে উঠেছে সুদূরপ্রসারী। গ্রাহামের জগং অথচ সেই পরিচিত জগং, যে জগতের আমরা সবাই অধিবাসী।

গ্রাহামের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বিচিত্র, পৃথিবী পরিক্রমা করে তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। জনসন বা হ্যাজলিটের মত তাঁর সাহিত্য জীবনসম্পর্কিত। জীবিত রিপোর্টারদের তিনি পুরোধা, তাঁর রচনায় বিশ্বজনীনতা আছে, একদিন হয়ত এই কারণেই তিনি সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করবেন। তবে বলা কঠিন, সমরসেট মমকে ত নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি।

রীতিগতভাবে তিনি বাস্তববাদীর চেয়েও অনেক উর্ধ্বে, কিন্তু রচনার ভিত্তি—বস্তুবাদ। গ্রাহামের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সমালোচকরা করে থাকেন তার পিছনে আছে একটি বিষয়ে অজ্ঞতা। ক্যাথলিকবাদের বিশ্বাসীদের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে কোনো ধর্মমতের চেয়েও বেশী। আর এই অনেক শাখা-প্রশাখা সত্ত্বেও এই মতবাদটি বেশ প্রাণবন্ত। সব ক্যাথলিকরাই যে এক ধরনের হবেন এই আশা করা অনুচিত আর তাই যদি হত তাহলে কবে এই ধারাটি লুপ্ত হয়ে যেত।

ক্যাথলিক উপন্যাসকার হিসাবে গ্রাহাম গ্রীনের নিজের স্থান ঠিক কোথায়? প্রথমত গ্রাহাম গ্রীন খৃষ্টীয় ধর্মমতের ধর্মনিরপেক্ষত্ব নামক বস্তুটির বিরোধী। গ্রাহাম গ্রীন বলেন—

> "St. Paul observed that secularised theology conforms itself to the world, making this world the only reality. But the faith is not be seated down and even though not necessarily themselves theologians."

এই মতবাদের খণ্ডন করবেন যাঁরা অধিকারী ব্যক্তি। উপন্যাসকারকে তাই বলে যে বাস্তবতা বর্জন করতে হবে একথা বলা যায় না। তাঁর কাজ হল জাগতিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করা, শুধু তার বাহ্যিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করে ক্ষান্ত হলে তাঁর দায়িত্ব শেষ হয় না।

নিউম্যান যাঁকে বলেন—'এবরিজিন্যাল ক্যালামিটি' সেই বিপর্যয়ে গ্রাহাম বিশ্বাসী বলে অনুমান হয়, তেইয়ার দ্য সারদাঁ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ কল্পিত খৃষ্টীয় বিবর্তনবাদে তিনি বিশ্বাসী নন। হেনরী জেমস ডেভিল বা অশুভের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, এই দানবিক শক্তির ক্ষমতা অসীম। অন্ধকার থেকে উৎসারিত বিক্রমে তিনি বিশ্বাসী।

সহজ সমাধান গ্রহণ করতে গ্রাহাম গ্রীন রাজী নন, তাই তাঁকে দুঃখবাদী মনে করা সহজ। তবে প্রকৃত অবস্থা তা নয়। অনেক তীক্ষ্ণ ও অপ্রীতিকর উক্তি গ্রাহামের রচনায় আছে। তাঁর কাছে এই বস্তুটি হিংসা, নিষ্ঠুরতা এবং অমঙ্গলের সমতুল। নরকে বিশ্বাস থাকলে স্বর্গে অস্তিত্বেও আস্থাবান হতে হয়। গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাসে বেদনা সুস্পষ্ট তার কারণ বেদনা, এমনই এক সত্য বস্তু যে, একমাত্র রোমান্টিক ভিন্ন এই বেদনাকে অস্বীকার করতে পারেন না। চরম পরিণতিতে তিনি বিশ্বাসী।

গ্রাহামের 'ব্রাইটন রক' অনেকের কাছে বীভৎস মনে হয়েছে, কিন্তু বীভৎস হল এর কাহিনী অংশ। 'পাওয়ার অ্যান্ড গ্লোরী' তাঁর সার্থকতম উপন্যাস। গ্রাহাম গ্রীন একনায়কত্বে বিশ্বাসী নন, কিন্তু তাঁর কাছে কম্যুনিস্ট মাত্রেই অতিকায় দানব বলে মনে হয়নি। তিনি জগৎকে জানেন এবং অনেক বেশী মাত্রায় তিনি সহনশীল, বিরোধীর প্রতি ঘৃণা এবং ঈর্ষায় অন্ধ হওয়ার মানুষ তিনি নন।

গ্রাহামের 'দি কমেডিয়ানস' উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন আছে মনে করি।

এই কাহিনী বলছেন জনৈক ব্রাউন, সঙ্গে সঙ্গে লেখক বলেছেন যে, যেহেতু ব্রাউন একজন ক্যাথলিক, একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, ব্রাউন লেখকের বেনামদার। লেখকের কথাটি সত্য বলে মেনে নিতে হয়, তবে ব্রাউন ব্যক্তিটি অকিঞ্চিৎকর হলেও রীতিমত বুদ্ধিমান। লেখকেরই নিজস্ব ভঙ্গীতে একজন বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক তবে তার আচরণ এবং বহিরঙ্গ ভঙ্গী একান্ত-ভাবে তারই নিজস্ব। সূচনায় টমাস হার্ডির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—

"…. Aspects are within us,
and who seems
Most kingly is the King."

ব্রাউন হাইতিগামী একটি ওলন্দাজ মাল জাহাজের যাত্রী, যাবে পোর্ট-অ-প্রিন্সে, সেখানে তার একটি হোটেল আছে, এখন অবশ্য হোটেলটি খালি। আরেকজন প্রবীণ মার্কিন সহযাত্রী আছেন, তিনি নিরামিষাশী, মদপানবিরোধী, একবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদের প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁর নাম স্মিথ। তিনি এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা বেদনাময় ব্যঙ্গের। পাশবিক জগতে তাঁরা বিভ্রান্ত আদর্শবাদী। তৃতীয় যাত্রীটির নাম জোনস।

তিনজনের নাম সাধারণ ব্রাউন, স্মিথ, জোন্স। কারো সঙ্গে কারো সংযোগ না থাকলেও কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে, এরা সবাই বিদূষক। বিদূষণকর্মে সকলেরই যেন সমান প্রবণতা, বাহ্যত যতই পার্থক্য থাক অন্তরে সবাই যেন সমান, সবাইকার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এক ধরনের। এদের কোনো বাঁধাধরা ধর্মমত নেই, কেউই ধর্মের সংকীর্ণ গন্ডীতে বাঁধা নয়, এরা সবাই মুক্ত চিন্তার ধারক, কারো কোনো বন্ধন নেই। স্মিথের একটু অস্পষ্ট ধারণা আছে তবে তা নিতান্ত ফিকে, ব্রাউন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত মানুষ, তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। জোনস আধা-দুর্বৃত্ত ভাঁড়বিশেষ। জাহাজের ডেকেই ওদের চরিত্র অপরূপ ভঙ্গীতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

জাহাজ তীরে লাগার অনেক আগে থেকেই ব্রাউন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সকলের অন্তরে আতংক সৃষ্টি করতে। পোর্ট-অ-প্রিন্সের অধিনায়ক বর্বর, অত্যাচারী। স্মিথ এসব বিশ্বাস করতে রাজী নয়। হিটলার ত এর চেয়েও খারাপ ছিল, কেমন হিটলারের চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে? অথচ হিটলার ত ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। শুধু গায়ের চামড়ার রঙ শাদা বা কালো হলে কিছু এসে যায় না, যে পিশাচ, সে শাদা হলেও বা কালো হলেও তাই। ব্রাউন বলতে চায় যে, সে রঙের জন্য কিছু বলছে না, রঙটায় কি আসে যায়, আসলে এরা অতি খারাপ। এর ফলে স্মিথের বিশ্বাস আরো দৃঢ়ীভূত হয়। ব্রাউনের সাজবহুল হোটেলের একমাত্র অতিথি হলেন স্মিথ দম্পতি। লাতিন আমেরিকার একটি রাজ্যের রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মার্থার সঙ্গে ব্রাউন প্রেমচর্চায় মত্ত। ওদের জীবনের মতো এই প্রেমলীলাও সম্পূর্ণ নিরর্থক। এদের কারো অন্তরে প্রকৃত প্রেম নেই, যেমন কারো মনে কোনো বিশ্বাসও নেই। এরা সবাই যান্ত্রিক মানব, ঘটনা-পরম্পরার ক্রীতদাস। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ওরাও নড়ে-চড়ে,—অসভ্য টনটনস ম্যাকউট সম্পর্কেও এই কথাই বলা যায়, সেও ত অবস্থার দাস।

নিগ্রো কম্যুনিস্ট ডাঃ ম্যাগিওর যতক্ষণ না আবির্ভাব ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন প্রকৃত 'কমিটেড' মানুষের সাক্ষাৎ মিলছে না। ডাঃ ম্যাগিওর প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য এমনই যে, সমকালের ভয়ংকর ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ার অংশভোগী। ডাঃ ম্যাগিও সমগ্র ঘটনাপর্বের কমিক দর্শক নন, তিনি ট্রাজিক অভিনেতা, কাহিনীর তিনি কেন্দ্র-বিন্দুতে অধিষ্ঠিত এবং তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গেই কাহিনীর গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বিনোদনরীতিও প্রসারিত হয়, জোনস মারা গেল, সেই সময় সে মেজর জোনস, এবং মারাও গেল মহাসমারোহে। স্মিথ দম্পতি টেনেসী ফিরে গেলেন, তাঁদের চোখে তখনও সেই সম্মোহের শিশিরের স্পর্শটুকু লেগে আছে। ব্রাউন ডাঃ ম্যাগিওর কাছ থেকে শেষ পত্র পেলেন, তিনি লিখেছেন—

"Communism is more than Marxism just as Catholcism is more than Roman buria. There is mystique as well as politique".

ব্রাউনের ডাঃ ম্যাগিও বিশ্বাস না হারাতে অনুরোধ করছেন—বিশ্বাস হারানো পাপ—যে বিশ্বাস হারায় তার একটা বিকল্প থাকে, কিংবা মুখোশের অন্তরালে এ কি সেই বিশ্বাসটুকু অনারূপে আসে? আমরা সবাই ত মুখোশের আড়ালেই আছি।

কিন্তু ব্রাউন ত বিদূষকদের অন্যতম, তার বিচরণক্ষেত্র সমতল, উঁচু নেই, খাদ নেই। সে চলেছে—অন্তহীন পরিক্রমা, বলছে—'একদা অন্যপথ নেওয়া সম্ভব ছিল হয়ত, এখন অনেক দেরী হয়ে গেল।' গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাস পাঠককে ভাবায় এবং নতুন চিন্তার প্রেরণা দেয়।

—অভয়ঙ্কর

THE COMMEDIANS (A Novel) : By GRAHM GREENE : Published by Bodley Head : Price 25 Shillings.

সাহিত্যের খবর

সাঁওতালী সাহিত্য ।। সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তেমন নিবিড় নয়। অথচ বাংলাদেশের জনসমাজের একটা বিরাট অংশ এই ভাষার ধারক ও বাহক। ইদানিং এই ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্যও রচিত হচ্ছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখকের রচনাও সাঁওতালী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কথাগুলো মনে পড়ল গত ১৩ জুন কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে সাঁওতালী লিটারেরি অ্যাণ্ড কালচারেল সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৩য় বার্ষিক সাঁওতালী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন প্রসঙ্গে। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত।

সভায় সাঁওতাল সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীদিলীপ সরেন, শ্রীটি কে রসাজ ও শ্রীইজিক্যাল হেম্বরম। সম্পাদক শ্রীনাথানিয়েল মুরমু এম এল এ ধনবাদী শিল্পভিত্তিক সমাজের প্রভাবে কিভাবে এই ভাষা ও সংস্কৃতি সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তা বর্ণনা করেন। সাঁওতালী গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রীনাথানিয়েল হেম্বরম, শ্রীরবীন টুডু, শ্রীচরণ হাঁসদা, শ্রীভৈরব মুরমু, শ্রীমতী প্রিসকিলা টুডু, শ্রীমতী মিরোলা হেম্বরম প্রমুখ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা ভাল, সাঁওতালী ভাষায় যেমন বাংলার অনুবাদ আছে, তেমনি বাংলাতেও কিছু কিছু সাঁওতালী কবিতা অনূদিত হয়েছে।

সোভিয়েত কবিতায় প্রেম ।। রুশ শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, তা মূলতঃ পলিটিকসের ফসল। কিন্তু সোভিয়েতের কবিতা সম্বন্ধে একথাটি অনেক রুশ কবিই মেনে নেন না। সম্প্রতি মস্কোতে অনুষ্ঠিত লেখক কংগ্রেসে প্রখ্যাত কবি আর ফিরো-দোরোভ বলেছেন : 'রুশ কবিতা যে সব কাব্য বিষয়কে বিশ্বজনীন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে, তার মধ্যে প্রেম অন্যতম।

প্রেমই হল রুশ জনগণের নৈতিক আদর্শের উদাহরণ। ফাশিজম সম্পর্কে রুশ দেশের মানুষ যে প্রখর ঘৃণা অনুভব করে এসেছেন, একমাত্র প্রেমই তার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ।" একালের রুশ কবিতা সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের এই উক্তিটি অনেক খোরাক জোগাবে বলে আশা করি।

সাহিত্যিক দেশবন্ধু: এ বছর চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হবে। দেশবন্ধুর সাহিত্যিক অবদানের কথা একালে কেউ আর তেমন উল্লেখ করেন না অথচ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান নিতান্ত স্বল্প নয়। কেবল পত্রিকা সম্পাদক রূপেই নয়, প্রবন্ধ ও কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'মালঞ্চ', 'মালা' 'সাগর সংগীত' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর কবি প্রতিভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই বৈষ্ণব প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'মালা' কাব্যগ্রন্থটি আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর কবিতায় গভীরতর অনুভূতির কথা উল্লেখ করেন। জন্মশতবর্ষে তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধের একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

সর্বোদয় সাহিত্য প্রদর্শনী: সর্বোদয় সাহিত্যের এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল সম্প্রতি বোম্বাই শহরে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন বোম্বাই সর্বোদয় মণ্ডল। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগুলাবদাস ব্রুকার। তিনি তাঁর ভাষণে আচার্য ভাবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কয়েকটি ইতালীয় উপন্যাস: ইতালীয় সাহিত্যে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প গ্রন্থ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় গিয়োভান্নি আর্পিনোর কথা। আর্পিনোর খ্যাতি প্রধানত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই। সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই তাঁর সমান প্রতিপত্তি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বা শিশু সাহিত্য—সর্বত্রই তাঁর রচনা আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমান বইটি আসলে তিনটি ছোট উপন্যাস সংকলন। আর এই উপন্যাস তিনটির প্রকাশ কাল বিগত পনের বছর। এতে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার ক্রম-পরিণতিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমটির নাম 'আর্জান্টিমো স্টোরি (১৯৬৬-৬৭), দ্বিতীয়টি 'আলট্রে স্টোরি' (১৯৬৯-৬৬) এবং তৃতীয়টি 'স্টোরি দি প্রোভিনসিয়া (১৯৫৭-৬৩)। প্রথমটিতে লেখক চিত্রিত করেছেন শিল্পভিত্তিক নগর সভ্যতাকে। দ্বিতীয়টিতে দেখা যায় বিভিন্ন দিক—যেমন, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক, প্রাচীন যুগ বা আধুনিক হিপিদের কথা। তৃতীয়টিতে ইতালীর একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনধারাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার নাম 'সারস'। এর রচয়িতা গিওর্গিয়ো বাসসানি। প্রকাশিত হয়েছে মিলান থেকে। এই উপন্যাসটি রচনা প্রেরণা তিনি কোথায় পেলেন তা 'লা ফিয়েরা লিতারারিয়া' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—'এক শীতের সন্ধ্যায় আমি ফিরারা অঞ্চলের একটা ছোট শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এভাবে বেড়াতে বেড়াতে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেই সময় দোকানের সামনে সাজান বিভিন্ন জিনিসের একটা সারস আমার চোখে পড়ে। আর তখনই মনে হল একে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে হবে। আমি উপলব্ধি করলাম, আমার উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হবে এমন একটি মানুষ যে ওরকম সুন্দর গতিহীন এবং বস্তুজীবনের দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্ত থাকতে চায়। লেখক এই অনুভব থেকে উপন্যাসের চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এতে একটা মানুষের শেষ দিনের কাহিনী বর্ণিত। মানুষটির বাস্তব জীবনে ধন সম্পদের কোন অভাব ছিল না। তবু তার মনে জীবন অসহনীয় এবং তার এক মাত্র সমাধান খুঁজে পেলেন আত্মহত্যার মধ্যে। বইটি এ বছর ইতালীর 'বেস্ট সেলার তালিকাভুক্ত হয়েছে। আসলে, বইটির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও এর কথার ভঙ্গিটির জন্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

শোলোখভের পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ।। গত ২৪শে মে বিশ্ববন্দিত রুশ লেখক মিখাইল শোলোখভ পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করেন। শোলোখভের রচনা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই সমাদৃত। একদা ম্যাকসিক গোর্কি তাঁর রচনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন:—বুদ্ধিমান ইউরোপীয়েরা শোলোখভের রচনাবলীকেই বাস্তব বলে মনে করেন। আলেক্সি তলস্তয়ও বলেছিলেন:—'ধীরে বহে ডন' গ্রন্থের লেখক স্বীয় প্রতিভায় সোভিয়েত সাহিত্যে ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তববাদী ঐতিহ্যের মিলন ঘটিয়ে জনগণের নতুন গদ্যের পথ উন্মুক্ত করেছেন।' সোভিয়েত সাহিত্যের মুখ্য আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চমকপ্রদভাবে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনিই শিল্পস্রষ্টা এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নিপুণ রূপকার হিসেবে স্বীয় অনন্য সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বকে সাহিত্যে মুদ্রাঙ্কিত করে গেছেন।

"ডন নদীপারের ছোটগল্প" দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। সেই নদীর তীরে তীরে সোভিয়েত কর্তৃত্ব বিস্তারের সেই প্রথম বছরগুলিতে যে প্রচণ্ড সামাজিক সংগ্রাম চলছিল, এই গল্পগুলিতে আছে তারই প্রতিচ্ছায়া অকটোবর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালের জনজীবন ও জনগণের সাহচর্যে রইলো না যারা সেই বিপথগামীদের জীবন ট্র্যাজেডির মহাকাব্য এটি।" কর্ষিত অহল্যাভূমিতে বর্ণিত হয়েছে যৌথ খামারের উদ্ভব, গণমানসে নব-চেতনার উন্মেষ এবং গ্রামাঞ্চলে মৌল সমাজ-রূপান্তরের প্রায় অলৌকিক কাহিনী। 'ধীরে বহে ডন' রচনায় তিনি জীবনের পনেরটি বছর ব্যয় করেছেন। উপন্যাসটিতে অসীম নৈপুণ্যে অঙ্কিত হয়েছে খেটে খাওয়া মানুষের নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকৃতির সঙ্গে নিসর্গের প্রাণময় বর্ণনা এবং গীতিময় বিষাদপূর্ণ ঘটনাবলী ও হাসির দৃশ্যের নাটকীয় বিবরণ। যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সেই সময়ের রচনায় পাওয়া যায় ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী ঘৃণা।

তরুণ লেখকদের কাছে তাঁর আবেদন, তাঁরা যেন মানুষের হৃদয়ের যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকেন। কারণ লেখকই জনগণের বিবেক এবং জনগণের জন্য লেখার অধিকার পাওয়া তাঁদের পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য ব্যতীত কিছু নয়।

নতুন বই

ভারতের সাধক চিত্রাবলী—সম্পাদনা: শংকরনাথ রায়, প্রাপ্তিস্থান: প্রাচী পাবলিকেশনস, ৩ এবং ৪ হেয়ার স্ট্রীট, দোতলা, কলিকাতা—১। মূল্য—দশ টাকা।

ভারতীয় সভ্যতার এক বড় বৈশিষ্ট্য এ সভ্যতা কয়েক হাজার বৎসর প্রাচীন হলেও, এর স্রোতধারা আজো খণ্ডিত হয়নি, বয়ে চলেছে অব্যাহতভাবে।

মিশর, গ্রীস, ব্যাবিলন, রোমের প্রাচীন সভ্যতার পতন ঘটেছে বহুকাল আগে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা তার অপূর্ব প্রাণশক্তি নিয়ে আজো বেঁচে আছে। পাশ্চাত্যের মনীষী ও ধর্ম-সংস্কৃতির গবেষকদের অনেকেই ভারতের অন্তর্জীবনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম-সংস্কৃতির কালজয়ী প্রাণ প্রবাহের মূলে রয়েছে এদেশের সাধকগোষ্ঠীর প্রভাব। যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক ও মরমীয়া সাধকরূপে তাঁরা আমাদের জনজীবনে ছড়িয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের বিবেকানন্দ অরবিন্দ অবধি এই সাধকদের বহুমুখী কল্যাণধারাকেই বিস্তারিত দেখা যায়।

অধ্যাত্ম ভারতের বিশিষ্ট নেতাদের মনোরম চিত্রসংগ্রহ বা অ্যালবাম সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত যশস্বী লেখক শংকরনাথ রায়। আর্ট পেপারে ছাপা এই চিত্রসংগ্রহের ছবিগুলি মনোরম। অঙ্গসজ্জার সুরুচি ও শিল্পগত সৌষ্ঠব প্রশংসার দাবী রাখে

শংকরনাথ রায়ের সুরচিত, জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাটি এবং সাধকদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি এই অ্যালবামের বড় আকর্ষণ।

বেংগলী লিটারেচার [মে ১৯৭০]—সম্পাদক : আশিস সান্যাল ।। ৫৩, বিধানপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা—৩২ দাম—দু টাকা।

মূলত ইংরেজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যর প্রচার ও আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে বেংগলী লিটারেচার প্রকাশিত হলেও বিদেশী ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে অনাগ্রহী নয়। নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পত্রিকাটি আপন লক্ষ্যে অবিচল। এ সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প সম্পর্কে সুন্দর একটি আলোচনা লিখেছেন অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। আশিস সান্যাল লিখেছেন সখারাম গণেশ দেউস্কর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ। তাছাড়া আছে বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, লোকনাথ ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শামসুর রহমান, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শিশির ভট্টাচার্য, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, তুলসী মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল ও আরো অনেকের কবিতার অনুবাদ। প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিভাগের লেখকদের মধ্যে আছেন জিওফে জনসন, জেমস ব্যারেট, ম্যারিয়ান এম ম্যাডার্ণ, রবার্ট টমসন, সতীকান্ত গুহ, প্রীতীশ নন্দী, দীপঙ্কর রায়, এস ভেংকট নারায়ণ, সঈদ প্রেমী, হাসান অসোর এবং গালিব। সমালোচনা এবং সংক্ষিপ্ত সংবাদের বিভাগ দুটি আকর্ষণীয়। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

গল্প কবিতা [এপ্রিল-জুন ১৯৭০]—সম্পাদক : কৃষ্ণগোপাল মল্লিক। ১৭।১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা—১২, দাম : দেড় টাকা।

কয়েকটি ভাষার অক্ষরলিপিসহ চমৎকার প্রচ্ছদ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গল্প কবিতার এ সংখ্যাটি। পশ্চিমবঙ্গের একটি লেখাও নেই। বাংলা গল্প ছাপা হয়েছে একটিই। লেখক পাকিস্তানের বাসিন্দা। আদিবাসী, প্রাগৈতিহাসিক ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ ছাপা হয়েছে শেষের দিকে। বাকি সবই বিদেশী লেখার অনুবাদ। লেখকদের মধ্যে আছেন এডুইন মুয়ের, এডিথ সিটওয়েল, কনস্তান্তিন কাভাফি, আল্মা বোস্কে, আলী মামুদ তাহা, জাভিয়ের হেরো, লার্স গুস্টাফসোন হো চি মিন, ছেরেনাদ্দো তেজেদা, গন্টার কুনার্ট, রমেশ শ্রেষ্ঠ, ইউজেনিও মন্তাল, ভাস্কো পোপা, সাদাত হাসান মানটো, মিরোশ্লাভ হোলাব এবং আরো অনেক চেনা-অচেনা, পরিচিত-অর্ধপরিচিত দেশের কবি-সাহিত্যিক। আমরা সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই এই সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য। ইদানীংকালে পত্র-পত্রিকায় এমন ব্যাপক অনুবাদের ব্যবস্থা করতে আর কাউকে দেখা যায়নি। বাংলা সাহিত্যের পাঠক এই সংখ্যাটি হাতে পেয়ে খুশী হবেন।

তরুণ [প্রথম বর্ষ প্রথম সংকলন]—সম্পাদক : অশ্বিনীকুমার মণ্ডল ও পরমেশ চক্রবর্তী ।। ১১৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—১২ ।। দাম : ৩৫ পয়সা ।।

সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়েছে : "আমরা চাই, অপরিচিত সাহিত্যস্রষ্টাকে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়ে সাধারণের কাছে পরিচিত করাতে।" মনে হয়, সম্পাদকের এই ইচ্ছা প্রথম সংখ্যাতেই কিছুটা সফল হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন, সুনীল সাধুখাঁ, সুমন্ত সরকার, সঞ্জীব ঘোষ, সুব্রত রায়চৌধুরী, দেবেশ্বর বিশ্বাস এবং আরো অনেকে।

ই এম ফরস্টার

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তির প্রজা ছিলেন এডওয়ার্ড মরগান ফরস্টার। ওদের উপনিবেশ ভারতের বিষয়ে ফরস্টারের মনোভাব কিন্তু রাজভক্ত প্রজার মত ছিল না। ছিল না বলেই লিখতে পেরেছিলেন কালজয়ী উপন্যাস 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'। প্রায় আট বছর লেগেছিল উপন্যাসটি লিখতে। দুবার ভারতে এসে মিশেছিলেন, ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে। উপন্যাসটি যেমন তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীর স্বীকৃতি দিয়েছিল, তেমনি এর ফলে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের অপ্রিয় হয়েছিলেন। ভারতবাসীর স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ফরস্টার তাঁর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং শিল্পগত আদর্শের পরিচয়কে স্পষ্ট করেছিলেন। পরে আরো দুবার ভারতে এসেছিলেন তিনি।

ফরস্টারের লেখক-জীবন শুরু বি-এ পাশ করবার পর। অন্যতম প্রেরণাদাতা ছিলেন জি এল ডিকিনসন। সাহিত্য-জীবনের আগে থেকেই ইতালি আর তার সাহিত্যে ছিল ফরস্টারের অকৃত্রিম অনুরাগ। প্রথম দুখানি উপন্যাস 'হোয়ার এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড' এবং 'এ রুম উইথ এ ভিউ'-এর পটভূমি ইতালি। প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খৃঃ এবং ১৯০৮ খৃঃ। ফরস্টার তখন ছিলেন ইতালিতে। কেম্ব্রিজকেন্দ্রীক তৃতীয় উপন্যাস 'দি লঙেস্ট জারনি' বেরোয় ১৯০৭ খৃঃ। ১৯১০ খৃঃ চতুর্থ উপন্যাস 'হোভার্ডস অ্যান্ড' প্রকাশিত হওয়ার পরও কিন্তু ফরস্টার পূর্ণ সাহিত্যস্বীকৃতি পান নি। সাধারণ একজন লেখক হিসাবে তখন পর্যন্ত মিলেছে সমালোচক স্বীকৃতি। ব্যথিত চিত্তে তীব্র হতাশাকে নিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন ফরস্টার। মহৎ কিছু সৃষ্টির উদ্দীপনায় ছটফট করছেন, অথচ নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠছেন। এ সময়ে একমাত্র নাটক 'দি হার্ট অফ বোসনিয়া' বেরোয় ১৯১১ খৃঃ।

বিক্ষত শিল্পী ভারতে এলেন ১৯১২ খৃঃ। ফিরে গেলেন ১৯১৩ খৃঃ। শুধু দু চোখ মেলে দেখে গেলেন ভারতকে। তাঁর প্রকৃতি, মানুষ, জীবনধারা এবং প্রাচীন সংস্কৃতিকে মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে ফিরে গেলেন স্বদেশে। ১৯২২ ও ২৩ খৃঃ দুখানি ফিচারধর্মী বই লিখলেন 'ফারোস অ্যান্ড ফারলিন' এবং 'আলেকজান্দ্রিয়া : এ হিস্ট্রি গাইড'। ভারত থেকে ফেরার পথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুকাল ছিলেন কায়রোয়। বই দুখানি তারই ফলশ্রুতি। দেশে ফিরে নিউ স্টেটসম্যান এবং স্পেকটেটারে ফিচার লেখেন। ডেইলি হেরাল্ডের সম্পাদনা করতে থাকেন। গল্প-উপন্যাস লেখা বন্ধ। অনেকে ধারণা করলেন হয়ত আর লিখবেন না। কিন্তু ফিচার লেখা আর সম্পাদনা অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন নি ফরস্টার। বেদনাহত অন্তরের ক্ষণিক সান্ত্বনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এই সব রচনাকে।

কিন্তু ইতিমধ্যে নিজের অক্ষমতাকে কাটিয়ে, কালজয়ী সৃষ্টির দিকে যে তাঁর গোপন পদক্ষেপ ঘটেছে সাধারণ মানুষ তার খবর জানত না। জানতেন কয়েকজন বন্ধুমাত্র। অবশ্য দ্বিতীয়বার ভারতযাত্রার সংবাদে অনেকে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ধারণা করলেন, এবার হয়ত এমন কিছু পাওয়া যাবে, যা ফরস্টারকে সাহিত্যে স্থায়ী আসন দেবে। ১৯১৩ খৃঃ ভারত থেকে ফিরে লিখছিলেন একখানি উপন্যাস। লেখা শেষ করে ১৯২১ খৃঃ ভারতে এলেন। অসহযোগ আন্দোলনে এ দেশের মানুষের মুক্তিকামনার উদ্দীপ্তস্বরূপ দেখলেন ফরস্টার। দেশে ফিরে গেলেন। জানাজানি হোল নতুন উপন্যাসের কথা। উদ্গ্রীব প্রতীক্ষার পর অবশেষে বেরুল 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া ১৯২৪ খৃস্টাব্দে। ফরস্টার সত্যিকার একজন মহৎ ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন।

সম্প্রতি তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। এতে সাহিত্য-জগতের ক্ষতি ছাড়াও আমরা ভারতবাসীরা হারালাম একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে।

—সাংবাদিক

বৈকুণ্ঠের খাতা

গোয়েন্দা উপন্যাসের ছদ্মবেশী লেখক

স্বনামে নয়, ছদ্মনামে উপন্যাস লিখে যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছেন এমন বাঙালি সাহিত্যিকের সংখ্যা কম নয়। বিদেশে তার নজীর আছে যথেষ্ট।

সংক্ষিপ্ত 'পেন নেম'-এর কথা বলছি না। ও ব্যাপারে পাঠকের কৌতূহল অপরিসীম। তাঁরা 'পরশুরাম''ক খোঁজ করতে গিয়ে চিনে ফেলেন রাজশেখর বসুকে। ঐ একই কারণে, আড়ালে ঘুচে যায় 'কণিষ্ক' 'যুবনাশ্ব' 'রূপদর্শী' 'বিক্রমাদিত্য' 'মল্লিনাথ'-এর।

কিন্তু মুশকিল হয় পুরো নামের বেলা। সহজে তাঁদের আড়াল ভাঙে না। কে আর জিজ্ঞেস করে, নিবারণ চক্রবর্তীর আসল নাম কি? কখনো কখনো লেখকের ডাকনামটাই জড়িয়ে যায় সাহিত্যখ্যাতির সঙ্গে। অনেকেই জানেন না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নামের হদিস।

দেবল দেববর্মারও হয়তো একদিন সে দশাই হতো। আসল নামের জায়গায় দখল করতো ঐ সাহিত্যের নামটি। সমতলবাসী বাঙালি পাঠকের মনে তিনি সন্দেহ জাগিয়েছেন, প্রথমত অচলিত একটি নাম গ্রহণ করে, দ্বিতীয় পদবীর জন্য। হয়তো, ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে, যখন তিনি ছদ্মবেশে আর তেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না, কিংবা পাঠকের ঔৎসুক্যই তাঁকে টেনে নিয়ে আসবে প্রকাশের আলোয়।

মাসখানেক আগে, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : "আমার কি ছদ্মনামে লেখা উচিত ? নাকি শুধু নিজের নামেই লিখব?"

আমি তাঁর সংশয়ের সদুত্তর দিতে পারি নি বোধ হয়। বললাম : "লেখার ধরণধারণ যখন আলাদা, তখন দুনামে লিখতে আপত্তি কি? 'কালকূট'তো স্বনামে বিখ্যাত হয়েও ছদ্মনাম ত্যাগ করেননি।"

স্বনামে ও ছদ্মনামে

অমৃতের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তিনি দুনামেই পরিচিত—স্বনামে এবং ছদ্মনামে। অবশ্য এই নাম-ব্যবধানের দ্বৈতচারণায় যে লুকিয়ে আছেন একই ব্যক্তি, তা হয়তো জানা নেই অনেকের। তিন-তিনটি ধারাবাহিক লেখা ছেপে অমৃতই তাঁকে জনপ্রিয় করেছে—পাঠক এবং প্রকাশক মহলে।

তিনি বলেন : "ভেবে অবাক হই, বই প্রকাশের জন্য আমাকে কখনো বেগ পেতে হয় নি। অমৃতে যখন 'নীল দরিয়ায়' লিখছিলাম, তখন সাহিত্যিক মনোজ বসু নিজেই বইটি ছাপার ব্যবস্থা করেন।"

দেবল দেববর্মা নামে তাঁর প্রথম বই 'রাত তখন দশটা।'

এ সম্পর্কে তিনি বলেন : "উপন্যাসটি যখন অমৃতে ধারাবাহিকভাবে বেরুচ্ছিল, তখন বাক-সাহিত্যের শচীনবাবু বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করেন এবং তিনিই বের করার প্রস্তাব দেন।"

ছদ্মনামে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'অন্ধকারের মুখ।'

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখা কোনটি ?

উত্তর দিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়লেন দেবল দেববর্মা। বললেন : সে তো স্বনামে লেখা! সে কথা কি বলা উচিত?

বললাম : বলুন, পাঠকের তা জানা দরকার।

সঙ্কোচ কাটিয়ে উত্তর দিলেন তিনি : 'কানাই লাটের গল্প।' প্রবাসীতে লিখে পুরস্কার পেয়েছিলাম।

প্রথম প্রকাশিত বই কোনটি?

—'যদি কোনোদিন।' সেটিও বেরিয়েছিল প্রবাসীর পুজো সংখ্যায় 'হে বন্ধু বিদায়' নামে। ছোট বই। সূর্যদেও পাণ্ডে তার হিন্দী অনুবাদ করেছেন।

যদ্দুর মনে পড়ে, অমৃতবাজার পত্রিকায় তিনি কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন

ংরেজীতে। অবাঙালি পাঠকদের কাছে ঁনি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন 'দি কম্পিটিশন' দ সিলেকসন' 'দি ওয়েস্ট' নামে তিনটি ল্প লিখে।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অন্যান্য বইগুলোর নাম কি পাঠকরা জানেন ?

—জানেন বোধহয়। আমার দ্বিতীয় ই 'ইতিহাস কথা কয়'—ভ্রমণকাহিনী-মূলক লেখা। তৃতীয় বই 'নাচনহাটির জন সাহেব' —কোনো পত্রিকায় বেরোয়নি, সরাসরি পান্ডুলিপি থেকে ছাপা উপন্যাস। বোধহয়, আমি সাহিত্যিক স্বীকৃতি পাই এ বইটি লিখে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভালো রিভিউ বেরিয়েছিল। আর ডি বনশল বইটির চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। হয়তো কোন একদিন রূপোলি পর্দায় তার চিত্ররূপ দেখা যাবে।

তারপর একটু থেমে বললেন, হ্যাঁ, আমার চতুর্থ বই 'রূপ হলো অভিশাপ' থেকে আমি অনেক পালটে গেছি। এর আগে রহস্যোপন্যাস লিখিনি কখনো। সেই প্রথম লিখলাম।

কেন লিখলেন ?

—বলা মুশকিল। তবে প্রত্যক্ষ কারণ হল দুটো—(১) একটি পত্রিকার অনুরোধ (২) প্রকাশকের চাহিদা। আমার প্রকাশক তখন একটি সিরিজে কিছু গোয়েন্দা-কাহিনী (বা ক্রাইম স্টোরি) প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। পঞ্চম বই 'নীল দরিয়ায়'—জলদস্যুদের কাহিনী। ষষ্ঠ-সপ্তম বই তো জানেনই। ও দুটো দেবল দেববর্মা ছদ্মনামে লেখা। এ ছাড়া আমার একটি ছোট উপন্যাস আছে, গ্রন্থাকারে বেরোয় নি. যুগান্তরে বেরিয়েছিল 'অথৈ জলে মানিক' নামে।

আমি চুপ করে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি ইংরেজীতে লেখা একটি টাইপ করা পান্ডুলিপির পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। জনৈক ভদ্রলোক (নামটি মনে পড়ছে না) তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'নাচনহাটির জনসাহেব' অনুবাদ করেছেন ইংরেজীতে। বোধহয় বেরুবে।

অন্ধকারের মুখ : কাহিনী

আমি তাঁর সপ্তম বই 'অন্ধকারের মুখ' পড়ছিলাম। কাহিনীটি এই রকম :

পলাশপুর হাসপাতালের ডাক্তার অম্বর রায়ের স্ত্রী নীপা রায়, দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি অসাধারণ তার শরীরের গঠন। অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ তার দীর্ঘ-কালের। আগে অভিনয়ও করেছে দু'একবার। অনেকদিন পর সে ভর্তি হল কলেজে। বাংলার অধ্যাপক নীলাদ্রির সঙ্গে তার ভাব ছিল এককালে। নীলাদ্রি নিজেও নাটক-প্রেমিক মানুষ। স্বভাবত পেশা ও নেশার সূত্রে নীপার সঙ্গে নীলাদ্রির আবার যোগাযোগ হয় সাত-আট বছর পর। টাউন হলে নাটকের মহলা শুরু হল। নীলাদ্রি তার পরিচালক, নায়িকা নীপা রায় আর নায়ক সুদর্শন চেহারার এক যুবক—তার নাম দেবরাজ মিত্র। চৈতি নামে অন্য একটি মেয়ে নীপাকে ঈর্ষা করে দেবরাজের সঙ্গে বেশী ভাব সাব আছে বলে।

মোটামুটি এই কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই। হঠাৎ অম্বর রায়ের বাসায় মধ্যরাত্রিতে ঢিল পড়তে শুরু করে। প্রথমে একটি, তারপরে আরো দুটি। অম্বরের মনে সন্দেহ জাগে। প্রতি মাসেই এ ঘটনা ঘটেছে। সে পুলিশকে ব্যাপারটা জানায়। এর আগেও নাকি পলাশপুরের একটি বাড়ীতে মাঝে মাঝে এরকম ঢিল পড়তো। শেষ পর্যন্ত ঢিল পড়া বন্ধ হয়, সে বাড়ীর একটি যুবতী মেয়ে আত্মহত্যা করার পর। অম্বর রায় নীপাকে সে কথা জানায়। কিন্তু নীপাই বা কি বলবে? সে তো জানে, কে ঢিল ফেলে ? কেন ফেলে ? তার নাম বীরেন মোদক। নীপার প্রথম বয়সের প্রণয়ী। একবার নীপা বীরেনের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাসও করেছিল।

ঘটনায় রহস্যের আভাস ঘনীভূত হয় ঐ বীরেন মোদককে নিয়ে। আসলে সে ব্ল্যাকমেলার। পূর্বতন সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে সে নীপার কাছ থেকে টাকা আদায় করে। অম্বর, তাকে নীপার পেছনে নিয়োগ করে, তারই কাকা নরেশবাবু, যাতে নীপার সঙ্গে অম্বর রায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। কেননা, বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলে নীপা তার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হারাবে।

এই জটিলতার মধ্যে বিপদ হয়ে দেখা দেয় ইতিহাসের অধ্যাপক অনিমেষ দত্ত। আসলে সেও একটি প্রতারক। প্রকৃত নাম সুরেশ্বর নন্দী। দুর্ঘটনায় নিহত একজন অধ্যাপকের সার্টিফিকেট নিয়ে সে অন্য একটি কলেজে অধ্যাপনা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। নীপার পূর্ব-প্রণয়ী বীরেন মোদক ছিল তার ছাত্র। নীপার সঙ্গে বীরেন মোদককে নদীর ধারে দেখতে পেয়ে সুরেশ্বর নন্দী চমকে ওঠে। ধরা পড়ার আশঙ্কায় সে-ই মরফিন ইনজেকশান দিয়ে নীপাকে হত্যা করে।

এখানেই কাহিনী শেষ। মাঝখানে আছে আরো কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনা—নীলাদ্রি, দেবরাজের সঙ্গে নীপার কয়েকটি স্খলিত মুহূর্তের দৃশ্য, চৈতি নামে মেয়েটির কার্যকলাপের বিবরণ। বাকি ঘটনা, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের দুই বিভাগীয় প্রধান—সুব্রত ও রাজীবের অনুসন্ধানের অন্তর্গত।

উপন্যাসের শেষে লেখক রাজীবের মুখ দিয়ে বলেছেন : "এই আলোর মুখটাই তো আমাদের সব পরিচয় নয়।

...রের ভিতরে গাঢ় অন্ধকারে আর একটা মুখও লুকিয়ে আছে। সেটি অন্ধকারের মুখ। ভাগ্য ভালো, সেই মুখটা আমরা দেখতে পাইনে। নইলে, হাসিমুখে সকলের সঙ্গে আমরাই কি কথা বলতে পারতাম?"

দেবল দেববর্মার সঙ্গে আলাপ

দেবল দেববর্মা বলেন : আমি 'অন্ধকারের মুখ' লিখতে শুরু করি ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে। পরের মাস থেকে অমৃতে ধারাবাহিক বেরোয়।

একটু থেমে বললেন : 'রাত তখন দশটা' যখন লিখতে শুরু করি, তখন মনকে ঠিক করে নিয়েছিলাম, রহস্যকাহিনী লিখব সিরিয়াসলি। আজগুবি কাহিনী লিখব না। আমি আগাথা ক্রিস্টির বই পড়েছি। কিন্তু কখনো বিদেশী কোনো গল্পের অনুকরণ করিনি। 'রাত তখন দশটার' ভূমিকায় পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছি, আমার গল্পে কোনো বিদেশী গল্পের ছায়া পাওয়া যাবে না।

আপনার গল্পের উপজীব্য কি ?

—আমার গল্পের প্রধান উপজীব্য হলো সত্যিকারের ঘটনাবলী। আমাদের দেশে যে সব খুন হয়েছে বা হচ্ছে, যেসব ঘটনা সংবাদপত্রে কিংবা পুলিশ জার্নালে বেরোয়, তাই আমি উপন্যাসাকারে লিখি এবং লিখেছি।

তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন : যেমন ধরুন, আমার ছোট উপন্যাস 'অথৈ জলের মানিক'। তাতে হয়তো অনেক রং চড়িয়েছি। কিন্তু মূল ঘটনাটি বাস্তব, তা হলো পাটনায়। অবশ্য ঠিক ঘটনামাফিক কোনো কিছুই সাজিয়ে লেখা যায় না।

তা হলে ?

আমি চেষ্টা করি ঘটনাটাকে অবিকৃত রেখে তার ওপরে সাহিত্যের রং দিতে। কেন না, আমার উদ্দেশ্য তো কেবল খুনের কাহিনী বর্ণনা করা নয়, বরং সেই ঘটনা ঘটতে যাবার আগে খুনীর মানসিকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করাই হলো আমার কাজ।

'অন্ধকারের মুখ' লিখতে গিয়ে কি আপনি কারো কোনো রকম সাহায্য নিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, নিয়েছি। আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কথা মনে পড়ে। সে এখন বাংলাদেশে নেই। আছে মহীশূরে। তার কাছে শুনেছি, হত্যাকারী যদি মরফিন দিয়ে কাউকে মারে, তাহলে রক্তে তার কোনো হদিস পাওয়া যাবে না।

আপনি কি এ উপন্যাসে কোনো সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন ?

—বলেছি। একটা নয়, দুটো। তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে খুচরো আরো অনেক সমস্যা।

প্রথম সমস্যাটি কি ?

—প্রথম সমস্যা হলো, এ উপন্যাসের নায়িকা নীপার মানসিকতা। সে সুন্দরী, রূপসী এবং বহির্মুখী। সাংসারিক জীবনে সে যদি সুখী হতো, ছেলেমেয়ের মা হতো কিংবা নতুন কোনো ঘটনাস্রোতে আবর্তিত হতো, তা হলে পুরনো স্মৃতি এসে তার নতুন সংসারকে ভাসিয়ে দিতে পারতো না। সে একটি পরিবারে একা, নিঃসঙ্গ। স্বভাবতই সহস্র স্মৃতি এসে তাকে বারবার আলোড়িত করতে থাকে। সংসার তার কাছে বাসি না হয়ে গেলে হয়তো সে কলেজে পড়তে যেতো না, টাউন হলের নাটকে অংশগ্রহণ করতো না। অবশ্য এতে অম্বর রায়ের দোষ নেই। আগেকার সেই একান্নবর্তী পরিবারগুলি এখন ভেঙে গেছে। ফলে, বর্তমান জীবনের নিস্তরঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই পুরনো স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে নীপা। এবং সেখানেই শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে চেয়েছে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি কি ?

—এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। সম্মান, মর্যাদা ও শিক্ষাগত মানের সঙ্গে এ প্রশ্নটি জড়িত। আপনিও হয়তো জানেন, জাল সার্টিফিকেট নিয়ে দু'একবার দু'একজন লোক বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করে যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছেন এবং পরে দৈবদুর্বিপাকে ধরা পড়ে হাজত বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে তা হলে শিক্ষার কি কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড নেই? অন্যের সার্টিফিকেট নিয়ে বেনামে অধ্যাপনা করাটা আইনের চোখে দোষের হতে পারে, নীতির কাছে দোষের নয়। এ উপন্যাসের সুরেশ্বর নন্দী মৃত অনিমেষ দত্তের ছদ্মনামে অধ্যাপনা করলেও তার যোগ্যতা এতটুকু কম ছিল না। সে ইতিহাসের প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছাত্রের মতোই সমান মেধাবী সমান জ্ঞানী। শুধু ইউনিভার্সিটি তাকে ডিপ্লোমা দেয় নি বলে যত কিছু গোলযোগ। সামাজিক স্বীকৃতি পেলে হয়তো সুরেশ্বর নন্দীকে অনিমেষ দত্ত সাজতে হতো না। করতো, ছাত্রীকে খুন করে নিজের লজ্জা ঢাকবারও প্রয়োজন হতো না তার কোনোদিনই।

বললাম, অর্থাৎ— ?

অর্থাৎ, আমি রহস্যকাহিনীকে সোস্যাল প্রোব্লেম-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চাই। সংবাদপত্রের পাতায় নিয়মিত চোখ বুলোলেই বুঝতে পারবেন, গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে খুনখখমের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ১৯৬২ থেকে ৬৭ সালের মধ্যে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশী।

'অন্ধকারের মুখ'-এর বৈশিষ্ট্য

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট দিকপালদের সঙ্গে হয়তো তাঁর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায় না। প্রতিভার প্রকারভেদে তিনি আলাদারকম। কিন্তু পাঠক-স্বীকৃতি পেয়েছেন নিঃসন্দেহে।

অমৃতে প্রকাশের সময়, কেউ কেউ অভিযোগ করেছিলেন, এতে রহস্যের ভাগ কম, বড্ড বেশী প্রেমের গল্প হয়ে গেছে।

দেবল দেববর্মা বলেন : আমিও তাই চেয়েছিলাম। মানুষের [illegible]নে সবটাই সাসপেন্স নয়। রহস্[illegible]সেরও একটা বস্তুভিত্তি অবশ্যই থাকবে। তার পাত্রপাত্রীর আকাশ থেকে উড়ে আসে না। এই পৃথিবীতেই তাদের বসবাস। ঘটনাক্রমে তারা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সেই জন্যেই প্রত্যেক লেখকেরই সেন্স অব প্রোবেবিলিটি থাক[া] দরকার।

জিজ্ঞেস করলাম : কি রকম ?

—আমাদের দেশে রহস্যগল্প বলতে বোঝানো হয়, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, টাকা ছিনতাই দুষ্প্রাপ্য হীরেজহরতের নিরুদ্দেশ কাহিনী কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা আর ঘ[টে] কটা? দীর্ঘকাল গোয়েন্দাকাহিনী প[ড়ে] পড়ে আমাদের একটা ধারণা তৈরী হ[য়ে] গেছে। বইয়ের শুরুতেই থাকে এক[টা] রহস্যের আভাস, সব সময় চমকের ভা[ব] যেন চারদিকে খুনীর পেছনে ঘুরে বেড়া[চ্ছে] পুলিশ আর গোয়েন্দাদের চোখ। আ[মি] সেই ধারণাটা ভেঙে দিতে চাই। সেজন্যে আমার নায়ক-নায়িকারা স্বাভাবিক। 'অন্ধ কারের মুখ'এ অলৌকিকতার আভাস বং[শ] সম্ভব কম, সমাপ্তিতেও নেই রূপকথা পরিণতি।

—গ্রন্থপর্ণ

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২)

যখন মন খুশিতে উজান বয় না তখন ডাকে আম্মু। আর যখন উজানে মন নদীর মতো মাতাল তখন ডাকে, আম্মু বেগম। পেট পুরে খেতে পারলে ডাকে, বেগমসাহেবা। ফেলু বেগমসাহেবার জন্য পাগল, আর পাগল এই মাইজলা বিবির দুই সুরমাটানা চোখের জন্য। ঘাট থেকে তাড়িয়ে দেবার পর এই অশ্বত্থের ঝোপ ওর মতো নিরালম্ব মানুষের সামান্য আশ্রয়। সে ঝোপের ভিতর একটা মরা গো-সাপের মতো সেই থেকে পড়ে আছে—মাইজলা বিবি এ-পথে এখনও ঘাটে এসে নামছে না।

এখন শীতের দিন। জমি থেকে সব ফসল উঠে গেল বলে মাঠ ফাঁকা। কেবল নরেন দাস অথবা মাঝি-বাড়ির শ্রীশচন্দ্র, প্রতাপ চন্দ কামলা দিয়ে নিচু জমিতে তামাকের চাষ করছে। আর সব উর্বরা জমি থাকলে সেখানে পেঁয়াজ রসুন এবং চিনাবাদামের গাছ দেখা যাচ্ছে। এই পথে কেউ বড় এখন আসবে না। এলেও ঝোপের ভিতর যে একটা মানুষ শিকারি বেড়ালের মত ওৎ পেতে আছে টের পাবে না। জালালির শরীরটা এখন মাঠের শেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুবের বাড়ির মালতী গরু নিয়ে এসেছে গোপাটে। সে গোপাটে গরুর খোঁটা পুঁতে চলে যাচ্ছে।

সরকারদের ঘাট পারে তেমনি ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। মাঠে মাঠে বাস্তু-পুজোর নিশান উড়ছে। ঠাকুরবাড়ি, পাল-বাড়ি এবং বিশ্বাসপাড়া যেদিকে তাকানো যাচ্ছিল সব দিকে সেই ঢাক-ঢোলের বাজনা আর মেষ অথবা মোষের আর্তডাক। মোষ বলির সময় হলে সরকারদের পঞ্চাশজন ঢাকী একসঙ্গে হররা ছোটাবে। সে এবার একটু কাত হয়ে গলাটা কচ্ছপের মতো যেন বাড়িয়ে দিল। মনে হল মাইজলা বিবির মুখ শরীর ঝোপের অন্য পাশে—ঠিক ঘাটের পথে নেমে আসতে ভেসে উঠেও উঠল না। মরীচিকার মতো ঝিলিমিলি করছে শুধু। আহা ভেতরটা কেমন করছিল ফেলুর।

তখন হাইজাদির সরকারেরা করজোড়ে গামছা গলায় দাঁড়িয়ে আছে। মোষের চামড়া এবং মাংস নিতে যারা শীতলক্ষার পার থেকে এসেছিল, তারা ঘাটের অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে। মাঠে মাঠে উৎসব আর ঝোপের ভিতর ফেলু। সে মাইজলা বিবির মরীচিকা দেখার জন্য ঝোপের ভিতর কচ্ছপের মতো গলা তুলে রাখল।

মালতী গোপাটে গরুর খোঁটা পুঁতে তাড়াতাড়ি শোভা আবুকে নিয়ে ঠাকুর-বাড়ির ঘাটে স্নান করতে চলে গেল। বাস্তু-পুজো বলে সকাল সকাল আভারাণী স্নান করেছে। মাঠে অমূল্য কলাগাছ পুঁতে এসেছে এবং দুর্বাঘাস চেঁচে চারিদিকটা পরিচ্ছন্ন করে শুকনো আমের ডাল, বেল-পাতা সব পেড়ে এনে বারকোষে রেখে দিয়েছে। গোটা তিনেক জমি পার হলে ঠাকুরবাড়ির ভিটা জমি। সেখানে বড়-বৌ ধনবৌ সকাল সকাল স্নান করে চলে এসেছে। সোনা, ঠাকুরঘর থেকে কাঁসি নিয়ে ছুটছে। সেনা, কাঁসিটা জোরে জোরে বাজাচ্ছিল। পুকুরের জলে কচুরি পানা, কলমিলতা এবং শীতের সময় বলে গাছে কোন ফল নেই, ফুল বলতে কিছু শীতের ফুল, ঝুমকো লতা, শ্বেত জবা, রাঙা জবা। বাস্তুপুজোয় রাঙাজবা দিতে নেই। শ্বেত-জবা কে ভোর না হতেই গাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। বড়-বৌ সাজিতে সামান্য ফুল সংগ্রহ করতে পেরেছেন। খুঁজে পেতে কিছু শ্বেত জবা, কিছু অতসী ফুল আর ঝুমকো লতা। বেলফুল কিছু আছে। শীতের জন্য ফুলগুলি তেমন ফোটে না ভাল, ফুলগুলি কুঁকড়ে আছে—অসময়ের ফুল বড় হতে চায় না।

তখন জালালি সমস্ত গরীব দুঃখী মানুষের সঙ্গে সেই বড় বিলে, প্রকাণ্ড বিলে—এ-পারে দাঁড়ালে যার ওপার দেখা যায় না, যে বিলে ভিন্ন ভিন্ন সব কিংবদন্তী রয়েছে, বিলের চারপাশে নল খাগড়ার বন, মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙা, আবার দু-দশ একর নিয়ে গভীর জল, কালো জল বড় গভীর—সেখানে মানুষ যেতে নৌকা বাইতে ভয়, তেমন বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। জলের ভিতর কি এক দৈত্য থাকে বুঝি, কিং-বদন্তীর দৈত্য। ওর পেট পিঠ জোৎস্না রাতে ময়ূরপঙ্খী নৌকার মতো। নৌকা যেন এক জলে ভাসে, জলে ভেসে নৌকা যায়, ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায় তারপর মানুষের সাড়া পেলে টুপ করে জলের নিচে ডুবে যায়—হায়, মানুষের অগম্য বুদ্ধি। অজ্ঞ মানুষের বিশ্বাস, অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটনা নেই। দুপুরে রাতে চরাচরে যখন মানুষ জেগে থাকে না, যখন সারা বিলটা পাঁচ দশ ক্রোশ জুড়ে জলের ভিতর ডুবে থাকে, যখন জ্যোৎস্নায় ফসলের মাঠ ভরে থাকে তখন জলে এক ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসে—ভিতরে রাজকন্যা এক, চাঁদ বেনের পুত্রবধূ হবে হয়তো, বেহুলা-লক্ষীন্দরের পাঁচালি মানুষের প্রাণে বিহ্বলতা জাগায়।

নৌকা বিলের জলে ভেসে উঠলে আলোতে আলোময়। যেন মাঝ বিলে আগুন ধরে গেছে। তেমন বিলে জেলে

যাবার আগে জালালি জলটা প্রথম মাথায় দিল, পরে মুখে জল দিল, তারপর গো-সাপের মতো জলে ভেসে গেল। শীত কন্-কন্ করছে—কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না জলে। কবে আবেদালি গেছে, মাস পার হয়ে যাবে প্রায়, ঘুরে এল না এখনও। এলে দু-চার হপ্তা পেট পুরে খাওয়া। তারপর ফের উপোস। জালালি জলে ভাসতে থাকল। ফুৎ করে জল মুখে নিয়ে হাওয়ার ভিতর জল ছুঁড়ে দিতে থাকল।

সব মানুষ সাঁতার কেটে যেখানে শাপলা শালুকের পাতা ভেসে আছে সেদিকটায় চলে যেতে থাকল ক্রমশ। বড় শালুকের জন্য সকলের লোভ বেশী। এ-জলে কি আছে, কি নেই, কেউ বড় জানে না। বরং কি নেই, কি থাকতে না পারে এই বিস্ময়। সেই এক সালে হাজার হাজার মানুষ পুরীপুজোর মেলা থেকে ফিরে আসার সময় দেখেছিল—বিলের ঠিক মাঝ-খানে কালো রঙের এক মঠ ভেসে উঠেছে। ভেসে উঠতে উঠতে কিছু উপরে উঠে থেমে গেল। তারপর ফের নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় স্বপ্নের মতো ব্যাপারটা। যারা দেখেছে, তারা মন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেছে, যারা দেখেনি তারা আজগুবি গল্প মনে করেছে। আর যাদের অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস আছে তারা খবরটাকে নিয়ে নতুন কিং-বদন্তী সৃষ্টি করেছে। মনে হয় বুঝি ঈশাখাঁ সোনাই বিবিকে নিয়ে এ-বিলে লুকিয়ে রয়েছে। সেই জাহাজের মতো ময়ূরপঙ্খীর হালের দাঁড় কালো রঙের মঠের মতো জলের উপর ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। শুধু একটু দেখিয়েই যেন ডুব দ্যায়। যেন বলে, দ্যাখো দ্যাখো আমি এখনও বুড়ো বয়সে সোনাইয়ে নিয়ে বড় সুখে আছি বিলের ভিতর। তোমরা আমার অনিষ্ট করলে, আমিও তোমাদের অনিষ্ট করব। সেই ভয়ে ভরা ভাদরে সোজা বিলের মাঝে কেউ নৌকা ছাড়ে না। এ-বিল বড় ভয়ঙ্কর। বিলের তল নেই, জলের নিচে মাটি নেই। শুধু যেন অন্ধকার আর প্রাচীন সব লতাগুল্ম নিয়ে চুপচাপ জলের ভিতর ডুবে আছে। ভয়ে এ বিলে কেউ নৌকায় বাদাম দেয় না। বড় নিভৃতে যেতে হয়, যেন ঈশাখাঁর কাল ঘুম ভেঙে না যায়।

অঞ্চলের মানুষেরা এ-বিলকে দানবের মতো ভয় পায়। ঈশম যে ঈশম সে পর্যন্ত এ-বিলের পাড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলে-ছিল। কি এক জীন পরী পিছু লেগে ওকে রাতের বেলায় অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সেই বিলে গরীব দুঃখী মানুষেরা পেটের জ্বালা ——— ——— ——— ফালায়ে গেল।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা মরে না জলে। জলের ভিতর ভেসে ছিল জালালি, যেন জলে নেমে গেলেই পেটের জ্বালা নিবারণ হবে। কিন্তু হায় জলের ভিতর, কাদার ভিতর কোথাও শালুকের গন্ধ নেই। রোজ রোজ তুলে নিয়ে গেলে কি আর থাকে। কিছু মরা সাপলা পাতা সামনের জলে উল্টে আছে। শীতের দিনে শাপলা ফুল আর ফোটে না। শাপলা ফুলে কালো কালো ফল হয়েছে। সে দুটো ফল সাঁতরাতে সাঁতরাতে সংগ্রহ করে ফেলল। এবং জলের ভিতরই জালালি ভাসতে ভাসতে খেতে থাকল। ভিতরে এক ধরনের কালো কালো বীচি, এক ধরনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, স্বাদ বলতে মরি মরি কিছু না, খেতে হয় বলে খাওয়া। পেটের ভেতর জ্বালা থাকলে কি খেতে না সখ যায়। লাল আলুর মতো সেদ্ধ করে খেতে হয় শালুকের ভিতরটা। একটু নুন দিয়ে, কোন কোন সময় তেঁতুলের অল্প গোলা খেলে দিলে প্রায় অমৃতের মতো স্বাদ। লোভে সাঁতার দিতে থাকল, জালালি। সামনে দুটো শালুক পাতা জলের ভিতর ডুবে আছে। লতা দুটো ধরার জন্য সে জলের ভিতর ডুব দিল। জলের নিচে নেমে গেল। অনেক নিচে, লতা ধরে ধরে আল-গোছে তা ধরে ধরে—জোরে টান দিলে লতাটা ছিঁড়ে যাবে, লতা ছিঁড়ে গেলে সব গেল, যাদুর ঘরে নেমে যাবার সিঁড়িটা তুলে নেবার মতো হবে। সুতরাং খুব সন্তর্পণে জলে ডুবে যাবার জন্য, অন্ধকার মাটিতে হাতড়ে বেড়ানোর জন্য ডুবুরির মতো বুড়বুড়ি তুলে প্রায় হারিয়ে গেল। জলের নিচে বড় ভয়। ভয়ে চোখ খুলছে না জালালি। চোখ খুললেই মনে হয় কোন যাদুকরের দেশে সে পৌঁছে গেছে। জলের নিচে জলজ ঘাসেরা তাকে নেচে নেচে ভয় দেখায়। নীল অথবা সবুজ মনে হতে হতে একটা কালো কুৎসিত অন্ধকার চারপাশে ঢেকে ফেলে। সে এক শ্বাসে জলের নিচে ডুবে নিমেষে জল কেটে উপরে ভেসে উঠল। তারপর, কত দীর্ঘকাল পর যেন আকাশ মাটি এবং সূর্য দেখতে পেয়েছে এমন নিশ্চিন্তে শ্বাস নেবার সময় মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—সোনার চেয়েও দামী একটা বড় শালুক ওর হাতে।

পাতিলটা ঢেউ খেয়ে খেয়ে একটু দূরে সরে গেছে। সে পাতিলটাকে টেনে এনে শালুকের শেকড়গুলি প্রথম কামড়ে ছিঁড়ে দেখল শালুকটা যত বড় ভেবেছিল—ঠিক তত বড় নয়। শালুকটা বোধ হয় রক্ত শাপলার। পোড়ি শাপলার শালুক বেশ মিষ্টি। সাদা শাপলার শালুকে কষ বেশি। রক্ত শাপলার শালুকে অল্প তিতাভাব থাকে। তবু শালুকটাকে পরিচ্ছন্ন করে খুব যত্নের সঙ্গে পাতিলের ভিতর রেখে পাড়ের দিকে তাকাল। কেউ আর পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। যে যার মতো শালুকের খোঁজে জলে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। আবেদালি আসে না, কতকাল আসে না, সেই যে কবে গয়না নৌকার মাঝি হয়ে চলে গেল—আর আসে না, জব্বর আসে না, সে যাবুর হাটে তাঁতের কাজ নিয়ে চলে গেছে। জোটন এসেছিল একটা মুরগি নিয়ে আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, মুরগিটা উড়াল দিয়ে সেই যে হাজি-সাহেবের বাড়িতে চলে গেল, আর এল না। হাজি সাহেবের ছোটবিবি কোতল করে ফেলল মুরগির গলাটা।

বিলের জলে দুঃখী মানুষেরা শালুকের খোঁজে ভেসে বেড়াচ্ছিল। চার পাশের গ্রাম থেকে দুঃখী মানুষেরা হেঁটে এসে নেমে গেল জলে। বেলা বেলিতে সকলে জল ছেড়ে উঠে যাবে। এই শীতের শেষে আর যখন শালুক থাকবেনা, যখন জলের উপর আর কোন শালুক পাতা ভাসবেনা অথবা এই বিলের জল শান্ত নিরিবিলি, তখন ঝোপে জঙ্গলে অথবা জলের উপর বালি-হাঁস ভাসবে। নানা রকমের পাখি, লাল-নীল পালকের পাখি, জলপিপি এবং ভিন্ন ভিন্ন সব বক। ছোট বড় চকাচকিতে প্রায় বিলটা ছেয়ে যাবে। তখন মুড়াপাড়ার জমিদার বাবুদের ছেলেরা হাতিতে চড়ে আসবেন, তাঁবু ফেলবেন বিলের ধারে এবং ভোরে অথবা জ্যোৎস্নায় পাখি শিকার করে তাঁবুতে পাখির মাংস, ওরা শীতের শেষে মাসাধিক কাল পাখির [illegible] বন-মহোৎসব চালাবে।

গ্রীষ্মকালটাই জালালির বড় দুঃসময়। প্রায় মাটিতে পেট দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। বর্ষা এলে ধানের জমিতে পাটের জমিতে আবেদালির কাজের অন্ত থাকেনা। বর্ষা শেষ হলে, জল কমতে থাকলে, শাপলা ফুল ফুটতে থাকলে মাটির নিচে অন্নের মতো প্রিয় এই শালুক, দুঃখী মানুষদের, নিরন্ন মানুষদের একমাত্র সম্বল এই শালুক, বর্ষা এলেই মাটির ভিতর জন্ম নিতে থাকে। এই জলা জমি আর মাটির অন্তরে শালুক আপনার প্রিয় ধন—ফেন ফেলতে নেই, অবজ্ঞা করতে নেই। বসে থাকলে পাপ, ভেসে বেড়ালে পুণ্য। জালালি পাতিলটার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে বেড়াতে থাকল। ডুব দিলে তখন অন্য কেউ হাত বাড়িয়ে পাতিল থেকে শালুক তুলে নিতে পারে।

সামনে শুধু জল, প্রায় অনন্ত জল-রাশি। শালুকের লোভে সে খুব দূরে চলে এসেছে। বোধ হয়

এর পর আর শালুক নেই। ডান দিকে পদ্মফুলের বন। বাঁ দিকে স্ফটিক জল। সামনের জলে কি যেন সব ভেসে বেড়াচ্ছে। কি হবে আর—বড় গজার মাছ হবে হয় তো। বড়-বড় মাছ, থামের মতো লম্বা গজার মাছ। কালো কুচকুচে, মাথার মুখে লাল সিঁদুর গোলা রঙ, গায়ে অজগর সাপের মতো চক্র। ওর ভয় লাগছিল। তবু মনে হয়, ভয়ে হোক বিস্ময়ে হোক কেউ এতদূর আসে নি। কেউ আসে নি বলেই বোধ হয় কিছু ইতস্তত শালুক এখনও পড়ে আছে। সে ভয় থেকে রেহাই পাবার জন্য চোখ বুজে জলের নিচে ডুব দিল। কিন্তু নিচে মনে হল, চোখ খুলতেই মনে হল—বড় একটা গজার মাছ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লেজ নাড়ছে। স্থির। গজার মাছটা জালালিকে দেখছে। জলের নিচে আজব একটা জীব, বোধ হয় মনুষ্য কুলের কেউ হবে—প্রায় ব্যাঙের মতো নিচে নেমে আসছে। প্রাচীন সব জলজ ঘাস এবং গুল্মলতা—লতার ভিতর মাছটা মুখ বার করে রেখেছে। জালালি চোখ খুললেই শুধু মাছটার মুখ দেখতে পাচ্ছে। কালো ভয়ংকর মুখ একবার হাঁ করছে, আবার জল গিলে মুখ বন্ধ করছে। জালালিকে মাছটা এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। বরং জালালিকেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

হায়, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা সহে না প্রাণে। ভয়ে বিস্ময়ে জালালি জলের নিচে এতটুকু হয়ে আছে। তবু লোভ সামলাতে পারল না জালালি। আর একটু নিচে গেলেই মাটিতে হাত লেগে যাবে এবং শালুকটা আয়ত্তে চলে আসবে। দমে আসছিল না। সে তাড়াতাড়ি শ্বাস নেবার জন্য জল কেটে ভেসে উঠল। দম নিল, একটু সময় ভেসে থেকে বিশ্রাম নিল। ফের ডুবে জলের নিচে চলে যেতে থাকলে দেখতে পেল, সবুজ এক দেশ, নীল জলের গালিচা পাতা। অন্ধকার, ক্রমে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তারপরই লতার গোড়ায় ঠিক মাটিতে যেখানে শাপলা পাতার লতা এসে থেমে গেছে হাতটা ঠেকে গেল। অন্ধকারেও টের পাচ্ছিল জালালি মাছটা মুখ হাঁ করে এগিয়ে আসছে। অতিকায় মাছ। তবু একটা মাছ, সে যত অতিকায় হোক, বড় হোক, সে মাছ। একটা মাছ, সামান্য মাছ, তুমি মাছ যত বড়ই হও—আমি মনুষ্যকুলে জন্মে তোমাকে ভয় পাব! বোধ হয় সে এমন কিছু ভাবতে-ভাবতে শালুকের গোড়া চেপে ধরল। তারপরও সে দেখল মাছটা সবুজ রঙের ঘাসের ভিতর মুখটা নাড়ছে। খুব সন্তর্পণে নাড়ছে আর জালালিকে দেখছে। জালালির শালুকটা হাতে পেয়ে সাহস বেড়ে গেল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না। সে আর একটু এগিয়ে গেল। মাছটা এবার পিছু হটে যাচ্ছে। সে এবার আর দেরী করল না। যখন মাছটা ভয় পেয়ে যাচ্ছে তখন আর ডুবে থেকে কি হবে। সে ফোঁস করে জল কেটে শুশুকের মত পিঠ ভাসিয়ে দিল।

সেই কবে একবার জালালি জলের নিচে হাঁস চুরি করে গলা টিপে ধরেছিল, কবে একবার মালতীর পুরুষ হাঁসটাকে ঝড়ের রাতে পুড়িয়ে নরম মাংস এবং ঠ্যাঙ চিবিয়ে আক্কার দুনিয়া বড় সুখের ভেবে বড় একটা ঢেকুর তুলেছিল—এখন শুধু তার কথা মনে আসছে। সেই মৃত হাঁসটার মতো মাছ, মাছটার চোখ সারাক্ষণ জলের নিচে স্থির হয়ে ছিল। যেন এক বড় অজগর সাপ ওকে গিলতে আসছে এমন মনে হল। কিন্তু সাপ হলে সব জায়গাটা এতক্ষণে প্লাবনের মত তোলপাড় হতে আরম্ভ করত। এত স্থির থাকত না। সে এটাকে মনের ভ্রম ভাবল। জলের নিচে চোখ খুললেই মনে হয় সব বিচিত্র গাছ-গাছালি যেন প্রাণ পেয়ে তার দিকে ধেয়ে আসছে। সে সহজে সেজন্যে চোখ খুলতে চায় না।

সবুজ রঙের কদম ফুলের মতো ঘাসের অন্ধকারে জালালি বুঝতে পারে নি কি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বেশ সুখে একটার পর একটা ডুব দিয়ে গভীর জলের ভিতর চলে যেতে থাকল। ঠিক ডুবুরীর মতো জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে, জলের উপর ভেসে উঠছে। তেমন অসংখ্য মানুষ এখন পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে, জলের ভিতর তারা ডুবে যাচ্ছে, জলের উপর ভেসে উঠছে। কখনও শালুক পাচ্ছে, কখনও পাচ্ছে না। আর ঠিক কখন পাবে কেউ বলতে পারছে না। সব শাপলা লতার গোড়ায় শালুক থাকে না। ফলে দলটা বিলের জলে ছড়িয়ে পড়ছিল। সূর্য উপরে উঠে গেছে। দূরে চোখ মেলে তাকালে, শুধু গভীর জল—শান্ত এবং কালো। সেখানে এক শীতল ঠাণ্ডা ঘর রয়েছে যেন। ও-পার দেখা যাচ্ছে না। অনন্ত জলরাশি কত প্রাচীন কাল থেকে ভিন্ন-ভিন্ন কিংবদন্তি নিয়ে বিলের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে। শীতের সময় জলের রঙটা আরো কালো হয়ে ওঠে। শীতের সময় চারপাশের নল-খাগড়ার ঝোপ থেকে পাখিরা অন্যত্র উড়ে যায় এবং ঝোপের ভিতর যেখানে জল থেকে জমি ভেসে উঠেছে সেখানে বিষাক্ত সাপেরা গর্তের ভিতর মরার মতো শীতের ঠাণ্ডায় পড়ে থাকে। গ্রীষ্মের জন্য, বর্ষার জন্য ওদের প্রতীক্ষা। বর্ষা জলে পড়লেই অথবা বসন্তকালে যখন সূর্য মাথার উপর কিরণ দেয় তখন বিষাক্ত সাপ সব মাঠ থেকে জলে নেমে যায়। জলের উপর ভেসে বেড়ায়। দূরের গজারী বন থেকে তখন কিছু ময়াল সাপ পর্যন্ত এই জলে নেমে আসে। জালালি জলের ভিতর দেখছিল লাল চোখ দুটো ওর দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকছে। কিছুই স্পষ্ট নয়। কারণ অন্ধকার বড় প্রকট জলের গভীরে। নীল অথবা সবুজ রঙের ঝোপের ভিতর যদি আরও দুটো শালুক খুঁজে পাওয়া যায় — প্রলোভনে জালালি একটা পাতি হাঁস হয়ে গেল আর জলের ভিতর ডুবে-ডুবে লাল চোখ দুটোকে মরণ খেলা দেখাতে থাকল।

তখনও ফেলু ঝোপের ভিতর শুয়ে আছে। নেমে আসছে, আসছে না। এলেই খপ করে ধরে ঝোপের ভিতর টেনে নেবে। কামরাঙা গাছের ছায়ায় বিবির শরীর দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে না। এদিকে রোদ মাথার ওপর উঠে এল। অথচ বিবির মুখ দেখা গেল না, অঙ্গ দেখা গেল না। মাঠের ভিতর বাস্তু পুজার ঢাক-ঢোলের বাজনা কখন থেমে গেছে। পুকুর পাড়ে বড়বৌ। সোনা মাঠের উপর দাঁড়িয়ে কথা নেই বার্তা নেই কাঁসি বাজাচ্ছে—ট্যাং ট্যাং! পুজা পার্বন শেষ। এখন সব তিল তুলসী, বারকোষ, নৈবেদ্য এবং তিলা কদমা আর অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য বাড়ি নিয়ে যাওয়া। বড় শাদা পাথরে পায়েস—ধনবৌ সাদা পাথরে পায়েস নিয়ে যাচ্ছে। ফল-ফুল, নতুন গামছা, ঘট আর নারকেল নিয়ে যাচ্ছে রঞ্জিত। মাঠের ভিতরই প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। গ্রামের যুবা পুরুষেরা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা প্রসাদ নিয়ে চলে

যাচ্ছে। তারপর হ্যাজাকের আলো জ্বলবে রাতে। সরকাররা পুকুরের পাড়ে চার পাঁচটা হ্যাজাক জ্বালাবে। পথের উপর ডে-লাইট জ্বলবে। তখন মাঠে-মাঠে আরও সব হ্যাজাকের আলো, আলোতে এই মাঠ এবং গ্রাম সকল এক সময়, মাত্র এক রাত্রির জন্য ডুবে থাকবে। আর ভেড়ার মাংস এবং আতপ চাউলের সুগন্ধ মাঠময় কী যে গন্ধ ছড়াবে। ফেলুর জিভে জল এসে গেল। রঞ্জিত এখন অন্য জমিতে মালতীকে দেখছে। মালতী বড় ব্যস্ত। সে কিছু লোককে বসিয়ে খিচুড়ি পায়েস খাওয়াচ্ছে। শীতের রোদে বেশ আমেজ আসছিল। উত্তরের ঠান্ডা হাওয়ায় বেশ শীত-শীত ভাব। সকলে পেট পুরে খেয়ে রোদের ভিতর ঘাসের উপর যেন প্রায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

আর সোনা তখন কাঁসি ফেলে গোপাট ধরে ছুটছে। ফতিমা গোপাটে ছাগল দিতে এসে ইশারাতে সোনাকে ডাকল। যেন ফতিমা শীতের ঠান্ডায় একটা কচ্ছপ আবিষ্কার করে ফেলেছে। কচ্ছপটাকে ধরার জন্য সে সোনাকে ডাকছে। এখন শীতকালে শীতের জন্য কচ্ছপেরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারে না। পাড়ে উঠে রোদ পোহায়। অথবা জমির ভিতর কচ্ছপেরা লুকিয়ে থাকে। লাঙ্গলের ফালে মাটির ভিতর থেকে কচ্ছপ উঠে আসতে পারে। কিন্তু ফতিমা সোনাকে সে-সবের কিছুই দেখাল না। অশ্বত্থ গাছটার নিচে সোনাকে টেনে নিয়ে গেল। ঝোপের ভিতর কি আছে দ্যাখেন। বলে ফতিমা চুপ দিল। বুঝি মানুষ হবে, পাগল ঠাকুর হবে। ফতিমা অন্তত তাই ভেবেছিল। সোনাবাবুর পাগল জ্যাঠামশাই যিনি রাতে-বিরাতে, কোনদিন খুব ভোরবেলা উঠে মাঠ পার হয়ে, সোনালি বালির নদী পার হয়ে নিরুদ্দেশে চলে যান, সেই মানুষই হয়তো আজ বেশী দূরে না গিয়ে এই অশ্বত্থের নিচে মটকিলা ঝোপের ভিতর শুয়ে-শুয়ে পাখির সঙ্গে গল্প করছেন। ছোট মেয়ে ফতিমা, সামুর একমাত্র মেয়ে ফতিমা জানে না— এই মানুষ পাগল মানুষ নয়, এ-অন্য মানুষ ফেলু শেখ। ফেলু শেখ এখনও চুপচাপ সেই পরানের চেয়ে প্রিয়, মরণে যার স্মৃতি ভোলা দায়—সেই এক পরমাশ্চর্য যুবতীকে খপ করে ঝোপের ভিতর টেনে নেবার জন্য আত্মগোপন করে আছে।

সোনা ঝোপের ভিতর উঁকি দিয়ে ডাকল, জ্যাঠামশয়। কারণ যখন সব দেখা যাচ্ছে তখন পাগল মানুষ ব্যতীত আর কে হবে! এই অঞ্চলে তিনিই ত একমাত্র মানুষ যাঁর কাছে এই মাঠ, গাছ-গাছালি এবং পরবের দিনে উৎসব সব সমান।

ফেলু এত নিবিষ্ট যে কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে খেয়াল নেই। কার যেন গলা, কে যেন ঝোপে উঁকি দিয়ে পিছনে ডাকছে। হাত পিঠ মুখ ফেলুর দেখা যাচ্ছে না। ঘন ঝোপের বাইরে শুধু পা দুটো দৃশ্যমান, এই পা দেখে ধনকর্তার ছোট পোলা টের পেয়েছে মানুষ আছে ঝোপের ভিতর। ওরা এখন হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে। আগে সোনা পিছনে ফতিমা। সে তাড়াতাড়ি ধড়-ফড় করে উঠে গেল। ঝোপ থেকে পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে যাবে ভাবল, কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে ধরা পড়ে যাবে, সে কি যেন হাতড়াতে থাকল। ওর কি যেন হারিয়ে গেছে।

সোনা এবং ফতিমা বুঝতেই পারে নি, এমন একটা নীরস মানুষ ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। সোনা বলল, আপনে!

ফেলুর কি হারিয়ে গেছে এমন চোখে-মুখে। সে বলল ঝোপের ভিতর শিকড়-বাকড় খুঁজতাছি।

—কি হইব?

—হাতটা জোড়া লাগব।

সোনা বলল, পাইলেন নি?

—নারে কর্তা পাইলাম না। কৈযে সব লুকাইয়া থাকে, বলে ফেলু ফতিমার দিকে কটমট করে তাকাল। ঝোপের ভিতর ফতিমা এবং সোনা। ফেলু সোনাবাবুকে কিছু বলল না। শুধু ফতিমার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে গজরাতে থাকল, সামু মাইয়াটারে বড় আসকারা দ্যায়। মাইয়া-টারে ইংরাজী শিখায়। এত অধর্ম ভাল নয় মনে হল ফেলুর। আর সঙ্গে-সঙ্গে পাগল ঠাকুরের মুখ ভেসে ওঠে, মুখ ভেসে উঠলেই ভিতরের সেই অধর্মটা জেগে ওঠে। হাতের দিকে তাকালে দুঃখের সীমা থাকে না। ফেলুর প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে। সেই যে বিবি আন্নু সে পর্যন্ত তেলের নাম করে হাজি সাহেবের ছোট বিবির কাছে চলে গেল। ছোট বিবির কাছে গেল কি ছোট সাহেবের কাছে গেল কে জানে! এখনও সে ফিরছে না। ফেলু তাই ভাবল, একটু তাড়াতাড়ি করা যাক। বিবির কথা মনে হতেই সে পা চালিয়ে হাঁটল। তাড়াতাড়ি করতে গেলে বড় বাগের ভিতর দিয়ে সোজা উঠে যেতে হয়। পথ নেই, শুধু বাঁশের জঙ্গল। কিছু বেতগাছ এবং চারপাশটা অন্ধকার। দিনের বেলায় হেঁটে যেতে পর্যন্ত গা ছম-ছম করে। পাশেই গ্রামের কবর-খানা। ফেলু হন-হন করে হাঁটছিল। বাঁ হাতে একেবারেই শক্তি নেই। কব্জিতে মন্ত্র-পড়া কড়ি ঝুলছে। যদি বিবি এখনও সং করে বেড়ায় সে বিবির পেটে একটা লাথি মারবে। তার শরীর এবং দাঁত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর তক্ষুনি দেখল বিবি তার বাগের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসছে। কিন্তু হাতটা, হায় হাতটা—পঙ্গু হাত নিয়ে সে কিছু করতে পারল না। বাগের অন্ধকার থেকে বের হতেই সে মুখের উপরে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল, তুই আন্নু।

আন্নু দাঁড়াল না। এমন মানুষটাকে সে আর ভয় পায় না। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বলল, তুমি মানুষটা ক্যামনতর! কইলাম হুমু করতে কাওয়া আর তুমি বাগের ভিতর ঘোরতাছ।

—তুই এহানে ঝোপেজঙ্গলে কি করতাছস?

—সঙের লাইগ্যা তোমারে খোঁজতাছি।

—অঃ! বিবিটাও ইতর কথা কইতে শিখা গ্যাছে। কারে লাথি মারে ফ্যালু। নিজের পেটে লাথি মারে! ফেলু রাগে দুঃখে নিজের পেটেই একটা লাথি মারতে চাইল। বিবিটা পর্যন্ত ধরে ফেলেছে ফেলু পঙ্গু হয়ে গেছে! সুতরাং কে কার পেটে এখন লাথি মারে। আন্নু পরম কুলীন এক যুবতী কন্যার মতো বাগের ভিতরে ডুব দিয়ে জল খাচ্ছে, একাদশীর বাপও টের পাচ্ছে না। ফেলু কেমন কাতর গলায় বলল, তুই মনে করস আমি কিছু বুঝি না!

—আর তুই মনে করস আমি-অ কিছু বুঝি না। ফেলুর মুখের উপর ঝামটা মারল।

—তুই যুবতী মাইয়া, তর কেওনের না আছে কি ক'। বলে ফেলু কথা আর বাড়াল না। একটু দূরে কাঁঠাল গাছে সোনা, ফতিমা নিচে। কাঁঠাল পাতা অথবা ডাল ভেঙে দিচ্ছে ফতিমার ছাগলটাকে। গোলমাল বাধালে অথবা চিৎকার চেঁচামেচি করলে এখানে ওরা ছুটে আসতে পারে! ছুটে এলেই এ-সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে। সে অশ্বত্থের ঝোপে আত্মগোপন করেছিল, গাছে তখন কাক উড়ছিল না, মেলার গরু যাচ্ছে, গলায় ঘণ্টা বাজছিল আর ঘাসের ভিতর পড়ে থেকে মাইজলা বিবির সনে সঙ — সব টের পাবে যুবতী মেয়ে আন্নু। সে চুপচাপ আন্নুর শরীরে আঁশটে গন্ধটা এবারের মতো হজম করে গেল। সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, গোসল কইরা বাড়ি ঢুকবি। না হয়, তর একদিন কি আমার একদিন। আর এই হজম করায় যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ল পাগল ঠাকুরের উপর, সে এক হাতীতে চড়ে ওর দুই হাত ভেঙে এখন মাঠে ময়দানে পাখি ওড়াচ্ছে, এবং বাতাসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চলে

খাচ্ছে। সেই মানুষকে বাগে পেলে পীর না বানিয়ে ছাড়ছে না। রাগ এবং বিদ্বেষ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিবি আন্নু এই ঝোপজঙ্গলের ভিতর এতক্ষণ তেল আনার নাম করে, ওকে মাছ পাহারায় রেখে এসে কি করছিল সব যেন জানা।

কিন্তু অসহায় ফেলু দুহাত উপরে তুলতে গিয়ে দেখল, সে নাচারি, বেয়াক্কি মানুষ। এমন জবরদস্ত বিবির সঙ্গে সে বুঝি ইহজীবনে লড়তে পারবে না। লড়তে পারলে বোধ হয় এই অন্ধকার বাগের ভিতর এখন এক প্রলয়ঙ্কর খণ্ড যুদ্ধ বেধে যেত। অগত্যা ভালো মানুষের মতো আন্নুর পিছনে পিছনে, যেন সে এবং আন্নু, মেমান বাড়ি থেকে বাগের ভিতর দিয়ে ফিরছে—কোন তঞ্চকতা নেই, পরস্পর তেমনভাবে হাঁটছে; মাঠে তখনও ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। মালতী প্রসাদ বিতরণ করছে মাঠে। কাগজের লাল নীল পতাকা উড়ছে বাতাসে। মাঠের ভিতর শাদা ধবধবে গরদ পরে মালতী, নিষ্ঠাবতী, ধর্মাধর্ম যার একমাত্র সম্বল, যে সকলের মতো হাঁস পুষে বড় করছে, পুরুষ হাঁসটার জন্য যার মমতা আর বর্ষায় যে চুপচাপ নিঃশব্দে বৃষ্টি ভিজে সারারাত ধরে, সেই যুবতী মালতী, বিধবা মালতী এখন বাস্তুপুজোর পায়েস খাওয়াচ্ছে সকল মানুষকে।

গাছের ডালে সোনাবাবু। ফতিমা দুষ্টু প্রজাপতির মতো চারা কাঁঠাল গাছটার চারপাশে ঘুরছে এবং লাফাচ্ছে। ছাগলটার জন্য সে ডালপাতা সংগ্রহ করছে। সোনা ছাগলটার জন্য ডাল ভেঙে দিচ্ছিল গাছের। কাঁঠাল পাতা খাবার জন্য ছাগলটা, ছোট্ট এক বাচ্চা ছাগল দু-পায়ে ভর করে লাফ দিচ্ছিল। সোনা ছাগলটার পাতা খাবার আনন্দে, গাছের সব কাঁচকাঁচা ডাল-পাতা ভেঙে ছাগলটার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ছাগলটার পাশে এখন পাতার ডাঁই। সোনা লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। পড়তেই কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, যাইবেন সোনাবাবু?

—কোনখানে?

—বকুল ফল আনতে যাইবেন?

—কতদূরে?

—বেশি দূরে না। বলে, আঙুল তুলে দেখালো, ঐ যে দ্যাখছেন না হাসান পীরের দরগা, দরগার ডাইনে ট্যাবার পুস্‌কনি, আমরা যামু পুস্‌কনির পারে।

—ছোট কাকা বকব।

—যামু আর আমু। এক দৌড়ে যামু, এক দৌড়ে আমু।

সোনা চারিদিকে তাকাল। পুজো-পার্বণের দিনে কারো কোনো লক্ষ্য নেই। লালটু পলটু ছোট কাকার সঙ্গে চরু রান্নার জন্য গেছে। ছোট মামা গেছে সরকারদের বাস্তুপুজাতে। লোক্তা, আবু, কিরণী বাস্তুপুজোর প্রসাদ খেয়ে বেড়াচ্ছে। পুজাপার্বণের দিনে কে কোথায় যায়—কে কার খবর রাখে! পাগল জ্যাঠামশাই ভোরে কোনদিকে বের হয়ে গেলেন, কেউ টের করতে পারেনি। সোনা মনে মনে ভাবল, বেশি দেরি হলে সকলে ভাববে, সোনা গেছে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে। সুতরাং সোনা বোঁ বোঁ শব্দ করতে থাকল মুখে। তারপর ওরা মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে থাকল। বড় মাঠ, উত্তরে গেলে হাসান পীরের দরগা। দরগার পাশ দিয়ে সাইকেলে গোপাল ডাক্তার নেমে আসছে। গোপাল ডাক্তার ওদের দেখে ফেলবে ভয়ে ওরা দালানবাড়ির খালের ভিতর নেমে গেল। দুজনে চুপচাপ মাথা গুঁজে উবু হয়ে বসে থাকল। এত বড় মাঠের ভিতর সোনা এবং ফতিমাকে একা একা ঘুরতে দেখলে আশঙ্কার কথা। তুমি সোনা, সেদিনের সোনা, একা একা এত বড় বিশাল বিলেন মাঠে নেমে এসেছ—কি সাহস তোমাদের! চল চল বাড়ি চল। অথবা কিছু তিরস্কার। কিংবা বাড়িতে খবরটা পৌঁছে দিলে ছুটবে, ঈশম ছুটবে, ঈশম তার প্রিয় তরমুজ খেত ফেলে ছুটবে। আর মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে অথবা বিলেন মাঠে নেমে গিয়ে ডাকবে, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন! অঃ সোনাবাবু!

কবে একবার সোনা একা একা তরমুজ খেতে নেমে গিয়েছিল—কবে, সেই কতকাল আগে, সোনা প্রথম গ্রামের বাইরে বের হয়ে দক্ষিণের মাঠে—সোনালি বালির নদীর চরে তরমুজ খেতের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল সঠিক মনে নেই, কিন্তু সেই তরমুজ খেত, মালিনি মাছ, এবং বড় মিঞার দুই বিবি—দুর্গাঠাকুরের মতো মুখ, নাকে নথ দুলছিল, কি এক রোমাঞ্চ যেন জীবনে, সোনা এখন সেই এক রোমাঞ্চের লোভে ছুটছে। ফতিমা কাপড়টা গামছার মতো করে প্যাঁচ দিয়ে পরেছে। শরীরে ফতিমার জামা নেই। কোন ফ্রক নেই। খালি গা। নাকে নথ দুলছে ফতিমার। কানে পেতলের মাকড়ি। নাকের বাঁশিতে সোনার নাকচাবি চাবির মুখটা চ্যাপ্টা চাঁদের মতো। কথা নেই বার্তা নেই সোনা ফতিমার নাকটা চ্যাপ্টা করে ধরে নাকের ভিতর সেই চ্যাপ্টা চাঁদ কি করে বাঁশিতে আটকে আছে দেখল। ফতিমার খুব লাগছিল নাকে। কিন্তু সোনা বাবু, ছোট্ট সোনাবাবু—শরীরে যার চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে আর মাথায় কি সুন্দর গন্ধ! সোনাবাবু তার নাক উল্টে বাঁশিতে এখন চ্যাপ্টা চাঁদের মুখ উঁকি দিয়ে দেখছে।

ফতিমার শরীর শিরশির করে আনন্দে কাঁপছিল। সে বলল, সোনাবাবু চলেন। গোপাল ডাক্তার গ্যাছে গিয়া। দূরে মাঠের আলে গোপাল ডাক্তারের ঘণ্টি বাজছে। আর প্রান্তরে যখন শস্য নেই, যখন মাঠ ফাঁকা, শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে তখন ছুটে যাওয়া ভালো। ওরা ছোটার সময়ই দেখল, ট্যাবার পুকুরের নিচে যে মাঠ আছে সেখানে পাগল জ্যাঠামশাই। তিনি হন হন করে বিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। সোনা আর মুহূর্ত দেরি করল না। সে যেন জ্যাঠামশাইকে মাঠের উপর আবিষ্কার করে ফেলেছে তেমন গলায় ডাকল, কিন্তু মানুষটা হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। ঢাক ঢোল বাজছে তো বাজছেই। বাস্তুপুজোর মোষ বলির থাঁড়াতে রক্ত লাগছে তো লাগছেই। আর সোনা ফতিমা, মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। ওরা ছুটছিল আর ডাকছিল। ওরা ঢিবির উপর উঠে ডাকল, জ্যাঠামশায়! কে কার কথা শোনে! জ্যাঠা-মশাই পুকুরটার পাড়ে পাড়ে যে বন আছে তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সংসারে কত কিছু ঘটে, কত কিছু ঘটে না। ফসল ফলে না সব সময় মাঠে। এখন কোথাও রুক্ষ মাঠ, কোথাও জমিতে তামাকের পাতা দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজ রসুন আলু বাঁধাকপি উঁচু জমিতে—পুকুর থেকে জল তুলে পেঁয়াজ আলু বাঁধাকপির চাষ করছে বড় গেরস্থ প্রতাপ চন্দ। আলে আলে দুই বালকবালিকা ছুটছে। ঢিবি থেকে নেমে মাঝিদের বড় জমি পার হয়ে ছুটছে। অকালের ফল বকুল ফল বনের ভিতর। ওরা বকুল ফলের অন্বেষণে ছুটে যাচ্ছে। ফতিমা ফল কুড়াবে, সঙ্গে সোনাবাবু আছে, ভর দুপুরের রোদ রয়েছে, আর শীতের সূর্য মাথার উপর বলে ওদের এতটুকু শীত করছে না। খালি গায়ে খালি পায়ে ছুটছে। যেন দুটো খরগোশ তাড়া খেয়ে বনের দিকে পালাচ্ছে।

সহসা মনে হল সোনার, ওরা বড্ড বেশি দূরে চলে এসেছে। এত বড় বন সামনে! সোনা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল! ওরা আর বাড়ি বুঝি ফিরে যেতে পারবে না!

(ক্রমশঃ)

নির্বিঘ্নেই আছে

ব্যকসাটো দুঃখহর

বাগরী মার্কেট বা রাজা কাটরা থেকে আনতে গেলে কিলো পড়ে আট, সাড়ে আট, নয় কখনো-সখনো সাড়ে নয়। দু-এক কিলোর জন্য রোজ-রোজ অদ্দুরে যাওয়া পোষায় না গেলেই তো গাড়ীভাড়া লাগাবে চার-ছ আনা। তাছাড়া ঠেলাঠেলি, ভিড়, গুঁতোগুঁতি তো ট্রামে-বাসে লেগেই থাকে, দুধ নিয়ে আসা বড় মুস্কিল।

তাহলে দুধ কোথায় পাস শ্যামল? শুনি তোর দোকানে রোজ দেড়-দু হাজার কাপ চা কাটে, ডবল হাফের প্রায় ফাঁকা কাপটার তলানিটুকু সড়াৎ করে টেনে নিয়ে জানতে চাইলেন তারকদা। ধুতির কোঁচাটা ভাঁজে-ভাঁজে সাজানো কোলের ওপর। হাফ পদ্মাসনে বসে দুপুর দেড়টার বরাদ্দ কাপটা শেষ করে আড়চোখে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা রিপিট করেন দাদা—দুধ পাস কোথ্ থেকে?

মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে রেজগী গুনছিল শ্যামল। থাক দিয়ে সাজানো পাঁচ নয়া দশ নয়া, সিকি, আধুলি সব টেবিলের ওপর। বড় বড় দুটো এনামেলের বাটি ভর্তি এক পয়সা দু পয়সা। ওগুলো বাসায় নিয়ে যায়। দোকানে বসে গুনতে গেলে দিন কাবার হয়ে যাবে। স্নান-খাওয়া মাথায় উঠবে। আবার চারটে বাজতে না বাজতেই বেরুতে হয়। তিনটি বয়, দুজন কারিগর রেখেও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বিকেল হতে না হতেই দোকানে ভিড় উথলে ওঠে। চপ, ফ্রাই, ডেভিল, মামলেট, মোগলাই পরটার সঙ্গে চায়ের যোগান দেওয়া যে কি কঠিন সে একদিন কাউন্টারে বসলেই মালুম হবে। কতদিন আটটা বাজতে না বাজতেই চা ফুরিয়ে গেছে। তখন লোক পাঠিয়ে চা আনানো এক বিরাট হ্যাঙ্গামা। একেই দিন-রাত হেড কারিগর গজ-গজ করছে, লোক কম। তার থেকে কাউকে টেনে এনে চা কিনতে পাঠালে সত্যি খুব অসুবিধে হয়। নিজেও দোকান ছেড়ে যেতে পারে না। একটু বাদেই নাইট শো শুরুর ও ইভনিং শো শেষের ভিড় দুটো কোলা-কুলি করবে তার দোকানে। তাই শ্যামলের রিকোয়েস্টে তারকদা নিজেই রোজ দুপুরে দোকান বন্ধ করে বাড়ী যাওয়ার পথে চাটা দিয়ে যান। এই সময় কেনাকাটা, বাজার-দর নিয়ে একটু-আধটু গল্প চলে। তারকদাকে চায়ের পেয়ালা ঠেকিয়ে দিয়ে শ্যামল খুচরো ও টাকার হিসাব মেলাতে বসে। ফাঁকে-ফাঁকে তারকদার দুটো-একটা প্রশ্নের জবাব দেয়।

তারকদার প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার কানে যেতেই গোনাগাঁথা থামিয়ে মুখটা একটু তুলল শ্যামল। হাসতে-হাসতে বলল, আমি তো দুধ কিনি না পাই।

এই মাগ্গীগণ্ডার বাজারে নিত্যদিন দেড়-দু হাজার কাপ চায়ের দুধ বিনে পয়সায় পাচ্ছে শুনে হাফ পদ্মাসন থেকে একটা ঠ্যাং আপনা-আপনিই টেবিলের তলায় নেমে গেল তারকদার—বলিস কি রে! মামুটা কে?

মামুকে আপনি চেনেন তারকদা, গাল-ভাসানো হাসিটা সূক্ষ্ম হতে-হতে ধারালো ব্লেডের মত ঠোঁট দুটোর সেফটি-রেজরে খাপে-খাপে আটকে রইল। নারান ঘোষ, আঁপনার দোকানের উল্টো দিকে যার দোকান নারায়ণশ্রী। ওখান থেকেই চালান আসে। মাসে দু বস্তা ফ্রি।

তারকদা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। বলে কি শ্যামল? ঐ নারান ঘোষ ওকে ফ্রিতে দুধ সাপ্লাই করে! দুবেলা খদ্দেরের সঙ্গে এক আধ পয়সার জন্য ঝগড়া না করলে যার পেটের ভাত হজম হয় না সে কি না মাসে চারশো সাড়ে চারশো টাকার মাল মিনি মাগনা শ্যামলকে জোগাচ্ছে। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও শ্যামলকে বিশ্বাস না করে পারেন না তারকদা। ছেলেটাকে ভালো করেই চেনেন। চেনেন ওর বাপকেও। অতি ভাল-মানুষ। সাতে পাঁচে থাকেন না। সিনেমা হলের ম্যানেজার। সামান্য আয়। আজকাল শ্যামল ভাল রোজগার করছে তাই, নইলে আগে তো একেবারেই চলত না সংসার। কতদিন তারকদার দোকানে বসে দুঃখ করেছেন ভদ্রলোক—ছেলে দুটো আর মানুষ হল না তারকবাবু।

ছেলে দুটো মানে রতীশ আর শ্যামল। পাড়ার গুণ্ডামি করে বেড়াত। কতদিন সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেছেন বড়টা মাল খেয়ে করপোরেশনের কাঁচা ড্রেনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাস্তাঘাটে মানুষজনের ভিড় ভাড়ি-হাঁড়ির গ্যাঁজলার মত তখন উপচে উঠেছে। অন্যান্য দোকান-দাররা রাগ করলেও ওর বাপের কথা মনে করে তারকদা নিজেই ছেলেটাকে টেনে তুলে রাস্তার কলে নিয়ে ফেলতেন। একটু বাদে শ্যামল এসে দাদাটিকে নিয়ে যেত। দুপুরে দোকান বন্ধ করার মুখে মুখে রতীশ-শ্যামলের বাপ, হল-এ যাওয়ার পথে, তারকদার কাছে ছেলের দুষ্কৃতির জন্য মাপ চেয়ে নিতেন।

ওদের অত্যাচারে গোটা পাড়াটা অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্য দোকানদারদের কাছ থেকে জোর করে নিত্য-পুজো আদায় করলেও তারকদার দোকানে ওরা কখনো ঢোকে নি। তবে অত্যাচার করত বটে ঐ নারান ঘোষের ওপর। দাও দশ টাকা সিনেমা দেখব, কি বিশ টাকা ছাড় মালের দোকানে বাকি পড়েছে। না দিয়েও উপায় নেই।

বড় দোকানী নারান ঘোষ। জ্যাম, জেলি, মাখন, চা, কফি, মিল্ক পাউডার, সিগারেট, বিস্কুট, টফির পাইকার। থরে থরে সাজানো টিন, কৌটো, আর প্যাকেটের মাঝে বসে বিস্কুটের খালি টিনে তাড়া তাড়া নোট খুসছে দিনরাত। দোকানের সামনে সকাল থেকেই লাইন পড়ে যায় খুচরো দোকানীদের। সাইকেলে চেপে কাহা-কাঁহা মুলুক থেকে আসে মাল কিনতে। রতীশ-শ্যামলকে চটালেই দোকানের সামনে হল্লা হবে। ফলে খদ্দের যাবে কমে। তাই যাকে পাড়াসুদ্ধ লোক নারান ঘোষ না বলে নারদ ঘোষ বলে আড়ালে, সেই লোকটিই ছেলে দুটোকে বাবা বাছা বলে খাতির করে দু দশ টাকা হামেশাই হাতে গুঁজে দিত। কিন্তু তাই বলে দু বস্তা

গুঁড়ো দুধ, একেবারে ফ্রিতে! বিশ্বাস করতে চান না তারকদা।

রেজগীগুলো একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে মুখটা ভাল করে বেঁধেছেঁদে নিল শ্যামল। তাকিয়ে দেখল রান্নাঘর ধোয়া-পাখলা সারা। কারিগররা গেছে রাস্তার কলে স্নান সারতে। বয় তিনজন আগেই বিদায় নিয়েছে। এবার দোকান বন্ধ করে শ্যামল বাড়ী ফিরবে। কিন্তু তারকদার ওঠার নাম নেই। গোল গোল চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। স্পষ্ট অবিশ্বাসের ছাপ মুখে চোখে।

ক্যাশের ড্রয়ারটায় তালা মেরে উঠে এল শ্যামল। উল্টোদিকের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসে বলল, আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন? ঘোষের এতে কোন লোকসান নেই। বরং না দিলেই ক্ষতি হবে।

কেন? তোরা তো আজকাল আর গুণ্ডামি করিস না। রতীশটা এয়ারফোর্সে নাম লিখিয়েছে, তুই দোকান দিয়েছিস। তবে কেন নারান ঘোষ তোকে খাতির করবে? —সোজাসুজি প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে ফেলেন তারকদা।

খাতির করবে না কেন? অবাক হয়েই বলে শ্যামল, ঘোষ কি আর নিজের পয়সায় কেনা মাল আমায় দিচ্ছে?

তার মানে?

দাঁড়ান। মানেটা বুঝতে হলে আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন আগে। আপনার দোকানের চা আসে কোথেকে?

ব্রাবোর্ন রোড থেকে আমি নিজে কিনে আনি, চটপট জবাব দেন তারকদা, ঐটাই তো চায়ের হোলসেল মার্কেট।

আর দুধের হোলসেল মার্কেট হচ্ছে গো-ডাউনগুলো। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে চলে শ্যামল। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের গো-ডাউন। চাল, গম, চিনি, দুধ সব ওখানে জমা হয়। ওখান থেকে চালান যায় শহরে ও গাঁয়ের সব রেশন সপে। মিল্ক পাউডার যায় হাসপাতালে, স্কুলে। জানেনই তো দুধ আসে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড থেকে গিফট হিসেবে। এদেশের অনাথ আতুর যারা এক ছটাক দুধ কখনো পায় নি তাদের জন্য। হাসপাতালের রুগী বা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য। উড়িষ্যায় বন্যা হোল, কি উত্তরবঙ্গ ভেসে গেল, কি বিহারের মাঠ-ঘাট খরায় ফেটেফুটে চৌচির, অমনি দেশ-বিদেশ থেকে বস্তা বস্তা খয়রাতির মাল চালান আসে। সেই সঙ্গে আসে গুঁড়ো দুধ।

বলতে বলতে একটু থামল শ্যামল। তারপর কি ভেবে নিয়ে ফের শুরু করল, আপনার বোধহয় মনে নেই তারকদা, বাষট্টি সালেও বাজারে গুঁড়ো দুধ বিকোত তেরো আনা পাউণ্ড দরে। তখন রেশন টেশন ছিল না। বাষট্টির শেষাশেষি সব কিছু রেশন হয়ে গেল। খোলা বাজারে মেলে না কিছু। চাল, গম, চিনি, সুজি, ময়দা, দুধ কিচ্ছু না। এক মাসের মধ্যে দুধের দাম তেরো আনা থেকে পাঁচসিকি হয়ে গেল কালো বাজারে। তখন দাদা আর আমি পাড়ায় মস্তানী করতাম।

মস্তানী করতাম, গুণ্ডামি করতাম। পাড়ার লোকে ভয় করত। সবচেয়ে ভয় পেত ঐ ঘোষ। ওর দোকানেই হামলাটা বেশী হত কি না। আপনাকে লুকোবো না দাদা। এখন লাইন ছেড়ে দিয়েছি, তাই বলছি—জোর-জবরদস্তি করলেও আগে কখনো চুরি করি নি। চুরি শেখালো ঘোষ, আপনাদের নারদ ঘোষ।

সবে রেশন চালু হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম দিন দিন হুহু করে বাড়ছে। যুদ্ধের জন্য সারা দেশ ঝেঁটিয়ে চাল গম এনে গভর্ণমেণ্ট গো-ডাউনে গো-ডাউনে জড় করছে। বিদেশ থেকে আসছে খাবার দাবার, ওষুধপত্তর, অস্ত্রশস্ত্র আর মিল্ক পাউডার। যুদ্ধের হিড়িকে দাদা এয়ার ফোর্সে নাম লেখাল। আমি রইলাম পড়ে। দলবল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হামলাবাজী করে বেড়াই। বাড়ীতে বাবা দেখলেই গালমন্দ করে ভূত ওড়ান। সেই সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা সাগরেদ কালুকে পাঠিয়েছি ঘোষের দোকানে কটা টাকা চাইতে। ক্যাশ সর্ট, ধারে বোতল দিচ্ছে না। কালু ফিরে এল টাকা নিয়ে। ফ্রেশ করে কচ্ছপের মাংস আর মা কালীর চন্নামেত্ত দিয়ে মুখ ফেরাচ্ছি, কালু ফিস ফিস করে বলল—ওস্তাদ রাতে একবার ঘোষের দোকানে যেও। বোধহয় কাজটাজ আছে।

তা গেলাম রাত্তিরে। নির্জন রাস্তাঘাট। দোকানপাট সব বন্ধ। দেখি ঘোষ তখনো কোলাপসিবল গেটের আধখানা খুলে রেখে বাতি জ্বালিয়ে বসে ক্যাশ গুনছে। কর্মচারীরা কেউ নেই। আমাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠল। তারপর কোনদিনও যা করেনি, সেদিনই তাই করল। নিজে উঠে এসে কাউণ্টারের পাঁচিল সরিয়ে ভেতরে ডেকে নিয়ে একটা খালি প্যাকিং বাক্স দেখিয়ে বলল—বস। তর লগে কথা আছে। আগে তর জন্য একটু চা আনি। বলে দোকান-টোকান ফেলে রেখে ঘোষ বাইরে পা বাড়াল। ভেবে দেখুন তারকদা, সে সময় আমি কি চীজ ছিলাম। সেই আমার সামনে বিস্কুটের টিন ভর্তি নোটের তাড়া রেখে নারদ ঘোষ চলল চা আনতে। খাতিরের বহর দেখে খটকা লাগল। এক ধমক লাগিয়ে বললাম, দিল্লাগী ছাড় মামু। কেন ডেকেছ তাই বল।

পয়লা নম্বরের শয়তান। সহজে কি পথে নামে। কাজের কথা না বলে, আমার সুলুক সন্ধান নিতে শুরু করল। গুণ্ডামি করে মাস গেলে বড় জোর একশ সোয়াশ আয় শুনে ব্যাটা চুক চুক করে উঠল। বলল, অরে অত মাল খাইস না। এই বয়সে বেশী খাইলে, লিভার একেরে পইচ্যা যাইবে। যেন কত পিরীতি আমার সঙ্গে। তখন আমি পুরো মালে [illegible]। সব কথা কানে ঢুকছে না, নেশা ছুটে যাচ্ছে। খুব এক চোট মুখ খিস্তি করে বললাম—ক্যাতা ছাড় ঘোষ। কি বলবে বল, আমার কাজ আছে।

আরে কাইজের লাইগ্যাই তো তরে ডাইক্যা আনাইলাম, ফিস ফিস করে বলল ঘোষ—একটা কাইজ যদি কইর‍্যা দিস, আগাম পাঁচশো দিমু।

পাঁচশো টাকা। মাইরী তারকদা বিশ্বাস করতে পারি নি। বলে কি শালা? পাঁচশো দেবে আমাকে? আমি দশ বিশের খদ্দের। এক সঙ্গে পাঁচশো কেন হাজার টাকাও দেখেছি, সে সিনেমা হলে। ছেলেবেলায় যখন বাবার সঙ্গে গিয়ে কাউণ্টারের পাশে বসে থাকতাম। তারপর বড় হয়ে তো আর চাকরী জোটাতে পারলাম না। বাঁ চোখে কম দেখি বলে আর্মিতে নিল না। ব্যাকিং নেই শালা, ফুটোমাদারীকে কে পুঁছবে বলো? বাবা বলেছিল হলের গেটকিপার করে দেবে। শুনে চেলারা বলল, মাইরী ওস্তাদ তুমি গেটকিপার হলে আমরা সিনেমা দেখাই ছেড়ে দেব। তাই সেটাও হল না। স্বাস্থ্যটা বরাবরই ভাল, ভয় পেতাম না কিছুতেই, হয়ে গেলাম মস্তান। সেই আমাকে পাঁচশো টাকা? মালের নেশাটা কেটে যাচ্ছিল। চোখ পাকিয়ে বললাম—রসিকতা কোর না ঘোষ। তোমার দোকান-টোকান সব ভুড়ে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে নারদ ঘোষ আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে মিহিগলায় নাকী সুরে বলল, রসিকতা নয় রে শামল, বিশ্বাস কর। বলে টিনের মধ্যে হাত গলিয়ে এক গোছা নোট বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, এই ল আগাম। অ্যাইবার তর বিশ্বাস ত হইল। কাজ শেষ হইলে বাকিডা দিমু। বাড়ী গিয়া গুইন্যা দেখিস।

ততক্ষণে নেশাটেশা সব মাথায় উঠেছে। একগোছা নোট হাতে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ঘোষের দিকে। কানে আসছে ঘোষের কাকুতি মিনতি—কাইজটা বাবা কইর‍্যা দে। আরো দিমু। যদি পাকা-পাকিভাবে কাম করস ত মাস গ্যালে হাজার টাকা পাবি। আরো চাইস ত আরো দিমু। ব্যাটা যতক্ষণ কোঁকাচ্ছিল তার ফাঁকে আমি গুনে দেখলাম দশ টাকার সাইত্রিশটা নোট আছে ঐ গোছে। গোনাগুনি শেষ করে মেজাজের মাথায় বললাম—রাজী। কাজটা কি বল?

কাজটা কি জান তারকদা? দুধের ব্যবসা। নারদ ঘোষ তাই বলেছিল। সরকারী গো-ডাউন থেকে বস্তা বস্তা দুধ সরাতে হবে। এক বস্তায় থাকে পঁচিশ কেজি মাল। এক কেজির এখন দর আট টাকা থেকে সাড়ে ন টাকা। এক বস্তা মানে কম করেও দুশো টাকা। এক এক রাতে আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ বস্তা মাল পাচার করতাম।

ব্যাপারটা রিস্কি হলেও ইজি। ঘোষ আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে রাখত। যেদিন যেদিক থেকে মাল সরাতাম সেদিন পাঁচিলের সে দিকটায় দেখতাম মামুদের কড়া গার্ড। দশ বারোজন খাকী হাফপ্যাণ্ট আর একটা ফুলপ্যাণ্ট লাঠি সোঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আলোগুলো আগে থেকেই নিভিয়ে দিত বা আমরা ঢিল মেরে বাল্ব ফাটিয়ে দিতাম। সঙ্গে সঙ্গে ইসারা পেয়েই ওরা গোটা জায়গাটা কর্ডন করে ফেলত। আর আমরাও পাঁচিল টপকে টপাটপ ভেতরে সেঁধুতাম। পাঁচিলের গায়ে কপিকল ফিট করে বস্তা বস্তা মাল এপারে এনে ঘোষের লরীতে চাপিয়ে দিলেই কাজ খতম। লরী বোঝাই মাল তখন কোন গুদামে যেত জানতাম না, দেখতাম দিন দুই বাদে ছোট ছোট প্যাকেটে, টিনে বা কৌটোয় ভর্তি করে কাউণ্টারে ফেলে বিক্রী করছে ঘোষ। আমরা চলে আসার সময় গোটা দুই পেটো ফেলে আসতাম। সেরকমই নির্দেশ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে হৈ চৈ পড়ে যেত। গোটা দুচ্চার ব্ল্যাংক ফায়ার। আমরা ততক্ষণে দুর্লভ শার দোকানে বসে বোতল খুলেছি।

এক এক রাতের জন্য ঘোষের খরচ হত বড় জোর হাজার দুই আড়াই। আমাদের গোড়ায় দিত পাঁচশো করে। পরে রেট বেড়ে হল হাজার। যারা আমাদের পাহারা দিত, আবার সরকারী মাইনেও পেত তাদের বরাদ্দ ছিল হাজার থেকে দেড় হাজার। আর পঞ্চাশ বস্তা মাল বেরোলেই কম করেও ঘোষের আয় দশ হাজার টাকা। এবার প্রফিটটা হিসেব করে দেখ। ঘোষ আজ চার চারটে বাড়ীর ম্যালিক। পাড়ায় দু দুটো দোকান, গোটা তিনেক বাস খাটছে নানা রুটে। এতসব কি ঐ বিস্কুট আর লজেঞ্চুস বেচে হয়েছে মনে কর? সব ঐ দুধ বেচা টাকায়।

শ্যামল থামতেই তারকদা মুখ খুললেন, তুই যা বললি সব তো পাস্ট টেনস। এখন তুই দোকান করেছিস। লাইন ছেড়ে দিইচিস। দুধের কণ্ট্রোলও উঠে গেছে। তবে ঘোষ কেন এখনো তোকে খাতির করে?

কে বলল পাস্ট? উল্লাসে উঠল শ্যামল। আমি লাইন ছেড়ে দিয়েছি ঠিকই। কারণ আজকাল লাইনে ভীষণ কম্পিটিশন। পাঁচ সাতটা পার্টি ঘুর ঘুর করছে। পুলিশ ধরবে না। নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে ধরিয়ে দেবে। সেই ভয়ে এক মওকায় হাজার পাঁচেক টাকা জোর করে আদায় করে লাইন ছেড়ে এসে এই দোকান খুলেছি। তাছাড়া কনট্রোল তো পুরোপুরি ওঠে নি, আধা-আধি এখনো আছে। তাছাড়া কনট্রোল থাক না থাক চাহিদা যে পরিমাণ তার সিকির সিকিও যোগান নেই। ফলে ঘোষের ব্যবসাও চলছে। আগে ছিল একটা ঘোষ। এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘোষেদের ফলাও কারবার। আর হবে নাই বা কেন? হাজার হাজার হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, মিষ্টি আর চায়ের দোকান যেখানে সেখানে বরাদ্দ মাফিক মিল্ক পাউডারে একশ কাপ চা হবে কিনা সন্দেহ। তাই বেশী দামে খোলা বাজার থেকেই কেনে। মালটা কোথা থেকে আসে কেউ খোঁজ নেয় না। ওরা দাম দিয়ে মাল পেলেই খুশী। আমি দাম দিই না। আমার সাগরেদ কালু এখন দল চালায়। কালু আমায় খাতির করে, তাই ঘোষও করে। ব্যাটা টাকা দিতে চেয়েছিল—মাসে মাসে আড়াই শ। আমি সাফ বলে দিয়েছি, টাকা চাই না, মাসে যত দুধ লাগবে তাই দিলেই আমি খুশী। ঘোষ তাই দিচ্ছে, মাসে দু বস্তা মিল্ক পাউডার। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শ্যামল। ডান হাতের কব্জীতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল—উরি ব্বাস! আড়াইটা। উঠুন দাদা। আবার চারটে বাজতে না বাজতেই বেরোতে হবে। আপনার চায়ের দামটা কাল দোকানে দিয়ে আসব।

শ্যামল যখন দোকানে তালা ঝোলাচ্ছে তখন ট্রামে চেপে বাড়ী ফিরছেন তারকদা। সিনেমা হলের উল্টোদিকে বড় মিষ্টির দোকানের সামনে ফুটপাথে একদল ভিখিরি, একপাল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঠাটাপোড়া রোদ্দুরে বসে আছে কয়েক টুকরো বাসী লুচি, কচুরী আর এক হাতা করে পচা ডালের আশায়। কালো রুগ্ন ক্ষুধার্ত শিশুগুলো খেতে না পেয়ে পেয়ে চিমসে মেরে গেছে। এরা কোনদিনও দুধ পায় নি। পাবেও না। এদের বরাদ্দ দুধ রাতের অন্ধকারে সরকারী গুদাম সাবাড় করে কালোবাজারে বেচে নারান ঘোষরা শহরের বুকে বাড়ীর পর বাড়ী হাঁকাচ্ছে। শ্যামলরা তারই ছিটেফোঁটার স্বাদে মাতাল হয়ে মস্তানী, গুণ্ডামি ছেড়ে চুরির পথ ধরেছে। ভাবতে ভাবতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তারকদা। পট করে ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল একটা ডাকেই। সামনে দাঁড়িয়ে কণ্ডাকটার। টিকিট।

—[illegible]

মনের কথা

ধনপতির গর্ব পুরুষ-প্রধান সমাজ

(১৯)

সতেরোর ও আঠেরোর কাহিনীর প্রসেনজিত ও অনাদির অবসেশন সম্পর্কে কিছু আলোচনা পাঠকরা দাবী করতে পারেন। ধনপতির রোগবৃত্তান্ত শুরু করার আগে সেই দাবী পূরণের চেষ্টা করা যাক। না হলে, রোগ ইতিহাস রহস্য রচনা বলে মনে হতে পারে।

প্রসেনজিত কেন অন্ধকারকে ভয় পায়? কেন তার মনে হয় যে তার ভেতরের পশুটা বেরিয়ে এসে সুরমাকে হত্যা করেছে? সুরমার স্বামীর দৃঢ় ধারণা প্রসেনজিত সুরেমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়, অথচ প্রসেনজিত নিজেকে অপরাধী মনে করে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। —কেন? পাঠকদের মনে এইসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে। প্রসেনজিতকে ভালভাবে জানবার সুযোগ পাবার আগেই সে চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়েছে; কাজেই তার মনের খবর অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। অনুমানভিত্তিক কারণ নির্ধারণ ছাড়া—এক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো কিছু করবার নেই। প্রসেনজিতের অসুস্থতা নিউরোটিক অবসেশন কিনা, এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। অবসেশন কোনো কোনো উন্মাদরোগের (সাইকোসিস) আনুসঙ্গিক উপসর্গ হয়েও দেখা দিতে পারে। হয়ত, সে প্যারানইয়া জাতীয় উন্মাদরোগে ভুগছিল। ডেলিউশন (ভ্রান্তি) এই রোগের প্রধান উপসর্গ। প্যারানইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে অবসেশন ও ডেলিউশনের শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাব। বর্তমানে এইটুকু শুধু বলে রাখা প্রয়োজন, যে প্রসেনজিতের মস্তিষ্কে প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর পরস্পর নিরপেক্ষ; শিল্পীমন ও দার্শনিক মন স্ব-স্ব প্রধান হয়ে কাজ করে চলেছে। অনুভূতিপ্রবণতা যুক্তিবুদ্ধির প্রভাবাধীন নয়। একদিকে প্রবৃত্তিবাদী ও অস্তিবাদী ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন মস্তিষ্ক, অন্যদিকে আবার অতিমাত্রায় সংবেদনশীল মন। দ্বন্দ্বজর্জর সংশয়াকুল এই ধরনের ব্যক্তির বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না। এদের পাণ্ডিত্য এদের জ্ঞান অনেক সময়ই এদের কাছে পথপ্রদর্শনের আলো নয়, বিভ্রান্তকারী অন্ধকার। মৃত্যু-রতিবাদধর্মী নাটক ভদ্রলোককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, আবার দেশবিদেশের জীবনধর্মী নাট্যকাররাও প্রসেনজিতকে অল্পস্বল্প নাড়া দিয়েছে। নাট্যকার প্রসেনজিত নিজের জীবনের ট্রাজেডী নিয়ে নাটক লিখতে পারবে কিনা জানি না। যদি লেখে তবে সেই নাটকে তার "আত্মার ক্ষত" হয়ত দর্শকদের কাছে মেলে ধরতে পারবে। ফরাসী দেশের এবং আমেরিকার কিছু নাট্যকার "ভেতরের পশুটাকে" নিয়ে যে সব নাটক লিখেছেন, সেই সব নাটকের চরিত্র প্রসেনজিতকে আবিষ্ট করেছে, অভিভাবিত করেছে, সংবেশিত করেছে। নাটকের কল্পলোক প্রসেনজিতের কাছে সত্য হয়ে উঠেছে। প্রসেনজিত শুধু নাট্যকার নয় সে একজন শক্তিশালী নটও। নাটকের কল্পলোকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে নট প্রসেনজিত। প্রসেনজিতের থেকে অনেক বেশি খ্যাতিমান, বাংলাদেশের এক সর্বজনপরিচিত অভিনেতাকে এক রাত্রে আমি অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে তার জীবনের এক শোকাবহ ঘটনার নায়ক কল্পনা করে অনুতাপ করতে শুনেছিলাম। তিনি কয়েক পেগ হুইস্কি সেবনের পর সাময়িক মত্ততায় ভুগছিলেন।

এইবার অনাদির কথা। তার ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাসে, বিশেষ করে কৈশোর যৌবনের ইতিহাসে প্রথম দিনই আমার কাছে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল। সব কিছু খুঁটিয়ে বলার ঝোঁক, শুধু অবসেশনের নয় অনেক রোগীর পক্ষেই অনিবার্য। কিন্তু সব রোগী অনাদির মত অতীত জীবনকে অত বেশি গুরুত্ব সহকারে ডাক্তারের কাছে তুলে ধরে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের নির্দেশে রোগী নিতান্ত প্রয়োজন ঘটলে, অতীতের ঘটনা মনে আনবার চেষ্টা করে। অনাদি কিন্তু গল্পলেখকের কায়দায় জীবনকাহিনী লিখে এনেছিল, এবং বেশ ফলাও করে কাহিনীর মারফত নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করেছিল। জাহির করতে চেয়েছিল নিজের নিঃসঙ্গতা ও একক-জীবনের বিড়ম্বনাকে। দশ-বারো বছরের আগেকার ঘটনা মনে করতে গিয়ে সকলেই প্রায় বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। অবশ্য একান্তভাবে বিষয়নিষ্ঠ ব্যক্তির কথা আলাদা। যাঁরা নিয়মিতভাবে প্রতিদিনকার ঘটনা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন না, তাঁদের পক্ষে অনাদির মত বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সঙ্গতি রাখার চেষ্টা দেখা যায়। সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কখন যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা বুঝতেও পারেন না। কখন যে ইতিহাস ব্যক্তিগত ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। ধরতে পারেন না। জ্যাঠাইমার চিঠিখানা পড়বার পর আমি বুঝতে পারলাম অনাদি কেন অত বিশদ-ভাবে নিজের অতীত ইতিহাস বলবার চেষ্টা করেছে। সে যে শুধু আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চায়, তাই নয়; সে অতীতের একটি ঘটনাকে চাপা দিতে চায়। বিস্তারিতভাবে খুঁটিনাটি বিবৃত করে সে নিজের অপরাধ গোপন করতে চায়। জ্যাঠাইমার চিঠিতে ইংগিতে সেই অপরাধের উল্লেখ ছিল। অনাদি কয়েকদিন পরেই স্বীকার করল যে মেয়েটির প্রতি তার প্রেম হঠাৎ সেদিন হাওড়া স্টেশনের প্লাট-ফর্ম ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়নি। টিকিটবাবুর হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে মেয়েটি যখন জ্যাঠাইমার আশ্রয়প্রার্থী হয়, তখন থেকেই অনাদি তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। জীবনে উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের সান্নিধ্যলাভ এই প্রথম। তাছাড়া মেয়েটিকে অন্য মেয়ের মত সমীহ বা শ্রদ্ধা করারও প্রয়োজন নেই; কেননা তার অনুমান তার দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। মনে মনে মেয়েটিকে নিয়ে অবাধ মিলনের কল্পনা করা চলতে পারে। আর তাই করতে শুরু করল নারীসঙ্গবঞ্চিত অনাদি। এক নিস্তব্ধ দুপুরে জ্যাঠাইমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনাদি মেয়েটির কাছে নিজের কামনার কথা খোলাখুলি প্রকাশ করে মেয়েটি তার অভিলাষ পূর্ণ করল না বটে, কিন্তু এ নিয়ে কোনো সোরগোলও তুললো না। জ্যাঠাইমা খানিকটা আঁচ করতে পেরে-ছিলেন। কন্বে যাওয়ার আগে অনাদির কাছে তিনি আকারে ইংগিতে নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করেন এবং সোজা-

সুজি জানতে চান, সে এই ধরনের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না। অনাদি উত্তর দিতে পারে নি। তখন তার রোজগার ছিল না। মেয়েটির মৌনভার কিন্তু তাকে উৎসাহিত করে এবং সুযোগ পেলেই তাকে প্রেম জানাতে থাকে। এমনি সময় ছাড়াছাড়ি হয়। জ্যাঠাইমা নিজের ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ভাবেন নি। তার ছেলে বিবাহের আশ্বাস দিয়ে মেয়েটিকে বিপথে নিয়ে যায়।

অনাদির অবসেশনের কারণ বোঝা এখন অনেকটা সহজ হবে। এই একটি মেয়েকেই অসম্বৃত অবস্থায় অনাদি কয়েক-বার দেখেছে। বম্বে থেকে যদিও কোনভাবে পত্রাদি লিখে প্রেম নিবেদন করে নি, তবুও অনাদি ধরে নিয়েছে মেয়েটি তাকে ভালবাসে। দীর্ঘ দশ-বারো বছর ধরে মেয়েটিকে ঘিরে চলেছে তার উদ্দাম কল্পনা। অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকায় নি, তাকালেও মনে হয়েছে তার কল্প-প্রতিমার তুলনায় সব মেয়েই নিকৃষ্ট। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক না থাকায়, বিয়ের তাগিদও আসে নি। স্খলিত বেশবাস মেয়েটির এক দুপুরের নিদ্রিত অবস্থার শিথিল দেহ-বিন্যাস কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে প্রতি রাত্রে স্মৃতিপথে জাগরিত হয়েছে। তার মস্তিষ্কের কোষে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে সেই দুপুরের ছবি; সেই ছবির রং কিছুতেই ম্লান হচ্ছে না। চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা এখানে কন্ডিশনড স্টিমুলাসের কাজ করে চলেছে; রিফ্লেক্স অব্যাহত রয়েছে। অনাদির মস্তিষ্কের টাইপ কোন ধরনের? সে দুর্বল (ইনহিবিটরি) এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি-প্রধান মস্তিষ্কের অধিকারী। মেয়েটির নিজের হাতের লেখা ডজন-খানেক প্রেমপত্র নিজের চোখে দেখা সত্ত্বেও তার আবেশ ও মোহ ভাঙ্গাতে বেশ সময় লেগেছে। দশ-বারো বছর ধরে, বলতে গেলে, যার ধ্যান করে এসেছে, তার সান্নিধ্য যে ওকে অতি-মাত্রায় বিচলিত করে তুলবে, এটাই স্বাভাবিক। এই ধরনের অবসেশন কাটতে সময় লাগার কারণ, প্রেমিকার সামান্যতম অতিসাধারণ সদয় ব্যবহারকে প্রেমিক প্রেমের ইঙ্গিত বলে মনে করে; প্রত্যা-খ্যানকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এমন কি, রূঢ় ব্যবহার বা অপমানে সাময়িকভাবে হতাশ হয়ে পড়লেও, একে-বারে হাল ছেড়ে দিতে চায় না। নানা ধরনের লজিক দিয়ে প্রেমিকা যে তাকে ভালবাসে, এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা থাকে অনাদির মত অবসেশনের রোগীর। ভয়াবিষ্ট রোগী যেমন ভয়ের কারণ নেই পুরোপুরি মানতে পারে না বা স্বীকার করতে চায় না; প্রেমাবিষ্টও তেমনি তার ভালবাসার কারণ নেই, একথা সহজে মানতে চায় না, স্বীকার করতে পারে না। এর কারণ, মস্তিষ্ক কোষের কিছু অংশের অনড় অবস্থা (ইনার্টনেস)।

অনাদির প্রেমিকা মেয়েটিকে দেখবার বা জানবার সুযোগ আমার হয় নি। তবে এই ধরনের অন্য দু-একটি মেয়েকে আমি দেখেছি এবং বিশেষভাবে জানবার সুযোগও পেয়েছি। এরাও নিউরোটিক। উদ্বেগ ও নিরাপত্তার অভাববোধে পীড়িত। অন্যের বিশেষ করে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ সাধারণত নিরাপত্তার অভাব দূর করার উপায়। পুরুষ-প্রধান সমাজে এরা সহজেই দুশ্চরিত্র পুরুষের শিকার হয়ে পড়ে। এই-ভাবে এদের ভালবাসার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, পুরুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ভাল-না বেসে অনেক সময় ভালবাসার ভান করে। পুরুষের স্তবস্তুতি প্রেমগুঞ্জন শুনে যায়। হয়ত প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকে। ক্রমশ পুরুষের কাছ থেকে আঘাত পেতে-পেতে এদের মন কঠোর হয়ে ওঠে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ভার ক্রমশ বাড়তে থাকে, ক্রমশ পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক আত্মম্ভরী হয়ে পড়ে। কোমল প্রবৃত্তিগুলো শুকিয়ে যায়। বিবাহ করলে নিজের ও স্বামীর জীবন বিড়ম্বিত করে তোলে। বিবাহ না হলে অন্যদিক থেকে জীবন বিপন্ন হয়। যৌবনের আকর্ষণী ক্ষমতা চলে যাবার উপক্রম হলে এরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন মনে করে। দু-একজন মেয়ে ডনজুয়ান হয়ে সমাজের ওপর প্রতি-শোধ নেবার চেষ্টা করে। আমার নিজের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, মেয়েদের এই দুরবস্থা ও মনোবিকারের মূলে শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই পুরুষ-প্রধান সমাজের নারীর প্রতি ঔদাসীন্য ও বিষম ব্যবহার।

সংক্ষেপে ধনপতির রোগবৃত্তান্ত বলছি। পুরুষের নারীর উপর আধিপত্য করার প্রবণতা নারী ও পুরুষ দুজনকেই যে অসুস্থ করে; — এই কাহিনী থেকে সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে।

ধনপতি ভয়ের অবসেশন নিয়ে চিকিৎসা করতে এল। পঙ্গু হয়ে যাবার ভয়ে সে অস্থির। বয়স প্রায় ছত্রিশ, সওদাগরী অফিসের কেরাণী, দুটি সন্তানের পিতা, স্ত্রী ও বিধবা মাতার প্রতিপালক ও অভি-ভাবক। মা অনেক দিন যাবৎ বাতে শয্যা-শায়ী। ধনপতি বছর দুয়েক ধরে এই ভয়ে ভুগছে। প্রথম দিনের কথা তার মনে আছে। ট্রেন থেকে হাওড়া স্টেশনে নেমেই তার মনে হল, পা আর চলবে না। শিষের মত ভারী হয়ে গেছে। সে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দৈনিক যাত্রী। তাকে ধীরে-ধীরে বসে পড়তে দেখে চেনা দু-একজন এগিয়ে এল। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে কোন রকমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসতেই অসাড় ভাব চলে গেল। কিন্তু ভয় গেল না। এর পর মাঝে-মাঝেই এই রকম অসাড়তা দেখা দিতে লাগল। পঙ্গু হয়ে যাবার ভয়ও দিন-দিন বাড়তে লাগল। বন্ধু ডাক্তার দেখে-শুনে বললেন, — ও কিছু নয়। ধনপতি সেকথা মেনে নিতে পারল না। অফিসের ডাক্তার স্নায়ু-বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালেন।

বিশেষজ্ঞের পরীক্ষাতেও বিশেষ কিছু ধরা পড়ল না। কিন্তু কয়েক মিনিটের মত চলৎ-শক্তিরহিত হয়ে পড়ার ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলল। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়। তখন সবাই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করলেন—এ মনের অসুখ; মনের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাই আমার কাছে আগমন। এখন নির্ভর করা চলে, এরকম একজন সাথী ছাড়া ধনপতি রাস্তাঘাটে চলতে পারে না। আমার কাছে যখন এল তখন একজন সহ-কর্মী সঙ্গে ছিলেন। এবার ধনপতির জবানীতে বলছি।

—কোনো রকমে ট্রাংকুইনাইজার খেয়ে অফিস করছি। ওষুধ ছাড়া ঘুম হয় না। ভয়টা ঠিক কিসের? মৃত্যুভয় ঠিক নয়; তবে অজ্ঞান হয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে যাবার ভয়ে আমি অস্থির। আমার আসল ভয় পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার। অন্যের উপর নির্ভর করতে আমি ঘৃণা করি। মায়ের মত বাত ব্যাধিতে ভুগছি না, আমি জানি। মায়ের অসুখ করে পঞ্চাশ পেরিয়ে। আমার পঞ্চাশ হতে এখনও দেরী আছে, কিন্তু খুব দেরী নেই। ঐ রকম যদি হয়,— আমাকে কে দেখবে? আর সংসার বা চলবে কি করে? ছেলে দুটো নাবালক। স্ত্রীর কথা বলছেন? তিনি চাকরি করেন। ছেলে দুটোকেই দেখবার সময় তার নেই। আমার কিছু ভাল-মন্দ হলে তিনি দেখবেন কি করে? তাঁর সময় কোথায়? বছর চারেকের চাকরী, এখনও নাকি পারমানেণ্ট হয় নি। ছুটি নেওয়াও চলবে না।

টুকরো-টুকরো করে ধনপতি তার পারিবারিক ইতিহাস জানাল। বছর আটেক হল বিয়ে হয়েছে। স্ত্রীর বয়স এখন আঠাশ। বিয়ের পর ধনপতিরই উৎসাহে ও সাহায্যে স্ত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে। তারপর স্ত্রীর এবং মায়ের

অমতেই, একরকম জোর করে তাকে চাকরীতে ঢুকিয়ে দেয়। সেলস-ওম্যানের চাকরী। এক কেম্পানীর কাপড়-কাচা সাবান বিক্রীর কাজ। বাড়ী-বাড়ী গিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে অর্ডার নিতে হবে। মাইনে সামান্য। তবে কমিশনের হার বেশ ভারী। স্ত্রীর চেহারা ভাল, সুন্দরীই বলা চলে। পুরনো দিনের বাঙালী মেয়েদের মত লাজুক স্বভাবের মেয়েটি কিছুতেই এ চাকরীতে মানিয়ে নিতে পারল না। কোম্পানী তিন মাস পরে হিসেব-নিকেশ করে তাকে চাকরীতে রাখার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না। স্বামীর মেজাজকে অনীতা খুবই ভয় পেত। মেজাজের কথা স্বামী মহাশয় আমার কাছেও স্বীকার করেছেন। কোন এক নাম-করা জমিদার বংশের গরম রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত, তাই তিনি মেজাজী। আগের দিনের মত মেজাজ দেখাবার গোমস্তা কর্মচারী প্রজা ইত্যাদি নেই বটে, কিন্তু মেজাজ ত' আছে, আর মেজাজ বিস্ফোরণের ফল ভোগ করতে আর কেউ না থাক, স্ত্রীত রয়েছে।

এবার স্ত্রী আমাকে যা বলেছিল তার কথাতেই বলছি।

বিয়ের পর থেকেই ওকে আমি ভয় পাই। মেজাজের জন্যেও বটে আর গুরু-মশাই গিরির জন্যেও বটে। অনবরত উপ-দেশামৃত দান করে আমাকে কালা করে দিয়েছে। আমি ক্যানভাসারি চাকরী করতে চাই নি; জোর করে আমাকে ঐ চাকরীতে ঢুকিয়েছে। বলেছে, তার একার রোজগারে সংসার চলছে না বলে সে আমাকে চাকরী করতে বলছে না। টাকার অভাব আছে, কিন্তু দেশের তালুক বেচলে সে অভাব দূর হয়ে যায়। পরে জেনেছি তালুক-মুলুকের কথা সব বানানো। আমাকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা আমার স্বামীর নাকি একান্ত কামনা। স্ত্রী স্বামীর রোজ-গারের উপর নির্ভরশীল হলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খাঁটি প্রেম-ভালবাসা থাকতে পারে না। সমমর্যাদাসম্পন্ন না হলে, স্ত্রীকে স্বামী ভালবাসতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার পরিবারে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাই নাকি আমাকে ক্যানভাসারি করে হোক, যেমন করেই হোক, রোজগার করতেই হবে। প্রথম তিন মাসে আমি তিরিশ টাকার সাবানও বেচতে পারি নি। স্বামীকে ভয়ে-ভয়ে মিথ্যে বলে এসেছি। তাকে যা বলেছি, সেই হিসেবমত তিন মাসে আমার অন্তত দেড়শ টাকা কমিশন হওয়া উচিত। তিন মাস পরে ম্যানেজারের ঘরে যখন ডাক পড়ল, ভয়ে আমার পা ঠক-ঠক করে কাঁপছে। স্বামী উদগ্রীব হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কমিশনের টাকা আর স্থায়ী নিয়োগপত্র নিয়ে আমি কতক্ষণে নামব, এই প্রতীক্ষায়। আমার ভয় ম্যানেজারকে নয়, স্বামীকে। আমার অদৃষ্টে আজ অনেক দুঃখ আছে। এর আগে এই রকম জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা কোন দিন বলি নি। আমার স্বামী রেগে গেলে রাস্তার মাঝখানেই আমাকে অপ-মানিত করতে পারে। বাড়ী গেলে যে কী হবে সে চিন্তাই করতে পারছিলাম না। ম্যানেজার আরো দু-একবার আমাকে দেখেছেন। তার চাহনী দেখে বুঝেছি সে আমাকে স্নেহ করতে শুরু করেছে। তাকে সব খুলে বলি যদি নিশ্চয়ই একটা উপায় হবে। এই আশায় বুক বেঁধে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলাম। ম্যানেজারের নির্দেশে একটা চেয়ারে বসলাম। চোখ না তুলেও বুঝতে পারলাম ম্যানেজার সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখছে। স্বামীর কাছে ভয়ে মিথ্যা বলেছিলাম, সেই মিথ্যাকে সত্য করার চেষ্টায় আর এক গাদা নতুন মিথ্যা বললাম। স্বামী অসুস্থ, সেই জন্যে মন দিয়ে সাবান বেচার কাজ করতে পারি নি। আজ ডাক্তারকে অন্তত দেড়শ টাকার মত না দিতে পারলে, তিনি আর ওষুধ-পত্র জোগাতে পারবেন না বলেছেন। অথচ আমার কমিশন বাবদ মাত্র দশ টাকাও পাওনা হয় নি। বলতে-বলতে আমার চোখে জল এসে গেল। ম্যানেজার সত্যিই লোক ভাল। আমি সেই দিনই দেড়শ টাকা অগ্রিম পেলাম। নতুন পদে বহাল হলাম। 'শো-রুম আর এক্‌জিবিশন ডেমনস্ট্রেটরের' পদে। মাইনে তিনশ থেকে শুরু। এইভাবে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে আমার চাকরী জীবন এবং বলতে গেলে, বিবাহিত জীবনেরও শুরু। এখন আমি স্বামীর চেয়ে রোজগার বেশি করি। পয়সার অভাব নেই, কিন্তু শান্তির অভাব ঘটেছে। যখনই বাইরে যেতে হয় স্বামী আপত্তি তোলে অশান্তির সৃষ্টি করে। প্রথম-প্রথম ভয় পেতাম। এখন আর আমি ভয় পাই না। এখন আমার চাকরীই স্বামীর চক্ষুশূল হয়েছে। আমাকে ম্যানেজার স্নেহ করে, আরো দু-একজন হেড-অফিসের বড়কর্তা আমার কাজে খুশী। স্বামীকে এসব বলি না। কিন্তু সে দিন-রাত আমার নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। আমার ছেলেবন্ধু, মেয়েবন্ধু বাড়ীতে এলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এমন কি আমার বাপের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনরাও তার দু চক্ষের বিষ। আমি এখন সহ্য করি না। কেন করব? স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দেবার ক্ষমতা ছিল না তাই আমাকে চাকরী করতে পাঠিয়েছিল। মুখেই খালি বড়-বড় কথা। এখনও রোজই শোনায় যে ও আমার অভিভাবক, ন্যায়ত, ধর্মত, আইনত। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধি-কারের বুলি আর ওর মুখে শোনা যায় না। আগে-আগে আমি বাইরে গেলে, ছুটি নিয়ে স্বামীও সেখানে গিয়ে হাজির হত। নানাভাবে কাজ-কর্মের বিশৃংখলা সৃষ্টি করত। ভয়ের রোগে ভোগার পর থেকে আর যেতে পারে না। ওর এই অসুখটা সেরে গেলে আমি ঠিক করেছি, আলাদা বাসা করব। আমাকে ত নিজের, ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে। ওর বাড়ীতে আমার প্রেস্টিজ নষ্ট হচ্ছে। প্রোমোশনের আশা চলে যাচ্ছে। ওর জন্যে আমি দিন-রাত অশান্তিতে ভুগছি। আমার মিগ্রেন (আধ-কপালে মাথা ধরা) কিছুতেই সারছে না। স্বামী-স্ত্রীর কথা থেকে রোগ-বৃত্তান্ত বোঝা গেল। ধনপতির যেদিন হাওড়া স্টেশনে প্রথম অবশ ভাব অনুভব করে, তার আগের রাত্রে অনীতা অফিসের কাজে বাইরে চলে যায়। কোথায় যাচ্ছে সঠিকভাবে স্বামীকে এই প্রথম না জানিয়ে বাইরে গেল। এই থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়েই চলেছে।

নিজের ভয়ের কারণ মানসিক এটা ধনপতি বুঝেছিল। কিন্তু রোগের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসম্বাদ, এত নিবিড়-ভাবে সম্পর্কিত সেটা আগে বুঝতে পারে নি। রোগীর মস্তিষ্কের টাইপ, প্রায়-কোলেরিক, (অতি-উত্তেজনাপ্রবণ) আত্ম-সংযমের ক্ষমতা কম। সত্যিই পড়াশুনো করে, প্রগতিবাদী মতামতও পোষণ করে। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা বলতে সে বোঝে স্বামীর নির্দেশিত সীমিত স্বাধীনতা। স্বামীর অর্থাৎ পুরুষ মাত্রেরই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বেশি, সুতরাং স্ত্রী তার কর্তব্য-অকর্তব্য, ভাল-মন্দ সব ব্যাপারেই স্বামীর পরামর্শ নিতে বাধ্য না হোক, পরামর্শ নেওয়া তার পক্ষে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। মুখে স্বীকার না করলেও, নিজের বংশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে সে গর্বিত। তুলনায় তার মতে স্ত্রীর পিতৃকুল অনেক নিকৃষ্ট। ধনপতির ধারণা হয়ত মিথ্যে নয়, কিন্তু এই ধারণা প্রকাশ করা মানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলা। ধনপতি স্নেহ-প্রবণ, স্ত্রীকে ভালবাসে। কিন্তু ভালবাসা প্রকাশ করতে জানে না। [illegible] দুটি। এক তার মেজাজ, দুই তার [illegible] মূলে স্বামীত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব বোধ। এই শ্রে[illegible] বোধ বজায় রেখে তারা সুখে-স্বস্তিতে থাকতে পারত; যদি না সে স্ত্রীকে স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর করার মহান [illegible]য়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ না হত! আর তার স্ত্রী হীনমন্যতাবোধে পীড়িত। তার ভয় ও হীনমন্যতা দূর না হলে, যতই সে রোজগার করুক, সত্যিকারের স্বনির্ভর হতে পারবে না। শান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে অনীতা। পুরনো দিনের পরি-মণ্ডলে সুন্দরী বুদ্ধিমতী কর্মঠ বধূ হিসেবে যশ অর্জন করত। আজকের স্বন্দ্ব-বিরোধের সমাজে অব্যবস্থিত-চিত্ত স্বামীর ঘরণী হয়ে মানসিক অশান্তি ও আন[illegible] ষঙ্গিক মিগ্রেনে ভুগছে। স্বামীর দেওয় ডমিনিয়ান স্ট্যাটাসে সে তৃপ্ত নয়; আবা[illegible] বিদ্রোহ করে পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেও তা[illegible] ভয়।

ধনপতির ভয় স্ত্রীকে স্বাধীনতা দি[illegible] সে উন্মার্গগামী হবে; আবার স্বাধীন[illegible] না পেলে বিদ্রোহ করবে। স্ত্রীর [illegible] স্বামীর শাসনকে আবার অন্য দিকে পু[illegible] স্বাধীনতাকে।

—অনোবি[illegible]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। পনের ।।

কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার শুরু করলেন।...

...কোন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমি যে তদন্ত পদ্ধতির পক্ষপাতী, আগে সেটা স্পষ্ট না করলে আপনারা আমার কোন কথাই বুঝতে পারবেন না। তাই দিয়ে শুরু করছি।

— প্রতিটি মানুষের জীবনে দুটি আলাদা-আলাদা ক্ষেত্র আছে। একটি হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্র, অন্যটি তার পারিবারিক ক্ষেত্র। অর্থাৎ মানুষ একইসঙ্গে দুই জগতের বাসিন্দা। দুটি ব্যাকগ্রাউণ্ডে তার গতিবিধি।

...তাই যখনই কোন মানুষ খুন হয়, আমার পদ্ধতি বলে—অদৃশ্য খুনীর পিছনে দৌড় দিও না, খুন হওয়া মানুষটির ব্যাকগ্রাউণ্ড খোঁজো। সেখানেই খুনীকে পাওয়া যাবে। এবং এই ব্যাকগ্রাউণ্ড দুটো।

... আমি হতভাগিনী কল্পনার কথায় আসছি। সে খুন হয়েছে। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে তার ব্যাকগ্রাউণ্ড কী। প্রথমে ধরুন, তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ডের কথা। কিছুটা স্বাতীর এবং অনেকটা স্বাতীর মায়ের কাছে আমি তার বর্ণনা পেয়েছি। স্বাতীর বাবা নিশিকান্ত রায় ছিলেন ধনী মানুষ। আনুসাঙ্গিক চরিত্রগত দোষ তাঁর বিস্তর ছিল। তাসত্ত্বেও মানুষটি হৃদয়বান ছিলেন সন্দেহ নেই। মৃত্যুর আগে স্বাতীর মায়ের কাছে একটি শিশুর খোঁজ দিয়ে যান—যে তখন তাঁর বিধবা দিদির কাছে পালিত হচ্ছে। নিশিকান্ত যে শিশুটির নামেও তাঁর সম্পত্তির একটা বিশেষ অংশ রেখে গেছেন, স্বাতীর মা তখনও জানতেন না। যাই হোক, সাধ্বী স্ত্রী তাঁর স্বামীর ইচ্ছেমত শিশুটিকে নিয়ে এলেন এবং লালন-পালনের দায়িত্ব নিলেন। সেই শিশু আমাদের কল্পনা। কল্পনার চেহারা ও আচরণে কিছু ছিল। স্বাতীর মা তার প্রতি স্নেহে অন্ধ হয়ে পড়লেন। এমন কি নিজের মেয়ের প্রতিও অমনোযোগী দেখা গেল তাঁকে। বিষবৃক্ষের বীজ তখনই রোপিত হল। স্বাতী স্বভাবত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল কল্পনার প্রতি। সে মায়ের চোখের আড়ালে কল্পনাকে কষ্ট দিত বা উত্যক্ত করত নানাভাবে। এমন কি একদিন ধাক্কা মেরে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল। খুব অল্পের জন্যে বেঁচে যায় কল্পনা। তাছাড়া স্বাতীর চেয়ে কল্পনার চেহারা সুন্দর, স্বভাব মিষ্টি। স্বাতীর গড়নে ও স্বভাবে পুরুষালি রুক্ষতা আছে। সবাই কল্পনার অনুরাগী, স্বাতীর নয়। প্রকৃতির নিয়মে স্বাতীর এই গূঢ় অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বহির্জগতে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা

করল। সে কৃতী খেলোয়াড় হয়ে উঠল। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, আমাদের সামনে যে স্বাতী উপস্থিত—সে খেলাধুলোর প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দক্ষ। সাঁতার, দৌড়, লাফ থেকে সুরু করে তীর-বর্শা-রাইফেল ছোঁড়া, তলোয়ার চালনা—সর্বক্ষেত্রে তার খ্যাতি আছে।...

হলের সকলে স্বাতীর দিকে তাকাল। স্বাতী চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে থাকল।

কল্পনার পারিবারিক জীবনের কথা বলতে গেলেই স্বাতীর প্রসঙ্গ অনিবার্য। স্বাতী তার সঙ্গে একক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য। স্বাতীর বহির্মুখীনতা কিন্তু তবু স্বাতীকে সেই ঈর্ষা ভুলতে দিলনা। ওরা যুবতী হয়ে উঠছিল। স্বাতীর সঙ্গে বহু যুবকের মেলামেশার সুযোগ ঘটছিল। কিন্তু স্বাতীর বাড়ি আসবার সুযোগ পেলেই পরিণামে দেখা গেছে, তারা সবাই কল্পনার অনুরাগী হয়ে উঠেছে। স্বাতী অক্ষম ক্রোধে ছটফট করেছে নিরন্তর। শুনেছি, কোন কোন বিষাক্ত সাপ এমনি ক্রোধে নিজের লেজ দংশন করে। নিজেকে দংশন করেছে স্বাতী। একটা উদাহরণ দিই। কল্পনাকে মডার্ণ গার্ল করে তুলবার অজুহাতে সেই শুভ বা নীরেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। স্বাতী সম্ভবত দূরে থেকে ওদের মেলামেশা প্রত্যক্ষ করে নিজের ক্ষতস্থান খুঁটে রক্ত-পাতের অদ্ভুত সুখ পেত। কিন্তু সবচেয়ে আঘাত বেশি বাজল তার, যখন মাত্র মাস-খানেক আগে সে মায়ের কাছে জানতে পারল যে কল্পনা ঠিক তার সমান সম্পত্তির মালিক! স্বাতীর মাও অবাক হয়েছিলেন। স্বাতীর আঠারো বছর পূর্ণ হলে নিশি-কান্তবাবুর অ্যাটর্ণী কথামত উইল সমর্পণ করেছিলেন ও'র কাছে। ব্যস, স্বাতী চরম আঘাত হানতে প্রস্তুত হল।...

হলে অস্ফুট গুঞ্জন সুরু হল। কর্ণেল চুপ করেছেন। রুদ্ধশ্বাসে মিঃ গুপ্ত বলে উঠলেন, তাহলে স্বাতী ইজ দা মার্ডারার?

কর্ণেল মৃদু হেসে হাত তুললেন।... লেট মি ফিনিশ প্লীজ। এবার দিব্যেন্দুর প্রসঙ্গে আসছি। কল্পনার ব্যাকগ্রাউণ্ড স্পষ্ট করতে তাকেও আমাদের দরকার। দিব্যেন্দু নিশিকান্তবাবু ফার্মের এক কর্মচারীর ছেলে। দারিদ্রের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে। নিশিকান্তবাবুর মৃত্যুর আগে থেকে সে স্বাতীদের বাড়ি যাতায়াত করত। স্বাতীর সঙ্গে তার একটা দিকে দারুন মিল। সেও নিপুণ খেলোয়াড়। স্বাতী তার প্রেমে পড়ল—খুব স্বাভাবিক নিয়মে নয়; কল্পনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে। কল্পনাকে সে দেখাতে চাইল, তারও প্রেমিক রয়েছে। সে প্রেমিক সুপুরুষ, বলিষ্ঠ, খ্যাতিমান। এদিকে প্রেমের দেবতার দুষ্টুমি: একদা স্বাতী সত্যি সত্যি গভীর প্রেমে আসক্ত হল দিব্যেন্দুর।

...দিব্যেন্দু কিন্তু মনে মনে কল্পনারই অনুরাগী। দিব্যেন্দু উচ্চাকাংক্ষী। জীবনে শুধু মানের প্রতিষ্ঠা চায় না, চায় ধনের প্রতিষ্ঠাও। তাই সে দ্বন্দ্বে ভুগছিল—সে কল্পনাকে ভালবাসে, কিন্তু কল্পনা নিতান্ত আশ্রিতা মেয়ে। তাকে পেলে ধনের আশা নিষ্ফল। তারপর হঠাৎ একদিন সে যখন জানল, না—কল্পনাও স্বাতীর সমান সম্পত্তির মালিক, তখন মনে মনে প্রস্তুত হল। স্বাতীর বর্তমানে কল্পনাকে পাওয়া বেশ কঠিন—তাছাড়া তার মাও চটে যাবেন। পাত্র হিসেবে ততদিনে দিব্যেন্দুকে স্বাতীর জন্যে তিনি নির্বাচিত করেছেন।

...অবশ্য তাতেও পার পাওয়া যেত। কিন্তু মুশকিল বাধল উইলের সর্ত নিয়ে। নিশিকান্ত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি জানতেন, স্বাতী-কল্পনা বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী জানলে বহু চতুর অজগর চোখে মায়া নিয়ে অগ্রসর হবে। তাছাড়া নিশিকান্ত সেকেলেপন্থী। এদিকে স্ত্রীর প্রতিও তাঁর আস্থা ছিল গভীর। উইলে সর্ত রইল যে তাঁর স্ত্রীর নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে স্বাতী বা কল্পনার সামাজিক বিয়ে সুসম্পন্ন হলে তবেই ওরা তাঁর সম্পত্তি পাবে। নয়ত সে সম্পত্তি যাবে তাঁর স্ত্রীর অধিকারে। স্ত্রীর অবর্তমানে তা যাবে কোন এক বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হাতে। স্বাতী-কল্পনার বিয়ের আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলে পাত্র নির্বাচন করবেন তাঁর অ্যাটর্নীবন্ধু পরমেশ চাকলাদার। ...উইলে আরও একটা উল্লেখযোগ্য সর্ত রয়েছে। বিয়ের আগে স্বাতীর মৃত্যু হলে কল্পনা, কল্পনার মৃত্যু হলে স্বাতী এবং উভয়ের মৃত্যু হলে স্বাতীর মা তাদের সম্পত্তি পাবেন।...

মিঃ গুপ্ত মন্তব্য করলেন, পিকিউলিয়ার! বড্ড গোলমেলে দলিল!

কর্ণেল বললেন, অতিসাবধানী বিষয়ী মানুষের পক্ষে এই উইল খুব স্বাভাবিক বলে মনে করি আমি। যাইহোক, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড আশা করি পরিষ্কার হয়েছে। বলেছি স্বাতী চরম আঘাত হানতে প্রস্তুত হল। এবার সে কথায় আসছি। স্বাতী মনে মনে ষড়যন্ত্র করল। শুভ আর নীরেনের সঙ্গে কল্পনার কিছু মাখামাখি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—অবশ্য কল্পনা তখনও তার হীনমন্যতার দরুন বেশ আড়ষ্ট। স্বাতী চাইল, ইতাবসরে বাইরে কোথাও কল্পনাকে নিয়ে যাওয়া যাক—যেখানে শুভ-নীরেন দুজনেই সঙ্গে থাকবে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ দেবে স্বাতী—যাতে কল্পনা ওদের একজনকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। মজার কথা, শুভ আর নীরেন—দুজনেই সাধারণ পরিবারের ছেলে। স্বাতীর মা পাত্র হিসেবে দুজনকেই দারুণ অপছন্দ করেন, সে জানত। তার ফলে কল্পনা সম্পত্তি হারাবে।... অবশেষে স্বাতী তার দলবল নিয়ে মুরশিদাবাদ এল। এ প্রমোদযাত্রার সব খরচ তার।

...এবার তাহলে আমরা প্যালেস হোটেল অব্দি পৌঁছে গেছি। কল্পনা-স্বাতী-দিব্যেন্দু-নীরেন-শুভ — অবশেষে বিভাস—বড় চমৎকার মেলামেশা। অপর্যাপ্ত সুযোগ। কিন্তু মানুষের মন বড় আজব জিনিস! প্রকৃতির খুব কাছে এসে এই দায়িত্বহীন নিঃসংকোচ পরিবেশে কল্পনা হঠাৎ বদলে গেল। তার আড়ষ্টতা কেটে গেল। সে রীতিমত ফ্লার্টিং শুরু করল। ব্যস্, স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে হতবুদ্ধি। সেই প্রাচীন নিষ্ঠুর ঈর্ষাবোধ আরেক বিচিত্র চেহারায় তাকে গ্রাস করল। সে সইতে পারছিল না শুভ-নীরেন—এমনি তার দিব্যেন্দু ও কল্পনার গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হবে! এ ঈর্ষা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক ঈর্ষা। সে যা চেয়েছিল, তা সত্যি সত্যি ঘটতে দেখল যখন, অবস্থা দুঃসহ হল তার কাছে। কল্পনা শুভ বা নীরেনকে বিয়ে করে বসলে সম্পত্তি হারাবে ঠিকই, কিন্তু তাতে যেন স্বাতীরও বড্ড হার হবে। সে তখন কল্পনার গারজেনের ভূমিকা নিল। অসহায় স্বাতীর পক্ষে এই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সবচেয়ে আঘাত লাগল তখন, যখন আট তারিখে মোতিঝিলের বটতলায় দিব্যেন্দুর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় সে দেখল কল্পনাকে। আগুনে জ্বলে উঠল স্বাতীর মগজে। ...কিন্তু না, স্বাতী তার জন্যে কল্পনাকে হত্যা ক[illegible] কথা ভাবেনি। সে এখান থেকে তা[illegible] নিয়ে পালাতে চাইছিল। নয় তারি[illegible] সে পাততাড়ি গোটাত। কিন্তু হ[illegible]টুর বাধা, দিব্যেন্দুর জেদ, তারপর কল্পনা সকাল থেকে উধাও, ...স্বাতীর যাওয়া হল না সেদিন।...

মিঃ গুপ্ত বললেন, আট তারিখ রাত্রে শুভ আর কল্পনা হোটেলের বাইরে কাটিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা।

কর্ণেল জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তাতেও একই প্রতিক্রিয়া স্বাতীর মনে। অর্থাৎ কল্পনা সত্যি এবার বাজি জিতে নিয়েছে। দিব্যেন্দু হোক, শুভ হোক বা নীরেন হোক—স্বাতীর কাছে তখন সবই এক। তবে দিব্যেন্দুর সঙ্গে কল্পনা উধাও হলে সে বেশি আঘাত পেত, এই যা।

...যাই হোক। এবার আমরা আসছি হোটেলের কিছু অদ্ভুত ঘটনার প্রসঙ্গে। চীনা মিত্র আমায় একটা কথা বলেছিল। অন্যমনস্কা মায়ের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে উপেক্ষিত শিশু অনেক সময় কিছু অদ্ভুত কাজ করে বসে। গৃহস্থালীর নানা জিনিস বিশৃংখল করে। যেমন ধরুন, হাতের কাছে খুন্তীটা মেলে না—দেখা গেল সেটা রয়েছে কাপড়ের বাক্সে। অফ কোর্স, এটা শিশু মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। কিন্তু অনেক বয়স্ক মানুষের মধ্যেও এই

শিশু-মনস্তত্ত্ব রয়ে গেছে। প্রথমে ঘটল কল্পনার টুথব্রাশ চুরির ঘটনা। টুথব্রাশটা অবশেষে দেখা গেল চীনা মিত্রের ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। এটা ইঁদুর-বেড়ালের কীর্ত্তি নয়, মানুষেরই। এই হোটেলে একজোড়া ডিভোর্সড স্বামী ও স্ত্রী বাস করছে। অবশ্য কন্ডিশানাল ডিভোর্স। আর এক মাস পরেই তাদের লিগ্যাল সেপারেশনের কাল শেষ হচ্ছে। এর মধ্যে যদি তাদের মিলমিশ না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে আইনত চরম ডিভোর্স চুকে যাবে। মজার কথা, সেই কল্পুখ কিন্তু আশাবাদী স্বামী করলেন কী, কল্পুখ কিন্তু হতাশ স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নিজের টুথব্রাশটি স্ত্রীর ব্যাগে পাচার করলেন। কিন্তু পরে বিলক্ষণ লজ্জা পেলেন, সাহসেরও অভাব ঘটল—ভাবলেন এতে যদি স্ত্রী আরও চটে যান, আশা নির্মূল হবে। সুতরাং তিনি চট করে কল্পনার টুথব্রাশটি সরিয়ে ফেললেন সুযোগমত। বিভাসবাবু! আশা করি, সমর্থন করছেন।

বিভাস সলজ্জ মুখে বলল, হ্যাঁ স্যার। কল্পনার ব্রাশটা এখনও আমার কাছে লুকানো রয়েছে।

চীনা মিত্র ফোঁস করে উঠল, বা রে! অদ্ভুত লোক তো!

কর্ণেল শুরু করলেন।...এর পর যা সব হারাল, স্বাতীর কেডস বা ইরা বোসের চুল—সব কিন্তু এমনি পৃথক-পৃথক ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ। খুলে বলি, স্বাতী কেডস পায়ে দিয়ে সুদেষ্ণা দেবীর ঘরে ঢুকেছিলেন। উনি তখন পুজোয় বসেছেন। এটা সাত তারিখ সন্ধ্যার ঘটনা। স্বাতী হয়ত নিভান্ত কৌতূহলী হয়েই গিয়েছিল ওঘরে...

স্বাতী মুখ তুলল এতক্ষণে। মৃদুকণ্ঠে বলল, কল্পনাকে খুঁজছিলাম।

...যাই হোক, সুদেষ্ণা ভীষণ চটে গেলেন এবং সুযোগমত এ কর্মটি করলেন। বিভাসকে তিনি সইতে পারছিলেন না। কারণ তাঁর স্বামীর আদরের ভাইপো দুলাল চেহারায় বা চালচলনে অবিকল বিভাসের মত। তাই বিভাসের বাথটাবেই জুতোটা ডুবিয়ে রাখলেন। মিসেস ব্যানার্জি?

সুদেষ্ণা নাক-মুখ সিঁটকে বললে, বেশ করেছি!

অস্পষ্ট হাসির গুঞ্জন উঠল ঘরে। কর্ণেল বলতে থাকলেন।...এর পর ঘটে চুল কাটার ঘটনা। একাজ নীরেনের। সে আট তারিখ সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক ফেলের সময় একটু দুষ্টুমি করতে চেয়েছিল সুদেষ্ণার সঙ্গে। কিন্তু অন্ধকারে ভুল করে চুপি-চুপি পর্দা তুলে সে অবাক হল। ইরা বোসের ঘর! সে আরও অবাক হল, ইরা মোমবাতির আলোয় চুলের ঝাঁপি খুলেছে। তার মাথাজোড়া টাক। ইরা তন্ময় হয়ে চুল গোছাচ্ছিল। ব্যস, নীরেন পিছন থেকে ফুঁ দিয়ে একসঙ্গে মোমবাতি নিভাল এবং কগোছা চুল কেটে ফেলল। ইরা ওকে ভূত ভেবে দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিছু গোপন রেখে কিছু বলল স্বাতীদের কাছে।...

ইরা বোস গর্জে উঠল, গুণ্ডা, মস্তান; ইতর কোথাকার!

সুদেষ্ণাও জের টানল।...আমি হলে আঁতুড় ঘরে গলায় নুন ঢেলে মারতাম।

কর্ণেল বললেন,...তারপর ছবি চুরি চীনার ছবিটি চুরি করেছিল যে, সেই কল্পনার খুনী। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। সুদেষ্ণার গুরুদেবের ছবিও সে চুরি করেছিল। কারণ সে জানত, সুদেষ্ণা হিস্টিরিয়ার রোগী এবং গুরুঅন্তপ্রাণ। এবং সে আরও জানত, অধ্যাপক দেবতোষ ব্যানার্জি একটা প্রাচীন নবাবী দলিল হাতাতে ব্যস্ত। সুদেষ্ণার রোগ বেড়ে যাবে ছবি চুরির ফলে এবং ফিট হয়ে পড়ে থাকবেন তিনি। সেই সুযোগে খুনের কিছু চিহ্ন তাঁর ঘরে পাচার করতে পারবে একেবারে দিনদুপুরেই। দেবতোষ দলিলের ব্যাপার গোপন রাখবার জন্যে এই খুন করেছেন — সেটা সে যেভাবে হোক প্রতিপন্ন করবেই, এই ছিল তার স্কীম। এই সঙ্গে শুভ-কল্পনার ব্যাপার জড়িয়ে দিল। শুভর সেই অদ্ভুত কবিতা, মধ্যরাত, ডোবা, শুভ-কল্পনার মধ্য রাত্রে অন্তর্ধান—সব মিলিয়ে দোষ পড়বে অধ্যাপকেরই কাঁধে। খুনের একটা সঙ্গত পটভূমি এবং মোটিভ মিলবে এতে।...

...কিন্তু একটা ত্রুটি ঘটল। ছবিটা তার ঘরেই হঠাৎ আবিষ্কার করল স্বাতী। সঙ্গে সঙ্গে সে কিছু না বলেই ফেরৎ দিতে গেল যথাস্থানে। সুদেষ্ণা তখন ফিটগ্রস্তা, দেবতোষ তাঁকে পরিচর্যায় ব্যস্ত। সুযোগ পেল না সে। তখন মানদার শরণাপন্ন হল। ঝি মানদা কোন এক ফাঁকে রেখে এল অধ্যাপকের ব্যাগে।

...এদিকে এ ছবিটা হাতছুট হওয়াতে খুনী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ছবি অর্থাৎ চীনারটা সে এমন জায়গায় লুকোল—এটা আমার অনুমান অবশ্য, স্বাতী তার খোঁজ পাবে না। স্বাতী নিশ্চয় অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে ভেবেছিল, এটা নিতান্ত দুষ্টুমি।

মিঃ গুপ্ত অধৈর্য হয়ে বললেন, এবার খুনীর কথায় আসুন কর্নেল।

কর্ণেল বললেন, ইয়েস। এসে পড়েছি। তবে শুধু মনে রাখবেন, দীপেন বোস বা তার গোল্ড স্মাগলিং আজ রাত দশটা অব্দি আউট অফ পিকচার ছিল। কেউ এ ব্যাপার জানতনা ঘুণাক্ষরেও। কিন্তু এটা ঠিক—একই ডোবার ধারে প্রফেসর বা দীপেন বোসের কারবার। প্রফেসর ভয় পেয়ে চেষ্টা ছাড়লেন। কারণ শুভ পদ্যকল্প লিখে ছাত্রোচিত ডেঁপোমি শুরু করল। কিন্তু দীপেন বোস দেখল, সে নিরাপদ। অবশ্য সে শেষরক্ষা করতে পারল না, এই যা দুঃখ......হেসে উঠলেন কর্ণেল।

...লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন! খুনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল কিন্তু স্বাতী।

সবাই চমকে উঠেছে সঙ্গে-সঙ্গে। স্বাতী সোজা হয়ে বসেছে।

...হ্যাঁ। প্রথম চেষ্টা করল সে স্বাতীর ওপর। কিন্তু সে জানত, স্বাতী শক্তিমতী মেয়ে। গায়ের জোরে তাকে পারা কঠিন। অন্য প্রক্রিয়া—যথা স্ট্যাবিং বা থ্রোটকাট কিম্বা অগত্যা পয়েজনিং করারও যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং সে স্বাভাবিক কিন্তু অদ্ভুত একটা উপায় খুঁজল। সাত তারিখ সন্ধ্যায় স্বাতী যখন সবে সিঁড়িতে পা বাড়াতে যাচ্ছে। পিছন থেকে কলার খোসা ছুঁড়ে মারল। স্বাতী পা পিছলে গড়িয়ে পড়ল। খুনীর উদ্দেশ্য ছিল, তাকে ওঠানোর ছলে গলা টিপে ধরবে কিম্বা...

...হ্যাঁ, এখানে যদিও গায়ের জোরের প্রশ্ন আসছে—আপনারা ভুলবেন না, মানুষ যত শক্তিমানই হোক, আকস্মিক পতনের

মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ অবশ হয়ে পড়ে এবং এই ছিল খুনীর পক্ষে অভাবিত সুযোগ।

...কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ শুনে সুরঞ্জন দৌড়ে আসায় সুযোগ ব্যর্থ হল। আট তারিখ সকাল থেকে দেখা গেল এক অভাবিত ব্যাপার। কল্পনা তার সঙ্গেও ফ্লার্টিং শুরু করেছে। সে কল্পনার প্রতিই বেশী আসক্ত ছিল। স্বাতীকে খুন করলে কল্পনা উইলের সর্তসম্মত তার অংশের মালিক হবে। অতএব কল্পনাকেই সে বিয়ে করবে। কিন্তু স্বাতী জীবিত থাকলে সেটা অসম্ভব। তার মাও চটে যাবেন।

......অথচ স্বাতীকে কীভাবে খুন করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ শুভ একটা বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। একটা প্রবাদ আছে, সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্ধেক ত্যাগ করেন। অগত্যা সে ভেবে দেখল, কল্পনাকে পাওয়া অসম্ভব স্বাতী বর্তমানে; কিন্তু স্বাতীকে পাওয়া খুবই সম্ভব কল্পনার অবর্তমানেও। কল্পনা মরলে তার সম্পত্তি স্বাতীকে বর্তাবে। ব্যস, সম্পত্তির লোভ তাকে গ্রাস করল—তার ব্যর্থতায় অন্য এক সান্ত্বনা আনল।

......পরিস্থিতি অনুকূল। ডোবারহস্য জমে উঠেছে। নয় তারিখ সকালে এক ফাঁকে সে বেরিয়ে পড়ল। বেরোনর প্রধান কারণ, কল্পনা হোটেলে নেই। সে কল্পনাকে একা পেতে চাইছিল—অথচ কল্পনার পাত্তা নেই। তবে কি শুভদের সঙ্গে গেছে? সে ভিউ-ফাইন্ডার নিয়ে বেরোল। ভিউফাইন্ডার নেওয়ার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। দূর থেকে দেখবে বা লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু আঁধার মহলে গিয়ে যখন আবিষ্কার করল যে দুজনে বেরিয়ে এল, শুভ থেকে গেল—হয়ত কল্পনাও তার সঙ্গে রয়েছে, সে মুহূর্তে প্ল্যান ঠিক করে ফেলল। এ সুযোগ মোক্ষম। শুধু কল্পনাকে খুন করলে তার ওপর কারো সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু শুভকেও শেষ করলে দায়টা ডোবারহস্য এবং পরে অধ্যাপকের কাঁধে গিয়ে পড়বে।......

...খুনী কিন্তু একা পেল শুভকে। কাজ শেষ করে ফিরে এল রিকশোয়। মোট মিনিট দশেক সময় হতে লাগল। পথ এবং সময়সংক্ষেপের জন্যে সে পোড়ো বাগানের ভিতর এল। আশ্চর্য, সেই সময় অভাবিত পেয়ে গেল কল্পনাকে—ঘড়ি খুঁজতে বেরিয়েছে সে। গলা টিপে মারার পরিশ্রম সে টের পেয়েছে—নার্ভ শ্রান্ত। ফলে খুব সহজ পন্থা নিল সে। একটা ইঁটের সাহায্যে কল্পনার মাথার পিছনে সর্বশক্তিতে আঘাত করল। কল্পনা নিশ্চয় বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়েছিল—অত সরল ভীতু মেয়ে; ...কর্ণেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ...বাকিটা বর্ণনা অনাবশ্যক। আপনারা মিঃ গুপ্তের বর্ণনার সঙ্গে একমত হতে পারেন।...

হলঘরে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপর স্বাতীই ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কে—কে খুন করেছে কল্পনাকে?

কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার আঙুল তুলে বজ্রনির্ঘোষে বললেন, দি মার্ডারার ইজ দেয়ার—দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী!

দিব্যেন্দু পাল্টা চিৎকার করল, শাট আপ! শাট আপ ইউ ওল্ড ফুল!

ততক্ষণে তার দুপাশে পুলিশ। সামনে মিঃ গুপ্তের রিভলবারের নল।

* * *

পরদিন সকালে।

স্টেশনে গিয়ে ওদের বিদায় দিয়ে ফিরছিলেন কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার। নীরেন, স্বাতী, স্বাতীর মা, অধ্যাপকদম্পতি, সবাই ফিরে গেলেন। ইরা বোস একা গেল আলাদা কামরায়। দীপেন বোস ততক্ষণে প্রিজনভ্যানে বহরমপুরে পৌঁছেছে। দিব্যেন্দু মুরশিদা-বাদ থানার হাজতে রয়েছে। চীনা আর বিভাস প্যালেস হোটেল আপাতত ছাড়েনি দেখা যাচ্ছে। কর্ণেল গঙ্গার ধারে-ধা ফিরে আসছিলেন পায়ে হেঁটে।

প্যালেস হোটেলের সামনে এে গঙ্গার ধারে গম্বুজওয়ালা শ্বেতপাথে বাঁধানো ঘাটের কাছে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। পাশাপাশি বসে রয়েছে বিভা আর চীনা। হাতে হাত, আঙুলে আঙু করতলে করতল।

সামনে শীতের নীলাভ গঙ্গা। শিরশি করে বাতাস বইছে। জলে কাঁপন। ঘাসে পাতায় কাঁপন। গাছপালায় কাঁপন। প্রকৃতি জগতে একটা অপরূপ শিহরণ চলেছে যেন। এবং নিজের শরীরেও সেই শিহরণ অনুভব করছিলেন কর্ণেল সরকার। যেন বা প্রকৃতির এই কাঁপনের প্রতিবিম্ব পড়েছে জলের নীচের ওই থরথর প্রতিবিম্বের মত সারা জীবজগতেও।

বিভাস আর চীনা অস্ফুট হে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেলের মনে হ জীবনের ওপর শুধু কি মৃত্যুরই নিরন্ ছায়া পড়ে চলেছে? মৃত্যুর ওপরেও জীবনের ছায়া পড়ছে ক্রমাগত। ওই ছায়া পড়েছে! বিভাস-চীনার এক বেদনা মৃত্যুর ওপর আজ এতদিনে তাদে জীবনের চঞ্চল ছায়া পড়ল। নতুন জীবনে ছায়া মুছে দিল একটি মৃত্যুর—একা বিচ্ছেদের ক্ষণকালটিকে। পৃথিবী জুড়ে এ ধারাবাহিক ছায়া পড়ার ইতিহাস!

আজীবন নিঃসঙ্গ কর্ণেল নীলা সরকার হয়ত গভীর দুঃখে কিংবা সু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হোটেলের দি পা বাড়ালেন। পিছনে বিভাস গান গে উঠেছে :

আমরা যারা এসেছিলাম
হারিয়ে যাবার [illegible]
নিশীথ রাতে [illegible]তাঝরা বনে
অন্ধকারের ভেলায়।
যাব আলোর উপকূলে......

[শেষ]

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী
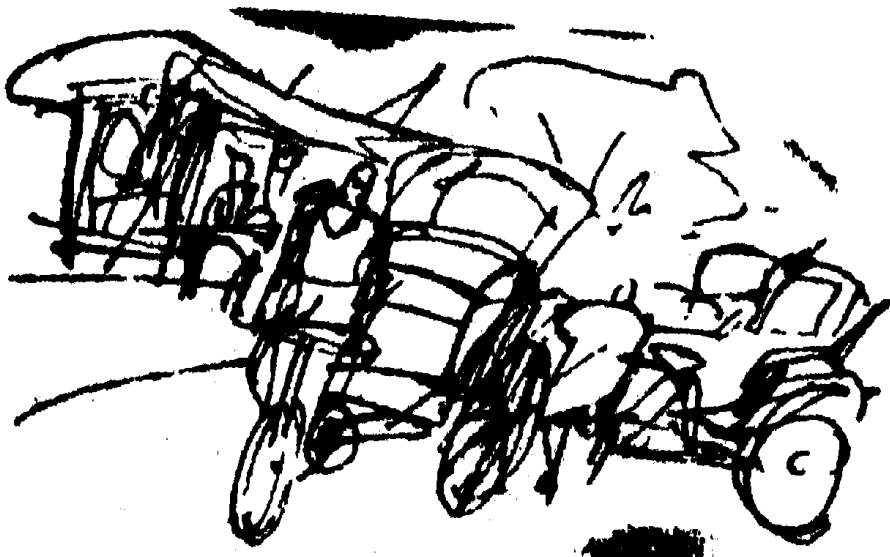
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩০ জুনের কথা মনে আছে। ঐদিন ভানু প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস. সি-তে ভর্তি হলো। বিষয় হিসাবে বিজ্ঞানটাই তার কাছে প্রিয়।

ঐ ৩০ তারিখেই একটি নতুন নাটক শোনা হলো নাট্যভারতীতে। মনোজ বসু তাঁর প্লাবন নাটকখানি নিজেই পড়ে শোনালেন।

নাটকের গল্পটা সবারই ভালো লাগলো। কিন্তু সংলাপবহুল বলে মনে হলো অনেকের। যাইহোক, মোটামুটি যখন ভালোই লেগেছে—তখন নাটকের দুর্বল দিকটা পরে ঠিক করে নিলেই চলবে। রিহার্সাল তো চলুক।

কদিন আগে অভিনয়ের সময়সূচীতে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, নতুন করে আবার সময়সূচী বদলানো হলো। প্রথম প্রদর্শনী আরম্ভ হবে বেলা দুটোয়, শেষ প্রদর্শনী সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়।

প্লাবন নাটকের রিহার্সাল শুরু হলো ৭ জুলাই।

ঐ দিনেই খবর পেলাম বিশ্বস্তসূত্রে, রঙমহলের নতুন নাটক 'রক্তের ডাক' দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য দুর্গাদাস তখন রঙমহলে যোগ দিয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভালো খবর পেলে মনটা স্বভাবত খুশি হয়। কেননা, আমরা থিয়েটারের মানুষ—জীবনের ভালো-মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি নাটক আর মঞ্চকে—সুতরাং ভালো খবর পাওয়ার মধ্যে আনন্দ থাকে বৈকি।

আরো একটি নতুন নাটক, কবি কালিদাস মিনার্ভায় উদ্বোধন হলো ১৯ জুলাই। ঐ দিনেই ছিল নাট্যভারতীতে পি ডবল্যু ডির ১৪৯তম অভিনয়। রাণীবালা ছুটি নিয়েছিলেন স্বাস্থ্যের কারণে—ঐ দিনের অভিনয়ে তিনি যোগ দিলেন। সাতটায় অভিনয় শুরু হয়েছিল। সেদিন রঙ্গালয় পূর্ণ ছিল প্রায়।

পরদিন ২০ জুলাই ১৫০তম অভিনয়। সেদিন দর্শকপূর্ণ ছিল রঙ্গালয়। অভিনয়ও জমেছিল। অভিনয় শুরু হয়েছিল বেলা চারটায়।

অভিনয় শেষে নতুন নাটক প্লাবন রিহার্সাল শুরু হলো। রাত তিনটে পর্যন্ত চললো রিহার্সাল। তারপর ফিরে এলাম বাড়ি।

এরপর পর পর তিন রাত প্লাবনের রিহার্সাল চললো। কোনদিন রাত তিনটের আগে রিহার্সাল শেষ হতো না।

যে কোনও নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবার আগে অভিনেতার মনটা সে-ই নাটকের কথাই চিন্তা করে। কী জানি—কেমন হবে নাটক। বিচারটা তো দর্শক সাধারণের। দর্শকের বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারাটাই তো আসল কথা।

যাইহোক, ২৪ জুলাই ছিল প্লাবনের উদ্বোধন রজনী। সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হলো অভিনয়। তিনঘণ্টা পনেরো মিনিটের নাটক!

সেদিনে এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। এর আগে নতুন নাটকের উদ্বোধন রজনীতে দেখেছি দর্শকদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য থাকে, অনেক সময় কিছুটা হৈ-চৈও হয় অভিনয় চলাকালে। প্রশংসা বা নিন্দা—যাইহোক নানা মন্তব্যও কানে আসে। কিন্তু আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হলো আমার। সেদিন শান্ত মনে দর্শকরা নাটক দেখলেন। এতটুকু হৈ-চৈ দূরের কথা কোনও টুকরো মন্তব্যও কানে আসেনি।

প্রশ্ন জাগলো মনে—তবে কি নাটকটা ভালো লেগেছে। হয়তো তাই।

দারুণ দুশ্চিন্তা ছিল নাটক নিয়ে। কী হবে, কে জানে। তাছাড়া নাট্যভারতীর ভিতরের অবস্থাও ভালো নয়। রাধানাথবাবু তো একদিন গোপনে আমাকে বলেই বসলেন, দাদা—ভাবছি সবাইকে এক মাসের নোটিশ দেব! এভাবে আর কদিন থিয়েটার চালাবো। হয়তো কোন মতে খরচটা উঠছে—কিন্তু এ অবস্থায় থিয়েটার চালানো কি সম্ভব?

বললাম, অপেক্ষা করে দেখুন। এর মধ্যে নোটিশ দেওয়ার কথা চিন্তা করবেন না। প্লাবনের ফলাফলটা একবার দেখা দরকার।

চিন্তাটা কেবল রাধানাথবাবুর নয়, আমারও। হয়তো অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনেও এই একই চিন্তা। থিয়েটারের ভিতরের খবর তো আমরা জানি, নাটক যদি চলে তাহলে যেমন আসে, না চললে সে অবস্থাটা ভাবাই যায় না। একটা থিয়েটার আর্থিক অনটনে বন্ধ হয়ে গেলে, দুঃখটা যে কোথায় বাজে তা বোঝানো যায় না।

যাই হোক, প্লাবন আমাদের সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটালো।

প্লাবন দর্শকের বিচারে উত্তীর্ণ হলো। দারুণ সুখ্যাতি পেল। সুতরাং আপাতত দুশ্চিন্তার শেষ।

প্লাবন অভিনীত হতে লাগলো পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। পঁচিশ থেকে সাতাশে জুলাই পর পর তিন দিন প্লাবন অভিনয় হলো। প্রতিদিনই আশাতীত দর্শকসমাগম হয়েছে। আর নাটক এবং অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছে সাধুবাদ।

বাইশে শ্রাবণ ইংরেজী ৭ আগস্ট, দিনটি শুধু বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির নয়, সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বিয়োগ-ব্যথায় চিহ্নিত দিন। ঐদিন কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ—এ খবর কদিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মৃত্যু সংবাদটা সব সময়ে আকস্মিক। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের সময় দুপুর বারটা বেজে দশ মিনিট।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে মহানগরীর জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হলো অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ। বন্ধ হলো থিয়েটার, সিনেমা।

রবীন্দ্রনাথকে শেষ দর্শনের উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকো বাড়িতে ঐদিন কলকাতা শহর ভেঙে পড়েছিল। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, এর আগে রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি তুলেছিল। ৮ আগস্ট সেইসব টুকরো ছবিকে একসঙ্গে গ্রথিত করে ধারাবিবরণী যোগ করা হলো। ধারাবিবরণীতে আমিই কণ্ঠ দিয়েছিলাম।

এরই মধ্যে আর একটি ঘটনা। পেট্রল র‍্যাশনিং। ১৫ আগস্ট থেকে পেট্রল র‍্যাশনিং শুরু হয়।

এদিকে শনি-রবি যথারীতি প্লাবন অভিনীত হচ্ছে নাট্যনিকেতনে। অন্যান্য দিনে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

১৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথের তর্পণ দিবস। ঐদিন রঙমহলে এবং নাট্যনিকেতনে অভিনয়ের পূর্বে কবিগুরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হলো।

১৭ আগস্ট শ্রী ও পূরবী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করলো ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'অবতার' ছবিখানি। ঐ ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

ঐদিনেই আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো। মহমেডান স্পোর্টিং ২ গোলে বিজয়ী হয়েছে। প্রতিপক্ষ কে, ও, এস, ডি কোন গোল করতে পারেনি।

২০ আগস্টের একটি ঘটনা। তটিনীর বিচার অভিনয় হচ্ছে নাট্যভারতীতে। অভিনয় দেখতে এসেছে দুর্গাদাস। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সে টিকিট কেটে এসেছে সাধারণ দর্শক হিসাবে। কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে দুর্গাদাসের কাছে গেল, তার টাকা ফেরত দিতে। কিন্তু দুর্গাদাস জানালো, সে-তো স্ব-পরিচয়ে এখানে আসেনি, এসেছে সাধারণ দর্শক হিসাবে।

দুর্গাদাস কিছু সময় দর্শকদের মধ্যে বসে থেকে অভিনয় দেখলো, তারপর খেয়াল ফুরোতেই চলে গেল।

অভিনয় আর অভিনয়, এর মধ্যে মাঝে মাঝে বৈষয়িক ব্যাপারেও জড়াতে হয়। গ্রে স্ট্রীটে খানিকটা বসতবাড়ির জমি সেদিন রেজেস্ট্রী করা হলো হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাছ থেকে। রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ছিল, ২৭ আগস্ট।

২৯ আগস্ট বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব লোকান্তর গমন করলেন। পরিচিত কারো মৃত্যু-সংবাদ পেলে মনটা খারাপ হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে আবার সবই স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যায়।

আগস্ট মাসটা শেষ হয়ে গেল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন, নাট্যভারতীতে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকের রিহার্সাল শুরু হলো।

নতুন নাটক, বিষয়-বৈচিত্র্যও আছে। তাছাড়া নাটকের আমার ভূমিকাটিও বেশ মনের মতো। অনেকদিন পর একটি ঘটনা-বহুল নাটক পাওয়া গেল। তবে নাটকখানি রিহার্সালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছিল।

এর পর বেশ কয়েকটা দিন কাটলো। প্রতিদিনই যেন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।

এর মধ্যে একটি নতুন খবর হলো ১৮ আগস্ট স্টার থিয়েটারে মদনমোহনের উদ্বোধন।

এদিকে ১৯ তারিখে নাট্যভারতীর স্টেজ নিয়ে একটা ঝামেলা হলো নানুবাবুর সঙ্গে। কঙ্কাবতীর ঘাটের দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে আমি নিজে কয়েকটা স্কেচ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাদ সাধলো নানুবাবু। তার কথা, আমার পরিকল্পনা মতো দৃশ্য-পট তৈরি করা অসম্ভব।

কিন্তু আমি তা মানতে রাজি নই। অগত্যা মহেন্দ্র গুপ্তকে বললাম, স্টারের পটলবাবুকে যদি পাওয়া যায়, তবে সে নিশ্চয়ই পারবে এই দৃশ্যপটের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে।

মহেন্দ্রবাবু আমার কথামতো স্টারে সলিলবাবুর কাছে গেলেন পটলবাবুর ব্যাপারে অনুরোধ করতে। স্টার কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। পটলবাবু কঙ্কাবতীর ঘাটের দৃশ্যসজ্জার দায়িত্ব নিলেন।

তবে একটা কথা দিতে হলো, নাট্য-ভারতী যেন পটলবাবুর নাম ব্যবহার না করে। পটলবাবুর ভালো নাম পরেশ বোস। বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর নাম নাট্যভারতী ব্যবহার করেনি, দিয়েছিল বোস স্টুডিও-র নাম।

যাইহোক, আপাতত একটা ঝামেলা চুকলো।

কিন্তু সহজ পথ ধরে কি সব চলে। ২০ আগস্ট রিহার্সাল চলছিল কঙ্কাবতীর ঘাটের। দীর্ঘ সময় ধরে রিহার্সাল। কিন্তু শিল্পীগোষ্ঠীদের মধ্যে কেমন যেন শিথিলতা। যে শৈথিল্য নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষ করে নাটকের উদ্বোধন রজনী আসন্ন—এবং যে নাটক নিয়ে অনেক প্রত্যাশা—সে নাটকের শুরুতে যদি এমন শিথিলতা দেখা যায়, তাহলে ভাববার কারণ বৈকি!

কঙ্কাবতীর ঘাটের উদ্বোধনের দিনটি এগিয়ে এলো। ২৫ আগস্ট নাট্যভারতীর পাদ-প্রদীপের আলোয় এলো মহেন্দ্র গুপ্তর কঙ্কাবতীর ঘাট। দিনটা ছিল মহাপূজার আগের দিন। দুর্গাপঞ্চমী।

সার্থক নাটক, সার্থ অভিনয়। কঙ্কাবতীর ঘাটের ওপর আমার আশা অনেক।

২৬ তারিখ ছিল দেবীর বোধন। ঐ শুভদিনটি নাট্য-প্রযোজক প্রবোধ গুহর কাছে নিয়ে এলো অশুভ বার্তা। নাট্য-নিকেতন থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করা হলো ঐ দিনেই।

২৭ আগস্ট, মহাসপ্তমী। ঐদিন ছিল প্লাবনের একুশতম রজনীর অভিনয়।

এ-ছাড়া রাধু লাহার বাড়িতে দুর্গোৎ-সব উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সপ্তমীর রাত্রের নাটক ছিল শাজাহান এবং সুদামা।

প্লাবন অভিনয় শেষে আমরা রাধু লাহার বাড়িতে গেলাম।

সপ্তমীর দিনে হরি ভঞ্জ পরিচালি ইন্দ্র মুভিটোনের ছবি। 'শ্রীরাধা' মুক্তিলা করলো।

মহাষ্টমীতে ছিল কঙ্কাবতীর ঘাটে দ্বিতীয় অভিনয় রজনী। ঐদিন প্লাব অভিনীত হয়েছিল দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে রাধু লাহার বাড়িতে ঐ রাত্রের নাটক ছিল পি ডবল্যু ডি এবং চৈতন্যলীলা।

মহানবমীতে কঙ্কাবতীর ঘাটের তৃত রজনী। প্রেক্ষাগৃহ সেদিন ছিল পূ দর্শকরা উচ্ছ্বসিত করতালিতে অভিনন্দি করলো কঙ্কাবতীর ঘাটকে।

কঙ্কাবতীর ঘাট অভিনয় শেষে লাহ বাড়িতে যেতে হবে। সেখানে আজকে নাটক পি ডবল্যু ডি আর মধুমালা।

পুজোর পালা চুকলো।

বিজয়াদশমীর সানাই বাজলো মহ নগরীর পূজামণ্ডপে।

বিজয়াদশমীর দিনটি বড়ো আনন্দের ঐদিন প্রতিমা বিসর্জন শেষে প্রি পরিজনদের মিলিত হওয়া—শুভেচ্ছ বিনিময়, এর মধ্যে যেন একটা আনন্দে সুর জড়িয়ে থাকে।

মাসগুলো কতো সহজে হারিয়ে যায় সেপ্টেম্বর মাসটাও ফুরিয়ে গেল।

অক্টোবর তিন তারিখ — ঐদিনেই গ্রে স্ট্রীটের বাড়ির ভিত্তি স্থাপনা করা হলো

দুঃসংবাদ আসে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে

৮ অক্টোবর খবর পেলাম, আম থিয়েটারের ডিরেকটর চেয়ারম্যান অ্যাটর্ন সতীশ সেন গিরিডিতে মারা গেছেন।

কিন্তু অভিনেতার জীবনে শোক প্রকাশের অবসর কই। নিজেরা আনন্দ পা না পাই, আনন্দের সুধাভাণ্ড তো আমাদে কাছে। রঙ্গমঞ্চে যে ভাণ্ড উজাড় করে দিতে হয়।

রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জী, মোহন বাগানের নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন আমার শিক্ষক। ৮ অকটোবর নাট ভারতীতে প্লাবন দেখতে এলে সপরিবারে।

অভিনয় শেষে ও'রা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবস্থাও দেখে গেলেন উৎসাহ নিয়ে।

অকটোবরের আট তারিখেই শৈলজানন্দ পরিচালিত কে বি পিকচার্সের 'নন্দিনী' মুক্তিলাভ করলো রূপবাণীতে। নন্দিনীতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

কঙ্কাবতীর ঘাট চলছে দর্শক এবং সুধীজনের আশীর্বাদ নিয়ে। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আর প্রশংসা—নাটকে শিল্পীদের মনে নতুন উৎসাহের জোয়ার এনে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে যেটুকু ভু বোঝাবুঝি, ছিল—তাও নিঃশেষে ধুয়ে মুছে গেছে।

নাটকটি নিয়ে কারো সমর্থন আশে পাইনি, কিন্তু অভিনয়ের সাফল্যে তা পেলাম। এই সময় একটি কথাই মনে হয়েছিল— Nothing suend like success.

নাম ছিল তার 'বিউটি।' শুধু আমার নয়, সে ছিল আমাদের পরিবারের সবার প্রিয়। সেই 'বিউটি' মারা গেল ১০ অকটোবর।

'বিউটি'র নামেই তার পরিচয়। পাঁচ বছর ধরে সে আমাদের ঘরে ছিল। এঘর থেকে সেঘরে, ঘর থেকে ছাদে, ছুটে বেড়াতো খেয়াল-খুশিতে। আদর করলে বুকের কাছে উঠতো, ধমক দিলে অভিমান করে চুপটি করে বসে থাকতো—সেই বিউটি মারা গেল।

ক'দিন থেকে বিউটির শরীর ভালো ছিল না। কিন্তু কী যে হয়েছে কেউ-ই ধরতে পারে না। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো সেদিন। ডাক্তার দেখেশুনে ব্যবস্থা দিলেন।

রিকসা করে বিউটি আসছিল ডাক্তারের কাছ থেকে। কালীঘাট ব্রীজের কাছে এসে ও রিকসা থেকে লাফিয়ে পড়লো। ছুটে এলো গোপালনগরের মোড় পর্যন্ত। ওখানেই ওকে ধরে ফেললো গোকুল।

তারপর সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এলো।

কিন্তু বাড়িতে এসেই যেন কী হলো বিউটির সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে গেল ওপরে চারতলার সিঁড়ির ওপরে চাতালে শুয়ে পড়লো। সুধীরার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বিউটি। কী যেন দেখতে লাগলো। সবাই অবাক হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে বিউটিকে দেখে।

আরো অবাক করে গেল সে, যখন সুধীরার দিকে চেয়ে থাকতেই সে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

বিউটি ছিল আমাদের পরিবারের আদরের কুকুর।

ভারাক্রান্ত কন্ঠে বললাম, বিউটিকে যেন ডাস্টবিনে ফেলে দিও না। ওকে এই বাড়ির মাটির নীচে কবর দিও।

কিন্তু কে যেন বললে, ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও। তাই হলো।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত উত্তরায়ণ ছবিটি মুক্তি পেল ২১ নভেম্বর উত্তরা এবং পূরবীতে। আমিও ঐ ছবিতে অভিনয় করেছিলাম।

২৮ তারিখে নাট্যনিকেতন নামটা মুছে গেল। শিশির ভাদুড়ী তার নতুন নামকরণ করলেন শ্রীরঙ্গম। নতুন শিল্পীদের নিয়ে 'জীবন রঙ্গ' নাটক উদ্বোধন হলো শ্রীরঙ্গমে।

নাট্যনিকেতন নামটা তখন ইতিহাসের পাতায়। তার জায়গায় নতুন নাম শ্রীরঙ্গম।

নাট্যজগতে এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়।

ডিসেম্বরের আট তারিখটি কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। ঐদিন জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলো বৃটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

বারোই ডিসেম্বর অভিনয়জগতেও একটি দুঃসংবাদ—গতকাল অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর বাম অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেছে।

প্রিয় অভিনেতার এই অসুস্থতার সংবাদটা নাট্যজগতের সকলের মনের ওপর রেখাপাত করলো। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালুম মনোরঞ্জনবাবু যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

অভিনয়জগতে মনোরঞ্জনবাবুর মতো মানুষ হয় না। মনোরঞ্জনবাবু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে, আবার অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন।

বেশ কিছুদিন থেকে কলকাতা শহরের মানুষদের মনে একটা দুঃস্বপ্ন জড়িয়েছিল। সে দুঃস্বপ্নের কালো ছায়াটা এবার শহরবাসীকে অকটোপাসের মতো জড়িয়ে ধরলো।

জাপান বার্মা দখল করেছে—শুধু কলকাতা শহরবাসী নয় প্রতিটি ভারতীয়ের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

শহরবাসীদের মনে ভয়টা আরো বেশি। কারণ সবাই জানে যুদ্ধের প্রথম লক্ষ্যস্থল গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি। তারপর ইংরেজ যখন শত্রুপক্ষ তখন ইংরেজ অধিকৃত ভারতের ওপর আক্রমণ ঘটাও নতুন কিছু নয়।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন জড়ানো দিনটি ছিল ডিসেম্বরের পনের তারিখ।

এরই মধ্যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে প্রকাশিত হলো থাইল্যাণ্ডের দরিয়ায় এ এম এস প্রিন্স অফ ওয়েলস এবং রিপাল্স-এর ভরাডুবি। জাপানীরা জাহাজ দুটির উপরে উড়ে এসে সরাসরি বোমা বর্ষণ করে। জাপানী 'সুইসাইড স্কোয়াডের' যুদ্ধরীতি ছিল এমনই।

শুধু একটা দিন, ১৬ ডিসেম্বর শহরবাসীর আতঙ্ক যেন চরমে পৌঁছলো। শুরু হলো শহরত্যাগের ধুম। কোলকাতা শহর ছেড়ে মানুষ পাগলের মতো ছুটেছে, শহর থেকে দূরে—যেখানে যুদ্ধের উত্তাপ সহজে পৌঁছবে না।

যুদ্ধের আতঙ্ক যে থিয়েটারগুলোর কতো ক্ষতি করেছিল, তা ভাবা যায় না। শহরবাসী ছুটেছে প্রাণের তাগিদে, সেখানে আনন্দ উৎসবের অবসর কোথায়?

এতোর মধ্যেও রঙমহলে রক্তের ডাকের জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২১ ডিসেম্বর।

প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি কোনদিকে যাচ্ছে, জানতে আগ্রহ।

তেইশে ডিসেম্বর প্রভাতী সংবাদপত্রে শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে, জাপানীর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেছে রেঙ্গুন শহরে।

ওদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা, সেই সঙ্গে ভারত জুড়ে এক রাজনৈতিক ঝংকার পূর্বলক্ষণ সূচিত হচ্ছে।

চব্বিশে ডিসেম্বর সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকর ভাগলপুরের পথে মুঙ্গেরে গ্রেপ্তার হলেন। বিহার সরকার সে সময়ে নিরাপত্তার তাগিদে হিন্দু-মহাসভা নিষিদ্ধ করেছিলেন।

সাভারকর মহাসভার সম্মেলন উপলক্ষে ভাগলপুরে আসছিলেন।

পঁচিশ তারিখের খবর হংকং-এর পতন। সেই সঙ্গে আরো একটি সংবাদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকেও গ্রেপ্তার কর হয়েছে ভাগলপুরের পথে।

এদিকে থিয়েটার মহলেও নান দুশ্চিন্তা। এই অবস্থায় কি করে থিয়েটার চলবে। থিয়েটার যদিও বন্ধ হয়নি, কিন্তু এভাবে লোকসান সহ্য করে আর কতোদিন

রাধানাথ মল্লিককে দস্তুর মতো চিন্তিত দেখলাম। আঠাশে ডিসেম্বর তারিখে যেদি সকালেই খবরের কাগজের পাতায় পড়েছি রেঙ্গুন শহরে জাপানী বোমার শিকা হয়েছে ছয় শতেরও অধিক নিরীহ নাগরিব সেদিনেই রাধানাথকে বলতে শুনলাম, এ তো অবস্থা। আমি ভাবছি থিয়েটার কি করে চলবে। অন্য খরচের কথা থাব মুলেজীর বাড়িভাড়াই বা দেব কোত্থেকে।

চিন্তাটা একা রাধানাথের না আমাদেরও।

দিনটা ছিল বৎসরের শেষদিন আনন্দের কি দুঃখের জানি না—তবে আমা কাছে বৎসরটা শেষ হলো ভয়ানক দুঃস্বপ্নে মধ্যে।

পরদিন।

১৯৪২-এর প্রথম দিন। রবীন্দ্রনাথে একটি লাইন মনে পড়ে ঐদিনটির কা স্মরণ করলে।

'নববর্ষ এলো আজি দুর্যোগের
ঘন অন্ধকারে'

তবুও দিন আসে প্রতিদিনের নিয়মে।

শিলং থেকে ডাঃ চক্রবর্তী এসেছে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে সেইসঙ্গে আমাদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষ করে যেতে চান। শুনলাম, উনি যুদ্ধে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে নামেরও তালিকাভুক্ত হয়েছে।

যুদ্ধের ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে, আর সেই সময় একজন পরিচিত মানুষ যুদ্ধে যাচ্ছে—শুনে কিছুটা বিস্মিত হলাম।

নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে ছিল কঙ্কাবতীর ঘাটের ৪৩ ও ৪৪তম অভিনয়।

যথারীতি অভিনয় হলো। অন্যান্য বছর ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনটিতে রঙ্গমঞ্চে তিল ধারণের জায়গা থাকে না, আর এ বছর প্রথম দিনেতে দর্শকসংখ্যা যারপরনাই সীমিত। এভাবে নাটক আর কদিন চলবে?

মনটা আরো খারাপ হলো, যখন রাধানাথবাবু এসে জানালেন, থিয়েটারের দুরবস্থার কথা। বাড়ি ভাড়া বাকি, তারপর থিয়েটারের এই রকম অবস্থা। কি করে যে চলবে। কথা প্রসঙ্গে বললেন, ভাবছি, এবারে আর্টিস্টদের দক্ষিণা কমাতে হবে। নইলে চালাতে পারবো না।

রাধানাথবাবু আমাকে ভাবিয়ে তুললেন। বললাম, সাধারণ আর্টিস্টরা কিই বা বেতন পান। তাঁদের বেতন নাই বা কমালেন। তার চেয়ে আমার দক্ষিণা বরং কমিয়ে দিন।

রাধানাথবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, আমি তো সুসময়ে থিয়েটার থেকে অনেক পেয়েছি। আমার দৈনিক পাওনার হিসাবের অংক যদি কিছু কমালে থিয়েটার চলে, তা হলে চলুক। আমার পাওনার অংক কমলে তেমন অসুবিধে হবে না। কিন্তু সাধারণ কর্মী এবং শিল্পীদের কম দিলে ওদের চলবে না।

রাধানাথবাবু তবু বললেন, ভাবছি বেতনের তিন ভাগের একভাগ কমাবো।

বললাম, তবে একবার বলে দেখুন।

রাধানাথবাবু কথাটা বললেনও। কিন্তু কর্মী বা শিল্পী কেউই রাজি হলো না।

এরপরেই রাধানাথবাবু মুলজীবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। কী কথা হলো, জানি না। তবে মুলজী সিক্কা নিজেই এলেন।

রাধানাথবাবু তাঁর কথা জানালেন। কিন্তু সব শোনার পরেও মুলজীবাবু বললেন, আমি এভাবে ক্ষতি সহ্য করতে পারছি না। বারজোরজী ম্যাডানের সঙ্গে আমি একটা বন্দোবস্ত করেছি। তিনি বলেছেন, রাীতেন কোম্পানীকে ভাড়া দেবেন। তাছাড়া রাীতেন কোম্পানীর হয়ে গ্যারান্টার হবেন সুখলাল করনানী।

জিজ্ঞাসা করলাম, রাীতেন কোম্পানী কি করবে হাউস নিয়ে? থিয়েটার না সিনেমা!

—না, তাঁরা থিয়েটারই করবেন। মুলজী বললেন, আরো একবার বুঝিয়ে বললাম, মুলজীবাবু—একটু ভেবে দেখুন, একজন থাকতে আর একজনকে হাউসটা দেওয়া কি ঠিক হবে। তাছাড়া এইরকম একটা সময়—সেটাও তো একবার ভাববেন?

মুলজীবাবু কি ভাবলেন, জানি না। যাবার সময়ে বলে গেলেন, আমি যেন কাল একবার তাঁর বাড়িতে যাই, দেখা করতে। সেখানেই কথাবার্তা হবে।

বলে মুলজীবাবু বিদায় নিলেন।

যাই হোক, তারপরেও খানিক সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম, নাট্য-ভারতীর কথা। ভাবতে মনটা খারাপ হলো। কতো উৎসাহ নিয়ে নাট্যভারতী চলছে—এই থিয়েটারে রাধানাথবাবুরও অবদান কম নয়—শেষটা থিয়েটারটা অর্থাভাবে হাত ছাড়া হয়ে যাবে?

চিন্তা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরছি।

ব্ল্যাক আউটের রাত। কালো ঠুসি লাগাতে ল্যাম্পপোস্টের বাল্বগুলো যেন অন্ধকারকে বিদ্রূপ করছে।

রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরছি। ফিরতি পথে বার বার মনে হলো, আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। কিন্তু কোথায় নতুন উৎসাহ। সব কিছু যেন স্তিমিত আর নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

পরদিন। ২ জানুয়ারী। সকালে ডাঃ এল কে চক্রবর্তী এলেন গোপালনগরের বাড়িতে। সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন। বার বার তাঁর কথার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ফুটলো, তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন।

যুদ্ধের কথায় মনে পড়ে ঐদিনই ম্যানিলার পতন হয়েছিল।

মুলজীবাবু আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, দেখাও করেছি।

মুলজী আমাকে সাদরেই গ্রহণ করলেন।

বললাম, এটা কি করলেন মুলজীবাবু, পাঁচ হাজার টাকায় স্টেজ বিকিয়ে দিলেন। যার রিভলবিং স্টেজের দাম দশ হাজারেরও বেশি। তাছাড়া অমন নতুন সাজ-পোশাক তাও ছেড়ে দিলেন ঐ টাকার মধ্যে। তাছাড়া টাকাও তো পাননি মুরলীবাবুর কাছ থেকে। করনানী গ্যারান্টার হয়েছে এই পর্যন্ত। রাধানাথবাবুর কাছ থেকে এভাবে স্টেজটা না নিলেই ভালো করতেন।

উত্তরে মুলজীবাবু বললেন, কেতা কোথায় পাবো! তাই দিয়ে দিলাম।

বললাম, তবুও একটু ভেবে দেখলে পারতেন।

মুলজীবাবু আচমকা এধরনের প্রস্তাব করবেন, এটা ভাবিনি। বললেন, বেশ তো আপনিই নিন না নগদ টাকা দিয়ে। একবারে না পারেন, না হয় দুটো ইনস্টলমেন্টে দেবেন। কী রাজি আছেন? আপনি নিলে কোন গ্যারান্টার লাগবে না।

বললাম, আপনার কথাটা শুনতে খুবই ভালো লাগলো। কিন্তু আপনার প্রস্তাব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শুনে মুলজীবাবু একটু হাসলেন।

সত্যি, এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। আমি অভিনেতা, সাজ-পোশাক পরে রং মেখে অভিনয় করাই আমার ধর্ম। কোন ব্যবসাগত ব্যাপারে আমার জড়ানো অসম্ভব। অভিনয় করবো, না ব্যবসা দেখবো! সুতরাং মুলজীবাবুর প্রস্তাবে আমার রাজি হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

ফিরে এসে রতীনকে বললাম মুলজীবাবুর কথা।

রতীন শুনে বললে, সেকি—আপনি রাজি হলেন না কেন?

—আমার পক্ষে এ কি সম্ভব।

—আপনি নিজের কথা ভাবছেন কেন, আমরা সবাই মিলে চাঁদা করে টাকা সংগ্রহ করতাম — আমরাই চালাতুম থিয়েটার।

—সবই তো বুঝলাম! কিন্তু অভিনয় করবে, না ব্যবসা দেখবে। তাহলে সব ছেড়েছুড়ে বুকিং-এ বসতে হয়। পারবে অভিনয় ছাড়তে? যা তুমিও পারবে না, আমিও পারবো না—তার মধ্যে যাওয়া কেন?

অগত্যা রতীন চুপ করলো।

যাইহোক, কাজ কারো অপেক্ষা করে না। ঐদিনেও মীনাক্ষী ছবির সুটিং-এ নিউ থিয়েটার্সে গিয়েছি। সুটিং চলছে। ওখানেই তুলসী চক্রবর্তীর মুখে শুনলাম রাীতেন কোম্পানী নাট্যভারতীর দখল নিয়েছে।

কথাটা শোনার কিছুক্ষণ বাদেই নাট্য-ভারতী থেকে রতীনের ফোন পেলাম। রতীন বললে, মুরলীবাবু এসেছেন সন্তু সেনকে সঙ্গে নিয়ে, নাট্যভারতীর দখল নিতে। আমি এখন কি করবো?

বললাম, তুমি আমি কি করতে পারি এ অবস্থায়। কিছুই করার নেই।

ফোন ছেড়ে দিলাম তখনকার মতো।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় স্টুডিওতে আবার রতীনের ফোন এলো। এবারে নতুন কথা বললে। বললে, মুরলীবাবু বলছেন, শিল্পীদের বেতন কিছু কমাতে হবে। আমি তাঁকে কি বলতে পারি বলুন। না পেরে, আমি বলেছি আপনার কথা। বলেছি, আহীনবাবু যা বলবেন, তাই হবে।

ফোনে বেশি কথা সম্ভব নয়। তবুও বললাম, ঠিক আছে আপাতত রাজি হয়ে যাও। আসছে শনি রবির অভিনয় তো হোক, তারপর ফলাফল দেখে যা হোক কিছু ভাবা যাবে। এখন সাময়িকভাবে রাজি হওয়া ছাড়া উপায় কি বলো। তারপর আমরা আলোচনা করে যাহোক একটা ঠিক করবো।

বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

(ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় পৃথিবী

শান্তি পাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আশপাশে কজন কৌতূহলী লোককে জমতে দেখে আর কথা বাড়াল না পরিমল। আচমকা পেছন ফিরে হন হন করে চলে যেতে থাকল। সিতুর বিদ্রূপের হাসিটা নিরুপায় ক্ষোভের মতন কামড়াতে লাগল তার সর্বাঙ্গে।

—কনক।

ঘরের মধ্যে তখনো আলো জ্বলেনি। বাড়ির ভেতর দিকে একতলায় নীচু সিলিং স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। প্রায় পরিমলের ঘরের মতন, তবে কিছু আসবাব আছে। বাইরের আলো থেকে এসে দরজায় ঢুকে কোনকিছুই স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ায় ক' মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল পরিমল। ওপাশের গলির দিকে কাঠের জানলা দুটো খোলা থাকলেও অপরাহ্নের মত রং না এসে কেমন একটা ধূসর কুয়াশার আস্তরণ বিছিয়ে যাচ্ছিল। কড়িকাঠের ঝুল জমা কোণে, পুরনো আমলের খাট আলমারি চেয়ারের আনাচেকানাচে ঝুপসি হয়ে থাকা অন্ধকার আস্তে আস্তে সবকিছুকে ঝাপসা করে দিচ্ছিল। জানলার ঠিক নীচে চেয়ারে বসে কনক কি একটা সেলাই করার চেষ্টা করছিল। পরিমলকে ঢুকতে দেখে তাকাল। —কি ব্যাপার। আজ যে বড় সাহস করে অন্দর মহলে চলে এসেছ।

কনক মুখ টিপে অল্প হাসছিল। বস্তুত পরিমল কখনো সখনো রমেনের আহ্বান ছাড়া ওদের শোয়ার ঘরে পারতপক্ষে ঢোকে না।

—না, ইয়ে হয়েছে, . পরিমল আমত আমতা করল, রমেন কোথায়?

রমেনের বউ বোধ হয় কলতলায় গ ধুচ্ছে। বালতি মগ এবং জলের শব্দ পাওয় যাচ্ছে। রমেনের বউকে সাধারণত পরিম পছন্দ করে না। ওর সন্দিগ্ধ, বেঁধানো, এ একটু অন্য ধরনের খটখটে চাউনীর কারণে

—কোথাও গেছে বোধ হয়, কনক বলল আড্ডা দিতে। ফিরতে রাত হবে মে হচ্ছে। কেন, কিছু দরকার ছিল?

রমেনের ছোট ছেলেটা খাটের ওপ ঘুমোচ্ছে। আবছায়া রেখায় ওর ক্ষুদ্র ক্ষী শরীরটা দেখা যাচ্ছে। অন্য বাচ্চাগুলো নিশ্চয় কোন পার্ক বা গলিতে খেলতে চলে গেছে। আপাতত ঘরে পরিমলের মুখো

মুখি প্রায় একাই কনক। কনকের চোখ-দুটো স্বচ্ছ লাগছিল।

—এরকম অন্ধকারে বসে বসে কি সেলাই করছ।

—দাদার নতুন বাচ্চার জন্যে কাঁথা। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল কনক। এ কথায় ওর গলায় যেন হতাশা ও অবসাদের সুর শুনল পরিমল। দাদার সংসারে থেকে তার ছেলেমেয়ে মানুষ করা ছাড়া কনকের সম্ভবত অন্য কোন নিয়তি নেই।

—কনক তোমার খুব কষ্ট, না? পরিমল হঠাৎ অসংলগ্ন বলে ফেলল।

শুনে কনক ফিরে তাকাল ওর দিকে, কোন কথা বলল না। শুধু চোখে একধরনের প্রশ্নসূচক দ্যুতি খেলা করল তার।

—পরের সংসারেই কেবল খেটে যাচ্ছ তুমি! নিজের ভবিষ্যৎ না চেয়ে।

কনক স্থির নির্বাক চেয়ে রইল পরিমলের দিকে, ওর এই অপ্রাসঙ্গিক কথার সঠিক বক্তব্যটুকু অনুধাবন করার জন্যে।

পরিমল অকস্মাৎ স্বভাবসুলভ মাঝ-পথে কথার খেই হারিয়ে চুপ করে গেল। এবং এরপর কি করবে, কনকের অপলক দৃষ্টির সামনে থেকে বেরিয়ে চলে যাবে কিনা ভেবে ইতস্তত করতে লাগল। ওর ভঙ্গিতে চেনা চঞ্চল ভাব দেখে কনকের ঠোঁটে আবছা হাসি বিস্তৃত হল। কনক পরিমলের মুখ থেকে চোখ নামাল না। সে যেন মুখের রেখায় পুরোপুরি মনের কথাটা পড়তে চাইছিল। ঘন হয়ে আসা সন্ধ্যার মত ঘরের আবহাওয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ভারাতুর মনে হওয়ায় পরিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বড় অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলোটা জ্বাল কনক।

কনক মন্থরগতিতে পরিমলের পাশ কাটিয়ে আলোর সুইচের দিকে গেল। ওর ঝুলন্ত আঁচল চুলের গন্ধ বাহুর সূক্ষ্ম একটু স্পন্দন পরিমলের গা ছুঁয়ে দিল। শিরশিরিয়ে উঠল পরিমল।

—বোস পরিমলদা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আলো জেললে খুব স্বাভাবিক গলাতেই বলল কনক। কনকের এই গুণটা আছে, যে কোন অবস্থায় নিজেকে স্থির করে রাখতে পারে।

—এটা কি বই? মেঝে থেকে একটা বই তুলে বলল পরিমল, নিতান্ত কথা সাজাবার জন্যে।

—গল্পের। পাড়া থেকে চেয়েচিন্তে আনি। ভাগ্যিস একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়েছিলে। তবু দু একটা ভাল বইপত্র পড়তে পাই। ওটাই আমার বিশ্রাম। নিশ্বাস ফেলবার স্থান।

হালকা গলায় বললেও কথা শেষ করে কনক সত্যিই শ্বাস ফেলল বড় করে। পরিমল মনে মনে যদিও এর যথার্থতা পুরোপুরি স্বীকার করল না। কনক পাড়ায় বা অন্যত্র অনেক বাড়ীতে যাতায়াত করে। ছোট বড় নির্বিশেষে মেলামেশা করে। এবং, যে বিষয়ে কনক সম্বন্ধে পরিমলের মনে একটা স্থায়ী দাগ আছে সেটা হল যুবক মহলে ওর প্রতিপত্তি। কনকের স্বাধীন চলাফেরা ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার যেমন দমিয়ে রাখে পরিমলকে তেমনি আকর্ষণও করে প্রচন্ড তীব্রতায়। বস্তুত কনকের ব্যবহারে ওর মন ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভে অসমর্থ বলেই পরিমল ওর সম্বন্ধে যতটা লোভী ঠিক ততটাই ভীত।

—তুমি আরও পড়লেই পারতে, মিছি-মিছি ছেড়ে দিলে।

—বাধ্য হয়েই ছাড়লাম। তোমার দিক থেকে আগ্রহের অভাব ছিল বলে। আর সেটাই স্বাভাবিক। অনর্থক খাটুনি কে আর ভালবাসে।

কনক খাটে শোয়া ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে ঝুঁকে পড়ে আদর করছিল। কনকের মুখে এরকম স্থলে কথা শোনা কাম্য ছিল না পরিমলের কাছে।

—একথা বলছ কেন, পরিমল প্রাণপণে কনকের ভুল শোধরাবার জন্য গলায় যথেষ্ট কাতরতা আনল। তুমি কি জান না যে আমার কাছে এটা নিছক পরিশ্রমই ছিল না। অন্তত তোমার বিষয়ে—

পরিমল আবারও থেমে গেল। এরপরের শব্দগুলি কি হবে ভেবে না পেয়ে। কনক কিছু সাড়া দিল না। পরিমল পেছন থেকে চেয়ে চেয়ে ওর ঝুঁকে পড়া শরীরের সুবিন্যস্ত ভাঁজ ঘাড়ের কাছে জড়ো করা এলো চুল গালের একপাশ ও বাহুর ভঙ্গি দেখল। এসবই ওর সাজানো, একবার ভাবতে চাইল পরিমল, নিজেকে দুর্গম অলভ্য করার জন্য। মনকে বশ করতে না পেরে পায়ে পায়ে এগোল পরিমল। ওর গায়ের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে ভেতরে ভেতরে তোলপাড় হয়ে গেল।

—তুমি সত্যি বোঝ না নাকি। কনকের ডান কাঁধে নরম করে হাত রাখল পরিমল। তুমি আমার কাছে সবার থেকে আলাদা অন্যরকম।

—চুপ। কনক সহসা এপাশ ফিরে ফিস-ফিস করে উঠল, বৌদি কলঘর থেকে বেরোচ্ছে।

দুমুহূর্ত পরিমলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কনক দরজার কাছে চলে এল। তারপর সামান্য হেসে মুখ ফিরিয়ে বলল,

—না ভয় নেই। বৌদি বোধ হয় ছাদে উঠে গেল সোজা। তুমি আছ বলে এঘরে ঢুকল না। বাতিক।

—আমি তাহলে যাই। অপ্রস্তুত হবার মতন বলল পরিমল।

—না। এত ভীরু কেন তুমি। জোর দিয়ে বলল কনক। ধীর পায়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। পরিমল ঘরের সবদিকে তাকিয়ে নিল একবার। কম পাওয়ারের আলোয় চারিপাশ কেমন নিঝুম নিরালা হয়ে আসছিল তার কাছে। পরিমল বলল, আচ্ছা কনক তুমি কি আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পার?

—তোমাকে বুঝে আমার লাভ? লঘু চপল গলায় বলল কনক। ওর ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি খেলা করছিল। দেখে দেখে সর্বাঙ্গে অদ্ভুত ও অসহ্য একটা ভাব ঘুরপাক খাচ্ছিল পরিমলের।

—তুমি আমাকে নিয়ে শুধু মজা দেখ। অভিযোগের সুরে অর্থহীনভাবে কথা-গুলো বলল পরিমল। কনক একথায় কোন সাড়া দিল না। পরিমল অপলক চেয়ে চেয়ে কনকের উজ্জ্বল চোখ আশ্চর্য রহস্যময় হাসি লক্ষ্য করছিল। কনক যদিও স্থির হয়ে ছিল তবু পরিমল ভাবল কনক অত্যন্ত মৃদু প্রায় দুর্লক্ষ্য গতিতে তার কাছে চলে আসছে। কনকের অপূর্ব দেহবিভঙ্গ এখনি তার সমস্ত সত্তার অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। এক পা এগিয়ে কোন পাথর অথবা মূর্তি দেখার মত করে ওর গালের ওপর আলতো দুটো আঙুল রাখল পরিমল। কনকের দৃষ্টি আস্তে আস্তে সরল হয়ে এল। মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে আবেগের লালচে আভা সঞ্চারিত হল।

—পরিমলদা, হাওয়ার মত সুরে ফিস-ফিসিয়ে উঠল কনক। এবং তৎক্ষণাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল পরিমল।

—তোমাকে একটা কথা বলব। কনক চেয়ারে ভর দিয়ে হেলে দাঁড়িয়েছিল। পরিমল অপলক চেয়ে দেখছিল ওকে। এখনি ইচ্ছে করলে সে ওর অধীশ্বর হতে পারে। কঠিন করে আঁকড়ে ধরতে পারে বুকের মধ্যে।

—পরিমলদা, তুমি কথা বলছ না কেন। ওর জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরেছিল কনক। ওর গলায় ওর হাতে এত রক্তস্রোত আছে এই প্রথম অনুভব করল পরিমল। কনকের কথার কোন উত্তর না দিয়ে স্থির হয়ে পরিমল দেখছিল, কনক ক্রমশ কত ঘনিষ্ঠ অত্যাজ্য হয়ে উঠছে। ওর খুলে যাওয়া এলোচুল পরিমলের সমস্ত পৃথিবীতে সন্ধ্যার মত দুকূল ছাপিয়ে আসছে। কনক কেবলই ওকে নিজের কবলে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে কুন্ডলী পাকানো সাপের মত। দুপাশে ঝোলান পরিমলের নিরালম্ব দুই বাহু বেয়ে অননুভূত অস্থিরতা বুকের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিল।

—তুমি খুব নির্বোধ। কিন্তু আজকাল কেন জানি আমার ভয় হয়।

হৃদপিণ্ডে বিদ্যুৎ হেনে কনক মুখ ঘসল পরিমলের বুকে। পরিমলের সামনে ক্রমশ পৃথিবীর অন্যসব রূপ রঙ যাবতীয় অন্ধকার মুছে আসছিল। আর কিছু না ভেবে কনকের দু কাঁধে হাত রাখল পরিমল। সেই মুহূর্তে ঘুম ভেঙে রমেনের বাচ্চাটা চীৎকার করে উঠল। ছিটকে সরে এল পরিমল, জাগ্রত সময়ে ফিরে এল তৎক্ষণাৎ। কনক ওর দিকে তাকিয়ে রইল খানিক, কিছু বিস্মিত কিছুটা অর্থহীন দৃষ্টিতে। তারপর বাচ্চাটার পরিচর্যায় এগিয়ে গেল। যা বলতে চেয়েছিল বলতে পারল না। পরিমলও আর শোনার চেষ্টা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জুতো পরার আগে বড় করে শ্বাস ফেলল একটা। বিষাদের, অথবা মোহমুক্তির, কে জানে।

—চারিদিক এত অন্ধকার কেন বৌদি। চৌকাঠে হোঁচট খাবার মতন হয়েছিল বলে উত্যক্ত গলায় বলল পরিমল, বাড়ীতে কেউ নেই নাকি?

সন্ধ্যেবেলা রাস্তায় কুয়াশার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোন কারণে চোখদুটো জ্বলে যাচ্ছিল ওর। সস্তায় কেনা সোয়েটারের ভেতর শরীরটা শিরশিরিয়ে কাঁপছিল। টিউশনি ফেরৎ পথ চলতে ওর মনে হয়েছিল মাথার মধ্যেও বুঝি কিছু ধোঁয়া খামোকা ঢুকে যাচ্ছে। এবং সেজন্য মাথা ও শরীরের ভেতর কেমন অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করছিল। পরিমল রোয়াকে উঠে বাইরের আলো জ্বালল। সরযূ সম্ভবত রান্নাঘরে উনুন ধরাচ্ছিল। পুনরায় ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসতে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করল পরিমল। ঈষৎ রূঢ় গলায় বলল,

—বাড়ী নয়তো নরক। পোড়োবাড়ীর মতন। ঢুকলে অসুস্থ বোধ হয়।

ঘরে ঢুকে নিজেও আলো জ্বালল না পরিমল। অভ্যাসমত আন্দাজে শয্যার ওপর গা এলিয়ে দিল। ওপাশের জানলার কোণ দিয়ে গলিপথে জ্বালা কর্পোরেশনের আলো তেরছাভাবে মেঝে এসে পড়ছিল। তাতে ঘরের ভেতরটা কেমন আবছা রহস্যময় লাগছিল। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ বন্ধ করল পরিমল। চোখের ভেতরটা এখনো জ্বালা করছে। অনর্থক ভারী লাগছে মাথাটা। আজকাল দেহ প্রায়ই এমন বিদ্রোহ করতে চাইছে। মেজাজ শুদ্ধ তিক্ত করে দেয়।

সরযূ এদিকে এল আঁচলের চাবি দুলিয়ে। ঘরের আলো জেলে দিল এসে। রহস্য করে হাসল একটু।

—ওরকম মোজেক করা বারান্দা দিয়ে হেঁটে এলে নিজের ঘরবাড়ী সবারই খারাপ লাগে।

পরিমলের এমন রুক্ষ কথার বিনিময়ে সরযূ হাস্যপরিহাস করছে। ঘটনটা একটু অন্যরকম মনে হওয়ায় চোখ খুলে তাকাল পরিমল। সরযূর পরণে পাটভাঙা ফর্সা শাড়ী, চুলটা আঁচড়ে বাঁধা, অন্যদিনের মত তালপাকানো নয়। আজ যেন তাকে অনেকদিন আগেকার সরযূ বলে মনে হচ্ছিল। যখন এতখানি সংসারী হয়নি। অন্য কেউ রাগ করলে হেসে ভুলিয়ে দিত।

—ঠাট্টা হচ্ছে, না? পরিমল মাথার নীচে হাতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে শুল।

—ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি। তুমি বলে তাই কিছু করতে পারছ না। আমি হলে তো ও বাড়ী ছেড়ে আসতুমই না। কোনরকমে একটা সুবিধে করে নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতুম।

সরযূ অনেক দিন পরে অমন উজ্জ্বল করে হাসছিল। পরিমলের ভাল লাগছিল। তবু ওর কথার নিহিত অর্থ কিছুটা আন্দাজ করে সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করল।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? কাজকর্ম কিছু নেই?

—নেই আবার। সরযূ ঠোঁট ওলটালো। আমার জীবনের শেষ আছে, কাজের নেই। চা খাবে, না পড়াতে গিয়ে ভাল চা খেয়ে এসেছ?

—আজকে এরকম খোঁচা দিচ্ছ কেন বলত? যাও চা করে আন।

পরিমলের মন বেশ লঘু লাগছিল। সরযূ চলে যেতে ওর খুব একা মনে হল। আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বাইরে এল পরিমল। বারান্দার নিস্তেজ আলোটার জন্য চারিদিকে কেমন একটা বুকচাপা বিমর্ষ ভাব ছড়িয়ে ছিল। একটা কথা বলার লোকের অভাবে যেন হাঁপ ধরছিল বুকের ভেতরটায়। রান্নাঘরে সরযূর কাছে চলে এল পরিমল।

—মিতুটা কোথায় গেল বৌদি?

—এই বেরিয়েছে একটু। সরযূ কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিল।

—ভরসন্ধ্যেবেলা পাড়া বেড়াতে গেছে? তোমার বাদবাকি অপোগণ্ডগুলো কই?

—ওঃ মেয়েটা ভাল আর ছেলেগুলো অপোগণ্ড না? সরযূ কৃত্রিম কোপ দেখাল। তারা দুজন মাষ্টারমশায়ের বাড়ী পড়তে গেছে আর ছোটটাকে পাশের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, জ্বালাতন করছিল বলে।

পরিমল যদিও ভাবছিল মিতু কনকের বাড়ি গেছে তবু স্বরে ঈষৎ গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, মিতুটা বড় আড্ডাবাজ হয়ে গেছে ত?

চায়ের কাপ পরিমলের হাতে দিতে গিয়ে সরযূ মুখের দিকে চাইল।

—তোমার চোখ অত লাল কেন, গা দেখি। গায়ে হাত দিয়ে আক্ষেপ করে উঠল সরযূ, ইস আবার জ্বর বাধিয়ে বসেছ তো?

—তাই চোখ জ্বালা করছিল, মাথা ভারী-ভারী।

—এরকম দুদিন ছাড়া জ্বর ভাল নয় তোমার। খুব সাবধানে থাক।

—এর চেয়ে সাবধানে আর কি করে থাকব।

—না হয় চিকিৎসা করাও। তোমার চেহারা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াও, আমার ঘরে ট্যাবলেট আছে কি না দেখি।

সরযূ নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। পরিমলও ঢুকল। খাটের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল হঠাৎ।

—একি, ঐ সিগারেটের প্যাকেট কার, বৌদি?

চকিতে সরযূ পেছন ফিরল। তার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

—এরকম দামী সিগারেট এ বাড়িতে কেউ খায় না। খুব শীতল গলায় বলল পরিমল। বিছানায় সদ্য পাতা পরিচ্ছন্ন ফর্সা চাদরের ওপর প্যাকেটটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। গম্ভীর, অপ্রসন্ন।

—শ্যামল এসেছিল। আচমকা বলেই যেন গলায় নিশ্বাস আটকে থেমে গেল সরযূর।

—কেন? হঠাৎ? অতিরিক্ত বিস্ময় দমন করতে পারছিল না পরিমল।

—এমনি। কেন আবার। সরযূ যেন এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজছিল।

—এমনি, অকারণেই, শ্যামল এল এবাড়িতে?

—কি হয়েছে তাতে

দাঁতে ঠোঁট চেপে কি যেন ভাবছিল পরিমল। মেঝের ওপর পায়ের বুড়ো আঙুল অস্থির ঘসছিল। হাতে ধরা চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

—শ্যামল তাহলে প্রায়ই আসে আজকাল, কি বল, থেমে থেমে গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করল পরিমল।

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসে। স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করল সরযূ।

—তার জন্যে ফর্সা জামাকাপড় পরা হয়, বিছানা বদলানো হয়, এখানে বসে সে সিগারেট পর্যন্ত খায়, তাই না? পরিমলের স্বর ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছিল। সরযূ ওর কথার কোন জবাব দিল না।

—এসব আমাকে জানাওনি কেন?

সরযূ অনর্থক জানলার বাইরে গলির দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখ আসলে কিছুই দেখছিল না। পরিমল উত্তেজিত পা ঘষল।
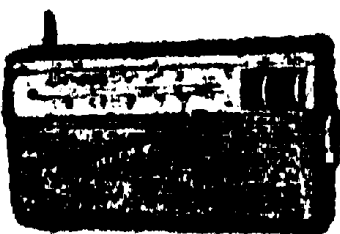
—বল, চুপ করে রইলে যে? বাড়িতে কি ঘটে আমি জানতে পারি না কেন?

—তুমি, তুমি সহ্য করতে পারবে না বল। চকিতে মুখ ফিরিয়ে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল সরযূ। পরিমল ভ্রূ কুঁচকে ওর মুখের রেখা নিরীক্ষণ করল। সরযূ তার কথার জের টানল।

—নিজে অক্ষম, তাই ঐ ছেলেটির বাড়ি গাড়ি টাকাপয়সা সবকিছুকে তুমি হিংসা কর। ওকে দেখলে মুখ তেতো হয়ে যায় তোমার।

—এসব কথা তুমি নিজে বলছ? পরিমলের চেতনা আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে আসছিল।

—না শ্যামল নিজেই বলেছে।

—ও। পরিমল শূন্য দৃষ্টিটাকে ঘরের কালচে ছোপ ধরা সিলিং দেয়াল জানালার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল। সরযূ প্রস্তুত হয়েই যেন দাঁড়িয়েছিল, আরো কথার জবাব দেবার জন্য।

—মিতু কি শ্যামলের সঙ্গে মেশে? পরিমল ধীর স্বরে বলল।

—বাড়ীতে আসে যখন মিশতে দোষ কি?

পরিমল আরও হতাশ ভাঙ্গা গলায় বলল,

—মিতু ওর সঙ্গে বেড়াতেও যায় বোধ হয়?

—খুব কম, ঢোক গিলে সরযূ বলল, কাজ নিয়ে দুদিন। তাও আজ গেছে পর্দা কিনতে। শ্যামল বলছিল দরজা-জানলাগুলোয় পর্দা দেওয়া দরকার। ভাল দেখায়।

পরিমল শান্ত অথচ কঠিন চোখে চেয়েছিল সরযূর দিকে।

—শ্যামল কি মিতুকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে?

—তেমন না, তবে মিতুকে ও পছন্দ করে।

—পছন্দ করে বলে একটা লোফারের সঙ্গে ছেড়ে দেবে?

—ওগো তুমি, মেয়েটা বড় হচ্ছে একটা বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই, শেষে কোন বস্তির ছোটলোকের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। শ্যামলের পয়সা আছে চেহারা ভাল, আর ও ছেলের থেকে কথা আদায় করতে হলে সঙ্গে দুদিন ঘুরতে হয় অমন।

—ছিঃ, চাপা গর্জন করল পরিমল, একথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

—লজ্জা তো তোমারও হওয়া উচিত ঠাকুরপো। পাঁচ বছর ধরে একটা অসহায় মেয়েকে ঝুলিয়ে রেখে ওদিকে বড়লোকের নন্দিনীর সঙ্গে রোজ মোটরে বেড়াচ্ছ। ময়দানে হাওয়া খাচ্ছ। কিছু খবর রাখি না ভেবেছ? শ্যামলের মুখে সব শুনেছি, সরযূর কথার ঝাঁঝে থমকে গিয়েছিল পরিমল। সরযূ মুখ ঘুরিয়ে বলল, বেচারী কনক তো এসব জেনে একেবারে হালই ছেড়ে দিয়েছে। মুখ অন্ধকার করে থাকে। এ বাড়িতে আসে না পর্যন্ত।

এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরযূ। পরিমলকে একটা শূন্য অনুভূতির মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে। পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল পরিমলও। মাথার ভেতরটা কিরকম শুধু মনে হচ্ছিল। যেন চিন্তা করবার সব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! নিশ্বাস এত গরম লাগছে, মনে হয় গায়ে প্রচুর উত্তাপ। তৃষ্ণায় গলা শুকনো তবু জল ঢেলে খেতে ইচ্ছে হল না। উদ্দেশ্যহীন রাস্তায় চলে এল পরিমল। কুয়াশার স্বচ্ছ পর্দায় ঘেরা রাস্তার আলো অনুজ্জ্বল দেখায়। সমস্ত পাড়ার উনুন ধরানো ধোঁয়া ওপরে ওঠার পথ পায় না। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ ঘুরে বেড়ায়। বুকের মধ্যে শীতের শিরশিরানি ভাব অনুক্ষণ গুড়গুড় করে।

—রমেন। রমেনদের দরজার বাইরে এসে ডাকল পরিমল। তার স্বর খুব মৃদু ও ভাঙ্গা। তার মনে হল সে যেন স্বপ্নের মধ্যে কথা বলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। দুবার ডাকতে রমেন শুনতে পেল। সদর থেকে নেমে এসে পরিমলের মুখোমুখি দাঁড়াল।

—ভেতরে যাবি না?

—না। পরিমল দূরে রাস্তার মোড়ে থকথকে হয়ে জমে থাকা কুয়াশা দেখছিল। রমেন ভ্রূ কুঁচকে চোখ ছোট করে ওর দূরমনস্ক দৃষ্টি ভাবলেশহীন মুখ দেখল।

—তোর কি হয়েছে? প্রশ্ন করল রমেন।

—কিছু না। কনক আছে? কিছু ভূমিকা না করেই বলল পরিমল।

—হঠাৎ কনকের খোঁজ করছিস যে? রমেন সামান্য গম্ভীর প্রচ্ছন্ন গলায় বলল।

—ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। খুব দরকার। যেন মিনতি করল পরিমল। দেখা করার অনুমতি পেতে।

—ও নেই এখানে। দেশে চলে গেছে কদিন হল।

—কেন? হঠাৎ?

—হঠাৎই। পিসিমা ওর জন্যে একটা বিয়ের সম্বন্ধ দেখে রেখেছিলেন অনেকদিন ধরে। ও রাজী ছিল না। হঠাৎ কিরকম ওর মন হল, সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখে দিলে।

পরিমলের মাথার ভেতর ভীষণ হালকা লাগছিল। সম্ভবত জ্বর ক্রমশ বাড়ছে। রমেনের কথাগুলো ওর মনে যেন কোন দাগ কাটছিল না।

—আমিও বেশ আশ্চর্য হয়ে গেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে গেল ও। দেখা-শোনা সব ঠিক হয়ে গেছে এতদিনে।

—ওকে ফেরানো যাবে না? আস্তে প্রশ্ন করল পরিমল।

—না। জানিস তো কিরকম জেদী। চিঠিতে লিখেছে সামনের মাসেই বিয়ে। অফিসের ছুটি পেলে আমিও চলে যাব এবার।

—ও। পরিমল কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওর শরীরের সমস্ত হাড়গুলো ঠকঠক করে কাঁপছিল। বুকের ওপর দুহাত আড়া-আড়ি রেখে সোজা থাকার চেষ্টা করছিল।

—আমার খুব আশা ছিল তোর ওপর। আক্ষেপ করে উঠল রমেন। আমার ঐ একটা বোন। বাপ-মা হারা। তোকে ও...আচ্ছা ইদানীং যেন তোর ব্যাপারে ভীষণ ডিস্যাপয়েন্টেড হয়েছিল। তোর কথা উঠলে ঘর ছেড়ে চলে যেত পর্যন্ত। কেন, তুই কিছু জানিস?

—না। পরিমল বাড়ী ফেরার জন্য পেছন ফিরল। তার দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছিল।

—পরিমল। রমেন ডাকল পেছনে।

পরিমল সাড়া দিল না। যেন হাওয়ায় ভেসে চলছিল সে, শরীর এত ভারহীন লাগছিল। জাগ্রত চৈতন্যের শেষ সীমায় এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তে পারল পরিমল। স্বপ্নের ঘোরের মত কত কি কথা বলতে চাইছিল সে। অস্ফুট স্বরে। ঠোঁট দুটো কেবল কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল তার। মাঝে মাঝে পরিচিত কোন স্বর কানে এলে চোখ মেলছিল পরিমল। দাদা বৌদি মিতু সবার মুখ দেখছিল। তারপর সেই মুখগুলো যেন আস্তে আস্তে দূরে পথের মোড়ে সরে গিয়ে থকথকে জমে থাকা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আসলে তার চেতন ও অচেতন স্বপ্নে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের ফলে কোন ছবিই তার মনে স্থির হতে পারছিল না। বন্ধ চোখের আড়ালে তখন অন্য দৃশ্য দেখছিল পরিমল। সিনেমার পর্দার মত। দৃশ্যগুলি যেন ভাল করে স্ফুট হবার আগেই হাওয়ার পাখায় ভর করে দৃশ্যান্তরে চলে যাচ্ছিল। অধৈর্য হয়ে পরিমল হাত উঁচু করে সেই জীবন্ত স্বপ্নকে ধরতে চাইছিল। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছিল বারবার। কখনো দেখল পরিমল, কনককে পাশে নিয়ে দুরন্ত রাস্তায় ঝড়ের গতিতে মোটর চালিয়ে যাচ্ছে পরিমল। কনকের মুখে অপূর্ব পরিতৃপ্তির দ্যুতি। পরক্ষণেই ছবিটা সরে গিয়ে সোমাকে দেখল। খুব করুণ মধুর সুরে গান গাইছে সোমা। চারিদিকে গাছপালায় পরিমণ্ডলের মধ্যে হাওয়ার দুর্বারতার মধ্যে, আবছা ছবির মত। মুহূর্তে পরেই দেখল মিতু তার কোলের কাছে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। খোলা দীর্ঘ চুল ছড়ানো পিঠে। ওর সমস্ত শরীরে বঞ্চনার অক্ষরে লেখা শ্যামল দত্ত ওর সর্বনাশ করে চলে গেছে। অস্ফুট শব্দে ভয়াবহ দৃশ্যটা মন থেকে তাড়াতে চাইল পরিমল। জোর করে। আস্তে আস্তে ইন্দ্রিয় সজাগ হচ্ছিল ওর। চেতনা স্বাভাবিকতায় আসছিল। চারিদিক চেয়ে দেখল, ভোরের আলোর আভা ঘরে চিকমিক করছে। রাতটা কেটে গেল কোথা দিয়ে। চোখ ফিরিয়ে সরযূর রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত মুখ দেখতে পেল পরিমল। তারপর চোখ বুজে একটা শ্বাস ফেলে ভাবল, অমন ভাল টিউশনিটা এবার ছেড়ে দিতে হবে।

(শেষ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

গৃহসজ্জার সৌখীন উপকরণের ছোট-খাট প্রদর্শনী যখন সাধারণ প্রদর্শনীগৃহে হয়, তখন সেগুলি একটা পরিবেশবহির্ভূত অবস্থায় দেখতে হয়। কিন্তু শর্বরী এবং আলো দত্তের মৃৎশিল্পের প্রদর্শনমূল্য অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল ২৩ শেক্সপীয়ার সরণীর অমলেন্দু ও উমা রায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়ায়। ঘরের যেখানে যে জিনিসটি রাখলে সুন্দর দেখায় সেইভাবে সেগুলি সাজানো হয়। মাটির বহুবর্ণে রঞ্জিত ফুলদানি, ল্যাম্পস্ট্যান্ড, ফলাধার, দীপাধার, ট্রে এবং আরো বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার্য বস্তুর সুরুচিসম্মত গঠন-পারিপাট্য এবং উজ্জ্বল চোখজুড়োনো রঙ অভ্যাগতদের আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া জিনিসগুলির দামও ছিল খুব কম, যাতে সকলেই কিছু না কিছু পছন্দসই জিনিস কিনতে পারে। তাই প্রদর্শনীর শেষে অল্প জিনিষই অবশিষ্ট ছিল। এই ঘরোয়া প্রদর্শনী ৬ই জুন অনুষ্ঠিত হয়।

●

দিল্লী আর্ট কলেজের সিনিয়র লেকচারার ফাল্গুনী দাশগুপ্ত অনেকদিন পরে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে তাঁর ১২খানি ছবির একটি প্রদর্শনী করলেন। ইতিপূর্বে তাঁর প্রদর্শনী দেখা গিয়েছিল আর্টিস্ট্রি হাউসে। বর্তমান প্রদর্শনীতে জল-রং রঙীন কালি ও প্লাস্টিক গুঁড়ো মিশিয়ে তিনি খুব উজ্জ্বল কতগুলি ছবি তৈরী করেছেন যাতে জল-রং-এর কাজে একটা পেন্টিং-এর গুণ এসেছিল। শ্রীদাশগুপ্ত দৃশ্য-জগতের কতগুলি ফর্ম থেকে অ্যাবস্ট্রাকশনে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। এতে ছবি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে পড়েনি, বিশেষ করে নিসর্গ দৃশ্য থেকে করা অ্যাবস্ট্রাকশনটি অত্যন্ত সুগঠিত হয়েছে। ছবিগুলির মধ্যে শাদা রেখার আনাগোনা নকশাকে যেমন একদিকে সমৃদ্ধ করেছে অন্যদিকে কোথাও কোথাও অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা স্টেনসিল এফেক্ট এসে গিয়েছে। তাঁর ২, ৩, ৬, ৯ এবং ১৬ নম্বরের ছবিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনী ৬ থেকে ১৩ জুন খোলা ছিল।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ক্যানভাস শিল্পী গোষ্ঠীর ১০জন শিল্পীর ৩২টি পেন্টিং ড্রয়িং ও গ্রাফিকের প্রদর্শনী ৯ থেকে ১৪ই জুন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গোষ্ঠীর কাজ এবারে গতবারের চেয়ে কিছু উন্নত হলেও কাজের মানের অসমতা এখনো পরিস্ফুট। এঁদের অনেক কাজে এখনো সমকালীন শিল্পী গোষ্ঠী ও ক্যালকাটা গ্রুপের ছবির প্রভাব রয়ে গিয়েছে। আলোক ভট্টাচার্যের একটি ড্রয়িং খুব নিখুঁতভাবে আঁকা। বরেন বসুর ছবিতে প্রতীক-ধর্মিতার একটু বাহুল্য দেখা যায়। অশোক বিশ্বাসের —'লেডি বিফোর মিরর' এবং 'সীটেড ফিগার' পরিচ্ছন্ন ডিজাইন। বলাই কর্মকারের 'ইমেজ' ছবিটি জল-রং-এর কাজের একটি সুন্দর নিদর্শন। রঙের ব্যবহার রোমান্টিক। মানিক তালুকদার—লোক-শিল্পের ফর্ম থেকে কয়েকটি মুরালের ধরণের ছবি করেছেন।

●

গ্যালারি ইউনিকে ৮ থেকে ১৪ জুন বি, আর পানেসরের ২২খানি অয়েল স্কেচ প্রদর্শিত হল। ছোট গ্যালারিতে ছবিগুলি একটু ঘন-সন্নিবদ্ধ হয়ে পড়ায় দেখার পক্ষে কিছুটা অসুবিধে হয়েছে। শ্রীপানেসরের ছবির অধিকাংশই নিসর্গ দৃশ্য অবলম্বনে। কথনো কথনো অদ্ভুত রসের অবতারণাও হয়েছিল—যেমন 'এ ওয়াইজ অ্যানিম্যাল লুকিং স্যাডলি দি হোমো স্যাপিয়েনস' ছবিতে। ৫ নম্বরের কম্পোজিশনে কালো রেখায় আঁকা ফিগারটি খুব মানানসই লাগল। ১০ নম্বরের ছবির স্বপ্নময়তা এবং 'লস্ট সিটি' ছবির গগনেন্দ্রনাথের আমেজ ভালই লাগে। তবে তাঁর 'টেম্পল এগেনস্ট এ সোলেম স্কাই' এবং 'হুইস্পারিং ডিটি' অনেক সুগঠিত গাম্ভীর্যময় এবং শক্তি-শালী কাজ। ছবির নির্বাচনে আরেকটু সতর্ক থাকলে প্রদর্শনীর সামগ্রিক মানের সমতা বজায় রাখা সহজ হত।

●

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সংগ্রহে একটি পুরাতন ব্রহ্মদেশীয় স্ক্রল সংযোজিত হয়েছে। ৬৪টি বিভাগে ৬২টি প্যানেলে ভাগ করা এই ছবিটি প্রায় ১৫০।২০০ বছরের পুরোন। যদিও ছবিটি বেশ সুরক্ষিত অবস্থায়ই আছে। সম্ভবত টুঙ্গু বংশের কোন রাজার আসনের অভিষেক ও অন্যান্য রাজকীয় উৎসব এই ছবির বিষয়বস্তু। চিত্রে রাজা-রাণী ও পারিষদবর্গকে বাঘ শিকার, হলা-কর্ষণ উৎসব, নৌকাবিহার, হাতীর লড়াই, শ্বেতহস্তী বন্ধন ইত্যাদি ঘটনায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। লাল সবুজ, হলদে, কালো ইত্যাদি কতকগুলি মৌলিক বর্ণে রঙে ও পরিচ্ছন্ন রেখাপাতে আঁকা মিনিয়েচার মুরালের মত এই ছবিটি প্রাচীন যুগে সাজ-পোষাক ও সামাজিক রীতি-নীতি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। ছবিটির নিখুঁত পারিপাট্য সর্বদাই শিল্পীর কুশলতা মনে করিয়ে দেয়।

●

১৫ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত আকাদমি অব ফাইন আর্টস মোহনলাল শর্মা ও এ এস নারায়ণ নামে দুই তরুণ শিল্পীর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয়জন মোটামুটি নিজে নিজেই কাজ শিখেছেন। ছোট ছোট জল-রং এবং প্যাস্টেলে আঁকা কয়েকটি ছোট দৃশ্যের মধ্যে ২১, ২২, ২৪ নম্বরের ছবিগুলি মন্দ নয়। দু-একটি কুঁড়ে ঘরের দৃশ্যে প্যাস্টেল পরিচালনা একটু অপরিণত।

মোহনলাল শর্মার জল-রং ও তেল-রঙের কাজগুলি সুদক্ষ ভাবে করা, তবে মিষ্টিভাব বেশী। অনেকগুলি নিসর্গ দৃশ্য বেশ একটু ক্যালেণ্ডার ঘেঁষা। উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী নিয়ে দুটি বড় তেল রঙের কাজে একটু সস্তার ইলাস্ট্রেশন ঘেঁষা ভাব এসে গিয়েছে। কেবল রাজস্থানের কূপ থেকে জল তোলার একটি ছোট দৃশ্য সুচিন্তিত ও পরিণত ধরণের কাজ।

●

৭ নম্বর চৌরঙ্গী রোডের ২০ নম্বর সুইটে সন্তোষ রোহাত…র স্টুডিওতে ১২ থেকে ১৫ মে …দের চিত্রশিল্পীদের পঞ্চাশখানির মত ছবির একটি প্রদর্শনী হল। ৫ থেকে ১৫ বছরের ১২।১৩ জন ছেলেমেয়ের ক্রেয়ন, জলরং প্যাস্টেল ইত্যাদির আঁকা ছবিতে চিরাচরিত নিসর্গ দৃশ্য খেলাধুলো রাস্তাঘাটের ছবি ছাড়াও দু চারটি অন্য ধরনের বিষয়বস্তু দেখা গেল। যেমন রেস্টুরেন্ট, হোটেল, প্রদর্শনী-গৃহ, ইত্যাদি বিষয়।

●

২২-শ পল্লীর 'সিট অ্যান্ড ড্র' চিত্র প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ২ মে হয়ে গেল। পুরস্কার বিতরণ করলেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী এবং সভাপতি ছিলেন শ্রীচিন্তামণি কর। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, চিন্তামণি কর, সত্যজিত রায়, সুনীল পাল, ইন্দু দুগড়, আমিনা কর, গণেশ হালোই ও নির্মল দত্ত।

—[illegible]

কলকাতায় তিনজন পটুয়া এসেছিলেন

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আবারও বৃষ্টি আসতে পারে। সুতরাং তাড়াতাড়ি বাড়িটার ভিতর ঢুকে গেলাম। আমেদাবাদ থেকে তিনজন পটুয়া এচেছেন এখানে। ওরা পট দেখিয়ে আজ গান করবেন।

বাংলা দেশের পটশিল্প সম্পর্কে আমার ধারণা সীমিত। তবু এই দেশের জল-মাটিতে সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এখনও টিকে আছে জেনে এবং তিনজন পটুয়া এসেছেন এই মহানগরীতে, ওরা আজ পট দেখাবেন, দেব-দেবীর যুদ্ধ বর্ণনা করবেন, দুর্গাপটে অথবা মনসাপটে নানারকমের গল্প গাথার ছবি আঁকা থাকবে ভাবতেই এই বর্ষার প্যাচে প্যাচে দিনটা সহসা আমার কাছে মনোরম হয়ে গেল।

বড় সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যা ক্রমে লুপ্ত হবার মুখে। ওদের অর্থাৎ যারা এসেছেন নানা বর্ণের পট নিয়ে এবং আরও আছে হলের ভিতর সংগ্রহ করা পট—কি দীর্ঘ আর লম্বা চোখ অথবা নাক, কান, মুখ, ওদের শিল্পকলা মঙ্গলকাব্য থেকে নেওয়া বলা যায়, ওরা অনুসরনাশিনী মহিষ-মর্দিনীর ছবি আঁকতে পটু, কবে কোন কালে থানেশ্বরের রাজা মৃগয়া সেরে ফির-ছিলেন—পথে শুনলেন পিতৃদেব অসুস্থ, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। শহরে ঢুকে দেখলেন তিনি পট শিল্পী গান গাইছে—এত যে জীবনের জয়গান হাঁকছ তোমরা, এত যে বড়াই কর বাঁচার অথবা যুদ্ধের, দ্যাখো, সেই অহঙ্কারের মাথা চূর্ণ করে নরকের পাপ খণ্ডন হচ্ছে।

মানুষের মন বড় সংস্কারে আবদ্ধ। থানেশ্বরের রাজা আরও জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। গান শুনে তার ভয় হয়েছিল পিতৃদেব হয়ত বেঁচে নেই।

সেকালে, সেকালে বলছি কেন, একালেও এই পটুয়ারা এক সুন্দর লোকশিল্পের মারফত গ্রামের মানুষদের শিক্ষা যেখানে তেমন সুলভ নয়, অথবা সংস্কারজাত মানুষ যেখানে বিশ্বাস করতে ভালবাসে, এই পটের সব গুণকীর্তন শ্রবণে ওদের পাপখণ্ডন হবে, পাপখণ্ডনের জন্য বাড়ি বাড়ি ওরা এখনও প্রায় ধর্মপ্রচারকের মতো সত্যপীর আর মনোহর ফাঁসুরের কাহিনী বর্ণনা করে বেড়ায়। কখনও ওরা গান করে রাবণ কর্তৃক জটায়ু বধের পালা, বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ। এমন বর্ণনাবহুল গ্রামীণ চিত্র বড় কম দেখা যায়। আমাদের সামনে বসে ওরা এখন গান গাইছে। কত গুণীজন এসেছেন এই সাহিত্য পরিষদের ভবনে। এসেছেন শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, সুকুমার সেন, তুষারকান্তি ঘোষমশাই, কে কে সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু। সকলের কিনা জানি না আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যেন কতকাল আগে শোনা পদ্ম-পুরাণের মতো বেহুলার ভাসান গাইছে বিজয় চিত্রকর। লক্ষ্মীন্দর-বেহুলার গল্প। যেন এক বর্ষাকালে নৌকা বেয়ে যাচ্ছি আর কেউ সুর ধরে পদ্মপুরাণ পড়ে যাচ্ছে। আলো পাখার নিচে বসে সেই সুদূর পূর্ব-বঙ্গের কথা মনে হয়। ধান গাছ আর বর্ষার জল এবং ডাহুকের শব্দ, নিরিবিলি নির্জন গ্রামে কে যেন সুর ধরে নিয়ত পদ্মপুরাণ পড়ে চলেছে, সেই সুর করে পড়া পদ্মপুরাণের লক্ষ্মীন্দর, বেহুলা, চাঁদসদাগরের হুবহু বর্ণনা দিলেন বীরেন চিত্রকর তাঁর হতে আঁকা পটে। বিষহরির পুজা দিতে যে অপারক, সেই চাঁদ-সদাগরের। উপরে এক বিশালনয়নার মূর্তি, নিচে চাঁদ সদাগর। তার পুত্রদের বিধবা বউ—সব সারি সারি ক্রমে নিচের দিকে সাজানো। আরও নিচে ভেলায় বসে বেহুলা, কোলে মৃত স্বামী, যে নদীতে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে।

আলা পাখার নিচে আমরা যারা বসে-ছিলাম তাদের কাছে কতটা এই বর্ণনা মহিমময় আমি জানি না—আমার কেবল মনে হয়েছে মেলা অথবা পালা পার্বনের কথা এবং এইসব পটুয়ারা মেলায় যেন ঘুরে ফিরে হাত নাচিয়ে পটের ব্যাখ্যা করছে, আমরা যেন কোন মেলায় উপস্থিত হয়েছি, সুদূরে গ্রাম থেকে এসেছে দুগাছা কাচের চুড়ি কিনতে চাষা বউ, অথবা ডুরে শাড়ি পরে ছোট্ট বালিকা জিলিপি খেতে খেতে ছুটে যাচ্ছে, মেলায় এসেছে পটুয়া, পট নিয়ে গান গাইছে। রামায়ণ মহাভারতের গল্প অথবা রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা করে যাচ্ছে আর ওরা কেউ জিলিপি খেতে খেতে, কেউ হাতের দুগাছ সোনালি রঙের চুড়ি দেখতে দেখতে রাম-রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর ওরা নিজেদের জীবনে এইসব আখ্যায়িকার হুবহু পূর্ণ বিকাশে ক্রমে এভাবে ডুবে যায়। এইভাবে এক প্রাচীন শিল্প আমাদের জন-জীবনে যে লোকশিক্ষার ভার নিয়েছিল আজ তা লুপ্ত হতে বসেছে।

যে তিনজন পটুয়া এসেছিলেন, দেখলেই মনে হবে ওদের শরীরে আর তেমন ঋজুতা নেই। দোমড়ানো চেহাড়া। অভাবি মানুষ। জামা গায়ে ওঠে না সাধারণত। কলকাতায় আসবে। আহা কি বড় মহান নগরী এই কলকাতা! জব চার্ণকের নগরীতে এত সমারোহ! ওরা তো বেশী দূরে যায়নি। খুব জোড় ওরা হয়তো গেছে মহিষাদলের রাজার বাড়ি, কারণ ওদের বাড়ি যেতে গেলে সেখান থেকে পায় হেঁটে দশ ক্রোশের উপর যেতে হয় অথবা আরও দূরে এমন এক জনমানিষার দেশে যেখানে মানুষ নিশীথে শুধু নক্ষত্রের আলোতে আহার করে। ওরা অর্থাৎ এই তিন পটুয়া বীরেন, পঞ্চানন এবং সেই তরুণ যুবক যে এখনও কঠিন স্বর গলায় বেঁধে রেখেছে—সে গাইছিল নহুষের আখ্যান। রাজা নহুষ সম্পর্কে যার গান গোটা পরিষদের হলকে মাঝে মাঝে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। দেখলেই মনে হবে ওদের, ওরা জোর এসেছিল তমলুক শহরে অথবা পাশকুরা রেল স্টেশনে। কিন্তু রেল স্টেশনে এসেই যখন ওরা ট্রেণের কামড়ায় চড়ে বসল— তখন ওরা নিজেরাও বুঝি কিছু সময়ের জন্য নহুষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা এক রাজার বাড়ি দেখেছে, এখন এই কলকাতায় হাজার হাজার রাজার বাড়ি, যার শেষ নেই, যার সীমা নেই। এত সব রাজার বাড়ি দেখে ওরা বিস্মিত অথবা এমন যে এ নগরী, যার আলো ওদের চোখে আশ্চর্য রকমের নীল মনে হয়েছিল। ডায়াসে ওঠে ওরা এখন নিজেরাও বুঝি নীল হয়ে গেছে অথবা তিনজন তিন নহুষ হয়ে বসে রয়েছে।

এইভাবে আমাদের পটশিল্প, যে সব পটে রয়েছে জটায়ু কর্তৃক রাবণের রথগ্রাস, রাবণ সভায় হনুমান, তারকাসুর বধ, রাম-সীতার বিবাহ এবং সেই যে ১৯৩০ সালে কাকদ্বীপে জাহাজডুবী হল, কত লোক ভেসে গেল সাগরের জলে, পটে এমন সব ছবির বর্ণনা দিয়ে পটুয়ারা কত না রোজগার করত একদা—আজ মৃতপ্রায় এই শিল্পকে আবার জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য সাহিত্য পরিষদ অনেক ভাল কাজের ভিতর আরও একটা ভালো কাজ করলেন। নিজেকে নিজে আর কি অভিনন্দন জানাবো। তবু যারা এই উৎসবের মূলে ছিলেন, যেমন ডেভিড ম্যাকাচ্চি, তারাপদ সাতরা এবং হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁদের অভিনন্দন জানানোর গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এবং তিনজন শিল্পী এসে আমাদের এই জড় শহরে গ্রামের ফল ফুলের শোভা এঁকে গেলেন মুহূর্তের জন্য, তাঁদের আর অভিনন্দন জানিয়ে খুব সহজ চালে বাজিমাত করতে চাই না।

—রূপকার

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

লছমী দেবীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।
তিনি প্রথমটা কিছু বলতে পারলেন না। মুখে তাঁর একটা যেন ভয় আর কাতরতার ছাপ।
স্বাভাবিক লজ্জা হওয়া সম্ভব। কিন্তু ভয়টা কিসের?
কিছু একটা সত্যিই যেন ভয়ের কারণ মনে হয়।

রতনলাল তাকে অনেক করে সাহস দিল।
চুপ করে থেকো না লছমী। যা সত্য তা বলতে ভয় কিসের?
তুমি ত অন্যায় কিছু করছ না। নিজের মুখে সত্যি কথাটা ওঁকে বলে দাও!
লছমী দেবী অনেক কষ্টে মাথা নীচু করে এবার বলে গেলেন।
আমি চাচাজি বলি। কিন্তু আমি উঁর আপনার কেউ নই।

আপনার কেউ নয়! তাহলেও কোনরকম আত্মীয়তা ত আছে?
বলো লছমী, সত্য কথাটা জানালে শিউপ্রসাদজি তোমায় ত আর ফাঁসি দিতে পারবেন না। তুমি এখন আমার স্ত্রী।
চাচাজি — চাচাজি আমায় ছোটবেলায় কিনে নিয়েছিলেন।
কিনে নিয়েছিলেন! সে আবার কি ব্যাপার?

অঙ্গনা

ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন ও নারী

পুরুষের জীবনে নারী বিরাট প্রেরণা। ...ত আর অবসাদ যখন চারিদিক থেকে ...বনকে নিরাশার ঘন অন্ধকারে ছেয়ে ...ল তখন নারী তাকে যোগায় উদ্দীপনা। ...ষ ফিরে পায় হৃতবল। নতুন উদ্যমে ...র লাভ করে অভাবিত সাফল্য।

এমনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই। পৃথিবীর ...সংখ্য বিরাট প্রতিভার পেছনে দাঁড়িয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে মহিমান্বিত নারী চরিত্র। লেনিন শতবর্ষে প্রথমেই মনে ভিড় করে আসে মাদাম ক্রুপস্কায়ার কথা। বিশেষ সর্বপ্রথম সর্বহারা বিপ্লবের কীর্তিমান পুরুষের জীবনে মাদাম ক্রুপস্কায়ার অবদান অবিস্মরণীয়। বিপ্লবের পথেই লেনিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঃ পরিণয়। লেনিনের সাধনাকেই তিনি নিজেরও সাধনা বলে গ্রহণ করেন। আর সারা জীবন ক্রুপস্কায়া ছিলেন তাঁর সংগ্রামী-সহায়ক।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন কারান্তরালে। পারিবারিক জীবনের কথা হয়তো তাঁর মনে পড়তো। দেশের চিন্তা বেশিক্ষণ মনে স্থান পেতে পারতো না। এটুকু সম্ভব হওয়ার পেছনে কমলা নেহরুর অবদান খুব সামান্য নয়। তিনি স্বামীকে স্পষ্টই বলতেন, আমার চেয়ে দেশের চিন্তাই তোমার কাছে বড় হওয়া উচিত। একবার কমলা নেহরু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন—প্রায় মৃত্যুশয্যায়। জওহরলাল জেলে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনুমতি দিতে রাজী হয় সর্ত-সাপেক্ষে। কিন্তু কমলা নেহরুর পরামর্শে তিনি সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন।

শুধু রাজনীতি নয়, জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই নারীর প্রেরণা পুরুষকে এগিয়ে যাওয়ার সাহায্য করে। হয়তো একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে কোন কোন মানুষের সাফল্যের আসল চাবিকাঠিটি হলো তার স্ত্রী। আবার শুধু স্ত্রী কেন, সামগ্রিকভাবে গোটা নারীসমাজও এ-কাজে অনেকখানি অগ্রণী। মনে করা যাক, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ব্রিটেনে ভোটাধিকার আন্দোলনে নারীসমাজের তৎপরতার কথা। সেদিন তাঁরা দাবীর প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাউস অব কমন্সের রেলিং-এর সঙ্গে নিজেদের শৃঙ্খলিত করেছিলেন। এ-ঘটনা থেকে এটুকু অনুমান করা যায়, নারী যেমন ব্যক্তিগত জীবনে প্রেরণা তেমনি নারীসমাজ। এরই প্রতিক্রিয়া আজ ব্রিটেনের নারীসমাজ ভোগ করছে। মহিলা নির্বাচন প্রার্থী, পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য বা মহিলা মন্ত্রী—এ-সবে আমরা এতো বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে এগুলি আর খবরের একটা বিশেষ মর্যাদা আমাদের কাছে পায় না। বিশেষ ভারত এবং সিংহলের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ই যখন মহিলা। অবশ্য একথা সত্য যে ব্রিটেনে এখনও প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে কোন মহিলা রাজনীতিবিদের স্থান হয়নি। আর অদূর ভবিষ্যতে এরকম সম্ভাবনাও সে দেশে নেই। ১৯২৪ সালের পর থেকে অর্থাৎ হাউস অব কমন্সে প্রথম মহিলা আসন গ্রহণ করার পর থেকে সেদেশে এপর্যন্ত ছাব্বিশজন মহিলা মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীও ছিলেন এঁদের মধ্যে।

অনেকের ধারণা যে, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিই শুধু মহিলা মন্ত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। কিন্তু এ ধারণা খুব ভুল। বর্তমান মন্ত্রিসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন মিসেস বারবারা কাসল। তিনি ফার্স্ট সেক্রেটারী অব স্টেট এবং সেক্রেটারী অব স্টেট ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকটিভিটি পদে রয়েছেন। এই দপ্তরের কাজ হলো শ্রমিক-মালিক এবং রপ্তানি বৃদ্ধি সংক্রান্ত। যথেষ্ট কঠিন কাজ। তিনি মন্ত্রী হিসাবেও নিজের যোগ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন ইতিপূর্বেই। পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে তিনি এমন কিছু আইন প্রণয়ন করেন যাতে যথেষ্ট সাহসিকতার প্রয়োজন। কারণ এসব অপ্রিয় আইন প্রণয়ন করে জনপ্রিয়তা হারানোর সম্ভাবনা কম নয়।

মন্ত্রিত্বে ব্রিটেনের মহিলাদের ভূমিকা তেমন গৌরবমণ্ডিত না হলেও সামগ্রিক ভাবে রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্ব অসীম। এদিকটা বিশেষভাবে ধরা পড়ে সাধারণ নির্বাচনের মুহূর্তে। এটা অবশ্য তেমন নতুন কথা নয় যে, নির্বাচনপ্রার্থী বা মন্ত্রীদের নির্বাচনে স্ত্রীর সাহায্য পাবেন। এটা অধিকাংশ দেশেই সত্যি যে, নির্বাচনের সময় তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইস্তাহার বিলি করেন, ভোটারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং চিঠিপত্র লিখে নির্বাচনী অভিযানে সাহায্য করেন। আরো নানাভাবে তাঁরা স্বামীদের সাহায্য করে থাকেন। তাঁরা স্বামীদের কেন্দ্রে মহিলা সংস্থায় বক্তৃতা দেন, স্কুলের ছেলেমেয়েদের পুরস্কার বিতরণ করেন, নানাবিধ অর্থ-সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন।

অবশ্য এমন স্ত্রীও আছেন, যাঁরা মনে করেন, রাজনৈতিক বা সর্বজনীন ক্রিয়াকাণ্ডে তা সে যে জাতীয় হোক না কেন, তাঁরা নিজেদের যত কম জড়িয়ে ফেলবেন তাদের স্বামীদের পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁরা মনে করেন, এসব অনুষ্ঠানে দৈবক্রমে তাঁরা এমন মন্তব্য করে ফেলতে পারেন যা তাঁদের স্বামীদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

এসব তো আছেই। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটেনে মেয়েদের পক্ষে যা সবচেয়ে গর্বের তা হলো যে নির্বাচনের প্রচারকার্যে তাঁরাই মুখ্য অংশ নেয়। রাজনীতির চাকাকে চলমান রাখতে হাজার হাজার মহিলা এভাবে কাজ করে চলেছেন।

অনেক মহিলা নির্বাচন কেন্দ্রে পার্টি এজেন্ট নিযুক্ত হন। এটা কোন সৌখীন কাজ নয়। সকল পার্টিই অনেক ভেবেচিন্তে তাঁদের এজেন্ট নিযুক্ত করেন। কারণ, এজেন্টদের উদ্যোগ, ব্যক্তিত্ব ও পরিশ্রমের উপর প্রার্থীদের জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে।

পার্টি এজেন্টদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণ সময়ের কর্মী এবং বেতনভোগী। তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত এবং পূর্ণ সময়ের কর্মী। প্রায়ই পাশ করা। পার্টি সদর দপ্তর থেকে সাফল্যের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সার্টিফিকেট যাঁর আছে, বুঝতে হবে তাঁর নির্বাচন সংক্রান্ত আইন-কানুন ভালোই জানা আছে।

নির্বাচনী এজেন্টদের চাই ধৈর্য, সুতীক্ষ্ণ নজর, বিশ্বস্ততা, এবং লোক-জনের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা। ক্রমেই দেখা যাচ্ছে মহিলারাই ভাল এজেন্ট হতে পারেন। বর্তমানে ব্রিটেনে সত্তরজন প্রার্থীর নির্বাচন কেন্দ্রে মহিলা এজেন্ট রয়েছেন। এ'দের মধ্যে ৬০ জন শ্রমিক দলের, সাতজন রক্ষণশীল দলের এবং ৩ জন উদারনৈতিক দলের। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত শ্রমিক দলের জাতীয় নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন মিস সারা বার্কার। তাঁর কাজ ছিল সারা দেশে পার্টি সংগঠনের তদারকি করা।

কেন্দ্রে এজেন্টই তাঁর এলাকায় পার্টির মুখ্য সংগঠক। তিনি তাঁর দলের স্থানীয় এম-পি'র কার্যকরী সহকারী এবং কেন্দ্র সমিতির সম্পাদক। এজেন্টদের কেন্দ্র এলাকায় বাস করতে হয়। কিন্তু নির্বাচন-প্রার্থী বা পার্লামেন্ট সদস্য অনেক সময় তাঁর নির্বাচনী এলাকায় বাস করেন না। সেজন্য এজেন্টের কাজ স্থানীয় পার্লা-মেন্টের সদস্যকে তাঁর এলাকার সমস্যা ও প্রবণতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা যাতে তিনি উপযুক্তরূপে জনপ্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

এমনি সময়েও এজেন্টদের ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু নির্বাচনের মুখোমুখি তাঁর কাজের চাপ পড়ে খুব বেশি এবং কাজও হয় বিশেষ ধরণের। এসময় এজেন্টকে তাঁর প্রার্থীর ম্যানেজারের ভূমিকা নিতে হয়। নির্বাচনের আইন-কানুন এবং কলা-কৌশল সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। তাই নির্বাচনী অভিযানের ব্যবস্থা, সভা আহ্বান, ঘরে ঘরে প্রচার, পোস্টার, ইস্তাহার—এই সমস্তই এজেন্টদের তদারকিতে হয়ে থাকে।

ব্রিটেনের নির্বাচন কঠিন নিয়মে বাঁ[illegible] এবং এজেন্টদের কাজ হলো সমস্ত নি[illegible] ঠিকমতো প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা নজ[illegible] রাখা। বিশেষভাবে তাঁকে দেখতে হ[illegible] নির্বাচনী ব্যয় আইনসিদ্ধ হচ্ছে কিনা প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খরচের হিসেব রাখতে হয়।

এজেন্টদের আর একটি কাজ হলো পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এ-কাজ তিনি করেন মেলা, শিল্পকর্ম বিক্রয়, পার্টি ইত্যাদির মাধ্যমে এবং সমর্থকদের কাছে আবেদন করে।

এসব 'ঘর গোছানো'র কাজ মেয়েরাই এখন ভাল পারে। এজন্য এজেন্টদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। পার্টিগুলিও মেয়েদের উপরই গুরুত্ব দিচ্ছে দিনে দিনে।

—প্রমীলা

আমের আচার

আমের ছেঁচা চাটনি—কাঁচা বড় রসালো আম দুটি, চারশোগ্রাম চিনি, গোলাপি আতর, বড় এলাচ চারটি। আমের মুখটি বড় করে কেটে পাঁচ সাত মিনিট জলে ভিজিয়ে রেখে, তারপর একটু মোটা কোরে খোলা ছাড়িয়ে ফেলতে হবে। খোলা পরিষ্কার কোরে ছাড়ানো হবে, আমের গায়ে যেন খোলার সবুজ সবুজ দাগ না থাকে। এইবার আমের গা চেঁচে চেঁচে শাঁস সব কেটে (একটু মোটা মোটা চাঁচা হবে) গামলা'র জলে ভিজিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পাত্রে তুলে অথবা একটি ঝুড়িতে রেখে জল ঝড়িয়ে ফেলা। জল ঝরে গেলে বাটনাবাটা শিলে আমগুলি থেঁতো কোরে নিন। শিলটি সোডা অথবা তেঁতুল দিয়ে বেশ কোরে ধুয়ে নেওয়া দরকার আম ছেঁচবার আগে। আমগুলি ছেঁচা হয়ে গেলে একটি পরিষ্কার কাপড়ে রেখে নিংড়ে আমের কাঁচা রস কিছু বার কোরে নিন। রস বার করার পর আমের পরিমাণ অনুযায়ী পাত্র নিয়ে তাতে চারশো গ্রাম চিনি দিন এবং ঐ ছেঁচা আম সবটা নিয়ে বেশ কোরে চিনির সঙ্গে মেখে নিয়ে তারপর উনানে বসিয়ে দিন। দেখা যাবে আস্তে আস্তে ফুটছে এবং আমের রস বেরিয়ে আসছে। যদি দেখা যায় রস তেমনভাবে বেরুচ্ছে না, তাহলে আধ কাপ জল দিন। কিছুক্ষণ ফুটতে থাকুক ও মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন, একটু সময় নামিয়ে রাখুন, আবার উনানে চাপিয়ে দিন। এইবার দেখা যাবে ফুটতে ফুটতে বেশ ঘন হয়ে আসছে ও হাতে কোরে দেখলে বোঝা-যাবে চটচটে লাগছে। চটচটে না লাগলে আরো কিছুক্ষণ ফুটবে। তা বোলে খুব বেশী যেন ফোটানো না হয়। কড়াপাক হলে রং লালচে মত হয়ে যাবে। এইবার আচার ঠাণ্ডা কোরতে দিন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে একটু খেয়ে দেখা দরকার যে, মিষ্টিটা ঠিক হয়েছে কি-না। আচারের নিয়ম হল চিনি কম হলেই শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। টক থাকলে আর একটু চিনি দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া, নাহলে প্রয়োজন নেই। ঠাণ্ডা হয়ে এলে চারদিন রোদে দিন। এরপর বড় এলাচের দানাগুলি বেশ পরিষ্কার কোরে ছাড়িয়ে দানাগুলি আলাদা আলাদা কোরে এর মধ্যে দিন, তিন চার ফোঁটা আতর দিয়ে নেড়ে-চেড়ে তুলে রাখুন। কিছুদিন যাবার পর ঐ বড় এলাচের দানা ও আতরের সংমিশ্রণে ভারীসুন্দর একটা সুগন্ধ হয়েছে এবং স্বাদও চমৎকার হবে। আমের এই ছেঁচা চাটনি কোরতে চিনিও কিছু কম লাগে যদি আমগুলি খুব টক না হয়।

আবার ঐ ছেঁচা চাটনিতে বড় এলাচ আতরের বদলে, একটা ছোট শুকনো লঙ্কা, সামান্য সাদা জিরে একটু ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে ওতে দিলে আর একরকম চমৎকার স্বাদ হয়।

আমের খোট্টাই আচার—দুটি বড় কাঁচা আম, চিনি পাঁচশো গ্রাম, দেড়শো কিসমিস, পঞ্চাশ গ্রাম আদা, গোটা পঁচিশ তিরিশ লবঙ্গ, বড় শুকনো লঙ্কা দেড়খানা। প্রথমে আমের মুখটি কেটে জলে ভিজিয়ে রাখা, আঠা ধুয়ে গেলে খোলা ছাড়িয়ে ফেলা। তারপর আমের গা চেঁচে লম্বা লম্বা টুকরো কোরে সেগুলিকে ছোট ছোট আকারে টুকরো কোরে নিতে হবে। গা চেঁচে আমের শাঁসটা নেবার পর আঁটিটা আলাদা হয়ে যাবে। আঁটি আলাদাই থাকবে। টুকরো আমগুলি জলে ধুয়ে, জল ঝরিয়ে রাখুন। কিসমিসগুলি বেছে জলে ধুয়ে আলাদা শুকিয়ে নিন, লবঙ্গর ফুলগুলি মাথা থেকে ছাড়িয়ে আলাদা রাখুন, আদার খোসা ছাড়িয়ে লম্বালম্বিভাবে সরু সরু কোরে কুচিয়ে আলাদা রাখুন. শুকনো লঙ্কা দেড়-খানা বিচি ও শির বাদ দিয়ে খুব সরু সরু কোরে গোলমত কুচিয়ে নিন।

এইবার অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ঐ চিনি, আধ কাপ আন্দাজ জল দিয়ে বসিয়ে দিন। রসটি ফুট ধরলে আস্তে আস্তে আমের টুকরোগুলি ছেড়ে দিন। [illegible] পরে পরে নাড়তে থাকুন। চামচ [illegible] কাঠের খুন্তি দিয়ে। মাঝে মাঝে নামিয়ে একটু রেখে ফের ফুটতে দিন। এই রকমভাবে দু'এক-বার নামিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। প্রথমে নামাবার পর কিসমিসগুলি দেওয়া হবে, দ্বিতীয়বার নামাবার পর লবঙ্গ, আদার কুচিগুলি দিয়ে আর একটু গাঢ় কোরে নিয়ে নামিয়ে রাখুন। হাতে কোরে নিয়ে দেখুন রসটা চটচটে লাগছে কি-না এবং আদা, লবঙ্গ মিশে বেশ একটা সুগন্ধ বেরুচ্ছে কি-না। এইগুলি হলে বোঝা যাবে আচারটি তৈরী হয়ে এসেছে। চার পাঁচদিন রোদে দিয়ে লঙ্কার কুচিগুলি দিয়ে বোয়ামে ভরে দিন। এই খোট্টাই আমের আচারটি খেতে বড়ই চমৎকার। কিসমিস, লবঙ্গ, আদার এবং লঙ্কার সংমিশ্রণে এর স্বাদ হয় অন্যরকম। অনেক সময় কুচোনো শুকনো লঙ্কার বদলে আস্ত আস্ত পনেরো, ষোলটা কাঁচা লঙ্কা শেষের দিকে দিয়ে নামিয়ে নিলে আরও স্বাদ ভাল হয়। লুচি, রুটি, পরটা দিয়ে খেতে হয়। কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি ইত্যাদি দিয়ে খেতে হলে, চিনির ভাগ কম দিয়ে আদা লঙ্কার কুচি একটু বেশী দিয়ে কোরে খেতে দিলে তবেই বেশী ভাল লাগবে।

—হেমপ্রভা মল্লিক

বেতারশ্রুতি

অনুষ্ঠান-পর্যালোচনা

কথাটা কি "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর ..."?... "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"-র পরের ...টা কি "ধর্ম্মং শরং গচ্ছামি"? প্রথমটার ...তন" স্থলে "পাতন" হবে না তো? ...তীয়টায় "ধর্মং" স্থলে "ধম্মং"?

২৪ মে বিকেল সাড়ে ৫টায় গল্প-...র আসরে "ভগবান বুদ্ধের কথা" ...তে গিয়ে শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" বলেছিলেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"-র পরে "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" বলেছিলেন। তাই এই প্রশ্ন।

শ্রীচক্রবর্তী বুদ্ধের "দুই অন্যতম শিষ্য"-র কথাও বলেছিলেন। "অন্যতম" অর্থ কি "বিশিষ্ট"? না বোধ হয়। "অন্যতম" অর্থ "বহুর মধ্যে এক" বলেই তো জানি। তাহলে "দুই অন্যতম শিষ্য" অর্থ কী দাঁড়ায়?

কথিকাটি এমনিতেও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি।

রেডিওর বড়ো জিনিস বেটা—বলা, সেই বলা হয়নি এতে, পড়া হয়েছে। একটা কিছু দেখে পড়া। তাই তেমন খুশি হওয়া যায় নি।

স্ক্রিপ্টটা অবশ্য মোটামুটি ভালোই বলা চলে।

২৫মে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন শ্রীমতী কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা। বেশ লাগল। শিল্পী বেশ আন্তরিকভাবে, দরদ দিয়ে গেয়েছেন।

২৯মে রাত ৮টায় অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক "তপস্বী কন্যা"। মূল কানাড়ী ভাষায় রচনা শ্রীবেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার, বাংলা রূপান্তর শ্রীপ্রদ্যোত-কুমার সরকার।

নাটকের নামে এইরকম সব ক্লান্তিকর পদার্থ কর্ণাধঃকরণ করে শরীর মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ আছে কিছু? শুক্রবার নাটকের দিনটা এমনি করে মাটি না করলেই নয়? কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মে অখিল ভারতীয় কার্যক্রম যখন করতেই হবে এবং তাতে নাটকের নামে এমনি সব পদার্থ প্রচার করতেই হবে তখন শুক্রবার নাটকের দিনটাকে রেহাই দিয়ে অন্য কোনোদিন তা করা যায় না? আগে তো অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক প্রচারিত হত বৃহস্পতিবার, শুক্রবার দিনটা পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটকের জন্যই বরাদ্দ থাকত। এখন আবার তা করা যায় না!

৩০মে সকাল ৮টায় শ্রীমাখনলাল সরকারের লোকগীতির মধ্যে মাটির টান পাওয়া গেল, মাটির সুর। ভালো লাগল।

৩১ মে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী ঋতু গুহর রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটি ভালোই লাগল। অনুষ্ঠান শেষ হলে ঘোষিকা ঘোষণা করলেন, "এতক্ষণ রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন ঋতু গুহ। আজ রাত ১০টায়, ১০টা ৩০ মিনিটে আবার ইনি রবীন্দ্রসংগীত শোনাবেন।" কিন্তু রাত ১০টায় এঁর রবীন্দ্রসংগীত শোনা যায় নি। রাত ১০টায় মঙ্গলবার ছাড়া প্রত্যহ সংবাদ পরিক্রমা প্রচার করা হয়, এদিনও তা-ই হয়েছিল।

এইদিন সকাল সওয়া ৮টায় আধুনিক গান শোনালেন শ্রীমতী উৎপলা সেন। বেশ লাগল।

সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে প্রচারিত হল একটি নকশা—"ফুলের দেশে"। রচনা শ্রীঅশোক শী, পরিচালনা শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক, আর পরিবেশনা প্রবন্ধ শিশু আসরের শিল্পিবৃন্দ। সুরসংযোজনায় ছিলেন শ্রীপ্রিয়লাল চৌধুরী, কিন্তু গোড়ার ঘোষণায় তাঁর নাম বলা হয় নি।

নকশাটি শুনে যতখানি খুশি হওয়া যাবে ভাবা গিয়েছিল, ততখানি খুশি হওয়া যায় নি। কথ্য ভাষা মাঝে মাঝে শিশুদের উপযোগী ছিল না, কথাগুলো যেন বেশ কষ্ট করেই তাদের বলতে হয়েছে। তারা অনেক সময় নিশ্বাস বন্ধ করে মুখস্থ বলার মতো বলেছে। তবে গানের অংশ শুনে খুশি হওয়া গেছে। শিশুরা গেয়েও যেন আনন্দ পেয়েছে।

নকশাটির বিষয়বস্তু মোটামুটি প্রশংসনীয়।

১ জুন সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ছিল রবীন্দ্রসংগীত। যিনি গাইলেন তাঁর নাম রণ গুহ ঠাকুরতা, না রাণা গুহ ঠাকুরতা? বেতার ঘোষণায় বলা হয়েছে রণ গুহ ঠাকুরতা, আর বেতারজগতে ছাপা হয়েছে রাণা গুহঠাকুরতা। তবে বেতার আর বেতারজগতের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বিলক্ষণ বুঝেছেন ভদ্রলোক রাণা নন, রণ। রণ বেতারজগতের কারখানায় গিয়ে রাণা হয়েছে। কেমন করে হয়েছে?—ইতিপূর্বে অনেকবারই এই বিভাগে বলেছি যে, বেতার দপ্তর থেকে বেতারজগত দপ্তরে অনুষ্ঠানসূচী যায় ইংরেজীতে। ইংরেজীতে রণ কিংবা রাণা, যাই লিখুন না কেন, লিখতে হবে Rana

বেতার দপ্তর রণ ভেবে Rana লিখে পাঠালেন, আর বেতারজগত দপ্তর তাকে রাণা ভাবলেন, রাণা ছাপলেন। কারও ভাবনার মধ্যেই দোষ নেই। সুতরাং উভয় পক্ষই নট গিলটি প্লীড করতে পারেন। তাহলে গিলটি কারা?—কেন, আমরা, শ্রোতারা!

কিন্তু আমরা শ্রোতারা তো বেতার দপ্তরকে বলতে পারিঃ মশাইরা অনুষ্ঠান-সূচীটা বাংলায় লিখে বেতারজগতে পাঠান—অন্তত, যেসব জায়গায় গোলমাল হবার সম্ভাবনা সেইসব জায়গায় ইংরেজীর পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে বাংলা লিখে দিন! কারণ, এই রকম গোলমাল তো এই প্রথম হল না, এর আগেও অনেক বার হয়েছে—এবং তা নিয়ে লেখাও হয়েছে এই বিভাগে।

২ জুন বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে দিল্লীর খবর এল কবন্ধ হয়ে। তার মাথাটা পাওয়া গেল না। মাথায় যে থাকে 'আকাশবাণী, এখন খবর পড়ছি...,' এই খবরে তার কিছুই ছিল না।

৬ জুন সকাল সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে টেলিকমিউনিকেশনের বাংলা করা হল—টেলিযোগাযোগ। ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে অকারণে এই রকম একটা জগাখিচুড়ি করার কোনো দরকার আছে কি? পুরো বাংলা করা যায় না? টেলি-র বাংলা তো দূরঃ টেলিফোন—দূরভাষ, টেলিগ্রাফ—দূরলিখ, টেলিভিশন—দূরেক্ষণ (দূরে+ঈক্ষণ), টেলিস্কোপ—দূরেবীক্ষণ ইত্যাদি।...আর মিউকোমিউনিজিনিসটা কী? উচ্চারণটা সঠিক হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

—শ্রবণক

জলসা

গ্রামোফোন ডিস্কে নজরুল জয়ন্তী: বৈশাখে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর রেশ না মিলাতেই জ্যৈষ্ঠ্য এল অনুজ কবি নজরুলের আবির্ভাব লগ্নকে স্মরণ করে। বিদ্রোহী কবির গজল-অংশের রোমান্টিক দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছিল তরুণ শিল্পীদের কণ্ঠে। এল পি ডিস্ক বাদ দিলে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়া তেমন সু-প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কেউ নেই। কিন্তু এ'রা যে প্রতিশ্রুতিবাহী সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

এল পি ডিস্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হলেন ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। বহুকাল পূর্বে নজরুল-গীতির অন্যতমা গায়িকা শ্রীমতী হরিমতীর গাওয়া সু-বিখ্যাত গান—'ঝরা ফুল দলে কে অতিথি' এবং 'গুলবাগিচার বুলবুলি' গান দুটি শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত উজ্জ্বলতা। গাইবার আবেগ এবং পরিশীলিত কণ্ঠের সুরেলা ইঙ্গিতে যেন প্রাণ কেড়ে নেয়। গজলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও লয়ের মোড় ঘোরার কারিগরী অক্ষুণ্ণ রেখেও সুরের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ তারিফ করবার মত। 'ঝরা-ফুল-দলে'—গানটির উপসংহারিয়ে সঙ্গীতে 'চোখে কি মায়া'র অণুরণণ যেন গানটির বক্তব্যের প্রতি আলোকপাত করে। শেফালী ঘোষ—গীত 'তোমার মুখের ফুলদানীতে' এবং 'এলো কৃষ্ণকানাইয়া'—সু-গীত। গুপী-গায়েন-বাঘা-বায়েনের সুবিখ্যাত শিল্পী অনুপ ঘোষালের 'না মিটিতে সাধ' এবং 'করুণ কেন অরুণ আঁখি' শ্রোতাদের আনন্দ দেবে।

পূরবী দত্ত তাঁর যথাযথ মান বজায় রেখেছেন 'আমার যাবার সময় হোলো' ও 'পরদেশী মেঘ' গান দুটিতে। প্রতিটি গান শ্রীমতী আঙ্গুরবালার পরিচালনাধীন করে কোম্পানী প্রবীণা জনপ্রিয় শিল্পীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

গীতি-গান-শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর স্ব-ধর্মের অনুকূল দুটি ভক্তিমূলক গান বেছে নিয়েছেন। গান দুটি হোল 'চিরদিন কাহারও' ও 'কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান'। বলা বাহুল্য শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির আবেগে এ গান মর্মস্পর্শী হতে সময় লাগেনি।

দুটি ই পি ডিস্কের মধ্যে একটিতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের চারখানি গান 'আজকে না হয়', 'কেনো আমার' 'আসিলে ভাঙ্গা ঘরে' এবং 'খেলো খেলোগো' শিল্পীর স্বকীয়তায় ব্যক্ত।

অন্যটি কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীর সঙ্গীতোপম কণ্ঠে কবির তিনটি সুন্দর কবিতা 'হে সর্বশক্তিমান', 'আর আর বাঁশী না বাজে' এবং 'জাতের নাম বজ্জাতি'—যেন কবির অন্তরের বিদ্রোহ, অভিমান ও অবসন্ন মনের ক্লান্ত বৈরাগ্যকে জীবন্ত করে তুলেছে। একটিমাত্র এল পি ডিস্কে ফিরোজা বেগমের দশখানি গানে নজরুলের রাগসঙ্গীত, আধুনিক গান, কাব্য-সঙ্গীত, চিত্রগীতি, গজল, আরবী ও ভাবগীতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ মেলে।

সুর ও ছন্দ সম্প্রতি শ্রী ও শ্রীমতী নীরেন্দু হালদার আয়োজিত মধ্য কলিকাতায় নিবেদিত সুর ও ছন্দ অনুষ্ঠান একটি সন্ধ্যাকে সুর-ছন্দের দোলায় যেন উতলা করে তুলেছিল। আসর সুরু হয় রবিশঙ্করের তরুণ শিষ্য সলিল চক্রবর্তীর সেতার মাধ্যমে। ইনি সুরু করে 'বেহাগ' দিয়ে। আলাপের অঙ্গে সুসংবদ্ধ। গৎ-এর মুখটি আলাউদ্দিন ঘরানার ধ্রুপদী মর্যাদায় পূর্ণ। তানের সঙ্গে রবিশঙ্করী বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই। বিস্তারে আর একটু সামঞ্জস্যবোধ এলে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী পর্যায়ে উন্নীত হতে এ'র দেরী হবে না। মীড়ের কাজ ও বাজ প্রশংসা করবার মত। শিল্পীজনোচিত মেজাজের পরিচয়প্রাচুর্য ছিল শেষের সু-রচিত ধুন দুটিতে। উপযুক্ত তবলা সঙ্গতে এ অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন কমলেশ মিত্র। সঙ্গতের পরই তবলার যাদুকর কমলেশ মিত্রের 'তবলা-তরঙ্গ'—ছন্দের আধারে সুর-তরঙ্গের এক আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ। ইনি বাজান 'কিরবাণী'। তালুর প্রতিটি আঘাতে প্রতি স্বর যেন কথা বলে ওঠে। আর স্বর-সমন্বয়ের মধ্যে ধরা দেয় রাগের করুণ মাধুরী, নিরুদ্দিষ্ট হৃদয়ের ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা। কখনও মৃদু টোকা কখনও দৃপ্ত গম্ভীর নিনাদে সুরের ওঠাপড়া, ছন্দের বিদ্যুৎ শিল্পী-হৃদয়ের কল্পনার জোয়ার যুগপৎ চমক ও কমনীয়তার এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আসন্ন-উৎসব

আগামী ৩০শে জুন সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র-সদনে আয়োজিত একক নজরুল-গীতির অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের নজরুল-গীতি পরিবেশন করবেন ধীরেন বসু। শিল্পীর সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করবেন রাধাকান্ত নন্দী (তবলা) অলোক দে (বাঁশী)। আবৃত্তি ও ভাষ্যে থাকবেন কাজী সব্যসাচী ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৭শে জুন ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার রবীন্দ্রসদনে দশম-বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে লো[illegible] নাট্যের এক পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান করবেন।

বর্ষামঙ্গল: [illegible] প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতার (মো[illegible] নবোদয় শিল্পীগোষ্ঠী গত ১৬ [illegible] সন্ধ্যায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠান ও 'বর্ষামঙ্গল' নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে [illegible] প্রথম বর্ষের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত ক[illegible] বর্ষামঙ্গলের রচনায় ছিলেন শ্রীধী[illegible] চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থনায় শ্রীবীরেশ্বর [illegible] পাধ্যায় ও শ্রীমতী সুনন্দা দত্তচৌধ[illegible] নৃত্য পরিচালনায় কুমারী বন্দনা ভট্ট[illegible] ও সঙ্গীত পরিচালনা ও রবীন্দ্রস[illegible] তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রীসৌরেন পাল। ন[illegible] ও সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করেছিলেন কু[illegible] বন্দনা ভট্টাচার্য, চিত্রা ভট্টাচার্য, [illegible] ভৌমিক, শর্মি[illegible] মুখার্জি, মহা[illegible] মুখার্জি, বীরে[illegible] চট্টোপাধ্যায়, পূ[illegible] ভট্টাচার্য, তাপস [illegible]চার্য, সুশান্ত ভট্টা[illegible] আল্পনা ভট্ট[illegible], শিখা দত্তচৌধুরী [illegible] মালা ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির [illegible] পনায় ছিলেন শ্রীনির্মাল্য ভট্টাচা[illegible]

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব: সম্প্রতি [illegible] নারায়ণপুর হিন্দুস্থান কেবলস ক্লা[illegible] উদ্যোগে মহা সমারোহের সঙ্গে রবী[illegible] জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়। [illegible] অনুষ্ঠানের এক বিশেষ আকর্ষণ [illegible] কুলটির সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'উ[illegible] চক্র' নিবেদিত নৃত্যনাট্য 'উৎসবে অন্তরালে' শ্রীসমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী রচিত ও প[illegible] চালিত এই পরীক্ষামূলক নৃত্যনাট[illegible] মূকাভিনয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং [illegible] প্রয়োগ-চিন্তায় এক উচ্চশ্রেণীর শি[illegible] সৃষ্টির দাবী রাখে। গ্রন্থনায় ছিলে[illegible] শ্রীকাজল লাহিড়ী।

সম্প্রতি চেতলার 'আমরা সবাই' এ[illegible] মনোজ্ঞ রবীন্দ্রসংগীত অনুষ্ঠান করে[illegible] তাঁদের নিজস্ব প্রাঙ্গণে।

এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠ প্রশং[illegible] পায় 'অন্তরঙ্গ'। নৃত্যে কুমারী ম[illegible] মুন দত্ত ও চন্দ্র সর্বাধিকারী কৃতিত্বে[illegible] পরিচয় দেন। নৃত্য পরিচালনা করেন শ্রীমত[illegible] মনমুন দত্ত। কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রীমতী অনুরূপ[illegible] ঘোষ ও বুলাই রক্ষিত অনবদ্য। যন্ত্রসঙ্গীতে সুন্দর সহযোগিতা করেন শ্রীরামমোহ[illegible] ভট্টাচার্য।

—চিত্রাঙ্গদ[illegible]

দুর্ঘটনা :

মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার খবর আজ [illegible]ই জানেন। সকলেই ফেলেছেন বাথিত [illegible]র দীর্ঘশ্বাস। সেই প্রিয়জনবিয়োগের [illegible]তে আমরাও জানাই আমাদের হৃদয়ের [illegible]ভীর বেদনা।

গত বারই জুন সকালে দার্জিলিঙের [illegible] সোনাদার কাছে গোয়াবাড়িতে এক [illegible]ন্তিক জীপ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন [illegible]তমাথা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কাবেরী [illegible]সু (চট্টোপাধ্যায়) স্বামী শ্রীঅজিত [illegible]ট্টোপাধ্যায়, আর শ্রীমতী বসুর মাঝখানে [illegible]দের কন্যা আট বছরের টিয়াও ইহলোক [illegible]ড়ে চলে গেছে। শ্রীমতী বসু আহত অবস্থায় এখন শিলিগুড়ির হাসপাতালে আরোগ্যের পথে।

সকাল ছটায় তাঁরা যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন বাগডোগরার পথে বিমান ধরার জন্য পথ তখন ছিল শান্ত। মনে মনে হয়ত ভাবছিলেন সবাই মিলে কলকাতায় ফিরে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলবেন আবার। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তা আর হয়ে উঠল না।

দুদিন বাদে শ্রীমতী বসুর জ্ঞান ফিরে এলেও তিনি এখনও জানেন না যে প্রিয়তম স্বামী আর চোখের মণি টিনা এ জগতে নেই। মিথ্যা স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা জানানো হয়েছে তাঁকে। জানি না, সব জানার পর তাঁর মানসিক অবস্থা কি হবে ? সে দুঃসহ মুহূর্ত অকল্পনীয়।

শ্রীমতী কাবেরী বসু অভিনয়কে ভাল-বাসতেন মনপ্রাণ দিয়ে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখশান্তির আশায় সেই ভালো-বাসার জগৎ ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন প্রথমে বম্বে ও পরে মাদ্রাজ। প্রিয়তম স্বামীর আর তিন সন্তানের সংসারে তিনি ছিলেন আদর্শ মাতা। শিশুকে সহ দের শ্রীচট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র আদর্শ স্বামী ছিলেন না, ছিলেন আদর্শ পিতাও। সেই সুন্দর আলোয় সংসার নিয়তির এক ফুৎকারে অন্ধকার হয়ে গেল। এ অবস্থায় সমবেদনা জানাবার ভাষা কোথায়!

শ্রীচট্টোপাধ্যায় কর্মজীবনে ছিলেন প্রিন্টিং টেকনোলজিস্ট। কলকাতার এক বিদেশী ফার্মে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি।

শ্রীমতী বসু অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটির নাম হলো 'বাইকল', 'শ্যামলী', 'শংকরনারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'সদানন্দের মেলা', প্রভৃতি। তাঁর সর্বশেষ চিত্রায়ণ ছবিটি ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে।

স্বামীকন্যাহারা শ্রীমতী বসুকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই, আমাদের এক-মাত্র কামনা তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন এবং পিতৃহারা জীবিত দুটি সন্তানের কাছে ফিরে যান।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

কলিযুগের শহরে সত্যযুগের মানুষ

সত্যযুগ ও সত্যযুগের মানুষ সম্পর্কে আমাদের সকলের মনেই একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে। সেই ধারণার সঙ্গে অনেক-খানি মিলে যায় ফিল্মনগর নিবেদিত "পহচান" ছবির নায়ক গঙ্গার চরিত্রটি। সাদাসিধা, সৎ, সত্যনিষ্ঠ, ঈশ্বরবিশ্বাসী পরহিতব্রতী গ্রাম্যযুবক হচ্ছে গঙ্গা। পর্বত উপত্যকায় অবস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতের আদেশ শিরোধার্য করে সে এসেছে শহরে যে-কোনোও একটি শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণীকে বিবাহ ক'রে গ্রামে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সারল্যোজ্জ্বল যুবক জানেনা, শহুরে সমাজ কি কৌটিল্যোত্তর এবং আরো সে জানেনা, তার গলায় বরমাল্য দেবার জন্যে শহুরে শিক্ষিতা তরুণী'রা আদৌ লালায়িত নয় : এখানে মানুষের মূল্য নিরূপিত হয় তার বেশভূষা গাড়ি-বাড়ি-অর্থপ্রাচুর্যের নিক্তিতে, তার পবিত্র হৃদয় ও সততার মাপকাঠিতে নয়। কিন্তু গঙ্গা নিজের আদর্শকে ত্যাগ করতে পারেনা। সহৃদয়তা ও মানবতাবোধের বশবর্তী হয়ে সে ফুলের মতো ছায়ে চম্পাকে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার ক'রে ভগিনীর সম্মান দেয়, নিরপরাধ প্রৌঢ়, খঞ্জ হৃদয়বান ব্যক্তিকে অন্যায় পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে আত্মীয় করে তোলে। গঙ্গার সাহসের কোনো অভাব নেই। তাই সে অন্যায়কারীদের সম্মুখীন হয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং সত্য উদ্ঘাটন করে। শিক্ষিতা তরুণী বরখা আশ্চর্য হয়ে যায় এই মানুষটিকে দেখে, তার অপ্রিয় সত্যকেও দাপটের সঙ্গে জাহির করবার ক্ষমতা তাকে করে মুগ্ধ। যাকে সে এতদিন ভালবাসত, সেই রাজুর প্রকৃত রূপ যেদিন তার কাছে ধরা পড়ল, সেদিন থেকে তার মন পরিপূর্ণভাবে গিয়ে পড়ল গঙ্গার ওপর। বরখা যখন সকলকে অবাক করে দিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল, সে গঙ্গাকেই বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তখন তার ভাই রাকেশ তাকে নানা রকমে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে দিল, গঙ্গার ভগ্নী চম্পা এক-জন বারবণিতা ছাড়া আর কিছু নয়। বরখা পড়ল প্রহেলিকায়। কেমন ক'রে বরখা এই প্রহেলিকা থেকে উদ্ধার পেল, কেমন করে সেই গোপন সত্য প্রকাশিত হল যে, রাকেশই চম্পার ঘৃণ্য জীবনের জন্য দায়ী এবং কেমন করে শেষ পর্যন্ত গঙ্গা তার আদর্শের প্রতি অটুট থেকে চম্পার জীবনের গতি পরিবর্তিত করল ও সঙ্গে সঙ্গে বরখাকে নিবৃত্ত ক'রে নিজের শহরে আগমনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করল, তাই নিয়েই ছবির শেষ উত্তেজনাপূর্ণ অংশটি গঠিত।

চম্পাকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করার জন্য রাকেশই দায়ী, এই সত্য প্রতিপন্ন হওয়ার পর থেকে "পহচান" ছবিটি যদি অধুনা প্রচলিত অধিকাংশ হিন্দী ছবির ধারাপথে গিয়ে সেই খুন-জখম মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তির রোমহর্ষক দৃশ্যা-বলীর অবতারণা না করে অত্যন্ত সহজভাবে রাকেশের মনে অপরাধবোধ জাগ্রত ক'রে তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারত, তাহ'লে ছবিখানি মাত্র কাহিনীর দিক দিয়ে হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে একটি স্মরণীয় অবদান ব'লে কীর্তিত হ'তে পারত।

বর্তমানকালের লেনিন-কার্লমার্ক্স-মাও সেতুং-প্রবর্তিত মতবাদ অধ্যুষিত সমাজে বাস করেও মানুষের মন যে আজও সত্য-যুগের আদর্শের প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টি মেলে থাকে, তার প্রমাণ এই "পহচান" ছবির অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তা। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গঙ্গার মতো একটি মনের মানুষকে উপহার দেবার জন্য আমরা কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার শচীন ভৌমিক এবং আশা সেগাল-এর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি।

অভিনয়ে চমৎকৃত করেছেন মনোজ-কুমার এই গঙ্গার চরিত্রচিত্রণে। সাদাসিধা মানুষটিকে তিনি বাচনে ভঙ্গীতে জীবন্ত করে তুলেছেন। 'গঙ্গা' তাঁর চলচ্চিত্রজীবনে একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টি হয়ে রইল। চম্পার ভূমিকায় চাঁদ উসমানীর হৃদয়-

সংবেদনশীল অভিনয়ও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রতারিতা চম্পার ব্যথাবেদনাতুক তিনি মূর্ত করতে পেরেছেন। বন্ধুখাবেশে ববিতা চিত্রনাট্যের প্রয়োজন মিটিয়েছেন; নাট্য-নৈপুণ্যের পরিচয় দেবার সুযোগ তাঁর অল্প। অবসরপ্রাপ্ত ফায়ার-ব্রিগেড অফিসাররূপে বলরাজ সাহনী তাঁর সহজাত অভিনয়কুশলতায় পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিবেশী-কন্যা রানীর ভূমিকায় ডেইজি ইরাণী অভিনয় ও নৃত্যে দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হীনচরিত্র রাজেশবেশে শৈলেশকুমার সম্ভাবনাপূর্ণ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে চিত্রগ্রহণে ও শিল্পনির্দেশনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যথাক্রমে কে, এইচ, কাপাদিয়া ও সুধেন্দু রায়। এস, কে, প্রভাকর লিখিত সংলাপ পরিস্থিতি অনুযায়ী উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে। ছবির আটখানি গানের মধ্যে "পৈসেকী পহচান ইহাঁ", "ব্যস এহী অপরাধ মৈ হর বার করতা হুঁ", "সবসে বড়া নাদান ওহী হৈ জো সমঝে নাদান মুঝে" প্রভৃতি নীরজ এবং ইন্দীবর বর্মা মলিক রচিত গানগুলিকে শঙ্কর-জয়কিষণ সম্মোহনী সুর দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন।

ফিল্মনগর নিবেদিত এবং সোহনলাল কাওয়ার প্রযোজিত-পরিচালিত ইস্টম্যান কলারে তোলা "পহচান" মনোজকুমার অভিনীত গঙ্গা চরিত্রটির জন্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তালাভ করবে।

মা আটর মমতা/নতুন

বিপরীতধর্মী দ্বৈত-ভূমিকায় রাজেশ খান্না

ভোলা তার খঞ্জ ভগ্নীর বিবাহের জন্য অর্থ উপার্জন করতে এসেছে শহরে এবং বিলাতী ব্যাণ্ড দলে ড্রাম ও ক্ল্যারিওনেট বাজাবার কাজ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে গানও গায়। এই বাজনা ও প্রাণখোলা গানের দৌলতে সে শহরবাসীর, বিশেষ করে গোয়েন্দা-পুলিশ রীতার মন হরণ করে। অবশ্য রীতার মনে হয়, লোকটি আসলে ভোলা নয়, অঘটনঘটনপটু রঞ্জিতকুমার। কারণ ওদের দুজনেরই অবিকল এক চেহারা। ভোলা প্রথম যেদিন রঞ্জিতকুমারকে দেখে, সে বলেছিল, আমরা এক বাপ বা মায়ের ছেলে না হয়েও এমন এক দেখতে কি করে? এতো তাজ্জব ব্যাপার। কিন্তু ভদ্রমুখোশধারী রঞ্জিতকুমার তার আসলরূপ প্রকাশ না করে ভোলাকে অর্থব্যয় করে তালিম দেওয়াতে লাগল, যাতে ভোলা আচার-আচরণে-ব্যবহারে পুরোপুরি রঞ্জিতকুমারে পরিণত হ'তে পারে। শিক্ষাগুণে ভোলা একদিন হুবহু রঞ্জিতকুমারের রূপ ধারণও করল। কিন্তু যেদিন সে দৈবক্রমে জানতে পারল, রঞ্জিতকুমার আসলে হচ্ছে একজন ঠগ, জুয়াচোর, চোরাকারবারী, সেদিন থেকে সে তার ভদ্রমুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল এবং তা সম্ভব হল যেদিন দুজনেই হীরা-তস্করূপের অভিযোগে-আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াল ও যখন সব সাক্ষ্য প্রমাণ বৃথায় যেতে বসেছে, তখন ভোলার অনুরক্ত কুকুর মোতি এসে আসল ভোলাকে সনাক্ত করল।

দুই বিপরীত চরিত্রের অভিনয়ে রাজে[শ] খান্না তাঁর নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে[ন]। নায়িকা রীতা (যার [আস]ল নাম লী[না]) বেশে মমতাজ নাচে [গ]ানে, অভিনয়ে ত[াঁর] পারদর্শিতার আর একটি প্রমাণ রেখেছে[ন]। ভোলার খঞ্জ ভগ্নী বেলুর চরিত্রটি অন্তরস্পর্শী করে তুলেছেন নাজ ও[াঁর] সংবেদনশীল অভিনয়ের মাধ্যমে। 'সাচ্চা ঝুটা' ছবির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে মো[তি] কুকুরের ভূমিকায় রক্সীর আশ্চর্য অভিন[য়]। অপরাপর ভূমিকায় পারভীন পাল (ভো[লা] ও বেলুর বিমাতা), বিনোদকুমার (পুলি[শ] ইনস্পেকটার), কমল কাপুর (পুলি[শ] চীফ), ফরিয়াল (জেনী) প্রভৃতির অভি[নয়] উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভা[গের] কাজ যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। একই অ[ভি]নেতার দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয়ের নিখ[ুঁত] চিত্রগ্রহণ নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচায়[ক]। ছবির কণ্ঠসঙ্গীত, বাদ্যসঙ্গীত এবং আ[বহ] সঙ্গীত—কল্যাণজী আনন্দজীর সু[র] বৃদ্ধি করবে।

মনোমোহন দেশাই পরিচালিত ডি ... ফিল্মস-এর নিবেদন 'সাচ্চাঝুটা' রা[জেশ] খান্নার দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় ও সঙ্[গীতে] সমৃদ্ধ হয়ে জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হবে।

স্টুডিও থেকে

সত্যজি[illegible] [illegible] ... উটভোরে [illegible] ... বাড়ির [illegible] ... গ [illegible] ... ানে [illegible] ... রা হচ্ছেন [illegible] (এখনই) আর াল সেন (ইন্টারভিউ)।

আপাততঃ তপনবাবুর বাইরের কাজ শেষ। সোমবার (বাইশে জুন) থেকে এন্‌টি'র দু নম্বরে ইনডোরের কাজ শুরু করেছেন। টানা আট দিনের কাজ। তারপর আবার রাস্তায় বেরোবেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কতগুলো দৃশ্য আছে—তার মধ্যে একটা হোল নায়ক অরুণ নায়িকা রুণুর সঙ্গে একদিন গেছে ভিক্টোরিয়ায় বেড়াতে, এমন সময় এল ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি। প্রকৃতির সেই বেরসিক রোমান্টিকতায় সেই ক্ষণে তাদের মনের অনেকগুলো বন্ধ দরজা সেদিন খুলে গিয়েছিল দুজনার কাছে—ইত্যাদি অনেক ভাইটাল সীনের টেক্ হবে বৃষ্টির মধ্যে।

তপনবাবু ইনডোরের কাজ শেষ করে অপেক্ষা করবেন বৃষ্টির জন্য। তবে রথের দুদিন আগে পরে তো বৃষ্টি হবেই সেই সুযোগটাই নেবেন তপনবাবু। তারপর আবার ইনডোরের কাজ। এবং তিনি আশা করেন সেপ্টেম্বর নাগাদ কাজ শেষ হয়ে যাবে ছবির। প্রধান চারটি চরিত্রে আছেন স্বরূপ দত্ত (অরুণ), মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (রুণু) দিলীপ বসু (টিকলু) ও অপর্ণা সেন (উর্মি), এ ছাড়াও আছেন ভাস্কর চৌধুরী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বরূপ দত্ত, তপনবাবুর 'আপনজন' ছবিতে কাজ করার পর থেকে কলকাতার চিত্রমহলে বক্স অফিসে স্টার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর হাতে পর পর 'পত্রাপুত্র', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ইত্যাদি ছবিগুলো এসেছিল। শ্রীদত্ত তাঁর জনপ্রিয়তার কদর রাখার জন্যই সাধ্যমত প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। তপনবাবু আবার ওঁকে নিয়ে কাজ করছেন। এ ছবির চরিত্র স্বরূপ দত্তের চেহারা ও চরিত্রের সঙ্গে মিলে গেছে। তাই তাঁর অভিনয়ও হচ্ছে প্রাণবন্ত। 'আপনজনে'র পর আবার স্বরূপ দত্তের প্রচণ্ড অভিনয়দীপ্ত ছবি হবে তপন সিংহের এই 'এখনই'। 'বালিকা বধূর' মৌসুমী যে আর কিশোরী নেই, রীতিমত তরুণী হয়ে গেছেন তার প্রমাণ 'পরিণীতা'-তেই পাওয়া গেছে। তপনবাবুর এই ছবিতে মৌসুমী যে চরিত্র করছেন সেটি হোল এক নিষ্পাপ সরল তরুণীর, উজ্জ্বল অথচ শান্ত, প্রাণময় অথচ চিন্তায় গভীর সেই তরুণী।

তপনবাবুর সঙ্গে কদিন আগে দু নম্বর স্টুডিওয় দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করেছিলাম 'আপনজন' আর 'এখনই'তে ফারাক কোথায়? উত্তরে জানিয়েছিলেন—"আসল ব্যাপার আজকের যুবসমাজ, আজকের মূল্যবোধ ও অপসৃয়মান নীতিবোধ 'আপনজনেও এই ব্যাপারটা ছিল, এখানেও আছে। তবে পথটা আলাদা। কতগুলো চরিত্র তাদের পাওয়া না-পাওয়ার কথা, আশা কল্পনার গল্প—আর সেই পথ ধরে আজকের সমাজের গলদের দিকে আঙুল দেখানো।'

মৃণাল সেন এখনও পর্যন্ত স্টুডিওর পথে পা দেন নি। কাজ চলছে রাস্তাঘাটে। নিজের বাড়ীতে ও অন্যান্য জায়গায়। বাড়ী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শ্রীসেন। অন্যত্র আছেন।

একজন আধাবেকার যুবকের এক ইন্টারভিউতে যাওয়া নিয়ে ছবির কাহিনী। পরীক্ষার ডাক এসেছে এক নামকরা সাহেবী ফার্ম থেকে। সকালে ঠিক করল সে স্যুট পরে জবরদস্ত সাহেব সেজেই ইন্টারভিউতে যাবে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দরজায় আঁতিপাতি করে খুঁজেও নিজের মাপমত স্যুট সে পেল না। তাই পরলোকগত বাবার স্যুট পরবে ঠিক করল, কিন্তু দেখা গেল সেটিও বড় হচ্ছে। তাই শেষ অবধি তাকে সাদা বাঙালী পোষাকেই যেতে হয়। ইন্টারভিউ—ছবির গল্প এটাই। এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ক্যাটালিস্টিক চরিত্র হিসাবে বাবা, মা, প্রেমিকা, বোন প্রভৃতি রয়েছেন, আর ব্যাকগ্রাউণ্ডে আছে আজকের কলকাতা। মৃণালবাবু নতুন চিন্তায় নতুন প্রকরণে নতুন ছবি আঁকছেন কলকাতার, কলকাতার প্রাণ—যুবসমাজের, কলকাতার রাজনীতির, কলকাতার ব্যথা বেদনা আনন্দের।

প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী ও পরিচালক তপন সিংহ এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তাঁদের নবতম চিত্র 'সাগিনা মাহাতো' শ্রমিক আন্দোলন ও বর্তমান যুগের রাজনৈতিক চেতনার

বিরোধী বলে যে অপপ্রচার হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সেন্সরের ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ছবিখানিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়ে তাঁরা তাঁদের অবিমিশ্র প্রশংসাই লাভ করেছেন এবং এ'দের মধ্যে একজনও ছবিখানি সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও বিরূপ সমালোচনা করেননি। শ্রীসিংহ আরও জানিয়েছেন, নায়ক সাগিনা মাহাতো চরিত্রটির প্রতি তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ঐ চরিত্রটিকে সম্যকভাবে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরবার জন্যে তিনি তাঁর মনের মতো করে কাহিনীর অদল-বদল করেছেন, কোনো রকম মতামতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই। আমরা আশা করব, 'কলঙ্কিত নায়ক' ছবির প্রদর্শন শেষে যখন 'সাগিনা মাহাতো' মুক্তিলাভ করবে, তখন ছবিটি যেন দলমত গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় হয়ে ওঠে।

শপথ নিলাম/নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্তা এবং সমিত ভঞ্জ

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় আজ থেকে তিরিশ বছর আগে চলচ্চিত্রজগতে প্রবেশ করেছিলেন নেপথ্য সংগীতশিল্পী হিসেবে। ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ তিনি সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরিচালক হেমেন গুপ্ত তাঁকে বোম্বাইয়ে নিয়ে যান হিন্দী ছবির সংগীত পরিচালনা করবার জন্যে। চিত্র-প্রযোজকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন 'বিশ সাল বাদ' ছবির মাধ্যমে। ১৯৭০ সালের জুনে তিনি বাংলা ছবি 'অনিন্দিতা'র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হেমন্তকুমার সর্বক্ষেত্রেই যেমন সাফল্যের মুকুট ধারণ করেছেন পরিচালক রূপেও তিনি তেমনই সার্থকতা লাভ করবেন, এই কামনাই করি।

রূনু ফিল্মসের প্রথম প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাড়াজাগানোর কবিতা ফাঁকি'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক রূণু চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন 'পান্না হীরে চুনি' খ্যাত পরিচালক অমল দত্ত। সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করছেন রমেশ যোশী। সংগীত পরিচালনা করছেন বিলায়েত হুসেন খাঁ, কণ্ঠদান করছেন কিশোরকুমার, বনশ্রী সেনগুপ্ত। কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে রূপ দেবেন শমিত ভঞ্জ, বিপ্লব চন্দ্র, উৎপল দত্ত, কনক দেবনাথ, গীতা দে, বিদ্যা রাও, ছায়া দেবী ও বিনুর ভূমিকায় নতুন শিল্পী সোমা। শিল্প নির্দেশনা ও চিত্রগ্রহণ করছেন গৌর পোদ্দার ও কেষ্ট চক্রবর্তী।

মঞ্চাভিনয়

ক্লান্ত রূপকার : মঞ্চের আলোয় হাসি কান্নার দোলন তুলে যাঁরা আমাদের অনুভূতিলোকে স্পন্দন তোলে, তাদের নেপথ্য জীবনের ক্লান্তির ইতিহাস নিয়ে গড়ে উঠেছে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ক্লান্ত-রূপকার' নাটক। সম্প্রতি গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা 'স্টার' থিয়েটারে এই নাটকের প্রাণবন্ত প্রযোজনার নজীর মেলে ধরে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। অফিস ক্লাবের নাট্যপরিবেশনায় মাঝে মাঝে যে শৈথিল্য ও প্রাণময়তার অভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, এ প্রযোজনায় তার বিপরীত ছবিই লক্ষ্য করেছি। নাটকের প্রতিটি মুহূর্তে শিল্পীদের আন্তরিকতা হয়েছে সোচ্চার এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিক অভিনয়ের ছন্দের সঙ্গে দর্শকদের হয়েছে নিবিড় সেতুবন্ধন।

সংঘাতসমৃদ্ধ কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করে দর্শকদের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত অটুট রাখতে নির্দেশক পিকলু নিয়োগীর নিষ্ঠা ও শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। মুখ্য কয়েকটি ভূমিকায় দর্শকদের উপলব্ধিকে যাঁরা আলোড়িত করে তোলেন তাঁরা হোলেন চুনী, বন্দ্যোপাধ্যায় (রণ[illegible]), বাসুদেব ভাদুড়ী (বিজলী সেন), দীপঙ্কর দে (অক্ষয়), কিশলয় বর্ধন (শিবেন), জয় সরকার (প্রবীর), প্রতিমা পাল (নন্দিতা), শিখা ভট্টাচার্য (সাধ্যা)। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন ভক্তকৃষ্ণ নন্দী, প্রভাস দাস, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, বেণু মুখোপাধ্যায়, ধীরেন রায়, রবীন চক্রবর্তী, গৌরীশংকর বাসু, বটকৃষ্ণ মন্ডল, রবীন বসু-মল্লিক ও ঝুমা মুখোপাধ্যায়। আলোক-সম্পাতে স্বরূপ মুখার্জী মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখেন। ডি সি চন্দ্রের আবহসংগীত গোটামুটিভাবে নাটকটির মেজাজটুকুকে মূর্ত করে তুলতে পারে।

জননায়ক শিবাজী : শিবাজীর মতো পরাক্রমশালী, বীর, যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিকের গৌরবদীপ্ত জীবন যে সর্বকালের সর্বদেশের লোকের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। সম্প্রতি 'নাটলীলা'র শিল্পীরা 'রংমহলে' জননায়ক শিবাজী' নাটক পরিবেশন করে এই সত্যকেই ভাস্কর করে তুললেন। মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতনের পটভূমিকায় শিবাজীর সাহসিকতা ও সংগ্রামকে অবলম্বন করে

নাটকটির সংঘাত গড়ে উঠেছে। তাই নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত বাস্তবের রক্তিম কঠোরতায় মুখর হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক নাটকের অতিনাটকীয় উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয় নি।

প্রয়োগপরিকল্পনায়ও 'জননায়ক শিবাজী' বৈশিষ্ট্যের নজীর মেলে ধরতে পেরেছে। বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের ওপর অতিরিক্ত প্রাধান্য না দিয়ে সমষ্টিগত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টাই অধিকতর পরিস্ফুট। এদিক দিয়ে 'নটলীলা'র শিল্পীরা প্রশংসার দাবী নিশ্চয়ই করতে পারেন। অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রথমে অবাক করেছেন প্রবীণ অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়. তিনি রূপ দিয়েছেন কুচক্রী 'ঔরঙ্গজীব'র চরিত্রে। সাধক রামকৃষ্ণের প্রাণের সঙ্গে যাঁর একাত্মতা বাংলার অভিনয়জগতে আশ্চর্য একটি অধ্যায় সৃষ্টি করেছে 'ঔরঙ্গজীব' চরিত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক অভিনয় আমাদের বিস্ময়ে আবিস্ট করে। মলিনা দেবীর 'জিজাবাঈ'ও দর্শকমন গভীরভাবে রেখাপাত করে, তবে 'শিবাজী' চরিত্রে সমর চাটার্জীর কাছে প্রত্যাশা ছিল আরো অনেক। 'সরযূ'র ভূমিকায় রুণু বড়ালের কয়েকটি বিশেষ অভিব্যক্তি উল্লেখযোগ্য; মুকুল সরকার ও সুনীত মুখার্জীর 'রঘুনাথ' ও 'আফজল খাঁ' হয়েছে চরিত্রপযোগী। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শিশির মিত্র, অমল বিশ্বাস, অবনী মুখার্জী, হিমাংশু রায়, পরিতোষ রায়, হরিদাস চ্যাটার্জী, নির্মল রায়, বিনয় চক্রবর্তী, শান্তি ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ সোম, রণজিৎ রায়, মুরারী চ্যাটার্জি, মুকুল ধর, রুবী মিত্র, নূপুর ও বিশাপা।

ফাঁস : আই আই এম সি এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি 'স্টার' থিয়েটারে পরিবেশিত হোল। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকের অভিনয়। অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের টিমওয়ার্ক হয়েছে সুন্দর, তাই নাটকের স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। শিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবী রাখেন 'সুভাষ' ও 'ডি. এস. পি'র ভূমিকায় যথাক্রমে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশান্ত ঘোষ। এঁদের পরেই নাম করতে হয় কে এল চক্রবর্তী (নবীনকুমার) ও পীযূষ ভট্টাচার্যের (সোমনাথ)। 'বিমান' চরিত্রে মৃণাল চক্রবর্তী মোটামুটি চরিত্রানুগ অভিনয় করলেও কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর আরো সংযত হওয়া উচিত ছিল। কয়েকটি টাইপ চরিত্রে সুঅভিনয় করেন অমলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী প্রবালকুমার বিশ্বাস, প্রবীর সেন, অশোক সেনগুপ্ত। 'তরলা'র ভূমিকায় দীপালি ঘোষের অভিনয় হয়েছে অনবদ্য, কিন্তু 'সোণালী' চরিত্রে আলোকা গাঙ্গুলীর আরো অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, সুদেব মুখোপাধ্যায় ও অরুণেন্দু ব্যানার্জী।

আবহসঙ্গীত নাটকের স্বকীয় গতি থেকে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন থেকেছে। কিন্তু আলোক সম্পাতে এসেছে মূল নাটকের ব্যঞ্জন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে জে সি সেনগুপ্ত ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রবীর সেন ও মণিকা দত্তের রবীন্দ্রসংগীত দর্শকদের মোটামুটি আবিষ্ট করে তুলতে পারে।

বঙ্গীয় সংসদ : খামারিয়া, জব্বলপুরের প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদের ঊনবিংশ বার্ষিকী সাংস্কৃতিক সপ্তাহ গত ২৫ বৈশাখ শুরু হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রজন্মোৎসব, একাংক নাটক প্রতিযোগিতা, যাত্রাভিনয় এবং বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিন পালন করা হয়। ২৫ বৈশাখ 'রক্ত করবী' নাটক অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীদ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়। সুপরিকল্পিত মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং সামগ্রিক অভিনয় স্থানীয় সুধীসমাজের প্রশংসা লাভ করে। ৩য় বার্ষিকী একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় এবার মোট ৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। জব্বলপুরের 'মুখোমুখি' নাট্য সম্প্রদায় দলগত অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। এঁরা করেছিলেন—'বিষণ্ণ সকাল' নাটক। এই নাটকের প্রসূনের চরিত্রে শ্রীঅনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবি চরিত্রে শ্রীমতী সবিতা ঠাকুরতা যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ প্রযোজিত 'তাহার নামটি রঞ্জনা' শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার লাভ করে। এবং পুরস্কারটি পান শ্রীগোপী বসু। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান, জব্বলপুরের 'তরুণ নাট্য সংঘের' শ্রীনিশীথ মিত্র। 'রক্তে রোয়া ধান' নাটকে 'কেশা' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই সংস্থাই মধ্যপ্রদেশে সর্বপ্রথম বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা প্রচলন করে। ১৬ মে অভিনীত হয়, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পরিচয়' যাত্রা নাটক। পালাটি পরিচালনা করে শিশির রায়। সামগ্রিক অভিনয় সৌকর্যে স্থানীয় দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ

দর্পণ/ওয়াহিদা রহমান এবং সুনীল দত্ত

বর্ধন করে। এরপর ২১ মে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিন পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানেও সংস্থাটি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। কারণ, জব্বলপুরে নজরুল গীত প্রসারের জন্য এরাই সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছে।

*

গেল ১৬ মে সন্ধ্যায় ত্যাগরাজ হলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গড়িয়াহাট শাখার কর্মচারী সমিতি উৎপল দত্ত বিরচিত বলিষ্ঠ যাত্রানাটক 'রাইফেল'কে পুরোপুরি যাত্রার ঢঙে আসরস্থ করে অফিস ক্লাবগুলির সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টা ক্ষেত্রে একটি অভিনব পদক্ষেপ করেছেন। জোছন দস্তিদারের সার্থক পরিচালনা গুণে সমগ্র অভিনয়টি এমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, কোনো দর্শকই এই যাত্রাভিনয়টি শেষ পর্যন্ত না দেখে আসর ছেড়ে উঠতে পারেননি। শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সুব্রত চক্রবর্তী (যুগল), বিভূপদ সমাজ-পতি (ইনগ্রাম), পবিত্র মুখোপাধ্যায় (কল্যাণ), কল্যাণ রায় (মধু সিংগি), দেব-কুমার মুখোপাধ্যায় (মানিক), কমল রায় (অবিনাশ), দুলাল আঢ্য (রহমৎ), ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভবানী), তপন চট্টোপাধ্[যায়] (বীরেন) এবং কৃষ্ণা গুহ (নসিবন)-এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

শ্রেষ্ঠ কাহিনীর জন্যে ১৯৬৮ সা[লে] রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত হিন্দী ছবি 'দ[র্পণ]' ২৬ জুন থেকে শহরের শ্রেষ্ঠ চিত্রগ[ৃহ]গুলিতে মুক্তিলাভ করছে। এ সুব্বা[রাও] পরিচালিত এই ইস্টম্যান কলারে [তো]লা ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সুনীল [দত্ত], ওয়াহিদা রেহমান, জগদীপ, সো[নি] সাহনী, রেহমান, ললিতা পাওয়া[র] সুলোচনা প্রভৃতি শিল্পী। লক্ষ্মীকা[ন্ত] প্যারেলাল দ্বারা সুরসংযোজিত ছবিটি[র] পূর্বাঞ্চলের পরিবেশক হচ্ছে ফিল[্ম] ডিস্ট্রিবিউটার্স'।

ভারত-চেকোশ্লোভাক সংস্কৃতি সংস্থার (পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ৯ই জুন মঙ্গলবার চক্রবৈঠক ক্লাবে চেকোশ্লোভাক অভিযাত্রী দল সাকুল্যে চারজন তরুণ সদস্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ এ এম ও গণি। এই অভিযাত্রী দলটি গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাগ থেকে পায়ে হেঁটে জাপান এক্সপো' ৭০-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে হলে তাঁদের মোট ২০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। ভারতে প্রবেশ করার আগে তাঁরা ইউরোপ ও এশিয়ার মোট বারটি দেশ অতিক্রম করেন। এ দা গণিতজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ছাড়া একজন ডাক্তার ও আছেন। দলের নেতৃত্ব করছেন ৩২ বছর বয়স্ক সিড্‌নেক টমা। অনুষ্ঠানের সূচনায় অভিযাত্রী দল তাঁদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন এবং চেক পল্লীগীতি গেয়ে দর্শক-দের যথেষ্ট আনন্দ দান করেন। অন্যান্য কার্যসূচীর মধ্যে ছিল চিত্তপ্রিয় মুখো-পাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত ও শ্রীডি এন অধিকারীর যাদুবিদ্যা প্রদর্শন। এ ছাড়া শ্রীমতী জয়ন্তী গাঙ্গুলীর নৃত্য পরিবেশন ও যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, আমার জীবন বাহির্জগতে কখনও এমনভাবে প্রকাশিত হয়নি, যাতে লোকে সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দ সম্পর্কে কি সমান কথাই প্রযোজ্য? বোধ করি-না। অরবিন্দের ভারতভূমিতে পদার্পণ থেকে শুরু করে রাজনীতির জগৎ থেকে তাঁর অন্তর্ধান পর্যন্ত তাঁর জীবনের অংশ অবলম্বন করে তাই বিপ্লবী অরবিন্দ ছবি নির্মিত হচ্ছিল তরুণ পরিচালক দীপক গুপ্ত দ্বারা। সম্প্রতি শ্রীকমলা ফিল্মস ছবিখানির সর্বস্বত্ব লাভ করে পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীমার আশীর্বাদ পেয়েছেন এবং ওখানকার কর্তৃ-পক্ষের—বিশেষ করে নলিনীকান্ত সরকারের পরামর্শক্রমে চিত্রনাট্যে বেশ কিছুটা রদ-বদল করে ছবির শেষ পর্যায়ের শুটিং শুরু করেছেন ১ জুন থেকে।
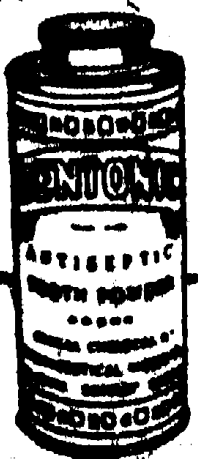
ফুটবল প্রসঙ্গ

হঠাৎ জনমতের হাওয়া অনুকূলে মান করে বৃটেনের ধুরন্ধর প্রধানমন্ত্রী ...ড উইলসন যখন ১৮ই জুন সাধারণ ...চনের তারিখ ঘোষণা করেন, তখন ... তারিখের বিরুদ্ধে যতগুলি গুরু-...ীর সমালোচনা হয়, তার মধ্যে একটা ...চ্ছ ওই সময়টায় মেকসিকোয় বিশ্ব কাপ ...তিযোগিতা সরগরম হয়ে উঠবে। অতএব ...াধারণ লোকে সেই দূরদেশে আন্তর্জাতিক ...খলার লড়াই নিয়ে এমনি মেতে উঠবে যে, ...নজ দেশে ব্যালট বক্সের লড়াই তুচ্ছ করবে। নেতাদের গলাবাজি মাঠে মারা যাবে। লোকে যখন সপরিবারে উদ্বেলিত আনন্দ উত্তেজনায় টেলিভিশনে দুনিয়ার সবচেয়ে দুরন্ত ম্যাচগুলি দেখছে, তখন দরজায় ভোটের ফেরীওয়ালারা এলে খেঁকিয়ে উঠবে। হয়তো খেপে গিয়ে উল্টো দিকে ভোট দেবার প্রতিজ্ঞা করে বসবে।

আমাদের দেশে, যেখানে রাজনীতি হচ্ছে জীবনমরণের প্রশ্ন, সেখানে বহু হাজার মাইল দূরে কয়েকটি ফুটবল ম্যাচ,—তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত জাঁদরেল টিমের হোক না কেন, এর জন্যে একটা সাধারণ নির্বাচন বেপাত্তা হয়ে যাবে, প্রায় তামাশার মত শোনাবে।—তবু ঐ বিতর্ক থেকে বোঝা যায় যে, এ-দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে ফুটবল কতখানি জুড়ে আছে এবং বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতার মত একটা আন্তর্জাতিক হর্ষোদ্দীপনাকে বিজ্ঞান কত দূরে থেকে, কত অগণিত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। যাতে সারা ইউরোপ জুড়ে টেলিভিশন দর্শকেরা সরাসরি মাঠের খেলা দেখতে পারে (অর্থাৎ ফিল্মে তোলা বাসি খেলা না হয়ে 'জীবন্ত' খেলা) তার মধ্যে মেকসিকো গরম দেশ হলেও খেলাগুলি যথেষ্ট বেলা থাকতে, এমনকি দুপুরের দিকে, আয়োজিত হয়। টেলিভিশনে খেলা দেখায় মাঠের উত্তেজনা ও উত্তাপ যদিও অনেকখানি হারিয়ে যায়, তবু সেটুকুর ক্ষতিপূরণ হয় প্রভূত। ড্রইংরুমে সপরিবারে কোকো-কফি, চুরুট-চকলেট সংযোগে দিব্যি তোয়াজে দুনিয়ার দুর্বার দলগুলির খেলা দেখছেন। শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারেরা টিকা-টিপ্পনী করছেন। দূরবীক্ষ ক্যামেরায় মাঠের দূরতম প্রান্তেও খেলোয়াড়দের কসরৎ বাদ পড়ছে না। গোল হওয়া, কিম্বা তাক-লাগানো গোল রক্ষা, ফাউল, পেনাল্টি, কর্ণার প্রভৃতি বিশেষ ঘটনাও দুর্ঘটনাগুলি মাঝে মাঝে চলচ্ছবির গতি শ্লথ করে বা স্থির করে দেখানো হচ্ছে। নগ্ন চোখে যা নাগালের বাইরে থেকে যেতে পারে, দূরবীক্ষ ক্যামেরায় তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। সবক'টি খেলা দেখাতে টেলিভিশন চলছে সারারাত। ঘণ্টাকয়েক বন্ধ থেকে আবার সকালে। নতুন ম্যাচ না থাকলে পুরানো ম্যাচের পুনরাবৃত্তি ও ভাষ্য। কারো কারো মতে তাতে কাজে কামাই বাড়ছে। জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ঠোক্কর খাচ্ছে।

ইদানীং বৃটেনে ভালো কিম্বা মন্দ এমন কিছুই প্রায় হয় না যাতে কেউ না কেউ মিঃ উইলসনের কসরৎ কিম্বা কারসাজি দেখতে না পান। বস্তুত, যে-কোন অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল জুৎসই কিম্বা বেয়াড়া ঘটনাকে অবলীলাক্রমে কাজে লাগিয়ে নেবার প্রত্যুৎপন্নমতিতে তিনি অদ্বিতীয়। সুতরাং এমন টিপ্পনীও শোনা গেছে, মিঃ উইলসন ইচ্ছে করেই বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতার ভরা মরশুমে নির্বাচন ডেকেছেন। উক্ত তথ্যে বিশ্বাসীদের যুক্তি অনুরূপ : মানুষ যখন খোস মেজাজে থাকে, তখন স্থিতবস্থাতেই খুশি থাকে। পরিবর্তনের ঝক্কি নিতে চায় না। বর্তমানে বৃটিশ অর্থনীতিতে প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে তেজিভাব এসেছে। জুনে সমগ্র প্রকৃতি দীপ্ত রৌদ্রে ঝলমল করছে।

> বিশ্ব ফুটবল কাপ ফাইনাল এবং বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনের আগে যে পরিস্থিতি ছিল, তারই আলেখ্য বর্তমান প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

বিশ্বকাপ ও ইংল্যান্ড

১৯৬৬ সালে নিজভূমে বিশ্ব কাপ জয় করলেও মোদ্দা ওই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি ইংলন্ডের কাছে অপরাই থেকে গেছে। প্রতিযোগিতা শুরু হবার ২০ বছর পরে, ব্রেজিলে ১৯৫০ সালে ইংলন্ড প্রথমবার যোগ দিয়ে শোচনীয়ভাবে ফুটবল ঐতিহ্যহীন আমেরিকার কাছে ১—০ গোলে হেরে যায়। ১৯৫৪ সালে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠে ইংলন্ডকে উরুগুয়ের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। ১৯৫৮ সালে বৃটেনের তিনটি দল উত্তর আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস ও ইংলন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত ওঠে। কিন্তু সেইখানেই তাদের অগ্রগতি খতম হয়। ১৯৬২ সালেও ইংলন্ড কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রেজিলের কাছে হেরে যায়। ব্রেজিল ছিল সেবার পরপর দু' বছরের কাপ বিজয়ী।

১৯৬৬ সালে ইংলন্ড বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী হলেও সেবারের প্রতিযোগিতা শুরু হয় এক লজ্জাজনক প্রহসনের ভেতর দিয়ে। প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে কে বা কারা কঠোর সতর্কভাবে ফাঁকি দিয়ে জুল রিমে কাপটি চুরি করে নিয়ে গিয়ে দুনিয়া জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। শেষপর্যন্ত এক প্রাতঃভ্রমণকারীর কৌতূহলী কুকুর কাপটিকে একটি ঝোপের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে। চোরের উদ্দেশ্য কি ছিল —স্বর্ণলোভ না উৎকট এক বেয়াড়া রসিকতা তা শেষপর্যন্ত জানা যায়নি। এবারে প্রতিযোগিতা শুরু হবার ক'দিন আগে ইংলন্ড দলের ক্যাপটেন ববি মুর মেকসিকোর পার্শ্ববর্তী উরুগুয়ের এক দোকানে একটি মণিহার তস্করূপের দায়ে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য রাশিয়ান থেকে আরম্ভ করে মেকসিকো সমাগত ছোট-বড় সব দল, সব

খেলোয়াড়ই ... অনুরূপ কোন কা...রা অসম্ভব বলে ঘোষণা করেন। গতবারের বিশ্ব কাপ জয়ী ইংলণ্ড দলকে গোড়াতেই একটা কেলেঙ্কারীর মধ্যে জড়িয়ে ফেলে নাজেহাল ও ম্রিয়মান করার উদ্দেশ্যে ওই লাতিন আমেরিকান ফাঁদটি পাতা হয় বলে বহু লোকের ধারণা। যাই হোক ববি মুর সাময়িকভাবে খালাস পেলেও ইংলণ্ড দল শেষপর্যন্ত নিষ্কৃতি পেল না। ৭ই যে ব্রেজিলের বিরুদ্ধে অতিগুরুত্বপূর্ণ খেলার আগের রাত্রে এক বিশাল লাতিন আমেরিকান জনতা তাঁদের হোটেলের সামনে জড়ো হয়ে মহা হল্লা জুড়ে দিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ড দলকে সারা-রাত জাগিয়ে রেখে পরের দিনের ম্যাচের পক্ষে ক্লান্ত করে দেওয়া। কর্তৃপক্ষ যদিও মাঝ রাত্রে খেলোয়াড়দের হোস্টেলের পেছনের দিকে ঘুমোবার বন্দোবস্ত করে দেন, তবুও হল্লাবাজদের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণ সফল হয়। পরের দিন ইংলণ্ড ০—১ গোলে ব্রেজিলের কাছে হেরে যায়। ওই ঘটনার পর থেকে ইংলণ্ড দলকে মেক্সিকান শহর থেকে ৩০ মাইল দূরে অপর একটি হোটেলে রাখার ব্যবস্থা হয়। তবে হল্লা-বিঘ্নিত অনিদ্রাই সেই পরাজয়ের একমাত্র কারণ নয়। ঐ খেলাটি ছিল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠতম ম্যাচ। ইংলণ্ডের পরাজয়ের মূলে ছিল সহজ সুযোগ সদ্ব্যবহারে ব্যর্থতা। কিন্তু মোদ্দা কথা, ইংলণ্ড-ব্রেজিলের ফুটবল দ্বন্দ্বের ইতিহাসে ব্রেজিলই শক্তিশালী দল। এবার নিয়ে দুটি দেশ আটবার খেলার মাঠে মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে ব্রেজিল জিতেছে ৫ বার, ড্র হয়েছে ২ বার এবং ইংলণ্ড জিতেছে মাত্র একবার।

ইতরের হুল্লোড় থেকে জাতীয় গর্ব

খেলার আনন্দ-জগতে আর পাঁচটা খেলার মত ফুটবলেও উল্টো পুরাণের ন্যায় নীতি চালু। এখানেও সবলের কাছে দুর্বলের পীড়নে ও পরাজয়ে হর্ষধ্বনি ওঠে। সুবিধাবাদী ও ফন্দিবাজদের সাফল্যে উল্লাস জাগে। তবু অন্য বহু খেলার তুলনায় ফুটবলের সমাজগ্রাহ্য হতে বহু শতাব্দী লেগে যায়। যেমন ধরুন, ক্রিকেট, শুরু থেকে সমাজের উঁচুতলার খেলা। তেমনি রাগবী। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, রাগবীর এক পাবলিক স্কুলে একটি ছেলের হাত দিয়ে বল খেলার খেয়ালে তার উৎপত্তি। কিন্তু তদবধি খানদানী পাবলিক স্কুলে গৃহীত ও অনুশীলিত ফুটবলকে তার বর্তমান সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় উঠতে বহু শতাব্দী কেটে যায়।

এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চীনেরা খৃষ্টজন্মের দুশো বছর আগে ফুটবলের মত একটা খেলা খেলতো এবং ২১৭ খৃষ্টাব্দে রোমানদের মধ্যে একটা ফুটবল কার্ণিভাল বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীনেরা চামড়ার বল নিয়েই ফুটবল খেলতেন। মধ্যযুগে ইংলণ্ডের চেস্টারের লোকেরা একদল ডেন্ হানাদারের হারিয়ে তাদের একজনের মাথা নিয়ে পা দিয়ে খেলে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড 'জনতার হুল্লোড়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বিবেচনা' করে ফুটবলকে বে-আইনী করার চেষ্টা করেন। সেকালে স্যার টমাস ইলিয়ট নামে এক ব্যক্তি লেখেন, 'ফুটবল খেলা পাশবিক উল্লাস ছাড়া আর কিছুই নয়। চিরন্তনী হিংসাকে চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' সপ্তদশ শতাব্দীতে ম্যানচেস্টারের একটি আদালত ফুটবল খেললে বারো পেনি জরিমানা ধার্য করে। কারণ 'প্রতি বছর একদল ইতর ও বিশৃঙ্খল জনতা কাঁচের জানালা ভাঙে', অবশ্য ম্যানচেস্টারের সেই ক্রুদ্ধ বিচার-পতিকে তার জন্যে দোষ দেওয়া চলে না। কারণ, তখন খেলা মানে ছিল তিন-চার মাইল দূরে গোল পোস্ট এবং দু' দলে শ'খানেক করে লোক।

অবশেষে ১৮৪৮ সালে ইটন, হ্যারো, উইনচেস্টার, রাগবি শ্রিউবেরীর বিশিষ্ট পাবলিক স্কুলের ছাত্ররা কেম্ব্রিজে মিলিত হয়ে 'কেম্ব্রিজ বিধি' প্রণয়ন করলেন। তাতে একটি খেলায় প্রতি দলে ২০ জন খেলোয়াড় নেবার প্রথা চালু হলো। ১৮৬০ সালে তা কমিয়ে ১২ জন এবং শেষপর্যন্ত ১৮৭০ সালে ১১ জন স্থির করা হলো। ইংলণ্ডেই প্রথম ফুটবল ক্লাবের পত্তন হয় ১৮৫৫ সালে সেফিল্ডে। পর বছরে তৈরি হয় ফুটবল এসোসিয়েশন। ১৮৭১ সালে ১৫টি ক্লাব নিয়ে এফ এ কাপ প্রতিযোগিতা চালু হয়। আজো ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা।

কিন্তু ফুটবলের সব আইনকানুন, সমিতি-সংঘ করা সত্ত্বেও হাঙ্গামা-হুজ্জুতের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকেই গেল। ক' বছর আগে তুরস্কে ফুটবল খেলার একটা হাঙ্গামায় ৪০ জন লোক মারা যায়। বর্তমান বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতায় 'কুয়ালি-ফাইঙ্' বা বাছাই প্রতিযোগিতার সময় লাতিন আমেরিকায় হনডুরাস ও এল সালভাডোরের মধ্যে খেলার বিরোধ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধে পরিণত হয় এবং ৩০০০ লোক মারা যায়। ওই সাংঘাতিক ঘটনাগুলি ছাড়াও কোথাও না কোথাও ঐ খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারি, হাতাহাতি, বোতল ও পটকা ছোড়াছুড়ি লেগেই আছে।

কিন্তু সম্প্রতি পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের আয়টা হাউই-বাজির মত ঊর্ধ্বগতি এবং ফুটবল খেলা একটি বিরাট লাভজনক শিল্পে পরিণত হবার পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছে। আজ বৃটেনে কিম্বা পাশ্চাত্যে ফুটবল-প্রিয় দেশ-গুলিতে একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় তার ক্লাব থেকেই ১০,০০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড বর্তমানে ১৮ টাকা) মাইনে আশা করতে পারে।

ওই অর্থের কৌলীন্য ছাড়াও বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনও ফুটবলকে সামাজিক ইজ্জৎ দিয়েছে। ফুটবল যে-জনতার ছিল সেই জনতা আজ সম্মার্হ হয়ে উ... ১৮৯৭ সালে সি বি ফ্রে 'এন... কোপিডিয়া অফ স্পোর্টে' লেখেন ... ফুটবল হচ্ছে সর্বহারা বা প্রলেটারিয়ে... খেলা। তার আবেদন শুধু বুদ্ধিহী... কাছে।' আজ কোন এনসাইক্লোপি... লেখকের ফুটবল সমর্থকদের সম্পর্কে ... ধরনের কথা লিখতে সাহসে কুলোবে... না, প্রলেটারিয়েট কথাটাই পাশ্চা... শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য? ... তারাই টেলিভিশন ও বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলির প্রধান ক্রেতা, তারা ... করলে তবে কোন ফ্যাসন বা পণ্যের মূন... লোভনীয় হয়ে ওঠে। অতএব তাদের য... আরাধ্য, তারা যে লোকরঞ্জনী গায়ক চি... তারকা ও রাজনৈতিক নেতাদের মত অ... গণ্য হয়ে উঠবেন, তাতে আর আশ্চর্য হব... কি আছে?

গণসংযোগের যাদুকর মিঃ উইলস... সর্বপ্রধান বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যিনি সমাজে... ওই জমকালো নবনায়কদের গুরুত্ব স... প্রথম উপলব্ধি করেন। প্রতিবাদের ... উঠবে জেনেও তিনি যেমন বিটল গায়... গোষ্ঠির চারজনকে ও-বি-ই খেতাবে... সুপারিশ করেন, তেমনি ফুটবল-জগতে... বীরদের সম্মানিত করেন এবং সংযোগ র... করে চলেন। আজ তার ফলেই নটনটীদে... অনেকেই আগামী নির্বাচনে শ্রমিক দলে... সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। বৃটিশ ফুটব... খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ... সম্মানিত বাব চার্লটন মেক্সিকো থে... তার করে শ্রমিক দলের প্রতি তাঁর সমথ... জানিয়েছেন।

দুনিয়ার সেরা একাদশ

রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে... দৌলতে যদিও পৃথি... বিখ্যাত খেলো... য়াড়দের পরিচয় আ... আন্তর্জাতিক ... পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ... দশে কারা স্থ... পাবেন, সে সম্পর্কে সার্বজনীন সিদ্ধা... প্রায় অসম্ভব, যদিও চার-পাঁচজন সম্পর্কে... কোন প্রশ্নই উঠবে না। তবু সে সম্পর্কে... কয়েকজন বৃটিশ সাংবাদিক একটি প্রস্তা... দিয়েছেন। কিন্তু সে-প্রস্তাবে শু... মেক্সিকোতে যোগদানকারী দলগুলি... ধরা হয়েছে। তাই হ্যাণ্ডের ক্রুয়েফ, স্ক... ল্যাণ্ডের ব্রেমনার এবং সর্বোপরি উ... আয়ারল্যাণ্ডের জর্জ বেস্ট ও পর্তুগালে... ডিফেন্স, ভগটস (পশ্চিম জার্মানি)... ইউ সি বি ও বাদ পড়বে... দেশগুলি বাছাইয়ের প্রতিযোগিতায় উত্তী... হতে পারেনি। বাকীদের নিয়ে দলটা হ... অনুরূপ : গোলে, ব্যাঙ্ক (ইংলণ্ড... সেস্টোরনেভ (রাশিয়া), মুর (ইংলণ্ড... ফ্যাচেত্তি (ইতালী), মিডফিল্ডে, পেটা... (ইংলণ্ড), রচা (উরুগুয়ে), ফরওয়ার্ড ... রিভা (ইতালী), টসটাও (ব্রেজিল), পে... (ব্রেজিল), প্রাতি (ইতালী)।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যা...

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

৯ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 3rd. JULY, 1970. শুক্রবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড

২২শে জ্যৈষ্ঠের অমৃত পত্রিকায় জলসা বিভাগে কানন পঙ্কজ সায়গলের রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ডের পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য 'গ্রামোফোন কোম্পানী এ-চাহিদা কিছুটা পূর্ণ করে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ করছেন। কিন্তু সায়গলের গান নেই কেন? কানন দেবীরও আরো গান ছিলো ত। ভবিষ্যতে এঁরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন'—এর প্রতিবাদস্বরূপে এই পত্র লিখছি।

কে এল সায়গল গ্রামোফোন কোম্পানির লেবেলে একটিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেননি। তিনি যে ছ'টি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডে গেয়েছেন, তার সবক'খানিই নিউ থিয়েটার্স-হিন্দুস্থান রেকর্ডের লেবেলে গাওয়া। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি ১৯৬৫ সালে অর্থাৎ পাঁচ বছর আগেই এল এইচ ১৬ নম্বর ই পি রেকর্ডে সায়-গলের চারটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পুনঃপ্রকাশ করেছেন। বাকি দুখানি গানও পরে এল এইচ ২৯ সংখ্যক রেকর্ডে তাঁরাই প্রকাশ করেছেন। সায়গলের গাওয়া সব-ক'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীতই পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং 'সায়গলের গান কই?' বলে একটি বিশেষ রেকর্ড কোম্পানির প্রতি —যাঁরা সায়গলের রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডই করেননি—এমন প্রশ্ন তোলা ঠিক কি?

'কানন দেবীরও আরো গান ছিলো ত' —আপনাদের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে জানাই কানন দেবী গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে একা চারখানি এবং অন্য গায়কের সঙ্গে দুখানি মোট ছ'খানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। সেই চারখানি গানই বর্তমানে গ্রামোফোন কোম্পানি প্রকাশ করেছেন। কানন দেবীর বাকি সব রবীন্দ্রসঙ্গীত মেগাফোন কোম্পানির রেকর্ডে গাওয়া। মেগাফোন কোম্পানি পাঁচ বছর আগেই ই জে এন জি ৫০১ সংখ্যক রেকর্ডে কানন দেবীর 'বারে বারে পেয়েছি / প্রাণ চায় / আমার বেলা যে যায় / সেই ভালো'—এই চারটি গানের প্রথম ই পি রেকর্ড প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী কালেও তাঁরা কানন দেবীর আরো একটি ই পি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কানন দেবীর 'আরো গান' পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে গেছে।

পঙ্কজ মল্লিকেরও এটি দ্বিতীয় এল পি রেকর্ড। গ্রামোফোন কোম্পানিই প্রথমে তাঁর একটি এল পি রেকর্ড প্রকাশ করেন। পঙ্কজের গাওয়া বিখ্যাত গান 'প্রলয় নাচন / গ্রহনে গগনে / যৌবন সরসী নীরে দিনের শেষে' ছ'বছর আগে হিন্দুস্থান রেকর্ড এল এইচ ১৪ সংখ্যক ই পি রেকর্ডে প্রকাশ করেন এবং পরে এল এইচ ২৯ সংখ্যক ই পি রেকর্ডে সায়গল ও হেমন্তর সঙ্গে তাঁর 'আমি কান পেতে রই' গানটি অন্তর্ভুক্ত করেন।

আশা করি এই চিঠিটি প্রকাশ করে পাঠক-পাঠিকাদের সঠিক তথ্য জানাতে সাহায্য করবেন।

কুমকুম সোম
নাগপুর ৩, মহারাষ্ট্র।

রবীন্দ্রনাথ : বিতর্কের উত্তরে

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লোকনাথবাবুর বক্তব্য যা বুঝলাম :—

১। বিদেশে 'রিলকে' অপাঠ্য বলতে পায়তাড়া করতে হয় না, কিন্তু এদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেরকম কথা বলা অভাবিতব্য।

২। আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার দুর্ভাগ্য যে সজীব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা জীইয়ে রাখতে পারিনি।

৩। রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখার স্থান কি?

লোকনাথবাবুর মতে শেষ লেখার শেষ কবিতায় যা বলেছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের সারাজীবনের বক্তব্যের অনেকটাই মিল আছে। কিন্তু পাঠক এই কবিতা পাঠে অস্বস্তি বোধ করবেন। এমনকি রবীন্দ্র-নাথও এই অস্বস্তিবোধের হাত থেকে রেহাই পাননি।

শেষ কবিতা সম্বন্ধে লোকনাথবাবুর কয়েকটি প্রশ্ন : (ক) এ ছলনাময়ী কি কৌতুকময়ী, বা তার আত্মীয়া? (খ) ছলনা সহ্য করার জন্য শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ—সেটা বাড়াবাড়ি। (গ) শান্তির স্বরূপ কি?

৪। এর পর বক্তব্য উপস্থাপনায় লোক-নাথবাবুর অস্বস্তি বোধ জেগেছে। রবীন্দ্র-নাথকে মানবপ্রেমী বলতে তাঁর আপত্তি নেই—কিন্তু কেন এখানে তাঁর আত্ম-কেন্দ্রিকতা? তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ এই দুই সত্য, দুই নৌকা (আত্মকেন্দ্রিকতা ও 'মানবপ্রেমী'তে) পা রেখে চলতে পেরে-ছিলেন, কারণ তাঁর যুগে তা সম্ভব ছিল। আজ তা সম্ভব নয়, কারণ আজ জীবন ও জগৎ অত্যন্ত জটিল এবং আজকাল ভদ্র-লোকেরা মনেপ্রাণে ছোটলোক হয়ে যাচ্ছে।

৫। রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা দূরে চলে এসেছি, তাই রবীন্দ্রনাথ আজ আকর্ষণ-হীন। কারণ, রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতকের রেণেসাঁসের ফল, এবং আজ তা অচল।

আমার বিনীত বক্তব্য :—

১। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির গভী অনেক, নানা সুরে নানাভাবে তি লিখেছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকে মত তাঁর লেখা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অলস্থা 'ইজম'-আশ্রিত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছে 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। আব লিখেছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দ ভুবনে'। এবং দুটোই সমানভা চেয়েছেন। বিলাত রবীন্দ্রসৃষ্টিকে ত হঠাৎ বাসী হয়ে গেছে বলার সুযে আসে না। কারণ কখনও একভাবে, এ সুরে, এক 'ইজম' বা সাম্প্রতিক রা নীতির আধারে তাঁর সাহিত্য তিনি সৃ করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলে গভীরভাবে মানুষকে ভালবাসতে প্রকৃতিকে ভালবাসতেন, এবং তাঁর ম সম্ভবত কোন 'নিউরোসিস' ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা চোখ-ধাঁধানো পাঠককে চিন্তার অবকাশ দেয় এবং উদ্ব করে। তাছাড়া আমাদের ভারতীয় প্রাচ্যজীবন সমাজবিবর্তন পাশ্চাত্যজীবন সমাজের তুলনায় অত্যন্ত শ্লথগতিতে চ আমাদের ভারতবর্ষ সজীব মহাকা দেশ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ ভালো লাগা বা না লাগার অধিকার ত করি সকলেরই আছে।

২। লোকনাথবাবুর অভিযোগ লাংশে সত্য, তবুও ' খানা থোড় খাড়ার মধ্যে এক- ানা সত্যিকার ম শীল লেখাও তে বেরিয়ে আসে? রব নাথের কথায় সব মুকুল থেকে ফল ফ না, অধিকাংশই ঝরে যায়—এটাই নিয়ম

৩। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখার' নিয়ে আলোচনা করার শক্তি ধরি না। ত বলতে ইচ্ছে করে, 'শেষ লেখা'র স্থান নি করা সত্যিই শক্ত। ওটা ঠিক রবীন্দ্রনা ছবির মত, দেশী-বিদেশী কোন স্রী সঙ্গে যা বাঁধা যায় না। অত্যন্ত একক। লেখায় অত্যন্ত গভীর প্রজ্ঞাবান দার্শ রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে সংযত ও সুন্দর ব ভঙ্গিমার মধ্যে প্রকাশিত। শেষ লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কিছু কাব্যময় গদ্য বা গদ্যময় কাব্য। এগ কবিতা ও গদ্যের মধ্যবর্তী কোন 'রিজি এর জিনিস।

অস্বস্তিবোধ সম্বন্ধে লোকনাথবাব বলেছেন, সেটা বিশ্বজগতের কোন গভীরে গেলেই আসে। সেটা আম বিষয় উপস্থাপনার গুণ হতেও যেমন বিজ্ঞান গতিকে ঠিকমত ব্যাখ্যা পারেনি, শেষ বিশ্লেষণে এ এই ন

চিঠিপত্র

মোশান ইজ দি সামেইশান অফ মেন্ট। কিছুকাল আগে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে পার্টিকেল ওয়েভ নিয়ে অন্বস্তিবোধ পড়েছিলো, কুয়ানটাম মেকানিক্সে এসে দুটোকে মিলিয়েছে (ভাইরাস-এর মত নট নন-লিভিং অ্যান্ড নট লিভিং গোছের আর কি?) আধুনিকতম বিজ্ঞান আজও ম্যাটার ও ফিল্ড-এর অস্বস্তিবোধে ভুগছে। (ম্যাটারস আর ক্লুক্স অফ ফিল্ড)। এমনকি রবীন্দ্রনাথকে লোকনাথবাবু মানবপ্রেমী ও আত্মকেন্দ্রিক দুই-ই দেখতে চেয়েছেন ও অস্বস্তিবোধে পড়েছেন। বিশ্বজগতে কোথাও ওয়েল ডিফাইন্ড বাউন্ডারি লাইন নেই। আদপে রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিকতাটা ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা—ওটা কায়া, মানবপ্রেম তারই ছায়া। রবীন্দ্রনাথ আত্মকেন্দ্রিকতা ও মানবপ্রেমের বাউন্ডারি রিজিঅন-এ আছেন। আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মপ্রেমের (ইগো) সাবলিমেশান হলে মানবপ্রেম, সুপার সাবলিমেশান হলে ঈশ্বরপ্রেম আসে। (ঠিক মনে পড়ছে না রামকৃষ্ণদেব কোথায় যেন এমন কথা বলেছিলেন) যাজ্ঞবল্ক ঋষিও তাই বলেছিলেন (নরাঃ অরে বিত্তস্য কামায় বিত্ত কামায়...ইত্যাদি) মানুষ নিজেকে ভালবেসে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আত্মীয়স্বজন সমাজকে ভালবাসে। সুতরাং জিনিসটা দ্বন্দ্বমুখর বলেই অস্বস্তিবোধ মনে হচ্ছে।

(ক) যৌবনের কৌতুকময়ী স্বাভাবিকভাবে বার্ধক্যে এসে ছলনাময়ী হবে—এতে আর আশ্চর্য কি? আলোচ্য কবিতাটা পড়ে আমার উপনিষদের কথা মনে পড়ে। (হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যাসাপিহিতং মুখম ...সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে) আলোচ্য কবিতাটির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম (চতুর্থ ও ষষ্ঠ বাদ দিয়ে) স্তবক; যেন একই মূল বক্তব্যের ভিন্নরূপ প্রকাশ। আমরা ছলনাজালে আবদ্ধ, মোহবদ্ধ (তুলনীয় জম্পাকেনচাসন্তৃপটকসংশ্চরান্তি যথা..... ইত্যাদি, ঋগ্বেদ) এই মোহাবরণ ভেদ করে এলে নিশ্চয়ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করা যায়।

(খ) শান্তি একটা সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি। ও নিয়ে তর্ক করা মুশকিল। সেটা অন্তর থেকে আসে। 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' অনেকটা বৌদ্ধদর্শনের বোধিলাভ বলা যেতে পারে, বা আমাদের 'মুক্তজীব' বলা যেতে পারে।

৪। এ সম্বন্ধে আমরা ৩নং অংশে আলোচনা করেছি।

৫। রবীন্দ্রনাথের জীবন, লেখা সবকিছুর আধার সাবজেকটিভ ফিলসফি। নেভ মেটিরিয়ালিজম দিয়ে বিচার করতে গেলে অসঙ্গতি আসবেই। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের ফল (ফল অর্থে ইভলুশান মনে করছি) নয়, তিনি মিউটেশান। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর বাবু সংস্কৃতিতে যথেষ্ট সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর লেখায়।

আজ আমাদের যুগটাকে বলা যেতে পারে এজ অফ নিউরোসিস। লোকনাথবাবু একথা ঠিকই বলেছেন যে আমাদের সমাজ আজ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু তার সঙ্গে কি আমাদের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও নীতিবোধ বিসর্জন আংশিক দায়ী নয়? আজকের দিনে একটা ফ্রীজের জন্য কিছু কিছু গৃহবধূরা পার্ট টাইম জঘন্য জীবনযাপন করছেন। ডঃ কার্ল ইয়ুং বলেছিলেন, আমাদের বেশীর ভাগ লোকের আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমাদের রিলিজিয়াস আউটলুক অফ লাইফ হারিয়ে গেছে বা ফেলেছি। আমাদের তাই মনে হয়, আমরা বহুলাংশে সাহস হারিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের যুগে তাঁরা স্পষ্ট করে হ্যাঁ, না, সত্য, মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় বলার সাহস রাখতেন। ভালমন্দর মূল্যবোধ তখনও জটিল ছিল, আজও আছে। স্বার্থচক্রের বাহিরে আজ আমরা যেতে পারি না, তাই রবীন্দ্রনাথকে বা সেকালের মহত্তর কিছুকে আজ আমরা সহ্য করতে পারছি না, স্বীকৃতি দিতেও পাচ্ছি না।

শ্যামল বসাক
গোরক্ষপুর

ভেরা নেভিকোভার রচনা

আপনার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'অমৃত'র ১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ভেরা নোভিকোভার লিখিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলা সাহিত্য চর্চা' নামক নিবন্ধটি পড়ে খুব আনন্দিত হলাম।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কাজ শুরু হয়েছে। সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের এই জাতীয় কিছু কিছু লেখা ভবিষ্যতেও পড়তে পাব। আশা করি।

সুতরাং শ্রীমতী ভেরা নোভিকোভার উক্ত লেখাটি সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নির্মলকুমার সেনগুপ্ত
কলকাতা-৪০।

(২)

সাম্প্রতিক সংখ্যা অমৃতে (২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭) ভেরা নোভিকোভা লিখিত সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলা সাহিত্যচর্চা নিবন্ধটি পড়ছিলাম। পড়তে গিয়ে বিশেষ এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেলাম। এতে লেখা হয়েছে, '...বিশেষ করে যোগাযোগ রক্ষা করছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ কবি জসীমউদ্দিন, ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল মান্নান ও আবদুল হাই।' মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল হাইয়ের নামের সঙ্গে তারকাচিহ্ন দিয়ে ফুটনোটে বলা হয়েছে, 'এঁরা দুজন মারা গেছেন কিছুদিন আগে।'

আমরা জানতাম ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আবদুল হাই কিছুদিন আগে মারা গেছেন। কিন্তু প্রখ্যাত সাহিত্যিক এনামুল হকের মৃত্যুর কোনো খবর আমরা জানি না। এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে আমরা সম্পাদকের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

ডাঃ নীলকৃষ্ণ পাল।
সুখিয়াপোখরি,
দার্জিলিং।

(এটি ছাপার ভুল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মারা গেছেন। এনামুল হক জীবিত। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ভুলটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পত্রলেখককে ধন্যবাদ)

মুখের মেলা

প্রথমেই আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আবদুল জব্বারের 'মুখের মেলা' উপহার দেওয়ার জন্য। লেখনীর মধ্য দিয়ে যে মানুষের চরিত্রকে হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া যায়, তা জব্বারসাহেব প্রমাণ করলেন তাঁর রচনার মধ্যমে। সত্যি বলতে কি প্রথমে 'মুখের মেলা'র চরিত্রের প্রতি এতো আকর্ষণ ছিল না, অর্থাৎ এতো সুন্দর হবে ভাবতেই পারিনি। কিন্তু কয়েকটি সমালোচনা পড়ে কৌতূহল হলো, এবং পড়ে দেখলাম। বর্তমানের জীবনযাত্রার দিনে তিনি যে গ্রাম-বাংলার এমন সুন্দর চরিত্র চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন একন্য তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। আশা করি আরো বেশ কয়েকটি সংখ্যায় 'মুখের মেলা'র চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পাব।

পৃথ্বীশকুমার গুনে
আর্য প্রেস
তিনসুকিয়া (আসাম)।

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গে "জনপ্রিয়" সরকার গঠিত হোক বা না হোক এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মঞ্চে নয়া নাটকের পালা শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অবস্থার মূল্যায়ন সম্পর্কেও বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন কেন্দ্রীয় সরকার বা শাসক কংগ্রেস ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে এই সমস্যাকণ্টকিত রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণে অনিচ্ছুক বলেই একটি "জনপ্রিয়" সরকারের কাঁধে এই গুরুভার ন্যস্ত করে নিজস্ব সংগঠন মজবুত করার জন্য অধিক সময় বিনিয়োগের জন্য চিন্তা করছেন। পরিকল্পনা হল এই যে, যাতে আগামী নির্বাচনে বিরোধী শক্তির সার্থক মোকাবিলা করতে পারেন।

'সমদর্শী'র ধারণা, শেষোক্ত পরিকল্পনা কার্যকর করার অভিপ্রায় ঠিক হলেও ইন্দিরাজী বা তাঁর শাসক কংগ্রেস রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন না। সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে শাসক কংগ্রেস যে নীতি অনুসরণ করে আসছেন সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে অনতিবিলম্বে একটি নির্বাচনের ঝুঁকি নেওয়া সাংগঠনিক দিক থেকে যে যুক্তিযুক্ত নয় একথা তাঁরা বিলক্ষণ বোঝেন। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহার ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বাংলা কংগ্রেস ও অন্টবাম যদি সরকার গঠন করেন তবে তাঁরা নিঃশর্ত সমর্থন জানাবেন। তবে শাসক কংগ্রেস ঐ সরকারে যোগদান করবে না। এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শাসক কংগ্রেস যাকে বলে "ব্যালান্স অফ পাওয়ার" হাতে রেখে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালনের কথা ভাবছেন। শাসক কংগ্রেস দল অন্যান্য রাজ্যে ক্ষমতা স্বহস্তে রাখবার জন্য অদ্যাবধি যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেছেন, এই রাজ্যে সে সমস্ত সার্থক রূপ লাভ করবার পক্ষে বাস্তব অবস্থা অনুকূল নয়। আদর্শগত দিক থেকে বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে পেলেও কৌশলের দিক থেকে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের শাসক কংগ্রেস অদ্যাবধি সহযোগী হিসাবে পান নি। বিহারে দারোগা রায় মন্ত্রীসভার সমর্থক হয়েছিলেন দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা। কিন্তু সেটা বোধকরি এই কারণে যে সেখানে আজও তাঁদের শক্তি দুর্বল। রাজ্য প্রাশাসনিক যন্ত্র হাতে থাকলে যে কায়দা করে সংগঠন বাড়ানো যায় এই সত্য আজ অনেকেই বুঝে ফেলেছেন। বিশেষ করে বামপন্থীদের হাতে ক্ষমতা থাকলে ত কথাই নেই। কারণ সুশিক্ষিত ক্যাডারের সাহায্যে গণ-সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেওয়া তাঁদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে প্রবল শক্তিধর হওয়ার ফলে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের 'বিহারী' কৌশল এখানে কাজে লাগছে না। এবং সেইজনাই দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা পূর্বতন যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন প্রশ্নে অটুট প্রতায় নিয়ে রাজনীতিক বড়ে টিপছিলেন।

যা হোক বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া সি পি এম'কে বাদ দিয়ে শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে একটি 'জনপ্রিয়' সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়ার পরই প্রায় সব দল, বিশেষ করে বাংলা কংগ্রেসের সহযোগী দলগুলির, মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। কিন্তু গোপন শলাপরামর্শ চললেও ফরওয়ার্ড ব্লক এগিয়ে এসে জোর দিয়ে বলেছেন যে, কোন দল বা দল-সমষ্টি সরকার গঠন করলে সেই সংখ্যালঘু সরকারকে তাঁরা মোটেই সমর্থন করবেন না। এই "সমর্থন না করার" ঘোষণাটি কিন্তু রাজনীতির অভিধানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা সমর্থন না করার অর্থ বিরোধিতা করা নয়। এবং এই বক্তব্যের মধ্যে আরও একটি "কিন্তু" রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই, "নিরপেক্ষতা" অবলম্বন করা। গুণী পাঠকরা হয়ত মনে করবেন, 'সমদর্শী' কথার মারপ্যাচে কোন কোন দলকে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করছে। হলফ করে বলতে পারি, উদ্দেশ্য আদৌ তা নয়। বাংলা দেশে যে জটিল রাজনীতির খেলা চলছে সেখানে প্রত্যেকটি শব্দের বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে রাজনৈতিক সমীকরণের হদিশ পাওয়া খুবই কঠিন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্যটা বুঝতে সুবিধা হবে। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, পার্লামেন্ট ভবনের সামনে সংযুক্ত সোসালিস্ট নেতাদের যখন নির্মমভাবে পুলিশ মারধর করেছিল তখন সমস্ত বিরোধী পক্ষই গর্জন করে উঠেছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, ইন্দিরা সরকারকে সমর্থন না করার কথা বাঘা বিরোধী নেতারা বার বার ঘোষণা করে অগ্নিস্রাবী বক্তৃতায় সভাকক্ষে যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ ইন্দিরাজীকে বক্তৃতায় কেউ সমর্থন জানায় নি। এমনকি সরকারী কার্যকলাপের বিরোধিতাই করেছিলেন। কিন্তু কার্যকালে, অর্থাৎ ঐ জঘন্য পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ জানিয়ে ভোট গ্রহণের সময় এসেছিল, তখন সেই বাঘা বাঘা বিরোধী নেতারা নীরবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। তাই বলছিলাম, সমর্থন না করার অর্থ সব সময় বিরোধিতা নয়। নিরপেক্ষতা বলেও রাজনৈতিক অভিধানে আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে। কাজেই ফরওয়ার্ড ব্লকের "সমর্থন" না করার ঘোষণার মধ্যে তাৎপর্য নিহিত থাকলে অবাক হওয়া চলবে না।

আবার ফরওয়াড ব্লকের বক্তব্যের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের বক্তব্যের একটি যোগসূত্র আছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীসুশীল ধাড়ার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া কি, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে কায়দা করে উত্তর দিয়েছেন ডান কম্যুনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেন। তিনি বলেছেন, "আমরা কোন হাইপোথিটিক্যাল প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। এ সমস্ত প্রশ্ন তখনই বিবেচনা করা হবে যখন এগুলি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে।" বক্তব্যটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল পরিপূর্ণ। আগে থেকে একটি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার পক্ষে ডান কম্যুনিস্টরা নন। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁরা। সকলেই জানেন, রাজনীতিতে সম্ভব ও অসম্ভব বলে কোন সঠিক নির্দেশনা নেই। অবস্থার হেরফের ঘটলে যে কোন প্রকারের সমঝোতা সম্ভব। আদর্শগত পার্থক্য কোন বাধার সৃষ্টি করে না। ভারতের রাজনীতিতে একথা অনেকবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাই মুস্লিম লীগের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে অনেকেরই বিবেকদংশন হয় না। আবার ক্ষেত্রবিশেষে জনসংঘ কিম্বা সকল বর্ণের কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করতেও চিত্তে চাঞ্চল্য দেখা যায় না। "End will justify the means" এর এখানেই সার্থকতা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে শ্রীসুশীল ধাড়ার প্রস্তাব এখনো মাঠে মারা যায় নি। প্রায় সমস্ত বড় দলগুলির মধ্যে এই প্রশ্ন এখনও নানাভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে চলেছে। 'সমদর্শী' আগেও এই সম্পর্কে বক্তব্য রেখে জানিয়েছে যে, বাম কম্যুনিস্ট ও তাঁদের সহযাত্রী দলগুলি ছাড়া আর সমস্ত পার্টিগুলির মধ্যে সাধারণভাবে

একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্যমত আছে। সেটা হচ্ছে একটি সরকার গঠন করে বাম কম্যুনিস্টদের মতো কৌশল অবলম্বন ক'রে তাঁদের সংগঠনগুলিকে তছনছ করে দেওয়া। না হলে যে দলের অস্তিত্ব রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে একথা অন্যরা সকলেই বিলক্ষণ বোঝেন। রাজ্যপালের শাসন বজায় থাকলে বাম কম্যুনিস্টদের সংগঠনের উপর রাজনৈতিক আঘাত হানা কঠিন, এটা রাজনীতির একজন সাধারণ ছাত্রও জানে। অন্যদিকে ইন্দিরাজীর শাসক কংগ্রেসও নিশ্চিন্ত যে, রাজ্যপালের শাসন দীর্ঘায়িত করলে সমস্ত বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কার্যত, ইতিমধ্যে তা ঘটেও গেছে। শাসক কংগ্রেস একথা বুঝে বিরোধী শিবিরে ফাটল না ধরাতে পারলে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। তাই রাষ্ট্রপতির শাসনকাল বাড়িয়ে বিরোধীদের মধ্যে বোঝাপড়ার একটি ভিত্তিভূমি পাকা করে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা মোটেই অগ্রণী হতে পারেন না। সরকারী কর্মচারীদের লড়াইকে কেন্দ্র করেই বামপন্থীরা পরোক্ষভাবে একটি ইউনিট গড়ে তুলেছেন। সকলেই জানেন বহরমপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দলাদলি চরমে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতীক ধর্মঘটকে সকল বামপন্থী দলই সমর্থন করেছেন। এবং শুধু এই নয়, রাজ্যপালের হুমকির যথাযথ উত্তরও তাঁরা দিয়েছেন। ব্যুরোক্রেসি বামপন্থীদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যদি রাজ্যপালের পরামর্শদাতারা ধর্মঘট বে-আইনী হবে বা ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ইত্যাদি হুমকি না দিতেন তবে সমদর্শীর মনে হয় ঝড় বয়ে যেত বটে, কিন্তু কেউ তা টের পেত না। তাছাড়া সরকারী তরফ থেকে বাধা না এলে বামপন্থীরাও নিজেদের মধ্যে রাজনীতির প্যাঁচ খেলে যেতেন। অবশ্য ব্যুরোক্রেসির দোষ দিয়েও লাভ নেই। এরকম করাটাই তাঁদের ধর্ম। তাঁরা ত আর রাজনৈতিক নেতাদের মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই তাঁদের আনাগোনা করতে হয়। যা হোক, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাসক কংগ্রেসের শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এভাবে চলতে থাকলে আখেরে শাসক কংগ্রেস যে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সেকথা তাঁরা জানেন। এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীনাহার বাংলা কংগ্রেসের "গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" গঠনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। যদি সরকার নাও করা যায় তবু এরকম ফ্রন্ট গঠিত হলে বিপদের আশংকা অনেক কম হবে। কাজেই ইন্দিরাজী পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন একথা ঠিক নয়। বরঞ্চ আরও শক্ত হাতে রাজ্য তরণীর হাল ধরতে চাইছেন।

বাংলা কংগ্রেস "গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের" কথা যতই সোচ্চারে ঘোষণা করুন না কেন, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলা কংগ্রেস সেই ফ্রন্টে শাসক কংগ্রেস আর নিদেনপক্ষে আদি কংগ্রেসও গুর্খা লীগ ছাড়া অন্য কোন দলকে পাবার আশা করতে পারেন না। কেননা অন্য দল এ হেন জোটের কথা ভাবতেও পারবেন না। যদি ভাবতে পারতেন, তবে "জনপ্রিয়" সরকার গঠনের পথ আজই সুগম হয়ে যেত। অনেকে হয়ত বলবেন, বাম কম্যুনিস্টদের বাদ দেওয়ার কথা ত এস এস পি ও বিদ্রোহী পি এস পি-ও জোরের সংগে বলছেন। কিন্তু সংগে সংগে দেখতে হবে, এস এস পি'র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব শাসক কংগ্রেসকেও সমদৃষ্টিতে দেখছেন। আবার এ'দের রাজ্যশাখাগুলি শাসক কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে সরকার গঠনের বিরোধিতাও করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে "গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের" শ্লোগানে যদি এটা একটি কৌশল মাত্রই না হয়ে থাকে—ভবিষ্যৎ সহযোগী কোন বামপন্থী দল হবে বলে মনে হয় না।

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, একটি সরকার গঠন যে প্রয়োজন একথা বাম-কম্যুনিস্ট বিরোধী শক্তিগুলি বুঝতে পারছেন। অথচ, কি কৌশলে তা করা যায় এবং তাতে বামপন্থী নামের উপর কলংকও আরোপিত হবে না, সেই প্রশ্নই সকলকে ভাবিত করে তুলেছে। আর যদি সে চেষ্টা সার্থক না হয় তবে জোট বাঁধার ব্যাপারে সহযোগী কাকে করা যাবে সেই বিষয়েও দলগুলি ভীষণ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে।

শাসক কংগ্রেস দলের একজন নেতা বলেছেন, দু'একটা টাইম-বাউন্ড প্রোগ্রাম নিয়ে তা কার্যকর করে ফেলতে পারলে "কেয়ার টেকার" গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে নামলে ফল খারাপ হবে না। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা নাকি তাতে ভরসা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে ডান কম্যুনিস্টরাও আজ অবধি ভিন্ননীতি অবলম্বন করায় এই রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারছে না। 'সমদর্শী' বলবে, পেটে ক্ষিধা মুখে লাজ রেখে কোন লাভ নেই। এটা নিঃসন্দেহ যে বাম কম্যুনিস্টরাই এই রাজ্যে সকল দলের একক মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাই তাঁরা আগেভাবে ইস্যু সৃষ্টি করে নিজের হাতে নেতৃত্ব রেখে অন্যান্য দলগুলিকে অনুসরণ করতে বাধ্য করছেন। তাঁরা যদি দীর্ঘদিন এই কৌশল চালাতে পারেন 'সমদর্শী' মনে করে অন্য দলকে তাহলে এ মুলুকে বিলক্ষণ, বিপদে পড়তে হবে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন এই প্রসংগে ভুললে চলবে না। সেটা হচ্ছে আজ পর্যন্ত সরকার গঠনের প্রশ্নে বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও ডান কম্যুনিস্ট পার্টি। শাসক কংগ্রেস ত আছেনই। কিন্তু অষ্ট বামের পূর্বোক্ত ঐ দুই অংশীদার ছাড়া অন্যরা যেন কাব্যে উপেক্ষিতা হয়ে আছেন। ভাবটা দেখে মনে হয় যেন অন্যরা এই 'বড় ভাইদের' কথায় উঠবেন, বসবেন। কিন্তু অবস্থা মোটেই তা নয়। অন্য সব কাঠবিড়ালী যদি বিগড়ে যায় তবে সেতু বন্ধন অত সোজা হবে না। পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে এ ঘটনা অনেক বারই ঘটেছে।

যে রাজনৈতিক টানা-পোড়েন চলছে তাতে সরকার মোটেই গঠিত হবে কিনা জানি না। তবে কেউ যদি মাইনরিটি সরকার করেও বসেন তা যে চলবে একথা খানিকটা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ তখন ইস্যুভিত্তিক সমর্থনের কথাই ডবল হয়ে উঠবে। ধরুন যদি বাংলা কংগ্রেসই সরকার করলেন এবং তাঁরা যদি কোন প্রগতিশীল বা পূর্বতন যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফার কয়েক দফা কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তখন যাঁরা বর্তমানে সমর্থন করবেন বলে অস্বীকার করছেন তাঁরা কি ভূমিকা অবলম্বন করবেন? ইস্যু-ভিত্তিক সমর্থনে সেই সরকার অন্তত কিছুদিনও যে টিকে যেতে পারবে না, রাজনৈতিক হালচাল দেখে সে কথা বলা যায় না। যাহোক, এই রাজনৈতিক দাবা খেলায় কে কি চাল দিচ্ছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে ১৯৬৭ সালের পূর্বাবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস কম নয়। বাংলা কংগ্রেস ও দুই কংগ্রেস 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে' সন্নিবেশিত হলে আরও যদি দু' একটা দল তাঁদের সহযোগী হন তবে দ্বিধা-বিভক্ত বামপন্থী মোর্চা কিছুসংখ্যক বেশী আসন পেলেও সরকার গঠন করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। রাজনীতির যুযুৎসুটা সেই অভীষ্ট পথ লক্ষ্য করেই চালানো হচ্ছে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

পানাজী ও পাটনা, লখনৌ ও চণ্ডীগড়, সর্বত্র একই খবর। মন্ত্রিসভা যায় যায়। আশু কারণ এক-এক জায়গায় এক এক রকম। কোথাও সরকারী দলের মধ্যে আত্মকলহ, কোথাও কোয়ালিশনের শরিক দলগুলির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। দল ভাঙছে, নূতন জোট গড়ে উঠছে অথবা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। পার্লামেণ্টারি রাজনীতি এভাবে যোগ-বিয়োগের খেলায় পরিণত হচ্ছে।

পাটনা ও লখনৌতে যা ঘটছে তার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে "নয়া" কংগ্রেস দল। দু জায়গায়ই তারা প্রধান দল এবং ক্ষমতার ভাগীদার। উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে ঐ দুই রাজধানীতে ঘুরে এসেছেন। কিন্তু তাতে মন্ত্রিসভার বিপদ কমেছে অথবা অন্যভাবে অবস্থার ইতরবিশেষ হয়েছে বলে মনে হয় না।

বিহারে শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের মন্ত্রিসভা পনেরো দিনের কম সময়ের মধ্যে বিধান সভায় দুটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথমবার ১৭০-১০২ ভোটে জয়ী হয়ে শ্রীরায় তাঁর সরকারের সপক্ষে নিঃসংশয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ডিভিসনে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৬৮ থেকে কমে মাত্র আটে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে যেগুলি শ্রীরায়ের মন্ত্রিসভার অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, 'পুরানো' কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, ও স্বতন্ত্র দল এর আগেই সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠন করে শ্রীরায়ের মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করার সংকল্প গ্রহণ করেছে। তার উপর আবার গত ২৩ জুন বিহার বিধানসভায় যে আকস্মিক ডিভিসন ডাকা হল তাতে ক্ষমতাসীন জোটের অন্যতম শরিক ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিল। দ্বিতীয়ত, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিহার শাখায় অন্তর্বিরোধের দরুন শ্রীসুরযনারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে সাতজন পি-এস-পি, এম-এল-এ, আলাদা গোষ্ঠী তৈরী করেছেন এবং অনুমান করা হচ্ছে যে, দারোগাপ্রসাদ মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ঘটাবার ব্রত উদ্‌যাপনে সংযুক্ত বিধায়ক দল এই দলছুট পি-এস-পি গোষ্ঠীর মদৎ পাবে।

জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী সম্প্রতি চণ্ডীগড়ে বলেছেন যে, দেশে স্থায়ী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর দল অন্যান্য 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক' দলগুলির সঙ্গে জোট বাঁধতে উৎসুক। 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক' দল বলতে তিনি কাদের বোঝাচ্ছেন তাও তিনি খুলে বলেছেন। তাঁর বিবৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে "পুরানো" কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির আঁতাত গড়ে তোলার পরিকল্পনায় তাঁর দল উৎসাহী। সম্ভব হলে এস-এস-পি পি-এস-পি প্রভৃতি দলকে সঙ্গে রাখতে তাঁদের ইচ্ছা। তাঁদের এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিহারের সংযুক্ত বিধায়ক দলের মধ্যে বীজের আকারে দেখা দিচ্ছে। এই বীজ যদি অঙ্কুরিত হয় তাহলে সেটা হবে "পুরানো" কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র আঁতাতের প্রথম পরীক্ষা।

প্রকৃতপক্ষে, একটি মাত্র ঘটনা এখন পর্যন্ত শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতার আসনে টিঁকিয়ে রেখেছে। সেটি হল এই যে, সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা (অর্থাৎ শ্রীরায়ের পর নূতন মুখ্যমন্ত্রী) কে হবেন সে বিষয়ে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের ভিতরে এবং সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিক দলগুলির মধ্যে মতৈক্য হচ্ছে না। সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা হিসাবে শ্রীরামানন্দ তেওয়ারি এস-এস-পি দলের একাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। গত ১৩ জানুয়ারী বিধান সভায় ভোট গ্রহণের সময় এস-এস-পি দলের মাত্র অর্ধেক সদস্য সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন, বাকী অর্ধেক কোনদিকেই ভোট না দিয়ে তাঁদের মত-বিরোধ প্রকাশ করেন। যাঁরা ভোট দেননি, তাঁদের মধ্যে দলের হুইপও ছিলেন। যাঁরা সংযুক্ত বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শ্রীরামানন্দ তেওয়ারির বিরোধিতা করছেন তাঁদের বক্তব্য হল, সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত কোন হরিজন, উপজাতীয় অথবা মুসলমান সদস্যকে, তেওয়ারিজী কোনটিই নন, তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। পরবর্তী সংবাদ হল, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান শ্রীকর্পুরী ঠাকুর যদি সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাহলে রামানন্দ তেওয়ারিজী সরে দাঁড়াবেন। কিন্ত সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্যতম শরিক জনসঙ্ঘ শ্রীকর্পুরী ঠাকুরকে গ্রহণ করতে রাজী নয়। জনসঙ্ঘ পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছে যে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের প্রাক্তন নেতা শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রীকে সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতৃত্ব দেওয়া হোক। সরকার-বিরোধীরা যদি একজন সর্বসম্মত নেতার নাম স্থির করে ফেলতে পারেন, তাহলেই শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের মন্ত্রিসভার পরমায়ু ফুরোবে। কেননা, এখন যাঁরা এই মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করছেন তাঁদের মধ্যে এমন কিছু সদস্য আছেন যাঁরা অনুকূল স্রোতে নৌকা ভাসানর অপেক্ষায় রয়েছেন।

*

উত্তর প্রদেশে শ্রীচরণ সিংহের মন্ত্রিসভার সামনে বিপদটা বিহারের মত ততটা আসন্ন না হলেও সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দস্তুরমত জটিল। ঐ রাজ্যের কোয়ালিশন সরকারের বড় শরিক "নয়া" কংগ্রেস দলের সংগে ছোট শরিক ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংযুক্তির প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসায় যত দেরী হচ্ছে দুই শরিকের সম্পর্ক ততই খারাপ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি লখনৌ-এ গিয়ে তাঁর দলের প্রায় তিনশর কর্মীর সংগে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন: সেখানে তাঁর দলের কর্মীরা নাকি প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছেন যে, সরকারী ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় ক্রান্তি দল কংগ্রেসকে "গ্রাস" করে ফেলছে; "নয়া" কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রীরা অন্য শরিকের দলভুক্ত মন্ত্রীদের তুলনায় পিছনের সারির সদস্য হওয়ায় তাঁরা কোন প্রভাব রাখতে পারছেন না। এই কংগ্রেস কর্মীরা মনে করেন যে, দল বাঁচাবার জন্য "নয়া" কংগ্রেসের সংগে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংযুক্তি প্রয়োজন। লখনৌতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সংগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী[illegible] একঘন্টা ব্যাপী কথাবার্তার সময় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানকার কংগ্রেস কর্মীদের এই মনোভাবের কথা তাঁকে জানিয়েছেন।

এই সংযুক্তির প্রস্তাবে যে শ্রীচরণ সিং অনিচ্ছুক তা নন। কিন্তু যদি তিনি ভারতীয় ক্রান্তি দলের [illegible] ভারতীয় চেয়ারম্যান তা হলেও দলকে দিয়ে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী ও সম্পাদক শ্রীএস কে সিং প্রকাশ্যে সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। শ্রীএস কে সিং বলেছেন যে, উত্তর প্রদেশের কয়েকজন ছাড়া দলের আর কেউ এই সংযুক্তি চান না; কেননা কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবেই এই দল গঠিত হয়েছিল।

সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য উত্তর প্রদেশে ভারতীয় ক্রান্তি দলের ভিতর থেকে শ্রীএস কে সিংকে শাস্তি দেওয়ার দাবী উঠেছে। শ্রীচরণ সিং বলেছেন যে, কয়েক মাস আগে শ্রীএস কে সিংকে দলের সম্পাদকের পদ ছাড়তে বলা হয়েছিল তিনি সেই নির্দেশ অমান্য করায় তাঁর কাছ থেকে সম্পাদকের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

আর একটি খবর এই যে, মহারাষ্ট্র, বিহার ও রাজস্থানে ভারতীয় ক্রান্তি দল ইতিমধ্যে সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

বিহারে "নয়া" কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করার প্রশ্নে লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দল ভেঙে গেছে। উত্তর প্রদেশে 'নয়া' কংগ্রেস দলের সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্নে ভারতীয় ক্রান্তি দল ভাঙার উপক্রম হয়েছে। হয় সংযুক্তি ও পরিণামে ভাঙন অথবা পৃথক্ অস্তিত্ব এবং পরিণামে 'নয়া' কংগ্রেস দলের সদস্যদের কোয়ালিশন ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—এই উভয় সংকটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংহ।

ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের তথ্যমন্ত্রী শ্রীগেন্দা সিং পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। পদত্যাগপত্রে তিনি কোন কারণ দেখান নি। প্রথমে জানা গিয়েছিল, দিল্লীর একটি সংবাদপত্র উত্তর প্রদেশ সরকারের সমালোচনা করায় উত্তর প্রদেশ সরকার ঐ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছেন, তারই প্রতিবাদে শ্রীগেন্দা সিংহের এই পদত্যাগ। পরে বলা হয়েছে যে. তিনি 'ব্যক্তিগত কারণে' পদত্যাগ করেছেন। কারণ যাইহোক না কেন, পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস. তাঁর পদত্যাগ কংগ্রেসের সঙ্গে বি-কে-ডি-র সংযুক্তির প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়।

*

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ সিং-বাদল তাঁর মন্ত্রিসভা রক্ষা করার জন্য বলতে গেলে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছেন। ২৯ জন সদস্যের মন্ত্রিমন্ডলী গঠন করেও তিনি তাঁর মন্ত্রিত্ব-কামী সদস্যদের সকলকে খুশী করতে পারেন নি। যাঁদের মন্ত্রী করা গেল না তাঁদের এখন অন্য বেতনভুক্ পদ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার পথ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যপালের কাছে একটি অর্ডিনান্স জারীর প্রস্তাব পাঠান হয়েছে যাতে এম-এল-এ'দের বেতনভুক সরকারী পদ গ্রহণের বাধা দূর করা যায়। বিরোধী দলগুলি এই প্রস্তাবে তো তুমুল বাধা দিচ্ছেই, স্বয়ং রাজ্যপাল ডাঃ পাভাতেরও যে এই ধরনের একটা অর্ডিনান্সের ন্যায্যতা সম্পর্কে সংশয় আছে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্যপাল নাকি নয়াদিল্লীর কাছে জানতে চেয়েছেন, অর্ডিনান্স জারী সম্পর্কে মন্ত্রিসভার মতামত জানতে তিনি বাধ্য কিনা, অথবা এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার অধিকার আছে।

কিন্তু শুধু দলের ভিতরেই অসন্তোষ নয়, কোয়ালিশনের দুই শরিকের মধ্যেও মন-কষাকষি দেখা দিয়েছে। অমৃতসর, গুরুদাসপুর, জলন্ধর ও কপূরতলা জেলার মোট ৪৬টি কলেজকে অমৃতসরের গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাব হয়েছে। এই প্রস্তাবে জনসঙ্ঘের তীব্র আপত্তি। জনসঙ্ঘ এই বলে হুমকি দিচ্ছে যে, এই প্রস্তাব কার্যকর করা হলে জনসঙ্ঘ অকালী দলের সঙ্গে কোয়ালিশনে আর থাকবে না।

এদিকে ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুরুনাম সিং রাজ্যপালের কাছে অবিলম্বে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানিয়ে

পকেটমার ?

সর্ষের তেল

২৫.৬.৭০

বলেছেন যে, বাদল মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন, তাঁদের আর টি'কে থাকার অধিকার নেই।

*

গোয়ায় যে ক্ষমতার লড়াই চলছে তার সংগে কোন সর্বভারতীয় দল জড়িত নেই। ক্ষমতাসীন মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলের সাতজন সদস্য শ্রীদয়ানন্দ বান্দোড়করের মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বিধানসভায় এই সরকার এখন সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন।

শ্রীবান্দোড়করের মন্ত্রিসভা বলতে অবশ্য এখন তিনি একাই অবশিষ্ট রইলেন। কেননা, আর দুজন মন্ত্রী, অ্যান্টনি জে ডি সুজা ও গোপালরাও মায়েকার, বিদ্রোহীদের সংগে নাম লিখিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

*

ডাঃ সুকর্ণ চেয়েছিলেন আজীবন তিনি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকবেন। তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হয় নি। কেমনা, বছর দুয়েক যাবৎ তিনি তাঁর নিজের বাড়ীতে প্রকৃতপক্ষে বন্দীর জীবন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর একটি সাধ পূর্ণ করেছেন। তাঁর জন্মস্থানে মায়ের সমাধির পাশে একটি সাদাসিধা সমাধিতে ডাঃ সুকর্ণকে শায়িত করে অল্প কথায় তাঁর এই পরিচয় লিখে রাখা হয়েছে :—'ইন্দোনেশিয়ার জনগণের মুখপাত্র বুং কার্ণোকে এখানে সমাধিস্থ করে রাখা হয়েছে।'

বেঁচে থাকতেই ডাঃ সুকর্ণ তাঁর এই সমাধিস্থল নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন এবং এই পরিচয়লিপি লিখে রেখে গিয়েছেন।

৬৯ বছর বয়সে ডাঃ সুকর্ণের মৃত্যু বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চ থেকে একটি বর্ণাঢ্য চরিত্রকে সরিয়ে নিয়ে গেল। জাভার একজন শিক্ষক ও বালীদ্বীপ-বাসির সন্তান সুকর্ণ বাল্যকাল থেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে অনেক বিতর্কের নায়কে পরিণত করেছেন। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের সংগে লড়াই করতে গিয়ে তিনি জাপানী দখলদারদের সংগে সহযোগিতা করেছেন, একই সংগে কম্যুনিষ্ট, মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন মাসজুমি পার্টি ও সেনাবাহিনীর সংগে হাত মিলিয়ে একটির বিরুদ্ধে আর একটি শক্তিকে চালিত করেছেন। বহুবিস্তৃত হাজার হাজার দ্বীপ-মালাকে একটি দেশের মধ্যে গ্রথিত ক'রে তিনি দেশবাসীর 'বুং কার্ণো' (ইন্দো-নেশিয়ার ভাষায় 'বুং' শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাই) সম্ভাষণ লাভ করেছেন, আবার ক্ষমতার মদিরায় মত্ত হয়ে তিনি তাঁর দেশকে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিপদজনক সংঘর্ষের কিনারায় নিয়ে গেছেন। ১৯৬৫ সালে যখন সেনাবাহিনী কম্যুনিস্ট " ..থান দমন করল তখন থেকেই সুকর্ণে পতনের শুরু। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কম্যুনিস্টরা জোর করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং সুকর্ণ নিজে সেই ষড়যন্ত্রের শরিক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে জেনারেল সুহার্তো তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করলেন। সেই থেকে ডাঃ সুকর্ণ নিভৃত জীবনযাপন কর-ছিলেন। শেষ জীবনে এমনকি তাঁর চতুর্থ ও প্রিয়তমা পত্নী জাপানী কন্যা শ্রীমতী রত্নসারি দেবীও তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর সেই পত্নী অবশ্য জাকার্তার মিলিটারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন তিন বছরের বয়সের মেয়ে কার্তিকা'কে, যে জন্মাবধি নিজের বিখ্যাত পিতার মুখ দেখেনি।

—পুণ্ডরীক

২৫-৬-৭০

সম্পাদকীয়

স্বাগত মহারাজ

গত সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অবিভক্ত ভারতের মুক্তিযোদ্ধা শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। পশ্চিম বাংলায় তাঁর আত্মীয়স্বজন আছেন। সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই এদেশে আসবার ইচ্ছা তাঁর থাকবে। কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর আকর্ষণ অবিভক্ত বাংলার মাটির প্রতি। ৮২ বৎসরের জীবনে শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং এখনও করছেন তাতে জাতিবৈরিতা বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। মহারাজ একজন সমাজবাদী নেতা। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করে সংগ্রাম চালিয়েছেন। এ জন্য সামরিক শাসকদের কাছে তাঁর পুরস্কার জুটেছে, কারাবাস।

কারাগার এই বিপ্লবীকে কোনোদিন তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। বৃটিশ কারাগারেই তাঁর কেটেছে ত্রিশ বছর। পাকিস্তানী কারাগার, তাই, তাঁর কাছে নতুন নয়। শ্রীচক্রবর্তীর এদেশে আগমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি দেশত্যাগ করে আসেন নি। অনেক নেতাই পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করে অনেক আগেই চলে এসেছেন। মহারাজের মতো কিছু আদর্শবাদী বরেণ্য নেতা এখনো পাকিস্তানে আছেন। এঁরা জন্মসূত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলেও পাকিস্তানের নির্যাতিত মানুষেরই সংগ্রামের সাথী। পাকিস্তানের সামরিক সরকার বহুবার নানা মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে মহারাজকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছে। অন্যায়ভাবে জেলে পুরেছে। কিন্তু বৃটিশ শাসনের কাছে যিনি মাথা নোয়ান নি, আয়ুব-ইয়াহিয়ার কাছে সেই হিমালয়সদৃশ উন্নত শির নত করবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মহারাজকে পশ্চিম বাংলার মানুষ আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ কোনোদিনই ত্রৈলোক্য মহারাজের মতো সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের ঋণ বিস্মৃত হতে পারে না। শ্রীচক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গে পদার্পণ করেই বলেছেন, দীর্ঘ বারো বছর পর 'পবিত্র ভারতভূমি'তে এলাম। এই উপমহাদেশের প্রতি ধূলিকণায় বিপ্লবীদের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। তাঁদের আত্মদানের বিনিময়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে। নিজেদের ভুলের জন্য দেশভাগ হয়েছে। কিন্তু সেজন্য এখন আর দুঃখ করে লাভ নেই। উভয় রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মুখ্য দায়িত্ব হল দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। মহারাজ নিশ্চয়ই এসে লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁকে ভিসা দিতে পাকিস্তান সরকার গড়িমসি করলেও প্রতিদিন হাজার হাজার গরীব উদ্বাস্তু পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এখানে এসে ওরা কোথায় যাবে, কীভাবে বাস করবে তা অনিশ্চিত। তা সত্ত্বেও এই উদ্বাস্তুরা পাকিস্তানে আর থাকতে পারছে না। মহারাজ পাকিস্তানের একজন সম্মানিত নেতা। বহু সংগ্রাম তিনি করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি যখন দেশে ফিরে যাবেন তখন তাঁর দেশের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী-চেতনাসম্পন্ন মানুষকে যেন তিনি বলেন সংখ্যালঘুদের এভাবে বিতাড়ন পাক-ভারত উপমহাদেশের সম্প্রীতির পক্ষে বিষস্বরূপ। বিনা কারণে এই দুঃস্থ খেটে-খাওয়া মানুষগুলোকে ভিটেমাটি ছাড়া করার চক্রান্ত পাকিস্তানেরই, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী। মহারাজ বলেছেন, 'পাকিস্তানের সকলেই ভারত-বিদ্বেষী নয়। আমরা সমমর্যাদায় বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করতে চাই।'

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। এই নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুব খাঁর মৌল গণতন্ত্রকে বাতিল করে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই প্রথম পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পূর্ব বাংলার মানুষ যদি এই নির্বাচনকে কাজে লাগিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সক্ষম হয় তাহলে, আমাদের বিশ্বাস আছে যে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক হৃদ্যতর হবে। কিন্তু তার আগে অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে জনমত সংগঠন করতে হবে। নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন সামরিক সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল। পূর্ব পাকিস্তান যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করছে তাকে নস্যাৎ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই সংখ্যালঘু বিতাড়ন চলছে। পাকিস্তানের গণতন্ত্রের সম্ভাবনার স্বার্থেই এই চক্রান্ত ব্যর্থ করা প্রয়োজন।

প্রমীলা নজরুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের পঞ্জরে তুমি এক অচপল বিদ্যুৎশিখা,
এক মৃত্যুঞ্জয়ী আগ্নেয়ী আশা
নজরুলের আশালতা—
তুমিও এক বিদ্রোহিনী
সীমাতিক্রান্তা প্লাবিনী স্রোতস্বতী
কত দুরদুর্গম পথ পেরিয়ে
কত বাধাবিপত্তির প্রাচীর ভেঙে দিয়ে
চলে এসেছ মিলতে তোমার নদীনাথে,
তোমার প্রাণদ পুরুষে
একমাত্র মনুষ্যত্বের অধিকারে।
তোমাকে না হলে যে নজরুলের হত না উদ্ঘাটন,
হত না উদ্ভাসন,
মিলত না এই সাফল্যপূর্ণতা।
তাতেই তুমি উন্মগ্ন-নিমগ্ন
তাতেই তুমি উন্মীলা-প্রমীলা।
তুমিই তো তার খরসূর্যের ছায়া,
অগ্নিবীণার বীণা, বিষের বাঁশির বাঁশি,
তার সর্বহারার সর্বেশ্বরী,
তার সমস্ত তপস্যার তাপ,
সমস্ত কল্লোল-কোলাহলের ছন্দ,
তার সার্বভৌম সাম্যবাদের সর্বংসহা শান্তি,
মানবতাবাদের মৃন্ময়ী মমতা।

কত অশ্রুস্নাত শোকসন্ধ্যা এসেছে জীবনে
বাঞ্ছিত প্রাণধনের ঘটেছে অকালবিদায়,
কত দুঃখদারিদ্র্যের নিশ্ছিদ্র অমানিশা
আচ্ছন্ন করেছে সংসার,
তবু, হে সুব্রতা, সে প্রলয়ঘোরঘটায়ও
তুমি রয়েছ শাশ্বতী স্মিতজ্যোৎস্না,
তুমি ব্রতচ্যুত হওনি, নজরুলকে তুমি স্থির রেখেছ,
রেখেছ তার সৃষ্টির সিংহাসনে।
তুমি যে সর্বার্থসাধিনী
তুমি তো শুধু সুখের সহচরী নও,
দীর্ঘ রুক্ষ পথে দুঃখেরও সহযাত্রী।
তুমি তার আর্তিতে আর্ত, আনন্দে প্রমুদিত,
তার মৌনে মৌনী, বিষাদে ম্লানমুখী,
তুমিই তো সার্থক পতিব্রতা—
তার সমস্ত গানের অলিখিত স্বরলিপি।
কী বিপুল তোমার বৈভব,
ত্যাগ আর তিতিক্ষা, নিষ্ঠা আর নির্নিমেষ সহিষ্ণুতা।
দুটি পদ্মপত্রবিশাল চোখে একটি মঙ্গল আলোকের দীপ।

তারপরে কী দারুণ বিধিচক্রে
তোমার অর্ধাঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেল,
তখনো তুমি অর্ধাঙ্গিনী
শয্যালীনা, ব্রতকৃশা, তখনো তুমি স্বামীর [illegible] করছ
দুটি হাতে, তোমার সাধ্যের পরিধির [illegible]
নিদাঘে বাদলে
শারদে শিশিরে
তুমি এক মধুমতী প্রশান্তবাহিতা
বিকল্প-বিকার-শূন্য নিস্পৃহ নিশ্চল
তোমার অস্তিত্বই এক অপরাজেয় আশ্বাস—
আর নজরুল তখন যোগভ্রষ্ট উন্মাদ
হিংস্র ও ধ্বংসলোলুপ,
সব ছিঁড়েখুঁড়ে ভেঙেচুরে নস্যাৎ করে দিচ্ছে—
কিন্তু, কী আশ্চর্য, তোমার কাছটিতে এসে বসছে চুপ করে
খেলাভোলা গৃহাগত শিশুর মত,
তোমার দুই চোখে আরোগ্য-স্বাগত প্রশ্ন
দুই হাতে স্নেহের শ্রাবণ লাবণি
সরল নির্মল মুখখানিতে অনাগত সুদিনের স্বপ্ন আঁকা।
তুমি নজরুলকে পরিচ্ছন্ন করে প্রসাধন করে দিচ্ছ
সেই প্রসাধনাই তোমার আরাধনা
ভয়ংকরকে সাজাচ্ছ সুন্দর করে।
যার স্মৃতি নেই তার বুঝি যন্ত্রণাও নেই,
তোমার স্মৃতি আছে অথচ পূর্ণ সামর্থ্য নেই,
দুঃখের মন্দিরের তলে প্রতীক্ষার থালায়
তোমার শুধু সংক্ষিপ্ত সেবার নৈবেদ্যরচনা।
কে সেবা নিচ্ছে কোথায় তার অনুভব?
সেই তো তোমার আদিগন্ত যন্ত্রণা—
কিন্তু সেই যন্ত্রণা তো রিক্ততার বিশুষ্ক হাহাকার নয়
সেই যন্ত্রণাই তো তোমার সকালের প্রার্থনা
দুপুরের উৎসবশোভা
সন্ধ্যার বাসকসজ্জা
নিশীথ রাত্রির সুগভীর প্রণতি।

বজ্রকে স্তব্ধ করে রেখে, হে বিদ্যুৎবহ্নি,
তুমি মিলিয়ে গেলে সহসা।
তোমাকে নজরুল অন্ধকারে খুঁজতে বেরুল,
দেয়ালে তোমার ছবির কাছে এসে
তাকাল অবোধ চোখে।
ওখানে নয়, দাঁড়াল এসে উন্মুক্ত আকাশের নিচে
দেখল তুমি চিরদ্যুতি তারা হয়ে গিয়েছ—
আরেক অরুন্ধতী।।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমস্যা

সাহিত্যিক একটি বিশেষ শ্রেণীর নন, তিনিও মানুষ। গজদন্তমিনারে করার সৌভাগ্য একালের সাহিত্যিকের ই। তাছাড়া সাহিত্যিকও সমাজবন্ধ ীব, তাঁর সংসার আছে, স্ত্রী, পুত্র কন্যা ইত্যাদিও আছে। সাহিত্যিকের ঘরের সবাই ত' আর সাহিত্যিক নয়, তারা শাদা মানুষ, সুতরাং সামাজিক সমস্যার ঢেউ ঘরে এসেও প্রবেশ করে। সাহিত্যিকের সন্তান কলেজে বোমা খেয়ে হাসপাতালে যায়, মেয়ে অবাঞ্ছিত যুবকের সঙ্গে উধাও হয়, স্ত্রী ক্রমবর্ধমান বাজারদরের সঙ্গে তাল রেখে চাহিদার হার বর্ধিত করেন। ফলে সাহিত্যিকের পক্ষে নির্বিকল্প সমাধির সুযোগ নেই। তাঁকে সব দেখতে হয়, শুনতে হয়। একটু বিশেষভাবেই দেখতে হয় কারণ তিনি তৃতীয় নয়নের অধিকারী। সাহিত্যিকের অবস্থা তাই ত্রিশঙ্কুর মতো। ঘরেও নয় পারেও নয়, তিনি 'যেজন আছে মাঝখানে' তাদের দলে। পতাকা হাতে নিয়ে সাহিত্যিক মিছিলে যোগ দিতে পারেন না। ভদ্র মানুষ তিনি, তাই তাঁর দাবী-দাওয়াটুকু পেশ করতে কুন্ঠা হয়। কিন্তু আর সব শ্রেণীর মানুষের মত তাঁকেও ঘূর্ণিপাকে পড়ে দিশেহারা হতে হয়। সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়ত হয়, হয়ত হয় না। হয় না তার কারণ অনেক ক্ষেত্রে যা প্রীতিপদ নয় তা প্রকাশে সাহিত্যিকের স্বাভাবিক অনীহা।

সমাজ কি সত্যই পরিবর্তিত হয়েছে? আজ থেকে একশ বছর আগের 'সংবাদ প্রভাকর' নামক ঈশ্বর গুপ্তের বিখ্যাত সংবাদপত্রের পাতা উলটালে দেখবেন সমস্যা সেকালেও কিছু কম ছিল না। সেকালের রাগী তরুণের অন্য নাম ছিল। আর সেইকালে তরুণরা অন্য কোনো কিছু সামনে না পেয়ে মিশনারীদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে পরমকারুণিক যীশুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তবে সেকালে চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল, একালে সেই চক্ষুলজ্জাটুকু অন্তর্হিত।

আধুনিককালের নীতি ও প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ও সমাজজীবনের রূপান্তর যে একটি সমস্যা, সে কথা প্রতিক্রিয়াশীল আর সংস্কারপন্থী উভয় পক্ষই অস্বীকার করবেন না। এই পরিবর্তন কিছু মানুষ রক্ষণশীলোচিত সতর্কতা আর অনুশোচনার চোখে লক্ষ্য করেন, আবার অনেকে এই পরিবর্তনের মধ্যে আশা ও আনন্দের আভাষ পেয়ে উৎসাহ ভরে তাকে বরণ করতে চান। যৌনতত্ত্ব এবং পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের মনোভঙ্গী শৈশব থেকেই ভাবাবেগ মিশ্রিত হয়ে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচার বিবেচনা না করে যৌনতত্ত্ব এবং যৌন সম্পর্ক বিষয়ে আমরা মনে মনে একটা নির্দিষ্ট ধারণা করে নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু জীবনে যা প্রত্যক্ষ, অসংখ্য ঘটনাস্রোতে যা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে, যা সত্য ও প্রত্যক্ষ, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি কই?

সকলেই চায় জীবনটা মন্দাক্রান্তা তালে মসৃণ গতি চলুক। কিন্তু তা সম্ভব নয়, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

সমাজের এই মূলগত পরিবর্তন ও রূপান্তরের সর্বপ্রধান কারণ আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

এই অর্থনৈতিক কারণ আমাদের সমাজে এমন এক ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যার ফলে পৃথিবী আজ এক সর্বগ্রাসী বিপ্লবের মুখে এসে পড়েছে। সদ্য পরলোকগত মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত "ম্যারেজ অ্যান্ড মর্যালস" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় আজ থেকে অনেক বছর আগে বলেছেন—

> "There are at the present day two influential schools of thought, one of which derives everything from an economic source, while the other derives everything from family or sexual source, the former school that of Marx the latter that of Freud."

পারিবারিক জীবনের সংহতিভেদ, আধুনিক বিবাহ, অনুষ্ঠানের অবনতি ও তৎসহ আধুনিক তরুণের বিদ্রোহ, আমাদের সামাজিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপান্তরের অন্যতম কারণ।

গ্রীষ্মের আকাশের আকস্মিক কাল বৈশাখীর মত বিপ্লব কল্পনাতীত আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। কোনো বিপ্লবই সামরিক ইঙ্গিতে বা আইনগত সিদ্ধান্ত মাথায় নিয়ে সংসাধিত হয় না। বিপ্লব সর্বপ্রথম জীবনের সকল দিক, সকল কোণ আক্রমণ করে, তারপর যখন সুনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনোপযোগী অনুকূল বাতাবরণের সূচনা হয়, তখনই সামান্য সংগ্রামে, ক্ষণিক সংঘর্ষে, পরিস্থিতি অনুযায়ী বাঞ্ছিত পরিবর্তনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা বা আয়ত্তাধীন করা সম্ভব হয়। বিপ্লব প্রক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র নয়, সংঘর্ষের বহু পূর্বেই বিপ্লব শুরু হয়। বিপ্লবের পরিণতির এক চরম অভিব্যক্তি এই ক্ষণিক সংঘর্ষ।

প্রাচীন সমাজ আজ ধ্বংসোন্মুখ, প্রাচীন নীতি আজ নিঃস্ব। দ্রুত পরিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে নব্যনীতি ও নব্যন্যায়ের উৎপত্তি। এই বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধের পর। এই আলোড়ন আজ সারা পৃথিবীকে আলোড়িত করেছে, প্রাচীনপন্থী ভারতবর্ষও সেই আলোড়নের বাইরে থাকতে পারে নি। যেটুকু বাকী ছিল তা সম্পূর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। আগের কালে যা শালীনতা ও শিষ্টাচার বহির্ভূত মনে হত, আধুনিক সমাজে তাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। রক্ষণশীলতার রক্ষাকবচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। প্রাচীন একান্নবর্তী পরিবারের যে আদর্শ অবশিষ্ট ছিল তা ধুয়ে মুছে গেল। বার্নার্ড শ'র নায়িকা চীৎকার করে ওঠে— Ilissaliance

> "Oh home! home! parents! family! duty! how I loathe them! How I like to see them all blown to bits!"

পারিবারিক সংহতিভেদ সম্পূর্ণ হল।

এই চিত্র সাহিত্যে কিছু কিছু প্রতিফলিত হয়েছে। অশ্লীল! অশ্লীল! বলে চীৎকার করলে হবে না, আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে যা অশ্লীল মনে হত তা আজ শ্লীল। আজ যা অশ্লীল তা কালই শ্লীল মনে হবে। সাহিত্যিককে যদি বাস্তবধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয় তাহলে তাঁর পক্ষে রক্ষণশীলের শুচিবায়ুগ্রস্ত রক্ষাকবচ এঁটে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। সাহিত্যিক সত্তার দিক থেকে তিনি পতিত হবেন। তাই সাহিত্যিক যা লিখছেন তা নিয়ে হৈ-চৈ করা নিছক অপরিণত মানসিকতার প্রকাশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সর্বদেশেই সাহিত্যে যৌন বিকার ও সামাজিক বিকৃতির স্পষ্ট বর্ণনা শুরু হয়েছে। ইতালীর নিও-রিয়ালিজম বা মার্কিন দেশের কোনো কোনো লেখকের রচনা পাঠ করলে এ-দেশের শুচিবাগীশরা হয়ত হার্টফেল করবেন। জীবনের বিচিত্র রূপের রিপোর্টার সাহিত্যকার। তিনি যে রিপোর্ট রচনা করেন, উপাদানের দিক থেকে সংবাদপত্রের রিপোর্টার থেকে তার পার্থক্য অতি সামান্য। পার্থক্য শুধু এই যে সংবাদপত্র রিপোর্টার শিল্প সঙ্গত রচনার জন্য মাথা ঘামান না। কিন্তু

সাহিত্যিককে তাঁর রচনাটি শিল্প সংগত করার জন্য চিন্তা করতে হয়। রচনাকে কালজয়ী করতে হলে এই "শিল্প সংগত" হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যকার যদি জীবনের দিকে বেশী করে তাকিয়ে থাকেন তাঁকে তাঁর জন্য অপরাধী করা উচিত হবে না, বরং জীবনবিমুখ হলেই ত' তাঁকে অকিঞ্চিৎকর মনে হবে।

এ যুগের তারুণ্য নিয়ে আমরা বড় বেশী বিচলিত বোধ করছি, হয়ত একটু বিব্রতও হয়ে পড়ছি। এ যুগের তরুণের সঙ্গে অন্যকালের তরুণের পার্থক্য এই যে এরা সংস্কারমুক্ত এবং শিক্ষিত। আগের যুগের তরুণদের মধ্যে এই বস্তুর অভাব ছিল। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানটায় ছুঁচোলো জুতো আর ড্রেন পাইপ পরা বড় বড় ঝুলপিওলা ঐ ছেলেগুলি যে অন্তত পক্ষে গ্রাজুয়েট এ আমি মুখ দেখে বলতে পারি। ওদের কাজ নেই, ওরা বেকার। বাড়িতে দু মুঠো দু'বেলা জোটে না। চাওলা ভালো লোক, সস্তায় এবং ধারে চা দেয়। ওরা এখানেই আড্ডা জমিয়েছে। মাঝে মাঝে চাঁদা তুলে জলসা করে, পারলে রবীন্দ্র-নজরুলকে জড়িয়ে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু ওদের চোখের সামনে ভবিষ্যতের কোনো স্বপ্ন কি রচনা করা সম্ভব হয়েছে? পশ্চিমের ছাত্রদের উত্তেজনা আর অভ্যুত্থানের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের অভ্যুত্থানকে এক সূত্রে গাঁটছড়া বাঁধলে ভুল হবে।

আমেরিকার ছাত্ররা আন্দোলন করছে তাদের স্বদেশের বিদেশ সম্পর্কিত ভূমিকা নিয়ে। বিশেষত ভিয়েতনাম যুদ্ধ নি... শাদা-কালোর পার্থক্য নিয়ে।

ভারতের ছাত্রের দাবী অনেক কম। ...বেলা দু মুঠো অন্ন, মাথার ওপর এক... ছাদ, আর একটা আত্মসম্মান সংগত ক... সংস্থান। সুতরাং পৃথিবীর সব দেশে... তরুণের বিদ্রোহের কারণ এক নয়। সরক... একেবারে সাধুবাবা হয়ে বসে আছে... কিছু জানি না বাবা, যা অবস্থা, এক... কষ্ট স্বীকার করো, স্বার্থ ত্যাগ কর... তবেই আগামী ত্রিশ বছর পরে তোমাদে... কল্যাণ হবে। এই ভন্ডামি এ যুগে... তরুণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এখন ছাত্র... যুবক সমাজকে ডেকে দুটো শুখনো উপদেশ দিয়ে বাড়ি পাঠানোর কা... অতিক্রান্ত। তাই এ যুগের ছাত্র ও যুব... সমাজ আত্মত্যাগ ...বৃহত্তর কল্যাণের জ... স্বার্থত্যাগ প... বড় বড় কথা শুনলে... বিরক্ত হয়, ...হাস করে। এ-সব বুলি... এখন ফাঁকা আওয়াজে পরিণত।

কিছুদিন আগে একটি গ্রামে যেতে হয়েছিল। বেশী দূরে নয়, কলকাতা থেকে দশ বারো মাইলের ভেতর। গরীব গ্রাম... হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মমতাবলম্বী মানু... যুগ যুগ সহাবস্থান করে এসেছে। কখন... দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নি। বেশ শান্তির নীড়... কিন্তু গ্রামটিতে স্বাধীনতার পর তেই... বছরে সরকারী তহবিল থেকে তেইশ... মুদ্রাও খরচ করা হয় নি। গ্রামের একম... মাইনর স্কুল বাড়িটা পড়ো পড়ো, সেখা... কিছু ভাগ্যবান ছেলে পড়ে। আরও কি... বাইরে বারান্দায় ম্লান মুখে বসে পড়া-প... খেলা দেখে। সেই শান্তিময় গ্রামী... মানুষ দেখলাম এইবার ভীষণ উত্তেজি... হয়ে উঠেছেন। তাঁরা একটা কিছু কর... জন্য যেন ছটফট করছেন। তাঁদের সমাজে... আজ পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

ফর্দ অনেক বাড়ানো যায়। এদি... ওদিকে কত কি দেখছি। কত বৈচিত্র্য, ... অভাবিত কান্ড। এমনটি কি আগে ছিল... আগে ত' কখনও এমনটি ঘটে নি। এই... কথা অবান্তর। ভালো করে বিচার কর... দেখা যাবে সবই একটা নির্দিষ্ট ধা... চলছে। আজ যাকে আমরা নৈরাজ্য বল... আগের যুগে তার নাম ছিল অরাজকতা।

আজ আমাদের বুঝতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক বাহ্যিক সংযম ও বাধা একদা বি... শক্তিশালী ছিল, আজ তা চির অবলুপ্ত। স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তি ও নি... এমন একটি আভ্যন্তরীণ শক্তি স... করতে হবে যা মানুষকে সহজ ও ... রাখতে সমর্থ হবে।

আমার মনে হয়, এই আভ্যন্ত... শক্তি গড়ে উঠেছে। বর্তমান যুগের ... মোহ, ও বয়স্কদের মূর্খতা সত্ত্বেও ... মনে করি আধুনিক যুব-শক্তির ... সুস্থ ও স্বাভাবিক তারুণ্যের ... পৃথিবীর ইতিপূর্বে পরিচয় ঘটে নি।

সাহিত্যিককেই সর্বাগ্রে অভি... জানাতে হবে এই তারুণ্যকে।

'অমানুষতা'-র বিপক্ষে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের স্বকীয় সিদ্ধির স্বার্থেই নিরাসক্তির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকা তাঁদের পক্ষে যে সম্ভব নয় তা দেদীপ্যমান হয়ে দেখা গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের চরাচরব্যাপ্ত আবির্ভাবে। যুগ যুগ ধরে মানবতাই যাঁদের গরিমা হয়ে এসেছে, সেই শিল্পীরা মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনীহা পোষণ করবেন কেমন করে?

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বে 'আফ্রিকা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছিলেন 'সভ্যের বর্বর লোভ' যা 'নগ্ন করল আপনার নির্লজ্জ অমানুষতা' এবং চেয়েছিলেন যে আধুনিক জগতের 'মানুষ-ধরার দল' যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে 'ওই মানহারা মানবীর দ্বারে' গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে অস্বীকৃত বলে তিনি আশা করতেন যে মানুষ তার 'লোভ জটিল বন্ধ' থেকে মুক্তি অর্জন করবে—শুধু বিচলিত হতেন এই ভেবে যে সর্বশুদ্ধি সঞ্চারের সম্ভাবনা বর্তমান সমাজের পরিস্থিতিতে প্রায় বিলীয়মান বলে হয়তো ঐ মুক্তির মূল্য দিতে মানুষকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়তে হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যার সূচনা দেখে গিয়েছিলেন, তাই আজ কয়েক দশক ধরে জগতের অর্ধাধিক আয়তন জুড়ে সমাজ আর জীবনে ভূমিকম্পের চেয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছে, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় বহু যুগের শৃঙ্খল ভেঙেছে। এই সামূহিক জাগৃতির গরিমা মৃত্যুঞ্জয় ভিয়েৎনাম-এ সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে কোথাওই মানুষ সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত নয় বলে ঐ গরিমারই অনিবার্য আনুষঙ্গিকরূপে কিঞ্চিৎ দুঃখ-দৈন্যের লক্ষণও নানাক্ষেত্রে বহুদেশে আজ প্রকট। জগৎ ও জীবনের রূপান্তরপ্রয়াসের এই যে ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ তার অসম অথচ অমিত সৌন্দর্য কবে আমাদের সাহিত্যে শিল্পে দেখতে পাওয়া যাবে কে জানে?

এ কথা মনে আসার কারণ হল এই যে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে আফ্রো-এশিয়ার লেখক সম্মেলন হবে বলে স্থির হয়েছে এবং সেজন্য সম্ভবত পশ্চিম বাংলায় কিছু পরিমাণে আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। এ কথা বিশেষ করে এই মুহূর্তে মনে পড়ার আর এক কারণ এই যে ২৬শে জুন দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিদিবস সর্বত্র পালনের জন্য আবেদন সম্প্রতি এদেশে পৌঁছেছে। অন্তত রবীন্দ্রনাথের দেশ এ ব্যাপারে সোৎসাহে সাড়া দেবে আশা করা অসঙ্গত নয়। মত এবং পথের বিপুল পার্থক্য সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন আজ সেখানকার মুক্তিযোদ্ধারা তার সমুচ্চ প্রশংসা থেকে বিরত যে নয়, এ কথা জানাও আমাদের পক্ষে প্রয়োজন।

আজকেরই (২৪শে জুন) কাগজে খবর রয়েছে যে রক্ষণশীল দল বিলাতে শাসন-ক্ষমতায় বসার ফলে শীঘ্রই 'লেবার' পার্টি'র আমলের লুকোচুরির ভান ছেড়ে প্রায় খোলাখুলিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা আর রোডেসিয়ার মতো বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ট দুরাচারী দেশে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হবে। সাম্রাজ্যবাদ যে ভেক বদলাবার অভিনয় বেশ কিছুকাল চালানো সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে বদলাবার মতলব রাখে না এবং তাকে যে এখনও পুরোপুরি পরাভূত করা সম্ভব হয় নি, এটাই আজ বিশেষ করে মনে পড়বে।

আফ্রিকা এখন আর 'ছায়াচ্ছন্ন' নয়--

অভূতপূর্ব বেগে সেখানে স্বাধীনতার পত্তন ঘটেছে দেশে দেশে, নূতন কিরণে নূতন জীবন যাপনের বন্ধুর সূচনা নানারূপে সেখানে দেখা যাচ্ছে। এখনও অন্ধকার কাটে নি, এখনও পথে বহু বাধা, এখনও শত্রুপক্ষের অজস্র চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্য। এখনও আত্মশক্তির স্ফুরণ অত্যন্ত আংশিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যা ছিল প্রায় অকল্পনীয়, তাই ঘটেছে ঐ মহাদেশে—দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসু প্রভৃতি দেশে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলছে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, আর অন্যত্র স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র, যাদেরও অবশ্য নিয়ত মোকাবিলা করতে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ আঘাতের বিপক্ষে। লন্ডন, লিসবন, ওয়াশিংটন, আর বন, প্রিটোরিয়া, সলসবেরি থেকে পরিচালিত এই সহস্রফণা বিরোধিতার সঙ্গে লড়ছে উদীয়মান আফ্রিকার অমোঘ জনশক্তি।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিব্রতীদের সঙ্গে বহুকাল অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন ভারত বংশোদ্ভব ডকটর য়ুসুফ দাদু এবং অন্য অনেকে। সেখানে আমরা দেখেছি নোবেল্ শান্তি পুরস্কার যিনি অসম্ভব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও পেয়েছিলেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় 'চীফ' লুথুলিকে। সেখানে নেলসন মণ্ডেলা এবং অন্য বহু সজ্জন যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত কিম্বা অহরহ উৎকট বিপদকে তুচ্ছ করে আত্মগোপন অবস্থায় ঐকান্তিক সংগ্রামে লিপ্ত। অসম শক্তি অথচ অসম সাহস নিয়ে মুক্তিরণে নিরত আফ্রিকা আজ দাবী করছে আমাদের ঐকান্তিক সহায়তা ও সমর্থন। ভারতবর্ষ যেন কিছুতেই এ ব্যাপারে তার কর্তব্য থেকে স্খলিত না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে এদেশের লেখক ও শিল্পীদেরও সজ্ঞানে ও সোৎসাহে অংশীদারী করতে হবে।

এখানে শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির প্রশ্ন জড়িত নয়—জীবনের মূল কথা নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁদের কাছে প্রধানত জড়িত রয়েছে মানবনীতি। সবচেয়ে নিদারুণ যে অভিশাপ সাম্রাজ্যবাদ এনেছে তা হল (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) 'অমানুষতা'। তাঁর স্বদেশেও সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব বড় কম হয়নি, কিন্তু তার সবচেয়ে নগ্ন, নির্লজ্জ, কদর্য প্রকাশ দেখা গেছে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় আর এদের মধ্যে আফ্রিকাকে যেন আরও বিশেষ করে মনুষ্যেতর প্রচার করে যন্ত্রণার শিকার বানানো হয়েছে। শ্বেতকায় যারা নয়, সভ্যতার বিচারে তারা ধর্তব্যের মধ্যে নয় বলে সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ তাদের ক্ষেত্রে মানবীয় কোন অনুভূতির ধার ধারে নি। এদেশে আমরা আর্যগর্বে গর্বিত হয়ে মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করেছি যে আমাদের গায়ের রংটা একেবারে কাফ্রীর মতো নয়, গৌরকান্তি পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার ছিটেফোঁটা পেয়েছি কিন্তু তবুও আমরা হলাম (কিপলিংয়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী) 'the lesser breed without the law' ! নানা ঐতিহাসিক কারণে এবং বিশেষ করে প্রায় দুশো বছর ধরে 'গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই' প্রবৃত্তি এদেশের সমাজপতিদের মধ্যে থাকার ফলে আফ্রিকার তুলনীয় দহন আমাদের হয়তো সহ্য করতে হয়নি, কিন্তু মূলগত কথা হল এই যে ইতিহাসে আমাদের স্থান, আমাদের মর্যাদা, আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আফ্রিকা এবং অন্যত্র 'অমানুষতা'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর—যে 'অমানুষতা'র অপর নাম হল সাম্রাজ্যবাদ।

আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে বহু লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছিল। সেই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে Franz Fanon তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে অগ্নিশিখার মতো যে কটি রচনা রেখে গেছেন, তাতে অপরূপ সাহিত্যগুণমণ্ডিত ভাষায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের এই অমানুষতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীস এবং আদিম খৃষ্টধর্ম থেকে আহৃত মানবতার বুলি যাদের মুখে সতত শোনা গিয়েছে, তাদেরই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ আনুকূল্য যে সাম্রাজ্যবাদের পিছনে থেকেছে তাতে সন্দেহ নেই। শ্বেতকায় সভ্যতার বাইরে মানবমহিমা যে সম্ভব, তা প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই মানবতাবাদীদের [illegible] স্বীকার করেনি—ঐ[illegible]ক [illegible] থেকে [illegible] সত্ত্বেও ইয়োরোপবহির্ভূত জগতে মানুষের গরিমা কিছুতেই যেন ধ্যানধারণার অঙ্গীভূ[ত] হয়নি, যাদুঘরে উদ্ভট নিদর্শন হিসা[বে] সাজিয়ে রাখা ছাড়া 'প্রাচ্য' জগতে[র] সংস্কৃতির মূল্যায়নকে অবাস্তব মনে ক[রা] হয়েছে। শুধু কৃষ্ণ আফ্রিকা নয়, আ[র] আফ্রিকা সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলি[ত] থেকেছে—চীনারা তো 'পীত আতঙ্ক' ভি[ন্ন] আর কিছুই প্রায় নয় আর মুষ্টিমে[য়] ভারতবিদের উৎসাহ সত্ত্বেও এদেশ [...] প্রতীচ্যের হিসাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি[র] মানচিত্রে অনুপস্থিত। বর্তমানে বিশ্ব[-] ব্যাপী মুক্তিঅভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে [...] বিষয়ে পরিবর্তন নিঃসন্দেহে আসছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী অহঙ্কারে[র] দাপট আজও প্রচন্ড। এ জনাই আ[...] অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই ধ্বনি উঠে[ছে] 'Black Power' এইজনাই ভারত বর্ষের 'Nigger-Nordic' দের পীড়[নের মধ্যে] দিয়ে আওয়াজ উঠছে 'Black is beautifull' এ জন্যই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতি[ন] আমেরিকায় আমাদের ভাবতে হচ্ছে নিজে[র] দেশের মাটিতে জীবনের শিকড় সম্বন্ধে। এজনাই অমানুষতাকে পরাভূত ক[রে] মানুষের মহিমা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব[ত্র] প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে সবাইকে জ[...] করার প্রক্রিয়া ও প্রকরণ সম্বন্ধে ভাবা হচ্ছে। এ ভাবনা থেকে এদেশের শিল্প[ী] সাহিত্যিকরা দূরে থাকবেন কেমন করে?

এক স্থানীয় ইংরেজি পত্রিকায় (অমৃ[ত] বাজার নয়) ২১শে জুন তারিখের র[বি-] বাসরীয় ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত এক প্রব[ন্ধ] থেকে জানা গেল যে লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড[-এ] ভারতীয় এবং পাকিস্থানীদের 'দেখু-ম[...] করার জন্য অল্পবয়সী ইংরেজ দুর্বৃ[ত্ত] দল অবলীলাক্রমে দৌরাত্ম্য চালায়[...] আর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অজুহা[তে] লর্ডসভায় (অধুনা ক্ষমতাচ্যুত লেবর) [...]কার পক্ষের প্রবক্তা [...] বেসিক (Beswic[k]) যুক্তি দেন যে যা[...] [...]ার খচ্ছে তা[...] ভাষা পুলিশ [...] [বু]ঝতে পারে না, [...] কিনা শীঘ্রই পুলিশ কর্মচারীদের [...] কয়েকজন তাদের ভাষা শিখে নিচ্ছে। ভাষাটি [...] বাংলা এবং ইংরেজ [...] কারের মুখপাত্র এ-সম্বন্ধে বলে[ন] 'the dialect in questio[n]' সাতান্ন বছর আগে যে ভাষায় রচনার [...] নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, [...] ভাষা হল ১৯৭০ সালে লেবর গভর্ণমে[ন্টের] হিসাবে 'উপভাষা'! কালো কাফ্রী[র] কপালে যাই ঘটুক না কেন, সাহেব 'আর্য' সগোত্র হিসাবে আমরা মাথা এ[কটু] উঁচু করে নাকি, তা যে আসল সাহে[ব] সইবে না। এটা হয়তো আমরা জা[নতে] চাই না।' কিন্তু ঘটনাটা হল তাই। [...] কারণ বৃত্তি চালিয়ে ভারতবর্ষের 'পুনর্ভ[...] ঘটিয়েছি, এবম্বিধ বহু কথা অবশ্য অ[...] বলে থাকি। কিন্ত মনকে চোখ ঠারা ক্রমাগত [...] [...] করে চলে বে[...] বন্দরেই [...] [...] উঠতে পারব যাই [...] [...] না। আজ [...] [...] পারি 'অমা[নু-] ষতার [...] জগদ্ব্যাপী সং[গ্রাম] তাতে যেন সবাই আমরা শামিল হই।

মনমোহনের একদিন

সুধাংশু ঘোষ

মনোমোহনের বিছানা শিউলি ফুলের মতো শাদা। তাঁর বিশ্বাস, আর পাঁচ সাত বছরের মধ্যে এমনই শাদা বিছানায় তাঁর মৃত্যু হবে। তখনো তাঁর বিছানা এতটুকু মলিন হবে না, সুষমা হতে দেবেন না, আটত্রিশ বছরের মধ্যে কোনোদিন হতে দেন নি, সুষমার নিজের অসুস্থতার সময়েও না। বিয়ের আগে মনোমোহনের শয্যা কেমন ছিল, এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। অথচ আজ দুপুর থেকে এই বিকেল পর্যন্ত শিউলির মতো শাদা সেই বিছানায় শুয়ে ভাল ঘুম হল না। বড় কষ্টে চারটি ঘণ্টা কেটেছে। একবারও সম্ভবত দশ মিনিটের বেশী একটানা ঘুম হয় নি। সব সময় সামান্য শব্দ করে পুরোন পাখাটা ঘুরছিল এবং চৈত্রের গরম ঠিক দুঃসহ নয়। পরে আরো বেশী গরম পড়বে। তথাপি আজ কেমন চামড়া জ্বলে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে কী যেন বিঁধছিল কাঁটার মতো। এ সবের কারণটাও অবশ্য জানা। আজ সকালে এ বাড়িতে যে-নাটক হয়েছে, তার ফলেই দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত চারটি ঘণ্টা এমন কষ্টে কাটল।

এখন যেমন মনোমোহন বারান্দায় পরিচ্ছন্ন কাপে চা নিয়ে বসেছেন, আজ সকালেও তেমন বাজার থেকে ফিরে দ্বিতীয় দফায় চা নিয়ে বসেছিলেন। তখন নাটক শুরু। বাইরের দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। দেখলেন, মল্লিকা ক্ষিপ্র হাতে দরজা খুলে দিল। মল্লিকার সঙ্গে একটি দুটি মৃদু কথা বলে অচেনা যুবক একটি টানটান ভঙ্গিতে বারান্দায় উঠে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। একখানা অর্ধেক ছাপা অর্ধেক হাতে-লেখা ধূসর রঙের বড় শক্ত কাগজ তাঁর সামনের টেবিলে মেলে ধরে প্রয়োজনের বেশী গলা চড়িয়ে বলল, 'আমি মল্লিকাকে বিয়ে করেছি।'

মল্লিকাকে বারান্দায় দেখতে পেলেন না। তার বদলে দেখলেন, সুষমা পিছনে

এসে দাঁড়িয়েছেন। মনোমোহন উত্তেজিত হলেন না। বস্তুত ইদানীং শরীর মনের সব তীব্রতা শিথিল। ওপাশে আর একটা চেয়ার ছিল। তাঁর বড় ছেলে বরুণের বয়সী এই অচেনা ছেলেটিকে ইঙ্গিতে সেই চেয়ারটা টেনে বসতে বললেন। দ্বিতীয়বার পিছনে মুখ ফিরিয়ে সুষমার চোখ, মুখের আকস্মিক বিবর্ণতা দেখলেন। ছেলেটি চেয়ারে বসেই আবার উঠে দাঁড়াল। সরে এসে নিচু হয়ে সুষমাকে প্রণাম করল। প্রথমে সুষমাকে কেন? সুষমাকে তাঁর থেকে নরম ভেবে কি? তাঁকে কি কঠিন মানুষ মনে হয়? তাঁকে প্রণাম করার সময় মনোমোহন পা সরিয়ে নিলেন না।

নাম বলল, পরিতোষ। পদবী শুনে জানা গেল, অসবর্ণ। অসবর্ণ বলে যেটুকু খোঁচা লাগল তার ধার খুব কম। তখনই আবার মোটেই খোঁচা লেগেছে কি-না বুঝতে পারলেন না। আজই প্রথম আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, ও-সব সংকীর্ণতার বালাই তাঁর নেই।

প্রণাম সেরে পরিতোষ দাঁড়িয়েছিল। আবার বসতে না বললে হয়ত বসবে না। খুব কালো, কিন্তু বলিষ্ঠ, উচ্চতা একটু বেশী। মুখের দিকে তাকাতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে আবার বসতে বললেন। মনোমোহনের চা তখনো শেষ হয় নি। বাইরের লোকটির সামনে একা কী করে চা খাবেন? ওর সামনেও অন্তত এক কাপ চা থাকলে ভাল হত। আবার—'পরিতোষকে চা দাও'—এই কথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করতেও একটা বিচিত্র লজ্জা মেশানো অস্বস্তিতে জিভ আটকে যাচ্ছিল। তাছাড়া তাঁর একমাত্র মেয়েকে যে বিয়ে করেছে, যে-বিয়ের প্রমাণ তাঁর সামনে, যে-বিয়ে অস্বীকার করার সাধ্য তাঁর নেই, অস্বীকার করার যুক্তি আছে কিনা তাও জানেন না, সেই লোকটি কতটা বাইরের, মনোমোহন বুঝতে পারছিলেন না।

এই নাটক যতই পুরোন হোক, মনোমোহনের কাছে নতুন। জীবনে প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার মতো লাগছিল। অসহায়ের ভঙ্গিতে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, সুষমা কখন বারান্দা থেকে চলে গেছেন। মল্লিকাকে জেরা করতে গেছেন হয়ত, অথবা চায়ের আয়োজনে। চায়ের জন্য গিয়ে থাকলেই ভাল।

এত অসহায়তাই বা আসবে কেন! মাত্র বাষট্টি বছর বয়সেই কি দ্বিতীয় শৈশব আসে?

মল্লিকার সঙ্গে পরিতোষের কোথায় কেমন করে পরিচয় হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চেপে গেলেন। প্রশ্নটা মনে হল, কিশোরোচিত। দুবার পার্ট টু ফেল করে মল্লিকা হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে হয়ত পরিতোষকে চিনেছে। ছেলেটা বলছে, সে বেকার নয়, এল-আই-সি-তে চাকরি করে। নিজে চাকরি জোটাতে পেরেছে বলেই হয়ত মল্লিকাকেও একটা জুটিয়ে দেবে, এমন আশা সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছে মেয়েটার মনে।

সকাল থেকে এই বিকেলে পৌঁছতে বেশ কয়েকটা ঘন্টা পার হয়ে আসতে হয়েছে। ইতিমধ্যে আকস্মিকতার চমক থিতিয়ে গেছে। একটু দূর থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন মনোমোহন। এখন চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হচ্ছিল, সকাল বেলার নাটকটা মোটেই বিষাদান্তিক ছিল না। বরং আনন্দের খবর নিয়ে এসেছিল পরিতোষ। উল্লসিত হওয়ার মতো খবর। মনোমোহন নিজে মল্লিকার জন্য এর থেকে ভাল কিছু করতে পারতেন না। মল্লিকা যা করেছে, তা-ই স্বাভাবিক ছিল। কারো মনে অভিযোগের বাষ্প জমে যাবার কোনো যুক্তি নেই। অন্তত মনোমোহনের নিজের কোনো অভিযোগ ছিল না। তবু মাঝে মাঝেই কোথায় যেন ছড়ে যাবার মতো একটা জ্বালা টের পাচ্ছিলেন, বিশেষ করে সুষমার কথা ভেবে। একমাত্র মেয়ের জীবনের সব থেকে বড় উৎসবের স্বাদ সুষমা মোটেই পেলেন না। অবশ্য এখনো ছোটখাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। কিন্তু মনোমোহন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না; প্লাস্টিকের ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার মতো লাগছিল।

এক সময়ে মনোমোহন প্রচুর সিগারেট খেতেন। দেশ-বিভাগের আগে গ্রামের বাড়িতে গড়গড়া ছিল। ইদানীং কোনোদিন দু-একটি সিগারেট, কোনোদিন একটিও না। এখন বালিশের তলায় রাখা চ্যাপ্টা প্যাকেট থেকে একটা সস্তা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আসবার সময় শোবার ঘরের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেলেন। আজ সকালে দাড়ি কামানো হয় নি। দাড়ির তিন ভাগ শাদা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই প্রথম মনোমোহন কোথাও ছড়ে যাবার মতো জ্বালার আসল কারণটা বুঝতে পারলেন। কেন যে শিউলির মতো শাদা বিছানায় চার ঘন্টা শুয়েও ভাল ঘুম হয় নি, এখন প্রথম বুঝলেন।

বড় ছেলে বরুণ এখনো এই সংসারে সাধ্যমত টাকা দিলেও বিয়ের পর অন্য বাড়িতে চলে গেছে। তার বাচ্চা ছেলেটাকে দেখতে হলে শহরের অন্য প্রান্তে যেতে হবে। ছোট ছেলে অরুণ, মল্লিকার থেকে তিন বছরের ছোট, বয়েস তেইশ পার হয়েছে, এর মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাধীন, তার কাছে মনোমোহন এবং সুষমার প্রায় অস্তিত্বই নেই, কোনোদিন বাড়ি আসে, কোনো দিন আসে না। আর আজ জানা গেল, মল্লিকা তার আপনজন খুঁজে পেয়েছে। তিন ছেলেমেয়ের ত্রিভুজের মাঝখানে মনোমোহন এবং সুষমার কোনো স্থান নেই। স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর অদরকারী।

জ্বালাটা নিজের জন্য ততটা নয় প্রধানত সুষমার জন্য। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিবর্ণ বিক্ষত দেয়ালে চোখ রাখলে মনোমোহন একটুক্ষণ অন্য একটি দৃশ্য দেখলেন। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আ[illegible] বছরের মেয়ে মল্লিকা পাশের বাড়ি রেডিওর গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল গানটা শেষ হলে রান্নাঘরে গিয়ে সুষমা পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি গা[illegible] শিখবো, মা।' রান্নার কাজে সুষমা দু-হাতই ব্যস্ত ছিল। শুধু মুখ ঘুরিয়ে এনে মেয়ের গালে সুষমা নিজে[illegible] গাল একটু ঘষে দিলেন। মনোমোহনে[illegible] কানে আট বছরের মল্লিকার আবদেরে গ[illegible] একবার ঘা মেরে গেল, উনুনের তা[illegible] রক্তাভ অথচ প্রশ্রয়ের হাসিতে [illegible] সুষমার মুখ পলকের জন্য বিবর্ণ দেয়ালে[illegible] একাংশ ঢেকে দিল।

ওই সব দিনে ত্রিভুজটির ঠিক কো[illegible] বিন্দুতে স্থান ছিল মনোমোহন এ[illegible] সুষমার। তারপর সঙ্গত কারণেই ত্রিভু[illegible] তিনটি বাহু আর সরল রেখায় থাকে[illegible] বাইরের অনিবার্য টানে কিছু সরল এ[illegible] অসরল নকশা তৈরি করে প্রসারিত হচ্ছে নানা দিকে। তবু এই সেদিন পর্যন্ত বিশেষত মেয়ে বলেই মল্লিকার সব বা[illegible] অথবা আশা প্রথমে সুষমাকে ছুঁয়ে অ[illegible] পেতে চেয়েছে।

আজ সকালের নাটক একটা সুবিধে করে দিয়েছে মনোমোহনের। এ[illegible] ব্যাপারে মন-স্থির করতে খুব সা[illegible] করেছে। এই ব্যাপারে তাঁর প্রচুর দ্বি[illegible] ছিল। এক সপ্তাহ ধরে অনেক ভে[illegible] কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন [illegible] একটা বড় ভাল প্রস্তাব এসেছে [illegible] কাছে। প্রস্তাবটি ক[illegible] তাঁদের পা[illegible] গ্রামের ছোট চৌ[illegible], যাঁর দাদার স[illegible] দেশ-বিভাগের অ[illegible] মনোমোহনের বন্ধুত্ব ছিল। ছোট চৌধুরীর একটা ব[illegible] আছে বারাণসীর সোনারপুরায়। বাড়ির একতলায় একটি করে ছোট চৌধু[illegible] মায়ের নামের দাতব্য চিকিৎসাল[illegible] ভার যাঁর ওপর ছিল, এক মাস হল মৃত্যু হয়েছে। সেই বাড়ির এবং চিকি[illegible] লয়ের দায়িত্ব নিতে হবে মনোমোহন[illegible] দোতলার ঘরগুলো মাঝে মাঝে এ[illegible] সাফসুফ করে তালা দিয়ে রাখবেন নিজে থাকবেন এক তলাটায়। চৌধুরীর বিশ্বাস, মনোমোহন ত[illegible] পারবেন। অনেক দিন থেকে তো হোমি[illegible] প্যাথির বইটই পড়ছেন, পরিচিতদের ও[illegible] দিচ্ছেন। শেয়ালদার কাছে ফার্নিচ[illegible] দোকান করতে যে-তারাপদকে টাকা অংশীদার হয়েছিলেন মনোমোহন, অত্যন্ত চতুর। ক্রমান্বয়ে তাঁকে আরো [illegible] ঠকাবে। বারাণসীতে গেলে ছোট চৌ[illegible] যে-টাকা পাঠাবেন তাতে মনোমোহনের যাবে। অরুণকে নিয়ে যেতে পারলে এ

কার কুসঙ্গ থেকে দূরে গিয়ে ছেলেটা হয়ত বদলাতে পারে। তাছাড়া বাবাকে টাকা দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে বরুণ বাঁচবে। ছোট চৌধুরীর প্রস্তাবের যুক্তিগুলো নিখাদ। সাত দিনের মধ্যে এই প্রথম ছোট চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন মনোমোহন। সিগারেটটার শেষাংশ চেপে নিভিয়ে ফেলে দিলেন। চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে বাড়ির বাইরে এসে ভাবছিলেন, বারাণসী, আহা বারাণসী, সুন্দর মধুর পবিত্র বারাণসী! একবার ছোট চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। বলে আসতে হবে, তাঁর প্রস্তাবে মনোমোহন রাজী। মনে হচ্ছে, আজ আর কোনো দ্বিধা নেই।

গলি থেকে বড় রাস্তায় এলে খোলা-মেলায় গায়ে বিকেলের হাওয়া লাগল। কোথাও আর রোদ্দুর নেই। তাপ নেই হাওয়ায়। বাড়িতে কাচা হলেও মনো-মোহনের ধুতি-পাঞ্জাবি মোটেই ময়লা নয় পাটভাঙা। কেমন পবিত্র লাগছিল। এক সপ্তাহের দ্বিধার পর একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরে ভাল লাগছিল। দাড়িটা কামানো থাকলে হয়ত আরো ভাল লাগত।

বাসে উঠে বসবার জায়গা পেয়ে গেলেন। উলটো দিকের বাস, তাই ভিড় একটু কম। অফিস-ফিরতি বাস হলে এ সময়ে উঠতেই পারতেন না। রাস্তার ও-পাশে পরিতোষের মতো টানটান ভঙ্গিতে একটি ছেলে হাঁটছে, পাশে মল্লিকার বয়সী একটি মেয়ে। এত দূরে

চলন্ত বাসের জানলা থেকেও ঠিক বোঝা যায়, মেয়েটি অবিরাম কথা বলছে, ছেলেটি শুনছে শুধু। যতক্ষণ দেখা গেল, মনোমোহন দেখলেন। সকালের পর মল্লিকাকে আর দেখতে পান নি। কিন্তু জানেন, মল্লিকা দুপুরে স্বাভাবিকভাবে খেয়েছে, একটু রোদ পড়লে সুষমাকে বলে বাইরে গেছে। ফিরতে একটু দেরি হলে ভাবতে বারণ করেছে। কাল পর্যন্ত মল্লিকার ফিরতে রাত হলে সুষমার ভাবনা হতো। আজ ঠিক তেমন ভাবনার আর কারণ নেই। অর্ধেক ছাপা, অর্ধেক হাতে-লেখা ধূসর কাগজখানা পরিতোষ জমা রেখে গেছে।

বাসের জানলা থেকে মনোমোহনের চোখে পড়ল, এক জায়গায় শ' দুয়েক লোক জমেছে। একটা দোকানের সামনে চওড়া ফুটপাতে কিছু একটা ঘটছে। ভিড়ের মাঝখানে পলকের জন্য কী যেন দেখতে পেলেন। কোনো চেনা রং, পরিচিত কোনো আদল। চৈত্রের বিকেলের দমকা হাওয়া, নিস্তেজ আলো, অনেক মিশ্র শব্দের ঢেউ কী একটা খবর তাঁর মনে পৌঁছে দিল। বেশ দূরে, স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না। তবু ভিড়ের মাঝখানের ঘটনা অনিবার্যভাবে টানল মনোমোহনকে। এটা তাঁর নামবার জায়গা না হলেও, স্টপ থেকে বাস ছেড়ে দেবার পর খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে লাফিয়ে নামলেন।

একটা ঘড়ির দোকানের সামনে প্রশস্ত ফুটপাতে উল্লসিত লোক জমেছে। বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে অজস্র মাথা ও ঘাড়ের আড়াল ডিঙিয়ে মনোমোহন ভিড়ের মাঝখানটা এক ঝলক দেখলেন। বাসের জানলা থেকে যা আভাসে দেখেছেন বলে মনে হয়েছিল, যদিও নিশ্চিত কিছু মনে হয় নি, তা-ই আবার দেখলেন। অরুণ। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে, অথবা কোনো দিকে না তাকিয়ে যান্ত্রিক দক্ষতায় ওঠ্-বস্ করছে। দোকানের সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে মলমলের পাঞ্জাবি ঘর্মাক্ত মোটা ঘাড় একজন পুরো দৃশ্যটা পরিচালনা করছে। বৃত্তের ভিতর দিকের লোকগুলোর আনন্দ ও উত্তেজনা ফুটছে টগবগিয়ে।

সঙ্গত কারণে মনোমোহনের হৃৎপিণ্ডের লাফানি কিঞ্চিৎ অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এই ধরনের একটা দৃশ্য কোনোদিন দেখতে হতে পারে এমন ভাবনা কখনো মনে আসে নি—একথা মনোমোহন জোর করে বলতে পারেন না। অরুণের অন্তত গত দু বছরের আসা-যাওয়া, কথা বলা এবং কথা না-বলা, তাঁকে না জানিয়েও যেন তাঁকে এমন দৃশ্যের জন্য তৈরি করছিল। তবু হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি ঈষৎ স্বাভাবিক হয়ে আসতে সময় লাগল। অরুণকে আর দেখা যাচ্ছে না। সামনে মানুষের দেয়াল দুলছে। মনোমোহন এখন কী করতে পারেন? এই সার্কাসের দর্শকদের সঙ্গে মরিয়া হয়ে একটা লড়াই শুরু করবেন?

ঠেলে এগিয়ে দোকানের সিঁড়িতে মলমলের পাঞ্জাবি মোটা ঘাড়ের পায়ে মাথা রেখে হাহাকার করে উঠবেন : ওকে ছেড়ে দাও!

কী করছেন ঠিক না বুঝে, ঠেলে সামনে এগিয়ে যাবার বদলে মনোমোহন বরং বৃত্তের বাইরের দিকে চাপেচাপে একটু সরে এলেন। ঠিক কিছু না দেখেও কোনো রহস্যময় কারো অদৃশ্য হাত তাঁকে ঠেলে ঠেলে বৃত্তের বাইরের দিকে নিয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, নিজেকে দ্রুত লুকিয়ে ফেলা দরকার। যদি অরুণের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়! কোনক্রমে ছেলেটা যদি এখানে তাঁর অস্তিত্ব টের পায়! তাহলে কোনোদিন আর কী করে তার মুখোমুখি হবেন?

একজন দর্শক নবাগত অপর একজনকে বলছিল : 'রাস্তা থেকে চলন্ত বাসের মহিলার হার ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। ধরা পড়ে গেছে বাছাধন। নাক-খত দিয়েছে। এবার শালা বৈঠক মারছে দু'শ' বোলবার। আরো কিছু হবে। ওসব পুলিশ-ফুলিশে দিয়ে লাভ নেই।'

নতুন করে উল্লাসের গমক উঠতে মনোমোহনকে ওদিকে মুখ ফেরাতে হল। মোটা ঘাড় এক বালতি জল ঢেলে দিচ্ছে। যার ওপর জল ঢালা হল তাকে দেখতে পেলেন না। কাপুরুষতা অথবা লজ্জা অথবা আত্মধিক্কার তাঁকে ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগোতে দিল না। পায়ে-পায়ে পিছিয়ে এলেন, অনেকটা দূরে চলে এলেন। তখন দুঃসহ দুঃখ বেদনার মতো কোনো অনুভব তাঁকে ক্রমান্বয়ে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলছিল। পায়ে জোর নেই, মনে হল—দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। সামনেই একটা উলটো দিকের বাস থেমেছিল, ভিতরে চাপাচাপি নেই, সম্ভবত বসবার জায়গা রয়েছে। বাসটাতে উঠে পড়লেন, অথচ ভাবছিলেন—এমন শেয়ালের মতো পালিয়ে না গিয়ে অন্তত কাছেই কোথাও গোপনে অপেক্ষা করা উচিত, ভিড়ের মাঝখানটার দিকে চোখ রাখা উচিত। দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে, না হয় ফুটপাতে কোথাও বসেই থাকতেন। সার্কাসের দর্শকদের দৃষ্টি যাকে বিদ্ধ করে রেখেছে, শেষ পর্যন্ত তার কী হয় না দেখে চলে যাওয়া অন্তত তাঁর পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

এভাবে চলে যাওয়া অনুচিত, অথচ দেখতে পাচ্ছিলেন বাসটা বেশ জোরে চলছে। এ বাস বালীগঞ্জ গার্ডেন্সের দিকে যাবে না, ছোট চৌধুরীর বাড়ির দিকে যাবে না। এ বাস বরং তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে অন্য প্রান্তে বরুণের বাসস্থানের দিকে। সেই ভাল। আজ ভিড়ের কেন্দ্রে অরুণকে দেখার পর তার বাবা মনোমোহন ছোট চৌধুরীর সামনে গিয়ে মাথা সোজা রেখে দাঁড়াতে পারবেন না। চৌধুরীদের কথা ভাবতে গিয়ে পুরোন একটা ঘটনা মনে পড়ল। ধান কাটা শুরু হবার ঠিক আগে মাঠের মধ্যে কালো কালো মারমুখো মানুষের বিরাট দুটো দল প্রচুর মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কাজিয়া হবে। পীতবর্ণ দীর্ঘকায় একজন মন্থর পায়ে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দু-পাশ থেকে দুজনকে ডেকে কী সব বোঝালেন। দশ মিনিটের মধ্যে মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। রক্তটুকু পড়ল না। সেই তপনমোহন অরুণের জ্যাঠামশাই ছিলেন। অরুণের জন্মের আগেই অবশ্য তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু মাত্র দু' পুরুষে কী করে এত ফারাক হয়!

বরুণদের দিকে যাচ্ছেন ঠিকই। তবে আজ যা দেখলেন তার সবটুকু বরুণকে কেমন করে বলবেন। সুষমাকেই বা সব কথা বলবেন কী করে। মনোমোহন কাউকে এতটা বলতে পারবেন না, বরুণকে না এমন কি সুষমাকেও না। অরুণ [illegible] এতদূরে নেমেছে, ওরা নিজেরা যেদি[illegible] জানতে পারবে সেদিন জানুক। তবু শুধু তাঁর একার পক্ষে এ বড় বেশী ভার।

মনোমোহন দেখলেন, তিনি আসবা[illegible] আগেই বরুণ অফিস থেকে ফিরেছে। আ[illegible] যেন একটু তাড়াতাড়ি। কোনো রহস্যজন[illegible] কারণে তাঁর মনে হল, বরুণ আজ একা[illegible] দেরি করে ফিরলেই পারত। তাহলে ঠি[illegible] এখনই বরুণের সামনে আসতে হত না। অরুণকে আজ ওইভাবে দেখার পর বরুণে[illegible] মুখোমুখি হতেও তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল।

তিনি এমন হঠাৎ এসে পড়ায় বা[illegible] ছেলেটি ছাড়া আর দুজনকে একা[illegible] অপ্রস্তুত মনে হল। বিব্রত ভাব লুকোে[illegible] চেষ্টা করলেও চাপা থাকছে না। একা[illegible] পরেই অবশ্য কারণটা বুঝতে পারলে[illegible] বরুণদের অফিসের থিয়েটার। সাতট[illegible] শুরু। ছেলেকে তৃপ্তির বাপের বাড়ি রে[illegible] দুজন থিয়েটার দেখতে যাবে। মনোমো[illegible] তখনই উঠতে চাই[illegible] তৃপ্তি উঠতে দি[illegible] না। বলল, 'এখনো অনেক সময় আে[illegible] আপনি বসুন, চা করি।'

অল্প সময়ের মধ্যে তৃপ্তি দুধ[illegible] তেজপাতা কিসমিস দিয়ে সুজি রান্না ব[illegible] নিয়ে এল। চায়ের বদলে এক কাপ ড্রিং[illegible] চকোলেট। সুজিটা মনোমোহনের [illegible] তৃপ্তি মনে রেখেছে।

বরুণের সংসারে প্রাচুর্যের চিহ্ন [illegible] তবে সব খুব ছিমছাম। বাচ্চাটা শা[illegible] দৌরাত্ম্য করে না। ভাল কাপড়ে ঢ[illegible] সস্তা টেবিলটা বরং নিচু। তবু তার ও[illegible] ফুলদানিতে ফুল নিরাপদেই রয়েছে।

খেতে খেতে মনোমোহন বরু[illegible] মাথার ওপর দিয়ে দেয়ালে তা[illegible] বললেন, 'অরুণটার জন্যে আর মানু[illegible] মুখ দেখাতে পারি না। লেখাপড়ায় ইতি হয়ে গেছে। কোথাও যদি ছেলো[illegible] ঢুকিয়ে-টুকিয়ে দেয়া যেত।'

বাবা আসবার সঙ্গে সঙ্গে বউ নিয়ে সেজেগুজে বেরোতে হচ্ছে বলে বরুণ এতক্ষণ বিশেষ কথা না বললেও বেশ স্নিগ্ধ ভাব দেখাচ্ছিল। একটু যেন লজ্জিতও। অরুণের প্রসঙ্গ ওঠায় এক মুহূর্তে বসার ভঙ্গি টানটান কঠিন হয়ে গেল। বলল, 'আপনার ছোট ছেলের কথা আমাকে আর বলবেন না। আপনার আদরের নন্দন!'

কথা বাড়াতে মনোমোহনের সাহস হল না। সময়ও ছিল না। বরুণের জন্য তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছিলেন মাত্র। তারপর ছেলেটা চাকরি জুটিয়ে রাত্তিরে ক্লাস করে বি-কম পাশ করেছে। এখন বউ-ছেলে নিয়ে একটু সাফসুফ থাকতে চায়। একে স্বার্থপরতা বলা অন্যায়। তবে শুধু তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় বরুণের গলা কেন যে এত রুক্ষ শোনায়!

মল্লিকার ব্যাপারটাও আর বলতে ইচ্ছে হল না। ছোট বোনের এমন জরুরী খবরটা জানবার অধিকার তো বরুণেরই পুরো-পুরি। তবু মনোমোহন কিছু বললেন না। প্রতি রবিবারে যেমন আসে, এই রবিবারে এলেই সুষমার কাছে শুনবে।

ঘরে এবং সদরে তালা লাগানো হল। ওদের সঙ্গেই মনোমোহন বাইরে এলেন। তারপর ওদের থেকে আলাদা হয়ে আবার বাসে উঠলেন। এবার বাড়িমুখো বাস। একদিনে কতবার বাসে উঠলেন। নিজেরই আশ্চর্য লাগছিল। অথচ আসল কাজটা তো হল না। ছোট চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করা হল না। বাসটায় খুব ভিড়। দাঁড়াবার জায়গা নেই। কন্ডাকটরকে পয়সা দিতে প্রচুর কসরৎ করতে হল। দু'জন যাত্রীর সংলাপ কানে এল ঃ 'মশাই, ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছেন কেন?' 'আপনার গায়ে মধু মাখানো আছে, চাটতে আসছি।'

ঠিক তখন নিজেকে বড় একা ভেবে মনোমোহন আরো বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল, কোনো গূঢ় অপরাধ করার জন্য তাবৎ শহরবাসীর ভিড়ের কেন্দ্রে তাঁকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। একটা শক্ত এবং মসৃণ আড়াআড়ি কাঠ দু' হাতে খামচে ধরে তিনি শূন্যে ঝুলছেন। সেই মুহূর্তে আবার বারাণসীর ছায়া পড়ল মনে। সুদূর মধুর পবিত্র বারাণসী।

বাড়ির কাছাকাছি এসে দু' স্টপ আগে নেমে পড়লেন। পায়ে পায়ে পরিচিত পার্কটার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। এখানে আলো কম। চোখ একটু ঠান্ডা হয়। তখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। সব দিক ঘুরে দেখলেন, বেঞ্চে বসার জায়গা নেই। মাটি থেকে ঘাস উধাও। তবু একটা জায়গায় সামান্য সবুজের আভাস পেয়ে ধুলোর মধ্যেই বসলেন। বসেই চোখে পড়ল, কাছের একটা বেঞ্চের কোণ ফাঁকা। আগে দেখতে পান নি। ধুলো ময়লা মনোমোহন সহ্য করতে পারেন না। উঠে গিয়ে বেঞ্চটায় বসলেন।

ছোট পার্ক। নিরিবিলি নেই। চার-দিকে খ্যাপা শহর। একবার অল্প দূরে কোথাও বোমা ফাটার শব্দ হল। একটু পরে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, বেঞ্চটায় তিনি একা। টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন মনোমোহন। শরীর টান করতে গিয়ে কোমরে একটু লাগল। আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘ নেই। তবু ধোঁয়াধুলোয় শহরের প্রতিফলিত আলোর জন্য তিন চারটির বেশী তারা দেখা গেল না। শিয়রের দিকে উঁচুতে একটা গুলমোহরের ডাল। তার পাতার জাফরির ফাঁক দিয়ে ঝির-ঝির হাওয়া আসছে। ঝিমুনি আসছে বুঝতে পেরে শরীর আরো শিথিল করে পেতে রাখলেন, চোখ বুজলেন।

পার্কটা ক্রমে নির্জন হয়ে এল। আকাশে এমন মেঘ জমল, যেন বৃষ্টি হবে। জোর হাওয়া মেঘ কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। বৃষ্টির সম্ভাবনা রইল না। এ-সব মনোমোহন কিছু বুঝতে পারলেন না। মাত্র কয়েক শো গজ দূর দিয়ে মোটর, রিকশ, লরি, বাস গেল একটির পর একটি, অজস্র। মনোমোহনের ঘুম ভাঙল না। নানাবিধ অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখলেন, প্রধানত শৈশবের। এক-একটা স্বপ্ন ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙায়। অবশেষে তেমন একটা স্বপ্ন তাঁকে জাগিয়ে দিল। সাত-আট ইঞ্চি উঁচু আমের চারার গোড়ার নরম মাটি খুঁড়ে আঁঠিটা তুলে নিয়েছেন ভেঁপু করবেন বলে, খোলার মধ্যে থেকে শাঁসটা বের করে নিয়েছেন, তাঁর মা বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে প্রায় লাফিয়ে নেমে এসে হাতে চড় মেরে আঁঠিটা ফেলে দিলেন। উঠোনে পড়ে গিয়ে আঁঠিটা দু' ভাগ হয়ে গেল। স্বপ্নে দেখতে পেলেন, আঁঠির ভিতরটা পরিচ্ছন্ন, হালকা নীল। মা'র ভয় মিথ্যে, আঁঠিটার ভিতরে কোনো কালো লিকলিকে বিষাক্ত সাপ ছিল না।

স্বপ্নের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে বেঞ্চটায় উঠে বসলেন। বুঝলেন, অনেক রাত হয়েছে। দেখলেন, চটিজোড়া রয়েছে, কেউ নিয়ে যায় নি। তাড়াতাড়ি পা গলালেন।

সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না। ঠেলতেই খুলে গেল। বারান্দার চেয়ারে আলোর তলায় বসে সুষমা কিছু একটা করছিলেন। মনোমোহন দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এলে সষমা বললেন, 'ছোট চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল?'

শুধু মাথা নেড়ে মনোমোহন জানালেন, হয়নি।

জামা-কাপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে মনোমোহন খেয়ে নিলেন। খাবার সময়ও সুষমাকে কিছু বললেন না, দেরি হওয়ার জন্য কোনো কৈফিয়ত দিলেন না।

কৌটো থেকে লেবুর রসে ভিজিয়ে আবার শুকিয়ে রাখা যোয়ান মুখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভিতর দিকের বারা-ন্দায় এসে দাঁড়ালেন। বাড়িটা উত্তরমুখো বলে ভিতর দিকের এই দক্ষিণের বারান্দায় বেশ হাওয়া আসে। বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় বদলাবার আগেই মনোমোহন এই বারান্দায় একবার এসেছিলেন। দেখে গেছেন, বারান্দার একপাশে নির্দিষ্ট জায়গাটায় অরুণ ঘুমোচ্ছে। ওপাশের রাস্তার আলো একটু আসে জানলা দিয়ে। দেখতে পেলেন, মল্লিকা ঘুমোয় নি, বিছানায় ছটফট করছে। আজ যেন কিছুই হয়নি, তেমন স্বাভাবিকভাবে বিছানা থেকে মল্লিকা বলল, 'বাবা তোমার আজ এত দেরি হল!'

মনোমোহন সমান স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন, 'এই একটু দেরি হয়ে গেল।'

বারান্দার একপাশে সরে এলেন। অরুণ হাঁটু দুটো মুড়ে কোলের কাছে নিয়ে এসেছে। কোথাও ছেঁড়াকাটার দাগ চোখে পড়ল না। এখানে অবশ্য আলো কম। মুখের ওপর বাঁ-হাতের কনুই। নাসাগ্রে ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা দেখতে পেলেন না। ভিড়ের কেন্দ্রে অরুণকেই দেখেছিলেন তো? অরুণের বয়সী, একরকম আদল অন্য কাউকে দেখে ভুল করেন নি? দেশ ছেড়ে আসবার সময় অরুণ বসতেও শেখে নি। ছোটবেলায় বাবার কাছে শোবার জন্য বায়না ধরত।

এ বাড়িটার কোথাও এখন কোনো শব্দ নেই। রান্নাঘরে সুষমা বরাদ্দ রুটি চিবো-চ্ছেন। ঠিক চিবোচ্ছেন না, দাঁতে তেমন জোর নেই। তাঁর খাওয়া হয়ে গেলে রান্না-ঘর গুছোনোর একটু শব্দ পাওয়া যাবে। বরুণের ছেলেটা এতক্ষণে ঘুমিয়ে বালিশে অনেক লালা ঝরিয়েছে। মনোমোহন চার-দিকে চোখে বুলিয়ে আনলেন। সব কিছু একান্তভাবে তাঁর কাছের, সব যেন কাদার মতো অথবা চন্দনের মতো তাঁর আদুড় গায়ে লেপে দেয়া হয়েছে, সব পরিপূর্ণ-রূপে তাঁর নিজস্ব। রেলিংয়ে হাত রেখে-ছিলেন। সেখানে দুটো টবে বেল ফুলের চারা লাগিয়েছে মল্লিকা। এই বর্ষায় নাকি ফুল ফুটবে।

একদিনের মধ্যে মনোমোহন দ্বিতীয়-বার সিদ্ধান্ত বদলালেন। কাল সকালে ছোট চৌধুরীকে সবিনয়ে বলে আসতে হবে, তাঁর প্রস্তাবে মনোমোহন রাজী হতে পারলেন না। এজন্মে বারাণসীবাসের সৌভাগ্য হল না। বারাণসী বড় দূর। নিজের শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে স্বল্প আলোয় দেখলেন, তাঁর বিছানা শিউলি ফুলের মতো শাদা।

সুখের মেলা

সোনালী গমক্ষেত এবং সোনিয়া…

সতেরো নম্বর বাসাড়ে-লাইনঘরে ভারতের প্রায় সব প্রদেশের মানুষ তাদের আন্ডাগুষ্ঠি নিয়ে এসে সংসার পেতে বসেছে। চটকল কারখানার ছোটখাটো কেরানীবাবু রমেন মিত্রই শুধু একক। চারটের পর কারখানা থেকে ফিরে লাইনঘরের গায়ে লাগানো 'টিউকল' থেকে বালতি ধরে জল বোঝাই করে মাথায় ঢেলে চন্দন সাবান, মেখে স্নান সেরে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করছিল, এমন সময় পাশের বাসার হিন্দুস্থানীর সোমত্ত মেয়েটা দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে কি যেন খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল।

রমেন শুধোলে, 'কি চাস রে সোনিয়া?'

সোনিয়া বেশ বাংলা বলতে পারে। বললে, 'বাবুজী, আপনার বঁটিটা লিব।'

'বঁটি, কি হবে!'

'বাবা মাংস আনছে।'

'কিসের?'

'খাসীর।'

বঁটিটা দেখিয়ে দিতে সোনিয়া সেটা নিতে এল। হাতে পায়ে ওর রঙের চিত্তির। কোমরে রুপোর চন্দ্রহার। চওড়া লকেটটা ঝুলছে সামনে—নাভির গর্তটার নিচের দিকে। পুরন্ত শরীরে খুব খাটো কুর্তো। পাতলা হলদে রঙের ছাপা শাড়ির মধ্যে দিয়ে বুকের বঙ্কিম ডৌল চোখে পড়ে। সোনিয়ার নিতম্ব ঈষৎ ভারী, চললে মনোরম দেখায়। রঙটা ওর কালো আর ফরসার মাঝামাঝি।

রমেন বললে, 'দেখি দেখি, আরে, তোর হাতে এ-সব কি এঁকেছিস?'

হাতটা ধরে দেখলে রমেন।

লজ্জায় হাসতে লাগল সোনিয়া।

'তোর সাদি হবে নাকি রে?'

লজ্জায় মাথা হেঁট করলে চিবুক তুলে ধরে রমেন। ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ দুটোতে যৌবনের সলাজ অপূর্ব এক মাধুরী খেলা করতে দেখলে।

'না বাবু, সাদি হবে কেন, এমনি!'

'বঁটি নিয়ে যাচ্ছিস, মাংস-রান্না দিবি তো?'

'হাঁ বাবু।'

'তোর বাপ কোম্পানীর পিয়ারের লোক। তাঁতের সরদার। খাসীর মাংস খাচ্ছে! তোর বাপের ওপরে অন্য সব লোকজনের রাগ।'

'জানি বাবু। বাপ বলে, কোম্পানী বেহার মুলুক থেকে আনছে। চাকরি দিছে। তার কথা না শুনে কি পারি?'

'মারা পড়বে একদিন। আমার কথা যেন বলিস না।'

'সোনিয়া—কা ভৈল রে—জলদি আও'…সোনিয়ার বুড়ী দাদি হাঁক পাড়ে।

সোনিয়া সাড়া দেয়, 'যাতা হ্যায় দাদি, তু মৎ চিল্লানা, মাংস দেখকর বহুৎ খুশ হো গিয়া বুঢ্ঢী দাদি!'

সোনিয়া চলে গেল।

ওরা থাকে রমেনের বাসার ডান-পাশে। বাঁ-পাশে থাকে রবি দাসের বউ আর ছেলে। তার পাশে মাদ্রাজী পরিবার। সোনিয়াদের পাশে থাকে ওড়িয়ারা। সামনের লাইনে থাকে ক'ঘর ডেউকি আর ভাটিয়ারা।

চা হলে রমেন ডাকে সোনিয়াকে। মাঝখানে এক-ইঁটের গাঁথুনি দেওয়া মাত্র একটা পাঁচিলের ব্যবধান। সোনিয়া এলে রমেন বলে, 'তোর বুড়ী দাদির জন্যে একটু চা নিয়ে যা।'

একটা মগ নিয়ে আসে সোনিয়া। চা নিয়ে যায়। দুটো সন্দেশ ছিল তাও দিয়ে দেয়। দেবার পর সোনিয়ার হাতে চুমু খেয়ে দেয়। সোনিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখায় তার চোখের তীর হেনে।

রবি দাসের বড় বড় জুলপি-রাখা ছেলেটা এসে বলে, 'আপনার সাইকেলটা একটু দেব মামা?'

'কেন?'

'বাজার থেকে আসব একটু, মায়ের জন্যে ওষুধ কিনে আনব।'

সাইকেল বার করে নিয়ে চলে গেল ছেলেটা। তারপর এল রবি দাসের স্ত্রী।

বললে, 'ছেলেটা বড় জ্বালাচ্ছে, বলে, বলো না মা, আমার মাথা কনকন করছে, ট্যাবলেট কিনতে যাবার কথা বলে সাইকেলটা নিই মিত্রমামার!'

রমেন হেসে উঠল। বললে, 'বসো রমলা। রবির তো নাইট ডিউটি পড়ল আজ থেকে। তাস খেলাটা মাটি হল।'

'তুমি রান্না করবে না?'

'ঐ এক ঝামেলা। শুধু ভাত রাঁধব কিম্বা রুটি করব। সোনিয়াদের খাসীর মাংস এনেছে নাকি, বাটি নিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই এক বাটি দেবে—বাস ঐ দিয়েই হয়ে যাবে। রবি কি ঘুমোচ্ছে?'

'না। কোথায় বেরিয়েছে। তুমি ওদের মাংস রান্না খাবে?'

বিছানাটায় চিত হয়ে শুল রমলা। হাই তাললে। আড়মোড়া দিলে। বললে, 'তোমার বিছানায় শুলে আমার ঘুম পায়, কেমন নরম!'

রমেন কোনো মন্তব্য করে না।

চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে রমলা। রমলা একটু আলসে এবং মোটা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম যৌবনে ঐ একটি ছেলে হবার পর থেকে ও বাঁজা হয়ে গেছে। বয়েসে বোধহয় তিরিশ হবে।

রমলা বলে, 'তুমি বিয়ে করবে না?'

'তুমি তো আছই আবার কেন?'

'আমার মধ্যে আর কি আছে?' হাসলে রমলা।

'যা আছে ঐতেই আমার মতন একজন গরিবের চলে যায়।'

—বলে রমলার কাছে এসে বসল রমেন। তারপর কাতুকুতু দিতে শুরু করলে রমলাকে। রমলা বালিশে মুখ চেপে হাসতে হাসতে ওর হাতটা সরিয়ে দিতে লাগল। শেষে দুজনে হাতাহাতি লেগে গেল। এবং আরো পরে এ ওকে জড়িয়ে ধরল। এ তাদের জীবনে নতুন কিছু নয়। দশ বছরের পুরোনো ব্যাপার। কিছুক্ষণ পরে রমলা 'বুকের ভেতর কনকন করছে' বলে চলে গেলে রমেন চুপ করে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। অন্ধকার হয়ে যায়। আলো জ্বালে না। সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ গাধার চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল।

শিব মন্দিরে বিলম্বিত লয়ে ঘণ্টা বাজছে। রবির গলা শোনা যাচ্ছে, 'এই বাঁদর, মাথায় জল ঢাল! রমলা—রমলা!'

কি হল আবার রমলার?

আলো জেলে ছুটে বেরিয়ে এল রমেন।

রমলার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুকে, তার চোখের বল দুটো বেরিয়ে পড়েছে। দাঁত লেগে গেছে।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে রমেন। কোম্পানীর গাড়িতে করে ওরা বাপ-বেটায় নিয়ে গেল কলকাতায়।

রমেন যেন নিজেকে অপরাধী ভেবে বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ জড়ের মতন পড়ে রইল ঈজিচেয়ারে।

সরদার সীতারাম তেয়ারী এল বাসায়। তার গলা শোনা গেল। বেটা মদ খেয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরে সে তার ভুঁড়িঅলা নির্বাক বধির কালা স্ত্রীর ওপরে খুব তম্বিতাম্বা করেই আবার জুয়ার আড্ডায় চলে গেল। সারারাত হয়তো আর ফিরবে না। পড়ে থাকবে কু-পল্লীতে।

সোনিয়ার মা নির্বাক হয়ে গেছে। খড়ম দিয়ে নাকি মাথায় মুখে কানের ওপরে একবার খুব মেরেছিল তেয়ারী। রাত্রে আর তেমন কিছু দেখতেও পায় না।

সোনিয়া এক সময় এক বাটি তরকারী এনে ডাকলে, 'বাবুজী।'

'কি রে, সোনিয়া? আয়। তরকারী এনেছিস—আমি তো ভাত রুটি কিছুই করি নি।'

'রোটি এনে দিব?'

'দে। তোদের কুলোবে?'

'হাঁ।'

সোনিয়া জল গড়িয়ে এনে খাবার দিলে। যেমন ঘরের বউ বা মেয়েরা দেয়।

রমেন বললে, 'আরে বাঃ! চমৎকার মাংস রান্না তো? কে রাঁধলে, তুই বুঝি?'

'হাঁ বাবুজী।'

'তুই আমার বউ হবি?'

'লাজ লাগে বাবু!'

'হয়ে যা। অনেক গয়না দোব। শাড়ি দোব।'

'আপনার বউ নাই?'

'না।'

নখ খুঁটতে থাকে সোনিয়া।

রমেন বলে, 'তোর বর হবে দেখবি ইয়া মোচঅলা কোন এক ব্যাটা!'

খিলখিল করে হেসে উঠল সোনিয়া।

রমেন ডাকলে, 'আয়, এখানে বস, খা আমার হাতের একগাল।'

'ইঃ!' লজ্জায় জিব কাটলে সোনিয়া।

হাত দিয়ে শাড়িটা ধরে টেনে কাছে আনলে তাকে রমেন। সোনিয়া বসল। মাংস রুটি গালে পুরে দিলে তার। সে লজ্জায় মুখ চেপে আড়ালে গাল নাড়তে লাগল।

'তোর দাদি, ভাই-বোনরা ঘুমোচ্ছে?'

'হাঁ।'

'মা?'

'সেও বি নিদ যাচ্ছে।'

'বাপ আসবে কখন?'

'সে আসবে না।'

'কেন?'

'সারা রাত জুয়া চালাবে। আর 'মাসিদের বাড়ি' থাকবে!'

'মাসিদের বাড়ি!' তুই তবে তো দেখছি বাঙালী মেয়ে হয়ে গেছিস? তবে তুই আজ রাত্রে আমার ঘরে থেকে যা। এই ভাল বিছানায় দুজনে শুয়ে থাকবখনে। খাওয়ালি, শোবে কে?'

'এই কম..টা!' বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালিয়ে গেল সোনিয়া।

* * *

রাত তখন বোধহয় একটা।

চারদিক কুয়াশায় ঢেকে গেছে।

কুকুর আর গাধা-ঘোড়া-শুয়োরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কারখানায় ঝমাঝম শব্দ হচ্ছে একটানা।

আজ রাতকাজ ছিল। রবি দাস ঘরে না থাকলে প্রায় সারারাত রমেনের কাছে থাকত রমলা। এককালে রমেন খুব ভাল ছেলে ছিল। দয়া, সহানুভূতি, আদর্শ, পাপ পুণ্যের বোধ ছিল তার মধ্যে টনটনে। কিন্তু রমলা সব ভাসিয়ে দিলে। জীবনটা বরবাদ করে দিলে। তার ছেলেটা অজ্ঞান অচেতন হয়ে ঘুমোয়—সন্ধ্যার পর শোয় আর সকালে ওঠে।

কোম্পানীতে গরম আবহাওয়া। দাম-কড়ি বাড়াবার আবার জোর আন্দোলন হবে। রমেন গরিবদেরই সমর্থন করে। তাই তার চাকরি যেতে পারে বলে ম্যানেজার হুমকি দিয়েছেন। প্রকাশ্যে রাজনীতি করে না বটে রমেন তবু ও'রা ঠিক লোক চেনেন।

হঠাৎ দোরটা খোলার অল্প একটু সাড়া হয় যেন। হয়তো কুকুর নাড়া দিচ্ছে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ে রমেন।

সোনিয়া ঘরের মধ্যে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবে. চলে যাবে কিনা!

কিন্তু...পায়ে হাত দেয় সে।

রমেনের ঘুম ভেঙে যায়। ডাকে, 'রমলা?'

হাত ধরে টেনে নিয়ে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল সে! 'একি, তুমি, সোনিয়া!'

সোনিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ। কাঁপছে সে শুধু ভীতু কবুতরের মতন। সে কি তবে প্রেমে পড়ে গেছে নাকি বাঙালীবাবু রমেন মিত্রের?

'কেন এলে তুমি সোনিয়া?' ক্লান্ত গলায় শুধোয় রমেন।

'আমাকে 'বিয়া' করবে?'

'পাগলি!' রমেন তাকে কোলে টেনে নিলে। বললে, 'হাঁ, তোমাকেই বিয়ে করব সোনিয়া! তুমি বড় ভাল!'

'তোমার আমার বহুৎ ভাল লাগে বাবু! নিদ নাই আঁখে!'

রমলা আর ফিরল না হাসপাতাল থেকে। গাড়িতেই নাকি সে হার্টফেল করেছিল। রমলার হার্ট দুর্বল ছিল। মাঝে দু'বার স্ট্রোক হয়েছিল। মরবার পূর্বে সে যেন জ্বলে উঠেছিল। দীপ্ত, সুডোল, লাবণ্যবতী। আর দুর্বার হয়ে উঠেছিল।

অথচ সোনিয়ার মধ্যে কি অপূর্ব স্নিগ্ধতা!

কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে তেয়ারীর চোখে পড়ে গেল। সোনিয়াকে ধরে বিষম প্রহার দিলে।

রমেনকে বললে, 'বাবুজী, আপলোক বহুৎ বড়া কাম করতা হ্যায়। দোসরা রোজ হামলোককা আঁখমে এইসা বড়া কাম যব আয়ে গা আপকা খুন নিকাল দে গা।'

কিন্তু সোনিয়া মাস কতক পরে রমেনকে জানালে যে সে নাকি মা হতে চলেছে।

বিপদ! ওকে কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়াও যাবে না—ওর বাপ জানতে পারবে। সে তাহলে কি করে বসবে কে জানে!

রবি দাস কোম্পানীর অন্য কারখানায় চলে গেল।

আবার গন্ডগোল লেগে গেল কারখানায়।

কারখানা বন্ধ।

হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল সীতারাম তেওয়ারী।

সোনিয়া রমেনের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, 'বাবুজী, আমাদের কি হবে?'

তারা দেশে চলে যেতে চায়। চিঠি দিয়েছে তেয়ারীর ভাইকে। সোনিয়ার চাচা এসে সবাইকে নিয়ে যেতে চাইলে সোনিয়া যেতে চাইলে না। রমেনের কাছে থাকবে সে। তার সন্তানের মা হতে চলেছে সে।

সোনিয়া বললে, 'তুমি যে আমাকে বিয়ে করবে বলেছিলে?'

'বলেছিলাম, কিন্তু আমি একজন ছাপোষা বাঙালী ভদ্দরলোক, আর তুমি হিন্দুস্থানী মেয়ে।'

'চোপ শয়তান। ভদ্দরলোক! আমি চাচাকে বলে দোব? ভদ্দরলোকের নিকুচি করে দেবে?'

রমেন বোকা বনে গেল! সোনিয়া গালে চড় হাকায় যে!

'বাপকে হারিয়েছি, মা থেকেও নেই, দাদি বুড়া, ভাইবোন ছোট। এখন আমার এই অবস্থা করলে—কি আমি করব শুনি?'

রমেন বললে, 'তোমাকে যদি নিই, এত বোঝা আমি বইব কেমন করে? তুমি দুশো কি তিনশো টাকা নাও।'

সোনিয়া বললে, 'চাচা ওদের সবাইকে নিয়ে যাবে, দেশে ক্ষেতি আছে—কাম করবে। বাবা জমি কিনে রেখে গেছে। তুমি শুধু আমাকে সাদি করে লাও—আমার ইজ্জৎ খেয়েছ। তোমার টাকা আমি লিব না।'

শেষ পর্যন্ত বুড়ী দাদির সঙ্গে কি যেন যুক্তি করলে সোনিয়া। চাচা বোকা-সোকা লোক। ক্ষেত খামার দেখে দেশের, গরু-মোষ চরায়।

বুড়ী রাজি হল। তিনশো টাকা দিলে রমেন সোনিয়ার হাতে। কোনো ক্লিনিক থেকে ব্যবস্থা করে নেবে নাকি তারা। আসলে বুড়ীই সব করবে—সে নাকি জানে সে সব। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকাগুলোও তুলে নিলে ওরা তেয়ারীর।

সোনিয়ারা চলে গেল।

যাবার সময় সে পায়ে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে : 'বাবু, আমাকে মনে রেখো।'

রমেনেরও দু' গাল বেয়ে চোখের জল ঝরেছিল।

পাগলের মতো সেদিন সারারাত শুধু কত কি হাতড়ে বেড়িয়েছিল বাসার অন্ধকারে। এ-পাশের বাসায় রমলা নেই—ওপাশে নেই সোনিয়ারা। এখানে আর পড়ে থেকে কি হবে?

কিন্তু মাস পেরিয়ে গেল। জীবনটা বড় একা একা বোধ হতে লাগল। ঘরে ফিরে যাবে কিনা ভাবতে লাগল।

তার এখন বিয়ে করা দরকার বোধহয়।

কারখানার স্টাফ লাইব্রেরীতে সহকর্মী বন্ধু সতোন সরকারকে সে কথা জানাতেই সে তাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল। আর তার বোন শীলাকে দেখিয়ে বললে, 'একে তোর পছন্দ হয়?'

রমেন বললে, 'অপছন্দর কি আছে!'

যদিও সে জানত শীলার সঙ্গে অন্য একটি ছেলের অবাধ মেলামেশায় খবর সবাই জানে। কিন্তু এখন ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যায়।... শীলা লেখাপড়া জানে। সুন্দর করে কথা বলতে জানে। চমৎকার রোমান্টিক মেয়ে।

ঘন-ঘন কয়েকদিন সে রমেনের বাসায় আসতে লাগল। ঘরটা তার গুছিয়ে পরিপাটি করে দিলে।

শীলা বললে, 'আপনার চাকরি চলে যেত এই মাসেই। ম্যানেজার শুনেছেন আপনার সঙ্গে আমার বি' হচ্ছে। তাতে খুশীই হয়েছেন। আমি আপনার জন্যে রিকোয়েস্ট করেছি। ..া দিয়েছেন বিয়ে হলেই আপনার পদোন্নতি করে দেবেন। আর স্টাফ কোয়ার্টারে একটা ফ্ল্যাট দেবেন।'

শীলা অদ্ভুত মেয়ে। সব দিকে তার চোখ! চুল আঁচড়ে দিতে দিতে দু-হাতে রমেনের মুখখানা করতলে পদ্মফুল ধরার মতো করে চুম্বন করলে। ওর মধ্যে একটা আর্ট আছে। কার্টসি আছে।

অতএব বিয়ে হয়ে গেল।

সোনিয়ার কথা মনে পড়ল রমেনের। তার মন খারাপ হয়ে গেল।

কে জানে এতদিনে সোনিয়ার কি হল। হয়তো সোনিয়া তার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছে। কিম্বা হয়তো মারে নি। স্বামী মারা গেছে বলে ছেলেটাকে রেখে দিয়েছে। মহুয়া গাছের ডালে কাপড়ের দোলনায় শুইয়ে রেখে দিয়ে তার বাবার ক্ষেতে পাকা সোনালী গম কাটছে।

—আবদুল জব্বার

রবীন্দ্রনাথ : বিতর্কের উত্তরে

শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের উত্তরে আলোচনার জন্য অমৃত সম্পাদক আহ্বান জানিয়েছেন বলেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখতে সাহসী হলাম। তিনি ঠিকই বলেছেন; যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধই লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, এবং সম্প্রতি কয়েকখানি ভাল বইও বেরিয়েছে তবু আরো অনেক বেশী আলোচনা ও ভাল বই লিখিত হওয়া উচিত, যেমন শেকসপীয়ার সম্বন্ধে আজ অবধি হচ্ছে।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। বাল্মীকি কালিদাস দান্তে শেকসপীয়ার গ্যেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মহাকবিদের পাশেই তাঁর স্থান, একথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত হই না। রবীন্দ্রনাথকে বোঝা, এবং তাঁর মহত্ব স্বীকার করার প্রধান অন্তরায় এই যে রবীন্দ্রপূর্ব উক্ত মহাকবিগণ এমন বিষয় নিয়ে কাব্য-রচনা করেছেন যা ধরা-ছোঁওয়া যায়, মহাকাব্য ও নাটক বুঝতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির দরকার হয় না। অতি-শিক্ষিত না হয়েও সাধারণ লোকও মহাকাব্য ও নাটকের রস মোটামুটি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নিছক লিরিক কবিতার রস গ্রহণ এবং প্রকৃত সমালোচনা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে বাঙালীর সময় লেগেছিল, এবং বিরূপ সমালোচনা এবং 'দুর্বোধ্য' আখ্যা তিনি প্রথম যুগে পেয়েছিলেন। ক্রমে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠবার পর তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত হলেন। মুষ্টিমেয় ভক্ত অবশ্য প্রথম যুগ থেকেই ছিল। আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে প্রভৃতি নতুন কবিদের উত্থানের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের অবসান, মোটামুটি এই বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষমতা ও মাত্রাজ্ঞান না থাকাতে অনুকারী কবিরা ভাষায় উচ্ছ্বাস ও শিথিলতা এনে ফেলছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং রবীন্দ্রোত্তর কবিদের উপর আমার কোনও বিরূপতা নেই, তাঁরা নতুন পথ ঠিক সময়েই বেছে নিয়েছিলেন। নয়তো তাঁদের আজ কেউ নামও মনে রাখত না। তবে ভাষা গাঢবদ্ধ করা সম্বন্ধে তাঁদের চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে বলতে পারি না। আমার মনে হয়, রবীন্দ্ররীতির কাছাকাছি পৌঁছতে হলে প্রমথ চৌধুরীর রীতি গ্রহণ করা দরকার। সুধীন্দ্রনাথের সংস্কৃত বহুল পাণ্ডিত্যের অনুকরণে যে ভাষা অন্ততঃ কবিতায় আজ প্রচলিত, অনেক ক্ষেত্রেই তা উদ্ভটই হয়েছে, সার্থক হয় নি। এ ক্ষেত্রেও সেই অধিকারীভেদের কথা। কিন্তু সমালোচনা করা মানেই ধ্বংসমুখী সমালোচনা নয়, দুই দিক দেখাতে যিনি পারেন তিনিই প্রকৃত সমালোচক। আমার আক্ষেপ এই যে রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের মত ভাষার আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে গঙ্গাধারা প্রবাহিত করলেন। নতুন বাক-সংযমের পুরোধারা সুযোগ পেলেই তাঁর মাহাত্ম্য কেন অস্বীকার করবেন? আজকাল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই লেখক তাঁর "অতি-কথন", "অতি প্রজলেখনী' ইত্যাদি কয়েকটা শব্দ না জুড়ে দিলে যেন অস্বস্তি বোধ করেন। পাছে লেখককে যথেষ্ট শিক্ষিত ও যোগ্য সমালোচক বলে গণ্য না করা হয়। তাঁর সব লেখাই যে সকলের সমান ভাল বোধ হবে তার কোনও অর্থ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত

আশা মজুমদার

পছন্দ অপছন্দ বাদ দিলেও তিনি যে মহাকবি একথা স্বীকার করতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হবো কেন? শুধু মহাকবিই নন, তাঁর গদ্যরীতির উৎকর্ষ ও প্রাঞ্জলতা বোধ হয় অননুকরণীয়।

যা হোক, এবার লোকনাথবাবুর প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্যে ফিরে আসা যাক। "তোমার সৃষ্টির পথ" কবিতাটি বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যদি আমরা "এই প্রবঞ্চনা দিয়ে" পাঠের বদলে "এই প্রবঞ্চনা মাঝে" এই পাঠান্তর গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথ এই শেষ কবিতাটি শেষ শয্যাশায়ী অবস্থায় রচনা করেন, এবং অনুলেখনকারীকে বলেন "আচ্ছা এখন এই থাক, কাল একবার আবার দেখে দেব।" কিন্তু সে কাল আর আসেনি। কাজেই ধরে নিতে পারি কবি হয়তো ঐ "দিয়ে" কথাটি বদলেই দিতেন কারণ "দিয়ে" কথার ওখানে কোনও অর্থ হয় না। রাণী চন্দ, রাণী মহলানবিশ বা মৈত্রেয়ী দেবী কার লেখা কোন বইয়ে বা প্রবন্ধে এই তথ্যটুকু আমি পেয়েছিলাম, আজ আর তা স্মরণ করতে পারছি না। পাঠক দেখবেন দিয়ের বদলে মাঝে পড়লে কবিতাটি জলের মত স্বচ্ছ হয়ে যাবে। ছলনাময়ী প্রকৃতি না ঈশ্বর একথা দার্শনিকরা বিচার করবেন, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ পাঠক সোজাসুজি এই বুঝবেন যে মহৎ লোকের অন্তরের আলোকেই তাঁকে ভুলভ্রান্তিসংকুল পথে ঠিক দিক দেখায়, এবং মৃত্যুর পরেও তাই অক্ষয় শান্তির অধিকারী করে। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন বলেই আমার ধারণা। কিন্তু তাঁর মত বিরাট প্রতিভা কি অন্ধবিশ্বাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? স্বভাবতই বুদ্ধি ও তর্ক দিয়ে তিনিও চিরজীবনই বিচার করে চলেছেন। তাঁর প্রথম দিকের মৃত্যুবিষয়ক কবিতায় যে সহজ বিশ্বাস ও আশাবাদ ছিল, বয়সের সঙ্গে, শারীরিক শক্তি হ্রাসের সঙ্গে তার যে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছে সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তিনি কিছুমাত্র কৃত্রিমতার আশ্রয় নেন নি, নিজেকে সাধক সত্যদ্রষ্টা বলে প্রচার করতে চান নি। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখা 'চিঠি' কবিতাটিতে মৃত্যুর পরে এযুগের কোনও মায়া ছায়া ফেলবে কি না মানব মনের এই চিরন্তন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন; মনে তো হয় না তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাব

ঘটেছিল। তিনি সাধনার কোন স্তরে পৌঁছেছিলেন সে কথায় আলোচনা অবান্তর, কিন্তু মহাকবির যে মহাগুণ Communicability অর্থাৎ নিজের মনের ভাব পাঠকের মনে সংক্রামিত করবার ক্ষমতা, এই শেষের কবিতাগুলির মধ্যেও পূর্ণ ভাবেই বিদ্যমান—আমরা আমাদের প্রয়োজন মত আহরণকরব এইটাই বড় কথা। সেদিক থেকে তিনি যথার্থই ঋষি। অক্ষয় শান্তির অধিকার যদি কারও থাকে তবে তাঁর নিশ্চয়ই আছে, কারণ তিনি নিজের অন্তরের আলোকে ঊর্ধ্বে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলেছেন। পৃথিবীর নানা মায়া মোহ তাঁকে মোহিত করলেও সম্মোহিত করতে পারে নি। মানুষমাত্রেরই ক্ষমতার একটা সীমা আছে, রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবেরও তাই। যথাসাধ্য সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার যদি কেউ করতে পেরে থাকেন, রবীন্দ্রনাথকে সে পর্যায়ে নিশ্চয়ই ফেলা যায়। অক্ষয় শান্তি কামনা করা তাই তো তাঁর পক্ষে মোটেই অসঙ্গত নয়।'

এই শেষের কবিতাগুলির মধ্যমণি আমার মতে শেষ সপ্তকের (বোধ হয় ৪০ নং) 'প্রথমজাতমমৃতং' কবিতাটি। এই কবিতাটিতে সেই অনির্বচনীয়তা রয়েছে যা বিশেষভাবে একান্তই রবীন্দ্রনাথের। বেশীরভাগ লেখক ও সমালোচক কিন্তু শঙ্পুটের "আমার প্রণাম লও পৃথিবী" কবিতাটির কথাই উল্লেখ করেন, কারণ বহু অলংকারখচিত এই গম্ভীর কবিতাটি যেন বোরোবুদুরের অপূর্ব ভাস্কর্য। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এরকম কবিতা হয়তো পৃথিবীর অন্য কোনও কবি লিখলেও লিখতে পারেন, কিন্ত "প্রথমজাত অমৃতে"র মত কবিতা লিখতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পারেন। এখানে তিনি একান্তই একক। যেমন আমার মতে উর্বশীর প্রথম স্তবকগুলি যদিই বা অন্য কোনও কবি লিখতে পারতেন, শেষ দুটি-স্তবক একান্তই রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী নিশ্চয়ই ছিলেন না। কিন্ত তাঁর মানব প্রীতির মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগের সমস্ত সমস্যাই তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে-ছিলেন ও সমাধান করবার পথও সন্ধান করেছিলেন। মুখ্যত তিনি কবি, সমস্ত বাংলাভাষা তাঁর যাদুমন্ত্রে কতখানি জেগে উঠেছিল সেকথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। এযুগে জন্মালে তিনি কমিউনিস্ট হতেন কিনা সে চিন্তা বৃথা। মোটামুটি বলা যেতে পারে তাঁর সহানুভূতি পীড়িত বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিকূলে নিশ্চয়ই যেত না। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাত না থাকলে কবি বা আর্টিস্ট নস্যাৎ হয়ে যাবেন এ মত আমি পোষণ করি না; করা অন্যায় বলেই মনে করি।

তাঁকে আমাদের দেশের লোকে ভুলতে বসেছে একথা সত্য নয়। সেন্টেনারীর সময় থেকে সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধিই পেয়েছে। তবে যাঁদের বলা যায় দেশের বুদ্ধিজীবী, এবং তাঁরা অধিকাংশই বামপন্থী, তাঁদের মনোভাব যে অনেকক্ষেত্রেই উদাসীন একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমেই তার কিছু কারণ দেখিয়েছি। একটা যুগের পরিণতির পর স্বাভাবিক নিয়মেই নতুন যুগের আবির্ভাব হয়ে থাকে। আমাদেরই জীবনকালে কত দ্রুত পরিবর্তন দেখলাম। মোটর দেখলে বিস্মিত হতাম, তারপরে এরোপ্লেন এল, তারপরে এভারেস্ট বিজয়, তারপরে মানুষ চাঁদেও পৌঁছে গেল। যখন কলেজে পড়তাম, ইংলণ্ডের ইতিহাসে ভিকটোরিয়ান যুগের ইতিহাস পড়তে ক্লান্তি আসত, মনে হত সব জায়গায় তো শান্তিপূর্ণ সহাবসস্থান, এদের বৈদেশিক নীতির মধ্যে আর কি বৈচিত্র্য থাকবে ? তারপরেই যে মহাভারত পর্ব আসছে তা তখন মনে হয় নি। সুতরাং মানুষের মন যে আজ এতটা বদলে গেছে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। জীবনযাত্রা দুরূহ, চারদিকে অন্যায় অবিচার অত্যাচার নিপীড়ন; অন্য দিকে যন্ত্রযুগের অভাবনীয় দ্রুত উন্নতি; এ শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বে। এ যুগে কবিরা এই সবেরই মুখপাত্র হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমার আপত্তি এই যে, এ যুগে জন্মেছেন বলে নতুন কবিরা রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত হেয় করবার চেষ্টা কেন করবেন ? অমৃত পানে অরুচি এলে ঝাল চাটনী মুখে ভাল লাগে, তাই বলে স্বাস্থ্যকর খাদ্য কোনও কাজেরই নয় এমন কথা শুধু অর্বাচীনের মুখেই সাজে। কোনও দেশে কোনও কবিই চিরদিন এক-ভাবে পঠিত হন না। যাকে বলে "শিকেয় তুলে রাখা" তাই হয়েই থাকতে হয়, সময়-মত নামিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখা হয়। আজ রবীন্দ্রনাথ কারও কারও কাছে তাই হয়েছেন, এতে তাঁর মাহাত্ম্য কণা মাত্রও হ্রাস হয় নি। লোকনাথবাবুও অবশ্য তাই মনে করেন, আমি যতদূর বুঝলাম। কিন্তু তিনি অক্ষয় শান্তির অধিকার কথাটি নিয়ে একটু অযথা চিন্তিত হয়েছেন মনে করি। রবীন্দ্রনাথের অক্ষয় শান্তির অধিকার কথাটি বুঝবার জন্য অতি-পাণ্ডিত্যের দরকার করে না। অত্যন্ত সাধারণ অর্থেই মুমূর্ষু কবি চোখ বন্ধ করবার আগে ঐ কথা কয়টি বলে গিয়েছেন। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, 'আমার লেখায় কি তত্ত্ব আছে জানি না। আমি কবি, আমাকে সহজভাবে নেওয়াই ভাল।'

আর একটি কথা বলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করি। লোকনাথবাবু বলছেন, "কিছু কিছু" আগের কবিতা এবং শেষ জীবনের কবিতাগুলি প্রথম শ্রেণীর বলে স্বীকৃত হবে। এখানেও দেখি সেই কুণ্ঠা। কেন প্রথম পর্যায়ের কবিতা, ধরুন সোনার তরী থেকে পূরবী পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর নয় ? মিল আছে, ঝঙ্কার আছে বলে তাকে বড় কবিতা বলব না ? এই ধরণের মনোভাব ঠিক নিরপেক্ষ সমালোচকের নয়। একটা কথা উঠেছে His peaks are few and far between । এর উত্তরে কেবল এইটুকু বলতে চাই যে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরগুলির সংখ্যাও খুব বেশী নয়। কিন্তু তার নীচেই অসংখ্য শিখর রয়েছে যারা আন্ডিস বা রকি পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের চেয়েও উচ্চতর। সুতরাং আধুনিক লেখক যখন লেখনীধারণ করবেন রবীন্দ্রনাথকে বিচার করবার জন্য, তখন দয়া করে একটু বিবেচনা করে মতামত প্রকাশ করলে উপহাস্য হন না। একথা আমি লোকনাথবাবুকে লক্ষ্য করে বলছি না, তিনিও আমারই মত রবীন্দ্রভক্ত বলেই আমার বিশ্বাস। তবে রবীন্দ্র সমালোচনার নামে কিছু কিছু বিরূপ মনোভাব অনেকের লেখায় প্রকাশ পেতে দেখেছি তাই এই ক্ষোভ।

পাখি

লীলা মজুমদার

এক
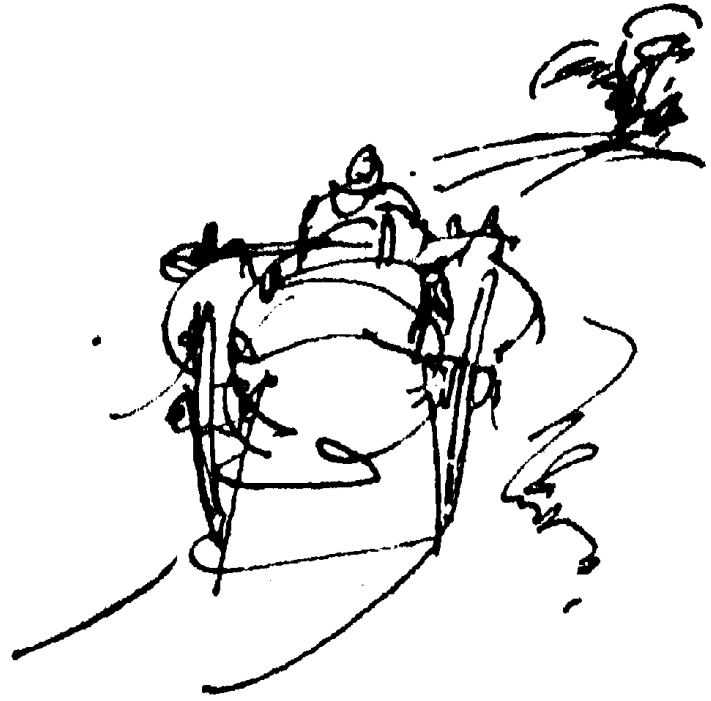
ভদ্রলোক দুজন চলে গেলে, সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। অমনি সড়-সড় করে লাল-সবুজ পুঁতি দিয়ে গাঁথা একশো বছরের পুরনো পরদা সরিয়ে বসবার ঘর থেকে অনি-মাসি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, আশা করি সব ঠিক হয়ে গেল? বললাম 'হুম্'। শুনে অনি-মাসি মহাখুসি। কারণ সব ঠিক হয়ে যাওয়া মানেই আমি এ-বাড়ি থেকে বিদায় হব। বড় দুধের বোতলে আর ভাগ বসাব না। তবে র‍্যাশন-কার্ডটা রাখবে নিশ্চয়ই অনি-মাসি। রাখলে বেশি দাম দিয়ে বাড়্তি চালগুলো আর কিনতে হবে না।

কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম বাড়িটাও খুসি হয়েছে কি না, ওর অবিরাম সর-সর ঝর-ঝর চিট--পিট খুট-খুট শব্দের মধ্যে একটুও আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে কি না। এতদিন বাদে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পেরে নিশ্চয় ওর খুসি হওয়া উচিত ছিল। দাদামশাই উইলে লিখে গেছিলেন যতদিন না বিয়ে হয়, ইচ্ছা হলে এ-বাড়িতে থাকতে পারি। এবং দোকান ভাড়ার টাকার থেকে অন্যদের সঙ্গে সমান ভাগ আমার। অবিশ্যি কাঁচা টাকা হাতে পাব না, আমার খাওয়া-পরার জন্যে খরচ হবে। কিন্তু বিয়ে করলেই, বা যে কারণেই হক অন্য জায়গায় বাস করলেই, এ বাড়ির উপর আর কোনো অধিকার থাকবে না।

ভালো উইল। এর-ই জোরে এখানে এতকাল ধরে থেকেছি, খেয়েছি। দিদিমার গয়নার অর্ধেকও আমার ভাগে পড়েছিল। তাইতো অনি-মাসির কি রাগ। যার মা একটা ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে বিলেত পালিয়ে যায়, তাকে আবার দিদিমার গয়নার ভাগ কেন? দাদামশাই শুনে খুব হেসেছিলেন। 'আরে তোদের মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো তার অর্ধেক গয়না ননীর আর অর্ধেক তোর হয়ে গেছিল। সে তো ইচ্ছে করলে ওগুলো সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারত। নেহাৎ আমি ভল্টে তুলে রেখেছিলাম, তাই নিতে পারে নি। আমি যদ্দিন আছি, ননীর মেয়ের সব ভার আমার। আমি মলে ঐ গয়না বেচে ওর পড়ার খরচ চলবে।'

স্পষ্ট সে-কথা মনে আছে। আমার তখন সাত বছর বয়স। মাকে একেবারে ভুলে গেছি। বাবাকেও। মা যাবার পর বাবা সেই যে আমাকে এ-বাড়িতে ফেলে দিয়ে গেল, তারপর থেকে আজ অবধি দেখা নেই। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ের কোনো গুহায় বাস করছে। কেউ বলে জাহাজের ডাক্তার হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনি-মাসি বলে, 'কিসের সন্ন্যাসী, ঐ শৌখিন মানুষ হল আর কি সন্ন্যাসী! সে সন্ন্যাসীও হয় নি, জাহাজেও যায় নি। বোম্বাইতে নাম পালটে, ব্যবসা করে লাখপতি হয়েছে। তোর মার চেয়েও দশগুণ সুন্দরী মারাঠী মেয়ে বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে আছে। তোর খবর নিতে তার বয়ে গেছে।'

শুনে আমার একটুও দুঃখ হয়নি। বলেছিলাম, 'তাহলে নিশ্চয় বেচারিকে নিরামিষ খেতে হয়।'

নিরামিষ খেতে আমার ভারি আপত্তি ছিল।

আমি যেবার কলেজে ভরতি হলাম, সেবার দাদু মারা গেলেন। বেশ গেলেন। আমিও ঐ রকম যেতে চাই। আমাকে ডেকে বললেন, 'লখাকে গাড়ি জুততে বল। ঘোড়াগুলো কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে।' কোথায় গাড়ি, কোথায় ঘোড়া, কোথায় লখা। ছোটবেলায় শুনতাম দাদামশাইয়ের বন্ধুরা নাকি আগেই উঁচু উঁচু ফোর্ড গাড়ি কিনেছিলেন, কিন্তু দাদামশাই কিছুতেই কিনবেন না। তাঁর জুড়ি-গাড়ি আর টম-টম, দুটো বড় ঘোড়া আর একটা মাঝারি সাইজের তেজী ঘোড়া ছিল। সে সব ছেড়ে আবার ফোর্ড-গাড়ি কিনতে আছে নাকি! ছোঃ!

তবে আমি এ-সব দেখি নি। বোধ হয় যখন এসেছিলাম, দাদামশাইয়ের তখনি পড়তি অবস্থা। মামলা করে করে জমিদারি গেছে। দোকানঘরের ভাড়া আর কি একটা পেনসন পেতেন, তাতেই সংসার চলত। তবু খুব সুখে কেটেছিল আমার ছোটবেলাটা। জমিদারি নেই তো বয়ে গেল। সে যাই হক, লখাকে চেঁচিয়ে ডেকে ফিরে এসে দেখি, ইতিমধ্যে সে অদৃশ্যভাবে এসে দাদামশাইকে নিয়ে গেছে। কাঠের সিঁড়ির একটার পর একটা ধাপ উঠে তিনতলায় পৌঁছেছি। অমনি অনি-মাসির নাতনি টিকলি আমাকে চেপে ধরল। 'শীগগির বল কে ওয়া?

নিশ্চয় আমার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিল? দিদা বোধ হয় এদেরও ফিরিয়ে দিল। কেন দিদা এমন করে!' এই বলে টিকলি কাঁদতে লাগল। আমি সূর্যের পড়ন্ত আলোতে দেখলাম তার সুন্দর ফরসা গাল বেয়ে মুক্তোর মতো ফোঁটার পর ফোঁটা জল গড়িয়ে নামছে। একটুও দুঃখ হল না। বিয়ে ছাড়া ওর কোনো চিন্তা নেই। হেসে বললাম, 'আগে স্কুল ফাইনেল পাশ কর, তারপর বিয়ে। আরে বিয়ের জন্য ভাবনা কিসের? তোর অমন রূপ দেখে লাখপতিরা তোকে তাদের ছেলেদের জন্য লুফে নেবে। এখান থেকে বৌবাজারের মোড় অবধি সারি বেঁধে ওদের বাড়ির বেহারারা কেমন তত্ত্ব নিয়ে আসবে দেখিস, অনি-মাসির বিয়েতে যেমন এসেছিল। এখন মন দিয়ে অঙ্ক কষ্ দিকি নি।'

এই বলে চলেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু টিকলি ছাড়লে তবে তো যাব। বলল, 'তাহলে ওরা কারা?'

আমার নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। টিকলিও সঙ্গে এল। বললাম, 'ওরা হল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন-দাতা উকিল। ওরা আমাকে একটা খবর-দারির চাকরি দিল। মাসে তিনশো টাকা মাইনে। ১ ডিসেম্বর জয়েন করতে হবে। সেখানেই থাকতে হবে। শুনে নিশ্চয় খুব খুসি হচ্ছিস? আমার ভাগের মাছটা এখন থেকে তুই পাবি।'

টিকলি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'না, তা পাব না। দিদা কম করে মাছ আনাবে। তুমি অনেক দূরে চলে যাবে নাকি? তোমাকে দেখতে না পেলে আমি মরেই যাব।'

বললাম, 'নারে, বেশি দূরে নয়। একেকবার এসে তোকে দেখে যাব। এখন যা দিকি নি, কালকের পিড়া তৈরী কর গে। আমাকে একটু বেরুতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'বাঃ, চাকরি করতে যাচ্ছি, নতুন কাপড় জামা লাগবে না? এই সব পরে কেউ চাকরি করে নাকি?' সত্যিই সব পুরনো রঙ-জ্বলা। টিকলি গম্ভীর মুখ করে বলল, 'টাকা কোথায় পাবে? দিদা কক্ষনো দেবে না।'

মুঠো খুলে দুটো একশো টাকার নোট দেখলাম। 'এই দ্যাখ, দেখেছিস কখনো একশো টাকার নোট? বিজ্ঞাপনদাতা উকিলরা দিয়েছে।'

'উপহার দিয়েছে?'

'দূর, পাগল নাকি? ডিসেম্বর মাসের মাইনে থেকে আগাম দিয়েছে, দরকারি জিনিসপত্র কেনার জন্য। দাদামশাই ছাড়া কেউ আমাকে কখনো উপহার দেয় নি।'

টিকলি বলল, 'কিসের জন্য দেবে? কালো মেয়েদের আবার কেউ উপহার দেয় নাকি? আমার কথা আলাদা। আমি ফরসা। আমাকে মা শাড়ি পাঠায়; পাশের বাড়ির বঙ্কুদা আমাকে চকোলেট দেয়—।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ফের, বাইরের লোকের কাছ থেকে কিছু নিয়েছ তো অনি-মাসিকে বলেটলে একাকার করব! আমি যখনি আসব, তোমার জন্য চকোলেট আনব। খবরদার বঙ্কুর সঙ্গে কথা বলবে না। মহা-পাজি ছেলে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে থিয়েটার করে বেড়ায়।'

টিকলি বলল, 'থিয়েটারে ও সীতা সাজে। পরচুলা পরে দুঃখের গান গায়, আর দর্শকরা কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।'

বললাম, 'মনে থাকে যেন, ওর সঙ্গে মিশবে না। যদি শুনি কথা বলেছ, ব্যস্ চকোলেট ফকোলেট সব বন্ধ।'

অনেকক্ষণ মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। আমি গেলে এদের কি দশা হবে? একরকম বলতে গেলে আমি মেয়ে হয়েও এবাড়ির একমাত্র পুরুষ মানুষ। অবিশ্যি গঙ্গাধর আছে। তার পঁচাশী বছর বয়স হবে। দাদামশাইয়ের ছোট বেলাকার খেলার সঙ্গী, লখার ছোট ভাই। কানে শোনে না, চোখে ছানি। তবে একটা হাঁক দিলে লোকের এখনো বুক দুরু-দুরু করে। আর আছে ওর-ই বিধবা ভাইঝি সৌদামিনী। তারও বয়স সত্তরের উপরেই হবে। লখার মেয়ে। সবাই ডাকে সদু। আমাদের বাড়ির বাজার করা, রান্না করা, খাবার দেওয়া, ও-ই করে। ঘর ধোয়, বাসন মাজে, কাপড় কাচে মতির মা। সদু তাকে বলে চাকরানী। অনি-মাসিও কখনো তাকে নাম ধরে ডাকে না। বলে দাসী। মতির মা হাসে। বলে, 'তা দাসী ঘাসী যা খুসি ডাকুক। সারা দিন খাটব, দু বেলা পেট পুরে খাব আর রাতে বাড়ি গিয়ে শোব, ব্যস চুকে গেল। রাতে কখনো পরের বাড়িতে শুতে হয় না দিদি।' এদের সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে। একবার গেলে এখানে যে আর ঠাঁই হবে না সেটা নিশ্চিত।

বৌবাজারের গলিতে পঁচাত্তর টাকায় পাঁচখানা তাঁতের শাড়ি কেনা যায়। পাঁচখানা জামা কিনলাম রঙ মিলিয়ে। দু জোড়া স্যান্ডাল, সায়া, বডিস, রুমাল, সব কিনলাম। দুটো তোয়ালে, গামছা, তেল, সাবান, পাউডার আর একটা মাঝারি সাইজের ফাইবার সুটকেস। এক সঙ্গে এত নতুন জিনিস জন্মে কখনো দেখি-ই নি, কেনা তো দূরের কথা। খুসি না হয়ে পারলাম না। খুসির চোটে এগারো টাকা দিয়ে টিকলির জন্যেও একটা গাঢ় নীল শাড়ি কিনে ফেললাম। আর মাত্র এগারো টাকা রইল।

টিকলি শাড়িটি পরে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। তারি মধ্যে সময় করে গঙ্গাধর আর সদুকে পাশের বাড়ির পাজি বঙ্কু সম্বন্ধে সাবধান করে দিলাম। টিকলির ষোল বছর বয়স। রূপের ডালি। বুদ্ধি-শুদ্ধি নাস্তি। ওর একটা ভালো বিয়ে হয়ে গেল আমিও নিশ্চিন্ত মনে চাকরি-স্থলে যেতে পারতাম। অনি-মাসির স্বামী স্টক এক্সচেঞ্জে দেদার টাকা করেও ছিল, আবার সর্বস্বান্ত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে মরে-ছিল। তার একমাত্র মেয়ে চারু বিধবা হয়ে বর্ধমানে মেয়ে স্কুলে মায়ের অমতে পড়ায়। টিকলি দিদিমার কাছে থাকে। মা বড় একটা খোঁজ-খবর নেয় না। তবে মাসে মাসে পঁচাত্তরটা করে টাকা পাঠায়, টিকলির খরচ বাবদ। ছুটিতেও চারুদিদি এবাড়িতে থাকে না। একবার দেখা করে, অমনি বন্ধুদের সঙ্গে চলে যায়, শিমলা, কাশ্মীর, পুষ্কর। টিকলির জন্যে নাকি তার মায়ের বন্ধুরা বর খুঁজছে। টিকলি শুনে আহ্লাদে আটখানা। আহা, মায়ের বন্ধুরা বড় ভালো। এদিকে টিকলি পাড়ার স্কুলে ফ্রি-তে পড়ে। দাদামশাইয়ের বাবা ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

রাতে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম বাড়িটার অবিরাম সর-সর ঝর-ঝর শব্দ, যেন কোথায় বালি-সুরকি ঝরে পড়ছে, কাঠের কড়ি-বরগায় ঘুণ ধরে, গুঁড়ো হয়ে ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে। ভাবতাম আমাদের মাথার উপর বাড়িটা একটু একটু করে মরে যাচ্ছে, অথচ এরা কেউ টের পাচ্ছে না। সদু বলেছিল, 'টের পাবে কি [illegible]? অনি-দিদির এক ভাবনা, কত [illegible]কা জমাবে। এই এর মধ্যে থেকেও [illegible]-কড়ি পয়সা জমিয়েছে, এই তোমাকে বলে রাখলাম। এই বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। মলেও একটা বাড়তি পয়সা খরচ করবে না। মরবেও একদিন না খেয়ে না খেয়ে। তখন টাকাগুলো কোথাও খুঁজে পাবে না তোমরা। হ্যাঁ।'

মনে হত বাড়িটা যখন খসে পড়বে, লুকনো টাকাও তখন বেরিয়ে পড়বে। আমার দিদিমাও নাকি বাপের বাড়ি থেকে আনা এক হাজার মোহর দাদামশাইয়ের মামলা-মোকদ্দমার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। মরবার সময় দাদামশাইকে কি একটা বলার জন্য আঁকুপাঁকু করেছিলেন। মুখ দিয়ে স্বর বেরোয় নি। সে মোহরগুলোও পাওয়া যায় নি। এ-সব অনি-মাসির মুখেই শোনা। সে মাঝে মাঝে ঐ মোহর খোঁজে। আর সাত দিন পরে, এই বাড়ি, এই সব গল্প, এই মানুষগুলোকে ছেড়ে আমি চলে যাব।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

লাটপ্রসাদের নেপথ্য কথা

স্বাধীনতা উত্তরকালে যাঁদের জন্ম তাঁরা প্রবল পরাক্রমশালী মহামান্য বড়লাট বাহাদুরদের বিক্রমের সংবাদ বিশেষ পান নি। যাঁরা আজ মধ্য-জীবনে, বড়লাট বাহাদুরদের স্মৃতির দুঃস্বপ্ন আজো তাঁদের উৎপীড়িত করে।

সেইকালে ব্রিটিশ সরকার যাঁদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে এদেশে পাঠাতেন তাঁরা ঠিক কাষ্ঠপুত্তলিকা নন, যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করেই এঁদের এদেশে পাঠানো হত। তদ্বির-তদারকের খাতিরে যাকে-তাকে এই পদ দেওয়া হত না, এবং বড়লাট একটি শাসক গোষ্ঠীর শোভাস্বরূপ হয়ে শাসন ব্যবস্থার মাথায় নৈবেদ্যের চূড়া হিসাবে বসে থাকতেন না। দৈনন্দিন শাসন কর্মের সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতেন, লাটগিরির বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ডুবে থাকলেও কাজের মধ্যে ফাঁকি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'ইংরাজ মদ খায় বটে, কিন্তু বিপদকালে তার নেশা ছুটে যায়', অর্থাৎ তখন সে সচেতন। লাট বাহাদুরগণ শিকার, নৃত্য-গীত, পান-ভোজন প্রভৃতিতে ডুবে অবসর যাপন করলেও, ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল নামক বৃহৎ ভূখন্ডের শাসনকর্মে ত্রুটী ছিল না।

এই রকম একজন খ্যাতিমান বড়লাট ছিলেন লর্ড রিডিং। তিনি জাতিতে ইহুদি এবং আইনজীবি হিসাবে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২১-১৯২৫ খৃষ্টাব্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অশান্ত কাল। সেই সময় মনটেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পিত সংস্কার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, তাই তখনকার উদারনীতিক বৃটিশ সরকার একটা উদারনীতিক পরীক্ষা হিসাবে রিডিংকে নির্বাচিত করলেন। এই সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনটেগু নিজেও ছিলেন ইহুদী। লর্ড রিডিং-এর কার্যকাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রিডিং পত্নী লেডী রিডিং-এর কয়েকখানি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ভিত্তি করে মিসেস আইরিশ বাটলার লিখেছেন—'দি ভাইসরয়স ওয়াইফ'—এইসব চিঠিপত্রে বিশের দশকের রাজা মহারাজা, নবাবজাদা, শিকার, গার্ডেন পার্টি, বিলম্বিত লয়ের রেল ভ্রমণের কাহিনী ইত্যাদির কিছু সংবাদ পাওয়া যাবে আর সেই সঙ্গে মিলবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ছিটে-ফোঁটা।

এই গ্রন্থের লেখিকা মিসেস বাটলার জন্মেছিলেন সিমলা শৈলে। তাঁর বাল্য-জীবন কেটেছে লাহোর আর রাজস্থানে, এর পর তিনি দিল্লী শহরে ছিলেন অনেক-দিন। একজন ইন্ডিয়ান আর্মি বিভাগের অফিসারের সঙ্গে মিসেস বাটলারের বিবাহ হয়। তিনি উর্দু শিখেছিলেন এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। এই গ্রন্থটিতে মিসেস বাটলার যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী স্বচ্ছ এবং সংবেদনশীল।

লর্ড রিডিং এবং তাঁর স্ত্রী শাসক জাতি সুলভ উন্নাসিকতা থেকে কিছুটা মুক্ত ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তপায়ী মানসিকতার উর্ধ্বে থাকায় তাঁদের পক্ষে এদেশে কাজ করার সুবিধা হয়েছিল। লেডী রিডিং ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না যখন এদেশে এসেছিলেন এবং এই দেশে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেও ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষ পরিচয় লাভ করেন নি। এমন কি এদেশে বসবাসের শেষ সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয় নি। তবে এই পাঁচ বছরে এদেশে অনেক নতুন বন্ধু-বান্ধবী লাভ করেন এবং ভারতীয়দের প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন।

রাজনীতির বিশেষ কিছু জানতেন বলে মনে হয় না, অন্ততঃ সেদিকে তাঁর আগ্রহ ছিল না, তা থাকলে ১৯২১-২৫-এর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু সংবাদ তাঁর চিঠিপত্রে পাওয়া যেত। তবে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে কিছু কিছু মজার মন্তব্য আছে। সি আর দাশকে তিনি 'কর্ডিয়ালি ডিসলাইক' করতেন। কেন যে এই ঝাল কে জানে, কিন্তু রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নাকি—

> "—is very interesting, but it is difficult to make him talk".

বল্লভভাই প্যাটেল সম্পর্কে তিনি বেশ প্রসন্ন; তার কারণ বোধহয় প্যাটেল এসেম্বলীর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন যে, লাটসাহেব যদি তাঁকে দিনের ভিতর দশবার ডাকেন তাহলে তিনি সে ডাকে সাড়া দিতে অবহেলা করবেন না—এবং

> "He renounced his extreme views in his opening speech and was kind enough to say that if the Viceroy sent for him ten times a day he would obey the summons when we met in Bombay he refused to join in our address of welcome to His Excellency though he was careful to say, it was not because of the man, only the politics".

মহাত্মা গান্ধী এলেন ভাইসরয় লর্ড রিডিং-এর সঙ্গে দেখা করতে সিমলা শৈলে। তখন সেখানে বেশ শীত, আর গান্ধীজীর শরীরটা সেই সময় তেমন ভালো

ছিল না, লেডী রিডিং-এর চোখে-গান্ধীজী—

"elderly, frail, slim man climbing stairs with difficulty, dressed all in home spun, with bare legs, an intelligent face, the eyes of a seer".

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে গান্ধীজী সম্পর্কিত এই বিবরণটুকু নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। লাটভবনে ছাগদুগ্ধ ছিল না; গান্ধীজীকে তাই আপ্যায়নে ত্রুটী থেকে যায়। গান্ধীজী শুধু গরম জল পান করেছিলেন এবং তার মধ্যে 'চার্মিং কার্টেসি' ছিল। এই অসীম সৌজন্যে লাট গিন্নী প্রসন্ন হয়েছিলেন। গান্ধীজী পরে যখন অনশন করলেন তখন সেই সংবাদে লেডী রিডিং লিখেছিলেন—

"I do feel sorry for Gandhi, I do believe he is sincere".

এইসব চিঠিপত্রে জওহরলাল নেহরুর উল্লেখ নেই, কারণ জওহরলাল তখনও নেতৃত্বের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন নি। মহম্মদ আলি জিন্নার কথা অল্পই আছে। তবে তাঁর স্ত্রীর উল্লেখ আছে অনেক বার। জিন্না এসেছিলেন সস্ত্রীক লাঞ্চ খেতে: লেডী রিডিং এই ঘটনাটির চমৎকার বর্ণনা করেছেন—

"He (Jinnah) came to lunch with his wife very pretty, a complete 'minx'. She is a Parsee and he a Mahammedan. (Their marriage convulsed both the communities."

এর পর শ্রীমতী জিন্নার পোষাক সম্পর্কে লিখছেন—

"She had less on the day time than any one, I have ever seen. A tight dress of brocade cut to waist back and front, no sleeves, and over it and her head fowered chiffon as a sari".

লেডী রিডিং লিখেছেন যে, তাঁদের একজন এডিকং বললেন, তাঁদের হোটেলটি রাতের বেলায় বেশ শান্তিময়, এর জবাবে শ্রীমতী জিন্না বললেন—

"I do'nt like nice, quiet nights, I like a lot going on'.

শ্রীমতী জিন্না সম্পর্কে লেডী রিডিং শেষ কথা বলেছেন—

"All the men raved about her, the woman sniffed".

অর্থাৎ সব সুন্দরীদের অদৃষ্টে যেমনটি ঘটে থাকে।

প্রথম ভারতীয় নারী ব্যারিস্টার মাদাম কর্নেলিয়া সোরাবজি সম্পর্কেও লেডী রিডিং অনেক চমৎকার মন্তব্য করেছেন—

"She had been a true friend and adviser to me in many ways—".

এবং ভারতবর্ষে দেখা মহিলাদের মধ্যে চতুরতম।

স্যার এডওয়ার্ড লুটেনাস বিখ্যাত স্থপতি। নিউ দিল্লীর সরকারী বাড়ি-ঘর, লাটপ্রাসাদ, এসেম্বলীভবন, সেক্রেটারিয়েট সবই তাঁর পরিকল্পিত। একবার লেডী রিডিং-এর অসুখের সময় স্যার এডওয়ার্ড চমৎকার গল্প বলেছিলেন। তিনি বললেন, যখন নতুন দিল্লীর পরিকল্পনা হল তখন ভারতীয় ও য়ুরোপীয়দের নিয়ে একটা কমিটি করা হল। কি নামকরণ করা হবে নতুন শহরের সেই হল সমস্যা। তখন জুন মাস, ছায়ার আড়ালে তাপমাত্রা ১১৭ ডিগ্রি। কিছুতেই আর কেউ ঠিক করতে পারছেন না কি নাম দেওয়া যায়; এমন সময় স্যার এডুইনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"Why not Uzepore? (ooz-a-pore)"

এই উক্তির পর মিটিং শেষ হল গন্ডগোলের ভেতর; সবাই বলতে লাগল প্রতিভাশালী মানুষদের নিয়ে এই বিপদ কোথায় কি বলতে হয় তার ঠিক থাকে না।

বর্তমান দিল্লীতে যে সুরাস্রোত বয়ে যায় তা দেখলে মনে হয় স্যার এডওয়ার্ড সেদিন ঠিকই বলেছিলেন।

লেডী রিডিং-এর চমৎকার মন্তব্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কে। এক স্টেট বানকুয়েটে মহারাজা পাতিয়ালা এত জোরে হেঁচেছিলেন যে, তার কলার থেকে প্রকান্ড একটা মুক্তা খসে পড়ল। মহারাজের ভোজনস্পৃহা এবং জাঁকজমকপূর্ণ আকৃতি বড়লাট প্রাসাদের কর্মচারীদের অভিভূত করে ফেলত। তিনি মাথায় ছ ফুট লম্বা ছিলেন, ওজন কুড়ি স্টোন, আর তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ অনবদ্য। দেশী ও বিদেশীর সংমিশ্রণে তৈরী পোষাক দেখবার মত ছিল। মহারাজা সিন্ধিয়া চমৎকার মানুষ। হাসিখুশী, বুদ্ধিমান এবং উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন। জামসাহেব ছিলেন অতিশয় সৌজন্যশীল আপ্যায়নকারী। বরোদার গাইকোয়াড ভারী ফুর্তিবাজ, তাঁকে আপ্যায়নে প্রীত করা সহজ ছিল। মহারাজা বিকানীরের আকৃতি ছিল অসামান্য, তাঁর সৌন্দর্যের মত আশও ছিল অসীম। মহারাজ আলওয়ার ছিলেন বয়সে তরুণ, সংস্কৃতিবান এবং আকৃতি জাঁক-জমকপূর্ণ। পাছে গরুর চামড়া স্পর্শ করতে হয় এই আশংকায় তিনি সর্বদা হাতে দস্তানা পরে থাকতেন। আর ভূপালের বেগম সাহেবা ছিলেন অতুলনীয়া। তাঁর ঘোমটার ভেতর এক জোড়া উজ্জ্বল বাদামী চোখ প্রকাশিত হত। সে চোখ বুদ্ধিদীপ্ত এবং চতুরতায় পূর্ণ।

রামপুরের বেগম সাহেবা ভারী মজার মানুষ। তিনি নর্তকী ছিলেন—

"She had been a dancer. She is quite fascinating but she chews betel nut all day. She wore a gergeous dress, enormous pearl tassels in her hair, diamonds through her nose. She had to lift the nose ring everytime she drank".

মহারাণা উদয়পুর দেখতে ছিলেন 'পার্সীয়ান ড্রয়িং'-এর মতো। তিনি একটিও ইংরাজী কথা বলতেন না, আর এমনই গোঁড়া ছিলেন যে, লাট বাহাদুরদের সঙ্গে কিছুতেই একত্রে ভোজন করতেন না।

নিজাম ক্ষুদ্র আকৃতির 'আগলি লিটল-ম্যান'। দেখতে কুৎসিত এই মানুষটির মেজাজ ছিল ভারী কড়া। তাঁর এক অনুচর এক মিনিট দেরী করেছিল আসতে, লেডী সাহেব শুনেছিলেন এর জন্য লোকটার লাখ টাকার মত জরিমানা হবে।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের নানারকম খেয়াল ও বদ-খেয়াল ভারী চমৎকার ফুটেছে লেডী রিডিং-এর চিঠিপত্রে। বড়লাটের এক ভোজসভায় এক বহু বিবাহিত মহারাজা গান করেছিলেন—

"I am tickled to death I am single, I am ticked to death I am free".

এবং তিনজন গোঁড়া হিন্দু মহারাজা 'The roast beet of old England' নামক বস্তুটির গরিমা কীর্তনে আত্মহারা হয়েছিলেন।

'দি ভাইসরয়স ওয়াইফ' পড়তে পড়তে মনে হবে হায় রে সেকাল হায় রে—

—অভয়ঙ্কর

THE VICEROY'S WIFE: BY IRIS BUTLER Published by Hodder & Stonghton, London Price 45 Shillings.

সাহিত্যের খবর

হিন্দি কবির সম্মান।। তরুণ হিন্দি কবি ও গল্পকার শ্রীকান্ত ভার্মা ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য আমেরিকার আইয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি লাভ করেছেন। এই বৃত্তিটি প্রধানতঃ কবিতা রচনায় কৃতিত্বের জন্য ইউরোপ এশিয়ার কোন কবিকে দেওয়া হয়। তাঁর এই সম্মানে ভারতীয় সাহিত্য রসিকমাত্রেই আনন্দিত হবেন। এই বৃত্তির নিয়ম অনুসারে তিনি আমেরিকায় এক বৎসর অবস্থান করবেন এবং বিভিন্ন সময়ে কবিতা পাঠ ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করবেন। শ্রীভার্মা হিন্দি 'সাপ্তাহিক দিনমান' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে' কবিতা পাঠের জন্য তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। এই সময় বাঙালী তরুণ লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ঝারি' (গল্প), 'দুসরি বার' (উপন্যাস) এবং 'মায়া দর্পণ' (কবিতা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী।। গত ২৬ মে থেকে ১ জুন ফরাসীদেশের নিসে একটি আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত প্রায় লক্ষাধিক গ্রন্থ এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী ছাড়াও এই উপলক্ষে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক

কয়েকটি আলোচনা-সভারও আয়োজন হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন আন্দ্রে চ্যাম্সন, মিগয়েল আস্তুরিয়ান প্রমুখ একালের প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখকবৃন্দ।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।। প্রতিবারের মত এবারেও আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যগাথা 'মেঘদূত' স্মরণে কয়েকটি সাহিত্যসভার আয়োজন হয়। এর মধ্যে বঙ্গীয় কবি-সম্মেলন ও কলিকাতা সাহিত্যিকদের যৌথ উদ্যোগে এবং সাহিত্যতীর্থের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানদুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি কলকাতার শ্রীবিদ্যানিকেতনের প্রাথমিক বিদ্যাভবনে শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমনোমোহন ঘোষ মেঘদূতের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ থেকে কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনান। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন পুষ্পরানী দাস, সরোজপ্রভা কর, শুভ্রা ঘোষ, বেলা দেবী, শক্তিপ্রসাদ শর্মা, সুশীলচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও আরো কয়েকজন। সাহিত্যতীর্থের অনুষ্ঠানেও বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি-লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাথলিক গ্র্যান্ড পুরস্কার।। ফরাসী ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্য রচনার জন্য প্রতিবারই বিশিষ্ট লেখকদের এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এবার এই পুরস্কার পেয়েছেন রেভারেন্ড লোই এবং জাঁ রিভারে। লোই পেশায় একজন আইনজীবী। রিভারে মূলতঃ সাংবাদিক। তিনি 'সাধারণ জীবন' নামক গ্রন্থটির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

বিশিষ্ট উর্দু কবির পরলোকগমন।। বিশিষ্ট উর্দু কবি শাকিল বদায়ুনি সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি প্রধানতঃ গজল রচয়িতা হিসেবেই উর্দু সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উর্দু ভাষায় তাঁর অনেককটি কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত উর্দু কবি জিগরে মোরাদাবাদীর তিনি ছিলেন ভাবশিষ্য। তাঁর মৃত্যুতে উর্দু সাহিত্য যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তাতে সন্দেহ নেই।

একটি কবিতা প্রতিযোগিতা।। 'নূপুর' পত্রিকার উদ্যোগে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এতে যে কেউ যোগদান করতে পারেন। যে-কোন বিষয়ে কুড়ি লাইনের মধ্যে কবিতাটি রচনা করতে হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ অগাস্ট। বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা : হেনা বাসর, শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার।। এ-বছর বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন শ্রীননীমাধব চৌধুরী ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। পুরস্কৃত বইদুটির নাম যথাক্রমে 'ভারতবর্ষের আদিবাসীর পরিচয়' ও 'মানব-কল্যাণে রসায়ন'। প্রথম গ্রন্থটিতে নৃতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখক ভারতের বিভিন্ন জাতি ও মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শ্রীবিশ্বাস এর আগেও বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক বই লিখে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর 'বিজ্ঞান ভারতী' গ্রন্থটি এর আগেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিং দাস পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার তেমন প্রচলন নেই। যাঁদের এ-বিষয়ে দক্ষতা আছে, তাঁরা বাংলায় লিখতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অথচ এছাড়া ভাষার উন্নতি কখনও সম্ভব নয়। তাই যাঁরা এই দুরূহ সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, তাঁদের কাছে জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করবে বলেই আশা করি।

হেমিংওয়ে প্রসঙ্গে।। হেমিংওয়েকে নিয়ে ইংরেজি ভাষায় অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও তাঁকে নিয়ে এই বই লেখায় তেমন ভাটা আসেনি। তাছাড়া তাঁর উপর লেখা বইগুলির বিক্রীও নিতান্ত কম নয়। কার্লস বেকার লিখিত 'আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : এ লাইফ স্টোরি' গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশই এর প্রমাণ। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। বইটিতে হেমিংওয়ের জীবন-কাহিনী এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যাঁরা কেবল সাহিত্য-পাঠক, তাঁরাও এর রস আস্বাদন করতে পারবেন। গবেষকরাও পাবেন নানা তথ্য।

ফরাসী ভাষায় বুলগেরিয়ান কবিতা।। ফরাসী ভাষায় বুলগেরিয়ান কবিতার একটি প্রামাণ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন নেভেনা স্টেসনোস্কা। বুলগেরিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে বাইরের পৃথিবীর ধারণা তেমন স্বচ্ছ নয়। অথচ এই ভাষায় অনেক উল্লেখ্য গীতি-কবি কাব্য রচনা করে গেছেন। আলোচ্য সংকলনে অবশ্য দু'-একজন প্রাচীন কবি অন্তর্ভুক্ত হলেও অধিকাংশই আধুনিক যুগের। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন এফরেইম করণফিলও। তিনি বুলগেরিয়ান কবিতার বিভিন্ন গতি-প্রকৃতিগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে, বুলগেরিয়ার কবিতা সম্বন্ধে প্রথমেই পাঠক-মনে একটা ধারণা জন্মায়। এছাড়াও কবিদের ব্যক্তিগত পরিচয়ও বইটির শেষে সংকলিত হয়েছে।

একটি ওড়িয়া গ্রন্থ।। ওড়িশার বিখ্যাত লেখক শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসের 'আমেরিকার, ইউরোপ আফ্রিকা' নামক গ্রন্থটি সম্প্রতি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বইটি আসলে একটি ভ্রমণকাহিনী। আমেরিকা ইউরোপ এবং আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনা নিছক চোখে দেখার বর্ণনা নয়, তিনি যেন সমস্ত কিছুর ভেতরে প্রবেশ করে তার দার্শনিক দিকটিও ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আমেরিকা ভ্রমণের, দ্বিতীয় ভাগে ইউরোপ ভ্রমণের এবং তৃতীয় ভাগে আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকা ভ্রমণের বর্ণনার অংশটিই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বইটি স্বীকৃতি লাভ করবে বলে আশা করি।

অস্ট্রেলিয়ার কবিতা: পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়া নামে একটি কবিতার মাসিক পত্রিকা অস্ট্রেলিয়ার সিডনী থেকে নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। এই পত্রিকাটি এরই মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক কবিতার উপরও তাঁরা বেশ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন 'ক্যাপ্টেন কুক বাই-সেন্টিনারি' বিশেষ সংখ্যা। অস্ট্রেলিয়ার কবিতা সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কাছে সংখ্যাটি খুবই মূল্যবান মনে হবে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয় কবিতার একটি সুনির্বাচিত সংকলন এর প্রধান আকর্ষণ। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শ্রীমতী গ্রেস নেরী।

নতুন বই

জলতরঙ্গ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বিচিত্র প্রকাশনী, ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। দাম সাত টাকা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাংলা কথা-সাহিত্যে একজন তরুণ প্রতিষ্ঠিত লেখক। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোট-গল্প পড়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত অন্য কয়েকটি উপন্যাসের সঙ্গে 'জলতরঙ্গ' উপন্যাসটিও প্রমাণ করে, তিনি সমকালীন বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করে সার্থক উপন্যাস রচনাতে রীতিমত পারদর্শী।

বাংলাদেশের এক মফস্বল শহর বাবলাতলী। এই শহর, তার আশপাশের গ্রাম, রাস্তাঘাট এই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ পটভূমি। বিগত কিছুকাল বাংলা সাহিত্যে গ্রাম-বাংলা কমবেশী উপেক্ষিত হয়েই ছিল। সম্প্রতি এই দিকে অনেক তরুণ লেখকের দৃষ্টি নতুন করে পড়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও যে সে বিষয়ে সচেতন, আলোচ্য উপন্যাস তা প্রমাণ করে। বরং বলা যায়, গ্রামের পটভূমিই যেন তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র।

উপন্যাসটিতে বহু বিচিত্র জটিল চরিত্রের ভিড়। কলকাতা থেকে আসা এক আধুনিক, যন্ত্রণাকাতর, অস্থিরচিত্ত, জীবনের আত্মিক সমস্যার বিক্ষুব্ধ যুবক উৎপল সেন এ উপন্যাসের নায়ক। তার শিক্ষিকা দিদি দীপ্তি, দীপ্তির বান্ধবী জয়াদি, জয়াদির প্রেমিক এক রহস্যময় চরিত্র সুশীল চৌধুরী, বন্ধু শিবনাথ ও আরতি, রাজনৈতিক কর্মী অমিয় দাস, বাবলাতলার নতুন ব্যবসাদার শতদল মৈত্র, উৎপলের নতুন প্রেমের আশ্রয় তপতী, তপতীর দাদা বাবলাতলার শিকারী অমরদা, উৎপল, মেনকা, সীমা, ফেলু, কানুবাবু—এই সমস্ত ছোট বড় চরিত্র, চরিত্র-নিহিত স্কেচসুলভ কাহিনী রচনায় উপন্যাসের ভার ও ব্যাপ্তি রচিত হয়েছে। সমগ্র কাহিনীটি এদের মধ্যেই উজ্জ্বল ও জীবন্ত।

সাম্প্রতিক উপন্যাসে জীবননিষ্ঠ সমকালীন বাস্তবতাকে আনতে গেলে যে রাজনীতি বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়, আলোচ্য লেখক সে সম্পর্কে সচেতন। বাবলাতলার পটভূমিকায় বদুবাবু ও শিবনাথের দলের সংঘর্ষের চিত্র এঁকে, নায়ক উৎপলের আত্ম-অন্বেষণের সঙ্গে তাকে জড়িত করে লেখক আধুনিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের শেষদিকে উৎপল-তপতীর প্রথম ভাল-লাগা ও ভালবাসার মুহূর্তগুলি, জয়ার জটিল মানসিকতা, প্রেমিকের জন্য দীপ্তির গোপন-প্রতীক্ষা, ফেলুর অ্যাকসিডেণ্টে মৃত্যুর খবরে সুশীল চৌধুরীর অকপট আত্ম-উদ্ঘাটনের চিত্র লেখকের সূক্ষ্ম শিল্পরচনার সার্থকতম নিদর্শন।

বস্তুত 'জলতরঙ্গ' উপন্যাসটি লেখকের গ্রামবাংলার সমকালীন বাস্তব-অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও তার যথাযথ শিল্পরূপ রচনার অন্যতম উদাহরণ।

রঙমহল —(উপন্যাস) পরেশ ভট্টাচার্য। ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি, দাম—পাঁচ টাকা।

বিশাল তাঁবুর ভিতরে আলোর বন্যার মাঝখানে সার্কাসের খেলোয়াড়রা নানারকম খেলা দেখায়। আর দর্শকরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই খেলা উপভোগ করে, ক্লাউনের অঙ্গভঙ্গীতে উচ্ছ্বকিত হাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু তাঁবুর অন্তরালের যে কাহিনী অজস্র মানুষের হাসি-কান্না ব্যথা বেদনায় সিক্ত সে দিকটা ঢাকা থাকে। তাই সেদিক আমাদের চোখে পড়ে না। পরেশবাবু তাঁর 'রঙমহল' উপন্যাসে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অন্ধকারে মাথা কুটে মরা মানুষগুলোর সামনে। তারা হাজার বাতির সামনে নেচে-কুঁদে, দু'দিন বাদে আবার অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায়।

কাহিনীর নায়ক রামস্বামী কৃষ্ণান, আর তার মেয়ে কমলা কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণানের অতীত স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে এসেছে গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের নানা চরিত্রের নানা নরনারী। এদের মধ্যে সার্কাসের ক্লাউন গোপাল রাও, ম্যানেজার, শয়তান যোসেফ প্রভৃতি চরিত্রগুলি সফলতা লাভ করেছে। এ সত্ত্বেও বলতে হয় কাহিনীটি আরো সংহত করা যেতো। কিছু কিছু ঘটনা অবান্তর ভাবে কাহিনীর মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু ছোটখাটো কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও উপন্যাসটি সুখপাঠ্য।

দোপাটির ইচ্ছে—(কবিতা) সাধনা মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি—১২, দাম—তিন টাকা।

সময়ের বুক চিরে মানুষ এগিয়ে চলে। কিন্তু সৌন্দর্য লুপ্ত হয়, লাবণ্য ঝরে পড়ে। চিরকাল কিছুই থাকে না। তবুও ঝরে যাওয়া সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে কবি-অন্তর হাহাকারে ভরে ওঠে সাধনা মুখোপাধ্যায়ের 'দোপাটির ইচ্ছে' পড়তে পড়তে কথাগুলো মনে এলো। একটা রোমান্টিক বিষণ্ণতা কবিতাগুলির অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত। একটি স্নিগ্ধ কবিপ্রাণ আমাদের বুকের মধ্যে নানা প্রশ্ন তোলে। এই অপূর্ণ জীবনে পূর্ণতা খুঁজতে হলে যেতে হবে কল্পনার জগতে। কবি স্বপ্ন-কল্পনাভরা জগতের বাসিন্দা। প্রতিটি কবিতায় সেই কবিপ্রাণের স্পর্শ আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। তাঁর ভাষায় সজীবতা আছে, রূপকল্পে আছে বলিষ্ঠতা। তিনি অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবেন, এ পরিচয় এই প্রথম কবিতার বইয়েই যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কখনো মুহূর্তের আলো—(কবিতা) শিশির ভট্টাচার্য। বাক সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলি—৯, দাম—তিন টাকা।

আজকে আমাদের জীবন বড় যন্ত্রণা-দগ্ধ। চারিদিকে দুঃখ বেদনার আবর্ত। তবুও মানুষ এগিয়ে চলেছে। কারণ মাঝে মাঝে হতাশ জীবনের অন্ধকারেও মুহূর্তের আলো আমাদের উদ্দীপ্ত করে তোলে। আমাদের পথ দেখায়—কোন 'আলোকিত চোখের উদ্ভাস/জীর্ণমন আলোড়িত করে।' কবি শিশির ভট্টাচার্য 'কখনো মুহূর্তের আলো' কাব্যগ্রন্থে এমনি আলোর কথা শুনিয়েছেন। যে আলোর উদ্ভাসে 'উৎকণ্ঠ মৃত্যুকে বাজি রেখে' জীবন সমুদ্রসন্ধানী। তাই আকাঙ্ক্ষার সোনালীদিনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে কবি গেয়ে ওঠেন, 'প্রতিশ্রুতির/সবুজ ধানেরা/আরো কতদূর সোনালী দিন।' এই আশাবাদে কবিতাগুলি উজ্জ্বল, শব্দচয়নে কবির সংবেদনাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর শব্দচিত্রগুলি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর। কল্পনা ও ভাষার উপর তাঁর এই দখলে রীতিমত আশ্বান্বিত হতে হয়। আরো ভালো কবিতা লিখে অচিরেই তিনি নিশ্চয় আমাদের উৎসাহিত করবেন।

সুন্দর নেহারি (ভ্রমণ) : সুবোধকুমার চক্রবর্তী, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ-১২। দাম ৭-৫০ টাকা।

'রম্যাণী বীক্ষ্য'র লেখক হিসেবে শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ 'রম্যাণী বীক্ষ্য'র বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'সুন্দর নেহারি'। ভারতবর্ষ সৌন্দর্যের দেশ। তার যুগ যুগ সাধনা—সৌন্দর্যের সাধনা। যুগে যুগে সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ ছুটে যায় দেশ-দেশান্তরে পাহাড়ে পর্বতে গিরিগুহায় অপরূপকে দু' চোখ মেলে দেখবার জন্যে। সুবোধবাবুর 'সুন্দর নেহারি' সেই সৌন্দর্যের অন্বেষণ, যে সৌন্দর্য ছড়ানো আছে কন্যাকুমারিকায়, উড়িষ্যা মহাবলীপুরমের মন্দিরগাত্রে আগ্রায়, সোমনাথে, আবু পাহাড়ে। লেখক ঐ সমস্ত স্থানের যে রূপ দেখেছেন, তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পথের কথা বলতেও বিস্মৃত হননি। যার ফলে ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে বইটি একটি 'গাইড বুক'-এর কাজ করবে। পথের সুবিধা অসুবিধার নানা হদিস তাঁরা বইটি থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। বইটির প্রথমে আর্ট পেপারে মুদ্রিত বিভিন্ন স্থানের দর্শনীয় বিষয়ের কয়েকটি সুন্দর ছবি সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটি ভ্রমণপিপাসুদের তৃপ্তিদানে সক্ষম হবে সন্দেহ নেই।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অনাদিম [চৈত্র ১৩৭৬]—সম্পাদক : আশিস সান্যাল, শিশির ভট্টাচার্য, অমল ভৌমিক ।। বিধানপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা ৩২ ।। দাম : এক টাকা।।

এ সংখ্যায় প্রবন্ধ বা আলোচনা ছাপা হয়নি একটিও। সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে কবিতার নির্বাচনে। পূর্ব বাংলার কবি সাগর দুহিতের একটা কবিতা (নিহত গান আর অসমাপ্ত উপন্যাস) ছাপা হয়েছে শুরুতে) শেষেরদিকে ছাপা হয়েছে 'অন্য প্রদেশে'র ও 'বিদেশী' কবিতার অনুবাদ। লেখকদের মধ্যে আছেন সুচেতা মিত্র, পলাশ মিত্র, রত্নেশ্বর হাজরা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দমনি, নিলম সিং, বিরাগো দিওপ, মাইকেল চেরুও, অমল ভৌমিক, আশিস সান্যাল, শিশির ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন। আধুনিক কবিতা পাঠকের পক্ষে পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

প্রতিবিম্ব — (প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংকলন) — সম্পাদক : গিরিধারী কুণ্ডু। ৫৯, বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা-১৪। দাম—তিরিশ পয়সা।

মিনি পত্রিকা 'প্রতিবিম্বে'র এই সংখ্যাটি নজরুলকে নিবেদিত। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র

মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, কৃষ্ণ ধর, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অখিল নিয়োগী, সন্তোষকুমার অধিকারী প্রভৃতি লেখক-লেখিকার মিনি রচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদে এবং ভিতরে নজরুলের কয়েকটি চিত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। 'প্রতিবিম্ব' সম্পাদনায় সম্পাদক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

দর্শক — (১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) — সম্পাদক : দেবকুমার বসু ও রবি মিত্র। ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

'দর্শক' বিগত দশ বৎসর ধরে একটা বিশিষ্ট ধারায় সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, নাট্যকলা প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক বিষয়াদি এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয়বস্তু। দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনায় যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে, তা রুচিবান পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। এই সংখ্যাটিতে কলকাতার আশেপাশে বঙ্গ-সংস্কৃতির নিদর্শন ও বিশেষ করে পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। পত্রিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কালি ও কলম (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭)—সম্পাদক বিমল মিত্র। প্রকাশ ভবন। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন চুনীলাল রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তব্রত পালিত, যজ্ঞেশ্বর রায়, যূথিকা বসু, সুন্দরলাল ত্রিপাঠী, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক সেনগুপ্ত, ছবি মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন বিমল মিত্র এবং জরাসন্ধ।

কাটুম কুটুম (বৈশাখ ১৩৭৭)—সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ সরকার। ২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।। দাম: তিরিশ পয়সা।।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত এই মিনি পত্রিকাটির যারা পাঠক-পাঠিকা, তাদের বয়স খুবই অল্প। সম্ভবত মিনির জগতে এই পত্রিকাটি একটি বিরল ব্যতিক্রম। এ সংখ্যার প্রথম ছড়াটি লিখেছেন সত্যজিৎ রায়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চার যুগের গল্প), জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিমা দেবী (শান্তিনিকেতনের স্মৃতি), জ্যোতিভূষণ চাকি, যীশু চৌধুরী, দিলীপ মালাকার সন্দীপ রায়, জয়শ্রী চক্রবর্তী, সুব্রত সরকার, শৈলশেখর মিত্র ও লীলা মজুমদার। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা অসাধারণ।

[illegible] — (ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র) — ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা : সম্পাদক : দেবী মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১০৯।৩৪, সাবর্ণপাড়া রোড, কলিকাতা-৮। দাম — পনের পয়সা মাত্র।

এই সংখ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কবিতা সিংহ, শান্তনু দাস, শিপ্রা ঘোষ, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গৌতম, সুনীল বসু প্রভৃতির মৌলিক কবিতা ও রিলকে, কোয়াসিমদো, জর্জ সিফেরিস, এডুইন মুর প্রভৃতির কবিতার বঙ্গানুবাদ আছে। ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে আয়তন অতিশয় ক্ষীণ এবং সম্পাদকীয়তে 'প্রসঙ্গত' শিরোনামে যেটুকু লিখিত হয়েছে তার বক্তব্য ঠিক বোধগম্য নয়।

ধাত্রী (বৈশাখ ১৩৭৭)—সম্পাদক গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম।। ৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২।। দাম: সত্তর পয়সা।।

মুদ্রণে, রচনা-নির্বাচনে পত্রিকাটি কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। এ সংখ্যায় প্রথম ছত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের অংশ ছাপা হয়েছে। লেখক স্বয়ং সম্পাদক। অন্য লেখকদের মধ্যে আছেন, শেখ আবুল কালাম, ক কু দে, শ্যামসুন্দর বসু ও হিমালয়নির্ঝর সিংহ।

সারস্বত (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬)—সম্পাদক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য।। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬।। দাম ১·২৫ টাকা।।

এ সংখ্যার দুটি মূল্যবান আলোচনা লিখেছেন ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন (ইতিহাস চর্চায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী) ও হারাণচন্দ্র নিয়োগী (বৌদ্ধধর্ম : মার্কসীয় বিচার)। 'দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি কবিতা' অনুবাদ করেছেন ডঃ অশোকদেব চৌধুরী। গল্প ও কবিতা লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শিশির সামন্ত, মনোতোষ সরকার ও তপোবিজয় ঘোষ। পুস্তক সমালোচনা বিভাগে 'কয়েকটি সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ' বিষয়ে আলোচনা করেছেন দীপেন্দু চক্রবর্তী। পত্রিকাটির রচনামান ও সম্পাদকীয় দৃষ্টি উন্নতধরণের। প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে দেকুয়াসের আঁকা একটি ছবি 'ঘোড়সওয়ার'। সাহিত্যপাঠকের কাছে পত্রিকাটি সমাদৃত হবে।

মানব মন [নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ, বিধান সরণী, কলকাতা—৪ ।। দাম : ১·২৫ টাকা ।।।

'মানব মন' মূলত মনোবিজ্ঞানের পত্রিকা। এ সংখ্যাটি বেরিয়েছে 'লেনিন জন্ম শত-বার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে। প্রায় প্রতিটি লেখাই সুনির্বাচিত। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হলো 'লেনিন প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত' পর্যায়ে আনাতোল লুনাচার্স্কি, এরভান্দ জাকারিয়ান্তস, জর্জি লোমিদ্‌দে, আর্দাতোভস্কি, মির্জা তুরসনজাদা, ও জি কালচিন-এর স্মৃতিচারণামূলক রচনাগুলি। জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আধুনিক বাংলা কাব্যে লেনিন' শীর্ষক একটি আলোচনা।

ক্ষপণক [বৈশাখ ১৩৭৭]—সম্পাদক : রণেন্দ্র চক্রবর্তী ।। ৩২।১৪, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা—৩৫ ।। এক টাকা ।।

এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মৈত্রেয়ী দেবী ও চিত্ত ঘোড়। 'লেনিন' শীর্ষক একটি নাটিকা লিখেছেন দীপক সরকার। পত্রিকাটিতে কবিতার প্রাধান্য সর্বাধিক। গল্প লিখেছেন বিশ্বজিৎ চৌধুরী ও জীবন সরকার। 'পুস্তক সমালোচনা' বিভাগে ছাপা হয়েছে তিনটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা।

কুখ্যাত রবীন্দ্রভক্ত !

"নবযুগের বাংলা সাহিত্য হইতে যিনি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভা বাদ দেন, আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি—তাঁহার জন্য দাশু রায়ের পাঁচালী ব্যবস্থা"—বলেছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সেকালের বিখ্যাত লেখক, সমালোচক, বাগ্মী এবং সম্পাদক। সমালোচক হিসেবে ছিলেন অতি নির্মম, কঠোর। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এই মানুষটি ছিলেন সেকালের রবীন্দ্রভক্তদের কাছে বিভীষিকার মত। একালেও তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের ওপর সমাজপতির অনুরাগ অন্য কারো চেয়ে কম ছিল না। নবীন রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গান, প্রবন্ধ, কবিতার ভাষায় দৈন্য ও কষ্ট কল্পনায় ব্যথিত হয়েছেন তিনি। কিন্তু বহুবার বহু রচনার তিনি প্রশংসাও করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন, 'দেশভক্ত-সাধক', 'মানবতার পুরোহিত'—বলেছেন 'সোনার লেখনী অক্ষয় হউক'—'অত্যন্ত সহজভাবে, নূতন ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর মর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন।' তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সমালোচনায় যে আন্তরিকতা ছিল—তা অধিকাংশ রবীন্দ্রভক্তের ছিল কিনা সন্দেহ। সাহিত্য পত্রিকায় এমন অজস্র প্রমাণ আছে, যা নিঃসংশয়ে সুরেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রভক্ত প্রমাণিত করে।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ পর্যায়ে সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' থেকে রবীন্দ্র তথ্য সংকলন করেছেন নন্দরাণী চৌধুরী। আট টাকা দামের এই বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং গ্রন্থের মূল অংশ পড়বার পর একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে, রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরা অন্ধ স্তাবকের মত এতকাল অসত্যই প্রচার করেছেন। সুরেশচন্দ্রের রবীন্দ্রবিরোধী মন্তব্য বিদ্রূপ এবং গালি-গালাজের মূল্য যে কতখানি, তা পেছন ফিরে তাকালে বোঝা যাবে সহজেই। এ'দের উপদেশ ও সাবধান বাণীই কবিকে সতর্ক-ভাবে পথ চলার শিক্ষা দিয়েছিল। নিজের যাত্রাপথে কবি স্বভাবত অনেক ভুল করেছেন, সংশোধন করেছেন এবং পরিমার্জ্জন করেছেন। সুরেশচন্দ্র সেকালে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতিকূলতা করে কবিকে আত্মোন্নতির পথে চালিত করেছেন। তিনি এবং তাঁর মতো সমালোচকরাই রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিমতম ভাষ্যকার—সনাতনপন্থী সমালোচকদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে, রবীন্দ্র সৃষ্টির বিচারে নতুন কোনো পথের নির্দেশ দেন।

সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য' পত্রিকা ১২৯৭ বৈশাখ থেকে ১৩২১ চৈত্র পর্যন্ত এবং ১৩২৩ বৈশাখ থেকে ১৩২৭ কার্তিক পর্যন্ত ত্রিশ বছর বেরিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মাসিক হিসাবে পত্রিকাটি ছিল বিপুলভাবে সমাদৃত। নবীন ও প্রবীণ লেখকেরা প্রায় সকলেই লিখতেন। লিখতেন না কেবল রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুরাগী ভক্তরা। সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য' প্রকাশের দেড় বছর বাদে বেরোল রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'। রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাপতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র। সেকালের যে-কোন পত্রিকার গৌরব ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা। অথচ সে যুগের বিখ্যাত সম্পাদকের পত্রিকায় যুগন্ধর কবির রচনা ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। সে অভাব সমাজপতি পূরণ করেছিলেন অন্যভাবে। রবীন্দ্রনাথের নিন্দা বা প্রশংসা যে কোন প্রসঙ্গে তাঁর রচনার উদ্ধৃতি থাকত 'সাহিত্যে'। ফলে সাহিত্য-পাঠকরা রবীন্দ্র রচনায় বঞ্চিত হতেন না। অবশ্য শেষদিকে সমাজপতির রবীন্দ্র বিরোধিতার ধার কমে গিয়েছিল অনেক।

এ দুটি মানুষের মিলন সম্ভব ছিল না। দুজনে ছিলেন দু মেরুর লোক। সুরেশচন্দ্র রক্ষণশীল শুচিবায়ুগ্রস্থ সনাতনপন্থী হিন্দু। আর রবীন্দ্রনাথ সংস্কারমুক্ত নব-জাগ্রত চিন্তাধারার প্রতীক; নিজের স্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তিত্বে, বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ পুরুষ। সাহিত্যরুচিতেও ছিল দুস্তর পার্থক্য। সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যবোধের গোঁড়ামি এবং নিজের সাহিত্য বিশ্বাসে অন্ধ মমত্ববোধ ছিল তাঁর যুক্তিবাদী সমালোচক হওয়ার প্রধান বাধা। মাঝে মাঝে কঠোর সমালোচনায় সত্যের বিদ্যুৎ-চমক ঘটত বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত বিস্তৃত প্রতিভার অধিকারী মানুষকে তাঁর মত সংকীর্ণপ্রাণ সমালোচকের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য সমাজপতির রবীন্দ্র বিরোধিতার অন্তরালে ব্যক্তিগত ক্ষোভ, কিছু মতবিরোধ এবং অসহিষ্ণুতাও ছিল যথেষ্ট। এই মনোভাবকেই রবীন্দ্র বিরোধীরা কাজে লাগাত এবং সমাজপতি ক্রমে তাঁদের পৃষ্ঠ-পোষক হয়ে ওঠেন। তাঁর হিন্দুয়ানী মন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বিদ্বেষ প্রচারে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

সমালোচনার ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রের আদর্শ ছিলেন বঙ্কিম। কিন্তু বঙ্কিমের মত উদার ও প্রশস্ত মনের অধিকারী তিনি ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনায় ব্যক্তিগত কুৎসা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রচার পছন্দ করতেন না। সুরেশচন্দ্র মনে প্রাণে এই জিনিসটাই যেন মেনে নিয়েছিলেন। সম্ভবত ব্যক্তিগত ভাল লাগা মন্দ লাগাকে তিনি সমালোচনার মানদণ্ড মনে করতেন। সাধু সমালোচকের নিঃস্পৃহতা এবং পরমতসহিষ্ণুতা সমাজ-পতির একেবারেই ছিল না। তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সাহিত্য-বিশ্বাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রবণতা, অসহিষ্ণু আপসবিমুখ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্নভাবে। সেকালের প্রায় সব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিবাদ করেছেন। উগ্র খামখেয়ালী কলহপ্রিয় মনের জন্য অকারণে তিক্ততা সৃষ্টি করছেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, বাঙলা সাহিত্যের ওপর সুরেশচন্দ্রের মমত্ববোধ ছিল গভীর। সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর বিশেষ রীতির মাসিক সাহিত্য সমালোচনা বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বঙ্কিম কটাক্ষ, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বাক্যবাণে জ্বালাধরা হৃদয়ের অসঙ্কোচ অবারিত আত্মপ্রকাশ তাঁর সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধারালো ও রসালো মন্তব্যে প্রতিষ্ঠানবানদের চোখে আঙুল দিয়ে ভুল দেখিয়ে দেওয়ার দুঃসাহস ছিল সমাজপতির। বাঙলা সাহিত্যে তখন যে-সব অবাঞ্ছিত আগাছার জন্ম হয়েছিল, নির্মমভাবে তার উৎখাতে সুরেশচন্দ্রই ছিলেন একমাত্র অগ্রণী পুরুষ। তাঁর সমালোচনায় কেবল নবীন নয়, প্রবীণরা পর্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যে লেখা ছাপা হওয়া ছিল সেকালে পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সম্পাদকের পছন্দ-অপছন্দ ও মেজাজের ভয়ে পত্রিকা অফিসে কেউ লেখা দিতে যেত না।

খ্যাতি অখ্যাতি দিয়ে গড়া মানুষ ছিলেন সুরেশচন্দ্র। তাঁর এমন প্রতিভা ছিল না যে সত্যিকারের একটা নতুন পথের নির্দেশ দেবেন। অবশ্য তখন বাঙলা সমালোচনার স্তর ছিল অপরিণত। বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনা বাদ দিলে বলা যায়, হয় কুৎসা, না হলে প্রশস্তি—এটাই ছিল অভ্যস্ত রীতি। পাঠকের অসংস্কৃত রুচিবোধে এই ধরনের সমালোচনা ছিল পরম উপাদেয়। যুক্তিহীন পিঠ চাপড়ানো অথবা চাবুক আস্ফালন ছাড়া সমালোচকের অন্য কাজ ছিল না। সুরেশচন্দ্র এই প্রচলিত রীতিরই সাধক। এই পটভূমিতেই জন্ম নেয় মননশীল বিচার বিশ্লেষণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ রসবিচারের ধারা। তার প্রথম প্রকাশ পায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং অজিত চক্রবর্তী ও বীরবলের রচনায়। —সাংবাদিক

বইকুণ্ঠের খাতা

বই নিয়ে লেখা হয় 'বইকুণ্ঠের খাতা'। স্বভাবতই গ্রন্থদর্শীর প্রধান উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে সদ্য-প্রকাশিত একেকটি বই। লেখা উপলক্ষ্য হলেও, কখনো কখনো, লেখকই তার প্রধান লক্ষ্য।

কয়েকদিন আগে জনৈক প্রকাশককে জিজ্ঞেস করেছিলাম : কোন্ লেখকের উপন্যাস ইদানীং বিক্রী হচ্ছে সবচেয়ে বেশী?

কোনো কিছু না ভেবে, নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন তিনি : 'শংকর'-এর। বই বেরুতে না বেরুতেই এডিশন হয়ে যায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে কারো বইয়ের এত তাড়াতাড়ি সংস্করণ হয় না। মনে হয়, জাদু জানেন ভদ্রলোক।

শংকর, মানে মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। পিতৃদত্ত মূলনাম ও পদবী বর্জন করে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন তিনি শংকর নামে।

এপার বাংলা ওপার বাংলা

শংকর

শংকরের সাহিত্যজীবন

তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'কত অজানারে'।

ঐ একটি বই লিখেই তখন বাজার মাৎ করেছিলেন তিনি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বিপুল স্বীকৃতি পেয়েছিলেন জনপ্রিয় সাহিত্যিক হিসেবে। রুপোলি পর্দায় দেখেছি উপন্যাসটির চিত্ররূপ।

পুরনো দিনের স্মৃতিচারণা-প্রসঙ্গে শংকর বলেন : ভয় ছিল আইনপাড়া নিয়ে। ভেবেছিলাম, উকিল - ব্যারিস্টার - জজ - অ্যাডভোকেটদের হয়তো 'কত অজানারে' তেমন ভালো লাগবে না। কেননা, যে-জীবন নিয়ে আমি লিখেছি, সবই তো ও'দের পরিচিত। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কিস্তি বেরুবার পর সে-ভুল ভাঙলো। সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকার মনে সাড়া জাগিয়েছিল উপন্যাসটি।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জনপ্রিয়তার মূল রহস্যটা কি?

সহজভাবে উত্তর দিলেন তিনি : সে-কথা আমি কি করে বলবো? সাহিত্যের প্রধান ধারার সঙ্গে আমার যোগ নেই। বলতে পারেন, তা থেকে আমি বিচ্যুত। কোনো আড্ডায় কিংবা সভা-সমিতিতে যাই না। কোথাও সভাপতিত্ব করিনি। তার ওপরে, লিখি ছদ্মনামে।

প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, আপনার প্রথম লেখা কোন্‌টি?

—হাত মক্‌সো করেছি, অন্য অনেকের মতো, স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিনে লিখে। তার বাইরে, আমার প্রথম লেখা, গল্প কিংবা উপন্যাস নয়, একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল দৈনিক বসুমতীতে। আর, আমার প্রথম রম্যরচনা 'কলকাতার খণ্ডসংস্কৃতি'। যুগান্তর সাময়িকীতে ছেপেছিলেন শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী।

শংকরের দ্বিতীয় বই 'যা বলো তাই বলো।'

জিজ্ঞেস করলাম, লেখেন কখন?

—কোনো নিয়ম নেই। সময় পেলেই লিখি। আইনকানুন মানি না। কখনো লিখি সকালে, কখনো সন্ধ্যায় কিংবা রাত্রিতে। আসলে, আমার কাছে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। সেজন্যে অভিযোগ করারও কিছু নেই। শনিবার অফিস ছুটি। সেদিন সকালবেলাটা, অন্য কোনো কাজ না থাকলে, লেখা নিয়ে কাটাই।

আপনার তৃতীয় বই কোন্‌টি?

—'পদ্মপাতায় জল'। বেরিয়েছিল চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বসুধারা'য়। চতুর্থ বই, 'এক দুই তিন', পঞ্চম বই 'যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ'।

জিজ্ঞেস করলাম : আপনার সবচাইতে প্রিয় বই কোন্‌টি?

এবার যেন দ্বিধায় পড়লেন শংকর। বললেন, 'সবচাইতে প্রিয়' বলা মুস্কিল। আমার একেকটা বই একেক রকম। তবে...

যেন যথেষ্ট সঙ্কোচ নিয়ে বললেন, তবে...'নিবেদিতা রিচার্স ল্যাবরেটরী' নাম করতে পারেন। ওতে আমি এমন কিছু

বলতে চেয়েছি, এবং দিয়েছি, যা পরবর্তীকালে অনেককে ভাবাবে। আমাদের বিজ্ঞান-চেতনা প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ, বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের জীবনের ওপর সবচেয়ে বেশী। একেকটা নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, তা পৃথিবীর যে-প্রান্তেই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তার ফলভোগ করছি আমরা প্রত্যেকেই। আমার ইচ্ছা ছিল, জীবনভিত্তিক এমন কিছু একটা দেবো। এ-উপন্যাসে যতটা পেরেছি, দিয়েছি। আর, তাতেই আনন্দ পেয়েছি। ঠিক এভাবে বাংলাসাহিত্যে আর কেউ চেষ্টা করেননি। আমার মনে হয়, এ-পথটাকে আরো বাড়ানো দরকার।

এপর্যন্ত কোন্ কোন্ ভাষায় আপনার লেখা অনূদিত হয়েছে?

—'চৌরঙ্গী'র অনুবাদ হয়েছে হিন্দী, রুশ, মালয়ালাম, গুজরাটী ও ওড়িয়া ভাষায়। 'কত অজানারে' হয়েছে হিন্দী, মালয়ালাম প্রভৃতিতে। সব অনুবাদের কথা জানি না। অনেকে অনুমতি না নিয়েই অনুবাদ করেন। শুনেছি, আমার 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসটি নাকি এখন সাউথ এশিয়ান ল্যাংগুয়েজ স্টাডিজ-এর পাঠ্যতালিকাভুক্ত।

আপনার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে কোথাও?

—সম্প্রতি হনোলুলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বুকস অ্যাব্রোড' পত্রিকায় আমার ওপরে একটা বিরাট প্রবন্ধ লিখেছেন ডক্টর রাচেল আলবামা। তাঁর মতে, 'চৌরঙ্গী' আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি লিখেছেন, উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে-কথকতার ধারাটি ছিল, বিশ শতকে, আমি সেই রীতিতে উপন্যাস লিখে সার্থক হয়েছি 'চৌরঙ্গী'-তে। আমার সম্পর্কে তাঁর মতামত সম্পূর্ণ নতুন। তিনি তাঁর প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন 'শংকর : দি টোয়েনটিথ সেঞ্চুরী বেঙ্গলী কথক'।

অবাঙালি পাঠকের মনে আপনার লেখার প্রতিক্রিয়া কি রকম?

—অপ্রত্যাশিত। প্রচুর চিঠি আসে। হিন্দীতেই বেশী। বোধহয় আমার লেখা তাঁদের মনে সাড়া জাগায়। কেউ কেউ বলেন, আমার 'চৌরঙ্গী' হলো দি মোস্ট ওয়াইডলি রেড বেঙ্গলী নভেল।

তাঁর অন্যান্য বই : 'পাত্রপাত্রী' 'মানচিত্র' 'রূপতাপস' 'সার্থক জনম' ও 'বোধোদয়'।

বললাম : আপনার অধিকাংশ কাহিনীই তো উত্তমপুরুষে বর্ণিত। সেই 'উত্তমপুরুষ'টির সঙ্গে আপনার ব্যক্তিজীবনের সংযোগ কতখানি?

—সব নয়, কয়েকটা বই লিখেছি আমি উত্তমপুরুষে। তবে সব লেখাতেই, আমি, আমিই আছি। কোথাও নাম পাল্টাইনি। কিংবা 'উত্তমপুরুষ'কে অন্য নামে চিহ্নিত করিনি।

প্রসঙ্গক্রমে বললেন : তরুণ লেখকদের সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ নেই।

তারপর নিজের ভুল শুধরে নিয়ে বললেন : না, আমারই-বা এমন কি আর বয়স হয়েছে? নিয়মিত লিখে আসছি ১৯৫৪ সাল থেকে। সে-বছরই আমার 'কত অজানারে' বেরোয়।

জিজ্ঞেস করলাম : এখন আপনার বয়স কত?

—জন্মেছি ১৯৩৩ সালের ৮ ডিসেম্বর।

বছরের কোন্ সময়টায় আপনি বেশী লেখেন?

—সব বছর তো একই নিয়ম মেনে লিখি না, বা লিখতে পারি না। বেরোয় বেশী পুজোর সময়, কোন না কোন পুজো-সংখ্যায়। পরে বই হিসেবে বেরোয়।

এপার বাংলা ওপার বাংলা

গত পয়লা বৈশাখে বেরিয়েছে তাঁর নতুন বই 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'। মাত্র একুশ দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছে তার দ্বিতীয় মুদ্রণ।

বইটি উৎসর্গ করেছেন তিনি : "ওপার বাংলার বুড়ীগঙ্গা নদীতীরে সেই অকুতোভয় যুবকবৃন্দকে—যাঁদের নিষ্ঠা ও ত্যাগে বঙ্গভাষা একটি স্বাধীন দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।"

মনে হয়, বিষয়টি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। দেশ নয়, ভাষাগত ঐক্য কিভাবে মানুষকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করে, তা তিনি জেনে এসেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশ ঘুরে ঘুরে। তিনি আমাকে বলেন : বিদেশে বাংলাভাষার এখন যে মর্যাদা বেড়েছে, তার কারণ বাংলা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি নয়, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বলে।

দুঃখ করে তিনি বলেন : এতে আমাদের কোনো দান নেই। পাকিস্তানীদের তাতে গৌরব আছে।

বিদেশে জনৈক পাকিস্তানী ভদ্রলোক তাঁকে বলেন : "বাংলাভাষা আপনাদের কাছে প্রাদেশিকতা, আমাদের কাছে জাতীয়তা।"

'লেখকের নিবেদন'-এ তিনি বলেছেন : "নানা কারণে এই বইটিকে আমার লেখক-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করি। পৃথিবী দেখার লোভে একদিন দেশ ছেড়েছিলাম, কিন্তু ভূ-প্রদক্ষিণ শেষ করে বুঝেছি, দূর থেকে স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই দেখা হলো না।"

প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছিলেন তিনি সানফ্রান্সিসকোতে গিয়ে : "কলম্বাস ভারত-সন্ধানে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। আমি আমেরিকা ভ্রমণে এসে ভারত আবিষ্কার করলাম।"

মনে পড়ে, লবটুলিয়ার 'আরণ্যক' পরিবেশের নির্জনতায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ব্যাকুল আর্তি : "দেশকে কী ভালো করিয়াই না চিনিলাম বিদেশে গিয়া।"

শংকরের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মানসিকতার অবশ্য কোনো মিল নেই। সামান্য সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়, এই স্বাদেশিকতার ভাবনায়। যদিও, দুজনেই বনগাঁ-র আদি বাসিন্দা।

শংকর লিখেছেন : "মহাযুদ্ধের আগে বনগ্রামের বন থেকে একদা রেলে চড়ে শিয়ালদহ এসেছিলাম এবং সেখান থেকে সেকেন্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সেই যে হাওড়ার নতুন বাসায় হাজির হয়েছিলাম, তারপর আর নড়াচড়া করিনি।"

২

জিজ্ঞেস করলাম : দেশভাগের যন্ত্রণা তো পাননি, পাকিস্তানে গিয়েছেন কখনো?

—না, যাইনি।

তাহলে, দুই বাংলার ভাবাবেগের সঙ্গে জড়িত হলেন কি করে?

তার উত্তর দিয়েছেন তিনি প্রথম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টির নাম অনুসারে তিনি সমস্ত বইটির নামকরণ করেছেন 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'। বিলেতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দুই বাঙালের কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন শংকর : "আমার মনে হলো আকাশবাণী শুনছি। ভক্তের বিপদে স্থির থাকতে না পেরে ভগবান স্বয়ং এই ম্লেচ্ছ দেশে আমার জন্যে বঙ্গবাসী পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিনি তাঁর সেই মুহূর্তের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন : "গল্প, উপন্যাস, কবিতা অনেক পড়েছি, গানও শুনেছি বহু, কিছু কিছু সাহিত্য-চর্চা নিজেও করেছি, কিন্তু মোদের গরব মোদের আশা এই বাংলাভাষায় যে কী জাদু আছে তা জীবনে এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম। সৌজন্যের ব্যাকরণে অমার্জনীয় ত্রুটি হলেও এই দুই অপরিচিত পথচারীর প্রায় নাকের ডগায় এসে দাঁড়ালুম। বিনা অনুমতিতে ওদের প্রাইভেসি ভঙ্গ করে বললাম, 'আমার অপরাধ মার্জনা করবেন, আপনারা বাংলায় কথা বলছেন শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না।'...ভদ্রলোক দুজন পরম আদরে আমাকে আশ্রয় দিলেন।"

ক্রমে বার্মিংহামেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মাছের ব্যাপারী আজিজ সাহেব, ইলোরা কফি-বারের মালিক চৌধুরীবাবু, দুইজন ওয়েটার—বরুণ সাহা আর জিয়ারুল হকের।

ঘটনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "মালিকের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শাদা শার্কস্কিনের স্যুট ও কালো বো-টাই-পরা দুই ওয়েটার যুবক একসঙ্গে এগিয়ে এলো আমার দিকে এবং কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কলকাতা থেকে আসছেন?'

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার নাম বরুণ সাহা। আমরাও যাদবপুরে বাসা নিসি।'

সঙ্গের সহকর্মীকে দেখিয়ে সাহা বললে, 'এর নাম জিয়াউল হক। এদের জন্যই তো আমাদের যতো দুর্গতি। ছিলাম বরিশালে; চালচুলো ছাইড়্যা আজ এ রিফ্যুজি কলকাতা আইলাম। তারপর ভাই-বোন-বাবা-মা সমেত ন'জন ফেমিলি মেম্বারকে 'সেভ' করার জন্য কালাপানি পার হইল্যাম।'

হক এতক্ষণ ফিকফিক করে হাসছিল। শুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণে সে বললে, 'আমাদের বাড়ি ছিল হাওড়ার বাঁকড়া গ্রামে। রিফ্যুজি হয়ে বাবা পাকিস্তানে এলেন। তারপর পেটের দায়ে দেশ থেকে পালিয়ে বার্মিংগাঁওয়ে এসে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ সাহাদার সঙ্গে একদিন রাস্তায় আলাপ হয়ে গেল। দাদা আমার চাকরি করে দিলেন; এখন দুজনে একখানা ঘর ভাড়া করে একসঙ্গে আছি।'

এই দৃশ্য দেখার যাঁর সৌভাগ্য হয়েছে, তিনি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব 'এপার বাংলা ওপার বাংলার' মতো বই। রাজনৈতিক কারণে যেখানে দেশের মাটি ভাগ হয়, সেখানে মানুষের মিল হয় বিদেশে মাটিতে। এটাই তো স্বাভাবিক। ভাষার সঙ্গে অন্তরের টানটাও যে কম নয়!

আমেরিকায় গিয়েও তিনি লাভ করেছেন একই অভিজ্ঞতা। পাকিস্তানের মহম্মদ আলী তাঁকে বলেছেন : "আমি দাদা কোনোদিন কলকাতায় যাইনি। তবে গল্প শুনেছি অনেক। আমার খুব ইচ্ছে ওখানে গিয়ে থিয়েটার দেখি আর সন্দেশ খাই।"

উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "পূর্ব-বাংলাও আমার চোখে দেখা নয়। তবে আমারও এতটা স্বপ্ন আছে। যদি কেউ আমাকে বলে বিলেত ভ্রমণ আর পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণের মধ্যে একটা বেছে নাও, তাহলে আমি পাকিস্তানে বেড়াতে যাবো। পদ্মার বুকে স্টিমারে চড়ার আশাটা আমার কাছে একটা স্বপ্নের মতো হয়ে রয়েছে।"

এমনিভাবে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা আকাদমির জিল্লা হায়দারের সঙ্গে। হাওয়াই দ্বীপে প্রবাসী পাকিস্তানী বেনেডিক্ট গোমেজ তাঁকে উপহার দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামের একটা ছবি-আঁকা মাদুর। এ-বইয়ের সূচনা অংশে তা প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে গভীর মমতার সঙ্গে।

৩

সাতটি অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'। যথাক্রমে—দ্বিতীয় অধ্যায় 'চ্যাপেল হিল', তৃতীয় অধ্যায় 'নিউ-ইয়র্কের পথে', চতুর্থ অধ্যায় 'নিউ ইয়র্কের দুধে', পঞ্চম অধ্যায় 'বাংলার রবি' ষষ্ঠ অধ্যায় 'অনেক দূরে', সপ্তম অধ্যায় 'জাপানে কয়েকদিন'।

ঘটনাবহুল এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় জড়িয়ে আছে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত। বিস্তৃত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। কেননা, সর্বত্রই কাজ করেছে একই মানসিকতা।

জিজ্ঞেস করলাম : বই আকারে বেরুবার আগে কোথায় কোথায় বেরিয়েছিল এর বিভিন্ন অধ্যায়গুলি?

শংকর বললেন : কিছুটা বেরিয়েছিল 'দেশ'-এ, খানিকটা 'উল্টোরথ'-এ, বাকিটা কোনো কাগজে বেরোয়নি। পাণ্ডুলিপি থেকে একেবারে বই হিসেবে ছাপা।

বইটি লেখা শুরু করেছেন কবে?

—বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর, বোধহয় ১৯৬৭-র শেষের দিকে।

একটু থেমে নিজেই বললেন, দুই বাংলার সম্পর্কে মানুষ যে কতখানি ভাবে, তা এর আগে আমার জানা ছিল না। এ বিষয়ে সাহিত্যিকদের কিছু ভাবা দরকার। তাঁদেরও কিছু করণীয় আছে।

বেনেডিক্ট গোমেজ তাঁকে বলেছিলেন : "বাংলার লেখকদের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দুই বাংলার অগণিত মানুষের মনে আজও আপনাদের অবাধ গতিবিধি। আপনারা মানুষের মনকে তৈরী করুন, তাদের আশা দিন, তাদের বলুন—জয় হবে, জয় হবে।"

শংকর বলেন : দেশভাগ না হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উন্নতি হতো না। ওরা শিক্ষিত, উন্নত এবং স্বাবলম্বী হয়েছে পাকিস্তান হওয়ার জন্যই। এখন অবিভক্ত বাংলার কথা ভাবাও যায় না। সে রকম চিন্তা করাও অন্যায়।

বললাম : বইটির ঘটনা এবং প্রেরণা বাইরে থেকে নিয়ে এলেও, আপনি কি দেশে ফিরে তার জন্যে আলাদা কিছু পরিশ্রম করেছেন?

—বাইরে গিয়েছিলাম পরীক্ষা দেবার জন্য। দেশে ফিরে প্রচুর পড়াশোনা, পরিশ্রম করেছি। অন্তত ছ' মাস লেগেছে নানা উপাদান সংগ্রহ করতে।

৪

হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গেছি। শংকর আমাকে বলেছিলেন, লিখবেন আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের কথা। বইটি ভালো করে পড়ে দেখবেন, আমি এ বইতে সেকথা বলতে চেয়েছি। আমাদের জীবন থেকে পুরনো মূল্যবোধগুলো ভেঙে যাচ্ছে, ছোট-বড়র সম্পর্ক অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, অথচ জীবনের প্রতি কোনো দৃষ্টি-ভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। বিদেশ-ভ্রমণে এটাও আমার একটা বড় উপলব্ধি।

আমি তাঁর লেখায় অনুভব করেছি সেই বাকলতার সাথে মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন উচ্ছ্বাস আর উৎকণ্ঠা। কয়েকটি অধ্যায়ে আছে তার ঘটনাশ্রয়ী বিবরণ। তবু সব-কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে, দুই বাংলার জন্য বেদনাবোধ।

জিজ্ঞেস করলাম : আপনার এ বইটিকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায়?

শংকর বললেন : স্ট্রিক্টলি স্পিকিং ভ্রমণকাহিনী। লাইব্রেরী ক্যাটালগিং-এও নিশ্চয়ই তাই লেখা হবে। আমার মতে, জীবন-কাহিনী।

তাঁর সঙ্গেই আমি একমত। হ্যাঁ, এটা জীবন-কাহিনী-ই। এছাড়া অন্য কোনো অভিধায় একে চিহ্নিত করা যায় না।

মনে পড়ে, জালাল আমেদের কথা। পাকিস্তানের এক তরুণ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

শংকর বললেন, তাঁরই চেষ্টায় জাপান রেডিও থেকে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন : "পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত ভাষাতেই জাপান রেডিও থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। কেবল হতো না বাংলা ভাষায়। জালাল আমেদের তা ভালো লাগেনি। তিনি গিয়ে ধরলেন রেডিও জাপানকে। কর্তৃপক্ষ বললেন, সরকারী সূত্রে অনুরোধ আসা দরকার। জালাল আমেদ ইন্ডিয়ার কয়েকজন বাঙালিকে অনুরোধ করেন, ইন্ডিয়ান এমব্যাসি থেকে একটা চিঠি লেখানোর জন্য। কিন্তু ওদের কাছ থেকে সাড়া পাননি তিনি। ভারতীয় দূতাবাসের মতে, বাংলা ভাষার জন্য অনুরোধ করাটা হবে প্রাদেশিকতা—প্রভিনশিয়ালিজম।"

তারপর?

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ আলী চিঠি লিখে দিলেন জাপান রেডিওকে, ফোনে কথা বললেন বাংলা প্রোগ্রাম করলে জাপান ও পূর্ব-পাকিস্তানের মঙ্গল হবে, দুই দেশের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হবে। তারপর থেকেই জাপান রেডিও থেকে শুরু হয় বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার।

শংকর বিস্মিত হয়েছিলেন জালাল আমেদের কথা শুনে। আমাদেরও বিস্ময়ের অন্ত নেই। স্থানগত ঐক্য না থাক, ভাষাগত ঐক্যে দুই বাংলার মানুষ যে একই সমতলের বাসিন্দা!

—গ্রন্থদর্শী।

কবিতার অনুবাদ

আশিষ সান্যাল

যদি সমস্ত পৃথিবী হত একই সংসার আর সকলেই একই ভাষায় কথা বলত, তাহলে অনুবাদের এই সমস্যাটি নিয়ে বিব্রত হতে হত না কাউকে। কিন্তু যেহেতু রূপে, বর্ণে ও ভাষায় এই পৃথিবী বহু বিচিত্র এবং সমস্ত রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের স্বাদ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে চিরন্তন, তাই অনিবার্যভাবেই এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রতিবেশী মানুষ সম্পর্কে জানবার এবং তার শিল্প-সাহিত্য আস্বাদনের পথে প্রধান অন্তরায় হল ভাষা। ভাষার অজ্ঞতাই ভিনদেশী সাহিত্যের রস আস্বাদের প্রধান প্রতিবন্ধক। সব দেশের ভাষা শিখে, সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদনের চিন্তা অমূলক এবং অবৈজ্ঞানিক। এই কারণেই আজকের পৃথিবীতে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ভীষণ-ভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই প্রয়োজনীয়তা যে কেবল শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেই, তা নয়, উচ্চতর গণিতবিদ্যা এবং ইলেকট্রিক্ এঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।

অনুবাদের এই সাধারণ প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিয়েও কবিতার অনুবাদ নিয়ে বিদগ্ধ সমাজে বিতর্ক সুদীর্ঘদিনের। কারণ প্রতিদিনের ভাষা আর কবিতার ভাষায় ব্যবধান বিরাট। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়ঃ 'গদ্য চলে যুক্তির সংগে পা মিলিয়ে, আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে, গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি, আর কাব্য খোঁজে আমাদের নিষ্ঠা; রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে ছবি আঁকে, গোটা কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে।' কবিতার এই আন্তর-সম্পদের গুণেই তার ভাষান্তর নিয়ে এত বাদানুবাদ।

॥ এক ॥

ইতালীয় ভাষায় একটা কথা প্রচলিত আছে যে অনুবাদকমাত্রেই নাকি বিশ্বাস-ঘাতক। সব অনুবাদকই বিশ্বাসঘাতক কিনা জানি না, তবে কবিতার অনুবাদক এক অর্থে তো বটেই। ষোড়শ শতকের ফরাসী কবি দ্যু-ব্যেলে কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, একথা সর্বজনবিদিত। সৈয়দ আলাওল 'পদ্মাবৎ'-এর অনুবাদের অবতারণায় যে বলেছিলেন ঃ 'স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজ মন উক্তি।'—বোধ করি তাতেও এই অনুভবের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। ডঃ জনসন তো কবিতার অনু-বাদের বিপক্ষে স্পষ্টতই বললেন ঃ

> "It is the poet that preserve language".

একালের মার্কিন কবি শিরোমণি স্বর্গত রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন, কবিতা অনূদিত হলে, তার রসচ্যুতি ঘটে। ফরাসীদেশে রমাঁ রোলাঁকে একবার কথোপকথনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ কীটসের কবিতা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তার মধ্যেও কবিতার অনুবাদের মৌল সমস্যা সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন ধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেছিলেন ঃ

> "Although Keats cannot be translated into our language, but we can presume the beauty of his language".

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে একটা অনীহা অনেকেই প্রকাশ করেছেন। একথা অবশ্যই মানতে হবে, কবিতা অনূদিত হলে মূলের রস ও সৌন্দর্য অনেকটাই বিনষ্ট হয়। তবু কবিতার অনু-বাদ হচ্ছে এবং হবার প্রয়োজনীয়তাও আছে। অন্য দেশের কবিতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ সাহিত্যরসিক মাত্রেই অনুভব করে থাকেন। সে কথা আগে বলা হয়েছে, সব ভাষা শিখে তারপর কবিতার রস আস্বাদনের প্রচেষ্টা অনেকটা মরুভূমির মধ্যে মহাসাগর অনু-সন্ধানের মত। এক্ষেত্রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া পথ নেই। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের' উদ্যোগে যে আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তাতেও কবিতার অনুবাদের বিষয়টি গুরুত্ব অর্জন করে। অনুবাদ মূল কবিতার অনেকাংশে ব্যাহত করে, এই উপলব্ধি থেকেই প্রখ্যাত সমা-লোচক জর্জ স্টেইনার কবিতার অনুবাদ সংকলন সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'আধুনিক কবিতার অনুবাদ সংকলনে প্রতিটি অনূদিত কবিতারই মূল মুখোমুখি পৃষ্ঠায় অবশ্যই থাকা উচিত।' (১) ইদানিং ইউরোপ এবং আমেরিকায় অনুরূপ আদর্শে কয়েকটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর কোন বিশেষ যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। কারণ, অনূদিত কবিতা প্রধানত তিনিই পাঠ করবেন, যিনি মূল ভাষায় কবিতাটি পাঠ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনূদিত কবিতাগুলি থাকাই বিধেয় বলে মনে হয়।

কবিতার অনুবাদ আলোচনায় আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা বোধ করি অত্যন্ত জরুরী। অনূদিত কবিতা মূলের প্রতিরূপ হবে, না অনুরূপ হবে? অধ্যাপক নীরেন্দ্র-নাথ রায় এক সময়ে শেলির একটি কবিতা অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথকে পরিমার্জনের জন্য পাঠালে তিনি দেখে দেবার সময় বলেছিলেন—'মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা অনুরূপ হয়েছে। মূল কবিতার সংগে যাদের পরিচয় নেই, এটা যে তারা জলের মতো বুঝবে এমন আশা নেই, কিন্তু সেজন্যে আমি বা বাংলাভাষাই যে একমাত্র দায়ী তা মানতে পারিনে। বস্তুত প্রথম শ্লোকের শেষ দুটো লাইন ঠিক যেন জায়গা পায়নি—যেন আরেকজনের কেদারার হাতার উপরে বসেচে।' (২) রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, তিনি কবিতার অনুবাদ বলতে কেবল ভাষান্তর বোঝেননি, বুঝেছিলেন আন্তরভাষ্য। আর এই কারণেই সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ব্রাউনিংএর অনুবাদ পড়ে তাকে 'দুঃসাহসিক নাবিকবৃত্তির' সংগে তুলনা দিয়েছিলেন। এই আন্তরভাষ্য রচনা করতে অনুবাদক খুব একটা কিন্তু সৃজন-ধর্মিতার পরিচয় দিতে পারেন না। এক্ষেত্রে মূলানুগত্যের সংগে মৌলিকত্বের সমন্বয় সাধনই কবিতার অনুবাদকের প্রধান কর্তব্য।

॥ দুই ॥

কবিতার অনুবাদে এরপর যে প্রতি-বন্ধকগুলির সম্মুখীন হতে হয়, তা মূলত প্রকরণকেন্দ্রিক। প্রকরণের মধ্যেও প্রধান বাধা বোধকরি 'শব্দে'র ভাষান্তর। কেননা, কবিতায় শব্দ শুধুমাত্র তার বাচ্যার্থকে

---

(১) On Modern Verse Translation : George Steiner; Encounter; August, 1966.

(+) চিঠির অংশ ঃ পরিচয়—কার্তিক, ১৩৩৮।

প্রকাশ করে না। 'শব্দমাত্রেরই দুটো দিক আছে : একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে' কাব্যের শব্দ আবেগবাহী।' (৩) শব্দের এই রসপ্রতিপত্তির দিকটি ভাষান্তরে ফুটিয়ে তোলা অসাধ্য ব্যাপার। কেননা, শব্দের এই রসপ্রতিপত্তির সঙ্গে কবি-মানস ছাড়াও জড়িয়ে আছে দেশীয় ঐতিহ্য, যুগ-চেতনা এবং বৃহত্তর জনসমাজের আধ্যাত্মিক চেতনা। 'পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' বলতে বাঙালী পাঠকের মনে যে দোলা জাগে তা বিজাতীয় সংস্কৃতিতে প্রতিপালিত মানুষের পক্ষে অনুধাবন অসম্ভব। অথবা 'কিসের তরে নদীর চরে চখাচখির মেলা' শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে আমাদের মনে, তা অন্যত্র অসম্ভব। 'নদীর চর' এই কথাটির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের যে সম্পর্ক, তা আর কোথায় পাওয়া যাবে? নদী হয়ত সর্বত্রই আছে কিন্তু নদীর চর আর চখাচখির মেলা? এ ক্ষেত্রে শব্দটিকে ভাষান্তরে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে? 'ব্যাংক অব্ দি রিভার' বা 'আইল্যান্ডস অব্ দি রিভার'—যাই ভাষান্তরে লেখা হোক না কেন, তাতে রসপ্রতিপত্তির বিরাট ব্যাঘাত ঘটবে। এম পি ভাস্করণ এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরেছেন। (৪) মালয়ালম কবি কুমারণ আশানের 'সীতা' অনুবাদ করতে বসে তিনি দেখলেন, মূলে ব্যবহৃত অনেক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। মূল গ্রন্থে সীতার বর্ণনায় কবি অনেক কটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন সীতা, দেবী, অলসঙ্গী, মহামনস্বিনী, ললিতাংগী, সুন্দরী, অবনেশ্বরী ইত্যাদি। এর মধ্যে সুন্দরী এবং 'অবনেশ্বরী' শব্দ দুটির ইংরেজি হয়ত পাওয়া যায়। 'ললিতাংগীর ইংরেজি গদ্যে ভাষান্তর হয়ত হতে পারে। কিন্তু অন্যগুলির কি হবে? (৫)

দেশ কাল ভেদে শব্দের একটা 'গ্রিড' গড়ে ওঠে। সম্প্রতি মস্কোতে এক আলোচনা সভায় কবি ভাসিলি ফায়োদরভ এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখ্য মন্তব্য করেছেন : 'প্রতিটি শব্দই জনগণের আধ্যাত্মিক শক্তির ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে, যেমন একটি গাছ বা কয়লা সৌরশক্তিকে করে প্রতিফলিত। কবির দায়িত্ব সেই আধ্যাত্মিক শক্তির নিষ্কাষণ।' তাই দেখা যাচ্ছে, শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কোন দেশের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস। প্রচলিত শব্দ তৈরী করে একটা 'গ্রিড'। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ জে সি ক্যাটফোর্ডের রচনাতেও এর প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি আছে :

"The language we speak forces us to select and group elements of our experience of the world in ways it dictates. It provides a kind of grid, or series of grids, through which we see the world".

শব্দের এই ঐতিহ্য এবং ব্যঞ্জনাধর্মিতার জন্যেই কবিতার যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয়। অথবা অনুবাদে কবিতা তার মূল সৌন্দর্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে। লিওনাদ ফ্রস্টার এই কারণেই মনে হয় অনূদিত কবিতাকে একটি গ্লাসের পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই পাত্রটি স্বচ্ছ হতে পারে, ভগ্ন হতে পারে বা রঙিন হতে পারে। সেই পাত্রের ভেতর দিয়ে যেমন অন্য জিনিসকে পাত্র অনুযায়ী স্বচ্ছ, বিকৃত বা রঙিন দেখা যায়, তেমনি কবিতার অনুবাদ-কও যেন একটি পাত্র। অনূদিত কবিতা পাঠ করার সময় পাঠক যেন কবিতার স্বাদ এভাবেই গ্রহণ করে।

ছন্দের গুরুত্বও কবিতার অনুবাদে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইদানিং অনেকে কবিতা অনুবাদের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি অনুধাবন করে কবিতার গদ্যানুবাদ করে থাকেন। এটা কাব্য অনুবাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। মূল কবিতার ছন্দকে অপরিবর্তিত রেখে যে কবিতার অনুবাদ করা যায় তা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বোদলেয়রের অনুবাদগুলি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে। কিন্তু তবু মূলের সৌন্দর্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। আর এখানেই কবিতা অনুবাদের সমস্যাগুলি নিহিত।

।। তিন ।।

উপরের আলোচনায় যে বিষয়গুলি স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হল : —(ক) কবিতার যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয়; (খ) তবু কবিতা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সমকালে এই প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে

(৩) কাব্যের মুক্তি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

(4) An Experience of Poetry Translation — From Malayalam into English : M. P. Bhaskaran; Poetry India (April-June, 1966).

(5) No two words in two different langulages ever have identically the same meaning. There is no absolute standard of conformance, it is alaways a question of degree" —Mrs. Lila Roy (Problems of Translation; Published by All India Poet's conference).

ইদানিং কবিতার অনুবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই যে 'যথার্থ অনুবাদ হয় না' অথচ 'প্রতিনিয়ত অনুবাদ হচ্ছে' —এই দুই বিরোধী ভাবধারার সমন্বয়সাধন সম্ভব কি ভাবে? সম্ভব একমাত্র পরিমিতি বোধের অনুশাসনে।

এ-ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্নটি বিবেচ্য, তা হল, যেহেতু মূল কবিতার শব্দ, ছন্দ বা অনুসংগকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়, সুতরাং কবিতার অনুবাদক কতদূর স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন, তার বিচার। এ প্রশ্নটি নিয়েও সহৃদয় সমাজে বিতর্ক আছে। তবে একথা সকলেই স্বীকার করবেন, কবিতার অনুবাদক যতই দক্ষ হোন না কেন, তিনি মূল কবির সমান্তরাল স্রষ্টা কখনই নন। তিনি কখনই মূল কবিতার বিষয় এবং চিত্রকল্প থেকে সরে যেতে পারেন না। অনূদিত কবিতা পাঠের সময় পাঠক যেন কখনই না ভুলতে পারেন, তিনি অন্যভাষার কবিতা পড়ছেন। তার স্বাদ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। অনুবাদক কখনই মূল কবির প্রতিযোগী স্রষ্টা নন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি মূল কবিতার শব্দ ও পংক্তি ধরে শর্তুরিয়া নির্দেশিত রীতির অনুসারক হবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এভাবে কবিতার অনুবাদ সম্ভব নয়। মূলানুগত অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু সেই মূলানুগত্যের স্বরূপটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায় বলা যায় ঃ

> "The faithfullness is to the sense and spirit of the original only..... The sentences of the orginal must be transferred in their full sence to as approximatly parallell expressions as possible. (৬)

এ দিক থেকে অনুবাদ সমালোচনারই আর একটি ধারা বা উপায়।

এল ডবু ট্যানকক কবিতার অনুবাদের এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, যখন মূল কবিতার অর্থ, প্রকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ হয়ে যাবে তখন কবিতাটির পরিমণ্ডল নিয়ে ভাবা দরকার। আর সেই মুহূর্তে সবটাই ব্যক্তিগত হয়ে যায়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদক কবির ব্যক্তি-মানস এতে সঞ্চারিত হয়। তাই দেখা গেছে, মূল কবির সঙ্গে অনুবাদক-কবির মিল যেখানে সমধিক, সেখানেই অনূদিত কবিতা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কবিতার উল্লেখ্য অনুবাদককে একই সঙ্গে ভাষাজ্ঞান এবং কবি-প্রতিভার অধিকারী হতে হবে। এ দুটোর কোন একটিতেই ঘাটতি পড়লে অনুবাদ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তাতে না থাকে রূপ, না থাকে রস।

(চার)

কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গের আলোচনায় আরো দুটি দিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বিশেষ করে ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে এই প্রসঙ্গ দুটির অবতারণা অত্যন্ত জরুরী। প্রসঙ্গ দুটি হলঃ (১) ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় কবিতার অনুবাদ এবং (২) অপ্রত্যক্ষ অনুবাদ।

ভারতীয় কবিতার প্রতি ইদানিং কিছু কিছু বিদেশী কবি-অনুবাদক আগ্রহী হলেও অধিকাংশ কবিতার অনুবাদক ভারতীয়রা নিজেই। বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও এ নিদর্শন নেই। বলাবাহুল্য, ভারতীয়দের দ্বারা কৃত অধিকাংশ ভারতীয় কবিতারই অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজিতে। প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব অনূদিত কবিতা ইংরেজ সাহিত্যরসিকদের কতদূর সাড়া জাগাতে সমর্থ হচ্ছে? একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, বিজাতীয় ভাষায় সাহিত্য সাধনা সফল হওয়া খুবই কঠিন। টি এস এলিয়ট এক সময়ে ফরাসী ভাষায় কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু অচিরাৎ নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করে নেন। মাইকেলের কথা তো বাঙালী পাঠকের কাছে খুবই পরিচিত। যেহেতু কবিতার অনুবাদে অনুবাদকের কবিত্বপ্রতিভা একান্তই প্রয়োজনীয়, তাই ভারতীয়দের দ্বারা ইংরেজিতে অনূদিত কবিতা সর্বদাই সফল হবে, এ প্রত্যাশা অযৌক্তিক। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই, একথা স্বীকার করা যায় না।

ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় কবিতা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কারণ স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ একটি বহুভাষিক দেশ। বিচিত্র এর সংস্কৃতি। অথচ পরস্পরের ভাষা না জানায় পরস্পরের কবিতা এবং সাহিত্য থেকে যায় আমাদের কাছে অপরিচিত। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় কাব্য ও সাহিত্যের যতখানি পরিচয় আমরা পাই, তার এক শতাংশেরও পরিচয় পাই না আমাদের ভারতীয় কবিতার। ভারতবর্ষের প্রতিটি ভাষা শিখে সেই ভাষার কবিতার স্বাদ আস্বাদন করবো, এ ধারণা অবিবেচনাপ্রসূত। ভারতীয় সংহতি এবং ভারতীয় বোধের জাগরণে প্রতি ভাষার কবিতার অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অসাধারণ। আর ইংরেজীভাষী ও অন্যান্য বিদেশী পাঠকদের কাছে ভারতীয় সাহিত্যে কবির স্থান ও অবদান কতদূর, সেটুকু বোঝানোই এই অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মালয়ালম কবি কুমারণ আশানের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে এম পি ভাস্করণের মন্তব্যটি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ—

> "I tried to remember that I might have two kinds of audience (i) an Indian from the same unified cultural area as of the people of Kerala and with this common inherited culture surrounding the use of Malayalam and the other Indian languages, and (ii) an English--speaking audience culturally remote from India. From readers outside India, I should ask for nothing more than an understanding of Asan's contribution to Indian poetry and thought"

ভারতীয়দের দ্বারা কৃত ইংরেজি অনুবাদের সাফল্য এখানেই এবং একে যাঁরা লঘু করে দেখাতে চান, তাঁরা ভারতীয় সমাজ ও জীবন থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন। আর একটা কথা। এইসব অনুবাদই হয়ত এভাবে একদিন কোন দক্ষ বিদেশী কবি-অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে।

অ-প্রত্যক্ষ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাও ইদানিং পৃথিবীর সর্বত্র ভীষণভাবে উপলব্ধ হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে, ভারতবর্ষে, আফ্রিকার বহুদেশে এই পদ্ধতি এখন চলছে। সোজাসুজি বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে, অনুবাদের অনুবাদ। একে কবিতাটি অনূদিত হওয়ার পরেই মূলের সৌন্দর্য অনেকটা বিবর্ণ হয়ে যায় তারপর সেই বিবর্ণ চেহারা থেকেই আবার তার অনুবাদ [illegible]লে মূল কবিতার স্বাদ কতদূর থা[illegible] তা বিবেচ্য। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এরও প্রয়োজনীয়তা অসীম। যত বিবর্ণই হোক, তবু পরস্পরকে জানার এই তো একমাত্র পথ। ভবিষ্যতে হয়তো কবি-সাহিত্যিকরা মূল ভাষা থেকে অনুবাদেই এগিয়ে আসবেন। কিন্তু যতদিন না আসেন, ততদিন এ পথেই হোক ভাবাদর্শের আদান-প্রদান।

।। পাঁচ ।।

কবিতার অনুবাদ বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ভাষারই একটি প্রধান শিল্পকর্ম। আধুনিককালের কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই কবিতার অনুবাদে যত দুরূহ সমস্যাই থাক না কেন, প্রতিনিয়ত বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হচ্ছে অনুবাদের ফসলে। ভিনদেশী ফুল আহরণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিরা নিজ ভাষার কাব্য মালঞ্চকে আরো বর্ণময়, আরো রূপময় আরো ধ্বনিময় করে তুলছেন। আর অর্জন করছেন আপন চিত্তের প্রসারতা।

---

6 Responsibilities of A Translator : Premendra Mitra (Bengali Literature, Vol 2 No 1).

দিনগুলি রাতগুলি

কল্যাণ সেন

পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকালো সুব্রত। ঘুম ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, তবু চোখ বুজে শুয়ে ছিল সে। নানারকম শব্দ তার কানে আসছিল, ঘর থেকে, বারান্দা থেকে, কী রকম মৃদু, যেন স্বপ্নের মধ্যে বৃষ্টির শব্দের মত, তবু প্রতিটি শব্দ সে আলাদা করে অনুভব করতে পারছিল। মশারির ভেতর এখনো ফিকে অন্ধকার; বাইরে টুকটাক শব্দ ; হঠাৎ তার মনে হলো যেন খুব সকালে যখন ভাল করে সূর্য ওঠেনি, হাত-পা একটু সিরসির করে, আর দু' একটি পুরনো গাছের ভেতর অন্ধকার শেষ আশ্রয় নেয়, তখন একটা ছোট স্টেশানে যেন ট্রেন থেমে গেছে। দু একটি কণ্ঠস্বর জল পড়ে যাওয়ার এক ধরনের অনুচ্চ শব্দ, স্টেশানের কথাবার্তা, জানলার ফ্রেমে চাই... ই... গর... ম চা—সব মিলিয়ে চলে যাওয়ার এক অদ্ভুত বেদনা আর একটি গতানুগতিক সকাল: এখন সুব্রতর অনেকটা সেই রকম কিছু মনে হলো। যেন দীর্ঘ রাত সে থ্রি-টায়ার স্লীপার-এ কোথায় চলেছে, তার চারপাশে অপরিচিত মানুষ, ট্রেনের শব্দ আর কোলাহল, তার চোখের ওপর যেন রাতের আলো একটা অতিকায় পোকার মত ঘুরছিল, সেই রকম, ঠিক সেই রকম, তার মনে হলো এখন। সত্যি বোধহয় সকালের কোনো স্টেশানে তার ট্রেন থেমেছে। এইবার হয়তো তাকে নেমে যেতে হবে। তারপর সকালের কুয়াশায় ঘাস যখন ভিজে আছে, তাকে... আর একবার তাকালো সুব্রত। না ট্রেন নয়, বিছনায় মশারির ভেতর সে শুয়ে আছে। আর যারা খুব বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে, তাদের কাছে সূর্যোদয় হচ্ছে, পৃথিবীর আর একটি দিন শুরু হলো, সেইসব মানুষের কাছে। চাপা নিঃশ্বাস পড়লো তার, পিঠের নিচে তোষকের চাপ, মশারি সামান্য দুলছে, যদি আবার সে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো, আর ঘুমিয়ে পড়লেই সেই মাঠ, যার শেষে কোনো পুরনো গীর্জায় প্রার্থনার ঘণ্টা বাজছে...এক...দুই...তিন: সে হেঁটে যাচ্ছে...ক্রমশ হেঁটে যাচ্ছে আর কে তাকে হাত তুলে ডাকছে: সুব্রত ঘুম আর প্রার্থিত স্বপ্নের কথা ভাবলো। এখন ঘুম এখন স্বপ্ন...

সে টের পাচ্ছিলো সকালের সামান্য ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তার মনে হয়, কী রকম মন্ত্রবলে যেন সকালের সঙ্গে সঙ্গেই সবাই এখানে জেগে ওঠে; বেঁচে ওঠে। সুব্রত জানে তার মাথার কাছে জানলার বাইরেই কী একটা গাছ আছে। এখন সেই গাছের ডাল থেকে পাখিদের মিলিত কলরব তার কানে আসে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে, সে যখন ছোট ছিল, টু-থ্রী-তে পড়ে, তখন কার কবিতায় পাখিদের মধুর গান এই কথাটা পড়েছিল; সে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, স্কুলের মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিল, সবাই হেসেছিল তার কথায়। আর তার পারুলদি তাকে খেপিয়েছিল—তুই কী বোকা রে!...

এখন তার সেই আশ্চর্য কথাটা আবার মনে পড়লো। কিছু দুর্বোধ্য কিচিরমিচিরকে কেমন গান বলে চালিয়ে দেয় কেউ কেউ। সবাই সেটা মেনে নেয়। সবই অভ্যাস, সবই শুধু চালিয়ে নেওয়া। জীবন...বেঁচে থাকা, সুখ...সুখের অভ্যাস; প্রেম... মৃত্যুর প্রতীক্ষা। এখন সে বুঝতে পারে অনেক কিছু। এখন সে আর হঠাৎ নির্জন

রাস্তায় পথ হারিয়ে ফেলার ভয় করে না। এখন আর—

এখন তার বেশ ভাল লাগছে। বেশ তাজা মনে হচ্ছে নিজেকে। বোধহয় ভোরের বাতাসের কোনো নিজস্ব পবিত্রতা আছে। এখন সবাইকে কাছে ডাকতে ইচ্ছে করে; বলতে ইচ্ছে করে। সে দেখছে না কিছুই। অথচ সবকিছুই তার কানে আসছে, যেমন মধ্যরাতে অনেক দূর থেকে 'মাইকে' গানের দু-একটি অস্পষ্ট লাইন ভেসে আসে। দরজা, জানলার শব্দ, জমাদারদের কথার টুকরো, সিস্টারদের জুতোর রুক্ষ শব্দ, পর্দার রিঙ টেনে দেওয়া; সুব্রত সবকিছু টের পাচ্ছে এখন। এইসব অভ্যাসের মধ্যেই সে যেন বেঁচে আছে। সুব্রত কী রকম আত্মসুখের ছবি তৈরি করলো মনে মনে। শব্দ...মানুষের পা বাইরে গাড়ির স্টার্ট নেওয়া, তার মানে আর একটা দিন; আর একটা দিন শুরু হলো এখানে। তুড়ি দিয়ে হাই তুললো সুব্রত।

কার্তিকের শেষ। শেষ রাতের দিকে বেশ হিম পড়ে। তাই মাঝ রাতে সে গায়ে চাদর টেনে দিয়েছিল। আর তখন হঠাৎ তার খুব কষ্ট হয়েছিল; কেন সে জানে না; অথচ মনে হয়েছিল পালিয়ে যাই। কুয়াশার মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার রঙ দেখে তার মৃত্যুর শীতলতার কথা মনে হয়েছিলো তখন। ইচ্ছে হয়েছিলো চীৎকার করে ওঠে —ফিরিয়ে দাও আমার স্বাভাবিক আলো।

এখন কথাটা কী রকম অবাস্তব মনে হয়। সুব্রত বাইরে তাকালো। যদিও বাইরে বাগানে, মাঠে, মাঠ ছাড়িয়ে বাইরের বড় রাস্তায়, এখনো সামান্য কুয়াশা জমে আছে, নুড়ি বাঁধানো পথের পাশের আলোগুলো এখনো জ্বলছে, তবু আকাশ কী পরিচ্ছন্ন, রোদ উঠছে ক্রমশ, হাওয়া আসছে ঘরের ভেতরে, আর সেই হাওয়ায় তার কেমন শীত শীত করছিল; একটা বালিশ টেনে নিল সে বুকের মধ্যে। ঢং ঢং শব্দে দুটোর ঘণ্টা শুনতে পেল সে।

এখন সে বেশ ঘুমোতে পারে। এখানকার দিনরাত জীবনের প্যাটার্ন, ক্রমশ সব তার নিজের অভ্যাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে! কেমন হাসি পেল তার, তার কোনো আলাদা অভ্যাস আর আছে নাকি? নোটিশ বোর্ডে লটকানো নিয়মগুলোর মত সেও এখন কিছু নিয়ম জানে মাত্র; কখন ওষুধ খেতে হবে, কখন পথ্য, কখন বড় ডাক্তার আসবেন রাউণ্ডে, সব তার জানা হয়ে গেছে। কখন বিশ্রাম, কখন খাওয়া, দিনে কটা সিগারেট খাওয়া যেতে পারে সব তাকে বলে দেওয়া হয়। এমনকি ঘুমোবার সময় পর্যন্ত এখানে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। ঠিক সাড়ে আটটার সময় ওয়ার্ডের আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। শুধু জ্বলতে থাকে মাঝখানে শেড-দেওয়া বড় আলোটা, আর জ্বলতে থাকে এক অদ্ভুত বাদামি আলো। কী অদ্ভুত মনে হয় তার।... হয়তো বাইরে দোকানের উজ্জ্বল আলোয় কেউ তখন কাপড় কিনছে, রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা মারছে কত লোক, সিনেমার আশ্চর্য ভালবাসায় কষ্ট পাচ্ছে কেউ কেউ, হয়তো ব্রেক-ডাউন বাসের যাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে কনডাকটারের, কেউ কেউ রেডিওতে শুনছে 'জয়মালা অনুষ্ঠান', আর এখানে চারপাশে সাদা মশারি, পরপর খাটের সারি, দেয়ালে বিচিত্র ছায়া ওই ঝোলানো আলোর। প্রথম প্রথম সেদিকে তাকিয়ে ভয় হতো সুব্রতর; মনে হতো যেন সে এক শব্দহীন মৃতের পৃথিবীতে চলে এসেছে; কোথাও কোনো শব্দ নেই; শুধু তার নিজের বুকে ওঠানামা করে; তখন খুব ভয় হতো তার; তার শরীর ঘেমে যেতো, যেন দমবন্ধ হয়ে খাটের ওপর সে মরে পড়ে যাবে; নাকি সে মরে গেছে? সমস্ত শরীরে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়তো তখন, সমস্ত শিরাগুলি ছিঁড়ে যেন অবিরাম রক্তমোক্ষণ হচ্ছে তার; আমি আলো চাই রোদ...বাতাস মানুষের হাতের আঙুল...তখন সে ভয়ে চোখ বুজে ফেলতো, অত্যন্ত কাতরভাবে বলতো—একটু জল দেবেন সিস্টার?...বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করেছে কিন্তু শরীরের গভীর যন্ত্রণা তাকে অসাড় করে রেখেছে ডিউটির সিস্টারকে বিরক্ত করেছে—আমাকে দুটো স্লিপিং পিল দিতে পারেন?...

না, সিস্টার সাহস পায়নি। বরং সে বাড়াবাড়ি করলে সিস্টার ধমক দিত তাকে। কতবার সে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; সেই আলোর দুলুনি, বাইরে হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ, কুকুরের ডাক, সবকিছুর মধ্যে সে যেন কার অমোঘ আদেশের জন্য চুপ করে জেগে বসে আছে; শুনতে পেত দেয়ালে ঘড়ির শব্দ একটা বাজে...দুটো...তিনটে...তারপর এক সময় রাত ফিকে হয়ে আসে ক্রমশ; তখন তার মনেও পড়তো না ডিউটির ক্লান্তিতে হয়তো টেবিলে মাথা নামিয়ে সিস্টারও ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। নিষেধ অগ্রাহ্য করে কারা রাস্তা দিয়ে চীৎকার করে শবযাত্রা নিয়ে যেতে থাকে; অসহ্য যন্ত্রণায় ভয়ে চীৎকার করতে থাকে কোনো রোগী; তখন সে সিস্টারের যান্ত্রিক ব্যবহার লক্ষ্য করেছে। অবাক হয়নি।

—কী চেঁচামেচি শুরু করেছেন? কী হয়েছে আপনার?

—আর পারছি না সিস্টার, আমি মরে যাবো—নির্ঘাৎ মরে যাবো, সমস্ত শরীরে অসহ্য জ্বালা, দয়া করে আপনি...

—চুপ করুন এখন, মোটেই মরবেন না আপনি, বরং ঘুমোবার চেষ্টা করুন, না হলে ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে আপনাকে, এত রাতে এমার্জেন্সীর ডাক্তার এসে কী আপনার গায়ে হাত বোলাবেন?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সিস্টারের এই শাসন শুনতে তারা কত অসহায়, কত দুর্বল! তার ইচ্ছে করতো প্রতিবাদ করে, কিন্তু কার কাছে করবে? ইচ্ছে করতো—যারা যন্ত্রণায় কাতর, তাদের মাথায় হাত রাখে, সান্ত্বনা দেয় তাদের। কিন্তু কী করতে পারে সুব্রত? সে নিজেও তো একজন...

পরে এখানকার সিনিয়ার স্টাফ নার্স অমলাদির মুখে সে অনেক কথা শুনেছে। অমলাদি তাকে অনেক কিছু বলেছিল, বুঝিয়েছিল।

অমলাদি বলেছেন—জানো সুব্রত, বাইরে থেকে দু'দিনের জন্য দেখে সমস্ত কিছু বিচার করতে যাওয়া ঠিক নয়। সত্যিই হঠাৎ অন্যরকম কিছু ভাবা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এছাড়া আমাদের আর কী উপায় আছে বল? তোমরা ঠিক বুঝতে পারো না, তাই খারাপ লাগে, কিন্তু দিনের পর দিন হসপিটালের এই আবহাওয়ায়, অসুস্থ লোকগুলোর পরিচর্যা করতে মনের সব স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো পালটে যেতে থাকে। একটু হেসেছেন অমলাদি, আমাদের এই অদ্ভুত সাদা পোশাকটা দেখছো না? বাইরের মত ভেতরটাও কখন একসময় একদম বর্ণহীন হয়ে যায়। কত অসংখ্য রোগী, বিচিত্র তাদের অসুখ, বিচিত্রতর তাদের ব্যবহার; হয়তো প্রথম প্রথম আর্তের সেবা—বইয়ের এই কথাটা একটু প্রেরণা জোগায়; তারপর কখন অজান্তেই এক সময় সব মুছে যায় মন থেকে। রোগী আসছে আবার চলে যাচ্ছে, বিছানার চাদর আর দেয়ালের টিকিট পালটে যাওয়া শুধু। কেউ সুস্থ হয়ে ফিরে যায় আবার পুরনো জীবনে কেউ ফেরেনা আর। যারা ফিরে যায় দু'দিন বাদে তাদের মুখটাও কেউ মনে রাখে না। আবার নতুন মুখ, নতুন ...। সাদা গাউন, সাদা ক্যাপ, থার্মোমিটার মেজার গ্লাস...টেম্পারেচার চার্ট, ওষুধের ট্রে হাতে ডাক্তারকে সাহায্য আবার সেই রুটিন বাঁধা ডিউটি। আমরা বুঝতেই পারি না কখন আমরা একটা অভ্যাসের যন্ত্র হয়ে গেছি। স্নেহ নেই, মমতা নেই, সমবেদনা নেই। শুধু আছে এক বেড থেকে আর এক বেড।

জানলার পর্দা তুলে দিতে দিতে অমলাদি আবার বলেছেন—জানো, প্রথম যেদিন এখানে 'মৃত্যু' দেখেছিলাম, সেদিন কীরকম একটা অস্থিরতায় কোথাও বসতে পারিনি, যেতে পারিনি, শুতে গেলেই লোকটার প্রাণপণ বেঁচে থাকার সেই যন্ত্রণাক্ত মুখ যেন বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে; অথচ লোকটা আমার কেউ নয়, তার কী অসুখ, এমন কী নামটা পর্যন্ত জানা নেই আমার তবু সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আর আজ এই তো তিনতলার ওয়ার্ডের আট নম্বর বেডের ছেলেটি সকালে মারা গেল; যে পরশু দিনও বলেছিল—ভাইফোঁটার আগে আমি বাড়ি যেতে পারবো তো?...দেখে এলাম সাদা কাপড়ে ঢাকা তার দেহ, হয়তো ছেলেটির মা বাবা এসে ডেডবডি জড়িয়ে ধরে

পাগলের মত কে'দে উঠবে, পাথর হয়ে যাবে তার বোন, কিন্তু আমরা জানি, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ওই বেডে চলে আসবে নতুন রোগী। বিছানার চাদর পালটে দেওয়া হবে। আর মাথার কাছে বেড নাম্বারের পাশে থাকবে রোগীর নাম। আবার ডাক্তারদের রাউণ্ডে আসা; আবার রোগীদের প্রশ্ন; কবে ভাল হয়ে বাড়ি যাবো ডাক্তারবাবু?...

এখন এই ভোরবেলা, যখন তার বাইরে তাকাতে খুব ভাল লাগছে, শরীরের কোথাও যেন আর কোনো গ্লানি জমে নেই, চোখের পাতা সামান্য ভারি, তখন তার এইসব কথা মনে পড়তে খুব আশ্চর্য লাগলো যেন তার ভেতর থেকে টেপ-রেকর্ডারের মত অমলাদির সব কথা অবিকল বেরিয়ে আসছে। চোখ বুজলেই হয়তো এখন সে আবার অমলাদির কণ্ঠস্বরের মধ্যে আস্তে আস্তে নেমে যেতে থাকবে। সত্যি, এখানে বড় বিচিত্র এক জীবনের মধ্যে সে হঠাৎ এসে পড়েছে; নিজে আসেনি; ভাগ্য তাকে টেনে এনেছে এখানে। যেন এক মানুষের মেলার মধ্যে সে মিশে গেছে। কত রকম মানুষ! কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কতরকমের সুখ-দুঃখ। তার মনে হয় সে দেখছে এক অদ্ভুত নাটক, যার কোনো দৃশ্যের সঙ্গে কোনো দৃশ্যের মিল নেই; নেই কোনো পরিচালক। সে কী বাইরে থেকে কোনোদিন এর আভাষটুকু পর্যন্ত পেতো?... নাকি অমলাদিই তাকে চিনিয়েছেন সব কিছু?...

—শুনছেন?...

চমকে উঠলো সুব্রত। তাকালো সিস্টারের মুখের দিকে। কেমন শান্ত, কোমল চেহারা। দেখলে মনে হয় এখানে নয়, অন্য কোথাও এর কোনো প্রয়োজন আছে। যেন কোনো তুলসীমঞ্চের প্রদীপের মলিন আলোয় এই মেয়েটি ভগবানকে তার গোপন ইচ্ছাটি জানাতে পারে; চোখের দিকে তাকালে অসুখের কথা ভুলে যেতে ইচ্ছে হয়; কোনো প্রার্থনার মন্ত্র কী লুকিয়ে আছে চোখের গভীরে? আর একবার দেখলো সুব্রত, ছোট কপালের ওপর অপরাজিতার মত একটি সুন্দর টিপ, চুলের সামান্য টুকরো দেখা যায় ক্যাপের আড়ালে, বোঝা যায় ডিউটির আগেই স্নান সেরে নিয়েছে মেয়েটি। স্নান করলে বোধহয় সব মেয়েকেই বড় নিষ্পাপ মনে হয়; সুব্রতর বড় ইচ্ছে হলো একবার ওর স্নিগ্ধ শরীর ছুঁয়ে দেখে।

—নিন, হাঁ করুন, মেয়েটির সামান্য ঠোঁট নড়লো।

নির্বিচারে আদেশ পালন করলো সে।

এমন কী তার মনে হয়, এখন যদি এই মেয়েটি তাকে বলতো—চলুন তাড়াতাড়ি আর আধঘন্টা পরেই প্লেন ছাড়ছে আমাদের তাহলেও সে হয়তো অবাক হতো না।

তার মুখের ভেতর থার্মোমিটার চালান করে দিয়ে হাতের ঘড়ির ওপর চোখ রাখলো সিস্টার; মুখ বুজে সুব্রত তাকিয়েছিল মেয়েটির এই নম্র কাজ করার ভঙ্গির দিকে; কী রকম পাতলা ভেজা ভেজা ঠোঁট, একটু অহংকারী চিবুক, সুব্রত দেখছিল সকালেও মেয়েটির গলার খাঁজে সামান্য ঘামের দাগ।

—দিন, হয়ে গেছে। সুব্রত সিস্টারের হাতে থার্মোমিটার ফিরিয়ে দিল। মেয়েটি শিয়রের কাছ থেকে টেম্পারেচার চার্টটা তুলে নিল। সে জানে, এখন ওটায় আজকের তারিখ পড়বে, তার দেহের তাপ লেখা হবে তারপর, আর সময়। তার মানে সুরু হলো দিনের কাজ। ঠিক নটার সময় রাউণ্ডে বেরিয়ে এই ওয়ার্ডের যিনি কর্তা; সেই বড় ডাক্তার দলবল নিয়ে তার বিছানার সামনে দাঁড়ালে ডিউটির সিস্টার হয়তো চার্টটা খুলে দেবে তাঁর হাতে, তিনি হয়তো আলগোছে একবার চার্টটায় চোখ বোলাবেন, হয়তো বোলাবেন না, তবু নিয়ম, আর নিয়ম দিয়েই বাঁধা আছে এখানকার জীবন। কথাটা এভাবে মনে হতেই যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার শরীরের ভেতর পাক দিয়ে গেল। তার বুকের ভেতর কী অবিরাম রক্তমোক্ষণ হচ্ছে? আজ তার একচল্লিশ দিন হয়ে গেল এখানে।

একচল্লিশ দিন।...মনে হয় কত যুগ আগে সে যেন এই হসপিটালে এসেছে। ক্রমশ সে ভুলে যাচ্ছে বাইরের জীবন। বাইরের আলো, হাওয়া, ঘাসের রঙ, এরিয়েলের তারে কাকেদের জটলা, বৃষ্টির কলকাতা, মানুষের মুখ, ট্রাম-বাস ময়দানের মিটিং একটা রবারের বলের মত বিশাল শহরটার ছুটতে থাকা, অফিসের সিঁড়ি, টিফিনের আড্ডা, তার মা, অর্চনা, সুলেখা, বিজন, আপিস, শেখর, রাসবিহারীর মোড়ের মাথায় সিনেমার একটানা বিজ্ঞাপন সব, সব কিছুর বাইরে যেন এক নির্জন দ্বীপে কারা তাকে নির্বাসিত করেছে। এখন আর সেই জীবনে যাওয়ার কোনো পথ নেই, কোনো উপায় নেই, বহুদিন আগের কোনো গল্পের অস্পষ্ট স্মৃতির মত যেন পুরনো জীবন খুব আবছাভাবে মনে পড়ে তার। এখন আর কার্তিকের হলুদ রোদের মধ্য দিয়ে সে সুলেখার সঙ্গে হেঁটে যেতে পারবে না মেয়ো রোডের মসৃণতার মধ্য দিয়ে। অথবা বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-চৈ করতে চলে যাওয়া বসিরহাট, এখন আর অর্চনাকে নিয়ে সে সিনেমা দেখতে যেতে পারবে না, বড়দিনের সময় ইচ্ছে হলেও কোথাও যেতে পারবে না পিকনিক করতে। এখন শুধু তার চারদিকে সিস্টারদের জুতোর শব্দ, ডাক্তারদের উপদেশ, রাত্তিরের ঠাণ্ডা আলো-ছায়া, রোগীদের আর্তস্বর, ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ।...একটু একটু করে তার অস্তিত্ব ডুবে যাচ্ছে, ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। এখন তার দিনগুলি অর্থহীন,, রাতগুলি বিবর্ণ, পোকার মত দুঃস্বপ্ন হয়ে বেড়ায় তারা। তার মানে হয়, যেন এখানেই সে জন্মেছে আর এখান থেকেই একদিন, শাদা চাদরে তার শরীর ঢেকে ওয়ার্ড-বয়েরা বাইরে নিয়ে যাবে তাকে। পরদিন ডাক্তার এসে দেখবে বাইশ নম্বর বেডের রোগীর নাম পালটে গেছে, আর তাতে সামান্য বিচলিত না হয়েই জিজ্ঞেস করবে তাকে কী কষ্ট হচ্ছে আপনার? এই ঔদাসীন্য, এই নিষ্ঠুরতার নাম জীবন! অমলাদি ঠিকই বলেন।

টের পেতে থাকে সুব্রত তার রক্তের ভেতর যেন বিষাদ ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ, সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই, চারপাশে আর একবার তাকালো সে—ফ্যান বন্ধ। হসপিটালের আইনে বিশেষ কারণ না থাকলে এখন আর ফ্যান চলবে না, লক্ষ্য করলো সুব্রত, সাদা ব্লেডগুলোয় ধুলো যেন সরের মত লেগে আছে। তার চোখে পড়লো—বিছানার চাদর সাদা তার চারদিকে সাদা দেওয়াল, তার সামনে দাঁড়ানো সিস্টারের সাদা পোশাক, জানালার পর্দা সাদা, বুক কেঁপে উঠলো সুব্রতর তার মানে আমার চারদিকে শুধু ধূসর শূন্যতা, কোথাও উজ্জ্বলতা নেই, স্বাভাবিক রঙ নেই...মাথা কেমন ঝিমঝিম করে ওঠে সুব্রতর।

—আপনি তো একদম ভালো হয়ে গেছেন। সুব্রত দেখলো সিস্টার ওদিকের কাজ সেরে আবার ঘুরে তার বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনো মেয়েটির হাতে থার্মোমিটার।

—ভালো হয়ে গেছি?...সুব্রত কেমন অসহায় বোধ করে।

তাই তো দেখছি, বোধহয় কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার ছুটি হয়ে যাবে। ছোট করে হাসলো মেয়েটি।

—ছুটি?...সুব্রতর কণ্ঠস্বর সকালের রোদে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ ছুটি, এখান থেকে বাড়ি ফিরে যাবেন। টেবিলের সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে সিস্টার কথা বলে। প্রথম প্রথম অবশ্য একটু অসুবিধে হবে, চারপাশের মানুষদের দেখে কষ্ট হবে, কারো কাছে চীৎকার করে নালিশ জানাতে ইচ্ছে করবে, পরে দেখবেন, সব একসময় ঠিক হয়ে যাবে। কোনোদিন যে আপনার বাঁ-পা ছিল, হয়তো সেটাই ভুলে যাবেন। আমার এক জামাইবাবুরও যখন একটা হাত কাটা যায়...

—কিন্তু আমি যদি আর ফিরে না যাই? মানে যদি...

—তা হয় না। নিয়ম নেই। অকারণ হসপিটালের বেড আটকে রাখা যায় না।

এসব কথা সে নিজেও জানে। তবু যেন এক অবাস্তব স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে হয় তার। যেন মেয়েটির হাত ধরে বলতে পারলে ভাল হতো—আমার জন্য তৈরী করা যায়না কোনো নতুন নিয়ম?...বলা যায়না। মেয়েটি তাহলে তাকে পাগল ভাববে।

—কোথায় যাব আমি?...

—কেন আপনার বাড়িতে; আপনার মার কাছে, বোনের কাছে, অ—

—কী আর?...

শুনেছি, আপনার খু[illegible]জন আপন জন আছেন; তার কাছে [illegible]ত অপলক তাকিয়ে থাকে সিস্টারের [illegible]র দিকে। কী গভীর বিশ্বাস থেকে ক[illegible] বলছে এই মেয়েটি; হয়তো এখন তাকে হাততুলে কোনো আশীর্বাদ করতে পারে সে। সমস্ত ঘর যেন এক অলৌকিক সুস্থতায় ভরে উঠছে। হাওয়া আসছে, বিছানার ওপর মসৃণ রোদ। সুব্রত কী ওকে একটু কাছে বসতে বলবে? কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিল সে। এসবের মানে হয়তো মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারবেনা। অসুস্থ মানুষের আবেগের কোনো উল্টো মানে খুঁজে পাবে। শুধু মুখে বললো—আপনি আমার অনেক কথা শুনেছেন।

জানলার ফ্রেমে সিস্টারের মুখ প্রতিমার মতো মনে হয় সুব্রতর, পরিপূর্ণ দৃষ্টি একবার সুব্রতর শরীর স্পর্শ করে যায়, জানলার পর্দা গুছিয়ে ঠিক করতে করতে বললো—হাসপাতালে কেউ পড়ে থাকার কথা ভাবে? এসব বাজে চিন্তা করে—

—মন্দ কী; এখানেই যদি—

—না, এখানে শুধু অসুস্থ মানুষদের আশ্রয়; যারা স্বাভাবিক জীবনে বেঁচে আছে, তাদের প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

সুব্রত মাঠ দেখলো, কার্তিকের নির্মেঘ আকাশ; তার সামনে সকালের স্নান সেরে দাঁড়িয়ে আছে এই মেয়েটি। হঠাৎ তার মার কথা মনে পড়লো; কী রকম যেন এক সাদৃশ্য খুঁজে পায় সে। তার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ নাটকের মত একটা টাটকা দৃশ্য সুরু

করে সে; খুব আন্তরিক তার ইচ্ছা; তবু মেয়েটি বিরক্ত হবে, হয়তো রিপোর্টও করতে পারে তার বিশ্রী ব্যবহারের জন্য, কিন্তু সিস্টার কী বুঝতে পারে আশ্রয়ের জন্য, বিশ্বাস ফিরে পাবার জন্য সে কত কাতর?... খুব ইচ্ছে হয়, মেয়েটির হাত চেপে ধরে বলে—কী হবে বাড়ি ফিরে গিয়ে? কাদের মধ্যে ফিরে যাব আমি? কেন?... সমস্ত জীবন সংসারের বোঝা হয়ে, সকলের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার যে কী গ্লানি, কী শূন্যতা আর যন্ত্রণা; তা তুমি কী করে বুঝবে? প্রতিটি মানুষ আমার অক্ষমতায় সহানুভূতি জানাবে, জীবন যে একটা স্ট্রাগল, সেটা বোঝাবে, যারা খুব কাছের মানুষ, দয়া করবে তারা, কেউ কেউ উপদেশ দেবে সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যেও জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে। ... অথচ সব বোগাস! ... সুব্রত জানে এসব শুধু কথার কথা, সংসারের অভ্যাস শুধু; যারা বলবে এসব কথা, কিছু হারায়নি তারা, সংগ্রামের কোনো অধিকার থেকে এক কণা বঞ্চিত হয়নি তারা; কী করে তারা বুঝবে কী নিষ্ঠুর এই শূন্যতা, সমস্ত বাকি জীবনটা এক কাল্পনিক অন্ধকার; সুব্রত প্রাণপণে বলতে চায় আমি দয়া চাই না, প্রশ্রয় চাইনা, তোমাদের মধ্যে, ঠিক তোমাদের মত বেঁচে থাকতে চাই।...

কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না সুব্রত; বলা যায়না। তার বুকের সব স্বাভাবিক ইচ্ছা শুধু তাকে ক্লান্ত আর দুর্বল করে তুললো; কোনো রকমে মুখে শুধু বললো—

—আপনি জানেন প্রথম থেকে অন্যের দয়ার ওপর বেঁচে থাকতে হবে আমাকে?

— আপনি বড় বেশি ভাবেন; মার কাছে ছেলে কখনো গলগ্রহ হয়?

—কিন্তু আমার মত পঙ্গু ছেলে?...

—না, সেও নয়

—আপনি বিশ্বাস করেন? না আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন? ওদিকে ডাকছে; আপনি শুয়ে থাকুন; আর কয়েকদিন দেখছি, আপনি দুপুরে একটুও রেস্ট নিচ্ছেন না, সমস্ত দুপুর বই পড়ছেন, এক্ষুনি নার্ভের ওপর এত স্ট্রেন ...

আর একবার ডাকাডাকি সুরু হতেই কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সিস্টার। সুব্রত কী রকম আবিষ্ট হয়ে রইল কিছুক্ষণ; তার পায়ের মৃদু শব্দে, শরীরের ভঙ্গী, কথার রেশ যেন একটা গল্পের যবনিকা মনে হলো তার।

নিজের শরীরের দিকে চোখ ফেরালো সুব্রত। চাদর দিয়ে শরীরের নীচের দিকটা ঢাকা; সুব্রত জানে তার কিছুটা অংশ একটা গোলাকার মাংসপিণ্ডের চেহারায় শেষ হয়ে গেছে বিকৃত... অসহ্য! চাদরটা সরাতে হাত কাঁপছিল তার। মনে পড়ছে তার, প্রথম যখন সে একটু একটু করে বুঝতে পারছিল—সে বেঁচে আছে, অথচ তার বাঁ-পায়ের অর্ধেকটা তাকে চিরজন্মের মতো হারাতে হয়েছে, তখন তার কোনো অনুভূতিই ঠিক কাজ করেনি, যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। ভয় নয়, আতংক নয়, কান্না নয়, দুঃখ নয়, কী রকম বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলো সে। সমস্ত ব্যাপারটা কী তার জীবনেই ঘটেছে?... নাকি সিনেমার রীল উল্টে গিয়ে সে এক গোলক ধাঁধায় ঢুকে পড়েছে? চারপাশে তাকিয়ে ছিল সে। কয়েকটা ঝাপসা মুখ, কাউকে সে চিনতে পারেনি তখন, যেন তন্দ্রার মধ্যে ট্রেন একটা ব্রীজ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে...কী রকম ঘুম-পাচ্ছিল বোধ হয়, নাকি দুর্বলতায় সে চোখ খুলে রাখতে পারছিল না? ঘুমের মধ্যে আবছা স্বপ্নের ওঠাপড়ার মতো যেন তার মাথার ভেতর দিয়ে হাজার হাজার পা কোথায় চলে যাচ্ছিল তখন, তা হলে তার নিজের পা?...নাকি এখুনি সে খাটের অপর প্রান্ত থেকে তার বাঁ পায়ের অর্ধেকটা খুঁজে পাবে? কে নিয়ে গেল তার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশটুকু?...না, ফিরে সে আর পায়নি। ক্রমশ সুব্রত বুঝতে পেরেছে এই অঙ্গহানি স্বপ্ন নয়, গল্পের নিখুঁত দুঃখ নয়, বরং নিষ্ঠুর মর্মান্তিক সত্য। এখন থেকে পৃথিবীতে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচর কাঠের দুটো ক্র্যাচ!...আর তখন সমস্ত দেহের কোষ থেকে কান্না উঠে আসছিল তার...যেন প্রতিটি রক্তকণা প্রতি-বাদ করতে চাইছে, কী রকম ভয় পেয়ে কেঁপে উঠেছিলো সে; জাহাজ ডুবির পর যেন পাতালের কোনো রহস্যময় জগতে সে চলে এসেছে, বিচিত্র সব পোশাকে কারা দাঁড়িয়ে আছে তার চারপাশে? সুব্রত তাদের কথা বুঝতে পারেনি, নির্বিকার মুখ দেখে সে শিউরে উঠেছে...হয়তো এবার তারা খুলে নেবে তার বাকি পা, হাত দুটো, চোখ...সব। তারপর হয়তো নিষ্ঠুর উল্লাসে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলবে তাকে? একবার মাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করলো সে...সুলেখা কোথায় এখন?...তার চোখে বোধহয় হাজার বছরের ধোঁয়া জমছিল তখন।

হাত ওঠালো না সুব্রত। বাইরে তখন হেমন্তের উজ্জ্বল সকাল, গাছের পাতায়

রাত হসপিটালের মাঠে কয়েকটি চড়ুই নেমে এসেছে, তখন চুপ করে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই তার, অথচ এখন তার খুব ইচ্ছে হয় কোনো অলৌকিক নদীর পাশ দিয়ে সে ছুটিতে হাঁটতে কোথাও চলে যায়, দুর্ঘটনার আগে যেখান থেকে ফিরে আসার কথা মনে পড়ে না...সেই অবাস্তব পৃথিবী তার খুঁজে পেতে বড় ইচ্ছে হয় এখন। কিন্তু এখন থেকে সেফটিপিন দিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে পড়তে হবে তাকে, মনে পড়ছে তার বাঁ পায়ে গোড়ালির কাছে একটা পুড়ে যাওয়ার দাগ ছিল, কালী পুজোর সময় তুবড়ি ফেটে আগুনে ঝলসে গিয়েছিল জায়গাটা, আর সেই দাগটাই পরে অফিসে 'বিশেষ চিহ্ন' হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিলো। নিঃশ্বাস পড়লো তার...এখন-এখন তার 'আইডেনটিটির' জন্য তাহলে...

অপারেশনের পর তার জ্ঞান ফিরে আসার অনেক পরে সে জানতে পেরেছিল—এমনভাবে সে জখম হয়েছিলো, এত রক্ত গেছে তার শরীর থেকে যে, সে যে বেঁচে যাবে, সে সম্বন্ধে ডাক্তারদেরও সন্দেহ ছিল। এখন কথাটা মনে হতে তার দুঃখ নয় কেমন হাসি পেল শুধু।

ডাক্তাররা তাঁদের কর্তব্য করেছেন, মরতে দেননি তাকে। কিন্তু তাঁরা কী বুঝতে পারছেন তাকে বাঁচিয়ে রেখে নতুন করে দুর্ভাগ্যের মধ্যে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে?...

জ্ঞান ফিরে আসতেই সে দেখেছিলো অনেক উঁচু ছাদ, কিন্তু তার ভাবনার কোনো আলাদা শক্তি ছিল না তখন, যেন শরীরটা মেঘের টুকরোর মত হালকা হয়ে ভাসছিলো ঘরের মধ্যে। সে দেখছিল কেমন সাদা রঙের বিশাল দরজা, সাদা পর্দা ঝুলছে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল; সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তার—সে কী কোনো অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েছে? হাত খুঁজেছিল...পা, কোনো কথা সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল না। চারপাশের সবই যেন খুব রহস্যময়। যেন একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের সতর্কতা চলছে ঘরের মধ্যে, সে চোখ মেলতেই একজন হেসে তার পালস পরীক্ষা করেছিল, তার মাথার কাছে তখনো কী সব যন্ত্রপাতি, সে বুঝতে পারছিল তার শরীরে এখন ধীরে ধীরে কী যেন, বোধহয় বেঁচে থাকার রসদ, ক্রমশ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

—আমি কী?

—ছুটে এসেছিলেন একজন সিনিয়র সিস্টার। ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করেছিল।

—আমার মা কোথায়? আমার বোন?

—এরকম করবেন না, সবাই আছেন, গতকাল সকাল এগারোটায় আপনার অপারেশন হয়েছে, এইমাত্র আপনার জ্ঞান ফিরেছে, এখন কোনো রকম দুশ্চিন্তা বা কথা বলা—

—কী হয়েছে আমার?

—সব পরে শুনবেন, এখুনি ডাক্তার আসবেন আপনাকে দেখতে

—আমার মা আসবেন না?

—না, আটচল্লিশ ঘণ্টা না কেটে গেলে ডাক্তাররা পারমিশান দেবেন না, এখনো ক্রাইসিস পিরিয়ড ওভার হয়নি। কাউকে দেখলে, কথা বলার চেষ্টা করলে মনের ওপর খুব চাপ পড়বে আপনার, তার থেকে হেমারেজ হওয়াও বিচিত্র নয়।

আস্তে আস্তে চোখ বুজে ফেলেছিল সুব্রত।

পরে সে শুনেছে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, দু রাত হসপিটালেই থেকেছে অর্চনা, আর প্রথম যখন তার সঙ্গে সবাইকে দেখা করতে দেওয়া হয়েছিল সে মার দিকে তাকাতে পারেনি, অর্চনা সেই প্রথম ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলেছিল, অথচ সে কীরকম বড়দের মত সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল অর্চনাকে।

—কান্নাকাটি করে কী করবি? বরং তুই মাকে একটু...

—দাদা তোর এরকম সমস্ত শরীর কেঁপে উঠেছিল অর্চনার

কিন্তু এখন সুব্রতর মনে হলো, কী ক্ষতি হতো যদি সে না বাঁচতো?...হয়তো কিছুদিন সকলের আড়ালে মা একা চোখের জল ফেলতো, অর্চনাও কয়েকটা দিন চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতো; তারপর কলেজে যেতো, গল্পের বই পড়তো, রেডিও শুনতো, আর সুলেখাও হয়তো দুদিনেই সব সহ্য করে নিত, হয়তো তার কথা ক্রমশ ভুলে যেতো, মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সুলেখা কী তাকে...হয়তো সুলেখার জীবন থেকে রোদ-লাগা কুয়াশার মত সে মুছে যেতো, বিয়ে করে সুখী হতো, পুজোর ছুটিতে যেতো পাহাড় অথবা সমুদ্রের কাছে নিজের বিশ্রামের জন্য, সুখের জন্য। রোগ-প্রতিষেধকের মত শোক-প্রতিষেধকও নিশ্চয়ই কিছু আছে মানুষের ভেতরে; না হলে মানুষ পাগল হয়ে যেতো, পৃথিবীটা হতো একটা সমাধির কারখানা! মানুষের মন বড় বেশি ডাইনামিক; আকাশের মত সব দাগ সেখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুছে যায়।

এই হয়। জীবনের এটাই অলিখিত নিয়ম। সংসারের সত্যিকার কোনো বন্ধন কোথাও নেই; সকলের সুখ-দুঃখের ওপর দিয়েই নির্বিকার দিনরাতগুলো আসে, সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, সুখ-দুঃখ, ব্যর্থতা, গ্লানি, পরাজয় সবই মানুষের অভিমান মাত্র; চারদিকে তাকিয়ে মনেও পড়ে না কে আছে, কে নেই, শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে, ক্যালেন্ডারের পাতায় ধুলো জমে, আর কিছু নয়।...সে নিজেও তো দেখেছে, বাবা-মারা যাবার পর কিছুই তো আটকে থাকেনি। অথচ প্রথমে মনে হয়েছিলো বোধহয় সবকিছু শূন্য হয়ে গেল, কী করে আমাদের চলবে ভাবতো তারা। বাবার কথা ভুলতে পারতো না, বিশেষত অর্চনা কাঁদতো দেখে-শুনে, মৃত্যুকে সাক্ষী রেখে বাবা হয়েছিলো সেই ঘরে, যাকে জড়িয়ে ধরে অর্চনা মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠতো; আর সে নিজের সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরতো, একা একা পার্কে বসে থাকতো, খুব বাজে ছবি দেখতে যেতো; কথা বলতে ভালো লাগতো না। তারপর এক সময় সব ঠিক হয়ে এলো, স্বাভাবিক হয়ে এলো। আবার বাড়িতে কেউ এলে মা জলখাবার দিয়েছে, সে অফিসে গেছে, আড্ডায় গেছে, সুলেখার জন্য অপেক্ষা করেছে; বাইরে গিয়ে হাফ-প্যান্ট পরে ছবি তুলেছে, বানিয়ে বানিয়ে ভালো বাংলা বলেছে বন্ধুদের হাসানোর জন্য। আবার সে লিখতে পেরেছে, অর্চনা বান্ধবীর বিয়েতে গেছে, ফাংশানের টিকিটের জন্য টাকা চেয়েছে তার কাছে। এখন যার ঘরে বাবার ফোটো ছাড়া সত্যিই কী আর কোনো চিহ্ন আছে বাবার?...

সুব্রত বুঝতে পারে সেও অবিকল এইভাবে একটা বুদ্বুদের মত টুপ করে ডুবে যেত। কিন্তু এখন? এখন শুধু হলো তার গ্লানিময় দিনগুলি।

শুধু সুব্রতর খুব ইচ্ছে ছিল সে খুব সুন্দরভাবে মরে যায়। যেন তার চলে যাওয়াটা গল্পের করুণ শেষ বিদায় হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন কত সিনেমায় সে দেখেছে। আহা! কী লোভনীয় সেই মৃত্যু! সে দেখেছে সিনেমায় সবাই খুব আহ্লাদে এই ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যায়; মুখ-চোখ একটুও বিকৃত হয় না, যন্ত্রণার কাতরতা নেই, ভয় নেই, শরীরের কোনো শীর্ণতা নেই। তখনো যেন টগবগে হয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে সে শুয়ে থাকে; খুব বানিয়ে বানিয়ে দুঃখের, অভিমানের কথা বলে; ভুলে যায় না কিছু, জড়িয়ে যায় না জিভ; আর যে মনের মানুষ, সে কাছে বসে থাকে; ভুলেও ডাক্তার ডাকার কথা তার মনে হয় না, আর পাঁচজনকে খবর দেওয়ার কথাটাও; সে শুধু ছলছল চোখে দারুণ ভাবের গান গায় একখানা; আর সেই গান শুনতে শুনতে মহাপ্রস্থানের পথ ধরে নায়ক; আর কী অদ্ভুত, কেউ সকাল পৌনে এগারোটায় বা রাত আটটা সতেরো মিনিটে মরে না, সূর্য যখন [illegible] দিয়ে খবরের কাগজের মত তার জানলা দিয়ে রোদ পাঠায়, সেই সুন্দর সকালে তার মৃত্যু হয়। ইস্, এরকম মৃত্যু! কী আক্ষেপ হয় সত্যিই। সে হয়তো ফাঁদে আটকে-যাওয়া একটা ইঁদুরের মত অত্যন্ত হাস্যকরভাবে মারা যাবে একদিন; তখন মা হয়তো [illegible] দেখে, সুলেখা হয়তো বাসের জন্য স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকবে, অথবা দোকানে পছন্দ করবে শাড়ির পাড়...এই-রকম নির্বোধ এবং গতানুগতিকভাবে সে মরে যাবে। নো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, প্রদীপের নিভে-যাওয়া নায়িকার মুখের দুঃখের ক্লোজ-আপ!...হায়! সুব্রত হেসে ফেললো [illegible]।

(ক্রমশ)

নিকটেই আছে

পাড়ার স্বাস্থ্য

হ্যালো, হ্যালো। শুনুন আপনাদের অফিসার এলে বলবেন যে গত সপ্তাহে ন'টা কলেরা রোগী আমার এলাকা থেকে আই-ডি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন, অথচ আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দেন নি। এটা কোন দিশী ভদ্রতা? হ্যালো, কি বললেন? আমার এলাকার রুগীর খোঁজ আমি নিজে কেন রাখি না? কি করে রাখব? অ্যাম্বুলেন্স তো আর আমার আণ্ডারে নয়। পেসেণ্টের বাড়ীর লোক আপনাদের খবর দিয়েছে। তা আপনারা কেন আমাকে জানালেন না? হ্যালো, দেখুন বাজে কথা বলবেন না। আমরা ডিস্‌ইনফেকশানের ব্যবস্থা না করলে ন'টার জায়গায় নব্বইটা কেস দাঁড়াত বুঝলেন। আমার দায়িত্ব কর্তব্য আমাকে শেখাতে হবে না। হ্যালো, আপনাদের অফিসার যে এখনো আসেন নি সে তো আগেই শুনেছি। এলে বলবেন যে আমার কাছে ন'টা পেসেণ্টেরই নামধামের লিস্টি আছে। আজ বারোটার মধ্যে আপনারা যদি রিপোর্ট না পাঠান তাহলে জানবেন কমিশনারের কাছে লিস্টি সমেত কমপ্লেন পাঠাব। বুঝলেন। হ্যাঁ তাই বলবেন।

ঝপ করে হাতলের ওপর রিসিভারটা ফেলে দিয়ে হেলানো চেয়ারটা সিধে করে ঘুরে বসলেন হেলথ অফিসার। অমুল্য আড়চোখে হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল. পৌনে এগারোটা। আধঘণ্টা ধরে চেয়ারে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছে। অফিসার এতক্ষণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শুধু চোখের ইসারায় চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে অনুপস্থিত কোন এক অফিসারের সাব-অর্ডিনেটকে এতক্ষণ ধমকালেন। অমুল্য বার দুয়েক কথা বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন ধমক খেয়েছে যে আর মুখ খোলে নি। অথচ কারখানায় এখুনি ওর একবার যাওয়া দরকার। আজ বিকেলেই এক লট মাল চালান দিতে হবে। চৌধুরী কোম্পানীর চীফ ইনজিনিয়ার খুব কড়া লোক। টাইম মত মাল চালান না দিলে বোস সাহেব ছেড়ে কথা বলেন না। বিল আটকে দেন। বলেন, আমাকে যেমন ভুগিয়েছেন, এবার নিজেও একটু ভুগুন। অমুল্য কোন জবাব দেয় না, শুধু হাসে। কিন্তু এবার দেরী হলে আর কোন অর্ডার দেবেন না জানিয়ে দিয়েছেন বোস সাহেব। ওদিকে হেডমিস্ত্রী সকালে কাজে আসে নি। নিশ্চয়ই ওভারটাইমের টাকা কটা গিলে ঘুম দিয়েছে। অথচ ও না এলে অন্য মিস্ত্রী-গুলো কাজে ফাঁকি দেবে। কাজ নামাবে না। তবু অমুল্য থাকলে কিছুটা এগুতো।

কিন্তু কাল বিকেলে যখন ফোন করল তখন হেলথ অফিসার নিজে বললেন, সকালের দিকে যে কোন দিন আসুন। হাতে সময় থাকে। শুনবখন আপনার কথা। সেই কথা শোনাতে এসেই আধঘণ্টা ধরে চুপচাপ বসে আছে অমুল্য। এতক্ষণে সময় হল। পেল্লায় লম্বা-চওড়া টেবিলটার বুকজোড়া ফাইলের গাদায় হাত দুটো চাপিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক ভ্রুজোড়া নাচালেন—কি ব্যাপার?

অমুল্য তাড়াহুড়ো করে ব্যাপারটার জট ছাড়াতে গিয়ে কেমন অগোছালো, বেসামাল হয়ে গেল। ঠিক গুছিয়ে গোড়া থেকে শুরু করতে না পেরে মাঝপথেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, এবারও ফাইন দিতে হোল স্যার।

কিসের ফাইন? যেন একটু হকচকিয়ে গেছেন হেলথ অফিসার। প্লেন সিম্পল কোন আর্জি আশা করেই বোধহয় ভ্রুজোড়া নাচিয়ে ছিলেন, কিন্তু বদলে কমপ্লেনের মত জবাবটা পেয়ে কেমন স্টিফ হয়ে গেলেন। অসহিষ্ণু হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন ফের, বলবেন তো কিসের ফাইন? দেখছেন হাতে এক ফোঁটা সময় নেই, যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।

আমার কোম্পানীর হেলথ লাইসেন্স নেই স্যার, এতক্ষণে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়েছে অমুল্য, বছর বছর ফাইন দিতে হচ্ছে।

তা নেই তো করে নিন, তাহলে আর ফাইন দিতে হবে না। চটপট কথাকটা ছুঁড়ে দিয়ে ভদ্রলোক গাদা থেকে একটা ফাইল টেনে নিলেন। কিন্তু খাতাপত্র, রেজিস্টার, ফাইল ইত্যাদির ভিড়ে পেনটা কোথাও খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়েই ফাইলটা টেবিলের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অমুল্য উত্তর পেয়েও উঠে যায় নি দেখে, চাপা বিরক্তিতে গরগর করে উঠলেন, বললাম তো লাইসেন্স করিয়ে নিন, আর কোন ঝামেলা থাকবে না।

ভদ্রলোকের মুখটায় যেন চৌধুরী কোম্পানীর বোস সাহেবের খানিকটা আদল আসে। গোল দশ নম্বরী ফুটবল একটা। লেপা পোঁছা মুখটায় চোখ মুখ নাক চেষ্টা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়, বিশেষ করে কালো রোঁয়া ওঠা ভুরুর নেড়ে কুতকুতে চোখ দুটো। ঐ রোঁয়া কটা কুঁচকে বা টানটান করেই মুখে ভাব ফোটান ভদ্রলোক। কপাল যেন ফাঁকা গড়ের মাঠ। সিথে ব্রহ্মতালু ছাড়িয়ে আউট্রাম ঘাটের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। পাড় ঘেঁষে একটা কাঁচা পাকা চুলের সরু বেল্ট পেছন থেকে এসে কান দুটোকে জাপটে ধরেছে। চুলের ঐ কটা পাক রয়েল ব্রু কালিতে মাখামাখি মুখটায় তবু খানিকটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। মেজাজটা অফিসারের আসল শরিফ নয় বুঝতে পারে অমুল্য। একটা আঠলো হাসিতে ঠোঁটের ভাঁজটা কান পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে জিজ্ঞাসা করে—চলবে স্যার?

না আমি সিগারেট খাই না, হেঁকে উঠলেন হেলথ অফিসার। খাঁটি এখনো মরে নি অমুল্য টের পেল। তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা পকেটে পুরতে গিয়েই কিন্তু হোঁচট খেল। শুনতে পেল ভদ্রলোক বলছেন, কি সিগারেট? বিলিতি বুঝি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। ঠিক বলেছেন। প্যাকেটটা আর পকেটে না ভরে টেবিলের দিকে বাড়িয়ে ধরল—এক বন্ধু এসেছে আমেরিকা থেকে। একটা প্যাকেট প্রেজেন্ট করেছিল। এখানে এর দাম তত

কমেও দশ টাকা। ওদেশে এক ডলারে বিক্রী হয়।

অমূল্য যখন সিগারেটের গুণপনা ব্যাখ্যা করছিল সেই ফাঁকে ছ'ইঞ্চি লম্বা একটা সিগারেটের ডগায় আগুন ধরিয়ে হেলথ অফিসার গোটা দু'চ্চার টানও বসিয়ে দিয়েছেন। এবার তোয়ালে ঢাকা চেয়ারের পিটে পিট ঠেকিয়ে গা থেকে ব্যস্ত ভাবটা একটু একটু করে ঝেড়ে ফেললেন। মনে মনে খুশী হল অমূল্য। এ ধরনের ব্যবহার ওর কাছে নতুন কিছু নয়। এগারো বছর ফ্যাক্টরী লাইনের অভিজ্ঞতা থেকে একটা সার সত্য বুঝেছে, কিছু আদায় করতে হলে কিছু ছাড়তে হয়। সেই কিছুটা হল, মান, মর্যাদা ও মানি। তা যাক কাজটা হলেই ও খুশী।

একটু খুলে বলুন তো ব্যাপারটা। দশ নম্বরী ফুটবলে বোল ফুটেছে। এখুনি ঠিকমত ট্যাকল করতে পারলে হয়তো কাজটা হাসিল হবে। তাই বিনয়ের কলসীটা গলায় উপুড় করে দিয়ে ধীরে সুস্থে ব্যাপারটার গোড়া থেকেই শুরু করল অমূল্য—ফ্যাক্টরীটা স্যার গত মাসে এগারো পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে। কোন রকমে ধারধোর করে, গায়েগতরে খেটে চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু স্যার হেলথ লাইসেন্স আজো পাই নি। বছর বছর ফাইন দিচ্ছি। ভয় হয় কোনদিন আপনারা আবার নোটিশ পাঠাবেন, তাহলে তো কারখানা ডকে উঠবে

: ট্রেড লাইসেন্স আছে আপনার? জোড়া ভুরু নেচে উঠল।

: নিশ্চয় স্যার, জোর দিয়েই বলে অমূল্য।

: লাইসেন্স ফি কত?

: বছরে ষাট টাকা স্যার।

: ফ্যাক্টরীর জায়গাটা কি নিজের?

: না স্যার, ভাড়া। মাসে সত্তর টাকা।

: হুঁ। তাহলে তো আপনার হেলথ লাইসেন্স ফি তো খুব কমই হবে। গোটা পঞ্চাশ বড় জোর। একটা কাজ করুন, ফ্যাক্টরীর প্ল্যান সমেত একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিন।

: সে অ্যাপ্লিকেশন তো স্যার পাঁচ বছর আগেই পাঠিয়েছি, লাইসেন্স তো পাচ্ছি না।

অমূল্যের শেষ কথাগুলো শুনে ভদ্রলোক একটু নড়ে চড়ে উঠলেন। ভেবে নিয়েই যেন বললেন, পাঁচ বছর অ্যাপ্লিকেশন করেছেন অথচ লাইসেন্স এখনো পান নি? আপনার ফ্যাক্টরীর ঠিকানাটা বলুন তো।

খুব কাছে . স্যার। আপনার অফিস থেকে হেঁটে গেলে ম্যাক্সিমাম সাত-আট মিনিট। বাঁধানতলাটা চেনেন স্যার? ঘাড় নেড়ে অফিসার জানালেন যে জায়গাটা তাঁর পরিচিত। উৎসাহের সঙ্গে অমূল্য পরিচিতিটা পাকা করে তোলে, ঐ মোড়েই, মসজিদটার গায়ে।

তাই বলুন, ওটাতো রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার। এতক্ষণে আদত রহস্যের হদিশ পেয়ে খুশী হলেন অফিসার। চর্বির পুরু আস্তর নাচিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন নিশ্চয়ই কোন লোক্যাল অবজেকশন আছে। আফটার অল ফ্যাক্টরী তো, ঘটাং ঘটাং আওয়াজ, সরু গলিতে দিনরাত লরী-টেম্পোর ছোটাছুটি, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে কোন মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ভয়, এরকম গোটা কয়েক অবজেকশন এলেই তো আমাদের হাত বন্ধ। বুঝতেই তো পারেন, রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় পাবলিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আমরা ফ্যাক্টরী চালাতে দিতে পারি না। তারপর আপনার ফায়ার লাইসেন্স আছে কিনা কে জানে। যদি কখনো আগুন-টাগুন লাগে তখন তো কোর্ট আমাদের চেপে ধরবে কেন আপনাকে আমরা হেলথ লাইসেন্স ইস্যু করেছিলাম। যাক সে সব কথা। আপনি একটা কাগজে আপনার ফ্যাক্টরীর নাম ঠিকানা, কবে অ্যাপ্লাই করেছিলেন, উত্তরে যদি আমাদের কোন চিঠি পেয়ে থাকেন তো তাররেফারেন্স নম্বর, রেন্ট-অ্যামাউন্ট, ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্সের নম্বর . সব লিখে দিয়ে যান। আমি স্যানিটারী অফিসার এলে, তার সঙ্গে কথা বলে আগে জেনে নিই কেসটার পজিশন কি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।

অমূল্য বুঝল আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভদ্রলোক থেকে থেকে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। তাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করল, কবে আসব স্যার?

পরশু আসুন। আর ঐ কাগজটা পাশের ঘরে বড়বাবুর কাছে দিয়ে যাবেন। আচ্ছা আসুন। অমূল্যর দু'হাত জড়ো করা নমস্কারের বিনিময়ে। শুধু ডান হাতটা একবার আলতো করে কপালের কাছে ঠেকিয়ে ব্যস্তভাবে ফাইলের গাদায় ডুবে গেলেন হেলথ অফিসার।

পাশের ঘরে এসে অমূল্য দেখল গোটা আপেক্স ফ্যান লাইট সব অন করে বেলা এগারোটার সময় জনা তিনেক বেয়ারা একটা বেঞ্চিতে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। আর কেউ নেই ঘরে। চেয়ার টেবিলগুলো খাঁ খাঁ করছে। অসময়ে আগন্তুক এসে আড্ডার মৌজ ভেঙে দেওয়াতে বেয়ারা ক'জন বেশ বিরক্তই হল। কি চাই, কাকে চাই-এর জবাবে বড়বাবুকে চায় শুনে ওরা বলল, বারোটার পর আসবেন, দেখা হবে। অমূল্য দেখা না করেই ফিরে এল।

যে আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ফিরে এল, এসে দেখল ঠিক তাই। মজুরীরা সব হাত গুটিয়ে বসে আসে। হেডমিস্ত্রী আসে নি। তাই কাজও বন্ধ। ছাম্পারটা স্টেনলেস স্টীলের ট্রের মধ্যে তখনো এগারোটার কাজ বাকী। তিনটের মধ্যে চালান না গেলে বোস সাহেব লোক পাঠাবেন। আর একবার যদি বোস সাহেবের লোক এসে ফিরে যায় তো ব্যস। অর্ডার ক্যানসেল।

কিন্তু সে কথা কে বুঝবে? কারই বা এত বোঝার দায় পড়েছে। হেডমিস্ত্রী সমেত সাত-সাতটা লোক খাটে ফ্যাক্টরীতে। অফিসে একজন অ্যাকাউনটেন্ট কাম স্টেনো-টাইপিস্ট ছাড়াও দু'জন দারোয়ান আছে। মাস গেলে যেখান থেকেই হোক অমূল্যকে এই দশটা লোকের মাইনে দিতে হবে। নেহাৎ কম নয়—প্রায় আড়াই হাজার টাকার ধাক্কা। তার ওপর হাজারটা ঝামেলা একাই ওকে পোহাতে হয়। বাজারের অবস্থা খুব খারাপ। অর্ডার নেই বললেই চলে। গত ছ'মাস ঐ চৌধুরী কোম্পানীর খুচরো অর্ডার ধরেই কোনরকমে টিঁকে আছে ফ্যাক্টরীটা। বড় কোম্পানীগুলোর দরজায় দরজায় ঘুরেও একটা অর্ডার আদায় করতে পারে নি অমূল্য। সব জায়গায় একই কথা শুনেছে, দাঁড়ান মশাই। অর্ডার দেব কি, কোম্পানী টিঁকলে হয়? দেখছেন তো দেশের অবস্থা।

দেশের অবস্থা যে কি তা তো দেখতেই পাচ্ছে অমূল্য। শুধু দেখা তো আর পেট ভরবে না। মাস গেলে হাজার টাকা বাড়ীতে দিতে হবে। মা, পিসীমা, তিনটে বয়স্থা বোন আর ছোট একটা ভাই—ছ'ছটা প্রাণীর ভরণপোষণের দায় তার। বোন তিনটির বিয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে। একটিকে তো ঠিকই করে রেখেছে সামনের শ্রাবণেই ঝুলিয়ে দেবে। নিজের গোপন সঞ্চয় থেকে সাত হাজার টাকা সেজন্য সরিয়েও রেখেছে অমূল্য। তিন হাজার টাকা ক্যাশ না দিলে বরের বাপ তার বেকার ইনজিনিয়ার ছেলের বিয়েতে মত দেবেন না।

হাজার ঝামেলা সত্ত্বেও অমূল্য টেনে-টুনে সব চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এবার সেই টানবার পুঁজিতেই টান ধরেছে। বাড়ীতে কেউ জানে না, সবাই বড়খুকীর বিয়ের আয়োজনে মত্ত। অমূল্য চোখে এখন অন্ধকার দেখছে। এবার পাঁচশো টাকা ফাইন দিতে হয়েছে।

এত টাকা কেন ফাইন হল সেটা জানতেই গিয়েছিল করপোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট অফিসের হেলথ ডিপার্টমেন্টে। কাজ কিছুই হল না, মাঝ থেকে খানিকটা সময় নষ্ট হল। তাছাড়া এদিকের কাজ-

করাবার সব বন্ধ হয়ে আছে। মনটা এমনিতেই খিঁচড়ে ছিল। খুব একচোট কড়া কথা বলবে মিস্ত্রীগুলোকে। তারপর নিজেই সার্ট-ফার্ট খুলে কাজে নেমে পড়ল।

এসব কাজ ওর জানা। চোদ্দ বছর বয়স থেকে ফ্যাক্টরী লাইনে ঘুরে ঘুরে হাড়হদ্দ সব জেনে গিয়েছে অমূল্য। না ঘুরেও উপায় ছিল না। বাপ সুরেশ দাস জুট মিলে সুপারভাইজার ছিলেন। হঠাৎ ফিফটি সেভেনে স্ট্রোকে সুরেশ দাসের একটা দিক পড়ে গেল। তাই স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই কাজে ঢুকতে হয়েছে অমূল্যকে। নইলে সংসার চলত না। তারপর ফিফটি নাইনে বাবা মারা যাওয়ার পর বেহালার এক কামরার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু বেচে দিয়ে এই ফ্যাকটরী শুরু করে।

তখন বাঁধানতলার এই সাইডটায় কিচ্ছু ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল একটা বিরাট জলা। চারপাশে রজকের আড্ডা। অমূল্য ফ্যাকটরী খোলার পর পরই আস্তে আস্তে চারপাশে বাড়ী উঠতে লাগল। তারপর একদিন রাবিশ ফেলে পুকুর বুজিয়ে বড় বড় হালফ্যাশানের তিনতলা চারতলা মাথা তুলে দাঁড়াল। চারপাশের সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলোর মাঝখানে এই টিনের টুপী পরা ফ্যাকটরীটা কেমন বেমানান খাপছাড়া।

আর সেখানেই হয়েছে যত ঝামেলা। প্রতিবেশীদের উঁচু নাক তার ফ্যাকটরীর গায়ের বাতাসে সিঁটকে ওঠে। গোড়ায় যখন ফ্যাকটরী খুলেছিল তখুনি যদি অ্যাপ্লিকেশন করত, হয়তো অ্যাদ্দিনে লাইসেন্সটা পেয়েও যেত। কিন্তু তখন করপোরেশন থেকে এসে কোন খোঁজ নেয় নি, অমূল্যও আর গা করেনি। পাঁচ বছর আগে হঠাৎ একদিন কোর্টের সমন পেয়ে থ মেরে গেল। হাজিরা দিল টাউনহলে, মিউনিসিপ্যাল কোর্টে। অভিযোগকারী স্বয়ং করপোরেশন, বকলমে হেলথ ডিপার্টমেন্ট। অমূল্যের ফ্যাকটরীটার জন্য না কি বাঁধানতলার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। এখনো মনে আছে, জজ সাহেব ওকে কি কি প্রশ্ন করেছিলেন, তার জবাবে ওই বা কি বলেছিল,

ঃ আপনি ড্যাসকো এজেন্সীর মালিক?

ঃ আজ্ঞে হুজুর।

ঃ আপনার ফ্যাকটরীর হেলথ লাইসেন্স নেই?

ঃ নেই হুজুর।

ঃ লাইসেন্স না করালে ফ্যাকটরী উঠিয়ে দিতে হবে। এবার আপনার ফাইন হল সত্তর টাকা।

ছোট ছোট অনেকগুলো ফ্যাকটরীর মালিকের সঙ্গে সেদিন কোর্ট ওঠা পর্যন্ত লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল অমূল্য পুলিশের হেফাজতে। ফাইন জমা দিয়ে যখন বাড়ী ফিরল তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে। শীত-শেষের মরা সন্ধ্যার সরু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিজের ফ্যাকটরীটা দেখে কেমন মায়া হল। অনেক পরিশ্রমে যত্নে এটাকে ও গড়ে তুলেছে। বাঁচিয়ে রাখার দায়-দায়িত্ব সবই ওর।

পরের দিনই অ্যাপ্লাই করল হেলথ লাইসেন্সের জন্য। দিন-পনেরো বাদে স্যানিটারী অফিসার এলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেশিনপত্তরের পজিশন দেখলেন। ওয়ার্কারদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর ঘুরে ঘুরে আশপাশের বাড়ীওয়ালাদের অপিনিয়ন নিলেন। এর দেড় মাস বাদে করপোরেশন থেকে চিঠি এল অমূল্যর কাছে—তোমার ফ্যাকটরীর বিরুদ্ধে লোক্যাল অবজেকশন আছে। পাড়ার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। তাই লাইসেন্স ইস্যু করা হবে না।

হবে না তো হবে না, তাতে হয়েছে কি। বছরে ঐ একদিন তো মোটে কয়েকটা টাকা ফাইন দেবার ঝামেলা, তা অমূল্য দিয়ে দেবে। কিন্তু এবারই ফাইন দিতে গিয়ে বুঝেছে মামলা ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। সময় থাকতেই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলা ভাল।

ওয়ার্কারদের কাজটাজ বুঝিয়ে দিয়ে অফিসে এসে ঢুকল অমূল্য। কারোটা যাবে। আর একবার ডিস্ট্রিক্ট অফিসে গেলে কেমন হয়? কিন্তু ও চলে গেলেই কাজে ঢিলে পড়বে। তার চেয়ে অ্যাকাউনটেন্ট বাবুকে পাঠানোই ভাল।

গৌরবাবু পুরানো লোক। সাত বছর এই কারখানার হিসাব দেখছেন। অমূল্যর ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র সব ভদ্রলোকের জানা। তাই নিশ্চিন্ত হয়েই সব ব্যাপারে অমূল্য এই বুড়ো মানুষটির ওপর ডিপেণ্ড করে। ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পুরোনো অ্যাপ্লিকেশনের রেফারেন্স নাম্বার, করপোরেশনের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্সের ফাইল, রেণ্ট-রিসিট, বছর বছর ফাইন দেওয়ার কাগজপত্র সমেত গৌরবাবুকে করপোরেশনের অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে আবার ফ্যাক্টরীতে ফিরে গেল অমূল্য। কাজটা যে করেই হোক তিনটের আগে ফিনিশ করতে হবে।

টেম্পোয় সব মাল তুলে দিয়ে সঙ্গে চালানসমেত একজন দারোয়ানকে চৌধুরী কোম্পানীতে পাঠিয়ে সবে টিফিনের বাক্সটা খুলে বসেছে অমূল্য, এমন সময় গৌরবাবু ফিরে এলেন। দুটো সন্দেশ আর একমুঠো ছোলা দিয়ে টিফিনটা শেষ করে জলের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল অমূল্য, কি ব্যাপার এত দেরী হল যে? সব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন তো?

বুঝিয়ে তো এলাম। কিন্তু এ যে গভীর গাড্ডা, ছাতাটা দেয়ালের পেরেকে ঝোলাতে ঝোলাতে গৌরবাবু জবাব দেন। শুনে চমকে উঠল অমূল্য। জিজ্ঞাসা করল, কেন?

যদি পাঁচ হাজার ছাড়তে পারেন তো এখুনি লাইসেন্স পেয়ে যাবেন, নইলে এবার থেকে নিত্যি ফাইন গুনতে হবে। আমাদের ফ্যাক্টরীর এগেনস্টে নাকি সিভিয়ার কমপ্লেন আছে। আস্তে আস্তে সবই খুলে বললেন অ্যাকাউনটেণ্ট বাবু। কথাবার্তা বলে জানতে পেরেছেন, পাড়ার মধ্যে ফ্যাক্টরী, তাতে নাকি অনেকেরই ঘুম হচ্ছে না। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার রীতিমত ক্ষতি হচ্ছে আওয়াজে। অ্যাক্সিডেন্টের চান্স যখন তখন। এ রকম দশ গণ্ডা অভিযোগের ফিরিস্তি। গৌরবাবু বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলেন যে ঘুম নষ্ট হওয়ার অভিযোগটা নিছক ফিচলেমি। কারণ কারখানার একটাই সিফট, তাও দুপুরে, যখন কেউ ঘুমোয় না। সকাল, সন্ধ্যে বন্ধ থাকে নেহাৎ ওভারটাইম না থাকলে, ফলে পড়াশোনার ক্ষতি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর তাছাড়া এত ছোট ফ্যাক্টরী যে মাল আনা নেওয়ার জন্য লরী লাগে না, টেম্পোতেই কুলিয়ে যায়। কিন্তু সে সব কথা কানে যায় নি বাবুদের। তাদের ঐ এক ধরতাই—পাবলিকের অসুবিধা হলে তারা নাচার। সেক্ষেত্রে ফ্যাক্টরী উঠে গেলেও ওদের করার কিছু নেই। ফাইন হবেই।

বরং আরো যদি কমপ্লেন আসে তাহলে নাকি হেলথ ডিপার্টমেণ্ট ফ্যাক্টরীর ঘাড়ে ডেইলি ফাইন চাপাবে। অ্যামাউণ্টটা কত হবে বলা মুস্কিল, ষাটও হতে পারে সত্তরও হতে পারে। অর্থাৎ মাসে গড়ে হাজার দুয়েক টাকা। সেই সঙ্গে এটা শোনাতেও তারা ভোলেন নি যে এই ফাইনের জন্যই গত বছর ষষ্ঠীতলার কিরণ স' মিলটা উঠে গেছে। ওর ডেইলি ফাইন ছিল পাঁচশ টাকা।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে বসে সব শুনছিল অমূল্য। এবার হঠাৎ যেন খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কেন আপনি বললেন না যে এই ফ্যাক্টরীর ওপর এতগুলো পরিবার ডিপেণ্ড করছে? কেন বললেন না যে ফ্যাক্টরীর ক্ষমতা নেই যে অন্য কোথাও সিফট করবে? তাছাড়া কেন চ্যালেঞ্জ করলেন না যে ফ্যাক্টরী এলাকায় ঘরদোর বানাবার পারমিশন কর্পোরেশন দিল কি বিবেচনায়? এখানে কি আগে থেকেই রেসিডেনসিয়াল কোয়ার্টার ছিল? এ-সব কিছু বললেন না? তবে আপনাকে পাঠালাম কিসের জন্য? গুড ফর নাথিং, ক্যালাস।

এক রাশ ধোঁয়া উগরে মেসিনটা ঠাণ্ডা হতেই অমূল্য বুঝতে পারল মিছিমিছি এই বুড়ো মানুষটাকে ধমকানো ওর উচিত হয় নি। ওকে এ-সব বলে কি লাভ? তাই তাড়াতাড়ি শুধরে নেওয়ার জন্য গলাটা খাটো করেই বলে, কিছু মনে করবেন না গৌরবাবু। মাথার ঠিক ছিল না। কি বলতে কি বলে ফেলেছি, আমায় মাপ করুন। আপনি পাঁচ হাজার টাকার কথা কি বলছিলেন?

মনে মনে বোধহয় বৃদ্ধ অ্যাকাউনটেণ্ট খানিকটা স্নেহই করেন অমূল্যকে। দেখছেন তো চোখের সামনে দিন-রাত কি অমানুষিক পরিশ্রম করে এই ছেলেটি ফ্যাক্টরীটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বিপদে আপদে হাত পাতলে কখনো ফেরায় না। হাসতে হাসতে বললেন, তাতে কি হয়েছে। ওতে আমি কিছু মনে করি নি। এ অবস্থায় পড়লে আমারই কি মাথার ঠিক থাকত। থাক একথা, যা বলছিলাম। পাঁচ হাজার দিতে পারলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এর এক পয়সা কমে হবে না। টাকাটা আগাম চাই। পরশু আপনাকে যেতে হবে না। অফিস থেকে লোক আসবে। টাকার সঙ্গে একটা ফ্রেস অ্যাপ্লিকেশন তার হাতে দিলেই চলবে। তা হলেই অবজেকশন-টবজেকশন সব হাস আপ হয়ে যাবে। পাল্টা অ্যাপ্লিকেশন পড়বে যে ফ্যাক্টরীটা থাকায় পাড়ার কি কি উপকার হচ্ছে। সে সব দায়-দায়িত্ব ওদের। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, শুধু টাকাটা দিলেই হবে।

টাকা না ছড়ালে যে কিছু হবে না, হয় না, তা অমূল্য জানে। কিন্তু টাকা এখন কোথায় পাবে? ব্যাঙ্কে যা আছে তাতে বড় জোর আগামী মাসের মাইনেটা হতে পারে। চৌধুরী কোম্পানীর বিলের টাকাটা পেতে পেতে সামনের মাস কাবার হয়ে যাবে। আর সামান্য যা হাতে আছে, তা ছাড়া চলে না। কাঁচা মাল কেনার প্রয়োজন যখন তখন দেখা দিতে পারে।

বিকেলে অফিস বন্ধ করে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীর পথে এই কথাই শুধু ভাবছিল অমূল্য। কোনও কুল-কিনারা পাচ্ছে না। অথচ যে কোন দিন ডেইলি ফাইনের নোটিশ এসে যেতে পারে। একবার যখন আঁচ পেয়েছে, তখন কি আর ঘাড় না মটকে ছাড়বে বাঘ? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে বাড়ীর কাছে পৌঁছে গেছে, দরজার সামনে যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, খেয়ালও ছিল না অমূল্যর। খেয়াল হল বড়খুকীর গলার আওয়াজে—এ কি দাদা তুমি চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে যে! কড়া নাড় নি কেন? তাকিয়ে দেখল, বড় খুকী আর রমা, ওরা দু' পিঠোপিঠি বোন সেজেগুজে কোথায় বেরোচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছিস? জবাবটা দিল রমা, গত মাসে সরকার ব্রাদার্সে তুমি দিদির জন্য যে দুল জোড়া বানাতে দিয়েছিলে, প্যাটার্নটা ওর পছন্দ হয় নি, তাই আজ পাল্টাতে যাচ্ছি। বড়খুকীর খুশী খুশী মুখটায় টুকরো লজ্জার মেঘ হাল্কা একটা ছায়া ফেলেই সরে গেল, কিন্তু ই অমূল্যর চোখ এড়ায় নি। বড়খুকীকে দেখেই যে ভাবনাটা অমূল্যর মাথায় ঝিলিক মেরে উঠেছিল, ওরা চলে যেতে সেটা আরো স্পষ্ট আরো গভীরভাবে দানা পাকিয়ে উঠল—বিয়েটা দু'দিন পিছিয়ে দিলে হয় না? তাহলে ফ্যাক্টরীটা বাঁচে। দশটা পরিবার ওর ওপর ডিপেণ্ড করে। তাছাড়া ফ্যাক্টরী উঠে গেলে নিজেরাই বা খাবে কি? কিন্তু যদি ছেলের বাপ অত আর রাজী না হয়? মা পিসীমাই বা কি মনে করবেন? আর বড়খুকী—এক দিকে পাড়ার অবস্থা অন্য দিকে সংসারের অবস্থা করুণ দৃশ্য ... ভাবতে ভাবতে কেমন দিশেহারা হয়ে সব গুলিয়ে ফেলে অমূল্য।

—সম্বৎসর

মনের কথা

রক্তের ভয়

বিরামবাবুর বিপত্তি

বিরামবাবু আজ থেকে প্রায় ১৪।১৫ বছর আগে চিকিৎসার জন্যে এসেছিলেন। আমাদের উভয়েরই পরিচিত এক ভদ্রলোক এক রকম জোর করেই আমার কাছে পাঠালেন। তাঁর রোগউপসর্গ থেকে চিকিৎসকরা মনে করেন নি যে তাঁর মানসিক চিকিৎসার দরকার হতে পারে। রক্তের চাপ কম, দুর্বলপ্রকৃতি, স্বভাব-ভীরু এই রোগীটি শহরের এক নামকরা চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ছিলেন প্রায় বছর দশেক। আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখন তাঁর বয়স প্রায় ৪৪।৪৫। ডিগ্রীধারী এঞ্জিনীয়ার। প্রায় বিশ বছর ধরে এক স্টীল কোম্পানীর ড্রাফ্‌টসম্যানের কাজ করেছেন। ভালভাবেই পাশ করে-ছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্যে প্রোমোশন হয় নি; প্রোমোশন তিনি দাবীও করেন নি। কোনো দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাটের কাজ তিনি পছন্দ করতেন না। নির্ঝঞ্ঝাটে বসে ড্রইং করে যেতে মন্দ লাগত না। যেখানে যে কাজে মানুষজনের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদের সম্ভাবনা, সে কাজ, সে জায়গা তিনি এড়িয়েই চলতেন। গত কয়েক বছর ধরে খুবই অনিয়মিতভাবে অফিসে আসা-যাওয়া করছেন। বছরে প্রায় দুমাস বর্ষাকালটা, তিনি বাড়ীতে শুয়েই কাটাতেন। চলাফেরার ক্ষমতা থাকত না। ডাক্তারের সহকারী এসে প্রায় রোজই তাঁকে গ্লুকোজ ইঞ্জেকসন দিয়ে যেতেন। খুবই দক্ষতা ছিল বলে কোম্পানী তাঁকে বিদায় দেয় নি, অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে গণ্য করে এসেছে। দশ বছরে একবারও বেতন বাড়ে নি। বিবাহিত; তিনটি সন্তানের পিতা।

বিরামবাবুকে দেখেই মনে হবে তিনি চিন্তারোগে ভুগছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে হাসতে দেখেছেন কমই। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বোঝা যাবে ভদ্রলোক না হাসলেও রসিক এবং আলাপে পটু। নানা ধরনের বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। তাঁর আগ্রহের অভাব ঘটে নি। 'কমন-সেন্স'টা তাঁর তারিফ করার মত। অজানা বিষয়েও খুব অল্পসময়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন ও কয়েকদিন পরেই দেখা যেত, সে বিষয়ে তিনি বেশ কিছুটা জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছেন। শুয়ে শুয়েও লেখাপড়ার কাজ চালিয়ে যেতেন।

এইবার তাঁর কথাতেই রোগ ইতিহাসের বিবরণ বলছি।

পূর্ব বাংলার মানুষ আমি। পাকি-স্থানী বলা চলে। কেননা এখনও দেশের বিষয়সম্পত্তি বাড়ী-ঘর বেচে দিই নি। যৌথপরিবারের মধ্যে শৈশব কেটেছে। জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। কোলকাতায় চার বছর পড়ার পর গ্রাজুয়েট হয়ে উত্তরপ্রদেশের এক ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাই। কোলকাতায় কাকার বাসায় ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে হোস্টেল-জীবন সুরু হল। বলতে গেলে এই সময় থেকেই আমার রোগের সূত্রপাত। এই রোগের কথা অন্য ডাক্তার-দের বলি নি, কেননা জানি তাঁরা আমল দেবেন না। এ রোগের কথা আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ বোধহয় জানে না। আমাকে বন্ধু-বান্ধবরা স্বভাবভীরু বলে জানে; কিন্তু তারা জানে না যে রক্তপাতের কথা শুনলে আমি ভয় পাই। রক্তপাত দেখলে ভয়ে আমার চেতনা লোপ পায়। অনেকবার এরকম হয়েছে। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছি, চেনা লোকে বাড়ী নিয়ে এসেছে। তারা ভেবেছে রক্তচাপের স্বল্পতাই বোধহয় চেতনা হারাবার কারণ। কিন্তু আমি হয়ত তখন মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি; কালীমূর্তির সামনে পাঁঠা কাটা হচ্ছে, নর্দমা দিয়ে রক্তস্রোত রাস্তার ড্রেনে এসে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে আমি চেতনা হারিয়েছি, একথা কারুর কাছে প্রকাশ করতাম না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সেই ছাত্রজীবনের কাহিনী। সেটা বোধহয় ১৯৩০ সাল। রাজনৈতিক আকাশে ঘন মেঘ, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হচ্ছে। কংগ্রেস লীগের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা রক্তক্ষরী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছে। আমাদের ইউনিভার্সিটি টাউনে দাঙ্গা বাধার দিন থেকেই আমার ভয়ের জীবন সুরু হল। আমার রুম মেট এসে ছুরিকাহত এক হতভাগ্যের রক্তপাতের কাহিনী সালঙ্কারে বিবৃত করছিল, অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে কমন রুমে বসে তার বিবরণ শুনছিল। হোস্টেলও রাত্রে আক্রান্ত হতে পারে শোনা গেল। বন্ধুর গল্প শুনতে শুনতেই আমার গলার কাছে কেমন অস্বস্তি বোধ হল: মাথা ঘুরতে লাগল। বাথরুমে গিয়ে খানিকটা বমি করে, মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। খাওয়ার কোনো ইচ্ছেই হল না। রাতটা কিভাবে কেটেছিল মনে নেই। তবে ঘুম ভাল হয় নি, আর ভয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম এইটুকু মনে আছে। পরের দিন অনেক বেলা অবধি বিছানায় ছিলাম। বন্ধুরা ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। তিনি ওষুধ দিয়ে-ছিলেন। কি রোগ হয়েছে তা তিনি বলেন নি; আমিও জানতে চাই নি। কয়েক দিন পরে পূজার ছুটিতে দেশে গিয়ে বিশ্রাম নিতে আবার মনোবল ও সামর্থ্য ফিরে পেলাম। বছর চার পাঁচের মধ্যে বার কয়েক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। শহরের সেরা ডাক্তার নার্ভ-টনিক খেতে দিয়েছিলেন। তবে তখনও রাস্তায় ভিড় দেখলে, বা হৈ-চৈ শুনলে ভয় পেতাম না। এখন অফিসে যাবার পথে কোথাও যদি জটলা হচ্ছে দেখি, বা হৈচৈ শুনি, সোজা বাড়ী ফিরে আসি। বৃষ্টি-বাদলার দিনে অফিস যেতে পারি না আজকাল। 'লো-প্রেসার' একমাত্র কারণ, মনে করবেন না যেন। বর্ষায় আমার বাড়ীর পাশের খালটায় গঙ্গার জল আসে, গেরুয়া রঙের জল। আমি ভয় পাই। আমাদের কারখানার ভিতরকার রাস্তাগুলোয় সুরকি ঢালা হয়; বর্ষায় সেগুলো ধুয়ে ড্রেনের মধ্যে পড়ে, রক্তের মত মনে হয়। আমার ভয় করে তাকাতে। তাই দু' মাস শুয়েই কাটাই। এখন জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে দুই কারণে। প্রথম, অর্থাভাব। এই মাইনেতে চার পাঁচজনের খরচা কুলোয় না। বছরখানেক হল দাদা আসামে বদলি হয়ে গেছেন। তিনি যতদিন আমার সঙ্গে ছিলেন, খরচার কথা বিশেষ ভাবি নি। কেননা, সংসারখরচার মোটা অংশ তিনিই বহন করতেন। এখন ৪৪ বছর বয়সে দাদার মণি-অর্ডারপ্রত্যাশী হতেও লজ্জা করে। হ্যাঁ, আর একটা কারণেও বিশেষ মনোকষ্টে ভুগছি। এখন যে আমার 'বস' সে আমার সহপাঠী ছিলো। পরীক্ষায় বরাবর আমি তার চেয়ে ভাল ফল দেখিয়েছি। সে আমাকে যথেষ্ট সমীহ করতো, কেননা আমি ছিলাম ক্লাসের সেরা ছেলে। সে আগে অন্য কোম্পানীতে ছিল, আমাদের এখানে বছর তিনেক এসেছে। এখানে এসেও আমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না: সে অন্য ডিপার্ট-মেন্টের চার্জে ছিল। আজ কয়েক মাস হল সে আমার উপরওয়ালা। আর এই কয়েক মাস আমার অসুখ অতিমাত্রায় বেড়েছে। তিন মাস প্রায় অফিসে যেতে পারছি না। আমার ত' জানেনই, 'নো ওয়ার্ক নো পে'। বাধ্য হয়ে দাদাকে লিখতে হয়েছে। তিনি সাহায্য পাঠিয়েছেন। এই নিয়ে আবার স্ত্রীর মুখভার। তাঁর নাকি আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে।

এইবার, প্রশ্নোত্তরের ফলে যে সব তথ্য সংগৃহীত, সেগুলো জানাচ্ছি।

বিরামবাবুর ভয় এবং আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া গত ২৫ বছরে কয়েক বার বেশ মনে রাখবার মত ভাবে বেড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন কলকাতা নগরী প্রথম নিষ্প্রদীপ হল: ভয়ের প্রাদুর্ভাব বাড়ল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ভয় একেবারে চরমে উঠেছিল: খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে বা রেডিও খুলতেও সাহস পেতেন না বিরামবাবু। অনেকদিন রাস্তায় বেরুতে পারেন নি। কাকার মৃত্যুর পর যখন খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে আনু-ষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে গেলেন, তখনও বেশ মনে আছে, কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। এর পর নেতাদের চক্রান্তে যা [illegible] হলো বাংলাদেশ যখন দু' টুকরো হল বিরামবাবুর ভয়ের অসংখ্য [illegible]।

সাধারণভাবে উদ্বেগ অশান্তি বাড়ার

সংগে ভয় বাড়ত। আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাতের সম্ভাবনা ঘটলে ত' কথাই নেই। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বিরামবাবুকে অনায়াসে স্বভাবভীরু বলা চলে। স্বভাবভীরুতা চিকিৎসার ফলে দূর হতে পারে, বলে মনে হল না। অবশ্য জ্ঞানের অভাব থেকে অনেক সময় ভয় আসতে পারে, সে ভয় আলাপ-আলোচনা মারফত দূর করা যায়। আমি আজীবন কলকাতায় আছি, সাপ দেখলেই ভয় পাই। সে ঢোড়াই হোক আর কেউটেই হোক। আবার পল্লীগ্রামের লোক ঢোড়া কেউটে চিনতে পারে, কাজেই ঢোড়া সাপ দেখে ভয় পায় না। জ্ঞান বাড়ার সংগে সংগে এই ধরনের ভয় দূর হয়ে যায়। আইনের জ্ঞান না থাকলে, অথবা অন্তরঙ্গ কোনো উকিল বন্ধু না থাকলে; বাড়ীওয়ালার উকিলের যে কোনো চিঠি পেলেই আমার পক্ষে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। চিঠিটার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার পর অর্থাৎ জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় চক্ষু উন্মীলিত হবার ফলে যদি দেখা যায় আইনের দিক থেকে আমার কেস খারাপ নয়; ভয় নিঃসন্দেহে কমবে। কিন্তু যে স্নায়ুতন্ত্র জন্মসূত্রে দুর্বল, তাকে সুসংগঠিত করে খানিকটা ঘাতসহ হয়ত করা যায়, কিন্তু পুরোপুরি তার ভয় দূর করা যায় না।

বিরামবাবুর ভয়ের সূত্রপাতের যে ইতিহাস পেলাম, তা থেকে ভয়ের কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পেলাম না। হৈ-চৈ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই অনেককে ভয়ার্ত করে। বিশেষ করে শৈশবে যারা দল বেঁধে খেলাধুলো করে না, খেলাধুলোর সূত্রে ঝগড়া মারামারি করে না, তারা বড় হয়ে এই ধরনের ভয়কাতুরে হতে পারে। বিরামবাবু ত' বললেন, স্কুলে পড়ার সময় তিনি দল বেঁধে খেলাধুলো করেছেন; ফুটবলের মাঠে আঘাত পেয়েছেন, আঘাত ফেরতও দিয়েছেন! শৈশবের কথা বলতে গিয়ে অনেক ছোটখাটো ঘটনা তাঁর মাঝে মাঝে মনে পড়তে লাগল। আমার নির্দেশ ছিল যে যখনই ছোটবেলার কোনো বিশেষ ঘটনা (ভয় ভাবনার সংগে সংশ্লিষ্ট) মনে পড়বে, তিনি যেন খাতায় লিখে রাখেন। নিজের রোগবিবরণী ও স্মৃতিচারণ লিপিবদ্ধ করার জন্যে একখানা মোটা খাতা, আমার পরামর্শে তিনি কিনেছিলেন। অনেকটা ডায়েরীর মত করে প্রতিদিনকার ঘটনা, চিন্তাধারা এবং অতীতের আনুষঙ্গিক স্মৃতি তিনি সেই খাতায় লিখে আনতেন: আমার সামনে বসে পড়তেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর মানসিকতার একটা সুনির্দিষ্ট পরিচয় পেলাম।

বিরাট যৌথ পরিবারের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, ফলে সামন্ততান্ত্রিক পরিবার-প্রীতি পরিবার-নির্ভরতায় তাঁর মানসিকতা বিশেষভাবে প্রভাবিত। যাঁরা নিয়মিত 'মনের কথা'র রোগীদের কাহিনী অনুসরণ করে চলেছেন, তাঁরা এদিক দিয়ে নিবারণ-[illegible] বিরামবাবুর মধ্যে অনেকখানি মিল দেখতে পাবেন। রোগলক্ষণ অবশ্য তাঁদের স্বতন্ত্র। গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, ভয় এবং পারিবারিক নিয়মশৃংখলার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ ও অনুগামিতা বিরামবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্ব কাজেই অপরিস্ফুট, ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ অনীহা। চাকরীর প্রথমদিকে বেতনের একটা মোটা অংশ বাড়ীতে পাঠাতেন। সে-টাকার কোনো দরকার আছে কিনা, এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। বিয়ের পর, বিশেষ করে আলাদা বাসা করার পর, এই সব ব্যাপারে স্ত্রীর অনুমোদন পেতেন না। এ নিয়ে মনোমালিন্য প্রায়ই ঘটত। বিরামবাবু অল্প কথার মানুষ, তাঁর ক্রোধ বা ক্ষোভ প্রকাশ পেত শারীরিক উপসর্গের মাধ্যমে। বেকার ছোট ভাই সপরিবারে কয়েক বছর বিরামবাবুর পোষ্য ছিলেন; সেই সময় স্ত্রীর সংগে বচসা ঘন ঘন ঘটত; রোগাক্রান্তও ঘন ঘন হতেন। বড় ভাই-এর উপর নির্ভরতা ছিল অতিমাত্রায়। পিতার মৃত্যু ও খুড়তুতোভাইদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর এই নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীর কাছে নিজের এই আনুগত্য গোপন রাখতে গিয়েও পারতেন না। ফলে খিটিমিট লেগেই থাকত। এইসব ব্যাপারেও মাঝে মাঝে অফিস কামাই হত। পারিবারিক নির্ভরতা ও আনুগত্য বিরামবাবুর নিরাপত্তাবোধের সংগে বিশেষ-সম্পর্কিত; এটা বেশ ভালভাবেই বোঝা গেল। শক্তি, সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও বিরামবাবু দায়িত্বপালনে অক্ষম, দায়িত্বগ্রহণে নিরুৎসাহী। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব তাঁকে দিবারাত্র পীড়িত করছে; আত্মনির্ভর হবার জন্যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন; বুঝতে পারছেন না। আত্মনির্ভর হবার ও দায়িত্বগ্রহণের তাগিদ এসেছে; অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। দাদার বদলি ও সহতীর্থের উপরওয়ালা হিসেবে আবির্ভাব,—তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ভয় আর দুর্বলতা দূর না হলে তিনি আত্মপ্রত্যয় পাবেন কি করে? অফিসে নিয়মিত হাজিরা দিতে না পারলে, প্রমোশনের কথাই বা তুলবেন কি করে? ভয়ের, বিশেষ করে, রক্তের ভয়ের উৎস খুঁজে না পেলে, ভয়ই বা দূর হবে কি করে? এইরকম নানা চিন্তার মধ্যে রোগী এবং চিকিৎসক, দুজনেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। এমনি সময়, কয়েকদিন সম্মোহিত অবস্থায় রক্ত-ভীতির উৎস অনুসন্ধান করবার জন্য তাঁকে 'সাজেশসন' দিলাম। 'সাজেশসন'-এর ফলেই কিনা জানি না, সপ্তাহখানেক পরে তিনি বেশ স্পষ্টভাবে রক্তভীতির কারণ আমার কাছে বিবৃত করলেন।

কথা হচ্ছিল তাঁর জেলার মানুষদের ক্রোধ-প্রবণতা নিয়ে। জাতিগত বৈশিষ্ট্য যদি থাকে, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যই বা থাকবে না কেন? বিরামবাবু প্রশ্ন করলেন। নিজেই উত্তর দিয়ে চললেন। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বোধহয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরই সামিল। তাঁর জেলা নদীনালায় ভরতি; তখনও রেলওয়ে স্থাপিত হয়নি। তাঁর দেশের মানুষদের সংগে বীরভূমের মানুষদের মানসিকতায় ও চরিত্রে পার্থক্য থাকাই ত স্বাভাবিক। তাছাড়া, সমুদ্রের উপকূলবর্তী হওয়ার দরুণ পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বিরামবাবুর পিতামহেরা অনেক লড়াই করেছেন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সংগ্রামী মনোভাব বেড়েছে। তার কিছুটা সন্তানসন্ততিদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। ক্রুদ্ধ না হয়ে লড়াই করা চলে না। তাই তাঁরা স্বভাবত রাগী ও দাঙ্গাবাজ। আমি নিশ্চয়ই জানি, তাঁর জেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফৌজদারী মামলার সংখ্যা অন্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি। ফৌজদারী আদালতের সংখ্যাধিক্য তাঁর জেলার বিশিষ্টতা। তাঁদের অনেকের ধমনীতে মগ ও পর্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত; সেটাও তাঁদের ক্রোধ-প্রবণতা ও সংগ্রামী মনোভাবের কারণ হতে পারে। এছাড়া, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে জমিদারী মেজাজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সরাসরি সরকারকে খাজনা দেবার দরুণ অসংখ্য ক্ষুদে জমিদারে তাঁর জেলা ভরতি। তাঁরা সবাই প্রায় দুর্যোধনের মত অভিমানী। বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ মেদিনী হস্তান্তরে তাঁরা রাজী নন। এঁদের সকলেই লাঠিবাজি-শড়কিবাজিতে ওস্তাদ। ভাড়া-করা পাইকদের সংগে নিজেরাই জমির লড়ায়ে সম্মুখ-সমরে নেমে পড়েন। বিরামবাবুর মনে আছে তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের লড়াইয়ের কথা। রাইটার্স বিল্ডিং-এ অফিসার-গ্রেডের চাকরি করতেন। কয়েক কাঠা জমির লড়ায়ে তিনি বন্দুক নিয়ে নেমে পড়েছিলেন।

—আপনিই দেখছি জেলাবাসীদের মধ্যে ব্যতিক্রম। আপনার বাবা-কাকারাও বোধহয় নিরীহ প্রকৃতির ছি[illegible]?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে, উপরে উদ্ধৃত আলোচনার সূত্র [illegible]র রোগের কারণ বেরিয়ে এল।

—হ্যাঁ প্রথম ভয় পাবার দিনের কথা এইবার মনে পড়েছে। অনেকদিন আগের কথা। বোধহয় তখন থার্ড ক্লাশে পড়ি (আজকালকার ক্লাশ এইট)। পুজোর ছুটিতে বিদেশ থেকে সবাই বাড়ী এসেছেন। আমার ছোটদাদু (বাবার কাকা) এলাহাবাদে হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করেন। বয়সে প্রবীণ ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন। জ্ঞাতি বড় জ্যাঠামশাইও কম যান না। মহকুমা-হাকিম বা জেলার জজ—এইরকম একটা কিছু। সেদিন বোধহয় অষ্টমী কিংবা নবমী পুজোর দিন। রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার ফলে সকালবেলার রোদটা মিঠে লাগছিল। বড়রা দুই বাড়ীর মাঝের খোলা জায়গায় রৌদ্র সেবন, খবরের কাগজ পাঠ, খোসগল্পে মেতেছিলেন। আমরা ছোটরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম, আর নিজেদের মধ্যে দুপুরের প্রোগ্রাম ঠিক করছিলাম। তাঁদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে ধীরে ধীরে উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছিল: আমরা ছোটরা সেদিকে খেয়াল করিনি। হঠাৎ তুমুল চীৎকার, হৈ-

চৈ, ক্রুদ্ধ গর্জনে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি, দাদু ও জ্যাঠামশাই সেনাপতি হয়ে দুই দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ পরিচালনা করছেন। একদলে আমাদের পরিবারের বড়রা; অন্য দলে পাশের বাড়ীর বয়স্করা। পরস্পরকে যথারীতি বাক্যালাপে বিধ্বস্ত করে, দুই সেনাপতি নিজেদের বাসগৃহের দিকে ছুটলেন। না, রণে ভঙ্গ দিয়ে নয়। বাকযুদ্ধটাকে শস্ত্রযুদ্ধে পরিণত করার চেষ্টায় তাঁরা নিজেদের অস্ত্রের সন্ধানে ছুটেছেন। ছোটদাদু নিয়ে এলেন তাঁর গাদা বন্দুক, আর জ্যাঠা নিয়ে এলেন পাঁঠা বলি দেওয়ার খাঁড়া। ব্যাপারটা বিনা রক্তপাতে থামত না; যদি না সত্তর বছরের কর্তামা যুযুৎসু দুজনের মাঝখানে এসে না দাঁড়াতেন। দৃশ্যটা মনে পড়াতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। মেয়েরা ছোটরা গলা ছেড়ে কাঁদছে, বড়রা গজরাচ্ছেন; দাদু বন্দুকের নিশানা ঠিক করছেন, জ্যাঠামশাই বিরাট খড়্গখানা দু-হাতে মাথার উপরে তুলে ধরেছেন। আর মাঝখানে শ্বেতাম্বরা কর্তামা শ্বেতপতাকা হয়ে দু-দলের মধ্যে বিরাজ করছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শান্তি স্থাপিত হল। দুপক্ষই লজ্জিত হয়ে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়লেন। এমনি সময় জ্যাঠামশাইদের চণ্ডীমণ্ডপে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক। মা এসে আমার হাত ধরে পুজো দেখতে নিয়ে গেলেন। চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে পা দিয়ে আমার নজরে পড়ল হাঁড়িকাঠের দিকে। রক্তে লাল। উঠোনের অনেকটা জায়গা রক্তে ভেজা। আমার পায়ে গরম গরম ভিজে ভিজে কি যেন লাগল। তাকিয়ে দেখি হাঁড়িকাঠের কাছ থেকে একটা ক্ষীণ রক্তের স্রোত আমার পায়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমার মাথা ঘুরে উঠল। হাত-পা কাঁপতে লাগল। বমনোদ্রেক হল। মায়ের আঁচলটা নিয়ে চোখদুটো ঢাকলাম। ফিস-ফিস করে মাকে বোধহয় বলেছিলাম, বাড়ী যাব, আমার ভয় করছে। তারপর আর কিছু মনে নেই। আমি জ্ঞান হারালাম। এখন মনে পড়ছে, জ্ঞান হলে দেখলাম আমাকে ঘিরে দু-বাড়ীর সব লোক। পাশাপাশি বসে আছেন ছোটদাদু আর জ্যাঠামশায়। এত বড় ঘটনাটা এতদিন আপনাকে বলিনি কেন? মনে ছিল না,—বললে ঠিক হবে না। আমার ভয়ের অসুখের সূত্রপাত এখানে। আজ সেটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি। ওহো, কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল, সেটাই আপনাকে বলা হয়নি। গান্ধী আর সি আর দাশের মতপার্থক্য নিয়ে দাদু আর জ্যাঠামশাই-এর তর্ক সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে,—একথা বোধহয় আপনি ভাবতেও পারেন না। দাদু ছিলেন অহিংসার উপাসক গান্ধীর দলে, আর তিনিই প্রথম বন্দুক টেনে বের করেছিলেন। জ্যাঠামশায় বিচারক; হত্যার দায়ে ফাঁসির রায় না লিখলেও, মারাত্মক আঘাতের জন্যে অনেক আসামীকে সাজা দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তিনিই মারাত্মক আঘাতের জন্যে খড়্গধারণ করেছিলেন। সেই থেকে আমার ভয়। আসল ভয় কি জানেন? আমি যদি দাদু-জ্যাঠামশাইদের মত ক্রোধ সংবরণ করতে না পারি, তাহলে কি হবে?—এই চিন্তা বোধহয় কিশোর বয়স থেকে আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি বোধহয় স্বভাবভীরু নই। আত্মসংযমের, ক্রোধ দমনের অতিরিক্ত চেষ্টার ফলেই বোধহয় আমার স্নায়ুতন্ত্র, আপনারা যাকে 'ইনহিবিটরী' (নিস্তেজনা-প্রধান) বলেন, তাই হয়ে গেছে। রক্তের ভয় মানে ক্রোধ দমন না করতে পারার ভয়। রাস্তাঘাটে গণ্ডগোল, হৈ-চৈ থেকে দূরে থাকি, —ভয়, পাছে কোনো পক্ষাবলম্বন করে ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলি। কোনো দল বা গ্রুপের সঙ্গে একতা বোধ করতে ভয় পাই; পাছে সেই দল বা গ্রুপের হয়ে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে আমার দ্বিতীয় রিপুকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলি। এমনকি, চাকরীর জায়গায় কারুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রমোশন পেতে হবে ভাবলে আমি ঘাবড়ে যাই। মানবীয় মস্তিষ্ক, যাকে আমরা 'নিউ ব্রেইন' বলি, পুরনো জৈব মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক দুর্বল। তাই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব; কোনো ব্যাপারে 'ইনিশিয়েটিভ' নিতে চাই না; সব ব্যাপারে উদ্যমহীন নিষ্ক্রিয় থাকতে চাই। মনে হয়, রিপু দমন আমার সাধ্যাতীত।

এত সুন্দরভাবে আত্মবিশ্লেষণে খুব কম রোগীই সক্ষম। অনেক কথা তিনি বললেন; কিন্তু একটি কথাও অপ্রাসঙ্গিক নয়। কয়েকদিন ধরে বিরামবাবুর সঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদির শারীরবৃত্তিক মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা করলাম। মানব-মস্তিষ্কের তিনটি স্তর : একটি শর্তহীন পরাবর্তের; আর দুটি শর্তাধীন পরাবর্তের স্তর (প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর)। সুস্থ মানুষের এই তিনটি স্তর পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। যাকে তিনি 'নিউব্রেইন' বলছেন, সেই 'নিউব্রেনের' দ্বিতীয় সাংকেতিক বা বাকভিত্তিক স্তরের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার নিদর্শন হিসেবে দু-একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবরও তাঁকে জানালাম।

মানুষ প্রবৃত্তি বা রিপুর দাস নয়। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ পরিবেশে রিপু প্রবল হয়ে উঠতে পারে, সাময়িকভাবে উচ্চমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনা যায়। এইভাবে ব্যাখ্যামূলক চিকিৎসার সঙ্গে সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন চিকিৎসাও চলল। বিরামবাবুর ভয় ক্রমশ দূর হল, দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আয়ত্তে এল। 'লো-প্রেসারের' ভয় চলে গেল। অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলেন।

দাদু ও জ্যাঠামশায়ের মস্তিষ্কের বিশেষত্ব, তাঁদের উত্তেজনাপ্রবণতার স্থান-কালনির্ভরতা, অন্য একটি রক্তাতঙ্কের কেস-প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

—মনোবিদ

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩)

জায়গাটা বড় নির্জন, পুকুরটা প্রাচীন। মজা দিঘির মতো দাম এবং কচুরিপানায় ঠাসা। পাড়ে পাড়ে কত বিচিত্র গাছ-গাছালি গভীর বনের সৃষ্টি করেছে। ছোট বড় লতার ঝোপ—পায়ে হাঁটা সামান্য পথ। পথে শুকনো ঘাস পাতা। মাটিতে মরা ডাল, পাখির পালক। বোধহয় মাথার উপরে প্রাচীন এক অর্জুনের ডালে পাখিদের রাতের আস্তানা। তার নিচে কত যুগ ধরে, মাছের এবং মানুষের হাড়, গরু বাছুরের হাড়। পাশেই এক জরদ্গবের মতো কড়ুই গাছ। গাছটার ভিতর কত বিচিত্র খোঁদল, ডালপালা নিয়ে প্রায় যেন আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে সব মৃত ডাল গাছের, ডালে ডালে হাজার হবে সব শকুন সার সার বসে রয়েছে। ওরা গাছটার নিচে যেতে সাহস পেল না। কিন্তু এইটুকু পথ পার না হতে পারলে ওরা অকালের ফল বকুল ফল খুঁজে পাবে না। বকুল গাছটা বড় নয়, ছোট। ঝোপ জঙ্গলে গাছটাকে খুঁজে বের করা কঠিন। গাছটার খোঁজ-খবর ফাতিমাকে জোটন দিয়ে গেছে। আবেদালির দিদি জোটন আবেদালির জন্য একটা মুরগি এনেছিল, মুরগিটা উড়াল দিয়ে চলে গেল হাজি সাহেবের আতা বেড়াতে। আতা বেড়ার পাশে ছোট বিবির সঙ্গে দেখা, জোটনকে ছোটবিবি বলল, মুরগিটা মাঠের দিকে নেমে গেছে। মাঠে নামলেই মনে হল জোটনের দূরে কি একটা কেবল ছুটছে। বুঝি কুকুর হবে। বেড়াল হতে পারে। মাঠের উপর দিয়ে অকারণে ছুটে পালাচ্ছে। মাঠে নামতেই হাজি সাহেবের ছোট বেটার সঙ্গে জোটনের দেখা।— ঐ যায়, যায়। দেখা যায়। সব সলাপরামর্শ যেন ঠিক ছিল। ছোট বেটা জোটনকে অকারণ সেই মাঠের দিকে হাত তুলে মুরগির খোঁজে যেতে বলে দিল।

জোটন মুরগিটা চুরি করে এনেছিল আবেদালিকে খাওয়াবে বলে। জোটনের ধারণা এখন সেই মুরগি ফাঁক বুঝে তার গ্রামের দিকে পালাচ্ছে। পোষা মুরগি, বড় সোহাগের মুরগি মৌলভিসাবের। আদরের মুরগি মাঠের উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। সে কি ভেবে তাড়াতাড়ি মুরগি ধরার জন্য ছুটতে থাকল। যদি এ-মুরগি চলে যায় আর যদি টের পায় মৌলভিসাব, মুরগি যাবার পথে জোটন চুরি করে নিয়ে গেছে তবে আর রক্ষে থাকবে না। সেই মুরগি যখন দূর থেকে অস্পষ্ট, মনে হচ্ছে কি একটা ট্যাবার পুকুর পাড়ে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, তখন জোটনও না ছুটে পারল না। এত সখ করে, এত কুরশিস করে মুরগিটা ধরে এনেছিল আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, এখন হায় সেই মুরগির চৈতন্য উদয়। কি হবে! কি হবে! সুতরাং ছোটা ভাল। মুরগি ধরার জন্য জোটন কাপড় হাঁটুর উপর তুলে ছুটতে থাকল। ছুটতে ছুটতে ট্যাবার পুকুর পাড়ে, ভিতরের জঙ্গলে। কিন্তু শেষে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। মুরগিটা যদি গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে, উঁকি দিয়ে দেখতে থাকল। তখন মুরগির গলা টিপে ধরেছে ছোটবিবি। হাজি সাহেবের ছোট-বিবি মুরগির গলা কেটে হাতের ভিতর শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে উঠবে। তখন বনে বনে জোটন খুঁজছিল, হায় মুরগি তুই কোথায় গেলি! ঝোপে জঙ্গলে জোটন মুরগি খুঁজতে এসে কপাল থাপড়াতে থাকল। তখন মনে হল ঝুঁটিতে লাল রঙ মুরগির, ঝোপের ভিতর লাল রঙের কি যেন দেখা যায়। সে লোভে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বনের ভিতর ঢুকে পড়ল। কিন্তু হায় ঢুকে দেখল গাছের ডালে লাল লাল বকুল ফল। অকালে বকুল ধরেছে গাছটাতে। পাকা ফল দু-চারটে নিচে পড়ে আছে। একটা বিড়াল কি নেড়ি কুকুর এই বাগের ভিতর ঢুকে গেল আবছা অস্পষ্ট শীতের রোদে দূরে থেকে বিড়াল কুকুর না অন্য কোন জীব ধর যাচ্ছিল না। জোটন ভেবেছিল, ওর মুরগি পালাচ্ছে। নাকের বদলে নরুন পাবার মতো জোটন মুরগির বদলে বকুল ফল তুলে নিল সেই ফল এনে সে ফতিমার হাতে দিয়েছে আর বলেছে সেই আশ্চর্য বকুল ফলে গাছটা বনের ভিতর লুকিয়ে আছে।

গাছটার অনুসন্ধানে এসে সোনার ভ ধরে গেল। সে বলল, আমার ডয় করতাে ফাতিমা।

—ডর কিয়ের। আইয়েন আপনে। বলে ফাতিমা সোনার হাত ধরে কড়ুই গাছটার দিকে তাকাল। বড় বড় শকুন, ওরা নির্বিঘ মনে বসে আছে। কা গাছটার দিকে তাকালেই সোনার বুকটা বাড়ছে। ওর শকুনের রাজা গৃধিনীকে দেখতে পেল, মগ ডালে বসে রাজার মতো ভাবছে পৃথিবীর কোথায় কোন মৃত জীব পড়ে আছে বাতাস শুঁকে টের পাবার চেষ্টা করছে অন্য শকুনগুলি ঠোঁট গুঁজে বোধহয় ঘুমোচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো ঘাড় নিচু করে ওদের একবার দেখে নিল—ছোট ছোট দুই কাঠের পুতুলের মতো মনুষ্যকুলের দুই জীব নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শকুনের রাজা সবসময় জেগে। সে ক্ষুধার জন্য শিকারের খবর দেবে। সেই একমাত্র উঁচু মুখে আকাশের অন্য প্রান্তে কি উড়ে যাচ্ছে, কারা উড়ে যাচ্ছে, কত হবে......আর যদি মৃত জীবের গন্ধ ভেসে আসে, সে প্রথমে দু পাখা বাতাসে ছড়িয়ে দেবে, তারপর উড়তে থাকবে আকাশে—প্রায় তখন মনে হয় নির্বাণ লাভের মতো এইসব বড় বড় পাখি কোনো এক অদৃশ্য জগতের সন্ধানে উড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রাজা শকুনটা ওড়ার বদলে কেবল উঁকি দিয়ে ওদের দেখছে। ফাতিমা, যে ফাতিমা, একা গোপাটে ছাগল নিয়ে আসে, যে মাথায় করে সানকিতে নাস্তা নিয়ে যায় জমিতে, যার ভয়ডর একেবারে কম—পাট খেত বড় হলে অথবা নির্জন মাঠের ভিতরে যখন বড় বড় পাট গাছগুলি ফাতিমার মাথা পার হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায়, যখন সামনের আলপথ সিঁথির মতো, দুধারে পাটগাছ ঘন বনের সৃষ্টি করে রাখে তেমন পথে কতবার ফাতিমা একা একা চলে এসেছে ছাগলটার দড়ি ধরে—সেই ফাতিমা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। রাজা শকুনটা নিচের দিকে উঁকি দিলে সে লাফ দিয়ে ছুটতে চাইল সোনাবাবুর হাত ধরে।

যেন এই গাছটা গল্পের সেই সদর দেউড়ি—গাছটা রাক্কস খোক্কসের মতো সদর দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছে। সদর দেউড়ি পার হতে পারলেই ফুল-ফল রাজকন্যা মিলে যাবে। ফাতিমা সাহসে ভর ক'রে ফুল-ফলের জন্য এবং সেই অত্যাশ্চর্য জগতের জন্য সোনাবাবুকে ঠেলে-ঠুলে পাখির পালক, মাছের হাড়, মানুষের হাড়, পাখিদের মলমূত্র অতিক্রম ক'রে বনের ভিতর ঢুকে গেল। ভিতরে বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। পাখিরা ডাকছিল। প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা গিরগিটি ক্রুপ ক্রুপ শব্দ করে ডাল থেকে পাতায় উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। জায়গাটা বড় নির্জন, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে সোনার। কোথাও

কেবল মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দূরে কে যেন কেবল কাঠ কেটে চলেছে—তার শব্দ ভেসে আসছে। কান পাতলে ঢাক ঢোলের শব্দ শোনা যায়। ওরা এমন একটা জায়গায় চলে এসে এই প্রথম পরস্পর অসহায় চোখ তুলে তাকাল।

ফতিমা বলল, সোনাবাবু, আপনেরে ছুইয়া দিছি। বাড়ি গেলে সান করতে হইব।

সোনা মার ভয়ে বলল, তুই ছুইলি ক্যান আমারে।

—আমি ছুইলাম, না আপনে ছুইলেন। বাঁশিতে ন্যাক-চাবিটা আপনে দ্যাখলেন না!

—মার শুনলে আমারে মারব। সোনার চোখের উপর সেই দুপাটী এতক্ষণে ভেসে উঠল। সেই বর্ষার মতো। সে ফতিমার আঁচলে প্রজাপতি বেঁধে দিয়েছিল বলে—মা ওকে খুব মেরেছিল। ফতিমার কথায় সোনার যথার্থই ভয় ধরে গেল। বলল, তুই কইস না। আমি তরে ছুইয়া দিছি মারের কইস না।

—আমি কইতে যামু ক্যান!

—কইলে ঠিক মায় আমারে মারব।

—কোনদিন কমু না।

—তিন সত্য।

—তিন সত্য।

সোনা যেন এবার একটু নিশ্চিন্ত হল। ফতিমা না বললে, এ-কথা কেউ আর জানতে পারবে না।

চারিদিকে বড় বড় গাছ। অপরিচিত গাছ। ঝোপ-জঙ্গলে লতায় পাতায় প্রায় কোথাও কোথাও নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে। ওরা সেই অরণ্যের ভিতর বকুল গাছটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন ওরা বলতে চাইছে, বৃক্ষ তুমি এতদিন কার ছিলে?

বৃক্ষ উত্তর দিল, রাক্ষসের।

—এখন কার?

—এখন তোমাদের।

—তবে তুমি আমাদের ফল দাও। বকুল ফল।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এগুতে পারছে না। চার পাশটায় যেন জঙ্গলের শেষ নেই। কতদূর হেঁটে যাওয়া যেন এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে! শুকনো ঘাস-পাতা পায়ের নিচে। কত দীর্ঘদিনের মানুষ-বিবর্জিত জায়গা! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে অথবা সন্তর্পণে কাঁটাগাছ পার হবার জন্য ছোট ছোট লাফ দিচ্ছিল। আর মনে মনে সেই গল্পের মতো বলা, বৃক্ষ তুমি কার ছিলে?

—রাজার ছিলাম।

—এখন কার?

—এখন তোমার।

—তবে ফল দাও। বকুল ফল।

বৃক্ষ কখনও রাজার, কখনও রাক্ষসের বৃক্ষ অঃ বৃক্ষ! ওরা বৃক্ষ বৃক্ষ বলে চেঁচাতে থাকল। কোথায় গেলে তুমি বৃক্ষ। ওরা বনের ভিতর হেঁকে ডেকে বেড়াতে থাকল। ওরা কেবল গাছটার অন্বেষণে আছে। মগডালে বসে শকুনেরা চিৎকার করছিল, বনের বিচিত্র সব শব্দ উঠছে ঘস-ঘস—ডালে ডালে পাখিদের কলরব ছিল আর ছিল দুই বালক-বালিকা। ওরা ভয়ে ভয়ে বকুল গাছটার উদ্দেশ্যে হাঁটছে।

আর ঠিক তখন মনে হল বনের ভিতর কে বা কারা যেন হুম্ হুম্ শব্দ করে ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, ঠাকুমার কাছে শোনা গল্পের সেই ভূত প্রেত অথবা ডাকিনী যোগিনীর মতো। ফতিমা ফিস-ফিস করে বলল, সোনাবাবু ঐ শোনেন!

সোনা একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসেছিল। ও আর হাঁটতে পারছিল না। পায়ে লাগছিল। পায়ে কাঁটা ফুটেছে। ওর মনে হল এখন এইসব ফেলে খোলা মাঠের ভিতর নেমে যেতে পারলে বেশ হত। কিন্তু মনে মনে বড় শখ অকালের সেই বকুল ফলের। নিতে পারলে বড়দা মেজদা ট্যারা হয়ে যাবে। আমারে একটা দে, সোনা বড় ভাল পোলা, দে দে একটা দে বলে বড়দা মেজদা ওর চারপাশে ঘুর-ঘুর করবে। ফতিমাও বড় শখ করে এই বনের ভিতর পালিয়ে এসেছে ফল নেবে বলে। কিন্তু বনের ভিতর সেই হুম-হুম শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

বনের ভিতর ওরা চুপচাপ বসেছিল। ওদের ভিতরে আতঙ্ক—এবারে কিছু একটা হয়ে যাবে। ওরা পালাতে গিয়ে ঘন গাছ-পালার ভিতর ক্রমে আরো হারিয়ে যাচ্ছিল। বনটা যে ভিতরে ভিতরে এত বড় ওদের জানা ছিল না। বনের ভিতর ঢুকে গেলেই গাছটা সদর দেউড়ির সেপাইর মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং ওদের অঞ্জলিতে বকুল ফল ভরে দেবে এমন একটা ধারণা ছিল। কিন্তু হায় এখন ওরা এত ভিতরে ঢুকে গেছে যে, কোনদিকে গেলে মাঠ এবং পরিচিত পথ মিলে যাবে বুঝতে পারছে না। ফতিমার মুখ চোখ শুকনো দেখাচ্ছে। বনময় সেই শব্দ কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এইসব জঙ্গলের ভিতর কে বা কারা সহসা সহসা অট্টহাস্য করছিল। ঠাকুমার গল্পের মতো যেন কে বা কারা বলছে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। ওরা ভয়ে, মৃত্যুভয়ে চোখ মুখ বন্ধ ক'রে সামনের ঘাস, শুকনো পাতা, জঙ্গল যা কিছু সামনে পড়ছে সব সরিয়ে ছুটছে। অথচ বাইরের খোলা মাঠ এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওরা শুকনো ডাল, পাখির পালক, মাছ এবং মানুষের হাড় অতিক্রম করে কেবল ছুটতে থাকল। কিন্তু সামনে আর পথ নেই, ফের পেছনের দিকে ছোটা! অথচ সেই এক অট্টহাসি পিছনে ছুটে আসছে তো আসছেই। ডালপালা ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে ওদের ধরার জন্য ছুটে আসছে। সূর্যের অমিত তেজের মতো বনের ভিতর সেই এক অট্টহাসি গাছপালা ভেঙে দুম-দাম শব্দ ক'রে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

তখন মাঠের ভিতর হুম-হুম শব্দ। রাজ-রাজেশ্বর কি জয়! জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়—কারা যেন মাঠ ভেঙে এমন বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। সোনা ভয়ে গাছ-পাতার ভিতর লুকিয়ে পড়ল। ফতিমাও জঙ্গলের ভিতর মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। আর মুখ তুলতেই দেখল, ঝোপের ভিতর থেকে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজনের একটা দল খোলা মাঠের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ষোলজন লোক বাঁশের ভিতর কাটা মোষটা ঝুলিয়ে নিয়েছে। চার পা বাঁধা কাটা মোষটা মরা গরু-বাছুরের মতো ঝুলছে। ঠিক পেটের মাঝখানে বসানো কাটা মোষের মাথাটা। দড়ি দিয়ে মাথাটাকে পেটের উপর বেঁধে রাখা রয়েছে। মাথাটা চোখ খুলে রেখেছে, কান ঝুলিয়ে রেখেছে। এবং শস্যবিহীন মাঠ দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। লোকগুলি জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়, রাজ-রাজেশ্বর কি জয় বলতে বলতে নেমে যাচ্ছে। ওরা ঝোপের ভিতর প্রায় যেন শ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য এখন শুধু চোখের উপর ভাসছে। গলা এত শুকনো যে, ওরা ডাকতে পর্যন্ত পারল না। বলতে পারল না। আমরা ঝোপের ভিতর আটকা পড়েছি। কোনোদিকে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমরা মরে যাব।

লোকগুলো কাটা মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে যারা আসছে, তাদের মাথায় চাল ডাল। একটা মোষের মাংস খাবার মতো মানুষের জন্য চাল ডাল তেল। ওরা শীতলক্ষার পার থেকে এসেছে। পুজোর প্রসাদ মোষের মাংস ফেলতে নেই। তাই এইসব মানুষ এসেছে শীতলক্ষার পার থেকে এই কাটা মোষ নিয়ে যেতে। ওরা মোষটা নিয়ে যেন পালকি কাঁধে বেহারা যায়—হুঁ হোম না, যেন বরের সঙ্গে বধূ যায় হুঁ-হোম-না, যেন মোষের পেটে কাটা মাথা যায় হুঁ হোম-না! বড় কুৎসিত এই দৃশ্য। মুণ্ডুবিহীন মোষ পেটে মাথা নিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে। বনের ভিতর তখন ডালপালা ভেঙে বেড়াচ্ছে [illegible] অট্টহাস্য, অট্টহাহা! মগডালে শকুনের আর্তনাদ, ঝিঁ-ঝিঁপোকার ডাক এবং সেই দ্রুত ডাল-পালা ভাঙার শব্দ—ওরা ভয়ে এবার চোখ বুজে ফেলল। কারণ বনের ভিতর পথ করে সেই অট্টহাস্য ওদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ওদের দুজনকে শক্ত দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরেছে। মাটি থেকে টেনে উপরে তুলে নিচ্ছে। যেন দুই পুতুল। সোনা রুপোর পুতুল। দৈত্যটা দুই কাঁধে দুই সোনা-রুপোর পুতুল ফেলে বনের বাইরে বের হয়ে এল। তখন দুই পুতুল প্রাণ পেয়ে ঝলমল করে উঠছে। দৈত্যটা বুঝি এত আনন্দ আর [illegible] সামলাতে পারছিল না। চিৎকার করে উঠল, গ্যাৎ চোরেৎ শালা!

তখনও মাঠে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। বাস্তুপুজো শেষ হলেই পরি পুজোর মেলা। মেলায় দোকানপত্র যাচ্ছে গোপাট ধরে। বাঁশ কাঁধে মানুষ যাচ্ছে। ত্রিপাল মাথায় মানুষ যাচ্ছে। সোনালি বালির নদীর জলে এখন কত সওদাগর নৌকো ভাসাল। বাদাম তুলে খাড়ি ধরে ব্রহ্মপুত্রে পড়বে। তারপর ফের বাঁক নিলে সেই প্রকাণ্ড বিল—পাঁচ ক্রোশের মতো বিল

রয়েছে। খালের জল বিলে পড়েছে। বিল পার হলেই মেলার প্রাঙ্গণ। বড় কাঠের পুল পার হলে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের পাশে সারকাসের তাঁবু পড়েছে।

সেই বিলের কথা মনে পড়ছিল পাগল ঠাকুরের। তিনি সোনা এবং ফতিমাকে মাঠে এনে ছেড়ে দিলেন। সোনার সব ভয় উবে গেছে। ফতিমা পর্যন্ত এখন হি-হি করে হাসছে। ওরা বাড়ি ফেরার জন্য দৌড়াতে লাগল। বেলা পড়ে আসছে, শীতের বেলা। সামসুদ্দিন ঢাকা গেছে। আজ ঢাকা থেকে ফেরার কথা। ফতিমা দ্রুত ছুটতে থাকল। ঢাকা থেকে বা'জান কাচের চুড়ি কিনে আনবে। ফিরে ফতিমাকে বাড়ি না দেখলে খুব রাগ করবে বা'জান। কানের দুল আনবে।। মার জন্য ডুরে শাড়ি আনবে। বা'জান সময় অসময় নেই শহরে চলে যায়। দু-চার দিন পর ফের ফিরে আসে। সেই ঢাকাশহরে বড় হলে ফতিমা যাবে। যেতে যেতে তেমন গল্পও করল ফতিমা।

সোনা বলল, আমি-অ যামু। বাবায় কইছে বড় হইলে আমারে লইয়া যাইব।

—বা'জী কইছে আমারে সদর ঘাটের কামান দেখাইব।

—বাবায় কইছে আমারে সদর ঘাটের কামান দেখাইব। রমনার মাঠ দেখাইব। বুড়িগঙ্গার জলে সান করাইব।

—বা'জী কইছে লিখা-পড়া শিখলে মোটরে চড়াইব।

—বাবায় কইছে ফাস্ট হইলে রেলগাড়ি কইরা ঢাকায় নিয়া যাইব।

—রেলগাড়ি ছোট। ছোট গাড়িতে সোনাবাবু যাইব!

—মোটরগাড়ি রেলগাড়ির ছোট।

—হু কইছে? ফতিমা সোনার মুখের সামনে গিয়ে মুখ বাঁকাল।

—কিছু জানস না ছেরি, দিমু এক থাপ্পর।

—দ্যানত দ্যাখি। থাপ্পড় দিবেন। আপনের মায়রে কইয়া মাইর খাওয়ামু না তবে। কমু সোনাবাবু আমারে ছুইয়া দিছে।

—আমি [illegible] তরে ছুইয়া দিছি, তুই কইয়া দিবি!

—তবে মোটরগাড়ি ছোট এভা কন ক্যান!

—আর কমু না।

ফতিমা আর দেরী করল না। এই বাবুটির উপর বিজয়িনী হয়ে উল্লাসে ছুটছে। মাথার চুল উড়ছে। কোমর থেকে ডুরে শাড়ি খুলে পড়ছে। ছুটতে ছুটতে কোনোরকমে প্যাঁচ দিচ্ছে কোমরে। কোনো-রকমে কাপড় সামলে মল বাজিয়ে ছুটছিল। পায়ে মল, রুপোর মলের ভিতর ছোট লোহার দানা। ফতিমা ছুটছিল আর পায়ের মল বাজছিল ঝম-ঝম। ছুটতে ছুটতে দুবার ফিরে তাকাল পিছনে। সোনাবাবু এতটুকু নড়ছে না, সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ছে। ফতিমা বিজয়িনীর মতো ঘুরে ফিরে লাফ দিল, হাঁটল, দুপা এগিয়ে ফের লাফ দিল। ফের ঘুরে ফিরে চরকি বাজির মতো মাঠের উপর ঘুরছে। যেন এক চঞ্চল খরগোস কচি ঘাস থেকে এক কামড় খাচ্ছে, দু-কামড় নষ্ট করছে। ফতিমা মাঠের উপর দিয়ে চঞ্চল খরগোসের মতো ছুটছিল, কিন্তু মনে মনে সোনা, যে সোনার শরীরে সব সময় চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, যে সোনাবাবুর মুখ ঘাসের মতো নরম, কচি কলাপাতার মতো যে লাজুক তেমন মানুষকে মাঠে একা ফেলে যেতে কেমন কষ্ট হচ্ছিল ফতিমার। ফতিমা এবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে ডাকল, আইয়েন, আমি খাড়াইছি।

সোনা রাগে এবং ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল, না আমি যামু না।

ফতিমাও গলা ছেড়ে বলল, আপনে না আইলে, আমি-অ যামু না।

দুজন দু জমির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকল। সোনা কিছুতেই নড়ছে না। ফতিমা ছুটে সোনার নাগালে চলে গেল।—চলেন।

—না আমি যামু না।

—চলেন। না-হয় আপনের রেল-গাড়িটাই বড়। তারপর ফতিমা আরও কি যেন বলতে চেয়েছিল। বলতে পারল না। অথবা মনের ভিতর হয়ত এমন কথা উঁকি মারতে পারে—মেলায় গেলে আমরা রেল-গাড়িতে যাব। বড় গাড়ি না হলে আমরা দুজনে যাব কি ক'রে। অথচ ফতিমা কথাটা প্রকাশের ভাষা ঠিক খুঁজে পেল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। তারপর সোনার হাত ধরে বলল, আমারে একটা কারতিক পূজার ছিরাঘট দিবেন!

—দিমু।

—আইয়েন ইবারে মাঠের উপর দিয়া ছুটি। ওরা হাত ধরে শীতের রোদে কিছু-ক্ষণ ছুটে দেখল, পুকুরপারে মালতী। ওরা তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল। হাত ছেড়ে দিয়ে দুজন দুদিকে ছুটতে থাকল।

সেই যে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল আর থামছে না। পঞ্চাশটা ঢাকী অনবরত ঘাড় কাৎ করে বাজাচ্ছে তো, বাজাচ্ছেই। সরকারদের বাস্তু পূজা অঞ্চলে বিখ্যাত। লোকজনের সীমা সংখ্যা নেই। আত্মীয় কুটুম, গ্রামের নিবাসীগণ, কিছু গরীব প্রজা আর সব মাতব্বর ব্যক্তি লাঠি হাতে ঘোরা-ফেরা করছিল। পুকুর পাড়ে হাজার মানুষ হবে, দূর দূর গ্রাম থেকে ওরা এসেছে। ধোপা নাপিত নমশূদ্র। ওরা পাত পেতে খিচুড়ি খাচ্ছে। আর মাঠের উপর দিয়ে মোষ যাচ্ছে, সেই যেন পাল্কি কাঁধে বেহারা যায়। ওরা মুসলমান গ্রামগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিব ঠাকুর কি জয়, রাজ রাজেশ্বর যজ্ঞেশ্বর কি জয় এইসব বলছিল। পেটে মাথা নিয়ে মোষ চলছে। মাঠের উপর, ঘাসের উপর বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে—ধর্ম আমাদের সনাতন, এত কচি মোষ তল্লাটে বলি হয় না। এত বড় খাঁড়া তল্লাটে আর কার আছে। আর এই ধর্মের মতো পূতপবিত্র কি আছে—জয় রাজ রাজেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর কি জয়। বিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মানুষগুলি কাটা মোষ বাঁশে ঝুলিয়ে জয়ধ্বনি করছিল। বিলের গরীব দুঃখী মানুষগুলি যারা শালুক তুলতে এসে জলের ভিতর সাদা হয়ে যাচ্ছে—হাত পা ঠান্ডা—এবং শীতে শিথিল হয়ে যাচ্ছে, যারা মাঝে মাঝে পাড়ে বসে রোদ পোহাচ্ছিল, তারা পাড়ের উপর দেখল বিন্দু বিন্দু এক ঝাঁক পাখির মতো মানুষগুলি কাঁধে মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার কাটা মোষের পেটে মাথা, মাথাটা হড়কে পিছে পড়ে গেল। এত খাড়া ছিল বিলের পাড় যে পড়বি তো পড়বি একেবারে সেই গরীব দুঃখীদের পায়ের কাছে। সহসা এমন কাণ্ড! ধড়-বিহীন মুন্ড ওদের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

মোষের কাটা মুন্ড দেখে ওরা তোবা তোবা বলে উঠল। এক কোপে কাটা মুন্ড দেখে ওরা কেমন গুনাহ করে ফেলল। এত বড় বিলে ওরা দুঃখী মানুষ সব শালুক তুলতে এসে এমন কুৎসিত দৃশ্য দেখে ফেলে চোখে কানে কেমন আঙুল দিল অথবা বুঝি ভয়, এই যে বিল দেখছ, বড় বিল, বিলে কত না কিংবদন্তী, কত না সাপ খোপ অজগর আর কত না জলজ ঘাস জলের ভিতর। লতাপাতা, কীট পতঙ্গ, বড় বড় জোঁক নাকে কানে ঢুকে গেলে কে কাকে রক্ষা করে! সুতরাং ওরা মুন্ডটার দিকে আর তাকাল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবারে ঘরে ফিরতে হয়।

শীতকাল বলে উত্তরের হাওয়া ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। আকাশ বড় পরিচ্ছন্ন। মনে হয় এবার পৃথিবী উজাড় করে সব ঠান্ডা এই মাটির উপর, এই বিলের উপর নেমে আসবে। এতক্ষণ বিলের জলে সহস্র পাতিল ভেসেছিল, এখন একটিমাত্র পাতিল জলে ভাসছে। জলে একা এক পাতিল ভাসলে বড় ভয়। সেই পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল! দ্যাখো দ্যাখো পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল!

সূর্য তেমনি অস্ত যাচ্ছিল। শালুক ফুল ফোটে না আর। দূরে সব পদ্মপাতা, পদ্মপাতার পাশে ছোট এক পাতিল একা একা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। মানুষটা কোথায় গেল! পাতিলের মানুষটা! জলের মানুষ সব পাড়ে উঠে এসেছে। যে যার শালুকের পাতিল মাথায় পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—একটা পাতিল বিলের জলে উত্তরের হাওয়ায় ভেসে ভেসে গভীর জলে চলে যাচ্ছে।

কে তখন হাঁকল, দ্যাখো বিলের জলে পাতিল ভাইস্যা যায়।

কে তখন ফের হাঁকল, দ্যাখো পানির তলে মানুষ ডুইবা যায়।

কিন্তু এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধা, মুখে জরার চিহ্ন, মুখে ক্লিষ্ট চেহারা, সে জোর গলায় হাঁকরাতে থাকল, বিল আবার একটা মানুষ কাইড়া নিল। সেই বৃদ্ধা নিয়তির মতো দাঁড়িয়ে যেন বলতে চাইল, এটা হবেই। সালের পর সাল বিল ক্ষুধা নিয়ে জেগে থাকে। ফাঁক পেলেই গিলে খায়। কিন্তু মানুষটা কে? কে ডুবে গেল জলে!

(ক্রমশঃ)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এদিকে সুতরাং নাট্যভারতী রাধানাথবাবুর হাত থেকে মুরলী চাটুজ্যের হাতে গেছে।

নাট্যভারতীর চলতি নাটক কঙ্কাবতীর ঘাট। ৪ জানুয়ারীর অভিনয় ছিল ৪৬ আর ৪৭তম অভিনয়।

যথারীতি অভিনয় হলো। অভিনয় শেষে মুরলীবাবুর কাছে জানানো হলো, পঞ্চাশতম অভিনয় রজনী আসন্ন ঐদিনে জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার।

মুরলীবাবু আপত্তি করলেন। এ সময়ে ওসব উৎসব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নাট্যজগতেরও যেমন খবর আছে, তেমনি প্রতিটি খবরের ওপর এখন যুদ্ধের খবর। ৪ জানুয়ারীর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে রেঙ্গুন শহরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হয়েছে।

যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল থাকতে চায়। তাছাড়া যুদ্ধের বিভীষিকা যেভাবে ভারতের মাটির দিকে এগিয়ে আসছে—সেটাও মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।

এদিকে কোলকাতা শহরবাসীদের মনের ওপর আতঙ্কের ছায়াটা আরো জাঁকিয়ে বসছে। এ আতঙ্ক যাবার নয়। প্রতিদিন হাজার হাজার নর-নারী শহর ছেড়ে চলেছে। যারা জীবনে কখনো শহর ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে পারে নি, তারাও চলেছে দূরের কোন গ্রামে—সেখানে কোন আত্মীয় কিম্বা বন্ধুর ঠিকানা জানা আছে।

স্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু বাড়ি ফিরেও স্বস্তি নেই। নাট্যভারতীর সমস্যার কথা কিছুতে ভুলতে পারছি না। এতগুলো কর্মী, অভিনেতা—সবাই আমার মুখ চেয়ে আছে—এইটাই তো সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। সবাই ভাবনা-চিন্তার দায় এড়িয়ে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

হঠাৎ রঙমহল বন্ধ হবে, একথাটা কেউই ভাবতে পারেনি। অথচ ৩ জানুয়ারীতে বন্ধ হলো রঙমহল। এতোদিন যামিনী মিত্র, দুর্গাদাস রঙমহল চালাচ্ছিল রক্তের ডাক নাটক নিয়ে। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল।

মিনার্ভার ভূতপূর্ব অভিনেতা শরৎ চাটুজ্যে বর্তমানে স্টারের শিল্পীগোষ্ঠীর একজন। পাঁচ তারিখে শুনলাম, যামিনী মিত্র, দুর্গাদাসের পর ওই রঙমহল হাতে নিয়েছে। ভালো-মন্দ জানি না, তবে খবরটা এই।

এদিকে মুরলীবাবুর হাতে আসার পরেও নাট্যভারতীতে প্রতি শনিবার-রবিবার কঙ্কাবতীর ঘাট অভিনয় হচ্ছে। অবশ্য দর্শক সমাগম মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। তবুও একরকম চলছে।

জানুয়ারীর প্রতিটি দিন যুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নে ভরা। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের ভাষা যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে আসছে। আর প্রতিদিন কোলকাতার ভয়-পাওয়া মানুষেরা দল বেঁধে চলেছে শহরের বাইরে।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই ভয়-পাওয়া মানুষের চেহারা। কতোদিন রাতে থিয়েটার সেরে ফিরে আসতে অন্ধকার রাজপথে দেখেছি এই সব ভীত নর-নারীর মৌন মিছিল। দেখেছি, ছায়ার মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে হাওড়া কিংবা শিয়ালদা স্টেশনের দিকে। আরো দেখেছি, কতো নর-নারী যারা ইঁট-কাঠের শহরে নানা আরামের মধ্যে দিন কাটায়, তারাও এই দারুণ শীতের মধ্যে একটু আশ্রয়ের সন্ধানে গেছে পল্লীবাংলার কোন গণ্ডগ্রামে। আশ্রয় না পেয়ে গোটা সংসার নিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দিন কাটাচ্ছে। এমনও দেখেছি, বাঁচার তাগিদে যারা গেছে, তারা শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। তবুও বাঁচার তাগিদে পালিয়ে যাবার নেশা—শহরবাসীকে যেন ব্যাধির মতো পেয়ে বসেছে।

এতো ভাঙা অশান্ত দেশ, তবু রঙ্গে ভরা—এতোর মধ্যেও নাটক চলছে, থিয়েটার চলছে। ভিড় করে না এলেও নাটক দেখতে আসছে মানুষ। নতুন নাটকও উদ্বোধন হচ্ছে কোন কোন মঞ্চে।

চব্বিশে জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে উদ্বোধন হলো মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন ঐতিহাসিক নাটক রাণী ভবানী। দুর্গাদাস মিনার্ভায় যোগ দিয়েছে এটা আঠাশে জানুয়ারীর খবর।

শান্তি গুপ্তাও মিনার্ভায় যোগ দিল উনত্রিশে জানুয়ারী।

কঙ্কাবতীর ঘাটের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ১ ফেব্রুয়ারী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন খ্যাতনামা শিল্পসমালোচক ও সি গাঙ্গুলী।

সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিল্পীকে নাটক এবং থিয়েটারের নামাঙ্কিত রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হলো।

৯ জানুয়ারী আবার নাট্যভারতীর কলকাতার বাইরে যাবার পালা। যশোহরে বি সরকার মেমোরিয়াল হলে চারদিনব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।

প্রথম রাতের নাটক পি ডবলু ডি। অভিনয় মন্দ হয়নি।

দ্বিতীয় রজনীর নাটক শচীন সেনগুপ্তের সংগ্রাম ও শান্তি।

কঙ্কাবতীর ঘাট অভিনীত হল তৃতীয় রজনীতে। এ রাতে আশাতীত দর্শক সমাগম হয়।

শেষ রজনীর নাটক সাজাহান। এদিনেও অজস্র-দর্শক পরিপূর্ণ ছিল হলঘর। তারপর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনও পাওয়া গেল।

স্থানীয় দর্শকরা প্রতিটি রাতের অভিনয়ে মুগ্ধ হলেও শাজাহান আর সংগ্রাম ও শান্তি তাদের বেশি আনন্দ দিয়েছিল।

চতুর্থ রজনীর অভিনয় শেষেই রাতের ট্রেনেই যশোহর থেকে কলকাতায় পাড়ি দেওয়া।

৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ ফেব্রুয়ারী—কদিন আমরা নাট্যভারতী গোষ্ঠী যশোহরে ছিলাম। ঐ ১২ তারিখেই রঙমহল উদ্বোধন হয়েছিল নতুন নাটক 'জীবনপথে'। শিল্পী তালিকায় শরৎ, ভূমেন, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায় ছাড়াও অনেকে ছিলেন।

১৩ ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি। ঐদিন নাট্যভারতীতে সারারাত্রব্যাপী নাটকাভিনয়ের

যন্ত্রণা। নাটক তালিকায় আছে শিবরাত্রি, কঙ্কাবতীর ঘাট, পি ডবল্‌ ডি, সুদামা এবং রাতকানা।

অভিনেতার জীবনে বোধহয় ক্লান্তি নেই। রাতের পর রাত অভিনয় আর অভিনয়—তারই মধ্যে কতো চরিত্রের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া, কতো কল্পিত চরিত্রের সুখ-দুঃখটাকে নিজের মধ্যে টেনে নেওয়া। নাটকের চরিত্র হাসে, কাঁদে—কথা বলে, দর্শকরা কী ভাবেন জানি না, তবে যে অভিনেতা সে জানে অভিনয়ের যন্ত্রণা কোথায়। যে যন্ত্রণার মধ্যেই সৃষ্টির উৎস।

সারারাত অভিনয়ের শেষে বাড়ি ফেরার পথে এই কথাই মনে হচ্ছিল।

কিছুদিন আগে 'জীবন রঙ্গ' নিয়ে শিশিরবাবু শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই পনেরোই ফেব্রুয়ারী জীবন রঙ্গের অভিনয় বন্ধ হলো।

পনেরোই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতনের সংবাদ প্রচারিত হলো। এশিয়ার মাটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা ক্রমেই প্রসারিত হতে চলেছে।

বাংলা চলচ্চিত্রে ডাক্তার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই ডাক্তারের হিন্দী চিত্ররূপ মুক্তি পেল ২০ ফেব্রুয়ারী, চিত্রা এবং নিউ সিনেমায়।

ডাক্তারের হিন্দী সংস্করণও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ডাক্তারের অন্যতম চরিত্রাভিনেতা আমি, করাচী, লাহোর, কানপুর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে অগণিত চিঠি পেয়েছিলাম। প্রতিটি চিঠির মূল কথা এক—আমার অভিনয় সকলের ভালো লেগেছে।

পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারী কর্ণার্জুন চিত্রটি মুক্তি লাভ করলো। ঐ চিত্রে আমি রূপ দিয়েছিলাম শকুনি চরিত্রে, আর ছবি বিশ্বাস ছিল কর্ণের ভূমিকায়। ছবিটির যুগ্ম পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সতীশ দাশগুপ্ত।

সাতাশ বছর আগে আর সাতাশ বছর পরে—এটা কোন নাটক কিংবা নাটক নিয়ে কথা নয়, আমার নাটকের বাইরে যে জীবন, সেই জীবনের কথা।

বাগআঁচড়া শান্তিপুরের কাছেই একটি গ্রাম। যে গ্রামটির সঙ্গে আমার জীবনের অনেক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। বাবার মাতামহের সূত্রে বাগআঁচড়া আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি।

সাতাশ বছর আগে সেই যে বাগআঁচড়া থেকে এসেছিলাম, সাতাশ বছর পরে বাগআঁচড়ায় যাওয়ার পথে সাতাশ বছর আগের একটি দিনের কথা মনে পড়লো।

সেদিন শান্তিপুর স্টেশনে না নেমে, নেমেছিলাম গোবিন্দপুর বাগদে স্টেশনে। বাগআঁচড়ার বাড়িতে যাকে পূর্বাহ্নে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, আমি অমুক দিনে যাচ্ছি গোবিন্দপুর বাগদে স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দিও। কিন্তু কা-কস্য পরিবেদনা। স্টেশনে নেমে কোন গাড়ির সন্ধান পেলাম না। এখানে যাতায়াতের জন্যে কোন গাড়ি পাওয়া যায় না। বাইরে পানের দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম, বাগআঁচড়া কোন দিকে?

দোকানী দূরের কতকগুলো তালগাছ দেখিয়ে দিয়ে জানালো, ওই দূরের তালগাছ বরাবর বাগআঁচড়ার পথ।

সুতরাং সেই মতো হাঁটতে শুরু করলাম।

অচেনা-অজানা পথ। চলেছি পায়ে হেঁটে। পথে যেতে সন্ধ্যে হলো।

সংকীর্ণ পথ। দুধারে আগাছার জঙ্গল। পা চলতে অন্ধকারে কখনো গর্তে পা পড়ছে, কখনো কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি। এমনি করে পথ চলতে চলতে গ্রামের এক বাড়ীর খিড়কিতে এসে দাঁড়ালাম।

অচেনা-অজানা লোক খিড়কিতে এসেছে। বাড়ির কর্তা তো রেগেই আগুন। বলে, ঠাওর পাওনা? একেবারে গেরস্ত-বাড়ির খিড়কিতে ঢুকেছো।

বললাম, আমি বিদেশী মানুষ—চিনতে পারি নি।

লোকটি আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলো।

বললাম, একটু জল খাওয়াবে কর্তা!

—জল! লোকটি বললে, আপনারা কি জাত?

আমি কায়স্থ শুনে লোকটি বললে, আপনাকে জল দিয়ে পাপের ভাগী হবো না। আমরা জাতে বাগদী!

বললাম, একটু জল দাও—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। জল দিলে তোমার পাপ হবে না, আমারও জাত যাবে না।

[illegible] রূপসজ্জায় অহীন্দ্র চৌধুরী
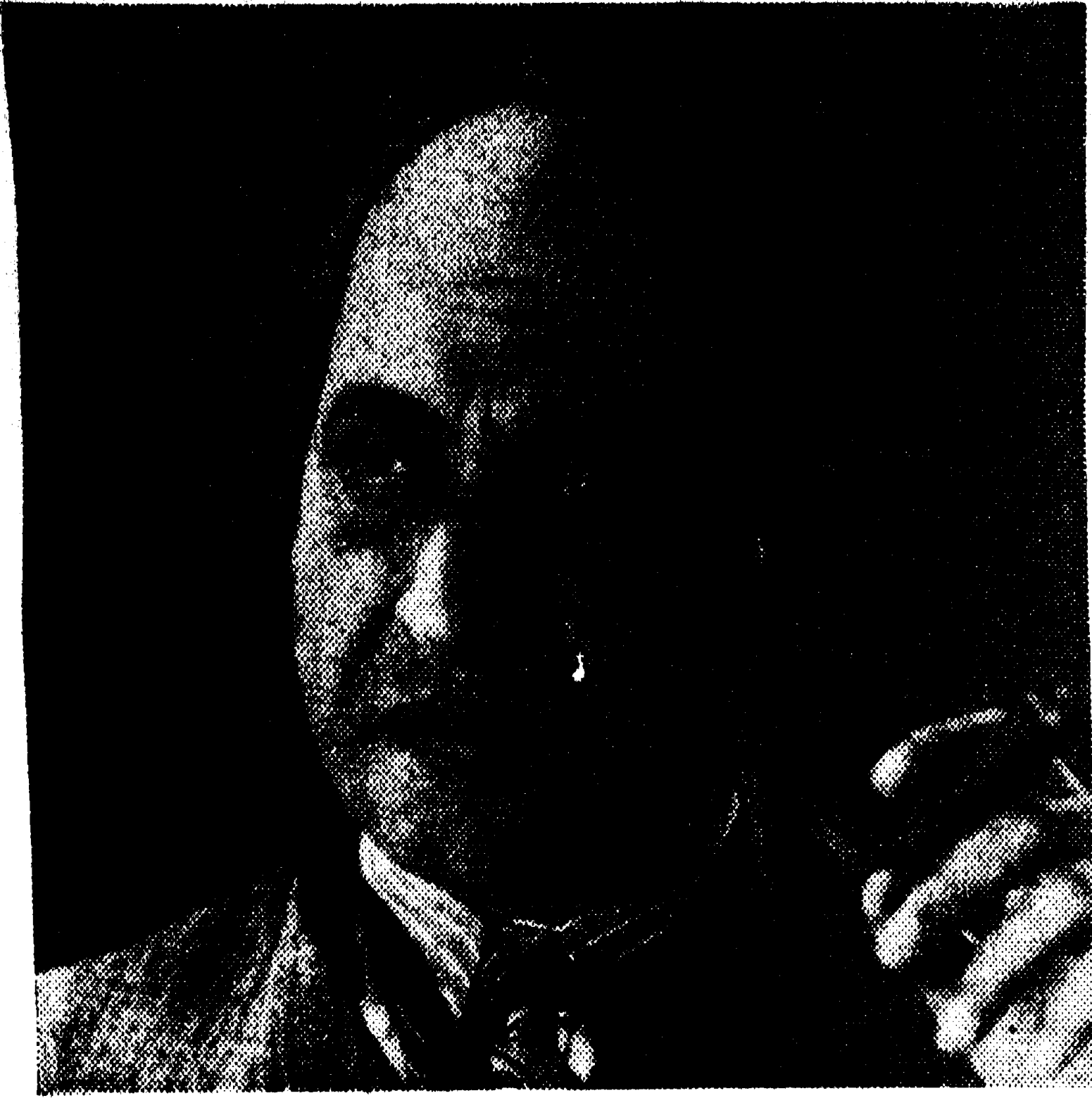
কিন্তু কোন কথাই শুনলো না সে। জল দিলে না। বললে, কোন ময়রার দোকানে গিয়ে জল খান গে—না হয় অন্য জেতের বাড়িতে। আমি জল দিতে পারবো না।

এবারে জানতে চাইলাম বাগআঁচড়ার পথের নিশানা।

লোকটি বললে, ওই ভাগাড় ধরে যান। ভাগাড় শব্দের একটা মানেই আমি জানি। গ্রামে যেখানে মরা গরু-মোষ ইত্যাদি ফেলা হয়, তাকেই ভাগাড় বলে।

কিন্তু ভাগাড় মানে যে পায়ে চলা গ্রাম্য পথ—আজই নতুন জানলাম।

কিছু পথ এসে দূরে আলো দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম, বাগআঁচড়ার বাজারের কাছে এসেছি।

এবারে বাড়ি চিনতে অসুবিধে হলো না।

বাড়ির দরজার কাছেই মস্ত বড়ো ঝাঁকড়া বকুল গাছ। এ জায়গাটা এলেই মনে হয় ছোটবেলার কথা। এখানে নাকি ভূত থাকে! কুড়ি-একুশ বছরের যুবক আমি, তবুও গাটা কেমন ছমছম করে উঠলো। সেই সঙ্গে সাপের কথাও মনে হলো। এখানে আবার সাপের উপদ্রবও আছে।

বাড়ির মধ্যে গেলাম। এবারে আর এক মুস্কিল। দরজায় তালা বন্ধ।

ভাবলাম, মা নিশ্চয়ই প্রফুল্লর বাড়িতে গেছে। প্রফুল্ল আমার সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই।

সেই বাড়িতেই গেলাম। মা তো আমাকে দেখেই অবাক!

—হ্যাঁরে তুই?

বললাম, বাঃ—আমি তো তোমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। লিখেছিলাম গাড়ি পাঠাতে।

শুনলাম মা আমার চিঠি পান নি।

তখন আর অন্য কথা নয়, ক্ষিধে-তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বললাম, আগে একটু জল দাও—তেষ্টাটা মিটিয়ে নিই। কী যে দেশ, লোকে তেষ্টার জল পর্যন্ত দেয় না।

সে রাত্রে আর বাড়ি ফেরা হলো না। কাকীমার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে সেখানেই দোতলার ঘরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওয়া।

সাতাশ বছর পরে বাগআঁচড়ায় পৌঁছে সেই পুরোনো কথা মনে হলো। সেদিনের অপরিণত তরুণ, আজ পরিপূর্ণ যুবক অহীন্দ্র চৌধুরী। যার জীবনের প্রচ্ছদপট শুধু নয়, গোটা পটভূমিকা বদলে গেছে। সেই আমি বাগআঁচড়ায় এলাম পুত্র ভানুকে নিয়ে। স্ত্রী-কন্যা আগেই এসেছে।

অনেকদিন পর এক জীবনের বাইরে আর এক জীবনকে খুঁজে পেলাম।

আবার কলকাতা। আবার সেই দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলা। ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা মঞ্চে সুপ্রিয়ার কীর্তির উদ্বোধন হলো। শচীন সেনগুপ্তের এই নাটকের পরিচালক দুর্গাদাস, আর নায়িকা সুপ্রিয়ার ভূমিকালিপিতে ছিল শান্তি গুপ্তা।

ফেব্রুয়ারী মাসটা গেল। মার্চের পাঁচ-ছয় তারিখে শ্রীরামপুরে গিয়েছিলাম নাটক অভিনয়ের জন্যে।

এরই মধ্যে এগারোই মার্চ একটি সরকারী ঘোষণায় শহরবাসীর আতঙ্ক চরমে পৌঁছলো। সরকারী ঘোষণা হলো, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার তাগিদে কলকাতা শহর থেকে স্ত্রীলোক শিশু পুত্র এবং সাধারণ নাগরিক যাদের শহরে না থাকলেও চলে, তারা যেন অবিলম্বে শহর ত্যাগ করে। কেননা যে কোন মুহূর্তে চরম বিপর্যয় ঘটতে পারে।

এদিকে এই ঘোষণা অন্যদিকে ওই একই তারিখে শিশির ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'উড়ো চিঠি' নাটকের উদ্বোধন।

কদিন বাদে উনিশে মার্চ নাট্যভারতী গোষ্ঠী চন্দননগরে সিনেমা-দ্য-প্যারীতে একটি অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।

উনিশে মার্চ রঙমহলের পাদপ্রদীপে একটি নতুন নাটক অভিনীত হলো। নাট্যকার ধীরেন মুখার্জী, পরিচালক প্রভাত সিংহ আর প্রযোজক শরৎ চট্টোপাধ্যায়। নাটকের নাম 'প্রোতের ফুল'।

বিশে মার্চ তারিখেও চন্দননগরে দুটি নাটক অভিনয় করেছিল নাট্যভারতীগোষ্ঠী।

তেইশে মার্চ বাগআঁচড়ায় পাঁচ বিঘে জমি রেজিস্ট্রি করা হলো কোলকাতা থেকে। ঐজন্যে বিভূতি মিত্র এসেছিলেন কলকাতায়। ঐদিন রাত্রে আমাদের বাড়িতেই ছিলেন।

মার্চ মাসের আঠাশ তারিখটিতে একটি অপ্রত্যাশিত ঘোষণা—জাপানের নিকটে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু। ঘোষণাটি কিন্তু কোথাও কোন সরকারী সমর্থন পেল না।

ঘোষণা শুনে গোটা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিন একটি প্রশ্নই করেছিল, সত্যি কি প্রিয় নেতাজী মারা গেছেন?

সেই প্রশ্নটা এখনো রয়েছে ভারতবাসীর মনে।

এদিকে যুদ্ধ ভারতের দরজায়। ২ এপ্রিল জাপান আকিয়াব অধিকার করলো।

দুদিন যেতেই পাঁচ তারিখের সংবাদ সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে জাপানীরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করেছে।

পরদিন ভারতের মাটিতে প্রথম জাপানী বোমা পড়লো। ভাইজাগ এবং কোকোনাদ—বোমারু বিমান থেকে জাপানীরা দুই শহরে বোমাবর্ষণ করেছে। সেদিন তারিখটা ছিল ৬ এপ্রিল। ঐদিনেই শিশির ভাদুড়ী অনির্দিষ্টকালের জন্যে শ্রীরঙ্গমের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সুসংবাদ বলে কিছু নেই। ৭ এপ্রিল খবর পেলাম রাণীবালা কলকাতায় তার করে জানিয়েছে উদীয়মানা অভিনেত্রী জ্যোতি মধুপুরে মারা গেছে। একজন প্রতিভাময়ী জনপ্রিয় অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে ব্যথা পেলাম।

যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হলো। ১৮ এপ্রিলের সংবাদ তা প্রমাণ করলো। জাপানের রাজধানীতে বোমাবর্ষণ করেছে মার্কিনরা।

ঐদিনেই নতুন করে 'উড়ো চিঠি' নাটক নিয়ে শ্রীরঙ্গমের দ্বারোদ্ঘাটন হলো। ঐদিনেই নাট্যভারতীতে অভিনয় শেষে আমি মুরলীবাবুর কাছে গেলাম। মুরলীবাবু কথা বলছিলেন সন্তু সেনের সঙ্গে। সেখানেই মুরলীবাবুকে বললাম, এই মাসের তিরিশ তারিখ থেকে আমি চলে যাচ্ছি।

মুরলীবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, এই কথাটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার দরকার ছিল।

মুরলীবাবু কিছুই বললেন না। বুঝতে পারলাম, আমার কথাটা উনি সহজ-ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

পরদিন ১৯ এপ্রিল যথারীতি নাট্য-ভারতীতে এসেছি। সেদিনে কঙ্কাবতীর ঘাটের ১০০ ও ১০১তম রজনীর অভিনয়। শততম রজনীর অভিনয় হলেও কোন স্মারক অনুষ্ঠান হলো না।

ঐদিনে অভিনয় দেখতে এসেছিল রঙমহলের শরৎ চাটার্জি নাটকের শেষের দিকে সে চলে গেল। কিন্তু অভিনয় শেষে, আমি যখন মেক-আপ তুলছি তখন আবার তার আবির্ভাব আমার কক্ষে। বললাম, ফিরে এলে যে?

শরৎ তখন বললে, দাদা—একটা কথা শুনেছি, ওটা কি ঠিক।

—হ্যাঁ, যা শুনেছো তা কিছুটা সত্যি।

—তবে নিশ্চয়ই আমাদের কথাটা ভেবে দেখবেন।

ভেবে দেখা বলতে, শরতের ইচ্ছে আমি রঙমহলে যোগ দিই। বললাম, আচ্ছা—তোমার কথা নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

তেইশে এপ্রিল সকালে বি সি মল্লিক শিশিরবাবু একবার ফোনে যোগাযোগ করে বলেছিল, আমি যদি তাদের ওখানে শনিবার আর রবিবার অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ হই।

আমি জানিয়েছিলাম, সে কী করে সম্ভব? সম্ভব নয়।

ঐ তারিখেই নাট্যভারতীতে কর্ণার্জুন অভিনয় হয়েছিল। কর্ণের ভূমিকায় ছিলাম আমি, নরেশ মিত্র ছিলেন শকুনির ভূমিকায়। বলা বাহুল্য আগের দিনেই নরেশ মিত্র যোগ দিয়েছেন নাট্যভারতীতে।

২৫ এপ্রিল সন্তু সেন নাট্যভারতীতে রতীনকে বলেছিল, অহীনবাবু তো নাট্য-ভারতী ছাড়ছেন, তোমরা কি করবে।

রতীনের কাছেই শুনেছিলাম কথাটা। বলেছিল, দাদা—কি বলবো [illegible]।

বলেছিলাম, তোমরা যেমন আছো থাকো। তবে আমি তো তোমাদের ছাড়া নই। যখন যা দরকার বুঝবে জানাবে।

এপ্রিল মাস গেল। মে মাসের প্রথম তারিখে নাট্যভারতীতে কঙ্কাবতীর ঘাটের একটি বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। 'কিলবার্ণ' কোম্পানীর জন্যে। কোম্পানীর কেরানী থেকে কর্তাব্যক্তি সবাই উপস্থিত ছিলেন। কর্মকর্তাদের অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ। অভিনয় দেখে তাঁরাও মুগ্ধ হয়েছেন রীতিমতো। কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতিতে ইংরেজ, এসে জানালেন, বড়ো সুন্দর অভিনয় দেখলাম। এমন মার্জিত রুচির অভিনয় আমাদের দেশেও কম দেখি।

একজন বিদেশীর মুখে এ ধরনের প্রশংসা শুনে আনন্দ হলো।

ঐদিনের যুদ্ধের খবর মান্দালয়ের পতন।

চিত্রজগতের একটি খবরই ছিল সেদিন, উত্তর কলকাতার 'মিনার' চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন। এই দুর্দিনেও একটি চিত্র গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হলো।

৩ মে দুপুর এগারোটা নাগাদ রঙমহল থেকে শরৎ এলো। আমাকে রঙমহলে যোগ দেওয়ার কথা বললে।

নাট্যভারতীতে কঙ্কাবতীর ঘাটের ১০৮ ও ১০৯তম অভিনয় আমার কাছে ঐ থিয়েটারের শেষ অভিনয় রজনী। ঐদিন অভিনয় শেষে রাণীর বাড়িতে এসেছি। মল্লিকমশায় ওখানেও আবার নতুন করে পুরোনো কথা বললেন। শনি ও রবি যাতে ওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হই।

আমার উত্তর সেই একই! শনি-রবি যদি থাকবো, তাহলে চলে যাবো কেন!

নাট্যভারতী ছাড়তে বাধ্য হলাম। না ছেড়ে উপায় ছিল না। মুরলীবাবু হাউস নেবার পর থেকে অনেক শিল্পী আমার মুখ চেয়ে বেতন কমিয়েও থিয়েটারে ছিল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু যখন তারা দেখলো, দুই পুরুষ খোলার আগে নতুন নতুন অভিনেতারা মল্লিকমশাই-এর কাছে যাতায়াত করছেন, এবং তাঁরা থিয়েটারে ঢোকার পথ করছেন, সেই সময় স্বভাবত আমাদের পুরোনো শিল্পীরা আমার কাছে এলো। বললে, দাদা— এই জন্যে কি আমরা ত্যাগ স্বীকার করে থিয়েটারে রইলাম। এ যে দেখছি, ভিতর ভিতর অন্য ব্যাপার চলছে।

বোম্বের চিত্রা সেনের সঙ্গে আমেরিকা এবং থাইল্যান্ডের দুজন গাইড

অঙ্গনা

পারস্পরিক বোঝাপড়া

নয়টি দেশের গার্ল স্কাউট এবং গাইডদের এবার বার্ষিক ছাউনি পড়েছিল পুণার সংগমে। একমাস ধরে ২৪ জন স্কাউট এবং গাইড এবারের সেসনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন বেলজিয়াম, সিংহল, ইসরায়েল, জাপান, মালয়েশিয়া, সিয়েরা লিওন, থাইল্যান্ড, আমেরিকা থেকে এবং আমন্ত্রণকারী ভারত।

এই সেসনের নাম ছিল জুলিয়েট লো সেসন, ১৯৭০। এই নামকরণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আমেরিকায় গার্ল স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তন করেন জুলিয়েট লো এবং তিনি হলেন সেদেশে এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যেমন উদ্দেশ্য ছিল তেমনি সেসনের খরচ-খরচার একটা বিরাট অংশও এসেছিল তাঁর নামাঙ্কিত ফান্ড থেকেই।

২৪ জন গার্ল স্কাউট এবং গাইড প্রায় একমাস কাটালেন সংগমে। ওদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২০। কিন্তু বয়সের তুলনায় যে বিষয়টি ওদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা খুবই গুরুভার। বিশ্বের তাবৎ বিশেষজ্ঞরা যে সমস্যা নিয়ে ভেবে অস্থির ওরাও সেই সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। বিশ্বের বিরাট জনসংখ্যার খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে এই একমাস ভাবনাচিন্তা করাই ছিল ওদের কাজ। তাই এই অধিবেশনের নাম ছিল—হাঙ্গার, অ্যাওয়ারনেস, অ্যাকশন। এবং এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষের মতো একটি দেশ। এদেশে খাদ্যসমস্যা ব্যাপক। আমাদের কৃষকরা বিপুল শ্রমের বিনিময়ে যা উৎপন্ন করে তাতে সারা দেশের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। দেশে দেশে খাদ্যের জন্য আমাদের হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে। এ সমস্যা আমাদের দেশে যেমন তীব্র তেমনি বিশ্বের নানা দেশেও খাদ্যসমস্যা ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে মনে হয় এমন দিন আর খুব দূরে নেই যখন অনেক দেশকেই খাদ্যাভাবে ভুগতে হবে। তাই প্রয়োজন আগে থেকেই সাবধানতা। সবাইকে এ নিয়ে ভাবতে হবে। বয়সের বিচারের তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে সমস্যা। তাই গার্ল স্কাউট এবং গাইডদের এক সময়ের প্রমোদভবন আজ রূপায়িত হয়েছে সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন্দ্রে।

বিশ্বের মাথা ধরানো সমস্যা নিয়ে এদের মাথা ঘামানোর একটা বিরাট সুবিধাও আছে। গার্ল স্কাউট এবং গাইডদের এই সংস্থা পৃথিবীর সব দেশেই শাখা বিস্তার করে আছে। এদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫ মিলিয়ান ছাড়িয়ে গেছে। এই অসংখ্য চঞ্চল যৌবন ধরা পড়ে আছে এই সংস্থায়, যারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। আর টুকরো টুকরো ভাবনার তুলনায় এরকম সম্মিলিত চিন্তা নিশ্চয়ই আরো বেশি কার্যকরী হবে। তাছাড়া গার্ল গাইডরা তো আর সরাসরি সমস্যা সমাধানে হাত লাগাতে পারছেন না। তাদের বক্তব্য হলো, এই সেসন থেকে তাঁরা খাদ্য সমস্যার অন্তর্নিহিত রূপটি অনুধাবন করতে পারবেন এবং এর দ্বারা ভবিষ্যতে কাজ করা তাদের পক্ষে হবে খুবই সহজ। তাদের ভাষায়, টু লাভ উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন দি এরিয়া। ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে তাঁদের আজকের এই অভিযান সত্যি প্রশংসনীয়।

বিশ্বে খাদ্যসমস্যার ভূমিকা ক্রমেই আগ্রাসী রূপ নিচ্ছে। প্রথম দায়িত্ব তাই উদ্যোক্তাদের ছিল এদের সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। এজন্য তাদের বইপত্র, হ্যান্ডবিল এবং অজস্র পামফলেট সরবরাহ করা হয়। ফিল্মের সাহায্যেও দেখানো হয় সমস্যা আজ কোথায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির আগামী দিনগুলিতে কোন অঞ্চলে সামস্যা কি রূপ নেবে। এছাড়া প্রতিনিধিস্থানীয় যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা খাদ্য নিয়ে মাথা ঘামান তাদেরও ডাকা হয়েছিল এদের সাহায্য করার জন্য। তারা নানারকম আলোচনায়

অংশ নেয়। খামারবাড়ি ঘুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে এবং শস্যক্ষেত পরিদর্শন তাদের জ্ঞান বাড়ানোর কাজে লাগে। এ তো গেল থিয়োরীর দিকটা। এবার প্র্যাকটিক্যাল। মানুষের সঙ্গে পরিচয় না হলে, স্থানীয় খাদ্যের প্রভাব ওদের উপর কতটা কার্যকর জানতে না পারলে সমস্যা সৈই খোঁয়াটে ভাবটা কাটিয়ে ওঠা হবে খুবই শক্ত। তাই গার্ল স্কাউট ও গাইডের এই দল গেছেন নিকটবর্তী গ্রামে। তারা কৃষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন ম্যাল-নিউট্রিসনের ভয়াবহতার পরিণাম।

ওরা দেখেছেন। তারপর ওরা নিজেরা কত কথা বলাবলি করেছেন। ওরা সবাই একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দেশে ফিরে গিয়ে ওরা নিজের লোকজনদের গোচরে কথাটা আনবে। ইসরায়েলী তরুণী মন্তব্য করেন, দেশের কাউন্সিল নেতাদের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে কথা বলবো এবং রিপোর্ট তৈরি করে তার ব্যাপক প্রচার করবো। যাতে সমস্যা সম্পর্কে সবাই সচেতন হতে পারে। আবার কেউ কেউ অন্য কথাও ভেবেছেন এবং মনোভাবও প্রকাশ করলেন সেরকম। টেলিভিসন, সেমিনারে তারা বক্তব্য রাখবেন। প্রয়োজন ভাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তব্যও রাখবেন।

ওদের কথাবার্তায় মুখ খুললেন ভারতের একজন গার্ল গাইড। তিনি বললেন, সত্যি আমাদের করার মতো কতো কাজ আছে তার ইয়ত্তা নেই। এসব দেখে-শুনে আমাদের মাথায় এমন সব চিন্তা গিজগিজ করছে যে, হয় আমরা ব্যক্তিগত-ভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে যেগুলি কাজে রূপায়িত করতে পারি। সবাই এ কথায় একমত।

শুধু আলাপ-আলোচনা আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই নয় হাতে-কলমে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য ওরা এক টুকরো জমি নির্দিষ্ট করে নেয়। সেই জমিটুকু ওরা নিজের হাতে চাষ করে, জল সেচ করে এবং ফসল ফলায়। ওদের বাগানের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগে। ফসলটা অবশ্যই এখানে আসল কথা নয় কিন্তু জমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং ওদের প্রচেষ্টার একটা পরীক্ষা হলো।

এই গার্ল স্কাউট এবং গাইডদের সম্বন্ধে আর একটা মজার তথ্য হলো, একদিন ওরা দল বেঁধে একটা সুইমিং পুলে বেড়াতে যায়। ওদের পরনে অবশ্যই সুইমিং কস্টুম ছিল না। সবাই কথা বলছিল। এতগুলি মেয়েকে একটা জিনিসেই বেমানান লাগছিল, সে হলো ওদের পেন্সিল আর নোটবুক। কান পাতলে শোনা যেত সেখানেও ওরা খাদ্য সমস্যা নিয়েই কথা বলছিল।

নানা দেশের ২৪ জন প্রায় সমবয়সী মেয়ে একসঙ্গে একমাস কাটালেন। এই থাকার মধ্যে ওরা অনুভব করলেন, আন্তর্জাতিক জীবন। এবং প্রতিমুহূর্তে ওরা অনুভব করেছেন, ওরা আন্তর্জাতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে ওরা আনন্দানুষ্ঠানের সামিল হয়েছেন। সবাই সেদিন জাতীয় পোশাক পরেছেন। সেজেগুজে সুন্দর হয়েছেন। সেদিন একজন আর একজনকে ওদের লোক-সংগীত এবং নাচ শিখিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কার ওরা আয়ত্ত্ব করেছেন। ভারতীয় পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। আর সবসময়ই ওদের মনে হয়েছে ওরা বাড়িতেই আছেন।

এদের খাবার টেবিলে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হতো। সব দেশের খাদ্য সেখানে পরিবেশন করা হতো। আমেরিকান ফ্রায়েড চিকেন থেকে জাপানীস গুকিয়াকি। ওরা আনন্দে মত্ত হয়ে খাওয়া শেষ করতো।

তারপর আসতো ক্যাম্পফায়ারের শুভ মুহূর্ত। স্কাউট গাইডদের সমাবেশ এছাড়া থাকে অসম্পূর্ণ। চারপাশে ওরা ঘিরে বসতো। গান গাইতো। এর ফাঁকে কেউ হয়তো ফিশফিশিয়ে বলতো, এখানে আসার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যি গর্বিত। আমার জীবনে এ এক বিরাট অভিজ্ঞতা। কথাটা এ কান থেকে ও কানে ঘুরতো। সবাই হেসে ওই কথায় সায় দিত।

—প্রমীলা

যাঁদের মনে পড়ে

মাতৃত্বের সকল মহিমা প্রস্ফুটিত শত-দলের সুরভি নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে আপন সন্তানের সমুজ্জ্বল কৃতিত্বের মধ্যে। সুসন্তান মায়ের অলংকার এবং অহংকারও বটে। রবীন্দ্রনাথের জননী সারদা দেবী কৃতি সন্তানের সৌভাগ্যবতী জননী। তিনি রত্নগর্ভা। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবীরও জননী ছিলেন শ্রীমতী সারদা দেবী। এমন রত্নগর্ভা জননী বাংলাদেশে কেন, বিশ্বের কোথাও বিশেষ আছেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখের বিরাট সাহিত্যের মধ্যে জননীর তেমন বিশেষ উল্লেখ বা পরিচয় পাওয়া যায় না! রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য-ভান্ডারে মায়ের স্থান অতি সামান্য। মনে হয় সেইকালের বৃহৎ পরিবারের নিয়মা-নুযায়ী ছেলেরা শৈশবকাল অতিক্রম করলেই অন্তঃপুর থেকে বাহির বাড়ীতে স্থান গ্রহণ করতেন। সেখানে লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে হোত। কবি যাকে আখ্যা দিয়েছিলেন ভৃত্যরাজকতন্ত্র। রবীন্দ্র-নাথ দুঃখ করে বলেছেন, বাড়ীতে নতুন বধূর শুভাগমন হলে সেই বালক বয়সে নববধূর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন। এইসব ঘটনার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বালকদের সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের এমনকি জননীর পর্যন্ত একটা আড়ালের সম্বন্ধ রয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সে সারদা দেবীর মৃত্যু ঘটে। শেষ জীবনে সারদা দেবী বহুদিন রোগশয্যায় ছিলেন। তাই মা ও ছেলের মধ্যে নিকটতমের স্নেহমধুর আলাপ গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ তাই বোধ হয় বেদনার সঙ্গে অনুভব করে ব্যক্ত করেছেন—

'তিমির দুয়ার খোলা
...জননী জীবন জুড়াও তব
প্রসাদ সুধা সমীরণে।'

জীবন জুড়ানো স্নেহস্পর্শ যে জননী তাঁর বালক সন্তানকে দিতে পারেননি, সেই জননীর মর্মবেদনা নিশ্চয়ই আরো গভীর—আরো করুণ! রবীন্দ্রনাথের সন্তানেরা পিতার মতই অল্প বয়সে মাতৃহারা হয়, রবীন্দ্রনাথ আপন হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে সেই মাতৃহারা ছেলেমেয়েগুলির অন্তর্বে-দনাকে রূপ দিয়েছেন দরদী লিপিকার মোহন স্পর্শে। তাঁর শিশুলীলার আদি ও অকৃত্রিম ভাবধারাই সৃষ্টি করেছে মা ও ছেলের মধ্যে এক অপরূপ রূপকথা—শিশু-গাথার সেই রূপকথা চিরকালের মা ও ছেলের মধুর সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছে। এই শিশুকাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের মাকেও স্মরণ করেছেন। শিশুকালে যখন বাঁধাধরা লেখাপড়া তাঁর পছন্দ হতো না,

সেই সময় মার স্নেহনীড়ে নিভৃত আশ্রয়ে স্থান করে নিতে তাঁর বড় ভাল লাগত—

'তোমায় মনে পড়ে গেলো
ফেলে এলাম খেলা।

আজকে আমার ছুটি, আমার শনিবারের ছুটি
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি।'

সারদা দেবী বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী। শুধুমাত্র আপন সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার ছিল না। আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভীড় সেখানে। বহুজনের নিত্য প্রয়োজনের তাগিদ সেখানে বেশী, পাঁচজনের মনোরঞ্জন করাই হল গৃহকর্ত্রীর প্রধান কাজ। দিনের সুরু থেকে দিনান্ত পর্যন্ত নানাজনের নানা আবদার সহ্য করার পালা চলত। কাজেই নিজের ছেলেমেয়েদের ঠিক নিজ তত্ত্বাবধানে রাখা কোনমতেই সম্ভব হতো না।

সেই যুগের সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়ের মত সারদা দেবীও ধর্মপরায়ণ, নিষ্ঠাবতী ছিলেন। পরিবারের ধর্ম, কর্ম, আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর বিবাহিত জীবনে প্রথম দিকটি অতিবাহিত হয়। তিনি ছিলেন কল্যাণস্বরূপা সর্বময়ী কর্ত্রী। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই দূর দেশে ভ্রমণে গেলে তিনিই সকল দিক সামলাতেন।

সারদা দেবীর স্নেহময়ী, কল্যাণশ্রী রূপের পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের কোন কোন আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সারদা দেবীকে কর্তাদিদিমা নামে সম্বোধন করতেন—'কর্তাদিদিমাকে দেখেছি তাঁর ছবিও আছে। তোমরাও তাঁর ছবি দেখেছ। কিন্তু তাঁর সেই পাকা চুলে সিঁদুর মাথা রূপ এখনো আমার চোখে জ্বলজ্বল করছে, মন থেকে তা মুছবার নয়। তিনি ছিলেন যশোরের মেয়ে, তখন এই বাড়ীতে যশোরের মেয়েই বেশী আসত। প্রতি ১১ই মাঘ খুব ভোজ হোত পোলাও, মেঠাই, সে কি মেঠাই যেন এক একটি কামানের গোলা। খেয়ে দেয়ে সবাই আবার মেঠাই পকেটে করে নিয়ে যেতো। অনেক অতিথি-অভ্যাগতের ভীড় হোত সে সময়ে। আমরা ছেলেমানুষ, বাইরের নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে আমাদের খাবার নিয়ম ছিল না। বাড়ীর ভিতরে একেবারে কর্তাদিদিমার ঘরে নিয়ে যেতো আমাদের। সঙ্গে থাকত রামলাল চাকর।

আমার স্পষ্ট মনে আছে কর্তাদিদিমার সে ছবি। ভিতর দিকের তেতলার ঘরে থাকতেন। ঘরে একটি বিছানা সেকেলে মশারী সবুজ রংয়ের, পংকের কাজ করা মেঝে, তাতে কার্পেট পাতা—একপাশে একটি পিলসুজে পিদ্দিম জ্বলছে। বালুচরী শাড়ী পরে, সাদা চুলে লাল সিঁদুর টকটক্ করছে কর্তাদিদিমা বসে আছেন তক্তপোষে। রামলাল শিখিয়ে দিত, আমরা কর্তাদিদিমাকে পেন্নাম করে পাশে দাঁড়াতাম। তিনি বলতেন, বোস্ বোস্। তারপর বলতেন, ও বৌমা ওদের এখানেই আমার সামনে জায়গা করে দিতে বল। এই ঘরেই একপাশে ছোট ছোট আসন পাতা হোত। কর্তাদিদিমা কাছে বসে বলতেন—বৌমা, ছেলেদের আগে গরম গরম লুচি এনে দাও—আরো মিষ্টি দাও—বড়দের মতো আদরযত্ন করে খাওয়াতেন। আমরা খাওয়া-দাওয়া করে পায়ের ধুলা নিয়ে চলে আসতুম।'

অবনীন্দ্রনাথের লিপিকার তুলিতে সারদা দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেই যুগের একান্নবর্তী পরিবারের কর্তব্য-পরায়ণা সুগৃহিণীর বেশ একটি নিখুঁত ছবি ভেসে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই মাতৃহারা হন। মায়ের মৃত্যুর পর তার মনটা উদাস হয়ে মাকেই খুঁজে বেড়াত। মোটা মোটা বেল-ফুল চাদরের প্রান্তে বেঁধে ঘুরে বেড়াতেন—অনুভব করতেন যেন মায়ের স্পর্শও ফুলের মধ্যে। লিখেছেন—"আমার মায়ের শুভ্র আঙ্গুলগুলি মনে পড়ত, আমি স্পষ্টই দেখতে পেতাম যে স্পর্শ সেই ফুলের আঙ্গুলের আগায় সেই স্পর্শই প্রতিদিন বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হয়ে ফুটে উঠেছে—জগতে তার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলেই যাই বা মনে রাখি।"

রবীন্দ্রনাথ সেই স্পর্শ মনে রেখেছিলেন—মায়ের গৃহাভ্যন্তরের কর্মরতা মূর্তিটিকে বার বার শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন মহীয়সী হিন্দু নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। সবার মধ্যেই আপন জননীর কল্যাণী রূপটিকে দেখেছেন—নারী, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই বিশ্বজননী।

কবি মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখছেন—'মার মৃত্যু যখন হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেক দিন থেকেই তিনি শয্যাগত কিন্তু কখন যে তাঁর জীবন-সংকট উপস্থিত হয়েছিল জানিতেও পারি নাই। এতদিন পর্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁর রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁকে বোটে করে গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়ীতে ফিরিয়া আমরা ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না—পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

ফটো : রমেন মিত্র

'ওরে তোদের কি সর্বনাশ হলো রে'..... প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটির অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর, সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না, সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখ-সুপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোরম। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ীর সদর দজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম, তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ীর এই দর্জা দিয়া মা একদিনও নিজের এই চির-জীবনের ঘরকরণার মধ্যে আপন আসনটিতে আসিবেন না।'

সারদা দেবী রবীন্দ্রনাথের জননী কিন্তু রত্নগর্ভা জননীরূপে বিশ্বের জননী সকাশে চিরস্মরণীয়া।

—বেলা দে

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

কেমন করে, কার কাছে কিনেছিলেন?
কার কাছে আর? ছেলে মেয়ে চুরি করে বিক্রী করা যাদের ব্যবসা তাদের কাছেই টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।
আপনার সে কথা মনে আছে লছমী দেবী? কত আপনার তখন বয়স?
লছমী দেবীই দ্বিধায় ভয়ে কাঁপা গলায় জানালেন যে বয়স পাঁচ ছয়ের বেশী না হলেও সব কথা তাঁর মনে আছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ···
কেনা বেচাটা কোথায় হয়েছিল? কলকাতায়?
না মিঃ ভর্মা, এসব চোরাই ছেলে মেয়ের চাহিদা যেখানে বেশী সেই রকম কোন দূর পশ্চিমের শহরে। নাম জানতে চান?
কিন্তু এসব কথা শুনেও একটা কথা না বলে পারছি না, রতনলালজি —
কেনা মেয়ে হলেও লছমী দেবী ত তাঁর কাছে নিজের মেয়ের চেয়েও বেশী। আপনাদের ফ্যাক্টরীর প্রায় অর্ধেক শেয়ার ত তাঁর নামে লিখে দিয়েছেন।
ঠিক বলেছেন, মিঃ ভর্মা! প্রথমে এই আশ্চর্য উদারতায় মুগ্ধ হয়ে আমিও ওঁকে দেবতা ভেবেছিলাম!
এখন দানব বুঝলেন কি করে?
অনেক কিছুতে। তার মধ্যে এই চিঠিটা দেখুন!

বেতারশ্রুতি

অনুষ্ঠান-পর্যালোচনা

বিপ্লবীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবজ্ঞার ও নিষ্ঠুরতার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। পরপর এমন দুটো ঘটনা ঘটল আকাশবাণীতে, যাতে কিছুতেই একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিপ্লবীদের মোটেই পছন্দ করেন না। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫ মে রাসবিহারী বসুর বেলায়, আর দ্বিতীয়টি গত ১২ জুন লীলা রায়ের বেলায়।

২৫ মে দেশনায়ক রাসবিহারীর জন্মদিনে তাঁর স্মরণে কোনো অনুষ্ঠান প্রচারের পূর্ব-পরিকল্পনা আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের ছিল না। ১১ জুন রাত প্রায় সাড়ে ১২টায় দেশনেত্রী লীলা রায় পরলোকগমন করেন, পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় দিল্লীর খবরে সব প্রথম এই খবরটিই বলা উচিত ছিল, অন্তত প্রথম দিকে—কিন্তু এমনই নির্মম আকাশবাণীর ব্যাপার যে, এই খবরটি বলা হ'য়েছে একেবারে শেষ দিকে, শেষ দু-মিনিটে। তার আগে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ সব খবর বলা হয়েছে।

এ শুধু নির্মমতা নয়, নির্লজ্জতাও। এই ঘৃণ্য 'নীতির' এত যে সমালোচনা হচ্ছে, তবু কর্তৃপক্ষ নির্লজ্জ রকম উদাসীন। এই উদাসীনতা দূর করার জন্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে সজোরে নাড়া দিতে পারেন, এমন 'কেউ কি নেই দেশে?

৫ জুন বেলা ১টায় ছিল ধারাবাহিক নকশা 'দিশেহারার কড়চা'-র নবম পর্ব। রচনা শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই নবম পর্বের মূল বক্তব্য ছিল: এত পরিবার পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেশের লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই ভিড় আর ভিড়—সর্বত্র জায়গায় ভিড়। এক ভিড় যে, টুরিস্ট অফিস নব-দম্পতিকে 'হানিমুন' করতে যাবার জায়গা দিতে পারেন না, তখন চাঁদে যাবার প্রস্তাব দেন।

[illegible]

করলেন। শিল্পী তাতেই খুশি, কারণ সেখানে তাঁর কোন্ এক বোন না সই থাকেন, অনেকদিন থেকে তাঁকে যেতে বলছেন।

নকশাটিতে রঙ্গ-রসের অনেক সুযোগ ছিল, কিন্তু বেশি সুযোগ কাজে লাগানো হয়নি। যা-ও হয়েছে, তেমন জমতে পারেনি তবে মোটামুটি উপভোগ্য বলা চলে। অভিনয়ে ছিলেন শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবীর গাঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী রত্না ঘোষাল ও আরও কয়েকজন।

এইদিন রাত ১০টা ১৫ মিনিটে আধুনিক গান শোনালেন শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়। সুন্দর লাগল। বেশ মিষ্টি গলা, স্বাভাবিক সুর।

৮ জুন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে শ্রীমতী কৃষ্ণা সাহার আধুনিক গানও সহজ, স্বাভাবিক, উপভোগ্য।

এইদিন সকাল সাড়ে ৯টায় ছিল সংবাদ-বিচিত্রা—'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী, ফ্যাসি-বিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, ময়দানে ফুটবলের আসর, আর সাইকেলে ভারত পরিক্রমা' বিষয়ে। প্রথমটাতে কিছু গোলাবারুদ আর কুচ-কাওয়াজের শব্দ শোনানোর পর সীমান্ত-রক্ষীদের কর্তব্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একজন পদস্থ অফিসারের ভাষণের কিয়দংশ প্রচার করা হয়েছে। দ্বিতীয়টাতে একেবারে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে—ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতার দু-চারটি মাত্র কথা শুনিয়ে। হস্তশিল্পের প্রসঙ্গটা কিছুটা জমেছে। ময়দানে ফুটবলের আসরটা ছিল জমজমাট, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরা। পঁয়ষট্টি ৫৭ বছর বয়সের এক পায়ে-খোঁড়া সাইকেলে ভারত ভ্রমণের বিষয়টা উৎসাহব্যঞ্জক, তাঁর সাইকেলের মাথায় সাপ জড়িয়ে যাবার ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর।

[illegible]

সমীক্ষায় রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গে বললেন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। বলাটা বেশ পাণ্ডিত্য-সুলভ। বিষয়টাও অ্যাকাডেমিক। রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গে অন্য অনেকের সমীক্ষায় সাধারণত যা শোনা যায় তার থেকে একটু ভিন্ন। নাট্যকলায় সত্যিকারের উৎসাহ আছে যাঁদের, তাঁদের ভালো লেগেছে বলেই বিশ্বাস।

১২ জুন রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে ইংরেজী নিউজ রীলটি ছিল বক্তৃতায় ভরা—কেবল শেষের কলকাতা-দীঘা মোটর র‍্যালের অংশটুকু ছাড়া। এই ধরনের মোটর র‍্যাল এখানে এই প্রথম। বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এই র‍্যালে, প্রচণ্ড উদ্দীপনা। প্রথম যুগের মার্কিন নির্বাক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ভাষণের অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য। বর্ষায় কলকাতায় আর জল জমবে না বলে গত বছর প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এ-বছর এই ক'দিনের বৃষ্টিতে কেন আবার জল জমেছে তার যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীএম জি কুট্টি, এই নিউজ রীলে তা শোনানো হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে—যেন নিউজ রীলের একটা অংশ নয় এটা, আকাশবাণীর পুরো একটা কথিকা কিংবা আলোচনা। অথবা বলা যেতে পারে, কর্পোরেশনের পক্ষে সাফাই। গোড়ায় লীলা রায়ের উদ্দেশে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশটুকু উল্লেখযোগ্য।

১৪ জুন বিকেল সাড়ে ৫টায় গল্পদাদুর আসর আরম্ভ হবার আগে 'একটি বিশেষ ঘোষণায়' বলা হ'ল, 'ট্রান্সমিটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার জন্য ৫টা বেজে ১৩ মিনিট থেকে ৫টা বেজে ১৪ মিনিট পর্যন্ত কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হয়নি, এজন্য আমরা দুঃখিত।' ঠিক একই ঘোষণা আবার শোনা গেল এই আসর শেষ হবার পরে—শুধু '৫টা বেজে ১৩ মিনিট থেকে ৫টা বেজে ১৪ মিনিটের' জায়গায় বলা হ'ল '৫টা বেজে ৩৯ মিনিট থেকে ৫টা বেজে ৪০ মিনিট'। ঘোষণাটায় আপত্তির কিছু নেই কিন্তু অসত্য ভাষণে আপত্তি আছে। দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ ছিল পুরো এক মিনিট নয়, এক মিনিট ২৫ সেকেণ্ড মতো। আর, গল্পদাদুর আসরের মাঝে একবার নয় দু-বার অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একবারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর একবারের কথা চেপে যাওয়া হয়েছে। চেপে যাওয়া হয়েছে যেটা, সেটা ৪৫ সেকেণ্ডের ব্যাপার।

—শ্রবণক

শিল্পী : সলিল চক্রবর্তী

শিল্পী : নিমাই দাস

জলসা

আনন্দধারার অনুষ্ঠান : গত সপ্তাহে উত্তর কলকাতার নবজাত প্রতিষ্ঠান 'আনন্দধারা'র সভ্যবৃন্দ তাঁদের দ্বিতীয় অধিবেশন পেশ করেন। আসর সুরু হয় শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সরোদ দিয়ে। প্রথমে কেদারা পরে দেশ এবং সর্বশেষে খাম্বাজ রাগাশ্রিত ঠুংরী বাজিয়ে ইনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। বর্ষাকাল যন্ত্রের পক্ষে সু-সময় নয়। কিন্তু সুর নেমে যাওয়া চড়ে যাওয়া তার ছেঁড়ার অবশ্যম্ভাবী উৎপাত সত্ত্বেও বুদ্ধদেববাবু যতটুকু বাজিয়েছিলেন যথাযথ সুরবিস্তার, স্বরবিন্যাস ও তানশৈলীতে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

পরের অনুষ্ঠান কণ্ঠ-সঙ্গীতের। শিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘনঘোর বরিষণের পটভূমিকার সঙ্গে যেন ছন্দ মিলিয়েই ইনি ধরলেন 'গৌড়-মল্লার'। শিল্পীর পরিশীলিত, মধুর কণ্ঠ, মেজাজ মাধ্যমের শিল্পীজনোচিত অনুরণন এক লহমায় যেন বর্ষার আসর জমিয়ে তুলেছিলো। কয়েকটি ছুট্‌তান ও সাপটের বাহার মনে রাখবার মত।

উভয় শিল্পীর সঙ্গে উপযুক্ত তবলা-সঙ্গত করেন গোবিন্দ বসু। ইনি সু-পরিচিত শিল্পী শ্যামল বসুর ভ্রাতা। এর হাতে দাপট মিষ্টতা দুই-ই আছে এবং রেওয়াজ ও শিক্ষার নিষ্ঠা থাকলে উচ্চমানে পৌঁছতে এঁর দেরী হবে না।

সংঘ-ভারতীর চিত্রাঙ্গদা : সম্প্রতি বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে সংঘ-ভারতীর পক্ষ থেকে মঞ্চস্থ কবিগুরুর 'চিত্রাঙ্গদা' গীতি-নৃত্য-নাট্যে গানের দিকটি গৌতম বসুর পরিচালনায় মোটের ওপর সুষ্ঠুরূপেই পরিবেশিত হয়। একক কণ্ঠের গানে সুশীল মল্লিক, পাপিয়া বাগ্‌চি ও অলকা দে। সমবেত সঙ্গীতগুলিতে উপযুক্ত মহড়ার অভাবে স্বরসঙ্গতি ছিল না। নৃত্য আশানুরূপ নয়। নেপথ্য-সঙ্গীত ও রূপ-সজ্জা চলনসই। সরস্বী ঘোষ, হিমানী দেবী ও দুলাল রায়চৌধুরীর আবৃত্তি সুশ্রাব্য।

রাগিণী প্রযোজিত 'গোপীচন্দ্রের কাহিনী' : অন্যান্য ধারার মত বাংলাদেশের লোকগীতি উপাখ্যানেরও একটি নিজস্ব ধারা আছে। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে অনেক গভীর জীবনদর্শনের অনায়াস প্রকাশ ঘটেছে, এমনই এক কাহিনী হোলো বাঙালী রাজপুত্র গোপীচন্দ্রর তরুণ যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করবার কাহিনী। বিষয়-গাম্ভীর্যে এই উপাখ্যানের একদা ভারতব্যাপী প্রসার ঘটেছিল এবং ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে মাত্র ৫০ বছরেরও আগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গোপীচন্দ্রের গান' বিষয়টি উত্তর বাংলার কৃষকদের মুখ থেকে সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'রাগিণী'র সভ্যরা সর্বপ্রথম এই বিষয়কে নৃত্যনাট্যরূপে মঞ্চস্থ করে কলা-রসিকদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কারণ এই প্রয়াস জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার এক উজ্জ্বল উদাহরণ নিশ্চয়।

প্রথম প্রয়াস অভিনন্দনীয় হলেও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আমরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমের দিকে রাজসভা বর্ণনায় রাজকীয় জাঁকজমক প্রদর্শনার্থেই হয়ত তারণো সঙ্গতে ভারত-নাট্যমের অবতারণা। কিন্তু লোকগীতি নাট্যে আমরা লোকনৃত্যের বিশেষ প্রকাশভঙ্গীটি দেখবার আশা করেছিলাম এবং লোক-নৃত্য ও গীতি দ্বারা কিভাবে বিষয়-গাম্ভীর্য বর্ণিত হতে পারে, তারই ব্যাপক অনুশীলন ও চিন্তা প্রয়োজন। অবশ্য নৃত্যকুশলীদের নৃত্য ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের স্বতন্ত্র রস-মূল্য অনস্বীকার্য।

অন্যান্য নৃত্যপরিকল্পনায় অসিত চট্টোপাধ্যায়ের কারিগরী প্রশংসনীয়। টিম-ওয়ার্ক পরিচ্ছন্ন। সুচিত্রা মিত্রর কণ্ঠে লোক-সঙ্গীত অত্যন্ত উপভোগ্য ও চমকপ্রদ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তিনি পরিণত শিল্পী, কণ্ঠসম্পদে দীপ্তা, যে কোনো গানকে রসোত্তীর্ণ করা তাঁর পক্ষে কিছু আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। সজ্জাপরিকল্পনায় রুচির পরিচয় রয়েছে।

—চিত্রাঙ্গদা

শোক সংবাদ

গত ২৬শে জুন মিত্র এণ্ড বোরাল-এর প্রবীণ অংশীদার শ্রীরাসবিহারী মিত্র সলিসিটর তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের একজন ঈশান স্কলার ছিলেন। তিনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং এটর্ণীশিপ পরীক্ষায় বেলচেম্বার স্বর্ণপদক লাভ করেন।

শ্রীমিত্র তাঁর স্বগ্রাম বর্ধমান জেলার চাণ্ডুলীতে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বহুবিধ কাজ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি গ্রামের হাই স্কুলের সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সরলতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তিনি সকলের সম্মানভাজন ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা এবং এক ভাই রেখে গিয়েছেন।

প্রেক্ষাগৃহ

অগ্রদূতের মঞ্জরী অপেরার সেটে জ্যোৎস্না বিশ্বাস এবং উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

একটি অসামান্য আবেগপ্রবণ হিন্দী ছবি

একটি বড়ো ছবির—অর্থাৎ যে-ছবিতে প্রকাণ্ড আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে, যে-ছবির উপস্থাপনায় বা মাউন্টিং-এ প্রচুর শ্রম, অর্থ ও সময় ব্যয় করা হয়েছে, যে-ছবিতে বাছাই-করা শিল্পী ও কলা-কুশলীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং যে-ছবিকে নির্মাতারা একটি মর্যাদাসম্পন্ন প্রযোজনা ব'লে মনে করেন, এমন ছবির—প্রাক্-মুক্তি প্রচার ব্যাপারে ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকা গ্রহণকারী শিল্পীদের ছবিটি সম্পর্কে এবং বিশেষ ক'রে নিজেদের গৃহীত ভূমিকা সম্পর্কে লিখিত মতামত প্রকাশের রেওয়াজ আছে। বাবু মুভীজ্ কম্বাইনস্ (প্রাঃ) লিমিটেড-এর নিবেদন, এ সুব্বারাও প্রযোজিত ও পরি-চালিত ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবি 'দর্পণ' এমনই একটি মর্যাদাসম্পন্ন বড়ো ছবি ব'লে এর ক্ষেত্রেও এই প্রথার ব্যতিক্রম করা হয় নি। নায়ক সুনীল দত্ত বলেছেন : মিঃ সুব্বারাও-এর প্রথম হিন্দী চিত্র "দর্পণ"-এ যে-ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশী কার্যকর ব'লে আমার মনে হয়েছে, তা' হচ্ছে উপভোগ্য উপাদানগুলির সংগে আবেগধর্মী নাটকের একটি সুষ্ঠু সমন্বয়-সাধন। ওয়াহীদা রেহমান এবং আমার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমরা দুজনেই আমাদের শিল্পি জীবনের কঠিনতম ভূমিকাগুলির অন্যতমকে চিত্রিত করেছি। নায়িকা ওয়াহীদা রেহমান বলেছেন : আমি 'দর্পণ'-কে আমার জীবনের তিন-চারটি শ্রেষ্ঠ ছবির অন্যতম মনে করি। আমার ভূমিকাটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, জটিল এবং আবেগপ্রধান—শিল্পী হিসেবে আমাকে একটি প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। ভাবনা উদ্রেককারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হিসেবে 'দর্পণ' সমগ্র ভারতের নারী-দর্শকের চিত্তে একটি বিরাট আবেদন সৃষ্টি করবে ব'লে মনে হয়।

আনন্দের কথা, 'দর্পণ' সম্পর্কে ছবিটির নায়ক ও নায়িকা সুনীল দত্ত এবং ওয়াহীদা রেহমান যে-সব কথা বলেছেন, তা' নিরর্থক সার্টিফিকেট-এ পর্যবসিত না হয়ে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছে। আমরা তাঁদের সংগে যোগ দিয়ে বলব "দর্পণ" চিত্রটিতে নায়ক বলরাজ ও নায়িকা মাধবীর চরিত্র যে-ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্ককে যে উচ্চ আদর্শে বেঁধে চিত্রিত করা হয়েছে, হিন্দী চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তার তুলনা অল্পই মেলে। এবং পার্শ্ব-চরিত্র দুটি—পেয়ারে রিক্সাওয়ালা ও বিজলীর কার্যকলাপ ও তাদের প্রতি আক্রমণের দৃশ্যগুলির আত্যন্তিকতা বা বাড়াবাড়ি অংশগুলি বাদ দিলে এমন পরিচ্ছন্ন অথচ সর্বাংশে হৃদয়গ্রাহী ছবি হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে অল্পই নির্মিত হয়েছে। এমন কি, ছবিটিকে বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজিডিতে শেষ ক'রে পরিচালক-প্রযোজক সুব্বারাও অত্যন্ত অসম-সাহসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন; যদিও সকল দুঃখের অবসানে নায়িকা যদি নায়কের ধর্মপত্নীরূপে সুখী জীবন-যাপনে অগ্রসর হ'ত, তাহ'লে সেটাই হ'ত কাহিনীর যুক্তিগ্রাহ্য পরিসমাপ্তি।

কাহিনীতে নারীকে দর্পণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পুরুষের সৎ এবং অসৎ কার্য নারীতে প্রতিফলিত হয়। পুরুষের সদ্‌গুণাবলী নারীরূপী দর্পণকে উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় করে, আবার তার একটি অসৎকার্য তাকে ভেঙে টুকরো

টুকরো ক'রে ফেলে। 'দর্পণ'-এর নায়িকা মাধবীর জীবনে একটি দুর্বল মুহূর্তে ডাক্তার জয়দেব যে-তমিস্র রজনী ডেকে এনেছিলেন, বেচারা সারাজীবন ধ'রে তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সাধনা ক'রে যে পরমক্ষণে আলোকিত পুণ্য লোকের আভাসটুকু পেল, সেইক্ষণে সম্ভবত অকল্পনীয় আনন্দের স্পর্শে সে আত্মহারা হয়ে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে; বলরাজের প্রতি তার শেষ কথা 'শুনেছিলাম ভগবান আছেন, তাঁকে এই প্রথম দেখছি মানুষের দেহে'—আমাদের কানে এখনও বাজছে।

সত্যিই স্মরণীয় অভিনয় করেছেন সুনীল দত্ত এবং ওয়াহীদা রেহমান ছবিটির নায়ক বলরাজ ও নায়িকা মাধবীর ভূমিকায়। এমন সংযত, আতিশয্যবর্জিত অথচ অন্তরস্পর্শী অভিনয় ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ঠিক বিপরীতধর্মী অভিনয় করেছেন 'পতিতা সুধার সদন'-এর রিক্সাওয়ালা পেয়ারে এবং প্রথমে উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবা বারনারী ও পরে 'পেয়ারে'র প্রেমিকা ও স্ত্রী বিজলীর ভূমিকায় যথাক্রমে জগদীপ ও সোনিয়া সাহনী। সম্ভবত অন্ধকারের পাশে আলো বেশী খুলবে বলেই নায়ক-নায়িকা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই হাল্কা আতিশয্যপূর্ণ অভিনয়ের প্রবর্তনা করেছেন পরিচালক সুব্বারাও। পারিবারিক সম্মান সম্বন্ধে সজাগ অথচ একরাত্রের দুর্বল মুহূর্তে পদস্খলনের জন্যে অন্তরে অনুতপ্ত, সনাতন ন্যায়-অন্যায় বোধের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ চরিত্র ডাক্তার জয়দেবের ভূমিকাটিকে বাস্তবভাবে রূপায়িত করেছেন চরিত্রাভিনেতা রেহমান। অপরাপর ভূমিকায় সুলোচনা (বলরাজের মা সরস্বতী), ললিতা পাওয়ার (দাদিমা), অচলা সচদেব (নারী আশ্রমের অধ্যক্ষা), সীমা (ডাঃ জয়দেবের স্ত্রী সন্ধ্যা) ও বেবী গুড্ডী (বিন্দু) বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটিকে কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক দিয়ে আশ্চর্যভাবে নিখুঁত বলা যায়। কি বহির্দৃশ্য গ্রহণে, কি অন্তর্দৃশ্য রচনা ও গ্রহণে আলোকচিত্রশিল্পী ও শিল্প নির্দেশকের একটি সূক্ষ্ম যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, দুজনে যেন একাত্ম হয়ে পরিচালক-প্রযোজকের কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ করেছেন। ছবির সংলাপ ও গান রচনার প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন পণ্ডিত মুখরাম, শর্মা এবং আনন্দ বক্সী। লতা মঙ্গেশকার গীত 'মুঝে প্যার করণেকা হক্ নাহী' এবং 'এক গগনকারাজা, এক চমনকীরাণী' এবং মান্না দে গীত 'দর্পণ ঝুঠ ন বোলে'—গান তিনখানি সুপ্রযুক্ত, সুগীত এবং জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনাপূর্ণ।

এ. সুব্বারাও পরিচালিত ও প্রযোজিত 'দর্পণ' আদর্শ কাহিনী চিত্ররূপে হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে একটি নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

ফিল্মস্ ডিভিসন সম্প্রতি তিনটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক তথ্যচিত্র নিবেদন করেছেন : (১) দি টোটোজ : পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর সন্নিকটে টোটোপাড়ায় মাত্র ৪৬৫ জন বিশিষ্ট 'টোটো' নামে একটি উপজাতি বাস করে। তাদেরই সরল জীবনযাত্রা, প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, বিবাহাদি সামাজিক উৎসব এবং সভ্যতার সংস্পর্শে তাদের জীবনে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এসে যাচ্ছে, তাও—এই রঙীন ছবিটির মধ্যে দেখানো হয়েছে। আজ থেকে অন্তত পঁচিশ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে নাট্যকার মন্মথ রায় 'টোটোপাড়ায় আসুন' বলে যে ছবিটি করেছিলেন, সেই ছবিটি সাদা-কালোয় তোলা হলেও তার মধ্যে অল্প মানবিক আবেদন ছিল না। (২) এক্সপ্রেশন : নাগরিক জীবনের উপর একটি পরীক্ষামূলক চিত্র। শহরের ব্যবসায় কেন্দ্রে একটি পার্কের ভিতরে এক পরী মূর্তি। এই মূর্তিটি যেন নির্লিপ্তভাবে প্রত্যক্ষ করছে নাগরিক সভ্যতাকে একেবারে ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। (৩) ইনকোয়ারি : ইলোরার কৈলাশ মন্দিরে অষ্টম শতাব্দীতে খোদিত মূর্তিকে অবলম্বন করে মনুষ্যজীবনের চারটি প্রধান আবেগ সম্পর্কে বিশ্লেষণী চিত্র। এই স্বল্পদৈর্ঘ তথ্যচিত্র তিনটিরই আবেদন যথেষ্ট।

ব্লো হট ব্লো কোল্ড

এক প্রৌঢ় দম্পতি (বিবি এণ্ডারসন ও গুনের রোজস্টাণ্ড) আর এক প্রণয়ীযুগলের (রোজমেরী ডেক্সটার ও গুলিয়েনো গেম্মা) পারস্পরিক বৈপরীত্য, প্রবৃত্তির তাড়না ইত্যাদি ষড়্‌রিপুর গল্প নিয়ে ফ্লোরেসেন্ড ভান্সিনির ছবি 'ব্লো হট ব্লো কোল্ড'-এর কাহিনীর বিস্তার। নয়নসুখকর সিসিলির এক ছোট্ট দ্বীপে একদল ট্যুরিস্টদের সঙ্গে উপরোক্ত চারজন বেড়াতে গেছে। তরুণ প্রণয়ীযুগল প্রেমের ব্যাপারে বড় প্রগল্ভ, অন দিকে প্রৌঢ় দম্পতির স্বামী ভদ্রলোক

নিমুক্ত শান্ত, যুক্তিপ্রবণ, শিক্ষক। স্ত্রী কিন্তু বাঁধদেওয়া প্রেমের জোয়ার। তরুণ প্রণয়ীযুগলের বেপরোয়া উদ্দামতায় আকৃষ্ট হয় সে। বাঁধ বুঝি ভেঙ্গে যেতে চায়। তাই তার সঙ্গে সাঁতার কাটতে বা নাচতে তার খারাপ লাগে না। স্বামীর মনে ঈর্ষার জন্ম হয়। বয়সের দরজা ভেঙে স্বামী এক রাত্রে স্ত্রীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে চায়, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয় সে। ঈর্ষা থেকে ঘৃণা আসে তাঁর মনে। কামের অক্ষমতা পাশাপাশি ক্রোধের জন্ম দেয় স্বামীর মনে। একদিন স্নানের শেষে তরুণ প্রেমিকাকে দেখা যায় রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণহীন দেহে।

ছবির শুরুতে যে উদ্দাম গতি ছিল প্রমোদ-তরণীর, ফেরার পথে তা শান্ত ধীর। দু-পাশের দুটি টুলে বসে থাকে দুই প্রেমিকা আর স্ত্রী, মুখে কারো কথা নেই। পরিচালক ভার্লিসান অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গীতে চিত্রায়িত করেছেন এই কাহিনীকে। অন্ধকার রাতে যখন তারা পাখী দেখছে, তখন স্ত্রীর চোখ দিয়ে অতীতের ছেঁড়া কটা দৃশ্য আবার স্বামীর মন দিয়ে পরবর্তী সময়ে সেই ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্যের পুনর্মিলন পরিচালকের সুসম পরিচালনার পরিচয় দেয়। এ ছাড়াও ছোটো ছোটো কয়েকটি চিত্রকল্প মনে রাখার মত।

প্রধান চারটি চরিত্রে সকলেই অভিনয় করেছেন সুন্দর, বিশেষ ভাবে প্রৌঢ়া স্ত্রীর চরিত্রে সুইডেনের খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিবি এন্ডারসনের নাম উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের পরিবেশনায় নিউ এম্পায়ারে ছবিখানি গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে।

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' চিত্রে নবাগতা রাজেশ্বরী রায়চোধুরী এবং নিমু ভৌমিক।

মঞ্চাভিনয়

'অনির্বাণে'র শিল্পীরা সম্প্রতি পট পাড়া বারোয়ারী সমিতির প্রাঙ্গণ শচীন ভট্টাচার্যের দুটি বলিষ্ঠ এব 'এক্কাগাড়ির ঘোড়া' ও 'ভূমিকম্প' ' বেশন করেছেন। নতুনের সঙ্গে পুরাত অবিরাম সঙ্ঘাতের পটভূমিকায় বত সমাজব্যবস্থাকে তীব্র কষাঘাত হয়েছে 'এক্কাগাড়ির ঘোড়ায়' আর 'ভূমিক তুলে ধরেছে ঘুণ-ধরা এই সামা কাঠামোর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে য পূর্ব মুহূর্তের এক মর্মান্তিক ছবি। একাঙ্কিকার অভিনয়েই শিল্পীদের : চাঞ্চল্য উদ্যাম ছিল, তাই প্রয়োজনী হয় নি। প্রথম নাটকটির নির্দেশক ছি গোবিন্দ গাঙ্গুলী এবং শচীন ভট্টা ছিলেন 'ভূমিকম্পে'র নির্দেশনায়। বি ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন সু লাহিড়ী, দীপেশ ব্যানার্জি, গো গাঙ্গুলী, চঞ্চল ভট্টাচার্য, গৌর সোম, দাস, রথীন চক্রবর্তী, সত্যব্রত গাঙ্গ পরিতোষ চক্রবর্তী ও অনিল মণ্ডল।

মজঃফরপুরের প্রখ্যাত নাট্যগো 'চতুরঙ্গে'র শিল্পীরা সম্প্রতি ব বসুর 'পাতা ঝরে যায়' ও স্যাম, বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডট' অবল প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ঈশ্বর আসছেন' নাটক দুটি অভিনয় সেখানকার নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা অ করেছেন। 'পাতা ঝরে যায়'তে আছে স্বচ্ছ জীবনদর্শন যা ঝরে পড়েছে বসা এক নিশব্দ বিকেলে এক বন্ধু ও স্ত্রীর স্মৃতির বাতায়ন দিয়ে। দুটি চরিত্রের এই নাটকটিতে আশ্চর্য অ করেছেন দিলীপ ঘোষ ও অনিমা ঘো

দ্বিতীয় নাটক 'ঈশ্বরবাবু আসছে মূল কথা হল মানুষের জীবনের উদ্দে

পঞ্চগোলাপ|সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন।

হীনতা। আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি তাঁর জন্য, অথচ আমরা কেউ জানি না কে সে, কি তার রূপ। তবু অধীর প্রতীক্ষা। আমাদের বিশ্বাস তিনি আসবেন, কবে তা জানি না—তবে আসবেনই। এই বক্তব্য-সমৃদ্ধ নাটকটিকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের কাছে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন শিশির দাস, ইন্দ্রদীপ মুখার্জি, সুধীর রায়, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, স্বাধীন দাস। দুটি নাটকেই নির্দেশনার দায়িত্ব সুষ্ঠু-ভাবে পালন করেন দিলীপ ঘোষ।

মরশুমী ইউনিটের শিল্পীরা সম্প্রতি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বশীকরণ' নাটকটি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেন। কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনার সংঘাত থাকার ফলে নাটকীয় গতি কোথাও প্রতিহত হয় নি। এর সংগে মিলেছে শিল্পীদের আন্তরিক চরিত্রচিত্রণের প্রয়াস। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রমেন দেব, সুকুমার পাল ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সুশান্ত পাল, নির্মল পাল, গোবিন্দ মাইতি, বলাই সামন্ত, সনৎ মান্না, সবল দে, দীপালি চৌধুরী। আবহসঙ্গীতে জয়কিষণ সম্প্রদায় প্রশংসার দাবী রাখে।

কিছুদিন আগে দুর্গাপুরের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'কল্লোল' শৈলেন গুহ-নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি পরিবেশন করল এ ভি বি ক্লাব হলে। শ্রীঅমিল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন হরিদাস চক্রবর্তী, কল্যাণ চক্রবর্তী, অমিতাভ গাঙ্গুলী, সুজিত সেন-গুপ্ত, স্বপন চ্যাটার্জি, প্রলয় চক্রবর্তী, বিপ্লব দত্ত, বিজয় চ্যাটার্জি, অসিত বাগচী, দ্বিজেন বোস, শান্তি ঘোষ-দস্তিদার, বিধান মুখার্জি ভক্তিরথন সিনহা এবং স্বাগতা রায়।

সানডিয়ানস সংস্থা সম্প্রতি রবীন্দ্র-সরোবর মঞ্চে অমর সেনের 'রাস্তা নিয়ে' নাটকটি পরিবেশন করেছে। শ্রীসেন রোনাল্ড মিচেলের 'দ্য রোড টু রুইন' অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করেছেন। সুপ্রযোজিত এই নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দেন : দীপক চক্রবর্তী, সোমনাথ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মিহির বসু, সুকমল ব্যানার্জি, কাজল মুখার্জি।

সম্প্রতি 'রূপশিল্পী'র সদস্যরা মিনার্ভা থিয়েটারে 'কালিন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কয়েকটি চরিত্রে অসাধারণ নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন অমরেশ ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল বসু, দেবেন দাস, অমর ভট্টাচার্য, বাসুদেব পোদ্দার, সুশীল দাস, সবিতা মুখার্জি, সাধনা পাইন, প্রতিমা পাল ও তাপসী গুইন।

বোম্বাইয়ের 'সঙ্ঘম' সংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' নাটকটি মোটামুটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন। বাসু ভট্টাচার্যের নাট্য পরিচালনায় সূক্ষ্মতম শিল্পবোধের নজীর আছে, কিন্তু মঞ্চসজ্জা, আলোক-সম্পাত আরো উন্নত হোতে পারতো। কয়েকটি ভূমিকায় বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত অভি-নয়ের স্বাক্ষর রাখেন মাণিক দত্ত, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, তরুণ ঘোষ, সুকৃতি রায়চৌধুরী, সমর গুপ্ত, অনুরাধা চ্যাটার্জি, ইন্দ্রাণী মুখার্জি।

দিল্লীর যাযাবর গোষ্ঠীর নতুন নাটক স্বপন সেনগুপ্তের 'কবে বসন্ত আসবে' সম্প্রতি রাজধানীতে অভিনীত হোল। যে দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে প্রত্যহ আচ্ছন্ন করে ফেলছে তারই প্রেক্ষাপটে এই নাটকটির সংঘাত গড়ে উঠেছে। বক্তব্যে বিশেষ কোন অভিনবত্ব নেই, সংলাপও মাঝে মাঝে 'অতিনাটক' সৃষ্টি করার প্রবণতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু নিখুঁত টিমওয়ার্ক এই দুর্বলতাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে, এজন্য নির্দেশক অমরেশ দত্ত নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখেন। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন দিলীপ ঘোষ, বেলা রায়, শিবশেখর সরকার, অনীতা সিংহ, গোবিন্দ চক্রবর্তী।

রাইফেল : শ্রীউৎপল দত্তের 'রাইফেল' নাটক মঞ্চস্থ করে হাউসিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। প্রাক-স্বাধীনতা ও তৎপরবর্তী-কালীন অবস্থার পটভূমিকে কেন্দ্র করেই নাটকের বিষয়বস্তু। নাট্যনির্দেশক শ্রীস্নেহ-ময় রায়চৌধুরীর সুদক্ষ পরিচালনা নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত ও শিল্পীদের অভিনয় প্রাণবন্ত হয়েছিল। বিশেষভাবে যেসব শিল্পীরা দক্ষতার ছাপ রাখেন, তাঁরা হলেন সর্বশ্রী কানু ভট্টাচার্য, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাল্য রায়, কান্তিময় ঘোষ, নবীন কুন্ডু, কাজল সিংহ।

নবান্ন : গত ২০ জুন মধ্য কলকাতার প্রথিতযশা নাট্যসংস্থা নবান্ন শ্রীমন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি দক্ষতার সংগে নেতাজী সুভাষ মঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। একক ও দল-

ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের দর্পণে মিছিল নাটকে দীপিকা দাস এবং তরুণ ঘোষাল। ফটো : অমৃত

গত অভিনয়ে শিল্পিবৃন্দের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। নাট্য নির্দেশক শ্রীঅসীম সেন কয়েকটি উপভোগ্য নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অভিনয়ে সর্বাগ্রে নাম উল্লেখ করতে হয় কল্যাণ সেনবরাট। তিনি চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। শিল্পীর বাচনভঙ্গী ও অভিব্যক্তি সুন্দর। অপর তিনটি চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন স্বপন চট্টোপাধ্যায়, সজল ঘোষ অমিত মল্লিক, স্বপন দাস। স্ত্রী চরিত্রে রাণু রায় ও মালা দাস চরিত্রানুগ। আলো, আবহসংগীত, রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা যথাযথ।

'মিনি' নাটক : 'মিনি'র বন্যা এবার তাহোলে মঞ্চে এলো। মাত্র সাত মিনিটের নাটক। তবু আলোর খেলা, সংঘাতের মুহূর্ত, চরিত্রের মুখরতা। নাটকের নাম 'দ্বন্দ্ব', লিখেছেন রমেন ভাদুড়ী। পরিবেশন করলেন, বেহালার 'ফ্রেন্ডস থিয়েটার ইউনিট'। এই 'দ্বন্দ্বে' নাটকটির রচনায় শ্রীভাদুড়ী যে মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখতে পেরেছেন অতি অল্প সময়ের বাঁধনে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রণব গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যনির্দেশনাও প্রশংসার দাবী রাখে। সাত মিনিটে যে সব শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্র হয়ে দর্শকদের অনুভবকে নাড়া দিয়েছেন তাঁরা হোলেন গুণময় শাল, পংকজ রায়, মণীশ ঘোষ, প্রণব গঙ্গোপাধ্যায়।

তরুণ অপেরা : আগামী ২০শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্বরূপায় প্রবীণ অভিনেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতি থাকবেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও প্রধান অতিথি হবেন ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ তরুণ অপেরার 'লেনিন' যাত্রাভিনয়।

সমাজ দর্পণ : চন্দননগর থিয়েটার সেন্টারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে তরুণ নাট্যকার দিলীপ দে'র বাস্তবনিষ্ঠ নাটক 'সমাজ দর্পণ' অভিনীত হোল। আজকের সমাজ জীবনের যে বহুমুখী সমস্যা তারই আলোয় গড়ে উঠেছে এ নাটকের তীব্রতম সংঘাত। প্রবীণ অভিনেতা পঞ্চানন ভট্টাচার্য নাটকটির নির্দেশনায় তাঁর পরিণত শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। শিল্পীদের সমবেত অভিনয়ের সংঘবদ্ধতায় প্রযোজনাটি বৈশিষ্ট চিহ্নিত হোতে পেরেছে। কয়েকটি মুখ্যচরিত্রে বাসন্তী চ্যাটার্জী, প্রেমাংশু বসু ও দিলীপ দে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অভিনয় করেছেন। নাটকের অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখার্জী, মৃণাল দত্ত, উদয় রায়, নিতাই দত্ত, আশা দেবী, লক্ষ্মীরঞ্জন ব্যানার্জী, লতা দেবী। আবহ-সংগীত সৃষ্টিতে ছিলেন বাসুদেব গোস্বামী। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ও সাংবাদিক রমেন্দ্র গোস্বামী।

রাজা বদল : সম্প্রতি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ক্যানিং স্ট্রীটস্থ শাখার কর্মীদের উদ্যোগে শ্রীজ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু আলোচিত নাটক 'রাজা বদল' অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অভনীত হোলো স্টার রঙ্গমঞ্চে। নাটকের কাহিনীভাগ বর্তমানের বিতর্কিত পরীক্ষামূলক আখ্যানভাগে গঠিত নয়—বাংলা নাটকের চিরপরিচিত স্বাভাবিক সমাজ-গ্রাহ্য জীবনবোধের ওপর তৈরী। সে কারণে এ নাটকের নাটকীয় ভাবধারাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে যে নিষ্ঠার ও লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গির দরকার তা অংশগ্রহণকারী অনেক ব্যক্তির মধ্যেই পরিস্ফুটিত। 'টিম ওয়ার্ক' বলতে যা বোঝায় তাও এ'দের মাঝে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়লেও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

অভনীত চরিত্রের মধ্যে 'তিনকড়ি মিঞা'র চরিত্র সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গি, চাল-চলন সব কিছুর মধ্যে উল্লিখিত চরিত্রে শ্রীশিবদাস কুন্ডুর অভিনয় অনস্বীকার্যভাবে উচ্চমানের দাবী রাখতে পেরেছে। 'দীপনারায়ণ'-এর ভূমিকায় শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে মানিয়ে ছিলো ভালো অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে সন্দেহ নেই তবে মাঝে মাঝে অতি-নাটকীয় ব্যঞ্জনা অভিনীত চরিত্রের স্বাভাবিকত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত 'শেঠজী'র চরিত্রকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন এবং সেদিক দিয়ে অনেকটা সার্থককাম হয়েছেন। 'কালু' ও 'সুবল'-এর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীঅবনী দত্ত ও শ্রীআশীষ সোম দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। তবে 'ভজহরি' ও 'নকুল' এ দুটি চরিত্রকে আরো বেশী সাবলীল করে তোলার জন্যে শ্রীঅশোক বসু ও শ্রীঅরিন্দম সরকারের আরো অনেক সুযোগ ছিলো। স্ত্রী ভূমিকায় 'ভোলার মা'র চরিত্রটিকে ভাবগম্ভীরতা ও স্বাভাবিকত্ব'র দিক দিয়ে অতি অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ'র অভিনয় আগাগোড়াই দর্শকচিত্তকে জয় করেছে। 'রাধারাণী' চরিত্রে শ্রীতৃপ্তি দাসের আরো বেশী সহজ হওয়া উচিত ছিলো। তাঁর 'ম্যানারিজম' জড়তার ছাপ স্পষ্ট। অবিশ্যি 'সতী দেবী'র ভূমিকায় শ্রীপুতুল চক্রবর্তীর উপস্থিতিও ঐ একই ত্রুটিযুক্ত। এছাড়া গুণগত বিচারে বৃন্দাবনের ভূমিকায় শ্রীচিত্তরঞ্জন বসুর নাম উল্লেখ্য, অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সর্বশ্রী গিরিশ ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কুণীভূষণ সেন, অসিত মিত্র, পুষ্প রক্ষিত, পিনাকী গুহ, প্রশান্ত ঘোষ, অমল চক্রবর্তী, সুধীর দাস ও তরুণ রায়। পরিবেশে বলা যায় যে, সামগ্রিক বিন্যাসে নাটকটির উপস্থাপনা আরও উচ্চমানের হোতো যদি আবহসঙ্গীত আরও পরিচ্ছন্ন হোতো।

৫ জুলাই অন্ধ্র হলে কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা শিল্প ও শিল্পী তিনটি একাংকের তৃতীয় অভিনয় পরিবেশন করবেন। নাটক তিনটি যথাক্রমে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাজপাখী', মনোজ মিত্রের 'কালবিহঙ্গ' ও ক্লিফোর্ড ওদেতের 'ওয়েটিং ফর লেফটি' অনুপ্রাণিত 'বিজয়ের অপেক্ষায়'।

বিবিধ সংবাদ

সম্প্রতি নাটকীয় নাট্য-ব্যবস্থা প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সুখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রীমৃণাল সেনকে এক সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত করেন।

'চলচ্চিত্রে মৃণাল সেন' সম্পর্কীয় আলোচনাটি বেশ কৌতূহলদ্দীপক হয়। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী শেখর চট্টোপাধ্যায়, সেবাব্রত গুপ্ত, উৎপল চক্রবর্তী, চন্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর দত্ত ওসুদীপ্ত চক্রবর্তী। সম্বর্ধনার উত্তরে চলচ্চিত্র নির্মাণের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন শ্রীমৃণাল সেন। এই প্রসঙ্গে ভুবন সেন প্রস্তুতির ভূমিকাটি আলোচনা করেন। নাটকীয়ে তরফ থেকে শ্রীসেনকে শিল্পীর প্রতিকৃতি, একটি তাম্রফলক এবং মানপত্র উপহার দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে নাটকীয় সংস্থা কর্তৃক তাদের নবতম প্রযোজনা 'স্বরচিত সংলাপ' (নাটক-নির্দেশনা—সুদীপ্ত চক্রবর্তী) নাটকটি অভিনীত হয়।

এক শিক্ষিত যুবকের বেকার জীবনে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারকে কেন্দ্র করে নাটকটি জমে উঠেছে। পরিশেষে এক জোরালো বক্তব্য দানা বেঁধে উঠেছে।

স্বাভাবিক সংলাপ ও বাস্তবসম্মত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পরিবেশনের জন্য নাট্যকার পরিচালক শ্রীসুদীপ্ত চক্রবর্তী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

সার্থক অভিনয়ের জন্য অমিতাভ বসু, জয়ন্ত দাস ও সুদীপ্ত চক্রবর্তী প্রশংসা পাবেন।

দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠস্বর সম্পর্কে সচেতন হবার অবকাশ আছে।

নাট্য-পরিবেশ তৈরী করতে সঙ্গীত তত্ত্বাবধানে সহায়তা দান করেছেন চন্ডীদাস মুখার্জি, হিমাংশু চৌধুরী ও অমিতাভ বসু।

৩৪তম বার্ষিক অধিবেশনে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেনঃ

পৃষ্ঠপোষকগণ ঃ তুষারকান্তি ঘোষ, অশোককুমার সরকার। সভাপতি ঃ মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। সহ-সভাপতি ঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং কালীশ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সহঃ-সম্পাদক ঃ অশোক মজুমদার এবং শৈলেশ মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ ঃ গোপাল পাল। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ বাগীশ্বর ঝা, সেবাব্রত গুপ্ত, জ্যোতির্ময় বসুরায়, রবি বসু, রঞ্জিৎ দত্ত, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ধর, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, রণধীর সাহিত্যালংকার, রফিক হারুণ, নরেন্দ্রদেও তেওয়ারী, বিশ্বরঞ্জন সান্যাল ও বিজন দত্ত।

এবারের বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারতের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অরণ্যের দিন-রাত্রি" ছবিটি। এ-ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে প্রদর্শিত হবার জন্যে যাচ্ছে নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক পরিচালিত "দিবারাত্রির কাব্য"। এই ছবি দুটির সঙ্গে এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও কিছু শিল্পীরও বার্লিন উৎসবে যোগদানের জন্যে যাবার ব্যবস্থা ছিল। এদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে জার্মান ফেডারাল রিপাব্লিক-এর পক্ষ থেকে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে যোগ দিয়েছিলেন সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়, অসীম দত্ত, নারায়ণ চক্রবর্তী, বিমল ভৌমিক, বসন্ত চৌধুরী, রবি ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম পুরোধা চিত্রাচার্য প্রমথেশ বড়ুয়ার স্মৃতি বাংলাদেশে জাগরূক রাখা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে 'প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল কমিটি' নামে একটি সংস্থা তৈরীর সংবাদ পাওয়া গেছে। সর্বশ্রী সুশীল মজুমদার (সভাপতি), বাগীশ্বর ঝা (সহ-সভাপতি), কুঞ্জবিহারী পাল (সহ-সভাপতি), প্রণব রায় (উপদেষ্টা), সুব্রতকুমার দাস (সম্পাদক), সুনীলচন্দ্র দাস (কোষাধ্যক্ষ) ও অমিতাভ সেন (জনসংযোগ আধিকারিক)। ডাঃ বিশ্বনাথ মন্ডল, ডাঃ সুকান্তি হাজরা, সর্বশ্রী সমর ব্যানার্জি, শুভেন্দু ঘোষ, শিবাজী সেন, দিলীপ কানুনগো, সুশীল চ্যাটার্জি, বরুণ বসু, কল্যাণ বসু, শৈলজানন্দ চ্যাটার্জি, ইন্দুভূষণ গোস্বামী, কমল পাকড়াশী, গোপাল মুখার্জি, মুকুলেশ্বর নিয়োগী ও বিরজাপ্রসন্ন রায় এই কমিটিতে আছেন।

মিলনী পাঠাগার ঃ গত ৯ থেকে ১৪ মে—ছ'দিনব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক উৎসব অনুষ্ঠিত হল ধূপগুড়ি ক্লাব হলে স্থানীয় মিলনী পাঠাগারের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা

বার্ষিকী উপলক্ষে। রবীন্দ্র দিবস, নজরুল দিবস, সুকান্ত দিবস, লেনিন দিবস, গণ-সংস্কৃতি দিবস ও পুরস্কার বিতরণী দিবস-রূপে এবারের উৎসব উদযাপিত হয়। ভুরাসের মধ্যে ধূপগুড়ির মিলনী পাঠাগারই একমাত্র সংস্থা যে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যে জেলাভিত্তিক আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা এবং নাটক প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পেরেছে।

সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীনির্মলকুমার সরকার। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীতপন চট্টোপাধ্যায় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন; সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র দে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। শ্রীসুদর্শন নন্দী, বি ডি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণের পর প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্য-সংস্থা অগ্রদূত মঞ্চস্থ করেন তরুণ নাট্যকার অনিল অধিকারীর 'জনতার আদালতে' নাটকটি।

যাদু উৎসব ঃ বাংলাদেশের তরুণ যাদুকরদের নিয়ে গঠিত যাদু সংস্থা বেঙ্গল ম্যাজিক সার্কেল-এর সভ্য এবং সভ্যাগণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞানভবন আয়োজিত কলকাতা যাদুঘরের সামনে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে এক যাদু উৎসব-এর আয়োজন করেছিলেন। যাদু উৎসবের উদ্বোধন করলেন শ্রীসুচারু ভট্টাচার্য। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে চিত্র-সাংবাদিক শ্রীধীরেন মল্লিক এবং প্রবীণ যাদুকর কার্তিক চট্টোপাধ্যায় (কে সি)। বেঙ্গল ম্যাজিক সার্কেল-এর সভাপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যাদুকর দি গ্রেট সুশীল এই যাদু উৎসব কেন করা এবং সার্কেল কেন গড়া, সে সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। যাদু উৎসবে অংশ নেন সার্কেল-এর সভাপতি যাদুকর দি গ্রেট সুশীল, বেতাল ভট্ট, শৈলেশ্বর, এস পি সরকার, হিমাংশুশেখর, কুমারী স্মিতা, সমীরণ।

দিশারী—গত ১৬ জুন সন্ধ্যায় স্টুডেন্ট হলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিশারী সংস্থা অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও যাত্রাজগতের বিভিন্ন শিল্পীদের পুরস্কৃত করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। অতীত দিনের মঞ্চশিল্পী শ্রীমতী রেণুবালা সুখ পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি শ্রীঘোষ বাঙলা দেশের শিল্পচর্চার প্রচার ও প্রসারে দিশারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বলেন, অতীতেও আমরা শিল্প-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা সেদিন এঁদের পুরস্কৃত করিনি,

যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো ঃ অমৃত

তবে সম্মান দিয়েছি। আজকের দিনে শিল্পচর্চার যেমন প্রসার ঘটছে, তেমনি এইসব পুরস্কারে এঁরা উৎসাহও পাচ্ছেন প্রচুর। প্রধান অতিথি নাট্যকার শ্রীগুপ্ত অতীত ও বর্তমান যুগের নাট্যধারার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের দেশের যা সমস্যা তাই দিয়ে নাটককে ভরিয়ে তুলতে হবে। আজকের নাটক দেশকে কালকে জয় করেছে কিনা দেখতে হবে। সাংবাদিক শ্রীঅরুণ বাগচী বিদেশী ভাল নাটক অভিনয় করার স্বপক্ষে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। সংস্থার সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু প্রীতিবাদের অভাবে আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে ভুলে গেছি—তাইতো এত গোলমাল। নৃত্য ও সঙ্গীত আমাদের দেশের ঐতিহ্য। সঙ্গীত জগতে শ্যাওলা জমছে। তাই বাঙলার সঙ্গীত সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সঙ্গীত সমাজের আচার্য স্থানীয়দের সেই শ্যাওলা পরিষ্কার করতে হবে। যাত্রা সে-তো অনেক আগেই চৈতন্যদেবের আমলে শুরু হয়েছে। কিন্তু আজকের যাত্রায় এমন সুন্দর অভিনয় হতে পারে ভাবতেও অবাক লাগে।

শ্রীমতী রেণুবালা সুখ বলেন, সাংবাদিকরা প্রবীণ শিল্পীদের জনসমক্ষে তুলে ধরার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী সুখ সংস্থার পক্ষ থেকে ১৯৬৯ সালের নাটক ও যাত্রায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজক, পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিল্পীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শেষে সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন চন্দনা মুখার্জি, সুবোধ রায়, প্রতাপ রায়, জয়ন্তী সেন, ঝর্ণা রায়, শ্যামল রায়চৌধুরী, বগলা মুখার্জি, প্রভৃতি। সকলকে ধন্যবাদ জানান রমেন ঘোষ।

প্রাণাচার্য সম্বর্ধনা সভা

গিরিশ নাট্য সংসদ-এর পক্ষ থেকে উত্তর কলিকাতার বহু প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে গত ১২ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় ৪৩।২, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটস্থ ভবনে কলকাতার প্রখ্যাত কবিরাজ শ্রীহেরম্বনাথ শাস্ত্রী মহোদয়কে তাঁর 'প্রাণাচার্য' উপাধি প্রাপ্তির জন্য সম্বর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত আইনবিদ শ্রীরমণীমোহন কর। সংসদ সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সভায় জানান যে, ধন্বন্তরী জয়ন্ত মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবিদ্যাবৈদ্য পরিষদের দিল্লী অধিবেশনে পরিষদ কর্তৃক ভারত ও সিংহলের যে সতেরোজন খ্যাতকীর্তি কবিরাজকে এই প্রাণাচার্য উপাধিতে সম্বর্ধিত করা হয়, শ্রীহেরম্বনাথ শাস্ত্রী তাঁদের অন্যতম। আয়ুর্বেদ চর্চায় কবিরাজ মহাশয়ের সাধনার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। সংসদ-এর পক্ষ থেকে কবিরাজ মহাশয়কে মানপত্র দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়।

সম্বর্ধনার উত্তরে কবিরাজ মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে আয়ুর্বেদের প্রসারের জন্য যে চেষ্টা একনিষ্ঠ ভাবে করে আসছেন তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে আয়ুর্বেদের মূলভিত্তিকে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে সকলের গ্রহণযোগ্য সহজ ও সরল ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে আয়ুর্বেদের প্রচার প্রসার ও গবেষণা কার্যে সচেষ্ট হতে হবে। মানব কল্যাণই আয়ুর্বেদের মূল লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে অবিচলিত থেকে তিনি সকলের সেবা ও নিরাময় করতে চিরদিন সচেষ্ট থাকবেন। বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহা-সম্মেলনের বর্তমান ও প্রাক্তন সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও শ্রীঅমলারণ সেন, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়কুমার গুহ, শ্রীজগদ্ধাত্রী-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কবিরাজ মহাশয়ের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন। পরে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

'সারা আকাশ' জার্মানীতে—বাসু চ্যাটার্জি পরিচালিত পরীক্ষামূলক হিন্দী ছবি 'সারা আকাশ' পঃ জার্মানীর 'মেক-লিনঘাউসেন' চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে। উত্তর ভারতের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব কাহিনী ছবিটিতে বিধৃত। পরিচালক শ্রীচ্যাটার্জি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মাত্র পঁচিশ দিনে সম্পূর্ণ আগ্রায় আউটডোরে ছবিটির কাজ করেছেন। হিন্দী চিত্রজগতে 'সারা আকাশ' নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রম।

ইউরোপের ছবি ঃ ভিন্ন রীতি

সৈকত ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সাহিত্যে ও চ্চিত্রে 'জেড' একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সিলিকস রচিত 'জেড'-এর কাহিনী র্ণত হয়েছে জর্জ লামব্রাকিসের হত্যা-স্যে অবলম্বনে। এই রাজনৈতিক খুনের ছনে ছিল বহুদিনের পুলিশী ষড়যন্ত্র। লিশ কর্ণধার থেসোলোনিক ও উত্তর সের ইন্সপেক্টর জেনারেল গেনভারমেস াকিস হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। লামব্রাকিসের মৃত্যু গ্রীসবাসীকে কস্তব্ধ করে দিয়েছিল। লামব্রাকিস লেন গ্রীসের খ্যাতনামা চিকিৎসক। ড়াবিদ হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল। ন ছিলেন যুবসমাজের আদর্শ। পিরে-সে তার ক্লিনিকের দ্বার গরীব দুঃখীর না থাকত সর্বদাই উন্মুক্ত। গ্রীসের শান্তি-লজের তিনি ছিলেন নায়ক। লাম-াকিস অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু যুবসমাজকে দিশাহারা করে দেয়। দশ বছরের ডানপন্থী সরকারের পতন ঘটল অবিলম্বেই। লাম-ব্রাকিসের নামে নব যুব আন্দোলন গড়ে উঠল। লেখক ভাসিলিকস লামব্রাকিসের হত্যা তদন্ত, পুলিশী ষড়যন্ত্র ও প্রশাসনিক দুর্নীতির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বইটি বেরোয় ১৯৬৬ খৃঃ। এই গ্রন্থ ভাসিলিকসের অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠার প্রতীক, লামব্রাকিসের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। লাম-ব্রাকিসের আদর্শ গ্রীসের যুবসমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। লাম-ব্রাকিস অমর। তাই গ্রন্থের নামকরণ 'জেড' (২) বিশেষ সার্থকতাপূর্ণ। 'জেড'-এর অর্থ 'সে জীবিত'। এই জটিল রাজনৈতিক তথ্য-সম্বলিত কাহিনীর চলচ্চিত্রায়নে তরুণ পরিচালক কোস্টাগ্রাভাস অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চলচ্চিত্রের খাতিরে স্বাভাবিক কারণেই পরিচালক এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের বহুলাংশ বর্জন করেছেন এবং তাতে কাহিনীর মূল সুর যেমন অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তেমন চিত্রনাট্যের গুণে ছবিটি পেয়েছে তীব্র নাট্যগতি। প্রতিটি ঘটনা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত। ইভাস মন-টানোকে লামব্রাকিসের চরিত্রে চমৎকার মানিয়েছে। তিনি অভিনয়ও করেছেন প্রাণ ঢেলে। তাঁর সঙ্গে সমান তাল রেখে গেছেন ফরাসী অভিনেতা জঁলুই ত্রিজই পাবলিক প্রসিকিউটার সারাজটাকিফের চরিত্রে। সাংবাদিকের চরিত্রটিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। 'জেড' ইউরোপ ও আমে-রিকায় যেখানেই মুক্তি পেয়েছে সাড়া জাগিয়েছে। গত কান উৎসবে 'জেড' বিশেষ প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরিচালক কোস্টাগ্রাভাস ও কাহিনীকার ভাসিলিকস দুজনেই তিন বছর ধরে নির্বাসিত। সামরিক শাসিত গ্রীসে এদের প্রবেশ নিষেধ। ছবিটি আলজেরিয়াতে তোলা হয়েছে। গ্রীস সরকার ছবিটি প্রদর্শনের অনুমতি দেন নি। ল্যাতিন আমেরিকা—যেখানে আজ রাজনৈতিক ছবির বন্যা বইছে সেখানেও 'জেড'-এর প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞা 'জেড'-এর সম্মান ও জনপ্রিয়তা স্পর্শ করতে পারেনি। শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র হিসাবে আমেরিকার অস্কার পেয়েছে ডি সিকা, ফেলিনি, আন্তনিওনি ভিসকান্তির প্রভাবমুক্ত যে কজন ইতালীয় পরিচালক সম্প্রতি খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন মার্কো বেলচিও, বেরনাডো বেত্রলুচি ও এডোয়ারডো ব্রুনো এবং এরা সবাই রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করছেন। চলচ্চিত্রায়নে কিছু ডিসিকা ও রোজেলিনির 'নববাস্তববাদ' ঘেঁষা হলেও এরা আন্তনিওনি ও ফেলিনির কল্পনাজগত থেকে সরে এসেছেন কঠিন বাস্তবে। অনেক বেশী সাধারণ মানুষের কথা বলছেন এরা। ইতালীর রাজনৈতিক দাবাখেলাকে তীব্র কষাঘাত করেছেন। দুর্নীতির মুখোস খুলে দিয়েছেন। কল্পিত কাহিনী অবলম্বন রোমান্টিক ছবি তুলতে এরা মোটেই ইচ্ছুক নন। রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে সমাজ-সচেতন ছবি তোলার দিকেই এরা উৎসাহী।

আঠাশ বছরের বেলচিওর প্রথম ছবি 'ফিস্ট ইন দি পকেট' ইতালীর সমাজ-ব্যবস্থার দুর্নীতির দলিল। ইতালীর পার্লামেন্টের কজন সদস্য চেষ্টা করেছিলেন যেন চিত্রটি প্রদর্শনের অনুমতি না পায়। অনেক ঝামেলার পর ছবিটি মুক্তি পেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই পেল জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। দেশেবিদেশে উচ্চ প্রশংসা লাভ করল তরুণ পরিচালকের প্রথম দুঃসাহসিক সৃষ্টি হিসাবে। শ্রেষ্ঠ চিত্র-নাট্যের জন্য ইতালীর অস্কার দেওয়া হল বেলচিওকে। দ্বিতীয় ছবিতে বেলচিও হলেন আরও দুঃসাহসী। ছবিটি 'চায়না ইজ নিয়ার'। জটিল রাজনৈতিক মতবাদের বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ। আদর্শহীনতা, নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন ও মোহভঙ্গ হল ছবিটির বক্তব্য। মধ্যবিত্ত ঘরের দুই ভাই ও এক বোন কাহিনীর মুখ্য চরিত্র।

বেলচিও মনে করেন রাজনৈতিক বিষয়-বস্তু নিয়েই তিনি ছবি করে যাবেন। জন-সাধারণকে সজাগ করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম চল-

জেড লুই ত্রিন্তিগা

চ্চিত্রকে তিনি তার রাজনৈতিক চিন্তার প্রতি-ফলন হিসাবে ব্যবহার করতে চান। পূর্ব-সুরীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন ভিসকান্তির প্রথম জীবনের দু-একটা ছবি তার প্রিয়, তবে ভিসকান্তি এখন পথভ্রষ্ট এবং তাঁর ছবিও বৈশিষ্ট্যহীন। ফেলিনি সম্পর্কে বলেন, একেবারে অসহ্য, দশ মিনিটের বেশী দেখতে পারি না তাঁর ছবি। আন্তনিওনিও খুব একটা পছন্দ নয়। তরুণ পরিচালক-গণের মধ্যে বেত্রলুচি ও ব্রুনো সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। বেত্রলুচির 'বিফর দি রিভলিউসন' তার প্রিয় ছবি। ব্রুনো ইতালীর বিখ্যাত চলচ্চিত্র পত্রিকা 'ফিল্ম-ক্রিটিকা'র প্রকাশক ও সম্পাদক। চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গতবার বার্লিন উৎসবে তার কাহিনীচিত্র 'গ্লোরিয়াস ডেজ' বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। একদল যুবকের রাজনৈতিক কান্ডকারখানা ছবিটিতে স্থান পেয়েছে। ইতালীর রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার তিনি তীব্র সমালোচক।

বহু-বিতর্কিত জাঁলুকগদার রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের একজন দিকপাল। ফিল্ম সোসাইটি থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি কাফে পর্যন্ত আঁতেলেকচুয়াল যুব-সম্প্রদায়ের চলচ্চিত্রালোচনার প্রধান বিষয় গদারের ছবি। 'লা চিনোয়া' থেকে গদারের চলচ্চিত্রচিন্তা একটা বিশেষ দিকে মোড় নিয়েছে। 'লা চিনোয়াই' গদারের প্রথম রাজ-নৈতিক ছবি। 'লা চিনোয়া' ভেনিস উৎসবে

এক্কেন পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও ইউরোপে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশক ছবিটি কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং জ্যঁলুকগদার প্রতিটি শোতে উপস্থিত থাকেন ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেন। সিনেমাৎসুক ছাত্র-ছাত্রীরা চেয়েছিলেন সিনেমা আর্ট সম্বন্ধে কিছু শুনতে। কিন্তু আজকাল গদার বিশ্বাসই করতে চান না আর্ট বলে কিছু আছে। তিনি উৎসাহের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, কিন্তু চলচ্চিত্র নিয়ে নয়। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'লা চিনোয়া'কে স্বাগত জানিয়েছেন। লসএঞ্জেলেসের জনৈক আণ্ডার-গ্রাউণ্ড সাংবাদিক ফ্রি প্রেসে লিখেছেন—"আমি ও আমার মত অনেকেই সিরিয়াসলি ভাবেন জ্যঁলুকগদার কোন অংশে সার্ত্রে বা ডস্টেয়ভস্কির চেয়ে কম নন।" রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কালিফোর্নিয়ার ছাত্র ও সাংবাদিকের সঙ্গে গদারের বিশেষ পার্থক্য দেখা দেয়নি। প্রখ্যাত ডকুমেণ্টারিস্ট সোল লানডু যিনি ফিডেল কাস্ট্রোর জীবনী অবলম্বনে ছবি তুলে খ্যাতি অর্জন করেছেন, 'রাজনীতি ও চলচ্চিত্র' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি গদারকে বলেন, "আমরা মনে করি না আপনার ছবি একটা আরম্ভের শেষ বরং বলা যেতে পারে আরম্ভের শুরু। বিপ্লবী রাজনীতি-বিদ্ ও বিপ্লবী চলচ্চিত্রকারদের পক্ষে এই ছবির মূল্য অসীম। আমাদের কল্পনাশক্তির বিস্তার ঘটেছে আপনার বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে।"

আপনি কি চলচ্চিত্রকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান? প্রশ্নের উত্তরে গদার বলেন, "আমি মনে করি চলচ্চিত্র মাধ্যমে বিপ্লব সম্ভব। আমার হাতে বন্দুক নেই। থাকলে হয়ত বা বন্ধুকেই গুলী করে বসতাম, কারণ আগ্নেয়াস্ত্রের সঠিক ব্যবহার আমি জানি না। আমি বিশ্বাস করি চলচ্চিত্রই আমার অস্ত্র এবং এই চলচ্চিত্র মাধ্যমকে আমি সশস্ত্র বিপ্লবে নিয়োগ করতে চাই।"

'লা চিনোয়া'র পর 'উইকয়েণ্ড' নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। উইকয়েণ্ডে রাজপথে দুরন্তবেগে গাড়ী চলে। প্রাণ হারায় অসংখ্য। কিন্তু গতি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। প্রাণের চেয়ে গতির মূল্য বেশী। গদার যেভাবে মোটরের মিছিল ও দুর্ঘটনা চিত্রায়িত করেছেন তা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অভিনব। রাস্তার দুধারে দুর্ঘটনায় নিহত দেহগুলো যেন প্রকৃতিকে শোভামণ্ডিত করেছে। একদিকে রক্তাক্ত দেহের ছড়াছড়ি আর তার পাশে সীমাহীন সবুজ প্রান্তর। এই বৈপরীত্য অসাধারণ। স্বাভাবিকতা ও ঘটনার সামঞ্জস্য উইকয়েণ্ডের অনেক ক্ষেত্রেই নেই; এবং এ ব্যাপারে গদার যতটা ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন, বুদ্ধিজীবি দর্শকরা নিশ্চয়ই ততটা নন। উইকয়েণ্ডে নৃশংসতা মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু গদারের মতে এই হল আধুনিক সভ্যতার স্যাটায়ার।

পরের ছবি 'ওয়ান প্লাস ওয়ান' বা তার পরের ছবি 'দি গে নোয়িংয়ে' ঘটেছে পুরোনো সংলাপের পুনরাবৃত্তি। কাহিনী প্রায় একই, শুধু পরিবেশে হয়ত বা কিছুটা অভিনবত্ব আছে, যেমন ওয়ান প্লাস ওয়ানের দৃশ্যপট জুড়ে আছে পরিত্যক্ত ভগ্ন গাড়ীর সমাধি—যার অর্থ হল বুর্জোয়া সমাজের শেষ অবস্থান।

'দি গে নোয়িংয়ে' মুখ্য চরিত্রে রয়েছে একজন তরুণ এমিল রুসো ও একজন তরুণী পেট্রিসা লুমুম্বা। স্থান: প্যারিসের কাফে। বক্তব্য: মার্কস, মাও ভিয়েৎনাম, চে গাভেরা, ছাত্র বিপ্লব। প্রা[য়] ঘণ্টা ধরে তরুণ রুসো ও তরুণী লুমুম্বা[র] মধ্যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হল সারা ছবিটি জুড়ে আছে শুধু সংলাপ নাভেল ভাগ আন্দোলনের হোতা গদারের ছবিতে এককালে যে শিল্পসৌন্দর্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল আজ তা সম্পূর্ণ বিলীন কিন্তু তবুও আজও তিনি জনপ্রিয়তা[য়] অদ্বিতীয়। আগামী ছবি 'ইস্ট উইণ্ড' সমাপ্তপ্রায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্যারিসের বিপ্লবী ছাত্রনেতা কো বান্ডিট।

পূর্ব ইউরোপের পরিচালকরা সাম্য[বা]দকে কশাঘাত করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। কোন সমাজব্যবস্থাই যে ত্রুটিহীন নয় এটা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। চেক, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভ পরিচালকগণের আধুনিকতা সৃষ্টিগুলো ভুয়সী প্রশংসার দাবী করতে পারে। চেক ছবিতে দেখতে পাওয়া সূক্ষ্ম প্রতীকের ব্যবহার, রাজনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষ রয়েছে। কিন্তু যুগোশ্লাভ পরিচালকগণ সোজাসুজি স্বদেশের রাজনীতিকে আক্রমণ করেছেন। তরুণ পরিচালকরা একটা বিশেষ মত ও পথ অবলম্বন করে ছবি করছেন। এরা সবাই কম বেশী দুঃসাহসী। এবং যেভাবে নিজের দেশের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছেন তা তুলনাহীন। গত বার্লিন উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী মিকাকে প্রথম কাহিনী চিত্র 'আর্লি ওয়ার্কস' সারা ইউরোপ জুড়ে বুদ্ধিজীবী মহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা পূর্ব ইউরোপে সাম্প্রতিক কোন ছবির পক্ষেই সম্ভব হয়নি। 'আর্লি ওয়ার্কসে'র নায়িকা যুগোশ্লাভা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। মার্কসের স্বপ্নকে সফল করতে বদ্ধপরিকর। যুগোশ্লাভার সঙ্গে রয়েছে তার তিন পুরুষবন্ধু। কিন্তু যখন বিপ্লবের সময় ঘনিয়ে এল, তিন বন্ধু অদৃশ্য হল। বক্তৃতা কেউ কম দেয়নি প্রতিজ্ঞাও কেউ কম করেনি কিন্তু নিজের দূরে রইল আসল সময়ে। বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা সরলমনা যুগোশ্লাভাকে দারুণ আঘাত করল। সে ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। বন্ধুরা যারা মজা দেখছিল এবার এগিয়ে এল। যুগোশ্লাভাকে যন্ত্রণা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিল তার দেহে পেট্রল দিয়ে আগুন ধরিয়ে। লেলিহান বহ্নিতে বহ্নিময়ী যুগোশ্লাভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। বিপ্লব ব্যর্থ হল, যুগোশ্লাভার নতুন পৃথিবীর স্বপ্নও ব্যর্থ হল, যুগোশ্লাভার নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন যুগোশ্লাভিয়াতে এখনও যারা দেখেন, তার পরিণতি শুধু ব্যর্থতা ও মোহভঙ্গ। রাজনীতিতে সারল্য ও স্বপ্নের কোন মূল্য নেই।'

খেলার কথা

বিশ্ব কাপ ব্রেজিলেরই

অজয় বসু

আমরা বলি ব্রেজিল। স্বদেশবাসীরা, ব্রাসিল। ব্রেজিলের কোনো খেলোয়াড়ের গায়ের ট্র্যাক স্যুটের ওপরকার ছাপও ব্রাসিল। মেকসিকো থেকে নতুন রাজধানী ব্রাসিলিয়ায় অথবা রিও ডি জেনেরোতে যেদিন ফুটবলের 'সোনার পরীটিকে' হাতে নিয়ে কোচ মারিও জাগালো ও ক্যাপ্টেন কার্লস অ্যালবার্টো দলবল নিয়ে পৌঁছলেন সেদিন তিন অক্ষরের ওই নাম ব্রাসিলই আশপাশের বাতাস ভরিয়ে তুলেছিল। জনতার জয়ধ্বনি, আবেগের তরঙ্গ শীর্ষে উঠে আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিল। হাজারো কণ্ঠের উথালপাথাল! প্রত্যক্ষ সাক্ষী নই। তবু বুঝতে পারি যে, সে উন্মাদনা গভীরতায় কতোখানি'

কিন্তু ব্রাসিলিয়া বা রিও ডি জেনেরোর মাথার ওপরকার আকাশ কতোটুকু! ওই আকাশ কি ব্রাসিল বা ব্রেজিলের মহিমা ধরে রাখতে পারে? রাজশহর ব্রাসিলিয়া অথবা রিও ডি জেনেরোর ছাদের সীমানা ছাড়িয়ে ব্রেজিল আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ফুটবল দুনিয়ার মহাকাশে। তিন অক্ষরের ছোট্ট নাম ব্রেজিল, কিন্তু ব্যাপ্তিতে কতোখানি! কানু বিনা গীত যেমন নেই, তেমনি আধুনিক ফুটবলে ব্রেজিল ছাড়া অন্য নামও বুঝি আর কিছু নেই।

কথাটা কি মিথ্যে? গত এক যুগের ইতিহাস উলটে দেখুন। ১৯৫৮ থেকে এই ১৯৭০—দীর্ঘ বারো বছরে ব্রেজিলই বিশ্ব ফুটবলে প্রথম পুরুষ, প্রায় সর্বশক্তিমান। বারো বছরে বিশ্ব কাপ ফুটবলের চারটি অনুষ্ঠান হয়েছে। তার তিনটিতেই ব্রেজিলের জয়জয়কার। অবশিষ্ট লগ্নে মাত্র একবারের জন্যেই ব্রেজিল কোণঠাসা। কিন্তু তাও অন্য পক্ষদের ক্রীড়া-দক্ষতার চাপে নয়, তাদের গা-জোয়ারীর গুণ্ডামীতে। ১৯৬৬ সালে হালে পানি পাবে না জেনেই অন্য অন্য পক্ষরা ব্রেজিলের সঙ্গে খেলতে চায়নি। চেয়েছিল 'সম্রাট' পেলের পায়ের হাড়গুলি টুকরো টুকরো করে দিয়ে ব্রেজিলকে হৃতশক্তি করে তুলতে। সে এক জঘন্য চক্রান্ত। ফুটবলের অগ্রগতির ইতিহাসে তা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন লগ্ন। ওই মুহূর্তের কথা আমরা যতো ভুলে যেতে পারি ততোই মঙ্গল।

আশার কথা, মেকসিকোতে এবার বিশ্ব কাপ ফুটবলের যে অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তার বিবরণ ইংলণ্ডের আয়োজনের (১৯৬৬) দুঃস্বপ্নকে ভুলিয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অশোভন আচরণের জন্যে এবার একজন খেলোয়াড়কেও মাঠ থেকে বার করে দিতে হয়নি। অথচ ১৯৬৬-তে রেফারীরা পরম সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীলের ভূমিকা নিতে চেয়েও নয় নয় করে জন-পাঁচেক খেলোয়াড়কে মাঠ ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই হিসাব থেকেই অনুমান করা যায় যে, চার বছরের ফাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির ফুটবল খেলোয়াড়দের মনোভাব বদলেছে। নৈতিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা আগের চেয়ে সচেতন হয়েছেন। বেপরোয়া গা-জোয়ারীর আস্ফালন ঘটানোর চেয়ে তাঁদের নজর এখন খেলার দিকে।

তাঁরা খেলতে চেয়েছেন বলেই আজটেক, জালিসকো, মিউনিসিপাল, ডোসাল ও জারাগোজা, মেকসিকোর এই পাঁচটি স্টেডিয়াম আধুনিক ফুটবলের ঐশ্বর্যে এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কীর্তি-কৃতিত্বের সাক্ষরে ভরে উঠেছিল। ও'রা যদি খেলতে না চাইতেন, না খেলে লাথি, ঘুঁষি, কিল, চড় ছুঁড়ে যদি পেলে, জাইরজিনহো, টোসটাও, কিউবিল্লাস, জার্ড মুলার, লুইগি রিভাকে অকেজো করে দিতে চাইতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ফুটবলের জাত-শিল্পীদের মাথা ও পায়ের কাজের অলংকরণে মেকসিকোর পাঁচটি স্টেডিয়াম সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো না। যেমন ওঠেনি ১৯৬৬-তে ইংলণ্ডের মাঠ-ময়দানগুলি।

চূড়ান্ত পর্বের ষোলটি দলই সাধ্যমতো খেলার খেলা খেলতে চেয়েছে। রক্ষণে তাদের মন ছিল, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কেউই (উরুগুয়ে, ইতালীও নয়) নিজেকে রক্ষণ-ব্যূহের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চায়নি। ইংরাজীতে যাকে বলে কিপিং দি স্যাটার্স ডাউন, অর্থাৎ দরজা-জানালায় খিল এঁটে বসে থাকার মতো নেতিমনের প্রভাব কোনো দলকেই গিলে ফেলেনি। মুক্ত মনে, স্ফূর্তি-মাথা মেজাজ নিয়েই সবাই খেলেছে। এবং ওইভাবে খেলতে খেলতে জিতে এবং হেরেও আনন্দ পেয়েছে তারা। হেরেও আনন্দ! কথাটায় অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। ফাইনালে হেরে ইতালীর খেলোয়াড়েরা অথবা কোয়ার্টার ফাইনালে হারা পার্টি ইংলণ্ডের খেলোয়াড়েরা স্বদেশে ফিরলে স্বদেশবাসীদের কেউ তাঁদের দুয়ো দেননি। বরং ও'দের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়নে প্রাপ্য প্রশংসাই তাঁদের উপহার দিয়েছেন।

খেলোয়াড় এবং দেশ-বিদেশের ফুটবল অনুরাগীরা নেতিমনের প্রভাব থেকে বোধ-হয় ক্রমশঃই মুক্তি পাচ্ছেন। এটা সুলক্ষণ। ১৯৬৬-তে ব্রেজিল হেরে যাওয়ার পর কে বা কারা যেন রিও ডি জেনেরোর রাজপথে দলের ম্যানেজার ভিসেনটি ফিওলার জন্যে একটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করেছিল। কিন্তু কই, আগের বারের চ্যাম্পিয়ন ইংলণ্ড এবারে কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডী ডিঙোতে না পারলেও তো কেউ দলের ম্যানেজার স্যার আলফ র‍্যামজের মুণ্ডপাত করতে চাইছে না? তাই বলছিলাম, জাতীয়তাবোধের প্রেরণা এবং দল সমর্থনের গোঁড়ামীর বুকচাপা প্রভাব মুক্ত ফুটবল অনুরাগীরা বুঝি বাস্তব পরিস্থিতির নাড়ি টেপায় আগ্রহ দেখাতে চাইছেন। তাঁরা এই তত্ত্বের মর্মার্থ অনুধাবনে সচিন্ত হয়ে উঠছেন যে, খেলায় জিৎ যেমন হারও তেমনি সত্যি। যে হারে সেই জিততে পারে। হার যার মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারে না, জেতার আনন্দ তারই সবচেয়ে সাচ্চা।

মেকসিকোয় বত্রিশটি খেলায় গোল হয়েছে পঁচানব্বইটি। শুধু দুর্গ আগলাবার সংকল্পে সবাই যদি শুধু আটঘাট বাঁধার চেষ্টায় আত্মসমর্পণ করতো, তাহলে কি এতো গোল হোতো? আর এতো গোল না হলে আমরাই বা কি করে বুঝতাম যে, বিশ্ব কাপ ফুটবলের নবম অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছে? সব না হলেও গোলই তো ফুটবলের অনেকখানি। গোলেই গণ্ড-গোল, আবার গোলই আনন্দ, উত্তেজনার উৎস। আনন্দ, উত্তেজনাই (এবং গণ্ড-গোলও) প্রাণের উষ্ণ উপাদান। উত্তেজনার হেতুটিকে হত্যা করে আনন্দের উৎসের ওপরে যদি কবরের মাটি চাপা দেওয়া হয়, তাহলে গোলবর্জিত সেই খেলায় থাকেই বা কি! যা অবশিষ্ট পড়ে থাকে তা দিয়ে মন যেমন ভরে না, তেমনি নয়নের তৃপ্তিও কি ঘটে?

এক পর্যায়ে পঁচানব্বইটি গোল বিশ্ব কাপ ফুটবলে রেকর্ড নয় কিন্তু। তবে রেকর্ডের কাছাকাছি বটে। আরও গোল (১৩৫) হয়েছিল ১৯৫৪-তে যেবার জুলে রিমে কাপ পায় পশ্চিম জার্মানী হাঙ্গেরীকে হারিয়ে এবং (১২৪টি) ১৯৫৮ সালে।

গোল, গোল বলে আকাশ ফাটাতে গিয়ে মেকসিকানদের গলা চিরে বোধহয় ছেঁড়ে হয়ে গিয়েছিল। বত্রিশটি খেলার মধ্যে গোল হয়নি এমন ম্যাচের সংখ্যা মাত্র তিনটি—লীগ পর্যায়ে রাশিয়া বনাম মেকসিকো এবং ইতালী বনাম উরুগুয়ে, বনাম ইজরায়েল। সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালের তিনটি খেলার প্রত্যেকটিতেই অন্যূন চারটি করে গোল হয়েছে এবং চারটি কোয়ার্টার ফাইনালের একটি ছাড়া বাকী ক'টিতেই গোল হয়েছে পাঁচ বা ততোধিক।

এবারের সেরা খেলা সেমি-ফাইনালে ইতালী বনাম পশ্চিম জার্মানী। খেলার নিষ্পত্তি হয় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের আধঘণ্টায় নয় নয় করে পাঁচটি গোল হয়েছে। এই ম্যাচে ইতালী না পশ্চিম জার্মানীর, কোন দল আনুপাতিক হিসেবে বেশি ভাল খেলেছে, তার হিসেব-নিকেশ বোধহয় কেউই মাথা ঘামাননি, শুধু দু'পক্ষের প্রশিক্ষকেরা ছাড়া। কারণ, নিজেদের দক্ষতা এবং প্রাণশক্তিকে উজাড় করে দিয়ে ইতালী ও পশ্চিম জার্মানীর যে সব খেলোয়াড় মেকসিকোর মাঠে প্রতিক্ষণেই নাটক গড়ায় সফল হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভাল খেলেছেন। দুনিয়ার ফুটবল অনুরাগীরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা শুধু ফুটবলের ক্রীড়াগত ঐশ্বর্য বাড়াননি তাঁরা মানুষের শরীর ও মনের বিরাট কর্মক্ষমতার সম্ভাবনার হদিশ দিয়ে

সমকালীন সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। শুনেছি, পশ্চিম জার্মানী বনাম ইতালীর ওই ম্যাচের শেষাংকে দু' পক্ষের জনকয়েক খেলোয়াড়কে দৈহিক সুস্থতা ছিল না। কারুর হাত ভেঙেছিল, কারুর বা পা হয়েছিল খোঁড়া। কেউ বা প্রায় অচৈতন্য। কিন্তু এতো সব অসুবিধা সত্ত্বেও ও'রা কেউই রণে ভঙ্গ দিতে চাননি। ও'দের মানসিকতা অপরাজেয়, সন্দেহ নেই। শেষ-পর্যন্ত যুঝেছেন, লড়েছেন, দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো ১২০ মিনিট পরিশ্রম করেছেন। ও'দের রক্ত জল-করা মেহনতের সূত্রে আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে—যে-অধ্যায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা : ওই খেলাই শতাব্দীর সেরা ম্যাচ।

দলগত শোভন আচরণে পেরু এবার 'ফেয়ার প্লে কাপ' পেয়েছে। মেক্সিকোয় বিশ্ব কাপ ফুটবল আরম্ভের মুখে এক সর্বনাশা ভূমিকম্পে পেরুর জনজীবনে মহা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। এই প্রলয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাথা ঠিক রেখে খেলে পেরুর খেলোয়াড়েরা মেক্সিক্যান দর্শককুল এবং সেই সঙ্গে অন্য মুলুকের ক্রীড়ানুরাগীদের সহানুভূতি ও প্রশংসা দুই আদায় করতে পেরেছেন। সর্বসম্মত রায়ে এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে এবারের ষোলটি প্রতিযোগীর মধ্যে পেরুর জনপ্রিয়তাই সবচেয়েও বেশি। কিন্তু ফেয়ার প্লে কাপ না পেয়েও পশ্চিম জার্মানী কোয়ার্টার ফাইনালে ইংলণ্ডকে হারিয়ে এবং সেমি-ফাইনালে ইতালীর কাছেহেরে যে সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার পরিমাণও কিছু নয়। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল, পরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়দের যে পরীক্ষার মুখে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল, সেই কঠিনতম পরীক্ষার কষ্টিপাথরে এবার অন্য পক্ষকে ঘষামাজা করার অবকাশ ঘটেনি। হারে জিতে কিই বা আসে যায়! পশ্চিম জার্মানী ইতালীর কাছে ৩—৪ গোলে হেরেছে। তাতে কি! কেই বা এই হারের লেখা মনে রাখতে চেয়েছে? হেরেও যদি কোনো দল বিজয়ীর প্রাপ্য অভিনন্দন পেয়ে থাকে তাহলে সে দলটি হলো ওই পশ্চিম জার্মানীই। ইতালীর জন্যে দুঃখ হয়! এই দলটির পিছনে এতোটুকু জনসমর্থন ছিল না। কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোকে হারিয়ে দিতেই ইতালী হয়ে ওঠে মেক্সিকান দর্শককুলের দু' চোখের বিষ। জনমতের ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও ইতালী যে ফাইনালে উঠেছে তা যে মস্তো কৃতিত্বের পরিচায়ক তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ইতালীর লুইগি রিভা, বোনিগসেগনা, ডোমেনঘিনি, ব্রেজিলের জাইরজিনহো, রিভেলিনো, গারসন, টোসটাও, পশ্চিম জার্মানীর জার্ড মুলার ও রেনহার্ড লিবুডা, পেরুর কিউবিলাস এবং আরও দু'-একজন হলেন ফুটবলের আকাশে নতুন নক্ষত্র। ইতালীর ফেচেটি, জার্মানীর ইউ সিলার, ইংলণ্ডের ববি মুর ও চার্লটন এবং ফুটবলের 'রাজরাজেশ্বর' পেলের ছেড়ে-যাওয়া আসন ও'রা অধিকার করলেন বলে। বলতে পারা যায় যে, একটি যুগ শেষ হতে চলায় নতুন যুগের সূচনা অত্যাসন্ন। এই তো স্বাভাবিক। অনন্ত-যৌবন কেউ নন। কালের নিরিখে আজকের রাজাকে আগামীকাল ফকির বনে যেতে হবে অথবা আজকের নায়ককে নতুন কালের নায়কের আবির্ভাবের পথ ছেড়ে দাঁড়াতেই হবে। পেলে-চার্লটনেরা সরে যাবেনই। ও'দের জায়গা দখলে যাঁরা আসছেন, তাঁদের কি মেক্সিকোর মাঠে-ময়দানে দেখতে পাওয়া গেল না?

ফুটবলের সোনার পরীকে চিরদিনের জন্যে ব্রেজিল ঘরে তুলতে পারায় আন্তর্জাতিক ফুটবলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের অভিমতটিই আবার প্রাধান্য পেয়েছে। এই মতে প্রথা-প্রকরণের ঊর্ধ্বে খেলোয়াড়দের ঠাঁই দেওয়া হয়। পরীক্ষিত তত্ত্বের দাম আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের সম্ভাবনার কি শেষ আছে? ব্রেজিল বা দক্ষিণ মার্কিনমণ্ডলের অন্য দেশগুলি খেলোয়াড়দের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভাকে প্রথা-প্রকরণের রক্তচক্ষু শাসানিতে বেঁধে রাখতে চায়নি।

ব্রেজিল দলের প্রশিক্ষক মারিও জাগালো ঠিক সেই কথাই বলেছেন। জাগালো ১৯৫৮ ও ১৯৬২-তে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রেজিল দলের খেলোয়াড় ছিলেন। ব্রেজিলের সাফল্য সম্পর্কে তাঁর মত কি জিজ্ঞাসা করা হলে জাগালো বলেন, 'খেলতে নেমে আমরা বলের দিকে দৃষ্টি রেখেই একাগ্র হতে চাই। মানুষ বা আঞ্চলিক রক্ষণনীতির তেমন ধার ধারি না। এইখানেই আমাদের সঙ্গে ইউরোপীয় ফুটবলের পার্থক্য।' কথাটা পুরোপুরি খাঁটি। বল নিয়েই তো খেলা। বলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে আপনা থেকেই ফুটবল খেলার অন্য প্রকরণ আয়ত্তে আনা যায়। করা যায় অনেক মুশকিলের আসান।

অন্য প্রথা-প্রকরণ ও প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রথমে মাথা না ঘামিয়ে ব্রেজিল আগেভাগেই বলটি নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করতে চেয়েছে। পেরেছেও বহুলাংশে। তাই পরের কাজগুলি করে তুলতে ব্রেজিলের আটকায়নি।

ব্রেজিল আধুনিক ফুটবলে একটি পরীক্ষারই প্রতীক। এবং সে পরীক্ষার সার্থকতা সম্পর্কে ক্রমশঃই একটি সর্ব-সম্মত ধারণা দানা বেঁধে উঠছে। যেহেতু পরীক্ষিত সম্বল হাতে করেই দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের প্রতিনিধিরা অন্যূন পাঁচবার বিশ্ব কাপ জয় করেছে। পক্ষান্তরে আনুপাতিক হিসাবে সংখ্যায় অনেক বেশি হয়েও ইউরোপীয় প্রতিযোগীরা অতোবার বিশ্ব কাপ জয় করতে পারেনি। তারা আরও পারেনি দক্ষিণ মার্কিন মুলুকে গিয়ে বিশ্ব ফুটবলের আসরে শ্রেষ্ঠের সম্মান অর্জন করতে। কিন্তু ব্রেজিল পেরেছে সুদূর ইউরোপে গিয়ে সর্বোত্তম প্রতিযোগীর ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ফুটবলে ইউরোপ ও দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের মধ্যে কৃতিত্ব, কীর্তির মূল্যায়নে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠতর এবং কোন্ পক্ষ অনুসৃত রীতি চূড়ান্ত সাফল্যের পথে সহায়ক সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই এতোদিনে সবাই নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে।

ফুটবলে পথিকৃৎ ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায় এবং কতোটা মৌল, ব্রেজিল তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

ইউরোপ জোর দেয় খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা ও প্রস্তুতি এবং খেলার প্রথাপ্রকরণ, টেকনিকের ওপর। ব্রেজিল শারীরিক সঙ্গতি ও প্রথাপ্রকরণের আশীর্বাদকে অস্বীকার না করেও খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতাকে অনেক বেশি মূল্যবান বলে মেনে নিয়েছে। ব্রেজিলীয় মতে, দক্ষতার বিকল্প নেই। ইউরোপ অনুশীলন ও পরিশ্রমে, ছক কাটা পদ্ধতি অনুসরণে খেলোয়াড়দের যন্ত্রবৎ নিখুঁত করতে চেয়েছে। কিন্তু যন্ত্রের সামর্থ্য কি সীমাবদ্ধ নয়? তাই ব্রেজিল কাটা ছকের বাঁধন কেটে খেলোয়াড়দের সামনের দিকে আরও এগোতে এবং সৃজনধর্মিতায় তাঁদের উৎসাহ যোগাতে চেয়েছে। ব্রেজিল খেলোয়াড়দের কলের পুতুল হিসেবে নয়, 'বল-আর্টিস্ট' বা জাতশিল্পী হিসেবে গড়তে চেয়েছে। গড়েওছে।

এক যুগের মধ্যে ব্রেজিল তাই পেলে, গারিনচা, ভাভা, ডিডি, জালমা সানটোস, জাগালো, জাইরজিনহো, টোসটাও প্রমুখের মতো প্রতিভাবানকে আন্তর্জা[illegible] ফুটবল আসরে নামাতে পেরেছে। ম[illegible]ারো বছরে যে দেশ নিজের ফুটবল [illegible]গানে এতো সব দর্শনধারী ফুল গাছে সাজাতে পারে সে দেশে প্রতিভা প্র[illegible] হওয়ায় পথ সত্যিই সহজ। ব্রেজিল তাই শুধু এক পরীক্ষার প্রতীকই নয়, ব্রেজিল এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তও বটে।

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার নবম অনুষ্ঠান সম্পর্কে শেষ কথা যে এবার আচমকা অঘটন বা আপসেট বড় একটা হয়নি। গতবারের বিজয়ী ইংলণ্ডের পরাজয় কোনো অঘটনই নয়। কারণ, বিশেষজ্ঞ মহলের, মায় আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার বৃটিশ সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউজেরও পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল যে, ইংলণ্ড জুলে রিমে ট্রফিটিকে নিজের অধিকারে রাখতে পারবে না। ইতালীর ফাইনালে ওঠাও কোনো অঘটন নয়। যেহেতু ইতালীই ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন। চূড়ান্ত পর্বে দক্ষিণ মার্কিন মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ দলের মোকাবিলা করার অধিকার ইতালীর যতোটা ছিল আর কারুর তো তা ছিল না।

খেলাধূলা

দর্শক

গারফিল্ড সোবার্স
বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা

ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব দল

প্রথম টেস্ট খেলা

ইংল্যান্ড : ১২৭ রান (রে ইলিংওয়ার্থ ৬৩ রান। সোবার্স ২১ রানে ৬ এবং ম্যাকেঞ্জী ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৩৯ রান (লাকহার্স্ট ৬৭, বেসিল ডি'ওলিভেরা ৭৮, রে ইলিংওয়ার্থ ৯৪ রান। ইন্তিখাব আলম ১১৩ রানে ৬ এবং সোবার্স ৪৩ রানে ২ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ : ৫৪৬ রান (সোবার্স ১৮৩, এডি বার্লো ১১৯, ইন্তিখাব আলম ৬১ এবং গ্রেমী পোলক ৫৫ রান। ওয়ার্ড ১২১ রানে ৪, আন্ডারউড ৮১ রানে ২ এবং স্নো ১০৯ রানে ২ উইকেট)

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব একাদশ দলের প্রথম টেস্ট খেলায় গ্যারী সোবার্সের নেতৃত্বে বিশ্ব একাদশ দল এক ইনিংস ও ৮০ রানে জয়ী হয়েছে। সোবার্স ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে যে তিনি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন তা অক্ষুন্ন রাখেন।

প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ১২৭ রানের মাথায় শেষ হয়। বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স ইংল্যান্ডের এই হাঁড়ির হাল করেছিলেন মাত্র ২১ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে। ইংল্যান্ডের দলপতি রে ইলিংওয়ার্থ যা কিছু খেলেছিলেন। দলের ১২৭ রানের মধ্যে তাঁর একারই ৬৩ রান ছিল। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ৪৪ রান উঠেছিল। এই সময় সোবার্সের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—১১·৫ ওভার বল করে মাত্র ৮ রান দিয়ে ৫টা উইকেট ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ৩ ঘন্টা ২০ মিনিট টিকেছিল। খেলার বাকি সময়ে বিশ্ব একাদশ দল ২টো উইকেট খুইয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এডি বার্লো ৫০ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় বিশ্ব একাদশ দলের রান দাঁড়ায় ৪৭৫ (৬ উইকেটে)। অর্থাৎ তারা আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে এইদিনের খেলায় ৩৬০ রান সংগ্রহ করেছিল। এডি বার্লো সেঞ্চুরী (১১৯ রান) করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই ৭ম সেঞ্চুরী। ৩য় উইকেটের জুটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই খেলোয়াড়—গ্রেমী পোলক এবং এডি বার্লো ১৫৭ মিনিটের খেলায় ১৩১ রান সংগ্রহ করে দেন। গ্যারী সোবার্স ১৪৭ রান এবং পাকিস্তানের অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম ৫৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। বর্তমানে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সের সেঞ্চুরী দাঁড়াল ২২টি। এখানে উল্লেখ্য, স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ২৯টি টেস্ট সেঞ্চুরী করার সূত্রে সর্বাধিক সেঞ্চুরী করার যে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তা ভাঙতে হলে সোবার্সকে আরও ৮টি সেঞ্চুরী করতে হবে।

তৃতীয় দিনে বিশ্ব একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৫৪৬ রানের মাথায় শেষ হয়। সোবার্স ১৮৩ রান করেন। ৪ ঘন্টার কিছু বেশী সময় খেলে সোবার্স তাঁর ১৮৩ রানে ৩০টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউন্ডারী করেন। ইংল্যান্ড ৪১৯ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৫ উইকেট খুইয়ে ২২৮ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যান্ডের আরও ১৯১ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পর ইংল্যান্ড এক ঘন্টা খেলেছিল। ৩৩৯ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে বিশ্ব একাদশ দল এক ইনিংস ও ৮০ রানে জয়ী হয়। নট এবং ইলিংওয়ার্থ ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৩ ঘন্টার খেলায় দলের ১১৭ রান সংগ্রহ করেছিলেন। এই ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি ভাঙার পর ইংল্যান্ডের বাকি ৪টি উইকেট অল্প রানের মধ্যে পড়ে যায়।

টেস্টে ২০০০ রান ও ২০০ উইকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স ৬৪ রানে ৮টি উইকেট পাওয়ার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ২০০০ রান ও ২০০ উইকেট সংগ্রহ করার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। বর্তমানে সোবার্সের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : টেস্ট খেলা ৭৭, মোট রান ৬৯৫১ এবং ২০১ উইকেট (৬৭৪১ রানে)।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

গত ২২শে জুন থেকে ৮৪তম উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা চলছে। এ পর্যন্ত খেলায় বড়রকমের দুটো অঘটন ঘটেছে। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার চতুর্থ রাউন্ডে ১নং বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) এবং ৫নং বাছাই খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস (আমেরিকা) অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। ১নং বাছাই লেভারকে ৪—৬, ৬—৪, ৬—২ ও ৬—১ গেমে পরাজিত করে ১৬নং বাছাই রোজার টেলার (বৃটেন) রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। অপরদিকে ৩নং বাছাই নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাসকে ৭—৫, ৭—৫ ও ৬—২ গেমে হারিয়েছেন ১৪নং বাছাই আন্দ্রেস গিমেনো (স্পেন)।

আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার পণ্ডিত মহলের মতে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। লেভার ইতিপূর্বে চারবার (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৮-৬৯) উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব এবং দুবার (১৯৬২ ও ১৯৬৯) দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্লাম' খেতাব জয়ী হয়েছেন, যা মাত্র একবার করে পেয়েছেন আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে এবং কুমারী মরীন ক্যাথেরিন কনোলী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী নর্মান ব্রিঙ্কার) ১৯৫৩ সালে। সুতরাং ১৬নং বাছাই খেলোয়াড়ের হাতে ১নং খেলোয়াড় লেভারের এই পরাজয় প্রতিযোগিতার ইতিহাসে পরম বিস্ময়কর ঘটনা হিসাবে নজির হয়ে থাকবে।

পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার বাছাই তালিকায় যে ১৬ জন খেলোয়াড়ের নাম ছিল তাঁদের মধ্যে এ বছরের প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এই ৭ জন বাছাই খেলোয়াড়—২নং বাছাই জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া), ৪নং বাছাই টনি রোচে (অস্ট্রেলিয়া), ৫নং বাছাই কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া), ৯নং বাছাই ক্লার্ক গ্রেবনার (আমেরিকা), ১০নং বাছাই রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া), ১৪নং বাছাই আন্দ্রেস জিমেনো (স্পেন) এবং ১৬নং বাছাই রোজার টেলর (বৃটেন)। পুরুষদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৭ জন বাছাই এবং একজন অবাছাই খেলোয়াড় (অস্ট্রেলিয়ার বব কারমাইকেল) আছেন। এই ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ারই ৫ জন এবং একজন করে বৃটেন, আমেরিকা এবং স্পেনের খেলোয়াড় আছেন।

মহিলাদের কোয়ার্টার ফাইনালে ৫ জন বাছাই এবং ৩ জন অবাছাই খেলোয়াড় উঠেছেন। পাঁচজন বাছাই খেলোয়াড় হলেন—১নং বাছাই শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া), ২নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা), ৫নং বাছাই রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা), ৭নং বাছাই কারেন ক্র্যানজেক (অস্ট্রেলিয়া) এবং ৮নং বাছাই কুমারী হেলগা নিসেন (পঃ জার্মানী)।

ভারতবর্ষের ভূমিকা

ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লালকে ৩য় রাউন্ডে ৯নং বাছাই ক্লার্ক গ্রেবনার (আমেরিকা) ৬—০, ৬—২ ও ৬—১ গেমে এবং জয়দীপ মুখার্জিকে ২য়

'জায়েন্ট কিলার' রোজার টেলর (বৃটেন) ঃ ৮৪তম উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার ৪র্থ রাউন্ডে ১নং বাছাই রড লেভারকে (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ৬-৪, ৬-২ ও ৬-১ গেমে পরাজিত করে রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন।

রাউণ্ডে ১৬নং বাছাই রোজার টেলর (বৃটেন) ৩—৬, ৬—৩, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে পরাজিত করেছেন।

ডাবলসের ১ম রাউণ্ডের খেলায় প্রেমজিত লাল এবং জয়দীপ মুখার্জিকে ৮-৬, ৬-১ ও ৬-২ গেমে মার্ক কক্স এবং গ্রাহাম স্টিলওয়েল (বৃটেন) পরাজিত করেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত রবিবার (২৮শে জুন) ইডেন উদ্যানে আয়োজিত মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের ফুটবল লীগ খেলা প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে আরম্ভই হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, এই আসরেই ২১শে জুন মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ খেলাও প্রবল বৃষ্টির ফলে বিরতির পর পরিত্যক্ত হয়। বিরতির সময় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলায় জোর বৃষ্টি হয়েছিল তবে খেলা ভণ্ডুল হয়নি। ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে জিতেছিল। দেখা যাচ্ছে, ইডেন উদ্যান ফুটবল খেলার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে বি এন আর ১০টা খেলায় ১৭ পয়েণ্ট। মোহনবাগান ৮টি খেলায় ১২ পয়েণ্ট, ইস্টবেঙ্গল ৮টি খেলায় ১৫ পয়েণ্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিং ৬টি খেলায় ১০ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে। খেলায় অপরাজিত আছে মাত্র এই দুটি দল—গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবং রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল।

১৯৫৭ সালের বিশ্ব পোলো চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় দল ঃ বাঁদিক থেকে—কিষেণ সিং, কুনোয়ার বিজেয় সিং, রাও রাজা হনুত সিং, জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মান সিং (অধিনায়ক) এবং ফরাসী পোলো এসোসিয়েশনের সভাপতি।

পরলোকে জয়পুরের মহারাজা

গত ২৫শে জুন ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের চিরেনচেস্টার শহরের পোলো খেলার মাঠে জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মান সিং খেলার বিরতির সময় সংজ্ঞাহীন হয়ে ৫৮ বছর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন।

১৯১১ সালের ২১শে আগস্ট তাঁর জন্ম। তিনি জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মাধো সিংয়ের দত্তকপুত্র ছিলেন। ১৯২২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি জয়পুরের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন ১৯৩১ সালে। তিনি ছিলেন জয়পুরের ৩৯তম মহারাজা। মহারাজা সওয়াই মান সিং ইংল্যাণ্ডের উলউইচ রয়েল মিলিটারী একাডেমিতে শিক্ষালাভ করেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে তাঁকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদবী দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তিনি ১৯৪৯ সালের ৭ই এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের ৩১শে অকটোবর পর্যন্ত নবগঠিত রাজস্থান রাজ্যের প্রথম রাজপ্রমুখ ছিলেন।

১৯৬২ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৫ সালে স্পেনে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং শাসনকার্যে দক্ষতার জন্য তাঁর বিপুল খ্যাতি ছিল। পার্লামেণ্ট সদস্যা শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী তাঁর সহধর্মিণী।

পরলোকগত মহারাজা সওয়াই মান সিং ছিলেন তাঁর সমকালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোলো খেলোয়াড়। ১৯৩৩ সালে তাঁর পোলো টিম ইংল্যাণ্ডের সমস্ত পোলো টুর্নামেণ্টে অপরাজিত ছিল। ১৯৫৭ সালে ফ্রান্সের ডুভিলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পোলো টুর্নামেণ্টে তাঁরই নেতৃত্বে ভারতীয় পোলো টিম 'গোল্ড কাপ' জয়ী হয়ে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার মানচিত্রে ভারতবর্ষের নাম উৎকীর্ণ করে। ভারতীয় পোলো টুর্নামেণ্টে তাঁর জয়পুর পোলো টিম বহুবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। কলকাতার পোলো প্রতিযোগিতায় তিনি নিয়মিতভাবে ৬১তম ক্যাভালরী পোলো দলে খেলেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ ১ম খণ্ড

অমৃত

১১শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 17th July, 1970. শুক্রবার, ৩২শে আষাঢ় ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

মুখের মেলা

গত ২৬শে জুন তারিখের অমৃতে মুখের মেলা বিভাগে, আব্দুল জব্বারের 'তালপাতার পাখার ছবি' শীর্ষক লেখাটি পড়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছি। লেখাটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যুগপৎ বরজাহান ও ফুলজান যেন কানের পাশে ফোঁপাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে নবাধারার বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে বেশ পড়াশুনো করছি। কিন্তু গ্রামবাংলার পটভূমিকায় এমন সার্থক ট্র্যাজেডী আর একটিও পড়িনি। লেখককে আমার অন্তর উজাড় করা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মনোজকুমার খাটুয়া,
রায়পুর, ২৪ পরগণা।

রবীন্দ্রনাথ : বিতর্কের উত্তরে

শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য "রবীন্দ্রনাথ : একটি বিতর্ক" লিখে ঝড় তুলেছেন। বিতর্কে যোগ দিতে চাই, বর্তমান পত্রটি ছাপালে বাধিত হব।

লোকনাথবাবুর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ হল এই যে তাঁর প্রবন্ধটি অতীব সুলিখিত হলেও অতীব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু যে প্রশ্নগুলি তিনি তুলেছেন, তা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। দেখে আশ্চর্য হচ্ছি, বিতর্কে আজ যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই লোকনাথবাবুর মুখ্য বক্তব্যগুলিকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। সে বক্তব্যগুলি আমার মনে হয়েছে একে একে এই : (১) "শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস" এবং "সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার", এই দুটি উক্তিতে "শান্তি" শব্দের অর্থ বিভিন্ন—তা মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাত্মবাদী ব্যক্তিবিশেষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের পরিচায়ক; (২) বৈদেশিক শাসনাধীন ভারতে হ্যাঁ ও না-র সীমারেখা ছিল চিহ্নিত, আজ সমস্যা আরো অনেক জটিল—আজ মানবতাবাদ ও ব্রাহ্মধর্মসুলভ আধ্যাত্মিক উচ্চারণ আর হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না; এবং (৩) যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের "পরম পরিপক্ব ফল" রবীন্দ্রনাথ, আজ তার সকল মূল্যবোধ ধুলোয় লুণ্ঠিত, আজ ভদ্দরলোকেরা ধনে-মনে-মানে ছোটলোক হয়ে যাচ্ছে—এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের নতুন মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

এই প্রশ্নগুলি তুললেই কেন যে "গেল গেল" রব উঠবে বা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা আমি বুঝলুম না। বরং প্রশ্নগুলি তোলাই উচিত ছিল। পরিশেষে বলি, সেণ্টিমেণ্টাল রবীন্দ্রানুরাগীদের দলে হয়ত লোকনাথবাবু পড়তে চান না, কিন্তু তিনিও কারুর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু কম অনুরাগী নন, তাঁর এই আন্তরিক লেখাটি পড়ে সেকথা অন্তত আমার মনে হয়েছে।

লেখাটির জন্য লেখক ও "অমৃত" পত্রিকাকে আবার অভিনন্দন জানাই।

দিলীপরঞ্জন দাশগুপ্ত
কলিকাতা—৩৩।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

ভিন্নভাষী বন্ধুর কাছে আমার দেশের কথা পৌঁছতে চাই বলে অনুবাদ করি। তার ভাষা জানা থাকে তো ভালো, নইলে আর কোনো মিলনী সূত্রের আশ্রয় নেই। ভাষান্তরে মূলের কতটুকু শ্রী অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে সৌন্দর্যবাদীর সন্দেহ থাকলেও, কার্যত পাকে-প্রকারে আমরা এর অপরিহার্যতা একরকম মেনেই নিয়েছি। 'কবিতার অনুবাদ' প্রবন্ধে শ্রীআশিস সান্যাল বিষয়টি পুনরুত্থাপন করেছেন। কৌতূহলোদ্দীপক রচনা, কারণ এতে প্রথমত একজন সাম্প্রতিক কবির মতামত পাচ্ছি। উপরন্তু শ্রীসান্যাল সমস্যাটি নিয়ে দীর্ঘকাল রত আছেন। 'বেঙ্গলি লিটারেচার' নামক একটি ইংরেজী পত্রিকার উদ্যোক্তা হিসাবে আমরা বিদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা লক্ষ্য করেছি। উপস্থাপিত রচনাটি তাই তত্ত্বকথার সীমা ছাড়িয়ে অভিজ্ঞতায় নিঃসৃত হয়েছে।

কবিতা অনুবাদের প্রতিবন্ধকতা প্রমাণে শ্রীসান্যাল অজস্র সতর্কবাণী উদ্ধার করেছেন। দেখা যাচ্ছে সব মতের লেখক মহলেই ও-কাজের বিপদ সমানভাবে ঘোষিত। রুশ কবি ভাসিলি ফায়োদরভ ইদানিং মস্কোতে আহূত এক সাহিত্য সভায় আবার নতুন করে মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী শব্দের চরিত্র নির্ণয় করে বলেছেন যে কথার রূপ নির্ভর করে সমাজে তার চল হিসাবে। বিভিন্ন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থের নানারূপ হেরফের ঘটায়, আর তাতে অনুবাদকের কাজ বিড়ম্বিত হয়। একই সুরে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ স্টেইনার জানিয়েছেন : 'আধুনিক কবিতার অনুবাদ সংকলনে প্রতিটি অনূদিত কবিতারই মূল মুখোমুখি পৃষ্ঠায় অবশ্যই থাকা উচিত।' দ্বিভাষী বই আমরা দেখেছি। মূল ভাষাটি যিনি জানেন অনুবাদের সাহায্য তাঁকে অংশবিশেষে দুরূহতা অতিক্রমণের ক্ষমতা দেয়। কিন্তু যাঁদের সেই ভাষাজ্ঞান নেই তাঁদের পক্ষে অনুবাদই সার। অনুবাদের বিভ্রান্তির ফলে মূল কবিকৃতি ভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে। একটি উদাহরণ দিই। অনুপযুক্ত অনুবাদের ফলে রবীন্দ্রনাথের সম্যক পরিচয় বিদেশ পায় নি, বুদ্ধদেব বসুর এই অভিযোগ অনেক দিনের। একদা তিনি নিজে এই অভাব পূরণে কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন। ফলে যে সমস্ত সংশয় দেখা দিয়েছিলো বিষ্ণু দের 'সাহিত্যের ভবিষ্যত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'রাজায় রাজায়' প্রবন্ধে তার নজীর আছে। অনুবাদ প্রশ্নের জটিলতা বিশ্লেষণে আমরা উল্লিখিত রচনার একাংশ উদ্ধৃত করছি। বুদ্ধদেব বসু 'মাধুর্যের মালা' বোঝাতে বলেছিলেন 'গার্ল্যাণ্ড অব সুইটনেস'। বিষ্ণুবাবু প্রশ্ন রাখেন : "তিনি (বুদ্ধদেব বসু) মিষ্টির অনুরাগী কিন্তু মাধুর্য কি বরঞ্চ 'গ্রেস' এর আত্মীয় নয় ? মাধুর্যের মালা 'এ টেণ্ডার গার্ল্যাণ্ড'? তাঁর মন্তব্যে বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদে স্বর্ণলতা হয়েছে গোল্ডেন বাসকেট এবং এ উন্নতির বুদ্ধদেবদত্ত কারণটি এরকম—

Basket is a better visual image than garland on the plate.

—তাই কি? বাজারের বাস্কেট, টিফিন বাস্কেট, ফলের বাস্কেট, ফুলের বাস্কেট 'ক সঠিক ইমেজ কিছু? তাছাড়া 'গার্ল্যাণ্ড অন দি প্লেট' এল কোথা থেকে? 'সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা, নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা'—ইমেজটি তো সোনার থালা উষার ডান হাতে।

বিদেশী পাঠকের পক্ষে প্রাচ্য জীবনযাত্রা, সঠিকভাবে বাঙালী জীবনযাপন, স্মরণ করে অনুবাদে যাথার্থ্য রক্ষা কতখানি সম্ভব হত? টমসন-এর গ্রন্থ উল্লসিত হবার সাক্ষ্য দেয় না। অনুবাদ সর্বত্র অমার্জনীয় নাও হতে পারে। 'ডাকঘর' নাটকের অনুবাদ

চিঠিপত্র

পড়ে বুদ্ধদেববাবু আনন্দ জ্ঞাপন করেছিলেন। ভিন্নভাবে আপন সংস্কৃত উপহারের চেষ্টা ভাষান্তরে অন্য কোনো কবির কাজে লাগতে পারে। কালীমোহন ঘোষকৃত কবিরের অনুবাদ পাঠে এজরা পাউন্ড-এর একটি বিখ্যাত কবিতা জন্ম নিয়েছিলো। বিক্ষিপ্তভাবে দেখা গেলেও দৃষ্টান্তগুলি বর্জনীয় নয়। অনুবাদের প্রচেষ্টায় আমতা আমতা করেও তাই অগ্রসর হতে হচ্ছে। উপায় নেই।

অনিবার্য বলেই প্রশ্নটির একটি সদর্থক উত্তর খুঁজছি। অনুবাদ বাধ্য না হলে মূল থেকে বিচ্যুত হবে না এটি আশা করা যায়। কিন্তু সাহিত্যের আবেদন তো এক রকম নয়। ব্যবহারে দেখতে পাই এক-ই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকের হাতে রং পাল্টায়। অনুবাদের গুণে তারতম্য ঘটে। স্বকীয় সৃষ্টির মত অনুবাদও তাই ব্যক্তিগত মুন্সীয়ানার ওপর নির্ভর করে। 'প্রতিকৃতি নয়, প্রতিভাতি' রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন। ট্রান্স-লিটারেশন নয়, ট্রান্স-ক্রিয়েশন। মূলের প্রতি যতটা সম্ভব অনুগত হয়েও যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে তার দাবি তাই মেনে চলতে হয়। ফলে সার্থক অনুবাদে একটি স্বতন্ত্র সৌকর্য বর্তায়। সুধীন্দ্রনাথের মত মনে পড়ে—'অনুবাদের বেলা সংবেদনের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া নামে আদ্য অনুভবনের ভূমিকায়; এবং পরে যা ঘটে, তার সঙ্গে কবিতা রচনার একমাত্র পার্থক্য এই যে এখানে আদিভূতের বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ অল্প। তাহলেও এমন সার্থক লেখা বিরল যার অভিপ্রায় যুগে যুগে বদলায় না, অথবা যাতে পাঠক-বিশেষের ব্যাপক বোধশক্তি প্রশ্রয় পায় না; এবং সেই জন্যে একই কবিতার একাধিক তর্জমা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনই একই অনুবাদকের চোখে তা চিরদিন এক রকম দেখায় না'। (ভূমিকা : প্রতিধ্বনি)। ফলে অনুবাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। আশা করবো উত্তরোত্তর আরো উৎকৃষ্ট ফল। পথ দুস্তর বটে তবে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্ররূপে অনুবাদের প্রসার কামনা করবো।

নিখিলেশ গুহ,
কলকাতা—২৯।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

'আজ অমৃতের ১০ বর্ষ ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে 'লাট প্রসাদের নেপথ্য কথায়' 'অভয়ংকর' **বল্লভভাই** প্যাটেল সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটি ঠিক নয়—কারণ **'বিঠলভাই প্যাটেলই'** প্রথম Non-official President হয়েছিলেন। বল্লভভাই কোনদিন Indian Legislative Assembly এর member হননি।

বোধহয় নামটি মুদ্রাকর প্রমাদ। ইতি

শৈলেন্দ্রনাথ সেন
—কলিকাতা—২৫

একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত

১৮৫৬ খৃঃ রাজনারায়ণ দত্তের লোকান্তরের পর মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। হিন্দু কলেজে সহাধ্যায়ী এবং তৎকালীন কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের ১নং দমদম রোড, সাতপুকুরের উদ্যান ভবনে মাইকেল, কিশোরীচাঁদ মিত্রের অতিথি হিসাবে বহুদিন অবস্থান করেন।

"Kissory Chand Mitra was magistrate of Calcutta, when Modhu returned from Madras. He returned like a true poet, without a six-pence in his pocket. One Mr. Thacker, choosing to go away from the Police Court to the Small Causes Court, made room for Modhu to be taken in as interpreter by Kissory, Modhu's pay was Rs. 120 a month — just enough for his DAL-PHAT . "

(ভোলানাথ চন্দ্র লিখিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

১৮৫৬ সালের ২০শে জুলাই মধুসূদনের সম্মানে কিশোরীচাঁদ মিত্র এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। এই ভোজ-সভার শেষে মধুসূদন দত্ত একটি ছোট কাগজে কবিতাটি লিখে কিশোরীচাঁদ মিত্রকে উপহার দেন।

"20th July 1956, Mr. M. S. Dutt gave me the following song :—

"When I was a young and gay recruit
Just landed at Madras
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass.
I roved about from place to place
Until I found my Mothonia
Oh what a charming girl she was
With her thana-na-na". (—M. S. Dutt).
(Diary of Kissory Chand Mitra).

উল্লেখযোগ্য এই দুষ্প্রাপ্য কবিতাটি কিশোরীচাঁদ মিত্রের পরিবারস্থ এক মহিলার নিকট সংরক্ষিত ছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রখ্যাত জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় কবিতাটি সংগৃহীত হয়। কবিতাটির কোন বিশেষত্ব না থাকলেও মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা হিসাবে উৎসাহী ও অনুরাগী পাঠকগণের নিকট ঐতিহাসিক মর্যাদা-সম্পন্ন।

গোরা মিত্র কলিকাতা—৪

বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে

আমি আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। গত ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় শ্রবণকের বেতারশ্রুতি পড়ে সত্যই খুব মর্মাহত হলাম। কি করে যে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র মহানায়ক রাসবিহারী বসুর কথা সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। সত্যি কথা বলতে কি গান্ধী ও জহরলাল ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব ছিল না—একথা বোঝাবার চেষ্টা সর্বদাই করা হয়। এ জন্যই গত ২রা অকটোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিক উদযাপনে আমরা যখন ব্যস্ত ছিলাম—তখন ভুলে গিয়েছিলাম স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কথা। আকাশবাণী সেদিনও তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতার সত্য ইতিহাস আজও উদ্ঘাটিত হয় নি। যে সব নেতা ও বিপ্লবীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের কাহিনী আজও অজানা রয়ে গেল, স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় লিখিত ইতিহাসে আজও যাঁরা উপেক্ষিত, বলতে দ্বিধা নেই বৃটিশ তাদের ভয়েই ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। প্রেম ও ভালবাসার মিষ্ট কথায় বৃটিশ কখনও কর্ণপাত করে নি। সকল উপেক্ষিত নেতা ও বিপ্লবীদের জীবনকাহিনী প্রচারে আকাশবাণী অগ্রণী হোক, এ দাবী আমরা করতে পারি কি!

বিজনবিহারী চৌধুরী, শিলচর, আসাম।

শাদা চোখে

বাংলা কংগ্রেস ও অষ্টবামের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের আলোচনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যে গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল এখনও তা সাসপেন্সএর পর্যায়ে রয়ে গেল। শুধু আশার বাণী হিসাবে তাঁদের সমর্থকরা শুনতে পেয়েছেন 'তাঁরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছেন মাত্র। ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নয়টি দলের একটি জোট হবে কিনা সেই প্রশ্ন এখন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করছে বাংলা কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদের উপর। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস মিত্রতা স্থাপনে রাজী হলে পশ্চিম বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে সংহতিকরণের প্রশ্নে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হবে।

দুদিনব্যাপী আলোচনার পর সাংবাদিকদের কাছে কি বক্তব্য রাখা হবে এই প্রশ্নটি সভায় আলোচিত হয়। সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে বাংলা কংগ্রেসের অষ্টবামের সঙ্গে মিলনের আর কোন বাধা নেই, একথা বলতে নাকি বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ রাজী হন নি। তাই পরস্পরের কাছাকাছি আসা গেছে এই বয়ানই নিবেদন করবার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। ডান কম্যুনিস্ট নেতা কুশাগ্রবুদ্ধি শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর উপরই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, নয় পার্টির তরফ থেকে ঐ বক্তব্য সাংবাদিকদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য। কাজেই প্রশ্ন করে সাংবাদিকরা খুব সুবিধা করতে পারেন নি। ফলে, আলোচনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ বাইরে বেরয়নি।

রাজনৈতিক অভিধানে 'কাছাকাছি আসা' কথাটার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে ধরে নেওয়া কঠিন নয়। কারণ ঐ কথাটার মধ্যেই লুকায়িত আছে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের কথাটা। এবং সেই পার্থক্যের গভীরতা পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যে কোন মুহূর্তে তা বিরাটভাবে দেখা দিতে পারে। অধিকন্তু অষ্টবামের সমস্ত ব্যাখ্যা শুনবার পরও বাংলা কংগ্রেস বস্তুতপক্ষে কোন মতামত ব্যক্ত করেনি। শুধুমাত্র অষ্টবামের তের দফা দাবীর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাই জিজ্ঞাসা করেছেন। জিজ্ঞাসার রকম-সকম দেখে রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মনে এই ধারণাই জন্মেছে যে শ্রীমুখার্জি হয়ত কোন 'জনপ্রিয় সরকার' গঠন করলে কি সমস্যায় তাঁকে পড়তে হবে তাই আঁচ করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। অবশ্য সমস্ত ধ্যানধারণাকে বানচাল করে দিয়ে শ্রীমুখার্জি এ প্রশ্ন একবারও উত্থাপন করেন নি যে অষ্টবাম সরকার গঠনে প্রস্তুত কিনা যে কোন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞই অবশ্য 'এই রকমই করতেন। কারণ, কর্মসূচীর মধ্যে ঐকামত হলেই তা সরকার গঠনের প্রশ্ন আসে। দেখা যাচ্ছে তের দফা দাবীর মধ্যে জনকল্যাণমূলক যে কর্মসূচী আছে তাঁরা তাতে সহমত হয়েছেন। 'সমদর্শী'র আন্দাজে ঢিল মারা বক্তব্য নয়। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী নিজেই ঘোষণা করেছেন যে অনেকগুলি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যদি তের দফা দাবীর সঙ্গে এই বক্তব্য মিলিয়ে দেখা যায় তবে সিদ্ধান্তে আসতে কিছু মুশকিল হওয়ার কথা নয়। সেই তের-দফা দাবী কি সহৃদয় পাঠকদের অবগতির জন্য প্রথমে তা নিবেদন করছি।

অষ্টবামের তের-দফা সনদঃ—(১) গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে; বে-আইনী কাজ-কর্ম দমনের জন্য যে আইন আছে তার অপপ্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বানচাল করা চলবে না এবং সেই আইনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার জন্য পরিবর্ধিত করা চলবে না, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে তা অবিলম্বে তুলে নিতে হবে। প্রাথমিক তদন্ত না করে কাউকে গ্রেপ্তার করা চলবে না। (২) দখল করা বেনামী ও খাস জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে; বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে; (৩) কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহজলভ্য করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে এবং দরিদ্র কৃষকদের ঋণ মকুব করতে হবে ও সার্টিফিকেট জারী করে মাল ক্রোক বন্ধ করতে হবে; (৪) উত্তরবঙ্গের জন্য বন্যা নিরোধ সম্পর্কিত 'মাস্টার প্ল্যান' অবিলম্বে রূপায়িত করতে হবে; (৫) বন্ধ কলকারখানা খুলতে হবে ছাঁটাই, লে-অফ ও অফিস স্থানান্তর বন্ধ করতে হবে। চায়ের নীলামের [illegible] স্থানান্তর করা চলবে না; শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক গ্র্যাচুয়িটি প্রবর্তন করতে হবে; (৬) বেকারদের কর্ম-সংস্থান করতে হবে এবং কর্মপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে; (৭) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে পুলিশী অভিযান চলবে না; (৮) যুক্তফ্রন্ট প্রবর্তিত পে-কমিশনের সুপারিশ (সরকারী কর্মচারীদের জন্য) কার্যকর করতে হবে এবং সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করতে হবে (৯) পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদে[র] অবিলম্বে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং [যে] সমস্ত শরণার্থীর অদ্যাবধি সম্পূর্ণ পু[ন]র্বাসন দেওয়া হয়নি তা অবিলম্বে সমা[প্ত] করতে হবে; (১০) বনাঞ্চলের অধিবাসীদে[র] ভোগ করে আসা অধিকার কেড়ে নেও[য়া] চলবে না এবং তাদের মধ্যে বনাঞ্চল সান্নিহি[ত] খাস জমি বন্টন করতে হবে; (১১) নিত্য

ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম কন্ট্রোল করতে হবে এবং মুনাফা-শিকারীদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (১২) খরা ও দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে বা যেখানেই মানুষের দুর্দশা চরমে উঠেছে বলে মনে হবে সেই সমস্ত জায়গায় টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং (১৩) শেষ দফায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটাতে হবে এবং ফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন যদি সম্ভবপর না হয় তবে নির্বাচন করতে হবে। সেই নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ভোটার নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর নির্বাচন যাতে 'ফেয়ার ও ফ্রি' হয় তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গে পুনরায় প্রবিষ্ট হওয়ার আগে তের-দফা দাবী সনদ সম্পর্কে 'সমদর্শী' একটি নিজস্ব মন্তব্য আমজনতার দরবারে নিবেদন করতে চায়। সেটা হচ্ছে, গোটা সনদটাই প্রায় ভগবানের মত নিরাকার। কবে, কখন এবং কিভাবে এটাকে কার্যকর করতে হবে সেই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই এই সনদে। কতক সাধু দাবী কার্যকর করতে হবে বলেই জোর দেওয়া হয়েছে মাত্র। গোস্তাকি মাপ করবেন, ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিয়েই অণ্টবাম শুধু হরতালের মাধ্যমেই এই দাবী মিঠাবার যে যৌক্তিকতা আছে তা প্রমাণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

যা হোক, শাদা চোখে দেখলে এই তের দফার মধ্যে বাংলা কংগ্রেস কোন্ দফার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১, ২ ও ৮নং দাবী ছাড়া অন্য প্রশ্নে মতান্তর হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর শেষ দফার উপর কিছু আলোকপাত করবার জন্য হয়ত বাংলা কংগ্রেস একটু চাপ দিয়েছিল মাত্র।

প্রথমেই শেষ দফা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখানে বলা হয়েছে যে, যদি 'পুরানো ফ্রন্টের' পুনরুজ্জীবন সম্ভব না হয় তবে শীঘ্রই নির্বাচন করতে হবে। আর সেই নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা প্রয়োজন, এবং নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একমাত্র যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন ছাড়া বাংলা কংগ্রেসের এই দফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অন্য কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু অণ্টবাম একথা উল্লেখ করল কেন— এই প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা কেউ করেন তবে, 'সমদর্শী'র উত্তর হবে এটা অণ্টবামের কৌশল মাত্র। কারণ পুনরুজ্জীবনের কথা যদি না বলা হয় তবে সঙ্গে-সঙ্গেই বলতে হয় এখনই নির্বাচন চাই। আরও বলতে হবে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক। কাজেই গভর্নরের কাছে যদি একথা বলা হয় সরকার গঠনের চেষ্টা চলছে অতএব, ধীরে রজনী ধীরে, গভর্নরের সেই অবস্থায় বিশেষ কিছু বলার থাকবে না। আর রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান, সে ত সরকার গঠিত হলে স্বাভাবিকভাবেই অপসারিত হবে। এ বক্তব্য অত্যন্ত মামুলী, অন্তত এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের এই দফা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করার কোন হেতু আছে বলে মনে করা যায় না।

এবারে ১, ২ ও ৮নং দফায় আসা যাক। পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করার প্রশ্নেও বাংলা কংগ্রেস অভিন্ন মত পোষণ করতে বাধ্য। কেননা, কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী, কোনো রাজনৈতিক দলই পুলিশী অত্যাচার চলবে একথা বলে নি। বলতে পারে না। তবে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' সম্পর্কে না তার ডেফিনিশান কি এই প্রশ্নে মতান্তর ঘটতে পারে। সেটা অনেকখানি পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ক্ষমতাসীন দল বহু ক্ষেত্রেই বিরোধীদের আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলতে কুণ্ঠবোধ করেন। বাস্তব ক্ষেত্রে আরও দেখা গেছে, প্রত্যেক দল তাঁদের আন্দোলনকেই সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বলে অন্যদের উপর নির্যাতন চালাতে কসুর করেন নি। এমন কি বিগত যুক্তফ্রন্টের সময়ও এর ভুরি-ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কাজেই বাংলা কংগ্রেস যেহেতু একটু বাম-সুলভ ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টায় তৎপর অতএব এই দফা সম্পর্কেও বিশেষ আপত্তি থাকার কথা নয়। কার্যক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব, এই দফা কতোটা মেনে নেওয়া যায়। আর রাজনৈতিক আন্দোলন দমাবার জন্য আইনের বিরোধিতা বাংলা কংগ্রেস অতীতেও করেছে।

এর পর ২নং দফা যেমন আছে সেভাবে বাংলা কংগ্রেস মেনে নিতে পারে। মেনেও নিয়েছে। তবে দলাদলির জন্য সাধারণ ছোট

চাষীর যে সব জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ নাকি বাংলা কংগ্রেস জানিয়েছে। অষ্টবামের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যদি এরকম কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাঁরা অবিলম্বে বসে সে সমস্ত মিটিয়ে দিতে ইচ্ছুক। আর ফ্রন্ট আমলেও তাঁদের তরফ থেকে যদি এহেন জবর-দখল কিছু করা হয়ে থাকে তবে তা হিসেব-নিকেশ করে ফিরিয়ে দিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। অষ্টবামের এই প্রতিশ্রুতি মেনে নিতে শ্রীঅজয় মুখার্জির কোন বাধা থাকার কথা নয়।

৮নং দফায় সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে সেই সঙ্গে পে-কমিশনের রায় কার্যকর করার কথা হয়েছে। শ্রীমুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মন্ত্রী-পরিষদের সিদ্ধান্তের ফলেই এই পে-কমিশন গঠিত হয়েছিল। অতএব, শ্রীমুখার্জি নৈতিক কারণেও এর বিরোধিতা করতে পারেন না। শুধু সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দেওয়ার প্রশ্নটা একটু সংশয়ের উদ্রেক করেছিল এবং তখন নাকি শ্রীমুখার্জি সখেদে কর্মচারীদের হাতে তাঁর লাঞ্ছনার কথাও ব্যক্ত করেছিলেন। তখুনি অষ্টবামের নেতারা নাকি বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দেওয়া হলেও সরকারের হাতে রক্ষাকবচ হিসাবে অনেক বিশেষ ক্ষমতা থেকে যায়। এই উত্তর শোনবার পর শ্রীমুখার্জি ঐ প্রসঙ্গ নাকি আর উত্থাপন করেন নি।

আগেই বলা হয়েছে অন্যান্য যে সমস্ত দাবী আছে সে সমস্ত যে কোন বর্ণের রাজনৈতিক দলই কার্যকর করার জন্য অক্লেশে প্রতিশ্রুতি দেবেন। দিয়েও আসছেন। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেই দাবীগুলির অধিকার পূরণের যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কয়েকটা মাত্র অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন করে তোলা হয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে যে, শ্রীমুখার্জি ঐ সমস্ত দাবী রূপায়ণের পদ্ধতির বিষয়ে বিরোধিতা করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন নি। কার্যকর করার পদ্ধতির প্রশ্নেও দলবাজীর নগ্নরূপে পারস্পরিক হানাহানিতে পরিণত হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই শ্রীমুখার্জি পদত্যাগ করেছিলেন। কারণ তাঁর আশা ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার আইন করে অতি সহজেই ঐ সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবেন। অধিকন্তু তাঁরা বামপন্থীরা কার্যকর করার প্রচেষ্টা শুরু করলে জনতা যে বিপুল সমর্থন নির্বাচনে তাঁদের জানিয়েছিলেন ভবিষ্যতেও ঠিক অনুরূপভাবেই সমর্থন জানাবেন শ্রীমুখার্জির এই ভরসা ছিল।

সে যা হোক, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল ছাড়া—কি অষ্টবাম, কি বাংলা কংগ্রেস বা শাসক কংগ্রেস কেউই বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কথা বলছেন না। অষ্টবাম পুনরায় যুক্তফ্রন্ট পুনরুজ্জীবনের কথা এখনও বলে যাচ্ছেন, আর বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস সরকার গঠনের কথা বলছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে বিধানসভা জিইয়ে রাখার পক্ষেই মেজোরিটি, কাজেই গভর্নর সাহেব এই অবস্থায় বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কথা বললে তা অগণতান্ত্রিক হবে কিনা সেটা বিচার করা যেতে পারে।

এই অষ্টবাম ও বাংলা কংগ্রেসের আলোচনার পটভূমিকায় রাজ্যপালের সঙ্গে শ্রীমুখার্জির দেখা হয়েছে। এখন কর্মসূচীর ভিত্তিতে চিন্তা করলে দেখা যাবে বাংলা কংগ্রেস ও অষ্টবাম সম্পূর্ণ একমত। অষ্টবাম এই তের দফা দাবী পেশ করছেন সরকারের কাছে অবিলম্বে পূরণের জন্য। আর অন্যভাবে যদি বলা যায় তবে এই কথাই বলতে হয় যে, অষ্টবাম জনতার কাছেও এই সমস্ত কার্যকর করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয় আন্দোলনে সাড়া দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

এখন যদি শ্রীঅজয় মুখার্জি অষ্টবামের কাছে বলেন যে, তিনি সমস্ত কর্মসূচীর সঙ্গে একমত হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্তত কিছুসংখ্যক দাবী পূরণ করে দেবেন এবং সেইজন্য সরকার গঠনে নিমিত্ত তাঁকে সমর্থন করা হোক, তে অষ্টবাম কি বলবেন? তাঁরা কি বল পারবেন, কংগ্রেসের সাহায্য নিলে তা সমর্থন করবেন না? তাহলে তাঁদের দাব প্রতি আন্তরিকতার চেয়ে অন্ধ কংগ্রে বিরোধিতাই প্রবল হয়ে যাবে না নাকি আর কংগ্রেসকে সরকারে না নিয়ে শ্রীমুখার্জি যদি একাই রাজ্যতরণীর হাল ধরেন তা অষ্টবামের কি বলার থাকে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁদের ম পারস্পরিক আলোচনার সময় তাঁরা একম হয়েছিলেন যে, রাজ্যে প্রশাসনিক কাঠা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাতে নির্বা অনুষ্ঠিত হলে তা 'ফ্রি ও ফেয়ার' হও অসম্ভব। এই বক্ত মধ্যেই নিহিত আ যে, এমতাবস্থা নির্বাচন হলে কম্যুনিস্টদের বিলা করা কঠিন হ বাম কম্যু নের সাংগঠনিক অবস্থ প্রতি নিঃস এটি একটি তাৎপর্যপ ইঙ্গিত। অতএব, রাজ্যের প্রশাসনিক কর্ হাতে না এলে এই অব্যবস্থাকে অনু করে তোলা যে অসম্ভব সেকথা অ থাকলেও অবচেতন মনে তা উঁকিঝ মারছে কিনা বলা শক্ত।

শ্রীমুখার্জি এই সমস্ত প্রশ্ন গভীরভ চিন্তা করেই অষ্টবামের তের-দফা দাব রাজনৈতিক সম্ভাব্য ফলাফল ও প্রতি সহ ব্যাখ্যা নিয়েছেন। এবং এই তুরু তাস হাতে নিয়ে শ্রীমুখার্জি তাঁর পরব রাজনৈতিক পদক্ষেপ নির্ধারণ কর শ্রীমুখার্জি যদি অষ্টবামের সঙ্গে সহ হতে পারেন তবে অষ্টবামের শ্রীমুখা অনুরোধ ও প্রতিশ্রুতি রাখতে কোথায়? যদি তা না করা হয়— সংহতিকরণের প্রশ্নে যে এক নয়া স খুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? অষ্টবাম ক'বামে পরিণত হয় সেটা দেখ আশংকায় পশ্চিমবঙ্গবাসী কম্পিত হ নজর রাখছে।

—সমদ

দেশে বিদেশে

'জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সংগে জোট বাঁধার' কথা বলে 'পুরানো' কংগ্রেস দলের নেতারা ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন। দলের কয়েকটি রাজ্য শাখা, বিশেষ করে গুজরাট শাখা একেবারে বেঁকে বসেছে এবং দলের সভাপতি শ্রীনিজলিংগাপ্পা, কোষাধ্যক্ষ শ্রী এস কে পাতিল প্রভৃতি প্রস্তাবটির নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে দলের ভিতরকার বিরোধীদের আপত্তির ধার কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর থেকেই পুরানো কংগ্রেস নয়া কংগ্রেস সম্পর্কে বলে আসছে যে, কেন্দ্রে ক্ষমতা রাখার জন্য ঐ দল ক্রমই বেশী করে কম্যুনিস্টদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। নয়াদিল্লী 'পুরানো' কংগ্রেস দলের কমিটির যে বৈঠক হয়ে গেল সেখানেও এই সব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেস ভাগ হওয়ার সময় থেকেই বলে আসছেন যে, সিন্ডিকেট নেতারা জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সংগে আঁতাত গড়ার চেষ্টায় আছেন।

'নয়া' কংগ্রেস দল এই বলে বাহাদুরি দাবী করতে পারে যে, এখন পর্যন্ত এই দল নিজের কর্মসূচী নিয়ে একাই চলছে, অন্য কোন দলের সঙ্গে তাকে আঁতাত করতে হয় নি, অথচ 'পুরানো' কংগ্রেস দল যে জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সংগে আঁতাত করার জন্য তৈরী হচ্ছে, সেই সন্দেহটা শ্রীমতী গান্ধীর দল পাল্টা কংগ্রেসের নিজেদের সদস্যদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

শ্রীনিজলিংগাপ্পা প্রমুখ নেতারা জানেন যে, আজ তাঁরা যদি শুধু জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সংগে জোট বাঁধেন তাহলে শ্রীমতী গান্ধী গত এক বছরের বেশী সময় ধরে যে কথা বলে আসছেন, সেটাই সত্য প্রমাণিত হবে। তাঁদের রাজনৈতিক মর্যাদার স্বার্থেই কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করা দরকার। সেই কারণেই শ্রীনিজলিংগাপ্পা বলছেন, দক্ষিণপন্থী 'গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স' গড়ার রটনাটা তাঁদের হেয় করার জন্য প্রতিপক্ষের অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে তাঁরা চাইছেন গণতন্ত্র বাঁচাবার জন্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলির ঐক্য।

গুজরাটে দলের মধ্যে বিদ্রোহ সামলাবার জন্য সেখানে ছুটে গেছেন শ্রী এস কে পাতিল। তিনিও একই ধরনের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যার পর গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস (পুরানো) কমিটির একজন সম্পাদক বলেছেন যে, শ্রীপাতিলের এই সব চালাকির সংগে তাঁরা পরিচিত আছেন, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার জোট যাতে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয় সেজন্য তাঁরা সতর্ক থাকবেন।

শ্রীনিজলিংগাপ্পা ও শ্রীপাতিল যখন এইভাবে জোট বাঁধার প্রস্তাবটি ব্যাখ্যার দ্বারা নরম করার চেষ্টা করছেন, তখন 'পুরানো' কংগ্রেসের আর একজন নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই অন্তত দুয়েকটি বামপন্থী দলকে এই জোটে আনার জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্ততপক্ষে তাঁর দল, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি, এস-এস-পি, পি-এস-পি, বি-কে-ডি প্রভৃতি দল যাতে একত্রে পার্লামেণ্টের ভিতরে একটি সংঘবদ্ধ অকম্যুনিস্ট বিরোধী পক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারেন, তার জন্য শ্রীদেশাই সংশ্লিষ্ট দলগুলির সংগে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই সব ব্যাখ্যা, আলাপ-আলোচনাটির মধ্য দিয়ে পরিষ্কার যে, (১) 'পুরানো' কংগ্রেস নেতারা কতকটা পিছিয়ে এসেছেন, (২) প্রস্তাবিত জোটের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে ধারণাটা অনেকটা ঘোলাটে হয়ে গেছে এবং (৩) জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দল ছাড়া অন্য কোন দলকে প্রস্তাবিত জোটের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ঐ জোট বাঁধার প্রস্তাবের সারবস্তু বলতে কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। তবে, 'পুরানো' কংগ্রেসের নেতারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আগামী ২০ ও ২১ জুলাই তাঁরা দক্ষিণ ভারতের মন্দির-শহর তিরুপতিতে মিলিত হচ্ছেন। বলা হচ্ছে যে, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির জন্য নির্বাচনী কৌশল স্থির করার উদ্দেশ্যে ঐ সব রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের যে সম্মেলন হচ্ছে, সেই উপলক্ষেই নেতারা তিরুপতিতে যাচ্ছেন। কংগ্রেসের ইদানীংকালের ইতিহাসে তিরুপতি শহরের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই তিরুপতি শহরেই কামরাজ পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল, এই তিরুপতি শহরেই সিণ্ডিকেট নেতারা শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতির পদের জন্য মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। ঐ তিরুপতিতে 'পুরানো' কংগ্রেস নেতারা কি আবার নূতন কোন ইতিহাস তৈরী করতে চাইছেন? এই প্রশ্ন উঠছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নেতাদের ঐ বৈঠকের তারিখ এমনভাবে ফেলা হয়েছে, যাতে বৈঠকের আগেই জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হয়ে যাবে এবং জোট গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তও জানা যাবে।

•

মহারাষ্ট্র 'নয়া' কংগ্রেস দলের একটা শক্ত ঘাঁটি বলে গণ্য করা হয়। সেখানে নায়ক মন্ত্রিসভা থেকে রাজস্ব মন্ত্রী ও মহারাষ্ট্র বিধানসভার কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার শ্রী ডি এস দেশাই পদত্যাগ করায় শক্ত ঘাঁটির মধ্যে দলের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

গত মাসে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস ('নয়া') কমিটির বৈঠক চলার সময় মহারাষ্ট্র বিধানসভার কয়েকজন নয়া' কংগ্রেস সদস্য বিধানসভায় দলের নেতৃত্ব থেকে শ্রী ডি পি নায়ককে সরাবার দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রচার করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নায়কের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হল, 'ভিওয়ান্ডি ও জলগাঁওয়ের দাঙ্গা নিবারণ করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।' ঐ স্মারকলিপিতে যাঁদের স্বাক্ষর ছিল তাঁদের অধিকাংশই মহারাষ্ট্রে শ্রীদেশাইয়ের অনুগত বলে পরিচিত। (শ্রীদেশাই 'মারাঠা' সম্প্রদায়ের একজন নেতা বলে স্বীকৃত)।

গত ৫ জুলাই তারিখে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস ('নয়া') কমিটির সভায় নায়ক-বিরোধী সদস্যদের এই আচরণের প্রসংগে কথা ওঠে। বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচ্যবন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, শ্রীচাবন কঠোর ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেন। সভায় নাকি এমন ইংগিতও করা হয় যে, সম্প্রতি বিধান পরিষদের নির্বাচনে দলের যেসব পরাজয় ঘটেছে, সেগুলির জন্য দায়ী শ্রীদেশাই ও তাঁর অনুগামীরা।

কমিটির ঐ সভার পর দিনই শ্রীদেশাই মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। মুখ্যমন্ত্রী নায়ক সে সময়ে নাগপুরে ছিলেন। শ্রীদেশাই টেলিফোন করে তাঁকে পদত্যাগের কথা জানিয়ে দেন। প্রকাশ যে, শ্রীদেশাই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলেছেন, 'কোন আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে মন্ত্রিসভায় ও সংগঠনে কাজ করা সম্ভব নয়।'

শ্রীদেশাইয়ের এই পদত্যাগের ফলে 'নয়া' কংগ্রেসের ভিতরকার অনৈক্য প্রকাশ পেয়েছে। এর জের কতদূর গড়াবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে, 'পুরানো' কংগ্রেস স্পষ্টতই এব্যাপারে খুশী। মহারাষ্ট্রের ভারতীয় ক্রান্তি দলের সভাপতি শ্রী ডি আর পাওয়ার ইতিমধ্যে শ্রীদেশাইকে তাঁর দলে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

•

পাঞ্জাবে 'নয়া' কংগ্রেস দল কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অকালী দল 'নয়া' কংগ্রেসের সমর্থন লাভের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এই সমর্থনের মূল্য হিসাবে সন্ত ফতে সিং অকালী দলের নেপথ্য-নেতৃত্ব থেকে এবং রাজনীতি থেকে সরে যেতেও রাজী আছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এই

ছায়া নাচ
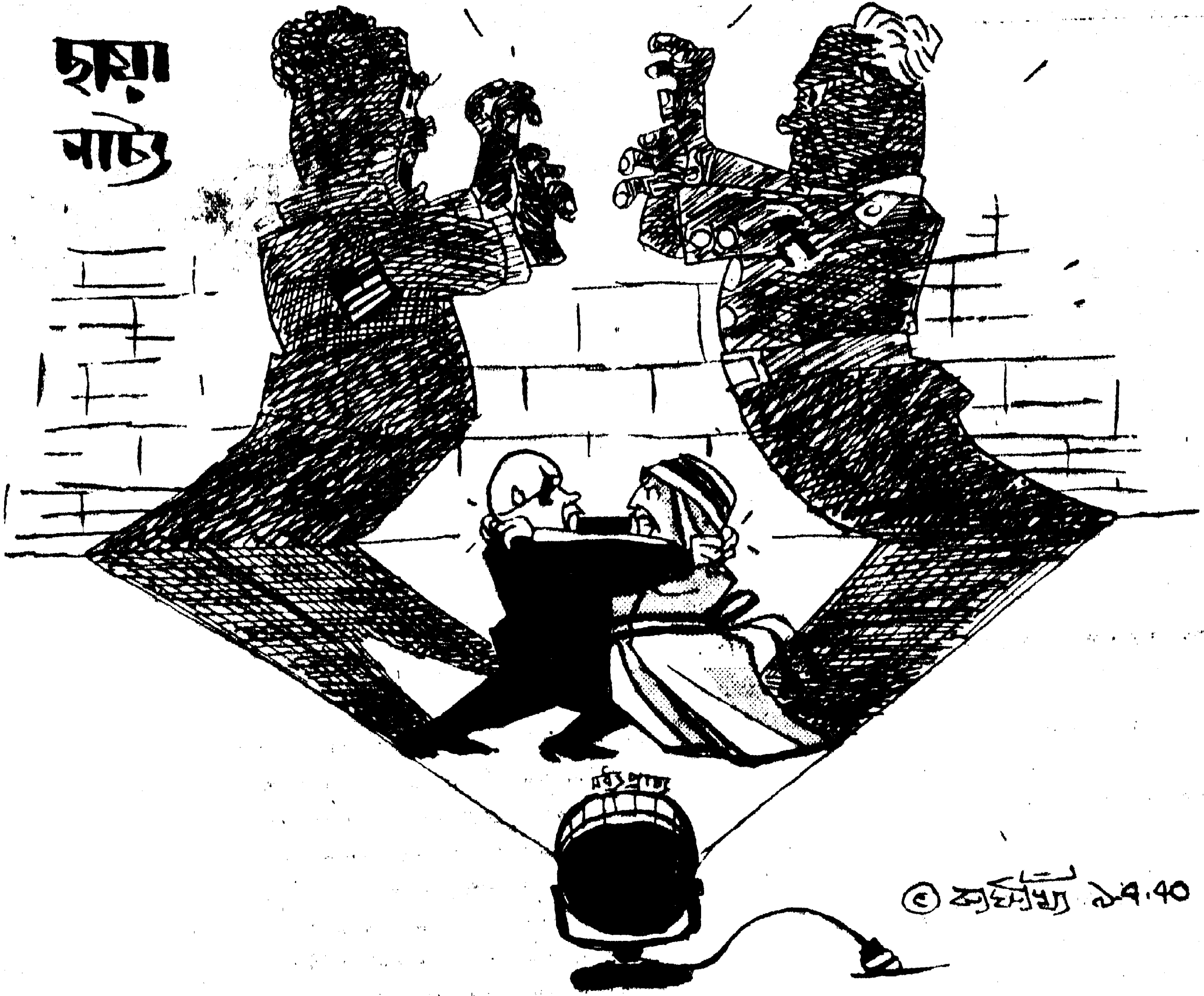
সমর্থনের বিনিময়ে অকালী দল পাওয়ার থেকে 'নয়া' কংগ্রেস দলকে পার্লামেণ্টের কয়েকটি আসন পাইয়ে দেওয়ারও নাকি প্রলোভন দেখাচ্ছে। পাঞ্জাবে 'নয়া' কংগ্রেস সদস্যদের একাংশ এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান, তখন অন্য এক অংশ কিন্তু এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। দুই অংশই দিল্লীতে দলের নেতাদের কাছে ছোটাছুটি করছেন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ সিং বাদল অবশেষে আগামী ২৪ জুলাই পাঞ্জাব বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে রাজী হয়েছেন। সপ্তাহখানেক আগেও তিনি বলছিলেন, সেপ্টেম্বর মাসে 'স্বাভাবিক সময়েই' তিনি বিধানসভার অধিবেশন ডাকবেন। রাজ্যপাল ও বিরোধী দল-গুলির চাপে তিনি পরে ৫ই আগষ্ট তারিখে বিধানসভার অধিবেশন ডাকবেন বললেন। শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল যখন ২৪শে জুলাই বিধানসভার অধিবেশন ডাকার নোটিশ দিলেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, রাজ্য সরকার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই ঐ তারিখ ঘোষণা করেছেন এবং তিনিও যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁর বিরোধীদের শক্তির পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিতে চান।

জনসংঘ দল কোয়ালিশন ত্যাগ করার পর ইতিমধ্যে পর পর সাতজন বিধানসভা সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর দল ছেড়ে শ্রীগুরনাম সিংয়ের অকালী দলে যোগ দিয়েছেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দলের সদস্যসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৩। পাঞ্জাব বিধান-সভার আসন সংখ্যা ১০৪।

মুখ্যমন্ত্রী বাদল কিন্তু এখনও জোর-গলায় বলে যাচ্ছেন, বিধানসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, কেননা, তাঁর মতে 'সমস্ত প্রগতিশীল দল তাঁকে সমর্থন করবে' এবং প্রগতিশীল দল বলতে তিনি কংগ্রেসকেও বোঝেন।

*

শ্রীগুরনাম সিং যখন পাঞ্জাবের মুখ্য-মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় তাঁর কতকগুলি কাজ সম্পর্কে এখন তদন্ত চলছে। এই তদন্ত করছেন এমন একজন অফিসার যিনি শ্রীগুরনাম সিংয়ের আমলে দণ্ডিত হয়ে-ছিলেন। ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, রাজ্য সরকার হয়ত তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। সেইজন্য তিনি আগেভাগেই আদালত থেকে জামিন নিয়ে এসেছেন।

পাঞ্জাবে যখন [অকা]লী দলের স[ঙ্গে] 'নয়া' কংগ্রেস দ[লের] হাত মেলাবার ব[...] উঠছে তখন [উ]ত্তরপ্রদেশে কিন্তু 'ন[য়া]' কংগ্রেস দলের সঙ্গে ভারতীয় ক্রান্তি দ[লের] জোট একটা নূতন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে[...]

এই তৃতীয়বার ভারতীয় ক্রান্তি দ[লের] জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতি '[নয়া'] কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যা[খ্যান] করলেন। প্রত্যাখ্যানের সুরটা নরম ক[রার] জন্য এবং সংযুক্তি প্রস্তাবের সবচেয়ে [...] সমর্থক যিনি সেই দলের সভাপতি [...] শ্রীচরণ সিংয়ের মুখরক্ষার জন্য অ[...] কার্যনির্বাহক সমিতি একটু-রেখে-[...] সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমিতি বলেছেন[...] সংযুক্তির প্রস্তাবটি নিয়ে আল[...] বিবেচনা করে সমিতিকে উপযুক্ত পরা[মর্শ] দেওয়ার ভার দলের সভাপতি শ্রী[চরণ] সিংকে দেওয়া হল। কিন্তু যে ভাষা[য়] সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, এটা পরিষ্কার উঠেছে যে, সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল দেওয়া হয়েছে।

এই প্রত্যাখ্যানের ফলে উত্তরপ্র[দেশে] 'নয়া' কংগ্রেস দলের সঙ্গে ভারতীয় ক্র[ান্তি] দলের কোয়ালিশনের আয়ু অনিশ্চিত পড়ল।

৯।৭।৭০ [...]

সম্পাদকীয়

বন্ধ, হরতাল ও তারপর

বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা আট পার্টি ও ছয় পার্টি জোটের কার্যকলাপে খুবেই কৌতুহল বোধ করবেন। পশ্চিমবঙ্গে এখন রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য আট পার্টি এবং ছয় পার্টি সাধারণ মানুষকে বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির শাসন কারো কাম্য নয়, এটা জানা কথা। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন বাংলাদেশে কেন প্রবর্তিত হল তা নিয়ে তো এই আট-ছয়ের জোট কোনো কথা বলছেন না। ১৯৬৭ সালে বাংলার কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী পার্টিগুলো রাজ্য শাসনের সুবর্ণসুযোগ পেয়েছিল। বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে কোনো কালেই আদর্শগত বা কার্যসূচীভিত্তিক ঐক্য ছিল না। কংগ্রেস-বিরোধিতার মঞ্চে তাঁরা এক হয়েছিলেন। পার্লামেণ্টারি শাসনে এক ধরনের পার্টিগত সমঝওতা করে নিতে হয়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস-বিরোধী পার্টিগুলো সেই সমঝওতার ভিত্তিতে রাজ্যশাসন ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু ব্যাপক দলত্যাগের ফলে সেই মন্ত্রিসভা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সত্যি কথা তখনও তাঁদের পার্লামেণ্টারি ঐক্য অটুট ছিল যার ফলে ১৯৬৯ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে।

১৯৬৯ সাল থেকেই বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির অগ্নিপরীক্ষা। পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতা পেলে কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয় এবং কতখানি সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণকে তাঁরা দিতে পারেন তা দেখাবার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের এমন ক্ষমতা ছিল না যে পেছনের দরজায় কারসাজি করে তারা যুক্তফ্রণ্টকে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে হটায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতাচ্যুত হল নিজেদের শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকতায়।

এখন তাই বাংলা বন্ধের ডাক দিয়ে এবং হরতাল পালন করে রাষ্ট্রপতি শাসনের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ জানানোর মধ্যে রাজনৈতিক অসঙ্গতি অনেকেরই নজরে পড়বে। প্রথমে তো দু'দিন দু'টি তারিখে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল দুই পরস্পরবিরোধী পার্টি-জোটের তরফ থেকে। পরে ও'দের সুমতি হওয়ায় একই দিনে হরতালের তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু এই হরতাল বা বন্ধের কার্যকারিতা আর কী অবশিষ্ট আছে, তা কি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আবার একটু তলিয়ে দেখবেন। রাজনৈতিক কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অল্প লোকই বন্ধের সামিল হয়। কিছু লোক ভয়ে বন্ধ করে, অনারা তো একে একটা বাড়তি ছুটি বলে গণ্য করে। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে হরতাল বা বন্ধের গুরুত্ব কমে গেছে। ব্রহ্মাস্ত্র বারবার ব্যবহার করলে তা ভোঁতা হয়ে যায়। বাংলাদেশে হরতাল বা বন্ধের রাজনৈতিক প্রয়োগও সে কারণেই ক্রমশ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ছে কিনা, ভেবে দেখতে হয়।

স্পষ্টতই বামপন্থী দলগুলো এখন দুই বা ততোধিক শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক বিরোধ এত তীব্র যে কোনো কারণেই এদের মধ্যে মিল হবার সম্ভাবনা নেই। এই বিরোধ থেকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের উৎপত্তি। নিজের নাক কাটা যাক ক্ষতি নেই, অপরের যাত্রাভঙ্গ তো হল! এই বন্ধ্যা রাজনীতির শিকার হচ্ছে জনসাধারণ। এরি মধ্যে চলছে উগ্রপন্থীদের উৎপাত ও তাণ্ডব। রাজ্যশাসন এখন যাঁদের হাতে তাঁরা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে মোটেই সক্ষম নন। এদিকে অর্থনৈতিক বাজারে বাংলার অবস্থা শোচনীয়। তার কলকারখানায় উৎপাদনের হার মন্দা; অনেক কলকারখানা বন্ধ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে অনেক শিল্প-কারখানা বাংলার বাইরে পা বাড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যা যুবক শ্রেণীর মধ্যে হতাশা ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত করে দিচ্ছে দিনের পর দিন। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে রাজনৈতিক নেতারা এই অবস্থার মোকাবিলা করতে না পেরে পুরনো শ্লোগান দিয়ে ও পুরনো কায়দায় এর পরিবর্তন আনতে চাইছেন। এর দ্বারা যে সুফল পাওয়া শক্ত তা এই নেতারা বুঝতে পারছেন না, এটাই আশ্চর্য।

শরীরের বাগানে।।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরীরের বাগানে তোমার অজস্র ফুল, অদেক্ষা
আমি ভ্রমর নই দক্ষিণের বসন্ত বাতাস অপ্রমেয়
আনন্দ কিংবা লুব্ধ এবং রঙীন প্রজাপতি নই
তবু বারবার কোন অনামী স্বাস্থ্যবান পানীয়ে
পূর্ণ করে রঙীন পরিচিত আমার এ ভিক্ষুক
ওষ্ঠের প্রকাশ্যে ধরেছো মোহবতী। শরীরের মদ
সবচেয়ে সেরা বলে খ্যাত প্রাচীন গোধূলি থেকে।
অনেক ভেড়ার পাল সৌন্দর্য বেচেছে শীতে
পশমী কাপড়ে; অনেক অনেক রাঙা
প্রজাপতি মরে আছে রেশমী আব্রুতে।
শরীর শরীর ঢাকো তৃষ্ণায় জর্জর চয়ে
আকাঙ্ক্ষারা কাঁদে তো কাঁদুক এই কথা
বলে গেছে কৃষ্ণ পক্ষ রাতে কোনো অন্ধ জমপতি।

আমরা এখানে আছি ততোদিন শরীরে সাবান
দিই; সুগন্ধ কল্লোল জলধারা; আয়নায়
আকাঙ্ক্ষার মুখ ধরা পড়ে।

সীমান্ত ছাড়িয়ে।।

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

ঝুলবারান্দার কোণে এখন সন্ধ্যার ধুলোঝড়
নাগকেশরের চোখ জেগে থাক বিনিদ্র রজনী
কুলুঙ্গীতে ঘরের পাঁচালী
প্রদীপের তেল সলতে তৈরী রাখতে
গৃহবধূ
চিত্রপট ভেঙে চলে আসে।

সমস্ত দেয়াল ছবি দিনে দিনে ম্লান হয়ে গেলে
কি থাকে
কিই বা থাকে
পৃথিবীর উজ্জ্বল সম্ভার
সময়ের খরশান রোদে জাগা
পাহাড়ের বিপ্রতীপ দিকে
আলোকের নির্মম প্রয়াণ।

শালবাহারের দেহে তবুও বর্ণালী আঁকে
আলোবাতাসের কররেখা
ছিঁড়ে যায় দিকসীমা
সীমান্তের ক্রুর কাঁটাতার
নাগকেশরের ফুলে জমাট বুকের কান্না
অশ্রুময় গূঢ় বেদনায়

দুটি কবিতা

তুমি।।

প্রতিমা সেনগুপ্ত

তুমি এক আশ্চর্য!
কি নাম দেওয়া যেতে পারে জানি না;
কোন অভিধানেরই বোধহয় তা জানা নেই,
তাই আমার বিপর্যস্ত আত্মার প্রতিটি মুহূর্ত আজ আকুল
তোমাকে পূর্ণ করে পাওয়ার আশায় হৃদয় মেলাতে চাইছে
আমাকে বুঝতে দাও।

শিশির।।

তুমি আমাকে যখন কিছু দাও
খুব বেশী করে দিয়ে ফেল; যা নেবার মত সুদৃঢ় নয়
এই করতল; অথচ
তীক্ষ্ণ একাগ্রতায় তাকিয়েছিলাম আমি ওরই জন্যে;
এখন এই মুঠোর মধ্যে সঞ্চিত রাজৈশ্বর্য টলমল করছে
অথচ হৃদয় কাঁপছে থরথর করে এক ফাঁকা অনুভূতির ব
তোমাকে মনের বেড় দিয়ে আকণ্ঠ পান করতে পারছি না
আমি কি বোকা!

সাধের

মিহির আচার্য

নভেন্দুর মতন ভীতু মনুষ আমি দুটো দেখিনি। ও যে কিসে ভয় পায় আর না পায় তার হদিশ পাইনে। অথচ সে আমাদের মতন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবান যুবক। কলেজে ভালো স্পোর্টসম্যান ছিল। অফিসে নাটক করে সুনাম অর্জন করেছে। ছোটো সংসার। স্ত্রী লীলা আর ছোটো দুটি মেয়ে।

নভেন্দু যদি নির্বোধ হত তাহলে ওকে এক রকম বুঝতাম। বরং আমাদের থেকে বেশি পরিমাণেই ওর চোখ-কান খোলা।

নভেন্দু বলে, 'না আগে এরকম ছিল না। ইদানীং কেন যে এমন হচ্ছে।'

অথচ অসুখ-বিসুখ নয়, আর্থিক চিন্তাও নয়।

নভেন্দু বলে, 'যতক্ষণ বাড়িতে থাকি একরকম। তারপর বাড়ি থেকে এক পা বেরুলেই মনে হয় আমার অজ্ঞাতে কী যেন ঘটে যাচ্ছে। ভয় ভয় আর ভয়।'

'তোমার ভেতরে কী কোনো পাপ-বোধ?'

'পাপ!' নবেন্দু বলে, 'না। বেঁচে আছি এর চেয়ে আর বড় পাপ কী আছে।'

'বেঁচে-থাকা পাপ!'

'নয়? আমার বেঁচে-থাকার অর্থই হচ্ছে আরেকজনকে মেরে ফেলা। সবাই যেন আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে: এই, এই সেই লোক। এরকম একটা অনিশ্চয়তা নিয়ে কী করে বাঁচা যায় বলো তো? তোমরা বেঁচে গেছ, তোমাদের এরকম হয় না! কিন্তু আমি, আমার কী হবে?'

'কী বলছ পাগলের মতো? তুমি বেঁচে থেকে কার কী ক্ষতি হচ্ছে?'

[illegible] কেন? লীলা বলে, ভেবো না আমরা আছি।

অথচ ওরা আছে বলেই তো ভাবনা। আমার একার জন্যে নয়, আমরা সবাই একসঙ্গে আছি, সেই জন্যে তো আরো ভাবনা।'

'ভাবনা আর ভয় কী এক জিনিস?'

'কী জানি। তবু বাইরে বেরুলেই... সেদিন একটা লোক দৌড়ে বাসে উঠছিল, আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার ভীষণ ভয় করছিল। যতক্ষণ না লোকটা বাসে উঠে পড়ল ততক্ষণ আমার ভয় যাচ্ছিল না। তারপর হাঁপ ছেড়ে নিশ্বাস ফেললাম; মনে হল আমি লোকটাই বাসে উঠেছি।'

'শহরে বাস করলে স্নায়ুগুলো আমাদের এরকম উত্তেজিত থাকাই স্বাভাবিক।'

'তুমি বলছ এটা স্নায়ুর ব্যাপার?'

'তাই মনে হয়। তোমার মাঝে মাঝে গ্রামে ফিরতে ইচ্ছে করে না? শহরে বাস করলে তোমাকে সব কিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে

নিতে হবে। সভ্যতা মানেই কে কত বেশি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে!'

'দ্যাখো যতক্ষণ না বাড়ি ফিরছি মনে হচ্ছে আমার অবর্তমানে ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে গেছে। রক্ত কিংবা...'

'তুমি বেশি-বেশি ভাবো। অত না ভাবলেও চলে।'

'কী জানি, রাস্তার ভিড়ে ভিড় হতে পারিনে। মনে হয় আমি আলাদা, বিচ্ছিন্ন, খাপছাড়া এগিয়ে চলেছি। কাউকে চিনিনে, কাউকে বুঝিনে, ভিনদেশীর মতন। আর তখনি ভয়টা সাপের মতন সর্বাংগে জড়িয়ে ধরে। যেন ওরা আমাকে চিনে ফেলবে, ফেলছে, আমাকে ধরতে আসছে। আমার চারদিকে পাথরের দেয়াল দেখি।'

'তোমার চিন্তাগুলোর কোনো মানে নেই। অথবা তুমি কিছু গোপন করতে চাইছ।'

'এরচেয়ে আমি যদি ধরা পড়ে যেতাম, ওরা যদি সত্যিই আমার বিচারক হত, একটা ফয়সালা হয়ে যেত। আমি এই যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যেতাম। অথচ ওরা আমাকে কোনোদিনই ধরবে না, দূরে থেকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করবে : এই, এই সেই লোক। আহ্।' একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলেঃ 'আমি যেন দাগী হয়ে গেছি। সেইটেই এক শাস্তি। যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি মরে থাকি। সকালে চা খেয়ে, বাজারের গলিতে হুবহু তিনটি ভিখিরি, বাবু দুটো পয়সা...। সে যে কী অত্যাচার। একেক দিন জেদ করে দুটো একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে আগুন-লাগা মানুষের মতো উদভ্রান্ত ছিটকে বেরিয়ে গেছি। যাওয়ার সময় এবং আসার সময় ওরা আমার বাজারের থলির দিকে শাদাটে ভূতের চোখে তাকিয়ে থাকে। ওদের মণি-হারা চোখের ভাষা তুমি দ্যাখোনি।'

'বারে, তুমি একা এসব ভেবে মন খারাপ করবে কেন? তুমি তো কোনো কিছুর জন্যে দায়ি নও। তোমার যোগ্যতার বাইরে তুমি তো কোথাও হাত বাড়াওনি।'

'তাহলে আমি ভয় পাচ্ছি কেন? আমার বাঁচবার প্রক্রিয়াগুলোই আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। আমি, আমার মেয়েরা, আমার স্ত্রী, আমার চোখে যত পরিষ্কার সত্য হয়ে ওঠে ততই আমি মিথ্যা হয়ে যাই। মনে হয় আমি একদিকে অধিক ঝোঁক দিচ্ছি। ফলে ভারসাম্য প্রতি মুহূর্তে নষ্ট হচ্ছে।... আমার কৈশোরের ফ্রেমে-আঁটা মামাবাড়ির মধুর স্মৃতির কথা তোমাকে বলেছি। কী হল? যৌবনের প্রান্তে এসে সে-স্মৃতি খর আগুনে ঝলসে কিম্ভূত হয়ে গেল। কালকে সেজমামার এই পত্রাঘাতঃ 'আমার একমাত্র শয়নগৃহের খড়ো চাল বৈশাখের ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। তুমি একশত টাকা পাঠাইলে ঘরটাকে খাড়া করিয়া তুলিতে পারি। তুমি বিবেচক, তোমাকে অধিক বলাই বাহুল্য।' আমি যে একশো টাকাও পাঠাতে পারিনে সেজমামাকে কী করে বিশ্বাস করাবো? অথচ মামাবাড়ির খিড়কির পুকুর পেরিয়ে আমবাগান, গ্রীষ্মের অবকাশের দুপুরগুলো বাগানের কুঁড়েতেই কাটত। আহ্। কী বলছ? চিঠির জবাব দেবো না? দিলাম না। হয়তো ট্রেনের মাশুল জোগাড় করে মামাবাবুও এতদূরে চড়াও হবেন না। কিন্তু...আমার বিবেক? আমাকে দস্তুরমতো বিবেচক বলে উনি বিশ্বাস করেন। পরিস্থিতিটা তুমি বুঝতে পারছ? বিবেচক খ্যাতির লোভ কাটানোও মুশকিল।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নভেন্দু আবার বলে, 'একা হলে ভয় করতাম না। কিন্তু আমার লীলা, আমার মেয়েরা, এদের জন্যেই ভয় পাই। ওরা আমার ওপর বেশি নির্ভর করে রয়েছে কিনা! অথচ ওরাও আমার মন্দভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। ওদের দোষ নেই, তবু আমাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাবার সময় ওরাও আমার সঙ্গী হবে। একসঙ্গে আছি বলেই ভয়টাও বেশি। ছোটো মেয়েটার একদিন অসুখ হলে শংকিত হয়ে পড়ি : বোধ হয় ও আর বাঁচবে না। কেন এমন হয়? আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো গর্হিত কাজ করিনি। তবু, জ্ঞানের অগোচরেও পাপ আছে।'

'তুমি এইভাবে ভাবতে শুরু করলে...'

'কী করব? ঢেউয়ের মতন একটার পর একটা ভয় আসছেই। বয়েস মানেই ভয় নিয়ে বাস করা। বয়স্কতাই একটা বিপদ। দ্যাখো প্রথম যৌবনে ভালবাসার পাত্রী নির্বাচনে আমি একটার পর একটা ভুল করে গেছি। দুটি মেয়েকে বিভিন্ন সময়ে আমি একরকম বিয়ের সম্মতিই দিয়ে ফেলেছিলাম। বিয়ে করলাম তৃতীয় জনকে। আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। আগের মেয়ে দুটোর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। নাঃ ভুল বললাম, চিত্রার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল তিন পাহাড় স্টেশনে। ও সেদিন প্ল্যাটফরমের হু-হু বাতাসে দাঁড়িয়ে ছোট্ট প্রশ্ন করেছিল, 'আমার মার কাছে আমাকে অপমান করার কী হেতু ছিল? আর রঞ্জিতা সেদিন খবর পেলাম লিউকোমিয়ায় সে হাসপাতালে মাত্র বাইশ বছর বয়েসে মারা গেছে। চিত্রা বিয়ে করে যথারীতি জননী হয়েছে, সম্ভবত সুখী হয়েছে। কিন্তু রঞ্জিতা, ওর অকালমৃত্যুর পিছনে আমার কী কোনো হাত ছিল? আমি কী ওকে বাঁচাতে পারতাম!'

'তুমি অতীতবিহারী হয়ে পড়ছ। গতস্য শোচনা করে লাভ কী?'

'লাভ-লোকশানের কথা নয় ভাই। তুমি কোনো সামাজিক নৈতিকতায় বিশ্বাস করো না? যা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে ব্যক্তিগত মানুষের ওপর। আমাদের এমন কোনো কাজ নেই যা সমাজকে আঘাত করে না। ভালোই হোক আর মন্দই হোক। অথচ একদা ভাবতাম : আমার কাজগুলি নিছক আনাড়ি, তার জন্য কারুর দায়িত্ব নেই।' এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক নৈতিক-হীনতাগুলি ঘটে থাকে।'

'ভুল-ভ্রান্তি মানুষের জীবনে থাকবেই। মানুষ তো আর ঈশ্বর নয়।'

'না ঈশ্বর নয়। তাহলে তো নির্দ্বন্দ্ব নির্বিকল্প থাকতে পারতাম। মানুষ বলেই তো হয়েছে জ্বালা। একদিন বুঝতাম না, যেদিন বুঝলাম সেদিন আমার বাবামশায়ের পরিকল্পনাহীন জীবন সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলাম। মনে হয়েছিল আমার জীবনের পরিকল্পনাহীনতার জন্যে দায়ি আমার বাবা। অথচ কেউই দায়ি নয়। জীবন এইরকমই। জীবনে পথচলার কোনো গুরুমশায় নেই। তাই শরসন্ধান এবং লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে ভেসে চললাম। যখন যে ঘাটে লেগেছি, আবার ভেসে গেছি। তারপর ক্লান্ত হয়ে প্রাচীন গাছের গুঁড়িতেই আশ্রয় নিয়েছি। গড়ানে পাথরের মতন এই জীবন। স্থিতি পেয়ে বারবার পিছনের জীবনের দিকে তাকিয়ে চলেছি। আর নার্ভাস হয়েছিঃ এই কী মনুষ্য-জীবন? আহ্। শবজির ক্ষেতে কাকতাড়ুয়ার মতন আমার নড়বড়ে আকৃতিটা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর অনেক বর্ষার জল আর গ্রীষ্মের তাপে দুমড়ে-মুচড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কষ্ট হয় না, করুণা জাগে। কে আমার নাম দিয়েছে মানুষ? আমি একটা শূন্য। আমার ভার নেই, আয়তন নেই, আমি কিছুই নই।'

'তুমি বড় হতাশায় ভুগছ। এই হতাশা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'না ভাই, আমার এই মূঢ় অস্তিত্বের জের আর আমি টানতে পারছিনে। কেন এমন জীবনটা হল? এর মানে কী? কেন পৃথিবীতে পা দেবার মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম না আমাকে অর্থপূর্ণ হতে হবে। আমি মহৎ কোনো উদ্দেশ্যের অন্ধ যন্ত্র হতে পারি[illegible] আমার প্রতিশ্রুতিগুলো আমাকে [illegible] করতে হবে। কিন্তু পারিনি। একেক সময়ে আমি একেক রকম শপথ করেছি, অথচ রক্ষা করতে পারিনি। চিত্রাকে কথা দেবার সময় আমি রঞ্জিতাকে মিথ্যা বলেছি। রঞ্জিতাকে কথা দেবার সময় আমি লীলার সঙ্গে সম্পর্কে এসেছি। অথচ কেন এমন করেছি আমি জানিনে। ওদের সঙ্গে আলাদা আলাদা মেশবার কালেও আমি কারুর সম্পর্কে অসৎ মনোভাব পোষণ করিনি। এরা স[illegible] সময় আমার কাছে সত্য ছিল। চিত্রা [illegible] রঞ্জিতাকে আমি বিয়ে করিনি, কি[illegible] ওদের আমি ভালোবাসিনি একথা বলা[illegible] মিথ্যা হবে। এমন কি চিত্রা রঞ্জিতাও তা বিশ্বাস করে। অথচ কেন আমি অ[illegible] করলাম, ওদের কাছে স্পষ্ট নয়, আম[illegible] কাছেও। অধিকন্তু মজার কথা, লী[illegible] আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠব[illegible] আগেই দুম করে তড়িত নোটিশে ও[illegible] বিয়ে করে সকলকে অবাক করে দিলা[illegible] নিজেকেও। চিত্রা আমার বউ দেখতে এ[illegible] [illegible] সঙ্গে উপহারও নিয়ে এসেছি[illegible] রঞ্জিতা আসেনি, ওর বাবা তাড়াতা[illegible]

মেদিনীপুরে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য, বিয়ের পর একা পেয়েও চিত্রা একদিনও আমার বিয়ে সম্পর্কে ওর মনোভাব আমাকে বুঝতে দেয়নি। ওরা যদি আমাকে অভিযুক্ত করত, আমি অনেক নিশ্চিন্ত হতাম। ওদের উদাস হয়ে যাওয়াটা আমার কাছে অপমানকর লেগেছিল। যেন মানুষ হিসেবে আমার দেউলে হৃদয়টাকে ওরা সঠিক ধরে ফেলতে পেরেছিল।...লীলা সব জানে। আর সেইখানেই মুশকিল। সেও আমার দেউলেপনাকে বুঝে ফেলেছে এতদিনে।'

অখণ্ড নীরবতা।

নভেন্দু চিন্তা করে বলে, 'মুখে সভ্যতার পালিশ লাগিয়ে সাজানো একটা সংসারের মঞ্চে আমি বাস করছি। যে কোনো মুহূর্তে পালিশ চটে যেতে পারে, সাজানো সংসারটা তাঁবুর মতন ভেঙে পড়তে পারে। কেউ-না-কেউ আছে যার নিঃশব্দ আঁখি আমাকে পাহারা দিচ্ছে, তার কাছ থেকে কেউ কখনো লুকোতে পারে না। আমিও পারব না। একদিন ধরা পড়তেই হবে। আজ কিংবা কাল। পরিত্রাণের পথ নেই। বলো আমার কী হবে, আমি কী করতে পারি?'

'তুমি যদি অনুতপ্ত হও, তোমার অনুতাপগুলোই তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করবে।'

'না, আমি অনুতাপ করতে চাইনে। অনুতাপগুলো আবার আমাকে নতুন করে, অপরাধ করতে প্রবৃত্ত করবে।

'তবে তুমি কী করতে চাও?'

'আমার অপরাধগুলো নিয়েই আমি বাঁচতে চাই। আমি যেন সব সময়ই বুঝতে পারি আমার ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড পাথর, আমাকে পাথরটাকে পাহাড়ের চূড়োয় পেঁছে দিতে হবে। যা কোনোদিনই পারা যাবে না। আমরা একটা অসম্ভাব্যতার সঙ্গে লড়ায়ের অভিনয় করে চলেছি। করে যেতে হবে যতদিন না বাঁচবার উপকরণ, পটভূমি, মূল্যবোধ পালটাবে।'

'পালটাবে? সেদিনও কী নতুন কোনো সমস্যা দেখা দেবে না?'

'জানিনে। তবে এমন বদ্ধ অবস্থায় চিরকাল থাকতে পারে না। দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, চারদিকে সব পচে যাচ্ছে।'

'এত জেনেও তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

'পাবো না? আমি তো শিশু নই যে খোলা ছাদের কার্ণিশে দাঁড়িয়ে আকাশে ঘুড়ি-ওড়া দেখবার চেষ্টা করব? জানি বলেই তো ভয় পাই।'

'সত্যি করে বলো তো কী হয়েছে তোমার? তোমাকে আজ অধিক অস্থির চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'পাপ একটা মধুর লোভ। রাস্তায় গজিয়ে-ওঠা অজস্র চায়ের দোকান। তেষ্টা না থাকলেও আমরা ঢুকে পড়ি। আমাদের তেষ্টাগুলোও বানানো। না হলে এত চায়ের দোকান চলত না।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনে।'

'কী জানি, আমি কী জটিল হয়ে পড়ছি?' নভেন্দুর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর যেন দীর্ঘকাল হেঁটে আসছে: 'আমি জানতাম যে পর পর এমনি ঘটবে। দুদিন কথা-বলা, হাসা, তৃতীয় দিন ময়দানে, চতুর্থ দিনে রেস্তোরাঁয়। একটা অন্ধও নির্ভুল হেঁটে যেতে পারে। একঘেঁয়ে বাংলা সিনেমার রোমান্টিক নায়কের নতুন অবস্থা। আমাদের পারস্পরিক বিবাহিত জীবনের আটপৌরে পোশাকটা যথারীতি বাতিল হয়ে যেত। রুটি ওলটালেই পোড়া দিকটা দেখা যাবে ভয়ে আমরা ওলটাতাম না। আমাদের তারুণ্যের অসহায়তা নেই, আমরা ভয়ানক সিরিয়াস গম্ভীর। গাম্ভীর্যের পুরু আবরণের আশ্রয়ে আমরা যথেষ্ট চতুর। ছুটির পর একজনের অপেক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ানো, তারপর ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যে রেস্তোরাঁর পর্দার আড়ালে আত্মসমর্পণ।'

'কী বলছ তুমি? এ কাদের কথা?'

'আমারি, আমাদেরি। মিসেস নন্দীকে তো তুমি চেনো। আমাদের অ্যাকাউন্টসের মেয়েটি। মাত্র দু'বছর হল ওর বিয়ে হয়েছে। বিশ্বাস করো আমি চাইনি যে এমন হোক। আমি ভীষণ, ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু কী করে যে হয়ে গেল। বোধ হয়, দুজনের মধ্যেই একটা বাড়তি লোভ ছিল। আজ একেবারে আকণ্ঠ জড়িয়ে পড়েছি, একটা বিশ্রী অভ্যেস পানাসক্তের মতন আমাদের দুজনকেই বেঁধে মারছে। আমি আর পারছিনে। কী করে যে মুক্তি পাব জানিনে।'

'আ, কী বলছ?'

'ওই দ্যাখো কারা কানাকানি করছে, আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে: এই, এই সেই লোক। আমাকে কোথাও লুকোতে হবে। আমি লুকোচ্ছি, দোহাই তুমি ওদের বোলো না আমি কোথায়।'

হুড়মুড় করে ছুটে বেরিয়ে গেল নভেন্দু।

সুখের মেলা

কাছিম শিকারী

নামখানার বাজার থেকে কেনা ছ-টাকার ছাতাখানা ফড়াস্ করে আকাশের দিকে উল্টে গেল বিভূতির। তার তো গাল হাঁ। এখন করে কী? গাছপালা দুমড়ে-মুচড়ে-ছোটা ঝড়ের মা-মাসি উদ্ধার করে সে মুখখিস্তি আরম্ভ করে, '...বাও' বইচে, শালার নিকুচি করেছে, নতুন ছাতিখান দিলে শালা উল্টে! এখন কি হয়!' প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে পুরে, সেটাকে আবার একটা চটের থলের মধ্যে ভরে মরা বাছুর মাথায় নিয়ে সঙ্গে-আসা চক্রধর মাল বোঝাটা নামিয়ে রেখে বলে, 'দে আমাকে, তিনটাকা দোব। ও তো শালা শহরের লোকদের ঠকানো 'কম্ম'। একটা দমকা বাও লেগে উল্টে গেলেই বাস!'

নতুন ছাতার 'আবস্থা' দেখে বিভূতির অবস্থা হল কাঁদো-কাঁদো। আস্ত একটা কচ্ছপের দাম! বললে, 'তুই নিয়ে কি করবি শালা?'

'ওর কল সরে গ্যাচে. নামখানায় যেয়ে 'সাতা হারাইব্যান'-এর কাছ থিনে কল বস্যে নেস্‌বো। তাকে আরো এক টাকা দিতে হবে।'

'ধ্যেৎ তেরি, তবে তুই নে মন্দার-বাপ, দে তিন টাকা।'

ট্যাঁক থেকে তক্ষুনি তিনটে টাকা বার করে দিয়ে ছাতা-খানা নিয়ে নিলে চক্রধর। তারপর অমনি ওল্টানো অবস্থাতেই খানিকক্ষণ নিয়ে চলল মাথার বোঝার উপরে ধরে ঝড়ের উল্টো-দিকে করে। সে ভাবলে বোকারাম 'বিগুতে'কে দেখিয়ে ছাতাটা চেপে ঠিক করে নিলে হবে না। তাহলে এক্ষুনি ফেরত চাইবে। না দিলে মন-কাকাকাকি হবে। ব্যাটা কখনো ছাতা ব্যবহার করে নি! শ্বশুরটার একটু অবস্থা ভাল. একশো বাঁশ দিতে গাঁয়ের খোলে বুকসমান 'গোজে' পুঁতেছে সমুদ্দুরের বড় কাছিম ধরবার জন্যে, আর একখানা নৌকা দিয়েছে। কিন্তু বিভূতির বুদ্ধি মোটা, তার হোঁতকা পাথরকালো চেহারাটার মতন। একশো পর্যন্ত গুনতেও পারে না বেচারী! কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি এলে চক্রধর বাধ্য হয়েই ছাতাটা নামিয়ে আবার ভেতরমুখী করে উল্টে নিলে। বিভূতি মহাবিস্ময়ে বলে ওঠে, 'দে আমার ছাতা, ও শালা কল! তুই শালা তো ওস্তাদ আদ্দিস চক্করে। এই লে তোর টাকা। তোর মেয়ে মন্দার সঙ্গে ধরাধরি হল, তুই শালা আমাকে চালা-কাঠের রাড়ি ঠেঙালি, তোকে শ্বশুর করলেই বরঞ্চ ভালো ছ্যালো। 'থালে' শালা আমার কচ্ছপ চুরি করাতিস নি। দে, ছাতি দে।'

চক্রধর বলে, 'কি রকম, আমাকে তো বেচে দিলি! ভদ্দর-লোকের ক-কথা র‍্যা?'

'ওঃ! আমি শালা 'ভদ্দরনোক'! সপ্তমুখী নদীর মোহনার চরে মড়া ফেলে ঘেরি বেঁধে আমরা শালা কচ্ছপ ধরি—আমরা ভদ্দরনোক! ছাতি না দিলে মা-কালীর দিব্যি, ফের তোর মন্দাকে নিয়ে সেই গোসাবার দিকে পালাব। সেখানে তাড়া করলে দেশান্তরী হব!'

অগত্যা ছাতাখানা ফেরত দিয়ে টাকা তিনটে ট্যাঁকের প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে রেখে চক্রধর বলে, 'ভদ্দরনোক না হলে ছাতি কিনতে গেলি কেন? একটা বস্তা কিম্বা তালপাতার 'পেখে' মাথায় দিলে আমাদের চলে যায়—শালা 'ভদ্দরনোক' হচ্ছে। আমার মেয়ের দিকে নজর দিয়েছ কি এবার মরেছ। শড়কি দিয়ে [illegible] দোব।'

'তোর মেয়ে তবে শালা, নুকুকে নুকুকে আসে কেন? অতো মার দিস তবু কি শোনে? শালা মারের চাইতে 'পীরিত' অনেক বড়। আমি তুই জাতে আলাদা। কিন্তু কার এক কাজ। তবু বিয়ে হল না! কোন্ শালারা এই রকম নিয়ম করেছে বলতো?'

কথা বলতে বলতে ওরা একটা পাড়ার কাছে এসে গেল। শ্মশানটার দিকে আঁতি-পাঁতি করে দেখে কোনো মরা গরু, ছাগল, কুকুর, শিয়াল অথবা যে-কোনো জীবজন্তু পড়ে আছে কিনা।

সকালে বিভূতি বাজারের পাইকেরকে মাত্র তিনটে কচ্ছপ দিতে পেরেছে পাঁচাদন পরে আজ। কোনো পচানী না দিলে তার হাঁড়ি বা ঘেরির মধ্যে কচ্ছপরা আসবে কোন্ সুখে? শালা চক্কুরে খুব মাল পাচ্ছে ক'দিন। চার বাপবেটায় খাটছে—চারদিক থেকে মাল আনছে কুড়িয়ে। দুপুরে গড়িয়ে গেল। খিদেয় পেটের ভেতরটা কোঁ-কোঁ করে শব্দ করছে। চক্রধর চলে গেল। বিভূতি মাথায় গামছার পক্কড় জড়িয়ে বসে রইল শ্মশানটার পাশে। কোথাও কেউ নেই দেখে খুঁঠে-বাঁধা কচি বাছুর সমেত গাই-গরুটার সামনে গিয়ে কলাপাতায় করে বাঁধা সেঁকো-বিষ নিয়ে ফেলে দিয়ে সট্ করে বনের আড়ালে আবার সরে এল। গাইটার অনেক-খানি দুধ হয় বোধহয়। কিন্তু কি করবে, তারও তো রোজগার দরকার! চারটে ছেলে-মেয়ে বউ আর মা আছে সংসারে। রোজ কত চাল আটা লাগে?

গাইগরুটা দিব্যি কলাপাতা চিবুতে-চিবুতে এক সময় গিলে নিলে! আর্সেনিক বিষের ক্রিয়া এবার ওর শরীরের রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর ঘন্টাকয়েক পরেই পেট ফুলে দম-সম হয়ে মুখে গাঁজা তুলতে তুলতে মারা যাবে শুয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে।

হয়তো সন্ধ্যার মুখে শ্মশানের গো-ভাগাড়ে পড়বে গরুটা। আশেপাশেই থাকতে হবে। অনেক গ্রাহক আছে তার মতন লুকিয়ে। তবু সরে পড়তে হয়। তার আগেই মুচি নিমাই দাসের বাড়িতে একবার যেতে হবে। খবর দিতে হবে নিমাইকে। একটা টাকাও হাতাবে সে তার হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ করে দেবার অজুহাতে।

মুচিপাড়ায় ঢুকে সে নিমাইয়ের বাড়ি আসতে কালো চেহারার তার বিধবা বোনটা একটা চট পেতে বসতে দিলে। বললে, 'দাদা দোকানে গ্যাছে বিগুতে-দা। এক্ষুনি এসবে, বস।'

খুঁটি হেলান দিয়ে বসল বিভূতি। নিমাইয়ের বউ ছেলেমেয়েরা নাকি তার শ্বশুরবাড়ি গ্যাছে। বোনের নাম হরকুলি দাসী। ডাকনাম 'হরি'। বিভূতি দেখলে হরিকে নিয়ে এখন একটু আনন্দ করা যায়। ছোট একখানা কুঁড়েঘর। তালপাতায় ছাওয়া। হরি কাঁথা সেলাই করতে বসল গিয়ে আবার একখানা পা লম্বা করে আর এক-খানা পা মুড়ে কোলের কাছে জড়ো করে। ওর ছেলেপিলে হয় নি। বাঁধা যৌবন।

বিভূতি বলে, 'তোর বয়েস কত হরি?'

'কত মনে হয়?'

'এক কুড়ি কিম্বা এক কুড়ি দুই।'

কালো চোখ মেলে, শাদা দাঁত মেলে একটু হাসলে হরকুলি দাসী। বললে, 'আমার বয়েস এক কুড়ি বারো।'

'ছেলেপুলে একটাও হয়নে না?'

'দূর মিনসে। আমার কি ভাতার আছে যে ছেলে হবে?'

'ওঃ! ভাতার না থাকলে আবার মেয়ে-দের ছেলে হয় নে, না?'

খিলখিল করে হাসে হরকুলি।

বিভূতি তার যৌবন দেখে। দেখায় হরকুলি। চাপা দেয় না। মন্দার কথা মনে পড়ে। মন্দা শামুক কুড়োবার নাম করে তার নোকোতে উঠে চলে যায় হেতাল-বনের মধ্যে। কিন্তু ক'দিন তার দেখা নেই। বিভূতি আর থাকতে না পেরে উঠে যায় হরির কাছে। তাকে ধরতে গেলে সে বলে, 'দেখ মিনসের কান্ড! এই, না ভাই ছাড়ো, দাদা এসে পড়বে। আরে আরে...

নিমাই এল ঘন্টা দুই পরে। তখন হরকুলি দুটো টাকা হাতিয়ে নিয়ে পাড়ার অবস্থাপন্ন বাড়ির মোড়লদের গিন্নির কাছ থেকে এক কেজি চাল কিনে এনে গোটাকতক ভেজে নুন-চা করে দিয়েছে বিভূতিকে।

বিভূতি দেখলে মেয়েটা খুবই চতুর। ফষ্টিনষ্টি করবার সুযোগ দিয়ে দু'দিন খাওয়া হয় নি বলে টাকাটা ঝেড়ে দিলে। আশা দিলে, অথচ...টাকা না দিলে নিমাইকে বলে দেবার ভয় দেখালে আবার!

নিমাই বললে, 'কি খবর বিগুতে-দা?'

'একটা মাল পাবি সন্ধ্যে পর্যন্ত—ঢালিপাড়াটার গো-ভাগারে খোঁজ রাখিস।'

'মাল খাইয়েচিস?'

'হ্যাঁ।'

হরকুলি বলে, 'এই রকম গোহত্যে করছ বিগুতে-দা, পাপ হয় না?'

'হয় না আবার। এত পাপ করিচি যে, ভগমানের তা রাখবার 'আছরা' (আশ্রয়) নেই। কিন্তু কচ্ছপ ধরে যে খাওয়াচ্ছ তাতে পুণ্যি হয় না?'

নিমাই বললে, 'মাল পাই এগুগে, চামড়া 'ছাইড়ে' বেচে এসে তোর বায়না এক টাকা দোব।'

বিভূতি বাড়িতে চলে এল। তার বউ তরলা বললে, 'আজো কিছু পেলে না? ভাগ্যি খারাপ তোমার। চান করে এসে ভাত খেয়ে নাও।'

'চাল কোথা পেলি?'

তরলা তরল হাসলে। ছোট মেয়েটাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বললে, 'বাবা এয়েছিল। মা এ্যাত্গুনি আলোচাল, মুড়ির চাল আর ভাতের চাল বেঁধে দিয়ে-ছিল নাকি—একটা 'ন্যাটাল' এনেছে। ছেলেরা ভাঙবে বলে নাচতেছে।'

বুড়ী মা বললে, 'তোর শ্বশুর মিনসেটা, এত করে বলনু, রইলুনি।'...

স্নান করে এসে ভাত খেয়ে নিলে বিভূতি। একটু শোবার পর মালটা খোওয়া যাবার ভয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার এল সে নিমাইদের বাড়িতে। নিমাই বললে, 'মাল পড়বে সকালে। সারদা ঢালি নাকি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে গোবদ্যি সত্যচরণকে ডেকে নিয়ে গেছে।'

আজও তাহলে সারা রাতটা পচানী-বিহনে কাঁকড়া-কাছিম ঢুকবে না তার ঘেরিতে। নিরাশ মনে বিভূতি চলে এল।

সকালে গো-ভাগাড়ে গিয়ে চামড়া-ছাড়ানো গরুর লাসটা পেয়ে গেল বিভূতি। কখন নিমাই চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে তা কেউ দেখে নি। শিয়াল কুকুর জুটেছিল। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে ঠ্যাং-ঠোকনা কেটে যখন বস্তায় ভরে মাথায় তুলেছে একটি ছোকরা শুধোলে, 'কোন্ মুচি চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গেল দেখেছিস তুই?'

'কই না তো দাদা! আমরা পচামাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে যাই. কচ্ছপ ধরি।'

—'কচ্ছপ মাংস খায়?'

'হাঁ বাবা। আর কচ্ছপের মাংস খায় মানুষে।'

বিভূতি দ্রুত চলে এল বাড়িতে।

নৌকোয় বস্তাটা তুলে নিয়ে ধজি মেরে মেরে একাই সপ্তমুখী নদীর তীর ধরে চলে এল তার খাঁড়িতে। জোয়ার নেমে গেছে। শত শত ঘন-ঘন বাঁশের 'গোজে' ঘেরের মধ্যে একটাও কচ্ছপ নেই। ওপাশে চক্রধরের ঘেরির মাল তুলে নিয়ে চলে গেছে। হাড়গোড় পড়ে আছে।

জোয়ার ওঠবার অপেক্ষায় তীরের ওপরে বসে রইল বিভূতি। অদূরেই জংগল, তীরের ওপরে। কেঁদোবাঘ এসে টাঁক করে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই হল। বড় বল্লমটা হাতে করে ধরে থাকে সে। কেউ লোকজন নেই এখন।

বুড়ো চক্রধর আসবে জোয়ার লাগার সময়ে যদি আবার মাল পায়। হরকোচ, তেকাঁটাল আর ফণিমনসার ঝাড়টার পাশে শুয়েছিল একটা কুমীর। আস্তে আস্তে জলে নেমে গেল।

বিস্তীর্ণ নদীর বুকে জোয়ার লাগছে। চক্রধররা ক-বাপ-বেটায় এল।

বিভূতি উঠে বস্তার মাল খুলে ঘেরির মধ্যে ঢেলে পাথরে বেঁধে ছাড়িয়ে দিয়ে এল।

চক্রধর বললে, 'আজ আমরা কুকুর মেরে এনিচি রে বিগুতে। তোরেই কাল পোয়া-বারো। দুটো জোয়ার পরে মাল তুলিস—অনেক হবে।'

দুপুরের জোয়ার নামতে সেই সন্ধ্যে। ছ-ঘন্টা জোয়ার। তারপর রাত্রে যখন ভাঁটা পড়বে তখন কি তার ঘেরির মাল চুরি করে আনতে পারে চক্কুরেরা?

বুড়ো চক্কুরের ভীষণ সাহস। সাপ, বাঘ, কুমীর কাউকেই সে ভয় করে না।

তবে চক্কুরে বলে, 'রাতের বেলা কখনো ঘেরিতে যাবিনি বিগুতে। সোঁদর-বনের জংগলে থাকে মেজ্জাই শাঁকচুন্নি। তারা ঐ ঘেরির মাছ বা মাংস খেতে আসে। মানুষকে দেখলে, তার গলা টিপে রক্ত শুষে খেয়ে নেয়।'

বিভূতি হাসে। এসব শুধু তাকে মিথ্যে ভয় দেখানো। তবু ভয় করে। অন্ধকারের যেন আলাদা একটা জীবন আছে!

রাত্রে যখন সে বলে, 'যাব মা একবার ঘেরিতে—যদি চক্কুরে মাল তুলে নেয়?'

'দোহাই 'ধম্মের' বাবা, 'আন্তিরে' যাসনি। বাঘে খেয়ে ফেলবে, সাপে কাটবে, কিম্বা তোকে কুমীরে ধরবে। কাল সকালে যাস।'

সকাল কখন হবে কে জানে। লম্ফ জেবলে বসে থাকে বিভূতি। বিড়ি টানে ভীষণ তেজে বৃষ্টি এলে উলুর ছাওয়া পুরোনো ছাউনী থেকে ঘরের এখানে-ওখানে জল পড়ে। মা খসস্সস্—শব্দ করে খেজুর-চাটাই টেনে আনে। তার কাছে দুটো ছেলেমেয়ে ঘুমোচ্ছে। তরলাকে ডাকলেও সে জাগে না। তার হাঁ-করা মুখের ওপরে যখন জল পড়ে তখন ঘুম ভেঙে যায়। উঠে ছেলে দুটোকে নিয়ে দোরগোড়ায় বসে ঘুমোতে থাকে সে। লম্ফের তেল ফুরিয়ে গেছে। নিভে গেল। এখন এই বর্ষা অন্ধকারে যদি ঘরের পাশের জল-হোগলাবনের মধ্যে থেকে একটা পদ্ম গোখরো উঠে আসে তবে তাকে অন্ধকারে মারাই বিপদ।

একটা মাত্র টাকা সম্বল। দু টাকা হরকুলি দা তার এক দুর্বল মুহূর্তে ঝেড়ে ছাতাটা ঝোঁকে মাথায় কিনে ফেল হয় নি। তার গায় একটা গেঞ্জি বা নেই। জীবনে কখনো জুতো পায় নি। তরলার ক ছিঁড়ে গেছে। মুদিখানায় দেনা।

ভোর হয়ে আসতে নৌকো নিয়ে গেল বিভূতি। গিয়ে দেখলে চক্রধর নেমেছে তাদের কাছিম-ঘেরির মধ্যে।

বিভূতি দেখলে আর একটু দেরি হলেই ওরা তার মাল তুলে নিয়ে নিত। পলল মাটিতে পায়ের দাগ দেখলেই ঝগড়া তর্ক মারামারি খুনোখুনি বেধে যেত।

পাঁচটা বড় বড় কচ্ছপ পড়েছে বিভূতির ঘেরির মধ্যে। বল্লম হাতে নিয়ে সে গেলে কচ্ছপগুলো ফোঁ-ফোঁ করে শব্দ করে বেরিয়ে পালিয়ে যেতে গেলে বাঁশের বেড়ার মধ্যে আটকে যায়।

কয়েকটা সমুদ্রে-কাঁকড়া পড়েছে। একটা কুমীরের বাচ্ছা। বল্লম গেঁথে তাকে ঘায়েল করে দেয় বিভূতি। হাতে গামছা জড়িয়ে জড়িয়ে সমুদ্রে-কাঁকড়াগুলো ধরে ফেললে সে প্রথমে। একটা হাতে চিপটে ধরে কেটে দিতে চিন-চিন করে খুন বেরুতে লাগল। কচ্ছপ-গুলো উল্টে দিলে বল্লমের খোঁচা মেরে মেরে। তারপর সব এনে এনে নৌকোয় তুলে নিয়ে জোরে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে চলে এল নামখানার বাজারে।

'ও সোনার ভাবিরে
কি উপায় করি রে
তোর সনে মোর
ভাব রাখা দায়!'...

পাইকের তার মালকটা সব নিলে। তিরিশ টাকার কচ্ছপ আর পাঁচ টাকার কাঁকড়া। পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র পেলে সে একটা আড়াইশো টাকার গরু মেরে মুচিটা চামড়া বা 'খাল' বেচে পাবে ছ-টাকা।

সপ্তাখানেক হয়তো আর মাল পাবে না বিভূতি। কোথায় কার গরু পাবে আবার কে জানে।

—আবদুল জব্বর

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শেষ পর্বের জীবন

গত সংখ্যায় প্রখ্যাত ফরাসী লেখিকা দাম সীম দ্য বুভোর সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওলড্ এজ' প্রসঙ্গে তাঁকে বিখ্যাত সী পত্রিকা 'লা ম'দ' যে কয়েকটি প্রশ্ন ন তার কয়েকটি উত্তরসহ প্রকাশিত হ। এই সংখ্যায় বাকী প্রশ্নগুলি সহ পরিবেশিত হল।

মাদাম সীম দ্য বুভোর এই গ্রন্থটিতে বয়সের সমস্যা নিয়ে যে সুগভীর ানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন শ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে তা প্রায় দ্বিতীয় হত।

স্বভাবতই এই সব গ্রন্থাদির পিছনে নৈতিক অভিসন্ধি থাকে। তাই প্রশ্ন- । সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন যে, গ্রন্থটির ইনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে া? মাদাম সুদীর্ঘ উত্তরে বলেছেন, উপ- হার অংশটিকে অন্ততঃ সেই রকম খ্যা দেওয়া যায়।

প্রশ্ন : আপনার গ্রন্থটি যে রাজনৈতিক কথা কি স্বীকার করবেন?

উত্তর : উপসংহারটুকু হয়ত তাই ন্ততঃ সে রকম বলা চলে। আর আমার ্থরচনার প্রেরণাটুকুও রাজনৈতিক। ৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা জুড়ে আছে ্টি বিশেষ ধরনের বুড়ো মানুষের দল। নবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দরিদ্র এবং বৃদ্ধ নুষের সংখ্যা অনেক কম ছিল। যথা— ীস বা রোমের ক্রীতদাস সমাজ বা ফ্রান্সের ৃষাণ সম্প্রদায়। সাহিত্য তাদের সম্পূর্ণ পেক্ষা করে গেছে।

এর পরবর্তীকালে শ্রেণীসংগ্রামে দুটি শেষ শ্রেণীর বুড়ো মানুষ দেখা গেছে। ড়ো মানুষ সম্পর্কে দুটি বিভিন্ন ধরনের রণা গড়ে উঠেছে। একদিক থেকে বুড়ো নুষেরা পরম শ্রদ্ধেয়, তাঁদের রজত-শুভ্র কেশ সম্ভ্রম সৃষ্টি করে, মাথা ঘিরে হিমার উজ্জ্বল আলো—আর বাকী বুড়োরা কেবারে অকর্মা, অপদার্থ, শারীরিক দিক থকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত, বাহাত্তুরেপ্রাপ্ত ীমরথীগ্রস্ত বাতুলের দল। তরুণ সমাজ ণোক্ত শ্রেণীর বুড়োদের উপহাস করে, বজ্ঞা করে।

যাঁরা সুবিধা ভোগকারী ধনী সমাজের ন্তর্ভুক্ত, সেই সব বুড়োরা তাঁদের চার- পাশে শ্রদ্ধামণ্ডিত বার্ধক্যের এক মহিমা-মণ্ডিত মূর্তি রচনা করেন, যার পিছনে আছে সামাজিক, নৈতিক ও ব্যক্তিগত হেতু। সেইহেতু ও'দের সাহিত্য আছে, ও'দের সমর্থক নীতিবাগীশের দল আছেন। সিসেরো 'দ্য সেনেকটুটে'সহ, সেনেকা ইত্যাদি ইত্যাদিরা এই সব পরম শ্রদ্ধেয় বুড়ো মানুষের চিত্রকল্প রচনা করেছেন, এ'রা পরম পূজনীয় বৃদ্ধ সৃষ্টি করেছেন।

তথাপি উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ বুঝেছে যে, বুড়ো মানুষদের পরিপূর্ণ-ভাবে বলিদান করা হচ্ছে। তার সঙ্গে তাঁরা বুর্জোয়া মানবিকতাবাদ সংযুক্ত করেছেন। সুতরাং বুড়ো মানুষদের শ্রেণী বিভাগ হল, তাঁরা হলেন সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ এবং বয়স নিয়ে বয়স বিচার করে মানুষের গুণাগুণ বিচারে তারতম্য করা হতে লাগল। বঞ্চিত এবং শোষিত শ্রেণীর সুবিধার জন্য তারা ক্ষয়িষ্ণু বৃদ্ধের এক চিত্রকল্প রচনা করলেন।

প্রশ্ন : আপনি কি কোনো সমাধান স্থির করেছেন?

উত্তর : দেখুন! তার অর্থ সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন। অথচ স্ক্যান-ডিনাভিয়ান দেশসমূহে এই সমস্যা সমা-ধানের পদ্ধতিটুকু অনেক চমৎকার। অনেক দিক থেকে প্রশংসনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। নরওয়েতে বুড়ো মানুষদের অনেক দিন পর্যন্ত কাজে নিযুক্ত রাখা হয়। প্রায় সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। তবে, এই কাজ তাঁদের বর্ধিত বয়সের সামর্থ্যানুসারে শরীর-উপযোগী কাজ হয়ে থাকে। এই সব দেশে ভোগ্য পণ্যের ওপর অতিশয় চড়াহারে কর ধার্য করা আছে, আর এই সূত্রে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে বুড়ো মানুষদের জন্য উন্নত-তর বাসগৃহ এবং কাজে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য আদর্শ ব্যবস্থা হবে—(দুঃখের বিষয় সোস্যালিস্ট দেশ-সমূহেও এই ব্যবস্থা নেই), বুড়ো মানুষদের জীবনের সঙ্গে এমনই জড়িয়ে রাখতে হবে যে, তারা বেঁচে থাকার একটা অর্থ বুঝবে, জীবনে অনেক আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বুড়ো মানুষেরা অপরের জন্য কাজ করবেন এবং অপরে তার পরিবর্তে কাজ করবেন বুড়ো-বুড়িদের জন্য। এই সহযোগিতার পার-স্পরিক যোগ তাঁদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

বুড়ো মানুষদের পি'জরাপোলে পাঠানো হবে না। এইভাবে নির্বাসিতের জীবন-যাপন ক্লেশকর। বর্তমানকালে তাদের অবস্থা অনেকটা অন্তত প্যারিয়ার মত, তাঁরা সামাজিক অচ্ছুত। এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।

প্রশ্ন : বিদগ্ধদের বয়োবৃদ্ধি বিষয়ে কি বলেন?

উত্তর : যে সব বিদগ্ধ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এবং জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মানসিকতার ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে থাকেন তাঁরা অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের মানসিক সচেতনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। যে সব সৌভাগ্যবান মানুষের অতীত বৈদগ্ধ্যের আবহাওয়ায় লালিত, তাঁদের স্মৃতি, সহজ বিচার শক্তি, বোঝাপড়ার স্বাভাবিক শক্তি, বিশেষ ধরনের জ্ঞান প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্ষয় পায় না। মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস পায় শুধু তাদের ক্ষেত্রে যাঁদের মস্তিষ্কের ব্যবহার সীমিত।

যে মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে অতি সামান্য পড়াশোনা করে থাকে তার যখন ষাট বছর বয়স হবে সে ত' কিছুই আর পড়বে না।

বিদগ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে যা ক্ষয় পায় সে হল তাঁর সৃজনী শক্তি। তবে সকলের ক্ষেত্রে তা হয় না, আর সেই দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতূহলপ্রদ। দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে তথ্যাদি তেমন সুলভ নয়। যা আছে তা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। এই স্বল্পতথ্য নিয়ে বেশী দূর যাওয়া চলে না।

চিত্রশিল্পী আর সঙ্গীতবিদ্‌রা তাঁদের সৃজনী শক্তি দীর্ঘকাল সজীব রাখতে পারেন। ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়। দার্শনিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা। কিন্তু লেখক এবং তাঁদের চেয়ে আরো অনেক কম শক্তিমান হলেন গণিতবিদ্‌রা, এ'দের সৃজনী শক্তি বেশী দিন থাকে না। যৌবনকালে, বয়স যখন অনেক কম বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক আবিষ্কার করা